৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
২৪৭৮
কলিকাতা

একাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৩০—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

একাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—পৌষ—১৩৩০—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ (প্রতিবাদ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম-এ ২৯২
মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ (মাতৃ-মঙ্গল)—অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ, বি-এস, এম-এ, জি-এ ৪৩
মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা ৬৭৮
মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহের জের (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীঅনুরূপা দেবী ২৫০
[illegible]ধরা (কবিতা)—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৫৮৫
[illegible] (কবিতা)—[illegible]নীন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৫৬
[illegible]টক (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫৬
[illegible] (উপন্যাস)—[illegible]ন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৩, ২২৫, ৪১১, ৫৯৮, ৭৩৩, ৮৭৩
[illegible]দেবতা (কবিতা)—কামিনী রায় বি-এ ৬১০
[illegible]বাদ (দর্শন)—[illegible] শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ১
[illegible] (কবিতা)—শ্রী[illegible]নাথ বাকচি ৫৫৩
[illegible]ক আদর্শ ব্যায়াম সমি[illegible] (স্বাস্থ্যতত্ত্ব) ২৬১
[illegible])—শ্রী[illegible]পাধ্যায় ৬১১
[illegible]য় (কবিতা)—[illegible] শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ১১৩
[illegible] (কবিতা)—কুমারী [illegible] ২৮৭
[illegible] চিঠি (সমাজতত্ত্ব) [illegible] খাতুন বি-এ ৮৯৭
[illegible]তিক বিধান (সঙ্কলন [illegible] পাল রুদ্র এম-এ ৮৩৮
[illegible]ন কমলা ও মোম্বে বাজার (ব্যবসা বাণিজ্য) শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস-সি ৯৪৭
[illegible]র কথা (মাতৃ-মঙ্গল) সফিয়া খাতুন বি-এ ৫১
[illegible]র সঙ্গীতের সংস্কার (আলোচনা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৮০১
[illegible]বীণা (কবিতা)—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ ৮৯৩
[illegible] ও প্রাণ (বিজ্ঞান)—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি ৯৭
[illegible]য়া ১৪৫, ৪৫৮, ৭৮১
[illegible]া (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১১৪, ২৯৭, ৪২৬
[illegible] (শিল্প)—শ্রীবিশ্বকর্ম্ম[illegible] ১৩৫, ২৮১, ৪৫৪, ৬২৩
[illegible]তন আবিষ্কার (বিজ্ঞান)—শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্‌সি ৮৭০
[illegible]ত্র (গল্প)—শ্রী[illegible]তোষ ঘোষ বি-এল ২৪৮
[illegible]সকাল (ব্যঙ্গ-চিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ ৬৯৮
[illegible]বিতা)—শ্রীআ[illegible]তোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর বি-এ ৮৭৮
[illegible] (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৬০৩
[illegible]া ইউনিভার্সিটী ট্রেনিং কোর্স—বাৎসরিক ক্যাম্পিং (আলোচনা)—শ্রীপতুলচন্দ্র মজুমদার ১৪০
[illegible]ার গৃহ-সমস্যা (স্থাপত্য-শিল্প)—শ্রীমথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-[illegible] এম-আর-এ-[illegible] ৮৬, ৩৫৭
কুজ্ঝটিকা (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-সী-এস ৮০১
কৃষিজীবী ও মসীজীবী (বার্ত্তাশাস্ত্র)—সফিয়া খাতুন বি-এ ৪১৬
কোষ্ঠীর ফলাফল (বড় গল্প)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬, ৫৪৬, ৬৮৩, ৯৫১
খড়্গপুর (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ৮৮৯
গরুড় (পুরাণ)—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি ২০৭
গান (কবিতা)—শ্রীসত্যানন্দ দাশগুপ্ত ২৪৭
গার্গী (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দত্ত ৫৭০
গীতায় কর্ম্মযোগ (দর্শন)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৩২১
গৃহ-ধর্ম্ম (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীপদ্মাবতী দেবী-চৌধুরাণী ৮৭১
চতুর্দ্দশী (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল ৮৯৫
চয়ন ১৪২
চাঁদের কলঙ্ক (গল্প)—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি-এ ৭২৫
চা-খোরের গান (কবিতা)—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার ২২৪
চিত্রশালা—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মজুমদার ৭৪৫
চিরকুমার (ব্যঙ্গ-চিত্র) ৪[illegible]
জন্তু-যাত্রা (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৬১১
জাতি-বিজ্ঞান (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৭১৭
জাপানী আর্টের যৎকিঞ্চিৎ (সুকুমার-কলা)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ৫১০
তর্কে (কবিতা)—কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ ৫৭৮
দানের মর্য্যাদা (উপন্যাস)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৫৭, ১৬৮, ৩২৮, ৪৮৮, ৬৪৭, ৮১০
দারিদ্র্য (কবিতা)—শ্রীদেবরঞ্জন গুহঠাকুরতা ২২৮
দীনের দিল্লী-দর্শন (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৭৪০
দুই যা (কবিতা)—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ ৮৬৯
দুর্ভিক্ষ ও মানব-সংখ্যা (অর্থ-নীতি)—সফিয়া খাতুন বি-এ ৮১৮
দৈববাণী (কবিতা) শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ ৯৪৬
ধর্ম্ম ও পলিটিক্স ৮৯৯
ধ্যান (দর্শন)—শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল ১০২, ৫৫৪
নটবর (বড় গল্প)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ ডি-এল ৫০৩, ৬৬২, ৮২৪
নমস্কার (কবিতা)—শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী ২১৯
নর্ম্মদার দেশে (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু বি-এ ৩৮৩
নবজাতিবাদ ৫৯১
নবযুগ—সমাজ-সমস্যা (সমাজতত্ত্ব)—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ ২১৫
নব-বিধান (উপন্যাস)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১১, ৪৭৩, ৭৯৩
নব্যা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ ৩৯৯
নষ্ট মহিমা (ব্যঙ্গচিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ ৬৬১
নিখিল-প্রবাহ (বৈদেশিকী)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৭৪, ৫৭১, ৭৪৭, ১২৬
নিয়ম-রক্ষা (সমাজ-তত্ত্ব)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ ৭

পদার্থের ধর্ম্ম (রঙ্গ ও ব্যঙ্গ)—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ এম-এসসি ৫৬৫
পল্লী-সঙ্গীত-সংগ্রহ (সঙ্কলন)—সংগ্রাহক—মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন ৩৮২
পল্লী-সেবা (আলোচনা)—শ্রীকালীমোহন ঘোষ ২৭৫
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৈন্যগণের শিবির—শ্রীননীগোপাল সমাদ্দার ৮৮২
পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা (চিকিৎসা-তত্ত্ব)—শ্রীপঞ্চানন বসু এম-ডি (কর্ণেল) ৩৫৮
পুনর্ম্মিলন (কবিতা)—শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৫৬
পুস্তক-পরিচয় (সংক্ষিপ্ত সমালোচনা)—সম্পাদক ১৫৩, ৭১৮
পোলাও (সমালোচনা)—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই ৮৮
প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত এম-এ ৬৫
প্রণবাদিতে সকলেরই অধিকার (দর্শন)—সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা ২২৯,৪৮১
প্রাচীন ভারতের গৃহস্থ (আলোচনা)—শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী ৭১২
প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল ২৯৬
ভদ্রলোকের লক্ষণ (ব্যঙ্গ-চিত্র)—শ্রীমনীন্দ্রনাথ নাগ ৭১৬
ভাত-কাপড়ের কথা (বার্ত্তাশাস্ত্র)—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল ১৯৯
ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষা (সঙ্কলন)—শ্রীরামানুজ কর ২৮৬
ভারতীয় চিত্রবিদ্যা (প্রত্নতত্ত্ব)—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ১৬১
ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বর সম্বাদ (সঙ্গীত শাস্ত্র)—শ্রীবাণী দেবী ১৭৪
ভারতে চিনির ব্যবসায় (ব্যবসা-বাণিজ্য)—শ্রীশচীন্দ্রলাল সরকার ৩৭০
ভারতের বিদেশী বাণিজ্য (ব্যবসা-বাণিজ্য)—শ্রীমন্ত সওদাগর ১২৯,২৯৪,৪৪২
ভারতে বস্ত্র-বাণিজ্য (ব্যবসা-বাণিজ্য)—শ্রীশচীন্দ্রলাল সরকার ৭৮৫
ভাবের অভিব্যক্তি (ব্যঙ্গ-চিত্র)—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৪৩
ভুল (গল্প)—শ্রীসুধেন্দুবিকাশ দাস ৬৩৫
ভুশণ্ডির মাঠে (গল্প)—পরশুরাম—রচিত ৪৩৫
ভুশণ্ডির মাঠের পরিশিষ্ট (নক্সা)—শ্রীরামচন্দ্র ৭৪১
ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৪০০,৬৬৭
মনুষ্য-বিক্রয়-পত্র (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র এম-এ ৮৪৭
মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী (আলোচনা)—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ ৬১,৩৬৬,৫২০
মহাকবির শতবার্ষিকী (জীবন-কথা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ৭২৯
মহিষুর (ভ্রমণ-কাহিনী)—রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল ৮৫৬
মায়াদর্পণ (গল্প)—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ১৪৩
মায়াবিনী (গল্প)—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় ১১
মালয় শ্যামরাজ্য (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—অধ্যাপক শ্রীবিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ২৭
মেলানেশীয়া (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৭৬৭,৯০০
মৈত্রেয়ী (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দত্ত ২৮৫
যখের দেশ (বৈদেশিকী)—শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৮
যাঁতি-কল (গল্প)—মৌলবী তরিকুল আলাম এম-এ, বি-এল ৮৬১
রক্তের সম্বন্ধ (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ৮২৮
রাজা রামমোহন রায় (আলোচনা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ ৬৪১
রাধার লিপি (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ কবিগুণাকর বি-এ ৪২
বউ দেখা (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ২২০
বংশরক্ষা (গল্প)—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৮৫০
বক্‌শিশ (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ৮৮৭
বঙ্কিম-সাহিত্যে নৌকাযাত্রা (সাহিত্যালোচনা)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ ২২৪,৭০৭
বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ ৩৬৮,৪৫১
বন্ধন-মুক্তি (গল্প)—শ্রীভূপতি চৌধুরী ৫৩০
বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার শিক্ষয়িত্রী সমস্যা ও [illegible]দিগের শিক্ষা (মাতৃ-মঙ্গল)—অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়, এম-এ ২৫৪
বাঙ্গলা দেশ কাহার ? ৩৮১
বাড়ীর বৌ (গল্প)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৬৮১
বার্দ্ধক্যে কর্ম্মশক্তি (সঙ্কলন)—শ্রীরাধাচরণ দাস
বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের সমালোচনা (মাতৃ-মঙ্গল)—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ৩৩৭
বিজ্ঞান ও শিল্প (শিল্প-বিজ্ঞান)—শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এসসি, বি-এইচ-ইউ ৩৭৪
বিদ্যুতের বিদ্রূপ (গল্প)—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
বিপথে (গল্প)—শ্রীপ্রফুল্ল হালদার এম-এ ৫৯৩
বিপর্য্যয় (উপন্যাস)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল ১,১৭৮,৩৪৮
বিফলের সফলতা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩৫৭
বিরাট মূর্ত্তি (কবিতা)—শ্রীবিভূতিভূষণ দাস ৪৪৪
বিশ্বজগতের প্রাথমিক উপাদান (বিজ্ঞান)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু ৫৮৬
বেদনার সুর (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৮২
বেদের অগ্নি (দর্শন)—শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৭২২
বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব (ধর্ম্ম)—শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম এ, বি-এল ২৭২
ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয় কেন ? (অর্থশাস্ত্র)—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস ২১১
ব্যথার দান (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১৪
শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খনিবিভাগ ও উহার অধ্যাপক রবার্টস (জীবন-কথা)—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল এ-এম, আই-এম-ই ৫১৭
শিশু-মঙ্গল (মাতৃ মঙ্গল)—শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস ৫৩৬
শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (শিক্ষা)—শ্রীসত্যেন্দ্র-নারায়ণ গুহ বি-এ ৫৪২
শেষ (কবিতা)—শ্রীচারুলতা রায় ৩১১
শোক-সংবাদ ১৫২,৪৭১,৬৩২
শোকাশ্রু (কবিতা)—শ্রী'বীরকুমার বধ' রচয়িত্রী ৬
ষ্টীম এন্‌জিনের (Steam Engine) ক্রমবিকাশের ইতিহাস (বিজ্ঞান)—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল এ-এম, আই-এম-ই ২৩৯
সতী (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ৫৬
সত্যযোগ (সঙ্কলন)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৯৬
সম্পাদকের বৈঠক ১০৬,৩১৬,৪৬৪,৬২৭,৭৮১, ৯৩৭
সম্মিলনে সম্মেলন—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী ১২২
সহধর্ম্মিনী, না, দাসী ? ৪৫০
সহযোগ (গল্প)—শ্রীসরসীবালা বসু ৩৯২
সহস্রবাহু-মন্দির (প্রত্নতত্ত্ব)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২
সাইকেলে দিল্লী (ভ্রমণ-কাহিনী)—ক্যালক্যাটা টুরিষ্ট ক্লাবের ডায়েরী ২৬৫
সাধ (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬৬
সাময়িকী (আলোচনা)—সম্পাদক ১৫৬,৪৬৭,৬৩৩,৯৫৫
সাবধানী পুথিক (ব্যঙ্গচিত্র)—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস ৬৯৮
হিত্য-সংবাদ ১৬০,৩২০,৪৮০,৬৪০,৮০০,৯৬০
ইটালী ও (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ ৪১০,৫৫৭
সুনীল (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ৫৭৯
স্বপ্নাতসলিল (গল্প)—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস ২৫৯
স্বপ্ন (উপন্যাস)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ১৩১,২৮৮,৪৪৫,৬১৭,৭৬০,৯১৮
স্বপ্নতত্ত্ব (গবেষণা)—শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ, এল-এম-এস ৬২
স্বরলিপি (কথা ও সুর)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ১০৪
হটু ঘোষ (গল্প)—শ্রীধূর্জ্জটী অধিকারী ৩৭
হিন্দুর মৃত্যু ৩৬২
হোম্ পরব্ (ধর্ম্ম)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ৮৪৫

চিত্রসূচি

পৌষ—১৩৩০

মালয় রমণী ... ২৭
রবার বাগান ... ২৮
শিঙ্গাপুর বন্দর ... ২৯
পান্থ-পাদপ ... ৩০
বেতের ক্ষেত, কাতুং ... ৩১
"গোয়ালিয়র দুর্গে" বড় "সহস্রবাহু-মন্দির" ... ৩২
গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের গর্ভগৃহের তোরণ ৩৩
গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের থাম ও গম্বুজ ৩৪
গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের তোরণ ও প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্য ... ৩৫
গোয়ালিয়র দুর্গে ছোট সহস্রবাহু মন্দির ... ৩৬
ডাক্তার ফ্রেডারিক গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং, ইনস্থালীন ... ৭৪
ইনস্থালীনের প্রয়োগ, মানুষের ক্রমবিকাশ, পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ ৭৫
চীনের বাদামের দুগ্ধ ... ৭৬
নূতন নীড়েন, চুলে চেট খেলানো, রূপী-টুপী ... ৭৭
চুল কোঁকড়াবার ঝাড়, রূপ-দীপ ... ৭৮
জলসাইকেল, আবরু ছার ... ৭৯
শ্রীমতী ক্যাথারীন ব্রাইডেন, দাঁত ও নাক, মুখ, চোখ, কান, কণ্ঠ প্রভৃতির নিকট সম্বন্ধ ... ৮০
আলোক মুকুট, ভুল বসার দোষ, ঠিক বসার নিয়ম, শরীর বিজ্ঞানা-যায়ী চেয়ার নির্ম্মাণের আবশ্যকতা, চেয়ারে বসা ৮১
বিজ্ঞান-সম্মত চেয়ার ... ৮২
১নং চিত্র, ২নং চিত্র ... ৮৭
বড়ামুঙ্গা সর্দ্দার ... ১১৪
কঙ্কাল সৎকার, শ্রাদ্ধোৎসব ... ১১৫
স্তর-সমাধি, শোকসভা ... ১১৬
অস্থি-তর্পণ, স্ত্রী-আচার ... ১১৭
অস্থি-উৎসর্গ, নৃত্য-শিক্ষা ... ১১৮
সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি, শোকাকুলা ... ১১৯
কুটীর না কোটর, মৃত্যুশয্যায় ... ১২০
কঙ্কাল-কবর, শোভাযাত্রা ... ১২১
সমাধি-উৎসর, রোগীর চিকিৎসা ... ১২২
কুমুদ-কহ্লার শোভিত স্রোতস্বিনী, সিন্ধু-গাভী ... ১২৩
যাদুকর, মৌন-ব্রত ... ১২৪
ছিঙ্‌রে মাছ ... ১২৫
সুন্দর বর্ব্বর, সঙ্কীর্ণায় ... ১২৬
ক্ষতস্মৃতি ... ১২৭
অরুন্তাজাতীয় লোক ... ১২৮
দূর হইতে ক্যাম্পের দৃশ্য ... ১৪০
দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম, ক্যাম্পের দৃশ্য ... ১৪১
৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৫৩
৺সূর্য্যকুমার আগস্তি ... ১৫৪
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার এফ-আর-সি-এস ... ১৫৭

বহুবর্ণ-চিত্র

যম
পূজা
তালতলী
পাশা খেলা

মাঘ—১৩৩০

শ্রীযুক্ত এফ, সি, মানুক বার-এ্যাট-ল ... ১৬২
মন্দির ও শ্বেত মার্ব্বেল-প্রস্তরে নির্ম্মিত চত্বর ... ১৬২
হরধনুর্ভঙ্গ, ঝুলন, মানভঞ্জন ... ১৬৩
হরধনুর্ভঙ্গ—আর একটী দৃশ্য ... ১৬৪
দোললীলা ... ১৬৫
মুসলমান সমাজের বিবাহ-উৎসব ... ১৬৬
তাঞ্জাম আরোহণে সম্রাট ... ১৬৭
১ নং চিত্র ... ২৪০
২ নং চিত্র, ৩ নং চিত্র ... ২৪১
৪ নং চিত্র ... ২৪২
৫ নং চিত্র, ৬ নং চিত্র ... ২৪৩
৭ নং চিত্র, ৮ নং চিত্র ... ২৪৪
৯ নং চিত্র ... ২৪৫
১০ নং চিত্র ... ২৪৭
একাদশ সাইক্লিষ্ট ... ২৬৫
এটা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল সান্নিধ্যে, দিল্লী—রাইসিনায়, মোটর ভ্রমণকারীদের সহিত সাক্ষাৎ, এলাহাবাদ অতিক্রম ২৬৬
দিল্লী হইতে ২২৮ মাইল অন্তরে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভ ২৬৭
দিল্লী হইতে একশত মাইল অন্তরে, তাজ-ক্রোড়ে ... ২৬৮
ব্যায়ামবীর শ্রীমান বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৬৯
শ্রীমান বসন্ত...রাখিয়াছেন ... ২৭০
শ্রীমান বসন্ত...রাখিয়াছেন ... ২৭০
শ্রীমান বসন্ত...রাখিয়াছেন ... ২৭১
আষ্ট্রেলিয়া...তৃতীয় পর্য্যায়...রণরঙ্গ ... ২৯৭
কোড়োবোয়েড়ো, বড়মুণ্ডা সর্দ্দার, মৃত্যু-দণ্ড ... ২৯৮

বোড়া উৎসব (শিকার পর্ব্ব), বোড়া উৎসব (মন্ত্রপর্ব্ব) ২১৯
সবস্ত্রা নারীবৃন্দ, বোড়া উৎসব (নৃত্য-পর্ব্ব), পবিত্র উষ্ণীষ ৩০০
বোড়া উৎসব (ঔষধ-পর্ব্ব), মৃত্যুবাণ, কুইল্‌ল্যাণ্ডের মেয়ে ৩০১
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, বোড়া উৎসব (বৃক্ষ পর্ব্ব), কুইল্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী ৩০২
মশক মারক, যাদুদণ্ড অলঙ্কার ... ৩০৩
মৌনভঙ্গ ... ৩০৪
আল্‌পনা, যুদ্ধযাত্রা ... ৩০৫
সুন্দরী বীভৎসতা, কুর্দ্দাইছা ... ৩০৬
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ; ৩০৮
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বার-এট-ল, ... ৩০৮
মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বার-এট-ল ... ৩০৮
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বার এট-ল ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এমএ, বি এল, রাজা হৃষীকেশ লাহা ; শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ৩০৯
ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিএসসি ; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বার এট-ল, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩১০
রাজা মণিলাল সিংহ রায় ... ৩১০

বহুবর্ণ-চিত্র

জীবনের বোঝা
ফিরোজ শা-স্তম্ভ—গৌড়
হংস ও দময়ন্তী
বাদল সন্ধ্যা

ফাল্গুন—১৩৩০

মান গেট কামান গাড়ীর কারখানা—জব্বলপুর ... ৩৮৩
কামানিয়া গেট ... ৩৮৪
ভিক্টোরিয়া টাউনহল, ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ... ৩৮৫
ওয়াটার ফাউনটেন রোড ... ৩৮৬
জলাধার ... ৩৮৭
মদন মহল ... ৩৮৮
মার্ব্বেল পাহাড় ... ৩৮৯
জলপ্রপাত ... ৩৯০
চির-কুমার ... ৪০৯
সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড ... ৪১০
জুরিখ শহর ... ৪১১
ফিয়ার হ্বাণ্ড্ ষ্টেটার হ্রদ ... ৪১২
এঙ্গেলবার্গ শহর ... ৪১৩
লুৎসার্ণ শহর ... ৪১৪
পিলাটুস্ ... ৪১৫
আষ্ট্রেলিয়া, ব্যাঙ্ পর্ব্ব, ... ৪২৬
পিপীলিকা পর্ব্ব, মৌনব্রত উদ্‌যাপন ... ৪২৬
অগ্নি-পরীক্ষা, মহীলতা তীর্থ ... ৪২৮
"এমু" পর্ব্ব, অগ্নি পর্ব্ব ... ৪২৯
কড়োবড়ির মহল্লা, ভুজঙ্গ পর্ব্ব ... ৪৩০
কড়োবড়ি ... ৪৩১
'প্রিন্স' দ্বীপের লোক, কড়োবড়ীর মহলা ... ৪৩২
দড়ীর খেলা ! ... ৪৩৩
অভিনেতার দল, প্রস্তর দেবতা ... ৪৩৪
ভুশণ্ডীর মাঠে ... ৪৩৫
বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল ... ৪৩৬
লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল ... ৪৩৭
গোবরগোলা জল ছড়াইয়া চলিয়া যায় ... ৪৩৮
খেজুরের ডাল দিয়া রক ঝাঁট দিতেছিল ... ৪৩৯
সড়াক করিয়া নামিয়া আসিল ... ৪৪০
সব বন্ধকী তমসুক দাদা ! ... ৪৪১
সহধর্ম্মিণী, না দাসী ? ... ৪৫০
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বাগচি, ... ৪৫১
শ্রীযুক্ত অনিলবরণরায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ... ৪৫১
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ... ৪৫২
খাঁ বাহাদুর মৌলবী মুসরফ হোসেন, ... ৪৫২
শ্রীযুক্ত শৈলজানাথরায় চৌধুরী ... ৪৫২
শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার ৪৫২
শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী ৪৫৩
ফিতা-বোনা কল ... ৪৫৬
ডাক্তার শ্রীহরিধন দত্ত রায় বাহাদুর ... ৪৬৮
মহাত্মা গান্ধী ... ৪৭৩
৺লেলিন, ৺রাখালরাজ রায় ... ৪৮০

বহুবর্ণ-চিত্র

দোটানা
ছোট সোণা মসজিদের সম্মুখের নাম-বিহীন কবর—গৌড়
রত্নাকর
যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন

চৈত্র—১৩৩০

হাইজিন ... ৫১০
বাঘের ছবি, বানরের ছবি, দৃশ্য চিত্র ... ৫১২
দরুম (ধর্ম্ম) ... ৫১৩
সমুদ্রের ঢেউ ... ৫১৪
শঙ্করের গৃহস্থালী ... ৫১৫
চরনপুর কয়লাখনিস্থ...ছাত্রবৃন্দ, Coal Distillation Plant ৫১৭
অধ্যাপক রবার্টন ... ৫১৮
শঙ্করপুর কয়লার খনি ... ৫১৮
অধ্যাপক রবার্টন ও ছাত্রবৃন্দ ... ৫১৯
সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড্ ... ৫৫৭
গোটহার্ড পাসের রেলপথ ... ৫৫৮
গোটহার্ড পাসের উপর মোটর-পথ ... ৫৫৯
লোকার্ণো ... ৫৬০
ইতালির সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পল্লী—গাণ্ডিয়া ... ৫৬১
লুগানো হ্রদের পাহাড়ী উষা ... ৫৬২
সমুদ্রগর্ভে রেলপথ, আংটী ঘড়ী ... ৫৭১
কীট-পতঙ্গের যন্ত্রপাতি, তুরপুন, ছুচ, করাত, সাঁড়াশী, চিরুণী, ৫৭২
বঁড়সী, সাঁড়াশী (উকুনের যন্ত্র), সাঁড়াশী (মশার যন্ত্র), ক্রস ৫৭২
টোকীয়ো রাজপথের দুরবস্থা, অটল আবাস ... ৫৭৩
ইয়োকাহামা বন্দরের দুরবস্থা, হাওয়ার কল ... ৫৭৪
অতলের ফুল (ক), অতলের ফুল (খ), ... ৫৭৫
অতলের ফুল (গ), অতলের ফুল (ঘ) ... ৫৭৫
অস্ত্রোপচার টেবিল, পীড়িতের পালঙ্ক, বাষ্পাধার যন্ত্র ৫৭৬
দৃষ্টি-পরীক্ষা, দৃষ্টি দোষ ... ৫৭৭
দৃষ্টিনাশের কারণ, এক্সরের দ্বার ক্যানসার চিকিৎসা ৫৭৮
কঙ্গো সর্দ্দার ও তাঁর কয়েকজন স্ত্রী, কঙ্গো বালা, ... ৬০৩
রূপসী, পল্লীবাসিনী ... ৬০৩
হাতীর দাঁতের শিল্পী, সেকেলে যন্ত্রে রেকেলে শিল্প ... ৬০৪
গজদন্তের উপর পালিশ ... ৬০৪

শ্রীপুরুষের অঙ্গশোভা ... ৩৫
জান্দে যোদ্ধৃবৃন্দ, সুন্দরীর মুখশোভা ... ৬০৬
কেশবিন্যাস, ওষ্ঠালঙ্কার, মাঙ্‌বেতু দম্পতীযুগল ... ৬০৭
ফাঁসীর কাণ্ড, ডোম সজ্জা ... ৬০৮
রাজা মাঞ্জিয়া আভুঙ্গুয়া, সুসজ্জিতা কঙ্গো সুন্দরী ... ৬০৯
কংলী কাফ্রীর দল ... ৬০৯
রাজা আকন্দ, রন্ধন নিরতা কঙ্গো গৃহিণী, রাণী, নেন্‌জিমা ৬১০
পুষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী * * * পত্নীবৃন্দ, শত্রুপুত যোদ্ধা, মোঙ্‌গো দম্পতী ৬১১
কুম্ভকার শিল্প, সর্দ্দারের বাড়ী ... ৬১২
সর্দ্দার দাঙ্‌গা ... ৬১২
পান ভাঙা, শিকারী সম্প্রদায় ... ৬১৩
ভূতের ওঝা ... ৬১৪
বাদ্যকরের দল, শৃঙ্গ-বাদক, নিত্য সন্ধ্যায় নৃত্য উৎসব ৬১৫
নৃত্যপরা নর্ত্তকীর দল, বামন যোদ্ধার দল ... ৬১৬
মিঃ ডে ... ৬৩৪
গোপীনাথ সাহা ... ৬৩৪
যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৬৩২

বহুবর্ণ-চিত্র

জীবনের পথে
আরাধনা
বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই।
সাঁওতালি নাচ

বৈশাখ—১৩৩১

অমরকণ্টকের পথে প্রথম দৃশ্য ... ৬৫৬
ঐ দ্বিতীয়, তৃতীয় দৃশ্য ... ৬৫৭
ঐ চতুর্থ দৃশ্য ... ৬৫৮
অমরকণ্টক—কর্ণরায়ের মন্দির ... ৬৫৮
ঐ বংশকুণ্ড—নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান, ... ৬৫৯
ঐ কপিলধারা নর্ম্মদারজলপ্রপাত ... ৬৫৯
ঐ শোনমুড়া—শোননদের উৎপত্তিস্থান ... ৬৬০
নন্দ মহিমা ... ৬৬৬
কাবেরী জলপ্রপাত ... ৬৬৭
চামুণ্ডী মন্দির—মহীশূর ... ৬৬৮
মহারাজার কলেজ ঐ ... ৬৬৯
দরিয়া দৌলতের অভ্যন্তর ভাগ—শ্রীরঙ্গপত্তম্ ... ৬৭০
দাক্ষিণাত্যের একটি সুন্দররাম-মূর্ত্তি ... ৬৭৬
বার বার ফিরে যায়,..... ... ৬৭৭
পথ ভোল, পথ ভোল,..... ... ৬৮৯
আজকালকার বাবুদের মাথায়... ... ৬৯৮
মরাল সরোবর ... ৬৯৯
মহারাজার অন্দরমহল ... ৭০০
প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলেজ ... ৭০১
রঘুনাথজীর মন্দির ... ৭০২
রাজা হরিসিং এর জাইগির ... ৭০৩
গুমট গেট—সহর প্রবেশের প্রধান তেরেণদ্বার ... ৭০৪
রাজপ্রাসাদ—তোবি তীর হইতে ... ৭০৫
তোবি Tow নদীর উপর পুল ... ৭০৫
আজব ঘর ... ৭০৬
আপনি ভদ্রলোক ... ৭১৬
মাইকেল শ্রীমধুসূদন ... ৭৩০
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ফাণিম্যান) ... ৭৩৩
ফাণিমান...যুবতী মেমসাহেব ... ৭৩৩
ঐ...দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী, ফাণিম্যান...হাস্যরসিক ৭৪৪
ফাণিমান হাতুড়ে ডাক্তার ... ৭৪৪
ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ, ঐ প্রধান প্রবেশদ্বারের কারুকার্য্য ৭৪৪
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মূর্ত্তি, সৌধের দক্ষিণদিকের প্রবেশদ্বার ৭৪৫
স্মৃতি সৌধের প্রবেশ পথ, সৌধের—বারান্দা, ... ৭৪৫
সৌধের সম্মুখে লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তরমূর্ত্তি ... ৭৪৬
অধ্যাপক হার্ম, খুব্‌রি কাটা ডিম, দশদিন পরের অবস্থা, ৭৪৭
ডিমফেটেছে, ডিম্বের মধ্যস্থ ভ্রূণ, কুড়ি দিন পরের অবস্থা, ৭৪৭
ডিম ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে, ভ্রূণের বৃদ্ধি (আড়াই দিন), ৭৪৭
ডিমের গায়ে ঠোঁকর মেরেছে, ডিম্বজাত সদ্য শিশু ... ৭৪৭
ধাতুর রূপান্তর, মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর ... ৭৪৮
তাড়িত প্রবাহের প্রকৃতরূপ, পরমাণু সঙ্ঘের প্রতিকৃতি, ৭৪৯
পরমাণু সংঘর্ষ ... ৭৪৯
রূপ রেখা ও সুর সঙ্কেত, বেসুরের রূপ, অধ্যাপক মিলার ও যন্ত্র ৭৫০
বাঁশরী বনাম মুরলী, বাঁশীর সুর, সুরের রূপ ... ৭৫১
ক্লান্তির পরিমাণ পরীক্ষা, কুব্জতার কারণ ... ৭৫২
স্নায়ু পেশীর সঙ্গে শোণিত প্রবাহের সম্পর্ক, ... ৭৫৩
ছুটির আগের ও পরে অবস্থা, রক্ত প্রবাহের দেহ পরিক্রমণ ৭৫৩
অবসর যাপনে শরীরের উন্নতি, শব্দহীন পথ ... ৭৫৪
অধ্যাপক এইচ কোয়োগেল ও...যন্ত্র, ... ৭৫৫
ছাত্রেরা খপোত বিদ্যা শিখছে, ছাত্রের তৈরি খপোত ৭৫৫
স্বচালিত হ'ল, আলোর চারে মাছ ধরা, দেশালাই পরীক্ষা ৭৫৬
বাড়ীর নক্‌সা ... ৭৫৭
নূতন ধরণের বাড়ী ... ৭৫৮
নৃত্যভঙ্গী, মুখোস প'রে নাচ ... ৭৬৭
সুসজ্জিত নর্ত্তকের দল, মাফুলু গৃহিণীর কেশ বেশ ... ৭৬৮
বৃক্ষচূড়ে গৃহ নির্ম্মাণ, অন্য একরকম বেশ, ... ৭৬৯
গুপ্ত সমিতির সভ্যদের উৎসব বেশ ... ৭৬৯
নর কঙ্কালের অলঙ্কার, নানা কারুকার্য্য খচিত...বর্শাফলক, ৭৭০
হরেক রকমের হাতিয়ার ... ৭৭০
বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জে...মুখোস, ডানা সংযুক্ত মুখোস, ... ৭৭১
নীশায়ু দ্বীপে ব্যবহৃত করে ... ৭৭১
পর্ব্বোপলক্ষে...মেলানেশীয়া বাসিগণ, নৃত্যভঙ্গী, ... ৭৭২
উল্কীপরা কেরেতা মেয়ে ... ৭৭২
সলোমন দ্বীপের লোক, মাফুলু মেয়ের কবরী ... ৭৭৩
ভৌতিক...দল ... ৭৭৪
মেলানেশীয়ার মানচিত্র, বিবাহযোগ্যা কন্যা ... ৭৭৫
উৎসব বেশে সজ্জিত মেকিয়ো নারীদ্বয়, ঐ পুরুষদ্বয়, ৭৭৬
সমরসাজে সাজে সজ্জিত মেকিয়ো যোদ্ধৃদ্বয় ... ৭৭৬
বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের মাথাপেটা লোক, কায়েন্তা সম্প্রদায়ের দেবালয় ৭৭৭
নৃত্যসজ্জা ... ৭৭৮
বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের মুখোসধারী নর্ত্তক ... ৭৭৯
নৃত্য-সজ্জা ... ৭৮০
গ্রাফ্ ... ৭৮৮

বহুবর্ণ-চিত্র

মুক্তির পথে
ঝুলন
মাতৃহারা
অভিমন্যু

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩১

মহিষুর রাজপ্রাসাদ ... ৮৫৭
টিপুর সমাধি ... ৮৫৮
গাসপা জলপ্রপাত ... ৮৫৯
কাবেরী জলপ্রপাত—শিবসমুদ্রম্ ... ৮৬০
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সৈন্যদল ... ৮৮২
প্যারেড মাঠ, শিবির দৃশ্য ... ৮৮৩
শ্রীমান ননী ও মাখন ... ৮৮৪
করপোরাল বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী ... ৮৮৫
পাঁচকুমারী—খড়্গপুর ... ৮৮৯
জঙ্গল—খড়্গপুর, খড়্গপুর পাহাড় ... ৮৯০
খড়্গপুর হ্রদ, হ্রদে স্নান, উষ্ণ প্রস্রবণ (বড় কীকুণ্ড) ... ৮৯১
খড়্গপুর নদী, জল ঠাণ্ডা করা ... ৮৯২
আমাদের বাসস্থান—খড়্গপুর ... ৮৯৩
সমুদ্রযাত্রী তরণী, শোকাবসান কালীন বেশ ... ৯০০
অনাচ্ছাদিত কবর, উনানা যুবতী ... ৯০১
আবৃত কবর, মালাইতাবাসীর...কণ্ঠহার মালইতাবাসীর কর্ণাভরণ ৯০২
সন্তানবাহিনী জননী, আড্ডাবাড়ীর অভ্যন্তর দৃশ্য, ৯০৩
নর্ত্তকের গরুড় মুখোস ... ৯০৩
নৃত্যের...তরুণী, নববিবাহিত দম্পতি, গুপ্তসমিতির সাজঘর ৯০৪
শোকার্ত্ত কীবাই, দীক্ষার্থীর মুখোস, সর্দ্দারের সমাধি ... ৯০৫
মরণের করুণ নৃত্য, কালের করাল নৃত্য ... ৯০৬
কাষ্ঠের পান-পাত্র, রো রো শিরোভূষণ, শোকার্ত্ত কীবাই ৯০৭
দীক্ষার্থীর দল, বাদ্যযন্ত্র, শোকসূচক অবগুণ্ঠন ... ৯০৮
অন্ত্যেষ্টি-উৎসব, শবাসন ... ৯০৯
ভূত-নৃত্য, সমাধিস্তূপ, মুখোস খানা ... ৯১০
শবাধারে রক্ষিত মৃতদেহ, দৈবায়ত্ত নরকপাল, মন্ত্রপূত নরকপাল ৯১১
বর্শাফলকে মৎস্য ধরা, কর্ণবিদ্ধ শিশু, বল্কলবেশিনী বিধবা ৯১২
আড্ডাবাড়ীর বাহ্যদৃশ্য ... ৯১৩
স্মারক-মূর্ত্তি ... ৯১৪
বিবাহ-যাত্রীর মিছিল, গভীর শোক-সজ্জা, তীর্থভূমি ... ৯১৫
ডমরু ও চক্রদন্ত, অগ্নি-প্রক্ষালন ... ৯১৬
কর্ণাভরণ ... ৯১৬
মাছধরা ফাঁদ ... ৯১৭
বিক্ষত ললাট রাণক ... ৯১৭
চূর্ণের ডিবে ... ৯১৭
মূল সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯২২
সাহিত্যশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায়, জলধর সেন বাহাদুর ৯২৩
দর্শনশাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ ৯২৪
বিজ্ঞানশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল চৌধুরী ৯২৪
ইতিহাসশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ ৯২৫
ডাক্তার ফিলিপটমাস, শৃঙ্গধর কীট, গুব্‌রে পোকার মুখ, ৯২৬
কাঁচপোকার মুখ ... ৯২৬
ফড়িঙের মুখ, খড়্গকীট, মাছির মুখ, মাকড়শার মুখ, ৯২৭
মৌমাছির মুখ, ছারপোকার মুখ ... ৯২৯
ইঁদুরের মুখ, ইঞ্জিনের.....আসছে, পাইপের.....হচ্ছে ৯২৯
রেল.....গুঁড়ো, কয়লার গুঁড়োর ছাঁকনী ... ৯২৯
ছাঁকনীতে জল, ভীত্র শক্তিসম্পন্ন এক্সরে দীপ,
তপ যৌবনের চিকিৎসা, যক্ষ্মার প্রতিকার ... ৯২৯
বসন্তের প্রতিষেধক, নূতন জগৎ, প্লেগের প্রতিষেধক ৯৩০
বংশগতগুণ ১ম পুরুষ, ২য় পুরুষ, ৩য় পুরুষ, ৪র্থ পুরুষ ৯৩১
ঐ ৫ম পুরুষ, ছেলে না মেয়ে, হিরাম ম্যাক্সিম্ ... ৯৩২
ঘুমের ঘোরে বেতার, সুড়ঙ্গ পথে বেতার, ... ৯৩৩
এপারে ওপারে বেতার আলাপ, খনি গর্ভে বেতার ৯৩৩
ধাতুর বার্দ্ধক্য, জলের ক্যামেরা, বায়ুর গতিবেগ নির্ণয় যন্ত্র ৯৩৪

বহুবর্ণ-চিত্র

বীণাবাদিনী
বসন্তের আগমন
বুদ্ধ ও জরা
দেবদাসী

ভারতবর্ষ



যম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

২৪৯৮

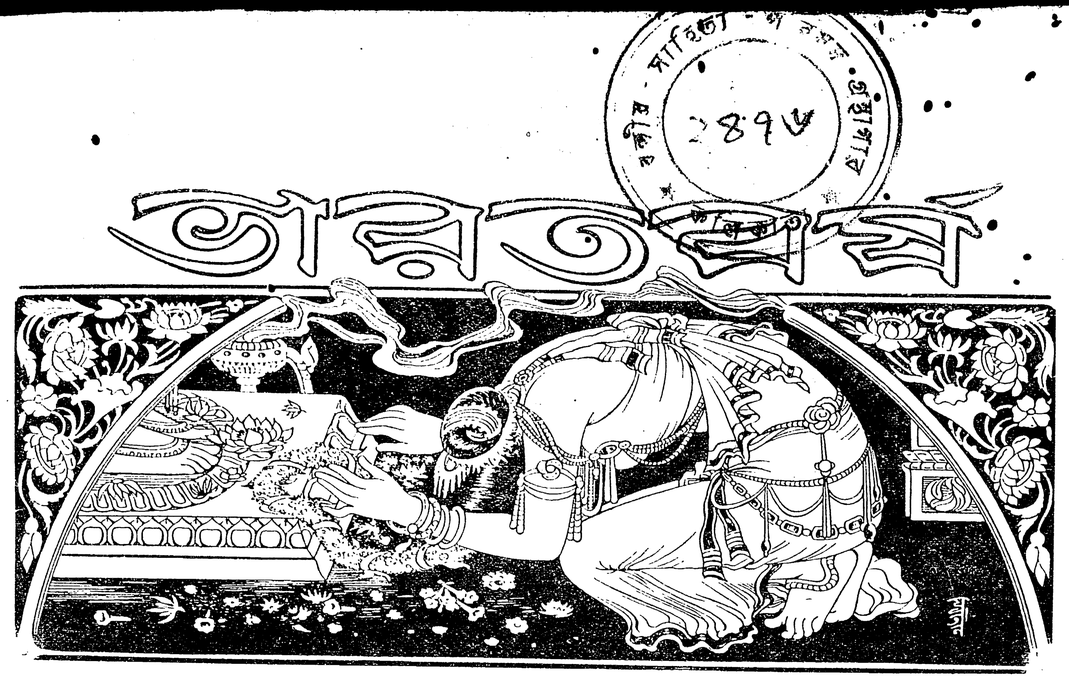

পৌষ, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

অবতারবাদ

অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

অবতারবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা ও সংস্কার বশতঃ যাহা নিজের মনে বুঝিয়াছি, তাহাই এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি সমস্তই আমার নিজের; তবে বিশ্ব-মানবের চিন্তার ধারা হইতে কয়েকটি ধারণা সঙ্কলন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনও সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অবতারবাদকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করি নাই, বা অস্বীকার করি নাই। অবতারবাদ বিশ্ব-জনীন হইলেও, ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য দেশে ইহা বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিতে গেলেও, যে দেশে যে ভাব আদৃত হইয়াছে, তাহার যথা-স্থানে উল্লেখ অনিবার্য্য। তবে ভারতবর্ষের সভ্যতার সহিত অবতারবাদ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট; সেই কারণে স্বদেশীয় ভাবগুলির অবতারণা করিয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য ভাবগুলির বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু সভ্যতার মূলমন্ত্রগুলি অল্পের মধ্যে জানাইতে গেলে, আমরা তিনটি কথায় ইহার সূচনা করিয়া থাকি:—চতুরাশ্রম, বর্ণাশ্রম ও অবতারবাদ। আর্য্যগণ জীবনের স্তরে-স্তরে উন্নতির জন্য চতুরাশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে সমাজবদ্ধ হিন্দু-সন্তানদিগের মধ্যে সাংসারিক জীবনে আর্থিক ঐক্য (solidarity) ও আন্তরজনীন নির্ভরপরায়ণতা (interdependence) থাকে, অথচ জাতীয় জীবন সমগ্র শক্তির কেন্দ্র হইতে পারে, তাহার জন্য বর্ণাশ্রম। চলিত ভাষায় কথাটি জাতি-ভেদে পরিণত হওয়ায়, ও কালের দুর্ব্বিপাকে ইহা বিকৃত হইয়া যাওয়ায়,

ইহার মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; নচেৎ ইহা সমাজ-রক্ষার এক সুমহৎ সঙ্কল্প। ধর্ম্মকে উন্নতিশীল করিবার জন্য, এবং নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও যুগ-ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাহায্যে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, অবতারবাদের সৃষ্টি মোট কথা, চতুরাশ্রম, বর্ণাশ্রম ও অবতারবাদ আত্ম-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য হিন্দু-সভ্যতার তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী। প্রথম দুইটি কার্য্যে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বা হইতে পারি নাই, তাহার আলোচনা এস্থলে প্রশস্ত নহে। তবে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য বা ধর্ম্মকে জীবনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে যুগে-যুগে আমাদের দেশে অবতারগণ আসিতেছেন, তাহা আমরা বর্ত্তমান কালেও অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

"অবতার" কথাটির অর্থ কি? ঈশ্বর জগতে জীব-রূপে অবতীর্ণ হ'ন। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, এস্থলে ঈশ্বর অর্থে সগুণ ঈশ্বর—যিনি নিজেকে স্বপ্রকাশ করিতেছেন। সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের মধ্যে যদি কিছু প্রভেদ থাকে, তাহা আমরা বলিতে পারিব না; কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে কি গভীর যোগাযোগ আছে, তাহা মানবের ভাষায় জানান যায় না। তবে অনুভূতির দিক্ হইতে ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের রূপ, রস বা গুণ যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ধারণা করি, তখন আমরা সগুণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকি। যখন রূপ, রস বা গুণের প্রাচুর্য্য বা অভাব আমাদের অন্তরে উপলব্ধ হইয়া থাকে, যখন আর দেখিবার বা বুঝিবার কিছু থাকে না, তখন আমরা নির্গুণ ঈশ্বরের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ি। অতএব নির্গুণ পরমেশ্বরের কাছে যাইতে গেলেও, সগুণ ঈশ্বরের পরিচয়-লাভের প্রয়োজন হয়।

সগুণ পরমেশ্বরের প্রকাশ সত্য, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের ক্রম-বিকাশের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া থাকে। ঈশ্বরের সত্য রূপ ইতিহাসে ও বিজ্ঞানে মানব-অভিজ্ঞতার ধারা অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠে। তাঁর সৌন্দর্য্য প্রকৃতির অন্তরাল হইতে মানব-মনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রেম বিশেষ করিয়া অবতার-দিগের ভিতর দিয়া আমাদের চিত্তকে উপচাইয়া দে'য়। মানুষ চিন্তাশীল অবস্থায় ঈশ্বরের সত্য রূপ বুঝিতে সমর্থ হ'ন। শিল্প-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বা সৌন্দর্য্যের পূজারী হইলে, নানাবিধ কলায় ও প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু যখন নিজের শক্তি তাদৃশ স্ফুরিত হয় নাই, অথবা চেষ্টা দ্বারা শান্তি লাভ করা যায় না, তখন ঈশ্বর-দর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় তাঁর প্রেমে আত্মসমর্পণ করা; এবং সে শুভ বাতাস এ পৃথিবীতে কালে-কালে বহাইবার জন্য অবতারদিগের আগমন।

এক্ষণে দেখা যাক্, অবতারবাদের তাৎপর্য্য কি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝিয়াছি যে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার চিরন্তন অভেদ ভাব রক্ষা করিবার জন্য ইহা এক নিগূঢ় কৌশল। পিতা-মাতা যেমন সন্তানের জীবনে বাঁচিয়া থাকেন, সেইরূপ সৃষ্টির মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ধরা দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি যদি কেবল আমাদের ভিতরেই স্বপ্রকাশ হ'ন, আমাদের বাহিরেও উপস্থিত হইয়া আহ্বান না করেন, তাহা হইলে আমরা অন্তরে বাহিরে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব কি করিয়া? মানুষও ত ধর্ম্ম-জীবনে বহি-র্জগতের সহিত একাত্মবুদ্ধি ছাড়িতে পারেন নাই—বরং ধর্ম্মের ইতিহাসে এই আকাঙ্ক্ষার ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই মানব-জাতির ভ্রাতৃত্ব,—মানুষ যে দিন হইতে স্বার্থের গণ্ডির উপরে উঠিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, সেইদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধ মানবকে জীবের সহিত একাত্মবোধে দীক্ষিত করিবার জন্য "অহিংসা" মূলতন্ত্র দিয়া গেলেন। কয়েক শতাব্দী পরে শ্রীগৌরাঙ্গ চরাচর-ব্যাপী জড়-চেতনার সহিত মানব-মনকে একীভূত করিবার জন্য আত্ম-পর-জ্ঞান-বর্জ্জিত ও বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হইতে আদেশ দিয়া গেলেন। মানুষের অন্তর-প্রকৃতির পক্ষে যদি এইরূপ অভেদ-ভাব সহজ-সাধ্য ও সকল রকমে প্রীতিজনক হইতে পারে, তাহা হইলে সেই পরম পিতার, জীবের সহিত লীলা করিবার যে আগ্রহ ও আনন্দ, তাহা কি ততোধিক ভাবে স্বাভাবিকও কল্যাণজনক নহে?

আমাদের মনে হয়, বড় যদি ছোটর সহিত মিলিত হইতে না পারে, সিন্ধু যদি বিন্দুকে আকর্ষণ না করে, যদি অসীম ও সসীমের অবিচ্ছেদে যোগ না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ঐক্য একেবারেই অসংলগ্ন ও অশান্তি-মূলক হইয়া পড়ে। তবে এইরূপ ছাড়াছাড়ি ভাব যে

জগতে কদাপি ছায়া বিস্তার করে না, তাহা নহে। চিত্তের এইরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দুঃখ, তাপ প্রভৃতি ও জীবের নানা প্রকার দুর্গতি জন্মলাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় জীব অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকে, যেন বিধাতা নাই, তাহার আত্মশক্তিও লুপ্তপ্রায় এবং দুর্দ্দান্ত সংসারই এক-মাত্র সত্য। এতাদৃশ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় সৃষ্টি কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানরাজ্যে দুইটি পথের ইঙ্গিত পাই—Revolution (প্রলয়) ও Evolution (বিবর্ত্তন)। প্রলয়কালে কষ্টের অবধি থাকে না। বিবর্ত্তনের মধ্যেও ডারউইনের মতে কত মারাত্মক প্রতি-যোগিতা বর্ত্তমান। আমাদের শান্ত মন এ সকল বাস্তবতার দ্বন্দ্বের মধ্যে কার্য্য-পদ্ধতি ও কর্ম্ম-কর্ত্তাকে খুঁজিয়া পায় না। আমাদের বিশ্বাস, মঙ্গলসূচক পরিবর্ত্তন বাস্তব-জগতে সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে, ভাবজগতে উন্মেষ লাভ করিয়া থাকে। বিপদের সময়, অথবা প্রয়োজনের সময়, পরমে-শ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সৃষ্টির সহিত মিলিয়া গিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু সেই মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টিকে প্রয়োজন মত নিয়োজিত করিবে কে? ব্যক্তিগত জীবনে দেখিতে পাই, দুঃখের মধ্যে দরদীর স্পর্শ পাইয়া জীব সুস্থ হয়; কিন্তু সেই দরদীর প্রাণ বেদনা-অনুভবকারীর চেয়ে কত শক্তিশালী! সেইরূপ জাতীয় জীবনে বা বিশ্ব-হিতার্থ অবতারগণ দেখা দে'ন—যাঁদের মন সম-সাময়িক কালের সমস্ত দুর্দ্দশা ধারণা করিতে সমর্থ। যতটুকু বুঝিয়াছি—তিনি তাঁহার যুগের মনের মানুষ, জাতীয় বা বিশ্ব মনের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়, সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, জগৎ সুন্দর হয়,—যিনি "শিবম্" তাঁর নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের আভাস দিতে গিয়া গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

পাঠক-পাঠিকাগণ হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাস্তব-জগতের বিবর্ত্তন ও প্রলয়বাদ ভাব-রাজ্যের সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধনের ইচ্ছার সমষ্টিগত ফল মাত্র। অন্তরে যে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এবং মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গলের ধ্বংস হইতেছে, তাহারই অনু-রূপ ক্রিয়া বাহ্য-জগতে সম্পন্ন হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এইখানেই মীমাংসার চরম নহে। অবতারের আগমনে সাধুগণ রক্ষা পাইবেন, ও দুষ্কৃতগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহা ত ধর্ম্ম-সংস্থাপনের অঙ্গীভূত ফল। কিন্তু দুষ্কৃতগণের সংহারকার্য্য আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে মতের অনৈক্য দেখিতে পাই। মহাপ্রভু যীশু বলিয়াছেন, "তোমরা দুর্জ্জনের প্রতিরোধ করিও না।" তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়াছিলেন—তাই বলিয়া কি স্বর্গীয় ধর্ম্মের অবতারণা করিতে পারেন নাই? আমাদের মনে হয়, যিনি অমঙ্গলের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম-স্থাপন করেন, তাঁহাকে গীতার উক্তি অনুসারে "অবতার" বলা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করেন, তিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাগবতের গোপাল ভক্তের হৃদয়-পুতলি,—ভক্ত তাঁহাকে শ্রীভগবানের আসনে না বসাইয়া কোন মতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না।

অথচ উভয়ত্রই শ্রীকৃষ্ণ একই ব্যক্তি! ইহা কিরূপে সম্ভব? আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সাময়িক লক্ষ্য ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াসী, সেইরূপ, যাঁহারা পুরুষোত্তম, তাঁহারাও খানিকটা নিজ সময়ের পরিবর্ত্তনের নেতাস্বরূপ এবং আংশিক ভাবে জগতের চিরকালের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারের ব্যাপারী। যিনি নিজ যুগের, তিনি ধর্ম্মের ইতিহাসে অবতার। যিনি যেভাবে চিরকালের আদর্শ স্বরূপ, তিনি সেই হিসাবে ভগবানের সহিত জড়িত। উদা-হরণ দ্বারা কথাটা বোঝা যাক্! পুরাণে দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, বরাহ ইত্যাদির উল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারা, আমাদের মনে হয়, সংগ্রাম করিয়া জগতকে আদিম অবস্থায় উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণু বা রক্ষণশীল দেবতার অংশ বিশেষ। আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি নামও অবতারদিগের মধ্যে ধরা হইয়াছে। অথচ আংশিক হিসাবে ইঁহারা নিজ যুগ ছাড়িয়া চিরন্তন ভাবে মানব-মনে স্থান জুড়িয়া আছেন। এবং এই ভাবে তাঁহারা অবতারেরও বাড়া; ইঁহাদের ভগবানের অংশ বলিতেও ভাবুক জন কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের মনে হয়, যীশুকেও যে তাঁর ভক্তগণ ভগবানের অংশ বলিয়া

চিনিয়া ল'ন, তাহাও এই হিসাবে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যীশু মন্দের প্রতিরোধ করিবার বিধান না দিলেও, দুষ্কৃত ব্যক্তি যে কিরূপে দাবাগ্নির মধ্য দিয়া আত্ম-শুদ্ধির পথে অগ্রসর হ'য়, তাহার আভাস দিতে ছাড়েন নাই। তবেই দেখা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-জগতেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী, যদিও খৃষ্টের জীবন আমাদের কাছে প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অবতারদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, মনের মধ্যে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—তাঁহাদের পরস্পরের জীবনগত আদর্শ বা বাণীর মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিংবা প্যালেষ্টাইনে বা আরব দেশে কিংবা অন্যান্য দেশে যুগ-ধর্ম্মের ধারা কিরূপে প্রবাহিত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন। সাময়িক হিসাবে আলোচনা করিতে গেলে, নিজ-নিজ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাবে অবতারদিগের চরিত্রগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সকলেই ধর্ম্মপিপাসু ও ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রয়াসী; তাহা সত্য; কিন্তু সকলেই এক জিনিষ লাভ করেন না, বা প্রচার করেন না। আমাদের দেশেই দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করিলেন, গুরুগোবিন্দ শক্তি লাভ করিলেন, আবার আমাদের নিমাই প্রেমে গলিয়া গেলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে এক-একটি মণির মাল। সাধারণ মানুষ তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হ'ন। আমরা অবাক্ হইয়া যাই—একই ভগবানের রাজত্বে এতপ্রকার ভিন্নপন্থী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা কিরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। ভিন্নতার মধ্যে যাঁহারা অভিন্নকে পা'ন, রূপের মধ্যে যাঁহারা অরূপের আস্বাদ পান, তাঁহারাই নিত্য-নূতন অভিব্যক্তির মধ্যে সেই চির-পুরাতনের প্রকাশ বুঝিতে সমর্থ হ'ন। আমরা শুধু লক্ষ্য করিয়াছি, অবতার-দিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বড়ই সহৃদয় ভাব প্রতিভাত হইয়াছে। সমসাময়িক সাধুজনের ত কথাই নাই, যাঁহারা কালভেদে বিচ্ছিন্ন, তাঁহাদের মধ্যেও হৃদ্যতা দেখা যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই, একজন অবতার আসিবার পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া যা'ন। আমাদের ঋষি-কবি চণ্ডী-দাসও এক শতাব্দী পূর্ব্বে গৌরাঙ্গদের লীলার কথা ভাবের ঘোরে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গেলেন। এইরূপে প্রত্যেক দেশেই ধর্ম্মনেতৃগণ যেন সকলে মিলিয়া এক বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া আছেন। প্রেমের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাঁহা-দিগকে অভিন্ন-হৃদয় করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তাঁহাদিগকে শুধু জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সকল জাতির সকল মানবের বন্ধু তাঁহারা; কাল বিশেষে বা দেশ বিশেষে তাঁহাদের কাহারও প্রভাব সীমাবদ্ধ নহে। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি যেমন কোন দেশ বিশেষের নহে, সমগ্র জগতের উপকারী দেবতা; সেইরূপ অবতারগণ সকল গৃহে সকল সংসারে অবতীর্ণ আছেন ও থাকিবেন। যিনি তাঁহাদের লইয়া সম্ভোগ করিতে পারিবেন, তাঁহারই পরিতৃপ্তি দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এইরূপে অবতারগণ যুগে-যুগে পৃথিবীতে আসিয়া মানবের আদর্শ স্থল হইতেছেন। তাঁহারা ঈশ্বর হইতে আসেন, আবার ঈশ্বরে ফিরিয়া যা'ন। তাঁহাদের এই ফিরিবার পথটুকু, তাঁহাদের জীবনে, আমাদের হিতার্থ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই পথে কি করিয়া চলিতে হয়, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা শুধু তাঁহাদের জীবনের চরম অবস্থা সম্বন্ধে যেটুকু সাধারণ ভাবে আলোচনা করিতে পারি, তাহাই বলিব। তাঁহাদের কাহাকেও দেখা যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান অহরহ অর্জ্জন করিয়া সেই ভাবে ভগবানকে আত্মস্থ করিতেছেন। কেহ বা ঈশ্বরের নিকট হইতে মনকে টানিয়া লইয়া, নিজেকে আহুতি দিয়া, জীবে দয়া বিলাইয়া, অবিনশ্বর ধামে অগ্রসর হইতেছেন। আবার হয় ত কেহ প্রেমের আতিশয্যে বিশ্বকে ছাড়াইয়া, জীবনের সকল সম্পর্কে ঈশ্বরের ভালবাসা আস্বাদন করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া আছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের ভাষায় বলিতে গেলে, এই তিন অবস্থাকে আত্মানুভূতিতে ঈশ্বর দর্শন, বিশ্ব-অনুভূতির ভিতর দিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ, ও লীলা বলা যাইতে পারে। এই তিনটি অবস্থা হইতে অদ্বৈতবাদ, নির্ব্বাণ ও ভক্তিমার্গ মানব-মনে সচরাচর পরিকল্পিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে শঙ্কর, বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই তিন ভাবের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে সচেষ্ট হ'ন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস, সকল অবতারের মধ্যেই এই তিন অবস্থা

একাধারে বর্ত্তমান আছে। তবে ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়া বিশেষত্বটুকু বুঝিতে যাই বলিয়া সামঞ্জস্যের দিক্‌টা আমাদের চক্ষে পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা খৃষ্টের কথা বলিতে চাই। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, "আমি এবং আমার পিতা একই।" আর এক স্থলে তাঁহার শিষ্যেরা যখন তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভো, আমাদিগকে পিতার দর্শনলাভ করাইয়া দিন" তখন যীশু উত্তর করিলেন, "এতদিন আমি তোমাদিগের সঙ্গে আছি, তথাপি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দর্শন করিল সে পিতাকে দর্শন করিল। তবে আমাদিগকে পিতার দর্শনলাভ করাইয়া দিন এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ?" এ অবস্থায় আত্মানুভূতির ভিতর দিয়া ঈশ্বর দর্শনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া খৃষ্ট অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন না কি? এক্ষণে কোন খৃষ্ট-ভক্ত শঙ্কিত চিত্তে বলিতে পারেন, "সাধারণের পক্ষে তাঁহার অবস্থা অনুধাবন করা সাধ্যাতীত।" আমাদের কিন্তু মনে হয়, যদি সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের মত পূর্ণ হইতে অক্ষম হ'ন তাহা হইলে যীশু কখনও বলিতেন না, "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ (perfect), তোমরাও তেমনই সিদ্ধ হও!" অন্য দিকে, বিশ্ব-অনুভূতির পথ ধরিয়া কি ভাবে বিশ্ব-প্রেমিক খৃষ্ট, আত্মবলি দিয়াছিলেন ও শত্রু-মিত্র সকলকে সমভাবে প্রেম করিতে বলিয়া গেলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তা'ছাড়া শিশুদিগকে কাছে টানিয়া, পতিতাকে উদ্ধার করিয়া, শিষ্যদিগের সেবা করিয়া কিরূপে তিনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদন করিয়া লীলা করিলেন ও জীবনের সকল সম্পর্কে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে বলিলেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, এই তিনটি অবস্থার চরমে পৌঁছিয়া সকল অবতার জীবন্মুক্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত এই ত্রিধারার স্রোতে জীবন ভাসাইতে প্রত্যেক মানবই সমর্থ। এইরূপে অবতারগণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। একজন ভারতবর্ষীয় ভক্ত বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যে পরিমাণে খৃষ্টে, খৃষ্ট যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বর সেই সেই পরিমাণে আমাতে।" প্রত্যক্ষভাবে ভালবাসিতে পারিলে, এ অভিমত সকল অবতারের সম্বন্ধে সত্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য অবতারবাদের যখন নানা ভাবে সাদৃশ্য দেখিলাম, তখন ইহাদের প্রভেদটুকু লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

ভারতবর্ষের ধার্ম্মিকমণ্ডলী অবতারগণের কৈশোরলীলা ও মধ্যলীলার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। পাশ্চাত্য ভক্তগণ খৃষ্টের অন্ত্যলীলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকেন; তাঁহার বাল্যকালের বা যৌবনকালের বিশেষ খবর রাখেন না। জীবন-লীলার মাধুর্য্য অফুরন্ত; সেইজন্য ভারতবর্ষের ভক্ত-গণের নিকট অবতারগণের সংখ্যা সামান্য নহে। মৃত্যুর আবরণ প্রত্যেকের জীবনে অভিনব হইলেও, ইহার একটি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র পাশ্চাত্য জগতে সৃষ্ট হইয়াছে; এবং খৃষ্টের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জনের ভাষায় বলিতে গেলে :—

"যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখি-জল ললিত গাথায়।"

খৃষ্টভক্তগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট হ'ন নাই। তাঁহারা নানা ভাবে ক্রুশের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ স্থলে সে সমস্ত মতামতের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। শুধু নমুনা স্বরূপ, হিন্দুসন্তান স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এতাদৃশ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The Figure of the cross :—My will is represented well by a straight line—thus, running from birth to death in unbroken current through the flesh and the world in all manner of self-indulgence into the hidden abyss. God's will is represented by a perpendicular I thus, falling from heaven like a bolt of thunder. The two wills meet and from the figure of the cross + thus. It cuts me, severs me, hinders me, clogs me, compels me; but thy will, O God, saves me. That cross means the life and death of the son of God; "for me", therefore, "to live is Christ and to die is gain." (Heart beat, P. 59) তবেই দেখা যাইতেছে খৃষ্টের অস্থিমলীলা খৃষ্ট-ভক্তদিগের নিকট জীবন-সর্ব্বস্ব।

ভারতবর্ষীয় ভক্তগণের নিকট মৃত্যুর এই জ্বালাময়ী চিত্র ততটা হৃদয়গ্রাহী নহে। আমাদের মনে হয়, ইহা

শুধু আত্মজ্ঞানের পার্থক্য। যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ইহলোকের সুখ-সম্পদের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করে, তাঁহাদের কাছে প্রত্যেক দিনটি মন্দের আধার, সমগ্র জীবন পরীক্ষাস্থল এবং ক্রুশই একমাত্র অবলম্বন। অন্যদিকে যাঁহারা অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ-দুঃখের হিসাব মিলাইতে ব্যস্ত নহেন; জন্মমৃত্যু, পাপপুণ্য—যাঁহাদের কাছে সত্যের চেয়েও প্রবলতর হইতে পারে নাই, তাঁহারা, অবতারগণের জীবনের যে অংশে আনন্দময়ের ও জ্ঞানময়ের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহারই সমাবেশ নিজ জীবনেও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। একজন বেশী মাত্রায় বৈরাগ্য সাধন করিতে ইচ্ছুক; অপরজন বিবেককে নানাপ্রকারে পরিপূর্ণ করিতে নিযুক্ত। অথবা বিবেক এবং বৈরাগ্য সকল দেশেই অনন্ত জীবন ও পরলোক সাধনের জন্য আবশ্যক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

শোকাশ্রু

(ভক্তিভাজন মহাত্মা ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণে)

শ্রী'বীরকুমার-বধ' রচয়িত্রী

তুমি নাকি চলি গেছ দেব !
সমস্ত ভারত আঁধারিয়া ?
নিবে গেছে উজল তপন
হিমাচল পড়েছে খসিয়া ?

তুমি নাকি চলি গেছ দেব !
বঙ্গ মা'র "কোহিনুর" মণি—
তোমা পেয়ে জননী কৃতার্থা,
কুলোজ্জ্বল, পবিত্র অবনী !

তুমি যদি চলি গেছ দেব !
তব শত সহস্র সন্তানে,
কে করিবে জিজ্ঞাসা, সংযমী,
মনুষ্যত্ব দিবে শিক্ষা দানে ?

তুমি যদি চলি গেছ দেব !
অনাথেরা কার মুখ চাবে,
পিতৃস্নেহ মায়ের মমতা,
তারা আর কার কাছে পাবে ?

রোগার্ত্ত অভাগা অশরণ
মাথা রাখি স্নেহকোলে কার,
মা'র সেবা লভি কার হাতে
শান্তি, তৃপ্তি পাবে মরিবার ?

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা মাখি
কে গড়িবে সাধু পুণ্যবান—
মহাপাপী জগাই মাধাই,
"ভক্তিযোগে" পাবে নবপ্রাণ ?

তুমি যদি চলি গেছ দেব !
আমরা কি দিব পরিচয়—
তুমি যে গো জাতীয় গৌরব,
বাঙ্গালীরে সবে ধন্য কয় !

স্নিগ্ধ সৌম্য ও দেব-মূরতি
আর মোরা পাব না দেখিতে,
মানব দেবতা হয় কিসে
তাও আর পাব না শিখিতে ?

উছলিয়া উঠিছে জাহ্নবী
পরশি পবিত্রা চিতা তব,
স্বরগে মঙ্গল-বাদ্য বাজে,
সেথা আগমনী মহোৎসব !

আমাদেরি নিভে গেছে আলো,
শুকায়েছে সুখের জলধি,
বিশ্ব যেন শুষ্ক মরুভূমি,
এ শোকের নাহি যে অবধি !

আমরা অধম দুরাচার
তাই কি দেবতা, গেলে ছাড়ি ?
সৌভাগ্যের অযোগ্য আমরা,
তাই কি নিয়তি নিল কাড়ি ?

কেন গেলে দেবর্ষি বশিষ্ঠ !
আত্মত্যাগী, যোগী, সত্যব্রতী !
কে ঘুচাবে জাতি-দুরদৃষ্ট,
কি হবে মা অরুন্ধতী-গতি ?

আমরা কি হারায়েছি তোমা—
না না না না সে কি সর্ব্বনাশ,
দীপ্তিমান জ্যোতিষ্কের মত
তব দীপ্তি স্থির অবিনাশ !

চিরজীবী সতীর দয়িত
চিরজীবী দেব-প্রাণ যার,
চিরজীবী ও পুণ্য-চরিত
চিরজীবী অশ্বিনীকুমার !

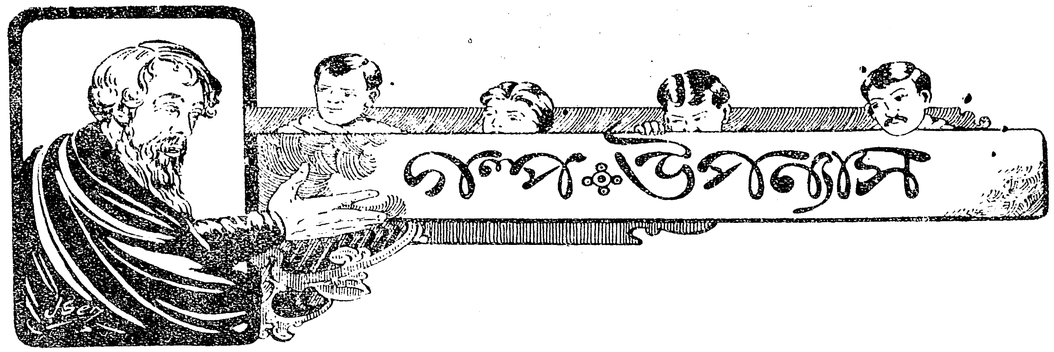

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

৪১

ইন্দ্রনাথের মায়ের মূর্চ্ছা একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বাড়ীর সবাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি অনেকটা আত্মস্থ হইলেন।

স্ত্রীর রকম-সকম দেখিয়া ইন্দ্রনাথের পিতা অত্যন্ত ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। শেষে তিনি উপযাচক হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি মনোরমাকে নিয়ে আসবো,—তাকে আর কিছু বলবো না,—তুমি সুস্থ হও।"

ইন্দ্রনাথ এই শুভসংবাদ লইয়া মনোরমাকে আনিতে গেল। পরম আনন্দিত চিত্তে সে অনেক দিনের পর অমলের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়া সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হইল আর এক দিনের কথা, যে দিন অমল এই বাড়ীতেই ঠিক এমনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তবে প্রভেদ এই যে, তখন ইন্দ্রনাথ ছিল প্রায় নির্দ্দোষ, আর আজ অমল নিজে;—ইন্দ্রের মনটা ক্ষেপিয়া উঠিল।

সে কেবল বলিল, "অমল, এ কি!"

এক মুহূর্ত্ত অমল লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর একবার সে মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে লজ্জায় ভয়ে যেন মরিয়া যাইতেছে। অমল হাসি-মুখে ইন্দ্রনাথের কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভাই, আমায় congratulate কর—পরশু আমাদের বিয়ে।"

অমল ইন্দ্রনাথের হাত ধরিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বেশ একটু জোরের সঙ্গে তার হাত ছাড়াইয়া লইল।

অমল দুই পা পিছাইয়া গিয়া মনোরমাকে ধরিয়া দাঁড়াইল। তীব্র শ্লেষের দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "কুণ্ঠিত হ'চ্ছ ভাই? দুঃখ হ'চ্ছে, তোমার এই উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, তাড়িত ভগ্নীটির একটা দৃঢ় আশ্রয় মিলেছে বলে'? বড় দুঃখ হ'য়েছে, অভিমানে তোমার বড় আঘাত লেগেছে একে তোমার পায়ে ধরে' সাধতে হ'বে না ব'লে, দু'মুঠো অন্নের জন্য তোমার কাছে ফিরে ফিরে ভিক্ষা করতে হবে না বলে! দুঃখ করো না ভাই, ভগবানের এমনি বিচার। যখন মানুষ সাহস করে' বিচারের নাম করে হিংসা ক'রতে যায়, তখন তিনি অনেক সময়েই সে বিচারের শিকারটা এমনি করে' কেড়ে নিয়ে পরিহাস করেন। এক দিন শক্ত ঘা' খেয়ে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম—সে কথা তোমার মনে না থাকবার কথা নয়।"

এই শেষ খোঁচাটায় ইন্দ্রনাথের মনের গড়া চড়া-চড়া কথাগুলি একেবারে মুশড়িয়া পড়িল। সে কতকটা নরম

ভাবেই বলিল, "তুমি যে কথাগুলো বল্লে, সে যে কত বড় মিথ্যা, তা' যে তোমার অন্তর না জানে, এ কথা আমি মনে করি না। মনোরমাকে আমি ত্যাগ করেছি, তুমি আশ্রয় দিয়েছ; আমি তার উপর অত্যাচার করেছি, আর তুমি তা'কে ভালবেসেছ! সে অকূলে ভেসে গেছে, আর তার উপায় নেই, তোমাকে যে কোনও মূল্য দিয়ে আশ্রয় করা ছাড়া তার গতি নেই, এই বুঝিয়ে তুমি যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনোরমাকে তা'র এত দিনকার আদর্শ থেকে স্খলিত ক'রেছ, এ যে তোমার কত বড় নীচতা তা কি তোমার একটিবারও মনে হ'লো না। তোমার হাতের ভিতর সে এসে প'ড়েছে বলে তাকে তুমি এমনি ক'রে—ওঃ কি বলবো, মুখে আমার কথা সরছে না। অমল, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ!"

অমল তার ক্রোধ চাপিয়া বলিল, "দেখ ইন্দ্রনাথ, তোমার নিজের মনটা খাটো বলে, সবাইকে অতখানি খাটো মনে করো না। মনোরমা আমার হাতের ভিতর এসে পড়েছে, সে নিতান্ত অসহায়, তাই ব'লেই যে আমি তাকে আত্মসাৎ ক'রতে চেষ্টা ক'রবো, এত বড় নীচ আমি নই—আমি তেমন কোনও চেষ্টা করেছি কিনা, তা' তোমার বোনের কাছেই জিজ্ঞাসা করো। তার পর তোমাদের ব্যবহার আমার কাছে যতই পশুর মত মনে হ'ক না কেন, আমার মনের কথা তোমার বোনের কাছে খুলে বলে' তার মনে ব্যথা দেব, এত বড় ছোটলোক আমি নই। আচ্ছা, তোমার মনের ভিতর এ কথাটাও তো একবার আসতে পারতো যে, আমরা দু'জনে দু'জনকে হয় তো বরাবরই ভালবেসে এসেছি—আজ বিধাতার চক্রে সেই দুটি ভালবাসার ভিতর-কার পরদাটা খসে পড়েছে! তা' কেমন করে হ'বে! সেটা সুধু যে সত্য হ'ত তাই নয়, সেটা মনে করায় তোমার যে একটা স্বভাব-বিরুদ্ধ উদারতা দেখান হ'ত।"

ইন্দ্রনাথ মনোরমার মুখের দিকে চাহিল। মনোরমা যে নিঃশেষ নির্ভরের সহিত অমলের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, ইন্দ্রনাথ তাহা দেখিল। তা'র চোখের ভিতর অনন্ত প্রীতির ছায়া দেখিতে পাইল—তার পর ইন্দ্রনাথ নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

মনোরমা যে অমলকে ভালবাসিয়াছে, এ সম্বন্ধে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ইহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত হইল না। মনোরমা ইহাতে তাহার মনের চক্ষে অনেকগুলি ধাপ নামিয়া গেল। বিধবা ব্রহ্মচারিণী মনোরমা,—তত্ত্বজ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ মনোরমার আদর্শ সে এতদিন ধ্যান করিয়া প্রীতি গর্ব্ব ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে; এ মনোরমা যে সে মনোরমা নয়—সাধারণ নারী মাত্র, এ কথা ভাবিতে তার মন একটা বিষম খোঁচা লাগিল। বিধবা-বিবাহ যে অবস্থা বিশেষে ভাল, তাহা সে এতদিন স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তা' ছাড়া এই মনোরমারই বিবাহের সম্ভাবনা কল্পনা সে এক দিন করিয়াছে কিন্তু তার পর এত দিন চলিয়া গিয়াছে মনোরমাকে সে এত দিন এতটা স্বতন্ত্ররূপে জানিয়াছে যে, বিবাহের নিম্ন আদর্শটা মনোরমার সম্বন্ধে খাটিতেই পারে না, এ কথা সে ধরিয়া লইয়াছিল। তাই এই দারুণ কথাটা তার বুকে শেলের মত বিঁধিল।

অমলও অনেকটা নরম হইয়া বলিল, "কি ভাবছো ইন্দ্রনাথ! তুমি কি মনে ভাব অমল মিত্তিরের আর বিয়ে হ'বার কোনও সম্ভাবনা ছিল না! আমিও জানি, তুমিও জান যে, আমি ইচ্ছা ক'রলে খুব ভালই বিয়ে ক'রতে পারতাম। তবে এত রাজ্যি ছেড়ে কেবল তোমার এই বোনটিকেই বিয়ে ক'রতে চাইলাম, কিসের জন্য?—এ কি কেবল একটা ঝোঁক! আমাকে এমন ঝোঁকের মাথায় এত বড় একটা কাজ কোনও দিন ক'রতে দেখেছ! তা নয় ইন্দ্রনাথ—আমি মনোরমাকে ভালবেসেছি, মনোরমাও আমাকে ভালবেসেছে—আজ নয়, অনেকদিন থেকেই আমরা পরস্পরকে ভাল বেসেছি। এটা আনন্দের কথা, সৌভাগ্যের কথা! তুমি ভুল বুঝে, এ নিয়ে একটা দুঃখ গড়ে তুলো না।"

ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে উৎকণ্ঠিত মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মনোরমা, অমলের এ কথা সত্য?"

মনোরমা হঠাৎ রক্তজবার মত লাল হইয়া গেল। মাটির দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে সে বলিল, "সম্পূর্ণ।"

ইন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে আমি তোমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তোমরা সুখী হও। অমল, তোমায় বৃথা কটু কথা ব'লেছি, ক্ষমা করো।"

অমল লাফাইয়া আসিয়া ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া খুব করিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। ইন্দ্রনাথ কিন্তু এই সম্ভাষণে তার মত মাতিয়া উঠিতে পারিল না। অমল হাত ছাড়িলে সে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

অমল বলিল, "Cheer up old boy! আবার ভাবছ কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ভাবছি অমল, বাবা মাকে এ খবর কি ক'রে দেব!"

অমল বলিল, "কেন, তাঁদের পরিত্যক্ত কন্যা ভেসে যায় নি, একটা আশ্রয় পেয়েছে, পাপে ডোবে নি, ধর্ম্মপথে আছে—এ কথা শুনলে কি তাঁদের বুক ভেঙ্গে যাবে মনে হচ্ছে?"

ইন্দ্র। তা নয় ভাই, অবস্থা এখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ,—আমি এখন মনোরমাকে নিতে এসেছিলাম!"—বলিয়া ইতিমধ্যে তাহাদের বাড়ীতে যাহা হইয়াছে, সব কথা বলিল।

মনোরমা আনন্দিত হইল, সে অমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আমি আজ দাদার সঙ্গে বাড়ী যাই না? একেবারে পরশু এসে"—বলিয়া লজ্জিত হইয়া থামিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "সে হ'বে কি ইন্দ্রনাথ?"

ইন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমার তো মনে হয় না যে বাবা থাকতে ও আর বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে!"

মনোরমার স্মিত মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

অমল বলিল, "তবে একেবারে পরশু রাত্রে বিয়ের পর গিয়ে তাঁদের নমস্কার ক'রে আসবো, কি বল মনোরমা?"

মনোরমা মাথা নীচু করিয়া হাসিল। একখানা মোটর আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় থামিল। তাহার ভিতর হইতে পিল পিল করিয়া কতকগুলি যুবতী ও প্রৌঢ়া বাহির হইয়া হাস্য কলরবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। পিছু পিছু একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক নামিয়া চুরোট কামড়াইয়া অমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "Oh you sly old fox!"

একটি সুন্দরী বলিলেন, "But where is the vixen."

আর এক সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "এটা তোমার বড় বাড়াবাড়ি jealousy অমি! অমল তোমার হাতছাড়া হয়েছে ব'লে যে তার স্ত্রীকে তুমি vixen ব'লবে, তার কি মানে আছে?" অমি ইহাকে একটা ঠোণা মারিয়া বলিল, "ওঃ বড় যে দরদ; jealousy তোর না আমার?"

মনোরমাকে এই দলের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া অমল বলিল, "vixen না fairy, পরখ করেই নেও না অমি।" তখন একটা ভয়ানক হাসাহাসি মাতামাতি লাগিয়া গেল। অমল ক্রমে তাহাদের প্রত্যেককে বসাইয়া, ইন্দ্রনাথ ও মনোরমাকে তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিল। চারু দি, সুশীলা দি প্রভৃতির নাম তার অনেক দিনই জানা ছিল, আজ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। অনেকক্ষণ আনন্দ-কল্লোলের পর মহিলার দল মনোরমাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অমল তাঁদের একজনের হাতে একখানা সাদা চেক সই করিয়া দিয়া দিল। তাঁহারা এখন বাজার ঘুরিয়া মনোরমার সাজ-পোষাক ও বিবাহের সরঞ্জাম কিনিতে চলিলেন। বাজার হইয়া গেলে মনোরমা চারুদির বাড়ীতে যাইবে এবং আজ রাত্রে সেখানেই থাকিবে। পরশু বিবাহও সেখানেই হইবে স্থির হইয়াছে। মনোরমা মোটরে চড়িয়া একবার কাতর দৃষ্টিতে খোকার দিকে চাহিল। অমল তাড়াতাড়ি খোকাকে গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিতে গেল।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "না থাক, আজ ও আমার সঙ্গেই চলুক।" মনোরমার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। কিন্তু সবাই এই ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

৪২

ইন্দ্রনাথের সবই যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। এরা যেন কেউ মানুষ নয়! ওই মেয়েগুলি এই যে প্রজাপতির মত, উড়িতেছে,—এই মুহূর্ত্তে যেন তারা সব হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতে পারে। ঐ যে ইন্দ্রনাথের পরিচিত আর একখানা মুখ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—বাস্তবতা সম্বন্ধে ইহাদের সঙ্গে তাদের কোনও প্রভেদই সে দেখিতে পাইল না। সেটী যেন এদেরই মত সমান সত্য—সমান স্বপ্ন—সে মুখ যে এ বাড়ীর ভিতর সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া রহিয়াছে, এ বাড়ীর সব ঐশ্বর্য্যে যে তার ছাপ রহিয়াছে—অনীতা ছাড়া কি এ বাড়ী কল্পনা করা যায়!

ইন্দ্রনাথের মনে ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল এই যে, তার

দুঃখিনী বোন মনোরমা এই সব ঐশ্বর্য্যের মালিক হইবে—অনীতার জায়গায় সে-ই এ বাড়ীর অধীশ্বরী হইবে—এ কি সত্য? সে ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া দেখিল, স্বপ্ন নয়। ঐ যে রোমী সাড়ী-পরা মেয়েটিকে লইয়া সবাই নাচানাচি করিতেছে, সমস্ত বাড়ীটা যাকে চারিদিক হইতে স্নেহের সহিত বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে—সে সত্যই সেই মনোরমা, না স্বপ্ন,—কে জানে?

মনোরমা,—দুঃখিনী বিধবা মনোরমা এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাণী হইয়া বসিবে। যে সংসার, যে ঐশ্বর্য্য, যে সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রনাথ তার নিজের সংসারের সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত, লোলুপ দৃষ্টিতে যে আদর্শ আয়ত্ত করিতে সে চাহিত—সে সব মনোরমার! এও কি সম্ভব? কিন্তু সেই সংসারই কি? কই—তবে যে এ সংসারের ক্ষুদ্রতম বস্তুটি একটা সৌন্দর্য্যরসে ভরিয়া রাখিত, যার চরণস্পর্শে সমস্ত গৃহ পুলকিত, উজ্জ্বল হইয়া উঠিত সে অনীতা কই - অনীতা আর এ সংসারে নয়, তার স্থানে আজ মনোরমা! কি আনন্দ! কি দুঃখ! কি সৌভাগ্য দুঃখিনীর! কি দুর্ভাগ্য অনীতার!

আর একটি চিত্র ইন্দ্রনাথের মনে ভাসিয়া উঠিল—সেটি মনোরমার প্রথম স্বামীর—ব্যথিত, পীড়াক্লিষ্ট, দারিদ্র্য-পীড়িত সেই যুবক যে শেষ দৃষ্টি দিয়া আশ মিটাইয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল—সেই মুখ, সেই দৃষ্টি মনে পড়িল। বুকের ভিতর কাঁটার মত এ ছবি বিঁধিল,—ইন্দ্রনাথের চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

সবাই চলিয়া গেল। ইন্দ্রের চোখের সম্মুখে আবছায়ার মত ভাসিতে লাগিল—অমলের আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ! তা'র প্রাণে শেষে সত্য-সত্যই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগিয়া গেল।

তার পাশে তার হাত ধরিয়া খোকা করুণ কণ্ঠে ডাকিল "মামা!"

স্বপ্নের রাজ্য হইতে ইন্দ্রনাথ ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, তা'র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এ ডাকের ভিতর সে দেখিতে পাইল, বিশ্বের যত দুঃখ, যত বেদনা জমাট হইয়া রহিয়াছে। মনোরমা আজ যে ইহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—এটা যেন এ শিশুর জন্মের শোধ দুঃখের নিমন্ত্রণ। এই শিশু মনোরমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল—এখন এ মা হারাইল। প্রেমের আবর্ত্তে পড়িয়া মনোরমা এ শিশুকে আর কি সে আদর, সে যত্ন দিতে পারিবে? সেই ঘূর্ণাবর্ত্তের পাকে এই ক্ষুদ্র শিশু তার হৃদয় হইতে ছিট্‌কাইয়া কোথায় পড়িবে কে জানে? সে শিশুকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল।

অমল আসিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। তার যত দামী দামী সুন্দর খেলনা ড্রইং রুমে সাজান ছিল, সব তাহাকে উপহার দিয়া বসিল। তার পর ইন্দ্রনাথকে বলিল, "চল, খোকাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

মোটরে করিয়া সে ও ইন্দ্রনাথ খোকাকে নানা জায়গায় ঘুরাইয়া বেড়াইল; বায়স্কোপ দেখাইল, নানা রকম খাবার খাওয়াইল, আর নূতন পোষাক, কাপড়, বাঁশী, খেলনা প্রভৃতি একরাশ কিনিয়া আনিল। তার পর অমল তার বাড়ীর কাছে নামিয়া খোকাকে চুম্বন করিয়া ইন্দ্রনাথের কোলে দিল। মোটর অনেক রাত্রে তাহাদিগকে ইন্দ্রনাথের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

ইন্দ্রনাথের পিতা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মায়ের শয্যাপার্শ্বে সরযূ বসিয়া সেবা করিতেছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই বাবা?—এই যে দাদু! ওঃ, এত খেলনা কোথায় পেলে!"

খোকা বলিল, "এ সব আমি নিজে দেখে কিনেছি" বলিয়া একটি একটি করিয়া সবগুলি খেলনা দেখাইতে লাগিল।

মা আবার বলিলেন, "কই বাবা, সে কই?"

ইন্দ্রনাথ কেবল বলিল, "সে আজ এলো না। পরশু আসবে।"

"কোথায় আছে সে? ভাল আছে?"

"হাঁ ভাল আছে। অমলের চারুদির বাড়ীতে সে আছে, তার জন্য কোনও চিন্তা নাই।"

"আহা! অমল আর জন্মে আমার বাপ ছিল নিশ্চয়। বাছাকে পথে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলেন উনি।" বলিয়া তিনি অশ্রু মোচন করিলেন।

ইন্দ্রনাথ একথা সেকথার পর বলিল, "মা, তুমি একবার ব'লেছিলে মনে আছে, 'মনোরমার আবার বিয়ে দে।' এখন আমার মনে হ'চ্ছে, তার বিয়ে হ'লেই ভাল হয়, না?"

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তা' হ'ত বই কি বাবা, কত মেয়ে তো বিধবা হ'য়ে ফের বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ক'রছে।"

"হ'ত, কেন মা। এখনো কি হয় না?"

"কে জানে? এখন আর কেই বা ওকে বিয়ে ক'রবে?"

"যদি কেউ করে, যদি খুব ভাল ছেলে হয়, তবে তুমি কি বল?"

মা উঠিয়া বলিলেন, "তুই কি বলছিস্? এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছিস বল!"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া ইন্দ্রনাথের ভরসা হইল। সে বলিল, "মনোরমা এলো না কেন জান? পরশু তার বিয়ে!"

উত্তেজিত কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "বলিস্ কি? কার সঙ্গে বিয়ে?"

"অমলের সঙ্গে।"

সরযূর হাতের পাখা পড়িয়া গেল—মুখ চোখ হাঁ করিয়া সে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রের মাও অবাক্ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলিল না।

মায়ের বুকে যে সব বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত হইতেছিল তাহা কে বর্ণনা করিবে। কিন্তু শেষে তাঁর স্নেহই জয়ী হইল। স্মিতমুখে তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাকুক!" অমল ও মনোরমাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সরযূ বলিল, "হাঁ গো, সত্যি নাকি? উপায় কি হ'বে?" মায়ের কথায় ইন্দ্রনাথের বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল "উপায় আর কি হ'বে—তোমার যা উপায় হ'য়েছে, সেই রকমই,—তবে একটু জাঁকাল গোছের। বড় বাড়ী, জুড়ী, মোটর, টাকার কাঁড়ি—এই সব সামান্য প্রভেদ!"

সরযূরও মনে প্রথমে ব্যাপারটা একটু খোঁচা দিয়াছিল। কিন্তু অমলের বাড়ীর জাঁক-জমক, আর অমলের স্বভাব-চরিত্রের স্মৃতিতে তার মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল। তখন তার জানিতে ইচ্ছা হইল, কি করিয়া এমনটা হইল। মনোরমাকে নিরিবিলি ডাকিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিল। ইন্দ্রের কথার উত্তরে সে মৃদুস্বরে বলিল "মরণ আর কি? আমার সে উপায় হ'তে যাবে কেন? আমার কি ঠাকুরঝির মত দশা।" "বালাই, ষাট!" বলিয়া ইন্দ্রনাথ নিজের গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, বলিল, "তা হ'তে যাবে কেন? ষাট! আমার শত্রু মরুক!" সরযূ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তা মরে কই? ম'লে তো আর একটা উৎসব দেখা যেত।"

ইন্দ্রের এ কথাটা ভাল লাগিল না, সে বলিল "তার মানে?" সরযূ মুখখানা একটু নীচু করিয়া রহিল, কথা কহিল না শেষে সে সম্পূর্ণ অপ্রাসাঙ্গিক ভাবে বলিল, "অনীতার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?" ইন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, "না।" আর কিছু বলিল না।

ইন্দ্রের মা অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কথা ওঁকে এখন ব'লে কাজ নেই। ভালয় ভালয় বাড়ী যাই, "তার পর বলা যাবে।"

ইন্দ্র এ কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল; কিন্তু বলিল, তারা যে পরশু দিন জোড়ে আসবে তোমাদের আশীর্ব্বাদ নিতে।"

মা বলিলেন, "তার কাজ নেই, তুই বারণ করিস্। আমিই তাদের বাড়ীতে গিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবো।"

সরযূ নীরবে খোকাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কি জানি কেন, খোকাকে দেখিয়া তার বুকের ভিতর কান্না ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

নিয়ম-রক্ষা *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ

এক দিন কোন ভাগ্যবান বড় সাধে দেবায়তন রচনা করিয়া তাহার স্তম্ভে প্রাচীরে কুট্টিমে সোণার গাছে হীরার ফুল ফুটাইয়াছিলেন। সেই হীরার জৌলুসে যাহাতে গর্ভ-গৃহ-প্রান্তের এতটুকু সুপ্ত অন্ধকারও লুপ্ত হইয়া যায়, সে জন্য অনেক মূল্যে স্ফটিকের ঝাড় কিনিয়া, ঝাড়ের শত বাহু দিকে দিকে মেলিয়া দিয়াছিলেন—বাহুতে বাহুতে গন্ধ-তৈলের দীপ জ্বলিয়াছিল। সে সুরসঙ্ঘের সমুন্নত চূড়ায় সেদিন মহাকালের ত্রিশূলের শিখরে শিখরে তপ্ত তপনের দীপ্ত কিরণ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের হোমশিখার মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত উঠিত। আজ তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! স্বয়ং নীলকণ্ঠ আজ বিষের জ্বালায় অচৈতন্য—তাই বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহারই করধৃত যে শূল একদিন বহু দৈত্যদানব বিনাশ করিয়াছিল—আজ তাহা তাঁহারই অস্থিপঞ্জর ভেদ করিতেছে!

গর্ভগৃহের বামে দক্ষিণে, প্রান্তে কেন্দ্রে একদিন যে সকল মহার্ঘ্য ঝাড় জ্বলিয়াছিল, তাহাদের শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেও যাহা আছে, তাহাদের মাথায় মাথায় ঘৃতের দীপ জ্বালিয়া দিবার কাহারও না আছে সাধ না আছে সাধনা—না আছে শক্তি, না আছে ভক্তি। এ কালের গৃহস্বামী সেই কলঙ্কলাঞ্ছিত রত্নবেদীকে বিড়ম্বনার সমান জ্ঞান করিয়াও ভয়ে ভয়ে তাহারই পাদমূলে একটী ভগ্ন জীর্ণ মৃন্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া দূরে দাঁড়াইয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে দেখিতেছেন—নিয়মরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে নাই ত! সেই স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের কম্পিত শিখা যে এখন ঘূর্ণ্যমান চামচিকার বাতাসেই নিবু নিবু, সেটা যে তিনি দেখিতেছেন না, তাহা নহে! দেখিতেছেন—কিন্তু পিতৃপুরুষের সে পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিবার সাহসও নাই—ইচ্ছাও নাই! দেশীর মাথায় বিদেশী পরগাছা এখন জাঁকিয়া বসিয়াছে।

নিয়ম-রক্ষার মোহ এমনি করিয়াই আমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, আমরা পরম সুখে শাঁস ফেলিয়া খোসাকেই লেহন করিতেছি। অধর যে প্রতি পলে রুধিরসিক্ত হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য নাই! আমরা চলিয়াছি বারৈয়ারি তলায় দেবীর চরণের সন্ধানে—এ দিকে চণ্ডী-মণ্ডপের অন্তরে সারির পর সারি বাদুড় ঝুলিতেছে! হাটে যেখানে সাগর-কল্লোল উত্থিত হইতেছে, সেইখানে খুঁজিতেছি তপশ্চরণের আসন,—যে শ্মশানের আগুন রাবণের চিতার মত জ্বলিতেই আছে, পূজার কুসুম চয়ন করিবার জন্য আমরা সেইখানে চলিয়াছি! যাহারা এমন করিয়া নিজেকে ফাঁকি দিতে পারে, তাহারা যে বিশ্বকে ঠকাইতে চাহিবে, সে আর একটা বেশী কথা কি? ভালো জহুরী যে, সে অনায়াসেই চিনিয়া ফেলে আসল কি ঝুট—রাং কি সোণা। পদে পদে তাই ধরাও পড়িতেছি—কিন্তু মোটেই সেটা স্বীকার করি না! আমরা—

"বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির
অসংশয়ে করি স্থির
মোদের বড় এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর।"

এ কথা আমরা ভাবি না—

"পরের কাছে হইব বড়
এ কথা গিয়ে ভুলে'—
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণ-মূলে।"

ভাবি না—

"ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে,
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে।
জগতে কত মহৎ আছে
হইব নত সবায় কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাদের দ্বারে দ্বারে।"

* উলুবেড়িয়া আনন্দময়ী সেবা-সমিতিতে পঠিত।

হায় রে! যাহাদের দুর্গোৎসব প্রতি দিনের ছিল, তাহাদের দুর্গোৎসব এখন বর্ষের পরে আসে—আর তাহার আগমনী বাজে এখন গ্রামোফোনে; ভক্তের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নহে! একদিন দুর্গোৎসব যাহাকে রিক্ত করিয়া বিলাইয়া দিত—তাহার পূজা-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে এখন নিদর্শন-পত্র চাই! যেখানে অন্নকুট বসিত, এখন সেখানে ভাড়া-করা মিষ্টান্নের থালি! মহাদেবীর মহাস্নানের জন্য এক দিন যাহারা কত না ব্যয়ে কত না শ্রমে সপ্তসিন্ধুর বারি আনিত—পদ্মরেণুদকে ভৃঙ্গার পূর্ণ করিত—সহস্র ধারায় সরস্বতীর বারি ঢালিত—আজ তাহারা শুধু গঙ্গাজলেই নিয়ম-রক্ষা করিতেছে। এখনও সঙ্কল্প করিয়া পূজা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু শেষ হয় বিকল্পে।

এই যে বাঙ্গালার সমাজ—কত বৃদ্ধ, কত পুরাতন। যুগের পর যুগ আপনার শক্তিকে ব্যয় করিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই। পাঠান, মোগল, ইংরাজ সকলেই এক একবার বেশ নাড়া দিয়াছে। এত ঝড় যাহার মাথার উপর দিয়া গেল—সে কি এখনো বাঁচিয়াই আছে? গঙ্গায় ভাটার টানের মত যাহার প্রাণ-শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে—আমরা এখন শুধু ইন্‌জেক্‌সনের বলে তাহাকে নবজীবন দান করিতে প্রয়াসী। মৃতকল্প মানুষ কি সূচের খোঁচায় সাড়া দেয়?

কালের স্রোত অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। সে যেন অপ্রতিহত জোয়ারের জল। বুদ্ধিমান সে, যে সেই জোয়ারকে অনুকূল করিতে পারে। জগন্নাথের রথের মত আমাদের এই সমাজ—অনড়, অচল। তাহার পশ্চাতে ডুরি লাগাইয়া যতই আমরা টানিতেছি, ততই তাহার ভীষণ চক্রগুলি আরও পঙ্কেই ডুবিতেছে! পৃথিবীর সমুদায় জাতি যখন আকাশের গ্রহ নক্ষত্র "টানিয়া ছিঁড়িয়া পাড়িয়া ভূতলে, নূতন করিয়া গড়িতে চায়"—আমরা তখন নিয়ম-রক্ষা করিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম! আমরা পুরাতনকেও পাইতেছি না, পাইলেও হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা দিয়া চাহিতেছি না,—আর নূতনকে লাভ করিবার জন্যও পাথেয় সংগ্রহ করিতেছি না। একটীর উপর ঘোর অরুচি—তবুও তাহাকে গলাধঃকরণ করিতেছি, রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া; আর, আর একটী লাভের জন্য যে দীর্ঘপথ পর্য্যটনের প্রয়োজন, আমাদের সে শক্তির অভাব। আমাদের সংসারে সর্ব্বদাই মধুর অভাব বলিয়া গুড় দিয়া ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি—মধু সংগ্রহ করিতে হইলে হুলটীকেও যে বরণ করিয়ালইতে হয়, সেই ভয় আমাদিগকে দিনের পর দিন এত অসহায় করিয়া তুলিতেছে যে, ফলে বাঙ্গালায় মরে যত, জন্মে তার অনেক কম—বাজারে কুইনাইন যত, ঘরে প্লীহা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা শুধু কপালে হাত দিয়া বলিতেছেন—'তাই ত! এ গ্রহ-বৈগুণ্য, এ বিধিলিপি, —যাহা হইবার হইবেই! কাহার সাধ্য যে এ অনুশাসনের বিরুদ্ধ অঙ্গুলী হেলন করে।

পুরাতন সমাজ—সে যতই কেন পুরাতন হউক না—একেবারে তাহাকে পরিত্যাগ করা চলে না। যুগ-যুগান্তের স্মৃতি তাহার সহিত জড়িত; যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতায় সে বৃদ্ধ, বহু ঝড়-তুফান সহিয়াও সে যখন আছে—মরে নাই, তখন বলিতে হইবে যে, তাহার অন্তরে কিছু সত্য আছেই—উহা একেবারে সারশূন্য নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে যে পুরাতন বলিয়াই তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ—তাহার আর সংস্কারের প্রয়োজন নাই। যুগধর্ম্ম যেদিকে আমাকে টানে, আমাকে সেই দিকেই যাইতে হয়। যদি না যাই, তবে সংঘর্ষের ফলে মৃত্যুকেই লাভ করিতে হয়।

প্রাণবন্ত জাতির সমাজও প্রাণবন্ত। সে সমাজ সংঘর্ষের ভয় করে না—মতবাদের ভয় করে না—তাহা আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। চক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহার চেয়ে বড় প্রমাণ নাই। বেশী দিন নহে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদিগের একটী আদম-সুমারী হইয়াছিল। তাহার ফলে জানা গেল ৪ বৎসরেরও কম বয়সের বিবাহিত বালকের সংখ্যা ৮৯০৫১ এবং বালিকার সংখ্যা ২২৩৫৬৬; আরও দেখা গেল ৪ বৎসরের কম বয়সের বিধবার সংখ্যা ১০৬৪১"। ইহা দেখিয়াও যে সমাজ নিয়ম-রক্ষার জন্য গৌরীদান করিতে ব্যগ্র—সে সমাজের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন নাই—(কারণ উহা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং দেবতার দানে পরিপুষ্ট) ইহা যিনি বলেন, অচিরেই তাঁহার চিকিৎসার প্রয়োজন! যে আদম-সুমারীর কথা বলিলাম, তাহাতে আরও প্রকাশ হইয়াছিল যে, ৫ হইতে ৯ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত বালকের সংখ্যা ছয়লক্ষ দুই হাজার এবং বালিকার সংখ্যা ১৮½ লক্ষ। এই বয়সের বিধবার সংখ্যাও তাই ৫২৭৫৯; তবুও অষ্টমে

গৌরীদানের নিয়ম রক্ষা না করিলেই নয়! স্বর্গটা কি এতই সহজলভ্য?

অশ্বলায়ন ও পরাশরের পরিচয় জানিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই বা না হই—গৌরীদান-রূপ নিয়ম-রক্ষার বিরুদ্ধবাদীদিগকে তর্কে পরাজিত করিবার জন্য অশ্বলায়ন ও পরাশরের মত অনায়াসে আবৃত্তি করিয়া থাকি। দুর্ব্বলের ইহাই লক্ষণ! যখন শুনি, মনু এবং বৌদ্ধায়ন গৌরীদানের ব্যবস্থা করেন নাই; যখন শুনি, সুশ্রুতের ন্যায় অসাধারণ চিকিৎসক দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, ষোড়শবর্ষের রমণী বালিকা মাত্র; যখন শুনি, কোন কোন তন্ত্রের নির্দ্দেশও এইরূপ, তখনও আমরা নিরস্ত হই না! বলি পিতৃ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিনা বিচারে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে, নতুবা নরক ভিন্ন গতি নাই। অন্ধ নিয়ম-রক্ষার এ সেই প্রাচীন এবং ভিত্তিহীন যুক্তি! পিতৃ-পিতামহ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, আমরা কি তাহাই? পিতৃ-পিতামহ ধর্ম্ম বুঝিতেন, ধর্ম্ম মানিতেন—আমরা কি কেহ অকপটে বলিতে পারি, কোন ধর্ম্মের ধার ধারি? আমরা যাহা মানি, তাহা খোসা-ভূষি মাত্র—তাহা রন্ধনশালা ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা! যে চিত্তশুদ্ধি সকল ধর্ম্মের সার, তাহা হইতে আমরা যে কত দূরে আছি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যে প্রেম সকল ধর্ম্মের প্রাণ, তাহা হইতে আমরা যে কত দূরে আছি, তাহা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি?

আপনার ভীষণ বিষে ঘৃণা নিজেও জ্বলিয়া মরে, যে তাহাকে আশ্রয় দেয় তাহাকেও জ্বালাইয়া মারে। সমাজের অঙ্গে অঙ্গে সেই বিষের ফোস্কা, প্রলেপ লাগাইব কোথায়? মানুষ যেখানে মানুষকে এত ক্ষুদ্র করিয়া দেখে—এত অবহেলা করে—এত লাঞ্ছনার কালি তাহার গায়ে ঢালিয়া দেয়, সেখানে কল্যাণ থাকে না। জীবন রক্ষার যে প্রচেষ্টায় বাঁধ দিয়া জল বাঁধিতে হয়—আবার সেই কারণেই বাঁধ কাটিয়া জল বাহিরও করিয়া দিতে হয়। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত জলের ঘড়াটীর মত একই নিয়ম রক্ষা করিতে গেলে সে শিকলটাই যে শেষে আমার কণ্ঠরোধ করিবে। আগে মানুষ—তার পর তাহার সমাজ—তার পর সে সমাজের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বলায়ন, পরাশর। আগে জীবন, তার পর সমাজ ও তাহার বন্ধন। এই বন্ধনও মুক্তি দেয়—বন্ধন প্রাণশক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও মুক্তি এক নহে। সেই কারণেই সমাজ ও তাহার বন্ধন। সেই কারণেই পরাশর, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁহারা শুধু এক যুগের নহেন—যুগে যুগে তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। যে যুগে স্বর্গ হইতে ভাগীরথীর ধারা নামিয়া রুদ্রদেবের জটার মধ্যে লীলায় খেলিয়াছিল—সে যুগের মহাদেব শূলাগ্রে সতীদেহ বহন করিয়া মহাব্যোমে বিচরণ করেন নাই—সে যুগের হর-কোপানলে মদন ভস্মীভূত হয় নাই!

সে এক কাল ছিল, যখন নারী অনূঢ়া থাকিলেও দোষের কারণ হইত না। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, প্রতিথেয়ী প্রভৃতি যে যুগে পূজা পাইয়াছেন, সে যুগে আবার নারীর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া গৃহীত ও পরিচালিত হইয়াছিল। সেকালের সমাজের জীবন ছিল—লোকের শক্তি ছিল,—সেকালে কেহ শুধু নিয়ম-রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, জীবন-রক্ষা করিত। সেকালের সমাজ নিজের কর্ম্মের পুণ্যে বারের পর বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরকে ফিরাইয়া আনিয়াছে—কলিযুগকে চিরস্থায়ী আসন দান করে নাই। পৃথিবীর শুভদিন যে একবার আসিয়াই ফিরিয়া যায় তাহা নহে—উহা আসে যায়, আবার আসে, আবার যায়। মাহেন্দ্র-যোগ যেমন ব্যক্তিগত জীবনে প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার—উহা সমাজের জীবনেও সেইরূপ। উহাকে আবাহন করিয়া আনিতে হয়—পাদ্য অর্ঘ্যে স্থাপিত করিতে হয়—পূজার মাল্য দিয়া তুষ্ট করিতে হয়। সে পূজায় প্রাণ চাই—সে প্রাণে শ্রদ্ধা ও বল চাই। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার বল চাই। শুধু নিয়ম-রক্ষা করিলে সে শ্রদ্ধা ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই। জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙ্গা দাওয়ায় যে অন্ধ বিচার-সভা বসে, তাহার রক্তচক্ষু দেখিয়া মাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে সে পূজা সার্থক হইবে না! কবি বলিয়াছেন—

Strong walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.—

আমরা মনের মধ্যেই কারাগার রচনা করিয়া তাহার প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছি। নিজের গঠিত বন্ধন-শৃঙ্খলে দিবা-নিশা নিজেকেই অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিতেছি। সে বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তি দিতে পারে, এমন শক্তিমান কেহ নাই।

সে মুক্তি নিজেকেই অর্জ্জন করিতে হইবে—সে মুক্তি অর্জ্জন করিবার শক্তি নিজেকেই সাধনার দ্বারা ও সত্যের দ্বারা লাভ করিতে হইবে। সে জন্য যদি ঝড়ের মত উঠিতে হয়, ওঠা চাই;—যদি উল্কার মত ধাইতে হয়, ধাও তাই—যদি বজ্রের অনলে দগ্ধ করিতে হয়, কর তাই।

"পড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

এ যাত্রা শুধু একজনের নহে। ইহা তোমার আমার সকলের। এই জগন্নাথের রথকে যদি পঙ্কমুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া ইহার ডুরি ধরিয়া টানিতে হইবে।

"পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছা নয়নের জল ভাই।"

অতীতের স্মৃতি লইয়া শুধু স্বপ্ন রচনা করিয়া ফল কি? অতীতকে যদি বর্ত্তমানে সফল করিতে পারি, তবেই সিদ্ধি লাভ হইবে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ বর্ষের বালকের কণ্ঠে যদি বালিকা বধূর মালা তুলিয়া দাও—সংসারকে চিনিবার ও জানিবার পূর্ব্বেই যদি তাহাকে পুত্র-কন্যায় পরিবেষ্টিত সংসারী করিয়া তোলো, যদি দেশে শুধু হীনবল ও ক্ষীণ-আয়ুর চাষ কর, তবে জীবন-সংগ্রামে মৃত্যু ভিন্ন গতি কোথায়? ক্ষুদ্র এতটুকু বালিকা—বাঙ্গালার অনাঘ্রাত ফুল্ল শুভ্র পবিত্র যূথিকা। সে তোমার ধর্ম্মা-ধর্ম্মের খোঁজ রাখে না,—তোমার পাপ পুণ্যের বিচার জানে না,—তোমার পিতৃ-পিতামহের কোন্ নিয়মটী রক্ষা করিবার জন্য তুমি তাহাকে বলি দিতে বসিয়াছ তাহা সে বুঝে না। যাহা থাকিলে সে বুঝিত, তাহাকে তাহা দাও নাই, যাহা পাইলে সে তোমাকে ন্যায়ের তর্কে পরাজিত করিতে পারিত, তাহা তাহাকে পাইতে দাও নাই। বিদেশের কুয়াসা আসিয়া দেশের জ্যোৎস্নাকে মলিন করিয়াছে! সহসা নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, তুমি তাদের চারিদিকে কেবল হাসি বাঁশী ও গীত রচনা করিয়াছ—চারিদিকে কুসুমের মালা সাজাইয়াছ। বিহ্বলা সে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কি জানে যে তুমি তাহার বলিদানের আয়োজন করিতেছ। তাহার পর সে স্বপ্নঘোর কাটিতে না কাটিতেই সে দেখিল সংসারে সে একা—শুধু একা নহে, একটী নিষ্প্রভ প্রদীপের কম্পিত দীপশিখা অঞ্চলে ঢাকিয়া রক্ষা করিবার ভারও তখন তাহার। তাহার সিঁথীর উজ্জ্বল সে সিন্দূর-বিন্দু আর নাই—তাহার শীর্ণ কর দুইটী কাটিয়া ছিঁড়িয়া শঙ্খ বলয় সবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে যখন আসিয়া তোমার কণ্ঠলগ্ন হইল—সেদিনও তোমার বুক ভাঙ্গে নাই! দুইদিন পর বৈশাখের একাদশীতে যখন সে পার্শ্বের কক্ষে শুষ্ক-কণ্ঠে মৃত্যু-কামনা করিতেছে—তুমি তখন অনায়াসে বৃহৎ মৎস্যের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছ—তবুও ভগবানের বজ্র তোমার শিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে না! তাহা পড়িতে পারে না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত যদি অত সহজে ঘটে, তবে ফল ভুগিবে কে? তোমার পাপে যদি আমিও দগ্ধ না হইলাম তাহা হইলে তোমাতে আমাতে আবার সমাজ কিসের? এইরূপে পুড়িয়া পুড়িয়া বাঙ্গালার সমাজ এখন মৃতকল্প হইয়াছে। তোমারই পুণ্যে সে আবার প্রাণ পাইবে—পূজার অর্ঘ্য লাভ করিবে—অগ্রসর হও, শুধু নিয়ম রক্ষা করিও না—

"স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত;
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!"

আগে চলিবার একমাত্র উপায় সাধনা। জানি না ত'—কিসের সাধনা করিব। সাধনা করিব মন্ত্রের। মন্ত্র! কৈ মন্ত্র! কোথায় মন্ত্র? কোথায় গুরু? যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে, গুরু মিলিবেই। আবার নানক চৈতন্য রামমোহন মিলিবেই। তোমার অন্তরে যে পরম দেবতা এখন সুপ্তি-মগ্ন, তিনিই জাগ্রত হইয়া তোমাকে দীক্ষিত করিবেন। কিন্তু মন্ত্রকে ধারণা করিতে হইলে যে আয়োজন চাই, তাহা ত' আর কেহ করিয়া দিবে না। আমার অঙ্গন আমাকেই মার্জ্জনা করিতে হইবে;—আমার দেবতার আসন যেখানে বিছাইব, সে স্থান আমাকেই পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। জ্ঞান-মন্দাকিনীর ধারা ঢালিয়া আমাকেই

যে সে পূজার বেদী মাজিতে হইবে। সত্যের আলোকে আমার এই অন্ধকার মন্দিরটীকে উজ্জল করিবার ভার আমার ;—আমার দেশের অরণি হইতেই যজ্ঞের অগ্নি লাভ করিতে হইবে, বিদেশের বিজলী বাতি হইতে নহে! আমরা বিশ্ব-বিদ্যাপীঠ রচনা করিয়াছি—তাহার চূড়ায় যে আলোক জ্বলিতেছে, তাহা এ দেশের নহে। সেই আলোক-ধারা দেশের নানা স্থানে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। আমরা কৃত-কৃতার্থ হইয়া মনে করিতেছি, জ্ঞান লাভের সুযোগের ত' অভাব নাই। বৎসরের পর বৎসর 'ট্রেড মার্ক' দিয়া বাঙ্গালার বালক বালিকাকে বিবাহের বাজারে বাহির করিতেছি—মেকারের নামে যেমন পাদুকার দাম হয়, তেমনি তাহাদের দামও হইতেছে! যে শিক্ষা বাঙ্গালী বালক ও বালিকাদের জাতীয় নীতি ও সত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে দেয় না—ভারতের Ideal হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত ক'রে—দূরে লইয়া যায়, সে শিক্ষাকে শিক্ষা বলা বিড়ম্বনা মাত্র! সে শিক্ষা উকীল, হাকিম, ডাক্তার সৃষ্টি করুক—তাহা গুরুমা বা inspectrees, স্ত্রী সাহিত্যিক বা স্ত্রী-ম্যাজিষ্ট্রেট সৃষ্টি করুক, তাহা বাঙ্গালার জলপ্লাবনে লেডি ভলান্টিয়ারের ব্যূহ রচনা করুক—কিন্তু তাহা সেইগুলি দেয় না, যাহা না থাকিলে বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্বের আসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ;—দিন শেষে দেখে, তাহার স্থান না আছে প্রাচ্যে, না আছে প্রতীচ্যে ; প্রতীচ্য তাহাকে দেখিয়া ভয় পায়—প্রাচ্য মনে করে সে একটা *Paria*—সে ময়ূরপুচ্ছে দাঁড়কাক!

বঙ্গনারী আমাদের সেই বিশ্ববিদ্যাপীঠে শিক্ষিতা হইয়া আজকাল বাঙ্গালা মাসিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার মূলে বর্ত্তমান ভোগাকাঙ্ক্ষা। য়ুরোপ যে দিন ঘোষণা করিল জ্ঞানই শক্তি, সে দিন পৃথিবী চমৎকৃত হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞান তখনই শক্তি, যখন তাহা মানুষকে ভোগ হইতে ভোগে লইয়া যায়। এ নীতি য়ুরোপীয় শিক্ষার পাদপীঠ হইতে পারে—কিন্তু ইহা ভারতীয় শিক্ষার বিরোধী। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে এমন কি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মুখে ভাষা ফুটিবারও পূর্ব্বে ভারত বলিয়াছে—জ্ঞানই মুক্তি। এই নীতির মূল ত্যাগে, ভোগে নহে। সকল ইংরাজ যদি আজ ধ্যান-ধারণায় বাঙ্গালী হইয়া পড়ে, তবে তাহা যেমন ইংলণ্ডের পক্ষে জার্ম্মাণযুদ্ধ অপেক্ষাও বিপজ্জনক, তেমনি বাঙ্গালার নরনারী যদি আজ ইংরাজ হইয়া পড়ে, তবে বাঙ্গালার পক্ষে তাহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষাও ভয়াবহ!

আজ একটী পুরাতন কথা মনে পড়িল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন একটী স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে কর্ম্মী আসিয়া বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। বুকড়ী চালের ভাত এবং ডাল খাইয়া এবং কখনো বা অনাবৃত স্থানে, কখনো বা তণ্ডুলপূর্ণ থলিয়াগুলির উপর নিশাযাপন করিয়া তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। সেই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার মাতৃ-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা একটু অধিক দূর অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বন্ধুদের বারণ মানিলেন না, ভলাণ্টিয়ারের দল গড়িয়া বন্যাপীড়িত স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত বেশী আগ্রহ দেখিয়া পুরুষ কর্ম্মিগণ কহিলেন, "আমাদের যতদূর সাধ্য, আপনাদের কার্য্যে সহায় হইব।" বন্যাপীড়িত স্থানটিকে নানা কেন্দ্রে ভাগ করিয়া কাজ চলিতেছিল। নারী-কর্ম্মিগণ যে কোন্ কেন্দ্রে আসিয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের নেতৃ-স্থানীয়া যিনি তিনি আসিয়াই দেখিলেন 'কমোড' নাই (!) খানার মেজ নাই, স্মেলিং সল্ট নাই ইত্যাদি। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। পুরুষ কর্ম্মীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জননীদের আহারের ব্যবস্থা করিলেন—সেই ডাল, ভাত এবং ঐ রকম আর দুই একটা দেশী জিনিষ। সে স্থানে যাহা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাই সংগৃহীত হইয়া থাকিবে! নেতৃ-স্থানীয়া নারী-কর্ম্মী না কি শুনিয়াই বলিয়াছিলেন—I hate native dishes. Thank you. A cup of tea will do for the night." বলা বাহুল্য, এক পেয়ালা চা'র বাটীতে চুমুক দিয়াই—মা আমার সমস্ত রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া পরদিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন! যাহারা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি কেবলই শুনিয়াছিল—"Oh! Horrible—Oh! Shocking!" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ত আমার মহিমময়ী মার মূর্ত্তি নয়—এ বুঝি সৎমা! তাই কি? এই যে দৃষ্টান্তটী আজ নিবেদন করিতেছি, ইহাই কি বলিয়া দেয় না যে আমরা পরম যত্নে শুধু সোণার পাথরের বাটী গড়িতেছি? আমাদের

দেশের শিক্ষার ব্যবস্থাই কি এইরূপ অভিনব সৃষ্টির জন্য দায়ী নহে?

প্রত্যেক দেশেরই একটী করিয়া বিশিষ্টতা আছে। তাহা হারাইলেই সব হারানোর সমান হইল। চিন্তার স্বাধীনতা শুধু যে মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, তাহা নহে—উহাই জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে, মহৎ করে, জাগ্রত সচেতন ক'রে। সেই চিন্তার ধারাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট খাত হইতে অন্য পথে চালিত হইতে দিলেই উহা জাতির পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে। ভারতে যে বলবীর্য্যের কোনোদিন অভাব ছিল তাহা নহে। ভারতবর্ষের বীরগণ ইচ্ছা করিলে যে সেকালে পরিচিত ভারতের বাহিরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া আরও বলদৃপ্ত হইতে পারিতেন না, তাহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে মন্ত্র অন্তরে থাকিয়া ভারত-বাসীকে কর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছিল, তাহা ত্যাগের মন্ত্র। সেই জন্যই ভোগাসক্ত রাবণের পতন ঘটিয়াছিল। রাবণ সত্য হউক, বা কল্পিত হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে চিত্র ইহাই দেখায় যে, ভোগাকাঙ্ক্ষা পতনের কারণ।

আজ যে ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার দাবী মাথা তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গে এই ত্যাগের সম্বন্ধ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন মাসিকে একজন বঙ্গমহিলা লিখিয়াছিলেন—আজ নারী "তার বঙ্গগৃহ-কোণ থেকে জেগে উঠেছে। আর গৃহের জানালা-দ্বার মুক্ত ক'রে দিয়ে, বাহিরের মুক্ত আলোক ও বাতাস সে অন্দরে আহ্বান করে নিতে চায়। যদি দরকার হয়, বাহিরে গিয়ে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে চায়—তাতে যদি কখনো পথের ধূলো গায়েই লাগে তার—তবে সে ধূলোকে ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার ও চালাবার শক্তি যে আপনা থেকে তার ভিতরে সঞ্চিত হয়ে উঠবে আজ সে সত্যি জগতের বিস্তীর্ণতর কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে আসবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে যদি, তাহলে পুরুষ-সমাজে এ নিয়ে এত আশঙ্কা ও সমস্যার সৃষ্টি কেন যে হবে, তা বুঝতে পারা যায় না" এই উক্তিই সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া দেয় যে বঙ্গনারীর ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার দাবী কেবল ভোগের দাবী। এই দাবী যতই প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ততই একটা সামাজিক সমস্যা জটিল হইতে কেন যে জটিলতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা লেখিকা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার লেখার প্রকাশ পাইতেছে তিনি তীব্র ভাষায় কহিতেছেন "নারী কি চায়? নারী আর দেবীও হ'তে চায় না, খেলনার জিনিষও শুধু সে আর নয়। কবির চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এক সাথে সুর মিলিয়ে মন তার এখন বলতে আরম্ভ করেছে—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।"

নারী যে দিন আর দেবী হইতে চাহিবে না—বলিবে "সে শুধু নারী হ'তে চায়" তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের দিন ভারতের আর ঘটিতে পারে না। কারণ ভারত নারীকেই শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাদেবীরূপে তাহার নিত্য পূজা করে। তাহাই ভারতবর্ষের সনাতন Ideal। নারী যেখানে খেলার সামগ্রী হইয়াছে, সেখানে আমরাই তাহার জন্য দায়ী। যে শিক্ষা দিয়া আমরা তাহাদিগকে দিনে দিনে পলে পলে গড়িয়া তুলিতেছি, সে শিক্ষা যে ভারতবর্ষের আদর্শের সহিত যোগ রক্ষা করিতেছে না—ইহাই এই নারী-বিদ্রোহের কারণ। যাহাদের অনুকরণে আমরা এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি, সকল স্থলে না হইলেও অনেক স্থলে তাহারা খেলার সামগ্রী—এবং কোন স্থলেই তাহারা দেবীত্বের আসন লাভ করে নাই। সেখানকার দার্শনিক Ruskin বলিয়াছেন—"A man's work for his house is to secure its maintenance progress and defence ; the woman's to secure its order comfort and loveliness." আর ভারতের ঋষি বলিতেছেন—স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়াশ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" —গৃহে স্ত্রী ও শ্রীর মধ্যে কোন ভেদ নাই।

বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে সকল বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে না পাঠাইয়া উপায় নাই,—কারণ বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাপ বিবাহের passport স্বরূপ গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে সকল বিদ্যালয় নারীর অন্তরে দেবীকে স্থাপন করিতে পারিতেছে কি না আমরা সে বিচারে উদাসীন। এ সেই নিয়ম-রক্ষা—বালিকাবিদ্যালয়ে মেয়েকে পাঠাইতেই হইবে, পাঠাইতে হয়! কঠিন

জীবন-সংগ্রামের দোহাই দিয়া আমরা নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিত করিয়া থাকি ; এবং যেমন আর দশটা সামাজিক সমস্যাকেও উপেক্ষা করি, তেমনি ইহার দিকেও চাহিয়া দেখি না। এ জন্য আমরা আর কাহাকেও দোষী করিতে পারি না—অদৃষ্টবাদেরও আশ্রয় লইতে পারি না। স্রোতের শেওলা যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনি ভাসিয়া যাওয়াটাই যখন বেশ আরামদায়ক, তখন তাহাকেই অবলম্বন করিয়াছি।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলীক দেহ ক্লিষ্ট গতি,
গৃহের প্রতি টান ;
তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রার সে ভরা,
মাথায় ছোট, বহরে বড়
বাঙালী-সন্তান !

কিন্তু হায়—

ইহার চেয়ে হতেন যযি
আরব বেদুয়িন !
চরণ তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন !
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি।
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি,
চলেছি নিশিদিন ;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

আমরা যে ভাবে নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছি, তাহা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কেন, ব্যক্তিগত জীবনে পর্য্যন্ত শুধু মিথ্যা ও ভণ্ডামীরই প্রশ্রয় দিতেছে। তাহা আমাদিগকে প্রতিদিন এক অসত্য হইতে অন্য অসত্যে লইয়া যাইতেছে। আজ মনে পড়ে সেই দিন, যে দিন চিতোর রাজসন্ন্যাসী মহারাণা প্রতাপের করচ্যুত হইয়াছিল। সেদিন তিনি দারুণ ক্ষোভে হেম ও রজত পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৃণের শয্যা ও তরুপত্রের পাত্রে ভোজন সন্ন্যাসী প্রতাপের অবলম্বন হইল। তিনি পণ করিলেন, যতদিন চিতোর পুনরুদ্ধৃত না হয়, ততদিন সেই সন্ন্যাসব্রত পালন করিবেন—বিলাস-বাসনা তত দিন আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। পূর্ব্বে সেনাদলের পুরোভাগে রণডঙ্কা বাজিত—চিতোরের পতনের পর মহারাণার আদেশে উহা সেনাদলের পশ্চাতে বাজিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন পর্ব্বত-বেষ্টিত পেশোলা তীরে উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপ একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন এবং শেষে সেই কুটীরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আজিও রাজপুত নিয়ম-রক্ষা করিয়া আসিতেছে বটে, আজিও সে তাহার হেম ও রজত পাত্রের নিম্নে একটী বৃক্ষপত্র রাখিয়া প্রতাপের অনুশাসন পালন করিতেছে! সুখশয্যার তলদেশে তৃণগুচ্ছ স্থাপিত করিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ বীরজাতির নিয়ম-রক্ষা। একটী বৃক্ষপত্র বা একগাছি তৃণ যদি বিলাস ও আড়ম্বরের পাপকে দূর করিতে পারিত, তাহা হইলে কথা ছিল না!

এইরূপে নিয়ম রক্ষা করিয়া পিতৃ-পুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভান করা অপেক্ষা নিয়মভঙ্গকারী হইতে পারিলে জড়ত্ব দূর হইয়া দেহে প্রাণ আসিতে পারে ; কর্ম্মব্যাকুলতা কর্ম্মহীনতার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। কুসংস্কার ধর্ম্মহীনের ধর্ম্ম। বহু দিনের সঞ্চিত কুসংস্কারের ফলে মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ে এইরূপে নিয়ম-রক্ষার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। বাঙ্গালার সামাজিক সংস্কার সাধন করিতে হইলে আর নিয়ম-রক্ষা করিলে চলিবে না। যদি ভুল হয় তা' হউক—ভোলানাথের ঝুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া ভুলগুলিই আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাদের লইয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক্ এদিক্ বারেক ওদিক্
এ খেলা আর খেলিসনে ভাই !

আপনাকে যে জয় করিতে পারে না, সে পরকে অভয় দিবে কিরূপে ? নিজে যে ভয়ে মরে, সে সমাজের দেহে প্রাণ আনিবে কিরূপে ? সত্যকে আশ্রয় না করিলে কোন কাজেই ভয় দূর হইবে না। সমাজের দেহে যেখানে যে ব্যাধি আছে, সুনিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় তাহার সন্ধান করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;—যদি প্রয়োজন হয়, অস্ত্রোপচার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলে চলিবে না। কবি তাই বজ্র নির্ঘোষে কহিতেছেন—

তোর আপন জনে ছাড়চে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না !
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়ত রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না !
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

মায়াবিনী

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

১

মাইনু সাঁওতালের মেয়ে। বয়স—বিশ্ কি ত্রিশ, ঠাহর করিবার উপায় নাই। চেহারাখানা ঠিক্ যেন কালো মার্ব্বেল পাথরের ভিতর হইতে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। গায়ের রংটা ফর্সা হইলে হয় ত তাহাকে রাজরাণী বলিতাম ; কিন্তু অসভ্য সাঁওতালের মেয়ে সে,—খাদের নীচে কয়লার ঝুড়ি মাথায় বহিয়া পেটের দায়ে সমস্তটা দিন খাটিয়া মরে,—তাহার আবার রূপ, তাহার আবার গুণ !.....

মাসখানেক হইল, সে ইক্‌ড়ার কয়লা-কুঠিতে কাজ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহাকে চিনে না এরকম লোক কুঠি খুঁজিলে দু' একটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

হাসি তাহার মুখে চব্বিশঘণ্টা লাগিয়াই আছে, চোখের জলের সহিত মাইনুর পরিচয় কোন দিন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ?

পাঁচ নম্বর কুলি-ধাওড়ার এক টেরে একটা আমগাছের তলায় ছোট্ট একটা ঘরে সে বাস করে। দিনে কিংবা রাত্রে, যেদিন যখন খুসী, খাদের নীচে খাটিতে যায়,—যা'র তার সঙ্গে হাসে, কথা কয়, আপন মনে গান করে। কোন দিন রাঁধে, কোন দিন বা শুধু মদ খাইয়াই পড়িয়া থাকে। এমনি করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই তাহার জীবনের দিনগুলা কাটিতেছিল।

.....বর্ষাকাল। গত রাত্রি হইতে বেশ জোরে-জোরে বৃষ্টি নামিয়াছে। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মাইনু দেখিল, বৃষ্টি তখনও ধরে নাই, অথচ তাহাকে কাজে যাইতে হইবে। কাল দিনের বেলা সে যাহা কিছু রোজগার করিয়াছিল, রাত্রে মদ খাইয়া তাহা শেষ করিয়াছে। নেশার ঘোরে পড়িয়া না থাকিলে হয় ত তাহার নিঃসঙ্গ বাদল-রাত্রিটা কাটানো দায় হইয়া উঠিত। তথাপি আজ সকালে উঠিয়া প্রথমেই তাহার মনে হইল, ছি, ছি, সে করিয়াছে কি ! আজ দু' আনা পয়সা থাকিলে হয় ত সে পেট পুরিয়া খাইয়া বাঁচিত ! ক্ষুধার্ত্ত মাইনু আজ তাহার অবসন্ন শরীর লইয়া খাদের নীচে পরিশ্রমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত !

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির জোর কমিয়া আসিল। মাইনু বাহিরে তাকাইয়া দেখিল, কর্দ্দমাক্ত পথের ধারে খানা-ডোবাগুলো বর্ষার জলে থৈ-থৈ করিতেছে, এবং তাহারই আশে-পাশে ভেকের অশ্রান্ত কল-ধ্বনি সুরু হইয়াছে।

গাছের ডালে-ডালে কাক্‌গুলা পাখা ঝাড়িয়া চীৎকার করিতেছে, চারিদিক ফর্সা হইয়া গেছে, দূরে—কয়েকটা তালগাছের ফাঁকে পূব্-গগনের সীমা-রেখায়, ক্ষান্ত-বর্ষণ নীল আকাশের গায়ে অরুণ-আলোর রক্তাঞ্জলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই।.....

পিপাসার্ত্ত মাইনু ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জল খাইয়া সপসপে' পথের উপর নামিয়া পড়িল।

গত রাত্রে মদ খাইয়া আজ এই বাদল-প্রভাতেও তাহার ঘন-ঘন পিপাসা পাইতেছিল,—তাহার চোখের সুমুখে ধরিত্রী তখনও রিম্-ঝিম্ করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার তরুণ হিয়ার স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ-উৎস এতটুকু মন্দীভূত হয় নাই। মাইনু জড়িত চরণে পথ চলিতে চলিতে গান ধরিল,—

"নদীতে পড়েছে বান, পার কর ভগবান,
বল্ দাদা, কত দূরে জামতাড়া!—"

কুঠির একজন ছোক্‌রা বাবু সেই পথ ধরিয়া বোধ হয় কুলি-ধাওড়ার দিকেই আসিতেছিল। মাইনুর গানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মাইনু তাহার গতি রোধ করিয়া সুমুখ দাঁড়াইয়া পড়িল। গান বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—হাস্‌লি কেনে বাবু?

বাবু বলিল,—বাঃ, হাস্‌বার জো নেই আমার?

মাইনু ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল,—বল্ বাবু, তুথে বল্‌তেই হবেক্ হাস্‌লি কেনে।.....আমাকে দেখে...লয়?

—না।···তোর গান শুনে'।

বা রেঃ। বলিয়া মাইনু তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া আবার চলিতে লাগিল। হাত দশ-বারো আসিয়া আবার গান ধরিল,—

"হাওয়া গাড়ী টম্ টম্ বাবুর বাগানে,
ও ছোঁড়া তুই বলে যা রে—হাস্‌লি কেনে!
বলে' যা, হাস্‌লি কেনে!"

মাইনু অফিস-ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় পথের ধারে, বোয়ান্-ঝোপের নিকট হইতে গুরু-গম্ভীর স্বরে কে যেন ডাকিল, মাইনু!

মাইনু চমকিয়া পিছন্ ফিরিতেই এক বৃদ্ধ সাঁওতালের দিকে তাহার নজর পড়িল। তার ডান্ হাতে লণ্ঠন, বাঁ হাতে একটা ছাতি। কোটরগত চোখ দুইটা জ্বল্-জ্বল করিতেছে!

মাইনু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। বজ্রাহতের মত পথের ধারে দাঁড়াইয়া কহিল,—ইখান্‌কেও এসেছিস্ পারিয়া?...আমি যাব নাই, যা।

—হুঁ, যাবি নাই? তুর্ বাপ্‌কে যেতে হবেক্।

—কিস্‌কে? কই নিয়ে যা দেখি? দেখি কেমন মরদ্।

বৃদ্ধ এইবার একটু নরম হইয়া বলিল, এই ছাখ্ শুন্ মাইনি, ভালয় ভালয় বল্‌ছি, চল্। তা না হলে' সায়েব্‌কে বল্‌বগা।

—হুঁ। বড় ত' সায়েবকে ডরাই কি না। আমি যা—ব নাই। তুঁই কি কর্‌বি কর্। বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাইনু চলিয়া গেল।

পারিয়াও ধীরে-ধীরে ম্যানেজার সাহেবের বাংলার দিকে অগ্রসর হইল।

২

বাংলোঘরের সম্মুখে অপরিসর বাগানের লাল কাঁকর-বিছানো রাস্তার উপর সাহেব পায়চারি করিতেছিল। পারিয়া হাত হইতে ছাতা ও লণ্ঠনটা নামাইয়া, একটা সালাম্ করিয়া বলিল, সাহেব শুন্।

সাহেব তাহার মুখের পানে তাকাইতেই পারিয়া জানাইল যে তাহার বিবাহিতা পত্নী মাইনু, তাহাকে ছাড়িয়া আজ মাসখানেক পলাইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই কুঠিতে কাজ করিতেছে। সে তাহাকে পুনরায় নিজের কাছে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়, সুতরাং সাহেবকে ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিল, মাইনু? কই, মাইনু বলে এখানে কেউ নাই।

—না সাহেব, আমি এখনই তাকে দেখেছি।

—কোথা?

—তুর্ খাদেই খাট্‌তে গেল।

—ডাক্ তাকে।

পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহলে আর তুর্ কাছ্‌কে আস্‌ব কেনে সাহেব; আমার কথা শুন্‌বেক্ নাই।

—আমাদের সর্দারকে ডাক্ তবে, আমি বলে' দিছি। বলিয়া সাহেব পুনরায় পায়চারি করিতে লাগিল।

সর্দারকে ডাকিতে গিয়া পারিয়া দেখিল, ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া মাইনু হাসিতেছে।

পারিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাইনু জিজ্ঞাসা করিল, সায়েবকে বলেছিস্?

হুঁ। চল্ তুথে ডাক্‌ছে।

—চল্। বলিয়া মাইনু তাহার আগেই সাহেবের নিকট আসিয়া বলিল, কি বল্‌ছিস্ সায়েব?

—তুই পালিয়ে এসেছিস্?

মাইনু হাসিয়া উত্তর দিল, ধেৎ! পালাঁই আস্‌তে আমার রং লেগেছে।

সাহেব বলিল, ও কি তবে মিছে কথা বল্‌ছে?··· ও তোর কে হয়?

—হবেক্ আবার কে? উ আমার কেউ লয়।

মুখের সাম্‌নে স্পষ্ট জবাব শুনিয়া পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

মাইনুর কথা শুনিয়া সাহেব একবার উভয়ের মুখের পানে তাকাইল। মাইনু তখন মুখ টিপিয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতেছিল।

প্রভাত-আলোকের মতই সুন্দর এই সাঁওতাল যুবতীর মুখের উপর কি ছিল কে জানে। সাহেব সেদিক হইতে তাহার চোখ দুইটা কোন প্রকারেই ফিরাইতে পারিতেছিল না। বলিল, হাস্‌ছিস্ কেনে? তুই নিশ্চয় ওর বৌ।

—বা সাহেব! বলিহারি তুর্ লজর্! যা-হোক্! উ বুড়া আর আমি ছুক্—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মাইনু আবার হাসিয়া উঠিল।

সাহেব এবার নিজেও একটুখানি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। জোর করিয়া তামাকের পাইপটা দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া সাহেব হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, তুই মিছেই এসেছিস্ বুড়ো, তুই ওকে পাবি না। দেখ্‌ছিস্ না মনের ভাব?

—তা বেশ। আমি চল্লম। বলিয়া বৃদ্ধ পারিয়া, তাহার ছাতা ও লণ্ঠনটি পুনরায় তুলিয়া লইল। একবার কাতর দৃষ্টিতে মাইনুকে শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া বুড়া চলিতে লাগিল।

সে যখন বাগানের 'গেট' পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল, সাহেব ও মাইনু তখনও পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া ডাকিল, মাইনু!···বোধ হয় সে তাহাকে কোন কথা বলিতে যাইতেছিল। 'আসি' বলিয়া মাইনু পারিয়ার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

পারিয়া তখন গুদামের নিকট রাস্তা ভাঙিয়াছে। মাইনু খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, এই, কোথা চল্লি তুঁই?

—কেনে, নুনিয়ার কুঠি।...ছাড়্। বলিয়া বৃদ্ধ তাহার হাতটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

মাইনু সহাস্যমুখে বলিল,—বাবা লো! রাগ ছাখ্ বুড়ার!...আয়, আয়, আমার ঘরকে আয় পারিয়া। এইখানেই থাক্, আর নুনিয়াকে যেঁয়ে কাজ নাই।

বুড়া বলিল, তুঁই কুন্ ধাওড়ায় থাকিস্?

—তুঁই আয় কেনে,—হোই পাঁচ নম্বরে। বলিয়া বুড়াকে একপ্রকার টানিতে টানিতে মাইনু তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পারিয়াকে ঘরের ভিতর বসাইয়া বলিল, আমরা এইখানেই থাক্‌ব। তুঁই আর ইখান্ থেকে যেতে পাবি নাই কিন্তুক্। বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, তুই এইখানে বস্ তাহেলে, আমি খাদ্‌কে যাই।

মাইনুকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা পারিয়ার ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, কেনে?

—খাট্‌তে যাব নাই ত' খাবি কি? তুথে খাওয়াব কি?·····তুর মতন ত' টাকা নাই যে বসে' বসে' খাব?

শেষের কথাটা বুড়ার প্রাণে বেশ আঘাত দিল। নুনিয়ার কয়লা-খাদে পারিয়া বহুকাল হইতে সর্দারি করিয়া দু' তিনশ টাকা জমাইয়াছিল এবং সেই অর্থের লোভে মাইনুর বাবা এই বুড়ার হাতে মাইনুকে সমর্পণ করিয়া দিয়া মরিয়া গেছে। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই মাইনু পারিয়ার নিকট হইতে পলাইয়া যায়, পারিয়া আবার ধরিয়া আনে, মাইনু আবার পলায়। এম্‌নি করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় পারিয়া প্রাণপণে

তাহার সঞ্চিত অর্থগুলি নিজের কাছে সাবধানে রাখিত, মাইনুর হাতে দিতে তাহার সাহস হইত না। মাইনু সে অর্থের প্রত্যাশীও ছিল না, আজ হঠাৎ কি ভাবিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিল। পারিয়ার মনটাও বেশ সদয় ছিল, তাই সে ধীরে ধীরে কোমর হইতে টাকা তোড়াটি খুলিয়া ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, এই লে, ভারি ত টাকা!...এতদিন দিথম্ নাই—তুঁই পালাথিস্ বলে'। শেষকালে বেইমানি করিস্ না কিন্তুক্।

মাইনু হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, ও মা গঃ! তুর্ টাকা কে চাইলেক্ থাল্‌ভরা?

—তা হোক্ মাইনু, লে। বলিয়া বৃদ্ধ টাকাগুলা তাহার দিকে সরাইয়া দিল।

মাইনু বলিল, তবে দে, আজকার খরচের মতন দে। চাল্, ডাল কিনে আনি।

পারিয়া হাসিতে হাসিতে একটি টাকা মাইনুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, চট্ ক'রে আসিস্। আমি তা কত্তে উনোন্‌ট ধরাঁই রাখি। লয়?

—হ' দেখ্ কয়লা আছে। আর হোই ও ওই কুলঙ্গাতে জিয়াশালাই। বলিয়া মাইনু চলিয়া গেল।

৩

দিন পনের পরে পারিয়া জ্বরে পড়িল। মাইনু ভাবিল, সামান্য জ্বর, দু' একদিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু আট-দশ দিনেও যখন জ্বর ছাড়িল না, তখন তাহার একটু চিন্তা হইল কুঠির ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, উয়াকে ভাল করে' দে বাবু, জ্বরের ঘোরে দিনরাত তন্‌ছট করছে।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, আগে খবর দিলে হতো মাইনু, এ আর বাঁচবে না। ডবল নিমোনিয়া হয়েছে।

বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের পানে তাকাইয়া মাইনু বলিল, নামুনি?···বাঁচ্‌বেক্ নাই তাহলে?...তুঁই যদি ভাঁল ভাল ওষুধ দিস্?

ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। রাতটা পেরোলে হয়।

...সম্মুখে পত্র-বহুল আমগাছের শাখায় শাখায় পাখীর কলরব; দূরে খাদের মুখে টব-গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ কাণে আসিয়া বাজিতেছে। বাহিরে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে রাস্তা-ঘাট ধীরে-ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল। মাইনু সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, ওষুধ দিবি ত? না, তাও দিবি নাই?

হ্যাঁ, ওষুধ নিবি আয়। বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিয়া 'বাইকে' চড়িলেন।

প্রদীপটা পারিয়ার শিয়রের নিকট রাখিয়া দিয়া একবার তাহার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাইনু জিজ্ঞাসা করিল, জল খাবি?

পারিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া ছিল,—কোন কথা বলিল না।

মাইনু ঔষধ আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানার উদ্দেশে বাহির হইল।

ঔষধ লইয়া ফিরিবার পথে অবিলাশের সঙ্গে দেখা। অবিলাশ জাতিতে হাড়ি, অতিশয় ভাল মানুষ। বহুদিন পূর্ব্বে পারথাবাদ কলিয়ারীতে মাইনুর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে। লোকটা অতি গরীব; ছোট-ছোট সাতটা ছেলে-মেয়ে, তাহার উপর স্ত্রী অকর্ম্মণ্য। নিজে গতর খাটাইয়া যাহা কিছু রোজগার করে, তাহাতে তাহার সংসার চলে না।

অবিলাশ অন্ধকার রাস্তার উপরেই একটা লাঠি হাতে লইয়া হন্ হন্ করিয়া ডাক্তারখানার রাস্তা ধরিয়া চলিতেছিল, মাইনুও বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। পথের মাঝে মাইনু একেবারে তাহার গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতেই অবিলাশ চীৎকার করিয়া উঠিল, কে রে?

মাইনু গলার আওয়াজটা চিনিতে পারিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—অবিলাশ! ছাথ্ দেখি, আর একটুকু হলেই গেইছিলম আর কি!

অবিলাশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাইনু, কোথা গেছিলি?

—ডাক্তরের কাছ্‌কে। পারিয়া হয় ত বাঁচ্‌বেক্ নাই অবিলাশ।

অবিলাশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেনে উয়ার আবার কি হলো?

—কে জানে ভাই, বুড়ার কি হঁইছে কে জানে! বলিয়া মাইনু চলিয়া যাইতেছিল; অবিলাশ বলিল, আমি

সাত-ঝঞ্ঝাটে পড়েছি মাইনু,—আমারও বৌ'ট বাঁচ্‌বেক্ নাই। সাঁত সাতটা ছেলে,—বলিস্ কি মাইনু,—আবার আর একটু। পাঁচ দিন ধরে' কষ্ট খেছে, ডাক্তর ডাকতে চল্লম।

—আবার? বলিয়া মাইনু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হঁ টে! তুর্ হথো ত' বুঝ থিস্ মজা। এম্‌নি করে হাস্‌তিস্ তাহ'লে।

—আ-মর্ থাল্-ভরা! বলিয়া মাইনু চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া দেখিল, প্রদীপটা তখনও মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। পারিয়া মলিন শয্যা হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া মেঝের উপর অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে। মাইনু অতিকষ্টে বৃদ্ধকে পুনরায় বিছানার উপর শোওয়াইয়া দিল। গলাটা তখন ঘড়্ ঘড়্ করিতেছিল। শিশি হইতে একদাগ ঔষধ পারিয়ার মুখে ঢালিয়া দিতেই চোয়াল বহিয়া ঔষধটা গড়াইয়া পড়িল।

পারিয়ার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা তখন ঘোলাটে হইয়া গেছে। বুকটা ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মাইনুর সন্দেহ হইল, সে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নয়।

ক্রমাগত কয়েকদিন পরিশ্রম করিয়া, রাত্রি জাগিয়া, না খাইয়া মাইনু বড় বেশী ক্লান্ত হইয়া পরিয়াছিল।

প্রদীপের শিখাটা একটুখানি বাড়াইয়া দিয়া, দরজার নিকট আঁচল বিছাইয়া মাইনু শুইয়া পড়িল।

অবিলাশ ডাক্তারখানা হইতে ফিরিবার পথে একবার মাইনু ও পারিয়ার সংবাদ লইয়া যাইবে ভাবিয়া দরজার নিকট আসিয়া ডাকিল, মাইনু!

মাইনু জাগিয়াই ছিল, মাথা তুলিয়া বলিল, অবিলাশ! ডাক্তর এলো নাই?

হাতের ঔষধটা দেখাইয়া বলিল, না। এই ঔষধ দিলেক্। বল্লেক্, ইয়াতেও যদি কিছু না হয়, তখন ডাক্‌বি।...বুড়া কেমন আছে?

—ওই ছাথ্ কেনে। বলিয়া মাইনু শায়িত পারিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

অবিলাশ ধীরে ধীরে পারিয়ার নিকট অগ্রসর হইয়া ডাকিল, পারিয়া!

কোন উত্তর না পাইয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্তিমিত আলোকে তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। হাতের শিশিটা মাটিতে নামাইয়া পারিয়ার বুকের উপর হাত দিয়া, অবিলাশ বলিল, মাইনু, উঠ্,—বুড়া হঁয়ে গেইছে।

কথাটা শুনিয়া মাইনু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, এ্যাঁ!

—হঁ। মরে' গেইছে। এই ছাথ্। বলিয়া অবিলাশ প্রদীপটা তুলিয়া পারিয়ার মুখের উপর ধরিল। মাইনু বলিল, আমি কিছুই জান্‌তে লেরেছি অবিলাশ!...ত'হেলে এত রেতে কি করি?

উভয়েই নিস্তব্ধভাবে মৃত পারিয়ার মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে তখন বাদল-রাত্রির অন্ধকার ঝম্-ঝম্ করিতেছে!

কিয়ৎক্ষণ পরে অবিলাশ বলিল, তুঁই বস্,—আমি শিশিটা রেখে আসি। লোকজন কাঠ-কয়লার জোগাড় কর্‌তে হবেক্ ত?

—হঁঃ যা। বলিয়া মাইনু তাহার একখানা মোটা কাপড় দিয়া পারিয়ার মৃত দেহটা আবৃত করিয়া দিল।

অবিলাশ চলিয়া গেলে, মাইনু শুষ্ক চক্ষে আর একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সমস্ত আকাশের গায়ে কালো মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। দিনের বেলা বৃষ্টি নামে নাই, বাদল-ভীতু আকাশটা ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর ভয়ে চমকিয়া উঠিতেছিল।.....

৪

চার পাঁচদিন পরে খাদের নীচে কাজ করিতে গিয়া মাইনুর সহিত ম্যানেজার-সাহেবের দেখা হইল।

দশ নম্বর গ্যালারির পাশে, ঝুড়ি মাথায় দিয়া হাতে কেরোসিনের ডিবে লইয়া মাইনু আপন মনে চলিতেছিল, এমন সময় সাদা সুট্-পরা ম্যানেজার সাহেব তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মাইনু, শুন্‌লাম, সেই বুড়া নাকি মরেছে।

মাইনু একগাল হাসিয়া বলিল,—হঁ, মরে গেইছে।

সাহেব বলিল, তবে তুই এক কাজ কর্। খাদের ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করিস্—

কেনে সায়েব্? বলিয়া মাইনু তাহার মুখের পানে তাকাইল।

—কথা আছে, বল্‌ব। বলিয়া সাহেব ত্রস্তপদে পাশের মেন্ গ্যালারি দিয়া চলিয়া গৈল।

বৈকালে মাইনু বাংলোবাড়ীতে সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই, সাহেব বলিল, তোকে আর খাদে খাটতে হবে না মাইনু, তুই আমার বাংলোতেই থাক্—আমার কাজ-টাজ করবি।

—বেশ। বলিয়া মাইনু জিজ্ঞাসা করিল, আজ থেকেই ?

—হ্যাঁ, আজ থেকেই। আমার বড় খান্‌সামার ঘরের পাশে যে ঘরটা আছে, ওই ঘরেই থাক্‌বি।

—কেনে সাহেব, তুর্ মেম্ আস্‌বেক্ নাকি ? বলিয়া মাইনু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

হ্যাঁ। বলিয়া সাহেব তাহার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মাইনুর দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, যা, মদ খেয়ে আয় গা।

টাকাটা তুলিয়া লইয়া মাইনু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; কহিল, মদ, এক টাকার ?

এক টাকার মদ খেতে পারিস্ ? বলিয়া সাহেব ধপাস্ করিয়া হাত-পা মেলিয়া ইজি চেয়ারটার উপর শুইয়া পড়িল।

—না সায়েব, তা লারি।

—তবে যত পারিস্ খাস্।

মাইনু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মদ খাইয়া যখন ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত কেন হলো তোর ?

মাইনু বলিল, দিনের বেলাকার ভাত রাধা ছিল, সে গলা খেঁয়ে এলম। আমার টাকা ছিল, কাপড় ছিল, সব নিয়ে এলম। বল্ সায়েব, ইবারে তুর্ কি কাজ আছে বল্—করি।

সাহেব আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া মাইনুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

মাইনু হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন করে' চাইছিস্ কি সাহেব ? বল্ কি কাজ কর্‌তে হবেক্।

সাহেব বলিল, না, এখন কিছু কাজ নাই। মেম সাহেব এলে তোকে আয়ার কাজ করতে হবে। এখন দিনকতক এম্‌নি থাক্।

—তেবে এখন গায়েন্ করি গা বলিয়া মাইনু চলিয়া যাইতেছিল।

সাহেব ডাকিল, এই মাইনু, শোন্!

চৌকাঠের নিকট মাইনু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি!

—কেয়াড়িটা বন্ধ কর্।

মাইনু বুঝিতে পারিল না। বলিল,—কেয়াড়ি কাথে বলে ?

সাহেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিল,—দরজা।

মাইনু বলিল, ও, দুয়ার্‌ট। কেনে ?

—বন্ধ করে' আয় এইদিকে শোন্।

—কেনে, কি হবেক্ ?

—আয় না, শোন্।

—না, বল্ তুঁই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, কত মদ খেলি ?

—কেনে, চার আনার।

—বাকি পয়সা কি করলি ?

—এই লে। বলিয়া আঁচলের খুঁট্ হইতে বাকী বারো আনা পয়সা খুলিয়া মাইনু সাহেবকে দিতে গেল।

পয়সাগুলা মাইনু ইজিচেয়ারের হাতলের উপর নামাইতে যাইবে, এনন সময় সাহেব তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

মাইনু বলিল, ছাড়্।

সাহেব হাতখানা না ছাড়িয়া মাইনুর খোঁপার দিকে তাকাইয়া বলিল, ফুল কোথা পেলি ?

মাইনু হাসিতে হাসিতে বলিল, হোই তুর্ বাগিচায়।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—কেন, আমার বাগানের ফুল কেন তুল্‌লি ?

—বেশ কর্‌ব। বলিয়া হেঁচ্‌কাটানে সাহেবের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া মাইনু হাসিতে লাগিল।

সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাইনুর দিকে অগ্রসর হইল।

মাইনু দরজার নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, খবর্‌দার্ সাহেব, তাহলে রইব নাই তুর্ ঘরে।

সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল, না, না, কিচ্ছু বলি নাই, তুই থাক্। এই নে, তোর পয়সা নিয়ে যা। বলিয়া সাহেব পয়সাগুলা চেয়ারের উপর হইতে তুলিয়া তাহাকে দিতে গেল।

—রাখ্ তুর্ পয়সা, ইয়ার্ পর্ লিব। বলিয়া মাইনু ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়া ত্রস্তচরণে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

৫

সাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও পরদিন প্রাতে মাইনু খাদের নীচে কাজ করিতে গেল।

বেলা প্রায় দশটার সময় অবিলাশ গাঁইতি দিয়া কয়লা কাটিতেছিল ; মাইনু বলিল, এই, রাখ্ রাখ্ গাঁইতি রাখ্—দিনরাত কাজ করছিস্, মরে' যাবি যে!

গাঁইতি নামাইয়া অবিলাশ বলিল, মর্‌তে আর বাকী আছে নাকি মাইনু……উঃ! বলিয়া হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া অবিলাশ বলিল, ঘরে বৌ'টাকে নিয়ে সারারাত জেগেছি, আজ আবার না খাট্‌লে কেউ খেতে পাবেক্ নাই।

—আয়, আয়, একটুকু জিরেই লে। ভারি ত' কাজ! বলিয়া মাইনু অবিলাশকে টানিতে টানিতে সেখান হইতে লইয়া আসিল।

তিন চারটা গলিরাস্তা পার হইয়া একটা নির্জ্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে যাইয়া মাইনু বলিল, এই খান্‌টা বেশ ঠাণ্ডা। ব'স্,—তুর্ মেয়ে কেমন আছে ?

অবিলাশ মাইনুর পাশে বসিয়া বলিল, কে জানে মাইনু, বাঁচ্‌বেক্ কি না কে জানে!

—ছেলে হয় নাই ?

—হঁইছে একটা ক্যাঁৎরা পারা। ধুক্‌পুক্ করছে, সেটাও মর্‌বেক্—বাঁচ্‌বেক্ নাই।

—কি ছেলে ?

—বিটি ছেলে। বেটা হলেও বা মাল্ কেটে' খেতো।

মাইনু হাসিয়া বলিল, কেনে, বিটি ছেলে কি ছেলে লয় না কি ? আমরা খাটি না ?……তুর্ মতন পাঁচটা মরদ্ পুষ্‌তে পারি আমি।

—আখুন্ খুব বলছিস্। ছেলে হলেই বুঝ্‌থিস্ মজা। ……পরশু তুথে খুজ্‌তে গেইছিলম, কোথা ছিলি ?

—পরশু ? কেনে, ঘরেই। কাল থেকে কোথা আছি জানিস্ ?

—কোথা ? বলিয়া অবিলাশ তাহার মুখের পানে তাকাইল।

—সায়েবের বাংলাতে। বলিয়া মাইনু হাসিতে লাগিল।

—উখানকে মর্‌তে কি জন্যে গেইছিস্ ?

একটা 'পিলারে'র গায়ে মগ্‌বাতিটা ঝুলিতেছিল। মাইনু সেইদিকে তাকাইয়া অন্যমনস্কের মত বলিল, কেনে, কি হবেক্ তার ?

অবিলাশ বলিল, হবেক্ নাই কিছুই। তাই বল্‌ছিলম্, সায়েব্‌ট বড় বজ্জাৎ।

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

অবিলাশ জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মাইনু, তুঁই শাঙা কর্‌বি নাই ?……

হাসিতে হাসিতে মাইনু বলিল, কেনে, তুঁই তাহেলে আমাকে রাখিস্, না কি ?

—ধেৎ। বলে একটাকে নিয়েই খাওয়াতে লাচ্ছি।

—আমাকে ত' খাওয়াতে হবেক্ নাই, আমি একাই একশ'। বলিয়া মাইনু জোরে জোরে হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ গ্যালারির মুখে তীব্র একটা 'সেফ্‌টিবাতি' হাতে লইয়া সাহেব আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে অবাক্ হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

সাহেব বলিল, এই! তোরা এখানে কি করছিস্—কাজে যা।

অবিলাশ গাঁইতি ও আলো হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

মাইনু চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব খপ্ করিয়া তাহার অঞ্চলপ্রান্ত টানিয়া ধরিতেই সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

সাহেব বলিল, এইবার!

মাইনু গর্জ্জিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি ?

—খাদে আস্‌তে বারণ করছিলাম, তবু যে এলি ?

মাইনু বলিল, তুর্ ঘরে চুপ করে' বসে' বসে', কি কর্‌ব ?

সাহেব হঠাৎ হাতের বাতিটা নিভাইয়া দিয়া দূরে ছুড়িয়া দিল।……নিমেষেই এই পাতাল গহ্বরের অন্ধকার চোখের সুমুখে আরও বিরাট হইয়া উঠিল।

সাহেব ধীরে ধীরে বলিল, চুপ্। চেঁচাস্ না।

মাইনুর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

সাহেব পাৎলুনের পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া অন্ধকারেই মাইনুর হাতের নিকট ধরিয়া বলিল দেখেছিস্, এটা কি?

'কই? বলিয়া মাইনু হাত দিয়া নাড়িয়া দেখিয়া বলিল, কে জানে ত!

—পিস্তল।.....চেঁচালেই মেরে' ফেল্‌ব।

মাইনু নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব পিস্তলটা রাখিয়া মাইনুর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, উয়ার সঙ্গে কি হচ্ছিল তোর?

মাইনু কথা বলিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে সাহেবের চক্ষু দুইটা মাইনুর মুখের উপর জ্বল্-জ্বল্ করিতে লাগিল।.....

শেষ

বেলা বারোটার সময় মাইনু খাদ হইতে উঠিয়া সাহেবের বাংলোবাড়ীর যে-ঘরে সে রাত্রি কাটাইয়াছিল, সেখান হইতে তাহার পরিত্যক্ত দুইখানা কাপড় এবং পারিয়ার দেওয়া টাকার থলিটি সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে মাতাল-শালে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সে কত যে মদ খাইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। মদের দাম দিয়া তাহার আর সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। তাহার শুষ্ক মলিন মুখখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল, এ যেন সে মাইনু নয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পড়িয়া থাকিবার পর, একটুখানি সুস্থ হইলে মাইনু ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া আপন মনে চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অবিলাশের ধাওড়াঘরের নিকট গিয়া ডাকিল,—অবিলাশ!

মাইনুর ডাক শুনিয়া অবিলাশ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল; বলিল, তুথেই আমি খুজ্‌ছিলম্ মাইনু, আয় শুন্—আমার সব্বনাশ হঁইছে।

মাইনু ভাবিল, বোধ হয় তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। তাই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, কি, কি হলো অবিলাশ?

অবিলাশ বলিল, সায়েব বলেছে, আমি আর কাল থেকে ই খাদে খাট্‌তে পাব নাই।.....আর এই ছাখ্। বলিয়া অবিলাশ তাহার হাঁটুর উপরের কাপড়টা তুলিয়া দিতেই, মাইনু সবিস্ময়ে দেখিল, চাবুকের ঘায়ে খানিকটা স্থানের চামড়া ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

মাইনু বলিল, সাহেব মেরেছে না কি?.... কেনে বল্ দেখি অবিলাশ?

—উবেলায় সেই তুঁই দেরী করে' দিল্লি, তাথেই এক-গাড়ী কয়লা চুরি করেছিলম্।.....তা না কর্‌লে আমার পেট চলে কি করে' বল্ দেখি?

—হাঁ। খুব করেছিস্, বেশ করেছিস্। তুই ও সায়েব্‌কে মার্‌তে লার্‌লি?.....না, না, মারিস্ নাই বো করেছিস্,—উয়ারা সব পারে। তুর এখন মরে গেলে চল্‌বেক নাই।.....আমি আর দাঁড়াতে লার্‌ব—চল্লুম। এ লে। বলিয়া, টাকার তোড়াটা অবিলাশের হাতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, ধর্,ইয়াতে তুর অনেক্‌দিন চল্‌বেক্।

অবিলাশ তোড়াটা হাতে লইয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ই কোথা পেলি তুঁই?.....আর তুর্ কি হবেক্?

—আমি যুথাই পাই কেনে, তুর্ কি?

—আর তুঁই চল্লি কোথা?

—আমি চট্‌কলে কাজ কর্‌তে যাব, ইখানে থাক্‌ব নাই।

অবিলাশ মাইনুর হাতখানা ধরিয়া বলিল, যাস্ না, যাস্ না মাইনু, অমন্ কাজটি করিস্ না। আমার এক বুন্ গেইছিল। তার লতিজার এক-শেষ হঁইছিল। মেয়েদের মান্ ইজ্জৎ কিছুই থাকে না।

আগ্রহাতিশয্যে মাইনু বলিল, ঠিক্ জানিস্ তুঁই?

—অই, তা আবার জানি না। আমার বুন্ গেইছিল যে!

—আমি সেইখানেই যাব।

অবিলাশ বলিল, শেষকালে মান্ ইজ্জৎ সব ঘুচাবি কেনে, যাস্ না মাইনু!

—মান্ ইজ্জৎ আমার থাক্‌লেই ত? বলিয়া জোর করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাইনু টলিতে টলিতে বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

মালয় ও শ্যামরাজ্য

অধ্যাপক শ্রীবিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

গত ২৭শে জুলাই কলিকাতা হইতে 'ইথিওপিয়া' নামক জাহাজে আমি শিঙ্গাপুর যাত্রা করি। এবার আমি সঙ্গীহীন অবস্থাতেই সেই সুদূর দেশে চলিয়াছিলাম; কারণ, গত বৎসর আমাদের তিব্বতযাত্রী দলের নেতা অধ্যাপক কশ্যপ গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় তিব্বতেই গিয়াছিলেন। একাকী হইলেও আমার উৎসাহের অভাব ছিল না; কারণ, সুদূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ রাজ্যগুলি পরিদর্শন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতেই মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার সেই অভিলাষ সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া, আমি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। স্বাধীন বৌদ্ধ প্রদেশ শ্যামরাজ্য পরিদর্শন আমার এই সমুদ্র-যাত্রার উদ্দেশ্য।



মালয় রমণী

সমুদ্র অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল থাকায়, আমরা কেহই সমুদ্র-পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই। 'কালাপাণির' পর্ব্বত প্রমাণ সফেন তরঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই আমার মাথা ঘুরিতেছিল— আমি যেন বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলাম। ব্রহ্মদেশের উপকূলের দিকে জাহাজ অগ্রসর হইতে থাকিলে, আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। রেঙ্গুন সহর দেখিবার জন্য তিনদিন সেখানে অবস্থান করি। এখানকার বৌদ্ধ সুবর্ণ-মন্দির (Shwe Dagon) একটি দেখিবার জিনিষ। নানাবিধ মনোরম সুগন্ধি পুষ্পে সজ্জিত এবং সুন্দর পোষাক পরিহিত ফুলের মতই সুন্দর উপাসকবৃন্দ-পূর্ণ মন্দিরটি দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। রেঙ্গুন সহরটী দেখিতে অনেকটা ভারতীয় সহরের ন্যায়; এখানে ব্রহ্মদেশীয় বিশেষত্ব কিছু নাই দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইয়া পড়িলাম।

রেঙ্গুন হইতে যাত্রা করিয়া তিন দিন পরে পেনাং পৌছাই। মালয় উপদ্বীপের উপকণ্ঠে অসংখ্য নারিকেল-বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন এই দ্বীপটি অতি মনোরম। অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আর তাহার মধ্যবর্ত্তী খাড়া পাহাড় দেখিতে যেন মনোমুগ্ধকর ছবির মত।

৮ই অগষ্ট প্রত্যূষে আমরা শিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীগুলির দৃশ্য অতি চমৎকার। এক একটি গৃহ যেন অভেদ্য দুর্গের মত সুরক্ষিত। চীনা জেটিতে অবতরণ করিয়া জাহাজের ডাক্তার, কেরাণী এবং বেতার-বার্ত্তা-প্রেরকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী তার পর শিঙ্গাপুরের পরিচ্ছন্ন বিস্তৃত রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। রাস্তাগুলির দুই পার্শ্বে প্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকা। আমি এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত শিখের নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। এই ভদ্রলোকটি শিয়ালকোটে (পাঞ্জাব) প্রস্তুত, খেলিবার সরঞ্জাম শিঙ্গাপুরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। আমার আশ্রয়দাতা, অমৃতসরের খালসা কলেজের একজনকে অতিথি রূপে পাইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তাঁহার আতিথ্যে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। নিরামিষভোজী ছিলাম বলিয়া কয়েক দিন জাহাজে আমাকে একরূপ উপবাসী হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল—এখানে সে ক্ষতি পুরণ করিয়া লইলাম। আহারাদির পর পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইলাম। আল্‌কাতরা-ঢালা ধূলিহীন রাস্তাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ধূলি-মলিন পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসীর নিকট ইহা এক বিস্ময়কর বস্তু। রিক্‌শ চড়িয়া ভ্রমণ এখানকার ফ্যাসান—সে দেখিতেও বেশ সুন্দর। রিক্‌শ-চালক সকলেই চীনবাসী—তাহাদিগকে কোনও কথা বুঝাইয়া বলা অতি দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, আমার আশ্রয়দাতাকে সঙ্গে লইয়া রিক্‌শতে (এখানে 'বেচা' নামে অভিহিত) বেশ একটু ঘুরিয়া আসা গেল। সমুদ্র তট-সন্নিকটস্থ রাস্তাগুলি অতিশয় সুদৃশ্য। বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী, সুরক্ষিত ক্রীড়াক্ষেত্র, নোঙ্গর-করা বিশাল জাহাজগুলি যে মনোরম দৃশ্যের সৃজন করিয়াছে, তাহা সত্যই উপভোগ্য।



রবার বাগান

পর দিন নিজম নামক একজন বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোক শিঙ্গাপুর-প্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালীর গৃহে লইয়া গেলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসাদার পরলোকগত আব্দুল ওয়াহেদের বাণিজ্য-পরিচালক মিষ্টার মহম্মদ আলি এবং বাবু অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র এই সুদূর দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসাদার। এক দিন অপরাহ্ণে মিঃ মহম্মদ আলির মোটরকারে সমস্ত শিঙ্গাপুর সহরটি প্রদক্ষিণ করি। মাঝে মাঝে যখন মোটরকার পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল, তখন নীল সমুদ্রের উদার দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। তান্‌জং কাতুংএ যে সন্ধ্যা অতিবাহিত করি, সেদিনকার কথা আমি কোনও দিন ভুলিতে পারিব না। এই স্থানটি

সম্ভ্রান্ত লোকগণের প্রধান আশ্রয়স্থল। সমুদ্র-তটের ধার দিয়া বরাবর চীনা বণিকগণের সুরম্য বিপণি। জাপানী হোটেলগুলির সংলগ্ন মঞ্চগুলি সমুদ্র-সলিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই মঞ্চের উপর বসিয়া সমুদ্রের লীলায়িত তরঙ্গগুলির দেখিতে দেখিতে যে কেহ চা পান করিতে পারেন। আর এক দিন নারিকেল ও রবার-বৃক্ষের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত দেখা করিবার জন্য যাই। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এখানে একটি সুন্দর চিকিৎসালয় চালিত হইতেছে।

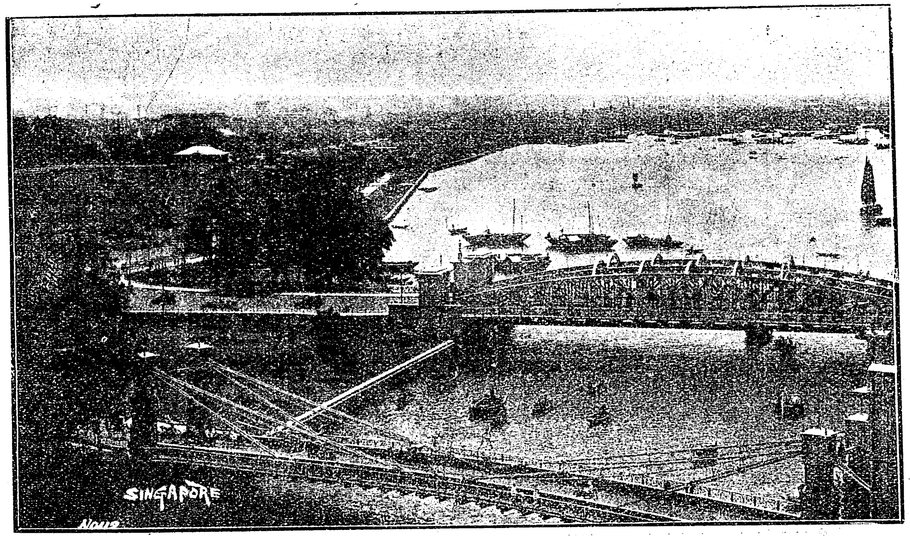

শিঙ্গাপুর বন্দর

শিঙ্গাপুর একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। রবারের ব্যবসাই এখানকার সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা—কিন্তু সম্প্রতি ইহার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। এখানে নৌবিভাগের আড্ডা স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এখানকার অধিবাসীরা আশা করিতেছে, তাহা হইলে স্থানীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে।

আমার আশ্রয়দাতা সর্দ্দার বুলদীপ সিং পাইনএপ্‌ল, ম্যাঙ্গোষ্টিন্‌স, র‍্যাম্পষ্টান্‌স প্রভৃতি নানাজাতীয় স্থানীয় ফল প্রায়ই আমাকে আনিয়া দিতেন। র‍্যাম্পষ্টান্‌স ফল খাইতে অনেকটা নিচুর মত, তবে ইহার লম্বা লম্বা খস্‌খসে আঁসগুলি লালবর্ণ। আলুর মত দেখিতে আর একরকম ফল আছে; তাহার ভিতরের রং হল্‌দে এবং তাহা খাইতে বেশ সুস্বাদু। আর এক প্রকারের ফল দেখিলাম—তাহাকে চীনা ভাষায় 'Cat's eye' বলিয়া থাকে। সত্যই ইহার খোসা ছাড়াইলে, ভিতরটা দেখিতে বিড়ালের চোখের মত। এখানে নানা রকমের সুস্বাদু কলা পাওয়া যায়। ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার শাক-সব্‌জী এখানে দেখিতে পাইলাম।

শিঙ্গাপুর প্রবাসীগণের মধ্যে চীনারাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা স্থানীয় শিল্প বাণিজ্য একরূপ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নামজাদা ধনী। 'New World' নামে এখানে একটি আমোদ-প্রমোদের স্থান আছে। এখানে ধনী পরিবারের চীনা মহিলাগণের চোখ-ঝলসানো বহুমূল্য পোষাক এক বিস্ময়কর দেখিবার বস্তু বটে! মালয়বাসীরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে নাই,—তাহারা স্বদেশে থাকিয়া পাহারাদারী অথবা মোটর চালানো প্রভৃতি অল্প মাহিনার কাজ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

শিঙ্গাপুরে একটি সুন্দর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ভারতীয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পড়িবার জন্য ভারতীয়

সংবাদপত্রাদি এবং নানারূপ খেলিবার ব্যবস্থা আছে। বাবু অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র এই সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি। 'উত্তর ভারতীয় হিন্দুসঙ্ঘ' নামে এখানে আর একটি সমিতি রহিয়াছে। এই সঙ্ঘ দ্বারা একটি হিন্দু নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে এবং কিছু বলিবার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম। ভারতীয়গণের মধ্যে মাদ্রাজীরাই (হিন্দু ও মুসলমান) এখানকার প্রধান বাসিন্দা। তাহাদেরও এখানে সঙ্ঘ রহিয়াছে। শিঙ্গাপুর-প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে খদ্দরের প্রচলন বেশ

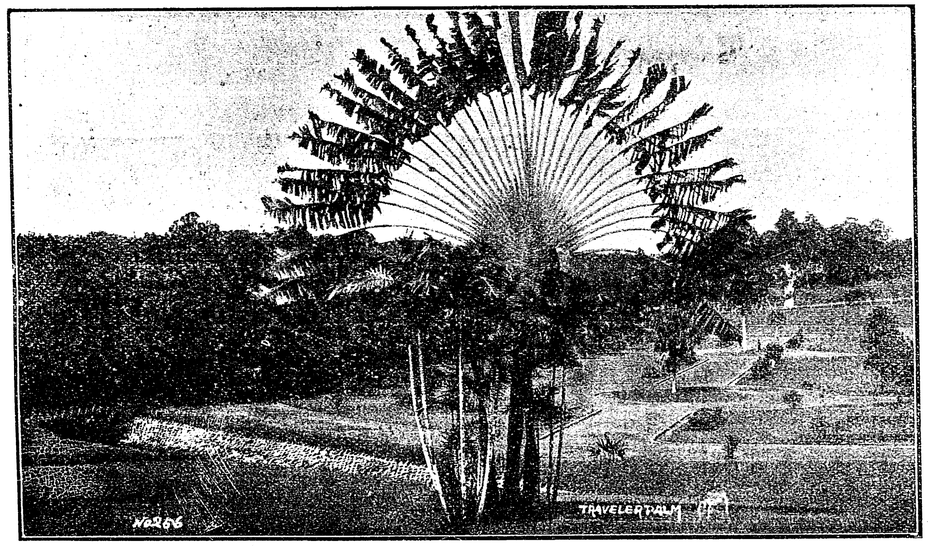

পান্থ-পাদপ

দেখিলাম। ডাক্তার ছোটা সিং, বাবু রামধারি সিং প্রভৃতির ন্যায় মহানুভব স্বদেশ-ভক্তগণের চেষ্টাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণে পেনাং এ সাউথ শ্যাম এক্সপ্রেস্ ধরিবার জন্য ট্রেণযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি। এই এক্সপ্রেসখানি প্রতি বৃহস্পতিবার পেনাং হইতে ছাড়ে এবং শ্যামরাজের রাজধানী ব্যাঙ্কক (Bangkok) পর্য্যন্ত গমন করে। জোহর প্রণালী (the Strait of Johore) পার হইবার জন্য ষ্টীমলঞ্চে উঠিতে হইল। এই প্রণালীটি শিঙ্গাপুর ও মালয় উপদ্বীপকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। লঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া জোহর ষ্টেশনে পুনরায় ট্রেণে চড়িলাম। এই স্থান মালয় ফেডারেটেড্ ষ্টেট্‌সের অন্তর্ভুক্ত। জোহর প্রণালীর উপর একটি বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে—ইহা শিঙ্গাপুর ও মালয় রাজ্যের সংযোজক স্বরূপ হইবে।

এফ, এম, এস্, ট্রেণে এক ডলার (অর্থাৎ এক টাকা বারো আনা) অতিরিক্ত দিলে ঘুমাইবার জন্য বার্থ পাওয়া যায়। পর দিন প্রাতঃকালে মালয় রাজ্যের প্রধান সহর কুয়ালা লম্পর (Kuala Lampar) পৌঁছিলাম। মাল

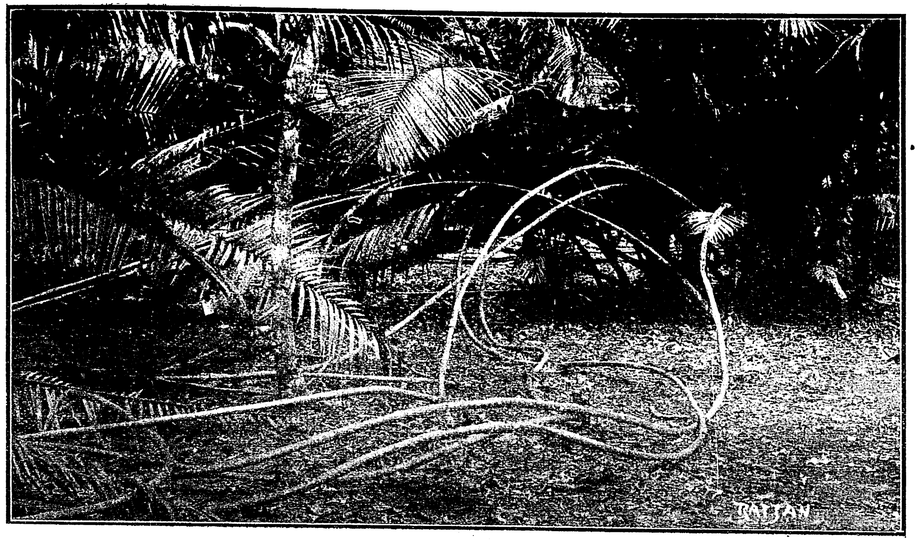

বেতের ক্ষেত



কাতুং (শিঙ্গাপুরের সৌখীন স্থান)

রাজ্য পেরাক্, সেলাঙ্গোর, পহাং প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ দ্বারা সংগঠিত এবং ব্রিটিশ রক্ষিত দেশীয় রাজন্যবর্গ দ্বারা শাসিত। এখানে আমাদের গাড়ী বদল করিবার কথা। ট্রেণে ছাড়িবার কিছু বিলম্ব থাকায় গাড়ীতে চড়িয়া সহরটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। পাহাড়ের গাত্রে সুন্দর চিত্রের ন্যায় উদ্যান এবং হিন্দু আরবীয় (Indo-Saracenic) শিল্পকলার আদর্শে গঠিত চিত্তাকর্ষক অট্টালিকাগুলি সত্যই দেখিবার মত। এইখানে আমি সর্ব্বপ্রথম পান্থ-পাদপ (Travellers' palm) দেখিলাম। এই গাছ দেখিয়া আমার পেখমধারী ময়ূরের কথা মনে পড়িল। এখানে ভারতীয়গণের অনেক দোকান দেখিতে পাইলাম—পরিচ্ছন্ন 'ইউনিফর্ম্ম' পরিহিত শিখ সৈন্য ও পুলিস সর্ব্বত্র চোখে পড়িল।

সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে ফিরিয়া ট্রেণে চড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ সীমাহীন রবার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। এগুলি অনেক স্থলে পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিলাম। রবার ক্ষেত্র এদেশের প্রধান বিশেষত্ব।

সহস্রবাহু-মন্দির

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্য-ভারতের শিল্পী গোয়ালিয়র দুর্গে যে মনোহারী, ভাব-মোহন, সৌন্দর্য্য মণ্ডিত-কারু-কার্য্যের অতুল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন,—তন্মধ্যে "সহস্রবাহু-মন্দিরই" শ্রেষ্ঠ। গোয়ালিয়র দুর্গে প্রাচীন যুগের যে সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে,—শিল্পী যেন তন্মধ্যে ইহাকেই প্রস্তুত করিতে নিজের শিল্পী-কলার সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

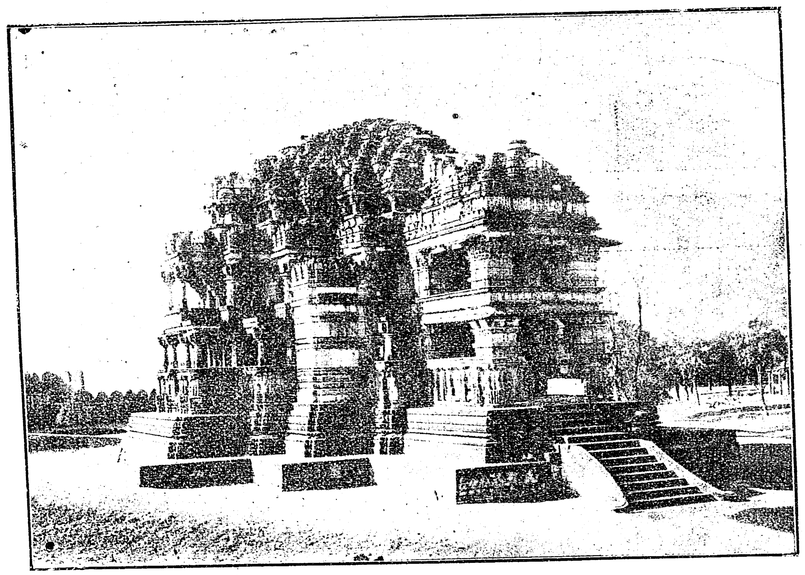

"গোয়ালিয়র দুর্গে" বড় "সহস্র-বাহু-মন্দির"

হইতে শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন ঝরিয়া পড়িতেছি,—তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ভারতের বাহিরে অন্যত্র দুর্ল্লভ! ইহার গুম্বজে, ইহার থামে, ইহার দেয়ালে, ইহার তোরণে, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শিল্প যেন সজীব-মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়া! এক কথায় সমস্ত মন্দির শিল্প-সম্ভারে পূর্ণ। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে,—"...are richly ornamented with sculptures."

এই শিল্প অতি সুন্দর—সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের মধ্যে অপূর্ব্ব সমবেশ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়! ইহা প্রস্তুত করিতে শ্রম, যত্নের কোনই ত্রুটি লক্ষিত হয় না;—সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কত শত ঝড়-ঝাপটা ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—কিন্তু আজও সেইরূপ নীরব, নিস্পন্দ,—অচল, অটল, স্থিরভাবে মাথা উঁচু করিয়া, দুই ভ্রাতার ন্যায়, দুইটি মন্দির দুর্গের মধ্য-স্থলে,—পূর্ব্ব-প্রান্তের শেষ সীমানায়. দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্য-প্রিয় সমাজের কৌতূহল জাগ্রত করিতেছে।

দূর হইতে বোধ হয় ঠিক যেন কেহ কাঠের কারুকার্য্য-খচিত একটি মন্দির বসাইয়া দিয়াছে। নিকটে আসিয়া ভ্রম যখন দূর হয়, তখন সত্যই অবাক্ হইতে হয়, মুগ্ধ হইতে হয়—আমাদের ভারতবর্ষের সমুন্নত শিল্প-কলার নিদর্শন দেখিয়া! এই সব দেখিয়া বোধ হয় আমাদের ভারতে শিল্প-কলার অভাব মোটেই ছিল না। তবুও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েষ্টমেকটের মতে, "There is no temptation to dwell at length on the sculptures of Hindustan." আর স্পষ্টবক্তা সার জর্জ্জ বার্ডউড বেশ গম্ভীর ভাবে বলিয়া গিয়াছেন, "Sculptures and paintings are unkonwn as fine arts in India."(?)

আমাদের প্রাচীনযুগের কাহিনী হইতে আমরা বঞ্চিত; কিন্তু প্রস্তর-গাত্রে এই মূল্যবান শিল্প-কার্য্য সকল আমাদের সম্মুখে সে যুগের সে আলেখ্য ধরিয়াছে, তাহা সত্যই গৌরবজনক!

এই মন্দির দেখিতে যাইতে হইলে 'উরবাহী দরজা' দিয়া যাওয়া সুবিধাজনক। পথটি চড়াই,—শত শত পার্ব্বত্য-পক্ষীগণের অপূর্ব্ব কাকলীর জয়শ্রীতে পূর্ণ;—খরগোস যাঝে মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে-ময়ূরের উচ্চ রব গম্ভীর স্থানটিকে সচকিত করে দেয়;—তাহা-দের নৃত্য দেখিয়া পথিককে দুদণ্ড দাঁড়া-ইয়া চক্ষু সার্থক করিয়া লইতে হয়। সহসা পথের মাঝে, ডান হাতের দিকে,—পাহাড়ের গায়ে,—সর্ব্বোচ্চ 'আদিনাথে'র মূর্ত্তিটি নূতন দর্শকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তোলে। ইহার উপরে উঠিবার জন্য পাথরের সোপান ঘুরিয়া-ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে আমরা কত-বার উঠিয়া মূর্ত্তির বুকের উপর নাম লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

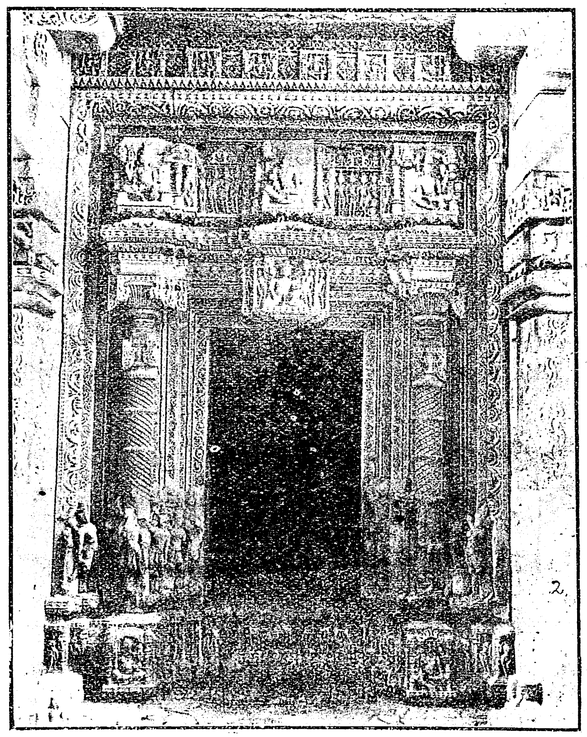

গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের গর্ভ-গৃহের তোরণ

দ্বিতীয় তোরণের নিকট উপরে উঠিবার পথটি সহজ করিবার জন্য সোপান চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর "তৈলাঙ্গনা-মন্দিরের" কাছাকাছি "সূর্য্য কুণ্ডের" পার্শ্বের পথ ধরিলেই অবিলম্বে সহস্র-বাহুর নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহা প্রাচীন প্রস্তর-শিল্প-কীর্ত্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায়, "...Very beautiful examples of eleventh century work."

ঐতিহাসিকের মতের ঐক্য নাই,—অনেকেই ইহাকে জৈন-মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যে মূর্ত্তি-গুলি অতি নিপুণতার সহিত খোদিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রতিচ্ছবি,—তাহা হইতে সহজে অনুমেয় মন্দির জৈনদিগের নয়—হিন্দুদিগের।

প্রথমে সোপান-সাহায্যে বড় মন্দিরে প্রবেশ করিলেই দুই-দিকে দুইটি লিপি প্রাচীর-গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়;—ইহা ১১৫০ শকাব্দের (A. D. 1093)। লিপিতে 'পদ্মনাথের' কথাটার উল্লেখের জন্য জৈন দিগের ষষ্ঠ সন্ন্যাসী পদ্মপ্রভা-নাথের ভ্রম হয়, এবং সেই কারণে সকলে ইহাকে জৈন-মন্দির বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ-মন্দির ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতার সুন্দর, সূক্ষ্ম মূর্ত্তির ভারে নুইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সেই কারণে ইহাকে জৈন-মন্দির বলা যায় না।

মন্দিরে দুইটি তোরণ। একটি প্রবেশ-দ্বার, অপরটি ভিতরে। এই তোরণগুলির কারুকার্য্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য ও সুন্দর। বৃহৎ একটি কারুকার্য্য-খচিত পাথরের মধ্যস্থলে তোরণ। দুটিরই গঠনাদর্শ এক-রূপ, ও কারুকার্য্য বড়ই চমৎকার। এই সব তোরণে অসংখ্য দেবতার মূর্ত্তি, পশু ও পুষ্পলতার চিত্র খোদিত

আছে। কতবার গিয়াছি, শুধু আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহার শিল্প-চাতুর্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। প্রত্যেক তোরণের উপরে পদ্ম-হস্তে অনেকগুলি বিষ্ণু-মূর্ত্তি;—ইহা হইতে অনুমান করা যায় মন্দিরটি বিষ্ণুকে অর্ঘ দিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দির দুইটি রাজা মহীপালের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালবাবু বলেন মহীপালের রাজত্বকালে, "...a figure of Padmanath a Jain divinity came sudderly into existence." এবং সেই কারণে তাঁহার মতে ইহা জৈন-মন্দির। কিন্তু ইহাতে হিন্দুদিগের নানারূপ দেবতাদিগের মূর্ত্তি বিশেষতঃ-বিষ্ণুকে পদ্ম হস্তে উচ্চাসনা-রূঢ় দেখিয়া ক্যানিংহাম বলেন, "I infer Padmanath must be one of the many titles of Vishmu." ষষ্ঠ জৈন-সন্ন্যাসীর নাম পদ্ম-প্রভা, পদ্মনাথ নয়; সেই কারণে পদ্ম-হস্তে বিষ্ণুকেই "...Lord of Lotus" বলিতে হইবে।

"সহস্রবাহু-মন্দির" ১০০ ফিট লম্বে ও ইহার চৌড়াই ৬৩ ফিট। উত্তর ও পশ্চিমদিকে মন্দিরের বাহিরে বারান্দার মত আছে। উত্তরদিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার;—দক্ষিণের মন্দিরের শেষে, একটি অন্ধকার, সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত পূজার ঘরের মত নির্জ্জন কুঠরী।

মন্দির সম্বন্ধে প্রস্তরস্তম্ভে যে লিপি উৎকীর্ণ ছিল,—সেই লিপি-সংযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভটি—মন্দির হইতে ১৫০ ফিট দূরবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহাতে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা এখন মুছিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব, এই স্তম্ভ হইতে আমরা মন্দির সম্বন্ধে আরও কিছু বেশী পরিচয় পাইতাম। পূর্ব্ব-যুগে রাজাদিগের ইতিহাস প্রস্তর-লিপিতেই উৎকীর্ণ হইত;—যাহা কিছু তাঁহারা করিতেন সে সব কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য লিপিতে খোদাই করিয়া দিতেন।

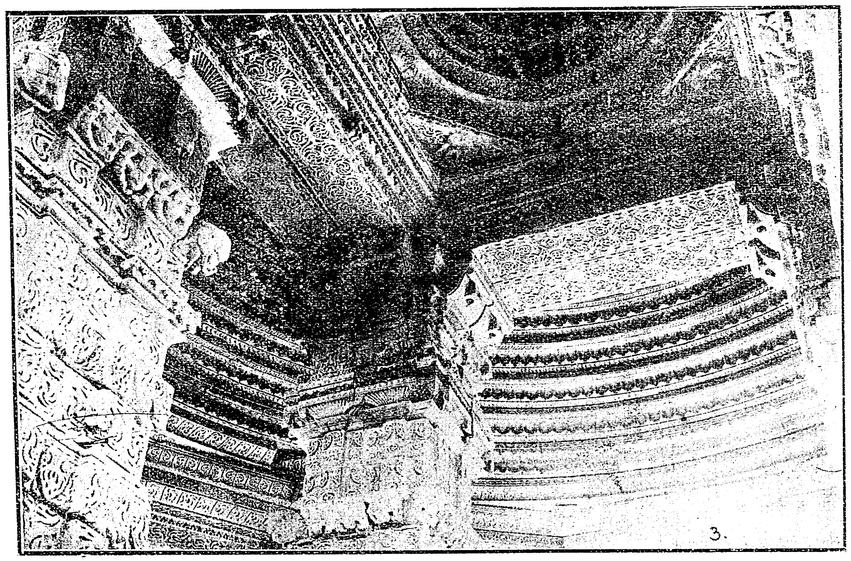

গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের থাম ও গম্বুজ

ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিট। ইহার চূড়া কিন্তু প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে;—সেই কারণে মনে হয় কোনকালে ইহা ১০০ ফিটের কম উঁচু ছিল না। সম্পূর্ণ মন্দির কারু-কার্য্যময়, পাষাণ-খণ্ডের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে;—উপরের অধিকাংশ পাথর খসিয়া পড়িয়াছে; সেই খসিয়া-পড়া পাথরে শিল্পের যে অনিন্দ্য-সুন্দর প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল তাহা অদৃশ্য হইয়াছে,—সেই কারণে শিল্প-কলার যে অন্যান্য গঠন নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা আর পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে তাহারই নিম্নের সারিতে হাতিগুলি সম্মুখে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

উহার নিম্নে পুষ্পহার-বিভূষিত সুন্দর বৃক্ষ এবং উড্ডীয়মান কিন্নরী—মাঝে মাঝে অলঙ্কারের প্রতিচ্ছবি—যাহা মিঃ ক্যানিংহামের মতে "...too fine and delicate for the near and prominent position which they occupy."

মন্দির তিনভাগে বিভক্ত,—ইহা অতি পরিষ্কাররূপে দূর হইতেই বোঝা যায়। দুই তলারই ছাদ নিম্নে থামের সাহায্যে দাঁড়াইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে সব-শেষে যে নির্জ্জন আলো-আঁধারে কক্ষ আছে,—তাহার উপরকার প্রায় অনেকগুলি পাথর ভাঙ্গিয়া খসিয়া গিয়াছে,—সেইজন্য

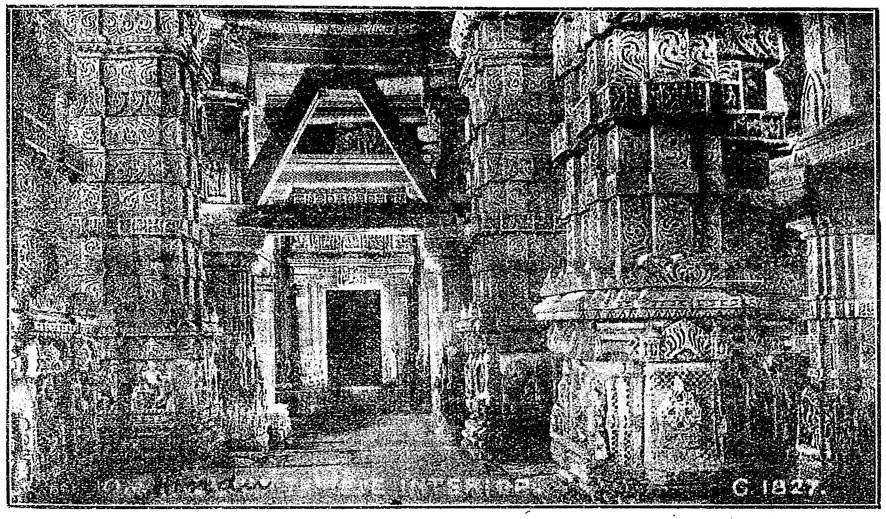

গোয়ালিয়র দুর্গে বড় সহস্রবাহু মন্দিরের তোরণ ও প্রাচীরগাত্রে-কারুকার্য্য

অনুমান করা যায় না উহার প্রকৃত উচ্চতা পূর্ব্বে কত ছিল। ক্যানিংহাম বলেন, "I infer that the sanctum could not have been less then 150ft. in height." উহার চূড়া অত উঁচু ছিল বলিয়া বহুপূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়াছে, কারণ বাবরের মতে, "Teli-mandir is the highest building in the fort." তাহা হইলে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের দুর্গ আগমনের আগেই পদ্ম-নাথের সব-চেয়ে উঁচু মন্দিরটি ভগ্নদশায় নিপতিত হয়।

মন্দিরের অভ্যন্তরিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইহার আলাদা আলাদা ৫টি ভাগ আছে,—প্রবেশ করিয়াই 'অর্দ্ধমণ্ডপ' সমস্তই কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি-চিত্রে অঙ্কিত;—এমন কি বিষ্ণুর হস্তে পদ্মের প্রত্যেক পাপড়ির সৌন্দর্য্য সকলকে মুগ্ধ করে। সোপানটি পর্য্যন্ত শিল্পের পরিচয় দিতেছে। তাহার পর তোরণ,—ইহা দেখিতে অতি চমৎকার। ভিতরে গিয়াই 'মধ্য-মণ্ডপ' ও তাহার পরই 'মহা-মণ্ডপ।' চতুর্থ অংশের নাম 'অন্তর্লা',—চারদিকে চারটি ছোট ছোট কুঠরী;—পঞ্চম "গর্ভ-গৃহ" ইহার দ্বারটি বাহিরের তোরণের মত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর রুচি অনুযায়ী অনেক প্রকারের নূতন নূতন গড়নের অলঙ্কার আবিষ্কৃত হইতেছে—কিন্তু এই তোরণের দুটি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়—এ সব আবিষ্কার নূতন নয়, অতি প্রাচীনযুগে ভারতবাসীর মস্তিষ্কে ইহার উদ্ভাবনা হইয়াছিল। স্বর্ণের উপর যেরূপ কারুকার্য্য হইয়া নূতন গড়নের অলঙ্কার বাজারে প্রচলিত হইতেছে,—(যাহা সভ্য-সমাজকে মুগ্ধ—অথবা আত্মহারা করিয়া তোলে)—সেই ধরণের—অথবা আরও আশ্চর্য্যজনক গঠনের নানাবিধ অলঙ্কার, শিল্পী একাদশ শতাব্দীতে, সামান্য পাথরের তোরণে খোদাই করিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পী শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়! ইহাদের অঙ্গ-লাবণ্য এরূপ সুষমা-মণ্ডিত, যে

বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। কিন্নরীর লীলাচঞ্চল পাদ সঞ্চালনে দর্শক-মনোহারী নৃত্য, এ সকল এত নিপুণভাবে খোদিত হইয়াছে যে শিল্প-প্রিয় মানবের মনে আনন্দের ঢেউ খেলাইয়া দেয়! সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম-শিল্পের পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান;—গাত্রের ভূষণ-গুলি বেশ সুস্পষ্ট—হস্তের ও বাহুর অলঙ্কার, কণ্ঠের হার, শিরোভূষণ প্রভৃতির অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের রচনা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কৃষ্ণের বাঁশী হস্তে দাঁড়াইবার ভঙ্গিমা দেখিয়া হঠাৎ বোধ হয়—এখনি বুঝি বাজিবে বাঁশরী!

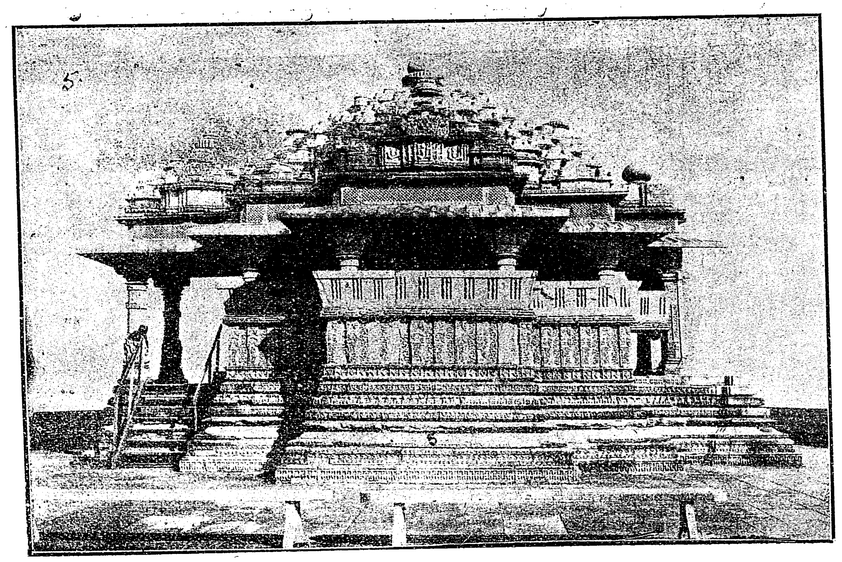

গোয়ালিয়র দুর্গে ছোট সহস্রবাহু-মন্দির

'মধ্যমণ্ডপের' গম্বুজও দেখিবার মত; ইহা ৩১ ফিট, গোলাকার—নিম্নে কারুকার্য্য-খচিত থামের সাহায্যে আজও দাঁড়াইয়া। শেষাংশ ছাদটি ছোট ছোট থামের উপর ভর করিয়া আছে। এই ছাদটিও গোলাকার ভাবে ঘুরিয়া গিয়া 'মধ্য-মণ্ডপে'র গম্বুজকে আলিঙ্গন করিয়াছে। থামে, গম্বুজে ছাদে সর্ব্বত্রই ঐরূপ সূক্ষ্ম শিল্প।

শিলালিপি হইতে জানা যায় মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য বিক্রম ১১৪৯ অব্দে (A. D. 1092) শেষ হইয়াছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরের কারুকার্য্য শেষ হইতে আরও সময় লাগিয়াছিল; ইহা ভাস্কর্য্যের ভিন্নতা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যায়। থামের উপরকার শিল্প আরও সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহার কারুকার্য্যময় লতাপাতাগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মুসলমানদের যুগে ইহাতে একবার চুণকাম করা হয়, তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

গোয়ালিয়র দুর্গে যখন মুসলমানদিগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে 'পদ্মনাথ' হিন্দুদিগের পূজা হইতে বঞ্চিত হ'ন। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। পশ্চিমদিকের একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ১১৬০ সম্বতের (A. D 110 ও) অসম্পূর্ণ একটী লিপি আছে; এই স্থানে আরও দুইটি লিপি আছে—একটি ১৫২২ সম্বতের (A. D 1465) ও অন্যটি ১৫৪০এর (A. D 1483)। এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি আবার হিন্দু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তখন তোমরবংশীয় নরপালগণের বিজয়-কেতন দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শতাব্দীতে গোয়ালিয়র দুর্গ হিন্দুদিগের হস্তচ্যুত হইয়া মুসলমানদিগের করতলগত হইল। তখন হইতে দুর্গটি "used as a prison"

এই সব প্রাচীন স্মৃতি একবারে নির্ম্মূল করিবার জন্য

মুসলমান নৃপতিগণ প্রায় সমস্ত মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত করিয়াছেন। কাহারও হস্তপদাদি ছিন্ন, আবার কাহারও মাথাটি স্কন্ধের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কাহারও নাকটি এরূপ সুন্দরভাবে কাটা হইয়াছে যে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না!

ছোট 'সহস্র-বাহু'-মন্দির" ইহারই প্রতিচ্ছবি; একই গঠনের, প্রভেদের মধ্যে উহার চেয়ে ছোট ও একতলা। "গর্ভ-গৃহ" ব্যতীত ইহা চতুর্দ্দিকে খোলা। পদ্ম-নাথ মন্দিরের পশ্চিমে দুর্গের শেষ সীমানায় ইহা অবস্থিত। এ স্থান হইতে নিম্নের দৃশ্য অতি চমৎকার। একদিকে বৃহৎ-সুন্দর-মনোমুগ্ধকারী উদ্যান ও অপরদিকে প্রাচীন গোয়ালিয়রের করুন ছবি!

ইহার ক্ষুদ্র কুঠরী অদৃশ্য হইয়াছে। মন্দিরের শেষাংশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; মুসলমানগণ এতদিন দুর্গের শাসণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহাকে কেন নিষ্কৃতি দিলেন? অনেকগুলি মূর্ত্তির দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আস্ত। ইহার বাহ্যিক গঠন সাধারণ। 'মহা-মণ্ডপ' ২৩ ফিট; গোলাকার ছাদ চারটি থামের উপর নির্ভর করিতেছে। পশ্চিমদিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার। ইহাতেও শিল্প-কলা বিকশিত হইয়াছে। থামগুলির চতুর্দ্দিকে যৌবন-পুষ্পিতা, রত্নালঙ্কার ভূষিতা নর্ত্তকীগণ নৃত্যপরায়ণা।

ইহাও বিষ্ণু-মন্দির। ক্ষুদ্র কুঠরীর তোরণের মধ্যস্থলে গরুড়ের উপর গদাহস্তে বিষ্ণু আসীন—তাঁহার ডান দিকে বেদ-হস্তে ব্রহ্মা ও বাঁদিকে শিব। কোন লিপিতে ইহার সম্বন্ধে কিছু উৎকীর্ণ না থাকায় ইহার নির্ম্মাণকাল অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বড় 'সহস্র-বাহু'-মন্দিরের গঠনপ্রণালী দেখিয়াই বলিতে হইবে, একই নির্ম্মাণকর্ত্তা কর্ত্তৃক এই দুটি তৈরী হওয়া সম্ভব। ইহার এক নাম "শাশ-বাহু"—অর্থাৎ শ্বাশুড়ী বধূ; ইহা হইতে বোঝা যায় দুইটিতে নিকটতর সম্পর্ক আছে। বড়টি যখন মহীপাল কর্ত্তৃক খৃঃ ১০৯২ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন ক্যানিংহামের মতে, "I would assign the smaller temple either to one of his queens or to some other member of his family."

এই চিরস্থায়ী দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভ গোয়ালিয়র দুর্গে এখনও সমুন্নতশিরে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

হটু ঘোষ

শ্রীধূর্জ্জটী অধিকারী

১

তাকে হটু ঘোষ বলেই প্রবীণেরা ডাকতেন। আর তরুণের দল ব'লতো খুড়োমশাই। বর্দ্ধমানের উকিল মহলে তার পসার ছিল খুব; কেন না, মামলা সাজাতে আর সাক্ষ্য দিতে সে না কি অদ্বিতীয় ছিল। নূতন উকিল সমর বোস, বছরখানেক ব্যবসা খুলেই, দুখানা গাড়ী, আর চার মহল বাড়ীর মালিক হতে পেরেছিল না কি তারই সহায়তা পেয়ে।

এই হটুর গ্রামের নাম ছিল মকুবপুর। সেখানে বাসের ভূমি ও চাষের জমীর অনুপাতে বসতি ছিল খুবই অল্প; তাই, বাংলার অন্যান্য গ্রামের মত, মকুবপুরের কুটীরগুলির অধিকাংশই শুধু পাগল হাওয়ার উদাস সুরে আর্ত্তশ্বাস মিশাতো; আর মাঠগুলি সব আগাছার বসন প'রে কোনও রকমে লজ্জা রক্ষা করতো।

কিন্তু দশ-বিশ বছর আগে মকুবপুর ঠিক এমনটাই ছিল না। তখন গ্রামের উত্তরে ছিল কায়স্থের ও দক্ষিণে ছিল ব্রাহ্মণের বাস; আর মধ্যভাগে যেন বুকটী জুড়ে ছিল বিশ-ত্রিশ ঘর চাষা। তাদের কেউ বা তুলে, কেউ বা জেলে, কেউ বা মুচি, কেউ বা ডোম। এ খবরটী না জানালেও গল্পের ক্ষতি হ'ত না হয় ত; কিন্তু এর পিছনে দূর অতীতের মানুষগুলির যে মনের ছবির আভাসটুকু

জাগছে, সেটা তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছোটর প্রতি এই যে আসল অনুরাগ, বড় জাতের আবাস-ঘেরা গ্রাম্য ভবনের আঙ্গিনায় ছোট জাতের এই যে অধিষ্ঠান,—অতীত যুগের বড় জাতের কতখানি উঁচু প্রাণের এ যে স্পষ্ট পরিচয়,—তা' কি আর বেশী ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে?

কোন্ সুদূর কালে দামোদরের একটী ধারা এই গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত—সেই চাষার নীড়ের তল বেয়ে। এখন তার স্মৃতিটুক্ জাগিয়ে আছে মাত্র একটী শুষ্ক রেখা; কাঙাল মেয়ের, পূজোর সময় তুলে-রাখা-নূতন কাপড় পরার মত—সে বর্ষায় বর্ষায় জলাম্বরীতে অঙ্গ ঢেলে উৎসব সজ্জায় সাজে।

নদী শাখা গ্রামের মাঝ দিয়ে ব'য়ে গেলেও, উভয় তীরের লোক তখন এক গ্রামেরই সামিল ছিল। একবার না কি কোন্ জমিদারের যুগে দুই তীরকে দুটো গ্রামে বিভাগ করবার কথা হ'য়েছিল; কিন্তু প্রজারা রাজার কাছে একবাক্যে জানায় যে, দামোদরের এই ললনা—মা যে ইনি তাদের,—জননীর দু'বাহু ধ'রে দু'ধারে নেচে খেলে বেড়ায় তারা,—তাদের পৃথক্ করার প্রয়াস কেন রাজার! সেই অবধি অনেক দিন আর এ বিষয়ে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। হঠাৎ এক সময়ে গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সমর বোসের ঠাকুরদাদা—বিপিন বোস। সদরে, সাহেব মহলে, তাঁর না কি খুব নাম হ'ল—পূর্ত্ত-বিভাগের 'ক' একটা কাজে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে। তখন দেশময় যে নূতন সাড়া পড়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ-রাজের দিকে-দিকে-প্রচারিত বিশ্ব-প্রীতির মন্ত্র-ঘটায়,—সেই ডাকের টানে ইনি পল্লী ছেড়ে বেরিয়ে গেছলেন একটা মস্ত কিছুর প্রলোভনে। এক যুগের পর যখন জন্মকুঞ্জে ফিরে এলেন, তখন তাঁরে কেউ বা বলল 'বাবু'. কেউ বা বলল, 'ভাগ্যবান'; আবার কেউ বা বলল 'সাধু'; কিন্তু সবার বলা অগ্রাহ্য ক'রে তিনি হলেন,—ক্ষুদ্র একটী সাহেব।

তখন নূতন বাংলার এই নূতনতর জীবের মান, যশঃ, খ্যাতি ছাপিয়ে উঠল বামুণ-পণ্ডিত বাচস্পতির চেয়ে। কারণ, সকল কাজে, সকল ফাঁকে এই বাচস্পতি বোসজারই মুখপানে চাইতেন—স্ত্রৈণ যেমন পত্নীর মুখের পানে চায়; আর তাই দেখেই, সেই পল্লীসংসারের আর সকল ছেলে-পুলে দলও চেয়ে থাকতো মহা বিস্ময়ে সেই লোকটীরই পানে।

প্রথম মোহের অবসানেই বাচস্পতি আত্মভ্রম বুঝলেন। কিন্তু তখন ভুলের পথে সারা গ্রামটাকে এতদূর নিয়ে গেছল যে, ফিরতে হবে শুনে, তারা চমকে' উঠে, উপহাস করে' বাচস্পতিকে পাগল আখ্যা দিল। তাতেও যখন তিনি দমলেন না, তখন এক দিন বোস মহাশয় নিজে ধমক দিয়ে বললেন, "ভট্চাজ! জমিদারের ইচ্ছামত তোমার টোলের বৃত্তি বন্ধ হ'ল এবার; কারণ, তুমি যা শেখাও, তা'র দ্বারা চালকলা বাঁধার বিদ্যা ছাড়া, পুল বাঁধবার কল চালাবার, তথা সভ্য হবার, বিদ্যা কিছুই হয় না। ঐ টাকাটা এবার থেকে আমার নূতন স্কুলে দেওয়া হবে। অতএব আজ থেকে এ সব ফাঁকি-বাজি ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে মন দাও।"

ক্রমে বাচস্পতি আর বিপিন বোসের মাঝে একটা ব্যবধান বেশ বড় হ'য়েই উঠল। বছর ঘুরতেই সেটা এমন আকার ধারণ করল যে, দেখতে দেখতে মকুবপুরে দু'টো পাড়ার সৃষ্টি হয়ে গেল;—একটা হ'ল দখিণ পাড়া, আর একটা হ'ল 'উতোর'। কিন্তু তা'তেও যেন বোসজার মেজাজ সরিফ হ'ল না। তিনি কোমর বেঁধে চেষ্টা করে' অনেক মাথা আর বিস্তর চাঁদি খরচ করে', সেই নদী-রেখার দোহাই দিয়ে, মকুবপুরকে দুটো গ্রামে বিভাগ করলেন। বোসজার দিক অর্থাৎ উতোর পাড়া হ'ল খাস মকুবপুর; আর, নিশ্চয়ই শ্রুতি-মধুর হবে ব'লেই, দখিণ পাড়া হ'ল বেকুবপুর।

বড়র দেখাদেখি ছোটর দলেও একটা ভাঙ্গাভাঙ্গি হ'য়ে গেল—সেই ক'ঘর চাষার কতক রইল বেকুবপুরে তা'দের বহুকালের বাস্তুভিটে আঁকড়ে; আর কতক গেল বোস মহাশয়ের এলাকায় তাঁরি দেওয়া বিঘা কয়েক জমীর উপর নূতন কুটীর বাঁধতে।

বংশানুক্রমে মকুবপুর আর বেকুবপুর এই রেষারেষির রেশটুকু বজায় রাখতে পেরেছিল। আর এই সুরেতেই হটু ঘোষ, খুব ওস্তাদি চালে গেয়েছিল একখানা গান, গেল ফাল্গুনের শেষে।

হটু যদিও মকুবপুরে থাকত, কিন্তু তা'র সম্পর্ক ছিল দুই গ্রামেরই সঙ্গে। দায়-দফা ত সকলেরই আছে,—সংসার-

ধর্ম্ম ক'রতে গেলে, এর হাত থেকে ন কি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এই দায় দফায় পরের জন্য মাথা দিতে হটু ছিল অগ্রণী;—তাই দুই দলই খুড়ো মশাইকে খুব মানত, আর সকল কাজেই তাকে ডাকত।

২

ফাল্গুনের এক দিনের শেষে বেকুবপুরের জগাই দুলে প্রতিবেশী আর কয়েকজন জাত-ভাইকে আপন বাড়ীতে ডেকে অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করল। তার পর ঘরের বহির্দ্বার ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ ক'রে সবাই মিলে কি একটা গোপন কাজে লেগে পড়ল—অবশ্য খুব উল্লাসভরে। কিন্তু তা'দের চাপা হাসির লহরগুলি আর মৃদু কথার গুঞ্জন-ধ্বনি রুদ্ধদ্বারের বাধা ঠেলে আকাশ বেয়ে যে ছুটতে পারে, এ ধারণা মোটেই তাদের ছিল না। তাই প্রহর রাতে, সহসা কার করাঘাতে, জগাইএর গৃহদ্বার যখন আর্ত্তস্বরে নিনাদ করে উঠল, তখন তাদের দেহের মাঝে যেন তড়িত খেলে গেল। কিছুক্ষণ তারা নীরব হ'য়েই রইল; কিন্তু করাঘাতের ফাঁকে-ফাঁকে যখন চৌকিদারের গলার আওয়াজ তীব্র স্বরে জেগে উঠল, তখন জগাই দুলে ধীরে-ধীরে কম্পিত করে গৃহদ্বার অর্গল-মুক্ত করল। দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল মকুবপুরের মধু মুচি, যদু পঞ্চায়েত, নিধু চৌকিদার,—আর সেই এলাকার দারোগাবাবু ও তাঁর সঙ্গী দুজন পাঁড়ে।

জগাইএর উঠানে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর একটা বড় মাটীর পাত্র বসান ছিল; আর কিছু দূরে ঢেঁকিশালার পাশে রক্ত ও কাদামাখা কি একটা জিনিস পড়ে ছিল। মধু মুচি সেটা তুলে নিয়ে দারোগা বাবুকে বলল, "এই দেখুন বাবু, যা বলেছিলুম—হবহু মিলিয়ে নিন। এই দেখুন, শিরদাঁড়ার দুপাশ সাদা, আর এই ল্যাজটী দেখুন কালো। এ নিশ্চয়ই আমার ছাগল 'বুধি'। 'এই হতভাগারা ধরে এনে রান্না সুরু করে দিয়েছে।"

পাঁড়ে আর চৌকিদারের জিম্মায় আসামীর দলকে যদু পঞ্চায়েতের বৈঠকখানায় নিয়ে আসা হল। সঙ্গে এল বেকুবপুরের দুলে-বাগ্দীর যত ছেলে, যত মেয়ে, যত বধূ. আর যত মায়ের দল তাদের সজল আঁখির নীরব মিনতি নিয়ে। আর মকুবপুরেরও বড়-ছোট সবাই এল—বেকুবপুরের বেকুবগুলার সাজাটা কি হয় তাই দেখতে। উভয় পক্ষের জবাব শুনে দারোগা বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন,"দেখ জগাই—কাজটা করেছ খুবই গর্হিত—চালান দিলেই সাজা হবে নিশ্চিত। অতএব আমার কথা শোন,—এই ছাগলটার বিনিময়ে মধু মুচিকে দশটী টাকা দিয়ে সকল হাঙ্গাম মিটিয়ে দাও।" একটী ছাগ-শিশুর বিনিময়ে দশ টাকা মধু মুচির লাভ বলেই মনে হ'ল, এবং খুব আহ্লাদেই সে দারোগাবাবুকে মস্ত এক সেলাম ঠুকল; আর বেকুবপুরের মেয়ের দল মন খুলে মনে-মনে 'দারোগা বাবু রাজা হো'ক' এই প্রার্থনাই রাজার-রাজার কাছে জানাল। নবীন চৌকিদারের জিম্মায় দারোগা বাবু সদল জগাইকে ছেড়ে দিলেন, আর বললেন, "নবীনের হাতে টাকা পাঠিয়ে দাও—নবীন না আসা পর্য্যন্ত আমরা এইখানেই রইলুম।"

৩

পঞ্চায়েতের বৈঠকখানার এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ছিল হটু ঘোষ। বসে-বসে সে মিটিমিটি চাইছিল, আর দারোগাবাবুর বিচার-প্রণালী দেখছিল। জগাইএর দল যখন শুক্‌নো নদীর ওপারে তালপুকুরের পাড়ের কোলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন সে হঠাৎ উঠে, একটা হাই তুলে, আর দুটো তুড়ি দিয়ে সরে পড়ল, 'বাড়ী যাই' বলে। কিন্তু বাড়ীর পথে মোটেই না গিয়ে, পঞ্চায়েতের বৈঠকখানার পিছন দিয়ে সে ছুটল বেকুবপুরের পানে। এর আমবাগান, ওর বাঁশবন, তার ত্যক্ত ভিটে ঊর্দ্ধশ্বাসে অতিক্রম করে' হটু জগাইএর খিড়কিতে এসে "জগাই" বলে দুটো ডাক দিতেই, শশব্যস্তে সে বেরিয়ে এল।

হটুর কথা বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। তার সহজাত তোতলামির পরিচয় ঢাকবার চেষ্টায় সে কথার মাঝে দু' কটা অবান্তর কথা বলত, যথা—'আর-সমস্ত' ও 'বুঝলে-কি না'। এই 'বুঝলে-কি না' ও 'আর-সমস্ত' —এই দুটীর আড়ম্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে, হটুর কথার যেন সকল মাধুর্য্যই লোপ পেত। জগাই সম্মুখীন হবামাত্রই, হটু তা'র হাত দুটো ধ'রে, চোক দুটো বিস্ফারিত করে, খুব বিচলিতের মত বলে উঠল, "জগাই! আর-সমস্ত, তুই করলি কি! টাকা দিতে স্বীকার পেলি! এতে করে

বুঝলে-কি-না—আর-সমস্ত তোর সর্ব্বনাশ হবে যে রে—একেবারে সর্ব্বনাশ আর-সমস্ত।" হতাশ ভাবে জগাই বলল, "কি করব খুড়োমশাই,—হাতে-নাতে ধরা পড়েছি, আর উপায় কি। আর তাও কি ছাই এই দশটাকার সম্বল আমার আছে;—সবাই মিলে যদি কোনো রকমে এই রাত্রের মধ্যে জোগাড় করে দিতে পারি ত' যথেষ্ট।"

"ওরে আহাম্মুক, তোকে আর-সমস্ত টাকা জোগাড় করতে হবে না; টাকা, বুঝলে-কি-না, দিতেই হবে না, আর-সমস্ত, মোটে।"

আধঘণ্টা কাল হটু চাপা গলায় যে বক্তৃতা দিল, তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই—দশটাকা অবশ্য এমন কিছু বেশী টাকা নয়;—জগাইএর না থাকে, হটু অম্লানবদনে জগাইএর উপকারের জন্য দিতে পারে। কিন্তু এই টাকা দেওয়া মানে আজীবন পুলিসের কাছে দাগী হ'য়ে থাকা। এর পর, এই গ্রামে কিংবা এর আশে-পাশে যেখানেই চুরি হোক না কেন, পুলিস এসে তাদেরই আগে তল্লাস করবে। এমন কি, মাসখানেক পূর্ব্বে পঞ্চায়েতের ভাই'পোর বাড়ীতে যে চুরিটা হ'য়ে গেছে—তার মূলে যে সবান্ধব জগাই তুলেই আছে, এ কথা ত' এইমাত্র সবাই মিলে দারোগা-বাবুকে বলছিল। দশটাকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া মানে, এ ব্যাপার আদালতে এই ভাবেই নিষ্পন্ন হ'তো; কিন্তু বড় চুরির দাবী দিয়ে, অর্থাৎ ঐ পঞ্চায়েতের ভাইপোর বাড়ীর চুরির দাবী দিয়ে যদি চালান দিতে পারে, তাহ'লে সাজাও হবে খুব, আর সঙ্গে-সঙ্গে কোম্পানির কাছে দারোগার খাতিরও বেড়ে যাবে বেজায়।"

সরল জগাই হটুর কথায় যেন দিব্য-দৃষ্টি লাভ করল। সে তখন খুড়োমশাইয়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে বলল, "আমায় তুমি বাঁচাও খুড়োমশাই।" "বাঁচাব ব'লেই ত' আর-সমস্ত দৌড়ে আসা। আর-সমস্ত আমি কি আর, বুঝলে-কি-না—হ্যাঃ। ডাক্ দেখি একবার, আর-সমস্ত, তোর বন্ধুদের।" সবাই এলে হটু তাদের বলল, "আর-সমস্ত জগাইকে আমি বুঝলে-কি-না বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলেছি। তোরা আর-সমস্ত গর্দ্দভ—বুঝলে-কি-না—গর্দ্দভের মত ভয় পাস নি মোটে। সটান্ দারোগাকে বলবি যে, আর-সমস্ত ছাগল আমরা বুঝলে-কি-না চুরি মোটেই করি নি। ঐ কাণা নদী—বুঝলে-কি-না—ঐ নদীর ধারে ছাগল ম'রে আর-সমস্ত পড়েছিল, আমরা তাই তুলে নিয়ে এসে—বুঝলে-কি-না রান্না করেছিলুম! তোদের ভয় বুঝলে-কি-না কিছুমাত্র নেই—আমি সব বাঁচিয়ে দেব—ঐ এক বুঝলে-কি-না—ছাগলের আর-সমস্ত ছাল হ'তেই সব কর্ম্ম ফর্সা করে দেব। ঐ ছাল থেকেই বুঝলে-কি-না—আদালতে আর-সমস্ত প্রমাণ করব যে, এই ছাগল আর-সমস্ত শিয়ালে মেরেছে—বুঝলে-কি-না—জগাই নয়, রমা নয়, হরা নয় আর-সমস্ত মানুষ নয়—বুঝলে-কি-না—শিয়াল। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—এই হটু ঘোষ—অমন কত শত বুঝলে-কি-না দারোগাকে আর-সমস্ত ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ভয় নেই তোদের বুঝলে-কি-না—'নির্ভরসায়'যা বলে গেলুম, আর-সমস্ত করে যা; আমি রইলুম পিছনে—বুঝলে-কি-না—"

গভীর রাতে, নবীন চৌকিদারের মুখে জগাই টাকা দেবে না শুনে দারোগাবাবু সব ক'টাকে চালান দিলেন সদরে। এদিকে বেকুবপুরের দুলেপাড়ার ঘরে ঘরে উঠল কান্নারোল। যাদের বেঁধে নিয়ে গেল, এদের কেউ ছিল বা স্বামী, কারও কেউ হয় ত' ভাই, কেউ বা কারও অন্নের উপায়—একটীমাত্র ছেলে, আর কেউ হয় ত' চার-পাঁচটী কাঙাল শিশুর অন্নদাতা পিতা।

সকাল হ'তেই হটু প্রতি ঘরে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। 'বুঝলে-কি-না' ও 'আর-সমস্তর' ভারে তার ভাষারাণী অবশ্য খুব মন্থরগতিতে চলছিল; কিন্তু তা'র একটা মোহিনী-শক্তি ছিল নিশ্চয়ই, নইলে শোকার্ত্তের দল ক্রমে ঠাণ্ডা হ'ল কেন।

বেলা দশটা অবধি পরিশ্রম ক'রে হটু আপন ঘরে ফিরে এসে, স্নানাহার সেরে, এক ক'লকে তামাক সেজে, টানতে বসে গেল। সাদা ধূমের পাকে-পাকে তার মনের কোণে কি যে পাক খাচ্ছিল, আর তার ঠোঁটের কোণে থেকে-থেকে কিসের হাসি যে ফুটছিল, তা সে-ই জানে।

৪

তখন ধরণী ম্লানমুখে অস্ত-সূর্য্যের পথের পানে তাকিয়েছিল,—আর নিরাশার ছবিখানির মতই জগাই দুলের স্ত্রী শূন্যপ্রেক্ষণে বসেছিল তা'র আপন কুটীর-দ্বারে।

মধু চৌকিদার খানিক আগে তা'র স্বামীর খবর দিয়ে গেছে। সবান্ধব জগাই দুলের একমাস কয়েদের হুকুম হ'য়েছে। জেলের শ্রম হয় ত' জগাইএর প্রতি-দিনের শ্রমের চেয়ে অধিক কিছু নয়; কিন্তু দিনের শেষে ক্লান্ত-দেহে যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে, তখন কা'র করাঙ্গুলির পরশগুলি তা'র শ্রান্তিহরণ করবে? ওগো, ঘুম যে হয় না তার নিত্য সাঁঝে পা দুটী না টিপে দিলে।

তালতরুর শীর্ষ হ'তে দিনের আলোর আল্‌পনা ঐ ত সরে গেল; দীঘির পাড়ের আমবনে অন্ধকারের জাল-বোনা ঐ ত' সুরু হ'ল। এমনই সময় তা'র দীর্ঘ দেহ তাঁতপুকুরের দখিণপাড়ে উঠত জেগে; এমনই সময় ঘরে এসে চ্যাটাই পেতে উঠানেতে শ্রান্ত-দেহ এলিয়ে দিত—পা টিপে দাও—ব'লে। আসবে না—আসবে না—গেল ক'দিন আসে নি সে—আরও একমাস আসবে না;—হায় রে।—

অথচ তাকে ফিরে পেতে চেষ্টার ত্রুটি সে ত কিছুই করে নি। খুড়োমশায়ের কথা মত দুলে পাড়ার আর সকলের চেয়ে সে বরং বেশী কিছুই করেছিল। খাড়ু বাজু থেকে বর্ষার জন্য সঞ্চিত জ্বালানি কাঠগুলি পর্য্যন্ত বেচে সে হটুর হাতে নগদ একশ টাকা গ'ণে দিয়েছে—মামলার খোরাকের জন্য। তবুও, হা ভগবান, মুক্তি তার মিলল না। খুড়োমশাই যে অনেক আশা দিয়ে গেল—তার কথাগুলো কি মিথ্যা তবে শুধুই? আর ওপাড়ার বামুনদাদা—বাচস্পতির নাতি—তারই বা কেমন মাকে ডাকা। সেও ত পূজার খরচ যৎসামান্য নেয় নি—মা কি তবে মা নন্—পাথরের সং সেজে, লোকের পূজা বৃথাই নেন তিনি!

এমন কত চিন্তাই তার মনের মাঝে ভিড় করছিল—তার তালিকা দেওয়া যায় না। ভাবনা-বিহ্বলা সারা রাতই বসে-বসে হয় ত ভাবত,—হটু এসে তাকে চেতনার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সান্ত্বনার খানিক মিষ্ট ভনিতার পর হটু তারে বলল,—"দুলে বউ—আর-সমস্ত আমার কপাল বড় মন্দ। শিয়ালে যে বুঝলে-কি-না ছাগলটাকে মেরেছিল, এটা আর-সমস্ত প্রমাণ করতে পারলুম না। সরকারী ডাক্তার আর-সমস্ত—ঐ আমার পিসতুতো ভাই নির্ম্মল গো—সে বুঝলে-কি-না ছুটি নিয়ে দিমলে পাহাড় গেছলো—তাইতেই ত বুঝলে-কি-না তার সার্টিফিকেট-খানা আর-সমস্ত পাওয়া গেল না। সেটা যদি আর-সমস্ত সমঝমত পেতুম, তাহ'লে দেখে নিতুম, বুঝলে-কি-না—দেখে নিতুম ঐ আর-সমস্ত আহাম্মুক ডেপুটীকে। কিন্তু এখনো বলছি, আর-সমস্ত তোমাকে ভুলে যউ, বুঝলে-কি-না, এই হাড়ক'খানা থাকতে যদি আমি আর-সমস্ত জগাইকে খালাস করতে না পারি, তাহ'লে, বুঝলে-কি-না, আমার নামই বদ্‌লে দিও—আর-সমস্ত—হ্যাঁঃ—এ আবার একটা মামলা। তবে আর-সমস্ত আরও কিছু বুঝলে-কি-না টাকা চাই; আপীল করবো জগাইয়ের হয়ে।"

—টাকা? আরও টাকা? হা অদৃষ্ট আবার টাকা কোথায় তার?—ঋণ? তাই বা কে দেবে,—কি ভরসায় দেবে? জগাই—সে-ই যে ঋণ শুধবে—সারা-জীবন বিনা মাহিনায় মহাজনের মজুর খেটে। একশ টাকায় হ'ল না,—আবার টাকা দিলেই কি হবে? মামলায় হারজিত দুটোই আছে—মধু চৌকিদার স্পষ্ট বলে গেছে।

হটু কিন্তু হটবার পাত্র নয়। নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে সে দুলে-গিন্নীকে বোঝাতে বসে গেল। ডেপুটি আর জজের বিচারে যে আকাশ-পাতাল ভেদ, তার দুএকটা দৃষ্টান্ত দিল। অবশেষে বলল যে স্বামীর চেয়ে দামী জিনিস হিন্দুর মেয়ের আর কি আছে? বুকের রক্ত দিলে যদি স্বামী ফিরে আসে, হিন্দুর মেয়ে কুণ্ঠিত নয় তাতে। সীতা-সাবিত্রীর দেশে জন্ম নিয়ে তুচ্ছ পয়সার মায়ায় কেউ কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে স্বামীকে বিপদের মাঝে ফেলে?

এই শেষ কথাটা দুলে-গিন্নীর বুকে গিয়ে বাজল! তাই ত—সে করছে কি? এখনো ত গরু দুটো রয়েছে, লাঙ্গল আছে, মাছ ধরবার খেয়া জাল, বীজের ধান,—এ সব ত আছে। স্বামীর জন্য এগুলো ত বেচে দিলেই পারে। কার জন্য এ সব সরঞ্জাম? স্বামী বিনা তার বাঁচবারই বা কি প্রয়োজন?—না, না—সর্ব্বস্ব খুইয়েও তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

"খুড়ো মশাই! কাল সকালে এসো—টাকার জোগাড় করে রাখব আমি।"

যা দেখবার তা দেখে, যা শুনবার তা শুনে—জজ সাহেব রায় লিখতে বসে গেলেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তখন জগাই দুলে শূন্যপানে চেয়ে ছিল। হয় ত তার মনের ব্যথা নীরব ভাষায় ব্যথাহারীর চরণতলে জানাচ্ছিল। তার সঙ্গীরা সব নতদৃষ্টিতে পদাঙ্গুষ্ঠে বিচার-কক্ষের ভূমিপৃষ্ঠে রেখাঙ্কনের বৃথা প্রয়াস পাচ্ছিল—তারাই ছিল এই মামলারূপ মহাযজ্ঞের বলি।

উকিল শ্রেণীর পুরোভাগে সমর বোস বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষ্‌ছিলেন—এই সহজাত বৃত্তিটী তাঁর অভ্যাসে পরিণত হ'য়েছিল—উকিল হ'য়েও ভুলতে পারেন নি;—তিনিই ছিলেন এই যজ্ঞের পুরোহিত।

এই কাঠগড়ার পাশ থেকে বিচিত্র ভঙ্গীতে হাতমুখ নেড়ে যে ব্যক্তি জগাইএর দৃষ্টি আকর্ষণের বৃথা প্রয়াস পাচ্ছিল—সে ছিল এই হুমাযজ্ঞের হোতো, হটু ঘোষ।

হটুর অধ্যবসায় দেখে প্রহরীর বোধ হয় একটু দয়া হ'ল। সে জগাইএর পৃষ্ঠদেশে তার যাদুদণ্ডের একটী মৃদু-কঠোর পরশ দিয়ে, তাকে চেতনার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

হটু তখন নিম্নস্বরে বলতে আরম্ভ করল—"দেখ জগাই, আর-সমস্ত রায় যা লিখছে তা' আমি বুঝলে-কি-না এইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলে দিতে পারি। অনেক মামলাই আর-সমস্ত এই ঘরেতে করেছি কি না, তাই জজ সাহেবের বুঝ্‌লে-কি-না কলমের টান দেখেই আর-সমস্ত বলে দিতে পারি সব। ঐ—ঐ যে টানটী মারলে কলমের—বুঝলে-কি-না, ওটী হচ্ছে বুঝলে-কি-না—এই যে বলে দিচ্ছি সব। আর-সমস্ত এইচ্, ও, এন্, ও—অনা; আর্, এ—রে; বি, এল, ওয়াই; আর-সমস্ত আর যায় কোথা, একেবারে বুঝলে-কি-না বেকসুর খালাস। হুঁঃ—এ কি আর আর-সমস্ত ধামাধরা ডেপুটি? এ—বুঝলে-কি-না—একেবারে খোদ জজ সাহেব। হুঁঃ!"

হটুর কথা শুনে জগাই একটু ম্লান হাসি হাসিল। পরক্ষণেই জজ সাহেবের রায় শুনে জগাই কাঠগড়ার রেলিং ধ'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার সহচরগণ আর্ত্তনাদ করে উঠল। সকলেরই তিনমাসের জেলের হুকুম হ'য়েছে।

শৃঙ্খলিত কয়েদীর দল যখন প্রহরী-বেষ্টিত হ'য়ে বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে নীত হ'ল, তখন হটু এসে তাদের বলল—"আর-সমস্ত, দেখ জগাই—আমি, বুঝলে-কি-না এই কাল মকুবপুর থেকে আসছি। আমি দেখে এলুম বুঝলে-কি-না, যে জল-অভাবে, আর-সমস্ত, মাঠগুলো সব জমে পাথর হয়ে গেছে। আর-সমস্ত লাঙ্গলের দাগ বসে না মোটে। এখন দেশে গিয়ে চাষের কাজ ত তোদের জুটত না—বসে-বসে আর-সমস্ত কেবল ঘরের অন্ন ধ্বংস করতিস। তার চেয়ে বুঝলে-কি-না এই তিনমাস কোম্পানীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বুঝলে-কি না, পেটপুরে দিব্যি খেয়ে আরাম ক'রে নে এই চৈৎ, বোশেখ, জষ্টি—বুঝলে-কি-না—এই তিন মাস। তার পরই আষাঢ় মাস—বর্ষা—বুঝলে-কি-না—বর্ষা আর যায় কোথা। তোরাও দেশে ফিরবি, আর 'দেবতাও' এদিকে নাম্‌বে। দেশে ফিরেই লেগে যাবি দেশের কাজে।"

রাধার লিপি

শ্রীআশুতোষ কবিগুণাকর বি-এ

কাঁদায়ে অবলায় যেদিন শ্যামরায়
গোকুল পরিহরি গিয়াছ মথুরায়—
সেদিন হ'তে দাসী বাঁধেনি কেশদাম,
মুকুর দূরে পড়ি কাঁদিছে অবিরাম।
কাজল আঁখি যুগ করেনি বিলপন—
কোথা সে শোভারাগ, কোথা সে প্রসাধন?
কোথা সে চীনবাস যেতেছে গড়াগড়ি,
মেখলা মুরছিয়া ধূলায় আছে পড়ি!
কাঁকন কেঁদে মরে নূপুরে সুর নাহি—
নয়ন নভঃপানে কেবলি আছে চাহি।
আর না সখী সনে লইয়া হেমঝারি
ধরিয়া বনপথ ভরিতে যাই বারি।
গৌরতনু মোর মরণ অভিসারে
পাণ্ডু হ'য়ে আসে—মিলাবে হাহাকারে?



অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ বি-এস্, এম-এ-জি-এ

গত ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" নামক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। তিনি উক্ত প্রবন্ধে অনেক কাজের ও সার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে সার ও কাজের কথা অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে একখানি বড় পুস্তক হইতে পারে। আমি তাঁহার প্রবন্ধকে কতখানি সমর্থন করি, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতের পার্থক্য, তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইব। আমার প্রবন্ধ তাঁহার প্রবন্ধের কতকটা সমর্থক ও কতকটা প্রতিবাদরূপে গৃহীত হইতে পারিবে। আমার ধারণা, আমার মতে সব বিষয়ে সায় দিবার মত লোক পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কেহ না কেহ থাকিবেন।

ইহা সত্য যে বাঁশকে কাঁচা অবস্থায় বেশ বাঁকান যায়, আর পাকা অবস্থায় তেমন বাঁকান যায় না। সেই মত ছোট মেয়ে বিবাহ করিলে সে সহজে পোষ মানে,—তাহাকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাহ না কেন, সে সেই শিক্ষা লইবে। আর ডাগর মেয়ে বা ধেড়ে মেয়ে বিবাহ করিলে তখন তাহার মনের গতি আর এক রকম হইয়া দাঁড়ায়। সেই মনের গতিকে ফিরাইতে অনেক বেগ পাইতে হয়। এমন কি সময়ে সময়ে স্বামী তাহাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মত করিয়া লইয়া চালাইতে পারে না। তখন স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া বাধে ও সংসারে অশান্তি ঘটে। তবে হিন্দু আইনে ডাইভোরস্ বা সেপারেসন্ নাই বলিয়া উভয়কে ঐ কলহপূর্ণ সংসারে থাকিয়া জীবন কাটাইয়া শেষ করিতে হয়। যদি আইন থাকিত, তা'হলে তাঁহাদের পাশ্চাত্য জাতিদের মত ডাইভোরস্ কোর্টে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আজকাল আমেরিকান সমাজেও কেহ ডাগর মেয়ে পত্নীরূপে লইতে চাহে না। "মার্কিনদের চলিত কথায় ষোড়শী বালিকাকে "sweet sixteen" বলে। কোন কোন যুবক বলিয়া থাকে ঐ বয়সের মেয়ের পাণিগ্রহণ করা উচিত। কারণ অধিক বয়সের মেয়েরা সহজে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করেন না, সুদীর্ঘ কোর্টসিপের প্রয়োজন হয়। মার্কিন মাতৃগণও আজকাল বেশী বড় করিয়া মেয়েদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না।" (১)

ছোটবেলা হইতে যুবক স্বামী ও বালিকা পত্নীতে একত্র থাকাতে কেমন একটী ভালবাসা জন্মে। সে ভালবাসা বেশ পূর্ণ প্রেমে পরিণত হয়। সে প্রেম এমনি যে যদি

(১) লেখক প্রণীত "আমেরিকা ভ্রমণ", ১৩২৮

স্বামীর মৃত্যু ঘটে, স্ত্রীর বড়লোক বাপ, মা বা আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও সে স্বামীর ভিটেতে দিনাতিপাত করে। সে ভিটে ছাড়িয়া বাপ ভাইয়ের ভিটেতে গিয়া তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে না। ঐরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আমি আমার ঠাকুরমা, মা, ভগ্নী ও বৌ'দিদির জীবনে দেখিতেছি। (পাঠক পাঠিকারাও নিশ্চয় তাঁহাদের ইদৃশ আত্মীয়ের জীবনেও দেখিতেছেন।) উহাঁদের সকলেরই বাল্য-বিবাহ। এই সম্পর্কে একটী পরিবারের কথা মনে পড়িল, তাহা বলি। একটী ডাগর মেয়ে বৌরূপে ঐ পরিবারে আসে। আমি সেই বৌ'কে জিজ্ঞাসা করি—"তোমার শাশুড়ী কেমন আছেন?" তাহার উত্তরে সে বলে, "শাশুড়ী মরে নাই—এখনও বেঁচে আছে।" এই উত্তর হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, শাশুড়ী মরিলে নিজ রোজগারে স্বামীকে ভাশুর বা দেবরদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া লইয়া অন্যত্র থাকিব বা তাহাদের "ভাতে মারিতে" পারিব ইহাই ঐ বৌটীর অভিপ্রায়। বাল্য-বিবাহে প্রেমের মাধুর্য্য কতখানি তাহার দু'একটী দৃষ্টান্ত দিব। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আমার দিদি শাশুড়ী (২) স্বামীর ফটো প্রত্যহ ফুল দিয়া পূজা করেন ও তৎপরে জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। আর একটী মহিলা তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর পাদুকাদ্বয়কে মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া রাত্রে শুইতেন। ইহার অপেক্ষা ভীষণতর প্রথা এই বঙ্গদেশে এক সময় ছিল তাহা শ্রীমতী মানকুমারীর ভাষায় বলিতেছি :—

"সধবার বেশ পরিয়া ললনা,
পতি শব বুকে যতনে ধরে।
দেখ রে মানুষ! দেখ রে দেবতা!
এ মরণে সতী কি যুগে মরে!
'ধূ ধূ ধূ ধূ অই গরজে অতল,
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সদল,
স্বন স্বন করি বহিল সমীর,
ফুরাল ফুরাল সে দু'টি শরীর।
পতি-দেহে সতী হইল লয়।" (৩)

স্বামী-স্ত্রীর এমনি ভালবাসা যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী ভাবে যে তাহার সব সুখ ফুরাইল তাই সে, পৃথিবীতে আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহিত না। তাই স্বামীর সহিত স্ত্রী এক চিতায় ভস্মীভূত হইত। গভর্ণমেণ্ট যদি ঐ প্রথা বন্ধ না করিয়া দিতেন, তাহলে আজকালকার দিনেও স্বামীর সহিত স্ত্রীর সহমরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত।

বাল্য-বিবাহের যেমন সুফল আছে, তেমনি আবার কুফলও আছে। লেখিকা তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্বকে লইয়া (সে একটী ছোট রকমের গণ্ডী) তাঁহাদের ও ঠাকুর পরিবারের Family traits হইতে দেখাইতেছেন যে, বাল্য-বিবাহে দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়। আমিও এরূপ দেখাইতে পারি যে, অনেক পরিবার বাল্য-বিবাহের ফলে দীর্ঘ আয়ু হয় নাই। যদি ঠাকুর পরিবারে বাল্য-বিবাহের ফলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে তবে রবি ঠাকুরের familyতে অধুনা বাল্য-বিবাহ হয় না কেন? যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যত বাল্য-বিবাহ হইয়াছে, সেই সব পরিবারের traits পাওয়া যায় বা লওয়া যায়—তাহলে বাল্যবিবাহের দ্বারা দীর্ঘ আয়ু পাওয়া যায় এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। (৪)

পাঠ্যাবস্থায় বিবাহিত হইলে ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। (৫) তাহা যে সত্য তাহা আমার অনেক ছাত্রের জীবনে দেখিয়াছি। আজকালকার যুবকরা বিবাহ হইলে মেসে বা হোটেলে বসিয়া পত্নীর চিঠির প্রত্যাশা করিতে থাকে। কেহ বা চিঠি না পাইলে বালিকা স্ত্রীর উপর রাগ করে। হায়! আমার এমন স্ত্রী! আমার বন্ধুটী আজকার ডাকে তাহার পত্নীর চিঠি পাইল, আর আমি পাইলাম না। এবার শ্বশুর-বাড়ী গিয়া তাহাকে চিঠি লেখাইতে শেখাব। বিবাহিত ছাত্রের মন সর্ব্বদা ঐ সব চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। রহিল তাহার কলেজের পড়া, এখন সে শ্বশুর-বাড়ী চলিল। তার পর যে সব

(২) এই প্রবন্ধ লেখার পর সংবাদ পাই যে, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।—লেখক।

(৩) কাব্যকুসুমাঞ্জলি—"সহমরণ"

(৪) আমেরিকায় আজকাল Eugenics Record Officeএ মার্কিন পরিবারের "Family Traits" রাখা হইতেছে। ভারতে সেরূপ কিছু আমাদের গভর্ণমেণ্ট করিতেছেন না। সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহে যে দীর্ঘ আয়ু হইতেছে তাহার actual figures পাওয়া শক্ত।—লেখক।

(৫) কাহার কাহারও যদি ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা সৎসঙ্গে মেশার দরুণ ও বাপ-মা প্রদত্ত সংযম গুণ থাকাতে।—লেখক।

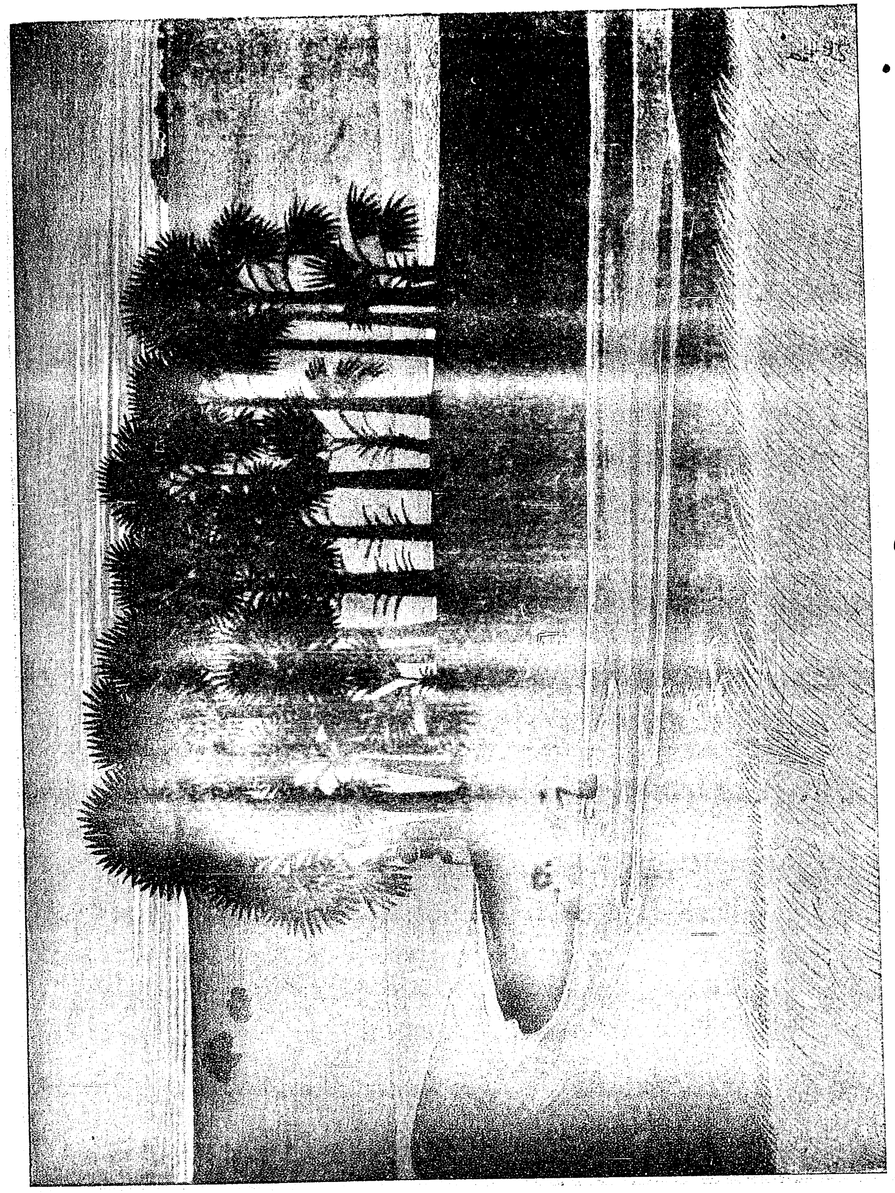

তালতলী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নাটক, নভেল আজকাল বাজারে উঠিয়াছে, যে সব গল্প মাসিক পত্রিকাতে থাকে, যুবক ত সে সব পড়েই, তাছাড়া নিজের পত্নীকে পড়িতে উপদেশ দেয়। (৬) এ স্থলে উভয়ের তখন সংযমী হওয়া শক্ত হয়। তখন ছেলেপিলে হইতে আরম্ভ করে। পাঠ্যাবস্থায় ছেলে বা মেয়ের বাপ হইয়া পড়ে। যদি অর্থের সঙ্গতি না থাকে, তবে এ হেন যুবককে পড়ায় "ইতি শেষঃ" করিয়া চাকরীর জন্য ছুটিতে হয়। কি বলেন আমাদের সহৃদয় পাঠক! তাই নয়?

এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, স্বামী শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছেন। সরলা বালিকা স্বামী সন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছুক। তখন তাহার দিদি বা বৌদিদি বা কোন প্রবীণা ভীতা, ক্রন্দননিরতা বালিকা স্ত্রীকে বল পূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে প্রেরণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে এই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ লজ্জা বশতঃ, দ্বিতীয়তঃ উভয়ের মধ্যে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই বলিয়া, বালিকা স্ত্রী স্বামী সন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছুক। এরূপ বাল্যবিবাহে, যে স্ত্রীর "নারীত্ব" দেখা দেয় নাই তাহার নারীত্ব শীঘ্র ঘটাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। মূল কথা বাল্যবিবাহে শীঘ্র নারীত্ব দেখা দেওয়া সম্ভবপর বিবাহ দেরীতে হইলে নারীত্ব একটু দেরীতে হইত। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ডাক্তার চার্লস বলেন, "নিতান্ত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। বিবাহ দ্বারা বালিকা যে অস্বাভাবিক অবস্থায় নিপতিত হয়, তাহাতেই তাহারা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে।" পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, সি-আই-ই মহোদয় লিখিয়াছেনঃ—"স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলেই সুস্থ সন্তান প্রসব করিবার উপযুক্ততা জন্মে, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিলে কেবল যে অল্পজীবী এবং অসুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করে এরূপ নহে, মাতার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমি নিজে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণের জন্য আমাদের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার পীড়ায় যাবজ্জীবন কষ্ট পায়। অল্প বয়সে বিবাহের জন্যই স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয়। যদি অল্প বয়সে বিবাহ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে অল্প বয়সে ঋতুমতী হওয়াও কমিয়া যাইবে।" (৭)

শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইলে, প্রসবকালে প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে। এ সম্বন্ধে বোম্বাই নগরের বিখ্যাত ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বলেন, "২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে প্রসব যন্ত্রণায় মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া যাইবে।" ডাক্তার হোয়াইট্ বলেন, "১৫।১৬ বৎসরের পূর্ব্বে দেশীয় বালিকাদিগের ন্যূন কল্পে বিবাহের বয়স হয় না। কিন্তু ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে শরীরের বিকাশ হয়, প্রসবের বিপদ কমিয়া যায় এবং অধিকতর সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।"

ভারতবর্ষে বালবিধবার সংখ্যাও কম নহে এক কলিকাতা সহরেই ১৫ বৎসরের কম বয়স্কা বালবিধবার সংখ্যা ১৮২৫৬। (৮) দেরী করিয়া বিবাহ দিলে এত অল্প বয়সে বিধবা না হইতে পারিত। ধরুন, একটী মেয়ের ১২ বৎসরে বিবাহ দেওয়া হয়, সে এক বৎসর না পার হতেই বিধবা হয়। সে ক্ষেত্রে যদি তাহার দেরীতে বা আরো দু' বৎসর পরে বিবাহ দেওয়া হইত, তাহলে আরো দু'বৎসর ত মাছ খাইতে পাইত, সাড়ী গয়না পরিতে পারিত। তাহার সধবা মা, পৃথিবীর সব সুখ অনুভব করিবেন, তাঁহার মেয়ে কিন্তু তা করিতে পারিবে না। একি কম কষ্টের কথা! (৯) ১৬ বৎসর বয়সের ন্যূন বয়স্ক বালিকার বিবাহ হইলে বালবিধবার সংখ্যা যত বেশী হয়, ১৬ বৎসর বা তদূর্দ্ধ

(৬) কোন কোন মেয়েরা অল্পবয়সে অর্থাৎ এঁচোড়ে পাকিয়া যায়। তাহারা আর স্বামীর শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না। সে সব স্ত্রীকে ছাত্রীরূপে" ঘরে রাখিয়া "ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা" অসম্ভব। বরং তাহাতে সে বধূ বিগড়াইয়া যাইতে পারে।—লেখক।

(৭) Journal of Medicine. July. 1871.

(৮) The Statesman. March, 1923.

(৯) এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, বাল্য বিবাহে বিধবা হইলে, আবার সেই বিধবাদের বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ দেওয়া হয়, এখন সেই মহিলারা দ্বিতীয়বার বিধবা না হইয়া স্বামী স্ত্রী, একঘর ছেলেপিলে লইয়া কেমন সুখে জীবন যাপন করিতেছেন। আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের নিয়ম সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয় নাই। যখন বালবিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ সহজসাধ্য নহে, তখন বিবাহের বয়স কিছু বৃদ্ধি হওয়া বালিকাদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।— লেখক

বয়স্কা কুমারীর বিবাহের ফলস্বরূপ বৈধব্যের মাত্রা তত বেশী বাড়িতে পারে না। ১৬ বৎসর বয়স্কা মেয়ের বিবাহ হইলে শীঘ্র জননী হ'বার সম্ভাবনা, সুতরাং একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'বার পর বিধবা হইলেও পৃথিবীতে সেই বিধবার দায়িত্ব ও স্নেহের ধন বর্ত্তমান থাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইলে সেরূপ সন্তানের জননী হওয়ার সম্ভাবনা।

অনেক বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিতে পারিয়া বা প্রলোভনে পড়িয়া ভ্রষ্টাও হইয়া পড়িতেছে।

অকাল-মৃত্যুর জন্য বাল্য-বিবাহ যে কোন দোষে দোষী নহে, তাই বা কি করিয়া বলি। শরীরের গঠন পূর্ণ হইবারপূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইলে প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে। প্রসব যন্ত্রণায় যদি প্রসূতির মৃত্যু ঘটে, আর যদি সন্তানকে বাঁচাতে যাওয়া যায়, সেই সন্তানও মাতৃ-স্তন হইতে বঞ্চিত হইয়া বেশী দিন পৃথিবীতে বাঁচে না। এ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত বলিয়াছেন, "অতি অল্প বয়সে গর্ভবতী হইলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হয়; এবং সে স্থলে প্রসব ব্যাপার যে কি বিপজ্জনক, তাহা বলা যায় না। ইহার বিষময় ফল ডাক্তারেরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের বস্তিদেশের অস্থিগুলি পরিপুষ্ট না হওয়ায় সন্তান প্রসবের পথ সঙ্কীর্ণ থাকে। সুতরাং অতি অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিতে প্রসূতির নিদারুণ কষ্ট হয়; এবং এমন কি, সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া অতি কষ্টে সন্তান প্রসূত হইলেও, তাহা কখন কখন মৃত অথবা অপুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শিশু সন্তানের মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্যের ইহার একটী অন্যতম কারণ।" (১০)

আমাদের দেশ এখনও সভ্য হয় নাই। সভ্য হইলে আমরা ৬।৭ বৎসরের গরীব বালিকা স্ত্রীকে সীমন্তে সিঁদুর, হাতে নোয়া, উলঙ্গ দেহ অবস্থায় পথে ঘাটে দেখিতাম না। আদাম ও ইভ যে গাছের ফল খাইয়াছিলেন, তাহাদের সেই গাছের ফল খাওয়ান দরকার। কিন্তু খাওয়াইলে হইবে কি? কেন এমন বালিকা-বধূ উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়? সাড়ী কিনিবার পয়সার অভাব বশতঃ নয় কি? যে দেশ এমন গরীব, সে দেশে বাল্য বিবাহ দিয়া একঘর ছেলেপিলে লইয়া দারিদ্র্যের কশাঘাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দেরীতে বিবাহ দিয়া সংসারের কষ্ট কি কম করা যাইতে পারিত না? একজন ইংরাজ বন্ধু হিন্দু পরিবারে এত ছেলেপিলে দেখিয়া বলেন, "আমরা তোমাদের মত এত মূর্খ নহি যে এতগুলি ছেলের বাপ হব। তোমাদের ত আয় এই, কি করে তোমরা সংসার চালাও?"

আজকালকার বাজারে দু' একটী পাস করা বাঙ্গালীর বেতন ৩০ হইতে ৪০ টাকার মধ্যে। এমন অবস্থায় স্ত্রী, তা ছাড়া আর যদি ২।৩টী ছেলে হয় তবে কলিকাতা বা অন্য কোন আক্রা-গণ্ডা সহরে বাড়ী ভাড়া, দুধের দাম প্রভৃতি কিরূপে চালান সম্ভবপর হয়? (১১) লেখিকা না হয় বড় ঘরের মহিলা, তাঁহার না হয় অন্ন-চিন্তা না থাকিতে পারে—কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঐরূপ অন্ন চিন্তা। মুটে মজুর তাহাদেরও ঐরূপ অন্ন চিন্তা। লেখিকার দাদামহাশয়ের আমলে জিনিষপত্র সব সস্তা ছিল। দুধ টাকায় ১৬ সের ছিল, ঘি টাকায় ৩ সের ছিল, কাজেকাজেই তখন বাল্যবিবাহের সন্তান-সন্ততি যথেষ্ট খাইতে পাইত, সেই কারণবশতঃ দীর্ঘায়ু পাইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যখন সব খাবার জিনিষ আক্রা ও ভেজাল, মাথা রাখিবার স্থান—যেমন বাড়ী বা একখানি ঘর তারও ভাড়া বৃদ্ধি হইয়াছে—এ ক্ষেত্রে বাল্য-বিবাহের দ্বারা "প্রজাবৃদ্ধি" কখন উচিত নহে। এরূপ আধমরা, ক্ষীণজীবী মা'র সন্তান সবাই কখন বলিষ্ঠ বা দীর্ঘায়ু হয় না।

এইরূপ আক্রা-গণ্ডা যুগে যাহার যাহা আয় আছে, তাহাতে আর কুলাইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ করিলে, সংযমী হইবার অভাবে, সন্তানের সংখ্যা এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—পুত্র হউক এই জন্য দার-পরিগ্রহ করা উচিত। তাই বলিয়া নারীরা ইহা চাহে না যে অনেক সন্তান হউক। (১২) প্রসব

(১০) নারী-জীবন, পৃষ্ঠা ১৪।

(১১) লেখিকা "সহর-বাসের মমতা" পরিত্যাগ করিয়া "পল্লীতে গিয়া বাস" "গো সেবা" প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। এ সব বলা সোজা কিন্তু সকলের পক্ষে কার্য্যে করা শক্ত।— লেখক

(১২) মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের "তুমি কতগুলি সন্তানের মা হইতে চাও?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে অধিকাংশ ছাত্রী ৪টী সন্তানের জননী হইতে চাহে—এই উত্তর দিয়াছিল।—শ্রীমতী সুষমা সিংহের লেখা, "কি কি গুণ দেখিয়া বিবাহ করা উচিত", প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৯। হিন্দুসমাজেও একটীমাত্র পুত্র জন্মাইলে শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হয়। লেখক

বেদনা কেমন তাহা নারী ভিন্ন পুরুষ বোঝে না। আমি দু' একটী হিন্দু সমাজের মহিলা, যাঁহাদের বাল্যবিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের অপর নারীর নিকট বলিতে শুনিয়াছি, "বলুন, ত, কি করলে আমার ছেলেপিলে না হয়? বছর বছর এক একটী করিয়া ছেলে হইয়া আমি যে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি, তিন তিনটী ছেলের যত্নও করিতে পারিতেছি না। কোন রকমে আমরা স্বামী স্ত্রীতে তাহাদের লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। আমার যদি আর সন্তানাদি না হয় তাহলে বলবতী হইতে পারি···" আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে ঐরূপ মনের কথা "ভারতবর্ষে"র বিবাহিতা পাঠিকাদের নিকট হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। বৎসর বৎসর গর্ভবতী হওয়াতে স্বাস্থ্য-সম্পন্না নারী রুগ্নকায়া হইয়া পড়িতেছে। ২০তে বুড়ী হইতেছে। স্বাস্থ্যহীন সন্তানের মা হইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি? কি গরীব, কি ধনী, ঘরে এক ঘর ছেলেপিলে হউক ইহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহাতে গর্ভিনীর শরীর বজায় থাকিবে কি না সন্দেহ। আর, গরীবদের হইলে দারিদ্র্যে মরিতে হয়। কশাঘাতে নিজেরাও দারিদ্র্যে মরিতেছেন, কশাঘাতে আবার ঘন ঘন সন্তানদের পৃথিবীতে আনিয়া তাহাদের কষ্ট দেওয়া কেন? (১৩) এরূপ ক্ষেত্রে সংযমী হইয়া থাকা নিতান্ত উচিত। কিন্তু তাহা সকলের কাছে যখন সম্ভবপর হয় না, সে ক্ষেত্রে birth-control league (জন্ম-দমন সমিতির) উপদেশমত গর্ভ নিয়মিত করা দরকার। (১৪) যদিও আমি এই সমিতির সমস্ত কার্য্য সমর্থন করি না, তথাপি ইহাদের উপদেশগুলি সকলেরই পড়িবার বিষয়।

লেখিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "পুরুষের ২৭।২৮।২৯।৩০ এবং মেয়ের যদি ১৭।১৮।১৯।২০ তে বিবাহই ঘটিবে, তবে সন্তান সন্ততি জন্মিবে কখন? দেশে প্রজা বৃদ্ধির উপায় কি?" তাঁহার কি ধারণা যে, উক্ত বয়সে বিবাহ হইলে ছেলে মেয়ে হইবার সম্ভাবনা থাকে না? তখনও ছেলে মেয়ে হইবে। যদি "১৮" বৎসরে মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়, স্ত্রীলোকদের সন্তান উৎপাদন করিবার ক্ষমতা ৪৫ বৎসর অবধি যখন, তখন ঐ ১৮ বৎসরের মেয়ের যদি ৩ বৎসর অন্তর সন্তান হয়, তাহলে ৪৫ বৎসর বয়সে সে ৯টী ছেলের মা হইতে পারে। ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ দিলে যতগুলি ছেলে হইত, "১৮" বৎসরে সেই মেয়ের বিবাহ দিলে ততগুলি ছেলে হইতে পারে, তখনও তাহার "যৌবন" নষ্ট হয় না। যখন ১৮ বৎসরে মেয়ের বিবাহ দিলে সেই একই সংখ্যক সন্তান হইতে পারে তখন ১২ বৎসরে বিবাহ না দিয়া ১৮ বৎসরে বিবাহ দিলে ক্ষতি কি হয়? ১২ বৎসরের বিবাহিত মেয়ের ৪৫ বৎসর বয়স অবধি যদি সন্তান হইতে থাকে, তাহার সন্তানের মধ্যে রুগ্ন ও মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হয়। অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া এভাবে "প্রজা-বৃদ্ধি" (১৫) করা প্রস্তাবে কোন সভ্য সমাজ সাড়া দিবে না। এই সব ভাবিয়া আজকাল মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়াইবার কথা ভারতবর্ষের চারিদিকে হইতেছে। সেদিন কাশীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ভারতবর্ষের অন্যান্য লোকেরা সমবেত হইয়া একটী হিন্দু মহা সভা করেন। সেই সভাতে মেয়েদের বয়স বাড়াইবার কথা স্থির হয়।

ভারতের প্রকৃত গৌরবের দিনে হিন্দুশাস্ত্রে যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই যৌবন বিবাহ কোন্ যুগে কেমন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, এখন কতখানি দশের সমর্থন পাইতেছে, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি:—

ক। বৈদিকযুগ (২০০০-১৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব)। (Vedic Period) হিন্দু-সভ্যতার এই বরণীয় যুগে পরবর্ত্তীকালের মত কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, মানুষের প্রয়োজনীয়তার উপর বিবাহাদি সম্পর্ক নির্ভর করিত। বালিকাগণ বিবাহ না করিয়াও পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না, এবং পিতৃ-গৃহে সসম্মানে বাস করিত। ঋগ্বেদ, ২।১৭-৭)। বৈদিকযুগে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। নিম্নলিখিত বেদবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেকালে

(১৩) "এক রুসিয়া ছাড়া ভারতবর্ষের জন্ম-সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী।" —অধ্যাপক গোপাল জি।

(১৪) যে সব উপদেশ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহা যদি কেহ জানিতে চাহেন তাহা অধ্যাপক গোপসম জি, Indian Birth Regulation Society, Delpi বা American Birth control League হইতে এ মর্ম্মে যে সব পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহা পড়িয়া অবগত হইতে পারেন। —লেখক।

(১৫) এ সম্বন্ধে আলোচনা ইহার আগের দু'টী paragraphএও দেখুন। —লেখক।

যৌবন বিবাহ হইত। (১) যুবতী জায়া প্রাপ্ত হইলে গুণী ব্যক্তি যেরূপ তাঁহার প্রতি কুপিত হয়েন না।" (ঋক্, ৮ম, ২সূ, ২৯)। (২) "যে কোন কন্যা পিতৃ-গৃহে বিবাহ-লক্ষণযুক্তা আছে, তাহার নিকট যাও" (১০ম, ৮৫সূ, ২১)। (৩) "নিতম্ববতী অপর অবিবাহিতা রমণীর নিকট গমন কর এবং তাহাকে পত্নী করিয়া পতি সংসর্পিনী করিয়া দাও।" (১০ম, ৮৫সূ, ২২)। পরবর্ত্তী-কালের যুবতীগণের স্বয়ম্বর প্রথার পূর্ব্বাভাষ এ যুগেও লক্ষিত হইয়াছিল। যথা—"সুন্দরী সদ্‌গুণ-ভূষিতা রমণী আমাদের মধ্যে নিজের প্রিয়পাত্রকে স্বামীরূপে মনোনীত করেন।" (১০।২৭।১২)।

খ। মহাকাব্যে প্রণয়নের যুগ (Epic Period; ১৪৮০—১০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্ব)।

এইকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষালাভের জন্য কেহ কেহ পরিষদে (বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষা-মন্দিরে) গমন করিত, কেহ বা গুরু-গৃহে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিত। সেখান হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ-পূর্ব্বক সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইত। এই সময়েও বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল।

মহাভারতে আছে—'প্রজা ন হীয়তে তস্য রতিশ্চ ভরতর্ষভ (অনু, ৪৪অ), যৌবন বিবাহেই সন্তানগণও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগহীন হয় না।

মহাভারতে পুনরায় আছে—'ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং' অর্থাৎ ৩০ বৎসরের পুরুষ ১৬ বৎসরের নগ্নিকা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে। গৃহ্য-সূত্রকার নগ্নিকা অর্থে ঋতুবতী বলেন। রামায়ণে নারী শ্রেষ্ঠা সীতাদেবী প্রভৃতির যৌবন বিবাহের পরিচয় সকলেই জানেন।

গ। দর্শন প্রণয়নের যুগ (Rationalistic Period; ১০০০—২৪২ খৃষ্ট-পূর্ব্ব)।

হিন্দু সভ্যতার তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণগণ ৮ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়গণ ১১ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে এবং বৈশ্যগণ ১২ হইতে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে গুরুর নিকট শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিত। ১২।২৪।৩৬।৪৮ বৎসর ধরিয়া বালকগণ গুরুর নিকট যথাক্রমে এক, দুই, তিন বা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করিত এবং স্নাতকরূপে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিক্ষা সমাপনান্তে স্নান করিয়াছেন) গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। সংখ্যায়নের নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সেকালে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল. "বিবাহান্তে বরকন্যা তিন রাত্রি যেন সহবাস হইতে বিরত থাকে।"

ঘ। বৌদ্ধযুগ (Buddhistic Period; ২৪২ খৃষ্ট পূর্ব্ব—৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

এই যুগ রাজা অশোকের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইতিহাস বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ বলেন যে, "সে সময় ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ৩০ বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপন করিত এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইত।" মনু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। বৌদ্ধ সমাজের পাপাচার ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া মনু হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সমাজকে কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে বাল্য-বিবাহের প্রথম সূত্রপাত হইলেও যৌবন বিবাহ সাধারণতঃ ছিল। যদিও মনু বলেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং",

অর্থাৎ ৩০ বৎসরের পুরুষ ১২ বৎসরের হৃদ্যা (অর্থাৎ হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী—চলিত কথায় যাহাকে 'বাড়ন্ত' বলে) কন্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সেই মনু আবার বলেন—

কামমারণাদ্‌তির্ব্বেদ্ গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণ হীনায় কর্হিচিৎ॥
(৯অ, ৮৯)

অর্থাৎ গুণহীন পাত্রে পিতা কদাপি প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকেও সম্প্রদান করিবে না। ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষি লিখিতেছেন যে, "যৌবন সঞ্চারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত এবং তাহার পরেও উপযুক্ত পাত্র লাভ না করিলে বিবাহ দিবে না।"

অত্যত্র মনু বলেন—

ত্রীণি বর্ষান্যুদীক্ষেত কুমার্য্যতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশ পতিং॥
(৯অ, ৯০)।

অর্থাৎ কুমারী কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর

উদীক্ষা পূর্ব্বক কালযাপন করিবে, তাহার পর সদৃশ পতি লাভ করিবে।

"ত্রাষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষায়া ধর্ম্মে সীদতি স্বত্বরঃ।" অর্থাৎ ২৪ বৎসরেরর পুরুষ ৮ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলে ধর্ম্মে বা উন্নতি লাভের সকল বিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন।

ঙ। পৌরাণিক যুগ (Pauranic Period; ৫০০ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ)।

পৌরাণিক যুগে নিয়মের কঠোরতা ভীষণাকার ধারণ করিল। বাল্যবিবাহ সমর্থক বিধান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ইহা সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িল। সমাজ চির-কালই পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা ভাল বলিয়া সাদরে গৃহীত হইল, কাল তাহা পরিত্যক্ত হইতে সময় লাগে না। কিন্তু এই যুগেও বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়া অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদ সুশ্রুত জলদ্‌গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—

উনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধ্যত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সঃ বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥
(সুশ্রুত শারীরস্থান, ১০ম)।

অর্থাৎ "২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত ১৬ বর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদগ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয়, অতএব অত্যন্ত বালিকা-বস্থায় গর্ভাধান করিবে না।" শাস্ত্রের অনুশাসন ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর আর কি হইতে পারে? হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মহাদেবের সৃষ্টি। হিন্দু হইয়া এই শিব-বাক্যের অবমাননা করা কি উচিত? মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,—

"অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত পতিসেবানাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্ম শাসনম্॥"

অর্থাৎ যে বালিকা পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা জ্ঞাত নহে এবং ধর্ম্মশাসন জ্ঞাত নহে, পিতা এমত বালিকার বিবাহ দিবেন না।

বালিকার পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে বলিয়া যৌবন বিবাহেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা, রুক্মিনী, ইন্দুমতী, সুভদ্রা, গান্ধারী, দেবযানী, প্রমদ্বরা, পৃথা প্রভৃতি সতী-শিরোমণি আর্য্যনারী-গণের ভিন্ন ভিন্ন যুগে যৌবনেই বিবাহ হইয়াছিল। যখন যৌবন-বিবাহ এই সকল উচ্চবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সাধারণ হিন্দু সমাজেও যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেকালে স্বামী নির্ব্বাচনেরও প্রথা ছিল; দেবী সাবিত্রী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বয়ম্বর প্রথাও যৌবন বিবাহ পরিচায়ক।

শাস্ত্রে সমাজ-রক্ষার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক জীবনের প্রকৃত ছবি দেখিতে হইলে সম-সাময়িক নাটক, ও উপাখ্যানের শরণাপন্ন হইতে হয়। মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, নাটক যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যৌবনেই নরনারীর বিবাহ হইত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে যৌবন-বিবাহের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতীত যাহাদের এত উজ্জ্বল ও মধুর, ভবিষ্যৎ কেন তাহাদের অন্ধকারময় হইবে?

চ। মুসলমান রাজত্ব।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে মুসলমানগণ এদেশের অধীশ্বর হইলেন। অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুগণ জাতিকুল রক্ষার জন্য বাল্য-বিবাহের আশ্রয় লইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ছ। ইংরেজ রাজত্ব।

বিধির বিধানে সুসভ্য ইংরেজগণ এদেশের রাজা হইলেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। শিক্ষা প্রচারের সহিত হিন্দুগণের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইতেছে।" (১৭)

লেখিকার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, তিনি সেকেলে ধরণের গুণবিশিষ্টা মহিলা। যাহা তাঁহার আমলে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই যে বরাবর চালাইতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। "The old order changeth yielding place to new." মানুষ জ্ঞান শিক্ষালাভ করিতেছে, দেশ বিদেশে যাইতেছে; জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অনেকে

(১৭) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিতের "বাল্য বিবাহ" নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ যাহা ১৩২৪-এর মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রের "তাম্বুলি-সমাজ" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধৃত।

reformed হইয়া ও আসিতেছে। সমাজকেও reformed করিতেছে। মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাসও করাইতেছে, ডাগর করিয়া মেয়ের বিবাহ হিন্দুসমাজে দিতেছে। এখনকার দিনে সবদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে গেলে ১৬ বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

লেখিকা আধুনিক মেয়েদের শিক্ষার কথা যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলি। আজকাল স্কুল, কলেজে যে সব শিক্ষা মেয়েরা পাইতেছে তাহাতে তাহারা প্রকৃত "মা" হইবার শিক্ষা পাইতেছে না। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় I. Aতে Sanskrit, Logic, Botany ও B. Aতে English, History, Botany প্রভৃতি conbination of subjects ছাত্রীদিগকে লইবার অনুমতি দিয়াছেন। chemistry ও soil Physics না জানা থাকিলে Botany বুঝা শক্ত হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত ছাত্রীর বিদ্যাও সেইরূপ হয়। তাহারা জানে যে, ঐ রকম subjectগুলি সংসারের কোন কাজেও আসিবে না, উপস্থিত পাশ করা নিয়ে দরকার।" (১৮) "অতটা পরিশ্রমে যত কিছু" মেয়েরা শোনে "তার অধিকাংশ জীবনপথে চলার কোন সাহায্যে" লাগে না। কাজেকাজেই আকজো বিদ্যা ভুলিতে হয়। "মার্কিন দেশে নারীর পক্ষে যাহা সমধিক প্রয়োজনীয় সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা (১) Principles of Selection and Preparation of food (this includes butter making, preservation of fruits etc) (আহার্য্য বস্তুর গুণাগুণ বিচার ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী, মাখন মোরব্বা প্রভৃতি তৈয়ারী করা) (২) Dietetics (পথ্যাদির ব্যবস্থা), (৩) Home economies (গৃহকর্ম্মে মিতব্যয়িতা), (৪) Household management (গৃহের যাবতীয় কর্ত্তব্যের সুবন্দোবস্ত), (৫) Millinery (টুপি, জরী প্রভৃতি পরিচ্ছদের কাজ), (৬) Laundry (কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রির কাজ) (৭) child nature (শিশুর স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি), (৮) House Sanitation (গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা), (৯) Art and Design (চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য), (১০) Physical training (শারীরিক ব্যায়াম); অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহারা সুগৃহিণী হইতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয় পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও লওয়া যাইতে পারে :—ইংরাজি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি। মূল কথা, স্ত্রীজাতি যাহাতে সুগৃহিণী হয় ও vocational education পায়, সেইরূপ Curriculum করা হইয়াছে। (১৯)

আমি বিবাহ করিয়া স্ত্রী ঘরে আনিলে আমার পরলোকগত বড় জ্যেঠা মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৌমা রাঁধিতে জানেন? যে স্ত্রীলোক রাঁধিতে জানে না তার নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করা বৃথা।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা একটী বড়লোকের মেয়ে, বিধবা হওয়ার পর, মফস্বলে যান। সকালে তাঁহার চা খাওয়া অভ্যাস ছিল। বাড়ীতে চাকর বা ঝি তখন কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তবে ঐ মফস্বল বাড়ীতে একজন অভিভাবক ভদ্রলোক ছিলেন। উক্ত মহিলা অনেকবার উনন ধরাইতে চেষ্টা করেন। যখন কিছুতেই পারিলেন না তখন তিনি অভিভাবক ভদ্রলোকের নিকট যাইয়া বলেন—"দেখুন, আমি উনন ধরাতে জানি না, আপনি উননটা ধরিয়া দিতে পারিবেন?" শেষে ঐ ভদ্রলোক তাঁহার উনন ধরাইয়া দেন তবে রান্না হয়। এ রকম পাস করা মেয়ে যে বাঙ্গালীর ঘরে বিদ্যমান—যিনি উনন ধরাতে, ছেলে মানুষ করিতে, বা একদিন চাকরাণী না আসিলে বাসন মাজিতে, বা রান্নাঘর নিকাইতে বা আহার প্রস্তুত করিতেও সম্পূর্ণ অপারগ—ইহা বড়ই দুঃখের কথা! আমরা মেয়েদের সুগৃহিণী করিবার মত শিক্ষার curriculum আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে হইতে করিব?

(১৮) লেখকের প্রবন্ধ, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর"; ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩২৫।

(১৯) লেখক প্রণীত, "আমেরিকা ভ্রমণ", ১৩২৮।

আমাদের কথা

সফিয়া খাতুন

শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে একটী সারবান প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে স্থানে স্থানে তিনি শিক্ষিতা মেয়েদের উপর যেসব দোষ দিয়েছেন, তা সত্য বটে; কিন্তু তার জন্য যে মেয়েরা দায়ী নহে, তা কি তিনি জানেন না? আর তা'ছাড়া তিনি আমাদের স্বাধীনতার যে আভাষ দেখিয়েছেন, এবং যার জন্য তিনি ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তা করে ভয় পাচ্ছেন, আমরা ত সেরকম স্বাধীনতা চাই না।

এ কথা যেন কেহ ভুলে না যান যে, ভারতের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও ইয়োরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার রাত-দিন তফাৎ—একেবারে আকাশ আর পাতাল। আমরা আমাদের দেশের আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই স্বাধীন হতে চাই। সোজা কথায় আমরা এই চাই—পুরুষ বিবাহের সময় যেসব প্রতিজ্ঞা করে স্ত্রীকে গ্রহণ করেন, তা যদি সত্যিকার মত পালন করেন, তবেই আমাদের স্বাধীনতা বজায় থেকে যায়। আমরা পুরুষের দাসী (slave) নই। স্বামী-স্ত্রীতে সকল বিষয়েই সমান অধিকার—এ ত খাতায় লেখা আছে। কিন্তু কাজের বেলায় তা করা হয় কি? হতে পারে, দু-একটা পরিবারে স্বামী স্ত্রীকে আপন আত্মার ন্যায় সমান অধিকার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই দু একটী পরিবার নিয়েই ত আর তামাম ভারতবর্ষটা নয়? আমার বিশ্বাস, শতকরা তিনজন লোক স্ত্রীকে সমান অধিকার দেন কি না সন্দেহ।

অনেকে হয় ত বলবেন যে, আজকাল কোন শিক্ষিত যুবকই স্ত্রীকে দাসী ভাবেন না। এ কথা কি করে বিশ্বাস করব? আমরা আর ত দু'চোখ খেয়ে বসি নাই? গ্র্যাজুয়েট জামাইয়ের দল টাকার জন্য দীন-দরিদ্র শ্বশুরের ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত নীলামে তুলছেন। যার তাও নাই, তার মেয়েকে বিবাহ করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন,—একেবারে পথের ভিখারিণী করে। জামাই শ্বশুরকে পত্র দিচ্ছেন "টাকা দাও, তা না হলে তোমার মেয়ে তোমারই রইল।" মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে; শেষে হতভাগিনী বিয়ের পরদিনই গলায় ফাঁস দিচ্ছে (কোন মুসলমান পরিবারে)। আর কত বলব। স্ত্রীকে একমাত্র ভোগের জিনিষ বা একটা অস্থাবর সম্পত্তি মনে না করলে, এমন পাষণ্ড মানুষ হতে পারে না।

সেদিন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেখলাম, কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বিবাহিতা কন্যা নিয়ে পর্য্যন্ত মহাবিপদে পড়ে গেছেন। জামাতাটী বি-এ পাশ, কলকাতার কেরাণী, অধিকন্তু মাতাল ও চরিত্রহীন। মেয়েটী ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দিভাষা বেশ ভাল জানেন; গৃহকর্ম্মেও সুনিপুণা। পাষণ্ড এমন সতী-সাধ্বী ও সুগৃহিণী স্ত্রীকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে মেয়ের পিতাও সংসারত্যাগী। ভাই বন্ধু আর কেহ নাই। এখন এই মেয়ের ভরণ-পোষণ কে করে? আজ যদি এই মেয়েটী স্বাধীন হতেন, অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত যদি তাঁহার মনের বল থাকত, তবে হয় ত সংসারত্যাগী পিতা বা নিজেকে এত লাঞ্ছিত হতে হত না।

মেয়েটী বেশ ভাল লেখা পড়া জানেন, অথচ দুমুঠো ভাত জুটছে না। এতে কি প্রমাণ হয় না যে, এই মেয়েটীর একমাত্র স্বাধীনতার অভাবেই এ অবস্থা ঘটেছে?

অনেকের বিশ্বাস, আমরা স্বাধীন হতে চাই—অর্থাৎ মেম সাহেব সাজতে চাই। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। খৃষ্টীয় সমাজের মেয়েরা যে ভাবে চলছেন, তাহা আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ নয়। বিদেশীয় আচার ব্যবহারে চলতে গিয়ে আজ খৃষ্টীয় সমাজের এত অধঃপতন। এ কথা মহামতি সি, এফ, এণ্ড্রুজের ন্যায় জগৎ-বিখ্যাত মিশনারীও স্বীকার করেছেন। তিনি ভারতবন্ধু ষ্টোক্স-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বলেছেন যে, ইয়োরোপীয় সভ্যতায় ভারতবাসীকে খৃষ্টান করতে গিয়ে মিশনারীরা একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন।

যাক্, আমাদের দেশের মেয়েরা কোন দিনই পর্দ্দানশীন বা পরাধীনা ছিলেন না। এসব পর্দ্দার সৃষ্টি হয়েছে বিলাসী মোগল পাঠান রাজাদের দ্বারা। ইহারা

মেয়েদের একমাত্র ভোগের জিনিষই মনে করতেন; এবং যেসব পাশবিক উপায়ে রাজপুত সুন্দরীদের এনে জেনানাতে পূরতেন, তাতে ওরা কাহাকেও বিশ্বাস করতে পারত না। নিজেদের স্বভাব চরিত্র লইয়া অন্যের স্বভাব চরিত্রের তুলনা করতেন বলে, মেয়েদেরে একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা করে রাখতেন।

এই মোগল রাজত্বের পূর্ব্বে দেশে স্ত্রী পুরুষে একমত সমান অধিকার ছিল। তা না হলে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব্য বিবাহ প্রথা থাকত না।

আমাদের মুসলমান সমাজেও ঠিক তাই। কোরাণ (দঃ) বলছেন এক, আর তার উপাসকরা করছেন আর। লেখা আছে, হে পয়গম্বর, তোমার স্ত্রী, কন্যা ও বিশ্বাসীদের স্ত্রীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের কাপড়ের উপরে ঢিলা লম্বা জামা পরে....."

ইসলামের পর্দ্দা ত এই। আর সেই জায়গায় মেয়েদের সিন্ধুকে পুরে রাখা হয়। হজরত মোহাম্মদএর (দঃ) স্ত্রী বিবি আয়েসা তখনকার দিনে খলিফা নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতেন। তা ইতিহাসে পাওয়া যায়। হজরৎ আলীর (রা) পৌত্রী সখিনা উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন। অনেক সময় তিনি পণ্ডিত পুরুষদের সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চা করতেন। খলিফা মামুনের স্ত্রী বুরান, ভগ্নি উমমুল্‌লফজল খলিফা হারুনর রশিদের স্ত্রী জোবায়েদা প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। ফখর-উন-নিসা বোগদাদের জামে মসজিদে সাহিত্য, অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্য বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন। তাপসী রাবেয়ার কথা ত সকলেই জানেন।

বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে, বিবাহে প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষেরও যেমনি সম্মতি প্রয়োজন, প্রাপ্ত-বয়স্কা স্ত্রীলোকেরও তেমনি সম্মতি প্রয়োজন। বয়স্কা নারী ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারেন। অভিভাবক অল্প-বয়স্কা বালিকার বিবাহে বালিকার পক্ষ হতে সম্মতি দেন; কিন্তু স্থান-বিশেষে বয়স্কা হয়ে সেই স্ত্রী বিবাহ অস্বীকার করতে পারেন! কিন্তু সমাজপতিরা করছেন কি? জোর করে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিচ্ছেন। সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম, একটী মেয়েকে তার চাচার ঘরের ভাইয়ের সঙ্গে অর্থাৎ খুড়াত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের পূর্ব্ব হতেই মেয়ে এই বিবাহে ঘোর আপত্তি করে আসছে। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাকে জোর করে পাত্রস্থ করা হয়। হতভাগিনী অনন্যোপায় হয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে ঠিক বিয়ের পরদিনই!

যাক্, বলতে যাচ্ছিলাম এই পর্দ্দার কথা। ভারতে পর্দ্দা একমাত্র মোগলরা এনেছে; এবং এই সময় হতেই আমরা দাসীত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী লিখেছেন "যদি স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে সামাজিক ও পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, যদি প্রকৃতির বিধানে নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হইবার যোগ্য হইতেন; তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি এই যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুরুষের অধীনতায় বাস করিতে হইত না।"

জানি না তিনি "অধীনতা" শব্দে এখানে কি বুঝাতে চেয়েছেন। তবে চাকর দাসীর যেমন অধীনতা,—তিনি কি তাই বুঝাতে চেয়েছেন?

যদি তা না হয়, তা'হলে স্ত্রী কোন দিনই পুরুষের অধীন ছিলেন না। উভয়েই প্রেমের বন্ধনে মিলিত। তাতে যদি অধীনতা বুঝতে হয়, তা'হলে স্ত্রী যেমন পুরুষের অধীন, পুরুষও তেমনি স্ত্রীর অধীন। স্ত্রী অন্যায় করলে বা কুপথগামিনী হলে তাকে শাসন করবার স্বামীর যেমন অধিকার, স্বামীও স্বেচ্ছাচারী বা কুপথগামী হলে তাকে সুপথে আনবার জন্য শাসনাধিকার স্ত্রীর আছে। নারীর এই অধিকারের অভাবেই আজ দেশের এত দুর্দ্দশা।

আমরা এম্-এ, বি-এ পাশ করে নিজের নারীত্ব কি মাতৃত্বকে ভুলে যাব না। প্রকৃতির বিধানে আমরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমান না হলেও, জ্ঞান বিষয়ে যে সমান বা কোন-কোন স্থলে বেশীও হতে পার; তার যথেষ্ট প্রমাণ এ দেশেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অনেক মেয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। পাবার বেলায় যে তাদের নিকট হতে সেই একঘেয়ে প্রেমের গল্প, কবিতা বা এক-আধটা স্বদেশী গান ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না, তার জন্য কি বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী নহে? তাদের শিক্ষার আর কি বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, তাদের নিকট হতে অন্য কিছু পাবার আশা করতে পারি। বিজ্ঞান বিষয়ে বা টেক্‌নিকেল কোন আর্ট তাদের শিক্ষা দিবার

জন্য কোন স্কুল কলেজ আছে কি? যে সব মেয়েরা বিদেশে যেতে পেরেছেন, তাঁরা বিজ্ঞান কি অন্যান্য বিষয়ে বেশ নাম করে এসেছেন। মান্দ্রাজের মিস্ গঙ্গা মাদেপ্পা বিলাতের বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি ডি-এস্‌সি লাভ করেছেন। গেল বছর আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো-প্রবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার মহাশয়ের কন্যা কুমারী লীলা হালদার মিকানিকেল ও ইলেক্‌ট্রিকেল এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কুমারী শকুন্তলা রাও বি-এস্‌সি জার্ম্মেনীতে "পটারী" শিক্ষা করতে গিয়েছেন। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের খেলার খেলনা আমাদের ছেলেদের মনোমত করে তৈরী করবার জন্য চায়ের পেয়ালা, ফিডিং কাপ, কোমট প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য আসবাবপত্র নিজ দেশী উপায়ে যাতে তৈরী করা যায়, তা শিক্ষা করতে গিয়েছেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি দেশে এসে একটী পটরী ফার্ম খুলবেন এবং তাহাতে শুধু স্ত্রী মজুর রেখে কাজ শিক্ষা দিবেন। এসব মেয়েদের কার্য্যকলাপ দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, মেয়েরা জ্ঞানরাজ্যে পুরুষের চাইতে কোন অংশে কম নহে?

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া বলেন "মেয়ে পুরুষ যদি সমান শিক্ষা লাভ করিয়া একই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তবে ঘর-সংসারের অবস্থা কিরূপ হইবে?"

এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! মানুষ কি লেখাপড়া শিখে চাকুরীর জন্য? মেয়েরা বি-এ পাশ করলেই যে চাকুরী করতে যাবে তার মানে কি? যাঁহার স্বামীর অবস্থা অতি হীন তিনি চাকুরী করতে বাধ্য হন। অবিবাহিতা যে সব মেয়েদের পিতামাতা বৃদ্ধ, উপায়ের কোন পথ নাই, অথচ ছোট ভাই বোন আছে, তাদের লেখাপড়ার বা ভরণপোষণেরও কোন বন্দোবস্ত নাই; এ রকম মেয়েরা চাকুরী করতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় চাকুরী করা কি বড় দোষের কথা? এসব মেয়েরা চাকুরী করেও ঘর-সংসার করে থাকেন। তবে গল্প গুজব দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করবার মত সময় তাদের থাকে না। উপন্যাস পড়ে, তাস খেলে বা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সময় নষ্ট করবার সুযোগ তাদের হয়ে উঠে না। খেতে পান না বলেই, চাকুরী করে থাকেন। তাতে দশ পাঁচট চাকর কি করে রাখা যায়? আজকাল মানুষের আর্থিক অবস্থা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সামান্য মোটা অন্নই খেতে পাচ্ছে না, দশটা চাকর রাখবে কি করে? স্ত্রী চাকুরী করলেও স্বামী পুত্রকে খাইয়ে, তবে নিজ কর্ম্মে যান। একজন লেডী ডাক্তারের পদ যে জগৎ সংসারের সকলে পাবে, তার কোন অর্থ নাই।

এরূপ অবস্থায় মেয়েরা হয় শিক্ষয়িত্রীর না হয় গবার্ণেসের কাজ করে থাকেন।

সাহেবের গাল খাবার চাইতে নিজ আত্মীয়ের গাল খাওয়া কি করে যে ভাল, তা বুঝতে পারি না। গাল খাওয়া কি এদের মামুলী সম্পত্তি (?) যে, যখন গাল খেতেই হবে, তখন সাহেবের গাল খাওয়ার চাইতে না হয় আত্মীয়ের গাল খাওয়াই ভাল। শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া কি পল্লীগ্রামের বিধবাদের লাঞ্ছনার কথা জানেন না? ভ্রাতৃজায়ার নাক-সিটকানী, আর ভ্রৈণ ভ্রাতার চোক-রাঙ্গানী ঠিক যে পোড়া ঘায়ে লবণ দেবার মত, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। দিনের মধ্যে দুবার লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তবু কি করে, শুধু এক মুঠা অন্নের জন্য আবার সেখানেই যাচ্ছে; সারা রাত নিজ দুঃখের কথা ভেবে চোখের জলে বালিশ ভিজাচ্ছে।

এসব মেয়েরা যদি নিজ উদরান্নের জন্য একটা স্বাধীন উপায় খুঁজে নেন, অর্থাৎ গৃহ-শিক্ষয়িত্রী, গবার্ণেস, এমন কি নার্সের কাজ করেন, তবে কি সমাজপতিদের কাছে বড় একটা অন্যায় করে বসলেন? সম্প্রতি বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষাশ্রমে মেয়েদের প্রিন্টিং, কম্পোজিটিং, ফটোগ্রাফী প্রভৃতি টেক্‌নিকেল আর্ট শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এসব নিরাশ্রয়া মেয়েরা যদি টেক্‌নিকেল আর্ট শিক্ষা করেন, তবে বোধ হয় সাহেবের গাল বা আত্মীয়ের গাল খেতে হয় না।

তা'ছাড়া এ রকম নিরাশ্রয়ার সংখ্যা আমাদের বাংলা দেশেও বড় কম নয়! আট নয় বৎসরের শিশু এদেশে বিধবা হয় এবং সেই বৈধব্যকে চিরদিনের জন্য বরণ করতে হয়।

প্রত্যেক ঘরেঘরেই এরকম গলগ্রহ অন্ততঃ দু' চারজন আছেন। সংসারে হয় ত' একজন উপার্জ্জন করে; কিন্তু সে উপার্জ্জনকারীর স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন এরকম গলগ্রহ দু' চারজন থাকেন। সংসারের উন্নতি হয় কি করে পাঠক? আমাদের

দেশের অর্থাভাবের ইহা একটা প্রধান কারণ নয় কি? একজনের আয়ের উপর দশজন নির্ভর করে। এক একজন লোক এক একটা সংসার এমনি ভাবে ভরণপোষণ করতে গিয়ে পথের ভিখারী সাজে! আমরা কি স্ত্রী কি পুরুষ সবই পরমুখাপেক্ষী বলে আজও পরাধীন আছি। কি করে ইকনমিষ্ট হতে হয় তা জানি না।

শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া চরকায় সূতা কাটতে বলেছেন। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, শুধু এর উপর নির্ভর করে একটী মানুষের জীবিকা অর্জ্জন করা চলে না। অন্যান্য দেশের মেয়েরা পোষাক তৈরী করে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করে থাকেন, আমাদের মেয়েদের জন্য সে রকম কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। থাকলে বোধ হয় কেহ চাকুরী করতে চাইত না।

আসল কথা, সবের মূলেই শিক্ষা। যে শিক্ষা আজ-কাল আমাদের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে, এটা একরকম বাঘের হাতে গরু চরাণী দেবার মত। ছেলে মেয়ে যদি সাহেব মেম সাজতে চায়, তার জন্য আমি ছেলে মেয়েদের বড় দোষ দিই না। যাঁরা তাদের শিক্ষা দিতে যাবেন, তাঁরা হ্যাটকোট, আর গাউন পেটিকোট পরে সাহেবিয়ানা জাহির করে যাবেন। গুরুমশাই যা করেন, তাই ত সব চাইতে ভাল। কাজেই গুরুমহাশয়ের মত পোষাক পরতে ছেলেরা চাইবে না কেন? তা'ছাড়া সাদা চামড়া না হলে না কি আজকাল শিক্ষা ভাল হয় না। মেয়েদের যে কয়টী কলেজ আছে—তার সবকয়টীর লেডী প্রিন্সিপাল মেমসাহেব। এ সব মেমসাহেবরা এ দেশের আচার ব্যবহার বা সভ্যতার বিষয়ে কিছুই জানেন না। অথচ তাঁরাই যাচ্ছেন আমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিতে। ফলে এই হয় যে নিজেদের সাহেবিয়ানাই শিক্ষা দিতে থাকেন।

আমাদের ছেলে কি মেয়েকে যে দেশবাসী শিক্ষা দিতে আসুন না, তাঁকে প্রথমে একেবারে ভারতবাসী সাজতে হবে। তার পর যদি শিক্ষা দিতে যান, তবে সে শিক্ষাটা ঠিক হবে। মহামতি পিয়ার্সন, সি, এফ্, এণ্ড্রোজ, মিস্ নবোল (ভাগিনী নিবেদিতা) ও মিসেস্ এনি বেসাণ্ট-এর ন্যায় যে সব বিদেশী ভারতবর্ষকে ভালবাসতে পারবেন, একমাত্র তাঁরাই এ দেশের ছেলেমেয়েদের গুরু সাজতে পারবেন।

উপরিউক্ত জগৎ-পূজ্য নরনারীরা ভারতকে এত ভাল বেসেছেন যে, ভারতবাসীও তা পারে নাই। ইঁহাদের প্রত্যেকেই ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে এদেশেবাসীর চাইতেও বিশেষ ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ আছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে ভারতকে কত ভালবাসতেন, তা যে তাঁকে দেখেছে সেই মাত্র জানে। বাঙ্গালী যুবককে হ্যাটকোট পরতে দেখে তিনি বড় দুঃখ করতেন। এই প্রসঙ্গে আমার ছেলেবেলার একটী ঘটনা না বলে আর পারছি না। আমার পিতৃদেব তাঁহার বড় ভক্ত ছিলেন। তাই আমার শিক্ষার ভারটা তাঁর হাতে পড়ে। একদিন একেবারে খাঁটি বিলেতী লেডীস্ সু পায়ে দিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। আমার পোষাক দেখে তিনি এত রাগ করেছিলেন যে, এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার বাবার সঙ্গে কথা বলেন নাই। বাবার অপরাধ, কেন আমাকে মেম তৈরী করছেন। এজন্যই বলি, যাঁরা ভারতকে ভালবাসিতে পারেন না, তাঁদের ভারতে শিক্ষা দিবার কোন অধিকার নাই।

এ দেশটা হচ্ছে Simple living and high thinkingএর দেশ। এদেশের গুহা-গহ্বরবাসী ঋষিরা গাছের ফল মূল খেয়ে যে সব সত্য আবিষ্কার করে গেছেন, পাশ্চাত্যের ভোগ-বিলাসী পণ্ডিতদের মাথায় তা আজও খেলে নাই। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে হলে ঠিক সেভাবেই করতে হবে। তা না হলে ছেলে হবে সাহেব, আর মেয়ে হবে মেম। এ কথা একেবারে ধ্রুব সত্য।

ভোগ-বিলাসের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা, সে শিক্ষা আমাদের ধাতে সইবে না। ভারতের শিক্ষা ছিল ত্যাগের ভেতর দিয়ে। সে চির-পুরাতন শিক্ষা ভিন্ন আমাদের ছেলে মেয়েদের মানুষ করা যাবে না।

চেয়ার টেবিল বা ডেস্কের স্থানে নলখাগ বা মুক্তা গাছের তৈরী চাটাই স্থান পেলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সময়, তারা যে ভারতবাসী তা ভুলে যেত না। বোলপুরে যে ছেলেরা গাছতলায় বসে পড়ে, আর মাষ্টার মশাইও সেই গাছের তলায় একেবারে সাদাসিদে ভাবে বসে শিক্ষা দেন, তা নিজ চোখে দেখেছি; এবং তা দেখে

আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, ঠিক এভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরে শিক্ষা যত দিন না দেওয়া যাবে, ততদিন আমাদের স্বাধীন হওয়ার নামে জল-পিণ্ডি দিয়ে বসে থাকাই ভাল।

বিশ্ব-ভারতীর ছেলে-মেয়েরা গাছতলায় বসে গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের যখন মীমাংসা করেন, তখন এক একবার মনে হয়, সেই অতীতের ভাস্করাচার্য্যের নিকট মৈত্রেয়ীর শিক্ষার; তখন তপোবনে মুনি বালকদের শিক্ষার দৃশ্য কল্পনা-রাজ্যে আঁকতে চেষ্টা করি। তবে মেয়েদের শিক্ষা সেখানেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। বিলাসিতার প্রতি ছেলেদের যতটুকু উদাসীনতা দেখা যায়, মেয়েদের ততটা হয় নাই। ভারত-নারী বলে পরিচয় দিয়ে যদি স্বাধীন হতে হয়, তাহলে বিলেতী নাম-গন্ধ ছেড়ে একেবারে শাঁখা সিদুঁর মাত্র নিতে হবে এবং তার পর ইংরেজী, লাটিন, ফরাসী, জার্ম্মেনী প্রভৃতি যত ভাষা আছে তা শিক্ষা কর, দেখবে, তখন সে সব সাহিত্যের মোহ তোমাদের সাহেব মেম তৈরী করবে না। তখন সে সব বৈদেশিক সাহিত্যের নভেল নাটক পড়ে সে দেশের সভ্যতা বা আচার ব্যবহারকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের ভারতীয় সভ্যতা বা তার আচার ব্যবহারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং তাকেই প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসবে। তখনকার এম-এ বি-এ পাশ করা মেয়েকে যেমন রান্না-ঘরে দেখতে পাবে, তেমনি সভায় সমিতিতেও দেখতে পাবে। অবশ্য এখনকার শিক্ষিতা মেয়েরা যে পাকশাক করেন না, তা মানি না। হতে পারে, কোন কোন মেয়ে পাকশাক না করতে পারেন। কারণ, হাতের পাঁচ আঙ্গুল ত আর সমান নয়? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আমি এমন অনেক মেয়ে দেখেছি, তাঁরা বি-এ পাশ করে শ্বশুর শাশুড়ী নিয়ে একেবারে বৌ সেজে ঘরকন্না কচ্ছেন। নববিধান সমাজের চট্টগ্রামনিবাসী কোন ভদ্রলোকের পুত্র-বধূকে দেখে আমি সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েটী বি-এ পাশ। তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী ননদ, বা দেবরদের আশ্চর্য্য সেবা করেন। স্নেহাতুরা শাশুড়ী বধূকে পাকশাক করে কষ্ট করতে দিতে চান না। তাই কএটী ঠাকুর রেখেছিলেন। বৌটী ঠাকুরটীকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ঠাকুরের কাজ করছেন। তাঁর বিশ্বাস, ঠাকুরের পাকে শ্বশুর শাশুড়ীর খাওয়া ভাল হয় না। তাই নিজ হাতে সমস্ত খাবার তৈরী করে দেবর ও ননদদের খাইয়ে তাদের নিজ নিজ স্কুল কলেজে পাঠিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীকেও নানা রকম সেবা করে স্বামীর জন্য বসে থাকেন। স্বামীটি ডাক্তার। কাজেই অনেক দিন বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যায়। মেয়েটী ততক্ষণ বসে থাকেন। স্বামী এলে তাঁর খাওয়া হলে পর আহার করেন। এ রকম মেয়ে হয় ত বেশী না পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তার চাইতে উনিশ বিশ মেয়ে ঢের আছেন।

অবশ্য আধুনিক শিক্ষা ছেলেদের যত সর্ব্বনাশ করতে পেরেছে, মেয়েদের ঠিক ততটা করতে পারে নাই।

এই পর্ব্ব এখানেই শেষ করি। বলছিলাম আমাদের প্রকৃত শিক্ষার কথা। প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ ভোগ-বিলাসিতাশূন্য যে শিক্ষা, সে শিক্ষা আমাদের মেয়েদের দিতে পারলে, আমাদের সব দিক দিয়েই উন্নতি দেখা যেত।

আজ আমাদের অন্নগত প্রাণ কেন? পেট পুরে দু' মুঠো খেতে পাই না। ১০০৲ টাকা বেতনের যুবক স্ত্রীরই ভরণপোষণ করতে পারছেন না। অবশ্য শিক্ষিতা মেয়েদের স্বামীদের কথাই বেশী করে বলছি। তার মূলে আধুনিক মেয়েদের শিক্ষা! অবশ্য তার জন্য আমি মেয়েদের বড় দোষ দেই না। কারণ তারা যে শিক্ষা পেয়ে আসে, তা ছাড়ে কি করে?

আজকাল শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের পড়ার দিকে যতটা নজর দেন, তাদের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তার দ্বিগুণ দিয়ে থাকেন। মেয়েটীর কাপড় কখানা, সেমিজ, ব্লাউস, পেটীকোট, সাড়ী, জুতা প্রভৃতি কয় প্রস্ত করে আছে ইত্যাদি। মেয়ের বাবার ক্ষমতা থাক আর না থাক, মেয়েকে বোর্ডিংএ রাখতে হলে, এ সব দশ পনর জোড়া করে দিতেই হবে। এই হল শিক্ষা।

কেন বাপু, আমাদের এত ব্লাউস পেটী-কোটের দরকার কি? পূর্ব্বে যে আমাদের দেশে এ সব ছিল না, তখনকার মেয়েরা কি স্বামীর ঘর করেন নাই? এই সর্ব্বনাশী শিক্ষা না পেলে ত আর, প্রথম পিতামাতা তার পর স্বামীকে প্রাণান্ত হতে হয় না।

আর শুধু শিক্ষিতা মেয়েদের কথাই বলছি কেন।

যেসব মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ছেন না, তাঁদের মধ্যেও বিলাসিতাটা বেজায় বেশী। অবশ্য তাঁদের শিক্ষার অভাবে এ অবস্থা, আর এদের একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নামধেয় কুশিক্ষার জন্য এই অবস্থা।

পর্দ্দানসীন মেয়েদের শরীর ভরে অলঙ্কার থাকা চাই। স্বামী দিতে পারুন আর নাই পারুন, অলঙ্কার চাই-ই চাই।

স্বামী স্ত্রীর হাতের তৈরী খাবার খেয়ে তৃপ্ত হন ঠিক। কিন্তু এই তৃপ্তি হতে আজকাল শুধু শিক্ষিত মেয়েদের স্বামী বঞ্চিত নহেন, কলকাতার শতকরা ৯৯টী সচ্ছল পর্দ্দানশীন ঘরের মেয়েরা নিজ হাতে পাকশাক খুব কমই করে থাকেন। ঠাকুর আর ঝির উপর দিয়েই সব চালিয়ে দেন।

তাই বলি, এক সর্ব্বনাশ হচ্ছে শিক্ষার অভাবে, আর হচ্ছে কুশিক্ষার প্রভাবে।

মোট কথা, আধুনিক শিক্ষার একেবারে অস্তিত্ব লোপ না পেলে, স্ত্রীশিক্ষা কি স্ত্রীস্বাধীনতা, বা ছেলেদের শিক্ষা কি দেশের স্বাধীনতা সবই আকাশ-কুসুম।

সতী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রাত্রিদিন নিদ্রাহীন
ওই তব ম্লানমুখ স্মৃতিপথে রাখি'
দলিতের ভগবানে বলি ডাকি' ডাকি'
"সতী-গর্ব্ব নাহি তার নিও
মৃত্যু তারে দিও।"

কায়মনে এতদিন
তুমি যে ঢালিয়া দিলে অনিবার ধারে
স্নেহ তব, প্রীতি তব—দিলে আপনারে
কোনো মূল্য নাহি কি তাহার,
কোনো অহঙ্কার?

তোমারি সে গুরুজনে
বলিল যে বারবার তব শুভকামী
আমারে দেখায়ে নিত্য, "ওই তোর স্বামী
এত যারে বেসেছিস্ ভালো;
ওই তোর আলো।"

তাহারা কিভাবে মনে
যে বিমল বরমালা আশাভরা চিতে
রেখেছ নবীন করি হৃদয়-অমৃতে
ব্যগ্র বক্ষে চাপি দুই করে
মোর কণ্ঠ তরে

ভয়ে তাহা হবে শ্লথ?
ব্যথা দিয়া সুধা তার করিবে হরণ,
টুটিবে সোহাগ-ডোর করিয়া পীড়ন
পরিহাসে টলিবে প্রণয়?
উন্মাদ নিশ্চয়!

হইও না অবনত
জানি সখি এতকাল সহিয়াছ কি যে,
আঁখিজলে নিরন্তর গেল বুক ভিজে,
তবু বলি, তবু এই মাঙি
পড়িও না ভাঙি।

কোনদিন কুলহারে
হয়তো বা দুইহাত এক করি দিয়া
পুরাঙ্গনা আমাদের ঘেরিয়া ঘেরিয়া
উলুধ্বনি করিবে উৎসবে
কী দিন সে হবে!

নাহি হয়,—পরপারে
মরমের প্রেমব্রত হইবে সফল,
আর কারো হ'তে হয়, বুকে ধর' বল
অকলঙ্ক রাখিতে জীবন
বারিতে মরণ।

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে ছাদের উপর মাদুর-খানা বিছাইয়া অমরনাথ শুইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে একটা মোমবাতির আলোকে বসিয়া কন্যা উমা একখানা বই পড়িয়া পিতাকে শুনাইতেছিল।

চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে চাঁদের আলোয়,—মোম-বাতির দীপ্তি চারিদিকে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে ঝরঝর করিয়া চৈত্রের উতল বাতাস আসিয়া দীপ-শিখাটীকে কাঁপাইয়া নিবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। উমা তখন বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে দীপ-শিখাটীকে বাতাসের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ এক সময় দুর্দ্দান্ত বাতাস অতর্কিতে আসিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া গেল। উমা সচকিত হইয়া যখন বইখানা ফেলিয়া দুই হাত বাড়াইল, তখন আলো নিবিয়া গিয়াছে।

উমা বলিল "আলোটা নিবে গেল বাবা, জেলে নিয়ে আসি?"

অমরনাথ অন্যমনস্ক ভাবে শুইয়া ছিলেন, কন্যার কথায় সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন, "নিবে গেল আলোটা? আর কতখানি বাকি আছে মা?"

উমা বলিল "বেশী নেই বাবা, দুই পাতা বাকি আছে।"

শ্রান্তকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "এখন তবে থাক মা, কাল শুনব।"

উমা বইখানা বন্ধ করিয়া বলিল "তবে থাক বাবা, কাল শুনো।"

অমরনাথ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন, উমাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অদূরে প্রবাহিতা গঙ্গা। তাহার ছোট ছোট ঢেউগুলার উপরে চাঁদের আলো পড়িয়া চিকমিক করিয়া জ্বলিতে-ছিল। ওপারের গাছগুলা মাথায় জ্যোৎস্না মাখিয়া বুকে অন্ধকার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারি মাঝে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া অবিরত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল—চোখ গেল।

নীচে একটা চীৎকার শুনা গেল "দোহাই হুজুর, দোহাই হুজুর, মারবেন না—মারবেন না, সব বলছি।"

সঙ্গে সঙ্গে নায়েবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল "ফের চীৎকার করছিস্ বেটা? দেখছি তোর মুখ না বাঁধলে তুই—"

উমা পিতার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বাবা? মতিকাকা কাকে মারতে হুকুম দিচ্ছেন?"

অমরনাথ উত্তর করিলেন "আমি বিশেষ কিছু জানিনে মা, তবে বিকেলে মতি বলছিল বটে, রতন জেলে ভারি হাঙ্গামা বাধিয়েছে, তাকে জব্দ করা বিশেষ দরকার; বোধ হচ্ছে তাকেই শাসন করছে।"

উমা বলিল "শাসন কি বাবা?"

অমরনাথ কন্যার পানে চাহিয়া সস্নেহে একটু হাসিলেন, বলিলেন "শাসন মানে মার আর কি?"

উমার কোমল হৃদয়খানা ব্যথিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য রতনজেলের কথা ভাবিয়া সে সজল নেত্র পিতার মুখের উপর রাখিয়া বলিল "না মেরে শাসন করা যায় না বাবা? তবে যে শুনেছি প্রহার করার চেয়ে স্নেহের শাসনের শক্তি বেশী? তা যদি হয় বাবা, তবে না মেরে মুখের মিষ্ট কথা দিয়ে শাসন করলেই তো ভাল হয়।"

অমরনাথ বলিলেন "তা হয় মা, সে আমিও জানি। কিন্তু এও জেনো, মানুষের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা কোন শাসনই মানতে চায় না। তাদের কাছে স্নেহের বাঁধন নেই, স্নেহের শাসন তারা মানতে পারে না। জগতে দেবতাও আছে মা, আবার শয়তানও আছে। সকলকে একই জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা যায় না। তাই যে যেমন, তাকে তেমনি দিতে হয়। কেউ বা মিষ্ট স্নেহে ধরা দেয়,

কেউ বা তাতে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। সকলকেই দেবতা বলে ভেব না মা, সকলকেই স্নেহের শাসনে বাঁধতে চেয়ো না, আবশ্যক হলে চোখরাঙানীও দিয়ো। এই যে লোকটা, একে তুমি এত দিন স্নেহের শাসনেই বশ করতে চেয়েছিলুম। তোমার বাপকে তো তুমি জানো মা,—তোমার বাপ সহজে বিচলিত হয়ে কোনও কাজ করে বসে না এ যখন স্নেহের শাসন মানলে না, তখন আমায় বাধ্য হয়ে একে জোর করে বশে আনতে হবে; আর তাকে শুধু চোখরাঙানী দিলে চলবে না, হাতের কাজটাও চাই।"

উমা নতমুখে বসিয়া রহিল। একটু পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এতে কি একে বশে আনতে পারবে বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "ভগবান জানেন।"

উমা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দটা পিতার কাণে গেল। তিনি বলিলেন "দুঃখ হচ্ছে মা, কিন্তু এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কষ্ট করা। ছেলেমানুষ তুমি, এখনও লোক চিনতে পার নি, সংসার কেমন তা এখনও জানতে পার নি, তাই একটুতেই ব্যথা পাও। যখন সংসার চিনবে, তখন লোকও চিনবে,—দেখবে, এর মধ্যে দেবতা আর শয়তান পাশাপাশি ভাবেই বাস করছে; যে যার ন্যায়সঙ্গত দাবী, তাই চাচ্ছে। দেবতা যা চায়, তাকে তাই দাও। কিন্তু শয়তান যা চায়, তা যদি তাকে না দাও, সে কিছুতেই তোমার কথা কাণেও তুলবে না, তোমার শত্রুতাচরণ করবেই। একজন লোক—সে আজীবন কাল দুঃখ কষ্টের মধ্যেই বাস করে আসছে,—প্রত্যেক দিন কত মারই যে খাচ্ছে তার ঠিক নেই। কোন দয়ালু ভদ্রলোক তাকে দেখে ভারি কষ্ট পেয়ে নিজের কাছে আনলেন, তাকে ভাল খেতে পরতে দিলেন। কিন্তু সে লোকটির কাছে এ সব কিছুই ভাল লাগল না; কারণ, সে প্রত্যেক দিনই মার গাল সইতে এমন অভ্যস্ত হয়েছিল যে, এক দিন এগুলো না হলে তার মনে হয়, দিনটাই বৃথা গেল। সে পর দিনই পালিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে,—ভাবলে, বাপরে, ও সব কি আমি সহ্য করতে পারি? সংসারে এমনি শয়তানও আছে মা, যে উপকারকে অপকার বলেই জেনে নেয়,—আর সেইটে নিয়ে একটা ভয়ানক কাণ্ডও করে বসে।"

উমা চুপ করিয়া পিতার পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল তাঁহার কথাই ঠিক। আর পিতা যাহা বলেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না।

অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সংসারের এই সব দেখে শুনে সময় সময় বড় মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে ভাবি, সব ফেলে একবার ছুটে পালিয়ে যাই। পালিয়ে যেতুম ঠিক—যদি তুই না থাকতিস উমা। তখন কেউ আমায় বেঁধে রাখতে পারত না।"

উমা বলিল "আর ঊষার বিয়ে বাবা—"

অমরনাথের মুখখানা বিমর্ষ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন "ঠিক কথা বলেছিস উমা, ঊষার বিয়ের একটা ভাবনা আছে মাথায়।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "কলকাতার পাত্রটী সব রকমেই ভাল; কিন্তু আমার মন সরছে না যে উমা।"

উমা বলিল "কেন বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "কেন তা জিজ্ঞাসা করছিস মা? আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাদের সঙ্গে যে আমার কোন মতেই মিলছে না উমা ছেলেটী বিলাত-ফেরৎ, ডাক্তার হয়েছে, ছেলের বাপ ব্যারিষ্টার। যদিও তারা হিন্দু মতের বলছে, তবু তাদের শিক্ষাটা—"

উমা বলিল "না বাবা, তারা তো ব্রাহ্মও হয় নি বা খৃষ্টানও হয় নি। তারাও বলছে তারা হিন্দু। স্বেচ্ছায় তারা আমাদের ঘরের মেয়ে নেবে, এটা কি ভাল নয়? শিক্ষা তাদের আছে—সে তো ভালই, আমিও তো তাই ভালবাসি বাবা। অশিক্ষিত পরিবারে, অশিক্ষিত ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া কে প্রার্থনা করে! আমার মত যদি নাও বাবা—তবে এই ছেলেটীর সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল। ছেলের ফটোও তো দেখেছি, চেহারাও বেশ ভাল, আমাদের ঊষার সঙ্গে বিয়ে হলে বেশ মানাবে।"

অমরনাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন "কিন্তু—হবে কি রকম জানিস? জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যেমন তার অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি। একে সে পল্লীগ্রামের জলবাতাসে মানুষ, লেখাপড়া যা জানে তা তাদের বাড়ীর উপযুক্ত নয়, বাংলা আর সংস্কৃতটাই শিখিয়েছি, ইংরাজি শিখাই নি। এতে সে কলকাতায় সেই সব সাহেবঘেঁসা লোকদের

কাছে গিয়ে থাকতে পারবে তো? আজকাল ধর্ম্মটা কেউ সহজে বিসর্জ্জন দেয় না, কিন্তু মতটা নিঃসঙ্কোচে নিজেদের মধ্যে চালিয়ে যায়। তারা হিন্দু, কিন্তু মতে তারা পুরো সাহেব। আমার সেই ভাবনা, আর কিছুই ভাবছি নে।"

উমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "তারা যখন সব জেনে শুনেও নিতে চাচ্ছে, তখন তোমার ভাবনা কেন বাবা? তারা নিজেদের মত ওকে দুদিনে তৈয়ারী করে নেবে।"

অমরনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন "সে ভাবনাও বড় কম ভেব না উমা। যাকে আমি নীতি, সংযম শিক্ষা দিয়ে দেবীরূপে গড়ে তুলেছি, সে যদি সে সব বিসর্জ্জন দিয়ে অসংযমী, দুর্নীতিপরায়ণ হয়, সেটা আমার বুকে কি রকম কঠিন ভাবেই বাজবে। আমার মেয়েকে আমি শান্ত, সংযত দেখতে চাই, তাকে বিলাসিনী দেখতে চাইনে; দেব দ্বিজে ভক্তিমতী দেখতে চাই, ঘৃণায় সঙ্কুচিতা হয়ে সরে যাওয়া দেখতে চাইনে। আমি যে অমূল্য জিনিসটী তৈরী করেছি, তাকে আবার নিজেরই হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলব উমা?"

উমা বলিল "কিন্তু, এও তো হতে পারে বাবা—তোমার মেয়ে সে সংসারে গিয়ে ধর্ম্মে, জ্ঞানে সে সংসার উজ্জ্বল করে তুলবে, অন্ধ বিজাতীয়ভাবাপন্নদের আবার স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে। এ রকম কি হতে পারে না বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন "জগতে কি না হতে পারে মা? কিন্তু কথা হচ্ছে, অনেকে আবার নিজেকে হারিয়েও ফেলে। অনেকগুলো প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একটী মেয়ের শক্তি কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না,—বিশেষ সে মেয়েটী আবার স্ত্রী রূপেই যাবে। যাই হোক, আমি এখানেই ঠিক করি। ভগবান যা করবেন তাই হবে—তিনি করাচ্ছেন, আমি উপলক্ষ হয়ে করে যাচ্ছি মাত্র। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি এই ক্ষুদ্র বালিকাটীকে দিয়েই নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।"

নীচে বালিকা ঊষার ডাক শুনা গেল "দিদি—"

"যাই—"উমা উঠিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "ঊষা বুঝি জল খেতে ডাকছে?"

উমা মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিল "আজ একাদশী বাবা।"

"একাদশী?"

পিতা মুখখানা বালিসের উপর রাখিয়া নীরব হইয়া গেলেন। উমা নীচে চলিয়া গেল।

২

অনেক দিনের কথা সে—যেদিন অমরনাথের স্ত্রী—উমার মা অভয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তখন উমা ছিল পাঁচ বৎসরের, ঊষা দুই বৎসরের। সংসারে অমরনাথের পিসীমা ছিলেন, তিনিই এই শিশু মেয়ে দুটির ভার লইলেন।

কাজটা বড় কম ছিল না। তিনি বৃদ্ধা, যে সময়ে লোকে ভগবানের নাম গ্রহণ করে, সংসারের দেনা-পাওনা অনেকটা চুকাইয়া ফেলিয়া একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়ায়, সেই সময়ে তাঁহার ঘাড়ে দুইটী শিশুর ভার পড়িল। হরিনামের মালা ও ঝুলিটী দেয়ালের হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া তিনি দুইটীকে দুই কোলে তুলিয়া লইলেন।

অবশ্য সে চিরকালের জন্যই নহে। কারণ দুই দিন যাইতে না যাইতেই তিনি অমরনাথকে বিবাহের জন্য ধরিয়া বসিলেন। গম্ভীর মুখে অমরনাথ মাথা নাড়িলেন।

বগলা ঠাকুরাণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "বিয়ে করবি নে, সে আবার কি কথা রে? কিসের বয়েস তোর, তোর বয়েসে যে অনেকে প্রথম বিয়ে করে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস, এখনি তুই সংসারের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাতে চাস না কি?"

হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন "তাও কি হতে পারে পিসীমা? দেনা-পাওনা চুকানো আমার মত লোকের কাজ নয়। চুকাতে পারতুম—যদি মেয়ে দুটো না থাকত। ও দুটো যখন আছে, তখন তফাতে গেলেও চলবে না, ওদেরই ভার নিতে হবে।"

বগলা দেবী বলিলেন "তবু বিয়ে করবি নে? ছোট মেয়ে দুটো—ওদের দেখতেও তো একটা লোকের দরকার। তুই তো বাইরে বাইরেই থাকিস,—কে এদের দেখা-শোনা করবে বল দেখি?"

অমরনাথ বলিলেন "তুমি তো আছ পিসীমা?"

রাগ করিয়া হাতখানা নাড়িয়া বগলাদেবী বলিলেন "তাই বলে চিরকালই তোর সংসারে আমি পড়ে থাকি

আর কি? আমার নিজের তো আর কাজকর্ম্ম কিছু নেই,—ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভাসিয়ে দিয়ে ছেলে মানুষ করি। না, তুই বিয়ে কর বা নাই কর, আমার তাতে কি? আমি ঠিক বলছি কিন্তু অমর, এই আসছে পুজোর পরেই আমি কাশী চলে যাব। কোথায় এখন জপ তপ করব, তা না, সংসার আর সংসার। সংসার আমার সঙ্গে যাবে, না? কক্ষনো আমি আর তোর কোনও কথা শুনব না, আমি যাবই পুজোর পরে, তা জেনে রাখিস।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ তো পিসীমা, যেয়ো তুমি পুজোর পরে, আমি বাধা দেব না তোমাকে। পুজোর তো এখনও দেরী আছে, এই তো মাঘ মাস সবে পড়েছে। এ কয়টা মাস থাকো, মেয়ে দুটোকে একটু দেখো শোনো, বেশী ভার তোমায় নিতে হবে না।"

রাগ ভরেই পিসীমা বলিলেন "দায় পড়েছে তোর মেয়েদের দেখতে আমার। ইচ্ছে হয় নিজে দেখা শোনা কর, না হয় না কর, আমার বয়ে গেল তাতে।"

অমরনাথ নিশ্চিন্ত ভাবেই বাহিরে চলিয়া গেলেন; কারণ তিনি বগলাদেবীকে বেশই চিনিতেন। রাগই করুন, দুঃখই করুন, যে কাজ তাঁহার হাতে পড়িয়াছে, তাহা তিনি পরিপাটীরূপে শেষ করিবেনই। মেয়ে দুটিকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, তাহা অমরনাথ বেশ জানিতেন। ইহাদের ছাড়িয়া পিসীমা কোথাও আর নড়িতে পারিবেন না, সে বিষয়ে অমরনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বগলাদেবী বাহিরে বাহিরে খুবই আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন, মায়ার পুতলী মেয়ে দুইটার জন্যই যে তিনি রহিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যে তিনি ভালবাসেন, সে কথাটা কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি লোকের কাছে আস্ফালন করিতেন, আমি কি ওদের জন্যে পড়ে আছি? ওদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। আছি কেবল সংসারটা ভেসে যাবে—তাই। এইবার অমরের একটা বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী যাত্রা করব। বিশ্বনাথের চরণে এখন ঠাঁইটা পেলে হয়, আর দেশে ফিরছিনে।"

এক পূজার জায়গায় তিন চার পূজা চলিয়া গেল, বগলাদেবীর পূজা আর শেষ হইতে চায় না। পূজা আসার মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে তিনি ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়েন,—কি করিয়া যে পিতৃপুরুষের পূজাটা শেষ করিতে পারিবেন, এই ভাবনায় তাঁহার আহার নিদ্রা একেবারেই দূর হইয়া যায়। পূজা শেষে মাসখানেক লাগে পায়ের হাতের ব্যথা সারিতে, সর্দ্দি সারিতে। তাহার পর হঠাৎ আবার তাঁহার মনে পড়িয়া যায় কাশীর কথা,—বিশ্বেশ্বরের চরণে লয় হইবার ইচ্ছাটা মনে ভাসিয়া উঠে।

কিন্তু কিছুতেই তিনি অমরনাথের আর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন না। অমরনাথের বড় কঠোর পণ, সে পণ ভাঙ্গা পিসীমার ন্যায় বৃদ্ধার কাজ নহে।

বাহিরেরও অনেক আকর্ষণ অমরনাথ অনুভব করিতেছিলেন। বিদ্বান বিপত্নীক জমীদারকে জামাতারূপে পাইবার জন্য অনেক পিতামাতাই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের ফটোও আসিয়া অমরনাথের টেবিলে স্তূপীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু অমরনাথ অটল। তিনি কিছুতেই বিবাহ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা গৃহের তাড়না ও বাহিরের আকর্ষণ কিছুতেই টলাইতে পারিল না।

মেয়েদের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠা উমা যথার্থই উমা। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। তাহার মনটী যেমন সরল, তেমনি উদার। এত কোমল প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে যে সামান্য কিছু দুঃখের কারণ দেখিয়া লোকে যেখানে কেবল একটা আহা বলিত, সেখানে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। সংসারের কুটিলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সংসারের মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া অমরনাথ গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন। ছেলেটী তখন মাত্র চতুর্দ্দশবর্ষীয়, থার্ডক্ল্যাসে পড়িত। গরীবের ছেলে, তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিবেন বলিয়া অমরনাথ তাহাকেই কন্যা দান করেন। গোপীনাথ সর্ব্বাংশে উমার যোগ্য স্বামীই ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, অমরনাথ সবগুলিই পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিবাহের পর এক বৎসর গত না হইতেই উমা স্বামী হারাইল। যে সময় তাহার খেলিবার বয়স, সেই সময়েই সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া বাঙ্গালার বিধবা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িল।

বড় আদরের কন্যা উমার এই শোচনীয় অদৃষ্ট দেখিয়া

অমরনাথ শয্যা লইলেন। অনেক কষ্টে, অনেক চিকিৎসায় তিনি ভাল হইলেন, কিন্তু মনের সুখশান্তি তাঁহার একেবারেই ঘুচিয়া গেল।

প্রথমটায় উমা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বিবাহ যে কি—এবং বিধবা হওয়াই বা কি, তাহা সে জানিত না। বাড়ীতে আমিষ বিভাগ তাহার জননীর পরলোকগতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া গিয়াছিল। অমরনাথ নিরামিষভোজী ছিলেন, মেয়ে দুটীও জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিরামিষভোজীই ছিল। পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও আহারাদির ব্যবস্থা তেমনিই রহিল। অলঙ্কার বা ভাল কাপড় কিছুই তাহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। সুতরাং বিধবা হওয়া যে কি, তাহা জানিবার উপায় না থাকায় উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আগেও যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, এখনও তেমনি বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু জ্ঞান হইল কিছুদিন পরে; কিছুদিন পরে সে নিজের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিল। উমা দেহ অলঙ্কারশূন্য করিল, ঠাকুর-মায়ের থান লইয়া পরিল। বালিকা কন্যা যখন এই বেশে শোকার্ত্ত পিতার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দৃঢ়চিত্ত অমরনাথও নিজের দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "আমার সামনে এ বেশ নিয়ে আসিস নে মা, আমি তোর এ বেশ দেখতে পারি নে।"

কিন্তু তাহাই আবার দুই দিনে সহিয়া গেল। তাহার সহিত কথা কহিতে অমরনাথ ভুলিয়া যাইতেন সে বিধবা; যে মুহূর্ত্তে কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত, আর্ত্তভাবেই তিনি বুকখানা চাপিয়া ধরিতেন।

কেন অত তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ দিতে গেলেন, আট বছর বয়সেই সে তাহার সব অধিকার হারাইয়া ফেলিল। যদি আধুনিক মতে বিবাহ দিতেন,—অবশ্য তাহার ললাটের বৈধব্য লেখা কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারিতেন না, সে বিধবা হইতই, তবু—তবু স্নেহময় পিতার বুকে একটু সান্ত্বনা থাকিত। আবার ভাবিতেন, তাহার ললাট-লিপিতে অষ্টম বৎসরে পরিণীতা এবং নবম বৎসরে বিধবা হওয়া আছে, তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন কিরূপে? যে যাহার অদৃষ্টলিপি সঙ্গে করিয়াই আনিয়া থাকে, তাহার জন্য মানুষ দায়ী হইতে পারে না। এই কথাটী ভাবিয়াই তিনি তাঁহার অসীম দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতেন।

আর একটা কথাও তাঁহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিত, কিন্তু সাহস করিয়া সে কথাটাকে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সে কথাটা মনে উঠিবামাত্র তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি সেটাকে তখনি চাপা দিয়া ফেলিত।

আবার কি উমার বিবাহ দেওয়া যায় না? সে নবম বৎসরেই বিধবা; স্বামীর কি জানে, কি বুঝে সে? সে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলিয়াই থাকে; পুতুল খেলার মতই, উমার বিবাহ হইয়াছে; সে পুতুলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর বিবাহ দেওয়া যাইবে না কেন? সমাজ ঘৃণা করিবে, কিন্তু অধঃপাতে যাক সমাজ। সমাজের তিনি ঢের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিবর্ত্তে সে যদি অপকার করে, করুক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বালিকা উমার সুখহন্তা হইবেন না। তিনি স্নেহময় পিতা, পিতার কাজই করিয়া যাইবেন।

কিন্তু ঊষা আছে। তাহাকে হিন্দুগৃহে দিতে হইবে, তাহার পরে।

ঊষাকে তিনি শীঘ্র বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। একজনের খুব কম বয়সে বিবাহ দিয়া তাহার ফল পাইয়াছেন, কি জানি ঊষার অদৃষ্টেও যদি তাই ঘটিয়া যায়। যতদিন রাখিতে পারা যায়—থাক না কেন?

ঊষা চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ বৎসরে পড়িয়াছে, বগলা দেবীর চোখে ঘুম ছিল না, আহার ছিল না। উমাও এ বিষয়ে পিতার মন আকৃষ্ট করিত;—বাস্তবিকই ঊষা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার বিবাহ না দিয়া রাখা ভাল দেখায় না।

অমরনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মেয়ের বিয়ে দিতে আর আমার ইচ্ছে নেই পিসীমা। ঊষা বেশ আছে; নিজের মনে খেলছে বেড়াচ্ছে সকলের সঙ্গে মিশতে পারছে। বিয়ে হলেই হয় তো বিধবা হয়ে যাবে, তখন আমি আবার তাকে দেখব কি করে? নিজের হাতে উমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়েছি, ঊষাকেও এ বেশে সাজাতে আর ইচ্ছে নেই আমার।"

বগলা দেবী বলিয়া উঠিলেন "বালাই ষাট, ঊষার

কেন উমার মত অদৃষ্ট হতে যাবে রে অমর? একজনের হলেই কি সকলের হতে হয়? কি যে সব অলক্ষুণে কথা বলিস, কিচ্ছু ঠিক নেই তার। ও সব কথা মুখে আনিস নে বলচি, মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ।"

উমা বলিল "আমায় তুমি অমন করে কেন দেখ বাবা? আর আমার অদৃষ্ট-বশে আমি বিধবা হয়েছি বলে উষাও যে হবে তেমন কোনও কথা নেই। আমার দুঃখ কিসের? আমি বেশ রয়েছি তো। তোমরা বল আমি বিধবা হয়েছি. আমার বড্ড দুঃখ, কিন্তু আমি ভাবছি আমার মোটে বিয়েই হয় নি, আমি ছোট বেলা হতে এখনও তোমার সেই উমাই রয়েছি। আমাকে তুমি বিধবা ভেব না। উষার বিয়ের চেষ্টা কর, নইলে লোকে ভারি নিন্দে করবে।"

অমরনাথ কন্যার কথা শুনিয়া মুখখানা ফিরাইয়া গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্নতত্ত্ব

শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ এল্-এম-এস্

পূর্ব্বে ডাঃ ফ্রয়েডের একটি স্বপ্ন-বিশ্লেষণের উল্লেখ করিয়া নিজের একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। এইবার আমার অন্য একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এই স্বপ্ন আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে দেখিয়াছিলাম। কোন-কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে তিনি যে তাঁহার গুণানুযায়ী popular হইতে পারেন নাই, তাহার কিছু কারণ বোধ হয় আমার এই স্বপ্নের ভিতর পাওয়া যাইতে পারে। স্বপ্নটি এইরূপ—বাড়ীর সম্মুখে যে ফুলবাগান আছে, সেখানে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার গায়ে গাউনের মত আলখেল্লা। সঙ্গে একটি ব্যাগ। সেই বাগানে উদ্ভিদাদি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ছোট মাইক্রস্‌কোপ্ এবং ছোট ছোট ছুরি কাঁচি আছে। তিনি এক-একটি ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন ও বলিতেছেন যে, এটি Calyx (সবুজ পাপড়ি) এইটি Corrolla (রঙ্গীন পাপড়ি)।

এই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের জন্য প্রথমতঃ ফুলবাগান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমি যখন এক জায়গায় সিভিল সার্জ্জন হইয়া যাই, তখন একটি সুন্দর সাহেবী ফ্যাসানের সরকারি বাড়ী অবস্থান করিবার জন্য পাই। এই বাড়ীর সম্মুখেই একটি সুন্দর জাফরির বেড়া দিয়া ঘেরা ফুলবাগান ছিল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সিভিল সার্জ্জন আমাকে বলিয়া গেলেন—"দেখুন, এই বাড়ীর পাশেই সাহেবদের খেলিবার ক্লাব। এইখানে সাহেব মেমসাহেবরা বৈকালে টেনিস্ খেলে। সেইজন্য এই বাগানটি বেশ পরিপাটি ও সুন্দর করিয়া রাখিবেন। তাহা না হইলে বাঙ্গালীদের রুচির অখ্যাতি হইতে পারে। আমরা বাঙ্গালীরা এই নতুন সিভিল সার্জ্জনের পদ প্রাপ্ত হইতেছি। যদি এই সব বিষয়ে পারিপাট্যের অভাব দেখাই, তাহা হইলে সাহেবদের ধারণা হইতে পারে যে, আমরা এরূপ বড় পদের অযোগ্য। বাগান পরিষ্কার রাখিবার জন্য আমার পনরো টাকা মাহিয়ানার একজন মালী আছে; আপনিও তাহাকে সেই কাজের জন্য নিযুক্ত রাখিবেন।"

অবশ্য তাঁহার কথায় আমাকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু মাসে মাসে যখন পনরো টাকা মালীকে গুণিয়া দিতে হইত, তখন টাকাগুলি অযথা খরচ হইতেছে বলিয়া হয় ত মনের মধ্যে দুঃখ হইত।

এই বাগানটি বিলাতী ফুলে ভরা ছিল। গৃহিণীর নিকট শুনিলাম, এ ফুলে দেবপূজা হয় না। তখন এই ফুল তুলিয়া, ছিঁড়িয়া, মাইক্রস্‌কোপে পরীক্ষা করিয়া, ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া, সময় কাটাইতাম। হয় ত এই পরীক্ষা করিয়া দেখার মধ্যে আমার কার্য্যের একটা সংজ্ঞা (symbol) জ্ঞাপন করিত। কারণ, ফুলগুলি যখন বিলাতী, তখন ইহা ছিঁড়িবার এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবারই যোগ্য। যদি ফুলগুলি দেশী হইত, তাহা হইলে হয় ত এরূপ হইত না। এই প্রস্ফুটিত ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া হয় ত কখনও মনের মধ্যে কবিতার ভাব উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ভিতরে কবিতার রস মোটেই না থাকায় চেষ্টাগুলি একেবারে নিরর্থক হইত।

স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলাম, স্বপ্নে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়াছি, তাহা আমার পুত্রকেই ইঙ্গিত করিতেছে। কারণ, আমার পুত্রকে রবিবাবুর শান্তি-নিকেতন আশ্রমে পড়িতে দিয়াছি। সেবার সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। আমার ইচ্ছা ছিল এই যে, সে এই পরীক্ষায় পাশ হইলে, যাহাতে ভবিষ্যতে সে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে পারে, সেইজন্য তাহাকে I. Sc. ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিব; এবং যাহাতে সে I Sc. classএ Botany, Physiology প্রভৃতি বিষয় পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। যখন তাহাকে বোলপুরে ভর্ত্তি করিয়া দিই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর সম্বন্ধে আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি বোলপুরের ব্রহ্মবিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে, যাহাতে বালকগণ physically এবং intellectually strong হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এবং এইজন্য তিনি Hard trainingএর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বোলপুর তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের সাধনার স্থান ছিল। তিনিও সেখানে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি তাহার পর ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারাই ছাত্রজীবনের যথার্থ বিকাশ হয়—এইরূপ Hard trainingএর দিকে চেষ্টা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। তিনি ছোট ছোট ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়েও তাঁহার আধ্যাত্মিকতার কথা খর্ব্ব করিয়া বলেন না। তাঁহার অনেক কথা, যাহা বোলপুরের বাহিরের লোকেরা বুঝিতে পারে না—এখানকার ছোট ছোট ছাত্ররা তাহা বুঝিতে পারে। সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছিলেন—বোলপুরের ছাত্রেরা এখান হইতে যাহা লইয়া যায়, সাধারণতঃ তাহা অন্য স্থানে পায় না। এই শেষ কথাটা আমার মনের উপর গভীর ভাবে দাগ কাটিয়াছিল। স্বপ্নে আমার পুত্রকে রবিঠাকুর রূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমার পুত্র বোলপুর হইতে রবিঠাকুর যাহা বলিয়াছেন—তাহা লইয়াছে,—অর্থাৎ রবিঠাকুরের স্বরূপ যেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু স্বপ্নের সংজ্ঞার মধ্যে একাধিক ভাব আছে। স্বপ্নে যে রবিঠাকুরের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে রবিঠাকুরের নিজের সম্বন্ধে আমার যে মনোভাব, তাহাও ঐ স্বপ্নের সংজ্ঞার মধ্যে প্রস্ফুটিত আছে।

আচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় একবার খুলনায় যান। ছেলেদের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের সভায় প্রেসিডেণ্ট হইতে খুব খুসী হন জানিয়া, একটি স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের উদ্যোগ করিয়া, তাঁহাকে সেই সভায় প্রেসিডেণ্ট করা হয়। ডাঃ রায় ছেলেদের পুরস্কার বিতরণ করিয়া, ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে সুরু করিলেন—"হে ছাত্রগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা পুরস্কার পাইয়াছ, তাহারা সুখী হইয়াছ; কিন্তু যাহারা পাও নাই, তাহাদেরও অসুখী হইবার কারণ নাই। কারণ, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বা বিশ্ববিদ্যালয়কে পদাঘাত করিয়াছে. তাহাদের মধ্যেও অনেকে বড়লোক হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—Sir R N. Mukherjee কিংবা Contractor, J. C. Banerji. ইঁহারা শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে বিশেষ যশের সহিত পাশ করিয়া বাহির হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, সেরূপ অর্থ, যাঁহারা যশের সহিত পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কেশবচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করেন—কিন্তু তাঁহার মত বক্তা—যাহারা ভাল ভাবে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে মেলে কি? এই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়াছিলেন। সেস্থান হইতে যদি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিতেন--তাহা হইলেও কি তিনি বেশী বড়লোক হইতে পারিতেন?"

ডাঃ রায়ের বক্তৃতার এই অংশ শুনিয়াই আমার বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ হঠাৎ যেন বাধা প্রাপ্ত হইল। আমি তখন চক্ষু মুদিত করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যারিষ্টারের গাউনে কিরূপ দেখান তাহার কল্পনা করিয়া, মানসিক চিত্রাঙ্কনে মনোযোগ দিলাম। বোধ হয় ডাঃ রায়ের বক্তৃতার এই অংশই আমার মনের গভীর স্তরে ঘা দিয়া, মনের ভিতর এই প্রশ্নের উদয় করিয়াছে যে, রবিঠাকুর যেরূপ হইয়াছেন, তাহা না হইয়া যদি অন্য কিছু হইতেন—তাহা হইলে কিরূপ হইত? স্বপ্নে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অনেকটা চেষ্টা আছে। আমার ধারণা, পাশ্চাত্য জগতে গেটের মত সাহিত্যিক আর জন্মায় নাই। কবি গেটের প্রতি আমার শ্রদ্ধার একটি কারণ এই যে, তিনি যেমন কবি ছিলেন, তাঁহার তেমনি বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। দেহতত্ত্ব (Anatomy) শাস্ত্রে গেটেই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, আমাদের মাথার হাড়গুলি আমাদের মেরুদণ্ডের হাড়গুলির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের মধ্যে গেটেই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, ফুলের Calyx, Corrolla, এইগুলি বৃক্ষের পত্রের রূপান্তর দ্বারাই হইয়াছে। স্বপ্নে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে Calyx, Corrolla লইয়া আলোচনা করিতেছেন—তাহাতে মনে হয় যে. যেন আমি আমার ভিতরের মনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এই 'গেটেত্ব' আরোপ করিতেছি। কিন্তু ঐ ফুলের পাপড়ি লইয়া বিশ্লেষণ করিবার যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে যে তাঁহার উপর শুধু 'গেটেত্ব' আরোপ আছে—তাহা নয়, রবিঠাকুর তাঁহার গদ্য ও কবিতার মধ্যে biological philosophy অনেকখানি আলোচনা করিয়াছেন—যেগুলি যে আমাকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাহারও ভাব আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে এই ফুল সম্বন্ধেই তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাঁহার লেখা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখতে পাই তার বাইরের সঙ্কোচ, তার পাপড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাহিরে আপন রঙ ফলিয়েচে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাইরের যে আয়োজন সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়েছিল, সে সবই পাপড়ির মত খসে পড়ল। সেখানে যে বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমন তাই হল, অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।"

রবিঠাকুর সম্বন্ধে আমার ভিতরের গভীর মনে যে সমালোচনার ভাব চলিতেছে—তাহাতে বুঝা যায় যে ইহা আমার নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ আমি নিজের অহঙ্কারের ভিতর দিয়া রবি-

ঠাকুরকে দেখিতেছি,—রবিঠাকুর ঠিক যে কিরূপ, তাহা আমি বুঝিতে ও জানিতে চেষ্ট করিতেছি না। আমি নিজে ফুল ছিঁড়িয়া Microscopeএ দেখিতাম—রবিঠাকুরকে দিয়াও তাহাই করিতেছি। আমার নিজের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতার গর্ব্ব আছে, গেটের স্বরূপত্ব রবিঠাকুরের উপর আরোপ করিয়া তাঁহাকেও সেইরূপ করিতেছি—অর্থাৎ ঠিক এইরূপ না হইলে আমি রবিঠাকুরকে ভাল লাগে না। আমার বোধ হয় যে দেশের মধ্যে রবিঠাকুরসম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে বিরূপতা দেখা যায়—তাহাও এইরূপ বিকারসম্ভূত। রবিঠাকুরকে আমাদের নিজের মনের মধ্যে ধরিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার উপর বিরক্তি, ক্রোধ এবং বিদ্বেষের ভাব অনেক স্থলে উৎপন্ন হয়।

এইবার আমি অন্যের কয়েকটি স্বপ্নের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

(১) একজন ভদ্রলোক zoological departmentএ কোনও একটি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মৎস্য বিভাগের একটি চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তাহা এই—যেন একটি বিড়াল আসিয়া তাঁহার ঘরের মাছগুলি খাইয়া ফেলিতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিমান লোক,—নিজেই এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। যেদিন রাত্রে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি দেখিয়াছিলেন যে একটি বাঘ, একটি নীল গাই এবং একটি নূতন রকমের গর্দ্দভকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় লইয়া আসা হইয়াছে। যেদিন স্বপ্ন দেখেন—সেইদিন মাছ যাহাতে পচিয়া না যায় তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য Smoking process অর্থাৎ ধোঁয়া দিয়া রক্ষা করিবার পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চাপরাশিকে এই কাজের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া অন্য কাজে চলিয়া যান। কিন্তু চাপরাশির ত্রুটিতে মাছগুলি অতিরিক্ত ভাপে পুড়িয়া গিয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহাতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন। স্বপ্নে যে বিড়াল দেখিয়াছিলেন—তাহার ইংরাজি হইতেছে Cat। Cat কথাটি এই তিনটি কথার আদ্য অক্ষর লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে—Cow, Ass, Tiger। Cow—তিনি যে নীলগরু দেখিয়াছিলেন তাহাকে, Ass সেই গর্দ্দভটিকে এবং Tiger সেই [illegible]কে ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি যখন zoological departmentএ ছিলেন, তখন কিছুদিন একটি সূচীপত্র (index) তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহাতে পশু, কীট, পতঙ্গাদির নামের আদ্য অক্ষর-গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সাজাইতে হইত। স্বপ্নের মধ্যেও এই ভাব সংক্রামিত হইয়াছিল। স্বপ্নে বিড়াল মাছ খাইয়া ফেলিতেছে—ইহার অর্থ এইরূপ বোধ হয় যে—যদি zoological deparment, fishery departmentকে গ্রাস করিয়া ফেলিত—তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে তিনি এই hsery department (যাহাতে তাঁহার মাছ পুড়িয়া যাইবার জন্য হাঙ্গামার মধ্যে পড়িতে হয় এবং যাহার জন্য হয় ত উদ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে দু'কথা শুনিতেও হয়) হইতে তাঁহার মনোমত zoological departmentএ যাইতে পারেন।

(২) রেলওয়ের একজন ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী তাঁহার একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমাকে বলেন। তাহা এই—গভর্ণমেণ্ট যেন একটি চাপরাশিকে দিয়া অনেক স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকে ঘুষ স্বরূপ পাঠাইতেছেন। তিনি তাহা লইতে চাহিতেছেন না; কিন্তু ইহা যেন ধমক দিয়া তাঁহাকে দিবার চেষ্টা হইতেছে।

হঠাৎ এই ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীটির এত সাধু ইচ্ছা হইল কেন—তাহা অনুসন্ধানের জন্য আমি স্বপ্নের অর্থ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া ঘটনাটি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম। এই ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীটি বিশেষরূপে মাতাল। তিনি এক জায়গায় Railway Refreshment Roomএ বসিয়া মদ খাইতেছিলেন। এক পেগ্ মদ খাইয়া ঐ Refreshment Roomএর চাপরাশিকে পুনরায় মদ আনিতে বলিতেছিলেন। সেই চাপরাশিটি ইতস্ততঃ করিতেছিল—সেইজন্য সাহেবের সহিত বচসা হইতেছিল। এই সময় সেই Refreshment Roomএ একটি Scotland দেশীয় খাঁটি সাহেব প্রবেশ করেন। এই সাহেবটি ফিরিঙ্গি সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। কথায় কথায় খাঁটি সাহেবটির সহিত ফিরিঙ্গি সাহেবের বচসা হয়। তাহাতে খাঁটি সাহেবটি ফিরিঙ্গি সাহেবের নাকে ঘুঁসি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। তাহার পর ফিরিঙ্গি সাহেবটি বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করান এবং ডাক্তারের Certificate লইয়া গুরুতর আঘাতের চার্জ্জে ঐ খাঁটি সাহেবটির নামে পুলিশে নালিশ করেন। এ সম্বন্ধে রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের enquiry হয়। তাহার ফলে দুই সাহেবকেই শাস্তি দিয়া দুই বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হয়। তাহার পর ঐ ফিরিঙ্গি সাহেবটিকে, খাঁটি সাহেবের নামে যে মোকর্দ্দমা রুজু করা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া লইবার জন্য বলা হয় এবং তাহা না করিলে যে তিনি আরও শাস্তি পাইবেন এ কথাও তাঁহাকে জানানো হয়। ইহাই ফিরিঙ্গি সাহেবের স্বপ্ন দেখিবার কারণ।

(৩) একজন গৃহস্থাশ্রমত্যাগী যুবক ব্রহ্মচারী তাঁহাদের আশ্রম-সংক্রান্ত কোনও কার্য্যের উপলক্ষে একটি গ্রামে যান। ঐ স্থানে এক অবিবাহিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের বাড়ী তিনি অবস্থান করেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলেও ঐ গ্রাম হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরের কোনও দর্শনীয় ধ্বংসাবশেষ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসেন। তিনি তাঁহার একটি স্বপ্নের অর্থ বলিবার জন্য সেইদিন স্বপ্নটি আমাকে বলেন। স্বপ্নটি এই:—ঘোড়ার উপর একজন চাপিয়াছে, ডান হাতে বল্লম। মুখটা একটা মাঠের দিকে। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "কি করে charge করে ভাই?" সে ঘোড়ার উপর প্রায় শুইয়া বল্লমটা প্রায় সোজা করিয়া ধরিয়া বলিল—"আল্লাহো আকবর।" ঘোড়াটা সোজা ছুটিয়া গেল।

স্বপ্নে আছে—'মুখটা একটা মাঠের দিকে।' এখানে মাঠটি মঠের Association word (ভাব-সংহতি)। ঘোড়সোয়ারটি সন্ন্যাসী স্বয়ং। স্বপ্ন বিশ্লেষণকারীরা জানেন যে Lance দিয়া charge করা কিংবা ঘোড়ার পিঠে শয়ন করা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রচ্ছন্ন কামভাবকে ইঙ্গিত করে। ঐ শুদ্ধাত্মা ব্রহ্মচারীটির স্বপ্ন দেখিবার আগে কোনও ঘটনাক্রমে মনে হয় যে তাঁহার কোনও খাদ্যদ্রব্য এমন কোনও স্ত্রীলোক দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে যিনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-স্বভাবা নহেন। এইটি তাঁহার স্বপ্নদর্শনের কারণ এবং এই কারণেই তিনি শীঘ্র সেস্থান ত্যাগ করেন। স্বপ্নে যে 'আল্লাহো আকবর' কথার উল্লেখ আছে, সেইমত তিনি যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন এই ইঙ্গিত আছে।

(৪) একটি বালিকা তাহার বিবাহের কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখে যে সে মোটরের সিটে বসিয়া যাইতেছে, আর তাহার ছোট ভগ্নী foot boardএর উপর বসিয়া আছে। এই বালিকাটি বিবাহের পর মোটরগাড়ী করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করে। স্বপ্নের ভাব এই যে, তাহার যেমন ভাল বিবাহ হইয়াছে, তাহার ছোট ভগ্নীর সেরূপ ভাল বিবাহ হইবে না।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব বিষয়ক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করার সঙ্কল্প করিয়া তদুপলক্ষে একটী কমিটি নিযুক্ত করায় বিষয়টী লইয়া দেশে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে খবরের কাগজ বা মাসিকপত্রাদিতেও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ভূমির অধিকারী করিয়া দেন, তখন সে কাজটা যে সব দিক দিয়া ন্যায় ও আইনসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ, মুসলমান আমলে জমিদার বলিতে সর্ব্বত্রই ভূমির স্বত্বাধিকারী বুঝাইত না। জমিদার শব্দ তখন নানা অর্থ-বোধক ছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য জানিতে চান, তাঁহারা ঐ সময়কার ইতিহাস আলোচনা করিবেন।

কর্ণওয়ালিশ ও অন্যান্য যাঁহারা জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও জানিতেন যে, জমিদারকে তাঁহারা যে স্বত্ব দিতেছেন, জমিদার তাহার ন্যায্য অধিকারী নন। এ সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিষয়ে পার্লেমেণ্ট যে select committee বসান, তাহার fifth report হইতে (১৮১২ ইং) কতক অংশ তুলিয়া দিতেছি। "They" (the Directors of the East India Company) seemed to consider a settlement of the rent in perpetuity, not as a claim to which the landholders had any pretensions, founded on the principle and practice of native government, but as a grace, which it would be a good policy for the British government to bestow upon them. In regard to the proprietory right to the land, the recent enquiries had not established the Zaminder on a footing of the owner of a landed estate in Europe, who may lease out portions and employ and dismiss labourers at pleasure; but on the contrary had exhibited from him down to the actual cultivator, other inferior Land-holders, whose claim to protection government readily recognised, but whose rights were not, under the principles of the present system so easily reconcilable as to be at once susceptible of reduction to the rules about to be established in perpetuity.

বলা বাহুল্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ভূমির নানা প্রকার স্বত্বাধিকারী ও রায়তের আইনতঃ দাবী কার কত এ সম্বন্ধে, যতটুকু জানা দরকার বা খোঁজখবর লওয়া উচিত, কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তাহা জানিতেন না এবং তদ্রূপ খোঁজখবর লইতে পারেন নাই। কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ তাঁহাদের এই ত্রুটী সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। এ সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্টে আরও লেখা আছে—"These (i. e, these rights) the directors particularly recommended to the consideration of the government, who, in establishing the permanent rules were to leave an opening for the introduction of any such in future, as from time to time may be found necessary, to prevent the ryots being improperly disturbed in their possessions and subjected to unwarrantable exactions."

কোম্পানী ভাবিয়াছিলেন যে, জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে পর, ইহাতে এক দিকে তাঁহাদের বার্ষিক রাজস্ব যেমন নিয়মিত ভাবে সহজে আদায় হইবে, অন্য দিকে জমিদারদের তত্ত্বাবধানে কৃষি ও কৃষকেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কোম্পানীর আশা যে একেবারেই ফলবতী হয় নাই, তাহা নহে। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও কোম্পানীর আমলের প্রথমাবস্থায় দেশ ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষিজীবনে একটা সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল সন্দেহ নাই। এ ভাবে দেখিতে গেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সে সময়ে যে একটা বড় প্রয়োজন ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জমিদারগণ অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া যাহাতে দেশে কৃষির বিস্তার হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। জমিদারদের সহায়তায় দেশে শান্তি স্থাপন ও অরাজকতা নিবারণ করা সহজ হইয়াছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা এক সময়ে দেশে সুফল ফলিলেও, চিরদিন এবং সব বিষয়েই যে তাহা মঙ্গলজনক হইবে, এ ধারণা ভ্রান্ত।

বস্তুতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষফলও এ দেশে কম ফলে নাই। মুসলমান রাজত্বে একটা আইন ছিল যে, কৃষক তাহার রাজস্ব রীতিমত আদায় দিলে, জমিদার বা সরকারের অন্য কোন তহশীল কর্ম্মচারী তাহার সম্পত্তি বা স্বত্বের উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নিরক্ষর গরীব কৃষকদের ঘাড়ে 'জমিদার'দিগকে চাপাইয়া দেওয়া হইল। জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহাকে পথের ভিখারী করিতে পারেন। অবশ্য জমিদারদের মধ্যে অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি সে সময়েও ছিলেন—আজও আছেন। কিন্তু প্রজা কোন সত্য বা কল্পিত কারণে জমিদারের রোষ-দৃষ্টিতে পড়িলে, তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগিত না। অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারগণ আদর্শ-চরিত্র নহেন এবং ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা নিজেদের বিষয় নিজেরা না দেখিয়া, কর্ম্মচারীদের হস্তে কার্য্যভার দেন ও দিতেন। এরূপ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে এমন নির্দ্দয়, নীচাশয় ছিল ও আছে যে, তাহারা নিজ স্বার্থ পরিপুষ্ট করিবার বা কুপ্রবৃত্তি জন্য প্রজাদের নানা ভাবে উৎপীড়ন করিত এবং এখনও করে। অনেক দুশ্চরিত্র জমিদার কঠোরহস্তে প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর খাজনা আদায় করিতে পারিতেন তাহা করিতেন। দুরন্ত জমিদার ও তাহার নরপিশাচ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লওয়া গরীব প্রজার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। প্রথমতঃ জমিদারের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে লোক পাওয়াও অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ 'বিদ্রোহী' প্রজাকে মিথ্যা মোকদ্দমা হাঙ্গামা ইত্যাদি দ্বারা জব্দ করা প্রবল প্রতিপক্ষদের পক্ষে সহজ ছিল এবং আজও অনেকটা আছে।

১৭৯৯ ইংরেজীর ৭নং রেগুলেশন মতে জমিদারগণ আদালতের আশ্রয় না লইয়াই প্রজাদের ধান, গরু ইত্যাদি আটক করিতে পারিতেন এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য আদায় করিতেন বা আক্রোশ মিটাইতেন।

১৮২২ ইংরেজীতে কোম্পানী প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত নূতন বিধান [illegible] বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতে প্রজার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। ১৮৫৯ ইংরেজীতে ক্যানিং সাহেব জ্যোতস্বত্ব বিষয়ে নূতন বিধান করিলেন (Act X of 1857) ১৭৯৩ সাল হইতে বা ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, যে সব প্রজারা একভাবে খাজনা দিয়া আসিতেছে, তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না—এরূপ বিধান করা হইল। যাহারা ১২ বৎসর জমি জোত করিবে, তাহাদের জোত স্বত্ব বজায় থাকিবে এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতীত জমিদারগণ তাহাদের খাজনার হার বাড়াইতে পারিবেন না। এই সময় হইতে জমিদারগণকে ফারগ দিতে বাধ্য করা হইল। কিন্তু এ আইনও যথেষ্ট ফলপ্রদ হইল না। জমিদারগণ নানাভাবে আইনের হাত এড়াইয়া প্রজাদের উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। অতএব ১৮৮৫ সালে গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমানে সেই Bengal Tenancy Actই প্রচলিত আছে। এই আইন মতে প্রজাদের Occupancy এবং non-occupancy ryot এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহারা ১২ বৎসর এক গ্রামে জমি জোত করিয়াছে, তাহাদের occupancy ryot শ্রেণীভুক্ত করিয়া, তাহাদের জমিতে কতক স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে; এবং জমিদারগণ যাহাতে অযথা খাজনা বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এইরূপে বিভিন্ন সময়ে নানা আইন করিয়া জমিদারের অন্যায় উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের জোতের জমিতে কতক স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রকার আইন লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী নন, এবং প্রজাকে এই সব অধিকার দেওয়া বে-আইনী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের Permanent settlement Regulationএর (Regulation I of 1793) নিম্নলিখিত sectionটী ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "It being the duty of the ruling power to protect all classes of people and more particularly those who from their situatian are most helpless, the Governor General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil; and no Zaminder, indepent Taluqdar or other actual proprietor of the land shall be entitled on this account, to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectively agreed to pay."

(২)

প্রজাস্বত্ব আইন করিয়া বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট চাহিতেছেন প্রজাদিগকে প্রধানতঃ তাহাদের জোতস্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার দিতে। রায়তের জোতস্বত্ব সম্বন্ধে ১৮৮৫ ইংরেজীর ব্যবস্থা পরিষ্কার নহে। বর্ত্তমানে জোতস্বত্ব বিক্রয় করিতে হইলে রায়তকে প্রমাণ করিতে হয় যে, এইরূপ হস্তান্তরিত করার প্রথা দেশে বর্ত্তমান আছে। আদালতে এ সম্বন্ধে দেশে প্রথা (custom) আছে বলিয়া প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়। একে ত দলিলাদির সাহায্যে প্রমাণ করা দুরূহ; তাহার উপর রায়তের প্রতিপক্ষগণ প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার। তাই বর্ত্তমানে পরিষ্কার ভাবে প্রজাকে তাহার জোত বিক্রয়ের অধিকার দিবার কথা উঠিয়াছে। প্রস্তাবটী কতদূর সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহা আমরা পরে দেখিব। তবে প্রায়ই একটা কথা বলা হয় যে, এইরূপ নূতন আইন লিপিবদ্ধ করা বে-আইনী হইবে। কেন না চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে জমির উপর সর্ব্বপ্রকার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবিত আইন দ্বারা জমিদারের স্বত্ব ক্ষুণ্ণ করিলে ন্যায়মতে সরকার বাহাদুর জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত রাজস্ব পাইতে পারেন না। আমি ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা

কালেও গবর্ণমেণ্ট প্রজার উন্নতিকল্পে পরে যে কোন বিধিব্যবস্থা করার ক্ষমতা হাতে রাখিয়াছিলেন এবং তদনুসারে কাজ করিয়াও আসিয়াছেন। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে যে কোন নূতন আইন প্রচার ও পুরাতন আইন রদ করিতেও পারেন। স্থান কাল পাত্রভেদে ব্যবস্থাও ভিন্নরূপ হয়। ১৫০ বৎসর আগেকার একটা আইন যে আমাদের জাতীয় জীবনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবে, ইহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদও করিতে পারেন। জোতস্বত্বের ব্যবস্থা ত সামান্য কথা।

আরও একটা কথা বিশেষভাবে তলাইয়া দেখা দরকার। জোতস্বত্ব বিষয়ে প্রজার কতদূর অধিকার থাকিবে বা না থাকিবে, ইহা আইনের লৌহ ছাঁচে ফেলিয়া বিচার করা সঙ্গত নয়। বিষয়টীকে অর্থনীতির principles বা মূলমন্ত্র দিয়াই প্রধানতঃ বিচার করিতে হইবে। যে দেশে শতকরা ৭২ জন লোক কৃষক, সে দেশে জাতীয় উন্নতি বলিলে প্রথমতঃ কৃষি ও কৃষকের উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে তাহাই বুঝিতে হইবে। মুষ্টিমেয় জমিদারের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ কৃষককে উৎসর্গ করা চলে না।

মানবের সকল প্রকার উন্নতির মূলে আশা, উৎসাহ ও স্বাধীনতা থাকা দরকার। বঙ্গের কৃষক একদিন সরল, ধর্ম্মভীরু ও স্বাধীন ছিল। তাহারা চাষ করিয়া সোণা ফলাইত, পল্লীবাসী আত্মীয়-স্বজনের প্রীতিতে বাড়িয়া উঠিত। গ্রামে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেন। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। দারিদ্র্য বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমানা; নিরুৎসাহ প্রত্যেকের বুক শোষণ করিতেছে। এই অধঃপতনের নানা কারণ আছে। তবে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেও ইহার একটা বড় কারণ বলিয়া মনে করি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদাৎ জমিদারগণ যখন ভূমির সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাধিকারী হইলেন, তখন প্রজাদের হিতাহিত, জীবন-মরণ, উন্নতি-অবনতি তাঁহাদের করুণা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিল। জমিদারদের মধ্যে কাহারও-কাহারও এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের কাহিনী বাংলার কৃষকসমাজে বহুদিন যাবত প্রবাদের মত চলিয়া আসিয়াছে। এই সব অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীদের মন যোগাইয়া তোষামুদি করিয়া থাকা। যখন দেশে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে কোন আইন প্রচলিত ছিল না, দেশে সাধারণ শিক্ষার আলো বর্ত্তমান সময়ের মত এত বিস্তৃত হয় নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তখন কৃষক আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া প্রকৃত পক্ষে অনেকটা ক্রীতদাসের মত হইয়া পড়িল। তাহার চাষবাসের জমি হস্তান্তরিত হইলে সে জীবনের সম্বল হারাইবে। অতএব জমিদারকে তুষ্ট রাখাই তাহার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উপায়। এই ভাবে দাসত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল নৈতিক অধঃপতন। তাই ক্রমে ক্রমে প্রভুদের নীচ তোষামুদি করিতে যাইয়া প্রজারা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে—তাহারা আত্মবিশ্বাস হারায়। আজকাল অবস্থার কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবুও কৃষকদের সর্ব্বত্রই যে একটা উৎসাহহীনতা, নিজের ক্ষুদ্রতা, ও কার্য্যোদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার জন্য প্রজাদের ঘাড়ে জমিদারদের চাপাইয়া দেওয়া কাজটা যে কতটা দায়ী, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি নাই।

জমিদারদের ভূমির সর্ব্বপ্রকার অধিকারী করিয়া দেওয়ায় গ্রাম্য-জীবনের ও কৃষকের নৈতিক অধঃপতন যে শুধু এইটুকু হইয়াছে—তাহা নহে। সহরে বসিয়া কাতর চক্ষে যাহারা গ্রামের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহারা গ্রামবাসীকে সরল, ধর্ম্মভীরু, প্রীতিপরায়ণ এই ভাবে চিত্রিত করেন। কিন্তু তাঁহারা কল্পনায় কেবল কাব্য রচনা করিয়া যান। গ্রাম্য জীবনের সহিত আমার মত যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, সে কেবল একটা সুখস্বপ্ন মাত্র। মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা আচরণ, পরের অপকার প্রচেষ্টা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি গ্রামে যত আছে, সহরে তত হয় না। এবং এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য গ্রাম্য জীবনের নেতা জমিদার বা তাহার কর্ম্মচারীগণও যে অনেকটা দায়ী, তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। অনেকস্থলে ইহাদেরই প্ররোচনায় আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাইয়া প্রজারা মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে জমিদারের আড়াআড়ি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি সর্ব্বদাই চলিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত চোখের সামনে পাইয়া, পরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে উত্তেজিত হইয়া প্রজারা যে দিন দিন মামলাবাজ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আগেই বলিয়াছি, এই সব নৈতিক অধঃপতনের অনেক কারণ আছে। কিন্তু কর্ণওয়ালিশের এই বিধানটাও যে তাহার একটা বড় কারণ, তাহা যাঁহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

প্রজাদের আর্থিক বা নৈতিক উন্নতির প্রধান উপায়—তাহাদের বুকে উন্নতির আশা জাগ্রত করিয়া দেওয়া, তাহাদিগকে স্বাধীন ও দায়িত্ব-জ্ঞান পূর্ণ করা। এবং তার জন্য তাহাদের প্রধান সম্বল চাষের ভূমিতে জোতস্বত্বের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। প্রজা বুঝুক যে সেও মানুষ, জমিদারের ক্রীতদাসের নয়; যতক্ষণ সে তাহার খাজনা ন্যায়মত আদায় দিবে, ততক্ষণ তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হইবে না—নীচ তোষামুদী করিতে হইবে না। জোতস্বত্বের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া মাত্রই যে তাহার এত দিনের এই সব সংস্কার, অভ্যাস, মানসিক ও আর্থিক দৈন্য দূরীভূত হইয়া পড়িবে, আমি অবশ্য এ কথা বলিতেছি না। বিশেষতঃ অনেক স্থলেই কৃষকেরা অজ্ঞ—নানাভাবে দুর্ব্বল। অসৎ জমিদার তাহার উপর সহস্র প্রকারে অত্যাচার করিতে পারিবেন। কিন্তু জোতস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণীত হওয়ার পর হইতে কৃষকগণ যে একটা নৈতিক [illegible] (moral strength) পাইয়াছে, এবং তাহাতে তাহাদের দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে,—যাঁহারা ইদানীং গ্রামে কৃষকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা চাই; জোতস্বত্ব আইন এমন ভাবে রচিত হউক, যাহাতে কৃষকদের এই স্বাধীনতাটুকু বজায় থাকে—যাহাতে তাহা

আরও বৃদ্ধি পায়। তাহারা নিজেরা যে মানুষ, তাহাদের অদৃষ্ট যে তাহাদেরই হাতে, এ কথা তাহারা বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করিয়া লউক।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি অযথা জমিদারদিগকে আক্রমণ করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সদাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে বা হইয়াছে। কিন্তু আমি এই systemএর বিরুদ্ধবাদী, এবং ইহা হইতে দেশে যে নানা অকল্যাণ সাধিত হইতেছে বা হইতে পারে, আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

আর্থিক উন্নতি প্রবল উন্নতি-আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। আর নিজের শ্রমলব্ধ ধন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিজের হাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এ বিষয়ে কর্ম্মীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, কাজ কখনও সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। কৃষকের বেলাও ঐ এক কথাই খাটে। কৃষকের প্রধান সম্বল তাহার চাষের জমি; এবং এই জমিতেই সে তাহার শ্রমবল ও সামান্য মূলধন খাটাইয়া যে ফসল উৎপন্ন করে, তাহা দ্বারাই তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই ফসলের উপরই তাহার সুখ, শান্তি, উন্নতি নির্ভর করে। অতএব যাহাতে কায়মনপ্রাণে জমির উন্নতিকল্পে কৃষক যথেষ্ট চেষ্টা করে, সেজন্য ঐ জমিতে তাহার জোতের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা প্রয়োজন। এবং জমিদারকে উপযুক্ত খাজনা দিয়া সে যাহাতে নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে, তাহার মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার; এবং সে নিমিত্ত, বিপদের সময় বা অভাবের তাড়নায় সে যাহাতে তাহার জোতস্বত্ব বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পারে, অথবা জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিতে পারে, সে ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া উচিত। কারণ, এরূপ অধিকার পাইলে, জমির উন্নতিকল্পে প্রজা যত খাটিবে, অন্য কোন অবস্থায় সেরূপ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদল গরীব; তাহাদের সঞ্চিত ধন নাই বলিলেও চলে। অতএব প্রজা তাহার শ্রমবল ভূমিতে নিয়োজিত করায় ভূমির যে উৎকর্ষ সাধন করা হইতেছে, তাহাকেই প্রজার মূলধন ও সঞ্চিত ধন ধরিয়া লইতে হইবে। বিপদে আপদে যদি তাহার এই ভূমিতে সঞ্চিত ধনকে আশ্রয় করিয়া বিপদের হাত এড়াইতে পারিবে—এরূপ আশ্বাস কৃষকের থাকে, তবেই সে কেবল ভূমির উন্নতিকল্পে সম্যক যত্ন করিতে উৎসুক হইবে।

কৃষকদের প্রধান অভাব মূলধনের। হালের গরু, বীজ, সার ইত্যাদি কিনিতে পারে, সেরূপ আর্থিক অবস্থা অনেকেরই নাই। তাই দেখা যায় যে, কৃষকগণ প্রায়ই ঋণগ্রস্ত, ও রক্তশোষক সুদখোরের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। অবশ্য আমাদের নানাপ্রকার সামাজিক আচার-ব্যবহারও এই ঋণের কতকটা হেতু সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গ্রামে কৃষকদের অনেক সময় বাধ্য হইয়া শতকরা ৩৬৫ টাকা বা ততোধিক সুদেও টাকা ধার করিতে হয়। যাঁহারা অর্থনীতির সাধারণ সূত্রগুলিও অবগত আছেন, তাঁহারাও বুঝিবেন, কৃষককে এই অসম্ভব হারে সুদ দিতে হয় কেবল তাহাদের credit নাই বলিয়া। ইহাতে এক দিকে যেমন কৃষক যথেষ্ট টাকা ধার করিতে পারে না, অন্য দিকে যে সামান্য টাকা ধার করে, তাহাও পরিশোধ করিতে না পারিয়া, ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হয়। মহাজনের তাড়নায় ফসল জন্মিবামাত্রই তাহা নামমাত্র মূল্যে—অনেক ক্ষেত্রে এই সব সুদখোর মহাজনদের নিকটই বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপ দুর্দ্দশায় হাবুডুবু খাইয়া সে ক্রমশঃ জীবনে ও কর্ম্মে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং দারিদ্র্য-জ্ঞানহীন হয়। অবশ্য কোন এক বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই এই সব সমস্যার সমাধান হইবার নহে। সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রচলন করা আবশ্যক। কৃষকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করার জন্য দেশে যথেষ্ট সমবায় ঋণদান সমিতি বা Co-operative Credit Society স্থাপন করা উচিত। তবে রায়তদিগকে তাহাদের জোতের জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করার বা তাহাদের জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা দিলে, তাহাদের credit বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে; এবং তাহারা সহজে অল্প সুদে তাহাদের প্রয়োজনীয় টাকা পাইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা মনে করেন যে, প্রজাদের জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করার ক্ষমতা দিলেই, তাহারা অযথা ঋণগ্রস্ত হইয়া উচ্ছন্ন যাইবে, তাঁহারা বাঙ্গলার কৃষকদের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত আছেন বলিয়া মনে হয় না। কৃষকেরা নিশ্চয়ই এত উচ্ছৃঙ্খল নয়। তাহারা তাহাদের শুভাশুভ বিচার করিতে পারে। আমাদের কৃষকের শ্রম ও সংযম অন্য কোন দেশের কৃষকের চাইতে কম বলিয়া মনে হয় না। অতএব তাহাদের এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিলেই যে তাহারা এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবে, এমন সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট পরিমাণে Land Bank ও Co-operative Credit Societies স্থাপিত হইলে বরং ফল অনুরূপ হইবে বলিয়াই মনে করি। প্রজা যখন দেখিবে তাহার credit বাড়িয়াছে, সে সহজে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিতেছে, ও স্থাবরাদত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইয়াছে, তখন তাহার প্রাণে নূতন উৎসাহ ও আশা আসিবে, তাহার মনের জোর বাড়িবে ও চরিত্রের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৮৫ সালের আইনমতেও জোতস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারা যায়। তবে প্রমাণ করিতে হয় যে, দেশে এই প্রকার হস্তান্তর করার প্রথা বর্ত্তমান আছে। অবশ্য আদালতে এরূপ প্রমাণ করা সহজ নহে। তাই জোতস্বত্ব হস্তান্তর করিতে হইলে, জমিদারের আদেশ লইয়া তাঁহাকে যথোচিত নজরানা দিয়া হস্তান্তরিত করিতে হয়। এইভাবে অনেক জমির জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং জোতস্বত্ব বন্ধক দিয়াও টাকা ধার করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইয়াছে। জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা জমিদারের হাতে থাকায়, তাহাতে প্রজাদের credit মোটেই বাড়ে নাই। বিশেষতঃ জোতস্বত্বের যাহা উপযুক্ত দাম, তাহার অধিকাংশই জমিদার লইয়া যান। জোতস্বত্ব বন্ধক রাখার সময় মহাজন জানে না যে, সে তাহা নীলাম করাইতে পারিবে কি না। তাই তাহাকে একটা বড় risk লইতে হয়। অতএব এত দিন জোতস্বত্ব বন্ধক রাখার বা হস্তান্তর করায় সুদখোর মহাজন ও জমিদারেরই লাভ হইয়াছে; প্রজাদের কোন শুভ হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান জোতস্বত্ব যত হস্তান্তরিত হইতেছে, পরিষ্কারভাবে জোতস্বত্বের উপর প্রজাদের সম্পূর্ণ অধিকার দিলে, জোতস্বত্ব তদপেক্ষা কম হস্তান্তর হইবে বলিয়াই মনে করি। প্রজারা যদি সহজ উপায়ে কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভূমি চাষ করিতে পারে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার মত সুযোগ পায়, তবে অচিরেই তাহাদের নৈতিক জীবনেও একটা আমূল পরিবর্ত্তন আসিবে, তাহাদের নিজেদের প্রতি ও পরিবারের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানও বাড়িবে সন্দেহ নাই।

অবশ্য রায়তদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়ায় জমিদারগণ যাহাতে অযথা ব্যতিব্যস্ত না হন তাহা দেখিতে হইবে। জোতস্বত্ব বিক্রয় করার সময় জমিদারকে উপযুক্ত নোটীশ দেওয়া উচিত। জমিদার যদি দেখাইতে পারেন যে, নূতন জোতদারের হাতে জমি গেলে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, অথবা তাঁহার জমির অপব্যবহার করিয়া ধ্বংস করা হইতেছে, তবে তিনি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন—এরূপ আইন থাকা উচিত।

কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রজাদের জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করার ক্ষমতা দিলে, দেশের সব জমি বিদেশী ধনীর করতলগত হইবে, অথবা কৃষি কোম্পানীর হাতে পড়িবে। বলা বাহুল্য, এরূপ কল্পিত ভয়ের দোহাই দিয়া বিষয়টী চাপা দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বিদেশীরা যদি এই দেশীয় জমিদারী হস্তগত করিয়া থাকেন, তবে তাহা প্রজাদের দোষে করেন নাই। উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের অমিতব্যয়িতাই তাহার জন্য দায়ী। দেশে কোথায়ও কৃষি কোম্পানী স্থাপিত হইলেই তাহাতে ভয়ে জর্জ্জরিত হইবার কোন কারণ নাই। বাংলার কৃষকগণ অনেক পুরুষ ধরিয়াই চাষের জমিকে সম্বল করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাহারা যে সহজে তাহাদের চাষের জমি কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ জোতস্বত্ব আইন নূতন ভাবে গঠিত হইলে, প্রজাদের নিজের জমির প্রতি মমতা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রজাকে তাহার জোতস্বত্বের উপর সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অবশ্য জমিদারগণ যাহাতে অযথা দুষ্ট প্রজার চক্রান্তে ব্যতিব্যস্ত না হন, তাহার জন্য উপযুক্ত আইন থাকা উচিত। আমরা চাই, এদেশে Free tenantry class বা স্বাধীন রায়তদল সৃষ্টি করিয়া তোলা। স্বাধীনতাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল—এই যুগে বোধ হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। স্বাধীনতা হইতেই চিত্ত-বৃত্তির বিকাশ হয়, কাযে উৎসাহ আসে, জীবনে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। দেশের বার আনা অংশ লোক কৃষক। বলা বাহুল্য ইহাদের কল্যাণ না হইলে জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে না।

মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে নানা অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি প্রাচীন রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তমান বীরভূম জিলার অধীন "সিঙ্গড়ীগড্ড" নামক গ্রাম; সুতরাং কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। কবিভূষণ মহাশয় যে সকল প্রমাণের বলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা একটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন *। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তি যথার্থ হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই বিশেষ গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা সাধ্য অনুসারে কবিভূষণ মহাশয়ের যুক্তিগুলির আলোচনা করিয়াও সেগুলির কোন সারবত্তা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি—কবিভূষণ মহাশয় এ ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন, তাহা খুব প্রশংসনীয়। এ যাবৎ কেহ যে তাঁহার সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন—তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। এরূপ একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য আমাদের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতারই আর একটী উদাহরণ ব্যতীত আর কি মনে করিব? এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা করিতে যে বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণার প্রয়োজন,—আমাদিগের তাহা নাই। এ সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যই আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সমীচীন আলোচনা প্রকাশিত করিয়া, এই জটিল বিষয়ের মীমাংসার সাহায্য করিয়া ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবেন।

আমরা এখন কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির আলোচনা করিব। কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, কবিভূষণ মহাশয় সে সম্বন্ধে দুইটি মুখ্য প্রমাণ ও কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি উক্ত উভয়বিধ প্রমাণ সম্বন্ধে ইহাও লিখিয়াছেন যে—"প্রধান কারণ বা বিনিগম হেতু (Irrevertible Proof)। কারণ কূটে কার্য্য হয়; কার্য্য বিষদরূপে বুঝাইতে হইলে, কতকগুলি পরিপোষক কারণও আবশ্যক করে, কাজেই কয়েকটি পরিপোষক কারণও দিতেছি। তাহা কেবল আমার প্রথম কারণকে বা মুখ্য কারণকে দৃঢ় করিবার জন্য মাত্র। যিনি প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার মুখ্য কারণদ্বয় খণ্ডিত করিবেন। পরিপোষক কারণে দোষ উদ্ঘাটন করিলে মুখ্য সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয় না।"

---

* "কালিদাস সমিতির চতুর্থ-শাখা কালিদাস জন্মপীঠ সভার অনুষ্ঠান পত্র"—৩৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতায় কালিদাস সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত মুখ্য প্রমাণ দুইটি উপস্থাপিত করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"মহাকবি কালিদাস গণিত জ্যোতিষে বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহার ফলিত জ্যোতিষেও অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি রঘুবংশে রঘুর জাতচক্র দিয়াছেন এবং স্থানে অস্থানে ফলিত জ্যোতিষের অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, তিনি তদানীন্তন ভারতের রাজধানীতে ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার জ্যোতিষজ্ঞানে কোনও ভুল ভ্রান্তি ছিল না। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্জিকা ব্যবহার তিনি অভ্রান্তরূপেই করিয়াছিলেন।

(১) বর্ষারম্ভ।—বাঙ্গালায় বর্ষারম্ভ বা নববর্ষ গ্রীষ্ম ঋতুতে হয়; দ্রাবিড়ে বর্ষারম্ভ বর্ষা ঋতু হইতে হয়, কর্ণাটে ও উৎকলে শরৎ ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ হয়; মধ্যদেশ হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত হেমন্ত ঋতুতে হয়; ইউরোপীয়গণ শীত ঋতুতে বর্ষারম্ভ গণনা করেন, হিন্দুস্থানে বসন্ত হইতে হয়।

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন,—তিনি ঋতুসংহারে, মেঘদূতে ও শকুন্তলায় গ্রীষ্ম ঋতু হইতেই বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী হইলে তিনি বর্ষাকে প্রথম আসন দিতেন, কর্ণাটী হইলে তিনি শরৎকালকেই মস্তকে ধরিতেন, তিনি উজ্জয়িনীর লোক হইলে হেমন্ত ঋতু হইতেই গ্রন্থের প্রথম বর্ণনা ধরিতেন, আর তিনি ইউরোপীয় হইলে শীতকালের প্রথম উল্লেখ করিতেন, তিনি হিন্দুস্থানী হইলে,—বসন্ত ঋতু হইতে গ্রন্থের আরম্ভ করিতেন। কিন্তু তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন, তাই তিনি গ্রীষ্মকাল হইতে বর্ষ-গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে বসন্ত হইতে বর্ষ-গণনা আরম্ভ। অমরে অগ্রহায়ণে বর্ষারম্ভ। প্রাচীন উৎকলে বারমাস্যায় অগ্রহায়ণে বর্ষারম্ভ।

(২) মাসের তারিখ। তিনি বাঙ্গালীর মত সৌরমানে মাসের তারিখ দিয়াছেন; তিনি ১লা আষাঢ় তারিখে মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি রামগিরি, রামগড় বা উজ্জয়িনীর লোক হইলে,—নিশ্চয়ই মালব দেশীয় মাসের দিন গণনার রীতি গ্রহণ করিতেন। তিনি মালবনাথ বিক্রমাদিত্যের পঞ্জিকা গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই লিখিতেন—আষাঢ়শুক্লপ্রতিপদি তিথৌ। তিনি হিন্দুস্থানী জ্যোতিষী হইলে লিখিতেন—মিথুনসংক্রান্তের্গতাংশ—একদিনে। আষাঢ়ের ১ম দিন জ্যোতিষের একটা গণ্ডগোলের কথা, কোনও হিন্দুস্থানী-ছাত্রকে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" এই কথার ব্যাখ্যা করিতে দিলে সে কিছুতেই তাহা বুঝাইতে পারিবে না। বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ এই কথার অর্থ বুঝাইতে অনেক বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"—প্রণেতার "দিবস" ও "তিথির" তারতম্য যে কি বস্তু তাহার উত্তম জ্ঞান ছিল।

* * * *

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কথার অর্থ ১লা আষাঢ়। মল্লিনাথ বাঙ্গালা পঞ্জিকা জানিতেন না, তাই এই কথার ব্যাখ্যা করিতে অনেক বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন। তিনি এইরূপ অপব্যাখ্যা নৈষধের "উলুলু" কথার ব্যাখ্যায় করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—উলুলু—মঙ্গলগীতি বিশেষঃ। বাঙ্গালা দেশতত্ত্ব তাঁহার জানা থাকিলে, তিনি লিখিতেন উলুলু—উলুধ্বনি। কালিদাস খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন, বাঙ্গালীর দুই কোটী হিন্দু নরনারীর যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কথার অর্থ—১লা আষাঢ়। এমন কি বাঙ্গালার একটি বর্ণজ্ঞানহীনা রমণীকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলে সেও এ কথার অর্থ ১লা আষাঢ় বলিবে।

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন—এ সম্বন্ধে আর কারণ না দিলেও চলে। যেমন মুদ্রিত পুস্তকের আবরক-পত্র দেখিয়া—কে লিখিয়াছে এবং কোথা হইতে লিখিয়াছে বুঝা যায়, যেমন ডাকে পত্র পাইবামাত্র তাহার শিলমোহর দেখিয়া বুঝা যায় যে—এই পত্র কবে কোথা হইতে আসিতেছে, সেইরূপ ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক, শকুন্তলার তৃতীয় শ্লোক, মেঘদূতের দ্বিতীয় শ্লোক পড়িয়াই বুঝা যাইতেছে—ইহা একজন বাঙ্গালীর লেখা।"

কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত মুখ্য প্রমাণদ্বয়ের অঙ্গহানি করা না হয়, সেজন্য আমরা উহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিলাম। এখন আমাদিগের বক্তব্য লিখিব।

অবান্তর কথা হইলেও প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গণিত-জ্যোতিষের গ্রন্থ নহে,—ইহা একখানা ফলিত-জ্যোতিষের গ্রন্থ। তবে উহাতে বৃহজ্জাতক ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থে যাহা নাই——সেই নক্ষত্র-পরিচয় ও নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত দ্বারা রাত্রিলগ্নের পরিমাণ নির্ণয়ের বর্ণনা আছে। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থখানির বিশেষ উল্লেখযোগ বিষয় এই যে, উহাতে গ্রন্থকার নিজকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের প্রণেতা ধন্বন্তরি ক্ষপণক প্রভৃতি দ্বারা গঠিত বিক্রমাদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন কালিদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজের প্রাদুর্ভাবকাল ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দের সমকালীন বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। অবিসংবাদিত প্রমাণদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিক্রমাদিত্যের তথাকথিত নব-রত্ন সভার অমরসিংহ ও বরাহমিহির ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী ছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদেরা অমরসিংহ ও বরাহমিহিরের প্রাদুর্ভাব-কাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক স্থির করিয়াছেন। এই সময় নির্দ্দেশে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখা যায় না। মহাকবি কালিদাসকে এখন প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোন পণ্ডিতই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং কিংবদন্তীর নব-রত্ন-সভার কালিদাসের সহিত বরাহমিহির ও অমরসিংহের যুগপৎ প্রাদুর্ভাব এখন সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন। এ অবস্থায় "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে প্রক্ষিপ্ত বা ভাক্ত (Literary forgery) সে বিষয়ে এখন সুধীবর্গের মতদ্বৈধ নাই। পূর্ব্বাপর যেমন অনেক সংস্কৃত কবি কালিদাসের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন—তাহাতে অল্পাধিক কৃতকার্য্যতাও লাভ করিয়াছেন—জ্যোতির্ব্বিদাভরণ-প্রণেতাও তাহাই

করিয়াছেন,—স্বীয় তাঁহার রচনা কালিদাসের নামে চলে কি না—পরীক্ষা করার জন্য নিজকে রঘুকার কালিদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি নব-রত্ন সভা ও উহার সময়ের উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে সাধারণের চক্ষে ধুলি দেওয়া চলিলেও চলিতে পারিত; কিন্তু তিনি বেশী আঁটাআঁটি করিতে যাইয়াই কার্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন;—বিশেষজ্ঞের নিকট তাঁহার উক্তি অসম্ভব সুতরাং অচিরতার পরিচয় কৃত্রিম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহা হউক মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যগুলিতে 'স্থানে অস্থানে' (?) জ্যোতিষ জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোন জ্যোতিষগ্রন্থের প্রণেতা না হইলেও, তাঁহার সৌর, সাবন প্রভৃতি মাসের তারতম্য বিলক্ষণ জানা ছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং আমরা কালিদাসের জ্যোতিষ জ্ঞানের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—কালিদাস ঋতুসংহারে, মেঘদূতে ও শকুন্তলায় গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মেঘদূত ও শকুন্তলা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। মেঘদূতের যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘদর্শনে প্রিয়তমার নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন,—তিনি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অর্থাৎ ভারতের বেদ, স্মৃতি, প্রভৃতি শাস্ত্র ও তদনুযায়ী অমর-কোষ প্রভৃতি গ্রন্থে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুইটি মাসে গ্রীষ্ম ঋতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া গ্রীষ্ম ঋতুতেই মেঘের দ্বারা প্রিয়তমাকে নিজের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে, কালিদাস আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করেন কিংবা কালিদাসের মতে আষাঢ় হইতেই বর্ষারম্ভ ধরিতে হইবে। শকুন্তলায় দেখা যায় যে সূত্রধার গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ নাটকাভিনয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও এরূপ বুঝায় না যে, কালিদাস গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক ঋতুসংহারে যে গ্রীষ্ম ঋতু হইতে বর্ষারম্ভ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয় কি না তাহা দেখা যাউক।

বর্ত্তমান মাস-গণনার আরম্ভ কোথায়?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী" পত্রিকার ২৯৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী মহাশয় কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ, তৈত্তিরিয় সংহিতা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে "মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু, শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রীষ্মাবৃতু, নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতু, ইষশ্চোর্জ্জশ্চ শারদাবৃতু, সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতু, তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতু" তৈ—স ৪, ৪, ১১০।

নগেন্দ্রবাবু ইহার অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—'মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু এবং মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু।' তিনি মন্তব্যে লিখিয়াছেন—এখানে দেখা গেল—সেই বৈদিক কালের মাসগুলির ও আজকালের মাস-গণনার মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে।" আর সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। স্মৃতি, পুরাণ ও অমর-কোষাদির ন্যায় কোষগ্রন্থে ঠিক এইরূপ ঋতুবিভাগই দৃষ্ট হয়। কালিদাস শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলে তিনিও জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুইটি মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারেন না। তিনি সেরূপ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসদ্বয় দ্বারা বর্ষারম্ভ করিয়া থাকিলে সেই বর্ষটি কোন্ মতের বর্ষ এবং তিনি কোন্ দেশীয় বলিয়া গণ্য হইবেন? সুতরাং অগত্যা বলিতেই হইবে যে ঋতুসংহারে বর্ণনারম্ভ গ্রীষ্ম ঋতু দ্বারা কবিলেও তদ্দ্বারা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত বৈশাখ দ্বারা বর্ষারম্ভ কালিদাসের স্বীকৃত ও তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালী ছিলেন ইহা প্রমাণিত হয় না। যদি কেহ বলেন "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" তাই মহাকবি কালিদাস ঋতুবিভাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত অগ্রাহ্য করিয়া, বাঙ্গালার লৌকিক-মতই গ্রহণ করিয়াছেন;—আমরা তদুত্তরে বলিব—তিনি যে সেরূপ করিয়াছেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তিনি যে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-সম্মত ঋতুবিভাগ মান্য করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কালিদাসের গ্রন্থাবলীতেই রহিয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। খুঁজিলে বোধ হয় এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে।

(ক) বাঙ্গালার প্রচলিত মতে ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ ঋতু। শাস্ত্রে আছে—কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীহরি অনন্ত-শয্যা হইতে উত্থিত হন। উহার পরবর্ত্তী পূর্ণিমা (প্রসিদ্ধ রাস-পূর্ণিমা) বাঙ্গালার এই প্রচলিত মতে শরৎকালের অন্তর্গত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির মতে এই পূর্ণিমাতেই শারদীয় মহারাস-লীলা সংঘটিত হয়। কালিদাস মেঘদূতে যক্ষের মুখে বলিয়াছেন—

"শাপান্তো মে ভুজগ-শয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
মাসানন্যান্ সময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নিবেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥"

"হরি-শয়নান্তে প্রিয়ে! শাপ অন্ত হবে গো আমার;
বাকি যে চারিটী মাস—চক্ষু মুদি' কাটাইবে তায়;
বিরহেতে ভাবি' ভাবি'—মনে যাগে যত আশা যার
মিটাইবে দোহে মিলি' জ্যোৎস্নাময়ী শারদ-নিশায়।"

(মৎকৃত পদ্যানুবাদ ২৯ পৃষ্ঠা)

বলা বাহুল্য যে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুইটি মাস শরৎ ঋতু না ধরিলে শ্রীহরির উত্থানের পরবর্ত্তী রাত্রিগুলির পক্ষে "পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু" বিশেষণ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না।

(খ) রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তপোবনে গমন করার পূর্ব্বে মাতৃ-চরণে প্রণত হইলে যেরূপ শোভা হইল, তাহার বর্ণনা করিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন—

"মাতৃ-বর্গচরণস্পৃশৌ মুনে
স্তৌ প্রণম্য পদবীং মহৌজসঃ।
রেজতুর্গতিরক্ষ্যাংশ প্রবর্ত্তিণৌ
ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব।"

রঘুবংশ ১১।৭

অর্থাৎ রাম ও লক্ষ্মণ মাতৃগণের চরণ-স্পর্শ করিয়া, মহাতেজস্বী মুনির পদবীর অনুসরণে প্রস্থিত হইলে সূর্য্যের গতি-অনুসারে প্রবর্ত্তিত চৈত্র ও বৈশাখ মাসদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। চৈত্র ও বৈশাখ পরস্পর সংযুক্ত ও ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তের সহচর স্বীকার না করিলে কালিদাসের এই উপমার সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। 'মধুমাধবৌ' মাসযুগল বৈদিক-কাল হইতেই ভারতীয়-শাস্ত্রে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কালিদাসের কাব্যেও তাহাই দেখিতে পাই।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি কালিদাসের ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম-ঋতুর বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করায় কালিদাসের মতে বৈশাখমাসে বর্ষারম্ভ প্রমাণিত না হয়—তাহা হইলে উহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এ কথার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য—কালিদাস তাঁহার কাব্যগুলিতে সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের বর্ণনাদ্বারা ষট-ঋতুর বর্ণন আরম্ভ করিয়াছেন কি না?

সকলেই জানেন কালিদাস আদিরসের বর্ণনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিরহের 'বার মাস্যার' ন্যায় কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির কাব্যে বিলাসের ও 'বার মাস্যা' দেখা যায়। রঘুবংশের ঊনবিংশ সর্গে কালিদাস অযোধ্যাধিপতি অগ্নিবর্ণের যে ষট ঋতু-সমুচিত বিলাস-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম প্রাবৃট বা বর্ষার ও তৎপরে যথাক্রমে শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুর সমুচিত বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসই আবার মেঘদূতের উত্তর-মেঘে অলকা-পুরীতে সকল ঋতুর পুষ্প-সম্ভারের যুগপৎ সুলভতা সূচিত করার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন—

"হস্তে লীলা-কমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতা মাননংশ্রীঃ।
চূড়া-পাশে নবকুরবকং চারু-কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"
"করে পদ্ম, অভিনব কুন্দ রাজি শোভিত কুণ্ডলে,
লোধ্র-পুষ্প-পরাগে যে পাণ্ডুকান্তি সুন্দর বদন,
কেশ-পাশে কুরবক, শ্রবণে শিরীষ চারু দোলে,
বর্ষার কদম্ব যথা সুন্দরীর সীমন্ত ভূষণ!"

(মৎকৃত পদ্যানুবাদ ১৮ পৃষ্ঠা)

মল্লিনাথ প্রভৃতি সকল টীকাকারের মতেই এ শ্লোকে কবির অভিপ্রায় এই যে, শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শিশিরের লোধ্র-কুসুম, বসন্তের কুরবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বর্ষার কদম্ব অলঙ্কার সকল ঋতুতেই সুলভ অর্থাৎ অলঙ্কার ষটঋতুর পুষ্প-সম্ভার যুগপৎ বর্ত্তমান।

কালিদাসের জন্ম-ভূমি যেখানেই হউক না কেন, তিনি যে মালব রাজসভায় কিছুকাল ছিলেন, এই প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী অমূলক মনে করার কোন কারণ পাওয়া যায় নাই। কবি-শ্রেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরিও কিম্বদন্তী অনুসারে মালবরাজ বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ছিলেন। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'শৃঙ্গার-শতক' নামক কাব্যে ষট-ঋতু সমুচিত বিলাস-বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রথমেই বসন্তের ও তৎপরে যথাক্রমে গ্রীষ্মাদি অবশিষ্ট ঋতুগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং বলিতেই হইবে যে তিনিও মালবের পঞ্জিকা মানিয়া প্রথমেই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ হেমন্তের বর্ণনা করেন নাই। রঘুবংশে ও মেঘদূতে যথাক্রমে বর্ষা ও শরতের বর্ণনা প্রথমে সন্নিবেশিত করায় কোনও স্পষ্ট কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কাল্পনিক কারণ অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাই যে কালিদাসের অভিপ্রেত—সেরূপকোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় তাহা প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। বিরাগী অগ্নিবর্ণের পক্ষে যোগ্যতম বলিয়া প্রাধান্য দিবার ইচ্ছা থাকিলে, কালিদাস বসন্তঋতুর দ্বারা আরম্ভ অথবা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—নীতি-অনুসারে বসন্ত দ্বারা শেষ করিতেন। অলকার বর্ণনা সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। সে যাহা হউক—পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার আর যাহাই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন—কবিভূষণ মহাশয়ের লিখিত বৈশাখের দ্বারা বর্ষারম্ভ সূচিত করার কোন উদ্দেশ্য তাহাতে থাকিতে পারে না—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ জ্যৈষ্ঠমাসে সর্ব্ব-বাদি সম্মত গ্রীষ্ম-ঋতুর আরম্ভ স্বীকার করিলে, কালিদাস সর্ব্বশেষে ঋতু-শ্রেষ্ঠ বসন্তের মধুর বর্ণনা দ্বারা কার্য্য শেষ করিবেন বলিয়াই ঋতু-সংহারে প্রথমে গ্রীষ্মের বর্ণনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন—অনুমান করিলে বোধ-হয় অসঙ্গত হইবে না। এরূপ করার পক্ষে অন্য কারণও আছে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, ভারতে প্রাচীন সংবৎ অপেক্ষা শকের প্রচলন অধিক ছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের সমপরিমিত (Corresponding) ১৮৮৫ শকে ১৯৮০।১৯৮১ সম্বৎ ঘটে। জ্যোতিষিক গণনায় সৌর বৈশাখের আদি হইতে শকাব্দের ও চৈত্রের শুক্ল প্রতিপৎ হইতে সংবতের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান শকের বৈশাখ অবধি কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত ১৯৮০ সংবতের মধ্যে ও অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৯৮১ সংবতের মধ্যে পতিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান শকাব্দ মধ্যে যে ১৯৮০।১৯৮১ এই দুইটি সংবতের অংশ পতিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন বহুসংখ্যক শিলা-লিপিতেই শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়; এমন কি খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতকের মধ্যবর্ত্তী মালবের অধিকাংশ শিলালিপিতেই সংবতের পরিবর্ত্তে শক ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধের শেষ দফায় উল্লিখিত পাটলিপুত্রের শিলা-লিপি অনুসারে ৩২০ খৃষ্টাব্দে কালিদাস বর্ত্তমান থাকিলে তিনিও শকাব্দের গণনা-প্রণালী অনুসারে বৈশাখ হইতেই বর্ষারম্ভ স্বীকার করিতেন—এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। বৈশাখ মাসটিকে যে শাস্ত্রীয় মতানুসারে কালিদাস বসন্ত ঋতুর অন্তর্গত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি; এ অবস্থায় বসন্ত ঋতুর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করিলেও বৈশাখের সহিত চৈত্রকে টানিয়া আনিতে হইত এবং সেই জন্যই বর্ষারম্ভের সহিত উহা সামঞ্জস্য

যুক্ত হইত না; অধিকন্তু তাহাতে "ন হি সুখং দুঃখৈ বিনা লভ্যতে' ও 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই কবি-সিদ্ধ নীতি-দ্বয়েরও ব্যত্যয় ঘটিত। জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করায়—উহা বর্ষারম্ভের সহিত সামঞ্জস্য-যুক্ত না হইলেও তাহাতে অন্য দুইটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করাই অধিক সমীচীন মনে হয়।

কবিভূষণ মহাশয়ের প্রদর্শিত ২য় মুখ্য প্রমাণটির গুরুত্বও আমরা বুঝিতে পারি নাই।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ কালিদাস যে সৌর মাস ও সৌর দিন-গণনার পদ্ধতি জানিতেন না এবং বাঙ্গালী ব্যতীত আর কেহ যে, বৈশাখ হইতে সৌর বর্ষারম্ভ ও সৌর দিন-গণনার ব্যবহার করেন না—ইহার কি প্রমাণ আছে? যদি তর্কস্থলে স্বীকারও করা যায় যে, কালিদাস তিথি-অনুযায়ী মাস অর্থাৎ চান্দ্রমাস ব্যতীত অন্য মাস ব্যবহার করিতেন না, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? তিনি যদি পহেলা আষাঢ় অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্ল-প্রতিপদ্‌ই বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ত আর একটা তিথি প্রায় এক অহোরাত্রের সম-পরিমিত বলিয়া 'আষাঢ়ের শুক্ল প্রতিপদ্ তিথিতে' এই পল্লবিত-বাক্যের পরিবর্ত্তে তার সমার্থক 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে' বাক্যটি ব্যবহার করিতে পারেন। তার পরে মেঘদূতের ২য় শ্লোকের 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' বাক্যটির পাঠ ও অর্থ লইয়া টীকাকারদিগের মধ্যে যে বিষম বিতর্ক আছে, তাহা মল্লিনাথের টীকার পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। কবিভূষণ মহাশয় সন্দিগ্ধ-বাক্যটির প্রকৃত পাঠ ও অর্থ কি হইবে তাহা বিচার না করিয়াই মল্লিনাথের ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মল্লিনাথের ভ্রম-প্রমাদ হইতে পারে না—এমন কথা কেহই বলিবেন না; কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার দোষ দেখাইতে হইলে কথাটা একটু ভালরূপে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। মেঘদূতের ২য় শ্লোকে আছে যে যক্ষ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" রামগিরির সানু-দেশে দৃপ্ত গজ-রাজের ন্যায় স্নিগ্ধ-শ্যামল একটা মেঘ দেখিলেন। ৩য় শ্লোকে আছে,—"প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থং" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রাবণ প্রত্যাসন্ন হইয়াছে, —তাই প্রিয়ার জীবন রক্ষার জন্য যক্ষ মেঘের দ্বারা তাঁহার নিকট নিজের কুশলবার্ত্তা পাঠাইতে সমুৎসুক হইলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পহেলা আষাঢ় তারিখে 'শ্রাবণ প্রত্যাসন্ন' অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই কল্পিত বিরোধ পরিহারের জন্য কতিপয় টীকাকার যক্ষ শ্লোকের "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" পাঠের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও হস্ত-লিপি পুঁথির লিখিত "আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" পাঠই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিনাথ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" পাঠ স্বীকার করিয়াই সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মেঘদূতের পাঠ-বিবেকে মল্লিনাথের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে তিনি মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় কোনও অসঙ্গতি দেখিতে পান নাই। মল্লিনাথ আপত্তিকারীদিগের বিতর্ক খণ্ডনজন্য বলিয়াছেন যে, মেঘদূতের উত্তর-মেঘে যক্ষ বলিয়াছেন,—

"শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
মাসানন্যান্ সময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।"

অর্থাৎ শ্রীহরি অনন্ত-শয়ন হইতে উত্থিত হইলে আমার শাপান্ত হইবে; (অতএব) চক্ষু বুজিয়া (কোনও মতে) বাকী চারিটা মাস কাটাইবে। শাস্ত্র-অনুসারে কার্ত্তিকের শুক্লা-একাদশীতে শ্রীহরি অনন্ত-শয্যা হইতে উত্থিত হন—এজন্যই পঞ্জিকায় উক্ত একাদশী "উত্থান-একাদশী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আষাঢ়ের "প্রথম দিবসে" পাঠ হইলে আষাঢ়ের শুক্লা প্রতিপৎ হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত ৪ মাস ১০ দিন ব্যবধান হয়। "প্রশম দিবসে" পাঠ ধরিলে শ্রাবণের প্রথম হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত ৩ মাস ১০ দিন। সুতরাং "প্রথম দিবসে" পাঠ ধরিলে যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের চারিমাস কাল হইলে ১০ দিন বেশী হয়, "প্রশম দিবসে" পাঠ করিলেও তেমন চারি মাস হইতে ২০দিন কম হয়। মল্লিনাথ বলেন যে উভয়রূপ পাঠেই যখন দিনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না—তখন আষাঢ় মাসটি সম্পূর্ণ গত করিয়া যক্ষের মেঘ-দর্শন কল্পনা করার কোনই হেতু নাই। প্রকৃত পক্ষে শ্রীহরির অনন্ত-শয্যা হইতে উত্থানের অর্থাৎ শাপাবসানের চারিমাস কাল বাকী আছে—ইহা বলাই কবির অভিপ্রেত; তিথি বা তারিখ ধরিয়া সূক্ষ্ম গণনা কবির অভিপ্রেত নহে—সুতরাং "প্রথম দিবসে" স্থলে "প্রশম দিবসে" পাঠ কল্পনা সমীচীন নহে।

আমাদের মতে মল্লিনাথের তর্ক অখণ্ডনীয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, সকল টীকাকারই পশ্চিমাঞ্চলের রীতি অনুসারে শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতেই মাসের আরম্ভ ধরিয়াছেন।

কবিভূষণ মহাশয় "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বাক্যের যে বাঙ্গালার পঞ্জিকামতে ১লা আষাঢ় অর্থ করেন, তারা স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'প্রত্যাসন্ন শ্রাবণের' সহিত পুরা একটা মাসের ব্যবধান হওয়ার অসঙ্গতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন ১লা আষাঢ় তারিখে শুক্লা বা কৃষ্ণা কোন্ তিথি—তাহার কোন নিশ্চয়তা বা উল্লেখ না থাকায় তদবধি কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী তিথি পর্য্যন্ত কিরূপে চারিমাস কাল ব্যবধান আছে—তাহা বুঝিবার কোনও উপায় না থাকায়—মহাকবির উক্তি অবোধ্য ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটি সন্দিগ্ধ পাঠ-ভেদের উপর এত বড় একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাহসের কার্য্য। কবিভূষণ মহাশয়ের স্বীকৃত অর্থ তর্ক-স্থলে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলেও কালিদাসের পক্ষে সৌর দিন গণনা অনুসারে 'পহেলা আষাঢ়' বাক্যটি বাঙ্গলার প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করার কোন বাধা দেখা যায় না; তর্ক-স্থলে উহা কালিদাসের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও আষাঢ়ের শুক্ল প্রতিপদ্ অর্থ বুঝাইতে 'পহেলা আষাঢ়' বাক্যটির ব্যবহারেও আমরা কোন অসঙ্গতি দেখিতে পাই না; অতএব কবিভূষণ মহাশয় বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত করিলেও, দুঃখের বিষয় যে, আমরা তাঁহার মুখ্য প্রমাণদ্বয়ের যথার্থতা স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। ইনস্যুলীন্

বিশ্বমানবের হিতসাধন করেছেন বলে ডাক্তার ফ্রেডরিক্ গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং এবার "নোবেল প্রাইজ্" পেয়েছেন। বহুমূত্র ব্যাধি এতদিন দুরারোগ্য ছিল। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী মেধাবী পণ্ডিত এই



ডাক্তার ফ্রেড্রিক গ্র্যাণ্ট ব্যাণ্টিং



ইনস্যুলীনের প্রয়োগ

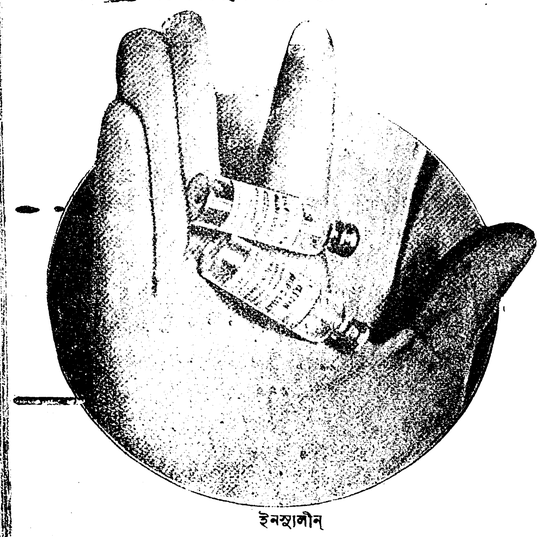

ইনস্যুলীন্

কাল ব্যাধির আক্রমণে অকালে ইহলোক হ'তে অপসারিত হ'য়েছেন। এই দুশ্চিকিৎস রোগে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপরিমেয়। ডাক্তার ব্যাণ্টিং এতদিন পরে এই রোগের এক মহৌষধ আবিষ্কার ক'রেছেন। ব্যাণ্টিং একজন ক্যানেডিয়ান চাষার ছেলে, বয়স সবে ৩১ বৎসর। মাত্র ছয় বৎসর আগে তিনি ক্যানেডার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েছেন। ডাক্তারী পাশ করবার পরই তিনি গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন! যুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে আসবার পর তিনি ক্যানেডা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে একজন সামান্য সহকারী পরিচারকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ডাক্তার ব্যাণ্টিংয়ের আবিষ্কৃত বহুমূত্র ব্যাধির ঔষধের নাম "ইন্স্যুলীন্।" ইনস্যুলীন্ লাটিন কথা—অর্থ হচ্ছে "দ্বীপ।" পশু অন্ত্রস্থ যে কোষমণ্ডলের রস থেকে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে তার নাম হচ্ছে "ল্যাঙ্গার্হন্স্ দ্বীপ-

পুঞ্জ" (Islands of Langerhans) তাই থেকেই এর নামকরণ হয়েছে 'ইন্স্যুলীন্'। এই ঔধধ সূচ্যগ্রে ত্বক্ ভেদ ক'রে রোগীর দেহের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালে এই ঔষধের পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বহুমূত্র রোগ থেকে যদি কোনও ওষধ মানুষকে বাঁচাতে পারে, তবে সে একমাত্র এই 'ইনস্যুলীন্!'

২। পূর্ব্ব জন্মের প্রমাণ

ডারউইনের 'বিবর্ত্তনবাদ' পড়বার পর 'চৌরাশী লক্ষ

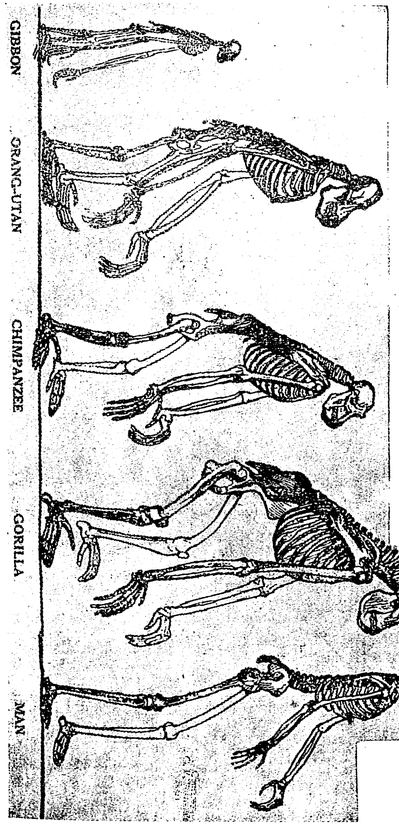

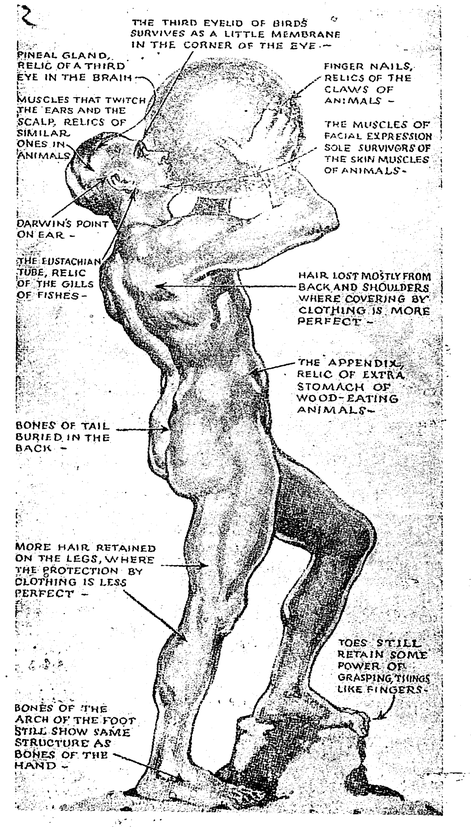

পূর্ব্ব জন্মের প্রমাণ

যোনী' ভ্রমণ ক'রে তবে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এ'কথাটাকে একেবারে নিছক্ গাঁজার প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে এখন অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। কথাটা যে খুবই সত্য, জীবতত্ত্ববিদেরা সেটা নানাদিক দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। মানবদেহ বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখ্লে সে যে এককালে জলচর, খেচর ও ভূচর প্রভৃতি জন্তু ছিল, মানুষের সেই সব পূর্ব্ব জন্মের বহু প্রমাণ এখনও তার দেহের গঠনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখ্তে পাওয়া যায়। খেচরের তৃতীয় আঁখিপল্লবের চিহ্ন এখনও মানুষের চখের কোণের ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণটুকুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যে 'পাইনীয়াল' চর্ম্মগ্রন্থিটি আছে (Pineal Gland) সেটি পুরাকালের তৃতীয় চক্ষুর অস্তিত্বের প্রমাণ।

যে মাংসপেশীর সাহায্যে মানুষ নানারকম মুখভঙ্গী করতে পারে, কেউ কেউ তাঁদের কানও নাড়তে পারেন, তারসঙ্গে

ভ্রূকুঞ্চন ও ললাটের চর্ম্ম প্রসারণ করবার শক্তিটাও মানুষের প্রাচীন পশুজন্মের পরিচয়টাই সপ্রমাণ ক'রে দেয়। মানুষের কানের গঠন বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি পশুর সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। কর্ণমূলের অভ্যন্তরস্থ শ্রবণ-নালী মাছের কানকোর রূপান্তর মাত্র। হাতের পায়ের নখ সেই পশুজন্মের থাবার কথা স্মরণ করিয়া দেয়। দীর্ঘকাল ধরে জামা কাপড় প'রতে শিখে মানুষের গায়ের লোম প্রায় বিরল হ'য়ে এসেছে, কেবল শরীরের যেখানে যেখানে গাত্রাবরণের ঘর্ষণ লাগবার সুযোগ হয়নি সেই সেই স্থানগুলি এখনও রোমাকীর্ণ হ'তে দেখা যায়। মানুষের উদরাভ্যন্তরস্থ 'এ্যাপেন্‌ডিক্স্'টি বৃক্ষভোজী পশুর অতিরিক্ত পাকস্থলীর চিহ্নাবশেষ মাত্র। মেরুদণ্ডের নিম্নে লাঙ্গুলাস্থি গোপন হ'য়ে আছে। চরণাস্থির সঙ্গে করাস্থির সমান গঠন চতুষ্পদের চিহ্ন জ্ঞাপক। হাতের আঙুলের মতো কতকটা মুঠা করে পায়ের অঙ্গুলের দ্বারা কিছু ধরতে পারাটা জীবজন্মের অভ্যাসের ফল!

৩। চীনের বাদাম

চীনের বাদাম আমরা সখ করে কখনও কখনও খাই, কিন্তু আমেরিকায় চীনের বাদাম একটা প্রধান খাদ্য। শুধু খাদ্য নয়, চীনের বাদাম আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার জর্জ্জ ডব্লিউ কার্ভারের সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও পরীক্ষার ফলে, উপস্থিত তাদের শতাধিক প্রয়োজনে ব্যবহার হচ্ছে। চীনের বাদামের দুধ ও মাখন. চীনের বাদামের আটা, বিস্কুট, কেক্, মোণ্ডা, হিমানী-ক্ষীর (Ice Cream), পনীর, শস্, মার্গারীন্ প্রভৃতি দেড়শ' রকম ভোজ্য দ্রব্য ছাড়া চীনের বাদাম থেকে খাবার ও মাখবার তৈল, পশুদের পোষ্টাই খাদ্য, এবং নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থও প্রস্তুত হচ্ছে—যেমন নয়প্রকার কাঠের পালিশ, উনিশ রকম চামড়ার রং, ধাতুরঞ্জন, চর্ব্বি, কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান, লেখবার কালি, ট্যানিক্ এ্যাসিড, ও গ্লিসারীণ প্রভৃতি।

ডাক্তার কার্ভার এখনও চীনের বাদাম নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন, তিনি আশা করছেন শীঘ্রই চীনের বাদাম থেকে কতকগুলি অমূল্য ঔষধও আবিষ্কার করবেন।

চীনের বাদামের শক্ত খোলা ভাঙবার পর বাদামের গায়ে যে পাতলা লাল ছালটি ঢাকা থাকে, ডাক্তার কার্ভার

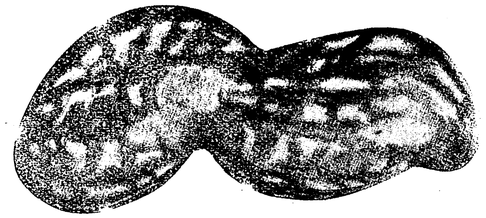

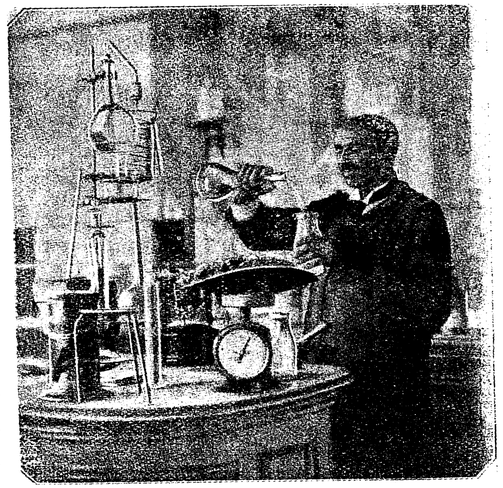

চীনের বাদামের দুগ্ধ

(প্রোঃ কার্ভার চীনের বাদাম থেকে দুধ তৈরি ক'রছেন)

তাই থেকে সম্প্রতি 'কুইনিন্' তৈরি ক'রতে পেরেছেন। তাঁর প্রস্তুত চীনের বাদামের দুধ গরুর দুধের চেয়ে মিষ্ট ও সুস্বাদু এবং বারোগুণ বেশী উপকারী।

৪। নূতন নীড়েন

ক্ষেত বা বাগান থেকে আগাছা তুলে ফেল্‌বার জন্য আর হেঁট হ'য়ে বা উবু হ'য়ে বসে কাজ ক'রে কোমর পিঠ টাটিয়ে তোল্‌বার দরকার হবে না। এক রকম নূতন নীড়েন তৈরী হ'য়েছে, সেটি হাতে করে ক্ষেতে বা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আগাছা উপ্‌ড়ে ফেলা

চল্‌বে। একগাছা ছড়ির মুখে দুটো লোহার লম্বা লম্বা কাঁটাদাঁত আঁটা আছে। কাঁটা দুটোর মুখের কাছাকাছি একটু ওপরে একটা হুড়কো লাগানো আছে। আগাছার



নূতন নীড়েন

গোড়ায় কাঁটার মুখ চেপে ঢুকিয়ে দিয়ে ছড়িতে টান দিলে হুড়কোয় আটকে আগাছা আপনি উপ্‌ড়ে আসে!

৫। কেশের কসরৎ

য়ুরোপের মেয়েরা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য সতত লালায়িত। রূপ ক্রয় করবার জন্য তারা অকাতরে অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত, কারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যের উপর তাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। নারীর সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে তার কুঞ্চিত কেশদাম। তাই কুন্তলের কমনীয়তা ও দেহের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য সে দেশে অনেক কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মাথার চুল চিরকাল কোঁকড়ান ক'রে রাখ্‌বার জন্য যত প্রকার বৈদ্যুতিক কেশ-কুঞ্চন যন্ত্র উদ্ভাবিত হ'য়েছে, তার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

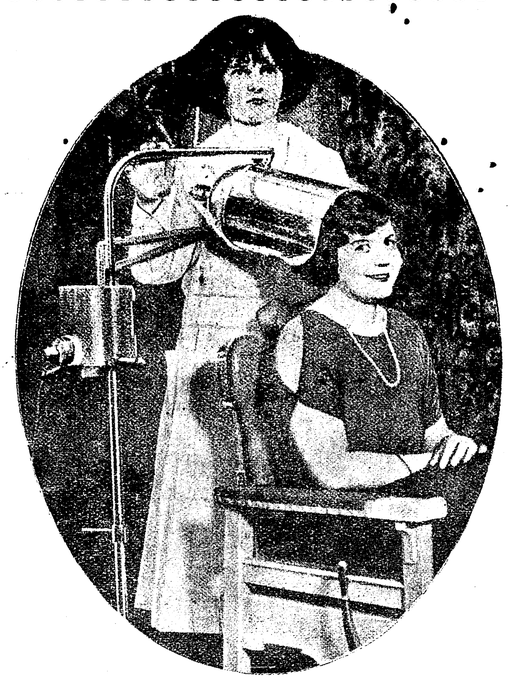

চুলে ঢেউ খেলানো



রূপী-টুপি

হ'চ্ছে 'মেদুসা'। এই যন্ত্রটি ঝাড়ের মতো উপর থেকে ঝোলে, ঠিক তার নিচের একখানি চেয়ারে সৌন্দর্য্যাভিলাষিণীকে বসিয়ে তাঁর মাথার কেশগুচ্ছকে যন্ত্রসংলগ্ন ছোট ছোট কুঞ্চন-দন্তে পাকিয়ে ঢেউখেলানো আরকে ভিজিয়ে ফ্লানেল জড়িয়ে বায়ুপ্রবেশহীন নলের মধ্যে পুরে সাত মিনিটকাল



চুল কোঁকড়াবার ঝাড়

উত্তাপ দিতে হয়। তারপরই নলাভ্যন্তরস্থ কুঞ্চনদন্ত থেকে কেশগুচ্ছ মুক্ত ক'রে আঁচড়ে ছেড়ে দিলেই চমৎকার কোঁকড়া চুল চিরস্থায়ী হ'য়ে যায়। আর একরকম যন্ত্র আছে, তাতে মাত্র এক হপ্তার জন্য মাথার চুল কোঁকড়ানো থাকে। এতে বেশী হাঙ্গামা নেই, এক গ্লাস জলে মাথার চুল ভিজিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে এই যন্ত্রের সাহায্যে জলটুকু শুকিয়ে নিলেই চুলগুলি ঢেউখেলানো থেকে যায়। স্নানের পর কোঁকড়ানো ভিজে চুল চট্ করে শুকিয়ে নেবার জন্য একরকম 'রূপী-টুপি' বেরিয়েছে। ভিজে চুলের উপর এই টুপি চাপা দিয়ে বৈদ্যুতিক উত্তাপে উষ্ণ বায়ু সঞ্চারিত করে অল্পক্ষণের মধ্যে চুল শুখিয়ে ফেলা হয়। প্যারিসে একরকম 'রূপ-দীপ' বেরিয়েছে। এই দীপের তীব্র উজ্জ্বল



রূপ-দীপ

নীল আলোকরশ্মি দেহ ও কুন্তলের উপর কিছুক্ষণ বিকীর্ণ ক'রলে চোখ মুখের রং একেবারে তরুণ অরুণাভ হ'য়ে ওঠে। মাথার চুলগুলি রেশমের মত চিকণ দেখায়। নবযৌবনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যেন যাদুবলে আবার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে ওঠে! তবে এ পরিবর্ত্তন চিরস্থায়ী হয় না।

৬। জল-সাইকেল

এই সাইকেল বা পা-গাড়ী পথে চলে না, কিন্তু জলে চলে। সমুদ্রে স্নান করবার সময় আজকাল এই জল-সাইকেল চড়া একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। জলে চলবার



জল সাইকেল

গাড়ীর সবটাই জলের মধ্যে ডুবে থাকে, কেবল সাম্‌নের পেছনের হাওয়া-ভরা বায়ু-পাত্র দুটি ভাস্‌তে থাকে। চালাবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি তিনডেলে দাঁড় থাকে, আর জল-সাইকেল জলের মধ্যে চল্‌তে সুরু ডাইনে বাঁয়ে গাড়ী ঘোরাবার জন্য হাতল ধরে' কে ফেরাতে হয়; হাতলের প্রান্তে হাল আঁটা আছে সেই হ'চ্ছে গাড়ীর গতি-নিয়ামক। বায়ুপাত্র আঁটা বলে এ গাড়ীর কলকব্জা খারাপ হ'য়ে গেলেও আরোহীর জলে ডুবে মরবার আশঙ্কা নেই।

৭। আব্‌রু-দ্বার

"বাড়ীতে কে আছেন?" বলে সদরে ক্রমাগত কড়া-নাড়া ও মহা ডাকাডাকি প'ড়ে গেলেও কর্ত্তা বা অপর পুরুষ কেউ বাড়ীতে না থাকলে গিন্নীরা প্রাণ গেলেও দরজা খোলা তো দূরে থাক সাঁড়া পর্য্যন্ত দেন না। সেই সব লাজুক গিন্নীদের জন্যে একরকম 'আব্‌রু-দ্বার' আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এই দ্বারের তলদেশে একটা গুপ্ত ছিট্‌কিনি লাগানো আছে, গৃহিণী ইচ্ছা করলে দ্বার যতটুকু মাত্র মুক্ত করবার অভিলাষ কর্ব্বেন, তাই করতে পার্ব্বেন তাঁর চারু চরণের ঈষৎ চাপে! আগন্তুক কিছুতেই বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজা তার বেশী আর খুল্‌তে পারে না, কারণ সেই ছিট্‌কিনীটি মেঝের সঙ্গে এঁটে গিয়ে গৃহদ্বার দুর্ভেদ্য করে তোলে। সেই ইচ্ছামত ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে লাজুক গৃহিণী নবাগতের



আব্‌রু দ্বার

পরিচয় নিয়ে তাকে কর্ত্তাদের খবর জানিয়ে দিতে পারেন।

৮। দন্তরোগে দৃষ্টি-হীন—

দাঁতের দোষ থেকে যে সব রকম ব্যাধির উৎপত্তি হ'তে পারে, একথা আজকাল সকল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেই স্বীকার ক'রছেন। স্বাস্থ্যের সঙ্গে দন্তের যে অতি নিকট সম্বন্ধ, এতে আর কোনও ভুল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্য সপ্রমাণ করেছেন। খাদ্য পরিপাক করবার জন্য দন্তের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ভুক্ত পদার্থ উত্তম রূপে চর্ব্বিত না হ'লে পাকস্থলীর পাচক রস উক্ত খাদ্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ ক'রতে পারে না। পরিপাক মন্দ হ'লে অজীর্ণ, অম্লরোগ, উদরাময়, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, দুর্ব্বলতা এসব তো প্রায়ই হ'তে দেখা যায়; তাছাড়া আরও এমন সব রোগ হয় যা আনাড়ী লোকেরা ধারণাও ক'রতে পারে না যে, দাঁতের সঙ্গে এসব রোগের কোনও সম্পর্ক আছে!



শ্রীমতী ক্যাথারীন ব্রাইডেন

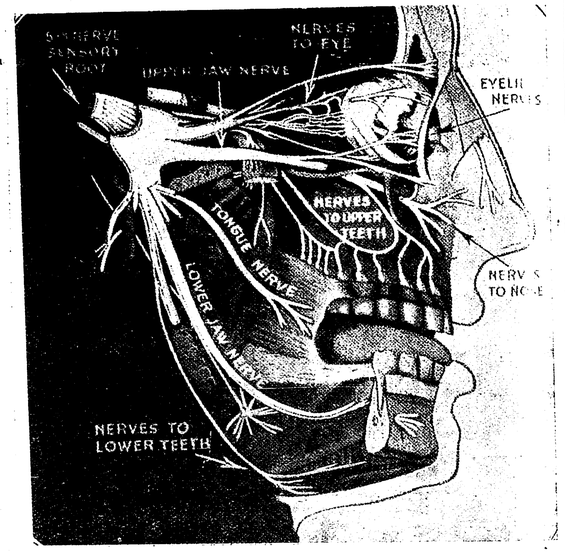

দাঁত ও নাক, মুখ, চোখ, কান কণ্ঠ প্রভৃতির নিকট সম্বন্ধ

বাত, মূত্রাশয়ের রোগ, পাকস্থলীর মধ্যে নালীঘা ও কর্কট রোগ, শ্বাসকণ্ঠ, যক্ষ্মা, কণ্ঠ-নালীর ঘা, গলায় বিচী ওঠা, নাকে ঘা, এ সমস্তই দাঁতের রোগ থেকে জন্মায়! সম্প্রতি জানতে পারা গেছে যে দাঁতের দোষে মানুষ দৃষ্টিহীন পর্য্যন্ত হ'তে পারে। ক্যাথারিন ব্রাইডেন নামে জনৈক মহিলা দাঁতের ব্যায়রামে অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন---অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং যৌবনে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৃষ্টিহীন হ'য়ে পড়েছিলেন। নানা-রকম চিকিৎসা করেও তবু তিনি চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পাননি! এখন তাঁর বয়স সবে মাত্র তেইশ। দাঁতের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে তিনি সম্প্রতি তাঁর দাঁতগুলি সব তুলিয়ে ফেলেছেন। দাঁতের জন্যে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল, অজীর্ণ রোগে তাঁর ওজন প্রায় ১৫ সের কমে গেছল;—বারোমাস সর্দ্দি কাশী আর গলার ব্যথায় তিনি ভুগতেন। কিন্তু দাঁত তুলিয়ে ফেলবার পর থেকে—তাঁর শরীরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হ'ল; তাঁর বারমাসের সর্দ্দি, কাশী, গলার ব্যথা তো একেবারে সেরে গেলই, তা ছাড়া অজীর্ণ রোগ আরাম হ'য়ে তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, এগারো বৎসরের উপর যিনি অন্ধ হ'য়ে ছিলেন, তাঁর সেই অপহৃত দৃষ্টি-শক্তি আবার নূতন আনন্দ নিয়ে তাঁর চখের কোলে ফিরে এলো! সুতরাং দাঁতের রোগকে অবহেলা করা যে কোনরকমেই উচিত নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

৯। আলোক মুকুট

কালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টো অঞ্চলের সৌখীন সুন্দরীরা আলোর মুকুট মাথায় দিয়ে রূপের জ্যোতিঃ দীপ্ত ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রছেন। রঙীন রেশমের মুকুটাকৃতি স্বচ্ছ টুপীর মধ্যে নীল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠলে মুকুটটি উজ্জ্বল নীলাভ হয়ে ওঠে। মুকুটের চূড়ার উপর একটি কমলালেবু রংয়ের বৈদ্যুতিক আলোক-মুণ্ডি রক্তিম-



আলোক মুকুট

আলোগুলি সুন্দরীদের বসনাভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত ব্যাটারীর সাহায্যে জ্বলে।

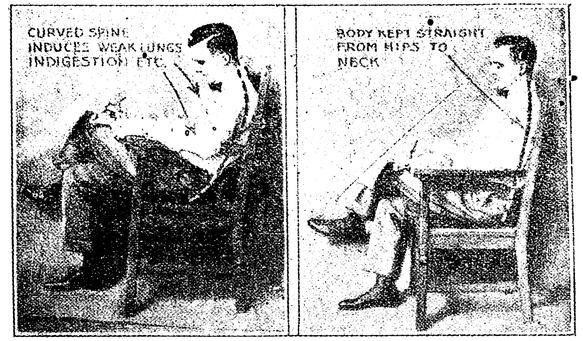

ভুল বসার দোষ

ঠিক বসার নিয়ম
(পাছা থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত সিধে থাকবে)

আভা বিকীর্ণ ক'রে সুন্দরীদের শির-শোভা সমুজ্জ্বল ও কল্পনাভিরাম ক'রে তোলে! মুকুটের এই বৈদ্যুতিক

১০। চেয়ারে বসা।

পশ্চিমের অনুকরণে আমরা আজকাল অনেকেই চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করা অভ্যাস করেছি বটে, কিন্তু চেয়ারে কি ভাবে বসবার নিয়ম তা অনেকেই জানিনি বলে অল্প-বয়সে মেরুদণ্ডের বক্রতা, ফুসফুসের বা শ্বাসযন্ত্রের দোষ, পিঠের শির-

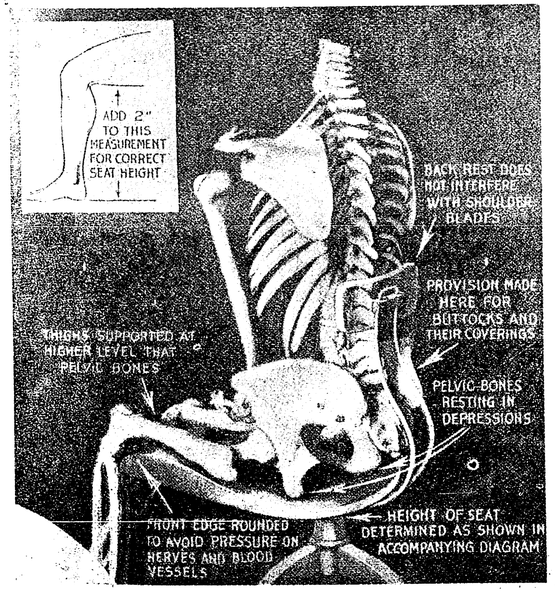

শারীর-বিজ্ঞানানুযায়ীক চেয়ার নির্ম্মাণের আবশ্যকতা



চেয়ারে বসা। (সাম্‌নে ভুল পিছনে ঠিক)



বিজ্ঞানসম্মত চেয়ার

দাঁড়ায় বেদনা, পাছার দুরবস্থা প্রভৃতি রোগে ভুগে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি! চেয়ার টেবিল যে দেশের সৃষ্টি, তাদের মধ্যেও অনেকে চেয়ারে বস্‌বার সঠিক নিয়মটি জানে না। চেয়ারের উপর ধনুকের মতো হ'য়ে বসা একেবারেই উচিত নয়। চেয়ারের ভিতর দিকে সম্পূর্ণ ঠেলে ঢুকে সমস্ত পিঠটি চেয়ারের পৃষ্ঠে ঠেকিয়ে একেবারে সিধে হ'য়ে বসাই হ'চ্ছে চেয়ারে বসার সঠিক রীতি। আজকাল নানা ফ্যাসানের যে সব চেয়ার তৈরী হচ্ছে, সেগুলিতে বেশীক্ষণ বসা উচিত নয়, কারণ শারীর-বিজ্ঞানের মতে সেগুলির গঠন সম্পূর্ণ ভুল। চেয়ার এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে সিধে হ'য়ে বসবার কোও অসুবিধা না হয়।

বেদনার সুর

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

দিগদিগন্তে গুমরি' গুমরি'
বুক ফাটা একি কাঁদন জাগে,
শঙ্কিত প্রাণ উঠিছে শিহরি'
ভয়-বিস্ময়-বেদন-রাগে!

সন্তান-হারা রিক্তা জননী,
রচে নিশিদিন দুখের অবনী;
দীর্ঘনিশাস মর্ম্ম বিদারি'
কত না করুণ মরণ মাগে!

ছিঁড়ি বন্ধন মেঘ-পঞ্জর
রূপ-জ্যোতি একি ভূতল পাশে?
গর্জ্জন-রত সিন্ধুর স্বর
পাতাল ফুঁড়িয়া নিখিলে আসে!

বিদেশে কাঁদিয়া সন্তান সারা,
মাতৃ-পরাণে পশে তার সাড়া;
প্রতি গৃহ-কোণে, অশ্রু-সজল
চোখ দুটি' সদা মানসে ভাসে!

আঘাত-ব্যথায় পাষাণ-হিয়ায়
ফুটিতে পারে না যে সব কথা;—
মূকের রসনা বঞ্চনে হায়
বুকে জাগে শত দহন-ব্যথা!

নিঃস্বের প্রাণ চির-সম্বলে,
মর্ম্ম-নিশাসে, নয়নের জলে,
পূর্ণ করিয়া নিখিল বিশ্ব
যুগে যুগে কে যে ধেয়ান-রতা!

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

অমলা শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পাঁচ ছয় দিন পরে কোন এক অপরাহ্নে বিজয়নাথ তাহার দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া অন্যমনস্ক চিত্তে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের কিয়দংশ তথা হইতে দেখা যাইতেছিল। তথায় নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া কোনও বিষয় লইয়া তুমুল বচসা বাধাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কলহ বা কোলাহলের প্রতি বিজয়নাথের কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যে কয়েক বেদনা এই কয়েক দিন বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া নিরন্তর তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে, তাহারই বিশ্লেষ আঘাতে তাহার সমস্ত চেতনা বিকল হইয়া ছিল। সে অসংলগ্ন ভাবে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাল্যকাল হইতেই সে মাতৃহীন। ভ্রাতা বা ভগ্নী কেহই তাহার ছিল না। বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান হইয়াও সে স্নেহ অপেক্ষা অধিকতর শাসনেরই মধ্যে পালিত হইয়া বড় হইয়াছে। বিষয়-বিজ্ঞ কঠোর পিতার কর্ত্তব্য পরিচালনার অবকাশে মাঝে মাঝে গোবিন্দনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিনোদিনী আসিয়া মরুভূমির মধ্যে বৃষ্টিধারার মত, কিছু দিনের জন্য বিধি-নিয়ন্ত্রিত সংসারের মধ্যে একটা স্নেহ-সরসতার সৃষ্টি করিত; কিন্তু সে নিতান্তই মাঝে মাঝে। কঠিন পর্ব্বত যেমন গিরি-নির্ঝরিণী উচ্ছ্বাসকে একটুও নিরোধ করে না, অবলীলাক্রমে নিজের কঠোরতার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেয়, ঠিক সেইরূপে গোবিন্দনাথ বিনোদিনীর সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা-অভিলাষ কার্য্য-কলাপের নিম্নে শান্ত হইয়া থাকিতেন। সংসারে অমলা প্রবেশ করিবার পর বিজয়নাথের বৈচিত্র্যহীন জীবন কয়েক দিনের জন্য এক নূতন আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এক অচিন্তিত ঘটনার মধ্য দিয়া দীপ্তিটুকু চিরদিনের জন্য অপসৃত হইয়া গেল, রহিল শুধু অনপনেয় দাহ! শীত-

কালের দ্রুত-বিলীয়মান অপরাহ্নের অস্পষ্টতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিজয়নাথের গভীর-বিদ্ধ চিত্ত একটা অপরিমেয় গ্লানি ও ঘৃণায় সমগ্র বিশ্বসংসারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

পদশব্দে বিজয়নাথ ফিরিয়া দেখিল কক্ষে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়াছে। কোন প্রশ্ন না করিয়া সে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"দাদাবাবু, আপনাকে কর্ত্তামশাই ডাকছেন।"

"কেন? কি দরকার?"

ভৃত্য প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

ক্ষণকাল অলস ভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিজয়নাথ বিরক্তি সহকারে শয্যাত্যাগ করিল; তৎপরে নিম্নতলে বৈঠকখানায় গোবিন্দনাথের নিকট উপস্থিত হইল।

গোবিন্দনাথ বৈঠকখানায় একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, বিজয়নাথকে দেখিয়া কহিলেন, "বোস।"

বিজয়নাথ উপবেশন না করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। পঁচিশে মাঘ তোমার বিবাহ দিব।"

বিজয়নাথের উত্ত্যক্ত বিদ্রোহী মন এই প্ররোচনায় একেবারে সংযমহীন হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল কিন্তু কোনও রূপে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, "স্থির করবার আগে একবার আমাকে ডাকালে ভাল হোত।"

"কেন?"

বিজয়নাথ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তা হলে যাদের সঙ্গে কথা স্থির করেছেন, তাদের নিকট অপ্রতিভ হবার কারণ ঘটত না।"

গোবিন্দনাথ ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিলেন;

বিজয়নাথের কথা শুনিয়া আলবোলায় নলটা স্থাপন করিয়া বিজয়নাথের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝলাম না। অপ্রতিভ হবার কারণ কেন ঘটবে?"

বিজয়নাথ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি বিয়ে করব না।"

"কেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "প্রবৃত্তি নেই।"

উত্তর শুনিয়া গোবিন্দনাথ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তুমি যখন এতটা প্রবৃত্তিবাজ হয়ে উঠেছ, তখন কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে জানা দরকার। হরমোহনের মেয়েকে কি তুমি ত্যাগ কর নি?"

বিজয়নাথ কহিল, "সে কথা শেষ হয়ে চুকে গেছে; সে কথা আবার তুলে লাভ কি? সে বিষয়ে ত' আমার সঙ্গে আপনার সব কথা হয়ে গিয়েছে।"

"তবে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি নেই কেন?"

বিজয়নাথ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "ঠিক সেই জন্যেই প্রবৃত্তি নেই। আবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে, বলা যায় না ত দুদিন পরে তাকেও হয়ত আবার ত্যাগ করতে হতে পারে। তার চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল।"

পুত্রের এ কৈফিয়তে গোবিন্দনাথ কিছুমাত্র প্রসন্ন হইলেন না। বিজয়নাথের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তিরস্কার নিহিত ছিল, তাহা তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিল। বিজয়নাথের প্রতি আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলতে চাও যে, এখন থেকে তুমি আমার কোন কথা মেনে চলবে না, নিজে স্বাধীন মতে চলবে?"

বিজয়নাথ কহিল, "না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনে, কিন্তু এটুকু আপনাকে জানাচ্ছি যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ আমি করব না। অতএব অনর্থক আপনি সে বিষয়ে কারো সঙ্গে কথা কয়ে অপদস্থ হবেন না।"

গোবিন্দনাথের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি আমাকে এত দুর্ব্বল মনে কোরো না যে, তুমি আমার একমাত্র ছেলে বলে তোমার সব রকম উপদ্রব আমি সহ্য করে চলব!"

অমলাকে পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে আলোচনার সময়ে গোবিন্দনাথ একবার বিজয়নাথকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অমলাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে তিনি বিজয়নাথকে পরিত্যাগ করিবেন। পুনরায় গোবিন্দনাথকে সেই ইঙ্গিত করিতে দেখিয়া বিজয়নাথের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এরূপ হীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আপনার সম্পত্তির লোভে আমি সব রকম অপমান সহ্য করে চলব, আমাকেও তত দুর্ব্বল মনে করবেন না। আপনার রক্ত আমার শরীরে আছে, আমি আপনার পোষ্যপুত্র নই!"

এত বড় কথার উত্তরে গোবিন্দনাথ কোনও কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

গোবিন্দনাথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "এ বিষয়ে আপনি যা স্থির করবেন, তা আমাকে জানাবেন। যে বিষয়ে আমি আপত্তি জানিয়ে গেলাম তা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আমার আপত্তি হবে না।" বলিয়া বিজয়নাথ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মানুষের আয়ুর শেষ আছে, কিন্তু জ্ঞানের শেষ নাই, সে কথা সেদিন গোবিন্দনাথ কতকটা বুঝিয়াছিলেন।

৪

সময় জিনিসটা এমন যে, তাহার গতিকে আর কিছু না বলিলেও অবাধ বলা নিশ্চয়ই চলে। সুখ দুঃখ, রোগ শোক, হাস্য রোদন, কোন কিছুরই খাতিরে তাহার অন্ধ অবিশ্রাম গতি এক মুহূর্ত্তেরও জন্য সংহত থাকে না। তাই হরমোহনের বেদনাপীড়িত সংসার দুঃখের গুরুভার বহন করিয়াও জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিল। চলার অবশ্য প্রভেদ আছে, কেহ সুখের হাওয়া; গাড়ীতে অবলীলাক্রমে চলিয়াছে, কেহ দুঃখের ভগ্নপদে সকাতরে চলিয়াছে। কিন্তু চলা ভিন্ন কাহারও উপায়ান্তর নাই, চলিতেই হইবে।

শ্বশুর-গৃহ হইতে অমলার বহিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয়ের ক্ষতর উপর কালের প্রলেপ পড়িয়া পড়িয়া ক্রমশঃ তাহা অধিক হইতে অল্প হইয়া আসিয়াছে; দুর্ভাগিনী কন্যার দুরদৃষ্ট লইয়া তাঁহাদের যে মনকষ্ট এখন

তাহার সহিত তাঁহারা অনেকটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের এই স্বামীত্যক্তা কন্যাটিকে তাহার সীমন্তে সিন্দুর এবং হস্তে লৌহবলয় থাকা সত্ত্বেও বিধবারই মত গণনা করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের কন্যাও যাহাতে তাহার যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত কিছু মনে না করে, সে বিষয়েও তাঁহারা মনোযোগী হইতেছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে অমলার চিত্তের গতি তাহার পিতামাতার অনুগামী ত ছিলই না, বরং বিপরীত ছিল। যে দিন বৈবাহিকের সহিত বচসা করিয়া হরমোহন অমলাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন, সেদিন পিতামাতার চাঞ্চল্য দেখিয়া অমলারও মন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেদিন তাহার বালিকা হৃদয়ে সে তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই এখন যাহা সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন তাহার চিত্তে বাসনা-কামনার উন্মাদনা ছিল না, তাই ক্ষতির মাপকাঠিও ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তাহার পর এই তিন বৎসরে ক্রমশঃ তাহার দেহ ও মনে যৌবনের প্রবল প্লাবন যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য উপদ্রব হইতে সে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? পলে পলে ক্রমশঃ যাহা সঞ্চিতই হইয়া উঠিতেছে, অথচ সার্থকতার বিস্তৃত প্রবাহে প্রশান্ত হইয়া বহিয়া যাইবার উপায় নাই, তাহা উদ্দাম না হইয়া আর কি হইবে?

প্রথমে অমলা ব্যাপারটাকে নিতান্ত সামান্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। পিতায় শ্বশুরে বচসা, যাহার কোনপ্রকার গুরুতর কারণ তাহার অজ্ঞাত, কাজেই অল্প দিনে মিটিয়া যাইতে বাধ্য। স্বামীর নিকট সে যে শুধু নিরপরাধা তাহাই নহে; এই অল্পদিনেয় মধ্যেই সে যে স্বামীর হৃদয় অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল সে জ্ঞানও তাহার ছিল। তবে কেন সে স্ত্রীর সহজ এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবে? কেন সে মনে করিবে যে পাপ না করিয়াও আজীবন ধরিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? কিন্তু কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন না আনিয়া যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, তখন শান্ত বালা ব্যস্ত হইয়া বিজয়নাথকে কয়েকখানি পত্র লিখিল। প্রথমে সহজ পত্র, তাহার পর অভিমান, তাহার পর ক্রোধ, সর্ব্বশেষে মিনতি। প্রত্যেক পত্রটি লিখিয়া উত্তরের অপেক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত; মনে মনে বিজয়নাথের পত্রের মর্ম্ম কল্পনা করিত। অকারণ নিষ্ঠুর আচরণের জন্য পত্রমধ্যে কত দুঃখ, কত অনুতাপ প্রকাশ, তাহার পর সেই অসঙ্গত অপরাধ স্খালনের জন্য কি ব্যাকুল ও কাতর ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করা! পত্রের প্রতি অক্ষর যেন দুঃখ ও বেদনার এক একটি পর্দ্দা! নিজের অনুযোগ ও ভর্ৎসনা-তীক্ষ্ণ পত্রের উত্তরে বিজয়নাথের কল্পিত কাতর পত্র পাঠ করিয়া অমলা মনে মনে কুণ্ঠা ও ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পর একদিন বসন্তের কোন এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যায়, যখন প্রকৃতি গন্ধে-বর্ণে, পুষ্পে-গীতে, প্রমত্ত কামিনীর মত লালসা-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মলয় পবন, চন্দ্র কিরণ ও পাপিয়ার তান মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত রসায়ন প্রস্তুত হইয়াছে, ও সেই উগ্র আসব পান করিয়া বিশ্ব বিবশ হইয়া টল্‌মল্ করিতেছে, মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সহসা বিজয়নাথ আসিয়া উপস্থিত হইবে,—ব্যথিত, অনুতপ্ত! চক্ষে আকুল আগ্রহ, বক্ষে ব্যাকুল প্রেম! শান্ত বালা মুদ্রিত কলিকার মত, সঙ্কুচিত শুক্তির ন্যায় আপনাকে আপনার মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া কঠিন হইয়া অবস্থান করিবে,—সংজ্ঞাহীন, শব্দহীন, অসাড়! তাহার পর আবেদন নিবেদন মিনতি বিনতি; তাহার পর সহসা কখন চক্ষের পলকে বাহুতে কণ্ঠে অধরে অধরে, বক্ষে বক্ষে নিবিড় মিলন!

কিন্তু হায়, কোথায় সে অধীর উন্মত্ত মিলন! কোথায় পত্র-পত্রোত্তর! কোথায় বসন্তের মদালস সন্ধ্যা! এ যে নিদাঘের নির্দ্দয় প্রদাহে সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল! এইরূপে দিনে পর দিন অতিবাহিত হইয়া ক্রমশঃ মেঘের মধ্যে বজ্রের মত শান্ত বালার অন্তঃকরণে দুঃখের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল। মনের যখন এইরূপ অধীর বিদ্রোহী অবস্থা তখন সহসা এক দিন অমলার জীবন-পথে প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইল। (ক্রমশঃ)

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-ই, এ-এম-আই-ও-ই

নিম্নে একটি বাড়ীর চিত্র দেওয়া গেল। এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিতে ২ কাঠা ২ ছটাক জমির আবশ্যক। বাড়ীটি দোতালা —নিচে ৪ খানি ঘর ও একটি বারাণ্ডা; ইহা বৈঠকখানা-রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তাছাড়া রান্না ও ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর ও পাইখানা। উপরেও ঐরূপ ৪টা শোবার ঘর। এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিতে মোট খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

খরচের হিসাব

পরিমাণ	বিবরণ	দর	হিসাবে	দাম
২৩২৬	বনিয়াদ খোদাই	৮/	১০০০ ঘন ফিট	১৯/
১৫৯৯	মাটি ভরাট	৮/	,,	১৩/
৫৮১	বনিয়াদের কন্‌ক্রিট	৪৫/	শতকরা	২৬১/
১৫৯৬	বনিয়াদের ও ভিতের গাঁথনি	৫০/	”	৭৯৮/
১৬৮১	নীচের তলায় ইটের গাঁথনি	৫২/	”	৮৭৪/
১৪৯৮	দোতলায় ইটের গাঁথনি	৫৪/	”	৮০৯/
৩৩৫	নীচের তলায় ৫ ইঞ্চি পার্টিসান দেওয়াল	।৶০	বর্গফুট	১২৬/
২৯৬	দোতলায় ৫ ইঞ্চি ঐ	॥০	”	১৪৮/
	কাঠের কাজ			
১০০.৮২	দরজা জানালার চৌকাঠ	৬॥০	ঘনফুট	১২১/
৭০৭ বর্গফুট	১॥০ ইঞ্চি খড়খড়ির পাল্লা	১॥৶০	বর্গফুট	১১৩৯/
৭০৭ বর্গফুট	১॥০ ইঞ্চি কাচের পাল্লা	১।০	”	৮৮৪/
৪৩৮ ”	১॥০ ইঞ্চি প্যানেল পাল্লা	১॥০	”	৬৫৭/
	লোহার কাজ			
১৭·৫৭ হন্দর	লোহার কড়ি	১০/	হন্দর	১৭৫/
১৭·৭৭	” বরগা	১১/	হন্দর	১৯৫/
৯৪৮	নীচ তলার মেজে	২৫/	শতকরা বর্গফুট	২৩৭/
৯৪৮	একতলার ৪· ইঞ্চি টেরেস্ মেজে (এক লেয়ার টালির উপর)	৪৫/	”	৪২৭/
৯৪৮	একতলার ছাদ পলস্তার	৫॥০	”	৫৩/
৯৪৮	ঐ চূণের কাজ	১৸০	”	১৭/
৯৪৮	দোতলার সিলিং কমপ্লিট	।৶০	বর্গফুট	৩৫৫/
১৭২৪	রাণীগঞ্জ টালির কাজ (কাঠের ফ্রেম ও বরগা সমেত)	২৫/	শতকরা বর্গফুট	৪৩২/
১৮৩	১″ ইঞ্চি ড্যাম্প প্রুফ্ অস্তর	২২/	শতকরা বর্গফুট	৪০/
১০১২২	বালির কাজ	৫/	”	৫০৬/
৭৪৯৭	চূণের কাজ	১॥০	”	১১২/
২১৪৬	সিমেণ্ট পলস্তার	১২	”	২৫৭/
২৬২৫	রংএর পোচড়া	১৸০	”	৪৬/
২৫২	সিঁড়ি	২০০/		২০০/
১৫ ফুট	রেলিং	২/	ফুট	৩০/
৫০৮০	দরজা জানালা ও লোহার কাজের রং	৫॥০	শতকরা বর্গফুট	২৭৯/
				৯২১০/

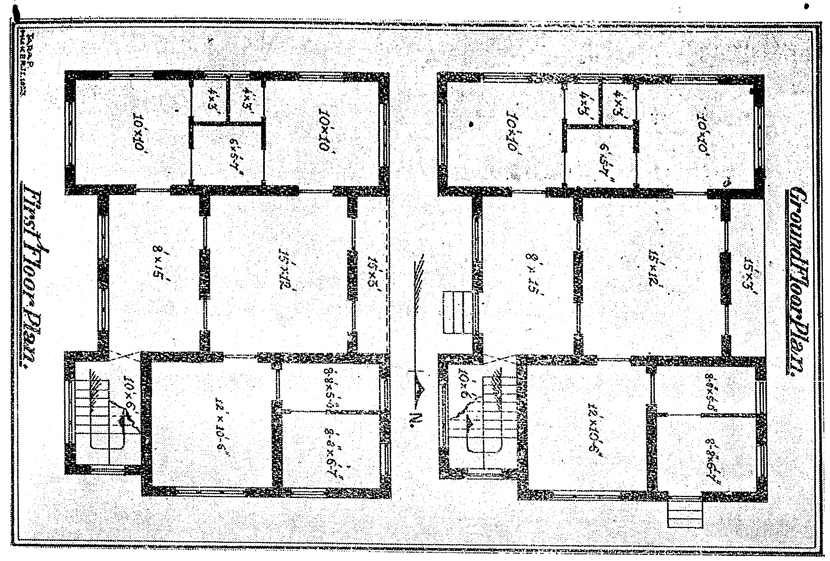

১ নং চিত্র

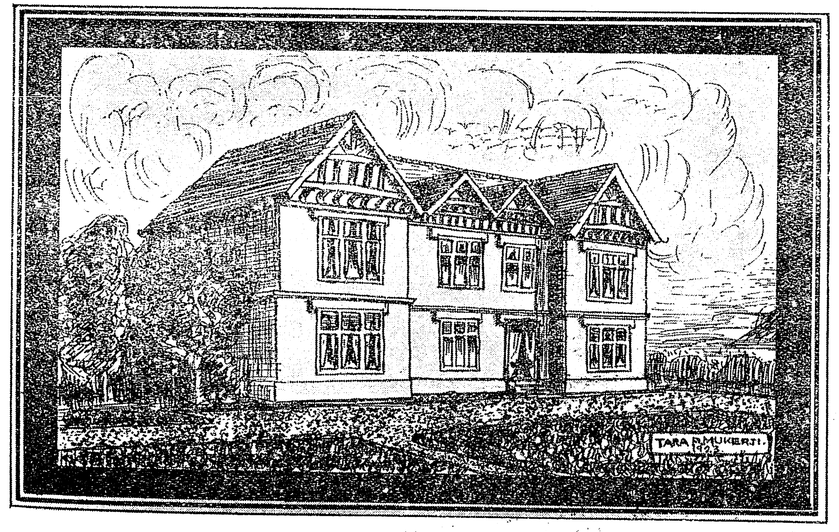

২ নং চিত্র

বনিয়াদের খোয়া উত্তমরূপে পেটাই হইলে পর গাঁথনি আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু গাঁথনি করিবার পূর্ব্বে খোয়ার উপর দিক ঠিক level হওয়া চাই। তার পর গাঁথনি জমির সহিত সমান level হইলে, গাঁথনির পাশের

গর্ত্ত মাটি ভরাট করিয়া দিবে। ঐ মাটি একফুট একফুট করিয়া ভরা উচিত ও মাঝে মাঝে জল দেওয়া দরকার; তাহা হইলে পরে আর মাটি বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রত্যহ গাঁথনি শেষ হইলে রাজমিস্ত্রিরা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে গাঁথনির উপর চূণ সুরকী দিয়া আল করিয়া জল বাধিয়া দিবে। গাঁথনি ৩।৪ দিন এইরূপে ভিজা থাকা দরকার।

জমির উপর হইতে পুনরায় গাঁথনি আরম্ভ করিবে। ও পোতা বা মেজে পর্য্যন্ত হইলে ১ ইঞ্চি মোটা পাথরকুচি ও সিমেণ্ট বালিতে Damp Proof Course দিবে।

৪ ভাগ পাথরকুচি, ২ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেণ্ট মিলাইয়া Damp Proof Course করিতে হয়।

এই Damp Proof Course দেওয়ালের উপর দিবার সময় দরজার জায়গা ফাঁক রাখা উচিত।

গাঁথনির প্রত্যেক ইটটির চারিদিকে মসলা থাকিবে—কোন দিকে যেন ফাঁক না থাকে। এইটি উত্তমরূপে দেখিতে হইবে, কারণ ইহার উপরই গাঁথনির শক্তি নির্ভর করে। গাঁথনির ইট অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা জলে ভেজা চাই ও চূণ সুরকী উত্তমরূপে মিশান দরকার! বেলচাকিতে মিশাইতে পারিলে ভাল হয়।

পোলাও *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই

শ্রীমদদ্বৈত-বংশাবতংস সুকবি বেণোয়ারীলাল দাদা বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে "খিচুড়ী" রাঁধিয়া বঙ্গসাহিত্য-সেবকগণের পাতে পাতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেক দিন ধরিয়া মাল-মস্‌লা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগকে এবার পোলাও খিলাইবার আয়োজন করিয়াছেন। এবার যেমন সময় বদ্‌লাইয়াছে, আহার্য্যের প্রকৃতিও সেইরূপ পৃথক্ হইয়াছে;—এবার আর "রন্ধন" নয়, এবার "পাকান"।

গ্রন্থের নাম হইয়াছে "পোলাও"; তজ্জন্য সর্গগুলির নাম হইয়াছে "হাঁড়ী";—তাহার সংখ্যা একাদশ। "হাঁড়ী" একটু বড় হইলে, তাহার নাম হয় "হাঁড়া"। দুই একটি "হাঁড়ী" হাঁড়ী নয়, "হাঁড়া"। সকলগুলিই গরমাগরম, সবে মাত্র চুলা হইতে নামাইয়া দমে বসান হইয়াছে, মুখ দিয়া এখনও তপ্ত ভাপ উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাই সকলের সান্‌কীতে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। এই পোলাওয়ের বাবুর্চ্চী স্বয়ং গো-স্বামী; 'গাই-বাঁধা' থাকিতেও, ঘৃতের অভাবে দুঃখ করিয়া জানাইয়াছেন;—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, তাতেও সাপের চর্ব্বি!"

সুধু সেটা হইলেও, স্বদেশী হইত; কিন্তু ইহাতে বিলাতী চর্ব্বিরই আতিশয্য;—তাহা অ-বেমালুম ভাবে ইংরাজী অক্ষরের অ-গলিত কাঠিন্যে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। পাঁটি বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা গলাধঃকরণ করা দূরে থাকুক, তাহার অর্দ্ধভোজন-চেষ্টাও অসম্ভব। তাঁহাদের জন্য ইহা "পাকান" হয় নাই;—ইহা কেবল ইঙ্গবঙ্গের জন্যই সময়োপযোগী মাল মস্‌লায় মস্‌গুল। "খিচুড়ী" নিরামিষ বলিয়া, গোস্বামি-তনয় তাহার রন্ধনকার্য্যে অবলীলাক্রমে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। "পোলাও" আসলে সামিষ, কেবল তাঁতিকুল-বৈষ্ণবকুল-রক্ষাপ্রয়াসী ব্যক্তি-বিশেষের খাতিরে নিরামিষ হইয়া থাকে। সামিষ অংশের তুলনায় নিরামিষ অংশটুকু অধিক উপাদেয় হইয়াছে। নমুনা,—

কি না ছিল? সব ছিল। সব গেছে দূরে,—
সত্য ছিল,—শিশির সমান নিরমল,
দয়া ছিল,—[সু] কোমল দ্রাক্ষারসে রসা,
ধর্ম্ম ছিল,—ভূমানন্দ-মুকুট-ভূষিত,
লোক-প্রেম? তাও ছিল,—অতুল ধরায়।

* শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী প্রণীত-মূল্য পাঁচ সিকা।

গেল কেন? সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু সত্যই যে "সব গেছে দূরে"—তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ফল কি হইয়াছে? গোস্বামি-কবি তাহাই বিনাইয়া বিনাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন;—বৈষ্ণব বলিয়া কাটিয়া কুটিয়া জীবহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে না পারিয়া, প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, চামড়া (বিনাইয়া) উঠাইয়া লইয়া, নগ্নরূপ দেখাইতে গিয়া, বহু কৃষ্ণের জীবকে ছট্‌ফটানি সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন!

এরূপ গ্রন্থের যথাযোগ্য সমালোচনা অসম্ভব। ইহাতে যে সকল ব্যক্তিগত, মতগত, এবং বিষয়গত নিন্দা-প্রশংসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তর্কসঙ্কুল; তাহার একমাত্র সুযোগ্য সমালোচক,—মহাকাল। কবি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; কবি-গৃহিণীও আর তরুণী নাই। তথাপি বৈষ্ণব বলিয়া, বুড়া বয়সেও কবির রসভাণ্ড শুষ্ক হয় নাই; গৃহিণীকে লইয়াই তাহার প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভদ্র কন্যার উপর এইরূপ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপে যাহার আরম্ভ, তাহার শেষ কিন্তু বৈষ্ণবোচিত পরকীয়া-প্রীতিতে ডগমগ। বাঙ্গালা আখ্যায়িকা-গ্রন্থের দুইটি নারীচরিত্র কবির বিচারে রমণী-চরিত্রের আদর্শ। বৌদিদি তেমন লেখা-পড়া জানিলে, এবং সকল কথা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে, কবির জন্য পায়েস রাঁধিতে বসিয়া, চিনি ভ্রমে লবণ দিয়া ফেলিতেন! কবি কিন্তু অকপটে অকুণ্ঠিতকণ্ঠে তখনও গাহিতেন:—

শরতের কিরুরাণী রবির বিনোদা
জগতের কাব্যবনে যুগল মন্দার।

প্রথমে মনে হয়,—ইহা ব্যঞ্জনার উদাহরণ; মন্দার কুসুম গন্ধহীন, মন্দার বৃক্ষও কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু তাহা নয়।

উভয়ের তুলি যেন কোন্ মন্ত্রবলে
বিধাতার বর্ণপাত্র করিয়া পরশ
আঁকিয়াছে দুইজনে যুগল রতন।

এখানে 'পরশ' শব্দ 'হরণ' অর্থে বুঝিতে হইবে, নতুবা স্পর্শ মাত্রে তুলিকা বর্ণ-সিক্ত হইতে পারে না। বাঙ্গালার যুব-জনচিত্তমুকুরে এই শ্রেণীর নিদর্শন কেমন প্রতিফলিত হইতেছে জানি না; তবে দাদার মত বুড়াকেও টলাইয়া কবুল করাইয়াছে;—

নবীন নবায়মান
কত্তে যদি চাও প্রাণ,
শরতের সাবিত্রীরে কর বিলোকন;
কোথায় রসের খনি, শচীন্দ্র কমলমণি,
এ যে পোকরাজ আর গলিত কাঞ্চন।

এই সাবিত্রীকে হাতের কাছে পাইলে দাদামহাশয় কি করিতেন, ইচ্ছামাত্র ব্যক্ত করিয়া, তাহার পরিচয় দিয়াছেন;—

ইচ্ছা করে কণ্ঠে তার
দোলাইয়া পুষ্পহার
চেয়ে থাকি ভক্তিভরে সারাটি জীবন।

দাদা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ইহা যে বিশ্ব-শিক্ষকগণেরও সার সিদ্ধান্ত, তাহার প্রমাণ—বিশ্ব-বিদ্যালয়! তাহা এক কবি-রাজকে ডাক্তার বানাইয়াছে, আর একজনের মাথায় জগত্তারিণী-জয়পতাকা বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

প্রভাতকুমার এখন যৌবন সন্ধ্যায় উপনীত; তাঁহার দাগা বুলাইবার দিন অতীত হইয়াছে, তথাপি তিনি দাগা বুলাইতে গিয়া, দাগা পাইয়াছেন। কবি তাঁহার সান্‌কীতে প্রথম হাঁড়ী হইতেই যে অর্দ্ধ-সিদ্ধ উত্তপ্ত সফেণ খাদ্য ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা গিলিতে বা ফেলিয়া দিতে উভয়-সঙ্কট। যথা,—

এখন তিনি রাজার মিতে,—
মত্ত থাকেন কাব্য-চর্চ্চায়, মত্ত থাকেন নৃত্যগীতে,
বিলাতী প্রেম, গোলাপ জলে, যত্ন করি মিশিয়ে,
বঙ্গনারীর কোমল হৃদয় দিচ্ছেন ভায়া বিষিয়ে।
"সিন্দুর কৌটার" যুনানি-প্রেমের মনমাতানি ছন্দে
সুশী ছুঁড়ি তান ধরেছে কতই মহানন্দে।

এ জগতে ডাকাত দিগ্বিজয়ীর সম্মান ভোগ করে, চোর মৌলিক মালিক বলিয়া বাহবা পায়; সুতরাং গাঁটকাটার উপর কঠিন কষাঘাত কপাল-দোষের ঝক্‌মারী। ছোঁড়ারা যাহা চাহিবে, "ছুঁড়ীরা" তাহারই যোগান দিবে; না পারিলে,—সুশীর দলের পোয়াবারো। এই সরল সত্যের আঁচটুকু রচনা-ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায়, গল্পলেখককে এত নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছে। অধিকাংশ গল্প-লেখকই একটা না একটা অজুহাতে, এইরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। সে বিচার সরাসরি, তাহার আপিল নাই। যথা,—

সুরেন ভট্টো লেখেন novel আঙ্ক আস্কের অভাব নাই,
Occult রসের Mysticism উড়িয়ে দিচ্ছে সদাই ছাই।
কল-কৌশল নাইক কোথায়; চিত্রে নাইক দীপ্তি,
ভাষায় ফোটে না ফুল্ল মল্লি, মেটে না কোথাও তৃপ্তি।

বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক এই সান্‌কী-ভোজে বাদ পড়েন নাই। কিন্তু তিনি পাইয়াছেন,—ধৃষ্ট ভৃষ্ট অশিষ্ট পেঁয়াজ! তিনিও এককালে কবির ন্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন; তখন বিদ্যাই ছিল সুন্দর কণ্ঠহার;—সেই বিদ্যা-সুন্দর এখন "বিদ্যা-সুন্দর"-বিরোধী।

ধূর্জ্জটির প্রিয় বঙ্গনায়ক নামটি তাঁহার দীনেশ;—
দীন ছিলেন, ভক্ত বলিয়া হ'য়েছেন আজি ধনেশ।

যে দিন ইনিই রায় গুণাকরে হেসে করিলেন নির্ব্বাসন,
সে দিন হইতে "বিদ্যা সুন্দর" কাট্‌ছে বাজারে বড়ই কম।

তবে উপাধিতে দুইজনে কিঞ্চিৎ সাম্য আছে। তিনি ছিলেন "রায় গুণাকার"; ইনি হন "রায় বাহাদুর"। লেখার জন্যই উভয়ের নামের সঙ্গে লেজুড়-সংযোগ। এক জনের গুণ; আর এক জনের বাহাদুরী।

আমাদের বেণুদাদার অনেক দিনের পাকা হাত,—তাহা আড়-খেম্‌টা বাজাইতে গিয়াও, পরণের বেলায়, সকল তালই সমান বাজাইয়া দিতে পারে। কেবল চৌতাল, সুরফাঁক, আড়াঠেকা, মধ্যমান, ধামার, ঝাঁপতাল নয়; গড়েরহাটী ব্রহ্মতাল, রুদ্রতালও মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মতাল যেমন লম্বা, তাহার নমুনাও সেইরূপ:—

জলজ্যোতি কলাযুতা ও সেমুণী কার,
চ্ছুরিত বিভায় যার বঙ্গ আলোকিত?
বিদ্যাতপে সিদ্ধকাম জ্বলন্ত পাবক,
গরিমার আসনেতে সদা সমাসীন,
তেজবন্ত মহাতপা দুর্ব্বাসা সমান।
* * * *
দোষ যদি থাকে থাক্, দীর্ঘ বিশালতা—
স্ফটিক-নির্ম্মল চিত্ত উদাত্ত চরিত—
গর্ব্বের জিনিস উহা, সাধনার ধন।
তবু যেন মনে হয়, ধীরোদাত্ত বীর
স্বার্থ তার দূরে ফেলে, দূরে ফেলে নিজ
ক্ষুদ্র প্রভুত্বের স্পৃহা, অমিতা বিক্রম,
(তুচ্ছ) করি সুখ্যাতির বীণার ঝঙ্কার,
(ভ্রূভঙ্গে) মল্লার রাগ আলাপন করি,
মাতৃ-পূজকের দলে যোগদান (করি)
ডুবাতেন প্রাণ (যদি) অমিয়-পাথারে,—
এ বঙ্গ,—ভারত অঙ্গে স্যমন্তক সম,—
উঠিত ঝলকি; যত) দর্দ্দূরী-ভক্ষক
পুচ্ছ গুটাইয়া সব ঢুকিত গুহায়।
তাই যদি হত, তবে গৃহী আশুতোষে
"শূলপাণি" রূপে বঙ্গ করিত দর্শন।

রুদ্রতালের নমুনা থাকিয়া থাকিয়াআকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাই আর সকল তাল ডুবাইয়া দিয়া, চিতান চেতাইয়া, অচেতনকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহা যেমন আন্তরিক, সেইরূপ মর্ম্মস্পর্শী। তাহার জন্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে। কবি কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার উপর আস্থা-হীন। তাঁহার ধারণা,—

বাঙ্গালী পাঠক স্রোতে গা ঢালিয়া পারে ভাসিতে,
বিজ্ঞজনের হাসিটি দেখিয়া পারে হাসিতে।
উজাতে চাহে না, উজাতে জানে না,
আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ কেনে না,
যদি কেহ কেনে, পড়ে কদাচন,
চাহে না রুচিরে করিতে মার্জ্জন,—
যদি কেহ পড়ে, বুঝিতে (না পারে)
গ্রন্থকারে গালি পাড়ে।
বোকামী ভূতটা (সকলেরি) ঘাড়ে;
না বুঝেও গালি ঝাড়ে।

ইহাতে পাঠক-সমালোচক তুল্যভাবে আক্রান্ত হইলেও, সাহস করিয়া বলিতে পারি, বড় দিনের মরসুমে কবির এই কাব্য তপ্ত কেকের মত রাতারাতি বিকাইয়া যাইবে,—সকলেই পড়িবে,—কেহ কিনিয়া, কেহ চাহিয়া লইয়া, কেহ বা চুরি করিয়া;—তবে সকলেই যে বুঝিবে, কেহই গালি পাড়িবে না, এমন ভরসা করা যাইতে পারে না। পাট্‌কেল চুঁড়িলে, ইট আসিয়া ঘাড়ে পড়িয়া থাকে;—এ জগতে এক গালে চড় খাইয়া, আর এক গাল পাতিয়া দিবার উপদেশ যিশুখৃষ্টের মন্ত্রশিষ্যেরাও মানিয়া চলিতে পারেন নাই; গান্ধীজির উপদেশেও কেহ পারিবে না। গায়ে

কাদামাটি লাগিবার ভয়ে দাদা জড়সড় হইয়া সরিয়া না দাঁড়াইলে, আমি কিন্তু অম্লানবদনে অভয়দান করিয়া, কোলাকুলি দিতে প্রস্তুত; যদিও আমি সেইদলে,—

ভারতমাটীর কোন্ গহনে সত্য আছে পোতা,
তাই তুল্‌তে সাবল হাতে ঘোরেন (যে সব) হোতা।

জলধর দাদার পনসোপম ভুঁড়ি লক্ষ্য করিয়া, কবি লিখিয়াছেন,—সে কাঁঠাল কাঁঠালই থাকিবে, তাহার বুকে থাকিবে—"ভীম ভুঁতুড়ী।" তাঁহার সম্পাদিত "ভারতবর্ষও" নিস্তার লাভ করে নাই, তাহার সান্‌কীতে পড়িয়াছে—একরাশি তেজপত্র! তবে সম্পাদককে রেহাই দিয়া, কবি, লিখিয়াছেন,—

এই না হ'লে মনের মতন মাসিক ত আর চলে না।

দাদার বা কি দোষ দিব ভাই, দাদা ত আর দেবতা না। মানসীর, বর্ণনায় কবি-কল্পনা তাহাকে নাস্তানাবুদ করিতে ত্রুটি করে নাই। আরম্ভটা এইরূপ;—

রূপনগরের মানসী তার ভাঙ্গা নূপুর দিয়ে পায়,
রাজার কাছে নাকি সুরে তালকাটা গান হেসে গায়।

ভাল হউক, আর মন্দ হউক, সকলেই কিছু না কিছু পাইয়াছেন,—কিছুই পান নাই কেবল "বসুমতী"। কবির দলের দুই চারিজন আসর পোলাও একটু আধটু পাইয়াছেন; আর সকলের সান্‌কীতে বাজে মাল পড়িয়াছে;—কাহারও ভাগ্যে মরিচ, কাহারও বা আদাকুচি, কাহারও কেবল আস্ত পেঁয়াজ। এ দলে ছোট, বড়, জীবিত, সদ্যমৃত, কেহই বাদ পড়েন নাই। দুই একটা নমুনা,—

রমণী কবির বিলাসবতী কবিতামধুর নিচোলে
বাহার দেওয়া জরির ফিতে শুধুই কেবল ঝল্‌মলে।
* * * * * *
ঝরাফুল ওতো মর্ম্মরফুল, রূপ আছে, নাহি প্রাণ,
(তাই) এতই দৃপ্ত, এতই নৃত্য, এতই অভিমান।
* * * * * *
আচ্ছা ধূমো হস্তিকায় বই লিখেছে দেব-কবি,
নিত্য কথার বস্তা বেঁধে, এত কেন গোলযোগ,
রদিমাল টানাই সার, লোকে বল্‌বে কর্ম্মভোগ।

দেশে যেমন নেতার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেইরূপ আড়া-আড়ি ছাড়াছাড়ি তাড়াতাড়িও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই নেতার দল বাদ পড়েন নাই। তাঁহারা কে, এবং কে কেমন,—কবি তাহার পরিচয় দিবার জন্য নেতা কে, আগে তাহার একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা একাংশে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন না করিলে, উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কে কি পাইয়াছেন, দুই একটা নমুনা দেওয়া যাইতেছে:—

বিপিনচন্দ্র

কত লেখা লিখেছিলে, এখনো লিখিছ;
পেঁচোধরা ভ্রূণ যথা আতুর-কুটীরে
জনমিয়া মরে যায় জননীর বুকে,
তোমার logic-সিক্ত হিজিবিজি গাথা
বাহির হইবামাত্র মরণেরে ভজে।

সুরেন্দ্রনাথ

স্নেহে ধন্য আছিলাম সুরেন্দ্র তোমার
সিসিরোর কণ্ঠচোরা বাগ্মীশির-শোভা।
* * * *
কোথা হ'তে এল বল নির্ম্মম অভাব,
তোমার এ নিদারুণ সুবর্ণ-পিপাসা?

স্বরাজ

মাথা লয়ে মাথা খেলা নহেক স্বরাজ;
দম্ভভরে প্রভুত্বের দাবানল জ্বালি,
প্রাণের বৈচিত্র্য হরা নহেক স্বরাজ;
মানুষের অধিকার মানুষকে দিয়া,
ন্যায়ের পবিত্র হর্ষ উপভোগ করি,
যে পুলক পায় নর,—তাহাই স্বরাজ।

ইহা সাংসারিক স্বরাজ। আর একটি স্বরাজ আছে, তাহা সাংসারিক নহে, আধ্যাত্মিক। যথা,—

ক্ষমতার তাজপরা কুক্কুট-হৃদয়
আইনের প্রহরণ করিয়া ধারণ,
দুর্ব্বলেরে নির্য্যাতন-পেষণ-যন্ত্রণা
দিয়ে যারা বড় হয়, তারা বড় নয়,—
তারা বড় নয়,—এই কথা বলিবার
অবাধ শকতি, এই শকতির নাম
নৈসর্গিক, আধ্যাত্মিক, নির্ম্মল স্বরাজ।

এই স্বরাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, কবি ইহার প্রধান পুরোহিতের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

আমার জনমভূমি প্রিয় শান্তিপুর ;
যারে বঙ্গনরনারী মানে তীর্থ বলি,
যেথায় অদ্বৈত, মম উর্দ্ধতন পিতা
জনমিয়া, ভক্তিরসে চিরদিন তরে
দিব্যস্থানে পরিণত গিয়াছেন করি,—
সেই শান্তিপুর মম গৌরবের খনি।
শ্রীঅদ্বৈত-বক্ষভেদি ভক্তি-তরঙ্গিণী
এনেছিল স্বর্ণপদ্ম উজানে বহিয়া,
সেই পদ্ম বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য প্রভু !
যার প্রেমে ভেসেছিল, নহে শুধু সাধু,
অসাধুও সাধু হয়ে অকৈতব সুখ
উপভোগি, বৈকুণ্ঠেতে গিয়াছেন চলি।
কোটি কোটি প্রাণমাঝে অদ্বৈত-প্রভাব
প্রবেশিয়া, [তীব্র] ব্যথা করিয়া সঞ্চিত,
আনিয়াছে অভিশপ্ত ভারত-মাঝারে
শুদ্ধপ্রাণ মহামতি দেবতা গান্ধীরে।

গান্ধীভক্ত আর কোনও বাঙ্গালী এমন করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার নিজের ধন বলিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইহার গৌরবে গুর্জ্জর ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এই চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে কবি যে রচনা-লালিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। কবির এক ভূত-পূর্ব্ব ছাত্র (অধুনা স্বনামখ্যাত স্বরাজ-প্রচারক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ভূমিকা লিখিয়া, ইহারই উল্লেখ করিয়া, শিষ্যোচিত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন।

বৃদ্ধ কবির ভারত-প্রীতি তাঁহার বঙ্গ-প্রীতির বাহ্য-বিকাশ। বঙ্গ-প্রীতির মূলকেন্দ্র—শান্তিপুর। তাহার মধ্যবিন্দু কবির "উর্দ্ধতন পিতা" শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য গোস্বামী। তাঁহার "উর্দ্ধতন পিতা" নরসিংহ নাড়িয়াল আমার "উর্দ্ধতন পিতা" মধু মৈত্রকে কন্যাদান করিয়া যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মৈত্র-বংশের অদ্বৈত-প্রীতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে,—উভয় বংশের আত্মীয়তা এত-কালেও পুরাতন হইয়া পড়ে নাই। কবি যে গৌরবের দাবি করিয়াছেন, আমিও তাহার এক অংশীদার। সুতরাং অদ্বৈত-প্রভাব যে গুর্জ্জর জয় করিয়াছে, এই লোভনীয় কল্পনার সমালোচনা করিয়া রসভঙ্গ করিব না।

শেষ হাঁড়ীটি একা রবীন্দ্রনাথকে নিবেদন করিয়া, কবি কাব্য শেষ করিয়াছেন। ইহা "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। যে দিন কবীন্দ্রের সঙ্গে এই কবির প্রথম পরিচয় সংসাধিত হয়, সে দিনের বর্ণনায় ইহার আরম্ভ। তাহার কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

তিতাল্লিশ বর্ষ আজি কোথা গেছে চলি
চলে গেছে বুকে লয়ে কত মধু মধু।

তখন

উদ্ভিন্ন-যৌবন তুমি পঞ্চমীর শশী
স্নিগ্ধোজ্জ্বল রাঙ্গাশশী আছিলা প্রভায়।

তাহার পর "স্বদেশীর দিনে" কবি কবীন্দ্রের মধ্যে এক নব সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার সাধন করেন।

স্বদেশীর দিনে তোমা কবীন্দ্র-কেশরী
দেখেছিনু যে বিগ্রহে, সে বিগ্রহে আজ
দেখিতেছি মহাপ্রাণ গান্ধীরে আমার।

এখন আর সে বিগ্রহ রবীন্দ্রে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন, কবি তাহার কারণ কল্পনা করিয়াছেন :—

দরিদ্র বাঙ্গালী আজ। তার অনুভূতি
পঙ্গুত্বের জড়িমায় হয়েছে নিশ্চল।
সাড়া তারা দেয় নাই, কলকণ্ঠ, তব
সাহানা গলিত বাক্যে,—তাই অভিমানে
যেথায় অক্ষুণ্ণপ্রাণ করিছে বিরাজ
সেই স্থানে করিতেছ মুরলীবাদন।

অথবা

পশ্চিমের মধুময়ী অপূর্ব্ব মায়ায়
বাঁধিয়াছে তোমা, তাই এ ঘোর দুর্দ্দিনে
বৈরাগ্যের মালা তুমি করিতেছ জপ।

ইহাতে পূর্ব্বরাগাদি বৃন্দাবন-লীলার সকল রসই উথলিয়া উঠিয়াছে। কেবল মানভঞ্জন হয় নাই, কিন্তু মানটুকু অকপট প্রেমের সকপট অভিব্যক্তি :—

সাহিত্যের কারাগারে যৌবনের রবি
আছে বাঁধা ; মধুর নিষ্ঠুর প্রিয়তম,
যাও তুমি ফিরে যাও, চাহি না তোমায়।



পূজা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ভারতবর্ষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বিদ্যুতের বিদ্রূপ

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

ষ্টিমারে ভয়ানক ভীড় হয়েছিল। এত ভীড় হয়েছিল যে, লোক বসা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাক্‌বারও স্থান করে' নিতে পার্‌ছিল না। তবুও তার পর আর ষ্টিমার না থাকায়, সকলেই সেইটাতেই ভীড় বাড়াচ্ছিল। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ ও মেয়েদের বিচিত্র গলার বিচিত্র স্বর-লহরীতে এক অপূর্ব্ব সুরের সৃষ্টি করে' তুলেছে। সে সুরে করুণাই হয়, আনন্দ মোটেই হয় না। সেটা যে ষ্টিমার কোম্পানির অব্যবস্থায় হতভাগ্যদের কাতরানি—আনন্দধ্বনি তো নয়। তারা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তারাই কোম্পানিকে বেশী পয়সা দেয় কি না, তাই সর্ব্বত্রই তাদের প্রতি এই সুব্যবস্থা।

জয়ন্ত ষ্টিমারের রেলিং ধরে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছিল, আর রাগে তা'র পেশীবহুল সবল সুগঠিত দেহ ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল। এই-সমস্ত নিরীহ বেচারীদের উপর অত্যাচার দেখেই তার রাগ হচ্ছিল। রাগ নিজের মধ্যে পোষণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, কাজেই সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল।

ছেলেবেলা হতেই জয়ন্তর স্বভাব একটু ডান্‌পিটে রকমের। গাছে চড়ে' ও সাঁতার কেটেই অধিকাংশ সময় সে কাটিয়ে দিয়ে এসেছে। বেড়াবার সখও তার খুব বেশী। বড়লোকের ছেলে, নিজেই নিজের কর্ত্তা, কাজেই তার ইচ্ছায় বড় একটা বাধা পড়্‌ত না। আজও তাই সে ষ্টিমারে করে' বেড়াতে চলেছে। সঙ্গে কেউ ছিল না। একা বেড়াতেই সে ভালবাস্‌ত, একজন চাকর পর্য্যন্তও সে সঙ্গে নিত না। ষ্টিমারের একটা কেবিনে সে বাসা নিয়েছিল। ষ্টিমারের যাত্রার শেষ সীমানা পর্য্যন্ত সে বেড়াতে যাবে—সে প্রায় চার পাঁচ দিনের পথ।

বর্ষাকাল। পদ্মার ভীষণ তরঙ্গের মাথার উপর দিয়ে ষ্টিমারখানা একটা মোচার খোলার মত হেল্‌তে দুল্‌তে ছুটে চলেছে। তরঙ্গময়ী পদ্মা যতবার তাকে তরঙ্গের আঘাতে সাম্‌নে অগ্রসর হ'তে বাধা দিচ্ছে, ততবারই সে ব্যঙ্গভরে তরঙ্গকে ভঙ্গ করে' ছুটে চলেছে। তবুও পদ্মাকে একটু ভয় করে' তাকে অগ্রসর হ'তে হচ্ছে। কোনও দিকে তীরের চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মেঘ জমে আছে। বৃষ্টিও অল্প অল্প পড়্‌ছে। সারেং অতি সন্তর্পণে ষ্টিমার চালাচ্ছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে বৃষ্টি মাথায় করে' ষ্টিমার এক ঘাটে লাগ্‌ল। ঘাটে কেউ নাম্‌ল না, উঠ্‌ল কেবল বৃদ্ধ ও এক তরুণী। বৃদ্ধ ও তরুণী পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে' পিচ্ছিল পথে নিজেদের বাঁচিয়ে কোনও রকমে ষ্টিমারে এল। তাদের সমস্ত কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে।

জয়ন্তর কেবিনের ঠিক পাশেই মেয়েদের চট-ঘেরা কেবিন। সেটা তখন বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কায় তুলে' দেওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধ একজন খালাসীকে সেটা ফেলে দিতে বল্‌লেন। সে বলে' গেল, সেটা এখন ফেলা হবে না। বৃদ্ধ তরুণীকে ডেকে বল্‌লেন,—'আয় মা, আমরা এইখানে একপাশে বসি।' তার পর পাশের লোকদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লেন,—'আর এঁদের লজ্জা কি,—এঁরা তো আমাদেরই জাত, ভাই-বন্ধু।' বলে' এক পাশে বৃষ্টির ছাট্ বাঁচিয়ে কোন রকমে নিজের স্থান করে' নিয়ে, তরুণীকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে নিলেন। তরুণী একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে বসে আস্তে আস্তে বল্‌লে,—'বাবা, আপনি গা-টা একটু ঢাকা দিয়ে বসুন। একে আপনার শরীর ভাল নয়, তা'তে ঠাণ্ডা লাগ্‌লে আবার অসুখ বেড়ে যাবে।' বলে' সঙ্গের বাক্স খুলে একখানা কম্বল বের করে' বৃদ্ধকে ঢেকে দিয়ে, তাঁর কোলের কাছ ঘেঁসে বস্‌লো।

জয়ন্ত তার কেবিনের বাইরে একখানা চেয়ারের উপর বসে' বসে' এই-সমস্ত দেখ্‌ছিল ও শুন্‌ছিল। তরুণীর সহজ সরল ভঙ্গীতে তার প্রাণের কোন্ এক কোণে একটু

তরঙ্গের সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছিল। তরুণীর লজ্জা ও সঙ্কোচের মধ্যে জড়তার লেশ মাত্র ছিল না। লজ্জা ও নম্রতার মধ্যেও একটা সহজ সরল ভাবের মাধুর্য্য ছিল। জয়ন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে কর্‌ছিল। কিন্তু কোথা থেকে সঙ্কোচের ঢেউ এসে তাকে বাধা দিচ্ছিল।

এমনি সময় বৃদ্ধ তরুণীকে ডেকে বল্‌লেন,—'ইলা মা, সেদিনকার সেই বইটা পড়্‌না, শুনি ততক্ষণ। সময়টাও খানিক কেটে যাবে।'

ইলার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে মনে ভাব্‌লে, বাবা যেন কি! এত লোকের সাম্‌নে নিজের মেয়ের বিদ্যা জাহির কর্‌তে চান। কিন্তু সে ভাব সাম্‌লে নিয়ে বই বের করে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। রবিবাবুর চয়নিকা থেকে সে পড়্‌তে লাগ্‌লো,—

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া!

প্রথমে স্বর নীচু করে' পড়ে' যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু ক্রমশঃ ভাবের উত্তেজনায় স্বর একেবারে উচ্চে উঠ্‌লো, জয়ন্ত শুন্‌তে শুন্‌তে, সঙ্গীত-মুগ্ধ হরিণের মত, কখন্ নিজের অজ্ঞাতসারে একেবারে তাদের কাছে—ইলার পিঠের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

পড়া শেষে ইলা যখন বইটা নামিয়ে লজ্জারুণ মুখ তুলে' একবার চারিধারে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় জয়ন্তর প্রশংসমান চোখের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টির মিলন হ'ল। লজ্জায় ইলার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল। জয়ন্ত নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লে।

জয়ন্ত সঙ্কোচ-কুণ্ঠা-জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধকে বল্‌লে,—'কিছু মনে না করেন তো একটা অনুরোধ করি। আপনারা যদি আমার কেবিনে আসেন, তাহলে বড়ই বাধিত হ'ব। আমি আপনার ছেলের মত, সেই জোরেই অনুরোধ কর্‌তে সাহস কর্‌ছি। আশা করি, এতে অমত কর্‌বেন না!' তার পর ইলার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—'আর এঁর বাইরে থাক্‌তে অসুবিধা হ'বে। আমি একলা, আপনারা সকলে আমার কেবিনে থাক্‌তে পারেন। আমি সারেংএর সঙ্গে ভাব করে' নিয়েছি, সেইখানেই এই কটা দিন বেশ থাক্‌ব।" বলে' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের ও ইলার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ একবার সম্মতির জন্যে ইলার মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু সেখানে মতামতের ভাষা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর মন, জয়ন্তের আত্মীয়ের মত সম্বোধনে, যাওয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। পাছে ইলা অমত করে সেই জন্যে তার দিকে চাইলেন। কিন্তু কোনও উত্তর পেলেন না। কাজেই একটু ইতস্তত করে' নিজেই একটু কিন্তু হ'য়ে উত্তর কর্‌লেন,—'তা বাবা, আমার কোনো আপত্তি নেই,—তবে তোমার কষ্ট হবে, কাজ নেই। আমরা এই-খানেই এই কটা দিন কাটিয়ে দেবো। কেমন ইলা, পার্‌বি না?' বলে' ইলার মুখের দিকে চাইলেন। ইলা কোনো জবাব দিলে না, চুপ করে' বসে' রইল।

শেষকালে উভয় পক্ষের যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল যে, ইলা ও বৃদ্ধ জয়ন্তর কেবিনে গিয়েই থাক্‌বেন, তাঁদের যাত্রা-কালের শেষ দিন পর্য্যন্ত। সেই সঙ্গে জয়ন্তকেও স্বীকার কর্‌তে হ'ল যে, তাকে বৃদ্ধের বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিন থাক্‌তে হ'বে। জয়ন্ত যেখানে বেড়াতে যাচ্ছে, সেইখানেই বৃদ্ধের বাড়ী। কাজেই জয়ন্তও বাধা হ'য়ে এবং কতকটা আনন্দের সঙ্গে রাজী হ'য়ে গেল। তৎক্ষণাৎ জয়ন্ত নিজেই বৃদ্ধের জিনিষপত্র নিজের কেবিনে এনে ফেল্‌লে।

দুই

মানুষ যেখানে যত বেশী নিঃসহায়, সেখানেই সে সামান্য একটু অবলম্বন পেলেই, তাকে প্রাণপণ-বলে জড়িয়ে ধরে। আর মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যে, সে কখনও একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাক্‌তে পারে না। এইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। তার মানে, মানুষ বাড়ীর বাইরে গেলেই, তারে অপরের সঙ্গে পরিচিত হবার স্পৃহা কিছু প্রবল হ'য়ে পড়ে। আর সেই সময়ই দু'জন অপরিচিত চট্ করে' উভয়ের কাছে পরিচিত হ'য়ে সম্বন্ধ এত গাঢ় করে' ফেলে যে, ভেবেই ঠিক করে' উঠা যায় না যে, এটা কেমন করে' হ'লো।

তাই আজ জয়ন্ত ও ইলার দুটি আলাদা জীবন-তন্ত্রীর

তার কথন এক হ'য়ে জড়িয়ে গিয়ে একই সুরে বাজ্‌তে আরম্ভ করেছে। ষ্টিমারের ঘরকন্না বেশ জমে উঠেছে। ইলা তার নিপুণ হাতে খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার তুলে নিয়েছে। খাওয়ার সময় জয়ন্ত ও তার বাবা যোগেশ-বাবুকে যখন সে নিজে পরিবেষণ করে' খাওয়ায় ও নানা অভিযোগ ও অনুযোগ করে' জয়ন্তকে খাওয়ার জন্য জিদ করে, তখন তার ভিতর নারীত্বের গৌরব ফুটে উঠে তাকে বেশ একটা তৃপ্তি ও আনন্দ দেয়।

এক এক দিন জয়ন্ত ইলার রান্নায় সাহায্য কর্‌তে গিয়ে, নিজের অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে, প্রথমে ইলার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ত, ও পরে হাসির বন্যায় নিজের হার স্বীকার করে নিত। ইলা হেসে বল্‌তো,—'যান, আপনার আর রাঁধ্‌তে হ'বে না, খুব হয়েছে। আপনার রাঁধবার বিদ্যে যে কতদূর, তা' জান্‌তে পেরেছি।'

জয়ন্ত হেসে বল্‌ত,—'আচ্ছা, তার পর পরীক্ষা করুন, জানি কি না।' পরীক্ষা দিতে গিয়ে রান্নার এমন সমস্ত উদ্ভট মসলার নাম কর্‌তো যে, ইলা হেসেই লুটোপুটি খেত। জয়ন্ত মুখ গম্ভীর করে' বল্‌ত,—'আর কোনো দিন আপনার সাম্‌নে কোনো কথা বল্‌ব না। সব তাতেই আপনি আমায় ঠাট্টা কর্‌বেন বই তো নয়।' বলে' চুপ করে' গোঁজ হ'য়ে বস্‌ত। ইলা কাতর হ'য়ে ক্ষমা চাইতেই, সে হেসে ফেল্‌ত। সঙ্গে সঙ্গে ইলাও হেসে ফেল্‌ত। এমনি করে'ই তাদের আড়ি ঝগড়ার ভিতর দিয়ে উভয়ের প্রাণের পরিচয় হচ্ছিল।

সেদিন যখন জয়ন্ত ইলার কাছ হ'তে জোর করে' বঁটি কেড়ে নিয়ে নিজের তরকারী কোটার নিপুণতা দেখাতে গিয়ে হাত কেটে ফেল্‌লে, সেদিন ইলা এমন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ল, যেন এটা তার দোষেই হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছিঁড়ে কাটাটা বেঁধে দিলে। জয়ন্ত অনুযোগের স্বরে বল্‌লে,—'হাত কাট্‌লাম আমি নিজের দোষে, আপনি কেন এমন অপ্রস্তুত হ'য়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেল্‌লেন বলুন তো। এ ভারী অন্যায় আপনার।' ইলা কোন কথা না বলে' শুধু জয়ন্তের মুখের দিকে একবার চেয়েই মুখ নীচু কর্‌লে।

সেই দিন হ'তে ইলা জয়ন্তকে রান্নার কাছে আস্‌তে দিত না। জয়ন্ত জোর করে' এলে তাকে ছোট ছেলের মত হুকুম করে' দূরে বসিয়ে রাখ্‌ত। যোগেশ-বাবু মধ্যে মধ্যে তাদের ঝগড়ার বিচারক হতেন। তাঁকে ঘিরে দুই তরুণ হৃদয়ের মিলন-পথ এই জলযাত্রায়, হাল্‌কা জলো হাওয়ার মত হাল্‌কা হয়ে মুক্ত হ'য়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যা বেলা। আকাশে বর্ষারাণী তাঁর মেঘময় বেণী এলিয়ে দিয়েছেন। দু'একটা জলচর ষ্টিমারের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বিচিত্র কলরবে উড়ে বেড়াচ্ছে। ষ্টিমার দোল্ খেতে খেতে জলের সঙ্গে লড়াই করে, ছুটে চলেছে।

জয়ন্ত কেবিনের সাম্‌নে একটা চেয়ারে বসে' আছে। কোলের উপর একখানা বই খোলা পড়ে' আছে। সে আকাশের দিকে চেয়ে বর্ষারাণীর ভীষণ মনোরম মূর্ত্তি দেখ্‌ছিল। ইলা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে, জয়ন্তের চেয়ারের পিছনে আস্তে আস্তে গিয়ে, চেয়ারটার ঠেসান দেবার হাতলের উপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জয়ন্তকে বল্‌লে,—'কি ভাব্‌ছেন অত করে' বলুন তো? আকাশে কোনো পরীর সন্ধান পেলেন না কি, যে, অত করে' তাকিয়ে আছেন?' বলে' ইলা হেসে উঠ্‌ল।

জয়ন্ত চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে ইলার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পার্‌লে না। ইলার পরণে ছিল একখানি ঘন নীলাম্বরী কাপড়। চুলগুলি খোলা—সমস্ত পিঠ একেবারে নিবিড় ভাবে ঢেকে ফেলেছে। এই কালোর খেলার মাঝে সুগৌর মুখখানি, মেঘের কোলে বিদ্যুতের চম্‌কানির মত দীপ্তি পাচ্ছে। কপালের উপর একটি সিঁদুরের টিপ, যেন কোণ-ভাঙা মেঘের ফাঁকে তারা উঁকি মার্‌ছে।

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেসে বল্‌লে,—'আকাশে পরী দেখিনি। এইখানকার পরীরাণীর কথা ভাব্‌ছিলাম। আপনাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। আজ থেকে আপনাকে বর্ষারাণী বলে' ডাক্‌ব।'

ইলা লজ্জারাঙা মুখে সে কথা চাপা দিয়ে হেসে উত্তর কর্‌লে,—'আচ্ছা, আপনি আমাকে আপনি বলে' ডাকেন কেন বলুন তো। এবার থেকে আপনি বলে' ডাক্‌লে উত্তর দেবো না কিন্তু বলে' রাখ্‌ছি।'

জয়ন্ত তুমি বল্‌তে রাজী হ'ল না। তার পর নানা

তর্কের ভিতর দিয়ে ঠিক হল, দু'জনেই দুজনকে তুমি বলে' ডাক্‌বে। এমনি করেই নানা কথার মধ্যে দিয়ে আসর জমে' উঠ্‌ল, জমাট-বাঁধা মেঘের তলে, সেই রকমই জমাট হ'য়ে।

রাত্রিবেলা আকাশের অবস্থা ভীষণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সারেং ভয় পেয়ে ষ্টিমার নোঙ্গর কর্‌লে। চারিধারে অন্ধকার যেন বিরাট্ দৈত্যের মত হাঁ করে' ষ্টিমারখানাকে গিল্‌তে আস্‌ছে। নিশুতি রাতে সকলের ভাবনা-সজাগ ঘুমের ঘোর ভাঙিয়ে প্রবল বেগে ঝড় ও জল আরম্ভ হ'ল। ষ্টিমারখানা বাতাসের ধাক্কা খেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণও কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লে,—না জানি, এই রাত্রের অন্ধকারের ভিতর কি বিপদ্ ঘটে। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। খালাসীরা তাদের অভয় মুখে ভয়ের ছাপ নিয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে। কারণ, তারা যে সামান্য ঝড়-জলে ভয় পায় না। পদ্মা উত্তাল তরঙ্গে আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে—তার রাক্ষসী ক্ষুধা নিয়ে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে গিল্‌তে আস্‌ছে।

জয়ন্ত আর ইলা ষ্টিমারের একধারে রেলিং ধরে' বৃষ্টির মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। জয়ন্ত ইলার দিকে ফিরে বল্‌লে,—'বর্ষারাণী, আমার কিন্তু আজ ভারী আমোদ হচ্ছে। আজ এই বিরাট্ রুদ্রদেবকে সাক্ষী করে' হয় তো আমাদের মিলন হবে, আর সেই মিলন আমাদের শেষ মৃত্যু-মিলন হবে।' বলে' হেসে ইলার মুখের দিকে তাকালে। ইলা একটু ম্লান হাসি হেসে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ ঝড়ের প্রকোপ কিছু প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। ষ্টিমার জলের আছ্‌ড়ানি ও ঝড়ের ধাক্কায় দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টিমার বেশীক্ষণ প্রলয়-দেবের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে পার্‌লে না। নোঙ্গরের বাঁধন থেকে মুক্ত হ'য়ে, পাগলা ঝড়ের সঙ্গে মাতাল হ'য়ে অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটে চল্‌ল।—সকলে হায় হায় করে' উঠ্‌লো। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পরে ষ্টিমার হঠাৎ কিসে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ উঠ্‌লো—ষ্টিমারে জল উঠ্‌ছে, রক্ষা পাওয়া ভার।

সারেংএর আদেশে সবাই জীবন-রক্ষক ভেলা নিয়ে সজ্জিত হ'য়ে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মরণ-জয়ী হবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো। সকলেই জানে যে, ঝড় জলের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেলেও পদ্মার কাছে নিস্তার নেই।

জয়ন্ত ও ইলা হাত ধারাধরি করে' মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের পাশেই যোগেশ-বাবু। ষ্টিমার তখন ডুব্‌তে আরম্ভ করেছে। জল তাদের পায়ের পাতা চুম্বন করে' বরণ করে', বুকের কাছে উঠে' আলিঙ্গন কর্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টিমার একেবারে তলিয়ে যাবার আগেই তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো, পিছনে যোগেশ-বাবু। পরে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

এমনি করে' অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে, জয়ন্ত ও ইলা পরস্পর পরস্পরকে ধরে', মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে কর্‌তে সাঁতার কাট্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ হাত পা সব অবশ শিথিল হ'য়ে এল, ক্রমাগত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে' করে'।

মুখে কারো কথা নেই। অবশ ভাবে কোনও রকমে ভেসে চলেছে, কেবল বাহুর বন্ধনে দুজনে দুজনকে বেঁধে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে দু'জনের অবশ বাহুর বন্ধন ছিন্ন করে' দু'জনকে পৃথক্ করে' দিয়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুক চিরে, তাদের বিদ্রূপ কর্‌বার জন্যেই যেন, বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। দু'জনে দু'জনকে দেখ্‌তে পেলে, দূরে দুটো ঢেউয়ের মাথার উপর শিথিল অবসন্ন দেহে ডুব্‌ছে ভাস্‌ছে। তার পর সব অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। বাতাস সোঁ সোঁ করে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌ল। মেঘ বৃষ্টির অশ্রুধারায় কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের খবর এখন কেবল দিতে পারে রাক্ষসী পদ্মা, আর প্রলয়ের রুদ্র দেবতা।



আলোক ও প্রাণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি

এই জগতে আলোক হইতে যে প্রাণী-জগতের উৎপত্তি তাহা বহুকাল হইতেই সকলে জ্ঞাত আছে। আলোক বিহনে যে প্রাণী-জগৎ লুপ্ত হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয় সূর্য্যকে মানব জাতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। এতাবৎকাল এটা অবশ্য বিশ্বাসের উপরই কেবল নির্ভর করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ইহার বিজ্ঞানসম্মত কোন পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আধুনিক কালে রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইয়াছে, এবং ইহাই দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, জড় জগৎ হইতেই প্রাণীজগতের উৎপত্তি।

ইহা বুঝাইবার প্রারম্ভে আপনাদিগকে আলোক সম্বন্ধে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য বলা আবশ্যক। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে সার্ আইজাক্ নিউটন্ (Sir Isaac Newton) নামে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছিলেন যে, আলোক কেবল সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রেণূকণা মাত্র এবং উহা তাহার উৎপত্তিস্থল হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার গতি তিনি এইরূপ স্থির করেন যে, উহা প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল হিসাবে চলে। ইহাকেই ইংরাজিতে Corpuscular or Emanation Theory of Light বলে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার হিসাবে আলোক কোন পদার্থ বিশেষ এবং ইহার গতিও অনেকটা বায়ুর সঞ্চালন-গতির ন্যায়। এই ধারণার দ্বারা সকল সময়েই কিন্তু আলোকের সকল কার্য্যের সুমীমাংসা হইত না। এই কারণে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে কিছু খট্‌কা উপস্থিত হয়। পরে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক Huyghens সাহেব Newton সাহেবের ঐ কল্পনার বিরুদ্ধে নিজ মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে আলোক-রশ্মি চতুর্দ্দিকে ঢেউএর ন্যায় গতিতে ছড়াইয়া পড়ে,—ঠিক যেরূপ শব্দের ঢেলগুলি হয়; এবং ইহার গতি আদৌ বায়ু-

সঞ্চালন-গতির ন্যায় নহে। অবশ্য পরীক্ষার দ্বারা পরে এই মতই জগতে গ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহাকে ইংরাজিতে Undulation or Wave Theory of Light বলে। তিনি আরও বলেন যে, উহা কোনরূপ পদার্থ-বিশেষ নহে ;—ঐ কম্পনেরই ফলে আলোকের উৎপত্তি হয়। তবে গ্রহ-নক্ষত্রাদি হইতে পৃথিবীতে আলোক আগমনের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাকে শূন্যে ঈথার (Ether) নামক কোনও পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই পদার্থের সঠিক বর্ণনা আজি পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই। অথচ ইহা যে নাই তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, শূন্যে গগন-মার্গে ২৫০ মাইলের ঊর্দ্ধে বায়ুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আলোকের এইরূপ ধারণাই বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগে Maxwell সাহেব হঠাৎ প্রচার করিলেন যে, আলোক কেবল বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তির একটা প্রকাশ মাত্র (Electro-magnetic energy)। এই অনুমান-মূলক পরীক্ষার দ্বারা আশাতীত ফললাভ হইল ; এবং বৈজ্ঞানিকগণের নিকটও এই অনুমান বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইল। অবশ্য Huyghens সাহেবের ঢেউএর কল্পনাটা প্রায় সমগ্রই বাহাল রহিল ; তবে কেবল ঐ ঈথারের কম্পনের মধ্যে যে চক্রাকার ঢেউগুলির কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার স্থলে বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তির কল্পনা বাহাল হইল। কোন স্থির জলাশয়ের মধ্যখানে একটা ঢেলা নিক্ষেপ করিলে তাহার চারিধারে যেরূপ সমকেন্দ্র চক্রাকার কতকগুলি ঢেউএর উত্থান ও পতন হয়, সেইরূপ আলোকদানকারী পদার্থের চারিধারেও ঐরূপ ঢেউএর উত্থান ও পতন হয় ; ইহাই মোটামুটি ভাবে Huyghens সাহেবের কল্পনা। এক্ষণে Maxwell সাহেবের কল্পনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যাহা এতদিন আলোক বলিয়া জানা ছিল, তাহা কেবল উত্তাপের বিকীর্ণতা শক্তি (Radiant energy)। সূর্য্যের আলোকও কেবল তাহার উত্তাপ বিকীর্ণতার তেজ মাত্র।

সম্প্রতি Planck এবং Einstein সাহেবদের আলোক সম্বন্ধে নূতন মন্তব্য প্রকাশিত হওয়াতে Huyghens সাহেবের কল্পনা প্রায় টলটলায়মান হইয়াছে। এই যে নূতন অতি আধুনিক ধারণাটি, ইহার দ্বারা গাছপালার উপর আলোকের ক্রিয়ার অনেকটা সঠিক মীমাংসা হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-শাস্ত্রের (Optics) কতক-কতক বিষয়ের মীমাংসা ভালরূপ হয় না। সেইজন্য এইখানে পুনরায় গলদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, আলোক তাহা হইলে কিরূপ পদার্থ, তাহার আর উত্তর পাওয়া গেল না ;—মোটের উপর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম, আলোক আমাদিগকে আলোকদানে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, এই Planck এবং Einstein সাহেবদের আলোক সম্বন্ধে ধারণাটার বিষয় আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাহি। ইঁহাদের কল্পনাটার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করা বিশেষ কঠিন। তবে মোটামুটি যতদূর সম্ভব, তাহার কথঞ্চিৎ আপনাদিগকে বলিতেছি।

তাঁহাদের মতে আলোক একটা ধমনীয় শক্তি, যাহার প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোনও পরমাণু (atom) ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়ে। অর্থাৎ কি না, ঐ ব্যাপারটা যেন ঐ সকল অণুপরমাণুদের আভ্যন্তরিক কোনও একটা সংঘর্ষণজনিত আকস্মিক দুর্ঘটনা। সূর্য্যের চারিধারে যেরূপ গ্রহেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তড়িতণুগুলি (Electron) পরমাণুর ভিতরকার কোনও এক তড়িতণু কেন্দ্রের চারিধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এগুলি হঠাৎ যখনই পথভ্রষ্ট হইয়া অপর একটির ঘাড়ে যাইয়া পড়ে, তখনই তাহার শক্তি বা তেজ আংশিক ভাবে শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে, এবং ইহাই আলোক রূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে ইংরাজিতে "light quanta" বলে। এই শক্তি যদি অত্যধিক পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা অতি বেগুণে রঙ্গের রশ্মি প্রাপ্ত হই (Ultra-violet light), এমন কি X-Ray আলোক-রশ্মিও প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু এই শক্তি যদি অত্যল্প পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমরা অতি কোমল লাল রঙ্গের রশ্মি প্রাপ্ত হই (Infra-red light)। তাহা হইলে আপনারা দেখিতেছেন যে, ফলে আমরা পুনরায় সেই নিউটন সাহেবেরই Emanation Theoryতে আসিয়া পড়িতেছি। তবে তাহার

সহিত ইহার এইটাই তফাৎ যে, তাঁহার মতে আলোক একরূপ পদার্থ বিশেষ ছিল, আর আধুনিক কল্পনায় উহা বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই হইল আজকালকার Quantum Theory of Light।

উপরিউক্ত আলোক বিষয়ের জ্ঞান কেবল মাত্র পদার্থ-বিজ্ঞান হিসাবে দেখান হইয়াছে। এখন উহাকে রাসায়নিক-বিজ্ঞান হিসাবে দেখা যাউক। আজকাল আলোককে একপ্রকার তেজ বা শক্তিরূপে জ্ঞাত হওয়ার পর হইতে ইহার দ্বারা সম্পন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার কারণগুলি বিবৃত করা অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, ইহার দ্বারা যখনই কোন কার্য্য সমাধা হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, আলোক-শক্তি অপর কোনও রূপ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভে Grotthus নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক এইরূপ নিয়ম দেখান যে, যখনই কোনও পদার্থ হইতে উত্তাপ বহির্গত হইতে না পারিয়া সেই পদার্থেই আবিষ্ট হইয়া যায়, তখনই photo-chemical কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই নিয়ম অদ্যাবধি বাহাল আছে। তবে আলোকের সকলটাই যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ব্যয়িত হইবে, এমন কোন মানে নাই। হয় ত তাহার কতক অংশ উত্তাপে পরিণত হইয়া যাইতে পারে, কতক অংশ বা আলোকই রহিয়া যাইতে পারে ; আর কতকটা বা অপর কোনরূপ শক্তিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক, সূর্য্য-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বায়ু-মণ্ডলে কতরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া আইসে। রাসায়নিক জড় পদার্থ হইতে অজড় পদার্থে আলোক-শক্তির সাহায্যে পৌঁছান যেরূপ ভাবে সংঘটিত হয়, ইহার ক্রিয়াও নিশ্চয়ই তদ্রূপ ভাবে হইয়া থাকে। ইহারই আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহেন আমাদের জীবাণুতাত্ত্বিকগণ (Biologists)। তাঁহারা জড়জগৎ হইতে একেবারে প্রাণীজগতের মধ্যে সোজাসুজি ভাবে চলিয়া আসিতে চাহেন। কিন্তু ইহার জন্য পৃথিবীকে এরূপ ভাবে শীতল হইতে হইবে, যাহাতে করিয়া জড় হইতে প্রাণীজগতের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। কারণ, Jacques Loeb নামক জনৈক আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, যে সকল গরম জলের স্বাভাবিক উৎসের (geysers) উত্তাপ ৫৫৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তদূর্দ্ধ, সেই সকল উৎসে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবাণু বা গাছপালা জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কাজে-কাজেই আমরা ইহা হইতে ধারণা করিতে পারি যে, এ পৃথিবীতে কোনরূপ প্রাণী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে ইহা নিশ্চয়ই ঐ উত্তাপের নিম্নে পৌঁছিয়াছিল। আরও ধারাবাহিক যুক্তির দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, অতি প্রাচীন কালে—কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর জল বায়ু নিশ্চয়ই আধুনিক জল বায়ু হইতে ভিন্ন প্রকারের ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, তখনকার কালে বায়ুতে Carbon dioxide গ্যাস ও জলের পরিমাণ অত্যধিক ছিল, এবং উত্তাপও খুব বেশী ছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, আধুনিক কালের আলোক-রশ্মির অতি-বেগুণে রশ্মি (ultarivolet rays) অপেক্ষা অতি প্রাচীনকালের আলোক-রশ্মিতে ঐ রশ্মি আরও অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কারণ, ইহা পরীক্ষিত জ্ঞান যে, অধিক উত্তাপযুক্ত আলোক-রশ্মিতে অধিক পরিমাণে অতি বেগুণে রশ্মি বর্ত্তমান থাকে।

এক্ষণে আমরা পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র এবং ভূতত্ত্ব-বিদ্যা হইতে কতকটা ধারণা করিতে পারি যে, কিরূপ উপায়ে জড় পদার্থের ক্রমবিকাশে প্রাণী-জগতের সৃষ্টি হইল। আধুনিক রসায়নাগারের সাহায্যে এ বিষয় আমরা কিছু পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। অবশ্য পৃথিবীর প্রারম্ভে আগ্নেয়গিরির ন্যায় যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাদন হইয়াছিল, তাহার দ্বারা সমগ্র আকাশ-মার্গ রাসায়নিক নানাবিধ জড় পদার্থের ধূলিকণায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; সেই নিমিত্ত নানাবিধ প্রাণী-জগতের সৃষ্টিও সম্ভবপর হইয়াছিল। আধুনিক কালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় দেখা যায় যে, নানা প্রকার চুম্বক-শক্তি-সম্পন্ন লৌহ-ধাতব পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইহারা অনেক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনে বিশেষ সাহায্য করে। এইরূপ দ্রব্যাদিকে ইংরাজীতে Catalyst কহে। এই সকল লৌহ পদার্থ অম্লজান বাষ্পকে (Oxygen) শক্তি-সম্পন্ন করে, এবং বাষ্পীয় জলের বিশ্লেষণে তাহা হইতে উদ্‌জান বাষ্প (Hydogen) পৃথক করিয়া দিতে পারে। এ

বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। Dakin, Neuberg, Mc Callum, Fenton প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষার দ্বারা লৌহ পদার্থের ঐরূপ আশ্চর্য্য গুণের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহার সামান্য একটা উদাহরণ আপনাদের নিকট বলিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিশুদ্ধ (Tartaric acid) তেঁতুলাম্লস্ফটিক জলে দ্রবীভূত করিয়া সূর্য্যের কিরণে রাখিয়া দিলে তাহার একটুও পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু উহাতে যৎসামান্য লৌহলবণ (Ferric chloride) মিশ্রিত করিয়া দিলেই উহা অতি সত্বর বিশ্লেষিত হইয়া যায়। অধিকাংশ প্রাণীর শোণিতের মধ্যে লৌহ ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। আমাদের শোণিতের যে লাল রং হইয়াছে, তাহা কেবল একপ্রকার লৌহময় জীবাণুর বর্ণের জন্য। আসল শোণিতের কোনও বর্ণ নাই,—তাহা লালাবৎ একপ্রকার তরল পদার্থ মাত্র। এই জীবাণুগুলির আকৃতি জন্তু হিসাবে কখনও বা চক্রাকার, কখনও বা ডিম্বাকার; এবং সেই আকারেরও তারতম্য আছে। বৃহদাকার জীবের শোণিতের জীবাণুগুলি মনুষ্য-শোণিতের জীবাণুগুলি অপেক্ষা অনেক বড়; যেমন, হস্তীর শোণিতের জীবাণুগুলি মনুষ্য-শোণিতের জীবাণুগুলি অপেক্ষা প্রায় পঞ্চগুণ বৃহত্তর। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার লৌহ ধাতু ঘটিত পদার্থ আছে; তাহাকে ইংরাজিতে hæmoglobin বলে। এই "হেমগ্লোবিন" শরীর মধ্যে অপরিষ্কার রক্তে ঐরূপ ভাবেই থাকে; কিন্তু উহা আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প (oxygen)টিকে আটক করিয়া রাখিয়া নিজে oxy-haemoglobinএ পরিণত হয় এবং আমাদের শোণিতকে সতেজ ও পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই "অক্সি-হেমোগ্লোবিন" পদার্থের মধ্যে প্রায় শতকরা ০·৪ ভাগ লৌহধাতু আছে। অশুদ্ধ রক্ত বর্ণে প্রায় অল্প কালাচে হয় এবং ইহা শিরার ভিতর প্রবাহিত হইতে থাকে। আর বিশুদ্ধ রক্ত বর্ণে উজ্জ্বল লাল হয় এবং ইহা ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। লৌহধাতব পদার্থের দ্বারা কেন যে অম্লজান বাষ্প ধৃত হয় বা সতেজ হয়, তাহার কোন মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই; কিন্তু ইহার এইরূপ শক্তির জন্য প্রকৃতির উপর যে ইহার কিরূপ প্রভাব থাকিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীতে সূর্য্যকিরণ দ্বারা কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাই বিশদ রূপে দেখা যাউক। য়ুরোপের রসায়নবিদ্‌গণ ইহার পরীক্ষার জন্য সুইজারলণ্ড দেশের "আল্পস্" পর্ব্বতের মন্টিরোজা (Monte Rosa) নামক তুঙ্গ শৃঙ্গের উপর একটি রসায়নাগার স্থাপিত করিয়াছেন। এই চূড়ার উচ্চতা প্রায় তিন মাইল হইবে। ইহার শৃঙ্গে উঠিবার সময় সূর্য্যতাপ এত প্রখর বলিয়া অনুভূত হয় যে, গাত্রচর্ম্ম কোন তৈলাক্ত পদার্থের দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া না উঠিলে, চর্ম্মে ফোস্কা উঠিয়া যায়। চক্ষু রঙ্গিন কাচের চশমা দ্বারা আবৃত না করিলে উহা ঝলসিয়া যায়। পর্ব্বতের নিম্নভাগে কিন্তু ঐ একই সূর্য্যকিরণ কত মধুর, কত আরামপ্রদ,—ইহার দ্বারা কত প্রকার ব্যাধির উপশম হয়। কিন্তু যে অংশ হইতে পর্ব্বতটি চির তুষারাবৃত সেই অংশ হইতে উপরিভাগে যত উচ্চে উঠা যায়, সূর্য্যকিরণ মানবের ততই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; কেবল আমরা তখন অধিক পরিমাণে ultraviolet রশ্মির তাড়নায় অস্থির হই। এই রশ্মিই অত্যধিক পরিমাণে উপভোগ করিলে প্রাণী প্রাণহীন হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত পর্ব্বতোপরি আরও এই এক ভয়ের কারণ আছে যে, মানবদেহ অল্পে-অল্পে বিষাক্ত হইয়া যায়; কারণ চিরতুষার-সীমার ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুস্তরের মধ্যে অধিক পরিমাণে nitric oxide, nitrous oxide, ozone, hydrogen peroxide, এবং ammonium nitrate পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা আমাদের রক্তের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া উহাকে বিষময় করিয়া ফেলে। ইহাই পার্ব্বত্য-ব্যারামের (mountain sickness) মূল কারণ। মন্টিরোজার উপত্যকার বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে ঐ সকল পদার্থের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। রসায়নবিদ্‌গণ বলেন যে, ঐ সকল পদার্থ প্রথমত NOH. পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে ইংরাজিতে nitrosyl কহে, এবং ইহা প্রায় Prussic acidএর তুল্য বিষ। বিখ্যাত ইতালীয় রসায়নবিদ্ Angeli সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই nitrosylটা অজড় রসায়ন পদার্থ aldehydeএর সহিত মিলিত হইয়া hydroxamic acidএ পরিণত হয়। আমেরিকা দেশের রসায়নাচার্য্য Oskar Baudischও ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জলযুক্ত বায়ুকে violet এবং ultraviolet রশ্মির উত্তাপে রাখিয়া

দিয়া প্রথমে nitrosyl প্রস্তুত করেন; পরে তাহাতে formaldehyde নামক অজড় রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়াও ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রসায়নবিদ্ E. E. C. Baly সাহেবও ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে তিনি formaldehydeএর পরিবর্ত্তে সোডার জলে carbon dioxide গ্যাস প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাকে ঐরূপ ভাবে রশ্মিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই formaldehydeএর সহিত nitrosyl সংযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহা nitroso-methyl alcohol এ পরিণত হয় $\left(\begin{matrix}H\\H\end{matrix}\!\!>\!C\!<\!\!\begin{matrix}NO\\OH\end{matrix}\right)$। এই দ্রব্যটিই গাছপালা মধ্যে সূর্য্যকিরণ সাহায্যে বায়ু জল ও carbon dioxide হইতে জন্মায় এবং ইহা উৎপন্ন হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষিত হইয়া methyl-alcoholও ammoniaয় পরিণত হয়। এই methyl-alcoholটি গাছপালার বিশেষরূপে প্রাণপোষক; ইহা হইতে গাছপালারা আপন আপন চিনি, মাড় (starch) প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ার করিয়া লয়। Ethyl-alcohol কিন্তু উহাদের পক্ষে বিষ। মানুষের পক্ষে ইহার ঠিক উল্টা। আমরা ethy-lalcohol মদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারি; কিন্তু methyl-alcohol খাইলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। Stoklasa এবং Baly সাহেব উভয়েই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, জলের মধ্যে carbon dioxide গ্যাস উত্তমরূপে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাতে ultra-violet রশ্মির উত্তাপ লাগাইলে, তাহা হইতে formaldehyde প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ জলে অত্যল্প ক্ষার দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলে formose নামক এক প্রকার সুমিষ্ট চিনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে একজন খুব রসিক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার পৃথিবীতে নিশ্চয়ই সরবৎ রূপে সুমিষ্ট বৃষ্টি পতিত হইত। এক্ষণে ইহাতে কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইল যে, প্রকৃতিতে আলোক সাহায্যে কিরূপ ভাবে জড় পদার্থ হইতে অজড় পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে।

আলোকের সাহায্যে যে অনেক প্রকার ব্যারাম আরোগ্য হইতে পারে, ইহা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই মানব জাতির জানা ছিল। কিন্তু তাহা কিরূপে যে সংঘটিত হইত, তাহা জানা ছিল না। অধুনা ইহা বৈজ্ঞানিক মতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ, অস্থিক্ষত (Taberculosis of the bones) এবং ক্ষীণাস্থি রোগ (Rickets বা osteomalacia) কেবলমাত্র আলোক সাহায্যেই আরোগ্য হইতে পারে। Mercury arc ল্যাম্পের নীলাভ আলোকরশ্মির যে ঐরূপ আরোগ্যকারী শক্তি আছে, তাহা গত যুদ্ধে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা প্রথা দৃষ্ট হয় যে, আঁতুড়ে ছেলেদের গাত্রে উত্তমরূপে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য তাহাদিগকে সূর্য্যের আলোকে শোয়াইয়া রাখা হয়। এ প্রথা যে শিশুদিগের অস্থি সবল করিবার পক্ষে কত উপকারী, তাহা বিজ্ঞান আজকাল প্রমাণ করিতেছে। অনেক সৌখিন ললনা হয় ত এ প্রস্তাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই; কারণ তাঁহাদের ধারণা যে, এ প্রথাটা বড়ই অসভ্য, এবং ইহাতে শিশুর গাত্র-চর্ম্ম কাল বর্ণের হইয়া যাইবে। কিন্তু আমেরিকা দেশে বড়-বড় ডাক্তারেরা এ প্রথার সমর্থন করেন, এবং mercury arc ultraviolet রশ্মির সাহায্যে rickets বা osteomalacia ব্যারামও আরোগ্য করিতেছেন। তাঁহারা প্রতি দিন রোগীদিগকে দুই তিন মিনিট কাল ঐ ল্যাম্পের ultraviolet রশ্মির দুই হাত দূরে বসাইয়া রাখেন মাত্র; তাহাতেই তাহাদের ক্ষীণাস্থি রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইয়া যায়। মানবদেহে অনেকগুলি রাসায়নিক ধাতব পদার্থ আছে, যাহার কোন একটির অল্পতায় শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। জীবজন্তু ও মনুষ্যের হাড়গুলি কেবল চুণ ও ফসফরাস্ পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণ মাত্র। এই পদার্থটিকে ইংরাজিতে calcium phosphate কহে; এবং ইহারই অল্পতায় এই ক্ষীণাস্থি রোগের উৎপত্তি হয়। অধুনা ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ ultraviolet রশ্মির সাহায্যে রক্তের মধ্যে ফসফরাস্ পদার্থটির বৃদ্ধি হয় এবং এই কারণে ক্ষীণাস্থি রোগ সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

পৃথিবীতে আলোক হইতেই যে প্রাণের উৎপত্তি, তাহা কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইল। কালে ইহা আরও অধিক পরিমাণে প্রমাণিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার জন্য বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, রসায়নবিদ্ এবং জীবাণুতাত্ত্বিকদিগের পরস্পর সাহায্য অত্যাবশ্যক হইবে। Pasteur সাহেব বলিয়াছিলেন যে, মানবজীবন তখনই অমূল্য, যখনই তাহা সমগ্র মানব জাতির হিতার্থে ব্যবহৃত হয়।

ধ্যান

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল

ধ্যান কি ? ধ্যান বলিলে কি বুঝি ?

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ

সাঙ্খ্য প্রবচন সূত্র। ৬।২৫

অন্তঃকরণে বিষয়ের অভাব, বিষয়ের পরিশূন্যতা, বৃত্তান্তরের পরিশূন্যতার নাম ধ্যান।

অন্তঃকরণে বিষয়ের অভাব বলিলে বিষয়-বৈরাগ্য বুঝায়। বিষয়ের দোষ উপলব্ধি হইলে, অর্থাৎ বিষয় অনিত্য, সুতরাং দুঃখের মূল সুতরাং দোষযুক্ত, এই জ্ঞানের উদয় হইলে বিষয়-বৈরাগ্য উদয় হয়—বিষয়ের প্রতি তখন অনুরাগ তিরোহিত হয়, বিষয়-বাসনা তখন থাকে না। সুতরাং অন্তঃকরণ তখন নির্বিষয়।

ধ্যান করিতে হইলে ধ্যেয় পদার্থের ধারণা আবশ্যক। ধারণা কি ? ধারণা কাহাকে বলে ?

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরামতা ॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি। ১২২

মন যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক যে মনস্থাপন, তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধারণা কহে।

ধারণার জন্য অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যসাধন প্রয়োজন।

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।

পাতঞ্জল দর্শন। সমাধিপাদ। ৩৭

সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য অথবা চিত্তবৃত্তি রসকল বাসনার প্রতি বীতরাগ হইলে চিত্ত স্থির হয়।

অভ্যাস করিতে করিতে, অর্থাৎ কালে, চিত্ত স্থির হইলে একাগ্রতা আসে ;—সেই এক, ধ্যেয় পদার্থ তখন অগ্রে বিদ্যমান থাকেন। চিত্ত তখন অনন্যচিত্ত একমনাঃ, একনিষ্ঠ। একনিষ্ঠ হইলে অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন ঘটে। সেই জ্যোতিঃ দর্শন ঘটিলে, শোক তাপের অতীত হইতে পারা যায়।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।

পাতঞ্জলদর্শন। সমাধিপাদ। ৩৬

নিজের ইচ্ছানুরূপ কোন দিব্য বস্তুর ধ্যান দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে।

যথাভিমত ধ্যানাদ্ বা। ঐ ৩৯

সুতরাং একাগ্রচিত্ত হইতে হইলে, নির্বিষয় হইয়া কোন অপরূপ জ্যোতিঃ, বা কোন দিব্য মূর্ত্তি, বা কোন দিব্য বস্তুর ধ্যান করা প্রয়োজন। অপরূপ জ্যোতিঃ বল, দিব্য মূর্ত্তি বল, দিব্য বস্তু বল,—সমস্তই পৃথক পৃথক শব্দ, পৃথক পৃথক নাম ; বস্তুতঃ একই পদার্থ। সুতরাং সেই একেরই ধারণা চিত্তে অঙ্কিত করিয়া সেই একেরই ধ্যান করা আবশ্যক।

যখন, যেখানে, চিত্ত স্থির হইবে, তখন সেইখানেই ভগবদ্ধ্যানে মনকে নিযুক্ত করিবে।

চিত্ত চঞ্চল। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করা কঠিন। ভগবৎকৃপায় চিত্ত যদি কোন সময়ে স্থির হয়, তবে কাল বা স্থানের অপেক্ষা না করিয়া, তখনই, সেই স্থানেই ভগবদ্ধ্যানে মনকে নিযুক্ত করিবে। কোন ক্ষুদ্র কারণ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহের প্রতি বাধক যেন না হয়। চিত্তকে স্থির করাই মুখ্য উদ্দেশ্য—নিরূপিত কাল বা নিরূপিত স্থান চিত্ত স্থির করিবার সহায় মাত্র। কথিতও আছে—

ন স্থান নিয়মশ্চিত্ত প্রসাদাৎ।

সাঙ্খ্যপ্রবচন সূত্র—৬।৩১

ধ্যানাদির জন্য স্থান নিয়ম নাই। যে স্থলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, সেই স্থলেই ধ্যান করিবে।

আরও—

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

বেদান্তদর্শন। প্রথম পাদ। ৪।১১

যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানই উপাসনার যোগ্য। এ সম্বন্ধে স্থানাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

"ধ্যানাদির জন্য স্থানের নিয়ম নাই"—এ কথার তাৎপর্য্য

কি ? যিনি দেশ-কালময় অথচ দেশকালাতীত ; নামরূপময় অথচ নামরূপাতীত ; সর্ব্বব্যাপী অথচ সর্ব্বাতীত ; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যাঁহার সত্তা ; এমন পদার্থ নাই যাহাতে তাঁহার সত্তা নাই, তাঁহাকে ধ্যান করিবার জন্য কি কোন বিশেষ স্থান বা কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে ?

যস্মিন সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥

মহাভারত।

যাঁহাতে সমস্ত লীন, যাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত, যিনি সমস্ত, সমস্তই যিনি, যিনি সর্ব্বময় নিত্য, সর্ব্বাত্মক—তাঁহাকে ধ্যান করিবার জন্য কি কোন বিশেষ স্থান বা কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে ? ভাবিয়া দেখিলে বিশ্বই যে বিরাট দেবমন্দির, সর্ব্বক্ষণই যে ধ্যানের ক্ষণ।

কথিত আছে গুরু নানকজী একদিন এক দেব-মন্দিরের দিকে পা ছড়াইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, গুরু নানকজীকে বলিলেন—"আপনি জ্ঞানী হইয়া দেবমন্দিরের দিকে পা ছড়াইয়া শুইয়া আছেন ? গুরু নানকজী বলিলেন—"ভাই, যে দিকে দেবমন্দির নাই, আমার পা দু'খানা সেই দিকে টানিয়া রাখিয়া দাও।" এই কথায় ঐ ব্যক্তির জ্ঞানের উদয় হইল—দেবমন্দির নাই, এমন স্থান তাহার চক্ষে পড়িল না।

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে, এই জ্ঞান, এই দর্শন লাভ করিয়াই ত ভক্তসখা অর্জ্জুন ভগবান নারায়ণ হরিকে অধে, ঊর্দ্ধে, সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইয়া ভক্তি-গদগদ চিত্তে বলিয়াছিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

গীতা—১১।৪০

এইরূপ জ্ঞান-উপদেশই ত একদিন দেবাদিদেব মহাদেব রাক্ষসকুলভূষণ শ্রীরাম-ভক্ত বিভীষণকে প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্রজের নিকট পদাহত, মর্ম্মাহত, অপমানিত হইয়া, গৃহ, ধন, জন ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশ্যে বিভীষণ বহির্গত হইয়াছেন। পথে, কুবেরালয়ে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে কি প্রকারে তিনি উপস্থিত হইবেন, লোকে তাঁহাকে কি বলিবে, শ্রীরামচন্দ্রই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন কি না—এই প্রকার কত কথা তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত উদ্বেলিত—করিতেছে। তখন—

তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি।
কহিতে লাগিলা তার অভিপ্রায় জানি ॥
** ** ** **
** ** ** *ঙ
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার ॥
কহিতেছি মোরা যাঁরে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয় ॥
** ** ** ত্ব*
** ** ** **
সত্যসুখ জ্ঞান ধন তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান কহে শ্রুতি যতি ॥
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্য শক্তিধর।
সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা জগত ঈশ্বর ॥
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন ॥
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট ॥
সময় নির্ব্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি হবে ইচ্ছা যবে মনে ॥

রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড।

তাই বলিতেছিলাম, সমস্তই দেবমন্দির। যেখানে বসিয়া তাঁহাকে ভাবিবে, সেই স্থলই তাঁহাকে ধ্যান করিবার স্থল ; যখনই তাঁহার ধ্যান করিবে, সেই কালই তাঁহাকে ধ্যান করিবার কাল।



স্বরলিপি

কথা—শ্রীদিলীপকুমার রায় সুর—গজল হইতে তাল—কাফী

কেন ?

যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও ?
যদি আশা নাহি রবে মিছে বোঝা কেন বওয়াও ?
যদি মেঘ না দেয় বারি কেন আশায় রাখ তারই ?
যখন চাতক তৃষায় পাগল- পারা কৃপার আশায় যারই ?
যদি মেঘের নানা খেলা শুধু মিছে রঙের মেলা,
তবে হৃদয়- তন্ত্রী বাজে কেন সকাল সন্ধ্যে বেলা ?
যদি সৃষ্টি শুধুই মায়া তবে কেন আলো ছায়া,
শত গীতি গন্ধ বর্ণ প্রাণে তোলে দখিন হাওয়া ?
যদি অশ্রু ব্যথার মাঝে মোদের মিছে সৃষ্টি কাজ এ—
তবে বি ফ ল তা র মাঝেও কেন আশার বাঁশী বাজে ?

II {সা ঋা | মা -া -া সা | মা -া গমা গমা | পা দা পা -া | -া -া
য দি দি ন্ - না দে - বে - ত - বে - - -

পা পা | পা দা পদা র্সণা | ধণা -া 'পা দা | পমা পা মগা মা | া া} II
এ ত ব্য - থা - - - কে ন স ও য়া ও - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্রমা | র্জ্ঞরা র্সণা
য দি আ - শা - - - না হি র - বে - - -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
মি ছে বো - ঝা - - - কে ন ব ও য়া ও - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্রমা | র্জ্ঞরা র্সণা
য খন চা - ত - - - ক তৃ ষায় পা - গ - - ল

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
পা রা কৃ - পা - - - র আ শায় যা র ই - - - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্রমা | র্জ্ঞরা র্সণা
ত বে হৃ - দ য় - - - ত ন্ত্রী বা - জে - - -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
কে ন স - কা - - - ল স ন্ধ্যে বে - লা - - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্রর্সা | র্জ্ঞরা র্সণা
শ ত গী - তি - - - - গ ন্ধ ব র্ ণ - - -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
প্রা ণে তো - লে - - - দ খিণ হ ও য়া - - -

ণদা ণা | র্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা | র্সা র্রা ণর্সা র্রমা | র্জ্ঞরা র্সণা
ত বে বি - ফ - - - ল তার মা - ঝে - - -

ধা ণা | ণা -া ধর্সা ণণা | -া পা পা দা | পমা পা মগা মা | া া II II
কে ন আ - শা - - - র বাঁ শি বা - জে - - -

ণদা ণা | র্সা গা গা -া | -া গা গা মা | মা গ মপা মগা | মা া
য দি মে - ঘ - - - না দে য় বা - রি - - -

র্জ্ঞরা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞপা মগা | মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্রা র্সণা সা | া া
কে ন আ - শা - - - য় রা খ তা - রি - - -

ণদা ণা | র্সা গা গা -া | -া গা গা মা | মা গা মপা মগা | মা া
য দি মে - ঘে - - - র না না - খে - লা - - -

র্জ্ঞরা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞপা মগা | মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্রা র্সণা সা | া া
শু ধু মি - ছে - - - র ঙের মে - লা - - -

ণদা ণা | র্সা গা গা -া | -া গা গা মা | মা গা মপা মগা | মা া
য দি সৃ - ষ্টি - - - শু ধু ই মা - য়া - - -

র্জ্ঞরা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞপা মগা | মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্রা র্সণা সা | া া
ত বে কে - ন - - - আ লো ছা - য়া - - -

ণদা ণা | র্সা গা গা -া | -া গা গা মা | মা গা মপা মগা | মা া
য দি অ - শ্রু - - - ব্য থা র মা - ঝে - - -

র্জ্ঞরা র্রা | র্সা র্রা র্জ্ঞপা মগা | মা র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্রা র্সণা সা | া া
মো দের মি - ছে - - - সৃ ষ্টি কা - জে - - -

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী ভারতবর্ষের কোথাও শিক্ষা করা যায় কি? সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে কতকাল লাগে? মাসিক খরচ কত পড়ে?

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রায় চৌধুরী

২। পিপীলিকার উৎপাত

'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসী'তে পিপীলিকা নিবারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে—সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি, এখানকার পিপীলিকার দল কিছুতেই পরাস্ত হইতেছে না। ইহারা আমাদের দেশের সাধারণ ছোট লাল পিঁপড়া, দলবদ্ধ ভাবে আমাদের কামড়াইয়া, বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় ময়লা কাপড় প্রভৃতি ফুটা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া, ষ্টীলট্রাঙ্কের ভিতর ঢুকিয়া গরদের, সিল্কের, ও সাধারণ কাপড় জামা পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে—রাতে হঠাৎ যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখি, চোখের পাতা আক্রমণ করিয়াছে।

মশাল জ্বালিয়া দলে দলে পোড়াইয়া দেখিয়াছি কেরাসিন তৈল, মেথিলেটেড স্পিরিট্, ইউকালিপটাস্ তৈল, কর্পূর ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য ছড়াইয়া দেখিয়াছি—উহারা একেবারে ভ্রূক্ষেপও করে না। আল্‌নার উপরে জামা কাপাড়ে ঢুকিয়া থাকে, ঝাড়িতে ভুলিয়া গিয়া জামা কাপড় পরিলে আর রক্ষা নাই। আমাদের জীবন অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। কোনও সহৃদয় বৈজ্ঞানিক, বাসায়নিক অথবা যে কেহ হউন না কেন, যদি ইহাদের পরাস্ত করিবার একটা উপায় বলিয়া পাঠান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব।

এল, এম ভাদুড়ী

৩। বিষ্ণুশর্ম্মা

হিতোপদেশকার বিষ্ণুশর্ম্মা কোন্ সময়ে কোন্ দেশে ও কোন্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? কোথায় তাঁহার মৃত্যু হয়? আর মৃত্যু সনই বা কত? তাঁহার পিতামাতার নাম কি? অদ্যাপি তাঁহার কোন বংশধর জীবিত আছেন কি না?

৪। পৌরাণিক প্রশ্ন

সূর্য্যবংশীয় বৈবস্বত মনু-পুত্র ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার তিন পুত্রের নাম মাত্র আমাদের গোচর হয়—যথা, জ্যেষ্ঠ সুকর্ণ, ২য় বিকুক্ষি ও ৩য় নেমি। সুধীবৃন্দের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, যদি তাঁহারা ঐ পুত্রত্রয় ছাড়া অন্য পুত্রগুলির নাম জ্ঞাত থাকেন, তবে সম্পাদকীয় বৈঠকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

৫। মেয়েলী সংস্কার

পূর্ব্ববঙ্গে রাত্রিকালে বিশেষ ঝড় উঠিলে মেয়েরা ঝড়ের শান্তির জন্য সুপারি-কাটা কাটারিতে গামোছা জড়াইয়া, যে কোণ হইতে ঝড় উঠিতে থাকে, বাসগৃহের সেই কোণস্থ খুঁটিতে, জড়ান গামোছার অংশ বিশেষ দ্বারা কাটারি কসাইয়া বাঁধিয়া রাখে। এই ব্যাপার পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থলে পরিলক্ষিত হয় কি না? আর ইহার উদ্দেশ্যই বা কি?

৬। শাস্ত্রীয় প্রশ্ন

পিতা বর্ত্তমান থাকাতেও একমাত্র পুত্র, মাতা মরিয়া গেলে, গয়ায় পিণ্ডদানের অধিকারী হইবে কি না?

৭। সংস্কার দ্বন্দ্ব

এক গালে থাপ্পড় মারিলে, অন্য গালে থাপ্পড় মারিতে হয় কেন? শুধু একগালে কাহাকেও থাপ্পড় মারিলে, অমনই লোকে বলিয়া থাকে যে, একগালে থাপ্পড় মারিতে নাই,—মারিলে অবিবাহিত থাকিতে হয়। এ কথার অর্থ কি?

৮। রঘুবংশ

রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় কালে বর্ণিত "প্রাচীন বর্হিঃ" রাজা কে? এবং পূর্ব্বদিকের কোথায়ই বা তাঁহার রাজ্য ছিল? "কপিলা" নদীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত কি? বর্ত্তমানে উহা কোন্ নামে অভিহিত? "মহেন্দ্র" পর্ব্বতের বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থান ও নাম কি? পাণ্ডু দেশ তাম্রপর্ণী নদী, মলয় ও দর্দুর নামক শৈলদ্বয়, মুরলা নদী, ত্রিকূট পর্ব্বত, কম্বোজ দেশ,—ইহাদের বর্ত্তমান নাম ও অবস্থিতি স্থান কোথায়?

শ্রীমোহিনীমোহন বিদ্যার্থী

৯। হাতকাঁপা রোগ

এখন দেখিতে পাই যে অনেক যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় "হাত কাঁপা" রোগে ভুগিতেছে। অর্থাৎ লিখিতে গেলে ভাল লেখা একেবারেই বাহির হয় না, হাত চলে না, তাড়াতাড়ি লিখিতে একেবারেই অক্ষম। ইহার কারণ কি? ইহার কি কোন প্রতিকার আছে?

শ্রীসুবলদাস ধর

১০। ইতুপূজা

শ্রীশ্রী৺মিত্রপূজাকে ইতুপূজা বলে কেন?

১১। জাতি-তত্ত্ব

সুবর্ণ-বণিকের গৃহে পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু

অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই সুবর্ণবণিকের গৃহদেবতাকে সুবর্ণবণিকের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণেরা পূজা করেন না কেন?

শ্রীউমাকান্ত পাল

১২। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

শবদাহ করিলেও তাহার নাভীটি পড়িয়া থাকে কেন? উহার বৈজ্ঞানিক কারণ কেহ বলিলে বাধিত হইব।

শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৩। কৃষি কথা

ভারতবর্ষের কোন স্থানে 'কোকো'র (cocoa) চাষ হয়? ভারতের মৃত্তিকা কোকো চাষের পক্ষে অনুকূল কি না?

১৪। চকোলেটের কারখানা

ভারতবর্ষে দেশীয় মূলধনে পরিচালিত, চকোলেট প্রস্তুতের কোন কারখানা আছে কি না? চকোলেট প্রস্তুতের প্রণালী কি?

১৫। কাঁচকড়া

কাঁচকড়া কোন্ কোন্ বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়? ভারতবর্ষে কাঁচকড়ায় নির্ম্মিত পুতুলের কোন কারখানা আছে কি?

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী

১৬। কাশীতে ভূমিকম্প

কথিত আছে যে কাশীতে ভূমিকম্প হয় না; ইহা কি সত্য? না অমূলক জনরব মাত্র। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি?

শ্রীনিশাকান্ত রায়

১৭। আলুর চাষের ক্ষতি

আমি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গোলআলুর চাষ করিতেছি। মাটি এটেল-প্রধান দোঁয়াস। খোল ও ছাই সার ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু আলু জন্মিতে আরম্ভ হইলে এক প্রকার পোকা ও এক প্রকার লাল পিঁপড়া মাটির নীচে আলু নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না?

শ্রীঅপর্ণাকুমার চৌধুরী

১৮। শিখি মাইতি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ৩ ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে

মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি

শিখি মাইতির আদি-নিবাস কোথায়? শিখি মাইতির কোন জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে কি না? শিখি মাইতির বংশ আছে কি না, মাধবী দেবীর যদি কোন জীবনী প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার ঠিকানা জানিতে চাই।

শ্রীশশিভূষণ মাইতি

১৯। মল্লভূমি ও মল্লরাজ

বর্দ্ধমান-বিভাগের মধ্যে কেবলমাত্র বন-বিষ্ণুপুরের নৃপতিগণই "মল্ল" উপাধিধারী এবং তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিই "মল্লভূমি" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই মল্লভূপতিগণের রাজ্য যে এক সময় মেদিনীপুরের উত্তরাংশেও বিস্তৃত ছিল, তাহা Bankura gazetteer, Oldham's Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District প্রভৃতি পুস্তক পাঠে জানা যায়। কিন্তু তাঁহারা যে কোন্ সূত্র হইতে মল্লভূমির এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু মল্লরাজগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মেদিনীপুরান্তর্গত চেতুয়া-বরদা জয়ের জনশ্রুতি হইতে এই সীমা নির্দ্দেশের কারণ কতখানি অনুমান করা যাইতে পারে। অপর দিকে "ভক্তিরত্নাকরে"র রচনার সময় মেদিনীপুরের উত্তর ভাগের কতখানি যে মল্লভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, ভক্তিরত্নাকরের ১৫শ তরঙ্গের এই পয়ারটী হইতে বুঝা যায়।

"মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নী নামে গ্রাম।
গ্রাম পাশে নদী সুবর্ণরেখা নাম॥"

বর্ত্তমানে এই রয়নী গ্রামখানি নাকি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত; কিন্তু যখন ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি রচিত হয়, তখন উহা মল্লভূমির অন্তর্গত ছিল বলিয়াই বোধ হয় কবি মল্লভূমির মধ্যে রয়নী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন; নচেৎ করিতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ রয়নী গ্রামের অধিপতি ছিলেন—দুই ভ্রাতা—রসিকানন্দ ও মুরারি। ইঁহারা বন-বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-রাজা বীরহাম্বিরের সমসাময়িক। আইনী আক্‌বরী নামক গ্রন্থে না কি উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুপুর-রাজের নিজের ১৫টী এবং তাঁহার অধীনস্থ ১২টী সামন্ত রাজার ১২টী দুর্গ ছিল। সুতরাং সেই সময়ের মল্লভূমির মধ্যে অবস্থিত রয়নী গ্রামের এই রসিকানন্দ ও মুরারি ঐ বীরহাম্বির মহারাজেরই সামন্ত রাজা কি না, তাহা যদি কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রমাণাদিসহ "ভারতবর্ষে" আলোচনা করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়

উত্তর

রাগ ও রাগিণী পরিচয়

দ্বাদশবিধ-তোড়ী—দরবারী, আসাবরী, গুর্জ্জরী, গান্ধারী, বাহাদুরী, নাচারী, লক্ষ্মী, দেশী, খট, মুদ্রা, সুহা, সুঘরাই, ও জৌনপুরী॥

সপ্তসারঙ্গ—বৃন্দাবনী, মধুমাধবী, গৌড়, সামন্ত, বড়হংস, শুদ্ধ, এবং মিঞাকী।

অষ্টাদশ কানেড়া—দরবারী, মুদ্রাকী, কৌশিকী, হোসেনী, সুহা, সুঘরাই, আড়ানা, সাহানা, বাগেশ্রী, গারা, নাগধ্বনি, টঙ্ক, কাফি, কোলাহল, মঙ্গল, শ্যাম, মিঞাকি-জয়জয়ন্তী, ও মিশ্র কানেড়া॥

রাগরাগিণীর বিস্তার করিবার যে নিয়ম বা পদ্ধতি প্রশ্নকর্ত্তা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তবে সাধারণ কয়েকটী নিয়ম আছে, যাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিস্তার করিতে হয়। স্বরগ্রামের এবং আরোহণ অবরোহণের পদ্ধতি বজায় রাখিয়া প্রত্যেক রাগের বাদি, সম্বাদি, অনুবাদী, ও বিবাদী স্বরের প্রতি

বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, সমবায়, সত্বলংঘন, অলঙ্কার, আক্ষিপ্তি, আলপ্তি, প্রস্তার, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়ের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইলে তবে, রাগরাগিনী বিস্তার করা চলে। প্রথমাবস্থায় হয় না এবং আমার মনে হয় চেষ্টা করাও উচিত নয়। রাগের প্রকৃতি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। রাগের প্রকৃতির জ্ঞান মনস্তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান। হৃদয়ের ভাব যেমন কথায় ব্যক্ত করা চলে না, রাগের প্রকৃতিও কথায় প্রকাশ হয় না। উহা সাধনার বিষয়। প্রবাদ আছে—

"রাগী, বাগী, পারখী, নারী ও ন্যাও
ইন্ পাঁচোকা গুরু হৈ, পরন্তু উব্ জে অঙ্গ সভাও"।

যাহা হউক, মোটের উপর উপরোক্ত নিয়মের ত্রুটী থাকিলে রাগিনী অশুদ্ধ হয়। আলাপে যেমন রাগরাগিনী প্রস্ফুটিত ও বিস্তার হয়, গানে ততটা হয় না। ধ্রুপদ অঙ্গের গানে অনেকটা হয়, খেয়াল অঙ্গের গানে তাহা অপেক্ষা কম হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য অঙ্গের গানে দেহটা হয়, প্রাণ দেওয়া চলে না। আমার বোধ হয় উপরিলিখিত পদ্ধতি যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া অন্ততঃ বিলম্বিত লয়ে বিস্তার-পদ্ধতি শিক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রমতে ষড়জের কোন নির্দ্দিষ্ট ওজন ধরা নাই। যার যেমন ইচ্ছা নিজ নিজ কণ্ঠানুযায়ী স্বাভাবিক স্বরকেই ষড়জ করিয়া গাহিতে পারেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক ষড়জ হইতে নীচু কিম্বা উচু ষড়জ স্থির করিলে গায়কের কষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রাম বিষয়ের অনেক কথা আছে। হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রমতে গ্রাম তিন প্রকার। ষড়জ, গান্ধার ও মধ্যম। অন্য কোন স্বরের গ্রামত্ব দেন নাই। গ্রাম বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি করা এত দুরূহ যে, শাস্ত্রকারেরা গান্ধারকে গ্রামত্ব দিয়াও, মর্ত্ত্যলোকে প্রচলিত হওয়া সম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া গান্ধার গ্রামকে দেবলোকে পাঠাইয়াছেন। অধুনা মধ্যম গ্রামেরও প্রচলন দেখিতে বা শুনিতে পাই না, থাকিলেও ষড়জ ভিন্ন অন্য কোন স্বরের গ্রামত্ব বুঝা আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে অতীব কঠিন। আমার বিশ্বাস, অধুনা ষড়জ ভিন্ন অন্য কোন স্বরের গ্রাম নাই, এবং যাবতীয় রাগরাগিনী ষড়জ গ্রামে গীত হইয়া থাকে। প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের "সঙ্গীত-সারে" গ্রাম বিষয়ে কতক জানিতে পারিবেন।

আলাহিয়া জাতীয় রাগিনীর নাম—নট, ছায়ানট, দেওবাট, কেদারনট, নটনারায়ণ, বৃহন্নট, হাম্বিরনট, কল্যাণনট, সামন্তসারঙ্গ, সুরসারঙ্গ, বড়হংস-সারঙ্গ, বৃন্দাবনি-সারঙ্গ, মধুমাতসারঙ্গ, মেঘ, শঙ্করাভরণ, কোকভ, কর্ণাট, বেলাবল, বিভাষ, লুম, দেওগিরি, দেশকার, হেমখেম, প্রদীপকী।

সিন্ধুজাতীয় রাগিনী—মুথারী, সুঘরাই, মধ্যমাদি, বাগেশ্বরী, কাফি, ধনাশ্রী, সৈন্ধবী, ধানী, পটমঞ্জরী, নীলাম্বরী, ভীমপলাশী, বাহার, মেঘমল্লার, মিঞামল্লার, সুরমল্লার, রামদাসী মল্লার, গোড়, সুহা, সাহানা, পিলু।

ভৈরবী জাতীয়—গুর্জ্জরী, গান্ধারী, আশাবরী, খট্।

ইমন্ জাতীয়—কল্যাণী, ভূপালী, হাম্বীর, কেদারা, হিন্দোল, রমণী, শ্যাম, গোড়সারঙ্গ, মালশ্রী, চন্দ্রকান্ত।

ঝিঁঝিট জাতীয়—খাম্বাজ, সুরট, দেশ, কামোদ, তিলকামোদ, গারা, বরাটী, রাগেশ্বরী, নারায়ণী, জয়াবতী, তিলঙ্গিকা, দুর্গা।

কানেড়াজাতীয়—মালকোশা, নায়কী, মুদ্রাকী, হোসেনী, দেশিতোড়ী, জৌনপুরীতোড়ী, আড়ানা, দর্ব্বারি কানেড়া, কৌশিকীকানেড়া॥

তানপুরা মিলন সচরাচর প্রথম তারটী, অর্থাৎ পিতলের সরু তারটী মুদারা গ্রামের পঞ্চমে বাঁধা হয়, মধ্যের পাকা লোহার তার দুইটী ঐ গ্রামের ষড়জে ও চতুর্থ তারটী অর্থাৎ পিতলের কিম্বা রৌপ্যের মোটা তারটী উদারাগ্রামের ষড়জে বাঁধা হয়। যার যেরূপ গলার ওজন সেইরূপ সুরে ষড়জ অর্থাৎ জুড়ির তার দুইটী বাঁধা উচিত। যে, যে, রাগরাগিনীর পঞ্চম বিবাদী সেই সেই রাগরাগিনী গাহিবার সময় পঞ্চমের তারটী মধ্যমে বাঁধিয়া লইতে হয়।

তম্বুরায় সঙ্গীতের সকল প্রয়োজন সাধিত হয়। সুরের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধনার আবশ্যক। সাধকগণ সাধনাবলে তম্বুরায় সকল স্বরের অনুরণাত্মক ধ্বনি আছে বুঝিতে পারেন। উপরিলিখিত নিয়মে ষড়জ ও পঞ্চমে বাঁধা হইলে এমন কি ২২টী শ্রুতি কর্ণগোচর হয়। আমাদের মত লোকেও ৭টী স্বর শুনিতে পাই। বড় বড় বর্ত্তমান ওস্তাদরা ১২টী অর্থাৎ ৭টী শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর সমস্তই শুনিতে পান। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, তম্বুরা গায়কের কত সাহায্য করে। হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধাসুরের যন্ত্রে তম্বুরার কাজ সাধিত হয় না। যেহেতু হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধাসুরের যন্ত্রে অণুরণাত্মক ধ্বনি (harmonies) পাওয়া যায় না। কেবল "C" সুরে গান করিলে পর্দ্দা বা কীএর সাহায্যে গায়কের সামান্যতর সাহায্য হয়। হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা সুরের যন্ত্রগুলি tempered scaleএ বাঁধা। Tempered scaleএর সুরগুলির হিন্দুস্থানী শুদ্ধ scaleএর সুরের সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে গায়কের সাহায্য হয় না। "C" ভিন্ন অন্য কোন scaleএ গান করিলে বা বাজাইলে শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিবেই না। উদাহরণ স্বরূপ "C" Sharp Scaleএ যদি বাজান যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ রেখার ও ধৈবত সুর হারমোনিয়মে পাওয়া যাইনা। "D"Sharpএ বাজাইলে কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার, মধ্যম, কড়ি মধ্যম, কোমল নিষাদ ও শুদ্ধ নিষাদ সুরগুলি পাওয়া যায় না। এইরূপ বাকি সমস্ত Scaleএই কতক কতক সুর পাওয়া যায় না।

উপরন্তু হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে মিড় বা মূর্চ্ছনা বাহির হয় না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বা বাজনা মীড় ও মূর্চ্ছনা পূর্ণ, সুতরাং ঐ সকল বাঁধা যন্ত্র হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপযোগী নয়।

আরও যে সকল রাগরাগিনীর কোমল সুর হারমোনিয়মে পাওয়া

যায় না, হারমোনিয়মে তাহা বাদিত হইলে কিরূপ শুনায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞগণ সেটুকু বেশ বুঝিতে পারেন। মনে করুন কানেড়ার গান্ধার কোমল বা পুরিয়ার রেখার কোমলের সহিত হারমোনিয়মের ঐ সকল সুর বাজান হইলে বেসুরা শুনাইবেই; এবং গায়কের গলা হইতে যখন ঐ সকল স্বর বাহির হইবে, তখন তাহা হারমোনিয়মের স্বরের দিকেই ঝুঁকিবে। তাহা হইলে রাগরাগিনীর বিশেষত্ব নষ্ট ও আসল সঙ্গীতের প্রলাপ হইবে। সঙ্গীত-বিজ্ঞান ও স্বরমিল শাস্ত্র হিসাবে তানপুরা গানের বিশেষ উপযোগী। স্বাধীনভাবে গলার রেওয়াজ করার পক্ষে উপযোগী ও ইহার সহিত অভ্যাস করিলে স্বরের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। গান গাওয়া বা স্বর সাধনা হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা করা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও, কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, যাঁহারা ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা করেন বা গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে গাহিতে প্রায়ই অক্ষম, গাহিলেও কষ্ট বোধ করেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের গলার স্বর যন্ত্রের স্বরকে অনুধাবন করে, যন্ত্র একবার ছাড়িয়া দিলে গলার দোষ বাহির হইয়া পড়ে ও তখন একেবারেই মিষ্টি শুনায় না।

শাস্ত্র মতে তালের সংখ্যা তিনশতেরও অধিক দেখা যায়। প্রচলিত হিন্দুস্থানী মতে সচরাচর যে সকল তাল বাজান হয়, তাহা অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের "সঙ্গীতসার" ও সঙ্গীতাচার্য্য যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গিতচন্দ্রিকা"য় দেখিতে পাইবেন। তন্মধ্যে চৌতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, সুরফাক্তা, তেওরা, রূপক, আড়াচৌতাল, ঢিমাতেতালা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লক্ষ্মীতাল ইত্যাদি পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গে বাদিত হয় এবং কাওয়ালী, মধ্যমান, একতালা, ঠুংরী, কাহারবা, পোস্ত, দাদ্‌রা, যৎ, আড়া, খেমটা, ঢিমাতেতালা ইত্যাদি তবলায় বাদিত হয়।

আমের আচার

কাঁচা আম দিয়া নানারূপ মুখরোচক আচার তৈয়ারী করা যায়। আমগুলির ভিতরে যখন অল্প অল্প আঁটি হয়, সেই আঁটি সমেত সেই আমগুলি চার ফাঁড়া দিয়া কাটিয়া ভিতরের শাঁস ফেলিয়া দিতে হয়। আঁটি ফাঁড়িয়া যে মাত্র চার খণ্ডই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পরে সেগুলিতে লবণ ও ধ'নে কালজিরা প্রভৃতি আধগুঁড়া করিয়া মাখাইতে হইবে। পরে একটা মুখমোটা শিশির ভিতর সেগুলি ভরিয়া, আধশিশি পরিমাণ আমে একশিশি ভাল সরিষার তেল ঢালিয়া দিয়া, শিশির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। এই শিশি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়। মসলা মাখাইয়া তেল দিবার পূর্ব্বেও কাঁচা আম কয়েক দিন রৌদ্রে দিতে হয়, যাহাতে আমের রসটা অনেকটা শুকাইয়া আসে। দুই মাস কি তাহার কিছু কম সময় তেলে ভিজিয়া ঐ আম উৎকৃষ্ট আচারে পরিণত হয়। যদি তেল শুকাইয়া যায়, তবে পুনরায় তেল দিতে হয়। মোট কথা আমগুলি সর্ব্বদা তেলে ডুবিয়া থাকা দরকার। এই আচারকে "আমতেল" বলে। ইহার তেলও খুব মুখরোচক হয়। এই "আমতেল" পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রধান মুখরোচক চাট্‌নি। ইহার আমগুলি যেমন মুখরোচক, তেল ভাতের সহিত মাখিয়া খাইতে ততোধিক সুস্বাদু লাগে। আমগুলিতে মসলা মাখাইবার পূর্ব্বে উপরের ছাল ফেলিয়া দিতে হয়।

(২) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আম কাটিয়া মসলা মাখাইতে হইবে। পরে মাত্র এক দিন কি দুই দিন রৌদ্রে রাখিয়া, যাহাতে আমগুলি বেশ ভিজিয়া যায়, এই পরিমাণে তেল দিয়া, তাহা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে সবটুকু তেল আমের গায়ে শুকাইয়া গেলে খাইতে খুব সুস্বাদু লাগে। ইহাতে আমের উপরের ছাল ফেলিয়া দেওয়ার দরকার করে না। আর আমগুলি কাটিয়া মাত্র দুই খণ্ড করিয়া দিলেই চলে।

(৩) আমগুলির ছাল ছাড়াইয়া খুব কুচিকুচি করিয়া কাটিবে। পরে উহাতে উক্ত প্রকার মসলার সহিত শুকনা মরিচ আধকোটা করিয়া মাখাইবে। কয়েক দিন রৌদ্রে রাখিয়া পরে খানিকটা তেল মাখাইয়া শিশিতে বন্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ তেল আমের সহিত মজিয়া গেলে উৎকৃষ্ট ঝাল আচার তৈয়ারী হইবে। মসলার সহিত একটু পুদিনা পাতা মাখাইয়া দিলে আচারটি বেশ সুগন্ধ হইবে।

(৪) আমগুলির ছাল ছাড়াইয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা কাটিতে পার। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মসলা ও তাহার সহিত পুদিনা পাতা মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। রস শুকাইয়া গেলে, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ গুড় মাখাইয়া পুনরায় রৌদ্রে দিবে। ১০।১২ দিন রৌদ্রে থাকিলে উৎকৃষ্ট "মিষ্টি আচার" তৈয়ারী হইবে।

(৫) আমগুলির ছাল ছাড়াইয়া প্রথমোক্ত প্রকারে কাটিয়া, সামান্য পরিমাণে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিয়া, পরে চিনির রসে পাক করিলে আমের মোরব্বা প্রস্তুত হয়।

টমেটোর আচার—ডাঁসা ডাঁসা টমেটোগুলির স্থানে স্থানে চাকু দিয়া ফাঁড়িয়া মসলা মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। পরে উপযুক্ত পরিমাণ ভিনিগারের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলেই উৎকৃষ্ট টমেটোর আচার প্রস্তুত হইবে।

এই প্রকারের ভিনিগারের মধ্যে ভিজাইয়া, শুধু টমেটো কেন, মরিচ, আদা, এমন কি লাট কুমড়ার পর্য্যন্ত আচার তৈয়ার করা যায়।

সমস্ত আচারই খুব সাবধানে রাখিতে হয়। যে শিশিতে উহা রাখিবে, তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিবে। কখনও আল্‌গা রাখিবে না। আর মাসে অন্ততঃ ৪।৫ দিন শিশি সমেত উহা রৌদ্রে দিবে। বৃষ্টি হইলে তাহার পরদিন অবশ্য অবশ্য রৌদ্রে দিবে। নহিলে আচার নষ্ট হইয়া যাইবে।

শ্রীতারাপদ লাহিড়ী

কৃষ্ণমাতা কালী

কালীবিলাস তন্ত্রে ২১শ পটল হইতে ২৮শ পটল পর্য্যন্ত কৃষ্ণমাতা কালীর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সদাশিবের

ঔরসে গৌরীর রূপান্তর কালীর গর্ভে কৃষ্ণের উৎপত্তি। এই কালীর ধ্যান এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"জটাজূটসমাযুক্তাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
পূর্ণচন্দ্রমুখীং দেবীং ত্রিলোচনসমন্বিতাম্॥
দলিতাঞ্জন সঙ্কাশাং দশবাহুসমন্বিতাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং দিব্যাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং নিত্যাং সুধাপুঞ্জসমন্বিতাম্।
শৃঙ্গাররসসংযুক্তাং সদাশিবোপরিস্থিতাম্॥
দিঙ্‌মণ্ডলোজ্জ্বলকরীং ব্রহ্মাদিপরিপূজিতাম্।
বামে শূলং তথা খড়্গং চক্রং বাণং তথৈব চ॥
শক্তিঞ্চ ধারয়ন্তীং তাং পরমানন্দরূপিনীম্।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি দক্ষহস্তে চ ভূষিতাম্।
উগ্রাং ভয়ানকীং ভীমাং ভেরুণ্ডাং ভীমনাদিনীম্॥
কালিকাং জটিলাঞ্চৈব ভৈরবীং পুত্রবেষ্টিতাম্।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সহিতাং কালিকাং পরাম্॥
সুপ্রসন্নাং মহাদেবীং কৃষ্ণক্রোড়াং পরাৎপরাম্।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েৎ পরমগোপিতাম্।"

দেবীর মস্তকে জটাজূট এবং তাহা অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত, মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত সুন্দর, চক্ষুঃ তিনটি, শরীরের বর্ণ রগড়ানো কজ্জলের মত কাল, দশখানা হাত, দেবী নবযৌবনসম্পন্না, সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা, সুচারুদশনা, অমৃতপুঞ্জে পরিপূর্ণা, শৃঙ্গাররসসংযুক্তা, শবরূপী সদাশিবের উপরি দণ্ডায়মানা, ব্রহ্মাদিদেবগণকর্ত্তৃক পরিপূজিতা। তাঁহার শরীরের আভায় দিঙ্‌মণ্ডল উজ্জ্বলীকৃত। তিনি বামদিকের পাঁচ হস্তে অধোদিক্ হইতে যথাক্রমে শূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি, এবং দক্ষিণ-দিকের পাঁচ হস্তে উর্দ্ধদিক্ হইতে যথাক্রমে খেটক (চর্ম্ম), জ্যাসংযুক্ত ধনুঃ, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা অথবা পরশু ধারণ করিয়াছেন। উগ্রা, ভয়ানকী, ভীমা, ভেরুণ্ডা, ভীমনাদিনী, কালিকা, জটিলা, ভৈরবী, এই আটটি শক্তি দেবীর সহিত অবস্থিত আছেন। এই শক্তিগণের প্রত্যেকের কোলে স্তন্যপানরত শিশুপুত্র অবস্থিত। সুপ্রসন্না মহাদেবীর ক্রোড়েও স্তন্যপানরত শিশু কৃষ্ণ অবস্থিত। চতুর্ব্বর্গপ্রদা দেবীকে এইরূপে চিন্তা করিবে।

কালীবিলাসতন্ত্রে দুর্গাপূজা বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। সেই দুর্গাপূজার প্রসঙ্গেই কৃষ্ণমাতা কালীর কথা উক্ত হইয়াছে। কালী-বিলাসতন্ত্রেও দুর্গার "জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্" এই প্রসিদ্ধ ধ্যানটিই কথিত হইয়াছে। দুর্গা ও কালীর স্থূলরূপে কতক সাদৃশ্য ও কতক বৈসাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য এই—উভয়েই জটাজূটসমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, ত্রিনয়না, দশবাহুসমন্বিতা। আয়ুধ উভয়েরই তুল্য। তবে দুর্গার দক্ষিণ হস্তের আয়ুধগুলি কালীর বামহস্তে এবং বাম হস্তের আয়ুধগুলি কালীর দক্ষিণ হস্তে। দুর্গার পার্শ্বে চণ্ড চণ্ডবতী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, কালীর পার্শ্বে উগ্রা, ভয়ানকী প্রভৃতি অষ্টশক্তি। বৈসাদৃশ্য—দুর্গা গৌরবর্ণা সিংহবাহিনী, কালী কৃষ্ণবর্ণা শববাহনা। দুর্গা শিষ্টের রক্ষার জন্য অসুর বিনাশ করিতেছেন, কালী জগৎপালনকর্ত্তা কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুকে স্তন্যদ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন। উভয় মূর্ত্তিতেই পালনী-শক্তির সমাবেশ। উভয় মূর্ত্তিই অভিন্ন, দুর্গা হইতেই এই কালীর বিকাশ। এই জন্যই দেবী প্রশ্ন করিতেছেন—

"দশভুজময়ীং দুর্গাং দলিতাঞ্জনসন্নিভাম্।
কালিকাং পরমাং দিব্যাং শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়সংস্থিতাম্।
কথয়স্ব দয়ানাথ যোগধ্যানপ্রদ প্রভো!"

[কালীবিলাসতন্ত্র ২১।৩]

কালীবিলাসতন্ত্রে কৃষ্ণমাতা কালীর যে উৎপত্তি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—সৃষ্টিপালনাভিলাষিনী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা কামবীজযুক্তা হইয়া কামবাণে পীড়িতা হয়েন।* কামবাণদিগ্ধ হইয়াই তিনি রূপপরিবর্ত্তনে কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই অবস্থায় সদাশিবসংযোগে কৃষ্ণের জন্ম। পরে স্তন্যদানে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়া পরে রাধার সহিত গোলোকে বিহার করিবার জন্য আদেশ করেন।

পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও শক্তি হইতেই উৎপন্ন এবং শক্তির নিদেশেই তিনি পালনক্রিয়া সম্পাদন করেন, এই ভাব সূচনা করিবার জন্যই কৃষ্ণ মায়ের ক্রোড়ে স্তন্যপান-নিরত। শক্তি ভিন্ন শিব শবতুল্য, শক্তিই শিবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সৃষ্টি স্থিতি পালন করিতেছেন, এই ভাব সূচনা করিবার জন্য শবরূপী সদাশিবের হৃদয়ে মায়ের অবস্থিতি।

কৃষ্ণমাতা কালীর ধ্যান, মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি কালীবিলাসতন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। মুদ্রিত কালীবিলাস তন্ত্র অশুদ্ধি-বহুল এবং কতক অংশ তাহাতে নাই। পূজা-পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে হস্তলিখিত শুদ্ধ পুথির সাহায্য লইতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন অধ্যায়ে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোনও কার্য্য বিশেষের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে, ইহাই গীতার উক্তি। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই মহাবাক্যের উহা অপেক্ষা স্পষ্টতরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে।

জয়দেব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাকেই তিনি ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "অবতার" এই শব্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে লঘু করা হইবে, এই ভয়েই ভক্ত জয়দেব ভগবান্‌কে দশ অবতারের অন্যতম বলেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক এই ভাবেই পরমহংসদেবকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই।

(স্বামি-শিষ্য সংবাদ দ্রষ্টব্য)।

* শিবশক্তির মিথুনীভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি, এবং এই মিথুনীভাবেই কামের বিকাশ, কামসম্বন্ধ ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বসম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুত হইয়া পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন;

সূর্য্যং নত্বা গ্রহপতিং জগদুৎপত্তি-কারণম্।
বক্ষ্যামি বেদ-নয়নং যথা ব্রহ্ম-মুখাচ্ছ্রুতম্॥

মৈত্রেয় উবাচ—

রামকৃষ্ণাদয়ো যে চ হ্যবতারা রমাপতেঃ।
তেঽপি জীবাংশকাঃ প্রোক্তাঃ কিংবা ব্রূহি মুনীশ্বর॥

পরাশর উবাচ—

রামঃকৃষ্ণশ্চ ভো বিপ্র নৃসিংহঃ শূকরস্তথা।
এতে পূর্ণাবতারশ্চ হ্যন্যে জীবাংশকান্বিতাঃ॥

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিলেন, রমাপতি ভগবানের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক অবতার আছে,—তাঁহারা পূর্ণাবতার কিংবা অংশাবতার, ইহা কীর্ত্তন করুন। উত্তরে পরাশর বলিলেন, হে বিপ্র, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও বরাহ, এই চারিটি পূর্ণাবতার, অন্যান্য সকল অংশাবতার।

শ্রীরাধারঞ্জন বসু এম্-এ (বিদ্যাবিনোদ)

"গজভুক্ত কপিত্থ" উত্তরের প্রতিবাদ

উত্তরে যে লেখা হইয়াছে হস্তীর পাকস্থলী হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া কয়েৎবেলের ভিতরকার শাঁস তরল করাইয়া বেলের গাত্রের ছিদ্র দিয়া বহির্গত করাইয়া লয়।

ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ হস্তীকে কয়েৎবেল খাওয়াইয়া পর দিবস বিষ্ঠার সহিত দেখা গিয়াছে যে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হয়। পণ্ডিত শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় কোন নেটিভ ষ্টেটের লাই-ব্রেরীতে হস্তলিখিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত বাক্যটি দেখেন—

"কপিত্থন্তর গত কীট, গজ ইতি অভিধীয়তে"

ইহা পাঠে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, হস্তীভুক্ত কয়েৎবেল খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বাহির হয়। আর গজ নামক একপ্রকার কীট ইহার বোঁটার নিকট ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে এবং সমস্ত শাঁস খাইয়া বাহির হইয়া যায়, ইহাতে খোলার কোন ক্ষতি হয় না। সেই নিমিত্ত বলা উচিত "গজের কয়েৎবেল খাওয়া"; "হাতীর কয়েৎবেল খাওয়া" বলা বা লেখা উচিত নহে।

শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীশ্রীসরস্বতী

"ভারতবর্ষ মাসিক পত্রে" সম্পাদকের বৈঠকে একজন প্রশ্ন করিতেছেন যে, লক্ষ্মী দেবী কি সরস্বতীর খশ্রূঠাকুরাণী? লেখক একটি উদ্ভট-শ্লোকের অর্থ লইয়া এই প্রশ্ন করিবার সুষ্ঠু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উদ্ভট সাগরের শ্লোকগুলি ত রূপক। রূপকের ব্যাখ্যা শাস্ত্রেই আছে। শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতা বাক্যের ঈশ্বরী। এই জন্যই তাঁহার নামান্তর বাগেশ্বরী, বাক্ দেবতা, বাগীশা, বাণী, বিদ্যা, ভারতী ইত্যাদি। অপরতঃ তিনি ব্রহ্মাত্মজা বলিয়াও বিখ্যাতা। গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা বলিয়াই পুরাণে কথিত হয়।

বাক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে লেখা আছে, "ভূমা মহাপুরুষ চিন্তা করিলেন লোকসমুদায়ে আমি লৌক প্রেরণ করিব। অমনই জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন; অমনই ডিম্বের ন্যায় একটি মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে বাক্, বাক হইতে অগ্নি হইল। তার পর নাসাছিদ্র হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।" ব্রহ্মের (ভূমা পুরুষের) মুখ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হওয়ায় বাগীশ্বরী দেবীর নামান্তর ব্রহ্মকন্যা। অপরে বলে তিনি ব্রাহ্মীরূপা গায়ত্রী সাবিত্রী।

"অগ্নি বাক্ রূপে ব্রহ্মের মুখে, বায়ু প্রাণ রূপে নাসায়, আদিত্য দর্শনরূপে চক্ষুতে, দিক্ শ্রবণরূপে কর্ণে, বৃক্ষলতা কেশরূপে ত্বকে, চন্দ্রমা মনরূপে হৃদয়ে, মৃত্যু অপান রূপে নাভিতে, জল বীর্য্যরূপে লিঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সমস্ত আত্মা বা জ্ঞান (ব্রহ্ম) হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।"

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন। ঐ কন্যার অনেক নাম আছে; তন্মধ্যে গায়ত্রী ও সাবিত্রী নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধা। মতান্তরে ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী দেবী কার্য্যান্তরে নিরতা থাকায়, যজ্ঞশীল প্রজাপতির যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না; তখন ব্রহ্মার আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র একটি গোপ কন্যাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিলেন। তাঁহার নামই গায়ত্রী।

সাবিত্রী দেবীই যে গায়ত্রী, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই বলা যায় যে, সাবিত্রীর একটি নাম "গায়ত্রী"। অপরতঃ তিনি বেদ-প্রসবিনী সূর্য্য-মণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবী, এবং ব্রহ্মার পত্নী ব্রাহ্মণী।

ভগবতী সরস্বতী দেবীরও ঐ নাম, ঐ সংজ্ঞা। তিনি ব্রহ্মার কন্যা ও বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা। কিন্তু ব্রহ্মাও যিনি বিষ্ণুও তিনি। "হরতি প্রাণীনাং পাপানি হরিঃ" ও "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" এই অর্থে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুঃ দুইই হয়। "তৎ সৃষ্ট্বা ত দেবানু প্রাবিশৎ" এই শ্রুতি অনুসারে বিষ্ণু শব্দের অর্থও ঐ। বিশ+ণু=যিনি জগতে অণুপ্রবিষ্ট আছেন ইত্যাদি। সাবিত্রী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে—

"সর্ব্বলোক প্রসবণাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্ত দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।
বেদ প্রসবনচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

সাবিত্রী বেদপ্রসবিনী; সরস্বতীও বেদজননী। অতএব উভয় দেবতাই এক; কেবল উপাধি মাত্র বিভিন্ন। সাবিত্রী বেদমন্ত্র। উহা স্বর লয়ে গীত হইত বলিয়া সাবিত্রীর নাম গায়ত্রী। অথবা "গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।" (ব্যাসঃ) অথবা গয়া এব গায়াঃ গায়ান্ (প্রাণান্) ত্রায়তে সা ইতি গায়ত্রী। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিলেন "কে পুনর্গয়াঃ? প্রাণা বাগাদয়ো বৈ গয়াঃ। বাক্যের ঈশ্বরী, প্রাণের ঈশ্বরী, এবং সর্ব্বেশ্বরীই বাগীশ্বরী।

গায়ত্রী শব্দ দ্বারাই সাবিত্রীত্ব সূচিত হয়। গায়ত্রী প্রাণের ঈশ্বরী। যথা শঙ্করভাষ্যে—"স আচার্য্য উপনীয় মানবকং অষ্টবর্ষং যামেবামুং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সবিতৃ দেবতা কা মন্বাহ পচ্ছোঽর্ধর্চশঃ সমস্তাঞ্চ। এষা এব সা সাক্ষাৎ প্রাণো জগত আত্মা মানবকায় সমর্পিত ইহ ইদানীং

ব্যাখ্যাতা নাস্য স আচার্য্যঃ যস্মৈ মানবকায় অথাহ অনুব্যক্তি তস্য মানবকস্য গয়াং প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদি পতনাৎ।" অতএব প্রমাণিত হইল জগৎ প্রসবিনী বলিয়া ব্রহ্মাই সাবিত্রী। আর সাবিত্রীই গায়ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গায়ত্রীকে ব্রহ্মার কন্যা বলার কারণ কি? তাহার উত্তর শ্রীহরিবংশে—"একাকী প্রজাপতি ব্রহ্মা লোকসর্জ্জনার্থ, তপস্যা তেজঃ প্রভাব ও নিয়মদ্বারা আত্মসদৃশী স্বীয় শরীরার্দ্ধ হইতে এক সুন্দরী ভার্য্যা সমুৎপাদন করিলেন। সেই ভার্য্যার স্মরণ করিয়া তাহা হইতে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা ত্রিপদা গায়ত্রী এবং গায়ত্রী-সম্ভব চারি বেদের সৃষ্টি করিলেন।" (যন্নবত্যধিক শততম অধ্যায়)।

সরস্বতী দুইটি নহেন। তিনি এক। তিনিই গায়ত্রীরূপে বেদপ্রসবিনী, সাবিত্রীরূপে জগজ্জননী, তিনিই কমলা, তিনিই ভারতী। ঐশ্বর্য্যধারিণী লক্ষ্মী ও বাগদেবী সরস্বতী ভগবান বিষ্ণুর (সত্ত্বগুণধারক স্বপ্রকাশ স্বরূপ বিভুর) অঙ্কলক্ষ্মী অর্থাৎ আশ্রিতা।

"উদ্ভট সাগরের" মনোরম শ্লোকটির অর্থ এই ঃ—

"নাথে কৃতপদাঘাত শ্চলুকিত তাতঃ সপত্নিকা সেবী।
ইতি দোষাদিব রোষাদ্ সাধব যোষা দ্বিজং ত্যজতি॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ভৃগু) বিষ্ণু বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন, (লক্ষ্মীর পিতা সমুদ্র) সমুদ্রকে (অগস্ত্য) গণ্ডুষ দ্বারা পান করিয়াছেন, আর সপত্নী সরস্বতীর অর্চ্চনা করেন (বেদ পাঠ করেন) বলিয়া লক্ষ্মীদেবী দ্বিজগণকে ত্যাগ করিয়াছেন। (বিদ্যারত কবি কোবিদগণ প্রায়ই দরিদ্র হন)।

লক্ষ্মীর সপত্নী সরস্বতী ইহাও রূপক। লক্ষ্মীর পিতা ভৃগু; ভৃগুর পিতা ব্রহ্মা; সুতরাং বিষ্ণুর শ্বশুর ভৃগু। আর ব্রহ্মা শ্বশুরের পিতা (পিতামহ)। ক্ষীরোদ-সমুদ্র মথনে লক্ষ্মীর উৎপত্তি বলিয়া ক্ষীরাব্ধিও লক্ষ্মীর পিতা। বরুণ সূর্য্যের ও ব্রহ্মার একটি নাম। সুতরাং লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই ব্রহ্মার কন্যাস্থানীয়া।

শ্রী শব্দের অর্থ কমলা ও সরস্বতী। ক—ব্রহ্মত্ব স—শিবত্ব লা—দান করেন; যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন তিনিই কমলা। জগজ্জননী প্রকৃতি দেবী ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির সৃজন-কর্ত্রী বলিয়া খ্যাতা। সেইজন্যই লক্ষ্মীদেবীর পুত্রবধূ সরস্বতী।

"উদ্ভট সাগরের" দ্বিতীয় শ্লোকটি এই ঃ—

"শ্বশ্রূং বিনা বৃত্তিরিহ স্বতন্ত্রা প্রায়ঃ সুধানামপবাদ হেতুঃ।
যদ্বাণি লোকে রময়া বিহীনা সতীমপী ত্বামসতীং বদন্তি।"

ব্রহ্মা কোনও সময়ে স্বীয় কন্যায় সঙ্গত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডের একটি খসিয়া পড়ে। (মৎস্যপুরাণ দ্রষ্টব্য) এইজন্যই পুত্রবধূর ঐ অপবাদ! বলা বাহুল্য, এতৎ সমুদায়ই রূপক। আমার রূপক ও উপমা" প্রবন্ধে এ সকল কথা "এডুকেশন গেজেটে" আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয় তখন আহার করিলে অতি সহজে পরিপাক হয়। প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে কখনও অজীর্ণ পীড়া হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য এবং ইহা পরীক্ষিত। ইহার তত্ত্ব স্বরোদয় শাস্ত্রে লিখিত আছে। শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রের কলঙ্ক

আমি বঙ্গের সুধী সমাজে নিম্নলিখিত বিষয়টীর সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আশা করি আপনারা আমার প্রশ্নের যথাযথ প্রমাণ সহ উত্তর দানে বাধিত করিবেন। এ বিষয়ে আমিও যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে দিলাম।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে (ইহা মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণের অন্তর্গত) মনু, বৃহস্পতিকে বলিতেছেন,—"দর্পণ তুল্য চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত জগৎকে কলঙ্ক রূপে অবলোকন করত মনুষ্য যেমন এই জগৎই চন্দ্রমণ্ডলে, বিলোকিত হইতেছে, ইহা অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ.....ইত্যাদি—"।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে চন্দ্রের উপরে যে কাল দাগ দেখা যায় তাহা এই পৃথিবীরই প্রতিবিম্ব; ইহাই পৌরাণিক মত। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন "উহা অর্থাৎ ঐ কাল দাগ চন্দ্রমণ্ডলের পাহাড় প্রভৃতির দৃশ্য, অথবা তাহাদেরই শৃঙ্গের, মাল-ভূমিস্থ ছায়ার প্রতিবিম্ব।" ইহার মধ্যে কোনটা সত্য?

আমার সমস্যা

চন্দ্রকে যদি দর্পণ বলিয়াই ধরা হয়, (চন্দ্র যে "দর্পণের মত একটী গ্রহ, বা নিজেই ইহা একটী দর্পণ, এবং উহার নিজের কোন আলোক নাই উহাতে সূর্য্যের আলোক পড়ে, ও সেই আলোকেই পৃথিবীতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত) তাহা হইলে সহজেই দেখা যাইতেছে যে, উহার মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত কিছুই দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ দর্পণে মুখ দেখিলে উহার পশ্চাতে যে পারা থাকে তাহা সেরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না; এবং উহাতে যখন মুখ দেখা যায় তখন কেবল আমাদের মুখের বা দর্পণের সম্মুখস্থ জিনিষেরই প্রতিবিম্ব উহাতে পতিত হয়; সেইরূপ, চন্দ্রকে যখন দেখা যায়, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) দ্বারাই হউক আর চর্ম্ম চক্ষেই হউক, তখন পৃথিবীর প্রতিবিম্ব তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবেই যাইবে।

এখন চন্দ্রের পৃথিবী দিকের সম্বন্ধে কিছু বলি। কেহ কেহ বলেন যে 'চন্দ্রের পৃথিবীদিকের উপরি ভাগে কোন পর্ব্বত বা পাহাড় আছে, এবং সেই দৃশ্যকেই, চন্দ্রের কাল দাগ বলিয়া জ্ঞান করা যায়'। কিন্তু আমি সামান্য প্রমাণের দ্বারা দেখিয়াছি যে, তাহা হইতে পারে না। আপনারাও দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, একটী দর্পণের উপরি ভাগে, "চন্দ্রের পর্ব্বতের স্বরূপ," কিছু মসী বা কজ্জল লেপন করিয়া, সেই দর্পণটী সূর্য্য কিরণে ধরিলে, উহা হইতে যে আলোক প্রতিফলিত হয়, সেই আলোক ছায়াযুক্ত আলোক হয়; অর্থাৎ সেই আলোকের মধ্যভাগে ছায়া থাকে। এখন চন্দ্রের উপরিভাগে যদি ঐরূপ পর্ব্বত প্রভৃতি কিছু থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চন্দ্রের আলোকও ঐরূপ হইত।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির শেষ মীমাংসা এই যে, দর্পণের দিকে যখন দৃষ্টি করা যায়, তখন দর্পণের সম্মুখে যাবতীয় পদার্থই উহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই জন্য আমার মনে হয়, আমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রজাপতি মনুর উক্তিই ঠিক।

শ্রীমতী মৃণালিনী চৌধুরাণী

শুক্র, চন্দ্র স্ত্রী না পুরুষ?

শুক্র ও চন্দ্র স্ত্রীগ্রহ নহে; কিন্তু উহারা স্ত্রীজনোচিত গুণ-সমূহের অধিকারী এবং স্ত্রীজাতির অধিপতি বলিয়া শাস্ত্রে উহাদিগকে স্ত্রীসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ঃ—

"পুংসাং সূর্য্যারবাণীশা ঘোষিতাং চন্দ্র-ভার্গবৌ।
ক্লীবানাং বুধ-মন্দৌ চ পতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

—বৃহজ্জাতক চন্দ্রিকা।

"ভৌমার্ক-জীবাঃ পুরুষাঃ ক্লীবৌ তু সৌম-ভানুজৌ।
স্ত্রাখ্যৌ ভার্গব-চন্দ্রৌ দ্বৌ তৎ-পতিত্বাৎ তথোচ্যতে॥"

—বৃহৎ পারাশরীয় হোরা।

শ্রীরাধারঞ্জন বসু এম-এ

শ্রীমতী ও শ্রীমত্যার পার্থক্য

অল্পবয়স্ক ব্যক্তি বা স্নেহ পাত্র হইলে শ্রীমান্ ও স্ত্রীলিঙ্গে শ্রীমতী ব্যবহারের প্রতি কারণ এই যে শ্রী+মতু প্রশস্তার্থে মতুঃ-প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই মতু প্রত্যয়ের দ্বারা উহাকে অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন ও শ্রীমতীয় বুঝাইয়া থাকে। এই শ্রীমতী ও শ্রীমান্ শব্দে স্নেহাধিক্য বুঝানোই তাৎপর্য্য। যেখানে স্নেহাধিক্য বা আশীর্ব্বাদ বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, কেবলমাত্র শ্রীসম্পন্ন বুঝানোই উদ্দেশ্য, সেখানে শ্রীযুক্ত ব্যবহার করা উচিত।

২। বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিকে কনিষ্ঠোচিত শ্রীমান্ বা শ্রীমতী শব্দে ব্যবহার করিলে তাহাকে পরিহাস করা হয়; সুতরাং এই স্থলে শ্রীমান্ বা শ্রীমতী এই শব্দটী অবজ্ঞাসূচক হইয়া থাকে।

৩। শ্রীমদ্‌গুরু পরম্পরা ইত্যাদি স্থলে যে মতুপ্রত্যয়ান্ত শ্রীমৎগুরু পরম্পরা বিশেষণ রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাতে প্রশস্ত ও শ্রীবিশিষ্ট বুঝায়, সেখানে কোনও অবজ্ঞা বা পরিহাস বক্তার তাৎপর্য্য নয়, উৎকর্ষ বুঝানই উদ্দেশ্য। উৎকর্ষাপকর্ষ বক্তার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে।

৪। শ্রীমান্ বা শ্রীমতী শব্দ এই ব্যবহার লোকের ইচ্ছানুসারেই চিরপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যে দোষগুণ সমাজের ব্যবহার অনুসারে লক্ষিত হয়, তাহাতে শব্দ রচনার কৌশলে লেখকের তাৎপর্য্যই মূলীভূত কারণ। প্রাচীন লিপি দেখিয়া বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন সময় হইতে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের পদাবলি রচনার কাল হইতেই এই শ্রীমতী প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

৫। আর যে শ্রীমতাম্ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ শব্দ কোথাও কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া বোধ হয় না।

৬। বর্ত্তমান সময় লোকে শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী লিখেন; কিন্তু সেটায় ব্যাকরণ দোষ পড়িয়া যায়। কারণ, নাম বিশেষ্যপদ, মতী বিশেষণ পদ। বিশেষ্য বিশেষণে সমাস করিলে পুংবৎ হইয়া যায়। তাহাতে শ্রীমৎ অমুকী দেবী এইরূপ হইবে। সুতরাং এইরূপ না লিখিয়া শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী লিখা যুক্তিযুক্ত। তবে যদি কেহ বলেন যে, আমি সমাস করিব না, সে অন্য কথা। তা হইলে শুনিতে ভাল হইবে না।

শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়

গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে সম্পাদকের বৈঠকে শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ রায় মহাশয় ৺ আত্মারাম সরকার মহাশয়ের ভোজ বল যাদুবিদ্যার সম্বন্ধে যে কৃতিত্ব উক্ত মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

তাঁহার মাতৃভূমি বা বাসস্থান বনবিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত ছিলিম গ্রামে লেখা আছে। তাহা না হইয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত (উপস্থিত হাওড়া) কমলাপুর গ্রামে হইবে। তিনি আমারই পূর্ব্বপুরুষ। তাঁর গুণাবলি সম্বন্ধে প্রকাশিত বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাঁহার বংশাবলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

৺মাধবরাম সরকার
|
১, ৺বাঞ্ছারাম সরকার ২, ৺আত্মারাম সরকার ৩, ৺গোবিন্দরাম সরকার ৪, ৺রামপ্রসাদ সরকার
|
৺পঞ্চুরাম সরকার
|
৺রাধানাথ সরকার
|
৺বামাচরণ সরকার
|
তস্য পুত্র লেখক—

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার

অশ্বিনীকুমার

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

পূর্ব্বাকাশ-শোভা, দীপ্ত নক্ষত্র যেমতি
নিশান্তে প্রকাশে স্নিগ্ধ রশ্মি-সমুজ্জ্বল!
তেমতি ভাতিল তব সাধনার জ্যোতিঃ;
প্রদানিল জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি নিরমল!
জড়তায় ভরা, সুপ্ত, অবসন্ন দেশে,
জাগিল দেশাত্ম-বোধ আহ্বানে তোমার,
সহিলে সে রাজরোষ বীর-বন্দী-বেশে,
বরিলে প্রশান্ত মুখে রুদ্ধ কারাগার।
মজ্ঞি' দেবী-তত্ত্বে ছিলে চির আরাধনে,
শুদ্ধ, পূত, শান্ত, সৌম্য ঋষি সনাতন!
ত্যাগের আদর্শ হেন এ মর ভবনে,
কে বল দেখাবে, দেব, তোমার মতন।
আর কি হেরিবে বঙ্গ কভু এ নয়নে,
হাস্যোজ্জ্বল জ্ঞানমূর্ত্তি—প্রভাত তপন!—

আষ্ট্রেলিয়া

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিকদের সামাজিক জীবনে জাতি-ভেদের কোনও অলঙ্ঘ্য প্রাচীর না থাকায় শ্রমজীবী বা মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে লোক উপযুক্ত হোয়ে ওঠে, সে অনায়াসে সমাজের উচ্চস্তরে আসন পায়। যারা দেশের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক হ'য়ে ওঠে তাদের সন্তানেরা যদি পৈতৃক গুণের অধিকারী হ'তে না পারে, তা হ'লে পিতার খাতিরে গুণহীন পুত্র সে দেশে কোনও সম্মানই পায় না! ব্রাহ্মণের সন্তান বলেই সেও যে নমস্য ও পূজ্য, এ কথা নবীন আষ্ট্রেলিয়া স্বীকার করেনা; তাই সেখানে যোগ্য লোকের অযোগ্য পুত্রদের সমাজের উচ্চস্তর থেকে সরে গিয়ে নিম্নস্তরের উপযুক্ত লোকদের জন্য সে স্থান ছেড়ে দিতে হয়।

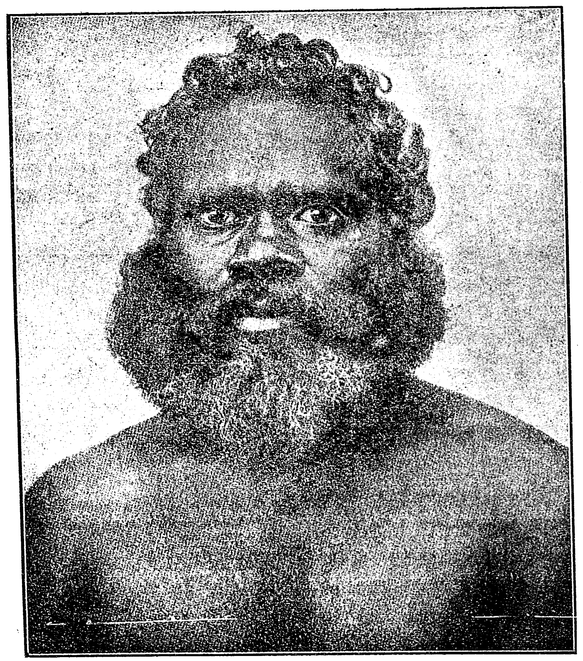

বড়ামুঙ্গা সর্দ্দার।—(আষ্ট্রেলিয়ার আদিম ও প্রাচীনতম অধিবাসী হ'চ্ছে এই বড়ামুঙ্গা জাতি। এরা এখনও চাষবাস করতে শেখেনি, ফল মূল ও শাক শব্জী খেয়ে থাকে।)

আষ্ট্রেলিয়ায় বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিনশ'টি দিন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রবিকরোজ্জ্বল ও আনন্দবর্দ্ধক। সে দেশের আবহাওয়ার গুণে সেখানে সারা বৎসর ধরে ক্রীকেট্ খেলা চলতে পারে। ছুটীর দিনে সর্ব্ব শ্রেণীর আষ্ট্রেলিয়ানদের প্রধান আমোদ হচ্ছে একটি বন-ভোজনের অনুষ্ঠানে। যুবক যুবতীদের তো কথাই নেই, বালক বালিকা ও বুড়োবুড়ীরাও এই আমোদে যোগ দেয়। দলের সকলের সঙ্কুলান হ'তে পারে এরূপ পরিমাণ আহার্য্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে এক একটী দল সকালবেলাই বেরিয়ে পড়ে একটী রম্য-স্থানের সন্ধানে। সেখানে পৌঁছে তারা নিজেরা রাঁধা-বাড়া করতে লেগে যায়। আষ্ট্রেলীয়ার প্রায় প্রত্যেক সহরেরই উপকণ্ঠে সুরম্য কানন-ভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতি যেন সেখানে ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী হ'য়ে বিরাজমানা!

খাওয়া দাওয়ার পর পুরুষেরা ধূমপান ক'রতে ক'রতে মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে, নাটক বা কাব্য পড়ে, কিম্বা কোনও রকম অলস খেলায় নিযুক্ত হয়। বিকেলের দিকে চা তৈরি হয়। চা একেবারে না হ'লেই নয়। আষ্ট্রেলীয়ানরা মেয়ে পুরুষে চা খাবার সময় তারা ডিনার টেবিলে খেতে বসেও চা খায়। যারা জীবনে কোনওদিন চা খায়না, যদিও সেরকম লোক আষ্ট্রেলিয়ায় খুব কমই আছে, তারাও বন-ভোজনে গেলে চা'য়ের অমর্য্যাদা করতে সাহস করে না। কারণ বনভোজনের সনাতন প্রথা

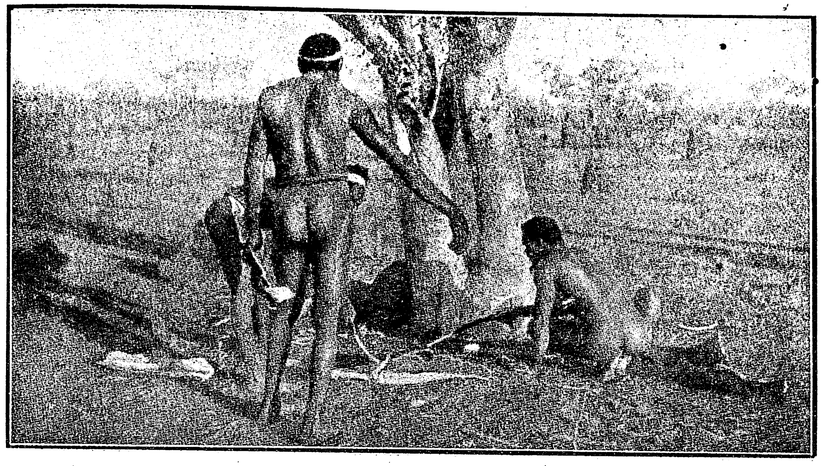

কঙ্কাল সৎকার।—(এক বৎসর পরে বৃক্ষের উপর থেকে মৃতব্যক্তির কঙ্কাল নামিয়ে তার অস্থিগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে।)

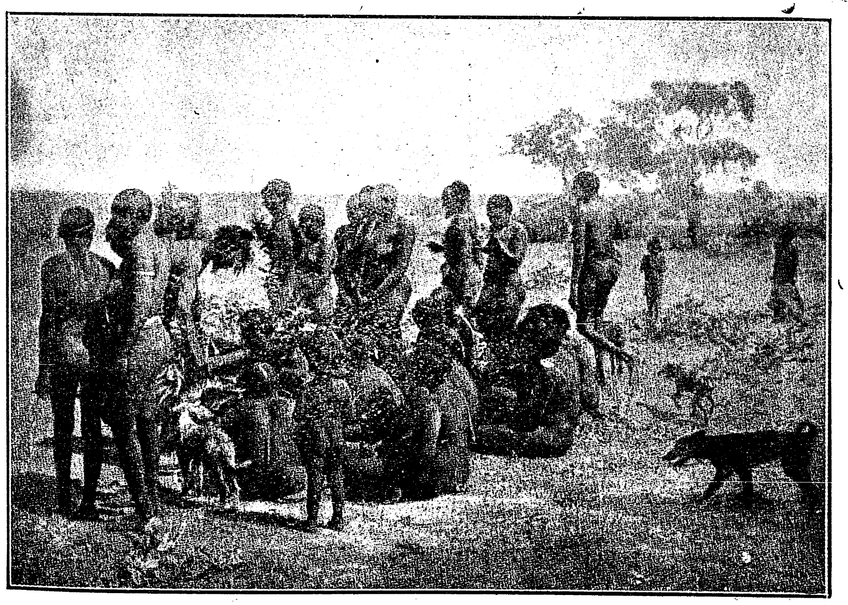

শ্রাদ্ধোৎসব।—(বৃক্ষবল্কলাবৃত ও পক্ষ শোভিত মৃতের বাহু-অস্থিখানি সমবেত আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে বহন করে আনা হ'চ্ছে।)

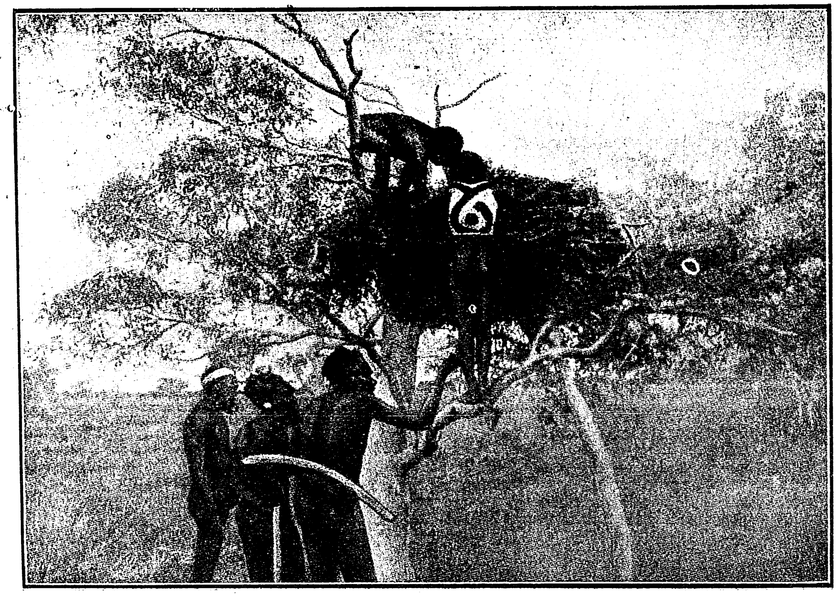

তরুসমাধি।—(বড়মুঙ্গারা শবদেহ গাছের উপর তুলে এক বৎসর ডালপালা চাপা দিয়ে রেখে দেয়।)



শোকসভা।—(অস্থি-বাহকেরা এসে মৃতের পিতার হস্তে অস্থিখানি সমর্পণ করে। শোকার্ত্ত পিতা আবার সেখানি যখন সভাস্থ বয়োজ্যেষ্ঠার হাতে তুলে দেন, তখন মেয়ের দল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে)



অস্থি-তর্পণ।—(অবশিষ্ট বাহু-অস্থিখানি বৃক্ষবল্কলে আবৃত ক'রে 'অপোশাম' রোমের রজ্জুতে বেঁধে তার একদিক পালকের দ্বারা সুসজ্জিত করা হচ্ছে।)



স্ত্রী-আচার।—(মেয়েরা মুখে খড়ি মেখে উরুদেশে শোকচিহ্নস্বরূপ অস্ত্রাঘাত ক'রে মৃতের বাহু-অস্থিখানি সমাধির পূর্ব্বে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে আছে।)

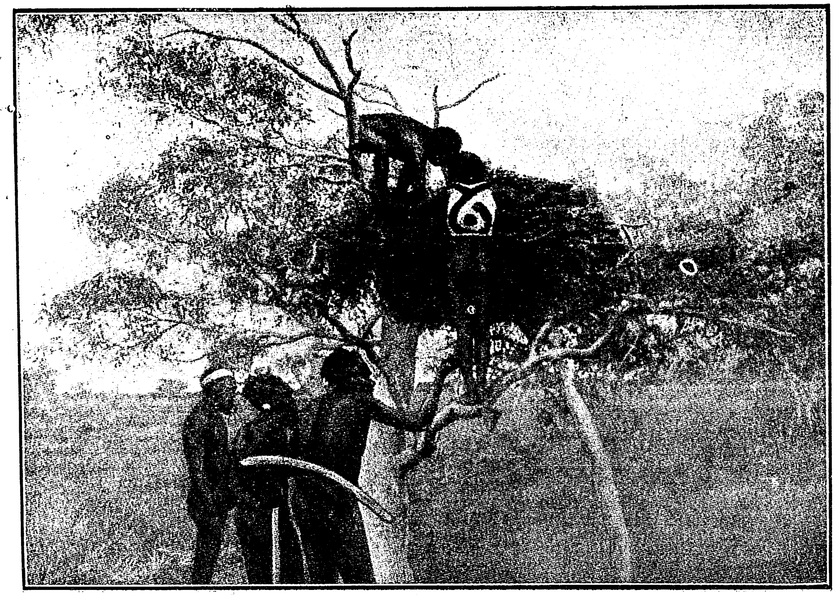

তরুসমাধি।—(বড়মুঙ্গারা শবদেহ গাছের উপর তুলে এক বৎসর ডালপালা চাপা দিয়ে রেখে দেয়।)



শোকসভা।—(অস্থি-বাহকেরা এসে মৃতের পিতার হস্তে অস্থিখানি সমর্পণ করে। শোকার্ত্ত পিতা আবার সেখানি যখন সভাস্থ বয়োজ্যেষ্ঠার হাতে তুলে দেন, তখন মেয়ের দল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে।)



অস্থি-তর্পণ।—(অবশিষ্ট বাহু-অস্থিখানি বৃক্ষবল্কলে আবৃত ক'রে 'অপোশাম' রোমের রজ্জুতে বেঁধে তার একদিক পালকের দ্বারা সুসজ্জিত করা হচ্ছে।)



স্ত্রী-আচার।—(মেয়েরা মুখে খড়ি মেখে উরুদেশে শোকচিহ্নস্বরূপ অস্ত্রাঘাত ক'রে মৃতের বাহু-অস্থিখানি সমাধির পূর্ব্বে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে আছে।)

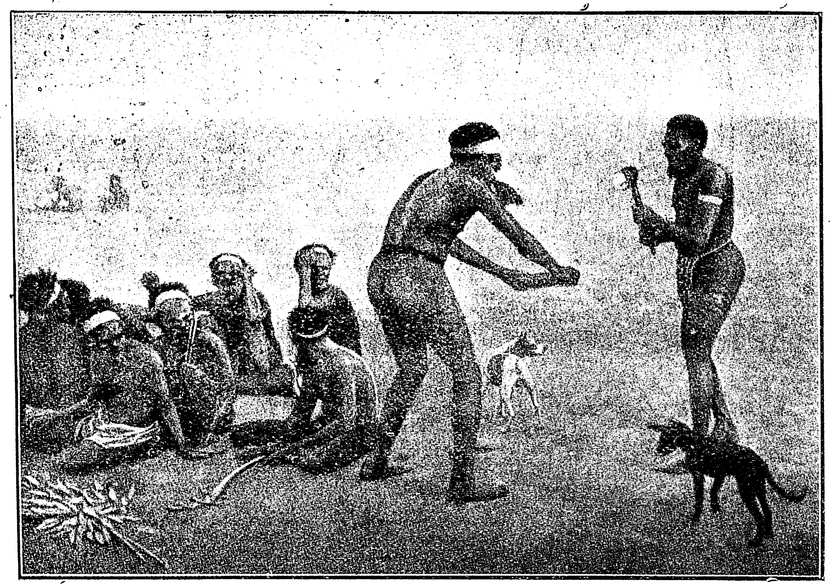

অস্থি-উৎসর্গ।—(মৃতের ভ্রাতা এসে মেয়েদের কাছ থেকে অস্থিখানি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাতকের সাম্‌নে প্রসারিত ক'রে ধরে ঘাতক পাষাণ-হাতুড়ীর আঘাতে অস্থিখানি চূর্ণ করে দিলে মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়।)

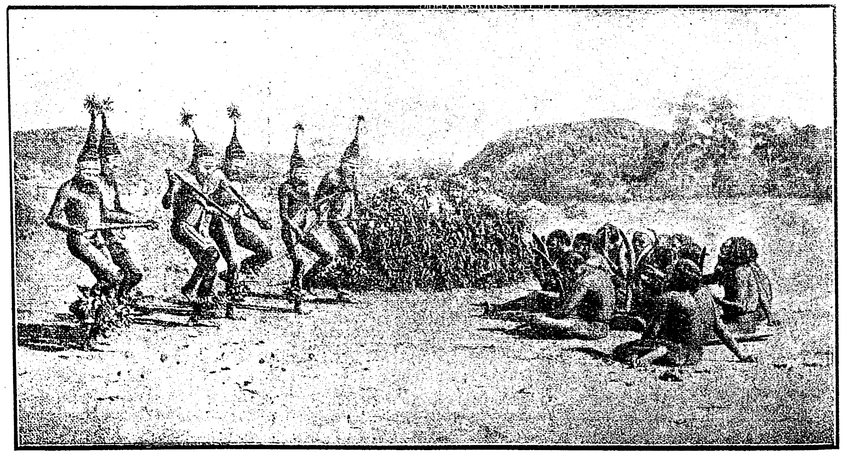

নৃত্য শিক্ষা।—(অরুন্তারা উৎসবের বেশে নৃত্য-শিক্ষা করছে।)

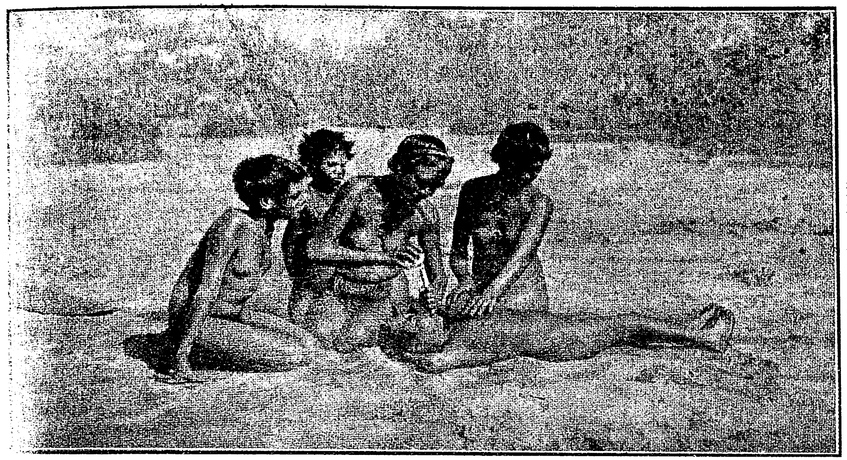

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি।—(তরুণীর দাঁত ভেঙে দিয়ে তাকে আরও সুন্দরী করা হ'চ্ছে।)

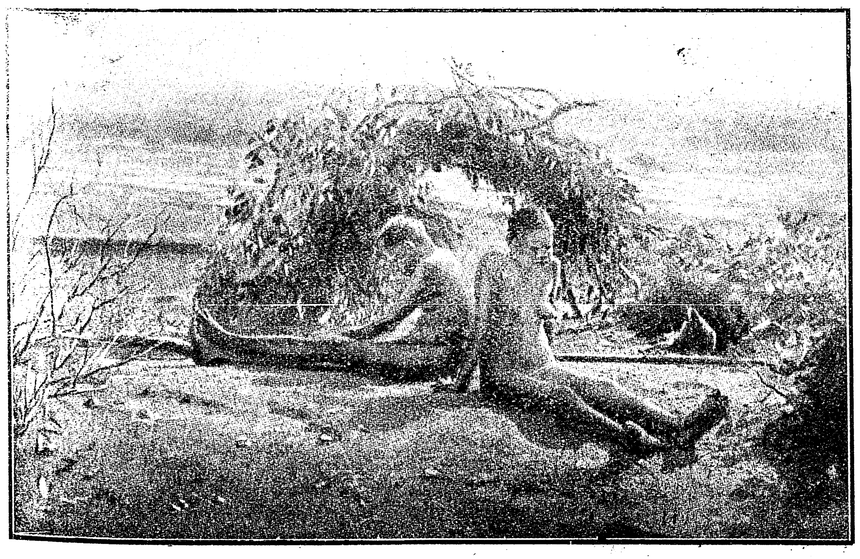

শোকাকুলা।—(পতিবিয়োগে শোকাতুরা সপত্নীদ্বয় কেশ-কর্ত্তন করে ধূলি মেখে বসে রোদন করছে।)

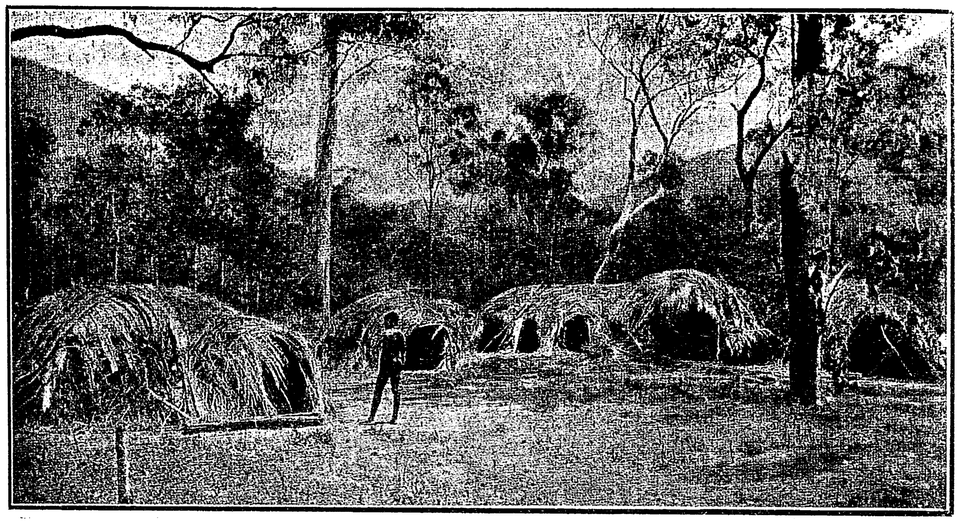

কুটীর না কোটর ?—(ঘাসপাতা চাপা এই ক্ষুদ্র অপরিসর ঘোপের মধ্যে তারা সচ্ছন্দে বাস করে।)



মৃত্যুশয্যায়।—(মৃত্যুকালে সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষ আত্মীয়েরা চারিপার্শ্বে সমবেত হয়। স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'রে, পুরুষেরা কেউ কেউ শোকোন্মত্ত হয়ে আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে থাকে ; রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকেরা তাদের নিরস্ত করবার জন্য ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ ক'রতে থাকে।)



কঙ্কাল-কবর।—(একখানি বাহু-অস্থি ভিন্ন অন্য সমস্ত অস্থিগুলি উইঢিবির মধ্যে প্রোথিত করা হচ্ছে।)

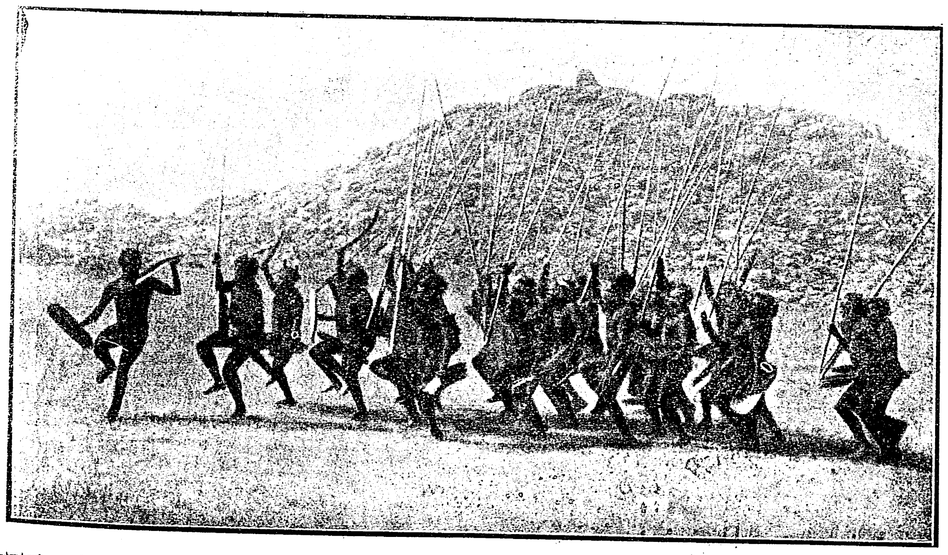

শোভাযাত্রা।—(একদল লোক যখন অপর একদল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর'তে যায়, কোনও বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্যই হোক বা সুখ সমাধার নিমন্ত্রণেই হোক্, তারা সকলে মিলে একসঙ্গে রণমূর্ত্তিতে নৃত্য করতে করতে ও গর্জ্জন করতে করতে অগ্রসর হয়। তাদের সেই শোভাযাত্রা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।)

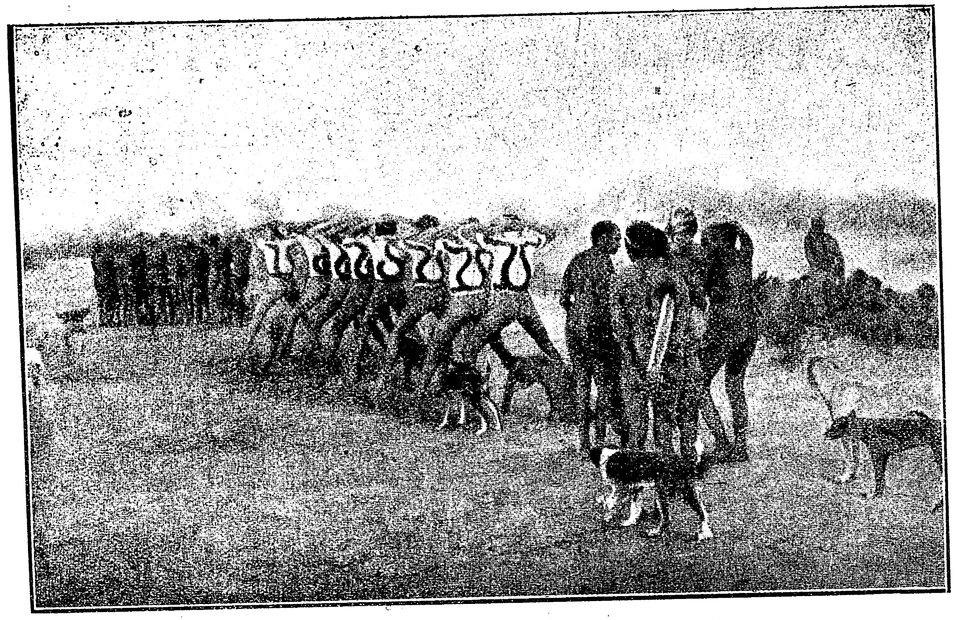

সমাধি উৎসব।—(বাহু-অস্থিখানি সমাধিস্থ করবার পূর্ব্বে একটি উৎসব-অনুষ্ঠান হয়, এই অনুষ্ঠানের শেষ প্রথা হ'চ্ছে পুরুষেরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পা ফাঁক ক'রে দণ্ডায়মান হয়, আর স্ত্রীলোকেদের হামাগুড়ি দিয়ে একে একে তাদের উভয় পদতলের নিম্ন দিয়ে চলে যেতে হয়। সর্ব্বশেষ নারীর নিকট অস্থিখানি থাকে; সে পার হ'য়ে আস্‌বা মাত্র তার হাত থেকে অস্থিখানি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলে সমাধিস্থ করা হয়।)

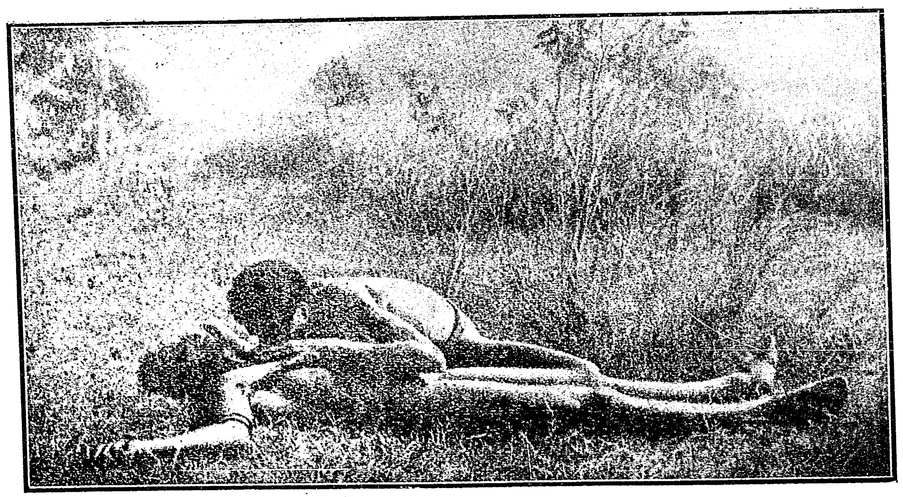

রোগীর চিকিৎসা।—(পীড়িত ব্যক্তির রোগ বালাই দূর করবার জন্য এরা ঝাড়ফুঁক করে এবং রোগীর শরীর থেকে শত্রুর কুদৃষ্টি শোষণ করে নেয়।

অনুসারে সেখানে চা পান করতে সকলেই বাধ্য! কাজে-কাজেই চা-বিরোধীদেরও শান্তশিষ্ট ছেলেটির মত সুড় সুড় ক'রে হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে ভাল মানুষের মত চুমুক দেওয়া সুরু করতে হয়। বড়দিন কিম্বা ইষ্টারের সময় লম্বা ছুটী পেয়ে কোনও কোনও দল সপরিবারে সহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে, নদীকূলে বা সমুদ্রতীরে—তাঁবু গেড়ে একেবারে সপ্তাহকাল কাটিয়ে আসে। এই বাইরে গিয়ে খোলা যায়গায় দু'চার দিন বাস করবার ঝোঁক আষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে খুব প্রবল থাকায় সে দেশের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য খুব ভাল।



সুদৃশ্য কহ্লার শোভিত স্রোতস্বিনী।—(আষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ নদনদীতে এমনি সুন্দর কমলবন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই শালুক ও পদ্ম ফুল মায় ডাঁটা পাতা সমেত আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের একটিপ্রধান শাকশব্জী জাতীয় খাদ্য।)

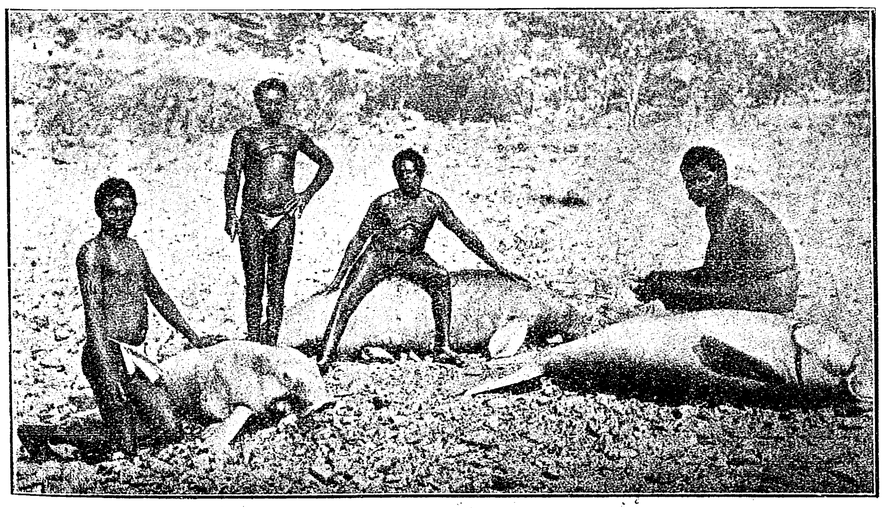

সিন্ধু-গাভী।—(এরা সমুদ্রের প্রাণী বটে কিন্তু সমুদ্র-তীরের ঘাস খেয়ে প্রাণধারণ ক'রে। এরা মৎস্যাকৃতি বটে কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব, ডিমপাড়ে না! আদিম অধিবাসীরা এদের বর্ষাবিদ্ধ ক'রে শিকার করে। এদের মাংস খেতে শূকর মাংসের চেয়েও সুস্বাদু! আষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকেরা এর সন্ধান ও আস্বাদ পেয়ে আজকাল বড় বড় জাল নিয়ে গিয়ে সমুদ্র থেকে এদের ধরে নিয়ে আসছে।)

সমুদ্রে ফেন-স্নান আষ্ট্রেলিয়ানদের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে! সমুদ্রস্নানের একটা নেশা এদের—বিশেষ করে এদের মেয়েদের মধ্যে এমন ধরেছে যে, সারাদিনের মধ্যে যে কোনও সময়েই সমুদ্রের ধারে যাও না—দেখবে হাজার মেয়ে আষ্ট্রেলিয়ার অসীম বিস্তৃত সাগরকূলে যেন স্নানযাত্রার উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে! একদিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর একদিক থেকে ভারত সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছুটে এসে আষ্ট্রেলিয়ার দু'পাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে—আর সেই দুই ভীমপারাবারের ফেনিলোচ্ছল উর্ম্মি-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মহারঙ্গে নৃত্য ক'রতে ক'রতে—তরুণ তরুণীর দল যেন জলকুমার ও জলকন্যাদের মত নির্ভয়ে খেলা ক'রছে!

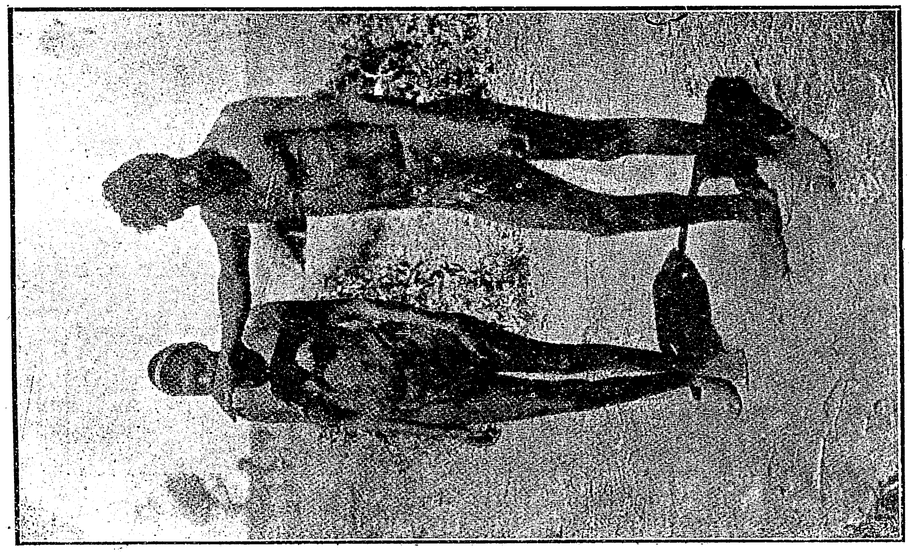

মৌন-ব্রত।—(পতি বা অপর কোনও পুরুষ আত্মীয়ের মৃত্যুর পর পত্নীকে ব অন্য আত্মীয় রমণীদের কিছুদিন মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতে হয়। সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে তারা মৌনব্রত উদ্‌যাপনের জন্য মৃতের পুরুষ আত্মীয়দের নিকট ভোজ্য উপঢৌকন নিয়ে আসে এবং কথা বলবার আগে প্রত্যেক পুরুষের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দংশন করে।)

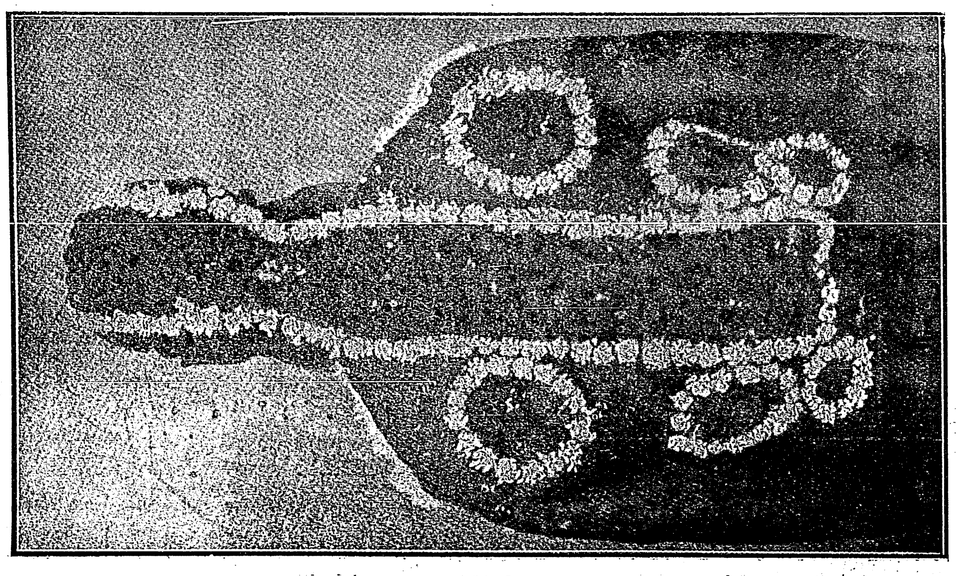

যাদুকর।—(ইনি যাদুবলে তৃণ উপানৎ ক'রতে পারেন বলে সম্মানী হয়েছেন।)

ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা প্রভৃতি খাস্ মোকামের যে সব বেয়াড়া আমোদ প্রমোদ আছে, আষ্ট্রেলিয়ানরা সেগুলি সমস্তই তাদের নূতন দেশে আমদানী করেছে। এই খাস মোকামের যা কিছু নির্ব্বিচারে আমদানী ক'রতে গিয়ে আষ্ট্রেলিয়াকে দিনকতক ভারি ভুগতে হ'য়েছিল। সেখানে খরগোস্ দেখতে পাওয়া যেতো না বলে একজন ঔপনিবেশিক সখ ক'রে কয়েক জোড়া খরগোস নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখেছিলেন। বছর কতক পরে দেখা গেল যে খরগোসের উৎপাতে টেঁকা দায়, চাষবাস প্রায় বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে! ক্ষেতে পা বাড়ায় কার সাধ্য! চারিদিকেই খরগোসের পাল অসংখ্যারে পিল পিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কারণ মাদী খরগোসরা তিনমাস বয়স হলেই বাচ্চা পাড়তে সুরু করে আর প্রত্যেক মাদী খরগোস্‌টা বছরে অন্ততঃ নব্বুইটা ছানা প্রসব করে! সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে খরগোসের জ্বালায় আষ্ট্রেলিয়ানদের এমন অবস্থা হোলো যে রীতিমত তাদের সৈন্যদল সংগঠ করে খরগোস-বংশ নির্ম্মূল করবার অভিযান ক'রতে হ'লো! কারণ শৃগাল কুকুর প্রভৃতি খরগোস-ভোজী জীবের সেখানে কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। শেষটা কিন্তু আষ্ট্রেলিয়ানরা আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে যে খরগোস ধ'রে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যেতে পারে এবং খরগোসের অত্যাচার থেকে শস্যক্ষেত্র বাঁচাবারও সহজ উপায় একটা আছে; তখন অনেকেই চাষবাস ছেড়ে খরগোসের ব্যবসা সুরু করে দিলে। এখন কেবল খরগোসের ব্যবসা থেকেই আষ্ট্রেলিয়ার বার্ষিক আয় দেড় কোটী টাকার উপর!

ভিতর মুল্লুকের চেয়ে সমুদ্রোপকূলের জায়গার আবহাওয়া বেশ ভাল বলে ঔপনিবেশিকরা প্রায় সকলেই সমুদ্রকূলের কাছাকাছি বাস করে। আষ্ট্রেলিয়ার ছয়টা বড় বড় সহরে সেখানকার শতকরা বেয়াল্লিশ জন লোক আস্তানা নিয়েছে। ভিতর মুল্লুকে বাস করবার একটা প্রধান অসুবিধে হ'চ্ছে লোকজনের অভাব! কালা আদমীদের নিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা ক'রলে হয়তো মফস্বলে থাকা তাদের পক্ষে সহজ হ'তে পারতো, কিন্তু আষ্ট্রেলিয়ানরা দৃঢ় পণ করেছে যে এ উপনিবেশটা তারা শ্বেতাঙ্গদেরই একচেটে ক'রে রাখবে সুতরাং কালা আদমীদের প্রবেশ সেখানে অনেকদিন থেকেই বন্ধ হ'য়ে গেছে।

আষ্ট্রেলিয়ার আর একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে সেখানকার বিচিত্র তরুলতা, ফুলফল ও জীবজন্তু! প্রাগৈতিহাসিক

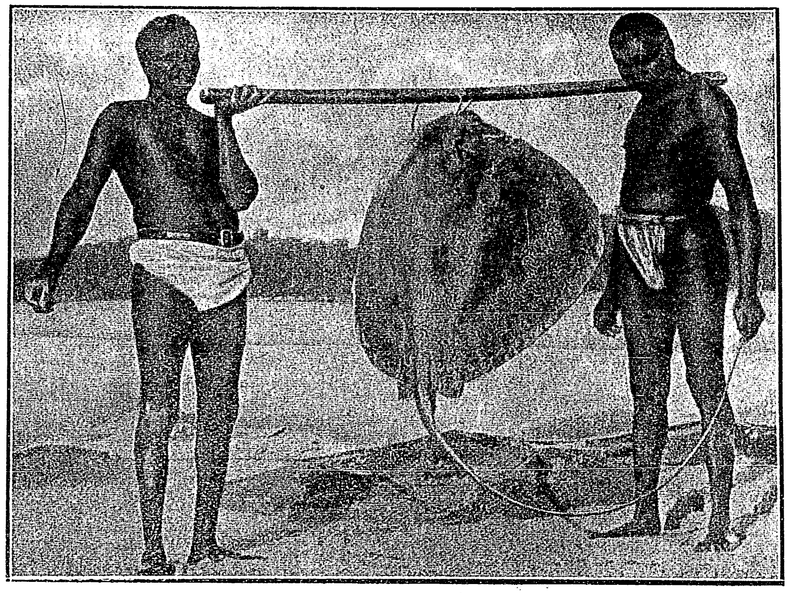

ষ্টিঙ্‌রে মাছ

(উত্তর-পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ; বিরাট আকৃতির ও সুদীর্ঘ পুচ্ছ বিশিষ্ট।)

যুগের যে সব জীবজন্তুর কথা আমরা কেবলমাত্র প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে পড়েছি এবং কোনও কোনও যাদুঘরে যাদের বিরাট অস্থি বা কঙ্কালমূর্ত্তি দেখে তাদের প্রাচীন অস্তিত্বের প্রমাণটুকু পাই, সেই সব শ্রেণীর অতিকায় জীবজন্তু কতক কতক আষ্ট্রেলিয়ায় এখনও জীবন্ত দেখতে পাওয়া যায়! 'ক্যাঙারু'ই হ'চ্ছে আষ্ট্রেলিয়ার প্রধান জীব। তা ছাড়া হরেক রকমের কাঠবিড়ালী সাপ আর এক রকম গাং-শূয়োরও সেখানে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। গাং-শূয়োর জীবটি দেখতে ঠিক প্রকাণ্ড একটি শূকরের মতোই,

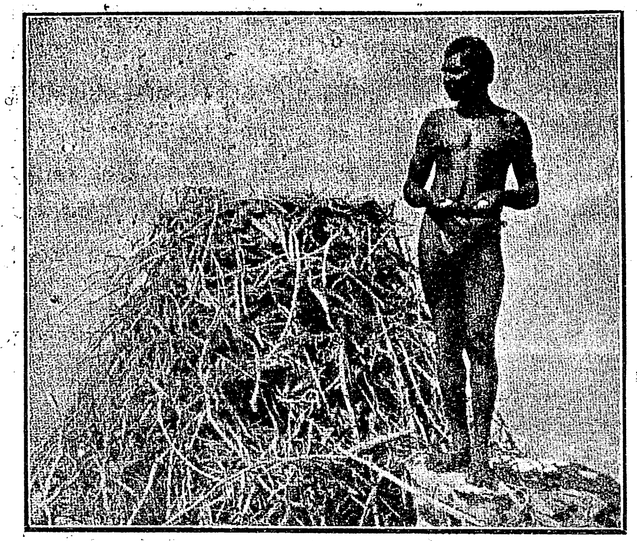

সুন্দর বর্ব্বর।—(এই ভাস্কর-খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির মত সুগঠিত আকৃতির বর্ব্বরেরা কেম্ব্রিজ উপসাগরস্থ দ্বীপে বাস করে। একজন দৈর্ঘ্যে সাতফুটেরও বেশী। ইনি পাহাড়ের চূড়োর উপর উঠে ঈগলপাখীর বাসা থেকে ডিম তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।)

কিন্তু নদীনালা খালবিলের ধারে গর্ত্ত খুঁড়ে মাটির ভিতর বাস করে বলে এদের ঠিক শূকরের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না।

আষ্ট্রেলিয়ায় পিঁপড়ে আর উইপোকার উপদ্রব খুবই। কাঠের আস্‌বাবপত্র মায় কাঠের বাড়ী পর্য্যন্ত এদেশের উইপোকায় উদরসাৎ করে ফেলে! পাখী এখানে হরেক রকমের দেখতে পাওয়া যায়! স্বর্গ-বিহঙ্গম বা বার্ডস্ অফ প্যারাডাইজ এখানকার 'পাপুয়া' প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর আছে। লাল ঝুঁটীওলা কালো কাকাতুয়া পাখী আর হলদে ঝুঁটীওলা সাদা কাকাতুয়া আষ্ট্রেলিয়ার একটা বিশেষত্ব! এ ছাড়া 'কুকাবুরা' বলে এখানে প্যাঁচার মতন দেখতে এক রকম পাখী আছে; এদের বিশেষত্ব হ'চ্ছে অদ্ভুত ডাক! দূর থেকে এদের ডাক শুনলে মনে হবে ঠিক যেন গাছের ওপর থেকে কোনও মানুষ খিল্ খিল্ করে হাস্‌ছে! নতুন লোকে শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করবেনা—যে পাখী ডাক্‌ছে,—কোনও লোক গাছে উঠে হাস্‌ছে না! কুকাবুরাদের সেখানে ভারি আদর, কারণ এরা সাপের যম! সাপ মেরে তাদের পরম উপকার ক'রে।

য়ুরোপ থেকে আষ্ট্রেলিয়ায় যেতে হ'লে প্রথমেই ফ্রীম্যাণ্টেল্ প্রদেশের 'পার্থ' বন্দরে এসে নামতে হয়। 'পার্থ' হচ্ছে পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার প্রধান সহর। ফ্রীম্যাণ্টেল প্রদেশটা আষ্ট্রেলিয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু লোকসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে খুব কম, এমন কি তাশমানিয়ার মত ক্ষুদ্র দ্বীপটীও লোকসংখ্যায় এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তবে খুব শীঘ্রই এ অঞ্চলে লোকের বাস বেড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে সমুদ্রতীরে বিস্তৃত মুক্তার কারবার চলে। এ অঞ্চলের ভিতর মল্লুকের বৃহৎ সোনার খনি পৃথিবীর মধ্যে পরিচিত। তা ছাড়া কৃষি ও পশুপালনের কারবারটাও এদিকে দিন দিন বিস্তারলাভ ক'রছে।



মক্কাতীরা।—(বৈদিক যুগের 'অরণী' কাষ্ঠের মতো অগ্নি-উৎপাদনের জন্য আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা চকমকির পরিবর্ত্তে দুই খণ্ড কাষ্ঠ ব্যবহার করে। একখানি চ্যাপ্টা নরম কাঠ, আর একখানি রুলের মত শক্ত সরু লম্বা কাঠ। চ্যাপ্টা কাঠের উপর সরু লম্বা কাঠখানি চেপে ঘোরাবার সময় যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তারই সাহায্যে শুষ্ক তৃণে অগ্নি সংযোগ ক'রে নিয়ে এরা দীপশলাকার কাজ চালায়। এই অগ্নি-উৎপাদক যন্ত্রটিকে তারা বলে 'মক্কাতীরা!')

ফ্রিম্যাণ্টেলে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে করে পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়ার মরুপ্রদেশ উত্তীর্ণ হ'য়ে একেবারে সোজা পূর্ব্ব আষ্ট্রেলিয়ার যে কোনও সহরে এসে উঠা যায়। দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়ায়ই হচ্ছে অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে ঐশ্বর্য্যশালী। এখানকার প্রধান সহর হ'চ্ছে 'আডেলাইডে'। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কমলা লেবুর বন, বাদাম ও জলপাইয়ের জঙ্গলে পরিবেষ্টিত এই সহরটি যেন ছবির মত দেখতে! আঙুরের সময় এক পেণীতে অর্থাৎ চার পয়সায় সেখানে এত আঙুর পাওয়া যায় যে, একজন লোক খেয়ে ফুরোতে পারে না। জনকতক সম্পন্ন ঔপনিবেশিক এইখানে এসে প্রথম আড্ডা গেড়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে জগতের এমন জায়গায় গিয়ে বাস ক'রবো যেখানে দারিদ্র্যের দুঃখ দৈন্য থাক্‌বেনা! তাদের এ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে! আডেলাইডে সহরে ভিক্ষুক নেই। জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত, অনাহারে শীর্ণ, অভাব-ঝঞ্ঝাহত দরিদ্রের পাণ্ডুর মলিন নিরানন্দ মুখ এখানে একটিও চখে পড়বেনা। সকলেরই চ'খে মুখে একটা স্বচ্ছলতার সহজ দীপ্তি, এবং বেশে ভূষায় একটা লক্ষ্মীশ্রী দেদীপ্যমান!

আডেলাইডে থেকে ট্রেণ ক্রমে 'লফ্‌টী' পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে তারপর আস্তে আস্তে ওপারের নামাল জমিতে নেমে 'মারে' নদীর মোহানা পার হয়ে চলে যায়। মারে হ'চ্ছে আষ্ট্রেলিয়ার সব চেয়ে বড় নদী। আষ্ট্রেলিয়ার যে বিস্তৃত গিরিশ্রেণীকে "আষ্ট্রেলিয়ান আল্‌পস্" বলে, সেইখানেই 'মারে'র জন্ম। পাহাড় থেকে বেরিয়ে সাগুরাভিমুখে যাবার পথে 'মরম বিদ্ধগী' (Marrumbidgee River) ও 'প্রিয়তমা' (River Darling) নামে দুই শাখানদীকে সে সখীরূপে সঙ্গে নিয়েছে। এই দুই নদীতে একদল ভবঘুরে লোক ভেসে বেড়ায়; তাদের পেশা হ'চ্ছে মাছ ধরে বেড়ানো, অর্থাৎ—জেলের কাজ করা, আর মাঝে মাঝে জাহাজ-ঘাটে এসে যে কোনও খুচরো রোজগারের চেষ্টা!

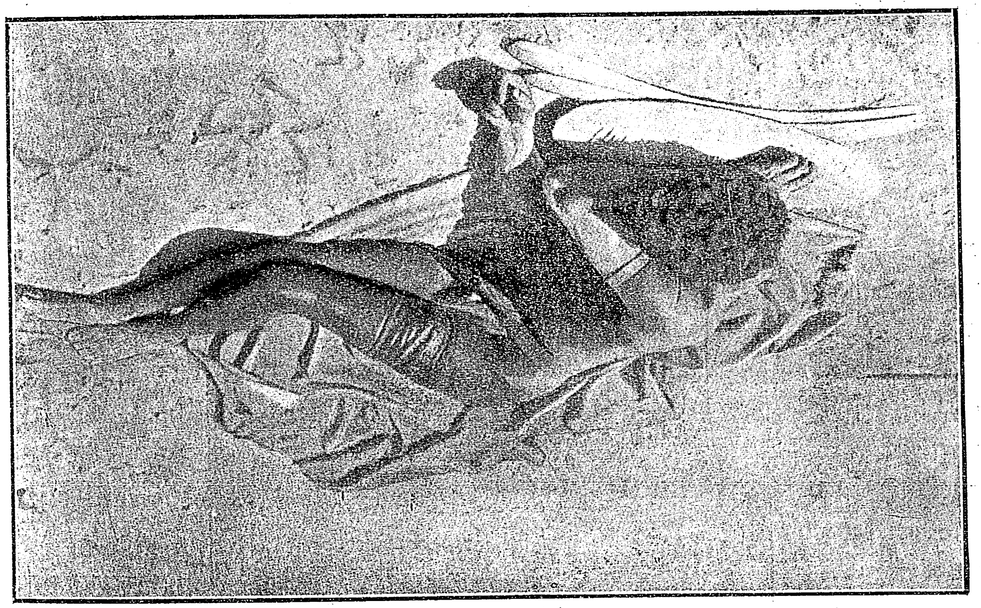

ক্ষতস্মৃতি।—(শোকার্ত্ত পুরুষ অস্ত্রাঘাতে আপন উরুদেশ ক্ষত করে পড়ে আছে।)

'মারে' নদী পার হবার পর ট্রেণ আষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত 'মাল্লী মরুভূমি' অতিক্রম করে চলে। 'মাল্লী মরুভূমি' নাম শুনে কেউ যেন ভাববেন না যে সেই উত্তপ্ত বালুকাময় শাহারা মরুভূমিরই কোনও নিকট আত্মীয়! মাল্লী হচ্ছে একরকম ছোট জাতের (ইউক্যালিপটাস) গাছ। এই গাছ সেখানে এত বেশী যে, একেবারে জঙ্গল হয়ে গেছে! চারিদিকে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত কেবল এই মাল্লীর বন দেখতে পাওয়া যায় বলে এখানকার নাম হয়েছে 'মাল্লী মরুভূমি।'

এর পরই হ'চ্ছে আষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বপ্রধান সহর মেলবোর্ণ।

মেলবোর্ণের অধিবাসীরা তাদের সহরটির উল্লেখ করবার সময় বলে মার্ভেলাস মেলবোর্ণ! অর্থাৎ অপরূপ মেলবোর্ণ নগর! এই অপরূপ সহরটি ইয়ারা নদীর কূলে প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই ইয়ারা নদী হাডসান্ উপসাগরে এসে মিশেছে। এবং সেই যুক্ত-বেণীর মুখেই বিখ্যাত ফিলিপ বন্দর। মেলবোর্ণ যথার্থই এক অপরূপ নগর। এই সুন্দর ও সুবৃহৎ সহরটিই হচ্ছে এখন আষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী। এইখানেই তাদের পার্লিয়ামেণ্ট বা শাসন-সভার অধিবেশন হয়।

মেলবোর্ণ থেকে বেরিয়ে কৃষিপ্রধান প্রদেশ ভিক্টোরিয়ায় আসতে হয়। এখানকার ছোট খাটো সহরগুলির সব যেন সহাস্যভাব! এখানকার লোকেরা সবাই কায়িক পরিশ্রমের গুণে ধীরে ধীরে সম্পদ্‌শালী হয়ে উঠছে। এরা গরু চরিয়ে খায়; ধান, ছোলা, গম, যবের চাষ করে, দুধ মাখনের যোগান দেয়, ভেড়া পোষে। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের আলবুরী অঞ্চলে আবার মারে নদী পার হ'তে হয়। এ'দিকটা হচ্ছে মারে নদীর উৎপত্তি-মুখ। এই মুখে মারে পার হ'য়ে 'নিউ সাউথ ওয়েলস্' প্রদেশে প্রবেশলাভ ঘটে! নিউসাউথ ওয়েল্‌সের রীভারীণা জেলাটা মেষভূমি ব'লেই বিখ্যাত!

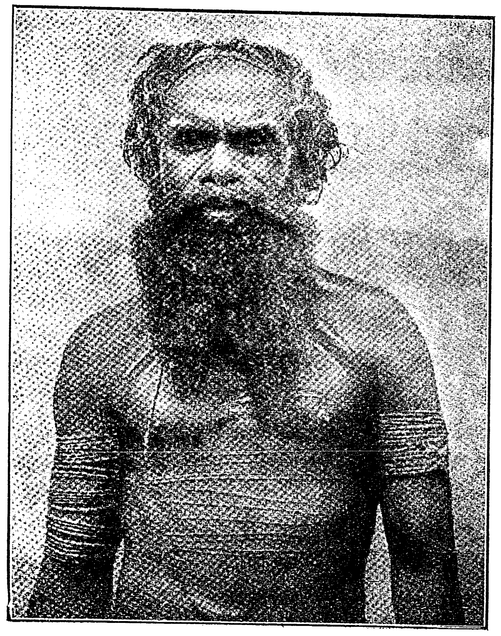

অরুন্তা জাতীয় লোক

(এরা আষ্ট্রেলিয়ার মধ্য প্রদেশস্থ মরুভূমির বাসিন্দা। বাহুতে প্রেয়সীদের কেশ নির্ম্মিত 'বাজু' পরিধান করে। বুকে পেটে শোকের অস্ত্রাঘাত চিহ্ন। কাহারও মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হ'লে এরা আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ক্ষত চিহ্ন এঁকে তার স্মৃতি ধারণ করে থাকে।)

এইখান থেকেই জগদ্বিখ্যাত মেরীনো পশম পৃথিবীর সব দেশে চালান যায়।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের প্রধান সহর হ'চ্ছে সিড্‌নী। সিড্‌নী আবার আষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য-প্রধান নগর। সিড্‌নীর জ্যাক্‌সন বন্দর জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলে খ্যাত। সিড্‌নী থেকে ব্রীসবেন্ সহরে যেতে হয়। ব্রীসবেন হ'চ্ছে উত্তর আষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স্‌ল্যাণ্ড প্রদেশের প্রধান সহর। কুইন্সল্যাণ্ডের আরও উত্তরে আষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ আখের ক্ষেত বিশাল স্থান অধিকার করে আছে।

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের বিষয় কিছু না বল্‌লে আষ্ট্রেলিয়ার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যদি পৃথিবীর কোথাও এখনও পর্য্যন্ত থাকে, তবে সে বোধ হয় এই আষ্ট্রেলিয়াতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার আদিম অধিবাসীরা এখনও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকে। মাতৃগর্ভ থেকে এদেশের নরনারী যে বেশে ভূমিষ্ঠ হয়, জীবনের অবশিষ্ট কটা দিনও এরা সেই ভাবেই কাটিয়ে দেয়। তবে কেউ কেউ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রবিচিত্র করে; কোনও কোনও জাত মাথায়, হাতে বা নাকে কোনও রকম একটা কিছু অদ্ভুত অলঙ্কার পরে; আর দু'একটা জাত যারা সেই প্রস্তর-যুগের সভ্যতা পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে,তারা কটি-বন্ধন-রজ্জুর সঙ্গে সম্মুখের দিকে একটুকরা গাছের ছাল বা খানিকটা লতাপাতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যথেষ্ট লজ্জা-নিবারণ করা হ'য়েছে বলে মনে করে! আজকাল অনেকেই কৌপীনমাত্র পরিধান করে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার চেষ্টা করছে।

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ঠিক কালা আদমী বলা চলে না। তাদের বর্ণ অনেকটা ঘনশ্যাম বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এরা এখনও ভবঘুরের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ী ফেঁদে

বাস করতে শেখেনি। কোনও রকম ধাতুপাত্র বা মৃৎপাত্র এরা ব্যবহার করতে জানেনা সুতরাং নির্ম্মাণ করতেও শেখেনি। এদের কারুরই গৃহপালিত কোনও পশু নেই, কারণ ঠিক যাকে গৃহ বলা যেতে পারে এরকম গৃহও এদের কারুর নেই এবং এরা কোনও গৃহপালিত পশুর আবশ্যকতাও বোধ করেনা।

(ক্রমশঃ)

ভারতের বিদেশী-বাণিজ্য

(অক্টোবর ১৯২৩)

শ্রীমন্ত সওদাগর

বৃটিশ ভারতের অক্টোবর ১৯২৩ সালের বাণিজ্য-তালিকায় দেখা যায় যে এ মাসে আমদানি ও রপ্তানি পূর্ব্বমাস অর্থাৎ ১৯২৩ সেপ্টেম্বর থেকে কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। বে-সরকারি আমদানির মূল্য ১,৮৭ লাখ টাকা বাড়িয়া ২০,৬০ লাখ টাকা হয়েছে। রপ্তানি ১,৯৫ লাখ আর পুন রপ্তানি ১৬ লাখ বাড়িয়া ২৪,৫৭ ও ৯৮ লাখ টাকায় পঁহুছিয়াছে। নিম্নে ১৯২৩ ও ১৯২২ অক্টোবর এবং এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই সাতমাসের মোট হিসাব দেওয়া গেল :—

	অক্টোবর ১৯২৩	অক্টোবর ১৯২২	বেশী (+)	কম (—)
	লাখ	লাখ	লাখ	শত
আমদানি	২০,৬০	২২,৯১	—২,৩১	—১০.১
রপ্তানি	২৪,৫৭	২০,৬৬	+৩,৯১	+১৮.৯
পুঃ রপ্তানি	৯৮	৯৭	+ ১	+১.০

	সাতমাস এপ্রিল হইতে অক্টোবর		বেশী (+)	কম (—)
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শত
আমদানি	১,৩১,১৫	১,৩৩,৪৬	—২,৩১	—১.৭
রপ্তানি	১,৮১,১২	১,৫৫,৫৪	+২৫,৫৮	+১৬.৪
পুঃ রপ্তানি	৮,০৪	৭,৯৭	+ ৭	+ .৯

কারেন্সি নোট সমেত এ মাসে বে-সরকারি অর্থের আমদানি ৪,৭২ লাখ টাকা। আর ১৯২৩ সেপ্টেম্বরে ৩,১০ লাখ এবং ১৯২২ অক্টোবরে ৩.৬৬ লাখ টাকা। নিম্নে সোণা ও রূপার হিসাব দেওয়া গেল :—

	এপ্রিল হইতে অক্টোবর		বেশী (+)	কম (—)
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি সোণা	২০,৪০	২১,৪৪	—১,০৪	— ৫
রপ্তানি ঐ	৫	৪	+ ১	+২৫
আমদানি রূপা	১১,৬৮	৯,৭৮	+১,৯০	+১৯
রপ্তানি ঐ	১,৩৫	২.২৬	— ৯১	—৪০

পণ্যদ্রব্য, অর্থাদি, কৌন্সিল বিল, মুখাঙ্কিত টাকার কাগজ (নোট) ইত্যাদির সর্ব্বসমেত হিসাবে দেখা যায় যে, কয়েক মাসের পর ভারতের দৃশ্যমান বাণিজ্যের পাল্লা বিরুদ্ধবাদী হইয়াছে, অর্থাৎ ১৯২৩ অক্টোবরে বিদেশে আমাদের ৬৪ লাখ টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। গত সেপ্টেম্বরে ভারতের ১,৯৮ লাখ টাকা পাওনা ছিল। আর ১৯২২ অক্টোবরে ৪ ক্রোর টাকা দেনা ছিল। ১৯২৩ এপ্রিল হইতে অক্টোবরে পাওনা হয়েছে ২৬,০০ লাখ, আর গত বৎসর ঐ সাত মাসে পাওনা হয়েছিল ৮,৭৭ লাখ টাকা।

আমদানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—

১৯২২ অক্টোবরের সহিত তুলনায়—

এ মাসে খাদ্যদ্রব্যাদি ও কাঁচা মালের দাম ক্রমিক ৪৬ লাখ ও ৪১ লাখ বাড়িয়া—৪,১৭ লাখ ও ১,৭০ লাখ টাকা হয়েছিল। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির দাম ৩,১৬ কমিয়া ১৪,৪৫ লাখ টাকা হয়েছিল। খাদ্য-দ্রব্যাদির মধ্যে বিশুদ্ধ চিনি ওজনে ১৩০০০ টন ও দামে ৫৭ লাখ বাড়িয়াছিল। কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিন তৈল ১৩ লাখ, তুলা ৯ লাখ, মণি-মুক্তা ৮ লাখ, আর রেশম ৭ লাখ বাড়িয়াছিল। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে কোরা তুলার কাপড় পরিমাণে ১০৪ মিলিয়ন গজ থেকে ৫৪ মিলিয়ন গজে আর দামে ৩,৩৯ লাখ থেকে ১,৭২ লাখে নেবেছিল। ধোয়া কাপড় ৪২ মিলিয়ম গজ থেকে ২৬ মিলিয়ম, আর ১,৫২ লাখ টাকা থেকে ৯৬ লাখ টাকায় নেবেছিল। রঙ্গিন কাপড় ২ মিলিয়ন গজ আর ১১ লাখ টাকার বেশী আমদানি হয়েছিল। কলকব্জা (—৬৫ লাখ), তৈজসপত্র (—১০ লাখ) কাগজ (—৯ লাখ)। এইগুলি উল্লেখযোগ্য কমতি। অধিকন্তু লোহার চাদর ও পশমী কাপড়ের ১৫ লাখ ও ৮ লাখ টাকার বাড়তি আমদানি ছিল।

রপ্তানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—

খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে এক চায়েতেই ১৯২৩ অক্টোবরে ৭,০৪ লাখ অর্থাৎ গেল বছর থেকে এক ক্রোর টাকার বেশী মাল রপ্তানি হয়েছিল। কাঁচা মাল ১,৫৬ লাখ বাড়িয়া ১০,২০ লাখে পঁহুছিয়াছিল, তুলা (+১,৬৪ লাখ) এবং তৈলবীজ (+ ৭২ লাখ) বাড়তি রপ্তানির কারণ। পাট ৮৭ লাখ টাকার কমতি রপ্তানি হয়েছিল। মোট তুলার রপ্তানি হচ্ছে ২৪ হাজার টন ; তার মধ্যে জাপান ও ইটালী—৫,৫০০ টন অর্থাৎ প্রত্যেকে ২৩ শতাংশ নিয়েছিল। যুক্তরাজ্য ৪,৪০০ টন অথবা ১৮ শতাংশ ; আর বেলজিয়াম, ৩,৭০০ টন ও জার্ম্মানী ১,৬০০ টন নিয়েছিল। ৮৯,০০০ টন পাট রপ্তানি হয়েছিল, কিন্তু বিদেশে চাহিদা মন্দ থাকায় গেল বছরের তুলনায় ৬৭ লাখ কমিয়া ২৩৯ লাখ টাকা হইয়াছিল। নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ১২৯ লাখ বাড়িয়া ৭,২০ লাখ হইয়াছিল বাড়তির কারণ ৫৫ লাখ টাকার তুলার দ্রব্যাদি ও ৫০ লাখ টাকার পাটের দ্রব্যাদির অধিক রপ্তানি। সুতা (তুলা) ৪ মিলিয়ন পৌণ্ড ও ৩৪ লাখ টাকার বেশী রপ্তানি হয়েছিল, কারণ ইজিপ্ট ও চায়নায় ভারতীয় তুলার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। চটের থলে ১৯২২ অক্টোবর থেকে এই অক্টোবরে সংখ্যায় ও দামে ৩৬ মিলিয়ন ও ১,৬৪ লাখ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। আর গুণচটও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাড়িয়া ১,৫৯ মিলিয়ম গজ ও ২,৭৩ লাখ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। চট রপ্তানির বেশী ভাগ আমেরিকার যুক্ত রাজ্য, তার পর যথাক্রমে আর্জ্জেন্টিনা, ক্যানেডা, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া লইয়াছিল।

বাণিজ্যে বিদেশের সম্বন্ধ—

১৯২২ অক্টোবরে যুক্তরাজ্য আমদানিতে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের ৬১.৫ ও ১৯২৩ অক্টোবরে ৫৩.০, এবং রপ্তানিতে ঐ ঐ মাসে ২৮.৮ এবং ৩১.২ শতাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জার্ম্মেণী, জাপান, ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য আমদানিতে ও রপ্তানিতে যথাক্রমে ৪.৬, ৬.০ ও ৪.০ এবং ৫.৫, ৪.৫, ১০.৪।

জাহাজের খবর—

এমাসে ২৬৬ খানি জাহাজ ৫৮১ হাজার টন মাল নিয়ে ভারতে এসেছিল, আর ২৭৯ খানি জাহাজ ৬১০ হাজার টন মাল রপ্তানি করেছিল। গত বৎসর ঐ মাসের আনুক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে, আমদানি—জাহাজ ২৯৬, মাল ৫৪২ হাজার টন ; আর রপ্তানি—জাহাজ ২৬৩, মাল ৫৮০ হাজার টন।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

১

আকাশের পূর্ব্বদিক মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। কালো মেঘের ফাঁক দিয়া ঊষার প্রথম স্বর্ণরেখা দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের স্বর্ণমণ্ডিত গম্বুজের চূড়ায় পড়িয়া একটু ঝিক্‌মিকি করিতেছে। চারিদিক এখনও অন্ধকার, মস্‌জিদের লাল পাথরের পূর্ব্বতোরণ-দ্বার প্রভাতালোকে রক্তের মত রাঙা হইয়া ওঠে নাই। পাশ্চমদিকের তারাগুলি ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে, শুধু একটি তারা মিনার-চূড়ার ওপর দপ্‌দপ্‌ করিতেছে।

ভোরের আলো আগুনের শিখার মত কাঁপিয়া কালো মেঘের বুক ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারি দিকে একবার চাহিয়া জুম্মা মস্‌জিদের মিনারের ওপর হইতে মুয়াজ্জিন দিবসের প্রথম নমাজের জন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির বিলাস উৎসব শেষে ভোগশ্রান্ত দিল্লী নগরী সুপ্ত, তাহার আহ্বান নিদ্রিত নগরের স্তব্ধ পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। মস্‌জিদের বাহিরের প্রাঙ্গণে সুপ্ত একচক্ষু মুসলমান ভিক্ষু মির্জ্জা আজানের আহ্বান ধ্বনিতে জাগিয়া মনে মনে আল্লার নাম করিয়া আবার ছেঁড়া কম্বলখানি জড়াইয়া ভাল করিয়া শুইল। লালসাতপ্ত সঙ্গীত-মুখর নূপুর-নিক্কণ ক্ষুব্ধ ভোগ-উল্লাসময় নিশীথ শেষে উৎসব-দীপমালা-নির্ব্বাপিত দিল্লীর হিমশীতল স্তব্ধ ঊষার আকাশে মুয়াজ্জিনের আহ্বান করুণ ক্রন্দনের মত বাজিতে লাগিল।

মস্‌জিদ হইতে কিছু দূরে এক পাথরের বাড়ীতে এক বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক শঙ্কর জাগিয়া ছিল। বাড়ীর ছাদের কোণে একটি ঘরে সে প্রদীপ জ্বালিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। মধ্য-রাত্রে একটি অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; গণনায় এত নিমগ্ন ছিল যে, রাত্রি কখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করে নাই। আজানের আহ্বান-শব্দে সে একবার চমকিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিল। যে তারা লইয়া সে গণনা করিতেছিল, সেটী কখন নিভিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটি উস্কাইয়া দিয়া সে আবার অঙ্কে মন দিল।

এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবকটি কাশীতে শাস্ত্রপাঠ শেষ করিয়া ভারতের সকল তীর্থ দর্শন করিতে করিতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া পর্য্যটন করিয়াছে। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনীতি-জ্ঞান দিয়া ভারতকে সেবা করিবার জন্য সে বহু হিন্দু রাজার সভায় থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিছুদিন পেশোয়া বাজীরাওএর সভায়, কিছুদিন চিতোরের রাণা অমরসিংহের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র ঈর্ষা, হীনতা, একতার অভাব, লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি দেখিয়া রাজনীতি ছাড়িয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মনোনিবেশ করিয়াছে। রাজার সহিত রাজার সম্বন্ধ, প্রতি রাজ্যের লোকসংখ্যা, সৈন্যসংখ্যা ছাড়িয়া, তারার সহিত তারার সম্বন্ধ, তাহাদের দূরত্ব ইত্যাদি গণনা করে। দিল্লীতে সে জয়পুররাজ জয়সিংহের নব-নির্ম্মিত যন্তর-মন্তর দেখিতে আসিয়াছিল। এখানে একজন মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদের সহিত আলাপ হওয়াতে তাহার সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য ও ভাল করিয়া আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখিবার জন্য রহিয়া গেছে। কাশী হইতে নিজের মা ও বোনকে আনিয়া এখন দিল্লীতেই বাস করিতেছে।

দিল্লী দুর্গের নিকট যমুনাতীরে লাল পাথরের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সাদা মার্ব্বেল পাথরের এক ঘরে আর একটি যুবক সারারাত্র জাগিয়া বই পড়িতেছিল। যুবকটি বয়সে তরুণ, মুসলমান ; তাহার মুখখানি আশায় জলজল করিতেছে ; কালো চোখ দুটি স্বপ্নে ভরা ! সে জ্যোতির্ব্বিদ্যা পড়িতেছিল না, ফরাসী ভাষায় লিখিত যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি বই পড়িতেছিল। কয়েকটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে সে রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। ভোরের নমাজ পড়ার আহ্বান শুনিয়া সে ধীরে মখ্‌মলের গালিচা হইতে উঠিল, কিংখাবের

পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরের বারান্দায় বাহির হইল। নীচে যমুনার জল কালো চোখের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। একবার ঊষার আকাশের দিকে চাহিয়া সে নমাজ পড়িল; তার পর আবার ঘরে ঢুকিয়া সমর-বিদ্যা সম্বন্ধে বইখানি তুলিয়া লইল। ঘরের মধ্যে দিল্লীশ্বর আকবরের একখানি সুন্দর তস্‌বীর ঝুলিতেছে। তাহার দিকে একবার ভক্তি-বিমুগ্ধ চোখে চাহিল। সম্মুখে ভারতের একখানি মান-চিত্র পড়িয়া আছে। ভারতের ছবির দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। এ ত এক ভারত নয়, খণ্ড খণ্ড রাজ্যময় কত জাতি ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত, বিদ্রোহঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুদ্ধাগ্নি-দগ্ধ অশান্ত ভারত, কে হিন্দু মুসলমান মিলাইয়া শিখ-জাঠ-রোহিলা-রাজপুত-মারাঠা-মোগলকে এক মঙ্গল সূত্রে গাঁথিয়া এ শতছিন্ন ভারতকে এক শান্তিময় রাজ্য-পাশে বাঁধিবে? সেই অনাগত বীরের প্রতীক্ষায় দুঃখিনী ভারত জাগিয়া আছে। হয়ত সে, কে জানে, হয়ত মোগল-বংশের এই দীনতম সন্তানের কপালে আল্লা মিলন-বিজয় টীকা জ্বালাইয়া দিবেন, এ যুগান্তরের বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ ভালে প্রলয়াগ্নিতে তাহারি নাম জ্বলিয়া উঠিবে। না, নাম সে চাহে না আল্লা, সেই মিলন-প্রয়াস, বীরের দীনতম সহচর হইয়া সে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়। সে হিন্দু হোক, সে মুসলমান হোক, সে শীঘ্র আসুক, সে আজ আসিয়া মহামিলন মন্ত্র-শিখায় এ বিচ্ছিন্ন ভারতের সকল বিরোধ ভস্ম করিয়া দিক।

যুবকটি যখন যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বইখানি শেষ করিল, তখন প্রভাতের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। বইখানি শেষ করিয়া আর একবার সে ভারতের মানচিত্রের দিকে চাহিল। রাত্রির মায়ায় সে যে স্বপ্ন ভাবিয়াছে, প্রভাতের আলোয় তাহা আশ্চর্য্য হাস্যকর বলিয়া তাহার বোধ হইল। মানচিত্রখানি ধীরে মুড়িয়া সে ধীরে ডাকিল—শিরিণ।

দাদা, বলিয়া একটি তরুণী দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ঢুকিল। তরুণী দুই তিনবার পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে উঁকি মারিয়াছে, কিন্তু দাদাকে ডাকিতে সাহস হয় নাই।

শিরিণ, আমি চকে যাচ্ছি, তোর জন্যে কিছু আনতে হবে?

না, দাদা, কিন্তু তুমি বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে যাও।

না, আমায় এক্ষুণি যেতে হবে, তোর কিছু কিনতে হবে?

আচ্ছা, দাদা, যদি সেই রকম সোনার সুতো কিছু নিয়ে এসো, আর কতকগুলা নীলা, তাহলে আমার আসন বোনাটা শেষ হয়।

কার জন্যে এত আসন বোনা—কোন বর এসে বসবে?

যাও, দাদা, না এবার আসনের খুব ভাল একটা নমুনা পেয়েছি, এবার ভাল একটা আসন বুনবো তোমার সিংহাসনের ওপর পাতবার জন্যে!

সিংহাসন—কথাটা শুনিয়া যুবকটির মুখ রাঙা হইয়া গেল। ধীরে বলিল,—না শিরিণ, কোন সিংহাসন আমি চাই না, আমি যা চাই তা বুঝি স্বপ্ন।

ধীরে যুবকটি ঘর হইতে বাহির হইয়া, পাঠান প্রহরীকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিয়া, বেশ বদলাইবার জন্য পাশের ঘরে গেল।

এই মুসলমান যুবকটি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া চাঁদনীচকের দিকে বাহির হইল, জ্যোতির্ব্বিদ যুবকটি তখনও নিবিষ্ট-মনে অঙ্ক কসিতেছে। তাহার গণনা আর শেষ হয় না দেখিয়া, একটি তরুণী দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া একটু ভ্রূকুটি করিয়া ডাকিল—দাদা! দাদাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে যুবকটির কাছে গিয়া লম্বা কোঁকড়া চুলগুলি একটু আদর করিয়া টানিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল—দাদা!

শেষ অঙ্কগুলির ওপর চোখ রাখিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া বলিল—কি, কি চাই?

ওঠ না ছাই।

কেন?

ওঠ, একবার বাজার যেতে হবে।

বাজার? রোস যাচ্ছি, এ অঙ্কটা শেষ করে নি।

ও অঙ্ক শেষ করতে বসলে আজ আর আমাদের হাঁড়ি চড়বে না।

বাজার, রামলালের কি হল?

তার যে অসুখ করেছে—

ও ভুলে গেছলুম—

ওঠ, কাল মা'র একাদশী গেছে, জান ত, কিছু ফল আগে নিয়ে এস—

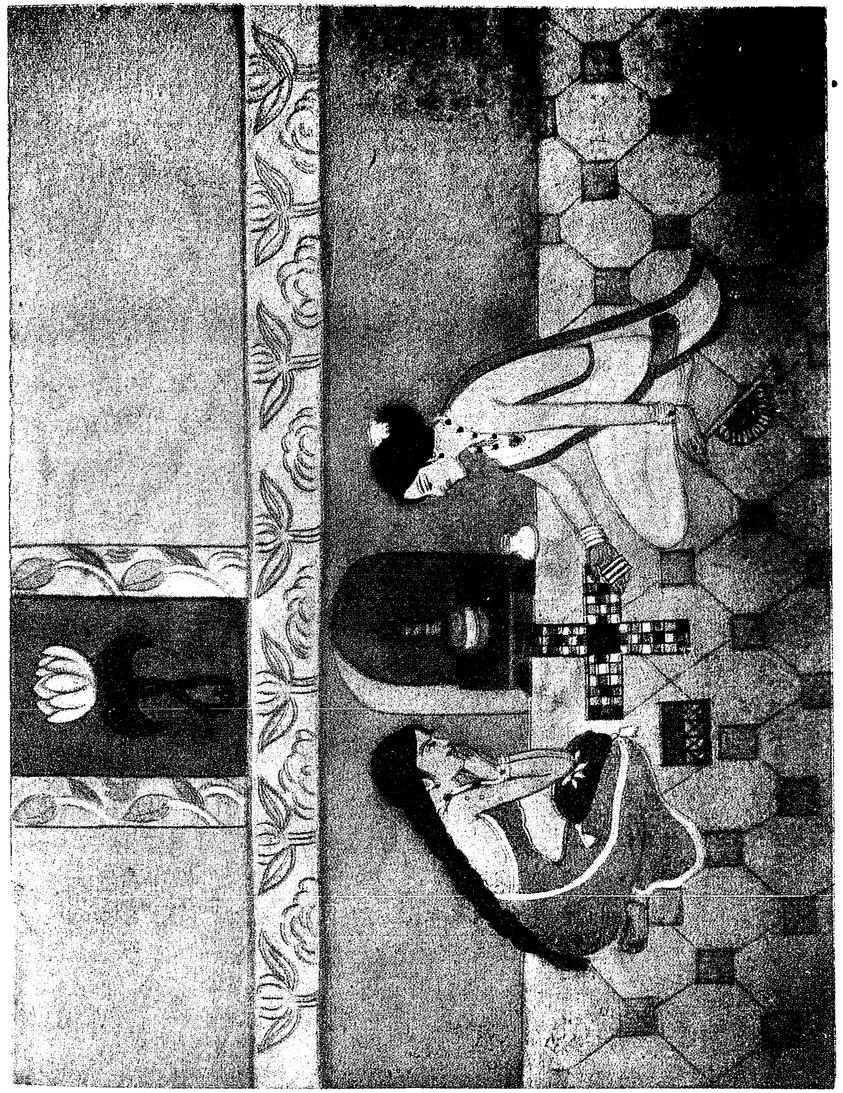

পাশা খেলা

শিল্পী—শ্রীমতী রমা দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

মার একাদশী—কথাগুলি কাণে যাইতেই শঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া বলিল—কি কি আনতে হবে শীগ্‌গীর বল।

যাও, আগে স্নান করে কাপড়টা ছেড়ে এস, বলছি—বলিয়া দাদাকে শুদ্ধ হইতে পাঠাইয়া যমুনা দাদার পুঁথি সাজাইয়া রাখিয়া ঘরটা গোছাইতে লাগিল।

২

দিল্লীর চাঁদনী চক প্রভাতে শান্ত, জনবিরল। এ চক দিনের আলোয় জাগে না, রাতের ভোগ-উৎসবের রোসনাইতে জাগে। তখন এখানে দোকানে দোকানে লাল-নীল ঝাড়ের আলো ঝল্‌মল্ করে, সারঙ্গী বাজে, গান ওঠে, হাসি ওঠে, নর্ত্তকীরা নৃত্য করে; সুরার স্রোতে উল্লাসের স্রোত বয়, সুন্দরীদের কটাক্ষে, ফুলের মালায়, আতরের গন্ধে, নানা রংএর বেশের রংএর ঝল্‌মলানিতে মায়াপুরী হইয়া ওঠে।

আজ সকালে চকে একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। দিল্লীর প্রসিদ্ধা বাইজী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা জামেলা স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকায় চক দিয়া যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছে। পথে লোক কম বলিয়া শিবিকার সোনার ঝালরের পর্দ্দা তুলিয়া দিয়াছে। অনুপম রূপশ্রীতে পথ আলো করিয়া চলিয়াছে। শিবিকা ধীরে যাইতেছে, মাঝে মাঝে থামিতেছে; পথের ফকির ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে দিতে বাইজী চলিয়াছে।

সুনেহরি মস্‌জিদের পাশে বৃহৎ ফলের দোকান। সেই দোকানের পাশে ভিক্ষুক মির্জ্জার দৈনিক বসিবার স্থান। সেইখানে বসিয়া কোরাণ আবৃত্তি করিয়া সে দোকানের প্রতি ক্রেতার কাছ থেকে কিছু আদায় করে। সেই দোকানে শঙ্কর ফল কিনিতে আসিবামাত্র সে তাহার প্রাপ্যটা জানাইয়া একটা উর্দ্দ গান গাহিতেছিল। শঙ্কর আঙুর বেদানা কিনিয়া কিছু আঙুর মির্জ্জাকে দিতে গিয়া অবাক্ হইল। মির্জ্জা অতি অলস আধ-ঘুমন্তভাবে বসিয়া মাথা দোলাইয়া গাহিতেছিল, সহসা সে গান থামাইয়া লাঠি না ধরিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, পথের দিকে চলিল। দোকানের সম্মুখে যে বাইজীর শিবিকা আসিয়াছে তাহা শঙ্কর লক্ষ্য করে নাই। মস্‌জিদের সম্মুখের ভিক্ষুকদলের কোলাহল শুনিয়া, সকলকে উৎসুক শশব্যস্ত দেখিয়া শঙ্কর একবার মুখ ঘুরাইয়া দেখিল, সম্মুখে এক শিবিকায় এক সুন্দরী মুসলমান নারী, তাহাকে দেখিয়া মুখের নীল ওড়না দোলাইতেছে। নিমেষের জন্য তাকাইয়া শঙ্কর মুখ ঘোরাইল। পথের সকলে অনিমেষ নয়নে যাহার দিকে তাকাইয়া আছে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া আর সে দেখিল না। কতকগুলি আঙুর মির্জ্জার বসিবার জায়গায় ফেলিয়া দিয়া সে একটু দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

জামেলা চোখ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মুখের ওপর নীল ওড়না ঢাকা দিয়া সে মির্জ্জার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিল, মির্জ্জা, ও লোকটা কে?

মির্জ্জা তাহার একচক্ষু নাচাইয়া বারবার মাথা দোলাইয়া সেলাম করিতে লাগিল; অর্থাৎ মির্জ্জা বুঝিয়াছে, ও লোকটির সব সন্ধান লইবে, আর কিছু বলিতে হইবে না।

ভিক্ষুকদের তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাইজী শিবিকাবাহকদের একটু তাড়াতাড়ি যাইতে বলিল। শিবিকা আবার প্রায় শঙ্করের পাশে আসিয়া পড়িল। শঙ্কর তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। ব্যথিত ক্ষুব্ধ চোখে জামেলা শঙ্করের সুন্দর দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পাৎলা ছিপছিপে চেহারা যেন আলোর ফোয়ারা, সমস্ত দেহ হইতে যেন কি জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তাহার দেহের তপ্তকাঞ্চনের মত রং যেন আগুনের আভা। সুন্দর পুরুষ সে অনেক দেখিয়াছে; কিন্তু এমন তেজোময় দেহ সে দেখে নাই। নিমেষের জন্য সে তাহার মুখ দেখিয়াছিল, সেই এক নিমেষে যেন তাহার দেহে বিদ্যুতের স্পর্শ হইয়া গেছে। শঙ্কর পাশের এক গলি দিয়া চলিয়া গেল। বিমুগ্ধ নয়নে সে তাহার চলিয়া-যাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

পথের আর সকলে রূপসী জামেলাকে দেখিতে এত ব্যস্ত যে, শঙ্করের দিকে কেহ লক্ষ্য করে নাই। শুধু একটি মুসলমান যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল; জামেলার মত তাহাকে দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করকে দেখিয়া সে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল। এ যেন তাহার কাছে এক নব জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার। এত দিন যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে সহসা এ শুভ প্রভাতে পাইয়াছে।

শরীররক্ষী সৈনিকের কাছে ঘোড়াটা রাখিয়া সে চক ছাড়িয়া শঙ্করের পেছনে পেছনে গলিতে ঢুকিল। মোহাবিষ্টের মত তাহার পিছনে চলিয়াছে। শঙ্করের তেজোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মুখ একবার দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে, এ বিরাট পুরুষটিকে তাহার চাই।

শঙ্কর নিজের বাড়ী আসিয়া ভিতরে ঢুকিতে, সেও তাহার পেছনে পেছনে প্রবেশ করিল। কিন্তু দরজা পার হইয়া ভেতরে ঢুকিয়া শঙ্কর কোথায় গেল খুঁজিয়া পাইল না। পাশে সিঁড়ি দেখিয়া অর্দ্ধেক উঠিয়া সে সম্মুখে এক সুন্দরী তরুণী দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তরুণীটি দ্রুতপদে নামিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সম্মুখে এক তরুণ মুসলমানকে দেখিয়া একটু বিস্মিত একটু ভীত হইয়া আপনার গতিবেগ থামাইল। ভ্রূকুটি করিয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যুবকটির অতি সুকুমার মধুর মুখ দেখিয়া তাহার মুখে কিছু ফুটিল না। কোন বাদশাহের পুত্র স্বপ্নের মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মাথায় হীরা ঝকমক করিতেছে, মুখখানি জলজল করিতেছে, সাঁচ্চার কাজ-করা জামা, সোনালী রেশমের পায়জামা ঝিকমিক করিতেছে। স্বপ্নভরা কালো চোখদুটির দিকে চাহিয়া সে মুখ রাঙা করিয়া বিমুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকটি তাহার চেয়েও আশ্চর্য্য হইয়া তরুণীর মুখের দিকে চাহিল, বাদশাহের রঙ্গমহলে, দিল্লীর অনেক আমীর-ওমরের উৎসব-গৃহে সে অনেক সুন্দরীকে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন নির্ম্মলোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি দেখে নাই। নীলবসনমণ্ডিতা তরুণীর তনুবল্লরীর সম্মুখে ধীরে মাথা নত করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দরজা পার হইয়া পথে বাহির হইয়া গেল। কেন সে এখানে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সে ভুলিয়া গেল শুধু প্রভাতের নির্ম্মল নীল আকাশের দিকে চাহিয়া এক মধুর মুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে আনমনে চলিয়া গেল।

৩

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কুতবমিনারের নিকট এক ভাঙা মস্‌জিদের ওপর বসিয়া শঙ্কর সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল। চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশ ধ্বংসের স্তূপ—কত মর্ম্মর-প্রাসাদ, কত মসজিদ, কত দুর্গ, কত রাজার সমাধি ধূলার সহিত ধূলা হইয়া গিয়াছে। মহাকালের কলকল্লোল যেন এ ধূলায় স্তব্ধ, কত শতাব্দীর ভারত ইতিহাসের ধারা এই ভগ্নস্তূপের মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এই চিরবিজন চির-উদাস স্থানে শঙ্কর মাঝে মাঝে একা আসিত।

আজ সে একা নহে, তাহার পাশে এক তরুণ রাজপুত বসিয়া। এ রাজপুত যুবকটি দিল্লীতে তাহার বাড়ীর নিকট হইতে তাহার সঙ্গ লইয়াছে, এবং তরুণ প্রাণের উচ্ছ্বাসে তাহার মন জয় করিয়াছে। সমস্ত পথ তাহারা নানা গল্প করিতে করিতে আসিয়াছে; কিন্তু এই ভাঙা মস্‌জিদের ওপর সন্ধ্যার আলোয় দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্তর কোণে দিল্লীর ওপর মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় সেগুলি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর সেইদিকে উদ্দীপ্ত মুখে চাহিয়া বসিয়া ছিল; তাহার চোখমুখও যেন জ্বলিতেছিল। রাজপুত যুবকটি তাহার মুখের দিকে একটু বিস্মিত ভাবে চাহিতে, সে বলিল—দেখতে পাচ্ছ?

কি?

চিতানলশিখা, দেখছ না; শ্মশানের ওপর চিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। ওই যে দিল্লীর ওপর ভয়ঙ্কর রাঙা মেঘে আতঙ্কিত আকাশ দেখছ, আকাশ ওর চেয়েও ভীষণ হয়ে উঠবে—দেখছ না, বিলাসিতা ভোগের আগুন, লালসা কামের আগুন জ্বলছে,—একটা রাজত্ব, একটা সভ্যতা জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে—ওই মোগলসাম্রাজ্যের শ্মশানশয্যার ওপর প্রলয়ের লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা ওই রাঙা মেঘের মত আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠবে—তারপর সব ছাই, ছাই হয়ে যাবে;—এই চারিদিকে যেমন ভগ্নস্তূপ দেখছ, ওই দিল্লীও একদিন এক সাম্রাজ্যের সমাধি-শ্মশান হয়ে থাকবে—

তার পর?

তারপর অরাজকতা, অমানিশার অন্ধকার—

আমি কিন্তু দেখছি, নব অরুণোদয় হচ্ছে—

কোথায়?

ভারতের চারিদিকে—আজ মহাশক্তির ভূমিকম্পে যদি মোগল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে, মোগলমহিমাধ্বজা যদি ধূলায় লুটায়,—কিন্তু ভারতের চারিদিকে মহান পর্ব্বত-চূড়ার মত কি নব নব শক্তি জাগছে না? নব নব জাতি ওঠেনি? রাজপুত জেগেছে, মারাঠা জেগেছে, শিখ জেগেছে—এ দিল্লী যদি ছাই হয়ে যায়, সেই শ্মশান-ভস্মের ওপর নতুন দিল্লী উঠবে। সে দিল্লী শুধু মোগলের দিল্লী নয়, সে শিখ-জাঠ-রোহিলা-রাজপুত-মারাঠা মোগলের যুক্ত অসির ওপর গড়ে উঠবে—

তুমি স্বপ্ন দেখছ—শুনতে পাচ্ছ, এ দিল্লীর ওপর শবলুব্ধ শকুনিদলের মত কারা ছুটে আসছে! মাঝে মাঝে আমি দিল্লীর পথে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই,—আমি শুনতে পাই, দিকে দিকে নবজাগ্রত শক্তিদের সৈনিকদলের পদভরে ভারত কেঁপে ব্যথিত হচ্ছে—দিল্লীর পথ ধরে তারা ছুটে আসছে—আমি শুনতে পাই, ঘোড়ার খুরের অবিশ্রাম শব্দ, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, রক্তের কল্লোল—মসজিদ ভেঙ্গে আগুন জ্বালিয়া রক্তের স্রোত ব'য়ে প্রতিহিংসা নিতে শিখ আসছে, 'হর হর' শব্দে ঘোড়া হাঁকিয়ে রাজ্যলাভের জন্য রাজপুত আসছে, মারাঠা ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নবশক্তি পরীক্ষা করবার জন্য আসছে—

কিন্তু সে বীর কি আসবে না, যে সমস্ত শক্তি এক করে দিল্লীতে শান্তি আনবে—

দেখ, ওই দূরে কে যেন গেল—ওই ভাঙা সমাধিটার পাশ দিয়ে কে গেল, এক নারীর মত—

আমি মাঝে মাঝে এখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিছি, এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কে নারী ঘুরে বেড়াচ্ছে—নিমেষে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়—মনে হয়, যেন অনাথিনী বিষাদিনী দিল্লীমাতা তাঁর কোন বীরসন্তানের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—

তরুণ যুবকের করুণ স্বপ্নময় মুখখানির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল—কে তুমি রাজপুত?

গুরু, আমি আপনার শিষ্য, বলিয়া যুবকটি শঙ্করের পদধূলি লইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

গুরু নয়, বল বন্ধু, বলিয়া শঙ্কর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না, আসুন, আপনাকে দেখাচ্ছি, বলিয়া যুবকটি শঙ্করের হাত ধরিয়া ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোথায় লইয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

নূতন শিল্প সৃষ্টি

আজকাল বাজারে (মনোহারীর দোকানে, পানের দোকানে, বিড়ির দোকানে, বেণেতি মশলার দোকানে এবং আরও নানা স্থানে) একটী নূতন জিনিস সকলেরই বোধ হয় নজরে পড়িয়াছে। জিনিসটি বিশেষ কিছুই নয়—দেওয়ালে টাঙানো এ্যালম্যানাকের মত পুরু কার্ড-বোর্ডে একখানি সুরঞ্জিত সুন্দর ছবি, এবং সেই কার্ড বোর্ডের গায়ে সেলাই করা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশির মত বারোটি টিউব শিশি। শিশিগুলির গায়ে রংচঙে লেবেল, এবং ভিতরে একটু একটু আতর বা এসেন্স। শিশির মাথায় একটী পিতলের কিম্বা পিতলের ন্যায় ব্রোঞ্জ রং করা টিনের টুপি। গন্ধ দ্রব্যটির তীব্রতা বা অনুগ্রতার হিসাবে এই জিনিসটির দামের ইতর-বিশেষ হয়।

নানা রকম আতর আপনারা নিশ্চয়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আতর রাখিবার নানা প্রকার শিশিও নিশ্চয়ই আপনাদের ঘরে আছে। হোমিওপ্যাথিক টিউব শিশি বা ঐ ধরণের অন্য রকম শিশিও আপনাদের মধ্যে অনেকেই নানা সূত্রে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কার্ড-বোর্ডের সচিত্র এ্যালম্যানাকও ইংরেজী বৎসরের শেষ ভাগে ও নববর্ষের প্রারম্ভে কিছুদিন পর্য্যন্ত অনেকেই উপহার পাইয়া ও দিয়া থাকেন। এখন, এই কয়েকটি শ্রেণীর জিনিস লইয়া একত্র করিয়া একটী নূতন শিল্প বিরচিত হইল। প্রথমে একজন বুদ্ধি খাটাইয়া এই শিল্পটির প্রবর্ত্তন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে অপরে তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই জিনিসটি বাজারে চলিয়া

গেল, এবং ক্রমে একটী স্বতন্ত্র নূতন শিল্পে পরিণত হইল। এইরূপে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন শিল্প-দ্রব্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এই ধরণের নূতন নূতন শিল্প লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই টিঁকিয়া যাইতেছে। নচেৎ দুই চারি দিন পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

নিজের মন দিয়া অনেক স্থলেই অপরেরও মনের ভাব কতকটা বুঝা যায়। কারণ, মানুষের চিন্তা-প্রণালী, সৌন্দর্য্যানুভূতি, প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি অধিকাংশ স্থলেই প্রায় এক রকম,—ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক হইলেও মানুষের মনের ভাবের অনেক সময়ে ও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, সৌন্দর্য্য শিল্পের প্রাণ। লোকে প্রথমে চোখ দিয়া শিল্পের সৌন্দর্য্য বিচার করে, তার পর তাহার গুণের পরিচয় লয় ও মূল্য নির্দ্ধারণ করে। "আগেতে দর্শনধারী, পিছেতে গুণ বিচারি।" শিল্পের সৌন্দর্য্য মানুষের চোখে লাগিলেই তাহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

একটী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটিয়া থাকিলে অধিকাংশ লোকই তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। এস্থলে জাতি, বর্ণ ভেদ নাই, দেশ-ভেদও নাই। সকল জাতীয় সকল বর্ণের এবং সকল দেশের লোকই সুন্দর গোলাপ ফুলটিকে সুন্দর দেখিয়াই মুগ্ধ হইবে। তেমনি একটী সুন্দর শিল্পদ্রব্য দেখিয়া লোক মাত্রেই মুগ্ধ হয়। মানুষের প্রকৃতিই এই রকম।

এখন, মানব-মনের এই সাধারণ ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনী-শক্তিশালী শিল্পীরা নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অবশ্য সকল স্থলেই যে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যই শিল্পের প্রধান অবলম্বন, তাহা নহে। জিনিসটির ব্যবহার্য্যতাই তাহার প্রধান গুণ। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও তাহাকে সৌন্দর্য্য দান না করিলে তাহা রীতিমত শিল্প-দ্রব্যে পরিণত হইবে না।

আপনাদের মধ্যে যাঁহাদের কল্পনা-শক্তি আছে, উদ্ভাবনী-শক্তি আছে, কাজ আটকাইলেই যাঁহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন না, কার্য্যোদ্ধারের জন্য যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া একটা না একটা সদুপায় স্থির করিতে পারেন, আমি তাঁহাদের উদ্দেশে বিশেষ ভাবে বলিতেছি, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন দেখি, নূতন কোন্ জিনিস তৈয়ার করিলে আমাদের দেশের লোকের খুব কাজে লাগিবে, এবং তাহাকে কি ভাবে লোকের সামনে ধরিলে তাহারা না কিনিয়া থাকিতে পারিবে না? কিম্বা কোন্ পুরাতন শিল্প-দ্রব্যকে কিরূপ নূতন আকার দিলে লোকের বেশী পছন্দ হইবে, তাহারা পুরাতন ছাড়িয়া নূতন আকারেই তাহার বেশী আদর করিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই মাথায় নূতন নূতন ফন্দী গজাইবে, আপনারা নূতন নূতন শিল্পের উদ্ভাবন ও প্রচলন করিতে পারিবেন।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আর দুই একটা দৃষ্টান্ত বিচার করিয়া দেখা যাক। পূর্ব্বেকার কাপড়-কাচা ড্যালা সাবানের বদলে আজকালকার চৌকা, মার্কামারা রঙ-বেরঙের সাবান কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহা বোধ হয় আমি একবার আপনাদের বলিয়াছি। আল্‌তা মান্ধাতার আমল হইতে আমাদের দেশের মা লক্ষ্মীরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে তুলার চাকতী লাক্ষারসে ছোবাইয়া শুকাইয়া লইয়া আল্‌তা প্রস্তুত করা হইত; আজকাল তরল আল্‌তার বহুল প্রচলনের ফলে তুলার নুটির আল্‌তার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, তাহাও বোধ হয় আজকাল সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। এমন কি, নাপিতানীরাও আজকাল তুলার চাকতির পরিবর্ত্তে তরল আল্‌তা ব্যবহার করা বেশী সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিতেছে; এবং তাহাদের চুবড়ীর ভিতর তরল আল্‌তার শিশিও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের দেশে যাঁহারা একটু বেশী রকম সাহেব-ঘেঁষা, সাহেবী চালচলনে অভ্যস্ত, এবং সাহেবদের দোকানে জিনিসপত্র কিনিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, সাহেব-মেমদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এক একটা কাজের উপযোগী প্রায় সব জিনিস একসঙ্গে একটী বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ধরুন, ক্ষৌর কার্য্যের জন্য ক্ষুর চাই, শেভিং সোপ চাই, শেভিং ব্রাস চাই, নখ ঘষিয়া ঝক্ করিবার জন্য একটী উকার মত জিনিস দরকার। এ সব জিনিসই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা

প্রস্তুত হইয়া বাজারে আমদানী হয়, এবং প্রত্যেকটি জিনিস স্বতন্ত্র ভাবে কিনিতে পাওয়া যায়। একজন লোক বুদ্ধি খাটাইয়া এই সব জিনিস একত্র করিয়া একটী বাক্সের মধ্যে ভর্ত্তি করিলেন। বাক্সটি এমন ভাবে তৈয়ার করিলেন, যাহাতে ক্রেতার ব্যবহারের সুবিধা হয়; এমন কি, দেশ ভ্রমণকালে তাহা সহজে সঙ্গে লওয়া চলে। বাক্সের ভিতর প্রত্যেক জিনিসটি রাখিবার জন্য তাহার আকার অনুযায়ী খাঁজ কাটা হইল বা খোপ তৈয়ার হইল। বাক্সটি দেখিতেও সুন্দর হইল। তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হাতল প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা করা হইল। এমন কি একটী কল বসাইয়া চাবি দিবার বন্দোবস্তও বাকী থাকিল না। ক্রেতা সব জিনিসগুলি এক যায়গায় সুসজ্জিত অবস্থায় পাইয়া খুসী হইলেন। সুন্দর ও ব্যবহারোপযোগী বাক্সটি পাইয়া তিনি কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

আবার দেখুন, মেম সাহেবরা সেলাইয়ের কাজে, বোনার কাজে অতি সুনিপুণা। সেলাইয়ের জন্য সূচ, সুতা, কাঁচি, সেলাইয়ের সময় আঙুলে পরাইবার পিতলের বা এ্যালুমিনিয়ামের টুপি, ক্রুসের কাঁটা প্রভৃতি অনেক জিনিস দরকার হয়। এই সমস্ত জিনিসই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু সাহেবদের দোকানে এই সব জিনিস (স্বতন্ত্র ভাবে একেবারেই যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে, কিন্তু) প্রায়ই একসঙ্গে একটী বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহার সাধারণ নাম work box। Work box বলিলেই তাহারা প্রায় সব সরঞ্জামে সজ্জিত একটী সুন্দর বাক্স আপনাকে দিবে। বাক্সটি এমন ভাবে তৈয়ারী যে, সব জিনিস রাখিবার উপযুক্ত খাঁজ কাটা স্থান তাহাতে থাকে। কোন জিনিস হারাইবার বা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। গুছাইয়া রাখিলে যখনই যে জিনিসটার দরকার, তখনই সেই জিনিসটি পাওয়া যায়।

আরও দেখুন, দাঁত মাজিবার সরঞ্জাম। টুথ ব্রাস, টুথ পিক, টুথ পাউডার, টুথ পেষ্ট প্রভৃতি সমস্ত দাঁত মাজিবার ও মুখ ধুইবার সরঞ্জাম একত্র করুন। সেগুলিকে একটী সুদৃশ্য বাক্সের মধ্যে সুন্দর ও ব্যবহারের সুবিধাজনক ভাবে সাজাইয়া বিক্রয়ার্থ ক্রেতার চোখের সামনে ধরুন। আপনি যদি বাক্সটির ডিজাইন ভাল রকম করিতে পারেন, বাক্সটি যদি সুদৃশ্য ও লোভনীয় হয়, তাহার ভিতরকার জিনিসগুলি যদি সুন্দর ভাবে ও সহজে ব্যবহারোপযোগী করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা তাহা কিনিবেই।

এইরূপ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জিনিস ছাড়াও আরও অন্য অনেক জিনিস বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বিক্রয় করা যায়। সে ক্ষেত্রে বাক্সটি কেবল দেখিতে সুন্দর হইলে চলিবে না, তাহার ভিতরকার জিনিস ব্যবহার করিতে করিতে ফুরাইয়া গেলেও যাহাতে বাক্সটিকে অন্য রকমে ব্যবহার করা যায়, এমন ভাবে সেটী তৈয়ার করা আবশ্যক। এ রকম জিনিসও বিলাতী অনেক পাওয়া যায়। সাবানের কাগজের বাক্স তেমন টেঁকসই নয়। তবু সাবান ফুরাইয়া যাইবার পর খালি বাক্সেও অনেকে অনেক জিনিস রাখিয়া থাকেন, এবং যত দিন তাহার পরমায়ু থাকে, তত দিন তাহা এই ভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন, সাবানের কাগজের বাক্সের পরিবর্ত্তে যদি সুরঞ্জিত কাঠের বাক্স ব্যবহার করা যায় (যেমন বাক্স এক সময়ে জাপানী দামী সাবান রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখিতাম), তাহা হইলে সাবানের উপর বাক্সটিও ক্রেতার পক্ষে স্বতন্ত্র একটী প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, এবং তিনি সে জন্য কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতেও কাতর হন না। কারণ, সাবান ফুরাইয়া যাইবার পর তিনি নিজে উহা অন্য কাজে ব্যবহার করিতেও পারেন, অন্ততঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর বাক্সটিতে তাহাদের পুতুল, খেলনা, অথবা নানাবিধ শিশু-সুলভ গোপনীয় জিনিস রাখিতে পারে। এরূপ বাক্স পাইলে শিশু-চিত্ত যে খুব খুসী হয়, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

এবার কালীপূজার সময় এই বুড়া বয়সে আমি নিজেও একটুখানি এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়াছিলাম, এবং আমার মত আরও অনেকে যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলাম। চরকাবাজী হাতে করিয়া ঘুরাইবার জন্য সাধারণতঃ বাঁশের চেয়াড়ীর কাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবার একজন বাজীওয়ালা বুদ্ধি করিয়া মেম সাহেবদের হ্যাট-পিনের মত ছোট ছোট পিন ব্যবহার

করিয়াছিলেন। সে পিন অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন, এবং হয় ত ব্যবহারও করিয়াছেন। একটী চারি-পাঁচ অঙ্গুলী পরিমাণ বড় ছুঁচের মাথায় ছিদ্রের পরিবর্ত্তে কাচ, বা চীনা মাটীর মাঝারি আকারের একটী পুঁতি পরাইয়া দিলে যাহা হয়, এ পিনও তাহাই। শুধু ঐ পিনটির লোভেই আমি চরকাবাজী অনেকগুলি কিনিয়াছিলাম, এবং বাজী পোড়ানো হইয়া যাইবার পর পিনগুলির জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম; এবং দেখিয়া খুব আমোদও পাইয়াছিলাম। বোধ হয় আরও অনেকের আমার মত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

বিবাহের সময় কনে-বধূকে উপহার দেওয়া আজকাল একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর পাকস্পর্শ বা বৌভাতের দিন বরের বন্ধুরা বৌয়ের মুখ দেখিবার সময় নগদ টাকা না দিয়া প্রায় কিছু উপহার দেন। বেশীর ভাগ লোকে স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসাদি দিয়া থাকেন, কেহ কেহ অন্য শ্রেণীর উপহারও দেন। আমি বলি, ঐ রকম একটী বাক্সের মধ্যে নব-বধূর ব্যবহারোপযোগী এসেন্স, আতর, সাবান, পাউডার, রুজ, তরল আলতা, পমেটম, মাথার কাঁটা, স্নো, প্রভৃতি জিনিস দিয়া এক একটী উপহার বাক্স সাজাইলে, কিম্বা বধূর যদি সূচি-শিল্প জানা থাকে, তবে work boxএর মত কোন বাক্স সাজাইয়া দিলে, অন্ততঃ বিবাহের মরসুমে তাহা বেশ বিক্রয় হইতে পারে। ভিতরকার জিনিসগুলি অবশ্য বাজার হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল বাক্সটি তৈয়ার করাইতে হইবে, এবং সাজাইবার কৌশল চাই। বাক্সটি দেখিতে সুদৃশ্য হইলে, ব্যবহারোপযোগী ও মজবুত হইলে, এবং মনের মত করিয়া জিনিসগুলি সাজাইতে পারিলে, বিক্রয়ের জন্য ভাবিতে হইবে না—এরূপ জিনিসের ক্রেতা অনেক মিলিবে।

বিলাতী ব্যবসায়ীরা কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ কয় প্রকার জিনিস বাক্সবন্দী করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ছেলেমেয়েদের স্কুলের সরঞ্জাম, যথা শ্লেট পেনশিল, লেড পেনশিল, কলম, কালীপূর্ণ দোয়াত বা খালি দোয়াত ও কালীর ট্যাবলেট, ইরেজার, ব্লটিং ও রাইটিং প্যাড, এক্সারসাইজ বুক প্রভৃতি স্কুলে ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস একসঙ্গে একটী বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। আর্টিষ্টদের রং, তুলি, drawing pencil, crayon pencil ও অন্যান্য সরঞ্জাম একত্র বাক্সের মধ্যে পাইবেন। Surveyor বা আমীনদিগের সরঞ্জাম, যথা, compass, কাঁটা, tape, level প্রভৃতি বাক্সবন্দী হইয়া বিক্রয় হয়। এমনি খুঁজিলে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। বুদ্ধিতে আপনারা কোন জাতির অপেক্ষা খাটো নন। এখন ভাবিতে শিখুন। ভাবিতে শিখিলে অনেক নূতন ব্যবসায়ের ফন্দী আপনাদের মাথায় গজাইতে পারে।

শিল্পে ভারতের বৈশিষ্ট্য

কলকারখানার কথা উঠিলেই আমরা ইয়োরোপীয় সমাজের মুখপত্র এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির মুখে, এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কেবল ইয়োরোপীয়গণের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র করিতে জানেন, আর কিছুই জানেন না, তাঁহাদের মুখে, শুনিতে পাই যে, ভারতবাসী আমরা কৃষি-প্রধান জাতি। আমরা শিল্পী নই, কলকারখানা স্থাপন করা আমাদের ধাতে সহে না। এদেশে কলকারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র। আমরা কেবল ধানের চাষ করিয়া বিদেশীদের মুখে অন্ন যোগাইয়া দিব; আমরা পাটের চাষ করিব, সেই পাট সস্তায় কিনিয়া ইয়োরোপীয়রা বড় বড় পাটের কল বসাইয়া সুতা ও গুণ-চট, থলে প্রস্তুত করিয়া তাহাদের স্বদেশে বিদেশে চালান দিবে; আমরা তুলা উৎপাদন করিয়া দিব, সেই তুলা বিদেশে গিয়া সুতা ও বস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিবে। আমার মনে হয়, এই ধরণের কথা বলিয়া আমাদিগকে দমাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। এদেশে কলকারখানা বসিলে যাঁহাদের স্বার্থহানি হইবে, তাঁহারা স্বার্থহানির আশঙ্কায় এইরূপ মিছামিছি আমাদিগকে ভয় দেখান মাত্র। এত বড় দেশ ভারতবর্ষ,—যাহাকে মহাদেশ বলিলেই হয়, এবং বলাও হইয়া থাকে, যেখানে মহাদেশের সকল লক্ষণ বিদ্যমান, পৃথিবীর সকল দেশের ঋতু, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সংস্থান যে দেশে বিদ্যমান, সে দেশে কলকারখানা স্থাপনের চেষ্টা বৃথা শক্তিক্ষয়—এ কথা আমি বিশ্বাসও করি না, স্বীকারও করি না। ভারতে কলকারখানা স্থাপন করা যদি পণ্ডশ্রমই হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপীয়েরা এদেশে

আসিয়া বড় বড় পাটের কল, কাপড়ের কল, তেলের কল, ময়দার কল, কাগজের কল, লোহার কারখানা স্থাপন করেন কোন্ সাহসে?

ভারতের প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই জাতি শিল্পী নহেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? হিন্দুদিগের কথাই বলি। হিন্দুরা ছত্রিশ জাতি, এবং বোধ হয় আরও অনেক উপজাতিতে বিভক্ত। হিন্দুদের চারিটী বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—মানব-জীবনের চারিটী প্রধান কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। তার পর, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, সোণার প্রভৃতি এক এক জাতি এক একটী বিশেষ শিল্প লইয়া পুরুষানুক্রমে চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইয়োরোপীয়দের মতে যে দেশ কৃষি-প্রধান, সেই দেশের অন্যতম প্রধান অধিবাসী হিন্দুদের মধ্যে চাষা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জাতি নাই। আমার মনে হয়, আমরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীজাতি; শিল্পমূলক জাতিভেদ প্রথা প্রধানতঃ তাহারই পরিচায়ক। আমার আরও মনে হয়, হিন্দুদের প্রত্যেক জাতিই এক একটী শিল্প পেশা স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং সকলেরই প্রায় দুই দশ বিঘা করিয়া জমি থাকিত; তাহাতে তাঁহারা চাষ বাস করিতেন। শিল্পই তাঁহাদের মুখ্য অবলম্বন, এবং কৃষিকার্য্য গৌণ ব্যাপার ছিল। তাই অন্য সকল শিল্পের উপলক্ষে এক একটী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চাষা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জাতির সৃষ্টি হয় নাই।

আর এক দিক দিয়া দেখিলেও কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়। প্রকৃতি দেবী ভারতবর্ষকে মানবের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থেই বঞ্চিত করেন নাই। ভারতের ক্ষেত্রে, ভারতের অরণ্যে, ভারতের ভূগর্ভস্থ খনিতে প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়। যে দেশে যে ভূষি মাল (raw material) উৎপন্ন হয়, সেই দেশের লোকেরা তাহার ব্যবহার জানিবে, এবং সেই দেশেই সেই সকল পদার্থ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া তদ্দেশবাসীর ব্যবহারে আসিবে, ইহাই স্বাভাবিক। তবে ভারতবর্ষের বেলাই বা এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন, তাহা কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? ভারতবাসীরা যে খনি-বিদ্যায় ওস্তাদ ছিলেন, এ তত্ত্ব আজকাল ভারতীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতরা আমাদের প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া বাহির করিতেছেন। সুতরাং ধাতু-শিল্পে ভারতবাসী আনাড়ী নহেন, হইতে পারেন না। ভারতের ইস্পাত-শিল্প যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহাই এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তার পর বস্ত্রশিল্প। কলে সস্তায় চলনসই গোছের সুদৃশ্য বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শিল্পীর হাতের গুণের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তাহা প্রাণহীন শিল্প। কিন্তু ভারতের তাঁতীর হাতে তাঁতে বোনা কাপড় জীবন্ত, প্রাণময় শিল্প। তাহার অনুকরণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই, হইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য শিল্পের সম্বন্ধেও এই কথা। সুতরং ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ মন্তব্য কতদূর সমীচীন, তাহা বুঝা কিছুমাত্র কঠিন নহে।

এ ত গেল হিন্দুদের কথা। তার পর ভারতের অন্যতম প্রধান অধিবাসী মুসলমানদিগের কথা। মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমি বিশেষ কিছু জানি না; মুসলমান সমাজে শিল্পের প্রভাব কতখানি, তাহার ঠিক ধারণা আমি করিয়া উঠিতে পারিব না। তবে মুসলমান সমাজের বাহিরে থাকিয়া কেবল প্রতিবেশী হিসাবে যতটুকু ধারণা করা যায়, আমি কেবল সেইটুকুই বলিতে পারি। এবং আমার মনে হয়, হিন্দুদের অপেক্ষা তাঁহারা শিল্পে কোন অংশেই কম নহেন। তাজমহলের কল্পনা যাঁহারা করিতে পারেন, দিল্ল আগ্রার ন্যায় সহর যাঁহারা গড়িতে পারেন, সৃষ্টির সুন্দর শ্রেষ্ঠ মনোহর সুকোমল পুষ্প হইতে ততোধিক সুকোমল আতর যাঁহারা আহরণ করিতে পারেন, যে সমাজের মহিলারা চারুচিকণ শিল্পে অদ্বিতীয়া, গজদন্ত শিল্পে যাঁহাদের তুলনা মিলে না, তাঁহারা শিল্প-প্রচেষ্টায় পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাতির অপেক্ষা কম কিছুতেই হইতে পারেন না। সেই হিন্দু-মুসলমান-অধ্যুসিত ভারতে কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বাধা দিতে চাহেন, স্তোক বাক্যে যাঁহারা আমাদিগকে ভুলাইতে চাহেন, তাঁহারা যে আমাদের কতবড় হিতৈষী, সে কথা আমরা না বুঝিলে, সে কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে, সর্ব্বনাশ আমাদেরই। আমরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী জাতি, ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন কৃষক, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিষ্ফল,—এ

সকল কথা অর্থহীন, স্বার্থ-প্রণোদিত বাজে কথা মাত্র। এ সব কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে।

বস্তুতঃ, শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ভারতবাসী যে আর উদাসীন নহে, ভারতীয় শিল্পীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যে ভাঙিয়াছে, তাহার লক্ষণও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এই যে সে দিন বিলাতে ইম্পীরিয়াল কনফারেন্স ও ইম্পীরিয়াল ইকনমিক কনকারেন্স হইয়া গেল, সেখানেও শিল্পীভারতের জাগরণের লক্ষণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণের মুখে মহাতঙ্কের আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতের নষ্ট শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ভারতের বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিতে হইবে। তবে, আমরা আগেকার মত গৃহশিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিব, কিম্বা আধুনিক কালের উপযোগী কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিব, সে স্বতন্ত্র কথা। যদি শ্রীভগবান দিন দেন, তবে আর এক দিন সে কথার আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর—বাৎসরিক ক্যাম্পিং

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মজুমদার

এই বৎসর উক্ত Corpsএর Annual camp training কাঁচড়াপাড়ায় হইয়াছিল এইরূপ Camp-training প্রত্যেক বৎসরেই একবার করিয়া, ১৫ দিনের জন্য হয়।

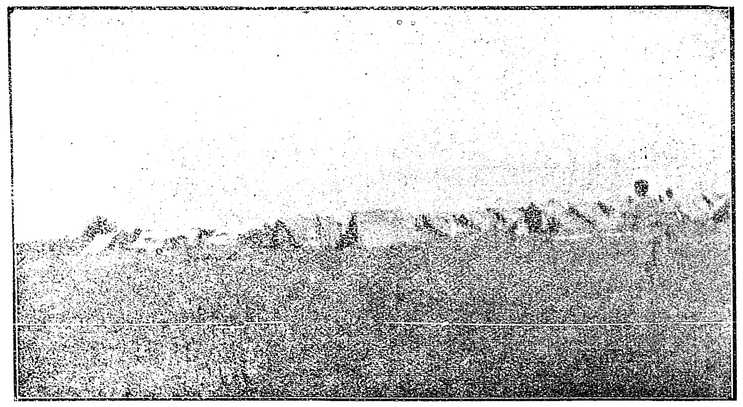

দূর হইতে ক্যাম্পের দৃশ্য

এই বৎসর training 3rd Nov হইতে 17th Nov পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আমাদের কয়েকজন বন্ধু, যাঁহারা trainingএ ছিলেন, আমরা জন চারেক তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

ওখানে বেলা দুইটার সময় পৌঁছান গেল, এবং গিয়ে দেখি যে, তখন সব সেদিনের মত ছুটি পেয়েছে।

তার পর সব বেড়িয়ে দেখা গেল, কি রকম ব্যাপার Camp-training জিনিষটা। তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত দিনের কাজের routine একটা লিখে নেওয়া গেল।

ভোর ৫৷৷০ টার সময় Quarter guard Commander সকলকে উঠিয়ে দেবার জন্যে চেঁচিয়ে সকলকে জাগিয়ে দেন। উঠে সব Physical drillএর জন্যে Civil-dress কর্ত্তে হয়। তার পর ৬৷৷০টা হইতে ৭৷৷০টা পর্য্যন্ত Physical drill এবং bayonet fighting শেখান হয়। ৭৷৷০টা হইতে ৮৷৷০ পর্য্যন্ত morning tea। ৮৷৷০টা থেকে ৯টার ভিতরে full uniform পরে নিতে হয় এবং ৯টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত Parade কর্ত্তে হয়।

১২টার পর থেকে ২টার মধ্যে স্নানাহার ইত্যাদি এবং দুইটার পর থেকে সকলের ছুটি ৪টা পর্য্যন্ত এবং কোন কোন datoonএর long range firing হয়।

তার পর ৪টে থেকে ৭৷৷০টা পর্য্যন্ত খেলাধূলা এবং আমোদ আহ্লাদ ইত্যাদি।

এটা কেবল যাদের Night guard duty আছে তারা ছাড়া আর সকলের পক্ষে Compulsory.

তার পর ৮টার সময় রাত্রির ভোজন এবং ৯৷৷০ টার সময় শুয়ে পড়া।



দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম

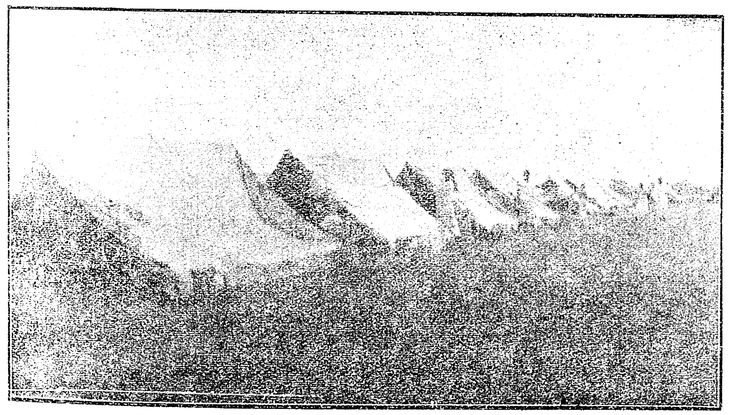

ক্যাম্পের দৃশ্য

আর ১০টার সময় আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়া।

এই ১৫ দিনের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটি হচ্ছে —কৃত্রিম যুদ্ধ। নিকটের একটা গ্রাম একদল আক্রমণ করতে গিয়েছে, আর এক দল গ্রাম রক্ষা করছে। আর একটা হচ্ছে G. O C. General Wilsonএর visit এবং সমস্ত পরিদর্শন।



চয়ন

বারোয়ারী

বক্তৃতা, Propaganda আর সঙ্ঘ-গড়া ছেড়ে দিয়ে, নিরুপদ্রব অসহযোগ নিয়েছিলুম; অর্থাৎ হতাশ-প্রেমের কবিতা লেখা সুরু করেছি। কেন না, দেখলুম, কবিতা লেখাটা মন্দ নয়; যদিও তার দাম নেই, তবু নাম আছে—আর অনেকটা বাঁচোয়া। যা কিছু লেঠা তা ঐ ছন্দের বেলায়। তাই অগত্যা বাধ্য হয়ে যে অভিনব ছন্দ আবিষ্কার করেছি, তা এই পোড়া দেশের সমালোচকরা সমঝাতেই পারলে না। তা হচ্চে ছন্দ-পতন-ছন্দ!

সেদিন তখন কবিতা লিখচি—চার লাইন লিখেচি—

পুরাতন গীতি গেয়ো না
পুরাতন প্রীতি চেয়ো না
পুরাতন স্মৃতি ছেয়ো না
তোমারি মনো-মন্দিরে!

লেখা বড় বেশী দূর এগোচ্ছিল না, কেন না, মন্দিরের সঙ্গে কি মেলাই তারই ফন্দী আঁটছিলাম। এমন সময় পণ্ডিতজী তাঁর বিপুল ভুঁড়ির সহায়তায় দরোজা ঠেলে ঘরের মধ্যে দেখা দিলেন।

ডবোল-চেয়ার একত্র করে পণ্ডিতজীর উপবেশন-দুষ্কার্য্যটী সমাধা হলে পর, কুশল প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করলুম, পণ্ডিতজী, একটা কবিতা লিখচি, কিন্তু মিলচে না।

পণ্ডিতজী দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বল্লেন—তবে ত ভাবনার কথা বাপ্। যাদের কবিতায় মিল আছে, তাদের জীবনে তা নেই; আর যাদের জীবনে মিল আছে, তারা কবিতায় তার কসরৎ করতে যায় না!

আমি বল্লুম—আমার মত অভাজনের পক্ষে তাহলে ত ডবোল সমস্যা হল!

পণ্ডিতজী শুধু ঈষৎ হাস্যের দ্বারা যেন সমস্ত মুস্কিল আসান করে, আমার মনটা লঘু করে দিলেন। বল্লেন—পড় ত বাপু তোমার কবিতেটা—

পড়লুম—

পুরাতন গীতি গেয়ো না
পুরাতন প্রীতি চেয়ো না
পুরাতন স্মৃতি ছেয়ো না
তোমারি মনোমন্দিরে।

পণ্ডিতজী যে গাছপাকা কবি (born poet) তা আমার জানা ছিল না, তিনি শোনবামাত্রই বল্লেন—এ যে গূঢ় অভিসন্ধি রে! তারপর তাঁর মুখখানা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মত হয়ে এল; তিনি আমার প্রতি নিতান্ত করুণ আঁখিপাত করে বল্লেন—

হবি তুই রাজবন্দী রে!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাঁর ছানাবড়া-প্রতিম চোখ দুটীর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাইতেই, তিনি অনাসক্তের মত বল্লেন—তবে শোন্! তুই যা লিখেছিস্, এতে রাজদ্রোহ, প্রজাদ্রোহ, গাঁজাদ্রোহ সবই রয়েচে; এবং এর জন্য তোর সুদীর্ঘ কারাবাস, নির্ব্বাসন, দ্বীপান্তর, ফাঁসি সবই হতে পারে, অন্ততঃ হওয়া উচিত।

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লুম—কি করে পণ্ডিতজী, এ যে নিতান্ত অহিংস—হতাশ প্রেমের কবিতা!

পণ্ডিতজী অমায়িকভাবে মোলায়েম হাস্য করে বল্লেন—সে কি আর জানিনে? প্রেমে হতাশ না হলে কি আর কেউ কবিতা লেখে, বক্তৃতা করে, খবরের কাগজ ছাপায়, না, গোসাঘরে অর্থাৎ জেলে যায়?

আমি বল্লুম—বেশ বুঝিয়ে দিন্, আমি ত জানিনে এর কোথায় Seditionএর Seed রয়েচে।

পণ্ডিতজী বল্লেন—তুমি যে লিখেচ—পুরাতন গীতি গেয়ো না,—এর মানেটা কি, না, নতুন গান গাও! এদেশে নবরসের মধ্যে আট-রসের গান লেখা ও গাওয়া হয়ে পচে গেছে, বাকী আছে কেবল একটী, সেটী হচ্চে বীররস। আর তুমি সবাইকে সেই উচু সুর ভাঁজতে বলচ—সুতরাং এটা হচ্চে দস্তুরমত সিডিশন, ১২৪ক ধারা, বুঝতে পারলে?

পণ্ডিতজীর গবেষণায় আমার বাক্য-স্ফূর্ত্তির শক্তি রহিত হল। পণ্ডিতজী বলে চল্লেন—

"তার পর লিখেচ পুরাতন প্রীতি চেয়ো না। তারও মানে হচ্চে—নতুন প্রেম চাও। নতুন প্রেম কি হতে পারে? সব প্রেমই পুরানো হয়ে গেচে, গল্প ও উপন্যাস-লেখকের অনুসন্ধিৎসায় সম্ভব অসম্ভব কোন প্রেমই ঘটতে বাকী নেই—সম্ভব অসম্ভব স্থানকাল পাত্রে অনেকেই প্রেম চেয়েচে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ যার প্রেম চাইবার কল্পনা স্বপ্নেও করেনি, সে হচ্চে সি, আই, ডির প্রেম। তুমি এই কবিতা লিখে সবাইকে সি, আই, ডির সঙ্গে প্রেম করতে বলেচ। আর তুমি জানো love-এও কিছু unfair নেই, war-এও নেই—অতএব love যা warও তাই! সুতরাং তুমি সি, আই, ডির সঙ্গে ভাষার মারপ্যাচে যুদ্ধ করতেই বলেচ। আর সি, আই, ডি পুলিশই যে রাজা, তা এদেশের বালক, বৃদ্ধ ও বনিতারা জানে। অতএব এটা হচ্চে যুগপৎ ১২০ ও ১২১ ধারা—Conspiracy এবং waging war against His Majesty.

শিকারী বেড়াল মুহ্যমান নেংটী ইঁদুরের দিকে যেমন নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে, পণ্ডিতজী সেই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পণ্ডিতজীর বিশেষজ্ঞতায় আমাকে বিশেষ অজ্ঞ বনতে হল; আর আমার অবস্থা মাথায় ন বস্তা চাপালে যা হয় তাই।

শ্রোতার মৌনসম্মতি অনুমান করে, পণ্ডিতজী ধীরে ধীরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে চল্লেন—তার পর লিখেচ, পুরাতন স্মৃতি চেয়ো না। এর মানেটা কি বাপু? তোমরা কি তবে মনু-স্মৃতি চাও না, এই সনাতন হিন্দু জাতটাকে গোল্লায় দেবে ঠাউরেছ, তার বদলে তোমাদের নতুন হনু-স্মৃতি আম্‌দানি করবে? ওসব বিলিতী চালান, আর্য্য-পুত্র আমি কখনই সমর্থন করব না। এটা হচ্চে রীতিমত সামাজিক সিডিসন!

যাক্, এর জন্যে জেল হবার ভয় নেই জেনে ঈষৎ আশ্বস্ত হয়ে বল্লুম—এত আমাদের ঘরোয়া লড়াই, রাজার সঙ্গে কিছু নয়ত।

পণ্ডিতজী বল্লেন—বটে আর কি! তোমরা ভায়ে ভায়ে মারামারির ছুতায় কুস্তি কসরৎ শিখে শক্তি সঞ্চয় করবে, আর তৃতীয় পক্ষ বাড়ীওয়ালা তাই নির্ব্বিকার হয়ে বসে বসে দেখবে ভেবেচ? গায়ে জোর হলে, চাই কি, একদিন তোমরা দুজনে এক হয়ে by force তাকেও ত divorce করে দিতে পারো। সুতরাং এর জন্যও তোমার জেল হবে—ভয় নেই। আগের দুটোর তুলনায় এর দণ্ড বোঝার ওপর শাকের আঁটী, গায়ে লাগবে না বিশেষ। এর জন্য তুমি পড়বে ১৫৩ক ধারায়—অর্থাৎ Promoting enmity between two classes of His Majesty's subjects. অর্থাৎ সেই-যুগের মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, হারীতের সঙ্গে এ যুগের মণীন্দ্র, পরেশ, যজ্ঞেশ্বর, অতীন্দ্র, হীরালালের শত্রুতা বৃদ্ধি।

আমি বল্লুম—সে কি, তাঁরা ত আর ইংরেজের প্রজা ছিলেন না যে এই Charge খাটবে।

মুখ-বিকৃতি করে পণ্ডিতজী বল্লেন—ছিলেন না? আলবৎ ছিলেন! তাঁদের বংশধররা যখন আছেন তখন তাঁরাও থাকতে বাধ্য, সুদ যে আদায় করচে আসলেও তারই দাবী—এটা আর বুঝতে পারো না বাপু! আর জেরায় যদি between two classes নাই-ই টেকে, তাতে কি! একতরফাতেও তোমার মত সন্দিগ্ধ লোকের জেল দেওয়া উচিত।

আমি অকূল পাথারে পড়ে গেলাম। পণ্ডিতজী উঠ্‌লেন, যাবার সময় সদয় হয়ে বল্লেন—যে রকম দিন কাল দেখ্‌চ, তাতে ওসব বদায়েশন ছেড়ে দাও, ঐ ছাই কবিতা লিখো না। শুধু খাও দাও ঘুমাও আর বায়স্কোপ দেখ; নইলে Reg. I I I of 1449 এর ফাঁদে কোন্ দিন আট্‌কে যাবে, নিজেও বাঁচ্‌বে না, কাজেই বাপের নামও ডোবাবে।

পণ্ডিতজী এই Sermonএর সঙ্গে চার মণ আমার মাথায় চাপিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি হাস্য-মুখে বোধ করি মহাপ্রস্থান করলেন!

—(যুগান্তর)

স্যার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

ভারতে ইংরাজ অধিকারের প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীতে যে সকল মনস্বী রাজপুরুষ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, স্যার উইলিয়ম জোন্স তাঁহাদেরই অন্যতম। নিজ জন্মভূমি হইতে শত সহস্র ক্রোশ দূরে অপরিজ্ঞাত দেশে ভিন্ন ভাষা-ভাষী অচেনা লোকের মধ্যে, অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া, কত কষ্টে, কত অসুবিধায় তিনি সংস্কৃত ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তৎকালে এতদ্দেশীয় জনগণই বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন বাক্য ও সমাজ শাসনের প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

স্যার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রূপে ভারতে পদার্পণ করেন। ভৃত্যবর্গের সহিত কথোপকথন করিবার জন্যই তিনি প্রথমে একটু হিন্দুস্থানী শিক্ষা করেন। এদেশে সংস্কৃতের আদর দেখিয়া স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত শিক্ষার অভিপ্রায়ে একজন অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণই ম্লেচ্ছকে দেবভাষা শিক্ষা দিতে সাহসী ছিলেন না। তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্র স্যার উইলিয়মের বন্ধু ছিলেন। তিনিও বন্ধুর জন্য অধ্যাপক সংগ্রহের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজার চেষ্টা, স্যার উইলিয়মের বিজ্ঞাপিত মোটা বেতনেও কোন ফল হইল না। মোটা বেতনের প্রলোভনে দু'একটী পণ্ডিত গোপনে উইলিয়মের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন—তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ ইহা অবগত হইয়া সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইলেন। সুতরাং একঘরে হইবার ভয়ে অধ্যাপকগণ আর স্যার উইলিয়মের বাটীর ত্রিসীমা মাড়াইতেও সাহস পাইলেন না। স্যার উইলিয়ম নিজে বাঙ্গলায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া অধ্যাপকগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন অধ্যাপকই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান, অনেক চেষ্টার পর রামলোচন কবিভূষণ নামক একজন বৈদ্যজাতীয় সুশিক্ষিত পণ্ডিত মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে স্যার উইলিয়মকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানে সম্মত হইলেন।

রামলোচন হাওড়ার নিকটবর্ত্তী সালখিয়াবাসী ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কেহই ছিল না, সংসারে তিনি মাত্র একাকী, সুতরাং একঘরে হইবার ভয় বড় রাখিতেন না। ইহা ব্যতীত তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা রোগ পীড়ায় তাঁহাকেই ডাকিত—তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং স্যার উইলিয়মকে সংস্কৃত শিক্ষা দিলেও লোকে তাঁহাকেই ডাকিবে এ ভরসা তাঁহার খুব ছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত সালখিয়া হইতে স্যার উইলিয়মের বাসা খিদিরপুর এবং খিদিরপুর হইতে সালখিয়া যাতায়াতের পাল্কী-ভাড়া পাইবেন, এই বন্দোবস্তে কবিভূষণ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন।

কবিভূষণ মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাই অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টী সর্ত্তের কথা হয়—

১। একটী একতল গৃহে অধ্যাপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।

২। পাঠাগারের মেজে মর্ম্মর প্রস্তরাবৃত করিতে হইবে।

৩। পাঠাগারের মেজে ও দেওয়াল (যতদূর হাতে পাওয়া যায় ততদূর) প্রতিদিন গঙ্গাজল দ্বারা মার্জ্জনা করাবার জন্য একজন হিন্দু ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইবে।

৪। কাষ্ঠাসন ব্যতীত অন্য কোন আসন পাঠাগারে ব্যবহৃত হইবে না এবং ঐ কাষ্ঠাসনগুলি প্রতিদিন গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে।

৫। প্রাতঃকালেই অধ্যাপনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

৬। নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে এক পেয়ালা চা ভিন্ন অধ্যয়নার্থী আর কিছুই আহার বা পান করিতে পারিবেন না।

৭। গোমাংস, শূকর মাংস কিংবা কাঁটা চামচ প্রভৃতি পাঠাগারে নিষিদ্ধ হইবে।

৮। অধ্যাপকের ব্যবহারের জন্য পাঠাগারের নিকটবর্ত্তী গৃহটীও প্রত্যহই গঙ্গাজলে মার্জ্জন করিতে হইবে। এই গৃহে একপ্রস্থ কাপড় রক্ষিত হইবে। পাঠাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক নিজ কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া এই কাপড় পরিধান করিবেন; আবার বাড়ী আসিবার সময় এই কাপড় রাখিয়া নিজ কাপড় পরিধান করিয়া আসিবেন।

জ্ঞানপিপাসু অধ্যয়নার্থী অধ্যাপকের এ আবদারে সম্মত হইলেন—কবিভূষণ মহাশয়ও সার উইলিয়মের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

পাঠারম্ভকালে স্যার উইলিয়ম সংস্কৃতের কিছুই জানিতেন না, আবার অন্যদিকে তাঁহার অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয়ও ইংরাজী ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন—সার উইলিয়ম যে একটু হিন্দুস্থানী শিখিয়াছিলেন, পরস্পরের মধ্যে তাহার সহায়তায়ই কথাবার্ত্তা চলিত।

যাহা হউক অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থী উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে এক বৎসরের মধ্যেই স্যার উইলিয়ম সহজ সংস্কৃতে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ্যের লিঙ্গ ও ক্রিয়ার বিভক্তি শিক্ষ করিতেই বিশেষ বেগ পাইতে হয়। স্যার উইলিয়ম সর্ব্বপ্রথম ক্রিয়া ও বিভক্তির তালিকা করিয়াই ধাতুরূপ শিখিতে আরম্ভ করেন, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। কিন্তু তিনি ঠিক কোন্ প্রণালীতে উহা শিক্ষ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে বহু অনুসন্ধানেও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

একদিন অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত কথা-প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্য কাব্যের অস্তিত্ব অবগত হয়েন। সহরের ধনীদিগের গৃহে যে নাট্যাভিনয় হইত, কলিকাতায় সেকালের ইংরাজ অধিবাসিবর্গের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। কবিভূষণ মহাশয়ও তাহা জানিতেন। এই নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গের আলোচনাকালে কবিভূষণ মহাশয় স্যার উইলিয়মকে বলেন যে, একালের ন্যায় সেকালেও ভারতের রাজা, মহারাজা ও ধণীবৃন্দের দরবারে নাট্যাভিনয় হইত। এই হইতেই স্যার উইলিয়ম সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য অধ্যয়ন করিতে আগ্রহান্বিত হয়েন। প্রথমেই তিনি মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটক অধ্যয়ন করেন। উত্তরকালে, স্যার উইলিয়ম পদ্যে গদ্যে এই নাটকেরই এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয়ের স্বভাব কিছু খিট্ খিটে রকমের হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি টোলের ধরনেই ছাত্রকে শিক্ষ দিতেন, তাহাতে কোন কোন সময় কোন কথা ভালরূপে না বুঝিতে পারিয়া স্যার উইলিয়ম দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিতেন "ও, এ অতি জটল প্রশ্ন, গরুখোরের পক্ষে ইহা ঠিক বুঝা অসম্ভব।" স্যার উইলিয়ম নিজ অধ্যাপকে বিশিষ্টরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাই প্রাচীন অধ্যাপকের এ রূঢ় তিরস্কারেও তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না।

অধ্যাপক কবিভূষণ মহাশয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি স্মার্ত্ত বা দার্শনিক ছিলেন না, সুতরাং ব্যাকরণ ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্যার উইলিয়ম যখন স্মৃতি ও হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইল। এ সময় দেশের লোকে অনেকটা উদার ভাবাপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং স্মৃতির অধ্যাপক খুঁজিয়া লইতে স্যার উইলিয়মকে এবার আর অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। —(প্রতিভা)

আবহাওয়া

দেশ

স্বাস্থ্য

লর্ড লিটনের ভুল ধারণা—গত ৩রা ডিসেম্বর লর্ড লিটন্ কৃষ্ণনগরে গিয়া জেলাবোর্ড ইত্যাদির অভিনন্দনের উত্তরে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য ও লোকসংখ্যার হ্রাস বিষয়ে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা একেবারেই ভুল। বঙ্গের লাটের পক্ষে বাঙ্গলার কোন জেলা বিষয়ে এইরূপ অমূলক কথা বলা নিতান্তই বিসদৃশ। লাটসাহেবই হউন আর সরকারের যে কোন উচ্চ কর্ম্মচারীই হউন, কেহই প্রকৃত সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করেন না—ইহাই আমাদের মনে হয়। বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের বেণ্টলী সাহেবও কি কোন সংবাদ রাখেন না? যদি প্রকৃত অবস্থা বেণ্টলী সাহেব জানিতেন তবে লাট সাহেব এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ কথা কি প্রকারে বলিলেন? তিনি ত লর্ড লিটনকে নদীয়া যাইবার পূর্ব্বেই ঐ জেলার অবস্থা বলিয়া দিতে পারিতেন।

নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা কি পরিমাণে লোকসংখ্যার হ্রাসের কারণ হইয়াছে তাহা গত সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ কৃষ্ণনগরে লাট সাহেব বলিয়া আসিয়াছেন যে, সমগ্র নদীয়া জেলা তেমন কিছু অস্বাস্থ্যকর নয়, তবে কোন কোন থানায় জন্ম সংখ্যা হইতে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর জেলার সাধারণ অবস্থা ভালই; এবং রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া অকাতরে বলিয়া আসিয়াছেন,—যে সব থানায় লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, তাহার আয়তন সমগ্র জেলার আয়তনের ১০০ ভাগের ১৫ভাগ মাত্র। লাট সাহেবের বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Figures show that the district as a whole is not unhealthy, although in certain thanas the death-rate has exceeded the birth-rate. But these thanas occupy only 15 per cent, of the district, which in this respect compares favourably with the average district in Bengal."

গত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায়, সমগ্র নদীয়া জেলাতেই লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। জেলার মোট ২৫টী থানার মধ্যে ২৩টীতেই লোকসংখ্যা গড়ে শতকরা ৮ জন করিয়া কমিয়াছে, কেবল কুমারখালী ও খোক্সা এই ২টী থানায় লোকসংখ্যা শতকরা ১৬ জন মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং এই জেলার আয়তনের (২৭৭৮ বর্গ মাইল) তুলনায় এই দুইটী থানার আয়তন (১৪২ বর্গ মাইল) ২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র অর্থাৎ জেলার শতকরা ৯৫ ভাগ স্থানেই লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং সমগ্র বাঙ্গলায় এই জেলার মত কোন জেলায় এইরূপ বিস্তৃতভাবে লোকসংখ্যা হ্রাস পায় নাই। সুতরাং লাট সাহেবের তিনটী কথাই ভ্রমপূর্ণ। সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে নদীয়া জেলার প্রত্যেক থানার আয়তন ও লোকসংখ্যা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহা হইতে আমাদের কথা প্রমাণিত হইবে।

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি (১৯১১—১৯২১) শতকরা
নদীয়া	২৭৭৮	—৮·০
সদর মহকুমা	৭২১	—৯·৪
থানা—		
কালীগঞ্জ	১১২	—১০·৭
নাকাসিপাড়া	১৪০	—৫·৮
কিসনগঞ্জ	৫৭	—২০·৩
হাঁসখালী	১০৪	—১১·৩
কৃষ্ণনগর	১৩৮	—৭·৬
চাপড়া	১৩০	— ঐ
নবদ্বীপ	৪০	— ঐ
রাণাঘাট মহকুমা	৯৩০	—৪·৪
শান্তিপুর	৭৭	—৬·২
রাণাঘাট	১৬৫	—৬·৬
চাকদহ	১২২	—১·৫
হরিণখোলা	৬৬	— ঐ
কুষ্টিয়া মহকুমা	৫৮২	—৪·২
কুষ্টিয়া	১২৯	+১·০
মীরপুর	১২৩	—১২·৫
ভেড়ামোরা	৫২	— ঐ
কুমারখালী	১১০	+১·৬
খোক্সা	৩২	+ ঐ
দৌলৎপুর	১৩৬	—৩·৩
মেহেরপুর মহকুমা	৬০৮	—১১·৭
করিমপুর	১৬৬	—১১·৭
গাঙ্গণী	১২৫	—১২·৫
মেহেরপুর	১৩৩	—১৩·৮
তেহট্ট	১৮৪	—৯·৬

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা	৪৩৭	—১১·৪
চুয়াডাঙ্গা	১১২	—১২·১
আলমডাঙ্গা	১৩২	—৯·৩
দামুরহুদা	১১৬	—১৪·২
জীবননগর	৭৭	—১০·৩

আনন্দবাজার পত্রিকা

ওলাউঠার আক্রমণ বৃদ্ধি—গত ২৪শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধিতে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগে আসিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত সপ্তাহে বাঙ্গালা প্রদেশের পনেরটী জেলায় ওলাউঠা রোগে মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী এবং নোয়াখালী জেলাতে ওলাউঠায় কাহারও মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ২, ১,৯ এবং ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। হাবড়ায় ১ হইতে ৬, বাথরগঞ্জে ১ হইতে ৬, চব্বিশ পরগণায় ৩ হইতে ৬, নদীয়ায় ২১ হইতে ২৪, রঙ্গপুর ৪৩ হইতে ৭০, বগুড়ায় ১৮ হইতে ২৩, মালদহে ৪ হইতে ২২, ঢাকায় ৪০ হইতে ৬৭, ময়মনসিংহে ২১০ হইতে ২৭১, ফরিদপুরে ৬ হইতে ১৪, এবং ত্রিপুরায় ০ হইতে ৩৪ জনে ওলাউঠায় মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলায় ওলাউঠায় আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যুর হার কমিয়াছে:—বর্দ্ধমানে ৩ হইতে ০, মুর্শিদাবাদে ৯ হইতে ৩, যশোহরে ১০৭ হইতে ৭৩, দিনাজপুরে ৭ হইতে ৪ এবং পাবনায় ৮ হইতে ৪ জনের মৃত্যুর হার কমিয়াছে। কলিকাতায় এবং আসানসোল মাইনিং সেটেলমেণ্টে আলোচ্য সপ্তাহে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ওলাউঠায় মৃত্যুর হার সমানই ছিল অর্থাৎ যথাক্রমে একজন ও সাতজন করিয়া মারিয়াছিল। খুলনা হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বসন্ত রোগে আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যুর হার সামান্য বাড়িয়াছে। এই রোগে নদীয়ায় ৩ জন এবং চট্টগ্রামে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

কলিকাতায় আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় দশজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

প্লেগে আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গালার কোন স্থান হইতে মৃত্যুর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই নায়ক

কালা জ্বর—গত ৬০।৭০ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব চলিয়া আসিতেছে। এর ফলে প্রতি বৎসর ৭।৮ লক্ষ লোক যমের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে।

"একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।" এখন আবার কালা জ্বর দেখা দিয়াছে। এই ভীষণ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালীর লোক কালা জ্বর কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে ইহা প্রায় ঘরে ঘরে সুপরিচিত। বেগমগঞ্জ থানার কাশীপুর হাটের অদূরস্থ কোন গ্রামে নাকি গত এক মাসে ১৩০ জন লোক শুধু কালা জ্বরেই মরণকে বরণ করিয়াছে। আর এখন ঐ অঞ্চলে এমন ঘর নাই যেখানে ২।৪ জন ভুগিতেছে না। ফেণী মহকুমায় খণ্ডল অঞ্চল তকালা জ্বরের লীলা-ক্ষেত্র। লক্ষ্মীপুরার দিকেও নাকি ইহার প্রকোপ কম নহে। সহরের বুকের উপরই এখন তিন শতের অধিক লোক কালা জ্বরে ভুগিতেছে। অতএব শীঘ্র ইহার প্রতীকারের জন্য সর্ব্বসাধারণ, জেলাবোর্ড, লোকেলবোর্ড, মিউনিসিপালিটী ও সরকার এক যোগে না লাগিলে এই সোণার দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে আর অধিক দিন আবশ্যক হইবে না।

সত্য বটে স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন ও জেলা বোর্ড তাঁহাদের অপরাপর কর্ত্তব্যের মধ্যে কালা জ্বর তাড়নকেও একটা ধরিয়া নিয়াছেন। কিন্তু ইহা দেশ-জোড়া বিরাট কার্য্যের অকিঞ্চিৎকর প্রতীকার। এ জেলায় যে কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহার সকল ডাক্তারও নবাগত—কালাজ্বর চিকিৎসায় বিচক্ষণ কিনা সন্দেহ। অতএব সকলকে ঐ বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা, কালাজ্বর প্রতীকারের সাধারণ নিয়মগুলি পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করা, স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া জ্বরের সংক্রামকত্ব নিবারণের জন্য উপদেশ দেওয়া, কালাজ্বরের ঔষধ স্থান বিশেষে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এই বৃহৎ কার্য্যে, সরকার, জেলা বোর্ড ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। স্থানীয় সেবা-সমিতি, খাদেমল ইছলামের নেতৃগণকেও আমরা এই কার্য্যে গা ঝাড়া দিয়া সাড়া দিতে আহ্বান করিতেছি। নোয়াখালি হিতৈষী

হিন্দু—মুসলমান

সাহারাণপুরে অধিবেশন—নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রেসিডেণ্ট কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা জানাইতেছেন যে, অদ্য (মঙ্গলবার) হইতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-তদন্ত-কমিটি সাহারাণপুরে তদন্ত করিবেন। শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা আজমীরবাসীদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ডাঃ মামুদকে সাহারাণপুরে গিয়া সেখানে যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বন্দে মাতরম্

ঝালকাঠিতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—বরিশাল হইতে জনৈক ভদ্রলোক তারযোগে জানাইতেছেন যে, ঝালকাঠির সন্নিহিত সুতালড়ী গ্রামে একটী হিন্দুমন্দির লইয়া স্থানীয় মুসলমান ও মালাকরদিগের মধ্যে বিষম বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমানেরা পরামর্শ করিয়া উক্ত মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্থান হিন্দুদিগকে লইতে দেয় নাই। তাহারা জোরপূর্ব্বক মন্দির অপবিত্র করিয়া মন্দিরটীকে মসজিদরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। মালাকরেরা পুলিসের সাহায্য লয়। মন্দিরটী বর্ত্তমানে পুলিশের পাহারায় আছে। স্থানীয়

হিন্দু মুসলমান নেতাগণ বিরোধটী মিটমাট করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা

মিলন-কমিটী—জনরব নোয়াখালীস্থ হিন্দু-মুসলমান-প্রেম ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এই ভাঙ্গা প্রেমে জোড়া দেওয়ার উপায় নির্দ্ধারণার্থ গত রাত্রে স্থানীয় কংগ্রেস আফিসে একটা সব কমিটী বসিয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর নাকি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পাঁচ জন করিয়া বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া একটা মিলন-কমিটী গঠন করিতে হইবে। আর এই দশ জনের উপর প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থানীয় আর, সি, মিশনের পাদ্রী সাহেব!

আমরা কমিটীর সিদ্ধান্তে আশ্বস্ত হইয়াছি। দেখা যাউক মিলনটা কিরূপ জমে। নোয়াখালি হিতৈষী

সদনুষ্ঠান

অর্দ্ধকুম্ভ মেলা সেবা সমিতির আবেদন।—আগামী ৬ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা আরম্ভ হইবে। এলাহাবাদের সেবা সমিতি এই মেলার জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন।

আগামী অর্দ্ধকুম্ভ মেলার সময় এলাহাবাদে যে সমস্ত যাত্রী উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ ভাবে ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য এলাহাবাদের সেবা সমিতি একটী স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ গঠন করিবার নিমিত্ত মনস্থ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীরই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করা হইবে। এই কার্য্যে যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিতে চাহেন তাঁহারা সমিতির নিকট সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্য-তালিকা ঠিক করিয়াছেন:—(১) টিকিট ক্রয় কালীন এলাহাবাদ ষ্টেশনে যাত্রীদিগকে সাহায্য করা (২) সুশিক্ষিত ডাক্তার ও বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে, উপযুক্ত নার্স ও কম্পাউণ্ডার সমেত কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা। এই চিকিৎসালয় হইতে যাত্রীদিগের চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা হইবে। (৩) আহত ব্যক্তিগণকে সেবা শুশ্রূষা করা ও যাঁহারা—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে লোকজনের ভিড়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগের আত্মীয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে যথাস্থানে পোঁছাইয়া দেওয়া। এ সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের জন্য সমিতি অন্ততঃ ৫০০ শত উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে চান। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে এই কার্য্যে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। বন্দেমাতরম্

চুরি—ডাকাতি—খুন—জখম

খুনের মরসুম।—সিরাজগঞ্জের অধীন হরিণাবাগবাটী অঞ্চলে খুনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। খুনের পর খুন হইয়া যাইতেছে, অথচ কোনটারই আস্কারা হইতেছে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী যুবক—একটী বেশ্যার ছেলে—মৃত অবস্থায় অন্য একটি বেশ্যার ঘরে পড়িয়া আছে দেখা গেল। রহস্যাবৃত মৃত্যু, চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গেল। পুলিশ আসিল। কিছুই হইল না।

তার পর একটী বিদেশী গোয়ালা বহুদিন এখানে বসবাস করিতে-ছিল। একদিন দেখা গেল তার মৃতদেহ নদীতে ভাসিতেছে। ঘরের তৈজসপত্র অপহৃত। পুলিশ আসিল, কিছুই হইল না। তার পর কালকুমারী নাম্নী একটী বেশ্যা নৃশংসভাবে হত অবস্থায় তার বাড়ীতে পড়িয়া আছে দেখা গেল। তদন্তে প্রকাশ পাইল তার গহনাপত্র অপহৃত হইয়াছে। ইহারও কোনও কিছু হইল না। আর একটী রহস্যাবৃত মৃত্যু ঘটনা ঘটিয়াছে। দেবী মালিনী নাম্নী একটি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের লাস উধাও হইয়া গিয়াছে, কোনও খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। এ পর্য্যন্তও লাসের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কোনও কিনারা যে হইবে এমন ত বোধ হইতেছে না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে কোন খানেই কোন খুন সন্তোষজনকরূপে আস্কারা হইতেছে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ খুন হওয়ায় ও অপরাধী ধৃত না হওয়ায়, স্থানীয় অধিবাসীগণ নিতান্ত ভয়বিহ্বল অবস্থায় বাস করিতেছে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বরাজ (পাবনা)

নেত্রকোণায় চুরি ও ডাকাতি।—একজন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন, "নেত্রকোণা সবডিভিসনের অন্তর্গত মদন থানার এলাকাধীন হাসনপুর, সাইতপুর, বাঙ্গালী, তিরশ্রী, দেওরসহিলা, কাইকুড়িয়া, মাটুয়া, ছত্রকোণা ও এই সকল গ্রামের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে আজ ২।৩ বৎসর যাবৎ চোর, ডাকাত ও বদমায়েসের উপদ্রব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন এই সকল স্থান গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন নহে। বিগত ২৬শে কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিতে আমার বাড়ীতে মধ্যের ঘরের ভিত্তিতে সিদ কাটিয়া আমার ৺পিতৃদেব ঈশানচন্দ্র সরকার (ময়মনসিংহ কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব তৌজিনবীশ) মহাশয়ের শ্রমোপার্জ্জিত চারি বাক্স স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ১০০৲ টাকা ও অন্যান্য মালামালে প্রায় ৩।৪ হাজার টাকার জিনিষ লইয়া আমাদের একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। যে ভাবে চুরি হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে ইহা দৃষ্টতঃ চুরি হইলেও ডাকাতির অনুরূপ। কারণ আমি যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া এরূপ ভাবে নির্ভয়ে চুরি করিয়াছে যে, আমি শব্দমাত্র করিলে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। নিকটস্থ সাইতপুর গ্রামে একটী লোককে মারিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন এবম্বিধ স্থানে আমরা ধনপ্রাণ লইয়া সশঙ্ক আছি। আশা করি আমাদের সহৃদয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব স্বয়ং উপযুক্ত প্রতীকার করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীকে এই ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন। অধিকন্তু আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে পুলিশ সাহেব স্বয়ং আসিয়া তদন্ত করিয়া চোর, ডাকাত দমন করতঃ বৃটিশ শাসনের গৌরব রক্ষা করিবেন।" চারুমিহির

বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার।—পানমগঞ্জের অধিবাসী মহেন্দ্রকুমার সাহার দোকানে গত সোমবার রাত্রিতে প্রায় ১২ জন লোক লাঠি ও ছোরা লইয়া ডাকাতি করিয়া লোহার সিন্দুক হইতে নগদ প্রায় ১২০০৲ টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে। কাপাসিয়া থানার অধীনে একটী গ্রাম হইতে আর একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গ্রেপ্তার—গত কয়েক মাসের মধ্যে এই জিলার নানাস্থানে কয়েকটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি পুলিশ এই সব ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস নামক জনৈক যুবককে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ, এই যুবকটি নাকি স্বরাজ্যদলের তাঁবে আবদুল করিম সাহেবের নির্ব্বাচনের জন্য ভোট সংগ্রহ করিতেছিল। ঢাকা প্রকাশ

শিক্ষা

বসু বিজ্ঞান-মন্দির স্মৃতি-বার্ষিকী।—গত ৩০শে নবেম্বর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে, তাঁহার ছাত্রগণ ও উক্ত মন্দিরের সভ্যগণ ঐ মন্দির স্থাপনের ষষ্ঠস্মৃতি-বার্ষিকী সম্পন্ন করেন। অধ্যাপক এন্, সি নাগ গত ২।৩ বৎসর উক্ত বিজ্ঞান মন্দিরে কি গবেষণা হইয়াছে, তাহার একটা আভাষ দেন।

বাঙ্গালী ছাত্রের বৃত্তিপ্রাপ্তি।—কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টের ছাত্র মিঃ অতুল বসু ইউরোপে কলাবিদ্যা শিখিবার জন্য 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ' বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডন যাত্রা করিবেন এবং তথায় দক্ষিণ কেনসিংটনে রয়েল কলেজ অব আর্টে অথবা রয়াল একাডেমী স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন।—গত ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হইয়া গিয়াছে। মহামান্য চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১০৩৩ জন গ্রাজুয়েট উপাধি গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। ৭১০ জন গ্রাজুয়েট অনুপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পাইয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা

মিঃ আলী করিম।—মিঃ আলী করিমের বাড়ী বেগমগঞ্জ থানার হাজীপুর গ্রামে। ইনি ভূপাল ষ্টেটের সহকারী রাসায়নিক ছিলেন। সম্প্রতি বার্ষিক ১০০ এক শত পাউণ্ড ষ্টেট স্কলারসিপ পাইয়া বিগত ২৪শে নবেম্বর বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য, বিলাত যাইয়া উদ্ভিদ ও মৎস্যাদি হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করা। আমরা এই কর্ম্মিযুবকের যশঃসৌভাগ্য কামনা করিতেছি।

নোয়াখালি হিতৈষী

কৃষি—শিল্প—বাণিজ্য

আফগানিস্থানে ফলের ব্যবসায়।—পেশোয়ারের ২০শে নবেম্বর তারিখের তারের খবরে প্রকাশ :—আফগান সরকারের সাহায্য পাইয়া আফগানিস্থানে দুইটী ট্রেডিং কোম্পানী গঠিত হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি আফগানিস্থানের সংবাদপত্রসমূহে বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে। তাহার একটি কোম্পানীর নাম "আমানীয়া ব্রাদার্স কোম্পানী" এবং আর একটীর নাম "ফ্রুট কোম্পানী"। পূর্ব্বোল্লিখিত কোম্পানীটি সকল রকমের সাধারণ ব্যবসায়ের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে; আর দ্বিতীয় কোম্পানীটি কাবুল ও ভারতবর্ষের মধ্যে সকল রকমের শুকনো ও তাজা ফলের কারবার খুব বড় রকমে চালাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমানিয়া ব্রাদার্স কোম্পানী কাবুলে একখানি দোকান খুলিয়াছে এবং তুর্কিস্থান, পারস্য এবং ভারতবর্ষে এজেণ্ট পাঠাইয়াছে। এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীগণের মনে বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে; কারণ তাহারা যে একচেটীয়া ব্যবসায়ের ফল ভোগ কবিতেছিল তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা তাহাদের মনে উদয় হইয়াছে। নায়ক

নারীসমস্যা

জয়মিত্রের ষ্ট্রীটে পতিতা বিতাড়ণ।—কলিকাতা ৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত জয় মিত্রের ষ্ট্রীটে, বহু ভদ্রলোকের বাস; পাশাপাশিই বারাঙ্গনা পল্লী। গত ১৯২১ সনে এই রাস্তাটিকে প্রকাশ্য রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য কয়েকজন কমিশনার আবেদন করেন কিন্তু "বিশেষ বেশ্যালয় কমিটি" ঐ সময়ে চীৎপুর রোডটীকে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন; তাঁহারা জয় মিত্রের ষ্ট্রীটকে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অনুপযুক্ত মনে করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯২১ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাঁহাদের মতই গ্রহণ করেন।

পুনরায় গত মে মাসে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণ আর একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন; ওয়ার্ড কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত ঐ আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। গত ২৪শে আগষ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে ১৯০৭ সনের কলিকাতা ও সহরতলির পুলিশ এ্যামেণ্ডমেণ্ট কার্য্য বিধির ৪৩ (১) (সি) ধারানুযায়ী জয় মিত্রের ষ্ট্রীটকে প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করা হউক। ঐ রাস্তা সম্বন্ধে পুলিশ কমিশনার, তাঁহার ১৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে জানাইতেছেন যে, ঐ ষ্ট্রীটে ১১ খানি বাড়ীতে ৪৮ জন বেশ্যা থাকে। ইহারা দুই মাস হইতে ১২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐখানে থাকিয়া আসিতেছে। ঐ রাস্তা প্রধান রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই।

পতিতাগণের মধ্যে যাহারা ঐস্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়াছে, তাহারা কর্পোরেশনে আবেদন করিয়াছে। নায়ক

আবার নারীর উপর অত্যাচার।—প্রকাশ, চণ্ডীতলা থানা আইয়া গ্রামের জ্যোতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রীকে ঘর হইতে টানিয়া লইয়া মাঠের ভিতর তাহাকে সারারাত্রি রাখিয়া তাহার উপর

অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটী পরদিন নিকটবর্ত্তী থানায় এই ঘটনা প্রকাশ করেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া ঘটনা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হইয়া নথীপত্র তলব করিয়াছেন। শ্রীরামপুর

বাধ্যতামূলক বহু বিবাহ।—শ্রীমতী কারপিসকোভা চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্লামেণ্টের জনৈক মহিলা সভ্য আইন দ্বারা বহু বিবাহ চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পুরুষকেই তাহার ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, দুইটী করিয়া বিবাহ করিতে হইবে, না করিলে তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে। পাশ্চাত্য জগতে নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে! বিগত যুদ্ধের কারণে পুরুষ সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় রমণীগণের স্বামীপ্রাপ্তি দুরূহ হইয়াছে, তাহাতেই এই চেষ্টা। নোয়াখালি হিতৈষী।

বাঙ্গলার হিন্দু কৃষক কোথায় গেল?—১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাঙ্গলার জনসংখ্যা ৪,৭০৫,৪২,৬২।

তন্মধ্যে হিন্দু ২,০৮,০৯১৪৮,

মুসলমান ২,৫৪,৮৬,১২৪।

বাঙ্গালার কৃষক সংখ্যা ৩,০৫,৪৩,৫৭৭।

তন্মধ্যে হিন্দু ১,০১,৭৯,৫০৫,

মুসলমান ১,১৭,২১,৮৫১।

১৯২১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাঙ্গালার কৃষক সংখ্যা ছিল ২১৭৪৮৬৬৬।

তন্মধ্যে হিন্দু ১০৪৫০২৫৮,

মুসলমান ১৮৭১১৬৯১।

দশ বৎসরে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা ২৭০৭৫০ কম হইয়াছে। কিন্তু দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্যা ১০০২১৫৯ বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু কৃষক কমিল কেন এবং মুসলমান কৃষক বাড়িল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কি আবশ্যক মনে করেন না?

হিন্দু কৃষকের সংখ্যা কমিল কেন তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) হিন্দু কৃষক অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না; পণ না দিলে কন্যা পাওয়া যায় না; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত থাকে; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে।

(২) হিন্দুর মধ্যে বিবাহ প্রচলন নাই। প্রৌঢ় বয়সে যাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারা ৮।১০ বৎসরের কন্যা বিবাহ করে; সন্তান হওয়ার পূর্ব্বেই স্ত্রীকে বিধবা করিয়া পরলোকযাত্রা করে। সুতরাং যাহারা বিবাহ করিতে পারে, তাহারাও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না।

(৩) যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে কৃষকেরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পুত্র কন্যা রাখিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত।

(৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কন্যাপণ উঠিয়া যাইত; সুতরাং কৃষকদের বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইত না।

বঙ্গের হিন্দু কৃষকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অবিলম্বে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে সকলের দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত।

(৫) হিন্দু কৃষকেরা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। হিন্দু কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই; সুতরাং দুধ, দই, ঘি খাইতে পায় না। অপরদিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান কৃষক গাভী পালন করে। গৃহজাত দুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপরাংশ নিজেরা পান করিয়া থাকে। মুসলমানেরা দিবসের কার্য্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই তাহা করে না। মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করে, হিন্দুর তাহার সুবিধা নাই। সুতরাং হিন্দু কৃষক দুর্ব্বল, মুসলমান সবল। মুসলমান সবল দেহ লইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে. হিন্দু দুর্ব্বল দেহে তাহা পারে না। কাজেই মুসলমান কৃষকের যেরূপ আয়, হিন্দুর সেরূপ নয়। দরিদ্রতা হিন্দু কৃষক ধ্বংসের আর এক কারণ।

(৬) হিন্দু কৃষক পুরুষানুক্রমে একই বাড়ীতে বাস করে; বহুকালের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা ও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল তাহার আবাসভূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। অধিকাংশ মুসলমান কৃষক এক বাড়ীতে বহুদিন থাকে না। তাহাদের বাড়ীতে বৃক্ষাদিও বেশী নাই। তাহারা সচরাচর নদীর নূতন চরে যাইয়া বসতি স্থাপন করে। সুতরাং তাহাদের দেহ হিন্দু কৃষকদের মত শীঘ্র জরাজীর্ণ হয় না।

(৭) হিন্দু কৃষক তাহার দুর্ব্বল দেহে এক বিঘা জমিতে যত শস্য উৎপাদন করে মুসলমান কৃষক তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং কৃষিকার্য্যে মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর তত হয় না। হাটবাজারে হিন্দু যে মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতে চায়, মুসলমান তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় হিন্দু হারিয়া যাইতেছে; সুতরাং বাধ্য হইয়া অনেক হিন্দু কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে।

হিন্দু কৃষক লোপ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করিলাম। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কারণ আছে। হিন্দু কৃষক সংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ যে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিলে বাংলা দেশে যে হিন্দু কৃষকের চিহ্নমাত্র থাকিবে না এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু কৃষক রক্ষা করা যদি উচিত মনে হয়, তবে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদ্যগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে আরম্ভ করুন।

(সঞ্জীবনী)

ব্যাঙ্কশিল নির্ব্বাচন।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলাফলও বাহির হইয়াছে। এবারের নির্ব্বাচনে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই স্বরাজ্যদল জয়লাভ করিয়াছেন।

স্বরাজ্যদলের জয়ে দেশে জাতীয়তার জয় সূচিত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেশে মডারেটদের আর স্থান নাই। কাউন্সিলে যাইয়া স্বরাজ্যদলের সফলতার সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু কাউন্সিল নির্ব্বাচনে যে স্বরাজ্যদলের পূর্ণ সাফল্য হইয়াছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

এবারের নির্ব্বাচনে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা কালের ঘোর পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে। মিঃ এস, আর দাশ ও স্যার সুরেন্দ্রনাথের পতন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিশেষতঃ স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরাভবে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, এককালে যিনি যত বড় দেশসেবী হউন না কেন, পরে যদি তিনি দেশের বিরুদ্ধে গমন করেন, লোকমতকে পদদলিত করেন, তবে তাঁহারও পতন অবশ্যম্ভাবী। সুরেন্দ্র-পতনে আমরা দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কেন না, এরূপ যে হইবে তাহা সকলেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও বোধ হয় এজন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। যখন তিনি জাতীয়তার মূর্ত্ত অবতার মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যপূত অহিংস অসহযোগনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, যখন তিনি লোকমতকে পদদলিত করিয়া বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর সহিত সহযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, দেশবাসী ইহা নীরবে সহ্য করিবে না, ইহার ফল তাঁহাকে হাতে হাতে পাইতে হইবে। আজ সুরেন্দ্রনাথের পরাভবে তাঁহার স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিল বারাকপুর সুরেন্দ্রনাথের ওয়াটার্লু। (যুগবার্ত্তা)

কলিকাতায় পুরুষ ও স্ত্রী—কলিকাতা সহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত অস্বাভাবিক। খাস কলিকাতায় প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় মাত্র ৪৭০ জন স্ত্রীলোক, হাওড়াতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫২০ জন স্ত্রীলোক এবং ২৪ পরগণা ও সহরতলীতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৬১৪ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গলার মফঃস্বল সহরে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৮১৬ জন। যে সমস্ত মফঃস্বল সহরে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বা কল কারখানা আছে, সেই সব স্থানে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরের মতই কম,—প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, বজবজ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৪৩৬ হইতে ৪৪০ জনের মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরা, যেকোন কারণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে বাস করে; সহরের ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রে বা কলকারখানার কাজে এখনও এদেশে স্ত্রী-মজুরের আমদানী, পাশ্চাত্য দেশের মত হয় নাই।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা তুলনা করিতে গিয়া আর একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ইউরোপে যুদ্ধের পর অবশ্য স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বেশী বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ঐ সব দেশে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যাই বেশী ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে তাহার বিপরীত অবস্থা। এমন কি ৪০।৫০ বৎসরের সেন্সাস তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, বাঙ্গলার সহরে ও মফঃস্বলে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বাড়িতেছে না, কমের দিকেই যাইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে ব্যাপারটী অনেকটা বুঝা যাইবে—

প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
কলিকাতা সহর	৪৭০	৪৭৫	৫০৭	৫১৯
২৪ পরগণা ও সহরতলী	৬১৪	৬৫৬	৬৮০	৭১৫
হাওড়া	৫২০	৫৬২	৫৭৭	৬১৪
মফঃস্বলের ব্যবসা বা কলকারখানার সহর	৫৩৭	৫৮২	৬০৫	৬৮৫
সাধারণ মফঃস্বল সহর	৮১৬	৮৪১	৮৬৯	৯০৩
সমগ্র বঙ্গ	৯৩৪	৯৪৫	৯৬০	৯৯০

(১৮৮১ সালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৯২ জন ছিল।)

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা কমিতেছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইহা কোন জাতির পক্ষে সুলক্ষণ নহে। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র স্ত্রী-সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহার ব্যতিক্রম, জাতির জীবনী-শক্তির অভাব সূচনা করিতেছে।

এই সঙ্গে আর একটী ব্যাপারও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিলেও, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। হিন্দু-স্ত্রীলোকের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। বিগত দশ বৎসরে ২০ হইতে ২৫—এই বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা (প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায়) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাড়িয়াছে, ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাড়িয়াছে এবং ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩২৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। ফিরিঙ্গী বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। সহরের উত্তরাঞ্চলে শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, জোড়াবাগান এবং জোড়াসাঁকো অঞ্চলে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে; অন্যদিকে পার্কষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া টেরেস এবং কলিঙ্গবাজারে ফিরিঙ্গী-স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

উপরে যাহা দেখাইলাম, তাহার রহস্য বুঝিতে হইলে আর একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। যে সহরে পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম, সেখানে দুর্নীতি ও বেশ্যাবৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাতা সহরে, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৪১৮১১৩ বা ৫ লক্ষ জন; তার মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১০৩৩১৭ জন বা ১ লক্ষের কিছু উপরে! ইহাদের মধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে ৬৪১ এবং

হাওড়ার ১২১৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ্য বেশ্যা বলিয়া লেখা হইয়াছে। বাদ বাকী কত স্ত্রীলোক যে "অপ্রকাশ্য বেশ্যা", "গুপ্ত বেশ্যা" বা "হাফ গেরস্ত," তাহা অনুমানেই বুঝা যায়। ধরিতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বেশ্যার সংখ্যা প্রতি ১৮ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১জন। এক সম্প্রদায়ের লোক "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের স্ত্রীলোকের অনেকেই বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। কলিকাতা সহরে 'জাতবৈষ্ণব'দের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৫৯ জন। ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের 'জাত বৈষ্ণব' স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১১৭০ জন এবং ৪০ এর উপরে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই সমস্ত অধিক বয়স্কা 'জাত বৈষ্ণব' স্ত্রীলোকগণই ঝি, পানওয়ালী, 'বাড়ীওয়ালী' প্রভৃতির ব্যবসা করে। ফিরিঙ্গীদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। যাঁহারা কলিঙ্গবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের খবর রাখেন, তাঁহারা ইহার রহস্য বুঝিতে পারিবেন।

যে সমস্ত নীতিবাগীশ লোক সহরে দুর্নীতি দমনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা এই সমস্ত তথ্য ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই আছে। কি কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সহরে বেশ্যাবৃত্তি ও দুর্নীতি বাড়িতেছে,—তাহা না জানিলে শুধু একটা ফাঁকা আইন করিয়া কিছুই লাভ হইবে না। মানুষকে ভাল হইবার সুযোগ না দিলে, দুর্নীতি দমন করা অসম্ভব।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলিকাতায় লোকসংখ্যা—কলিকাতা বাঙ্গলাদেশের রাজধানী হইলেও, এখানে বাঙ্গালীর প্রাধান্য নাই, এমন কি উহা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ১৯২১ সালের লোক গণনার হাওড় ও সহরতলীর সহিত সমগ্র কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা ১৩,২৭,৫৪৭ জন। তার মধ্যে খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ৯০৮৫১। এই লোকসংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালীর অংশ কত, নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যাইবে।

খাস কলিকাতা—৯০৭৮৫১

(জন্মস্থান অনুসারে)

কলিকাতা সহর	২৪ পরগণা ও হাওড়া	বাঙ্গলার মফঃস্বল
৩০৪৭৭১	৯৯১২৪	১৭৫৬৬৪

বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন প্রদেশ	ভারতের বাহিরে বিদেশ
৩১ ২৩৬	১৪০৫১

অর্থাৎ খাস কলিকাতার সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ জন অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতে আগত লোকের সংখ্যা কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ১৯৩৫ ভাগমাত্র; অর্থাৎ কলিকাতায় মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ডবল।

হাওড়ার লোকসংখ্যার শতকরা ৪০৪৬ ভাগ অ-বাঙ্গালী এবং সহরতলী ও ২৪পরগণার শতকরা ৩১৭৫ ভাগ অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বলবাসী লোকের সংখ্যা হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার সহরতলীতে যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১০৭৪ ভাগ ও শতকরা ১১১৬ ভাগ মাত্র।

এক বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের লোকই কলিকাতার লোক সংখ্যার প্রায় পাঁচভাগের একভাগ দখল করিয়া আছে। কলিকাতার লোক-সংখ্যার দশভাগের একভাগ যুক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে। সহরের হাজার করা ২৩ জন রাজপুতানার লোক। ভিন্নপ্রদেশের যে সমস্ত জেলা হইতে বেশী লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার দুই একটী নমুনা নীচে দিলাম:—গয়া—৪৮১১৪, পাটনা—২৮০৩৪, সাহাবাদ—২৬৭৪১, মজঃফরপুর—২১০৫৩, মুঙ্গের—২০৬৯০, কটক—৪৫৮৭৪, বালেশ্বর—১৬৪১৯, বারাণসী—১৬৬১৫, গাজীপুর—১৫৩৯১, বালিয়া—১৪০৯২, আজমগড়—১২০৬২, জৌনপুর—১২৩৪১, বিকানীর—১২৫৯৬, জয়পুর—১১৭১৪।

এর সঙ্গে বাঙ্গলার মফঃস্বলের কোন জেলা হইতে কতলোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার তুলনা বেশ কৌতূহলজনক হইবে:—হুগলী—৪৭০৯২, মেদিনীপুর—৩৬০৮২, ঢাকা—৩০৪৬৫। বর্দ্ধমান—২০৬২৭, নদীয়া—১৬২৩৫, ফরিদপুর—১০৫৮৬, যশোহর—৯৫৪৮, বাখরগঞ্জ—৭২১৮, বাঁকুড়া—৭১৭৯, মুর্শিদাবাদ—৬১০৯, খুলনা—৫৭৫৪। এই দুই তালিকার তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কলিকাতা বাঙ্গালীর রাজধানী নয়, উহা বিহারী, উড়িয়া, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীদেরই সহর।

খাস কলিকাতা ও হাওড়ায় যত লোক স্থায়ীভাবে বাস করে, সাধারণতঃ আদম শুমারীতে তাহাদেরই হিসাব ধরা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মফঃস্বল হইতে ডেলী-প্যাসেঞ্জাররূপে যে সমস্ত লোক দিনের বেলায় কলিকাতায় কাজ করিতে আসে এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহারা প্রত্যূষে নাকেমুখে দুইটি অন্ন গুঁজিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে রেলে ষ্টীমারে চড়ে, আবার সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিয়া যায়। গ্রাম্যজীবন বা পারিবারিক জীবন এদের নাই বলিলেও চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ন-সমস্যার ফলে এই জাতীয় জীবের সংখ্যা কলিকাতায় ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহাদের অধিকাংশ কেরাণীর দল হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লোক প্রত্যহ এইভাবে কলিকাতায় ডেলী-প্যাসেঞ্জার হইয়া আসিয়া কাজ করে। ইহাদের সংখ্যা ক্রমে কিরূপ বাড়িতেছে, 'লোকাল রেলওয়ের' মাসিক টিকিটওয়ালা প্যাসেঞ্জারদের তালিকা হইতেই উহা কতকটা বুঝা যাইবে—

রেলের নাম—	১৯০১, ১৫১০, ১৯২০
হাওড়া, ই, আই—	৩১৫৪৩, ৫৪১৮৭, ১০১৬৩২
হাওড়া, বি, এন—	৬১১৮, ১৭৫১, ২৯৫৩৩
হাওড়া আমতা ও হাওড়া শিয়াখালা—	১০৮১, ৭৫২২, ১৭৫৬৫
শিয়ালদহ, ই, বি— ...	৩১৭৬৬, ৯৩৬৫৩৪
শ্যামবাজার—বারাসত	
বসিরহাট	১২২৪

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

শোক-সংবাদ

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই—৫৭ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্রদ্বয় ও সংখ্যাতীত আত্মীয় বন্ধুগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পাঁচকড়িবাবু সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রায় সাত আট মাস তিনি শয্যাগত ছিলেন; আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম এ যাত্রায় তিনি নীরোগ হইবেন; মধ্যে তিনি একটু সুস্থও হইয়াছিলেন। তাহার পরই আবার রোগ বৃদ্ধি হয় এবং সেই দুশ্চিকিৎস্য বহুমূত্র রোগেই তাঁহার জীবনান্ত হইল। পাঁচকড়িবাবু কি ছিলেন, তাহার পরিচয় বাঙ্গালা দেশের কাহাকেও দিতে হইবে না; তিনি, বলিতে গেলে,



পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

এ দেশে সর্ব্বজন পরিচিত ছিলেন। আজ ত্রিশ বৎসর তিনি নানাভাবে বাঙ্গালা দেশের সেবা করিয়াছেন, সে কথা কেহ ভুলে নাই, ভুলিবে না। তিনি ত চলিয়া গেলেন, কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন বৃদ্ধ মাতা-পিতা; তাঁহাদের কথা মনে করিয়া সকলেই কাতর হইবেন। পাঁচকড়িবাবু মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান; এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্তও তিনি মা বাপের আদুরে আবদারের ছেলে ছিলেন। এমন পুত্রের বিয়োগে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে কি অবস্থায় আছেন, তাহা ভাবিয়াই আমরা অধীর হইতেছি—তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা ত নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ইঁহাদিগকে শোক-তাপের অতীত করুন।

৺সূর্য্যকুমার অগস্তি

মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বড়ই দুঃখিত



সূর্য্যকুমার অগস্তি

হইলাম। অগস্তি মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ প্রতিযোগিতায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে "ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। অনেক জেলাতে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের

কার্য্য করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তখন অগস্তি মহাশয় ঐ সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের সকল হিতকর অনুষ্ঠানেই তাঁহার উৎসাহ ও সম্বন্ধ ছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি মেদিনীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। অবশেষে, হৃৎপিণ্ডের ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ন্যায় সুচিকিৎসকের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র ও পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

ভাগের পূজা।—মূল্য দুই টাকা। এই 'ভাগের পূজা' উপন্যাসের লেখক একজন নহেন—ষোলজন পূজারী ও পূজারিণী এই পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। 'যমুনা' পত্রিকায় প্রত্যেক মাসে একজন করিয়া এই উপন্যাসখানিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার যেমন খেয়াল, যাঁহার যতটা শক্তি-সামর্থ্য তিনি তাহাই এই ভাগের পূজায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আটজন পূজারী ও আটজন পূজারিণী মিলিয়া এই উপন্যাসখানি শেষ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন হাতের লেখা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে জোড়া না মিলিলেও গল্পটা মোটের উপর বেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার অধিক কিছু বলা শোভন হইবে না, কারণ এ পূজার অংশ যে আমরাও গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইমাত্র বলিতে পারি যে, এমন ভাল কাগজে ভাল ছাপা, এমন সুন্দর বাঁধাই এবং ষোলজনের লেখা দুই টাকা দিয়া কিনিলে কাহারও অপব্যয় বলিয়া মনে হইবে না।

স্নেহের শাসন।—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কাব্যরত্ন প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই সুন্দর উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, কারণ এখানি একটু স্বতন্ত্র ধরণের উপন্যাস। বাঙ্গালী সাহেবের গৃহদেবতা গোবিন্দজী এই উপন্যাসের মেরুদণ্ড; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারে ভগবানের অপার করুণার খেলা গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে দেখাইয়াছেন। সবগুলি চরিত্রই বেশ ফুটিয়াছে। আগাগোড়া কেমন একটা পবিত্রতা, একটা নিষ্ঠার সুবাসে গ্রন্থখানি ভরপুর। একেলে সেকেলে সকলকেই এই গ্রন্থখানি মুগ্ধ করিবে।

বিধির খেলা।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। উপন্যাসখানির নাম বিধির খেলা। এ জগতে বিধির খেলা সবই, সুতরাং গ্রন্থকার বইখানির নামকরণ ঠিকই করিয়াছেন। বারবনিতার প্রলোভনে পড়িয়া যুবকেরা কেমন করিয়া ধর্ম্মসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দেয়, তাহার কয়েকটী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কুল-ললনা কেমন করিয়া নরপিশাচের করতলগত হয়, তাহাও ইহাতে আছে এবং বিধির বিধানে বারবনিতা কেমন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহাও দেখান হইয়াছে। সবই পুরাতন কথা; তবুও গ্রন্থকার সেই পুরাতন কথাই বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

মেনকারাণী।—শ্রীতারকনাথ সাধু প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এই কিছুদিন পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়ের 'ভোলানাথের ভুলে'র পরিচয় দিয়াছি; তাহার পরেই তিনি 'মেনকারাণী'কে বাঙ্গালা সাহিত্যের দরবারে হাজির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়ের উদ্দেশ্য অতি সাধু; তিনি আদর্শ হিন্দু-মহিলার চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হইয়া এই 'মেনকারাণী' লিখিয়াছেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মেনকারাণী সত্যই আদর্শস্থানীয়া। ঘরে ঘরে মেনকারাণী আবির্ভূতা হউন, গ্রন্থকারও ইহাই কামনা করেন, আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সাধু গ্রন্থকারের এই সাধু প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় সত্যসত্যই অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

টাকার নেশা।—শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম-এ, বি-এল্, প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা। এখানি উপন্যাস। ছেলের বিবাহ দিয়া দুপয়সার সংস্থান করিতে অনেকেই চান, এই উপন্যাসের বৈকুণ্ঠ মজুমদার সেই দলের এম-এ পাশ—একেবারে চরম চাসার। তার প্রায়শ্চিত্তও তেমনই হইয়াছিল। বইখানি বেশ লেখা হইয়াছে, চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়াছে। সবই বেশ হইয়াছে, কিন্তু অর্থ-পিশাচ বরের বাপদের যদি এই উপন্যাসখানি পড়িয়া চৈতন্যোদয় হয়, শ্রীকণ্ঠের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যদি কেহ ব্যথিত হন, তাহা হইলেই উপন্যাসখানি লেখা সার্থক হইবে।

নারীর প্রাণ।—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা। 'নারীর প্রাণ' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার একনবতিতম গ্রন্থ। গ্রন্থারম্ভে

কৈফিয়তেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এই বইখানি তাঁহার প্রথম লেখা; সুতরাং নবীন লেখকের প্রথম রচনা হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়। প্রথম লেখা বলিয়া বইখানিকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না; গ্রন্থকার যে কয়েকটী চরিত্র এই বইখানিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার দুই একটী বেশ ফুটিয়াছে, 'গীতা'র অপেক্ষা নির্ম্মাল্যের চরিত্রাঙ্কন আর্ট হিসাবে দাঁড়াইয়াছে। এই নবীন লেখক যে পরে যশস্বী হইবেন, তাহা এই বইখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

চোখের নেশা।—শ্রীকিশোরীলাল দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এখানিও উপন্যাস। লেখক নবীন কি প্রবীণ, তাহা জানি না, কিন্তু লেখা খুব পাকা, নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তানের ছাপ এই উপন্যাস-খানির সর্ব্বত্র বিদ্যমান। গল্পের আখ্যানভাগ অতি সুন্দর, চরিত্রগুলিও অতি মনোরম ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে অনিলকে গ্রন্থকার একেবারে দেবতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন; বিনয়ের চরিত্রও বেশ হইয়াছে; দুই ভাই মহেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র—একজন গোঁড়া হিন্দু, অপরজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম; এ জাতীয় চরিত্র সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। রমণী চরিত্রের মধ্যে সাধনা অতুলনীয়া; অন্যগুলিও বেশ হইয়াছে। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি; এবং বলিতে পারি, যিনি এই উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন, তিনিই লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা গ্রন্থকারকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

পাথরের দাম।—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টী, প্রণীত মূল্য আট আনা। আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রিনবতিতম গ্রন্থ এই পাথরের দাম। লেখক শ্রীমান মাণিক ভট্টাচার্য্য পাঠক সমাজে বিশেষ পরিচিত; তাঁহার ছোট গল্প ও উপন্যাস অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। এই বইখানিতে তিনি কয়েকটী ছোট গল্প লিখিয়াছেন; প্রথম গল্পের নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে পাথরের দাম, কর্ম্মত্যাগ, সমস্যা, কলির ভাই, দুঃস্বপ্ন, অগ্নি-পরীক্ষা, বিজ্ঞতার মূল্য, দীক্ষা, পার্ব্বতী, ও ইস্কুলের বাবু, এই কয়টী ছোট গল্প আছে। সবগুলিই সুলিখিত, সুতরাং সুপাঠ্য; পাঠকগণ পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন। গল্প কয়েকটীর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য অগ্নি-পরীক্ষা ও দীক্ষা।

প্রজ্ঞাপতির দৌত্য।—শ্রীঅজয়কুমার সেন প্রণীত, মূল্য আট আনা। এই ছোট গল্পের সংগ্রহ পুস্তকখানি আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রিনবতিতম গ্রন্থ। শ্রীমান অজয়কুমার নানা মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী এবং দুইটী নূতন গল্প দিয়া এই পুস্তকখানি ছাপাইয়াছেন। প্রশংসার কথা এই যে, গল্পগুলি সত্য সত্যই ছোট এবং এই ছোট গল্পের মধ্যে ভাব-বিশেষ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমান বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; নবীন লেখকের পক্ষে এই সাফল্য কম কথা নহে।

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবু স্বর্গীয় নাট্যরথী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; ছায়ার ন্যায় তিনি গিরিশবাবুর সঙ্গী ছিলেন; সুতরাং রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা বলিতে তিনি হকদার। বিগত দুই যুগের অধিককাল অবিনাশ বাবু রঙ্গালয়ের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। তিনি কোন দিন অভিনয় করেন নাই। কিন্তু অভিনেতাদিগকে তিনি বিশেষ ভাবে জানিতেন এবং এখনও জানেন। কাজেই বিভিন্ন রঙ্গালয়ে যখন যে রঙ্গ-কথা হইয়াছে, তাহার অনেকই তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, কতক বা অপরের মুখেও শুনিয়াছেন। সেই সকল রঙ্গ-কথা একত্র সংগ্রহ করিয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখন এক রকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনাশ বাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠক পাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইখানি সুন্দর হইয়াছে, যেমন ছাপা, তেমনই বাঁধাই, আবার কয়েকখানি আলোক-চিত্রও আছে। জিনিস হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে।

অংশুমতী।—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য সাড়ে সিকা। 'অংশুমতী' উপন্যাস। গ্রন্থকার বহুদিন হইতে পশ্চিমাঞ্চল-বাসী; সুদূর লাহোরে বসিয়াও যে তিনি মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা তেমন ছিল না। এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন চিরপ্রবাসী বাঙ্গালীরাও বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ এই প্রবীণ লেখক মহাশয়ের উপন্যাস 'অংশুমতী'। বইখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। একেলে নভেলের ধারা অনুসারে লিখিত না হইলেও আখ্যানভাগ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত মানব প্রলোভনের বশীভূত হইয়া কি প্রকারে দ্রুত অধঃপতিত হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন।

কমলাকান্তের পত্র।—মূল্য এক টাকা। লেখকের নাম নাই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন; তিনি নিজের নাম গোপন করেন নাই; কিন্তু এই 'কমলাকান্তের পত্র'—লেখক নাম গোপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে চিনি, বিশেষ ভাবে জানি, বন্ধু বলিয়া গৌরবও অনুভব করি। কিন্তু নামটা তিনি যখন গোপন করিয়াছেন, তখন আমরাও প্রকাশ করিলাম না। তবে, ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এমন কৃতী, এমন পণ্ডিত, এমন তত্ত্বজ্ঞ, এমন সুরসিক লেখক বেশী দিন আত্মগোপন করিতে পারিবেন না। এই 'কমলাকান্তের পত্র'ই তাঁহাকে শুধু জাহির করিবে না, তাঁহাকে যশস্বী করিবে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পরে এই 'কমলাকান্তের পত্র' নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এ কথা আমরা এই পুস্তকের প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এ এ মহাশয়কে জানাইয়া দিতেছি। এই পুস্তকের ইহার অধিক পরিচয় আর কি, তাহা আমরা জানি না। যিনি বাঙ্গলা পড়িতে জানেন তাঁহাকেই এই বইখানি পড়িবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

ভক্তিমতী।—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১।০। এখানি উপন্যাস। শ্রীমান বিজয়রত্ন কলিকাতাবাসী হইলেও পল্লীর সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, তাহা এই 'ভক্তিমতী' গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অতি মনোরম একটী পল্লী গৃহস্থ-পরিবারের চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি যে কয়টী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সিন্ধু ও নির্ম্মল অতি সুন্দর হইয়াছে। সিন্ধুর শ্রীধরের প্রতি ভক্তিকে আধুনিকেরা অন্ধ কুসংস্কার বলিতে পারেন, কিন্তু ঐ প্রকার ভক্তিতেই মুক্তিলাভ হয়। বইখানির ছাপা কাগজ প্রভৃতি বেশ মনোজ্ঞ।

কলেরা চিকিৎসা (সচিত্র)।—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি প্রণীত, মূল্য এক টাকা। কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এসিষ্টাণ্ট রিসার্চ্চ ওয়ার্কার শ্রীমান অরুণকুমার এই কলেরা চিকিৎসা বইখানি লিখিয়াছেন। রজার্স সাহেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সেলাইন চিকিৎসা আজ জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইংরাজী ভাষায় এ সম্বন্ধে অনেক ভাল পুস্তক আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না; শ্রীমান অরুণকুমার সেই অভাব পূরণ করিলেন। আমরা চিকিৎসক নহি, তবুও বইখানি আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি, এবং কেমন করিয়া সেলাইন ইন্‌জেক্‌সন করিতে হয় তাহা, অরুণকুমারের লেখার গুণে বুঝিতে পারিয়াছি। বইখানি সকলেরই ঘরে থাকা দরকার, কারণ ওলাউঠা ত দেশে লাগিয়া আছেই।

মায়াপুরী।—শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু প্রণীত, দাম এক টাকা আট আনা। গত তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার লেখক মহাশয় যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী লইয়া এই 'মায়াপুরী' রচনা করিয়াছেন। মনীন্দ্রবাবু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে একটা নূতন সুর আনিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি গদ্যকাব্য লেখেন। আমরা তাঁহার সুন্দর, সুরঞ্জিত বর্ণ-শিল্পের মোহে এমন অভিভূত হইয়া যাই যে, গল্পের আখ্যানভাগ ভুলিয়া যাই। নিপুণ চিত্রকরের মত তিনি শব্দের পর শব্দ বসাইয়া, অলঙ্কারের পর অলঙ্কার সাজাইয়া মায়াপুরী রচনা করেন; বর্ত্তমান সংগ্রহ পুস্তকে তাহার প্রমাণ আছে। চিত্র-শিল্পী শ্রীমান চারুচন্দ্র রায় বি-এ অঙ্কিত প্রচ্ছদপট মায়াপুরীরই মত হইয়াছে।

মণিকাঞ্চন।—শ্রীফণীন্দ্র নাথ পাল বি-এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত ফণীবাবু উপন্যাস-সাহিত্যে বিশেষ যশঃ লাভ করিয়াছেন; তিনি লিখিতেও পারেন খুব বেশী। রোগ-শয্যায় পড়িয়া তিনি এই 'মণিকাঞ্চন' বইখানি লিখিয়াছেন। উপন্যাসের আখ্যান ভাগ বেশ হইয়াছে, কোন স্থানে জড়তা নাই, কোথাও মলিনতা নাই। মানদা, লতিকা, অপূর্ব্বের চরিত্র চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। ফণীন্দ্রবাবুর ভাষা কোন দিনই কষ্টকল্পিত নহে, বেশ ঝরঝরে। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় এখানিও পাঠক সমাজে আদর লাভ করিবে।

দুরন্ত দেবতা।—শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল, এখানি বুঝি একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস। দেখিলাম, চুরি, ডাকাতি, খুন এবং পেশাদার ও এ্যামেচার টিকটিকির অভাব না থাকিলেও বইখানি ঠিক ডিটেকটিভ উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। গ্রন্থকার একজন বাঙ্গালী কলেজের ছাত্রকে এ্যামেচার ডিটেকটিভ রূপে হাজির করিয়া তাহার দ্বারা যে অসাধ্যসাধন করাইয়াছেন, তাহাতে যেমন তাঁহার অসীম স্বজাতি-প্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, পক্ষান্তরে তিনি সেইরূপ ভাস্কর পন্থীর চরিত্র এমন ভাবে গড়িয়াছেন যে, সে ডাকাত হইলেও তাহাকে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকা যায় না, এবং কাহার বিয়োগান্ত প্রেমের সর্ব্বশেষ মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়। গ্রন্থের নায়ক ভাস্করপন্থী ডাকাত হইলেও স্বদেশপ্রেমিক ডাকাত; স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় অর্থ সংগ্রহ করাই তাহার ডাকাতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের অপেক্ষা পত্নী-প্রেম নলবত্তর হওয়ায় সে ডাকাতি ছাড়িয়া সংগৃহীত সমস্ত অর্থ দেশের নামে উৎসর্গ করিয়া পত্নীকে লইয়া দরিদ্র গৃহস্থরূপে সাধুভাবে শান্তিতে বাস করিতে গেল; কিন্তু নাছোড়বান্দা টিকটিকিরা তাহা ঘটিতে দিল না, এবং গ্রন্থের উপসংহার বিয়োগান্ত হওয়া অনিবার্য্য

সঙ্গীত দর্পণ—প্রথম ভাগ শ্রীযাদবকৃষ্ণ বসু প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র স্বরলিপি সাহায্যে গীতবাদ্য শিক্ষা করিবার পুস্তকের অভাব নাই। এই পুস্তকখানিও সেই ধরণের, তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে তবলার ঠেকা সেতারের গৎ এবং অন্য সঙ্গীতের স্বরলিপি সমস্তই একই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহিখানিতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সুর ও তালের হিন্দী গান আছে, কিন্তু গানগুলির অনেক কথা এরূপ অদ্ভুত হিন্দীতে লিখিত হইয়াছে, যে তাহার অর্থোদ্ধার দুসাধ্য। স্বরলিপিগুলিতে সম মাত্রা ও তালাঙ্ক ব্যবহার করিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া রীতিমত মাত্রার তারতম্য হিসাবে গীতগুলির স্বরলিপি দিলে শিক্ষার্থীর শিখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত।

সুরের তালিকায়—"কালনেংড়া" ও "গোড়সারঙ্গ," দেখিলাম। ইহা কি মুদ্রাকর প্রসঙ্গ? আমরা বালাংড়া ও গৌরসারঙ্গ বলিয়াই এই দুই সুরের নাম জানি।

বহিখানিতে শিখিবার অনেক জিনিষ আছে, এবং যদি কোন গায়ক এই পুস্তকের একখানি গানও নিজের চেষ্টায় সম মাত্রাগুলি বিভাগ বণ্টন করিয়া গাহিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ একখানি গানেই তাঁহার শ্রোতাদের মুগ্ধ করিবেন।

সাময়িকী

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপার কতকটা নির্ব্বিবাদে,—কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে নহে,—সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কতকটা নির্ব্বিবাদে এই জন্য বলিলাম যে, বাঙ্গলার স্থানে স্থানে নির্ব্বাচন উপলক্ষে লাঠালাঠিও চলিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আর নির্ব্বাচন যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই, তাহার প্রমাণ,—বেশী দূরে নয়,—২৪ পরগণায় নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছিল; এই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অসংখ্য মোটর গাড়ী চলাফেরা করিয়াছিল, এবং একটী বৃদ্ধা না কি একখানি মোটরের তলায় পড়িয়া আত্মবলি দিয়াছে। সে যাহা হউক, যেমন করিয়াই হউক, নির্ব্বাচন ব্যাপার শেষ হইয়া গেল,—তিন বৎসরের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাওয়া গেল।

এই সব নির্ব্বাচন ব্যাপার এদেশে এখনও সম্পূর্ণ tame affair, অর্থাৎ খুব মোলায়েম জিনিস। কিন্তু এবার বিলাতে পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, এবং তাহার যতটুকু সংবাদ তারে বেতারে এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আক্কেল গুড়ুম হইয়া যায়। সেখানে নির্ব্বাচন উপলক্ষে গুণ্ডামি, দলাদলি পূর্ণ মাত্রায় চলিয়াছিল। ইষ্টক-বৃষ্টি, দরজা জানালা ভাঙা, কুকুর বেড়াল শিয়ালের ডাক, এমন কি মহিলা নির্য্যাতন প্র্যন্ত অবাধে চলিয়াছিল। অনেক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা স্বয়ং নির্ব্বাচন-প্রার্থিনী-রূপে অথবা স্বামীর বা আত্মীয় স্বজনের সাহায্যকারিণীরূপে নির্ব্বাচন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। পদাঘাত, গায়ে থুথু নিক্ষেপ, মারপিট কোনটাই বাকী ছিল না। অনেকে আহতাও হইয়াছিলেন। তথাপি, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়,—এত কাণ্ডের পরও পুরাতন পার্লামেণ্টের তিনজন মহিলা সদস্যার স্থলে নূতন চারিজন ও পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন—মোট এই সাতজন নূতন পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্যা রূপে নির্ব্বাচিতা হইতে পারিয়াছেন। ক্রমেই যে ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তখন পার্লামেণ্টে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইলে তাঁহারা যে এই নির্য্যাতন লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, সে পক্ষেও আমাদের মনে একটুও সন্দেহ নাই। নির্ব্বাচন উপলক্ষে পাশবিকতা ও বর্ব্বরতায় মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অনেকেই মনে করিতেছেন, নূতন পার্লামেণ্টের সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে আইন করিয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিয়া বৃটিশ জাতি প্রকাশ্য সভা করিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা।

পার্লামেণ্ট বা কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপার খাঁটি বিলাতী জিনিস। আসল জিনিস যখন বিলাত হইতেই আসিয়াছে, তখন তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি, যথা, গুণ্ডামি, দলাদলি, মহিলা-নির্য্যাতন প্রভৃতিও যে ক্রমে ক্রমে এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ বিলাতের ন্যায় এ দেশেও মহিলারা কিছু কিছু নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিয়াছেন, ক্রমে আরও পাইবেন। এবং আজ হউক বা কাল হউক, তাঁহারাও যে প্রকাশ্যে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিবেন, এবং কেহ বা ভোটার রূপে কেহ বা নির্ব্বাচন-প্রার্থিনীরূপে নির্ব্বাচন-সমরে যোগ দিবেন তাহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। তখন এ দেশের নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহার কল্পনা আর এখন করিয়া কাজ নাই।

এখন নির্ব্বাচন ত হইয়া গেল; কিন্তু তাহার ফলাফল কি দাঁড়াইল? এই সংবাদটি জানিবার জন্য সকলেই বোধ হয় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। তা ফল মন্দ হয় নাই। এখানকার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেও দলাদলির প্রভাব বড় অল্প ছিল না, এবং সকল দলই নিজের নিজের কোলের

কে ঝোল টানিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; এবং শুনিতে পাই; নির্ব্বাচন যুদ্ধে জয় লাভের জন্য সদসৎ কোন উপায়ই নিন্দনীয় বলিয়া বর্জ্জিত হয় নাই। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা এবং লোকের মনের গতি বিলাতে যে সকল উপায়ে সিদ্ধিলাভ হয়, এখানে তাহার সকলগুলি চলে না। কিন্তু নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা এবং তাঁহাদের দলবল তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত ছিলেন না,—এখানকার উপযোগী উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছিল। ফলে, প্রায় সকলেই মোটামুটি ভোটারদিগকে সশরীরে স্বর্গে তুলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। এইভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ করিয়া ফলাফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মোট ১৪০জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জন সরকারী মনোনীত, এবং বাকী ১১৪জন নির্ব্বাচিত; তন্মধ্যে অমুসলমান ৪৬জন, মুসলমান ৩৯জন, ইয়োরোপীয়ান ৫জন, এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ২জন, জমিদার ৫জন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২জন ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে ১৫জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দলাদলির হিসাবে ২৪জন অমুসলমান ও ১৫জন মুসলমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন—এই ৪০ জন স্বরাজ্য দলভুক্ত। এক তরফা হিসাব। আবার কোন কোন হিসাবে দেখা যায় স্বরাজ্য দলভুক্ত সদস্য সংখ্যা ৫১ জন; এবং ব্যবস্থাপক সভায় মেজরিটি তাঁহাদেরই দিকে। মধ্যে আবার অনেক গণ্ডগোলের কথাও শোনা যায়। অনেকে না কি স্বরাজ্য দলের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইয়া এখন বাঁকিয়া বসিতেছেন; বলিতেছেন, স্বরাজ্য দলের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সে যাহা হউক, নূতন ব্যবস্থাপক সভায় বৈঠক আরম্ভ হইতে ত আর বেশী দেরী নাই। কার্য্যক্ষেত্রে বুঝা যাইবে কে স্বরাজ্যদলের, এবং কে নয়।

এ ত গেল সদস্য নির্ব্বাচনের পালা। ইহার পর আর একটা বড় পালা আসিতেছে। সেটা—মন্ত্রী মনোনয়ন। সে পালাটাও বড় সোজা নয়। বিশেষতঃ মন্ত্রী মনোনয়নের সঙ্গে মন্ত্রীদের বেতন নির্দ্ধারণের কথা উঠিবে। গত তিন বৎসর ধরিয়া মন্ত্রীদের বেতন কমাইবার প্রস্তাব লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভাতেও এই আন্দোলনের টেউ পৌঁছিয়াছিল। ফলে যাহা হউক একটা সিদ্ধান্তও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে সমস্তই বৃথা হইবে, কথাটা আবার নূতন করিয়া উঠিবে। ফলে আন্দোলনটাও আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিবে। সুতরাং মন্ত্রী-মনোনয়ন ও মনোনীত মন্ত্রীদের বেতন নির্দ্ধারণ না হইয়া গেলে ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে শেষ বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও বহুদূর।

আজ আমরা একজন কৃতি বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।



শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার

উপরে যাঁহার চিত্র দেখিতেছেন, ইনি শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার এফ-আর-সি-এস (লণ্ডন)। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৯ সালে অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা (Surgery) গুণপনায় নিদর্শন স্বরূপ Mcleod স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরে কিছু দিন Prince of wales হাসপাতালের Senior House Surgeon রূপে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ১৯২১ সালে

বিলাত যাত্রা করেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের Royal College of Surgeonএর fellow হইয়াছেন। এখন তাঁহার উপাধি T. R. C. S. ইনি খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রামের অধিবাসী এবং হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদার মহাশয়ের পুত্র। আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

এক সময়ে যে ভারতবাসী নিজেদের জাহাজে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, সেই ভারতবাসীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় জনকতক লোক এখন জাহাজে খালাসীর কাজ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া জাহাজ সংক্রান্ত অপর কোন কার্য্যে বা উচ্চপদে ভারতবাসীর নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই। ভারতবাসীকে অতঃপর এই সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে কি না, খালাসীর অপেক্ষা উচ্চতর পদে অর্থাৎ অফিসার, মেট, ষ্টিউয়ার্ড, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পদে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান, বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ম্যারিণ কমিটির বৈঠক বসিতেছে। ভারতবাসীদের নিজেদের জাহাজ নাই, ভারতের বহির্বাণিজ্য ভারতবাসীর হাতে নাই, সেইজন্য ভারতবাসী নৌবিদ্যা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। অথচ, এই নৌবিদ্যা না জানা থাকিলে, ভারতবাসী বৈদেশিক বাণিজ্যে পুনরায় নিযুক্ত না হইলে ভারতের সনাতন দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কারণ ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইতে হইলে বিদেশী বণিকদের জাহাজে মাল চালান দিতে হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে তৈয়ারী মাল কিনিয়া তাহাও বিদেশী বণিকদের জাহাজে এদেশে আমদানী করিতে হইবে। অর্থাৎ বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত সকল ব্যাপারেই ভারতবাসীকে পরমুখাপেক্ষী, পরের হাততোলা, পরনির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হইতেছে। কোন জাতির পক্ষেই এরূপ অবস্থা সুলক্ষণ নহে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। তাহা করিতে হইলে আমাদের নিজেদের জাহাজ চাই, আমাদের নৌবিদ্যা জানা চাই, সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত জাহাজ লইয়া দূর মহাসমুদ্রে যাতায়াত করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক—চর্চ্চার অভাবে যাহা আমরা হারাইতে বসিয়াছি, অথবা হারাইয়াছি, সেগুলি আবার আয়ত্ত করিতে হইবে। সমুদ্রগামী জাহাজের কাজকর্ম্ম কতকটা আমাদের হাতে আসিলে আমাদের অন্নসমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু এখন যাঁহাদের হাতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ভার আছে, তাঁহারা যে সে ভার আংশিক ভাবেও ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে সহজে সম্মত হইবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল ম্যারিণ কমিটির কাছে তাঁহারা যেরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহা ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল নহে। তাঁহাদের আপত্তির প্রধান কথাগুলি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংশ্লিষ্ট। মোটামুটি, তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অসার নহে। কিন্তু তাহা হইলে ত চলিবে না। আমাদিগকে এই সকল যুক্তি খণ্ডন করিতে হইবে; কেবল মুখের কথায় নহে, কেবল যুক্তির বলে যুক্তির অবতারণা করিয়া নহে,—কার্য্যক্ষেত্রে, হাতে হেতেরে কাজ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, যে জাহাজের কাজে ভারতবাসীদের নিযুক্ত করিলে, তাহারা জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কোন আপত্তি আমলে না আনিয়া সানন্দে সাগ্রহে এই কার্য্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত। তবেই এই প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া নৌবিদ্যা পুনরায় আমাদের হস্তগত হইবার আশা আছে। নচেৎ আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অন্ধকার।

নদীয়ার উঠবন্দী প্রথা বহুদিন হইতেই প্রজার বিশেষ কষ্টের কারণ ছিল এবং ঐ প্রথা উৎপাটনের জন্য পূর্ব্বে বহুবার চেষ্টা হয় কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। পরে নূতন শাসন সংস্কারক আইন অনুসারে অধিক বেসরকারী সভ্য লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে মিঃ মৈয়র এরফান আলী সাহেব ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে "রায়ত ও শ্রমজীবী সমিতি" গঠিত করিয়া তাহার সভাপতি স্বরূপ কয়েকটী প্রস্তাব বেশ করেন এবং উঠবন্দী প্রথা উঠাইবার প্রস্তাবও তাহার মধ্যে অন্যতম। এই প্রস্তাবগুলির ফলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে উঠবন্দী প্রথা উঠাইবার আইন পাশ হয়। গভর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে বাহা

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভায় নদীয়ার প্রতিনিধিগণ উঠবন্দী আইনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কোন আলোচনা করেন নাই; মিষ্টার এরফান আলী সাহেব রায়তের পক্ষে এই আইন পাশের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এতদিনে নদীয়ার প্রজাদের একটা মহা অসুবিধা দূর হইল।

বিলাতের সাম্রাজ্য শিল্প প্রদর্শনীতে প্রেরণের উপযুক্ত দ্রব্যনির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে। সে দিন বঙ্গের লাট লর্ড লীটন বাহাদুর কলিকাতা গড়ের মাঠে ইডেন উদ্যানে এইরূপ একটী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে ও হইবে, তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, কারণ, এখনও সকল স্থান হইতে সকল জিনিস প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছায় নাই; তবে দেশী বিলাতী নাচ তামাসার বিরাট আয়োজন হইয়াছে, তাহা প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ ও বিজ্ঞাপন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; এবং প্রদর্শনী দেখিবার জন্য যত না হউক নীচ তামাসার আমোদ উপভোগ করিবার জন্য বেশী লোক প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে গমন করিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমরা অবশ্য নাচ তামাসার বিরোধী নহি; কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারে লোকশিক্ষার যে সুযোগ রহিয়াছে, সেটা উপেক্ষিত না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে দর্শকগণের সমক্ষে প্রদর্শকেরা তাঁহাদের দ্রব্যাদির গুণাগুণ, প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার-প্রণালী ব্যাখ্যা করিবার এবং demonstrate করিবার ব্যবস্থা করিলে, এই মহৎ অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে; এবং দর্শকেরাও যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে, তাহাদের অর্থব্যয়ও সার্থক হইতে পারে।

কলিকাতার খৃষ্টীয় মিশনারী কন্‌ফারেন্স ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা সাহিত্যে পরীক্ষা গ্রহণের একটী অভিনব প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতেছেন। এই পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত একটী নিয়মাবলীর প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কয়েকটি নিয়ম ও পরীক্ষার প্রণালী আমাদের অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র হইতে প্রশ্ন নির্দ্ধারিত হওয়ায় ব্যবস্থা যেমন অভিনব, তেমনি শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। দৈনিক না হউক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিতে শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট থাকে; কিন্তু পরীক্ষা দিবার জন্য কেহ কোন কালে সাময়িক পত্রাদি পাঠ করেন কি না তাহা আমরা জানি না। সাধারণতঃ লোকে দৈনিক সংবাদগুলি জানিবার জন্য, কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এবং কিঞ্চিৎ আমোদ লাভ করিবার জন্যই দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র পড়িয়া থাকে। যদিও তাহারা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই কিছু না কিছু নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তথাপি সে শিক্ষার পরিমাণ যৎসামান্য, এবং তাহাও বোধ হয় স্থায়ী হয় না। কিন্তু স্কুল বই পড়ার মত করিয়া কেহ যে সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র পড়েন না, অর্থাৎ Study করেন না, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বোধ হয় যাঁহারা কলিকাতা খৃষ্টীয় মিশনারী কন্‌ফারেন্সের পরীক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা দিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে অতঃপর অন্ততঃ একখানি সাপ্তাহিক ও একখানি মাসিকপত্র নিয়মিত ভাবে Study করিতে হইবে। তাহার ফলে লোকশিক্ষার প্রসার যে অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আমাদের মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

সেদিন শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক সভায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজী পাস বিষয়ের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনমূলক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজীর পাঠ্য বিষয়ঃ ১। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ শুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় ইংরেজী লিখিতে এবং আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকদের প্রবন্ধ বুঝিতে পারে কি না, তাহাই পরীক্ষা করা হইবে। 'বোর্ড অব ষ্টাডিস্' কর্ত্তৃক অনুমোদিত ইংরেজী পদ্য ও গদ্য রচনাসম্বলিত সিণ্ডিকেট

কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পুস্তক পাঠ করিতে হইবে। ইংরেজী পরীক্ষায় এক পেপারে (1st paper) ভারতীয় ভাষা-সমূহ হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে হইবে। নির্ব্বাচিত পুস্তকসমূহ হইতেও প্রশ্ন থাকিবে। ব্যাকরণ রচনা ও অন্যান্য বিষয়সমূহও থাকিবে। ইংরেজীর প্রথম পেপারে (1st paper) মাতৃভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য ৫০ নম্বর ও রচনার জন্য ৩০ নম্বর এবং গ্রামারের জন্য ২০ নম্বর ; দ্বিতীয় পেপারে (2nd paper) নির্ব্বাচিত পুস্তক হইতে ৫০ নম্বর ও অপঠিত বিষয়সমূহের জন্য ৫০ নম্বর থাকিবে। বর্ত্তমান প্রণালীতে ছাত্রদের ইংরাজীতে আশানুরূপ জ্ঞান হইতেছে না দেখিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন হইল।

"বুদ্ধ-গয়ার বৌদ্ধ-মন্দিরটি হিন্দুদিগের হাত হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্য ভারতবর্ষের বৌদ্ধরা কিছুদিন হইতে আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। বৌদ্ধরা বলেন যে, এই মন্দিরটি বৌদ্ধদের। মন্দিরটি বাস্তবিক পক্ষে কাহাদের—সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। যদি তাহা বৌদ্ধদেরই হয়, তবে তাহা হিন্দুদের কবলে গিয়া পড়িল কি করিয়া, এবং তাহা বৌদ্ধদিগের হাতে ফিরাইয়া দিতে কি বাধা আছে, সে সম্বন্ধে সরকারী কোনো মন্তব্য আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মান্দালয়ের আরাকান প্যাগোডার ট্রষ্টীরা এবং মান্দালয়ের বৌদ্ধ-অধিবাসিগণ স্থির করিয়াছেন যে, লর্ড রেডিং সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহারা এই সম্বন্ধে তাঁহার নিকট এক আবেদন করিবেন। হয় তো এবার একটা পাকা কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

কয়েক দিন পূর্ব্বে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের একটি বিরাট স্মৃতিসভা হইয়াছিল। সভায় এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, হলের ভিতর স্থান না হওয়ায় কলেজ স্কোয়ারে স্বতন্ত্র একটী সভার অধিবেশন করিতে হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আচার্য্য রায় মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, অশ্বিনীকুমার নৈতিক চরিত্রের দ্বারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে অভিভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার এত ব্যক্তিত্ব ছিল যে, দোকানদারেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমতি না লইয়া কোন বিলাতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে নাই। শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, আজ সকল সম্প্রদায়ের লোক অশ্বিনীকুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে বাঙ্গালী আজ সকল প্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়াছে। অশ্বিনীকুমার যুবকগণের চরিত্র গঠনের জন্য আজীবন নিজের জীবনের আদর্শ দ্বারা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, অশ্বিনীকুমার দেশ-মাতৃকাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইলে দেশ মাতৃকাকে ভালবাসিতে হইবে। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি তবেই রক্ষিত হইবে যদি তাঁহার শ্মশান ভস্ম হইতে বাঙালী যুবকগণের হৃদয়ে নূতন তেজের সঞ্চার হয়। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বলেন, আজিকার এই বিরাট ও বিপুল জনসঙ্ঘ দেখিয়াই বোধ হইতেছে, দেশের লোকের হৃদয়ে অশ্বিনীকুমারের কতটা স্থান ছিল। তারপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দুরন্ত দেবতা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত "ঝড়ের পাখী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আট আনা সংস্করণের ৯৪ সংখ্যক পুস্তক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "সাধে বাদ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "অমূল তরু" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গীতাভিনয় "রাজা যদুমল্ল" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "ভুলভাঙ্গা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত "পুরাতন প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় পর্য্যায় প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নদের নিমাই" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

ভারতবর্ষ

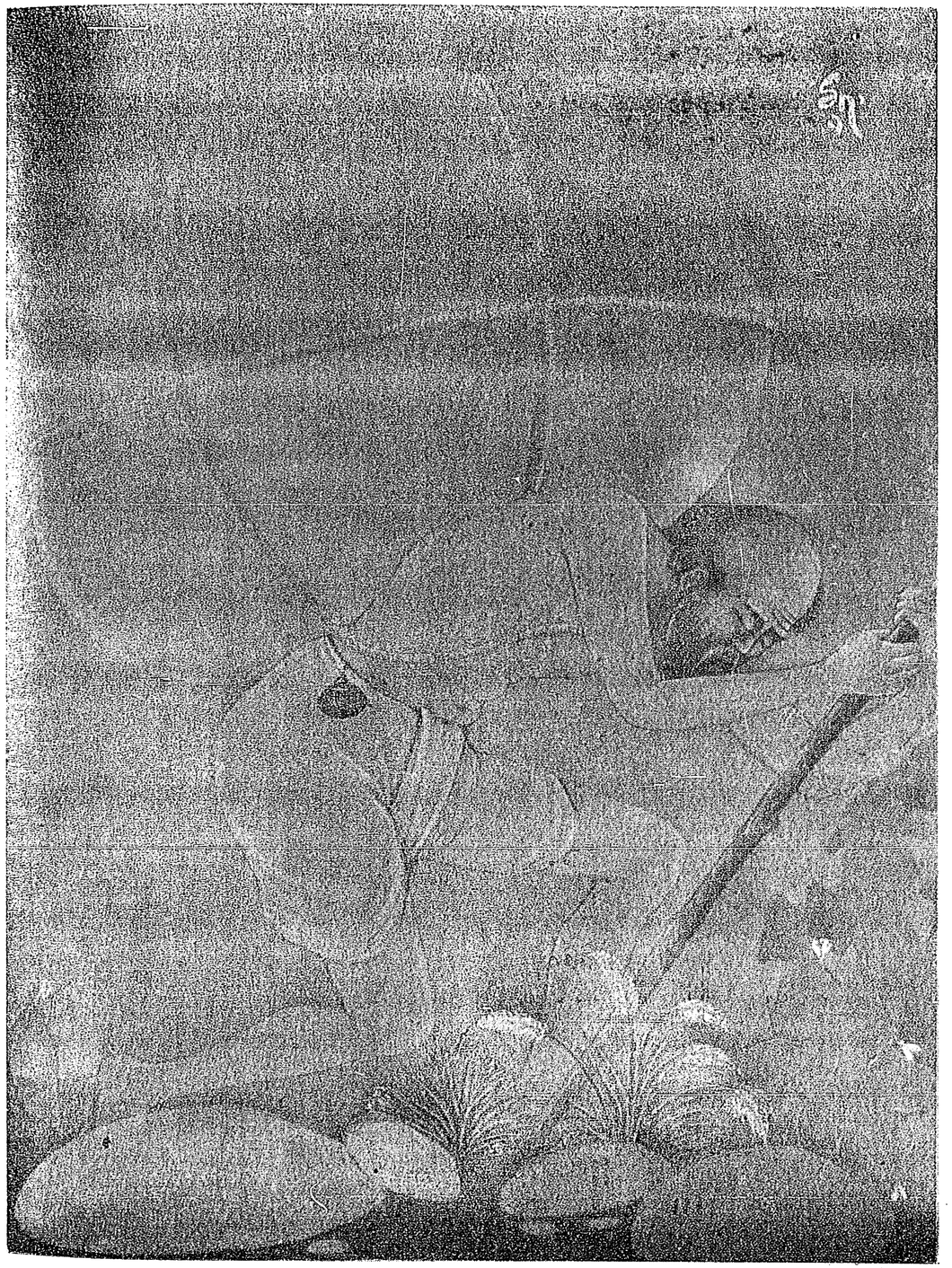

জীবনের বোঝা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS



মাঘ, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা



শ্রীযুক্ত এফ, সি, মানুক বার-এ্যাট্-ল

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা *

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

আপনাদের এই বিহার ও উড়িষ্যা প্রত্নতত্ত্ব—সমিতির সহকারী সভাপতি স্যার বসন্ত মল্লিক যখন আমাকে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন আমি দুইটী কারণে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, আমি কোন দিন এরূপ ভাবে বক্তৃতা করি নাই; বিশেষতঃ, তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত এরূপ সদস্যগণের সম্মুখে গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ বিশেষ সাবধানতার সহিতই করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও শত সহস্র চিত্র আমি ভারতবর্ষ, পারিস ও লণ্ডনে দেখিয়াছি, ও নাড়াচাড়া করিয়াছি, এবং এই সম্বন্ধীয় তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছি, তথাপি আমি সকল বিষয় এখন পর্য্যন্ত সুবিন্যস্ত করিতে সমর্থ হই নাই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টী অত্যন্ত তর্কবহুল এবং তজ্জন্যই আমি বক্তৃতা দিতে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এরূপ বিষয়, এরূপ পণ্ডিতগণের

* বিহার ও উড়িষ্যা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির বাৎসরিক অধিবেষনে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, সি, মানুকের অভিভাষণ।

সম্মুখে পর্য্যালোচনা করিলে, আমার যতই ত্রুটী থাকুক, বিষয়টী অধিকতর পর্য্যালোচিত হইবে বিবেচনায়, আমি আমার বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

প্রারম্ভেই আমি বলিতে পারি যে, বিষয়টী পাটনার ন্যায় স্থানেই আলোচিত হইবার যোগ্য। যে খুদাবক্স পাঠাগারে অমূল্য চিত্র সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই পাটনা শহরেরই অন্তর্ভুক্ত : আপনাদের অনুমতিক্রমে

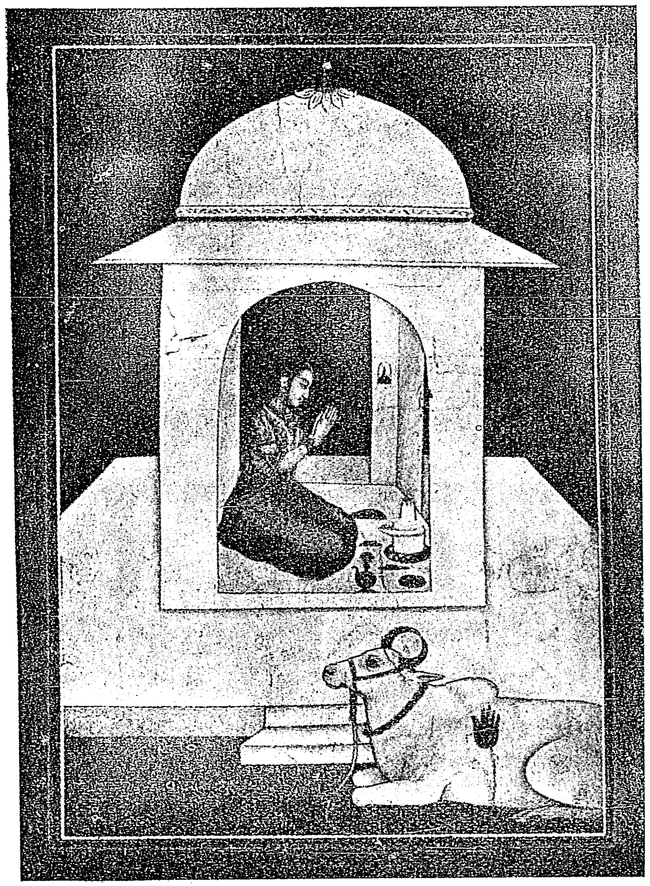

মন্দির ও শ্বেত মার্ব্বেল-প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বর

আমি আমার চিত্রাবলীর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। প্রকাশ্য সভায়, আমি আমার পরলোকগত বন্ধু খানবাহাদুর খুদাবক্সের অমূল্য সংগ্রহ ও তাহা সাধারণের ব্যবহারার্থ প্রদানের কথাও এ স্থানে ব্যক্ত করিতে পারি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার পুত্র খুদাবক্সের নিকট হইতে চিত্র সংগ্রহে যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই, যে সকল শ্রোতা পাশ্চাত্য মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে আমি সাবধানতার সহিত আমার মতামত আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা গ্রীক বা রোমের মতের অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য চিত্রকলা সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তাহা যেন পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই সভ্য জগৎ এই চিত্রপদ্ধতি যে উচ্চশ্রেণীর, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমি এই সকল পারসীক ও ভারতীয় চিত্রসমূহের মধ্যে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে এবং অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে, তাহারা নিঃসন্দেহে পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা ও আদর্শ-পুষ্ট চিত্রাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

আমি যতদূর অবগত আছি, তাহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে, খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর অজন্তা চিত্রের সময় হইতে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর ইণ্ডো-পারসীক বা মুঘল চিত্রের মধ্যবর্ত্তী যুগের কোন চিত্রের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই না। অজন্তা ও অন্যান্য গুহামধ্যস্থ চিত্রগুলি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইলেও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা পর্ব্বতগাত্রে, কন্দর মধ্যে সুচিত্রিত হইয়াছিল। প্রাসাদ, মন্দির এবং এইরূপ স্থান-সমূহের চিত্রগুলি সাধারণতঃ আক্রমণকারীর হস্তে লুণ্ঠনের সামগ্রী হইয়াছিল। অবশ্য ঋতুর প্রভাবও ইহাদের পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিল। মুঘল-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যবদ্বীপ ও এসিয়ার অন্যান্য জনপদসমূহের প্রচলিত সংস্কৃত চিত্রলিপি বা চিত্রিত পাণ্ডুলিপির কথা এস্থলে আমি উল্লেখ করিতেছি না। স্যার ওরিয়েল ষ্টীন্ এবং অন্যান্য আবিষ্কারক-গণ আবিষ্কৃত মধ্য-এসিয়ার চিত্রের কথাও আমি উল্লেখ করিতেছি না। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁহার পুস্তকে উল্লিখিত কোন কোন ছবির প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন; এইগুলির সহিত অজন্তা চিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, আকবরের পিতা বাবর অনেকগুলি চিত্রকরকে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের পোষণ করিতেন। বাবর সুবিখ্যাত পারসিক



হরধনুর্ভঙ্গ

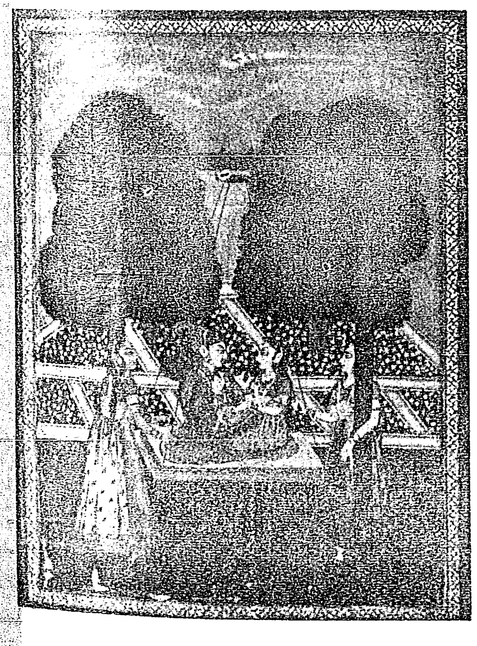

ঝুলন

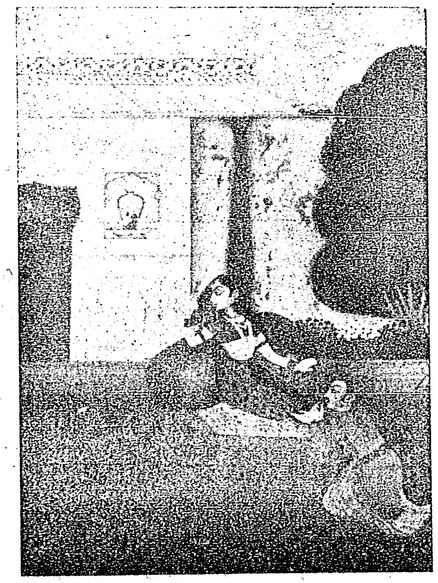

মানভঞ্জন

চিত্রকর বিহীজাদের সমসাময়িক ছিলেন। নিরক্ষর কিন্তু সুপণ্ডিত আকবরই মুগল চিত্রবিদ্যার প্রথম এবং প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন; এবং তিনিই মুগল চিত্রবিদ্যায় উৎসাহ প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরও চিত্রকলার প্রতিপোষক ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে চিত্রকরগণ বিশেষ উৎসাহ পাইতেন। তাজনির্ম্মাতা শাহজাহানের সময়েই মুগল চিত্রবিদ্যা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী চিত্রকর রেম্‌ব্রাণ্ডই এই সকল চিত্র অম্লানবদনে নকল করিয়াছিলেন।



হরধনুর্ভঙ্গ—আর একটী দৃশ্য

মুগল চিত্রপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহা পারস্যে উদ্ভূত এবং পরে ইহা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পারসিকগণ নিঃসন্দেহে এই বিদ্যা চীনদেশীয় চিত্রকরগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। অনেকে এই মত পোষণ করেন না। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বপারস্যের চিত্রবিদ্যাই চীন হইতে উদ্ভূত, পশ্চিম পারস্যের সহিত চীনের কোন সম্পর্ক ছিল না। খুদাবক্স লাইব্রেরীর শাহনামার প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রটী, যাহা সম্ভবতঃ বিহীজাদ কর্ত্তৃক চিত্রিত—দৃষ্টে চীনের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

সে যাহাই হউক, পারসীক চিত্রবিদ্যা ভারতবর্ষে আসিয়া নূতন আদর্শের সংস্রবে নব কলেবর প্রাপ্ত হইল। মুগল চিত্রবিদ্যায়, বিশেষতঃ দরবার চিত্রে, যতই আড়ম্বর থাকুক না, ক্ষুদ্রাকারের চিত্রগুলি যে চক্ষুর আনন্দ বর্দ্ধন ও তৃপ্তি-সাধন করে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। একাধিক চিত্রকর যে একখানি চিত্র রচনার সহায়তা করিত, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; তবে, এ কথা মুগল বাদশাহগণের উৎসাহে অঙ্কিত সুবৃহৎ চিত্র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, মুগল রাজত্বের মধ্য ও শেষ যুগের অনেক চিত্র যে সম্পূর্ণ ভারতীয় তাহা বলা যাইতে পারে। কোন কোন সমালোচক ইহা হইতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুগল চিত্রকলা-পদ্ধতি সম্পূর্ণই ভারতীয়। কিন্তু, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন ভিত্তি নাই, এবং ভারতবর্ষের এরূপ দাবী করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও নাই। প্রকৃত-

পক্ষে, পারসিক্ চিত্রকরগণ হিন্দুচিত্রকরগণের সহিত একক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে ভারতীয়-পদ্ধতিতে অসম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়া উহাই গ্রহণ করে। পারসিক চিত্রকরগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সুন্দর হস্তলিপির উন্নতি সাধন করে। তাহারা এই লিপি সুচিত্রিত করিতে আরম্ভ করে। ফলে, এইগুলিও সুন্দর চিত্রে পরিণত হয়। তৎপরে তাহারা তাহাদের চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া জন্তু ও মনুষ্য অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এগুলি চক্ষুর তৃপ্তি সাধন বা মনে আনন্দ প্রদান করে না। হিন্দুচিত্রকরগণের এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তাহাদের দেবদেবীর চিত্রসমূহ তাহাদের নিকট জীবন্ত মূর্ত্তি ছিল। ইহারই ফলে হিন্দুচিত্রকরগণ কর্ত্তৃক চিত্রসমূহ আত্মার তৃপ্তি

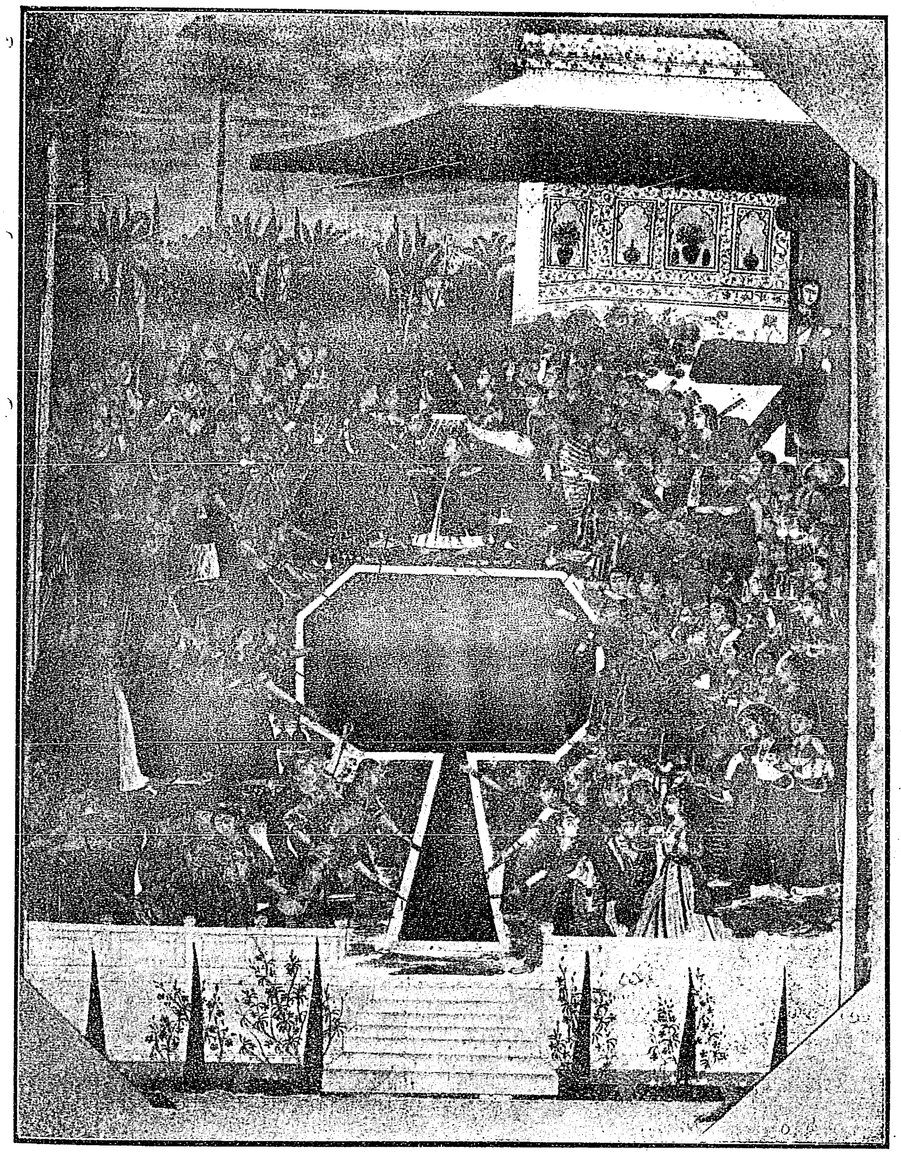

দোললীলা

সাধনে সমর্থ হইত। ইতিমধ্যে এক নূতন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল;—অন্য নামের অভাবে ইহাকে রাজপুত চিত্রপদ্ধতি আখ্যা দেওয়া হইল। এইগুলি বর্ণচিত্র অপেক্ষাকৃত মধুর এবং প্রথম চিত্রাপেক্ষা অধিকতর পবিত্র। উজ্জ্বলতায় এগুলি হীন হইলেও. এগুলি নয়নানন্দকর। এই শ্রেণীর চিত্রসমূহে চিত্রকরের দস্তখত প্রায়শঃই দেখা যায় না এবং চিত্রের সময় নির্ণয়ে কষ্ট পাইতে হয়।

অতঃপর, কাংড়াচিত্র-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যাইতে

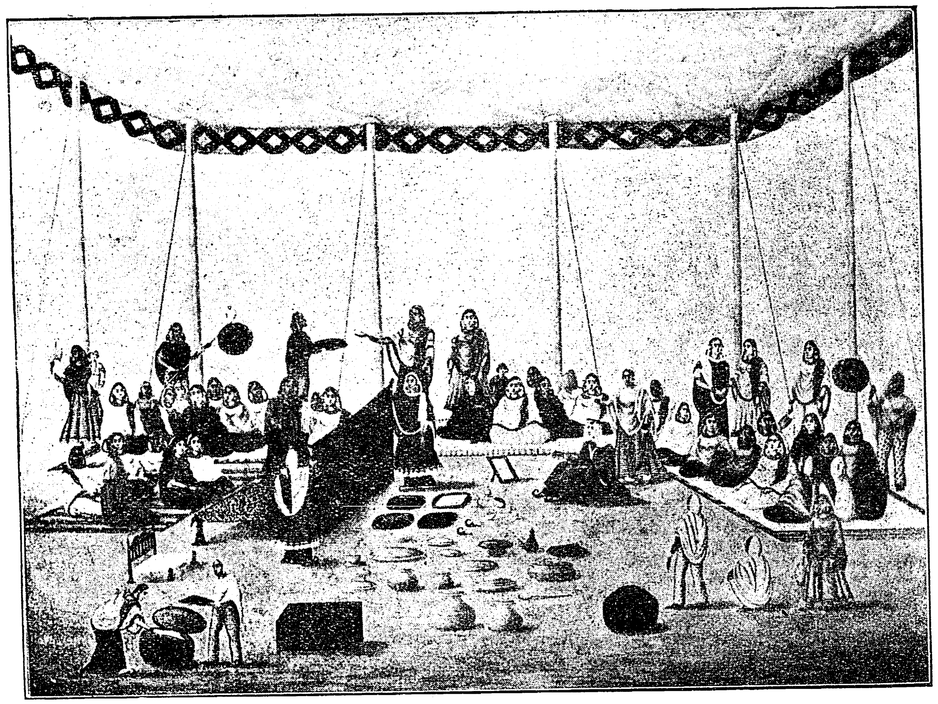

মুসলমান সমাজের বিবাহ উৎসব

পারে। ১৭৬০ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত এই চিত্রকরগণের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মোলারামের সময় নির্ণয় করা হয়। গঙ্গা নদীর অন্যতম শাখা অলকানন্দার তীরস্থ ঘাড়োয়ালে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই চিত্রকর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের অঙ্কিত চিত্রগুলি বড়ই সুন্দর হিন্দু পৌরাণিক চিত্রগুলি অঙ্কন করিতে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

আমার ইহাও বোধ হয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কারণ, আমার সংগ্রহের মধ্যে এরূপ চিত্র আছে, যাহাকে দিল্লী, বা জয়পুর বা রাজপুত বা কাংড়া—ইহার কোন পদ্ধতিভুক্ত করা যায় না।

অতঃপর, পাটনার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি আলোচিত হইতে পারে। গত শতাব্দীর শেষভাগে এই চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, পাটনা সহরের দুইজন ধনী ও চিত্রপ্রিয় জমিদারের অনুগ্রহেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, চিত্রকরগণ পাটনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ও অন্যত্র গমন করেন; এবং এই সকল চিত্রকরগণের অন্যতম বংশধর ঈশ্বরী প্রসাদ বর্ত্তমানে কলিকাতা আর্টস্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ। ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর।

কিন্তু, এই সকল চিত্রকর তাঁহাদের বঙ্গীয় সহযোগিগণের ন্যায় বঙ্গীয় চিত্রকলা-পদ্ধতিভুক্ত হইয়াছেন। পৃথ্বীখ্যাত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভয় কবচে সুরক্ষিত হইয়া ইঁহারা চিত্রাঙ্কনে রত। পাটনার শ্রীযুত

প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নিকট এই চিত্রকলান্তর্গত অনেক চিত্র ও আমার নিকটেও কয়েকখানি চিত্র আছে। এই পদ্ধতির অনুরক্ত ব্যক্তিগণ বলিবেন যে, এই শ্রেণীয় দৃষ্ট হয়। বঙ্গে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে যে বৈদেশিক ভাবের আধিক্য প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং আমি এই আতিশয্যের নিন্দা করি। ভারতবর্ষ অতীত কালে যাহা করিয়াছে, আমি তাহার একান্ত অনুরক্ত; এবং জাপান ও য়ুরোপীয় পদ্ধতির সহিত সহানুভূতি আমার নাই। আমি আপনাদিগকে যে চিত্র দেখাইতেছি, তদ্দৃষ্টেই আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরব-স্মৃতির অনুসরণই কর্ত্তব্য।



তাঞ্জাম আরোহণে সম্রাট

চিত্রকরগণ প্রকৃতির উচ্চাঙ্গ প্রকাশ করিতেই রত। সমালোচক বলিবেন যে, ইঁহাদের চিত্রে ভগবানের সহিত জীবের প্রত্যক্ষ যোগের নিগূঢ়তা প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস

[পাটনার সুবিখ্যাত ব্যরিষ্টার শ্রীযুত পি, সি, মানুক মহাশয় যে চিত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মূল্য ন্যূনকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা। এই চিত্র সম্বন্ধে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাঁহারই অনুরোধে আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম; এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি ছবির প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। অবশ্য প্রতিলিপিতে মূল ছবির আদর্শ কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীযুত মানুক মহাশয় "পাটনার চিত্র" (Art Treasures of Patna) নামক আমার পুস্তকের ও এই প্রবন্ধের জন্য ছবি প্রকাশের যে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য এইস্থানে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।—অনুবাদক।]



দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩)

"এদিকে আয় ঊষা, চট করে চুলটা বেঁধে দেই।"

ঊষা তখন লেস বুনিতেছিল, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের দিদি? থাক না, বিকেলে বেঁধে দিয়ো'খন।"

উমা একটু হাসিয়া বলিল, "বিকেলে যে আসবে তারা দেখতে! আর বিকেলের দেরীই বা কত? তিনটে বেজে গ্যাছে, দেখছিস্ নে, রোদ কোথা চলে গ্যাছে।"

ঊষা নতমুখে বুনিতে বুনিতে বলিল, "থাক না দিদি, দেখতে আসবে তা আবার সেজে গুজে—"

"যা, যা, নেকামো করিস নে, নে, রাখ ওগুলো—"

ঊষার হাত হইতে সূতার গুটি ক্রুশ টানিয়া ফেলিয়া উমা তাহার মাথা লইয়া বসিল।

"আহা, কি তুই হয়েছিস বল দেখি ঊষা! চুলগুলো—তা একটু যত্ন নেই; কাপড়খানা—তা যা তা হলেই হল। তোর কি কিছু নেই, কিছু পরতে পাস নে? তোর মত মেয়েরা কেমন চুলের ফ্যাসান করে, কেমন গুছিয়ে কাপড় পরে, আর তুই হয়েছিস যেন একটা হাবা, কিছু যদি বুঝিস।"

ঊষা হাসিল। তখনি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল "কি হবে?"

উমা। কিসের কি হবে?

ঊষা বলিল "এই চুল বেঁধে কি ভাল কাপড় পরে?"

উমা রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল "হয় আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

ঊষা হাসিয়া দিদির হাতখানায় একটু নাড়া দিয়া বলিল "রাগ কর না দিদি, মাইরি, আমি মিথ্যে বলছি নে। ভাল করে চুল বেঁধে, কাপড় পরে কি হবে, তা তো জানি নে। দিন এমন ভাবেও তো কেটে যায়, তবে—"

বাধা দিয়া উমা বলিল "দিন সব ভাবেই তো কেটে যায় ঊষা! তবু ভাল আর মন্দ। সব থাকতেও থাকিস কেন একটা চাষার মত। চিরদিন এমনি ভাবটা রাখতে পারিস, তবে তো বুঝি। যে ঘরে যাবি, সে আবার তেমনি ঘর। সেই বিলাসিতার মাঝে যদি ঠিক থাকতে পারিস, তবেই বুঝব।"

পিসীমা আসিয়া বসিলেন; বলিলেন "হ্যাঁরে উমা, তারা শুনছি না কি খিষ্টেন? তারা না কি সব খায়, মেয়েরা না কি জুতো পরে। অমর জেনে শুনে এই খিষ্টেনের ঘরে মেয়েটা দেবে,—বাপ হয়ে মেয়েটাকে এমন করে মাটী করবে?"

উমা ঊষার বেণী জড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "কে

বললে তারা খৃষ্টান ঠাকুরমা? খৃষ্টান হলে কি হিন্দুর ঘরে হিন্দু মতে বিয়ে করতে পারে? আমাদের যেমন সমাজ আছে, সব জাতের মধ্যেও তেমনি একটা সমাজ আছে। তোমাকে কে এই মিথ্যে কথাটা বলেছে বল দেখি?"

বগলা দেবী বলিলেন "আর দিদি—সব্বাই বলছে। কেউ একলা বললে তার নামটা না হয় করা যেত। একলার মুখ ছাপানো যায়, একশ লোকের মুখ বন্ধ করা কি সোজা কথা? একলা কেউ যদি এ কথাটা বলত, তোর ঠাকুরমা কি এমনি আস্তে-আস্তে ঘরে ফিরে আসত? আচ্ছা, খিষ্টেন তো নয়, কিন্তু তাদের বাড়ীর মেয়েরা সব নাকি জুতো পায় দেয়, সব যায়গায় বেড়ায়? যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, তারই একটী বোন আছে, সে না কি কলেজে পড়ে, বোর্ডিং না কি—সেখানে থাকে? এতগুলো কথা—আমি তাই ভাবছি, একটা কথা না হয় মিথ্যে হতে পারে, এতগুলো কথা কি মিথ্যে হতে পারে?"

উমা একটু থামিয়া বলিল, "আমি বলি সেটা মন্দ কি ঠাকুরমা? লেখাপড়া সবাই জানেন, জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে—"

বাধা দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বগলা দেবী সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "আমার মুণ্ডু আছে। মেয়েটাকে তুই আর তোর বাবা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাস—দে গিয়ে। আমার কি, আমার মত তো কেউ নিবিনে তোরা, নিজেরাই যে লায়েক হয়েছিস। যাক, আমি এই আসছে দোল-পূর্ণিমাতে কাশী চলে যাব। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব, কারও ভাবনা ভাবতে হবে না।"

রাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঊষার চুল বাঁধা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে ফিরিয়া দিদির চোখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "না দিদি, ওখানে আমার বিয়ে হতে পারবে না।"

উমা বলিল, "কেন রে?"

ঊষা বলিল, "আমি তাদের ঘরে থাকতে পারব না। তারা যা তা খাবে, আমাকেও তাই খেতে হবে তো! তারা জুতো পরবে, আমাকেও তাই পরতে হবে। আমি যা তা খেতে পরতে পারব না। না দিদি, কক্ষনো ওখানে আমার বিয়ে হতে পারবে-ই না। তুমি বাবাকে বলে দিয়ো—"

উমা শান্তকণ্ঠে বলিল, "সেজন্যে তোর আমার মাথা ঘামানোর কি দরকার ঊষা? বাবা রয়েছেন, তিনিই দেখবেন শুনবেন। তুই যে বলছিস, তুই বিয়ে করতে পারবি নে, এই কথাটা বাবাকে জানাতে, ছিঃ, এ কথা কি জানানো যায় বাবাকে? বাবা কি ভাববেন বল দেখি এই কথা শুনলে? ভাববেন, আজকালকার মেয়েগুলো এমনই হয়েছে যে, নিজেদের বিয়ের কথাও বাপ-মাকে জানাতে একটু লজ্জা বোধ করে না।"

পিতার সেই ভাবনার মূর্ত্তিটা কল্পনায় মনে আনিতে বালিকা ঊষার গণ্ড-কর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "সত্যি দিদি, আমি তা একটুও ভাবিনি কিন্তু। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে তুমি, নচেৎ কি হতো।"

তাহার পাগলামীর কথা শুনিয়া উমা একটু হাসিল। সযত্নে তাহার ললাটের উপর পতিত একটা চুল সরাইয়া দিয়া বলিল, "আর সত্যি বাবার যতটা জ্ঞান, যতটা বুদ্ধি, তা কি আমাদের একটুও আছে? বাবা আমাকে বলছিলেন, কি করি। আমি বললুম,—যদি ঊষার ক্ষমতা থাকে, সে তাদেরই ফিরিয়ে স্বধর্ম্মে আস্থা আনাতে পারবে। বাবা শুনে খানিকটে ভেবে বললেন, তবে এখানেই ঠিক করি। সত্যি ঊষা, তোর মনের যদি জোর থাকে, তবে যেখানে তুই আছিস সেখানেই থাকবি, কেউ তোকে এক চুল সরাতে পারবে না। বরং যারা দূরে আছে, তারাই তোর কাছে সরে আসবে। তুই ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানিস। ভগবানের ওপরে বিশ্বাস রাখিস, বাবার দৃষ্টান্ত সামনে রাখিস, বাস, আর কিছু তোকে করতে হবে না।"

ঊষাকে দাসীর সহিত ঘাটে গা ধুইতে পাঠাইয়া দিয়া উমা পিতার সন্ধানে গেল।

অমরনাথ নিজের গৃহে টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া পরলোকগতা পত্নীর বৃহৎ তৈল-চিত্রখানার পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। উমা গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, উমা?"

উমা বলিল, "হ্যাঁ বাবা।"

অমরনাথ বলিলেন, "এ বিয়ে হতে পারবে না মা। ভদ্রলোক আসছে আসুক, দেখে যাক—কিন্তু বিয়ে দেওয়া হবে না।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা? বিয়ে হতে যে পারবে না, এমন কি কথা আছে?"

অমরনাথ একখানা চেয়ার সরাইয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "কথা আছে বই কি মা? পিসীমা মহা আপত্তি তুলেছেন। এইমাত্র কেঁদেকেটে আমায় বললেন, যেন হাত-পা ধরে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া না হয়। তাঁর কান্নাতে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গ্যাছে। তা ছাড়া তর্কচূড়ামণি, আরও অনেকে এসেছিলেন—যেন জানাশোনা এই বিধর্ম্মীর ঘরে মেয়ে না দিই।"

উমা মাথা নত করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিল "আচ্ছা—"

সে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে বাস্তবিক সেদিন অনেক লোকেরই শুভাগমন হইল। নিষ্ঠাবান অমরনাথকে সকলেই নিষেধ করিলেন, যেন সে ঘরে মেয়ে না দেওয়া হয়। তাঁহার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি? ঊষা সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা, জমীদারের মেয়ে, তাহাকে বিবাহ করিতে অনেক সুপাত্র আসিয়া জুটিবে।

সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতা হইতে দুইটী ভদ্রলোক আসিয়া মেয়ে দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন; এবং বিবাহের কথা-বার্ত্তা ঠিক করিতে অমরনাথকে লইয়া বসিলেন।

অমরনাথ বিমর্ষ-মুখে বলিলেন, "আমার কোনই আপত্তি ছিল না; কারণ, আপনাদের আমি চিনি, ছেলেকেও আমি চিনি। কিন্তু এখানে এই বিষয় নিয়ে একটা ভারি গোল উঠেছে। আমার অন্তঃপুরেও সে গোল পৌঁছেচে। পাত্রেরা যে কিছু ইংরাজি-ঘেঁসা লোক—"

পাত্রের মাতুল হাসিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু তাদেরকে এইটা বুঝিয়ে বলে দেবেন, পাত্রের মা নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য্যের ঘরের মেসে, সেখানে ম্লেচ্ছাচার হওয়ার ভয় নেই। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন—উচ্চশিক্ষিতা অনেক মেয়ে আছে, যারা স্বেচ্ছায় তাঁর পুত্রবধূ হতে প্রস্তুত—তাদেরই কেউ তাঁর ঘরে আসতে পারত। কিন্তু তিনি বেছে-বেছে চান এমনি ঘরের মেয়ে—সুন্দরী, বেশ শিক্ষিতা, একটু বয়স্থা, আর হিন্দু। এ রকম জুটেছে ঠিক আপনারই ঘরে; তাই এখানেই আমরা এসেছি। আমাদের ছেলের বিয়ের ভাবনা কি বলুন, আমি আর আমার বোনই হতে দিচ্ছিনে। দেখুন, আপনার ইচ্ছে হয়, আপনি এখানে বিয়ে দিতে পারেন। না পারেন বলুন, আমরা বিদায় নেই।"

অমরনাথ সকল দ্বিধা সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিলেন, "না, আমি এখানেই বিয়ে দেব। আপনারা একেবারে আশীর্ব্বাদ করে যেতে পারেন। আমিও কাল পরশু আশীর্ব্বাদ করে আসব। এই মাঘ মাসেই কয়েকটা দিন আছে, তার মধ্যে যেটাতে সুবিধা বোধ করবেন, আপনারা সেইটেতেই বিয়ে দিয়ে ফেলুন।"

ঊষার আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

অমরনাথ পুরোহিত মহাশয়কে দিয়া পঞ্জিকা দেখাইলেন, বিবাহের দিন ঠিক হইল মাসের কুড়ি তারিখে।

বিদায় লইয়া পাত্রের মাতুল ও অপর ভদ্রলোকটী কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

(৪)

পাত্র সভাস্থ হইল, গ্রামের লোকে হাঁ করিয়া এই বিলাতফেরৎ মস্ত বড়—অথচ হিন্দু-ডাক্তার পাত্রকে দেখিতে লাগিল।

মৃন্ময় সুপুরুষ, বিদ্বান। তাহার মাতা পরম হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পিতা একেবারেই নাস্তিক ছিলেন। এই দুইটার মাঝামাঝি মত লইতে গিয়া সে একটা খিচুড়ি মত তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কখনও ঈশ্বরকে অত্যন্ত ভক্তি দেখাইত, কখনও বা পায়ের তলায় ফেলিবার প্রস্তাবও করিত। এক কথায়, তাহার মাথার ঠিকই ছিল না। মা তাহাকে পাগল ছেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতেন পিতা তাঁহার নিজের মতে ছেলেটিকে সম্পূর্ণ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিতেন।

মৃন্ময় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হইতে বি-এ ডিগ্রি গ্রহণ করিয়াছিল কুড়ি বৎসর বয়সে। সেই বৎসরেই সে বিলাত গিয়াছিল এবং সেখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া নামের আগে ডক্টর এবং নামের শেষে এম-ডি যোগ করিয়া সে দেশের ছেলে দেশে ফিরিল।

মতটা বিলাত যাইবার আগে যাহা ছিল, বিলাত গিয়া বেশ সুমার্জ্জিত করিয়া যখন ফিরিল, তখন পিতা নিজের

প্রতিভা পুত্রে বিকশিত হইতে দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, পুত্র যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া একেবারে নাস্তিক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মা তেমনি ব্যথিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মৃন্ময়ের চরিত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল, সে মাকে খুব ভক্তি করিত, ভালবাসিত। শুধু মায়ের জন্যই সে প্রবল অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই হিন্দুগৃহের অল্প-শিক্ষিতা বালিকাটীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হইল। পিতা আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের জলে অবশেষে তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

সম্প্রদানের সময় পার্শ্বে উপবিষ্টা জড়পিণ্ডবৎ স্ত্রীটির উপর চোখ পড়িতেই মৃন্ময়ের হৃদয় ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতে এই জড়ভাবাপন্না স্ত্রীটিকে লইয়াই তাহার জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা ভাবিতে অনুতাপে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। হায়, কেন সে এক মুহূর্ত্তে মায়ের চোখের জলে নিজের দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিল,—কেন সে ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই জেদ করিয়া বসিল যে, যে কোনও মেয়ে মা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, চোখে না দেখিয়া তাহাকেই সে বিবাহ করিয়া ফেলিবে! এক মুহূর্ত্তের ভুলটা তাহার সারা জীবনের মত সঙ্গের সাথী হইয়া রহিল,—কিছুতেই আর ইহাকে তফাতে রাখা চলিবে না।

তাহার হাতের উপর সুগোল সুগৌর একখানা হাত পড়িল, অমরনাথ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মৃন্ময় হাতখানা টানিয়া লইবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তখনি মনে পড়িয়া গেল আর অনর্থক চেষ্টা। কেবল একটা কলঙ্ক মাত্র, আর কিছুই হইবে না। সাধারণের চোখে সে ইহাতে নীচুই হইয়া পড়িবে, উঁচু হইতে পারিবে না।

বিবাহের একটা মন্ত্রও সে পাঠ করে নাই। অমরনাথ সন্দিগ্ধ চোখে তাহার মুখপানে চাহিতেছিলেন; সে মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহা দেখিয়া অমরনাথ মোটেই শান্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, ঊষাকে বাস্তবিকই তিনি জলে ফেলিয়া দিলেন; এ বিবাহ কেবল গরলই উৎপন্ন করিবে, সংসার সুখময় করিতে পারিবে না।

তাঁহার মনটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,—বিবাহ কার্য্য শেষ হইতেই তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কোলাহল আর ভাল লাগিতেছিল না; তিনি একটা নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেম।

বাড়ীর পার্শ্বে একটী ছোট ফুলবাগান ছিল। বাড়ীটা গ্যাসালোকে উজ্জ্বল, কোলাহলে মুখরিত,—এ বাগানটা নির্জ্জন, আলোকশূন্য। অন্ধকার সেখানে এত ঘন ছিল না, বাহিরের প্রাঙ্গণের গ্যাসালোক সেই অন্ধকার কতকটা ভেদ করিয়া সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

অমরনাথ শ্রান্ত দেহখানা কোনও মতে বহন করিয়া আনিয়া সেখানে একখানা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন।

এক কথায় বিদ্বান, সুচরিত্র, রূপবান, ঐশ্বর্য্যশালী—মানুষের যাহা প্রার্থিত, তাঁহার জামাতায় সে সব গুণই আছে। কিন্তু তবু—তবু তাঁহার মনে হইতেছে,—না, কাজটা ভাল হইল না। তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চাহিলেন, কিন্তু হৃদয়ের মধ্য হইতে বার বার তবু কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—ভাল হয় নাই, আগাগোড়া ভুলের বশে চলিয়াছ, এই ভুলের ফল একদিন পাইতে হইবে।

অমরনাথ চমকাইয়া উঠিলেন, কি ভুলের ফল পাইতে হইবে। ঊমার মত কি? জীবনে কত ভুল কাজ করিয়াছেন, ফল তো সবগুলিরই লাভ হইয়াছে। এ ভুলের কি ফল পাইবেন!

ঊমার কথাটা মনে হইতেই তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। এমনি একটী রাত্রে প্রাণাধিকা অষ্টম বর্ষীয়া উমাকেও উদ্বাহ বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, সেদিনও বাড়ীখানাকে সাজাইয়া ছিলেন, ইহার চেয়েও বেশী উৎসব করিয়াছিলেন। উমার সেই অবগুণ্ঠনাবৃত শ্রী দেখিয়া কি আনন্দেই না তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর এক বৎসর পরে—আঃ, সে দিনটা কি দিনই না আসিল।

অমরনাথের অজ্ঞাতে তাঁহার দুইটী চোখ কখন সজল হইয়া উঠিয়াছিল, কখন দুই ফোঁটা জল গণ্ড ভাসাইয়া হাতের উপর পড়িয়া গেল।

ছি, ছি, তিনি করিতেছেন কি? আজ যে ঊষার বিবাহ-রাত্রি। তাহার মা নাই, তিনি আজ এই শুভ দিনে চোখের জল ফেলিয়া কি দম্পতির অমঙ্গল কামনা করিতেছেন?

তাড়াতাড়ি মুখ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া তিনি শান্ত, নীরব আকাশখানার পানে চাহিলেন। কি সুন্দর নক্ষত্র-খচিত আকাশ। লক্ষ হীরার টুকরা যেন বুকে ধরিয়া হাসিতেছে।

শান্ত আকাশের পানে চাহিয়া অমরনাথ দুটি হাত ললাটে স্পর্শ করাইয়া গভীর সুরে বলিয়া উঠিলেন, "নাথ, আজীবন তোমায় বিশ্বাস করেই এসেছি প্রভু, অনেক ঝড় তুফান মাথার উপর দিয়ে চলে গ্যাছে, তবু বিশ্বাস হারাই নি। দেখ, জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত যেন এমনি বিশ্বাস রেখেই যেতে পারি, যেন বিশ্বাস হারিয়ে না যেতে হয়। নিজের জন্য কোনও দিন প্রার্থনা করিনি নাথ, প্রার্থনা করবার কোনও দরকার হয় নি। উমার জন্যেও কোনও দিন প্রার্থনা করি নি,—সে যা পেয়েছে তাইতেই সুখী হোক। কিন্তু ওগো পরম পিতা, আজ যে কাজটি করলুম, যদি তা ভুলের বশে হয়ে থাকে—প্রার্থনা করছি, সে ভুলের দণ্ড আমাকেই দেওয়া হোক। যাকে আজ নিজের হাতে সাজিয়ে দিলুম, নারীর শ্রেষ্ঠ, বাঞ্ছিত যে আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত করলুম, পিতার ভুলের জন্য সে যেন সে আসনচ্যুত না হয়।

"বাবা, তুমি এখানে, আমি যে সারা বাড়ীখানা খুঁজে বেড়াচ্ছি এদিকে—"

উমা আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

রুদ্ধ কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন "কেন মা, আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?"

বিস্ময়ের সুরে উমা বলিল "কেন? বাঃ, কখন বিয়ে শেষ হয়ে গ্যাছে, সারাদিন যে উপোস করে আছ তা বুঝি মনে হচ্ছে না। মেয়ের বিয়ে বুঝি আর কোন বাপেই দেয় না, তোমার মত সব্বাই আনন্দে আত্ম-হারা হয়?"

"আনন্দ!" অমরনাথ হাসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফলে চোখে আসিয়া পড়িল অশ্রু-জল। তিনি বলিলেন "আনন্দ নয় মা আনন্দময়ী, বড় কষ্টেই ছুটে এসেছি এখানে। মনে ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিনে—কি করলুম, কাজটা ভাল করলুম কি মন্দ করলুম। আমি বরাবর দেখে আসছি—ভেবে যা ভাল করতে যাই, সেটা মন্দ ফলই উৎপন্ন করে।"

উমা বলিল, "এ কথা কেন বাবা? আমি দেখছি কাজটা খুব ভালই হয়েছে। মৃন্ময়ের কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছিনে তো।"

অমরনাথ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "ছেলেমানুষ তুই মা, সংসার চিনতে, মানুষ চিনতে এখনই কি পারবি? আমি তোর বাপ, অভিজ্ঞতা আমার বেশ আছে, যাতে আমি জানতে পেরেছি এ বিয়েতে মৃন্ময়ের একটুও মত ছিল না। নেহাৎ দায়ে পড়েই সে বিয়ে করতে এসেছে। একে তো তারা চলে বিদেশী ভাবে, তার পরে মৃন্ময়ের এই ভাব,—আমার মনে হচ্ছে, ঊষাকে আমি জীবন্তেই আগুনে ফেলে দিলুম,—সে বুঝি জন্মেও সুখী হতে পারবে না।

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

চমকাইয়া উমা বলিয়া উঠিল "না বাবা, ও সব চিন্তা মনেও এন না। ঊষা কি আমার তেমনি বোন, সে কি অনাদর করবার জিনিস? তার শিক্ষা যে তোমারি কাছে বাবা, সে যে যথার্থ রত্ন, কাচ তো নয়। ওকে অনাদর করতে পারে, এমন লোক জগতেই নেই। তুমি চল, জল খাবে। রাত কতটা হয়ে গ্যাছে দেখ তো?"

পিতার হাত ধরিয়া সে টানিয়া উঠাইল।

জলযোগান্তে অমরনাথ গিয়া নিজের গৃহে শুইয়া পড়িলেন।

বাসর তখন জনাকীর্ণ—নারীবৃন্দে সে স্থান ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা নাতজামাইয়ের আহার করাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। উমা এখনও এদিকে আসে নাই। সারাদিন-রাতের পরিশ্রম,—কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল পিতার দিকে। বিবাহের সময় সে দূরে ছিল, আয়ুষ্মতীদের কাছে থাকিবার অধিকার তাহার ছিল না; দূরে থাকিয়া মৃন্ময়ের উন্নত, বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া বাস্তবিকই সে পুলকিতা হইয়া উঠিতেছিল। ঊষা সুখী হইবে, এ কল্পনা করিতে তাহার মনটা যেমন পুলকে পূরিয়া উঠিতে-ছিল; সে একেবারে পর হইয়া গেল ভাবিতেও তেমনি বিষাদে হৃদয় আচ্ছন্ন হইতেছিল।

বিবাহ শেষে সে পিতাকে জল খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। তাহার পর খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাগান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জল খাওয়াইয়া সে শান্তি

পাইল। নিমন্ত্রিতগণের আহারাদি পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাজকর্ম্মও ফুরাইয়া গিয়াছিল।

রাত তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু বিশ্রামার্থ নিজের কক্ষে যাইতে গিয়া সে বাসরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় বালিসটায় হেলান দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অসভ্য হিন্দু-গৃহের মেয়েদের নির্লজ্জ আচরণের কথা ভাবিতেছিল, এবং যে কোনও সভ্য সমাজে এরূপ ব্যবহার করিলে যে কিরূপ কাণ্ডটা ঘটিত, তাহাই মনে মনে বিচার করিতেছিল। পার্শ্বে পড়িয়া ঊষা তো আরামে ঘুম দিতেছিল। তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা কেহ করে নাই, কিন্তু বেচারা বরকে কেহই নিষ্কৃতি দিতে চায় না। বর ঘুমাইলে যে বাসরটা মাঠেই মারা যায়।

বহুদিনের অতীত একটা স্মৃতি ধীরে ধীরে উমার মনে জাগিয়া উঠিল। তখন সে বড় ছেলেমানুষ, কি হইতেছে তাহাই জানে না। কে একটী ছেলে তাহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল,—সে লজ্জায় চোখ তুলিয়া তাহার পানে চায়ও নাই। আট বছরের মেয়ের লজ্জা, কথাটা হাসির বটে, কিন্তু হিন্দু-গৃহে হাসিবার কিছুই নাই। ছোট বেলা হইতেই মেয়েদের কানে বর কথাটা তুলিয়া দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের মেয়েটী—সকলের সঙ্গে মারামারি করে, কিন্তু বরের কথা শুনিয়াই পরণের কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় মুখে চাপা দেয়। উমা যদি বরকে দেখিয়া লজ্জা করিবার কথা না জানিত, তবে সে ভাল করিয়া দেখিত; কিন্তু এই লজ্জা তাহাকে ঊষার মতই এক কোণে ঠাসিয়া রাখিয়াছিল।

সেই দিনের কথাটা মনে পড়িতে উমা অন্যমনস্ক হইয়া গেল; সে যে বাসর ঘরের সামনেই দাঁড়াইয়া, সে কথা তাহার মনে রহিল না।

মেয়েরা বরকে গান গাহিবার জন্য ধরিয়াছিলেন। বর এ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই। ইহাতে সে বেচারাকে কথা শুনিতে হইয়াছিল বড় কম নয়। অবশেষে একটী ছোট মেয়ে যখন তাহার কাণ মলিয়া দিল, তখন মৃন্ময় তাহার সকল ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল।

"এই চললুম আমি, আর যদি কখনও আসি—"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাসরে রীতিমত একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সে গোলযোগে ঊষার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া দুই চোখ ডলিতে লাগিল। মহিলারা মৃন্ময়কে বসাইবার এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মৃন্ময় কিছুতেই আর বসিল না। সে পণ ধরিল, এই রাত্রি-শেষের ট্রেণ ধরিয়াই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, কিছুতেই এখানে থাকিবে না।

উমা আর বাহিরে থাকিতে পারিল না,—গৃহে ঢুকিয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মুখের উপর দুইটা চোখ রাখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "তুমি এই চারটের ট্রেণেই কলকাতায় ফিরে যেতে চাও,—কিন্তু যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ, তাকে রেখে যাবে কোথায়?"

মৃন্ময় তাহাকে সামনে দেখিয়াই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এ মেয়েটীকে সে একবারও দেখে নাই। এমন সুন্দর, দৃঢ় মূর্ত্তি যে এখানে এমন ভাবে সে দেখিতে পাইবে, সে আশাও করে নাই। এমন স্পষ্ট কথাও যে কেহ তাহার মুখের উপর বলিতে সক্ষম হইবে, তাহাও সে ভাবে নাই। সে একবার উমার মুখের পানে তাকাইয়াই চোখ নীচু করিল। স্বস্থানে বসিতে বসিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু এঁদের বেজায় রকম অত্যাচার। দুর্ভাগ্যের কথা, আমি কখনও আশা করি নি যে, এ রকম পীড়ন আমায় উপরে হতে পারবে। আমি এত দেশ বেড়িয়েছি,—নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের কাছে মেয়েরা যে এমন লজ্জাহীন কথা বলতে পারেন, তার গায়ে হাত পর্য্যন্ত তোলেন, এ কোথাও দেখি নি।"

উমা উগ্রকণ্ঠ স্নিগ্ধ করিয়া বলিল, "তা হতে পারে; আমি তা অস্বীকার করছিনে। বাসরটা আমাদের দেশে বহুকাল হতেই চলে আসছে। এই একটা দিন সবাই এ অত্যাচারটা সহ্য করে যায়। তুমি বিদেশী সভ্যতার মধ্যে মানুষ হয়েছ, এ সব দেখতে পাওনি, জানোও না। কিন্তু—এটা ঠিক, তুমি হিন্দু বলেই আমার বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। যখন সেটা সহ্য করতে পেরেছ, তখন হিন্দু সমা-জের একটা অঙ্গ এই বাসরটা আর তার অত্যাচারটাও তেমনি করে সহ্য করে যেতে হবে। এ দিনটা তোমায় কেউ মানবে না, সবাই তোমায় যা না তাই বলবে। অবশ্য এটা যে খুব ভাল রীতি, তা আমি বলছিনে,—আমরা সবাই

বাসরের বিরোধী। কিন্তু সমাজে যখন চলে আসছে, আমরা কেন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে যাব? সমাজের অঙ্গহানি করে এটা বাদ দেওয়া আমরা কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করিনে। আশা করছি তুমিও করবে না।"

বিস্ময়ে মৃন্ময় উমার পানে চাহিয়া রহিল। হিন্দুর মধ্যে এমন শিক্ষিতা, এমন উন্নতহৃদয়া নারী যে থাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণায় ছিল না। কিন্তু এমন বেশ কেন? উমা একটু হাসিয়া বলিল "আমি এঁদের বলছি, এঁরা আর তোমায় বিরক্ত করবেন না, তুমি এখন অনায়াসেই ঘুমাতে পারবে, তা হলে বোধ হয় তুমি খুসী হবে।"

মৃন্ময় মাথা নত করিয়া হাসিয়া ফেলিল। উমা সস্নেহে উষার পানে তাকাইয়া বলিল "তুই ঘুমো ভাই, বসলি কেন?"

উষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দিদির পানে চাহিল। উমা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মৃন্ময়ের মনে হইল তাহার চোখের সামনে যে উজ্জ্বল আলোটি জ্বলিতেছিল, উমা অন্তর্হিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিভিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বর-সম্বাদ *

শ্রী বাণী দেবী

সাধারণত আজকাল আমাদের ধারণা এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ বা harmony কখনও ছিল না বা হইতে পারে না, কেবল melody বা তান ছিল এবং আছেও। † এখানে সঙ্গীতের ব্যাপক অর্থ ধরিয়া, কেবল কণ্ঠসঙ্গীত নহে, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবাদিত তান প্রভৃতিও সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত ধরিতে হইবে। কোমল ও কড়ি সহ সপ্তস্বরের মধ্যে কতকগুলি স্বর লইয়াই এক একটি তানের সৃষ্টি। সেই এক একটি তানের এক একটি রূপ আছে। সেই এক একটি তানের বিভিন্ন আকারে (উদারা, মুদারা, তারা এবং উহাদের সংমিশ্রণোদ্ভূত) সমাবেশ অথবা বিভিন্ন সম্বাদী তানের সংযুক্ত সমাবেশ হইতেই এক একটি শুদ্ধ বা মিশ্র রাগের উৎপত্তি হয়। রাগ সুপরিস্ফুট হইলেই তাহার ভিতর হইতে তানের রূপ স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই রূপকেই সেই রাগের বা তাহার তানের প্রাণ বলা যাইতে পারে। তানের সেই সুরগুলিকে পরস্পর-সম্বাদীরূপে ভাঁজিতে পারিলেই melody বা সুতান রাগের উৎপত্তি হয়; সেগুলির মধ্যে কোন বিবাদী সুর প্রবেশ করাইলেই তানের প্রাণ কাটিয়া যায়। প্রত্যেক গানই এইরূপে একটা-না-একটা শুদ্ধ বা মিশ্র রাগের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। প্রত্যেক গানের ভিতর দিয়াই রাগের এই মূল সুর বা তান ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। আসলে তানকেই melody বলা উচিত, কিন্তু লক্ষণার বলে তানমূলক রাগ ও গানকেও melody বলা হয়। কিন্তু স্বর-সম্বাদে বা harmonyতে ঐ মূল তানের প্রত্যেক স্বরের সঙ্গে তাহার নানা বিভিন্ন সম্বাদী স্বর এমন সমান্বিতভাবে ঝঙ্কৃত করা হয় যে, ঐ প্রত্যেক স্বরের প্রকাশে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র গানটির সমগ্র প্রকাশে একটা সম্বাদীভাব প্রকাশ পায়—আমাদের কাণে বেসুরা লাগে না।

এই স্বর-সম্বাদ ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকটে জ্ঞাত ছিল অথবা অজ্ঞাত ছিল? আমরা প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে "রক্তং নাম বেণুবীণাদিস্বরাণামেকীব রক্তমিত্যুচ্যতে" (Hindu Music) পাই, অর্থাৎ বেণু, বীণা প্রভৃতির স্বরগুলি বাজাইয়া একীসাধনের নাম "রক্ত।" ইহা ব্যতীত, প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে আমরা "বহুলস্বর", "বাদী", "বিবাদী" "সম্বাদী" প্রভৃতি শব্দ প্রাপ্ত হই। এই সকল হইতে আমরা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করিতে পারি যে, পুরাকালে এদেশে স্বর-সম্বাদ অপরিজ্ঞাত ছিল না। স্বর-সম্বাদের ভাব অন্তরে না থাকিলে এই সমস্ত শব্দ আসিতেই পারিত কি না সন্দেহ। প্রাচীনকালের সঙ্গীতজ্ঞদিগের অন্তরে স্বর-সম্বাদের কথা উঠা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কোলদের ন্যায় অসভ্যদের সঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাহাদেরও সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। ঐ অসভ্যদিগের সঙ্গীতে যখন স্বর-সম্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন আর্য্যদিগের আদিম সঙ্গীতেও যে স্বর-সম্বাদ প্রকাশ পাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি যে, সামগানে স্বর-সম্বাদ অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়।

পৌরাণিক যুগের কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের পর, অন্তত বৌদ্ধযুগের পর তো নিশ্চয়ই, এই স্বর-সম্বাদের জ্ঞান নানা কারণে এদেশের সঙ্গীতজ্ঞদিগের অন্তরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শোনা যায় যে, বৌদ্ধযুগের বহুকাল পরে আকবরের রাজত্বকালে তানসেন কণ্ঠ হইতে স্বরসন্ধি বা chord বাহির করিতেন—কণ্ঠেই সা ও গা একসঙ্গেই বাহির করিতেন। এই স্বরসন্ধি প্রকাশের চেষ্টাতেও আমরা স্বর-সম্বাদ প্রকাশেরই ক্ষীণ আভাস দেখিতে পাই। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞের নিকট শাস্ত্রীয় স্বর-সম্বাদতত্ত্ব নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না। হয়তো ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ নূতনভাবে জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে স্বতই উদ্ভূত হইয়াছিল; অথবা এমনও হইতে পারে যে, সেই সময়ে এদেশে ইউরোপীয়দের যথেষ্ট আমদানি হওয়াতে তাহাদের স্বর-সম্বাদ-সম্বলিত গান তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল এবং তাঁহার ন্যায় সঙ্গীতের তত্ত্বজ্ঞ ও ব্যবহারত অভিজ্ঞের কাণে সেই স্বর-সম্বাদ ধরা পড়াতে তিনি তাহা কণ্ঠে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতের ন্যায় যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি যদি স্বর-সম্বাদ পুনঃস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই স্থায়িত্ব লাভ করিত। যাই হোক্, ইহা স্থির যে ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ অজ্ঞাত ছিল না।

তবে ভারতীয় সঙ্গীত হইতে স্বর-সম্বাদ বিলুপ্ত হইল কেন? আমাদের মতে স্বর-সম্বাদ বিলুপ্ত হইবার অন্যতম প্রধান কারণ ভারতীয় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফলে স্বর-সম্বাদজ্ঞ প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদিগের অভাব হওয়া। আমরা তো প্রত্যক্ষ করিলাম যে, বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের বিশ্বগ্রাসী অগ্নিতে ইউরোপের কত শত সহস্র গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মবলি দিতে বাধ্য হইয়াছেন; এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বলে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ভারতীয় মহাসমরেও নিশ্চয়ই বহুতর সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিলেন।

সঙ্ঘবদ্ধ ভাবের অভাবও ভারতীয় সঙ্গীত হইতে স্বর-সম্বাদ বিলুপ্ত হইবার আর একটি গুরুতর কারণ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে যেমন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মহাসমরের ফলে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ভাব আর নাই—তাহা বিলুপ্ত হইবার দিকে চলিয়াছে; সেইরূপ মহাভারত, পুরাণ ও তৎপরবর্ত্তী ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, ভারতীয় কুরুক্ষেত্রের পরেও ভারতবর্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধের ভাব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিবিহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রাজ্যের জন্ম হইয়াছিল। সেই সকল বিচ্ছিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ভাব যে জনসাধারণের উপর ব্যক্তিগত ভাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রকারে গ্রামে গ্রামে বিচ্ছেদ প্রাণ সামাজিক দলাদলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবের ছায়া পরিদৃষ্ট হইলেও বস্তুত তাহা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরসম্বাদও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উত্তরাংশে যেখানে শীতাধিক্য প্রভৃতি নানা কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ভাব স্বভাবতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই স্বরসম্বাদও খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু

* আজকাল কেহ কেহ harmony'র অনুবাদ করেন স্বরসন্ধি। তাহা ঠিক নহে। harmony'র মূল প্রাণ হইল একটা সমগ্র রাগের পরিপোষক বিভিন্ন তানের এবং তাহাদের বিভিন্ন আকারের ভিতর এবং সেই তানগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন সুরগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বাদী ভাব। এই কারণে আমরা harmony'র অনুবাদ করিলাম স্বর-সম্বাদ; harmonise-স্বর-সম্বাদ বা সম্বাদিত করা ইত্যাদি। স্বর-সম্বাদের ভিতর স্বরসন্ধিবা chord অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু স্বরসন্ধি সকল সময়ে স্বর-সম্বাদে নাও পরিণত হইতে পারে। আমরা chordএর অনুবাদ করিলাম স্বরসন্ধি; উভয়ের ভাব হইতে কতকগুলি সম্বাদী স্বরের সন্ধি বা মিলনমাত্র।

† অভিধানে melody অর্থে রাগ করা হইয়াছে, আমরা করিলাম তান। melodious song=সুতান গান। কতকগুলি তানের ধারা মিলিত হইয়া যে একটী বিশেষ রসপূর্ণ সুরের সৃষ্টি করে, তাহাকেই রাগ বা tune বলে।

স্পেন, 'ইটালি প্রভৃতি ইউরোপের দক্ষিণাংশে যেখানে গ্রীষ্ম ঋতুর অধিকতর প্রাদুর্ভাবের কারণে এবং প্রাচীন সভ্যতা ও বহুতর সংগ্রাম প্রভৃতির ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ভাব অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে স্বরসম্বাদের উন্নতি যেন কতকটা স্থগিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তানমূলক রাগরাগিণীর অনুরূপ Madrigal, Serenade প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে দেখা যায়। কোন রাগরাগিণীকে বৃহদাকারে (on a grand scale) স্বর-সম্বদ্ধ করিয়া গাহিতে বা বাজাইতে চাহিলে অনেক লোকের দরকার হয়, এবং তাহা শুনিবার জন্যও বহুতর লোকসমাগম, আলো, সজ্জা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় বলিয়া মনে হয়। সজনতা, সঙ্ঘবদ্ধভাব, লোকসমাগম প্রভৃতিই স্বরসম্বাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের অভাবের তৃতীয় গুরুতর কারণ হইতেছে, পৌরাণিক যুগের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মহা হত্যাকাণ্ডের পর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি বৈরাগ্যমূলক বিবিধ ধর্ম্মের উদ্ভব ও আবির্ভাব। এই হত্যাকাণ্ডের পর সংসারের, বিশেষত সংসারের আমোদ-প্রমোদের প্রতি ভারতবাসীর একটা গভীর ঔদাস্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহা না হইলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বৈরাগ্যমূলক ও ঔদাস্যপ্রাণ ধর্ম্মের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব হইত না। বৈরাগ্য ও উদাসভাব আমোদপ্রমোদের জন্য লোকসঙ্গ সহ্য করিতে পারে না—একাকী আত্মরতি হইয়া থাকিতে চাহে। কাজেই ভারতবাসীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গীতবাদ্য করিবার প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বরসম্বাদের অস্তিত্বও তাহারা ভুলিয়া গেল। তখন দুই চারিজন সমধর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে একান্তে বসিয়া যে তানমূলক রাগরাগিণীর সাহায্যে আপনার আত্মার সঙ্গে কথোপকথন করা যায়, তাহাই জনসাধারণের রুচিকর বোধ হইল, এবং কাজেই সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাহারই উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন। আমাদের রাগরাগিণীর উপযুক্ত ক্ষেত্র হইল নির্জ্জনতা।

প্রাণের নির্জ্জনতাপ্রাণ উদাস প্রভৃতি ভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে তানমূলক রাগরাগিণী বিশেষ সহায় হইলেও স্বরসম্বাদের সাহায্যেও যে ঐ সকল ভাব একেবারেই ব্যক্ত করা যায় না তাহা নহে, তবে তাহা করিতে সঙ্গীতে বিশেষ একটু কুশলতা লাভ আবশ্যক। বীঠোবেনের (Beethoven) Sonata Pathetique বা Funeral March স্বরসম্বদ্ধ হইলেও তাহা শুনিলে প্রাণের ভিতর সত্যই কেমন এক উদাসভাব জাগিয়া উঠে। কিন্তু স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতে যতই কেন এই সকল নির্জ্জনতাপ্রাণ ভাব প্রকাশের চেষ্টা হউক না, তাহার মধ্য হইতে একটা কি-জানি-কি গোলমালের ভাব, রাশি রাশি লোকজনের অস্তিত্বের আভাস, এককথায় একটা প্রবল সজনতার ভাব প্রচ্ছন্ন ও অন্তঃসলিলরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। আবার সেইরূপ, তানমূলক রাগরাগিণী দ্বারা আমরা যতই কেন সজনতাপ্রাণ বীরত্ব বা আমোদ-প্রমোদের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি না, তাহার মধ্যে একটা নির্জ্জনতার ভাব, আপনার সঙ্গে একটা নিভৃত কথোপকথনের ভাব উঁকি না মারিয়া থাকিতে পারে না। রসগ্রাদকে আমরা সঙ্গীতের আধিভৌতিক বা material দিক এবং তানমূলক রাগরাগিণীকে সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক বা spiritual দিক বলিতে পারি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আধিভৌতিক বা ঐহিক সুখভোগের ভাব প্রবল বলিয়াই সেখানে সঙ্গীতের আধিভৌতিক আকারও সহজেই প্রবল হইয়াছে; ভারতে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল বলিয়াই এখানে সঙ্গীতেরও আধ্যাত্মিক আকারই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতার কারণেই ভারতের সঙ্গীত এতই উচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে এবং তাহার প্রাণের সন্ধান পাইতে পাশ্চাত্যদের বহুকাল লাগিবে।

ভারতীয় সঙ্গীত হইতে স্বরসম্বাদ বিলুপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই, তাহার ছায়া রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত হইতেও যেমন তান সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইতে পারে না, সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীত হইতেও স্বরসম্বাদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে পারে না; কারণ, সাধারণত মানুষের এবং মানুষের সমষ্টি বা সমাজের মোটামুটি ভাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই এক—পাশ্চাত্যদিগেরও যেমন সুখ-দুঃখ আছে, প্রাচ্যদিগেরও তেমনি সুখদুঃখ আছে। ভারতবাসী যেমন সমস্তক্ষণ বৈরাগ্যে ও ঔদাস্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, সময়ে সময়ে তাহার প্রাণে হর্ষ জাগিয়া উঠিতে বাধ্য; পাশ্চাত্যবাসীও তেমনি সমস্তক্ষণ আমোদ-

আহ্লাদেই নিমগ্ন থাকিতে পারে না, তাহারও প্রাণে সময়ে সময়ে দুঃখের আঘাত লাগিতে বাধ্য। প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্যেরা দুঃখ অপেক্ষা সুখকেই প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লয়; আর সুখ অপেক্ষা দুঃখকেই প্রাণের সহিত বরণ করা ভারতবাসীর মজ্জাগত ভাব। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের প্রাণে যখন দুঃখ জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি স্বর-সম্বাদের ভিতর দিয়াই দুঃখের তান প্রকাশের চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টার ফলেই বীঠোবেনের Sonata Pathetique প্রভৃতি টমাস মূরের করুণ-তান সুপ্রসিদ্ধ গানগুলি এবং serenade প্রভৃতি নৈশসঙ্গীতের উৎপত্তি। আবার যখন প্রাচ্য সঙ্গীতজ্ঞের প্রাণে হর্ষ বা সজনতা-প্রাণ কোন ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি তানমূলক রাগরাগিণীর ভিতর দিয়াই সেই ভাবের ঝঙ্কার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহারই ফলে এদেশে টপ্পাজাতীয় সঙ্গীতের জন্ম।

সেতারের তার বাঁধিবার প্রণালীর ভিতরেও স্বর-সম্বাদের ছায়া দেখিতে পাই বলিয়া মনে হয়। সেতারের যে তিনটি প্রধান তার, সেই তিনটি তার তিনটি প্রধান সুরে (ম্, স্, ও প্) বাঁধা হয়।* এই তিনটি সুরের প্রত্যেকটিকে ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তিনটি করিয়া সুর লইয়া (যথা স গ প) এক একটি স্বরসন্ধি রচিত হয়। সেই একএকটি স্বর-সন্ধিকে ইংরাজীতে Primary triad বা প্রধান স্বরত্রয়ী বলে। সেতারে এই তিনটি প্রধান তার ভিন্ন আর চারিটি তার প্, স্, স এবং প বা র্স্ য়ে বাঁধা হয়। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই চারিটি তারও প্রধান তিনটি তারের সঙ্গে সম্বাদীরূপেই বাঁধা হয়। তার বাঁধার প্রণালী হইতেই বুঝা যায় যে, এদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবক এবং সঙ্গীতজ্ঞ-দিগের স্বরসম্বাদবিষয়ক বেশ একটু জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল। সেতারের তিনটি তার মৌলিক বলিয়াই উহার নাম ত্রি-তার, পারসীতে সি-তার, এবং অপভ্রংশে সেতার হইয়াছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সেতারে স্বরসম্বাদ সুন্দররূপে আনা যায়। সেতার বীণের অনুকরণে গঠিত; সেতারে যখন স্বরসম্বাদ সম্ভব হয়, তখন বীণ, এসরাজ প্রভৃতি উহার অনুরূপ বাদ্যযন্ত্রেও তাহা সম্ভব না হইবার কোনই কারণ দেখি না।

প্রচলিত নাই বলিয়া একালের ওস্তাদেরা বিচার না করিয়াই সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে অথবা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে স্বরসাধন আনা সম্ভব নহে। তাহা যদি হইত, তবে তানসেন সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই বা স্বরসম্বাদ আনিবার চেষ্টা করিলেন কেন? বর্ত্তমানে বাদ্যযন্ত্রে ওস্তাদেরা যে সমস্ত গৎ বাজান, সে সমস্তের ভিতরে কেবল রাগরাগিণীই আত্মপ্রকাশ করিলেও গৎ বাজাইবার সঙ্গে ঝঙ্কার দিবার যে প্রথা আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই তো আমরা এদেশীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের আদিম আভাস প্রাপ্ত হই। বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ঝঙ্কার-তারের বন্দোবস্ত হইতে স্পষ্ট মনে হয় যে, ঐ সকল যন্ত্র কেবল তান বা melody বাজাইবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয় নাই, harmony বা স্বরসম্বাদকেও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছিল। একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, এদেশে স্বরসম্বাদ পরিজ্ঞাত ছিল না, অথবা এদেশীয় কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীতে স্বরসম্বাদ ফুটাইয়া তোলা যায় না, বা সম্ভব হইলেও শ্রুতিমধুর হইবে না। এমনও কোন কথা নাই যে, স্বরসম্বাদের উন্নতির চেষ্টা করিলেই ধরিতে হইবে যে, আমরা তাহা পাশ্চাত্য সঙ্গীত হইতে হুবহু ধার করিয়া লইতেছি। বর্ত্তমানে যদি কোন গৎ, তান বা রাগরাগিণীকে স্বরসম্বদ্ধ করা যায়, তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। ইহাকে আমরা ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের পুনরভিষেক বলিতে পারি।

সামঞ্জস্যেই জগতের সৃষ্টি। কেবল বিকর্ষণ শক্তি থাকিলেও সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না, প্রত্যেক পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় থাকিত তাহা কে জানে? কেবল আকর্ষণ শক্তি থাকিলেও সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না, সকল পরমাণু মিলিয়া গিয়া একটি মহাতাল পাকাইয়া থাকিত। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয় সামঞ্জস্যের সহিত কার্য্য করিতেছে বলিয়াই এই শোভনসুন্দর বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। সামঞ্জস্যের উপরে কেবল সৃষ্টি নহে, এই বিশ্ব-জগতের স্থিতি ও উন্নতিও দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গীতেরও প্রকৃত রক্ষা ও উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক হইলে আমাদিগকে সামঞ্জস্যের পথে চলিতে হইবে; ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সঙ্গীতের প্রয়াগসঙ্গম সাধন

* ম্= মুদারা মা; স্=মুদারা সা; প্=অতিমুদারা পা; স=উদারা সা।

করিতে হইবে। সঙ্গীতের কেবল আধ্যাত্মিক দিক লইয়া থাকিলে স্থূল শরীরবিশিষ্ট মানুষ সংসারে চলিতে পারিবে না, প্রতি পদে পরাজয় সহ্য করিতে বাধ্য হইবে; কেবল আধিভৌতিক দিক লইয়া থাকিলে সূক্ষ্ম আত্মা উপযুক্ত রসের অভাবে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে শরীরও ধ্বংসের পথে চলিবে। ভারতের ঋষি-মুনিরা এই সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া সেই পথে ভারতবাসীকে পরিচালিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সময়ে ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সামঞ্জস্যের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যেখানে যাহা ভাল দেখিতেন, তাহাই নিজের করিয়া লইবার চেষ্টাও করিতেন এবং করিতে পারিতেনও। ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার জন্য, আবশ্যক হইলে অন্যের নিকট হইতে ভাল জিনিস গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই কারণেই ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র রোমকদিগের নিকট হইতে দু-এক বিষয়ে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদেরও বর্ত্তমানে ঘরের কোণে বসিয়া কূপমণ্ডুকের মত নিজের যাহা কিছু তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, অনন্তস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রাজ্যে অনন্ত ভাবধারা ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার সঙ্গে বাষ্পীয় যন্ত্র, তড়িৎ যন্ত্র, বেতার টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যে সহস্র সহস্র যোজন-ব্যবহিত দেশবিদেশের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে কি প্রকার আদান-প্রদান চলিতেছে, সুমেরু ক্রমে ক্রমে কিরূপ দ্রুতগতিতে কুমেরুর সহিত মিলনের পথে চলিয়াছে, চক্ষু খুলিয়া তাহা দেখিলে নির্বাক হইয়া যাইতে হয়। এখন আর মূর্খের মত দেশ-বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না। সঙ্গীতরাজ্যেও আমরা যদি আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতকে উন্নতির অভিমুখে তুলিয়া ধরিতে চাহি, তবে আমাদেরও তানমূলক রাগরাগিণীর মধ্যে স্বরসম্বাদ নিশ্চয়ই আনিতে হইবে। ইহার জন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নিকটেও যদি কোন সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাতে লজ্জার কোনই কথা নাই। আমাদের রাগরাগিণীর সহিত স্বর-সম্বাদের মহা মিলন সাধিত হউক। এ মিলন সাধিত হইলে ভারত নিশ্চয়ই সঙ্গীতরাজ্যে পুরকালের ন্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন সঙ্গীতজ্ঞ সাধক একনিষ্ঠভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(৪৩)

অমল অনেক হিসাব করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া অনীতার সন্ধানে শ্যামাসুন্দরীর গৃহে অভিযান করিয়াছিল।

শ্যামাসুন্দরীর ঠাকুর-দালানে প্রবেশ করিয়া অমল ও ইন্দ্রনাথ দেখিল গোস্বামীজীর অসুন্দর মূর্ত্তি—তাদের প্রাণে এ মূর্ত্তি খুব একটা প্রীতির উৎস খুলিয়া দিল না। কিন্তু পাশে বসিয়া ও কে?

অনীতা পরিয়াছিল একখানা সামান্য লালপেড়ে গৈরিক বস্ত্র ও একটা সাদাসিধা গেরুয়া রঙ্গের সেমিজ। তার গলায় ছিল একটা তুলসীর মালা, হাতে কেবল এক জোড়া বালা। এই যোগিনী মূর্ত্তি যে অনীতার, তাহা অমল ও ইন্দ্রনাথ বুঝিতেই পারিল না।

অনীতা চাপিয়া মাটীতে বসিয়া রহিল, মাটীর দিকেই চাহিয়া রহিল। তার বুকের ভিতর এ কি তাণ্ডব নৃত্য, এ কি আনন্দ-কল্লোল, এ কি দুঃখের তরঙ্গ! এত দিন গিয়াছে, তবু কি তার হৃদয় একটু শান্ত হয় নাই! ইন্দ্রনাথকে কাছে দেখিয়া এখনও সে এত অধীর!

সে একবার লক্ষ্মীনারায়ণের দিকে চাহিয়া মনে মনে

বলিল, "ঠাকুর, এ কি তোমার লীলা! একবার দাসীর হৃদয়ে উদয় হ'য়ে আবার কি তা'কে ত্যাগ ক'রলে—আমার হৃদয় একেবারে নিঃশেষে তোমার ক'রে নিলে না কেন? কেন আমার এ পরীক্ষা? আমি দীন, আমি দুর্ব্বল! তোমার চরণ-রেণুর তো যোগ্য নই স্বামী! তবে কেন দাসীর এ পরীক্ষা!" সে চক্ষু মুদ্রিত করিল, তা'র মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিল ইন্দ্রনাথেরই আনন্দ-উজ্জ্বল মূর্ত্তি—কিন্তু তার ভিতর ও কি? ও কার মূর্ত্তি! কার ও-বাঁশী, কার ও-চূড়া! মরি, মরি, কি সুন্দর! তার মাথার ভিতর বড় গোলমাল বাধিয়া গেল।

অমল ও ইন্দ্রনাথ অনীতাকে দেখিয়া স্তব্ধ ও নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে অনেক কষ্টে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অমল ডাকিল, "অনীতা!"

অনীতা নীরব, স্তব্ধ, তদ্গতচিত্ত!

ব্যস্ত হইয়া ইন্দ্রনাথ ডাকিল "অনীতা!"

চক্ষু মেলিয়া অনীতা বলিল, "কি?"

নামাবলীখানা গলায় জড়াইয়া অনীতা গড় হইয়া ভক্তিভরে ইন্দ্রনাথের পায়ে প্রণাম করিল।

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া বলিল, "এ কি অনীতা, আমাকে মিছে লজ্জা দিও না।"

অমল একটা রহস্যের আবরণ দিয়া, তার অনুভূত যাতনা ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টায় কষ্ট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "যাক ইন্দ্রনাথ, তুমি দেখছি এক লাফে দেবতা হ'য়ে উঠলে!"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "হাঁ দাদা, আমার দেবতা! কেন তুমি কুণ্ঠিত হ'চ্ছ? তুমি যে আমার গুরু, তুমিই আমার গৌর, তুমিই আমার নারায়ণ! তুমি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছ, তাই আমি নারায়ণকে পেয়েছি।"

অমল ত্যক্ত হইয়া উঠিল। অনীতার স্পষ্টই religious mania হইয়াছে দেখিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল। আর এই একটা অপরিচিত বৃদ্ধের সামনে সে এমনি পাগলামি করিয়া নিজেকে খেলো করিতেছে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। সে বলিল, "অনীতা, আমরা তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি। ফিরে চল। অতীত ভুলে যাও বোন, আমার উপর এখন আর রাগ রেখো না। আজ তুমি আমার বাড়ীতে না গেলে আমার সব উৎসব মাটী হ'য়ে যাবে।"

এ কথার উত্তরে অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে অনীতার মনে হইল। তার মধ্যে সে প্রথম বলিল, "কিসের উৎসব দাদা?"

"কাল আমার বিয়ে?"

অনীতা আনন্দিত হইল। বলিল, "তাই না কি? হাঁ দাদা, কার সঙ্গে, বুঁটলী বুঝি।"

"বুঁটলী না হাতি—এ তার চেয়ে ঢের ভাল। তুই চট্ ক'রে কাপড়-চোপড় নিয়ে আয় দেখি। আমি আগে থেকে বলবো না!" বলিয়া হাসিল।

অনীতা গোস্বামীর দিকে চাহিল। গোসাঁই হাসিয়া বলিলেন, "যাও মা, ভাইয়ের বিয়েতে যাবে না?"

অমল তীব্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিল। কোথাকার কে এ, যে, তার ভগ্নীর উপর চট্ করিয়া এমন প্রভু হইয়া বসিয়াছে? এ সব ব্যাপার অমলের মোটেই ভাল লাগিল না। পাছে অনীতা চটিয়া যায়, এই ভয়ে সে অতি কষ্টে আত্মদমন করিল। কিন্তু তার দৃষ্টি গোস্বামীকে প্রীতিতে অভিষিক্ত করিল না।

অনীতা উঠিয়া বলিল, "চলো দাদা, যাই।"

গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "এই বেশে কি মা উৎসবের বাড়ী যেতে আছে? লক্ষ্মীরূপে আজ যাও মা, বিয়ের বাড়ীতে কি যোগিনী হ'য়ে যাওয়া সাজে?"

অনীতা হাসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। অমল তাহার অসাক্ষাতে গোস্বামীকে বলিল, "তুমি—আপনি কে ম'শায়?"

"শ্রীভগবানের দাসানুদাস, শ্রীরাধাগোবিন্দ গোস্বামী!"

এ নাম অমলের শোনা ছিল। গায়ক ও ভক্ত বলিয়া ইহাঁর খ্যাতি ছিল, যদিও অমল ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহাকে দেখে নাই।

সে হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। ইন্দ্রনাথ তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। গোস্বামীজী হাসিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অমল বলিল, "আপনার নাম অনেক শুনেছি, দেখা পেয়ে সুখী হ'লাম। আপনার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা ব'লতে চাই, আমার এই ভগ্নীর সম্বন্ধে।"

"কি কথা বাবা ?"

"অনীতাকে কি আপনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রেছেন ?"

"না, আমি করি নি, উনি যে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন, তা' আজ শুনতে পেলাম।"

"কার কাছে পেয়েছে ?"

"শুনলেন তো, এই বাবুটির কাছে !"

অমল একটু উষ্ণ ভাবে বলিল, "দেখুন ঠাকুর, ও-সব কথার মার-পেঁচ ছাড়ুন। আমার এই শ্যালকটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনও ধার ধারেন না, আর কাণে মন্ত্র দিয়া পয়সা রোজগার করা ওঁর ব্যবসা নয়"—

শান্ত মুখে গোস্বামী কহিলেন, "আমারও নয়।"

"হ'তে পারে। কিন্তু কোনও একজন এমন আছে, যে আমার বোনের ধনদৌলতের খবর রাখে, এবং মন্ত্র নিয়ে কারবারও করে থাকে। সে ইন্দ্রনাথ নয়। সেটি কে আমি তাই জানতে চাই।"

"তেমন লোক থাকতে পারে বই কি !"

এই লোকটির শান্ত পরিহাস অমলের সহিষ্ণুতার অন্তর ভেদ করিয়া গেল। সে বলিল, "শুনে সুখী হ'লাম। কিন্তু বলুন দেখি, অনীতাকে গেরুয়া পরালে কে ?"

"শচীর দুলালকে যে পথে বের ক'রেছিল, সেই পরিয়েছে বাবা—ওই তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেই চক্রী—ওর কাছে জিজ্ঞাসা কর। সুকৃতি থাকে জবাব পাবে।" বলিয়া গোস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখাইয়া দিলেন।

অমল ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল, "সোজা কথার সোজা জবাব দেওয়া দেখছি আপনার অভ্যাস নাই। তবু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অনীতার টাকাকড়ি কি সবই লক্ষ্মীনারায়ণের পেটে গেছে, না এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে?"

"তাঁর টাকাকড়ির খবর তো আমি জানিনে বাবা ! তবে শুনেছি, এই মন্দির তিনি মেরামত করে দিয়েছেন—"

"আচ্ছা, সে হাজার আষ্টেক—তার পর ?"

"লক্ষ্মীকে একটা হার দিয়েছেন, সে বুঝি হাজার খানেক টাকার। আর একটা মহোৎসব ক'রেছিলেন, সে টাকা আমিই খরচ ক'রেছি, জানি—এক হাজার টাকা তাতে খরচ হ'য়েছে। এ ছাড়া আর কোনও কিছু ক'রেছেন ব'লে তো জানি নে।"

অমল। আপনি টাকাকড়ির কোনও খবর না রেখেও যখন হাজার দশেক টাকার হিসাব মিলিয়ে দিলেন, তখন যিনি খবর রাখেন, তিনি কেন না আর হাজার বিশেক খতিয়ে দেবেন। তা' যা'ক, সে বড় বেশী নয়। তার পর আর একটা কথা,—ম'শায়ের সঙ্গে অনীতার সম্পর্কটা কি ? থামুন, আগে আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট ক'রে বলে নি, যাতে আপনি কোনও রকম ভুল না ক'রতে পারেন। আপনি তাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন নি, অথচ তার উপর আপনার বেশ প্রভুত্ব আছে দেখতে পাচ্ছি। আপনি তার টাকা পয়সার খবর রাখেন না, তবু হাজার দশেক টাকার হিসাব দিলেন। এ সম্বন্ধটা একটু জটিল ঠেকছে। কাজেই, ম'শায় যদি আপনার সঙ্গে অনীতার প্রথম সাক্ষাৎ থেকে আরম্ভ ক'রে, এ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক হ'য়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ দেন, তবেই ভালো হয়।"

গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "তাই বলছি। তবে বিবরণটি সংক্ষিপ্ত না বিশদ, না সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ হ'বে, সেটা বিচারের ভার তোমার ! মা আমাকে ডাকিয়েছিলেন নবদ্বীপ থেকে কীর্ত্তন শিখবেন ব'লে। আমি এসে তাঁকে কীর্ত্তন শেখাতে আরম্ভ ক'রে দেখতে পেলাম যে, মায়ের সঙ্গীত শাস্ত্রে অসামান্য দখল। কিন্তু কীর্ত্তন তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না—এতে চাই প্রাণ, ভক্তি, প্রেম। ভক্তের প্রাণ যখন প্রেমরসে বিহ্বল হ'য়ে সঙ্গীতের ধারায় প্রবাহিত হয়, সেই হ'ল কীর্ত্তন"——

অমল বলিল, "এ স্থানটা অত বিশদ না হ'লেও চ'লবে—তার পর।"

"সংক্ষেপে, আমি মাকে ব'ল্লাম, মা, সুধু কস্‌রতে চলবে না, ভক্তি চাই। মা বল্লেন, সে পাবো কোথায় ! আমি বল্লাম সাধন ক'রতে হবে'—মা সাধন ক'রলেন।"

"রসুন—সাধনের প্রক্রিয়া ? মন্ত্রটা আপনি দিলেন।"

"না, আমি দি'নি ! মা বল্লেন, 'আমায় দীক্ষা দিন'। আমি তো জানি তিনি কে, আর তাঁর ভিতর কি আছে, তাঁকে দীক্ষা দিবার আমি কে ? আমি বল্লাম, তোমাকে দীক্ষা দেবেন লক্ষ্মীনারায়ণ। সত্যিই মায়ের দীক্ষা হ'য়ে গেল—দেখতে দেখতে মায়ের চেহারা ফিরে গেল, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হ'য়ে গেলেন।"

"হাঁ, হাঁ, আপনি বল্লেন, কৃষ্ণ যদি পেতে চাও, বিলাস ছাড়, গয়না কাপড় বিলিয়ে দেও, সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিখারী হ'য়ে নারায়ণের চরণ আশ্রয় কর ! কেমন না ? তাই তিনি গেরুয়া ধরলেন।"

"না বাবা, আমি সে কথা বলিনি। আজ হঠাৎ দেখলাম, মা রাণীবেশ ছেড়ে যোগিনী সেজেছেন। আমি মোহে অন্ধ, তাই বল্লাম, মা, 'এ বেশ কেন ?' মা বল্লেন 'বড় ইচ্ছা হ'ল।' আমি মাথা পেতে শুনলাম।"

ইন্দ্রনাথ এসব বৃত্তান্ত শুনিয়া যেন একটা অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ অনুভব করিল। এও কি সম্ভব। অমলের ব্যঙ্গের স্বর যেন তাহার সহজ ভক্তির উপর একটু রূঢ় আঘাত করিতেছিল। এবার অমল কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "ঠাকুর, আর একটু ভেঙ্গে বলুন এই দীক্ষার কথাটা,—কেমন ক'রে কোথা থেকে এ দীক্ষা হ'ল, আমার জানতে বড় কৌতূহল হ'চ্ছে।"

"সে তো আমি ব'লতে পারবো না বাবা ! মা আমার মধুর-রসে ভরপুর ! তার সঙ্গে নারায়ণের কি সম্বন্ধ, কি সম্ভাষণ, তা' কি আমি খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস ক'রতে পারি ? আমি জানি না। তবে জানি এই যে, কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ ক'রবার জন্য তাঁর হৃদয় প্রস্তুত হ'য়েই ছিল—তিনি প্রেমে ভরপুর হ'য়েছিলেন, কিন্তু যে তাঁর তৃষিত অন্তর প্রেমরসে সরস ক'রে দেবে, তার সন্ধান পাননি। ঠিক যেন শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বাবস্থা ! কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে শ্রীরাধার মধুর কথার ভিতর প্রাণ ঢেলে দিতে দিতে কখন যে মায়ের নারায়ণের সঙ্গে প্রেমবন্ধন হ'য়ে গেছে, আমি তা তো টের পাইনি।"

সহসা সুন্দর বেশভূষা করিয়া অনীতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তার তুলসীমালার উপর সে একটা সরু চেন পরিয়াছে। বালা খুলিয়া দু'গাছা সাদাসিধে ব্রেসলেট পরিয়াছে। তিলকটি ভাল করিয়া পরিয়াছে ; আর একখানা চওড়া লাল পেড়ে মুগার সাড়ী পরিয়াছে। এই বেশে তার মূর্ত্তি এত স্নিগ্ধ-শান্ত, সুন্দর ও শ্রীযুক্ত দেখাইল যে, সবাই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্মুখে গড় হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া হাস্যমুখে বলিল, "এখন চল দাদা !"

অমল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছিল, অপ্রসন্ন চিত্তে বলিল, "তোর কাপড়-চোপড়, গহনা-পত্র সব নিয়ে চল্—এখানে আর কেন ?"

অনীতা একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে বউ আসুক। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হ'ক।"

"না, সে কিছুতেই হ'বে না। তা' হ'লে বুঝবো, তুই আমাকে ক্ষমা ক'রতে পারিসনি।"

গদ্‌গদ-কণ্ঠে অনীতা বলিল, "না দাদা, তা' নয়। এ বাড়ী বোধ হয় আমার ছাড়বার উপায় নেই।"

"কেন ?"

"কেন ? বৌদিকে এর পর জিজ্ঞাসা করো কেন তার তোমার বাড়ী ছাড়বার জো নেই ! সে-ই জবাব দেবে।"

ইন্দ্রনাথের চোখের কোল ভিজিয়া উঠিল। সে অমলের হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "অমল, এখন ওকে পীড়াপীড়ি করো না !"

অমল মুখভার করিয়া বলিল, "যা' ইচ্ছা কর। চল।"

অনীতা গোস্বামী ঠাকুরকে গড় হইয়া প্রণাম করিল, গোসাঞিজি সঙ্কুচিত ভাবে দুই হস্ত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "শ্রীবিষ্ণু !"

তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলিল। একটা সাড়ীর তলায় জুতা-পরা এক জোড়া সুন্দর পা দেখা দিল। তার পর সাড়ীটার একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। ক্রমে দরজার কাছে একখানা সুন্দর মুখ ফুটিয়া উঠিল।

অমলের মুখ চট্ করিয়া সহজ হইয়া গেল। ওষ্ঠের কোণে একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। সে অনীতার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "অনীতা, তোমাকে আমার ব্রাইডের সঙ্গে—"

অনীতা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, এও কি সম্ভব ? শেষে সে হাসিয়া, "ও পোড়ারমুখী তুই," বলিয়া মোটরের ভিতর লাফাইয়া উঠিল। অনীতা ও মনোরমা দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

(৪৪)

বিবাহ-সভায় ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না ; তার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কথা, মনোরমার বিবাহের কথা পিতার নিকট হইতে গোপন করিয়া সে একটা দারুণ

অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচার তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ; বিশেষ বাপের কাছে এত বড় একটা বিষয় লুইয়া বঞ্চনা করিতে তার ভয়ানক আত্মগ্লানি হইতেছিল। তার পিতা যদি মনোরমা সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাকে জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে সে হয় তো সব কথাই বলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইত। এই এক মিথ্যাচারের বোঝা বহিয়া, বিবাহে গিয়া আবার আরও মিথ্যা কথনের প্রয়োজন সৃষ্টি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। যদিও পিতা জানিতে পারেন যে মনোরমার বিবাহ হইতেছে, তবু ইন্দ্রনাথ যে বিবাহে গিয়াছে এ কথা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া তাঁর ক্লেশবৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন কোনই লাভ হইবে না।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক কারণে সে বিবাহে যাইতে পারিল না। তাহার প্রথম ভগ্নীপতির সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখের সেই বেদনাভরা, নির্ভরভরা দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিষম খোঁচা দিতে-ছিল। সে খোকাকে পাশে লইয়া আজ সমস্ত দিন বসিয়া ছিল। ইহার মুখের ভিতর ইহার পিতার সেই মুখের ছায়া দেখিয়া দেখিয়া সে পীড়িত হইতেছিল। সেই মাতার ক্রোড়চ্যুত বালকের উদাস দৃষ্টি তাহার প্রাণের ভিতর দারুণ হাহাকার তুলিয়া দিতেছিল। সে কিছুতেই আজ মনের ভিতর আনন্দ জাগাইয়া তুলিতে পারিল না।

বিবাহে খুব বেশী ভিড় হয় নাই; কেবল অমলের নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েকটি বন্ধু ছিল। অতিথিদিগের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের কোনও ত্রুটি ছিল না—কিন্তু নিরাবিল আনন্দ-ধারার মধ্যে দুইটি ছায়াপাত হইয়াছিল।

মনোরমার অন্তরেও এমনি আর একটি দিন ও তাহার পর দুই বৎসরের স্বামী সহবাসের চিত্র থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিয়া উঠিতেছিল। অমল পাশে থাকিলে তাহার হৃদয় উজ্জ্বল ছায়াশূন্য হইয়া উঠিত, কিন্তু অমল অন্তরালে গেলেই তাহার প্রাণ সেই অতীত স্মৃতির বেদনায় নিপীড়িত হইতেছিল।

অমল বারবার তাহার কাছে আসিয়াছে, প্রতিবারেই আসিয়া সে তার বলিষ্ঠ হৃদয়ের তীব্র প্রেমের ধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া ধন্য করিয়াছে। বৈকাল বেলায় বিবাহের একটু পূর্ব্বে সে যখন আসিল, তখন মনোরমা বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। অমলের তিনটি নারী বন্ধু বসিয়া সজ্জার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অনেক আলোচনার পর তাহার অঙ্গে বসাইতেছেন। অমল আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া ইঁহাদের একজন গিয়া তাহাকে বলিলেন, "ঠিক আধ ঘণ্টাকাল ধন্না দিয়া না থাকিলে দেবীর দর্শন লাভ হইবে না। তবে যদি সাধনার জোর থাকে, তবে ১৫ মিনিটে দেখা হইলেও হইতে পারে।"

অমল সানন্দচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যখন নারী-পরিষৎ সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করিয়া মনোরমাকে ছুটি দিলেন, তখন তার হৃদয় আকণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা মনোরমাকে অমলের কাছে যখন ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন সে জলভরা বিদ্যুৎভরা মেঘের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মনোরমার ভূষিত মূর্ত্তি দেখিয়া অমল বিস্মিত আনন্দে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণ মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল—যেন সে মনোরমাকে এই প্রথম দেখিল! তার পর সে মনোরমার উপর লাফাইয়া পড়িয়া যত্নের সহিত তাহার দুই বাহুর ভিতর তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মনোরমার বহুরুদ্ধ অশ্রুধারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিল।

অমল ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "কাঁদছো কেন মনুয়া?"

মনোরমা অমলের বুকে মাথা রাখিয়া বুকের বোতামটা মুচড়াইতে মুচড়াইতে বলিল, "শুন্‌লে তুমি রাগ করবে না? আমাকে তুমি তবু ভালবাসবে?"

অমল একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কি মনো, কি কথা বল।"

মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "আজ আমার বারবার কেবলি মনে পড়ছে তা'র কথা! একদিন সেও এমনি করে আমায় আদর ক'রেছিল। আমি তাকে আজ মনে ক'রছি ব'লে তুমি রাগ ক'রবে না?"

কাতর দৃষ্টিতে মনোরমা অমলের মুখের দিকে চাহিল।

সুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য একখানা ক্ষুদ্র মেঘ অমলের আনন্দময় মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। একবার বুকের ভিতর সে একটা নিবিড় বেদনা অনুভব করিল।

তার পর আরও ঘনিষ্ট ভাবে মনোরমাকে বুকে টানিয়া

সে বলিল, "না মনো, রাগ ক'রবো না। বরং তুমি যদি আজকের দিনে সে অভাগ্যকে একটিবার ব্যাথার সঙ্গে স্মরণ না ক'রতে, তবে তোমায় হৃদয়হীনা মনে ক'রতাম।"

মনোরমার হৃদয় অমলের প্রতি নূতন করিয়া প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু চক্ষু ছাপাইয়া আরও অশ্রুর বন্যা ছুটিল।

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, "অনেকদিন ভেবেছি যে, তার স্মৃতি আমার প্রাণের ভিতর থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। তাই আমি তার ছবিখানা সরিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু—আজ বুঝছি, আমি এতদিন বুঝিনি; আজ তোমাকে ভালবেসে নূতন করে' বুঝছি যে, আমি তাকে হারিয়েছি। এই স্মৃতির জন্য আমাকে ক্ষমা করো প্রিয়তম!"

অমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা ক'রছি না মনো, তোমায় শ্রদ্ধা করছি! তুমি কি এখন একটু একলা থাকতে ইচ্ছা কর? তবে এখন আমি যাই!"

মনোরমা অমলকে আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিল, "না, যেয়ো না, তোমার বুকে মাথা রেখে আমায় কাঁদতে দাও, তাতেই আমার সুখ, তাতেই শান্তি। নইলে, কান্না পেলে মনে হয় যেন আমি অপরাধ করছি।"

কিছুক্ষণ পরে মুখ মুছিয়া শান্ত কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "দাদা এলেন না?"

গম্ভীর উদার মূর্ত্তি অমল বলিল, "না, সে লিখেছে যে, আজ এলে তার বাপকে বঞ্চনা ক'রতে হ'বে, তা' সে পারবে না।"

মনোরমা মুখ নীচু করিয়া রহিল। চারুদি বাহিরে দরজার কাছে খুব একটা সোরগোল করিয়া তার পর অন্যদিকে চাহিতে চাহিতে ঘরে ঢুকিলেন। ইহাদের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, দুইজনে প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে দুইটি স্বতন্ত্র চেয়ারে বসিয়া আছে। ঠিক এমনটি দেখিবার আশায় তিনি ঐ অধর কোণে লুকান হাসি আর চোখের কোণের দুষ্ট চঞ্চলতা লইয়া আসেন নাই। দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

হাসিয়া চারুদি' বলিলেন, "বাঃ, এ তো বেশ প্রিয় সম্ভাষণ!" হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ওগো হাঁড়িমুখ মহাশয় ও মহাশয়া, দূর স্বপ্নলোকে আপনাদের আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হ'চ্ছে যে আজ আপনাদের বিয়ে, ফাঁসী নয়!"

অমল শান্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "দুটোতে খুব বেশী তফাৎ আছে কি চারুদি?"

"হাঁ, তা তোমাদের দুজনের মুখ দেখলে বলতে ইচ্ছা হয় বটে যে কোনও তফাৎ নেই।"

চারুদির স্বামী মিষ্টার রায় আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাস্য পুরোবর্ত্তী করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কিসে তফাৎ নেই চারু?"

চারু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বিয়েতে আর ফাঁসীতে।"

মিষ্টার রায় মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কিছু না, কিছু না! বিবাহের মধ্যে আমাদের যে সব অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে আমার মতে একটা এই হওয়া উচিত যে, একটা দড়ি ফাঁস গেরো দিয়ে বরের গলায় বেঁধে ক'নের হাতে দেওয়া উচিত—সেটা ঠিক খাঁটি symbolism হয়।"

চারু বলিলেন, "তা ঠিক, কিন্তু একটু সামান্য ভুল হ'ল, ফাঁসীটা থাকবে ক'নের গলায় আর দড়িটা থাকবে বরের হাতে।"

অমল হাসিয়া বলিল, "দুটোই ঠিক। তবে রায়ের কথাটায় একটু ভুল আছে। বোধ হয়, দড়িটা বরের গলায় না হ'য়ে নাকে থাকা উচিত।"

"Bravo my boy! ঠিক বলেছ!"

"বাঃ বেশ, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা—একটা গোলমাল ক'রলেই সত্য প্রতিষ্ঠা হ'য়ে যায় না। উপস্থিত তোমার নাকের দড়িটা আমার কর্ত্তাটির হাতে এবং মনোরমার গলার দড়িটা আমার হাতে দেওয়ার দরকার হ'য়েছে। সবাই অপেক্ষা ক'রছে, এখন আর তো তোমাদের একত্র থাকা ভাল দেখাচ্ছে না।"

মিঃ রায় বলিলেন, "বাস্তবিকই তো এ কি বেয়াড়াপনা। শুভদৃষ্টির আগে দেখা-শোনা, এ কোন্ দেশী কথা! বেরোও তুমি ঘর থেকে! চলো। বাইরে বসো গে। চুপটি ক'রে সাধু সেজে বসে থাকবে, কেউ যেন টের না পায় যে, কোনও দিন তুমি ক'নের ছায়াও দেখতে পেয়েছ।" অমলকে তিনি দুয়ারের দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

অমল মনোরমার কাছে বিদায় লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কাঁদিয়া মনোরমার হৃদয় অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। এই রহস্যালাপে তাহা আরও পরিষ্কার হইয়া

গেল। চারুদি তাহাকে শেষ ফিনিস দিবার জন্য ড্রেসিং রুমে লইয়া গেলেন।

বিবাহের আসরে বসিয়া হঠাৎ মনোরমার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল,—সে একটা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গেল;—পার্শ্বে চাহিয়া সে দেখিল, বিবাহে আচার্য্যের স্থানে বসিয়া আছেন সত্যকিঙ্কর! সত্যকিঙ্করও চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁর শ্মশ্রুবহুল মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

এ ব্যাপারের একটা ইতিহাস আছে। অমল স্থির করিয়াছিল, তাহার বিবাহে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান না হইয়া শুধু সোজাসুজি রেজেষ্ট্রী করা হইবে। কিন্তু মনোরমার মুখ এ কথায় অন্ধকার হইয়া উঠিল। তার জীবনের এত বড় একটা অনুষ্ঠানে ভগবানের আশীর্ব্বাদ না লইয়া অগ্রসর হইতে তার বড় সঙ্কোচ বোধ হইল। অমল কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে রাজী হইয়া একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে আচার্য্য খুঁজিতে ছুটিল। মনোরমা ধরিল, সুকুমার বাবুকে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হউক। এ সম্বন্ধে অনেকের গুরুতর আপত্তি ছিল, কেন না, এ পক্ষে সকলেই সাধারণ সমাজের লোক,—নববিধান সমাজের আচার্য্য আসিয়া এখানে পৌরোহিত্য করেন, ইহা কাহারও মনঃপূত হইল না। তবু অমল সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজে সুকুমার বাবুর বাড়ী গেল।

বিনীত ভাবে সুকুমার বাবুর কাছে তাহার কৃত অন্যায় অপমানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া অমল তাঁহাকে বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সুকুমার বাবু স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমাদের আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি তোমরা সুখী হও, কিন্তু মনোরমার বিবাহে আচার্য্য পদ লইতে আমার গুরুতর আপত্তি আছে। আমাকে ক্ষমা কর।"

মনোরমার সম্বন্ধে বিধবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কাছে সমস্ত বিবরণ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে জানাইয়াছিলেন। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে তিনি এই অপবিত্র বিবাহে যোগ দিতে পারেন না, এই কথা সুকুমার বাবু ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু অমলকে তিনি সে কথা কিছু বলিলেন না।

যখন কিছুতেই সুকুমার বাবুকে টলান গেল না, তখন অমল তাড়াতাড়ি তাহার এক বন্ধুকে সাধারণ সমাজের নরেন্দ্র বাবু কি যোগেশ বাবুকে ঠিক করিতে বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেই বন্ধু নানা লোকের কাছে ঘুরিয়া কাহাকেও সেদিন পাইল না, কেবল সত্যকিঙ্কর বাবুকে অনেক বলিয়া কহিয়া আর একটা কাজ ছাড়াইয়া সন্ধ্যাবেলায় আনিয়া হাজির করিল। সত্যকিঙ্কর জানিতেন অমলের বিবাহ; কাহার সঙ্গে তাহা তিনি জানিতেন না। তাই যখন মনোরমাকে দেখিলেন, তখন তিনি চমকাইয়া উঠিলেন।

বিবাহ যতক্ষণ চলিল, ততক্ষণ সভাস্থ অনেকেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। সত্যকিঙ্করকে দেখিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; অতি দীর্ঘ প্রার্থনা ও উপদেশে তিনি অতি-বড় সহিষ্ণু উপাসকেরও অন্তর ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেন বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি ছিল। আর তাঁর উপদেশ ও প্রার্থনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি ভুলিয়াও কখনও একটি নূতন কথা বা একটা সরস কথা বলিতে পারিতেন না। বহু পুরাতন জীর্ণ মন্ত্রের পুনঃপুনঃ বিজৃম্ভণ ছাড়া তাঁহার বক্তৃতায় কেহই কিছু খুঁজিয়া পাইত না।

মিষ্টার রায় বলিলেন, "ভগবানের উপর লোককে যদি চটিয়ে দেওয়াই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য হয়, তবে সত্যকিঙ্করকে উপাচার্য্য করাটা খুব সঙ্গত হ'য়েছে।"

আর একজন বলিলেন, "আর, সমাজে যাই হ'ক না কেন, বিয়ের সভায় এই সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা একেবারেই অগ্রাহ্য!"

হঠাৎ হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল, সমস্ত শ্রোতার হৃদয় মথিত করিয়া অনীতা গাহিল,—

(এদের) জীবনতরী ভাসলো আজি
প্রেমের পাথারে;
হালে বসে, প্রেমের ঠাকুর,
চালাও ইহারে।
ঝঞ্ঝা যদি এসে পড়ে,
পাগল সাগর দোলে ঝড়ে,
অভয় দিয়ে ছায়া দিও
তোমার আঁচরে।

(ওগো) চির-যুগল, এই যুগলে
ঠাঁই দিও হে চরণ-তলে,
(তোমার) দয়ায় যেন হৃদে সদা
পুলক সঞ্চারে।

সঙ্গীত থামিয়া গেল! এক মুহূর্ত্ত সমস্ত সভা সঙ্গীত-রসে মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। একদিকে একটা অশান্তির মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—পরমেশ্বরকে 'যুগল' বলিয়া সম্বোধনে বৈষ্ণব পৌত্তলিকতার আভাসে কয়জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম অশুচিবোধ করিতে লাগিলেন।

সত্যকিঙ্কর অনেকক্ষণ নীরবে ধ্যানস্থ থাকিয়া মুখ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বর শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। এ তো সত্যকিঙ্করের সিংহনাদ নয়, তদ্গতচিত্ত সাধকের মৃদু সম্ভাষণ। কথা শুনিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইল। সত্যকিঙ্কর শান্তকণ্ঠে কেবল বলিলেন,—

"হে প্রেমের ভগবান, হে মিলনের দেবতা, তুমি এই নূতন প্রেমিক দুটীকে তোমার চরণে আশ্রয় দাও, তোমার পুণ্য-স্নিগ্ধ দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোকের তলে ইহাদের অন্তরে প্রেম-শতদল পুঞ্জে পুঞ্জে বিকশিত হইয়া তোমার করুণার ধারায় অভিষিক্ত হইয়া উঠুক। বরবধূ ও তাহাদের বন্ধুদের তোমার চরণে এই একমাত্র প্রার্থনা দয়াময়—তোমার প্রেমময় নাম ইহাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক!"

এত সংক্ষিপ্ত, এত সরস, এত নূতন কথায় ভরা প্রার্থনা সত্যকিঙ্করের মুখে কেহ কখনো শোনে নাই।

প্রার্থনার শেষ স্বর যখন সভার শান্ত গভীরতার ভিতর মিলাইয়া গেল, তখন অনীতা কলকণ্ঠে আবার একটী গান গাহিল। তারপর সত্যকিঙ্কর উপদেশ দিলেন।

আচার্য্যের উপদেশ দিবার সময় সত্যকিঙ্কর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল বলিলেন,—

"শ্রীমান অমলকুমার, শ্রীমতী মনোরমা তোমরা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান; সংসারে তোমরা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; ভগবানে তোমরা ভক্তিমান। তোমরা যে পথে আজ পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছ, সে পথের পাথেয় তোমরা যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছ;—আমি তোমাদিগকে কি উপদেশ দিব?—কেবল আশীর্ব্বাদ করি, ভগবানের অপার করুণা তোমাদের উপর বর্ষিত হউক। তোমরা দুজনেই জীবনে ভগবানের করুণার পরিচয় পাইয়াছ;—তিনি তোমাদিগকে কত বিপদ, কত প্রলোভন, কত কলঙ্ক, কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া অক্ষত, মহান্ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন;—তাঁর এই করুণা তোমাদের জীবনে যদি নিরন্তর জাগ্রত থাকে, তবে আর তোমাদের কোনও চিন্তাই নাই।"

ব্যস্, উপদেশ শেষ হইয়া গেল। বরকন্যা হাত ধরিয়া উঠিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে করমর্দ্দন ও নমস্কারাদি করিল।

সত্যকিঙ্করের হাত ধরিয়া অমল খুব জোরে ঝাঁকাইয়া বলিল, "আপনাকে কি বলে' ধন্যবাদ দেব জানি না, খুব সংক্ষেপে সেরেছেন, It was a pleasant surprise."

সত্যকিঙ্কর নীরবে প্রতি-নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইল। মিষ্টার রায় সত্যকিঙ্করের হাত ধরিয়া খুব ঝাঁকাইয়া বলিল, "Thank you, thank you! লুচিগুলো গরম থাকতে থাকতে যে শেষ করেছ, তাতে বহু ধন্যবাদ।"

সত্যকিঙ্কর কথা কহিল না।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া সত্যকিঙ্করকে বলিলেন, "বড় সুন্দর উপাসনা, সুন্দর সরস ক্ষুদ্র উপদেশ—আপনার মুখে এমন কথা আরও অনেক শুনতে আশা করি।"

সত্যকিঙ্করের চোখের ভিতর একটু চকচকে হইয়া উঠিল। সে নীরবে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইল। পর মুহূর্ত্তে আর কেহ তাহাকে দেখিল না। আজ সে অন্তর ঢালিয়া উপাসনা করিয়াছে—আর অন্তরের সমস্ত আশীর্ব্বাদ যৌতুক দিয়া সে তার একমাত্র প্রেমাস্পদকে অমলের হাতে দিয়া গেল।

সত্যকিঙ্কর না খাইয়া অমনি চলিয়া গেল দেখিয়া সবাই নানা কথা বলিতে লাগিল, কেহই কারণ বুঝিতে পারিল না। মনোরমা কতক বুঝিল, কিন্তু ভুল বুঝিল।

* * * *

রাত্রেই মনোরমার মা একেলা তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে আসিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কোষ্ঠীতে না কি লেখা ছিল,—চিরজীবন ঘুরিয়া মরিতে হইবে। তরুণ বয়সে কথাটা বেশ লাগিয়াছিল,—উৎসাহ আগ্রহও আনিয়াছিল। যৌবনে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া এমন চাকুরী স্বীকার করিলাম যে, অল্পদিন মধ্যেই কোষ্ঠীর ফল দল বাঁধিয়া দেখা দিতে লাগিল; আমি কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সবেগে সতের বৎসর নানাস্থানী হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। সখ্ মিটিলেও ফলের good luck (শুভদৃষ্টি) তখনো তুঙ্গী,—জল স্থল মরু গিরি নির্ব্বিশেষে সমান ফলিতে লাগিল। শেষে চীনের প্রাচীরে পায়চারি করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার মাটী মাড়াইয়া, রাজপুতানার মরুভূমি ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি—কোষ্ঠীখানি উইয়ের উদরস্থ হইয়াছে! যাক্, আপদ গিয়াছে,—ফলের জড় মরিয়াছে,—বাঁচা গেল। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া যেরূপ ফ্যালাও ভাবে ফল ফলিয়াছে, তাহাতে সহজেই বুঝিলাম—নিশ্চয়ই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া গিয়া থাকিবে;—স্বর্গপ্রাপ্তির আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন Segregation campএ (ভিন্ন গোয়ালে) অপেক্ষা করাই সুবুদ্ধি-সঙ্গত। কাশী আমাদের ভূস্বর্গ, আপাততঃ সেই স্বর্গে থাকাই বিধেয়। তাড়াতাড়ি যাহা জুটিল পেনসন্ লইয়া, পাত্তাড়ি গুটাইয়া, কাশী রওনা হইয়া পড়িলাম।

(২)

৺কাশীধামে বাসা বাঁধিতেছিলাম, ইচ্ছা—আর নড়াচড়া নয়, একেবারে শিব হইয়া leave (ছুটী) লইব। মানুষের স্পর্দ্ধা তাহাকে বুঝিতে দেয় না যে, তাহার নিজের ইচ্ছাই চরম নহে। পূর্ণিয়া হইতে পরমাত্মীয়দের জরুরি ডাক্ আসিল,—বিশেষ কাজ আছে!

অধিকার মত জগতের বহু বাহার আস্বাদন করিয়া কাশী আসিয়াছিলাম; এখন ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়া, অর্থাৎ আহার নিদ্রা ছাড়া যে, আমার আর কোন কাজ থাকিতে পারে, তাহা মাথায় আসে নাই। যাহা হউক, কুটোকাটি পড়িয়া রহিল,—অপস্বর্গে পুনর্যাত্রা করিলাম। পূর্ণিয়ায় পৌঁছিয়াই দেখি, সেই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দেওঘর যাইবার পরোয়ানা প্রস্তুত! কি পাপ! "মরিয়া না মরে রাম—এ কেমন বৈরী!"

নষ্ঠ-কোষ্ঠী উদ্ধার হইল না কি? আবার যে ফল ধরে!

ব্রাহ্মণী পূর্ণিয়াতেই ছিলেন; তিনিই মুখপাত্রীরূপে (দুঃখদাত্রী বলা আইনে আটকায়) অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন,—"দেরী করলে ত' চলবে না, আর দিন নেই, শীগ্গির তয়ের হ'য়ে নাও।" বলিলাম—"তয়ের হ'য়ে ত অনেক দিন থেকেই রয়েছি, কেউ নেয় কই!" কথাটা বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিল না, একটু বিরক্ত হইলেন,—কিন্তু তাগাদা বাহাল রহিল।

শুনিয়াছি সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir William Jones) সংস্কৃত শাস্ত্রে সেরা পণ্ডিত ছিলেন, আমাদের সমস্ত শাস্ত্রই না কি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত তাঁকে নূতন একটি শাস্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, যেটির নাম "অনটন" শাস্ত্র, এবং যা তাঁর দেখা ছিল না। কার্য্য হইতে অবসর লইবার জন্য আমার ছট্‌ফটানি ধরিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি অসময়েই retire করি। উদ্দেশ্য নূতন আর কিছু দেখিতেছি না, অবশ্য আর যোগ্যতা মত সব কাজই করিয়া দেখা হইয়াছে—এখন কাশী গিয়া নিশ্চিন্তে শেষ কয়টা দিন কাটানো। কিন্তু অচিরেই পরমাত্মীয়েরা, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণী, বাতলে দিলেন,—"ব্যাগার" বলিয়া যে বড় কাজটি আছে, তাহার অন্ত নাই; এবং কেহ তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই।

বুঝিলাম—"ব্যাগারের" জন্যই এখন বাঁচিতে হইবে। যথা,—দুধ্‌টো উনানে বসানো রইল, দেখো উথলে না পড়ে,—আমি আহ্নিকটে সেরেনি। মাছগুলো না বিড়ালে নে'যায়,—গা' ধুয়ে আসি! ননীগোপালকে নিয়ে একটু খেলা কর',—ও ভারি শান্ত ছেলে, আমি একবার হরিমতিদের বাড়ী যাচ্চি;—তাদের গুরুপুত্তুর এসেছেন—হারমোনিয়া বাজিয়ে কি হরিনামই ক'রচেন, পণ্ডপক্ষীরা

থির্ হ'য়ে শোনে।—এই শাঁখটা রইল', সন্ধ্যে হ'য়ে যায় ত' তিনবার ফুঁ দিও (অর্থাৎ-ফুঁকো)—ইত্যাদি। শাঁখটা শিল্পা হইলেই ভাল হইত, ফুঁকিতে পারিলে আরাম ছিল! ননীগোপাল যে কিরূপ শান্ত ছেলে তা অষ্টপ্রহরই প্রত্যক্ষ করি, আর পালাই পালাই করি। ওই বর্ব্বরটির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি এমনি উর্ব্বর—এরি মধ্যে সে দেশলায়ের বাক্স সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত; সেদিন ভাঁড়ার ঘরের বড়ির হাঁড়ির মধ্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া "মশারি বাজি" খেলিয়াছিল! নিবাইতে নিবাইতে সাড়ে তিন হাত সাফ্। তখন সেই শান্ত ছেলে লইয়া, কত আদর, কত আশঙ্কা, কত মানসিক; কারণ—সোণারচাঁদ গিছলো আর কি,—হরি রক্ষা করেছেন! পরে শুনিতে হয়,—হ্যাঁগা তুমি মানুষ না কি? বাড়ীতে ব'সে রয়েছ—ইত্যাদি, এবং বলিতে হয়—"যদি চারিশ বছরে না চিনে থাক', সেটা কি আমার অপরাধ?" এখন ফুল-বেঞ্চের রায়ে আমারই দোষ সাব্যস্ত,—আমিই গিল্টি (guilty)! এই কিল্‌টি নীরবে হজম্ করাই বিধি। সে যাহা হউক,—ছেলে শান্ত বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক বেগ্ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলগুলা ত' শান্ত অশান্ত ভেদে আসে না, আর সে-ফল্ চতুর্ব্বর্গের চৌহদ্দিও মাড়ায় না, অথচ ভোগটা পুরোপুরি চার-পো! আবার বোঝাটা চাই—আহ্নিক আর হরিনাম (যাহা পশুপক্ষীতে থির্ হ'য়ে শোনে), তাহা আমার তরে নয়, তাহাতে আমার অধিকার পঞ্চাশ পেরিয়েও জন্মায় নাই; বাকি-গুলার তরেই বাঁচিয়া থাকা! কোন দিন বা শুনিতে হয়—"একটু নড়াচড়া ভাল গো,—বরাবর বাইরে বাইরে ঘুরেচ';—একবার পায়ে পায়ে ঐ বোসেদের বেড়ার ধারে গিয়ে, ব'সে ব'সে চারটি সজনে-ফুল কুড়িয়ে আনো দিকি, আহার ওষুধ দুই-ই হবে,—এই নাও, এই ধামিটে নাও!" কি দয়া! আবার হাইজিনের হাউই ছাড়ে যে! কোন দিন বা দেখিতে হয়,—বড় নাতি তস্করের মত রুদ্ধদ্বারে—'টেবিল-আয়নার' সম্মুখে, ভাস্কর পণ্ডিতের ভণিতা ভাঁজিতেছে, আর একটা মোটা পাশ-বালিসের ওয়াড়ের বন্ধন-রজ্জুতে একটা নিবন্ত বাতি একবার করিয়া ঢোকাইতেছে আর—"সংহার-সংহার" বলিয়া লাফাইয়া উঠিতেছে! কিন্তু "সংহার" কথাটার কোন্ অক্ষরের উপর accent (ঝোঁক) পড়িলে জীবনটা সার্থক হয়, তাহা কিছুতেই ঠিক্ করিতে পারিতেছে না; কখন accent on second half, কখন' on third one third, কখন first one seventh syllableএর উপর চাপাইয়া দেখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দানীবাবু সে সময় কত ডিগ্রি angleএ গ্রীবা বক্র করেন এবং তাঁহার নাসারন্ধ্র কতটা diametreএ dilated (বিস্ফারিত) হ'য় ও অক্ষিগোলক খোল ছাড়িয়া কতটা বাহিরে আসে, তাহার কসরৎও চলিতেছে। তখন ইচ্ছা হয় বলি—"ওরে রাস্‌কেল্, আস্‌চে বারে কর্কট জন্ম নিস্, ও দুঃখ থাকিবে না, চোখ ঠেলিয়া নাকের ডগার সমরেখায় অনায়াসে আনতে পারিবি,—দু'শো বাহবা পড়ে যাবে, এবারটা দয়া করে চরকা কাট্,—বড় দুঃসময়।"—একটু পরেই গুন গুন্ স্বরে কেশ-প্রসাধন,—গ্রিসিয়ান্ স্লিপার পায়, ও গন্ধ-গোকুলের মত ভরভরে গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে বেগে জরুরি কার্য্যে পাঁচ ঘণ্টার মত প্রস্থান! বাহিরে পা দিয়াই আওয়াজ—"দোরটা খোলা রইল; গরু না ঢোকে!" তখন বলিতে হয়—"পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঢুকবে না,—ভয় নেই।" কেই বা শোনে, বরং ক্রমোচ্চাব স্বরে tidal progressionএ ধনুষ্টঙ্কার-curveএ, আমারি কাণে আসে "আ—মা র—দে—শ"। তখন হাসি পায়, মনে মনে বলি—"তোমার চোদ্দোপুরুষের দেশ! ও-"বেশে" দেশ হয় না রে পাজি!"—তবে ননীগোপাল বেঁচে থাকুক,—রাত্রে মশায় rush (তাড়া) করিলে, ফস্ করিয়া সুবর্ণচন্দ্র-কৃত সিঁদ্‌বোন্ দিয়া ছুটিয়া পলাইবার সুবিধা হয়।

কার্য্য হইতে অবসর লইলে দেখিতেছি সুবিধা বিস্তর! পূজনীয় শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সে মুখো পা বাড়াইলেই forest department (বন-বিভাগ) ফেরার আসামী বলিয়া চালান্ দেন। কাজেই কাশী যাই, কারণ কাশীর অপর একটি নাম—"আনন্দ-কানন";—এই mild doseও বুঝি তলায় না। যদ্‌বিধের্মনসি স্থিতম্।

(৩)

পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন ছিল না,—পেন্‌সন্-প্রাপ্ত লোকের আর শুভ-অশুভ দিন কি? তাহার আবার বিপদ-আপদ কি? তাহার বাঁচিবার যত্নটাই যে হাসির কথা! (শাস্ত্রকারেরা 'মহাপাতক' বলিয়া একটা মহা অনর্থ

ঘটাইয়া গিয়াছেন, নচেৎ যে গরু দুধ দেয় না, তাহাকে রাখাটা মস্ত একটা economic problemএর (অর্থনৈতিক সমস্যার) মধ্যে পড়িয়া যাইত; আর গো-ব্রাহ্মণ ত চিরকাল এক ব্রাকেটের মধ্যে পড়িয়াই আছে।) তাই পঞ্জিকার পরিবর্ত্তে টাইম্ টেবেলের টান্ ধরিল। এক-দুই ক্রমে তিনখানি নাড়াচাড়া করিয়া, পথের পাত্তা লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল। পূর্ণিয়া হইতে কাটিহার; কাটিহার হইতে মনিহারি ঘাট; পরে ষ্টিমারে গঙ্গাপার হইয়া সকরিগলি ঘাট; তথা হইতে সাহেবগঞ্জ; সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া কিউল্; কিউল হইতে যশ্‌ডি; যশ্‌ডি হইতে destination অর্থাৎ ঠিকানায়! উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই যাবা-ওঠা, যান-পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ আমার পক্ষে 'জান পরিবর্ত্তন'! এক টুক্‌রা কাগজে এই সময় ও ওট্-বোসের তালিকা ছকিবার পর দেখি সেখানি যেন কালা-জ্বরের temparature chart দাঁড়াইয়াছে! এই জ্বর ভোগ করিতে হইবে, উপায়ান্তর নাই। মনে হইল ইহা অপেক্ষা North Pole (উত্তর মেরু) আবিষ্কারে লাগিয়া পড়া সহজ।

তাগাদায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" ভাবিয়া প্রাণভয়ে পলাতক প্রাণীর মত পরদিনই শুভাশুভ-নিরপেক্ষ কোন এক মুহূর্ত্তে দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ভাগ্যবানেরা বলেন Life is holy and Sweet—মিথ্যা নয়!

যাহা হউক, একটি সহকারী সঙ্গী পাইলাম। ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহা এক্ষণে ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের দাওয়ায়ের মত—"ফলেন পরিচীয়তে" থাকাই ভাল। নানা চিন্তা সমেত ইণ্টার ক্লাসে enter করা গেল,—কারণ আমরা মধ্যবিত্ত। চিন্তাগুলি 'নিরাকার' তাই রক্ষা, নচেৎ সে বোঝা গাড়ীতে ঢুকিত না,—'ব্রেক্-ভানে' দিতে হইত, এবং তাহার পশ্চাতে পথের সম্বলও সাবাড় হইয়া যাইত।

শুনিয়াছি—সাপে-কাটা রোগীকে সর্ব্বক্ষণ সজাগ রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়,—পাছে ঢুল্ ধরে। আমাদের কিসে কাটিয়াছিল, সেটা ভাষায় না বলাই ভাল, তবে এ-যাত্রায় আমাদেরও ঢুল্ ধরিবার জো-টি ছিল না। ওট্-বোস্ করিতে করিতে দিনরাত কাটিতে লাগিল; সুতরাং সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম,—এই গেঁটে যাত্রাটি সাপে-খাওয়া রোগীর একটি 'টোট্‌কা'। যাত্রাটি শুধুই গেঁটে ছিল না,—প্রত্যেক গাঁটের দু'পিটেই কাঁটা,—পাশ ফিরিলেই ফোটে,—কুলিদের বুলি শুনিলে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়! হায়, তখনো জানিতাম না—আমার সহকারীটি দাঁড়াইয়া এবং চক্ষু না বুজিয়া ঘুমাইতে পারেন।

(৪)

ক্রমে তখন কিউলে আসিয়া পড়িয়াছি। কুলি-জি আশ্বাস দিয়া গেলেন,—বিলম্ব আছে, ট্রেণ আসিলেই বোঝাই দিবেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; দৌড়্‌ধার প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শীতের হাওয়া, হু হু করিয়া অবাধ ছুটিয়াছে। ট্রেণের অপেক্ষায় বহুলোক বোচকা-বুচ্‌কি লইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, হিম আর হাওয়ায় জড়সড়। আমাদের জন্য সর্ব্বত্রই এই ঢালা-ব্যবস্থা আর খোলা-দরবার। যেন মড়কের মাল। আচ্ছাদন-যুক্ত অংশটুকু প্রায় কোম্পানীর কুপুত্রেই ভরাট;—কুলি প্রভৃতিরা আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া, লম্বা হইয়া দখল করিয়াছে; দুইজন যা একজোড়া করিয়া বসিবার, দুইখানি বেঞ্চিও বর্ত্তমান! পূর্ব্বাগতরা তাহা পুঁটলি সমেত পূর্ণ করিয়াছেন, ও এদের মুড়ি দিয়া গুঁড়ি মারিয়া আছেন যে, কোন্‌টি পুঁটলি, কোন্‌টি মালিক তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন। তাহারি সম্মুখে কুলি-জি আমাদের সামান্য মালপত্রগুলি নামাইয়া-ছিলেন।

একস্থানে দাঁড়াইয়া সরাসরি হাওয়া খাওয়া অপেক্ষা একটু নড়িয়া চড়িয়া নাড়ী বজায় রাখিবার চেষ্টা পাওয়াই ভাল ভাবিয়া যেই দুই পদ অগ্রসর হইয়াছি, অমনি আকাশবাণী হইল—"এটা পার্ক (Park) নয় মশাই,—কিউল্ ইষ্টেসন্;—পেছন ফিরলেই পুঁটলি সরে যায়। বরং বোচ্‌কার উপর চেপে sit down (বসুন)। এটা মহতের আড্ডা, তাঁরা যাত্রীদের ভার লাঘব ক'রতে সর্ব্বদাই যত্নবান!" এদিক-ওদিক তাকাইতেছি, আবার আওয়াজ আসিল—"এই একটু আগে একজনের পুঁটলি পাচার হয়েছে, সে পাগলের মত' ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।" বুঝিলাম বেঞ্চিস্থিত দুইটি মোড়কের মধ্যে কোন একটি এই সতর্কবাণী ঘোষণা করিলেন। উদ্দেশ্য

কৃতজ্ঞতা প্রকাশানন্তর, আমার বেতের ট্রঙ্কটি চাপিয়া বসিলাম, এবং নস্যদানিটি বাহিরের পকেট্ হইতে ভিতরের পকেটে চালান্ দিলাম।

আমার সহকারী-সঙ্গী জয়হরি—দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফিট্, ওজনে সওয়া দুই মণ, এবং বয়সে সাতাশ; সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়াছিলাম। চাহিয়া দেখি, সে সোজা প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ধরিয়া চলিয়াছে;—নিশ্চয়ই এই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া, কোন একটি স্বাভাবিক পীড়া প্রবল হইয়া থাকিবে। মিনিটখানেক পরেই সেইদিকে একটা "মার্ মার্" শব্দে সকলকে সচকিত করিয়া দিল। কিন্তু সকলেই পুঁটলির সঙ্গে বাঁধা! আমি জয়হরিকে না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম; বেঞ্চি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—"অনুগ্রহ ক'রে একটু দেখবেন, আমি আমার সঙ্গীটির খোঁজ লই, আর ব্যাপারটা কি, তা শুনে আসি।" অনুমতিটা সহজেই পাইলাম; বুঝিলাম—তিনিও ঘটনাটা জানিবার জন্য উৎসুক।

এস্থলে একটা বিশেষ কথা আছে, যাহা বাদ দিলে ঘটনাটা খোলসা হইবে না। কিউল্ ইষ্টেসন্ হইতে অন্যূন পঞ্চাশ হাঁড়ি (কলস) দধি, প্রত্যহ রাত্রে কলিকাতায় চালান যায়; এবং প্রাতে,—রবিবাবুর ভাষায়:—

"বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি"—লয় চুপে চুপে; অর্থাৎ রাজধানীর রসে—এক হাঁড়ি, সাত হাঁড়িতে উন্নতিলাভ করিয়া, ক্রেতাদের দীর্ঘায়ু লাভে সাহায্য করে। (ইতি সায়েন্স্)।

কিউল্ সম্ভবতঃ গৌড় মণ্ডলের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে, বা গণ্ডী ঘেঁসিয়া থাকে; আর গোড়্-গয়লারাই এই মধু (সুধা) নিত্য সরবরাহ করে,—"গৌড়জন যাহে—" ইত্যাদি।

আজও সেই-সব দধিভাণ্ড বা মধুভাণ্ড—মধু-চক্রাকারে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর, গাড়ীর অপেক্ষায় রক্ষিত ছিল। মালিকেরা অদূরেই স্ব স্ব বাঁকের উপর বসিয়া, কেহ সুর ভাঁজিতে, কেহ খইনি টিপিতেছিল। ইষ্টেসনে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুবই, কারণ অনেকেই "মধুংলিহ"। হেনকালে—

গিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব, কি মাথা খুঁড়িব, স্থির করিতে পারিলাম না। দেখি—জয়হরি একদম সেই হাড়ি (হাঁড়ি) পাঁড়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; এবং বাঁকহস্তে 'গৌড়জন' তাহাকে ঘিরিয়া এই মারে ত' এই মারে! যে সব শক্ত বাত্ চলিয়াছে, তাহাতে রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে সহসা জয়হরির চট্‌কা ভাঙ্গিল; সে একবার চারিদিক চাহিয়া আসন্ন মুহূর্ত্তে বলিল,—"ভাই,—শো গিয়া থা"! দু'একজন বলিয়া উঠিল,—"হাঁ—নাক্ তো বোল্ রহা থা।"

আগুনে যেন জল পড়িল, একটা হাসির সঙ্গে Crisis over,—ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তাহারা তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যূহের বাহির করিয়া দিল, ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—"বাঙ্গালীকা সবই আজব্ হায়"।

আমি মনে মনে ভাঁজিতেছিলাম, বলিব—"রাতকাণা হায়", নচেৎ নিস্তার নাই; সেটা ফাঁশিয়া গেল। বলিলাম—"কিছুদিন হইতে এই কঠিন রোগ আশ্রয় করিয়াছে, বড়ই শোচমে (দুর্ভাবনায়) পড়িয়াছি ভাই। সেদিন রাস্তায় নূতন গরম কোট্‌টি কে খুলিয়া লইয়াছেন, উনি কিছুই টের পাননি। ডাক্তার বৈদ্যে জবাব দিয়া হায়, হাকিম হাল্ ছোড়া হায়। এখন সকলেরি রায়—ঝাড়্‌ফোঁক্।" তাহারা উৎসাহের সহিত বলিল—"ইয়ে তো বহুত্ ঠিক্ বাত্ হায়।" পরে আমাকে "চুড়ানন্দ ঝা"র ঠিকানা লিখাইয়া দিল, ও বলিল,—"প্রেতমোচনের অমন ওস্তাদ্ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই।" কাগজখানি তিনবার মাথায় ঠ্যাকাইয়া, বুক্ পকেটে রাখিলাম, ও এইভাবে তাহাদের শ্রদ্ধা-সহানুভূতি আকর্ষণ ও উপদেশ অর্জ্জন করিয়া, আসামী লইয়া ফিরিলাম।

মোড়ক্ মধ্যস্থ মানুষটি উন্মুখ হইয়া ছিলেন; মোদ্দাটা শুনিয়া বলিলেন—"বলেন কি—এ যে পথে নারীর বাবা! এক্ষুনি ওঁর কাছায় আর আপনার কোঁচায় গাঁটছড়া বেঁধে ফেলুন;—এমন বিপদও সঙ্গে আনে!" জয়হরি অপ্রতিভের মত বলিল—"কথনো কথনো হয়ে যায়।"—অবিকশিত মোড়ক মহাশয় বলিলেন,—"বাবা—তোমার ওই 'কথনো' তেই কুম্ভকর্ণকে হটিয়ে দিয়েছ,—তিনি শুয়ে ঘুমুতেন!" পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ওঁকে কতদূর টান্‌তে হবে?" বলিলাম—"দেওঘর পর্য্যন্ত।" তিনি বলিলেন "ওঃ বৈদ্যনাথ যাচ্ছেন, ওঁর কল্যাণে 'হত্যা' দিতে বুঝি?"

আমি বলিলাম—"না, দেওঘরেই৺ দরকার আছে।" তিনি বলিলেন—"ওই হোলো, দেওঘর আর বৈদ্যনাথ ত' ভিন্ন নয়; কাজটা সেরে এলেই ভাল হয়, আবার ত ওঁকে নিয়ে ফিরতে হবে?"

আমি ত' অবাক; দেওঘর আর বৈদ্যনাথ তবে কি একই জিনিস! মনে পড়িল,—পঠদ্দশায় একবার জিওগ্রাফির প্রশ্ন ছিল—"মম্‌বাসা কোন্ নদীর উপর অবস্থিত?" আমি অনেক চিন্তার পর লিখিয়াছিলাম,—"গোদাবরী নদীর উপর।" অবশ্য কারণ ছিল,—এমন হৃষ্ট পুষ্ট নাম, গোদাবরীর সান্নিধ্যেই থাকা সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চতন্ত্রের অনেক পাখীই গোদাবরী-তীরস্থ শাল্মলী তরুতে বাসা বাঁধিত, সুতরাং মম্‌বাসা গোদাবরী তীরেই সম্ভব। পণ্ডিতেরা কেতাবের কথারই কদর করিতে জানেন, imaginationএর (কল্পনার) কদর জানেন না,—সেবার তাই মোট সাত নম্বর পাই। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ও বদ অভ্যাস তাঁহাদের যাইবার নয়।

যাহা হউক, ভাবিলাম মোড়ক-মধ্যস্থ মানুষটি নিশ্চয়ই কোন ইস্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষক হইবেন, নচেৎ এত ঢাকিয়া ঢুকিয়া থাকেন কেন;—পরের মগজ নিজের মগজে রাখিতে হইলে, বোধ হয় ইহাই দস্তুর। পাছে বে-ফাঁস্ হইয়া পড়ে তাই আমাদের তালপত্রে লিখিত শাস্ত্রাদিকেও "ছিন্নবস্ত্র বিমণ্ডিত" হইয়া থাকিতে হয়। প্রবাদ আছে কোন এক "হবুচন্দ্র" নামধেয় মন্ত্রীও না কি এই প্রথার দস্তুর-মত পক্ষপাতী ছিলেন। এই সব নজির বর্ত্তমান থাকিতে আমাদের মোড়ক মহাশয়ের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না; নিশ্চয়ই দেওঘর ও বৈদ্যনাথ এক বস্তুই হইবে; জগতে এমন ত' বহুত হইয়াও গিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর সাধের জাহানাবাদ এক্ষণে আরামবাগে দাঁড়াইয়াছে; সহপাঠী নসীরামকে 'নসীরাম' বলিলে, বিরক্ত হয়, উত্তর দেয় না; সে এখন—"সচ্চিদানন্দ স্বামী!" নিশ্চয়ই ৺ বৈদ্যনাথধামও দেওঘর নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ অলক্ষ্যে শুড়্‌শুড়ি দিয়া গেল। ৺ বৈদ্যনাথধামে চলিয়াছি এ জ্ঞান থাকিলে, আর একটি বুচ্‌কি বাড়িত,—ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই front হইয়া দাঁড়াইতেন, এবং সেই ত্র্যহস্পর্শ ক্ষেত্রে আমাকে মধ্য পথেই কোথাও লাফ্ মারিয়া হাঁপ ছাড়িতে হইত। এতদিন পরে আজ ignorance is bliss কথাটার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া আরাম বোধ করিলাম।

(৫)

এই সময়—"টিসন্ ছোড়া হৈঃ" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতেই, প্ল্যাটফর্ম্মস্থিত সজীব নির্জ্জীব পুঁটলিগুলি নড়িয়া উঠিল, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে সজীবগুলি—বোচকা-বুচ্‌কি কাচ্চা-বাচ্চা পৃষ্ঠে লইয়া অপোজমের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কুলি বা কলি আসিয়া বলিলেন—"চলিয়ে বাবুজি, উ-পলাট্‌ফারম্‌মে।" তথাস্তু।

এ কি! দেখি এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ-মুখে উপস্থিত। সর্ব্বনাশ এর মধ্যে ত' আমাদের প্রণয়-ঘটিত কোন কথাই ছিল না, তবে এ বৃথা বিপদের মুখে আত্মসমর্পণ কেন; এ 'সিঁদবনে' মাথা দেওয়া gallantryর নির্ভীক নাগরালির বাহবা দেবে কে! কিন্তু ভাবিবার সময় নাই, ট্রেণ—এলুম্ এলুম্ শব্দে, তাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে;—বৈতরণী পার হইতেই হইবে! দুর্গা বলিয়া স্রোতে গা ঢালিলাম। বহু পশ্চাত হইতে আওয়াজ আসিল—"পকেট্ সামলে ভাই,—এ ভিড়্ 'ভাসুরকে' ভরা!" এ যে সেই মোড়ক্ মহাশয়ের গলা!

যখন আবার আকাশের তলায় মাথা দেখা দিল, তখন এক-গা ঘামিয়া গিয়াছি। কবিদের তারকা-রাজি তখন হাসিতেছিল কি কাঁদিতেছিল, তাঁহারাই বলিতে পারেন; আমাদের তাহা দেখিয়া রাখিবার মত অবস্থা ছিল না। সম্মুখে তখন 'বিশ্বরূপ' উপস্থিত,—যাহা দেখিয়া অর্জ্জুন আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। দেখি অসংখ্য 'অভিনয়-চঞ্চল' হস্ত, পদ, নাক, মুখ, চোখ, improved by হরেক রকমের বুলি! ('গীতায় এটুকু বাদ পড়িয়াছিল।) তাহা একত্র উদ্গত হইয়া যে শব্দের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহাই বোধ হয় 'দেবভাষা'! বুঝা ত দুঃসাধ্যই, কান্‌পাতাই মুস্কিল! শুনিয়াছিলাম—ভগবান কোন কিছুই বৃথা করেন নাই,—সবই দরকারী। বধিরতারও যে সার্থকতা আছে আজ তাহা বুঝিলাম।

যাহা হউক, এখন যাই কোথা? যাহা দেখিতেছি তাহাতে ত' শনিরও প্রবেশ-পথ নাই। এই সময় এক দ্বার দিয়া বহির্মুখী তিন মূর্ত্তি খসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত-

মুখী তিরিশ মূর্ত্তি ঝুঁকিল! সৃষ্টির সব জিনিসই দরকারী, দেখি,—জয়হরি forward হইয়া হাঁকিল—'আসুন' এবং হাত ধরিয়া টানিল। তখন—রামে বা রাবণে মারে-র অবস্থায় পড়িয়া গেলাম, অগ্র পশ্চাৎ সমান হইয়া দাঁড়াইল, একদম Buffer State!

অস্বীকার করিলে মহাপাতক হয়,—এতক্ষণে জয়হরির জবর-দস্ত মূর্ত্তি কাজে লাগিল। গত বৎসর সে 'লালিম্‌লির' একটা পাঁচ হাত পরিমিত কালো কম্ফর্টার কিনিয়াছিল;—সদ্ব্যবহারে অধুনা সেটা এগারো হাতে পরিণত। তাহার সাত পাক্ মাথায়, দুই ফেরে কর্ণ রোধ, দুই ফের কণ্ঠে, তেহাই—বক্ষে ঢ্যারা—(স) রচনা করিয়া 'কটি বেড়ী বান্ধই' মধ্যস্থলে সুদৃশ্য গ্রন্থিরূপে কৃষ্ণ-নাভিপদ্ম সৃষ্টি করতঃ 'দশম ভাগের ভাগ' ঝুরির মত ঝুলিতেছিল! ফুল্-মোজার উপর মালকোঁচা। এই ছয় ফিট্ জীবটির হাতে একটী বর্শা থাকলে 'কিং আর্থারে'র 'ল্যান্স্ লট্' না হইয়া যায় না। সুতরাং যাহারা দ্বার রোধ করিয়াছিল, তাহারা সম্ভবতঃ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিল ঃ—

"আনন্দে প্রবেশ' লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।"

এই বিশ্বরূপ মধ্যে মিশিয়া সাযুজ্য লাভের পূর্ব্বেই—চক্ষু কর্ণ দুই-ই বুজিয়াছিলাম; কারণ সে অবস্থায়—শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় রোধ করাটাই,—তাহাদের প্রকৃত কাজে লাগানো। এতদ্বারা 'ফিলজফি' একটু জটিল হইল বটে, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিল। যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখি—একস্থানে (বা অস্থানে) খাড়া Straight lineএর (সরল রেখার) মত দাঁড়াইয়া আছি! "তুমি আমি" আর নাই; সব জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে; কেবল বিভিন্ন মুখ আর চোখ্—ধড়্ এক!

শুনিয়াছিলাম—সাযুজ্য লাভের পর না কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আর শান্তি। কিন্তু অনেক আঁচিয়াও কোনটারই স্বাদ পাইলাম না, স্বেদের প্রাচুর্য্য যথেষ্টই পাইলাম। "অমন অবস্থায় প'ড়্‌লে" নস্যখোরদের সকলেরি যা হয়, আমারও তাহাই হইল, অর্থাৎ নস্য লইবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু হাত তখন বে-হাত, নস্যদানী সাযুজ্যের গর্ভে,—শ্রীভগবানে সমর্পিত! আহা, সে কি আনন্দ,—কি শান্তি!

সহসা দ্বাররক্ষক বা দ্বার-রোধকদের মধ্যে একটা সোরগোল—"নহি—নহি" শব্দে প্রকাশ পাইল—কারণটা সহজেই সকলে বুঝিয়া লইয়া, তাহাতে যোগ দিলেন; কারণ, সাযুজ্য অবস্থায় গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তখন লোকে প্রবৃত্তির পারে পৌঁছিয়া যায়, তাই (সরোষে ও সজোরে ধাক্কা মারিয়া) ত্যাগই বিধি! কিন্তু এ কি! এ যে আবার সেই সুপরিচিত স্বর! বোধ হয় সুবিধা নয় দেখিয়া তিনি ধৈবতে হাঁকিলেন—"বোলো ভাই, গান্ধী মহারাজকি জয়!" কি আশ্চর্য্য প্রভাব, উদ্ভেজিতেরা বিমূঢ়বৎ হইয়া গেল, কাহারো আর কথা ফুটিল না—কণ্ঠে জড়তা আসিয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া ফেলিল—"আপনি স্থান করিয়া লইতে পারেন ত' আমাদের কোন আপত্তি নাই।" "ভাই ভাই এক্ ঠাঁই" বলিতে বলিতে তিনি ত' উঠিয়া পড়িলেন! আরোহীগুলি গান্ধী মহারাজের নামে যেন গেঞ্জী বনিয়া গেল! তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, স্থানও ততই পরিসর হইতে লাগিল। বেশ সুবিধা করিয়া লইয়া, তিনি আর একবার সিংহনাদ ছাড়িলেন,—"আউর একদফে প্রেমসে বোলো ভাই, মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়"। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী জয়ধ্বনি হইল, এবং তাহা আশপাশের গাড়ীতে সংক্রামিত হইয়া আদি ও অন্তে গিয়া অনন্তে মিশাইল। পরক্ষণেই দেখি—"আপ্ বইঠিয়ে তো" বলিয়া ৫।৭ জন তাঁহাকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। সজীব মন্ত্র বটে! কোন সুউচ্চ পদাভিষিক্ত ইংরাজ সত্যই বলিয়াছিলেন—"He (Gandhi) was their (319,000,000 peoples') God. * * * Gandhi's was the most colossal experiment in world's history and it came within an inch of succeeding. * * * "

আগের কোন ইষ্টেসন্ হইতে কয়েকটি ভব্য বেশধারী বিহারী ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ সাযুজ্যের বহু পূর্ব্বে, সালোক্য মাত্র লাভ করিয়াছিলেন, ও সতরঞ্চি বিছাইয়া পাঁচজনে দশজনের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহারা যে শিক্ষিত, তাহাতে কাহারো সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না; কারণ, পার্শ্বেই Nice লেখা বিস্কুটের বাক্সটির উপর Three Castle সিগারেটের কৌটা ও তদুপরি Vulcan দেশালাই শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা চা পানান্তে তিন কেল্লা ফুঁকিতেছিলেন। উল্লিখিত 'জয়নাদ' তাঁহাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। একজন প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে মুখ

বাড়াইয়া মিষ্টার গার্ড—Mr. Guard, হাঁকিতে লাগিলেন। আবার ভগবান এমনি রহস্য-প্রিয় যে, ঠিক তাঁহাদেরি প্রায় সম্মুখেই আমাদের নব আগন্তুকটির আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন! গার্ড একবার বক্রগ্রীবায় চাহিয়াই—সোণার চশমা-পরা সোণা ব্যাংয়ের মত কালো মুখখানা নজরে পড়িতেই, মুখ ফিরাইয়া সজোরে আলো দেখাইলেন; গাড়ী ছাড়িল।

(৬)

কোম্পানীর আকমাড়া কলে ঢুকিয়া সকলেই অল্প বিস্তর সরস হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সকলেরি ঘাম দেখা দিয়াছিল। পাগড়িটি খুলিয়া ফেলায়,—এতক্ষণে শব্দভেদী পরিচয় শেষ হইল, মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। বয়স পঞ্চাশের উপকূলে উপস্থিত; বেঁটে গড়ন,—ময়রার দোকানের মালিকের মত বেশ গোলগাল্। চক্ষু দুইটি আলুবক্‌রার বিচি পরিমাণ, অথবা চতুর্দ্দিকের মাংসের চাপে ঐরূপ দেখাইতেছিল। মাথাটি বড়, কিন্তু কেশ-বিরল; মধ্যে টাক্ থাকায় অনেকটা ফাঁক; কাল চুল কয়গাছি সাদার আওতায় পড়িয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট দুই গালের গর্ভে পড়িয়া নাসিকাটি কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক্ গোঁফ্ জোড়াটী ত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু তন্নিম্নে দন্তগুলি সবই বজায় আছে, এবং তাহারা জীবন্ত ছাগেরও ভয়ের কারণ বলিয়াই অনুমান করি। ইনি আয়েসা বা তিলোত্তমা নহেন যে, রূপ বর্ণনার আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু আমার বহুক্ষণের আগ্রহটা যে ভাবে মিটিল, তাহাও যে একক উপভোগ করার মত নহে!

এই আগন্তুকটির উপর কেল্লা মারা (Three castle সেবী) বাবু কয়টি খুবই চটিয়াছিলেন। একজন বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখে প্রশ্ন করিলেন—"আপ্ কাঁহাকে লোক্ হ্যায়!"

উত্তর—হাম্ কঁহিকে লোক্ নেহি হায়!

বাবু—তব্ আপ্ ক্যা হায়?

উত্তর—"ধেমোশালিক্" হায়!

আমি প্রমাদ গণিলাম। যাত্রা করিয়াছি মাঘ মাসে, যে মাসের পূর্ণিমাটি প্রসিদ্ধ হয়েছেন—"মঘা" সংযুক্ত হয়ে! এখন সামলাইতে পারিলে হয়। রায় মহাশয়ের রায়ে—মাত্র—"রেলে কলিসন্ হয়," এই কথাই আছে; এ যে আবার—"ফ্রিক্‌সনের" উপক্রম!

বাবু—ধেমোশালিক্ কোন্ চিজ্ হায়?

উত্তর—বড়া আজব্ চিজ্ বাবুজি;—আপ্ মালিক হোকে নেহি জান্‌তে? যেমন জাত্ হারাকে বষ্টম্ বন্‌তা হায়, হাম্ ধেমোশালিক্ বন্ গিয়া।

বাবু—উ ক্যায়সা?

উত্তর—উ অ্যায়সা;—লেকিন্ বর্ণনা কুছ বেশী হায়।

বাবু—আপ্ বোলিয়ে—

ব্যাখ্যাটা শুনিবার কৌতূহল সকলকেই পাইয়া বসিল। আগন্তুক আরম্ভ করিলেন:—

"ধেমোশালিক্ বন্‌নেকে ওয়াস্তে—বুঝেছ উপেন—সর্ব্ব প্রথম,—মা কো জল্‌দি জল্‌দি গঙ্গা পাওয়ানো চাই। বাপ্‌কো ভি পাওয়াতে পারলে বহুত আচ্ছা;—অসমর্থ পক্ষে কাশী যাত্রা করাবে তারপর ভারি ভারি চিজ্—টেবিল, চেয়ার, খাট্, সিন্দুক, আলমারি, বাসন, বগায়রা নিলাম, আউর গরু বাছুর দানপুণ্য করনে হোগা। গরীব আশ্রিত আত্মীয় কোই রহে তো—রাস্তামে হাঁকা দেবে। কুত্তাকে মিউনিসিপালিটির লাঠির মুখে দেবে, আর বিল্লিকে আছাড়্ মারকে সাবাড়্ কোরবে। তদনন্তর স্ত্রী আর তিন কন্যা লেকে রাস্তামে দাঁড়াবে। অতঃপর কোমর বাঁধকে, প্যাঁকাটি জ্বাল্‌কে, হরিবোল্ দেকে,—ঘরবাড়ীর মুখাগ্নি করকে—ফুঁক দেনা চাই। এবম্ প্রকার মে ভিটে ভস্ম হ'য়ে গেলে, তিন দফে বোল্‌না চাই—

"বাংলার মাটি বাংলার জল্—
শূন্য হোক্—শূন্য হোক্
হে ভগবান্!"

পরে এক দৌড়ে রেজেষ্ট্রী আপিসমে যাকে, গেটের কড়ি দেকে, জমি, জল, আর পোড়া ভিটেকা নতুন নামকরণ কোরবে—"ঘুঘুডাঙ্গা"। ব্যস্, নিশ্চিন্ত হোকে ঘুঘুর নামে দান-পত্র দস্তখৎ করকে;—দেশের জলস্পর্শ না করকে, স্ত্রী-কন্যা লেকে, বগল্ বাজাকে, একদম টিসেন্ মুখে টেনে পাড়ি লাগাও। হাওড়া পুলের মাঝ্‌মধ্যিখানে পৌছকে—গৃহদেবতা শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ যো কুছ জঞ্জাল্ থাকে—গঙ্গাজিমে টপাটপ্ ডালো। Then টিনেস্ পৌছকে টিকস্ কাটাও,—আউর পাটনা, গয়া, আরা, ছাপরা,

মুঙ্গের, ভাগলপুর, যাহা খুসী ভাগো। ঠিকানামে যাকে nest (বাসা) বানাও, ভগবান্ বন্ যাও। অর্থাৎ বাংলাকে "ভূমি জল তৃণ শূন্য" "আত্মীয় বিমুখ" "ভস্মকিট্" বোলকে উচ্ছন্ন সার্টিফিটি (certificate) দাখিল করো, তব্ আলবৎ—প্রপন্ন সার্টিফিকেট হাসিল্ হো যায়গা! তদনন্তর বড়ি মজিমে নোক্‌রি করো, চাক্‌রি বাজাও, বক্‌রি চরাও, টোক্‌রি বেচো, লেড়কী কো ম্যাড্‌ফেলিমে লাগাও, সব্ রাস্তা সাফ্। বুঝেছ উপেন!"

বাবুজি—ইসিকা নাম "ধেমোশালিক" হো যানা;—জিস্‌কো আপ্ উচ্চ শিক্ষিত লোক্, রাজভাষামে—"ডোমি-সাইল্ড্ (Domiciled) কহতে হেঁ। আপ্ তো গুজরাট্ হায়,—সব্ সমঝতে হেঁ।

অপর একটি বাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সংযুক্ত অল্প কথায় বলিলেন—"হাম্‌লোক্ গুজরাটকে নেহি পাট্‌নেকে হায়।"

আগন্তুক বলিলেন—"আপ্ লোক্ বি-এ পাস্ তো হায়?"

তখন অন্য একটি বাবু বলিলেন—"O you mean graduate" (তোমার বলবার উদ্দেশ্য "গ্র্যাজুয়েট্"?)"

উত্তর হাঁ বাবুজি—ওহি বাৎ।

শুনিয়া, বাবু কয়টির হাসি আর থামে না। হাসির হাওয়ায় ব্যাপারটা কিছু ফিকে হইয়া আসিল। ভাবিলাম—রক্ষা! কি সর্ব্বনাশ—এ যে "দো-দমা"! আবার আরম্ভ করিলেন;—"আউর একটু হায় বাবুজি"—

বাবু—বোলিয়ে—বোলিয়ে—

পুনরারম্ভ:—কার্য্যস্থলকে dutyমে একদা কল্‌কাত্তা যাকে পড়া। ধর্ম্মশালামে কলা থাকে কাটিয়ে দিয়া, ইতি মধ্যমে পত্নী পত্র ভেজা। সুরুমে দেখি লিখা হায় "পরদেশী সেঁইয়া!" দেখ্‌তেহি বক্ষ একদম্ দশ হাত ভেঁইয়া! Family Certificate ভি মিল্ গেঁইয়া!

আপ্ লোক্‌কে কৃপা সে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ বেতন, কথঞ্চিৎ "ইদিক্-উদিক্" মিলা'কে, মজিমে হায় বাবুজি। আত্মীয় কুটুম্ব ঘুচ্ গিয়া—কোই "বালাই" নেহি। ইচ্ছা হায়—আগামী ভূত চতুর্দ্দশীমে গয়াজি যাকে, আপনা পূর্ব্বাশ্রমকে মুখমে পিণ্ডদান করতঃ, পাক্কা সহোদর বন্ যায়েঙ্গে; "কানাইলাল মিত্র"—কানাইয়া লাল মিশ্র হো যায়গা। আপ্ লোক্ অভয় দিজিয়ে বাবুজি।"

বাবুদের মুখের বর্ণ ক্রমে কাঁচা সিঁদুরে-আঁবের মত হইয়া আসিতেছিল, চক্ষুও চাপা-বিদ্রোহ-ব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু এই সময় কোন্ এক ষ্টেসনে ট্রেন্ থামিল; দেখি, আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও দুঃখের সহিত বলিলেন—"সব বাত্‌ই রয়ে গিয়া,—মাপ্ করবেন বাবুজি,—মেহেরবণী রাখবেন। অধুনা হাম্ সব ভাই ভাই হায়; আমাদের coal-washing (অঙ্গার ধৌতিকরণ) পূরা দস্তুর চল্ রহা হায়; purification (আত্ম-শুদ্ধি) অচিরাৎ হো যায়গা;—বোলো ভাই—non-violence in spirit-কি (অহিংস মনোবৃত্তিকি) জয়!—বড়িয়া ভ্রাতৃভাব কি জয়!!" এই বলিতে বলিতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পা দিয়াই হাঁকিলেন্—এইবার কিন্তু রহস্য ছোড়কে, গবিত্র দিল্‌মে বোলো ভাই—"শ্রীগান্ধি মহারাজকি জয়।"

তখন রাত বোধ হয় নয়টা। নৈশ গগন, পবন, প্রান্তর, কাঁপাইয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাহা একযোগে ধ্বনিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গ-তাড়নে নক্ষত্রগুলি যেন সচকিতে চাহিল। প্রকৃতির শান্ত অনাড়ম্বর সাঁওতাল ভূমির উপর, এই হীরামুখীরা যেমন অবাধে অবগুণ্ঠন মোচন করে, এমন বোধ হয় আর কোথাও নয়। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অতি সন্নিকট। উভয়ের কেহই সভ্যতাভিমানী মানুষের গর্ব্বিত হস্তের প্রসাদ গ্রহণ করে নাই,—স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

আগন্তুক ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। বাবুদের কেহ বলিলেন—'idiot' (বিকৃত-মস্তিষ্ক), কেহ বলিলেন—"বিচ্চু বাঙ্গালী"। যিনি একটু মাতব্বর গোছের ছিলেন, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম—"লোকটা কোথায় কাজ ক'রে জেনে নিতে পারলে না?" অর্থাৎ-তা হ'লে—

সাধারণ আরোহীরা বলাবলি করিতে লাগিল—"মহারাজকি চেলা হায়;—হিন্দুস্থানমে ওই একহি 'ইলম্‌দার' জাত হায়।" ইত্যাদি। তাহারা সরল প্রকৃতির অশিক্ষিত গাঁওয়াল লোক;—আপিস-আদালতের সুধায় ক্ষুধা মেটায় না।

(৭)

গাড়ী ছাড়িল। প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম পার হইবার মুখেই দৈববাণীর মত আবার সেই কণ্ঠস্বর,—"মনে যেন থাকে—

আপনাদের যশেডিতে নেবে অন্য গাড়ীতে উঠতে হবে। সঙ্গীটি—।" বস্, গাড়ী সবেগে ছুটিল, উপদেশ অসমাপ্ত রহিয়া গেল! 'পথে পাওয়া বন্ধু—পথেই হারাইলাম,—বোধ হয় ইহজন্মের মত।

অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কত কথাই স্রোতের মত হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল,—মাথার মধ্যে কি মনের উপর দিয়া সেটা লক্ষ্য ছিল না। লোকটির সবই বোধ হয় ঠেকে শেখা। দেহটা জলিয়া পুড়িয়া—অঙ্গারে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় বহু আশা লইয়া 'বিদেশে চণ্ডীর কৃপা' ভাবিয়া আসিয়া পড়েন; পরে চতুর্দ্দিকের সহানুভূতিশূন্য আবেষ্টনীর ধাক্কায়, ধোঁকা মিটিয়াছে,—দেহ মন, আশা উৎসাহ, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেশে না থাকায়—ভিটে ভূমিসাৎ। তাহা এখন—জঙ্গল, শৃগাল আর ঘুঘুর দখলে। দেশের লোকের সহানুভূতি সরিয়া গিয়াছে,—কেহ আপন বলিয়া কাছে আসে না। সাধিয়া কথা কহিলে কথা কয়,—সে কথার সুরে আন্তরিকতা নাই, বরং এড়াইবার ঝোঁকই বেশী। ২০।২৫ বছরের ছেলে-মেয়েরা চেনেই না,—হাঁ করিয়া তাকায়,—পর বা অপরিচিত ভাবিয়া সরিয়া যায়। দোষ ত' তাহাদের নয়। যে দেশের অন্নজলে, যে দেশের মাটিতে, যে দেশের ভালবাসা আত্মীয়তায়—এ দেহের, এ জীবনের প্রারম্ভ ও পুষ্টি, যে ভিটার প্রতি রেণু পূজ্য পিতামাতা ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণের চরণ স্পর্শে পূত ও তীর্থতুল্য, বোধ হয় যে বাটীর ভগ্ন দেউলসকল, দেব-কার্য্যের শুভ হোমাবশেষ ঘৃতধারা আজিও মুছিয়া ফেলে নাই, এবং আজ যাহা দেখিলে পূর্ব্বপুরুষদের অশ্রুধারা বোধে নিশ্চয়ই বেদনায় প্রাণ হায় হায় করিয়া ওঠে, এ সব ঋণ যে অপরিশোধ্য। যাহাদের শাস্ত্রে সামান্য অতিথিকে বিমুখ করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহারা কি এই আলিঙ্গন-উন্মুখ মহান অতিথিকে বিমুখ করিয়া কোথাও শান্তি পাইতে পারে! মানুষ ভুল করে, পরে ইচ্ছা সত্ত্বেও শোধরাইতে পারে না, কষ্টে দিন কাটায়।

ক্রমে আগন্তুকের 'ধেমোশালিক' অবস্থার—লাভের দিকটার একটা আনুমানিক চিত্র যেন দেখিতে পাইলাম;—কয়েকখানি খোলার ঘর; উঠানে পালঙ শাক্, ঘরের চালে লাউগাছ ঢেউ খেলিতেছে। ধোপা, ম্যাথর, আর আপিসের চাপরাসীরা সেলাম করিতেছে। মুদী, ডাক্তার আর কাপড়ের দোকানের তাগাদা দ্বারে উপস্থিত। কর্ম্মস্থলে অধর্ম্মই ভরসা, কারণ উন্নতির আশা আড়ষ্ট। সব তৈলটুকু নিঃশেষ করা হইয়াছে,—এখন গর্ত্ত পুড়িতেছে। সম্ভবতঃ সত্য অবস্থাও এই। যাহা হউক,—মুমূর্ষুর প্রায়ই সদিচ্ছা জাগে, তাই স্বজাতির (আমাদের) প্রতি এই সহৃদয়তা; অর্থাৎ—এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব।

এই সব ভাবিয়া, তাঁহার ওই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অযাচিত সরল-স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে,—প্রাণটা উদাস হইয়া উঠিল। অন্তরে কেবলি মৃদু ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল:—

"পথিক "অজানা—তব গীত' সুর
বাজিতেছে প্রাণে—ভীষণ ও মধুর"!

সহসা মাদলের আওয়াজ কাণে গেল! বাহিরে চাহিয়া দেখি—বিশ্বস্রষ্টার এই নিভৃত নিকুঞ্জে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোলে কোলে, প্রকৃতির প্রিয় পুত্রেরা, সারাদিনের স্বাধীন শ্রমের পর, আনন্দ-সঙ্গীত তুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য করিতেছে। পূর্ব্ব চিত্রটির সহিত কি বৈসাদৃশ্য! এখানে সভ্যতার শয়তানীর ঠাঁই নাই,—তাহার জ্বালা-যন্ত্রণার সরঞ্জাম নাই। মোটারের মদগর্ব্ব, টাকার টঙ্কার, অট্টালিকার অহঙ্কার, বিষয়ের বিষদাহ, খেতাবের খোয়ে-বন্ধন, হাইকোর্টের হাউইবাজি—আজিও ইহাদের নির্ম্মল আনন্দটুকু নষ্ট করিবার প্রবেশ-পথ পায় নাই। হায় রে সভ্যতা,—তোমাকে সাত সেলাম্!

জয়হরি কি ভাবিতেছিল জানি না; আমি তাহার দিকে চাহিতেই বলিল,—"কিছুই হ'ল না মশাই!' ভাবিলাম—তাহারো বুঝি বৈরাগ্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোলো না?" সে বলিল—"কেবল কথাতেই শেষ হ'য়ে গেল!" বুঝিলাম "হাতাহাতি হইল না, ইহাই তাহার দুঃখের কারণ! আর এক চিত্র চাপিল;—অধুনা এ-দিক্‌টাতেও সতর্ক থাকিতে হইবে! সুখের আর সীমা রহিল না। এই একশো চুয়াল্লিসের মরসুমে,—সাথে এই সু-সঙ্গ!

(৮)

বোধ হয় রাত তখন ১০টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার যেমন গভীর,—'পাহাড়ে-ঝিঁঝি'র ডাকও তেমনি

প্রবল। ট্রেন্ আবার এক ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। কুলিরা হাঁকিল—"যশডি জক্‌সেন্"। সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫টি মূর্ত্তি—কেহ গাড়ীর হাতল্, কেহ রেলিং ধরিয়া টপাটপ্ পা'দানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"দেওঘর বৈদ্যনাথকে যাত্রী উতর আইয়ে।" পুনরায়—ভাষান্তরিত করিয়া—"বৈদ্যনাথ দেওঘরের যাত্রীর এই স্থানে উতরতে হোবে বাবুজি।" বেশ কথা।

দেখি, জয়হরি দরজার মুখে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং "দিন্‌না বাবুজি" বলিয়া তাহার হস্ত হইতে একজন বেতের ট্রঙ্কটা টানিয়া লইতেছে; তাহার পোষাক কিন্তু কুলির মত নয়। বলিলাম—"কার হাতে দিলে?" প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে উত্তর আসিল—"কোন চিন্তা নেই বাবুজি,—হামি বাবার পাণ্ডা আছে।" কয়েকজন নামিবার পর, আমি ফাঁক্ পাইলাম। নামিয়া দেখি—জয়হরির 'নীলকমলের' অবস্থা; ৭।৮ জন ষণ্ডাষণ্ডা পাণ্ডায়, তাহাকে ঘিরিয়া একই প্রশ্ন করিতেছে;—"মোশায়ের পাণ্ডার নামটি কি আছে,—পিতার নামটি কি আছে?"

জয়হরি বেশ সোজা পথটি অবলম্বন করিল। আমার দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া, ছোট্ট দুই কথায়, এত বড় বিপদটি সহজেই এড়াইল। বলিল—"উনি সব জানেন"! এতক্ষণে বুঝিলাম—বুদ্ধিও আছে। এইবার আমার পালা। পলক্ না পড়িতেই যেন পোলো চাপা পড়িলাম। আমার বুদ্ধির বদ্‌নাম পিসিমাও দিতে পারেন নাই, ভগবৎ কৃপায় আজিও ও-জিনিসটি আমাতে নাই। সরল ভাবেই বলিলাম—"পাণ্ডাজি,—আমাদের আপনজন দেওঘরে থাকেন, তাঁদের বাড়ীতেই যাইব,—কাজ আছে। এখন কিছু বলিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে আজ মাপ চাই। পাণ্ডা আর গুরু কখনো পর হন্ না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন এসেছি, বাবা কৃপা করেন ত' দর্শন করিতেই হইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"অবশ্য করবেন্, বাবা জরুর কৃপা ক'রবেন;—আহা—ভক্তি তো বাঙ্গালীর!" এইরূপ মিষ্ট কথার পর তাহারা বলিল—"ভুলবেন্ না বাবুজি, মনে রাখবেন এই আমাদের জীবিকা; আপনারা আমাদের সম্পত্তি,—অন্নদাতা"। এই বলিয়া তাহারা অন্য যাত্রীর অনুসন্ধানে গেল। কেবল জামীন স্বরূপ যাঁহার হস্তে আমাদের বেতের ট্রঙ্কটি গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন,—"এখন চলুন বাবুজি, গাড়ীমে বৈঠিয়ে দি।" সেই বেশ কথা। আমরা দেওঘরের গাড়ীতে বসিলে, তিনি ট্রঙ্ক প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"কুছু দরকার রহে তো বলুন—আনিয়ে দি। গাড়ী এখন বহুৎদের ঠ্যায়েরবে!" আমাদের কিছুরই আবশ্যক নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন,—"মেজ্ বিছাকে আরাম করুন, হামি ঠিক্ সময়মে আস্‌বে। কেউ পুছবে তো বলবেন—'আমরা নন্দকিশোরকা যাত্রী';—ভুলবেন না বাবুজি।" এই বলিয়া, তিনি সম্ভবতঃ অন্য যাত্রীর সন্ধানে গেলেন।

মধ্যে মধ্যে এক একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মূর্ত্তি,—সহসা গাড়ীর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"মোশার নামটি কি আছে?—মোশার পিতার নামটি কি আছে?—মোশার পাণ্ডার নামটি কি আছে?"—সকলেরি ঐ তিন প্রশ্ন! আমাকে এই ত্র্যহস্পর্শ সামলাইবার, আর "মোশার" কামড় ভোগ করিবার ভার দিয়া জয়হরি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেড়াইতে লাগিল। ঠাণ্ডায় আর পাণ্ডায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। দেখি, জয়হরি একপ্রান্তে হিমের মধ্যে দাঁড়াইয়া, এক এক ভীম্-টানে এক একটি আস্তো আস্তো সিগারেট্ আমূল শেষ করিয়া ফেলিতেছে! যাক্—জাগ্রত অবস্থায় আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা হইল; গাড়ী যেন ক্রমেই গা ঢালিল,—নড়েও না, সাড়াও দেয় না। দারুণ শীত, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে যাত্রীরা মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধ; লোক আছে কি নাই বোঝা যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই ভাবে বাকি রাতটুকু কাটিয়া যায় ত' মন্দ নয়; নচেৎ শীতের এই গভীর রাতে, কোথায় এক্ অজানা জায়গায় উপস্থিত করিয়া দিয়া তাড়া দিবে—নামিয়া যাও! কথাটা ভাবিতেও ভয় হয়। কারণ সঙ্গে যে ঠিকানা আছে, সম্ভবতঃ তাহা মহম্মদ রেজাখাঁর সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত;—সাঁওতাল পরগণার চৌহুদ্দি বিশেষ! সেটেল্‌মেণ্ট্ আপিসের কোন বিচক্ষণ সার্ভেয়ারের শরণাপন্ন না হইলে, তাহার পাত্তা লাগাইতে পারিব না। ভাবিয়াছিলাম ষ্টেসনে রাতটা কাটাইয়া দিব, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আগন্তুকের নিকট তাহার চেহারার আভাস পাইয়া হতাশ হইয়াছি। সেটি জ্যামিতির 'বিন্দু'-বিশেষ—without

length and breadth, দৈর্ঘ্যও নাই, প্রস্তও নাই! সুতরাং একৈ ভরসা—নন্দকিশোর। সে বলিয়াছে—"কুছ চিন্তা নেই বাবুজি, ইচ্ছা করেন গরীবের ঘর আছে—সে আপনাদেরই; না হয় টিসেনের সাত গজ্‌কে মধ্যে সুন্দর দো-মহলা ধরমশালা আছে; সেখানে বিশ্রাম করবেন। আপনার যা পচিন্দ্ হয়। প্রাতঃকাল হোতেই হামি হাজির হোবে,—ঠিকানা ঢুঁড়্ দেবে। কুছ্ চিন্তা কোরবেন না বাবুজি।"—এমন সুমধুর কথা, এমন আন্তরিকতা-পূর্ণ আশ্বাসবাণী,—অজানা অচেনা ভূমে, এই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর শীতের রাত্রে, কে শুনায়? উচ্চ শিক্ষা পাইয়া যাঁহারা মূর্খতা বর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি এমন নির্ব্বোধ অল্পই আছেন।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে—য তিষ্ঠতি স বান্ধব! জানি না কি কারণে প্রবাস-তীর্থের পাণ্ডারা বান্ধবের কোটা হইতে বাদ পড়িয়াছেন। বিষ্ণুশর্ম্মা (?) বোধ হয় দূর বিদেশের তীর্থের ধার ধারিতেন না। অধুনা "উৎসব" ত' প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে;—"ব্যসনের" মধ্যে প্রধান দেখিতেছি ঘোড়-দৌড়্,—স্বয়ং সরকার তার স্বপক্ষে, সুতরাং কোন বালাই নাই;—'দুর্ভিক্ষ' অভ্যাসের মধ্যে absorbed,—কবেলা চা খাইয়া বেশ চলে। রাষ্ট্র নাই—"রাষ্ট্রবিপ্লবের" চিন্তাও নাই; যাহার আছে, চিন্তার ভার তাঁহার। "রাজদ্বারে" বান্ধবের অভাব নাই, বরং প্রাচুর্য্যই পাই,—অনেকেই ব্রিফ্-লেস্ ঘুরিতেছে;—আর "শ্মশানে" মিউনিসিপালিটি আছেন—কাজেই 'বান্ধবের' সেকেলে ব্যাখ্যা এখন obsolete—অচল। এখন ভ্রমণ বা অজীর্ণ-দমন ব্যপদেশে অনেকেই সপরিবারে তীর্থাদিক্ষেত্রে উপস্থিত হন্; অনেককেই এই পাণ্ডাদের আশ্রয়, অন্ততঃ সাহায্য লইতে হয়। এখন ঐ সেকেলে শ্লোকটি পরিবর্ত্তিত হইয়া "তীর্থে ও চাকুরী-স্থলে য তিষ্ঠতি স বান্ধব" হইলেই যেন সঙ্গত হয়। যাক্, ওসব পণ্ডিতদের অধিকারের কথা।

আমি ভাবিতে লাগিলাম পাণ্ডা বেচারীদের কথাই;—ইহারা সর্ব্বক্ষণই আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এবং করিয়াও থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদের উপর যেন predisposed ভাবে (আগে থেকেই) বিরক্ত! বোধ হয় ইহারা এক কথা বারবার কয় বলিয়া। এমন কি ইহাদের একটা ভাল কথা বা সৎপরামর্শও সহিতে পারি না,—অবিশ্বাস করি, চটিয়া নিজেদের দৌর্ব্বল্য দেখাইয়া বসি। ইংরাজি শিক্ষায় সভ্য হইবার পর ভিক্ষুকদের উপর আমাদের এই মেজাজটা শতকরা সাতানব্বই জনের সুপ্রকট। পাণ্ডারা ভিক্ষুক নয়। তাহারা কিন্তু আমাদের এই অকারণ অসীম অবহেলা, অপমান, তিরস্কার, গায়ে না মাখিয়া যাত্রীদের ইচ্ছা পালনে উন্মুখ ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যস্ত। তাহারা আমাদের এই মেজাজটার সহিত বিশেষ পরিচিত;—তাই তাহারা আমাদের চেনে,—আমরা তাহাদের চিনি না। পিতার নাম, পাণ্ডার নাম প্রভৃতি বারবার জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বাধ্য, কারণ অপরের যাত্রী তাহারা ভাঙ্গাইয়া লইতে চায় না, নিজের অধিকারের লোকই তাহারা খোঁজে। পাণ্ডার নাম বলিতে পারিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। শিক্ষিত না হইলেও ইহারা পুরুষানুক্রমে এই নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আর উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আমরা—ভোট-সাধকেরা, আজ বারবার স্থলে শতবার লোকের দ্বারস্থ হইয়া একই কথা শতবার শুনাইতেছি; মোটরের চাকা দিয়া তাহাদের ভিটা চষিয়া ফেলিতেছি; তাহাদের ভদ্রস্বভাব ও চক্ষুলজ্জার সুবিধাটুকুর আশ্রয় লইয়া, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (অনেক স্থলেই) মিথ্যাকে বরণ করাইতেছি এবং স্বার্থান্ধ হইয়া অন্যের ভোট ভাঙ্গাইয়া লইতেছি; সম্মানী প্রতিযোগির নাম কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বিলাতী রহস্য প্রকাশ করিতেছি। এ সব উৎপাত উপদ্রব বোধ হয় বিরক্তিকর নহে, কারণ এ সব নাকি দেশের ও দশের উপকারের জন্য করা হইয়া থাকে, এবং ইহাই নিয়ম। 'পাণ্ডা' কথাটা ইংরাজি শব্দ নয়, তাই তাহার ন্যায়সঙ্গত কাজটা বড়ই বিরক্তিকর উপদ্রব বলিয়া ঠ্যাকে। আমাদের mentalityর মহিমাই এইখানে।

ট্রেন্‌খানি যেখানে দাঁড়াইয়া হিম খাইতেছিল, তাহার দুই ধারেই বিস্তৃত বালুময় ভূমি। মধ্যে মধ্যে এক-একখানি অতিকায় শিলাখণ্ড মুখ গুঁজিয়া নিদ্রিত। অদূরে যশেডি পাহাড়। উপরে নক্ষত্র-খচিত নির্ম্মল আকাশ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। রাত বারটার আমল, চারিদিক নিস্তব্ধ।

সহসা গাড়ীর সন্নিকটেই একটা 'ফেউ' ডাকিয়া উঠিল।

চারিদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতা—তাহার সুস্পষ্টতা বাড়াইয়া, সকলকে সচকিত করিয়া দিল। দেখি জয়হরি সলক্ষে হুড়্‌মুড়্ করিয়া, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মত, গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া—একদম বাঙ্কের উপর হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি?—গাড়ী ছাড়্‌লো না কি?"

জয়হরি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"শুনতে পেলেন্ না?" বলিলাম—"কি,—ফেউয়ের ডাক্?—তা হয়েছে কি?"

জয়হরি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বলেন কি মশাই!—ও-তো শুধু ফেউয়ের ডাক্ নয়,—সঙ্গে কর্ত্তাও আছেন। ও-ডাক্‌টা যোগরুঢ়ী"!

উদাহরণটা উপভোগ্য বটে। জয়হরির নিবাস—"লোহারাম শিরোমণির" সান্নিধ্যে।

বলিলাম—"তা হলেও, তোমার ভয়টা কি? এ অঞ্চলে এতবড় বাঘ নেই যে, তোমাকে কায়দা করে।"

জয়হরি বলিল—"আপনি দেখছি বাঘের শিকার দেখেন নি! ওর ছোটবড় নেই মশাই,—বড় বড় গরু নিয়ে যায়।"

বলিলাম—"তা হ'লে ভয়ের কথা বটে,—সাবধান হওয়াই ভাল।"

গাড়ী গা-নাড়া দিল। দেখি—নন্দকিশোর ঠিক আসিয়া হাজির! বলিল—"গাড়ী ছোড়্‌চে বাবুজি। আধা ঘণ্টামে পোঁহুছে দেবে।"

এ সংবাদে আমার বিশেষ সুখ ছিল না। বলিলাম—"তুমি কিন্তু আমাদের রাতটা কাটাবার একটা উপায় করে দিও।" নন্দকিশোর বলিল,—"আপনি ফিকর্ ক'রবেন না,—ধর্ম্মশালাতে উত্তম ঘরমে রাখিয়ে দেবো,—আরামসে বিশ্রাম ক'রবেন। টিসেন্‌সে এক মিনিট্‌ও লাগবে না। সেখানে হামার সব পরিচিত লোক আছে,—কুছ্ চিন্তার কারণ নেই। প্রয়োজন হোবে তো হামি সাথ্ সাথ্ থাকবে। প্রাতঃকাল হোতেই বাসায় পোঁহুছে দেবে। যেমন আজ্ঞা ক'র্‌বেন্,—হামি তাবেদার আছে।" আহা—এমন অভয়বাণী ত্রেতাযুগে মহর্ষি বাল্মীকি, অসহায়া জনকরাজ-দুহিতাকে একবার শুনাইয়াছিলেন;—আর কলিতে নন্দকিশোর আজ আমাকে শুনাইল! আমি সোজা হইয়া বসিয়া—সজোরে একটিপ্ নস্য লইলাম। গাড়ী ছাড়িল।

অর্দ্ধ-পথে আধখানা ইষ্টেসন্ আছে। যে সকল ভদ্র লোকের ঐ অঞ্চলে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, তাঁহারা উক্ত ইষ্টেসনে নামিবার অনুরোধ গার্ডকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া রাখিলে, মিনিট খানেকের জন্য তথায় গাড়ী থামানো হয়। কাজ না থাকিলে সোজা পাড়ি চলে। আমাদের 'বুড়ি' ছুঁইয়াই অগ্রসর হইতে হইল,—দুইজন নামিয়া গেলেন।

এতক্ষণে এই গেঁটে যাত্রার সমাপ্তি আসন্ন হইলেও,—তাহার পরের অবস্থাটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকায়,—মনে উদ্বেগই ঘনাইতে লাগিল। গাড়ীও বার্ দুই ঘড়াং ঘড়াং করিয়া বস্-বস্ বলিতে বলিতে থামিল। নন্দকিশোর বেতের ট্রঙ্কটি দখল্ করিয়া,—"আসেন্ বাবুজি" বলিয়া নামিয়া পড়িল। 'আসেন' ছাড়া উপায়ও ছিল না;—জয়হরির কাঁচা-ঘুমটা ভাঙ্গাইতে হইল। উভয়ে নামিলাম। নন্দকিশোর বলিল—"ভিড়্ কম্‌তে দিন বাবুজি"। বাবুজির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না;—যতটা সময় কাটে।

এই অবসরে ইষ্টেসন্‌টি একবার দেখিয়া লইলাম। ছোট ছোট দুইখানি ঘরের সম্মুখে একটু বারাণ্ডা। সেটুকু যেন অনুপ্রাসের আড়ত,—বাস্ক, বস্তা আর বাণ্ডিলে বোঝাই। 'দাশুরায়' ইষ্টেসন্ মাষ্টার থাকিলে, বোধ হয় "বস্তার" উপর "বসিবার" অনুমতি পাইতে পারিতাম,—অনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকিত;—অধুনা সে আশা নাই।

পাঁচ মিনিটেই ভিড় পাতলা হইয়া পড়িল। এ-রাত্রে সব গেল কোথায়, কিছুই বুঝিলাম না। নন্দকিশোর বলিল—"আব্ আইয়ে বাবুজি।" এখন বেওয়ারিস্ মালের সামিল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম—"চলিয়ে"। ফটকের মুখে নন্দকিশোর বলিল,—"টিকস্ দিজিয়ে বাবুজি"। প্রস্তুতই ছিলাম;—টিকিট্ দু'খানি রেলের বাবুটির হস্তে দিলাম। তিনি টিকিটের দিকে না দেখিয়া,—জয়হরিকে দেখিতে লাগিলেন; ভাবটা যেন বলিবেন—"এঁর একখানা টিকিটে হবে না মশাই।" সেটা আর বলিলেন না, অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী না কি!" তখন আমার উত্তর দিবার মত অবস্থা নয়; সকলের প্রকৃতিও রহস্য-সহ নয়। চাই কি এইবার সহানুভূতিবশে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন—"এত রাত্রে যাবেন কোথায়?"—দুরাশা!

এমন সময় সহসা সুমধুর বংশীধ্বনির মত কর্ণে পশিল—

"আসুন—আর হিম খাওয়া কেন!" চমকিয়া চাহিলাম। এ বয়সে, আর এ-রাতে, এক ধর্ম্মরাজের কাছেই এ আহ্বান আশা করিতে পারি,—তুমি কে বন্ধু?

জয়হরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"জামাইবাবু যে!" চাহিয়া দেখি,—ফুল্‌কাটা চুলগুলি বাঁচিয়ে, একখানা রাঙ্গা র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া, হাস্য-মধুর মুখ। তাই ত'—শ্রীমান নাতজামাই-ই ত' বটে! এ কি স্বপ্ন—না বারো-আনার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার ফল! এই নাটক-সুলভ (dramatic) অবস্থায় ইচ্ছা হইল, জগৎসিংহের মত বলি—"আমি কোথায়।"—আমার ইচ্ছাটাই হইয়াছিল, কিন্তু সত্য সত্যই—আয়েসার মত সুমিষ্টস্বরে warning আসিল—"কথা কহিবেন না"! অর্থাৎ—চলে আসুন। বহুৎ বেশ!

সঙ্গে ঠাকুর চাকর হরিকেন্ হস্তে উপস্থিত ছিল; তাহারা নন্দকিশোরের দখলী ট্রঙ্ক প্রভৃতি লইল। নন্দকিশোরের উৎসাহ-ভঙ্গ হয় দেখিয়া বলিলাম,—"তুমি ভেব না, সকালে দেখা হবে!" শ্রীমানের পায়ে চটি দেখিয়া বলিলাম—"গাড়ী ঠিক করা আছে না কি?" শ্রীমান অস্ফুট হাস্যে বলিলেন—"আপনাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব!" সম্পর্ক ত' তা নয়।

ইষ্টেসনের ১০।১২ হাত পশ্চাতেই রাজপথ; তাহা পার হইয়া অন্য একটি রাস্তায় পা দিয়াই বলিলাম—"গাড়ী কই।"—"এই যে—উঠে পড়ুন" বলিয়াই শ্রীমান একখানি বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িলেন। চাকর পূর্ব্বাহ্ণেই পৌঁছিয়া, আলো হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। চার মিনিটে—সকল চিন্তার অবসান!

হঠাৎ এই অভাবনীয় অবস্থাটার আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই adventure টা মাটি হইয়া যাওয়ার ক্ষোভও যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। আশ্চর্য্য মানুষের প্রকৃতি! নন্দকিশোর তখনো উপস্থিত,—একটু তফাতে পরের মত দাঁড়াইয়া;—পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে সেই ত' আমাদের অকূলের কাণ্ডারী ছিল! তাহাকে বলিলাম—"নন্দকিশোর, তুমি কোন সন্দেহ রেখ না, আমাদের অন্য পাণ্ডা ও যদি থাকে, তা হলেও তুমি আমাদের নূতন পাণ্ডা রইলে, তোমাকে আমরা ছাড়চি না, তুমি এখন আরাম কর'গে।" সে বলিল—"বাবুজি, আমি আপনাদের তাবেদার, আপনাদেরি ভরসা রাখি। বাবা বৈদ্যনাথ আপনাদের মঙ্গল ক'রবেন, গরীবকে ভুলবেন না,—আমি সকালে আসবে।" বলিলাম—"নিশ্চয় আসবে, একটু বেলায় এসো। তুমি না হ'লে আমাদের চ'লবে না।" নন্দকিশোর খুসী হইয়া চলিয়া গেল। তাহাকে খুসী হইতে দেখিয়া, আমার প্রাণটাও শান্তি বোধ করিল। এতক্ষণ কোথায় যেন একটা বেদনা ছিল।

পরবর্ত্তী অধ্যায়টা পুরোপুরি আনন্দ,—আহার, আর আরামের। প্রথম দশটা মিনিট অবশ্য খাঁটি ধর্ম্ম কথায় কাটিল;—যথা—ভোঁদার মা কেমন আছে; পাঁচীর পেটের অসুখ কেমন; সোতে এখনো সেজে মোতে কি? ভুলো তেঁতুলের তোলো সাবাড় ক'রচে না ত'? এবার ফুমড়ো-বড়ি কেমন হ'ল? পোড়ার-মুখো হুনমানের জ্বালায় আমাদের আর কিছু করবার যো নেই। এবারকার নতুন গরুটো খুব শান্ত—ঘুঁযুতে জানে না। দু'বেলায় তিনপো দুধ দিচ্চে,—তা মন্দ কি। এক দোষ নেদে মরেন—পেটে কিছু সয় না। রাক্কুসীর জ্বালায় বাইরে কাপড় শুকুতে দেবার যো নেই,—আদা-আদি খেয়ে ফ্যালে। সে দিন গদীর নতুন র‍্যাপারখানা পেটে পুরেচেন,—মরেও না, হাড় জুড়োয়! ইত্যাদি।

গরম জল প্রস্তুতই ছিল,—মুখ হাত পা ধুইয়া বাঁচিলাম, শীতে জড়সড় করিয়া দিয়াছিল। পরে—একাসনেই চা, লুচি, বেগুনভাজা, কপির তরকারি, রসগোল্লা! হুবহু আলাদিনের রাজত্ব! জয়হরি চুপি চুপি বলিল—"এঁরা বুঝি মাছ খান না?" বলিলাম—"চুপ্ চুপ্ মাল পাড়ার গুরুর শিষ্য।" শুনিয়া সে একটু যেন মনমরা হইল। আমার ইচ্ছা চা খাইয়াই পা ছড়াই। জয়হরি ডাক্তারি পড়িয়াছিল; সে বলিল—"বলেন কি মশাই, এমন কাজটি ক'রবেন না। এ শীতে শরীরের (heat and vitality) শারীরিক উষ্ণতা ও জীবনীশক্তি বজায় না রাখলে কি রক্ষা আছে!" এই বলিয়া সে ভোর পেট্ vitality বজায় করিতে লাগিল। ধর্ম্মশালায় এ vitality রক্ষা যে কিসে হইত তাহা ভগবানই জানেন। আমি সামান্য কিছু মুখে দিলাম। রাত দুইটা বাজিয়াছে,—শয্যা লইতে পারিলে বাঁচি।

শয্যা প্রস্তুতই ছিল। সে রাত্রে আর কথা না বাড়াইয়া,—চার-পা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া গেল,—অবশ্য দুই জনে। "যোগরুঢ়ী" কি না জানি না।—সে কি আরাম!

চক্ষু না বুজিতেই জয়হরির vitalityর পরিচয় পাওয়া গেল;—নাসিকাধ্বনির তাড়নায় গৃহ-মধ্যস্থ তৈজসাদি

সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই কসরতি tripএ এত ক্লান্তি আসিয়াছিল—নিদ্রা রুখিল না;—এই "Rip van Winkle"এর পার্শ্বে কি করিয়া ও কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানি না।

ভাত-কাপড়ের কথা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল,

সেদিন একখানা কাগজের সংবাদস্তম্ভে পড়িলাম "শ্রীযুক্ত—অমুক স্থানে পাটচাষের পরিমাণ কমাইবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন। পাটে যে আমাদেয় দেশের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা সকলেই জানেন,.....ইত্যাদি।"

সেই কাগজেই বোধ হয় একদিন পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতী মাল কিনিয়া, আমাদের কোটি কোটি টাকা বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, ইহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে".....ইত্যাদি।

এ সব কথার চলতি এত বেশী যে, এ সম্বন্ধে যে আজ-কাল আর বিচারের কোনও অবসর আছে, তাও অনেকে স্বীকার করিতে চান না। দারুণ অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় পীড়িত দেশবাসী ভাত-কাপড়ের অভাবটা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করে এবং সে সম্বন্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত আপাত-রম্য তাহা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকে।

এ কথা দুটির মধ্যে যে কোনও সত্য নাই, তাহা নহে, বরং অনেকটা সত্যই আছে। পাটের ব্যবসা আমাদের দেশে যে ভাবে চলিতেছে, ইহাতে দেশের খুব যে বেশী অমঙ্গল হইতেছে, সে কথা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তা'ছাড়া যে মাল আমাদের দেশেই অনায়াসে তৈয়ার হইতে পারে, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহাও নিঃসন্দেহ সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে ভাবে কথাটি লোকের মুখে মুখে রটিতেতে, বা ছাপার হরপে বিলি হইয়া হাটে মাঠে ছড়াইয়া বেড়াইতেছে, সে ভাবে যে ইহা সত্য নয়, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

বিদেশী মাল আমদানীর ফলে বিদেশে আমাদের টাকা চলিয়া যাইতেছে, এবং সেই টাকায় বিদেশী ধনী হইতেছে এবং আমরা দরিদ্র হইতেছি, এই কথা ঠিক সত্য নয়। পাটের চাষে আমাদের আপত্তি করিবার কোনও হেতু থাকিত না; কেন না, পাট খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হয় এবং তার মূল্যটা বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আসে। কাজেই বিদেশের টাকায় আমাদের দেশ ধনী হয়। সুতরাং যত বেশী পাট রপ্তানি করা যায়, ততই আমাদের বেশী ধনী হইবার কথা। ইহাতে আপত্তি হইবার কারণ কি?

কারণ আছে, কিন্তু সে অন্যরূপ। প্রথমতঃ আবশ্যকের অতিরিক্ত পাট যদি জন্মে, তবে বিদেশী ক্রেতা কেবল চাপিয়া বসিয়া থাকিলেই আমাদের গরীব চাষী ও ব্যবসায়ীদের পাটের দাম কমাইয়া দিতে পারেন। কাজেই বেশী পাট জন্মাইলেই যে বেশী টাকা ঘরে আসিবে, তাহার কোনও মানে নাই। পাটের দাম এইরূপে এতটা কমিয়া যাইতে পারে যে, পাটের চাষে লাভ না হইয়া লোকসান দাঁড়াইতে পারে।

তা ছাড়া, যদি লোকে পাট বেশী জন্মাইয়া ধান এত কম জন্মায়, যে, দেশের খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়, তবে ধানের দাম বাড়িয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সব আবশ্যক জিনিষেরই দাম অল্প-বিস্তর বাড়িয়া যাইবে। এমন যদি হয়, তবে চাষী পাট বেচিয়া যে টাকাটা বেশী পাইল, তার দ্বারা তার অভাব মিটাইবার শক্তি বাড়িবে না। যদি চালের দাম চার টাকা মণ হয়, তবে দশ টাকায় যে পরিমাণ চাল পাওয়া যাইবে, আট টাকা মণ চাল হইলে ঠিক

তার অর্দ্ধেক চাল পাওয়া যাইবে। সে স্থলে আমি যদি পাট বেচিয়া ১০৲ টাকার স্থলে ২০ টাকাও রোজগার করি, তবে আমি বাস্তবিক বেশী ধনী হইব না।

সুতরাং, যদি পৃথিবীর আবশ্যকের অতিরিক্ত পাট জন্মান যায়, এবং পাট জন্মাইবার ফলে যদি ধানের আবাদ এতটা কমিয়া যায় যে, পাটে যে টাকা ঘরে আসে তার চেয়ে বেশী খরচ হয় আবশ্যক জিনিষপত্র কিনিতে, তবেই পাটের আবাদে দেশের অনিষ্ট হইতেছে বলিতে হইবে। নচেৎ পাট আবাদ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর টাকা ঘরে আনিলে, আমাদের দেশবাসী ধনী বই নির্ধন হইবার কোনও কারণ নাই।

কথাটা যথাসম্ভব সরল করিয়া বলিলাম। ইহার মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে। বিদেশের টাকা ঘরে আসিলেই যে দেশ সমৃদ্ধ হয়, আর ঘরের টাকা বিদেশে গেলেই যে দেশ দরিদ্র হয়, তার কোনও মানে নাই। তা ছাড়া, পাটের ব্যবসায় জিনিষটা এমন জটিল যে, পাটের লাভ যাহা, তার খুব বেশী অংশ দেশের লোকের হাতে যে আসেই, তাহা নয়; আর যাও বা দেশের লোকের হাতে আসে, তারও খুব কম ভাগ কৃষকের হাতে যায়। এই সব কারণে সমস্যার যে সব জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহা আপাততঃ তফাতে রাখিয়াই কথাটা বলিলাম। যে ভাবে ইহা বলিলাম, সে ভাবে ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও মোটামুটি রকমে সত্য।

এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, পাটের চাষ দেশের অনিষ্ট করে না, মোটের উপর দেশের সমৃদ্ধি বাড়ায়। তবে সে আবাদ যদি অতিরিক্ত হয়, কিম্বা ধান্যের আবাদ যদি পাটের চাপে পড়িয়া অতিরিক্ত রকম কম হয়, তবে ইহাতে অনিষ্ট হইতে পারে। সেই অবস্থা হইয়াছে কি? দেশের আবশ্যকের চেয়ে অল্প খাদ্য কি উৎপাদিত হইতেছে? পৃথিবীর ব্যবহারের জন্য যত পাট আবশ্যক, তার চেয়ে বেশী পাট কি উৎপন্ন হইতেছে?

পাঠকদের মধ্যে হয় তো অনেকে নিঃসংশয়ে বলিবেন "হাঁ।" আমি জোর করিয়া "হাঁ"-ও বলিতে পারি না, "না"-ও বলিতে পারি না। কেন না আমার যতদূর জানা শোনা আছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোনও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সেরূপ অনুসন্ধান যে আবশ্যক, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা।

যাঁরা বলেন যে, আবশ্যকের অতিরিক্ত পাটের আবাদ হইতেছে, তাঁহাদের সোজাসুজি যুক্তি এই যে, পাটের দাম অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এ যুক্তি বেশ সঙ্গত। কোনও জিনিষের চাহিদার পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণে সেই জিনিষ বাজারে আসিলে তাহার দাম পড়িয়া যায়, ইহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটা সরল সূত্র। কিন্তু এ সরল সূত্র সব জায়গায় খাটে না। তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে একটি কারণের কথা এখানে উত্থাপন করিব। যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার সঙ্গে সামনাসামনি কারবার হয়, সেখানে এ সূত্র যেমন খাটে, পাটের ব্যবসায়ে তাহা খাটিতে পারে না। পাটের চাষী পাট উৎপাদন করে, ব্যবহার করে, ধর, মরিশাসের চিনির কারবারীরা। কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসিয়া আছে অনেকগুলি লোক। প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর চাপিয়া মাল ছাড়ে, যাহাতে সুবিধা দরে বেচা-কেনা করিতে পারে। পাটের কলওয়ালারা যদি বেশী লাভজনক মনে করে, তবে তারা ঠিক যতটা চট বাজারে দরকার সবটা না ছাড়িয়া তার চেয়ে কিছু কম ছাড়িয়া দাম বেশী করিয়া পোষাইয়া লইবে। আবার কলওয়ালা যে বড় মহাজনের কাছে পাট কেনে, সেও তেমনি বাজার আগলাইয়া বসিয়া থাকে, যাতে সে বেশী সুবিধায় মালটা বেচিতে পারে। এমনি করিয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাধা পাইয়া আসল চাহিদাটা কৃষকের কাছে যাইয়া পৌঁছায়। সুতরাং চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক বিষয়ে সরল সূত্রটি এখানে সম্পূর্ণ খাটে না।

তা ছাড়া, আর একটা কথা এই যে, কাঁচা পাটের খরিদ্দারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, আর তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ। তাই তাহারা ডাণ্ডী হইতে বসিয়া বাঙ্গালার পাটের দর ঠিক করিয়া দেয়। এখানকার অসংবদ্ধ ব্যবসায়ীর দল বা চাষী কেহই সে দরে "না" বলিতে পারে না। ফলে বাস্তবিক পক্ষে পাটের দর প্রত্যক্ষ ভাবে চাহিদা ও উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। ইহা যে তাহার উপর নির্ভর করে না তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পাটের কেনা-বেচার চুক্তি এবং তার দাম স্থির হয় পাট জন্মিবার বহুপূর্ব্বে। এই Forward contract ব্যবস্থার ফলে পাটের ব্যবসা একটা উচ্চ অঙ্গের জুয়াখেলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে কথা পরে বলিব।

কাজেই পাটের দর পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, চাহিদার চেয়ে বেশী পাট জন্মান হইতেছে। হয় তো হইতেছে; কিন্তু সে কথা বিনা বিচারে বিনা অনুসন্ধানে অমনি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দেওয়া যায় না।

আর যদি তাই হয়, তাহা হইলে পাটের চাষের পরিমাণ কমাইলেই যে চাষীর বা দেশের লোকের লাভ হইবে, তার কোনও মানে নাই। পাটের তাহাতে দাম বাড়িবে সত্য, কিন্তু তাহাতে চাষীর যে উপকার হইবেই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমনও হইতে পারে যে চাষীর তাহাতে লোকসান হইবে। ধর, আমার জমীতে পাট আবাদ করিয়া এই মন্দা বাজারে আমি বছরে পাঁচ টাকা দরে পঞ্চাশ টাকা পাই। সে স্থলে যদি আমি অর্দ্ধেক জমীতে পাট আবাদ করি, তবে হয় তো সাত টাকা দরে পাট বেচিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা পাইব। আর অর্দ্ধেক জমী আবাদ করিয়া যে ফসল তুলিব, তাহার মূল্য হয় তো দাঁড়াইবে দশ টাকা; যদি এমন অবস্থা হয় তবে তো বিনা বিচারে পাটের আবাদ কমাইলেই প্রজার লাভ হইবে বলা যায় না। কাজেই পাটের আবাদ কমাইলেই যে চাষীর উপকার হইবেই, এ কথা বলা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" "না" বলাও তেমনি শক্ত। আমাদের সমস্ত জাতির খাদ্যের শস্য যে কতটা দরকার, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তার দেশে কি পরিমাণ ফসল জন্মে তাহাও ঠিক কাহারও জানা নাই। তা ছাড়া কতটা জমীতে কোন্ বছরে পাট বা ধান রবিশস্যের আবাদ হইয়াছিল তাহারও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ নাই। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে সব বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কাজেই বলা যায় না যে, বাস্তবিক পাটের আবাদের ফলে ধানী জমীর পরিমাণ বিশেষ রূপে কমিয়াছে কি না। কমিয়া থাকিলেও কতটা কমিয়াছে তাহা বলা অসম্ভব। যতটা কমিয়াছে, তাহাতে চাষীদের এবং দেশের লোকের ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে, সে কথা বলার কোনও দৃঢ় ভিত্তি নাই।

যদি ধানের জমী এত কমিয়া গিয়া থাকে যে, আমাদের সমস্ত জাতির খাদ্যের জন্য যতটা ধান হওয়া দরকার তাহা হয় না, তবে তাহা নিঃসন্দেহ খারাপ। তেমন হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত মোটামুটি রকমে করা যাইতে পারে ধান চালের রপ্তানির দিকে দৃষ্টি করিয়া। যদি দেশ হইতে ধান চাল রপ্তানি হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত ধান চাল জন্মিতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। এমন বলা যাইত, যদি আমরা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিতাম যে সকল লোকে ভর পেট খাইয়া যাহা বাড়তি থাকে, তাহা ছাড়া কখনও রপ্তানি হয় না। কিন্তু হাজার হাজার লোকে আধপেটা খাইয়া বা না খাইয়া থাকিলেও যে রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে?

কাজেই কেবল রপ্তানির দিকে চাহিয়াই বলা চলে না যে, আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত ধান চাল জন্মায়। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যায় না যে বেশী চাউল জন্মায় না।

ঠিক সমস্ত জাতির খাদ্যের জন্য এবং আপদ বিপদের সঞ্চয়ের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য শস্য জন্মান দরকার, তার অতিরিক্ত খাদ্যের ফসল জন্মাইয়া অপচয় করায় দেশবাসীর বা কৃষকের কোনও স্বার্থ নাই (১)। তার অতিরিক্ত ধান যদি জন্মান যায়, তবে তার একমাত্র সদ্ব্যবহার রপ্তানি করা। কারণ রপ্তানির দ্বারা যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতে দেশ সমৃদ্ধ হয়। রপ্তানি না করিয়া সে অতিরিক্ত শস্য দেশে ফেলিয়া রাখিলে, তাহা কেবল সম্পদের অপচয় মাত্র। সুতরাং আবশ্যকের অতিরিক্ত এই যে কৃষি-সম্পদ, ইহার একমাত্র প্রয়োজন তার বিক্রয় মূল্য দিয়া।

এখন ধর, আমাদের দেশে দুই কোটী মণ ধান হইলে সবার পেট ভরে। দুর্ব্বৎসর প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য আরও ধর এক কোটী মণ ধান জমান সঙ্গত। এই তিন কোটী মণ ধান দেশের খাদ্যের জন্য দরকার। অথচ ধর, দেশের সমস্ত জমীতে যদি ধানই খালি আবাদ করা যায়, তবে ত্রিশ

(১) কতটা খাদ্য দরকার, এ প্রশ্নটা নানারকম অর্থে ধরা যাইতে পারে। জিনিষের দরকারের পরিমাণটা অনেকটা তার মূল্যের উপর নির্ভর করে—ধান যদি দুর্ম্মূল্য হয় আর গম সস্তা হয়, তবে ধানের প্রয়োজনটা কাজেই কম হইবে। সে সব কুটিলতা উপস্থিত না করিয়া আমি এখানে চালকে একমাত্র খাদ্য ধরিয়া লইয়া তাহার দরকারের পরিমাণ অর্থে এই ধরিতেছি যে, সুস্থ অবস্থায় থাকিবার জন্য সমস্ত দেশবাসীর যে খাদ্য প্রয়োজন সেই খাদ্যের সমষ্টির পরিমাণ।

কোটী মণ ধান জন্মান যায়। যদি আমরা বছর বছর এই ত্রিশ কোটী মণ ধানও জন্মাই, তবু আমাদের আবশ্যক খরচ তিন কোটী মণ ধানই হইবে। আর সাতাশ কোটী মণ ধান রপ্তানী করিতে হইবে। না করিলে সমস্ত জাতির সম্পদের পক্ষে ভয়ানক হানি হইবে। এখন এই রপ্তানির শস্য ধানই হউক বা পাটই হউক, তাতে দেশের কিছু আসে যায় না। যাতে বেশী লাভ হয়, তাই আবাদ করাতেই দেশের বেশী উপকার। কেন না তাহাতেই দেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সাতাশ কোটী মণ ধান বিক্রী করিয়া যদি ২৭০ কোটী টাকা পাওয়া যায়, এবং তার স্থলে সমস্ত পাট আবাদ করিয়া তাহা বিক্রয় করিলে যদি মাত্র ২০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, তবে সে স্থলে ধান আবাদ করাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। পক্ষান্তরে যদি সেই পরিমাণ জমীতে পাট আবাদ করিয়া তিনশ' কোটি টাকা পাওয়া যায়, তবে পাট আবাদ করাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

ফল কথা, দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ঐ তিনকোটী মণ ধানের অতিরিক্ত যে কিছু ফসল হয়, তার ভাল মন্দ সম্বন্ধে একমাত্র মানদণ্ড,—তাহা বিক্রী করিয়া কত দাম পাওয়া যায়।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্‌টা দরকার,—পাটের বদলে ধান আবাদ করা, না পাটের আবাদ বজায় রাখা, না বাড়ান? এ সব সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমে জানা দরকার যে, দেশের খাদ্যের জন্য কি পরিমাণ খাদ্য-শস্য জন্মান প্রয়োজন, এবং কি পরিমাণে সেই শস্য জন্মিতেছে। তার অতিরিক্ত যে শস্য জন্মায়, সেটার মধ্যে কতটা পাট, কতটা ধান বা কতটা অন্য ফসল হইলে বেশী টাকা ঘরে আসে, সে কথা নির্ণয় করা দরকার। তাহা না করিয়া পাটের আবাদ কমাইতে বা ধানের আবাদ বাড়াইতে লোককে পরামর্শ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করিবার চেষ্টা করেন নাই। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া যে সব ব্যক্তি বাহির হইতেছেন, তাঁহারা দল বাঁধিয়া এই অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইলে অনেক সুফল লাভ হইতে পারে। কিন্তু সে অনুসন্ধান না করিয়া চট্ করিয়া এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বিড়ম্বনা সুধু নয়, হয় তো বা ঘোর দেশদ্রোহিতাও হইতে পারে।

আমি এ সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান করি নাই; কেননা, ইহা আমার ব্যবসায় নহে, এবং আমার এ অনুসন্ধান করিবার যোগ্যতা নাই। তাই আমি যোগ্য ব্যক্তিদের বিশেষভাবে এই অনুসন্ধান করিতে আহ্বান করিতেছি। অনুসন্ধানের ফলে যাহা সাব্যস্ত হয়, সেই অনুসারে কাজ করিতে সকলের উঠিয়া পড়িয়া লাগা আবশ্যক হইবে। কিন্তু এ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র পরের মুখ হইতে চলতি ধুয়া ধার করিয়া হৈ চৈ করিলে, আমরা দেশের কি যে অনিষ্ট করিয়া বসিব জানি না।

এই ধর, আমাদের এই ধুয়া যে, পাট আবাদ করিও না, ধান আবাদ কর। এবং প্রকৃত অবস্থা যদি এই হয় যে, দেশের খাদ্যের উপযুক্ত যথেষ্ট ধান চাউল জন্মিতেছে এবং অতিরিক্ত জমীতে পাট আবাদই বেশী লাভজনক, তবে আমরা এই ধুয়া ধরিয়া যদি লোককে পাট বর্জ্জন করিতে বলি, তবে দেশের হিত কিছুই করিব না, অহিত করিয়া বসিব। এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়া আমাদের এ বিষয়ে একটা আলগা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া হৈ চৈ না করিয়া এ বিষয়টি বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিশেষ অনুসন্ধান করান দরকার।

সম্পূর্ণ বিনা অনুসন্ধানে যে এ ধুয়াটা উঠিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু সে অনুসন্ধান হইয়াছে কেবলমাত্র পাটের ব্যবসাদারদের দ্বারা, কেবলমাত্র তাঁদের ব্যবসার দিক হইতে। পাটের পরিমাণ কমিলে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীর মোটের উপর লাভবান হইবেন; কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা খরিদ্দার-সঙ্ঘের উপর চাপ দিবার সুযোগ পাইবেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাটের ব্যবসাদারের যে স্বার্থ, তাহাই দেশবাসীর স্বার্থ নয়—এ কথাটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা যে খাইতে পরিতে পাই না, এটা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি, এবং সেই জন্যই সাধারণ লোকে এত চট্ করিয়া মানিয়া লয় যে, ধান যথেষ্ট জন্মিতেছে না, তাই খাইতে পাইতেছি না। কিন্তু এ কথা ঠিক না হওয়াই সম্ভব। খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেই যে সবাই খাইতে পাইবে, তাহা তো নয়। সমাজের জটিল ব্যবস্থার এমন প্রায়ই দাঁড়ায় যে, একজন অজস্র খাদ্য অপচয় করিতেছে, আর একজন না খাইয়া মরিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয় তো

দেখা যাইবে যে, যারা খাইতে পায় না, তাহারা খাইবার অধিকারের এই অসমতা বশতঃই খাইতে পায় না, দেশে ধানের অভাবে নয়। অজস্র পরিমাণে ধান চাল জন্মাইয়া খাদ্যের মূল্য কমাইলে হয় তো বেশী লোক খাইতে পাইবে; কিন্তু অপর পক্ষে অনেক বেশী জাতীয় সম্পদের অপচয় করা হইবে। দেশকে সমৃদ্ধ ও সুখী করিতে হইলে, অপচয় বাড়াইলে চলিবে না, চারিদিক দিয়া অপচয় নিবারণ করিতে হইবে। কাজেই অনুসন্ধান দ্বারা ইহা যদি সাব্যস্ত হয় যে, দেশে অন্নের অভাব নাই, তার বিতরণের আলস্যই লোকের না খাওয়ার হেতু, তবে প্রকৃত দেশ-হিতৈষীর পক্ষে এই আলস্য দূর করিয়া দেশের কৃষিসম্পদ যাহাতে সকল কর্ম্মীর মধ্যে ন্যায্য ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, সেই সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

সমাজের এখনকার যে অবস্থা, তাহাতে কৃষিসম্পদ সৃষ্টি করে কৃষক, কিন্তু তার বিতরণের ভার লয় ব্যবসায়ী। ব্যবসার system ক্রমশঃই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। এক হিসাবে সমস্ত বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ সমস্ত বিশ্বের সম্পদের ভাগ করিবার ভার লইয়াছে। এই জটিল ব্যবসায় জগতের একমাত্র নিয়ামক স্বার্থ। পরস্পরের স্বার্থ-সংঘাতমূলে ব্যবসা চলিতেছে। ফলে বিতরণ ব্যাপারটা যে অনেক স্থলেই ঠিক উপযুক্ত রকম হইতেছে না, তাহা আজকালকার সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে সোস্যালিষ্টগণ দেখাইয়াছেন যে, স্বার্থসংঘাত-মূলক ব্যবসায়ের বন্দোবস্তে পৃথিবীর বহু সম্পদের অযথা অপচয় হইতেছে, সম্পদ বিতরণের অসুচিত অসামঞ্জস্য হইতেছে। তাহার ফলে যে খাটিয়া মরিতেছে, সে খাইতে পায় না, আর যে অলস জুয়ারী সে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া শ্রমিকের কষ্টের ধন-সম্পদ ফুঁকে উড়াইতেছে। সে সব কথা বিস্তারিত করিয়া বলিবার স্থান এখানে নাই। ব্যবসায়ের জটিল ব্যবস্থার ফেরে পড়িয়া বাঙ্গালার কৃষি-সম্পদের বিতরণে যে আলস্য উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব।

পাট জন্মায় চাষী। সে হাটে লইয়া বেচে, না হয় বাড়ী বসিয়া বেচে। ফড়িয়ারা তাহা কিনিয়া দেয় মহাজনের কাছে। এই মহাজন বড় বড় মহাজনের সঙ্গে অগ্রিম চুক্তি করিয়া বসিয়া থাকেন যে এবারকার বৎসরে দুইলাখ বা দশলাখ মণ পাট এত দরে জোগাইবেন। সেই বড় মহাশয় তো কলিকাতার কোনও Baler বা চট-কলের সঙ্গে চুক্তি করেন। "বেলার" চুক্তি করেন বিলাতের খরিদ্দার দের সঙ্গে।

এই যে সব বেচাকেনার চুক্তি, ইহা পাট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে হয়। ১৯২১ সনে যে পাট বাঙ্গলায় জন্মিল, সে পাট হয় তো ১৯২২ কি ২৩ সনে মরিসাসে চিনির কারখানায় বস্তা হইয়া পৌঁছায়। ১৯২২ সনে যে বস্তার প্রয়োজন হইবে, তাহার সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করিয়া চট-কলের মালিক বেলারদের সঙ্গে চুক্তি করেন ১৯১৯ সনে। বেলার আন্দাজ করেন যে ১৯২১ সনে পাটের কি বিক্রী দর হইতে পারে। এই দুই আন্দাজের উপর যে চুক্তি হয়, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। বেলারের সঙ্গে তার নিম্নতর মহাজনের এবং তাহাদের সঙ্গে অন্য মহাজনের পর্য্যায়ক্রমে যে চুক্তি হয়, তাহার একমাত্র ভিত্তি কল্পনা এবং সরকার বাহাদুরের কৃষিবিভাগের পোনেরো আনা মনগড়া forecast। কার্য্যকালে মহাজন দেখিতে পায় যে, যে পাটের জন্য সে দশ টাকা দরে চুক্তি করিয়াছে, তাহা ফড়িয়াদের কাছে সে ছয় টাকা দরে কিনিতে পায়, এবং ফড়িয়ারা তাহা পাঁচ টাকা দরে চাষার কাছে কেনে। সুতরাং মহাজন অনায়াসে মণকরা ৪৲ টাকা লাভ করিয়া বড়লোক হয়। পক্ষান্তরে এমনও হয় যে, মহাজন যেখানে বেলারকে নয় টাকা দরে পাট জোগাইবে বলিয়া চুক্তি করিয়াছে, সেখানে তার পাটের খরিদ দর পড়ে বারো টাকা। কাজেই মহাজনকে লোকসান দিতে হয় মণকরা দুই টাকা।

ব্যাপারটা যেখানে ষোল আনা হাওয়ার উপর, সেখানে লাভের অঙ্ক খুব বেশী না হইলে লোকে অগ্রসর হইবে কেন? কাজেই পাটের ব্যবসা খুব লাভের ব্যবসা। এ কথার মানে এই যে, যে পাট বেলার বা কলওয়ালা দশ টাকা দরে কিনিতে প্রস্তুত, সে পাট বেচিয়া চাষী পায় হয়তো মাত্র চারটাকা; আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ফসল খুব ভাল হয়, তবে তো চাষার পাওনা আরও কমিয়া যায়।

সাধারণ কেনাবেচার বাজারেও এমনি ঝুঁকি কতকটা ব্যবসাদারকে লইতে হয় বলিয়া সে লাভের একটা ভারী অংশ লয়। কিন্তু পাটের ব্যবসার মত এত ঝুঁকি এ দেশের কোনও ব্যবসায়ে কেহ কোনও দিন লয় না; এত লোক-কেউ দেয় না, এত লাভও করে না।

আমাদের দেশে পাট জন্মিয়া যেমন এখানকার কলে কতক এবং ডাণ্ডীতে কতক বোনা হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় বিক্রী হয়, তেমনি আমেরিকা ও ইজিপ্টে তুলা জন্মিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারে বুনান হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বিক্রী হয়। সেখানেও এমনি জুয়াখেলা অল্প-বিস্তর চলে। কিন্তু সেখানকার তুলার চাষীরা এমন অসহায় নয়। সেখানে তুলার চাষ বড় বড় সঙ্ঘবদ্ধ কম্বাইন বা ট্রাষ্টের হাতে। তাহারা কলওয়ালাদের হাতে নয়, কলওয়ালারাই তাহাদের হাতে। তুলার দাম ঠিক করিয়া দেয় আমেরিকার আবাদকারীরা, ল্যাঙ্কাশায়ারকে সেই দর মাথা পাতিয়া মানিতে হয়। সেখানকার আবাদকারীরা বাজারের তেজী মন্দা হিসাব করিয়া আবাদের পরিমাণ ঠিক করে, কাজেই তাহাদের কিছুতে বিশেষ লোকসান হইতে পারে না।

আমাদের পাট আবাদ করে ছোট ছোট কৃষক, যারা হয় তো এক বিঘা দুই বিঘা জমীতে পাট জন্মায়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সংযোগই নাই। একে অন্যের খবর রাখে না, আর কেউই বাহিরের দুনিয়ার খবর রাখে না। কেবল জানে যে নিকটবর্ত্তী হাটে পাটের দর কবে কত হইল। আর সে দর তারা বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মের মত মানিয়া লয়। তাদের বিচ্ছিন্ন সম্পদ একত্র করে ফড়িয়া। তাহার সঙ্গে চাষীদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। চাষীদের ভাল হউক, সমগ্র জাতির যাতে ভাল হয় সেই পরিমাণে পাটের আবাদ হউক, এ কথা ভাবা তাহাদের কাজ নয়। তাদের কাজ একদিকে চাষী ও অপর দিকে মহাজনকে ঠকাইয়া যথাসম্ভব বেশী লাভ করা। যে মহাজন ফড়িয়ার কাছে মাল কেনে, তার কাজ তার চুক্তি অনুসারে বড় মহাজনকে পাট যোগাইয়া যথাসম্ভব বেশী লাভ করা। এমনি করিয়া পরস্পরকে খাওয়া-খাওয়ি করিয়া পাটের বিপুল ব্যবসা চলিতেছে। ইহার খুব উপরের স্তরে ছাড়া কোথাও কোনও সংযোগ নাই, কোথাও সঙ্ঘবন্ধন নাই, পৃথিবীর পাটের চাহিদার দিকে এবং দেশের খাদ্যের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাটের উৎপত্তি নিয়মিত করিবার আয়োজন কোথাও নাই; কিসে দেশ সব চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ হয়, চাষীর হাতে সব চেয়ে বেশী টাকা আসে, এ ভাবনা ভাবিবার কেহ নাই।

ইহার ফলে হইতেছে একটা ভীষণ যজ্ঞ, যার ভিতর দেশের স্বার্থ ও অর্থ, কৃষীবলের সুখ ও ঋদ্ধি নিত্য আহুতি দেওয়া হইতেছে পাটের ব্যবসা গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার চাষার যে অবস্থা ছিল, এখন তার চেয়ে তার অবস্থা অনেকটা ভাল,—অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ভাল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাট বেচিয়া যে টাকা তাহারা পাইয়াছে, অন্য ফসল বেচিয়া সে পরিমাণ টাকা তাহারা কখনও পাইত না। চাষীর যখন প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের চেয়ে অনেক বেশী ফসল জন্মাইতে হয় খাজনা দিতে, মহাজনের সুদ দিতে, কাপড়চোপড় ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ কিনিতে, তখন এই অতিরিক্ত ফসল যত দামে সে বেচিতে পারে তাহাতেই তার মঙ্গল। কাজেই পাটের আবাদ করিয়া চাষী উপকৃত হইয়াছে এবং ঐ পাটের সম্পদে অল্পবিস্তর সমস্ত দেশই সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে বিরাট ব্যবস্থা-বন্ধন দ্বারা এই পাটের বেচাকেনা হইতেছে, তাহার ফলে লাভের পরিমাণটা চাষীর ঘরে যথাসম্ভব কম যাইতেছে, এবং স্তরে স্তরে ব্যবসায়ীরা যথা-সম্ভব লইতেছে এবং অপচয় সম্ভবতঃ খুব বেশী হইতেছে। অর্থাৎ চাষী এবং দেশের লোক পাটের দ্বারা যে পরিমাণে সমৃদ্ধ হইতে পারিত সে পরিমাণে সমৃদ্ধ হইতেছে না।

কেবল স্বার্থ ও পরস্পর প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত ব্যবসা চলিতেছে। এমন হওয়া খুব সম্ভব যে, তার ফল ক্রমে দাঁড়াইয়াছে এই যে, যার যেখানে জমী আছে, সে সেখানে প্রাণপণে যথাসম্ভব বেশী করিয়া পাট বুনিতেছে। ইহার ফলে হয় তো এত পাট জন্মিতেছে যে, পাটের আখেরী খরিদ্দার যে ডাণ্ডীর মহাজন বা কলওয়ালা, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে দাম কমাইয়া লইতেছে। এত কমাইয়া লইতেছে যে, চাষীর লোকসান হইতেছে। অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া চাষী যে পাট উঠাইয়াছে, তাহা সে হয় তো তিন চার টাকা মণ বেচিতে বাধ্য হইতেছে। যদি ইহার বদলে এই শক্তি তাহারা অন্য ফসল জন্মাইতে নিয়োজিত করিত, তাহা হইলে তাহারা অনেক বেশী লাভবান হইত। কাজেই হয় তো অতিরিক্ত পরিমাণে পাট জন্মাইয়া দেশের কৃষি-সম্পদের অপচয় হইতেছে।

অল্প-বিস্তর সব ব্যবসায়েই এমনি অপচয় হয়—বর্ত্তমান

ভারতবর্ষ

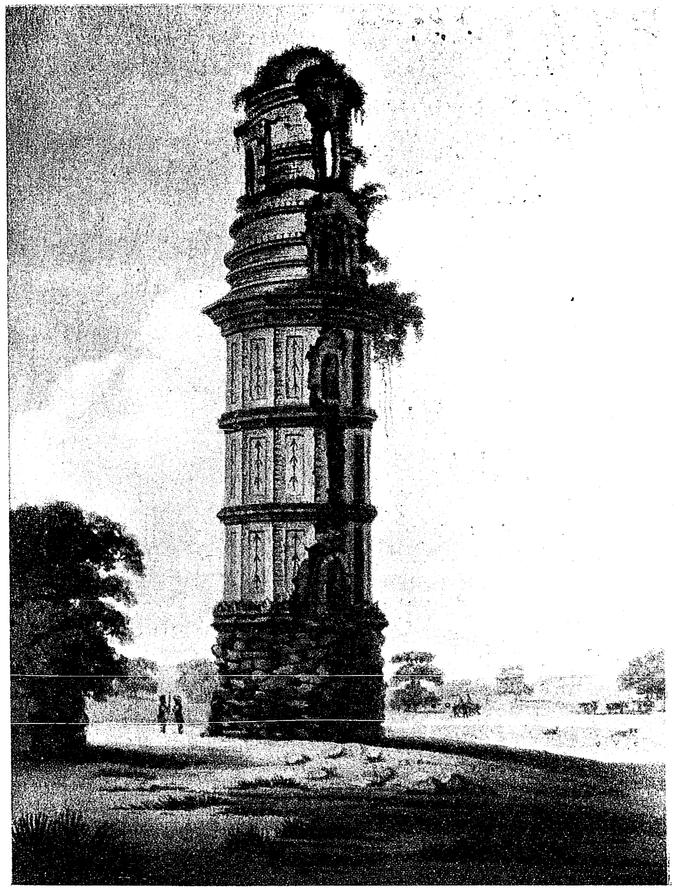

ফিরোজ শা-স্তম্ভ—গৌড়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ব্যবসায়-পদ্ধতির এটা একটা গুরুতর দোষ। কিন্তু পাটের কোথায় একটা এমন সুবিধা আছে, যাহাতে এমন অপচয় হইবার কোনও দরকার নাই সে সুবিধাটা এই যে, পাট বাঙ্গলা দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা জন্মায় কেবল বাঙ্গলার চাষী। ইহার যে চাহিদা আছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত আর কোনও উপায়ে মিটিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই, যদি আমাদের দেশের চাষী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আড়া-আড়ি কোনও উপায়ে নিবারণ করা যায় এবং চাষী ও চটের খরিদ্দারের ভিতর এমন একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ঘটান যায়, যাহাতে খরিদ্দারের প্রয়োজন অনুসারে পাট জন্মান ও জোগান হইবে, এবং ন্যায়সঙ্গত লাভ রাখিয়া পাট বিক্রী করা যায়, তবে এই সব অপচয় নিবারণ হইতে পারে।

সে রকম ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়। আমেরিকায় এমন ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি; দুই পক্ষে বড় বড় capitalist; দুই পক্ষই সঙ্ঘবদ্ধ। তার মধ্যে কলওয়ালার গরজ তুলাওয়ালার চেয়ে বেশী বলিয়া, তুলাওয়ালা কলওয়ালাকে অনেকটা খাসাইতে পারে। পক্ষান্তরে, পাট যেমন বাঙ্গলার সম্পূর্ণ নিজস্ব, তুলা, অনেকটা হইলেও, তেমন পরিপূর্ণ ভাবে আমেরিকার নিজস্ব নয়—আর তাহা অন্য দেশেও ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে জন্মান যাইতে পারে। বাঙ্গলায় যেমন একদিকে এই সুবিধা আছে যে, পাট বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোথাও জন্মে না, আর ইহার তুল্য অন্য কোন বস্তুও এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, অপর পক্ষে এখানে এই প্রকাণ্ড অসুবিধা যে, এখানে একদিকে সঙ্ঘবদ্ধ capitalist, অপর দিকে পরস্পর-সম্পর্ক-শূন্য অসংঙ্ঘবদ্ধ গরীব প্রজা। মাঝখানে যারা আছে, তাদের স্বার্থের সঙ্গে প্রজার স্বার্থের পরিপূর্ণ যোগ নাই।

এ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় সমবায় (co-operation)। মনে কর, প্রত্যেক গ্রামে যারা পাট জন্মায়, সেই গৃহস্থের দল একত্র হইয়া একটা ক্ষুদ্র সমবায় করিল। তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্য মূল্যে পাট কিনিয়া কলওয়ালার কাছে বেচিবার জন্য একটা সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন হইল, যাহার সভ্য এই সমস্ত দেশব্যাপী কো-অপারেটিভ সোসায়েটি। তাহা হইলে পাটের উৎপাদক (grower) ও গ্রাহক (consumer) ইহাদের মধ্যে আর কোনও মধ্যবর্ত্তী থাকে না। আর উভয় পক্ষের সম্পর্কও তাহা হইলে এমন হয়, যাহাতে কলওয়ালার কোনও রকম আধিপত্যই খাটে না।

এমন একটা বিরাট সমবায় গঠিত করিয়া তুলিতে অনেক দিন সময় লাগিবে। গ্রামে গ্রামে একটি একটি করিয়া ছোট ছোট সোসায়েটী গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে কাজ যে কত কঠিন, তাহা যাঁহারা এইরূপ সোসায়েটি গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। এমন সোসাইটি গড়িয়া তুলিবার পক্ষে অনেকগুলি গুরুতর অন্তরায় আছে, যাহার জন্য এ কাজ আরও অতিরিক্ত রূপ কঠিন।

সুতরাং একটা দেশব্যাপী বিরাট কো-অপারেটিভ ফেডারেশন গড়িয়া বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার করার আশা সুদূর-পরাহত। ইতিমধ্যে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ব্যবসা চলিতে থাকিলে তাহার বহু পূর্ব্বে প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় তো ব্যবসাটির মুণ্ডপাত হইবে এমন আশঙ্কা করিবার গুরুতর হেতু আছে।

এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর। যাঁহারা প্রজার ও সমগ্র বাঙ্গলা দেশের প্রকৃত হিতকামী, আশা করি, তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহাদের এ বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি আছে, যাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই বিরাট দেশব্যাপী পাটের ব্যবসাটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই এমন একটা প্রতিকার বাহির করিতে পারিবেন, যাহাতে ব্যবসার সমস্ত দোষ নিরাকরণ হইয়া ইহা সর্ব্বতোভাবে দেশের হিতসাধন করিতে পারিবে। বাঙ্গলায় আজ অর্থনীতি-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের অভাব নাই; তাঁহাদের অনুসন্ধান-স্পৃহারও যথেষ্ট পরিচয় আমরা রোজই পাইতেছি। এই সব পরীক্ষক ব্যক্তি যদি এই বিরাট সমস্যার প্রতি উপযুক্ত চেষ্টা ও আয়োজনের সহিত মনোনিবেশ করিতে পারেন, তবে প্রতিকার একটা অবশ্যই মিলিবে। বর্ত্তমান ব্যবসায়-বন্ধনের কোন্‌খানে ফাঁক আছে, কোন্‌খানে দোষের আকর আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহির হইবে, এবং সমস্ত দোষ ও ত্রুটি নির্দ্ধারিত হইলে, এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে,

যাহার দ্বারা পাটের ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দোষসমূহ নিরাকৃত হইতে পারে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই, এবং এ বিষয়ে কোনও মতামত দিবার জন্য যে পরিমাণ গবেষণার প্রয়োজন, তাহা আমি করিতে পারি নাই। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের ভার আমি লইতে চাই না। আমার এ সব কথা বলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞদের এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। তবে একটা কথা বোধ হয় মোটের উপর বলা যাইতে পারে। এ কাজে গভর্ণমেণ্টের হাত দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট পাট পরিবেশনের সকল ভার ব্যবসায়ীদের হাতে নির্ব্বিরোধে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে, কোনও মতেই এ সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন্ প্রণালীতে গভর্ণমেণ্ট ইহা নিয়মিত করিবার ভার লইলে ব্যবসায় সম্যকরূপে দেশের হিতার্থ নিয়োজিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এ প্রবন্ধে আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম, সেগুলিকে বেশ সুসংবদ্ধ নিবন্ধ বলিয়া আমি দাবী করিতে পারি না। পাটের চাষ ও ব্যবসা সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যা যেমন ভাবে আমার মনে আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়া গেলাম। কারণ আমার মনে হয় যে, এসব প্রশ্নের সম্যক সমাধানের উপর আমাদের বাঙ্গালী জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। কৃষি আমাদের প্রধান উপজীবিকা, আর কৃষি-সম্পদের মধ্যে পাট আমাদের প্রধান সম্পদ। পাটের টাকায় কেবল চাষী ধনী নয়, সমস্ত বাঙ্গালী ধনী। কাজেই পাটের কথা বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত জাতির ভাত-কাপড়ের কথা। এতবড় একটা গুরুতর বিষয়ে বিনা বিচারে কেবল পরের মুখে ধার করা বুলি সম্বল করিয়া আমরা নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিলে, হয় তো দেশের এতবড় একটা অনিষ্ট করিয়া বসিব যে, যুগ যুগ অনুতাপ করিয়া তাহার দুঃখ মিটিবে না।

সমস্যাটির সমাধান আর বেশী দিন ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। এখন যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে পাটের ব্যবসা আছে, তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য এই যে, কি উপায়ে এই ব্যবসা হইতে সব চেয়ে বেশী লাভ করা যাইতে পারে। সেই চেষ্টার ফলে এই ব্যবসার মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আসিয়া পড়িয়াছে, যাহারা শুষিয়া লাভ আদায় করিয়া ব্যবসাটীকে মারিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। এমন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এক দিন বাঙ্গলা দেশে নীলের আবাদ একচেটিয়া ছিল, আর তার বিক্রয়ের ক্ষেত্র ছিল পৃথিবীব্যাপী। নীলকরেরা লাভ খাইয়া খাইয়া এত লোভী হইয়া উঠিল যে, তাহাদের পেট আর কিছুতেই ভরে না। ফলে নীলের চাষ চাষীর পক্ষে রীতিমত লোকসানজনক হইয়া উঠিল। তখন আরম্ভ হইল অত্যাচার, উৎপীড়ন, তার পর বিদ্রোহ। তার ফলে বাঙ্গলা দেশ হইতে নীলের চাষ নিঃশেষে উঠিয়া গেল। তখনও কৃত্রিম নীল বাজারে দেখা দেয় নাই। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল নীলের ব্যবসা বেহারে পুরা দমে চলিয়াছে। রহিয়া সহিয়া ব্যবসা করিলে, চাষীকে খাওয়াইয়া নিজেরা খাইলে বাঙ্গালার নীলকরও অন্ততঃ এই পঞ্চাশ ষাট বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারিত, দেশেরও হয় তো তাহাতে লাভ হইতে পারিত। পাটের ব্যবসায়ে যে ক্রমে সেই অবস্থা দাঁড়াইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পাটের ব্যবসায়ে জুয়া খেলার পরিমাণ অসম্ভব রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তার ফল এখন চাষাদের উপর গিয়া পড়িতেছে। রক্তচোষা জুয়াড়ী ব্যাপারীর সংখ্যা আরও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, নীলের চাষীর মত পাটের চাষীও যে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া ডাক ছাড়িবে না, কে বলিতে পারে।

যদি সে দিন আসে, তবে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে তাহা বড় দুর্দ্দিন হইবে। বাঙ্গলার এত বড় একটা সম্পদ যদি এমনি করিয়া মারা যায়, তবে বাঙ্গালী জাতির দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইবে। তাই এখন হইতে সাবধান হওয়া দরকার। কিসে সে ব্যবসায়টি রক্ষা পায় এবং চাষী তার ন্যায্য লাভ পায়, সে দিকে দৃষ্টি দিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক নিশ্চয়। কিন্তু অর্থ-নীতিতে যাঁরা অভিবিদ্য এবং এরূপ অনুসন্ধানে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে এই বিষয়ে একটা খুব পাকা রকমের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গরুড়

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি

গরুড় বিষ্ণুর বাহন—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, পক্ষিকুলের রাজা। গরুড় সম্বন্ধে আমাদের এখন যাহা ধারণা তাহা আমরা পুরাণ হইতে পাইয়াছি। পুরাণকার একেবারে নূতন বৃত্তান্তের সৃষ্টি সকল সময় করিতেন না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পুরাণে যে সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহার মূল বেদ প্রভৃতি আরও প্রাচীন গ্রন্থ।

ঋগ্বেদের ১।৮৯।৬এ তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি বলিয়া দুইটি নাম বা শব্দ আছে। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নিকট সূক্ত-প্রণেতা ঋষি মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ভারতের বেদভাষ্যকার অরিষ্টনেমিকে বিশেষণ করিয়া তার্ক্ষ্য অর্থে গরুড় বুঝিয়াছেন; কিন্তু উইল্‌সন্ সাহেব শব্দটির অর্থ গরুড় হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান; কারণ সে যুগে গরুড়সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। ঋগ্বেদের ১০।১৭৮এ দেখা যায়, ঋষি তার্ক্ষ্য দেবতার (১) স্তব করিতেছেন। তাহাতে আছে যে তার্ক্ষ্য দেবগণ কর্ত্তৃক সোম আনয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৮।৩) আছে, গায়ত্রী যখন সোম আনিতে যান, তার্ক্ষ্য তাঁহার পথিপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে তার্ক্ষ্য বৈস্তশত নামে পক্ষিরাজের উল্লেখ আছে। গায়ত্রী কর্ত্তৃক সোম আনয়নের যে কাহিনী বৈদিক গ্রন্থে আছে, তার্ক্ষ্যের কাহিনী তাহার সহিত মিশিয়া গরুড়ের উৎপত্তি-কাহিনী-রচনায় যে সহায়তা করিয়াছে ইহা একরূপ নিশ্চিত। বেদে তার্ক্ষ্য গরুড়কে না বুঝাইলেও পরবর্ত্তী যুগে শব্দটির সহিত গরুড়ের সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান পুরাণে তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৫ম অঃ) কশ্যপ ও বিনতার সন্তানগণের মধ্যে গরুড় ও অরুণের নামের সহিত তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির নাম আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (২য় অঃ) আছে অরিষ্টনেমির পুত্র গরুড়। বায়ু পুরাণ (৬৫।৫৭) অনুসারে অরিষ্টনেমি কশ্যপের ন্যায় একজন প্রজাপতি। বিষ্ণু পুরাণের ইংরাজী অনুবাদক উইল্‌সন্ সাহেব একটি পাদ-টীকায় মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অরিষ্টনেমি কশ্যপের আর একটি নাম। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে তার্ক্ষ্য কশ্যপেরই নাম। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণু পুরাণে আছে তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কাল সূর্য্যরথে বাস করেন। (২) বিষ্ণু পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ঐ স্থলের টীকায় দুইজনকেই যক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমির নামের এই গোলকধাঁধার মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝা যায় যে ঐ দুইজনের সহিত গরুড়ের কিম্বা সূর্য্যের অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্রব রহিয়াছে। বেদে বিষ্ণুদেবতা সূর্য্যের রূপান্তর মাত্র। পুরাণে অদিতি-পুত্র যে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সূর্য্য ও বিষ্ণু আছেন। সুতরাং পুরাণ অনুসারে সূর্য্য ও বিষ্ণু দুই ভ্রাতা। (৩) তথাপি বিষ্ণুর সহিত তার্ক্ষ্য-অরিষ্টনেমির সম্পর্কের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঠিক গরুড় নামটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তবে 'সুপর্ণ' 'গরুত্মান্' বলিয়া দুইটি শব্দ অগ্নি ও সূর্য্যের উপর আরোপ করা হইয়াছে (১।১৬৪।৪৬)। পরবর্ত্তী যুগে সুপর্ণ ও গরুত্মান্ দুইটি শব্দই গরুড়ের নাম হইয়াছে। বেদে বিষ্ণুর বাহনের উল্লেখ না থাকিলেও সূর্য্যের বাহনের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ দেখিতেন সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিয়া পশ্চিমে চলিয়া পড়িতেছেন, সুতরাং তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইলেন, সূর্য্যের অশ্ববাহন বা অশ্বযুক্ত রথ আছে। সূর্য্যের কিরণ দ্রুতগামী, তেজোবিশিষ্ট; অশ্বেরও সেই গুণ আছে। তাহার উপর অশ্বের গুণে আর্য্যগণ মুগ্ধ; দ্রুত গমনাগমনের জন্য, যুদ্ধে ব্যবহারের পক্ষে অশ্বতুল্য উপকারী জীব তাঁহারা পান নাই, (৫) তাঁহাদিগের নিকট অশ্ব শ্রেষ্ঠ বাহন। মানব দেবতাকে আপনার আদর্শেই কল্পনা করে। আর্য্যগণ

১। ভাষ্যকার তার্ক্ষ্যকে 'সুপর্ণ' বলিয়াছেন এবং ঐ সূক্তে অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাস্ক তার্ক্ষ্যকে মধ্যমস্থান দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং তিনি ইন্দ্র বা বায়ুর প্রকারভেদ বা রূপান্তর মাত্র। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ইন্দ্রের ষড়বিংশ নামের মধ্যে তার্ক্ষ্য নাম আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৬৬।৩৯) গরুড় ও অরুণকে আদিত্যগণের মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইন্দ্রও একজন আদিত্যকশ্যপ পুত্র। সুতরাং তার্ক্ষ্য ইন্দ্র-গরুড় উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

২। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে যজ্ঞের গ্রামনী ও সেনানী তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি শরতের দুই মাস বুঝাইতেছে। পুরাণ অনুসারে তাঁহারা হেমন্তের দুই মাস সূর্য্যরথে বাস করেন।

৩। বেদের আদিত্য সংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশে পরিণত হয়। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে যে বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ কিন্তু গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে বোধ হয় তিনিই আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বশেষে প্রবেশলাভ করেন।

৪। গরুড়ের জন্মকালে তাঁহাকে মহাভারতে প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৫। প্রাচীন আর্য্যরাজ্য মিতান্নি এককালে পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে

যখন অশ্বকে বাহন করিলেন তখন তাঁহারা পূজনীয় প্রধান দেবতাগণেরও ঐ বাহন কল্পনা করিলেন। সেইজন্য ইন্দ্রের বাহন হরি, সূর্য্যের বাহন হরিৎ, বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ।

বেদে সূর্য্যের বাহন অশ্ব কিন্তু মহাভারতে বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের বাহন পক্ষী।[১] ইহার অপ্রধান কারণ মনে হয়—বেগ হিসাবে পক্ষী অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, (১) যদিও আকার হিসাবে হীন। সুতরাং যদি আকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষী বাহনের রাজা হইতে পারে। গরুড়ের আকৃতি ও ক্ষমতা ভয়াবহই হইয়াছিল, আর এরূপ হওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছিল। বৈদিক যুগে ইন্দ্রের প্রাধান্য যত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহার কিছুই ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে ইন্দ্র নামে মাত্র দেবেন্দ্র; উহা বিষ্ণু ও শিবের প্রাধান্যের যুগ। তখন বিষ্ণুর বল এত অধিক হইল যে, বিষ্ণুর বাহনের নিকট সুরপতি ইন্দ্রকেও পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

বাহন হিসাবে পক্ষী যে নগণ্য নহে, তাহা গ্রীক পুরাণ হইতেও জানা যায়। গ্রীকদিগের দেবরাজ জিউসের বাহন ঈগল পক্ষী। মিশর দেশের সূর্য্যদেবতা রা, শ্যেনপক্ষী তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ ছিল। জাপানে সূর্য্য দেবতা নহেন, তিনি দেবী, এক কাক তাঁহার পক্ষী। চীনদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী-অনুসারে ঐরূপ একটী পক্ষী সূর্য্যে বাস করে, তাহার বর্ণ লোহিত, তিন পদ। (২) প্রাচীন পারসীক আবেস্তা গ্রন্থে বিজয় বা বেরেথ্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন)র সহিত একস্থানে 'শ্যেন' পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে। অন্য স্থানে আছে বেরেথ্রঘ্ন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দাঁড়কাক মূর্ত্তি একটি। আর একটি কাহিনী অনুসারে প্রভা যখন দাঁড়কাক-মূর্ত্তিতে যিমকে ত্যাগ করিয়াছিল, মিথ্র (দিবালোক) তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিথ্র সম্বন্ধে আর একটি প্রাচীন কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি যখন ষণ্ডরূপী মহাশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহার হিতৈষী বন্ধু সূর্য্য তাঁহার সাহায্যের জন্য আপনার দাঁড়কাককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদেশে এপোলো সূর্য্যদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। শ্যেন, হংস, দাঁড়কাক তাঁহার পক্ষী বলিয়া পবিত্র বিবেচিত হইত। বৈদিক গ্রন্থে সূর্য্যকে হংস বলা হইয়াছে। কোথাও বা তাঁহাকে দিব্যলোকের সুপর্ণ, শ্যেন, অরুণবর্ণ সুপর্ণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কল্পনাবলে সূর্য্যের সহিত পক্ষীর তুলনা করা সর্ব্বদেশের মানবের পক্ষেই সম্ভবপর।

সূর্য্য রূপীর বিষ্ণু বাহন পক্ষী হওয়ার প্রধান কারণ শ্যেন কর্ত্তৃক সোম আহরণের বৈদিক আখ্যায়িকা। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ সোমের ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা সোম পান করিয়া মত্ত হইতেন এবং সোম বলিয়া উন্মত্ত হইতেন। এই সোম পরে অমৃত উপাধি পান। সোম অমৃত এই বিশ্বাসের ভিত্তি বৈদিক যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল ৮।৪৮।৩। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল সোমের স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। সূক্তগুলি হইতে দেখা যায় ঋষিগণ আত্মহারা সোমের গুণগান করিতেছেন। সূক্তগুলির অনেক স্থলে সোমরসক্ষরণের সহিত শ্যেনপক্ষীর গতির তুলনা আছে এবং সোমকে শ্যেন উচ্চস্থান হইতে লইয়া আসিয়াছে এরূপ বর্ণনাও আছে। এই শ্যেনের আখ্যায়িকা হইতে গরুড়কর্ত্তৃক অমৃত-আহরণের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।

সোম একটি লতা, তাহার পত্র আছে। শ্যেন পক্ষী, তাহার পক্ষ আছে। সুপর্ণ অর্থে সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট কিম্বা সুন্দর পত্রবিশিষ্ট উভয়ের যে কোনটি হইতে পারে। সোমকে অনেক স্থলে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। তাহার উপর সোম উচ্চস্থান মুজবান পর্ব্বতে অবস্থান করেন এ কথাও আছে। পক্ষীও আকাশে বিহার করে। সুতরাং সুপর্ণ সোম যে সুপর্ণ শ্যেন বা শুধু সুপর্ণ অর্থাৎ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরূপে কল্পিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তাহার পর সোমকে সুপর্ণ পৃথিবীতে লইয়া আসিল এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

সোম-আনয়ন সম্বন্ধে যে বৈদিক উপাখ্যান আছে তাহা আলোচনা করিলে তাহার সহিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যাইবে। ঋগ্বেদে আছে যে সোম আনিবার জন্য শ্যেন পক্ষীর মাতা শ্যেনপক্ষীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সোম কৃশানুর বাণের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। (৩) অন্য এক স্থানে আছে শ্যেন আকাশ হইতে সোম আনিবার কালে কৃশানুর নিঃক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার একটি পালক খসিয়া যায় (৪।২৭।৩-৪)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে ঋষি ও দেবগণ চিন্তা করিতেছিলেন সোমকে দিব্যধাম হইতে কিরূপে আনা যায়। অবশেষে তাঁহাদিগের আদেশে ছন্দসমূহ পক্ষিরূপে সোম আনিতে গেলেন। সকলেই অকৃতকাম হইলেন, কেবল গায়ত্রী সোম আনিতে পারিলেন। কিন্তু আসিবার সময় কৃশানু নামে একজন সোমপালের নিঃক্ষিপ্ত তীরে তিনি আহত হ'ন এবং তাঁহার বামপদের একটি নখর ছিন্ন হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার আখ্যায়িকাগুলি হইতে পুরাণের কাহিনীর ভিত্তি আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কদ্রুর নাম, (৪)

যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন মিতান্নির অশ্বারোহী সৈন্যই তাহার বিজয় গৌরবের কারণ।

১। পক্ষীর বেগের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় ১০।৯৯।৬ষ্ঠ ঋকে মরুৎগণের সহিত পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে।

২। এই পদ-সংখ্যার সহিত বৈদিক বিষ্ণুর বা বিষ্ণুর বামন-মূর্ত্তির তিন পাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কল্যাণে চীন দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বৌদ্ধ ভারতবর্ষ, আর তিন প্রভৃতি কয়েকটি সংখ্যা অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। ৯।৭৭।২; এই শ্যেন-জননীই অবশেষে বিনতা হইয়াছেন। ১০।১১।৪ এ আছে অগ্নি শ্যেনকে পাঠাইয়াছিলেন।

৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১) দেখা যায় কাদ্রবেয় (কদ্রুপুত্র)

অশ্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। ঐ পুস্তকে আছে, দেবগণের ইচ্ছা হইল যে সোম আকাশ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসেন। সেই জন্য তাঁহারা সুপর্ণী ও কদ্রু নামে দুইটি মায়া সৃজন করিলেন। দুই জনের মধ্যে কলহ হয়। অবশেষে স্থির হইল তাঁহাদের মধ্যে যিনি অধিক দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবেন, তিনিই অপরকে লাভ করিতে পারিবেন। সুপর্ণী বলিলেন, "সলিলরাশির পারে যুপকাষ্ঠে বদ্ধ একটি শ্বেত অশ্ব রহিয়াছে।" কদ্রুর দৃষ্টিশক্তি আরও তীক্ষ্ণ। তিনি অশ্ব ত' দেখিলেনই, তাহার পর তাহার পবনে আন্দোলিত পুচ্ছও দেখিলেন। সুপর্ণী গিয়া দেখিয়া আসিলেন কদ্রুর কথাই সত্য। কদ্রু বলিলেন, "দিব্যলোকে সোম রহিয়াছে, তুমি তাহা আনিয়া মুক্তিলাভ কর।" সুপর্ণী ছন্দসকলকে প্রসব করিলেন, (১) এবং গায়ত্রী স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিলেন, সুপর্ণী মুক্তিলাভ করিলেন (৩।৬।২।২-৯, ১৫)। যখন গায়ত্রী সোম আনিতেছিলেন তখন গন্ধরহিত একজন তীর নিঃক্ষেপক তাঁহার একটি পালক বা সোমের একটি পত্র (২) ছেদন করিয়াছিলেন (৩।৩।৪।১০)। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই বিবরণ আছে (৬।১।৬)। তথায় উল্লেখ আছে যে কাহার রূপ অধিক ইহা লইয়া কদ্রু ও সুপর্ণীর মধ্যে কলহ হইয়াছিল।

পৌরাণিক গরুড়-কাহিনীর পূর্ণ বিকাশ মহাভারতে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড ব্রাহ্মখণ্ড ও নাগরখণ্ড হইতেও গরুড়ের কাহিনী পাওয়া যাইতে পারে। আদিপর্ব্বে আছে—বালখিল্য মুনিগণের আকার ও ক্ষমতার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া ইন্দ্র উপহাস করিলে পর তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নূতন ইন্দ্র-সৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করেন। তাহার পর কশ্যপ মধ্যস্থ হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করেন ও পত্নী বিনতার গর্ভে পক্ষিকুলের ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করেন।

কশ্যপ প্রজাপতির দুই কন্যা কদ্রু ও বিনতাকে বিবাহ করেন। কশ্যপের বরে কদ্রুর সহস্র নাগপুত্র জন্মে। বিনতারও দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য প্রথম পুত্র অরুণ অঙ্গহীন হ'ন। তিনি পরে সূর্য্যের সারথি হইয়াছিলেন। বিনতার দ্বিতীয় পুত্র গরুড়।

কদ্রু ও বিনতা একদিন অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবাকে দূরে দেখিয়া তাহার পুচ্ছের বর্ণ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বিনতার মতে পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, কদ্রুর মতে তাহা কৃষ্ণবর্ণ। স্থির হইল, যাহার কথা মিথ্যা হইবে সে অন্যের দাসী হইবে। কদ্রুর আদেশে তাঁহার নাগপুত্রগণ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া রহিল। ফলে পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ হইল। বিনতা পরাজিত হইয়া কদ্রুর দাসী হইলেন। ইহার পর গরুড়ের জন্ম।

প্রকাণ্ড আকার ও প্রভূত-পরাক্রমশালী হইয়াও গরুড়কে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের দাসত্বস্বীকার করিতে হইল। সে বল যে কি প্রচণ্ড তাহা গজকচ্ছপ-ভক্ষণ ও বটশাখা-ধারণের বৃত্তান্ত হইতে কিছু কিছু জানা যায়। বীরপুত্র মাতার নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার দাসত্ব-মোচনের সর্ত্ত জানিতে চাহিলে নাগগণ কহিল যে অমৃত আনিয়া দিতে পারিলে মাতাপুত্র মুক্ত হইবেন। অমরগণ অমৃতরক্ষার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। তথাপি গরুড় তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নিব্যূহ, ঘূর্ণ্যমান চক্র ও রক্ষক সর্পদ্বয়কে ব্যর্থ করিয়া অমৃতহরণ করিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বরবিনিময় করিলেন। ফলে গরুড় অমরত্ব লাভ করিলেন এবং বিষ্ণুর বাহন হইলেন। বিষ্ণু গরুড়ধ্বজ হইলেন।

বিজয়ী গরুড় যখন অমৃত লইয়া প্রস্থান করিতেছিলেন তখন ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপ করিলেন। অক্ষতদেহ গরুড় দেবেন্দ্রের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়া পক্ষের একটি সুরূপ পত্র ত্যাগ করিলেন। এইজন্য মহাভারতে তাঁহাকে আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে 'সুপর্ণ'। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে নাগগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করিলেন অমৃত নাগগণকে পান করিতে দিবেন না। গরুড় অমৃত লইয়া গিয়া মাতাকে মুক্ত করিলেন। অমৃত কুশের উপর থাকিল। নাগগণ তাহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র তাহা হরণ করিলেন। নাগগণ শূন্য কুশ লেহন করিয়া খণ্ডজিহ্ব হইল।

মহাভারতে লিখিত গরুড়ের সম্বন্ধে অন্যান্য আখ্যায়িকার অবতারণার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে গায়ত্রী সোম আনিয়াছিলেন। গায়ত্রীর সহিত সূর্য্যের সম্পর্ক আছে। বেদ-ও-পুরাণ-অনুসারে সূর্য্যের রথে সাতটি অশ্ব। ইহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা—গায়ত্র্যাদ্যমুখ সাতটি ছন্দই সূর্য্যের সাত অশ্ব। এখনও গায়ত্রী মন্ত্র যাহা পাঠ করা হয় তাহা সূর্য্যেরই স্তব। বৈদিক যুগে সোমের সহিত গায়ত্রীর সম্পর্ক—সম্বন্ধে একজন পণ্ডিতের মত-গায়ত্রীচ্ছন্দে সূত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পর্ব্বত প্রদেশ হইতে সোমকে আনয়ন করা হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় যে সোমের প্রাতঃসবণে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রয়োজন হইত। গায়ত্রীকর্ত্তৃক সোম-আনয়নের আখ্যায়িকাই যে গরুড়ের কাহিনীর মূল তাহা পুরাণের যুগেও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। বৈদ্যগ্রন্থে সোমলতার বিভিন্ন নামগুলির

অর্ব্বুদ নামক সর্পদেহ মহর্ষি সোমাভিষবের সময় গ্রাব বা পাষাণখণ্ডের স্তুতিপাঠ করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্পরাজ একজন অর্ব্বুদের নাম পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে অর্ব্বুদির নাম পাওয়া যায়। ভাষ্যে তাঁহাকে সর্প-ঋষি অর্ব্বুদের পুত্র বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও কদ্রু রমণী। পৌরাণিক কদ্রুকাহিনীতে সম্ভবতঃ সর্পদেহ ঋষি কাদ্রবেয় অর্ব্বুদ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ও সর্পরাজ কাদ্রবেয় অর্ব্বুদ (শতপথ ব্রাহ্মণ)এর কাহিনী মিশিয়া গিয়া কদ্রু সর্পজননীতে পরিণত হইয়াছেন। অর্ব্বুদ নামে কদ্রুপুত্র এক সর্পের নামও পাওয়া যায়।

১। ঐ স্থলেই বলা হইয়াছে সুপর্ণী বাক্। সুতরাং তিনিই ছন্দোজননী।

২। পর্ণ বলিতে পালক ও বৃক্ষপত্র দুই-ই হয়।

মধ্যে গরুড়াহৃত ও গায়ত্রী নামও পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে (৬৯ অঃ) গায়ত্রীআদি ছন্দ বিনতার সন্তানগণের মধ্যে পরিগণিত; এই বিনতাই সুতরাং ছন্দোজননী বা বাক্ বা সুপর্ণী। অধিকাংশ পুরাণে সুপর্ণী নাম নাই, তাহার স্থলে বিনতা আছে। (১)

গরুড়েয় সহিত অমৃতরক্ষকদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। মহাভারতের এই স্থলে গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির উল্লেখ আছে। ইহাও বৈদিক উপাখ্যানের স্মৃতির ভগ্নাবশেষ। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে গন্ধর্ব্বগণ সোমের রক্ষক; অন্যত্র আছে অগ্নি সোমের রক্ষক (১০।৪৫।৫)। গন্ধর্ব্বগণ বাণ-নিঃক্ষেপকারী ইহারও উল্লেখ আছে। বেদে ও ব্রাহ্মণে কৃশানুর নাম আছে, তাঁহার শরেই গায়ত্রীর পালক বা নখর ছিন্ন হইয়াছিল। মহামতি সায়নাচার্য্যের মতে কৃশানু একজন সোমরক্ষক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার সহিত গরুড়ের প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপকারী ইন্দ্রের কোন সম্বন্ধ নাই। ঋগ্বেদে একস্থলে কৃশানুকে দেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিধানে কৃশানু অগ্নির একটি নাম। বায়ুপুরাণে কৃশানুকে 'সত্রাড়গ্নি' বলা হইয়াছে।

গরুড় অমৃত আনিয়া কুশের উপর রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে সোমকে কুশের উপর স্থাপন করা হইত। গরুড়ের জন্মপ্রসঙ্গে পুরাণে বালখিল্যমুনিগণের অবতারণা কেন হইয়াছে বুঝা গেল না। ঋগ্বেদে বালখিল্য সূক্ত কতকগুলি আছে। সে গুলির অধিকাংশ ইন্দ্রের স্তুতিগান পুরাণে বালখিল্য মুনিগণ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন; কোন কোন পুরাণের মতে তাঁহারা ক্রতু এবং সন্নতির পুত্র। তাঁহারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কুশ সংগ্রাহক ও নিয়ত সূর্য্যরথবাসী। তাঁহারা সূর্য্যের সহচর—সূর্য্যের সহিত তাঁহাদের এইটুকু সম্বন্ধ বুঝা যায়।

গরুড়ের কীর্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। অমৃত আহরণের পূর্ব্বে গরুড় নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহারা হরিভক্তিহীন কোন জাতি। বিষ্ণু-পুরাণ হইতে জানা যায় ব্রাহ্মণগণ হরিদ্বেষী অত্যাচারী রাজা বেণকে হত্যা করিয়াছিলেন। বেণের এক পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ ও নিষাদের সন্ততিগণ পূর্ব্বপুরুষ বেণের ন্যায়ই দেবদ্বেষী। এ স্থলে বিষ্ণুভক্ত গরুড়ের সহিত নিষাদগণের শত্রুতার উল্লেখ করা পুরাণকারের পক্ষে অসম্ভব নহে। (২)

গরুড়ের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বৃহৎকায় গজকচ্ছপের অবতারণা করা হইয়াছে। মহাবল মহাকায় গরুড় যদি অতিকায় জন্তু না বহন করেন তবে তাঁহার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। গজ-কচ্ছপের আখ্যায়িকাটি সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের গজকুম্ভীরের আখ্যায়িকার ন্যায় রূপক নহে।

উদ্যোগপর্ব্বে (১০৫অঃ) গরুড় বলিতেছেন তিনি ক্রোধবশী, ক্রুদ্ধ সেন, বিবস্বান, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষ প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিয়াছিলেন। এ সকলের বিবরণ কিছু নাই। ইহা ব্যতীত আর দুইটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে গরুড়কে পরোপকারী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মহামুনি গালব যাহাতে বিভিন্ন রাজার নিকট হইতে অভিলষিত দান গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে পারেন সেইজন্য গরুড় মুনিবরকে লইয়া নানা দেশে গিয়াছিলেন। এই পরোপকারবৃত্তি গরুড়ের বংশগত ধর্ম্ম; ইহার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বৃত্র অকাতরে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গরুড়ের আর একটি কার্য্য—রামলক্ষ্মণকে নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করা। (৩) রামায়ণে আছে যে গরুড়ের স্পর্শে রামলক্ষ্মণের দেহে সর্পশরজনিত ক্ষতসকল দূর হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৫০ সর্গ)। নানাগ্রন্থে গারুড়ী মন্ত্রের প্রভাবের উল্লেখ আছে। সর্পভয় নিবারণের জন্য এখনও আমরা গরুড়ের নাম করি। গরুড় নাগগণের ভক্ষক, সুতরাং নাগবিষ-দমনের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তাহার উপর তিনি সূর্য্যরূপী বিষ্ণুর বাহন। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী মহাশয় 'সূর্য্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে (বামাবোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) দেখাইয়াছেন যে আর্য্যগণ বৈদিককাল হইতেই সূর্য্যের ত্বগ্‌দোষনাশক ক্ষমতার কথা জানিতেন। আলোচনার উদ্দেশে ঐ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়ের 'নেচারের কথা' হইতে ব্লক্ সাহেবের লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্লক্ সাহেব গরুড় ও পারস্যদেশের সিমুর্গ্ পক্ষীর তুলনা করিয়াছেন। সিমুর্গ্ পক্ষীর জন্য বীর রুস্তমের আঘাত আরোগ্য হইয়াছিল। (৪) রামায়ণে রামলক্ষ্মণের আঘাতও সেইরূপ আরোগ্য হইয়াছিল।

১। মহাভারতের স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে বিনতাকে 'সুপর্ণী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাক্ষের (কশ্যপের) (কশ্যপের) চারি পত্নী—বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী, যামিনী, তন্মধ্যে সুপর্ণা (বিনতা) গরুড়কে প্রসব করেন। মনে হয় বৃহদ্দেবতাও মহাভারতে সুপর্ণী স্থলে বিনতার নাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী (দক্ষকন্যা)র মধ্যে বিনতার সহিত কদ্রুরও নাম পাওয়া যায় এবং কশ্যপের পত্নীগণ হইতে গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, পক্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও বলা হইয়াছে।

২। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে নিষাদগণ সম্ভবতঃ ভারতেরই অধিবাসী কোন আদিম জাতি। তাহা হইলে গরুড় কর্ত্তৃক তাহাদের হিংসা হয়ত' আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যের বিবাদের কাহিনীর একটি অংশ।

৩। যিনি যখনই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, গরুড়ই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে বলি এবং অনিরুদ্ধ মুক্তিলাভ করেন।

৪। পারস্যকবি ফার্দ্দেসি লিখিয়াছেন রুস্তমের পিতা জাল সিমুর্গ্ পক্ষীর দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রুস্তমের জননীর পার্শ্বদেশ বিদারণ করিলে পর রুস্তম জন্মগ্রহণ করেন। সিমুর্গের পালকের স্পর্শে এই ক্ষত বিলুপ্ত হয়। রুস্তম যুদ্ধে আহত হইয়া এইরূপ পালকের স্পর্শে নিরাময় হন। শাহনামার সিমুর্গ্ পক্ষীর পালকের এই রোগনাশকারী ক্ষমতার কাহিনী আবেস্তাগ্রন্থ হইতে গৃহীত। সিমুর্গ্ পক্ষী আবেস্তার বরেঙ্গানা (শ্যেন বা দাঁড়কাক)র

গরুড়ের চরিত্রে এইরূপে কোমল কঠোর গুণের সমাবেশ হইয়াছে। গরুড়কে মহাপুরুষোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়া পুরাণকারগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পুরাণে বড় বড় দেবগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। গরুড় বাহন, তাঁহারও দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। ইন্দ্র সারথি মাতলি যখন কন্যার জন্য পাত্র-অন্বেষণ করিয়া সুমুখ নামক নাগকে সুপাত্র বলিয়া স্থির করিলেন, তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু গরুড়ের সহিত নাগগণের জাতিগত বৈরভাব অবগত করিয়া, পূর্ব্বসন্ধি বিস্মৃত হইয়া সুমুখকে অমরত্ব প্রদান করিলেন। এ ক্ষেত্রে গরুড়ের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। যখন গরুড় ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া দর্পপ্রকাশ করিতেছিলেন তখন বিষ্ণু আপনার বাহুভারে গরুড়কে ক্লিষ্ট করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন। গরুড় তপোরতা শাণ্ডিলীকে অপমান করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার পক্ষসকল খণ্ডিত হইয়া দেহ মাংসপিণ্ডবৎ হইয়াছিল। এইরূপে দ্বিতীয় বার গরুড়ের স্পর্দ্ধা চূর্ণ হয়। গরুড় অমৃতময়দ্বারা শাণ্ডিলীকে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বপক্ষলাভ করেন। ইহা মহাভারতের বৃত্তান্ত; স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে আছে মহাদেবের কৃপায় গরুড়ের পক্ষোদ্গম হয়।

সুযোগ পাইলে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ভারতের গরুড়-কাহিনীর সহিত বায়ুপুরাণে (৬৯ অঃ) গরুড়ের পত্নীগণের নাম আছে—ভাসী, ক্রোঞ্চা, ধৃতরাষ্ট্রী প্রভৃতি গরুড়ের পঞ্চভার্য্যা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কয়েক-জনের নাম সুমুখ, সুরূপ, সুরস, বল ইত্যাদি। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে (১০১ অঃ) তাঁহার সুমুখ, সুনেত্র, সুবল প্রভৃতি ছয়জন পুত্রের নাম আছে। অন্যান্য দেশের পৌরাণিক কাহিনীর তুলনা, গরুড়ের মূর্ত্তি ও অন্যান্য বৃত্তান্তের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয় কেন?

শ্রীজলধরবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস

ব্যাঙ্ক জিনিষটা ভারতবর্ষে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানের মত সর্ব্বজন-পরিচিত না হইলেও, যাঁহারা একটু ব্যবসা বাণিজ্য করেন বা উহার খোঁজ রাখেন, তাঁহাদের অনেকেরই অজ্ঞাত নহে। আবার ব্যাঙ্ক জানা থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে তাহা যে একটা সর্ব্বনাশকর ঘটনা, এ কথা গ্রামের কৃষককেও বুঝাইতে হয় না। ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে, বা ব্যাঙ্কের কি কি কাজ, এ কথা নূতন করিয়া বিস্তৃতভাবে বলিবার অবসর আমাদের নাই। পূর্ব্বে এই পত্রিকায়ই তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। * তবে মোটামুটি, টাকা লইয়াই ব্যাঙ্কের কারবার। এই টাকার লেনাদেনা বিশ্লেষণ করিলে ধার নেওয়া এবং ধার দেওয়ায় দাঁড়ায়।

মনে করুন, একজন লোক ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া টাকা রাখিয়াছেন। যিনি টাকা রাখিয়াছেন, তিনি হইতেছেন ব্যাঙ্কের পাওনাদার, আর ব্যাঙ্ক হইল তাহার দেনাদার। এইরূপ যত লোক ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, তাহারা সকলেই ব্যাঙ্কের পাওনাদার বা উত্তমর্ণ; অর্থাৎ ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট ধারিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের সাধারণের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করার মধ্যে আবার প্রকার-ভেদ আছে। ব্যাঙ্ক কতকগুলি টাকা এই সর্ত্তে ধার করে, যাহা চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে হয়, এবং উত্তমর্ণের হুকুমমত তৃতীয় ব্যক্তিকে দিতে হয়। ইংরাজি Current accountএর বাংলা তর্জ্জমায় যাহাকে "চল্‌তি হিসাব" বলে। সেই হিসাবের টাকাগুলিই এই সর্ত্তে জমা রাখা হয়। অবশ্য যাহার ৫০০০৲ জমা আছে, সে ৫০০৲ চাহিলে বা চেক্ (cheque) কাটিয়া কাহাকেও দিতে বলিলে ৫০০৲ টাকাই দিতে হয়, সব টাকা দিবার কোন প্রয়োজন বা আইনের বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মোক্কেল (constiuent) যদি এক চেকেই ৫০০০৲ টাকা কাটিয়া বসে, তাহা হইলে সমস্ত টাকাই একসঙ্গেই দিতে হইবে, কিছু কম করিয়া দিলে চলিবে না।

ইহা ব্যতীত আর একরকম হিসাবেও একসঙ্গে সমস্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যায়; তাহার নাম সেভিংস হিসাব। বাংলায় "উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব" বলা যাইতে পারে। পোষ্টাফিসের অনুগ্রহে সেভিংস বা উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব আর কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না। তবে এই হিসাবে সপ্তাহে একবারের বেশী সাধারণতঃ টাকা তুলিতে দেওয়া হয় না, যদিও দিনে পাঁচবার জমা দিলেও তাহাতে ব্যাঙ্কের কাহারও আপত্তি করিবার সম্ভাবনা বড় বেশী নাই। ইহার আর এক অসুবিধা এই যে (যদিও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন নিয়ম) খুব বেশী টাকা এই হিসাবে রাখিতে দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ ৫০০০৲ হইতে ১০,০০০৲ এর বেশী টাকা কোন ব্যাঙ্কই এইরূপ হিসাবে রাখিতে রাজি নয়। এইস্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, সমস্ত ব্যাঙ্কই মোক্কেলগণকে এইরূপে হঠাৎ, একসঙ্গে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইবার পুরোপুরি ক্ষমতা দেয় না। আমি এক ব্যাঙ্ক জানি, যাহাদের নিয়ম হইতেছে যে, একবারে ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত কেহ তুলিতে পারিবে না। আবার অপর এক ব্যাঙ্ক সপ্তাহে একবারে ১০০০৲ পর্য্যন্ত তুলিতে দেয়। প্রথমোক্ত ব্যাঙ্ক একটু বেশী হুসিয়ার ও কড়া; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ব্যাঙ্কের নিয়ম বোধ হয় খুব অসুবিধাজনক নহে। যাহা হউক, উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবে ব্যাঙ্কের দেনার দায়িত্ব এইরূপ।

নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বেশী সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের ভাষায় ইহার নাম স্থায়ী জমা (Fixed Deposit)। তিন, ছয় বা নয় মাসের কিম্বা একৎসরের জন্য সাধারণতঃ স্থায়ী জমা গ্রহণ করা হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যাঙ্কের কোনটাই দুই বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য স্থায়ী জমা গ্রহণ করে না। বঙ্গদেশের লোন

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। আবেস্তাগ্রন্থে আছে অহুর মজ্‌দ জরথুষ্ট্রকে উপদেশ দিতেছেন যে ঐ পক্ষীর পালক অঙ্গে ঘর্ষণ করিলেই তিনি শত্রুর মন্ত্রে উৎপন্ন অসুখ হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

* মৎলিখিত "ব্যাঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ভারতবর্ষ।

আফিসগুলি পাঁচ বৎসরের জন্যও স্থায়ী জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের টাকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য লগ্নি (Investment) হয় বলিয়াই ইহারা বেশী দিনের জন্য স্থায়ী জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রকারের হিসাবে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পরে সুদসহ আসল টাকা উত্তমর্ণকে ফিরাইয়া দেওয়া। নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে টাকা ফিরাইয়া লইবার আইনতঃ অধিকার উত্তমর্ণের নাই; এজন্য স্থায়ী আমানতে ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে চলিবে না; কারণ, সেদিন উত্তমর্ণের সুদসহ আসল ফিরাইয়া পাইবার অধিকার জন্মে।

আমরা তিন প্রকারের হিসাবে ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ফিরাইয়া দিবার বিভিন্নরূপ দায়িত্ব দেখিলাম:—(১) চল্‌তি হিসাব—যে কোন সময়ে ব্যাঙ্ককে টাকা পরিশোধ করিতে হইতে পারে; (২) উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব—সপ্তাহে যে কোন দিন সমস্ত টাকা বা নিয়মানুযায়ী বৃহত্তম সংখ্যক টাকা পরিশোধ করিতে হইতে পারে; (৩) স্থায়ী আমানত—নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত টানাটানি পড়িলে ১০।১৫ দিনের জন্যও ব্যাঙ্ক কর্জ্জ করিয়া থাকে। এমন কি সময় সময় ২৪ ঘণ্টার চিঠিতে পরিশোধ করিবার সর্ত্তেও ব্যাঙ্ককে ধার করিতে হয়।

ব্যাঙ্ক একটা মহাজনী ব্যবসায়ের ব্যবস্থা। তাহাকে সুদে ধার করা টাকা সুদে না খাটাইলে উঠিয়া যাইতে হয়। শুধু তাহা নহে, তাহার টাকা এরূপভাবে খাটাইতে হইবে যে, জমা টাকার উপর কেবলমাত্র সুদ দিলেই চলিবে না, কর্ম্মচারীর মাহিনা, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি নানা খরচ দিয়াও অংশীদারগণকে (Share holders) লাভ দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি অতিরিক্ত লাভ হইতে ব্যাঙ্কের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য রিজার্ভ ফণ্ড (Reserve Fund) তৈয়ার করিতে হইবে। রিজার্ভ ফণ্ডকে "অবণ্টনীয় গচ্ছিত লভ্যাংশ" বলিলে বোধ হয় চলে। ব্যাঙ্ককে এক দিকে যেমন লাভ করিতে হইবে, অন্য দিকে তেমনি লোকসান এড়াইয়া চলিতে হইবে; কারণ, দশটী লোককে কর্জ্জ দিয়া যে টাকা সুদে লাভ হইবে, একটা কর্জ্জের টাকা মারা গেলে তাহার দ্বিগুণ লোক্‌সান হইয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক টাকা লইয়া কারবার করে, প্রত্যেক লোক্‌সানই ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকার লোক্‌সান, এ কথা, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

অংশীদারের টাকা বা মূলধন ও জমার অর্থ হইতেই ব্যাঙ্ক ধার দেয়। কিন্তু এই মূলধন ও জমার টাকার সমস্তটা কর্জ্জ দেওয়া চলে না। হাতে কতকটা রাখিতে হয়, কারণ জমার কতক অর্থ যথা চল্‌তি ও উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাবের টাকার উপর যে কোন সময়ে চাহিদা আসিতে পারে। যদিও সমস্ত টাকাটাই প্রত্যহ সকলে মিলিয়া চায় না, তথাপি একটা মোটা টাকা হাতে রাখিতে হয়; কারণ, ব্যবসায়ের নাড়ী কিছু সকল সময় ঠিক থাকে না বা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। হুসিয়ার বেশী হইলে হয় ত একটু কম টাকা খাটে এবং কম লাভ হয়, কিন্তু উল্টা দিকে ভুল করিলে যে, দিনে জ্বালবাতি জ্বলে তাহাতে অন্ধকার ব্যতীত আলো হয় না। তাই ব্যাঙ্ককে শুধু ভাল বন্ধকী রাখিয়া কর্জ্জ দিলে চলে না হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা রাখিতে হয়; কারণ, সর্ত্তানুযায়ী টাকা না দিতে পারিলেই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গেল। পঞ্চনদের পিপ্‌ল্‌স্ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে পর, ইহার সম্পত্তি বেচিয়া দাদনের টাকা আদায় করিয়া গচ্ছিত প্রতি টাকায় ষোল আনার অধিক দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ব্যাঙ্কের ফেল হওয়া কিছু আটকায় নাই।

ব্যাঙ্কের যিনি ম্যানেজার বা কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহার এই সর্ত্তরক্ষার কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। হাতে উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা না রাখিতে পারিয়া ব্যবসায়ের সর্ত্তানুযায়ী চাহিবা মাত্র দেনা পরিশোধ না করিতে পারিলে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায়। তবে কোন্ ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন্ সময়ে কি পরিমাণ অর্থ "উপযুক্ত", তাহা দেশকাল অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের প্রতিভাই বিচার করিতে পারে, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দ্বারা তাহা স্থির করা সম্ভব নহে।

ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দেয় নানারূপ দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া। সোণার গয়না বাঁধা রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া লোন আফিসের কাজ হইলেও, সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কাজ নহে। বাড়ীঘর বাঁধা রাখিয়াও ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিতে বিশেষ উৎসুক নহে; কারণ তাহাতে টাকাটা আট্‌কা পড়িয়া যায়; এবং অধমর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, আইন আদালতের সাহায্য লইতে হয় ও তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক এরূপ সমস্ত দ্রব্য বন্ধক রাখে, যাহা সকল সময় বিক্রয় করিয়া কর্জ্জের টাকা ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব। কোম্পানীর কাগজ (Government Security) বাজারে সব সময়ই বিক্রয় করা চলে; কারণ, ইংরাজ সরকার যতদিন আছেন ততদিন উহার মার নাই। আর সরকারের উঠিয়া যাইবারও ভয় নাই বলিয়া ইহার দরও বিশেষ উঠা নামা করে না। টাকার বাজারে সুদের হার বাড়ে ও কমে; এইজন্যই কোম্পানীর কাগজের দর যাহা একটু পড়ে চড়ে। সুতরাং ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কোম্পানীর কাগজ বন্ধ রাখিয়া কর্জ্জ দেয়।

ইহা ব্যতীত মিউনিসিপালিটীর কাগজ ও পোর্ট ট্রাষ্টের কাগজ বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ধার দেয়। ইহাদের ইংরাজি নাম হইতেছে Municipal Loans বা Bonds এবং Port Trust Debenture ইত্যাদি। এগুলি পুরোপুরি সরকারের কাগজ না হইলেও আধা সরকারী ত বটে, এজন্য ভয় নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কের নিকট ইহাদের আদর প্রায় কোম্পানীর কাগজের সমান। ইহাদের কেনা বেচ সম্বন্ধেও কোন অসুবিধা নাই, সকল সময়ই বিক্রয় করিয়া অর্থ ফিরাইয়া পাইবার সুবিধা আছে।

কেবলমাত্র কোম্পানীর কাগজ বা মিউনিসিপাল ও পোর্ট ট্রাষ্ট কাগজ বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিতে গেলে, ব্যাঙ্কের ব্যবসা চলে না। তাহাকে নানা সমবায় কোম্পানীর অংশ জমা রাখিয়া ধার দিতে হয়। সেয়ার বাজারে পাটের কল, কয়লার খনি, চা

বাগান, রাসায়নিক কারখানা, তৈলের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারবার প্রভৃতির অংশের কেনা বেচা হয়। ব্যাঙ্ক এই সমস্ত অংশ (shares) জমা রাখিয়াও ধার দেয়। অবশ্য ইহাদের সকলগুলির আদর কিছু ব্যাঙ্কের নিকট সমান নহে। পাটের কলের সবগুলি সমান লাভ করে না বা দেয় না, সকলের আবার সমান "অবণ্টনীয় গচ্ছিত লভ্যাংশ" নাই। তাহার উপর কতকগুলি কোম্পানী আবার সুতন, অংশের মূল্যের সমস্ত আদায় হয় নাই। ইহাদের অনেকে আবার যথেষ্ট লাভ করে না বা লভ্যাংশ দেয় না। সুতরাং বাজারে এগুলির দর সুবিধাজনক নহে (কম); কারণ, ইহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

যে সকল কোম্পানীর অংশ বাজারে সব সময় কাটে এবং যে সকল কোম্পানী বহুদিন পর্য্যন্ত অংশীদারগণকে লাভ দিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত "সেয়ারে" ব্যাঙ্ক বাজার দরের শতকরা কতকাংশ (যথা ৫০) কর্জ্জ দেয়। শতকরা যতটা অংশ ব্যাঙ্ক ধার দেয় না, তাহা হইতেছে হাতের Margin। কোন কারণে বন্ধকী অংশগুলির বাজার-দর কমিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাঙ্ক তাগাদা দিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে টাকা আদায় আরম্ভ করে এবং যাহাতে হাতের Margin ঠিক থাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখে। এইরূপে ব্যাঙ্ক সেয়ার বাজারের নানারূপ অংশ (shares) রাখিয়া টাকা লগ্নি করে। যে সেয়ার যত নিকৃষ্ট, তাহাতে তত বেশী Margin রাখা হয়। ব্যাঙ্কের কখনও এক প্রকার সেয়ারেই অধিক পরিমাণ কর্জ্জ দিতে নাই; কারণ, বিশেষ কোন কারণে ঐ বিশেষ ব্যবসায়েরই ক্ষতি হইতে পারে; তখন হঠাৎ বাজার দমিয়া গেলে ব্যাঙ্কের বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার গোড়ার কারণ, ব্যাঙ্ক অনেক সময় যথেষ্ট Margin রাখিয়া কর্জ্জ দেয় না। যখন বাজার পড়িতে থাকে, তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্জ্জের পরিমাণ অংশের দামের পরিমাণ ছাড়াইয়া যায়। সেই অবস্থায় বন্ধকী অংশগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে গেলে, বাজার আরও দমিয়া যায় ও ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যথেষ্ট Margin রাখিয়া ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সর্ব্বদা অংশের বাজার দরের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া অনেক ব্যাঙ্কের দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক কারবার ও কারখানা বন্ধক রাখিয়াও কর্জ্জ দিয়া থাকে। এইরূপ কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে তেমন নিরাপদ নহে; কারণ কারবার ও কারখানা অপরের হাতে থাকে এবং সর্ব্বদা তাহা পাহারা দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ঐ সমস্ত পরিচালন বিষয়ে ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ নহে, তাহাকে পরের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ নির্ভর করিতে হয়। এই প্রকারের কর্জ্জ প্রায়ই আটকা পড়ে (Locked up) এবং সহজে টাকা ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। খুব হুসিয়ার হইয়া ব্যাঙ্ককে এরূপ ভাবে টাকা দাদন করিতে হয়। এই ভাবে টাকা আটকা পড়িয়া যাওয়ায়, অনেক ব্যাঙ্ককে অকালে লীলা শেষ করিতে হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণকে অল্প সময়ের জন্য কর্জ্জ দিয়া থাকে। ব্যবসায়ীগণ যে ব্যাঙ্কের নিকট হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া থাকেন, ইহা আর কিছুই নহে—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অর্থ ফিরাইয়া দিবার চুক্তিতে কর্জ্জ করা। হুণ্ডীর উপর টাকা দেওয়ার আর একটা সুবিধা এই যে, একক্রমে কিছুকাল হুণ্ডী ভাঙ্গাইলে পরে, হুণ্ডীগুলির পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রমশঃই টাকা হাতে আসিয়া পড়িতে থাকে। ব্যাঙ্ক সে টাকা আর খাটাইতে ইচ্ছা না করিলে, আর নূতন করিয়া হুণ্ডী না ভাঙ্গাইলেই হইল। এইরূপে হুণ্ডীর পাওনা সমস্ত টাকা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে। তবে হুণ্ডীর পক্ষগণকে (Parties) খুব ভাল করিয়া জানা দরকার; কারণ, কেবলমাত্র নামের উপরেই কর্জ্জ দেওয়া হয়। আর এক বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, একই মোক্কেলের যেন অনেক হুণ্ডী ভাঙ্গান (Discount) না হয়; কারণ, একটী পক্ষ দেউলিয়া হওয়ার সঙ্গ সঙ্গেই ব্যাঙ্কের বেশী লোকসান হইলে, তাহার অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। এইরূপ ভুল করিয়া অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

বিলাতী হুণ্ডীর (Sterling Bills of Exchange) উপরেও ব্যাঙ্ক ধার দেয়। এইরূপ হুণ্ডীর সুবিধা এই যে ইহার সহিত মাল থাকে। হুণ্ডীর পক্ষেরা দেউলিয়া হইলে বা অর্থ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে মাল বেচিয়া অনেকটা অর্থের পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু একই সময়ে অনেকগুলি বিলাতী হুণ্ডী অগ্রাহ্য হইলে (Dishonoured) এবং তৎসঙ্গে মালের বাজার দর বেশী রকম পড়িয়া গেলে, ব্যাঙ্কের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। ১৯২০ সনের শেষে এক্সচেঞ্জ পড়িয়া গেলে কলিকাতার বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এক্সচেঞ্জের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; সুবিধা হইলে আর একদিন বলিব।

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক ব্যক্তি-বিশেষকে বিনা বন্ধকীতে ধার দিয়া থাকে। বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কেবল মাত্র হাতচিঠা (Pro-note) লিখিয়া দিয়াই কর্জ্জ পাইয়া থাকেন। অধিক পরিমাণে এরূপ কর্জ্জ দেওয়া যে বিপজ্জনক, তাহা বলাই বাহুল্য। একজন উকীল বা ডাক্তারের যত বেশীই আয় হউক, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে সেই আয় একেবারেই লোপ পায় এবং টাকা পুনরুদ্ধারের পথ সন্দেহজনক হইয়া পড়ে। এইরূপে বড় বড় কর্জ্জে আসল হারাইয়া অনেক ব্যাঙ্ককে দ্বাররুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

দ্রব্যের কেনা-বেচার মধ্যে যাওয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য নহে। সেয়ার বাজারের অংশ কেনা-বেচার কার্য্যে ব্যাঙ্কের কখনও যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এই সমস্ত কাজ প্রায়ই একটু Speculative হইয়া থাকে। এমন কি ব্যাঙ্ক যখন বুঝিতে পারিবে যে, মোক্কেল তাহার টাকা লইয়া Speculate করিতেছে, তখন তাহার কর্ত্তব্য হইতেছে সেই কার্য্যে বাধা দেওয়া। বিলাতের বাজারের অধিকাংশ রৌপ্য কিনিয়া তাহা বেশী দামে বিক্রয় করিবে—এইরূপ দুরাশা লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া ইণ্ডিয়ান স্পীসি ব্যাঙ্কের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় দুঃখের কাহিনী। ব্যাঙ্কের

কখনই অনিশ্চিত বেশী আশায় ঘোড়দৌড় খেলিতে (Speculate) যাইতে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ লোকসান অল্পবিস্তর অনিশ্চিতই হইবে। এই অনিশ্চিত ব্যাপারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হুসিয়ার হইয়া ব্যাঙ্ককে কাজ করিতে হয়; কারণ একবার ব্যাঙ্ক টলিলে সমস্ত ব্যবসা টলিয়া উঠে। আর একটা ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেলে, সেইসঙ্গে পাঁচটা ব্যাঙ্ক কাঁপিয়া উঠে, ও যে বিশ্বাসের উপর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কণ্ঠরোধ হইতে থাকে।

ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী অনেকটা উহার কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত। ব্যবসায়ের ইতিহাসে, ডাইরেক্টর ও কর্ম্মচারীগণের অসাধুতার জন্য ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা কিছু কম নহে। এই যে নানাপ্রকার দাদন, লগ্নি বা কর্জ্জের কথা বলিলাম, ইহার সহিত ডাইরেক্টরগণ বা ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন। তখন আর margin রাখিবার বা টাকা আটকাইয়া যাইবার কথা স্মরণ না রাখিয়াই ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিয়া থাকে ও তাহার ফল ভোগ করে। এমনও দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ বেশী লাভের আশায় বেশী সুদে অনিশ্চিত স্থানে টাকা ধার দিয়া ব্যাঙ্ককে ডুবাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মূর্খতা অপেক্ষা অসাধুতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের কর্ত্তব্য তত সহজ নহে। এক দিকে তাহাকে যতটা সম্ভব বেশী টাকা খাটাইতে হইবে। এই টাকা আবার যত বেশী সুদে খাটিবে, তত বেশী লাভ। অথচ বেশী টাকা খাটানোর এবং বেশী সুদ খাওয়ার সহিত বিপদের ঘনিষ্ঠতা কিছু কম নহে। বেশী টাকা খাটাইলেই কম টাকা হাতে থাকে, আর কম টাকা হাতে থাকিলেই, হঠাৎ জমা টাকার উপর টান পড়িয়া বিপদের সম্ভাবনা হয়। আর ভাল বন্ধক (Good Security) ও যথেষ্ট margin রাখিয়া কেহ বেশী সুদে টাকা ধার করে না; সুতরাং বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার মানে অনেক সময় বেশী বিপদ ঘাড়ে করিয়া টাকা দাদন দেওয়া। বেশী সুদের পরিবর্ত্তে অনেক সময় আসল লইয়া টানাটানি পড়িতে পারে। এই মোটা কথাটা ভুলিলে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের চলে না। সুতরাং মোট টাকার (working capital) কতটা খাটিবে ও কিরূপে খাটিবে এবং কতটা হাতে থাকিবে, এ একটা সহজ সমস্যা নহে। এই সমস্যার সমাধান কর্ম্মক্ষেত্রে বসিয়া, কৃতী ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে করিতে হয়।

তবে মোট কথা হইতেছে এই যে, ব্যাঙ্কের পক্ষে হাতের টাকাটাই প্রধান সম্বল। কারণ, দেনা আর কিছু দ্বারাই পরিশোধ করা চলে না। বাড়ী ঘর, কোম্পানীর কাগজ, সোনারূপা, হীরাজহরত, সেয়ার-ডিবেঞ্চার হাজার হাজার হাতে থাকিলেও কোন পাওনাদার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকার পরিবর্ত্তে তাহা লইতে রাজি হইবে না। টাকা আত্মরক্ষার প্রধান সহায়, এই কথা মনে রাখিয়া ব্যাঙ্কের এরূপ ভাবে ব্যবসা করিতে হইবে যে, খুব সহজে সে বন্ধকী দ্রব্যের সাহায্যে টাকা তুলিতে পারে। যখন ব্যাঙ্কের টাকার উপর টান পড়ে, তখন কিছু এক সঙ্গেই সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকাটা কেহ চাহিয়া বসে না। এই প্রথম টান্‌টা হাতের টাকা দ্বারা যোগাইতে হইবে। তাহাতেও যখন না কুলাইবে, তখন ব্যাঙ্কের নিজ হিসাবের কোম্পানীর কাগজের (Investments) সাহায্যে অন্য স্থান হইতে টাকা ধার করিতে হইবে ও টানে যোগান দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্জ্জ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে এবং লগ্নির টাকা মোক্কেলগণের নিকট হইতে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ দুই একদিন চালাইতে পারিলেই সাধারণতঃ ব্যবসায়ের অবিশ্বাস জন্য টাকার টান (Run) বন্ধ হইয়া যায় ও নূতন জমা সুরু হয়। কিন্তু একসঙ্গে একস্থানে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর টান পড়িয়া কোন একটী ফেল হইয়া গেলে, অবিরাম কয়েকদিন ধরিয়াও টান চলিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অপর ব্যাঙ্কগুলিরও অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকা অধিক পরিমাণে আটক পড়িয়াছে বা লগ্নিতে মারা গিয়াছে, তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই টানের সময় ব্যাঙ্ক রীতিমত টাকা দিতে পারিলে আর কেহ টাকা উঠাইতে চাহে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে উদ্‌ভ্রান্ত জনমণ্ডলী টাকা তুলিতে আসিয়া ব্যাঙ্কের জানালায় পুঞ্জীভূত নোটের তাড়া দেখিয়া শান্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আবার এক হাতে টাকা তুলিয়া সেই সময়ই অপর হাতে জমা দিয়া গিয়াছে, ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার।

অবশ্য খুব বেশী রকম টান পড়িলে ব্যাঙ্ককে মোক্কেলের বন্ধকী দ্রব্যগুলি আবার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। তবে এইরূপ কার্য্য বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িলে, ব্যাঙ্কের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। মোক্কেলের বন্ধকীগুলি আবার এরূপ হওয়া দরকার যে, সহজে হস্তান্তরিত করা যায় (Negotiable securities); তাহা না হইলে অপর স্থান হইতেও টাকা পাইবার সম্ভাবনা অল্প। এইজন্যই বুদ্ধিমান ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কখনও আটক দাদনের (Lock up advance) পক্ষপাতী হইতে পারেন না। যে পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্কের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই দোষে দেউলিয়া হইয়াছিল।

তাহা হইলেই দেখা গেল, ব্যাঙ্কের যথেষ্ট টাকা হাতে রাখা দরকার। হাতে অর্থাৎ নিজেদের সিন্ধুকে সমস্ত টাকা রাখিবার দরকার নাই, অপর ভাল ব্যাঙ্কে. যেখান হইতে চাহিবামাত্র পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে রাখিলেও, তাহা হাতে রাখিবারই সামিল।

তার পর কতকগুলি টাকার কোম্পানীর কাগজ নিজ হিসাবে কিনিয়া রাখা উচিত; কারণ, ইহার সাহায্যে টাকা পাওয়া খুব সহজ।

সর্ব্বশেষে টাকা এরূপভাবে লগ্নি করিতে হইবে যে, সহজে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যায়; এবং যতদূর সম্ভব হস্তান্তরিত করার পক্ষে সুবিধাজনক বন্ধকী যথেষ্ট margin রাখিয়া ধার দিতে হইবে। যদিও ব্যাঙ্কের পক্ষে অনেক সময় শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য কতকটা আটক দাদন করিতে হয়, তথাপি তাহার পরিমাণ কোন সময়ই বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আর বন্ধকী ব্যতীত কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে

একেবারেই উচিত নহে। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে সকল সময় এই নিয়ম মানিয়া চলা সম্ভব নহে। অনেক সময় ব্যক্তিগত নামের (credit) উপর ধার দিতে হয়। কিন্তু এরূপ লগ্নির পরিমাণ যত কম হয়, ততই মঙ্গল, তাহাই বলাই বাহুল্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, অনেক প্রকৃতপক্ষে দেউলিয়া ব্যাঙ্কও সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস (confidence) থাকার জন্য অনেক কাল টিকিয়া থাকিতে পারে। আবার অনেক অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যাঙ্কও হঠাৎ বিশ্বাস হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দেউলিয়া হইয়া যায়।

নবযুগ—সমাজ-সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি এ

আজ যুগচাঞ্চল্যের একটা দিকের আলোচনা করিব—তাহা সমাজসমস্যা। এইগুলির আলোচনা কালে পুনরুক্তি প্রায় অপরিহার্য্য। কারণ, একটীর সহিত অন্যটী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত,—একটীর কথা বলিতে হইলেই অন্যটী আসিয়া পড়ে। পুনরুক্তি পরিহার করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।

সমস্ত পৃথিবীতে আজ এই সমাজ-সমস্যা বর্ত্তমান। আমরা বিশেষ ভাবে আমাদের নিজেদের সমাজের কথারই আলোচনা করিব। অবশ্য আজ আর কেহ শুধু নিজের সমাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ সমস্ত জগৎই যেন এক কেন্দ্রাভিমুখে চলিয়াছে। এক দেশের বা সমাজের কথার আলোচনা করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্য দেশের কথাও বলিতে হয়। আজ কোন এক বিশেষ সমাজকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার দিন আর নাই। তবুও যখন আমরা নিজেদের দেশের—নিজেদের সমাজের কথার আলোচনা করিব, তখন আমাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের ন্যায় প্রত্যেক জাতিরই এক একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। যে কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলেই, এই বিশিষ্টতার দিকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা কি নারী-সমস্যা, কি ব্রাহ্ম সমাজ, কি শিক্ষা-সমস্যা। এই বিশিষ্টতাকে বাঁচাইতে না পারিলে সেই ব্যক্তি বা সমাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এখানে এই সম্বন্ধে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আজকাল যে মহামানব বা বিশ্বমানবের কথা উঠিয়াছে, তাহাতে যেন এই স্বাতন্ত্র্যকে ছাঁটিয়া কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখা যায়। উহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আর যদি হয়, তবে মানব-সমাজের গতি প্রতিহত করিয়াই সম্ভব হইবে। মহামানব-সমাজের বা বিশ্বমানব-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে তখন—যখন ব্যষ্টিগত ভাবে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সমাজ নিজেদের বিশিষ্টতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, উন্নতির পথে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে।

সমাজ-বিজ্ঞানের মোটা কথা

সমাজ-বিজ্ঞানের খুব জটিল তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়া, যদি আমরা ধরিয়া লই যে, মানব আদিম অবস্থায় পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল—অথবা মানুষ কোন না কোনও প্রকারের সমাজ গঠন করিয়া বাস করিত, তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। মানুষ আদিতে সমাজবদ্ধ অবস্থায় না থাকিলে, সে অবস্থায় যে বেশী দিন ছিল না—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষ প্রথমে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সমাজ-গঠনের প্রথম সূত্র হইতেছে সমাজের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বসাধন, আর তৎপরিবর্ত্তে সমাজের সংহতি-শক্তির আশ্রয়ে ব্যক্তির নিরাপদে বাস। তার পরের কথা এই যে, সমাজ তাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের (members, individuals) মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনরূপ বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করিবে ও ব্যক্তি সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহা মানিয়া চলিবে। এই সূত্র সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর পরস্পরের নির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে সমাজ বা ব্যক্তির—কাহারও স্বেচ্ছাচারী হইবার কথা নাই। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি; সুতরাং একের মঙ্গলে অন্যের মঙ্গল—একের পতনে অন্যের পতন। সমাজ-পত্তনের পর হইতেই দেশ কাল ও অবস্থানুযায়ী সমাজ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া সমাজ বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্রমে হাজার হাজার বৎসরের ক্রমানুবর্ত্তিতায় প্রত্যেক সমাজদেহের উপর এমন এক একটী ছাপ পড়িল—যাহা দ্বারা একটীকে অন্যটী হইতে সহজেই পৃথক করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্য সমাজের এমন মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিতে চাহিলে, সমস্ত সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই যখন কোন সমাজের উত্থান পতনের আলোচনা করিতে যাই, অথবা কোন দোষের সংশোধনের চেষ্টা করি, তখন ঐ বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য এমন অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে যে, বিকৃত বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া সমাজ-অঙ্গে নানাবিধ কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করে। তখন ঐ বিকৃত বৈশিষ্ট্যকেই আঘাত করিতে হইবে। আর সমাজে যখন কোন বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখন তাহার মূলে প্রায়ই ঐ ব্যাধি বর্ত্তমান থাকে।

অনেকে বলেন, আমি মানুষ,—মানুষ হিসাবে আমার দাবী সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সমাজ-সম্পর্ক-হীন মানুষের দাবী কাহার নিকট। দাবী ও কর্ত্তব্য (Right and duty) পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ,—একটী থাকিলে অন্যটি থাকিবেই। সুতরাং দাবী করিতে গেলেই তাহার মূল্য দিতে হইবে। সে মূল্য সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিয়দংশ বিসর্জ্জন। সুতরাং কি পুরুষ, কি নারী কেহ যদি এ কথা বলেন যে, আমার ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতার উপর হাত দিবার কাহারও অধিকার নাই, তবে তাহা ছেলেমেয়ের চাঁদ ধরিয়া দেওয়ার আবদারের মতই শুনাইবে।

পতৃহীনা মিরান্দা, বা কাপালিক পরিত্যক্তা কপালকুণ্ডলা এ কথা বলিতে পারেন, যদিও তাহা অর্থহীন। সমাজের জন্য (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে নিজের স্বার্থের জন্য) আমাদিগকে কিছু কিছু স্বাধীনতা ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের একেবারে দাস হওয়া নয়; কারণ আমিও নিজে সমাজের, অঙ্গ। সমাজ-যদি আমার মনুষ্যত্বের উপর অস্ত্র চালায়, তবে নিশ্চয়ই আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। যেমন ব্যক্তির, তেমনি সমাজের শক্তিও সীমাবদ্ধ। তাই সমাজ যখন ব্যক্তিকে গ্রাস করিতে চায়, মঙ্গলের ভান করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠে, তখনই সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দেয়—নিজের বিপথগামী শক্তির আঘাতে সমাজ নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সমস্যা

আজ স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য মানবের মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহা সমাজবিশেষ বা দেশবিশেষে আবদ্ধ নয়। সামাজিক স্বাধীনতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা এই বিশ্বজাগরণের একটা অংশ মাত্র। মানুষ আজ নীরবে উৎপীড়িত লাঞ্ছিত হইতে রাজী নয়। সর্ব্বপ্রকারের অন্যায়ের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মানুষ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমাজ ত মানুষেই তৈয়ার করিয়াছিল; তবে আজ তাহার বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইতে চাহিতেছে কেন? তাহার উত্তর এই যে মানুষ শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলিয়াছে। অথবা হয় ত সে শিবেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ক্রমে আজ তাহা অশিবের আগারে পরিণত হইয়াছে। যে মন্দিরের মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদে শান্তি সুখ বর্ষিত হইত, আজ সেই মন্দিরে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। যুগ যুগান্তের অস্বস্তি বুকে বহিয়া আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে। তাই আজ অশিবের ধ্বংসের ও সঙ্গে সঙ্গে শিব-প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ ব্যাকুল। মানুষ মঙ্গলের জন্য সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাহার ন্যায্য অধিকার কেহ খর্ব্ব করিবে না। কিন্তু আজ জাগিয়া দেখে যে, সমাজ তাহার বুকে পিঠে এমন করিয়া নাগপাশ আঁটিয়া দিয়াছে যে, তাহার আর নড়িবার শক্তি নাই। সমাজের হস্তে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই—সমাজ নামক অশরীরী বস্তুটীর পিছনে দাঁড়িয়ে একদল লোক তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে চালাইতেছে। যে সমাজ সে একদিন তৈয়ার করিয়াছিল তাহার মঙ্গলের জন্য, সেই সমাজ তাহার নিজের ঔদাসীন্যে—আজ তাহারই নির্ম্মম শাসন ও শোষণ-কারী মাত্র। সমাজ চালাইবার অজুহাতে একদল লোক তাহাকে ক্রীড়ার পুতুল, স্বার্থসাধনের যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ-গঠনের সময় মানুষ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই; দিতে হইলে বোধ হয় সে সমাজ গঠনই করিত না। কিন্তু আজ সে হৃতসর্ব্বস্ব। কিন্তু অত্যাচার অনাচার চিরকাল থাকিতে পারে না। ভগবানের নিয়মই এই যে, যাহা ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা চিরকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এই বর্ত্তমান মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা। সমাজকে হয় পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, নয় একেবারে ধ্বংসের পথে যাইতে হইবে।

নর ও নারী

এখন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কথার আলোচনা করা যাউক। সমাজবিজ্ঞানের একটা প্রধান কথা বর্ণবিভাগ। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজের বর্ণবিভাগ অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ভারতীয় সমাজ; আনুষঙ্গিক ভাবে ইয়োরোপীয় সমাজের আলোচনা হইবে মাত্র।

মানব-সমাজ মাত্রেরই সবচেয়ে বড় বিভাগ হইতেছে নর ও নারী। আর কাজে-কাজেই বড় সমস্যার কথা উঠে ঐখানে। গতবারে 'নারী সমস্যায়' মোটামুটি একটী কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই নর ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নারী-সমস্যার আলোচনা করিতে হইবে। এখন আমরা এই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া সামাজিক নারী-সমস্যার আলোচনা করিব। এ বিষয়ে কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে না,—কালের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্ত্তন হইবে। সুতরাং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গেরও পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।

সমাজের অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া আছেন নারী। পরিবারে যেমন, সমাজেও তেমনি তাঁহার স্থান আছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সমাজে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার। কারণ নারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নারী যেমন বলিতে পারিবেন, পুরুষ তেমন পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমরা নর ও নারীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতেছি—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ নারী—মাতা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতি রূপে আপনার অস্তিত্ব পুরুষ সমাজের অস্তিত্বে মিশাইয়াছেন। অন্ততঃ ভারতে তাহাই হইয়াছে এবং উহা ভারত নারীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কিন্তু আমরা পরে দেখিব যে, নারীকে পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার প্রয়োজন আছে।

যেমন পরিবারে, তেমনি সমাজে নারীর স্থান থাকা উচিত। কিন্তু সমাজে নারীর স্থান কোথায়? সমাজ-সমস্যায় আজ ইহাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। মানবের সভ্যাবস্থার পর হইতেই (হয় ত বা আদিম অবস্থায়ও) সমাজে নারীর স্থান পুরুষের একটু পশ্চাতে অবস্থিত—ইহাই আমরা দেখিতে পাই। পৃথিবীর সব সভ্যসমাজের ইতিহাসই এই সাক্ষ্য দেয়। এখানে পশ্চাতে বলার অর্থ এই নহে যে, নারী সমাজে পুরুষের চেয়ে সম্মানে হীন। সমাজ চালাইবার কাজে নারী পুরুষের একটু পশ্চাতে—ইহাই আমাদের বক্তব্য। আর মনে হয়, প্রাকৃতিক নিয়মের এবং ঘর ও বাহিরের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বিভাগের জন্যই এই পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নারীর সম্মানের দিক আলোচনা করিলে, এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমাজ যে পরিমাণে

উন্নত হইয়াছে, নারীকে সেই পরিমাণ বেশী সম্মান দিয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে নারীর মাতৃত্ব উহার মূলে আছে বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ ভারতের পক্ষে এ কথা সত্য। এবং উহা ভারত সমাজের একটী বিশেষত্ব। নারীর এই সম্মান সমাজের উত্থান-পতন-উন্নতি অবনতির সহিত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজে নারী

এখানে পাশ্চাত্য সমাজে নারীর স্থান ও সম্মান সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিয়া আমাদের নিজেদের সমাজের কথা বলিব। পাশ্চাত্য সমাজের কথা বলিতে গেলেই, প্রথমে ইহাই বলিতে হয় যে, উহা নারী ও পুরুষের সমাজ, শুধু পুরুষের সমাজ নয়। সেখানে পুরুষের মত না হউক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে নারীরও সমাজ চালাইবার অধিকার ও শক্তি আছে। তাই সেখানে পুরুষ নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। যেখানে পুরুষ এবং নারীর অধিকার ও স্বার্থে সংঘর্ষ বাধে, সেখানে নারীকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার দরকার হয়, কারণ পুরুষ সেখানে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। সেরূপ ক্ষেত্রে নারীরও সামাজিক ক্ষমতা থাকা দরকার। তাহা না হইলে তাহাকে "কোণ ঠাসা" হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু নরনারীর পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাব সেইখানেই সমাজের আদর্শ হইবে, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-সংঘর্ষ নাই। পুরুষ যদি নিরপেক্ষ ভাবে নারীর স্বার্থ সমাজে রক্ষা করিতে পারেন, তবেই তাহা আদর্শ হইবে। কারণ তাহা হইলে নারীকে আর কঠোর সংগ্রামের মধ্যে আসিয়া তাহার কোমলতাকে নষ্ট করিতে হয় না।

তার পর পাশ্চাত্য দেশে নারীর সম্মানের কথা। নারীর যথেষ্ট সম্মান আছে স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের আদর্শের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। যাক্, সে কথা পরে হইবে। আজকাল নারী-সমাজের গতি দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা শুধু-নারী বলিয়াই (womanhood) পূজা পাইতে চান, সমাজের বা পরিবারের নির্দ্দিষ্ট কোন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া নয়। তাঁহারা ঠিক মাতা, ভগিনী, পত্নী ইত্যাদি কিছুই নন—স্বাধীনা বন্ধনহীনা শুধু মানবসমাজের অংশমাত্র,—তাঁহারা শুধু নারী। আবার কোন দল নর ও নারীর মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—তাহাকেই অবিকৃত ভাবে—অর্থাৎ সমাজ বা পরিবারের কোন নির্দ্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে না আনিয়া—সেই নৈসর্গিক সম্বন্ধকে মাত্র স্বীকার করিতে চান। আর এই মতবাদ নানা ভাবে নানা দিক দিয়া প্রচারও করা হইতেছে। উহাতে সমাজের যে খুব মঙ্গল হইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। উহার প্রধান একটা ফল হইতেছে, বিবাহবন্ধন অস্বীকার ও তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি। তন্মধ্যে প্রধান একটা unmarried mother's problem. (অবিবাহিতা-মাতৃ-সমস্যা)। উহা উৎকট স্বাতন্ত্র্য ও ততোধিক উৎকট শিক্ষার ফল। এরূপ নারী সমাজে কতটুকু পূজা পান জানি না। তবে উহা উন্নতির পরিচায়ক কি পশ্চাদনুবর্ত্তন, (Retardation) তাহা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যের আর এক ফল সাফ্রিজেট আন্দোলন। পুরুষের সঙ্কীর্ণতা যে এই উৎকট অবস্থার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী নয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সাফরিজেটরা যে ভাবে কাজ করেন, তাহা খোদার উপর খোদাকারী বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতি তাহা কতটুকু সহ্য করিবেন, তাহা বিবেচনার বিষয়। জীবনের সুখশান্তির পক্ষে যে তাহা খুব আরামদায়ক, তাহাও ত মনে হয় না। ভারতীয় মহিলারা একটু সবুর করিয়া দেখুন না! সমাজের প্রত্যেকেই সজাগ থাকিবে সত্য, নিজেদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে মাতলামি আরম্ভ করিয়া দিবে, এমন কোন কথা নাই। বাস্তব জগতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, শুধু শুষ্ক ন্যায়শাস্ত্রের দড়ি কামড়াইয়া থাকিলে জীবনটা চলে না। জাগরণের মধ্যে, দোষ-দুষ্টকে সংশোধনের মধ্যে, জীবনের প্রতি—বাস্তবের প্রতি—সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। এত কথা বলিবার দরকার এই যে, পশ্চিম থেকে পূর্ব্বমুখী হাওয়া বহিতেছে যে! আর চোখ বুজিয়া সেই হাওয়ায় পাল খাটাইয়া দেওয়া আমাদের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের সমাজে নারী

এখন আমাদের সমাজের অবস্থা দেখা যাউক। ভারতীয় সমাজকে সোজা কথায় পুরুষের সমাজ বলিলে বিশেষ কিছু আপত্তির কারণ নাই। আমাদের বাংলা দেশের ত কথাই নাই,—অন্যান্য যে যে দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে আছে, সে সব স্থানেও পুরুষেরাই সমাজের শাসনকর্ত্তা। নারীর তাহাতে বিশেষ কোন অংশ আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সাধারণতঃ সকল দেশেই পুরুষেরা সামাজিক বিধিনিয়ম প্রণয়ন করেন; কিন্তু অন্য দেশে নারীর শক্তি আছে বলিয়া তাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন,—পুরুষের একছত্র শাসন সেখানে চলে না। কিন্তু আমাদের দেশে পুরুষের পক্ষে এসব কোন আপদ বালাই নাই। আদিকাল হইতে তাঁহারা কতক বা স্বার্থের আর কতক বা প্রেমের খাতিরে যে আইন-কানুন নারীদের জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন, নারী তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলিয়া পুরুষ যে সবক্ষেত্রে নারীর আত্ম-বিসর্জ্জনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা বলিতে সাহস হয় না। অনেকে বলিবেন, সে কি কথা! ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে পুরুষ তাহার প্রেমময়ী নারীর স্বার্থে আঘাত করিবে? কিন্তু আমরা বলি সবই সম্ভব—ক্ষমতা-মদিরা বড় শক্ত জিনিস। উহার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। আমেজানরা (Amazon) শক্তির জন্য নিজের অঙ্গচ্ছেদ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতে নর ও নারীর এই পার্থক্য সৃষ্টি হইল কিরূপে এবং কবে? পৃথিবীর অন্যান্য সবদেশ এক দিকে, আর ভারতীয় সমাজ এক দিকে। একটা যেন অদ্ভুটার প্রতিবাদস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ভারতনারী হয় ত তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা বশতঃ কঠোর ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; অথবা হয় ত কোনও যুগে, কোনও

বিশেষ কারণ বশতঃ নারীর অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছিল; আর সেই অভিসম্পাতের ফল তাঁহার সন্ততিগণ হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতেছে।

নারীদের অধিকার খর্ব্ব করা হইলেও তাঁহাদিগকে প্রথমেই একেবারে যে অন্ধ ও পঙ্গু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নয়—ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কিন্তু সমাজ যেমন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ডুবিতে লাগিল, নারীর অধিকারও তেমনি অধিকতর খর্ব্ব হইতে লাগিল। এই অধঃপতনের জন্য নারীদেরও যে কিছু দায়িত্ব নাই, তাহা নয়। তাঁহাদের নিজের আলস্য ঔদাসীন্যও উহার কারণ বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, আজ আমাদের সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে নারী-শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। আর সেই সুযোগে পুরুষ নারীদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ফলে সমাজ আজ অর্দ্ধমৃত—তাহার অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে আজকাল কিছু আলোচনা হইতেছে; সুতরাং বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। তবে দু একটী কথা না বলিয়াও পারিতেছি না—যদিও তাহা ঠিক সামাজিক প্রশ্ন নয়। ঋষি ঠাকুর যে দিন বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে নাই, সেই দিনই যে স্ত্রীলোকের শুধু কপাল পুড়িল তাহা নয়—তাঁহার জন্য নিত্য ভীম একাদশীরও বন্দোবস্ত হইল। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্যে সমাজের কতটুকু উপকার হইল, জানি না; কিন্তু অর্দ্ধেক সমাজ—নারীগণ অসহায় হইয়া পড়িলেন। হয় ত তখন সমাজে উদারতা ছিল; কিন্তু আজ পতিপুত্রহীনা নারীর স্থান কোথায়? তিন কালের জন্য তিনজন রক্ষক নির্দ্দেশ করিয়াই ঋষিঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন,—কিন্তু যম মহারাজ ত আর ঋষি ঠাকুরের হুকুমের চাকর নহেন যে, স্ত্রীলোকের একজন রক্ষক তিনি রাখিবেনই। সুতরাং পুত্রহীনা বিধবার জন্য যে সহমরণই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা, তাহা যাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের খবর রাখেন তাঁহারাই বলিবেন। দেশের ও সমাজের মঙ্গলকামী নেতৃবৃন্দ যদি নারীদের রাজনৈনিক অধিকার বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের উদ্ধরনৈতিক (উদ্ধারনৈতিক নয়) অধিকার বিধিবদ্ধ করেন, তবেই সুবুদ্ধির কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারত-নারীর সম্মান

এখন ভারতের নারীদের সম্মানের কথা। এখানে আমাদের গৌরব করিবার যথেষ্ট আছে—অন্ততঃ ছিল; আর এখনও যে এ একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না। নারীর সম্মান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পাশ্চাত্যের তথা-কথিত নারীপূজা হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। ভারতের আদর্শ মহত্ত্ব—এটা মিথ্যা কথা নয়। যাঁহারা চোখ খুলিয়া চলেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ অধঃ-পতনের মধ্যেও ওই মাতৃত্বটুকু নারী-সমাজকে জীবিত রাখিয়াছে॥ এখানে আঘাত করিলে এখনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। এই মাতৃত্বের চরম আদর্শ ঈশ্বরের মাতৃরূপ কল্পনায়—ভারত ইহার অপেক্ষা মহত্তর নারীর মাহাত্ম্য আর কিছু কল্পনা করিতে পারে নাই। সত্যিকার নারীপূজা এইখানে—"যত্র নারী তত্র গৌরী"—এ কথা কথা-কথিত Lady worship নয় প্রাণহীন formality নয়। এই মাতৃত্ব ও নারীত্ব অভিন্ন। এই খানেই ভারত সমাজের বিশেষত্ব ও মহত্ব। ভারত এখানে জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে নারীকে মাতৃত্বের সম্মান দেয়—নিজ সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া ভিন্নজাতীয়া নারীর অঙ্গে পদাঘাত করে না। কেহ কেহ অবশ্য দুএকটা উদাহরণ সহ এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন; কিন্তু ওরূপ উদাহরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময় থাকিবে। কিন্তু আজ মাতৃত্ব যে ফাঁসীকাষ্ঠের আসামী, পশ্চিমের হাওয়া এসে ভারতের এই মহত্ত্বকে সাগরতলে ডুবাইতে প্রয়াসী। তাই আজ তথাকথিত শিক্ষিতা মহিলা (বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশে) মাতৃত্বের বদলে Ladyshipএর পক্ষপাতী।

নারীর সম্মানের কথায় আর একটী বিষয় আমাদিগকে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা প্রথমেই শিখি, অবশ্য স্কুল কলেজের কোন কেতাবে নয়—কিন্তু যে প্রকারেই হউক আমরা শিখিয়া থাকি যে,—ভারতবাসী নারীর সম্মান জানে না। নারীর সম্মান আনিতে হইবে সাগর পার হইতে। সুতরাং নারীর আদর্শও অবশ্য আসিবে সেখান হইতে। তাই আজকাল যে সব উদ্ভট রকমের নারী সম্মান (প্রণয়ীর পক্ষে জুতাত্রাস করা পর্য্যন্ত হয়েছে কি না জানি না—) আমাদের দেশে আমদানী হইতেছে, তাহা দেখিলে হাসিও আসে, দুঃখও হয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হইয়া থাকেই—সুতরাং আমদানী-করা এই আদর্শ ও সম্মানের চোটে দেশটা যে একটু অস্বস্তি বোধ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এখানে বাঙ্গালার তথা ভারতের শিক্ষিতা মহিলাদিগকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য এ কথায় কাজ কতটুকু হইবে জানি না। তাঁহাদিগকে এ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নিজের ভাণ্ডারে কি আছে আগে তাহা দেখিয়া, তার পর পরের দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইলে ভাল হয়। সত্য সত্যই এই আমদানী-করা Lady's honour কি খুব তৃপ্তিদায়ক—প্রাণস্পর্শী! "মা ঠাকরুণ" এর চাইতে "মেমসাহেব" কি বেশী মিষ্টি? তার পর মহিলারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ Lady's honour এর ভিতর কি আছে? সাধারণ মানবের সম্মানের দাবী না করিয়া ঐ Lady নামে দাবী কেন? এই সম্মান দেখানোর জন্য যে প্রাণহীন দেঁতোর হাসির অভিনয় ও উদ্বেগ-চাঞ্চল্য দেখান হয় তাহা কতটুকু প্রাণের স্পন্দন হইতে উদ্ভূত, তাহা যে শিক্ষিতা মহিলারা বুঝিতে পারেন না, তাহা মনে করিব কিরূপে? আর কারণে অকারণে (অকারণেই বেশী) শিক্ষিতারা (সকলে নিশ্চয়ই নন) যে অপমানের অভিনয় করেন—(অর্থাৎ "কি, আমায় অপমান করলে!" ইত্যাদি) তাহাতে পুরুষবেচারাদিগকে বড়ই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। কথাটা সত্য মনে করি বলিয়াই লিখিলাম। এটা দোষ না গুণ, তাহা শিক্ষিতারা নিজেই বিবেচনা করিবেন।

নানা রকম খুটনাটী বিষয় আলোচনা করিতে গেলে পুথি বাড়ে। হাজার রকমের এরূপ বিষয় আছে—অথচ আমরা নির্ব্বিবাদে দিব্যি আরামে তাহা স্বাভাবিকের মতই মেনে চলে চাই। কোন্ মান্ধাতার যুগে কে কোন্ বিধি তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহার টিকা টিপ্পনি ভাষ্য নিয়াই সমাজে মারামারি। হাজার বছরের পুরাতন বিধিনিষেধের চেয়ে যে বর্ত্তমানের একটু অভিজ্ঞতাও ভাল এ কথা আমরা ভুলে গিয়াছি। পরিবর্ত্তনময় জগতের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে না পারলে যে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করা হবে, এই সহজ সত্যটী আমরা ভুলে গেছি। সমাজ আজ জীবিত নয় মৃত, তার প্রেতাত্মা আমাদের কাঁধের উপর চড়িয়া আছে—ঐ ভূতের ভয়েই আমরা অস্থির। আজ নূতন প্রাণে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে পূর্ণতার জন্য—মুক্তির জন্য। মানব মুক্ত হবে পূর্ণ হয়ে—অন্ধ পঙ্গু হয়ে নয়। তার সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভূতের সাধ্য নাই যে বাধা দেয়। ঐ মৃতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে নূতন তরুণ সমাজ গড়িয়া উঠিবে—যাহার মধ্যে মানব তাহার অন্তরের আদর্শকে মূর্ত্তরূপে দেখিতে পাইবে।

আমরা জানি যে নারী-সমাজের বর্ত্তমান এই অবস্থার নারী ও পুরুষ স্তুতিবাদকের অভাব নাই। আর তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কারণ যুগ-যুগবাহী অত্যাচারের ফলে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়েই অবস্থাটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়া লয়, বরং তদ্বিপরীত কিছুকেই অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলিয়া মনে করে। পুরুষ যেমন সন্তুষ্ট নারীও তেমনি সন্তুষ্ট। কিন্তু জগতে সন্তোষ বলিয়া জিনিষটাই খুব মূল্যবান নয়। তাহার চেয়েও বড় জিনিষ সত্যিকার মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্বকে জাগাইবার জন্য মুক্তির মন্ত্র যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। নিদ্রিতেরা তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী বলিতে পারে শত্রু ভাবিতে পারে, ধ্বংসের অগ্রদূত মনে করিতে পারে, কিন্তু যুগে যুগে তাঁহারাই আসিয়া মানুষকে অমৃতের সন্ধান দেন।

এখানে আর একটী কথা বলা দরকার। প্রপীড়িতদের কোন প্রকার সাহায্য না পাইলে (Co-operation) অত্যাচারী অত্যাচার করিতে পারে না। নারী যে তাহার নিজের পতনের জন্য অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে দায়ী তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। পুরুষ যেখানে বলিয়াছে নারীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে—সেখানে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পা এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, হয়ত আলস্য ও ঔদাসীন্য বশতঃ কতক অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। জেগে ওঠা নারীদের এ কথা মনে রাখা দরকার যে তাঁহাদের পতনের জন্য পুরুষ যেমন দায়ী নারীও তদ্রূপ দায়ী। আর গালাগালি দিয়া কাজ হইবে না, কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না। জেগে ওঠা নারীরা যদি সত্যসত্যই সমাজের কল্যাণ কামনা করেন তবে স্থিরভাবে কাজ করুন। Constructive theory দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কি করিলে নারীর সম্যক জাগরণ হয়—কি করিলে প্রকৃতপক্ষে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহা মনস্বিনী নারীরা নিজে চিন্তা করুন এবং সেই অনুসারে কাজ করুন। তাঁহাদের নিকট একটা নিবেদন আছে তাহা এই যে তাঁহারা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন যে এই দেশটা ভারতবর্ষ এবং তাহার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের এই চোখ বুজে অনুকরণ-প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে এবং তাঁহাদের (শিক্ষিতাদের) বর্ত্তমান যে দোষশূন্য আদর্শ অবস্থা নয় তাহা মনে রাখিতে হইবে।

এখানে আমাদের সমাজ বলিতে আমি ভারতীয় সকল সমাজকেই লক্ষ্য করিয়াছি। কোন না কোন দিক দিয়া গলদ আছেই। সব সমাজ সম্বন্ধে বলিবার অধিকার হয়ত আমার নাই। কিন্তু এ কথা সত্য যে ভারতের মঙ্গল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। নারীদের অবস্থা হয়ত ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজে অপেক্ষাকৃত ভাল—কিন্তু তাহাকে আদর্শ অবস্থা বলা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পুরাতন বাঁধা বুলিকে—জীর্ণতাকে বিসর্জ্জন দিয়া নবযুগের নব মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় চালিত হইয়া কাজ করিতে হইবে—লক্ষ্য স্বেচ্ছাচার নয়—মানবের পূর্ণ মুক্তি।

নমস্কার

শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী

গানের তরী বেয়ে তুমি
এলে সাগর-পারে;
নাম্‌লে হেথা আজ্‌কে আমার
বিজন বনের ধারে॥

আজ, ছায়ায় ঘেরা পাতার ফাঁকে,
বিরামবিহীন বিহগ্‌ ডাকে,
অঙ্গে আজি পুলক্ মেখে,
তোমার অভিসারে।

যদি নাম্‌লে হেথা আজকে আমার
বিজন বনের ধারে॥

সবুজ্‌ ছাওয়া তরুর শাখে,
ফুল ফুটেছে থরে থরে,
শুকনো পাতা যাচ্ছে ঝরে,
ভিড় জমেছে মাটীর পরে।

আজ্‌, পেয়ে তোমার সুরের আলো,
হৃদয় আমার পথ হারালো,

অই চরণে লুটায়ে রল,
একটা নমস্কারে।

যদি নাম্‌লে হেথা আজ্‌কে আমার
বিজন বনের ধারে॥

বউ দেখা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

যামিনী বড়লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাইতে বিশেষ অনিচ্ছুক। এমন অনেক কারণ ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে দৈবাৎ কোন বড়লোকের বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ আসিলে সে শুধু সন্ত্রস্থ হয় না, বিরক্তও হইয়া উঠে। সে কারণগুলি সে প্রকাশ করিতে চায় না, এই মাত্র বলে যে "ও সব আমার পোষায় না।" যখন স্কুল কলেজে পড়িত, তখন দুই চারিটি বড় লোকের ছেলের সহিত তাহার সখ্যতা জন্মিয়াছিল, তাহারা পরে যদি কখন কোন উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, যামিনী বরাবর চিঠি লিখিয়া শারীরিক না হয় পরিবারিক অসুস্থতা লিখিয়া অব্যাহতি লইয়াছে। বহুদিন এমনই ভাবে সে কাটাইয়া আসিতে পারিয়াছিল, সম্প্রতি বেচারাকে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

তাহাদের আফিসের 'বড় সাহেব' রায় মোহিনীমোহন দত্ত বাহাদুরের জ্যৈষ্ঠপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে আফিসের সাহেব, বাবু, বেয়ারা, দরওয়ান সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বড় সাহেব সকলকে একখানি করিয়া পত্র ত দিয়াছেনই; উপরন্তু আফিসের প্রত্যেক বিভাগের ঘরে ঘরে গিয়া সকলকে নিজের মুখে বলিয়া আসিয়াছেন, যাওয়া চাই-ই। একে ত বড় সাহেব কোনদিন কোন বিভাগের কোন ঘরেই পদার্পণ করেন না, কখন কোন বাবুকে কাজ-কর্ম-সম্বন্ধীয় কোন কথাই বলেন না, তারপর কেহ কখন আবেদন নিবেদন লইয়াও যাঁহার দর্শন পায় না, তিনি স্বয়ং আসিয়া প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, প্রীতিভোজনের দিন সকলকেই দেখিতে চাহেন বলিয়াছেন, একা যামিনীর নয়, অনেকেরই মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

পড়িবার কথা নয় কি? রায় বাহাদুর লোকটি কি যে সে? তাঁহার পূর্বে কোন বাঙ্গালী এতবড় চাকরী পাইয়াছে? তাঁহার পূর্বে কোন বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্টের আফিসে দুই হাজার টাকা মাস-মাহিনার কল্পনা করিতে পারিত? সহস্র সহস্র কেরাণীর অন্ন-বস্ত্রের, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতে কি কোন বাঙ্গালীরই সৌভাগ্য হইয়াছিল? পাঠক স্মরণ রাখিবেন, রায় বাহাদুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগনে আরোহণ করিয়াছিল, লর্ড সিংহ হেন ব্যক্তিও তখন দোলনায় শুইয়া দোল খাইতেছিলেন। অর্থাৎ সে অনেক দিনের কথা। সেই রায় বাহাদুরের গৃহে নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে—সেই ত সব চেয়ে বড় বিপদ; তার উপর সেখানে হয়ত স্বয়ং ছোট লাট হাজির থাকিবেন, বড় লাটও আসিতে পারেন: কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ্ হয়ত কামান-বন্দুক সাজাইয়া বিয়ে বাড়ীর শোভা বাড়াইবেন;—মহাবিপদ নয় কি!

শনিবার দেড়টায় আফিসের ছুটি হয়। চিফ্ ক্লার্ক গোবিন্দশঙ্কর বাবু বেয়ারা দ্বারা সব ঘরে বলিয়া পাঠাইলেন, দেড়টার পর সকলে যেন বড় হলে উপস্থিত হন্, গোবিন্দশঙ্করবাবু উপদেশ দিবেন। সকলেরই উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য।

তিন চারি শত কেরাণী দেড়টা বাজিতেই বড় হলে হাজির হইলেন। টেঁস-ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গি, সাদা-চামড়া, কালা-চামড়া সকলেই উপস্থিত, গোবিন্দশঙ্কর বাবু আসিলেই হয়। কয়েকজন বাবু এক-একটি মিনিট যাইতেছে আর কৈ মাছের মত ঝটাপট করিয়া উঠিতেছেন; যাঁহারা উইকলি-প্যাসেঞ্জার, শনিবারে তাঁহারা স্বীয় অথবা পত্নীর আলয়ে গমন করিয়া থাকেন। উৎকণ্ঠা তাঁহাদেরই বেশী, পথে আবার হাট-বাজারও কিছু কিছু করা আছে কি-না। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল—গোবিন্দশঙ্কর বাবুর আর্দালী আসিয়া জনতাকে স্তব্ধ করিয়া দিল, পরমুহূর্ত্তেই সাহেব-বেশী গোবিন্দশঙ্কর প্রবেশ করিলেন। জনতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ বাবু প্রথমে ইংরেজীতে পরে বাঙ্গালায় বলিলেন—আমাদের বড় সাহেবের বাড়ী সোমবার সকলের নিমন্ত্রণ, মনে আছে ত? বড় সাহেব আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যাহাতে সকলেই যান, তাহা করিতে। তিনি আরও বলিয়াছেন, কেহ যেন যাইতে কোন কারণেই কুণ্ঠিত না হ'ন। আফিসের বাবুদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন; যে যেমন যাইবে, খাইয়া চলিয়া আসিবে।

গোবিন্দশঙ্কর বাবু একটু থামিলেন, তারপর বলিলেন, বিবাহের দিন আপনাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ বড়-লোকের বাড়ীতে একটু এদিক ওদিক হয়-ই, আপনাদের একটু আধটু অসুবিধা ঘট্‌তে পারে সেইজন্যই তিনি আপনাদের একটি প্রাণীকেও বলেন নাই। কিন্তু প্রীতি-ভোজের দিন যাতে সকলেই যান তার জন্যে বারবার বলে গেছেন। আমাকে আজ আবার দুপুর বেলা টেলিফোঁও করেছেন। কি বলেন সব? যাচ্ছেন ত?

কেহ কেহ সঙ্গেসঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—যেতে হবে বৈ-কি মশায়! নিজে এসে নাম ধরে ধরে বলে গেলেন।

কেহ কেহ বলিল—বাঘকে চটিয়ে বনে বাস করবে কে—বলুন!

কেহ বা স্পষ্ট খোলাখুলি ভাবেই বলিয়া দিল—ওঁদের কি বলুন, নেমন্তন্ন করলেই লাভ! মারা যেতে আমরা গরীবরাই মারা যাই! বড়লোকের বাড়ী যেতে হবে—কোথায় জামা, কোথায় কাপড়, কোথায় কি!

গোবিন্দশঙ্করকে যাহারা ভগ্নদূত বলিয়া জানিত, তাহারা উপরিউক্ত মন্তব্যের বক্তার দিকে রোষরক্তিম নয়নে চাহিয়া কহিয়া উঠিল—যাব মশাই, যাব।

গোবিন্দশঙ্কর বাবু—তা হ'লেই হল—বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সাদা চামড়া, অর্দ্ধ-শ্বেত, অ-শ্বেত সাহেবগণও চলিয়া গেল, কয়েকজন শনিবারের যাত্রীও 'যা হয় হইবে' ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া গেলেন, বাকী সকলে হল-ঘরে চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন. আমাদের যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্যও তাঁহাদের একজন।

জ্ঞানদা বাবু বয়োবৃদ্ধ লোক, বড় সাহেবের নামে কবে একটা কি কথা বলিয়া ফেলিয়া প্রায় দশ বছর প্রোমোশন পান্ নাই, ষাট টাকাতেই জীবন ব্যয় করিতেছিলেন, তিনিই সর্ব প্রথমে কথাটা তুলিলেন—কে কি দিচ্ছ বল!

এই প্রশ্নটি কাহারই মুখে প্রকাশ্যে বাহির হয় নাই; যে যার বেশভূষা ইত্যাদির সমস্যা-ভঞ্জনেই ব্যস্ত ছিল, জ্ঞানদা বাবুর কথা শুনিয়া সবাই হাঁ করিলেন।

যামিনী বলিল—আমরা গরীব লোক, কি ক্ষমতা যে বড় সাহেবের ছেলের বৌ-কে উপহার দিই।

জ্ঞানদা বাবু মুখখানি হাসি হাসি করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন—নেমন্তন্ন করবার কারণটা কিহে ভায়া! ভীম-নাগের সন্দেশ, নবীন ময়রার রসগোল্লা খাওয়াবার লোক নেই আর, না?

বাবুদের শুষ্ক মুখগুলি রৌদ্রদগ্ধ আমের আমসী হইয়া উঠিল।

জ্ঞানদা বাবু কহিলেন—কে কি দিলে না দিলে 'নোট্' করে রাখবে! যে যেমন জিনিষ দেবে, তার ভাগ্যে আফিসের ব্যবহার তেমনি হ'বে—বুঝেছ কি ভায়ারা!

ভায়াদের বুঝিয়া লইবার মত মাথা সাফ তখন ছিল না, তাঁহারা নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদা বাবু বলিলেন—যে কিছু দেবে না, তার অদৃষ্টে—জ্ঞানদা বাবু বক্তব্য শেষ না করিয়াই এমন এক হাসি হাসিলেন যে, সেটি অতি পরিষ্কার হইয়া গেল।

যামিনী জিজ্ঞাসিল—ঠাকুর্দা, আপনি কি দিচ্ছেন?

জ্ঞানদা বাবুর মুখটা অতি নোংরা ও বয়সটা খুব বেশী বলিয়া তিনি বহুদিন যাবত এই আফিসের ছোট বড় সকলের ঠাকুর্দা; ফিরিঙ্গিরাও শুনিয়া শুনিয়া তাঁহাকে ঠাকুর্দা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে। ঠাকুর্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—যা হ'ক একটা কিছু দিতে হবে রে ভাই, দেখি কি দিতে পারি?

যামিনী ত্রিশ টাকা মাহিনায় নতুন ঢুকিয়াছে; অবস্থা তাহার আদৌ সচ্ছল নয়, ভাবনায় তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে যখন চিন্তান্তিত মুখে চলিয়া গেল তখন সে জ্ঞানদা বাবুর সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া বলিল—আচ্ছা ঠাকুর্দা, এ-কি অন্যায় নয়! বড় সাহেব ত জানেন যে বাবুরা সব গরীব গুর্বো লোক। জেনে শুনে এ-রকম অত্যাচার করা কি তাঁর উচিত?

ঠাকুর্দা হাসিয়া বলিলেন—তিনি ত আর মুখ ফুটে দিতে বলেন নি, অত্যাচার আর তিনি ক'রছেন কৈ ভায়া? দাও, তোমাদের ভাল, না দাও—

যামিনী বলিল—তা হলেই ত' ঠাকুর্দা!

ঠাকুর্দা বলিলেন—যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি দেবে, বাড়াবাড়ির দরকার কি! বলিয়া একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন।

যার যেমন ক্ষমতা—এ কথাটা ঠাকুর্দার আদৌ মনের কথা নয়; কারণ ঠাকুর্দার যে অবস্থা, তাহাতে গিনি-সোণার পাঁচভরির হার দেওয়া একরূপ অসম্ভবই কিন্তু সোমবার দিন আফিসে বাবুরা যখন 'কি দিচ্ছেন ঠাকুর্দা' বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন ঠাকুর্দা বুক পকেট হইতে সন্তর্পণে সেটি বাহির করিয়া দেখাইলেন। বলিলেন 'গিন্নী দিলে ভায়া!' এ কথাটিও সত্য নয়; হার ছড়াটি গৃহিণীর গ্রাস মুক্ত করিতে ঠাকুর্দা মহাশয় কাল নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দশ বছরের রুদ্ধ উন্নতির কপাটখানি যদি এই ফাঁকে খুলিয়া যায়, তাই ঠাকুর্দা গিন্নীকে চোখের জলে ভাসাইয়াও হার আনিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাবুরা দুপুরে দু' এক ঘণ্টার ছুটি লইয়া বাজারে বাহির হইলেন; অধিকাংশই বৌ-বাজারের স্বর্ণকারদিগের উদ্দেশে ছুটিলেন; কেহ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, কেহ হোয়াইটওয়ে, কেহ লালবাজারের মোড়ে সাহেব ঘড়ি-ওয়ালার দোকানের দিকে চলিলেন। যামিনী সব দেখিল, তাহাদের ডিপার্টমেণ্টের ত্রিশখানি চেয়ারের ঊনত্রিশখানাই খালি; দেখিয়া তাহার আত্মারাম ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল। কি একটা কাজে গোবিন্দশঙ্কর বাবুর ঘরে গিয়াছে, সেখানে গিয়া দেখে, রামভরত নামধারী আর্দালী আফিসের বেশ খুলিয়া ঘরোয়া কুর্ত্তা আঁটিয়া ট্রে সাজাইতেছে। ট্রেতে একখানি বেনারসী কাপড়, জ্যাকেট পিস্, একটি ভেলভেটের বাক্সে একগাছি হীরামুক্তাখচিত টায়েরা, একটি গন্ধ তৈল, একটি এসেন্স ও একটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া রক্ষিত। গোবিন্দশঙ্কর বাবু একখানি স্লিপে কি লিখিয়া দিয়াছেন, রামভরত আল্‌পিন্ দ্বারা সেইটাই আট্‌কাইতেছিল। যামিনী আলমারিতে নথী খুঁজিতে খুঁজিতে আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কাগজ-টুকরায় লেখা আছে—An humble token of sincere affection from G. S. Roy. অস্যার্থ করিয়া লইতে যামিনীর বিলম্ব হইল না। 'জি, এস, রায়ের অকৃত্রিম স্নেহের ক্ষুদ্র নিদর্শন।'

যামিনী একটা বাজে নথী বগলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নথীটা টেবিলের উপর ফেলিয়া ভাবিতে বসিল। ক্ষুদ্র নিদর্শনটির মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও একটি সহস্র মুদ্রা হইবে। ক্ষুদ্রই বটে!

যামিনী নগদ পাঁচটি মুদ্রা পকেটে করিয়া আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, ইহা দ্বারাই হগ্ সাহেবের বাজার হইতে একটা কিছু কিনিয়া লইবে। অবশ্য মনের কোণে আর একটা চিন্তা তাহার জাগরুক ছিল, তাহা এখন আর না বলাই সঙ্গত। কারণ পাঁচ টাকার নিচে নামিবার সাহস আর তাহার নাই। গোবিন্দশঙ্কর বাবু তিন শো' টাকা মাহিনা পান, তিনি যদি হাজার টাকা মূল্যের ক্ষুদ্র নিদর্শন দেন; সে ত্রিশ টাকা পায়, তাহার দেওয়া উচিত কত? রুল্ অফ্ থ্রি যামিনী ছেলেবেলায় কসিয়াছিল, কিন্তু এখন আর মনে নাই, হিসাব করিতে একটু সময় লাগিল, খান দুই আফিস্-স্লিপ্ ও ছিঁড়িতে হইল, শেষে অঙ্ক বাহির হইল, একশত টাকার 'নিদর্শন' তাহায় দেয়! যামিনীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। ঘণ্টা দুই গবেষণা করিয়া যামিনী স্থির করিল, দশটি টাকার কম দামের জিনিষ দেওয়া কখনই উচিত হইবে না। পাঁচ টাকা দামের খেলো জিনিষ দিলে, বড় সাহেব হয়ত বিরক্ত হইবেন, এই সেদিন কর্মে ঢুকিয়াছে, তাহাতে হয় ত খারাপই হইবে। কাজ নাই বাপু বিপদ টানিয়া আনিয়া! এ মাসে ভাবিয়াছিল, নব-বিবাহিতা পত্নী সরযূকে একখানি ঢাকাই কাপড় কিনিয়া দিবে, সেটা স্থগিত রাখিতেই হইবে, আগে সাহেব, পরে স্ত্রী। স্ত্রী চটিলে পার আছে, সাহেব চটিলে পারের নৌকা বাণচাল্!

কিন্তু বাকী পাঁচ টাকা পাওয়া যায় কোথায়? ডিপার্টমেণ্টের বড় বাবুটি যে রকম লোক, একটি কপর্দক তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করা চলে না; অন্য বাবুদেরও মাসের পঁচিশে তারিখে হাতে কিছু না থাকাই সম্ভব। যামিনী দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। শেষে গোবিন্দশঙ্কর বাবুর নামটি তাহার মনে পড়িল। তাঁহার কাছে পাঁচটি টাকা ধার চাহিলে কি পাওয়া যাইবে না? লোক ভাল, দিলেও দিতে পারেন, আর পাঁচটি দিন বাদেই ত সে ফিরাইয়া দিবে। যামিনী তাঁহার ঘরে ঢুকিল। বিনা বাক্যব্যয়ে গোবিন্দশঙ্কর বাবু মণি-ব্যাগ খুলিয়া পাঁচ টাকার নোট একখানি যামিনীকে দিলেন। কবে পাইবেন, যেন ভুল না হয়, কোন কথাই তিনি বলিলেন না। যামিনী কি দু' একটা কথা বলিবার জন্য হাঁ করিতেছিল, গোবিন্দবাবু আচ্ছা আচ্ছা করিয়া উঠিলেন।

যামিনী হগ সাহেবের বাজারে গিয়া অনেক জিনিষ

দেখিল, পছন্দ-অপছন্দ করিল, তাহার বাজেট মিলাইল, কেনা কিন্তু কিছুই হইল না; যে জিনিস পছন্দ হয়, বাজেটে কুলায় না, যদি বা কোনটির দাম বাজেটের মধ্যেই থাকে, জিনিষ জঘন্য। ঘণ্টা তিনেক ঘুরিয়া সে একটি ফাউণ্টেন পেন কিনিল—ওয়াটারম্যানের কলম, বেশ জিনিষটি! ভাবিল, জিনিষটি কি বধূকে উপহার দেওয়া অসঙ্গত হইবে? কেন? বধূর কি লেখনীর কোনই প্রয়োজন নাই? অত বড় লোকের বাড়ীর বৌ যখন, নিশ্চয়ই লিখিতে পড়িতে জানে, কলমটি তাহার কাজে লাগিবেই।

দশ টাকা দিয়া কলম কিনিয়া যামিনী আফিসে ফিরিয়া দেখিল, বাবুরা ভবানীপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যামিনী ভিড়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

অফিসের বাবুদের মধ্যে তাহার মত উপহার কেহই আনে নাই। বধূকে 'উপহার'—কলম একটু অশোভন নয় কি? বাবুরা ধোঁকা লাগাইয়া দিলেন, যামিনী মনে-মনে সেই আলোচনাই করিতে লাগিল।

শীতকাল, সাড়ে পাঁচটাতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে, বাবুরা লালদীঘির কোণে কালীঘাটের ট্রামে উঠিলেন। শালের মধ্যে সকলেরই হাতে একটি-না-একটি দ্রব্য আছে। কাহারও কাহারও শাল অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে, কেহ-কেহ-বা 'উপহার' তারে একটু আধটু অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করিতেছেন। ভবানীপুর জণ্ড বাবুর বাজারের পার্শ্বে নামিয়া তাঁহারা রায় বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে আসিতেই দেখিলেন, বড় সাহেব বাঙ্গালী-বেশে পায়চারী করিতেছেন। তিনি তাঁহাদের মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া একেবারে ত্রিতলের ছাদে তুলিলেন। আসন পাতাই ছিল, সকলকে বসিতে বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবুরা নিবিষ্টচিত্তে উপস্থিত কর্মে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন।

অত লোক খাইতে বসিয়াছে, স্থানটি কিন্তু নিঃশব্দ। মৃদুগুঞ্জন ও মৃদুকণ্ঠে 'এটা দাও, ওটা আন' ছাড়া কোনই শব্দ নাই। কেন? রায় বাহাদুর যে স্বয়ং সামনে দাঁড়াইয়া! কাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে, কথা বলিবে! এটা আফিস নয় সত্য, কিন্তু লোকটি ত অন্য নয়!

আধাআধি খাওয়া হইয়াছে, রায় বাহাদুর ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে অদৃশ্য হইলেন; বাবুরা ঘাড় তুলিলেন, কথা বলিলেন; খাদ্যগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন; বহুকাল এমন সুপাচ্য সুখাদ্য খান নাই স্বীকার করিলেন। যাঁহাদের 'উপহার' দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থের বিশালতায় শালের বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারা নড়িয়া বসিয়া সামলাইয়া লইলেন। হাসিখুসিও সুরু হইবার উপক্রম করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল, আবার রায় বাহাদুর পরিদৃশ্যমান হইলেন।

সেখান হইতেই সন্ধান লইতেছেন, লুচি দেওয়া শেষ হয়েছে ত হে?

আসিয়াই বলিলেন—এই দেখ হে, আমার বৌ-মা তোমাদের পোলাও পরিবেশন করতে এসেছেন।

বাবুরা সসম্ভ্রমে মুখ তুলিলেন। রূপার একখানি থালা হস্তে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী ঠিক রায় বাহাদুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শান্ত-শ্রী বিকীর্ণ করিতেছিল; বাবুরা মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ, বৌয়ের মত বৌ বটে!

রায় বাহাদুর পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া স্নেহভরা স্বরে বলিলেন—দাও মা, দাও, এদিক থেকে আরম্ভ কর।

পুত্রবধূ মৃদু হাসিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন; দুই জন বাঙ্গালী বামুনঠাকুর পাশে বালতী ভরা পোলাও লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—কেমন বৌ হয়েছে হে?

বেশ! বেশ! চমৎকার, চমৎকার—ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—মা আমার অন্নপূর্ণা! কি সুন্দর পরিবেশন করছেন দেখ্‌ছ, একটি ভাতও পড়েছে কি?

তা আর বল্‌তে! আপনার ঘরে···ইত্যাদি!

আহার শেষ হইল, আচমন কার্য্যও শেষ, পান বিতরিত হইল। রায়বাহাদুর স্বীয় পুত্রকে ডাকিয়া বাবুদের নীচে লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাবুরা শালের মধ্যে হাত পুরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন, সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর্দা বয়সেও বড়, সাহসেও বড়, রায়বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, আজ্ঞে বৌ-মাকে একবার দেখব যে!

ও তুমি বুঝি দেখ-নি, আফিং খাও বুঝি? কি মুস্কিল? ওরে বাবুকে একবার নিয়ে—

আজ্ঞে এঁরা সবাই দেখ্‌বেন !

রায় বাহাদুর সাশ্চর্য্যে বলিলেন—সে কি হে ! তোমরাও দেখ্‌নি নাকি ? এই যে সব বল্লে—

আজ্ঞে তা না—

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন—তা না ত' আবার কি ? মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—এই দিকের সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাও এঁদের, ওদিকে শ্যামবাজার থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের পাত হয়েছে।

ঠাকুর্দা আবার কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, রায় বাহাদুর তৎপূর্বেই কহিলেন—নতুন কুটুম-বাড়ী থেকে সব এসেছেন, কিছু মনে কর না তোমরা, তাঁদের দেখ্‌তে হবে—বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

আসুন—বলিয়া রায় বাহাদুর-পুত্র তাঁহাদের নীচে নামাইয়া দিল। ঠাকুর্দাই সকলের খরচ করাইয়া দিয়াছেন, এই বাজারে এতগুলা করিয়া টাকা লোকসান—সকলে ঠাকুর্দাকে ধর ধর করিয়া ধরিতে ছুটিলেন, কিন্তু ঠাকুর্দাকে নিকটে বা দূরে কোথাও দেখা গেল না। বাবুরা অনেকক্ষণ ফটকের সামনে জটলা করিয়া ক্রমশঃ ভিড় বাড়িতেছে দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিলেন। জানি না 'উপহারগুলা' তাঁহারা কি কাজে লাগাইলেন !

যামিনীর খবরটা আমরা জানি, হগসাহেবের বাজারে সেই দোকানটিতে একটি টাকা বাটা দিয়া কাউণ্টের পেণটি ফিরাইয়া পরদিনই গোবিন্দশঙ্কর বাবুর কর্জ শোধ করিল।

চা-খোরের গান

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার

কোন্ দেশেতে মানুষগুলো
সকল দেশের চাইতে চা-খোর ?
কোন্ দেশেতে বালক-বুড়ো
ভোগে 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে' ঘোর ?
কোন্ দেশেতে হিন্দুবধূ
চা'র টেবিলে জোটেরে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
সে আমাদের বাংলা রে !

কোন্ দেশেতে মুটে-মজুর
চা কিনে খায় সকাল-সাঁজে ?
কোথায় চায়ের ফেরিওলার
কণ্ঠধ্বনি উচ্চে বাজে ?
কোথায় এত চায়ের দোকান
গণে' উঠা যায় না রে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
সে আমাদের বাংলা রে !

কোন্ দেশেতে পাড়া-গাঁয়ের
রান্নাঘরের উনানে
কোন্ প্রভাতে 'কেট্‌লি' চায়ের
চাপল এসে কে জানে ?
কোথায় চলে নুন্-চা সুধু
দুধ আর চিনি বিনা রে—
সে আমাদের বাংলা দেশ
সে আমাদের বাংলা রে !

কোন্ দেশেতে গোস্বামী-জী
চায়ের প্রিয় ভক্ত গো,
পেতে দেছেন অন্তঃপুরে
চায়ের চির-তক্ত গো।
পল্‌তেয় করে' চা পিয়ান'
বাকি নবকুমারে,
ধন্য হবে বাংলা তবেই
ধন্য হবে বাংলা রে !

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৫)

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক ; নিবাস হুগলী জেলার কোন গ্রামে। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সহিত অর্থ সংযুক্ত হইলে মানুষ যে পথের পথিক হয়, প্রমথনাথের নিকট সে পথের কোনো সন্ধান-সন্ধি অজ্ঞাত ছিল না। সমঝ্‌দার ব্যক্তিরা বলিত, এ বিষয়ে প্রমথ অদ্ভুত কৌশলী ; উপমার ভাষায় নারী-মৃগয়ায় সে নিপুণ শীকারী। কোনো চকিতা ত্রস্তা হরিণীকে ধরিতে হইলে, কখন তাহার কর্ণে বংশীর কোন্ রাগিণী বর্ষণ করিতে হইবে, কোন্ পথে তাহার গতি অপ্রতিহত রাখিতে হইবে এবং কোন্ পথে রোধ করিতে হইবে, পদস্খলনের জন্য কখন তাহার পথে প্রচ্ছন্ন গহ্বর প্রস্তুত রাখিতে হইবে, এবং কোন্ পরম এবং চরম অবসরে তাহার চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত জাল ধীরে ধীরে কিম্বা দ্রুতবেগে গুটাইয়া লইতে হইবে, সে সকল কৌশল এ ব্যাধের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। গতিকে সে এমন মন্দ করিতে জানিত যে, দেখিলে তাহাকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হইত, এবং উদ্দেশ্যকে সে এমন প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত যে, শীকার তাহার করায়ত্ত হইয়াও তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত না।

অমলার সহিত প্রমথর একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু তাহা এতই সুদূর যে, সম্পর্ক অপেক্ষা সম্পর্কের অভাবই তাহার দ্বারা অধিক ব্যক্ত হইত। অমলা প্রমথনাথের দূর-সম্পর্কিনী মাসীর ননদ-কন্যা। কিন্তু দূরকে নিকট করিয়া লইবার কৌশল যাহার জানা আছে, তাহার নিকট কোন দূরত্বই দূর নহে। তাই সেদিন যখন হরমোহনের গৃহে উপস্থিত হইয়া অমলাকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে অন্তরালে যাইবার অবসর না দিয়াই প্রমথ বলিয়া উঠিল, "কি অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে আছে ত ?" তখন অমলার গমনোদ্যত চরণ সহসা গতি হারাইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সম্পর্ক ধরিয়া যে ডাক দিয়াছে, তাহাকে লজ্জা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, এমন নির্লজ্জ অতি অল্পই আছে।

অমলার মুখে কিন্তু প্রমথর প্রশ্নের কোন উত্তর আসিল না ; সে লজ্জারক্তিম মুখে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

প্রভাবতী হাস্যমুখে কহিলেন, "মনে নিশ্চয়ই আছে, তবে বছর চার পাঁচ তোমার দেখা ত' আমরা পাই নি। প্রমথকে প্রণাম কর অমলা।"

অমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রমথকে প্রণাম করিল। প্রমথ অবনতা অমলার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "চিরসুখী হও।" অমলা সরিয়া আসিয়া জননীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

প্রমথর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভাবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। "সুখ আর কোথায় বাবা ? সুখের পথে ত' বিধাতা চিরদিনের জন্য কাঁটা দিয়েছেন !"

কথাটা প্রমথ ভালরূপই জানিত, কিন্তু তদ্বিষয়ে যেন সে কিছুই জানে না সেইভাবে সবিস্ময়ে বলিল, "কেন বল দেখি ? কি হয়েছে ?"

প্রভাবতী সংক্ষেপে কিন্তু ধীরে ধীরে প্রায় সব কথাটাই বলিয়া গেলেন। বসিয়া থাকা অপেক্ষা উঠিয়া যাইতেই বেশী লজ্জা করিতেছিল বলিয়া, উঠি উঠি করিয়াও অমলা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কাহিনী শুনিতে লাগিল, এবং সেই সকরুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ছলনার মধ্যেও প্রমথর মুখে মাঝে মাঝে বিরক্তি ও ঘৃণার অকৃত্রিম চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাহিনী সমাপ্ত হইলে প্রমথ ক্ষণকাল এরূপ নির্ব্বাক হইয়া রহিল যে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাবতীর, এবং ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াও অমলার মনে হইল যে দুঃখে, ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অবশেষে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া চাপা গলায় প্রমথ যখন কয়েকটা দুর্ব্বোধ্য ইংরাজী বাক্য উচ্চারণ করিল, তখন তাহার মর্ম্ম কিছুমাত্র না বুঝিয়াও প্রভাবতী

ও অমলা বুঝিল যে, গোবিন্দনাথ ও বিজয়নাথের প্রতি সেগুলা কঠোর কটূক্তি।

সমবেদনার প্রভাবে প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিল। অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "এ যে আমার কি অশান্তি হয়েছে বাবা! এর চেয়ে যদি মেয়েটা—" বাকি কথা মুখেই রহিয়া গেল, এত দুঃখেও কন্যার অকল্যাণের বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইল না।

মুখ বিকৃত এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রমথ কহিল, "কি বলব মাসিমা, এর ওষুধ হচ্ছে চাবুক, ঘোড়ার চাবুক!" কিন্তু বক্র কটাক্ষে এক নিমেষে অমলার মুখের ভাবে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, বিজয়ের এর মধ্যে কোন দোষ নেই, বাপের বর্ত্তমানে সে কি করতে পারে বল? লেখাপড়া শিখে সে যে নিজের ইচ্ছায় এমন জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তুমি ঠিক জেনো মাসিমা, সময়ে এসব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রভাবতী ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "এক দিন আমিও এ আশা করতাম। কিন্তু আমার আর সে আশা নেই। তাই যদি তার মনে মনে থাকত তাহলে এই তিন বৎসরে মেয়েটাকে অন্ততঃ একখানা চিঠিও ত দিতে পারত? আচ্ছা, তা না হয় নাই দিলে; কিছুদিন আগে পথে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এঁরা কথা কইতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা না কয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। তবে আর ভাল বলি কাকে বল?"

কথাবার্ত্তার গতি ক্রমশঃ যে রূপ ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে আর কোন প্রকারেই অমলার সেখানে বসিয়া থাকা চলিল না। উঠিবার সঙ্কোচ কোন প্রকারে অতিক্রম করিয়া সে উঠিয়া পড়িতেই প্রভাবতী বলিলেন, "অমলা, প্রমথর জন্যে জলখাবার নিয়ে এস ত মা। এই রোদে বাছার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

জলখাবারের জন্য মৃদু আপত্তি করিয়া প্রমথ পুনরায় পূর্ব্ব-কথা পাড়িল। অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বলিল, "এ সব কথা আমাকে আগে জানাও নি কেন মাসিমা? আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা এতদূর গড়ান সত্ত্বেও আমি মিটিয়ে দিতে পারব।"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার একটা অধীর আগ্রহ বহন করিয়া, অমলা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রমথর আশ্বাস-বচন শুনিয়া তাহার অসাড় বিমুখ হৃদয় সহসা যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চকিত হইয়া উঠিল,—আশার আনন্দে নহে, কৌতূহলের উত্তেজনায়। যে পথের লৌহ-দ্বারে অদৃষ্ট কঠিন অর্গল দিয়া দিয়াছে, সেখানে আর ব্যবস্থা করিবার কি বাকি আছে, তাহাই জানিবার আগ্রহ।

প্রভাবতী কিন্তু আশায় ও আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁহার মনে একমুহূর্ত্তও সুখ ছিল না। কালের প্রভাবে দুঃখের সে তীব্র ক্লেশ কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা বদ্ধ-গভীর বেদনা হৃদয়কে নিরন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত। তাই এই দুর্ব্বহ পারিবারিক অমঙ্গল হইতে উদ্ধার পাইবার বিন্দুমাত্র আশ্বাস পাইয়াই তাঁহার মন সম্ভাবনা অসম্ভাবনার বিচার না করিয়াই একেবারে নাচিয়া উঠিল।

"তা যদি পার বাবা, তা হলে, তুমি পেটের সন্তানের তুল্য, তোমাকে আর বেশী কি বলব, পোড়ারমুখীর একটা কিনারা হয়। তা না হলে, মা হয়েও এ কথা আমার মুখে বাধছে না, ওর থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

অমলা যতক্ষণে প্রমথর জন্য জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল, ততক্ষণে প্রমথ আশা ও আশ্বাসের প্রয়োগে প্রভাবতীর মন সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবিয়া প্রভাবতীর অনুশোচনা হইতেছিল যে, মনান্তরের প্রথম সূচনার সময়ে প্রমথ কেন আসে নাই; তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই নিদারুণ বিপত্তি ঘটিতেই পারিত না। এত দুঃখের পরও যাঁহার করুণায় পরিত্রাতা রূপে আজ প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার চরণোদ্দেশে প্রভাবতী শত বার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

এক হস্তে একখানা রেকাবে কিছু আহার্য্য ও অপর হস্তে এক গ্লাস জল লইয়া অমলা প্রবেশ করিল, এবং প্রমথর অনতিদূরে একখানি আসন পাতিয়া, আসনের সম্মুখে জল-হাত বুলাইয়া, জলখাবারের পাত্র ও জলের গ্লাস রাখিয়া মুখ তুলিতেই প্রমথর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সম্পর্কের হিসাবে প্রমথ অমলার দাদা, তা সে যত সুদূরই হউক না কেন। এ পর্য্যন্ত বাক্যে ও আচরণে প্রমথ সেই সম্পর্কেরই হিসাব রাখিয়া আসিয়াছে, এবং গৃহে পদার্পণ করিয়া অবধি সে অমলার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ইষ্টসাধন

করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া, অন্ততঃ বাহ্যতঃ অমলার একজন পরম শুভানুধ্যায়ী রূপে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছে। প্রমথর স্বপক্ষে এ সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, মনুষ্য-মস্তিষ্ক-নিহিত আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই হউক, অথবা অপর যে কারণেই হউক, প্রমথকে ততখানি শুভানুধ্যায়ী বলিয়া অমলার মনে হইল না, যতখানি প্রভাবতীর মনে হইতেছিল। প্রমথর সহিত চোখোচোখি হইতেই অমলার মনে হইল যে, প্রমথর সেই তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে যে জিনিসটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশমান, তাহা ঠিক করুণা বা উপকার-বৃত্তির মতই স্নিগ্ধ নহে। সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করিল।

অমলা যখন অবনত হইয়া জলখাবার দিতেছিল, তখন তাহার আনত-আরক্ত মুখের উপর প্রমথ ও প্রভাবতী উভয়েরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের মন হইতে মানুষের মন এত সহজে ও সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী মন এত কাছাকাছি ও পাশাপাশি থাকিয়াও কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিল না। প্রভাবতী নিশ্চিন্ত প্রসন্ন মনে যখন বুঝিয়া রহিলেন যে, প্রমথর পরদুঃখকাতর হৃদয়ে সহানুভূতি ও হিতৈষণার সুধা ক্ষরিত হইতেছে, ঠিক তখন তথায় লালসা ও শঠতার রাসায়নিক ক্রিয়া পুরাদস্তুর চলিতেছিল।

হরমোহন আফিস হইতে আসা পর্য্যন্ত প্রভাবতী প্রমথকে ছাড়িলেন না, এবং প্রমথও সহজেই সে পর্য্যন্ত থাকিয়া গেল।

প্রমথর মুখে সকল কথা শুনিয়া হরমোহন বলিলেন, "আমার ত একটুও মনে হয় না যে, সে পাষণ্ডকে তুমি কোন রকমে রাজি করতে পারবে। তবে বিজয় যখন তোমার বন্ধু বলছ, তখন একটু চেষ্টা দেখতে পার। কিন্তু তার বিষয়েও আমার কোন আশা নেই, সে-ও তার বাপেরই মত বলে আমার মনে হয়।"

কক্ষের বাহিরে দ্বার-পার্শ্বেই যে অমলা ছিল, তাহা প্রমথ, চক্ষে দেখিতে না পাইলেও, অনুমানে বুঝিয়াছিল। ঘরের বাহির হইতেও যাহাতে কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ উচ্চ কণ্ঠে সে বলিল, "গোবিন্দবাবুর বিষয়ে আপনি যাই বলুন মেসোমশায়, আমি তাতে আপত্তি করব না; কিন্তু বিজয় আমার বন্ধু, তাকে ত আমি চিনি। সে কখন নিজের ইচ্ছায় এ ব্যাপার করে নি। সে যখন নিজের ইচ্ছায় চলতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই তার ত্রুটি শুধরে নেবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন মনে মনে হাসিলেন; মুখে বলিলেন, "তা বেশ ত, তুমি চেষ্টা করে দেখ। যদি সফল হও ত একটা নিরীহ বালিকার ব্যর্থ জীবন সার্থক করবে। কিন্তু দোহাই বাবা, আমাকে যেন এর মধ্যে টেনো না। আমি আর জীবনে গোবিন্দা হারামজাদার সঙ্গে বাক্যালাপ করব না, তা যদি সে এসে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, তবুও নয়।"

প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "না, এর মধ্যে আপনার সাহায্য আমি একেবারেই চাইব না। তা ছাড়া, ঠিক অবসর না বুঝলে আমি ত এ বিষয়ে কথা পাড়ব না। দেরী যদি হয়, তাহলে মনে করবেন না যে, আমি নিশ্চেষ্ট রয়েছি বা চেষ্টা নিষ্ফল হোলো!"

হরমোহন বলিলেন, "না, না, সে তুমি যেমন ভাল বুঝবে, করবে। কখনই যে ঘটনা ঘটবে না বলে আমার বিশ্বাস, সে ঘটনা কেন শীঘ্র ঘটছে না বলে আমি কখন অধীর হব না।"

প্রমথ পুনরায় হাসিয়া বলিল, "আপনি যখন আমাকে এমন অবাধ অবসর দিচ্ছেন, আর মনে সফলতার একটুও আশা রাখছেন না, তখন আমার মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয় সফল হব।"

এক পেয়ালা গরম চা নিঃশেষ করিল প্রমথ বাহিরে আসিয়া গৃহকার্য্যরতা প্রভাবতীকে বলিল, "মাসিমা, আজ তাহলে চল্লাম।" তাহার পর অদূরে দণ্ডায়মানা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অমলা, পাণ থাকে ত দু চারটে দাও ত, অনেকখানি রাস্তা চলতে হবে।"

প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অমল, শীগ্‌গির তোমার দাদাকে পাণ দাও; যদি সাজা না থাকে ত সেজে দাও।" প্রমথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে গেছে, দুটি খেয়ে যাও না বাবা?"

প্রমথ স্মিতমুখে বলিল, "এ ত বাড়ীর কথা মাসিমা, দরকার হলে চেয়ে খেয়ে যাব। কিন্তু আজ নয়, আজ আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।"

"তবে শীগ্‌গীর আর এক দিন এসো।"

"তা আসব এখন। পাণ সাজা না থাকলে দরকার

নেই অমল, আমি চল্লাম।" বলিয়া প্রমথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

"না, না, দেরী হবে না; সেজে দিচ্ছে। পাণ নিয়ে তবে যেয়ো।" বলিয়া প্রভাবতী রন্ধনালয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পাশের একটা ঘরে অমলা তাড়াতাড়ি পাণ সাজিতে বসিয়াছিল, প্রমথ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

"পাণ সাজতে হোল অমল? মশলা দিলেই ত পারতে? তাই দাও না।"

এই অতি ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনে লজ্জিত হইয়া অমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে অবনত মস্তকে বলিল, "দেরী হবে না, একটু দাঁড়ান।"

বিস্ময়াতিশয্যের সুরে প্রমথ বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান কি রকম কথা অমলা! আপনার লোককে কখন আপনি বলতে আছে? দাঁড়াও!"

এই আত্মীয়তাসূচক ভৎর্সনায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া অমলা মাথা নত করিয়া রহিল। তৎপরে চার খিলি পাণ মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে প্রমথর দিকে আগাইয়া ধরিল।

অমলার হস্ত হইতে পাণ লইয়া স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "আচ্ছা, আজকে ক্ষমা করলাম; কিন্তু ফের যদি কোন দিন এমন অবিবেচনার কাজ কর, তাহলে সকলের সামনে তোমাকে আপনি বলে সম্বোধন করে শাস্তি দোব। আর এমন ভুল হবে না ত?"

অগত্যা অমলাকে মৃদুহাস্য সহকারে বলিতে হইল "না।"

"বেশ!" বলিয়া প্রমথ প্রফুল্লমুখে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

দারিদ্র্য

শ্রীদেবরঞ্জন গুহঠাকুরতা

হে দারিদ্র্য,

ছিনু যবে মত্ত হয়ে
ঐশ্বর্য্যের মদে,
করিয়াছি দরিদ্রেরে
ঘৃণা প্রতিবাদ,
ক্ষুধাতুরে করি নাই
কভু অন্ন দান,
অতিথি-ব্রাহ্মণ এলে
করি অপমান,
করিয়াছি বিতাড়িত
সহাস্য বদনে,
বিন্দুমাত্র অনুতাপ
লভি নাই মনে।
অহরহঃ মম গৃহে
আসি বন্ধুগণ—
নানা তোষামোদ-বাক্যে
তুষি মোর মন
থাকিত বসিয়া সদা
স্বার্থসিদ্ধি আশে,
তাবিতাম তারা মোরে
কত ভালবাসে।
পলে পলে সবে মোরে
শক্তিহীন করি,
সর্ব্বস্ব হরিয়া যবে
করিল প্রয়াণ,
তব স্নেহময় অঙ্কে
দিয়াছিলে স্থান।
দেখাইলে বিশ্বমাঝে
কে মোর বান্ধব,
কে আত্মীয়, কেবা পর,
কি তুচ্ছ বিভব,
ফুটাইয়া আঁখি মম
বুঝাইলে সার।
শ্রীহরি চরণ বিনা
গতি নাহি আর।
এ মহান্ তত্ত্ব লভিয়াছি তব কাছে,
হে দারিদ্র্য, তোমা সম বন্ধু কেবা আছে?
ঐশ্বর্য্যের মদে পুনঃ
হারাইলে জ্ঞান,
কাছে আসি তুমি মোরে
কোরো সাবধান;
সতত রক্ষিও মোরে
কাছে কাছে থাকি,
(আজি) তোমার প্রসাদে মম
ফুটিয়াছে আঁখি।

ভারতবর্ষ

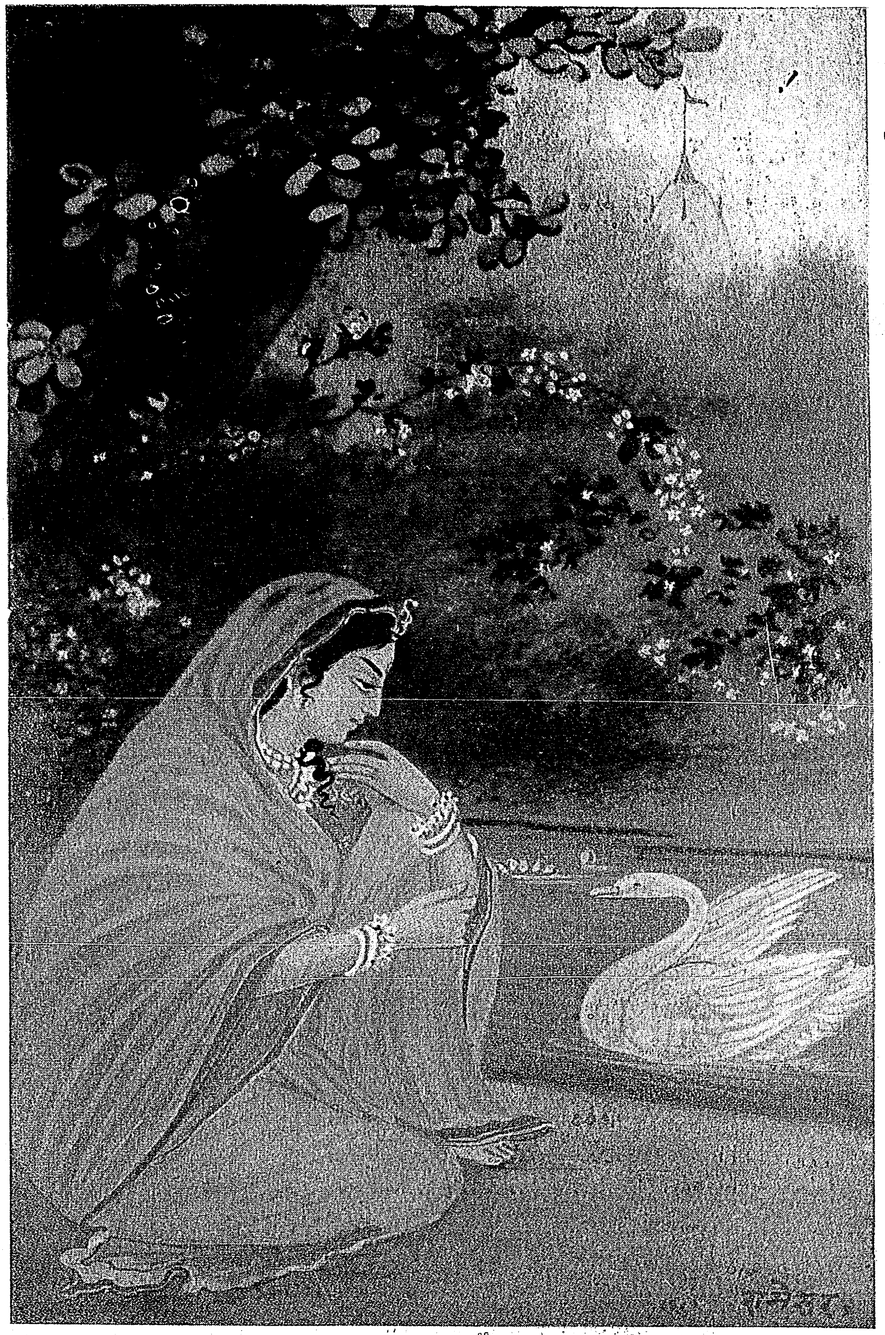

হংস দময়ন্তী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS.



প্রণবাদিতে সকলেরই অধিকার *

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

(প্রতিকূলতা পরিহার)

অনেকে বলিবেন যে, যখন অনির্ব্বচনীয়, নিরঞ্জন সৃষ্টি স্থিতি-লয় কর্ত্তা পরমেশ্বরের উপাসনা অপ্রণব অসাবিত্রী অন্যবিধ অবলম্বনে শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব নহে তখন যাহাতে অনেকের বা কাহারও বিপক্ষতা আছে সেরূপ সাধন গ্রহণের প্রয়োজন কি? যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা হয় তাহাই ত বিধেয়। এখানে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, প্রস্তাবিত উপাসনার অপরিহার্য্য উপকরণ কি—যাহা না থাকিলে এই উপাসনা অসম্ভব হয়। উপাসনা যে উপায় বা সাধন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি প্রথমতঃ স্থির না করিলে উপায় বা সাধনের হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব স্থির করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তির সম্ভাবনা নাই। কি ব্যবহার কি পরমার্থ উভয়ত্রই এ নিয়ম অব্যাহত দেখা যায়। গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে স্থির ধারণার অভাবে যাত্রায় প্রবৃত্তি বাতুলতার পরিচায়ক। উদ্দেশ্যশূন্য উপায় উপায়ই নহে। উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা ভ্রান্তি মাত্র। বিচার-হীন ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি বহুশঃ লোকদৃষ্ট। ধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া ধন সংগ্রহই যাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহার

---

* গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত বর্ত্তমান বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে (পৃঃ ৮০, বাম স্তম্ভ) বলা হইয়াছে "তন্ত্র শাস্ত্রে স্ত্রীগণের গায়ত্রীতে অধিকার স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে।" কিন্তু সেই স্পষ্টাক্ষর বিধি উদ্ধৃত হয় নাই। এক্ষণে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা— শ্রীদেব্যুবাচ।

গায়ত্রী জপকালেতু সাধিকা কিং জপেৎ প্রভো।

শ্রীশিবউবাচ।

গায়ত্রীং অজপাং বিদ্যাং প্রজপেৎ যদি সাধিকা॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন ধ্যাত্বা কৃত্বা তু পূজনং।
মানসং পরমেশানি জপেৎ তদ্গত মানসা॥

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রং। ৫ম পঃ।

অর্থাৎ। শ্রীদেবী বলিলেন। (সাধন প্রণালী ক্রমে) গায়ত্রী জপকালে হে প্রভু সাধিকা কি জপ করিবেক। শ্রীশিব বলিলেন। যদি সাধিকা অজপা বিদ্যা গায়ত্রীকে জপ করে তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানে ধ্যান ও পূজা করিয়া, হে পরমেশানি, তদ্গত চিত্ত হইয়া মানস জপ করিবেক।

উদ্বেগ অশান্তি অবশ্যম্ভাবী—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রতি আচার্য্য বাক্য সুপ্রযুক্ত যে,—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তিততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

বিনা প্রয়োজনে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। উপাসনা বা সাধন কার্য্য বলিয়া বিনা প্রয়োজনে ইহাতেও প্রবৃত্তি অসম্ভব। সিদ্ধির প্রয়োজন বলিয়া সাধনে প্রবৃত্তি। সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পূরণার্থে উপাসনা বা সাধনের অনুষ্ঠান। সিদ্ধি বা উদ্দেশ্য কি, ইহা বুঝিলেই তবে উপাসনা বা সাধনের উপযোগিতা বুঝা যাইবে, নতুবা কোন মতেই বুঝা যাইবে না। প্রস্তাবিত উপাসনার উদ্দেশ্য অথবা অন্য কথায় এ সাধনার সিদ্ধি কি? ব্রহ্ম লাভ, ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ, কৈবল্য প্রভৃতি নানা নামে সেই উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি ব্রাহ্মণ-প্রমুখ মনুষ্য-মণ্ডলীর শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। সেই উদ্দেশ্য পূরণার্থে উপায় স্বরূপ যে উপাসনা, তাহাই প্রস্তাবিত। এ উপাসনা যে অনির্দ্দেশ্য প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ইহা ব্রাহ্মণ-গৃহীত সর্ব্ব শাস্ত্রেই অভিব্যক্ত। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার অনুষ্ঠাতা কোন সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ থাকেন না, অথচ কোন সম্প্রদায়েরই সহিত তাঁহার বিরোধ থাকে না। গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে,

নামরূপাদি নির্দ্দেশৈ বিভিন্নানামুপাসকাঃ।
পরস্পরং বিরুদ্ধন্তে নতৈ রেতদ্ বিরুদ্ধ্যতে॥ *

এই উপাসনার অনুষ্ঠানার্থে প্রয়োজনীয় অবলম্বনের মধ্যে প্রণব, গায়ত্রী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া, শ্রুতি স্মৃতি-সম্মত। ইহা পূর্ব্ব প্রস্তাবেই দেখা গিয়াছে। এবং জাতি বর্ণ লিঙ্গ নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রয়োজন বুঝিলে ইহার অবলম্বনে কৃতার্থ হইতে পারেন, ইহাও দেখা গিয়াছে। এই উপাসনার আর একটী বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। সাধকের চরিত্রের উপর ইহার একটী বিশেষ প্রভাব আছে। ভগবদ্গীতায় জ্ঞাননিষ্ঠের লক্ষণ বহু স্থানে বর্ণিত। বিশেষতঃ ১২শ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। "নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি"তে সুরেশ্বরাচার্য্যপাদ গীতার এতদ্বিষয়ক উপদেশের সার উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে —

"প্রাপ্ত আত্ম প্রবোধস্যাদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যস্য নতু সাধন রূপিনঃ॥" *

গীতা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন,—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥"

৬ অঃ।৩২"

সংক্ষেপতঃ যুগপৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সর্ব্বজীবহিতে রতি লাভে যত্ন এই উপাসনা ছাড়িয়া সাম্প্রদায়িক উপাসনায় কতদূর সম্ভবপর সকলেই বুঝিয়া দেখিবেন। ইহার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধিলাভ না হইলেও ইহা নিষ্ফল হয় না। গীতার উক্তি যে,—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

২।৪০

এই যোগধর্ম্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। পরে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"প্রাপ্য পুণ্য কৃতাং লোকা"মুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টো ঽভিজায়তে॥"

(অর্থাৎ) "যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন করিয়া (সেইখানে) অনেক বৎসর বাস পূর্ব্বক পবিত্র অথচ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করিয়া থাকেন।"

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম॥"

(অর্থাৎ) অথবা ধীমান যোগীদিগের কুলে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মলাভ করিয়া থাকেন; মনুষ্যলোকে এই প্রকার যোগিগণের কুলে জন্ম (যোগভ্রষ্টগণের পক্ষে) দুর্লভতর।"

* শ্রুতির সম্মত যিনি অনির্ব্বচনীয়, যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা, তাঁহাতে নাম রূপাদি নির্দ্দেশ বশতঃ বিভিন্নের উপাসকগণ পরস্পর বিরোধাপন্ন। কিন্তু ইহার অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত উপাসনার সহিত তাহাদের কাহারও বিরোধ হয় না।

* যিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিনা চেষ্টায় "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ" প্রভৃতি গীতা-বাক্যে সূচিত গুণসমূহ লাভ হয়। এই সকল গুণ তাঁহার পক্ষে সাধন স্বরূপ নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠের পক্ষে এ সকল গুণ অযত্নলব্ধ।

"তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"

(অর্থাৎ) সেই জন্মে (সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পূর্ব্বজন্মকৃত বুদ্ধি সংযোগ (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যোগ সংস্কার) প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর যোগসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য পুনর্ব্বার যত্ন করিয়া থাকে।

"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপিসঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিরিচ্যতে॥"

(অর্থাৎ) তিনি অবশ হইয়া সেই পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগ মার্গে প্রবর্ত্তিত হন। যে ব্যক্তি যোগের জিজ্ঞাসু তিনি সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের ফলকে অতিক্রম করিতে পারেন; যে ব্যক্তি যোগ করিয়া থাকেন, তাহার ত কথাই নাই।

গীতা ৬ষ্ঠঃ ৪১—৪৪ *

হিন্দু মাত্রেই বুঝিয়া দেখুন, এই উপাসনা গ্রহণ মাত্র কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হয় কি না। সুরেশ্বরের পরাম্পরায় শিষ্য শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য স্বামীর উপদেশে প্রাপ্ত হয় যে, বিশ্বপ্রেম ও ব্রহ্মজ্ঞান একই বস্তুর নাম ভেদ। যথা,—

"দেহাত্মবৎ পরাত্মত্ব দাঢ্যাৎ বোধ সমাপ্যতে। *

পঞ্চদশী। চিত্রদ্বীপ।

মূল কথা। প্রস্তাবিত উপাসনার উদ্দেশ্য ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সর্ব্বভূতে হিতে রতি। অন্য কথায় বক্তব্য যে, উক্ত সাধনে যিনি সিদ্ধ তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বভূত হিতে রত। সিদ্ধের যাহা স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহাই সাধকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যাঁহাদের বাহ্যিক অবলম্বনের প্রয়োজন, তাঁহাদের পক্ষে প্রণব ও গায়ত্রী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহাই সর্ব্ব হিন্দু-নামধারী মনুষ্যের সমাজে সমাদৃত শাস্ত্রের উপদেশ, ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহার দুইটী অসাধারণ গুণ। একদিকে হিন্দুত্ব রক্ষা, অন্য দিকে সার্ব্বলৌকিকত্ব। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই নিজ নিজ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে সক্ষম। পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্ত্তা যে ভাবে শীতাতপ, উচ্চ-নিম্নতার বৈচিত্র্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে দেশ কাল পাত্র ভেদে আচার ভেদ অবশ্যম্ভাবী। আচার ভেদ সত্ত্বেও বিচার দ্বারা আন্তরিক একতা ও শাসনের পরিবর্ত্তে প্রেমই কর্ত্তব্যের প্রেরক হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও সৃষ্টিকর্ত্তা রাখিয়াছেন। সেই সম্ভাবনার ব্যবহারে পরিণতিই মনুষ্য জীবনের চরম সাফল্য কি না ইহাও বিচারশীল ব্যক্তি বুঝিয়া দেখিবেন। অপরন্তু বুঝিয়া দেখিবেন যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় বাণিজ্য প্রচারাদির আধিক্য ও গতি-সৌকার্য্য বশতঃ জাতি বা উৎপত্তির ভিত্তি বলে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দেশ ও আচারগত ভেদ পূর্ব্বের ন্যায় সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে। তাহার সাধন-চেষ্টায় দুঃখ ভিন্ন আর কি ফলের প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত হয়? যদি সাম্প্রদায়িক উপাসনা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবিত উপাসনায় প্রবেশাধিকারের জন্য যত্ন করা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, তাহা হইলে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ানের অপেক্ষা হিন্দু সম্প্রদায়ের সুবিধা কি না তাহাও বিবেচ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়ের আচারে বদ্ধ মনুষ্যের জীবিকার্জ্জনের কিরূপ সুবিধা? স্ববৃত্তিস্থ পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণ স্মার্ত্ত "আহ্নিক তত্ত্বে" উপনিষ্ট নিয়মানুযারে চলিয়া কয়জনের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে? এই নিয়মানুসারে চলিলে রেলে, ট্রামে গমনাগমন প্রায়শ্চিত্তার্হ অপরাধ কি না? সরকারী বেতনভোগী অধ্যাপক পণ্ডিতের শাস্ত্রানুগত আপর্দ্ধর্ম্মও রক্ষিত হয় কি না? এই সকল বিষয়ের আলোচনার ফলে আশঙ্কার কি স্থল নাই যে, প্রকৃত যথেচ্ছাচারই শাস্ত্রীয় আচার, এই মিথ্যা নামে হিন্দুকুলে প্রচলিত। এ দিকে শাস্ত্রের উপদেশ যে আত্মা "সত্যেন লভ্যঃ" অর্থাৎ সত্যের দ্বারাই আত্মলাভ। যদি হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া এরূপ উপাসনা প্রাপ্তব্য হয় যে তাহাতে হিন্দু অহিন্দু মনুষ্য মাত্রেরই হিত ও ধর্ম্ম-বিরোধের চির শান্তি তাহার অনুষ্ঠান ও প্রচার প্রকৃত ধর্ম্ম কি না? হিন্দুদিগের অন্য সংখ্যাতীত বিষয়ে বিরোধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে হিন্দু মাত্রেই এক-মত। ব্রাহ্মণ-পরিত্যক্ত হিন্দু আছে কিন্তু ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উৎপত্তি কুল

* মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত অনুবাদ—
স্বদেহ সম্বন্ধীয় আত্মা ও পরদেহ সম্বন্ধীয় আত্মার তুল্যত্ব বোধের দৃঢ়তাই জ্ঞানের সমাপ্তি বা পরাকাষ্ঠা।

ও সম্প্রদায় অনুসারে যতই ভেদ থাকুক না কেন, ওঁকার ও সাবিত্রী গ্রহণে ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তি মাত্রেই এক-মত। এ অবস্থায় যদি ব্যবহার ও পরমার্থ সাধনের অক্ষুণ্ণ সহায় প্রণব গায়ত্রী ও তাহার গ্রহণে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে তাহার পরিত্যাগী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে আত্মহত্যার অপরাধী হন কি না, ইহাও সকলে বিচার করিয়া দেখুন—এই বিনীত প্রার্থনা।

এরূপ আপত্তিও শুনা যায় যে, প্রস্তাবিত উপাসনা শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ হইলেও গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় নহে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সচরাচর যাহা প্রমাণ বলিয়া শুনা যায়, তাহা তিন জাতীয়। প্রথম যে, ইহা ঐহিক ফলশূন্য। দ্বিতীয় যে, ইহা গৃহীর অসাধ্য। তৃতীয়, ইহা অন্ততঃ গৃহীর পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। পর্য্যায়ক্রমে এই তিন জাতীয় আপত্তি বিচার্য্য। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য যে এই উপাসনার বলে যদি মনুষ্য—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ" এই সকল গুণে অলঙ্কৃত হয়, তাহাতেই কি মনুষ্য-জীবনের সাফল্য নহে? ভোগ কামনার অবধি নাই। কাম্য ভোগে কামনারই বৃদ্ধি। সন্তোষো সুখ মূলং হি। যযাতি রাজার মহাভারতে রক্ষিত বাক্য সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই সত্য।

ন জাতু কামঃ কাম্যানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাধি বর্দ্ধতে॥

ভোগের দ্বারা কামনা শান্তির চেষ্টা ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল। সুখ সকলেই চাহে, কিন্তু কিসে যে সুখ তাহা কয়জন বুঝে? সুখ কোন বাহ্য পদার্থের নাম নহে। সুখ মনের অবস্থা-বিশেষের নাম। যদি বাহ্য পদার্থের নাম সুখ হইত তাহা হইলে একই পদার্থ সকলেরই সুখের হেতু হইত। কেহ দারা পুত্র রাজ্যের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, কেহ বা স্বেচ্ছায় দারা পুত্র রাজ্য ত্যাগ করিতেছেন, সুখ উভয়েরই উদ্দিষ্ট। এই উপাসনার পরিণামে যে কি সুখ তাহা শুনিবার ইচ্ছা হইলে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ৮ম অনুবাক দ্রষ্টব্য।

যিনি ঐহিক উন্নতির অভিলাষী তাঁহাকেও এই উপাসনার দ্বার হইতে রিক্ত-হস্তে ফিরিতে হইবে না। এ বিষয়ে সাক্ষাৎ বেদের উক্তি যথা—

"যং যং লোকংমনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ কাময়তে মাংশ্চকামান্। তং তং লোকং জায়তে তত্রংশ্চ কামান্। তস্মাদাত্মজ্ঞর্ষ ন চর্চ্চায়ৎ ভূতিকামঃ॥ ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১০

দ্বিতীয় আপত্তি যে, প্রস্তাবিত উপাসনা গৃহীর অসাধ্য। এই আপত্তির অনুকূলে যে কি প্রমাণ আছে, তাহা মুদ্ধর্নে ধার্য্য। বেদে দেখা যায় যে বহু গৃহস্থ এ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। রাজা অশ্বপতি, অজাতশত্রুর এতদ্বিষয়ক উপদেশ বেদে প্রাপ্তব্য। রাজর্ষিগণের মধ্যে পরম্পরা ক্রমে প্রস্তাবিত উপাসনা রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা গীতায় (২।৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। যথা,

এবং পরম্পরা প্রোপ্তং ইমং রাজর্ষয়োবিদুঃ অর্থাৎ এইরূপ পরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ পাইয়াছিলেন। গৃহস্থ উদ্দালকের নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে এই উপদেশ দান ছান্দোগ্যে প্রাপ্তব্য। দ্বিপত্নীক যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক রাজার সভায় দত্ত এই উপদেশ বৃহদারণ্যকে রক্ষিত। কেহ কেহ বলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থ অবস্থার অপূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার জন্য শেষে প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অপূর্ণ জ্ঞানীর বাক্যই বেদ বলিয়া শিরোধার্য্য। আর প্রব্রজ্যার পরে যদি কোন উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বুঝিয়া দেখিবেন যে, গৃহী অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যকে অপূর্ণ জ্ঞানী বলিলে তাঁহার কর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদের নিন্দা হয় কি না এবং বেদ নিন্দা নিরপরাধ কি না। অধুনাতন গৃহী বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভামতীর নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত-সূত্রের টীকা সর্ব্বত্র সমাদৃত। তদ্ব্যতীত গৃহী কৃত অপর বৈদান্তিক গ্রন্থেরও প্রচার রহিয়াছে। স্মৃতি ভট্টাচার্য্য কৃত আহ্নিক তত্ত্বানুসারে গৃহস্থের পক্ষে অন্ততঃ মুখে এই উপদেশের সারাংশ প্রত্যহ প্রভাতে বলিবার বিধি আছে।

"অহং দেবো নচান্যাস্মি ব্রহ্মৈবাহংন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যশুদ্ধ স্বভাববান॥"

* নির্ম্মলচিত্ত পরমাত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানবান পুরুষ যে যে লোক মনের দ্বারা সংকল্প করেন এবং যে যে কাম্যের কামনা করেন সেই সেই লোক ও কাম্য প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐশ্বর্য্যকামী আত্মজ্ঞের অর্চ্চনা করিবেক।

এ বিষয়ে একই উপদেশ ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়ে প্রাপ্তব্য। ছাঃ ৮অঃ।৪ পাঃ।১ সূ। তৈঃ ব্রঃ বল্লী। ৬অ।

স্ববৃত্তিস্থ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ইহা অবশ্য গ্রাহ্য। ইহার অর্থ চিন্তাতেই ইষ্টসিদ্ধি ইহা শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ। ইহা অতিরিক্ত, কিম্বা অন্যথা প্রয়োজনীয় হইলেও পরমার্থ সাধনে নিষ্প্রয়োজনীয়। গৃহীর অসাধ্য হইলে এ বিধি ন্যায়সঙ্গত হইত না।

গৃহীর পক্ষে প্রস্তাবিত উপদেশ প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তম গৃহবান শৌনক অঙ্গিরসের নিকট এই উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেই উপদেশেই মুণ্ডকোপনিষৎ গৃহী অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেই উপদেশেই ভগবদ্গীতা। গৃহী শাক্ত উপাসকগণও সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে যে মন্ত্র পড়েন তাহাও এই উপাসনা মূলক।

"একমেব পরংব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্ম ময়ং ধ্রুবং।"

দ্রব্য শোধনের যে মন্ত্র তাহাও উক্তরূপ। কৌলিকার্চ্চন দীপিকা ধৃত তন্ত্র বচনও উক্তরূপ, যথা—

"কৌলজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে"।

যন্মানুষ্ঠান মাত্রেন ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ। মহা নিঃ সেই কুলাচার এই। (যথা) সথা—

জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিককালাকাশমেবচ।
ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিশেষং এতোষ্বাচরণঞ্চযৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামর্থমোক্ষদঃ॥

মঃ নিঃ তন্ত্র পউ, ৯৭৭-৯৮

অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্তার সহিত তাঁহার সৃষ্টি পঞ্চভূত ও দিককালজীব প্রকৃতি এই নয়ভাবে বিভক্ত, তিনি স্বাতন্ত্র্যশূন্য অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়া সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি না থাকিলেও তিনি তন্ত্রোক্ত কুলাচারও মূল প্রস্তাবিত উপাসনার সহিত এক। অথচ ইহার সংক্রান্ত যে আচার তাহার সর্ব্বভৌমত্ব স্থাপনার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম নীতির ও সদাচারের অবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত উপাসনা বিশ্বজনীন হইবার যোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে রক্ষিত উদ্ধবের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধেও এই কথা সুপ্রযুক্ত। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রীয় সর্ব্ব প্রকার উপাসনা সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথাই সুপ্রযুক্ত। সে যাহা হউক, গৃহস্থের পক্ষে প্রস্তাবিত উপাসনা অসাধ্য নহে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। অসাধ্য হইলে কোনও উপাসনাই সাধ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। যেহেতু সর্ব্ব উপাসনাই সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে অনির্ব্বচনীয় জগদীশ্বরের উপাসনা। যিনি নিজের ইষ্টের সে রূপ বা কার্য্য ধরুন না কেন সে স্পষ্টই যে চেতনাচেতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের আশ্রয় অনিত্যের নিত্য ভিত্তি, এক কথায় বিষম্বাদী নাই। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত মনুষ্যের বিশ্বাস যে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাসনাই একমাত্র সত্য। সেই বৈশিষ্ট্যই যে চরম সত্য এই অধ্যবসায়ই ধর্ম্ম বিবাদের মূল। আর এই ধর্ম্ম-বিবাদই যে সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিনাশী ইহা সর্ব্বদেশের ইতিহাসে প্রাপ্তব্য। প্রস্তাবিত উপাসনা ইষ্ট সিদ্ধির অনুষঙ্গে মনুষ্যের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের সর্ব্বোতোভাবে উপযোগী। এরূপ হিতকর উপাসনা গৃহস্থের অসাধ্য বলিয়া কোন ব্যক্তিরই কেন বিশ্বাস? ইহার এক হেতু সামান্য ও বিশেষ্যের ভেদ বোধের অভাব। আবাস ভূমির শীতাতপ, সমুদ্র হইতে উচ্চতা প্রভৃতি নৈসর্গিক ভেদে আচার ব্যবহারের ভেদ অবশ্যম্ভাবী এই বোধের অভাব। দেশকাল নিরপেক্ষ এ ভাবে ব্যবহার অসম্ভব। এই বোধের অভাব। ব্যক্তিগত প্রকৃতির বৈশ্বরূপ বশতঃ অবান্তর ভেদও সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য এই বোধের অভাব মূল কথা। ব্যক্তি জ্ঞান সহজ, অযত্নে বহির্দৃষ্টি গ্রাহ্য। সামান্য বা জাতি জ্ঞান অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি সাধ্য।

প্রস্তাবিত উপাসনায় যাঁহাদের বাহ্যিক কোন অবলম্বনের এমন কি কোন শব্দের ও প্রয়োজন হয় না তাঁহারা জীবকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব জীবের পূজনীয়, সত্যের উৎস, জগদ্‌গুরু। অবলম্বনের প্রয়োজন হইলে প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থযুক্ত অবলম্বনে সার্ব্বভৌমত্বের রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন হয়। নিরলম্ব উপাসকের উদ্দেশে বহু শব্দের প্রয়োগ তাঁহাদের এক প্রকার অবমাননা। কিন্তু উক্ত অবলম্বনের প্রত্যেক বা সমবেত আশ্রয়ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষক। অন্য সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক উপাসনার তুলনায় ইহাই ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব। এ প্রকার উপাসক নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আনন্দে স্বতঃপ্রণোদিত বিচার পূর্ব্বক নরনামা জীব মাত্রেরই ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে হিতসাধনে যত্ন করিতে

* রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সংস্করণ পৃঃ ৪।

* আমি দেব অন্য নহি, আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, শোকভাগী নহি। আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্য শুদ্ধ স্বভাববান।

সক্ষম। সম্প্রদায় ও দেশ কাল পাত্রভেদে তাঁহার নিকট হত বল। *

অধিকন্তু ভগবান বেদব্যাস সমগ্র শ্রুতির সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে,

"কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিনোপসংহারঃ।

(শঙ্করাভাষ্য) ব্রঃ সূঃ ৩।৪-৪৮

তু শব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোৎস্য বিশিষ্যত। বহু লায়াসানি হি গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মানি যজ্ঞাদীনি তং প্রতি কর্ত্তবো তয়োপদিষ্টানি। আশ্রনান্তর কর্ম্মানি চ যথা সম্ভব মহিংসেন্দ্রিয় সংযমাদীনি তস্যাঽপি বিদ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসংহারোন বিরুধ্যতে ॥" ৪৮

(কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ) ঃ—"গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন—সমুদায়) গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে তাহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায় বহুায়াস সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অন্যাশ্রম বিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্য বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যই আছে, অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমান্তর বিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে। এই অধিকটুকু বলিবার জন্যই শ্রুতি উপসংহার কালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন।"

তবে গৃহস্থের সহিত সন্ন্যাসীর ভেদ রক্ষার্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই উপাসনার যে বিশেষত্ব বা উপাধির বাহুল্য রূপে প্রচার করিয়াছেন তাহা যে গৃহস্থের সুসাধ্য নহে ইহা সুবোধ্য।

সন্ন্যাসীকে গৃহস্থ হইতে ভিন্ন না রাখিলে সন্ন্যাসাশ্রমের রক্ষা হয় না। সন্ন্যাস রক্ষার প্রয়োজন। অতএব এরূপ ভাবে উপাসনা রাখিতে হইলে যে সন্ন্যাসীর সহিত গৃহস্থের মিল না হয়। ভেদ রক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ফলে এই উপাধিযুক্ত উপাসনা ও গাহস্থ্য জল তৈলের ন্যায় বি-মিশ্র। কিন্তু এই উপাধি প্রস্তাবিত উপাসনার স্বরূপ নহে। এ উপাধির বিনাশে এ উপাসনার বিনাশ হয় না, ইহা পূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে দেখা গিয়াছে। আচার্য্য-পাদ সন্ন্যাসীর পক্ষে আত্মানাত্ম বিবেকসাধনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বিধান করিয়াও গৃহস্থকে ইহাতে অনধিকারী করেন নাই। অমুমুক্ষু গৃহস্থের পক্ষে ফলের বি-ভেদ মাত্র বলিয়াছেন। আত্মানাত্ম বিবেকে সৎ সন্ন্যাসীর মুক্তি। অমুমুক্ষু গৃহস্থের কৃচ্ছ্র, অশীতির ফল লাভ। যথা, "সাধন চতুষ্টয় সম্পাত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থনামাত্মানাত্ম বিচারে ক্রিয়মানেসতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্ত্বতীব শ্রেয়োভবতি, দিনে দিনে তু বেদান্ত বিচারাৎ ভক্তি সংযুতাৎ। গুরু শুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতি ফলং লভেৎ ॥ ইতুক্তং।

আচার্য্যপাদোক্ত যে সাধন চতুষ্টয় তাহার অন্তর্গত মুমুক্ষুত্ব। অমুমুক্ষু গৃহস্থের সম্বন্ধেই ফলশ্রুতি, মুমুক্ষুর সম্বন্ধে নহে।

মুমুক্ষু গৃহস্থের মুক্তি অসম্ভব একথা আচার্য্য আদৌ বলেন নাই। সৎ গৃহস্থ যে মুক্তির অধিকারী তাহার অনুকূল শাস্ত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু মিতাক্ষায়াতেও প্রাপ্ত হয়ে "শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে।" আচার্য্য বাক্যের অনুবাদ।

নিত্যনিত্য বস্তুর বিবেক, ঐহিক পারত্রিক ফলভোগে বিরাগ, নামদি ছয়গুণ এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারিটির নাম সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি। ইহার অভাব সত্ত্বেও যদি গৃহস্থগণ আত্মানাত্ম বিচার করেন তাহাতে প্রত্যবায় নাই, কিন্তু অতীব শ্রেয়ঃ আছে। কথিত আছে যে, গুরু সুশ্রূষায় লব্ধ বেদান্ত বিচার প্রতিদিন ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অশীতি কৃচ্ছ্রের ফললাভ হয়।—আত্মানাত্ম বিবেকঃ।

এই উপাসনা প্রকার ভেদে উপদিষ্ট। যথা—"কুলাচারেন দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।"

প্রস্তাবিত উপাসনা গৃহস্থের পক্ষে শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিনা এখন তাহাই বিশেষরূপে প্রচলিত সংস্কার অনুসারে বিচার্য্য। প্রণব গায়ত্রীতে অধিকার সংকোচের নিয়ামক সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম ভেদ নহে, বর্ণভেদ। অর্থ বোধের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়াও উক্ত দুই পরমার্থ—সাধনের অবলম্বন সামাজিক ব্রাহ্মণ্য রক্ষার বর্ত্তমানে একমাত্র উপায়। কিন্তু পরমার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় অর্থবোধ। অর্থের সহিত এই উপায় গৃহীতার অন্য উপায় প্রয়োজন শূন্য। বর্ণভেদই অত্র অধিকার সঙ্কোচের নিয়ামক ইহার অবশিষ্ট বিচার

* প্রণবের বিস্তারিত অর্থ মুণ্ডকোপনিষদে প্রাপ্তব্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ভট্টগুণ বিষ্ণু, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কৃত গায়ত্রীর অর্থ রামমোহন রায়ের "গায়ত্রীর অর্থ" নামক গ্রন্থে প্রাপ্তব্য।

পরে হইতেছে। গৃহীর পক্ষে প্রস্তাবিত উপাসনা নিষেধের শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্থলে নিম্নলিখিত যোগবাষিষ্ঠীয় বচন উদ্ধৃত হয়। যথা ;

সাসার বিষয়া সক্তঃ ব্রহ্মজ্ঞোস্পীতি বাদিনঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং ত্যজেদন্ত্যজেবদ যথা ॥

অর্থাৎ সাংসারিক সুখে আবদ্ধ অথচ আমি ব্রহ্মজ্ঞ ঐরূপ ব্যক্তি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট চণ্ডালবৎ পরিত্যজ্য। একথা সত্য যে, যদি আশ্রমী বা অনাশ্রমী কেহ "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়া অভিমান করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম ভ্রষ্ট নতুবা বেদ মিথ্যা। যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদসঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতং ॥ এই কেন শ্রুতি। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞকে তাহাও ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদচ। *

ভগবান বেদব্যাস শ্রুতির মর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্"। † ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫০

আর এক প্রকার শাস্ত্রীয় নিষেধের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন শাক্ত তন্ত্রের উপদেশ "কলৌ পশুর্ণস্যাৎ" বা বৈষ্ণব পুরাণের উক্তি "কলৌ হরের্নামৈব কেবলংনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" এইরূপ নিজ নিজ সম্প্রদায়িক উপাসনার প্রশংসা বাদ যদি যথার্থ বাদ বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলে পরস্পর বিরোধ বশতঃ প্রত্যেক শাস্ত্রেরই প্রমাণ্য লুপ্ত হয়। অথচ সর্ব্বসাম্প্রদায়িক পুরাণের একই রচয়িতা বেদব্যাস। অতএব এ প্রশংসা বা অর্থবাদ প্রথম প্রয়াসীর সন্দেহাদি বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্য অত্যুক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষাই সমীচীন।

আর একটী আপত্তি এই যে, প্রস্তাবিত উপাসনা যাঁহাদের আশ্রেয় তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের ভিতর এই উপাসনায় যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহাদের সদ্‌গুণ সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা। সিদ্ধের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহাই সাধকের সাধন। যদি উভয়ে একই গুণ বর্ত্তাইত তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সিদ্ধ সাধকের যে ভেদ তাহা অন্তর্হিত হইত। সাধক ও সিদ্ধের ভেদ সর্ব্ববাদি-সম্মত তবে সিদ্ধের গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলে সাধকের সাধকত্ব লুপ্ত হইবে কি ন্যায়ে? শিশুতে যুবাবস্থা নাই বলিয়া কি মনুষ্যত্ব বা শিশুত্ব নাই। মুণ্ডক শ্রুতিতে "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" কথাটী প্রাপ্তব্য। এ কথায় সূচিত যে, প্রহ্মবিদের মধ্যেও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট আছে। অপকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবিৎ। এইটী বুঝাইবার জন্যই গৌড় পাদাচার্য্য—বলিয়াছেন যে, "আশ্রমা স্ত্রিবিধা-হীন মধ্য-মোৎকৃষ্ট দ্রষ্টয়। ‡

অপর এক আপত্তি এই যে, রসবর্ত্তার অভাবে প্রস্তাবিত উপাসনা গৃহস্থের অনুপযোগী। এ আপত্তি শুনিবামাত্র বিস্ময় জন্মে। যে হেতু উপাস্যের উদ্দিষ্ট তৈত্তিতীয় শ্রুতির উক্তি যে, "রসোবৈসঃ" অর্থাৎ তিনিই রস। এই নিত্যানন্দ এক রস, নিজ অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র শক্তি যোগে জীবের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন রসের আবির্ভাব করিয়াছেন। রস যে, বস্তু তাহার প্রতিদৃষ্টি শূন্য হইয়া তাহারই বিভিন্ন বিশেষের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য ব্যক্তির পক্ষেই রস বস্তুর পরমাত্মাতে অভাব বোধ সম্ভব। নতুবা যিনি সকলেরই সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তিনি কি ঋণগ্রস্থ হইয়া রসকে সৃষ্টি করিয়াছেন? কোন বিশেষ রসে আবিষ্ট হইয়া রস স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা অবিশ্বাস সাধনের বিঘ্ন—একথা সত্য। যেমন কাণা কড়ীর লোভে মাণিক ত্যাগ। পরমার্থ সাধনে যে রস বিজ্ঞানের বিনাশ হয় না, এ কথা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সুবোধ্য হইতে পারে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রস্তাবিত উপাসনায় আদর্শ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত। যদি তাঁহাতে আলোকসামান্য সকলের পরিচিত রসজ্ঞতা দেখা যায় তাহা হইলেও কি কেহ এই উপাসনাকে রস বিনাশিনী বলিবেন? তৎ প্রণীত; "আনন্দ লহরীতে" পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় শক্তির উদ্দেশ্যে তিনি গাহিতেছেন,

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিন গিরিশূন্যো তুলয়িতুং।
কবীন্দ্রাকল্পন্তেকথমপি বিরঞ্চি প্রভৃতয়ঃ ॥...
কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবন বালাতপরুচিং।
ভজন্তে যে সন্তঃকতিচিদারুণামেবভবতীং ॥
বিরঞ্চি প্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গার লহরীং।
গভীরাভির্বাণ্ডিবিদধতি সভারঞ্জনময়ীঃ ॥

* বর্ত্তমানে ইংরেজির যেরূপ প্রচার তাহাতে শ্রুতির অর্থ ইংরেজি শব্দে সুবোধ্য হইতে পারিবে God can be apprehended but not comprehended.

† জ্ঞানী—দর্প রহিত জ্ঞান ব্যক্তি না করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন।

‡ হীন দৃষ্টি, মধ্যম দৃষ্টি ও উত্তম দৃষ্টি অধিকারী এই তিন প্রকার। মুণ্ডক কারিকা। ৩য় প্রকরণং।

সেই মহাশক্তিই "প্রণত জন সৌভাগ্য জননী।" মদন তাঁহাকে প্রণাম করেন, "রতি নয়ন লেহেন বপুষা" এবং তিনি "প্রকটিত বরাভীতিরভিনয়া।" অঙ্গ বিশেষ দ্বারা নহে। *

স্থাপত্যবিৎগণ শেষোক্ত কথার ভাব বিশেষরূপে বুঝিবেন। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাব্য জগতে উদ্ধৃত রসাত্মক বাক্যের তুলনা আবিষ্কারে সফল যত্ন হইবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। যদি ইহাতেও নীরসত্ব অপবাদের পরিহার না হয় তবে নিরুপায়।

শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাদের নিকট-রসের খনি তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, এই গ্রন্থখানি শাঙ্কর সম্প্রদায়ে সংরক্ষিত এবং শাঙ্কর দণ্ড শ্রীধর কর্ত্তৃকই পণ্ডিত সমাজে মহাপুরাণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত।

জ্ঞানানুষ্ঠান ভক্তির বিরোধী ইত্যাকার ধারণা করিলে বক্তব্য যে, যিনি অনেকের নিকট শুষ্ক জ্ঞানের অবতার বলিয়া নিন্দিত সেই শঙ্করাচার্য্যই "বিবেক চূড়ামণিতে" বলিয়াছেন যে, "মোক্ষ সাধন সামগ্র্যাং ভক্তিরের গরীয়সী" অর্থাৎ মোক্ষ সাধনের সর্ব্ব উপকরণ অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। গীতানুসারে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যথা "প্রিয়োহিজ্ঞানিনোহত্যর্থমহংসচমমপ্রিয়ঃ। অর্থাৎ জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় ও জ্ঞানীও আমার প্রিয়। গী ৭।১৭

তথাচ শ্রুতি—যথা—"তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ অন্তরতমযং অয়মাত্মা। † বৃহদাঃ ১।৪।৮

ইহারই আনুষঙ্গিক অন্য আপত্তি এই যে, প্রস্তাবিত উপাসনায় সাধন সম্বন্ধে পরমেশ্বরের প্রভাব অস্বীকার বশতঃ তাঁহার মহিমার খর্ব্বতা সংঘটন। তিনিই যে সিদ্ধ দাতা ইহাই শ্রুতির উপদেশ যথা ;

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষো বৃণুতে তৈনেষ-লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥‡ কটও মুণ্ডক,

তিনিই যখন সাধকের আত্মা তখন কি আর আছে যে, তাহার নিজস্ব হইবে? আত্মা বলিয়া গ্রহণের তুলনায় প্রেম বা ভক্তি আর অধিক কি হইতে পারে? ইহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় যে, যিনি নিজের স্বাধীনতা তাঁহাতে সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত, যিনি বাৎসল্য সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত, যিনি মিথুন ভাব সমর্পণ করেন তিনি ভক্ত আর যিনি নিজের সত্তায় সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন তিনি অভক্ত। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খদ্যোতের নিকট উজ্জ্বলতার পরাভব। হরি! হরি!

শাস্ত্রানুসারে যদি দ্বিজেতরের পক্ষে প্রণয় গায়ত্রী গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে প্রস্তাবিত উপাসনার সার্ব্বভৌমত্ব নাই—ইহা নিশ্চিত। তাহাই এখন বিচার্য্য।

দ্বিজেতরের প্রণবাদিতে অধিকার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ইহার প্রমাণ স্বরূপ অনেকে বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী শূদ্রের বেদাভ্যাসে নিষিদ্ধ। প্রণব গায়ত্রী বেদের অন্তর্গত অতএব দ্বিজেতরের পক্ষে নিষিদ্ধ। এ যুক্তি যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে অহং, তং, গচ্ছতি, ইচ্ছতি, তথা, এক, প্রভৃতি শব্দও নিষিদ্ধ হইবে। যদি বলা যায় যে শব্দ নিষিদ্ধ নহে বাক্য নিষিদ্ধ তবে—

"যদিচ্ছান্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।"

"যত্রনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতেহতঃ"। ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য যাহা স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের অধিকৃত পুরাণাদি স্মৃতি শাস্ত্রে প্রাপ্তব্য তাহাও নিষিদ্ধ হইবে। শ্রুত্যুক্ত উপাসনা স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ এ সিদ্ধান্তও ক্ষোদক্ষম নহে। শ্রুত্যুক্ত উপাসনা দুই প্রকার—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্ম জ্ঞান ও সগুণ বা বাহ্য অবলম্বনে উপাসনা। এই দুই প্রকার উপাসনাই গীতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞান বিধায়ক তন্ত্র শাস্ত্রের উপদেশে সকলেরই প্রাপ্তব্য। এস্থলে দ্বিজেতরের পক্ষে বেদাভ্যাস নিষিদ্ধ এই জন্য বেদের অন্তর্গত শব্দ, বাক্য বা উপাসনা নিষিদ্ধ হেতুর ব্যাপ্যসিদ্ধি হয় কিনা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। বেদাভ্যাস সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিষেধের প্রকৃত মর্ম্মানুসন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে

* রথ ভঙ্গের ভয়ে অনুবাদ চেষ্টায় বিরতি।

† সেই যে আত্মা তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

‡ এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার দ্বারা তাঁহাকে লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)

অপ্রাসাঙ্গিক। বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার যে সকল নিবন্ধ গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে যে যুক্তির বিচার হইল তাহা গৃহীত হয় নাই। তথা সাঙ্গ সাবিত্রী যে বেদ নহে তাহা পূর্ব্বে প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু মনূক্ত বিধি-অনুসারে যখন বেদাধ্যয়নের আদিতে ও শেষে ওঁকার গঠিতব্য তখন অধ্যয়ন আদ্য ওঁকার উচ্চারণের পরবর্ত্তী এবং অধ্যয়ন সমাপ্তির পর শেষ ওঁকার পাঠ। ইহাতে স্পষ্টই প্রাপ্তব্য যে ওঁকার বেদাধ্যয়নের অন্তর্গত নহে। অধ্যয়নের পরিপোষক।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমানকালে যাহা শাস্ত্রীয় আচার বলিয়া প্রচলিত তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎরঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক স্থাপিত। তৎপ্রণীত অষ্টবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত মলমাস ও দীক্ষা তত্ত্বে ও অন্যত্র এ বিষয়ের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রাপ্তব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীর্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় কৃত "তন্ত্রসারে"রও দুই স্থানেও এ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। উভয়ে প্রায় একই শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কেবল একটী তান্ত্রিক বচনের ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। আর আগমবাগীশ মহাশয় তন্ত্রান্তর উল্লেখে একটী অতিরিক্ত বচন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হোমাধিকারে বিচার্য্য। গৌড়ীয় স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ পণ্ডিতগণ যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণান্তর দেখান নাই তখন তাহার অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র। মলমাস তত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "অথ স্ত্রী শূদ্রয়ো প্রণব যজ্ঞন্ত্রাঃ নিষেধঃ। নৃসিংহ তাপনীয়ে, সাবিত্রীং প্রণবং যজুলক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রয়ো নেচ্ছন্তি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুলক্ষ্মীং যদি শূদ্রো জানীয়াৎ সমৃতো গচ্ছতি। নেবচ্ছন্তি পর্য্যন্তং পরাশর ভাষ্যেপি গোবিন্দ ভট্ট ধৃতং।

স্বাহা প্রণব সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদাদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরময়াপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতা মিয়াৎ।"

দীক্ষা তত্ত্বে শ্রুতির অংশান্তর সংগৃহীতং যথা, "সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবমিত্যাদি। আগমবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক বচনের শেষ চরণের পাঠ এই। যথা :—ব্রাহ্মণো যাত্যধো গতিং। অধিকন্তু যজুর্লক্ষ্মী শব্দেরও তিনি অর্থ এইরূপ করিয়াছেন। যথা "যজুর্বেদঃ। লক্ষ্মীঃ বীজামিত্যর্থঃ।"

স্মার্ত্ত কৃত যজুলক্ষ্মীঃ পদের অর্থ নাই কিন্তু দীক্ষা তত্ত্বে গৃহীত শ্রুত্যাশ দেখিয়া অনুমান হয় যে, "তন্ত্রসারে"র প্রদত্ত অর্থ তাঁহারও সম্মত। পরাশর ভাষ্য ও গোবিন্দ ভট্টের নামোল্লেখ দেখিয়া আরও মনে হয় যে, নিবন্ধকারদ্বয় মূল গ্রন্থ হইতে শ্রুতিটি সংগ্রহ করেন নাই। মূল গ্রন্থ দেখিলে অবশ্যই বুঝিতেন যে, যজুলক্ষ্মীঃ তাপনীয়োক্ত মন্ত্র বিশেষ সে মন্ত্রটী এই যথা :—"ওঁ ভূলর্ক্ষ্মী ভুবলর্ক্ষ্মী স্বঃ কালফর্ণী তন্নো মহালক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ"। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নিবন্ধকারদ্বয় মূলশ্রুতি দেখেন নাই। এজন্য মূলশ্রুতি দ্রষ্টব্য। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এখন এ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হয়। সূত্রপাতে বক্তব্য এই যে, নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষৎ দশোপনিষদের অন্তর্গত নহে বলিয়া উহার সার্ব্বভৌমত্ব নাই। ইহা কেবল নৃসিংহ উপাসকদিগেরই অবলম্বনীয়। এ শ্রেণীর উপাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের কুত্রাপি আছেন বলিয়া অপরিজ্ঞাত। তাহা ছাড়া উদ্ধৃত শ্রুতিতে 'নেচ্ছন্তি' এই ক্রিয়া পদে বিধিসূচক কোন বিভক্তি নাই। অতএব উদ্ধৃত শ্রুতি অন্যত্র শ্রুত বিধির অনুবাদ মাত্র। অথচ কোনও বিধায়ক শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই এবং শ্রুতি উদ্ধার করিতে উহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। শ্রুতিটির পূর্ণাবয়ব নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

"সহোবাচ প্রজাপতি সযেহবৈতৎ সাবিত্রস্য অষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তং তৎ সাম্নোহঙ্গং বেদ শ্রিয়াঃ হৈবা ভিষিচ্যতে, সর্ব্বৈ বেদাঃ প্রণবাদিকা; তৎপ্রণবং তৎ সাম্নোহঙ্গং বেদ স ত্রিলোকান্ জয়তি। চতুর্বিংশশত্যাক্ষরা মহালক্ষ্মী র্যজুস্তৎ সাম্নোহঙ্গং বেদ স আয়ুর্যবীর কীর্ত্তি জ্ঞানৈশ্বর্য্যবান ভবতি। তস্মাদিদং সাঙ্গং সামজানীয়াৎ। যোজানীতে সোহমৃতত্বজ্ঞ র্নিযচ্ছতি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রায় নেচ্ছন্তি। দ্বাত্রিশদক্ষরং সামজানীয়াৎ। যো জানীতে সোহ মৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। সাবিত্রীং লক্ষ্মীঃ যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রী শূদ্রঃ সমৃতোহ ধোঃ গচ্ছতি। সর্ব্বদা নাচষ্টে যদ্যাচষ্টে স আচার্য্য স্তেনৈব মৃতো মৃতো ধোগচ্ছতি। ১ম ও ৩য় খণ্ড।

বৈরাগ্যবান দেবতাগণ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। তাঁহাদের প্রতি প্রজাপতির উত্তর পূর্ব্বোধৃত শ্রুতি। গ্রন্থের উত্তর অংশে পাওয়া যায় যে, 'ঘৃশী সূর্য্য

আদিত্য," এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সাবিত্রী, চতুর্বিংশতি অক্ষরা মহালক্ষ্মী যজুঃ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নোক্ত মন্ত্রের নাম শুদ্ধ সাম।

উগ্রংবীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বোতো মুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু মৃত্যুং নমাম্যহং॥

এই মন্ত্রই নৃসিংহ মন্ত্র নামে "সারদা তিলক" ও "তন্ত্র সারে" উদ্ধৃত বলিয়া সকলেরই অধিকারভুক্ত। শ্রীবীজের দ্বারা অভিষিক্ত অষ্টাক্ষর পদ পূর্ব্বোক্ত উগ্রংবীরমিত্যাদি শুদ্ধ সামের অঙ্গ। শ্রীবীজের দ্বারা তাহার অভিষেক কর্ত্তব্য। সর্ব্ব বেদের আরম্ভ যে প্রণব, সেই প্রণব এই সামের অঙ্গ জানিবে। যিনি জানেন তিনি তিন লোক জয় করেন। চতুর্বিংশতি অক্ষরাযে মহালক্ষ্মী যজুঃ তাহা সেই সামের অঙ্গ জানিবে। যিনি জানেন তিনি আয়ুর্যশ কীর্ত্তি জ্ঞানৈশ্বর্য্যবান হয়েন, অতএব এই সাঙ্গ সাম জানিবে। যিনি জানেন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্ব কথিত সাবিত্রী, প্রণব ও যজুলক্ষ্মী স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে অনভিপ্রেত। বত্রিশ অক্ষর সাম। উগ্রবীরহিত্যাদ্যি জানিবে। যিনি জানিবেন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সাবিত্রী প্রণব যজুর্লক্ষ্মী স্ত্রী শূদ্র যদি জানে তাহা হইলে মরণান্তে অধোগামী হয়। সর্ব্বদা বলিবে না। বলিলে তাহাতেই আচার্য্যের মরণান্তে অধোগতি হয়। নৃসিংহ তাপনীয় হইতে উদ্ধৃত শ্রুতির এই অর্থ।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে মুমুক্ষুর পক্ষে শুদ্ধ সাম যাহা নৃসিংহ মন্ত্রের নামান্তর ও সাঙ্গ সাম অর্থাৎ সাবিত্রী প্রণব যজু লক্ষ্মী এই তিনটীই ও নৃসিংহ গায়ত্রী নামক মন্ত্র সমন্বিত নৃসিংহ মন্ত্র এতদুভাই সমাস। যে হেতু উভয়ই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভের হেতু। ঐহিক বিভূতি লাভের হেতু যে তিনটী সামঙ্গ তাহাই স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ শুদ্ধ সাম তাহাদের পক্ষে অনভিপ্রেত নহে, ইহা প্রথম উপনিষতের ৭ম খণ্ডে স্পষ্টাক্ষরে প্রান্তব্য।

এই উপনিষদের ভাষ্য—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের নামে পরিচিত। তাহাতে তৎপূর্ব্বোক্ত উপদেশের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নলিখিত মত প্রদত্ত। যথা—"সাঙ্গং সামচেৎ প্রথম পাদান্তে প্রণবং নিক্ষিপ্য দ্বিতীয় পাদন্তে সাবিত্রীং তৃতীয় পাদান্তে যজু র্লক্ষ্মীং চতুর্থ পাদন্তে নৃসিংহ গায়ত্রীং গায়েৎ। স্ত্রীচেৎ শূদ্রনেৎ এতৎ ত্রিতয়ং বিহায় শুদ্ধ সাম গায়েৎ। অর্থাৎ আদি সাঙ্গ সামের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে নৃসিংহ মন্ত্রের প্রথম চরণের পর প্রণব, দ্বিতীয় চরণের পর সাবিত্রী, তৃতীয় চরণের পর যজুর্লক্ষ্মী এবং চতুর্থ চরণের পর নৃসিংহ গায়ত্রী নিক্ষেপ করিয়া গাহিবে। যদি স্ত্রী বা শূদ্র হয় তাহা হইলে এই তিনটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ সাম গাহিবে, ভাষ্যের এই অর্থ। এখন পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন যে, প্রদর্শিত প্রমণানুসারে স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে নৃসিংহ উপাসনায় ঐহিক ফলার্থী ভিন্ন অন্যের সম্বন্ধে প্রণবাদি নিষিদ্ধ কিনা।

"স্বাহা প্রণব সংযুক্তং" ইত্যাদি যে তান্ত্রিক বচন নিবন্ধকার দ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন তাহার উৎপত্তি অবিদিত। যদি কোন কাম্য উপাসনা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার মন্ত্র নিষিদ্ধ হয় তাহাতে মুমুক্ষুর কিছুই হানি লাভ নাই। আর যদি ইহা "রুদ্রযামলোক্ত" নিম্নলিখিত বচনের পাঠান্তর মাত্র হয় তাহা হইলেও মীমাংসা দুরূহ হয় না।

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধো গতিং॥ *

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক দীক্ষা তত্ত্বে ধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচন এখানে সুপ্রযুক্ত হয় কিনা বিচার্য্য বচনটি এই। যথা—

† "করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমেবচ এবম্বিধানি-চান্যানি মোহনার্থা নীহানিচ মরা সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥

নিবন্ধকার দ্বয়ের সংগৃহীত প্রমান আলোচনা করিয়া "শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী" রচয়িতার সিদ্ধান্ত এই যে তান্ত্রিক মন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত প্রমাণের প্রয়োগ হয় না বৈদিক মন্ত্রেই উহার প্রয়োগ আবদ্ধ। এমত যদি গ্রাহ্য হয় তবে যখন বর্ত্তমান কালে পরমার্থ সাধনে বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার নাই তখন তাহার বিচার বা আলোচনা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া ভিন্ন আর কি? এই সমস্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত এই হয় কিনা যে, নিম্ন বর্ণাশ্রম নিরপেক্ষায় নিরঞ্জন পরমাত্মার উপাসক প্রণবাদির

* রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কৃত সংস্করণ॥ পৃঃ ৯ সুপ্রযুক্ত হয় কিনা বিচার্য্য। বচনটী এই। যথা—

† ইহাদিগের অর্থাৎ অসুরগণের ইহসংসারে মোহের জন্য করাল ভৈরববায় মার্গীয় যামল এইরূপ বহু অন্য শাস্ত্র আমা কর্ত্তৃক ভবার্ণবে মোহনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

অধিকারী? অধিকন্তু স্ত্রী শূদ্র ও বৈদিক মন্ত্র সাম গাহিতে অধিকারী, যদি নৃসিংহ তাপসীয় উপনিষৎ, সারদা তিলক ও তন্ত্রসার প্রমাণ্য হয়।

উপসংহারে অপর একটী বিষয় আলোচ্য। শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে প্রণব গায়ত্রী বা শুদ্ধ প্রণব অবলম্বনেই কৃতার্থতা। অন্য পক্ষে আগমোক্ত বিধানে উপাসনায় কৃতার্থতা। কৃতার্থতার জন্য উভয় সাধনের সংমিশ্রন কোন শাস্ত্রেই উপদিষ্ট নহে। এ অবস্থায় কৃতার্থতার জন্য উক্ত সংমিশ্রণ অশাস্ত্রীয়। প্রয়োজনাভাবে প্রবৃত্তি অসম্ভব। অথচ সামাজিক ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর এ বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ। সেই প্রবৃত্তির উদ্ভাবক যে প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধানে সামাজিক প্রধান্য রক্ষা ভিন্ন অপর কোন কিছু প্রাপ্তব্য আছে কিনা ইহাই বিবেচ্য। যদি অপর কিছু না থাকে তবে একের লৌকিক হিতার্থে বহু অপরের অনিষ্ট ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত কিনা তাহা বিবেচ্য। যদি বলা যায় যে, প্রচলিত সাম্প্রদায়িক বিধানে সকলেরই কৃতার্থতার দ্বার নির্মুক্ত তখন একেরও প্রধান্য হানি ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত নহে। ইহাই কি তাহার সদুত্তর নহে যে, বর্ত্তমানে বৈষ্ণব, শাক্ত বা স্মার্ত্ত আচারে সমাজ রক্ষা, বৃত্তি রক্ষা, বিদ্যা বুদ্ধি রক্ষা, দেশ রক্ষা, সংক্ষেপতঃ আত্মরক্ষা সম্ভবপর নহে। যাহাতে জীবনের অহিত তাহাতে মুখে-ধর্ম্ম রক্ষা ফলতঃ সর্ব্বধর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কোন সম্প্রদায়ই অন্য সম্প্রদায়ে কৃতার্থতা সাধনের সম্ভাবনা স্বীকার করে না বরং বিনাশ সাধনের প্রত্যেকের চেষ্টা ইহা প্রত্যক্ষ। অন্যত্র দৃষ্টি শূন্য হইয়া কেবল হিন্দু নামধারী মনুষ্যেরই কি ব্যবহার দেখা যায়? সম্প্রদায় ভেদে মানুষে মানুষে ভেদ। সে ভেদ কেবল ঐহিক বিলাস হইতে নহে। বৈষ্ণবেতরের গোলক হইতে নির্ব্বাসন তথা শাক্তেতরের পার্থিক মনুষ্যগণ বুঝিয়া দেখুন যে, পরমার্থ বর্জ্জিত যে লৌকিক সম্প্রদায় বা একাধিক ব্যক্তির একতা তাহার ভিত্তি ঐহিক পারত্রিক স্বার্থ। মনুষ্য ও পশুর মধ্যে যে অভাব সমান তাহার পূরণের যে স্বার্থ তাহাই অপর স্বার্থগত একতার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। কিন্তু এখানেও একতার বিরোধ উৎপাদিকা শক্তি মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। ভোগ্য পদার্থের দেশ কাল ঘটিত সীমা অবশ্যম্ভাবী। সন্তোষ ও মনুষ্যর অযত্ন লব্ধ গুণ নহে। এজন্য লৌকিক সম্প্রদায় বিনশ্বর ও পরস্পর প্রতিযোগী। স্থায়ী শান্তির হেতু নহে। কিন্তু অনিত্য জগতের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত যে নিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাহার সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বরঞ্চ অনুযোগিতাই অবশ্যম্ভাবী। এ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার জন্য কাহেকেও কাহারও অংশ ক্ষুণ্ণ করিতে হয় না। একজনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে দেখিলে তাহার সকলের কৃতার্থতার আশা ও যত্ন বৃদ্ধি হয়। প্রাস্তাবিত উপাসনা ঘটিত একতা অবিচ্ছেদ্য। উপাসকের ব্রতই সর্ব্বজীবের হিতসাধন। কোন ধর্ম্মের নিন্দা তাহার পক্ষে অধর্ম্ম। কাহারও বৃত্তিলোপের চেষ্টা অধর্ম্ম।

"বিবেকং কিং সোঽপি রস জনিতা যত্নন কৃপা
সকিং যোগো যস্মিন্ ন ভবতি পরানুগ্রহ রসঃ।
সকিং ধর্ম্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহ বিরতি॥
শ্রুতং কি তদ্বস্যাৎ উপশম ফলং যন্নভবতি শাস্ত্রি শতকং।

সে কি বিবেক যাহাতে সরস কৃপা জন্মায় না। সে কি যোগ যাহাতে পরানুগ্রহ রস জন্মায় না। সে কি ধর্ম্ম যাহাতে পরদ্রোহ বিরতির স্ফুর্ত্তি হয় না। সে শাস্ত্রাভ্যাস কি যাহাতে নিবৃত্তিরূপ ফল জন্মে না।

ষ্টীম-এন্‌জিনের (Steam-engine) ক্রম-বিকাশের ইতিহাস *

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল এ-এম্-আই-এম্-ই

বাঙ্‌লা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়নের ও পদার্থ-বিদ্যার কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ আছে ও প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তক শিল্পশাস্ত্রের (technical subject) মধ্যে নাগরিক

* নিম্নলিখিত তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে প্রবন্ধটী লিখিত—
১। A History of the Growth of Steam Engine by Thurston.
২। The Steam Engine and other Heat Engines by Ewing.
৩। Text Book of Steam and Steam Engine by Jainioson.

পূর্ত্তবিদ্যা (Civil Engineering) ও জরিপের দুই-চারখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পশাস্ত্রেরও এক-আধখানি পুস্তক দেখা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যন্ত্র-পূর্ত্ত-বিদ্যার (Mechanical Engineering) কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। এমন কি ঐ বিষয়ে কোন প্রবন্ধও বড় একটা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। অথচ চারিদিকে শিল্পের উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই কলকব্জার যুগে বাঙ্‌লা ভাষায় যন্ত্র-পূর্ত্ত-বিদ্যার আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, ষ্টীমের চাপে চায়ের কেট্‌লির ঢাক্‌না উঠিতে দেখিয়া, জেম্‌স্ ওয়াট ষ্টীম-এনজিন্ উদ্ভাবন করেন। ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

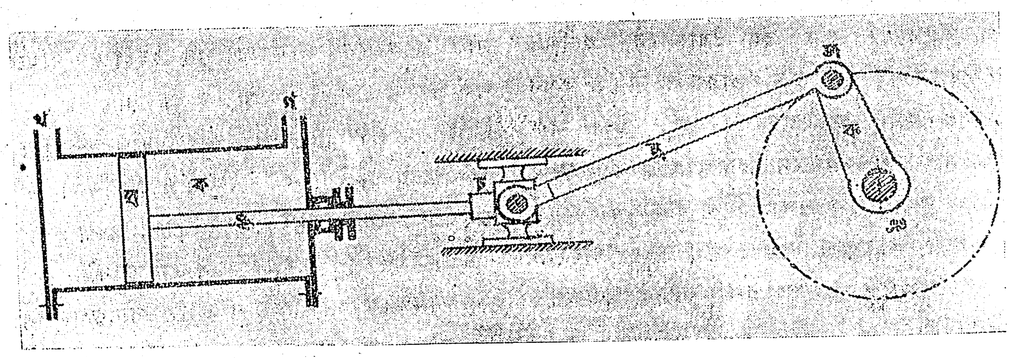

১ নং চিত্র

একটী পাত্রে জল রাখিয়া উহার তলদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে জল উষ্ণ হয়। অধিক তাপ প্রয়োগ করিলে উহা হইতে বাষ্প উত্থিত হয়। পাত্রের মুখে ঢাক্‌না চাপা দিলে দেখা যায়, ষ্টীম (অত্যুষ্ণ বাষ্প) উহাকে উপরে ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। ঢাক্‌না ময়দা দ্বারা আঁটিয়া দিন, এবং পাত্রকে আর একটু উত্তপ্ত করুন, দেখিবেন জল হইতে উত্থিত ষ্টীম ঢাক্‌নাকে ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠাইতেছে। অতএব আমরা বুঝিতে পারি, রুদ্ধ পাত্রে জল গরম করিলে, উহা হইতে যে ষ্টীম উৎপন্ন হয়, তাহা পাত্রের গাত্রে চাপ দিতে থাকে। যে পাত্রে চাপ-প্রদানক্ষম ষ্টীম প্রস্তুত হয়, তাহাকে বয়লার বলে।

ষ্টীম-এন্‌জিনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, একটী রেখা-চিত্রের (line diagram) সাহায্যে আধুনিক তাদৃশ যন্ত্রের মূল তত্ত্বটী ব্যাখ্যাত হইবে।

১ম চিত্রে ক সিলিণ্ডার, খ ও গ ষ্টীমের আগম-নির্গম পথ (steam port), ঘ পিষ্টন, ঙ পিষ্টন-দণ্ড, চ ক্রশহেড্, ছ সংযোগদ-ণ্ড (connecting rod), জ ক্র্যাঙ্ক-পিন্, ঝ ক্র্যাঙ্ক এবং ঞ ক্র্যাঙ্ক-শ্যাফ্‌ট। বয়লার হইতে চাপ প্রদানক্ষম ষ্টীম খ পথে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিয়া পিষ্টনের উপর চাপ দিতে থাকে। সুতরাং পিষ্টন বাম হইতে দক্ষিণে সরে। যন্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল এরূপ যে, যখন পিষ্টন সিলিণ্ডারের ডানদিকে আইসে, তখন খ পথ দিয়া ষ্টীমের প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়, এবং ঐ পথ বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) সহিত সংযুক্ত হয়। আরও গ পথে ষ্টীম প্রবেশ করিয়া পিষ্টনকে বামদিকে সরাইতে থাকে, এবং পিষ্টনের বামদিকস্থ ষ্টীম বায়ুমণ্ডলের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে ষ্টীম পর্য্যায়ক্রমে খ ও গ পথে প্রবেশ করাতে পিষ্টনটী দক্ষিণে ও বামে গমনাগমন করে। সিলিণ্ডারে ষ্টীমের প্রবেশ এবং উহা হইতে নির্গমন স্লাইড-ভাল্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থূল কথায় বলিতে গেলে ঘ, ঙ, চ ও ছ পরস্পর সংযুক্ত। তবেই দেখা যাইতেছে, যেমন ঘ বামে ও দক্ষিণে চলাফেরা করিবে ছও সেইরূপ করিতে থাকিবে। সুতরাং জ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিবে। জ এবং ঞ ঝ দ্বারা সংযুক্ত। অতএব ঞ ঘুরিতে থাকিবে। ফলে পিষ্টনের ঋজু রেখার গতি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের বৃত্তাকার গতিতে পরিণত হইতেছে। ঐ শ্যাফ্‌টের রেল-গাড়ীর চাকাকে ও ষ্টীমারের পাখাকে ঘুরায়।

কোন বৃহৎ আবিষ্কারই এক দিনে একজনের চেষ্টায় হয় না। এই লোকহিতকর যন্ত্রও এক ব্যক্তি উদ্ভাবন করেন নাই। বহু বৈজ্ঞানিক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে

উহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যন্ত্রটী আবার মিস্ত্রিশ্রেণীর লোক দ্বারাই উদ্ভাবিত। তাঁহারাই উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া ও বেশভূষায় সাজাইয়া উহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। কারণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, স্যাভারে খনিতে মালকাটা (খনক) হইয়া জীবন আরম্ভ করেন; নিউকমেন কর্ম্মকার ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু কলে শার্সিতে কাচ লাগাইতেন; ওয়াটের প্রথম অবস্থা বড় সুবিধাজনক ছিল না; তিনিও সাধারণ মিস্ত্রি ছিলেন। মানব-জাতি চিরদিন এই কয়জন মনীষীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

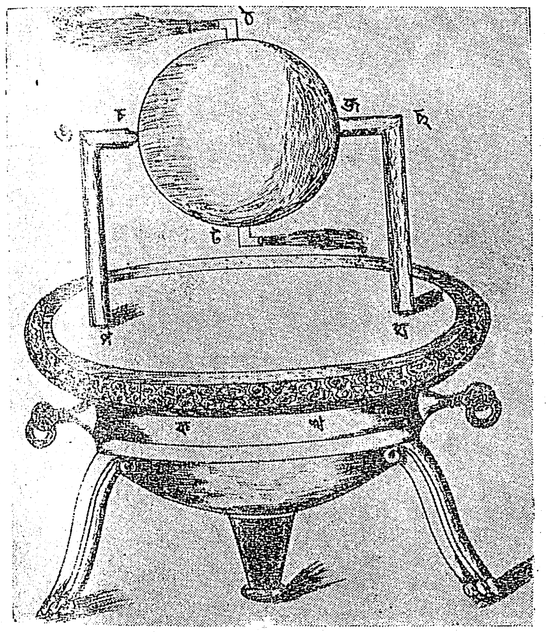

২ নং চিত্র

ইউক্লিডের জন্মস্থান পুণ্যভূমি আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরের এক পুস্তকাগারে একখানি গ্রন্থে ষ্টীম-এন্‌জিনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা হিরো। ইনি আর্‌কিমিডিসের সমসাময়িক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে অনেকগুলি যন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁহার উদ্ভাবিত, তাহার উল্লেখ নাই। গ্রন্থে বর্ণিত প্রথম ষ্টীম-এন্‌জিন্‌টীর বিষয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাউক।

২য় চিত্রে ক খ একটী কটাহ, গ ঘ উহার ষ্টীম-নির্গম-রোধক ঢাক্‌না। গ ঙ চ এবং ঘ ছ জ দুইটী নল ঢাক্‌না হইতে উত্থিত হইয়া একটী ফাঁপা গোলককে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চ প্রান্ত ফাঁপা নহে, সুচাল, এবং বিবর্ত্তন কীলকের (pivot) কাজ করে। জ প্রান্ত দিয়া ষ্টীম গোলকের মধ্যে প্রবেশ করে। ট, ঠ দুইটি বাঁকান নল গোলক হইতে নির্গত হইয়াছে। উহাদের মুখ বিপরীত দিকে আছে। কটাহে জল রাখিয়া উহার নীচে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে, জল হইতে ষ্টীম উত্থিত হইয়া গোলকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং বাঁকান নল হইতে বেগে বাহিরে আসিতে থাকে। ষ্টীম বাহিরে আসিবার সময় বিপরীত দিকে নলের গাত্রে চাপ দেয়, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই অসমতুলিত চাপ দ্বারা গোলকটী ঘুরিবে।

হিরোর পুঁথিতে একটী উষ্ণ-বায়ু-চালিত এন্‌জিনের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যন্ত্রটী দ্বারা মন্দিরের দরজা খোলা হইত; কিন্তু ষ্টীমের পরিবর্ত্তে উহা উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে চলিত।

হিরোর সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ষ্টীম-এন্‌জিন্ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে এন্‌জিন্ আখ্যা দেওয়া যায় না। উহাদিগকে পরীক্ষাযন্ত্র

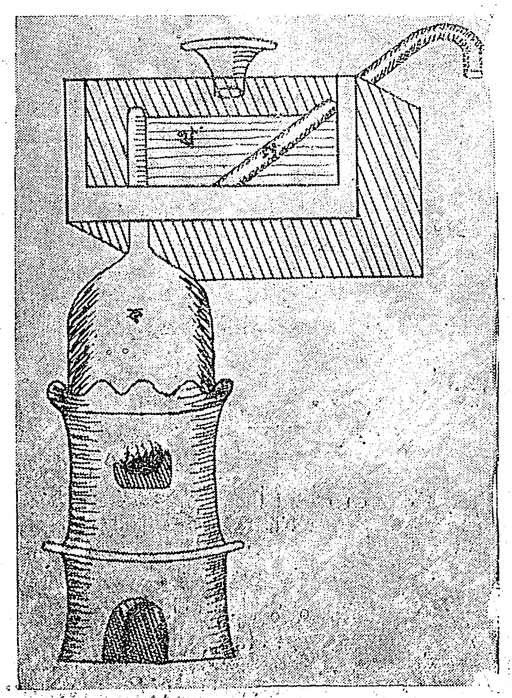

৩ নং চিত্র

(apparatus) বলা চলে। ঐ সময় পর্য্যন্ত ষ্টীম-এন্‌জিন্‌কে প্রকৃত কাজে লাগাইবার সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইবার আশা হয়। ষ্টীম যে প্রভূত চাপ দিতে পারে, এবং ঘনীভূত হইয়া পুনরায় জলে পরিণত হইলে শূন্যস্থান (Vocunm) জন্মায়, তাহা তাঁহারা জানিতেন। ৩য় চিত্র

১৬০১ খৃষ্টাব্দে পর্টা তাঁহার গ্রন্থে ষ্টীমের চাপ দ্বারা জল উত্তোলন করিবার একটী যন্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। পর্টা নেপলস্‌বাসী। ৩য় চিত্রে তাহার ষ্টীম-এন্‌জিন্‌টী দেখান হইল। চিত্রে ক একটী রিটর্ট্ বা বয়লার, খ জল রাখিবার চৌবাচ্ছা, এবং গ একটি বাঁকা নল। রিটর্টে জল রাখিয়া নিম্নে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে, জল হইতে ষ্টীম উত্থিত হইয়া চৌবাচ্ছায় জলের চাপ দিবে, এবং উহার জল বাঁকা নল দিয়া বাহিরে আসিতে থাকিবে। এই উপায়ে জল অনেক উচ্চে উঠান হইত।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সলোমন ডি কজ একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ত্তবিৎ ও স্থপতি ছিলেন। তাঁহার পুস্তকে একটী ষ্টীম-এন্‌জিনের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঐ

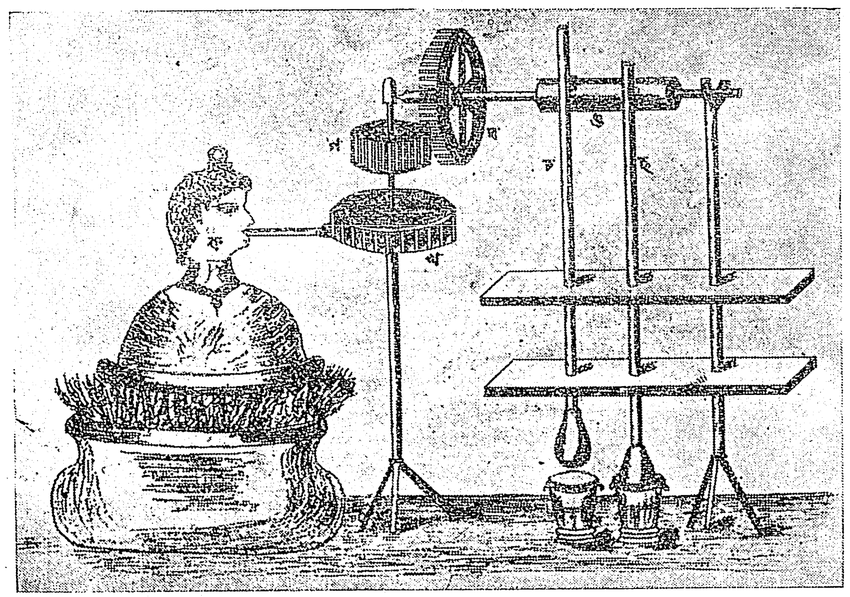

৪ নং চিত্র

যন্ত্রের সাহায্যে অনেক উচ্চে জল উঠান যাইত। তাঁহার যন্ত্রের মূলতত্ত্ব পর্টারই যন্ত্রের অনুরূপ।

ডি কজের পর গিয়োভানি ব্রাঙ্কার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬২৮ সালে ঔষধ চূর্ণ করিবার জন্য একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ৪র্থ চিত্রে ক বয়লার। উহার আকৃতি একজন নিগ্রোর মস্তক সদৃশ। বয়লার হইতে ষ্টীম নির্গত হইয়া জোরে খ চাকার ফলকে লাগে। সুতরাং চাকা ঘুরিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গ, ঘ, ঙ ঘুরিবে, এবং চ ও ছ মুষলদ্বয় উঠিতে ও পড়িতে থাকিবে। ব্রাঙ্কা ইটালিবাসী।

ইংলণ্ডনিবাসী ডেভিড র‍্যাম্‌জে ১৬৩০ সালের ২১শে জানুয়ারি তারিখে অনেকগুলি যন্ত্র পেটেণ্ট করেন। উহার মধ্যে ষ্টীম-এন্‌জিন্‌ও ছিল। ইংলণ্ডে শিল্পকার্য্যে ষ্টীমের ব্যবহার বোধ হয় এই প্রথম।

বৃহৎ আবিষ্কারগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় উহারা ক্ষুদ্র অবান্তর ঘটনা হইতে উৎপন্ন। কথিত আছে ষ্টীমের চাপে একটী পাত্রের ঢাক্‌না উত্থিত হইতে দেখিয়া, ঈষ্টার তাঁহার ষ্টীম-এন্‌জিনের কল্পনা করিয়াছিলেন। * ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত তাঁহার কৃত Century of Invention নামক পুস্তকে একটী ষ্টীম-এন্‌জিনের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তিনি না কি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ভক্স্‌হলে জল উচ্চে তুলিতে সমর্থ হন। যন্ত্রটি কিরূপ দেখা যাউক।

৫ম চিত্রে ক ও খ পাত্রদ্বয় গ ও ঘ নল দ্বারা একটী বয়লারে সংযুক্ত। একটী ঙ খাড়া নল হইতে চ ও ছ শাখাদ্বয় ক ও খ পাত্রের তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। জ ও ঝ নলের মধ্য দিয়া জল পাত্রদ্বয়ে প্রবেশ করে। উহার অন্য প্রান্ত একটী কূপে ডুবান থাকে। বয়লার হইতে ষ্টীম পর্য্যায়ক্রমে পাত্রদ্বয়ে প্রবিষ্ট হয়। পাত্রে ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হইতে থাকিলে শূন্যস্থান উৎপন্ন করিবে, এবং বায়ুমণ্ডলের চাপে জল ঐ শূন্য স্থান

* স্যাভারে ও ওয়াট সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

অধিকার করিবার জন্য ধাবিত হইবে। যখন একটী পাত্র জল পূর্ণ হইতে থাকিবে, তখন অন্যটীতে ষ্টীম প্রবেশ করিয়া উহার মধ্যস্থিত জলের উপর চাপ দিবে, এবং জল ঙ নল হইতে ফিন্‌কি দিয়া নির্গত হইয়া ফোয়ারার আকার ধারণ করিবে। একটী পাত্রের জল

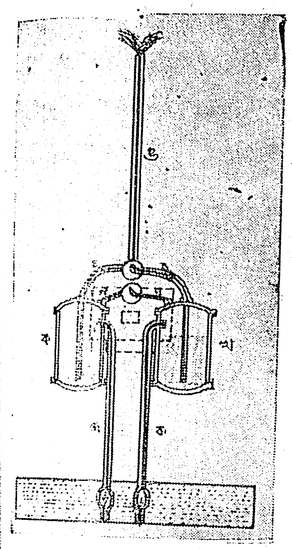

৫ নং চিত্র

ফুরাইলে উহাতে ষ্টীম প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে, এবং বয়লার অন্য পাত্রটীর সহিত সংযুক্ত হইবে।

কে যে ষ্টীমকে প্রকৃত কাজে লাগান সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন পর্টাই উহা করিয়াছিলেন। আবার কাহারও মত ঔষ্টারই প্রথম কার্য্যকর ষ্টীম এন্‌জিন উদ্ভাবনে সমর্থ হন। ইটালিবাসীরা দাবী করেন, ব্রাঙ্কাই উহার প্রথম উদ্ভাবক। যিনিই করুন না কেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কেহই ব্যবসা হিসাবে উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখনকার পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ষ্টীমকে এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই মানুষের ইঙ্গিতে চলিতে হইবে।

ঐ সময়ে বিলাতের খনিগুলির অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যে, উহাদের ভিতর হইতে জল বাহির না করিলে কয়লা ইত্যাদি বাহির করা অসম্ভব। 'অভাবই উপায় উদ্‌ভাবনের মূল'। ফলে তখন বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। ইয়োরোপের প্রত্যেক প্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ষ্টীম-এন্‌জিন্ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন, এবং উহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টিত থাকেন। জয়লক্ষ্মী স্যাভারের গলায় মাল্যদান করেন। এই মনীষী ব্যক্তি একটী ঘড়ি নির্ম্মাণে সমর্থ হন, এবং ক্যাপ্‌ষ্টান্ দ্বারা পাখা ঘুরাইয়া নৌচালনের একটী কৌশলের উদ্‌ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৯৮ সালের ২৫শে জুলাই খনি হইতে জল উত্তোলনার্থ যে যন্ত্রটী পেটেণ্ট করেন, তাহা ৬ষ্ঠ চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

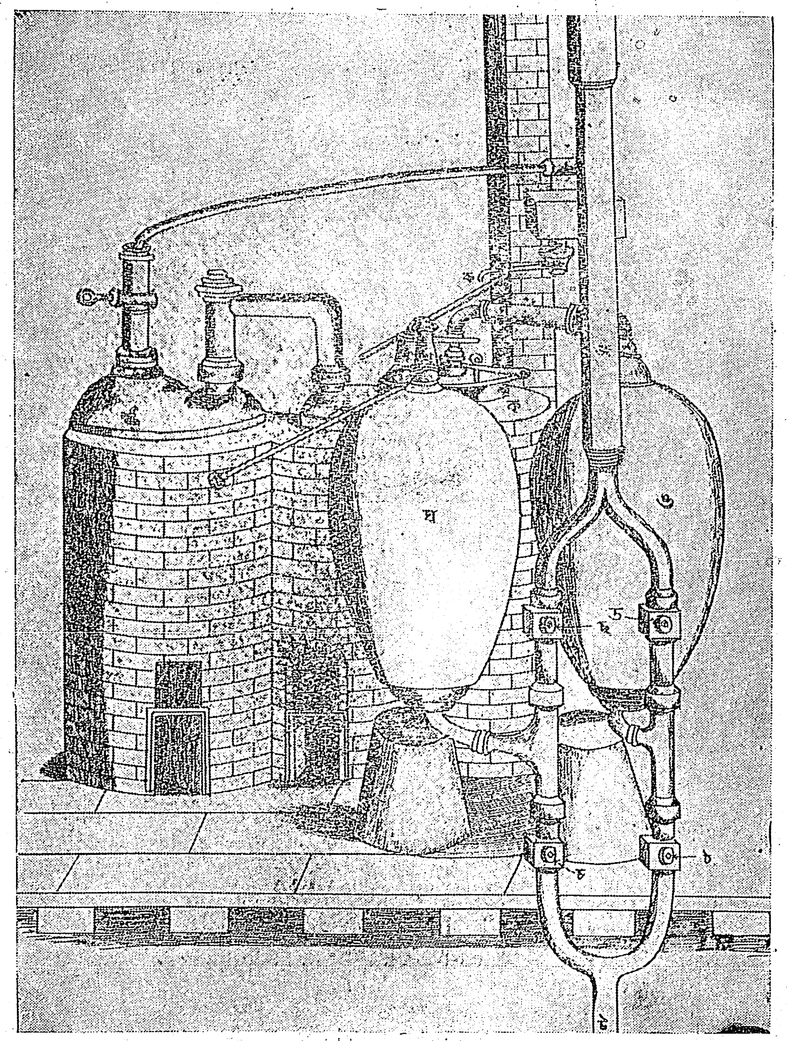

৬ নং চিত্র

ক বয়লার হইতে ষ্টীম উত্থিত হইয়া থ ও গ নলের মধ্য দিয়া পর পর থ ও ঙ পাত্রে প্রবেশ করে। যখন

ষ্টীম থ-তে প্রবেশ করে, তখন চ ভাল্‌ব বন্ধ করিয়া ছ খুলিয়া দিলে পাত্রের ভিতরস্থ জল জ নল দিয়া উপরে উঠিতে থাকে। ছ এবং থ নলস্থিত ভাল্‌ব বন্ধ করিয়া চ খুলিয়া দেওয়া হইল। এখন ঝ কক্ খুলিয়া ঘ এর বহির্ভাগে জল দেওয়া হইতে থাকে। পাত্র শীতল হইলে উহার মধ্যস্থিত ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হইবে ও শূন্যস্থান উৎপন্ন করিবে। এখন চ ট পথে জল প্রবেশ করিয়া পাত্র পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে ঠ বন্ধ করা ও ড খুলিয়া দেওয়া

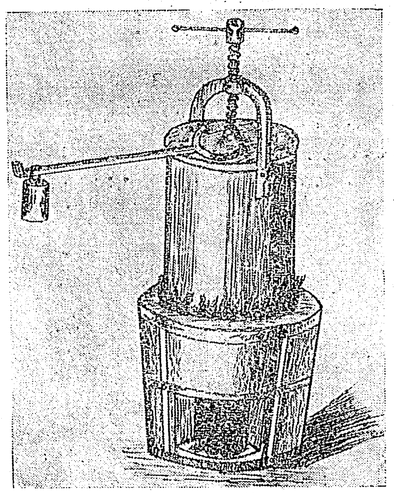

৭ নং চিত্র

হয়, অপিচ বয়লার হইতে ষ্টীম ঙ পাত্রে প্রবেশ করিতে থাকে। সুতরাং ষ্টীমের চাপে জল জ পথে বেগে বাহিরে আসিবে। এই প্রকারে জল অনেক উচ্চে উঠান যায়।

স্যাভারে যদিও ঐ যন্ত্রের নাম "খনির বন্ধু" রাখিয়াছিলেন, তত্রাচ ইহা বহু খনিতে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, উহাতে নিরাপদ ভাল্‌ব (safety valve) ছিল না। সুতরাং বয়লার ফাটিয়া দুর্ঘটনা হইবার ভয় ছিল, এবং উহাতে অনেক কয়লা লাগিত। আবার, তাঁহার বয়লারে ষ্টীমের চাপ ৮ হইতে ১০ বায়ুমণ্ডলের চাপ (atmospheric) অপেক্ষা অধিক চাপ পাওয়া যাইত না, সুতরাং জলও অল্প উচ্চে উঠিত।

পরবর্ত্তী সময়ে উদ্ভাবিত ষ্টীম-এন্‌জিন্ মাত্রেই নিরাপদ ভাল্‌ব ব্যবহৃত হইত। পেপিন ১৬৮০ সালে ঐ ভাল্‌ব নির্ম্মাণ করিয়া ষ্টীম-এন্‌জিনের ইতিহাসে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করেন। ইনি ফ্রান্স দেশীয় লোক। যে যন্ত্রে প্রথম উহা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম পেপিনের ডাইজেষ্টার (৭ম চিত্র)। উহাতে রন্ধন-কার্য্য হইত। উহা একটী পাত্রবিশেষ। পাত্রের ঢাক্‌না স্ক্রু দ্বারা আবশ্যকমত জোরে আঁটিয়া দেওয়া হয়। পাত্রের নীচে অগ্নি জ্বালিলে ষ্টীম উত্থিত হইয়া পাত্রের গাত্রে চাপ দিবে। চাপের পরিমাণ একটী লিভারে ওলন ঝুলাইয়া জানা যায়।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, আধুনিক এন্‌জিনে পিষ্টন

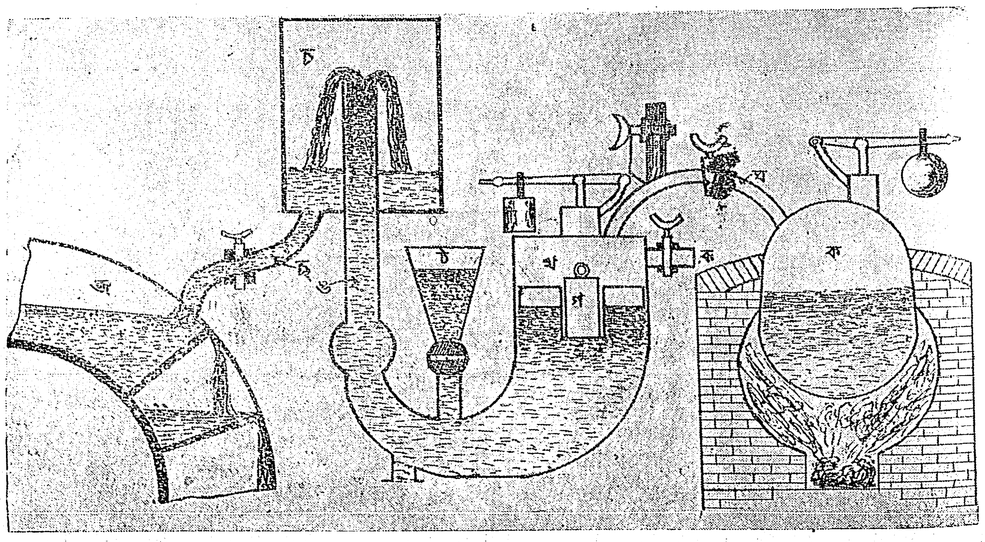

৮ নং চিত্র

ষ্টীমের চাপে অগ্র-পশ্চাৎ গমনাগমন করে। প্রথমে পেপিনই সিলিণ্ডারে ষ্টীমের চাপে পিষ্টন সরাইয়া জল উপরে উঠান। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনিই প্রথমে অভ্যন্তরে চুলাযুক্ত বয়লার নির্ম্মাণ করেন। বিখ্যাত গণিতবিদ লাইব্‌নিজ্ বিলাতে আসিয়া স্যাভারের এন্‌জিনটী দেখিয়া যান, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পেপিনকে উহার বিষয় বলেন। পেপিন তখন জার্ম্মাণিতে ছিলেন। তিনি ষ্টীম-এন্‌জিন্ লইয়া পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করেন, এবং ১৬৯০ সালে পিষ্টন এন্‌জিন্ যুক্ত প্রথম ষ্টীম-এঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৭ সালে যে নূতন যন্ত্র দ্বারা জল উঠাইয়া জল-চক্র (water-wheel) চালান, তাহা ৮ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

চিত্রে ক বয়লার থ শিলিণ্ডার এবং গ পিষ্টন। ক হইতে ষ্টীম ঘ পথে থ এ প্রবেশ করে, এবং উহার উপর চাপ দিতে থাকে। চাপে জল ঙ নল দিয়া চ কক্ষে প্রবেশ করে, এবং ছ পথে নির্গত হইয়া জ জল-চক্র চালায়। এখন ঝ পথ দিয়া ষ্টীম পলায়ন করে, এবং ট ফাঁদল দ্বারা শিলিণ্ডার পুনরায় জলপূর্ণ হয়। আবার থ পথে ষ্টীম প্রবেশ করিয়া ঙ পথে জল উঠায়।

আশার ক্ষীণ আলোক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উজ্জ্বলতর হয়। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের অনেকগুলি তথ্য পূর্ত্তবিদগণ জানিতে পারেন। বায়ুমণ্ডলের চাপ, গ্যাসের চাপের ধর্ম্ম, শূন্য স্থানের প্রকৃতি ও তাহা উৎপন্ন করিবার উপায় ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। পেপিন ও স্যাভারে প্রভৃতি ষ্টীম ঘনীভূত করিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যন্ত্রনির্ম্মাতা বিপুল চাপ-সহনক্ষম বয়লার নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া আছেন। অপিচ এ পর্য্যন্ত যে সকল এন্‌জিন্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ত্রুটি অজ্ঞাত নাই। সমস্ত মালমশলা প্রস্তুত। অপেক্ষা কেবল একজন আবিষ্কারকের, যিনি এগুলি একত্র করিয়া কার্য্যকর অথচ কম খরচায় চলে এমন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন। যে ব্যক্তি এই কার্য্য সম্পাদন করেন তাঁহার নাম নিউকমেন। তিনি সাধারণ কর্ম্মকার ছিলেন। ১৭০৫ সালে ক্কলের সহযোগে তিনি যে সুবিখ্যাত যন্ত্র প্রস্তুত করেন, তাহা ৯ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

ক একটি বয়লার। ষ্টীম ঘ ককের মধ্য দিয়া গ শিলিণ্ডারে প্রবেশ করিলে ঘ পিষ্টন উঠিবে, এবং ব বীমে (beam) সংযুক্ত প্লাম্পের দণ্ড ঙ কে নীচে নামাইবে। খ বন্ধ করিয়া চ খুলিয়া দেওয়া হইলে টাঁকি হইতে ছ পথে শিলিণ্ডারের মধ্যে ফিন্‌কি দিয়া জল প্রবেশ করিতে থাকিবে। ষ্টীম ঘনীভূত হইয়া শিলিণ্ডারে শূন্য স্থান সৃজন করিবে। এখন বায়ুমণ্ডলের চাপে পিষ্টন নামিবে, সঙ্গে সঙ্গে পাম্প-দণ্ড উঠিবে। ষ্টীম ঘনীভূত করিবার জল জ

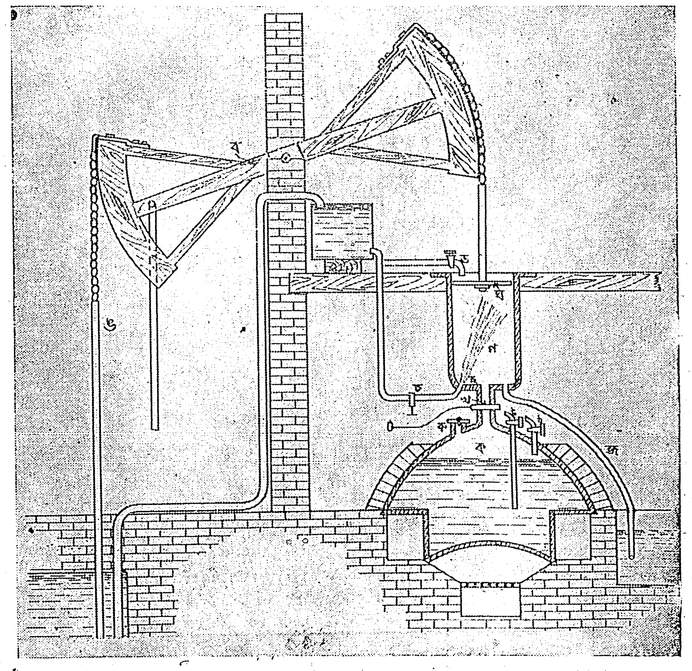

৯ নং চিত্র

পথে নির্গত হইবে। ঝ নিরাপদ ভাল্‌ব, এবং ট ও ঠ দুইটী গেজ-কক। ষ্টীমের পলায়ন নিবারণার্থ ড নল দিয়া পিষ্টনের উপর জল দেওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, নিউ-কমেনের এন্‌জিন্ মূলতঃ পেপিনের শিলিণ্ডার ও পিষ্টন এবং স্যাভারের বয়লার লইয়া গঠিত।

ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই যন্ত্র চালাইতে হইলে, ককগুলি খুলিতে ও বন্ধ করিতে হইবে। প্রথমে যে যন্ত্রটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে কক আপনা হইতে খুলিত কিম্বা এক ব্যক্তি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ঐ কার্য্য করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত। ১৭১৩ সালে হাম্‌ফ্রে পটার নামক একটী বালক এইরূপ একটী এন্‌জিনের ককগুলি খুলিতে ও বন্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। চঞ্চলমতি বালকের পক্ষে একস্থানে দাঁড়াইয়া এই কার্য্য করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাকল রশি ও ক্যাচের (catch) সাহায্যে বীম দ্বারাই এই কার্য্য করাইয়া লইত ; সুতরাং খেলিবারও একটু সময় পাইত। ১৭১৮ সালে হনরি বেটন তাঁহার এন্‌জিনে পটারের আদিম কৌশলের পরিবর্ত্তে মজবুত ভাল্‌ব-গীয়ার সংযুক্ত করেন।

নিউকমেন ও বেটনের পর স্মীটন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি নিউকমেনের এন্‌জিন্ ও বয়লারের প্রভূত উন্নতি করেন। ঐ যন্ত্র ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক খনিতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এমন কি ইংলণ্ডের বাহিরেও তাঁহার যন্ত্র আদৃত হইয়াছিল। ১৭৭৩ সালে সেণ্ট পিটার্শবর্গের বন্দরে ঐ যন্ত্র বসান হয়। হলাণ্ডের সমুদ্র-পৃষ্ঠাপেক্ষা নিম্নস্থানসমূহ হইতে জল নিকাশের জন্য যন্ত্রটী স্থাপিত হয়। তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ শিল্পী কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অসাধারণ প্রতিভা-শালী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিয়া গ্রেট ব্রিটেন দেশে তখন কোন বৃহৎ কারখানা নির্ম্মিত হইত না। উষ্টার যে পথ উন্মুক্ত করেন, স্যাভারে, পেপিন ও নিউকমেন প্রভৃতি দ্বারা যাহার বন্ধুরতা অপনোদিত হয়, স্মীটন তাহার পৃষ্ঠ দৃঢ় করিয়া দেন, এবং অবশেষে ওয়াট আসিয়া সেই পথ সুশোভিত করেন।

জেম্‌স্ ওয়াটের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এন্‌জিনিয়ার-গণ নিউকমেনের উদ্‌ভাবিত এন্‌জিনের বিভিন্ন অংশের অনুপাতের উন্নতি এবং অংশগুলির সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা এই এঞ্জিনের মূল ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন নাই। নিউকমনের শিলিণ্ডার পর্য্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। সুতরাং অনেক উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায় ; ফলে কয়লা বা কাঠের অপব্যয় হয়।

১৭৬৩ সালে ওয়াট গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউকমেনের একটি এন্‌জিন্ মেরামতের জন্য নিযুক্ত হন। সেই মুহূর্ত্তে তিনি এন্‌জিনের উপরুক্ত ত্রুটি ধরিয়া ফেলেন। এই ত্রুটি সংশোধন করিতে হইলে শিলিণ্ডারকে ষ্টীমের সমান উত্তপ্ত রাখা আবশ্যক। তজ্জন্য তিনি কন্‌ডেন্‌সার নামক আর একটী পাত্র শিলিণ্ডারে সংযুক্ত করিয়া দেন। শিলিণ্ডার হইতে ঐ পাত্রে ষ্টীম গমন করিবে, এবং জলের সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া শূন্য স্থান উৎপন্ন করিবে। কন্‌ডেন্‌সার সকল সময়ে শূন্য রাখিবার জন্য তিনি উহাতে একটী পাম্প যোগ করেন। শিলিণ্ডারের চতুর্দ্দিকে ষ্টীমের জ্যাকেট ও উহাতে তাপ অপরিচালক পদার্থের আবরণও তাঁহার আবিষ্কার। যন্ত্রে পিষ্টন-দণ্ড শিলিণ্ডারের উপরিভাগে ষ্টীম-রোধক ষ্ট্যাফিং-বাক্সের মধ্য দিয়া নির্গত। পিষ্টনের উপরিভাগে বায়ুর পরিবর্ত্তে ষ্টীম চাপ প্রদান করে। ১০নং চিত্র

ওয়াট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে একদিকে-ক্রিয়াশীল single acting) একটী এন্‌জিন্ (১০ চিত্র) নির্ম্মাণ করেন। শিলিণ্ডারের কেবল নিম্নাংশ কন্‌ডেন্‌সারের সহিত সংযুক্ত। যন্ত্রে ক ষ্টীম ভাল্‌ব, খ সাম্য ভাল্‌ব (equilibrium valve), এবং গ নিগম ভাল্‌ব (exhaust valve)। যখন ঘ পিষ্টন নামিতে আরম্ভ করে, তখন উহার নিম্নে শূন্য স্থান উৎপন্ন করিবার জন্য গ খুলিয়া দেওয়া হয়, এবং ক খুলিয়া পিষ্টনের উপর ষ্টীম চাপ প্রদান করে। পিষ্টন নীচে নামিলে ক ও গ বন্ধ করিয়া খ খুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে, পিষ্টনের উভয় পৃষ্ঠে ভারসাম্য হয়। এখন ও অস্ত্রদণ্ডের ভারে পিষ্টন উপরে উঠিবে। চ কন্‌ডেন্‌সার, ছ বায়ুপাম্প। ছ হইতে নির্গত জল ইত্যাদি জ-তে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ঝ ফিডপাম্প দ্বারা বয়লারে গমন করে।

১৭৮১ সালে নির্ম্মিত যন্ত্রে তিনি ফ্লাই-চাকা (fly-wheel) সংযুক্ত করিয়া দেন। উহাতে পিকার্ডের উদ্ভাবিত ক্রাঙ্ক এবং সংযোগ-দণ্ড (connecting rod) ব্যবহৃত হয়। ১৭৮১ সালের যন্ত্রে আরও দুইটী উন্নতি দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ উহা দুইদিকে ক্রিয়াশীল (double acting), অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে পিষ্টনের উভয় পার্শ্বে ষ্টীম প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, পিষ্টন কিয়দ্দূর গমন করিলে ষ্টীমের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ হয়, এবং বাকি পথটা পিষ্টন ষ্টীমের প্রসারণ-শক্তির সাহায্যে চলে। পিষ্টন-দণ্ড যাহাতে ঠিক ঋজুভাবে উঠিতে ও নামিতে পারে,

তজ্জন্য তিনি সমান্তরাল গতি (parallel motion) নামক কৌশলটী উদ্ভাবন করেন।—ষ্টীমের প্রবেশ নিয়মিত করি-

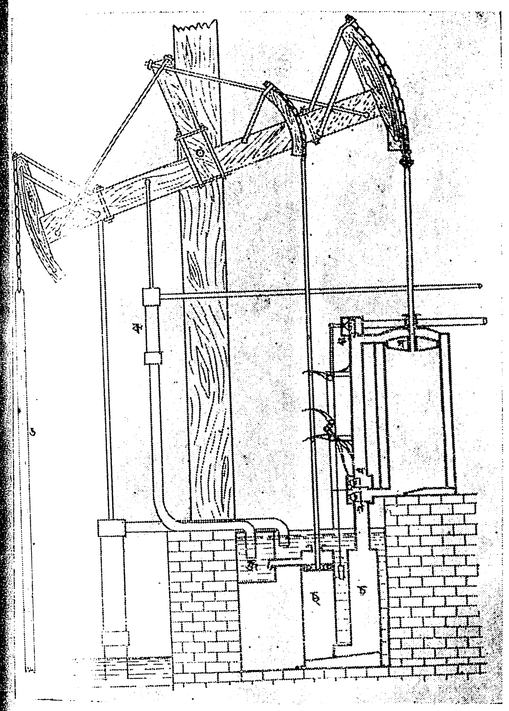

১০ নং চিত্র

বার নিমিত্ত থ্রট্‌ল-ভাল্‌ব (throttle-valve) গভর্ণরও এখনও হইতেছে। একটী আধুনিক যন্ত্রের দিকে চাহিলেই তাঁহার নির্ম্মিত। ইণ্ডিকেটারও সৃষ্টি। ইহাতে ষ্টীমের উহা পরিস্ফুট হয়।

বাষ্প ও পিষ্টনের গতি এই দুইএর সম্বন্ধ আপনা হইতে অঙ্কিত হইয়া যায়।

মার্ডক ওয়াটের সহকারী ছিলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। কাহার কথা বলিব ? ওয়াট নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এন্‌জিনের যে সমস্ত উন্নতি হইয়াছে তাহাতে মার্ডকের অনেক হাত আছে। মার্ডকই স্লাইড-ভাল্‌ব উদ্ভাবন করেন, যদ্দ্বারা সিলিণ্ডারে ষ্টীমের প্রবেশ ও উহা হইতে নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়।

ওয়াটের জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি ষ্টীম এন্‌জিন্ উদ্ভাবন করিতে গিয়া দুইবার ঋণে জড়িত হইয়া পড়েন, এবং সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য অন্য কার্য্য লইতে বাধ্য হন। শুভক্ষণে তিনি বোল্টনকে পেটেণ্টের অংশীদার করেন। এই দুই ব্যক্তি মিলিত না হইলে ষ্টীম-এন্‌জিনের এতটা উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। ওয়াটের দেহ দুর্ব্বল ছিল, এবং অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার মনও দমিয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন বোল্টনের উদ্যম ও সাহস যথেষ্ট ছিল। বোল্‌টনের ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত ওয়াটের কারি-করী প্রতিভার সংযোগ, এবং সর্ব্বোপরি বোল্‌-টনের আর্থিক অবস্থা সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতি-ক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ওয়াট ও বোল্‌টনের পর ষ্টীম-এন্‌জিনের আরও উন্নতি হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। একটী আধুনিক যন্ত্রের দিকে চাহিলেই উহা পরিস্ফুট হয়।

গান

শ্রীসত্যানন্দ দাশগুপ্ত

আজ

অরুণ আলোর কিরণরেখা
পড়্‌ল এসে ভূমিতলে,
অরূপ রূপের হাট বসেছে
ঘাটে, মাঠে, জলে, স্থলে।
প্রভাতে আজ কোন্ পাখীটী
ধর্‌ল তাহার মধুর গান,
বীণাখানির কোন তারেতে
বাজ্‌ল তাহার সুরের তান।

পথিক আজি কোন পথেতে
চল্‌তে গিয়ে পেল বাধা,
কৃষক বধূ কোন্ ঘাটেতে
দেখল আজি অসীম সাদা।
নদীর মাঝে কোন্ তরণী
চল্‌ল আজি উজান জলে,
আমার প্রাণের পাগ্‌লা ভোলা
চরণ ফেলে তালে তালে।

এক রাত্রি

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল

এবার যশিদিতে তিন মাসের জন্য বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল, লম্বা ছুটিটা সেইখানেই নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত মনে কাটাব মনে ক'রে। "তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে"—এরি মধ্যে তিন বার কল্‌কাতায় আস্‌তে হয়েছিল, অবশ্য মক্কেলের খরচায়। একটা কমিশন সেরে ফিরছিলুম লক্ষ্মীপূজার আগের দিন,—রাত্রি ১০টা ২৪শের প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে। ভিড় একেবারেই নেই। একখানি গাড়ীতে ছিলাম হাওড়ার আরোহী মাত্র ৪ জন। ২ জন নেমে গেলেন উত্তরপাড়ায়। নীচেকার বার্থে আমি ও আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

সে দু'জন লোক চলে যাবার পর, আমিই কথা আরম্ভ কল্লুম।

"আপনার কতদূর" ?

"যশিদি"।

"আমিও তাই,—বেশ, গাড়ীতে চাবী বন্ধ করলে আপনার কোন আপত্তি নেই ?"

"একেবারেই না।"

এই বলে আমার সঙ্গে চাবী ছিল, দুদিক দিয়ে বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লুম।

সে ভদ্রলোকটির একটু বিবরণ দেওয়া দরকার। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, ঢিলে পায়জামা ও পাঞ্জাবী। একটী ছোট বিছানা, তার ভিতরে একটা পোর্টফোলিও, ও একটা বাদ্য-যন্ত্র। তাঁর বাক্সটা দেখে, বেহালা বা বেঞ্জোর মত একটা কিছু মনে হ'লো। সেটা ছিল বেঞ্চের নীচে।

রাত্রে আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটে নাই। খুব সকালে সেতারের মত মৃদু ঝঙ্কারে ঘুম ভাঙ্গলো। বোধ হয়, ষ্টেসন হবে অণ্ডাল। দেখি, ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এফটি তারের যন্ত্রে আলাপ কর্চ্ছেন! যন্ত্রটা ব্যাঞ্জোর ছোট সংস্করণ ব'লে মনে হ'লো। মনে মনে অনেক গবেষণা করে ঠিক কর্‌তে না পেরে, জিজ্ঞাসা করলুম,—"মশাই, এটা কি যন্ত্র ?"

"এর নাম গীতার। নামটা বিলাতী বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, দেশী থেকে নেওয়া। এর মাঝে হচ্ছে, তারের যন্ত্রে,—গীত অর্থাৎ সংগীত সুন্দররূপে ধ্বনিত হয়। এই আপনারা মনে করেন, বেহালা বা ভায়োলিন বিলাতী যন্ত্র। তা একেবারেই নয়—আসল নাম হ'চ্ছে বাহুলীন, অর্থাৎ যে যন্ত্র বাহুতে লীন করে বাজাতে হয়।"

আমি—"মশায়, যশিদিতে যাবেন কোথায়" ?

তিনি—"রোহিণী রোডে রেল পার হয়ে বাঁ দিকে মিনিট দশেকের (অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি চল্‌লে), তার পর ডানদিকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা,—মনভরণ মাহতো'র বাড়ী"—

আমি খানিকক্ষণ ভেবে ভেবে মনভরণ মাহতোর বাড়ী কোন্‌টা, ঠিক করতে পারলুম না, যদিও সেখানে সে বাড়ীই আমার চেনা ও যাতায়াত আছে। বড় মুস্কিলে পড়লাম। লোকটার কাছে ঠকে যাবো!

তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন,—"সে বাড়ী চিন্‌বেন্ কি ক'রে, সে ত পাকা বাড়ী নয়। সে ওখানে চাষ করে। তার খড়ের বাড়ী। সেইখানে আমি উঠিবো। থাক্‌বো মাত্র কালকের দিনটা। কাল রাত্রের এক্সপ্রেসে ফিরে যাবো।"

লোকটা ক্রমশঃ যেন সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। তিনি নিজেই বল্লেন,—"আচ্ছা এখন থাক্ ও-সব কথা। সেখানে গিয়ে, কাল সন্ধ্যায়, যেখানে একটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত বাড়ী আছে, তার কিছু দক্ষিণে মনভরণের বাড়ী খোঁজ কর্‌লে। আর খুব সম্ভব আমাকে সেই বাড়ীর কাছেই পাবেন। অনেক কথা বল্‌বো আপনাকে।" ততক্ষণে তিনি বাজনা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তারপর আমরা বেলা ১১টায় যশিদি পৌঁছে গেলুম।

* * * * * * * *

সন্ধ্যা হয়ে এলো, ছেলেরা তখনও বেড়িয়ে ফেরেনি—আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লুম। ঠাকুরকে বলে গেলুম, যদি দেরী হয়, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো।

কোজাগরী পূর্ণিমা; তাতে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মাঠের উপর দিয়ে সেই বাড়ীটার দিকে চল্লুম। সেই

তের বাড়ী বলেই প্রসিদ্ধি ছিল। সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনি বাড়ীর পাশের মাঠে পায়চারী কর্চ্ছেন। সেই পোষাক, সেই সব,—বেশীর মধ্যে কপালে এক সিঁদুরের ফোঁটা।

আমি বল্লুম—"এই যে, এরি মধ্যে বৈদ্যনাথ সেরে এসেছেন দেখ্‌ছি।"

তিনি—"পায়ে হেঁটে গেছি, মা কালীর কাছে পাঁঠা বলি দিয়েছি, তার পর পায়ে হেঁটেই এসেছি।"

আমি—"আজই যাবেন ?"

তিনি—"হ্যাঁ, আর থাক্‌বার যো নেই।"

"কেন ?"

"এই আমার মানত।"

"কি সংকল্প করবেন বলেছিলেন যে ?"

"হ্যাঁ, এই যে বলি। চলুন, ওই বেদীটার উপর বসি।"

* * * *

"আমি ছিলাম প্রফেসার,—কলেজের নামটা নাই বা বল্লাম। আমার নাম নির্ম্মল। বাপের অনেক বিষয়ও আছে। উকীল হইনি, কারণ, অনর্থক মিথ্যা কথা বলতে হবে বলে। ডাক্তার হইনি, কারণ, লাইসেন্স নিয়ে মানুষ খুন করতে পারবো না ব'লে। তাই হলুম অধ্যাপক। দুটী বিষয়ে এম-এ-ও পাশ করেছিলাম। বিয়েও হয়েছিল কম বয়সে। আর স্ত্রীর নামও ছিল নির্ম্মলা। বেশ মিল হয়েছিল, না?—হয়েছিলও সত্য। আর ভালবাসার ভাগ বসাতে ভগবান কোন সন্তানই দেন নাই। চার বৎসর আগে—তখন আমার বয়স ৩২,—আর তাঁর বয়স ২৫, আমার বুকের সুখ করেছিল। এখানে এসেছিলাম হাওয়া বদল করতে ঐ যে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে দুখানা বাড়ী দেখ্‌ছেন, ওরই একখানা আমি নিয়েছিলাম। ছিলাম আমি, আমার স্ত্রী, পিসিমা, আর লোকজন। সঙ্গের সাথী ছিল রাশীকৃত বই ও ঔষধ। তিন মাসের মধ্যে নির্ম্মলার সুচিকিৎসা যত্নে ও সেবায়—শরীর বেশ সেরে উঠ্‌লো। এই-খানেই বাড়ী করবো ঠিক করে এই জমিটা নিয়েছিলাম, আর ক্রমে বাড়ীও কতকটা তোলা হয়েছিল, দেখ্‌তে পাচ্ছেন বোধ হয়!

* * *

"আমাদের পাশের বাড়ীতে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক, জমিদার। বেশ বড়লোক। বাতে ভুগ্‌ছিলেন,—তাঁর স্ত্রী, ভাই ও লোক লস্কর, মায় মোটর গাড়ী। পাশাপাশি থাকার দরুণ বেশ মেশামিশি হয়ে পড়্‌লো। মেয়েদেরও আসা-যাওয়া আরম্ভ হলো। ভদ্রলোকটীর নাম হরেন্দ্র, বয়স চল্লিশ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কিছু কিছু পড়া আছে, তাই আমার সঙ্গে মিলেছিল। ছোট ভাইয়ের নাম নৃপেন্দ্র, বয়স প্রায় ২৪।২৫ হবে। এরি মধ্যে নানান দেশ-বিদেশে ঘুরে কৃষি-বিদ্যা, না কি একটা শিখে এসেছে। বড় ভাইয়ের চাইতে ছোটকেই আমাদের বেশী ভাল লাগতো। কারণ, সব বিষয়ে সে বেশ একটা কৃতিত্বের সহিত কথা বল্‌তে পারতো। তা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্কও বার করে ফেল্লে। সে না কি আমার মামাতো সম্বন্ধীর মাস্‌তুতো ভাইয়ের শালা। সে আমার স্ত্রীকে বৌদি বলেই ডাকৃতো।

খাওয়া-দাওয়া, নিমন্ত্রণ, বনভোজন, মোটরে বেড়ান; আজ রোহিণী,—কাল রিখিয়া, পোরশু দুম্‌কা,—এরকম প্রায়ই চল্‌তো। আমি ত শীঘ্রই হাঁফিয়ে উঠলুম। আর বেশী যেতে পারতুম না। আমার স্ত্রীর জন্য যত রকম বাঙ্গলা মাসিক পত্র, ও আধুনিক গ্রন্থমালা সংস্করণের বই সমস্তই আস্‌তো। কিন্তু এদানী আর সেগুলো প্যাকই খোলা হ'তো না।

শেষে এক দিন,—এই কোজাগর পূর্ণিমার দিন,—আমি গিছলাম দেওঘরে। সন্ধ্যার ট্রেণে ফিরে এসে শুন্‌লুম, নির্ম্মলা গেছে পার্টি কর্ত্তে, সঙ্গে মাত্র একটা ব্যাগ নিয়ে। আমি স্থির হয়ে শঙ্কর ভাষ্যের এক অধ্যায় শেষ করবার জন্য ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লুম। ঘড়িতে রাত্রে ১০টা টং টং করে বেজে উঠ্‌তে,—হরিয়াকে ডেকে বল্লুম, ওরে, ও বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আয়,—অনেক রাত্রি হচ্ছে। সে এসে কিছুই বলতে পারলে না। আমি তাকে ধমকে নিজেই গেলুম। কেউ কোন খবর দিতে পার্ল্লে না।

* * *

আরো কয়েক দিন ছিলাম। তার পর চলে এলাম কলকাতায়। নির্ম্মলার কোন সন্ধান পেলাম না। বাড়ী অসমাপ্ত রয়ে গেলো। অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছি। এখন বৎসর বৎসর এইখানে এই দিনে এসে মায়ের কাছে নিজে হাতে পাঁটা বলি দিয়ে আসি। দেখি, কত দিনে বাসনার বলি দিতে পারি।" বলেই, একটা বিদায় সম্ভাষণও না ক'রে, তাড়াতাড়ি মনভরণের বাড়ীর দিকে গেলেন। বুঝলাম লোকটার মাথা ঠিক নেই।



অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহের জের

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(৩)

আমি বাল্যবিবাহের সপক্ষে লেখায় অনেকেই আমার বিপক্ষে লিখিতেছেন। আমাদের সমাজ-বিধির পক্ষে বাল্যবিবাহ যৌবন-বিবাহাপেক্ষা উপযোগী ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। দাম্পত্য-প্রেমের প্রসারও আমার মতে ইহাতে অধিকতরই হইয়া থাকে। অবশ্য সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। তবে বিচারটা সমষ্টি ধরিয়াই করিতে হয়। যৌবন-বিবাহের ব্যবস্থা যে সকল সমাজ আছে, তাহাদের তুলনায় আমাদের সমাজে যে দাম্পত্য-জীবন অধিকতর সুখের, ইহা অনেকেরই দ্বারা স্বীকৃত সত্য

বাল্য-বিবাহকে অনেকে অকাল-মৃত্যুর জনক বলিয়া থাকেন। আমি বলিয়াছি, অকাল-মৃত্যুর জন্য আমাদের মধ্যে নূতন আমদানী আরও সহস্র কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ হিন্দু সমাজে সুদূর অতীত কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অকাল-মৃত্যু জিনিসটী যে এ দেশে অনেকটাই নূতন আমদানী, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

সে যাহা হৌক, এ দেশে বাল্য বিবাহ দিন দিন হ্রাস ভিন্ন বর্দ্ধিত হয় নাই; কিন্তু দীর্ঘজীবীর সংখ্যা নিত্যই সংক্ষেপ হইতেছে। ইহাতে মনে হয়, বাল্য-[illegible] অকাল-মৃত্যুর অন্ততঃ মুখ্য কারণ নহে। তবে [illegible] কারণে এ দেশীয় নরনারীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া [illegible] তাহাতে বিবাহ বয়োবৃদ্ধির প্রয়োজন ঘটিয়াছে"—এ কথা যদি কেহ বলেন ত আমি 'না' বলিতে পারি না, [illegible] উহা বলিও নাই। রুগ্ন ও দুর্ব্বল "নর বা নারী যে আদৌ বিবাহ করিবার উপযুক্তই নহেন" এই কথাই আমি লিখিয়াছি। যদি কেহ বলিতেন, "এখনকার ক'জন ছেলেমেয়ে সবল ও সুস্থ?" তাহা হইলে আমায় বলিতে হইবে "তবে তাহাদের সবল সুস্থ করিয়া তার পর যে বয়সেই হৌক বিবাহ দিও। শাস্ত্রেও ইহার বিধি আছে "ব্যাধিগ্রস্ত বা ব্যাধিগ্রস্তা পাত্র পাত্রী" নির্ব্বাচন কার্য্যে তালিকা-বহির্ভূত হইয়াছে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ দেশের ছেলেমেয়েদের নীরোগ ও সবল কারবার জন্য ঔষধ গেলানো ভিন্ন আর কি কোন পথ আছে?

পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মাত্রেই নিন্দনীয় ও সর্ব্বদোষাকর, এমন বিশ্বাস আমার নাই। শাস্ত্র-বিধিসকল [illegible] প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা থাকে। কালে হয় ত তাহার সংস্কারের আবশ্যকতা ঘটে; ইহা

প্রশস্ত কারণ দেখাইলে, এ কথা স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বিধি সমস্তই অন্যায় ও ভ্রমপূর্ণ ছিল এবং ঐ সকলের প্রবর্ত্তকগণ একান্ত মূঢ়, অনুদার-চিত্ত ছিলেন, এমন কথা আমার মত লোকের মুখে শুনিলে, নিজেদের বুদ্ধির উচ্চ প্রশংসা করিতে পারিব না; এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদের মুখেও শুনিলে ভয়ে ভয়ে বলিবে, মুনিঋষিরাও কদাচিৎ মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে, এরূপ একটা প্রবাদ আছে।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীসরসীবালা বসু লিখিয়াছেন "স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ বিবেকানন্দ ভারতের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই ভারতবর্ষের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কঠোর বিধি নিষেধের প্রতি তীব্র কটুক্তি করিয়া গিয়াছেন। লেখিকা (অর্থাৎ আমি) যে একস্থানে লিখিয়াছেন, যথার্থ সমাজ-হিতৈষণা ও দেশ-হিতৈষণার সহিত ভাবিয়া বলেন না। স্বামীজীর পক্ষেও কি সেই কথা প্রযোজ্য?"

এস্থলে পুরোহিত বলিতে কাঁহাদের বুঝাইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি আধুনিক "দেবশর্ম্মা" স্বার্থকরকারী সংস্কৃতভাষা-ভীত "চালকলাজীবী" জীব-বিশেষকে বুঝায়, তাহা হইলে স্বামীজীর 'কটুক্তি' যত তীব্র হয় আমি ততই খুসী। কিন্তু সে "কটুক্তি" যদি মনুযজ্ঞে ঋষ্যাদি মহর্ষিগণের বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে, এস্থলেও বিনিময়ে বলিব, "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।" কারণ, উক্ত মহাপুরুষ ও মহাত্মা স্বামীজী মহারাজকে আমি অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়াই সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহাদেরও উর্দ্ধে কোন অংশে, কোন মতে এতটুকু ছোট তো ভাবিতে পারি না, বরং অধিকতর অভ্রান্ত মনে করি।

যাহা হৌক, "বর্ত্তমান কালে অশক্ত শরীর ও অসংযত শিক্ষার মধ্যে থাকিয়া আমাদের ছেলেরা বাল্যবিবাহের পর শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মচর্য্য-পালন পূর্ব্বক সন্তানজননে বিলম্ব করিতে পারিবে না। তার চেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বয়স্থা কন্যা লাভানন্তর বর্ষ মধ্যে পিতা হওয়াই ভাল" এ কথার উত্তরে আমি বলিব, "যদি সন্তানদের ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপযুক্ত করিয়া আমরা গঠিত করিতে না পারি, তবে বার বৎসরের মেয়েকে বিবাহ দিয়া মনোমত বধূ গড়িয়া লওয়ার সাধ মন হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই সঙ্গত।" "শিক্ষিতা মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী ভাল ভাবে ঘর করিতে পারে না।" এমন কথা আমি বলি নাই। কিন্তু এ দেশের ক'জন মেয়ে যথার্থ শিক্ষিতা? আমি বলিয়াছি, ১১।১২ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিয়া তার ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে নিজ মনোমত করিয়া শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। ঐ মেয়ের স্বামী ঐ কয়েক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। আমি জানি, সকল ঘরের পক্ষেই ইহা অসম্ভব ঘটনা নহে। তবে ইহার জন্য শৈশবাবধি "রাঙ্গা বউ"এর ছড়া কাটিয়া ছেলেকে বধূর জন্য লালায়িত রাখিলে চলিবে না। মেয়েদের পিত্রালয়াপেক্ষা শ্বশুরালয়েই প্রধানতঃ শিক্ষা-কেন্দ্র হওয়া কেন এদেশে সঙ্গত, তাহার যথেষ্ট কারণও দেখান হইয়াছে। "সকল ঘরের চালচলন ঠিক এক" নহে, যথেষ্ট বিভিন্ন; বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান কালে। এখন হিন্দু-সমাজে বৈদিক কালোচিত আচারপরায়ণতা হইতে আরম্ভ করিয়া পুরা ইয়োরোপীয় সমাজোপযোগী আচারসম্পন্ন হিন্দু যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। শিক্ষা-বিভ্রাট মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট ঘটিতে দেখা যায়। তার পরও যখন কোন দেশের কোন শাস্ত্রে নাই বলিয়া ইহাকে উপহাস করা হইতেছে, তখন নাচার।

মেয়েরা বড় হইয়া শ্বশুরবাড়ী গেলেই, শাশুড়ীর সহিত কলহ করিবে এমন কথা বলা হয় নাই। বালিকা বধূর শ্বশুর-বাড়ীর আত্মীয়জনের প্রতি সমধিক ভালবাসা জাত হওয়াই মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত। অপর পক্ষ হইতেও ঠিক এই যুক্তিই দেখান যায়। পতি-পত্নী সম্বন্ধেও এই একই কথা। ইহার ব্যতিক্রম যথেষ্ট হয়, কিন্তু সে "সমষ্টি ধরিয়া কথা নয়।" তার পর বয়োধিক বিবাহের সহিত স্বাধীন নির্ব্বাচন অস্বীকার করা চলে না। পরিণত মনোবৃত্তিতে কি অভিভাবকের পছন্দকেই মনের সহিত মানিয়া লওয়া সকলকার পক্ষেই সম্ভব? সংসারে কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিতেছি। আমার একটী কুমারী বান্ধবী,—ইনি জাতিতে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে খৃষ্টান, উপাধিতে এম-এ, বি-এল, আমায় বলিয়াছিলেন, "মা-বাপে কম বয়সে দুটীকে মিলাইয়া দেন, একত্র বসবাস করিতে করিতে দুজনের প্রতি দুজনে আকৃষ্ট হইয়া পড়া যায়; তখন রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-দৌলতের ফাঁক চোখে-কানে ঠেকে না। কিন্তু যদি নিজেকে পছন্দ করিয়া

বিবাহ করিতে হয়, তবে মন কি সহজে কাহাকেও নিজের যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চায়? তা নিজে যেমনই কেন হই না। আবার অপর পক্ষেও এই উপদ্রব আছে। পরিণত বয়সে, উভয়তঃ সর্ব্ব বিষয়ে মনের মিলন মতের মিলন হইয়া যে বিবাহ, সে বড় উচ্চাঙ্গের বিবাহ বিবাহ বটে; কিন্তু সে কি সহজে ঘটে? তাই মনে হয়, আমার বিবাহ করা আর সম্ভব হইবে না। অবশ্য যদি সুযোগের খাতিরে করা যায়, সে স্বতন্ত্র কথা।" ছেলেমেয়েদের বড় করিয়া বিবাহ দিলে তাদের পছন্দর উপর কতকটা আসিয়া পড়িবে বই কি! কিন্তু সেটা এই বাঁধাবাঁধির সমাজ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণের জন্য আরও জটিল ব্যাপার। যাই হোক, "তাই বলিয়াই আর কোন্ স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য-ধর্ম্ম-পালনে বিরত আছেন?"

এ দেশের লোকের আয়ু গড়পড়তায় ২৩ বৎসর, ইহা বোধ করি আমারই কল্পিত নহে। কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই, যে ২৩ বৎসরের মধ্যেই সকল লোককেই ৪টী সন্তান জন্মাইয়া মরিতে হইবে এবং সকলেই ঠিক ঐ এক সময়েই মরে। আমি বলিয়াছি, অদীর্ঘজীবী জাতি দীর্ঘজীবী জাতির দৃষ্টান্তানুসারে ১৭।১৮।২০ বৎসরে মেয়ের বিবাহ দিলে, তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিবে কবে? তবে সেটা লেখা আমার ভুল হইয়াছে; কারণ, বার বৎসরে বিবাহও ষোড়শে সন্তান জন্ম না হইয়া, সপ্তদশে বিবাহ ও উক্ত বর্ষেই সন্তানের জননী হওয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই, এখন এইরূপই হইতেছে। তাঁরা বধূ জীবনের আনন্দে বঞ্চিত হইয়া একেবারেই প্রমোশন পাইয়া উচ্চপদবীতে আরূঢ়া হইয়া থাকেন।—সেই ভাল। তবে আমার প্রবন্ধে ১৭ বৎসরে তিন-চারিটী ছেলেমেয়ে হওয়া চাই, ইহা কিরূপে বুঝাইল? আমি ১৬, বৎসরের পূর্ব্বে সন্তান হওয়া অনুচিত, এইরূপই ত বলিয়াছি।

বাল্য-বিবাহ পল্লী-সমাজে ও ব্রাহ্মণ-কায়স্থেতর জাতির মধ্যেও দিন দিন হ্রাস প্রাপ্তই হইতেছে। নানা কারণে হইবেও। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যেই ইহার আবশ্যকতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহার উচ্ছেদের সহিত ইহার প্রয়োজনীয়তারও দিনে দিনে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সব জিনিসেরই দুইটা দিক আছে; এবং সময় ও অবস্থা নিজেই সবচেয়ে বড় সংস্কারক। যখন যে সমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায়, তখন সেই অনুসারেই সে কতকটা ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এ দেশের বর্ত্তমান কালের দুর্ব্বল-শরীর, সঙ্কীর্ণ-চিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার মধ্যে পালিত হইয়া বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন যখন ছেলের পক্ষে আকাশ-কুসুম বলিয়াই তাদের অভিভাবকেরা রায় দিতেছেন, তখন সে আশা করা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা। যুবতী বধূগণ যে শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিতেছেন, তাহা তাঁদের স্বামী ও পরিজনবর্গের বেশ মনোমত হইতেছে, ইহাও একান্ত সুখের বিষয়। আমরা কিন্তু সর্ব্বদাই ইহার বিরুদ্ধ অভিযোগই শুনিতে পাই। কেহ বলেন "ম বাপ এত বড় ধেড়ে মেয়ে করে রেখে কি এই লেখাপড়াও শেখাতে পারে নি?" কেহ বলেন "ম বাপ কি কেবল বই পড়তেই শিখিয়েছিল? সংসারে কুটীগাছটী কি কখনও নাড়তে শেখায় নি? মেয়েমানুষে লেখাপড়া করে কি আফিসে যাবে না কি? বাইজী না কি, যে গান শিখেছে।" আবার কাহাকেও দুঃ করিতে শুনি, "বউমার পেটে ছেলে এলো, নইলে এই গান বাজনা শেখাই, ইচ্ছা ছিল।"

কেহ কেহ আমার প্রতি অবরোধ প্রথার পক্ষপাতি আরোপ করিয়া উহা যে দেশের জিনিস নহে, পর বাহিরের আমদানী, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি অবরোধ-প্রথাকে কোথাও সমর্থন করি নাই। বরং বলিয়াছি, বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামে অবরোধ-প্রথা নাই, এবং বাস্তব পক্ষে মেয়েরা পুরুষের একান্ত পদদলিত ও অধীন নহেন। শিক্ষিত জনগন মধ্যে নারীর ন্যায় অধিকার ও স্বাধীনতার সম্বন্ধে খুবই ত্রুটী আছে, তাও আমার মনে হয় না। অর্থাৎ যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে উহা অপ্রাপ্য থাকে না। তবে যে দেশের পুরুষজাতিই পরাধীন, অস্ত্র আইন যাদের হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সে দেশের মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? পুরাকালের নারীরা পূর্ণ স্বাধীনাই ছিলেন; বৈদেশিক অত্যাচার আরম্ভ হওয়া অবধি তাদের স্বাধীনতার উপর ক্রমশই হস্তক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে এবং কতকটা রাজার জাতির অনুকরণের ফলও আছে। আবার যদি কখন তুর্কির অধিকারে আসিতে হয়, তবে আমাদের এই স্বাধীনতার সুর বদ্‌লাইবে না

ত? বোধ হয়, না। কারণ, তুর্ক নারীও বোর্কা খুলিতেছেন। শাস্ত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জিত হইলেও, যখন তাঁর স্বামীর সহিত একাত্মতা স্বীকৃত হইয়াছিল, যখন তাঁর সকল ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অধিকার জাত হইয়াছিল, তখন পুরুষের সকল উন্নতির সহিত তাঁহার সংযুক্ত থাকাও অবশ্যম্ভাবী, এবং চিরদিন তাহাই হইয়া আসিতেছে। নারী যে চিরদিনই অবলা ছিলেন না, তার সম্বন্ধে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সেদিন পুরুষের বীর্য্যও তদপেক্ষা হয় ত বা কম ছিল না। আজ পুরুষশক্তি গুহা-নিহিত, তাই নারীও অবলা। পুরুষ যতটুকু পৌরুষ লাভ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে নারীরও ততটুকু উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে গৃহের পুরুষ যতটুকু উদার, যতটুকু উন্নত, সে গৃহে নারীও তাহাতে বঞ্চিতা নহেন, এইরূপই যেন মনে হয়।

ভদ্রসমাজে নারীকে ভিতরে ও পুরুষকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র সমাজে সে ব্যবস্থা নাই। নারী সেখানে সমধিক স্বাধীনা। তাই কি সেখানে নারীকে অধিকতর সম্মানের পাত্রী ও সম্পূজিতা মনে করিব? আবার বলি, আমি অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতিনী আদৌ নহি; কিন্তু নারীর স্বাতন্ত্র্য বা পুরুষের সহিত সর্ব্বত্রই সমান অধিকারকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করি।

"পুরাতত্ত্ববিদ ইচ্ছা করিলে প্রাচীন সমাজের" কি কি "উদাহরণ" দিবেন জানি না—তবে আমাদের মনে হয় এদেশে যখন লোকে শতায়ু ছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থাশ্রম বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের ব্যবস্থা ঐ শাস্ত্রকারগণই করিয়াছিলেন এবং উহা শত শত লোকে মানিয়াও চলিত। এখনকার কালে আর সে আয়ুও নাই, সে আশ্রম-বিভাগও নাই—তবে আর সে সুদূর অতীত কাহিনী স্মরণের লাভ কি? চতুরাশ্রমের পুনঃ প্রবর্ত্তন এ ভারতে আর এখন সম্ভব কি? আহা, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি হইতে পারে? বোর্ডিং বাস ছাড়িয়া কি ছেলেরা গুরুগৃহে বাস করিবে? অধ্যাত্ম বিদ্যালাভে জন্ম সফল করিবে? ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ সংযমে পূত হইয়া কুল পবিত্র ও জননীকে ধন্যা করিবে? মেয়েরা রেশম পশম লেশ—চিকনের শ্রাদ্ধ ছাড়িয়া অজীন-বসনা (বা মোটা খদ্দর) হইবেন? দশের জন্য আত্মবলি দিতে শিখিবেন? এমন দিন কি আসিবে?

আমরা সেকেলে "হিঁদুর" মেয়ে। শিক্ষা, সঙ্গ, আদর্শ সবই আমাদের সঙ্কীর্ণ। তাই শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রকারগণকে একান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, ও তাঁদের বাণীকে অভ্রান্ত মনে করি। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ সকল স্থলেই সমান ব্যবস্থা খাটাইয়া রাখেন নাই। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে তাঁরা সকল বিধি-ব্যবস্থারই তারতম্য রাখিয়াছেন। যেদিনে আবশ্যক বোধে বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থায় অকাল-মাতৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন। আবার রুগ্ন, দুর্ব্বল পাত্র পাত্রী, অথবা অক্ষম পিতার কন্যাদের জন্য উহাকে বাধ্যতামূলক করেন নাই। আমি বাল্য-বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য বিধানের ব্যবস্থা পালিত হইতে দেখিয়াছি; তাই আমার বিশ্বাস ছিল যে, উহা ভদ্র সমাজে অন্ততঃ অসম্ভব নহে; বিশেষ যেদিনের ছেলেরা হাসিমুখে জেলখানার অসংখ্য লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া লইয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যে সব নজীর দেখা গেল, তাহাতে আমি বলিব, বাল্য-বিবাহে প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা এখনও বলিব যে, এই অল্পজীবী জাতির মেয়েদের তথাকথিত "২০।২২শে" বিবাহ হোক। অবশ্য আমার মত পূর্ব্ব প্রবন্ধেই লিখিয়াছি। বিবাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক হওয়া সঙ্গত নহে এবং শাস্ত্রেও সে বিধি নাই। যে মা-বাপ নিজের ছেলেকে ব্রহ্মচর্য্য পালনোপযোগী শিক্ষা দিতে সমর্থ, যাঁর পুত্রবধূটীকে নিজ মনের মত গঠনের সাধ ও সামর্থ্য আছে, তিনি অবশ্যই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে ঘরে আনিতে পারেন। যাঁরা ও সকল পরিশ্রমে কাতর, তাঁরা দ্বাবিংশ-বর্ষীয়াই গ্রহণ করুন; রুচি এবং আদর্শ সবারই কখন এক হইতে পারে না। তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্ম-পরিজন প্রতিবেশী এবং ঐ কন্যার পরিণেতা নিজের ছেলেটীকে শুদ্ধ যেন ভাল করিয়া বলিয়া দেন যে, তাহারা ঐ মেয়েটীকে তার "ধেড়ে বয়সের" ও অমনোনীত শিক্ষার ত্রুটী ধরিয়া তাহাকে উঠিতে বসিতে সদা সর্ব্বদা খোঁটা দিয়া দিয়া না পাগল করেন।

শেষ কথা, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়া ভিখারী ধনী হয় না বটে, কিন্তু যাদের রক্তে ধনার্জ্জনের শক্তি ছিল, চেষ্টা করিলে আজও তারা নিজেরাও যে ধনী হইতে পারে, অন্ততঃ এ জন্যও তাদের নিজেদের অতীত

ইতিহাসটুকু জানিয়া রাখা মন্দ নয়। চির-ভিখারীর আশয় ও আদর্শ দুই-ই একান্ত ক্ষুদ্র।

যারা শুধু পূর্ব্ব ধনবত্তার বড়াই করে, অথচ নিজেদের বড় করে না, তারা তাদের অতীত ইতিহাসকে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্য দিয়া অনুভব করিতে পারে নাই; মাত্র ভাসা-ভাসা ভাবে পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে। জাতীয় মর্য্যাদা-জ্ঞান না থাকিলে জাতি উন্নত হইবে কি দিয়া? তবে সে জাতীয় গৌরব সত্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও খাঁটি জিনিস হওয়া চাই, ইহা নিশ্চিত; এবং কালোচিত সংস্কার উপযুক্ত হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার মত উদারতা থাকা প্রকৃত উন্নতি-কামীর পক্ষে একান্তই আবশ্যক, ইহাতেও কোন দ্বিধা নাই।

কিন্তু এখন সমাজ-সংস্কারের অধিকার—বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের, এত লোকের উপর অর্শিয়াছে যে, তদনুসারে তাহাদের চলিতে গেলে "জাতীয় আদর্শ" যে কোন্ পূতি-গন্ধময় পঙ্কের তলায় তলিয়া যায়, তাহা বলা যায় না। যাঁরা আধুনিক বঙ্গীয় "আর্টের" সহিত পরিচিত আছেন, তাঁরা কি পুরাতন শাস্ত্রবিধির চেয়েও উহাকেই উন্নততর আদর্শ মনে করিবেন? বিশেষতঃ নারীর পক্ষে? শাস্ত্র-বিধি সবাই মানে না; ইচ্ছামত বিকৃতার্থেই অধিকতর ব্যবহৃত হয় সত্য, কিন্তু না মানার দলও তো তার চেয়ে কই কোন বড় আদর্শ দেখাইতে পারিলেন না?

পিতৃ-পুরুষের বা মাতৃ মাতামহীর সাহায্যে আত্মশ্লাঘা না করিয়া নারী-সমাজ এই নূতন আদর্শকে সম্মান করিবেন কি?

প্রবীণ উপদেষ্টা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয়ত মন্দ হইত না। তাঁহার উপদেশের মধ্যে আমরা অনেক সময় প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া থাকি।

মানুষ যখন সংশয়ের গোলক-ধাঁধায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন তার পরিচিত পুরাতন পথকেই বরং সে কথঞ্চিৎ নিরাপদ মনে করে, যতক্ষণ না যথার্থ বিশ্বস্ত সাহায্য-হস্ত তাহার জন্য প্রসারিত হয়। ইহাতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া যায়, সেও মঙ্গল; তথাপি বারম্বার বিপথে বিড়ম্বিত হওয়া ভাল নয়।

বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার শিক্ষয়িত্রী-সমস্যা ও বিধবাদিগের শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ

স্ত্রী শিক্ষার একটি প্রধান সমস্যা

দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার একটী সাধারণ সমস্যা শিক্ষয়িত্রীর অভাব। শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর এখানে বিশেষ প্রয়োজন। সমাজে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত থাকায়, অনেক স্থলে পুরুষের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া, অনেকেই নিজ নিজ পরিবারের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। শিক্ষার উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরগুলিতে এই আপত্তি খুব বেশী। শৈশব-শিক্ষায় বালক-বালিকারা মিলিত হইয়া, একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আপত্তি প্রথম উত্থাপিত হয়, আদ্য-শিক্ষায়। এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ না হইলেও, শিক্ষয়িত্রীদিগের দ্বারা শিক্ষা পরি-চালনের বন্দোবস্ত হইলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিতে পারে। অপরাপর স্তরে, যতদিন পুরুষের সম্পর্ক থাকিবে, ততদিন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইবে না। অন্তঃপুরে, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, ইহা বলাই বাহুল্য। এরূপ অবস্থায়, শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা-বৃদ্ধি স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

শিক্ষয়িত্রী লাভের সম্ভাবনা

এখন দেখা যাক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, শিক্ষয়িত্রী লাভের সম্ভাবনা কিরূপ। বর্ত্তমান সময়ে, যাঁহারা এরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার করিতেছেন, সেই অগ্রসর সম্প্রদায়ের মহিলারা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করিতে পারেন। তাঁহাদিগকেই স্ত্রীশিক্ষার নেতৃত্ব করিতে হইবে। ইঁহাদের সংখ্যা খুব কম। সেই জন্য, যেখানে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন খুব বেশী, কেবল সেই-খানেই, ইঁহাদের স্থান হওয়া উচিত। যখনই সুযোগ ঘটিবে,

মধ্য, অন্ত্য ও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশীয় ফিরিঙ্গি সম্প্রদায় হইতেও শিক্ষয়িত্রী লাভের সম্ভাবনা আছে। এই উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ফিরিঙ্গি-মহিলা স্ত্রীশিক্ষায় সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগকে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ইংরাজী ভাষা অধ্যাপনার ভার ইঁহাদের উপর থাকিতে পারে। য়ুরোপীয় মহিলারাও আমাদের স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব ও বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষায়, ইঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ আবশ্যক হইবে। মণ্টেসারীর প্রণালী, বুদ্ধি পরীক্ষা, বা মনো বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া, এবং শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা দ্বারা, ইঁহারা আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। এরূপ কার্য্যে, ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের মহিলারা, বিশেষ ভাবে, আমা-দিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন। শিক্ষাতত্ত্বের আলো-চনায়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির স্থান ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির অপেক্ষা অনেক উচ্চে।

এই তিন শ্রেণীর মহিলা শিক্ষয়িত্রীদিগকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়া শিক্ষা-কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে নিজ নিজ সংস্কার ও ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবার অধিকার কাহারো নাই; তবে তাঁহাদের নিকট অনেকখানি সহানুভূতির আশা করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই, শিক্ষার্থিনীদিগের সংস্কার ও অসম্পূর্ণতা স্নেহের চক্ষে দেখা আবশ্যক হইবে, এবং লোক-হিতৈষণা তাঁহাদের কর্ম্মের নিয়ামক না হইলে, তাঁহাদিগের দ্বারা যথেষ্ট সুফল লাভের আশা থাকিবে না। দেশের নৈষ্ঠিক সমাজের, এরূপ মহিলা শিক্ষয়িত্রী-দিগের উপর, একটা অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান। এই ভাবকে, সহানুভূতি ও প্রীতি দ্বারা নষ্ট করিতে না পারিলে, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সামাজিক বাধা অতিক্রান্ত হইবে না।

কিন্তু উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রী দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষায় যথেষ্ট হইবে না। আমাদের সমাজের ভিতর হইতেই এরূপ শিক্ষয়িত্রী অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদিগকে শিক্ষা-কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। পর্দ্দা সত্ত্বেও, এ বিষয়ে, আমাদের ভাবিবার ও করিবার কি কিছুই নাই? সধবা স্ত্রীলোকেরা, সাধারণতঃ, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিধবাদিগের ভিতর হইতেই শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

বিধবাদিগের দুঃখে অসঙ্গত সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের অবমাননা করা হইবে। তাঁহাদের পার্থিব দুঃখ, ত্যাগ, সেবা ও সংযমের মহিমায়, সমাজে বরণীয় হইয়া আছে। বাহির হইতে, যে দুঃখ অমানুষিক অত্যা-চার বলিয়া বোধ হয়, সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমাজের সহিত একাত্ম জীবন যাপন করিয়া, তাঁহারা সমাজকে মাত্র বাহ্য বস্তু বলিয়া বুঝিতে ও ধারণা করিতে শিখেন নাই। তাই যাহা অপরের দৃষ্টিতে সামাজিক অত্যাচার বা নিষ্পেষণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাঁহাদের নিকট পরমার্থ,—অনন্ত পারত্রিক সুখের আকর। সকলেই সজ্ঞান, এই আধ্যাত্মিক শান্তি ও সংযমের পবিত্র-তায় মহনীয়া না হইলেও, এইটীই যে তাঁহাদের জীবনাদর্শ, এবং এই আদর্শই যে সামাজিক আচার ব্যবহার দ্বারা পরিপুষ্ট, এ কথাও খুব সত্য। এই আদর্শ যে সর্ব্বস্থলেই সংগ্রামপূর্ণ জীবনে কার্য্যে পরিণত হয়, এই সংযমের ভিতর, বা অন্য প্রকার, দুঃখ যে কাহারো নাই, অসংযমের পিচ্ছিল পন্থা অনুসরণ করিবার অবসর বা কুযোগ যে তাঁহাদের থাকিতে পারে না, অথবা এরূপ পন্থা যে কেহ কখনও অনুসরণ করেন না,—এরূপ কথা বলিবার মত দুঃসাহস কাহারো নাই। সমাজে বিধবাদিগের ভিতর দেবীও আছেন, মানবীও আছেন, এবং পিশাচীরও অভাব নাই। এরূপ সম্ভাবনার ভিতর দিয়াই, শিক্ষার প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমাদের বিধবাদিগের ভিতর হইতে, শিক্ষয়িত্রী লাভের আশা বলবতী হইতে থাকে।

বিধবাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন

আমাদের সমাজে বিধবাদিগের স্থান, হয় পিতার সংসারে, না হয় স্বামীর গৃহে। সকলেরই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইতে পারে না। যেখানে অর্থাভাব, সেইখানেই

তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু নির্ভরতা, ক্ষেত্র-বিশেষে, বিধবাদিগের অনেক দুঃখের ও অনেক লাঞ্ছনার কারণ হয়। অনেকের আবার নির্ভর করার মত স্বজনেরও অভাব হয়। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও যদি সঙ্গে সঙ্গে হীন হয়, তখন কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে যেখানেই দুঃখের আতিশয্য বিদ্যমান, এবং ব্রহ্মচর্য্য সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইখানেই প্রলোভন ও পতনের আশঙ্কাও অধিক। এরূপ লাঞ্ছিতা ও সঙ্গতিহীনা বিধবাদিগের উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা যে আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। সমাজের সকল স্তরেই, এরূপ বিধবার সংখ্যা কম হইবে না, এবং সেই কারণে, ইহাদের জন্য, উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে।

বৃত্তি শিক্ষা

উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষাই বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি শিক্ষা। এরূপ শিক্ষায় দেখিতে হইবে, সমাজে ও দেশে, কিরূপ বৃত্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে বৃত্তিগুলি অনায়াসেই অবলম্বিত হইতে পারে, উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষায়, প্রথমেই সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের দেশে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ উপার্জ্জন করেন না। তাঁহারা নিজ নিজ পরিবার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহাদের জন্য, বৃত্তি অবলম্বনের পথও খুব প্রশস্ত নয়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, এবং শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে বহু স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হইবে। সঙ্গীত সম্পন্ন গৃহস্থদিগের সন্তান-সন্ততির অভিভাবিকা (governess) রূপেও, অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বিভিন্ন প্রকার কুটীর-শিল্পও অনেকের অন্ন-সংস্থানের সহায় হইবে, এবং ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী ও চিকিৎসক রূপেও, অনেকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন। সমাজের সকল অবস্থাতেই, এই বৃত্তিগুলি গ্রহণ করিবার সুযোগ অনেকেরই ঘটিবে না। তথাপি, স্ত্রীশিক্ষায় এই বৃত্তিগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলি ব্যতীত, আরো কোন প্রকার বৃত্তি গৃহীত হইতে পারে কি না, তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং বিধবাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। একটী কথা এখানে বেশ জোর করিয়াই বলা যায়;—শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে বহু বিধবার প্রয়োজন হইতে পারে, এবং সেই কারণে, উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষায়, এই বৃত্তিটীর উপর, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাতেও, সদ্‌বংশজাতা অনেক বিধবা শিক্ষার অভাবে, ভদ্রপরিবারে, নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রম দ্বারা, সামান্য উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই, শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইলে, শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে পারেন, অথবা অন্য প্রকার বৃত্তি দ্বারা, নিজ নিজ ভরণপোষণের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে অনিচ্ছুক হইবেন না। এই কারণে মনে হয়, বিধবাদিগের জন্য বৃত্তি শিক্ষার বন্দোবস্ত, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাতেও ব্যর্থ হইবে না।

পতিতাদিগের শিক্ষা

কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, সকল শ্রেণীর বিধবারাই শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্ত হইবেন না। পতিতা বিধবাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিলে, সমাজ শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। যাহারা নব জীবন লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ প্রদান, যত বড় সামাজিক ও নৈতিক কর্ত্তব্যই হউক না কেন, বর্ত্তমান সমাজে, শিক্ষয়িত্রী রূপে, অথবা অপরাপর বিধবাদিগের সহিত একই শিক্ষাশালায়, তাহাদিগকে স্থান দিলে, শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ বিমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং সকল শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইবে না। নিম্ন শ্রেণীর বিধবাদিগের সম্বন্ধেও বোধ হয়, এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে। শিক্ষা-বিস্তারই, সর্ব্ব প্রধান সামাজিক সংস্কার রূপে, গণনীয় হওয়া উচিত; কারণ শিক্ষা সংস্কারের ফলেই, কুসংস্কার ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। তাই এই দুই বা তিন শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক হইবে না;—বর্ত্তমান অবস্থাকে মানিয়া লইয়া, সংস্কারের পথ প্রশস্ত করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর স্বধর্ম্মনিরতা বিধবাদিগের এবং পতিতা নারীদিগের শিক্ষার পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর ভিতর যখন শিক্ষা-বিস্তার সম্ভব হইবে, তখন তাহাদের জন্যও, তৃতীয় প্রকার ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে।

পতিতাদিগের শিখিবার জন্য, সামাজিক বাধার সম্ভাবনা খুব অল্প। ইহাদিগের শিক্ষা ঠিক শিক্ষা-সংস্কার নয়,—সামাজিক-সংস্কার। সেই নিমিত্ত, পতিতাদিগের শিক্ষা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানকার যা শিক্ষা-সমস্যা, তাহা সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তি-শিক্ষার যথোপযুক্ত সংযোগ স্থাপনের সমস্যা। কুটীর শিল্প, ধাত্রী-বিদ্যা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় এখানকার শিক্ষনীয় বিষয় হইতে পারে। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালিকাদিগের শিক্ষয়িত্রী রূপেও, অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

বিধবাদিগের শিক্ষার অন্তরায়

বর্ত্তমান সময়ে, উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা-সমস্যা। এই শ্রেণীর বিধবাদিগের শিক্ষায়, একটী বিশিষ্ট অন্তরায় বিদ্যমান। এখনও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাকে সৌখীন পদার্থ, বিলাসের জিনিস মনে করা হয় এবং সকল প্রকার বিলাস ও সৌখীনতা বিধবা ব্রহ্মচারিণীগণের পক্ষে বর্জ্জনীয় বলিয়া, যে শিক্ষাটুকু প্রচলিত আছে, তাহাও বিধবাদিগের জন্য নয়। সুচিন্তিত উপায়ে, স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষায় পরিণত হইলে, এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। বিধবাদিগের মধ্যে যাঁহাদের উপার্জ্জনের জন্য শিক্ষা আবশ্যক হইবে না, বিভিন্ন স্তরের সাধারণ শিক্ষা তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে, সমাজ স্ত্রী-শিক্ষাকে অনেকটা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য অনেকগুলি বিধবার পক্ষে যে বিশেষ শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, সেই শিক্ষাকেও প্রথম প্রথম এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের মধ্যে, বিদ্রোহের ভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা দ্বারা, এরূপ সামাজিক সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা খুব অল্প। এরূপ চেষ্টায়, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে,—শিক্ষা-বিস্তারের যথার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে না। সেই নিমিত্ত বর্ত্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়া, সহায় ও সঙ্গতিহীনা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিধবাদিগের বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিধবা জীবনের বিশেষত্ব

বর্ত্তমান অবস্থায়, বিধবাদিগের শিক্ষার যথার্থ উপায় উদ্ভাবনের জন্য, তাঁহাদিগের জীবনের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ হিন্দুসমাজে ব্রহ্মচর্য্যই বিধবাদিগের জীবনের ভিত্তি, এবং ধর্ম্মাচরণ, ত্যাগ, সংযম, ও সেবাই তাঁহাদিগের জীবনাদর্শ। সমাজের যেখানেই এই আদর্শ, সেইখানেই সমাজের ও বিশেষভাবে বিধবাদিগের আকর্ষণ। দ্বিতীয়তঃ সকল শ্রেণীর বিধবাদিগের মধ্যে পর্দ্দার বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল। বিধবারা পিতা ও স্বামীর গৃহে বাহিরে যাইবার যতটুকু স্বাধীনতা পান, সধবারা ততটুকু স্বাধীনতা ও সুযোগ পান না। পিতার সংসারে, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট। তৃতীয়তঃ আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্মে এবং ধর্ম্মশিক্ষার সহিত সংযুক্ত আমোদ উৎসবে, তাঁহাদের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত অধিক। পুরাণ পাঠ, কথকতা, যাত্রাগান, ইত্যাদিতে বিধবাদিগের প্রায় অমোঘ অধিকার। চতুর্থতঃ কর্ম্মময় জীবনেই তাঁহাদের আনন্দ,—কর্ম্মহীন জীবন তাঁহাদের শোভনীয় নয়। হিন্দু বিধবাদিগের কর্ম্মতৎপরতা ও সেবা হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ম্মশক্তি, এবং সেইজন্যই তাহা সমাজের মূল ভিত্তি। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু বিধবাদিগের জন্য, শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলেই, দলে দলে শিক্ষার্থিনী লাভ হইবে না। তবে ব্রহ্মচর্য্যের ও ধর্ম্মভাবের উপযোগী ব্যবস্থা সম্বলিত বৃত্তি-শিক্ষা, ক্রমে ক্রমে, তাঁহাদিগের একটী আগ্রহের বস্তু হইতেও পারে; এবং তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবনের অধিকতর স্বাধীনতা ও তাঁহাদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতা, পরোক্ষভাবে, শিক্ষা বিস্তারের সহায় হইতে পারে।

বিধবাশ্রমের প্রয়োজন

মহিলাদিগের বিদ্যালয়ের শিক্ষায়, বৃত্তিশিক্ষার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইতে পারে না। কুটীরশিল্প, শিশু প্রতিপালন, সন্তান শিক্ষা, শুশ্রূষা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, প্রভৃতি বিষয় বৃত্তি-শিক্ষার অঙ্গ হইলেও সাধারণ শিক্ষায়, ইহাদের স্থান, কর্ম্মশিক্ষা দ্বারা, প্রশস্ত শিক্ষার উন্নতির জন্য। এই বিষয়গুলিতে, এখানে, উপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষার

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যও এই বিদ্যালয়গুলির ভিত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য উপদেশের জিনিস নয়,—আচরণের জিনিস। ইহা পালন করিতে হইলে;—একাত্মভাবে সংযুক্ত থাকিয়া, ইহার ভিতর বাস করিতে হইবে। যে স্থানে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা মাত্র যাপন করিতে হয়, যে ব্যবস্থা কতকটা জীবনের বাহিরের ব্যবস্থা, সেইস্থানও সেই ব্যবস্থা, ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলা যায় না,—এখানে ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াও অসম্ভব। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বস্তু;—যেখানে জীবনযাপন করিতে হইবে, সেইখানেই তাহার সার্থকতা। তাই যদি বিধবাদিগের ভিতর বৃত্তিশিক্ষা আবশ্যক হয়, গৃহে অথবা গৃহের অনুরূপ আশ্রমে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ মহিলাবিদ্যালয়েই, যদি উপার্জ্জনের উপযোগী বৃত্তিশিক্ষা অসম্ভব হয় অন্তঃপুরে ইহার ব্যবস্থা আরো অসম্ভব হইবে। সেই কারণে, বিধবাদিগের বৃত্তিশিক্ষার জন্য, বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আশ্রম সংগঠন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মচর্য্যই হইবে এই আশ্রমের ভিত্তি; এবং ধর্ম্ম ত্যাগ, সংযমও সেবাই হইবে, এখানকার জীবনাদর্শ। বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকবে। কিন্তু সকল প্রকার বৃত্তিশিক্ষা কতকটা সাধারণ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষায় এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণে, আশ্রমে, ক্রমে ক্রমে, শৈশব, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা শক্তি ও সামর্থ্যের অনুকূল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সমাপন করিয়া, নানা প্রকার বৃত্তিশিক্ষা করিবে। বুদ্ধি পরীক্ষা যথাসময়ে বৃত্তিশিক্ষার কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। যাঁহারা শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে, ব্যাবহারিক ভাবে, বৃত্তিটী আয়ত্ত করিবেন; এবং যদি একটী বীক্ষণ বিদ্যালয় (Demonstration schane) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে, এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে। এই আশ্রমের সন্নিকটে, যদি মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলেও আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা এই বিদ্যালয়গুলিতেই শিক্ষার অবসর পাইবেন, এবং এরূপ বিদ্যালয় শিক্ষাতত্ত্ব ও অপরাপর বৃত্তি শিক্ষার সহায়তা করিবে। মহিলা-বিদ্যালয় সম্পর্কে, যদি কুমারাগার ও চিকিৎসা-বিদ্যার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, শিশু প্রতিপালন, শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়, খুব ব্যাবহারিক ভাবেই, এখানে শিক্ষা হইবে। কুমারাগার পরিচালয়িত্রীরা ব্যাবহারিক শারীরবিদ্যা, ও চিকিৎসা-বিদ্যার অপরাপর অঙ্গ শিক্ষা দিতে পারিবেন। এইরূপে বিধবাশ্রম ও মহিলা বিদ্যালয় একযোগে, শিক্ষা-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকিলে, এরূপ শিক্ষার ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে। আশ্রমের জীবন, গৃহস্থালীর অনুকরণে গঠিত হইবে বলিয়া, সকল প্রকার শিক্ষার্থিনী গৃহকর্ম্ম, রন্ধন ইত্যাদিও, খুব ব্যাবহারিক ভাবেই, শিক্ষা করিবার অবসর পাইবেন। এক কথায়, বিধবাশ্রমটীকে কেন্দ্র করিয়া, একটী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায়তন গঠিত হইয়া উঠিবে।

আশ্রমের অবস্থান

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায়, এখানে যদি একটীমাত্র এরূপ বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার উপায় হয়, এবং যদি সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর কতকগুলি বিধবা, শিক্ষালাভের জন্য, এই আশ্রমে বাস করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে, দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার একটী বৃহৎ সমস্যার সমাধান হইবে। বাংলাদেশের কোন তীর্থ স্থানে, এরূপ আশ্রম স্থাপিত হইলে, অবস্থানের আকর্ষণও বিধবাদিগের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এক নবদ্বীপ ভিন্ন সমস্ত বাংলাদেশের ভিতর এরূপ তীর্থস্থানের একান্ত অভাব। এই নবদ্বীপই বাংলার কাশীধাম, এবং ইহাই বাংলার শ্রীক্ষেত্র। জাতীয় শিক্ষায় ও বিদগ্ধতায়, নবদ্বীপ গৌরবে অদ্বিতীয়। কিন্তু দেশের বিধবাশ্রমটীকে কেন্দ্র করিয়া, ক্রমে ক্রমে একটী সুবৃহৎ শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইলে, বাংলার রাজধানী কলিকাতা বা কলিকাতার কোন স্বাস্থ্যকর উপকণ্ঠে, এই বিধবাশ্রমটী স্থাপনের স্বপক্ষে, অনেকেই মত প্রকাশ করিবেন। একাধিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলে, বহু প্রলোভনের কেন্দ্র স্থান, বহু জনাকীর্ণ, কোলাহলময় রাজধানী অপেক্ষা, কোন তীর্থস্থানের নিকটবর্ত্তী একটী স্বাস্থ্যকর পল্লী-অঞ্চলে, আর একটী এরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা খুব বাঞ্ছনীয় হইবে।

স্বখাত সলিল

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস

১

তরুণকুমার ও তাপসকুমার উভয়ে খুব অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ট বন্ধু। তরুণ তাপসের অপেক্ষা বৎসর দুই-একের বড়। সে ভাল চিত্রকর এবং সুদক্ষ অভিনেতা। কলেজের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া সে রাশি-রাশি প্রশংসাপত্র ও মেডেল পাইয়াছিল। সে ভাবের অভিব্যক্তি খুব ভাল দেখাইতে পারে। তাপস অত্যন্ত দেশ-ভ্রমণ-প্রিয়; এবং সেই অভিপ্রায়েই একটা হ্যাণ্ড-ক্যামেরা কিনিয়াছে। সে খুব ভাল ফটো তুলিতে পারে।

তরুণ একটা ছোট নাটক লিখিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, সে নিজে একা তাহার নাটকের সমস্ত ভূমিকার অভিনয় করিয়া, প্রত্যেক দৃশ্যের ফটো তুলাইয়া ছাপাইবে। সে তাহার নিজের বহিখানির নামকরণ করিয়াছে "স্বামীর ধর্ম"।

নাটকটির 'প্লট্' হইতেছে এই যে, প্রকাশ নামক এক যুবক ইন্দু নাম্নী এক শিক্ষিতা বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে। ইন্দুর এক পুরুষ বাল্যবন্ধু ছিল; দুজনের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না—যাহা ছিল, ঠিক্ বন্ধুর ও ভাই-বোনের ভালবাসার ন্যায়। ইন্দুর বিবাহের পরও সেই ছোকরাটি ইন্দুর শ্বশুরবাড়ীতে তাহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিত। প্রকাশ সন্দেহ করিল যে, ইন্দু তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং করিতেছে। ইন্দুর সহিত ঐ ছোকরাটির, বোধ হয়, বাল্য-প্রণয় হয়; এবং কোন কারণে হয় ত বিবাহ হয় নাই; সেই জন্য ছোকরাটি বন্ধু ও ভাই সাজিয়া প্রায়ই আসিয়া থাকে। কিন্তু ইন্দুর মনে কোন পাপ ছিল না, সে তাহার সহিত ঠিক্ নিজের মা'র পেটের ভাইএর ন্যায়ই মিশিত। প্রকাশ ভুল বুঝিয়া রহিল। কোন বোঝাপড়া হইল না। ক্রমশঃ স্বামী-স্ত্রীর মন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। শেষে এক দিন প্রকাশের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল; ইন্দুর সহিত তাহার আবার মিল হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তরুণকুমার প্রথম দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নাট্যোল্লিখিত পুরুষ ও মেয়ের সাজে সজ্জিত হইয়া দৃশ্যাবলী-অনুযায়ী ফটো তুলাইতে আরম্ভ করিল। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সে বেশ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ফটো-গুলি তুলাইয়া গেল; কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আসিয়া মহা মুস্কিলে পড়িল। এই দৃশ্যে নাটকের প্রধান নায়ক প্রকাশ দেখিতেছে যে, তাহার স্ত্রী ইন্দু তাহার সেই বন্ধুটির সহিত হাস্যালাপে রত! ইন্দুর একটা হাত সেই যুবকের হাতে ধরা রহিয়াছে। তখনই প্রকাশের সন্দেহ বদ্ধমূল হইবে, এবং সে নিঃসঙ্কোচে ধারণা করিয়া লইবে যে, ইন্দু সত্য-সত্যই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এইখানে প্রকাশ স্বগত বলিয়া উঠিবে—"যা ভেবেছিলাম, তাহাই সত্য। আমারই স্ত্রী আমারই ঘরে ব'সে অন্য এক যুবকের সহিত প্রেমালাপে রত! কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি কালসাপই এতদিন বুকে পুষিয়া রাখিয়াছি! উঃ! পৃথিবী এত ঘোরে কেন? পায়ের নীচে হ'তে মাটি স'রে যায় কেন?—"এই বলিয়া প্রকাশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে।

এইখানে তরুণের মহা 'গোল' বাধিল। সে নাটকের নায়ক প্রকাশ সাজিয়া ফটো তুলাইতেছে। স্বামী তাহার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা স্বচক্ষে দেখিতেছে—দেখিতেছে যে, তাহার স্ত্রী অন্য এক যুবকের সহিত প্রেমালাপে রত! এইখানে যে মুখের ভাব কিরূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা সে ভালরূপে মনে-মনে বুঝিতে পারিলেও, মুখে কিছুতেই ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

তাপস সম্মুখে ক্যামেরা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তরুণ একখানা বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানারূপ মুখের ভাব আনিতেছে,—কিন্তু কোনটাই তাহার মনঃপুত হইতেছে না।

তরুণ বলিল, "আচ্ছা, এইবার দেখ দেখি, ঠিক্ হ'য়েছে

কি না ?” তাপস অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল, “ঠিক্ হ’য়েছে। আমি তুলে নি’—Ready !”

তরুণের মনঃপূত হইল না। সে হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “ঠিক্ হ’য়েছে, না, তোর মাথা হ’য়েছে ! কিচ্ছু হয় নি ! ওঃ ! এই একটার জন্যেই সব ‘মাটি’ হ’য়ে গেল !”

“এটা তা’র চেয়ে সেরেফ্ Omitই ক’রে দাও না ?”

“বাঃ, এইখানটাই হ’ল আসল। স্বামীর মিথ্যা ভুল, মিথ্যা সন্দেহই ত’ সব দুঃখের মূল। তা’ ছাড়া, স্ত্রী’র বিশ্বাসঘাতকতা স্বচক্ষে দে’খে স্বামীর মুখের ভাব, চোখের ভাব কিরূপ হইয়া গিয়াছে—এই ফটোটাই যদি না দিই, তবে আর বইখানাতে রহিল কি ? এইখানেই art সব চেয়ে বেশী ফুটে উঠ্‌বে। আচ্ছা, রেণুকে ডাক্ দেখি।”

তাপস ভিতরে যাইয়া তরুণের স্ত্রী রেণুকে ডাকিয়া আনিল। রেণুর বয়স ১৬।১৭ ; সদাই হাস্যমুখী ও প্রফুল্ল। দেখিলেই মনে হয়, যেন খানিকটা বসন্তের হাওয়া, এক টুক্‌রা আনন্দ।

তরুণ বলিল, “ওগো শো’ন, এই—এই—তোমার ‘গিয়ে’—তুমি একবার এমন ভাব দেখাও দেখি যে, আমাকে মোটেই ভালবাস না, অন্য একজনকে ভালবাস।”

“এই পাগ্‌লামি করতে বুঝি আমাকে ডাকলে ? ছাড়, ছাড়, কাজ রয়েছে।”

তরুণ তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, আয়নার সাম্‌নে উঠিয়া আসিয়া বলিল, “আচ্ছা, শুধু বল দেখি, ‘আমি তোমায় ভালবাসি না’—দেখি, মুখের ভাবটা আমার কেমন হয়।”

“আঃ ! কি পাগ্‌লামি ক’র ?”

“তোমার পায়ে পড়ি, রেণু, একবার বলই না ?”

মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসির বেগ সম্বরণ করিতে-করিতে রেণু বলিল, “একেবারে পাগল হ’লে না কি ? আচ্ছা, বল্‌ছি, বল্‌ছি, আমি তোমায় ভালবাসি না। হ’য়েছে ?”

“আঃ, একটু গম্ভীর ভাবেই বল না ছাই।”

“কি বিপদেই পড়্‌লাম, বাপু ! আচ্ছা, বল্‌ছি, বল্‌ছি, তোমায় অমন করতে হ’বে না। এই নাও, খুব গম্ভীর ভাবেই বল্‌ছি, আমি তোমায় ভালবাসি না।” শেষ কথাটা উচ্চারণ করিতে রেণুর গলা কাঁপিয়া গেল।

আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুখের প্রতি একাগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া তরুণ নাটকের কথাগুলো বলিয়া উঠিল, “উঃ, কি বিশ্বাসঘাতকতা ! কি কালসাপকেই বুকে স্থান দিয়েছি ! এ কি ? পৃথিবী এত ঘোরে কেন ? পায়ের নীচে হ’তে মাটি স’রে যায় কেন ?” তরুণ এই কথাগুলো ঠিক্ বলিয়া গেল ; কিন্তু মুখে ভাব ঠিক্ ফুটিয়া উঠিল না। রেণু ও তাপস ‘হো’ ‘হো’ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরুণ হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

“Art, art, ক’রে তুমি একদিন সত্যসত্যই পাগল হ’য়ে পড়বে দেখছি” বলিয়া রেণু ভিতরে চলিয়া গেল।

তরুণ বলিল, “হাসি, কান্না, চিন্তা, এসব ভাব সহজেই বেশ ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা যায় ; কিন্তু যাহা মনে আনিতেও হৃদ্‌কম্প হয়, যাহা ধারণাতেও আনা যায় না, সে ভাব কি ক’রে ফুটিয়ে তুলি ? নাঃ, এ আমার দ্বারা যো হয় হ’ল না ভাই।”

তাপস এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল। সে বলিল, “আচ্ছা, আমি যদি ঠিক্ এমনি একটা ছবি দিই ? ওঃ, হো,—আমার দেশের বাড়ীতে ঠিক্ এই ধরণের একটা ছবি আছে। আমি—।”

“My God ! আছে না কি ? আজই তুই দেশে চলে যা’। যা’, উঠে পড়্‌।” “এখনই কি ? এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, তরুণ’দা, অবিকল এমনি একটা ছবি আছে। স্বামী তাহার স্ত্রীকে অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, অন্যের প্রেমাসক্তা জানিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ওঃ, সে কি মুখের দৃশ্য ! শিল্পী তা’র ছবিতে কি সুন্দর ভাবেই মুখের ভাবটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বল্‌লে হয় ত’ বিশ্বাস করবে না তরুণদা,—আমার মনে হয়, মুখখানাও অনেকটা তোমারি মত। আচ্ছা, আজই আমি লিখে পাঠাচ্ছি, ছবিটা যেন শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।”

“আঃ, বাঁচালি ভাই। সেটা দেখেও যদি না হয়, তবে সেইখানাকেই আমার মুখের মত যথাসাধ্য ক’রে নিয়ে—।”

“সে সব আমি ঠিক্ ক’রে দে’ব।”

“আচ্ছা।—তুই এখন বাড়ী যাবি না কি ? একটু ব’স্—

ভারতবর্ষ

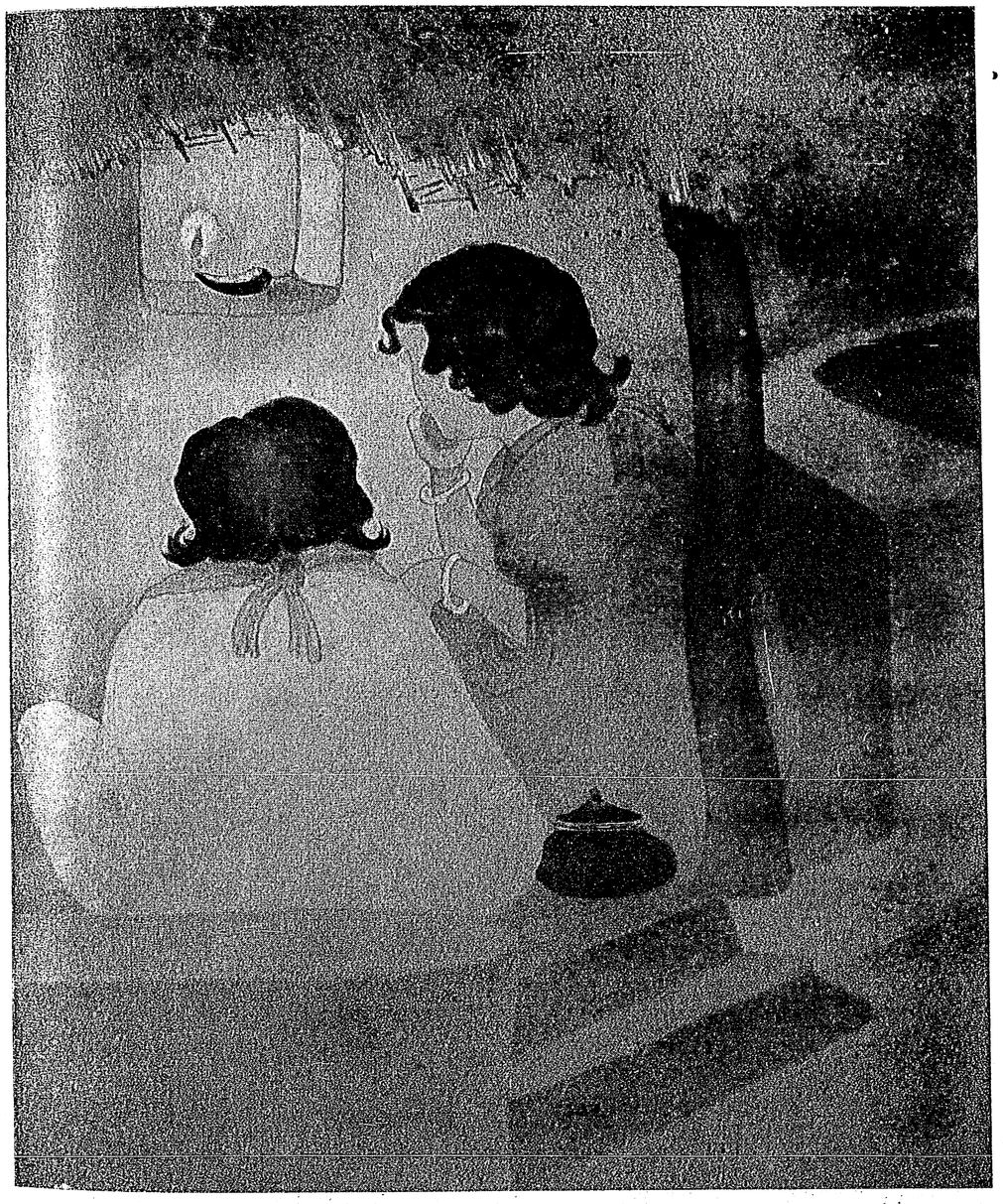

বাদল-সন্ধ্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS.

আমি এক্ষুণি একবার Press থেকে ফিরে আস্‌ছি," এই বলিয়া তরুণ বাহির হইতেছিল ;—হঠাৎ দরজাতেই নির্ম্মলের সহিত দেখা হইল। নির্ম্মল তরুণের শ্বশুরবাড়ীর লোক ; রেণুর এক দূর-সম্পর্কের ভাই। "নির্ম্মলবাবু যে! এখন হঠাৎ? আসুন, আসুন! সেখানের সব খবর ভাল ত'? বাড়ীর ভিতরে চলুন। সেদিন হঠাৎ এসে, হঠাৎ চলে গিছলেন। এবারে কিন্তু দিন কয়েক থাক্‌তে হ'বে। তাপস! নির্ম্মলবাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল্—আমি এখুনি আস্‌ছি," বলিয়া তরুণ চলিয়া গেল।

নির্ম্মলকে ভিতরে বসাইয়া, তাপস রেণুর নিকট গিয়া কতক্ষণ কি একটা বিষয়ে আলোচনা করিল।

(২)

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। রেণু আসিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি হ'ল কেন?" রেণু কেমন একটু চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আঁ—কি—তুমি এখনও জেগে আছ নাকি? রাত্ একটু বেশী হ'য়েছে বটে! নির্ম্মলদা'র সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু দেরী হয়ে গেল।" "রেণু!" "রাত্ হ'য়েছে, ঘুমোও।" "তোমাকে আজ বড় চিন্তিত দেখ্‌ছি? বাড়ীর কি কোনও খবর—?" "না, না, ও কিছু নয়" বলিয়া রেণু শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া তরুণ বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া ছিল। এমন সময় তাপস আসিয়া পাশের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নির্ম্মলবাবু আজই চলে গেলেন কেন? আমার সঙ্গে রাস্তাতে দেখা হ'ল ; তিনি বলে গেলেন, হঠাৎ তাঁকে ফির্‌তে হ'চ্ছে ; তুমি তখনও উঠ নি বলে তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেন নি।" "সে কি? নির্ম্মলবাবু বাড়ী চলে গেছেন না কি? অদ্ভুত ছোকরা! হঠাৎ আসেন, আবার হঠাৎ চলে যান্! আমাকে উঠিয়ে দেখা ক'রে গেলেই পার্‌তেন।"

এমনি সময়ে রেণু চা লইয়া প্রবেশ করিল। তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "নির্ম্মলবাবু এমন হঠাৎ চলে গেলেন কেন বল দেখি? তোমাকে কিছু ব'লে গে'ছেন?"

"আমি কি ক'রে জান্‌ব,—কে কখন আস্‌ছে, কে কখন যাচ্ছে? সে কি আমার জন্য এসেছিল না কি, যে আমাকে ব'লে যা'বে? তুমি কি ভাব্‌ছ যে—?" তরুণ রেণুর এই অস্বাভাবিক এবং অসংলগ্ন উত্তরে একটু বিস্মিত হইল। বাধা দিয়া বলিল, "না, না, জিজ্ঞেস কর্‌ছি, যাবার সময় দেখা হ'য়েছিল কি না? সেই সময় যদি কিছু ব'লে গি'য়ে থাকে!"

"না, না, আমাকে কেউ কিছু বলে যায় নি।"

রেণু ফিরিতেছিল, হঠাৎ প্রভাতের খানিকটা সোণালি আলো তাহার উপর পড়িতেই, তাহার গলার নেক্‌লেসের বহুমূল্য পাথরগুলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। এটা তরুণের এতক্ষণ নজরে পড়ে নাই। এতক্ষণে সে দেখিল, রেণুর গলায় আজ একটা নূতন বহুমূল্য নেক্‌লেস্। তরুণ বলিল, "এই যে, স্যাকরা দিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। দেখি, দেখি, বেশ গড়েছে! কি সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে! পাথর-গুলো—।" রেণু বাধা দিয়া বলিল, "তুমি যেটা' গড়্‌তে দিয়েছ, সেটা নয়। আমার বিয়ের সময় নির্ম্মলদা' অসুখে প'ড়েছিল, তখন কিছু দিতে পারে নি—কাল এইটা আমায় দিয়েছে। আমি অনেক বল্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই ছাড়্‌ল্ না,—কাজেই নি'তে হ'ল।"

"তা'তে কি হ'য়েছে? দূর সম্পর্কের হ'লেও দাদা বটে ত? তা'র উপহার নিতে এমন বিশেষ কি দোষ? আমি যে নেক্‌লেসটা তোমার জন্য গড়্‌তে দিয়ে এ'সেছি, সেটাও ঠিক্ এই প্যাটার্ণের হ'চ্ছে—দেখে এসেছি।" রেণু তাপসকে বলিল, "ঠাকুর-পো', তুমি ভিতরে এসেই চা-টা খেয়ে যাও, আমি আর আন্‌তে পারি না।—খেয়ে এ'সেছ? তা' হো'ক্! এস।" "চল বৌদি" বলিয়া তাপস উঠিল।

রেণু ও তাপসের চোখাচোখি হইতেই, দুজনের ঠোঁটেই একটু গোপন হাসি ফুটিয়া উঠিল ; এবং চোখে-চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল।

(৩)

বেলা প্রায় তিনটা। তরুণ বাহিরের ঘরে বসিয়া রেণুর কথা ভাবিতেছিল। আজ সারাদিনের মধ্যে যখনই রেণুর সহিত দেখা হইয়াছে, তরুণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, চুরি করিয়া যেন কিছু করিতেছিল, এইরূপ ভাবে সে চম্‌কিয়া উঠিয়াছে। কাল রাত্রি হইতেই সে রেণুকে কেমন

চিন্তাযুক্ত ও অন্যমনস্ক দেখিতেছে। রেণু যখন হাসিয়াছে, তখন মনে হইয়াছে, যেন সে জোর করিয়া হাসিতেছে—প্রাণের হাসি তা নয়। রেণু ত এমন ছিল না! কাল রাত্রি হইতে তাহার কিসে এত পরিবর্ত্তন হইল? স্বামীকে গোপন করিয়া সে এত কিসের ভাবনায়—? তরুণ এই সমস্ত মনে-মনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় তাপস তাহার হাণ্ড ক্যামেরা হাতে প্রবেশ করিল।

"কি রে, এমন সময় ক্যামেরা হাতে যে?"

"একটু খারাপ হ'য়েছিল, সারাতে দিয়েছিলুম। তার পর? হ'চ্ছে কি? বড় গম্ভীর দেখ্‌ছি যে?"

মুখে হাসি ফুটাইয়া তরুণ বলিল, "তোর সামনে গম্ভীর হ'ব না ত' কি? জানিস্, আমি তোর চেয়ে ৩বছরের বড়—Senior. আচ্ছা, কালকের সেই বইটার বাকীটুকু পড় দেখি।"

"সে বইটা এখন থাক্;—তুমি এ মাসের 'ভারতবর্ষ'টা পড়েছ? পড়নি? 'ভারতের প্রাচীন শিল্প' নামে খুব একটা সুন্দর প্রবন্ধ বেরিয়েছে।"

শিল্পর নাম শু'নে তরুণ লাফাইয়া উঠিল; যেহেতু সে একজন শিল্পী। বলিল, "না, 'ভারতবর্ষ'টা এখনও আমার পড়াই হয় নি; যাই, রেণুর কাছে সেটা আছে, নিয়ে আসি।"

রেণুর ঘরে আসিয়া তরুণ দেখিল, সে তখনও ঘুমাইতেছে। এমন অসময়ে সে কোন দিন ঘুমাইয়া পড়ে না। তরুণ ভাবিল, বোধ হয় রেণুর শরীর খারাপ আছে। তজ্জন্য রেণুকে না উঠাইয়া সে নিজেই টেবিল, দেরাজ প্রভৃতি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' কোথাও পাওয়া গেল না। বারান্দা দিয়া সেই সময় তাহার ছোট বোন যাইতেছিল,—তরুণ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ মাসের 'ভারতবর্ষ'টা কোথায় আছে রে?"

"'ভারতবর্ষ'টা? বৌদিই দুপুরে পড়্‌ছিল। না, না, পড়েনি ত'—বৌদি ত' চিঠি লিখ্‌ছিল। ওহো, মনে পড়েছে, 'ভারতবর্ষ'টার উপরেই কাগজখানা রেখে চিঠি লিখ্‌ছিল। তার পর, সেই তুমি একবার এলে না? সেই সময় বৌদি ট্রাঙ্কে রেখে দিলে। বৌদিকে উঠোব না কি?"

"না, না, থাক্, ওর বোধ হয় শরীর খারাপ আছে, আমিই বে'র ক'রে নি'চ্ছি।"

নিদ্রিত রেণুর অঞ্চল হইতে চাবির গোছাটা খুলিয়া লইতে লইতে তরুণ আপন মনে বলিল, 'ভারতবর্ষটা' ট্রাঙ্কে চাবি দিয়ে রে'খেছে! যত কি সব অদ্ভুত কাজ!"

পত্রিকাখানা বাহির করিয়া তরুণ পুনরায় বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। তাপস তখন তা'র ক্যামেরা লইয়া ব্যস্ত। "আমি ছবিগুলো একবার দেখে নি" বলিয়া তরুণ ভারতবর্ষটার পাতা উল্টাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে একটা চিঠি পড়িয়া গেল। তরুণ দেখিল, রেণুর হস্তাক্ষর। সে পুনরায় চিঠিখানা পত্রিকার ভিতর রাখিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রথমের দুটো কথার উপর চক্ষু পড়িয়া গেল—"নির্ম্মল প্রিয়তম আমার!"

তরুণের মাথাটা 'চম্' করিয়া উঠিল। রেণু নির্ম্মলকে 'প্রিয়তম আমার' সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিতেছে! সে তাহার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; সে চিঠিখানা আবার চোখের নিকটে ধরিল। তাহাতে লেখা ছিল—"নির্ম্মল, প্রিয়তম আমার!

একটা বড় ভুল হইয়াছে। সোমবার রাত্রিতে সময় ঠিক্ করিয়াছ; কিন্তু আমার মনে ছিল না, ঐ দিন 'ওঁদের' জন্মদিন। রাত্রিতে অনেক বন্ধুবান্ধব থাইবে কাজেই ঐ দিনে সম্ভব হইবে না। তুমি তার পর দিন রাত্রি দুইটার সময় বাগানের ওধারে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিবে।

একটা কথা বলি, হাসিও না। এত দিন আমি রাজী হই নাই কেন, জান? তার কারণ, ওঁরা আমাকে খুবই বিশ্বাস করিয়াছিল এবং ভালবাসিয়াছিল। এতটা প্রাণ-ঢালা ভালবাসার পরিবর্ত্তে চিরজন্মের মত ওঁর বংশে কালিমা দি'য়ে, গৃহত্যাগ ক'রে তোমার সঙ্গে চলিয়া যাইতে এত দিন কিছুতেই মন সরিতেছিল না। সেই কারণেই এত দিন তোমার কথায় রাজী হইতে পারিতেছিলাম না, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কাল রাত্রিতে তোমার কথায় আমার সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমার কথাই ঠিক্—এমন করিয়া ত' জীবনটাকে নষ্ট করা চলিবে না। সত্যই, কেন করিব, কোন্ অপরাধে? একদিন এঁর সঙ্গে জোর করিয়া দুটো হাত বাঁধিয়া দিয়া দু'টো মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া, সেইটাই জীবনে চরম সত্য—আর বাকী সব মিথ্যা! কথনই না।

দয়িত আমার! আমি কৃতসঙ্কল্প। আমার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। যা'কে ভালবাসি না, তা'র ঘর করা কি কষ্টকর। মঙ্গলবার রাত্রি দুটোর সময় আসিয়া সেই সঙ্কেত করিবে। আঃ, তার পর! তার পর দুজনে আবার নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ করিব। কালের গতি আমাদিগকে একবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; কিন্তু আর ত' জীবনে কেউ পৃথক্ করিতে পারিবে না। আজ এ জগৎ আমার সাম্‌নে—।"

এই পর্য্যন্ত চিঠিতে লেখা আছে, আর কিছুই নাই; বোধ হয়, কোন বাধা পাইয়া চিঠিখানা লেখা এইখানেই হঠাৎ বন্ধ করিতে হয়।

তরুণের মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল; কালির অক্ষরগুলো চোখের সাম্‌নে বৃশ্চিকের আকার ধারণ করিয়া নাচিতে লাগিল। দেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। 'ভারতবর্ষ'টা কোল হইতে পায়ের তলে পড়িয়া গেল। তরুণ নিজের কপালটা টিপিয়া ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে পত্রখানার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখ চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, অবর্ণনীয়।

উঃ! পৃথিবী আজ এত ঘোরে কেন? দেওয়ালে বিলম্বিত নারী-চিত্রগুলোর দিকে চাইতে এত ঘৃণা হয় কেন? প্রাণের বন্ধু তাপসের মুখ আজ এত শয়তানের ছায় দেখায় কেন? দিনের আলো এত বিশ্রী ঠেক্‌ছে কেন? পায়ের নীচে হ'তে মাটিটা স'রে যায় কেন? তরুণ চেয়ারের হাতল দুটো টিপিয়া ধরিল। পৃথিবী ঘুরিতেছে—ইহা বিজ্ঞান-সম্মত কথা; কিন্তু ইহা বেশী করিয়া, এবং ভাল করিয়া অনুভব করিল আজ এই তরুণ শিল্পী তরুণ রায়।

তাপস এতক্ষণ সাম্‌নের টেবিলে ক্যামেরা লইয়া ব্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরে ক্যামেরা হাতে লইয়া বলিল, "তুমি পড়, তরুণদা, আমি এখুনি ফি'রে আস্‌ছি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেল। সেকথা তরুণের কাণেও গেল না—বিশ্ব-সংসার তখন তাহার মন হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পত্রখানার প্রত্যেক অক্ষরগুলো সহস্র সহস্র সর্প, বৃশ্চিকের আকার ধারণ করিয়া তাহার বুকে ছোবল মারিতেছিল। উঃ, এ অসহ্য যন্ত্রণা বুকে কোথা হ'তে এ'ল গো? নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হ'য়ে যায়!—

তরুণ চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। গত রাত্রি হইতে সমস্ত তাহার মনে পড়িল—রেণুর ভাবান্তর, নির্ম্মলের হঠাৎ আসা এবং হঠাৎ চ'লে যাওয়া, তাহার নেক্‌লেস উপহার—সমস্তগুলো তাহার মনে একবার বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে তরুণ পত্রখানা 'ভারতবর্ষে'র ভিতর রাখিয়া, ট্রাঙ্কে আবার সেইরূপ ভাবে রাখিয়া চাবি দিল এবং অতি সন্তর্পণে চাবিটা রেণুর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।—ইচ্ছা, সে রেণুকে জানিতে দিবে না যে পত্রটা দেখিয়াছে। ঝিএর সহিত বারান্দায় দেখা হইলে, তরুণ তাহাকে বলিল, "আমার রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে, বলে দিস্, সেইখান হ'তেই থিয়েটারে যা'ব—আজ আর ফিরব না।"

এই বলিয়া তরুণ বাহির হইয়া গেল,—বোধ হয়, বাহিরে একা ভাল করিয়া ভাবিবার জন্য; এবং বিশেষ কারণ এই যে, বাড়ীতে থাকিলে রাত্রিতে বাধ্য হইয়া রেণুর সহিত এক বিছানায় শুইতে হইবে।

(৪)

পরদিন সকালে তরুণ তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া মানুষ যখন আদালত হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার যেরূপ চেহারা হয়, তাহা অপেক্ষাও তরুণের চেহারা খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বিনিদ্র রাত্রির ভীষণ চিন্তায় মুখে, চোখে কালি এবং কপালে রেখা পড়িয়াছে। মুখখানা শুষ্ক, কঠিন এবং ভয়ানক; দেখিলেই মনে হয় যেন একটা কিছু করিতে সে কৃতসঙ্কল্প।

তাপস বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। "এই যে, কতক্ষণ এ'সেছ, তরুণদা? থিয়েটার দেখে বাকী রাতটা বুঝি আর কোথাও ছিলে? কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল?" বলিয়া তাপস একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

"ছিল;—ঐ তোর—তা' তুই কতক্ষণ এসেছিস্?"

"অনেকক্ষণ। এই নাও, তরুণদা, তোমার ফটো—যেদিন যা চে'য়েছিলে—এবং যা'র জন্য এই দুদিন এত মিথ্যা অভিনয়।" এখানা তরুণের ফটো। কাল দুপুরে সে যে জামা কাপড় পরিয়াছিল—ফটোর পরণে তাহাই—

একই চেয়ার, একই কক্ষ—পায়ের নীচে একটা 'ভারতবর্ষ' পড়িয়া আছে;—এক হাতে একটা কাগজ এবং অন্য হাতে কপালটা টিপিয়া ধরা! মুখের চোখের ভাব অস্বাভাবিক, অবর্ণনীয়! তাহার নিজের ফটো দেখিয়া তরুণ ভাবিল, জীবনের মধ্যে কেবল কাল দুপুরে আমার এই অবস্থা ছিল। তবে কি তাপস কাল দুপুরে সেই সময় হ্যাণ্ড ক্যামেরাটায় আমার ফটো লইয়াছিল? হাঁ, নিশ্চয়। ধীরে ধীরে, ব্যাপারটা তরুণের নিকট স্বচ্ছ হইয়া আসিল। সে হাঁ করিয়া তাপসের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তাপস বলিল, "মাপ্ কর, তরুণদা, অনেক ব্যথা দিয়েছি। শোন। তুমি যেদিন 'প্রকাশ' সাজিয়া ফটো তুলাইতেছিলে, কিন্তু কিছুতেই হইল না; রেণুকে ডাকিয়া পাগ্‌লামি আরম্ভ করিলে, তখন হঠাৎ আমার মনে হইল যে, সত্যই একটু মজা করিলে মন্দ হয় না। তারপর নির্ম্মলবাবু আসিলেন। তখন স্থির করিলাম যে, নির্ম্মলবাবুকে সত্যসত্যই নাটকের ইন্দুর বন্ধু সাজিয়ে এবং তোমাকে 'প্রকাশ' সাজিয়ে, একটা ঠিক্ ফটোই নিতে হ'বে। বৌদিকে যাইয়া সব খুলিয়া বলিলাম। প্রথমে তিনি রাজী হন নাই; কিন্তু তিনি তোমার স্বভাব জানেন ত'—ঠিক্ এমনি ফটোটি না পাইলে তুমি শান্তিতে থাকিবে না—এই ভাবিয়া সম্মত হইলেন। তার পর, দুজনে প্ল্যান ঠিক্ করিলাম। বৌদিকে বলিয়া দিলাম যে তিনি যেন ঐ দিন রাত্রিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ম্মলবাবুর সহিত গল্প করেন; প্রত্যেক কথাতেই চম্‌কিয়া উঠেন এবং খুব চিন্তাযুক্ত ও অন্যমনস্কতার ভান করেন। নির্ম্মলবাবুকে সকালে উঠিয়াই একদিনের জন্য বৌবাজারে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করি। বৌদির গলায় যে নেক্‌লেস্ দেখিলে, সেটা নির্ম্মলবাবুর উপহার নয়, তুমি যেটা তৈরী করতে দিয়েছিলে,—সেটাই। তার পর শুনিলাম, তোমার এ মাসের 'ভারতবর্ষ'টা পড়া হয় নাই—বৌদিকে বলিলাম, তিনি যেন ঐরূপভাবে চিঠিখানা লেখিয়া 'ভারতবর্ষে'র ভিতর রাখিয়া ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখেন, এবং ঘুমাইয়া পড়েন—আমি আসিয়া তোমাকে দিয়াই পত্রিকাটা আনাইব। তাহা হইলেই, বুঝলে না, তোমাকে নিজে ট্রাঙ্ক হ'তে বে'র ক'রে আন্‌তে হ'বে? অর্থাৎ সন্দেহটা যাহাতে ভাল রূপে হয়। তার পর তুমি যখন 'ভারতবর্ষ'টা হাতে লইয়া চেয়ারে বসিলে, আমি তখন ক্যামেরায় instant plate দিয়া ঠিক্ করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তার পর, বুঝ্‌তেই পারছ।"

অরুণের বুক হ'তে পাষাণের গুরুভার নামিয়া গেল;—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল।

ঠিক্ এমনি সময়ে, "ঠাকুর পো, তোমার বন্ধু রত্নটিকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমি হাতে ক'রে চা আন্‌লে তাঁর খাওয়া হ'বে কি না? এবং আজও কোথাও নিমন্ত্রণ আছে কি না?"

তরুণ একবারে রেণুকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "উঃ, এমনি ক'রে জলে ডুবিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে মার্‌তে হয়?"

তাপস উত্তর দিল, "এ' ত তোমারই স্বখাত সলিল—তোমার জন্যই ত'—।"

রেণু বলিল, "অনেক মিথ্যা অভিনয় ক'রে ব্যথা দিয়েছি, মাপ কর।"

"ব্যথা? উঃ, কি যন্ত্রণাতেই যে এই ক'ঘণ্ট কেটেছে, বল্‌তে পারি না। একটু সান্ত্বনা এই যে তা'র বদলে বড় আকাঙ্ক্ষার এই ফটোটা পেয়েছি।—ঠিক্ এমনি ফটোটি না পেলে, বোধ হয়—।"

রেণু বলিল, "ঠিক্ এমনি ফটোটি না পেলে, বোধ হয় সকলকে কেন, নিশ্চয়, নিজেকে ও বাড়ী শুদ্ধ অস্থির ক'রে তুল্‌তে—ইহা ভাল করে জানতাম বলেই ত' এই দুদিন ধরে এত মিথ্যা পাপ অভিনয়—আঃ, ছিঃ, ছাড়, ছাড়, ঠাকুর-পো রয়েছে!" বলিয়া জোর করিয়া রেণু নিজের মুখখানি সরাইয়া লইল।

মাস দুই পরে তরুণের 'স্বামীর ভুল' নাটকখানি প্রকাশিত হইল—পঞ্চাশটি দৃশ্যের পঞ্চাশটি ফটো সহিত। সকলেই খুব প্রশংসা করিল এবং যে ফটোটির জন্য এত কাণ্ড, তরুণের সেই ফটোটি দেখিয়া সবাই বলিল, "ভাবের অভিব্যক্তিতে তরুণকুমার অদ্বিতীয়।"

সাইকেলে দিল্লী

ক্যালকাটা টুরিষ্টস্ ক্লাবের ডায়েরী

১৪ই অক্টোবর।—সেক্রেটারী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় রওনা হইয়া বেলা ৫টার সময় বর্দ্ধমান পৌঁছিলাম। বর্দ্ধমান কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল। রাস্তায় চন্দননগর হইতে খাবার লওয়া হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সে রাত্রির জন্য আশ্রয় লইলাম।

১৫ই অক্টোবর।—বর্দ্ধমান হইতে ভোর ৪টার সময় রওনা হইয়া বেলা ৫॥ টার সময় আসানসোলের ১ মাইল আগে কালিপাহাড়ীতে পৌঁছিলাম। রাস্তা খুব ভাল। আসানসোল কলিকাতা হইতে ১৪১ মাইল। পথে খাইবার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে Messrs Patel & Mukerjeeর এক কুঠীর ম্যানেজার আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১৬ই অক্টোবর।—আসানসোল হইতে সকাল ৬টার সময় বাহির হইয়া সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় ডুমরী ডাক বাংলোয় পৌঁছিলাম। রাস্তা ভয়ানক উঁচু-নীচু। সেদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পরেশনাথের কাছে অতি সুন্দর

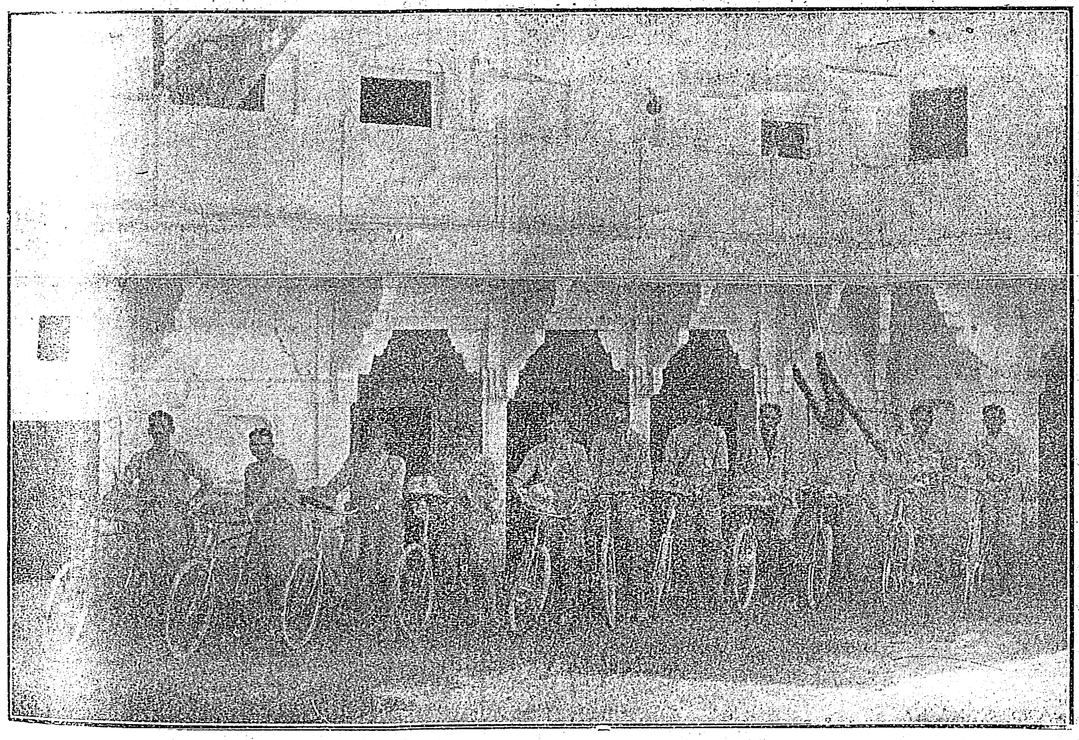

একাদশ সাইক্লিষ্ট—বাম দিক হইতে (১) শোভন-চট্টোপাধ্যায়; (২) কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়; (৩) বটকৃষ্ণ রায়; (৪) জগদীশচন্দ্র সরকার; (৫) শিবেন্দ্রনাথ বসু; (৬) চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (৭) বিমল মুখোপাধ্যায়; (৮) শৌরীন্দ্রনাথ বসু (ক্যাপ্টেন); (৯) প্রকাশচন্দ্র দত্ত (১০) কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; (১১) শচীন্দ্রনাথ বসু

দৃশ্য। ডুমরী কলিকাতা হইতে ২০৩ মাইল। পথের দুধারে পাহাড় আর জঙ্গল।

১৭ই অক্টোবর।—ডুমরী হইতে সকাল ৭টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি ৮টার সময় চোপারান পৌঁছিলাম। বারহি পৌঁছিয়া খাবার বন্দোবস্ত করিতেই সন্ধ্যা হইয়া

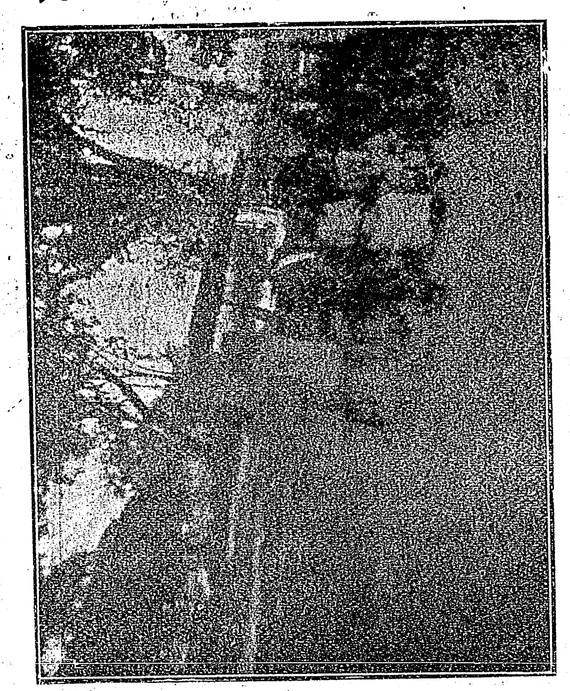

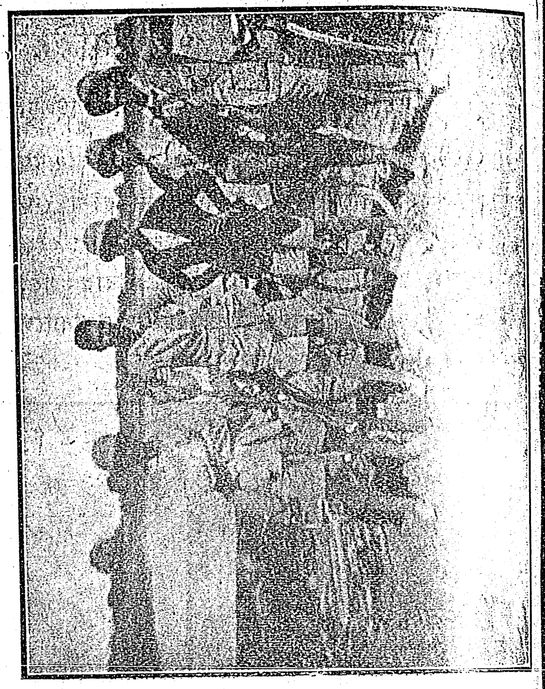

মোটর ভ্রমণকারীদের সহিত সাক্ষাৎ

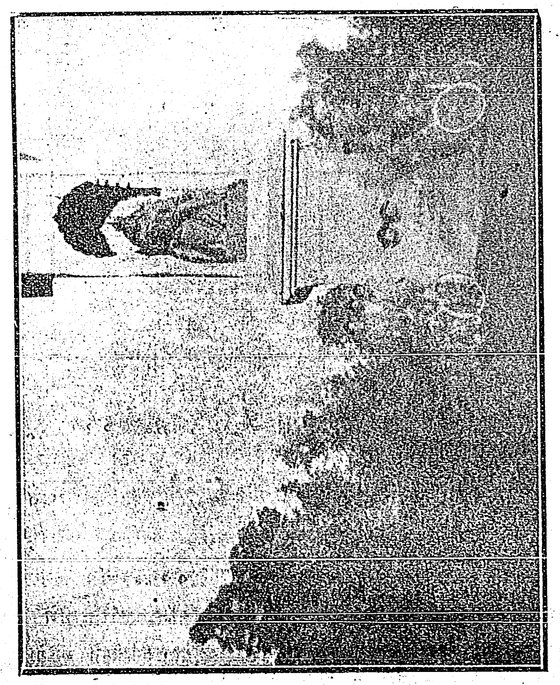

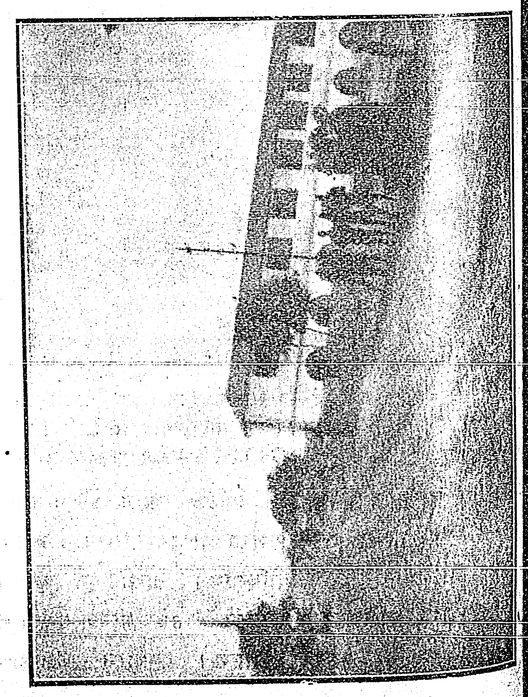

এটা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-সারিবেঁধা

গেল। তবে সেখানে থাকিবার সুবিধা নাই, সেজন্য সেই রাত্রেই চাঁদের আলোয় চৌপারান যাইতে হইয়াছিল। চৌপারান কলিকাতা হইতে ২৬৪ মাইল। বাংলোর চারিধারে বন জঙ্গল।

১৮ই অক্টোবর।—চৌপারান হইতে সকাল ৭টার সময় বাহির হইয়া বেলা ৫টার সময় আওরঙ্গাবাদ পৌঁছিলাম। রাস্তায় ফল্গু নদী পার হইতে হইয়াছিল; পুল নাই। আওরঙ্গাবাদের স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। আওরঙ্গাবাদ কলিকাতা হইতে ৩২২ মাইল।

১৯শে অক্টোবর।—রাত্রি ১টার সময় আওরঙ্গাবাদ হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ১০॥ টার সময় কাশী পৌঁছিলাম। বন্ধে মেলে শোন নদী পার হইতে হইয়াছিল। কাশী



দিল্লী হইতে ২২৮ মাইল অন্তরে

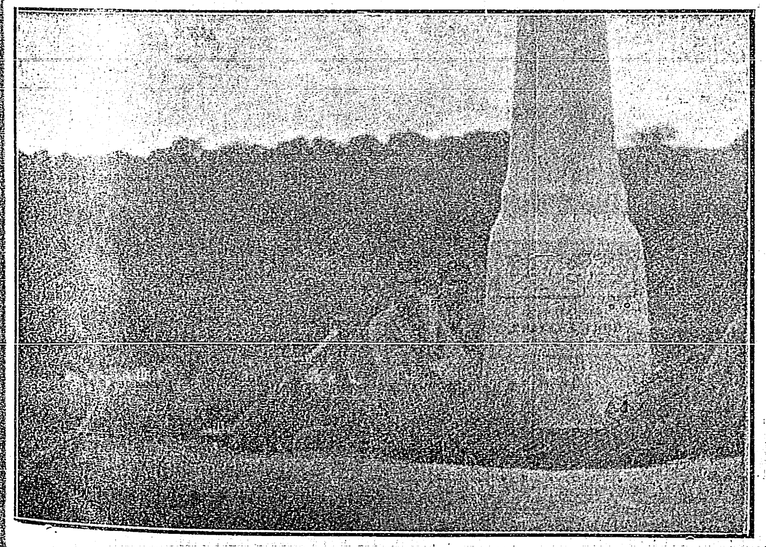

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লীতে নিহত মিঃ চার্লস টডের স্মৃতিস্তম্ভ

কলিকাতা হইতে ৪২২ মাইল। সেখানে পার্ব্বতী আশ্রমে ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম।

২০শে অক্টোবর।—বিশ্রাম—রাত্রে ৫জন কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

২১শে অক্টোবর।—সকাল সাতটার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় এলাহাবাদ পৌঁছিলাম। গঙ্গা পার হইতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগিয়াছিল। সেখানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এলাহাবাদ কলিকাতা হইতে ৪৯৮ মাইল। রাস্তা খুব ভাল।

২২শে অক্টোবর।—এলাহাবাদ হইতে বেলা ৯টার সময় বাহির হইয়া বেলা ৩টার সময় মুরাটগঞ্জ পৌঁছিলাম। একজনের সাইকেল খারাপ হওয়ায় তাহার আর যাওয়া হইল না। মুরাটগঞ্জ কলিকাতা হইতে ৫৩০ মাইল।

২৩শে অক্টোবর।—ভোর ৩টার সময় রওনা হইয়া রাত দশটার সময় কানপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। কানপুর কলিকাতা হইতে ৬২৪ মাইল। পথে দেখিবার কিছু নাই। ফতেপুরে একদল



দিল্লী হইতে একশত মাইল অন্তরে

European motor touristsএর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

২৪শে অক্টোবর।—কানপুর হইতে সকালে বাহির হইয়া রাত্রি ১২টার সময় গুরসাহাইগঞ্জে পৌঁছিলাম। রাস্তায় একদল ডাকাতের কবল হইতে পলাইয়াছিলাম। গুরসাহাইগঞ্জ কলিকাতা হইতে ৬৯০ মাইল।

২৫শে অক্টোবর।—সকাল ৬টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি ১২॥ টার সময় এটাতে পৌঁছিলাম। এটা কলিকাতা হইতে ৭৩১ মাইল।

২৬শে অক্টোবর।—এটা হইতে রওনা হইয়া বেলা ২টার সময় আলিগড় পৌঁছিলাম। সেখানে একজনের হাণ্ডেল খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ায় সে অজ্ঞান হইয়া গেল। সেদিন আর অগ্রসর হওয়া গেল না। আলিগড় কলিকাতা হইতে ৮৫১ মাইল।

২৭শে অক্টোবর।—সকাল বেলা বাহির হইয়া বেলা পাঁচটার সময় দিল্লী পৌঁছিলাম। যমুনার পুল পার হইতে হইয়াছিল। দিল্লী কলিকাতা হইতে ৯৩৩ মাইল। সেখানে করোনেশন হোটেলে রাত্রিযাপন করিলাম।

২৮শে অক্টোবর।—ভোর বেলা রওনা হইয়া সন্ধ্যায় কর্ণাল পৌঁছিলাম। পথে একদল ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলাম। পলাইবার সময় আর সকলে বাঁচিয়া গেল কেবল একজন মাথায় একটা লাঠির ঘা খাইয়াছিল। সকলে অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল এবং সেখান হইতেই কলিকাতা ফিরা সাব্যস্ত হইল। পেশোয়ার যাওয়া আর হইল না। কর্ণাল কলিকাতা হইতে ১০২৮ মাইল। সেই দিনই প্রথম ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

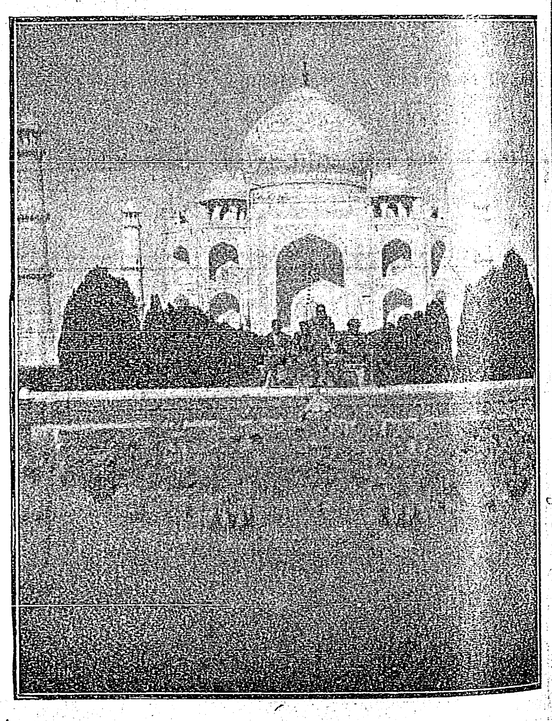

তাজ-ক্রোড়ে

অবৈতনিক আদর্শ ব্যায়াম-সমিতি

আজ চতুর্চত্বারিংশ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় এবং তাহার উপকণ্ঠস্থিত গ্রামসমূহে "গৌরবাবুর আখাড়া" আখ্যায় এই সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। হাইকোর্টের এটর্ণি বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়াম-কৌশলবিশারদ আচার্য্য গৌরহরি মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আচার্য্য মহাশয়ের সুশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যায়াম চর্চ্চার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাঁহার প্রধান শিষ্য অধুনা গরিফা-নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার বামাচরণ মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র ব্যায়াম-কুশলী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯০০

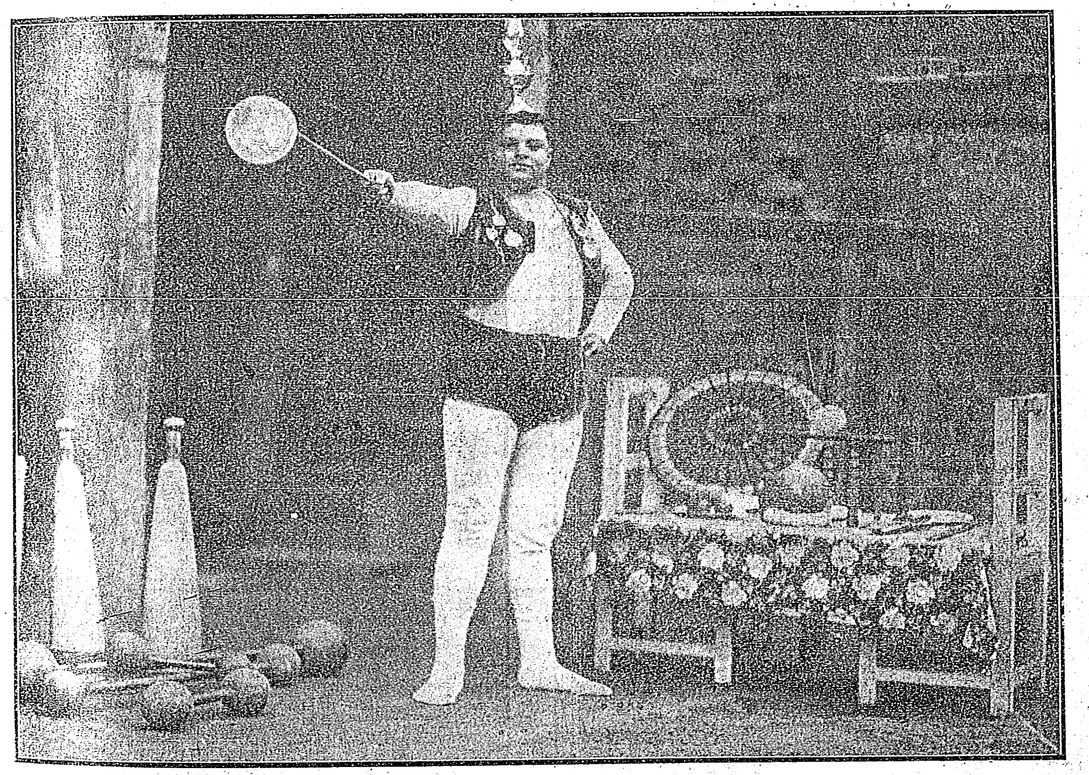

ব্যায়ামবীর শ্রীমান বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ পল্লী আহিরীটোলায় ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহার বহু শাখা কলিকাতায় বিভিন্ন পল্লীতে, ২৪ পরগণায় প্রধান প্রধান গ্রামে, ভাগিরথীর পর পারস্থ গ্রাম সমূহে, যশোহর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের সহরে, সুদূর হায়দ্রাবাদ, মহিশূর, এলাহাবাদ, বেণারস প্রভৃতি নগরে খৃষ্টাব্দে বেনিয়াটোলার সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দের সাহায্যে একটী শাখা উক্ত পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শিক্ষাচাতুর্য্যে এবং পল্লীস্থ যুবকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এই ব্যায়াম সম্প্রদায় আজ বঙ্গে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মাষ্টার বসন্ত এই সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বসন্ত আহিরীটোলা

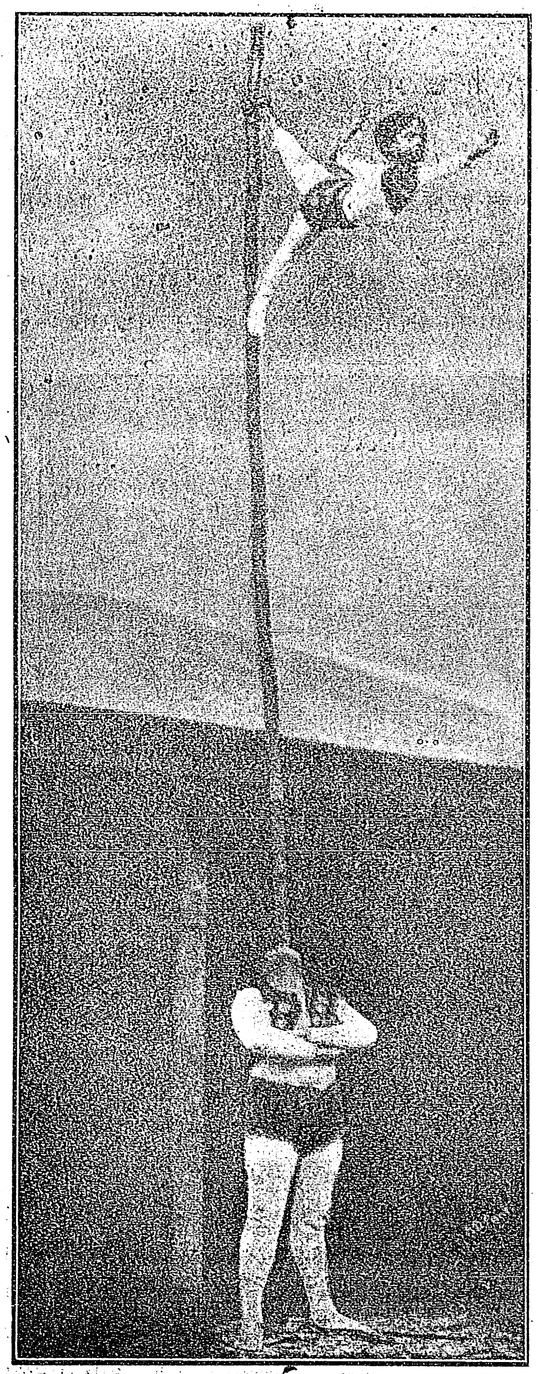

শ্রীমান বসন্তকুমার নাকের উপর বংশদণ্ড ধরিয়া একটী বালককে অর্দ্ধ পার্শ্বে স্থির রাখিয়াছেন

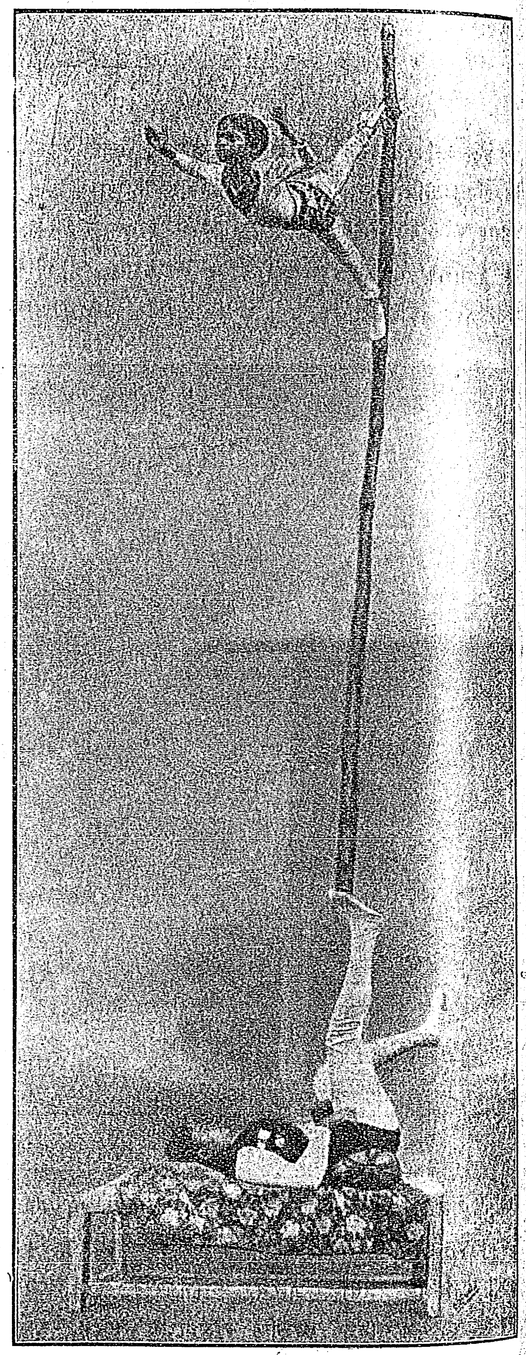

শ্রীমান বসন্তকুমার এক পায়ের উপর বংশদণ্ড ধরিয়া একটী বালককে তদূর্দ্ধ পার্শ্বে স্থির রাখিয়াছেন

নিবাসী হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ৺ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র, ৺হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। মাতুল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইয়া, বসন্ত আজ যাবতীয় ব্যায়াম-কুশলী বীরগণকে পরাস্ত করিয়াছে। তাহার এক পাদোপরি সুদীর্ঘ বংশদণ্ড সংলগ্ন বালক ক্ষীরোদলালের অদ্ভুত শরীরাবর্ত্তন—এবং সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের পদ পরিবর্ত্তনে ভার কেন্দ্রের সাম্যভাব প্রদর্শন—দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে পুলকিত করিয়া দেয়। কপালের উপর দ্বাদশবর্ষীয় ক্রীড়ক সহ বংশদণ্ডের অত্যদ্ভুত ভার কেন্দ্রের সাম্যভাব একটী বিস্ময়কর দৃশ্য। সোপান সমষ্টির উপর ক্রীড়ক সহ দ্বিপাদ বিশিষ্ট মই বসন্ত এক পদের উপর স্থিরভাবে রাখিয়া যে ক্রীড়া দেখাইয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বেনিয়াটোলা সম্প্রদায় যে কেবলমাত্র ব্যায়ামানুশীলনে প্রবৃত্ত তাহা নহে, এখানে, প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। এই ত্রয়োবিংশ কাল ধরিয়া একাদিক্রমে বহু ছাত্র বাহির হইয়াছে, সকলেই চরিত্রবান ও বহুগুণে বিভূষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। সম্প্রদায় পল্লীবাসীর বহু উপকার সম্পাদিত করিয়া সগৌরবে অবস্থান করিতেছে ৺ বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান হরিশঙ্কর পাল এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধারক। তিনি তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একখণ্ড জমী সম্প্রদায়কে ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য সমর্পণ করিয়া পল্লীবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বাটীর বালকগণও এ সম্প্রদায়ের সভ্য। তাঁহার সাহায্যে এবং সম্প্রদায়ের সুযোগ্য সম্পাদক রা বিহারী দে, অধ্যক্ষ গোষ্ঠবিহারী দে এবং পরেশনাথ ী জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডুও প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষের আন্তরিক যত্নে ও উৎসাহে সম্প্রদায় উন্নতিপথে অগ্রসর। ভগবানের কাছে আমরা ইহার চিরপ্রতিষ্ঠ অবস্থান প্রার্থনা করি এবং সম্প্রদায়ের ছাত্রবৃন্দও তাহাদের পরিচালকবর্গের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আনন্দের কথা—সুপ্রসিদ্ধ সার্কাসক্রীড়ক বঙ্গের গৌরব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়কে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

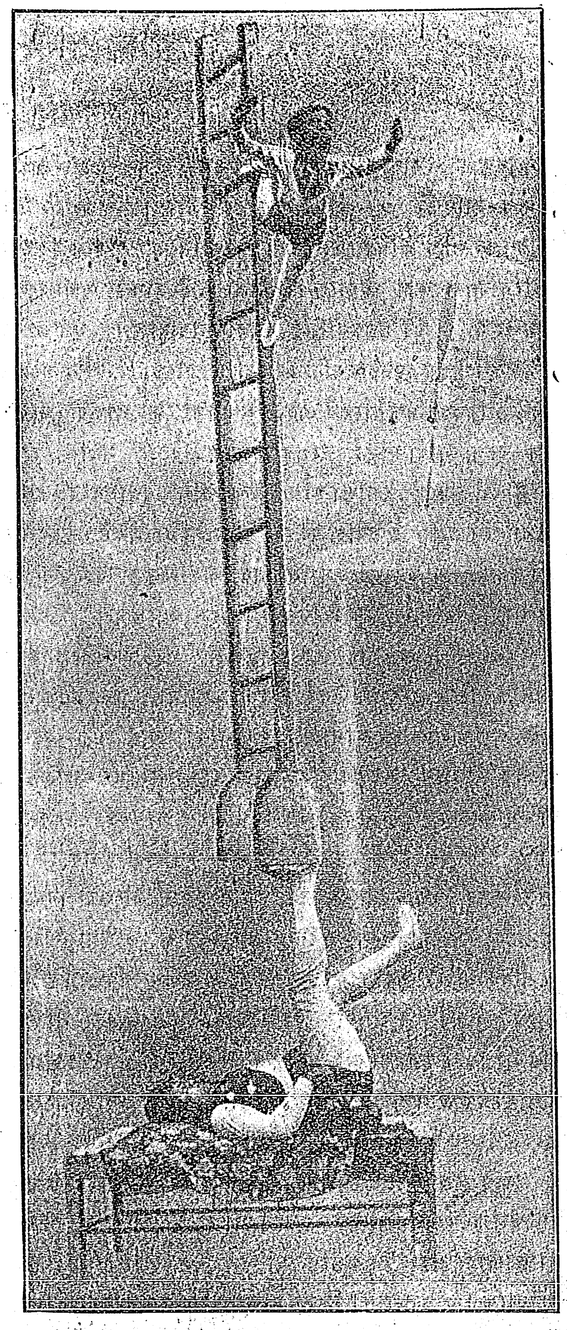

শ্রীমান বসন্তকুমার এক পায়ের উপর একখানি মই ধরিয়া তদূর্দ্ধ পার্শ্বে একটী বালককে স্থির রাখিয়াছেন

বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেত-তত্ত্ব

শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল

পেথবত্থু বৌদ্ধ-সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বৌদ্ধ-সাহিত্য ও ধর্ম্মে প্রেতের ধারণা কিরূপ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থখানিতে তাহাই বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিখ্যাত টীকাকার ধর্ম্মপালের 'অথকথা' এই গ্রন্থখানির টীকা-ভাষ্যমাত্র। মূল গ্রন্থে যে সব গল্পের আভাসমাত্র দেওয়া হইয়াছে, সে সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ ধর্ম্মপালের এই 'অথকথা'তে পাওয়া যায়। সে যুগে সাধারণতঃ গল্পের ভিতর দিয়াই সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতির গোড়াকার কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। সুতরাং এই বইখানি গল্পের সমষ্টি হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত রহস্যের বহু উপাদান এই গ্রন্থখানির ভিতর নিহিত আছে।

প্রেতবস্তু ভাষ্যের এই গল্পগুলি পাঠ করিলে মনে নানারকমের সমস্যার উদয় হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, এই গল্পগুলিতে কোথাও প্রেত-পূজা বা পিতৃ-পুরুষের পূজার উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ, পালি ধর্ম্ম-সংহিতায় দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কোথাও কোনও ব্যক্তিবিশেষের পূজারই উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃ-পুরুষ প্রেত বা দেবতা, কাহাকেও বৌদ্ধেরা ব্যক্তি হিসাবে কখনো পূজা করে নাই—বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যও এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহাতে এমন কি ব্যক্তিগত ভাবে বুদ্ধের উপাসনার পরিকল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বোধিক্রম অথবা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সঙ্কেত অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ব্যাপারটাই দাক্ষিণাত্যের এই উপাসকদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

কিন্তু গল্পগুলিতে কোথাও পিতৃ-পুরুষের পূজার উল্লেখ না থাকিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকণ্ঠার আভাস বেশ স্পষ্টরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্র-কন্যা পিতা-মাতার কল্যাণ কামনায় দান ধ্যান করিতেছেন, এবং তাহারই ফলে পিতা-মাতা দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন—অনেক গল্পেই এই ধরণের ব্যাপারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও—পুত্র-কন্যাদের এই সব কাজ কোথাও তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে বর্ণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া প্রেতের এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের অধিকার যে কেবলমাত্র পুত্র কন্যারই আছে, তাহা নহে। ইহার ব্যবস্থা পুত্র কন্যা ছাড়া অন্য লোকেও করিতে পারে।

পরলোকে দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসীরা এবং উপাসক-উপাসিকারা যাহাতে ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই উদ্দেশ্যে গল্পগুলি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব উপদেশ সেই কর্ম্মের স্বাভাবিক এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে। এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কর্ম্ম ভালই হোক, আর মন্দই হোক্—তাহার পরিণাম অপরিহার্য্য এবং এই কথাটাই সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-বিশ্বাসীদের মনের ভিতর মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রজ্ঞা, ধ্যান এবং সমাধির দ্বারা যাহারা নির্ব্বাণ লাভের জন্য উন্মুখ, এমন কোনও পাঠকের জন্যই পরমার্থ দীপনীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই। চিরন্তন সত্য বা আদিম বাস্তবকে বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কার করিতে চান—তাঁহার মনের সম্মুখে এমন কোনও চিন্তাশীল পাঠকও ছিল না। যাহাদের জন্য তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিত, তাহারা সেই সব সাধারণ লোক, যাহারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র পার্থিব কল্যাণই কামনা করে,—পান-ভোজন, বংশ-বৃদ্ধি লইয়াই যাহারা মাতিয়া আছে; এবং মৃত্যুর পরে যাহারা এই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থার কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের কাণে বার বার করিয়া একটিমাত্র মন্ত্র উচ্চারণ করা হইয়াছে; এবং সে মন্ত্রটি এই যে, জীবিত অবস্থায় অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করার দ্বারাই কেবলমাত্র

পরলোকে আনন্দের অধিকারী হইতে পারা যায়—মনুষ্য-দেহে যাহারা প্রচুর খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করে, মৃত্যুর পর তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং পানীয় লাভ করিবে।

এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পরমথদীপনীর প্রেত এবং প্রেতিনীদের সঙ্গে রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষের কিছুমাত্র তফাৎ নাই। তাহারাও ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হয়। ভালবাসার আসক্তি—পুরুষের প্রতি নারী এবং নারীর প্রতি পুরুষের অনুরাগ—এ জিনিসটাও তাহাদের ভিতর বিদ্যমান আছে। এ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, প্রেত বা প্রেতিনীরা মনুষ্য-দেহে জীবিত প্রণয়ীর সঙ্গেও উপভোগ করে। জীবিতাবস্থায় যে রমণীকে তাহারা ভালবাসিত, প্রেতজন্ম লাভ করিয়া তাহাকে লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে, এবং দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত একত্রে বসবাস করিয়াছে—এই ধরণের ঘটনা কতকগুলি গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। একটি গল্পে আবার এরূপ ঘটনারও উল্লেখ আছে যে, পাঁচ শত প্রেতিনী বারাণসীর একজন রাজাকেও প্রলুব্ধ করিয়া, তাহাদের উদ্যানে লইয়া গিয়া, তাহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, প্রেত এবং মানুষের এই যে যৌন-সম্মিলন—এ ব্যাপারটাও গল্পগুলির রচয়িতাদের কাছে বিচিত্র বলিয়া মনে হয় নাই।

খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র প্রভৃতি কোনও দ্রব্যই যে প্রেতেরা সোজাসুজি ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না—এ কথাটা বহুবার বহু রকমে বলা হইয়াছে। ছলে-বলে তো তাহারা কোনও জিনিস গ্রহণ করিতে পারেই না,—কেহ স্বেচ্ছায় কোনও জিনিস দান করিলেও, তাহা স্পর্শ করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু দান করিয়া তাহার পুণ্য প্রেতদের নামে উৎসর্গ করা হয়—কেবলমাত্র তখনই প্রেতদের সেই সব দ্রব্য উপভোগ করিবার অধিকার জন্মে। পরলোক-গত আত্মার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার এই যে ব্যবস্থা, এ কেবলমাত্র বৌদ্ধদেরই পরিকল্পনা নহে—হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মূলেও এই ধারণা বিদ্যমান। বস্তুতঃ, বৈদিক যুগ হইতে যে সব ধারণা ভারতীয় মনে একটা গভীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এ ধারণাও তাহাদেরই একটি। হিন্দু মত অনুসারে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণের কোনও প্রতিনিধিকে দান করিতে হইবে, এবং পরলোকগত আত্মার নামে যতগুলি লোককে আহার্য্য এবং বস্ত্রদান করা হইবে, তাহারই উপরে দানের পুণ্য নির্ভর করিবে। দানের ফলই কেবলমাত্র প্রেতদের নামে উৎসর্গ করা হয়। হিন্দু শ্রাদ্ধে কোনও কোনও খাদ্য-বস্তু এবং বস্ত্র সোজাসুজি-ভাবে প্রেতের নামে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঈপ্সিত ফললাভ করিতে হইলে, উপযুক্ত লোকের ভিতর এই সব দ্রব্য বিতরণ করার প্রয়োজন হইবে—এ কথারও উল্লেখ আছে।

পরমথদীপনীর গ্রন্থকারের ভিতর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানের দ্বারাই পুণ্য সঞ্চিত হয়, প্রেত এবং প্রেতিনীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইহাদিগকে দান করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা—এ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। দুই-এক স্থানে অবশ্য শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগকেও দান করার কথারও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা কেবল সাধারণ দানের প্রসঙ্গে, দাতারা যাহা নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে করিয়া থাকেন;—প্রেত বা প্রেতিনীদের দুঃখ-মোচনের প্রসঙ্গে নহে। সে জন্য যে দান, তাহা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, অন্ততঃ পক্ষে একজন উপাসক, অথবা সাধারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীকেই করিতে হইবে। এমন কি, প্রাত্যহিক দানের সম্পর্কেও তাঁহার পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দুর্লভ নহে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন দানের সম্পর্কে তিনি বৌদ্ধেতর ধর্ম্মবিশ্বাসীদের দাবী একেবারে ঝাড়িয়া ফেলেন নাই বটে, কিন্তু অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার পৃথিবীর সাধারণ লোককে দান করিয়া নিঃশেষ করা অপেক্ষা, একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সামান্য কিছু দান করার পুণ্যকে ঢের বেশী বড়,—অঙ্কুর প্রেত প্রভৃতি উপাখ্যানের ভিতর দিয়া তাহা স্পষ্টরূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রেতদের দেহের অবয়বও ঠিক নর-দেহেরই অনুরূপ। ক্বচিৎ কখনও অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও করা হইয়াছে। কখনও তাহাদের দেহকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ, কখনও বা পৃথিবীর কর্ম্ম অনুসারে তাহাদের কোনও অঙ্গকে বিকৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সাধারণ চেহারার সঙ্গে মানুষের চেহারার কিছুমাত্র অমিল নাই। জড়দেহে মানুষ যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, প্রেতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের

আদর্শও যখন তাহারই অনুরূপ, তখন দেহের সাদৃশ্য অনুরূপ হওয়ার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা, বলাই বাহুল্য।

পরলোকে প্রেতদের স্বভাবের গতি সাধারণতঃ ভালর দিকেই পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাদের দুঃখ-কষ্ট, তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতির কঠোর অভিজ্ঞতা তাহাদের ভিতরকার দোষ-ত্রুটিগুলি মুছিয়া দিয়া, তাহাদের স্বভাবকে সবল এবং মনকে কোমল করিয়া তোলে। জীবনে দানের দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, পরলোকে তাহাই যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পাথেয়, এ অভিজ্ঞতাও তাহারা অর্জ্জন করে। সুতরাং পরের অপকার করিতে তাহাদিগকে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের ভারে তাহারা এমনি ভারাক্রান্ত যে, পরের অনিষ্ট করিবার সুযোগ বা সময়ও তাহাদের নাই। দুষ্টবুদ্ধি আখ্যা আর কিছুতেই তাহাদিগকে দেওয়া যায় না—তাহাদিগকে দুঃখ-ভার-পীড়িত প্রেত বলিলেই বরং তাহাদের ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়।

পরলোকগত আত্মাদের ভিতর নানারকমের শ্রেণী বিভাগ আছে। এই সব বিভাগের ভিতর প্রেত এবং দেবতা এই দুইটি বিভাগের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এবং ইহাদের ভিতর পার্থক্যও যথেষ্ট রকমেই সুস্পষ্ট। যে সব আত্মা দেবজন্ম লাভ করে, তাহাদের জীবিতকালের কার্য্যকলাপের ভিতর সাধারণতঃ সৎকার্য্যের সংখ্যাই বেশী। তাহা হইলেও, পাপের চিহ্ন তাহাদের ভিতর, বিশেষ ভাবে নিম্নশ্রেণীর দেবতাদের ভিতর একেবারে দুর্লভ বস্তু নহে। এই দেবতাদের ভিতর শেঠ টী অসৈহ অথবা যুবরাজ অঙ্কুরের মত যাহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর, পৃথিবীতে অপরিমিত দান করার ফলে তাঁহারাই তাবতিংস স্বর্গে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এই তাবতিংস স্বর্গেও স্তর বা শ্রেণী-বিভাগের অন্ত নাই। দেবতাদের নিম্নস্তরের ভিতর রুক্ষদেব (বৃক্ষদেব) ভূমিদেব প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিভাগ আছে। যে সব দেবতার পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ মৃত্যুর পরেও শেষ হয় না, সম্ভবতঃ তাহাদিগকেই এই সব নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। পেতবত্থুতে বিমান দেবের নামেরও উল্লেখ আছে। ইহারা বিমান অর্থাৎ আকাশের প্রাসাদে বাস করে। বিমানদের এবং বিমানপ্রেতের ভিতর পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। যদিও বা থাকে, তবে সে পার্থক্য এতই অল্প যে, তাহা স্বচ্ছন্দেই অবহেলা করা চলে। প্রেতদের ভিতর বিমান প্রেতই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলেও তাহার সহিত দুষ্কৃতিও যথেষ্ট পরিমাণেই মিশ্রিত আছে; এবং তাহারই ফলে তাহাদিগকে দুঃখ-যন্ত্রণাও যথেষ্টই ভোগ করিতে হয়। তাহাদের নীচে প্রেত এবং প্রেতিনীদের সাধারণ স্তর। অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হয়। তাহাদের শাস্তির বীভৎস এবং বিশ্রী বিবরণ পাঠ করিতে করিতে মন আপনা হইতেই বিরক্তিতে ভরিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের দুঃখের ইতিহাস এত জঘন্য হইলেও অতি অকিঞ্চিৎকর কারণেই তাহারা আবার মুক্তিলাভ করে—তাহাদের নামে সামান্য একটু দান ধ্যান করিলেই, তাহাদের মুক্তির পরোয়ানা আসিয়া হাজির হয়। তাহাদের শাস্তি এবং তাহাদের মুক্তি এই দুইটি জিনিসের ভিতর কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই।

যে স্থানে অধঃপতিত প্রেতেরা শাস্তি ভোগ করে সে স্থানের সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। যে সব ক্ষেত্রে অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, সে সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাপীরা সহস্র সহস্র বৎসর নরক ভোগের পর পাপের শাস্তির শেষাংশ ভোগ করিবার জন্য প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। নরকের বিশদ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না; এবং নরক-যন্ত্রণার কতকগুলি অস্পষ্ট উল্লেখ মাত্রই আমাদের চোখে পড়ে। নরক হইতে পরলোকগত আত্মা পাপক্ষালনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া প্রেতজন্ম লাভ করে; এবং যে পর্য্যন্ত না কোনও মানুষ দান করিয়া তাহার পুণ্য তাহাদের নামে উৎসর্গ করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা এই প্রেতজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তবে অনেক আত্মা নরকে গমন না করিয়া একেবারেই প্রেত-জন্ম লাভ করে।

পেতবত্থুতে এবং তাহার ভাষ্যে প্রেত এবং প্রেতলোকের ধারণা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এসব উপাখ্যানের অধিকাংশই অবিশ্বাস্য, এমন কি, অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, এগুলি বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বাসবান ভক্তকে দেহে, কাজে এবং কথায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই এবং তাহাদিগকে জীবন্ত প্রাণীর প্রতি দয়ায় এবং অহিংসায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে।



পল্লীসেবা

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন বিভাগ হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল, এই ত্রিবিধ গ্রামে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে।

সাঁওতালগণ সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ, অল্পেতে সন্তুষ্ট। ইহাদের স্বভাব কোমল অথচ দৃঢ়। স্বাধীনতাই ইহাদের প্রাণ। ইহারা সর্ব্বদাই বাহিরের অন্য সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন থাকিতে ভালবাসে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ইহাদের মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ নাই। ইহারা চুরি কাহাকে বলে জানে না এবং সর্ব্বদাই শান্তিতে থাকিতে চায়।

ইহারা সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া শালবনের ধারে ধারে ছোট ছোট উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া অনুর্ব্বর কাঁকরময় কঠিন ভূমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তুলে। জমির উপর ইহাদের কোনও অধিকার নাই। জমি চাষের উপযোগী হইলেই জমিদার ও জোদ্দারগণ ইহাদের উপর উৎপাত সুরু করে। ইহারা কিছুদিন ধরিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে জায়গা জমি ফেলিয়া দলকে দল সবাই অন্যত্র চলিয়া যায়।

ইহাদের ঘর বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকের মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে খোয়াইর কাছে—যেখানে ঝর্ণার পরিষ্কার জল পাওয়া যায়, সেখানেই ইহাদের বসবাস। বিশুদ্ধ জল ও হাওয়া যেখানে নাই সেখানে ইহারা থাকে না। হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলির ন্যায় সাঁওতালগ্রামে স্বাস্থ্য-সমস্যা গুরুতর নহে।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও এমন সদানন্দ জাতি আর বড় বেশি নাই। অত্যধিক অত্যাচারে যেমন ইহারা ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়, সামান্য মিষ্টি কথায় তেমনি ইহাদের প্রাণ গলিয়া যায়। নৃত্যগীত ও শিকার প্রভৃতি নিত্য নূতন আমোদপ্রমোদ ইহাদের লাগিয়াই আছে। তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার; ইহার ভিতর দিয়া সামাজিক সাম্যভাব ইহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকে।

এই জিলায় সাঁওতালদিগের মধ্যে পঞ্চায়েৎ শাসন এখনও বিস্তৃত ভাবে বিদ্যমান আছে। গ্রামের মোড়লকে ইহারা সর্দ্দার মাঝি বলে। কোনও স্থানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় তাহারা এক-জনকে সর্দ্দাররূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। সেই সর্দ্দারই জমিদারের নিকট জমি সম্বন্ধে দরবার করে; এবং গ্রামের আভ্যন্তরিক মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। সর্দ্দার গ্রাম্য পেয়াদা "গোরেৎ"কে পাঠাইয়া আসামী ও ফরিয়াদীকে তাহার গৃহে আহ্বান করে। গোরেৎ অন্য অধিবাসীদিগকেও বৈঠকের সংবাদ জ্ঞাপন করে। গ্রামের যে কেহ এই বৈঠকে যোগদান করিতে পারে। সাক্ষ্য দিবার বা আসামী-ফরিয়াদীকে প্রশ্ন করিবার অধিকার সকলেরই রহিয়াছে। সর্দ্দার মাঝি সকলের কথা অবগত হইয়া, সকলের মতামত আলোচনা করিয়া অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করেন।

বিভিন্ন গ্রামের সাঁওতালদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ হইলে গ্রামের বাহিরে বটগাছতলায় তাহার বিচার হয়; উভয় গ্রামের দুই সর্দ্দার মাঝি ও প্রতি গ্রাম হইতে তাহাদের চারি জন করিয়া সহকারী বিচারের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু উভয় গ্রামের যে কোনও লোক

উপস্থিত হইয়া তাহার মতামত প্রকাশ করিতে পারে। তাহাতে মীমাংসা না হইলে ইহারা পঞ্চগ্রাম লইয়া সভা করিয়া থাকে।

ইলামবাজারের নিকটে গোচমাইল ব্যাপী একটী বৃহৎ বন আছে। এই বনে ২৫।৩০টি গ্রামের বিশিষ্ট সাঁওতালগণ বৎসরের বিশেষ দিনে শিকার করিতে যায়। ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ইহারা বনেই থাকে। সারাদিন শিকারের পর সন্ধ্যায় ইহাদের মহাসভার বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সমগ্র বৎসরে ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু গুরুতর অভিযোগের কারণ ঘটে তাহার মীমাংসা হয়। সমগ্র সাঁওতাল সমাজের সাধারণ স্বার্থঘটিত ব্যাপারও এইখানে আলোচিত হইয়া থাকে।

এইরূপে এ প্রান্তরে ক্ষুদ্র বস্তির লোক হইয়াও সুদূর ভিন্-গাঁয়ের স্বজাতির সহিত ইহারা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। নিজেদের এই বিপুল সমাজের আশ্রয়ে সাঁওতালগণ এতদিন পর্য্যন্ত বেশ ভাল করিয়াই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। ইদানীং আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া এই সঙ্ঘবদ্ধভাব ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও কোনও সাঁওতাল যদি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎকে উপেক্ষা করিয়া আদালতে অথবা জমিদারের কাছারীতে নালিশ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজের সকলেই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে।

প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান গ্রামগুলির তুলনায় সাঁওতাল গ্রামে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা নাই বলিলেই হয়। সাঁওতাল গ্রামে "টন্নি" আখ্যাধারী উকিল দালালগণের আনাগোনা নাই। তথা-কথিত উচ্চশিক্ষিত আইন ব্যবসায়ীর সহিত পরিচয় অতি অল্প বলিয়াই ইহারা এখনও মিথ্যায় পাকা হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে দেশে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা যে কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। একবার কোনও মামলাপ্রিয় মুসলমান গ্রামে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, সমগ্র বৎসরের উৎপন্ন শস্য হইতে যে আয় হয়, তাহার এক তৃতীয়াংশ মোকদ্দমায় ব্যয় হইয়া থাকে। গ্রামের কোনও মঙ্গলকর কার্য্যে তাহারা অর্থ-সাহায্য করিতে পারে না। যখন হিসাব করিয়া দেখা হইল যে, বৎসরে মামলা করিয়া যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহার এক-দশমাংশ ব্যয়ের দ্বারা ৫ বৎসরের মধ্যে এই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার করা যায়, তখন সেই গ্রামের অধিবাসীরা পঞ্চায়েৎ-সালিশী স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইল। সালিশী বৈঠকে উপস্থিত হইয়া দেখি, উকীলের দালাল সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই সালিশীর বিরুদ্ধে লোককে উস্কাইয়া দিতে চেষ্টা করে। বহুদিন ধরিয়া উকীল ও তাহাদের দালালের নিকট মন্ত্র করিয়া এই গ্রামের অধিবাসীদের স্বভাবও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষই মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে এমন ভাবে ঘটনা সাজাইয়া আনে, যে সত্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

উকীল ও আদালত কেবল যে পল্লীর আর্থিক দুরবস্থার কারণ, তাহা নহে। ইহাদের কৃপায় পল্লীগুলি নৈতিক অধোগতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। যে সত্যনিষ্ঠা ও সহানুভূতির ভিত্তির উপর সমাজসৌধ প্রতিষ্ঠিত, ইহারা সেইখানেই ফাটল ধরাইতেছে; মিথ্যার বিষ ছড়াইয়া ইহারা সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়াছে; এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আইন ব্যবসায় বর্জ্জন করিতে ও জনসাধারণকে আদালতের ত্রিসীমানায় না যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মুসলমান গ্রামগুলি মামলাবাজ হইলেও, তাহাদের একটা প্রধান গুণ এই যে, সামাজিক সাম্যভাব তাহাদের মধ্যে এখনও বিশেষরূপে জাগ্রত আছে। মস্‌জিদে তাহারা সমান আসনে উপবিষ্ট হইয়া নমাজ পড়ে। বৈঠকে তাহারা একই চাটাইর উপর ধনী দরিদ্র সকলে সমবেত হয়। ধনী মোড়লের সহিত কৃষাণ মজুরও নির্ভীকভাবে সমানে সমানে তর্ক করে।

কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় বন্ধু এলমহার্ষ্ট সাহেবের সহিত আমি একটি মুসলমান গ্রামে উপস্থিত হই। দাঙ্গা হাঙ্গামা, ডাকাতির জন্য এই গ্রামটির বীরভূমে বড়ই দুর্নাম ছিল। প্রতিবেশী হিন্দুদিগের উপর ইহারা যথেষ্ট অত্যাচার করিত। আমরা যাওয়ার পর সেখানে একটি সভা আহূত হয়। আমরা সভায় গিয়া উপবেশন করিলে এক বৃদ্ধ মোড়ল আসিয়া একেবারেই সাহেবের পাশে আসন গ্রহণ করিল এবং নির্ভীক ভাবে বলিল,—"সাহেব, তুমি বলছ কি? তুই বাবু বলছে বলেই যে আমরা তোমাদের কথামত কাজ করব, তা করব না। আমাদের যদি বুঝিয়ে দিতে পার যে, তোমরা যা বলছ তাতে আমাদের যথার্থই উপকার হবে, তবেই তোমাদের কথা অনুযায়ী চলব, নইলে নয়।"

খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি যে, এই নির্ভীকতাই ইহাদের প্রাণ, আর অসংযমই ইহাদের প্রধান দোষ। সালিশী বৈঠকে বসিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া হাতাহাতি করিবে; কিন্তু বিচারক যদি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, তবে পর মুহূর্ত্তেই শত্রুকে বোধ বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করিবে। ইহারা সহজেই যেমন আত্মকলহে রক্তারক্তি করে, তেমনি আবার ইহাদের মধ্যে কোনও মহৎ হৃদয়াবেগ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে অতি সহজে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই গুণেই হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইয়াও ইহারা অধিকতর শক্তিশালী।

ইহাদের মধ্যে যাইয়া, ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, কোনও কাজ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে ইহাদের চরিত্রগত এই বিশিষ্টতা-টুকুকে বেশ ভাল করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে হইবে। আর তাহা করিলে, ইহাদের চরিত্রের এই নির্ভীকতাকে বিনষ্ট না করিয়া, যাহাতে প্রেমের দ্বারা, উচ্চ আদর্শের দ্বারা ইহাদিগকে সংযত ও উন্নত করা যায়, তাহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

হিন্দু গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বড়ই নিরাশাব্যঞ্জক।

বীরভূম জিলার অধিকাংশ হিন্দুগ্রামেই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অন্ত্যজ। 'ছোটলোক' নামে ইহারা আখ্যাত হয়। এই 'ছোটলোকগুলি' সর্ব্বদাই 'ভদ্রলোকে'র ভয়ে ভীত। উৎসাহ উদ্যমের রেখাপাত ইহাদের চোখে, মুখে আদৌ দৃষ্ট হয় না।

এক দিন কোনও হিন্দুগ্রামে 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র বালকদের জন্য একটা ফুটবল লইয়া যাই। 'ছোটলোকে'র ছেলেরা প্রথমটা খেলায় যোগ দিতে অস্বীকার করে; পরে আমার কথায় ভরসা পাইয়া দুটী একটী ছেলে খেলিতে নামে। কিছুক্ষণ পরে দেখি অতি অল্প বয়স্ক একটী 'ভদ্রলোকে'র ছেলে, তাহার সমবয়সী একটী 'ছোটলোকে'র ছেলের গণ্ডে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বসিল। আমি তিরস্কার করায় সে উত্তর করিল, "মশায়, আপনি খেলতে বলেছেন, তা খেলুক; কিন্তু তাই বলে গায়ে ধাক্কা দিবে কেন? আগে থেকে সাবধান না হলে ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে।" বুঝিলাম এই বালক অতিদিন তাহার অভিভাবক ও আত্মীয়দের মুখে যাহা শোনে, এ তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র।

শিক্ষিত ভদ্র বাবুসম্প্রদায় হস্তপদ চালনে একান্ত অক্ষম বলিয়া এই সকল 'ছোটলোকেরা'ই অতি সস্তায় মজুরী করিয়া অথবা মুনিবের জমি চষিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্র যোগায়। কিন্তু এই উপকারের পরিবর্ত্তে ইহারা পায় কি? আজ ইহাদের অবস্থাটাই বা কি? বহু শতাব্দীর জাত্যভিমানের নিষ্পেষণে ইহারা যে একেবারে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে, এ সকল অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইলে ইহাই ত বারে বারে চোখে পড়ে।

হাড়ি, বাগ্দী, বাগ্দী, মাল প্রভৃতি জাতি এক সময় অসাধারণ বাহুবলে বঙ্গের সীমান্ত-দেশ রক্ষা করিয়া আমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বিষ্ণুপুর রাজ্য স্থাপন করেন। বীরভূম ও বাঁকুড়া একসময় এই রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। "ধর্ম্মমঙ্গল" বর্ণিত ইহাই ঘোষ ও লাউসেনের লড়াই হইয়াছিল কেন্দুলীর অপর পারে অজয়ের অনতিদূরে। এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কালুবীরের বীরত্ব কাহিনী এখনও বীরভূমের গৃহে গৃহে শোনা যায়। এই কালুবীর ডোমগণের পূর্ব্বপুরুষ। এখনও বীরবংশী বলিয়া ডোমগণ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। "ধর্ম্মমঙ্গল" ডোম কবির রচনা। বহু গ্রামে ধর্ম্মপূজার পুরোহিত ডোম ছিল। এখন ধীরে ধীরে নানা কৌশলে ব্রাহ্মণগণ সেই পৌরোহিত্য গ্রাস করিয়াছেন। কালুবীর ও রমাই পণ্ডিতের বংশীয় ডোমগণ এবং স্বাধীন রাজ্যস্থাপক বাগ্দী ও মালগণের বংশধরগণ আমাদের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার ফলে আজ পৌরুষ ও বীর্য্যহীন হইয়া কাপুরুষতার চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া আমরাও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, একটী ক্ষুদ্র দুর্দ্দান্ত মুসলমান পল্লীর ভয়ে ৬।৭টী হিন্দুগ্রাম সততই ভীত। এমনটি হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, হিন্দুগ্রামে ভদ্র বাবুগণ বীর্য্যহীন ও অকর্ম্মণ্য। কিঞ্চিৎ কেতাবী বিদ্যার কুবুদ্ধি ও জাত্যভিমানের অন্ধ গোঁড়ামীই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। প্রাচীন হিন্দুসমাজের সহজ, সরল অথচ সুদৃঢ় নিষ্ঠা ইঁহাদের মধ্যে নাই। অন্ত্যজ জাতির অন্তরেও ইহাদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাভক্তি নাই। কোন ভদ্রনামধারী কুচরিত্র কাপুরুষ যদি ঘরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রাত্রিগুলা হাড়িপাড়ার কাটায়, তাহা হইলে সমাজে তাহা লইয়া টুঁশব্দটিও হইবে না। কিন্তু তিনিই আবার দিবালোকে কেহ 'হাড়ির' জল ছুঁইলে সমাজরক্ষার্থে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিবেন। এই অপমান তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধে। তাই ভদ্রলোকেরা যখন মার খায়, ঐ তথাকথিত ছোটলোকগুলি তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়।

একবার কোনও একটী সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে পূজার অনিয়ম হওয়ায় পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সকলের মনে ভয় হয় যে এ বৎসর তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। একটী 'ছোটলোক' কথাচ্ছলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা, তা কি হবে? ভগবান কি আছেন? আমাদের কান্না কি তিনি শুনেছেন? এরা ধ্বংস হ'লে আমরা বাঁচি।" কথাটা আবেগের মুখে বে-ফাঁস বাহির হইয়া যাইবার পরেই সে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া আমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিল, আমি যেন কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ না করি।

এইখানেই হিন্দুসমাজ শক্তিহীন। সাঁওতালদিগের উপর বেশী জুলুম চলে না। তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া স্বগ্রামে চলিয়া যায়। মুসলমান কৃষকদের বেলাও তাই। তাহারা স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন। আমাদের হিন্দুগ্রামে আমাদের স্বধর্ম্মী ও স্বগ্রামবাসীগণের মনে সাহস নাই। বাবুদের সামনে ভাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না। বাড়ীতে কোনও বাবুকে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিলে, অসময়ে বেগার খাটিতে হইবে মনে করিয়া সে হয় ধানের ডোলে লুকাইয়া থাকে, না হয় মুখ বাঁকা করিয়া, পেটে হাত দিয়া কঠিন রোগের ভান করিতে থাকে।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আর্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য আমরা একটি হিন্দুগ্রামে গমন করি। কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা বড় সহজে সফল হইবে না; কারণ, সর্ব্ববিধ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূল হইতেছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি; কিন্তু সেখানে তাহার বড়ই অভাব।

মুসলমান পল্লীতে যে প্রাণ ও ঐক্য দেখিতে পাই, হিন্দুপল্লীতে তাহার অত্যন্ত অভাব বলিয়া তথায় সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অধিকতর কষ্টকর ব্যাপার। সমাজ সংস্কারের দ্বারাই হিন্দুসমাজে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান কাজ—অস্পৃশ্যতা দূর করা। যাহারা ছুঁৎমার্গ মানিয়া চলিবে, পল্লীসেবায় তাহাদের অধিকার নাই। বঙ্গের সেবক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রকাশ্যে এই ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া অন্ত্যজ জাতির জল গ্রহণ করেন। রাজা রাম মোহন রায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ করিয়া আমরা যেন এই পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতা দূর না করা পর্য্যন্ত স্বরাজ-পতাকা স্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই।" হিন্দুপল্লীর জটিল সমস্যার সহিত যতই পরিচিত হইতেছি, ততই আমরা তাঁহার এই পবিত্র বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি।

(সংহতি)

যথের দেশ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যেখানেই যথেষ্ট ধনের পরিচয় পাওয়া যায়, লোকে সেই ধনের উল্লেখ করিয়া সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যেন 'যথের ধন'। এবং যিনি তাহার মালিক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলে "যেন যক্ষী"। পরিমিত অর্থ বা ধন সম্বন্ধে 'যথের ধন' এ কথাটা বড় কেহ ব্যবহার করে না—ব্যবহার করে যেখানকার ধন সম্পদ অপরিমিত—তাহারই সম্বন্ধে।

কিন্তু তবুও একটু কিন্তু থাকিয়াই গেল। যেখানে সেখানে প্রচুর ধনরাশি থাকিলেই তাহাকে যথের ধন বলিয়া অভিহিত করা হয় না। টাকশালে প্রচুর অর্থ আছে। তাই বলিয়া টাকশাল যক্ষাগার নহে। বিজয়ী বিধর্ম্মী বীর যখন তাঁহার অপ্রমেয় শক্তি ক্ষয় করিয়া সোমনাথের প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন তথায় হিন্দুর সেই পাষাণ মূর্ত্তিমাত্র দেখিয়া যে হৃদয় তাঁহার ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল তাহা নহে। বরং তাঁহার ঈপ্সিত ধনরাশির পরিবর্ত্তে শুধু সেই পাষাণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সেই ভয়াবহ যুদ্ধের সার্থকতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষ অপেক্ষা সম্ভবতঃ তাঁহার ক্রোধই হিন্দুদের মূর্ত্তিগুলিকে চূর্ণ করিয়াছিল। অপরিমেয় শক্তির পরিবর্ত্তে সে পাষাণ মূর্ত্তি মধ্যে ও পদতলে যে ধন লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু অপ্রমেয় নহে—অকথিত। যুদ্ধ জয় করিয়া নহে—বিজয়ী সেনানীর বিজয়োল্লাস এই ধন লাভের পরেই আকাশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এই যে অপরিমেয় ধনরাশি, ইহাকে কি যথের ধন বলা যায়? —না। একস্থানে যথেষ্ট ধন থাকিলেই তাহাকে যথের ধন বলা যায় না। সে ধনরাশি কাহারও উদ্দেশে গচ্ছিত থাকা আবশ্যক।

মিশরের প্রাচীন নগরী থিবিসের মৃত্তিকাভ্যন্তরে লর্ড কর্ণারভান্ সেদিন তুতেনখামেনের যে প্রাসাদসমাধি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যকে বরং যথের ধন বলা যাইতে পারে। মৃত্যুর পরও একটা জীবন আছে এবং সেই জীবনের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি পূর্ণ প্রাসাদ মধ্যে দেশাচার মতে তুতেনখামেনের মৃতদেহ সমাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্তই তুতেনখামেনের প্রেতাত্মার। এ কথার আলোচনাও অনেক হইয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কারে সমগ্র জগত চমকিত; কিন্তু এতদপেক্ষাও অনেক অধিক ধন,—শুধু অনেক অধিক নহে, যাহা আবিষ্কৃত হইলে কার্ণারভানের এই আবিষ্কার একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে—আজও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সে ধন রত্ন আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোনই সন্দেহ নাই। তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও লোকে তাহাকে দৃষ্টির অভ্যন্তরে আনিতে সদা সচেষ্ট। তাহা যথের ধন ত বটেই, কিন্তু যথের ধন বলিলেই তাহার পূর্ণ পরিচয় হয় না—তাহাকে 'যথের দেশের যথের ধন' এ আখ্যা স্বচ্ছন্দেই দেওয়া যায়। সে দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু। পেরু দেশ সোণা-রূপাদি মূল্যবান ধাতব পদার্থে পূর্ণ।

সোণা-রূপার চলন যে শুধু আর্য্য সভ্যতার সহিতই জড়িত, তাহা নহে। আর্য্যগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী অনার্য্যগণও ইহাদের ব্যবহার ও নিষ্কাশনের সহিত সম্যক পরিচিত। রাবণের হৈমলঙ্কা তাহার প্রমাণ। সে হৈমলঙ্কার যে বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব। স্বর্ণশিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের কলা-কুশলতার বিচিত্র চিত্র। খনি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির সহিত বর্ত্তমান লেখকের অধিক কার-কারবার। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হস্তক্ষেপও সেই খনি-গন্ধাধিক্য হেতু। সিংভুম ও সম্বলপুরের পাহাড় ও জঙ্গলে কিরূপ নিপুণতার সহিত আর্য্য-সভ্যতার আলোক অপ্রাপ্ত আদিন সাঁওতাল ও কোলগণ ছাঁকনি ও পাতার রস-সাহায্যে স্বর্ণ নিষ্কাশন করে, তাহা অনেক বৈজ্ঞানিকেরও বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু মনে হয়, এ বিষয়ে পেরুর আদিম অধিবাসীরা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

পেরুর বাহিরে পৃথিবী ছিল কি না, তাহা জানা পেরুবাসীদের পক্ষে যেরূপ অনাবশ্যক, জগতের সোণার বাজার সম্বন্ধে সংবাদাদি রাখাও তাহাদের পক্ষে তদ্রূপ ছিল। কাজেই তাহারা শুধু আবশ্যকমত স্বর্ণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত, প্রাসাদ ও মন্দিরাদি সুবর্ণ কারুকার্য্যে খচিত করিত, কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন-শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য। কারিগরের হাতে পড়িয়া সেই সব সোণা-রূপা নানা আকার প্রকারে ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিত। রবির কিরণ-সম্পাতে শত সহস্র আভা চারিদিকে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র স্থানটীতে একটা দীপ্তির লেখা ফুটাইয়া তুলিত—ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত। তাহার পর যখন স্পেনবাসীরা দলে-দলে তাহাদের দেশে আসিতে লাগিল এবং তাহাদের দেশের সেই কাঁচা হলুদের বর্ণ বিশিষ্ট ধাতব পদার্থের উপর নজর দিতে লাগিল, তখন তাহারা বিস্মিত হইল, ভাবিল উহারাও বোধ হয় তাহাদেরই মত গৃহ-প্রাঙ্গণ ও মন্দিরাদি সজ্জিত করিতে চাহে। কিন্তু অজ্ঞতা কাটিয়া গিয়া যখন তাহারা স্পেনবাসীদের আগ্রহাতিশয্যের কারণ সম্যক বুঝিতে পারিল, যখন বুঝিল তাহাদের দেশের ঐ ধাতব পদার্থ কি মহামূল্য, জগতে তাহার স্থান কোথায়। তখন তাহারা চকিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক হইয়া পড়িল।

পেরুর রাজাগণের উপাধি 'ইঙ্কা'। ইঙ্কারা এক একজন কুবের বা যক্ষ। পেরুর নানাস্থানে ইঙ্কাগণের প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল প্রাসাদের দেওয়াল সাধারণতঃ স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত হইত এবং প্রাসাদ চূড়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যে খচিত হইত। স্নানাগারে স্বর্ণনল দ্বারা জল আসিয়া চৌবাচ্চায় পড়িত। সে চৌবাচ্চা আবার সুবর্ণ ও রৌপ্য-মণ্ডিত। ইঙ্কা তাহাতে অবগাহন করিতেন। মোগল সম্রাটগণের স্নানাগারের কথা অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নানারূপ সাজ-সরঞ্জামের বিবরণে সাধারণতঃ আমরা চমৎকৃত হই। কিন্তু ইঙ্কাগণের স্নানাগার যে তদপেক্ষাও অধিক আড়ম্বরময় ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঙ্কাদের বসিবার আসনও সেই অনুপাতে

নির্ম্মিত হইত। একখানি প্রকাণ্ড পুরু সম-চতুষ্কোণ সুবর্ণ টালির উপর এইখানি সু-উচ্চ সুনিপুণ শিল্প-শোভা-সমন্বিত টুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট আসন স্থাপিত হইত। ইঙ্কা তাহাতেই উপবেশন করিতেন। প্রাসাদে ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় তৈজস-পত্র সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত হইত। তাহা না হইলে ইঙ্কাগণ তাহা স্পর্শ করিবেন কিরূপে? স্বর্ণ-রৌপ্যের মোটামুটি দ্রব্যাদি সাধারণ লোকের গৃহেও থাকিত।

ইঙ্কাদের প্রত্যেক বিভিন্ন প্রাসাদে এইরূপ আস্‌বাব পত্র থাকিত। কারণ, তাহা না হইলে এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে গমন করিতে হইলে এ সমস্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক, তাহাতে অসুবিধা অনেক। ইঙ্কাগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন তৎসমুদায় তাঁহাদের মৃতদেহের সহিত সমাহিত হইত—যাহাতে প্রেতলোকেও তাঁহারা কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করেন। নূতন ইঙ্কা পুনরায় নূতন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া লইতেন।

ইঙ্কাগণের ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী এখনও প্রচলিত। শুনা যায়, কোন ইঙ্কা না কি তাঁহার পুত্রের জন্মোপলক্ষে এত বড় একটী স্বর্ণ-শৃঙ্খল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে, তাহাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ আবশ্যক তত স্বর্ণ বিশেষজ্ঞগণের মতে হঠাৎ কোন এক দেশে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। স্পেনবাসিগণের দৌরাত্ম্য যখন ক্রমশঃই অধিক হইয়া উঠিল, তখন পেরুবাসীরাও চতুর হইতে লাগিল। এবং যখনই তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি স্পেনীয় তস্করবর্গের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা বুঝিত, তখনই তাহা পর্ব্বতের গুহায় বা হ্রদের গভীর প্রদেশে নিক্ষেপ করিত। প্রবাদ সেই সুদীর্ঘ বিস্ময়কর সুবর্ণ-শৃঙ্খলও নাকি এইরূপে আর্কাস হ্রদের গভীর জলে নিরুদ্দিষ্ট ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পেরুর উত্তরে ইকোয়েডর, কলম্বিয়া ও কষ্টারিকা। এই সকল দেশেও মৃতদেহের সহিত তাহাদের ব্যবহার্য্য স্বর্ণ-রৌপের দ্রব্যাদি সমাহিত হইত। সে সকল অনেক সময় এখন মৃত্তিকা খনন কালে পাওয়া যায়। পেরু ও এই সকল দেশের এক শ্রেণীর লোকের পেশা কেবল পুরাতন গোরস্থান খুঁজিয়া বাহির করা এবং ধনলাভের আশায় তাহা খনন করা। কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ কিছু কিছু প্রাপ্ত হইলেও অপর্য্যাপ্ত ধন-প্রাপ্তির মত কিছু কেহ পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তবে লোকের সাধারণতঃ বিশ্বাস যে ইঙ্কাগণের সমাধি খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু যদি কেহ কোনরূপে তাহা বাহির করে তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত ধন-রাশির মালিক সে অনায়াসেই হইতে পারিবে। অনেক সময় এই সকল পেশাদার খননকারীগণের এ কার্য্যে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি অকস্মাৎ ইঙ্কা-ধন-প্রাপ্তির আশায় তাহারা এ কাজ ছাড়িতে না পারিয়া ক্রমশঃই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বসে।*

পেরু দেশে অতি প্রাচীন কালে চিমু নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্য এখন আর নাই, তাহার সামান্য সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র অধুনা বিদ্যমান। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন স্বর্ণ দ্রব্য পাওয়া যায়। সেগুলি নিউইয়র্কের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে তিনটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম—একটী জলপাত্র, দ্বিতীয় একটী বক্ষস্ত্রাণ, তৃতীয় একটী শিরোভূষণ। এই শিরোভূষণ যাদুঘরে আরও আছে এবং পূর্ব্বেও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোনটীই আলোচ্যটীর ন্যায় এত বৃহৎ নহে। এই শিরোভূষণ কয়েকটি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটীর আয়তন সুবৃহৎ—দৈর্ঘ্যে ১৭½ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৫½ ইঞ্চি। সুতরাং ইহা যে কত বড় শিরোভূষণ তাহা সহজেই অনুমেয়। একখানি বক্ষস্ত্রাণের উপর বোধহয় সুদৃশ্য করিবার জন্য আবার পর পর হাল্কা ও গাঢ় পীতবর্ণের পটী। তাহাতে দ্রব্যটীকে বাস্তবিকই সুদৃশ্য করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞগণের হস্তে পড়িলে কোন জিনিষই অল্পে নিস্তার পায় না। এটী যখন বিভিন্ন প্রকার ধাতব পদার্থে সুশোভিত তখন তো আর কথাই নাই। সুতরাং পরীক্ষা আরম্ভ হইল ও দেখা গেল যে গাঢ় পীত অংশে শতকরা ৮০ ভাগ স্বর্ণ, ১৩ ভাগ রৌপ্য ও ৭ ভাগ তাম্র বর্ত্তমান এবং হাল্কা বর্ণের অংশে শতকরা ৪৭ ভাগ স্বর্ণ, ৪৪ ভাগ রৌপ্য ও ৮½ ভাগ তাম্র বর্ত্তমান। এরূপ সংমিশ্রণ হেতু দ্রব্যটীর দৃঢ়তা সাধারণ খাঁটি সোণা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ ফল মোটামুটী, সোণা শতকরা ৬০ ভাগ, রৌপ্য ২০।৩০ ভাগ ও তাম্র ৬।২০ ভাগ। এগুলির প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে অনুমিত হয় যে, উত্তপ্ত তরল স্বর্ণ ছাঁচে ঢালিয়া তৎপর হাতুড়ী ও খোদাই কল সাহায্যে ঈপ্সিত আকৃতিতে আনয়ন করা হইত এবং কোন দুই অংশকে একত্রে জুড়িবার প্রয়োজন হইলে অন্য কোন প্রকার কঠিন ধাতুর সাহায্যে প্রস্তুত "ঝাল" ব্যবহৃত হইত। †

আমাদের এদেশে মহানদী ও ইর নদীর তীরে আদিম অধিবাসীগণ যেরূপে স্বর্ণ সংগ্রহ করে পেরুতেও তেমনি সমুদ্রগামিনী নদী-সৈকতে তদ্দেশবাসীরাও স্বর্ণ সংগ্রহ করিত বা এখনও করে। আমাদের দেশ অপেক্ষা তাহাদের দেশে ঐ সকল স্থানে স্বর্ণের পরিমাণ অধিক। রবির কিরণ-লেখায় বালুকা রাশির মধ্যে স্বর্ণকণা-ঝলকিত হইয়া পেরুবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং সাধারণ পেরুবাসীরা এই উপায়েই সাধারণতঃ স্বর্ণ সংগ্রহ করিত।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদির সহিত পেরুবাসীরা যতই সংস্পর্শে আসিতে লাগিল ততই তাহারা এ সকলের নিষ্কাশন সম্বন্ধে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। স্পেনবাসিগণ যখন তাহাদের দেশে আগমন করে তখন পেরুবাসীরা অনেক উন্নত প্রণালীতে ধাতুনিষ্কাশনে মনোনিবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের 'লোহার'গণের ন্যায় তখন তাহারা খনিজ ধাতুর পাহাড়ের সানুদেশে তদানীন্তন 'ব্লাষ্ট

* Mr. Hamilton Bell's "Golden age of Peru" in "Natural History" published by the "American museum of Natural History in New York."

† Mr. Pliny E. Goddard's "Peruvian Gold of the Chimu kingdom" in the "Natural History", published by the American Museum of Natural History in New York.

ফার্‌নেস্' বসাইয়া ধাতুনিষ্কাশন করিতেছে। "সাধারণতঃ দুই প্রকার নিষ্কাশন প্রণালীর তাহারা সাহায্য লইত। প্রথম ধাতু প্রস্তর (যে সকল প্রস্তরে ধাতুর যথেষ্ট সমাবেশ রহিয়াছে) গুলিকে একস্থানে সংগ্রহ করিয়া হাপরে নিক্ষেপ করিত। তৎপর কয়েকজন মিলিয়া তামার নল সাহায্যে অগ্নির অভ্যন্তর ভাগে ফুঁ দিয়া যথাবশ্যক উত্তাপ প্রয়োগে প্রস্তরগুলিকে গলাইয়া তাহা হইতে ধাতু সংগ্রহ করিত। এ প্রণালী যে কোন স্থানেই অবলম্বিত হইত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রথা কেবলমাত্র পর্ব্বতের সানুদেশেই অনুষ্ঠিত হইত। এ ক্ষেত্রে উনানগুলি এরূপভাবে বসান হইত যাহাতে তাহাদের উন্মুক্ত বায়ুপথে প্রচুর পরিমাণে পাহাড়ের জোর হাওয়া প্রবেশ করিয়া তাহাই ব্লাষ্টের (blast) কাজ করিতে পারিত। পেরুবাসীরা সে যুগে খনিজ স্বর্ণ, খনিজ রৌপ্য ও খনিজ তাম্রের সন্ধান ও তাহা হইতে ঐ সকল ধাতু সংগ্রহ করিত।

কিন্তু তাহাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব ধন রত্নের পরিণাম কি? বিজিতের ধন বিজয়ীগণ কর্ত্তৃক যাহা হইয়া থাকে কতক তাহাই, কতক বা কালের কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত গৃহ বা নগরের মৃত্তিকাভ্যন্তরে এবং কতক বা বিজয়ী দস্যুর হস্তে না দিয়া অধিকারীবর্গ কর্ত্তৃক এরূপভাবে লুক্কায়িত, যাহাতে তাহা একেবারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ইঙ্কাগণের প্রাচীন রাজধানী কাজকো নগর প্রান্তবর্ত্তী সাকসাহুয়ামান নামক দুর্গের ধ্বংস স্তূপের নিম্নদেশে নাকি অপরিমেয় স্বর্ণ দ্রব্যাদি গচ্ছিত রহিয়াছে। একটী পাহাড়ের উপর ঐ দুর্গ বিদ্যমান ছিল। এখন সেখানে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ঐ গুহা দ্বারা অনেকগুলি পাতাল পথে পৌঁছান যায়। সেই সব পথ প্রায় অর্দ্ধমাইল নিম্নে পাতালপুরে ইঙ্কাগণের বিভিন্ন প্রাসাদে ও তাঁহাদের সূর্য্যমন্দিরে গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পেরুর একজন আদিম অধিবাসী সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, সেই গুহা পথে কেহ প্রবেশ করিলে আর বাহিরে আসিতে পারে না। গুহামধ্যে অন্ধকারময় অসংখ্য পথের গোলকধাঁধায় দিশাহারা হইয়া প্রাণ হারায়। কিন্তু ৪দিন পরে হঠাৎ অনাহারে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ও শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেই লোকটী একখানি সুবর্ণ গোলক হস্তে লইয়া সহরের এক গির্জ্জার সম্মুখে উপস্থিত হয়। পাতালাভ্যন্তরে লুপ্ত নগরীর প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্ণাভরণ সম্বন্ধে বিড় বিড় করিয়া নানারূপ বকিতে বকিতে সে তাহার স্বর্ণগোলক গির্জ্জার বেদীর উপর স্থাপনানন্তর উপাসনার জন্য হেঁট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গুপ্ত ধনের অধিকারী হইবার আশায় গুহামুখে ছুটিয়া চলিল এবং সাতজন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের কেহই অদ্যাবধি ফিরিয়া আসে নাই এবং তাহারা নিঃসন্দেহ সেই পাতালপুরীর গোলক-ধাঁধায় পথ হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার পর হইতে সরকারের আদেশে আর কেহ সে গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত ধনের অধিকারী হইতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অগাধ ঐশ্বর্য্য ঐ স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং হয় ত কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কোন দিন তাহার একছত্র অধীশ্বর হইয়া জগতের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

কলম্বিয়াতে গেটেভিটা নামক একটী হ্রদ আছে। আদিম অধিবাসীদিগের চক্ষে উহা পবিত্র। প্রবাদ, উহার অসীম সলিলরাশির মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিদ্যমান। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য বাকি যাহাতে বিজয়ী স্পেনবাসীগণের হস্তে না পড়ে এজন্য তদানীন্তন অধিবাসীরা ঐ হ্রদ মধ্যে নিক্ষেপ করে। যে সকল স্থানে জল কম তথা হইতে অনেক সময় নানারূপ দ্রব্যাদি পাওয়াও গিয়াছে। এ কারণে কতকটা নিঃসন্দেহ হইয়া স্পেনীয়গণ কয়েকবার হ্রদের জলরাশি বাষ্প সাহায্যে নিষ্কাশিত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রতিবারেই অকৃতকার্য্য হয়। হ্রদ মধ্যে প্রচুর সলিলোদ্গারী অসংখ্য ঝরণা আছে। যত বড় পাম্প লাগাইয়া যত জল নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে, তদপেক্ষা অনেক অধিক জল ঐ সকল ঝরণা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় হ্রদ পূর্ণ করে। কাজেই জল ছেঁচিয়া ফেলা দুঃসাধ্য বোধে তাহারা সে উদ্যম একেবারে ত্যাগ করিয়াছে।

ঐ হ্রদ মধ্যে এইরূপ অসম্ভাবিত ঐশ্বর্য্যের সমাবেশের একটী কারণও পাওয়া যায়। শেষ ইঙ্কা আটাহুয়াল্‌পা স্পেনীয় আক্রমণকারীবর্গের সেনাপতি পিজারোর হস্তে বন্দী হইলে ইঙ্কা তাঁহার স্বাধীনতার বিনিময়ে পিজারোকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য উপঢৌকন দানের অঙ্গীকার করেন। তাহার পরিমাপ এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, যে ঘরে ইঙ্কা বন্দী অবস্থায় যাপন করিতেছিলেন, সেই ঘর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা পূর্ণ হইবে এবং তাহাদের উচ্চতা এরূপ হইবে যে, পিজারোর সৈন্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তি যেন উত্তোলিত হস্তে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা কোন রকমে তাহা স্পর্শ করিতে পারে। নানারূপ বাদে বোঝাই হইয়া ঐ সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য পিজারোর নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু পরিমধ্যে রক্ষীবর্গ যখন জানিতে পারিল যে পিজারোর আদেশ মত ইঙ্কাকে হত্যা করা হইয়াছে, তখনই তাহারা সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে যেখানে পারিল লুকাইয়া ফেলিল। তাহারই এক অংশ গেটেভিটা হ্রদ মধ্যে বিদ্যমান। বাকী অন্যান্য হ্রদমধ্যে ও নানাস্থানে পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। *

যে দেশে এত অধিক এবং এত অসংখ্য প্রকার ঐশ্বর্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত এবং যাহা যক্ষ বা প্রহরী বেষ্টিত না থাকিলেও এরূপ ভাবে অবস্থিত তাহাকে "যথের দেশ" না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে?

(বাঁশরী)

* The adventures of a Trophical Tramp by Mr. Harry L. Foster.

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

দরজীর খড়ি

এই কলিকাতা সহরে হাটে বাজারে এবং পথের ধারে এক শ্রেণীর লোক নানান রকম জিনিসের দোকান খুলিয়া বসে। সে দোকানগুলিকে ঠিক মনোহারী দোকান বলা চলে না; অথচ, অনেক রকম জিনিস তাহাদের কাছে পাওয়া যায়। দোকান দেওয়া ছাড়া তাহারা আর একটী কাজ করে; নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা স্ত্রীলোকদের রূপা ও কাঁসার গহনা তাহারা রঙ্গীন সুতা ও ঝুমকো দিয়া গাঁথিয়া দেয়। এই শ্রেণীর লোকদের বোধ হয় পাটোয়ার বলে। আমি এই পাটোয়ারদের দোকান হইতে একটী জিনিস কিনিয়া আনিয়াছি। জিনিসটির নাম দরজীর খড়ি। ইহার এক একখানির দাম চার পয়সা। সবুজ (ঠিক সবুজ নয়, বরং ফিকে নীল বলা চলে) রংয়ের জিনিসটি; ইহার ওজন চার পয়সা ও এক আনি। (প্রায় এক আউন্স) ত্রিকোণ (গোল ভাববুক্ত) আকারের জিনিসটি মাপে এক কোণ হইতে তাহার বিপরীত পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই ইঞ্চি। এই রকম চারখানি কি পাঁচখানি খড়ি উপরি-উপরি রাখিলে এক ইঞ্চি হইতে পারে।

জিনিসটি একটী ভদ্রলোকের হাতে দেখিয়া প্রথমে আমার কৌতূহল হয়। আমি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া, কাগজে ও কাপড়ে ঘষিয়া অনুমান করিলাম, ইহা দর্জিদের ব্যবহার্য্য খড়ির মত কোন জিনিস হইতে পারে। পরে জানিলাম, বস্তুতঃ উহা খড়িই, এবং পাটোয়ারদের দোকানে দর্জিদের খড়ি নামে উহা বিক্রীত হয়। তার পর ভাঙ্গিয়া দেখিলাম। এক কোণ একটী দেশালাইয়ের কাটি জ্বালিয়া পোড়াইয়া দেখিলাম। অবশেষে হাতের তালুতে একটু জল রাখিয়া সেই জলে জিনিসটি ঘষিয়া দেখিলাম, ইহা জলে গলিয়া যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইল, জিনিসটিতে খড়ির গুঁড়া একটুখানি নীল রং ও সামান্য একটু গঁদ আছে। এই জিনিস কয়টি প্রবল চাপে জমাট বাঁধাইয়া খড়ি তৈয়ার হইয়াছে।

জিনিসটি যদি বাস্তবিক খড়িই হয় (এবং আমার এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত খুব সম্ভব ভুল হইবে না), তাহা হইলে ইহার লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিলে মন্দ হয় না। বেণের দোকানে খড়ির খুচরা দর প্রতি সের চার পয়সা। পাইকারী দর আরও কম। দরজীর খড়ি এক একখানির ওজন চার পয়সা ও একটী এক আনি। অর্থাৎ প্রায় সওয়া দুই ভরি বা এক আউন্স। তাহা হইলে ফেলিয়া ছড়াইয়াও প্রতি সেরে ঐরূপ খড়ি ৩০।৩২ খানি হওয়া সম্ভব। ইহাতে যেটুকু রং ও গঁদ লাগিয়াছে, তাহা ধরিয়া প্রত্যেকখানি খড়ির পড়তা সিকি পয়সা ধরিলে অন্যায় হয় না। তার উপর মজুরী ও নির্ম্মাতার লভ্যাংশ আরও সিকি পয়সা ধরিলে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খরিদদার উহার জন্য আরও সাড়ে তিন পয়সা অর্থাৎ সাতগুণ বেশী দাম দিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার কারণ, উহা বিলাতী জিনিস (Made in England), সাহেবেরা উহা তৈয়ার করিয়াছে; জাহাজে চড়িয়া উহা এ দেশে আসিয়াছে, পাঁচ হাত ঘুরিয়াছে, অনেকে উহার ভিতর হইতে লাভ খাইয়াছে; তার পর উহা খরিদদারের হাতে আসিয়াছে। বিশেষতঃ, ঐ জিনিসটি এখানে তৈয়ার হয় না, এবং দেখিতেও সুন্দর; আর বোধ হয় দর্জিদের পক্ষে বেশ ব্যবহারোপযোগীও বটে। আপনারা দেখিতেছেন, কত সামান্য জিনিসের জন্য নিরুপায় আমরা কত বেশী পয়সা খরচ করিতে বাধ্য হইতেছি। অথচ, এই পয়সা আমাদের দেশেও থাকিতেছে না। উহার প্রায় সবটাই বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ সহস্র সহস্র তুচ্ছ জিনিস অগ্নিমূল্যে আমাদিগকে কিনিতে হইতেছে; আমাদের

দেশও সেইজন্য দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এই খড়িটি যদি দর্জিদের যথার্থই কাজে লাগে, তবে ইহা এখানে তৈয়ার করিয়া লইলেই ত হয়। কেহ ইহা তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিবেন কি ?

বাজারে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, এ রকম হাজার হাজার তুচ্ছ জিনিস পাইবেন, যাহা না হইলে আমাদের দিন চলে না, অথচ যাহা এখানে তৈয়ার করাও তেমন কঠিন নয়,—একটু চেষ্টা করিলেই আমরা তাহা নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। এই রকম এক একটী জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভাবিয়া দেখুন, কেমন করিয়া, কি প্রণালীতে, কোন্ কোন্ উপাদানে সেই জিনিসটি তৈয়ার হওয়া সম্ভব। জিনিসটিকে ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, গুঁড়াইয়া, নানা রকমে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, রাসায়নিক ভাবে বিশ্লেষণ করাইয়া উহাদের উপাদানের সন্ধান লইবার চেষ্টা করুন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত প্রণালীর কথাও ভাবিয়া দেখুন, যদি কোন উপায় বাহির করিতে পারেন। এ চেষ্টা, এ ভাবনা, এ পরীক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইবে না; একটা না একটা লাগিয়া যাইবেই। একশোটা নিষ্ফল পরীক্ষার পর অন্ততঃ পাঁচটাতে কৃতকার্য্য হইবেনই। এরূপ চিন্তাশীলতা ও পরীক্ষার ফলে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটিবে। পরের জিনিসটিকে আয়ত্ত করিতে না পারেন, আপনি নিজেই একটা না একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন।

চাবি

বাক্স, তোরঙ্গ, সিন্ধুকের কল, তালার চাবি হারাইয়া গেলে আপনারা যাহাদের কাছে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া লন, সে চাবি মেরামতের কাজটা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি ? চাবিওয়ালা আপনার তালা বা কলটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তাহার অসংখ্য চাবির ভিতর হইতে একটী বা দুইটী চাবি বাছিয়া বাহির করিয়া লয়, এবং লেভারের সংখ্যা ও মাপ আন্দাজ করিয়া তাহার প্রয়োজনানুসারে চাবিটী মাজিয়া ঘষিয়া খাঁজ কাটিয়া কল তালার উপযোগী চাবিটী তৈয়ার করিয়া দেয়। তাহারা যে সকল চাবি ব্যবহার করে, তাহা খুব সম্ভব বিদেশ হইতে আমদানী; এখানে কোথাও চাবি তৈয়ার হয় কি না, জানি না। অবশ্য তালা ও কল তৈয়ার করিবার জন্য ভারতবর্ষে কয়েকটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আপনারা জানেন, এবং সেখানে যে সব কল বা তালা তৈয়ার হয়, তদুপযোগী চাবিও তৈয়ার হয়, তাহাও জানা কথা। কিন্তু, কেবল কল তালা মেরামত করিবার জন্য শুধু চাবি প্রস্তুত করিবার কোন বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত এখানে হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

চাবি দুই ধরণের হইয়া থাকে। এক তালা বা কল তৈয়ার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তাহাদের উপযোগী চাবি তৈয়ার করা হয়; আর, মেরামতের জন্য শুধু চাবিও তৈয়ার হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চাবিতে খাঁজ কাটা থাকে না। প্লেন চাবি তৈয়ার হয়। চাবিওয়ালারা যে কল বা তালা মেরামত করিবার জন্য পায়, প্লেন চাবিতে খাঁজ কাটিয়া দিয়া তাহার উপযোগী চাবি তৈয়ার করিয়া দেয়। তবে যে চাবিওয়ালাদের কাছে খাঁজওয়ালা চাবি পাওয়া যায়, সে পুরাতন কল বা তালার হারানো চাবি। এই সকল চাবি নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়া তাহাদের হস্তগত হয়। নচেৎ, মেরামতের জন্য কারখানায় প্লেন চাবিই (অবশ্য নানা আকারের ও মাপের) তৈয়ার হইয়া থাকে। আমি এই শ্রেণীর প্লেন চাবি তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

এইরূপ চাবি তৈয়ার করিবার কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, যে সকল তালা চাবির কারখানা আছে, তাহাদের কোনটিতে কিছু দিন শিক্ষানবীশী করিলে ভাল হয়। আপনার কেবল প্লেন চাবি তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে, কারখানাওয়ালারা বোধ হয় আপনাকে শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না; কারণ, ইহাতে আপনার সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

বোধ হয় একটী ছোটখাট ঢালাইয়ের কারখানা করিলেই চাবি তৈয়ার করা যাইতে পারিবে। লোহা ঢালাইয়ের অনেক কারখানাই এ দেশে রহিয়াছে; তাহাতে অনেক বড় বড় জিনিস ঢালাই হইয়া থাকে। সুতরাং চাবির ন্যায় ছোটখাট জিনিস ঢালাই করিবার কারখানা স্থাপন

করিতে বোধ হয় খুব বেগ পাইতে হইবে না। বলা বাহুল্য, এই কারখানার ক্রমোন্নতি হইয়া, পরে ইহা খুব বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হইতে পারে।

চাবি-তালার কথার আর একটী কথা মনে পড়িতেছে। আজকাল জার্ম্মানীতে ও আমেরিকাতে দিন দিন নূতন ধরণের কল, তালা ও চাবি তৈয়ার হইতেছে। এই সকল চাবিতালা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং প্রায়ই স্প্রিং যুক্ত। জার্ম্মাণ তালাগুলি কিছু সূক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর তালা তেমন মজবুত হয় বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, সস্তা ও দেখিতে সুদৃশ্য বলিয়া বাজারে ইহাদের আদর খুব। আমাদের দেশে এখনও সেই পুরাতন ধরণের তালা চাবিই তৈয়ার হইতেছে। আমার মনে হয়, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য আমাদিগকেও বৈজ্ঞানিক ধরণের তালা চাবি তৈয়ার করিতে হইবে

সেলুলয়েড

যাঁহারা শিল্প-চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটির নাম শুনিয়া থাকিবেন। বাজারে বিক্রয়ের জন্য সেলুলয়েড এখানে তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না, সে খবর এখনও পাই নাই। একবার এ দেশে সেলুলয়েড তৈয়ারী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। একটী ছোট কারখানা গড়িয়া সেলুলয়েডের চিরুণী নাকি তৈয়ার হইতেছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছিল। তার পর কতদূর কি হইল, তাহা শুনি নাই। কারখানা কিম্বা চিরুণী দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই। সেলুলয়েড তৈয়ার করিতে আমি আপনাদের পরামর্শ দিই না। কারণ, উহা তৈয়ার করিতে হইলে উচ্চাঙ্গের ফলিত রসায়ন অধ্যয়ন করিয়া কোন বিদেশী কারখানায় কিছু দিন হাতে হেতেরে কাজ না করিলে ইহা প্রস্তুত করা চলে না। আর, সেলুলয়েড স্বয়ং তাদৃশ বিপজ্জনক না হইলেও, কারখানায় যে প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা তাদৃশ নিরাপদ নহে। খুব সাবধান না হইলে, এবং রীতিমত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিলে, হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। তা ছাড়া, ছোটখাট কারখানা তৈয়ার করিয়া সেলুলয়েড প্রস্তুত করিয়া লাভ নাই। প্রথমেই জাপান, ইয়োরোপ প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, খরচা পোষাইবে না। প্রচুর মূলধনে বড় কারখানা করিয়া জাপান ইয়োরোপে সুশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে সেলুলয়েড প্রস্তুত করা চলিতে পারে। এখন সেলুলয়েড জিনিসটা কি এবং তাহার ব্যবহার মোটামুটি জানিয়া রাখুন। আমাদের দেশে সেলুলয়েডের সমস্ত উপকরণই আছে; বড় কারখানা বেশ খোলা চলিতে পারে। এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলয়েড প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহা হইতে অনেক জিনিস তৈয়ার হইতে পারিবে। সেলুলয়েড হইতে নকল হাতীর দাঁতের মত সকল জিনিস তৈয়ার করা যায়। ছুরি, ক্ষুর, ছাতা প্রভৃতির বাঁট, ছড়ি, চিরুণী, বিবিধ খেলানা সেলুলয়েড হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। জাপানী সেলুলয়েডের খেলানার বাঙ্গালার বাজার ছাইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইতেছেন কি ?

সেলুলয়েড জিনিসটি কি ?

সেলুলয়েড জিনিসটি সেলুলোজ নামক পদার্থ হইতে উৎপন্ন। উহার রাসায়নিক গঠন $C_6H_{10}O_{15}$; অর্থাৎ সেলুলোজ বিশ্লেষণ করিলে ৬ ভাগ কার্ব্বণ, ১০ ভাগ হাইড্রোজন ও ৫ ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়। সেলুলোজ উদ্ভিজ্জ পদার্থ; উদ্ভিদের একটী প্রধান উপাদান সেলুলোজ (cellulose); যেমন তুলা। ইহা প্রায় বিশুদ্ধ cellulose, কেবল সামান্য পরিমাণে ধাতব পদার্থ ইহাতে আছে। Linen, hemp, কাগজ প্রভৃতিও সেলুলোজ। এই সব জিনিস আগুনে পোড়াইলে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ধাতব পদার্থ, তাহা পোড়ে না; আর সেলুলোজটুকু পুড়িয়া উড়িয়া যায়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সেলুলোজ দরকার হইলে তুলা প্রভৃতিকে hydrofluoric acidএ পোড়াইয়া লইতে হয়। তাহা হইলে ধাতব পদার্থগুলি পুড়িয়া যায়, আর বিশুদ্ধ সেলুলোজ বাকী থাকে।

Cotton wool (পেঁজা, বীজশূন্য তুলা) তিন ভাগ fuming nitric acid ও এক ভাগ তীব্র গন্ধক দ্রাবকের (strong sulphuric acid) মিশ্রণে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে, তুলার একটা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। এই তুলা ধুইয়া ধুইয়া এসিডশূন্য করিলে এবং শুষ্ক করিয়া লইলে gun cotton নামক অতীব তীব্র দাহ্য পদার্থে পরিণত

হয়। এই gun cotton এর সহিত কর্পূর মিশাইয়া এবং আরও কোন কোন জিনিস যোগ করিয়া celluloid বা xylonite তৈয়ার হয়। এই জিনিসটির আমাদের বড় দরকার।

সেলুলয়েডের গুণাগুণ

সেলুলয়েডের বর্ণ নাই বলিলেই চলে। পাতলা সেলুলয়েড কাচের মত স্বচ্ছ। নমনীয়; মচকায় তবু ভাঙ্গে না। ইহা সহজে না ভাঙ্গা গেলেও, কাঁচি দিয়া কাগজের মত বেশ সহজে কাটা যায়। খাঁটি সেলুলয়েড কি না তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, উহার উপর আঙ্গুল দিয়া ঘষিলে কর্পূরের গন্ধ বাহির হয়। অল্প তাপ (১২৫) দিলে ইহা নরম হইয়া যায়; তখন ইহার দ্বারা ছাঁচে নানা জিনিস গড়া যায়, কিম্বা যে কোন আকারে পরিণত করা যায়। বেশী তাপে ইহার অধিকাংশ বায়বীয় আকার ধারণ করে। গরম জলে দিয়া নরম করিয়া লইলেও ইহার দ্বারা নানা আকারের অনেক জিনিস গড়া যায়। আগুনের তাপে নরম করা অপেক্ষা গরম জলে নরম করাই সুবিধা; কেন না, সেলুলয়েড জলে গলিয়া যায় না, ইহার একটুও লোকসান হয় না, অথচ সব রকম আকারের জিনিসই ইহার দ্বারা তৈয়ার করা যাইতে পারে। অগ্নিশিখার উপর সেলুলয়েড ধরিলে উহা জ্বলিতে থাকে, খুব ধোঁয়া হয় ও কর্পূরের গন্ধ বাহির হয়। সেলুলয়েড গান্-কটন হইতে তৈয়ার হয় বটে, গান্-কটন খুব বিস্ফোরক পদার্থ বটে, কর্পূরও খুব দাহ্য পদার্থ বটে, কিন্তু সেলুলয়েড নিজে বিস্ফোরক নয়; কেবল আগুনের শিখায় ধরিলেই উহা জ্বলিতে পারে; আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিবার ভয় নাই। বেশী তাপ দিলে উহার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া ধোঁয়া হইয়া যায়। সেলুলয়েড জলে গলিয়া যায় না, কিন্তু ঘনীভূত গন্ধক দ্রাবক, ঘনীভূত নাইট্রিক এসিডে, ও ফুটন্ত কষ্টিক পটাশে দ্রব হয়। Acetone, Sulphuric ether alcohol, তারপিন তৈল, benzine, amyl acetate প্রভৃতিও সেলুলয়েডকে গলাইতে পারে।

এই সেলুলয়েডের প্রসঙ্গে এখানে একটা অবান্তর কথা কহিতে হইতেছে। জাপান হইতে আমদানী সেলুলয়েডের খেলানার এ দেশের বাজার ছাইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে খেলানাগুলি দেখিতে এত সুন্দর যে, ছেলেরা একবার তাহা দেখিলে না কিনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। এই শিল্পটির সম্বন্ধে জাপান বোধ হয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ, এই ধরণের পুতুল ও খেলানা জাপান হইতে ইয়োরোপ, আমেরিকাতেও রপ্তানী হয়। সেজন্য সেখানকার শিল্পীরা ও ব্যবসায়ীরা চটিয়া লাল হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। কারণ, জাপানী সেলুলয়েডের (শুধু সেলুলয়েড কেন, অন্যান্য জিনিসেরও পুতুল ও খেলানার সম্বন্ধে জাপান খুব উন্নতিলাভ করিয়াছেন; সেই সব রকম খেলানাই জাপান হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী হয়; সেখানে তাহাদের আদর ও কাট্‌তি খুব।) পুতুল খেলানা অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া ছেলে-মেয়েরা মুগ্ধ হয়; কাজেই দেশীয় খেলানা বেশী বিক্রী হয় না।

জাপান যে এই শিল্পে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ, ইহার উপকরণগুলি জাপানেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কর্পূর ত জাপানের নিজস্ব জিনিস বলিলেই হয়। আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, প্রত্যেক দেশেই সেই দেশজাত কাঁচামালই প্রধানতঃ সেই দেশের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, এবং সেই সেই দেশীয় শিল্পকে বিশেষত্ব প্রদান করে। জাপানে বনজঙ্গলের অভাব নাই; সেলুলোজ সেখানে প্রচুর। আর কর্পূর জাপানের নিজস্ব—আমাদের বাঙ্গালা দেশের যেমন পাট, জাপানের কর্পূরও তেমনি;—কাজেই স্বদেশজাত কাঁচা মালের সুবিধা পাইয়া জাপান এই শিল্পে এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে আমি বলিয়াছি যে, সেলুলয়েডের কারখানা গড়িবার পক্ষে আমাদের দেশেও বিলক্ষণ সুবিধা আছে। আপনারা বলিবেন, কর্পূর আমাদের দেশের জিনিস নয়, আমরা কিরূপে সেলুলয়েডের কারখানা গড়িব? সেলুলয়েডের প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাবলীর আরও একটু পরিচয় লইলে আপনারা তাহার উত্তর পাইবেন।

সেলুলয়েডের অন্যান্য উপকরণ

সেলুলয়েড কেবল জাপান নয়, অন্যান্য দেশেও প্রস্তুত হয়। যে দেশে কর্পূর উৎপন্ন হয় না, সে দেশেও সেলুলয়েড তৈয়ার হয়। কেমন করিয়া হয়? না, কর্পূরের বদলে অন্য জিনিস ব্যবহার করিয়া। ফ্রান্স দেশে কর্পূর বাদ দিয়া ন্যাপথলিন যোগ করিয়া নাইট্রো-সেলুলোজ

হইতে সেলুলয়েড প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুত-প্রণালী অবশ্য ফরাসীরা গোপনে রাখিয়াছেন। তবে যতদূর জানিতে পারা যায়, ১০০০ ভাগ নাইট্রোসেলুলোজ, ৬০০ ভাগ এলকোহল, ৩০০ ভাগ এসেটোন ও ১০০ ভাগ ন্যাপথালিনের মিশ্রণে ফরাসী সেলুলয়েড তৈয়ার হয়। কর্পূর খুব দামী জিনিস; ন্যাপথালিনের দাম কর্পূরের অপেক্ষা অনেক কম। ফরাসী প্রথায় সেলুলয়েড প্রস্তুত করিতে পড়তা অনেক কম পড়ে। তবে ইহাতে ন্যাপথালিনের দুর্গন্ধ কিছু থাকিয়া যায়। সেলুলয়েড তৈয়ার হইয়া গেলে কিছু দিন তাহা হাওয়ায় রাখিয়া দিলে, উদ্বায়ী ন্যাপথালিনের গন্ধ অনেকটা উড়িয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, কর্পূর যুক্ত সেলুলয়েডের অপেক্ষা ন্যাপথালিন যুক্ত সেলুলয়েড গুণে কিছু নিকৃষ্ট। তথাপি, ইহাতে কাজ বেশ চলে। এই সকল মশলা ছাড়া অন্য মশলা দ্বারাও সেলুলয়েড প্রস্তুত হইতে পারে।

এখন দেখুন, বড় আকারের সেলুলয়েডের কারখানা খুলিতে পারা যায় কি না। সেলুলোজ অর্থাৎ তুলা আমাদের দেশের স্বভাবজাত জিনিস। এলকোহলের কারখানাও এদেশে আছে। বাঙ্গলায় কয়লার খনি আছে; সেই কয়লা হইতে আলকাতরা, এবং আলকাতরা চুয়াইয়া ন্যাপথালিন প্রস্তুত হইতে পারে। তবে কেন এখানে সেলুলয়েডের কারখানা হইতে পারিবে না? এখন, আপনারা যদি একটী লিমিটেড কোম্পানী গড়িয়া বড় রকমের একটী সেলুলয়েডের কারখানা স্থাপন করিতে পারেন, এবং উপযুক্ত লোকের সাহায্যে সস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলয়েড তৈয়ার করাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই সেলুলয়েড হইতে নানাবিধ নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে। বড় কারখানায় সেলুলয়েড তৈয়ার হইলে, সেই সেলুলয়েডের সাহায্যে গৃহশিল্পের হিসাবে অনেক ছোট ছোট কারখানা চলিতে পারিবে, বহু বেকার লোকের তাহাতে অন্ন সংস্থানের উপায় হইবে।

সেলুলয়েড সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

সেলুলয়েডের নিজের কোন বর্ণ নাই, উহা জলের মত বর্ণহীন। কিন্তু ইহাতে নানা রকম রং মিশাইয়া ইহাকে রঞ্জিত করিতে পারা যায়। কাগজের মত ইহাতে হরপ, ছবি প্রভৃতি ছাপা যায়। সেলুলয়েড প্রায় কাগজের মত পাতলা অবস্থায় পাওয়া যায়। দুই চারিখানি এই রকম পাতলা সেলুলয়েড ঈষৎ গরম করিয়া উপরি উপরি রাখিয়া প্রবল চাপ দিলে উহা জুড়িয়া দিয়া কঠিন পুরু দৃঢ় পাতে প্রস্তুত হয়। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে পড়িলে সেলুলয়েড সৌখিন শিল্পে যুগান্তর ঘটাইতে পারে।

মৈত্রেয়ী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।
—উপনিষৎ।

বানপ্রস্থ লিপ্সু স্বামী পত্নীদ্বয়ে তাঁর
আহ্বানি দিলেন বিত্ত বিভাগ করিয়া,
গো, গৃহ পাত্র বা শস্য ধন-রত্ন ভার;
হে মৈত্রেয়ি! তুমি দেবি লহনি বরিয়া।
জ্ঞানের আধার স্বামী ঋষিকুলরাজ,
অমরত্ব-জ্ঞান যাঁর ভারত-বিদিত,
যোগ্যা পত্নী তাঁর তুমি, তাই পেলে লাজ
লইতে নশ্বর বিত্ত;—হয়ে ক্ষুব্ধ চিত
বলেছিলে দীপ্ত তেজে ঋষি-পতি পাশ,
"অমরত্ব যাহে নাই সেই বিত্ত লয়ে,
কি করিব আমি? স্বামি! করহ প্রকাশ
সেই বিত্ত, যাহা রবে চির নিত্য হয়ে।"
কোন্ দেশে কোন্ নারী কহ পতি কাছে,
হেন অভিনব বিত্ত কবে প্রার্থিয়াছে!

ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষা

শ্রীরামানুজ কর

ভারতবর্ষের পরিমাণফল ১৮০৫৩০২ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৩১৮৯৪২৪৮০। ২৫৭টী ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে ভারতীয় ভাষা ২২৮, এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশের ভাষা ১১ এবং ইয়োরোপীয় ভাষা ১৮। কোন্ ভাষায় কত লোক কথা কয়, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

হিন্দি-উর্দ্দু	৯৬৭১৪৩৬৯
বাঙ্গালা	৪৯২৯৪০৯৯
তেলগু	২৩৬০১৪৯২
মারাট্টি	১৮৭৯৭৮৩১
তামিল	১৮৭৭৯৫৭৬
পাঞ্জাবী	১৬২৩৩৫৭৭
রাজস্থানী	১২৬৮০৫৬২
ক্যানায়ীজ	১০৩৭৪২০৪
উড়িয়া	১০১৪৩১৬৫
গুজরাটী	৯৫৫১৯৯২
বামিজ	৮৪২৩২৫৬
মালয়ালম	৭৪৯৭৬৩৮
পশ্চিম পাঞ্জাবী	৫৬৫২২৬৪
খেরয়ারী	৩৫০৩২১৫
সিল্পি	৩৩৭১৭০৪
ভিল্লী	১৮৫৫৬১৭
আসামী	১৭২৭৩২৮
পশ্চিম পাহাড়ী	১৬৩৩৯১৫
গন্দ	১১১৬৯১১
পস্তু	১৪৯৬২৬৭
পূর্ব্ব হিন্দী	১৩৯৯৫২৮
কাশ্মীরী	১২৬২৯৫৯
উরাঁও	৮৬৬০৬৬
তুলু	৫৯২৩২৫
বেলুচী	৪৮৫৪০৮
কন্ধ	৪৮৩৬৬৮
শাঙ্গালী	৪৭৪৮৭৮
শ	৩৬৮২৮২
পো	৩৫২৪৬৬
মণিপুরী	৩৪২৬৪৫
শান	৩২৬৫৭৫
ইংরাজি	৩০৮০৭১
আরাকানী	৩০৪৫৪৯
নেপালী	২৭৯৯৭৮
বদো	২৭১৬১২
ইয়াম্বী	২৫০৬১৮
ভুটীয়া	২৩১৮৮৫
গারো	২১৬১১৭
খান্দেশী	২১৩২৭২
টীং খু	২১০৫৩৪
খাসি	২০৪১০৩
পেওয়ান	১৮৯২৬৩
ব্রাহণী	১৮৪৩৬৮
সভার	১৬৮৪৪১
মং	১৬৩৭২০
কাচীন	১৫০৮৯৩
খেড়িয়া	১৩৭৪৭৬
টীভয়ান	১৩১৭৪৮
চীনা	১২৭৫২৭
কুর্কু	১২০৮৯৩
পালং	১১৭৭৭৩
চীন	১১০৭৮২
মিকির	১০৯১২৩
কারু	৯৮৭২৩
লুসাই	৭৭১৮০
	৭২৯২৫
মাল	৬২৯৬৩
চং	৬৫২৮৯
রামলিংদার	৫৬৩৪২
ইন্থা	৫৫০০৭
নাগা	৪৩০৫০
আবাহী	৪২৭২৯
কুর্গী	৩৯৯৯৫
যুমী	৩৮৫১২
শেমানাগা	৩৪৮৮৩
কারেমী	৩৪৪৮৮
আখা	৩৪২৬৫

জাংশীন	৩৩২৫৮
খুন	৩২১০
গদাবা	৩৩০৬৬
আওনাগা	৩০১৪২
শিনা	২৮৪৮২
থবী	২৭৩ ৬
লু	২৬১০৮
ভুঁকী	২৫০৫২
টীং খুল নাগা	২৪১৭০
কলাই	২৩৯৮৯
মান টায়ফ	২৩৪৭৩
লাহু	২২৭৪২
লাই	২২৬৬৮
লড়া	২২৫৯৫
অশ্রেণীভুক্ত নাগা	২২৪৪১
টিঙ্গীয়ো	২২৩৩২
নাশীয়ান	২২১৯১
মুলতানী	২২০৯৮
পোক্তী	২১৯ ৯
বারু	২০৫৭৭
লেপ্চা	২০৫৬৯
নগাই	২০৫৩৬
কাদু	১৮৫৯৪
লাটানাগা	১৮৪১২
শাগুই	১৮০৭৪
লাশী	১৬৫৭০
কোচ	১৬১৬৫
কালুলনাগা	১৫৬৪৭
জিপশী	১৪৯৩১
ম্রো	১৪৩২৪
পাদং	১৩৭৪৩
ওয়া	১৩৬৪৮
আবোমিনি	১৩৩১৭
লিস্তু	১৩১৫২
মোপিওয়া নাগা	১৩০৯৬
রিসজ্জ	১২৮৫৮
কারুংবী	১১১৬০
দিনাশা	১১১৪০
বুই	১০৬২৭
জুয়াং	১০৫৩১
পৈচী	১০৪৬০
লালুং	১০৩৮৩
নেওয়াই	১০১৩৪
ইপু	১০০৪৫

যে সকল ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫ হাজার হইতে দশ হাজারের মধ্যে, সেরূপ ভাষার সংখ্যা ২৫। ৫ হাজারের কম লোক যে সকল ভাষার কথা কয়, সেরূপ লোকের সংখ্যা ভারতীয় ১২০৮৭০, এশিয়াটীক ১৩৩৮৩, ইয়োরোপীয়। ১১০৪১ বাংলাদেশে ১৭৭৫৮৯৮ জন হিন্দি ভাষায়, ২৯৩৭০০ জন উড়িয়া ভাষার কথা বলে। ব্রহ্মদেশ ৩০১০৩৯, বিহার ও উড়িষ্যার ১৫৬৮১৩৮, আসামে ৩৫২৫২২০, বিহার উড়িষ্যা করদ রাজ্যে ৮৮৮৫২ জন বাংলা ভাষায় কথা বলে।

আকাঙ্ক্ষা

কুমারী দাস

লয়ে সুবর্ণের সল্‌মা চুম্‌কি
বসাব অনেক যত্নে,
নিবিড় আঁধার ঘুচাতে প্রসূণে
স্থাপিব বহুল-রত্নে।
দূরিয়া তমসা ভরিয়া বসুধা
ছড়াবে আলোক-দীপ্তি,
অলস মদির আবেশে কাটিবে,
পলাবে সুদূরে সুপ্তি।
দূর হয়ে যাবে যত ব্যাধি জরা
মহেশ-আশীষ বরে,
শান্তি বিরাম লভিবে হৃদয়
দান-ডালা ধরি করে।
নীলাচল তুলি চাঁদোয়া গড়িব
স্নেহ-সমীরণ সনে,
শ্যাম তৃণাসনে বসা'য়ে তুষিব
শ্রান্তকে জীবন দানে।
চারু চন্দ্রাননে তৃপ্ত-প্রীত-হাস,
পদ্ম আঁখে কৃতজ্ঞতা,
নেহারিব যবে তাহাদের মাঝে,
পাব সুখ, গরবতা।
কোন মাতা দেখে ভাবিবে না তার
জীবন সফল হ'ল
শত সন্তানে শীতাংশু-উজল
সুদীপ্ত ভানুতে বলো!
হবে কি ভবেশ! সেদিন কখনো
ঘরে ঘরে হেন মাতা,
পূরিবে কি মোর বাসনার ডালি
তব কৃপা-ফুলে পিতা!

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৪)

চাঁদনীগঞ্জের প্রান্তে মুস্তাফা মিঞার সরাইখানা দিল্লীর সবাই জানে। মুস্তাফার হাতের কাবাব ও তাহার সুন্দর ভুঁড়ি সহরের মধ্যে প্রসিদ্ধ। দিল্লীতে কোন বিদেশী আসিলে, এই অপরিচিত স্থানে এই সরাইখানায় নির্ভয়ে গিয়া উঠে। মুস্তাফা শুধু সরাইরক্ষক নয়, গুণ্ডাদলের সর্দ্দার বলিয়াও তাহার এক খ্যাতি আছে; তাহার আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলে কোন ভয় নাই। শুধু ভাল খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থার জন্য নয়, সরাইখানার সহিত এক মদের দোকান এবং নাচ ও গানের সুন্দর ঘর থাকাতে, মুস্তাফার দোকান দিল্লীর সবাইয়ের প্রিয়।

এই সরাইখানার দোতোলার একটি ছোট ঘরে একটি তরুণ বাঙ্গালী যুবক কয়েক দিন হইল দিল্লীতে আসিয়া জ্বরে পড়িয়া আছে। এই মহা দিল্লী নগরীতে পৃথিবী ও ভারতের নানা সুদূর দেশ হইতে নানা জাতির লোক অর্থ ও মানের সন্ধানে, আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লুব্ধ হইয়া আসে। শুধু এসিয়ার নয়, ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে কত বণিক, কত সৈনিক, কত গৃহহারা দুর্ভাগা এই এই স্বর্ণভূমি ভারতের স্বর্ণলঙ্কায় কত সৌভাগ্যের স্বপ্নজাল বুনিয়া আসিতেছে। এ বাঙ্গালী যুবক তাহাদের মত অর্থ বা শক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া আসে নাই;—এ পথিক, ভারত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীর ফটক দিয়া ঢুকিতেই, তাহাকে বিদেশী বুঝিয়া, মুস্তাফার একটি চর তাহার সহিত আলাপ করিয়া, মুস্তাফার সরাইখানায় লইয়া আসিয়াছিল। হিন্দু হইলেও মুসলমানের বাড়ীতে থাকিতে তাহার কোন আপত্তি হইল না। শুধু মুস্তাফার সহাস্য অভ্যর্থনা, বিনীত ব্যবহারে ও রান্নাঘর হইতে সুমিষ্ট গন্ধে মুগ্ধ হইয়া নয়, লৌকিক আচার ও ধর্ম্মতত্ত্বের ওপর তাহার কোন বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই সে মুসলমানের সরাইখানায় আসিয়া উঠিল। তাহার সাজসজ্জাও অনেকটা মুসলমানী ছিল।

বয়স তাহার চব্বিশের বেশী নয়; কিন্তু এই বয়সেই তাহার জীবনের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে। ভোগের পাত্র ভরিয়া সে জীবনের সুখসুধা নিঃশেষে পান করিয়াছে। এখন বৈশাখের খররবি-দীপ্ত মধ্যাহ্ন-আকাশের মত তৃষ্ণার জ্বালা জাগিয়া রহিয়াছে, ভাদ্রের ভরা নদীর মত তৃপ্তি নাই। মদ, নারী ও সঙ্গীত, এই তাহার জীবনের তিনটী ক্ষুধা; এই তিন জ্বালাময় পথে সে তাহার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, অসীম যৌবন-শক্তি ও সুন্দর রূপ উজাড় করিয়া দিয়াছে। প্রথম যৌবনের ফাল্গুনে ভোগের হাস্য-উৎসবে দেউলিয়া হইয়া, শুধু শুষ্কনদীর তৃষ্ণা ও রাপাতার দীর্ঘশ্বাস বক্ষে বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জ্বরের ঘোরে মনের এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মন ঊর্ণনাভের মত আপন উন্মত্ত কল্পনার তন্তুজালে অসংলগ্ন, অদ্ভুত, বিচিত্র, রঙীন জগৎ সৃষ্টি করে। তখন সেই স্বপ্নের জগৎকে সত্য ও সত্যের জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। রাজশেখর জ্বরের ঘোরে চক্ষু বুজিয়া, আপন মনের বাসনার রঙীন জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে দেখিতেছিল,—বসন্তের রঙীন পুষ্পবন, চারিদিকে সুন্দরী অপ্সরীর দল, কেহ নাচিতেছে, কেহ পুষ্প-দোলায় দুলিতেছে, কেহ কত রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। কিন্তু সে যে সুন্দরীকে ধরিতে যায়, সে মোহিনী মরীচিকার মত দূরে সরিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়। অনেক ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া সে একটী তরুণীকে ধরিল। সরাবের রংএর ওড়না ধরিয়া, তারার মত তাহার চোখের দিকে চাহিয়া, অধরের কাছে অধর লইয়া গেল। অমনি সে শূন্যে কোথায় হারাইয়া গেল। চিরতৃষিত ওষ্ঠ-প্রান্তে আসিয়া মদের পেয়ালা টুটিয়া খান খান হইয়া গেল,—শুধু ব্যঙ্গ আর জ্বালা! ওঃ, বলিয়া ছটফট করিয়া উঠিয়া রাজশেখর চোখ মেলিয়া শূন্য ঘরের দিকে মাতালের মত চাহিল। সন্ধ্যার আলো মুমূর্ষু পাখীর চোখের মত জানালা দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া

আছে, ঘরের কোণে অন্ধকারে খাটিয়াটা একটা জন্তুর কঙ্কালের মত শুষ্ক হইয়া দাঁড়াইয়া। এই খাটিয়ায় সে প্রথম রাত্রি আসিয়া শুইয়াছিল। কিন্তু ভয়ানক ছারপোকা থাকায় টান মারিয়া ফেলিয়া মেজেতে শুইয়াছে। উঃ, তৃষ্ণায় বুক জ্বলিয়া যাইতেছে। রাজশেখর ক্ষুব্ধ স্বরে ডাকিল—কে? কোন হ্যায়? ভৃত্য ইস্মাইল ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে ঘোলা চোখে চাহিয়া রাজশেখর বলিল—মদ, মদ লেয়াও, উঃ! ইস্মাইল জানাইল, তাহাকে মদ দিতে বারণ আছে। বারণ! শেখর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইস্মাইল তাহাকে জলের পাত্র দিলে সে সেটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল,—জল নয়, মদ চাই। ইস্মাইল জানাইল, তাহা অসম্ভব। মুস্তাফা মিঞা তাহাকে মদ দিতে সবাইকে নিষেধ করিয়া মানা করিয়া দিয়াছেন। এ মুস্তাফা মিঞার সরাইখানায় যে আসে, তিনি তার অভিভাবক বলিয়া আপনাকে মনে করেন,—তাহার কোন ক্ষতি করিতে দেবেন না। ক্রুদ্ধ স্বরে শেখর বলিল—ভাগো! কিন্তু ইস্মাইল ঘর হইতে বাহির হইতে, আবার তাহার ডাক পড়িল। ইস্মাইল আবার আসিলে, শেখর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পাশের ঘরে অলিভার সাহেব আছে কি না। যদি থাকে, তাহার কাছে ভাল মদ আছে। এই অলিভার একটি ফরাসী জেনারেল,—সাহসী, সুন্দর, সুপুরুষ। ভারতের অবস্থার কথা শুনিয়া ধনরত্নের আশায় স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইস্মাইল জানাইল, অলিভার সাহেব ঘরে নাই; দোকানে একটি বাইজী বিক্রি হইতেছে, তাহাই দেখিতে গিয়াছে। জাহান্নামে যাও, বলিয়া শেখর ইস্মাইলকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিল। সন্ধ্যার আলো শুকনো ফুলের মত কালো হইয়া আসিতেছে। শেখরের মন বড় উদাস হইয়া গেল। এই অজানা বিদেশে একা আত্মীয়-বন্ধুহীন, রোগ-শয্যায় শুইয়া আছে। কেহ স্নেহ করিবার, কেহ সেবা করিবার নাই। কেবল এ জন্য নহে,—তাহার মনে হইল, পৃথিবী একটা ছায়াবাজী, এ জীবন একটা দুঃস্বপ্ন, মদ ও নারী লইয়া সে দুঃখ ভুলিতে, আপনাকে ভোলাইতে চাহিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। হায়, একটুকু প্রেম, একটুকু শান্তি সে কোথায় পাইবে? তাহার দেহ জ্বলিতেছে, মন জ্বলিতেছে। তাহার মা নাই, বাবা নাই, ভাই নাই, বোন নাই, আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই। উল্কার মত সে আপন কামনার আগুনে জ্বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,—এ যাত্রা শেষ হোক।

টলিতে টলিতে শেখর বিছানা হইতে উঠিয়া জানালায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘর হইতে মাংস রান্নার সুমিষ্ট গন্ধ, পোলাওর গন্ধ আসিতেছে। নাচগানের ঘর হইতে হাসির ধ্বনি, গানের সুর, সারঙ্গের ঝঙ্কার আসিতেছে, কি একটা ফুলের তীব্র গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। পথে লোকেরা উন্মত্তের মত অট্টহাস্য করিতে করিতে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এই হাস্য-গীত-মুখর পুষ্প-গন্ধময় ছায়াবাজীর জগৎ তাহার কাছে বড় শূন্য, বড় করুণ বোধ হইল। ধীরে সে আবার শয্যায় আসিয়া শুইল।

সহসা মধুর নূপুর-ঝঙ্কারে সে চমকিয়া উঠিল, আবার বিছানা ছাড়িয়া পথের দিকে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পথের ওধারে যে পাণ, জর্দ্দা ও আতরের দোকানে আছে, তাহার ভিতরে নাচ হইতেছে। এক সুন্দরী ইরাণী তরুণী নাচিতেছে, আর বহু লোকে তাহাকে ঘিরিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। বিদ্যুল্লতার মত তরুণী নাচিতেছে, তাহার লাল ঘাঘরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিতেছে, গোলাপী ওড়নার কাঁচগুলি বৃহৎ ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য জ্বরের বেদনা, জীবনের ব্যর্থতা ভুলিয়া শেখর নৃত্য দেখিতে লাগিল। নটীর নূপুর-ঝঙ্কার তাহার মাথার শিরায় যেন দপদপ করিয়া বাজিতে লাগিল। নটীর পাশে এক দীর্ঘাকৃতি পাঠান দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার হাবভাব দেখাইবার জন্য তাহাকে ইসারা করিতেছিল। তাহার রোষ-দীপ্ত নয়নের কটাক্ষে নটী মাঝে মাঝে ভীত করুণ মুখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিতেছিল। ওই পাঠান তাহাকে পারস্য হইতে কিনিয়া দিল্লীতে বিক্রি করিতে আনিয়াছে। ক্ষুধিত হিংস্র ব্যাঘ্রের মত তাহাকে ঘেরিয়া মোগল আমীর ওমার, মনসবদার, বেণিয়া, মহাজন, রাজপুত যুবক, বড় লোকের দালাল, এমন কি এক ফরাসী সেনাপতি, কতজন আসিয়া জুটিয়াছে।

নাচ থামিল, শেখরের বুকের জ্বালা আবার যেন ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে হইল, অন্তরের সেতারের আর একটা তার আবার ছিঁড়িয়া গেল। একেবারে সব তার ছিঁড়িয়া চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া যায় না।

ওদিকে ইরাণী নটীর দরদস্তুর চলিতেছে। কেহ তাহার হাত টানিয়া, কেহ তাহার মুখ তুলিয়া, কেহ তাহার চুল মেলিয়া দেখিতেছে। মাংস-লুব্ধ শকুনি দলের মত কামার্ত্ত পুরুষগুলি এক পুষ্পের মত কোমল তরুণীকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। শেখর একবার সে দিকে চাহিল, আবার ঘরের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইল, আবার ওদিকে আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যটির দিকে চাহিল। চিরন্তনী মায়াবিনী আবার তাহাকে নবরূপে ভুলাইয়া ডাকিতেছে! না, আর নারী নয়, সে রূপবহ্নি চায় না, সে হিমস্নিগ্ধ, স্তব্ধ, শান্তিময় অন্ধকার চায়। কিন্তু শেখর বিছানায় গিয়া শুইতে পারিল না, সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেখিল, এক কামান্ধ মাতাল প্রৌঢ় মুসলমান ইরাণীর বক্ষের কাপড় টানিতে গেল। ইরাণী তাহাকে একটু ধাক্কা দিয়া দূরে সরিয়া গেল। পাঠানটা তাহার গলা ধরিয়া আবার ঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইল। সেই মুসলমানটি আবার তাহার দিকে অগ্রসর হওয়াতে, ইরাণী আবার ঘরের কোণে ছুটিয়া সম্মুখে আতরপূর্ণ এক চামড়ার পাত্র তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। চারিদিকে আতর ছড়াইয়া পড়িল। সেই আতরের তীব্র গন্ধে শেখরেরও মাথা যেন রিমঝিম করিয়া উঠিল। আঙ্গুলের হীরকখণ্ড-খচিত সোণার আংটিটির দিকে একবার জ্বলজ্বল চোখে চাহিয়া সে টলিতে টলিতে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইল।

সরাইখানা হইতে বাহির হইয়া, পথ পার হইতে যাইয়া, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে কয়েকজন মুসলমান একটি মৃতদেহ নিঃশব্দে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। স্থির হইয়া তৃষিত চোখে সে শুভ্রবসনাবৃত মৃতদেহের দিকে চাহিল। ওই লোকটির জীবনের সকল দাহ, সকল তৃষ্ণা মিটিয়া গিয়াছে,—জীবনের সকল দেনা-পাওনার, সকল ভুল-ভ্রান্তির হিসাব-নিকাশ চুকিয়াছে, সে শান্তি পাইয়াছে। এই ত মূর্ত্তিমান মৃত্যু আসিয়া তাহাকে চিরশান্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। সে আতরের দোকানে যাইবে না, সে যমুনার অতল, স্নিগ্ধ কোলে ঝাঁপাইয়া দেহের সকল জ্বালা মিটাইবে,—তাহার দেহ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। মৃতদেহ লইয়া লোকেরা চলিয়া গেল, সে বহুক্ষণ তাহাদের চলিয়া যাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের আতরের দোকান হইতে একটা আর্ত্তনাদ কাণে আসিল। সে টলিতে টলিতে দোকানের দিকে চলিল,—নারীর সহিত এই তাহার শেষ খেলা।

দর-কসাকসি বেশ জমিয়াছে। প্রৌঢ় মাতাল মুসলমানটি আতরসিক্ত দাড়ি নাড়িয়া, সবাইয়ের ওপর দর দিয়া চলিয়াছে। তাহার দৌড় কতদূর দেখিবার জন্য, সকলে অসম্ভব রকম উচ্চ মূল্য হাঁকিয়া চলিয়াছে। সহসা শেখরকে টলিতে টলিতে ঢুকিতে দেখিয়া, সকলে একটু স্থির হইয়া, আবার কোন নূতন রঙ্গের আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কাছে যাইতে একটু ভীত হইয়া স্তব্ধ হইল। তাহার জ্বরাতুর মুখ হইতে, রাঙা ঘোলা চোখ হইতে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছিল। সেই রক্তিম মুখের চারিদিকে লম্বা, কালো, শুকনো চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; শুধু পা, একটা লাল পাজামা ও একটা কালো ফতুয়া,—সে যেন স্বপ্নের ঘোরে আসিতেছে। সেখর কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিল না, সে বরাবর পাঠানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া সোণার আংটিটা ছুঁড়িয়া মারিবার মত তাহাকে দিয়া বলিল—এই নে, ছেড়ে দে ওকে। পাঠানটি আংটির বৃহৎ হীরকখণ্ডের দিকে চাহিল। প্রৌঢ় মুসলমানটি আংটিটি ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। শেখরের কাণ্ড দেখিয়া তাহার নেশা ছুটিয়া গেল। সে ব্যবসাদার, সুন্দরীকে অত মূল্যে কিনিতে রাজী নয়। সে আর দাম হাকিল না, শুধু অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, অত বড় হীরে! শেখর তাহার দিকে একবার খর দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া নাড়িয়া দিল। তার পর পাঠানের দিকে চাহিয়া বলিল—ব্যস, ঠিক হয়েছে। পাঠানটি তাহাকে অতি সবিনয় সেলাম করিয়া, ইরাণীর হাত টানিয়া শেখরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিল—নিয়ে যান। শেখর একবারও ইরাণীর দিকে চাহিল না। যদি চাহিত, তবে দেখিতে পাইত, সেই শিশুর মত সুকুমার ভীত-করুণ, সরল মুখ কি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইরাণীর বুকে-জড়ান সাদা পায়রাটির দিকে ভাসাভাসা চোখে একবার চাহিয়াই সে ইরাণীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে, স্বপ্নের ঘোরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দোকান হইতে বাহির হইয়া, পথের মধ্যে আসিয়া, যেন অতি শ্রান্ত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল; ধীরে বলিল, যাও, চলে যাও।

বক্ষের পারাবতটিকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া তরুণী বলিল—কোথায় যাবো? তাহার স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠস্বরে শেখর তাহার দিকে চাহিল, সুর্ম্মামাখা দুইটি কালো চোখ অজানা লজ্জা, গোপন বেদনায় কম্পিত হইয়া কি রহস্যে তাহার দিকে মায়াজাল বিস্তার করিতেছে। না, সুর্ম্মামাখা কালো চোখ নয়, নীল স্নিগ্ধ যমুনার জল তাহাকে ডাকিতেছে। মুখ ফিরাইয়া শেখর বলিল—যেখানে খুসী চলে যাও, তোমায় আমি মুক্তি দিলাম। ইরাণী কাতর কণ্ঠে বলিল—কোথায় যাব, আমার ঘর নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কেউ নেই। শেখর ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—আমারও ঘর নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কেউ নেই।

আতরের দোকানে তখন আর এক তাতারিণীর মৃত্যু মূক হইয়াছে। সকলে তাহাতে জমিয়া গিয়াছে, শুধু অলিভার ও মিঃ মির্জ্জা ইরাণীর পেছনে পেছনে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। শেখরের কথা শুনিয়া অলিভারও মনে মনে বলিল,—আমারও ঘর নেই, মা-ভাই-বোন—কেউ নেই। মির্জ্জা মৃদু হাসিয়া ভাবিল—আমারও ত এই অবস্থা। রাত্রের অন্ধকারে চারিজন সমাজ-পরিত্যক্ত আত্মীয়-বন্ধুহীন গৃহ-হারা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইরাণী বীর সরিয়া শেখরের হাত ধরিল। শেখর হাতে ঝাঁকুনি দিল। তার পর মাতালের মত টলিতে টলিতে সম্মুখের পথ দিয়া চলিল। প্রভুভক্ত ভীত জীবের মত ইরাণী তাহার পেছনে পেছনে চলিল। অলিভার তাহাদের পেছনে পেছনে যাইবে ভাবিল; কিন্তু সম্মুখে মির্জ্জা আসিয়া, তাহার দিকে রহস্যের হাসি হাসিয়া চাহিতে, সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভিক্ষুকটাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া সে আপনার ঘরে মদ খাইতে গেল। তরুণীকে মুক্তি দিয়া শেখরের মানসিক অবস্থা আরও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। তাহার স্বাভাবিক সুখী মন তাহাকে যেমন ইরাণীর দিকে টানিতেছিল, তাহার উন্মত্ত ব্যথা-বিকল মন তাহাকে তেম্নি শান্ত মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। এই দুই বিরুদ্ধ স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে সে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। টলিতে টলিতে প্রায় পথে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, তরুণী তাহাকে ধীরে ধরিয়া লইয়া চলিল। তরুণীর স্পর্শ বড় মধুর লাগিল; আবার চমকিয়া উঠিল,—মৃত্যু চাই,—সেই শুভ্রবসনাবৃত শান্ত মৃতদেহের মত। তরুণীর দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল, এ কে! এ ত নারী নয়, এ যে নারীর কঙ্কাল! গোলাপী ওড়না লাল ঘাঘরা-চাপা-দেওয়া তাহার সুকোমল সুন্দর মাংসের তলায় একটা কঙ্কালের ছায়া দেখিতে পাইল। স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা হইলে সে হয় ত সেখানে মূর্চ্ছা যাইত; কিন্তু বিকল-মস্তিষ্কের অবস্থায় এ কঙ্কাল-সঙ্গিনী তাহাকে ভীত করিল না। সে শুধু ইরাণীর নিকট হইতে একটু সরিয়া প্রখর দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিল, মৃত্যু মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাকে লইয়া চলিয়াছে। তাহার শ্রান্ত ক্ষীণ দেহ যেন সবল হইয়া উঠিল। প্রচুর মদ খাইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মাতাল যেমন করিয়া চলে, তেম্নি করিয়া সে পথ দিয়া চলিল। দেখিয়া পথ খুঁজিয়া নয় যেন কোন রহস্যময় শক্তির আকর্ষণে সে যমুনার দিকে চলিল। অসহায় শঙ্কিত ভাবে ইরাণী তাহার পিছন পিছন চলিল।

যমুনার তীরে আসিয়া জলকল্লোলে ও জলসিক্ত বাতাসের স্পর্শে শেখর একটু প্রকৃতিস্থ হইল। আকাশে ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, মেঘের ফাঁক হইতে ঝরা চাঁদের আলো নদীর কালো জলে আলেয়ার মত মাঝে মাঝে ঝলসিয়া উঠিতেছে। শেখর বিমুগ্ধ হইয়া তাহার জ্বরতাপদগ্ধ দেহ নদী জলে শীতল করিতে চলিল। এবার ইরাণীর সত্যই ভয় হইল, এ লোকটা মাতাল না পাগল? পাগল! নদীর জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছে! সে সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কাঁচের কাজ-করা তাহার রঙীন ওড়না ক্ষণিক বিদ্যুতের আভায় শেখরের চোখে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, দূরে বজ্র গর্জ্জনে সে একটা অট্টহাস্য শুনিতে পাইল, শিহরিয়া উঠিল, এ কে? রঙীন মায়া! এক কঙ্কাল! একবার দেখিল সুন্দরী নারী, আবার দেখিল এক কঙ্কাল। তাহার দেহের, তাহার মনের সকল শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ইরাণীর বুকে পড়িয়া গেল। নারী ও মৃত্যু তাহাকে লইয়া যেন পাশা খেলিতেছিল, নারীরই আবার জয় হইল।

"অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ"

(প্রতিবাদ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ

ভারতবর্ষের বিগত (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় 'শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা'র লিখিত উপরিউক্ত শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে এই অধমকে ইহার লেখক মনে করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা যে আমার লেখা নহে, এবং হইতেও পারে না, প্রধানতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র বন্ধটি লিখিত হইল।

প্রথমতঃ আমার নাম 'পদ্মনাভ' নহে—পদ্মনাথ, এবং যদিও আমি "দেবশর্ম্মা" বলিয়া নাম স্বাক্ষর করি, তথাপি "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক মহাশয় (বোধ হয় প্রবন্ধের গুরুকরণ কল্পে) আমার উপাধিগুলি যুড়িয়া দিয়া থাকেন। তার পর "পদ্মনাভ" মহাশয় তাঁহার "ইংরাজীতে ভাল জ্ঞান নাই" এ কথা বলিয়াছেন—এ অধম (প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ বলিবার অধিকারী হইলেও) এ কথা বলিতে অক্ষম—কেন না একটা এম-এ ডিগ্রীর ছাপ (সেটা আবার ইংরাজী সাহিত্যে) রহিয়াছে। আমি যে এরূপ প্রবন্ধ এ ভাবে লিখিতাম না—তাহা সুহৃজ্জনের "বিস্ময়-প্রকাশেই" সূচিত হইয়াছে। ফলতঃ, তিনি যাদৃশ প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া "বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা খুবই ভয়াবহ" বলিয়া স্বীয় রচনার উপসংহার করিয়াছেন, আমি তাদৃশ প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভই করিয়াছি। সুশিক্ষিতা জননীরা এ ভাবে সমাজের হিতার্থ লেখনী প্রয়োগ করুন, এই আমার আন্তরিক কামনা।

"পদ্মনাভ" মহাশয়ের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বোধ হইল কোনও পাকা লেখক এই ছদ্মনামের মুখস পরিয়াছেন—তবে তাঁহার 'অভিনয়' ভাল হয় নাই—নিজকে "অর্দ্ধ শিক্ষিত" "চালকলা"-ভোজী বলিয়া খ্যাপিত করিলেও তিনি একজন পূর্ণশিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয় এবং কোনও দিন "চালকলার" আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। আমার অনুমান যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে কেন যে তিনি এই নামটি নির্ব্বাচন করিয়া এ অধমকে বিড়ম্বিত করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা-দেবী লিখিত মূল প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত—যদিও দুই একটি অবান্তর বিষয়ে যথা, অবস্থা বিশেষেও বালিকাকে চির-অবিবাহিত রাখা, কন্যাকে বিশেষতঃ বিবাহিতাকে—বিদ্যালয়ে প্রেরণ) * তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। তিনি এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া "ভারতবর্ষের" 'মাতৃমঙ্গল' বিভাগ সমলঙ্কৃত করুন—এই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। নারীগণের কথা জননীরাই ভাল বুঝেন—তাঁহারাই এ বিষয়ে বলিবার অধিকারিণী—"পদ্মনাভ" মহাশয় যাই কেন বলুন না। প্রতিবাদ দেখিয়া নারীজন-সুলভ শালীনতাবশতঃ যদি জননীরা এ বিধ প্রবন্ধ প্রকাশে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে সমাজের অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইবে। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, স্বয়ং

* স্ত্রীজাতির বিবাহই একমাত্র সংস্কার—তাই অন্ধা খঞ্জা রুগ্না কন্যারও এই সংস্কার লোপ করা অনুচিত। তবে ঈদৃশ স্থলে বরের যাহাতে ক্ষতি না হয় তাহার বিধান করা আবশ্যক। এমন কি উহাকে স্থল বিশেষে অন্য বিবাহ করিতেও দেওয়া উচিত। পিত্রালয়ে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী এবং বিবাহান্তে স্বামী শ্বশ্রূ দেবর নন্দা প্রভৃতির নিকটেই বালিকাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করা উচিত। একে তো বিদ্যালয়ের পাঠ্যাদি প্রায়শঃ কন্যাদের উপযোগী নয়; তার পর স্কুল কলেজে যাহা শিখান হয়, তাহা তো বিলাতী ভাবেরই পরিপোষক। ছেলেরা যে অর্থার্জ্জনার্থ বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ে গিয়া এই ভাবে ভাবিত হইতেছে, সমাজহিতৈষিগণ ইহাতেই সন্ত্রস্ত। আবার মেয়েরাও ঐরূপ হউক, ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। বিদ্যালয়ে যাতায়াত, অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়েও মেয়েদের পক্ষে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে। বলা বাহুল্য যে পুস্তকগত বিদ্যা ছাড়া যাহা নারীগণের সমধিক প্রয়োজনীয় অর্থাৎ 'সুগৃহিণী' হইবার নিমিত্ত যেটুকুর দরকার, তাহার জন্য কোনও বিদ্যালয়ে যাইবার আবশ্যকতা নাই, পিতৃগৃহে ও স্বামি-ভবনেই তাহা সম্যক্ শিক্ষণীয়।

আদ্যাশক্তি ভগবতী (প্রত্যেক জননী যাঁহার অংশভূতা) দানব দলনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার উপরেও অস্ত্রবর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু শস্ত্রাঘাতে "ন তস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।" আশা করি, ঐ প্রতিবাদও জননীরা তেমনি লঘু মনে করিয়া সহিয়া লইবেন—ভগ্নোৎসাহ হইবেন না।

বাল্যবিবাহের যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদের সর্ব্বদাই ইহাই প্রধান যুক্তি যে, ইহাতে সন্তান-সন্ততি দুর্ব্বল হয় ও অকালে কাল-কবলিত হয়। তাই তাঁহারা আইন করিয়া বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তৎফলে ১২৯৭ সালে স্কোবল্ সাহেব সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার জন্য বড়লাটের আইন্ সভায় এক বিল্ উপস্থাপিত করেন। সেই সময়ে সমগ্র হিন্দু-সমাজের উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় এক বাক্যে এই বিলের প্রতিবাদ করেন; এবং তখনকার খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, বাল্যবিবাহ এ দেশের অনুপযোগী নহে—* এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র সমর্থিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বিল্ পাস্ করিয়া প্রেষ্টিজ্ রাখিলেন বটে, পরন্তু সর্কুলার প্রভৃতির দ্বারা ইহা 'ডেড্ লেটারে' পরিণত করিয়া দিয়া দেশীয় সমাজের সঙ্গে আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইদানীং স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ৺নরেন্দ্রনাথ সেন ম্যারেজ রিফর্ম্ম লীগ স্থাপন পূর্ব্বক বিবাহের বয়স বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সেই লীগের কথা বড় শোনা যাইতেছে না। বোধ হয়, এতদ্দ্বারা কোনও ফল হয় নাই। সে যাহা হউক, লীগ্ সংস্থাপনের সময় উদ্‌যোক্তৃগণ এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ করেন—এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক এই লেখকেরও অভিমত আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের ১ম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় (কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে) "হিন্দু-বিবাহ সংস্কার" নামে প্রকাশিত হয়; এবং অবশেষে তাহা গৌহাটীস্থ সনাতন ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সমাজ-সেবক পুস্তকাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিবেন। অতএব এস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচিত হইল।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর যুক্তিতর্কের সঙ্গে মদীয় উক্ত প্রবন্ধের ভাবগত এত সৌসাদৃশ্য যে, "পদ্মনাভ" মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া, উহা আমার লেখা ভাবিয়া, আমাকে চিনেন এমন কেহ যে বিস্মিত হইতে পারেন, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। ফল কথা, বাল্যবিবাহ যে অকাল-মৃত্যুর কারণ, ইহা আমি কদাপি মনে করি না।

তবে অকাল-মৃত্যুর কারণ কি? তদ্বিষয়ে সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রের উক্তি এই—

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।"

বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্যয়ন, সদাচারের বর্জ্জন, অলসতা এবং দূষিত আহার্য্য গ্রহণ এই সকল কারণে মৃত্যু বিপ্র প্রভৃতির হননেচ্ছা করিয়া থাকে।

এখানে 'বিপ্র' পদ (এবং বেদ শব্দ) উপলক্ষণ মাত্র। এখনকার লোক শাস্ত্র শিখে না; সদাচার মানে না, অলসতা বশতঃ অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, এবং যত তত্র যা তা খায়—তাই অকালে কাল-কবলিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীও তদীয় প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তবে একটি অত্যাবশ্যক কথা তিনি (বোধ হয় মাতৃজাতিসুলভ সঙ্কোচ বশতঃ) স্পষ্টতঃ বলেন নাই—তাহা 'সদাচারের' অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে লোকে শাস্ত্রাচার মানিয়া স্ত্রীসহবাসে সংযত ছিল—ঋতুকালে, তাহাতেও দিনক্ষণ বাছিয়া, দার-সঙ্গত হইত। ফলে স্বয়ং

* এতৎ সম্পর্কে এস্থলে আরো একটা পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যৌবন-বিবাহের ফলে সংস্কারকদের আপন সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, "নব্যভারতের" স্পষ্টবাদী সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় (স্বয়ং ব্রাহ্ম হইলেও) "যৌবন-বিবাহ ও ব্রাহ্ম সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছিলেন। "পদ্মনাভ" মহাশয় যে বলেন "বিদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ যৌবন বিবাহ বা স্ত্রীস্বাধীনতা নয়, সমাজের বা বিবাহের আদর্শই তজ্জন্য দায়ী", এ কথার কোনও অর্থ নাই। সামাজিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে 'আদর্শ'ও যে বদলাইয়া যাইবে—তাহা কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। গান্ধর্ব্ব বিবাহ হিন্দু-সমাজে ছিল এবং আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা কাদাচিৎক,—সুপ্রচলিত সামাজিক পদ্ধতি নয়। অপিচ, অভিনিবেশ সহকারে ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নাটকাদি পড়িলে দেখা যাইবে যে, প্রায়শঃ এরূপ বিবাহের ফলে নানারূপ বিপত্তিও ঘটিয়াছে।

নীরোগ থাকিয়া, দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ করিয়া "আচারাল্লভতে হ্যায়ুঃ আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ" এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিত। এখন যাহা হইতেছে; তাহার ফলে মাতা, পিতা, সন্তান, সকলেরই অকাল মৃত্যুর পথ পরিষ্কার হইতেছে।

অতীব অবান্তর ভাবে 'পদ্মনাভ' মহাশয় 'অবগুণ্ঠনে'র কথা পাড়িয়াছেন—এবং তাহা মোসলমানদের আমদানী বলিয়াছেন। 'অবরোধ' সম্বন্ধেও অনেকের এবংবিধ মত। এই সংস্কারটা ঠিক নয়। 'অবগুণ্ঠন' হিন্দুসমাজে পূর্ব্বাবধিই ছিল, কালিদাসের শকুন্তলায় "কেয়মবগুণ্ঠনবতী" ইত্যাদির শ্লোক (৫ম অঙ্কে) দেখিতে পাই। মৃচ্ছকটিক নাটকের শেষ অঙ্কে গণিকা বসন্তসেনাকে 'অবগুণ্ঠন' দ্বারা কুলবধূতে পরিণত করা হইয়াছে। 'অবরোধে'র কথাও নাটকাদিতে বহুশঃ আছে। "অসূর্য্যম্পশ্যা" শব্দটি সাধিবার জন্য পানিনিকে একটি পৃথক সূত্র করিতে হইয়াছিল। অতএব "পদ্মনাভ" মহাশয় প্রভৃতি যেন এসব বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের উক্ত সংস্কার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করেন।

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য

শ্রীমন্ত সওদাগর

(নভেম্বর, ১৯২৩)

বিগত অক্টোবরের সহিত তুলনায় নভেম্বরের ভারতীয় বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, আমদানি ও রপ্তানিতে এ মাসে আধিক্য ঘটিয়াছে। বে-সরকারি আমদানির এ মাসের মূল্য ২১,০৯ লাখ টাকা, এবং ইহা গত মাসের অপেক্ষা ৪৯লাখ টাকার অধিক। রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি গত মাস অপেক্ষা ১,৮৬ লাখ ও ২৪ লাখ অধিক হইয়া যথাক্রমে ২৬,৪১ ও ১,২২ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। নিম্নে আমদানি, রপ্তানি, ও পুনঃরপ্তানির হিসাব দেওয়া হইল :—

	নভেম্বর ২৩	অক্টোবর ২৩	বেশী (+) কম (—)	
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	২১,০৯	২০,৬০	+৪৯	+২·৩
রপ্তানি	২৬,৪১	২৪,৫৫	+১,৮৬	+৭·৩
পুনঃরপ্তানি	১,২২	৯৮	+২৪	+২৪·৫

	নভেম্বর ২৩	নভেম্বর ২২	বেশী (+)	কম(—)
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	২১,০৯	২০,৭০	+৩৯	+১·৯
রপ্তানি	২৬,৪১	২৭০৫	—৬৪	—২·৪
পুঃ রপ্তানি	১,২২	১,৮৪	—৬২	—৩৩·৭

এপ্রিল হইতে নভেম্বর ৮মাস বেশী (+) কম(-)

	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১,৫২,২১	১,৫৪,১৬	—১,৯৫	—১৩
রপ্তানি	২,০৭,৫২	১,৮২,৫৮	+২৪,৯৪	+১৩·৭
পুঃ রপ্তানি	৯,২৬	৯,৮২	—৫৬	—৫·৭

বে-সরকারি হিসাবে এই মাসে কারেন্সি নোট সমেত অর্থাদির আমদানির মূল্য ৩,৭৫ লাখ, এবং ১৯২২ অক্টোবরে ৪,৭২ লাখ ও ১৯২২ নভেম্বরে ২,৯৭ লাখ টাকা। নিম্নে স্বর্ণ ও রৌপ্যের এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসের আমদানি ও রপ্তানির তালিকা দেওয়া হইল:—

এপ্রিল হইতে নভেম্বর ৮ মাস	বেশী (+)	কম (—)	
১৯২৩	১৯২২		
লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি সোণা	২১,৮৪	২৩,২৬	—১,৪২	—৬
রপ্তানি ঐ	৫	৫	—	—
আমদানি রূপা	১০,৩৮	১০৮৮	+৩,৫০	+৩২
রপ্তানি ঐ	১,৩০	২,৩০	—৫৪	—২৩

পণ্যদ্রব্য, অর্থাদি, কৌন্সিল বিল, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির সর্ব্বসমেত হিসাবে দেখা যায় যে, এ মাসে ভারতের দৃশ্যমান ব্যবসার পাল্লা আমাদের অনেকটা অনুকূল হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের এ মাসে বিদেশ হইতে ১,৫৩ লাখ টাকা পাওনা হইয়াছে। ১৯২৩ অক্টোবরে আমাদের দেনা ছিল ৬৬ লাখ টাকা, আর ১৯২২ নভেম্বরে আমাদের পাওনা ছিল ৫,৯৬ লাখ টাকা। ১৯২৩ এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই আট মাসে আমাদের পাওনা দাঁড়াইয়াছে ২৮,২৫ লাখ, এবং বিগত বর্ষের এই সময়ে পাওনা হইয়াছিল ১৪,৭৩ লাখ টাকা।

আমদানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—১৯২২ নভেম্বরের সহিত তুলনায় খাদ্য দ্রব্যাদি ও কাঁচা মাল ৫৭ লাখ ও ১৩ লাখ বাড়িয়া যথাক্রমে ৩,১২ লাখ ও ১,৪০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ৩১ লাখ কমিয়া ১৬,২১ লাখ, জীবজন্তু ২ লাখ কমিয়া ২ লাখ, ও ডাকবিভাগের আমদানি ২ লাখ বাড়িয়া ৩৪ লাখে দাঁড়াইয়াছে খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে চিনি ৫২ লাখ বাড়িয়াছে; কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিন তৈল ১১ লাখ বাড়িয়াছে, তুলা ও রেশম প্রত্যেকে ৪ লাখ বাড়িয়াছে, কিন্তু কয়লা ৪ লাখ কমিয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে কোরা বস্ত্রাদি ১৩ মিলিয়ন গজ ও ৩৩ লাখ টাকা কমিয়াছে, ধোয়া বস্ত্রাদি ৬ মিলিয়ন গজ ও ২৩ লাখ টাকা কমিয়াছে, রঙ্গিন বস্ত্রাদি ৭ লাখ টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিমাণে ৫৩৯ হাজার গজ কমিয়াছে। কলকব্জা (১৭ লাখ), রেশমী বস্ত্র (৮ লাখ) এবং তৈজসপত্র (৬ লাখ) এইগুলি উল্লেখযোগ্য হ্রাস। লোহার চাদর এবং মোটরগাড়ী যথাক্রমে ৩০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা বাড়িয়াছে।

রপ্তানি বিভাগে পরিবর্ত্তন—গত বর্ষের নভেম্বরের সহিত তুলনায় খাদ্যশস্যের বহুল পরিমাণে কম্‌তি রপ্তানির জন্য (১,১৮ লাখ) এ মাসে মোট খাদ্যদ্রব্যাদির রপ্তানির মূল্য ১৪ লাখ কমিয়া ৭,৪৮ লাখে দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যশস্যের এত কম্‌তি রপ্তানির ক্ষতি চায়ের দ্বারা পূরণ হইয়াছে। কারণ এ মাসে গত ১৯২২ নভেম্বর অপেক্ষা ৯৬ লাখ টাকার বেশী চা রপ্তানি হইয়াছে। এ মাসে মোট ৪,৩১ লাখ টাকার চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। কাঁচা মাল বা অ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ৩৬ লাখ বাড়িয়া ১২,৫০ লাখ হইয়াছে। ইহার মধ্যে তুলা যদিও ওজনে ৪,০০০ টন কম ছিল, কিন্তু মূল্যে ৫০ লাখ টাকা বাড়িয়াছে। খনিজ তৈল ২৯ লাখ এবং তৈলবীজ ১০ লাখ টাকা বাড়িয়াছে; এবং পাট ও লা যথাক্রমে ৫০ লাখ ও ২১ লাখ কমিয়াছে। মোট ৩৩ হাজার টন তুলা রপ্তানির মধ্যে জাপান ১১,৮০০ টন বা বা ৩৬ শতাংশ, ইটালি ৫,৩০০ টন বা ১৬ শতাংশ, বেল্‌জিয়াম্ ৪,৭০০ টন, যুক্তরাজ্য ৩,৯০০ টন এবং জার্ম্মেনী ১,১০০ টন লইয়াছে। পাট রপ্তানি যদিও পরিমাণে ৮৯,০০০ টন হইতে ১১০,০০০ টনে উঠিয়াছিল, কিন্তু চীনদেশে চাহিদা মন্দা হওয়ায় উহার মূল্য ৩,৩৭ লাখ হইতে ২,৮৬ লাখে নামিয়াছিল। প্রধানতঃ তুলা ও পাট নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য যথাক্রমে ৪৩ লাখ ও ৬৫ লাখ টাকা কম হওয়ায় নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য এ মাসে ১,০১ লাখ কমিয়া ৬,০৭ লাখ টাকা হইয়াছিল। তুলার সূতা ৩ মিলিয়ন পৌণ্ড ও ৩০ লাখ টাকা কম রপ্তানি হইয়াছে। গুণচটের থলে সংখ্যায় ২৪ মিলিয়ন হইতে ৩৮ মিলিয়ন ও মূল্যে ১,১৮ লাখ হইতে ১,৫৭ লাখ টাকায় উঠিয়াছে। অপর দিকে চটের কাপড় ১৪৭ মিলিয়ন গজ হইতে ১১৪ মিলিয়ন গজে ও ২,৯২ লাখ হইতে ১,৮৭ লাখ টাকায় নামিয়াছে। আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও তৎপরে আর্জ্জেন্টিনা, ক্যানেডা, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভারতীয় চট লইয়াছে।

ব্যবসায়ে বিদেশের সম্বন্ধ—

যুক্তরাজ্য আমদানিতে গত বৎসর নভেম্বর ৬২·২ ও এ বৎসর নভেম্বরে ৫৮·২ ও রপ্তানিতে গত বৎসর ২৮·৩ ও এ বৎসর ৩৩·১ শতাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মেনী, জাপান ও আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের স্থান আমদানিতে যথাক্রমে ৫·১, ৬·০ ও ৪·৮ এবং রপ্তানিতে ৪·২, ৮·৪ ও ১০·০।

জাহাজের খবর—

এ মাসে ৩১৫ খানি জাহাজ ৩০০ হাজার টন মাল লইয়া ভারতে আসিয়াছিল ও ২৯৭ খানি জাহাজ ভারত হইতে বিদেশে ৬০০ হাজার টন মাল লইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর ঐ মাসে ২৬৭ খানি জাহাজ ৫৪১ হাজার টন মাল লইয়া ভারতে আসিয়াছিল, ও ২৭০ খানি জাহাজ ভারত হইতে ৫৫৯ হাজার টন মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল।

শুল্ক—

১৯২৩ নভেম্বরে সরকারের ৯,০৯ লাখ ও ১৯২২ নভেম্বরে ৩,১৭ লাখ টাকা আমদানি শুল্ক, এবং ১৯২৩ ও ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ৭১ লাখ ও ৬০ লাখ টাকা রপ্তানি শুল্ক আদায় হইয়াছে।

নিম্নে আমদানি ও রপ্তানি বিভাগের কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এ মাসে খাদ্য দ্রব্যাদির ও কাঁচা মালের কতক উল্লেখ করিলাম, আগামী বারে নির্ম্মিত দ্রব্যাদির অবশ্য দ্রষ্টব্য তালিকা দিবার ইচ্ছা রহিল।

নভেম্বর ১৯২৩

আমদানি

মাল	টাকা
খেজুর—	২৬,৭১,৮৫৯
স্পিরিট (মদ	১৪,৯৬,৪৪৪
জমাট দুধ	৬,১৩,৭৬২
সুপারি	১৬,৮৮,২৩৭
পরিষ্কৃত চিনি	১,৩২,৫১,৩৮২
লবণ	১০,৮৬,৯৪৯
সিগারেট	১১,৮০,৪৬৮
মণিমুক্তাদি	২২,৯১,৭৭৪
কেরোসিন তৈল	২৪,৮৮,৪৬১
অপর খনিজ তৈল	৩৩,০৬,৮১৫

রপ্তানি

খাদ্য শস্য	২,৭৫,৩১,১১১
চা	৪,৩০,৫৯,১৮২
তামাক	১১,৫২,৬৫৬
গঁদ, রজন ও লা	৭০,০৪,৬৯৪
চর্ম্ম	৪৭,৪৭,০৪৩
তৈল (সর্ব্ববিধ)	৩৬,২১,৬৭৮
তৈলের খইল	১৪,৪৬,৬৪৫
তৈল-বীজ	২,০২,৩৯,০৪৭
তুলা	৪,৮২,৩৯,৪২৬
পাট	২,৮৬,২৬,৮২৩
পশম	৩০,২৩,৫৫৯

কেন এত মোটা মোটা টাকার জিনিস বিদেশ হইতে আসে বা কেন এত জিনিস বিদেশে যায়, এবং এই আদান বা প্রেরণ ব্যাপারে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কতটুকু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বা অ-বাঙ্গালীর ইহাতে কতটুকু অংশ, এবং বাঙ্গালীর বা ভারতীয়ের কায অ-বাঙ্গালী বা অ-ভারতীয় কতটা করিয়া দিতেছে, এবং আমরা স্থাণুবৎ কেনই বা বসিয়া আছি,—অথবা অচির-ভবিষ্যতে ইহার সমূল বা কথঞ্চিৎ—প্রতিবিধান হয় কি না, এই সকল চিন্তার উদ্রেক করাইতে—এই ক্ষুদ্র মাসিক নিবন্ধ যদি সক্ষম হয়, এবং এ দেশীয় ব্যবসায়ীগণ যদি প্রতিবিধান কল্পে বদ্ধ পরিকর হন, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্যের সার্থকতা।

প্রার্থনা

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল

আমার গর্ব্ব, করিয়ে খর্ব্ব,
রাখহে সর্ব্ব, লোকের তলে।
করহে পূর্ণ, হৃদয় ক্ষুণ্ণ,
তাহারি শূন্য, ভরিবে ব'লে।
হউক ভগ্ন, যতেক স্বপ্ন,
হইয়ে মগ্ন হৃদয় 'পরে,
তোমার হাস্য, আনুক লাস্য,
মম আলস্য হরণ করে।

কুটীর কুঞ্জে, পুষ্প-পুঞ্জে,
আমার প্রাণ যে দেখিতে পাই,
তাহার বার্ত্তা, জানিও ভর্ত্তা,
কোনই সত্তা নাই গো নাই,
তোমার স্পর্শে, জাগিবে হর্ষে,
আমার প্রাণ সে আকাশ পরে,
টুটিয়ে বন্ধ, নাচিবে ছন্দ
মহা আনন্দ হৃদয় 'পরে।



শ্রীনরেন্দ্র দেব

পূর্ব্বেই বলেছি, আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এখনও বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। তারা এখনও জমিতে লাঙ্গল দিতে পর্য্যন্ত শেখেনি। তারা সাপ, কাঠবিড়াল, গিরগিটি, টিক্‌টিকি, কেঁচো শুঁয়োপোকা, 'এমু' পাখী (তিতির জাতীয় একরকম বড় বড় উট পাখীর আকারের পাখী, কেবলমাত্র আষ্ট্রেলিয়াতেই দেখতে পাওয়া যায়) আর সামান্য শাক সব্জী ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে আষ্ট্রেলিয়ার কতক প্রদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এসে প্রাচীন জাতির সে আদিম বর্ব্বরতা একেবারে লোপ পেয়েছে। দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ প্রদেশ এবং কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে এই আদিম অধিবাসীরা সকলেই আজকাল বেশভূষা ক'রতে শিখেছে, মদ খেতে সুরু করেছে এবং বিবিধ পাশ্চাত্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যারা আগে জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে বাস ক'রতো, তারা এখন জঙ্গল ছেড়ে পল্লীর মধ্যে এসে একত্রে বসবাস আরম্ভ করেছে।

কার্পেণ্টারিয়া উপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এখনও পাশ্চাত্য বিষের সংস্পর্শে আসেনি। অরুন্তা, বড়মুড়্গা, বীনবিড়্গা আর কামীল্‌রোই এই কটা হচ্ছে নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের প্রধান আদিম জাতি। বৎসরের মধ্যে আট মাস সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের একান্ত অভাব হয়; এই সময় এক একটা কুয়ো বা ঝর্ণার ধারে কুড়ি পঁচিশ থেকে আরম্ভ ক'রে একশ' জন পর্য্যন্ত জংলী এসে দল বেঁধে বাস ক'রে, আবার প্রাচুর্য্যের সময় তাদের দল হাল্‌কা হয়ে যায়। সেই সময় তাদের যে সব জাতীয় উৎসব আছে, সেই সকলের অনুষ্ঠান হয়। প্রাচীন আর্য্যদের বৈদিক যাগযজ্ঞের মতো এদেরও আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনাতেই অধিকাংশ সময় এইসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তা ছাড়া আমাদের দশবিধ সংস্কারের মতো তাদের মধ্যেও পুরুষানুক্রমে কতকগুলো বীভৎস সংস্কার-প্রথা চলে আসছে সে গুলো তারা একেবারে গোঁড়া আচারীদের মতো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে! 'সাবালক' বলে গণ্য হবার জন্য যুবকদের কতকগুলো ভীষণ পরীক্ষা দেবার রীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে এই পরীক্ষার প্রকরণ বিভিন্ন বটে, কিন্তু বীভৎসতায় কোনটাই বিশেষ কম নয়। দেহের নানাস্থানে ছোট-খাটো ক্ষত চিহ্ন করা থেকে আরম্ভ করে 'মাইকা' বলে যে ভীষণ অস্ত্রোপচারের অনুষ্ঠান হয়, তাতে অনেক সময় সাবালক হবার আগেই হতভাগ্য যুবকের প্রাণবিয়োগ ঘটে!

'সাবালক' বা লায়েক হ'তে হ'লে একদিনের একটা



কোড়োবোরেড়া—(অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা তাদের নৃত্য-গীতের উৎসবকে "কোড়োবোরেড়ী" বলে। যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ কোনও উৎসবে স্ত্রীলোকদের যোগ দেওয়া নিষেধ, কিন্তু প্রতিদিনের নৃত্য-গীতের আসরে তারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। পশুপক্ষীদের ডাক অনুকরণে এবং বীররস, করুণ রস প্রভৃতি ভাবাভিনয়েও এরা সুনিপুণ।)

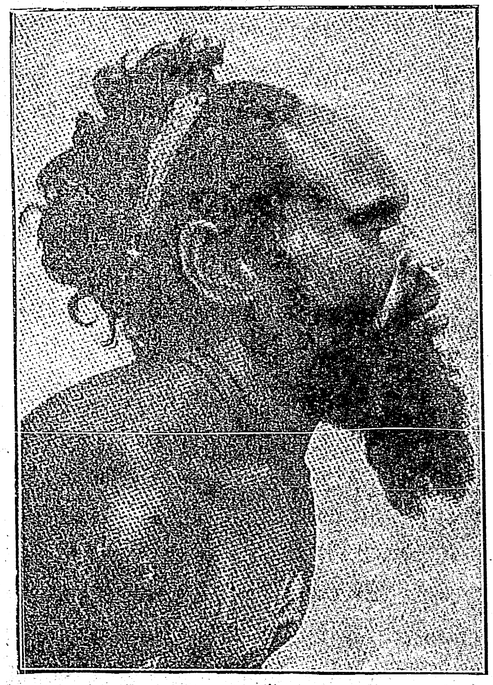

বড়মুড়গা সর্দ্দার—(এরা দাড়ী রাখে কিন্তু গোঁফ ছিঁড়ে ফেলে এবং ভ্রূদেশের লোম তুলে ফেলে। বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে।)

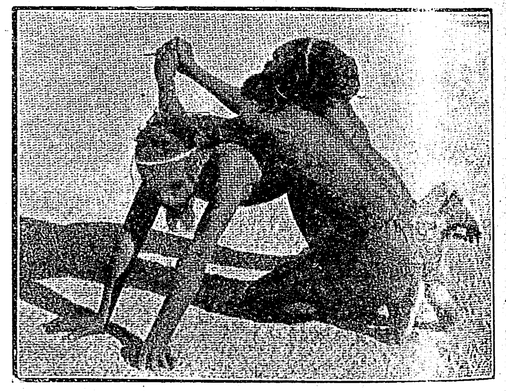

মৃত্যু-দণ্ড

পরীক্ষাতেই সেটা সাব্যস্ত হয় না। দীর্ঘকাল ধরে তাকে একটার পর আর একটা ক'রে নূতন নূতন পরীক্ষা দিতে হয়। সমস্ত পরীক্ষা শেষ করে 'লায়েক' পদে উত্তীর্ণ হ'তে তাদের কুড়ি থেকে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত লেগে যায়। সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কতকগুলো জিনিস ছেলেদের খাওয়া একেবারে নিষেধ থাকে, যেমন 'এমুর' চর্ব্বি প্রভৃতি কতকগুলো তাদের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম খাদ্য। ছেলে যেই কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করবার সঙ্গে

সঙ্গে কার্য্যক্ষম হ'য়ে ওঠে, সেই সময় একটা উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে তাকে খাদ্যের নিষেধ-আজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ খাদ্য সেবনাভিলাষী যুবাকে সেই সব উপাদেয় ভোজ্য বস্তু সংগ্রহ করে এনে

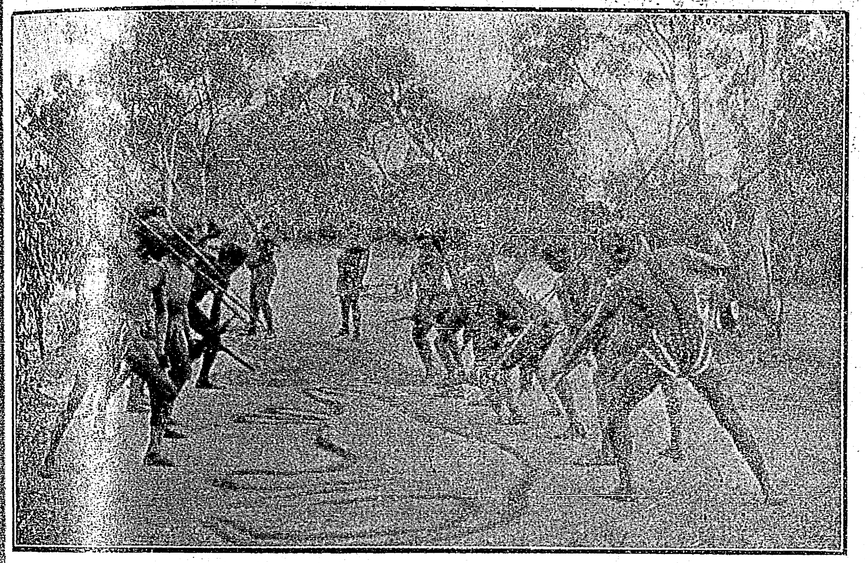

'বোড়া' উৎসব। (শিকার পর্ব্ব)—(ভূমিতে কোনও জীবমূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে সদলে তাকে বর্শা ও ধনুকের দ্বারা বিদ্ধ করা হয়।)

তার ভাবী শ্বশুরকে উপহার দিতে হয়। যদি কোনও বালক এই সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে অসময়ে নিষিদ্ধ ভোজ্য ভক্ষণ ক'রে, তাহ'লে তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ ক'রতে হয়। অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব, অঙ্গহানি ও কেশমুণ্ডন প্রভৃতি এই শাস্তির অন্তর্গত। বালকদের পক্ষে কতকগুলি উপাদেয় ভোজ্য নিষিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ওই সকল খাদ্য যাতে কেবলমাত্র পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য মজুত থাকে।

এই সকল জাতিগত, বংশানুক্রমিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান বেশীর ভাগ উত্তর প্রদেশীদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর উৎসব ছাড়া অন্যান্য যা কিছু উৎসব সে সমস্তই "বাঙ্গিয়ামে" ও "মুঙগাংগাউয়া" প্রভৃতি দেবতার পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই ঐন্দ্রজালিক যাদু-বিদ্যা ও ভৌতিক ভোজবাজীর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু এই যাদু-বিদ্যা মন্ত্র তন্ত্র ঝাড় ফুঁক্ প্রভৃতি—তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই জানে। কেবল অষ্ট্রেলিয়া ভিন্ন অপর সকল জাতির মধ্যে নারী ও নাবালকদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা একেবারে নিষেধ। অষ্ট্রেলিয়াদের মধ্যেও কতকগুলো এমন সব ভেল্কী আছে, যা তাদেরও মেয়েদের ক'রতে নেই, কেবলমাত্র পুরুষদেরই সেগুলো তে অধিকার থাকে। যেমন 'জোঁক বসানো' কাজ বা 'দৃষ্টি কাটানো' ব্যাপার! আমাদের দেশের

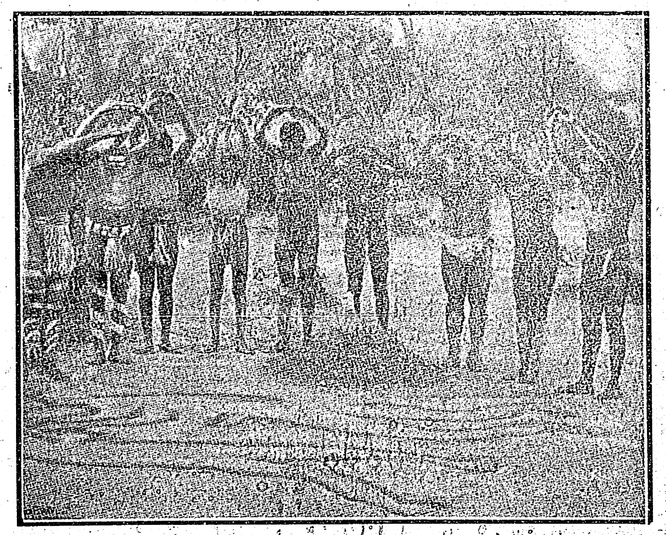

'বোড়া' উৎসব। (মন্ত্র পর্ব্ব)—(ছেলেরা সাবালক হলে এদের মধ্যে একটা উৎসবের আয়োজন হয়। তার নাম 'বোড়' উৎসব। ইংলণ্ডে এখনও এই আদিম যুগের সাবালক হওয়ার উৎসব-রীতি খানিকটা বজায় আছে। এই উৎসব মন্ত্র, ঔষধ, যাদু, অগ্নি, জীব প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে বিভক্ত।)



সবস্ত্রা নারীবৃন্দ—(এরা সকলেই জঙ্গলী মেয়ে বটে, কিন্তু কেউ বিবসনা নয়। লতা পাতা বা গাছের ছাল কোমরে ঝুলিয়ে এরা আ[illegible] রক্ষা করে।)

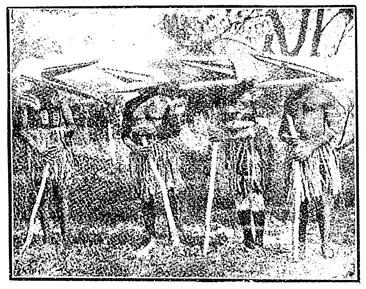

বোড়া উৎসব। (নৃত্য-পর্ব্ব)—(এই নৃত্যের বিশেষত্ব হ'চ্ছে সকলে কুম্ভীরের মুখোস পরিধান ক'রে লাঠির উপর ভর দিয়ে নাচে।)

ভেল্কীওয়ালারা যেমন একটা চাঁড়ালের হাড় বা আত্মারামের ছড়ি ব্যবহার করে, এরাও তেমনি একখানা হাড় বা মন্ত্রপুত যষ্টিখণ্ড ব্যবহার করে। এদের মন্ত্রও অনেকটা আমাদের দেশের রোঝাদের মতোই কেবল গালাগালি, ভয়প্রদর্শন ও অভিসম্পাতের সমষ্টি মাত্র। শত্রু নিপাতের জন্য এরা এই মন্ত্রপুত অস্থি চালনা করে। এটাকে অনেকটা আমাদের সেই প্রাচীন ঐন্দ্রজালিকদের "মারণ প্রকরণ" বলা যেতে পারে। এদের বিশ্বাস যে এই মন্ত্রপুত অস্থির

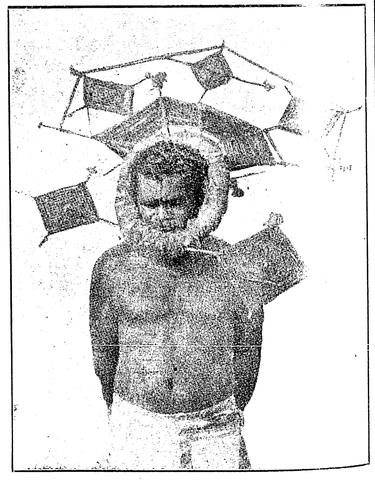

পবিত্র উষ্ণীষ—(উৎসব উপলক্ষে যারা পৌরহিত্য করে তাদের সকলে মাথায় এই পবিত্র উষ্ণীষ পরিধান করতে হয়।)

সাহায্যে শত্রুর নিধন একেবারে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যদি নির্দ্দোষীর প্রতি কেউ এই আস্থি 'মারণ' প্রয়োগ ক'রে

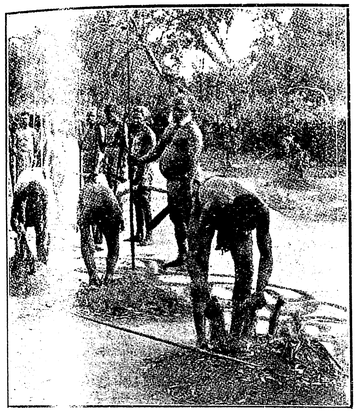

'বোড়া' উৎসব। (উষধ পর্ব্ব)

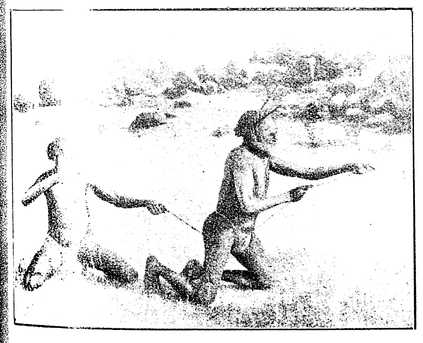

মৃত্যুবান—(কোনও শত্রুর মৃত্যু কামনা ক'রে এই অস্থি নির্দ্দিষ্ট সুদীর্ঘ গান মন্ত্রপূত করে গোপনে তার দিকে লক্ষ্য ক'রে ধরলেই অবিলম্বে তার মৃত্যু হবেই এইরূপ এদের বিশ্বাস।)

তা'হলে সেই মন্ত্রপূত অস্থি চালকেরই বিরুদ্ধে যায় এবং তার ঘোর অকল্যাণ, এমন কি প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত ঘটায়।

দক্ষিণ আষ্ট্রেলিয়ায় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়াই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম, কিন্তু এখানকার অন্যান্য প্রদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তিন রকমের বিভিন্ন অন্ত্যেষ্টি প্রথা প্রচলিত আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রথম হ'চ্ছে শোকোচ্ছ্বাস এবং মৃতব্যক্তির দেহ সমাধিস্থ করা বা বৃক্ষশাখায় কিম্বা কোনও উচ্চ স্থানে রেখে দেওয়া। দ্বিতীয় মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান এবং কে তাকে মারলে সেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। কারণ, হঠাৎ কেউ মারা গেলে এরা ধ'রে নেয় যে নিশ্চয় কেউ শত্রুতা ক'রে যাদুবিদ্যায় প্রভাবে তাকে হত্যা ক'রেছে। তৃতীয় এবং শেষ নিয়ম হ'চ্ছে, এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মায় সদগতির জন্য তার অস্থি সৎকারের অনুষ্ঠান! স্ত্রীপুরুষেরা দল বেঁধে বিকট চীৎকার ও উৎকট বিলাপ ছাড়া এই শোকানুষ্ঠানের আর একটি প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে নিকট আত্মীয়দের আপন হাতে অস্ত্রাঘাতে স্ব স্ব অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করা!

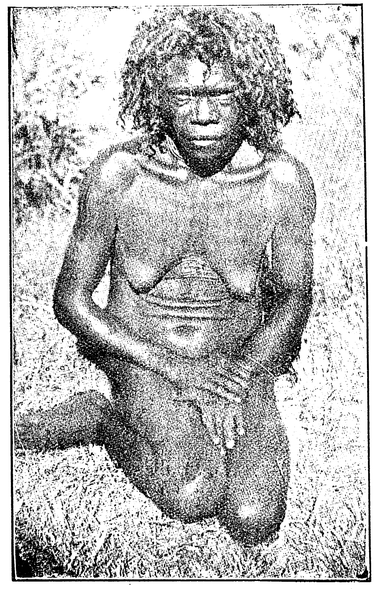

কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের মেয়ে

(আসরে বসে নৃত্য-গীত শুন্‌ছে এবং নাচগানের তালে তালে হাততালি দিয়ে ও উরুদেশ চাপ্‌ড়ে তালমানের অনুসরণ ক'রছে।)



দ্বন্দ্ব যুদ্ধ



বোড়া-উৎসব। (বৃক্ষপর্ব্ব)

(যে বৃক্ষতলে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় সেই বৃক্ষ-কাণ্ডটিকে তারা চিত্রবিচিত্র ক'রে।)

শোকোচ্ছ্বাস ঠিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয় —এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মৃতদেহ ভূসমাধি বা তরু-সমাধি লাভ ক'রে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলে। এই শোকোচ্ছ্বাসের সময় দলকে দল স্ত্রী পুরুষ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'রতে

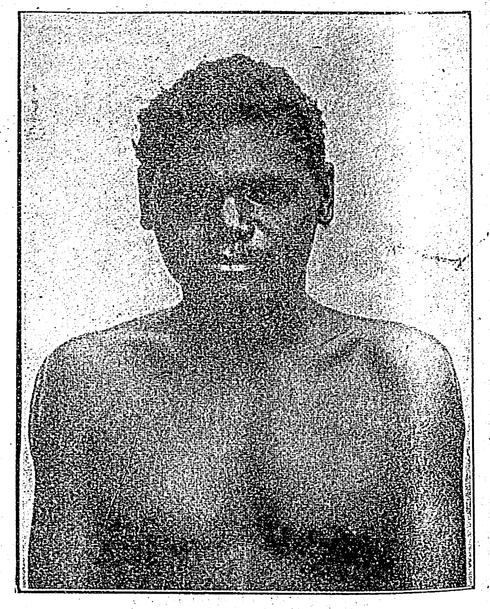

কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী

(এরা নদীতীরবর্ত্তী উত্তর প্রদেশে বাস করে। অসুরের মত শক্তিশালী এই বর্ব্বরের দল দাঙ্গাহাঙ্গামায় সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধের নামে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে, মরিয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। অধুনা এরা অল্প অল্প চাষবাসে মন দিতে শিখছে।)

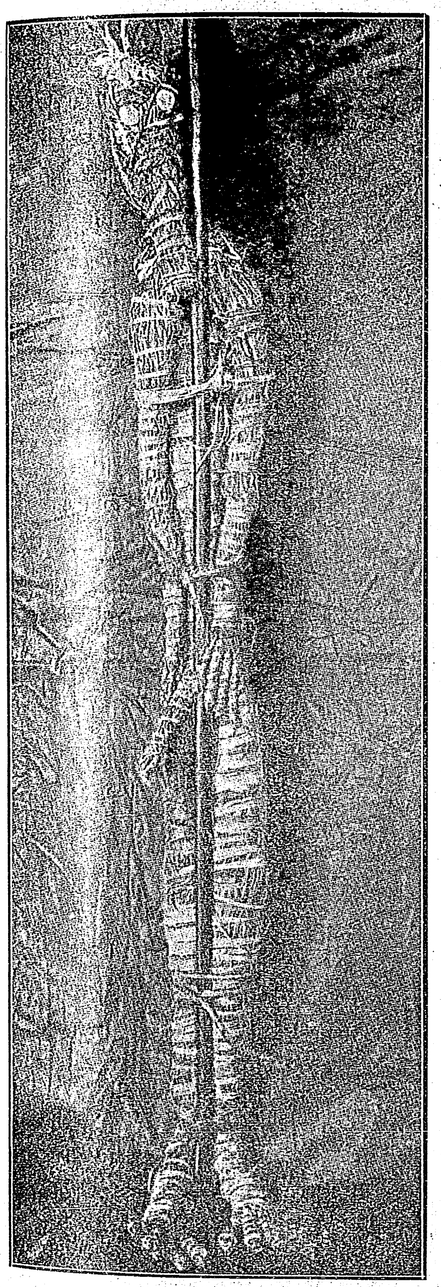

মশক-মারক—(শুষ্ক তৃণের তৈরী এই রাক্ষস মূর্ত্তি দগ্ধ ক'রে তারা মশক নিবারণ করে)।

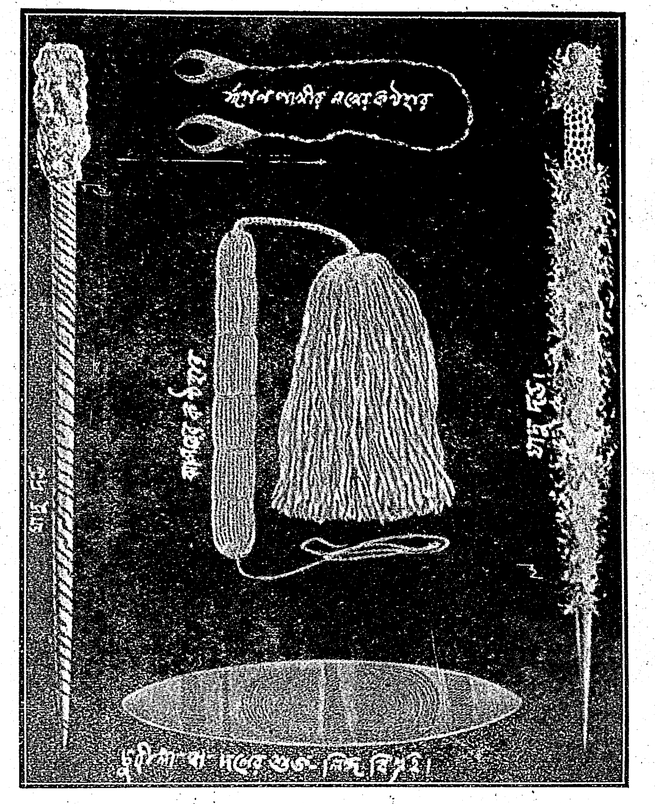

যাদুদণ্ড, অলঙ্কার ও চুরীঙ্গা বিগ্রহ

(দুইপার্শ্বে যাদুদণ্ড, মধ্যে ঈগলপাখীর নখের ও ঝালরের কণ্ঠহার এবং নিম্নে চুরীঙ্গা বা দলের শুভ-লিঙ্গ বিগ্রহ।)

থাকে এবং উন্মাদের মতো পরস্পরকে আঘাত ক'রে আহত ও রুধিরাক্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রতে থাকে। যে স্থানে দলের মধ্যে একজন কারুর মৃত্যু ঘটে, অমনি তারা সদলে সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র গিয়ে আড্ডা গাড়ে।

এই মৃত্যুর সময়ে শোকোচ্ছ্বাস আর সমাধি ও অস্থি-সৎকার প্রভৃতি—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানগুলি ছাড়া জংলী আষ্ট্রেলিয়ানদের জীবন প্রায় একরকম একঘেয়ে ভাবেই কেটে যায়; মাঝে মাঝে কেবল যা ঐ ওদের 'কড়োবেয়েড়ী' বা নৃত্য-উৎসব—তাদের সেই একঘেয়ে জীবনের পথে ক্ষণিকের জন্য বৈচিত্র্য এনে দেয়; নইলে তাদের পুরুষ-দের কাজ হ'চ্ছে সমস্তদিন ধরে পুরোণো অস্ত্র-শস্ত্রগুলো মেরামত করা, আর নূতন অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ করা; মাঝে মাঝে 'ক্যাঙ্গারু' ও 'অপোশুম্' প্রভৃতি-জানোয়ার শিকার করা এবং জালের সাহায্যে জীবন্ত 'এমু' পাখী ধরে বেড়ানো! স্ত্রীলোকদের এবং ছোট ছেলে মেয়েদের

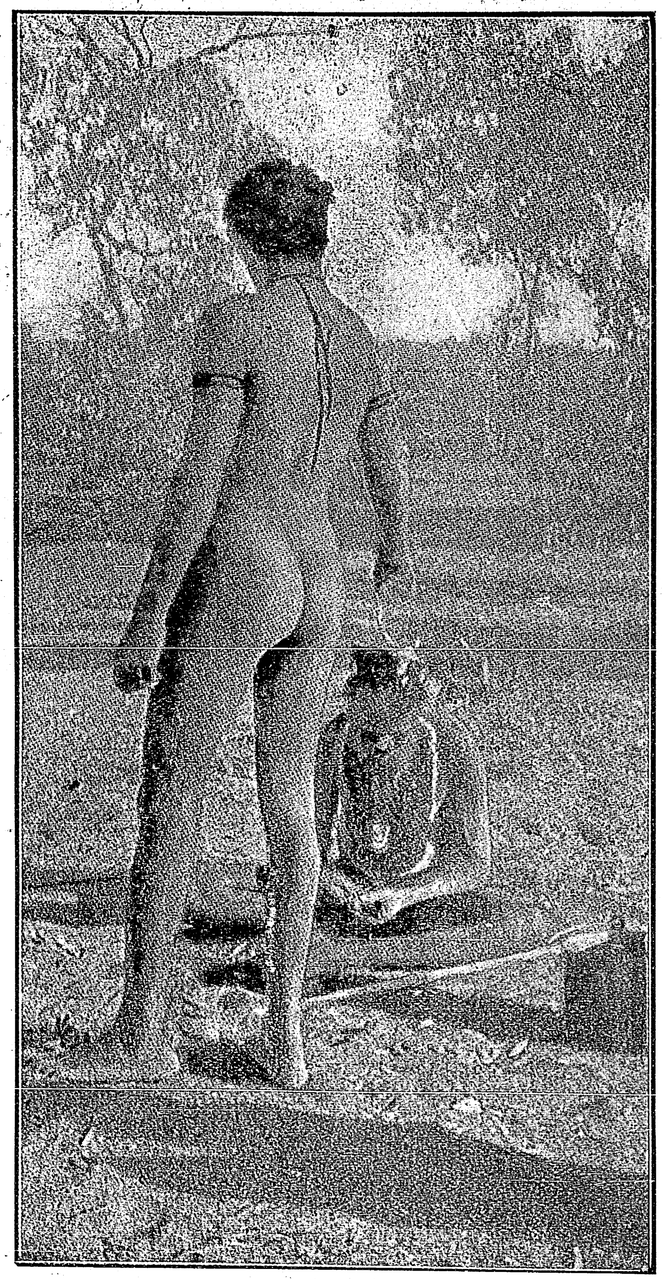

মৌন-ভঙ্গ

(সাবালক হওয়ার উৎসব যে কদিন চলে, সে কদিন বালককে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে থাকতে হয়। পরে উৎসব-শেষে একটি সপল্লব বৃক্ষশাখার দ্বারা কোনও প্রবীণের শিরস্পর্শ করলেই তার মৌন-ব্রত উদ্‌যাপন হ'য়ে যায়।)

কাজ হ'চ্ছে গির্‌গিটি, সাপ, কেঁচো ইত্যাদি এবং সুখাদ্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সংগ্রহ করে বেড়ানো। এ ছাড়া ঘাসের বীজ সংগ্রহ করাও তাদের একটা প্রধান কাজ; কারণ এই ঘাসের বীজ গুঁড়িয়ে নিয়ে তারই চাকাচাকা মোটা রুটি বানিয়ে খেতে তারা অত্যন্ত ভালবাসে। এই রুটী তাদের কাছে যেমনি প্রিয় তেমনি তাদের শরীরের পক্ষেও পুষ্টিকর।

একটা প্রবল উৎসাহ এদের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যখন এরা নতুন আর একদল স্বজাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে! দু'মিনিটের মধ্যে এরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নেয়। পুরুষেরা তাদের 'ধনুশ্চক্র' আর বর্ষা হাতে ক'রে আগে আগে চলে, তাদের পিছনে পিছনে মেয়েরা এক একটা কাঠের ডাবা মাথায় ক'রে তার মধ্যে গৃহস্থালীর আবশ্যক দু'একটা জিনিস ভ'রে নিয়ে বাঁ হাতে কচি ছেলেটাকে ট্যাঁকে করে ডান হাতে এক-গাছা লাঠি নিয়ে চলে। ছোট ছেলে মেয়েদের ব'য়ে নিয়ে যাবার ভার পড়ে নিঃসন্তান যুবতীদের উপর।

দলটি যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তারা যদি দেখে যে সেই অনাহূত অতিথিদের মধ্যে মেয়ে ছেলেরা আছে, তাহ'লে আর তাদের সেই হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা কোনও রকম সন্দেহ করে না; কিন্তু আগন্তুকের দলে যদি কেবল-মাত্র পুরুষদেরই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাহলে তারা বুঝতে পারে যে, এদের উদ্দেশ্য মন্দ সুতরাং তারাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। তবে যুদ্ধটা তাদের মধ্যে কোনও দিনই বিশেষ মারা-ত্মক রকমের হয় না। গোটা-কতক 'ধনুশ্চক্র' আর বর্ষা নিক্ষেপের পরই উভয়

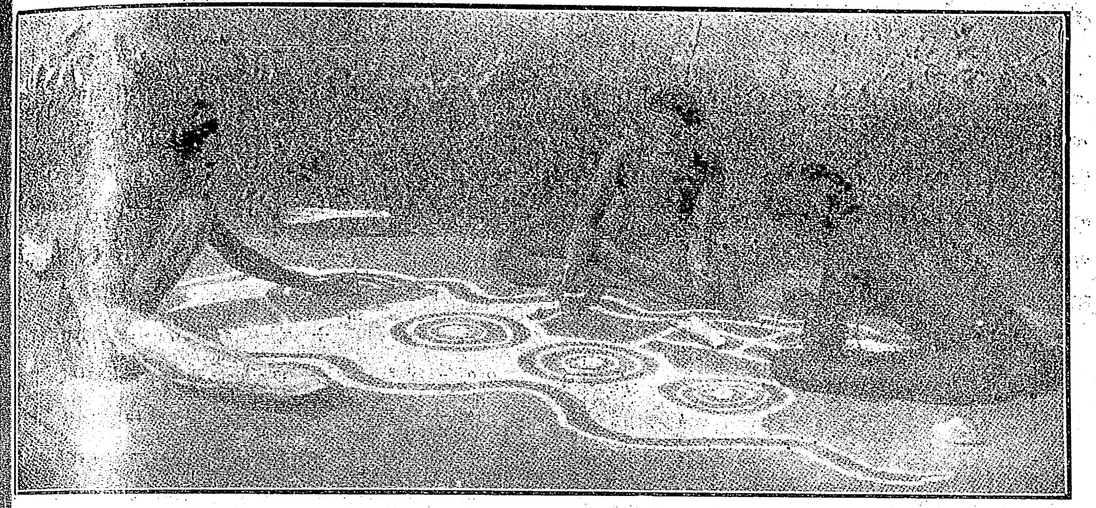

আল্‌পন—(উৎসব উপলক্ষে আল্‌পনা দেওয়ার প্রথা এদের মধ্যেও প্রচলিত আছে; কিন্তু আমাদের দেশে যেমন স্ত্রীলোকরাই কেবল এ কাজ করে, ওদের মধ্যে তেমনি পুরুষদেরই এ কাজ করতে হয়।)

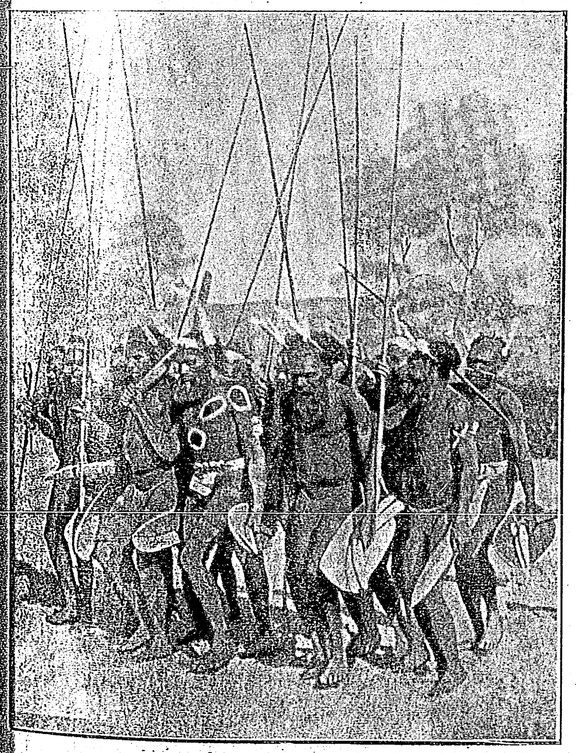

যুদ্ধযাত্রা—(কোনও স্বজাতি বা আত্মীয়ের মৃত্যু হ'লে এরা শত্রুপক্ষকে তার মৃত্যুর জন্য 'দায়ী করে' তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য সশস্ত্র হয়ে সদলে অভিযান করে।)

দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হ'য়ে যায়। এবং এক-বার সন্ধি হ'য়ে গেলে তখন আর তাদের মধ্যে কোনও প্রকার শত্রুতাই থাকে না।

মেয়েরা সঙ্গে থাকলে যুদ্ধের অনুষ্ঠানটা আর হয় না বটে, কিন্তু তা'বলে অতিথিদের তৎক্ষণাৎ অভিবাদন ক'রে গ্রহণ করাও হয় না। অতিথি-রাও একেবারে অপর দলের আড্ডার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় না। উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য অদূরে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা ক'রে বসে থাকবার পর স্থানীয় দলের লোকেরা এসে মহা সমাদরে তাদের আহ্বান ক'রে নিয়ে যায় এবং বিশেষ সমাদরে অতিথি-সৎকার করে।

এদের মধ্যে আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার। প্রত্যেকেরই এক একটা নাম আছে বটে, কিন্তু কেউ কারুর নাম ধ'রে ডাকে না, যার সঙ্গে যার যে সম্পর্ক তাকে সে সেই হিসেবে বাবা, মা, ভাই বা বোন বলে ডাকে। আবার মামা, খুড়ো, পিসে, মেসো, ঠাকুর্দা, দাদা মশাই, সবাইকেই এরা 'বাবা' বলে ডাকে এবং ওই সকল সম্পর্কের

মেয়েদের সকলকেই তারা "মা" বলে সম্বোধন করে। আপন আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যেই এদের বিবাহ করবার রীতি প্রচলিত; কেবল সহোদরা ভগিনী, পিতৃব্য, কন্যা এবং মাসীমার মেয়েকে বিয়ে করা একেবারে নিষেধ। মামার মেয়েরা এবং পিসির মেয়েরাই হ'চ্ছে এদের ছেলেদের বিবাহ করবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্তা পাত্রী! বিবাহে যাতে সম্পর্ক নিয়ে কোনও গণ্ডগোল না বাধে, এইজন্যে তারা সম্পর্কটাকে চার শ্রেণীতে ভাগ

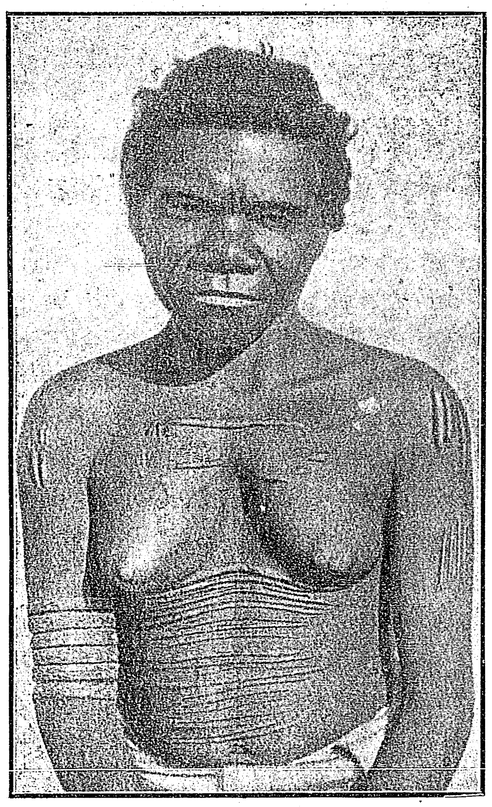

সুন্দরী বীভৎসতা—(যুবতীরা কিশোর বয়সেই সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র ক্ষত ক'রে রাখে। অঙ্গের এই অস্ত্র-ক্ষত-চিহ্ন তারা দৈহিক লাবণ্য-বৃদ্ধির সহায়ক বলে মনে করে।)

করেছে এবং কোন্ শ্রেণীর পুরুষ কোন্ শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করতে পারে এবং সেই বিবাহের ফলে কোন্ শ্রেণীর দল পুষ্ট হবে তার একটি সুন্দর তালিকা করে রেখেছে। এই শ্রেণী চতুষ্টয়ের নাম হ'চ্ছে যথাক্রমে 'বানাকা' 'বুরোং' 'পাল্‌জেরী' আর 'কাইমেরা'।

বানাকার ভাই বোনেরাও 'বানাকা' আর পিতামহের দলও "বানাকা।" কিন্তু বানাকার পুত্র কন্যা ও পিতৃ পিতৃব্যের দল হ'চ্ছে 'পাল্‌জেরী'। বানাকার মাতা ও মাতুলরা হ'ল 'বুরোং' এবং মাতুল-সন্তানেরা 'কাইমেরা'। সুতরাং যে বানাকা সে ওই 'কাইমেরা' শ্রেণী ছাড়া অপর তিন শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ ক'রতে পারে না। এদের তালিকাটি মনে ক'রে রাখ্‌লে আর কোনও গোল হবে না।

পুং-বানাকা + স্ত্রী-কাইমেরা = পাল্‌জেরী
পুং-বুরোং + স্ত্রী-পাল্‌জেরী = কাইমেরা
পুং-কাইমেরা + স্ত্রী-বানাকা = বুরোং
পুং-পাল্‌জেরী + স্ত্রী-বুরোং = বানাকা

আষ্ট্রেলিয়ার সকল শ্রেণীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাদের মাতা এমন কি দুজন সখীর নিজেদের বিবাহ হবার আগেও তারা পরস্পরের নিকট 'বাগ্‌দত্তা' হ'য়ে থাকে যে তাদের বিবাহের পর তাদের গর্ভে যদি যথাক্রমে পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সে দেশে

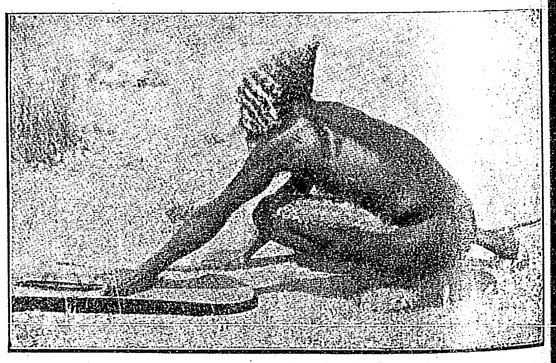

কুর্দ্দাইচ্ছা—(শত্রুকে আক্রমণ করবার পূর্ব্বে এরা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ক'রতে গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম "কুর্দ্দাইচ্ছা", এবং এদের বিশ্বাস যে এই অনুষ্ঠান বিজয়ের অব্যর্থ অনুকূল।)

ছেলে মেয়েরা ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে থাকে! পিতামাতা বা অভিভাবকগণের পুত্র কন্যার জন্য পতিপত্নী নির্ব্বাচন ক'রে দেওয়ার রীতি যা এদেশে এখনও চল্‌ছে, এটা সেই প্রাচীন অসভ্য যুগের আদিম সামাজিক প্রথা!

কেবলমাত্র তারাই দুজনে পরস্পরের পুত্র কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেবে বলে প্রতিশ্রুত বা' বাগদত্ত হ'তে পারে তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব হবে; অর্থাৎ সম্পর্কে বাধবে না; যেমন ছেলের বাপের বোন, ছেলের মায়ের মামা তো বোনের সঙ্গে 'বেহান' সম্পর্ক পাতাতে পারে।

এই বাগ্‌দত্ত হ'য়ে থাকার প্রথা প্রচলিত আছে বলে সে দেশের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের বিভিন্ন পার্থক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যেমন দু'জন বাগদত্তা সখীর মধ্যে একজনের হয় ত আগেই কন্যা লাভ ঘট্‌ল, কিন্তু অন্যের পুত্র হ'ল বহুদিন পরে; সে স্থলে স্বামীকে সেই বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীই গ্রহণ করতে হয়। আবার যেখানে উভয়েরই পুত্রলাভ ঘটে, যেখানে উভয়ের পুত্রকেই অপেক্ষা ক'রে থা'কতে হয় যে পর্য্যন্ত না আবার তাদের জননীদের পরস্পরের গর্ভে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এরূপ স্থলে অনেক সময় হয় ত দুর্ভাগ্যদের যৌবন-সীমা পার হ'য়ে যাবার পর পত্নীলাভ ঘটে!

তাদের মধ্যে বিবাহের কোনও একটা বিশেষ পদ্ধতি নেই। কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করলেই তাকে স্বামীর সহবাসে সমর্থা বলে বিবেচনা করা হয় এবং কন্যার আত্মীয়রা গাছের ডালপালা ও লতাপাতার আচ্ছাদন দিয়ে একটি ঘেরাটোপ নির্ম্মাণ করে; একদিন চাঁদনী রাতে ভাবী বরকে তার মধ্যে আহ্বান করে এনে তার হাতে কন্যাকে অর্পণ করে। ব্যস, সেই মধুরাত্রির পর থেকে তারা আজীবন স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস ক'রতে থাকে। নানাপ্রকার সম্পর্কের বাধা ও বিবিধ দৈব বিপত্তির বশে সে দেশের ছেলে মেয়েদের মনের মতো স্বামীস্ত্রী পাওয়া একটা দুর্লভ ব্যাপার। অনেক সময় কোনও কোনও ছেলে মেয়েকে আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় যাপন ক'রতে বাধ্য হ'তে হয়। তবে যারা সাহসী পুরুষ তারা জোর ক'রে অন্যের স্ত্রীকে অধিকার ক'রে নেয়, কিন্তু এই জোর ক'রে দখল করার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অশান্তি এসে উপস্থিত হয় ব'লে সেটুকু এড়াবার জন্য প্রায়ই দেখা যায় অবৈধ প্রণয় বা গোপন-মিলনের সংখ্যাটাই তাদের মধ্যে বেশী। আবার অনেক সময় বিবাহের পূর্ব্বেই বাগদত্ত পুত্র কন্যারা যেখানে পরস্পরের জন্য নির্দ্ধারিত পতি পত্নীকে পছন্দ না ক'রে অন্য কোনও যুবক বা যুবতীর প্রণয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, সেখানে তারা প্রায়ই ভাবী বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করে' তাদের মনোমত পাত্র পাত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অন্যত্র পলায়ন করে। তবে পলায়ন করেই যে তারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে তা নয়; কারণ স্ত্রী পাওয়া একটু দুর্লভ বলে ভাবী স্বামীর দল ও তাদের আত্মীয় স্বজন চারিদিকে পলাতকা বধূর অনুসন্ধান করতে থাকে এবং যদি তারা ধরা পড়ে, তাহ'লে সেই কন্যাকে তায় নির্দ্দিষ্ট ভাবী স্বামীর নিকট ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'তে হয়; এবং সেই কন্যা-অপহরণকারী উক্ত ভাবী স্বামীর হাতে লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অপহরণকারী কোনও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ নারীকে নিয়ে পলায়ন করে সে স্থলে অপহরণকারী এবং অপহৃতা উভয়কেই অবৈধ কার্য্যের জন্য ভীষণ দণ্ড ভোগ ক'রতে হয়; বিশেষতঃ যদি ভগ্নীস্থানীয়া কোনও বালিকার সঙ্গে এই অবৈধ প্রেম সংঘটিত হয় এবং তারা যদি উভয়ে পলায়ন ক'রে কোথাও দম্পতীর ন্যায় একত্র বসবাস করে, তা'হলে তাদের উভয়ের প্রাণদণ্ড করা হয়।

বহুবিবাহও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যে অধিক পণ দিতে পারে সে একজনের তিন চারটি কন্যাকেই একত্রে বিবাহ কর'তে পারে। কিন্তু যার বেশী সঙ্গতি নাই তাকে একটীমাত্র স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটাতে হয়। যদি কোনও স্বামী তার স্ত্রীর উপযুক্ত ভরণপোষণে অসমর্থ হয় তাহ'লে সে স্ত্রীর তাকে পরিত্যাগ ক'রে পত্যন্তর গ্রহণ করবার অধিকার আছে।

অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্য আপন স্ত্রীকে পর্য্যন্ত দান করা তাদের একটী অবশ্য পালনীয় প্রথা। স্বামীর অবিবাহিত ভ্রাতাদের সহিত সহবাসও ভ্রাতৃবধূদের পক্ষে কোনও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। কোনও কোনও জাতের মধ্যে আবার এরূপ প্রথাও প্রচলিত দেখা যায় যে, স্বামীদের প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধব যদি ইচ্ছা করে তবে পরস্পরের স্ত্রীকে যে কোনও দিন গ্রহণ ক'রতে পারে। অনেক সময় এই পরিবর্ত্তন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ

(প্রথম পর্য্যায়)

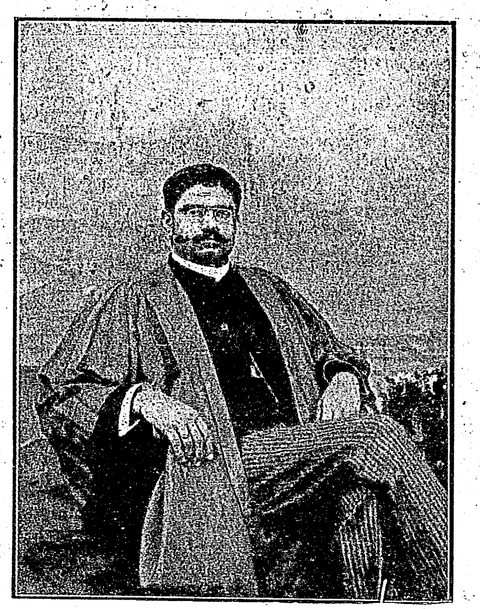

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এম-এ, বি-এল
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

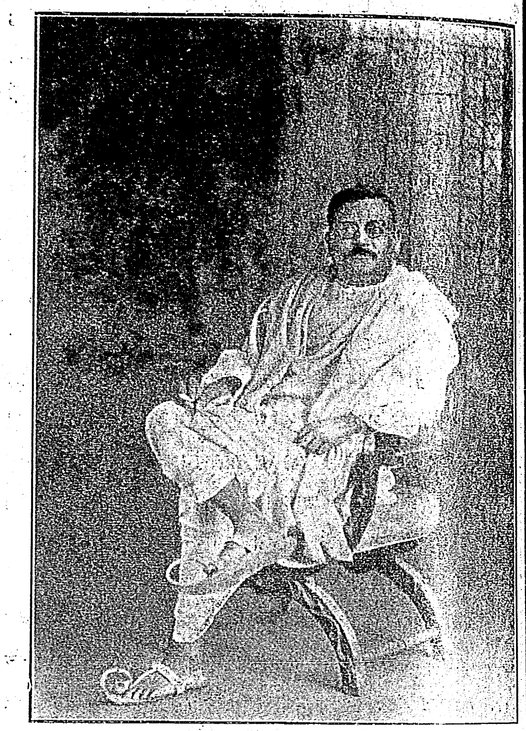

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র এম-এ, বি-এল কলিকাতা



মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বার-এট্-ল
চট্টগ্রাম, অমুসলমান কেন্দ্র

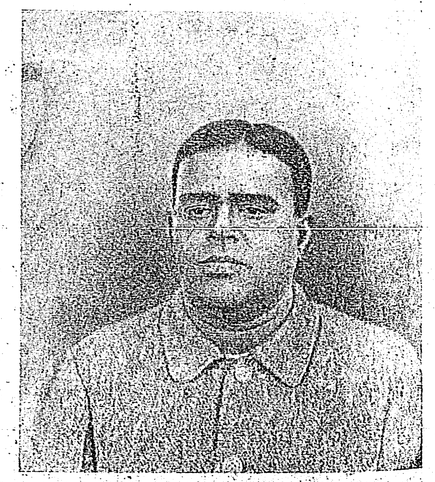

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বার-এট্-ল
মেদিনীপুর (দক্ষিণ) অমুসলমান কেন্দ্র

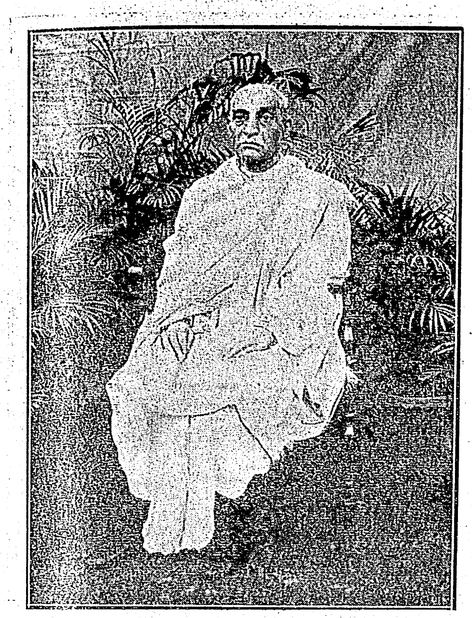

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বার-এট্-ল
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

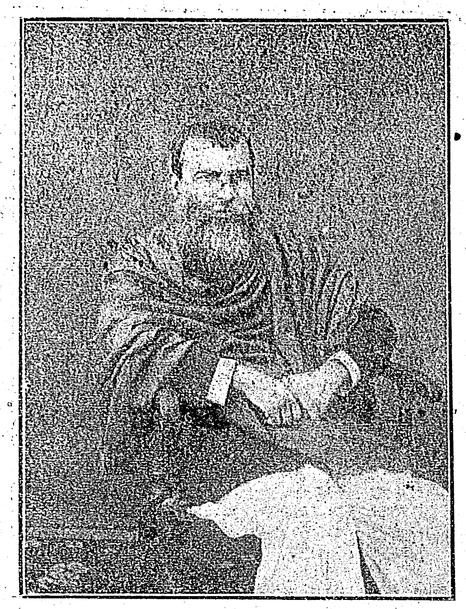

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ, বি-এল ২৪শ পরগণা

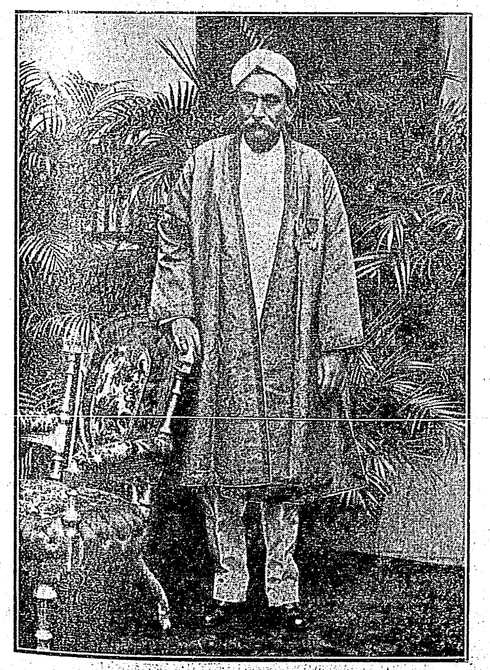

রাজা হৃষীকেশ লাহা
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

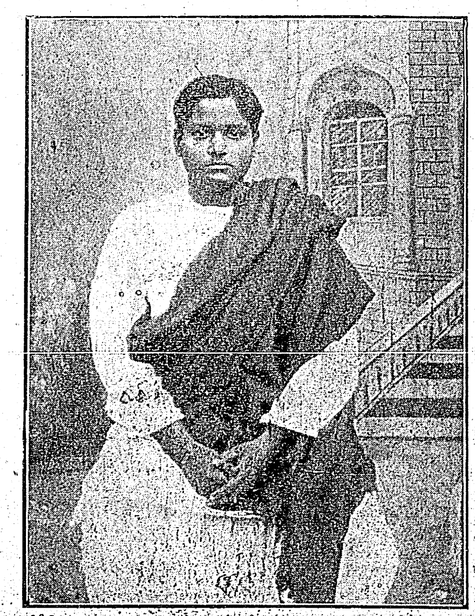

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার
নদীয়া, অমুসলমান কেন্দ্র

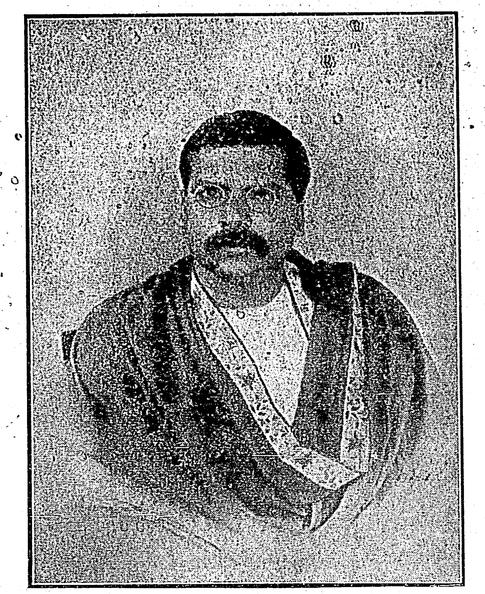

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি-এস সি
পূর্ব্ব কলিকাতা



শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বার এট্-ল
সাউথ সেণ্ট্রাল কলিকাতা



শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়
হুগলী, অমুসলমান-কেন্দ্র



রাজা মণিলাল সিংহ রায়
বর্দ্ধমান, অমুসলমান কেন্দ্র

নব-বিধান

(১)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল পত্নী-বিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার সূচনাতেই যদি না বন্ধু মহলে একটু বিশেষ রকমের চঞ্চুলজ্জায় পড়িয়া যাইতেন ত, এই ছোট্ট গল্পের রূপ এবং রঙ বদ্‌লাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত তাহা আন্দাজ করাও শক্ত। সুতরাং, ভূমিকায় যে বিবরণ টুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক,—বিলাতি ডিগ্রি আছে। বেতন আট শত। বয়স বত্রিশ। মাস পাঁচেক পূর্ব্বে বছর নয়েকের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙায় বাস, বাড়ীর মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা বাবুর্চ্চি, সহিস কোচমান প্রভৃতিতে প্রায় সাত আট জন চাকর। ধরিতে গেলে সংসারটা এক রকম এই সব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিলনা। ইহা স্বাভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুয্যের মেজ মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে এবং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহল ও সম্পূর্ণ বিশেষত্ব-হীন, তথাপি সেদিন সন্ধ্যাকালে শৈলেশেরই বৈঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া পড়িল। তাহার বন্ধু-সমাজের ঠিক ভিতরের না হইয়াও একজন অল্প বেতনের ইস্কুল পণ্ডিত ছিলেন, চা-রসের পিপাসাটা তাঁহার কোন বড়-বেতনের প্রফেসারের চেয়েই ন্যূন ছিলনা। পাগ্‌লাটে গোছের বলিয়া প্রফেসররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া ডাকিতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিতনা, তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিতনা। দিগ্‌গজ নিজে ইংরাজি জানিতনা, মেয়ে মানুষে এক্‌জামিন পাশ করিয়াছে শুনিলে রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। ভূপেন বাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে খেলেন, আবার বিয়ে? সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চায্যির মেয়ে দোষটা করলে কি শুনি? ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়ীতে আনুন,—আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোনমতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ।

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁস থাকিতনা, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সব্বাই! আমাকেও লোকে পাগল বলে,—তাই বলে আমি পাগল!

সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িলনা। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিত মুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত unfortunate ব্যাপার। বিলাত যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা নিয়ে ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা'ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়ীতে রাখতেও পারেননি। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখিনি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ওহে দিগ্‌গজ! বুদ্ধিমান! তা' না হলে কি তাঁরা একবার পাঠাবার চেষ্টাও করতেননা? চায়ের মজ্‌লিসে গরহাজির ত কখনো দেখ্‌লুমনা, কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে এ আশা আর কোরোনা। গঙ্গাজল আর গোবরছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ

করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখ্‌লুম!

দিগগজ জোর করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না!

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেননা। ইহার পরে, সাধারণ গোছের দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রায় এম্‌নি সময়েই প্রত্যহ সভাভঙ্গ হয়,—হইলও তাই। কিন্তু আজ কেমন একটা বিষণ্ণ, ম্লান ছায়া সকলের মুখের পরেই চাপিয়া রহিল,—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিলনা।

(২)

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেননা, বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়াই গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিলনা, অপরদিকে তেম্‌নি লজ্জারও অবধি রহিলনা। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠারো বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী ঊষার বয়স তখন মাত্র এগারো। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালিপদবাবু অল্পমূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনো-মালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে এক প্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেননা। ইচ্ছাও তাঁহার ছিলনা। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন, অযাচিত, কোন মতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেননা। শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়া-ছিল; ভাবিয়াছিল বাড়ী গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর চারেক পরে যখন যথার্থই বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদ্‌লাইয়া গেছে অতএব আর একজন বিলাত-ফেরতের বিলাতি আদপ-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে। শৈলেশের পিতা কালিপদ বাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতকালের মধ্যে ও-বাড়ীর কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া দিন কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগ্‌লামিতে ভাইয়েরা পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার শ্রুতিসুখকর নহে, কেবল, একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয়না। দিলে শৈলে-শের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্নামের আভাস মাত্রও কোন সূত্রে আজও তাহাকে শুনিতে হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল। ভূপেনবাবুর শিক্ষিতা কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেই নয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে আনিয়া একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি গৃহিণীপনার ভার দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বিশেষতঃ, সোমেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপ বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ী শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু ইহা ত' চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দিগগজ পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এম্‌নি করিয়া তাহার শোধ দিল!

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিলনা, কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ। তাই, সত্যকার লজ্জার চেয়ে চক্ষুলজ্জাই তাহার প্রবল ছিল। বিদ্যাভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার এই ছিল যে, সে জ্ঞানতঃ, কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারেনা। বন্ধুরা মুখে না বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে ইহা বুঝিতে বাকি ছিলনা,—এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে

পাঠাইলেই ত' সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমতঃ সে আসিবে না। যদি বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে দুদিনেই আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই দু' পাঁচ দিন সোমেনকে তাহার পিসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল! এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই ত' ঠিক!

কলেজ হইতে সে সাতদিনের ছুটি লইল। এলাহাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের যাওয়ার কথা তাঁহাকে তার করিয়া দিল, এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নন্দীপুর হইতে ঊষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত সে যেন আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহা-বাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাতো ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী আফিসে চাকুরি করিত। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, ভুতো, তোকে কাল একবার নন্দীপুরে গিয়ে তোর বৌদিদিকে আন্‌তে হবে।

ভুতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিদিটা আবার কে?

তুই ত বর-যাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভট্টাচায্যির বাড়ী?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনিনে, তিনি আস্‌বেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল, না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আস্‌বে না বল্‌লেই ফিরে আস্‌বি।

ভুতো আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাবো। কিন্তু মার-ধর না করে।

শৈলেশ তাহার হাতে খরচ-পত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেণে আমি এলাহাবাদ যাচ্চি। সাতদিন পরে ফিরবো। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভুতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হল কেন মেজ্‌দা? থাল খুঁড়ে কুমীর আন্‌ছনা ত?

শৈলেশ চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আস্‌বেনা নিশ্চয়। কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত! শ্যামবাজারে একটা খবর দিস্। সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পঞ্জাব মেলে শৈলেশ্বর এলাহাবাদ চলিয়া গেল।

(৩)

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুরবেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল। এবং, মিনিট দুই পরেই একটি বাইশ তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সোমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যালবাম হইতে তাহার নূতন মাকে ছবি দেখাইতেছিল; সে-ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসিমা।

ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরনে নিতান্ত সাদা-সিধা একখানি রাঙা-পেড়ে শাড়ী, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই একখানি গহনা, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক হইল।

প্রথমে ঊষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসিমাকে প্রণাম কর্‌লেনা বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। ঊষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে ঠাকুরঝি, বোসো?

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

ঊষা বলিল, সোমবারে এসেছি, আজ বুধবার,—তা'হলে তিন দিন হল। কিন্তু, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হবে কেন ভাই, বোসো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ী হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার,—ঢের কাজ। সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রুক্ষতার জবাব ঊষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি করে থাক্‌বো ভাই? সেখানে বৌয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ একজন কাছে না থাক্‌লে ত আমি বাঁচিনে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেছেন আমার ওখানে

গিয়ে থাকতে। আমার নষ্ট করবার সময় নেই সোমেন,—যাও তো শীগ্‌গীর কাপড় পরে নাও; আমাকে আবার একবার নিউমার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দুজনের মাঝখানে পড়িয়া সোমেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসিমা? তাহার বিপদ দেখিয়া ঊষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করছিনে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়ীতে আমার বড় কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিল না, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্যে দিয়া আঙুল বুলাইতে বুলাইতে ঊষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায়না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

ঊষার ঠোঁটের কোন দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত করে উঠ্‌তে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ। ও বোঝেই বা কতটুকু। আর অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুল্‌লে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেচি, এ সব আমি সাম্‌লাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা'হলে চিঠি লিখে দেবো।

ঊষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার কলকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড়, এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পাবে না। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বস্‌লে না পর্য্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৌদিদির কাছে এসে বস্‌বে, এ কথাও আজ তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিল না, কহিল, আজ আমার সময় নেই,—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়ীতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া ঊষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

(৪)

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের নীচের বারান্দায় বসিয়া সোমেন্দ্র কতকগুলা কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্রই সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্ট ভাবে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনো সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়াতেই বলিয়া উঠিলেন, ও সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এক কথায় ফাঁস করিল না, বলিল, তুমি বল ত বাবা ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি করে জান্‌ব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ!

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপ কি হবে?

ইহার অদ্ভুত বিবরণ সোমেন আজ সকালেই শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যাবেলায় উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙাতে হবে বাবা। মা বলেন, আমার ঠাকুদ্দাদারা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টান মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া দিয়া ধমক্ দিয়া কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করেন! যত সমস্ত কুসংস্কার,—যা' পড়গে যা' বল্‌চি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছত্রাকার হইয়া পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপরে কোথা

হইতে অত্যন্ত মিষ্ট কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবা সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও ভাল একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দেব, তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেল। শৈলেশ কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীর বিরক্ত মুখে তাঁহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘণ্টার শব্দ হইল—টুন্ টুন্ টুন্ টুন্! কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল?

আবদুল আসিল না।

গিরধারী? গিরধারী?

গিরধারীর পরিবর্ত্তে বাঙালী চাকর গোকুল গিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে—

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিলেন, আজ্ঞে? ব্যাটারা মরেচিস্?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কই?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটি দিয়েছেন, সে বাড়ী গেছে।

ছুটি দিয়েছেন! বাড়ী গেছে! গিরধারী কোথা গেল?

গোকুল জানাইল সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে। শৈলেশ স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, বাড়ীতে কি লোকজন কেউ আর নেই নাকি?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,আজ্ঞে, আর সবাই আছে।

তাই বা আছে কেন? যা দূর হ—

শৈলেশ্বর নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া রাখিল; আলনা হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে সেটা নীচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; নেক্‌টাই কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখেই টেবিলের উপরে ছোট্ট একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল,—মলাটে লেখা, সংসার খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল মেয়েলি অক্ষরের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। দৈনিক খরচের অঙ্ক,—মাছ এত, শাক এত, চাল এত, ডাল এত,—হঠাৎ দ্বারের পর্দ্দা সরানোর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল কে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে আর যেই হোক দাসী নয়, তাহা চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এতবেলায় আবার চা খাবে না কি? কিন্তু তাহ'লে আর ভাত খেতে পারবে না।

ভাত খাবোনা।

না খাও, হাত মুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান করে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক করে আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেচি। চল।

এখন থাক্।

ওগো আমি ঊষা,—বাঘ ভালুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি ছি করবেনা।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ ভালুক?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্চো কেন?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন?

ঊষা কহিল, ও তোমার বানানো কথা। তোমাকে সে কখ্‌খনো লেখেনি আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েচ কেন?

কে বলেচে তাড়িয়েচি? সে এক বছরের মাইনে পায়নি, বাড়ী যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিল; আমি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েছ? তাহ'লে সে আর আস্‌বেনা। গিরিধারী গেল কেন?

ঊষা কহিল, এ তো তোমার ভারি অন্যায়। চাকর বাকরদের মাইনে না দিয়ে আট্‌কে রাখা—কেন, তাদের কি বাড়ী-ঘর-দোর নেই না কি? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম বানিয়ে তুলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই চমকিয়া কহিল, এটা কি? চারশ ছ' টাকা—

ঊষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েছি। এখনো বোধ করি শ'দুই আন্দাজ বাকি রইল, বলেচি আস্‌চে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক হইয়া বলিল, ছ'শ টাকা মুদির দোকানে বাকি ?

ঊষা হাসিয়া কহিল, হবেনা ? কখনো শোধ করবেনা, কখনো হিসেব দেখ্‌তে চাইবেনা,—কাজেই দুবচ্ছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দুবৎসরের হিসেব দেখ্‌লে নাকি ?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি ?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িতেছে, এ কথা এ পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও ঊষার চিনিতে বাকি রহিলনা, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব্‌চো বল ত ?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাব্‌ছি টাকা যা ছিল সব তো খরচ করে ফেল্‌লে, কিন্তু মাইনে পেতে যে এখনো পনর ষোল দিন বাকী ?

ঊষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলে মানুষ যে সে হিসেব আমার নেই ? পনর দিন কেন, এক মাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসবোনা। কিন্তু কি কাণ্ড করে রেখেছ বল ত ? গোয়ালা বল্‌ছিল তার প্রায় দেড়শ টাকা পাওনা, ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জ্জির দোকানে যে কত পড়ে আছে সে শুধু তারাই জানে। আমি হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি ? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বল্‌বে কি, কি,—দেবে কোথা থেকে ?

ঊষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল, একেবারেই দিতে পারবো তা তো বলিনি, আমি তিন চার মাসে শোধ কোরব। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখোনি ? আমাকে লুকিয়োনা।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিম্‌লা যেতে একজনের কাছে হ্যাণ্ডনোটে দু-হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি।

ঊষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখ্‌চি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবে না। কিন্তু আর কিছু নেই ত ?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাক্‌তেও পারে, কিন্তু আমি ত ভেবেচি এ জন্মে ও ধার শোধ দিতে পারব না।

ঊষা কহিল, তুমি কি সত্যিই কখনো ভাবো ?

শৈলেশ বলিল, ভাবিনে ? কতদিন অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে যেন দম আট্‌কে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমাকে তুমি ভুলিয়োনা। যথার্থই কি আশা কর শোধ করতে পারবে?

ঊষার চোখের কোন সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও চিনিতনা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, তাহারই জন্য হৃদয়ে সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েছে, শোধ দিতে হবেনা ? কিন্তু এই ক'টা টাকা দিয়ে ফেল্‌তে আমার ক'দিন লাগবে!

সকলের বড় কষ্ট হবে—

ঊষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবেনা কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল অনেক দিনের মেঘ্‌লা আকাশের কোন্ একটা ধার দিয়া যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

২০। বাতাবী লেবুর দোষ শোধন

আমাদের একটী বাতাবী লেবুর গাছ আছে। তাহাতে যে লেবু হইতেছে উহা কাঠের মত শুক্‌না,—কিছুমাত্র রস নাই।—কিন্তু এদিকে খেতে বেশ মিষ্টি। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া কি উপায়ে লেবুগুলিকে রসাল করা যাইতে পারে তাহা বলিয়া দেন ত বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীদলীলউদ্দিন মোল্লা

২১। বেদান্ত-বিচার

কাশীধামে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যে শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল। ইহা চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে। এই বিচারের তথ্যসমূহ কোন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কি না ? হইয়া থাকিলে তাহার নাম কি ও কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রীতারাপদ লাহিড়ী

২২। হলুদ প্রস্তুত

বাজারে দুই প্রকার হলদী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে এক প্রকার হলদীকে পাটনাইয়া হলদী বলা হয়। সেই হলদীই বাজারে বেশী কাটতি। সেই হলদী কি প্রকার তৈয়ার ও রং করিতে হয় ও সেই হলদী লাগাইবার জন্য কোথায়, কত দামে বীজ কিনিতে পাওয়া যায় ও কোন সময় লাগাইতে হয় ?

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন

২৩। প্রত্নতত্ত্ব

ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তটস্থিত এগার সিন্ধু গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে মুসলমান বাদ্‌শাহদের আমলের একটী কেল্লা আছে। ঐ গ্রামের ঐরূপ নামের অর্থই বা কি এবং এগার কেল্লার প্রকৃত নির্ম্মাতা কে ? ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা উত্তর চাই।

শ্রীমোহাম্মদ দানেশ

২৪। লীলাবতী কে ?

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন, শিবের গাজনের সময়, "লীলাবতী" খেলার বিধি, বঙ্গের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লীলাবতী কে ? কেহ বলেন,—ইনি বুদ্ধের একজন শিষ্যা; আবার কেহ বলেন,—গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের পত্নী শৈব ধর্ম্মাবলম্বী লীলাবতী। কোন্‌টী সত্য ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

২৫। রম্ভার শুভাশুভ ফল

রম্ভা প্রত্যেক শুভকর্ম্মে আবশ্যক হয়; কিন্তু যখন কোন শুভকার্য্যে কোথায়ও গমন করা হয়, তখন যদি (রম্ভা) শব্দটী উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে অশুভ ফল হইবে বলিয়া মনে করি কেন ?

২৬। কৃষিতত্ত্ব

আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল একটী বোম্বাই আমের কলম রোপণ করা হইয়াছে। দুই বৎসর পরে গাছে প্রথম মুকুল ধরিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বারে মুকুল ভাঙ্গিয়া দিতে হয় প্রবাদ থাকায়, যথাসময়ে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৎপর হইতে এ যাবৎ গাছে আর মুকুল ধরে নাই। ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা কি ? নূতন আম গাছে প্রথম বারে মুকুল ধরিলে ভাঙ্গিয়া দিতে হয় কেন ? শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রামাণিক

২৭। নির্লোম করিবার উপায় কি ?

সর্ব্বাঙ্গে অধিক পরিমাণে লোম থাকা বহু অসুবিধা ও কষ্টের কারণ। বাজারের লোমনাশক বিষাক্ত ও কার্য্যকরী নহে। যাহা দ্বারা চিরকালের জন্য বা অন্ততঃ কতিপয় বৎসরের জন্য লোম সমূলে ধ্বংস করা যায় এরূপ বিষহীন কোন পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি ?

শ্রীহেমনলিনী বসু

২৮। মিসি বাবার অর্থ কি ?

আজকাল বালিকা স্কুল ও কলেজে এবং তথাকার বোর্ডিং সমূহে একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যে কোন দ্বারবান, বেয়ারা (Bearer), মালী অথবা কোচম্যান, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের "বাবা" সম্বোধন করিয়া থাকে। "সরযু বাবা" "সুবালা বাবা" "কনকলতা বাবা" ইত্যাদি। ছাত্রীদের নামের পেছনে "বাবা" শব্দ প্রয়োগের স্বার্থকতা কি এবং কখন হইতে, কাহার দ্বারা এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে ? সাহেব বাড়ীর আয়ারা (খাসিয়া—নেপালী 'ঝি'রা) Baby দের "বাবালোক" বলিয়া থাকে; সেই হইতে, লোকে"র "বাবা" শব্দটুকু মেয়ে ছাত্রীদের নামের সঙ্গে চলিত হইয়াছে কি না ?

শ্রীসরলকুমার দাস

২৯। শুভাশুভ লক্ষণ

দৈবাৎ কোনও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য হস্তস্খলিত হইলে, বাটীতে আগন্তুক আসিবে বলিয়া ধারণা হয়। এইরূপ ধারণার ভিত্তি কি।

শ্রীআশালতা দেবী।

৩০। দ্বিতীয় পক্ষের দুর্ভাগ্য

১। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগদান করিতে নাই কেন ?

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রাহা

৩১। কাঁচা সোণা পাকা করা

১। কাঁচা সোণাকে পাকা করা যায় কিরূপে ? স্বর্ণকারগণ যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, অর্থাৎ Nitric Acidএ জ্বাল দিয়া পাকা করে,

তাহাতে সোণার কোন ক্ষতি হয় কি না, আর মূল্য কমে কি না। অনেক সময় দেখা যায় নীচে Sediment পড়ে, তন্মধ্যে সোণা থাকে কি না? কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া সোণা কিরূপে পাকা করা যায় তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী

৩২। ক্ষৌর-কর্ম্মের বিধি-নিষেধ

প্রবাদ আছে বিবাহের পূর্ব্বে ক্ষৌর-কর্ম্ম নিষিদ্ধ ও পিতার বর্ত্তমানে শ্মশ্রু মুণ্ডন একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু নিষ্ঠাবান মহারাষ্ট্রীয় ও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণগণকেও পিতার বর্ত্তমানে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে দেখা যায়। অতএব ইহা কি কেবল দেশাচার? না শাস্ত্রে ইহার কিছু বিধান আছে ও যদি থাকে ত কোন্ শাস্ত্রে আছে? শ্রীঅরুণ বসু

৩৩। সামাজিক আচার ব্যবহার

(ক) এক গৃহে অথবা এক আচ্ছাদনের নীচে 'জল অচল' জাতির কেহ দূরে থাকিলেও পান ভোজন করা নিষিদ্ধ দেখা যায়। ইহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কিনা?

(খ) ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ক্ষৌরকার অহিন্দুর ক্ষৌর কার্য্য করে। কিন্তু হিন্দু-নমঃশূদ্রের ক্ষৌর কার্য্য করে না। এই না করার হেতু সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? যদি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেও নমঃশূদ্রের ক্ষৌর কার্য্যে কাহারও আপত্তি থাকে ত, তাঁহার কি যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা কেহ জানাইবেন কি? শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্য্য

৩৪। কাঁটায় স্বাস্থ্যনাশ

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সবডিভিসনের অন্তর্গত কতিপয় স্থানের পুষ্করিণীগুলিতে একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়। উহা পুষ্করিণীতে উৎপন্ন হইয়া মৎস্য ও পানীয় জল উভয়ই নষ্ট করে। উহাদের মূল মাটীতে থাকে এবং উহা বর্দ্ধিত হইয়া জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ উহাকে পানা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। উহার চলিত নাম "কাঁটা"। উহা পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার একটী প্রধান কারণ। উহা নিবারণের উপায় কি?

৩৫। হলুদের ব্যবহার

হিন্দুজাতির বিবাহের সময় হরিদ্রার অতিশয় ব্যবহার দেখা যায়। বলিতে গেলে হরিদ্রা ব্যতীত বিবাহ কার্য্য হইতে পারে না। ইহার কারণ কি? হরিদ্রার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কিছু বলিয়াছেন কি? উহার কি বৈজ্ঞানিক কোনও গুণ আছে। শ্রীপশুপতি মাইতি

৩৬। বাসীজলের গুণ

গ্রামে কবিরাজগণ অনেক সময় বাসীজল ঔষধের অনুপমরূপে ব্যবহার করেন। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি জল বাসী হইলে কেন তাহার উপকারিতার আধিক্য লক্ষিত হয়, বুঝাইয়া দেন, তবে বিশেষ আপ্যায়িত হইব। মোঃ শাহাবউদ্দিন

৩৭। শিশুর আদর

ঘুমন্ত শিশুকে আদর করিতে নাই কেন? ইহার ভিতর কোন পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি না?

৩৮। আমলকীর কথা

রবিবার ও বৃহস্পতিবারে আমলকি খাইতে বা ছুঁইতে নাই কেন? ইহাতে কোন শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে কি না? শ্রীযুথিকা দাশগুপ্তা

৩৯। ধান্যের পোকা নিবারণ

হৈমন্তিক ধান্য পাকিলে বা পাকার পূর্ব্বে একপ্রকার পোকা উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। উক্ত পোকা কলাই, সরিষা প্রভৃতি আরও দুই একটী শস্যও ঐ ভাবে নষ্ট করে। ঐ পোকার উপদ্রব নিবারণের কোনও উপায় আছে কি? একপ্রকার পোকা আছে, উহারা প্রধানতঃ ধান্যক্ষেত্রে থাকে। উহাদের শরীর গ্রন্থিযুক্ত এবং বর্ণ সবুজ। গোকাগুলিকে "নাড়া পোকা" বলে। উক্ত পোকা কাহারও শরীরের সংস্পর্শে আসিলে সংস্পৃষ্ট স্থান ফুলিয়া যায় এবং পরে সেখানে ঘা হইয়া মাংস পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে। ঐ পোকার সংস্পর্শ ঘটিলে কি উপায় অবলম্বন দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে! শ্রীনিরঞ্জনাথ রক্ষিত

৪০। শৃগালী ও বসুদেব

বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে রাখিতে যান তখন নাকি এক শৃগালী তাহার আগে আগে যমুনা পার হইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে যমুনায় জল বেশী নাই। এই শৃগালীর কথা কোন্ পুরাণের কোথায় আছে? চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

ভারতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠক ৩১নং প্রশ্নে শ্রীযুক্ত গণপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে শ্রীশ্রীনারায়ণ চিত্র কোথায় পাওয়া যায়। "সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী," "সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট," "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী 'কেয়ুর' বিশিষ্ট, হিরণ্ময়বপুধৃত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর ১৩২৮ বাঙ্গালার লটকান দিনপঞ্জিকার (Calender) অতি সুন্দর ও ভক্তিউদ্রেককারী মনোমোহন রূপে অঙ্কিত আছে। শ্রীভূতনাথ দাস অধিকারী

কাশীযোড়া

কবি নিত্যানন্দ, দক্ষিণবঙ্গ মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। কাশীযোড়া নামক স্থানটী এই জেলারই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু উহা ঐ জেলার তমলুক মহকুমার বর্ত্তমান কাশীযোড়া হইতে পারে কি না, ইহাই সন্দেহের বিষয়। অদ্য ৮।১০ বৎসর হইল আদি কৃত্তিবাসী রামায়ণের হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথির খোঁজ করিতে গিয়া দ্বিজ নিত্যানন্দের—পূজাস্থাপনা পালা, (ইন্দ্র-পূজা) বাল্মীকি পালা, (সীতা-পূজা) পাণ্ডব-পূজা, নিমাজাগাতির পূজা ও বিরাট-পূজার পুঁথীগুলি প্রাপ্ত হই। নিত্যানন্দের ভণিতা-যুক্ত লক্ষ্মীমঙ্গল ও দক্ষিণ রায়ের পালা (কালুরায়ের গীত) ও তৎসঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পুঁথীগুলির সমস্তই তালপত্রে উৎকলাক্ষরে লিখিত ছিল। উহাতে নন্দের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

শীতলামঙ্গলের জাগাতি পূজার ৯ম পয়ারের শেষে লিখিত আছে:—

"কাশীযোড়া ষষ্ঠীপাড়া অতি বিচক্ষণ।
শ্যামতুল্য রাজা তাতে রাজনারায়ণ।"
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলা মঙ্গল রচে পানে সুধা মত॥"

বিরাট-পূজার ১৮শ পয়ারেও এইরূপ—

"কাশী যোড়া ষষ্ঠী পাড়া অতি বিলক্ষণ।
শ্যাম তুল্য রাজ্য পালে রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতটে সিংহ হলধর॥"

লিখিত আছে। সুতরাং কাশীযোড়া স্থানটী যে কোনরূপ ক্ষুদ্র গণ্ড-গ্রাম ছিল, এ কথা বলা যায় না। উহাতে অনেকগুলি গ্রাম এবং ইহার অন্তর্গত "ষষ্ঠী পাড়া" গ্রামে রাজা রাজনারায়ণের গড়বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ উহা পরগণা বা তদনুরূপ বহুদূরব্যাপী স্থান ছিল। রাজা রাজনারায়ণ ঐরূপ কয়েকটী পরগণার অধিপতি বা জমিদার ছিলেন। গ্রন্থ-লিখিত "ষাড়ি পারা" শব্দটী "ষষ্ঠী পাড়া" হইবে।

এই রাজনারায়ণের উপাধি "রায়" ছিল, তাহা কবির উক্তি হইতে জানা যায়। যথা:—

"শ্রীকাশীযোড়াতে হরশঙ্করেতে
রাজনারায়ণ রায়।
তস্য পোষ্য জনে নিত্যানন্দ ভণে
পশ্চিম শ্মশান সায়॥"

বিরাট-পূজা ১৮শ পয়ার।

কবি ইঁহাকে রাজা নরনারায়ণ রায়ের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা:—

"কাশী যোড়া মহাস্থান মহারাজা নরনারায়ণ
রাজনারায়ণ তাহার নন্দন।
তাহার সভায় রৈয়া শীতলা আদেশ পায়া
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ॥"

বিরাট-পূজা ২২শ পয়ার।

রাজা রাজনারায়ণের বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে এ সকল পুঁথীতে অধিক আর কিছু উল্লেখ নাই। নিত্যানন্দ ইঁহার সভাসদ ও কবি হইলেও হলধর সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি, কিন্তু, ইঁহাকে "গাএন" রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পুস্তক সমূহের বহুস্থলেই তাহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা:—

"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর।
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গা-তটে সিংহ হলধর॥"

পূর্ব্বে "গাএন" প্রতিষ্ঠা করার প্রথা ছিল। দেবতা প্রতিষ্ঠা, শিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণ দ্বারা অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া প্রতিষ্ঠাকারীরা গায়েনকে চামর প্রদান করিতেন। কেহ কেহ বা তৎসঙ্গে হস্তে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডলও প্রদান করিতেন। উক্ত "প্রতিষ্ঠা গাএন" গায়ক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ও জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলের বাটীতে গান করিতে সক্ষম হইতেন; তাহাতে কোন প্রকার সামাজিক দোষ ঘটিত না।

সে যাহা হউক, কবি তাঁহার আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;

"কাসাড়িয়া দিলিসাই গোত্র ভরদ্বাজ।
মহাসিশ্র রাধাকান্ত ক্ষেমা ক্ষিতিমাঝ॥
দ্বিতীয় আত্মজ তার দৈব অনুবলে।
দ্বিজ নিত্যানন্দে বলে সাধনার ফলে॥
জাগাতি পূজা ১১শ পয়ার।

"বিশারদ সর্ব্বশাস্ত্র শ্রীযুত ভবানী মিশ্র
তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তস্য সুত চিরঞ্জীব কি গুণে তুলনা দিব
যার সখা দেব গদাধর॥
রাধাকান্ত তস্য সুত অশেষ গুণের যুত
চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভাই শীতলা আদেশ পাই
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ॥" ঐ ১৩শ পয়ার।

বাসস্থান সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইরূপ যে:—

"ভণে দ্বিজ নিত্যানন্দ গীত মধুক্ষর।
কাশী যোড়া সাকিনে কানাই চকে ঘর॥"
ইন্দ্রপূজা ৭ম পয়ার।

তাহার পর,—শীতলা মঙ্গল রচনার সময় নিরূপণ বিষয়ে আমরা এইরূপ অবগত হইতেছি,—

"মনেতে রাখিয়া মন রসে দিয়া বিধু।
নিত্যানন্দ রচিল অক্ষরে যার মধু॥"

১৬৫৫ শক বা ১৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শীতলামঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৫৮ শক বা ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উহার পরিসমাপ্তি হয়। কেন না, শীতলা মঙ্গলের "পূজাস্থাপনা" বা ইন্দ্র-পূজাই আরম্ভ পালা এবং বিরাট-পূজা শেষ পালা। বিরাট-পূজার অন্তর্গত জাগাতি পূজার ১২শ পয়ারের ভণিতায় লিখিত আছে:—

"মনেতে রাখিয়া বীর রসে হৈয়া বিধু।
নিত্যানন্দ রচিল অক্ষরে যার মধু॥"

সুতরাং পুঁথীখানি রচনা করিতে কবির ৩ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "লক্ষ্মী মঙ্গলে" আরও একটী সন-শকাব্দার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কোন প্রতিলিপিকার হয় ত তাঁহার নিজের পুঁথী নকলের সময়টী পুস্তকের মূল পয়ারের সহিত গোঁজা মিল দিয়া আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন পুঁথীগুলির বহুস্থলেই প্রতিলিপিকারগণের এইরূপ বহু কীর্ত্তি বিরাজমান। এই সন ও শকাব্দটী এতই আধুনিক যে, উহা মূল কবির রচিত বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। লক্ষ্মী

মঙ্গলের শনি-লক্ষ্মীর দ্বন্দ পালার ১৫শ পয়ারের ভণিতায় এইরূপ লিখিত আছে যে :—

"সিন্ধু বামে শর সপ্ত শশী শক হন।
বিধুর দক্ষিণে পক্ষ বেদ পক্ষ সন॥
আরম্ভ হইল অঘ্রাণের অষ্ট দিনে।
নিত্য ডাকে লক্ষ্মী মাকে নিতাই ব্রাহ্মণে॥"

এই ভণিতার উক্তি অনুসারে ১৭৫৭ শক বা ১২৪২ সনে রাজা রাজনারায়ণ ও কবি নিত্যানন্দের বিদ্যমানতা সম্ভব কি না, তাহা ঐতিহাসিকগণেরই বিচার্য্য। বিশেষতঃ উক্ত লক্ষ্মী-মঙ্গলের "কৃষ্ণশর্ম্মার পালা" নামক আর একটী পালায় দেখা যায় যে :—

"শিবের মুখে দিয়া সুধা বিষ্ণুর মুখে বিধু।
নিত্যানন্দ রচিল অক্ষরে যার মধু॥" ৬ষ্ঠ পয়ার।

ইহা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কবি ১৬৫৮ শকে শীতলা-মঙ্গল রচনা শেষ করিয়া ঐ বৎসরেই পুনরায় লক্ষ্মী-মঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। কেন না, লক্ষ্মীর জন্মপালা ও কৃষ্ণশর্ম্মার পালা উহার আরম্ভ অংশ এবং শনি-লক্ষ্মীর দ্বন্দপালা শেষ অংশ। সুতরাং প্রথমোক্ত সন-শকাব্দাটী যে প্রকৃতই জাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কত অজ্ঞাত ও অখ্যাতনামা কবি ও লিপিকর যে মূল কবিগণের রচনার অন্তরালে বেমালুম গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। সে যাহা হউক, প্রশ্নোক্ত কাশীযোড়া স্থানের নির্দ্দেশ করিতে হইলে—ষষ্ঠী পাড়া ও কানাইচক নামক গ্রাম দুইখানি যে কাশীযোড়ার অন্তর্গত দেখা যাইবে, তাহাকেই কবি নিত্যানন্দে প্রাগুক্ত কাশীযোড়া বলা অসমীচীন হইতে পারে না। কালক্রমে হয় ত বা ঐ সকল নামের কোনরূপ রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটা অসম্ভব নহে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

ভাদ্রমাসের ভারতবর্ষের ৩৭ নং প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই শ্লোকাংশটী ভাগবতের ১৩৩৮ শ্লোকের এক ভগ্নাংশ। অন্ততঃ অর্দ্ধেক শ্লোক উল্লেখ না করিলে ঐ বাক্যাংশটীর তাৎপর্য্য বোধ হওয়া অসম্ভব। তাহা এই "এতেচাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এইটী সমগ্র ভাগবতের পরিভাষা সূত্র।

অবতার সকলের চরিত্র বর্ণন করুন—এই প্রশ্ন দ্বারা সৌনক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সংক্ষেপে সূত অবতার সকলের নামাদি উল্লেখ করিলেন। ১ম অবতার কৌমার, ২য় নারদ, ৩য় বরাহ ইত্যাদি করি গণনায় ২৫টী প্রাকৃত জগতের অবতার বর্ণন করিলেন। তার পর কহিলেন:— "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরে সত্ত্ব নিধের্দ্বিজা" হে দ্বিজগণ সত্ত্বনিধি হরির অসংখ্য অবতার। অর্থাৎ সেই অনন্তের অবতার ও অনন্ত এখানে প্রধান কয়টী বলিলাম মাত্র। এই সকল অবতার বর্ণনের মধ্যে যাঁহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বর্ণন সামান্য ভাবে হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে পৃথক করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন :—"এতেচাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"; অর্থাৎ এই যে অবতার সকলের নাম উল্লেখ করিলাম, তাহারা কেহ কেহ পুরুষের অংশ, কেহ কেহ কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই "তু" অব্যয়টী ভিন্ন উপক্রমে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "ইরাণের রাণী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "হাসির হল্লা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ।৶০ আনা।

শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন প্রহসন "চাল-বেচাল" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ।৶০ আনা।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হতাশ প্রেমিক" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৸০ সাতসিকা।

শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত "লক্ষ্মী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম-এ প্রণীত "ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "ভুল ভাঙ্গা,' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "সতীত্বের মূল্য" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷০ টাকা।

আগামী ১২ই মাঘ শনিবার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পঞ্চ বার্ষিকী জন্মদিন। মহাকবি মধুসূদন উনবিংশ-শতাব্দীতে বঙ্গ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রথ ছিলেন। আমরা আশা করি এই উপলক্ষে যাবতীয় সুধী সাহিত্যিকবর্গ একত্র সমবেত হইয়া মহা কবির স্মৃতি পূজা করিবেক। সাহিত্য পরিষৎ এই শুভ অনুষ্ঠানের অগ্রণী হইয়া এই মহোৎসব সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে'র 'আলোক ও প্রাণ' প্রবন্ধের (১১ পৃষ্ঠা তৃতীয় পংক্তি)"৫৫৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড"স্থলে "৫৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড" হইবে।

গত মাসের সাহিত্য সংবাদে বাহির হইয়াছিল—"শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ সোম প্রণীত "মন্ত্রদীক্ষা" উপন্যাস বাহির হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা।" শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ সোমের স্থলে শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.



দোটানা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
প্রদর্শনীর প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.



ফাল্গুন, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

গীতায় কর্মযোগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ঈশ্বর কি বস্তু, কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়—ইহাই গীতার মুখ্য বিষয়। এজন্য গীতাকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং উপনিষৎ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা,—কারণ ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; উপনিষৎ,—কারণ, ইহাতে ব্রহ্মলাভের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। তাই প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে"। কিন্তু গীতা শুদ্ধ উপনিষৎ এবং ব্রহ্মবিদ্যা নহে; ইহা একটী যোগ-শাস্ত্র। ঠিক মত কর্ম করিবার কৌশল যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই যোগশাস্ত্র—"যোগঃ কর্মসু কৌশলং"।

কর্ম করা ভাল না খারাপ? এই প্রশ্নের উত্তরে গীতা বলেন, যে ভাবে কর্ম করা হয়, তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক কর্ম করা ভাল। ইহার বিপরীতভাবে কর্ম করা খারাপ। কর্ম ভালরূপে করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহাতে ঈশ্বর লাভের পথ সুগম হয়। নচেৎ কর্ম ঈশ্বর লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়। ভাল কর্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক বটে; কিন্তু ঈশ্বরলাভের পক্ষে কর্ম অপরিহার্য্য নহে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিজের জন্য সৎকর্ম করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু জগতে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তাহার কর্ম করা উচিত। গীতা এই সকল কথা বলিয়াছেন—কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান সমগ্র জগৎকে উপদেশ দিয়াছেন।

কর্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। বীজ যেমন স্বাভাবিক নিয়মে বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ কর্মও স্বাভাবিক নিয়মে কর্মফলে পরিণত হয়। কোন কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়; কোন কর্মের ফল অল্প বিলম্বে দেখা দেয়—যদিও কর্ম এবং কর্মফলের মধ্যে সম্বন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যায়; আবার কোন কর্মের ফল অনেক বিলম্বে,—হয় ত জন্মান্তরে—আবির্ভূত হয়, প্রাকৃত দৃষ্টিতে কর্ম এবং কর্মফলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। এইরূপ বীজ হইতেও বৃক্ষের উৎপত্তি কখনও শীঘ্র, কখনও বা বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। গত বৎসর পুষ্প-বৃক্ষের বীজগুলি কখন মাটীতে পড়িয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই, প্রবল শীত এবং দারুণ গ্রীষ্মের সময় বীজগুলি মাটীর মধ্যে লুকাইয়া ছিল, আবার এক বৎসর পরে যখন নববারিধারায় ভূপৃষ্ঠ সিক্ত ও শীতল হইল, তখন দেখা গেল ছোট ছোট ফুলগাছের চারায় বাগানটি ভরিয়া গিয়াছে। আমরা প্রতিনিয়ত নানারূপ কর্ম করিয়া থাকি। প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্মের যে ফল ভোগ করিতে হইবে, সে কথা আমাদের তখন মনে থাকে না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেই সকল কর্মের শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। সেই সকল ফল ভোগ করিয়া আমরা অন্যের উপর প্রীত বা অপ্রীত হই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এ সকল ভোগের অন্যে নিমিত্ত মাত্র,—প্রকৃত পক্ষে দায়ী আমরা স্বয়ং। বীজ বহুকাল রাখিয়া দিলেও তাহার বৃক্ষ-উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। সেইরূপ কর্মের ফলোৎপাদিকাশক্তি দীর্ঘকাল ব্যবধানেও নষ্ট হয় না। এমন কি প্রলয়ের সময়—যখন সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, কিছুই থাকে না,—ব্রহ্মার সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী রাত্রির সময়ও কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। প্রলয়কালে এই সকল কর্ম প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করে। প্রলয়াবসানে যখন পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পূর্বকালের কর্মগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট ফল প্রসব করে।

কর্মফল এড়াইবার উপায় নাই বলিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্মকে মোক্ষমার্গের বিরোধী মনে করেন; এবং বলেন যে, কর্ম মাত্রই ত্যাগ করা উচিত।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।১৮।৩

"কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, দোষ যেরূপ ত্যাগ করা উচিত, সেইরূপ কর্মও ত্যাগ করা উচিত।" ইঁহাদের অভিপ্রায় এইরূপ। কর্মফল ভোগ করিতে হয় বলিয়াই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে না, আর পুনর্জন্ম হইবে না, অতএব মোক্ষলাভ সহজ হইবে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কর্ম ত্যাগ করা অতি দুরূহ—প্রায় অসম্ভব। প্রথমতঃ শরীর ধারণের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম অপরিহার্য্য।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।৩।৮

"কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও (দেহ রক্ষা করাও) সম্ভব হইবে না।"

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।১৮।১১

"যাহারা দেহ ধারণ করে, তাহারা সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না।"

যাঁহারা কর্মের বিরোধী, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, যে কর্ম না করিলে নয় সে কর্ম না হয় করিলে, কিন্তু তাহার অধিক কোন কর্ম করিও না; জীবন-ধারণের জন্য যে কর্ম অপরিহার্য্য মাত্র, সেইটুকু কর্ম করিলে, তাহার ফলে কেবল জীবন-ধারণই নিষ্পন্ন হইবে, জন্মান্তরে ভোগ করিবার মত কোন কর্মফল অবশিষ্ট থাকিবে না; অতএব মোক্ষপথে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। কিন্তু তাহা হয় না। এরূপ ভাবে কর্ম করা সম্ভব নহে, যাহার ফলে প্রাণ-ধারণ মাত্র নিষ্পন্ন হইবে। ধরুন, প্রাণ-ধারণের জন্য আহার প্রয়োজন। এই আহার সংগ্রহ করিবার বিভিন্ন উপায় আছে, কিন্তু প্রায় সকল উপায়েই কিছু পরিমাণে হিংসা বিজড়িত আছে। অবশ্য বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে হিংসার তারতম্য আছে, এবং যাহাতে হিংসার আধিক্য (যথা প্রাণিবধ) শাস্ত্রে তাহার নিন্দা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ ভাবে আহার সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কৃষিকার্য্য অপেক্ষাকৃত নির্দোষ; কিন্তু ইহাতেও প্রাণিহিংসা আছে। ঐ মাঠে চাষ দিবার সময় অনেক প্রাণিহত্যা হয়, মহিষ-বলদকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে হয়। সুতরাং জীবন-ধারণের জন্যও কর্ম করিলে জীবন-ধারণ ব্যতীত আরও কর্মফল উৎপন্ন হইবে; তাহার ভোগ কি করিয়া নিরস্ত হয়? তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

সহজং কর্ম কৌন্তেয়, সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ১৮। ৪৮

"হে অর্জুন, জাতিকুল অনুসারে যে কর্ম স্বাভাবিক, তাহা ত্যাগ করিও না। কারণ, অগ্নিমাত্রেই যেরূপ ধূমের আবরণ আছে, সেইরূপ সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত।

আরও কথা আছে। আপনি যে মনে করিতেছিলেন, আমি কেবল জীবিকানির্বাহোপযোগী কর্ম করিব, আর কিছুই করিব না,—আপনার এ সঙ্কল্প কতদূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, তাহাও সন্দেহের বিষয়। কারণ, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই কর্মবন্ধ হয় না। যতক্ষণ মন সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ না হয়—সম্পূর্ণ শুদ্ধ মন, যে মনে বাসনার লেশমাত্র নাই, আমাদের কয়জনের আছে?—ততক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও আমাদের মনে নানাপ্রকার ভোগসুখের বাসনা স্বতঃই উৎপন্ন হইবে। বাসনা উৎপন্ন হইলেই কর্ম করা হইল, এবং তাহার ফলও ভোগ করিতে হইবে। এজন্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪

"কর্ম আরম্ভ না করিলেই মানুষ কর্মহীন হয় না। কর্ম ত্যাগ করিলে যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাও নহে।"

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

"কেহ ক্ষণমাত্রও কর্মহীন ভাবে অবস্থান করে না। সকলেই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া (সর্বদাই) কর্ম করিতে বাধ্য হয়।"

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩।৬

"কর্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া যে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলা হয়।"

আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ঈদৃশ অবস্থা অতিশয় বিপদজনক। কারণ, আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই কর্মফল ভোগ করিতে হইবে, এবং অনেক সময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ না করার দরুণ আকাঙ্ক্ষা অধিকতর তীব্র হয়। এজন্য, যাহাদের মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম করাই প্রশস্ততর। তাই ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। ৩।৮

"শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম সম্পাদন করিবে। অকর্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কর্ম ত্যাগ করা সহজ নহে। কর্ম যখন না করিয়া উপায় নাই, এবং কর্ম করিলেই যখন তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, তখন মোক্ষলাভ কিরূপে সম্ভব হয়? গীতা এই সমস্যার অপূর্ব্ব মীমাংসা করিয়াছেন।

কর্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় কেন? কারণ, কর্ম করিলে আমাদের মনে ঐ কর্মের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়,—অনেক সময় কর্মে আসক্তি জন্মে। এ জন্য আমাদের মনের উপর একটা ছাপ পড়ে, বা মন একটা বিশেষ আকারে আকারিত হয়। ইহাই কর্মফল ভোগের কারণ। অতএব যদি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা বা কর্মে আসক্তি ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কর্ম করিয়াও ফল ভোগ করিতে হয় না। কর্ম করিবার এই কৌশল গীতা শিক্ষা দিয়াছেন। কর্ম কর, কারণ, ইহা তোমার কর্তব্য; কিন্তু কর্মফলের কথা ভাবিও না; উহা তোমার অধিকার-বহির্ভূত।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥২।৪৭

"কর্মেই তোমার অধিকার; কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কর্মফলের হেতু হইও না; (কিন্তু) কর্মহীন হইয়াও থাকিও না।"

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥২।৪৮

"আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে। সফলতা এবং বিফলতাতে একই অবস্থায় থাকিবে। এইরূপ সাম্যাবস্থাকে যোগ কহে।"

কর্মফলে যদি আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে সফলতা এবং বিফলতাতে মনের অবস্থার কোন পার্থক্য হইবে না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥৩।১৯

"এ জন্য সর্বদা অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবে। অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে মানব মোক্ষলাভ করে।"

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥৪।২০

"কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্বদা তৃপ্ত থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কোন কর্ম ই করা হয় না (কর্মফল ভোগ করিতে হয় না)।"

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥৪।২১

"নিষ্কাম হইয়া, ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত করিয়া, অপরের দান গ্রহণ না করিয়া, কেবল শরীর দ্বারা কর্ম করিলে কোন পাপ হয় না।"

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তোকামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥৫।১২
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥৬।১
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১২।১১
শ্রেয়োহিজ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ॥১২।১২
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥১৮।৬
[এতান্যপি তু কর্মাণি=যজ্ঞদান তপোরূপাণি]
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥১৮।৯
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১৮।১১
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম যৎতৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥১৮।২৩
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥১৮।২৬

কর্ম এবং কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিলে কর্মও ভাল করিয়া করা যায়, তাহাতে কার্য্যসিদ্ধিরও সম্ভাবনা বেশী। অতএব গীতোক্ত পদ্ধতিতে কর্ম করিলে এক দিকে কর্মে সফলতার সম্ভাবনা বেশী, অপর দিকে বিফল হইলেও চিত্ত-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা কম। আসক্তির কারণ মোহ বা অজ্ঞান।*

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়া সজ্জন্তেগুণকর্মসু ।৩।২৯

"প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ (সত্ত্ব রজ ও তম) দ্বারা সংমূঢ় হইয়া লোকে গুণ এবং কর্মে আসক্ত হয়।" জগতের যাবতীয় পদার্থ বিনশ্বর ; তাহারা কখনও চিরস্থায়ী সুখ দিতে পারে না। মায়ার গুণে আমরা ইহা বুঝিয়াও বুঝি না, এবং যিনি একমাত্র চিরস্থায়ী সুখ দিতে পারেন, সেই পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে আকৃষ্ট হই। ইহাই কর্মফলে আসক্তির কারণ। অতএব কর্মফল ত্যাগের পক্ষে জ্ঞান খুব সহায়ক। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে আর সংসারের তুচ্ছ পদার্থে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না ; অতএব কর্মফলের জন্যও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কর্মে আসক্তিও জ্ঞান দ্বারা নিরস্ত হয়। আমি এই সব কাজ করিতেছি বা করিব, আমি-ই কর্ত্তা, এই অহংজ্ঞান হইতে কর্মে আসক্তি উৎপন্ন হয়। সৎকর্ম করিতে করিতেও এইরূপ অহংজ্ঞান দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তিও কর্মে আসক্ত হইয়া দুঃখ পান। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতির গুণ দ্বারা যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষীস্বরূপ। এইরূপ জ্ঞান হইলে আর কর্মে আসক্তি থাকে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃকর্মাণি সর্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে ॥৩।২৭

"প্রকৃতির গুণ দ্বারা যাবতীয় কর্ম নিষ্পন্ন হয়। অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় হইয়া লোক মনে করে আমিই কর্ত্তা"।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥৩।২৮
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্‌জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৫।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৫।৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥১৩।৩০
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৮।১৭

কর্মে আসক্তি হইবার আর একটি কারণ ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব। ইন্দ্রিয়গুলি না সংযত না থাকিলে যে কর্ম ইন্দ্রিয়ের অনুকূল তাহাতে আসক্তি হয়। এজন্য কর্ম করিবার সময় ইন্দ্রিয়-সংযম অতি প্রয়োজনীয়। যাহা ভাল লাগিবে সেইরূপ কর্ম করিলেই হইবে না, যাহা করা উচিত সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।

যন্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩।৭

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।"

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মা ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৫।৭

যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয় তাহা হইলে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কর্মে আসক্তি থাকে না, এবং ইন্দ্রিয়-গুলিও অসংযত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তখন মনে হয় ভগবান প্রীত হইবেন বলিয়া আমি এই কর্ম করিতেছি, কর্মের ফলভোগ করিবার জন্য নহে, কিংবা বিশিষ্ট কর্ম করিতে ভাল লাগে বা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বলিয়া নহে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র সকল কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করিতে বলিয়াছে। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার সময় তাহাকে বলিতে হয়,

প্রাতঃকথায় সায়ান্তং সায়মারভ্য প্রাততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব ॥

"প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, যাহা কিছু করি, সকলি হে জগন্মাতঃ, তোমার পূজা করি মাত্র।"

গীতাতেও এই মর্মের উপদেশ নানা স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৩।৯

"যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে মনুষ্য যে কর্ম করে তদ্ব্যতীত অপর কর্ম করিয়া মানব কর্মফলে বদ্ধ হয়। এজন্য, হে অর্জুন, আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর নিমিত্ত কর্ম কর।"

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩।৩০

(বাহুল্য ভয়ে সকল শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হইল না)

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥৩।৩১
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥৪।২৩
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণং ॥ ৯।২৭
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ৯।২৮
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ১২।৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥১২।৭
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২।১০
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥১৮।৪৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্যমৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥১৮।৫৭

অতএব দেখা যাইতেছে যে, গীতার শিক্ষা এইরূপ,—সকল কর্ম এককালে ত্যাগ করা সম্ভব নহে। এজন্য কর্ম ও কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করাই প্রশস্ত, কারণ এই ভাবে কর্ম করিলে কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। আসক্তি ত্যাগ করিবার উপায়,—প্রথমতঃ জ্ঞান, আমি কর্ত্তা নহি, প্রকৃতির গুণ দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হয়, এই ধারণা ; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-সংযম ; তৃতীয়তঃ ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ। এই ভাবে কর্ম করিলে কর্ম মোক্ষলাভের অন্তরায় হয় না। শুধু অন্তরায় হয় না, এমন নহে, এই ভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়।

প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মঃ * * ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা প্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।

[শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকা]

"শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করিলাম এই বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভের উপযোগিতা হয় এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়ক হয়।"

সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা কি প্রকারে চিত্তশুদ্ধি

* বাহুল্য ভয়ে সকল শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

হয়, তাহা শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ শ্লোকের ভাষ্যে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম দ্বারা ইহজন্মে এবং জন্মান্তরে অর্জিত পাপসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এজন্য চিত্ত শুদ্ধ হয়। সহজবুদ্ধিতেও আমরা এই তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। কামনা এবং বাসনাগুলিই আমাদের চিত্তের মলিনতা। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম করিলে আমাদের বাসনাগুলি ক্ষয় হইতে থাকে, কারণ আমাদের ইচ্ছামত কার্য্য করি না, শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, রুচিকর না হইলেও তাহা করিতে হয়। বিশেষতঃ এই কর্ম যদি ভগবানের প্রীত্যর্থ করিতেছি, এই জ্ঞান সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয় না, যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই প্রসঙ্গে মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জ্ঞানম্যুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।

যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ শান্তিপর্ব্ব ২ ৪।৮

"পাপকর্মের ক্ষয় হইলে মানবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বের ন্যায় চিত্তমধ্যে আত্মার (ব্রহ্মের) সাক্ষাৎকার হয়"।

গীতাও বলিয়াছেন,

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥৫।১১

"যোগিগণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি এবং মমত্ববুদ্ধিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করিয়া থাকেন।"

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ।৬।৩

"যিনি যোগমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কর্ম্ম করিয়া এই পথে আরোহণ করিতে সক্ষম হন।"

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং ।১৪।১৬

"সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম করিয়া নির্দ্দোষ সাত্ত্বিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

যজ্ঞোদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানংতপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥১৮।৫

"যজ্ঞ দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নহে, উহাদের অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ যজ্ঞ দান এবং তপস্যা, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় করেন না তাঁহাদের চিত্ত পবিত্র করে।"

যাঁহাদের চিত্তে মলিনতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম প্রয়োজনীয়, কারণ কর্ম দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়; অবশ্য শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম হওয়া আবশ্যক এবং তাহা নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধির সহিত অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে মলিনতা নাই, তাঁহাদের কর্ম করিবার কি প্রয়োজন আছে? বলা বাহুল্য ঈদৃশ নির্ম্মলচিত্ত লোক অতিশয় বিরল; প্রায় সকলেরই চিত্তে কামক্রোধাদি মলিনতা অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

গীতা বলেন যে ঈদৃশ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ম অনুষ্ঠান না করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥৩।১৭

যিনি আত্মাতেই আনন্দ পান, তৃপ্তি পান এবং সন্তুষ্ট থাকেন [অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে কোন বাহ্যবস্তুর জন্য কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চিত্ত মলিন হইবে] ঈদৃশ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভের জন্য কর্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। [কিন্তু তাঁহাদেরও কর্মানুষ্ঠান করিবার অন্য প্রয়োজন আছে—তাহা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে]।"

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥১৮।৪৯

"যাঁহার বুদ্ধি অনাসক্ত, যিনি সর্বদা জিতেন্দ্রিয় এবং কামনাশূন্য, ঈদৃশ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক যে ব্রহ্মাত্মবোধ হইলে সকল কর্ম নিরস্ত হয় সেই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।"

কিন্তু ঈদৃশ সাধু ব্যক্তির নিজের জন্য কর্মের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করিবেন, গীতার এরূপ অভিপ্রায় নহে। গীতা বলেন যে, ঈদৃশ ব্যক্তিও কর্ম করিবেন,—জগতে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য।

লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩।২০

"সকলকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।"

কারণ,

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৩।২১

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ লোক সেইরূপ আচরণ করে। তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণ করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুসরণ করে।"

সক্তাঃ কর্মণ্য বিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥ ৩।২৫

"জ্ঞানহীন ব্যক্তি আসক্তিপূর্ব্বক যে রকম কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া লোকশিক্ষার্থ সেইরূপ কর্ম করিবেন।"

বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান এই উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকেন। ভগবানের অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি জগতের হিতার্থ তিনি কর্ম করিয়া থাকেন।"

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥ ৩।২২

"হে অর্জুন, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই।"

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং যাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃপার্থ সর্বশঃ ॥ ৩।২৩

"আমি যদি আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্বদা কর্ম না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমার পথ অনুসরণ করিবে, (কর্ম ত্যাগ করিয়া আলস্যে কাল কাটাইবে)। আমি যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।"

গীতায় ভগবান যেরূপ অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সেইরূপ অনাসক্ত ভাবেই কর্ম করেন।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। ৪।১৪

"কর্ম আমাতে লিপ্ত হয় না; কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই।"

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯।৯

"সেই সকল কর্ম আমার বন্ধনের কারণ হয় না। কারণ আমি সেই সকল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি।"

কর্ম কি ভাবে করা উচিত, গীতাতে প্রধানতঃ তাহাই বলা হইয়াছে। কি কর্ম করা উচিত তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা করা উচিত (১৮।৫)। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট কর্মও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে (১৮ অধ্যায় ৪১-৪৪ শ্লোক) এ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশের জন্য অন্য শাস্ত্র আশ্রয় করিতে হইবে। এজন্য শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং ॥ ১৬।২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১৬।২৪

"যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, সুখ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।"

"এজন্য কি কার্য্য করা উচিত কি অনুচিত এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত বিধান অবগত হইয়া তদনুসারে তোমার কর্ম করা উচিত।"

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমো ভূত্বাসমত্বং যোগ উচ্যতে ॥২।৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥৫০

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যতি ॥৫৩

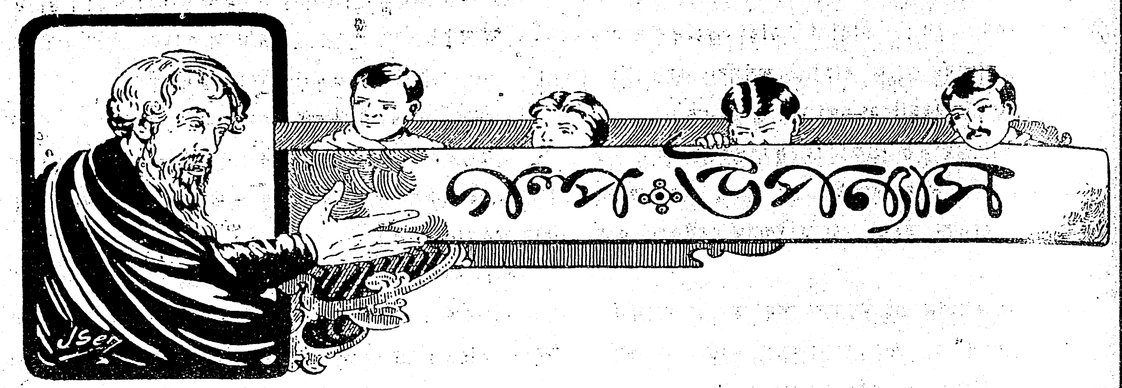

দানের মর্য্যাদা

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৫)

ঊষা স্বামীর সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল।

বাড়ীটা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। একা ঊষাই বাড়ীটাকে হাসাইয়া রাখিত। ছুটাছুটি করিতে, চীৎকার করিয়া বাড়ীটা সরগরম করিয়া রাখিতে তাহার মত আর কেহই ছিল না। উমা যেমন শান্ত, নম্র ছিল, ঊষা ঠিক তাহার বিপরীত ছিল উমা সময় সময় তাহার দুর্দ্দান্ততার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত, সেটা কেবল তাহার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ীর ভয়ে। ঊষা যেদিন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকিত, সেদিন বাড়ীটা একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত। সে নিস্তব্ধতা শুধু উমার নয়, নির্জ্জন স্থানাভিলাষী অমরনাথের পর্য্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া ঠেকিত।

উমা গোপনে চোখের জল মুছিয়া বগলা দেবীর কাছে গিয়া হাসিল, "বেশ হয়েছে, না ঠাকুর মা? ঊষা সেখানে বেশ সুখেই থাকবে।"

ঠাকুরমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হুঁঃ, সুখ যে কত হবে তা আমিই জানছি। সেই সব মেলেচ্ছ আচার ব্যবহার—তাদের মধ্যে গিয়ে ও কথনো থাকতে পারবে উমা?"

উমা নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা আর কি হবে ঠাকুরমা যা হবার তা তো হয়ে গ্যাছে, বিয়েটা তো আর ঘুরোনো যাবে না।"

বগলা দেবী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হলেই হত। তোমরা সবাই যে ওই ঘরই ঠিক করলে—তবে হবে না কেন? বাপের মত হল, বোনের মত হল, অমনি বিয়ে হয়ে গেল। আমি আর কোথাকার কে, একটা দাসী বাঁদি বই তো নই, আমার কথা কি গ্রাহ্য হতে পারে?"

ঠাকুরমায়ের এই উল্টা অভিযোগে উমা যেন আত্মহারা হইয়া গেল, বলিল, "কিন্তু ছেলেটী—"

বাধা দিয়া বগলা দেবী বলিলেন, "জানি বাছা, জানি তা; কিন্তু শুধু ছেলে ভাল নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ছেলের রূপ আছে, বিদ্যা আছে, পয়সা আছে, কিন্তু গুণটা আছে কি বল দেখি? বাসরের রাতটায় কি কাণ্ডটা না করলে! মাগো, মেয়েরা সব কি নিন্দেই না করে গেল। করবে নাই বা কেন? বাসরে মেয়েরা বরকে কত ঠাট্টা তামাসা করে,—কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, অমনি লাফিয়ে উঠে যায় আর কি? সহুরে ছেলে, বিলেতও গেছল, এমন চাষা কেন?"

উমা একটু হাসিল, বলিল, "সত্যি ঠাকুরমা, চাষার মতই শিক্ষাটা তার,—বাসর কি তা বোঝে না। কেন

বোঝে না জানো? ওরা সব সাহেব-ঘেঁসা লোক কি না,—সাহেবদের মধ্যে তো বাসর নেই, কাজেই বাসর ওরা জানবে কি করে? রাগ করলেও তার সাজে। কিন্তু দেশের মেয়েরা কেন যে চটেন, তা আমি বুঝতে পারছি নে।"

বগলা দেবী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। উমা সেখানে আর কথাবার্ত্তার সুবিধা না দেখিয়া বাহির হইল।

অমরনাথ আজ জমীদারির কাজে হাত দেন নাই। নিজের ঘরে একটা সোফায় বসিয়া একখানা বই দেখিতেছিলেন। বইটা কোথায় ছিল কে জানে, তিনি কেবল পাতা উল্টাইয়াই যাইতেছিলেন।

উমা পিতার পায়ের কাছে নীচে বসিয়া পড়িল। পিতার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কোনও কথা বলিল না।

অমরনাথ বইখানা সমীপবর্ত্তী টেবলের উপর রাখিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। পাখানা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "থাক মা, পা টিপতে হবে না, তুমি এই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসো।"

উমা বলিল, "না বাবা, একটুখানি পা টিপে দিই। সকাল বেলায় বলছিলে পা ব্যথা করছে, তাই—"

সস্নেহকণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "সকালবেলায় ব্যথা করেছিল, এখনও কি তা থাকে মা? বিকেল হয়ে গ্যাছে যে।"

উমা তথাপি পা ছাড়িল না, নীরবে পদসেবা করিতে লাগিল।

অমরনাথ একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আজকের খবরের কাগজখানা পড়া হয় নি, একটু পড় তো, শুনি মা।"

শ্রান্ত কণ্ঠে উমা বলিল, "আজ কিছু ভাল লাগছে না বাবা।"

কেন যে ভাল লাগিতেছে না পিতা তাহা বেশ জানিতেন। চঞ্চলা যে বালিকাটী ছিল সে আজ নাই, বাড়ীটাতে এত লোক থাকা সত্ত্বেও মনে হইতেছে, কেহ নাই। অমরনাথ প্রাণে ভারি শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে বেদনাটা ফুটিয়া প্রকাশ হইতে পারে নাই।

অমরনাথ বলিলেন, "কেন ভাল লাগবে না মা? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, ঊষা যেন জন্মে জন্মে শ্বশুর-ঘরই করে, বাপের বাড়ীর সঙ্গে যেন তার সম্পর্ক না রাখতে হয়।"

উমার দুটি চোখ দিয়া গোপনে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখখানা অবনত করিয়া কোনও ক্রমে সে অশ্রুবিন্দুকে মুছিয়া ফেলিয়া ভারি গলায় বলিল "সে প্রার্থনা তো দিন-রাতই করছি বাবা।"

আজ অমরনাথেরও কোন কথা ফুটিতে চাহিতেছিল না। উমা সেখানেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না, একটা ছুতা ধরিয়া খানিক পরেই বাহির হইল।

তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়খানা আজ কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। সে মুক্ত ছাদে গিয়া বসিয়া রহিল। মনে জাগিতেছিল, ঊষার ছোটবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সব দিনগুলার কথা।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বিন্দু গোয়ালিনী দেখা করিতে চায়।

বিরক্ত ভাবে উমা বলিল, "কেন?"

দাসী বলিল, "তা বলছে না।"

উমা একটু ভাবিয়া বলিল, "তার মাসিক বৃত্তি তো তাকে সে দিন দেওয়া হয়েছে, আবার কি দরকার? আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে।"

শুধু বিন্দু গোয়ালিনী নয়, অনেক দীন দরিদ্র উমার নিকট হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কেবল অমরনাথ ইহা জানিতেন, আর কেহই জানিত না। কন্যার এই সৎকার্য্যে পিতা বাধা দেন নাই, বরং আরও উৎসাহ দিতেন।

বিন্দু আসিয়া দাঁড়াইল।

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি দরকার?"

বিন্দু কাঁদিয়া বলিল, "দরকার না থাকলে কি আসি দিদিমণি?"

উমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "মর, কেঁদেই মরছেন; আসল কথাটা কি আগে তাই বল, তার পর যত পারিস কাঁদিস, আমি বারণ করব না। সেদিন গোমস্তা বাবু তোকে টাকা দিয়ে আসেন নি?"

বিন্দু চোখ মুছিয়া বলিল, "দিয়েছেন।"

উমা বলিল, "তবে আর কি চাস, আবার কাঁদছিস কেন ?"

বিন্দু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সব কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে সে,—একটা পয়সা ঘরে নেই, যা দিয়ে ছেলেটার খাবারের একটু যোগাড় করি। নিজের কি দিদিমণি, দু' দিন না খেয়েও বেশ কাটিয়ে দিতে পারি ; কিন্তু ছেলেটা"—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল। উমা খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "তোরই দোষ।"

বিন্দু কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "কিসে দিদিমণি ?"

জ্বলিয়া উঠিয়া উমা বলিল, "আবার জিজ্ঞাসা করছিস কিসে ? তোর স্বামী এতটা অধঃপাতে গ্যাছে, সেও তোর জন্যে। তুই যদি একটু শক্ত হতিস, তবে এতটা হতে পারত না।"

বিন্দু বলিল, "আর কি করে শক্ত হব দিদিমণি ? যে কিছু বোঝে না, তাকে বুঝাব কি ? প্রথম প্রথম ঝগড়া করতুম, সেবা করতুম না,—ভাবতুম, এমনি করলে সে ঠিক জব্দ হয়ে যাবে, নিজের ওপরে নিজের ঘেন্না হবে। তাতে কোনই ফল পাই নি। তার পরে তোমার কথা শুনে, তোমার উপদেশ মতই চলতে লাগলুম, ঝগড়া করা একেবারেই ছেড়ে দিলুম, প্রাণপণে সেবা যত্ন করতে লাগলুম। এতে সে বেশী সাহস পেয়ে গেল। আগে সে কখনও একটা কথা আমায় বলতে সাহস করে নি,—কিন্তু এখন দিদিমণি, সে আর ভয় করে না,—চক্ষুলজ্জা বলে একটা যে জ্ঞান, সেটাও আর নেই। এই দেখ দিদিমণি, তার কাছে আমার একেবারে নীচু হয়ে থাকার—সেবা-যত্ন করার চিহ্ন আমার গায়েই দেখতে পাবে—।"

সে পিঠের কাপড়খানা তুলিয়া দিল,—বিস্ময়ে উমা চাহিয়া দেখিল, অনেকগুলা প্রহারের চিহ্ন।

অতি কষ্টে চোখের জল প্রশমিত করিতে করিতে বিন্দু বলিল, "আর আমি কি করব দিদিমণি, শক্ত হয়েও দেখলুম, নরম হয়েও দেখলুম। শক্ত হয়ে যে ভয়, যে চক্ষুলজ্জাটা রাখতে সমর্থ হয়েছিলুম, নরম হয়ে তা সবই হারিয়েছি। এখন আমায় কি করতে বল।"

উমা আকাশ পানে চাহিল, সাধ্বী স্ত্রীর এই লাঞ্ছনা, ভগবান, আছ কি তুমি ? চোখ দুইটী সত্যই খাইয়া বসিয়া আছ, না আছে তাহা ?

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ নামাইয়া বলিল, "সবই দেখছি বিন্দু! কিন্তু তোকে বলছি আমি—হাল ছেড়ে দিস নে, হাল ছাড়লেই তোর নৌকা একেবারে অতল জলে ডুবে যাবে। মনে কর—এইবার তোর স্বামী যথার্থ মুক্তিলাভ করবে। সতী-স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা—বড় সহজ কথা মনে করিস নে, এর জন্যে অনুতাপ তাকে করতেই হবে ; সেই অনুতাপের ফলেই তার দানবত্ব ঘুচে যাবে, সে আবার সেই হবে। মনে করে দেখ, গৌর নিতাই যখন নদীয়ার পথে পথে হরিনাম করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই সে পবিত্র নাম সহ্য করতে না পেরে, কলসীর কানা ছুঁড়ে মেরেছিল, যা মহাপ্রভুর কপালে লেগে রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন কি বলেছিলেন জানিস ? তাঁর মহত্ত্ব দেখে পাপী দুভাই যখন তাঁর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু সাধারণ যখন তাদের হরিনাম দিতে মহাপ্রভুকে নিষেধ করলে, তখন তিনি চোখের জলে ভেসে বললেন, 'মেরেছে কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না।' দেখছিস—কত বড় মহান ত্যাগের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে! তিনি তাদের দুই হাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, তাঁদের নাম দিলেন, তারা মুক্তিলাভ করলে। বিন্দু, তোর স্বামী তোকে মেরেছে, তুই অটুট থাক, তেমনি সেবা যত্ন করে যা, যত বড় মহাপাপী—যত বড় পাষণ্ডই হোক না, তাকে ভাল হতেই হবে। কিন্তু তুই যদি এখন কঠিন হয়ে উঠিস, সে অনুতাপ করবে না, সে ভালও হবে না। তাকে ভাল করতে, সৎপথে ফিরাতে, চাই কেবল প্রেম, তা ছাড়া আর কিছু দিয়ে কাজ হবে না। যে মন্দ, তারও পরে কঠিন ব্যবহার করতে গেলে, সে আরও মন্দ হয়ে যায়, তাকে আর ফেরানোর আশা করা যায় না। কিন্তু সৎ ব্যবহারে তাকে অনায়াসে ফেরানো যেতে পারে, এই কথাটা মনে রাখিস।"

বিন্দুর চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, আনন্দে তাহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে নত হইয়া উমার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "তোমার কথামতই চলব দিদিমণি,—তুমি মানুষ নও, দেবী। কিন্তু আজ কি খেতে দেব ছেলেটাকে ?"

উমা বলিল, "চল, আমি দিচ্ছি।"

নীচে নামিয়া গিয়া নিজের গৃহে সে প্রবেশ করিল ; বাক্স খুলিয়া একখানা পাঁচটাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এইটে নিয়ে যা। নগদ পয়সা একটাও হাতে রাখিস নে, যা যা দরকার, একেবারে সব কিনে নিয়ে যা।"

বিন্দুর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল। সে নীরবে নোটখানা লইয়া চলিয়া গেল। উমা আবার ছাদে গিয়া বসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, বাহির-বাটীতে গৃহ-দেবতা গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির উদ্যোগ হইতেছিল। প্রত্যেক দিনই আরতির সময় উমা মন্দিরে উপস্থিত থাকিত, আজ সে গেল না।

আকাশে একটী দুটি করিয়া অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল ; ধরণীর গায়ে অন্ধকার ক্রমে নিবিড় ভাবেই নামিয়া আসিতেছিল। অমরনাথের ফুলবাগানের পাশে গোটাকতক শৃগাল খুব চীৎকার করিয়া উঠিতেই, চাকরের দল হৈ-হৈ করিয়া তাড়া দিল ; বেচারা শৃগালকুল চীৎকারে বাধা পাইয়া পলাইল। মন্দিরে আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল।

উমার কোন দিকেই মন ছিল না ; সে আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল বিন্দুর কথা,—ঊষার কথাও তখন তাহার মনে ছিল না।

সংসারে এমন ঢের বিন্দু আছে, যাহারা এমনি করিয়া মাতাল স্বামীর হাতে মারই খাইয়া যায়, কেহ নীরবে সহিয়া যায়, কেহ উগ্ররূপ ধরে। সামান্য স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে গিয়া আমাদের দেশের অনেক ছেলেই মাতাল হয়। তাহাদের আত্মীয়-পরিজন অপদস্থ হয়ও তো বড় নয়। তাহার মনে পড়িল, এক দিন তাহাদের বৈঠকখানার সামনে রতন জেলেকে দেওয়ান মতিবাবু উত্তম মধ্যম প্রহার করাইয়াছিলেন। পরদিন সে কারণটা শুনিতে পাইয়াছিল। রতন মদ খাইয়া, জ্ঞান হারাইয়া, তাহার মাকে মারিয়াছিল,—তাই তাহাকে শাসন করিয়া দেওয়া হইল।

কারণ শুনিয়া সে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলে, তাহার সম্পর্কীয়া মাসীমা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই ; অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও এরূপ করিয়া থাকে। মদ খাওয়া যে শিক্ষা-দীক্ষাবিহীন ছোটলোকের কাজ, তাহা নহে ; অনেক ভদ্রলোকও ইহাকে গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তাঁহার যায়ের পুত্র মনীশের উল্লেখ করিয়াছিলেন। মনীশ ছেলেটীকে উমা চিনিত। সে প্রায়ই এখানে আসা-যাওয়া করিত। সে এম-এ পাশ দিয়াছিল, এবং পরে কলিকাতার কোনও কলেজের প্রফেসার হইয়াছিল।

মনীশ মদ খায়—কথাটা শুনিয়া উমা একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়াছিল। সে মনিদার চরিত্রে তো কোন দিনই দোষ দেখিতে পায় নাই। মনিদা এমন জ্ঞানবান ছিল,—এমন বুদ্ধিমান ছিল, যে, উমা তাহার নাগাল পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। মনিদার মত লোক মদ খায়—একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু পিতা বলিয়াছেন, জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, সবই সম্ভব হইতে পারে। পিতার কথা উমার কাছে বেদবাক্য, উমা তাই ভাবিয়াছিল, হইতেও পারে।

আজ বিন্দুর কথা ভাবিতে ভাবিতে এই সব কথাই তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এই সব স্বামীর স্ত্রী, স্বামীর নিকট উৎপীড়িতা হইয়া মৃত্যুকেই প্রার্থনা করে। হিন্দু-স্ত্রীর স্বামীই দেবতা, দেবতাকে তাহারা অবহেলা করিতে পারে না,—ঘৃণা আসিলেও তাহা চাপিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এই সব দেবতা—ইহারা পূজা লইতে জানে, পূজারিণীর পানে তাকাইতে জানে না।

জগৎটা এ রকম কেন ? এখানে সকলেই লইতে চায়, দিতে কেউ চায় না। যদি আদান-প্রদান সমানই চলিত, তবে জগৎটা যথার্থ স্বর্গ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদান-প্রদান নাই বলিয়াই জগৎ—জগৎ।

মন্দিরের আরতির বাদ্য থামিয়া গেল, দর্শকের কণ্ঠ হইতে যুগপৎ শব্দ উঠিল,—হরিবোল—হরিবোল।

উমা গলায় কাপড় দিয়া নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। খানিকক্ষণ প্রার্থনা করার পরে তাহার মনটা অনেকটা পাতলা হইয়া গেল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী আসিয়া বলিল, "বাবু ডাকছেন।"

তাহার সহিত উমা নামিয়া গেল।

(৬)

শ্বশুরবাড়ী যে কি জিনিস, তাহা বাঙ্গালীর মেয়ে বেশ জানে। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গেসঙ্গেই শ্বশুরবাড়ী কথাটা তাহার কাণে আসিয়া লাগে, এবং সেই সময় হইতেই তাহাকে শ্বশুরবাড়ীর উপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। সে একটা কিছু অন্যায় কাজ করিলেই তাহাকে তাড়না করা হয়—শ্বশুরবাড়ী গেলে কি উপায় হইবে? প্রতি পদে তাহাকে ধীর, শান্ত, নম্র হইবার উপদেশ দেওয়া হয়, যেন সে শ্বশুরবাড়ীর জীবনটাকে দুঃসহ মনে করিতে না পায়। শ্বশুরবাড়ীর জন্যই মেয়ের জীবন, কারণ মেয়ে শুধু মা, আর কিছুই নয়। এই মাতৃত্বের শিক্ষা অভিভাবিকার কাছে। এইখান হইতে সে যে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাই তাহার জীবনটাকে রমণীয় করিয়া রাখিবে। বাংলার মেয়ে ছোট বেলা হইতে সংযম শিক্ষা করিতে শেখে। নানা ব্রতের মধ্য দিয়া তাহাকে সহনশীলা করিয়া গড়িয়া তোলা হয়; কারণ, মা হইতে গেলে সহনশীলতা আবশ্যক। শ্বশুরবাড়ীতে সকল মেয়েকেই যাইতে হইবে; তাহাদিগকে তাহার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেও হইবে; নহিলে তাহার জীবনটাই খাপছাড়া হইয়া যাইবে; সংসারের কাহাকেও সে সুখী করিতে পারিবে না।

ঊষাও এ শিক্ষার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ছোটবেলা হইতে সে বিশেষ করিয়া বগলা দেবীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বেশী হাসা, চীৎকার করা, দৌড়াদৌড়ি করা, এ সবই স্ত্রীলোকের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। চঞ্চলা ঊষাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তিনি তখন যে ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহা কোনও সভ্যসমাজে উক্ত হইবার নহে। তখন ঊষার নিকট তাহা অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও, এখন তাহা কাজে লাগিল।

সে দেখিল, যথার্থই ঠাকুরমা ও দিদি তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। স্ত্রী-জীবনে শ্বশুরালয় প্রথম সময়ে একটা কারাগার বলিয়াই ঠেকে। ক্রমে সেই কারাগার আবার মুক্ত রাজ্য বিবেচিত হয়, তাহার সকল বন্ধন আলগা হইয়া যায়, এবং সেই রাজ্যের একছত্রী রাণী হয় সেই ক্ষুদ্র বধূটীই। কিন্তু প্রথম নূতন বধূ, সে না পায় আনন্দ, না পায় স্ফূর্ত্তি। চোখের জলে, আর পুরাতন স্মৃতি মনে করিয়া, অতি কষ্টেই তাহার দিন কাটে।

ঊষা জলের মাছ ডাঙ্গায় গিয়া পড়িল।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে নিজের চক্ষুজল লুকাইবে, সে যোও ছিল না। অবগুণ্ঠন একটীবারও সে দিতে পারে নাই।

এ বাড়ীর সবই তাহার কাছে নূতন বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র একটী যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। অত বড় মেয়ে, বোধ হয় তাহার দিদির মত,—তাহার মাথায় সামান্য একটু কাপড় পিন দিয়া আঁটা, সামনেটা সবই খোলা। কাপড় পরার ধরণটাই বা কেমন? পিছনে আবার কাপড় খানিকটা কুঞ্চিত করা, অঞ্চলটা বুকের বামদিকে একটা ব্রোচে আঁটা। পায়ে গোড়ালী উঁচু জুতা, আবার মোজা।

বিস্মিতা ঊষা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কই, সিন্দূর তো সিঁথিতে নাই। মেয়েরা আবার বাঁকা করিয়া পুরুষদের মত সিঁথা কাটে, এদেশে যে সবই আশ্চর্য্য।

আরও কয়েকটী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সকলেরই সেই এক সমান বেশ ভূষা। 'অবগুণ্ঠনাবৃতা' ঊষাকে দেখিয়া তাহারা হাসিয়াই আকুল, একজন বলিল, "সতী, তোর ভাইবউ তো বেশ ঘোমটা দেয়। মৃন্ময় বাবুর খাসা বউ হয়েছে। এত পছন্দ, এ বিয়ে করব না, ও বিয়ে করব না, শেষে পছন্দ হল বুঝি এই তিন হাত লম্বা ঘোমটাবতীটিকে।"

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা করিস নে। দেখিস, এই বউকে কেমন করে তৈরি করে নিই।"

আর একটী মেয়ে—তার চোখে এক জোড়া চশমা, হাতে একটী রিষ্ট ওয়াচ,—সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঊষার মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিল, "ওগো, তোমায় আর অত ঘোমটা টানতে হবে না। সতী, তোর ভাই-বউ আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে।"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই সব হাসি-পরিহাসের মধ্যে ঊষা সত্যই কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ কখন তাহা উপচাইয়া গণ্ড বাহিয়া

গড়িয়া গেল। পিতার উপর, দিদির উপর অভিমানে তাহার সারা হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা তো সবাই জানিতেন,—জানিয়া শুনিয়া কেন এখানে তাহার বিবাহ দিলেন।

চশমা-চোখে মেয়েটী মৃন্ময়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "সুন্দর স্ত্রী পেয়েছেন মৃন্ময় বাবু, চালিয়ে নিতে পারবেন তো?"

মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঊষার পানে একবার চাহিল, তার পর আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

ঊষা দাঁড়াইয়া কাঁদিয়াই আকুল হইতেছিল। যে দাসীটা তাহার সহিত প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছিল, সে এই গোলযোগ দেখিয়া, অনেক দূরে দাঁড়াইয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র। একে সহরে পা দিয়াই সে চমকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই আশ্চর্য্য সুন্দরীর দল দেখিয়া সে আর পলক ফেলিতে পারিতেছিল না। ঊষা তাহাকে কাছে পাইবার আশায় দু'চারবার এদিক ওদিক চাহিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার চোখের জল আরও বেশী পড়িতে লাগিল।

"এসো, আমার মা লক্ষ্মী, আমার ঘরে এসো মা—"

ঊষা মুখ তুলিল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যথার্থই মাতৃ-মূর্ত্তি। চওড়া লালপেড়ে একখানি শাড়ি তাঁহার পরিধানে, একটী সাদাসিদা সেমিস গায়ে, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। হাতে কতকগুলি সোণার চুড়ি। তাঁহার মুখখানায় যথার্থ দেবীর ন্যায় জ্যোতিঃ। তাঁহাকে দেখিলে যথার্থই হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

ঊষা তাঁহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তিনি অগ্রসর হইয়া ঊষাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া বলিলেন "কান্না কেন মা, আমি যে তোমার মা রয়েছি এখানে। তোমার মা নেই, তাই ভগবান আমায় তোমার মা করে পাঠিয়ে দেছেন। এস মা আমার আনন্দময়ী, আমার ঘর আলো করবে এস, আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করবে এস।"

সতীর পানে চাহিয়া, ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, "ছি সতী, কাজটা তোমাদের মোটেই উচিত হয় নি। পল্লী-গ্রামের মেয়ে, কি জানে সে। তোমাদের কথাবার্ত্তা, হাসি দেখে সে কেঁদে ভাসাচ্ছে, দেখছ কি? ছেলে মানুষ, তোমাদের কি বোঝে সে?"

সতী অপ্রস্তুত ভাবে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। ঊষাকে লইয়া মৃন্ময়ের মা মালতী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই মুহূর্ত্তেই ঊষার মনটা তাঁহার পদতলে একেবারে নুইয়া পড়িল, সে সজল চোখ মালতী দেবীর মুখের উপর রাখিল।

দাসী শ্যামা এক সময়ে তাহাকে একাকিনী পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "কি রকম লোক এরা দিদি? বরণ নেই, আচার নেই, কিছু নেই, আমাদের দেশ ঘরে বিয়ে হলে এতক্ষণ কত কাণ্ড হতো। এ সবই অনাছিষ্টি দেখছি। শুনেছিলুম হিন্দু নয়, বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি ঠিকই।"

ঊষার মনেও কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল। সে কত বিবাহ দেখিয়াছে, এমন আশ্চর্য্য কখনও দেখে নাই। প্রতিবেশী রামসদয় বাবুর ছেলে হৃদয় বিবাহ করিয়া আসিল, বধূকে দুধ আলতার পাথরে দাঁড় করানো হইল, বরণ করা হইল, আরও কত কি হইল। কই, তাহার বিবাহে তো সে সব কিছুই হইল না।

সে যত দেখিতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। এ বাড়ীতে তাহার শ্বাশুড়ী মালতী দেবী ছাড়া আর সকলেই জুতা পায় দেয়, সকলের সম্মুখে বাহির হয়।

ননদিনী সতীর বাল্যসখী কয়টী মেয়ে দুই তিন দিন সে বাড়ীতে ছিল। মালতী দেবীর ভয়ে তাহারা ঊষাকে আর ঠাট্টা-তামাসা করিতে পারে না, তাহার কাছেও বড় একটা আসে না। ইহাতে ঊষা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের ঠাট্টা-তামাসার ভয় তাহার বড় বেশী রকম ছিল।

সে দিনে বাড়ীতে একটা সান্ধ্য-সম্মিলন ছিল, ইহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বড় হলটা নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। মজলিসের হাসি, কথা ঊষার কাণে অপর কক্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল। অনভিজ্ঞ বালিকা ঊষা বসিয়া ভাবিতেছিল—এ আবার কি, এ কাহাদের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। বাবা দেখিয়া

এ কোথায় তাহাকে নির্ব্বাসিতা করিলেন? দিদি যে বলিয়াছিলেন—

অভিমানে ঊষার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবা—তোমার ঊষাকে এখান হইতে উদ্ধার কর, তোমার কাছে লইয়া যাও। এখানে থাকিলে ঊষা বাঁচিবে না, তোমার ঊষা মরিয়া যাইবে।

সতী দ্বারের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের মলিন আলোটার পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "ঘরের আলোটা এত কম করে দেছে। বললেই পারতে বউদি, আলোটা বাড়িয়ে দিতে। এমন করে আছ, যেন চোর হয়ে এসেছ তুমি। না, অমন করে বসে থাকলে হবে না, চল, তোমায় ওখানে সবাই ডাকছে।"

ঊষা একেবারে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল, সেখানে অত লোক, কেমন করিয়া সে সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে? সে মাথা নত করিয়া যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল।

সতী এত সাধ্য-সাধনা করিল, ঊষা নড়িল না; পরাভূত হইয়া সতী চলিয়া গেল।

একটু পরেই মালতী দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঊষার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে বলিলেন, "ছি মা, অমন একগুঁয়েমী করতে নেই। সবাই তোমায় দেখতে চাচ্ছে। আমাদের বউ-ভাত তো নেই মা, এতেই লোকে তোমায় দেখবে। চল মা লক্ষ্মী, লজ্জা কি? আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় দেখিয়ে আনছি।"

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল ঊষার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। দেখিতে পাইয়া মালতী দেবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি মা, কাঁদছ কেন? বল লক্ষ্মী, আমায় বল, আমার কাছে কোনও কথা লুকিয়ো না।"

ঊষার চোখের জল শুখাইয়া গেল, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মালতী দেবী ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার চুলটা ঠিক করিয়া দিয়া, মুখখানায় পাউডার মাখাইয়া, ভাল করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। বধূর হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, ঘোমটা টেনো না যেন, তা হলে লোকে আমায় যা না তাই বলবে। এর পরে তুমি যা খুসি তাই কোরো, আজকার দিনটা আমার মান রক্ষা কোরো।

অবগুণ্ঠনশূন্যা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া তিনি হলে প্রবেশ করিলেন। সতী তখন পিয়ানোর কাছে বসিয়া তাহাতে সুর দিয়াছিল, ঊষাকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেল।

ঊষাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিল। ইহারি মধ্য হইতে রেখা চাপা গলায় পার্শ্ববর্ত্তিনী জনৈক বন্ধুকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "শুধু দেখতে ভাল, গুণ কিছু নেই। মৃন্ময়-বাবুর কপালে গোলাপ জুটল না, জুটল শিমুল ফুল। বেশী বেছে নিতে গেলে এমনিই হয় বটে।"

একটু আহত ভাবে সতী বলিল, "কিন্তু বউদির বয়েস তো বেশী নয় ভাই, আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে দুদিনে ঠিক করে নিতে পারব। এখন তো আর সেখানে যেতে পারবে না, এখানে থেকে লেখাপড়া শিখতে হবে। বছর খানেক পরেই দেখতে পাবে, বউদিকে কি করে তৈরি করেছি। যেমন সুন্দর দেখতে, তাতে শিক্ষার যদি যোগ হয়—দেখতে পাবে, বম্বাই গোলাপ হয়ে দাঁড়াতে পারবে কিনা।"

মৃন্ময়ের বন্ধু জ্যোতিশ ঊষার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে ভালরূপে দেখিয়া লইয়া বলিল, "একেবারেই অশিক্ষিতা কি?"

পার্শ্বের চেয়ারখানা হইতে পরিচিত একটা কণ্ঠে উক্ত হইল "না, সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। তবে শিক্ষা বলতে তোমরা ইংরাজীটাই বোঝ, এরা সে শিক্ষায় শিক্ষিতা নয়।"

রেখা চশমা খুলিয়া কাঁচ দুইখানা মাজিয়া চোখে দিতে দিতে হাসিয়া বলিল, "কি রকম শিক্ষা মনীশবাবু? পল্লী-গ্রামের মেয়ের শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত, আর রান্না-ঘর-দোর পরিষ্কার করা, একেই আপনি বলতে চান ইংরাজি ছাড়া শিক্ষা।"

মনীশ নামটা শুনিবামাত্র ঊষা সচকিতে মুখ তুলিল। সত্যই তো পার্শ্বে তাহারই মনীশ-দা। এতগুলি অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে পরিচিত এই একজনকে দেখিবামাত্র ঊষার প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আনন্দাশ্রু-পূরিত নেত্রে সে মনীশ-দার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার মনীশ-দাকে আগেকার মতই চাপিয়া ধরে, কাঁদিয়া নিজের ব্যথা জানায়; কিন্তু তখনি মনে

পড়িল, সে শ্বশুরালয়ে বধূ, এখানে তাহার একটুও স্বাধীনতা নাই।

রেখার কথায় উত্তেজিত হইয়া মনীশ বলিল, "শুধু তাই যদি আপনি পল্লীগ্রামের শিক্ষা বলে ধরেন, আমি বলি ইংরাজি শিক্ষার চেয়ে তাই ভাল। ইংরাজি ভাবটা আমাদের দেশে এসে কি লাভ হয়েছে তা জানি নে। লোকে—অর্থাৎ আমার বন্ধুর মত লোকেই বলে, ইংরাজি শিক্ষা খুব ভাল; কিন্তু আমি বলি একেবারেই খারাপ। যেহেতু আমাদের প্রকৃত যা জিনিস, তা আমরা এ শিক্ষায় হারিয়ে ফেলেছি। বাঙ্গালী—অথবা শুধু বাঙ্গালীই বা বলি কেন, ভারতবাসীর আপনার বলে গর্ব্ব করার মত জিনিস আর কি আছে, বলুন দেখি? আমরা সর্ব্বাংশে বিদেশীর অনুকরণ করতে যাই, আমাদের নিজের যা তা বিসর্জ্জন দিয়েছি। যাক্, আমি সে কথা নিয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই নে, তাতে আমাদের এই শান্ত সান্ধ্য-সম্মিলনটায় অশান্তি এসে পড়বে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করতে এটুকু বলছি,—অমরবাবু মেয়েদের ইংরাজি ছাড়া আর সব শিক্ষাই দিয়েছেন। মৃন্ময় বোধ হয় উমাকে দেখে এসেছে, তার শিক্ষা যথার্থ প্রশংসনীয়! আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি—উমার মত শিক্ষা এ পর্য্যন্ত কোন মেয়েই পায় নি, উমার মত স্বভাব এ পর্য্যন্ত কোনও মেয়েরই আমি দেখি নি। তারই বোন ঊষা, সেই বোনের কাছে মানুষ, সেই বাপের শিক্ষায় শিক্ষিতা, এ বাড়ীতে কালী দেয় নি। বরং আমি জানি—সে এ সংসার উজ্জ্বল করতে পারবে।"

চকিতে উমার মূর্ত্তিটা মৃন্ময়ের মনে জাগিয়া উঠিল। সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি—বিবাহের রাত্রে যে এক কথায় তাহার মত লোককেও বসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিদায়ের সময় স্বামী-স্ত্রীতে যখন তাহার নিকট বিদায় লইতেছিল, কি উদাস-করুণ সে মূর্ত্তিখানা। বড় বড় স্থির চোখের দৃষ্টি আকাশের কোনখানে ন্যস্ত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া, ঊষার ডাকে জ্ঞান পাইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিয়াছিল "যাচ্ছিস—যা ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, সারাজন্ম যেন তোর সেখানেই কাটে, আমার মত পোড়াকপাল যেন না হয়।"

তাহার পর মৃন্ময়ের হাতখানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল "দেখো ভাই—আমার জীবন তোমার হাতে দিলুম। ওকে দেখো—"

সৌন্দর্য্য তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন দীপ্ত সৌন্দর্য্য তো দেখা যায় না। পবিত্র জ্যোতিতে উমার সর্ব্বাবয়ব উদ্ভাসিত। সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুন্দর তাহার সেই চোখ দুইটা। সেই চোখ দুইটাতেই তাহার মনোভাবটা বাহিরে প্রকাশ হইয়া যায়, সে নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও গোপন থাকিতে পারে না।

সেই শুভ্র খানখানা—সেই অলঙ্কার-শূন্যতাই তাহাকে বড় চমৎকার মানাইয়াছিল। সাজ-সজ্জা প্রভৃতি অতিরিক্ত বোঝার দরকার তাহার নাই, সে বড় হালকা, বড় ক্ষীণ। মনে হয় অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা তাহার উপর চালাইলেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

তবু মৃন্ময় তাহার অন্তরটা দেখিতে পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মনীশের কথাগুলো রেখার মনে বিলক্ষণ জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু সে না কি উমাকে দেখে নাই, তাই চুপ করিয়া গেল; নচেৎ সে মনীশকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিতে পারিত।

সতীর কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "মনীশবাবুর আত্মীয় কি না—তাই অত প্রশংসা। একবার দেখতে পেলে হত।"

সতী শুষ্ক স্বরে বলিল, "দাদা বলেছেন—অমন সুন্দরী না কি দেখা যায় না। তার না কি একটা গুণ আছে—যে তাকে দেখে, সেই ভালবেসে ফেলে।"

পরিহাসের সুরে রেখা বলিল, "তোমার দাদা ভালবাসায় পড়েন নি তো?"

সতী বলিল, "না। একবার দেখাতেই কি ভালবাসা জন্মায়?"

রেখা গম্ভীর মুখে হাতের ব্রেসলেট ঘুরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "জন্মায় বই কি। তার ঢের প্রমাণ আমি দিতে পারি। যাই হোক—সে কথা এখন থাক। আমি এই বলতে চাই, মনীশবাবু নিশ্চয়ই উমাকে ভালবাসেন। ভালবাসা যায় যাকে, লোকে তাকে সব রকমেই বাড়িয়ে তুলতে চায়। মনীশবাবুর কথার ভাবেই জানা যাচ্ছে—"

সতী বাধা দিয়া বলিল, "বেশ তো, ভাল কথাই, তিনি তাকে ভালবাসেন, না ভালবাসেন, সে কথা নিয়ে মাথা

ঘামানোর কি দরকার আমাদের। সকলে গান করতে বলছেন, একটা গান করে ফেলি না।"

রেখা একটু হাসিয়া বলিল, "ঠাট্টা কেন ভাই? যে গান জানে, তার বেশী গর্ব্ব হয় কি না; সে তাই সহজে গান গাইতে চায় না। আমি যদি গাইতে জান্‌তুম, বলতেও হত না, দশটা গান গেয়ে দিতুম। বলে ফেল না একটা গান। অমন তো হাজারটা গান গেয়ে দিস তুই, আজ কি হল?

সতী পিয়ানোতে সুর দিল। রবিবাবুর গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া সে গাহিল—

শুধু তোমার বাণী নয় কো বন্ধু প্রিয়,

শেষ লাইনটা—একলা পথে চলা আমার করব রমণীয়, গাহিতে গাহিতে বাস্তবিকই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কণ্ঠটাও আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে সমস্ত মন ঢালিয়া গানটী গাহিতেছিল; তাই গানটা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

গান থামিয়া গেলে—রেখা চুপি চুপি সতীর কাণে কাণে বলিল "কে সে ভাগ্যবান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে কি? বল তো ঘটকালি করতে রাজি আছি। একজামিনের এখনও মাস তিনেক দেরী আছে, ঘটকালী করতে এর সাতটা দিন ব্যয় করতে আমি রাজি আছি।"

সতী একটু হাসিল, উত্তর দিল না।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া যাইবার সময় মনীশ সতীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "তোমার বউদির সঙ্গে একটু দেখা করাতে পারবে কি?"

সতী বলিল, "পারব না কেন? কিন্তু দাদার কাছে বললেই তো ভাল ছিল।"

মনীশ একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা? সে তো স্ত্রী বলেই মানতে রাজি হয় না। বললে—যখন বেশ শিক্ষিতা হবে, তখন সে তার বন্ধুদের তার কাছে নিয়ে যাবে আলাপ করাতে, এখন সে কোন মতেই কাউকে নিয়ে যাবে না; কাজেই তুমি ছাড়া আর উপায় নেই।"

যে কক্ষে ঊষা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, সতী সেই কক্ষদ্বারে মনীশকে আনিয়া বলিল, "এই ঘরে বউদি আছে, যান।"

মনীশ দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ঊষা—"

"মনীশ-দা!"

ঊষা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "মনীশদা।"

মনীশ সস্নেহে তাহার ললাটের অবিন্যস্ত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এই দুদিনেই রোগা হয়ে গ্যাছিস এত? হ্যাঁরে পাগলী, এ রকম করলে এখানে থাকবি কি করে? জন্মটা যে তোর এখানে কাটাতে হবে।"

ঊষা কাঁদিয়া বলিল, "না মনীশদা, আমি থাকতে পারব না।"

মনীশ বলিল, "থাকবি নে তো কোথা যাবি?"

ঊষা বলিল "বাবার কাছে থাকব।"

মনীশ রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "তা বই কি? একজন রয়েছে তাঁর চোখের সামনে বিধবা হয়ে, তুই গিয়ে না থাকলে চলবে কি করে? পাগলামী করিস নে ঊষা, ও সব কথা মনে আনিস নে বলছি।"

ঊষা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এরা আমায় আর যেতে দেবে না বলছে মনীশদা।"

মনীশ বলিল "যেতে দেবে না কি? আমি মৃন্ময়ের ছোট বেলাকার বন্ধু, আমায় এরা খুব ভালবাসে। আমি তোকে নিয়ে যাব দিন কত পরে। তুই কাঁদাকাটা করিস নে বলছি, যে যা বলবে তাই শুনে যাবি। আমি রোজই আসব তোকে দেখতে। যদি শুনতে পাই, এদের কথা শুনিস নি, তা হলে উমাকে গিয়ে সব বলে দেব।"

ঊষা বলিল, "না মনীশদা, কিছু বল না দিদিকে। আমি কাঁদব না। কিন্তু বল, তুমি আমায় রোজ দেখতে আসবে তো?"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "আসব রে আসব, রোজ আসব, তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তোকে না দেখলে তোর দিদির কাছে নিস্তার পাব আমি? নিজের গরজে না এলেও তার গরজে আমায় আসতেই হবে।"

ঊষা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সজল নেত্রে শাসাইল—"যদি না এস মনীশদা, আমি কিন্তু নিশ্চয়ই দিদিকে লিখব।"

মনীশ বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)



বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের সমালোচনা

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন কবি-সম্রাট

যাঁহার "অনুশক্তি" বঙ্গের নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে, যাঁহার "পথহারায়" পথভ্রষ্টের প্রতি প্রকৃত পথের ইঙ্গিত রহিয়াছে, যিনি "মা" লিখিয়া আদর্শ নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, পিতৃ-আজ্ঞায় পুত্রের কি পর্য্যন্ত সংযম করিতে হয়, স্বামি-প্রেমে আত্মহারা পিতার আজ্ঞায় সেই প্রেমময় স্বামি-কর্ত্তৃক চির-উপেক্ষিতা হইয়াও একান্ত দৈন্যে পড়িয়াও স্বামীর প্রতি পত্নীর কি ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রেম, রক্ষা করিতে হয়, পুত্রের লালন, পালন, শিক্ষা, দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, পুত্রকে ধার্ম্মিক করিতে হয়, পিতৃভক্ত করিতে হয়, সাপত্ন্য ভুলিয়া সপত্নীকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতে হয়, সপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের প্রতি—নিজের গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা একচুল কম নয়, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা কি ভাবে বাড়িতে পারে, পুত্রেরও বিমাতার উপরে জননীর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়,—যাঁহার পবিত্র লেখনীর মুখে এই সকল বিষয়ের নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, যিনি তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসেই প্রতেক নায়ক-নায়িকার চরিত্রগুলি স্পষ্ট করিয়া উজ্জ্বল অক্ষরে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন, সেই মাতার অনুরূপা পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিয়া "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুইখানি প্রতিবাদপত্র বাহির হইয়াছে। একখানি এই "ভারতবর্ষে" অন্যখানি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে। প্রথমখানির লেখক শ্রীপদ্মনাভ শর্ম্মা,—পদ্মনাভশর্ম্মাকে চিনি না। দ্বিতীয়খানির লেখিকা শ্রীমতী মাতা সরসীবালা বসু। এই দ্বিতীয় খানিতে যুক্তিতর্ক আছে, লিপি-সৌন্দর্য্য আছে, মর্য্যাদা রক্ষা আছে, শিষ্টতা, সভ্যতা ও নম্রতা আছে; কিন্তু প্রথমখানিতে এই সকল গুণের সম্পূর্ণ অভাব আছে, বিপরীত গুণের সদ্ভাব আছে। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নারী জাতির সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, লেখক তাহাও জানেন না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রবীণ সম্পাদকের পক্ষে উহা পত্রস্থ করাও সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

যৌবন-বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন রস ভাল লাগে, রূপ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ,—এক এক জনের চক্ষে এক একজনের রূপ ভাল লাগে। জিহ্বায় যাহার যে রস ভাল লাগে, তাহার যেমন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, যৌবনে যাহার চক্ষে যাহার রূপ ভাল লাগে, তাহারও পরিবর্ত্তন করা সেইরূপ মনুষ্য-শক্তির অতীত। সুতরাং যৌবন-বিবাহের

প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, পিতা মাতার হাতে বা সেইরূপ অভিভাবকের হাতে বর, কন্যা নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। যুবক বর যুবতী পত্নী নির্দ্ধারণের ভার নিজেই গ্রহণ করিবে, যুবতী কন্যা যুবক স্বামি-নির্দ্ধারণের ভার নিজের হাতেই লইবে। পিতা, মাতা বা অভিভাবকের চোখে যে বরের বা কন্যার রূপ ভাল লাগিল, বর বা কন্যার সেই কন্যার বা সেই বরের সেই রূপ ভাল না লাগিতে পারে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ এ দেশে ছিল না বলিতে পারি না। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে এই বিবাহের প্রচলন ছিল। শাস্ত্রকারেরাও ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিহিত বলিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ হইতেই আমরা পূর্ব্ব-প্রচলিত ব্যবহারের নিদর্শন পাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কন্যাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছে; ইহার উদাহরণ প্রণ্ডক্ত পুস্তকসমূহে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভগবান্ মনু এই বিবাহকে কামজ ("মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ") বলিয়া এই বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি আরও নিন্দা করিয়াছেন,—এই বিবাহে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহারা নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী, ঈশ্বরদ্বেষী ও ধর্ম্মদ্বেষী হইবে ("নৃশংসানৃতবাদিনঃ—ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃসুতাঃ") ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থেও আমরা গান্ধর্ব্ব-বিবাহের কবি-প্রদর্শিত দোষের ইঙ্গিত দেখিতে পাই। আবশ্যক হইলে আমরা ভবিষ্যতে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের দেশে যেমন "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" ইত্যাদি সচ্ছিক্ষা দিবার জন্যই এক সময়ে সমস্ত কাব্য গ্রন্থ রচিত হইত, ইয়োরোপে কোন দিন সেরূপ ছিল না, এখনও তাহা নাই। ইয়োরোপের কবি ও লেখক কাব্য ও উপন্যাসে সে দেশের সমাজের যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইয়োরোপে অন্য বিবাহ নাই, একমাত্র গান্ধর্ব্ব বিবাহ আছে। আমরা ইয়োরোপের শত শত উপন্যাসে দেখিতে পাই, একটি যুবতী একটি যুবকের রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছে। যুবক কিন্তু সে যুবতীর রূপে না হইয়া অন্য একটি যুবতীর রূপে আসক্ত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে সে যুবতীর যদি এই যুবকের প্রতি অনুরাগ থাকে, মন্দের ভাল; আর না থাকে তবে এই ভালবাসা কত দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িবে বলিতে পারি না। তাহার ফলে অন্ততঃ দুই একটি যুবক-যুবতীর আত্মহত্যায় লেখক তাহার দুঃখের অবসান করিলেন। আমরা কিন্তু বলি,—দুঃখের অবসান হইল না, দুঃখের আরম্ভ হইল। এ কথাও সত্য, তুমি আমায় ভালবাস বলিয়া আমারও তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, এ কেমনতর কথা? তুমি আমায় ভালবাস, এজন্য তোমার নিকটে আমি কৃতজ্ঞ; সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও আমি কুণ্ঠিত নই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা এক নয়; কৃতজ্ঞতা আছে বলিয়া ভালবাসা জন্মিবে তাহাও ঠিক নয়। যৌবনে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ সমস্তই প্রবল, মনঃ আরও সবল। ইহারা তোমাকে ভালবাসে না, আমি কি করিব?

যৌবনে দুই কারণে ভালবাসা জন্মে, একটি রূপ গুণের প্রত্যক্ষ-জন্য, অপরটি স্বভাব-জন্য। নৈয়ায়িক হয় ত এই দ্বিতীয় ভালবাসাকে স্বভাব-জন্য না বলিয়া অদৃষ্ট-জন্য বলিবেন। এই স্বভাব-জন্য বা অদৃষ্ট-জন্য ভালবাসাও আবার দ্বিবিধ; এক, তোমাকে আমি যেমন হৃদয়, দেহ, আত্মা দান করিয়া ভালবাসিতেছি, তোমারও সেইরূপ হৃদয়, দেহ, আত্মা আমাকে দিয়া ভালবাসিতে হইবে। অন্য কেহ ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে না, অন্য কেহ তোমাকে ভালবাসিতে পারিবে না, তুমিও অন্যকে ভালবাসিতে পারিবে না। ইহার দ্বিতীয়টি হইতেছে এই, তুমি আমায় ভালবাস না বাস, আমি তোমাকে ভালবাসিব, আমি এ ভালবাসার প্রতিদান চাই না, আমি তোমাকে ভালবাসিয়াই বিমল আনন্দ লাভ করি। যৌবনে দেহ, মন, বুদ্ধি সমস্তই পরিপুষ্ট হয়; কি রূপ-গুণের প্রত্যক্ষ-জন্য ভালবাসা, কি স্বভাব-জন্য ভালবাসা—এই উভয় ভালবাসাই যৌবনে উৎপন্ন হয়। আমি যাহাকে ভালবাসিলাম, সে আমাকে ভালবাসে উত্তম। আর যদি না বাসে, তবে তাহার মন্দ ফল অনিবার্য্য। ইয়োরোপের কবি যাহা দেখাইয়াছেন, এদেশেও যে তাহার চিত্র চোখের উপরে আমরা দেখিব, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

এ দেশে এখনও সমস্ত হিন্দু-সমাজে সেইরূপ বিবাহের প্রচলন হয় নাই; যাহা হইয়াছে,—একান্ত ইংরেজি-ভাবাপন্ন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। এই অল্প সংখ্যক লোক লইয়া যে সমাজ, সে সমাজের দোষ-গুণও

কবির চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাহিরে" লিখিয়া ইহার একটি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। রূপের বা গুণের শেষ নাই। একের রূপ বা গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; সাময়িক উত্তেজনার বশে তাহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম; তাহা অপেক্ষা অধিক রূপ বা গুণ আসিয়া চক্ষের উপরে পড়িয়া আমাকে যে মোহিত না করিবে, কে বলিতে পারে? সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জানি না, যাহার রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইলাম, সেও যদি আমার রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইয়া থাকে, আর যদি তাহার সহিত কিছু কাল একত্র বাসের সুবিধা ঘটে, তাহার ফল যে কতদূরে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। স্বভাব-জন্য ভালবাসা সকলের উপরে,—এ ভালবাসায় রূপ, গুণ কিছুরই অপেক্ষা করে না। সে ভালবাসা কবে কাহার উপরে জন্মিবে, বলিতে পারি না। আজ আমি কাহারও রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বামিত্বে বা পত্নীত্বে বরণ করিলাম, কালান্তরে অন্য কাহারও উপরে আমার স্বভাব-জন্য ভালবাসা আসিয়া পড়িল। তখন যে কি হইবে, একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

উচ্চ-শীর্ষ হিমালয় হইতে জোরে প্রপাত-পীড়নে তাহার মুখে কিছুই টেকে না,—ঐরাবতের মত গজরাজও কোথায় ভাসিয়া যায়,—বড় বড় গাছ, পাথর, প্রকাণ্ড অট্টালিকা চূরমার হইয়া কোথায় যাইয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করে। স্বভাব-জন্য ভালবাসারও মুখে রূপ-গুণ-জন্য ভালবাসা কোন ক্রমেই টিকিতে পারে না—কোথায় ধসিয়া যায়। যৌবন-বিবাহের ও গান্ধর্ব্ব-বিবাহের এই সকল দোষ অপরিহার্য্য। আমার দু'একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত দু'একটি বিদুষী যুবতীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, আত্মহারা হইয়াছিলেন, প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন; কিন্তু সে বিবাহ কোথায় ভাসিয়া গেল! তাঁহারা অন্যের পাণিগ্রহণ করিলেন; কেহ বা অন্যের পাণিগ্রহণে মর্ম্মাহত হইয়া আজীবন ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন। আর একটি হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তিমতী ব্রাহ্মণকুমারী সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিতা বলিয়া জগতে পূজনীয়া, নিজের সংস্কৃত কবিতায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া, সংস্কৃতে যাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না এইরূপ একটি তাঁহার হইতে নীচ-কুলোৎপন্ন ইংরেজিনবীশের পাণিগ্রহণ করিলেন!!! বলা বাহুল্য, সেই বিদুষীর বিবাহপ্রার্থী ছিলেন,—ব্রাহ্মণ-কুমার আনুষ্ঠানিক হিন্দু সিভিলিয়ান্ যুবক। যুবক ব্রাহ্মণ-কুমারের ও সেই যুবতী বিদুষীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সংস্কৃত কবিতায় লিখিত অনেকগুলি প্রণয়লিপি সৌভাগ্য-বশতঃ আমার হস্তগত হইয়াছিল। পড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই, পড়িয়াও দেখিয়াছি। এই নব প্রণয়ের পেষণে, এই অভিনব প্রণয়-ঝঞ্ঝাবায়ুতে সেই পূর্ব্ব-পোষিত প্রণয় চুরমার হইয়া তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল, বলিতে পারি না। ইহাঁরা উপন্যাসের কল্পিত নায়ক-নায়িকা নহেন, ঘটনাগুলিও উপন্যাসের কল্পিত ঘটনা নয়। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। নাম করিলে সকলেই চিনিবেন, নাম করিলাম না।

বাল্য-বিবাহে এই সকল দোষের সম্ভাবনা নাই। বাল্যকালের শিক্ষা, বাল্যকালের অভ্যাস সংস্কারে পরিণত হয়। এই সংস্কারই স্বভাবকে আনয়ন করে। বাল্যে বিবাহ দিয়া এই সংস্কার, এই স্বভাবকে প্রস্তুত করা হয়। এই স্বভাব-জন্য ভালবাসা কামজ ভালবাসা নয়। যৌবনে কামের উৎপত্তি, কাম জন্মিবার বহু পূর্ব্বে এই ভালবাসা উৎপন্ন। আবার বাল্যকাল হইতে পিতা-মাতার মুখে, শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখে, গুরু-পুরোহিতের মুখে, পুরাণ-ব্যাখ্যাতার মুখে শুনিয়া আসিয়াছি,—পতি-পত্নী এক জন্মের নয়। এই পতিকে লইয়া এই পত্নীকে লইয়া আমরা বহুবার আসিয়াছি; আরও কত জন্ম আসিব তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন তর্কশক্তি ছিল না, অবিশ্বাস করি নাই, বিশ্বাস করিয়া গিয়াছি; বিশ্বাসই অভ্যাসকে দৃঢ় করিয়াছে। এই সংস্কার আবার আমাদিগের পুরুষ-পরম্পরা হইতে আগত, বাল্যকালে যদি সেই সংস্কারের অঙ্কুরে জল সেচন করা যায়, তবে সেটি যে জীবিত থাকিবে, বর্দ্ধিত হইবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ব-সংস্কারের বিসর্জ্জন করা বড় কঠিন। রাস্তায় চলিবার সময়ে যদি আমার পায়ে একখণ্ড প্রস্তর স্পর্শ হয়, এবং যদি দেখি, সেখানি অন্য প্রস্তর নয়, শালগ্রামচক্র, তা হইলে নিশ্চয় আজও আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিবে, আমি ভীত হইব।" ভাল করিয়া বাগানের জমী পরিষ্কার করিতে হয়। অনেক দূর খুঁড়িয়া নীচের জমী

বাছিয়া, তাহা হইতে কঙ্কর প্রভৃতি বাছিয়া দূরে ফেলিতে হয়। নিকটে কোন গাছপালা না থাকে; থাকিলে, তুলিয়া দূরে ফেলিতে হয়। সেই জমীকে জলার্দ্র করিয়া কাদা করিয়া, তাহাতে কচি গাছ লাগাইলে, সেই গাছ লাগে; বড় গাছ লাগাইলে কখনই সে গাছ লাগে না। জমী বাছিয়া জলে কোমল না করিলেও লাগে না। নিকটে গাছপালা থাকিলেও, সেই কচিগাছ ভালরূপে বাড়িয়া উঠে না। বাল্য-বিবাহে স্বভাবতঃ দম্পতির হৃদয় কোমল; তাহাতে অন্য ভাব আসিয়াও পড়ে নাই, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গাছপালারও শিকড় প্রবেশ করিতে পারে নাই। কাজে কাজে, তাহাতে কচি বয়সের পরস্পরের কচি ভালবাসাটুকু গাড়িলে ও তাহাতে পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির সেই সমস্ত উপদেশরূপ জল-সেচন হইলে, কালে যে সেটুকু পুষ্প, ফল, দল, পল্লবে বিভূষিত হইয়া সুবৃহৎ প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক আসিয়া সেই বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করিতে পারিবে; দেহ মনঃ সুশীতল করিতে পারিবে; পুষ্পের আঘ্রাণে ও ফলের আস্বাদনে কৃতার্থ হইয়া যাইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

যৌবন-বিবাহ কামজ। এ বিবাহে কেবল ভোগ-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, স্বার্থপরতা বাড়িয়া যায়। এই স্বার্থপরতার পায়ে যুবক পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতিকে অনায়াসে বলিদান করিতে পারে। করিতে পারে কেন বলিতেছি! করিয়া থাকে বলিতেছি। ইহার দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে প্রতি-নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্য-বিবাহের সময়ে যাহার অণুমাত্র সত্তা ছিল না, আজ তাহা বীভৎস মূর্ত্তিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় চক্ষুঃ মুদিত করিতে হয়। বাল্যকালে প্রণয়ের বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইলে তাহাকে যে যৌবনেও আর উঠাইতে পারা যায় না—এই চিত্র দেখাইবার জন্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরের" সৃষ্টি। শাস্ত্রানুসারে প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইতে পারে না; বিবাহ হইল চন্দ্রশেখরের সহিত। শৈবলিনী কিন্তু প্রতাপকে ভুলিল না। শৈবলিনী লরেন্স্ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গায় প্রতাপের সহিত ভাসিয়া চলিল। ভাসিতে ভাসিতে নিভৃতে তাহাদিগের প্রণয়ের মর্ম্মকথা হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার ফলে পতঙ্গের মত প্রতাপ গিয়া প্রোজ্জ্বলন্ত ঘৃতানলে আত্মাহুতি প্রদান করিল। শৈবলিনীর দৈহিক পাপ ছিল না, কেবল মানসিক পাপ ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্যও তাহার উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া অবশেষে গুরুদেবের আজ্ঞায় শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের লইতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের হস্তে শৈবলিনীকে দিতে পারিলেন না। যিনি, পতিপ্রেমে আত্মহারা হইলেও বেশ্যা হইয়াছিল বলিয়া, যবনী হইয়াছিল বলিয়া মতি বিবিকে ব্রাহ্মণ নবকুমারের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন নাই, তিনি কি করিয়া পরের পরিণীতা পত্নীকে প্রতাপকে দিবেন? কবি নবীনচন্দ্রও "রৈবতক কুরুক্ষেত্রে" বাল্যের শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হৃদয়ে লইয়া বর্দ্ধিত ভগিনী সুভদ্রাকে নাগরাজ বাসুকি দ্বারা দুর্ব্বাসার হস্তে অর্পণ করাইয়াছেন ও সেই জন্য স্বামীর উপরে একান্ত বিরক্ত করিয়াছেন। কারুর হস্তে দুর্ব্বাসাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। পাঠক, পাঠিকা, বুঝিয়াছেন কি—ইঁহারা কি বলিতে চান? ইঁহারা বলিতে চান,—বাল্যকালেই বালক-বালিকার প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। সেই সূত্র ধরিয়া—সেই বালক আত্মীয় হউক, সগোত্র হউক, জ্ঞাতি হউক,—তাহার হাতেই কন্যারত্নকে অর্পণ করিবে, শাস্ত্রের বাধা, সমাজের বাধা মানিবে না। না করিলে তাহার মন্দ ফল অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, "বাল্যে বালিকা পতি কি বুঝে না, সে সময়ে বুদ্ধি, জ্ঞান, ভালবাসা কিছুই জন্মে না; সুতরাং বাল্যে কোন ক্রমেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। যৌবনে সকল গুণেরই স্ফূর্ত্তি হয়; সে সময়ে বালিকার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।" আমরা এখন দোটানায় পড়িলাম, কাহার কথা ফেলিয়া কাহার কথা রাখিব?

আসল কথা, বাল্যবিবাহ লইয়াও নয়, যৌবন-বিবাহ লইয়াও নয়,—যাহা প্রচলিত আছে, তাহা ভাঙ্গিতে হইবে; বৃদ্ধ গেঁজেল ঋষিযের কথা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। ঋষিরা যে বলিয়াছেন, পিতৃ সগোত্রে ও মাতামহ সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ,—পিতৃকুলে সপ্তমী কন্যা ও মাতামহকুলে পঞ্চমী কন্যা অবিবাহ্যা—এই কথার উপরেই আসল ঝাল। আর যে ঋষিরা বলিয়াছেন,—ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তাহার উপরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ঝাল। এই ঝাল ঝাড়িবার জন্যই বাল্যেই বালক-বালিকার প্রণয়ের চিত্র দেখান হইয়াছে, যৌবন বিবাহের

সমর্থন করা হইতেছে। আমার এই প্রবন্ধের এই পর্য্যন্ত লিখিবার পরে পৌষের "ভারতবর্ষ" হস্তগত হইল। তাহাতে "অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার লেখক প্রোফেসার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহ বি-এস, এম্-এ-জি-এ মহাশয়। তিনি তাঁহার "আমেরিকা ভ্রমণ" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"মার্কিণ মাতৃগণও আজকাল বেশী বড় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না।" আরও তিনি লিখিয়াছেন,—"ছোটবেলা হইতে যুবক স্বামী ও বালিকা পত্নীতে একত্র থাকাতে কেমন একটি ভালবাসা জন্মে। সে ভালবাসা বেশ পূর্ণ প্রেমে পরিণত হয়। সে প্রেম এমনি যে, যদি স্বামীর মৃত্যু ঘটে, স্ত্রীর বড়লোক বাপ, মা বা আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও সে স্বামীর ভিটেতে দিনাতিপাত করে। সে ভিটা ছাড়িয়া বাপ ভাইয়ের ভিটেতে গিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। ঐরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আমি আমার ঠাকুরমা, মা, ভগ্নী ও বৌদিদির জীবনে দেখিতেছি। (পাঠক পাঠিকারাও নিশ্চয় তাঁহাদের ঈদৃশ আত্মীয়ের জীবনেও দেখিতেছেন। উহাঁদের সকলেরই বাল্য বিবাহ"—"স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আমার দিদি শাশুড়ী স্বামীর ফটো প্রত্যহ ফুল দিয়া পূজা করেন ও তৎপরে জলস্পর্শ করিয়া থাকেন। আর একটি মহিলা তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর পাদুকাদ্বয়কে মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া রাত্রে শুইতেন।" "বাল্য-বিবাহে প্রেমের মাধুর্য্য কতখানি তাহার দু' একটি দৃষ্টান্ত দিব।" এইরূপ বলিয়াই তিনি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আবার সিংহ মহাশয় যুবতী বিবাহের কুফল দেখাইতে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও তাহারও মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাহাও আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—"একটি ডাগর মেয়ে বৌরূপে ঐ পরিবারে আসে। আমি সেই বৌকে জিজ্ঞাসা করি—"তোমার শাশুড়ী কেমন আছে?" তাহার উত্তরে সে বলে, "শাশুড়ী মরে নাই—এখনও বেঁচে আছে।" এই উত্তর হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাশুড়ী মরিলে নিজ রোজগা'রে স্বামীকে ভাসুর বা দেবরের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া অন্যত্র থাকিব বা তাহাদের ভাতে মারিতে পারিব ইহাই ঐ বৌটীর অভিপ্রায়"।

বাল্য-বিবাহের অনুকূলে ও যৌবন-বিবাহের প্রতিকূলে কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেও সিংহ মহাশয় বাল্য-বিবাহের সমর্থন করেন নাই। প্রত্যুত যৌবন-বিবাহেরই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়াছেন। যে যে কারণে তিনি বাল্য-বিবাহে মত না দিয়া যৌবন-বিবাহে মত দিয়াছেন, প্রথমতঃ সেইগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

১। বাল্য-বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না, দুর্ব্বল-দেহ ও রুগ্ন-দেহ লইয়া তাহাদিগের জীবন-কাল অতিবাহিত করিতে হয়।

২। শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গর্ভ-সঞ্চার হইলে, প্রসবকালে প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে।

৩। ভারতবর্ষে বাল-বিধবার সংখ্যা বেশী। "দেরী করিয়া বিবাহ দিলে এত অল্প বয়সে বিধবা না হইতে পারিত।" বার বৎসরে বিবাহ দেওয়া হইল। এক বৎসর পার না হইতেই মেয়েটি বিধবা হইল। দুই বৎসর পরে যদি বিবাহ দেওয়া হইত; "তা হইলে সে মেয়েটি আরও দু'বৎসর ত মাছ খাইতে পাইত, সাড়ী গয়না পরিতে পারিত।"

৪। "এইরূপ আক্রাগণ্ডা যুগে যাহার যাহা আছে, তাহাতে আর কুলাইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ করিলে, সংযমী হইবার অভাবে, সন্তানের সংখ্যা এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না।"

৫। "নিতান্ত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্য বিবাহ।" "অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিলে কেবল যে অল্পজীবী এবং অসুস্থ সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে এরূপ নহে, মাতার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।"

৬। বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র সকল শাস্ত্রেই বাল্য-বিবাহের সমর্থন নাই, যৌবন-বিবাহেরই ব্যবস্থা আছে।

সিংহ মহাশয়ের প্রথম আপত্তির উত্তরে আমার আর কিছু না বলিলেও চলে। মাতা অনুরূপা তাঁহার প্রবন্ধে বাল্য-বিবাহের উল্লেখ করিয়া, নিজের বংশের মহাপুরুষ-দিগের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহারা যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ ছিলেন—দেখাইয়াছেন; আরও তিনি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরদিগেরও সেই ভাবে তালিকা

প্রদর্শন করিয়াছেন। রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট (এক্ষণে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার) মিষ্টার জে, এন, গুপ্তের অনুরোধে আমার রঙ্গপুরে যাইতে হয়। যে দিন প্রত্যূষে রঙ্গপুরে পঁহুছি, সেই দিন ১টার সময়ে টাউন হলে সভা। সেই সময়ে যাইয়া দেখি, বাগ্মি-প্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত। তিনিই বক্তৃতা দিবেন "বালকদিগের প্রতি উপদেশ দান।" সভ্যদিগের ঐকমত্যে আমারই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সভাপতির আসন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক জলদ্-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানা কথা বলিলেন, অবশেষে বলিলেন, "তোমারা কখনও বাল্য বিবাহ করিও না, পূর্ণ বয়স্ক হইলে বিবাহ করিও। দেখ, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, আমার মাতাও ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। কুলীন-কুমারীর অল্প বয়সে বিবাহ অসম্ভব। সুতরাং ধরিয়া লও তাঁহার অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। সেই পূর্ণ বয়স্কা মাতার গর্ভে আমার জন্ম। তাহার ফলে কাল আমি কলিকাতায় ট্রেণে উঠিয়াছি, আজ প্রত্যূষে রঙ্গপুরে পঁহুছিয়াছি। তাহার ফলে, এই বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ ট্রেণের ক্লান্তির পরে এখানে আসিয়া অনায়াসে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতেছি।" সভপতিব পক্ষে বক্তার প্রতিবাদ করা সভ্যতা-বিগর্হিত; সেই জন্য সভায় সে কথার উপরে আমি কোন কথাই বলি নাই। পরে যখন তাজহাট-রাজপ্রাসাদের উদ্যানে সান্ধ্য-সম্মিলন হয়, তখন আমি শিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মুখে সুরেন্দ্রনাথকে বলি—"আমি আপনার ন্যায় কুলীন নই। আমার পিতৃকুল ও মাতামহকুল উভয়েই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সুতরাং আমার মাতার অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া নয়, অল্প বয়সেই সকলে কন্যার বিবাহ দিত,—বেশী বয়সের প্রতীক্ষা করিত না। আপনার অপেক্ষায় আমার বয়সও কম নয়, বরং অধিক হইবারই সম্ভাবনা। আপনি কাল কলিকাতায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে ট্রেণে উঠিয়াছেন; রাত্রি-ভোজনও ট্রেণে সম্পন্ন হইয়াছে; আজ সকালেও প্রতারাশ হইয়াছে। অপরাহ্ণ-ভোজনও হইয়াছে। তৎপরে সভায় আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। আর এ দুর্ভাগ্য গত পরশ্বঃ প্রাতে নয়টার ভিতরে কোন রকমে স্নানাহ্নিক সারিয়া নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া প্রাণপাত করিয়া গাড়ী ধরিয়াছে। তার পর আর সেদিন দিবা-রাত্রির মধ্যে জল-স্পর্শ নাই, পরদিনেও আর দিবা রাত্রির মধ্যে জলস্পর্শ নাই। আজ ভোরে রঙ্গপুরে আসিয়াছি। পথে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া মাঝে মাঝে ট্রেণের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আজ এখানে আসিয়া কর্ত্তব্য সারিতে প্রায় দেড়টা বাজিয়া যায়। পরে সেই ভাবে নাকে মুখে দুটি ভাত দিয়া সভায় আসিয়াছি। এখন আপনার সহিত বাজি রাখিয়া বক্তৃতা করিতে চাই। আপনার জন্য অবশ্য টেবিলে জলপূর্ণ গ্লাস থাকিবে, আমি মাঝে মাঝে টুঁটি ভিজাইতে পারিবেন। আমার পক্ষে ত তাহা একেবারে অসম্ভব। দেখা যাউক, পূর্ণ বয়সে বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত কতকাল বক্তৃতা করিতে পারে ও বাল্য-বিবাহে বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত কতকাল বক্তৃতা করিতে পারে?"

সেকালে সকলের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের ভিতরে, বাল্যে সকল কন্যারই বিবাহ হইত। সেকালের পণ্ডিতদিগকে অনেকেই দেখিয়াছেন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন—সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। কাহারও আশী বৎসরের ভিতরে দেহান্ত হয় নাই। কেহ বা নব্বই বৎসরও অতিক্রম করিয়াছিলেন। দেহ-পাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলেই সবল ছিলেন। বিগত ৩০শে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিবস দিবা ১ ঘটিকায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে খ্যাতনামা পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছে। সে দিনেও তিনি হরিসভার বার্ষিক উৎসবে নিজের বাড়ী হইতে দূরবর্ত্তী মহারাণী ভবানীর সত্রে খড়ম পায়ে দিয়া অনায়াসে গিয়াছিলেন ও সেই ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার একটু জ্বর হইয়াছিল। আমি এক দিন সকালে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি আসনে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূজান্তে কাহারও কাহারও সাহায্য লইয়া শয্যায় গিয়া উপবেশন করিলেন। অনেক কথা হইল, শাস্ত্রীয় কথাও হইল। তার পর দিনেই তিনি কাশীতে দেহ রক্ষা করিলেন।

সে কালের হিসাব ইহাঁকে দীর্ঘায়ুঃ বলা যায় না। কিছু বেশী বা কিছু কম এই বয়সেই ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার, মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক বৎসর অতীত হয় নাই, আমার একটি আত্মীয় পণ্ডিত একশ তের বৎসর বয়সে মহানিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিনেও তিনি রাত্রে লুচী খাইয়া শয়ন করেন। একটা রাত্রির সময়ে জাগিয়া পৌত্র ও পুত্রকে ডাকিয়া নিজকে বাহির করিতে বলেন। বঙ্কিমবাবুর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৮ বৎসর বয়সের সময়ে ও তাঁহার পিতৃব্য জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১০৫ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করেন। বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে দেহত্যাগ করেন। ইহাঁদিগের সকলেরই পিতামাতার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। ঐ কাঁঠালপাড়ার রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে,—৮২ বৎসর বয়সে; তাঁহার মাতা অসম্ভব অল্প বয়সে এই পুত্রটিকে প্রসব করিয়াছিলেন। আমার খুল্ল পিতামহ ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষের দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ৭৬ বৎসর বয়সে পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার আশী বৎসর বয়সের সময়ে সেই বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে হরকান্ত বিদ্যাভূষণের জন্ম হয়। তিনিও প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। আর কত দেখাইব? এক কথায় বলিতে পারি,—সেকালে সকলেই বাল্য-বিবাহ করিতেন; সেকালের সকলেরই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ পুত্রাদি জন্মিত! সেকালে কাহারই ডিস্‌প্যাপসিয়া বা ডাইবিটিস ছিল না। একালের লোক সেকালের লোকের ভোজন দেখিলে বিস্মিত, চমৎকৃত ও ভীত হইবেন। মেয়েদের ভিতরেও এত জরায়ুঘটিত ব্যারাম ও হিষ্টিরিয়া ছিল না। প্রসবের জন্যও শিক্ষিতা ধাত্রী, লেডি ডাক্তার, ডাক্তার ও সিবিল সার্জ্জনকে ডাকিয়া টানা-হিচড়া, কাটাকাটি করিয়া বীভৎস কাণ্ডের অবতারণা হইত না, অশিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্যে অনায়াসেই সুখপ্রসব হইয়া যাইত।

বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবন্ধ লিখিয়া আর বেগ পাইতে হইবে না,—বরপণের দায়ে পড়িয়া কন্যাপক্ষের একেবারে অন্ধকার দেখিতে হইতেছে। অল্প মূল্যে বর মিলে কি না তাহার চেষ্টায়, অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় এই ৩০।৪০ বৎসরের ভিতরে ১২ হইতে ক্রমে ১৮।২০ বৎসরে কন্যার বিবাহের বয়স দাঁড়াইয়াছে। পাশের অনুপাতে বরপণ অধিক পাওয়া যাইবে, এই আশায় বরের পিতাও বরের বয়স বাড়াইতে থাকে। সুতরাং শাস্ত্র বিশ্বাসী ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী উভয়েই, কিসে কল্যাণ হইবে, কিসে অকল্যাণ হইবে, সে চিন্তা না করিয়াও, বর কন্যার বয়স বাড়াইতেছে। সুতরাং সেজন্য আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি ও প্রবন্ধ লিখিয়া পত্রিকার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া অনর্থক কালি, কলম ও কাগজের অপব্যয় করিবার প্রয়োজন কি বুঝি না।

মাতা অনুরূপা নিজের পরিবারের মধ্যে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশে, বাল্য বিবাহেও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র জন্মিয়াছে, দেখাইয়াছেন। তাহা দ্বারা কি তিনি বলিতে চান,—বাল্য বিবাহে জাত সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয়? তা তিনি বলেন নাই। সিংহ মহাশয় যদি সেরূপ বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন বলিব। বাল্য-বিবাহে জাত সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না, অল্পায়ুঃ হয়, রুগ্ন হয়—এই সিদ্ধান্তের উত্তরেই অনুরূপা দেবী বলিতেছেন,—আমি দেখাইয়া দিতেছি,—ইহাঁরা বাল্য বিবাহে জাত, অথচ দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছেন। অনুরূপা দেবীর প্রদর্শিত গণ্ডী ছোট রকমেরই হউক আর বড় রকমেই হউক, বা গণ্ডী না হইয়া একটিও হউক; দেখাইতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত, জোর গলায় ইহা বলিতে পারা যায়। কি দেশীয় ন্যায়-শাস্ত্র, কি বিদেশীয় লজিক,—উভয়েই এই হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন। সিংহ মহাশয় একজন খ্যাতনামা প্রোফেসার হইয়াও যে অনুরূপা দেবীর প্রদর্শিত বিষয়টিকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, এজন্য দুঃখিত হইলাম।

২। সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তেও আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। এই কাশীধামে অনেক বৃদ্ধা কাশীবাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের অল্প বয়সে প্রসব করিতে হইয়াছে। প্রসবকালে প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয় নাই, এখনও তাঁহারা কুব্জপৃষ্ঠ হইয়াও অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া স্বহস্তে রন্ধন করেন ও দণ্ডী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন

করাইয়া নিজে ভোজন করেন। নিজের পরিবারে ও অন্য পরিবারে ইহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই।

৩। সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, বার বৎসরে বিবাহিতা যদি সেই বৎসরে বিধবা হয়, তবে তখন হইতেই তাহার মাছ খাওয়া বন্ধ, সাড়ী ও গহনা পরা বন্ধ। আর যদি চৌদ্দ বৎসরে বিবাহ দেওয়া হয় ও সেই সময়ে সে বিধবা হয়, তবে সে অনায়াসে আরও দুই বৎসর মাছ খাইতে পারে, শাড়ী ও গহনা পরিতে পারে। সিংহ মহাশয় করুণা করিয়া দুই বৎসর (অতি অল্প সময়) মাছ খাওয়াইয়া শাড়ী ও গহনা পরাইয়া বিধবাদিগের কতটুকু আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাহা না করিয়া যদি বিধবাদিগকে মাছ খাইতে ও শাড়ী গহনা পরিতে চিরদিনের জন্য ব্যবস্থা দিতে পারিতেন, যাহাতে তাহারা মাছ খায় ও শাড়ী গহনা পরে তাহার চেষ্টা যত্ন করিতেন, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, পুস্তিকা লিখিয়া বিতরণ করিতেন, তবে বিধবাদিগের চির আশীর্ব্বাদ পাইতেন। তিনি ত আর আমাদিগের মত কুসংস্কারসম্পন্ন নহেন যে, সেকালের অসভ্য ঋষিদিগের প্রদর্শিত জুজুর ভয়ে অধীর হইবেন। যজ্ঞোপবীতের পূর্ব্বে তিন বেলা যাইতাম, কত কি খাইতাম। অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন হইল। সেই দিন হইতে সমস্ত বন্ধ হইল, সেই দিনেই ত একবেলা চরু (কেবল দুগ্ধে সিদ্ধ চাউল, মিষ্টের সম্পর্ক নাই) মাত্র খাইলাম। এ ভাবে বারদিন চলিল। এক বৎসর পর্য্যন্ত অনেক নিয়ম পালন করিলাম। ৮।৯ বৎসরের বালক কি করিয়া এই সমস্ত করিল? পিতামাতার পরলোকের পরে ব্রাহ্মণ বালক ১১ দিন ও কায়স্থ বালক প্রভৃতি ১ মাস পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষার কঠোর নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকে। উত্তরাপথে, দক্ষিণাপথে, মথুরা বৃন্দাবনেতে কেহই মাছ খায় না, যুক্তপ্রদেশে ব্রাহ্মণেরা মাছ খান না, ছোট লোকের মধ্যেও অনেক শ্রেণীর লোক মাছ খায় না। সিংহ মহাশয়ের মতে মাছ খাওয়াটাই কি বড় হইল? অভ্যাস-বলেই হউক, শাস্ত্র-বিশ্বাসেই হউক, বিধবারা যে মাছের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন—"অনেক বাল্য-বিধবা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বা প্রলোভনে পড়িয়া ভ্রষ্টাও হইয়া পড়িতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া বন্ধুর ও বন্ধুত্বের খাতিরে অনেকে অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে। বালবিধবাই হউক আর যুবতী বিধবাই হউক, এ ভাবে উভয়েরই পতন হইতে পারে,—শুধু বাল-বিধবা বলিলে চলিবে না। বাল বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা কঠিন, এ মতের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহার যে বিষয়ে রস বোধ হয় নাই, তাহার সে বিষয়ে প্রলোভন বা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে হিন্দু-সন্তান কখনও হিন্দুর অখাদ্যগুলি খায় নাই, তাহার সেই অখাদ্য খাইতে প্রবৃত্তি হয় না; বরং দেখিলে ঘৃণা হয়। আবার যাহারা খাইয়াছে, তাহারা ছাড়িতে পারে না। মদ্য পানেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্ত্রী জাতির পুরুষ অপেক্ষা কাম প্রবৃত্তি অতি কম। ইহার দৃষ্টান্ত, পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ পশু প্রভৃতি স্ত্রী পশু প্রভৃতির পাছে পাছে যাইতেছে, আক্রমণ করিতেছে, স্ত্রী পশু প্রভৃতি ছুটিয়া পলাইতেছে, উপেক্ষা করিতেছে, পদাঘাত করিতেছে। তাহার উপর আবার যে নারীর স্বাদগ্রহ হয় নাই, সে ত সহজেই উপেক্ষা করিবে; সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

৪। সিংহ মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি বাল্য-বিবাহে সন্তান বৃদ্ধি হইলে, দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করা অনিবার্য্য। উত্তরে বলিতেছি,—সেই জন্যই ত ঋষিরা বিধবা-বিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। একশ পুরুষের মধ্যে যদি নিরান্নব্বই জন পুরুষ সংযমী হয় ও একজন লম্পট হয়, তবে সে একশত স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং পুরুষদের সংযমী করিলে প্রজাবৃদ্ধির মাত্রা কমিবে না। স্ত্রীলোক হইতেই সন্তান প্রসূত হয়; সেই জন্য তাহাদিগেরই সংযমের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কুমারী বিবাহ বন্ধ করিলে বিবাহ হইবে কাহার? আইন হয় না; এই জন্য বিধবা বিবাহ বন্ধ করা হইয়াছে। ঋষিরা যে যে জন্য যে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে অবশ্য তাহার সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়।

৫। অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। বুঝিলাম না। বিবাহের মন্ত্র পাঠ করা মাত্র সেই মন্ত্রশক্তির বলেই বুঝি কন্যা ঋতুমতী হইল! এ দেশে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বিহারে সকল জাতির মধ্যেই বাল্য বিবাহের প্রচলন; কিন্তু ঋতুমতী না হওয়া

পর্য্যন্ত কন্যা পিত্রালয়ে বাস করে। ঋতুমতী হইলে পুনঃ সংস্কার করিয়া স্বামী পিত্রালয় হইতে পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া আসে। মাতা অনুরূপাও এদেশের সেই আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই আচারের প্রবর্ত্তন করিলে দোষ কি? কামরূপে ও উৎকলেও এইরূপ আচার দেখিতে পাই। পূর্ব্বের মাতা প্রভৃতি অভিভাবিকাগণ অল্প বয়সে কখনই ছেলে বৌকে এক ঘরে শুইতে দিতেন না। কলিকাতার মেয়েরা আহ্লাদ করিয়া এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার অনুকরণে সমস্ত বঙ্গদেশেই অল্প বয়সে বিবাহিত দম্পতিকে এক ঘরে শোওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কন্যাকে হীরা, চুণি, পান্নায় মণ্ডিত নানা অলঙ্কারে ও মুক্তাহারে বিভূষিত করিবার ব্যবস্থা, বরকে বহুমূল্য হীরার আঙটী, হীরার চেন, ঘড়ী ও বহুমূল্য নানাবিধ যৌতুক দিবার ব্যবস্থাও কলিকাতায় প্রথমে আরম্ভ হয়। প্রথমে সুবর্ণ বণিকের ভিতরে, পরে ধনী কায়স্থদিগের ভিতরে প্রতিযোগিতা করিয়া ইহার প্রবর্ত্তন হয়, এমন কি, বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর বিবাহে যৌতুকে রূপোর খাট পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমি তখনই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনি এ কাজটি ভাল করিলেন না। দিতে ইচ্ছা হয়, যৌতুক বলিয়া বিবাহ সভায় না দিয়া অন্য সময়ে দিলেও চলিত।" পরে বঙ্গদেশের ধনীরা কলিকাতার অনুকরণে কন্যা ও বরকে দানের মাত্রা, তত্ত্বের মাত্রা বাড়াইয়া ফেলেন। ধনীর দেখাদেখি মধ্যবিত্তেরাও অল্পবিস্তর যথাসম্ভব বাড়াইয়া লয়েন। বর-পক্ষীয়েরাও অন্য বর-পক্ষের লাভ দেখিয়া লোভাকৃষ্ট হইয়া নির্লজ্জ ভাবে ক্রমে প্রকাশ্য চুক্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখন সেই চুক্তি বঙ্গদেশময় হইয়া পড়িয়াছে। যাউক, এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। সিংহ মহাশয়ের মতে পড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিলে বালকের পড়াশুনা মাটী হয়; সে কেবল পত্নীর চিঠী পাইবার জন্য মেসে পড়িয়া দিন-রাত চিন্তা করে। বুঝিলাম। এজন্য সমস্ত পরীক্ষার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বালকের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সিংহ মহাশয় বলিতে পারেন কি, পরীক্ষার শেষ হইবে কত দিনে? এম-এ দেওয়ার পরেও যে অনেক ছেলে ডাক্তারি শিখিতে যায়, ওকালতি দিতে যায়, এঞ্জিনিয়ারি পড়িতে চায়। আবার পি-আর-এস আছে, রিচার্চ্চ আছে। জন্ম ভরিয়াও যে পরীক্ষার শেষ হয় না; একেবারে বিবাহ বন্ধ করিয়া দিলেই আপদ শান্তি হইয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি সৃষ্টির পরে সমস্ত বঙ্গদেশের বালককে যে কলিকাতার মত স্থানে রাখিতে হয়। কলিকাতার মত স্থানে যে চতুর্দ্দিকে প্রলোভন। এখানে বাইস্‌কোপ, সেখানে থিয়াটার, তাতে আবার হাব ভাব প্রদর্শন করিয়া যুবতী কুলটাদিগের নৃত্য ও গান। অন্যখানে আবার নগ্নভাবে রমণীদিগের সার্‌কেস্!!! পত্নীর চিঠী বন্ধ করিয়া পাঠার্থী বালকদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিবেন কি? তবে আর সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠায় খারাপ রোগের ঔষধের এত বিজ্ঞাপন কেন বাহির হয়? সেই সকল ঔষধেরই বা এত কাট্‌তি কেন? নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের অবস্থিতির জন্য যে সকল ঘর নির্ম্মিত হইত, সেগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, পাশে ক্ষুদ্র। সেই ঘরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটরী থাকিত, এক একটি কুটরীতে এক একটী ছাত্র থাকিত। সেই কুটরীগুলিতে বাহিরের দরজা দিয়া ভিন্ন আর প্রবেশের পথ ছিল না। এখনও নবদ্বীপে সে ভাবের চতুষ্পাঠী গৃহ আছে। হষ্টেলে বা মেসে এক একটি ছাত্রের এক একটি ঘরের ব্যবস্থা অদ্যাপি হয় নাই। সিংহ মহাশয় বাল-বিধবার মাছ খাওয়া বন্ধ হয় বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। মাছই কি বড় খাদ্য? বিধবাদিগের জন্য যে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, মাখন, মিছরি, সুপক্ক নানাবিধ ফল, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যের শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে বিধবাদিগের সেবায় বধূদিগের এই সমস্ত যোগাইতেও হইত। এক্ষণে এ সমস্ত দূরে থাকুক, বিধবার ভাগ্যে ভাগ্যনিয়ন্ত্রীদিগের কৃপায় দিনান্তে এক তোলা দুধও যে মিলে না!

৬। সিংহ মহাশয়ের ষষ্ঠ আপত্তি—বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ সকল ধর্ম্ম-পুস্তকেই যৌবন-বিবাহের সমর্থন আছে, বাল্য-বিবাহের নিষেধ আছে। তিনি বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি বাঙ্গালী, বেদ জানি না, বেদের অর্থও বুঝি না। আমি বলিয়া নয়, স্বয়ং বেদব্যাস পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "মুহ্যন্তি যৎ পূরয়ঃ" বেদের অর্থে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপ বলিয়া "বিজ্ঞোল্লপ্ত—শ্রুতাদ্ বেদঃ" ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বেদের অর্থ কত গভীর, কত কঠিন। আমার মত অল্পজ্ঞ কি তাহার অর্থ বুঝিবে? সুতরাং বেদের কথা লইয়া আমি কিছুই বলিব না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত আমি শাস্ত্রীয় বিচার করিতেও অসমর্থ। এ কথা আমি অনেকবার বলিয়াছি, সেইরূপ বিচারও আমি কখনও করি না। তবে তিনি উন্নতি যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; শাস্ত্রীয় বিচারের মত নয়, যথাশ্রুত সেই গুলি ঠিক কি না দেখাইব।

১। সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন; "ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষি লিখিয়াছেন, "যৌবন সঞ্চারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত।" মেধাতিথি ঋষি নহেন। সিংহ মহাশয়ের পক্ষে সেই সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা উচিত ছিল।

২। "কাম মামরণাত্তিষ্ঠেদ গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি
নচৈবৈনাং প্রয়চ্ছেত্তু গুণ হীনায় কর্হিচিৎ॥"
(৯+য্য, ৮৯) মনু

"গুণহীন পাত্রে পিতা কদাপি প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকেও অর্পণ করিবে না।" এই অর্থ হইতে কি বুঝা যায় যে, যৌবনে বিবাহ দিবে? বরং বুঝা যাইতেছে যে যৌবন-বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও বরং তাহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য; তথাপি গুণহীন বরে দান করা কর্ত্তব্য নয়।

৩। "ত্রিংশব্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকাং।"
৯ অ, ৯৪

সিংহ মহাশয় এই মনু-বচন উদ্ধৃত করিয়া কি প্রমাণ করিবেন, বুঝিলাম না। ত্রিশ বৎসরের বর বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে; ইহাতে কি যুবতী-বিবাহ হইল? এই বচনেরই অর্দ্ধেক হইতেছে এই,—

"ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্ট বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ"।

সিংহ মহাশয়ও এই অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—২৪ বৎসরের পুরুষ ৮ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলে ধর্ম্মে বা উন্নতিলাভের সকল বিষয়ে শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন।" তিনি তাঁহার এই মনগড়া ব্যাখ্যাটি পূর্ব্বোক্ত বচনার্দ্ধের কোন্ কোন্ শব্দ, কোন্ কোন্ বিভক্তি (সুপ্ ও তিঙ্), কোন্ কোন্ কারণার্থ হইতে পাইলেন? "বিবাহ করিলে" ইহা কোন্ ক্রিয়াপদের অর্থ? কর্ত্তৃপদ কি? "সত্বর" শব্দের শীঘ্র শীঘ্র অর্থ করিলে যে "সত্বরঃ" না হইয়া সত্বরং হইয়া যায়। সংস্কৃতে বড় বাঁধাবাঁধি নিয়ম; যা তা করিবার সম্ভাবনা নাই। এই বচনার্দ্ধে মনু ৮ বছরের মেয়েকে বিবাহ করিবারই ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্যরূপ অর্থ করিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। মনু "উৎকৃষ্টায়াভিরূপায়" ইত্যাদি বচন দ্বারা কুলাচারাদিতে শ্রেষ্ঠ বরকে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যাকেও দান করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া গুণহীন বরকে কখনই কন্যা দান করিবে না, ঋতুমতী হইলেও বরং আমরা কন্যাকে গৃহেই রাখিব, এইরূপ বলিয়াছেন; তৎপরে আবার মনু বলিতেছেন,—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিং।"

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে (তাৎপর্য্য—পিতা উৎকৃষ্ট বরের সহিত বিবাহ দেন কি না। এই তিন বৎসরের ভিতরে বিবাহ না দিলে আর অপেক্ষা না করিয়া) ইহার পর আত্মতুল্য জাতি-গুণ-বিশিষ্ট বরকে নিজেই বরণ করিবে। সিংহ মহাশয় এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া কি বুঝাইতে চান, বুঝিলাম না। মনু যদি ঋতুমতী না হইলে বিবাহ দিবে না বলিতেন, তবে সেই বচনের পরেই,—

"অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচ যং সাধিগচ্ছতি।"

এই বচন বলিয়া পিত্রাদি বিবাহ না দিলে সেইরূপ কন্যা নিজে ঐরূপে আত্মদান করিবে, তাহাতে তাহার কোন পাপ হইবে না, যে বিবাহ করিবে তাহারও কোন পাপ হইবে না, বলিতেন না। ঋতু হওয়া নিবন্ধন যদি কন্যার পাপ না হয়, ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করা নিবন্ধন যদি বরের কোন পাপ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে কেন পাপ হইবে না, বলিতেছেন?

৪। সিংহ মহাশয় মহাভারত হইতে আর একটি বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন; সেটি এই—

"ত্রিংশদ্ বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং কন্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

ত্রিশ বছরের বর ষোল বছরের নগ্নিকা কন্যাকে বিবাহ করিবে। সিংহ মহাশয় "নগ্নিকা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ঋতুমতী"। গৃহ্যসূত্রকার "নগ্নিকা" শব্দের না কি "ঋতুমতী" অর্থ করিয়াছেন। কোন্ গৃহ্যগ্রন্থে এইরূপ অর্থ আছে? গোভিল গৃহ্যসূত্র, পারস্কর গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন সূত্র,—এতগুলি গৃহ্যসূত্র আছে। গৃহ্য গ্রন্থ অভিধান নয় ও টীকাও নয় যে, শব্দের অর্থ করিতে বসিয়াছেন। "নগ্নিকা নাগতার্ত্তবা" এই ত অমরকোষ। যে কন্যার ঋতু হয় নাই, তাহাকেই "নগ্নিকা" বলে। সমস্ত কোষেই এই অর্থ লিখিত। "শব্দকল্পদ্রুম" ও "বাচস্পত্যভিধান" অনেক পাঠক পাঠিকার গৃহে আছে। তাঁহারা খুলিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, আমার অর্থ ঠিক কি সিংহ মহাশয়ের অর্থ ঠিক। বাচস্পত্যভিধানে আবার মহাভারতের ঐ বচনটি "নগ্নিকা" শব্দের নীচেই প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাতে "ষোড়শাব্দাং" নাই "দশবর্ষাং" আছে। "দশবর্ষাং" হইলে অর্থ-সঙ্গতিও হয়। "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করা দূরে থাকুক, কোন গ্রন্থকার "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। এরূপ স্থলে "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের" বাক্যে কি করিয়া আস্থা স্থাপন করিব?

৫। রামায়ণ দৃষ্টে বুঝিতেছি,—বিবাহকালে রামচন্দ্রের বয়স ছিল, পোনের বৎসর। সীতার বয়স কত ছিল—পাঠক পাঠিকা অবধারণ করিবেন। সিংহ মহাশয় "সীতার" নামোল্লেখ কেন করিলেন, বুঝিলাম না। আর আমি কিছু বলিব না; কেবল একজন খ্যাতনামা চিন্তাশীল সুলেখক ইংরেজ সাহিত্যিকের একখানি পুস্তকের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ও ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ এফ, এইচ্, স্ক্রীন তাঁহার—"An Indian Journalist" পুস্তকে (p. 12-13) লিখিয়াছেন, "His wife was a scion of the Bural family of Jorasanko. This event was far from having the sinister influence on his mental development which is assigned to early marriages by self-styled friends of India. They are stigmatised as the root of the decay which is consuming the country's manhood. That the children of the upper middle classes in many parts of Bengal are mere human weeds is but too evident: but the cause of deterioration must be sought for in adverse physical conditions rather than in a custom which is hallowed by the acquiescence of a hundred generations. Doctrinaire reformers forget that human nature is more powerful than convention, and that the sexual instinct is far stronger and is manifested at an earlier stage of life in the tropics than in temperate regions. The institution of marriage regulates this overwhelming impulse, just as law does the equally powerful craving for revenge. Hence marriages in early life are good in themselves and the cause of good to society: and would-be reformers should ponder well the lessons afforded by countless ruined careers the outcome of an undue postponement of the nuptial rites." *

* বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহ সম্বন্ধে সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা আপাততঃ প্রকাশিত হইবে না।—ভারতবর্ষ সম্পাদক

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(৪৫)

বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইলে মনোরমা অমলকে বলিল, "ওগো, খোকাকে কখন আনবে ?"

তার দৃষ্টির ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল যে তাহাতে অমলের প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। মনোরমাকে বুকের কাছে টানিয়া সে বলিল, "আজই নিয়ে আসবো মনু।"

তাদের বাড়ী ফিরিতে প্রায় দশটা হইয়া গেল। অমল বলিয়াছিল, মনোরমাকে বাড়ীতে রাখিয়াই সে খোকাকে আনিতে যাইবে। কিন্তু বাড়ী গিয়া দেখিল, ইন্দ্রনাথ খোকাকে লইয়া হাজির।

মনোরমা মোটর হইতে লাফাইয়া নামিয়া খোকার কাছে ছুটিয়া গেল। খোকা তার কোলে উঠিয়াই কাঁধে মাথা রাখিয়া ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "কাল রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে 'মা, মা' বলে কেঁদে উঠলো। সেই থেকে সমানে কাঁদছে। আজ সকালে ওকে কিছু খাইয়েই নিয়ে এসেছি।"

মনোরমা তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। আদরে তাহাকে ভরিয়া দিল, তাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "কেঁদো না বাবা, আর তোমাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকবো না।" বলিয়াই সে অমলের দিকে চাহিল।

অমল ব্যথিত চিত্তে এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল। সে বলিল, "এতেও কি আমার কথার অপেক্ষা ক'রতে হ'বে, মনোরমা ?"

সে অমলের কাছে ছুটি লইয়া গেল, নিজের ঘরে নিরিবিলি যাইয়া ছেলেকে শান্ত করিতে। অমলের কাছে ছেলেটাকে প্রাণ ঢালিয়া আদর করিতে তার যেন একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচে বোধ হইতেছিল।

আপনার ঘরে গিয়া সে তাহাকে আদরে সোহাগে ভরিয়া দিল। ছেলে শান্ত হইল, কিন্তু স্তব্ধ হইয়া মায়ের বধূ বেশের দিকে চাহিয়া রহিল। এ রূপ তাহার অপরিচিত বলিয়াই সে বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল; কিন্তু মনোরমা সে দৃষ্টির ভিতর যেন অভিমান ও তিরস্কার দেখিতে পাইল। তাহার মৃত স্বামীর চক্ষু যেন এই শিশুর চোখের ভিতর দিয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইল। সে বিছানার ভিতর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমল ঘরে ঢুকিয়া এই অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইল। সে আস্তে আস্তে মনোরমাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চোখ মুছাইয়া, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মনোরমা, আমাকে বিয়ে করে' কি তুমি অসুখী হ'য়েছ ?"

অশ্রুতে মনোরমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল; সে উত্তর দিতে পারিল না।

অমল আবার বলিল, "যদি তাই হয়, যদি মনে কর, তুমি ভুল ক'রেছ, তবে তাতে দুঃখ করো না মনোরমা। তোমার যাতে সুখ হয় তাই আমার একমাত্র ইচ্ছা, তার জন্যে আমি সবই ছাড়তে পারি। আমার সংসর্গ যদি তোমাকে পীড়া দেয়, তবে, বিয়ে হয়েছে, হোক, কিন্তু তুমি ঠিক যেমনটি ছিলে, তেমনি হ'য়ে স্বতন্ত্র থাকতে পারো। আমি তোমাকে রক্ষা ক'রবো, সেবা যদি চাও ক'রবো। কিন্তু তোমার কাছে এসে বা তোমাকে আমার প্রেম দিতে এসে কষ্ট দেব না। বল, তুমি যা ইচ্ছা ক'রবে, তাই হবে মনোরমা। তোমার দুঃখ আমি দেখতে পারি না।"

মনোরমা স্বামীর বুকের কাছে মাথা লুকাইয়া বলিল, "আজকের দিনেই এমন কথা তুমি আমায় কেমন করে ব'লছো। তোমায় পেয়ে আমি অসুখী হ'ব ? হায়! আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে বামন অসুখী হ'বে ?"

"তবে কাঁদছো কেন ?"

"ওগো, তোমায় পেয়ে আমি স্বর্গ পেয়েছি; কিন্তু,—

কিন্তু,—আমার ছেলে যে আমার পর হয়ে যাচ্ছে! খোকা যদি আমায় ভাল না বাসে, তবে আমি কেমন ক'রে বাঁচবো ?"

"ওঃ, এই কথা ?" বলিয়া অমল বলিল, "এস তো বাবা, তোমাকে আমাদের হরিণের পিঠে চড়িয়ে আনিগে।" বলিয়া সে খোকাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল।

কিছুক্ষণ পরে অনীতা আসিয়া সে ঘরে ঢুকিল; যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি ও প্রীতি আসিয়া মনোরমার মনের সব গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গেল।

অনীতাকে আনিয়া অমল তাহার ঘরেই তাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। আর একখানা ঘর তাড়াতাড়ি ঠিক-ঠাক করিয়া মনোরমার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। অনীতার ঘরখানাই ছিল সব চেয়ে ভাল ঘর।

অনীতা মনোরমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাহার কাপড়-চোপড় ছাড়া হইলে, তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। দেশী বিলাতী নানা আসবাবে, বিলাস ও আয়েসের নানা অপূর্ব্ব আয়োজনে ঘরখানা বোঝাই ছিল। অনীতা সমস্ত জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া মনোরমাকে বুঝাইয়া দিল। কোন্‌টী কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ যন্ত্রের ভিতর কি কৌশল, তাহাকে সমস্ত শিখাইল।

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, "এখন থাক ও-সব ভাই, এখন তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি—ঠাকুরঝি!"

অনীতাকে এই নূতন সম্বোধন করিয়া সে কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল।

অনীতা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আর কখন সময় হ'বে কি না কে জানে, এখনি সব বুঝে নাও ভাই!"

বিস্মিত হইয়া মনোরমা বলিল, "কি ব'লছো ভাই, বুঝে নেব কি ?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "এই ঘরটি মায় আসবাব আমি তোমাকে প্রণামী দিচ্ছি যে বৌদিদি।"

মনোরমার লজ্জিত গণ্ডে রক্ত-আভা দেখা দিল। সে বলিল, "দাও দেবে, এর পরে বুঝে নেব।" সে মনে মনে ভাবিল, অমলকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এত বড় দান কিছুতেই লওয়া হইতে পারে না।

"আর কখন বুঝে নেবে ? আমার যে যাবার সময় হ'য়ে এল ভাই!"

শঙ্কিত চিত্তে মনোরমা বলিল, "কোথায় যাবি ভাই ? কি ব'লছিস ?"

অনীতা মৃদু হাসিয়া চুপি চুপি বলিল, "যাব আমার শ্বশুরবাড়ী।"

হাসিয়া মনোরমা বলিল, "সত্যি, কবে ভাই ? কোথায় ? কবে বিয়ে হবে ?"

"বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

"হ'য়ে গেছে ? তোর দাদা জানে না, কেউ জানে না ?"

"হাঁ ভাই; কেউ জানে না। আমার স্বামীটি গোপন প্রেমের নাগর—দুষ্টের এক শেষ!"

"কে সে ? কোথায় সে ?"

অনীতা আবিষ্টের মত বলিল, "সে আমার অন্তরে বাহিরে বোন—সে সমস্তটা বিশ্ব ছেয়ে আছে।—তার বাঁশী যুগ-যুগান্তর থেকে লোকের মনকে টেনে এসেছে, সংসারীকে সন্ন্যাসী ক'রেছে, সতীকে কলঙ্কিনী ক'রেছে—সেই আমার স্বামী! সেই আমায় পাগল ক'রেছে।"

মনোরমা এতক্ষণে কথাটা বুঝিল। গম্ভীর হইয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। অনীতা যে তার যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, তার ঘর দুয়ার ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া যাইবে, এ কথা ভাবিতে তার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে ব্যথিত চিত্তে বলিল, "তুই আমাকে এমনি করে' ছেড়ে গেলে ভাই, আমার সব সৌভাগ্য যে শূন্য হ'য়ে যাবে। তুমি যেতে পাবে না।"

অনীতার হাত সে চাপিয়া ধরিল। অনীতা নীরব রহিল।

মনোরমা বলিল, "আমাকে ঘরে তুলে দিয়ে তুমি যদি এ ঘর ছেড়ে যাও, তবে এ ঘর বাড়ী আমার উপর একটা দারুণ বোঝা হ'য়ে উঠবে! আমার অপরাধের সীমা থাকবে না। তোমার সব সুখ কেড়ে নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারবো না অনীতা!"

অনীতার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বড় মায়ায় বাঁধছিস বোন! কিন্তু উপায় নেই, আমায় যেতেই হ'বে।" বলিয়া সে মৃদুস্বরে গাহিল

"রাই বলে বাজিলে বাঁশী,
আমায় যেতে যে হ'বে গো!"

"কেন যেতে হ'বে ? ঘরে বসে কি সাধনা হয় না ? ভগবান তো ভাই, মন্দিরে বাস করেন না। তাঁর লীলা-ক্ষেত্র আমাদের অন্তরে। মনকে আপনার ভিতর ডুবিয়ে দিয়ে, তাঁর সান্নিধ্য যত সহজে, যত নিবিড় ভাবে অনুভব করা যায়, আর কিছুতেই তা' হয় না। তপ, জপ আরাধনা, শিব-পূজা সব ক'রে দেখেছি ভাই, কেবল ধ্যানে, কেবল আপনাকে আপনার ভিতর ডুবিয়ে দিয়েই তাঁকে কাছে পেয়েছি। তা' সে কি তুমি এখানে ব'সে পেতে পার না ?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "সে হয় না ভাই। সে একরকম হয় বটে, কিন্তু যে ফকীর হ'য়ে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছে, সেই যে কেবল সেই গোপীবল্লভের নিবিড় প্রেমের বন্ধন জানতে পেরেছে। সেই জানতে পেরেছে, তার কাছে আর জগতে কিছুই প্রার্থনীয় নাই! যে অনুভব ক'রেছে, সেই কেবল জানে যে, সে প্রেমের সাগরকে 'প্রেম বিনা নাহি মিলে।' আর সে প্রেমের স্বাদ যে পেয়েছে, তার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না।"

মনোরমা তর্ক করিল না। ব্রাহ্মের মেয়ে হইয়া, দেশী ও বিলাতী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাইয়াও অনীতার কেমন করিয়া এমন বুদ্ধিভ্রংশ হইল, যে, অবশেষে যাহাকে সে অত্যন্ত অশুচিতা ও আবিলতা-পূর্ণ মনে করে, সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে এমন করিয়া আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারিল, তাহা ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাই হোক, আমি তোমাকে এখন কিছুতেই যেতে দেব না। আমাকে এমন করে' ভাসিয়ে দিয়ে তোমার যাওয়া হ'তেই পারে না। যদি যাও, তবে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ী ছেড়ে যাব।"

নিবিড় স্নেহের সহিত মনোরমার ক্লিষ্ট মুখখানা বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া অনীতা বলিল, "এমন ক'রে আমায় বাঁধিস নে বোন। রাখতে আমায় পারবি না, কেবল বাঁধন ভাঙ্গার ব্যথাটাই বেড়ে যাবে।"

অমল খোকাকে কাঁধে করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। মনোরমা দেখিল, তার ও খোকার দু'জনেরই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল!

খোকাকে নামাইয়া দিয়া অমল বলিল, "নেও মনো, তোমাকে একটা নূতন present দিলাম—খোকার হাসিমুখ।"

স্মিত উৎফুল্ল মুখে খোকাকে চুম্বন করিয়া মনোরমা মনে মনে বলিল, "এর চেয়ে দামী তুমি আর কিছুই আমায় দিতে পারবে না।" সে অমলকে এমন একটা কৃতজ্ঞ, স্নিগ্ধ, প্রীত দৃষ্টি উপহার দিল যে, অমল একেবারে ধন্য হইয়া গেল।

খোকা মায়ের চিবুক ধরিয়া, নানা রকমে ঘাড় নাড়িয়া, হরিণের পিঠে চড়ার কথা, মোটর-কারের ভোঁ ভোঁর কথা, বাগানের বড় বড় ফুলের কথা, এমনি কত কথা, অনর্গল বলিয়া গেল। শেষে বলিল, "বাবা আমায় কত মজার গল্প বল্লে! হাঁ মা, ঈশ্বর খুব ভালো; না? বাবা বল্লে, তুমি না কি খালি তাঁর কাছে কাঁদতে, তাই তিনি তোমাকে রাণী করে' দিয়েছেন! আর আমাকে রাজপুত্তুর ক'রে দিয়েছেন।"

"বাবা!" অমল খোকাকে ইহারই মধ্যে এতটা আপন করিয়া লইয়াছে! এ কথা শুনিয়া যেন মনোরমার বুকের উপর হইতে একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। সে বালকের মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, ঠিক।" বলিয়া প্রেমপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অমলের দিকে ফিরাইয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ, অভিমান তো কম নয়! তুমি না কি রাজা!"

অনীতা ইতোমধ্যে অলক্ষ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দেখিল যে, এই আনন্দ-মিলনের মধ্যে সে একটা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন আবর্জ্জনা।

অমল নিজের শরীরখানা সটান করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "নই কিসে? হাঁ খোকা, আমি রাজা নই?"

খোকা তার দিকে চাহিয়া বলিল, "দ্যুৎ! তুমি রাজা কেন হবে? তুমি বাবা।"

"তা তো বটে! তোমার বাবা রাজা নয়?"

"না।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "দেখলে?"

অমল বলিল, "রাজা নয় তো কি?"

মনোরমাও জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে খোকা! বল্ তো।"

সঙ্কুচিত ভাবে মুখখানা মনোরমার মুখের কাছে ধরিয়া, দুই হাতে মায়ের গাল চাপিয়া ধরিয়া, মৃদুস্বরে খোকা বলিল, "রাজা না, সাহে-এ-ব।"

অমল ও মনোরমা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

(৪৬)

ইন্দ্রনাথের পিতা আর মনোরমার সম্বন্ধে কোনও খোঁজই করিলেন না। তিনি চিরদিনই স্বল্পভাষী, এখন প্রায় সম্পূর্ণ নীরব হইলেন। মনোরমার বিবাহের দিন দুই পরে বলিলেন, "ওগো, এখানে আসবার দরকার তো মিটে গেল, এখন বাড়ী চল।"

তাঁর ক্লিষ্ট, মলিন মুখ দেখিয়া, গৃহিণীর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ে আর কোনও ক্লেদ ছিল না; অমলের পাশে মনোরমাকে দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হইল, মনোরমার এ সৌভাগ্য-কাহিনী স্বামীর কাছে জানাইয়া, তাঁর দুঃখে শান্তি দেন। কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না। কি জানি, যদি হিতে বিপরীত হয়! পরের দিন তাঁহারা দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রিটা সরযূ ছট্‌ফট করিয়া কাটাইল। কাল সকালে মনোরমার কাছে গিয়া সে সব শুনিবে! এই প্রতীক্ষায় সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনোরমার আজ এই সৌভাগ্য! সেই দুঃখিনী মনোরমা,—তার কৈশোরের সখী, যৌবনের সঙ্গিনী, তার স্বামীর দুঃখিনী ভগিনীর এত সুখ! ভাবিয়া তার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সে ইন্দ্রনাথকে বলিল, "হাঁ গো, অমল তাকে নিয়ে কি ক'রছে? খুব আদর ক'রছে, না?"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "তা কি আর ব'লতে, তার সমস্ত জীবন যেন ধন্য হ'য়ে গেছে।"

সরযূ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "আমিও আগে ভাবতাম যে, আমাকে পেয়ে যেন তোমার জীবন ধন্য হ'য়ে গেছে!"

ইন্দ্রনাথের মনে কথাটায় বড় আঘাত লাগিল। সরযূ যে জানে ও বিশ্বাস করে যে, ইন্দ্রনাথ তাহাকে আর আগের মত ভালবাসে না, তাহা সে অনেক দিনই বুঝিয়াছে। কিন্তু আর কোনও দিন এত স্পষ্ট করিয়া এ কথা সে প্রকাশ করে নাই। ইন্দ্রনাথের মনে পড়িল অনীতার কথা, তার কাতর অনুরোধ! সে অনুরোধ ইন্দ্রনাথ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সরযূকে ভালবাসিতে পারিয়াছে কি না, ঠিক বুঝিতে পারি নাই। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্রনাথ বলিল, "আর এখন? এখন তা' তুমি মনে কর না?"

"পোড়া কপাল! আমি কি এখনও জানিনে, আমি কি ছাই একটা! আমি কি, যে, তোমার মত লোককে আমি ধন্য করে দেবো?"

ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরযূকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "এমন অধর্ম্ম যেন আমি না করি সরযূ, এই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করো! তোমাকে পেয়ে যদি আমি ধন্য না হ'তে পারি, তবে আমি মানুষ বলে' ভগবানের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।"

স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনের ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া দিয়ে সরযূর সমস্ত সত্তা কৃতার্থতায় ভরিয়া গেল। সে নীরব সন্তোষের আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অনীতা এ বিয়েয় আসে নি?"

ঠিক এই কথার পরই অনীতার কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ একটু ক্ষুব্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল যে, সরযূকে সে অমলদের বাড়ীর সকল খবরই দিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনীতার কথা একটি বর্ণও বলে নাই। যখনি এমন কোনও কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে অনীতার নাম আসিয়া পড়ে, তখনি সঙ্কুচিত হইয়া থামিয়া গিয়াছে। সরযূর কাছে অনীতার নাম করিতে তার এ সঙ্কোচ করা যে ভাল হইতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিয়াও ইহা সে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

একটু সঙ্কুচিত ভাবেই ইন্দ্রনাথ বলিল, "সে এসেছে; কিন্তু সে থাকবে না।"

"কেন?" সরযূ বিস্মিত হইল।

"সে যেন কেমনধারা হ'য়ে গেছে! সে ভয়ানক বৈষ্ণব হ'য়ে গেছে।" বলিয়া অনীতার বর্ত্তমান অবস্থা ইন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়া গেল। বলিতে বলিতে সে হৃদয়ের বেদনা গোপন করিতে পারিল না। তার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

সরযূও আঁচলে চক্ষু মুছিল। সে ভাবিতে লাগিল। যে দিন ইন্দ্রনাথ অমলদের বাড়ী হইতে অপমানিত হইয়া চলিয়া আসে, সে দিন যে সেখানে ঠিক কি হইয়াছিল, তাহা সরযূ এখনো শুনিতে পায় নাই। কিন্তু শোনা কথার ভিত্তির উপর সে কল্পনার জোরে অনেকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল। অমল ইন্দ্রনাথকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

ঠিক তার পরই অনীতা রাগ করিয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়া, সুকুমার বাবুর বাড়ীতে ছিল। তার পর সে গৈরিক-ধারিণী সন্ন্যাসিনী। বিবাহে সে আসিয়াছে, কিন্তু থাকিতে নারাজ। এই কয়টা কথা একত্র জুড়িয়া দিয়া সে যে সিদ্ধান্ত করিল, তাহাতে তার মনটা ভার হইয়া গেল। সে মনে মনে ভগবানের কাছে অভিযোগ করিয়া বলিল, "আর কতদিন প্রভু আমায় স্বামীর গলায় পাথর ক'রে বাঁচিয়ে রাখবে? স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে মেয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হ'বে, চিরদিন তার নিরাশ ব্যথাভরা মুখ দেখতে হ'বে, এ তোমার কি বিচার নারায়ণ? বাঁচিয়েই যদি রাখলে, তবে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বামীর যোগ্য ক'রে তাঁর হৃদয় ভরিয়ে দিলে না কেন? দয়া করে হরি আমায় নেও।"

পরের দিন সরযূ অমলদের বাড়ী গেল। তখনও উৎসবের জের চলিতেছে। অমলের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের অন্ত নাই। তাহাদিগকে দলে দলে নিমন্ত্রণ করিয়া সে মনোরমার সঙ্গে আলাপ করিয়া দিতেছিল এবং দলে দলে পান ভোজনের উৎসব চলিতেছিল।

সরযূ আসিয়াই মনোরমাকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। তার কাছে খুঁটিয়া খুঁটিয়া কত কথাই যে তার জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। কিন্তু ছাই সময় কি সে পায়? দু দণ্ড মনোরমাকে লইয়া নিরিবিলি বসিবার উপায় নাই। দুই মিনিট অন্তর অমল আসিয়া ঘরে উঁকি মারিতেছে, আর পাঁচ মিনিট অন্তর মনোরমাকে বগল-দাবা করিয়া লইয়া পাড়ি দিতেছে—কি না, তার কোন এক বন্ধু বা আত্মীয় বা আত্মীয়া আসিয়াছেন। আশ মিটাইয়া ঠাকুরঝির সঙ্গে আলাপটা সে করিয়া উঠিতে পারিল না।

অনীতার কিন্তু অবসরের বিশেষ অভাব ছিল না। সরযূ অনীতার ভিতর বড় বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না। সে ঠিক আগেরই মত শান্ত, স্নিগ্ধ, হাস্যময়ী, তেমনি মিষ্টভাষিণী। সে উৎসবের ভিতর প্রাণ ভরিয়া যোগ দিয়াছে; আলাপ-সালাপ, গান-বাজনা করিয়া সে বন্ধু ও অভ্যাগতদের ঠিক আগের মতই আপ্যায়িত করিতেছে। কেবল তার মুখের ভাবটা ফিরিয়া গিয়াছে—সাজ-গোজের ঘটাটা অনেক কমিয়াছে; কিন্তু রূপ যেন আরও উছলিয়া উঠিতেছে। অনীতা আগে ছিল যেন একটা পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি,—এখন সে যেন একটা জীবন্ত নারী। তার চোখের ভিতর একটা কি যেন নূতন কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে নারী ভালবাসিয়া জীবন সার্থক করিয়াছে, তাহার চোখের প্রাণপূর্ণ চাহনী আজ অনীতার শরীরকে সজীব ও একটা অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

অনীতাকে লইয়া সরযূ অনেকটা সময় কাটাইল। তার প্রাণের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া একটা কি যেন বিষের মত জ্বলিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু তবু সে অনীতার সাহচর্য্যে মোটের উপর বেশ আনন্দই অনুভব করিতেছিল। অনীতার কাছে কয়েকটা কথা জানিবার জন্য সরযূর মনে ভয়ানক আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা-করা যে যায় না। ইন্দ্রনাথ ও অনীতার সম্বন্ধটা কি রকম, কি লইয়া ইন্দ্রনাথকে অমল বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, অনীতাই বা কেন ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তার অনেকগুলি মনগড়া কল্পনা ছিল। তার মধ্যে কতটা সত্য? স্পষ্টাস্পষ্টি কথাগুলি জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব হইলেও, সরযূ সেই সব কথার আশপাশ দিয়া ঘোরাফেরা করিয়া, নানা কথা আলাপ করিয়া ক্রমে আসল কথাটার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর তার দুই চক্ষু সজাগ করিয়া অনীতার কথাবার্ত্তা, হাবভাব, কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করিতেছিল। লক্ষ্য করিয়া সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, অনীতা ইন্দ্রনাথকে ভালবাসে। ইন্দ্রনাথ যে অনীতাকে ভালবাসে তা' তো সে অনেক দিনই জানে। কিন্তু, সুধু কি তাই? তা'দের ভিতর ব্যাপারটা কতদূর ঠিক গড়াইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সরযূ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে চক্ষু কর্ণ সর্ব্বদা সজাগ রাখিয়াও কিছুতেই কিছু নির্ণয় করিতে পারিল না। কেবল সে দেখিল যে, ইন্দ্রনাথ ও অনীতা পরস্পরকে বেশ একটু এড়াইয়া চলে। নিতান্তই যেখানে সামনাসামনি আসিতে হয়, সেখানে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ করিয়া তাহারা পাশ কাটাইয়া যায়। অথচ, সরযূ নিজ চক্ষে দেখিয়াছে যে, অন্তরাল হইতে অনীতা ইন্দ্রনাথের দিকে পিপাসিত চক্ষে চাহিয়া আছে। ইন্দ্রনাথকে তেমন করিতে সে কখনও দেখে নাই; কিন্তু ইন্দ্রনাথ যে ঠিক সহজ অবস্থায় নাই, সে ভয়ানক উন্মনা, ব্যাকুল, অথচ মনের ভাব লুকাইতে ব্যস্ত, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে।

সরযূ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বেশ!"

তিন দিন ধরিয়া সরযূ ইন্দ্রনাথ ও অনীতাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, এই সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত আপনার কাছে প্রকাশ করিল।

শেষ দিন সরযূ মনোরমাকে লইয়া চড়ায়ে খিল দিয়া বসিল। আজ আর কোনও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ নাই। তা ছাড়া, আজ অমলকে বাধ্য হইয়া একবার হাইকোর্টে যাইতে হইল। কাজেই, দুপুরবেলা সরযূ মনোরমাকে সমস্তক্ষণ একলা পাইল।

জিজ্ঞাসার ঝুড়ি একেবারে উজাড় করিয়া দিয়া শেষে সে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, সে কথা কিছু শুনেছিস? সে দিন অমল কেন তোর দাদাকে বের ক'রে দিয়েছিল?"

মনোরমা অমলের কাছে সব শুনিয়াছিল। ঠিক অনীতা নিজেকে যাহা বলিয়াছিল, অমল মনোরমাকে তাহাই বলিয়াছিল। মনোরমা সে কথা সরযূর কাছে বলিল।

সরযূ একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। ইন্দ্রনাথের উপর তার ভক্তি-শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সে যে এমন মহান্ চরিত্রের উপর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার মন ধিক্কারে ভরিয়া গেল। অনীতার জন্যও তার মনে দুঃখ হইল। সে গভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল, এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা কহিল না।

(৪৭)

সেই দিন দ্বিপ্রহরে অনীতা আপনার ঘরে চেয়ারে বসিয়া, দুই হাতে মাথাটা ধরিয়া, একাগ্র মনে আরসীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। তার দুই চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

আজ তিন চার দিন হইল সে যাইবার কথা বার বার পাড়িয়াছে, দাদা সে কথাকে আমলই দেন নাই। মনোরমা বার বার অনুরোধ করিয়াছে—এমন কি কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। কিন্তু যাইতে তো হইবেই। কেন হইবে, সে কথা সে ঠিক স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিল না। যেতে হবে—এটা যেন তার উপর একটা হুকুমের মত কে জারী করিয়া গিয়াছে। যুক্তি-তর্কে সে দাদা ও বউদিদির কাছে বার বার হটিয়া গিয়াছে; কিন্তু যাওয়া যে অনিবার্য্য, সে কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই।

কিন্তু এখন ফিরিতে যে প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতে চায়, বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে, অশ্রুসাগর উচ্ছ্বসিত হয়! হায়, কেন সে আসিল? লক্ষ্মীনারায়ণ কেন অভাগীকে এ পরীক্ষায় ফেলিলেন? পায়ের কোণে ঠাঁই দিয়া আবার কেন ঝাড়িয়া ফেলিলেন?

পরীক্ষা বড় ভীষণ! আজন্মের স্নেহনীড়—দাদার অপরিসীম স্নেহ, মনোরমার একাগ্র অনুরাগ, সবই বড় কঠিন বন্ধন। কিন্তু সব চেয়ে বেশী করিয়া বাঁধিতেছিল তাহাকে তাহার নিষিদ্ধ সাধনা—ইন্দ্রনাথ! এই কয় দিন ইন্দ্রনাথ যে কাছে কাছে আছে, এই জ্ঞান তাহার সমস্ত শরীর-মনকে একটা অপূর্ব্ব পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রনাথ আগের মত তার কাছে আসে নাই; তাহার সঙ্গে সম্ভাষণ করে নাই; কিন্তু তবু তাহাকে দেখিয়া, তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই সে আনন্দে ভরপুর হইয়া আছে। এ কথা তার বার বারই মনে হইতেছিল যে, এখানে থাকিলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বার বারই দেখা হইবে,—ভাবিতে প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছিল।

পর মুহূর্ত্তে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—হায়, লক্ষ্মীনারায়ণকে সে পাইয়া হারাইবে?—তাঁর পদছায়ায় আশ্রয় পাইয়াও কি তা'র দুর্ব্বল চিত্ত এ ছার সংসারের ছোট ছোট ভাল-মন্দ ছাড়িতে পারিবে না? এত দুর্ব্বল, এত হীন, এত অবিশ্বাসী তার হৃদয়! তখন সে করযোড়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া প্রার্থনা করিল, "হে দেব, হে প্রভু, হে স্বামিন্, দয়া কর, এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ কর, আমার হৃদয় শান্ত কর! আমি তোমারই, প্রভু, আর কারও নই,—আমার মনের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর!"

প্রার্থনা শেষ না হইতেই ইন্দ্রনাথের কমনীয় কঠোর মূর্ত্তি তাহার মনের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। একবার তাহার মনে হইল "কেন যাব? দাদা, বউদিদি যা ব'লছে, তা' ঠিক নয় কি। আমি আমার বাড়ীতেই তো লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করে' ষোড়শোপচারে তাঁর নিত্য পূজা ক'রতে পারি—তার জন্য যাবার

দরকার কি ?" কিন্তু দরকার আছে—সে কথা তার সমস্ত অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল যে, সে একটা মহা সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন যদি সে এখানে থাকিয়া যায়, তবে তা'র পরাজয়, তার আত্মার বিনাশ হইবে। যদি জয়ী হইতে হয়, আত্মাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার যাইতেই হইবে!

অন্তরের সহিত দ্বন্দ্বে যখন তার হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছে, যখন সে ঘরের বন্ধনের টানে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ঘরের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছে, তখন আয়া আসিয়া খবর দিল, গোসাঞি ঠাকুর আসিয়াছেন।

গোস্বামীর কাছে যাইতে অনীতার আজ বড় লজ্জা করিতে লাগিল। অপরাধিনী পত্নী যেমন স্বামীর কাছে যাইতে লজ্জায় ভয়ে পীড়িত হয়, তেমনি পীড়িত হইল অনীতা। সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া, বহু কষ্টে সঙ্কোচ জয় করিয়া, গোসাঞিজির সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

গোসাঞিজি ততক্ষণে গাড়ী হইতে কতকগুলি বাক্স পেটারা নামাইয়া, হলটা ভরিয়া তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনীতা গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "এ সব কি বাবাজি ?"

"তোমার জিনিস-পত্তর মা। তোমার পিসীমা আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।"

"কেন ? আমি যে কালই যাব আবার।"

"তুমি সেখানে আর যাও, সেটা তাঁদের বড় ইচ্ছা নয়। ভট্‌চাজ তো স্পষ্ট করেই ব'লেছে, তোমাকে আর সে সে বাড়ীতে উঠতে দিচ্ছে না।"

অনীতা স্তম্ভিত হইল। সে গোস্বামীকে লইয়া ড্রইং রুমে বসাইয়া বলিল "আমি কিছু বুঝতে পারছি না ঠাকুর! তাঁদের রাগের কারণ কি ? আমি তো জেনে শুনে কোনও অপরাধ করি নি।"

গো। অপরাধ করেছ বই কি মা, তুমি বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়েছ, যে অযোগ্য তাকে দয়া ক'রেছ ; তা'র এ শাস্তি চিরদিনই হ'য়ে আসছে। মহাপ্রভু তাঁর দয়ার জন্যে মার খেয়েছিলেন, আর তুমি এই অপমানটা হ'বে না ?

অনীতা। তবে এখন উপায় ?

গো। কিসের উপায় মা ? তুমি কি অক্ষম, না দীন, যে, তা'দের মুখ চেয়ে বাস ক'রতে যাবে ?

অ। কিন্তু ঠাকুর, আমি এখন কোথায় যাব ?

গো। কেন, এখানেই থাক না।

অনীতার কান্না পাইল। সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না ; বলিল, "আপনিও এই কথা ব'লছেন ? লক্ষ্মীনারায়ণ কি আমাকে একেবারেই ত্যাগ ক'রেছেন!"

গোস্বামী একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার কথাটা হয় তো বুঝতে না পেরে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি এখানে থাকতে চাও না ?"

"না।"

"বেশ তবে অন্য বাড়ী কর। তোমার দাসী সঙ্গিনীর অভাব হবে না।"

"আর লক্ষ্মী-নারায়ণ ?"

"প্রতিষ্ঠা কর, আপনার ঘরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করে' নিজের মনের মত করে তাঁর সেবা পূজা কর।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনীতা বলিল, "আচ্ছা ঠাকুর, বৃন্দাবনে একটা আশ্রয় পাওয়া যায় না ?"

গোসাঞি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "বৃন্দাবনে ? সে কি মা ?"

"কেন ঠাকুর, আমি কি বৃন্দাবনে ঠাঁই পাব না ?" অনেকক্ষণ একাগ্রচিত্তে অনীতার লজ্জাবনত মুখের দিকে চাহিয়া গোস্বামী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি পাবে না তো কে পাবে মা!"

অনেকক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হইল যে, দুই দিন পরে গোস্বামীজী আসিয়া অনীতাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন।

সন্ধ্যা-বেলায় অমল ও মনোরমা ড্রইংরুমে বসিয়া ছিল। অনীতা আসিতেই অমল বলিল,—

"অনি, অনেক দিন তোর ইংরাজী গান শুনি নি, একটা গা না ?"

অনীতা স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া বলিল, "কি গাইব বল।"

"তোর যা খুসী।"

অনীতা পিয়ানোর কাছে বসিয়া Handel এর Oratoris একটা গাহিল—সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর তার সুমধুর কণ্ঠ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা অপূর্ব্ব অমৃতপ্রাশ রচনা করিল। অমল ও মনোরমা মুগ্ধ হইয়া শুনিল।

তার পর মনোরমা ফরমায়েস করিল একটা বাঙ্গলা গান। অনীতা গাহিল,—

"আমার যেতে যে হ'বে গো
রাই ব'লে বেজেছে বাঁশী, যেতে যে হ'বে গো।"

গানের ভিতর তীব্র আবেগের উপর একটা স্নিগ্ধ বিষাদের মৃদু প্রলেপ দিয়া অনীতা গাহিল। অমল ও মনোরমার মনটা কি জানি কেন অন্ধকার হইয়া গেল।

গান শেষ হইলে সকলেই কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তার পর অনীতা বলিল, "দাদা, পরশু আমাকে ছুটি দিতে হ'বে।"

অমল বলিল, "সে কি! এই না বলছিলে মনো, অনি তার সব জিনিস-পত্তর আনিয়েছে, আর সে যাবে না ?"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "বৌদিদি মিথ্যা বলে নি দাদা, আমার জিনিস-পত্তর এসেছে, আমার পরশুই রওনা হ'তে হ'বে।"

মনোরমা বলিল, "অনি ভাই, কেন ওই কথা বার বার ব'লে আমাদের কাঁদাস বল! তুই গেলে আমরা এখানে কেমন করে' থাকবো বল!" তার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

অনীতাও চক্ষু মুছিয়া বলিল, "উপায় নেই ভাই—আমার যেতেই যে হ'বে—আর কাঁদাস নে ভাই, হাসি মুখে যেতে দে।"

অমলের গলাটা বড় ধরিয়া আসিল। সে কষ্টে গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আচ্ছা পরশু, সে তো অনেক দিনের কথা—আজ, কাল, তবে না পরশু।—পরশুর কথা ভেবে আজ মন খারাপ করাটা শাস্ত্রসঙ্গত নয়।"

অনীতা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "শাস্ত্র অশাস্ত্র জানি না দাদা, পরশু আমি যাচ্ছি, বলে রাখলুম।" বলিয়া কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে পিছনের বারান্দা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অনীতার বুকের ভিতরটা কাটা পাঁঠার মত ধড়ফড় করিয়া উঠিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া পায়চারি করিতে করিতে সে আসিয়া পড়িল ঠিক সেই খানটায়, যেখানে সে ইন্দ্রনাথকে তা'র প্রেম নিবেদন করিয়াছিল।

তার মনের ভিতর অগ্নিরেখায় চিত্রিত হইয়া উঠিল সেইদিনকার সেই দৃশ্য। সেই প্রেম পূর্ণ শক্তিতে তার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

যে চেয়ারখানার পিঠ ধরিয়া ইন্দ্রনাথ নির্ম্মম দেবতার মর্ম্মর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানা এখনো সেইখানে ছিল। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে সেই চেয়ারের পিঠটা চাপিয়া ধরিয়া, অনীতা তার সেই বেদনাময় স্মৃতি উপভোগ করিতে লাগিল। বুকের ভিতর বিষের ছুরির মত বিঁধিতে লাগিল সেদিনকার প্রত্যেকটী কথা ও প্রত্যেকটী ঘটনা ; তবু তাহা স্মরণ করিতে কি আনন্দ! ইন্দ্রনাথের স্মৃতি-মাত্রেই যে আনন্দ! তা ছাড়া, সেদিন এক উন্মত্ত আবেগে সে যে ইন্দ্রনাথকে বলিয়াছে যে, সে তাহাকে ভালবাসে। তাতে কি লজ্জা, কি অপমান—কিন্তু কি আনন্দ! অনীতা তন্ময় হইয়া সেই ব্যক্ত প্রেমের উন্মত্ত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ তখন বাগানে পায়চারী করিতেছিল। এবার এখানে আসিয়া সে সুখ পায় নাই। অনীতার মূর্ত্তি দেখিয়া তার মন দারুণ বেদনায় পীড়িত হইতেছিল। তার হৃদয়ের অনুপভোগ্য, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত প্রেম তাহাকে বেদনা দিতেছিল। কিন্তু তার বেশী পীড়িত করিতেছিল তাহাকে অনীতার ব্যর্থ জীবন। তার জন্য ইন্দ্রনাথ নিজেই যে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী, তাহা তো তাহার অজানা ছিল না। কি অশুভ মুহূর্ত্তে অনীতা ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিল! যাহার জন্য ইন্দ্রনাথ অনায়াসে জীবন ত্যাগ করিতে পারে, তাহার জীবন সে নিজে মরুময় করিয়া দিল—কি অভাগ্য তাহার!

অনেকক্ষণ একা বাগানে পায়চারী করিয়া এই সব জ্বালাময়ী চিন্তায় আপনাকে পীড়িত করিয়া, শেষে ইন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া আপনার চিন্তার হাত হইতে পলাইবার আশায় বাড়ীর দিকে গেল।

বারান্দায় উঠিয়াই সে দেখিতে পাইল অনীতা—অশ্রু-মুখী অনীতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া, সেই চেয়ার ধরিয়া সেই কথাই চিন্তা করিতেছে। তার বুকের ভিতর বিষের ছুরী বসিয়া গেল।

অনীতা তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথ এবার অনীতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা যথাসম্ভব কম বলিয়াছে—নিভৃতে কখনও তার সঙ্গে কথা বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু এখন কোনও কথা না বলিয়া পলায়ন করাটা কেবল অভদ্রোচিত হইবে না,—এই অবস্থায় অনীতাকে ফেলিয়া যাওয়াটা তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা হইবে, তাহা সে বুঝিতে

পারিল। তাই দু'টো হাল্কা কথা বলিয়া তার প্রাণটাকে উস্কাইয়া তুলিবার ইচ্ছায় সে চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি, দাদার কাছে বুঝি আর এখন ঠাঁই পাও না অনীতা—একেবারে stranded হ'য়ে পড়েছ। এ কিন্তু মনোরমার ভারি অন্যায়।"

অনীতা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, না, তা নয়, তা'দের কাছেই ছিলাম আমি—আমিই তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি।"

"কেন, বিয়ে করে কি তারা খুব ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে না কি?"

"হাঁ, কতকটা—অন্ততঃ যারা বিয়ে করেনি, তা'দের পক্ষে।"

"হাঁ?—এ তো বড় অন্যায়! তা' এর একটা প্রতিকার করে ফেল শিগ্‌গীর! তুমি বিয়ে করে ফেল।"

অনীতা তার বড় বড় ক্লিষ্ট চক্ষু দুটি একবার ইন্দ্রনাথের মুখের উপর রাখিল—তার পর মাটির দিকে চাহিল, আর কিছু বলিল না।

ইন্দ্রনাথের নিজেকে চাবুক মারিতে ইচ্ছা করিল। তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইবার চেষ্টায় সে অন্য কোনও একটা বলিবার মত কথা খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিয়া পাইল না। যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই এই অশোভন নীরবতা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। শেষে সে এই অবস্থাটা ভাঙ্গিবার জন্য ধপ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "হাঁ অনীতা, তুমি তা হলে এখন এখানেই থাকছ?"

অনীতা শান্ত ভাবে বলিল, "না, পরশু যাচ্ছি।"

"অ্যাঁ, যাচ্ছ? মনোরমা বলছিল—যা'ক, এটা কি তোমার উচিত হ'চ্ছে অনীতা? তোমার দাদার মনে এত বড় বেদনা দেওয়াটা কি তোমার উচিত? তা ছাড়া, মনোরমা, সরযূ, আমি, আমরা সবাই এতে যে কত বড় ব্যথা পাব, তা' কি তুমি বুঝছো না?"

অনীতা বলিল, "ব্যথা আমিই কি কম পাব? কিন্তু আমার তো না গিয়ে উপায় নেই।"

ইন্দ্রনাথ আরও জোর করিয়া বলিল, "যাতে তুমি ব্যথা পাবে তোমাকে যারা ভালবাসে তারা ব্যথা পাবে, তাই না হ'লেই কি দেবতা তৃপ্ত হ'বেন না অনীতা? তুমি একদিন ব'লেছিলে আমি তোমার গুরু। গুরু হ'বার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। তবে আমি বয়সে বড়, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী; আমি বলছি, তুমি ভুল ক'রছো অনীতা। তুমি ঘর ছেড়ে গেলে শান্তি পাবে না। তুমি যেয়ো না।"

অনীতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি সত্যিই আমার গুরু। তুমি আমায় অমন করে' বলো না, তুমি বাধা দিলে, আমি যেতে পারবো না। আমায় ক্ষমা করো, আমায় যেতে হ'বেই।"

একটী ক্ষীণ ক্ষুদ্র নারী-মূর্ত্তি একটু ছায়ার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। এই কথা শুনিয়া সে অগ্রসর হইয়া অনীতার হাত ধরিয়া বলিল, "কেন যেতে হ'বে ভাই?"

ইন্দ্রনাথ ও অনীতা দুজনেই চমকিত হইয়া দেখিল, সরযূ।

সরযূ অনীতার হাতখানা দুই হাতের ভিতর ধরিয়া বলিল, "কিসের জন্য তুমি যাচ্ছ, কি ব্যথা তোমার প্রাণের ভিতর আছে, সে কথা আমার কাছে তুমি লুকোবে কি ক'রে দিদি? আমরা যে এক ঘাটের মড়া! কার জন্য তুমি সংসার ছেড়ে যাচ্ছ? সেও যে দিন-রাত তোমার জন্যে সংসার অন্ধকার দেখছে, দিন দিন তিল তিল করে' আমার চক্ষের সামনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমি কি এত বড় পাপিষ্ঠা যে, তোমাদের দুজনকে এমনি করে দুঃখের আগুনে পুড়ে মরতে দেব? তবে আমার বেঁচে থাকায় ধিক্। এসো বোন" বলিয়া অনীতাকে টানিয়া ইন্দ্রনাথের কাছে লইয়া গেল। ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া অনীতার হাতে দিয়া সরযূ বলিল, "এই নেও বোন, আমার সর্ব্বস্ব আমি নিঃশেষে তোমার হাতে তুলে দিলাম। ভগ্নী বলে স্নেহ কর তো দু বোনে মিলে এঁর সেবা করে কৃতার্থ হ'ব—না হয় আমার বরাতে যা আছে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইন্দ্রনাথ ও অনীতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ইন্দ্রই প্রথম কথা বলিতে পারিল—সে বলিল, "এ কি করছো সরযূ!"

সরযূ বলিল, "চুপ কর, তোমার আর কিছু বলবার নেই এতে। তুমি বীর, তুমি দেবতা,—বীরের মত, দেবতার মত তুমি এতদিন কর্ত্তব্য পালন ক'রে এসেছ। আজ আমি আমার কর্ত্তব্য পালন ক'রবো, তাতে তুমি বাধা দিও না।

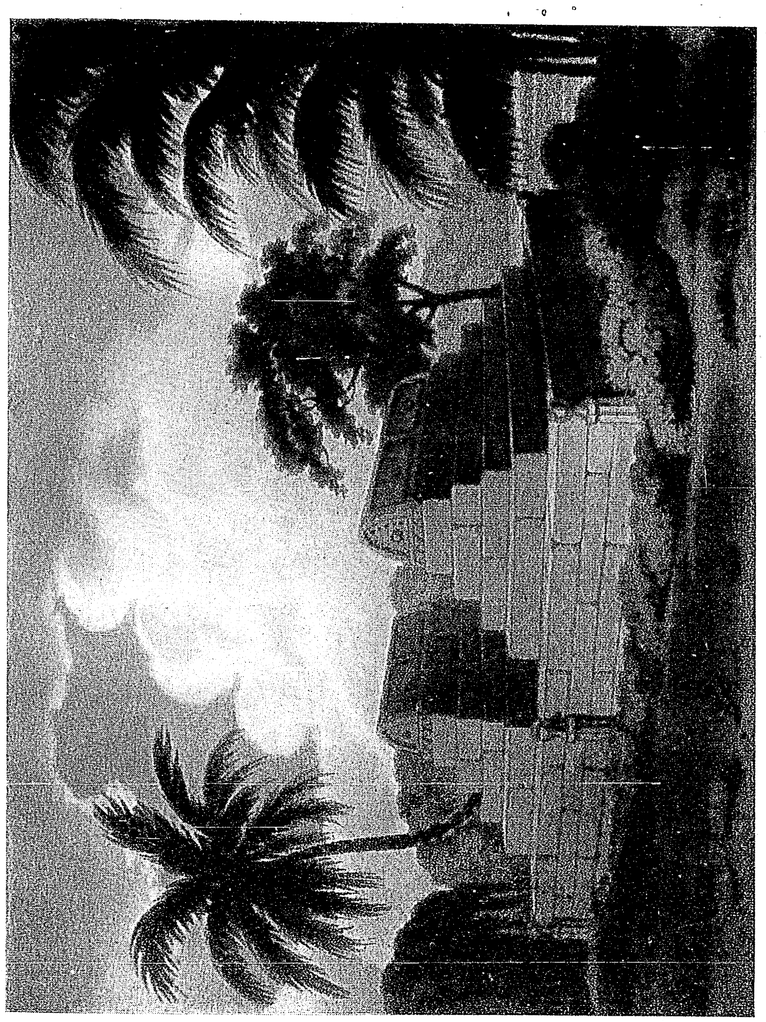

ছোট সোণা মসজিদের সম্মুখের নাম-বিহীন কবর—গৌড়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

অনীতা, ভাই, তুমি মনে কোনও দ্বিধা করো না। আমার মনে কোনও গ্লানি নেই। আমি তোমাদের দুজনের কথা সব জেনেছি, সব শুনেছি। তোমরা যা' ক'রেছ, তা' তোমাদের যোগ্যই হ'য়েছে। এখন তোমরা আমাকে তোমাদের যোগ্য হবার একটা অবসর দাও ভাই। তুমি এখন ব্রাহ্ম নও, বৈষ্ণব। এখন তো আমার স্বামীর তোমাকে বিয়ে ক'রতে বাধা নেই।"

অনীতা এতক্ষণে কথা কহিল। সে ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়িল না। ইন্দ্রনাথ ও সরযূ দুজনের হাত একত্র করিয়া সরযূর হাতের উপর ইন্দ্রনাথের হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, তোমার স্নেহের দান আমি অস্বীকার ক'রতে পারি না।" বলিয়া সে ইন্দ্রনাথের হাতের উপর দুইটি চুম্বন দিল। তার পর বলিল, "তোমার দয়ায় আমি আজ অমূল্য সম্পদ পেলাম। এখন আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিচ্ছি বোন, তুমি গ্রহণ কর।" বলিয়া সরযূর হাতে ইন্দ্রনাথের হাত দিয়া সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া বলিল, "এত দিন দেবতাকে একা দেখেছিলাম, আজ তোমাদের যুগল-মূর্ত্তি দেখে ধন্য হ'লাম। নারায়ণ নারায়ণ!"

অনীতা চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ সরযূকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। দুজনের চক্ষের জলের ধারা অন্তরের সব গ্লানি, সব অন্ধকার ধুইয়া দিল।

অনীতা বৃন্দাবনে গেল। অমল ও মনোরমা তাহার সঙ্গে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া তাহার যথাসম্ভব সুখ-সুবিধার আয়োজন করিয়া দিল।

অমলের আর দেশে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। সে মনোরমা ও টুকুকে লইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়া গেল। এখন তাহারা আমেরিকায়।

সমাপ্ত

বিফলের সফলতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(১)

বিফল তোমারও সফলতা আছে
ম্লান মুখে কেন দাঁড়ায়ে,
তোমার গাছের মধুফল ফলে
তোমার লাগাল ছাড়ায়ে।
যে বীজ ছড়াও তুমি আঁখিজলে
চাপা পড়ে গেছ ভাব ভূমিতলে,
তোমারি চিতায় ঢালে ফুল ছায়া
যায় না সে কভু হারায়ে।

(২)

সাধনায় তুমি নিজে শব হও
এমনি তোমার সুমতি।
আপনারে তুমি পোড়াইয়া হও বিভূতি।
লভিয়া তোমার হৃদয়ের বল
জাগে সে সত্য প্রেম মঙ্গল,
সমাধি তোমার, 'সিদ্ধি'র লাগি
মন্দির দেয় গড়ায়ে।



পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা

ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন বসু এম্-ডি (বার্লিন)

আজকাল আমরা অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ সুরু করিয়াছি। অনুকরণ করা যে সকল সময় ভাল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সদ্‌গুণ বা সৎ বিষয় অনুকরণ বা অনুসরণ করা ভাল বই মন্দ নহে। পূর্ব্বে যখন প্রাচ্য দেশগুলি সভ্যতার শিখরে ছিল, তখন পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রাচ্য দেশ হইতে অনেক জিনিস আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ বহু শতাব্দীর দাসত্বে আমরা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের যে সকল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান (Institution) ছিল, সেগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছি। হারাইয়াছি বলিয়া যে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে না এমন নহে। কিন্তু অনেকের যে ধারণা যে, ঠিক দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মতন অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পুনরায় প্রচলন করিতে না পারিলে আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব, তাহা বিশেষ ভ্রান্ত। কারণ, আমরা আর দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোক নই। এখন যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হওয়াতে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দৃষ্টি ও অভিজ্ঞান কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং আমরা যদি এই আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের হিসাব-নিকাশ না লইয়া, জগতের এই সমবেত সুরের সঙ্গে কণ্ঠ না মিলাইয়া—তাল-মান বজায় না রাখিয়াই, জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, তাহা হইলে এ যুগে তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর হইবে কি? এখন যুগধর্ম্মানুযায়ী আমাদের জাতীয় উন্নতির পথটি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

প্রথমে চিকিৎসার কথা ধরা যাউক। পুরাকালে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসারই প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশের চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা-প্রণালী যে গ্রীক্ ও রোমান চিকিৎসক-মণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে বিষয়ে এখন কেহই সন্দেহ করেন না। সেকালে আমাদের দেশে হাসপাতাল করিয়াও যে লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তা' ছাড়া প্রত্যেক কবিরাজ ও বৈদ্য নিয়মিত কিছু না কিছু দাতব্য চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। ধনী রোগীর বা রাজা মহা-রাজার অর্থে যে ঔষধ তৈয়ারি হইত, তাহা তাঁহারা অনেক সময় গরীব রোগীদের দান করিতেন। মুসলমানী আমলে হাকিমদের প্রথাও প্রায় হিন্দুযুগের অনুরূপ ছিল। ইংরাজদিগের রাজত্ব সুরু হওয়ার পর আমাদের দেশে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী প্রবেশ করে। তখন হইতে বিদেশীয় মতে ও বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া চিকিৎসার সূত্রপাত হয়। আমাদের দেশে এলোপাথিই এখন গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত। আমাদের দেশে এখন নূতন ধরণের হাসপাতাল তৈয়ারি হইয়াছে এবং হাসপাতালে যাহাতে ভদ্র রূপে লোক-চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার চেষ্টাও হইতেছে। এই যে নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতির আমরা অনুকরণ করিয়াছি, তাহা যে আমাদের দেশেই বা আমরা লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা কিরূপ করিয়াছি, সমর্থ হইয়াছি, এবং পাশ্চাত্য দেশেই বা লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা

কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে বিষয়েই আমি এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

চিকিৎসার দুইটি দিক আছে—একটী রোগ হইলে রোগের চিকিৎসা করা, আর একটী—যাহাতে রোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা করা—যাহাকে ইংরাজীতে Preventive medicine, Community Hygiene বা Public Health এইরূপ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

রোগ হইলে আমাদের দেশে রোগ-চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আছে? যাঁহাদের পয়সা আছে, তাঁহারা রোগ হইলেই ডাক্তার ডাকেন। কিন্তু সেটা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। কারণ, প্রথমতঃ, আমাদের দেশে পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা খুব কম। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে সকল স্থানেই সুশিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া যায় না। এমন অনেক স্থান আছে, যাহার ২০।২৫ মাইলের ভিতর শিক্ষিত ডাক্তার মেলে না। অনেক সময় হাতুড়ের চিকিৎসার উপরই নির্ভর করিতে হয়। গরীব লোক বা মধ্যবিত্ত লোকেরা আমাদের দেশে কিরূপে চিকিৎসিত হয়? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ খুব বাড়াবাড়ি না হইলে তাহারা চিকিৎসার জন্য যায় না। রোগ বেশী হইলে হয় কোন ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া ব্যবস্থা লইয়া আসা, না হয় হাসপাতালে যাওয়া। হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়াও সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কারণ, লোকসংখ্যার অনুপাতে আমাদের দেশে হাসপাতালের সংখ্যা খুব কম। তা'ছাড়া, অনেক লোকেরই হাসপাতালে যাইবার নাম শুনিলেই একটা আতঙ্ক আসে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাই বা কেন এত সহজে হাসপাতালে যায়? তাহার কারণ অনেক আছে। প্রথমতঃ আমাদের দেশের লোকেরা বাড়ীতে মা স্ত্রী বা ভগিনীর নিকট যেরূপ শুশ্রূষা বা ব্যবহার পায়, হাসপাতালে অনেক সময় সেইরূপ পায় না। অবশ্য বাড়ীতে হয় ত অজ্ঞতাবশঃ বিজ্ঞানসম্মত শুশ্রূষা হয় না, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় লোকে বিজ্ঞানটা ততটা বোঝে না। তাহারা দুইটা মিষ্ট কথা বা একটু স্নেহ ও সান্ত্বনাই সর্ব্বাগ্রে চায়। আমাদের দেশে বড় বড় হাসপাতালে সাদা চামড়ার শুশ্রূষাকারিণীই বেশী। তাহারা অনেক সময় দেশীয় ভাষায় রোগীর সহিত কথাই কহিতে পারে না। এবং তাহাদের ভিতর অনেকে ভাল থাকিলেও, সকলেই যে কাল চামড়ার রোগীর প্রতি দয়ার সহিত ব্যবহার করেন, তাহাও নহে। এক্ষেত্রে যদি আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা আমাদের হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীরূপে নিযুক্তা হন এবং আমাদের দেশের মা কিংবা ভগিনীর মত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া পীড়িতদের সেবা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় হাসপাতালের ভয়টা আমাদের দেশ হইতে অনেকটা চলিয়া যাইতে পারে।

হাসপাতালে না যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ অজ্ঞতা, ও অস্ত্রচিকিৎসায় ভয়। অস্ত্রচিকিৎসায় ভয়ের যে কারণ নাই, তাহা নহে। কারণ, আমাদের দেশের বড় বড় হাসপাতালে যে সকল ইংরাজ অস্ত্রচিকিৎসক নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা এই পাশ্চাত্য দেশের অস্ত্রচিকিৎসকদিগের তুলনায় খুব নিকৃষ্ট। রাজার জাত বলিয়াই তাঁহাদের এত পসার ও প্রতিপত্তি, এবং গবর্ণমেণ্ট বড় বড় পদে তাঁহাদেরই নিযুক্ত করেন। এক্ষণে যে সকল ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বিদেশ হইতে অস্ত্রচিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা যদি দেশে গিয়া কোন হাসপাতালের সংশ্রবে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশে অস্ত্রচিকিৎসা বিশেষ উন্নত হইতে পারে; এবং ক্রমশঃ দেশের লোকের ভয়ও ভাঙ্গিতে পারে। অনেক সময় হাতুড়ের পাল্লায় পড়িয়া বিনা অস্ত্রে চিকিৎসা করাইতে গিয়া যে কত লোক মারা পড়িয়াছে, তাহার হিসাব দেওয়া যায় না। তা'ছাড়া, বিনা চিকিৎসায় যে আমাদের দেশে কত লোক মারা পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা অবশ্য তাহার মূল কারণ।

পাশ্চাত্য দেশে কুকুর ঘোড়াও বিনা চিকিৎসায় মরে না। কিন্তু হায় রে আমাদের দেশ, আমাদের দেশে মানুষের জীবন কুকুর ঘোড়া অপেক্ষাও হেয়! আমাদের দেশে চিরকাল নরনারায়ণের সেবার কথা শুনিয়া আসিয়াছি। এই পীড়িত আর্ত্ত নরনারায়ণদের চিকিৎসার কি আমাদের দেশে কোনই ব্যবস্থা হইতে পারে না? বিলাতে বিশেষতঃ লণ্ডনে সমস্ত হাসপাতালই সাধারণ লোক দ্বারা পোষিত ও পরিচালিত। সময় সময় অবশ্য তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যদি চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল স্থাপন বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে কি আমরা অন্য কোন উপায়ে লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারি না? এই মীমাংসা করিতে গিয়া আমি জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি মধ্যইয়োরোপীয় দেশে যে Kranken Kasse System প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিব।

এখানে বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে বড়লোক ছাড়া বেশীর ভাগ লোকেই একটা-না-একটা kranken kasse (ক্রাঙ্কেন কাসে) অন্তর্ভুক্ত। ক্রাঙ্কেন কাসে কথাটির ঠিক বাঙ্গালা তর্জ্জমা করা যায় না। ইহাকে একটি কো-অপারেটীভ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যে সকল লোক এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা ইহা হইতে অসুখের সময় বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হইতে পারেন। এখন কিছু বিশদ ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করি। ধরুন, আপনি কোন আফিসে বা কাহারও বাড়ীতে কার্য্য করেন। যে দিন হইতে আপনি কার্য্যে ঢুকিবেন, সেই দিন হইতেই আপনাকে সেই স্থানীয় ক্রাঙ্কেন কাসের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। মাহিনার অনুপাতে মাসিক ৪-৫ পার্সেণ্ট এই ক্রাঙ্কেন কাসেতে দিতে হইবে। যাহারা খুব কম মাহিনা পায়, যথা, সাধারণ বাড়ীর ঝি, চাকর প্রভৃতি—তাহাদের জন্য তাহাদের মনিব বরাই ক্রাঙ্কেন কাসের অর্থ জমা দেন। এই যে মাসে মাসে টাকা দিয়া যাইবেন, তাহার পরিবর্ত্তে আপনি পাইবেন কি? না—যখনই আপনার কোনরূপ অসুখ হউক না কেন, এই ক্রাঙ্কেন কাসে আপনার সমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিবে। প্রত্যেক সহরে ও প্রত্যেক গ্রামে অনেক চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা ক্রাঙ্কেন কাসের রোগী দেখেন। এই সকল চিকিৎসকদিগের ভিতর সাধারণ চিকিৎসকও আছেন এবং বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য

বিশেষজ্ঞ(Specialist)ও আছেন। তাঁহাদের ভিতর যাহাকে পছন্দ হয় তাঁহার কাছে যাইয়া বিনা পয়সায় পরীক্ষিত হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা লওয়া যাইতে পারে। তা' ছাড়া, সহরময় এমন অনেক ডিস্‌-পেন্‌সারি আছে, যেখানে ক্রাঙ্কেন কাসের ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ অনুযায়ী ঔষধ বিনা পয়সায় পাওয়া যাইতে পারে। ইহা কম সুবিধা নহে; ইচ্ছামত ডাক্তার ও ঔষধ দুইই পাওয়া গেল। যদি ব্যারাম শক্ত হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এমন কি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আসিয়া বিনা পয়সায় বাড়ীতে দেখিয়া যাইবেন। যদি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে যাওয়ার প্রয়োজন হয় ত হাসপাতালে ও স্বাস্থ্য-নিবাসে বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হইতেও পারা যায়। ডাক্তারের খরচা, হাস-পাতালের ও স্বাস্থ্য-নিবাসের খরচা ও ঔষধের খরচা সমস্তই ক্রাঙ্কেন কাসে বহন করিয়া থাকে।

যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছানুবর্ত্তী কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহা-দের প্রসবকালেও—দরকার হইলে—প্রসবের আগে ও পরে সাহায্য করিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। প্রসবকালে হয় বাড়ীতে ধাত্রী-নিয়োগের খরচা যোগাইয়া, না হয় কোন হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া সেখানের ব্যয়ভার বহন করিয়া, ক্রাঙ্কেন কাসে ইহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রসবের পরে দুই মাসকাল যাবৎ এই স্ত্রীলোকগুলি অর্থ-সাহায্য পাইতে পারেন। তার পর যখন তাঁহারা পুনরায় কার্য্যে যোগ দেন, তখন তাঁহারা পুনরায় রোজগার করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করিতে পারেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রসবকালে যে কত কষ্ট পাইয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কতগুলি যে প্রসবকালে মারা পড়ে কিংবা এরূপ রোগাক্রান্ত হয় যে, প্রসবের পর হইতে চিররোগী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রসবের সময় এবং প্রসবের পরে উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া যে আমাদের দেশে কত নবজাত শিশু মরিয়া যায়, তাহা ত আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। ভেড়ার পাল থাকিলে কি আর মরিলেই বা কি,—নিশ্চয় অনেকেই এইরূপ ভাবেন। তা না হইলে এই শিশু-মৃত্যু ও গর্ভিণী-মৃত্যুর প্রতিকারের ত কোনই প্রণালীবদ্ধ আন্তরিক চেষ্টা দেখি না। আমাদের দেশে সুশিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা কম এবং যেখানে বা সুশিক্ষিত ধাত্রী পাওয়া যায়, সেখানেও অর্থাভাববশতঃ ধাত্রী-নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় না। সকল গর্ভিণীকে যে হাসপাতালে স্থান দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাও সম্ভব নহে। সেইজন্য গর্ভিণীদিগের বাড়ীতে যাহাতে প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কলিকাতা কর্পোরেশন কয়েক জন ধাত্রী নিয়োগ করিয়াছেন বটে, তাঁহারা বস্তিতে গিয়া গরীব স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু এই বন্দোবস্ত যে যথেষ্ট, তাহা বলা চলে না। যাহাদের সাধারণভাবে প্রসব হইয়া যাইবে তাহাদের কোন কষ্টই পাইতে হয় না; কিন্তু যে সব স্থলে প্রসবের সময় কষ্ট হইবে অনুমান করা যায়, সে ক্ষেত্রে হাসপাতালে পাঠাইয়া উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এইরূপ একটি গর্ভিণীদের হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু সেখানে শুনিতেছি না কি, হাজার আবশ্যক হইলেও পুরুষ ডাক্তা-রের সাহায্য লওয়া হইবে না, যা করেন আমাদের দুই একটি মহিলা ডাক্তার। এই সকল গোঁড়ামীর অর্থ বুঝা ভার। যখন মরণ বাঁচন লইয়া কথা, তখন ছাই পর্দ্দাপ্রথাটাই কি বড় হইল, আর মানুষের প্রাণটা কিছু নহে? আমাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত লোকাচার যত দিন না দূরীভূত হইতেছে, তত দিন এ সব বিষয়ে কিছু করা বড় শক্ত ব্যাপার। আর যে পর্দ্দা লইয়া আমাদের দেশের লোক বড়াই করিয়া থাকেন, সেটা জগতের কোন আর্য্য সমাজে এত কঠোর ভাবে প্রচলিত নাই, আমাদেরও পুরাকালে ছিল না।* এই ধার করা প্রথার গোঁয়ার স্ফীত হওয়া অজ্ঞেরই সাজে।

স্ত্রী ও পুরুষদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়া ক্রাঙ্কেন কাসেগুলি অন্য নানা প্রকারে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। অসুস্থতা বশতঃ কেহ কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে, তাহাকে মাহিনার অর্দ্ধেক অর্থ দিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মরিয়া গেলে, তাহার স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন পরিবারের লোককে মাহিনার অনুপাতে একটা মোটা টাকা দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইলে, তাহার সংসার প্রতিপালনের জন্যও মাহিনার অনুপাতে কিছু অর্থসাহায্য করে।

ইংল্যাণ্ডেও প্রায় জার্ম্মানীর ন্যায় লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে National Health Insurance Act অনুযায়ী অল্প রোজ-গারী প্রত্যেক লোকেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে এই সকল রোগী দেখিবার জন্য যে সকল চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদের Insurance practitioners বা Panel practitioners বলা হয়। এইরূপ প্রত্যেক চিকিৎসকের উপর ২।৩ হাজার লোকের চিকিৎসার ভার থাকে। ইহাদের অসুখ হইলে, তাহারা নিজ চিকিৎসকের বাড়ী গিয়া যখন ইচ্ছা চিকিৎসিত হইতে পারে। জার্ম্মানীতে অসুখ হিসাবে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়া ব্যবস্থা লওয়া যায়; কিন্তু ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়া ব্যবস্থা লওয়া তত সহজ নহে। নিজের চিকিৎসকের খাতা হইতে নাম কাটাইয়া তবে অন্য চিকিৎ-সকের কাছে যাওয়া যায়। এই পদ্ধতির সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। কারণ, বরাবর এক চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইলে, তিনি যেরূপ রোগীর ধাত বুঝেন, অপরের নিকট সহজে বোধ হয় তাহা আশা করা যায় না। অসুবিধা এই যে, এক চিকিৎসকই যে সকল ব্যারামের, যথা, নিউমোনিয়া, খাইসিস, হাড়ভাঙ্গা (Fracture) বা অস্ত্র চিকিৎসা এবং স্ত্রীলোকে গর্ভকালীন বিপদের চিকিৎসা বা অন্য কোন স্ত্রীরোগের কিম্বা শিশুরোগের চিকিৎসায় সমান পারদর্শী হইবেন, তাহা বলা যায় না। সেই হিসাবে জার্ম্মানীতে যে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা লোক-চিকিৎসা হিসাবে অনেকটা সুবিধাজনক বলিয়াই মনে হয়।

* পর্দ্দা ও অবগুণ্ঠন-প্রথা আমাদের দেশে মৃদু ভাবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতক হইতেই প্রচলিত আছে। তবে মুসলমান আমলে ইহার প্রচলন কঠোরতর ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। হিন্দুযুগে পর্দ্দাপ্রথার রেওয়াজ থাকিলেও অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত। যেমন—রামায়ণের এক স্থলে আছে—"ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধে স্বয়ম্বরে ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রীয়ঃ। অর্থাৎ বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহস্থলে স্ত্রীলোক দর্শন দিলে কোন দোষ নাই।

—সম্পাদক—স্বাস্থ্য-সমাচার।

এই ত গেল পাশ্চাত্য দেশে লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কি এইরূপ কোন লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে না? আমাদের দেশে কয়েকটা Millএ ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে, এবং Factory Act অনুসারে যে সকল ফ্যাক্টরীতে ৭৫জনের অধিক লোক কায করে, যেখানে ১জন ডাক্তার এবং আকস্মিক বিপদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ রাখারও নিয়ম আছে। কিন্তু এই নিয়মে যে রীতিমত লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তাহা বোধ হয় না। রীতিমত লোক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইলে, আমাদের দেশেও National Health Insurance Actএর মত একটা আইন পাশ হওয়া দরকার; তা না হইলে সকলে চিকিৎসার জন্য মাহিনার কিছু অংশ দিতে রাজী হইবে না। নূতন রিফর্ম হিসাবে Public Health ও Sanitation আমাদের দেশী মন্ত্রীরই তত্ত্বাবধানে। তাঁহারা যদি একটা বড়দরের কেরানীর মতই সই মারিয়া যান বা ditto দিয়া যান, এবং আপনা হইতে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি কিছু কায না করেন, তাহা হইলে এইরূপ মন্ত্রী থাকা আর না থাকা, দুই-ই সমান। এই Health Insurance Act সম্বন্ধে যদি আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের লোকের বিশেষ প্রিয়পাত্রই হইবেন।

অবশ্য এইরূপ আইন যদি পাশ হয়, তাহা হইলে এই অনুযায়ী কায করার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হইবে। দেশের মেডিকেল স্কুল-কলেজ হইতে যে সকল চিকিৎসক বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, আপাততঃ তাঁহাদের লইয়াই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। আর যদি চিকিৎসকের সংখ্যা কম হয়, নূতন দুই চারিটা মেডিকেল স্কুল খুলিলে বোধ হয় সে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ এবং চিকিৎসক-মণ্ডলীর ভিতর নিয়মমত মধ্যস্থ ভাবে কাজ করিবার জন্য কতকগুলি যৌথ-মণ্ডলী আবশ্যক। ইংল্যাণ্ডে যেমন Insurance Society আছে, আর জার্ম্মানীতে যেমন নানা স্থানে Kranken kasse আছে, আমাদের দেশেও সহরে ও জনবহুল গ্রামে এই জাতীয় যৌথ-মণ্ডলীর অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। এই সকল যৌথ-মণ্ডলী স্থানীয় সাধারণ লোক ও চিকিৎসক দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত; এবং অন্যান্য যৌথ-মণ্ডলীর ন্যায় রেজিষ্টার্ড হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের টাকাকড়ির হিসাবপত্র যথারীতি রাখা হইবে। আমি ইয়োরোপে বসিয়া এই সম্বন্ধে আমার

মতামত প্রকাশ করিলাম বটে; এক্ষণে আমাদের দেশের লোকেরা যদি এই বিষয়ে দেশের আধুনিক অবস্থা হিসাবে আলোচনা করেন ও তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, আশা করি, ক্রমশঃ আমরা আমাদের দেশের উপযোগী একটা Constructive Scheme লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিব। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

বাংলা দেশ কাহার

বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে স্বতঃই একটি প্রশ্নের উদয় হয়, বাংলা দেশ কি বাঙ্গালীর, না অন্য কাহারও? ব্যবসা বাণিজ্যই বলুন, কৃষিশিল্পই বলুন, আর কুলীমজুরের কাজই বলুন, যে কোন কর্ম্মক্ষেত্রে যাওয়া যাউক না কেন, সেখানেই বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক দেখা যাইবে না, অবাঙ্গালীতে সমস্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাংলায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

বিগত আদম সুমারীর বিবরণ হইতে আমরা বাংলায় অবাঙ্গালীর বর্ত্তমান সংখ্যার একটা হিসাব দিতেছি—

১। বিহার ও উড়িষ্যা—১২২৭৫৭৯; ২। যুক্তপ্রদেশ—৩৪৩০৯৫; ৩। আসাম—৬৮৮০২; ৪। মধ্যপ্রদেশ ও বেহার—৫৪৮১০; ৫। রাজপুতনা—৪৭৮৬৫; ৬। মাদ্রাজ—৩২০২৪; ৭। পাঞ্জাব ও দিল্লী—১৭৭১৫; ৮। সিকিম—৪০৫৭; ৯। ব্রহ্মদেশ—২৩৬১; ১০। নেপাল—৮৭২৮৫; ১১। য়ুরোপ—১৩৩৫৬; ১২। চীন দেশ—৩৮৫৬; ১৯০২৮০৫।

বিগত লোক গণনায় বাংলায় মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৪ শত ৩১ জন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উপরি উক্ত সংখ্যক লোকই অবাঙ্গালী। তারপর বাংলায় যাহারা অবাঙ্গালী আছে, তাহারা কেহই বাঙ্গালীর মত অল্প নিশ্চেষ্ট ভাবে নাই। বাংলায় অর্থোপার্জ্জন করিতেই তাহারা আসিয়াছে, বাংলার অর্থশোষণই তাহাদের কাজ। ফলে বাঙ্গালী আজ অর্থোপার্জ্জনের সকল ক্ষেত্র হইতেই হটিয়া যাইতেছে, নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে কাল কাটাইতেছে।

অবশ্য বাংলা দেশ হইতেও কেহ কেহ যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে না গিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু বিদেশগামী বাঙ্গালীর সংখ্যা বাংলা দেশে আগত অবাঙ্গালীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বাংলার বাহিরে কোথায় কত বাঙ্গালী আছে, তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

১। আসাম ৩৭৫৫৭৮
(বেশীর ভাগ ময়মনসিংহ হইতে)
২। ব্রহ্মদেশ ১৪৩০৮৭
(বেশীর ভাগ চট্টগ্রাম হইতে)
৩। বিহার ও উড়িষ্যা ১১৬১২২

বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু বাঙ্গালী আছে। তবে বিদেশগামী বাঙ্গালী অধিকাংশই কেরানী, শিক্ষক,

TIGHT BINDING.

উকীল বা ডাক্তার। মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতির মত ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ইহারা কেহই করে না।

তার পর বাংলার রাজধানী কলিকাতার জনসংখ্যার হিসাব করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। কলিকাতা যে বাঙ্গালীর রাজধানী, তাহা বিশ্বাস হইতে চাহে না।

১৯২১ সালের লোক-গণনায় হাওড়া ও সহরতলীর সহিত সমগ্র কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা ১৩,২৭,৫৪৭ জন। তার মধ্যে খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ৯০৭৮৫১। এই লোকসংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর অংশ কত, নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যাইবে।

খাস কলিকাতা—১০৭৮৫১

(জন্মস্থান অনুসারে)

কলিকাতা সহর	২৪ পরগণা হাওড়া	ও বাঙ্গলার মফঃস্বল
২০৪৭৭৬	৯৯১২৪	১৭৫৬৬৪
বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন প্রদেশ		ভারতের বাহিরে বিদেশ
৩১৫২৩৬		১৪০৫১

অর্থাৎ খাস কলিকাতার সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ জন অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতে আগত লোকের সংখ্যা কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ১৯·৩৫ ভাগমাত্র; অর্থাৎ কলিকাতার মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ডবল।

হাওড়ার লোকসংখ্যার শতকরা ৪০·৪৬ ভাগ অ-বাঙ্গালী এবং সহরতলী ও ২৪ পরগণার শতকরা ৩১·৭৫ ভাগ অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গলার মফঃস্বলবাসী লোকের সংখ্যা হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার সহরতলীতে যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১০·৭৪ ভাগ ও শতকরা ১১·১৬ ভাগ মাত্র।

এক বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের লোকই কলিকাতার লোকসংখ্যার প্রায় পাঁচভাগের এক ভাগ দখল করিয়া আছে। কলিকাতার লোক-সংখ্যার দশভাগের এক ভাগ যুক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে। সহরের হাজার করা ২৩ জন রাজপুতানার লোক। ভিন্নপ্রদেশের যে সমস্ত জেলা হইতে বেশী লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার দুই একটী নমুনা নীচে দিলাম :—গয়া—৪৮১১৪, পাটনা—২৮০৩৪, সাহাবাদ—২৬৭৪১, মজফরপুর—২২০৫৩, মুঙ্গের—২০৬৯০, কটক ৪৫১৭৪ বালেশ্বর ১৬৪৯৯, বারাণসী ১৬৬১৫, গাজীপুর ১৫৩৯৯, বালিয়া ১৪০৯৪, আজমগড় ১২০৬২, জোনপুর ১২৩৪০, বিকানার ১২৫১৬, জয়পুর ১১৭১৪।

এর সঙ্গে বাঙ্গলার মফঃস্বলের কোন জেলা হইতে কত লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার তুলনা করা যাক। হুগলী—৮৭০৯২, মেদিনীপুর ৩৬০৮২, ঢাকা ৩০৭৬৫। বর্দ্ধমান ২০৬২৭, নদীয়া ১৬৪৩৫, ফরিদপুর ১০৫৮৫, যশোহর ৯৫৪৮, বাখরগঞ্জ ৭২১৮, বাঁকুড়া ৭১১৭, মুর্শিদাবাদ ৬১০৯, খুলনা ৫৭৫৪।

এই সকল তালিকার তুলনা করিলে কি মনে হয় না, কলিকাতা বাঙ্গালীর রাজধানী নয়, উহা বিহারী, উড়িষ্যা মাড়োয়ারী হিন্দুস্থানী প্রভৃতির সহর?

তার পর এই সকল বিদেশীরা বাংলার অর্থ যে কি ভাবে শোষণ করিয়া নিতেছে, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়। বাঙ্গলা দেশে অন্যান্য সকল দেশের লোকই অন্নসংস্থান করিতেছে, কেবল বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই। ব্যবসা বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বেহারা, চাকর, পাচক, মুচী, মিস্ত্রী, পাটনী, মুটে মজুর প্রভৃতি সমস্ত কাজেই অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালী কোথায়?

বাঙ্গালী, এখনও সাবধান হও, এখনও ঘর সামলাইতে চেষ্টা কর। বিদেশী পঙ্গপাল আসিয়া তোমার সোণার দেশ লুটিয়া লইতেছে, আর তুমি এখনও মোহ-শয্যায় শায়িত থাকিবে? "তোমায় সাধেরি ঘুঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না?" যুগবার্ত্তা

হিন্দুর মৃত্যু গোড়ার কথা

১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায়, সমগ্র বাঙ্গলার লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ২০,৮০৯,১৪৮ জন এবং মুসলমান ২৫,৪৬৮,১২৪ জন; অর্থাৎ হিন্দু, বাঙ্গলার লোকসংখ্যার শত করা ৪৩·৭২ ভাগ এবং মুসলমান শতকরা ৫৩·৫৫ ভাগ; বাকী গতকরা ৪ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক। অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বেই (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়াছে। আমরা সুবিধার জন্য নীচে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধির একটা তুলনা মূলক তালিকা দিলাম—

খৃষ্টাব্দ	হিন্দুসংখ্যা	মুসলমানসংখ্যা	মন্তব্য
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪লক্ষ বেশী
১৮৮১	১৭২॥০ লক্ষ	১৭১ লক্ষ	মুসলমান ৬লক্ষ বেশী
১৮৯১	১৮০ লক্ষ	১৯৬ লক্ষ	মুঃ ১৬লক্ষ বেশী
১৯০১	১৯৪ লক্ষ	২২০ লক্ষ	মুঃ ২৬ লক্ষ বেশী
১৯১১	২০৬ লক্ষ	২৪২ লক্ষ	মুঃ ৩৬ লক্ষ বেশী
১৯২১	২০৮ লক্ষ	২৫৪ লক্ষ	মুঃ ৪৬ লক্ষ বেশী

উপরের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ১৮৭২—১৯১১ এই ৪০ বৎসরে হিন্দুর বৃদ্ধির হার ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ গত ১০ বৎসরে (১৯১১—১৯২১) হিন্দুর সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে প্রায় ২লক্ষ নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে। হিন্দুর সমাজ-দেহে এমন কোন ব্যাধির বীজ প্রবেশ করিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীর রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—

The actual number of Hindus has decreased since

1911 and everywhere except in central Bengal, the Hindus have made less progress in numbers or more retrogressoin, than has the population as a whole.

অর্থাৎ একমাত্র মধ্যবঙ্গ ছাড়া সর্ব্বত্রই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে এবং সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

গত ৪০ বৎসরে (১৮১১—১৯২১) হিন্দু ও মুসলমানের বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে কিরূপভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে, নিম্নলিখিত তুলনা-মূলক দুইটী তালিকা হইতে তাহা অনেকটা স্পষ্ট হইবে—

শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার

(১৮৮১—১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
পশ্চিমবঙ্গ	২১·৫	৬·১
উত্তরবঙ্গ	১২·৯	৭·৪
মধ্যবঙ্গ	১০·৫	১৯·৩

পূর্ব্ববঙ্গের হিসাব ধরিলে এইরূপ দেখা যায়—

শতকরা বৃদ্ধির হার

(১৮৮১—১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
ঢাকা বিভাগ	৬১·৯	২২·৪
চট্টগ্রাম বিভাগ	৭৯·৩	৫৬·০

সমগ্র বঙ্গের শতকরা বৃদ্ধির হার কষিলে দেখা যায় যে, গত ৪০ বৎসরে মুসলমানেরা বাড়িয়াছে শতকরা ৩৮·৫ ভাগ এবং হিন্দুরা বাড়িয়াছে শতকরা ১৫·২ ভাগ মাত্র, অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার গড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানেরা বর্ত্তমান সংস্থান কিরূপ, তাহার তুলনাও করা যাইতে পারে—

(১৯২১)

	মুসলমান	হিন্দু
পূর্ব্ববঙ্গ	৬৯·১২	২৮·৪৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৩·৪৪	৮২·০৭
উত্তরবঙ্গ	৫৯·৮২	৩৫·৫২
মধ্যবঙ্গ	৪৭·৭২	৫১·৪৬

অর্থাৎ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা বেশী এবং মধ্যবঙ্গে তাহাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান এবং অন্য দুই অঞ্চলে মুসলমানেরাই সংখ্যায় অত্যধিক। যেরূপভাবে হিন্দুর ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ যে শীঘ্রই হিন্দুশূন্য হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গ যে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ স্বাস্থ্যকর এবং হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের ভূমির উর্ব্বরাশক্তিও বেশী। অতএব পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা কমিতেছে এবং তাহার ফলেই সমগ্র বঙ্গে মুসলমান বাড়িতেছে এবং হিন্দু কমিতেছে। কিন্তু আমরা যে সমস্ত তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত ও অমূলক। নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তাহার উর্ব্বরাশক্তিও বেশী, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে, হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হারের এত অধিক অসামঞ্জস্য কেন? পূর্ব্ববঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থানে তো হিন্দুরাও বাস করে এবং তথাকার ভূমির উর্ব্বরাশক্তির সুযোগ সেও পাইয়া থাকে; তবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার হিন্দুদের চেয়ে এত বেশী কেন? ঢাকা বিভাগে তো হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের বৃদ্ধির হার প্রায় তিনগুণ। উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার মুসলমানদের বৃদ্ধির হারের প্রায় অর্দ্ধেক। একমাত্র মধ্যবঙ্গে মুসলমানদেরচেয়ে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার অধিক দেখা যাইতেছে। কিন্তু আদমশুমারীর বিবরণেই ইহার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা সহর মধ্যবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতায় বঙ্গের বাহিরের বহু ভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বৎসর বৎসর আমদানী হইতেছে। কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ কলকারখানাতেও অসংখ্য অ-বাঙ্গালী শ্রমিক ও মজুরের আমদানী অহরহ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিকাংশ। এই সব কারণে মধ্যবঙ্গে হিন্দুর বৃদ্ধির হার একটু বেশী দেখা যাইতেছে। আসলে মধ্যবঙ্গে 'বাঙ্গালী হিন্দু' যে মুসলমান অপেক্ষা সংখ্যায় বাড়িতেছে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গত দশ বৎসরে (১৯১১—২১) বাঙ্গলাদেশে হিন্দুর হ্রাস অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ দশ বৎসরে সমগ্র বঙ্গে মুসলমান প্রায় ১২ লক্ষ বাড়িয়াছে, আর হিন্দু প্রায় ২ লক্ষ কমিয়াছে। এই দশ বৎসরের হিন্দু-মুসলমানের শতকরা হ্রাসবৃদ্ধির হার তুলনা করিলেও ব্যাপারটী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

১৯১১—১৯২১

	মুসলমানের বৃদ্ধির হার	সমগ্র বঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
পশ্চিমবঙ্গ	—৪·৯	—৪·৯
মধ্যবঙ্গ	—১·৮	+০·৪
উত্তরবঙ্গ	+২·৯	+১·৯
পূর্ব্ববঙ্গ	+৯·৯	+৮·৩
সমগ্রবঙ্গ	+৫·২	+২·৮
	হিন্দুদের বৃদ্ধির হার	সমগ্রবঙ্গের লোক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
পশ্চিমবঙ্গ	—৫·১	—৪·৯
মধ্যবঙ্গ	+২·৩	+০·৪
উত্তরবঙ্গ	—৩·২	+১·৯
পূর্ব্ববঙ্গ	+৪·৬	+৮·৩
সমগ্রবঙ্গ	—০·৭	+২·৮

অর্থাৎ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র সাধারণ কসংখ্যার তুলনায় হিন্দুর

TIGHT FINISHING.

হ্রাস হইয়াছে। সমগ্রবঙ্গে মুসলমান বাড়িয়াছে গত দশ বৎসরে শতকরা ৫·২ ভাগ,—আর হিন্দু কমিয়াছে শতকরা—·৭ ভাগ।

আনন্দবাজার পত্রিকা

হিন্দুর মৃত্যু ছুঁৎমার্গের পরিণাম

বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতি 'উচ্চ জাতি' বলিয়া গণ্য। এই উঁচু জাতের' লোকেরা নিজেদের কৃত্রিম সামাজিক মর্য্যাদা ও গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরাও যে সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ, এমন কি অনেক স্থলে মেরুদণ্ড স্বরূপ, এ জ্ঞান তাঁহাদের নাই। আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ফলে এই তিন জাতির হাতে নানা কারণে বহু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই উঁচু জাতের লোকেরা সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন নাই। বরং তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্মৃতি-শাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই দিয়া, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কৃত্রিম ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন নাই। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া যাহাতে তাহারা নিজেদের ও হিন্দুসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, উচ্চজাতির লোকেরা সে পক্ষে কোন উৎসাহ দেন নাই; এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতিকে "অস্পৃশ্য জলানাচরণীয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া পশুবৎ ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন। ফলে হিন্দু-ব্যবসায়ী জাতিরা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে, কৃষক ও শ্রমিক জাতিরা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের স্থান মুসলমান প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, এমন কি বাঙ্গলার বাহিরের লোক আসিয়া অধিকার করিতেছে।

সমাজের প্রধান বন্ধন সংহতিশক্তি। যে সাম্যের উপরে সংহতি-শক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুসমাজে এখন তাহাই নাই। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে উহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাই বাঙ্গলার তথা ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; আর হিন্দুরা কেবল "ছুঁৎমার্গের" নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে। সমাজের এই নিম্নবর্ণের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারই যে হিন্দুসমাজে বলক্ষয় ও ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ, এ কথা আজ বুঝিয়াও কেহ বুঝিতে চাহিতেছে না। অথচ এই তথাকথিত "উচ্চজাতি" হিন্দুসমাজের কতটুকু অংশ? সমগ্রবাঙ্গলার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা প্রায় ২০৮ লক্ষ। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১০ লক্ষ, কায়স্থ ১২ লক্ষ, এবং বৈদ্য ১ লক্ষ—মোট ২৬ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ এই তিন জাতি একত্রে হিন্দু-সমাজের মাত্র শতকরা ১২৷৷০ ভাগ। বাকী শতকরা ৮৭৷৷০ ভাগ তথাকথিত "নিম্নবর্ণের" লোক। যে সমাজের মুষ্টিমেয় শতকরা ১২৷৷০ ভাগ লোক, কতকগুলি কৃত্রিম দেশাচার ও প্রথার বলে সমাজের অপর ৮৭৷৷০ ভাগ লোককে দাবাইয়া রাখিতে পারে, সে সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধেকের বেশী, এবারকার সেন্সাসে Depressed classes অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতি বা অবনত জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই সমস্ত জাতিদের মোট সংখ্যা ১ কোটী ১২ লক্ষেরও উপর। কোন্ কোন্ জাতি "অবনত" বা অস্পৃশ্য" বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিতেছি।—বাওরী, বাগ্‌দী, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চামার ও মুচি, চাষী কৈবর্ত্ত, ডোম, গারো, হদি, হাজঙ্ হাড়ি, জেলে কৈবর্ত্ত, কলু, কেওড়া, কায়রা, কান্তা, খণ্ডায়েত, খেন, কোচ, কৈরী, কোড়া, কুর্ম্মি, লোহার, মাল, মালো, মেচ, মুণ্ডা, নমঃশূদ্র, মুনিয়া, ওঁরাও, পাটনী, পোদ, পুণ্ডরী, রাজবংশী, রাজু, সাঁওতাল, শুকলী, তিয়র! ইহাদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং চাষী কৈবর্ত্তদের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধাংশেরও বেশী এই বিরাট অবনত বা অস্পৃশ্য জাতি, সমাজপতিদের কাছে কি ব্যবহার পাইতেছে? দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে কি ইহারা নিমগ্ন হইয়া নাই? ছুঁৎমার্গী-বলম্বী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ফলে, ইহারা কি দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে না? মুসলমান ও খৃষ্টান হইলে, আর কিছু না হোক, তাহারা একটা উদার সাম্যভাবের আশ্রয় কতকটা পাইয়া থাকে। এ ছাড়া, খৃষ্টান মিশনরীরা স্থানে স্থানে মিশন খুলিয়া তাহাদের মধ্যে যেরূপভাবে শিক্ষা বিস্তার ও সেবাকার্য্য করিতেছেন, হিন্দুরা সেরূপ কিছু করিয়াছেন কি?

বাঙ্গলার যেখানে যেখানে অনুন্নত জাতিরা একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই খানেই 'উচ্চজাতিরা' মিলিয়া তাহাদের বাধা দিতেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে, হদি জাতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে তথাকার ব্রাহ্মণ জমিদারেরা যেরূপ বৈরভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত হিন্দু—মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা দেখায়, স্বধর্ম্মীদের প্রতি তাহাও দেখাইতে চায় না। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, ঢাকার স্কুল কলেজের হোষ্টেলে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমানদের সহিত এক ঘরে থাকিতে পারে; কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্রের সঙ্গে একঘরে থাকিতে গেলেই, তাহাদের জাতি যায়। আরও দুঃখের কথা এই যে, 'উচ্চজাতিদের' কুদৃষ্টান্তের প্রভাব সমাজের সর্ব্বস্তরে সংক্রামিত হইতেছে। প্রত্যেক "জাতিই", তার চেয়ে ঈষৎ 'অনুন্নত' অন্য জাতিকে দাবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। নিজেরা যে অধিকার চায়, অন্যকে তাহা দিতে রাজী নয়। সেন্সাসের রিপোর্টে লিখিত আছে—লোক গণনার সময় প্রত্যেক জাতিই নিজেদের বড় করিতে এবং অন্যকে "হীন ও ছোট" বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। চাষী-কৈবর্ত্তেরা নিজেরা মাহিষ্য হইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু জেলে, কৈবর্ত্ত পাটনী প্রভৃতিকে ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে কিছুতেই দিবে না।

হিন্দু সমাজের বহু নিম্নজাতি ও অনুন্নত জাতি কিরূপভাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, আমরা তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি

জাতির নাম	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৯০১-২২
বাগ্দী	—১১·৮	—০·৩	—১১·৯
বারুই	—৪·৩	—৮·৮	—১৩·৫
বাউরী	—৩·৪	—১·২	—২·২
ভুঁইমালী	—১০·৯	৩·০	—৮·২
ভুঁইয়া	—১২·৮	৩৮·৯	২১·১
ভূমিজ	—১২·৩	৭·৭	—৫·৫
চাষাধোবা	—৭৭·৪	৯৫·৩	—৫৫·৮
ধোবা	—০·৩	১·৬	১·৪
ডোম	—১৩·৬	—৬ ৮	—২৪·৮
দোসাদ	—১২·৫	৪৭·৯	২৯·৪
গোয়ালা	—৯·৭	১·১	—৮·৫
হাড়ি	—১৪·৩	—৩·৮	—১৭·৭
যুগী	১·৩	৫·৩	৬·৮
চাষী কৈবর্ত্ত	৩·৪	৯·৫	১৩·২
জেলে কৈবর্ত্ত	১৭·৬	২৩·১	৪৪·৮
কলু	—১৪·০	—২·৫	—১৬ ২
কপালী	—২·৯	—৭·৫	১০·৬
কুমার	—২·১	৪ ২	২·০
কুর্ম্মী	২·৬	১৪·৮	১৭·৯
মালাকার	—১০·৬	৯·২	—২·৪
ময়রা	—৯·৮	—১.৩	—৫·১
মুচি	—৮ ৩	৯·৩	০ ৩
নাপিত	—০·৭	৩ ৬	২·৮
পাটনী	—৩০·৭	০ ১	৩০·৬
পোদ	৯·৭	১৫·৫	২১·৬
সদ্গোপ	—৩·১	—১·৬	—৪·৬
সাঁওতাল	—৪·২	৯·৯	৫·২
সোণার (স্বর্ণকার)	—১৬·৫	—৫·৪	—২১·০
শূদ্র	—৩৪·১	—১৯·৯	—৪৭·২
সূত্রধর	—৫·৬	৪·৩	—০·৯
তাম্বুলী	—৫·৪	—৭·৬	—১২·৬
তাঁতি	—১·০	৩·২	২·১
তেলী ও তিলি	—১৪·১	৩·৮	—২·০
তিয়র	—১৮·৪	০·৮	—১৭·৭

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি নিম্নবর্ণের হিন্দুজাতি তাহাদের প্রধান প্রধান বাসভূমিতে কেমন ভাবে কমিয়াছে দেখুন—

জাতির নাম	বাসস্থান	শতকরা হ্রাস ১৯০১—২১
আগুরী	বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-হাওড়া	—১৩·৬
চাঁই	মুর্শিদাবাদ-মালদা-রাজসাহী	—৯·৪
চাসাতী	মালদা	—৩৩ ৩
ধানুক	মুর্শিদাবাদ-মালদা	—২০·৯
গঙ্গাই	মালদা-দিনাজপুর	—৭·০
হদি	ময়মনসিংহ	—১৪·৫
হাজঙ	ঐ	—১০·০
কন্দারা	মেদিনীপুর	—৮·২
কান্তা	ঐ	—৫৬ ৬
খেন	দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-রঙ্গপুর	—১২·৩
কোনাই	বীরভূম	—১ ৬
কোড়া	বর্দ্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া	—২১·০
কোটাল	বর্দ্ধমান	—৪১·৬
মেচ	জলপাইগুড়ি	—৫১·৮
নাগর	মালদা	—১৫·৬
নায়ক	বাঁকুড়া-মেদিনীপুর	—৬২·২
পুণ্ডরী	বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-মালদা	—৪০·৪
রাজু	মেদিনীপুর	—১১·৭
সামন্ত	বাঁকুড়া	—৯৫·৪

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

(পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের উপস্থাপিত পরিপোষক প্রমাণগুলির যথাক্রমে আলোচনা করিব।

(৩) গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্ব

কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"কালিদাস যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সে দেশে উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম ঋতু আছে। সে দেশে প্রচণ্ড ও অনুপভোগ্য গ্রীষ্ম নাই। কালিদাসের জন্মভূমিতে গ্রীষ্মের নামে গান বাঁধে, মধুমাসের নামে গান বাঁধে না। সে দেশের লোক 'মধুমাস এল সজনি' বলিয়া পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায় না। শকুন্তলা-প্রণয়নাবস্থায় কালিদাস যে রাজার সভাসদ ছিলেন, তিনি মধুমাসের বা মধূৎসবের বর্ণনার জন্য লালায়িত। জগতের সমুদায় কবি বসন্তকালকে উপভোগের সময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণও বসন্তকালকে উপভোগ্যই বলিয়া কবি-সময়-প্রসিদ্ধি বা অবশ্য বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল সে উপভোগার্হ এ কথা শকুন্তলা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও কবির গ্রন্থ হইতে বাহির করিতে পারিবেন না। নীতি শাস্ত্রে পর্য্যন্ত লেখে—বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ—ইত্যাদি। বসন্তকালে ভ্রমণ করিবে, ঘি দিয়া ভাজিয়া কচি কচি নিমের পাতা খাইবে, ইহা যদি না করিতে পার, তবে তেমন প্রাণ রাখিও না, আগুণে পুড়িয়া মরিও। * * *

"শ্রাদ্ধে—"বসন্তায় নমস্তুভ্যং" এই কথা বলিয়া বসন্তকালের প্রাধান্য দিয়াছেন।

"যে দেশে বসন্তের এমন আধিপত্য, সে দেশে কি না তিনি উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের উল্লেখ করিয়া, নিজে এক ছড়া কাটিলেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা নটীও গ্রীষ্ম সময় অধিকার করিয়াই এক গান গাহিলেন। এই "অমার্জ্জনীয়" দোষের জন্য কালিদাসের নাম কবি-সমাজ হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত। অলঙ্কার-শাস্ত্রের দোষ পরিচ্ছেদে, এ কথা বিশেষ ভাবে সমালোচিত হওয়া উচিত। কারণ, তিনি "কবি সময়ের অপ্রসিদ্ধ" বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী—জগতের মতের বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র বাঙ্গালী বিদুষগণের পরিতোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অচির-প্রবৃত্ত উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের বর্ণনা করিয়াছেন।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই একতরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কালিদাসের জন্মভূমিতে প্রচণ্ড ও অনুপভোগ্য গ্রীষ্ম নাই, ইহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? ঋতু-সংহারের প্রথমেই আছে গ্রীষ্মকাল 'প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমাঃ' আবার গ্রীষ্মের বর্ণনার শেষে আছে—

'পটুতর-দব-দাহাৎ প্লুষ্ট-শষ্প-প্ররোহাঃ
পরুষ-পবন-বেগাৎ ক্ষিপ্ত-সংশুষ্ক-পর্ণাঃ।
দিনকর-পরিতাপাৎ ক্ষীণ-তোয়াঃ সমন্তাৎ
বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমানাঃ বনান্তাঃ॥"

যে ঋতু চির-প্রিয় বনভূমির নয়ন-মনঃ-প্রীতিকর সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়ে আনন্দ না জন্মাইয়া, ভীষণতা দ্বারা উৎকট ভয়েরই উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকে 'প্রচণ্ড' বা 'অনুপভোগ্য' বলা যাইতে পারিবে না—এমন কি কথা আছে? কবিভূষণ মহাশয়েরও বোধ হয় ঋতু-সংহারের গ্রীষ্ম বর্ণনার এই ভাবের শ্লোকগুলি পড়িয়া মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল, তাই তিনি এগুলি চাপিয়া যাইয়া তাঁহার চতুর্থ প্রমাণের বিবরণ প্রসঙ্গে "ঋতু-সংহারের প্রথম শ্লোক তাঁহার শ্বশুরালয়ের বর্ণনা, আর শকুন্তলার এই শ্লোক * তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা।"—এইরূপ একটী অমূলক উক্তি করিয়া ঋতু-সংহারের বিরুদ্ধ প্রমাণগুলি উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদিগের মতে ঋতু-সংহার কাব্যখানা কালিদাসের প্রথম রচনা এবং শকুন্তলা নাটক তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। রচনা-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-মূলক এই সিদ্ধান্তটী অগ্রাহ্য করিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করার উপযুক্ত কোন কারণই আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শকুন্তলার বঙ্গদেশীয় হস্তলিপি পুথিগুলিতে প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তিতে আছে—"আর্য্যে! ইয়ং হি রসভাববিশেষ দীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপ ভূয়িষ্ঠা পরিষৎ।" ইহা দ্বারা কালিদাস যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ থাকা অবস্থায় শকুন্তলা প্রণয়ন করেন, ইহাই প্রমাণিত হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হস্তলিপি পুথিগুলিতে এইরূপ পাঠ নাই বলিয়া আপত্তি করা যাইতে পারে; কিন্তু এই পাঠ অস্বীকার

* "সুলভ সলিলাবগাহা" ইত্যাদি ৪র্থ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত শকুন্তলা নাটকের সূত্রধারের উক্তি শ্লোক। লেখক

করিলেও বহু প্রমাণসিদ্ধ ঐ বিষয়টী স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং কালিদাস বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনে বা প্রৌঢ় অবস্থায় মালব-রাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হইয়াছিলেন, কবিভূষণ মহাশয়ের এইরূপ অনুমানের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিশেষজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। কবিভূষণ মহাশয়ের উপস্থাপিত অনেক যুক্তিতেই দেখা যায় যে, তিনি, যাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক, সেইরূপ সিদ্ধান্তটীকেই প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়া—উহার পোষক এমন সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা ঐকান্তিক (irrevertable) বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, আমরা তর্ক-স্থলে কালিদাসের জন্মভূমি বঙ্গদেশ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিব যে, কালিদাসের জন্মভূমিতে 'বার-মাস্যা' ব্যতীত শুধু গ্রীষ্মের নামে গান বাঁধে না; কেহ বাঁধিলেও তাহাতে গ্রীষ্মের প্রশংসা—গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্ব অপেক্ষা গ্রীষ্মের নিন্দা—গ্রীষ্মের বিড়ম্বনাই অধিক ফুটিয়া থাকে। কবিভূষণ মহাশয় 'মধু মাস এল সজনি"—এরূপ গান যে শোনেন নাই, ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাদের বাল্যকালে "বসন্ত আগত হের না লো সজনি!"—এই গানটী আমরা যেখানে সেখানে গাহিতে শুনিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোনও কবি যে কোন না কোন সময়ে মধু মাসের নামে গান না বাঁধিয়াছেন—এমন ত আমরা দেখি নাই। বসন্তকে ঋতুগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই যে কবিরা গ্রীষ্মের কোনও কদর করেন না,—এক শকুন্তলা ব্যতীত কোন কবির গ্রন্থ হইতে যে গ্রীষ্মকাল উপভোগার্হ—এমন কথা বাহির করা যায় না, ইহা দুঃসাহসিকের উক্তি বটে। উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল ঝটিকা-তাড়িত নীলাম্বুরাশির ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের ন্যায়—দাবাগ্নি-দগ্ধ পত্র-হীন তরু-শ্রেণি বেষ্টিত শূন্য মরুভূমিবৎ দিগন্ত-বিস্তৃত রণভূমিরও একটা রৌদ্র-রসের উদ্দীপক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আছে; কবির দৃষ্টি উহাতেই বিস্ময়-বিমিশ্র মাধুর্য্য অনুভব করিয়া, উহারই রসাত্মক শব্দ-চিত্র অঙ্কিত করিতে কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। তার পরে, দারুণ শীত কিংবা দারুণ গ্রীষ্ম বিলাসী ব্যক্তিদিগের পক্ষে যতই উদ্বেগ-জনক হউক না কেন, পুরুষকারের দ্বারা সেই শীত-গ্রীষ্মের প্রতিকূলতাকে পরাজিত করিয়া, এমন কি, উহাদিগকে উপভোগের যথেষ্ট অনুকূল উপকরণ রূপে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতেও সুখ অনুভব করা মানবের অসাধ্য নহে। কবি-কল্পনাকে এস্থলে বিলাসী-দিগের বিলাস-বাসনা চরিতার্থের পক্ষে অপূর্ব্ব সহায়তা করিতেই দেখা গিয়াছে। অন্য সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অনাবশ্যক; কবিভূষণ মহাশয় কালিদাসের 'ঋতু-সংহার' ও ভর্তৃহরির সুপ্রসিদ্ধ 'শৃঙ্গার-শতক' কাব্যেই ইহার অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। বাঙ্গালা দেশে শীত ও গ্রীষ্ম—উভয়ই অপেক্ষাকৃত মৃদু; কালিদাস বাঙ্গালী হইলে এবং ঋতু-সংহারে বাঙ্গলা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া থাকিলে, শীত ও গ্রীষ্ম অনুপভোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু ভর্তৃহরি ত বাঙ্গালী ছিলেন না; তাঁহার 'শৃঙ্গার-শতক' কাব্যে গ্রীষ্ম এত উপভোগ্য হইল কি প্রকারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই 'উপভোগ্য' বা 'অনুপভোগ্যের' যুক্তিটীর উপর বেশী নির্ভর করা চলে না।

কবিভূষণ মহাশয় 'বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি শ্লোকটীর যে অভিনব অর্থ করিয়াছেন—তাহা পরিহাসোক্তি না বাস্তবিক, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছি—

"বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ অথবা নিম্ব সেবনম্।
অথবা যুবতী সঙ্গঃ কিংবা বহ্নি নিষেবণম্॥"

এই স্বাস্থ্যরক্ষার আয়ুর্ব্বেদসম্মত উপদেশ-পূর্ণ শ্লোকটীর 'বহ্নিনিষেবণম্' কথাটাই এই হাস্যজনক ভ্রমের উৎপাদন করিয়াছে।

শ্লোকটীর উদ্দেশ্য উপভোগক্ষমত্ব হিসাবে বসন্তের প্রশংসা নহে,—কেন না তাহা হইলে, আর আর উপভোগ্য বস্তুগুলির কথা যাহাই হউক, নিম্ব-ভক্ষণ যে স্বাস্থ্য-রক্ষা ব্যতীত অন্য কারণে তেমন উপাদেয় নহে, তাহা বোধ হয় কবিভূষণ মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। শ্লোকে ঘিয়ে ভাজার কোন কথা নাই—ইহা ব্যাখ্যা-কার কবিভূষণ মহাশয়ের কল্পনা মাত্র। তিনি কি জানেন না—

'ঘিয়ে ভাজ নিমের পাত,—
তবু না ছাড়ে আপনা জাত।'

বস্তুতঃ শ্লোকটীতে কফাধিক্য-জনক বসন্ত ঋতুর উপযোগী কয়েকটী সহজ-সাধ্য স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায়, যথা—বন-ভ্রমণ, নিম্ব-পত্র ভক্ষণ ও আগুনের তাপ প্রভৃতি লওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ কার্য্যের কোন একটীর ফলেই কফের অপচয় হেতু বসন্তকালে স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কবিভূষণ মহাশয় আর একটা কথার অর্থ বড় ভুল বুঝিয়াছেন; আলঙ্কারিকদিগের বর্ণিত 'কবি-সময়-সিদ্ধ' বিষয়গুলির তাৎপর্য্য এই যে, সুন্দরীদিগের চরণ-তাড়নে অশোক-বৃক্ষের অকালে পুষ্পোদ্গম ইত্যাদি ঘটনা প্রকৃত-পক্ষে কোথায়ও সঙ্ঘটিত হইতে দেখা না গেলেও প্রাচীন কবিগণ চিরকাল ধরিয়া ঐ রূপ বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া কবিদিগের 'সময়' অর্থাৎ 'আচরণ' ("সময়ঃ শপথাচার-কাল-সিদ্ধান্ত-সংবিদঃ") অনুসারে ঐরূপ বর্ণনা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। এইরূপ কাল্পনিক 'কবি-সময়-সিদ্ধ' বিষয়ের সংখ্যা খুব বেশী নহে। এই বিষয়গুলির মধ্যে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই—সেগুলিকে অপ্রকৃত বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে—ইহা বলিলে উন্মত্তের প্রলাপ হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকে অনুপভোগ্য বলিয়াই বর্ণন করিতে হইবে—কোনও অলঙ্কার-শাস্ত্রেই ইহা বলে না। সুতরাং 'কবি-সময়ের অপ্রসিদ্ধ' (?) গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্বের বর্ণনা করিয়া কালিদাস কোনও অশাস্ত্রীয় বা অন্যায় কার্য্য করেন নাই। তিনি যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, তাহা কবিভূষণ মহাশয়ও অস্বীকার করেন নাই—এ অবস্থায় তিনি "কেবলমাত্র বাঙ্গালী বিদুষ (?) গণের পরিতোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অচিরপ্রবৃত্ত উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের বর্ণনা করিয়াছেন" ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? শকুন্তলায়

গ্রীষ্ম-কালের যে 'অচিরপ্রবৃত্ত' বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় উহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই, এ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর হইতে পারে। বয়ঃসন্ধির ন্যায় ঋতুরও সন্ধি আছে। শৈশব ও যৌবনের সন্ধি কৈশোরের মত বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিটীও বেশ রমণীয় বটে। গ্রীষ্ম অধিক অগ্রসর হইলে আর উহার এই রমণীয়ত্ব বা উপভোগক্ষমত্ব তেমন থাকে না, সে জন্যেই বোধ হয় কালিদাস "অচিরপ্রবৃত্তং উপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়ং" বলিয়াছেন। এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়াই কবিভূষণ মহাশয় এই সকল জল্পনা-কল্পনার বিস্তার করিয়াছেন।

শকুন্তলার প্রস্তাবনার সূত্রধারের উক্তি—

"সুলভ-সলিলাবগাহাঃ
পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বন-বাতাঃ।
প্রচ্ছায়-সুলভ-নিদ্রা
দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ।"

আর্য্যা ছন্দের উৎকৃষ্ট শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া, কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—'তিনি * উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের উল্লেখ করিয়া নিজে এক ছড়া কাটিলেন, এবং তাঁহার প্রিয়তমা নটীও গ্রীষ্মসময় অধিকার করিয়াই এক গান গাহিলেন।" ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবিকে ছড়া-কাটা কবির সর্দ্দার ও নটীকে তাঁহার "প্রিয়তমা" রূপে বর্ণনা করিয়া কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রিয় স্বদেশী কবি-চূড়ামণির কবিত্ব ও চরিত্রের মাহাত্ম্য কতদূর বাড়াইয়াছেন কিংবা কমাইয়াছেন, সে বিচার এখানে করিব না; তাঁহার কথার উত্তরে শুধু এইমাত্র বলিব যে, তিনি গ্রীষ্মের ভক্ত বলিয়া গ্রীষ্মের নামে ছড়া কাটেন নাই, ঘটনা-চক্রে অচির-প্রবৃত্ত গ্রীষ্ম কালে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায় তাঁহার শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয় বোধ হয় প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি তিনি 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' স্বরূপ গ্রীষ্মের সময়োচিত বর্ণনা সংযোজিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেই যদি কালিদাস বসন্ত অপেক্ষা গ্রীষ্মেরই অধিক ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গের প্রসঙ্গে আমরা অকালে বসন্তের অবতারণার পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মেরই অপূর্ব্ব বর্ণনা দেখিতে পাইতাম। বস্তুতঃ বাঙ্গালা দেশেও গ্রীষ্ম অপেক্ষা পুষ্প-রাজি-সমাকীর্ণ নাতিশীতোষ্ণ বসন্তই যে অধিক রমণীয় ও 'উপভোগক্ষম' ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে; এ অবস্থায় বসন্তকে ছাড়িয়া গ্রীষ্মের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করা যে দুঃসাহসের কার্য্য তাহা বলা বাহুল্য।

"(৪) সুলভ-সলিলাবগাহাঃ
পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বন-বাতাঃ।
প্রচ্ছায়-সুলভ-নিদ্রা
দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ॥

"এই শ্লোকটীতে চারিটী রহস্য আছে। ইহার প্রত্যেক পাদে এক একটী রহস্য আছে। ইহা কালিদাসের জন্মভূমি গ্রীষ্মকালে কিরূপ সৌন্দর্য্য লাভ করে, তাহারই প্রতিচ্ছায়া। ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক তাঁহার শ্বশুরালয়ের বর্ণনা, আর শকুন্তলার এই শ্লোক তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা—এরূপ অনুমান করার কোনই কারণ নাই। বরং তিনি পরিণত বয়সে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায় অবস্থানকালেই যে শকুন্তলা প্রণয়ন করেন—ইহার স্বপক্ষেই আভ্যন্তরীণ ও অন্যবিধ প্রমাণ আছে। আমরা কবিভূষণ মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

হিন্দুস্থানে কি পুকুর নাই? সেখানে বাঙ্গালা অপেক্ষা গ্রীষ্মাতিশয্যের জন্য স্নান যে অধিক প্রীতিকর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মে বৃক্ষতলে ছায়া থাকে না এবং তাহার নীচে শুইয়া নিদ্রাও দেখা যায় না—এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মকালে সকল প্রকার পত্রাভাব ঘটে না; সুতরাং উহার নীচে শুইয়া নিদ্রা অসম্ভব নহে। বঙ্গদেশেও এ সময়ে সকল গাছে সমান পত্র থাকে না; সুতরাং এ দেশেও 'প্রচ্ছায়' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-ছায়া-যুক্ত স্থানেই নিদ্রা সুলভ হয়। হিন্দুস্থানেও আম্র, বট প্রভৃতি 'প্রচ্ছায়' বৃক্ষতলে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে গ্রামীণ লোকদিগকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে হিন্দুস্থান-প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই সাক্ষ্য দিতে পারেন; এজন্য বিলাতী সাক্ষী ডাকিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। তবুও করি, যৌবনে দীর্ঘকাল সুদূর আর্য্যাবর্ত্তের প্রবাসী 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক রায় বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিলে, কবিভূষণ মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইতে পারিবে।

* অর্থাৎ সূত্রধার-রূপী কালিদাস। লেখক

* * * *

"প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা" এবং "স্নিগ্ধছায়া তরু" বাঙ্গালার নিজস্ব; অবঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মে বৃক্ষ-তলে ছায়া থাকে না এবং তাহার নীচে শুইয়া নিদ্রাও দেখা যায় না। বর্দ্ধমানের জজ Mr. Cammiade আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

"পাটল ফুল বা পারুল ফুল, এই বাঙ্গালাতেই মাত্র পাওয়া যায়। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পারুলে স্তূপের নিকটে একটী পারুল দীঘি ছিল, তাহারই নামানুসারেই পারুলে বা পাড়ুলে গ্রাম হইয়াছিল। গ্রাম্য ছড়ায় এই ফুলের নাম "পারুলী।"

"দিবসের পরিণাম বা বৈকাল বেলা। তিনি গ্রীষ্মের অপরাহ্ণকে বলিয়াছেন "দিনান্তরম্য" "দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ।" এই গ্রীষ্মের দিনান্ত-রম্যত্ব এবং পরিণাম রমণীয়ত্ব একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই সম্ভবে। ইহা হিন্দুস্থানে সম্ভবে না। সেখানে গ্রীষ্মের দিবসের পরিণামে "লু" চলে। বৈকালে আর গৃহের বাহির হওয়া যায় না।

* * * *

অতএব দিনান্তরম্য বাঙ্গালার গ্রীষ্মকালের বৈকাল বেলা।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই চতুর্থ প্রমাণের সম্বন্ধে শেষেই বক্তব্য যে, ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক কালিদাসের শ্বশুরালয়ের † বর্ণনা আর শকুন্তলার 'সুলভ সলিলাবগাহাঃ' ইত্যাদি শ্লোক তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা—এরূপ অনুমান করার কোনই কারণ নাই। বরং তিনি পরিণত বয়সে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায় অবস্থানকালেই যে শকুন্তলা প্রণয়ন করেন—ইহার স্বপক্ষেই আভ্যন্তরীণ ও অন্যবিধ প্রমাণ আছে। আমরা কবিভূষণ মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

† অর্থাৎ কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাসের শ্বশুরালয় মালব-দেশের। লেখক

বস্তুতঃ গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে গ্রামীণ লোকদিগকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে হিন্দুস্থান-প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই সাক্ষ্য দিতে পারেন; এজন্য বিলাতী সাক্ষী ডাকিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। তবুও করি, যৌবনে দীর্ঘকাল সুদূর আর্য্যাবর্ত্তের প্রবাসী 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক রায় বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিলে, কবিভূষণ মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইতে পারিবে।

কালিদাসের বর্ণিত 'পাটল' ফুলকে কবিভূষণ মহাশয় সোজাসুজি 'পারুল' ফুল বলিয়া বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাহা নহে। বাঙ্গালায় যাহা 'পারুল' নামে পরিচিত, ঐ ফুল মধুর জন্যে অভিধানে 'অলিপ্রিয়' নামে অভিহিত হইলেও, উহা সুগন্ধের জন্য মোটেই প্রসিদ্ধ নহে। সংস্কৃতের কাব্য-সাহিত্যে 'পাটল' বা 'পাটলা' নামে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পারুল' ফুল নহে; উহা এক জাতী পাটল-বর্ণ সেউতী গোলাপ। সেউতীর সংস্কৃত নাম 'শতপত্রী'; উহা হইতে প্রাকৃত সম্ভবতি ও অপভ্রংশ 'সঅতি' 'সেঅতি' সিদ্ধ হইয়াছে। স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের "শব্দ-কল্পদ্রুম" অভিধানে লিখিত আছে—"শতপত্রী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ, সেউতী ইতি ভাষা। পাটলবর্ণাসৌ গোলাব ইতি খ্যাতা।" এই সেউতী গোলাব উত্তর পশ্চিমের দেরাদুন প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে বন্য-অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় ও উহার সুগন্ধে বসন্তকালে বন-ভূমি সুবাসিত হইয়া থাকে—বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি।

বাগ্‌ভট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়" নামক বৈদ্যক-গ্রন্থে ঋতু-চর্য্যা বর্ণন-প্রসঙ্গে গ্রীষ্মে তাপ-শান্তির জন্যে 'পাটলা-বাসিত' জল ব্যবস্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি কোনও কোনও স্থলে প্রাচীন প্রথাসতে পানীয় জলে গোলাবের পাপ্‌ড়ি ফেলিয়া রাখা হয়; এজন্য গন্ধ-হীন পারুল ফুলের কেহ ব্যবহার করে না; এমনি কি সুগন্ধি বেলা, চামেলিরও করে না; তাহার কারণ বোধ হয় গোলাবের ভৈষজ্য-গুণ। শব্দ-কল্পদ্রুমে লিখিত আছে—"পাটলবর্ণাসৌ 'গোলাব' ইতি খ্যাতা। তৎপর্য্যায়ঃ সুমনাঃ, ২ সুশীতা, ৩ শিববল্লভা, ৪ সৌম্যগন্ধী, ৫ শতদলা, ৬ সুবৃত্তা, ৭ শতপত্রিকা, ৮ অস্যাগুণাঃ—হিমত্বম্। তিক্তত্বম্। কষায়ত্বং। কুষ্ঠ-মুখস্ফোট-পিত্ত-দাহ-নাশিত্বম্। রুচ্যত্বম্। সুরভিত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।"

সংস্কৃত কবিদিগের কাব্যে এই পাটলা' বা 'পাটল' পুষ্পের যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে উহাকে গোলাপ ব্যতীত আর কিছু মনে করা যায় না। ভর্তৃহরি তাঁহার 'শৃঙ্গার-শতক' কাব্যে বসন্ত-বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"অপ্যেতে নব-পাটলা-পরিমল-প্রাগ্‌ভাব-পাটচ্চরা।
বান্তি ক্লান্তিহরাঃ সুশীতলতরাঃ শ্রীখণ্ড-শৈলানিলাঃ॥"

বসন্তে 'পাটলা' পুষ্পের নূতন বিকাশ; তাই, অচিরপ্রবৃত্ত গ্রীষ্মের বর্ণনায় দেখিতে পাই, পাটল-পুষ্পের সুগন্ধে বন-বায়ু আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাস রঘুবংশের ঊনবিংশে বিলাসী রাজা অগ্নিবর্ণের বিহার-বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"যৎ স লগ্নসহকার-মাসবং
রক্তপাটল সমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশঃ
চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্ণবঃ॥"

আসবের অর্থ 'মদ্য-বিশেষ'। "শীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ"—অর্থাৎ পক্ক ইক্ষু-রস দ্বারা 'শীধু' এবং অপক্ক ইক্ষু-রস দ্বারা 'আসব' প্রস্তুত করা হয়। অপি চ 'আসবস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজ দ্রব্যগুণৈঃ সমা' অর্থাৎ আসবের গুণ বীজ-দ্রব্যের (base) গুণের তুল্য। তাই বিলাসী অগ্নিবর্ণের সেবিত আম্রের রস ও গোলাব দ্বারা প্রস্তুত করা আসব পক্কাম্রের ন্যায় স্নিগ্ধ ও বাজীকরণ-গুণ-বিশিষ্ট হওয়ায় তদ্দ্বারা উপভোগাতিশয্য ও গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হেতু ক্ষীণীভূত কন্দর্পও আবার নবীকৃত হইত।

সাতবাহনের সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ 'গাথা-সপ্তশতী' কাব্যেও 'রক্ত পাডল' (রক্তপাটল) পুষ্পের মধুর সুগন্ধের বর্ণনা আছে, যথা—

"রন্ধণ-কম্ম-নিউণিএ
মা জূরসু রত্ত-পাডল-সুअন্ধম্।
মুহ-মারুअং পিअন্তো
ধুমাই সিহী ণ পজ্জলই॥"

অর্থাৎ—

রাগিও না, হে রন্ধন-কর্ম্ম-পরায়ণে!
তোমার গোলাপ-গন্ধী মুখানিল পানে
লোভাতুর এ যে বহ্নি,—তাই তো না জ্বলে;
উগারিছে ধূম পাছে যাও যদি চ'লে!

কবিভূষণ মহাশয়ের 'পারুল' ফুলকেই যদি গায়ের জোরে এই কবি-বর্ণিত 'পাটল' বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও এই পারুল 'বাঙ্গালাতেই' মাত্র পাওয়া যায়, এইরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করা যায় কি? পক্ষান্তরে সেউতী গোলাপের বন কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত বাঙ্গালার কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং শব্দকল্পদ্রুম ও অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতির প্রামাণ্য ও কবিদিগের বর্ণনার যথার্থতা স্বীকার করিলে, শকুন্তলা নাটকখানি আর্য্যাবর্ত্তে তদ্দেশীয় কবির দ্বারাই রচিত হইয়াছিল, এরূপই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

'দিনান্তরম্য' বিশেষণটী যে শুধু বাঙ্গালার পক্ষে নহে—আর্য্যা-বর্ত্তের পক্ষেও যে উহা বিলক্ষণ খাটে—তাহা না বলিলেও হইবে। হিন্দুস্থানের সকল স্থলেই গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে "লু" চলে না; তার পরে কালিদাসের "অচিরপ্রবৃত্ত' বিশেষণ দ্বারাই এই সকল কুতর্ক খণ্ডিত হইয়াছে; সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাগাড়ম্বর অনাবশ্যক।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক—যে 'স্নিগ্ধছায়াতর'—(?) বলিতে কবিভূষণ মহাশয় যাহা বুঝিয়াছেন, বস্তুতঃ জিনিসটী তাহা নহে। মেঘদূতের—"স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু" বাক্যের 'স্নিগ্ধ-

চ্ছায়াতরুযু' দ্বারা স্নিগ্ধ ছায়া-তরু অর্থাৎ নমেরু বৃক্ষ আছে যাহাতে সেই চিত্র-কূট পর্ব্বতের আশ্রমগুলিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদি স্নিগ্ধ-ছায়া-বিশিষ্ট যে কোনও তরু বুঝাইতে এই শব্দটীর ব্যবহার হইত, তাহা হইলে পদটী 'স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুযু' না হইয়া 'স্নিগ্ধচ্ছায়তরুযু' হইত এবং তাহাতে ছন্দঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। এজন্যই মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারদিগকে বাধ্য হইয়া, স্নিগ্ধ 'নমেরু' বৃক্ষ-শোভিত' অর্থ করিতে হইয়াছে। 'নমেরু' একপ্রকার পার্ব্বত্য বৃক্ষ। কুমারের হিমালয়-বর্ণনা প্রসঙ্গে নমেরু বৃক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সমতল ভূমিতে এই বৃক্ষ বোধ হয় খুব কমই জন্মিয়া থাকে।

(৫) ঋতুসাম্য

"কালিদাসের "ঋতুসংহার" পড়িলে বুঝা যায়, তিনি কোনও ঋতুকেই প্রাধান্য দেন নাই। তাঁহার যে দেশ জন্মভূমি, সে দেশে ছয় ঋতুই বরণীয়। তিনি হিন্দুস্থানী হইলে শীত ঋতুকে প্রাধান্য দিতেন, মধ্যদেশ বা পশ্চিম ভারতের লোক হইলে গ্রীষ্ম ঋতুকে প্রাধান্য দিতেন, দাক্ষিণাত্যে চির বসন্ত বিরাজমান। বাঙ্গালায় কোনও ঋতুরই প্রাধান্য নাই। এখানে ছয় ঋতু সমানভাবেই বরণীয়। তিনি বাঙ্গালার লোক ছিলেন—তাই ঋতুসংহারের ছয় ঋতুকেই সমানভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই কথার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, প্রাধান্য দেওয়া বলিতে তিনি কি বুঝেন? অধিককাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি কিংবা প্রকৃতির রমণীয়তা—ইহার কোন্‌টী প্রাধান্যের কারণ ধরিতে হইবে? অধিক-কাল-ব্যাপিত্ব নিশ্চিতই কবির চক্ষে প্রাধান্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রমণীয়তা হিসাবে ঋতুসংহারে যে গ্রীষ্মের বর্ণনা অধিক মনোরম হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় উন্মত্ত ব্যতীত কেহই বলিতে পারিবেন না; সুতরাং ঋতুসংহারে প্রথমে গ্রীষ্মের বর্ণনা থাকিলেও তদ্দ্বারা গ্রীষ্মের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না। ঋতুসংহারে গ্রীষ্মের দ্বারা বর্ষারম্ভ করার কি গূঢ় তাৎপর্য্য ছিল—তাহা আমরা প্রথম প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

"(৬) বহুফলদাএ উপভোগক্ষমো * সহআরো। গ্রীষ্মকালে আম্রবৃক্ষের ফলাগমের পরিপূর্ণতা হেতু প্রৌঢ়াবস্থা ইহা কেবল এই নিম্নবঙ্গ বা রাঢ়েই সম্ভবে। কলিকাতায় যাহারা আম্র-ফলের ব্যবসা করেন তাঁহারা বলেন—বাঙ্গালার আমের নাম জ্যাঠো আম—ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ফল, অথবা ইহা সমগ্র ভারতের আম্র ফল জাতির জ্যৈষ্ঠ আম বা অগ্রিম ফল। মুরশিদাবাদের নবাবদের আনীত আমের নাম—আষাঢ়ে আম। মালদহের আমের নাম শ্রাবণে আম বা ইহা শ্রাবণ মাসে পাকে। বিহারের আদিম আমের—ভদরী আমের নাম ভাদুই—যাহা ভাদ্র মাসে পাকে; কাশী অঞ্চলে আশ্বিনে আম, পমরু প্যায়রাফুলী প্রভৃতি, ইহা আশ্বিন মাসে পাকে। মান্দ্রাজে শীতকালে আম পাকে। কাজেই গ্রীষ্মকালে আম্রবৃক্ষের প্রৌঢ়াবস্থা ইহা কেবল একমাত্র নিম্নবঙ্গ বা রাঢ়েই সম্ভবে।"

কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তিগুলিও তাঁহার অন্যান্য অনেক উক্তির ন্যায় অতিরঞ্জিত। আম্রফলের ব্যবসাদার ও ভোক্তারা সকলেই জানেন যে কেবল বঙ্গের আম নহে,—কয়েক জাতি সুখাদু বোম্বাই আমও জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে প্রায় বার মাসই কোন না কোন জাতীয় আম পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বিলম্বে বেহার ও কাশী অঞ্চলে বর্ষার বৃষ্টি (Monsoon) আরম্ভ হওয়ায়, সে দেশে আম বিলম্বে পাকে। তবু সেখানে আষাঢ় হইতে পাকা আম পাওয়া যায়। কেবল দুই চারি রকমের আমই ভাদ্র ও আশ্বিন পর্য্যন্ত থাকে। কলিকাতার বাজারে উৎকৃষ্ট আমের মধ্যে বোম্বাই আমই সর্ব্বাগ্রে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে পাওয়া যায়;—কবিভূষণ মহাশয় কিন্তু ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের আমের বর্ণনা করিতে যাইয়াও যে জন্যেই হউক, বোম্বাই আমের উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। যাহা হউক, হিন্দুস্থানে যে আষাঢ়ের প্রথম ভাগেই সুপক্ব আম্রের অভাব ছিল না, তাহা আমরা মেঘদূতের—

"ছন্নোপান্তঃ পরিণত-ফল-দ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ" ইত্যাদি আম্রকূট নামক পর্ব্বত-শিখরের বর্ণনায়ই দেখিতে পাই। আমরা প্রথম প্রবন্ধে কালিদাসের স্বীকৃত যে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-সম্মত ঋতু বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেই দেখা গিয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুইটী মাস লইয়া গ্রীষ্ম ঋতু গণিত হইয়াছে; সুতরাং গ্রীষ্ম-কালে যে আর্য্যাবর্ত্তে সুপক্ব আম্র মিলে না—কেবল বঙ্গদেশেই মিলে এই উক্তির যথার্থতা প্রাকৃতিক অবস্থা কিংবা কালিদাসের কাব্যের বর্ণনা কিছুর দ্বারাই সমর্থন করা যায় না।

বারান্তরে অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইবে।

---

* 'উপভোগক্ষমো' নহে 'উঅভোঅক্খমো' প্রকৃত পাঠ বটে। লেখক

ভারতে চিনির ব্যবসায়

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার

চিনি কথাটা এখানে একটু ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় চিনি বলিতে শুধু "চিনিই" বুঝায়; গুড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাহার মধ্যে আসে না। কিন্তু এখানে চিনির মধ্যে গুড় প্রভৃতিকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

চিনি পাঁচ প্রকার, যথা—গুড় (molasses), পরিষ্কার চিনি, পাটালা গুড় (treacle), চিনির দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন (confectionery), ও স্যাকারিন্ (saccharin)।

আমরা যথাক্রমে এই পাঁচ প্রকার চিনির কথার আলোচনা করিব। প্রথমে আমদানির কথা আরম্ভ করি। পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ১৯২২-২৩ সালে চিনির আমদানি কিছু কম হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে সকল প্রকার চিনি মিলাইয়া মোট ৭৮২,৬৬৮ টন চিনির আমদানি হইয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর (১৯২২-২৩) তাহা কমিয়া ৫০৪,০১০ টন হইয়াছে। আমদানি কম হওয়ার আনুমানিক কারণ নিম্নে লিখিত হইল—

১। এ বৎসরের প্রথমে পূর্ব্ব বৎসরের দরুণ অনেক মাল মজুত ছিল।

২। গত বৎসর যাভা চিনির দর পড়িয়া যাওয়ায়, মহাজনদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; কাজেই তাঁহারা লোকসানের ভয়ে এ বৎসর বেশী চিনি কিনিয়া রাখিতে সাহস করেন নাই। কোন রকমে দৈনিক বিক্রয় বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন।

৩। কিউবার গত বৎসরের প্রস্তুত ১,২৫০,০০০ টন চিনির অধিকাংশই মজুত রহিয়া গিয়াছিল; এবং সমস্ত পৃথিবীতে এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ১৩৪,১৪২ টন চিনি অধিক প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আশা হইয়াছিল, এ বৎসর চিনির দর বেশী উঠিবে না; কাজেই মহাজনেরা বেশী চিনি খরিদ করেন নাই।

৪। আমদানি কম হওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, এ বৎসর চিনির আমদানি শুল্কের হার শতকরা ১৫৲ হইতে শতকরা ২৫৲ হইয়াছে। বাজার নরম থাকায়, এই শুল্ক-বৃদ্ধির ফল ক্রেতারা তত বুঝিতে পারেন নাই।

এখন বিভিন্ন প্রকার চিনির কথা যথাক্রমে বলা যাক্।

প্রথমতঃ গুড়ঃ—১৯২১-২২ সালে যে গুড় তৈয়ারি হয় ১৯২২-২৩ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার চলে; অতএব আমাদের জানিতে হইবে ১৯২১-২২ সালে এদেশে কত গুড় তৈয়ারি হইয়াছিল। আখ ও খেজুর এই উভয় প্রকার মিলাইয়া ১৯২১-২২ সালে মোট ২,৫৩২,০০০ টন গুড় প্রস্তুত হয়। তাহার পূর্ব্ববৎসরের ঐরূপ গুড়ের পরিমাণ ২,৪৪৮,০০০ টন ছিল; আর এবৎসর ১৯২২-২৩ সালে ২,৮৭ ৫,০০০ টন গুড় প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার অধিকাংশই কিন্তু আগামী বর্ষে (১৯২৩-২৪) ব্যবহৃত হইবে। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এদেশে এত বেশী গুড় প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনাও চিনির আমদানি কম হওয়ার অন্যতম কারণ। সীমান্ত প্রদেশ হইতে ৫৪১ টন গুড় এবার এদেশে আমদানি হইয়াছিল। গত বৎসর ঐ আমদানির পরিমাণ ৫২৪ টন ছিল। আবার এখানকার গুড় কিছু কিছু করিয়া যুক্তরাজ্য, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানিও হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশগুলিতে এ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ৮,৭৩০ টন চিনি রপ্তানি

হইয়াছে। তাহার মূল্য ২৮,১৬,৩১৯ টাকা। গত বৎসর উক্ত রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ৮,৮০৩ টন ও ৩০,৯৯,৬৬৯ টাকা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, পরিষ্কৃত চিনিঃ—এ বৎসর (১৯২২-২৩) যুক্তপ্রদেশে দুইটি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু এবার পরিষ্কার চিনির দর অন্যান্য বৎসরের মত অত অধিক নহে বলিয়া চারিটি পুরাতন কারখানা কাজ বন্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টি চিনির কারখানা আছে। ঐ কারখানাগুলিতে ১৯২১-২২ সালে মোট ৭৭,৬০০ টন পরিষ্কার চিনি তৈয়ারি হইয়াছিল, অর্থাৎ উক্ত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪,৫০০ টন চিনি বেশী প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯২১-২২ সালে প্রস্তুত চিনি এই বৎসর খরচ হইতেছে। পুরাতন সেকেলে প্রথায় এবার অনুমান ৪০,০০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। হিসাব ঠিক না পাওয়া যাওয়ায় অনুমানিক পরিমাণ দেওয়া হইল। তাহা হইলে মোট ১১৭,৬০০ টন পরিষ্কার চিনি এই আলোচ্য বৎসরের খরচের জন্য এদেশে প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকাংশ এশিয়ার তুরস্ক, পারস্য, আরব, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই রপ্তানির মোট পরিমাণ ৪৫৬ টন, ইহার মূল্য ২,৯২,৫৫৬ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ৭৯৪ টন অধিক রপ্তানি হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩,৬১৪ টন ও মূল্য ৩১,২৮,০৩৮ টাকা। সমস্ত ভারতবর্ষে যে পরিমাণ পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাতে এ দেশের সমস্ত খরচ সংকুলান হয় না। কাজেই বিভিন্ন দেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে হয়। প্রধানতঃ যাভা মরিসস্ এবং ইয়োরোপ মহাদেশ হইতে এই অভাব পূরণ হইয়া থাকে। ১৯২২-২৩ সালে যত চিনি ভারতে আমদানি হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৮৪ ভাগ যাভা, ৭ ভাগ মরিসস্, বাকি ৯ ভাগ ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া পাঠাইয়াছিল। যাভা হইতে এ বৎসর মোট ৩৭৩,৭০০ টন চিনি ভারতে আসিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ২৫৪,৭০০ টন বেশী আমদানি হইয়াছিল। এই বৎসরে আমদানি চিনির মধ্যে বাংলাদেশ ১৫১,৬৪২ টন, বোম্বাই ১০৪,৫১৪ টন, সিন্ধুপ্রদেশ ৮৬,২০০ টন, ব্রহ্মদেশ ২২,৭০০ টন ও মান্দ্রাজ ৮,৭০০ টন লইয়াছিল। এবার মরিসসের চিনিও কম আমদানি হইয়াছিল। উহার পরিমাণ ৩১,৪০০ টন; আর পূর্ব্ব বৎসরের পরিমাণ ৬১,৬০০ টন। ইহার কারণ বোধ হয় মরিসস্ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ও যাভা হইতে ইংলণ্ডের নিকটতর বলিয়া তথাকার চিনি যুক্তরাজ্যে অধিক কাটতি হয়। জার্ম্মেনী, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়ম্ এবং পোল্যাণ্ড হইতে এবার অনেক বীট চিনি এ দেশে আমদানি হইয়াছিল। বোম্বাই বন্দরেই এই চিনি বেশী আসিয়াছিল। কিন্তু সেখানে ভাল কাটতি না হওয়ায় আবার রপ্তানি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন বৎসরে এ দেশে পরিষ্কৃত চিনির আমদানির পরিমাণ বুঝা যাইবে—

	১৯১৩-১৪ যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর	১৯১৯-২০	১৯২ -২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
	টন	টন	টন	টন	টন
জাভা	৫৮৩,০০০	৩২৯,৬০০	২০১,৬০০	৬২৩,৩০০	৩৭১,১০০
মরিসস্	১৩৯,৬০০	২৩,৫০০	১১,৬০০	৬১,৬০০	৩১,৪৩০
ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্টস্	২,৯০০	১৮,১০০	৯,০০০	৫,১০০	২,৬০০
চীন সাম্রাজ্য	১,৫০০	১২,১০০	৫,৯০০	৪,৪০০	৪,৬০০
ইজিপ্ট	১০০	৩,৩০০	৪,২০০	২০০	১,০০০
জাপান	১০০	১,৪০০	১০০	৬০০	১৩০
জার্ম্মানী	৭০০	,,	১০০	১০০	১০০
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী	৭,৪০০	,,	,,	,,	,,
নেদার ল্যাণ্ডস্	,,	,,	১,৬০০	২,০০০	২,৮০০
বেলজিয়াম্	,,	৫০০	১,৬০০	১২,৮০০	৪,৬০০
আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য	,,	১০০	২০০	২,৮০০	১০,৪০০
অপরাপর দেশ	১,১০০	১০০	১,০০০	৪,৭০০	৪,৭০০
মোট	৮০৩,০০০	৪০৮,৭০০	২৩৬,৯০০	৭১৭,৬০০	৪৪২,৮০৩
দাম (লক্ষ টাকা)	১৪,২৯	২১,৮৪	১৬,৯১	২৬,৭৮	১৫,০৬

এ বৎসর স্থলপথে আফগানিস্থান হইতে মাত্র ২ টন পরিষ্কার চিনি এ দেশে আসিয়াছিল। এইরূপে যত চিনি এ দেশে আমদানি হইয়াছিল, সব এখানে খরচ হয় নাই, কিছু আবার বিভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হইয়াছিল। এ বৎসর এইরূপে মোট ৩২,৯৬২ টন পুনর্ব্বার রপ্তানি (re-exported) হইয়াছিল; ইহার দাম ২,৬২,৩৫,৩৪৮ টাকা। নিম্নে এই পুনঃ রপ্তানির সবিশেষ হিসাব দেওয়া হইল ঃ—

পরিষ্কৃত চিনি পুনঃ রপ্তানির তালিকা

১২ মাস ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত

	পরিমাণ			দাম		
কোথায় রপ্তানি হইয়াছে	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
	টন	টন	টন	টাকা	টাকা	টাকা
যুক্তরাজ্য	২,৮০৮	,,	১৫,৭০৮	২৩,৭৩,৫৭৮	৫৭	৬৫,৮৫,৮৭৩
বেলজিয়াম	২,১৯৯	,,	,,	১৭,৬৬,১৪৯	,,	,,
নেদারল্যাণ্ডস্	১,০২০	,,	,,	১০,৪৪,২৯৮	,,	,,
আসিয়ার তুরস্ক	১২,৭৯৭	৭,০৮২	১৩,০৩০	১,০৮,৮৪,২৭৯	৪১,২৭,৮৮০	৫৯,০৫,৩৭৪
এডেন	১,১২১	৩,৬১৮	৩,২৫১	৮,৪৬,৮০৮	১৮,৫০,২৬২	১২,২০,৪০৫
আরব	১,৬৭৫	৫,৩৬৫	৫,৪৬৩	১২,৫৪,৬৮৪	২৫,৯৯,৪২৪	২১,২৯,৫২১
পারস্য	৮,২৮৮	৬,১৫৯	৭,৫২১	৭০,০৬,৫৩৮	৩৬,১৪,২৫৩	৩৩,৯২,১৬৮
সিংহল	৮৫৭	২,৫৭৩	২,৪৮৫	৬,২২,৮২৮	১৩,১৫,৮০৩	৯,১২,৫১১
ইজিপ্ট	২,২৬৮	৩৩৯	,,	১৭,৯৩,৫৬১	১,২৭,১৭০	,,
কেনিয়া	২,২৬৬	২,৮১৩	৪,২৭৬	১৬,৪৮,০২৫	১২,১০,০৬৩	১৫,৪৯,২১১
আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য	৩১,৩৪৮	,,	,,	৭৭,৮৬,৭৪৯	,,	,,
অপরাপর দেশ	৬,৯৮৪	৪,৬৪৬	১১,২২৮	৫৪,০৪,৪৫৬	২১,৮৯,৫৮৪	৪৬,৪০,২৬৫
মোট	৭৩,৬৩১	৩২,৫৯৫	৬২,৯৬২	৬,২৮,৩১,১৫৩	১,৭০,৩৪,৪১৬	২,৬২,৩৫,৩৪৮

এত গেল জলপথে পুনঃ-রপ্তানির হিসাব; ইহা ছাড়া স্থলপথে রপ্তানিও আছে। এ বৎসরও গত বৎসরের ন্যায় ৬,৬০০ টন চিনি স্থলপথে রপ্তানি হইয়াছিল। দামটা কিন্তু দুই বৎসরের দুই রকম—১৯২১-২২ সালে দাম ছিল ৫০,৬৭,০২১ টাকা আর এবার দাম কমিয়া দাঁড়াইল ৩৫,৬৯,২১৯ টাকা। ১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচি বন্দরে যে চিনি মজুত ছিল, তাহার পরিমাণ ৯৪ হাজার টন। আবার ১৯২৩ সালের মার্চ্চ মাসে যে পরিমাণ চিনি ঐসব বন্দরে মজুত রহিয়া গেল, তাহার পরিমাণ ৮৮,৫০০ টন। এবার জমাখরচ হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, কত চিনি আমরা খরচ করিয়াছি।

	টন
জমা—	
১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে মজুত	৯৪,০০০
এ দেশে প্রস্তুত চিনি মোট	১১৭,৬০০
জলপথে এ দেশে আনীত চিনি	৪৪২,৪০০
স্থলপথে এ দেশে আনীত ,,	২
	মোট ৬৫৪,০০২
খরচ—	
জলপথে পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ	৩২,৯৬২
,, রপ্তানির ,,	৪৫৬
স্থলপথে রপ্তানির ,,	৬,৬০০
১৯২৩ সালের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে মজুত	৬৮,৫০০
	মোট ১৩৮,৫১৮

অতএব দেখা যাইতেছে, সারা বৎসরে মোট ৫১৫,৪৮৪ টন চিনি এ দেশে খরচ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পাৎলা গুড়—

এ বৎসর স্থলপথে ৬০,৮৭১ টন পাৎলা গুড় আমদানি হইয়াছে। ইহার দাম ৩২,৫৭,৬৭২ টাকা। এ দেশে আন্দাজ ১ লাখ টন গুড় এ বৎসর তৈয়ারি হইয়াছিল। এই গুড় মদ তৈয়ারি ও তামাক মাখা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য শুধু ব্যবহার হয়।

চতুর্থতঃ, মিষ্টান্ন—

এ দেশে এ বৎসর ৭৩১ টন মিষ্টান্ন আমদানি হইয়াছিল। তাহার মূল্য ১৭,৮৮,৬১৯ টাকা। ইহার সমস্তই এ দেশে খরচ হয় নাই। ৫১ টন মাল পুনঃ রপ্তানি হইয়া বিদেশে যায়। এ দেশে জাত মিষ্টান্নও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। এ বৎসর ২০ টন মাল রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার দাম ৭৫,৬৭৯ টাকা।

পঞ্চমতঃ, ভাঙ্কারিণ—

ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। গত তিন বৎসরের আমদানির পরিমাণ ও দাম নিম্নে দেওয়া গেল—

১৯২০-২১	২৫	টন	৭,৪৪,২৬৮
১৯২১-২২	২১	,,	৪,১৭,১৬৫
১৯২২-২৩	৪৪	,,	৩,৮৬,৯২২

গত মার্চ্চ মাস হইতে ইহার আমদানি শুল্ক পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতি পৌণ্ডে কুড়ি টাকা হয়, পূর্ব্বে উক্ত হার দাম হিসাবে শতকরা ২৫ ছিল

এই ত গেল বিভিন্ন প্রকার চিনির কথা। এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন প্রদেশ কত পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে। হিসাবে দেখা যায়, বাংলা দেশই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিনি আমদানি করে। এ বৎসর কিন্তু গত বৎসর অপেক্ষা বাংলা দেশে কম পরিষ্কৃত চিনি আসিয়াছিল। গত বৎসর আমদানি চিনির পরিমাণ ছিল ৩৪৮,৭২১ টন, এবার তাহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১৬০,৯৬০ টন; দামও কমিয়াছে। গত বৎসরের দাম ১১,৯৩ লাখ টাকা; এ বৎসরের দাম ৫,০৯ লাখ টাকা। যাভা চিনির কম আমদানি—এই হ্রাসের কারণ। যাভা এবার অন্যত্র বেশী দর পাইয়াছিল বলিয়া ভারতের বাজারে যাভা চিনি বেশী আসে নাই; আর গত বৎসরের অনেক মজুত থাকায়, এবার বেশী দরে কেহ চিনি কিনে নাই। কাজেই এবারের আমদানি কম হইয়াছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে—গত বৎসর চিনির দর বেশী থাকায় এ বৎসর অনেকে আখের চাষ করিয়াছিল। ফলে গত বৎসর বাংলা দেশে যত পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল, এ বৎসর তাহা অপেক্ষা আরও শতকরা ১৪ ভাগ বেশী জমিতে ঐ চাষ হইয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৯২১-২২ সালে ২,৩৯৫ হাজার একার জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল; এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ২,৭২১ হাজার একার দাঁড়াইয়াছিল। বাংলা দেশ অপেক্ষা বোম্বাই কম চিনি ব্যবহার করিলেও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সে প্রদেশে বেশী চিনি খরচ হয়। তাহার পর সিন্ধু প্রদেশ, তাহার পর ব্রহ্মদেশ, এবং মান্দ্রাজে সব চেয়ে কম চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গত তিন বৎসরে কোন প্রদেশে মোট কত চিনি আমদানি হইয়াছিল, তাহার হিসাব ফুটনোটে দেওয়া গেল।— *

কলিকাতায় সাদা যাভা চিনির দর এই বৎসর কোন্ মাসে কত ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কলিকাতার বাজারে সাদা যাভার দর মণকরা

		সর্ব্বাপেক্ষা বেশী	সর্ব্বাপেক্ষা কম
এপ্রিল	১৯২২	১৫৷৷০	১৪৸৵০
মে	,,	১৫৷/০	১৪৷৵০
জুন	,,	১৫৷/০	১৫৷০
জুলাই	,,	১৫৸০	১৫৶১০
আগষ্ট	,,	১৬৷/১০	১৫৷৶১০
সেপ্টেম্বর	,,	১৬ ১০	১৫৶০

*

	১৯২০-২১		১৯২১-২২		১৯২২-২৩	
	টন	টাকা	টন	টাকা	টন	টাকা
বাংলা দেশ	১৭৭,৭৪১	৬,৮২,৫৪,২০৫	৪,০৭,৬৭৩	১২,৪৪,৫৬,২২১	২১৯,২৫০	৫,৫৪,৭২,৫৯৭
বোম্বাই	৮২,৫৬৩	৬,৮১,১০,৬৫২	১,৬২,৬৫৬	৬,৭৬,৯২,১৪৫	১,৫৩,২৩৯	৫,১৬,২১,৬৩৪
সিন্ধু প্রদেশ	৫০,৫৪৯	৩,৩৪,৯২,৫৪৬	১,৭৬,৯২১	৭,০০,৪২,৪৮৬	৯৭,৪২৫	৩,৫০,৭০,৮২২
মান্দ্রাজ	১৯,২১১	৬৬,৪৮,৩৫২	১৫,১১১	৬৬,৫৩,৫১৯	৯,৮৬৪	৪০,১৫,৭২০
ব্রহ্মদেশ	১৩,৬২৭	৮৫,২০,৮১৯	২০,৩০৭	৭৪,৮৩,৮০৭	২৪,২৪২	৮৬,২৯,১১৫
	মোট ৩৪৩,৬৯১	১৮,৪০,২৯,৭৫৪	৭,৮২,৬৬৮	২৭,৫০,২৮,২৫৮	৫,০৪,০৩০	১৫,৪৮,৮৯,৯৬৮

অক্টোবর	,,	১৫।১০	১৪৸৵১০
নভেম্বর	,,	১৫।৵০	১৪।৵০
ডিসেম্বর	,,	১৫৵০	১৪।৵০
জানুয়ারী	১৯২৩	১৪।৶১০	১৪৵০
ফেব্রুয়ারি	,,	১৮৸৵০	১৪৵০
মার্চ্চ	,,	১৯৸৶০	১৬।৵০

এই তালিকা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাদা যাভা চিনির দর গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত মণকরা ১৪৵০ আনা হইতে ১৮।১০ এর মধ্যে ছিল। তাহার পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চিনির দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ দর এখানেও বাড়িয়া গত মার্চ্চ মাসে ১৯৸৵০ দাঁড়ায়। এই সব আলোচনা করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চিনির দর দেখিয়া সুবিধা মত চিনি ক্রয়বিক্রয়াদি করিলে ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতে এই বৎসরে ৪৪২,৭০০ টন চিনি আমদানি হইয়াছে ও তাহার মূল্য ১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা; আর এই দেশের কারখানায় ঐ সময়ে প্রস্তুত চিনি মোট ৭৭,৬২৮ টন, কাজেই যত চিনি এই দেশে প্রস্তুত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী চিনি খরচ হয়। অতএব বর্ত্তমান যুগে যখন সমস্ত বিদেশী দ্রব্য পরিহার করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তখন আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, কি উপায়ে দেশের এই অভাব দূর করিতে পারা যায়। চিনি না হইলে চলিবে না। দেশী চিনি না পাইলে লোকে বিদেশী চিনি কিনিতে বাধ্য হইবে। আমাদের ধনী লোকেরা যদি চিনির কারখানা বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদিগের সাহায্য লইয়া চিনির কারখানা খুলেন, তাহাতে তাঁহাদের অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হয়, অথচ প্রতি বৎসর যে প্রায় এক কোটি টাকা বিশেশে চলিয়া যাইতেছে তাহাও বন্ধ হয়। এ বিষয়ে কৃষকেরও কর্ত্তব্য আছে। আখের চাষ বাড়াইতে হইবে, এবং ভাল আখের চাষ প্রচলন করিতে হইবে। ভারতের উত্তরাংশে এক প্রকার নূতন আখের চাষ পরীক্ষিত হইতেছিল, তাহার ফল খুবই আশাপ্রদ। এই পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ আখ জন্মে, পরীক্ষিত উপায়ে চাষ করিলে তাহার দেড় গুণ জন্মিতে পারে। ঐ আখের বীজ ঐ প্রদেশের চাষীদিগকে দেওয়া হইতেছে; এবং আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় কারখানায় আরও ১ লাখ টন চিনি প্রস্তুত হইবে।

এখন চিনির উপর আমদানি শুল্ক খুব বেশী আছে, কাজেই চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। যাভার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার চিনির ব্যবসায়ে ফল, আমাদের সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের মুখের অন্ন পরকে তুলিয়া দিতেছি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

বিজ্ঞান ও শিল্প

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এসসি, (বি-এচ-ইউ)

এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লওয়া ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে, এই যুগধর্ম্ম বরণ করিয়া লইতে হইবে; নতুবা, অন্যান্য জাতির সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

এককালে ভারতবর্ষ ধর্ম্মজগতে অগ্রণী ছিল; কিন্তু আজ তাহার কেবলমাত্র পুরাতনকে ধরিয়া থাকা ও নূতনকে অবজ্ঞা করা চলিবে না। বিজ্ঞানানুশীলন ব্যতীত এই কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভবপর নহে।

যেমন সাহিত্য ও কলা-চর্চ্চায় আনন্দলাভ হয়, সেইরূপ বিজ্ঞান-চর্চ্চাতেও বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মাত্রেই এই বিমলানন্দ ভোগের অধিকারী। তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, স্বীয় পরীক্ষাগারে (laboratory) বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমুক্ত থাকেন। যশ ও অর্থের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। বিজ্ঞান-চর্চ্চাতেই তাঁহার আনন্দ। কথিত আছে, বিখ্যাত গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিজ (Archimedes) যখন জলে নিমজ্জিত করিয়া বস্তুর গুরুত্ব (Specific gravity) নির্দ্ধারণের তত্ত্ব অবগত হন, তখন তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সকল গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ও ছাত্র কোনও কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে, বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা কিরূপে শিল্পোন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সভ্যতা সাক্ষ্য দিতেছে। পদার্থ-বিদ্যার (physics) (বিদ্যুদ্বিজ্ঞান ইহার অন্তর্বর্ত্তী) প্রয়োগে, ইঞ্জিন (Engine), মোটর (motor), ডাইনামো (Dynamo) প্রভৃতির সৃষ্টিতে বর্ত্তমান কলকারখানার আবির্ভাব হয়। উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) ও জীবতত্ত্বের (Zoology) বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ হয়। রসায়নশাস্ত্রের প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Synthesis) দ্বারা বহু নূতন বস্তুর সৃষ্টি ও নূতন শিল্পের আবির্ভাব হয়।

হইতে পারে, বিজ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবশিশুর শারীরিক পরিশ্রম করিবার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, ও কলকারখানার ধূম স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর; কিন্তু সেইজন্য কি বিজ্ঞান একেবারেই পরিত্যাজ্য! বাষ্পযান, অর্ণবযান ও ব্যোমযান (Aeroplane) আবিষ্কৃত হওয়ায় জল, স্থল ও বায়ুপথে গমনাগমন, তৎসঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারের কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যুতের সাহায্যে আমেরিকায় রন্ধন, গৃহ-মার্জ্জন, জুতা ব্রুশ প্রভৃতি কার্য্যও অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। বেতার পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিমেষের মধ্যে সন্দেশ বহন করে। 'রেডিও' (Radio) সাহায্যে নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, বহুদূরের গীতবাদ্য, বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতি শ্রবণ করা, ও এমন কি, প্রবাস বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করাও সুসাধ্য। দুঃখের বিষয়,

উন্নিত অত্যাশ্চর্য্য ও উপকারী বস্তুসমূহের অধিকাংশ এখনও এদেশে আসে নাই।

রণ্টজেন (Rontgen) সাহেবের এক্স-রে (X Ray) ও কিউরী-দম্পতির (Dr. and Madame Curie) রেডিয়াম আরও আশ্চর্য্যজনক বস্তু। চিকিৎসাশাস্ত্রে উহাদিগের প্রয়োগে অভূতপূর্ব্ব উপকার সাধন হইয়াছে।

অর্গানিক রসায়নের (Organic Chemistry) উন্নতির সহিত এক নূতন জগতের আবির্ভাব হইয়াছে; বহু স্বাভাবিক বস্তু অনায়াসেও অল্পমূল্যে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আলকাতরা হইতে প্রত্যহ বহু পরিমাণ রং, সুগন্ধ ও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। দীনবন্ধুর অমর লেখনী যাহা সাধন করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই, তাহা নীলে বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম নীল তৈয়ারী করিয়া বাঙ্গলার সেই নীলের অত্যাচার দূর করিয়াছেন।

রসায়নের উন্নতির সহিত কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে। 'সাইন্টীফিক আমেরিকান' (Scientific American) বলেন যে, জার্ম্মানি বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা একখণ্ড ভূমিতে আমেরিকা হইতে পাঁচগুণ অধিক শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের 'রোদামষ্টেড' (Rothamstead) নামক স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য সাধনের জন্য রীতিমত পরীক্ষা (Experiment) হয়। আজ এই বিশ্বব্যাপী নবজাগরণের দিনে, এই বৈজ্ঞানিক ও শিল্পময় জগতে ভারতকে নিষ্ক্রিয় ও সুপ্ত থাকিলে চলিবে না। তাহাকেও ইয়োরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে বিজ্ঞানের ঐক্যতান বাজাইতে হইবে। তাহাকে জাগিতে হইবে, বাঁচিতে হইবে ও বিশ্ব-সভায় যোগদান করিয়া স্বীয় আসন গ্রহণ করিতে হইবে।

বহু ইয়োরোপীয় ও অনেক এ দেশীয় ব্যক্তিগণের ধারণা, এসিয়া-বাসীগণ স্বভাবতঃ ব্যবসায় করিতে জানে না। কিন্তু এই ধারণা যে কিরূপ অমূলক তাহা ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। কিরূপে বাঙ্গলার কুটীর-শিল্প ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (East India Company) অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াছে, তাহা স্বদেশ-প্রাণ রমেশ দত্ত মহাশয়ের বিখ্যাত পুস্তক (Economic History of India) পাঠে অবগত হওয়া যায়।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য (ঢাকার মসলিন প্রভৃতি) রোমে পরে, ভেনিস ও জেনোয়ায় রপ্তানি হইত (জ্যেষ্ঠ প্লিনী [Pliny] ইহার উল্লেখ করিয়াছেন)। মসলিন, কালিকো (calico) প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে বিক্রীত হইত। আর আজ ভারতবাসীকে লজ্জানিবারণের জন্য মান্‌চেষ্টার ও ল্যাঙ্কেশ্বরের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। এমনই বিড়ম্বনা! ঢাকা মুর্শিদাবাদের সেরূপ শ্রীবৃদ্ধি আর নাই। তন্তুবায়গণ তাহাদের জাতীয় শিল্প ভুলিয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, হিন্দুরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে লৌহ গলান, ইস্পাত-প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি অবগত ছিল। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীর কোন বর্ত্তমান বৃহৎ লৌহকারখানাতেও এত লৌহ প্রস্তুত সম্ভব কি না সন্দেহ। ভারতীয় ইস্পাত এককালে ছুরী, কাঁচী ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ডে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত (Ranade's Esaey on Indian Economics)।

অর্ণবযান প্রস্তুত ভারতবর্ষের আর একটি অতি পুরাতন শিল্প ছিল। চট্টগ্রামে এখন জাহাজ প্রস্তুত বিষয়ক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। (শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত History of Indian Shipbuilding দ্রষ্টব্য)। ভারতবর্ষে প্রস্তুত জাহাজ লণ্ডন বন্দরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত। ডাইরেক্টরগণের অন্যায় আদেশে এই পুরাতন শিল্পও ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত যে ভারতীয় শিল্প বলিদান করা হইয়াছে, তাহা ইংরাজ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন (The Industrial Revolution of the Eighteenth Century—Arnold Toynbee)। ইংরাজ বণিকেরা ভারতবর্ষকেও আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার মত একটী উপনিবেশ মনে করিয়া শিল্পের উপাদানের জন্য কেবল কৃষি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন (Plantation); তুলা, পাট, সিল্ক, প্রভৃতি যাহাতে এ দেশে যথেষ্ট পরিমাণ জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উক্ত উপাদানগুলি হইতে বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ দেন নাই; বরং বাধা প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য আজ কৃষিই ভারতবাসীদিগের প্রধান অবলম্বন; এবং অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন প্রভৃতি উপলক্ষে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িয়া সহস্র সহস্র কৃষক এ ধরাধাম পরিত্যাগ ক'রে।

ভারতবর্ষের কৃষিবিদ্যার সহিত বিজ্ঞানের কোনও সংস্রব নাই। আমেরিকা, জাপান, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মনি প্রভৃতি দেশে কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ হইতেছে।—রাসায়নিক সার দ্বারা অনুর্ব্বর ক্ষেত্র উর্ব্বর হইতেছে, উর্ব্বরতা ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি হইতেছে। ফলে আমাদের সোণার ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অর্দ্ধেক পরিমাণ (Proportion) শস্য উৎপন্ন হয়। সোরার অভাব এ দেশে নাই। অস্থি প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ফস্ফোরাস (Phosphorus) প্রস্তুত হইতে পারে। নাইট্রোজেন (Nitrogen) ফস্ফোরাস (Phosphorus) ও পোটাসিয়ম (Potassium) যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সারের মূল উপাদান। আমরা ইচ্ছা করিলেই রাসায়নিক সার প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া কৃষিশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারি।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে অপরিষ্কৃত সোরা উৎপন্ন হয় (দেওয়ালের গায়ে 'লোনা' ধরে; এই 'লোনা' আর কিছুই নয়—ইহাই সোরা বা পোটাসিয়ম নাইট্রেট [Potassium Nitrate]। ইহা স্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন হয়; কোনও পরিশ্রমের আবশ্যক নাই)। বলিতে গেলে, সোরা ভারতবর্ষের একচেটিয়া। দেশীয় লোকেরাই ইহা পরিষ্কৃত ও বিশোধিত করে। পরে

ইহা বিদেশে চালান দেওয়া হয়। শান্তিতে ইহা রাসায়নিক সার রূপে ব্যবহৃত হয়, ও যুদ্ধের সময় বারুদ ও অন্যান্য বিদারণক্ষম (Explosive) বস্তু তৈয়ারীর জন্য ইহাই প্রধান উপাদান। এই জন্য গত যুদ্ধের সময়ে ইহা মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সোরা হইতেই পোটাসিয়মের অন্যান্য লবণ (Salt) প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ম্যাগ্‌নেসিয়ম (Magnesuim) লবণের জন্য আমাদের দেশে ম্যাগ্‌নেসাইট (Magnesite—Carbonate of Magnesium) ও ডোলোমাইট (Dolomite—Double Carbonate of Magnesium and Calcium) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ম্যাগ্‌নেসিয়ম লবণ যে কেবল বিরেচক ঔষধ (Purgative) প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাই নহে; অদাহ্য (fire-proof) ইট ও নানারূপ মৃত্তিকাজাত বস্তুও (Pottery) উহা হইতে তৈয়ারী হইতে পারে। ইহা একটী প্রকৃত রাসায়নিক শিল্প। সাধারণ লবণের অভাব এ দেশে একেবারেই নাই। লবণ-খনি ও সমুদ্র হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত লবণ তৈয়ারী হইতে পারে; এবং এই লবণ হইতে সোডা, (Sodium Carbonate) ও কষ্টিক সোডা (Caustic সোডা) অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ।

যুক্তপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ও অসম্ভবরূপ সস্তায় 'সাজিমাটী' পাওয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, ইহার অধিকাংশ ভাগ সোডা (Sodium Carbonate) ও তৎসঙ্গে অল্পবিস্তর পরিমাণ লবণ, সোডিয়ম সালফেট (Sodium Sulphate) ও সোডিয়ম সিলিকেট (Silicate) আছে। সোডিয়ম সিলিকেট ও সোডা উত্তম বস্ত্র পরিষ্কারক। এ দেশীয় রজকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সাজিমাটি হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি পৃথক করা যাইতে পারে ও সোডা (Carbonate) হইতে কষ্টিক সোডা অনায়াসে ও সস্তায় প্রস্তুত হইতে পারে।

পাঞ্জাবের 'খেওরা' খনিতে পোটাস্ ক্লোরাইড (Potassium Chloride) পাওয়া যায়, ও উক্ত উপাদান হইতে পোটাস্ কার্ব্বোনেট (Carbonate) ও কষ্টিক পোটাস (Caustic Potash) প্রস্তুত হইতে পারে। কষ্টিক সোডা ও পোটাস সাবানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে কলাগাছ পোড়াইয়া তাহার ছাই দিয়া কাপড় কাচে। এই ছাইতে পোটাস কার্ব্বোনেট (Carbonete) আছে এবং ইহাই বস্ত্র পরিষ্কারক।

এই ত গেল ক্ষারের (alkali) কথা। এখন অম্ল (acid) বিষয়ে আলোচনা করা যাক। শিল্পে, হাইড্রোক্লোরিক (Hydrochloric), নাইট্রিক (Nitric) ও সালফিউরিক (Sulphuric) এই তিনটী এসিডই (acid) বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমোক্ত এসিডটি ও লবণ হইতে অতি সস্তায় হইতে পারে (Le Blancs Process)। দ্বিতীয়টী সোরা হইতে ও তৃতীয়টী গন্ধক হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে গন্ধকের অভাব নাই। সেই জন্য বোধ করি যে, আমাদের শিল্পের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid) এ দেশেই তৈয়ারী হইতে পারিবে। অধিক মূল্য ও মূল্যের ৪।৫ অংশ ভাড়া দিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিবার আবশ্যক হইবে না। সোহাগা যথেষ্ট পরিমাণ এদেশে পাওয়া যায়; উহা হইতে বোরিক এসিড (Boric acid) প্রস্তুত করাও লাভজনক সন্দেহ নাই।

গালা ও রবার প্রস্তুত শিল্প ভারতবর্ষের একচেটিয়া। গালা হইতে লাল রং (Lac dye) প্রস্তুত করা একটী কুটীর-শিল্প। দুঃখের বিষয়, কিন্তু, ভারতবর্ষে উৎপন্ন যে প্রায় সমস্ত গালা বিদেশে রপ্তানি হয়। ইদানীং মহিশূর গর্ভমেণ্ট একজন শিক্ষিত যুবককে এই শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উক্ত শিল্পের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। রবারের বস্তু তৈয়ারী করিবার প্রণালী আমরা আজ পর্য্যন্ত শিখিয়া উঠিতে পারি নাই বা শিখিতে চেষ্টা করি নাই। রবারের পোষাক (Waterproof) টায়র (Tyre) প্রভৃতি প্রস্তুত করার প্রণালী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি, কোনও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক বিদেশে (আমেরিকায়) গমন করিয়া উক্ত শিল্পে পারদর্শী হইয়া জাতীয় শিল্প (National Industry) প্রায় রক্ষায় হইবেন।

পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে চন্দনকাষ্ঠ জন্মে না বলিলেই চলে। ভারতীয় চন্দনকাষ্ঠ আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়, ও সেখান হইতে চন্দনের এসেন্স (Essential oil of Sandel wood) এদেশে আমদানি হয়। সুখের বিষয় এই যে, একজন দেশীয় যুবক উক্ত শিল্প বিদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া মাদ্রাজের নিকট একটী কারখানা খুলিয়াছেন। মহীশূরের গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে মহীশূরের সরকারী চন্দন অরণ্য হইতেও চন্দন-তৈল, চন্দন-কাষ্ঠচূর্ণ ও ধূপ প্রস্তুত হইতেছে।

তৈল প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জ তৈল বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। উক্ত তৈলও ভারতবর্ষের একচেটিয়া বলিলেই হয়। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে নানা প্রকারের তৈল এরূপ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ তৈলবীজই (Oilseed) বিদেশে রপ্তানি হয়; এখানে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ বীজ হইতে তৈল নিষ্পেষিত (Expressed) হয়। গত বৎসর ১৭,১৩,৬৩,৭০৪ টাকা মূল্যের (৭২৬,৪৮১ টন) তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানি হয়, কিন্তু তৈল মোট ৪৬,৩২,৩৩৭ টাকা মূল্যের (৭১১,৪৭২ গ্যালন) মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল। কেবল সংযুক্ত প্রদেশে (United Provinces) গড়ে ১২৫ লক্ষ মণ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ মণ বীজ হইতে তৈল বাহির করা (Expressed) হয়। বাঙ্গালা ও বোম্বাইতে অবশ্য কিছু তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্পেষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৈলবীজই বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ইহার ফল এই হয় যে, এ দেশ হইতে বীজ অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিদেশে পাঠান হয় ও সেখানে তৈল নিষ্কাষিত হইয়া আসিয়া এখানে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। পরন্তু তৈলের খোল (যাহা গরুর খাদ্য এবং কৃষি-ক্ষেত্রের উত্তম সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে

পারে) হইতেও আমরা বঞ্চিত হই। তৈল অধিক প্রস্তুত না হওয়ায় তৈল-সংক্রান্ত শিল্পগুলির (Industry of the oil products) যথা, সাবান, বার্ণিস, ভার্ণিস (Varnish) রং (Paint) ইত্যাদি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনও হয় না।

এদেশে তৈলবীজ হইতে যে তৈল নিষ্কাষিত হয়, তাহা প্রায় কলুরা 'ঘানিতে' করিয়া থাকে। কিন্তু এই অসংস্কৃত (Crude) উপায়ে প্রায় অর্দ্ধেক তৈল নষ্ট হয়। তৈলের কল (যেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রেসে (Hydratic press) তৈল নিষ্কাষিত হয়) এদেশে বিরল। কলিকাতা, বোম্বাই, কাণপুরে সামান্য কয়েকটি কল আছে, কিন্তু সেগুলিতে অন্যান্য দেশের কথা ত' দূরে থাকুক, স্থানীয় সমস্ত তৈল বীজই ব্যবহৃত হইতে পারে না। দ্রাবক (Solvent) দ্বারা তৈল বাহির করিবারও (Extraction) কোনও ব্যবস্থা নাই। এ বিষয়ে কৃষি ও শিল্প বিভাগ (Agricultural and Industrial Departments) উভয়েই উদাসীন। আমাদের শিল্প বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তৈল শিল্পের (Oil Industy) উন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে তৈলসংক্রান্ত অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা এখন নিতান্ত আবশ্যক।

তৈল বর্ণশূন্য ও নির্গন্ধ করা আর একটী সমস্যা। প্রথমে কষ্টিক সোডা, তৎপরে সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid) দিয়া পরে রাসায়নিক বর্ণশূন্য করার উপাদান (Chemical Bleaching agents), যথা, বাইক্রোমেট (Bichromate of potash), পারমাঙ্গানেট (Permangarate of Potash) প্রভৃতি দিয়া বর্ণশূন্য করিতে হয়। হাড় হইতে প্রস্তুত কয়লা (Bone charcoal) ও এমন কি সাজিমাটী (Fuller's Earth) দিয়াও তৈল বর্ণশূন্য ও নির্গন্ধ করা যাইতে পারে।

তৈল বিশুদ্ধ হইলে, কেশের জন্য গন্ধ তৈল, ঔষধ, উত্তম সাবান, ঘড়ি প্রভৃতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের তৈল অতি সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। সাবান ইত্যাদি এদেশে তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও অনেক কারখানা রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর বেশ কৃতকার্য্য হইতেছেন। মসিনার তৈল হইতে, ভার্ণিস, রং, তৈল-বস্ত্র (Oil cloth) প্রভৃতি অনায়াসেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নারিকেল ও অন্যান্য খাদ্য তৈল (Edible oil) হইতে কৃত্রিম মাখন প্রভৃতি আজকাল ইয়োরোপে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে।

সাধারণ তৈলের ন্যায় নানারূপ আতর (Essential oil) তৈয়ারীর যোগাও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই বেশী। জার্ম্মাণী, আমেরিকা ও ফ্রান্স রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম আতর তৈয়ারী করিতেছে অথচ আমরা স্বাভাবিক আতর তৈয়ারী করিতে অক্ষম।

এককালে ভারতবর্ষের চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত, আর আজকাল অধিকাংশ চিনিই মরিসস্ (Mauritius), যাভা (Java) ও জার্ম্মাণী (Germany) হইতে এ দেশে আমদানি হয়। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের হেতু কি? ইক্ষু কি এ দেশে আর পূর্ব্বের মত জন্মিতে পারে না? না, তাহা নহে। কৃষিকার্য্যে অবহেলা বশতঃ ইক্ষুর উৎপত্তি কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিলেই অধিকতর পরিমাণ ইক্ষু এখনও জন্মিতে পারে। আর এক কারণ, এখানে চিনির কল বেশী নাই। অধিকাংশ ইক্ষুরসই প্রায় গুড়ে পরিণত হয়। আরও দেখা যায় যে, চিনির কল স্থাপিত হইলেও তাহা অধিক দিন টিকিতে পারে না। ইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশে অপরিষ্কৃত গুড় ও ইক্ষুরস (molasses) হইতে সুরাসার (alcohol) তৈয়ারী হয়, আবগারী বিভাগের কল্যাণে এ দেশে তাহা হইবার উপায় নাই, প্রতিযোগিতায় যে দেশীয় কল বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা তাহার একটী কারণ। আর এক কথা, চিনির কল চালাইবার জন্য এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা (Mechanical Engineering) ও চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য (Sugar Refining) অল্পবিস্তর রসায়ন শিক্ষার প্রয়োজন।

চিনির সমস্যা সমাধানের আর একটী উপায় আছে। বাঙ্গলাদেশ ও মধ্য প্রদেশে (Central Provinces) যথেষ্ট পরিমাণ খর্জ্জুর গাছ পাওয়া যায়। উক্ত গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ গুড় হইতে অনায়াসে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

সুরাসারের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। উহা যে কেবল পানীয় বলিয়া পরিত্যাজ্য তাহা নহে। বহু শিল্পে (যথা, নানা প্রকার ঔষধ তৈয়ারী, কৃত্রিম সিল্ক, ভার্ণিস, রং ইত্যাদিতে উহা দ্রাবক [Solvent] রূপে ব্যবহৃত হয়) উহা অত্যাবশ্যক। সুরাসার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ও চাই কি সস্তা হইলে উহা দ্বারা মোটর প্রভৃতি চালান যাইতে পারে। একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন যে, সুরাসার প্রস্তুত করিতে কেবলমাত্র সূর্য্যকিরণ আবশ্যক। শ্বেতসার (Starch) প্রায় সমস্ত ফলেই আছে, আর ইহা হইতেই সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। যাহা উচ্ছিষ্ট (Refuse) পড়িয়া থাকে, তাহা উত্তম সার রূপে ব্যবহৃত হয়। জার্ম্মাণীতে অধিকাংশ সুরাসার আলু হইতে ও আমেরিকায় ভুট্টা হইতে প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে ভুট্টার অভাব নাই। রাঙ্গা আলু (বা সাদা মিষ্ট আলু) হইতেও উহা অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। ডি, ওয়াল্‌ডি (D. Waldie) কোম্পানি ত উহা মহুয়া ফুল হইতে প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এইরূপ শুনিয়াছি। মহুয়া ফুলকে চুয়াইয়া (Distil) লইলেই সুরাসার পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণ কাঁচা চামড়া (Raw hides) বিদেশে (অধিকাংশ জার্ম্মাণীতে) চালান যায়, ও জুতা তৈয়ারীর উপযোগী চামড়া (Tanned Leather) বা জুতা তৈয়ারী হইয়া, এ দেশে আমদানি হয় এবং তখন তাহার মূল্য দশগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হয়। ১৯২০-২১ সালে প্রায় ২৯,১০০ টন কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের সমস্ত কাঁচা চামড়া হইতে পাকা চামড়া (Leather) প্রস্তুত করা সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু অধিকাংশই এখানে প্রস্তুত হইতে পারে। দেশীয় চর্ম্মকারেরা এই শিল্পে একেবারে অজ্ঞ এবং প্রায়ই তাহারা "ভাল কাঁচা চামড়া হইতে খারাপ পাকা চামড়া তৈয়ারী করিয়া থাকে" (making a good hide into bad leather)। ইহার একমাত্র

কারণ, তাহাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষিত লোকদিগকে তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে। ক্রোম প্রণালী (Chrome Tanning) শিক্ষার জন্য রসায়ন শিক্ষা আবশ্যক। এখানকার দেশীয় চর্ম্মকারেরা বাবলা, হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করে (Vegetable tanning), কিন্তু তাহারা প্রায় অর্দ্ধেক ট্যানিন (Tannin) নষ্ট করে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে কাচ প্রস্তুত হইতে পারে না। হইতে পারে যে, অতি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক জেনা কাচ (Jena Glass for chemical wares, optics) এখানে তৈয়ারী করা শক্ত, কারণ বিশুদ্ধ বালুকা (quartz) পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ কাচ তৈয়ারীর উপযোগী বালি, চূণ, সোহাগা, সোরা ও লেড অক্সাইড (Lead oxide or carbonate) ইত্যাদির অভাব নাই। অভাব কেবল শিক্ষার ও সুশৃঙ্খলার সহিত অনুসন্ধান এবং কার্য্য পরিচালনের। সুখের বিষয় যে, কলিকাতা, জব্বলপুর, নৈনী প্রভৃতি স্থানে বোতল ও চিমনীর উপযোগী কাচ (Bottle and chimney glass) তৈয়ারী হইতেছে। তবে আরো কুঠি ও কারখানা স্থাপন করা আবশ্যক, যাহাতে আমাদের জাপান কিংবা জার্ম্মাণী বা অষ্ট্রিয়ার কাছে ভিক্ষা না করিতে হয়। ১৯১৩-১৪ সালে প্রায় ১৬৪ লক্ষ টাকার কাচ আমদানি হইয়াছিল।

মাদ্রাজ, বুঁদি, কাট্‌নি প্রভৃতি স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিমেণ্ট তৈয়ারীর জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি ৬০ লক্ষ টাকার উপর সিমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানি হয়। অথচ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের (Portland cement) উপযোগী চূণ, মাটী (Shale or slag) প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে এ দেশে পাওয়া যায়।

মাটীর পাত্র একটী অতি সাধারণ বস্তু। কিন্তু চীনা মাটী বা পোর্সিলেনের (Porcelain) পাত্র ইত্যাদি অতি মূল্যবান, এবং তাহা এদেশে এখন পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না। বম্বে স্কুল অব্ আর্টসে (Bombay School of Arts) এ বিষয়ে পরীক্ষা (Experiments) চলিতেছে। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্ (Bengal Pottery Works)ও কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এখনও আমাদের অভাব দূর হয় নাই। পোর্সিলেন তৈয়ারীর জন্য ভাল পাঁজার আবশ্যক, যাহাতে ১২।১৩০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত টেম্পারেচার (Temperature) উঠিতে পারে। চক্‌চকে (Glaze) করাও একটী শিল্প; কিন্তু ইহাতে বিশেষ নৈপুণ্যের আবশ্যকতা নাই। বর্ণশূন্য পাত্র তৈয়ারী উচ্চ টেম্পারেচার ভিন্ন সম্ভব নহে। জাপান এই শিল্পে অগ্রণী। এনামেলও (Enamal) এই জাতীয় শিল্প; ইহার সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই।

১৯১৫-১৬ সালে ২৪৯,০০০ বর্গ মাইল অরণ্য গর্ভমেণ্টের অরণ্য বিভাগের (Forest Department) অধীন ছিল; তাহাতে ২৪৬০ লক্ষ ঘন ফুট (Cubic feet) কাষ্ঠ ও ১১৬ লক্ষ টাকার অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন হয়। এখনও গর্ভমেণ্ট তত্ত্বাবধান করেন না, এরূপ আরও অনেক অরণ্য আছে। গালা ও রবারে বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কেবল মাত্র কাষ্ঠ হইতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

দেশলাই ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয়; অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা একেবারেই এ দেশে তৈয়ারী হইত না। অধিকাংশ দেশলাই সুইডেন (Sweden) হইতে আসিত। যুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপ হইতে দেশলাইয়ের আমদানি বন্ধ হইলে, ভারতবর্ষের দেশলাই ব্যবসা জাপানের একচেটীয়া হয়। গত পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে এ দেশে বহু দেশলাইয়ের কল স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রায় কোনটীই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজকাল গুজরাট ইসলামিয়া দেশলাইয়ের কারখানা (Ahmedabad) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে যে ভাল দেশলাই তৈয়ারী হয় না, তাহার একটী প্রধান কারণ সুইডেন ও নরওয়ের এসপেন (aspen) ও পপ্‌লার (Poplar) এ দেশে পাওয়া যায় না। তবে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দেশলাই তৈয়ারীর উপযোগী অনেক কাষ্ঠ পাওয়া যায়। এখন বাঙ্গলাদেশে হস্তপরিচালিত দেশলাই তৈয়ারীর যন্ত্র হওয়াতে, দেশের একটী অভাব দূর হইয়াছে। অবশ্য বিদেশী বৈজ্ঞানিক বৃহৎ যন্ত্র শোভিত দেশলাইয়ের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহারা সমর্থ হইতে পারে না; তবে দেশলাই তৈয়ারী কুটীর-শিল্পে পরিণত হইলে স্থানীয় অভাব দূর হইবে। আজকাল বিদেশী দেশলাইয়ের উপর শুল্ক এত অধিক যে, বিদেশী বণিক এই কুটীর-শিল্পীগণের ব্যবসা নষ্ট করিতে পারিবে না। আর এক কথা এই, ছোট ছোট যন্ত্রে অনেক সাধারণ কাষ্ঠ—বথা,—করঞ্জ, ছাতিয়ান, শিমুল, দেবদারু, মেড়া প্রভৃতি যাহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায়—ব্যবহার করা যাইতে পারে। বালক ও স্ত্রীলোকগণও উক্ত যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারে। আর মূলধনও অল্প হইলেই চলিতে পারে।

এ দেশে বৎসরে প্রায় ২০০ লক্ষ গ্রোস পেন্সিল ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কেবলমাত্র কলিকাতায় স্মল ইণ্ডষ্ট্রীজ ডেভেলপমেণ্ট কোং (Small Industries Development Co) পেন্সিল তৈয়ারী করিয়া থাকেন, ও বাকী পেন্সিল বিদেশ হইতে ক্রয় করা হয়। এ দেশে অন্ততঃপক্ষে ৪০টী ছোট পেন্সিলের কারখানা চলিতে পারে। কাষ্ঠের অভাব নাই। সিংহল ও ভারতের দক্ষিণাংশে অতি উৎকৃষ্ট গ্রাফাইট (Graphite) পাওয়া যায়। আর মাটীও সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। উক্ত তিনটী বস্তুই পেন্সিলের উপাদান। অভাব কেবল শিক্ষার ও কার্য্যকারিতার।

কাগজ আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। আমাদের প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫,০০০ টন কাগজ আবশ্যক হয়। আজকাল এদেশে কয়েকটী কাগজের কল হইয়াছে; কিন্তু ঐগুলিতে মাত্র ৩০,০০০ টন কাগজ প্রস্তুত হয়। প্রায় ১৩,০০০ টন কাষ্ঠের শাঁস (Wood pulp) বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এ দেশে কি কাষ্ঠের অভাব? না, তাহা নয়; কিন্তু কাষ্ঠের শাঁস প্রস্তুত করা হয় না। এই জন্য বিদেশ হইতে আমাদের উহা ক্রয় করিতে হয়। ভারতবর্ষে

অধিক কাগজ প্রস্তুত হয় না বলিয়া যুদ্ধের সময়ে কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়াছিল। কাগজ হইল সভ্যতার দীপ। কাগজ হইতে পুস্তক মুদ্রিত হয়। পুস্তক পাঠে জ্ঞান ও তৎসঙ্গে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাগজের সৃষ্টি না হইলে, মুদ্রাযন্ত্রের এত উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইত। কাগজ তৈয়ারীর অন্যান্য উপাদান ছিন্ন বস্ত্র, রজ্জু, পাটের আঁশ (fibre), এসপার্টো ঘাস, খড়, বংশ প্রভৃতিরও অভাব এ দেশে নাই; এগুলি অত্যন্ত সুলভ। তবে শাঁসকে (pulp) বর্ণশূন্য করা এই শিল্পের একটী প্রধান অঙ্গ। উত্তম কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে, এ দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কাষ্ঠ আরও অন্যান্য কার্য্যেও ব্যবহার করা যায়। কাষ্ঠ চুয়াইয়া (Distill), মিথিট (Methyl alcohol), এসেটিক এসিড (acetic acid), এসিটোন (acetons) ও কয়লা পাওয়া যায়। উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি বহু শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

রঞ্জনশিল্প একসময়ে ভারতবর্ষে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এ দেশে রঞ্জিত কাপড়, ক্যালিকো (Calico) প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে বিশেষরূপে আদৃত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে। উদ্ভিজ্জ রঙ্গের অভাব এ দেশে নাই। সেগুলি দিয়া যে বস্ত্র উত্তম রূপে রঞ্জিত হইতে পারে, তাহা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র তাঁহার "দেশী রং" পুস্তকে দেখাইয়াছেন। তবে রাসায়নিক রং প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বস্ত্র রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমে উহাকে বর্ণশূন্য (bleach) করা আবশ্যক। এই বর্ণশূন্য করিবার শিল্প (Bleaching Industry) আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। অথচ ইহা বিশেষ কঠিন নহে। তবে সেজন্য এ দেশে ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী করার প্রয়োজন।

শীতবস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি জল লাগিলে নষ্ট হইয়া যায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উহাদিগকে পেট্রল বা গ্যাসোলিন (Gasolene) দ্বারা বিনা জলে পরিষ্কৃত করে (Dry cleaning)। ময়লা, তৈল প্রভৃতি পেট্রলে দ্রব হইয়া যায়। তবে বস্ত্রগুলি শুষ্ক করিবার সময়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, নচেৎ আগুন লাগিয়া যাইতে পারে।

মানুষের জীবনরক্ষা ও রোগমুক্তির জন্য ঔষধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বহু রাসায়নিক ঔষধ যে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল কেমিক্যাল (Bengal Chemical and Pharmaceutical Works) এবং বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং (B. K. Paul & Co.) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তবে মাত্র দুইটী কারখানা এই মহাদেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এখানে ঔষধের উপাদানের অভাব যে নাই, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কবিরাজি ঔষধ প্রস্তুত করাও আবশ্যক। বহু কবিরাজি উদ্ভিদ্ ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর বলিতে গেলে ভারতবর্ষই কুইনাইনের একমাত্র জন্মভূমি।

কোন প্রকার শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, উপাদান-বস্তুর মূল্যের দিকে ব্যবসাদার মাত্রকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে উপায়ে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও সুলভে দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, শিল্পীকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সেইজন্য এইস্থানে বৈদ্যুতিক শক্তির (Electric Power) বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, না। আজকাল বহু রাসায়নিক শিল্পে, ধাতু পরিষ্কারক বিদ্যা (Metallurgy) প্রভৃতিতে রাসায়নিক শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এলুমিনিয়ম (aluminium), তৈয়ারী, সোড কষ্টিক (Caustic Soda manufacture) কৃত্রিম উপায়ে সোরা (Nitric) তৈয়ারী, কার্ব্বাইড (Calcium Carbide) প্রভৃতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

আর এক দিকে আটার কল, বস্ত্রের কল প্রভৃতিও আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। আমেরিকায় বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চ'লে। সে দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার (কয়লা বা তৈলের) শক্তির ব্যবহার নাই বলিলেই চ'লে। এখন দেখা যাউক এ দেশেও বৈজ্ঞানিক শক্তির উৎপত্তি হইতে পারে কি না।

অবশ্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে ডাইনামো (Dynamo) চালাইয়া কয়লার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা একেবারেই সুলভ নহে। যদি জলশক্তিকে (Water power) বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবেই উহা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। নরওয়ে (Norway) ও সুইডেন (Sweden) প্রভৃতি পার্ব্বত্যদেশে বৈদ্যুতিক শক্তি এই জন্য অতি সুলভ। ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ পার্ব্বত্য নহে, তবে পার্ব্বত্য প্রদেশেরও অভাব নাই।

টাটা মহোদয় পশ্চিম ঘাটের (Western Ghats) পার্ব্বত্য নদীর জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন (Tata Hydro-Electric Scheme)। ইহা পৃথিবীর একটী আশ্চর্য্যের বস্তু। এই বৈদ্যুতিক শক্তি বোম্বাইয়ে প্রেরণ করিয়া (১৩ ঘণ্টার জন্য ৪০,০০০ অশ্ব শক্তি (Horse power) প্রেরিত হয়) সেখানকার বস্ত্রের কল ও অন্যান্য অনেক কারখানা চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। টাটার নাম এজন্য অমর হইয়া থাকিবে।

কাশ্মীরে (শ্রীনগরে) এইরূপে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপত্তি হয়। হিমালয়ের পার্ব্বত্য নদীর জলপ্রপাত হইতে আরও অধিক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা উত্তর ভারতের অনেক শিল্প ও কারখানার উন্নতি হইতে পারে। চেষ্টা করিলে, এমন কি টাটার কারখানা অপেক্ষা অধিক শক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

এমন কি, কৃত্রিম জলপ্রপাত দ্বারাও বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। মহীশূর হাইড্রো-ইলেকট্রীক স্কীম (Mysore Hydro-Electric Scheme) কাবেরীর বর্ষা ঋতুর জল উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, পরে একটী অতি নিম্নস্থানে পড়িবার উপায় করিয়াছেন; এবং এই কৃত্রিম জলপ্রপাতের দ্বারা ১৩০০০ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক

শক্তি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই শক্তি ৯০ মাইল দূরে কোল-হারের স্বর্ণখনিতে প্রেরিত হয়। ইহার ভোল্টেজ (Voltage) অত্যন্ত অধিক (৭০,০০০)।

এইরূপে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে যে ভারতের প্রায় সমস্ত শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের শিল্পের দুরবস্থা সর্ব্ব প্রথম গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ১৯০৫ সালে একটী সভা আহূত হয় (Indian Industrial Conference)। তাহার পরে গত যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উৎসাহ দান না করার ভ্রম মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করেন। ১৯১৬ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল কমিশন (Indian Industrial Commission) বসে ও তাহার রিপোর্ট বাহির হয় ১৯১৮ সালে। ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল (ক) ভারতবর্ষের মূলধন কোনও নূতন শিল্প ও বাণিজ্যসমূহে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না; ও (খ) গভর্ণমেণ্ট কিরূপে শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ দান করিতে পারেন তাহা নির্ণয় করা।

তার পর নিখিল-ভারত শিল্প-বিজ্ঞান (Imperial Industrial Department) ও প্রাদেশিক শিল্প বিভাগসমূহ স্থাপিত হইল। তবে তথাকথিত রাজকীয় শিল্প বিদ্যালয় (Imperial Polytechnical Institute) আজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবাসী-দিগের উৎসাহ ও সাহায্যের নিমিত্ত কোনও নূতন কারখানাও স্থাপিত হয় নাই। বস্তুত আজ পর্য্যন্ত, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনও বিশেষ উৎসাহদান ("direct encouragement") হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশী বণিকে দেশের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে; আর দেশবাসিগণ দিনে দিনে নিঃস্ব ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। আর কত কাল আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া রহিব? এরূপ ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া একবেলা অর্দ্ধেক আহার করিয়া এই ভারতবাসী আর কত দিন জীবন-সংগ্রাম করিয়া সমর্থ হইবে?

ভারতে অর্থ-সমস্যা ও অন্ন-সমস্যার সমাধান একমাত্র শিল্প সাধনার দ্বারা হইতে পারে। অন্য পন্থা নাই। শিল্প সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা—বৈজ্ঞানিক ও শিল্প শিক্ষা (Technical Education), অর্থ-নীতি (Economics) শিক্ষা, মহাজনী শিক্ষা (Banking and Commerce)।

শিল্প শিক্ষার বিষয়ে জার্ম্মাণী ও জাপান (বিশেষতঃ জাপান) ভারতবর্ষের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে। জার্ম্মাণী কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক (প্রধানতঃ রাসায়নিক) শিক্ষা ও শিল্পে তাহার প্রয়োগের বলেই আজ বিশ্বের নিকট বরেণ্য। অন্য দিকে নির্জ্জীব, রক্ষণশীল (Conservative) এসিয়ার বক্ষে জাপান কর্ম্মের জোয়ার আনয়ন করিয়াছে। আজ জাপান সভ্য জগতে অন্যান্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতির সহিত এক পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিয়াছে। অথচ এই জাপান অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না। জাপানের এই উন্নতির একমাত্র কারণ এই যে, শতকরা ৯৮ জন জাপানি শিক্ষিত। আর আমাদের দেশে মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক; আর তাঁহারাও কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা প্রভৃতি "চাকরীর" মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকেন। কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্যবসায়ে মনোযোগ দিয়া থাকেন? জাপান এই গত দশ বৎসরের মধ্যে শিল্প শিক্ষার (Technical Education) বিপুল আয়োজন করিয়াছে। জাপানি গভর্ণমেণ্ট, সর্ব্বতোভাবে শিল্পোন্নতির জন্য উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

সমস্ত লোকেরই প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য করণীয় (Compulsory) হওয়া উচিত। কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা ও অল্পবিস্তর শিল্প শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজন; স্ত্রীলোক ও বালকগণকে কুটীর শিল্প বিষয়ক শিক্ষাদান আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষায় (Primary Education) দৈনন্দিন বিজ্ঞান শিক্ষাদান অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও কোনও একটী শিল্প (যথা, সূত্রধরের কার্য্য, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি) অবশ্য পাঠ্য হইবে। রসায়ন ও রাসায়নিক শিল্প (Industrial Chemistry) বিষয়ে উচ্চশিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধিমান যুবক ছাত্র-দিগকে উক্ত বিষয়ক শিক্ষার নিমিত্ত জাপান, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশে বৃত্তি দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় উন্নতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিল্প শিক্ষার সহিত অর্থনীতিশিক্ষা, কুঠি পরিচালনা (Factory management), তৈয়ারী বস্তু বিক্রয় করা (Salesmanship) প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকায় এইরূপ বন্দোবস্ত আছে।

প্রত্যেক স্বদেশভক্ত ভারতবাসীর স্বদেশী শিল্প সাধনায় উৎসাহদান ও স্বদেশী বস্তুর আজীবন ব্যবহার, এই ব্রতপালন করিতে হইবে। ভারতের সমস্যা ভারতবাসীকেই পূরণ করিতে হইবে; উহা বিদেশীর কার্য্য নহে। বিশ্বসভায় ভারতবাসীকে অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে স্বীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতেই হইবে।*

* জেম্‌সেদপুর সাহিত্য সভার অগ্রহায়ণ অধিবেশনে পঠিত।

বাড়ীর বৌ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নাটোরের স্কুলদের ঘড়ীতে ঢং ঢং করে' ছ'টা বাজ্‌ল। পৌষের শীতের রাত তখনো ভালো করে' পোহায় নি। ভারি কন্‌কনে শীত পড়েচে! কর্ত্তা গিন্নীর ঘুম ভাঙ্‌বার দেরি আছে। সে বাড়ীর আর-কেউ তখনো শয্যা-ত্যাগ করে নি—বাড়ীর বৌটি ছাড়া।

বৌটি গায়ে শুধু কাপড়ের আঁচল জড়িয়ে বাঁ হাতে একটা হেরোসিনের 'কুপি'-বাতি নিয়ে রান্না-ঘরের বারান্দায় উঠ্‌ল। বারান্দায় উঠে একটা তক্তার ওপর থেকে কতকগুলি শুক্‌নো কাঠের টুক্‌রা বেছে' নিয়ে, বারান্দার উনুনটায় আগুন দিয়ে, শিকল খুলে' ঘরের মধ্যেকার মাটির কলসী থেকে ভালো জল গড়িয়ে এনে, উনুনে চা'র জল চড়িয়ে দিলে। বাড়ীর কর্ত্তা—বউটির শ্বশুরের, শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বেই এক পেয়ালা গরম চা চাই-ই।

চা তৈরি কর্‌তেই চারদিক বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌ল। রাস্তায় মেথরদের রাস্তা ঝাঁট দেবার শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। কর্ত্তার ঘরে কর্ত্তার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরেই গিন্নী দর্‌জা খুলে' বাইরে এলেন।

বৌ চা নিয়ে তার শ্বশুরের ঘরে ঢুক্‌ল। কর্ত্তাকে চা দিয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দার চা'র উনুনটা ভালো করে' পুঁছে' ঘরের মধ্যে গিয়ে এক পাশে জড়ো-করা রাতের এঁটো বাসনগুলো উঠিয়ে নিয়ে বাইরে উঠানে রেখে' কুয়ো-তলায় গেল স্নান কর্‌তে—খাবারের ঠাঁই রাত্তিরেই সে নিকিয়ে রেখেছিল।

স্নান করে' এখনি তাকে শাশুড়ীর শিব-পূজার জন্যে ভিজে কাপড়ে উঠানের কোণের ফুলগাছ ক'টা থেকে ফুল তুল্‌তে হবে, ঠাকুর-ঘরের এঁধো কুটুরীতে গিয়ে চন্দন ঘস্‌তে হবে,—সজ সাজাতে হবে।

সজ সাজিয়ে অনেকক্ষণ পরে বৌ যখন ঠাকুর-ঘর থেকে বেরুল, তখন বাড়ীর সকলেই উঠেচে। ছেলেরা পড়্‌বার ঘরে পড়্‌তে আরম্ভ করেচে; কর্ত্তা উঠানে কেদারায় বসে' আরাম করে' রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ফর্‌সী টান্‌চেন; গিন্নী তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় বসে' তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে কর্ত্তার সঙ্গে মাঝে-মাঝে সাংসারিক দু' একটি কথা কচ্চেন।

ছেলেদের ইস্কুল আছে, কর্ত্তার কাছারি আছে,—তার পর তাঁর স্নানের জন্যে জল গরম করা আছে; বৌ তাড়া-তাড়ি রান্না-ঘরে গিয়ে, কয়লার উনুনে কয়লা দিয়ে, কয়লার ধুঁয়ায় চোখ-মুখ রাঙা করে' উনুন ধরালে। ততক্ষণে বাড়ীর হাড়ীর মেয়ে দাসীটি এসে উঠান ঝাঁট দেওয়া সারা করে' উঠানের এঁটো বাসনগুলো নিয়ে মাজ্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি খিড়্‌কীর পিছনের 'লাল দীঘি'র ঘাটে গেল।

জল গরম করে' গরম জলের হাঁড়ীটা কর্ত্তার ঘরের বারান্দার র'কে রেখে' এসে বৌ ভাত তুলে' দিল। ভাত হ'লে ভাত নামিয়ে দা'ল তুলে' দিয়ে বৌ যখন তর্‌কারীর ডালা এগিয়ে তার থেকে কয়টি ভালো দেখে' বেগুন বেছে' নিয়ে ভাজ্‌বার জন্যে বঁটিতে ছোট ছোট করে' বানাতে বস্‌ল, দাসী তখন নিকটের বাজার থেকে বাজার সেরে' ফিরেচে। বাজারের ঝাঁকা বারান্দায় নামিয়ে রেখে' সে উঠানে বসে' মাছ কুট্‌তে লাগ্‌ল।

রাস্তায় নতুন জলের কল থেকে স্নান করে' ফিরে' এসে ছেলেরা যখন কলরব করে' এক সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুক্‌ল, বৌ তখন মাছের তরকারীতে সম্বরা দিচ্চে।

"বো'ঠান—আমাদের শীগ্‌গির ভাত দাও!"

"আঃ! মাছের তরকারী এখনো হয় নি?—ন'টা অনেকক্ষণ বেজে' গেছে যে!"

বৌ তাড়াতাড়ি তাদের ঠাঁই করে' দিলে তারা খেতে বস্‌ল। দা'ল, বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে খেতেই বৌ মাছ রেঁধে' নামাল। ছেলেরা মাছের জন্যে তাগিদ কর্‌ছিল—

তাড়াতাড়ি তাদের পাতে মাছের তরকারী দিল।

ছেলেরা খেয়ে গেলে বৌ শ্বশুরের জন্যে আলু দিয়ে একটা মাছের অম্বল রেঁধে' নামিয়ে তাঁর খাবারের ঠাঁই করে' রাখ্‌লে। একটু পরেই শ্বশুর এসে পিঁড়িতে বস্‌লেন।

শ্বশুর খেয়ে উঠে পান-তামাক খেয়ে যখন সুকুল-জমিদারদের কাছারিতে গেলেন, তখন শাশুড়ী এসে খেতে বস্‌লেন।

শাশুড়ী খেয়ে উঠে বাইরে যেতেই বাইরে দাসীর গলা শোনা গেল—"বৌমা, আমায় কখন ভাত দেবে গো? দুপুর যে গড়ে' গেল।"

বৌ দাসীকে ভাত দিলে ভাত নিয়ে; দাসী তার বাড়ী চলে' গেল। বৌ রান্না-ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে' রান্না-ঘর বন্ধ করে' বেরিয়ে এল। শাশুড়ী তখন তাঁর শোবার ঘরে একটু গা-গড়িয়ে নিচ্চেন।

বৌ কুয়ো-তলায় গিয়ে আবার স্নান করল। ঢং—স্কুলদের ঘড়ীতে ১টা বাজ্‌ল। সে দিন একাদশী। বিধবা বৌ 'হবিষ্যি'—ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বারান্দার ওপর ছল্ ছল্ চোখে মলিন মুখে গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌তে বস্‌ল!

পল্লী সঙ্গীত-সংগ্রহ *

সংগ্রাহক—মোহাম্মদ মন্‌সুরউদ্দিন

(ক)

আমি কোন্ সাধনে তারে পাই,
আমার জীবনের জীবন সাঁই ॥
সাধিলে সিদ্ধির ঘরে,
শুনেছি সেও পায় না তারে,
সাধু যে ব্যক্তি,
পেলে যে মুক্তি,
ও কে যাবে অম্‌নি শুনিরে ভাই ॥

(খ)

শাক্ত, শৈব্য, বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ-লাভ,
তবে দয়াময়,
কেন সর্ব্বদায়,
বিধি বলে দুষিবে তাই ॥

(গ)

গেল নারে মনের ভ্রান্ত
পেলেম না সে ভাবে অন্ত
কয় মূঢ় লালন,
ভবে এসে মন,
কি করিতে ওরে কি করে যাই ॥

সামান্য জ্ঞানে কি মন তুই পারবিরে
বিষ জুদা করিয়ে সুধা রসিকজনা পান করে ॥
কতজন সুধার আশায়,
ফণীর মুখে হাত দিতে যায়
বিষের আতস লেগে গায়,
শেষে তার মরণদশা হয় রে ॥
মন তুমি কি ইহাই ভাব,
সুধা খেয়ে অমর হব,
পার যদি ভালই ভাল,
তাই লালন ফকির কয় রে ॥

জানি মোর প্রেমের প্রেমিক কাজে পেলে
পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব থাক্‌তে কি তায় রসিক বলে।
মদন জ্বালায় ছিন্নভিন্ন,
প্রেম, প্রেম বলে জাঁক লাগানো,
ঐহিক দ্বারে রসিক মান্য
"খুক্‌শী" জারি প্রেম টাকলালে ॥
প্রেমের প্রেমিক রসিকজনা,
'শোষায়' শোষে বাণ ছাড়ে না,
সেই প্রেমের সন্ধি জানা,
যে জন বাঁচাতে পারে মরিলে ॥
তিন রতি রস সাধ্‌লেন হরি,
শ্যামাঙ্গ, গৌরাঙ্গ তারই,
ফকির লালন বলে বিনয় করি,
সে প্রেমেতে রসিক খেলে ॥

---

* এই গান কয়েকটী নদীয়া জিলার সন্ধা গ্রামনিবাসী বন্ধুবর মৌলবী আহ্‌মদ হোসেন সাহেবের সাহায্যে সংগৃহীত।—সংগ্রাহক।

নর্ম্মদার দেশে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু বি-এ

শরতের ঝলমল-কিরণোজ্জ্বল উষায় শিশুপালের রাজ্যে সেই প্রথম পদার্পণ করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ না কি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জব্বলপুর অতীতের সেই মহাভারত-প্রখ্যাত চেদীরাজ্য। যাহা হউক, অতীত যুগের চেদীরাজ্যের কীর্ত্তিকাহিনী যতই বিপুল-প্রসারিণী হউক না কেন—অধুনাতন জব্বলপুরও গরিমা, সম্পদে বা শ্রীসৌভাগ্যে কিছু কম নয়। জব্বলপুর মধ্য প্রদেশের দ্বিতীয় সহর—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার এবং বেঙ্গল নাগপুর —এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ রেলওয়ের জংশন স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সুষমায়ও জব্বলপুর ভারতের অন্য কোন নগর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। অদূরে কলনাদিনী নর্ম্মদা দুই পারের তটভূমি সজাগ করিয়া প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে প্রবহমানা; সমগ্র নগরের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া গ্রেনাইট প্রস্তরের অতুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী;—তাহার কোনটি বা লতাগুল্মবিবর্জ্জিত কঙ্কর-ধূসর, কোনটি বা পত্রপল্লববিভূষিত শ্যামল-সুন্দর। সৌন্দর্য্যের সর্ব্ব অঙ্গ পূরণের জন্য সহরের মধ্যস্থলে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের পদচুম্বী একটি সুন্দর হ্রদও বিরাজমান।

যাক্ সে কথা—ট্রেণ হইতে ত নামিলাম; এখন যাই কোথা? এইখানে বলিয়া রাখি, আমরা পাঁচজন বন্ধু একত্র কলিকাতা হইতে আসিতেছি। আগে হইতে চিঠিপত্র



মান গেট কামান গাড়ীর কারখানা—জব্বলপুর

লিখিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি নাই; সুতরাং বলা বাহুল্য, স্থানীয় বন্ধুবান্ধবেরা কেহই আমাদের আগমন অপেক্ষায় ষ্টেশনে আসেন নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ আশুবাবু পরামর্শ দিলেন, "চল ধর্ম্মশালায় যাই।" বিপত্তিকালে বৃদ্ধের বচন অবশ্য গ্রহণীয় ভাবিয়া তদনুযায়ী কুলির মাথায় জিনিস-পত্র চাপাইয়া ধর্ম্মশালা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া গেল। ধর্ম্মশালা ষ্টেশনের নিকটেই—মাত্র ৪।৫ মিনিটের

পথ। এখানকার সুবিখ্যাত ধনী ও সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী রাজা গোকুলদাসের "জব্বলপুর ওয়াটার-ওয়ার্কস" নির্ম্মাণকল্পে মুক্তহস্তে দানের স্মারক চিহ্নস্বরূপ এই সুবৃহৎ অট্টালিকা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। তাই ইহার নাম রাজা গোকুল-দাস ধর্ম্মশালা। ইহার পরিচালনের ব্যবস্থাভার মিউনিসি-প্যালিটির হস্তে। ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ পুষ্পপ্রাঙ্গণে এই মহামনা মহাপুরুষের অমল-ধবল মর্ম্মরমূর্ত্তি অবলোকন করিলাম।

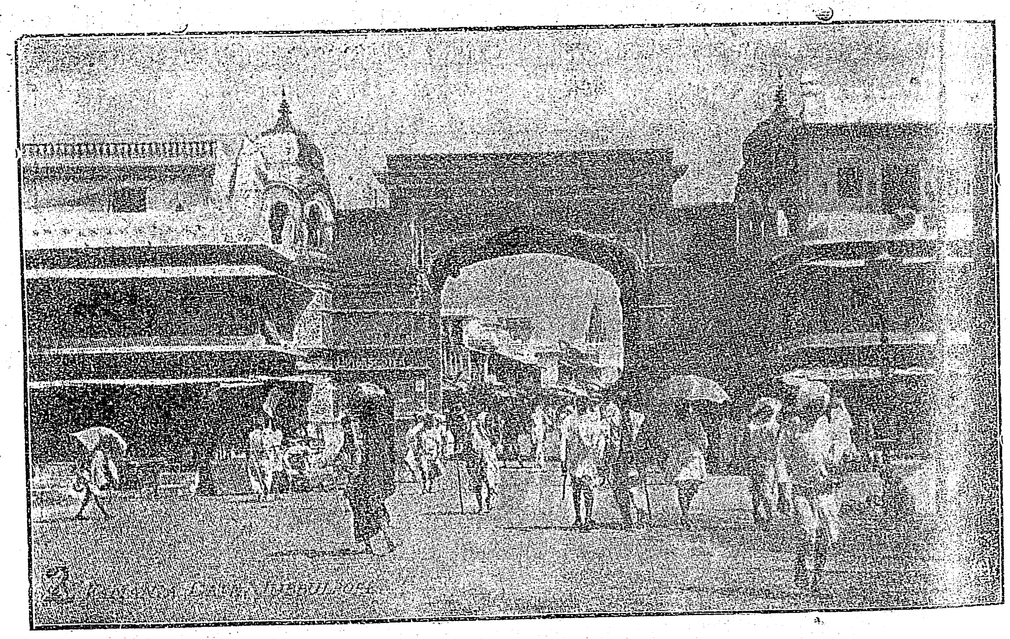

কামানিয়া গেট—জব্বলপুর

নিম্নে বারান্দার এক ধারে খাতাহস্তে ম্যানেজার সাহেব বিরাজ করিতেছিলেন। নাম, ধাম, পেশা ও জব্বলপুরে আসিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সেই খাতায় লিপিবদ্ধ করাইয়া দ্বিতলের একটি গৃহে কয়জনে আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। বাড়ীটিতে অনেকগুলি শয়নকক্ষ আছে। যে কোন ভারতীয় ভ্রমণকারীকে সাতদিন এই সকল কক্ষে বিনাভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হয়। সপরিবারে থাকিবারও সুন্দর বন্দোবস্ত আছে দেখিলাম। প্রত্যেক ভদ্রপরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা রান্নাঘর, স্নানের কল ও তৎসংলগ্ন একটি করিয়া চতুষ্পার্শ্বাবৃত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। এতদ্ব্যতীত দ্বিতলে কয়েকটি জলের কল ও পায়খানা রহিয়াছে। নিম্নস্থিত প্রাঙ্গণে একটি চায়ের ও একটি মিষ্টান্নের দোকান রহিয়াছে দেখিলাম। এই দোকান দুইটি ব্যতীত আর একটি হোটেলও রহিয়াছে,—যে সকল যাত্রী রন্ধনের কষ্ট সহ্য করিতে অপারগ, তাঁহারা এই হোটেলের আশ্রয় লইয়া থাকেন।

দোকান হইতে চা ও গরম গরম জিলাপী আনাইয়া সেবন করিয়া প্রাণটা কিছু ধাতস্থ হইলে, স্নান ও ক্ষৌর-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। এদিকে হোটেলেও পাঁচ জনের উপযোগী ভাতের জন্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যথাসময়ে খাইবার ডাক আসিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের নমুনা যা দেখিলাম, তাহাতে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও জব্বলপুরে থাকিবার বাসনা রহিল না। আহারের উপকরণ কঙ্কর-সঙ্কুল, জবাকুসুম-সঙ্কাশ-বর্ণ অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুল, খোসা-সংযুক্ত মসীবিনিন্দিত-কান্তি জলবৎ তরল কলায়ের ডাল এবং লবণ-পরিশূন্য অথচ লঙ্কা-পরিপূর্ণ আলুর ব্যঞ্জন। সর্ব্বশেষে কিঞ্চিৎ বহু পুরাতন তিন্তিড়ী বিতরণ করিয়া হোটেলের অধিপতি মহাশয় অম্লমধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন। তিন্তিড়ীর উপরিভাগস্থ শ্বেতবর্ণ আবরণ দর্শনে বন্ধুবর

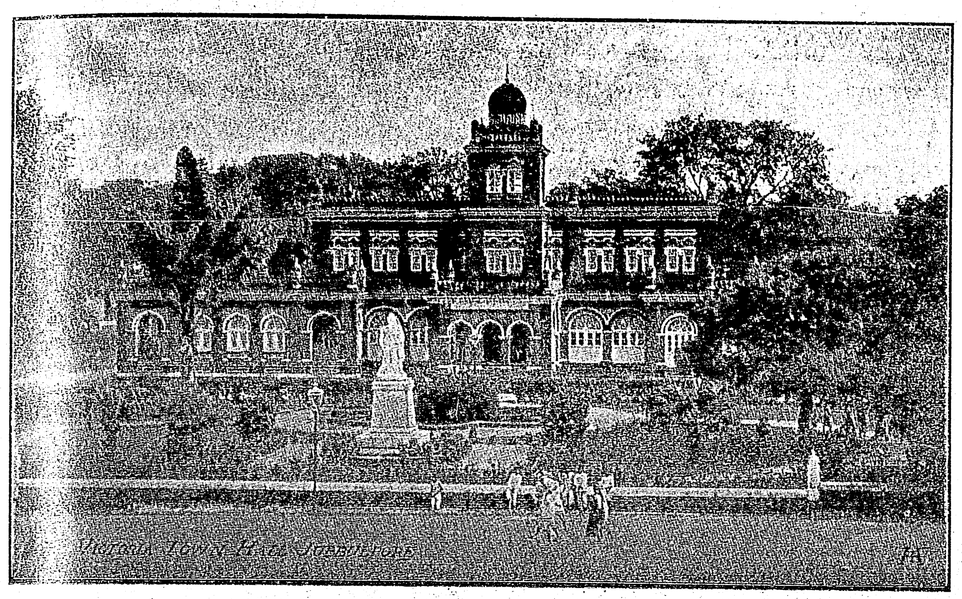

ভিক্টোরিয়া টাউন হল—জব্বলপুর

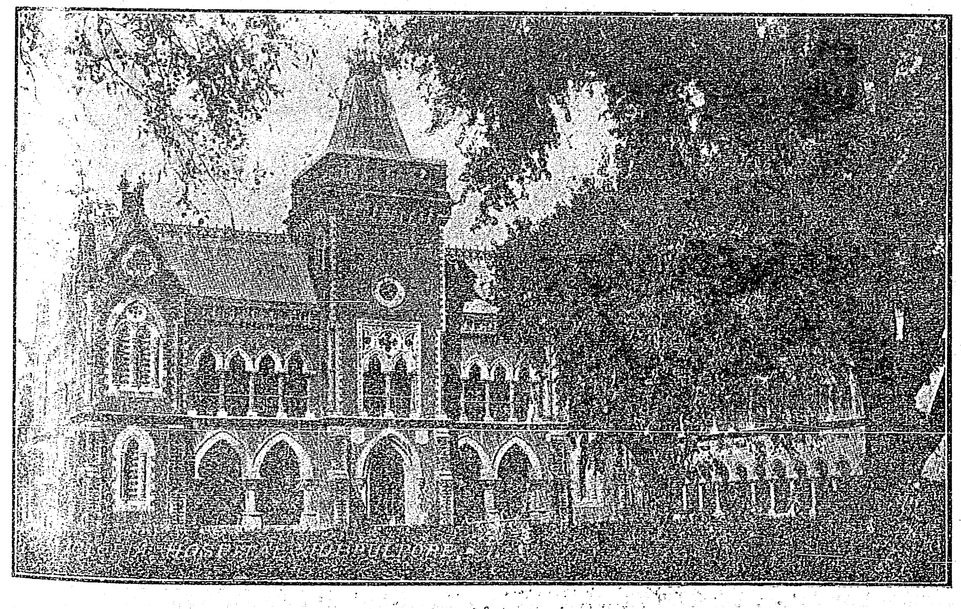

ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল—জব্বলপুর

বনবিহারীবাবু সভয় অন্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন,—"তেঁতুল এত পুরাতন যে ইহা ভারতবর্ষের যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়ীভূত হইতে পারে।" যদিও এই হোটেলটি মধ্যপ্রদেশের আচারপূত নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, তবু আমাদের আহারে আমিষের সংস্রব যে একেবারেই ছিল না, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। কেননা সুহৃদ্বর অনাথের পাত্রোপরি সযত্নে রক্ষিত সেই তিন্তিড়ীখণ্ডের মধ্যে দুইটি নাতিদীর্ঘ শ্বেতবর্ণ কীট দর্শন করিয়াছিলাম। ভোজনের এমন সুন্দর ও সুপ্রচুর আয়োজন দর্শনে আমরা ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। রাঢ়দেশবাসী নারায়ণচন্দ্র কিন্তু হটিলেন না,—একে কলায়ের ডাল তদুপরি তেঁতুলের টক,—সোনায় সোহাগা আর কি? অর্দ্ধসের তণ্ডুল স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। বাস্তবিকই যে রেটে গ্রাসের পর গ্রাস তাঁহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছিল, তাহা হোটেল-স্বামীর পক্ষে ত বটেই, এমন কি আমাদের পক্ষেও বিভীষিকাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বিদেশে না বিপদে পড়িতে হয়। জব্বলপুরের জলবায়ুর গুণেই হউক কিম্বা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই হউক, বন্ধুবরের জঠরাগ্নি সেই অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুলরাশি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পরিপাক করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বেলা প্রায় দশটার সময়ে Gun carriage Factoryর অভিমুখে চলিলাম। সহর দিয়া যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরিতে হয় বলিয়া পথ সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আমরা রেল লাইন ধরিয়া চলিলাম। বামে বার্ণ কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ টালির কারখানা দৃষ্ট হইল। কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত রাণীগঞ্জের টালি অপেক্ষা এই টালি অনেক বেশী মজবুত ও দেখিতেও সুন্দর। এখানকার মাটির ও বিশেষত্ব

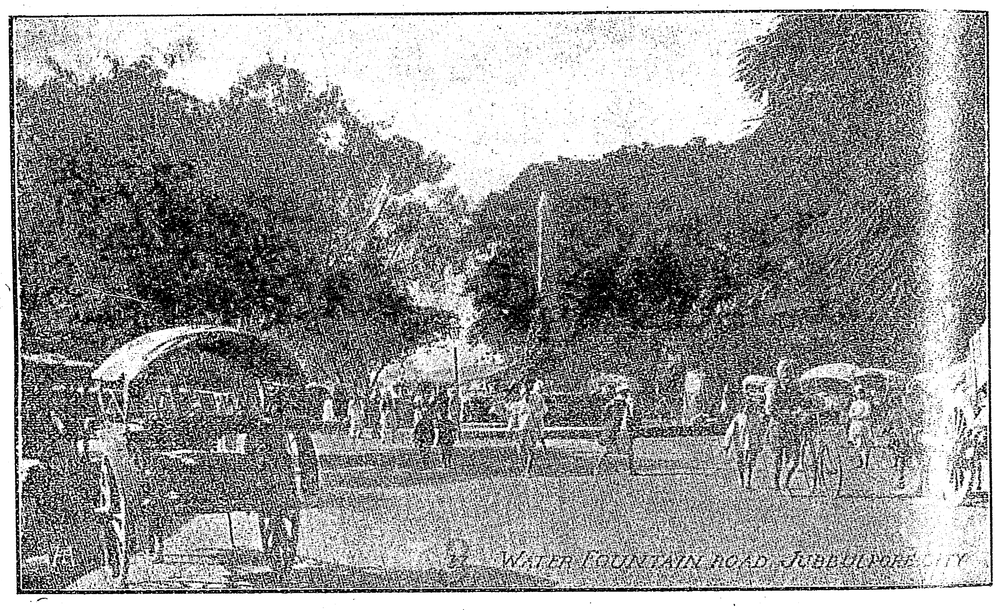

ওয়াটার ফাউনটেন রোড—জব্বলপুর

আবিষ্কার করিয়া ইঁহারা এ প্রদেশে এক প্রকাণ্ড কারখানা বসাইয়াছেন। এই টালি ব্যতীত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র এখানে প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কারখানাটি সুবিস্তৃত। ইহার সীমার ভাগে কারখানার কর্ম্মচারীদের এবং কিছুদূরে কুলী-মজুরদের থাকিবার স্থান। মাঝে মাঝে চূণের পাহাড় দেখিলাম। সেই পাহাড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জল জমিয়া চূণ ও মাটির সংমিশ্রণে গগন নিলীম বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর।

Gun Carriage Factoryতে যখন পৌঁছিলাম, তখন

বেলা প্রায় ১১টা। এই ফ্যাক্টরী ১৯০৪ অব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানে Gun Carrigeএর যাবতীয় উপাঙ্গনিচয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রায় তিন সহস্র লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ফ্যাক্টরীর সম্মুখস্থিত তোরণোপরি প্রকাণ্ড ক্লক টাওয়ার বিরাজমান। তাহারই ঠিক নীচে দিয়া যাতায়াতের দুইটি পথ বিদ্যমান। প্রবেশ-তোরণের একটি আলোক-চিত্র এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। ফ্যাক্টরীর চতুষ্পার্শ্বে চারিটি পাহাড়ের চূড়ায় চারিটি গড় দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহাই Factory defence ;—বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিমানচারী

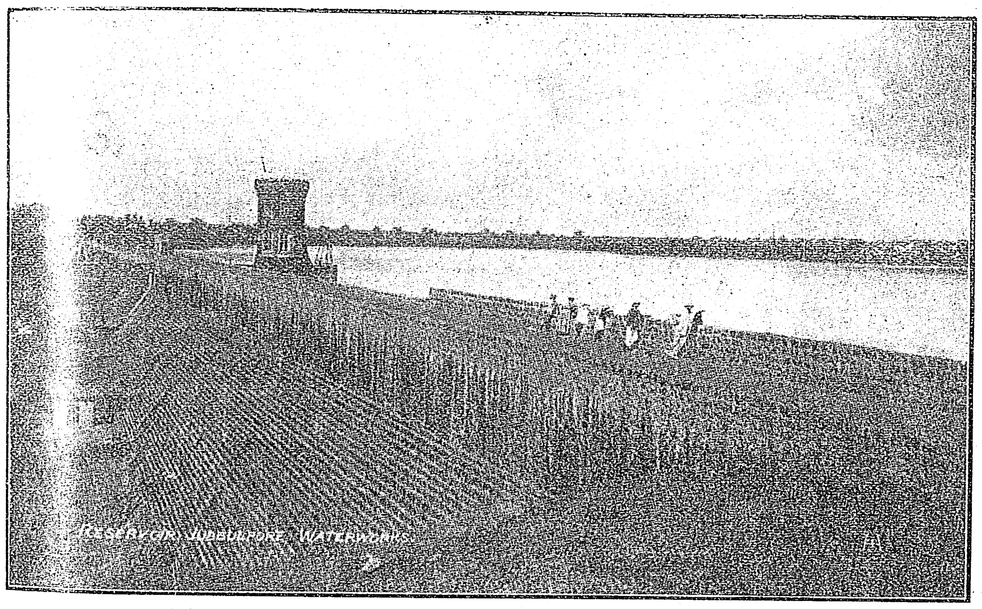

জলাধার—জব্বলপুর

আক্রমণকারীর প্রতিরোধকল্পে নির্ম্মিত। যুদ্ধের সময় ওখানে কামান প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সদাসর্ব্বদা সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি পরিচিত সুহৃদের সাক্ষাৎ পাইলাম,—ইঁহারা জব্বলপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী। ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছি জানিয়া সকলেই ত রাগিয়া আগুন। ইঁহারা সকলেই ফ্যাক্টরী কোয়াটারে থাকেন; সুতরাং আমাদের সকলকেই সেখানে লইয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। ফ্যাক্টরী কো-অপরাটিভের ম্যানেজার সমিতিঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাদিগকে এক রকম জোর করিয়া তাঁহার বাসায় টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার প্রতিবাসী শান্তিবাবু ধর্ম্মশালা হইতে আমাদের জিনিসপত্র আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ টোঙ্গা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমরাও গত্যন্তর না দেখিয়া "কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ী জাত দিতে" স্বীকৃত হইলাম। দলের নেতা বনবিহারী বাবু ত আগেই একটি খাটিয়া অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন; ভাবটা—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।" আলাপে প্রলাপে হাস্য পরিহাসে জব্বলপুরে প্রথম রাত্রি বেশ ভালভাবেই কাটিল।

পরদিন অপরাহ্নে কয়েকখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া সদলবলে সহর দর্শনে চলিলাম। জব্বলপুরে দর্শনযোগ্য দৃশ্য অনেক আছে। তন্মধ্যে যে কয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ কয়েকখানি আলোকচিত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। প্রথম, "কামিনিয়া ফটক"। এই তোরণ দ্বারের সহিত ভারত ইতিহাসের অনেক অতীত-সুরভি-স্মৃতি বিজড়িত আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৯ অব্দে নাগপুর এবং সাগর রাস্তা রক্ষার জন্য

মারাঠাগণ কর্ত্তৃক এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৮১৭ অব্দে নাগপুর-রাজ ভোঁসলা পেশওয়া ও হোলকারের সহযোগে ইংরাজ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টিত হওয়ায়, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস-প্রেরিত সৈন্য কর্ত্তৃক সিতাবালদী সমরে পরাজিত হইয়া এই দুর্গের অধিকারচ্যুত হন। এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে ৪র্থ মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮ অব্দ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদবধি জব্বলপুর ব্রিটীশরাজের শাসনাধীন। কামিনিয়া

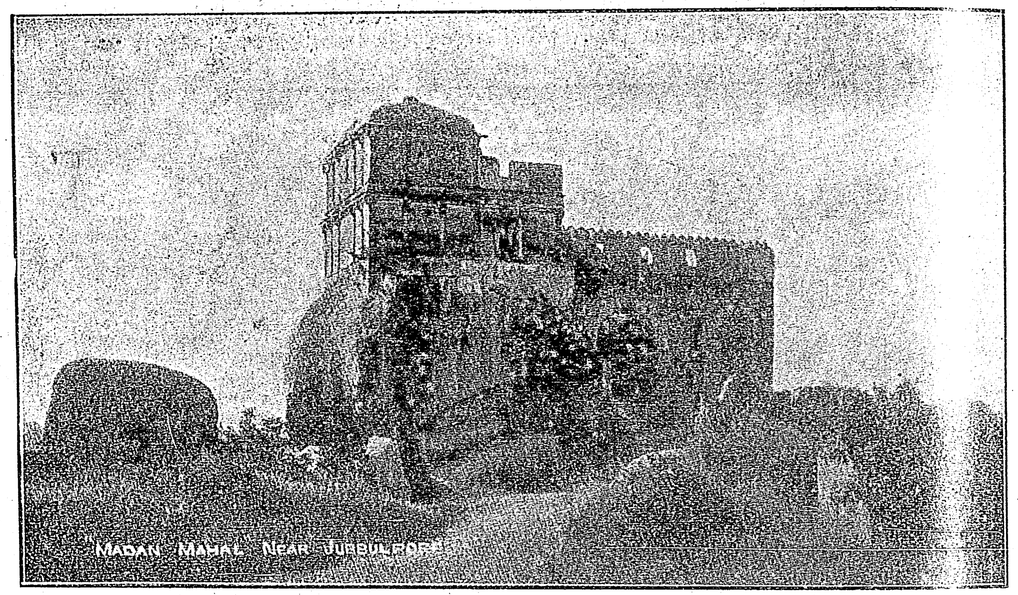
MADAN MAHAL NEAR JUBBULPORE

মদনমহল—জব্বলপুরের নিকট

ফটক সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গের ভগ্নাবশেষরূপে আজও বিরাজমান।

তাহার পরের দৃশ্য,—কামিনিয়া রোডের বিখ্যাত কৃত্রিম উৎস (Water Fountion)। ১৮৮৩ অব্দে জব্বলপুরে সর্ব্বপ্রথম জলের কল স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই কৃত্রিম উৎস নির্ম্মিত হয়। তাই ইহাকে water works memorial বলা হইয়া থাকে। লর্ডগঞ্জ নামক ওয়ার্ডে ঠিক চৌরাস্তার উপরেই ইহা অবস্থিত।

তৃতীয় দৃশ্য,—ভিক্টোরিয়া টাউনহল। ইহা জব্বলপুরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ ধনী রাজা গোকুলদাসের আর একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব উপলক্ষে তিনি এই সুবৃহৎ টাউনহলটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা এক্ষণে মিউনিসিপ্যাল কমিটির হস্তে ন্যস্ত। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, এখানে একটি কাঁচের কারখানা আছে। কিন্তু সেটি দেখিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।

চতুর্থ দৃশ্য,—ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল। এই সুন্দর সৌধটি ১৮৭৬ অব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর রোগীর থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে। এই হাসপাতালের সংলগ্ন একটি দাতব্য চিকিৎসালয় রাখা হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ইহার আবশ্যক খরচের জন্য প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন।

নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছি, ইতিমধ্যে কখন যে রজনী দেবীর আগমন হইয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। আর বেশীক্ষণ বাহিরে থাকা চলিবে না ভাবিয়া, হাস্য-কলরবে রাজপথ মুখরিত করিতে করিতে ফ্যাটনী কোয়াটারে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন বৈকালে জব্বলপুরের সুবিখ্যাত রিজার্ভায়ার (Resevoir) দেখিবার পালা। এই রিজার্ভায়ার, শুধু জব্বলপুরের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি দর্শনীয়

সামগ্রী। ইহার আয়তনও যেমন সুবিস্তৃত, নির্ম্মাণ-কৌশলও তেমনি অনন্যসাধারণ। Jabeulpur Sarvesir নামক চিত্র-পুস্তিকা হইতে এই রিজার্ভায়ারের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The resrvoir is formed by a high masonry dam across the Khaudari nane, about 7 miles from the city. * * * The total length of the dam is 1718 feet, greatest height 69 feet, length of weir 300 ft. Capacity from low level to weir 145 million cubic feet."

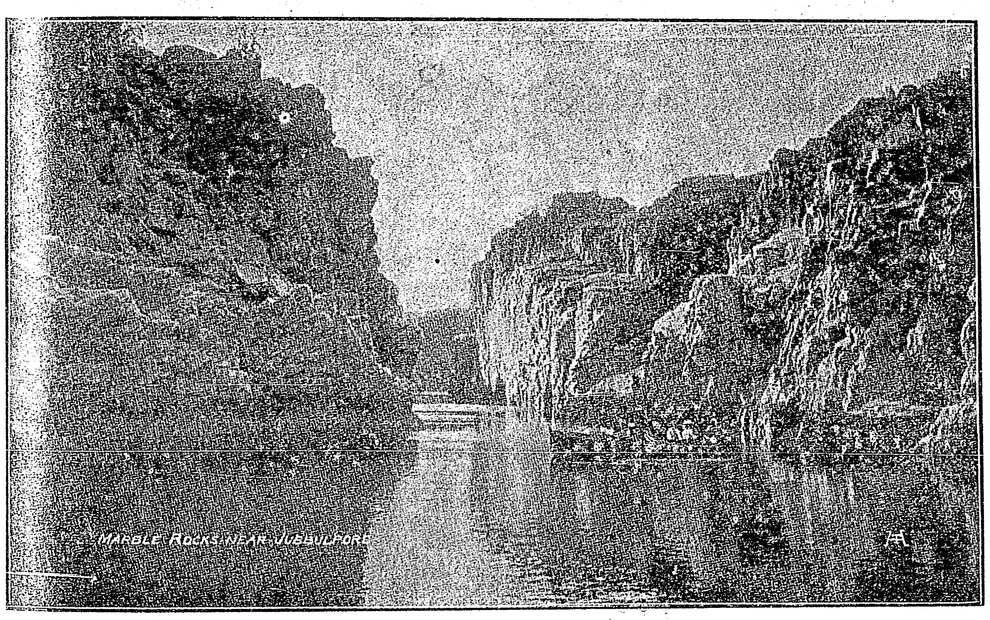
MARBLE ROCKS NEAR JUBBULPORE

মার্ব্বেল পাহাড়—জব্বলপুরের নিকট

এখানকার প্রসিদ্ধ প্রবাসী-বাঙ্গালী দেবেন বাবুর যত্নে একটি মোটর সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাতেই আরোহণ করিয়া আমরা কয়জন ওয়াটার ওয়ার্কস (Water works) দর্শনে চলিলাম। যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। মেঘে মেঘে সিন্দুরধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। রিজার্ভায়ারের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা কুঙ্কুমরাগলিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বচ্ছ নির্ম্মল নীরে সেই রক্তিমচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া তরল সোণার মত দেখাইতেছিল। ঊর্দ্ধে দিগন্ত-বিস্তৃত অনাহত গগনে সপ্ত রঙ্গের নয়ন-মনোহর মেলা, নিম্নে সোণালী রঙ্গীন লহরীমালায় মনোমুগ্ধকর খেলা। প্রকৃতিদেবী যেন আপন সৌন্দর্য্য-সুষমায় আপনি হরষ-বিহ্বলা। দেখিতে দেখিতে মন প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। বন্ধুবর নারায়ণচন্দ্র স্বভাব-সুন্দর মিষ্ট কণ্ঠে গান ধরিলেন

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার প্রাণের কামনা
মম শূন্য গগন-বিহারী,
আমি আপন মনের মাধুরী বিছায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি, তুমি আমারি।

রিজার্ভায়ারের গর্ভে নৌকায় বেড়াইবার বন্দোবস্ত আছে। কেহ কেহ তাহার প্রস্তাবও করিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব ভোটে টিকিল না।

ওয়াটার ওয়ার্কস দেখা হইলে Robertson College দেখিতে গেলাম। মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন Chief Commissioner Sir Benjamine Robertsonএর নামে এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এ অঞ্চলের ইহাই একমাত্র কলেজ। একটি নয়ন-রঞ্জন হ্রদের তীরে এই কলেজটি

অবস্থিত। ছাত্রাবাস ও Play Ground দুই-ই কলেজ-সংলগ্ন। এখানে একটি বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহার নাম মিঃ বক্সী। তিনি Imperial Educationel Serviceএর অন্তর্গত একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলাম। মিঃ বক্সী যেমন অমায়িক, তেমনি অতিথিবৎসল। মিষ্ট ভাষা ও বিনয় যেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিতৃপ্ত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন রবিবার। মার্ব্বেল-রক দেখিবার প্রোগ্রাম

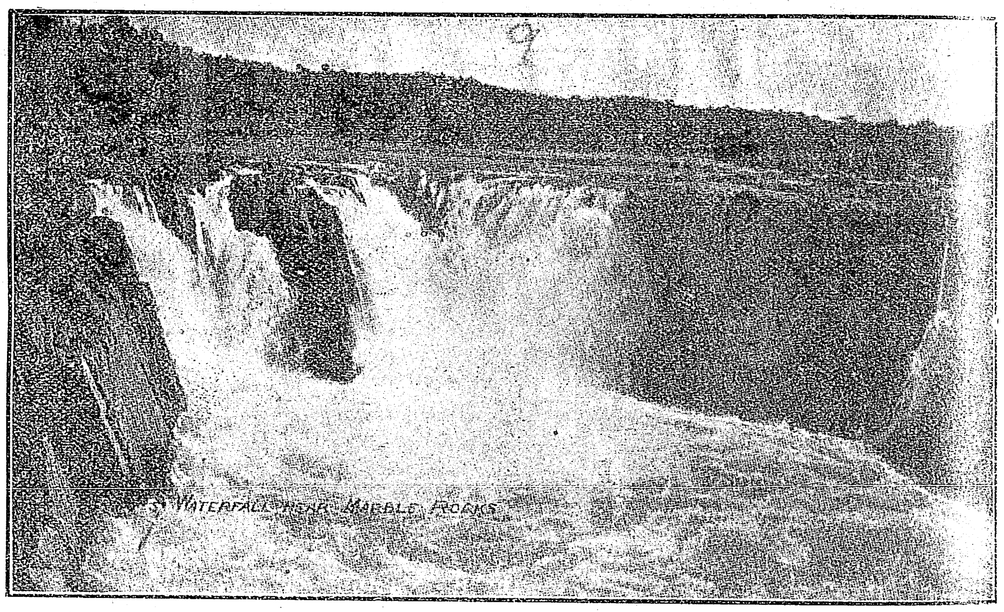

জলপ্রপাত (মার্ব্বেল পাহাড়ের নিকট)—জব্বলপুর

দুইখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া আমরা ছয় জনে রওয়ানা হইলাম। একটি টোঙ্গায় কলিকাতা হইতে নবাগত Factory Accounts Audit Offcer রায়সাহেব জানকীপ্রসাদ দত্ত, তাঁহার পার্শ্বন্যাল এসিষ্টেণ্ট মিঃ মুখার্জ্জী এবং স্থানীয় ফ্যাক্টরীর একাউণ্টেণ্ট গোলাম রসুল সাহেব; আর অন্যটীতে আমরা তিনটী সহযাত্রী সুহৃদ,—বনবিহারী বাবু, অনাথবাবু ও আমি। দশটার সময় টোঙ্গা ছাড়িল। এখান হইতে মার্ব্বেল রক প্রায় ১৬ মাইল দুর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বামে ছোট সিমলা পাহাড়ের অনতিউচ্চ শিখর দৃষ্ট হইল। প্রাণীবিদ্যার আবিষ্কারের সহিত এই পাহাড়ের একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। বিগত ১৯১৯ সালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ ম্যাটানী Gun Carriage Factoryর হিসাব পরীক্ষা করিতে আসিয়া এই পাহাড়ের গর্ভ হইতে একটি বৃহৎ ম্যামথের অস্থিকঙ্কাল আবিষ্কার করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই নিদর্শন পণ্ডিতপ্রবর ম্যাটানী সাহেবের অনুসন্ধিৎসার সাক্ষী রূপে কলিকাতার যাদুঘরে বিরাজমান। শুনিয়াছিলাম এই আবিষ্কার-প্রসঙ্গে অডিটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিদধিককাল জব্বলপুরে অতিবাহিত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার বৈদেশিক তলব করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও না কি এই মনস্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমে নাই! ইনি আমাদের এক ডিপার্টমেণ্টের লোক বলিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম।

দেখিতে দেখিতে টোঙ্গা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ ময়দানে অসংখ্য জনসমাগম দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহাই এতদঞ্চল-প্রসিদ্ধ গ্রান্থির হাট। প্রতি রবিবার এখানে হাট বসে এবং চারিধারের ১০।১৫ মাইলের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের ক্রয়বিক্রয়ের ইহাই একমাত্র

হাট। হাটে শশা ও জালানীকাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন পণ্য দ্রব্য বড় বেশী দেখিলাম না। Central bank Robertson Muslim High School, George Town High School প্রভৃতির পার্শ্ব দিয়া গাড়ী ধীর-মন্থর গতিতে চলিল। ক্রমে বসতিবিরল সহর সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়া গাড়ী তিলওয়ার ঘাটের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এখান হইতে মর্ম্মর পাহাড় আট মাইল দুর।

পথের দুইধারে দৃশ্যবৈচিত্র্য বড় দেখা যাইতেছিল না। কেবলি ঊষর-ধূসর মাঠ;—ক্বচিৎ কোথাও স্নিগ্ধ-শ্যামল ভূখণ্ডক্ষেত্র। শস্যপুষ্প-বিভূষিতা বঙ্গজননীর সেই মনোরম শোভা এ অঞ্চলে বড় দেখা যায় না। সহরের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে গরহা গ্রামের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সুপ্রসিদ্ধ Poised rock দর্শন করিলাম। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে কোন একটি মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম; দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ শৈলখণ্ড প্রায় নিরালম্বভাবে একটি পাহাড়ের উপর বিরাজমান। শুনিলাম একবার হস্তী সাহায্যে পাথরটিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

তাহারই কিয়দ্দূরে দৃষ্ট হইল "মদনমহল"। একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত এক সুপ্রাচীন ইমারত। এই ইমারত ১১০০অব্দে সেনাপতি মদনসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, ইহা পরে ইতিহাস-প্রখ্যাতা রাণী দুর্গাবতী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক নহি,—কাজে কাজেই এই প্রবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলাম। আশা করি, কোন ঐতিহাসিক "ভারতবর্ষের" মারফৎ এ সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তারিত অভিমত জানাইয়া আমার অনুগৃহীত করিবেন।

শেষ

শ্রীচারুলতা রায়

ওগো, খেয়া-ঘাটের মাঝি!
বুঝি, পরপারে পাড়ি দিতে
সময় হল আজি!
তাই, দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
নাম্‌ছে আমার চোখের পাশে,
সাঁঝের সুরে মরম-তারে
মরণ ওঠে বাজি!
ওগো খেয়া তরীর মাঝি!

জীবন যখন হল সুরু
তোমায় পেনু দেখা,
যাত্রা-শেষে পুনর্ম্মিলন
ভাগ্যে ছিল লেখা।—
সাঁঝের আলো ভাঙ্গা হাটে,
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
বিদায় সুরে মরণ-বীণা
উঠ্‌বে যবে বাজি!
ওগো, জন্ম-তরীর মাঝি!
বুঝি, এম্‌নি করে সাঁঝ সকালের
কাটাও দিবস্ রাজি!

সহযোগ

শ্রীসরসীবালা বসু

এক

রাত্রি আটটা বাজে—এলাহাবাদের বাদশাহীমণ্ডির একটি গলির চোর কুঠ্‌রীর মত বাড়ীর একটি ঘরে বসিয়া একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী কোলের মেয়েকে নানা ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি কিছুতেই ঘুমাইতেছে না। সেই যে বৈকাল হইতে সে একটানা নাকি সুরে কান্না ধরিয়াছে, তার জের যেন আর কিছুতেই মিটিতে চাহে না। গলির ওধারের দোতালা বড় বাড়ীর একটি ঘরে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। তরুণী চমকিয়া উঠিয়া, মেয়ের কাণে পিঠে দ্রুত চাপড়াইতে সুরু করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঘুমো না হতভাগী,কখন আজ রান্না চড়াব?" শিশু যদি বা মা'র কণ্ঠের ঘুমের ছড়া শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে কান্নার সুর পঞ্চম হইতে খাদে নামাইয়া আনিতেছিল, এখন তিরস্কারের আভাষে সে আবার প্রাণপণে সে সুর সপ্তমে চড়াইল। এই সময় দোতালা বাড়ীর সামনের ঘরটির জানালায় একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে কোলে লইয়া একটি বধূ আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"রাণুর মা, রাণুকে বুঝি কিছুতেই ঘুম পাড়াতে পারলে না?"

অসহিষ্ণু ভাবে তরুণী কহিল—"না দিদি, সেই যে বিকেল থেকে কান্না জুড়েচে, তা আর হতভাগা মেয়ের কিছুতেই থাম্‌চে না। এখনো রান্না চাপাতে পারি নি, অদৃষ্টে আমার দুর্গতি আছে।"

বধূটি মমতাভরা কণ্ঠে কহিল—"মেয়ের বোধ হয় অসুখ করেচে; নইলে এত কাঁদে না ত। ওকে বোকো না ভাই, আদর কোরে ঘুম পাড়াও। ছেলের অসুখ, তা তুমি কাজ করবে কি করে। না হয় নাই রাঁধলে,—বাজার থেকে কিনে আনিয়ে খাবে।"

বধূর উপদেশ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "খুকী" বলিতে বলিতে সুধীর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ওদিকের জানালা হইতে চকিতে বধূটি সরিয়া গেল; কিন্তু এ ঘরের কথা-বার্ত্তাগুলা শুনিবার জন্য কাণ দুটি তার উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তাই দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেলেও সে একেবারে চলিয়া গেল না।

তরুণীর নাম শ্যামা, সুধীর ঘরে ঢুকিয়াই জামাটা খুলিয়া আল্‌নায় ছুঁড়িয়া দিয়া তক্তাপোষে বসিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে কহিল, "খুকী এখনো ঘুমোয় নি? তবে আমার কোলে দিয়ে শীগ্‌গির খাবার দাও,—খেয়েই আমায় বেরুতে হ'বে।"

শ্যামা কহিল—"একটু দেরী হবে, খুকী বিকেল থেকে কেবলি কাঁদ্‌চে, রাঁধতে পারি নি।"

সুধীর মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল—"খবর শুনিয়ে কেতাথ করলে আর কি! নটায় বায়স্কোপ হবে, দেখতে যাব কথা দিয়ে এলুম, উনি এখনো রান্না করে রাখেন নি। ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো!"

তার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"রাঁধতে হবে না। আমি এক টাকার মাংস রুটি কিনে বাজারেই খেয়ে নেবো। তোমার হাতের ফুমড়োর ঘাঁট আর শুক্নো রুটি খেয়ে অরুচি ধরেচে।"

শ্যামা কহিল—"সে ত আমার দোষ নয়! আমায় যে দিন যা এনে দাও তাই রাঁধি।"

সুধীর কহিল—"তা আমার টাকায় না কুলুলে আনব কোত্থেকে? একলা ছিলাম, ফুর্ত্তির প্রাণ যা চেয়েচে তাই করেচি! মাসী মাগী তোমায় ঘাড়ে চাপিয়েই না সর্ব্বনাশ করেচে! জন্মে তো একদিন খোঁজ নেয় না।"

স্বামীর এ সব টীকা-মন্তব্য বেচারী শ্যামার তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। উত্তর দিয়া কথা-কাটাকাটি করিতে সে অভ্যস্ত ছিল না, আজও কোনো উত্তর দিল না। খুকী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। সুধীর

তখন উঠানে কলতলায় দাঁড়াইয়া গা হাত ধুইতেছে। শ্যামা সাহস করিয়া কহিল—"মাইনে পেয়েচ বোধ হয়?"

সুধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "হুঁ।"

শ্যামা কহিল—"খুকীর জন্যে দুটো জামা কিনে দিও।"

সুধীর কহিল—"এ মাসে হবে না; কুড়ি টাকা দেনা আছে, সেটা শোধ করতে হ'বে। ভারী আমার মেয়ে, তার আবার তিন সন্ধ্যে জামা, জুতো। তবু যদি মার মতন কালিন্দী না হয়ে সুন্দরী হোতো।"

শ্যামার সাহস হইল না যে বলে, চামড়া কটা ও কালোর জন্য সন্তানের প্রতি বাপ-মার ভালবাসার তারতম্য হওয়া হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। আজই জগতে শ্যামাকে স্নেহ যত্ন করিতে কেহ নাই,—শৈশবে সে এমন দুর্ভাগিনী ছিল না। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও পিতা মাতা তাঁহাদের এই কালো মেয়েটিকে হৃদয়ের অনাবিল স্নেহ-সুধা ঢালিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাহার দুটি ভাইএর সহিত সমান আদরেই সে বাপ-মার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। স্নেহ-ভালবাসার প্রাচুর্য্য সাংসারিক অভাব-অনাটনকে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকা দিয়াছিল। তার পর হঠাৎ সে কি দুর্দ্দৈব! প্লেগে দুটি ভাই মারা গেল, শোকে মা মারা গেলেন। কিছু দিন পরে বাবাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মাসী তখন আদর করিয়া শ্যামাকে আশ্রয় দিলেন। সুধীরের কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে সে এলাহাবাদে চাকুরী করিতে আসিয়াছিল, এবং বুদ্ধি ও কর্ম্ম-দক্ষতার গুণে চাকুরীও ভাল পাইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই অসৎসঙ্গে তার চরিত্রদোষ ঘটে। মাসী ইহা জানিয়াও বড় গ্রাহ্য করেন নাই। বয়স্থা শ্যামাকে আর ঘরে রাখা চলে না; অথচ মুখ-চোখ সুন্দর হইলেও, কালো রঙের জন্য তার বিবাহ হইতেছে না; বিশেষ আবার যৌতুকের অভাব। এ অবস্থায় জোগাড়-যন্ত্র করিয়া সুধীরের সহিত তিনি শ্যামার বিবাহ ঘটাইলেন। অতঃপর বয়স্থা বধূর পাহারায় সুধীর যে শীঘ্রই সচ্চরিত্র হইয়া উঠিবে, এই বিশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষের চরিত্রদোষ,—সুরাপান, ব্যভিচার—এ কি আর ধর্ত্তব্যের মধ্যে? বিশেষ আবার প্রথম যৌবনে।

সুধীরের চারিপাশে অনেকগুলি মোসাহেব জুটিয়াছিল। খানেক টাকা ছিল তার মাহিনা। এত দিন না ছিল তার পোষ্য, না ছিল কেহ তাগিদ্‌দার (অবশ্য পেটের তাগাদা ছাড়া)। সুতরাং মোসাহেবের দল তার সঞ্চয়ের যাহা কিছু মধু সবটুকু নিঃশেষে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। সুধীরের বিবাহের সময়ও সকলে সুধীরের পয়সায় খুব ফুর্ত্তি করিল। ইংরাজী বাঙলায় পদ্য বা ছড়া লিখিয়া সুধীরকে প্রীতি-উপহার দিল। আর বারবার করিয়া এ কথাটাও আবৃত্তি করিল—"আর এই শেষ দাদা! এর পর বৌ ঠাক্‌রুণের রাঙা পায়ে জন্মের মত দাসখত লিখে দেবে।" সুধীর পুরুষবাচ্ছা,—সে সগর্জ্জনে প্রতিবাদ করিল, "কক্ষনো না, কক্ষনো না, দেখে নিও তোমরা, দাসখত আমি লিখব না, বরং লিখিয়ে নেবো। আমি মরদ, মেয়ে নই।" তার পর তার বিবাহিত জীবনের কথা। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সত্যই সে মাথা উঁচু করিয়া চলে। সে যে স্ত্রীর "ভেড়ুয়া" নয়, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, মাহিনা পাইলেই সেই দিনই সে বন্ধুদের লইয়া জুয়া খেলিতে যায়, বা শুঁড়ীর দোকানে দেনা দিয়া ও নূতন করিয়া ধার লিখাইয়া আসে। সময়ে সময়ে বাহিরেই রাত্রিযাপন করে। বন্ধুরা তখন তাহাকে 'বাহবা' দেয়, 'সাবাস্' বলে। এর পরে আর কি বলিবার আছে?

দুই

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বধূ নীলিমা জানালার কাছে আসিয়া চাপা গলায় ডাকিল—"রাণুর মা, অ—রাণুর মা, ঘুমুলে না কি?"

অন্ধকার ঘরে বিছানার উপর ঘুমন্ত মেয়েটির পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া শ্যামা বসিয়া ছিল; চমকিয়া উঠিয়া আসিয়া জানালার গরাদেয় হাত রাখিয়া সাড়া দিল—"না দিদি, যে গরম ঘরের ভিতর—শুয়ে চোখ বোজবার সাধ্যি কি, ছট্‌ফটিয়ে মরচি।"

নীলিমা কহিল,—"তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয় ভাই। একলাটি,—ঘরে দোসর কেউ নেই যে মুখ চাইবে। একলাটি বুঝি বাইরে শুতে পারলে না? তা ছেলেমানুষ, ভয় করে বৈ কি।" শ্যামা উত্তর দিল না, নিঃশ্বাস ফেলিল। নীলিমা আবার কহিল—"তিনি বুঝি বাইরে চলে গেলেন? আচ্ছা মানুষ তো! তুমি নেহাৎ ভালমানুষ, কিছু বল না, তাতেই বোধ হয় আরও তোমায় গ্রাহ্য করেন না।" হায় হায়,

দাসী যাইবে প্রভুকে বুঝাইতে? দিন রাত্রি যে মানুষ প্রতি কথায় প্রতি চরণক্ষেপে শক্তির অহঙ্কার, অর্থের গর্ব্ব প্রচার করিয়া স্ত্রীর ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট,—কোন্ স্পর্দ্ধায় বেচারী শ্যামা তাহার মুখের উপর গিয়া বলিবে যে "এ কাজ আমি ভালবাসি না, তুমি করিও না।"

এবারেও শ্যামার উত্তর না পাইয়া বধূ কহিল—"কিছু খেলে না, উপোস করে রইলে? কর্ত্তা তো বাজারে গিয়ে নানা জিনিষ খেয়ে পেট ভরাবেন। তুমি যদি ঘরে কিছু না খেয়ে উপোস করে থাক, নিজেই ঠকবে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া শ্যামা কহিল—"জিতেই বা কি লাভ দিদি, এ প্রাণ কি সহজে বেরুবে?"

"ওগো, এ দিকে এস" স্বামীর আহ্বান শুনিয়া চঞ্চল চরণে নীলিমা চলিয়া গেল। শ্যামা জলভরা চোখে আবার ঘুমন্ত রাণুর কাছে আসিয়া বসিল। অসহ্য জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে ঘরের বদ্ধ বাতাস যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। মাত্র অপরিসর দুটি জানালা—বাহিরের বাতাসের সাধ্য নাই তার মধ্য দিয়া অবাধে যাওয়া আসা করে। খোলা আঙিনায় মুক্ত বাতাস তখন দাবদগ্ধ ধরণীর গায়ে মৃদু বীজন সুরু করিয়াছে। মনের ভিতর যত জ্বালাই থাক্, আপাততঃ দেহের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শ্যামার লুব্ধ দৃষ্টি বার কয়েক আঙিনার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু একা একা বাহিরে শয়ন করিতে তার সাহসে কুলাইল না। সারা দিনের কর্ম্ম-শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া অভাগিনী তখন মেয়েটির পাশেই শুইয়া পড়িল। উদরে অন্ন নাই। যত্নাভাবে কেশ বেশ শ্রীহীন। পরিধানের সাড়ী-খানিও ছিন্ন। আর চক্ষে তার অশ্রুর ঝরণা। হায় নারী! ভাগ্য-বিধাতা পতি-দেবতা তার সেই সময় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া হোটেলে গিয়া চপ্ কাট্‌লেট্ প্রভৃতি মুখরোচক জিনিসগুলি লইয়া বৌতল দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত। শাস্ত্র, সমাজ, সকলের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র হাতে লইয়া অস্থান কুস্থান সর্ব্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। সে যেখানেই যাক্, যেস্থানেই বিচরণ করুক, অন্তঃপুরে নারী তার দুটি চক্ষে আরতির দীপশিখা জ্বালিয়া, সতী-মহিমায় মহিমান্বিতা হইয়া, একান্ত মন-প্রাণে তারই আশায় পথ চাহিয়া আছে। অবসর সময়ে দেখা দিয়া সে তাহার নারীজন্মকে সার্থক করিবে বৈ কি!

তিন

বেলা তখন চারটা। রাণুর শরীর কাল হইতে ভাল নাই। একটু জ্বরভাব হইয়াছে। কয়েক দিন অসহ্য গুমোটের পর আজ বেলা তিনটার সময় হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। রাণু কান্না ভুলিয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া তাহা দেখিতেছিল। সেই অবসরে শ্যামা তাহার অনেকগুলি কাজকর্ম্ম সারিয়া লইয়াছে। এইবার সে উনান ধরাইয়া রাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—বৃষ্টি থামিয়া গেল, রাণুও বায়না জুড়িয়া মার কোলে আশ্রয় লইল। শ্যামা অগত্যা মেয়েকে কোলে লইয়াই সাধ্যমত কাজ করিতে লাগিল।

রাত্রে সুধীর বাড়ী আসে নাই। সকালে উচ্ছৃঙ্খল বেশ-ভূষা লইয়া রক্ত চক্ষে যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন স্বামীর দিকে চাহিয়া শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কিন্তু যাক্ সে কথা, এ কিছু নূতন দৃশ্য নয়। তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে এ দৃশ্য তার কাছে দিনের পর দিন পুরানো পাঠের মতই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

স্নান করিয়া সুধীর খাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু আঁরা ভাত তরকারী অখাদ্য হইয়াছে বলিয়া এক গ্রাস মুখে দিয়াই ইতি করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। এ বেলা তাই শ্যামা ভয়ে ভয়ে রান্নার ব্যবস্থা করিতেছে, স্বামী-দেবতা এখন প্রসন্ন হইলে হয়। চারটা বাজিবার পরই সুধীর বাড়ী আসিল—হাতে একটি ছোট পুঁটুলী। রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল—"কি রাঁধ্‌চ এ-বেলা?" শ্যামা ভয়ে ভয়ে কহিল—"ডিমের তরকারী আর রুটি করচি।"

সুধীর কহিল—"আচ্ছা। আর দেখ, বেশ ভালো মাংস এনেছি, মাংস চাপিয়ে দাও। আর খানিকটা চপের মাংস এনেছি, খানকতক গরম গরম চপ ভেজে দাও,—গণেশ, বিমলেন্দু, শরৎ এখুনি আস্‌চে। তারা তোমার হাতের চপ-ভাজা খেয়ে খুব প্রশংসা করে।"

আদেশসহ সার্টিফিকেটের সংবাদেও শ্যামার মন বড় প্রসন্ন হইল না। সারারাত্রি অনিদ্রায় আর সমস্ত দিন রাণু শিশুর আব্দার সহিয়া শরীর তার বড় বেশী ক্লান্ত হইয়াছিল, এখনও মেয়েকে কোলে লইয়াই সে কাজ করিতেছে। রান্না শেষ হইলে সে তবু তাহাকে লইয়া একটু বসিয়া বিশ্রাম করিতে পায়। যাহা হউক, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সে মাংস রান্নার জোগাড় করিতে লাগিল। সুধীর

জামাজোড়া খুলিয়া, মুখ হাত ধুইয়া শ্যামার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খুকী কেমন আছে?"

শ্যামা কহিল—"ভারী কাঁদ্‌চে, কাজকর্ম্ম কিছু করতে দিচ্ছে না।" সুধীর খুকীর দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল—"আয় খুকী, আমরা বাইরে যাই।"

মেজাজ ভাল থাকিলে সুধীর খুকীকে লইয়া আদর যত্ন করিত। খুকীও বাবার কোলে থাকিতে ভালবাসিত। এখন সে হাত বাড়াইয়া বাবার কোলে গেল। সুধীরও তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। একটু পরেই প্রতিশ্রুত বন্ধুগণের শুভাগমন হইল। সুধীর অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—"এসেচ—আমি মনে কর্‌ছিলাম, ফাঁকী দিলে বুঝি।"

গণেশ কহিল—"ফাঁকী কি রকম? পাঁচটা টাকা দেয়েছি তা আর দেব না? এ শরৎ নই, যে, পরিবারেরই কথায় ওঠ বস্—আমি দাদা তোমারি ভাই।"

শরৎ কহিল—"তা আমিই বা কবে বাজী হেরে টাকা দিই নি বল। তবে বে-থা হয়ে দু পাঁচ টাকার বাজী রাখিও না, দিইও না। তোমাদের মত দেনদার হয়ে ফূর্ত্তি উড়াবার রাজা আমি নই। যা পয়সায় কুলোয় তাই কর্‌ব।"

গণেশ তাচ্ছিল্যভরে কহিল—"আরে যা যা, তোর যা মুরোদ, এক বচ্ছর বিয়ে করেই তা জানিয়েছিস্। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের নাকি কান্নাকে এত ভয়?"

শরৎ কিছু না হটিয়া কহিল—"আর তুমি বুঝি ভয় খাও না? মনে আছে সে-দিন সোণীয়া বাইজীর কান্না? চোখে একটু রুমাল তুলে দিয়েচে, আর তুমি তাকে তোমার আঙটিটা দিয়ে দিলে, মনে আছে কি? আমি না হয় ঘরের বউএর কান্নাকে ভয় পাই; আর তুমি?"

গণেশকে অপ্রস্তুত দেখিয়া বিমলেন্দু কহিল—"রাখ তোমাদের কচকচি, বের কর বোতল। সুধীর দা, তোমার গেলাস নিয়ে এস। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েচে। অনেক দিনের গুমোট গরমের পর এমন ঠাণ্ডা দিনটি—একে মাটি হতে দিও না বাবা।"

শরৎ কহিল—"আমি ভাই তোমাদের বোতল ছুঁচ্ছি না। খানকতক চপ আর খাবার টাবার যা দেবে খাব।"

গণেশ নাকি সুরে কহিল—"বউ বকবে বুঝি?"

শরৎ কহিল—"বকবে না তো কি পুজো করবে? কাল তোমাদের পাল্লায় পড়ে যে বকুনি খেয়েচি। মা কত গাল-মন্দ করেছেন। আজ সকালে সকালে বাড়ী ফির্‌ব।"

ইতিমধ্যে রাণু কান্না জুড়িয়া দিল। সুধীর তাহাকে শ্যামার কাছে দিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে আসিয়া, রান্নাঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, শ্যামা মাংস চাপাইয়া রুটি বেলিতেছে। মাকে দেখিয়াই রাণু বাবার কোল হইতে নামিয়া মার কোলে আশ্রয় লইল। শ্যামা বিরক্ত হইয়া মেয়েকে ঠেলা দিয়া কহিল—"তোকে কোলে নিয়ে আমি রুটি বেল্‌ব কি করে, সরে যা।"

খুকী মাতার আদেশ পালনে কিছুমাত্র অনুরাগ না দেখাইয়া, ভাল রকমে কোলটি জুড়িয়া বসিল। এদিকে সুধীর প্রশ্ন করিল—"চপের জোগাড় করেচ?"

নতমুখে শ্যামা কহিল—"কর্‌ব।"

সুধীর এ উত্তরে আদৌ সন্তুষ্ট হইল না। সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়, বন্ধুরা বোতল খুলিয়া গরম গরম চপ-ভাজার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ এভাবে বসাইয়া রাখা যায়? সে কহিল—"অন্ধকার হয়ে এলো যে, একটু চট্‌পট্ নাও না, ওরা আর কতক্ষণ বসে থাকবে।"

তার পর সে বন্ধুদের আশ্বস্ত করিবার জন্য আবার বাহিরের ঘরে গিয়া দেখা দিল। গণেশ বলিয়া উঠিল—"কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখ্‌বে দাদা? এর চাইতে তোমার হোটেলে গেলে যে ভাল ছিল।"

বিমলেন্দু কহিল—"সেখানে কিন্তু বউদিদির মতন ওস্তাদী হাতের সোয়াদ মিল্‌ত না।"

শরৎ কহিল—"ততক্ষণে একটু গান টান গাই এস হে, নেহাৎ চুপ্ চাপ—"

বাধা দিয়া সুধীর কহিল—"না হে, গান টান গেয়ো না। সেদিন সাম্‌নের ডাক্তার ভারী বকাবকি করেছিল। লোকটা বড় সুবিধের না।"

গণেশ কহিল—"বাঃ, এ ত ভারী মজার কথা। হরিনাথ ডাক্তার ভারী কড়া লোক ত। তোমার বাড়ীতে তুমি গান করবে, নাচবে, তা ওর তাতে চোখ টাটায় কেন? টাটায় ত চোখে ঠুলি দিয়ে থাকুক না।"

সুধীর কহিল—"তোমরা সে দিন নেশার ঝোঁকে যা তা গান গাইতে সুরু করেছিলে, তা বকবে না? ভদ্রলোকের বাড়ী—ও সব ঠিক নয় ভাই।"

গণেশ কহিল—"আরে তোমার ভদ্দর লোক! ফুর্ত্তি বুঝি ছোট লোকেরই একচেটে? একে তো দেশে কোথাকার কে এক গান্ধীর হুজুগ উঠেচে 'মদ খেয়ো না, হেন কোরো না, তেন কোরো না'—তার পর হুকুম জারী হবে এখন, 'থুতু ফেলো না, চোখ চেয়ে দেখো না, নাকে শুঁকো না'।"

বিমলেন্দু কহিল—"পেটে না পড়্‌তেই যে তোমার বোল্‌চাল ফুট্‌তে সুরু হ'লো হে, গতিক তো ভাল নয়।"

গণেশ সুধীরকে ঠেলা দিয়া কহিল—"যাও দাদা, দয়া করে শ্রীহস্তের প্রসাদ নিয়ে এসো গিয়ে।"

সুধীর আবার তখন আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি দিল। রাণু তখন বিষম কান্না জুড়িয়াছে। কাঁচা লঙ্কার রসাস্বাদন করিতে গিয়া বেচারী বড়ই দাগা পাইয়াছে। সেই লঙ্কার হাত চোখে মুখে লাগাইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা রান্না ফেলিয়া মেয়েকে লইয়া উঠানে আসিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সুধীর তখনো চপ ভাজিবার উদ্যোগ হয় নাই দেখিয়া প্রসন্ন হইল না। ঝাঁজের সহিত কহিল—"অন্ধকার হয়ে গেল, এখনো আলো জ্বলল না, মেয়ে নিয়েই সোহাগ হচ্ছে. রান্না শেষ হবে কখন?" শ্যামার নিজের শরীর ভাল ছিল না। তার উপর অসুস্থ মেয়েটা লঙ্কা খাইয়া এক ফ্যাঁসাদ বাধাইয়াছে। স্বামীর ইহাতে সহানুভূতি দূরে থাকুক, বন্ধুদের "মদের চাট" জোগাইবার তাগিদের আর অন্ত নাই। এ হেন অবিবেচনার ব্যাপারে তার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে বলিয়া ফেলিল—"দুটো হাত নিয়ে কত কি কর্‌ব, আলো জাল্‌ব, না মেয়ে ভোলাব, না রাঁধ্‌ব।"

সুধীর তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া হ্যারিকেনটি টানিয়া জ্বালিবার উদ্‌যোগ করিতে করিতে উত্তর দিল, "আলো আমি জেলে নিচ্ছি, তুমি প্যান্‌পেনে মেয়েকে নামিয়ে ফেলে রেখে রান্না দেখ গে। এই খুকী, ফের কাঁদ্‌বি তো মেরে হাড় ভাঙ্‌ব।" বাবার বকুনির সঙ্গে সঙ্গেই খুকীর কান্না সপ্তমে চড়িল। সুধীর রাগিয়া কহিল—"মরুক কেঁদে, দাও নামিয়ে।"

শ্যামা কহিল—"ওকে চুপ না করিয়ে আমি কিছু কর্‌তে পার্‌ব না।"

সুধীর হুঙ্কার করিয়া কহিল—"কি বল্‌লে, পারবে না? পার্‌তে হবে।"

শ্যামা উত্তর দিল না, আপন মনে খুকীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে হ্যারিকেন জ্বালিতে গিয়া, উহা তৈলশূন্য দেখিয়া সুধীর কেরোসিনের বোতল সংগ্রহ করিয়া, বকিতে সুরু করিল—"এমন সব হতভাগা যে, ঠিক সময় তেলবাতীটুকুও করে রাখ্‌তে পারে না। মুখে আগুন এমন কুড়েমীর। মাসীর ঘরে খেটে খেটে শুকিয়ে মর্‌তে, সেই ছিল ভাল। এখানে এসে দিন দিন বিবি হয়ে উঠেচেন।"

শ্যামার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে কহিল—"বড় সুখেই রেখেচ কি না,—এর চাইতে মরণ হলেই বাঁচতাম।" সুধীর স্ত্রীর মুখে এতখানি স্পর্দ্ধার উত্তর কোন দিন শোনে নাই। প্রথমটা শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ! যে মানুষ 'সাত চড়ে রা' দিত না, আজ সে এমন কথা বলিতেছে? না জানি, প্রশ্রয় পাইলে এর পরে আরও না কি বলিয়া বসিবে। সে তখনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! নেহাৎ দয়া করে বিয়ে করে এনেচি, তাই না? মাসী মেসো পায়ে কত তেল মালিস করেছিল, মনে আছে? অই তো কালো বউ, কেউ তো কাছে ঘেঁসে নি, ভাগ্যিস্ উদ্ধার করেছিলাম।"

শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"এ উদ্ধার করা নয়, জ্যান্তে খুঁচিয়ে মারা—এ যে আর রাত দিন সহ্য হয় না গো" খুকীকে নামাইয়া দিয়া শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল, সুধীর পথ আগুলিয়া কহিল—"আবার ঐ সব প্যানপ্যানানি? বল্‌চি, ভাল চাও তো রান্নাঘরে গিয়ে রান্না শেষ কর। তার পর তোমার ব্যবস্থা আমি কর্‌চি।"

শ্যামা রুক্ষ কণ্ঠে কহিল—"আমি কিচ্ছু করতে পারব না, আমার মাথা ব্যথা কর্‌চে।"

সুধীর কহিল—"নেহাৎ মার খেয়ে মরবে কেন, এখনো বল্‌চি—"

স্বামীর হাতের প্রহার-সুখেও মধ্যে মধ্যে শ্যামা বঞ্চিত ছিল না। তবে খুব সাবধানে চলিত বলিয়া, সুধীর তাহাকে বকারকি করিয়াই ক্ষান্ত দিত। আজ শ্যামার মাথায় যেন ভূত চাপিয়াছিল। সে জবাব দিল—"মেরে ফেল্‌লেও কিছু পারব না।"

"বটে? এত বড় আস্পর্দ্ধা? মর তবে পুড়ে!"

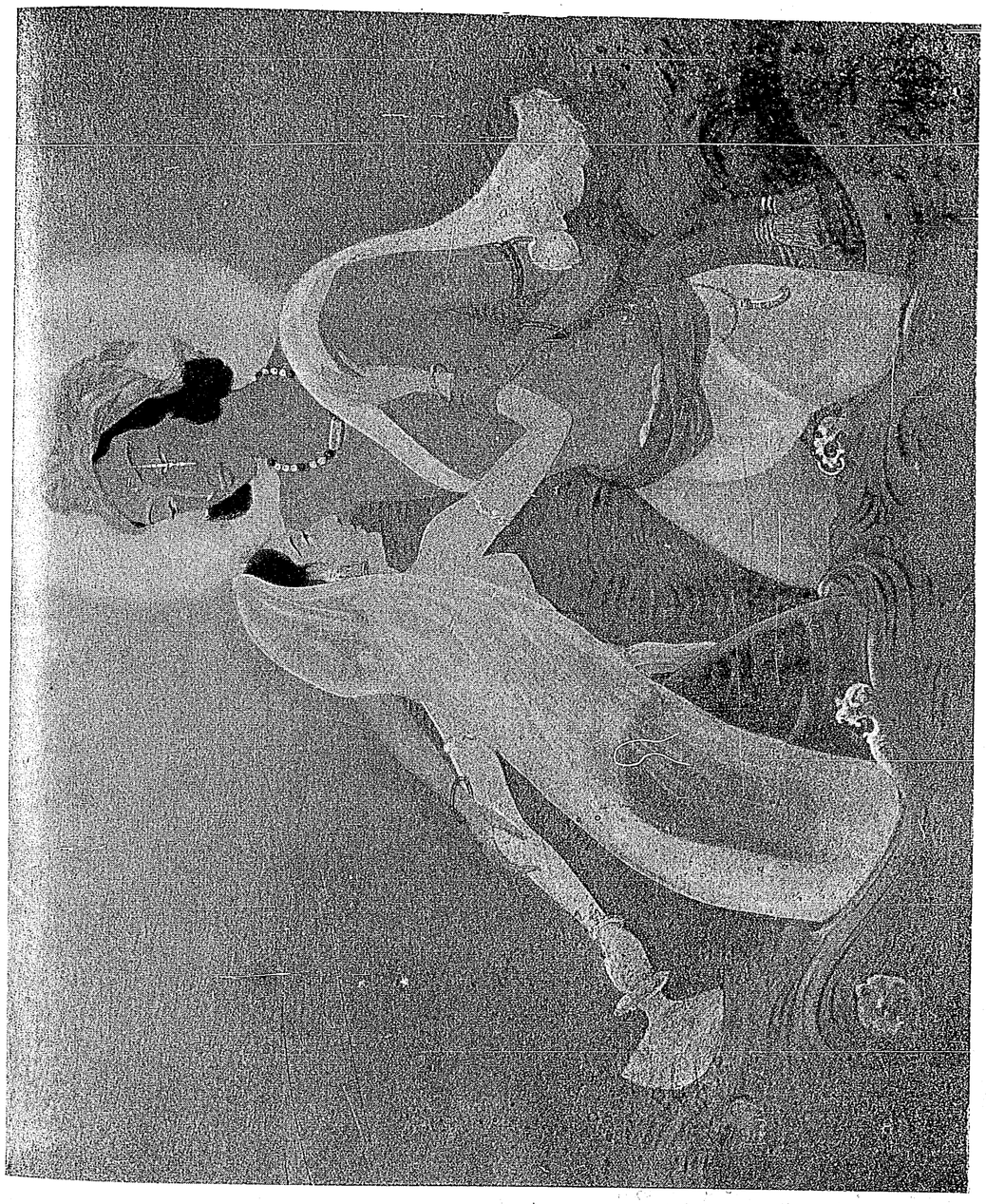

বলিয়াই সুধীর হাতের কেরোসিন-পূর্ণ বোতল স্ত্রীর গায়ে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, দেশালাই জ্বালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আগুণ লক্‌লক্ জিহ্বা মেলিয়া শ্যামার তরুণ দেহখানি সাপটিয়া ধরিল। শিশু রাণু আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামারও করুণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ বাতাসে ভাসিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত সাড়া পৌঁছাইয়া দিল।

চার

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। নীলিমা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাক্তার স্বামীর প্রত্যাগমন-পথ চাহিয়া আছে। জানালায় মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া, শ্যামার শয়ন-গৃহের দিকে তাকাইয়া, ঘরের খবর কিছু কিছু জানিবার জন্য কৌতূহলের তার আর অন্ত নাই। কিন্তু কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সন্ধ্যার সময় শ্যামার আর্ত্ত-নাদ কাণে আসিবামাত্র, তার মনে হইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া শ্যামার কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাকে বুকের মধ্যে জাপটিয়া ধরে। কিন্তু বধূ সে, বিশেষ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বধূ। সুধীর মাতাল বলিয়া হরিনাথ স্ত্রীকে তাহার বাড়ী যাইতে দিতেন না। হরিনাথের পিতা মাতারও আপত্তি ছিল। তবে শ্যামা অবসর মত ইহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত, তাহাতে কাহারও আপত্তি ছিল না। নীলিমা অল্প দিনের পরিচয়েই তার এই অবসর-সঙ্গিনীটিকে ভালবাসিয়াছিল। মাতৃপিতৃহীনা স্বামী-স্নেহ-বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি মনের টান তার কতকটা করুণা মমতাতে পরিপূর্ণ ছিল। শ্যামার আর্ত্তনাদ কাণে আসিয়া পৌঁছিতেই, সেই সর্ব্ব প্রথমে ঝিকে খবর লইতে পাঠাইয়াছিল। শ্বাশুড়ী বরং বধূর অত্যন্ত ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মাতাল মানুষ, নিজের পরিবারকে নেশার ঝোঁকে হয় তো মার-ধোর কিছু করছে,—তাতে তোমারি বা কি, আমারি বা কি। তুমি বউ মানুষ, চুপ চাপ করে ঘরের কোণে আছ তাই থাক,—পাড়ার কে কি করচে সে খোঁজে মাথা ব্যথার দরকার কি?" যাহা হউক, ঝি আসিয়া যে সর্ব্বনাশের সংবাদ দিয়াছিল, তাহাতে নীলিমা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তার পর সুধীর নিজেই পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া ডাক্তার হরিনাথকে ডাকিয়া লইয়া যায়। হরিনাথ সেই সময় হইতে সেইখানেই রহিয়া-ছেন। নীলিমা শ্যামার সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য উৎ-কণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা পদশব্দে নীলিমা বুঝিল, স্বামী আসিতেছেন। সে সত্বর দ্বারের কাছে গিয়া হরিনাথের মুখোমুখি হইতেই জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছে গা? বাঁচ্‌বে তো?" হরি-নাথ চেয়ারে বসিয়া জামা জুতা খুলিতে লাগিলেন। নীলিমা পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে স্বামীর উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিনাথ কহিলেন—"মানুষ না পশু,—কাণ্ড দেখে আমি অবাক্। স্বামী স্ত্রীতে কি বচসা হয়েচে, আর তার গায়ে তেল ঢেলে আগুণ জেলে দিয়েচে। বউটার অবস্থা কি ভয়ানকই হয়েচে। বাঁচ্‌বে না বলেই মনে হয়। আর যে যাতনা—না বাঁচাই ভাল।"

নীলিমাও এ কথা অস্বীকার করে না। কিন্তু অভাগিনী শ্যামার জন্য তার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দুটি চোখে তার মুক্তাধারা ঝরিতে লাগিল। হরিনাথ স্ত্রীকে সাদরে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—"তুমি কেন কাঁদ্‌চ নীলা, তোমার সে তো কেউ নয়!" নীলিমা উত্তর দিল না, তার অশ্রু উথলিয়া আসিতে লাগিল। হরিনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"বউটিকে তুমি একবার দেখ্‌তে যাবে নীলা? জ্ঞান আছে, মানুষ চিন্তে পার্‌চে। মুখ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেছে। একটু একটু কথাও কইতে পারচে। তোমায় হয় তো চিন্‌তে পার্‌বে।" নীলিমা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল—"যাব আমি, কিন্তু বাবা মা বকাবকি করবেন,—দোহাই তোমার, যদি মত করাতে পার।" তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি বল্‌চ সে আমার আপনার কেউ নয়। আচ্ছা, বল দেখি, আপনার না হলে কি কষ্ট দেখে কষ্ট হতে নেই? তুমি যে ডাক্তার মানুষ, তোমারও তো দেখে কষ্ট হচ্ছে? আর আমি একজন স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের কষ্টের কথা শুনে স্থির থাক্‌তে পারি?" হরিনাথ নীরবে স্ত্রীর এই সহানুভূতির অনুমোদন করিলেন। আহারান্তে হরিনাথ বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। নীলিমা আহার নিদ্রা ভুলিয়া অধীর উৎকণ্ঠায় জানালায় বসিয়া একমনে ভগবানের নিকট শ্যামার আরোগ্য কামনার সহিত ঊষালোক ভিক্ষা করিতে লাগিল। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, সে একবার শ্যামাকে দেখিতে পাইবে।

পাঁচ

সদ্যঃ-জাগ্রত পাখীর কাকলি তখন সবেমাত্র প্রভাত-পবনকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কনক ঊষার রক্তিম রাগ মেঘহীন নীলাম্বরকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। সেই আলোকের একটি রেখা স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র জানালার পথে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিশার প্রদীপের সহিত কোলাকুলি করিতেছে। সেই সময় মৃত্যু-পথ-যাত্রিনীর পাণ্ডুর ললাটের উপর কম্পিত অধর রাখিয়া কান্নাভরা কণ্ঠে নীলিমা ডাকিল —"শ্যামা, বোন্‌টি, একবার চেয়ে ত্যাখ্ বোন্", শ্যামা স্তিমিত দৃষ্টি মেলিবার চেষ্টায় সফলকাম হইল না, সে আধখোলা চোখেই নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কে, দিদি, এসেছ ?"

তার পর দুইজনেই নীরব। অভাগিনীর বিবর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নীলিমার মনের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা বর্ণনার বিষয় নয়। মৃত্যুর নীল ছায়া যার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছে,—চক্ষের শেষ জ্যোতিঃটুকু নিভাইবার অপেক্ষা মাত্র, তাহাকে সে আর প্রশ্নের খোঁচা কি দিবে ? আর সান্ত্বনা দিবারও তো কিছুই নাই। একান্ত সম্বল আঁখিজল—তাই লইয়া নীরবেই শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমা বসিয়া রহিল। ওদিকে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে রাণু ওঘর হইতে এঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, নীলিমা হাত বাড়াইয়া ডাকিল —"রাণু, কোলে এস মা—"

রাণুর শিশু-হৃদয় পূর্ব্ব দিনের ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ঘটনার পর সুধীরের বন্ধুগণেরও নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল ; সকলেই তৎপর হইয়া সময়োচিত ব্যবস্থায় লাগিয়া গিয়াছিল। সুধীর মেয়েকে কোলে কোলেই রাখিয়াছিল। যাহা হউক, রাণু মাকে অচৈতন্য অবস্থায় শয়ান দেখিয়া, কিছুতেই যেন স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। অনেক কান্নাকাটির পর সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এখন উঠিয়াই মাকে দেখিতে আসিয়াছে। সে নীলিমার কোলে গিয়া বসিলে, নীলিমা ডাকিল, "শ্যামা, রাণুকে দেখ্‌বে ?"

ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"চল্‌লাম তাতে দুঃখ নেই দিদি, মেয়েটাকে দেখবার কেউ রইল না, এই দুঃখু। তবে মরে যায় সেও ভাল। নইলে যদি আমারি মতন—" কথা তার শেষ হইল না। জীবনের দুঃসহ দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মৃত্যুর কামনা নিজের জন্য বাঞ্ছনীয় হইলেও সন্তানের জন্য যে কোন অবস্থাতেই মৃত্যু-কামনা করা মাতার পক্ষে বড় নিদারুণ ক্ষোভের কথা। শ্যামা তাই সে কথা শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তার ক্ষীণ দৃষ্টি আরও ঘোলাটে হইয়া গেল।

* * * * * *

তার পর ? তার পর যথাসময়ে সব শেষ হইয়া গেল। শ্যামার ক্ষুদ্র জীবন-দীপ নিভিবার সবিস্তার কথা লিখিবার প্রয়োজনই বা কি। তবে এইটুকু লেখা দরকার যে, সুধীরের বন্ধুগণ মৃতদেহ সৎকার করিতে যাইবার সময় ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিল। "সহজ মৃত্যু" বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে হরিনাথ কিছুতেই রাজী হন নাই। অগত্যা পাড়ার আরও কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে আনিয়া তাঁহার নিকট হইতে "স্বাভাবিক মৃত্যু"র সার্টিফিকেট আদায় করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত হরিনাথ বাবুর কথাবার্ত্তা হয় এইরূপ,—যথা—

১ম ভদ্রলোক—আপনার কথা মান্‌চি ডাক্তার বাবু, লোকটা কাজ যা করেচে তা খুবই অন্যায়। কিন্তু—"

হরিনাথ (উত্তেজিত ভাবে) অন্যায় ? শুধু অন্যায়! যাকে বলে murder, তাই নয় কি ? এর শাস্তি কি জানেন—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিম্বা ফাঁসী।

২য় ভদ্রলোক—সে তো বটেই মশাই! তবে লোকটা সহজ অবস্থায় এ কাজ করে নি,—নেশায় ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, নইলে—

হরিনাথ (রাগিয়া)—বেশ তো মশাই, আদালতে জেরায় আপনারা ঐ কথা বলে লোকটাকে বাঁচিয়ে দেবেন। আমি তা বলে false certificate দিতে রাজী নই। দোষীর শাস্তির বিধান কর্‌বই।

৩য় ভদ্রলোক—রাগ্‌চেন কেন মশাই, একটু ঠাণ্ডা হয়েই কথাটা বুঝুন না। ও কিছু আমাদেরও আপন কুটুম্ব নয়, আপনারও নয়। তবে বাঙালী হয়ে বাঙালীর আপ্তজন বটে। হোতো বাঙ্‌লা দেশ, যা ইচ্ছে করা যেতো। একে এই পশ্চিমে বাঙালীর সংখ্যা অল্প, তার ওপর জানেন তো হিন্দুস্থানীরা কথায় কথায় খোঁটা দেয়—বাঙালী বাঙালী ভাই ভাই লড়্‌তে রহে। তার ওপর গান্ধী মহারাজের হুজুগ চলেছে। এখন যদি আমরা ঘরে ঘরে নন-কো-অপা-

রেশন চালাই, তা হ'লে বাঙালীর নিন্দেয় কি মুখ পাওয়া যাবে ? আজ যদি এই কেলেঙ্কারী ঘটনা প্রকাশ পায়, কাল সহরে—আপনিও তো একজন পদস্থ বাঙালী,—আর কি মাথা উঁচু করে চল্‌তে পারবেন ? পারবেন না, কি বলেন ?

কথাগুলি এবার হরিনাথকে একটু খোঁচা দিল। সত্যই ঘটনাটি প্রকাশ হইলে প্রবাসী বাঙালীর দুর্নামে সহরের সর্ব্বস্থান ভরিয়া যাইবে। যাহা হউক, সে কণ্ঠের তেজ মৃদু করিয়া উত্তর দিলেন—"তা হ'লে আপনারা কি বলেন দোষীর শাস্তি হবে না ? আবার ও সংসার মধ্যে বুক চিতিয়ে চলা-ফেরা করবে। তার পর মাস না যেতে যেতে আবার একটি মেয়েকে বিয়ে করে আন্‌বে। তার পর তাকেও আবার একদিন পুড়িয়েই হোক, আর ছুরি মেরেই হোক, খুন কর্‌বে। এই তো ? ইচ্ছে ক'রে এই সব হত্যাকে প্রশ্রয় দেবো,—একি conscience সায় দেয় মশাই ?

৪র্থ ভদ্রলোক কহিলেন—বারে বারে কি আর তাই করে মশাই,—এবারেই ওর চৈতন্য হয়েছে,—নেড়া ক'বার বেলতলায় যায় ?

ইহার উপর আর তর্ক চলে না। অগত্যা হরিনাথকে সুবোধ বালকের ন্যায় সার্টিফিকিটখানি "natural death" বলিয়াই লিখিয়া দিতে হইল। নহিলে অবাঙালী সমাজে বাঙালীর সহযোগিতার সম্মান রক্ষা হয় কি করিয়া ?

মৃতার অতিশপ্ত জীবনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সেই সহযোগিতার উপর কিসের স্পর্শ বুলাইয়াছিল, কোন্ সর্ব্বদর্শী তাহা আমাদের বলিয়া দিবে ? অনুমানের অপেক্ষা কিছুই থাকে কি ?

নব্যা

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর

বিশ্রামটাও কাজের অঙ্গ
সেটাই বড় কাজ,
তোমার—বাজে কাজের জন্য আছে
মা ভগিনী ভাজ।
কুলীর দ্বারা যে কাজ চলে
আমায় সে কাজ করতে বলে ?
পত্নী তোমার ক্রীতদাসী ?
হয় না মনে লাজ ?
কাপড় কাচো বাসন মাজো,
এঁটো ঘুচোও, বাপ্‌!
দুদিন পরে বল্‌বে, করো
পায়খানাটাও সাফ্‌।
ঘটর ঘটর বাটনা বাঁটো,
আলুর সঙ্গে আঙুল কাটো,
রান্নাঘরে ধোঁয়ায় কেশে,
মাথায় হানো বাজ।

চিঠি লেখা গল্প করা
নভেল পড়ে বোঝা,
মুর্খেরা সব মনে ভাবে
যেন বড়ই সোজা।
দেশের দশের খবর রাখা,
বাজে ভাব, সাবান মাখা,
উলের লেসের কাজগুলো আর
নারী-দেহের সাজ।
চাকর বাকর রাখতে নারো
মিছে আমায় দোষো,
দুজন না হয় মাসী পিসি
নীচের ঘরে পোষো।
বুঝেছি ত তোমার ওজন
না হয় বলো, দাসী দুজন
মাইনে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে
লিখছি বাবায় আজ।

ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রায় সকলেই ভ্রমণ কর্ত্তে বাহির হয় কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমারও পাঁচ-ছয় মাস ধরে ভারত-ভ্রমণে বাহির হওয়ার দুই একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্যটা শুন্‌লে কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেরই বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হবার সম্ভাবনা। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের গান শোনা—অবশ্য গানের মধ্যে বাজনাও বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল, নানারকম চিত্তাকর্ষক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা; ও তৃতীয় উদ্দেশ্য—দেশ দেখা। অবশ্য "দেশ দেখা" বল্‌তে সকলের মুখেই একরকম শোনালেও, প্রত্যেকের দেশ দেখার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবেই। আপিসের কাজে আমাদের প্রায় কারুরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। তার কারণ, সে কাজটার মধ্যে কোনও সহজ স্ফূর্ত্তি বা প্রেরণা নেই, সেটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ভ্রমণটা অন্ততঃ অধিকাংশ লোকেই আনন্দের প্রেরণাতেই করে থাকে—এক আমেরিকান touristরা ছাড়া অবশ্য। তবে তাদের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়—তাদের উদ্দেশ্য ইংরাজীতে যাকে বলে "Doing it"। বার্লিনে আমার পরিচিতা এক সুরসিকা সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ মহিলা এ সম্পর্কে আমাকে বেশ একটি গল্প বলেছিলেন। তাঁর পরিচিত একটি আমেরিকান মেয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে তাঁকে এসে বলেছিলেন যে, লণ্ডনে দ্রষ্টব্য কি কি স্থান আছে, সেগুলি তাঁর guide-bookএ তিনি যেন দাগ দিয়ে দেন—কারণ তিনি তার পর দিন লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। এ কথা শুনে জার্ম্মাণ মহিলাটি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "কিন্তু এক দিনে তুমি সব দেখবে কেমন করে?" তিনি প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "দেখার ত আমার দরকার নেই মাদাম! আমার দরকার শুধু আমেরিকা ফিরে কেবল দ্রষ্টব্য জায়গাগুলির নাম কর্ত্তে জানার।" আমাদের মধ্যেও এ রকম লোক আছেন সন্দেহ নেই, যাঁরা নানা স্থান দেখ্‌তে চান শুধু বাড়ী ফিরে "অমুক অমুক জায়গা দেখেছি" বলার গৌরব (?) ভোগ কর্ত্তে। কিন্তু এরূপ পরিচিত type ছেড়ে দিলে বোধ হয় এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকেই তাঁর ভ্রমণের মধ্যে থেকে কেবল সেই সব ঘটনা বা বস্তুই লক্ষ্য করেন, যাতে তাঁর মন প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে। তাই আমি বলে রাখতে চাই যে, আমার ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এক দিকে যেমন কোনও ধারাবাহিকতা বা পর্য্যায় খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই, তেম্‌নি অপর দিকেও ভ্রমণসংক্রান্ত নানান অত্যাবশ্যক detailএর আশাও যেন কেউ না করেন। কারণ, আমি কি উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হয়েছিলাম, তা পূর্ব্বেই বলে সাফাই গেয়ে রেখেছি। অতএব এবার নারায়ণং নমস্কৃত্য সুরু করা যাক্।

লক্ষ্ণৌয়ে এবার অনেক দিন থেকে গিয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ এই যে, গান শোনার জন্য ভারত ভ্রমণ কর্ত্তে গিয়ে, প্রথমেই সেখানে বেশ উচ্চশ্রেণীর গান শুন্‌বার সুযোগ যেন হঠাৎ উপস্থিত হ'ল বল্‌লেই চলে। তা ছাড়াও অবশ্য অন্য কারণও ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে অনেকেই বেশ মিশুক দেখা গেল। লক্ষ্ণৌ ছাড়ার কয়েক মাস পরে হঠাৎ ট্রেণে এক বৈজ্ঞানিক বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি য়ুরোপের Specializationএর পক্ষপাতী—মেলামেশার ক্ষেত্রেও। যথা, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে তাঁর মনে আগ্রহ অত্যন্ত কম। (পরে আরও জানা গেল যে তাঁর অসাধারণ শিক্ষার ফলে তিনি আরও আবিষ্কার করেছেন যে, সঙ্গীতের রসোদ্রেকের চর্চ্চায় বিশেষ লাভ নেই, আছে কেবল তার শব্দবিজ্ঞানের (acoustics) চর্চ্চায়। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক রকম চীজ্‌ই জন্মায় বটে!) কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালীর ও অবাঙালীর মধ্যেও এমন লোক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা মেলামেশার ক্ষেত্রে এ specialisation কে খুব আমল দিতেন না।

অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বিশেষ চর্চ্চার বিষয় ছাড়াও, সামাজিক মেলামেশাতে একটা উদারতন্ত্রতায় বিশ্বাস কর্ত্তেন ও নানান্ সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় যোগদান কর্ত্তেন। পরে অন্য দুচারটি বড় বড় সহরের মান্যগণ্য বাসিন্দাদের মধ্যে এগুলির একটু অভাব আমার বিশেষ করেই মনে হয়েছিল। এলাহাবাদে একজন বড় প্রফেসর ছিলেন;—তাঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার বড় একটা হয় নি, কারণ তিনি তাঁর বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের চর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করাটা একান্তই বাজে কাজ মনে করতেন। তাঁর কোনও আত্মীয় তাঁকে কোনও public-hallএ গান শুন্‌তে যাবার জন্য অনুরোধ করাতে, তিনি বিজ্ঞ ভাবে হেসে বলেছিলেন, "গানবাজনা শুন্‌তে যাওয়া যেত একসময়ে—তবে তখন আমি ছেলে-মানুষ ছিলাম।" লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালী প্রফেসরদের মধ্যে কিন্তু তাঁদের বয়সের বিকাশের ফলে তাঁদের মনের বিকাশটির গতি ঠিক্ এঁর মতন হয় নি। ফলে তাঁদের সঙ্গে গল্পালাপে সময়টি বেশ কাট্‌ত। বর্ত্তমান সভ্যতার যে একটা প্রবণতা আছে মানুষকে বেশ পরিপাটি ভাবে অঙ্গহীন করে ফেলার দিকে—সেটা উপরিউক্ত দুই অধ্যাপকের ন্যায় লোকের সংস্পর্শে এসে যেন একটু বেশি প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

লক্ষ্ণৌ নগরী পুরাকালে গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই সঙ্গীতের চর্চ্চা একেবারে নিভে গেছে। তবে লক্ষ্ণৌয়ে এখনও দুই একজন ভাল গায়ক-গায়িকা আছেন—যাঁদের গান-বাজনা শুনে মনে ভারি তৃপ্তি পাওয়া গিয়েছিল। বাজনার মধ্যে সবচেয়ে ভাল যন্ত্রী ঠাকুর নবাবালি। এমন সুন্দর হার্ম্মোনিয়াম আমি আর একবার মাত্র শুনেছি—গয়ার বিখ্যাত গায়ক হনুমান দাসের পুত্র শোনির কাছে। কিন্তু ঠাকুর নবাবালির হাত বোধ হয় আরও মিষ্ট। ইনি গানবাজনায় যাতে আবার উন্নতি হয় সেজন্য যথেষ্ট সচেষ্ট। কাজেই এঁর গানবাজনার অনুরাগের প্রশংসা কর্ত্তে হয়। ইনি আমাদের উত্তর ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। শুনেছি বইখানি ভাল।

গায়কদের মধ্যে একজন মাত্র ভাল গুণীর পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর নাম আবদুল রশিদ। মধুর কণ্ঠস্বর ও গলায় modulation অল্প থাকার দরুণ এঁর গানে একটা বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে খুব কম লোকের গলায়ই modulation (সুরের ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি) আছে। এটা আমি দুঃখের বিষয় বলে মনে করি। Modulationএ গানের সৌন্দর্য্য যে কতটা বাড়ে, তা লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত গায়িকা অচ্ছন বাইয়ের গান শুন্‌লে অনেকটা বোঝা যায়। অচ্ছন বাইয়ের কণ্ঠস্বর এলাহাবাদের বিখ্যাত জানকী বাইয়ের চেয়ে কম মিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, অচ্ছন বাইয়ের গানের মাধুর্য্য যে অনেক বেশি, তার একটা প্রধান কারণ তাঁর modulationএ কৃতিত্ব। তা ছাড়া এঁর গানের মধ্যে এমন একটা dignity আছে ও প্রশান্তি আছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস দরদ আছে, যা সঙ্গীতানভিজ্ঞকেও অনেকটা আনন্দ দেয় বলে মনে হ'ল।

আর একজন গায়কের গান শোনা গেল। তাঁর নাম আহম্মদ খাঁ, কিন্তু তাঁর গান শুনে তাঁর নামের শেষের "দ"র স্থলে "ক" বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ওস্তাদ-সুলভ অঙ্গবৈচিত্র্যের তাঁর অভাব নেই এবং আর্টিষ্ট-সুলভ দরদের তাঁর বালাই নেই।

এলাহাবাদে বিখ্যাত জানকী বাই এবার আবার গান শুনিয়েছিলেন। কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও গলার তানকর্ত্তব অতি পরিষ্কার। তবে এঁর গানের মধ্যে খুব একটা dignity নেই যেটা অচ্ছন বাইয়ের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌয়ে একটি এগার বার বছরের ছেলের গান অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। বালকটির নাম চন্দ্রশেখর পন্থ। তার মামা সত্যানন্দ যোশী তাকে বেশ ভাল শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শিখিয়েছেন। এলাহাবাদে এসে সেখান-কার Muir College hostelএর ছাত্রদের ধ'রে আমি এই ছেলেটির গান সেখানে করিয়েছিলাম। তারা এর গান শুনে খুব তৃপ্ত হবার পর আমি যখন বল্লাম যে ছেলেটি যা গাইল তার নাম সেই শ্রোতৃবর্গের ভীতি-উৎপাদনকারী ও অবলা রমণীর হিষ্টিরিয়ার-জায়ক ধ্রুপদ সঙ্গীত, তখন বোধ হয় অনেকে আমার সংজ্ঞার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়াকুল হয়েছিলেন। সেজন্য আমাকে বল্‌তে হয়েছিল যে ধ্রুপদের মাধুর্য্য সত্যই তার ধনুষ্টঙ্কার-উৎপাদিকা শক্তির ওপর নির্ভর করে না, করে—তার প্রশান্তি (repose), গাম্ভীর্য্য

ও সুরের সুমিষ্টতার উপর। তখন বোধ হয় অনেকে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ধ্রুপদ সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণার মূল কারণ বোধ হয় এই যে, অধিকাংশ ধ্রুপদ-গায়কই স্বরমাধুর্য্যের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন না। মিষ্ট স্বর হলে ধ্রুপদ যে কত মনোহর হয়, তার প্রমাণ যদি কেউ চান তবে যেন তিনি এলাহাবাদে এই বালকটির গান শোনেন। এই ছেলেটি অবিশিষ্ট ভদ্র পরিবারভুক্ত—সেজন্য আমার এর সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা হয়। এর মাতুল যোশী মহাশয় রীতিমত সঙ্গীতজ্ঞ ও খুব ভাল প্রণালীতেই একে শেখাচ্ছেন, যার জন্য বম্বের বিখ্যাত ভাতখণ্ডে মহোদয় ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁর সম্বন্ধে পরে লিখব।

লক্ষ্ণৌয়ে এক তালুকদারের বাড়ীতে দেওয়ালি উপলক্ষে আর একজন গায়িকার গান শুনেছিলাম, যার নাম উল্লেখ-যোগ্য। এ গায়িকাটির নাম ইন্দর বাই; লক্ষ্ণৌয়ের কাছে কোথায় থাকে। প্রথমে এর বয়স অপেক্ষাকৃত কম দেখে মনে হয়েছিল যে এ কখনই ভাল গাইতে পারবে না। কারণ আমাদের গান এমন দুরূহ জিনিস যে অল্প বয়সে তাতে বিশেষ পারদর্শী হওয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, সে রাত দশটায় আরম্ভ করল, ও রাত বারটা থেকে তিনটে অবধি এমন গান গাইল যে, শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে দু তিন জন গম্ভীরানন প্রফেসর ছিলেন, তাঁদের গম্ভীর আননও একটু তরল হয়ে এল বলে মনে হয়েছিল। এর গলাটি মধুর হলেও খুব অসাধারণ রকমের মধুর নয়। কিন্তু গলায় একটা মস্ত জিনিস, দরদ, ছিল। বিশেষতঃ খান কয়েক গজল এত সুন্দর গাইল যে গজলের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। এর খেয়াল খুব ভাল নয়, তবে দাদ্‌রা ও গজল এর অতি সুন্দর। আমাদের এই আসরে এক নবাব ছিলেন—খুব মূর্খের মত জরীর পোষাক পরা, যেমন নবাবদের সচরাচর হয়ে থাকে। লোকটি কিন্তু একজন রসিক লোক, কারণ, সুরের যে সব মোচড়ের যায়গায় তিনি আমাদের ধারে অষ্টমীর ছাগশিশুর ন্যায় করুণ নয়নে চাইছিলেন, সে সব যায়গায় সুরের মাধুর্য্য বাস্তবিকই বেশি ছিল। বে-সমঝ্‌দার লোক কখনও ঠিক যায়গায় মাথা নাড়তে পারে না বা আহা উহু বলতে পারে না, এ কথা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। কিন্তু এর তারিফ-ব্যঞ্জক অব্যক্ত চাহনি যথাস্থানে প্রযুক্ত হলেও তার মধ্যে একটা কেমন যেন হাস্যকর উপাদান ছিল। বোধ হয় সেটা ইনি নবাব বলে। কিন্তু সে যাই হোক্, এঁর সেই করুণ "আহা-উহুর" মজ্জা-মাখা চাহনি যে গায়িকার পক্ষে একটা মস্ত প্রেরণা ছিল, তাতে আমাদের কারুরই সন্দেহ ছিল না। বাই সাহেবার সঙ্গে ইনি উর্দ্দু ভাষায় যে সব কথা বলছিলেন তার মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের চিরপরিচিত কপট অনুক্তির রেশ বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু কপট উক্তি যে শ্রুতিমধুরতায় খাটো হয় না, তা বুঝ্‌তে হলে একবার লক্ষ্ণৌ যাওয়া দরকার।

লক্ষ্ণৌয়ে এ সব বিভিন্ন গায়ক গায়িকার মধুর কণ্ঠে গীত হিন্দুস্থানী গান উপভোগ করতে করতে আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্যের চরম বিকাশের পক্ষে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যের মূল্য যে কতখানি, তা যেন আমি আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম। এবং এ সূত্রে আমার আবার মনে হয়েছিল যে, গানের গভীর আনন্দ দানের পক্ষে মধুর স্বরের আমরা যথেষ্ট দাম দিতে শিখি নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে লেখার ইচ্ছে আছে—তাই এখানে শুধু এই কথাটি মাত্র বলে রাখি যে, কণ্ঠ-সঙ্গীতে রাগালাপের চরম মাধুর্য্য কখনই কর্কশ গলায় তেমন বিকাশ পেতে পারে না। আমি কাশীতে ও গোয়ালিয়রে দু জন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাদের নাম মঞ্জু বাই ও দুর্গা জান। একজনের বয়স প্রায় ৭০, অপর জনের ৬০-৬৫। গানে এদের দুজনেরই অসাধারণ দখল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই—কিন্তু বয়সের দরুণ তাদের কারুরই কণ্ঠস্বর তেমন মিষ্ট ছিল না বলে তাতে ততটা তৃপ্তি পাই নি, যতটা তাদের গলা মিষ্ট হলে পেতাম। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোক্ত বার বছরের ছেলেটির গান শুন্‌তে আমি যতটা কষ্ট করতে রাজী আছি, এঁদের দুজনের গান শুন্‌তে যে সে কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে মনকে সম্মত করতে পারব না, তার প্রধান কারণ, ছেলেটির গলার অপূর্ব্ব মিষ্টতা। আমাদের উচ্চশ্রেণীর গানে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার দাম কতখানি, আর রাগালাপের ক্ষমতার দাম কতখানি, সে দুরূহ সমস্যাটির সমাধান স্থগিত রেখে, আপাততঃ এইটুকু বোধ হয় বলে রাখা যেতে পারে যে, আমাদের ওস্তাদী সঙ্গীতের পতনের জন্য অধিকাংশ স্থলেই কণ্ঠের কর্কশতা অনেকটা দায়ী।

এলাহাবাদ, কাশী ও লক্ষ্ণৌ হয়ে মোরাদাবাদে ছিলাম দিন সাতেক। মোরাদাবাদেও আগে সঙ্গীতের চর্চ্চা

যথেষ্ট ছিল, এখন সেখানে মাত্র একটি হার্ম্মোনিয়াম-বাদক ও একটি গায়ক আছেন যাঁদের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও অন্তর্দৃষ্টি থাকুক বা না থাকুক—অঙ্গভঙ্গীতে উৎকট হাস্য-করতার অভাব ছিল না। শুন্‌লাম পূর্ব্বোক্ত গায়কটি না কি গত বৎসর জলন্ধরে সঙ্গীত-সম্মিলনীতে তুবারগাইতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। এ কথা শুনে জলন্ধরের সঙ্গীত-পরিষদের বিচারশক্তি সম্বন্ধে একটু সন্দিহান হয়ে পড়তে হয়েছিল মনে আছে।

রামপুরে অনেকগুলি ভাল গায়ক ও বাদক নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় গঞ্জিকা সেবন করে' সুখে কালাতিপাত করেন শুনে সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে দুই এক জনের সুপারিশে নবাব সাহেবের "মেহমান" (অতিথি) হয়ে মহা মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। নবাব সাহেবের সেক্রেটারী মহাশয় ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে ধুতি পরা দেখেই কি না জানি না, প্রথমটা তাঁরা বিশ্বাসই করে নি যে, এক বাঙালী বাবু নবাব সাহেবের মত হোমরাও চোমরাও লোকের অতিথি হতে পারে। কিন্তু ট্রেণ থেকে অন্য কোনও ভদ্র-লোককে সেই পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে নামতে দেখ্‌তে না পেয়ে তারা সিদ্ধান্ত করল যে আমিই নিশ্চয় নবাবসাহেবের মেহমান হব। ইতিমধ্যে রামপুরের টঙ্গাওয়ালারা নষ্টনীড় মৌমাছির মত আমাকে ছেঁকে ধরে প্রায় বিহ্বল করে ফেলেছিল। আমার বিছানা এক টঙ্গায় ও তোরঙ্গ অপর টঙ্গায় দেখে এবং কুলি ও বিভিন্ন টঙ্গাওয়ালাদের মধ্যে বিবাদের দৃশ্য দর্শন করে আমি যখন প্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি, তখন নবাবসাহেবের সারথি আমাকে প্রচুর ব্যাখ্যা সহকারে তাঁদের আমাকে খুঁজে পেতে দেরী হবার অগণ্য কারণ জ্ঞাপন করলেন। আমি আগে থেকেই রামপুরে এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের ওখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু নবাবের সারথি-পুঙ্গব আমাকে সটাং এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। আমি ডাক্তার বাবুর ওখানে যাব বলাতে, সকলেই এক-বাক্যে আমাকে জানালেন যে, সেটা অসম্ভব; যেহেতু আমি এবার নবাব সাহেবের মেহমান (অতিথি)। নবাব সাহেবের মেহমান হলেই আমার বন্ধু সত্ত্বেও হোটেলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া কোন তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁরা সকলেই আমাকে এক-বাক্যে উপদেশ দিলেন যে, সেইটেই হচ্ছে সেখানকার অতিথি-সৎকারের কেতা। আমি মাছ মাংস খাই না বলাতে, তারা বল্‌ল, "বেশ ত, সিধে আস্‌ছে, যা চান তাই পাবেন, ও রেঁধে খেয়ে নেবেন।"

ক্ষুধাশান্তির এরূপ সহজ উপায়ে আমার প্রায় বাক্‌রোধ উপস্থিত হওয়াতে, তারা আমার রন্ধননৈপুণ্যের অভাব সিদ্ধান্ত করে বল্‌লে, "রাঁধতে না জান্‌লেও ভাবনা নেই। সিধে রেঁধে দেবার লোকও আছে।" সেই রাত্রে আবার নবাব সাহেবের সিধে এনে তার পর তাকে রাঁধিয়ে খেতে হবে, (যখন ডাক্তার সাহেবের ওখানে তাঁর স্ত্রী স্বহস্তে আমার জন্যে রেঁধে অপেক্ষা করে বসে আছেন) এ কথা ভেবে মনে হ'ল, কুক্ষণে নবাব সাহেবের অতিথি হতে সাধ গিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সহিত হঠাৎ পুরুষোচিত উদ্দীপ্ত ক্রোধে তাদের তারস্বরে জ্ঞাপন কর্লাম যে, আমি যে ডাক্তার সাহেবের ওখানে উঠ্‌ব তা নবাব সাহেব জানেন। এ কথায় তারা একটু থতমত খেয়ে গেল, ও অনেক জল্পনার পর বল্‌ল, "আচ্ছা, আপনি ডাক্তার সাহেবের ওখানেই থাক্‌তে পারেন; কিন্তু "মেহমান" আপনি নবাব সাহেবের, আর কারো নন্।" আমি সানন্দে বল্লাম "তথাস্তু।" অতি কষ্টে নবাব সাহেবের আতিথ্যের হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে, কোনও মতে ডাক্তার সাহেবের ওখানে গিয়ে আমার নবাবী আতিথ্য-সৎকারের বিড়ম্বনার কাহিনী খুলে বল্‌লাম। আমার গৌরবময় লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে তাঁদের কৌতুক-হাস্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল, তা বোধ হয় বর্ণনা করার চেয়ে অনুমান করতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সে রাত্রে ত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাক্তার মহাশয়ের ওখানে কাটানো গেল। তার পর দিন সকাল বেলা ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আমাকে হেসে বল্লেন, "নবাব সাহেব আপনার জন্য যে সিধে পাঠায়েছেন তার ক'রে, একবারটি দেখে যান।" গিয়ে দেখ্‌লাম যে সে এলাহী কাণ্ড—চাল্, ডাল, নুন, তেল, ঘি, কপি, মাংস, চিনি ইত্যাদি ইত্যাদি, মায় কয়লা পর্য্যন্ত। তাতে অন্ততঃ ৩।৪ জনের দুবেলা খাওয়া হ'তে পারে। অথচ আমার না কি সে সব এক বেলায় খেয়ে ফুরিয়ে দেবার কথা। তার ওপর নবাব সাহেব এক পরিচারক পাঠিয়েছিলেন। আমি তাকে

বল্‌লাম "নবাব সাহেবকে আমার অনেক সেলাম জানিও; কিন্তু তোমার সেবা গ্রহণ করার আমার কোনও দরকার নেই; যেহেতু আমি ডাক্তার সাহেবের অতিথি।" সে কিন্তু নাছোড়বন্দ্। বল্‌ল, "আপনার সেবা আমি করবই। কারণ তা না হলে আমার নিস্তার নেই।" আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম যে, অধম নিস্তারণের ভার আমার নয়, সে ভার—কল্কি দেবের; কিন্তু উত্তরে সে আমাকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিল যে, যেহেতু আমি technically নবাব সাহেবের মেহমান, সেহেতু আমার সেবা করার অধিকার তার মারে কে? বুঝলাম যে "হাঁ, সনাতন নবাবী অতিথি-সৎকার বটে!" এ সম্বন্ধে নবাবের ধারণা অভ্রভেদী। তিনি কোনও উৎসব উপলক্ষে রামপুর ষ্টেশনের প্রতি ট্রেণের যাত্রীদের উৎকৃষ্ট থলি-ভরা মিষ্টান্ন উপহার দিয়েছিলেন, তা আবার এক দিন নয় তিন দিন ধরে। অতএব আমি দেখ্‌লাম যে resignation রূপ গুণটির চর্চ্চা করাই শ্রেয়! নবাব সাহেবের আতিথ্য পাছে আমাদের দেশের আর কেউ গ্রহণ করেন, সেই আশঙ্কায়ই আমি এত কথা লিখ্‌তে বাধ্য হলাম।

সে যাই হোক্, রামপুরের একজন বড় ওস্তাদ মুস্তাক হুসেনের গান শুন্‌লাম, আর বিখ্যাত স্বনামধন্য উজীর খাঁর বীণা শুন্‌লাম। গান বিশেষ ভাল লাগ্‌ল না—কারণ (১) গায়কের গলা ভাল নয় (২) গায়কের গানের মধ্যে কোনও dignityর অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। শুধুই তান দেওয়া যে বড় আর্ট নয় ও অত্যন্ত শ্রান্তিকর, তার যদি কেউ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে যেন তিনি অন্ততঃ একবার রামপুরের মুস্তাক হুসেনের কিম্বা বম্বের বালগন্ধর্ব্বের গান শোনেন। উজীর খাঁ সাহেবের বীণা কিন্তু ভারি ভাল লাগ্‌ল। সেদিন বেশিক্ষণ শোনা হয়ে উঠ্‌ল না, কিন্তু একটি গৌড় সারঙ্গের আলাপেই খাঁসাহেবের অসাধারণ মিষ্ট হাতের পরিচয় পাওয়া গেল। তার পর বম্বেতে খ্যাতনামা তিলঙের বীণা শুনেছিলাম; কিন্তু খাঁ সাহেবের পর বড়ই সাধারণ লেগেছিল। সঙ্গীতের আর্ট ঠিক্ কোথায়, সে সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয় কারুর কারুর একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে, যদিও শিক্ষার অভাবে সেটা প্রায়ই তারা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারে না।

রামপুরে কোনও ধনী শিক্ষিতা (?) মুসলমান মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। এ রকম type সচরাচর চোখে পড়ে না; তাই এঁর সম্বন্ধে দুচারটি কথা লিখ্‌ব। ১৯১৬ সালে বরোদায় একটি সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তাতে ইনি একটি ছোট প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে, মাত্র ২৫ লক্ষ টাকায় কেমন করে একটি চলনসই রকমের সঙ্গীত-মন্দিরের (Musical Academy) গোড়া পত্তন করা যেতে পারে। তাতে বিদ্যালয়ের কি রকম ঘর হবে, কি রঙের পাথর হবে, কি ভাবের কারুকার্য্য হবে ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের কোনই অভাব ছিল না—কেবল অন্ন বস্ত্রের অভাব ছাড়া; অর্থাৎ কেমন করে ঐ যৎসামান্য ২৫ লক্ষ টাকা যে সংগ্রহ করা হবে, সেই সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সমাধান ছাড়া অন্য সব সমস্যারই সমাধান তিনি লিখেছিলেন। তিনি "বৎসরে অন্ততঃ চার মাস পর্ব্বতবাস না কর্লে চলে না" এরূপ ইঙ্গবঙ্গ সুলভ মনোভাব প্রকাশ কর্লেও, সে প্রবন্ধটিতে "The West has been proved to possess no real culture" রূপ কথা লিখে নিজের গভীর দেশভক্তির প্রমাণ দিতে ছাড়েন নি। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্লেন, কি ভাবে আমি সঙ্গীতের কাজ কর্ত্তে চাই। আমি উত্তর দিতে না দিতেই তিনি আমার মতটি ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিলেন। আমি দুই একবার তাঁর আরও দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ-প্রয়াস হয়ে শেষে তাঁর তেজোগর্ভ বাণী শুনতেই মনো-নিবেশ করা শ্রেয়ঃ মনে করলাম। তিনি আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, সঙ্গীতের কোনও academy কর্ত্তেই হবে এবং তদর্থে অভাব কেবল ছয়জন নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর। আমি টাকার কথা উল্লেখ কর্ত্তে না কর্ত্তে তিনি বল্লেন যে, টাকা কিছুই নয়, তিনি গাইকবাড়ের কাছ থেকে এক লাখ, মহীশূরের কাছ থেকে এক লাখ, রামপুরের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ইত্যাদি বিস্তর টাকা যোগাড় কর্ত্তে পারেন। আমি তার পর বল্লাম ভাল গায়ক পাওয়া সম্বন্ধে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, তিনি উদয়পুরের কাছ থেকে জাফরুদ্দিন, রামপুরের কাছ থেকে উজীর খাঁ, আলওয়ারের কাছ থেকে অল্লাবন্দে খাঁ প্রভৃতিকে শিক্ষার্থে যোগাড় করে আন্‌তে পারেন। ইত্যাদি নানান্ অকাট্য যুক্তিবলে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, শিক্ষক ও টাকা দুইয়েরই যোগাড় অত্যন্ত সহজ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গীত বিদ্যালয় কেন স্থাপিত হচ্ছে না—বিশেষতঃ তাঁর মতন পৃষ্ঠপোষক থাক্‌তে—এই সামান্য সমস্যাটির খুব সন্তোষজনক সমাধান যেন পাওয়া গেল না—যদিও তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অন্যান্য বিষয়ের মতন এ সমস্যার সমাধানটিও জলের ন্যায় সোজা ছিল।

তিনি আমাকে বল্লেন যে, জগতে এখন একমাত্র উজীর খাঁ আছেন, যিনি আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জানেন। আমি জাফরুদ্দিন, আবদুল করিম, অল্লাদিয়া খাঁ কেমন গান করেন জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি অবজ্ঞার সহিত হেসে বল্লেন "গায় বটে, কিন্তু উজীর খাঁর কাছে তারা গড় হ'য়ে যায়।" উজীর খাঁর কাছে তাদের এরূপভাবে সাষ্টাঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় থাক্‌লেও (কারণ আমাদের দেশের গায়ক-বাদকদের পক্ষে একের অপর কারুর গানবাজনার সুখ্যাতি করার সম্ভাবনা যে, কতদূর তা আমার অগোচর ছিল না) আমি সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ না করে ধীরে ধীরে বল্লাম যে, আমি গায়কদের কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম—বাদকদের নয়। উজীর খাঁ যন্ত্রী বটে কিন্তু গায়ক নন। এবং তাঁর গান আমার বিশেষ ভাল লাগেনি। এ কথা বল্‌বা মাত্র তন্ত্র-মহিলা মহা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, যেন আমি ওরূপ মত ভবিষ্যতে না প্রকাশ করি। তা কর্লে আমার জীবন সংশয় হবার সম্ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বল্লেন, পরিহাস প্রবৃত্তির স্থান অস্থান আছে; এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু না জান্‌লে "তাবচ্চ শোভতে অজ্ঞো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে।" আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে আশৈশব যৎসামান্য চর্চ্চা করেছি, এ কথাটি তাঁর কাণে পৌঁছল কি না জানি না; কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎই সোৎসাহে আমাকে তাঁর জ্বলন্ত বক্তৃতা দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তুল্‌বার চেষ্টায় বিরত হলেন না। পরিশেষে কিন্তু আমার নীরব মনোযোগে আমার প্রতি একান্ত তুষ্ট হয়ে আমাকে এই বর দিলেন যে, এক দিন আমি তাঁর ওখানে চা খেতে আস্‌তে পারি। আমি আমার জীবনের সে গৌরবময় মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় থাক্‌ব, এ কথা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ কর্লাম। শেক্‌সপীয়র বলেছেন যে দুঃখ না কি আমাদের অপ্রত্যাশিত শয়নসঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত করে থাকে *।

* Misery acquaints a man with strange bed-fellows—Shakespeare.

আমার যদি কখনও দিন আসে, তবে আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা পাব যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি খাটে যদি "শয়নসঙ্গী" কথাটির স্থলে "তর্কালাপসঙ্গী" কথাটি বসিয়ে দেওয়া যায়।

রামপুরের নবাবের আতিথ্য যেন আমি পুনরায় স্বীকার করি এই সর্ত্ত করে আমি রামপুর পরিত্যাগ কর্লাম।

বেরিলিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছিলাম; কিন্তু যেদিন আমি সেখানে গিয়াছিলাম, ঠিক্ সেদিনই সেখানকার কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী মিলে এক গানবাজনার আসর করে তুলেছিলেন। সেখানে বাংলাদেশ থেকে অত দূরে কীর্ত্তন শুন্‌তে শুন্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল ও মনে হচ্ছিল যে কীর্ত্তনের মধ্যে 'লম্ফঝম্পে'র অতিচার, খর্ত্তালের অত্যাচার ও গলাবাজির অনাচার কমিয়ে দিয়ে দরদ দিয়ে গাইলে তাতে রস নিতান্ত কম পাওয়া যায় না। মনে আছে একবার কোনও গণ্যমান্য লোকের বাড়ী একজন খুব বড় কীর্ত্তনিয়ার পালা শুন্‌তে গিয়েছিলাম। দোয়াররা ভগ্ন স্বরে দুরারোহ উচ্চ পর্দ্দায় আরোহণ করা রূপ অসাধ্য সাধনের এমন দুর্দ্ধর্ষ চেষ্টা কর্চ্ছিল ও তদুপরি খর্ত্তালের অত্যন্ত বেসুরো আর্ত্তনাদ এতই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে, আমি আমার কর্ণপটহে রীতিমত যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। এমন কি শেষে আমার সত্যসত্যই কাণে কাগজের ছিপি এঁটে বসে থাক্‌তে হয়েছিল; কারণ প্রকাশ্য সভায় কাণে আঙুল দিয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকা যেমন অসম্ভব, তেম্‌নি দৃষ্টিকটু। তখন আমার মনে হয়েছিল যে যদি কোনও সঙ্গীতজ্ঞ য়ুরোপীয় সেদিন সে আসরে উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে সেদিনকার ভারতীয় সঙ্গীত হতে তাঁর মতামত লিখ্‌তে হলে তিনি বোধ হয় লিখ্‌তেন:—"It is a popular error among us, Westerners, to think of Indian Music as purely melodic in contra-distinction to harmonic, for it is undoubtedly as far removed from any suspicion of melody as from harmony." অন্ততঃ এ কথা লিখ্‌লে আমি ত তাঁকে বিশেষ দোষ দিতে পারতাম না। কিন্তু কীর্ত্তন যে বাস্তবিকই কতটা melodic হতে পারে, তা এই সব আনুষঙ্গিকের অত্যাচার দূর কর্লে এক মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

বেরিলিতে এই আসরে আমার অনুরোধে ঘুরণ বলে সেখানকার একজন বড় মুসলমান গায়ককে আনা হয়েছিল। এমন চমৎকার টপ্পা বড় শোনা যায় না—বিশেষতঃ এমন সুন্দর টপ্পার দানা। আমাদের গিট্‌কারীর বা মূর্চ্ছনার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে তার পরিষ্কার হওয়ার উপর। ঘুরণের গিট্‌কারী শুন্‌লে এ কথার যাথার্থ্য আরও উপলব্ধি হবে।

আগ্রার তাজমহল যে কতখানি ভাল লাগ্‌ল তা বলে শেষ করে ওঠা কঠিন। তাজমহল দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায়ই কবিবরের অমৃতময়ী বর্ণনার কথা মনে হ'ত। তাতে তাজমহল-উপভোগের রস যেন আরও মধুর হয়ে ধরা দিত। এক শিল্পকলার উপভোগ অপর কোন কলার মধ্য দিয়ে যে কত সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে, তা "সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে"—রূপ এক ছত্রের বর্ণনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। এই সূত্রে আমার মনে হয়েছিল যে, বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে techniqueএর আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাক্‌লেও তাদের মধ্যে একটা সত্য মিলনের চিত্র আছে।

কিন্তু সে কথা থাকুক। তাজমহলের নানান সময়ে নানান্ রূপ। আকাশে অনুদিত অরুণচ্ছটার আলোয় তাজমহল এক রকম; উদীয়মান রক্ত-রবির রঙীন আলোয় এক রকম; দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল রূপালি আলোয় এক রকম; আবার সন্ধ্যায় চন্দ্রালোকের ম্লানমৌন গরিমায় অন্য এক রকম। নানান্ আলোয় যে কোনও মানুষী কীর্ত্তির রূপেরও এত রকম প্রকৃতিভেদ হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। পারিসের Notre-dame, মিলানোর Cathedral, রোমের Vatican, পিসার Leaning tower...এ সবের কোনও কিছুই তাজমহলের মত বহুরূপী নয়।

সাগর যায়গাটিতে আমার এক বন্ধু তাঁহাদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেলেন। এমন সুন্দর ছোট্ট সহর আমি খুব কমই দেখেছি। আমার বন্ধুবরের বাড়ীটি একেবারে একটি বিশাল নীলহ্রদের উপরে। সময়ে সময়ে হ্রদটির বক্ষে এমন চমৎকার নীল রঙ্ ফল্‌ত, যা দেখে আমার সুইজর্লণ্ডের হ্রদের কথা মনে হ'ত। অবশ্য সুইজর্লণ্ডের হ্রদগুলির মধ্যে অধিকাংশই ২০।২৫ মাইলেরও বেশি লম্বা, এবং সেখানকার তীরবর্ত্তী ঘরবাড়ীও অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু আমার মনে হ'ত যে সাগরের হ্রদটিও যদি তেমন শিল্পীর হাতে পড়ে, তবে সে এর রূপ শতগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। সাগরে ডিসেম্বর মাসের শেষেও শীত খুবই কম—বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ আগ্রার তুলনায়। সাগরের জলবায়ু তাই একটা মস্ত আকর্ষণ। সেখানে সুন্দর সুন্দর বনপথও আছে। শুন্‌লাম সেখানে বাঘও পাওয়া যায়। তবে এ তথ্যটিতে আমার মনে যে খুব গভীর হর্ষের উদয় হয়নি তা বলাই বেশি।

সেখান থেকে বেরারে আমার এক বন্ধুর ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। বেরার প্রদেশটি বেশ শৈলময়। কাজেই দেখ্‌তেও মনোহর। পথঘাটের উচ্চ নীচতা আমাদের কাছে সমতলতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক কেন, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞবিদ্‌রা ভাবেন না কেন বোঝা যায় না, বিশেষতঃ যখন তাঁরা প্রত্যহই "আমার আঙুলটা আছে কি নেই", "বিছানার চাদরটার রং সাদা কি না" এরূপ বিষয় নিয়েও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কর্ত্তে পশ্চাৎপদ হন না। বেরারের লোকে দেখা গেল তুলো ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা কয় না। কারণ জিজ্ঞাসা কর্লে বলে "Nothing like তুলো"। আমার বন্ধুবর এমন তুলোধ্যান-তুলোজ্ঞান দেশে আছেন কেমন করে জিজ্ঞাসা করাতে এমন একটা উত্তর পাওয়া গেল যাকে তিনি ছাড়া অপর কারুরই একটা পরিচারু উত্তর বলে মনে করার সম্ভাবনা নেই। আমরা সকলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ অনুযায়ী ঘাড়োয়ারী হলে আমাদের কথাবার্ত্তা কি রকম প্রণালীতে প্রবাহিত হবে, তা যদি কেউ জান্‌তে চান, তবে যেন তিনি একবার বেরারের মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসেন। একদিন সেখানে দুজন বেশ সুশ্রী ইংরাজকে ষ্টেশনে দেখ্‌লাম। দুচারজন বেশ গণ্যমান্য ভারতীয় ব্যবসায়ী তাঁদের ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ ভদ্রলোক দুটি বেশ সুদর্শন ও refined মনে হ'লেও তাঁদের মুখেও অনর্গল কেবল তুলোর মহিমাকীর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছুই শোনা গেল না। আমার মনে হ'ল সেই কবির কথা, যিনি বলেছিলেন "Of all the saddest thought the saddest is, what we might have been!" বেরারের আপামর সাধারণের কথাগুলি ও পরে বম্বের ভাটিয়াদের দেখে

আমার উপরিউক্ত কবির কথা মনে হয়েছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে সংশয়ও জেগেছিল যে সব সময়েই "কি হতে পার্ত্তাম কিন্তু হই নি" চিন্তাটি দুঃখময় কি না।

বোধাইয়ে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক লোক—যার সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁর নাম বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। এঁর সম্বন্ধে দুচারটে কথা বিস্তারিত ভাবেই লেখা দরকার মনে করি। কারণ এঁর মতন আমাদের সঙ্গীতের সাধক ও পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর নেই বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও থিওরেটিকাল দিকের চর্চ্চায় কোনও শিক্ষিত লোকই বোধ হয় এঁর মতন একান্তভাবে জীবন উৎসর্গ করেন নি। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই এঁর নাম সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে বিদিত; ও এঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নয় এমন কোনও অভিজ্ঞ লোক আমি খুঁজে পাই নি। ইনি বাল্যে দারিদ্র্যের কোলেই মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ১৮৭৬ সাল হতে গান বাজনা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝেও ইনি সঙ্গীতচর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নি। এঁর জীবনের অনেক কাহিনীই আমি এঁর কাছে শুনেছিলাম—কারণ আমি বম্বে অবস্থানকালে প্রায়ই এঁর সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা বিষয় শিখ্‌তে যেতাম এবং সেই সূত্রে একথায় ও কথায় তিনি তাঁর সঙ্গীত-সাধনার অনেক গল্পই আমার কাছে করেছিলেন। ইনি পঞ্চাশ বৎসর ধরে ওকালতী করে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্য কিছু সঞ্চয় করে শেষ জীবনটা সম্পূর্ণ সঙ্গীতের সেবায় উৎসর্গ করবেন ঠিক করেছিলেন এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সে সঙ্কল্প কাজেও পরিণত করে গত ১৪।১৫ বৎসর একটানাভাবে সঙ্গীত-সাধনা করে আস্‌ছেন। অশিক্ষিত ওস্তাদদের কাছে যে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর কত লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হয় ও কত সময় যে অপব্যয় কর্ত্তে হয়, সে বিষয়ে স্বয়ং ভুক্তভোগী হওয়ার দরুণ ইনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর জন্য যথাসাধ্য সমস্ত রাগরাগিনীর স্বরলিপি ছাপিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক রাগরাগিনীর রূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সমেত ৩০০।৪০০ গান ইনি নিজে রচনা করে ছাপিয়াছেন। এ সব গানের নাম "লক্ষণ গীত"। একটা উদাহরণ দিলে এঁর এ পদ্ধতির কৌশলটি বিশদ হবে বোধ হয়। ধরুন, রাগ বাগশ্রী। ইনি লিখ্‌ছেন—

বাগশ্রী—ঝাঁপতাল।

গাওয়ে বাগেশ্বরী, মহু লগত সুর গ নি
খর হার প্রিয়া ঠাঠ তীবর করত ধ রি
মধ্যম করে জান সম্‌বাদী সামান

ব ব
))
পঞ্চম করে অল্‌প সা সা নি ধা নি সা সা

ব ব ব ব,
))))
মা মা গা মা ধা নি ধা মা পা গা গা রে সা

শিক্ষার্থীর পক্ষে এসব গান শেখা যে তার স্মৃতির কতটা সহায়তা করে, তা সকল শিক্ষার্থীই জানেন। ভাতখণ্ডে মহোদয়ের উদ্যমে স্থাপিত অধুনাতন বিখ্যাত গোয়ালিয়র স্কুলে এঁর পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার্থীদের গান শেখান হয়। সেজন্য ইনি সেখানকার ৫।৬ জন শিক্ষককে স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে তৈরি করেন। সেখানে ছেলেদের গান বাজনায় পারদর্শিতা আমি নিজে মাস চারেক আগে দেখে এসেছিলাম এবং তখনই প্রথম ভাতখণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী দেখে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেছিলাম মনে আছে। গোয়ালিয়র স্কুলে ভাতখণ্ডে মহোদয় বছরে বার দুই স্বয়ং সেখানকার কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন কর্ত্তে যান এবং সেই সময়ে রাজপুতানায় দুচারজন বড় বড় গায়কের কাছ থেকে পুরাতন গানের স্বরলিপি করে নিয়ে আসেন। এঁর স্বরজ্ঞান এত অদ্ভুত যে, একবার শোনামাত্র ইনি যে কোনও তান বা আলাপের স্বরলিপি লিখে নিতে পারেন। তা না কর্ত্তে পারলে তিনি এত অগণ্য ধ্রুপদ খেয়াল সংগ্রহ কর্ত্তে পার্ত্তেন না। গোয়ালিয়র স্কুলে এঁর ছাত্রদেরও এঁর পদ্ধতি অনুসারে এমন সুন্দরভাবে স্বরলিপি শেখানো হয় যে, তারাও একটা নূতন গান শুন্‌লে প্রায়ই তার স্বরলিপি লিখে নিতে পারে। আমি সেখানে একটি ছোট ছেলেকে আমার কোনও ইতালিয়ান গানের দ্রুত-হস্তে স্বরলিপি লিখে নেওয়া দেখে ভারি খুসি হয়েছিলাম মনে আছে। ভাতখণ্ডে মহাশয় সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে কত যে দুর্লভ সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন, তার আর সীমা নেই। আমাদের সঙ্গীতের সংস্কৃত শাস্ত্রসম্বন্ধে এঁর চেয়ে বড় authority ভারতে কেউ নেই, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইনি সে সব বইয়ের অনেকগুলিই

প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে কতকগুলির নাম যথা, শ্রীমদ্রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর, রাগচন্দ্রিকা, সঙ্গীতসুধাকর, অষ্টোত্তরশতরাগলক্ষণম্, রাগতরঙ্গিণী, রাগতত্ত্ববোধ, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকাসার ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি এ ছাড়াও অন্ততঃ ২০।২৫ খানা বই লিখেছেন, কিন্তু এ সমস্ত বইয়ের কাটতি খুব কম হওয়া সত্ত্বেও তার লাভের এক পয়সাও নিজে গ্রহণ করেন না—বহুল প্রচারের জন্য সব বই-ই cost-priceএ বিক্রয় করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা যখন গোয়ালিয়রে স্কুল করবার জন্য ভাতখণ্ডেকে মোটা মাহিনার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বম্বে সহর ছেড়ে গোয়ালিয়রে বাস করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তখন ভাতখণ্ডে মহাশয় উত্তর দেন, "আমি বম্বেতে ১০০।১৫০ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ভার নিয়ে একটা স্কুল চালাচ্ছি, তাই গোয়ালিয়রে গিয়ে বসবাস কর্ত্তে পারি না। তবে আমি সেখানকার স্কুল Organize ও মাঝে মাঝে পরিদর্শন করার ভার নিতে খুবই রাজী আছি, এবং সেজন্য শিক্ষকদের তৈরি করে নেওয়া, text-book প্রণয়ন করা সবই কর্ত্তে সম্মত আছি। তবে এ সব কাজের জন্য আমি একটি পয়সাও চাই নে, কারণ আমার যৎসামান্য যা আছে তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তবে আপনি হাজার টাকা মাহিনা দিলেও আমি আমার বম্বের কাজ ত্যাগ করে গোয়ালিয়রে যেতে পারব না।" ইনি ব্রাহ্মণ এবং সত্যকার ব্রাহ্মণ, জ্ঞানসাধক, নির্লোভ ও নিষ্কাম কর্ম্মী। আমাদের গৌরবের দিনে বোধ হয় এরকম ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি ছিল। য়ুরোপে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীতের জন্যও এরূপ অক্লান্ত সাধক আছেন, কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় ভাতখণ্ডেই একমাত্র এ বিষয়ে অগ্রণী। অন্ততঃ আমি ত বিস্তর সঙ্গীতজ্ঞ লোকের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাউকে সঙ্গীতের জন্য এরূপ যথার্থ সাধকের মতন জীবন উৎসর্গ করতে দেখি নি।

বম্বেতে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের এক তরুণ শিষ্যের গান শুনলাম। যুবকের নাম রতনজনকর। আই-এ পড়ে। বয়স ২০।২১ বৎসর। একে ভাতখণ্ডে মহোদয় নিজে খুব ভাল দরের তিন চার শ' খেয়াল শিখিয়ে বরোদার মহারাজাকে বলে কয়ে সেখানকার বিখ্যাত খেয়ালী ফৈয়াস খাঁর কাছে তানকর্ত্তব ভাল করে শিখবার জন্য পাঁচ বৎসরের জন্য বরোদায় পাঠায়ে দেন। কিন্তু অশিক্ষিত গাইয়ের শিষ্যত্ব কর্ত্তে হ'লে যে লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হয়, রতনজনকরের তার চেয়ে ঢের বেশি সহ্য কর্ত্তে হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে ফৈয়াস খাঁ তাকে মোটে ২৫খানি খোয়ালের বেশি শেখান নি। রতনজনকর শেষে বিরক্ত হয়ে চলে আসে; ও আমাকে বলেছিল তাকে এজন্য কত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়েছে—কতদিন কত ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কিছু শিখবার সুযোগ পায় নি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আমাকে আরও বলে "পাঁচ বৎসরে আমাকে মোটে পঁচিশখানি গান আদায় করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, যেখানে আমার ক্ষমতা ছিল সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একটি করে খেয়াল শেখবার।" বাস্তবিক এর গান অতি চমৎকার। আর খুব উচ্চ চালের গান। এমন সুন্দর ঢঙের খেয়াল খুব কমই শোনা যায়। তাছাড়া গলার তানকর্ত্তব অতি অসাধারণ। এক একটি রাগ এ ঘণ্টা দুই ধরে আলাপ কর্ত্তে পারে। এত অল্প বয়সে এরূপ অসামান্য কৃতিত্ব দুর্লভ। আর ভাতখণ্ডে মহোদয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি-গুণে এর স্বরজ্ঞানও অতি চমৎকার। প্রত্যেক দুরূহ তান নিয়েই এ তার সার্গম করে শোনাতে পারে। ভাতখণ্ডের কাছে এ যা শিখেছে, কর্ত্তে গেলে ফৈয়াস খাঁর কাছে তার চেয়ে বিশেষ বেশি শেখবার সুযোগ পায় নি। এর গান শুনে ভাতখণ্ডের শিক্ষা-পদ্ধতির মহিমা আরও উপলব্ধি করা গেল।

ভাতখণ্ডে আবার এই মার্চ্চ মাসে জয়পুরে অনেকগুলি ধ্রুপদ গান সংগ্রহ কর্ত্তে সেখানে মাসাধিককাল কাটিয়ে, গোয়ালিয়রের সঙ্গীতবিদ্যালয় পরিদর্শন করে, এপ্রিল মাসে রামপুরের গাইয়েদের কাছে আরও কিছু গান সংগ্রহ কর্ত্তে যাবেন। ৬৪।৬৫ বৎসর বয়সে সঙ্গীতের উদ্ধারের জন্য এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও পর্য্যটন করার উৎসাহের জন্য এঁর প্রতি ভক্তি না হয়েই পারে না। কলকাতায় আসবেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে আমাকে বললেন যে, যদি কলকাতার কোনও বড় গাইয়ের কাছে খান পঞ্চাশেক ধ্রুপদ সংগ্রহ করার সুযোগ পান, তবে সেখানে যেতে পারেন। আমি বাংলার ধ্রুপদীশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের কথা বলাতে ভাতখণ্ডে মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর ধ্রুপদ তিনি বম্বের এদিকে প্রচলিত করার জন্য স্বরলিপি করে ছাপাতে চান। অবশ্য এজন্য তিনি গোঁসাইজীর

ন ভূমিকাতেই স্বীকার কর্ব্বেন। গোঁসাইজী অত্যন্ত মহাশয় লোক, এ কথা বলাতে ভাতখণ্ডে মহাশয় এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আসতে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগের সম্বন্ধে আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগীদের কারুর কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি এত কথা লিখলাম। সত্যকার জ্ঞানী যে কত নম্র হন, তিনি যে নূতন তথ্যের জন্য কারুর কাছেই নত হতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তা এঁর মতন লোককে দেখলে বোঝা যায় বটে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত গায়ক-বাদকদের সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, তাঁরা সচরাচর কিরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ত, নির্ব্বোধ ও সঙ্গীতের রাগ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ। আমাদের দেশে ওস্তাদগণ সহজে নিজের পরিবারভুক্ত দুচারজনকে ছাড়া অপর কাউকে শিক্ষা দিতে চান না। এর ফলে এক একজন গুণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে কত সুন্দর রাগ রাগিনীর আলাপ চিরকালের জন্য লুপ্ত হয় তার ইয়ত্তা কে করবে! এটা যে কত বড় আক্ষেপের বিষয় তা সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেন। কত গভীর অন্ধতার ফলে যে সঙ্গীতজ্ঞ লোকের দ্বারাই সঙ্গীতের এ ভাবে বিলোপ সাধন সম্ভব, তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এরূপ অজ্ঞ ও মূঢ় গায়ক যে গর্ব্বোন্নত হবেন, সেটাও কিছু বিচিত্র নয়। আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আগ্রাতে এবার "সঙ্গীতের ইতিহাস" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর শেষ কথা এই ছিল যে, আমাদের সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরব যদি আবার ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে অশিক্ষিত পেশাদার সম্প্রদায়ের হাত হতে তার উদ্ধারের ভার উদার শিক্ষিত লোককেই নিতে হবে। একজন শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা এ পক্ষে কতখানি কাজ হওয়া সম্ভব, বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের মতন লোকই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। (আগামীবারে সমাপ্য)

চির-কুমার

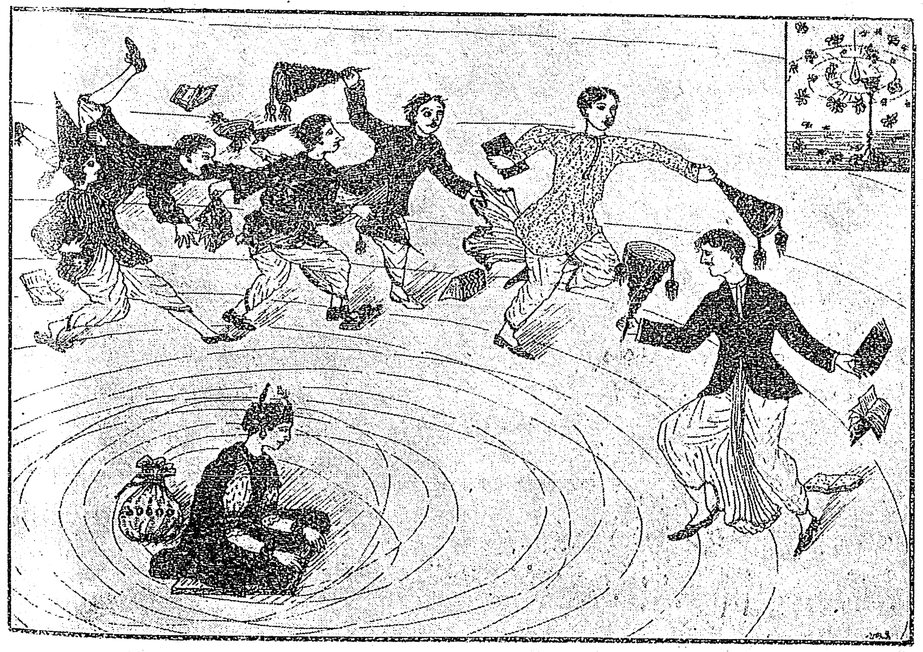

বিবাহ করিব না, এ প্রতিজ্ঞা তত দিন দৃঢ় থাকে, যত দিন না সন্তোষজনক পণের সঙ্গে সালঙ্কারা সুন্দরী কন্যা পাওয়া যায়।

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ

প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলির নাম যথা, শ্রীমদ্রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর, রাগচন্দ্রিকা, সঙ্গীতসুধাকর, অষ্টোত্তরশতরাগলক্ষণম্, রাগতরঙ্গিণী, রাগতত্ত্ববোধ, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকাসার ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি এ ছাড়াও অন্ততঃ ২০।২৫ খানা বই লিখেছেন, কিন্তু এ সমস্ত বইয়ের কাট্‌তি কম হওয়া সত্ত্বেও তার লাভের এক পয়সাও নিজে গ্রহণ করেন না—বহুল প্রচারের জন্য সব বই-ই cost-priceএ বিক্রয় করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা যখন গোয়ালিয়রে স্কুল করবার জন্য ভাতখণ্ডেকে মোটা মাহিনার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বম্বে সহর ছেড়ে গোয়ালিয়রে বাস্ করারজন্য নিমন্ত্রণ করেন, তখন ভাতখণ্ডে মহাশয় উত্তর দেন, "আমি বম্বেতে ১০০।১৫০ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ভার নিয়ে একটা স্কুল চালাচ্ছি, তাই গোয়ালিয়রে গিয়ে বসবাস কর্ত্তে পারি না। তবে আমি সেখানকার স্কুল Organize ও মাঝে মাঝে পরিদর্শন করার ভার নিতে খুবই রাজী আছি, এবং সেজন্য শিক্ষকদের তৈরি করে নেওয়া, text-book প্রণয়ন করা সবই কর্ত্তে সম্মত আছি। তবে এ সব কাজের জন্য আমি একটি পয়সাও চাই নে, কারণ আমার যৎসামান্য যা আছে তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তবে আপনি হাজার টাকা মাহিনা দিলেও আমি আমার বম্বের কাজ ত্যাগ করে গোয়ালিয়রে যেতে পারব না।" ইনি ব্রাহ্মণ এবং সত্যকার ব্রাহ্মণ, জ্ঞানসাধক, নির্লোভ ও নিষ্কাম কর্ম্মী। আমাদের গৌরবের দিনে বোধ হয় এরকম ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি ছিল। য়ুরোপে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীতের জন্যও এরূপ অক্লান্ত সাধক আছেন, কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় ভাতখণ্ডেই একমাত্র এ বিষয়ে অগ্রণী। অন্ততঃ আমি ত বিস্তর সঙ্গীতজ্ঞ লোকের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাউকে সঙ্গীতের জন্য এরূপ যথার্থ সাধকের মতন জীবন উৎসর্গ করতে দেখি নি।

বম্বেতে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের এক তরুণ শিষ্যের গান শুন্‌লাম। যুবকের নাম রতনজনকর। আই-এ পড়ে। বয়স ২০।২১ বৎসর। একে ভাতখণ্ডে মহোদয় নিজে খুব ভাল দরের তিন চার শ' খেয়াল শিখিয়ে বরোদার মহারাজাকে বলে কয়ে সেখানকার বিখ্যাত খেয়ালী ফৈয়াস খাঁর কাছে তানকর্ত্তব ভাল করে শিখ্‌বার জন্য পাঁচ বৎসরের জন্য বরোদায় পাঠায়ে দেন। কিন্তু অশিক্ষিত গাইয়ের শিষ্যত্ব কর্ত্তে হ'লে যে লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হয়, রতনজনকরের তার চেয়ে ঢের বেশি সহ্য কর্ত্তে হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে ফৈয়াস খাঁ তাকে মোটে ২৫খানি খোয়ালের বেশি শেখান নি। রতনজনকর শেষে বিরক্ত হয়ে চলে আসে; ও আমাকে বলেছিল তাকে এজন্য কত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়েছে—কতদিন কত ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কিছু শিখ্‌বার সুযোগ পায় নি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আমাকে আরও বলে "পাঁচ বৎসরে আমাকে মোটে পঁচিশখানি গান আদায় করে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়েছে, যেখানে আমার ক্ষমতা ছিল সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একটি করে খেয়াল শেখ্‌বার।" বাস্তবিক এর গান অতি চমৎকার। আর খুব উচ্চ চালের গান। এমন সুন্দর ঢঙের খেয়াল খুব কমই শোনা যায়। তাছাড়া গলার তানকর্ত্তব অতি অসাধারণ। এক একটি রাগ এ ঘণ্টা দুই ধরে আলাপ কর্ত্তে পারে। এত অল্প বয়সে এরূপ অসামান্য কৃতিত্ব দুর্লভ। আর ভাতখণ্ডে মহোদয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি-গুণে এর স্বরজ্ঞানও অতি চমৎকার। প্রত্যেক দুরূহ তান নিয়েই এ তার সার্গম করে শোনাতে পারে। ভাতখণ্ডের কাছে এ যা শিখেছে, ধর্ত্তে গেলে ফৈয়াস খাঁর কাছে তার চেয়ে বিশেষ বেশি শেখ্‌বার সুযোগ পায় নি। এর গান শুনে ভাতখণ্ডের শিক্ষা-পদ্ধতির মহিমা আরও উপলব্ধি করা গেল।

ভাতখণ্ডে আবার এই মার্চ্চ মাসে জয়পুরে অনেকগুলি ধ্রুপদ গান সংগ্রহ কর্ত্তে সেখানে মাসাধিককাল কাটিয়ে, গোয়ালিয়রের সঙ্গীতবিদ্যালয় পরিদর্শন করে, এপ্রিল মাসে রামপুরের গাইয়েদের কাছে আরও কিছু গান সংগ্রহ কর্ত্তে যাবেন। ৬৪।৬৫ বৎসর বয়সে সঙ্গীতের উদ্ধারের জন্য এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও পর্য্যটন করার উৎসাহের জন্য এঁর প্রতি ভক্তি না হয়েই পারে না। কল্‌কাতায় আস্‌বেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে আমাকে বল্‌লেন যে, যদি কল্‌কাতার কোনও বড় গাইয়ের কাছে খান পঞ্চাশেক ধ্রুপদ সংগ্রহ করার সুযোগ পান, তবে সেখানে যেতে পারেন। আমি বাংলার ধ্রুপদীশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের কথা বলাতে ভাতখণ্ডে মহাশয় জিজ্ঞাসা কল্লেন যে, তাঁর ধ্রুপদ তিনি বম্বের এদিকে প্রচলিত করার জন্য স্বরলিপি করে ছাপাতে চান। অবশ্য এজন্য তিনি গোঁসাইজীর

এ ভূমিকাতেই স্বীকার কর্ব্বেন। গোঁসাইজী অত্যন্ত মহাশয় লোক, এ কথা বলাতে ভাতখণ্ডে মহাশয় এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আস্‌তে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগের সম্বন্ধে আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগীদের কারুর কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি এত কথা লিখ্‌লাম। সত্যকার জ্ঞানী যে কত নম্র হন, তিনি যে নূতন তথ্যের জন্য কারুর কাছেই নত হতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তা এঁর মতন লোককে দেখ্‌লে বোঝা যায় বটে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত গায়ক-বাকদের সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, তাঁরা সচরাচর কিরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ত, বিদ্বেষী ও সঙ্গীতের রাগ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ। আমাদের দেশে ওস্তাদগণ সহজে নিজের পরিবারভুক্ত দুচারজনকে ছাড়া অপর কাউকে শিক্ষা দিতে চান না। এর ফলে এক একজন গুণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে কত সুন্দর রাগ রাগিনীর আলাপ চিরকালের জন্য লুপ্ত হয় তার ইয়ত্তা কে করবে! এটা যে কত বড় আক্ষেপের বিষয় তা সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেন। কত গভীর অন্ধতার ফলে যে সঙ্গীতজ্ঞ লোকের দ্বারাই সঙ্গীতের এ ভাবে বিলোপ সাধন সম্ভব, তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এরূপ অজ্ঞ ও মূঢ় গায়ক যে গর্ব্বোন্মত্ত হবেন, সেটাও কিছু বিচিত্র নয়। আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আগ্রাতে এবার "সঙ্গীতের ইতিহাস" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর শেষ কথা এই ছিল যে, আমাদের সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরব যদি আবার ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তবে অশিক্ষিত পেশাদার সম্প্রদায়ের হাত হতে তার উদ্ধারের ভার উদার শিক্ষিত লোককেই নিতে হবে। একজন শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা এ পক্ষে কতখানি কাজ হওয়া সম্ভব, বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের মতন লোকই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। (আগামীবারে সমাপ্য)

চির-কুমার



বিবাহ করিব না, এ প্রতিজ্ঞা তত দিন দৃঢ় থাকে, যত দিন না সন্তোষজনক পণের সঙ্গে সালঙ্কারা সুন্দরী কন্যা পাওয়া যায়।

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ

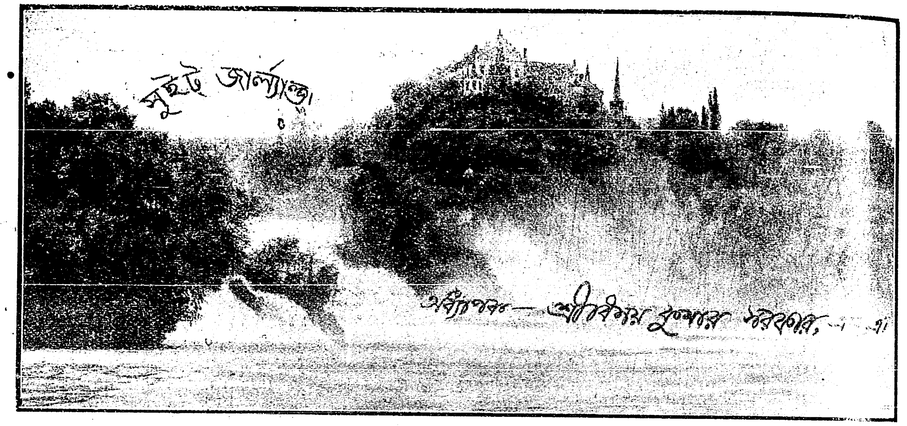

রাইন প্রপাত (শাফাউজেনের নিকট) [ফটো :—Wehrli, Zurich]

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

(১)

ষ্টুটগার্টের পথে সুইট্‌সার্লাণ্ডে পৌছিলাম। এই সহর দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণির এক বিপুল গৌরব-কেন্দ্র। মিন্‌খেন, ড্রেসডেন, কোল্‌ন্ ইত্যাদি সহরের মত ষ্টুটগার্টকে জার্ম্মান "কুল্‌টুরের" পীঠস্থান বিবেচনা করা চলে।

রঙ্গালয়, সঙ্গীত-ভবন ইত্যাদি ত আছেই। সুকুমার শিল্পের সংগ্রহালয় এবং অন্যান্য মিউজিয়াম ষ্টুটগার্টে কয়েক গণ্ডা। বার্লিনের শিল্পরসিকেরা জার্ম্মাণ শিল্প-কেন্দ্রের তালিকায় ষ্টুটগার্টকে কোনো মতেই ভুলে না। এখানকার "টেক্‌নিশে হোখ্‌শুলে" বা টেক্‌নিক্যাল কলেজে হাজার হাজার দেশী বিদেশী ছাত্র উচ্চতম অঙ্গের এঞ্জিনিয়ারিং এবং ফলিত-রসায়ন শিক্ষা করিতে পারে। অধিকন্তু কেতাব ছাপা এবং প্রকাশের ব্যবসায় ষ্টুটগার্টকে লাইপৎসিগ, মিনখেন ইত্যাদি সহরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি।

অতি সুরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর সহরের অবস্থান দেখিতে পাইলাম। জনপদকে "শোহ্বার্ট্‌স্‌হ্বাল্ড" বা কৃষ্ণবন বলে। পাহাড়ী অঞ্চল। গাছের ভিতর পাইনের সংখ্যা বেশী। গাঢ় সবুজের আভতা চোখে পড়ে বলিয়া বোধ হয় গোটা জনপদকে "শোহ্বার্ট্‌স্" বা কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আল্‌প্‌স পাহাড়ের উত্তর কোনরের অথবা পায়ের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মাণিকে উত্তর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জের বিবেচনা করা সঙ্গত। জার্ম্মাণ নরনারীরা শোহ্বার্টস্‌হ্বাল্ড অঞ্চলে গ্রীষ্ম কাটাইতে আসিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রবাসের আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে।

(২)

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। এবার কিছু তাড়াতাড়ি বরফ পড়া সুরু হইয়াছে। "কৃষ্ণবন" আগাগোড়া সাদা দেখিতেছি। কয়েক ঘণ্টায় শাফ্‌হাউজেনে আসিয়া গাড়ী ঠেকিল। এইখানে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সীমানা। ষ্টেশন ছাড়িবামাত্রই গাড়ী হইতে দেখা গেল "রাইণফাল" বা রাইণ-প্রপাত। নায়গ্রা প্রপাতের দৃশ্য স্মরণে আনিবার কোন কারণ পাইলাম না। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরিয়া দেখিবার মতন একটা জলপ্রপাত বটে।

গাড়ীর ভিতর সহযাত্রী একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অভিনেতা। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা থিয়েটারে অভিনয়

করিবার জন্য ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া জুরিখে চলিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন :—"সুইস গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ পর্য্যটকদিগকে কোনো মতেই পাসপোর্ট দিতে চায় না। জার্ম্মাণরা সুইট্‌সার্লাণ্ডে গণ্ডায় গণ্ডায় আড্ডা গাড়িতে থাকিলে, সুইস নরনারীর কর্ম্মাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভয়ে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে কড়া নিয়ম জারি করা হইয়াছে।"

একজন সুইস্ ব্যবসায়ী সপরিবারে বার্লিন হইতে দেশে ফিরিতেছেন। ইনি নিজে ফরাসী নারীর সন্তান। ইঁহার

(৩)

গাড়ী চলিতেছে পাহাড়ের পায়ে পায়ে,—উপত্যকার উপর দিয়া। দুই ধারে বিশেষ কোনো বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী চোখে পড়িল না। জমিন বরফে ঢাকা। চাষবাসের কোনো লক্ষণ নাই। অধিকন্তু শরৎ হেমন্তের শস্য কাটা হইয়া গিয়াছে। কাজেই রেলে বসিয়া এখন আর কোনো মতেই কিষাণ্ জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতে পারে না। পল্ল-

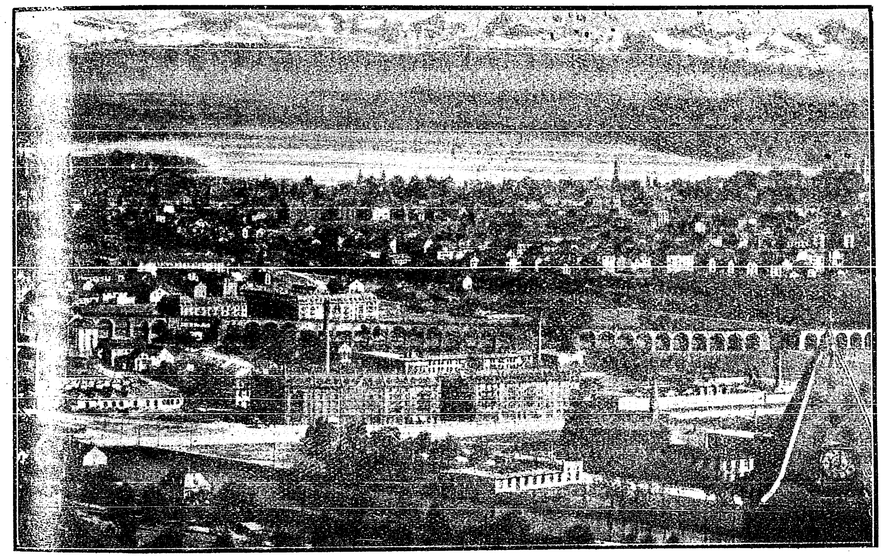

জুরিখ শহর

[ফটো :—Wehrli, Zurich]

পত্নীর জনক-জননী জার্ম্মাণ। ব্যবসায়ী মহাশয় অভিনেতাকে বলিলেন :—"সুইটসাল্যাণ্ড জার্ম্মাণিকে ভালবাসিবে কি করিয়া? জার্ম্মাণদের ভয়ে-ভয়ে আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয় যে! প্যারিসের অবস্থান যদি লিঅঁ শহরের ঠাঁইয়ে থাকিত, তাহা হইলে ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণ পল্টন সুইটসাল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইত না কি? তাহা হইলে আমাদের কপালে জুটিত ঠিক বেলজিয়ানদের দুর্দ্দশা। এই কারণেই সুইস সমাজে জার্ম্মাণদের আদর নাই।"

কুটীরের গড়নে কোনো বিশেষত্ব নাই। গির্জ্জার চূড়াও চোখে পড়িল না।

জুরিখে পৌছিতে পৌছিতে এক বড় গোছের নগর-জীবনের সমীপবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু শহরের ভিতর জনসমাগমের অথবা অন্য কোনো প্রকার বিপুলতার প্রভাব নাই। প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির তুলনায় জুরিখ নেহাৎ ছোট সন্দেহ নাই।

শহরটার ঠিক খাঁটি জার্ম্মাণ উচ্চারণ ভারত সন্তানের পক্ষে রপ্ত করা কঠিন। "জু"র স্থানে "ৎস্যি" এবং "ৎস্যু"

এই দুই আওয়াজের মাঝামাঝি একটা আওয়াজ অভ্যাস করা আবশ্যক। জার্ম্মাণরা ছাড়া আর কোনো জাতি এই উচ্চারণের জন্য মাথা ঘামায় না। ভারতবাসীও শহরটাকে সোজাসোজি জুরিখ বা এমন কি জুরিচ বলিয়া জানিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না।

(৪)

দেশটার নামই বা কি সোজা? এখানে তিন তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জাতির "স্বদেশ"। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে

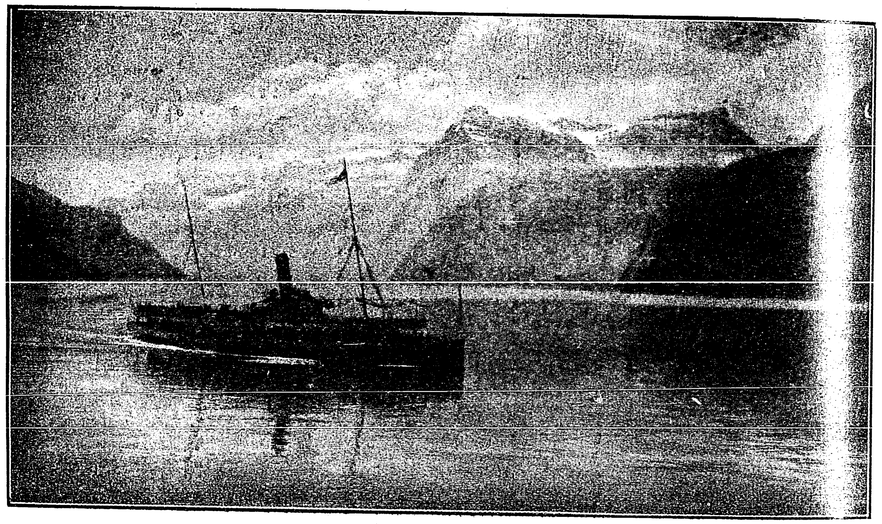

"ফিয়ার ল্যাণ্ড ষ্টেটার" হ্রদ (হিলহেল্মটেনের কাহিনীতে সুপ্রসিদ্ধ)
[ফটো :—Wehrli, Zurich]

স্বদেশকে ডাকিয়া থাকে। জার্ম্মাণরা বলে "শোহ্বাইট্‌স্" ফরাসী নাম "সুইস্," আর ইত্যালীয়ান ভাষায় এই দেশ "স্‌হ্বিট্‌সেরা"।

ভারতীয় ভাষায় এই দেশের নাম করণ কিরূপ হইবে, কোনো ভারতীয় ভূগোল-লেখক তাহার আলোচনা করেন নাই। আমরা বিলাতী নামটাই ইস্কুলে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। ভারতীয় ভাষা যথার্থরূপে সজীব ভাষা হইলে, এই দেশের নামকরণে আমরা খাঁটি স্বরাজ রক্ষা করিতে পারিতাম।

প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাতৃ ভাষার "ধাত্" অনুসারে বিদেশের শহর, পল্লীপ্রদেশ গুলির নাম গড়িয়া লয়। এই ধরণের নাম গড়িয়া লওয়া স্বাধীনতার এবং স্বতন্ত্র জীবনবত্তার এক মস্ত চিহ্ন। কেবল নাম সৃষ্টি করা মাত্র নয়। বিদেশী নামের উচ্চারণেও স্বরাজ চলিতেছে জগতের সকল স্বাধীন দেশে।

বিলাতী "লণ্ডোন"কে জার্ম্মাণরা জানে "লণ্ডন" বলিয়া। ইতালীয়ানদের ভাষায় বিলাতী শহরটা "লোন্দ্রা"। ফরাসী নাম "লোঁদ"। অতএব কোনো বিদেশী মুলুকের নাম করিতে হইলে ভারতবাসীকে ঠিক বিদেশী উচ্চারণটা জাহির করিতেই হইবে, এইরূপ ভাবা অসঙ্গত।

(৫)

ভারতে আমরা জানি, "গোআলিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ" আসে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড হইতে। হোটেলে সকাল বেলা খাইতে বসিয়া দেখি, টেবিলের উপর প্রকাণ্ড এক ভাঁড় বিশেষ দুধে ভরা। ভাবিলাম, দুধের বাথানে যখন আসিয়াছি, তখন দুধ জলের মতনই বোধ হয় সস্তা। অধিকন্তু বার্লিনে কিম্বা জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরে দুধের দেখা পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য ছিল। কাজেই সুইস জাতিকে

গোআলা জাতিরূপে বিবৃত করিতে সহজেই প্রলুব্ধ হইতেছি। এমন সময়ে একজন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক বলিলেন :—"দুধ, মাখন, পনির ইত্যাদির দাম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে খুব বেশী। দেশদেশান্তরে এত রপ্তানি হয় যে, সুইসরা অনেক সময় দুধের চেহারা দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। অধিকন্তু, দুধের চাষ হয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম জনপদে। জুরিখ ইত্যাদি অঞ্চলে গোআলার ব্যবসা বড় ব্যবসা নয়।"

নেস্‌লে কোম্পানীর "কন্‌ডেন্‌স্‌ড্" দুধ ভারতে সু-

(৬)

এক জার্ম্মাণ পরিবার আট দশ বৎসর জুরিখে আছেন। ইঁহারা বলিতেছেন :—"জুরিখে জার্ম্মাণ ভাষী সুইসদের জীবন-কেন্দ্র বটে। কিন্তু খাঁটি জার্ম্মাণ সমাজকে এই সকল সুইসরাও ভাল চোখে দেখে না। আমরা এ দেশে নেহাৎ বিদেশী রূপে চলাফেরা করি। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড-প্রবাসী জার্ম্মাণ নরনারীরা নিজেদের ভিতর লেনদেন আলাপ আপ্যায়ন আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য। আমাদের সঙ্গে সুইস-

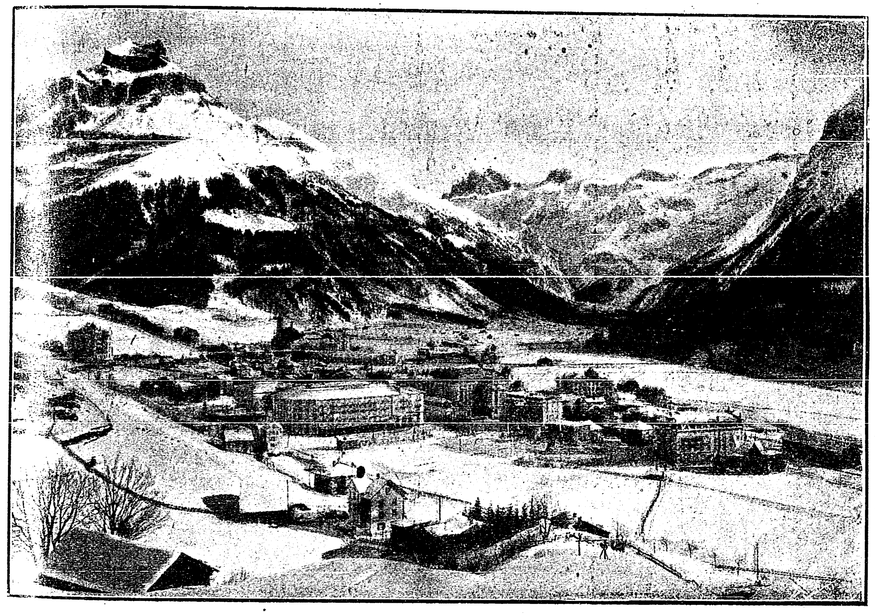

এঙ্গেলবার্গ শহর (সুইটসার্ল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধ)
[ফটো :—Wehrli, Zurich]

প্রসিদ্ধ! নেস্‌লে একজন ফরাসী জাতীয় সুইস। পশ্চিম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক পল্লীতে বা ছোট শহরে নেস্‌লের কারখানা অবস্থিত।

কায়রোর হোটেলে এবং মিশরের অন্যান্য হোটেলে বসবাস করিবার সময় সুইস জাতিকে বাবরচি রূপে প্রথম চিনি। তখন ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুইসরা রাঁধে ভাল। জুরিখে আসিয়া বুঝিতেছি, সুইসদের এই যশটা একমাত্র বিদেশেই আবদ্ধ থাকিবার জিনিস নয়।

জার্ম্মাণদের সামাজিক আসা-যাওয়া এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

জুরিখে এক মাঝারি গোছের দোকানে স্যাক্সনির এক জার্ম্মাণ যুবা উচ্চতর পদে চাকরী করিতেছেন। ইঁহাকে দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা—বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই সুইস—চক্ষুঃশূল বিবেচনা করিয়া থাকে। কথা-বার্ত্তায় বুঝা গেল যে, জার্ম্মাণির লোকেরা উত্তর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা সুইস কারবারে মোটা মাহিয়ানা ভোগ

করিয়া আসিতেছে। সুইসরা জার্ম্মাণদের হুকুম তামিল করিয়া চলে। ইহাও এক প্রকার "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে," এবং অনেকটা "পরদীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

জার্ম্মাণির জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে, সুইস-জার্ম্মাণদের "স্বদেশী" আন্দোলন বুঝিয়া উঠা যে-কোনো রক্তমাংসের মানুষের পক্ষেই অতি সোজা কথা।

(৭)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নর নারী ফরাসী গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে

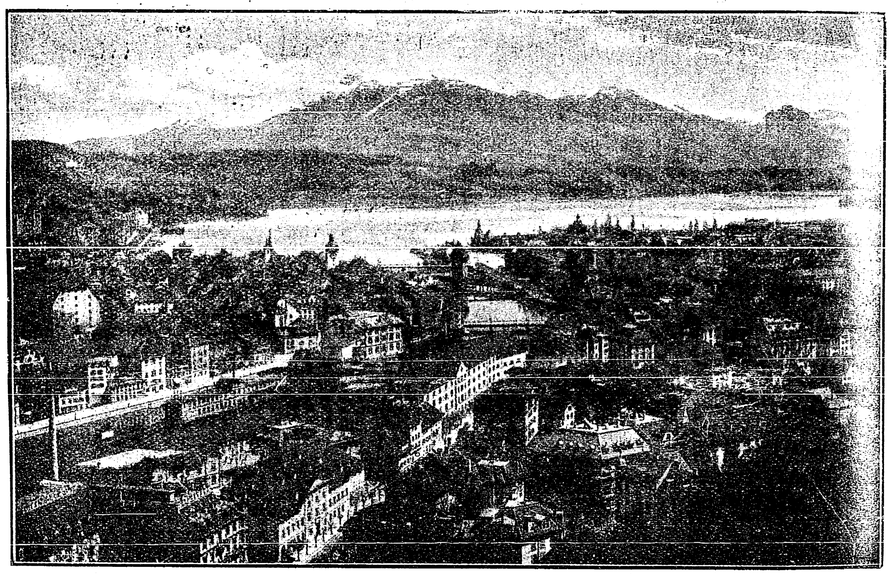

লুৎসার্ণ শহর
[ফটো :—Wehrli, Zurich]

ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া পঁয়কারের সঙ্গে সুইস দরবারের চিঠি-পত্র চলিতেছিল। একটা সমঝোতা কায়েম হইবার আশা করা হইতেছিল। কিন্তু ফ্রান্স কড়া মেজাজের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই ঝগড়া পাকিয়া উঠিতে চলিল।

ঝগড়াটা চলিতেছিল জেনেহ্বা শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানার নিকটবর্ত্তী ফরাসী জনপদের বাণিজ্য-পথ লইয়া। জনপদটা দুই জেলায় বিভক্ত :—তৎ সাহোআ এবং গেক্স্। জেলা দুইটা ফ্রান্সের অন্তর্গত। জেনেহ্বা অবশ্য সুইস রিপাব্লিকের অন্তর্গত নগর। এখানে ফরাসী ভাষার রেওয়াজ। জুরিখ যেমন সুইস সমাজে জার্ম্মাণ "কুল্টুরের" কেন্দ্র, জেনেহ্বা সেইরূপ সুইটসার্ল্যাণ্ডের ফরাসী সভ্যতার পীঠস্থান। জেনেহ্বার জার্ম্মাণ নাম গেন্‌ফ্। ফরাসীরা ইহাকে বলে জেনেহ্ব।

১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সুইস এবং ফরাসী রাষ্ট্রে একটা সন্ধিপত্র সহি করা হয়। শর্ত্ত ছিল এই যে, জেনেহ্বার সুইস-ফরাসীরা ফ্রান্সের জেলা দুইটায় বিনা শুল্কে কেনা-বেচা করিতে পারিবে। দুই দেশের ভিতর যে রাষ্ট্রীয় সীমানা আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেই সীমানা স্বীকার করা হইবে না।

এই অবাধ বাণিজ্যের সুযোগে সুইস নগরটা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিয়াছে। তৎ সাহোআ এবং গেক্স্ জেলা দুইটার ফরাসী প্রজারাও শস্তায় সুইস মাল খরিদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার তরফ হইতে ফরাসী জাতিকে অনেকটা খর্ব্বতা স্বীকার করিয়া চলিতে

হইয়াছে। ফ্রান্স একশ' বৎসর ধরিয়া নিজ স্বাধীনতার আংশিক লোপ সহ্য করিয়াছে। পঁয়কারে এই অবস্থা আর বেশী দিন টিকিতে দিতে রাজি নন। বাণিজ্যের সীমানাকে রাষ্ট্রীয় সীমানায় না ঠেকাইয়া ইনি শান্ত হইবেন না।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ক্ষমতা অতি অল্প। ১৮১৫-১৬ সালের সন্ধিপত্র ছাড়া সুইস জাতির স্বপক্ষে কোনো যুক্তিও বাস্তবিক পক্ষে ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু জেনেহ্বার আর্থিক অবস্থায় বিশেষ দুর্গতি

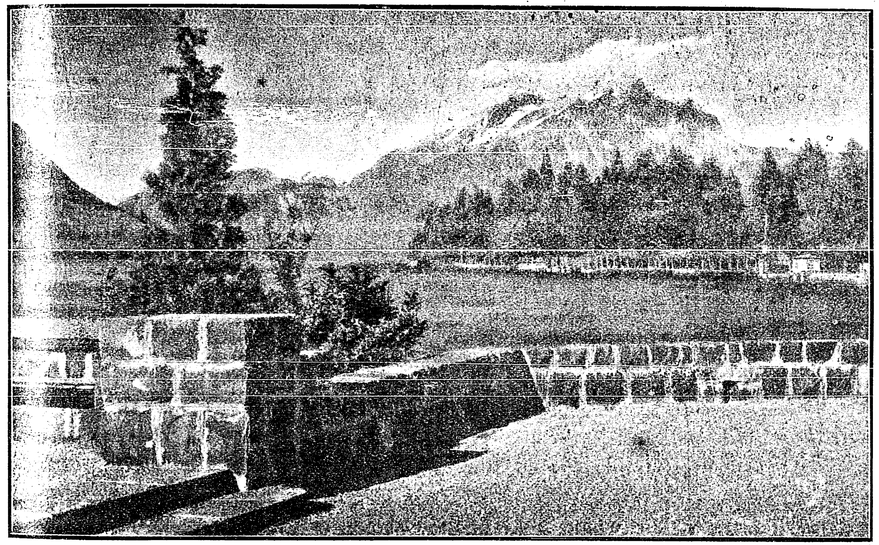

পিলাটুস্ (সুইস্ আল্পসের প্রসিদ্ধ গিরিশৃঙ্গ। হোগিস্ শহর হইতে ছবি তোলা হইয়াছে)
[ফটো :—Gaberell, Zurich]

ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে যতগুলা পঞ্চায়ৎ আছে, সর্ব্বত্র মজলিস্ বসিয়াছিল। সকলে মিলিয়া একস্বরে বার্ণ্ শহরের যুক্তরাষ্ট্রের দরবারকে জানাইয়াছিল যে, পঁয়কারের প্রস্তাব কোনো মতেই গ্রাহ্য করা হইবে না। ফেডার‍্যাল দরবার ফরাসী গবর্মেণ্টকে সুইস নর-নারীর মত জানাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু পঁয়কারে কথা কাটাকাটিতে সময় নষ্ট করিবার পাত্র নন। ১০ নবেম্বর তারিখে ফরাসী শুল্ক-আফিস জেনেহ্বার দুয়ারে বসানো হইয়াছে। জেনেহ্বা হইতে তৎ সাহোআ জেলায় সওদা কেনা বেচা করিবার উপর মাশুল চড়ানো হইয়াছে। এমন কি সাইকেল, অটো-মোবিল ইত্যাদি যান ব্যবহারের জন্যও "পাশ" অর্থাৎ ট্যাক্স আবশ্যক। সুইস জাতি ফ্রান্সের জুলুম কতখানি সহ্য করিবে, সর্ব্বত্র তাহার আলোচনা চলিতেছে।

(৮)

জেনেহ্বা ফরাসী-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক জগৎ-প্রসিদ্ধ নগর। দুনিয়ার ইতিহাসে এই নগরে অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার আশ্রয় স্থান রূপে বহু নির্য্যাতিত নর-নারী এই নগরে আড্ডা গাড়িয়াছেন। কাজেই জেনেহ্বা ভারতেও অপরিচিত নয়।

সম্প্রতি সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আর এক ফরাসী কেন্দ্র ভারতে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। তাহার নাম লোজান (জার্ম্মাণ উচ্চারণ লাওজান)। এই শহরেই আঙ্গোরার যুবকতুর্ক তাহার বিজয়লাভের সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

আজকাল লোজানে এক মস্ত বড় মোকদ্দমা চলিতে-

ছিল। সোভিয়েট রুশিয়া শ্রীযুক্ত হোরোব্স্কিকে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। কন্‌রাড়ি নামক একজন সুইস তাহাকে হত্যা করে। বিচারে প্রকাশ যে, সোভিয়েট গবর্মেণ্ট বহু ধনী সুইসের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করিয়াছে। অনেক নির্দ্দোষ সুইস নরনারী মস্কো শহরে বোলশেভিকদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সহিতে বাধ্য হইয়াছে। কন্‌রাড়ি নিজে একজন ধনী লোক। রুশিয়ায় ইঁহার বড় ব্যবসা ছিল। ইনিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এই সকল জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য কন্‌রাড়ি রুশ প্রতিনিধিকে খুন করিয়াছে। আদালতের রায়ে কন্‌রাড়ি খালাশ হইল।

সুইসরা খুসী। সকলে বলাবলি করিতেছে—"এইবার রুশিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডকে যমের মতন শত্রু বিবেচনা করিবে।" কিন্তু কোনো কোনো সুইসের মুখে শুনিতেছি :—"রুশ গবর্মেণ্ট সরকারী হিসাবে সকল রাষ্ট্রের উপরই জুলুম চালাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য কোনো রুশ ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনা করা যায় কি? হোরোব্স্কিকে কন্‌রাড়ি খুন করিয়াছে, ইহা একটা ব্যক্তিগত খুনাখুনির মামলা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির আড়াআড়ি ঢুকানো বে-আইনি। সুইস আদালতের বিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। কন্‌রাড়িকে দোষী সাব্যস্ত করাই উচিত ছিল।" বাজেল শহরের "নাট্‌সিওনাল ৎসাইটুঙ্" এই অবিচারের জন্য সুইস জুরির এবং সুইস আদালতের যারপর নাই নিন্দা করিতেছে। কাগজটা সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক উদারপন্থী দৈনিক।

বস্তুতঃ জুরির ভিতর মাত্র চারজনের মত ছিল কন্‌রাড়ির স্বপক্ষে। পাঁচজন মত দিয়াছিল বিরুদ্ধে। অন্ততঃ ছয়জন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহার সাজা হইত। জুরির দুই-তৃতীয়াংশ একমত না হইলে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে আসামীর সাজা হয় না।

(৯)

জুরেখের "ক্যাণ্টন" সভায় ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। ক্যাণ্টন শব্দে জেলা বুঝিতে হইবে।

সুইসরা প্রধানতঃ ৎসুইংলি-পন্থী ধর্ম্ম-সংস্কারের মত মানিয়া চলে। জার্ম্মাণিতে লুথারের যে ঠাঁই, ফ্রান্সে ক্যালভিনের যে ঠাঁই, সুইস সমাজে ৎসুইংলির সেই ঠাঁই। এই তিন ধর্ম্ম প্রচারকই কাথলিক মতের বিরুদ্ধে দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুইস নরনারীর ভিতর—অন্ততঃ জার্ম্মাণ-সুইস সমাজে ৎসুইংলির প্রভাব প্রবল। ক্যাথলিক মতের লোক, গির্জ্জা এবং পুরোহিতের সংখ্যাও মন্দ নয়।

ক্যাণ্টন-সভায় একজন ক্যাথলিক পুরোহিত বলিয়াছেন :—সরকারী অবৈতনিক পাঠশালায় প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা অবশ্য-গ্রহণীয় রূপে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তবে ক্যাথলিক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে ৎসুইংলি-পন্থীদের আওতায় ক্যাথলিক নর-নারীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হইবে।"

এই বিষয়ে "রুশচিয়ান-সোসালিষ্ট"দের সঙ্গে ক্যাথলিকরা একমত। কিন্তু "এহ্বাঙ্গেলিষ্ট" নামক ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা একদম উল্টা কথা বলেন। ইঁহাদের এক পুরোহিত সভায় বলিয়াছেন :—"পাঠশালায় ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করাই যুক্তিসঙ্গত। কেন না, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন। এই সকলগুলার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কোনো ধর্ম্মশিক্ষক মত প্রচার করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সম্প্রদায়গুলার বহির্ভূত একটা তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্ম আবিষ্কার করা অসম্ভব।" একজন "ডেমোক্র্যাটিক" প্রতিনিধি এবং একজন কিষাণ প্রতিনিধি এহ্বাঙ্গেলিষ্ট পাদ্রীর মতে সায় দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশিক্ষার বদলে নীতি শিক্ষা কায়েম করা হউক।" এই সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বলেন :—"ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসাধ্য।"

জুরিখের জেলা-সভায়ও কমিউনিষ্ট মতের প্রতিনিধি আছে। ইঁহারা বলেন :—"জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-বিভাগটা এখনই উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা যারপরনাই কম। অনর্থক খরচ। অধিকন্তু এই বিভাগের সাহায্যে মজুর ও কিষাণদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কোনো মতেই সহজ-সাধ্য হয় না।"

(১০)

বার্ণ শহর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের প্রায় মধ্যস্থলে কিছু পশ্চিম-ঘেঁসা। এইখানে ফেডার‍্যাল দরবারের সরকারী কেন্দ্র। আমেরিকার ওয়াশিংটনের মতন সুইস রাষ্ট্র-

বার্ণের নামও জগতে বেশী সুপরিচিত নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের মত এখানকার জুরিখই প্রায় সকল কর্ম্মক্ষেত্রে রাজধানী বিশেষ। "বুন্ড্" নামক একটা দৈনিক প্রকাশিত হয় বার্ণ শহরে। এইটাকে সরকারী ইস্তাহারের গেজেট বলা চলে। বেশী লোকে পড়ে না।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় কাগজ বলিলে জুরিখের "নয়ে ৎসুরিখার ৎসাইটুঙ" অথবা জেনেভার "জুর্ণাল দ' জেনেভ" ইত্যাদি দৈনিক বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ৎসাইটুঙ" ছাপা হয় জার্ম্মাণ ভাষায়। দিনে এইটার তিন সংস্করণ বাহির হয়। "জুর্ণাল" ফরাসী ভাষার কাগজ। দুইবার করিয়া ছাপা হয়। দৈনিক দুইটাই শিল্প ও ব্যবসায়ওয়ালাদের মুখপত্রী বার্লিনের "টাগেব্লাট" ও "ডয়েচে আল্‌গে মাইনে ৎসাইটুঙ" অথবা ফ্রাঙ্কফুর্টের "ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুঙ" ইত্যাদি কাগজের মতন ইহাদের প্রভাব। রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে। ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে যে প্রভেদ, সুইস সমাজের জেনেভায় এবং জুরিখেও প্রায় সেইরূপ প্রভেদ ধরিয়া লওয়া চলিতে পারে।

(১১)

জুরিখে পৌঁছিয়া ভাবিলাম, শহরের অলিতে গলিতে গণ্ডা গণ্ডা ঘড়ির কারখানা অথবা ঘড়ির দোকান দেখিব। কেন না, ছেলেবেলা হইতেই সুইস ঘড়ির নাম ভারতের সকলেই জানে! "নেস্‌লের" দুধের মতন "কুরভোয়াজে" কোম্পানীর ঘড়িও আমাদের দেশে সুইস জাতির প্রতিনিধি-বিশেষ।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘড়ির দোকান জুরিখে চোখেই পড়িতেছে না বলা চলে। কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, ঘড়ি তৈয়ারি হয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী অঞ্চলে,—অর্থাৎ পশ্চিম জেলাগুলায়। ফরাসী-সুইসরাই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের গোআলা এবং ঘড়ির কারিগর। জুরিখে এঞ্জিনিয়ারিং ঘটিত যন্ত্রপাতি, তড়িতের কারখানার আসবাব ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে একটা মাত্র টেক্‌নিক্যাল কলেজ,—সেইটা জুরিখেই অবস্থিত।

নয়শাতল-জেলাটার প্রত্যেক পল্লীই ঘড়ির কারখানায় এবং ঘড়ির দোকানে ভরা। এই জেলার অন্তর্গত লাশো-দর্ফো গ্রামকে ঘড়ি-শিল্পের উৎপত্তি স্থান এবং বর্ত্তমান কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়। এই গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই ঘড়ির কাজে নিযুক্ত।

সুইটসার্ল্যাণ্ড হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর ঘড়ি দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়। এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ৫,৫১৩, ২৫৫টা ঘড়ি বিদেশে গিয়াছে। এই গুলার সমবেত দাম ৭৮,০২০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার কোটি ভারতীয় টাকা।

নয়শাতল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলিতেছেন :—"এমন কি দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও সুইসরা নিজ নিজ ঘরে বসিয়া সপরিবারে ঘড়ি নির্ম্মাণ করিত। ক্রমনঃ মার্কিণ ব্যবসায়ীদের প্রভাবে বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আগেকার স্বাধীন শিল্পীরা আজকাল ফ্যাক্টরিতে মজুর মাত্র রূপে কাজ করিতেছে। সুইসরা এই শিল্প-বিপ্লব পছন্দ করে না।" অবশ্য "কুটীর-শিল্প" একদম উঠিয়া যায় নাই।

(১২)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ব পুরাতন "স্বরাজ"। জনসাধারণের ক্ষমতা, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, প্রজাশক্তি ইত্যাদি বস্তু সুইস সমাজে ছয় শত বৎসর ধরিয়া ধারা-বাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর স্বাধীনতা এবং আত্ম-কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন বিশেষ প্রবল নয়। মার্কিণ মহিলা-পরিষদের এক প্রতিনিধি সুইস সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত।

সুইস মহিলা-পরিষদের এক ধুরন্ধর শ্রীমতী এমিলিন ওর মার্কিন মহিলাকে বলিয়াছেন :—"আমেরিকা এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে অতি সামান্য ক্ষমতার জন্যও নারী জাতিকে পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া একটু একটু করিয়া অধিকার লাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সুইটসার্ল্যাণ্ডের আটপৌরে আইনগুলায় নারী জাতির জন্য সেই সব ক্ষমতা দেওয়া আছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের হুজুগে মাতিবার দিকে সুইস মেয়েরা বিশেষ ব্যস্ত হয় না।"

ধন-সম্পত্তির ভোগ, দান, বাটোআরা ইত্যাদি সম্বন্ধে এদেশে মেয়ে পুরুষদের সমান ক্ষমতা। স্ত্রী-বর্জ্জন বিষয়ে পুরুষের পক্ষে যে নিয়ম, স্বামী-বর্জ্জন বিষয়ে স্ত্রীর পক্ষেও সেই নিয়ম খাটে। সন্তানের উপর পিতার যতটা অধিকার, আইনতঃ মাতার অধিকারও ততটা। এই সকল ক্ষমতা বা অধিকার সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে মামুলি কথা। বলা বাহুল্য, অন্যান্য "সভ্য" দেশে বহু কষ্ট-কল্পনার ফলে এই সব একতিয়ার আটপৌরে আইনে ঠাঁই পাইয়াছে।

কিন্তু সুইস মেয়েরাও "অগ্রসর" হইতেছে। পল্লী-পঞ্চায়তে, শহর-"রাটে", কাণ্টন সভায় এবং "বুন্ড্"-সভায় সভ্য হইবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য সুইটসার্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে সমিতি কায়েম হইয়াছে। এই ধরণের বাইশটা সমিতির মাথায় শ্রীমতী গুর প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর বড় আফিস জেনেহ্‌ব শহরে।

বাজেল শহরের একজন পোষ্টমাষ্টার এবং তাঁহার পত্নী বলিলেন:—"সুইস পরিবারের পুরুষেরা করে বাহিরের কাজ, মেয়েরা করে ঘরের কাজ। ইহাই আমাদের সনাতন রীতি। এই রীতি ভাঙিয়া মেয়েদের বাহিরের কাজে টানিয়া আনা সুইস মেজাজে সহিবে না।"

(১৩)

একজন জীবন-বীমা কোম্পানীর বড় কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁর নিকট শুনিলাম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে, আজকাল ৬৫ বৎসরের উপর বুড়া ৫০,০০০ নর নারীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গবর্মেণ্ট খোঁজ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কোনো উপায় ইহাদের নাই। কাহারো কাহারো হয়ত বা আয়ের পথ কিছু কিছু আছে। কিন্তু তাহাদের আয়ও বৎসরে ৮০০ ফ্রাঙ্কের অর্থাৎ ৪৮০ টাকার কম।

সুইস গবর্মেণ্ট দুস্থ বুড়াদের জীবন ধারণের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। একজন লোকও যাহাতে খাওয়া পরার অভাবে কষ্ট না পায়, সেইদিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি রহিয়াছে। জার্ম্মণিতে, ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডেও এই নীতি চলিতেছে। ভারতবাসী এই নীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন কি?

আর এক কথা, ৪৮০র কম যাহার বার্ষিক আয় তাহাকেও সুইস গবর্মেণ্ট সাহায্য করিতে সচেষ্ট। অর্থাৎ মাসিক ৪০৲ র আয়কে সুইস সমাজে দরিদ্রতম বিবেচনা করা হয়। এই তথ্য হইতেই সুইস নরনারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতার মাত্রা ও পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

এই উপলক্ষে সুইস গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ আদর্শের "সরকারী" বীমার নিয়ম কায়েম করিতে যত্ন লইতেছেন। বুড়াদিগকে টাকা সাহায্য করাটা ভিক্ষা দেওয়ার সামিল। ভিক্ষা দেওয়া আর ভিক্ষা লওয়া দুইই মানুষের পক্ষে নিন্দাজনক। ইহাতে চরিত্রের অবনতি ঘটে। কাজেই যাহাতে কোনো লোককে কোনো বয়সে ভিক্ষা করিয়া খাইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত। এইজন্যই সকল দেশে—অন্ততঃপক্ষে উন্নত দেশে, বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণিতে, —"বার্দ্ধক্য বীমার" প্রথা জারি হইয়াছে!

প্রত্যেক লোক সাপ্তাহিক বা মাসিক রোজগারের কিছু কিছু অংশ বীমা-অফিসে জমা রাখিতে বাধ্য হয়। মনিবও মজুর বা কর্ম্মচারীর নামে বীমা-আফিসে কিছু কিছু চাঁদা দেয়। অধিকন্তু গবর্মেণ্ট এই বীমা ভাণ্ডারে প্রত্যেকের নামে একটা সাহায্য জমা করে। এই "সরকারী" বীমা প্রথার ব্যবস্থাগুলা যুবক ভারতের পক্ষে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার ও আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৬)

পরদিন প্রাতে প্রমথ তাহার এক বিশেষ অনুগত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল। বন্ধুর নাম মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়।

মাণিক গৃহেই ছিল, বাহিরে আসিয়া প্রমথকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিল, "কি প্রমথ, এত সকালে কি মনে করে?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে মহাজন করতে!"

"মহাজন করতে? কার মহাজন হে?"

প্রমথ ইতস্ততঃ দেখিয়া লইয়া মাণিকলালের কর্ণে মৃদুস্বরে কথা বলিল।

"কি রকম?" বলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মাণিক প্রমথর প্রতি চাহিয়া রহিল।

"সব না শুনলে বুঝতে পারবে না। তোমার সঙ্গে বিশেষ একটু পরামর্শ আছে। কোথায় বসবে বল?"

"এইখানেই বোস না। এখানে এখন কেউ আসবে না।"

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। প্রমথ বলিল, "কি হে, পারবে ত?"

প্রমথর কথা শুনিয়া মাণিক শুধু ঈষৎ হাস্য করিল, প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিল না।

প্রমথ বলিল, "তা হলে আর দেরী করে কাজ নেই, এখনই বেরিয়ে পড়। আমি সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। নাম আর ঠিকানাটা কাগজে লিখে নাও।"

প্রমথ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে মাণিক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুবাজার অঞ্চলে এক গৃহে উপস্থিত হইল।

বহির্বাটীতে একটি বালক পাঠাভ্যাস করিতেছিল। মাণিক তাহাকে বলিল, "এই কি প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি বাড়ী আছেন?"

"আছেন।"

"একবার ডেকে দাও, আমি দেখা করব। নাম জিজ্ঞাসা করলে বোলো মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়।"

ক্ষণকাল পরে প্রিয়নাথ বাবু আসিলেন।

মাণিক নমস্কার করিয়া কহিল, "মাফ করবেন, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।"

প্রিয়নাথ মাণিকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কি আপনার প্রয়োজন, বলুন।"

মাণিক বলিল, "বসুন আপনি; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না। আমি যা নিবেদন করব, তাতে একটু সময় লাগবে।"

প্রিয়নাথ আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বলুন। তবে একটা কথা আপনাকে গোড়াতেই বলে রাখি, লাইফ-ইনসিওর আমি কিছুতেই করব না, আর কন্যাদায়-গ্রস্তের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখিনে। অতএব ও দুটো প্রসঙ্গের মধ্যে যদি আপনার কোনটা হয়, তা হলে প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।"

মাণিক অল্প হাসিয়া বলিল, "লাইফ-ইনসিওর আপনার আমি করাব না, সে বিষয়ে অঙ্গীকার করছি; কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তের সঙ্গে আপনি কোন সম্পর্ক রাখেন না, সে কথাটা ভুল।"

প্রিয়নাথ বাবু বিরস মুখে বলিলেন, "আপনি কি তবে—?"

মাণিক প্রিয়নাথের কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কন্যাদায় গ্রস্ত; কিন্তু আশ্বস্ত হোন, সে দায় থেকে আপনার দ্বারা উদ্ধার হতে আসি নি। আপনাকেই একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"কি রকম?" বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত প্রিয়নাথ মাণিকলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"শ্যামবাজারের হরমোহন মুখোপাধ্যায়কে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি?"

"না।"

"তিন চার বৎসর আগে তিনি যখন কন্যাদায়গ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর সঙ্গে আপনার আর একটা সম্পর্ক হয়েছিল, মহাজন আর খাতকের;—সে কথাও বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

"খুব আছে। তার পর?"

"তার পর তিন হাজার আসল টাকা, যা আপনি তাঁকে ধার দিয়েছিলেন, এখন সুদে আসলে চার হাজারের ওপর দাঁড়িয়েছে। টাকাটা আপনার এখন বিশেষ প্রয়োজন; অথচ হাতে হাতে আদায়ের কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না; কাজেই মনে মনে ভাবছেন, আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু আদালতের কথা মনে ভেবে গায়ে জ্বর আসছে। প্রথমতঃ উকিলের বাড়ী দৌড়ো-দৌড়ি, তার পর আদালতে ছুটোছুটি, তার পর জলের টাকা তোলবার জন্যে হালফেল ঘরের একরাশ টাকা জলে ফেলা। তার পর সমন ধরাবার জন্যে পেয়াদার কাছে খোসামুদী, তার পর এত কষ্টে যদি মামলা ডিক্রী হোল ত' সানি বিচার, আপীল। সে সব থেকে রক্ষা পেলেন ত' ডিক্রীজারীর ব্যবস্থা, বাড়ী ক্রোক করান, নিলামী ইস্তাহার বার করা, নিলাম করান। তার পর আপনার হাণ্ড-নোটের টাকা, বাড়ীখানি যদি কোথাও বাঁধা থাকে, তা হলে—"

প্রিয়নাথ চিন্তিত মুখে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আসুন মশায়, আসুন; আমি এত কথা না ভেবেই চিন্তিত হয়ে আছি, আমাকে আর বেশী ভয় দেখাবেন না! এখন উপায় কি বলুন দেখি?"

মাণিক গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিল, "বাড়ী যদি বাঁধা থাকে ত আপনার টাকা বুহুড়ীর ট্যাকে গেল। তার পর আপনি যদি নিতান্ত চক্ষুলজ্জাহীন হন ত' বন্ধুর বিরুদ্ধে দেহ গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা, বন্ধুকে জেলে দেওয়া; তার পর তাকে বসিয়ে ছ' মাস ধরে খাওয়ান (তর্জ্জনী হেলাইয়া) আপনার নিজের খরচে।"

মাণিককে আর অধিক বলিবার অবসর না দিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে প্রিয়নাথ কহিলেন, "তা'হলে আপনি বলতে চান কি? আমি হাণ্ডনোটখানার টিকিট ছিঁড়ে আপনাকে দিয়ে দোব, আর আপনি গিয়ে সেখানা হরমোহনকে ফেরৎ দেবেন?"

মাণিক মুচকিয়া হাসিয়া জিভ কাটিয়া বলিল, "রাম-চন্দ্রঃ! তা'হলে আপনার আর উপকার করলাম কি? আপনি কতকটা ঠিক বলেছেন, আমি আপনার হাণ্ডনোট-খানা নিয়ে যেতে চাই বটে, কিন্তু সুদে আসলে আপনার সব টাকাটা শোধ করে দিয়ে তবে।"

"কি রকম?" প্রিয়নাথের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

মাণিক ধীর গম্ভীর সুরে বলিল, "ঠিক যে রকম বলছি। আপনি যদি রাজি থাকেন, আজ বৈকালই হাণ্ড-নোটখানা কিনে নিতে রাজি আছি।"

"কিনে নিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সত্যি কথা?"

"সত্যি কথা।"

"পরিহাস করছেন না?"

"পরিহাস করছি নে। পরিহাস করবার মত আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার জানা নেই।"

প্রিয়নাথের মুখ দিয়া আর কোন বাক্য বাহির হইল না, শুধু বিস্ময়-বিস্ফারিত দুটি চক্ষু মাণিকের মুখে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

মাণিক বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, এত বিপদের ভয় দেখিয়ে এ লোকটি স্বেচ্ছায় সেই বিপদে নিজেকে কেন বিপন্ন করতে চাচ্ছে। কেমন, ঠিক নয়?"

প্রিয়নাথ ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়। তবে হ্যাঁ, আচ্ছা ওই কথাটারই জবাব দিন না।" তাহার পর হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ওরে খোজা! শীগ্‌গীর একডিবে পাণ নিয়ে আয়!"

মনে মনে হাসিয়া, প্রকাশ্যে ঈষৎ চিন্তার ভাব দেখাইয়া, মাণিক কহিল, "কথাটা আপনাকে বলতে পারি, যদি এই আশ্বাসটুকু পাই যে, কথাটা আর কেউ জানবে না।"

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে না, কিছুতেই নয়; কোন মতেই নয়! তবে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, কাজ কি, নাই শুনলাম! নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ আছে; আর যদি নাই থাকে, তাতে আমার কি এসে গেল!"

মাণিক বলিল, "বিলক্ষণ! আপনি যখন কথা দিচ্ছেন, তখন আবার দ্বিধা কি? তবে আপনি যখন বলছেন, সঙ্গত কারণ আছেই, আর না থাকলেও আপনার কিছু এসে যায় না, তখন না হয় নাই বললাম। কি বলেন?"

প্রিয়নাথ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "বলবেন না, কখন বলবেন না! নিজের গুপ্ত-কথা কখন কাউকে বলতে নেই। কখন কার মুখ দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বার হয়ে যায় বলা যায় না ত!" তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "দেখুন মাণিকবাবু, কথাটা যখন তুললেন তখন দেরী না করে সেরে ফেলাই ভাল। মানুষের মনের কথা ত' বলা যায় না। সাত পাঁচ ভেবে যদি পেছিয়ে পড়ি, সে ভাবনাও আছে ত?"

মাণিক সবিনয়ে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ভাবনা ত' আছেই তার চেয়ে গুরুতর ভাবনাও আছে।"

চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "কি বলুন দেখি?"

মাণিকলাল তেমনি নিরীহভাবে কহিল, "সাত পাঁচ ভেবে আমরাই যদি পেছিয়ে পড়ি!"

মাণিকলালের কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ উক্ত বিষয়ে আর কোন কথা না কহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে ও খোজা, পাণ নিয়ে আয় না রে!"

কয়েক দিনের মধ্যে যথাবিধি নোটিস আদি জারি হইয়া হরমোহনের হাণ্ডনোট মাণিকলালের নামে বিক্রয় হইয়া গেল।

(৭)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিবার কোনও উদ্যোগ নাই। ঘনায়মান অন্ধকারে বারাণ্ডায় বসিয়া প্রভাবতী বিমর্ষ মুখে নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ঘরে শয্যার উপর বালিসে মুখ গুঁজিয়া অমলা অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিল। আজ গৃহে নূতন মহাজন মাণিকলাল আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছে; পরদিন সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে নালিশ করিবে।

অমলা যে আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র নালিশ হইবার ভয়ে বা ভাবনায় নহে। যে তীক্ষ্ণ বেদনায় তাহার চিত্ত নিপীড়িত হইতেছিল, তাহার জন্য মহাজনের পরিবর্ত্তে খাতকই প্রধানতঃ দায়ী ছিল। টাকার জন্য মাণিকলালের নিকট দুঃসহ অপমান-বাণী শুনিয়া ভিতরে আসিয়া হরমোহন অল্প যে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া অমলার পুনঃ পুনঃ ইহাই মনে হইতেছিল যে, তাহার বিড়ম্বিত জীবন লইয়া সে নিজে যত না কষ্ট পাইয়াছে, তাহার দশগুণ কষ্ট অপরকে দিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সে তাহার দুরদৃষ্ট লইয়া নিজে যত না অসুখী হইবে, তাহাকে লইয়া তাহার দশগুণ অপরে অসুখী হইবে! তাহার মনে হইতেছিল, এমনই অশুভ মুহূর্ত্তে সে এই বহু দিবসের পৈত্রিক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল যে, গৃহখানি অপরের হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহার একমাত্র সহোদরকে গৃহহীন না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না!

যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, তাহার আর কোনও উপায় ছিল না, অমলা ভাবিতেছিল ভবিষ্যতের কথা। এই দুঃখ ও অপমানের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার উপায় ত সর্ব্বদাই তাহার হাতে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত বিপন্ন সংসারের কোনও উপকার হইবে না। তাহারই জন্য যে নিষ্ফল অসার্থক ঋণ কালসর্পের মত তাহার পিতার বর্ত্তমান ও তাহার সহোদরের ভবিষ্যৎকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহার দৃঢ় পাশ হইতে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করা যায়, অমলা তাহাই ভাবিতে-ছিল। সে বিষয়ে কোন প্রকার উপায় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, সে জ্ঞান মনে মনে সম্পূর্ণ থাকিলেও, নিজের জীবনটাকে তাহার আজ এমনই এক অক্ষমনীয় অপরাধের মত মনে হইতেছিল যে, নিজের উপর দিয়া এমন একটা নিদারুণ কল্পনা করিয়াও সে একটু তৃপ্তি পাইতেছিল। বিপদের দিনে মানুষে যেমন শত্রুরও হাত চাপিয়া ধরে, আজ এই মহা অপমানের দিনে তেমনি অমলার মুহূর্ত্তের জন্য বিজয়নাথকে মনে পড়িল। পত্র লিখিয়া তাহাকে তাহার এই বিপদের কথা জানাইলে কি হয়? সে ত

তাহারই স্বামী! কিন্তু স্বামী কথাটা মনের মধ্যে আসিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অমলার চিত্ত বিরক্তি ও ঘৃণায় একেবারে বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! ছি ছি! তদপেক্ষা এখনি বাহিরে ছুটিয়া গিয়া মহাজনের পা জড়াইয়া ধরাও ভাল! তাহার মনে করুণা হইতে পারে, সে আর কিছুদিন সময় দিতে পারে!

বাহিরে তখন হরমোহনের সহিত মহাজনের সেই কথাই হইতেছিল। মাণিকলাল বলিতেছিল, "এই কথাটা আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন্ যে, যে মানুষ তিন বছরে সুদে আসলে এক পয়সা শোধ করলে না, তাকে আরও দু বছর সময় দিলে সে কেমন করে সমস্ত টাকা শোধ ক'রবে?"

কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা হরমোহন বাধ্য হইয়া বলিলেন, "দু বছর পরে আমি লাইফ্ ইন্‌সিওরের টাকা পাব।"

"কত টাকা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "প্রফিট্ নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার হবে।"

একটু চিন্তা করিয়া মাণিকলাল বলিল, "ও সব আমি বুঝিনে মশায়, লাইফ্ ইন্‌সিওরান্স্ বড় গোমমেলে ব্যাপার। কোথায় কি গলদ আছে, ঠিক সময়ে পাবেন কি পাবেন না, তা কিছুমাত্র বলা যায় না। টাকা পাওনা হলে পাবার জন্যে যে লড়ালড়িটা করতে হয়, তা একটা মামলা মকর্দ্দমার সমান। তার পর আপনার পলিসি কোথাও বাঁধা আছে কি না তা জানিনে; না থাকলেও বাঁধা দিতে কতক্ষণ লাগে বলুন? আর কোন বার যদি প্রিমিয়ম্ না দিলেন ত সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল! ও সব সাত শ' হাঙ্গামার মধ্যে আমার যাবার দরকার নেই, আমি সোজাসুজি নালিশ করে ডিক্রি করিয়ে নিই।"

মাণিকলালের কথা শুনিয়া হরমোহন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বায়োস্কোপের নিঃশব্দ অভিনয়ের মত অদূর-ভবিষ্যতের নির্য্যাতন ও অপমানের দৃশ্যগুলি তাঁহার মানস নেত্রের সম্মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যে খেলিয়া গেল। ক্ষণকাল বিমূঢ় ভাবে অবস্থান করিয়া হরমোহন মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "দেখুন, অফিসে আমার ক্যাস নিয়ে কাজ, আপনি যদি আমার নামে নালিশ করেন, তাহলে আমার চাকরী পর্য্যন্ত যেতে পারে। ছা-পোষা গরীবের এত বড় সর্ব্বনাশটা করার চেয়ে আর দু-বছর সময় দেওয়া উচিত নয় কি? প্রিয়নাথ বাবু তিন বছর অপেক্ষা করেছেন, আপনি কি দু-বছরও পারেন না?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে মাণিক বলিল, "দেখুন হরমোহন বাবু, সব সহ্য হয়, ন্যাকামী সহ্য হয় না। আপনি কি বাস্তবিকই বলতে চান যে, আপনি বুঝতে পারছেন না এ নালিশটা প্রকৃতপক্ষে আমার নাম দিয়ে প্রিয়নাথ বাবুই করছেন? আমি কি উন্মাদ হয়েছি যে আপনাকে জানি নে শুনি নে—কতকগুলা ঘরের টাকা দিয়ে আপনার এই পচা হাণ্ডনোট কিনব? প্রিয়নাথ বাবু আপনার বন্ধু, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে আড়াল করে তিনি এই নালিশ করছেন। নালিশ না হয় তাই যদি আপনার ইচ্ছা, বেশ ত, টাকাটা ফেলে দিন।"

হরমোহন কহিলেন, "টাকা দিতে পারলে সময়ের জন্য আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করব কেন? তা হলে কালকের জন্যে অপেক্ষা না করে আজই আপনার টাকা ফেলে দিতাম।"

এ কথার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রমথ ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মাণিকলালের প্রতি বিশেষ অবধান না দিয়া হরমোহনকে কুশল প্রশ্ন করিল। প্রমথর সম্মুখে মাণিকলালের সহিত দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোন কথা যাহাতে না হয় তদুদ্দেশ্যে হরমোহন প্রমথকে কুশল প্রশ্ন করিয়া ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

প্রমথ কিন্তু 'হ্যাঁ যাই' বলিয়াই টেবিল হইতে সে দিনের খবরের কাগজখানা উঠাইয়া লইল এবং সহসা এমন একটা কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল যে, তাহার উৎসুক নেত্র সেই সংবাদের দেহে সংলগ্ন রাখিয়াই সে ধীরে ধীরে নিকটস্থ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

মাণিক পুনরায় পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। কহিল, "আপনি বলছেন আপনার টাকা নেই। এ কথা যে সত্যি নয়, তা আমি সে দিন প্রমাণ করে দোব, যে দিন ডিক্রীজারীতে দেহ গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। তখন আপনি বাধ্য হয়ে যে টাকা

বার করে দেবেন সে টাকা আপনি ইচ্ছা করলে আজই দিতে পারেন।"

মাণিকলালের কথার উত্তর দিতে হরমোহন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, যদি সেই ইঙ্গিতে প্রমথ সেখান হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, কাগজের উপর গভীর মনোনিবেশ সহকারে প্রমথ বসিয়াই রহিল, তখন অগত্যা হরমোহন বলিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া এ বিষয়ে আমি আর কোনও প্রমাণ দিতে পারি নে। ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস করতে আপনার ভদ্রতায় যদি একটুও না বাধে তা হলে আমি নিরুপায়!"

হরমোহনের এই সবিদ্রূপ অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া মাণিক ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "না, আমার ভদ্রতায় কিছুই বাধে না। কাল আপনার নামে নালিশ করতেও বাধবে না; পরশু আপনার অফিস-মাষ্টারের মারফৎ সমন ধরাতেও বাধবে না। তার পর ডিক্রী হলে মায় খরচা হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করবার জন্য ডিক্রীদার যত রকম নির্য্যাতন করতে পারে, তার কোনটা করতেও বাধবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি বলে আপনি যে আমাকে যথেচ্ছা দুর্বাক্য বলছেন, আপনার লেখা হাণ্ডনোটখানা যদি পকেট থেকে বার করে আপনার সম্মুখে ধরি, তা হলে তার উত্তরে আপনি কি বলবেন? সেখানে শুধু মুখের কথা নয়, আপনি নিজের হাতে লিখে দস্তখত করে দিয়েছেন যে চাইলেই টাকা ফেরত দেবেন। টাকা চেয়ে চেয়ে ত' অভদ্রলোকের প্রাণান্ত হয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের ত' তাতে কিছুমাত্র করুণা হোল না! ক্ষমা করবেন হরমোহন বাবু, ভদ্রলোকের কথায় আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই, বরং আপনারা যাদের ছোট-লোক বলেন তাদের কথায় আছে।"

মহাজনকে অনুরোধ করিবার কথা চিন্তা-সূত্রে মনে হইতেই অমলা শয্যাত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার দ্বার-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহাজনকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে নিশ্চয়ই নহে,—তাহার পিতার সহিত মহাজনের অবশেষে কি ব্যবস্থা হয় তাহাই শুনিবার জন্য। মাণিক-লালের কথা শুনিয়া দুঃখে, ভয়ে ও অপমানে অমলা কাঠ হইয়া গেল! কাল হইতে নিগ্রহ ও নিপীড়নের যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, তাহার একমাত্র কারণস্বরূপ হইয়া সে কিরূপে নিজের কুণ্ঠিত দেহকে পিতামাতার সম্মুখে বাহির করিবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। নিজের অবসন্ন দেহকে দ্বারগাত্রে কোন প্রকারে সংলগ্ন রাখিয়া, মাণিকলালের অপমান-বাণীর উত্তরে হরমোহন কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কথা কহিল এবার প্রমথ। সংবাদপত্রের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে মাণিকলালের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার পর দৃঢ় কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি যদি এ বিষয়ে দু একটা কথা কই, তা হলে আমাকে মাপ করবেন। আপনার খাতক যদি আমার নিকট-আত্মীয় না হতেন, তা হলে আমি কিছুতেই অনধিকার-চর্চ্চা করতাম না।"

অভিনয়ের কৌতুকে সতর্ক মাণিকলালেরও অধর-প্রান্ত মৃদু হাস্য-রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সেই-টুকু অসাবধানতা হাস্যের দ্বারাই সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বলুন। খাতকের নিকট থেকে ত অভদ্র আখ্যা পেয়েছি, এখন নিকট-আত্মীয়ের কাছ থেকে বাকীটুকু লাভ করে বাড়ী ফিরি!"

প্রমথ বলিল, "লক্ষ্মীর দরবারে যাঁর নাম মহাজন, তাঁকে অভদ্র বলবে এমন দুঃসাহস কারো নেই; তবে মহাজনেরও ব্যবহারটা এমন হওয়া উচিত, যাতে নিন্দুকেও তাঁকে দুর্জ্জন না বলতে পারে। মহাজনের আচরণ মহৎ না হলে শব্দের অর্থ বদলে যায়।"

মাণিকলাল একটু ভাবিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা। কিন্তু খাতক যদি ঘাতক হয়ে উঠেন, তা হলে মহাজনকে বাধ্য হয়ে দুর্জ্জন হতে হয়। কিন্তু এ সব বাজে কথা-কাটাকাটি করে ত' কোন লাভ নেই, কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত' বলুন।"

প্রমথ কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, কাজের কথা আছে। আপনার উদ্দেশ্য যদি শুধু টাকা আদায় করাই হয়, আমাদের বিপন্ন করা না হয়, তা হলে আমাদের

আরও কিছুদিন সময় দিতেই হবে, কারণ কাল আমরা টাকা আপনাকে দিতে পারি নে। (হরমোহনকে সম্বোধন করিল) পারি কি মেসো মশায়?"

হরমোহন বিহ্বলভাবে কহিলেন, "না।"

মাণিকলালকে লক্ষ্য করিয়া প্রমথ বলিল, "তা হলে সময় আপনাকে দিতেই হবে; কারণ, আমাদের পক্ষে যতই ভয়ানক হোক না কেন, নালিশটা আপনার পক্ষেও বিশেষ রুচিকর হবে না।"

মাণিকলাল সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "রুচিকর নিশ্চয়ই হবে না। ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে কুইনীন্ রুচিকর নয়। তবুও তাকে কুইনীন্ খেতেই হয়। আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে ত' চারু চৌধুরী উকিলের বাড়ী গিয়ে দেখতে পারেন যে, এই অরুচিকর ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, আপনাদের এখান থেকে গিয়ে প্লেণ্টে সই করে হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁর জিম্মা করে দিলেই, কাল সাড়ে দশটার পর এটা আদালতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চারুবাবুর বাড়ী থেকেই এখানে আসছি, আর এসেই এঁকে বলেছি যে, শুধু হাতে আর একদিনও সময় দোব না। দোব না যে তা নিশ্চয়ই, কারণ এঁর সঙ্গে আমার কোন খাতির বা চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। অতএব আপনার যদি আর কিছু বলবার না থাকে ত আমাকে বিদায় দিন, কারণ খুব কাজের লোক না হলেও ঠিক এমি করেই আমি সময় নষ্ট করিনে।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "সময় আমাদের চাই-ই; আর আপনি যখন মহাজন তখন যথাশক্তি আপনার আদেশ পালন করতেও আমরা বাধ্য, অতএব—" প্রমথ পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া মাণিকলালের সম্মুখে ধরিল।

প্রসন্ন মূর্ত্তিতে নোটখানা খুলিয়া দেখিয়া মাণিক বলিল, "মোটে একশ' টাকা?"

প্রমথ বলিল, "হ্যাঁ, মোটে। কিন্তু তবুও ত' শুধু হাতে নয়। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করলাম, এখন আপনি এই একশ' টাকার বদলে আমাদের ক'দিন সময় দিতে পারেন বলুন?"

"কি জন্য সময়?"

"আপনার টাকা পরিশোধ করবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য। সে ব্যবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয়, তখন আপনার যা অভিরুচি হয় করবেন।"

মাণিকলাল বলিল, "এ ভাল কথা। এ কথার অর্থ আমি বুঝি। আপনি আমাকে টাকা দিন, আমিও নিশ্চয়ই আপনাকে টাকা শোধ করবার অবসর দোব। তা নয়, শুধু মুখের কথায় ক'দিন চলে বলুন? আমি আবার সাত দিন পরে আসব; আপনারা যা ব্যবস্থা করেন, সে দিন আমাকে জানাবেন।"

প্রমথর অনুরোধে মাণিকলাল দশ দিন সময় দিতে স্বীকৃত হইল, এবং হ্যাণ্ডনোটের পশ্চাতে হরমোহনের দ্বারা একশত টাকার উশুল লিখাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মাণিকলাল প্রস্থান করিলে আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া অমলা নিঃশব্দে ত্বরিত বেগে প্রস্থান করিল।

হরমোহন দুই হস্তে প্রমথর দুই হস্ত দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "প্রমথ, তোমাকে কি বলে আশীর্ব্বাদ করব বাবা, তা বুঝতে পারছি নে! তুমি আজ শুধু আমার মান বাঁচালে না,—এই দরিদ্র অক্ষম পরিবারকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলে!"

প্রমথ মৃদু হাস্য করিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন মেসো মশায়, যে, আমার প্রতি আপনার স্নেহ যেন এত গভীর হয় যে এই রকম সব ছোট-খাট কথায় এমন করে আমাকে লজ্জিত না করেন। সব টাকা মিটিয়ে দেবার মত টাকা যদি আমার কাছে আজ থাকত, তা হলে ছোট লোকটা যখন আপনাকে কড়া কথা শোনাচ্ছিল তখন কি তার মন ভিজিয়ে কথা কইতাম? তা হলে হাতে টাকা আর গলায় হাত দিয়ে বার করে দিতাম। কি করব, কারে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়!"

হরমোহন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একটা কথা তখন থেকে আমি ভাবচি,—টাকাটা চট্ করে তুমি দিয়ে দিলে, তোমার হয়ত দরকারের টাকা—"

প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার দরকারের টাকা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী দরকারে খরচ করেছি। সে জন্যে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই।"

হরমোহন কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু টাকাটা তোমাকে দিতে যদি একটু দেরী হয়ে যায়—"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাকাটা যদি আমাকেই শীঘ্র দিতে পারেন, তা হলে ত আপনার মহাজনকেই সেই টাকাটা দিতে পারতেন। আমি বলি মেসো মশায়, এ সব বাজে কথার কোন দরকার নেই। টাকাটা আমি আপনার অনুরোধে পড়ে দিই নি যে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেরত নেবার একটা ব্যবস্থা করে নোব। আপনি আমার আপনার লোক; আপনার বিপদ ও অপমান দেখে আমি নিজেকে বিপন্ন ও অপমানিত মনে করে দিয়েছি, এবং ভবিষ্যতে যদি এমন আবার দিতে হয় তাও দিতে পারি। এর মধ্যে যদি আপনি ভদ্রতার কথাবার্ত্তা নিয়ে আসেন, তা হলে আমার এই মনে হবে যে, যে অধিকারের জোরে আমি টাকা দিয়েছি, সে অধিকার আমার বাস্তবিক নেই।"

হরমোহন তাড়াতাড়ি দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না, না, প্রমথ, সে কথা বোলো না, সে অধিকার তোমার সুরেশের চেয়ে এক বিন্দু কম নেই।"

সুরেশ হরমোহনের সপ্তম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র।

হরমোহনকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া প্রমথ বলিল, "তাই যদি, তবে এ বিষয়ে আপনার কোন ভাবনার দরকার নেই। এখন একমাত্র কথা হচ্ছে, দশ দিন পরে কি ব্যবস্থা করা যাবে।"

চিন্তিত মুখে হরমোহন কহিলেন, "প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি, যদি এই দশদিনের মধ্যে কোথাও থেকে টাকাটা কর্জ্জ নিতে পারি। কিন্তু তার আশা বড়ই অল্প। শুধু হাতে টাকা ধার পাওয়া আজকাল এক রকম অসম্ভব। সম্পত্তির মধ্যে ত' এই বাড়ীখানা, তা-ও চাকরীর সিকিউরিটিতে বাঁধা রয়েছে।"

একটু ভাবিয়া প্রমথ বলিল, "সে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। আজ অনেক ভাবা গেছে, আজ আর থাক্।" বলিয়া প্রমথ উঠিয়া পড়িয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

হরমোহন ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, সে কিছুতেই হতে পারে না। ভিতরে গিয়ে দেখাশুনা করে না গেলে, তোমার মাসীমা অতিশয় দুঃখিত হবেন। আর আমার ওপর রাগ করবেন।"

প্রমথ বলিল, "আজ রাত হয়ে গেছে, ভিতরে গেলেই দেরী হয়ে যাবে। আজ থাক্, পরশু না হয় আবার আসব।"

হরমোহন সে কথা শুনিলেন না। প্রমথকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে আসিলেন। প্রভাবতী তখন রন্ধনালয়ে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

স্বামীর আহ্বানে প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে, হরমোহন বলিলেন, "আজ থেকে তুমি জেনে রাখ যে, সুরেশই তোমার একমাত্র ছেলে নয়; তোমার দুই ছেলে, প্রমথ সুরেশের দাদা।"

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া একবার প্রমথর মুখের দিকে ও একবার হরমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাবতী কহিলেন, "সে ত' সত্যি কথা; কিন্তু এ কথা বলবার কারণ কি হোল।"

হরমোহন কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রমথ সহাস্যমুখে কহিল, "কারণ জেনে কি হবে মাসীমা, কথাটা জেনে রাখ, তা হলেই হ'ল। আমি যে সুরেশের দাদা তার বিরুদ্ধে আমার কিছুমাত্র বলবার নেই।"

হরমোহন প্রভাবতীকে কথাটা সবিস্তারে শুনাইলেন।

হরমোহনের কথা শেষ হইলে প্রমথ বলিল, "এই ত শুনলে মাসীমা, কত সামান্য একটা ব্যাপার, এর জন্যে তখন থেকে মেসোমশায় যা' তা' কথা বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।"

দুরূহ এবং সমূহ বিপদ হইতে অকস্মাৎ এরূপে উদ্ধার পাওয়ার সংবাদ পাইয়া প্রভাবতীর উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয় আশ্বাসে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গেল। অমলার দুরদৃষ্ট সংস্কারের প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রমথ প্রভাবতীর হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল, অতঃকার এই ঘটনার পর তথায় অধিকার করিবার জন্য অবশিষ্ট আর কিছুই রহিল না। উৎকট চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইতে সহসা মুক্তি লাভ করিয়া প্রভাবতীর মন এমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রমথর কথার উত্তরে "বাবা প্রমথ—" মাত্র এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং তৎপরে, মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে, চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

প্রমথ একটু থমকিয়া গিয়া তাহার পর ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নাঃ, তোমাদের কারোর সঙ্গে আমার পোষাল না। আমি চল্লাম সুরেশের সঙ্গে আলাপ করতে।" বলিয়া সে সুরেশের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

সুরেশ তখন দ্বিতলের কোন কক্ষে সমুচ্চস্বরে পাঠাভ্যাস করিতেছিল। [ক্রমশঃ]



কড়োবড়ি! (নৃত্যগীত ও অভিনয়কে অরুন্তারা কড়োবড়ি বলে। পাতা ঢাকা সাজঘরের ভিতর থেকে একে একে বেশভূষা করে অভিনেতারা দর্শকদের সম্মুখে বেরিয়ে আসে এবং এক এক পালা নেচেগেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য আবার সাজঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।)

(শেষ)

আষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, সভ্য জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্ম-পথগুলির কোনটাই তারা অনুসরণ করে না। অথচ তাদের নাস্তিক বলাটাও হিসাব মতো ঠিক খাটে না। কারণ তারা প্রকৃতির পূজারী! তারা ঈশ্বরকে জান্‌তে না পারলেও তাঁর সৃষ্টিকে মান্‌তে পেরেছে! আমাদের দেশের দক্ষিণী মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে যেমন বনস্পতি প্রভৃতি 'দেবকের' উপাসনা প্রচলিত আছে, এই বর্ব্বর অসভ্য জাতির মধ্যেও তেমনি জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে ওই জীবজন্তু বৃক্ষ লতা অগ্নি প্রভৃতি তাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। তারা সকলেই ওদের কারুর না কারুর বংশসম্ভূত, তাই মহাসমারোহে তারা ওই সব পূর্ব্বপুরুষদের পূজা অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করে এবং এই সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে রীতিমত উৎসবের আয়োজন হয়।



ব্যাঙ পর্ব্ব। (ব্যাঙ-দেবকদলের পুরোহিতের মস্তকাচ্ছাদন একটি বৃক্ষকাণ্ডের প্রতিরূপ এবং অঙ্গাচ্ছাদন উক্ত বৃক্ষের মূলাবলির প্রতিরূপ।)

এদের এই দেবকোপাসনা বা আদি জনকের পূজাটাকেই এদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতর প্রাণী ও জড়-প্রকৃতি প্রভৃতির পূজাকে ইংরাজীতে "টটেমিজম্" (Totemism) বলে। এই 'টটেমিজম্'ই হচ্ছে আদিম অধিবাসীদের প্রধান ধর্ম্ম। প্রত্যেক দলের এক একটী ক'রে দেবক নির্দ্দিষ্ট থাকে। এবং সেই দেবকের পূজার দ্বারা তারা পিতৃলোকের সন্তোষ সাধন ক'রতে চেষ্টা করে। কারণ, আদি জনক পরিতুষ্ট হ'লে, তাদের বিশ্বাস যে, দেশে আর কোন অভাব থাকবে না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক দলের এক একটি বিভিন্ন 'দেবক' নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এই 'দেবক' সাধারণতঃ কোনও ইতর প্রাণী বা জড়পদার্থ মাত্র। যেমন একদলের দেবক' হয়ত 'এমু' পাখী, আর এক দলের বৃষ্টি-ধারা! প্রত্যেক দল তাদের এই 'দেবক'-গুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী সুসভ্য

রূপ আজ প্রভু খৃষ্টের যে অবমাননা ক'রছে, এই অসভ্য আদিম বর্ব্বরেরা তাদের 'দেবক' সম্বন্ধে সেরূপ কোনও দিন কল্পনাও ক'রতে পারবে না। দেবকের অপমান তো দূরের কথা, তারা অনেকেই বরং তাদের নির্দ্দিষ্ট দেবকটীকে সকলের চেয়ে মাননীয় বলেই মনে করে, এবং কোনও দিন তার এতটুকু অসম্মান করে না। কোনও একটা ভক্ষ্য বস্তু যাদের 'দেবক', তারা অনেকেই জীবনে কখনও সে বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করে না। যেমন, এমু পাখী যাদের দেবক, তারা তাদের 'দেবকের' সম্মানার্থ সেই সুস্বাদু-শ্রেষ্ঠ খাদ্যটির প্রলোভনও অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রেছে। তবে এমু পাখী যাদের পূর্ব্ব পুরুষের জনক নয়, তারা এর মাংসটাই খেতে ভালবাসে সব চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একদল অন্য দলের দেবকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। খাতিরে প'ড়ে বা চক্ষুলজ্জাতেও অন্যের দেবকটিকে মান্য করা তাদের মধ্যে প্রচলিত নেই; এবং একদল অন্য দলের কাছ থেকে সে সম্মান দাবী ক'রে কোনও দিনই দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায় না! গোমাতা যাদের কাছে দেবী ভগবতী তুল্য, এবং গো-মাংস যাদের কাছে খাদ্য হিসাবে অমৃত তুল্য, তারা পরস্পরেই উভয়ের স্বাধীন রুচি অনুসারে কাজ ক'রে যায়; এবং তাদের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বার পক্ষে এই রুচি-ভেদ ও মত-পার্থক্য কোনও দিনই বাধা স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায় না।

প্রত্যেক দলই তাদের 'দেবক'কে 'ভাই' ব'লে উল্লেখ

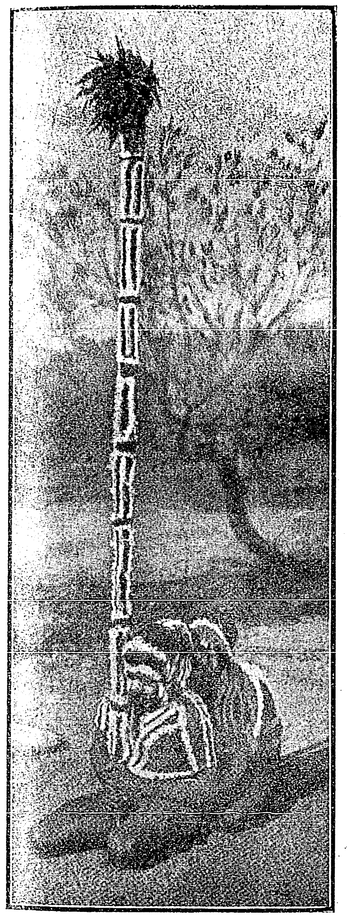

পিপীলিকা পর্ব্ব।

(পিঁপড়ে আর পিঁপড়ের ডিম 'অরুন্তা' সম্প্রদায়ের একটি প্রিয় খাদ্য। পিঁপড়ে যখন বিরল হয়ে ওঠে, সেই সময় পিপীলিকা-দেবক-দলের লোকেরা সভিত্ব পিপীলিকা বৃদ্ধির জন্য এই উৎসবের আয়োজন করে। গাথীর পালকে আবৃত হ'য়ে দুজন পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশে একটি কল্পিত নকল বৃক্ষকাণ্ডের মূলে পিপীলিকার আরাধনা করে।)

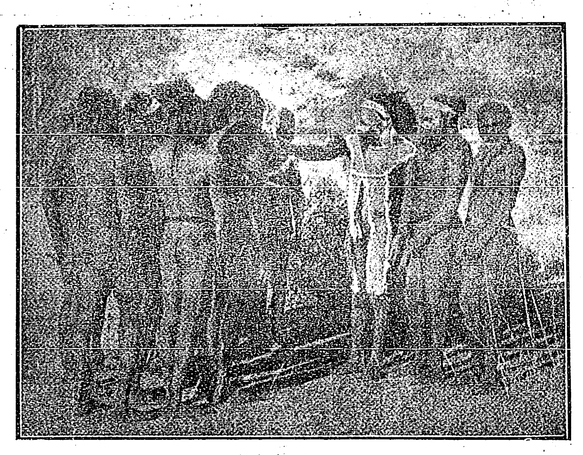

মৌনব্রত উদ্‌যাপন।

(সাবালকত্ব প্রাপ্তি কামনায় যুবকদের সাড়ে তিনমাস বাক্য-সংযম ব্রত পালন করতে হয়। যে এই পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ এই সাড়ে তিনমাসের মধ্যে একটী কথাও না ক'য়ে থাকতে পারে, তাকে, দলের যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি একটী ক্যাঙারুর বাচ্ছা উপহার দিয়ে, তার মুখস্পর্শ করে তাকে কথা কইতে অনুমতি দেন।)

করে। কোনও কোনও দল তাদের জান্তব দেবকের মাংস ভক্ষণেও কোনও দ্বিধা বোধ করে না। অর্থাৎ গোঁড়ামী বলে জিনিসটা তাদের মধ্যে একেবারেই নেই।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে তাদের দেবকের যে একটা বংশগত সম্বন্ধ আছে, এটা তারা সকলেই বিশ্বাস করে; এবং তাদের প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবক উপাসনা ক'রে তাদের স্ব স্ব দেবকের বংশ বৃদ্ধি ক'রতে পারে। যেমন, এমু পাখীর

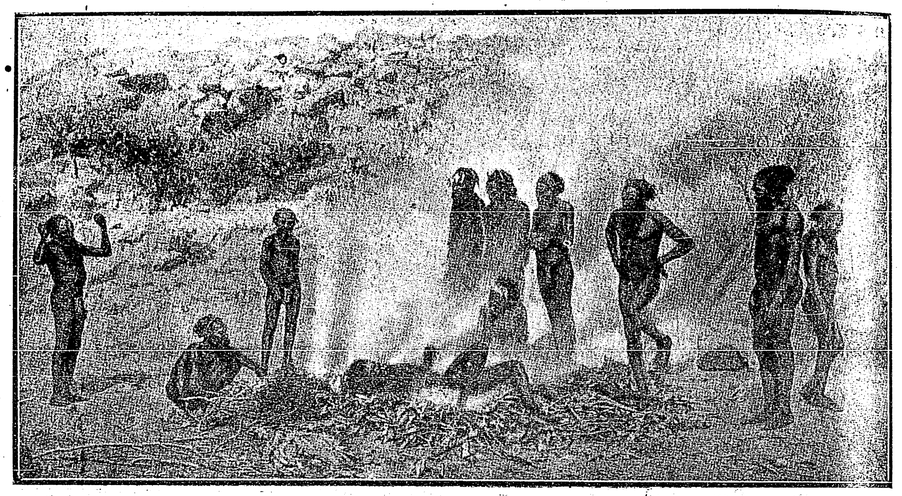

অগ্নি-পরীক্ষা। (সাবালক ব'লে-সমাজে গৃহীত হবার পূর্ব্বে বড়মুঙ্গা যুবকদের এই শেষ পরীক্ষা দিতে হয়—জলন্ত চিতানলের উপর অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল গা ঢাকা দিয়ে।)

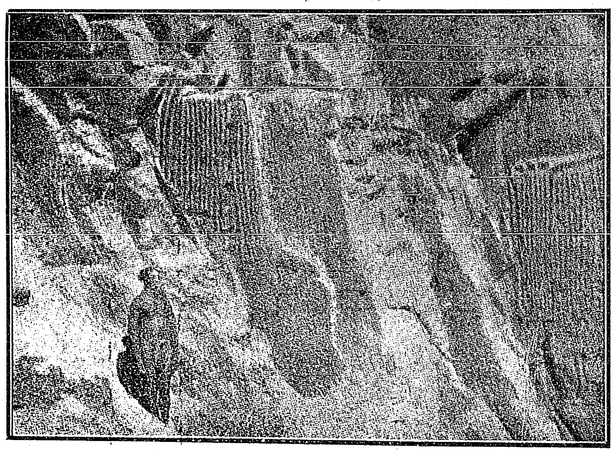

মহীলতা তীর্থ। (এই স্থানে মহীলতা-দেবকদলের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থানে যে যে বিশেষ দেবকের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—সেই সেই স্থান উক্ত একটি দেবক সম্প্রদায়ের নিকট তীর্থ স্বরূপ গণ্য হয়।)

বংশধরেরা এমু পাখীর সংখ্যা বাড়াতে পারে, কাঙারুর বংশধরেরা কাঙারু বৃদ্ধি ক'রতে পারে, বৃষ্টি-বংশীয়েরা বর্ষা সৃষ্টি ক'রতে পারে ইত্যাদি; কিন্তু এমুর বংশধর যে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে না এবং কাঙারুর বংশধর যে এমুর সংখ্যা বাড়াতে পারে না, এ কথাটাও তারা মানে। অর্থাৎ যাদের যা দেবক তারা কেবল সেই বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাতে পারে, অন্য বিষয়ে নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়া-বাসীদের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের দেবক হচ্ছে অগ্নি। অনেকের বিশ্বাস যে আগুনের জন্ম তাদের চক্‌মকি বা দীপশলাকার মধ্যে এ বিশ্বাসটাও খুব প্রবল দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রয়োজন হয় না। তারা দৈব প্রভাবে বা ভৌতিক প্রত্যেক দলের গুণী লোকেরা পূজা অর্চ্চনা, মন্ত্রোপচার বলে ইচ্ছামত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রতে পারে। কোনও

কোনও দিন আবার এ কথাও বলে যে তারা নাকি ইচ্ছামত তাদের জান্তব দেবকের রূপ ধারণ ক'রতে পারে! যেমন নাগ-বংশীয়েরা ইচ্ছামাত্র সর্প-রূপ ধারণ করতে পারে! এবং এ বিশ্বাসও তাদের মধ্যে খুব প্রবল যে, যে জন্তু যাদের দেবক সে জন্তুর দ্বারা কখনই

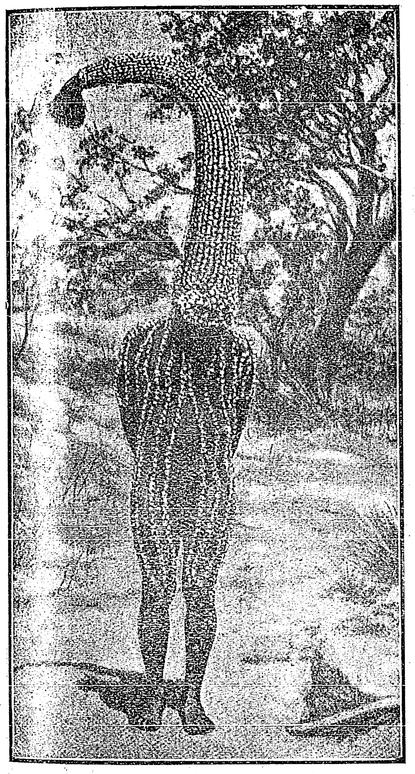

"এমু" পর্ব্ব।
(এমু-দেবকদলের সাধক এমুর চঞ্চু ও গ্রীবার প্রতিরূপ মস্তকাচ্ছাদন পরিধান ক'রে এমু বৃদ্ধির জন্য সাধনা ক'রছেন।)

তাদের কোনও অনিষ্ট হ'বে না! অর্থাৎ নাগবংশীয়েরা কেউ কখনও সর্পাঘাতে মরবে না। অগ্নি ভ্রাতাদের কোনও দিন অনলে অনিষ্ট হবে না ইত্যাদি।

দেবকের পূজা অর্চ্চনার কথা যা পূর্ব্বে উল্লেখ করিছি তা থেকে কেউ যেন মনে করবেন না যে আমাদের দেশের দেবদেবী পূজার মত তারা এই দেবকের অর্চ্চনা করে! তাদের এই দেবকের আরাধনা একেবারেই সে রকমের কিছু নয়। যদিও কোনও কোনও দলের মধ্যে দেবক উপাসনার একটা বিধিবদ্ধ ধারা প্রচলিত হ'য়েছে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটাকে কেবলমাত্র একটা কৌলিক প্রথা বা আচার হিসাবেই ধ'রতে হবে; কারণ তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই—অথচ নিয়ম যথেষ্টই আছে।

প্রত্যেক দলের দেবক উপাসনার জন্য পল্লীর মধ্যেই বা পল্লীর বাইরে কোথাও একটা উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। যেমন নাগবংশীয়েরা জঙ্গলের এমন একটা জায়গা তাঁর আরাধনার যোগ্য ব'লে নির্দ্ধারিত ক'রে রেখেছে যে, জন্মেজয় যতবারই সেখানে সর্প-যজ্ঞ করুন না কেন, তবু সেস্থানটিকে ভূজঙ্গ বিরল ক'রে তুলতে কোনও দিনই পারবেন না। সেই রকম এমু বা কাঙারুর দলও সেই রকম জায়গাই বেছে নিয়েছে, যেখানে তাদের দেবকের বংশ একেবারেই অপ্রতুল নয়।

অগ্নি পর্ব্ব।
অগ্নি দেবের দণ্ড সম্মুখে স্ত্রীলোকদের সদলে নৃত্যগীত ক'রতে হয়।)

এদেশে বিবাহের পর স্ত্রী যেমন স্বামীর গোত্রের অন্তর্গত হ'য়ে যায়, এদের মধ্যে সেই রকম স্ত্রীকে স্বামীর দেবকই গ্রহণ ক'রতে হয় এবং এক দেবকের বংশ সম্ভূত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনও নিষিদ্ধ। কিন্তু সন্তান সন্ততিদের পক্ষে 'দেবক' সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। যেমন, কোনও দলের মধ্যে নিয়ম

আছে, পুত্র কন্যা উভয়েই পৈতৃক দেবকের অধিকারী; কোথাও পুত্র পিতার দেবকের উত্তরাধিকারী এবং কন্যা মাতার দেবকের অধিকারী! অরুণ্ডাদের মধ্যে নিয়ম হ'চ্ছে যে,যে স্থানে মাতার গর্ভ-সঞ্চার হয়, সেই স্থান যে দেবকের চৌহুদ্দির মধ্যে, স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বা কন্যা সেই দেবকেরই উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ নাগ বংশীয়া কোনও গর্ভিণী যদি মনে করে যে, অমুক স্থানে অবস্থান কালীন স্বামী সহবাসের ফলে তার এই গর্ভ সঞ্চার হয়েছে এবং সেই স্থানের সন্নিকটে কোথাও যদি এমু জাতীয় দেবকের কোনও আসন থাকে, তবে সেই গর্ভিণীর গর্ভজাত পুত্র বা কন্যা এমু বংশীয় বলেই পরিচিত হবে,—তার পিতামাতার দেবকের উত্তরাধিকারী হবে না।

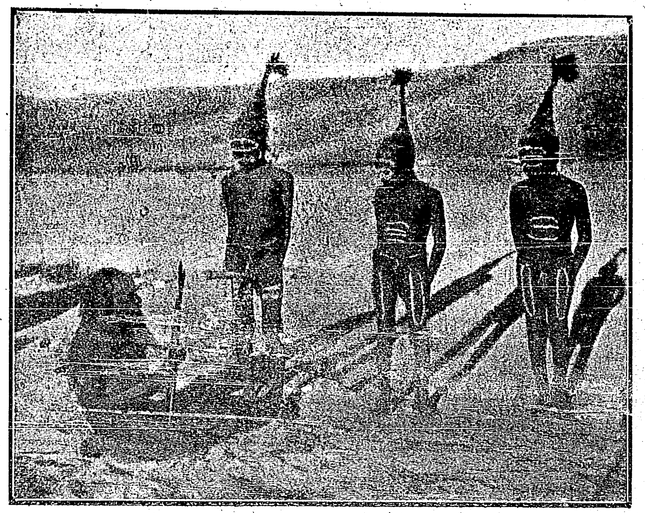

কড়োবড়ির মহল্লা। (বৃদ্ধ নাট্যাচার্য্য অপরিণত বয়স্কদের নৃত্যাভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন।)

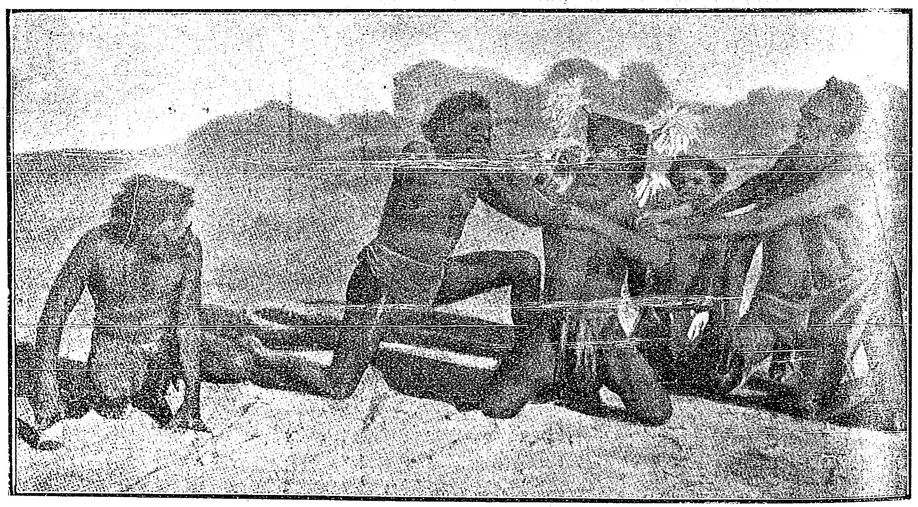

ভূজঙ্গ পর্ব্ব। (সর্পবৃদ্ধি কামনায় এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কারণ সর্প, ওদের একটা প্রধান খাদ্য। কিন্তু যে পুরোহিত এই যজ্ঞের অধিনায়কত্ব করেন, তাঁর পক্ষে সর্প ভোজন একেবারে নিষেধ! উরাবুন্না জাতির মধ্যেই এই সর্প দেবকের দল বেশী। এদের পুরোহিতেরও মাথায় সেই সুপবিত্র 'বানীঙ্গা' বাঁধা রয়েছে।)

দেবক আরাধনার বিবিধ বিভিন্ন প্রথা ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তবে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক; অর্থাৎ উপাস্য দেবকের দল বৃদ্ধি করা!

যখন দেখা যায় যে, এমু পাখীর আমদানী বড় কম প'ড়ে গেছে, বা খাদ্যোপযোগী সর্প একেবারে দুর্লভ হয়ে এসেছে, তখনই এমু-বংশীয়েরা এমুর বৃদ্ধি কামনায় এবং নাগ-বংশীয়েরা সর্প-কুলের সংখ্যা বাড়াতে স্ব স্ব দেবক আরাধনার অনুষ্ঠান করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যারা সর্দ্দার, দেবক আরাধনায় তাদেরই পৌরোহিত্য ক'রতে হয়। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ও পীত গৈরিক মৃত্তিকার তিলক সজ্জা করে মাথায় একটি 'বাণীঙ্গা' বা টোপর পরে তাঁকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়। সর্প বৃদ্ধির জন্য নাগ দেবকের আরাধনায় পুরোহিতকে মাটিতে নতজানু হ'য়ে বসে উভয় হস্ত যথাসম্ভব প্রসারিত করে দিতে হয়। প্রত্যেক হস্তে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এক একখানি খর শাণিত অস্থি থাকে। তার দক্ষিণ ভাগে একজন নতজানু হ'য়ে বসে সেই অস্থি গ্রহণ করে' বাহু দেশের ত্বক ছেদন করে এবং পুরোহিত স্বয়ং বামহস্তে

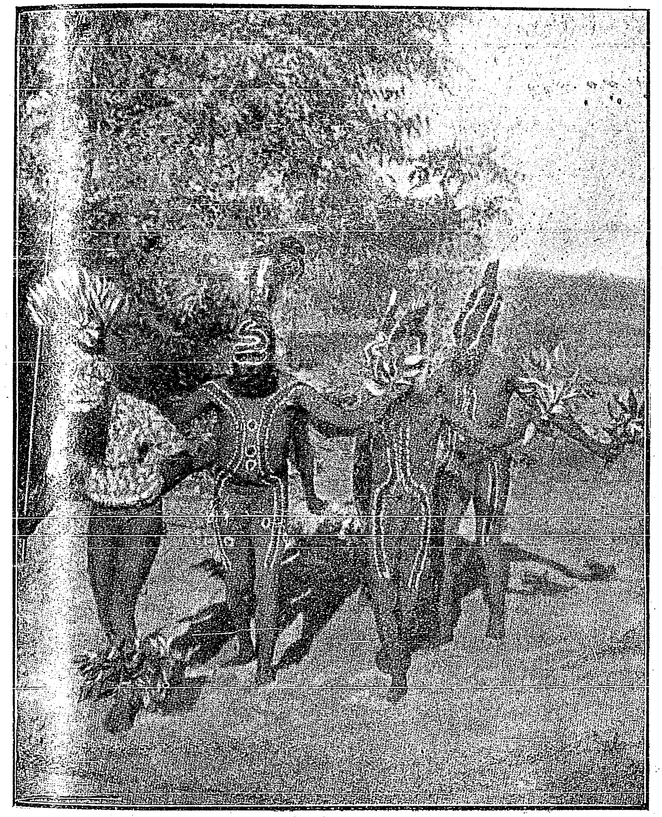

কড়োবড়ি। (এই অভিনয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'চ্ছে অতি-প্রাকৃত জীবেরা কিরূপ অসাধারণ বিভূতি প্রকাশে সক্ষম।)

অপর অস্থি দ্বারা আপন চর্ম্ম ভেদ করেন। তার পর পুরোহিতের বাম পার্শ্বস্থ অপর একজন বাহুদেশের ছিন্ন চর্ম্ম টেনে তুলে ধরে,এবং পুরোহিত দ্বিতীয় অস্থি খানি সেই স্থানে বিদ্ধ ক'রে দেন, পরে সেই অস্থি বিদ্ধ উভয় হস্ত প্রসারিত করে পুরোহিত একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হলে তিনি বাহুদেশ হ'তে অস্থিদ্বয় উৎপাটন ক'রে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূজঙ্গ-আরাধনা উৎসব শেষ হয়ে যায়।

এই উৎসবের কিছুদিন পরেই যখন দেখা যায় যে, সর্প-কুল বেশ বৃদ্ধি লাভ করেছে, তখন সর্প যাদের দেবক নয়, এমন দলের দু'একজন গোটা-কয়েক সাপ মেরে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিতের কাছে নিয়ে আসে এবং বলে "এই দেখুন আপনার অনুগ্রহে আমরা সর্প লাভ করিছি!" পুরোহিত সেই সর্পের কিয়দংশ চর্ব্বি নিয়ে বলেন "যাও তোমরা সবাই মিলে পেট ভ'রে খাও!" এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ করেন, যার অর্থ এই যে, দেখ, তোমাদের আহার যোগাবার জন্য আমি কেমন সর্পকুল বৃদ্ধি করিছি!

বিভিন্ন দেবক আরাধনার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত

আছে। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুও কোনও কোনও দলের দেবক স্বরূপ হ'য়ে গেছে। এরা ইচ্ছামতো শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার হ্রাস বৃদ্ধি ক'রতে পারে! শীত আবাহনের উৎসবে 'হিম-দেবক' দলের লোকেরা নিজেদের চিত্রবিচিত্র ক'রে সাজায়; একটি বায়ু নিশান খাটিয়ে বৃক্ষপল্লবের ছাউনীর মধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত ক'রে যেন দারুণ শীতে কম্পিত কলেবরে আগুণ পোয়াচ্ছে, এইরূপ অভিনয় ক'রে! তাদের বিশ্বাস যে, এই উৎসবের পর হিম ঋতুর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী! কোন কোনও দলের আবার 'শিশু দেবক'ও আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়! তারা ইচ্ছামাত্র শিশুর জন্মহার বৃদ্ধি ক'র্‌তে পারে এ বিশ্বাস তাদের সকলেরই মনে দৃঢ় বদ্ধ। শিশু দেবকের আরাধনায়ও বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়।

ইতিহাসের দিক থেকে আষ্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধে লেখবার বিশেষ কিছু নেই। আষ্ট্রেলিয়ার ছোড়-ভঙ্গ আদিম অধিবাসীরা সভ্যতার এত পশ্চাতে পড়েছিল এবং এখনও আছে যে, তারা তাদের দেশে শেতাঙ্গদের অনধিকার প্রবেশে কোনও রকম সঙ্ঘবদ্ধ বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। সুতরাং উপনিবেশ স্থাপন কর্ব্বার জন্য সেখানে অন্য দেশের মতো কোনও যুদ্ধ বিগ্রহও হয়নি। আষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের কথা বলিতে গেলে উপনিবেশরই ইতিহাস আবৃত্তি ক'রতে হবে এবং



'প্রিন্স্' দ্বীপের লোক।

(এরা সুসজ্জিত হ'য়ে হাতে একটি পুষ্প-শোভিত দণ্ড ধারণ করে। সেই দণ্ডশীর্ষে সুপবিত্র 'বানাঙ্গা' সংযুক্ত থাকে। সুলল্যাণ্ডের উত্তর দেশ থেকে পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এই 'বানাঙ্গা' জিনিসটা অত্যন্ত পবিত্র বস্তু বলে পরিগণিত।)



কড়োবড়ীর মহলা। (কড়োবড়ীর জন্য একদল উৎসাহী "অরুন্তা" প্রস্তুত হ'চ্ছে।)

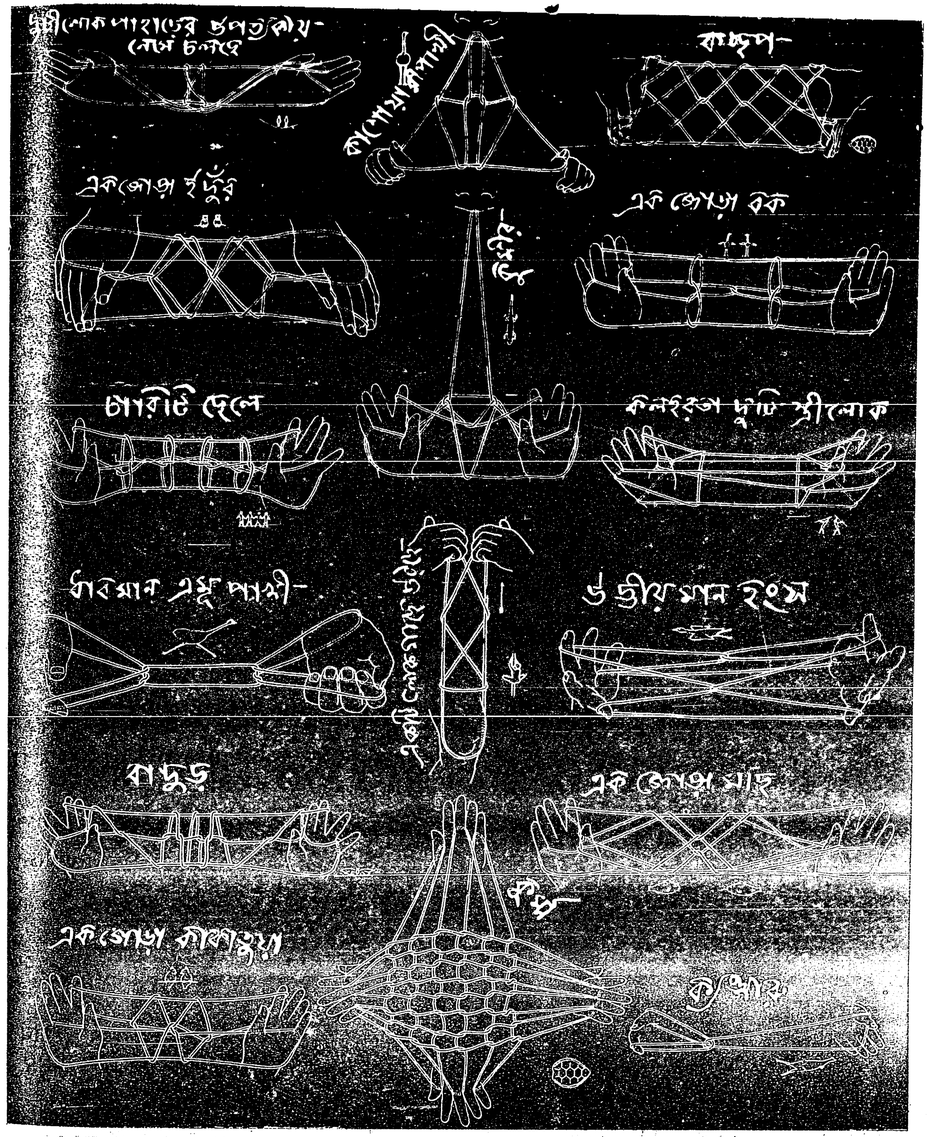

দড়ীর খেলা। (কুইন্সল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা—আঙুলের ফাঁকে দড়ি গলিয়ে নানারকমের প্রতিকৃতি তৈরি ক'রে অবসর কালে আত্ম-বিনোদন ক'রে। এই দড়ীর খেলাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যে এই নগ্ন বন্য বর্ব্বরদের মধ্যেও অনাদি শিল্পীর প্রাণ আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'র্‌ছে।)

সেটা এত আধুনিক ব্যাপার যে তার কোনও প্রয়োজনই নেই। আষ্ট্রেলিয়া আজ ইংরেজেরই উপনিবেশ বটে, কিন্তু পোর্ত্তুগীজরাই সর্ব্ব প্রথম আষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করে। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে 'ফার্ণাণ্ডে ডিঃ কুইরো' নামে একখানি স্পেনীয় অর্ণবযানের একজন পোর্ত্তুগীজ নাবিক আষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন এবং তিনিই সর্ব্ব প্রথম শ্বেতাঙ্গ যিনি এই দ্বীপে অবতরণ ক'রে চার বৎসর বাস ক'রে ছিলেন। তিনিই এই দ্বীপের প্রথম নামকরণ ক'রেছিলেন "আষ্ট্রেয়ালিয়া"। তারপর একে একে আরও অনেক পোর্ত্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী ভ্রমণকারী এখানে ঘুরে গেছেন। কিন্তু ১৭৭০ সালে ইংরেজ কাপ্তেন জেমস্ কুক্ এই দ্বীপটাকে অধিকার ক'রে আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে নেন। ১৭৮৬ সালে লর্ড সিড্নী

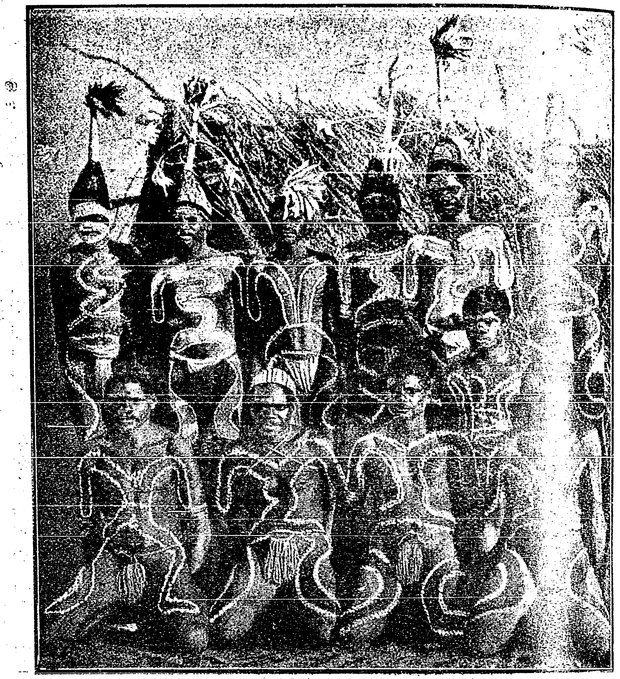

অভিনেতার দল—(এই সুসজ্জিত দলটি অনেকক্ষণ ধরে—পাখীর পালক প'রে ও রং চং মেখে "কড়োবড়ীর" অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।)



প্রস্তর দেবতা

(এই শিলা-খণ্ডকে আদিম বাসীরা দেবতার মত ভক্তি ক'রে তাদের বিশ্বাস যে এই প্রস্তর দেবতাকে পরিতুষ্ট ক'রতে পারলে যে কোনও বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হ'তে পারবে। যে স্বামী এই দেবতার কণ্ঠে তার কটিবন্ধ বেঁধে দিয়ে যায় তার স্ত্রীর অচিরে গর্ভসঞ্চার হয়।)

দ্বীপান্তরে দণ্ডিত অপরাধীদের আষ্ট্রেলিয়ায় পাঠানর ব্যবস্থা করেন এবং ১৭৮৮ সালে আর্থার ফিলিপ্ সর্ব্ব প্রথম এখানে উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত ক'রেছিলেন।

গত ১৯২০ সালের আদম-সুমারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে আষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশকদের সংখ্যা উপস্থিত প্রায় বায়ান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার এবং ক্রত-লুপ্তমান আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা মোটে নব্বুই হাজার মাত্র। আষ্ট্রেলিয়ার পরিমাপ উনত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশত একাশী বর্গ মাইল। আষ্ট্রেলিয়ায় অর্দ্ধেকেরও অধিক অংশ এখনও অনধিকৃত প'ড়ে আছে, লোকের বসবাস হয়নি।



ভুশণ্ডীর মাঠে

পরশুরাম-রচিত

নারদ-বিচিত্রিত

(১)

শিবু ভট্টাচার্য্যের নিবাস পেনেটী গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি কন্যা, একতলা পাকা বাড়ী, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী, কয়েক ঘর প্রজা,—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে সে একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমান রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দ্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচ মিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারার জন্য পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনীমুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তার স্বামীর চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার বচসা চরমে পৌঁছিল,—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে, ক্ষোভে, কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনো-গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছটার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

সেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া নানা উপচারে সওয়া পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—"হে মা কালি, মাগীকে ওলাউঠায় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা করে দাও মা যাতে আবার নতুন করে সংসার পাত্‌তে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হল না, সেটাও ত দেখতে হবে। দোহাই মা।"

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙ্গা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তার-পর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, যাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন ষ্ট্রীটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারী, দু প্লেট রোষ্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তারপর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটী ফিরিয়া গেল।

মা কালী কিন্তু উল্টা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়াই

শিবুর ভেদবমী আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

(২)

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটীর আড়পার কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তর মুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানীর চটকল ছাড়াইয়া আরো দু তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানব-শূন্য। এককালে এখানে ইঁট-খোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত্ত, কোথাও মাটির ঢিবি। মাঝে মাঝে আসশেওড়া ঘেঁটু, বুনোওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।



বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল

যাঁরা স্পিরিচুয়ালিজম্ বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরীর সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁরা মরিলে অম্লজান, উদ্‌জান, যবক্ষারজান প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁরা আস্তিক, তাঁদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁরা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমতঃ একটি বড় ওয়েটিং রুমে জমায়েৎ হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাশে ওয়েটিং রুম ছাড়িতে পারে না। যাঁরা seance দেখিয়াছেন তাঁরা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আত্মা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্ম্মফল, ত্বয়া হৃষিকেশ, নির্ব্বাণ মুক্তি, সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং তত্র তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে, —আবশ্যক মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেউ বা দশ বিশ বৎসর পরে, কেউ বা দু তিন শতাব্দী পরে। ভূতদিগকে মাঝে মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্ত্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে চিরেতা খাওয়ার কাজ হয়, অর্থাৎ পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্ম শরীর বেশ হাল্‌কা ঝর্‌ঝরে হয়। কিন্তু যাঁদের ভাগ্যক্রমে ৺কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতি নাথ বা রথের উপর বামন দর্শন ঘটে,—কিম্বা যাঁরা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষিকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন,—তাঁদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একবারেই মুক্তি।

(৩)

দু তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, কিন্তু এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ্ হোক, নৃত্যর

একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হোক্, না হয় পেনেটীতেই আড্ডা গাড়ি। তারপর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। সূর্য্যদেব জলে হাবুডুবু খাইতেছেন। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে শিমুলগাছে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া তারার মত ঝিক্‌মিক্ করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হল্‌দে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কালো গুব্‌রে পোকা ভুর্‌র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে এক জোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদগদ স্বরে মাঝে মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাব্‌ডেবে চোখ মেলিয়া টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিঁ-পোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এখন সঙ্গত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রি-রি-রি-রি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্ত-মাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক্ ধড়াক্ করিতে লাগিল। মনে পড়িল,—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলী বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার কেবল সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তার সমুখের দুটা দাঁত নাই, আর গালও একটু তোবড়াইয়াছে। তার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

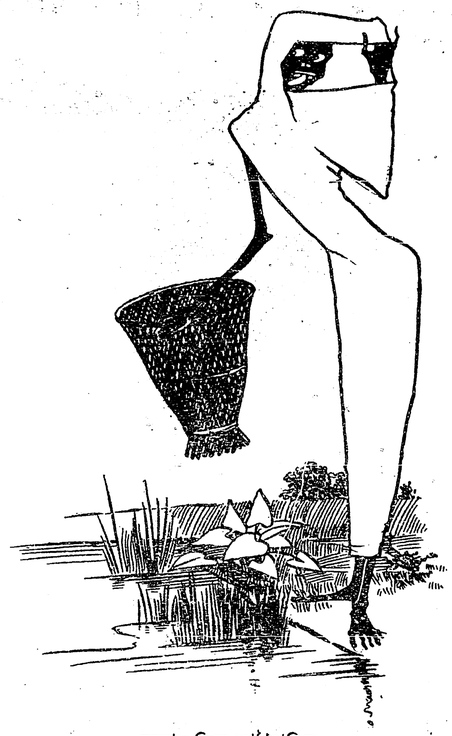

লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছে। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ্ করিয়া উঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরি-বাম্নীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে, তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাকে মাত্র একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া র'ক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রঙ! নৃত্যকালীর রঙ ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু এই ডাকিনীর রঙ যেন পানতুয়ার পাঁস।

(৪)

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্ত্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা

আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাঁদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—"তালগাছে কে রে ?"

উত্তর আসিল—"কারিয়া পিরেত বা।"

শিবু।—কেলে ভূত ? নেবে এস বাবা।

মাথায় পাগ্‌ড়ি, কালো লিক্‌লিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক্ করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"গোড় লাগি বরম্‌দেও জি।"

শিবু।—জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস ?

কারিয়া পিরেত।—ছিলম্ বা ?



গোবরগোলা জল ছড়াইয়া চলিয়া যায়

শিবু।—তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর না।

প্রেত ঊর্দ্ধে উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈদ্যবাটীর বাজার হইতে তামাক, টিকা, কলিকা আনিয়া 'আগ্ শুল্‌গাইয়া' শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—"তারপর, এলি কবে ? তোর হাল-চাল সব বল্।"

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম্ম এই।—তার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তার জরু, গরু, জমী, জেরাৎ সবই ছিল। তার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদ্‌মেজাজী, বনিবনাও কখনো হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরী করিয়া অবশেষে চাঁপদানীর মিলে কুলীর কাজে ভর্ত্তি হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি লোহার কড়ি 'হাফিজ' অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তারপর একমাস হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল—"ভায়া, তল্‌কেটায় কিছু আছে না কি ?"

বেলগাছের কাছে যে ইঁটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইঁট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্ত্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় তুলসীর কণ্ঠি, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মের্জাই, পরনে গরদের ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগ্‌লাচ্চি। বেশী কিছু নয়—এই দু পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা,—ইষ্টাম্বর কাগজে লেখা,—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না।

ধরবদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে। থুঃ থুঃ।"

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—"যক্ষ মশায়, আপনিই কি কালিদাসের—"

যক্ষ।—ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাস্তুতো শালীকে বে করে। ছোকরা নিম্‌কির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জান্‌লে কিসে হ্যা ?

শিবু।—আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েচে ?

যক্ষ।—আমার আগমন ? হ্যা, হ্যা। আমি বলে গিয়ে বাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি ত সে দিন এলে, কাট-পিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট্ খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেচি আমি। তোমার পেটের সক আছে দেখচি,—বেশ বেশ। ক্যালোয়াতি শিখ্‌তে যদি চাও ত আমার সাকরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু।—মশায়ের ভূতপূর্ব্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

যক্ষ।—বিলক্ষণ। আমার নাম ৺নন্দেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশ্‌ড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, এলাকা রিশ্‌ড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জ্জটি সাহেবের নাম শুনেচ ? হুগলীর কালেক্টার,—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

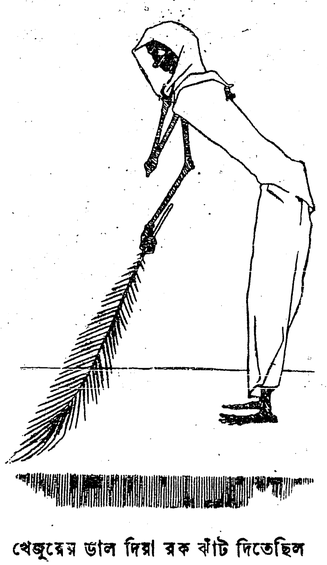

খেজুরের ডাল দিয়া রক ঝাঁট দিতেছিল

শিবু।—মহাশয়ের পরিবারাদি কি ?

যক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা। ঘর-সংসার সবই ত ছিল, কিন্তু গিন্নিটি ছিলেন খাণ্ডার। বল্‌ব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক,—কোম্পানীর দেওয়ানী, ফৌজদারী, নিজামৎ আদালত যাঁর মুঠোর মধ্যে,—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা কাঠ কসিয়ে। তার পরেই পালালো বাপের বাড়ী। তিনশ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা ? গুরু আছেন, ধর্ম্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগীকে সর্‌তে হল। তারপর আর সংসার ধর্ম্মে মন বস্‌ল না। জর্জ্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেন্‌সন্ নিয়ে এক সখের যাত্রা খুল্‌লুম। তারপর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েচি। ছেলে-পুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের বেটা ভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগ্‌লাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর কৃষ্টিয়ে-রাধার নাম করি। যাক্, আমার কথা ত সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।"

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—"সব স্যাঙাতের একই হাল দেখ্‌চি। পুরানো কথা ভেবে মন খারাপ করে ফল নেই, এখন একটু গাওনা বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই,—তেমন জুৎ হবে না। আচ্ছা, পেট চাপ্‌ড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢন্ ঢন্ কচ্চে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চট্‌কে এই মধ্যিখানে থাব্‌ড়ে দে ত। ঠিক হয়েচে। চৌতাল বোঝো ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক্। বোল্ শোনো—

'ধা ধা ধিন্ তা কৎ তাগে, গিন্নি ঘা দেন কর্ত্তা কে।
ধরে তাড়া কোরে খিট্‌খিটে কথা কয়
ধূর্ত্তা গিন্নি কর্ত্তা গাধা রে।
ঘাড়ে ধরে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্টে পাল্টে ফ্যালে
গিন্নি ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়।
ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনি করে না
নগণ্য নির্ধন কর্ত্তা গাধা—'

'ধা' এর ওপর সোম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা। এই 'ধা' ফস্‌কালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আস্‌চে। বাবা খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ্ বেটা।"

(৫)

উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য্য। অনেক কাকুতি মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজি হইয়াছে। কিন্তু সে এখনো কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইসারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক মতে শিবুর বিবাহ। সূর্য্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আঠা দিয়া পৈতা মাজিল, ফনিমনসার বুরুষ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাশ ঘেঁটুফুল, বৈঁচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐক্যতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরি-বাম্‌নীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—"এইবার ঘোম্‌টাটা খুল্‌তে হচ্চে।"



সড়াক করিয়া নামিয়া আসিল

ডাকিনী ঘোমটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—"অ্যাঁ! তুমি—নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল—"হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে মরে আমার কবল থেকে বাঁচ্‌বে। পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?"

শিবু।—এলে কি করে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী।—ওলাউঠো শত্তুরের হোক্। কেন, ঘরে কি কেরাসিন ছিল না?

শিবু।—তাই চেহারাটা ফর্‌সাপানা দেখাচ্চে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাত্‌টা একটু নরম হয়েচে নাকি?

শুভকর্ম্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলো-যোগ? যেন একপাল শকুনি গৃধিনী ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাঁকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন।)—

পেত্নী।—আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাঁকচুন্নী।—আ মর্ বুড়ি, ও যে তোর নাতির বয়সি।

পেত্নী।—আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাঁকচুন্নী।—দূর্ পেত্নীপেত্নী, আমি যে ওর দুজন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী।—দূর্ গোবরচুন্নি, আমি যে ওর তিনজন্ম আগেকার বউ।

শাকচুন্নী।—মর্ চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনী মাগী মিন্সেকে নিয়ে উধাও হোক্।

তখন পেত্নী বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—"আগে তোর ঘাড় মট্‌কাবো তারপর ডাইনী বেটীকে খাবো।"

কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্য-কালীতেই রক্ষা নাই, তার উপর পূর্ব্বতন দুই জন্মের আরো দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পৈতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনি, শুন্‌চ কিবা আন্‌মনে
ভাব্‌চ বুঝি শ্যামের বাঁশী ডাক্‌চে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাঁক্‌শেয়ালী, দিওনা কুলে কালি

রাত-বিরেতে শ্যাল্‌কুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক্ শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—"ভায়া এখানে হচ্চে কি? অত গোল কিসের?"

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—"এ বরম্ পিচাস, আরে দর্‌বাজা ত খোল।" শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটন-মন্ত্র পড়িল—

মারে জ্ জুয়ান—হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া
পর্ব্বত তোড়ি—হেঁইয়া
চালে ইঞ্জন—হেঁইয়া
ফটে বয়লট্—হেঁইয়া
খবরদার—হা-ফিজ্।



সব বন্ধকী তমসুক দাদা

মড় মড় করিয়া ঘরের চা'ল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—"একি, গিন্নি এখানে! বেম্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জায় মাথা খেয়েচ?" ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—"আরে মুংরি, তোহর্ সরম নেহি বা?"

* * * * *

তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালী শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী,—এই ভরল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প সুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাসা দেখিতে আসিল। স্পুক, পিক্সি, নোম, গবলিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতী ভূত বাঁশী বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান্, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপা-দাপি আরম্ভ করিল। চিং, চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজী খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডি, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূত জাতি অতি নাছোড়বান্দা,—ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব,—এ সব তারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুয্যে, চারু বাঁড়ুয্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিন যাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনোরকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য

শ্রীমন্ত সওদাগর

(ডিসেম্বর ১৯২৩)

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের সহিত তুলনায় ডিসেম্বরে রপ্তানি বাণিজ্যে আধিক্য ও আমদানি ও পুনঃরপ্তানিতে হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। বে-সরকারি আমদানির মূল্য ১৫,৪২ লাখ টাকা, এবং ইহা নভেম্বর অপেক্ষা ৫,৬৭ লাখ টাকা কম। রপ্তানি অর্থাৎ খাঁটি ভারতীয় জিনিষের রপ্তানি গত মাস অপেক্ষা ৩,৫৭ লাখ টাকা অধিক, অর্থাৎ ২৯,৯৮ লাখ টাকা; এবং পুনঃরপ্তানি, অর্থাৎ বিদেশী মাল ভারতে একবার আমদানি হইয়া যাহা আবার অন্যান্য বিদেশে রপ্তানি হয়, ২৭ লাখ কমিয়া ৯৫ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। নিম্নে ডিসেম্বর ১৯২৩ এবং এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসের বাণিজ্যের মোট হিসাব দেওয়া হইল :—

	ডিসেম্বর ২৩	নভেম্বর ২৩	বেশী(+) কম (−)	
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১৫,৪২	২১,০৯	−৫,৬৭	−২৬.৯
রপ্তানি	২৯,৯৮	২৬,৪১	+৩,৫৭	+১৩.৫
পুঃরপ্তানি	৯৫	১,২২	−২৭	−২২.১

	ডিসেম্বর ২৩	ডিসেম্বর ২২	বেশী(+) কম (−)	
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১৫,৪২	১৯,২০	−৩,৭৮	−১৯.৭
রপ্তানি	২৯,৯৮	২৬,৫৯	+৩,৩৯	+১২.৭
পুঃরপ্তানি	৯৫	১,৫০	−৫৫	−৩৬.৭

	এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর		বেশী(+) কম (−)	
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি	১,৬৭,৬৩	১,৭৩,৩৬	−৫,৭৩	−৩.৩
রপ্তানি	২,৩৭,৪৯	২,০৯,১৭	+২৮,৩২	+১৩.৫
পুঃরপ্তানি	১০,২১	১১,৩২	−১,১১	−৯.৮

বে-সরকারি অর্থাদির আমদানির মূল্য মোট ৪৭ লাখ টাকা, এবং নভেম্বরে ৩,৭৫ লাখ ও ১৯২২ ডিসেম্বরে ৩,৪৮ লাখ টাকা। নিম্নে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব দেওয়া গেল—

	এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর		বেশী(+) কম (−)	
	১৯২৩	১৯২২		
	লাখ	লাখ	লাখ	শতক
আমদানি স্বর্ণ	২২,৮৪	২৪,৮১	−১,৯৭	−৮
রপ্তানি ঐ	৬	৫	+১	+২০
আমদানি রৌপ্য	১৫,৩৯	১২,৬৩	+২,৫৬	+২০
রপ্তানি ঐ	৩,২৬	২,৩৫	+৯১	+৩৯

১৯২৩ ডিসেম্বরে আমাদের বিদেশ হইতে ১২,২৭ লাখ টাকা পাওনা দাঁড়াইয়াছে, এবং নভেম্বরে ১,৫৩ লাখ টাকা পাওনা হইয়াছিল, ও ১৯২২ ডিসেম্বরে ৫,৯০ লাখ টাকা পাওনা ছিল; অধিকন্তু এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসে ৪০,৫০ লাখ, এবং ১৯২২ সালে ঐ নয় মাসে ২০,৬৩ লাখ টাকা পাওনা হইয়াছিল। অর্থাৎ ঐ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পণ্যদ্রব্য, অর্থাদি, কোন্সিলবিল, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি সকলের সম্মিলিত মূল্য রপ্তানিতে আমদানি অপেক্ষা উল্লিখিত পরিমাণে অধিক হইয়াছিল।

আমদানিতে পরিবর্ত্তন—১৯২২ ডিসেম্বরের সহিত তুলনায় খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য ৩৯ লাখ বাড়িয়া ২,২৫ লাখ টাকা হইয়াছে, এবং কাঁচামাল ও নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য যথাক্রমে ৪০ লাখ ও ৩,৭৯ লাখ কমিয়া ১,২৩ লাখ ও ১১,৬০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে বিশুদ্ধ চিনি ১৩,৬০০ টন ও ৫৬ লাখ টাকা বাড়িয়াছে। কাঁচা মালের মধ্যে রেশম ১৭ লাখ, কয়লা ১৫ লাখ এবং কেরোসিন তৈল ৯ লাখ কমিয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে তুলার সর্ব্ববিধ বস্ত্রাদি পরিমাণে ও

মূল্যে কমিয়াছে। কোরা বস্ত্রাদি ৮৫ মিলিয়ন গজ ২৬৯ লাখ হইতে ৫০ মিলিয়ন গজ ও ১,৬৬ লাখ টাকায়, ধোয়া বস্ত্রাদি ৫১ মিলিয়ন গজ ও ১ ক্রোর হইতে ২৬ মিলিয়ন গজ ও ৮১ লাখ টাকায়, এবং রঙ্গিন বস্ত্রাদি ২৯ মিলিয়ন গজ ও ১,৪১ লাখ হইতে ১৮ মিলিয়ন গজ ও ৯৪ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। আমদানি বিভাগে বিলাতী বস্ত্রই প্রথম ও প্রধান; এই কম্‌তি আমদানি দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের লক্ষ্য করা উচিত। অপর উল্লেখযোগ্য হ্রাসের মধ্যে কলকব্জা (−৭১ লাখ), তুলার সূতা (−২৬ লাখ) এবং তৈজসপত্র (hardware) ও রেলের গাড়ী ইত্যাদি প্রত্যেকে ৮ লাখ টাকা। লোহার চাদর ও মোটর গাড়ী যথাক্রমে ১৪ লাখ ও ৮ লাখ বাড়িয়াছে।

রপ্তানিতে পরিবর্ত্তন—

খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির মূল্য ৬১ লাখ বাড়িয়া ৭,৩৪ লাখ টাকায় উঠিয়াছে,—ইহার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য বস্তু আছে। প্রথম চা (+৭৫ লাখ) ও দ্বিতীয় খাদ্যশস্য (−২১ লাখ)। কাঁচা মালের মূল্য ২,৭২ লাখ বাড়িয়া ১৬,৪৪ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তুলা (+২,৫৬ লাখ) চামড়া (+২৩ লাখ) এবং তৈলবীজ (+২০ লাখ), ও লা (−৩২ লাখ) এবং পাট (−১৬ লাখ), এইগুলি উল্লেখ-যোগ্য হ্রাস ও বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত। মোট ৪৮ হাজার টন রপ্তানি তুলার মধ্যে ইটালি ১৪,৩০০০ টন বা ২৯ শতাংশ, জাপান ১২,৭০০ টন বা ২৬ শতাংশ, বেল্‌জিয়ম্ ৫,৮০০, টন, যুক্তরাজ্য ৪,৭০০ টন এবং জার্ম্মেণী ২,৫০০ টন লইয়াছে। রপ্তানি পাট ৮৩ হাজার টন হইতে ১১৪ হাজার টনে উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য ৩,৫২ লাখ হইতে ৩,৩৬ লাখ টাকায় নামিয়াছে। নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ১১ লাখ বাড়িয়া ৬,২০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। তুলার সূতা পরিমাণে ২ মিলিয়ন পৌণ্ড ও ২২ লাখ টাকা কম রপ্তানি হইয়াছে। চটের থলে সংখ্যায় ৩৫ মিলিয়ন হইতে ৪১ মিলিয়ন ও মূল্যে ১,৬৪ লাখ হইতে ১,৮৩ লাখ টাকায় উঠিয়াছে। গুণচট যদিও ১০৪ মিলিয়ন গজ হইতে ১১৯ মিলিয়ন গজে উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য ১৬ লাখ কমিয়া ২ ক্রোর টাকায় নামিয়াছে। আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য যথারীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চট আমদানি করিয়াছে, এবং তৎপরে ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

বিদেশের সহিত সম্বন্ধ—ডিসেম্বর ১৯২৩ :—

	আমদানি	রপ্তানি
যুক্তরাজ্য	৮,৫৩,০৮,২০০ = ৫৫·৩%	৮,৬৭,৬৫,৭১৫ = ২৯%
জার্ম্মেণী	৭৫,০০,১৩৩ = ৫%	১,৪৩,৭২,৯৮৯ = ৫%
বেল্‌জিয়াম্	৪৮,৩২,৬০৬ = ৩%	১,৫০,৬২,৯১৩ = ৫%
ফ্রান্স্	২৪,৯৩,০৭৩ = ২%	১,৪৫,৭৪,৫৯৬ = ৫%
যাভা	৮০,৩৫,০১৪ = ৫%	
চায়না	৩৯,৫৫,২৪৯ = ২%	৩১,৯০,৭৮২ = ১%
জাপান	৭৮,২১,৭৩০ = ৫%	২,৬৪,১৩,৭২৯ = ৯%
আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য	৯৪,০৪,০৩৭ = ৬%	৩,০৮,৮০,৭৩৭ = ১০%

জাহাজের খবর—এ মাসে ২৭৯ খানি জাহাজ ৫২৭ হাজার টন মাল লইয়া ভারতে আসিয়াছে ও ৩২০ খানি জাহাজ ৬৪৭ হাজার টন মাল লইয়া ভারত হইতে বিদেশে গিয়াছে। এ মাসে পূর্ব্ব বৎসরে ৫৩৪ হাজার টন মাল আমদানি হইয়াছিল ও ৬৩৯ হাজার টন মাল রপ্তানি হইয়াছিল, এবং ঐ পূর্ব্ব বৎসরের জাহাজের আনুক্রমিক সংখ্যা ২৪৬ ও ৩০২।

শুল্ক—এ মাসে সরকারের ২,৩৪,৬৮,১২০ টাকা আমদানি শুল্ক ও ৬০,৭১,৮০৪ টাকা রপ্তানি শুল্ক আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ববৎসর ডিসেম্বরে আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ যথাক্রমে ২,৯০,৭৩,৮০৪ ও ৪৩,০৫,০২৪ টাকা।

গত মাসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ মাসে নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানির একটি তালিকা দিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে ভারতে কি জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং কি জাতীয় দ্রব্য ভারতে প্রস্তুত হয় না বা কম

প্রস্তুত হয়, এবং কি কি দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠান হইয়া থাকে।

ডিসেম্বর ১৯২৩

আমদানি

কাচের দ্রব্য	১৩,৭৬,৬৯৪
বৈদ্যুতিক কলকব্জা	১৭,৪৫,৭৩৯
কাপড়ের কারখানা ঐ	২৪,৩৩,৫০৭
ইস্পাতের চাদর	৭৩,০৩,৫৯৮
„ বার	২৬,৬৪,৩১৬
কাগজ	১৪,৪৪,০৩৭
রেলের গাড়ী	৪১,৯৬,২০২
ঐ এঞ্জিন	১৪,০৭,১০১
ঐ উপাদান	২২,৩৬,৭৯২
মোটর গাড়ী	২০,২১, ৭৬
তূলা—সূতা	৪৮,৩৮,৮১৬
ঐ কোরা বস্ত্র	১,৬৬,০৩,৯৬৩
ঐ ধোয়া „	৮১,২৩,৫৫০
তূলা রঙ্গিন বস্ত্র	৯৩,৫৩,৫৮৩
রেশমের বস্ত্র	২১,৪৪,৬৩৮
দিয়াশলাই	১১,৬৩,৮৯৪
সাবান	৯,৫৯,৫৭৬

রপ্তানি

আফিম	১৮,৬১,১৭৫
চামড়া বড়	২৪,৬৮,৫৮৮
ঐ ছোট	২৬,৩৩,৩০৩
তূলার সূতা	২৪,৭২,৭৬১
ঐ বস্ত্রাদি	৫৪,০৩,০৪২
গুণচটের থলে	১,৮২,৯৬,৪৪৪
গুণচট	২,০০,৩৯,১২৩
পশমী কার্পেট	৯,১৪,৫১৬
নারিকেল দড়ি	৭,৫৮,৫১৫
খনিজ মোম	৯,৯২,৩০৭

বিরাট মূর্ত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

আপনার মাঝে ঘিরিয়া আমারে পাই না ত কই তৃপ্তি,
রুদ্ধ-দুয়ার বসিয়া, যখন বাহিরে ঊষার দীপ্তি।
নিজেরে করেছি বঞ্চিত আমি, আপনার মাঝে ঢেকে,
বাঞ্ছিত মোর আর্ত্তের বেশে চলে গেছে ডেকে ডেকে।
আপনার হাতে চোখ ঢেকে রেখে খুঁজিয়াছি আমি কোথা,
এতকাল মোর এমনি করিয়া কাটিয়াছে হায় বৃথা।
প্রভাত-বায়ুর পেয়েছি পরশ, নয়নে নবীন আলো,
সকলের মাঝে রয়েছে নিহিত যা কিছু আমার ভাল।
বিশ্ব-মানব হইতে ছিনায়ে চেয়েছিনু বাঁচিবারে,
তুষার-শীতল মরণ আঁকাড়ি' ব্যর্থতা হাহাকারে।

সকলে যেখানে মিলিত আজিকে যেথা আছে মোর কাজ,
'ভাঙ্গরে দুয়ার, বাহিরিয়া পড়' কহিছে বিশ্বরাজ।
কত অসারতা, কত বিফলতা, অস্ফুট কত গান,
অনাহত কত জীবন-তন্ত্রী পেয়েছে আজিকে প্রাণ।
দ্বিধা-সঙ্কোচ, মিছে অভিযোগ, সংসার-বন্ধন
লীন হ'য়ে যাক্, উঠেছে যেখানে ব্যথিতের ক্রন্দন।
দীন ও মলিন অনাহারে মরে যেথায় দেশের ভাই,
শূন্য এ বুকে তা'রা কি আমার পাবে না একটু ঠাঁই?
মন্দিরে নাই দেবতা রে তোর,—ডুবে যা সবার মাঝে,
বিধাতার শুভ বিরাট-মূর্ত্তি ওইখানে সে ত' রাজে।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৫)

স্তব্ধ গভীর রাত্রির আকাশের তারাগুলি যেন কিসের প্রতীক্ষায় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্না-লেখা যমুনার জলে ঝিকিমিকি করিতেছে। যমুনার জলের দিকে চাহিয়া শিরিণ তাহার দাদার কথা ভাবিতেছিল, এখনও তিনি আসিলেন না। তাহার প্রিয় কবি হাফেজ পড়িতে তন্ময়ক্ষণ সে মগ্ন ছিল, পাঠশ্রান্তা হইয়া সে ঘরের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিল। হাফেজ পড়িয়া উঠিলে তাহার মন কি গোপন তৃষ্ণা অজানা বেদনায় ভরিয়া ওঠে, হৃদয় সেতারের তারের মত কাঁপে, ইচ্ছা হয় এ জ্যোৎস্নারাত্রে রহস্যময় পথে কোন প্রিয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু সে প্রিয় বন্ধুকে কি সহজে লাভ করা যায়? কত সাধু ভক্ত কত ত্যাগ কত সাধনা করিয়া তাঁহাকে পান নাই,—ধন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, এ সুখ সম্ভোগের মধ্যে সে কি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে? সে যদি তপস্বিনী রাবেয়ার মত ধর্ম্মসাধনা করিতে পারিত!

ছেলেবেলা হইতেই শিরিণ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা; বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এ ধর্ম্মভাব বাড়িয়া চলিয়াছিল। সে ঠিক করিয়াছিল, অবিবাহিতা থাকিয়া ধর্ম্মসাধনা ও লোক সেবা করিয়াই জীবন কাটাইবে। পুরুষদের মত সে স্বাধীনা নয় বলিয়া তাহার মাঝে মাঝে বড় বেদনা বোধ হইত। সে যদি পথে বাহির হইতে পারিত, কত রোগীর সেবা করিয়া, কত অনাথকে সাহায্য করিয়া, সে তাহার প্রিয়বন্ধুর মিলন-মন্দিরের পথে অগ্রসর হইতে পারিত। সেবা করিবার কোন সুযোগ পাইলে সে পর্দ্দার শাসনও মানিত না। সেইজন্য সন্ধ্যাবেলায় বারান্দা হইতে করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই, চঞ্চলপদে পথে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অন্ধকার নদীতীরে এক অসহায়া নারী এক মূর্চ্ছিত যুবককে লইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ব্যথা দিতে বেদনা বোধ হইল। খোজা ভৃত্য ডাকিয়া অসুস্থ যুবকটিকে সে বাড়ীতে আনাইয়া রাখিয়াছে।

যুবকটির কথা মনে পড়াতে ধীরে শিরিণ পাশের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। দ্বারের কাছে খোজা ঘুমে ঢুলিতেছে, তাহার পাশ দিয়া ধীরে ঘরে ঢুকিল। খাটিয়ার ওপর যুবকটি মূর্চ্ছিতের মত ঘুমাইতেছে। লোকসেবা করিবে বলিয়া শিরিণ চিকিৎসাবিদ্যা কিছু আপন চেষ্টায় শিখিয়াছিল। তাহার ঔষধে কিছু ফল হইয়াছে দেখিয়া একটু আনন্দিত হইল। নীচে গালিচায় বসন্তের ছিন্ন পুষ্পবল্লরীর মত ইরাণী ফতেমা নিদ্রিতা। তাহাকে সে নিজের ঘরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এ পাগলিনী এ যুবককে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চায় নাই। নিদ্রিত যুবকটির দিকে শিরিণ মুগ্ধব্যথিত চোখে চাহিয়া রহিল। হয় ত তাহার বোন তাহারি মত দাদার জন্য চিন্তিত হইয়া বিনিদ্র বসিয়া আছে। বাহিরে একটু শব্দ হওয়াতে সে চমকিয়া বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া আপন ঘরে চলিয়া গেল। হাফেজ লইয়া আবার পড়িতে বসিল।

যমুনাও তাহার দাদা শঙ্করের জন্য জাগিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সে দাদার জন্য যে জাগিয়াছিল বলিলে ঠিক হইবে না। উজ্জ্বল যৌবনের অকারণ পুলকে এ জ্যোৎস্নারাত্রি বিনিদ্র স্বপ্নময় কাটাইতে তাহার বড় সুখ হইতেছিল। এক তরুণ সুন্দর মুখ বার বার তাহার মনের পটে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে ঘিরিয়া কত স্বপ্নজাল বুনিতেছিল। হউক সে যুবক মুসলমান, তাহাকে ত সত্যই সে জীবনে লাভ করিতে পারিবে না। তাই বলিয়া তাহাকে মনের স্বপ্নজগৎ হইতে কেন নির্ব্বাসিত করিবে। যাহা অসম্ভব, যাহা দুর্লভ, তাহাকে লইয়া মন এম্নি রঙীন মায়ার খেলা খেলিতে চায়, সত্যের জগতে যাহাকে না পায় স্বপ্নের জগতে তাহাকে লইয়া মনের মত সাজাইয়া খেলা করে।

যমুনা ভাবিতেছিল, হয়ত ওই যুবক সত্যই কোন নবাবের পুত্র। কে বলিতে পারে, ওই যুবক একদিন দিল্লীর বাদশা হইবে না। দিল্লীর বাদশাহেরা ত রাজপুত নারীদের বিবাহ করিয়াছে, তাহারা ত হিন্দু, তবে—থাক সে কথা। কিন্তু যুবকটি কি সুন্দর, চাহিয়া কি অপ্রতিভ ভাবে চলিয়া গেল—বস্তুতঃ যমুনা তাহার মনকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে যাহা খুসি ভাবুক, প্রতি দিনের জীবনে সমাজে সংসারের চারিদিকেই বন্ধন অবরোধ, এ জ্যোৎস্নারাত্রে মন একটু মুক্তি পাক্। স্বপ্ন বুনিতে বুনিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যমুনার যখন ঘুম ভাঙিল, তখন চারিদিকে প্রভাতের প্রখর আলো। তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাদার ঘরের দিকে চলিল। কিন্তু চকিত পদে ঘরে ঢুকিয়াই চমকিয়া দাঁড়াইল, যাহাকে সে এতক্ষণ স্বপ্নে খুঁজিতেছিল সে কি সত্যই রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! দাদা একখানি গ্রন্থের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, আর তাহার পাশে যে রাজপুত যুবকটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখ দেখিয়া সে বিস্মিত মুগ্ধ হইল। পূর্বদিন প্রভাতে যে মুসলমান তরুণ যুবক স্বপ্নের মত আসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ঠিক তাহারি মত ইহার মুখ, সে যেন বেশ বদলাইয়া আসিয়াছে। যুবকটি তাহার সদ্যজাগরণফুল্ল মুখের দিকে প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিল, সেই তরুণ বাদশাহের পুত্র আসিয়াছিল যেন প্রেমিক রূপে, আপন প্রেম নিবেদন করিতে; আর এ রাজপুত যোদ্ধা, এ যেন জয় করিয়া লইবে। মুখ রাঙা করিয়া যমুনা তাহার দিকে চাহিল। যুবকের তেজোজ্জ্বল মুখখানি ভারি করুণ বোধ হইল। শুধু নিশিজাগরণ ক্লান্ত নয়, যেন কোন অসীম অজানা বেদনার আভায় মণ্ডিত। মুখ নত করিয়া যমুনা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, দ্বারের পাশে আড়ালে দাঁড়াইল। দাদা ও রাজপুতটির কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

শঙ্কর বই বন্ধ করিয়া যুবকটির হাত ধরিয়া বলিল,—দেখ ভাই ভারত, এই সব আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের বই, এই জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আমি শান্তিতে আছি। তোমরা আবার আমায় রাজনীতি চর্চা করতে ডাকছ, বড় অশান্ত বড় কঠোর সে পথ, কিন্তু আমি বুঝছি, ঈশ্বর আমাকে কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে আবার আগুনের লীলায় মাততে ডাকছেন। তা না হলে তোমার সঙ্গে এমন আশ্চর্য্য ভাবে দেখা হত না। তোমাদের আশা, তোমাদের উৎসাহ দেখে, একবার তোমাদের সঙ্গে যেতে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু পারবে কি, লক্ষ্য ঠিক রেখে চলতে পারবে কি? শক্তির মদে মাতাল হয়ে উঠবে না?

ভারতসিংহ ধীরে উত্তর দিল—আপনি সহায় থাকলে—শঙ্কর একটু উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল—দেখ যখন তুমি ভগ্নস্তূপের মধ্য সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তোমাদের গুপ্ত সভার স্থানে নিয়ে গেলে, আমি শুধু বিস্মিত নয়, আমি মোহিত হলুম—তোমরা যে ভ্রাতৃদল গঠন করছ তা সত্যই আশ্চর্য্য। এক যায়গায় শিখ, রাজপুত, মারাঠা, বাঙ্গালী ভারতের সকল দেশের তরুণ প্রাণ মিলনের স্বপ্নে এসে জুটেছে—চারিদিকে বিচ্ছেদ বিদ্বেষ হীনতা ঈর্ষা লোভ, দলের সঙ্গে দলের জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ, এর মাঝে দিল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে চিরনবীন প্রাণের মিলন কল্লোল-ধ্বনি শুনতে পেলুম, তোমাদের স্বপ্নপ্রাসাদ দেখে আমি ধন্য হয়েছি—

আপনাকে পেয়ে আমরাও ধন্য হলুম—

আচ্ছা, আমায় এক দিন ভাববার সময় দাও। এ দল অতি বৃহৎ করে গড়তে হবে, এর কাজ অসীম। কিন্তু শুধু সৈনিক দিয়ে ত হবে না, সন্ন্যাসী চাই, ভারতের প্রতি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এর কেন্দ্র চাই। শুধু শক্তিলাভ করতে চাইলে হবে না, শক্তি বড় লোভী বড় ক্রূর—ওই দেখ, নাদির পারস্যের সিংহাসন পেয়েই ভারত জয়ের জন্য লুব্ধ হয়ে উঠল, তারি ওপর এখন ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে—

হাঁ, নাদির শা' ত লাহোর অধিকার করেছে শুনলুম, বোধ হয় এবার দিল্লীর দিকে আসবে—

ও লুণ্ঠনকারীর জন্য ভাবি না, ও শুধু একটা ঝঞ্ঝার মত এ ভগ্ন মোগলসাম্রাজ্য আরও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে যাবে—কিন্তু এ ভগ্নস্তূপের ওপর নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলাই ত আমাদের কাজ—তার সাধনা কঠোর,—কিন্তু দেখ, তোমরা স্বপ্ন দেখছ, মারাঠা আজ শক্তিলুব্ধ, রাজপুত আজ রাজ্যলোলুপ—হিন্দুশক্তি সব মিলবে কি? তোমরা হিন্দু-সাম্রাজ্য চাও? কিন্তু মুসলমান রয়েছে, মুসলমান—দাক্ষিণাত্যে, বাংলায়, দিল্লীর সিংহাসনে—

যুবকটি ধীরে বলি , আমি মুসলমান—

রসিকতা করিতেছে ভাবিয়া মৃদু হাসিয়া শঙ্কর বলিল,—তোমাদের দলে ত মুসলমানের স্থান দাও নাই, তাহাদেরও ত চাই—

সত্যই আমি মুসলমান, এ আমার ছদ্মবেশ—

আশ্চর্য্য ক্রুদ্ধভাবে শঙ্কর বলিল—তুমি মুসলমান? বলে আরও মুসলমান আছে? সকলে ছদ্মবেশে থাকে কেন?

দলে আমিই একমাত্র মুসলমান আছি, আজ যাদের দেখলেন সব হিন্দু—

দলের সবাই জানে তুমি মুসলমান? জেনে তোমায় তারা দলপতি করেছে?

না, তারা জানে না, কিন্তু আপনি তাদের জানাবেন—

বৈশাখী ঝড়ের আকাশের মত রোষ-ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ নয়নে চাহিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল—তুমি তাদের প্রতারণা করেছ, ভণ্ড! তুমি—তুমি দূর হও—

ক্ষুব্ধ তেজস্বী ব্রাহ্মণের সম্মুখে যুবকটির ভয় করিল,—আপনি এ দলের ভার নিন, আমাকে—

তুমি—যাও!

যুবকটি আর অপমান সহ্য করিতে পারিল না, সে নত মস্তকে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বাহিরে যাইতে পারিল না, দ্বার রোধ করিয়া একটি নারী দাঁড়াইয়া, বিদ্যুৎলতার মত কাঁপিতেছে।

দাদা!

শঙ্কর চমকিয়া চাহিল।

দাদা, তোমার ভারতে কি মুসলমানের স্থান নেই!

শঙ্কর একবার যমুনার দিকে একবার ভারতসিংহের দিকে চাহিল। তাহার সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, তেজোজ্জ্বল মুখশ্রীর দিকে চাহিল। হউক সে মুসলমান, তাহাকে ত সে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আপনাকে শান্ত করিয়া শঙ্কর বলিল—দেখ ভারত, তুমি মুসলমান বলে নয়, তুমি প্রতারণা করেছ বলে আমি রেগে উঠেছিলুম—

এ প্রতারণা নয়, এ ছদ্মবেশ, একই ভাইয়ের দুই রূপ—

আমি বুঝি, জাতিবিদ্বেষ দূর করবার জন্যে তোমাকে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে, কিন্তু সত্যের ওপর সব প্রতিষ্ঠা করতে হবে—

তাই আপনার কাছে এসেছি—

কিন্তু, কে তুমি—

আমি? আমি আলি মহম্মদ—

আলি মহম্মদ! যার নামে এত গল্প শুনেছি—

হাঁ, আমি—

তুমি! কখন শুনেছি আলি মহম্মদের মত ভোগ-বিলাসী সৌখীন যুবক আর দিল্লীতে নেই, কখন শুনেছি তার মত বীর কৌশলী যোদ্ধা মোগল সভায় নাই, কখন শুনেছি সে দস্যুর মত তার সেনাদল নিয়ে নগর গ্রাম লুণ্ঠন করে বেড়ায়, কোন বনে পর্ব্বতে সে নতুন রাজ্য স্থাপনা করছে, তার দলে মোগল পাঠান তাতার সব দলের সেনা আছে, কখন শুনেছি সদৎ খাঁর সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য চক্রান্ত করছে, সৈয়দরা তাকে গুপ্ত হত্যা করছে—

হাঁ, সে আলি মহম্মদ মরে গেছে, তার ভোগের জীবন শেষ হয়েছে, এ তার স্বপ্নের জীবন—

বেশ, তোমার নবজীবনই আরম্ভ হোক—কিন্তু তোমায় দীক্ষা নিতে হবে—

সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি—

আমার কাছে না, আল্লার কাছে, যাও মসজিদে যাও, ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা কর, সমস্ত ভোগবিলাস ছাড়বে, সত্যপথে চলবে, ন্যায় বিচার করবে, আপন আদর্শের জন্য প্রাণ দেবে, আর—বিবাহ করেছ?

না,

চিরজীবন অবিবাহিত থাকবে, সন্ন্যাসী চাই—কখনও কোন নারীর মুখ ভাববে না—

প্রভু, যাহাকে ভালবাসি—

একমাত্র দেশকে তুমি ভালবাস—

যমুনা দরজার গোড়ায় যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্ষণিকের জন্য সেদিকে চাহিয়া ভারত মাথা নত করিল। যমুনা দরজা হইতে সরিয়া কোথায় চলিয়া গেল, চারিদিকের প্রভাতের আলো তাহার কাছে বড় করুণ বোধ হইল।

শঙ্কর ধীরে বলিল, তোমার দলকে আমি বুঝিয়ে বলব,

কোন ভাবনা নেই, চল, তোমায় মসজিদ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

শঙ্করের পেছন পেছন আলি মহম্মদ পথে বাহির হইল। তাহার পেছনে যে দুইটি সুন্দর নয়ন চাহিয়া আছে, সেই করুণ ব্যাকুল দৃষ্টি সে সমস্ত দেহ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু একবার ফিরিয়া চাহিল না।

(৬)

রাজশেখরের যখন ঘুম ভাঙিল, তাহার প্রথমে মনে হইল, সে যেন মুস্তাফা মিঞার সরাইখানার ঘরে শুইয়া আছে, কিন্তু ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া সে অবাক হইল, এক সুন্দর ঘরে সুকোমল শুভ্র শয্যায় সে শুইয়া, তাহার দেহে জ্বরের জ্বালা নাই, তাহার মন অতি হাল্কা। গত রাত্রির ঘটনা অতি অস্পষ্ট ভাবে তাহার মনে পড়িল, সে যেন এক নর্ত্তকীর অপমান দূর করিতে গিয়াছিল, তার পর? তার পর—সে যেন বিকারের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে, এ কি সরাইখানার অন্য কোন ঘর? ধীরে সে বিছানায় উঠিল বসিল। অতি মধুর গানের সুর তাহার কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল, ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এ বাস্তব না স্বপ্ন তাহা যেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নটীর যে নূপুর নিক্কণ শুনিয়া সে উতালা হইয়া বাহির হইয়াছিল, সে সুর ছিল জ্বালাময় মাদকতায় ভরা; কিন্তু এ সুর চন্দন-প্রলেপের মত স্নিগ্ধ, পুষ্পগন্ধের মত মধুর। সুর-মুগ্ধ সুর-চালিত হইয়া সে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল, ধীরে ধীরে সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া চলিল, গানের সুরের সোণার কাটিতে তাহার মন জাগিয়া উঠিল, সুর-গন্ধে উন্মনা হইয়া সে যেন কোন পুষ্পের সন্ধানে চলিয়াছে। সিঁড়ির শেষ পর্য্যন্ত উঠিয়া রাজশেখর স্তব্ধ শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে ঘরের কোণে একটি নারী চক্ষু বুজিয়া এক উর্দ্দু গান মৃদুস্বরে গাহিতেছে। সম্মুখে পাথরের জালতির ফাঁক দিয়া প্রভাতের আলো তাহার ভক্তিনত পবিত্র মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, যেন উষার শ্বেতপদ্ম আলোর দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছে। গানের সুর রাজশেখরকে চিরকাল মত্ত করিয়া তোলে, সঙ্গীত সুধার জন্য তাহার হৃদয় চির তৃষিত, কিন্তু এ ঈশ্বর-বন্দনায় গানের মধুর সুরে সে শান্ত তৃপ্ত হইয়া দাঁড়াইল; নারীকে সে চিরকাল মোহিনী, আলেয়ার আলো রূপে দেখিয়াছে, নারীর এ রূপের সম্মুখে সে মাথা নত করিয়া প্রার্থনা-বেদনা-মণ্ডিত ভক্তি-উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার সম্মুখে যেন কোন নব-জগতের রহস্যময় পট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

পিছন হইতে কে শেখরের হাত টানিল, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি জ্বলন্ত চোখ তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এ নারীর মুখও ত ওই প্রার্থনারতা ভক্তিমতীর মত কোমল সুকুমার; কিন্তু যেন কিসের ব্যথায় এ ক্ষুব্ধ, ইহার চোখে কিসের আগুন জ্বলিতেছে। ইরানী নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া শেখর একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, গত সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা বিদ্যুৎশিখার মত তাহাকে যেন নিমেষে দগ্ধ করিয়া গেল, সম্মুখের স্বপ্নজাল টুটিয়া গেল, নর্ত্তকী আবার তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

বস্তুতঃ, ফতেমার এ বেদনা-জ্বালা তাহার নিজেরও সম্পূর্ণ অজানা। সে এত দিন পুরুষের ভোগবিলাসের পণ্য-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেহ তাহাকে ভালবাসে নাই, সে কাহাকেও ভালবাসে নাই। কিন্তু গত সন্ধ্যায় এই অজানা রহস্যময় যুবকটি তাহাকে উদ্ধার করিল, মুক্তি দিল, তার পর মৃত্যুর অতলস্পর্শ অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল। সে এই উন্মত্ত, অসহায়, জরাতুর যুবকের সঙ্গ ছাড়িতে পারে নাই, মনে হইতেছে যেন তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। এ যুবক ত তাহাকে ক্রয় করিয়াছে, এ তাহার। সে যে আর কোন নারীর প্রতি বিমুগ্ধভাবে চাহিয়া থাকিবে, আর কাহারও গান শুনিবে, ফতেমা যেন তাহা সহিতে পারিতেছিল না। সে বুঝিতে পারিতেছিল না—তাহার মন প্রেমের আগুনে, ঈর্ষায় জ্বলিতেছে। উনি তাহাদের আশ্রয়দায়িনী হউন, উনি যদি এ যুবককে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে চান, সে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিবে। জোরে সে শেখরের হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। শেখর কিছু বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে চাহিল না, সে শ্রান্ত হইয়া শয্যায় গিয়া শুইল। ফতেমা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, গান শুনবে? শিশুর মত সরল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শেখর কিছু বলিতে পারিল না। ফতেমা একটি গজল গাহিতে আরম্ভ করিল। শেখরের চোখে ভজন-সুর-দীপ্ত একখানি পবিত্র মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

শিরিণ গান শেষ করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে সুরু করিল। প্রতি সকালেই সে আল্লার নাম গান করে; কিন্তু আজ সে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিতেছিল, তাহার দাদার জন্য তাহার মন বড় বিচলিত ছিল। গত বৎসর শত্রুরা তাহার দাদাকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করে। তার পর শিরিণকে জোর করিয়া এক লম্পট ওমারের সহিত বিবাহ দিবার চক্রান্ত হয়। তখন তাহারা দু'জন ছদ্মবেশে দিল্লী হইতে পলায়ন করে। ভারতের নানা স্থান ঘুরিয়া আবার তাহারা দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ছদ্মবেশে লুকাইয়া বাস করিতেছে। হয়ত দাদাকে আলি মহম্মদ বলিয়া কেহ চিনিতে পারিয়াছে, তাঁহার আবার কোন বিপদ হইয়াছে, এই ভাবিয়া শিরিণ চিন্তিত ছিল। সে প্রার্থনা করিতেছিল, আল্লা, আমাদের মনে তুমি যে স্বপ্ন জাগাও, তুমি তা সফল কর না কেন, যে সব সৎ ইচ্ছা দাও, তা পূর্ণ করবার শক্তি দাও না কেন, কেন তোমার পৃথিবীতে এত দুঃখ এত দ্বন্দ্ব এত অশান্তি? প্রেম দাও, আমাদের প্রত্যেকের মনে তুমি প্রেম দাও—

তাহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে আবার এক হিন্দি ভজন গাহিতে আরম্ভ করিয়া তাহার ব্যথাভারাক্রান্ত মন একটু শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। সে দুর্ব্বলা বন্দিনী নারী, তাহার দাদার উদ্যমে, দাদার বিপদে কি সাহায্য করিতে পারে। ভগবানের নাম গান করিয়া সে দাদার স্বপ্ন সফল করিবে, এই তাহার আশা।

হায় আশার স্বপ্ন! এই স্বপ্নে মাতোয়ারা হইয়া এ পৃথিবীতে প্রতিজন আপন আপন জীবনের গল্পজাল বুনিতেছে। এ গল্পটিতেও সকলে স্বপ্নের ঘোরে চলিয়াছে—আলি মহম্মদ ভাবিতেছে, হয়ত সে এক দিন ভারতের সকল জাতি মিলাইয়া এক শান্তির সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে। ওই ত নাদির, খোরাসনের এক দরিদ্র দরজীর পুত্র, পারস্যের সিংহাসনে বসিয়াছে। শঙ্কর ভাবিতেছে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি রাজনৈতিক প্রতিভা দিয়া সে এক নবশক্তি নবরাজ্য গড়িবে। ওই ত রামদাস, ওই ত গুরু গোবিন্দ নব নব শক্তির সৃষ্টি করিলেন! যমুনা স্পষ্ট কিছু ভাবিতেছে না, একটি তরুণ সুন্দর মুখের স্বপ্নে তাহার মন লীন, যাহা সুদূর যাহা অসম্ভব তাহারি স্বপ্ন তাহাকে মুগ্ধ চঞ্চল করিতেছে।

শিরিণ নিজের জন্য কিছু চাহিতেছে না বটে, সে সুখ ঐশ্বর্য্য চায় না; সে শুধু আল্লার চরণে পড়িয়া থাকিতে চায়, কিন্তু তাহার দাদার স্বপ্নমরীচিকায় সেও দিশাহারা, তাহার দাদার উত্তম সফল হোক ওই তাহার প্রার্থনা। নর্ত্তকী ফতেমা, সেও ভাবিতেছে স্রোতের ফুলের মত আর তাহাকে গৃহহারা ঘুরিতে হইবে না, হয়ত শান্তির প্রেমের আশ্রয় সে পাইল। বাইজী জামেলা, সেও ভাবিতেছে, তাহার শূন্য জীবন হয়ত চিরকাল এম্নি শূন্য চিরতৃষ্ণা-জ্বালাময় থাকিবে না, কোন শুভ প্রভাতে কোন্ প্রেমিক পুরুষের চরণপাতে পুষ্পময় হইয়া উঠিবে।

আর রাজশেখর, সে ত জীবনভারে শ্রান্ত হইয়া মরিতে গিয়াছিল, আবার কোন্ আশার স্বপ্নে সে বাঁচিতে চায়; চরিত্রহীন লম্পট যুবক যখন কোন সতী সাধ্বীকে ভালবাসে, তাহার কাম-পঙ্কিলতার অন্ধকারে সেই প্রেম প্রদীপের শিখায় সে একটু আনন্দ-পথ দেখিতে পায়, সে বোঝে সে কাহারও প্রেমের যোগ্য নয়, তবু মনে আশা জাগে, শান্তি আসে। রাজশেখরও তাই ভাবিতেছিল, এ পৃথিবীতে এমন সুন্দর স্বর এমন পবিত্র মুখ এমন সেবিকা নারী আছে, আবার নতুন জীবন আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করে। তাহার মন যে কি চাহিতেছিল, তাহা সে নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, আবার জীবনের অজানা তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে। ফতেমার যখন গান শেষ হইল, শেখর ধীরে শয্যা হইতে উঠিল। প্রার্থনারতার মূর্ত্তি আবার সে দেখিতে চায়, অশ্রুসজল করুণ সুর আর একটু শুনিতে চায়। ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইল, ফতেমা তাহাকে বাধা দিল না, তাহার পেছন পেছন চলিল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া শেখর আবার দাঁড়াইল, এ ত কামের আহ্বান নয়, এ তার আত্মার জাগরণ, লালসাকলুষিত হইয়া সে ত নারীর পবিত্র মন্দিরে যাইতে পারিবে না, ওই তরুণী যে ঘরে থাকে যে পথ দিয়া চলে যেখানে গান গায়, সব পবিত্র, সেখানে তাহার যাইবার অধিকার নাই। তাহার এই নবজাগ্রত মন তাহার গতজীবনের মানুষটিকে ঘৃণা করিতে লাগিল। করুণ চোখে সে ফতেমার ঈর্ষা-ব্যথিত মুখের দিকে চাহিল। ফতেমা চমকিয়া উঠিতে শেখর মুখ ঘুরাইয়া দেখিল, সিঁড়ির ওপর তাহার দেবী শুভ্রবসনমণ্ডিতা স্বপ্নের মত

দাঁড়াইয়া। সে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে মাথা নত করিয়া ফতেমার দিকে চাহিল। এ মুখও সহসা যেন বদলাইয়া গেল, সে কি নবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে! ঐ লালসাজ্বালাময় মুখের মধ্যে কল্যাণী নারীকে স্নেহময়ী সেবিকাকে দেখিতে পাইল, তাহার দেবীর কল্যাণজ্যোতি ইহার ওপরও আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে সে সত্যরূপে পাইল।

স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। ধীরে ফতেমার হাত ধরিয়া শেখর বাহিরের দরজার দিকে চলিল। যে খোজা ভৃত্যেরা গতরাত্রে তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সম্মুখে নীল যমুনা কলোচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছে, সম্মুখে অজানা দীর্ঘ জীবনপথ। প্রভাতালোকে যমুনাতীরে ফতেমার পাশে দাঁড়াইয়া শেখরের মনে হইল, এ নর্ত্তকী সখীর হাতে ধরিয়া সম্মুখের পথ দিয়া সে আনন্দে চলিয়া যাইবে, এই ভগ্নভ্রষ্ট জীবন এক কল্যাণী নারীর হাতে দিয়া সে শান্তি পাইবে, সে আবার সুখ-জীবনের স্বপ্ন দেখিল।

সহধর্ম্মিণী, না দাসী ?



বর বিবাহ করিতে যাইতেছেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি আনতে যাচ্ছ?" বড়দিদি বলিয়া দিলেন, "বল, মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।" বর উত্তর করিলেন, "তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।"

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ

বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)



শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ



শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, বাঁকুড়া



শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বাগচি, লদহ



শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মৈমনসিংহ



শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, চুঁচুড়া



খাঁ বাহাদুর মৌলবী মুসরফ হোসেন, জলপাইগুড়ি



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, বর্দ্ধমান



শ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, খুলনা



শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্ত্তী, রাজসাহী



ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, ২৪ পরগণা

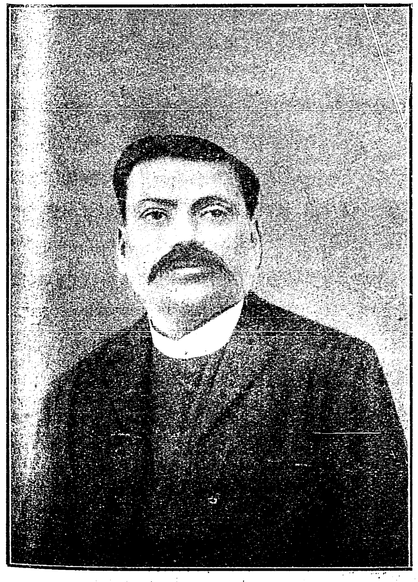

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হাবড়া



মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মুর্শিদাবাদ

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ধাতুশিল্প

পিতলের চাদর হইতে ডাইসের সাহায্যে গোল চাকতি কাটিয়া চারিটী ছিদ্র করিয়া এবং মাঝখানটি গভীর করিয়া ইজেরের বোতাম প্রস্তুত করিবার কথা পূর্ব্বে একবার হইয়া গিয়াছে। ঐ পিতলের চাদর হইতে ঐরূপ ডাইসের সাহায্যে আরও অনেক জিনিস আপনারা তৈয়ার করিতে পারিবেন। পিতলের মুখওয়ালা ও চিমনীযুক্ত দেওয়ালে আটকানো টীনের ল্যাম্প আজকাল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরেই দুইচারিটা করিয়া পাওয়া যায়ই। এইরূপ একটী আলো লইয়া তাহার গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেখুন। আলোটির যে অংশ টীনের, সেটী টীনের চাদর হইতে এখানে প্রস্তুত হইতেছে। এই টীনের খোলটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এক একটী অংশ এক এক আকারের ডাইসের সাহায্যে কাটিয়া কলে মুড়িয়া ঝাল দিয়া টীনের খোলটি প্রস্তুত হয়। এই ডাইস ও তাহার কল হাতেই চলে। একেবারে কয়েকখানি টীন উপরি উপরি রাখিয়া কলের ভিতর ফেলিয়া punch করিয়া লওয়া হয়। তার পর সেগুলিকে ঝাল দিয়া জুড়িয়া লওয়া হয়। এই আলোর পিতলের মুখগুলি এখনও বিদেশ হইতে আসে। কিন্তু পিতলের চাদরও যখন আমদানী হয়, তখন ডাইসের সাহায্যে এটীও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। পিতলের মুখটির এক প্রান্ত টীনের খোলটির সঙ্গে ঝাল দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ মুখ রাধাবাজারে, এবং সহরের নানা স্থানে মনোহারী দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই রকম মুখ আমি আপনাদের এখানে তৈয়ার করিয়া দিতে বলিতেছি।

দুই একটী এই রকম মুখ বাজার হইতে কিনিয়া আনুন; আনিয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহার গঠন কি রকম। দেখিবেন, উহার প্রধানতঃ দুইটী অংশ আছে। সেই দুইটী অংশ প্যাঁচ দিয়া পরস্পরের সঙ্গে জোড়া যায়, আবার খোলা যায়। এই দুইটী অংশের মধ্যে একটী অংশ টীনের খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে। অপর অংশটীতে পলিতা পরাইয়া, খোলের ভিতর কেরোসিন তেল ঢালিয়া প্যাঁচ কসিয়া দিলেই আলোটী সম্পূর্ণ হইল। যে অংশটি খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে, সেটী একটী ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইবে। এটী একটী অখণ্ড অংশ। অপর অংশটি আবার আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু সেই সকল খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জুড়িবার জন্য কোথাও ঝাল দিতে হয় না। আর এখানে ঝাল দেওয়া চলেও না; কারণ, ল্যাম্প জ্বালিলে এটী এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, ঝাল গলিয়া গিয়া জোড় খুলিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য এই ছোট ছোট অংশগুলি এমন কৌশলে ডাইসের সাহায্যে কাটা হয় যে, সেগুলি কেবলমাত্র মুড়িয়া (বিনা ঝালে) পরস্পরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যায়। মুখটির অংশগুলির জোড় খুলিয়া একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই আপনারা সেই কৌশলটি বুঝিতে পারিবেন।

এখন, একটী মুখের সকল জোড় একখানি ছুরীর সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়া খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করুন। তার পর দেখুন, সেইগুলি প্রস্তুত করিতে কয়খানি কি কি রকমের ডাইস দরকার। খণ্ডগুলি আলাদা করিলে দেখিবেন, সমস্ত অংশই ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারিবে। এমন কি, পলিতা উস্কাইবার স্ক্রুটি পর্য্যন্ত। স্ক্রুটি যদি ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত করিবার সুবিধা না হয়, তবে উহা ঢালাই করিয়াও লইতে পারা যায়। তবে সকল অংশ একই পিতলের চাদরে প্রস্তুত হইবে না। দুই তিন রকম বেধের পিতলের চাদর দরকার হইবে।

টীনের ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানি হয়; পিতলেরও ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানি হয়। টীনের চাদর হইতে যেমন খোলটি প্রস্তুত হইতেছে, আমার মনে

হয়, পিতলের চাদর হইতে সেইরূপ মুখটিও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আরও একটী নূতন industryর পথ এ দেশে খুলিয়া যাইবে। আপনারা দেখিবেন, একটু চেষ্টা করিলেই এইটী তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়; ইহা একটুও অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহার জন্য খুব দামী ও খুব জটিল কল-কব্জার দরকার হইবে না; দু' দশ লাখ মূলধনও দরকার হইবে না। কল-কব্জাগুলি বোধ হয় বাজারে পাওয়া যায়; কেন না, সে রকম অনেক কল অন্য উদ্দেশ্যে বাজারে চলিতেছে। যদি না পাওয়া যায়, তবে যে কোন কারখানায় (workshop এ) উহা অর্ডার দিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইবে। কারখানায় গিয়া আপনার উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া বলিলেই কারখানাওয়ালারা আপনাকে যথামূল্যে কল তৈয়ার করিয়া দিবে।

টীনের জার্ম্মাণ খেলানা

মুর্গিহাটা, রাধাবাজার এবং অধিকাংশ সাধারণ মনোহারী দোকানে জার্ম্মাণী হইতে আমদানি বিবিধ মনোহর টীনের খেলানা পাওয়া যায়। কলের গাড়ী (রেলওয়ে ট্রেণ, এঞ্জিন আদে), মোটর, এরোপ্লেন, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক রকম সুন্দর সুন্দর টীনের খেলানা জার্ম্মাণী হইতে আমদানি হইয়া এদেশে খুব বিক্রী হয়। জিনিসগুলি খুব সুন্দর দেখিতে ও খুব মজবুত বলিয়া তাহাদের দামও খুব বেশী। তাহাদের ক্রেতারও অভাব নাই। ইহাদের প্রচুর আমদানিই তাহার প্রমাণ।

রাধাবাজার হইতে কতকগুলি এইরূপ খেলানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন; দেখিবেন, ইহাদের অনেকগুলি অংশ আছে। সেগুলি ঝাল দিয়া জোড়া হয় না, মুড়িয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। জোড়গুলি খুলিয়া অংশগুলি স্বতন্ত্র করিলে দেখিবেন, পূর্ব্বোক্ত চিমনীর ল্যাম্পের পিতলের মুখের মত, এগুলিও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে।

কিন্তু ইহাদের রং দিয়া সজ্জিত করা একটু কঠিন। রং খুব বিচিত্র ও উজ্জ্বল হওয়া চাই; এবং খুব সতর্কতা ও কৌশল সহকারে রং লাগানো চাই। এই রং বোধ হয় ছাপা যাইতে পারে। এবং টীনের উপর ছাপিবার কারখানাও বেলেঘাটায় খোলা হইয়াছে। মোট কথা, ছেলেমেয়েরা ইহার খরিদদার। তাহারা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রং দেখিয়া ভুলিবে, এবং কিনিতে চাহিবে। তার পর ইহার অন্য গুণের বিচার করিবে।

আর এক রকম খেলানা

শিশুদের ক্রীড়নক নির্ম্মাণ শিল্পে জাপান দেখিতেছি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেদিন এক ফেরিওয়ালার কাছে দুই একটা নূতন রকমের খেলানা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে খেলানাগুলি দেখিলেই জাপানী হাতের শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। খেলানাগুলি বিশেষ কিছু নয়—একটী কুকুর ও একটী কাঠের হাত-পা-ওয়ালা বানর। কাঠের উপর লোমযুক্ত কোন পশুর কাঁচা চামড়া লাগাইয়া পুতুলগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। সেগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর এবং লোমগুলি ও চামড়া অতি নরম। সে কোন পশুর চামড়া ও লোম তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিলাম না। লোমশ কুকুর এদেশেও তৈয়ার হয়, এবং এক পয়সায় একটী বিক্রী হয়। ভেড়ার লোম দিয়া বোধ হয় সে কুকুরগুলি প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহা দেখিতে তাদৃশ সুন্দর নহে। কিন্তু এই জাপানী পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে তাহা দেখিয়াই আমার এবং আরও দুই একজন পথিকের কিনিতে লোভ হইল। কিন্তু দাম শুনিয়াই চক্ষু স্থির। এক একটী ছয় আনা। পাঁচ আনায় কমে সে কিছুতেই তাহা বিক্রী করিবে না। তাই দিয়াই দুইটা কেনা হইল। পুতুলগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমন মজবুত বলিয়া বোধ হইল না। ছেলেদের হাতে পড়িলে তাহাদের পুতুল লীলার অবসান হইতে এক দণ্ডও লাগিবে না। অথচ পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে, কম মজবুত হইলেও, এ দেশে ঐরূপ উচ্চ মূল্যে তাহাদের খরিদদারের অভাব হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের দেশেও ত অনেক রকম জীব জন্তু আছে। তাহাদের লোম ও চর্ম্ম শিল্পে প্রয়োগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা দেখা উচিত। যাঁহারা জীবহিংসায় নারাজ, তাঁহাদের অবশ্য এ অনুরোধ করা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের জীবহিংসায় কোন আপত্তি নাই, তাঁহারা

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ধাতুশিল্প

পিতলের চাদর হইতে ডাইসের সাহায্যে গোল চাকতি কাটিয়া চারিটী ছিদ্র করিয়া এবং মাঝখানটি গভীর করিয়া ইজেরের বোতাম প্রস্তুত করিবার কথা পূর্ব্বে একবার হইয়া গিয়াছে। ঐ পিতলের চাদর হইতে ঐরূপ ডাইসের সাহায্যে আরও অনেক জিনিস আপনারা তৈয়ার করিতে পারিবেন। পিতলের মুখওয়ালা ও চিমনীযুক্ত দেওয়ালে আটকানো টীনের ল্যাম্প আজকাল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরেই দুইচারিটা করিয়া পাওয়া যায়ই। এইরূপ একটী আলো লইয়া তাহার গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেখুন। আলোটির যে অংশ টীনের, সেটী টীনের চাদর হইতে এখানে প্রস্তুত হইতেছে। এই টীনের খোলটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এক একটী অংশ এক এক আকারের ডাইসের সাহায্যে কাটিয়া কলে মুড়িয়া ঝাল দিয়া টীনের খোলটি প্রস্তুত হয়। এই ডাইস ও তাহার কল হাতেই চলে। একেবারে কয়েকখানি টীন উপরি উপরি রাখিয়া কলের ভিতর ফেলিয়া punch করিয়া লওয়া হয়। তার পর সেগুলিকে ঝাল দিয়া জুড়িয়া লওয়া হয়। এই আলোর পিতলের মুখগুলি এখনও বিদেশ হইতে আসে। কিন্তু পিতলের চাদরও যখন আমদানী হয়, তখন ডাইসের সাহায্যে এটীও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। পিতলের মুখটির এক প্রান্ত টীনের খোলটির সঙ্গে ঝাল দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ মুখ রাধাবাজারে, এবং সহরের নানা স্থানে মনোহারী দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই রকম মুখ আমি আপনাদের এখানে তৈয়ার করিয়া দিতে বলিতেছি।

দুই একটী এই রকম মুখ বাজার হইতে কিনিয়া আনুন; আনিয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহার গঠন কি রকম। দেখিবেন, উহার প্রধানতঃ দুইটী অংশ আছে। সেই দুইটী অংশ প্যাঁচ দিয়া পরস্পরের সঙ্গে জোড়া যায়, আবার খোলা যায়। এই দুইটী অংশের মধ্যে একটী অংশ টীনের খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে। অপর অংশটীতে পলিতা পরাইয়া, খোলের ভিতর কেরোসিন তেল ঢালিয়া প্যাঁচ কসিয়া দিলেই আলোটী সম্পূর্ণ হইল। যে অংশটী খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে, সেটী একটী ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইবে। এটী একটী অখণ্ড অংশ। অপর অংশটি আবার আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু সেই সকল খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জুড়িবার জন্য কোথাও ঝাল দিতে হয় না। আর এখানে ঝাল দেওয়া চলেও না; কারণ, ল্যাম্প জ্বালিলে এটী এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, ঝাল গলিয়া গিয়া জোড় খুলিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য এই ছোট ছোট অংশগুলি এমন কৌশলে ডাইসের সাহায্যে কাটা হয় যে, সেগুলি কেবলমাত্র মুড়িয়া (বিনা ঝালে) পরস্পরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যায়। মুখটির অংশগুলির জোড় খুলিয়া একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই আপনারা সেই কৌশলটি বুঝিতে পারিবেন।

এখন, একটী মুখের সকল জোড় একখানি ছুরীর সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়া খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করুন। তার পর দেখুন, সেইগুলি প্রস্তুত করিতে কয়খানি কি কি রকমের ডাইস দরকার। খণ্ডগুলি আলাদা করিলে দেখিবেন, সমস্ত অংশই ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারিবে। এমন কি, পলিতা উস্কাইবার স্ক্রুটি পর্য্যন্ত। স্ক্রুটি যদি ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত করিবার সুবিধা না হয়, তবে উহা ঢালাই করিয়াও লইতে পারা যায়। তবে সকল অংশ একই পিতলের চাদরে প্রস্তুত হইবে না। দুই তিন রকম বেধের পিতলের চাদর দরকার হইবে।

টীনের ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানি হয়; পিতলেরও ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানি হয়। টীনের চাদর হইতে যেমন খোলটি প্রস্তুত হইতেছে, আমার মনে

হয়, পিতলের চাদর হইতে সেইরূপ মুখটিও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আরও একটী নূতন industryর পথ এ দেশে খুলিয়া যাইবে। আপনারা দেখিবেন, একটু চেষ্টা করিলেই এইটী তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়; ইহা একটুও অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহার জন্য খুব দামী ও খুব জটিল কল-কব্জার দরকার হইবে না; দু' দশ লাখ মূলধনও দরকার হইবে না। কল-কব্জাগুলি বোধ হয় বাজারে পাওয়া যায়; কেন না, সে রকম অনেক কল অন্য উদ্দেশ্যে বাজারে চলিতেছে। যদি না পাওয়া যায়, তবে যে কোন কারখানায় (workshop এ) উহা অর্ডার দিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইবে। কারখানায় গিয়া আপনার উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া বলিলেই কারখানাওয়ালারা আপনাকে যথামূল্যে কল তৈয়ার করিয়া দিবে।

টীনের জার্ম্মাণ খেলানা

মুর্গিহাটা, রাধাবাজার এবং অধিকাংশ সাধারণ মনোহারী দোকানে জার্ম্মাণী হইতে আমদানি বিবিধ মনোহর টীনের খেলানা পাওয়া যায়। কলের গাড়ী (রেলওয়ে ট্রেণ, এঞ্জিন বাদে), মোটর, এরোপ্লেন, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক রকম সুন্দর সুন্দর টীনের খেলানা জার্ম্মাণী হইতে আমদানি হইয়া এদেশে খুব বিক্রী হয়। জিনিসগুলি খুব সুন্দর দেখিতে ও খুব মজবুত বলিয়া তাহাদের দামও খুব বেশী। তাহাদের ক্রেতারও অভাব নাই। ইহাদের প্রচুর আমদানিই তাহার প্রমাণ।

রাধাবাজার হইতে কতকগুলি এইরূপ খেলানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন; দেখিবেন, ইহাদের অনেকগুলি অংশ আছে। সেগুলি ঝাল দিয়া জোড়া হয় না, মুড়িয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। জোড়গুলি খুলিয়া অংশগুলি স্বতন্ত্র করিলে দেখিবেন, পূর্ব্বোক্ত চিমনীর ল্যাম্পের পিতলের মুখের মত, এগুলিও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে।

কিন্তু ইহাদের রং দিয়া সজ্জিত করা একটু কঠিন। রং খুব বিচিত্র ও উজ্জ্বল হওয়া চাই; এবং খুব সতর্কতা ও কৌশল সহকারে রং লাগানো চাই। এই রং বোধ হয় ছাপা যাইতে পারে। এবং টীনের উপর ছাপিবার কারখানাও বেলেঘাটায় খোলা হইয়াছে। মোট কথা, ছেলেমেয়েরা ইহার খরিদদার। তাহারা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রং দেখিয়া ভুলিবে, এবং কিনিতে চাহিবে। তার পর ইহার অন্য গুণের বিচার করিবে।

আর এক রকম খেলানা

শিশুদের ক্রীড়নক নির্ম্মাণ শিল্পে জাপান দেখিতেছি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেদিন এক ফেরিওয়ালার কাছে দুই একটা নূতন রকমের খেলানা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে খেলানাগুলি দেখিলেই জাপানী হাতের শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। খেলানাগুলি বিশেষ কিছু নয়—একটী কুকুর ও একটী কাঠের হাত-পা-ওয়ালা বানর। কাঠের উপর লোমযুক্ত কোন পশুর কাঁচা চামড়া লাগাইয়া পুতুলগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। সেগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর এবং লোমগুলি ও চামড়া অতি নরম। সে কোন পশুর চামড়া ও লোম তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিলাম না। লোমশ কুকুর এদেশেও তৈয়ার হয়, এবং এক পয়সায় একটী বিক্রী হয়। ভেড়ার লোম দিয়া বোধ হয় সে কুকুরগুলি প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহা দেখিতে তাদৃশ সুন্দর নহে। কিন্তু এই জাপানী পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে তাহা দেখিয়াই আমার এবং আরও দুই একজন পথিকের কিনিতে লোভ হইল। কিন্তু দাম শুনিয়াই চক্ষু স্থির। এক একটী ছয় আনা। পাঁচ আনায় কমে সে কিছুতেই তাহা বিক্রী করিবে না। তাই দিয়াই দুইটা কেনা হইল। পুতুলগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমন মজবুত বলিয়া বোধ হইল না। ছেলেদের হাতে পড়িলে তাহাদের পুতুল লীলার অবসান হইতে এক দণ্ডও লাগিবে না। অথচ পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে, কম মজবুত হইলেও, এ দেশে ঐরূপ উচ্চ মূল্যে তাহাদের খরিদদারের অভাব হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের দেশেও ত অনেক রকম জীব জন্তু আছে। তাহাদের লোম ও চর্ম্ম শিল্পে প্রয়োগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা দেখা উচিত। যাঁহারা জীবহিংসায় নারাজ, তাঁহাদের অবশ্য এ অনুরোধ করা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের জীবহিংসায় কোন আপত্তি নাই, তাঁহারা

স্বচ্ছন্দে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে পারেন। আর একটী কথা মনে রাখিবেন, জাপানীরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অথচ, তাহারাই পশু লোম ও পশুচর্ম্ম হইতে খেলানা প্রস্তুত করিয়া এ দেশে পাঠাইতেছে! খরগোস, গিনি পিগ, কাঠবিড়াল, বেজী, ভোঁদড়, খটাশ, প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্ম ও লোম বোধ হয়, এইরূপ শিল্পের উপযোগী হইতে পারে। বিশেষতঃ, যে সকল প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে, তাহাদিগকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া এই কাজে লাগাইতে পারিলে আহার ঔষধ দুইই হইবে—ক্ষতি নিবারণও হইবে, অর্থাগমও হইবে।

Paper clip

অফিস অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য Paper clip আপনাদের নিজেদের কাছেও দুই চারিটা থাকা অসম্ভব নহে। লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত থাকিলে প্রায় এই জিনিসটির দরকার হয়। যখন আপনারা এই জিনিসটি ব্যবহার করেন, তখন এই জিনিস—এমন দরকারী জিনিস—এখানে তৈয়ার করিতে পারা যায় কি না, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা তৈয়ার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অথচ, আপনারা যাহা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী। অথচ, দেখুন, আপনারা যদি চিমনীর আলোর মুখ বা টীনের খেলানার কারখানা খোলেন, তাহা হইলে সেই কারখানাতেই সেই সকল জিনিসের সঙ্গে এটীও তৈয়ার হইতে পারিবে। যে যে যন্ত্রের সাহায্যে চিমনীর আলোর মুখ ও টীনের খেলানা তৈয়ার হইবে, তাহারই দুই একটীতে ইহারও কতক অংশ তৈয়ার হইবে। Paper clipএর কয়েকটি অংশ আছে দেখুন। প্রথমতঃ যে দুইটী আঙ্গুলের মত অংশের দ্বারা কাগজগুলিকে টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। পিতল, টীন বা লোহার চাদর পাঞ্চ করিয়া এই দুইটী জিনিস তৈয়ার হইবে। দ্বিতীয়তঃ Springটি। ইস্পাতের তার বাজারে পাওয়া যাইবে। তাহাকে লোহার খিলের গায়ে জড়াইয়া লইলে স্প্রিং তৈয়ার হইবে। স্প্রিংটি একটী যন্ত্রের সাহায্যে তৈয়ার করিতে হইবে। এই যন্ত্রের দাম বেশী নয়, ২৫।৩০ টাকার মধ্যে হওয়াই সম্ভব—যে কোন Work shopএ অর্ডার দিয়া ইহা তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। তার পর খিল। লোহার মোটা তার উপযুক্ত মাপে কাটিয়া লইয়া খিল তৈয়ার করিতে হইবে। তার পর অংশগুলি ঠিক ভাবে সংযুক্ত করিয়া, যাহাতে খিল হইতে অংশগুলি খুলিয়া না যায়, সেই জন্য খিলটির দুই প্রান্ত একটু একটু পিটিয়া দিতে হইবে। তার পর কার্ড বোর্ডের উপর কারখানার নাম ছাপিয়া এক ডজন হিসাবে ক্লিপ তাহাতে সেলাই করিয়া হউক অথবা রবারের সুতার দ্বারা হউক আটকাইয়া বাজারে পাঠাইয়া দিন। একই শ্রেণীর জিনিসগুলি এক কারখানাতে তৈয়ার হইলে কাজের বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

ফিতা-বোনা কল।

যশোহরের চিরুণীর কারখানায় প্রতিষ্ঠাতা জাপান প্রত্যাগত বিখ্যাত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এণ্ড সিই

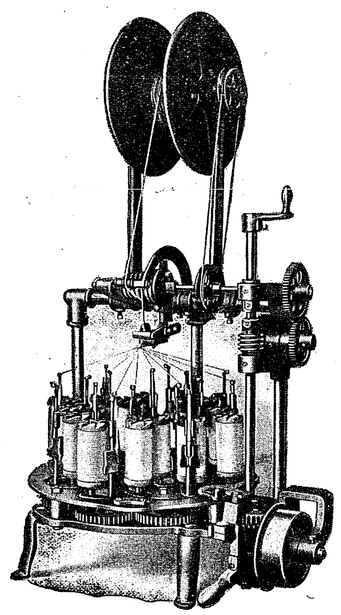

ফিতা-বোনা কল

(জাপান), এম-আর-এ-এস (লণ্ডন) মহাশয় আপনাদের সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখুন। তিনি গৃহ

শিল্পের উপযোগী তাঁত ও অন্যান্য কম দামের ছোট ছোট কল ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান হইতে আমদানী করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ফিতা বোনা কল আনাইয়া, তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দেখুন, আপনারা তাহা হইতে কিছু সুবিধা করিতে পারেন কি না।

জুতার, ও বুটের ফিতা, মোমবাতির ফিতা, ঘড়ির কার প্রভৃতি, আজকাল আমাদের দেশে আদৌ প্রস্তুত হয় না বলিলেই হয়। আমাদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। এই সমস্ত ব্যবসায়ে যে খুব বেশী মূলধনের আবশ্যক হয় এমন নহে। এই সঙ্গে যে কলের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, এই প্রকার কলেই উপরিউক্ত চওড়া এবং গোল সর্ব্বপ্রকার ফিতা প্রভৃতিই, সুতা, রেশম বা নকল রেশম হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলগুলি সাধারণতঃ ছোট ইলেকট্রিক মোটর বা অয়েল ইঞ্জিনে চালাইবার উপযোগী করিয়াই প্রস্তুত করা হয়। এক ঘোড়া (1 H. P.) ইঞ্জিনে এইরূপ ৫টী কল চলে। এত কম Power আবশ্যক হয় বলিয়া ইচ্ছা করিলে এই কল হাতে চালাইবার বন্দোবস্তও করিয়া লওয়া যায়, অবশ্য তাহাতে কলের কার্য্য অপেক্ষাকৃত কম হয়। এঞ্জিনে চালাইলে ফিতার বিভিন্নতা অনুযায়ী একটী কলে দৈনিক ৮ ঘণ্টায় ৮০০ হইতে ১০০০ ফিট ফিতা প্রস্তুত করা যায়। একটা কলে একই মাপের ফিতা প্রস্তুত হয়। তবে একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া লইলে একই কলে চওড়া এবং গোলফিতা তৈয়ারী করা চলে। জুতার ফিতা সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়। "ডারবী সু" প্রভৃতিতে যে ফিতা ব্যবহৃত হয়, উহাতে ৬৫টী সুতা থাকে এবং তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে ৬৫ ববিণযুক্ত কল আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত সরু আর এক প্রকার ফিতা আছে, তাহাতে ৪৯টী সুতা থাকে। উহা ৪৯ ববিণ যুক্ত কলে প্রস্তুত হয়। এই দুই প্রকার কলের দাম যথাক্রমে ৭৫৲ এবং ৬৫৲ টাকা মাত্র।

বাজারে যে বুটজুতার ফিতা বিক্রয় হয়, উহাতে সাধারণতঃ ২৪টী সুতা থাকে। ঐরূপ গোলফিতা প্রস্তুত করিতে ২৪ ববিণযুক্ত কল আবশ্যক। উহার মূল্য ২৭৫৲ টাকা মাত্র। এতদ্ব্যতীত জুতার ফিতার অগ্রভাগে যে টীনের পাত দ্বারা আটকান থাকে, উহা লাগাইবার জন্য একটী "টিপিং" মেশিন আবশ্যক। ইহা পায়ে চলে এবং ইহার দ্বারা ঘণ্টায় প্রায় ৫ গ্রোস ফিতায় টীনের বা পিতলের পাঁত লাগাইয়া লওয়া যায়। ইহার মূল্য মাত্র ১৮৫৲ টাকা।

ফিতায় লাগাইবার উপযোগী পাত এখানে কাটিয়া করিয়া লওয়া যায়, অথবা বিদেশ হইতেও আনাইয়া লওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড প্রায় ৪৲ টাকা খরচ পড়ে।

একই প্রকার মেসিনেই অন্য অনেক প্রকার ফিতা, ঘড়ির কার প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। জুতার ফিতা প্রস্তুত করিতে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে, তাহার একটা মোটামুটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

২০০ জোড়া বুটের ফিতা প্রস্তুত করিতে হইলে সুতা ছিঁড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে নষ্ট হওয়া সমেত—

৩ পাউণ্ড—প্রতি পাউণ্ড

১৷৷০ হিঃ—৪৷৷০

টীনের পাত অর্দ্ধ পাউণ্ড—প্রতি পাউণ্ড

৪৲ টাকা হিঃ—২৲

মজুরী—২ জন লোক—দৈনিক ১৲ টাকা হিঃ—২৲

প্যাকিং ও অন্যান্য ব্যয় ৷৷০

মোট ৯৲

২০০ জোড়া ফিতা—পাইকারি হিসাবে প্রতি জোড়া /০ আনা করিয়া বিক্রয় করিলেও ন্যূনকল্পে ১২৷৷০ টাকার বিক্রয় হইবে। তাহাতে মোট লাভ দৈনিক—অন্ততঃ ৩৷৷০ থাকিতে পারে।

আবহাওয়া

হোদি জাতি।—সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় হোদী জাতির সংখ্যা ২২২৪৬ জন। ইহারা অশিক্ষিত ও নিরীহ। বহু দিন যাবৎ ইহারা জমিদার ও হিন্দুজাতির দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজ হইতে এইরূপে ঘৃণ্য ও পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্য হইতে বহু লোক খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠস্থ আশকপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের হাত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া নানা রূপে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। অদূরদর্শী, কর্ম্মে শক্তিহীন কতকগুলি লোক, কেদার বাবু স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে গিয়াছেন অজুহাতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে বাধা দিয়া হিন্দু সমাজের কি ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন বা চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন?

আজ এই জাতিটাকে গ্রাস করিবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্পাদিত কাগজে কি ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, উক্ত হোদী সুহৃদগণ একবার ঐ সমস্ত কাগজ পড়িতেছেন কি? পড়িয়া থাকিলেও আজ আর বন্ধু হইবার ইচ্ছা রাখেন না, কারণ এ স্থান বড় ভয়ানক।

আমরা টাঙ্গাইলের "হিন্দু সংরক্ষিণী" সভাকে অনুরোধ করি, সময় থাকিতে তথায় প্রচারক পাঠাইয়া যাহাতে জাতিটা আমাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া না যাইতে পারে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

জামালপুর ও সেরপুরবাসী হিন্দু সমাজরক্ষক বন্ধু যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারাও যেন এই জাতিটা যাহাতে রক্ষা পায়, হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। হিন্দু দিন দিন যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ঐরূপ একটী জনবহুল সম্প্রদায়কে আমাদের তাচ্ছিল্যে—ঔদাসীন্যে বিচারহীন রক্ষণশীলতার ভণ্ডামিতে যদি পর করিয়া দিই, তবে ইহার অধিক দুর্ভাগ্য আমাদের আর কি হইতে পারে?

(টাঙ্গাইল হিতৈষী)

কলিকাতায় কুষ্ঠ রোগী।—কলিকাতার রাজপথে যেখানে সেখানে কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত বহু লোককে অসহায় অবস্থায় দেখা যায়। ইহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করা যায় কি না, তৎসম্বন্ধে সে দিন কলিকাতার রোটারী ক্লাবের এক সভায় আলোচনা হইয়াছিল। ডাক্তার মুর, ডাক্তার হোমস এবং শ্রীযুক্ত পি এ সেনের সমবায়ে কুষ্ঠ সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে একটা সব কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই সাব কমিটির তদন্তের ফলও সভায় বিবেচিত হয় এবং স্থির হয় যে, কলিকাতা সহরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট কুষ্ঠ সমস্যার সমাধান কল্পে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইবে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ডবলিউ এইচ ফেলপস্ ডাক্তার মুর প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বলেন, প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের পরিদর্শন উপলক্ষে কলিকাতার অধিবাসীবর্গ আলোক সজ্জা প্রভৃতির জন্য ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি টাউন হলে এক সভা করিয়া কলিকাতার কুষ্ঠ সমস্যা সম্বন্ধে বলেন এবং প্রিন্সের পরিদর্শনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী কুষ্ঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উহা হইতে পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করাইয়া লন। তাহার পর কুষ্ঠ আইন হয়। স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রীরূপে তিনি মেদিনীপুরে একটী কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাবে সে টাকা প্রদত্ত হয় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ কমিটির অন্যতম সদস্য মিঃ ডবলিউ এইচ ফেলপস বলেন, কমিটি কুষ্ঠ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে পদে পদে বাধা পাইতেছেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য জোর প্রচার-কার্য্য চালাইতে এবং একটী ফণ্ড খুলিতে বলেন। রোটারী ক্লাবের অন্যতম সভ্য মিঃ হরলক বলেন, কুষ্ঠ চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের টাকা মঞ্জুরীতে ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির কুড়ুল পড়িয়াছে। কুষ্ঠ সমস্যার সমাধান জন্য বহু লক্ষ টাকার প্রয়োজন এবং কলিকাতার সমুদায় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতে হইবে। রোটারী ক্লাবের অন্যতম সদস্য মিঃ হরস্ প্রস্তাব করেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের একটী ডেপুটেশন প্রেরণ করিতে হইবে। আলোচনার উপসংহারে সভাপতি মিঃ ডবলিউ রীড বলেন, কলিকাতার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকগণের সমস্যা সমাধানের জন্যও কিছু করা অত্যাবশ্যক। (নায়ক)

বাংলার খাদি কর্ম্মীর জ্ঞাতব্য বিষয়।—বীজ সমেত তুলার নাম কাপাস। কাপাস কথার ইংরাজী নাই। ইংরাজী ভাষাতেও এখন কাপাস কথাটী বীজ সমেত তুলা অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কাপাস কথাটী প্রচলিত। জাত অনুসারে কাপাস হইতে উৎপন্ন তুলা বেশী কম হয়। বাংলা দেশের গাছ কাপাসে চারি ভাগের একভাগ তুলা পাওয়া যায়। জটা কাপাস এবং বুড়ী কাপাস বা দেব কাপাস হইতে কখন এক চতুর্থ কখনও তদপেক্ষা কম হয়। বাংলার ক্ষেত কাপাস কয়েক রকম চলিত আছে। চট্টগ্রামে যে কাপাস হয় তাহাতে এক মণ হইতে ষোলসের অথবা /২৷৷০ সেরে এক সের তুলা হয়। কুমিল্লা জাত কাপাসেও ঐ প্রকার। ভারতবর্ষের অন্যত্র হইতে বীজ আনাইয়া বাংলায় যে কাপাস উৎপন্ন করা হইতেছে, উহা হইতে

এক মণে তের সের তুলা হয়। গারো কাপাসের জাত অনুসারে একমণ কাপাস হইতে ১৬ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত তুলা হয়। ব্যবসায়ের জন্য কাপাস বাংলা দেশে এক চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলার উত্তরস্থ গারো পাহাড়ে কাপাস জন্মে, তাহাও বাংলাদেশের উপর দিয়া রপ্তানী হয়। অনেক লক্ষ টাকার কাপাস এই সকল বাজারে প্রতিবৎসর কেনা বেচা হয় এবং সমস্তটাই রপ্তানী হইয়া থাকে। বাংলার অন্যান্য জেলায় এবং অজ্ঞাত পল্লীতেও তুলার চাষ এখনও আছে এবং হইতেছে; কিন্তু কাপাসের বড় ব্যবসায়ীরা সেখানে নাই। সে সকল স্থান সম্বন্ধে অল্প সংবাদই সাধারণে পরিজ্ঞাত আছে। ইংরাজী ১৮৬২ সালে প্রকাশিত "কটন হ্যাণ্ডবুক" নামক পুস্তকে বাংলাদেশে ঐ সময় কোন জেলায় কত তুলার চাষ হইত তাহার বিবরণ আছে। যে সকল স্থানে তুলার চাষ ছিল, এখন নষ্ট হইয়াছে অথবা উঠিয়া গিয়াছে, চেষ্টা করিলে, সেই সেই স্থানে পুনরায় তুলার চাষ আরব্ধ হইয়া বাংলার পল্লীতে খাদি প্রচলনের পথ সুগম হইতে পারে।

গারো কাপাস।—এই বৎসর কয়েকজন খাদি কর্ম্মী যাহাতে সস্তা থাকিতে বাংলার খাদির জন্য কিছু কাপাস কিনিয়া রাখা যায় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েক শত মণ গারো কাপাস জোগাড় করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে বহমারী ষ্টেশন। সেই স্থান হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে মাণিকারচর গ্রাম অবস্থিত। মাণিকারচরেই গারো কাপাসের বাজার। কয়েকটী বিভিন্ন স্থান হইতে মাণিকারচরে কাপাস আইসে; যথা:—গাজীরবাদা রাজবালা, দাসালগিরি এবং তুরা। তুরের কাপাস এই অঞ্চলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার আঁশ ভাল এবং তুলা বেশী হয়। তুরা পাহাড় তিন হাজার ফিট উচ্চ। তুরায় সপ্তাহে একবার হাট বসে। তুরা পাহাড়ে দালাল এবং ব্যাপারীরাই গিয়া থাকেন। মাণিকারচর হইতে গোয়ানে ৩২ মাইল পার্ব্বত্য পথে তুরায় যাইতে হয়। গারোরা তুলা লইয়া আসে। নভেম্বরের মধ্যভাগ হইতে ডিসেম্বরের শেষ এই ছয় সপ্তাহে ছয়টী হাটে তুলার কাজ শেষ হয়। ডিসেম্বরের পর নিকৃষ্ট তুলা অল্প পরিমাণে আমদানী হইতে থাকে। এই ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপেই ইংরাজ ক্রেতা মাড়োয়ারী মধ্যবর্ত্তী ব্যাপারী এবং দালালের হাতে। বাঙ্গালীর স্থান নাই বলিলেই চলে। গারো কাপাসের এক মণ হইতে আধমণ তুলা হয়।

ডলাই।—মাণিকারচর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক কেরকী প্রচলিত আছে। তাহা দ্বারা কাপাস ডলাই করা হয়। আমেদাবাদ সত্যাগ্রহাশ্রমে এক প্রকার কেরকী ব্যবহৃত হয়। উহাতে একটী লোহার রোলার আছে। সমস্ত দিনে ৬ হইতে ৮ সের গারো কাপাস এই কেরকীতে ভাঙ্গা যায়। দুই প্রকার কেরকীই খাদি প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়ার্থ আছে। ছোটর দাম ১৷০ পাঁচসিকা, বড়র দাম ১৲ টাকা। ডলাই করিবার পূর্ব্বে কাপাস রৌদ্রে দিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। দাগী ও অপুষ্ট বীজযুক্ত কাপাস সহজেই ধরা যায়। উহা বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। তিন দিন রৌদ্রে দিয়া কাপাস ডলাই করিতে হইবে। কেরকীটীও রৌদ্রে তপ্ত থাকিলে কাজ ভাল হয়। রৌদ্রে দেওয়া আছে এমন কাপাস রৌদ্রে রাখিয়া তপ্ত কেরকীতে ডলাই করা বিধেয়। ঠাণ্ডা হইলে বা সেঁতিয়া গেলে বীজ রোলারের চাপে ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গা বীজসহ তুলা সর্ব্বকর্ম্মের পক্ষে নিকৃষ্ট। যাহাতে ডলাই করিবার সময় বীজ না ভাঙ্গে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অপুষ্ট ও কীটদষ্ট বীজ রৌদ্রে দিলে ও ডলাই করিবার সময় কিছু ভাঙ্গিবে। এইজন্য তুলার নিকৃষ্টাংশ বাছিয়া স্বতন্ত্রভাবে ডলাই করা আবশ্যক। নিকৃষ্ট তুলা সূতা কাটার জন্য ব্যবহার না করিয়া অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা ভাল।

কাপাস এবং তুলার মূল্য।—খদ্দর উৎপাদনের নিমিত্ত যে তুলা আবশ্যক, তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বাংলার যে সকল স্থলে চরকা চলিতেছে, সেই সকল স্থলে তুলার অভাবে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় যে তুলার মূল্য ৪০৲ টাকা মণ ছিল, এ বৎসর তাহার মূল্য ৬০৲ টাকারও অধিক। এই দর পাইকারী। আজকাল চরকায় সূতা কাটা যায় এমন তুলা পৌনে দুই হইতে দুই টাকা সের হিসাবে খুচরা বিক্রয় হইতেছে। ঐ দরে তুলা কিনিয়া সূতা কাটিলে সূতা এবং তদুৎপন্ন খাদির মূল্য অত্যন্ত বেশী পড়িবে। কোন কোন স্থলে মজুরী না দিয়া, দেড় সের তুলা দিয়া একসের সূতা লইবার প্রথা আছে। সে স্থলে একসের সূতার দাম প্রায় পৌনে দুই টাকা পড়িয়া যায়। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কেবলমাত্র চরকার সূতা কাটার জন্য গারো কাপাস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মূল্য এক মণ কাপাস ২৪৲ চব্বিশ টাকা। অন্যত্রও কাপাস কিনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যদি কম মূল্যে কেনা যায়, খাদিকর্ম্মীরা তাহার সুবিধা পাইবেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান।—খাদি সম্বন্ধে কাহারও কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে খাদি প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করিবেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:—৩৯ নং চড়কডাঙ্গা রোড, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। ফোন নং ৪৯৪ বড়বাজার। টেলিগ্রামের ঠিকানা:—"খাদিস্থান"

(আলোক)

বয়ন বার্ত্তা।—১৯২৩ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কল সমূহে উৎপন্ন সূতার পরিমাণ ৫,৫০,০০০০০ পাউণ্ড এবং বস্ত্রের পরিমাণ ৩৪০০ ০০০০ পাউণ্ড। গত বৎসর ঐ মাসে এই হিসাবে যথাক্রমে ছিল ৫৯০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ৩৫০০০,০০০ পাউণ্ড—অর্থাৎ তুলনায় বুঝা যাইতেছে—সূতার উৎপাদন শত করা ৬ পাউণ্ড কমিয়াছে এবং বস্ত্রের পরিমাণ ২ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত ১১ মাসে সূতা প্রস্তুত হইয়াছে ৬১৩০০০,০০০ পাউণ্ড এবং বস্ত্র হইয়াছে ৩৬৬০০০,০০০ পাউণ্ড—তৎপূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ের হিসাব হইতেছে যথাক্রমে ৬৪০০০০,০০০ পাউণ্ড ও ৩৬৬০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯২৩ এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ভারত হইতে রপ্তানি ভারতীয় সূতার পরিমাণ—১৪০০০,০০০ পাউণ্ড পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে উহা ছিল ২৫০০০,০০০। ঐ জুলাই মাসের মধ্যে

সর মোটা ও মধ্য ভারতীয় সুতা যেমন হইয়াছে পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড, তেমনি বিদেশ হইতে আমদানি সুতা হইতেছে ২ কোটি ৮ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতীয় কলে প্রস্তুত বয়ন পণ্যের মূল্যের এইরূপ অনুপাত পাওয়া যায়—৪,৪৩ লক্ষ টাকা (জুলাই ১৯২৩) ও ৪,৯১ লক্ষ টাকা ও ১৯২৪ সালে হইয়াছে ৪,৩৬ লক্ষ টাকা এই সমস্ত জিনিষের উপর আদায় শুল্ক ২২ সালে ১০ লক্ষ টাকা ও ২৩ সালে ১৪ লক্ষ টাকা জানা যায়।

গত ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিখিল-ভারতীয় খদ্দর বিভাগের আয় ও ব্যয় গত বৎসরের তহবিল ৬৭৩০৮৪৶৭ পাই, খদ্দর তহবিল ১০৫৭২ পাই, দালালী ৩৩৬৶১ পাই, অগ্রিম দাদন আদায় ২৩১৫/৯ পাই; মোট ৫৮৩২২৪৷৷৭ পাই। ব্যয় খদ্দর উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ধার দেওয়া যায় (কেবল ১০০০৲ ভিন্ধ ৫০০০৲) মোট ১৫০০০৲। সাধারণ বিভাগের ব্যয় ৩৪৩৶৬ পাই, খদ্দর তৈয়ার বিভাগের ব্যয় ৩১০০৲ খদ্দর ফিরির খরচ ১৬২০৶১ সজুদ মাল ১৮৬।০; অগ্রিম দাদন ৬৪৬১৮/৫ পাই, মজুত তহবিল ৫৫৬০৯০৮৶৮ পাই, মোট ৫৮৩২২৪৷৷৭ পাই।

(নবসঙ্ঘ)

বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগে ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলী, ১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিবরণীর সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বাঙ্গালাদেশের গত কয়েক বৎসরের শিশু-মৃত্যু, কৌমার মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নানা দিক দিয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুতে মিলিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, বাঙ্গালী বালক-বালিকাদের শতকরা ৫০ জন আট বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মারা যায় এবং মাত্র শতকরা ২৫ জন, ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছায়। ১৯১৮—২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। জীবনীশক্তি-ক্ষয়ের ফলে, জাতির জন্মের হারও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই দুই কারণে ১০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বালক-বালিকাদের সংখ্যা যত ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক হ্রাস হইয়াছে :—

বয়স	১৯১১	১৯২১	শতকরা হ্রাস
১ বৎসরের কম	১৪২৩৪১৬	১৩৭০৩৬৬	—৩৯৫
১—৫	৫ ১২২০৬	৪৬০৬৪৬১	—৮০৫।

বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মৃত্যুর হারের তুলনা করিলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে—

১৯২১ খৃষ্টাব্দ—হাজারকরা মৃত্যুর হার।

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
১ বৎসরের নীচে	২১১·৪	২০০·৫
১—৫	৪০·৪	৩৬১
৫—১০	১৭·০	১৪·৫
১০—১৫	১২·৬	১১·১
১৫—২০	১৭·৫	২০·০
২০—৩০	১১·১	২১·১
৩০—৪০	২২·৭	২৩·২
৪০—৫০	২৮·৮	২৬·৬
৫০—৬০	৪৩·৮	৩৯·৭
৬০ এর উপরে	৮৪·৬	৭৪·৮

ঐ তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সকল বয়সেই পুরুষের মৃত্যুর হার স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হারের তুলনায় বেশী,—কেবল ১৫—৪০ এই বয়সের মধ্যে স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য, এই বয়সেই স্ত্রীলোকেরা সন্তানের জননী হইয়া থাকে।

প্রসূতির মৃত্যু

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালাদেশে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যাও ভয়াবহ। মোটের উপর সন্তান-প্রসবক্ষমা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৮ হইতে ১০ জনের মৃত্যু সন্তান প্রসবের ফলেই ঘটিয়া থাকে। মৃত-প্রসূতিদের মধ্যে, শতকরা ৫০ জনের বয়স ১৫ বৎসরের নীচে, শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের বয়স ১৫ হইতে ২০ এর মধ্যে, শতকরা ৩৩ জনের বয়স ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে এবং শতকরা ৩ হইতে ৫ জনের বয়স ৪০এর উপর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের হিসাব ধরিলে মোটের উপর প্রায় ৬০ হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই ঘটিয়াছে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় সূতিকারোগ বলে, তার ফলে এইরূপে কত বালিকা ও যুবতীর যে অকাল-মৃত্যু হইতেছে, তাহা ভাবিলে মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। অকাল-মাতৃত্ব, ধাত্রীবিদ্যার অনভিজ্ঞতা, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাব, দারিদ্র্য তথা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে এই সকল শোচনীয় অকালমৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশু-মৃত্যু

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের শিশু-মৃত্যু হারের তুলনামূলক একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল :—

	জন্মসংখ্যা	হাজারকরা মৃত্যুর হার।
১৯১৭	১৬২৭৮৭৩	১৮৫
১৯১৮	১৪৮১৩৫	২২৮
১৯১৯	১২৪৫৩৯২	২২৮
১৯২০	১৩৫৯১১৩	২০৭
১৯২১	১৩০১০০১	২০৬

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্ব তিন বৎসর অপেক্ষা শিশু মৃত্যুর হার একটু কম হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বেণ্টলী বলিতেছেন যে, ইহা প্রধানতঃ জন্ম-সংখ্যা হ্রাসের ফলেই ঘটিয়াছে।

হেন না, যদিও ১৯১৯ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা শিশু-মৃত্যুর হার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৯ ভাগ কমিয়াছে, তবুও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তুলনায় শিশু-মৃত্যুর হার এখনও শতকরা ১২ ভাগ বেশী। ডাঃ বেণ্টলী আরও বলেন যে, তালিকায় যে শিশুমৃত্যুর হার ধরা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলায় শিশু-মৃত্যুর হার তার চেয়ে বেশী,—বোধ হয় হাজারকরা ১৯০ হইতে ২৫০এর মধ্যে। স্থল বিশেষে এই হার ৭০০ পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। জন্ম-সময়ের বিকলতা দোষে প্রায় শতকরা ৫০ জন শিশুর মৃত্যু হয় এবং এক ধনুষ্টঙ্কারেই শতকরা ১১·৪ জন শিশু মরে। এই হিসাব অনুসারে ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রায় ৩০ হাজার শিশু বাঙ্গলাদেশে মরিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ।

বাঙ্গলার কোন্ বিভাগে শিশু-মৃত্যুর হার কত, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

বিভাগ	শিশু-মৃত্যুর হার: হাজার করা মৃত্যুর হার	বাঙ্গালার সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শতকরা শিশু-মৃত্যুর অনুপাত	প্রতি বিভাগে সমগ্র শিশু-মৃত্যুর অংশ শতকরা
বর্দ্ধমান	২২০	১৮৪	১৮৬
প্রেসিডেন্সী	২১৮	১৮·৪	১৮৬
রাজসাহী	২১০	২০·৩	২৫৬
ঢাকা	২০৬	১৯·৮	২৬·৪
চট্টগ্রাম	১৪৯	১৯·১	৮৬

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও অস্বাস্থ্যকর, সুতরাং এই দুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাঙ্গলার সমগ্র মৃত্যুর হারের তুলনায় শতকরা শিশু-মৃত্যুর অনুপাত ঐ দুই বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঃ বেণ্টলী বলেন, ইহার দুইটী কারণ আছে—প্রথম, ঐ দুই বিভাগে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির হইতে এই অঞ্চলে বৎসর বৎসর নূতন লোকের আমদানী।

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা কত, তাহারও একটা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে।

বিভাগ	এক মাসের কম বয়সের	ছয় মাসের কম বয়সের	৬ হইতে ১২ মাস বয়সের
বর্দ্ধমান	৫১·৮	৩৬·৯	২১·২
প্রেসিডেন্সী	৪০·০	৩৭·৮	২২·১
রাজসাহী	৩৯·৪	৩৬·৫	২৪·১
ঢাকা	৩৫·৮	৪৫·৮	১৯·০
চট্টগ্রাম	৩৫·২	৪২·৯	২১·৮

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগে একমাসের কম বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা বেশী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৬মাসের উর্দ্ধ বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা বেশী; অথচ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া ডাঃ বেণ্টলী বলেন,—প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগের অস্বাস্থ্যকর স্থানে রুগ্ন প্রসূতিদের দোষে অধিকাংশ শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; সেই জন্যই ঐ অঞ্চলে ১ মাসের অনধিক শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গলার সহরগুলির মধ্যে রাজধানী কলিকাতাতেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—হাজার করা ৩৩১। অন্যান্য সহরের নমুনা এই :—নদীয়া—২৫৫, বীরভূম—২৪৬, রাজসাহী—২৪৫, বর্দ্ধমান—২৩৭, বাঁকুড়া—২২৯, দিনাজপুর—২২৭, ফরিদপুর—২২৭, বগুড়া-২২৪।

কৌমার মৃত্যু

১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার কাল ধরা যাইতে পারে (বালক-বালিকা উভয়ের)। বাঙ্গলাদেশে এই কৌমার মৃত্যুর হারও অত্যধিক, এমন কি এক হিসাবে শিশু-মৃত্যু অপেক্ষাও উদ্বেগের কারণ। সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ বালকদের ও শতকরা ২৫·১ ভাগ হইয়াছে বালিকাদের মৃত্যু। নীচে বাঙ্গলার কৌমার মৃত্যুর একটী তালিকা দিলাম :—

শতকরা কৌমার মৃত্যুর অনুপাত

১—১৫ বৎসর বয়স

বিভাগ	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	১৯·৪	১৯·২
প্রেসিডেন্সী	২৪·৩	২৪·০
রাজসাহী	২৭·৫	২৬·৫
ঢাকা	৩০·৩	২৮·৪
চট্টগ্রাম	২৮·২	২৮·৪

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর হইলেও এখানে বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাত কম। তাহার কারণ এই অঞ্চলে জন্মসংখ্যার হ্রাস ও অ-বাঙ্গালীদের আমদানী। ঢাকা ও চট্টগ্রামে লোকদের উৎপাদিকা শক্তি বেশী; সুতরাং লোকসংখ্যার তুলনায় বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাতও বেশী হইয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশু-মৃত্যু, কি কৌমার মৃত্যু, কি প্রসূতি মৃত্যু—সব দিক দিয়াই বাঙ্গালী জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি আছে এবং স্বজাতির কল্যাণের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যাঁহাদের মনে উদয় হয়, তাঁহারাই বুঝিবেন, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি কিরূপে দ্রুত ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে ধরাপৃষ্ঠে আমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। শিশু ও কুমারেরাই ভবিষ্যৎ জাতির বীজ, প্রসূতিরাই জাতির জন্মদাত্রী। বাঙ্গালী জাতির ক্ষয় নিবারণ করিতে

হইলে, সকলের পূর্ব্বে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু রোধের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই শক্তিহীন, উৎসাহহীন, জীবন্মৃতবৎ জাতির কে বা কাহারা এই চেষ্টা করিবে? (আনন্দবাজার পত্রিকা)

(২)

বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি।—আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে ১৯২১ সালের স্বাস্থ্যবিবরণীর কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ১৯২১ সালের বিবরণে দেখা যায় যে, সমগ্র বাঙ্গালাদেশে ১৯২১ সাল অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা মোটের উপর ২ লক্ষ ৩০ হাজার কমিয়াছে। কিন্তু ৬ মাসের অনধিক বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ১৯২২ সালে আরও বাড়িয়াছে।

(১৯২২ সালের মৃত্যুর হার)

বয়স	১৯২১ সাল হইতে শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি
এক মাসের কম	+৫·১
ছয় মাসের কম	+·৫
৬—১২ মাস	—৩৩·৮
এক বৎসরের কম	—১১·১
১—৫ বৎসর	—১৭·৪
৫—১০ বৎসর	—১৮·৪
১০—১৫ বৎসর	—১৩·৮
১৫—২০ বৎসর	—১৩·৪
২০—৩০ বৎসর	—১৮·০
৩০—৪০ বৎসর	—১৮·১
৪০—৫০ বৎসর	—১৮·৮
৫০—৬০ বৎসর	—১৯·৯
৬০ এর উপর	—১৭·০

এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদের মধ্যে, মৃত্যুসংখ্যা মোটের উপর ১৯২১ সাল হইতে শতকরা ১১·১ ভাগ কমিয়াছে এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুদের মধ্যে, মৃত্যুসংখ্যা ১৯২১ সাল হইতে মোটের উপর শতকরা ১৮ ভাগ কমিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য হঠাৎ উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। ডাঃ বেণ্টলী বলেন যে, এই মৃত্যুসংখ্যা হ্রাসের কারণ প্রধানতঃ দুইটী :—(১) ১৯১৭—১৯২১ এই চারি বৎসরে জন্মসংখ্যার অত্যধিক হ্রাস—তথা জাতির জীবনীশক্তি হ্রাসই ইহার কারণ। (২) ১৯১৮—১৯২০ সালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ১ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা খুবই বেশী হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ঐ বয়সের বালক-বালিকাদের সংখ্যা দেশের সর্ব্বত্র কমিয়া গিয়াছে। ১৯২২ সালে, এই দুই কারণে, দশ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার-মৃত্যুর হার বাঙ্গলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম বোধ হইতেছে।

ডাঃ বেণ্টলী এই প্রসঙ্গে একটী বিস্ময়কর তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন বিভাগের শিশুমৃত্যু ও কৌমারমৃত্যুর হারের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একমাসের অনধিক বয়স্ক পর্য্যন্ত কৌমারমৃত্যুর হারের অনেকটা বিপরীত সম্বন্ধ; অর্থাৎ শিশু-মৃত্যুর হারের সঙ্গে ১ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার মৃত্যুর তুলনায় শিশু-মৃত্যুর হার যখন বাড়ে বা কমে, কৌমার-মৃত্যুর হার সেই অনুপাতে হ্রাস হয় বা বৃদ্ধি পায়:—

১৯২২ সাল

সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার সঙ্গে শিশু-মৃত্যু বা কৌমারমৃত্যুর অনুপাত

বিভাগ	পুরুষ		স্ত্রী	
	১মাসের কম	১ হইতে ১০ বৎসর	১ মাসের কম	১ হইতে ১০ বৎসর
বর্দ্ধমান	১৪·৯	১৯·৬	১৩·০	১৫·৪
প্রেসিডেন্সি	১০·২	১৭·৯	৯·৫	১৮·৭
রাজসাহী	৯·৩	২০·৯	৯·১	২১·১
ঢাকা	৯·২	২৩·৮	৮·৯	২৩·২
চট্টগ্রাম	৫·৪	২৫·৮	৪·৮	২৬·২

ইহা হইতে মনে হয়, যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা বাড়ে, সেই সকল অবস্থা, অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদের বাঁচিবার পক্ষে অনুকূল। সম্ভবতঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি, একদিকে যেমন জন্ম-সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে তেমনি কৌমার মৃত্যুর হার কমাইয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯২২ সালে বর্দ্ধমান বিভাগে জন্মসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং তাহার ফলে একপক্ষে এক মাসের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যু যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর পক্ষে ১—১০ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা তেমনি হ্রাস পাইয়াছে। নীচে বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটী জেলার হিসাব হইতে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

শতকরা মৃত্যুর অনুপাত

জেলার নাম	১ মাসের কম বয়স	১—১০ বৎসর বয়স
নোয়াখালি	৫·৫	২৮·৪
চট্টগ্রাম	৫·১	২৭·৫
ফরিদপুর	৪·৫	২৬·১
বাঁকুড়া	১৭·৮	১৪·৬
বীরভূম	১৭·৭	১৫·৮
বর্দ্ধমান	১৫·৬	১৩·২

উপরের হিসাব হইতে অনুমান হয় যে, স্বাস্থ্যকর জেলা সমূহে শিশুমৃত্যুর হার কম, কিন্তু কৌমার মৃত্যুর হার বেশী; এবং অস্বাস্থ্যকর জেলা সমূহে শিশুমৃত্যুর হার যেমন বেশী, কৌমার মৃত্যুর হার তেমনই কম। যাহা হউক, বিষয়টী এত জটিল যে, এ বিষয়ে সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আরও বহু তথ্যের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

শিশু-মৃত্যু

১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯২২ সালে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ১১ ভাগ কমিয়াছে। ১৯১৮ সালের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যদিও গত ৩ বৎসরে শিশু-মৃত্যুর হার কিছু কমিয়াছে, তথাপি ১৯১৭ সালের তুলনায় এখনও উহা বেশী :—

সাল	হাজার করা শিশু-মৃত্যুর হার
১৯১৭	১৮৫
১৯১৮	২২৮
১৯১৯	২২৮
১৯২০	২০৭
১৯২১	২০৬
১৯২২	১৮৮

কিন্তু ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯২২ সালে জন্মসংখ্যা শতকরা প্রায় ২২ ভাগ কম। বাঙ্গালী জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাসের ইহা একটা প্রধান লক্ষণ।

বাঙ্গলার বিভিন্ন সহর ও জেলার শিশু-মৃত্যুর হারের তুলনা করিলে দেখা যায় যে ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯২২ সালে অনেক স্থানে শিশু-মৃত্যুর হার একটু কমিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই ঘটনার অন্যতম কারণ ১৯২১ ও ১৯২২ সালে জন্ম সংখ্যার অত্যধিক হ্রাস। নিম্নে কতকগুলি জেলার শিশু-মৃত্যু হারের তালিকা দেওয়া গেল—

জেলার নাম	হাজারকরা শিশু-মৃত্যুর সাধারণ হার	১৯২২ সালে শিশু-মৃত্যুর হার
কলিকাতা	৩১৯	২৮৭
বীরভূম	২৮৬	২০৬
বর্দ্ধমান	২৭২	২১১
নদীয়া	২৪৬	১৯৩
দিনাজপুর	২৪২	২১৩
খুলনা	২৪১	১৯৫
মুরশিদাবাদ	২৩৪	১৮৫
বাঁকুড়া	২৩৩	১৯০
হুগলী	২২৮	১৯২
বাখরগঞ্জ	২২৬	২০৬
জলপাইগুড়ি	২২৫	২০০
রাজসাহী	২২২	২১৯
মেদিনীপুর	২২০	১৭৯
রঙ্গপুর	২১৮	২২৭
বগুড়া	২১৩	২১১
হাওড়া	২১০	২০২
দার্জ্জিলিং	২০৬	২১৫
ফরিদপুর	২০৬	১৫৬
ময়মনসিংহ	১৯৩	২০৭
চব্বিশ পরগণা	১৯২	১৯৮
ঢাকা	১৯২	১৭৬
পাবনা	১৮৯	১৫৫
যশোহর	১৮০	১৬১
মালদহ	১৭৯	১৩৭
চট্টগ্রাম	১৭২	১৯০
নোয়াখালি	১৭০	১৩৫
ত্রিপুরা	১৫৯	১৩০

রঙ্গপুর, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম,—১৯২২ সালে এই চারিটী জেলায় শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে।

কৌমার মৃত্যু

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে, শিশুমৃত্যু অপেক্ষা কৌমার মৃত্যু এক হিসাবে অধিক আশঙ্কাজনক, কেন না ইহারাই ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের মূল। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলাদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯২২ সালে ১—৫ বৎসর বয়সের ১৪৬৬৮২ জন, ৫—১০ বৎসর বয়সের ৯১১১২ জন, এবং ১০—১৫ বৎসর বয়সের ৫৬৬৫৪ জন বালকবালিকা মরিয়াছে; অর্থাৎ কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা ১৯২২ সালে মোট প্রায় তিন লক্ষ। সমগ্র বাঙ্গলার মৃত্যুসংখ্যার শত-করা ২৫ ভাগই কৌমার মৃত্যু হইয়াছে। নীচে বিভিন্ন বিভাগের কৌমার মৃত্যুর একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় কৌমার মৃত্যুর শতকরা

বিভাগের নাম	১৯২১	১৯২২
বর্দ্ধমান	১৯·৩	১৯·৫
প্রেসিডেন্সী	২৩·৬	২০·৪
রাজসাহী	২৬·৯	২৫·১
ঢাকা	২৯·৪	২৮·৩
চট্টগ্রাম	২৮·২	৩০·৬

বাঙ্গলার বিভিন্ন সহরে ও জেলায় ১৯২২ সালে সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় কৌমার মৃত্যুর অনুপাত (শতকরা) কিরূপ হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে ব্যাপারটী আরও স্পষ্ট হইবে :—নোয়াখালি—৩৪·১; চট্টগ্রাম—৩১·৩; ফরিদপুর—৩০·২; পাবনা—৩০·১; মালদহ—২৯·৮; দার্জ্জিলিং—২৯·৫; বগুড়া—২৮·২; ময়মনসিংহ—২৮·২; ঢাকা—২৭·৬ বাখরগঞ্জ—২৭·৫; মুর্শিদাবাদ—২৭·৩; ত্রিপুরা—২৭·২; রঙ্গপুর—২৬·৫; ২৪ পরগণা—২৪·৫; রাজসাহী—২৪·০; দিনাজপুর—২৪·০; যশোহর—২৩·৮; নদীয়া—২৩·৬; হাওড়া—২২·৩; খুলনা—২১·৬; হুগলী—২০·৮; জলপাইগুড়ি—২০·৮; বীরভূম—২০·১; মেদিনীপুর—১৮·৯; বাঁকুড়া—১৮·৫; বর্দ্ধমান—১৮·০; কলিকাতা—১৬·৭।

বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ জাতির মূল—বালক বালিকাদের মধ্যে অকাল-মৃত্যু কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, উপরের তালিকা দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই অকালমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা যদি আমরা না করি, তবে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ শোচনীয় হইয়া উঠিবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৪১। বসুদেবের আট পুত্র

বসুদেব পত্নী দেবকী যে আটটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন সেই পুত্র কয়েটীর নাম কি ছিল ? শ্রীগোপালচন্দ্র সেন

৪২। লাঙ্গল দেয়া

যে ভিটায় বাস করা যায়-সেই ভিটায় লাঙ্গল দিতে নাই কেন ?

৪৩। ক্যামেরার আবিষ্কারক

ক্যামেরার আবিষ্কারক কে ? তাঁহার নাম কি এবং কোন দেশের লোক। শ্রীসরযূ রায়

৪৪। "সবুজ আলু"

আলুর মধ্যে, দিশি আলুর ভিতর যে একপ্রকার সবুজ রংয়ের আলু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ হবার কারণ কি ? এবং তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি ? শ্রীশোভারাণী রায়

৪৫। ধূপ

পূজার্চ্চনায় যে ধূপ ব্যবহৃত হয় উহা প্রস্তুত করিবার কি কি প্রণালী এখনও প্রচলিত আছে ? তন্মধ্যে কোন্ প্রক্রিয়া অনুসারে এখনও ভাল ধূপ অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায় ? সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধূপেরই বা কি প্রস্তুত প্রণালী ?

এখন যে সকল সূক্ষ্ম ধূপ "মাদ্রাজী ধূপ" নামে কলিকাতায় ব্যবহৃত হইতেছে উহা কি কি দ্রব্যে কি প্রকারে প্রস্তুত করা হয় ? "জিজ্ঞাসু"

৪৬। পূজায় কলার ব্যবহার

কাঁচা কলা, জিনকলা ইত্যাদি পূজায় লাগে এবং সাধারণতঃ অন্যান্য কাজে লাগে, কিন্তু "সৌরী"কলা খাওয়া ব্যতীত কোনও দৈব বা অন্য কাজে লাগে না। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

৪৭। সমাজতত্ত্ব

অনেক সময় শুনা যায় এবং দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মণের পৈতা হইবার পূর্ব্বে যদি পিতা বা মাতা স্বর্গগত হয়েন, তবে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন নিষেধ। কিন্তু পিতা এবং মাতা এ পৃথিবীতে সাক্ষাৎদেবতা স্বরূপ। তাঁহাদের মৃত্যুতে মস্তক মণ্ডনে কি দোষ আছে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

৪৮। কৃষিতত্ত্ব

আমাদের বাটীতে একটী নারিকেল গাছের 'লাল' নারিকেল হয়। কিন্তু তাহার সমস্ত নারিকেলই 'ঝেঁঝে' পড়ে যায়, অর্থাৎ তাহার মধ্যে নারিকেল থাকে না। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক, কি উপায়ে এই গাছটীর নারিকেল ভাল করা যায় বলিয়া দেন তবে বিশেষ উপকৃত হইব। শ্রীশঙ্করাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

৪৯। প্রবাদ-প্রসঙ্গ

১৩২২ সালের "ভারতবর্ষে" কার্ত্তিকের সংখ্যায় শ্রীযুক্তা সরযূকুমারী দেবী "মেয়েদের যন্ত্র-তন্ত্র-ও প্রবাদমালা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখেন এবং পরিশেষে বলেন যে "ডাকের কথা বা প্রবাদ-বাক্য এ পর্য্যন্ত পুঁথী কেতাবে বহুসংখ্যকই প্রকাশিত হইয়াছে।" সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার মধ্যে কেহ যদি এ সম্বন্ধে কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের কি নাম এবং সেগুলি কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা জানান তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। শ্রীমনোরঞ্জন অধিকারী

৫০। এণ্ডিগুটির সুতা

আমরা কতকগুলী এণ্ডি পোকার গুটী তৈয়ার করিয়াছিলাম এবং আপনাদের ভারতবর্ষের লিখিত নিয়ম অনুসারে সোডা দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চরকায় কাটাতে সুতাই বাহির হইল না। আমাদের দেশীয় কোন একটী লোক আসামে কিছুদিন ছিল। সে বলিল কার্পাস তুলার ন্যায় ইহা ধুনিয়া লইতে হয়। এ বিষয় আমরা সঠিক খবর যাহাতে পাইতে পারি অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। এবং এণ্ডির গুটী কোথায় কত দরে বিক্রয় হয় তাহাও জানাইবেন।

শ্রীকুসুমিনী দেবী

৫১। বৈষ্ণব-সাহিত্য

ক। শ্রীললিতা সখীর এক চক্ষু হীন (কাণা) কেন হইল ? এবং কোন্ চক্ষু হীন ?

খ। কোন্ সখীর বক্ষে রাধা নাম লেখা ?

গ। কোন্ সখীর দক্ষিণ হস্তে রাধা নাম লেখা ?

ঘ। স্ত্রী এবং পুরুষের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের স্তনের অগ্রভাগ কাল কেন ? শ্রীপুলিন চন্দ্র চাকী

৫১। উত্তর শিয়রে শয়ন

উত্তর শিয়রে শয়ন করিলে নাকি স্বাস্থ্য হানি ঘটে। এতদিন এইরূপই শুনিয়া আসিতেছি। কারণ জানিতে চেষ্টা করিয়া দুইজন বহুদর্শী ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, magnet ঘটিত কি ব্যাপার আছে। রোগীকে ত তার আত্মীয়-স্বজন কিছুতেই উত্তর শিয়রে শয়ন করিতে দেন না—কারণ ওটা নাকি "যম শিয়রী"।

সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত হইয়া জনৈক বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ও শয়ন অনুচিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কার্ত্তিক সংখ্যা স্বাস্থ্য-সমাচারে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিতেছেন—"Professor Le Duc states that a person should always sleep with the head towards the north, as the magnetic currents take the same direction and by doing so favourably affect the organic functions which the base of the brain presides over; and I have no doubt myself but such is the case." ইহার মীমাংসা কি ?

এইরূপ উত্তর শিয়রে শয়নের ঘোর আপত্তি না করিলেও, অনেকে পশ্চিম শিয়র অপেক্ষা পূর্ব্ব শিয়রে শয়ন অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ইহারই বা কারণ কি ? শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

উত্তর

কালরাত্রি

রাজা দশরথের তিন মহিষীর মধ্যে সুমিত্রা দেবী পরমা রূপসী ছিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে বিবাহ করেন, এবং বিবাহের পর দিবস রাত্রিতে পত্নী সন্দর্শন ও সম্ভাষণ করেন। এই ঘটনার পর হইতেই সুমিত্রা দেবী তাঁহার বিষ-দৃষ্টিতে পড়েন। এই জন্যই বিবাহের পর দিবস রাত্রিকে লোকে কালরাত্রি বলে।

শ্রীমালতীমালা দেবী।

নীরস লেবুতে রসসঞ্চার

আমাদের একটি বাতাবী লেবু গাছের ঠিক ঐরূপ অবস্থা ছিল, অধিকন্তু তাহার কোয়াগুলির সাদা রং ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার গোড়ায় গোবর এবং গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করা জঞ্জাল ফেলিতে থাকায়, উহার লেবু এখন উৎকৃষ্ট রসাল এবং কোয়াগুলি লাল বর্ণের হইতেছে। এবং একটি লিচু গাছের ফল একরূপ অখাদ্য ছিল; তাহার প্রায় শাঁস হইত না। কেবল আঁঠি এবং টক ছিল। পরে ঐরূপ গোয়াল পরিষ্কৃত জঞ্জাল ও গোবরের সার ২।৩ বৎসর দেওয়ায় সে গাছটিতেও এখন উৎকৃষ্ট লিচু হইতেছে।

পাটনাই হলুদ

পাটনাই হলুদ সম্ভবতঃ পাটনা বা বিহারাঞ্চলের আমদানি হলুদকে বলে। কিন্তু এই দেশী হলুদ ভাল দোআঁশ মাটী (যাহাতে বালির অংশ থাকে) এবং ফাঁকা জমিতে চাষ করিলে, ঐরূপই মোটা এবং সুন্দর রং হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বাগানের মধ্যে আওতায় চাষ করা হয় বলিয়া হলুদ ভাল হয় না।

কৃষিতত্ত্ব

কলমের আম গাছে পুরাতন গাছের ডাল থাকায় সেই বৎসরই প্রায় মুকুল হয়; কিন্তু ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গাছ বেশ বলবান না হওয়া পর্য্যন্ত, মুকুল ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। নচেৎ গাছ দুর্ব্বল হইয়া বাড়িবে না, বা মরিয়া যাইতে পারে। এই জন্য মুকুল ভাঙ্গার রীতি প্রচলিত। কলমের গাছে ভাল করিয়া সার জল দিবার ব্যবস্থা করিলে এবং পরিষ্কার রাখিলে সুফল হইবে। অফলা হওয়ার অন্য কারণ থাকিতে পারে।

পাঁকুই ঘা

এদেশে বর্ষাকালে কৃষকদিগের পায়ে একরূপ ঘা হইতে দেখা যায়, তাহাকে পাঁকুই পোকার ঘা বলে। তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, মসিনার তৈল গরম করিয়া লাগান। (মসিনার তৈল Linseed oil)। ঐ তৈল ব্যবহারে নাড়া পোকার ঘাও সারিতে পারে।

৺কাশীধামে ভূমিকম্প

গত পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' সম্পাদকের বৈঠকে শ্রীযুক্ত নিশাকান্ত রায় ৺কাশীধামে ভূমিকম্প হয় কি না, জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে আমি জানাইতেছি, অন্ততঃ একবার হইয়াছিল, তাহা আমার জানা আছে। গত ইং ১৮১৭ সালের জুন মাসে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল সেই সময় আমার খুল্লপিতামহী কাশী হইতে আমাকে পত্র দিয়াছিলেন সে পত্র অদ্যাপি আমার নিকট আছে।

শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী যেরূপ আম ও টমাটোর আটার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ঐরূপ ওলের আচার আমার খুল্লপিতামহী করিতেন। সেই সময় পত্র মধ্যে তাহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী আমাকে দিয়াছিলেন। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইল—

প্রথমে ওল ছাড়াইয়া পাতলা এবং ছোট ছোট করিয়া কুটিবেন। তাহার পরে কাঁচা জলে সেই কোটা ওলকে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে মাটীর নূতন হাঁড়িতে সেই ওলকে সিদ্ধ করিতে দিবেন। যখন দেখিবেন, টিপিলে বেশ গলিয়া যায়, তখন তাহাকে নামাইয়া জল ঝরাইতে দিবেন। তাহার পরে সেই হাঁড়িতে ওলের পরিমাণ অনুসারে খাঁটি সরিসার তৈল জ্বালে চড়াইয়া, তৈল অল্প তাতিয়া উঠিলে, উক্ত সিদ্ধ ওল তাহাতে দিয়া কাটি দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবেন (তৈল খুব মৃদু জ্বালে থাকে যেন)। এইরূপে ওলগুলি বেশ ভাজা হইলে, যখন ২।১ খানি ভাঙ্গিতে থাকিবে, তখন ওলের পরিমাণ অনুসারে পাকা তেঁতুল গোলা, হলুদ ও সরিসা বাটা, লবণ ও আখের গুড় দিয়া, পুনরায় কিঞ্চিৎ কাঁচা তৈল তাহাতে দিবেন। যদি ঝাল করিবার ইচ্ছা থাকে, কিঞ্চিৎ লঙ্কা-বাটা বা আস্ত লঙ্কা ছাড়িয়া দিবেন। কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া ভাজা সরিসার গুঁড়া, ভাজা মেথির গুঁড়া, এবং ভাজা পাঁচ-ফোড়নের গুঁড়া উহার উপর দিয়া সরা ঢাকা দিয়া রাখিবেন। ২।১ দিন পরে ব্যবহার করিলে ইহা এক উপাদেয় আচার হয়।

শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

অনাদি শিবলিঙ্গ

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পুরাণ-ভারতাদি প্রসিদ্ধ লিঙ্গ মাত্রই অনাদি। এই মতে অনাদি লিঙ্গের সংখ্যার ইয়ত্তা করা যায় না। আর যদি অনাদি শব্দের 'স্বয়ম্ভু' অর্থ লওয়া হয়, তাহা হইলেও অনাদি লিঙ্গের

সংখ্যা দ্বাদশের অধিক হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, গ্রন্থ-কর্ত্তা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নাম, অবস্থিতি ও বিশেষত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। অনাদি লিঙ্গ সমূহের মধ্যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রধান। সেগুলি এই :—

(১) সৌরাষ্ট্র দেশে 'সোমনাথ'। কাঠিয়াবাড় প্রদেশে জুনাগড় রাজ্যে প্রভাসক্ষেত্রে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহমুদ গজনী এই মন্দির ও লিঙ্গ ধ্বংস করেন। (২) শ্রীশৈলে 'মল্লিকার্জ্জুন'। মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণা জেলায় কৃষ্ণা নদীর তীরে পর্ব্বতের উপর মহাদেবের বিশাল মন্দির অবস্থিত। পথ জঙ্গলময় ও বন্য-জন্তুসঙ্কুল। (৩) উজ্জয়িনীতে 'মহাকাল'। (৪) অমরেশ্বরে 'ওঙ্কারনাথ'। মধ্যপ্রদেশে নীমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদানদীর মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে মন্দির অবস্থিত। (৫) হিমালয়ে 'কেদারনাথ'। (৬) ডাকিনীতে 'ভীমশঙ্কর'। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের মতে বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। শিবপুরাণের মতে আসাম কামরূপে। (৭) বারাণসীতে 'বিশ্বেশ্বর'। (৮) গৌতমী তটে 'ত্র্যম্বক'। বোম্বাই নাসিক জেলায় গোদাবরী তটে ত্র্যম্বক গ্রামে অবস্থিত। (৯) চিতাভূমিতে 'বৈদ্যনাথ'। সাঁওতাল পরগণাস্থিত এই লিঙ্গ প্রসিদ্ধ। বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত স্তোত্র গ্রন্থ সমূহে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটী স্তব আছে। তাহাতে 'পরল্যাং বৈজনাথঞ্চ' এইরূপ লেখা আছে। সুতরাং দাক্ষিণাত্যবাসীদের মতে বৈদ্যনাথ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পরলী গ্রামে অবস্থিত। কিন্তু এই স্তব কোন্ গ্রন্থের, বুঝা যায় না। (১০) দারুকাবনে 'নাগেশ'। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে স্থিত। (১১) সেতুবন্ধে 'রামেশ্বর'। (১২) শিবালয়ে 'ঘৃষ্ণেশ্বর', 'ঘুসৃণেশ', বা 'ঘুস্নেশ্বর'। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে দৌলতাবাদের নিকট।

জ্যোতির্লিঙ্গ সমূহের পূজায় চারি বর্ণেরই অধিকার আছে; এবং নৈবেদ্য ভোজনে পাপ নাশ হয়। নীচ জাতীয় মনুষ্যও জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে পর জন্মে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করে। জ্যোতির্লিঙ্গ সমূহের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিতায় বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। বোম্বাই মুদ্রিত স্তোত্র-গ্রন্থগুলিতে জ্যোতির্লিঙ্গের দুইটী স্তব আছে; তন্মধ্যে একটী অতি সুমধুর।

বসুদেব ও শৃগালী

যে কয়খানি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মকথা পাঠ করা গিয়াছে, সেগুলিতে শৃগালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। তবে যে যে পুস্তকে জন্মাষ্টমী ব্রত-কথা দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে কোন পুস্তকে হয় ত লেখা আছে, "ততঃ সোঽপি পুরো দৃষ্ট্বা ধাবন্তং খলু জম্বুকম্।" না হয় লেখা আছে "শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে"। আর এই জন্মাষ্টমী ব্রত-কথা ভবিষ্যপুরাণের বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূলগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নাই, অন্য প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানি না, সম্ভবতঃ হয় নাই। জন্মাষ্টমীব্রতকথায় এত পাঠান্তর দৃষ্ট হয় যে, মূল গ্রন্থে কি ছিল বা আছে, তাহা বুঝা দুষ্কর।

শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র

গত ১৯২০-২১ সালে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রদেশ	মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা	সংবাদপত্রের সংখ্যা	সাময়িক পত্রের সংখ্যা	ইংরাজি পুস্তক	দেশীয় ভাষায়
মাদ্রাজ	৮৭৫	২৭৭	৬৬৪	৪১৮	১১৭
বোম্বাই	৬১২	১৮৬	৮২৯	১৬০	১৩৯
বঙ্গদেশ	৮৫২	১৪৫	২১১	৫৩৭	১৮৫
যুক্তপ্রদেশ	৫৬৭	১২১	২৬৪	২২৩	১৮৬
পাঞ্জাব	২৬৬	১১৬	১৬১	১৮২	১৬৩
ব্রহ্মদেশ	২১২	৬২	১০০	১৪	২৯০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৪৩	২৭	৩৫	১০৮	৭০
ধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১১	৪৭	৪	২১	৯৫
আসাম	৪১	১৩	৯	৩	২৯
উত্তর পশ্চিম সীঃ প্রঃ	২৪	১	১		
আজমীর-মাড়য়ার	১৬	৪	৩	৬	৬৩
কুর্গ	২				
দিল্লী	৭৪	১৮	১১		
মোট	৩৭১৫	১০৯৭	২২৯৭	১৬১০	১০১৫

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, ১৯২০—২১ সালে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বেশী সংখ্যক ইংরাজি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি পুস্তক প্রকাশ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই বঙ্গদেশ অন্য প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বঙ্গদেশে যত লোকের বাস, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে তত লোকের বাস নাই। সাময়িক পত্র প্রকাশে বঙ্গদেশ তৃতীয় স্থানীয়। ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এক ইংরাজি ভাষায় তাহার প্রায় দেড় গুণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা সহরে মুদ্রাযন্ত্র ৫২৫, দৈনিক পত্র ৩৫, দ্বিসাপ্তাহিক ৪, সাপ্তাহিক ৬১, পাক্ষিক ৫, মাসিক ১১৫, ত্রৈমাসিক ২২টি পত্র প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামানুজ কর

পেঁপে গাছে অমঙ্গল

পেঁপে গাছ ও ডালিম গাছ বাড়ীতে থাকিলে, গৃহস্থের সন্তানাদি হয় না বা অকালে মরিয়া যায়—কথাটী ঠিক নয়। কারণ আমি দেখিয়াছি—অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে উক্ত দুই প্রকার গাছই আছে; অথচ তাহাদের সন্তানাদি যথেষ্ট ও দীর্ঘজীবী।

পাঁচথুপী

মহাত্মা বুদ্ধদেবের পঞ্চস্তূপই ছিল, এবং সেই নামানুসারে পাঁচ থুপী নাম হইয়াছে। বর্ত্তমান যে ভগ্ন স্তূপ দেখা যায়, সেটাও উক্ত মহাত্মার স্তূপেরই নিদর্শন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

শনির স্তব

শ্রীউষারাণী ঘোষ শনির স্তব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দশরথ কৃত শনি স্তব যেটি আছে তাহা রামায়ণের রাজা দশরথ নহে, দশরথ নামে একজন মুনি ঐ শনি স্তবটী রচনা করিয়াছিলেন।" লেখিকা দশরথের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। স্কন্দ পুরাণে দশরথ কৃত শনৈশ্চর স্তব হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, লেখিকার উক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন।

"শ্রীকৃষ্ণ উবাচ :—রঘুবংশেঽতিবিখ্যাতো রাজা দশরথঃশ্রুতা
চক্রবর্ত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তদ্বীপাধিপোঽভবৎ।"
"এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং মন্ত্রিভিঃ সহপার্থিবঃ
দেশশ্চি নগরগ্রামা ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ।"
"পপ্রচ্ছ প্রযতো রাজা বশিষ্ঠ প্রমুখানদ্বিজান্।"
"ববিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু রাজা দশরথ স্বয়ম্
তদা সংচিন্ত্য মনসা সাহসং পরমং যযৌ।"
"শনৈশ্চর উবাচ :—পৌরুষং তব রাজেন্দ্র"—ইত্যাদি
"তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র! স্তোত্রেণানেন সুব্রত
দদামিতে বরং ব্রূহি স্বেচ্ছয়া রঘুনন্দন!"
"এষ দত্তো ময়া তুভ্যং বর ইক্ষ্বাকুনন্দন।"
ইত্যাদি ইত্যাদি—।

উদ্ধৃত অংশ সমূহ পাঠেও কি কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে যে ঐ দশরথই রামায়ণের দশরথ?

শ্রীশশীভূষণ বাগচী

বয়ন বিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গস্থিত পাবনা সদরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি একটী বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ২০।২৫টী ছাত্র গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত মাসিক বৃত্তিতে বয়ন বিষয়ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। বৃত্তির হার মাসিক ৮৲ টাকা। এতদ্ভিন্ন প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা ছাত্রদেরই প্রাপ্য। উক্ত বৃত্তির টাকা হইতে মাসিক এক টাকা করিয়া বাটিয়া স্কুল ফণ্ডে জমা রাখা হয়। শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা অন্তে, যখন তাহারা চলিয়া যাইবে, তখন ঐ টাকা দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে একখানি করিয়া তাঁত ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম কিনিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা তাঁত লইতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে গচ্ছিত টাকাই ফেরত দেওয়া হইবে। উপরিউক্ত এক টাকা বাদে বক্রী টাকা এবং লভ্যাংশ দ্বারা ছাত্রেরা মেস্ করিয়া থাকিলে বেশ চলিয়া যায়, ও কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা যাহাদের নাই, তাহারা নিজ ব্যয়েও শিক্ষালাভ করিতে পারে। মেস্ করিয়া থাকিলে ৭।৮ টাকায় চলিয়া যায়। এই স্কুলে একজন বেশ সুদক্ষ বয়ন-শিক্ষক রাখা হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে যাহারা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি দিয়া শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে উক্ত স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে জানা যাইতে পারে।

পাবনা জেলাস্থিত সিরাজগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন স্থল গ্রামের পাকড়াশী বাবুদের উদ্যোগে তথায় একটী বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ৮।১০ খানা তাঁত চলিতেছে, এবং অনেকগুলি শিক্ষার্থী বিনা ব্যয়ে বয়ন শিক্ষা করিতেছে। দূরবর্ত্তী শিক্ষার্থিগণের জন্য উক্ত পাকড়াশী বাবুরাই আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া জনহিতকর কার্য্যের নিদর্শন দেখাইতেছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

পিপীলিকার উৎপাত

পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' এল, এম, ভাদুড়ী মহাশয় যে পিপীলিকার কথা লিখিয়াছেন, তাহা দূর করা কর্পূর, কেরোসীন ইত্যাদির কর্ম্ম নহে। যখন পিপীলিকারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাদের গর্ত্ত দেখিয়া রাখা উচিত। বাড়ীতে যতই পিপীলিকা হউক না কেন, ৩।৪টার বেশী গর্ত্ত থাকে না। সেই গর্ত্তে একটি খড়িকা কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিন। তারপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফিনাইল (concentrated, জলে গোলা নহে) খড়িকার গা বহাইয়া দিতে থাকুন। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে গর্ত্তের মধ্যে খানিকটা নির্জ্জলা ফিনাইল ঢালিয়া দিন। ইহাতে এক দিনেই পিপীলিকার উপদ্রব নিবারিত হওয়া উচিত। যদি না হয়, ২।৩ দিন ধরিয়া এইরূপ করিতে থাকুন। ভাদুড়ী মহাশয়ের মত আমরাও কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম; কিন্তু এই উপায়ে নিস্তার পাইয়াছি।

শ্রীইন্দুকুমার রায়

সাময়িকী

অনেক কাণ্ডকারখানার পর, অনেক আলোচনার পর বাঙ্গালায় যে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে ব্যবস্থাপক সভার চতুর্ব্বিংশতি জন সদস্যের চিত্র দুই মাস ধরিয়া "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইল, পূর্ণোদ্যমে তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সেই নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বৈঠক হয়। অধিকাংশ সদস্যই নানা বিচিত্র রকমের পোষাক পরিয়া সভায় দর্শন দিয়াছিলেন। এই দিন বিশেষ কোন কাজ হয় নাই, কেবল সদস্যগণকে শপথ গ্রহণ করানো হয়। তৎপর দিন বুধবার হইতে সভার প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হয়। এই দিন বাঙ্গলায় শাসন-কর্ত্তা লর্ড লীটন বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। এতদুপলক্ষে

তিনি একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙ্গলায় বিপ্লববাদের পুনরাবির্ভাবের উল্লেখ করেন। বলেন, গবর্মেণ্ট কঠোর ভাবে এই বিপ্লববাদ দমন করিবেন। প্রচলিত আইন-গুলি এ পক্ষে পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হইলে, নূতন আইন-রচনা করিয়াও বিপ্লববাদ দমন করা হইবে। বুধবার লাট বাহাদুরের বক্তৃতার পর সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া সে দিনের মত সভার কার্য্য শেষ হয়।

পর দিন বৃহস্পতিবার পুনরায় সভার কার্য্যারম্ভ হইলে, মিঃ জে, এন, সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, ১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশন অনুসারে যাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হউক। এই দিন প্রস্তাবটির সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না হওয়ায় পর দিন শুক্রবার আবার প্রস্তাবটির সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে প্রস্তাবটি সভায় পাশ হইয়া যায়। এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইবার পর সেন গুপ্ত মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে, বাঙ্গলার সমস্ত রাজনীতিক বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা হউক। এ প্রস্তাবটিও অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে সভায় গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যে, রাজদ্রোহসূচক সভাবন্ধের আইন, ভারতীয় ফৌজদারী আইন সংশোধক আইন, ১৮১৮ সালের তিন নং রেগুলেশন ও পুলিশ আইনের পঞ্চদশ ধারা তুলিয়া দেওয়া হউক। শুক্রবারে প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ায়, সোমবারের বৈঠকে উহা পুনরায় উত্থাপিত হয়। পরে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে অধিকাংশ সদস্য ইহার সমর্থন করেন। কাজেই প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। আগামী তিন বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য কি ভাবে চলিবে, এই কয়দিনের অধিবেশনে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া গেল। এই ত সবে সূচনা। ইহার পর আরও কত ব্যাপার যে দেখা যাইবে, এখন তাহার কল্পনাও করা যায় না। যাহা হউক, প্রস্তাব ত পাশ হইল; অতঃপর প্রস্তাব অনুসারে কাজ কতদূর হয়, তাহা দেখিবার জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। প্রস্তাব পাশের ফলাফল দেখিলে, শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে আমরা কতখানি অধিকার পাইয়াছি, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে আর একজন বে-সরকারী দেশীয় ভদ্রলোককে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা যথার্থই প্রীতিলাভ করিয়াছি। স্বায়ত্ত-শাসনের ভার-প্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-মন্ত্রী সার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদায়ের অব্যবহিত



রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত (কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান)

পূর্ব্বে রায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত বাহাদুরকে কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করিয়া সহরবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই পদে রায় বাহাদুরের কার্য্যকাল তিন মাসের অধিক নহে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনাররূপে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত দেশবাসীর যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় যেরূপ যোগ্যতা সহকারে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে, দেশীয়

বেসরকারী চেয়ারম্যানের দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মহাশয়ও পূর্ণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে এই পদে স্থায়ী হইতে দেখিলে সকলেই সুখী হইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন এবার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। সম্মেলনের সভাপতির পদে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৃত হইয়াছেন। আর শাখা-সভাগুলির পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; যথা, সাহিত্য-শাখা—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ইতিহাস-শাখা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল, বিজ্ঞান-শাখা—শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল চৌধুরী ও দর্শন-শাখা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়। বাঙ্গলা সাহিত্য গঠনে রাজা রামমোহন রায়ের অংশ সামান্য নহে। তাঁহার জন্মভূমিতে সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা হওয়ায় স্থান-নির্ব্বাচন উত্তম হইয়াছে বলিতে হইবে। রাধানগরের সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তা-গণ—সর্ব্বাধিকারী গোষ্ঠিও বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম অনুরাগী। অভ্যর্থনা-সমিতি, সম্মেলন ও শাখাগুলির সভাপতিত্বের ভারও যোগ্য হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এবারকার সাহিত্য-সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে আমরা পরম আশান্বিত হইয়াছি।

গত ১২ই মাঘ বাঙ্গলায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন গিয়াছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ বঙ্গভূমি মহাকবি মাইকেলকে ক্রোড়ে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। এবার বাঙ্গলার নানাস্থানে মাই-কেলের শত বার্ষিক জন্মতিথির উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের ধরণ দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। মহাকবির শত বার্ষিক জন্মোৎসব যে ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। মাইকেল জাতীয় কবি। তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে না হইয়া, হয় সাগরদাঁড়ীতে তাঁহার জন্মক্ষেত্রে, না হয় খিদিরপুরে তাঁহার বাসস্থানে, না হয় কলিকাতায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্র বাঙ্গলার সমবেত উদ্যোগে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। মাইকেলের অমিত্র ছন্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে মাইকেলের অপূর্ব্ব দান। (সেইজন্য ইহার নামই হইয়াছে মাইকেলী ছন্দ)। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যায়, বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কিছুই নাই। বাঙ্গালী জাতি সেই দানের কি উপযুক্ত প্রতিদান করিতে পারিয়াছে—কবির উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা কি করিতে পারিয়াছে? মহাকবি স্বয়ং তাঁহার কাব্যে ও খণ্ডকাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিগণের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী জাতি কি কবির কাছে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? প্রবাস-যাত্রার প্রাক্কালে কবি তাঁহার জন্মভূমির কাছে যে কবিতায় বিদায় লন, মা প্রিয় কবির এই মিনতির অপমান করেন নাই, তিনি দাসেরে মনে রাখিয়াছেন বটে, কবির মনঃ-কোকনদকে মধুহীন করেন নাই বটে, কিন্তু মায়ের সাত কোটী সন্তান কি তাঁহাদের কবি-ভ্রাতার উপযুক্ত সম্মান রাখিতে পারিয়াছেন? কবির কাব্য এখন আর তেমন পড়া হয় না; শিক্ষা-বিভাগে কবি বিস্মৃতপ্রায়; তাঁহার কাব্য ঠিক মত আবৃত্তি করিতেও অনেকে সমর্থ নহেন। কবি তাঁহার চিত্ত ফুল-বন-মধু লইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, গৌড়জন আনন্দে নিরবধি সেই সুধা পান করিতেছেন বটে, কিন্তু মধুচক্রের রচয়িতার প্রতি কি তাঁহাদের কিছুই কর্ত্তব্য নাই?

বার্ষিক ও শতবার্ষিক উৎসব ত ফাঁকা আওয়াজ! বৎসরের মধ্যে এক দিন, কিম্বা শতবর্ষ পরে এক দিন জনকয়েক সাহিত্যসেবী একস্থানে সমবেত হইয়া কিছু বক্তৃতা, আবৃত্তি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়া কবির স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিলেন,—তাহাই কি যথেষ্ট হইল? মাইকেলের সময়ে, তাঁহার সম-সাময়িকগণের মধ্যে তাঁহার কাব্য, তাঁহার নাটক, তাঁহার খণ্ডকাব্য, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, তাঁহার সমাজ-বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান, তাঁহার ইয়োরোপীয় পত্নী গ্রহণ, তাঁহার অখাদ্য ভোজন ও কারণ-সেবন প্রভৃতি

ব্যাপার লইয়া তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেরূপ উত্তেজনা, আন্তরিকতা, উন্মাদনা দেখিয়াছি, এখন তাহার কিছুই দেখিতে পাই না কেন? মাইকেলের সময়ে যাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত বন্ধুতা ও শত্রুতা করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন, এমন লোকও বাঙ্গলা দেশে এখনও একেবারে দুর্লভ হয় নাই। মাইকেলের সময়কার উত্তেজনা, উন্মাদনা, সামাজিক আন্দোলনের কথা তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হন নাই; সে সময়কার কতক কতক কথা তাঁহারা বলিতে পারিতেন বোধ হয়। কিন্তু মাইকেলের শত বার্ষিক জন্মোৎসব যেন দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ব্যাপারের মত নিতান্ত চুপি চুপি শেষ হইয়া গেল। দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল না। মাইকেলের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে তাঁহার পৈত্রিক ভিটা ভগ্নপ্রায়। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সামান্য একটী স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহাও কবির উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন নয়। আমরা বলি, সমগ্র বাঙ্গলার সমবেত ভাবে মহাকবির উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দেশ-বিদেশের লোকের কাছে সে স্মৃতিচিহ্ন যেন গৌরব করিবার উপযুক্ত হয়। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী, তাঁহার বাল্যের লীলাক্ষেত্র কপোতাক্ষ যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

গত ১৭ই মাঘ অপরাহ্ণ-কালে সংস্কৃত কলেজের শত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। লর্ড লীটন এই উৎসবে সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইংরেজের আমলে সংস্কৃত কলেজ আধুনিক ধরণের আদি বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান। সেই সংস্কৃত কলেজের বয়স শত বৎসর পূর্ণ হওয়া বড় সাধারণ ঘটনা নহে। সভাপতি গবর্ণর বাহাদুরও বলিয়াছেন, এক শত বৎসর অস্তিত্ব বহন করা এই বিদ্যালয়ের পক্ষে বিলক্ষণ গৌরবের বিষয়। এই সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে বাঙ্গলায় শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক গৌরবময় স্মৃতি বিজড়িত। সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার জন্যই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে শিক্ষার আবশ্যকতা যে এখনও বিদ্যমান, কলেজটির অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। মধ্যে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য কলেজটি তুলিয়া দিবার জনরব রটিয়াছিল; কিন্তু সভাপতি মহোদয় বঙ্গবাসিগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, কলেজটি তুলিয়া দেওয়া হইবে না; কারণ, সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। এ কথায় সকলেই যে আশ্বস্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের পরিচালন-ব্যবস্থা এবং তাহার ভাবী অধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ ও আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংস্কৃত কলেজটি যাহাতে সুপরিচালিত হয়, যোগ্য অধ্যক্ষের হস্তে যাহাতে ইহার ভার অর্পিত হয়, সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করেন। এ বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা হইলে ভাল হয়।

গত ২৭শে পৌষ (ইংরেজী ১২ই জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের রাজসম্মান লাভ উপলক্ষে দিল্লী-প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ মাননীয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ফ্লাগষ্টাফ রোডস্থ ভবনে মিত্র মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ সকল শ্রেণীর প্রায় সাতশত বাঙ্গালী এই সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রবাসে এরূপ আনন্দ-সম্মিলন বড়ই সুখের, বড়ই আনন্দের কথা! গৃহস্বামী মাননীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত সকলের যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনা-অনুষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশবাসীও নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথি রূপে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর এরূপ প্রীতি-সম্মিলন, বাস্তবিকই অতি আনন্দের কথা। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাধারণ কেরাণী রূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্থায়ী ভাবে Military Financial Adviserএর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। সাধারণ কেরাণী হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে এই উচ্চ পদে স্থাপিত করিয়া গবর্মেণ্ট যেমন গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে 'সার' উপাধিতে ভূষিত করিয়া সেইরূপ গুণের উপযুক্ত সম্মান ও সমাদরও করিয়াছেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কলিকাতা হগ ষ্ট্রীটে, সমবায় ম্যান্সন্স নামক প্রকাণ্ড ভবনে ভারতীয় প্রাচ্যকলা সমিতির একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এবারকার প্রদর্শনী সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক প্রদর্শনী। বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র, প্রস্তর ও কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গলায় অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর কলা-কৌশলের নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। কেবল যে বঙ্গদেশ হইতেই দ্রষ্টব্য চিত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর প্রবাসে অবস্থিত বাঙ্গালী শিল্পীরাও এই প্রদর্শনীতে তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালী চিত্রকরগণের মধ্যে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মসলিপত্তনের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় কর্ত্তৃপক্ষ আধুনিক ভারতীয় শিল্পের আলোচনার জন্য উক্ত কলাশালার সংস্রবে একটী নূতন শাখা খুলিবার কল্পনা করেন, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই মহাশয়ের নিকট একজন যোগ্য শিল্পী চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই কার্য্যের যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার এই ভার গ্রহণপূর্ব্বক মসলিপত্তনে গিয়া অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার সংস্রবে নূতন ক্লাসের পত্তন করেন। এ যাবৎ তিনি সেখানে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁহার ছাত্রগণের ও তাঁহার নিজের অঙ্কিত প্রায় পঁয়ত্রিশখানি চিত্র ভারতীয় প্রাচ্যকলা-সমিতির শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রমোদকুমারের বিশ্বকর্ম্মা, মনসা, ষষ্ঠীমাতা ও শ্রীচৈতন্য—এই চারিখানি চিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কলা নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা এই তরুণ প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীকে "ভারতবর্ষে"র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে পরিচিত করিয়া দিতেছি।

শ্রীমতী লেডী রেডিং সাহেবার আগ্রহে গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে এক সপ্তাহকালের জন্য কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একটী শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বঙ্গের নানা স্থানে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঐ সময়ে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শিশুদিগের অকাল-মৃত্যু নিবারণ, ও তাহাদিগকে সুস্থ রাখিয়া লালন-পালন করিবার প্রণালী সম্বন্ধে প্রসূতি ও শিশুর অভিভাবকগণকে জ্ঞান দান করাই এইরূপ শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত শিশুর মৃত্যু হয়, এত আর অন্য কোন দেশেই হয় না। শিশুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে জনকজননীগণকে কিরূপ আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয়, পূর্ব্বে আমাদের দেশে সে সম্বন্ধে অনেক নিয়ম ছিল। আজকাল যে কারণেই হউক, লোকে আর সেই সকল নিয়ম পালন করেন না। এ দিকে বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য সমাজে শিশু-রক্ষার যে সব ব্যবস্থা আছে, তাহাও এ দেশে অবলম্বিত হইতেছে না। কাজেই, শিশুরা অবাধে ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছে।

এ দেশে শিশু-মৃত্যুর কারণগুলি অতি স্পষ্ট। প্রধানতঃ জনক-জননীর অজ্ঞতা, ধাত্রীগণের অনভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব, খাদ্যাভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই সকল কারণে এ দেশে অধিক সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়। শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের যদি কোথাও সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এই ভারতবর্ষ। শুনিতে পাই, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডেও বড় বেশী পরিমাণে শিশুদের মৃত্যু হইত। তাহা দেখিয়া সেখানকার চিকিৎসকগণ ও জনসাধারণ বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া উঠেন। শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে লোকশিক্ষার জন্য শিশুমঙ্গল সপ্তাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার ফলও খুব ভাল হইয়াছে, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বিলাতে যে ব্যবস্থায় এমন সুফল ফলিয়াছে, সেই ব্যবস্থা যে এ দেশেও সুফলপ্রসূ হইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। লেডী রেডিং সাহেবা এতদ্দেশে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের প্রবর্ত্তন করায় আমরা সেইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু একটী কথা আছে। বিলাতে শিশু-মঙ্গল সপ্তাহে যেরূপ সুফল প্রদান করিয়াছে, এ দেশেও যে তাহা ঠিক সেইরূপ সুফল প্রদান করিবে, সে বিষয়ে একটী প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। তাহার কারণ এতদ্দেশে সাধারণ শিক্ষার একান্ত অভাব। বিলাতে প্রায় সকল নরনারী এক রকম শিক্ষিত; প্রাথমিক শিক্ষা সেখানে সর্ব্বত্র বাধ্যতামূলক। শিশুমঙ্গল সপ্তাহের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বিলাতের শিক্ষিত নরনারীর পক্ষে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করা সহজ। কিন্তু এ দেশে শতকরা ৯৫ জন লোক অশিক্ষিত। কাজেই শিশুমঙ্গল সপ্তাহের বা প্রদর্শনীর শিক্ষনীয় বিষয়গুলি অধিগত করা এ দেশের নরনারীগণের পক্ষে তাদৃশ সহজ নহে। সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস, প্রথমে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার না করিলে শিশুমঙ্গল সপ্তাহ এ দেশে তাদৃশ সুফলপ্রদ হইবে না। বস্তুতঃ, লোকহিতকর যে কোন অনুষ্ঠানই এ দেশে করা হউক না কেন, সাধারণ শিক্ষার অভাবে, তাহা তেমন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। শিক্ষার অভাব হেতু পাশ্চাত্য-প্রণালীসম্মত অনেক সদনুষ্ঠান পণ্ড হইতে দেখিয়া এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও মধ্যে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এ দেশের লোকের মূর্খতার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা কখনও সরকারকে কিম্বা দেশের লোককে শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরামর্শ দেন না। হয় ত ভাবেন, পরামর্শ দিয়াই বা কি হইবে,—শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহার সংস্থান হইবে কোথা হইতে? সেইজন্য তাঁহারা কেবল দেশের লোকের শিক্ষা-হীনতার নিন্দা করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন।

বাঙ্গলা দেশে খদ্দর প্রচারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয় তাঁহার আজীবনের সঞ্চয় দান করিয়াছেন। এই অর্থের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ তিনজন ট্রাষ্টীর হস্তে টাকাটি ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার সুদ হইতে দেশে খদ্দর প্রচারের চেষ্টা হইবে। প্রয়োজনের পক্ষে এই টাকা হয় ত পর্য্যাপ্ত না হইতে পারে; কিন্তু এখানে টাকার পরিমাণই বড় কথা নহে—ইহাতে দাতার মহৎ হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাই সকলের অনুকরণযোগ্য। আজীবন-সন্ন্যাসী সার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহাশয়ের নিজের ব্যক্তিগত ব্যয় অতি সামান্য; অথচ তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহার প্রায় সবটাই দান-ধ্যানে খরচ হইয়া যায়। তার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাঁহার সঞ্চয়। সেই টাকাই এতদিনে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হইয়াছিল। পরিণত বয়সে জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই টাকাটিও তিনি দেশ-সেবার্থ দান করিলেন। কত বড় মহৎ হৃদয়ের পরিচয় ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া দেশবাসী যদি খদ্দর ব্যবহারে উৎসাহী হন, তবেই তাঁহাদের যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। খদ্দরের প্রচার যেমন আবশ্যক, কাজটি সেইরূপ ব্যয়-সাধ্য। সার শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের এই দান উপলক্ষ করিয়া দেশের অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিগণ যদি তহবিলটির পুষ্টিসাধন করিয়া খদ্দর প্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে একটা কাজের মত কাজ করিতে পারিবেন।

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার টমাস উড্‌রো উইলসন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া কিছুদিন তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন; তার পর কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউ জার্সির শাসনকর্ত্তা হন। তাহার দুই বৎসর পরেই তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সময়ে ইয়োরোপে মহাসমর উপস্থিত হয়। এ যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপীয় রাজনীতি হইতে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনও সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হন, এবং তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত চৌদ্দটি দফা শান্তি-প্রস্তাব করেন। যুদ্ধ-বিরামের পর তিনি ইয়োরোপে ভ্রমণ করিতে যান, এবং সর্ব্বত্র রাজসম্মানের সহিত গৃহীত হন। সেই সময়ে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় জাতি-সঙ্ঘ গঠিত হয়। সেই জাতি-সঙ্ঘ ডাক্তার উইলসনের অভি-প্রায়ানুসারে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে নিযুক্ত আছেন।

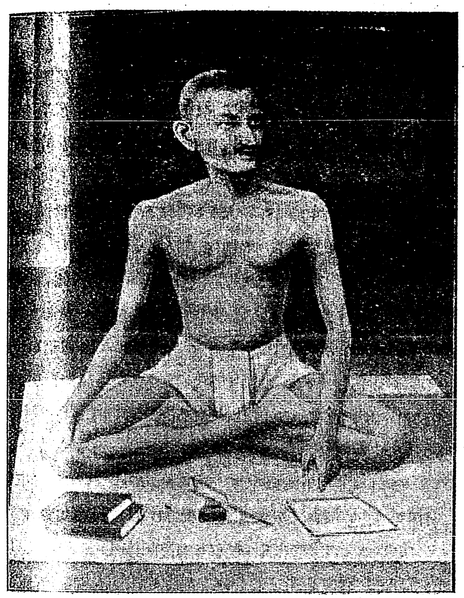

মহাত্মা গান্ধী

সর্ব্বজনবরেণ্য মহাত্মা গান্ধী মহোদয় বিগত ২২শে মাঘ কারামুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মাজীর নামে রাজ-দ্রোহের অভিযোগ হয়। তিনি অপরাধ স্বীকার করেন। ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ্চ তাঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পীড়িত হন, তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রের ক্ষত শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার জীবনের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, অন্ততঃ ছয় মাস কাল তাঁহাকে সমুদ্রতীরে বাস করিতে হইবে। মুক্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বোম্বায়ের সাসুন হাসপাতালে আনা হয়। এখনও তিনি সেখানে আছেন, এবং আরও কিছুদিন সেখানে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৭৷৷০টার সময় তাঁহাকে মুক্তি লাভের সংবাদ দেওয়া হয়; এবং ৭-৫৫ মিনিটের সময় মুক্তি দেওয়া হয়। সাসুন হাসপাতালে তিনি নাম মাত্র বন্দী ছিলেন—কারাগারের নিয়ম রক্ষার্থ হাসপাতালের বাহিরে কয়েকজন পুলিশ প্রহরী থাকিত। দর্শনপ্রার্থী মাত্রকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪০১ ধারা অনুসারে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নব-বিধান

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৫)

থাম ও পোষ্টকার্ডে বিস্তর চিঠি-পত্র জমা হইয়াছিল, সেই সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এম্‌নি সব ছোট খাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার কর্ম্ম-নিরত, একাগ্র মুখের চেহারা বাহিরে হইতে পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে, এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ি লোকের মনের মধ্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, অধ্যাপক বলিয়াই যে সংসারে ছলনা করার কাজে হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশ্বর নিজেই সুইচ্ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। যেন, তাঁহার নষ্ট করিবার মুহূর্ত্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ কুকর্ম্ম

করিতে পূর্ব্বে তাঁহাকে কোন দিন দেখা যাইত-না।

এইরূপে যখন তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে, পর্দ্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে, আসুন।

শৈলেশ্বর ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, এ তো আমার খাবার সময় নয়। এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তাহ'লে তুলে রাখতে বলে দেব ?

শৈলেশ্বর কহিলেন, তুলে রাখাই উচিত। আবদুল না থাকাতেই এই সময়ের গোলযোগ ঘটেছে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত তোলা-তুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্চি।

আজ খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত নয়, উপরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাশ বাটি প্রভৃতি মাজা-ধোয়া হইয়া বাহির হইয়াছে,—থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য্য থরে থরে সজ্জিত, অদূরে মেঝের উপর বসিয়া উষা, এবং তাহাকে ঘেঁসিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিলেন, তোমাকে ত সঙ্গে খেতে নেই আমি জানি, কিন্তু সোমেন ? তাকেও খেতে নেই নাকি ?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, কহিল, আমি রোজ মার সঙ্গে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এত সব রাঁধলে কে ? তুমি নাকি ?

উষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিলেন, বামুনটাও নেই বোধ হয়। যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকি ছিলনা,—তাকে কি তা'হলে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদেয় করলে ?

উষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হলে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকি রাখলেই চলেনা। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি ?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না না, থাক্। তাকে দেখবার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠিনি, কিন্তু তাকেও মাঝে মাঝে রাঁধতে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তাহা সেই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন হঠাৎ সেই দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিলেন, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েচে। গোঁসাইরা মাংস খায়না, তারা কাঁঠালের তরকারিতে গরম মসলা দিয়ে গাছ-পাঁটা বলে খায়। আমার রুচিটা ঠিক অতখানি উচ্চ জাতীয় নয়। তাই কাঁঠাল বরঞ্চ আমার সইবে, কিন্তু গাছ-পাঁটা সইবেনা।

উষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিলনা, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁটা কি মা ?

প্রত্যুত্তরে উষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ।

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিলেন, না, চার-পেয়ে পাঁটাই বটে। চমৎকার হয়েছে, কিন্তু এ রান্না তুমি শিখলে কি করে ?

উষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে ? আমার বাবা ছিলেন সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়ৎ, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাই-বাড়ী থেকে আস্‌চি।

শৈলেন কহিলেন, এই এক বাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য। কিন্তু আমার ত সিদ্ধেশ্বরী নেই, এ কি প্রতিদিন জুটবে ?

উষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি ?

শৈলেন কহিলেন, আবদুলের শোক ত আমি আজই ভোল্‌বার যো করেচি, দেনা—

উষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে স্বামি-পুত্রকে না খেতে দিয়ে আমি দেনা শোধ করব ? দেনার কথা তুমি আর মুখেও আনতে পাবে না বলে দিচ্চি।

শৈলেশ কহিলেন, তোমাকে বলে দিতে হবেনা, দেনার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

উষা বলিল, এতে কোন কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত দেনা হয়নি।

কিসের জন্য যে হ'ল কিছুই ত জানিনে উষা—

উষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই। দয়া করে এইটি শুধু কোরো পাগল বলে আবার যেন নির্ব্বাসনে পাঠিয়োনা।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিলেন। সোমেন কহিল, খাবে চলনা মা। কালকের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করলে মা ?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিলেন, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখ্‌চি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

উষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিলেন, এর কারণ কি জান ?

উষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলেমানুষ একলা বাড়ীতে—

তা' বটে, কিন্তু মা থাকতেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায়নি।

উষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আনতে বলে দি। আচ্ছা, না খাও,—আমার মাথা খাও, মেঠাই দুটো ফেলে উঠো-না কিন্তু। সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া উষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্য এই পীড়াপীড়ি, এম্‌নি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্য দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলেবেলায় শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের একছেলে,—অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিলনা। ভাঙিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, কোন দিকের কোন হিসেবই আর আমি কোরবনা উষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

(৬)

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল শৈলেশ ঠাহর পাইল-না। সকালে উঠিয়াই উষা কহিল, তোমাকে রোজ বল্‌চি কথা শুন্‌চোনা—যাও আজ ঠাকুরঝির ওখানে। সে কি মনে করচে বল ত ? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যি সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে না কি।

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিলেন, কলেজের যে রকম কাজ পড়েচে—

উষা বলিল, তা' আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠ্‌তে পারলেনা।

কিন্তু কি রকম শ্রান্ত হয়ে ফির্‌তে হয় সে তো জানো-না ? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয়ন।

উষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার যাও। রবিবারেও ছেলে পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর আমার মুখ দেখ্‌বেনা। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ী তৈরী করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজারে পৌঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস্। গাড়ীতে আমার কাজ আছে।

যাইবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে সে বিমাতার গায়ে ঠেস দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমার কাছে যাইতে সে কোন দিনই উৎসাহ বোধ করিতনা, বিশেষতঃ, সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ভয়ের অবধি রহিলনা। উষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক্, ও না হয় আর একদিন যাবে।

শৈলেশ কহিলেন, বিভার ওখানে ও যে যেতে চায় না সে দেখ্‌চি তুমি টের পেয়েছ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

খানাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ী ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাঁহার সতেরো আঠারো

বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিলনা। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই আসিল। ঊষার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া এতগুলি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লী-গ্রামের কুশিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিবে এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্য্যন্তই সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারম্বার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা কিসের জন্য? সমাজের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবেনা, কোথাও কোন সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবেনা, এমন কি বড় ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

অপরিচিত ঊষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান বলে, গিরধারীকে দূর করলেন ছোট জাত বলে।—এত যাঁর জাতের বিচার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বউকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারব না তা' যিনিই কেননা যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বউদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে-না-দিতেই তাহারা পালাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমার এখন চলে কি করে?

শৈলেশ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, অমনি একরকম যাচ্চে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আসবে না আমি বেশ জানি। কিন্তু বাড়ী ত একেবারে ভট্‌চায্যি বাড়ী করে রাখ্‌লে চল্‌বেনা, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখে শুনে রাখো,—মানুষে বল্‌বে কি?

শৈলেশ কহিলেন, না চল্‌লে রাখ্‌তে হবে বই কি!

বিভা বলিল, কি করে যে চল্‌চে সে তোমরাই জানো, আমরা ত ভেবে পাইনে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বাপের বাড়ী না গিয়েও পারিনে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবেনা।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাই-বোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও তখন না হয় বোলো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিন তাঁর ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেছি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারেই সত্য নয়, বস্তুতঃ, সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিলনা তাহা উভয়ের কেহই জানিতেননা, ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ ব্যাপার কি তোমাদের? চাকর বাকর সমস্ত বিদায় করে দিয়ে কি বোষ্টম বৈরাগী হয়ে থাকবে না কি? আজকাল খাচ্চো কি?

শৈলেশ কহিলেন, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গল্‌চে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাধ্‌চেনা এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, ঠিক তা' আমিও জানি। এবং আমারও যে সত্যিসত্যিই বাধে তা'ও নয়—কিন্তু মজা এম্‌নি যে সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার যো

নেই। তুমি কি এম্‌নিই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ না কি?

শৈলেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, দেখ ক্ষেত্র, যথার্থ কথা বল্‌তে কি স্থির আমি নিজে কিছুই করিনি, করবার ভারও আমার পরে তিনি দেন্‌নি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেচি যে তাঁর অমতে তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চিনে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ্‌ চুপ্‌, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাক্‌বেনা তা বলে দিচ্চি।

শৈলেশ কহিলেন, এ দিকে যদি রক্ষা নাও থাকে, অন্যদিকে এটুকু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবেনা। বল কি হে, অহর্নিশি কেবল টাকার ভাব্‌না, মাসের পোনর দিন পার হলেই মনে হয় বাকি পোনরটা দিন পার হব কি করে,—সে পথে আর পা বাড়াচ্চিনে। আমি বেঁচে গেছি ভাই,—টাকা ধার করতে আর যেতে হবেনা। যে কটা টাকা মাইনে পাই, সেই আমার যথেষ্ট,—এ সুখবরটা এঁর কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল না কি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেচি সে খবর তো রাখোনা!

শৈলেশ বলিতে লাগিলেন, এলাহাবাদে পালাবার সময় পুরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই একটি মাস পুরো চলা চাই। আগে ত কোনকালেই চলেনি, সোমেনের মা বেঁচে থাকতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এঁর হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়েও চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিলেন, তাদের মুসলমান এবং ছোট জাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু এটা জানি যাবার সময়ে তারা একবছরের বাকি মাইনে নিয়ে খুব সস্তব খুসি হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চারশ টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও ছোটখাটো কি-কি সব সাবেক দেনা শোধ করে ছোট্ট একখানি খাতায় সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় লেখা,—ভয় পেয়ে জিজ্ঞেসা করলুম এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো, ঊষা, অর্দ্ধেক মাস যে এখনো বাকি,—চল্‌বে কি করে? জবাবে বল্‌লেন, আমি ছেলে মানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে একতিল পাইনি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত,—আমার দর্জ্জি ও কাপড়ের বিল এবং হ্যাণ্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক্‌ ভাই, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত পথটা ক্ষেত্রমোহন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কাহারও কোন কথা বোধ করি তাঁহার কানেই গেলনা।

(৭)

অল্প কিছুক্ষণেই গাড়ী আসিয়া শৈলেশ্বরের দরজায় দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সাক্ষাৎ মিলিল সোমেনের। সে কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাটে বসিয়া তাহার রেল-গাড়ীর চাকা মেরামত করিতেছিল—তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিলনা। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে,—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্দ্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা শাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম-সীতা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার দেব-দেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ দেখিয়েছে বাবা, বেঁচে থাকো!

শৈলেশের এই দুজনের কাছে যেন মাথা কাটা গেল। স্বভাবতঃ, সে মৃদু-প্রকৃতির লোক, যে-কোন কারণেই হোক হৈ-চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিতনা, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোতা থেকে এই সমস্ত করে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল তাহাতে বুঝা গেল আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল।

শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌গে যা বল্‌চি!

তিনজনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়েরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর, মিনিট খানেক কেহই কোন কথা কহিলনা, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে এতটা বাড়াবাড়ি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই; কিন্তু বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, এসব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য।

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে একেবারে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে ফেল্‌লে হে! ছেলেটাকে মারলে কি বলে?—তোমাদের সঙ্গে ত চলা-ফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চায়ের পেয়ালায় তুফান কি রকম? তুমি কি এটাকে ছেলে-খেলা মনে করলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ, ভয়ানক কিছু একটা যে মনে হচ্চেনা তা অস্বীকার করতে পারিনে।

তার মানে?

মানে খুব সহজ। আজ নিশ্চয় কি একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি যে মহাপাপ হতে পারে আমি ত ভেবে পাইনে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপারও খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পাণ্ডা আছে, হয়ত কেউ দুটো একটা পয়সার আশায় ছেলেমানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েছে। এতে খুনোখুনি কাণ্ড করবার কি আছে!

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, এর পরিণাম ভেবে দেখেচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকালবেলা মুখ হাত ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র! তোমার ছেলেপুলে থাক্‌লে তুমিও তা'হলে এই রকম করতে দিতে?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলে-পুলে যখন নেই, তখন এ তর্ক বৃথা।

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক বৃথা হতে পারে, চন্দনও ধুয়ে ফেল্‌লে উঠে যায় আমি জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত অত সহজে নাও উঠ্‌তে পারে। ছেলে পুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চেয়েই কাজ করতে হয়। আজকের কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় এ কথা আমি একশ বার বোল্‌ব, তা তোমরা যাই কেননা বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নয়—এলা আমি। শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেন,—আমি কিন্তু এ আশা করিনে যে অধ্যাপকবংশের মেয়ে এসে একদিনেই মেম সাহেব হয়ে উঠ্‌বে। তা' সে যাই হোক্, তোমরা দু ভাই বোনে এর ফলাফল বিচার করতে থাকো, আমি উঠ্‌লুম।

শৈলেশ চুপ করিয়াই ছিল, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্র কহিলেন, উপরে। ঠাকুরুণের সঙ্গে পরিচয়টা একবার সেরে আসি। কথা ক'ন কিনা একটু সাধ্য-সাধনা করে দেখিগে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতেই ডাক দিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ বাড়াইতেছিল, কহিল, পিসেমশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটা দুই আলমারির কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য রকমের কাপড় জামা শাড়ী জ্যাকেট কোট পেণ্টুলান মোজা টাই কলার—কত যে রাশিকৃত করা তাহার নির্ণয় নাই, ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনার হচ্চে কি?

সোমেন স্তূপের মধ্যে হইতে একজোড়া মোজা টানিয়া

বাহির করিয়া কহিল, এই আর একজোড়া বেরিয়েচে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া,—চেয়ে দেখ মা?

ঊষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়াই প্রশ্ন করিলেন,এ কি অনাথ আশ্রমের ফর্দ্দ তৈরি হচ্চে, না জঞ্জাল পরিষ্কারের চেষ্টা হচ্চে? কি করচেন বলুন ত? তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ তাঁহাকে দেখিয় হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু ঊষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইলনা। সে মুখ তুলিয়া চাহিলনা বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজ কণ্ঠেই দিল, কহিল, এগুলো সব সারতে পাঠাবো ভাবছি। কেবল মোজাই এত জোড়া আছে যে বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনলেও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ, এখন কেউ নেই, এই সময়ে চট্ করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তার স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেননা। বাইরে থেকে আমার সাজসজ্জা আর আচার ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেননা, আমি নিতান্তই বাঙালী। কেউ গঙ্গাস্নান করে এসেছে শুনলে তাকে আমার মারতে ইচ্ছে করেনা এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আরও একটা কথা নিরিবিলিতেই বলে রাখি। সোমেনের মারটা নিজের গায়ে পেতে নিলে শৈলেশ বেচারার প্রতি কিন্তু অবিচার করা হবে। এত বড় অপদার্থ ও সত্যি-সত্যিই নয়।

ঊষা এ কথারও কোন জবাব দিলনা, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন। আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী-হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম একটু শিখে নিই।

ঊষা মেঝের উপর বসিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, এ সব মেয়েদের কাজ আপনার শিখে লাভ কি?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব আর একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

ঊষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই কহিল, এ সব ত গরীব দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষায় ত কোন প্রয়োজনই হবেনা।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারও ভুল হয় ত, সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব্যথা বোঝবার আর কেউ থাকবেনা। ইচ্ছে করে আমার ছোট বোনটিকে আপনার কাছে দিনকতক রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মীশ্রীর কতকটাও হয়ত সে তা'হলে শ্বশুর বাড়ীতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে শুনিতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আস্‌চেন দেখ্‌চি। শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরটাও এক রকম বলে স্থির করে নেবেননা।

ঊষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিন্‌তে পারবো।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয়? নিশ্চয় পারবেন এও আমি নিশ্চয় জানি। (ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺পার্ব্বতীনাথ বসু

প্রবীণ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র পার্ব্বতীনাথ অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবুর সংসারের বন্ধন ঐ একমাত্র পুত্রটীই ছিলেন; ক্রমে ক্রমে সকলকে বিসর্জ্জন দিয়া পার্ব্বতী নাথকেই তিনি বৃদ্ধ জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীনাথও পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল; পিতার ন্যায় তিনিও সাহিত্য-সেবায় অবহিত ছিলেন। আমরা বৃদ্ধ দেবেন্দ্র বাবুকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব?

৺রাখালরাজ রায়

"ভারতবর্ষে"র অন্যতম লেখক, ৺রাখালরাজ রায় মহাশয় বিগত ২রা পৌষ তারিখে ৫৩ বছর বয়সে, মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ

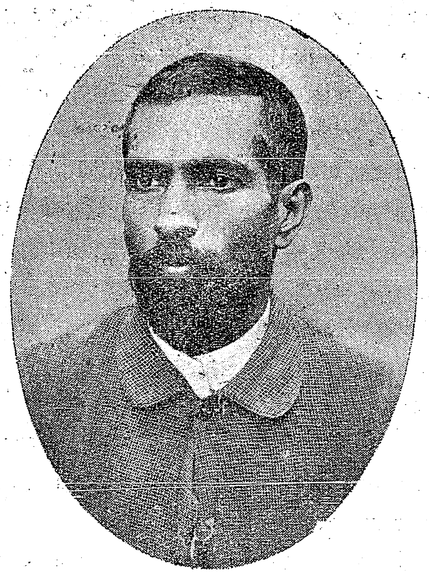

৺রাখালরাজ রায়

পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব প্রাচীন, বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত।

৺লেনিন

সোভিয়েট রুষিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা বোলশেভিক তন্ত্রের প্রবর্ত্তক লেনিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে বহুবার লেনিনের মৃত্যু-সংবাদ রটিয়াছিল; কিন্তু আবার তিনি বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন।

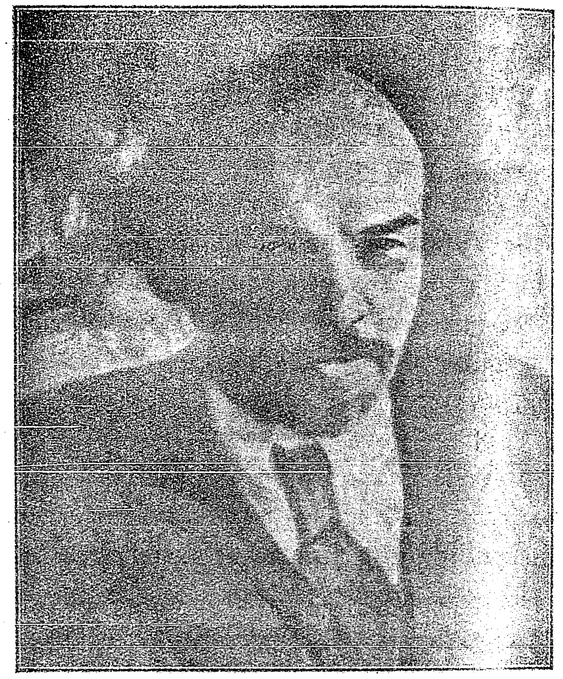

লেনিন

কিন্তু এবার শুধু তাঁহার মৃত্যু সংবাদ নয়—ময়দানারোহে তাঁহার সমাধির খবরও এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নূতন উপন্যাস "পতিতার সিদ্ধি" প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৷৷০।

৷৷০ সংস্করণের ১৫ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "ঋণমুক্তি" ও ১৬ সংখ্যক গ্রন্থ রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত "মুসাফির মজ্লিস" প্রকাশিত হইল।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত "কণ্ঠকৌমুদী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল; মূল্য ৩৲।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আঁধারে আলোকে" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৸০।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত "বিজিতা" উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৷৷০।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "সোণার পেয়ালা" ও "ভূঁচোর কীর্ত্তি" প্রকাশিত হইল; মূল্য প্রত্যেক খানি ৸০।

দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "নিত্যকর্ম্ম কৌমুদীর" দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বামুনের মেয়ে" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "স্কন্দ গুপ্ত" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম বহুবর্ণ চিত্র "দোটানা" নামক আলেখ্যের স্বত্বাধিকারী—শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA



জীবনের পথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঝাপচী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.



চৈত্র, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রণবাদিতে সকলের অধিকার

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

(তৃতীয় প্রস্তাব)

হোমাধিকার

এখন হোম সম্বন্ধে অধিকার বিচার্য্য। সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হোম-কার্য্যে জীবের বিশেষ উপকার। পোড়া ঘৃত যে গলদ্ ক্ষতের ঔষধ, ইহা সকলেই জানেন। চিনি প্রভৃতি মধুর পদার্থ অগ্নিসংযোগে যে বাষ্পে পরিণত হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম ফর্মিক আলডেহাইড। ইহার ন্যায় রোগের বীজনাশিকা শক্তি অপরত্র অপ্রাপ্য। হোমের অন্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার অনুষ্ঠান ও ব্যয়ে নির্ব্বাহ-কর্ত্তার যে হিত, অপরেরও সেই হিত। এই তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিলে, সর্ব্ব সৎ ব্যবহারের মূল তত্ত্বের জ্ঞান হয় যে, যাহাতে সকলের হিত, তাহাতেই প্রত্যেকের হিত; যাহাতে অপর সকলের অহিত, তাহাতে কাহারও হিত নাই। তাহাই যথার্থ হিত, যাহাতে আত্মপর সকলেরই হিত; কাহারও অহিত নাই।

হোমানুষ্ঠানের জন্য যাঁহারা একত্র মিলিত হয়েন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য একই। আত্মপর সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতই সেই এক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে স্বার্থ ও পরার্থ সমভাবে সম্মিলিত। কোন বিরোধ নাই। এইরূপ উদ্দেশ্যের মিলই প্রকৃত মিল। কোন কালে কোন ভাবে ইহাতে বিরোধের সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য এই ভাবে পরস্পর মিলিতে শিখিলে ধর্ম্মগত, সমাজগত, রাজনৈতিক হিতের

পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয় কি না, সকলে বুঝিয়া দেখুন, এই প্রার্থনা।

পরমার্থ সাধন বিষয়েও হোমের উপযোগিতা যথেষ্ট। কার্য্য দেখিয়া তবে কর্ত্তার অনুসন্ধান ও সমাদর। শিল্প না চিনিয়া শিল্পীর সুখ্যাতি যে অন্তঃশূন্য মৌখিক চাটুক্তি, ইহা সামান্য বুদ্ধিতেও সুবিদিত। বিশ্বের জ্ঞান-বর্জ্জিত বিশ্বকর্ত্তার স্তব-বৈপুল্যও সেইরূপ। সমগ্র বিশ্বও বোধায়ত্ত নহে। বিশ্বের বোধায়ত্ত অংশ বা ভাব লইয়াই সাধ্য সাধনের সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত কোন্ ভাব বা অংশ গ্রহণে সাধনের সুবিধা, তাহা সাধারণ রূপে নির্দ্ধারণ সুসাধ্য নহে। তবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় পাঁচটী। সেই জন্য ব্রহ্মাণ্ডও পাঞ্চভৌতিক। এই পঞ্চ ভূতের শেষ ভূত আকাশ যে কি পদার্থ, তাহার নির্দ্ধারণ মনের অল্পাধিক পরিশ্রম-সাধ্য। তারকাদি-খচিত ব্রহ্মকটাহ আকাশ নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত অপ্রত্যক্ষ ঈথরও নহে। প্রথমে পরিষ্কার রূপে শ্রুত কোন শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়। সেই শব্দের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে যাহা সংযোজক বলিয়া বোধ হয়, তাহাই যথাসম্ভব শুদ্ধ আকাশ। সেই আকাশ অন্যান্য ভূতের সহিত মিলিত হইয়া সান্নিধ্য দূরত্ব প্রভৃতিরূপে বোধায়ত্ত হয়।

মহাদেবের হস্তের ডমরু, এই পঞ্চ তত্ত্বের রূপক। উপরের অংশ বায়ু ও আকাশ, নীচের অংশ জল ও পৃথিবী; ক্ষীণ মধ্যস্থান অগ্নি। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও পুনরায় সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতিই জীবন-চক্র। এই চক্র অবিরত-গতি। এই চক্রের প্রত্যক্ষ পরিচালক অগ্নি। পৃথিবী-তত্ত্ব অগ্নি সংযোগে জলে পরিণত হয়। সেই প্রণালীতে জলের অগ্নি, অগ্নির বায়ু, বায়ুর আকাশ-তত্ত্বে পরিণতি প্রত্যক্ষ। পৃথিবী তত্ত্বরূপ উদ্ভিজ্জাদি দেহে কেরোসীন তৈল হয়। কেরোসীন আভ্যন্তরিক তাড়নায় জলিয়া অগ্নি, অগ্নি নির্ব্বাণে বায়ু, বায়ু স্পন্দন-শূন্য হইলেই আকাশ হয়। এই প্রণালী সাধারণ ও নৈসর্গিক বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। এইরূপ ভাবনায় বিষয়টী সুগম হয়। নতুবা জটিলতাবশতঃ নৈসর্গিক প্রণালী বিভ্রান্তির হেতু হইয়া পড়ে।

এই অগ্নিই আকাশে রবি-শশী রূপে প্রকাশমান। সেই অগ্নি দিবসে সমুদ্রের লবণাক্ত জল, গলিত মৃতদেহাদির রস ও সেই জাতীয় অন্যান্য তরল পদার্থ আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। সেখানে বৈদ্যুতাগ্নি সেই আকৃষ্ট জলীয় পদার্থকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মলশূন্য করিয়া বৃষ্টি-বারি উৎপন্ন করে। সেই বারিতেই পৃথিবীর জীবন-সঞ্চার। সেই অগ্নিই চন্দ্রমারূপে জোয়ার ভাটা খেলাইয়া জলকে সজীব রাখিতেছেন, উদ্ভিজ্জের রস বৃদ্ধি করিতেছেন। নতুবা সৌর-তেজে জীব-শরীর, বৃক্ষলতা শস্যাদির শুষ্কতায় জগৎ প্রাণশূন্য হইত।

অগ্নির স্বভাব চিন্তায় জগতে অতি বিস্ময়কর শক্তি-সন্নিপাত লক্ষিত হয়। অগ্নির তেজের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া স্থূলের সূক্ষ্মে পরিণতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ প্রণালীর শাস্ত্রীয় নাম বিলোম বা প্রতিলোম। ইহার বিপরীত অনুলোম প্রণালীতে অগ্নির উত্তরোত্তর পরিমাণ ক্ষয়বশতঃ সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্থূলে পরিণত হয়। যেমন বরফের আধার পাত্রের পৃষ্ঠে উদিত জলবিন্দু। এইরূপ ভাবে বিচারের ফলে এইটি প্রাপ্তব্য যে, তত্ত্বের পরিবর্ত্তন বস্তুর পরিবর্ত্তন নহে, শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি। বস্তুর পরিবর্ত্তন হইলে জলের বাষ্পাকারে পরিণতি বিনাশেরই নামান্তর হইত। সে বাষ্প আর জল হইতে পারিত না। এইরূপ চিন্তার ফলে আরও প্রাপ্তব্য, বৈচিত্র্যময় প্রকাশ-অপ্রকাশাত্মক জগতের মূলে জগতের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত সত্তার সংবাদ। সেই জগদ্বিলক্ষণ সত্তার অনুসন্ধান পরমার্থ সাধনের বিষয় বলিয়া তাহার আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য।

এমন কোন স্থান বা কাল নাই, যেখানে বা যখন কেবল একটী মাত্র তত্ত্ব অপরাপর তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত। যেখানে যখন যাহাতে অপরাপরের তুলনায় যে তত্ত্বের পরিমাণাধিক্য লক্ষিত হয়, সেখানে তখন তাহা সেই তত্ত্ব বলিয়াই গৃহীত হয়। অন্যথা তত্ত্ব গ্রহণের বা ব্যবহারিক ফলোৎপত্তির অবসর থাকে না। সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও লয় প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। অথচ বিবেক নামক বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা তত্ত্ব-পঞ্চককে শুদ্ধ ও ভিন্ন ভিন্ন করিয়া না ধরিলে এ বিষয়ক চিন্তাই অসাধ্য। ব্যবহার বিনা বিচার হয়, কিন্তু স্থির ধারণা হয় না; অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান রূপে পরিপক্ক হয় না। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

এই পঞ্চভূত বা তত্ত্বের মধ্যে পৃথিবী ও জল-তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত স্থূল অর্থাৎ চেতনের অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের

গ্রাহ্য। অবশিষ্ট তিনটীর লক্ষণ ভিন্ন, তত স্থূল নহে। বায়ু ও আকাশ-তত্ত্ব সূক্ষ্ম অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অগ্নি এই স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যবর্ত্তী।

সত্তা অপরিবর্ত্তিত সত্তা। বৈচিত্র্যের উৎপত্তি স্থিতি লয় শক্তির কার্য্য—এই বোধও শক্তির কার্য্য। শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতে স্থূল-সূক্ষ্মের চক্রাকার আবৃত্তি অগ্নির স্বভাব-চিন্তায় প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ প্রত্যক্ষের অগোচর। কারণ আছে এই পর্য্যন্ত অনুমান-গম্য। সেই কারণের বিবরণ, অর্থাৎ তাহা কি বা কেমন, ইহা অনুমানের অতীত। এই পর্য্যন্ত বোধই পরমার্থ-সংবাদ। পরমার্থের অনুসন্ধান বা সাধন আপ্তবাক্যাধীন বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনালোচ্য।

ব্যবহার-দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ অগ্নি-সংযোগে অগ্নিরূপ হইয়া চক্ষুর অগোচর হয়, ইহা প্রত্যক্ষ; কিন্তু বিনষ্ট হয় না, ইহা বুদ্ধিসম্মত। কেননা উপায়-বিশেষে তাহা পুনরায় অন্য আকারে প্রত্যক্ষ-গোচর হয় বা হইতে পারে। এ ভাবেও সত্তার সংবাদ প্রাপ্তব্য। অনন্তর পরমার্থ সাধন।

অগ্নি সম্বন্ধে যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর, যদি তাহারই প্রতি মনোযোগ আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে কি বলিতে বাধ্যতা ঘটে? চক্ষে চক্ চক্, চর্ম্মে তাপ, দৃশ্য পদার্থের অদর্শন ও অবস্থা বিশেষে দাহন কার্য্যের শব্দ কর্ণগোচর হয়। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গোচর। অথচ অগ্নি একই পদার্থ—এই ভাব বুদ্ধিতে আরূঢ়। যাহা যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর বলিয়া বোধ হয়, তাহা একটী বাহিরের শক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য। অথচ সেই বাহিরের শক্তি একই, ইহাও বোধ হয়; কেন না যে শক্তির সংঘাতে চক্ষে চক্ চক্ অনুভূত হয়, আর যাহার সংঘাতে ত্বগেন্দ্রিয়ে তাপ অনুভূত হয়, তাহার মধ্যে দেশ বা কালের ভেদ অনুভূত হয় না, একই শক্তির বলিয়া অনুভূত হয়। কার্য্য না হইলে শক্তি আছে এ বোধ থাকে না, কার্য্য-কালে সেই বোধ উৎপন্ন হয়। কার্য্যে শক্তিবোধের উৎপত্তি শক্তির উৎপত্তি নহে। শক্তি কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তিনী; এ জন্য জিজ্ঞাস্য হয় যে, নিষ্ক্রিয় শক্তির ভাব কি? শক্তি মাত্রেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাহার আধারের অর্থাৎ শক্তিমানের সহিত অভিন্ন ভাবে থাকে। যেমন উপবিষ্ট মনুষ্যের চলিবার শক্তি তাহার সহিত অভিন্ন ভাবে থাকে। এখন জিজ্ঞাসা উঠে এই যে, যে শক্তির নাম অগ্নি, যাহার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ সংঘাতে অনুভূত হয়, তাহা দাহনাদি কার্য্যের পূর্ব্বে ও পরে কাহার সহিত অভিন্ন ভাবে থাকে? সেই সত্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাই পরমার্থ-জিজ্ঞাসা।

সামান্য এক কড়ার দিয়াশলাই হইতে লব্ধ প্রকাশ-শক্তি, অগ্নি যাহার নাম, সেই শক্তি অবাধে পরিবর্দ্ধিত হইলে ঘর বাড়ী, গ্রাম নগর, প্রদেশ দেশ, পৃথিবী এমন কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসিনী। তবে তাহা এই অনাদি কালেও কেন ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় জগৎ রক্ষা করিতেছেন? রসজ্ঞ ব্যক্তি এই চিন্তার ফলে কাব্য-সিংহাসনের অধীশ্বর হইতে পারেন।

দেখুন, জল ও অগ্নি পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তি। একের বৃত্তি অপরের বিনাশিনী। অথচ আবহমান কাল কেহই কাহারও বিনাশ করেন নাই। এরূপ সতীনের সংসারের শান্তিরক্ষক কে? এইরূপ ভাবনা কি পরমার্থ-সংবাদী নহে।

তত্ত্ব সকলের মর্য্যাদা-রক্ষায় জীবন-রক্ষা। জীব-দেহের-রক্ষার্থ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অগ্নির প্রয়োজন। দেহস্থ অগ্নির অন্য কার্য্য চক্ষের আড়াল করিয়া দুইটী কার্য্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজনীয়। যথা প্রমাণ দেহস্থ অগ্নি যকৃতাদি যন্ত্রের চালনা দ্বারা আগ্নেয় দ্রাবক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া স্থূল অন্নকে পরিপাক করেন। অন্যদিকে শ্বেত ও পিঙ্গল বর্ণের মস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় পদার্থের উজ্জ্বলতা রক্ষাই শরীর ও বুদ্ধির কার্য্যরক্ষা। অগ্নির হ্রাস-বৃদ্ধিতে শরীর ও বুদ্ধির বিকৃতি প্রত্যক্ষ। বুদ্ধির সহিত সোম সূর্য্যাগ্নিরূপিনী শক্তির সম্বন্ধ চিন্তা পরমার্থ-সাধনের অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রোক্তি। এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে।

ব্যবহার-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অগ্নির বাহ্যিক গুণের অবলম্বনে মনুষ্যের সভ্যতা। অগ্নির ব্যবহার না জানিলে মনুষ্যে ও বানরে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। অনগ্নি-পক্ক অন্ন আহার, নগ্নাবস্থায় বিচরণ, গিরিগুহা বৃক্ষাদিতে বাস, গাছ পাথর ভিন্ন অস্ত্রহীন—এরূপ মনুষ্য মনুষ্যনামের বাচ্য কি না বিবেচ্য। সংক্ষেপতঃ অগ্নি-শক্তিই সভ্যতার

জননী—ইহা অসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষ। সভ্য মনুষ্যেরও সর্ব্ব বিষয়ে অগ্নিশক্তি উন্নতি-সাধিকা, এইটীও উত্তমরূপে ধারণার যোগ্য। হোম কার্য্য অগ্নির স্বভাব জ্ঞানের উপায়। ঐ জ্ঞানোৎপন্ন অগ্নির সদ্ব্যবহার উন্নতির দ্বার। অগ্নির স্বভাব জ্ঞান ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধির সহায় বলা অযুক্ত নহে। অবশ্য নীচ স্বার্থ বা পরানিষ্ট উদ্দেশ্যে অগ্নি-শক্তির অপব্যবহার অনিষ্টের হেতু। মন অনুসারে ফল, এ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। এ অবস্থায় যে কোন মনুষ্যের আন্তরিক প্রেরণায়, অকৃত্রিম ইচ্ছায় হোম কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় তাহাকে নিবারণ করা ক্ষুধিতের অন্ন, রোগীর ঔষধ অপহরণের সমান অত্যাচার কি না? যদি শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে অবিমিশ্র বাক্যে দ্বিজেতরের সম্বন্ধে সর্ব্বাবস্থায় হোমানুষ্ঠানের নিষেধ থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রকে যাঁহারা ব্যবহার ও পরমার্থের একমাত্র সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে নিষেধ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহাও নিঃসন্দিগ্ধ। এজন্য এ নিষেধ প্রামাণ্য শাস্ত্রসম্মত কি না, বিশেষ সাবধানে বিচার্য্য। এমন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিরল, যাহাতে অগ্নি-শিখায় হবন বা বিশিখ অগ্নিতে সুগন্ধ সংযোগ অপ্রচলিত।

স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে হোম নিষিদ্ধ কি না, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে; পরিষ্কার ভাবে বলা উচিত যে, হোম না করিলেও পরমার্থ সিদ্ধি হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে মুক্তি হয়, ইহা শাস্ত্র-সম্মত। "অন্তরাচাপিতুতাদৃষ্টঃ"—এই সূত্রে ব্যাসোক্তি পূর্ব্বে দর্শিত। মনুসংহিতায় প্রাপ্তব্য যে,

এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞ শাস্ত্রে বিদোজন।
অনীহমানাঃ সতত মিন্দ্রিয়েষ্চৈজুহ্বতি ॥
বাচ্যে জুহ্বতি প্রাণংপ্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণেচ পশ্যান্তো যজ্ঞনিবৃত্তিমক্ষয়াং ॥
জ্ঞানেনৈবা পরে বিপ্রারুর্যজন্ত্যৈতৈ সদৈঃ সদা
জ্ঞান মূলাম ক্রিয়া মেষাং পশ্যান্তোজ্ঞান চক্ষুষা ॥

৪।২২।২৪

"কোন কোন বাহ্যান্তর যজ্ঞানুষ্ঠান শাস্ত্রজ্ঞ বাহ্য চেষ্টা সমুদায় হইতে উপরত হইয়া বিষয় হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার দ্বারাই এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। ২২। কোন কোন জ্ঞানী গৃহস্থ বাক্য এবং প্রাণবায়ুতে যজ্ঞ নিষ্পাদনের অক্ষয় ফল জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু এবং প্রাণবায়ুতে বাক্য আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ কথা কহিবার সময়ে "বাচি প্রাণং জুহোমি" চিন্তা করেন, আর কথা না কহিবার সময়ে "প্রাণে বাচং জুহোমি" চিন্তা করেন। ২৩। অন্য কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা উপনিষদ চক্ষু দ্বারা দেখেন যে, জ্ঞানই সমুদায় যজ্ঞের মূল কারণ।" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।

টীকায় কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন, "শ্লোক দ্বয়েন ব্রহ্ম নিষ্ঠানাং বেদ সন্ন্যাসি নাম অমীবিধয়ঃ।" এই তিন শ্লোকে বৈদিক কর্ম্মত্যাগী গৃহস্থের পক্ষে এই সকল বিধি কথিত। যে শ্রুতি স্মরণে মনুর বাক্য তাহা কল্লুক টীকায় উদ্ধৃত। সে শ্রুতি এই, যথা—

"যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে তবেৎ প্রাণিতুং শক্নোতি প্রাণং তদা বাচিজ হোতি। যাবদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবৎ ভাষিতুং শাক্নোতৈ। বাচং তদা প্রাণে জু হোতি।" কৌষিতকী উপঃ (অঃ ৩।৪ বিদ্বাং সোগ্নিহোত্রং ন জুহ্বাং।

যাবৎ কাল পুরুষ কথা কহেন, তাবৎ কাল শ্বাসের কার্য্যে অশক্ত। তখন প্রাণ বাকে হবন করেন। যাবৎ কাল পুরুষ শ্বাসের কার্য্য করেন, তাবৎ কাল বাক্যোচ্চারণে অশক্ত। তখন বাক্য প্রাণে হবন করেন। জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করিয়াছিলেন না।

আবার বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায় যে, "জনকো বৈদেহো বহু দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে।" বিদেহরাজ জনক বহু দক্ষিণা-যুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ শাস্ত্র দেখিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, হোম পরামর্থ সাধনের সহিত অবিনা ভাবে সংযুক্তা নহে। এজন্য ভগবান বেদব্যাসের উক্তি—'তুল্যন্তু দর্শনাৎ।' ব্রঃ সূঃ ৩।৪ ৯

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মরণে ভগবদ্ গীতার উক্তি; যথা—

ত্যজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যজ্যমিতি চাপরে ॥ গীঃ ১৮।৩

কতকগুলি মনীষী বলিয়া থাকেন যে—কর্ম্ম সদোষ, এই কারণে উহা পরিত্যজ্য। আবার কেহ কেহ বলেন যে যজ্ঞ দান এবং তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যজ্য নলে।

(শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ)

যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যজ্যং কার্য্যমেবাতৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম ॥ গীঃ ১৮।৫

"যজ্ঞ দান এবং তপস্যারূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যজ্য নহে; কিন্তু কর্ত্তব্য। কারণ, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনীষিগণের পবিত্রতার প্রতিহেতু ॥" (পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)

এইরূপ মনীষীত্ব বর্ণাশ্রমের অপেক্ষা করে না। রৈক্য, সম্বর্ত্ত, জড়ভরত, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি মনীষী হইয়াও বর্ণা-শ্রমের বাহির। কিন্তু এখানে মনীষী শব্দে সাংখ্যাচার্য্যই বিশেষ রূপে উদ্দিষ্ট। তাঁহাদের মতে বৈদিক কর্ম্ম অবিশুদ্ধ, ক্ষয়াতিশয্য দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যজ্য। যে সাতজন ঋষির তৃপ্ত্যর্থে ঋষি-তর্পণ তাঁহাদের মধ্যে চারিজন সাংখ্যাচার্য্য। যথা—

"কপিলশ্চা সুরিশ্চৈব বোঢু পঞ্চশিখস্তথা।"

সাংখ্য কারিকায় প্রাপ্তব্য যে, ভগবান কপিলের শিষ্য আসুরি, পঞ্চশিখ তাঁহারই শিষ্য। বোঢুর নামোল্লেখ নাই। বস্তুতঃ ইনি পঞ্চশিখের সতীর্থ।

গীতা মোক্ষ-শাস্ত্র, বর্ণাশ্রমের সহিত মুখ্য সম্পর্ক রহিত। মুমুক্ষু মাত্রেই ইহার অধিকারী। গীতা শুনিয়া পিশাচের মুক্তি হইয়াছিল এরূপ কিম্বদন্তি আছে। বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে যে কোন মুমুক্ষুকে যজ্ঞাদিতে অনধিকারী বলিবার পূর্ব্বে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোক-গুলি বিচারনীয়। যথা—

সহ যজ্ঞঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ঠ কামাধুক্ ॥ ৩।১০

পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া (তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞই তোমাদের অভিলষিত ফল সকল প্রদান করিতে সমর্থ হউক। পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ।

তদকরণে নিন্দা, যথা—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ ৩।১৬

এই প্রকার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সংসার চক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, তাহার জীবন পাপময়, সে ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকামী। (অতএব) তাহার বাঁচিয়া থাকা নিস্ফল।

(পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)

গীতা শাস্ত্র আচার্য্য-সম্মত প্রস্থান ত্রয়ের অন্যতম। মোক্ষ-শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ বিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধে সেই সেই শাস্ত্রই অগ্রাহ্য হইবে। কেন না ভগবানের গীতার আজ্ঞা যে—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যাগিমা শুচঃ ॥

১৮।৬৬

তুমি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

(পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)

মহাভারতের অন্যত্র প্রাপ্ত ভৃগু ঋষির উপদেশ প্রাসঙ্গিক বোধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

ভৃগুরুবাচ

নবিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণো পূর্ব্বসৃষ্টংহিকর্ম্মভিবর্ণতাং গতং ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তক্ষোঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তা স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গসি দ্বিজক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় গীতা কুর্য্যন জীবিনং।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তিতে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তো দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়াস্তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিদ্ধাতৈ ॥
শান্তিপঃ। মোক্ষধর্ম্মপঃ। অঃ ১১৮।১০-১৪।

ভৃগু বলিলেন—

বর্ণদের মধ্যে কোন ভেদ নাই; কেন না, এই সমস্ত জগৎই ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি। পূর্ব্বে ইহা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মবশতঃ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা কামভোগ প্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী, সাহসপ্রিয় আর যাঁহারা নিজেদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের শরীর রক্তবর্ণ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সে সমস্ত ব্রাহ্মণ গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কৃষিজীবী হইয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন নাই এবং যাঁহাদের শরীর পীতবর্ণ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ হিংসা ও অনৃতপ্রিয়লোভী

এবং সর্ব্বকর্ম্ম উপজীবী ও লোকভ্রষ্ট এবং যাঁহাদের শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণেরা বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের যে যজ্ঞ-ক্রিয়া ধর্ম্ম তাহা নিয়মতঃ নিষিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।—

শেষ শ্লোকার্দ্ধ বিশেষরূপে চিন্তনীয়।

এখন প্রতিকূল শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীর্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৃত "তন্ত্রসারে" বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত। আগমবাগীশ মহাশয় "মুণ্ডমালা তন্ত্র" ও কুল প্রকাশ" নামক সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে প্রত্যেক বর্ণের অনুষ্ঠেয় হোমের নির্ণায়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, "এতেন স্ত্রী শূদ্রাণাম হোমাধিকারঃ।" ৩২॥ অনন্তর কান্যকুব্জবাসী শাক্ত সম্প্রদায়ে বিশ্বগুরু বলিয়া বিখ্যাত লক্ষ্মণাচার্য্যকৃত "সারদা তিলক" হইতে অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। যথা—"তথাচ শূদ্রাণাং ত্র্যম্বমীরিতমিতি কুণ্ড প্রকরণে সারদায়াং। স্ত্রীনাম হোমাধিকারশ্চত ত্রৈব।"

লাজৈস্ত্রি মধুরোপেতৈর্হোমংকন্যা প্রযচ্ছতি।
অনেন বিধিনা কন্যা বরমাপ্নোতি বাঞ্ছিতং॥

অতএব "স্ত্রীণাং হোমাধিকারঃ।" তাহার পর বলিতেছেন, "সচ ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্থাৎ তাহাও ব্রাহ্মণ দ্বারা এই স্বকৃত বিশেষ বিধির অনুকূলে প্রমাণ দিতেছেন। "তথাচ তন্ত্রান্তরে—

ওঁকারোচ্চারণাৎ হোমাৎ শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্র চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

ইতি সাক্ষান্নিষেধঃ। তথা স্ত্রীনামপি সর্ব্ব বৈদিক কর্ম্ম শূদ্রতুল্যত্ব প্রতিপাদন ত্বাৎ।" তাহার পর শূদ্রের শালগ্রাম-অর্চ্চনা নিষেধের প্রমাণান্তর। ৩৪॥ তদনন্তর নৃসিংহ তাপনীয় প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত বচনে দেখাইতে সচেষ্ট যে স্ত্রী শূদ্রের প্রণবাদি কতকগুলি মন্ত্রে অনধিকার। "ইতি সর্ব্ব স্ত্রীণাং শূদ্রবদ্ব্যবহার।" ৩৬॥ অর্থাৎ স্ত্রী সকলের শূদ্রবৎ ব্যবহার। সত্যপ্রিয় আগমবাগীশ মহাশয় অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন, "শূদ্রস্যাপি হোম কর্ম্মাণি স্বকর্ত্তৃক হোম ইতি কেচিৎ।"

'সারদা তিলকের' কুণ্ড প্রকরণে শূদ্রদিগের ত্রিকোণ কুণ্ডের উল্লেখ আছে। সেইখানেই স্ত্রীগণের হোমাধিকার প্রাপ্তব্য।

খই দুগ্ধ চিনি মধু হোমে প্রদান করিলে কন্যা বাঞ্ছিত পতিলাভ করে। অতএব স্ত্রীদিগের হোমে অধিকার।

কাহার কাহার মতে শূদ্রেরও হোম কার্য্যে স্বকর্ত্তৃক হোম।

তথাচ বারাহী তন্ত্রে,

যদি কামীভবত্যত্র শূদ্রোপি হোমকর্ম্মণি।
বহ্নি জায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ॥৩৭॥

এই হোম-কার্য্যে শূদ্রের কামনা হইলে স্বাহা মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নমঃ বলিবে।

বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার বা অনধিকার, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। হোমে অধিকার আছে কি না ইহাই বিচার্য্য। হোমে অধিকার আছে ইহা সকলেরই মত। আগমবাগীশ মহাশয়ের মতে স্ত্রী শূদ্রের স্বকর্ত্তৃক হোমে অনধিকার। বারাহীতন্ত্রে প্রকাশিত নিষেধবাক্য তাঁহার মতের প্রত্যক্ষ বিরোধী। তাঁহার মতের অনুকূল প্রমাণ যে তন্ত্রের বচন তাহার নামোল্লেখ নাই। এ জন্য প্রকরণচ্যুত বাক্যের প্রকৃত প্রয়োগস্থল কি নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। যে হোম শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ যে হোম করিলে শূদ্রের সামাজিক অবনতি মাত্র ঘটে, তাহা যদি আসন্ন পরবর্ত্তী শালগ্রাম শিলা সম্বন্ধীয় হয়, তবে আগমবাগীশ মহাশয়ের উক্ত বিশেষ বিধি যে, ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্রের সর্ব্বপ্রকার হোম, তাহা স্থাপিত হয় কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। আরও দেখিবেন, তন্ত্রান্তর নাম মাত্রে উল্লিখিত তন্ত্র বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ তন্ত্রের বাক্য ব্যবহৃত হইবে কি না? "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদোন যুজ্যতে" এই ন্যায়ানুসারে দ্রষ্টব্য যে, বিচারে আরোপিত শাস্ত্র সকলের এক বাক্যত্ব রক্ষা হয় কি না।

তন্ত্রান্তরের বচন অনুসারে শূদ্রের পক্ষে এই চারিটী নিষিদ্ধ যথা—

(১) ওঁকার উচ্চারণ (২) হোম (৩) শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা (৪) ব্রাহ্মণী গমন। উক্ত বচনানুসারে যদি সর্ব্বাবস্থায় ওঁকার উচ্চারণ শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "শাক্তনন্দ তরঙ্গিণী" ধৃত "তন্ত্রোক্তং প্রণবামি" ইত্যাদি ভূতশুদ্ধির বাক্য ব্যবহৃত হয়। (২) হোম নিষিদ্ধ হইলে আগমবাগীশ মহাশয় ধৃত বহু তন্ত্র বাক্য-ব্যাহত হয়। (৩) শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা সর্ব্ব-তান্ত্রিক শাস্ত্রে বিহিত নহে।

ইহা বীরাচারী শাক্ত সাধনের বহির্ভূত বলিয়াই দেখা যায়। আগমবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থ দধিবামন মন্ত্র ভিন্ন শালগ্রামার্চ্চনার সহিত সম্পর্কশূন্য। তন্ত্র বিশেষে শালগ্রাম অর্চ্চনার নিষেধও দেখা যায়। যথা, কুলাবলীতন্ত্রে:—

"বেদাঃ বিনিন্দিতাঃ যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধ রূপিণা
হরের্ণাম ন গৃহ্ণীয়াৎন স্পৃশেৎ তুলসীদলং।
নস্পৃশেৎ তুলসী পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ॥

বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বেদ সকল বিশেষ ভাবে নিন্দিত। এজন্য হরির নাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীদল ও পত্র স্পর্শ করিবে না এবং শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিবে না।

(৪) ব্রাহ্মণী-গমন সর্ব্বতন্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। শ্যামা বিষয়ক স্ত্রীমন্ত্র অর্থাৎ স্বহোস্তক মন্ত্র সাধনে ব্রাহ্মণী গমন অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্যামা বিদ্যা ন সিদ্ধেত ব্রাহ্মণী গমনং বিনা।

প্রাণতোষিণী ধৃত। ১২৬৬ সালের সংস্করণ পৃঃ ৬২৩। এই গ্রন্থের সংগ্রহকার রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার, আগমবাগীশ মহাশয়ের অধস্তন একাদশ পুরুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। "নিরুত্তরতন্ত্র" আগমবাগীশ মহাশয়ের অপরিজ্ঞাত ছিল না, এ অনুমান অযুক্ত নহে। শ্যামা বিদ্যা ও প্রয়োগে "তন্ত্রসারে" প্রাপ্তব্য।

এ অবস্থায় তন্ত্রান্তরের বচনের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার না করিলে সকল শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য লোপ হইবে। এখন ইহাদের একবাক্যত্ব রক্ষার উপায় কি? যদি তন্ত্রান্তরের বচনের এইরূপ অর্থ করা যায় যে, উপাসনা বিশেষেই উহা প্রযোজ্য, অন্যত্র নহে। যে উপাসনার অন্তর্গত শালগ্রাম অর্চ্চনা, তাহাতেই হোমাদি শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। বামদেব্য সাম যে উপাসকের অবলম্বন তাহারই পক্ষে বিধি যে—

"ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ব্রতং' (ছা ২।১৩২) ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্প প্রাপ্তং পরিহরেৎ সমান মার্থিনীং। বামদেব্য সামোপসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। এতস্মাদন্যত্র প্রতিষেধ নন্যতর।" সেইরূপ শালগ্রামার্চ্চনাত্মক উপাসনায় শূদ্রের স্বকর্ত্তৃক হোম নিষিদ্ধ, অন্য সর্ব্বত্র প্রশস্ত। এইরূপ সিদ্ধান্তেই সর্ব্বশাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা হয়। আর এক কথা—আগমবাগীশ মহাশয়ের মতে "স্ত্রীণামাপি সর্ব্ব বৈদিক কর্ম্মসু শূদ্র তুল্যত্ব প্রতিপাদনাৎ।"

প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে তান্ত্রিক কর্ম্মের অন্তর্গত হোম। "তন্ত্রসারে" কোন বৈদিক হোমের কথাই নাই। তবে বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে স্ত্রী-শূদ্রের তুল্যত্ব সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কি না, ইহাও সত্যপ্রিয় পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

পক্ষান্তরে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, স্ত্রীজাতির হোমাধিকার যদি বৈদিক বিধি-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী শূদ্রের তুল্যত্ব বশতঃ শূদ্রের পক্ষেও হোমাধিকার নিষিদ্ধ হইবে না—ইহা যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে মহিষী-বিধুরা মহারাজা বহু যজ্ঞে অনধিকারী। সীতা-বিরহিত রামচন্দ্রের স্বর্ণ-সীতা ব্যতীত অশ্বমেধ যজ্ঞে অনধিকার শাস্ত্রে বর্ণিত। সাগ্নিক দ্বিজের প্রবাসকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হোমে অনধিকারিণী হইলে যাজ্ঞবল্ক্যাদি অপুত্রক দ্বিজের অগ্নিত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হইত। নতুবা স্বগৃহে বন্দী হইয়া রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিতে বিরাজ করিতে অসমর্থ হইতেন। ব্রাহ্ম-বিধানে বিবাহিত দ্বিজকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, তিনি ধর্ম্ম অর্থ ভোগ বিষয়ে পত্নীকে অতিক্রম করিবেন না। তদ্বিষয়ক মন্ত্র যথা—'ধর্ম্মেচ অর্থেচ কামেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েমং।" অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থও কাম বিষয়ে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না। যদি হোমানুষ্ঠান ধর্ম্ম হয় তাহাতে স্ত্রীকে অনধিকারিনী করিলে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয় কি না, ইহাও বিচার্য্য। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ যে ধর্ম্ম নহে, ইহা ত সর্ব্ববাদি সম্মত।

"বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু" বিদায়কালে এই ভগবদ্বাক্য স্মরণান্তে প্রার্থনা—ইদং ব্রহ্মার্পণমস্তু।

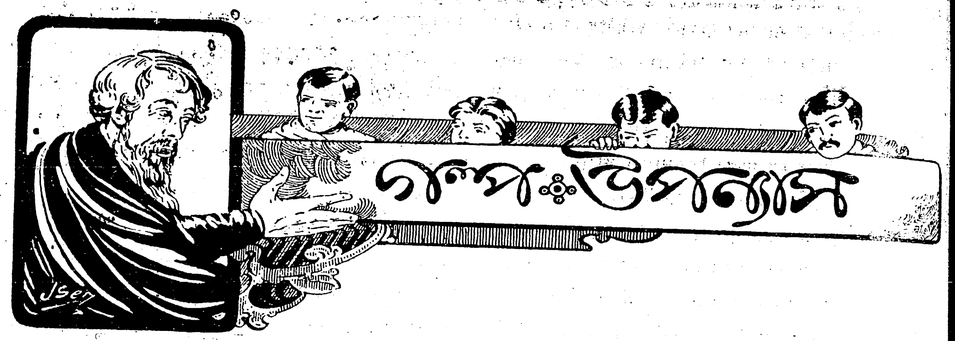

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৭)

দিন চলিয়া যাইতেছে। মাঘ মাসের মাঝামাঝি উমার বিবাহ হইয়াছে, সে মাস গেল, ফাল্গুন মাসও শেষ হইয়া আসিল; উষা আসিল না। তাহাকে আনিবার জন্য দুইবার লোক পাঠানো হইল। প্রথম তাঁহারা বেশ ভদ্রতার সঙ্গেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বারে স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা এখন উষাকে পাঠাইবেন না; কিছু দিন পরে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গেলে পাঠাইবেন।

উমা খুব গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। থাক, সেখানেই সে সুখে থাক, স্বামীর আদরিণী হইয়া সে যদি চিরজন্মও স্বামীর আলয়ে থাকে, তাহাও প্রার্থনীয়।

অমরনাথের আকারে প্রকারে কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। দিনগুলা তাঁহার কাছে যেমন আসিতেছিল, তেমনই আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। মনের মধ্যে কষ্ট হইলেও তিনি সেটা প্রকাশ্যে বাহির হইতে দিতে পারিলেন না।

হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন বগলা দেবী;—"তখনই বলেছিলুম—অমর, ওখানে মেয়ের বিয়ে দিস নে। ওখানে মেয়ে কখনই সুখে থাকতে পারবে না, পারবে না; তা আমার কথা শোনা হবে কেন? আমার কথায় কি ওরা প্রথমে কান দেয়? যখন কান দেয়, তখন সব শেষ হয়ে যায়। এই যে মেয়েটার বিয়ে হল, একটী দিনের জন্যে তারা আর পাঠালে না, একটীবার দেখতেও দিলে না। এতে সুখটা কি হল? ছেলেমানুষ মেয়েটার কপালে কষ্ট, নিজেদেরও মনে কষ্ট।"

উমা শান্তকণ্ঠে বলিল, "কষ্ট কিসের ঠাকুর-মা? মেয়েমানুষ স্বামীর ঘর করে, এর বেশী প্রার্থনার বিষয় ভগবানের কাছে আর কিছু নেই। না এল, নাই আসবে। আমরা এই ভেবে সুখে থাকব সে শ্বশুর-ঘর করছে, স্বামীর সেবা করছে। সেও মনে ভেবে সুখে থাকবে, সে স্বামী-সেবা করতে জন্মেছে, স্বামী সেবাই করে যাচ্ছে।"

বগলা দেবী মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন, "তোর কথা রাখ্ উমা; যদি নিজে সব জেনে উপদেশ দিতিস, তাতে বরং কাজ হতো। মেয়েদের প্রথম দু' একবার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কি, তা তো জানিস নে,—ভগবান তোকে এ জন্মে তেমন দিন দিলেনও না। তারা বাপ মা, ভাই বোন, ছোটবেলা হতে যাদের দেখে আসছে, তাদেরই চেনে, তাদেরই ভালবাসে। হঠাৎ একরাত্রে একটা অচেনা লোক, কস্মিনকালে যাকে কখনও চোখে দেখেনি, সে এসে গোটাকত মন্ত্রের জোরে তার প্রভু হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ তাকে দেখে ভালবাসা তো চুলোয় যাক, ভয়ই করে,—কোথায় নিয়ে যাবে, এই কথা ভেবে। তার পর শ্বশুরবাড়ী যে সে যাবে, সেখানেও তো সবই পর, কেউ আপনার লোকটী নেই। সেই সব অচেনা লোকের মধ্যে প্রাণটা তার কি রকম করে, বল্ দেখি? ছেলেমানুষ বউদের এই মনের কষ্টটা যারা বোঝে না—তারা কি মানুষ? একেবারে কি পোষ মানানো যায় মানুষকে? অতিরিক্ত জোর চালাতে গেলে যে তার মনটা একেবারেই বিদ্রোহী হয়ে যায়। সেই তিক্ত মন নিয়ে সে যে কাজ করে, সবই যে তিক্ত হয়ে যায়। ছেলেমানুষকে কি একেবারেই আটক করতে আছে? বিয়ে যখন হয়েছে, তখন সে পরেরই হয়ে গ্যাছে, বাপ মায়ের তার উপরে আর কোন দাবী দাওয়াই থাকতে পারে না। এইটেই না বড় কষ্টের কথা যে, ছেলেমানুষ বউটার পানে তাকাতে অনেক শ্বশুর-বাড়ীর লোকই উদাসীন হয়।"

উমা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "এমনি তো সবারই হয়ে থাকে ঠাকুর-মা। লোকে এটা জানে, জেনে-শুনেও কেন এমন করে? সবারই তো মেয়ে হয়, ব্যথাটা সবাই পায়,—তারা তবে বোঝে না কেন?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর-মা বলিলেন, "কেন বোঝে না, তার উত্তর আমি কি দেব দিদি? তার উত্তর তাদের কাছেই পাবে।"

উমা আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া অনাবশ্যক সে এটা ওটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল,—কি করিবে তাহা মোটে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। মনের মধ্যে ঠাকুর-মায়ের কথাগুলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে কথাগুলোকে সে কোনও মতে হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

অমরনাথের কক্ষ হইতে তাঁহার আহ্বান শুনা গেল—"উমা!"

"যাই বাবা।"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইল। আজ দু' তিন দিন অমরনাথের শরীরটা তত ভাল যাইতেছিল না, সেজন্য তিনি গৃহেই ছিলেন।

অমরনাথ দুখানা পত্র উমার হাতে দিয়া বলিলেন "এই পত্র দুখানা পড়তো মা।"

একখানা পত্র উষা লিখিয়াছে। বেশী কথা সে কিছুই লিখিতে পারে নাই, নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানাইয়া সে এখানকার সকলের কুশল চাহিয়াছে।

অপর পত্রখানার খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উমা আগেই উল্টাইয়া দেখিল, সেখানা মনীশ লিখিয়াছে। সে গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে আসিবে, আসিয়া উষার কথা সব জানাইবে। উষা বেশ ভালই আছে, তবে একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুই তিন দিন কাঁদিয়াছিল, আর কাঁদে না। মনীশকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে; সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মনীশকে প্রত্যহই তাহাদের বাড়ী যাইতে হয়,—এটার ব্যতিক্রম করিবার যো কিছুতেই নাই।

পত্রখানা পড়িয়া উমা আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মনীশদা আছেন সেখানে, তা হলে বিশেষ কোনও ভাবনার কারণ নেই, না বাবা?"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভাবনার কারণ থাকলেই বা কি হত উমা, ভেবেই বা কি করতে পারতুম। মেয়ে যখন দান করেছি, তখন তার পরে আমাদের কি অধিকার আছে? ভাববার অধিকারটুকু আছে বটে, কিন্তু সেটা জ্বালা কেবল বাড়ায়, কমাতে পারে না। মনীশ আছে বলে একটু সান্ত্বনা যে, সে তার বাপের বাড়ীর একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। পত্রে আর কিছু লেখা আছে কি মা?"

উমা আবার পড়িল—মনীশ লিখিয়াছে উষাকে তাহারা এখন পাঠাইবে না। সে উষাকে পাঠানোর সম্বন্ধে বলায় উষার শাশুড়ি বলিয়াছেন, এখন কিছু দিন তাঁহারা পাঠাইবেন না। আর সে পল্লীগ্রামে পাঠাইতেও তাঁহাদের কাহারও ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শিখাইয়া পড়াইয়া যেটুকু শিক্ষিতা করিতে পারিবেন, পল্লীগ্রামের সেই সব কুসংস্কারের মধ্যে গিয়া পড়িলে তাহার সে শিক্ষা সবই দূর হইয়া যাইবে, সে আবার কতকগুলা কুসংস্কারের বোঝা মাথায় লইয়া আসিবে। উষার পিত্রালয়ের দাসীটিকে তাঁহারা বিদায় দিতেছেন, কারণ, সে থাকিলে উষার শিক্ষা হয় না, সে কেবল তাহার কাছেই পড়িয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, সেখানকার আর কোনও লোক অযাচিত ভাবে আসিয়া উষার মনকে কাঁচাইয়া না দেয়। তাঁহারা জানেন, এ ভিত এখন পাকা নহে, কাঁচা,—বাপের বাড়ীর

ধাক্কা আসিলেই এ ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে অমরনাথ নিজে যদি দেখা করিতে আসেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কন্যার সহিত দেখা করিতে পারিবেন।

অমরনাথের ললাটে দুই তিনটী রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি অধর দংশন করিলেন, পরক্ষণে একটু হাসিলেন।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হাসলে যে বাবা। ঊষার এ বন্দিনীত্ব শুনে তোমার মনে একটুও কষ্ট হল না?"

অমরনাথ শান্তস্বরে বলিলেন "দুঃখ? কি লাভ মা দুঃখ করে? আমরা দুঃখ করলেই যদি কাজ হতো, তবে তো ভাবনাই থাকত না। সংসারে এসে হেরে যাব কি বারেবারেই, একবারও কি দুঃখকে জয় করতে পারব না; প্রত্যেকবারই তাকে বিজেতার আসন দিয়ে তার পায়ের ওপর পড়ে থাকব? সে আমাদের দলবে পিষবে, আমরা কেবলই কাঁদব?"

উমা পত্রখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মলিন মুখখানার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া অমরনাথ বলিলেন "এত মলিন হয়ে পড়লে মা? সুখ দুঃখ যদি তোমায় তাদের মতে চলতে বাধ্য করে, তবে তুমি যথার্থ মানুষ হবে কি করে? যথার্থ মানুষ সেই—যে সুখ দুঃখকে সমান ভাবে বরণ করে নিতে পারে। যখন সুখ আসবে তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অগ্রসর হয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে নেবে, যখন দুঃখ আসবে তখন তার দিকে চেয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করবে—না না, আমি তো এ চাই নি, তবে কেন এল? হ্যাঁ মা, আমরা কি এ ইচ্ছা প্রবৃত্তি দমন করতে পারি নে? সুখ দুঃখ, এ ত আসবেই মা। সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ ঘুরছে, এ আসবেই। আর এ কি দুঃখ মা? সামান্য একটুতেই যদি এতটা বিহ্বল হয়ে পড়, এর পর দাঁড়াবে কি করে?"

উমা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "তোমার মত জ্ঞান যদি পেতুম বাবা, তবে তো যথার্থ একটা মানুষ হয়ে যেতুম। আমরা যে মেয়েমানুষ বাবা, অল্পেতেই আমাদের ঘা লাগে বেশী যে।"

অমরনাথ বলিলেন "তা আমি জানি মা। মেয়েদের মনটা স্বভাবতঃই ভারী নরম কারণ, তারা জগতে এসেছে শুধু ভালবাসতে। আমি তোমায় তো অন্য মেয়ের মত শিক্ষা দিই নি উমা, তবে তোমার মনটাই বা কেন তাদের মত হবে? তুমি ভালবাসতে এসেছ; কিন্তু তাতে আপনার সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দিতে ত এস নি।"

উমা একটু হাসিল, বলিল "সেটা আমিও ভাবি বাবা। কিন্তু তুমি যতই শিক্ষা দাও, তবু তোমাদের মত দৃঢ়-চিত্ত আমাদের কখনই হবে না। তোমাদের পথে আমরা চলতে যাব বাবা, কিন্তু তোমাদের মত একেবারেই চলে যেতে পারব না,—নানা দিককার আকর্ষণ আসবেই। মেয়েকে পুরুষ প্রকৃতি দেওয়া চলবেই না। কখনও কখনও তার ভেতরের নারী-শক্তি বেরিয়ে পড়বেই। তার দৃষ্টান্ত ঢের রয়েছে বাবা। ঢের পড়েছি, নিজের মন দিয়েও বুঝে দেখেছি। মনে ভাবি, কে কার, কেউ তো আমার না, আমি নিজেই যখন আমার নই, তখন পরের জন্যে ভাবতে যাই কেন? মনকে খুব শক্ত করে আনি, কিন্তু কোথা হতে একটা কথা মনে ভেসে ওঠে, আমি আত্মহারা হয়ে যাই; তার কথা ভাবতে আমার চোখ ভরে জল আসে।"

অমরনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "কলকাতায় কিছু-দিনের জন্যে যাবে মা?"

উমা বলিল "কেন বাবা, ঊষাকে দেখতে?"

অমরনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "না, তার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী—সেবাই যখন তার বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়ে তাকে নিতে চান, আমরাই বা কেন সম্পর্ক রাখতে যাব? জেনে সুখী থাক—সে ভাল আছে, সে সভ্য সংসারে গ্যাছে, কুসংস্কারীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক এক দিন সে নিজেই রাখতে চাইবে না, এক দিন আমাদের দেখেই সে সরে দাঁড়াবে।"

উমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, তা কখনও হতে পারে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "ঠিক হতে পারে। অনেক শিক্ষিত যুবক যে সভ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়, সে বালিকা তাতে ভুলবে না, এও কি কথা হতে পারে? এই বিজাতীয় শিক্ষায় সার বস্তু কিছু নেই মা, কিন্তু বাহ্যিক

চাকচিক্য এমন যে, লোকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে যায়; আর তা পাবার জন্যে লালায়িত হয়। ঊষার কথা ছেড়ে দাও। যখন তাকে দেখবে—যে রূপে পাঠিয়ে দিয়েছ, সে রূপে আর তাকে দেখতে পাবে না, নূতন রূপে দেখতে পাবে।"

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া উমার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এই মেয়েটীর প্রকৃতি অন্য মেয়েদের হইতে অনেকটা পৃথক। সাধারণের চেয়ে সে অনেক বেশী জ্ঞান এই বয়সেই লাভ করিয়াছিল। তর্ক তাহার সহিত চলিত না,—একটা কথাতেই সে প্রতিপক্ষকে নীরব করিয়া দিত। কিন্তু উমা পিতার কাছে আসিলে ছোটবেলাকার মতই জ্ঞানহীনা হইয়া যাইত। পিতার কথার উপরে একটা কথাও সে কহিতে পারিত না। পিতা যাহা বলিতেন, সে নীরবে মাথা পাতিয়া তাহাই গ্রহণ করিত।

উমার মন জানিতে অমরনাথের বাকি ছিল না। তাহার মনখানা শুভ্র যুঁই ফুলটীর মত পবিত্র, বড় সরল,—দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিবার মত জিনিস। সংসারের কোনও ছলনা, কুটিলতা উমার মনে স্থান পায় না। তাহার সহিত লজ্জাবতী লতার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। সংসারের পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই সে সঙ্কুচিতা হইয়া মাটীতে মিশাইবে। অমরনাথ ঊষার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহাকে কোনও জটিলতার মাঝে তিনি টানিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ঊষার বড় স্নেহপ্রবণ হৃদয়। সে জগতে সকলকেই বড় ভালবাসে। কেহই তাহার চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে না। সে নিজেকে দুর্ব্বার চেয়েও নত বলিয়া মনে করে। সকলের নীচে সে তাহার আসন স্থির করিয়া লইয়াছিল। জগৎকে ভালবাসিয়া, স্নেহ করিয়া সে প্রাণে বড়ই শান্তি লাভ করিয়াছিল।

বহুদিনকার অতীত একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল,—ঊষার বিবাহের কথা। আবার কি তাহার বিবাহ দেওয়া যায় না?

কথাটা মনে করিতে বেদনাও বুকে বাজে, আবার আরামও বোধ হয়। তাঁহার উমা জগতের উপর হইতে এই ছড়ানো ভালবাসা গুটাইয়া আনিয়া একটীতেই অর্পণ করিবে, তাঁহার চেয়েও তাহাকে ভালবাসিবে, এ কল্পনা যেন অসহ্য বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু উমা সুখী হইবে, উমা আনন্দ পাইবে, এই কথাটা ভাবিতেও হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠে। উমা স্বামীর স্ত্রী হইবে, সন্তানের মা হইবে, তাহার নারীজন্ম সার্থক হইবে।

স্বামীর স্ত্রী হওয়া, সন্তানের মা হওয়া কোন্ নারীর আকাঙ্ক্ষিত নয়? উমার মনের মধ্যে অতি গোপনে কি এই আকাঙ্ক্ষাটা জাগিয়া নাই? সে সংসারের কি বুঝিয়াছে? অতি শিশুকালেই সে যে বিধবা হইয়াছে, সধবা বা বিধবা—ইহার কি জানে সে? লোকাচারের বশবর্ত্তিনী হইয়া সে চলিতেছে মাত্র। এ লোকাচারের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত করা স্নেহময় পিতার কার্য্য, আর কাহারও নহে।

শিশু যে কচি মুখে হাসিয়া মা বলিয়া ডাকে, সেই মা ডাকটী শুনিতে সকল নারীই চায়। কারণ জগতে নারীর পূর্ণ বিকাশ জননীতে,—আর কিছুতেই কোনও রূপে সে নিজের বিকাশ এরূপ ভাবে করিতে পারে না।

অমরনাথ দু হাতের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলে। উমার সংস্কার ত্যাগ করানো যাইবে তো? তা যাইবে বৈ কি। তাহার নিজের মধ্যে একটা যে অভাব লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বুভুক্ষুর ন্যায় বসিয়া আছে, তাহাকে দলিয়া ফেলিতে সে সংস্কারের বোঝা বহন করিতেছে। সংস্কারবশে সে আপত্তি করিবে, কিন্তু আপনিই নিজের ভাল বুঝিয়া সম্মত হইবে।

আর সমাজ?

ঊষার বিবাহের পূর্ব্বে উমার বিবাহ দিবার কল্পনা একবার তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল, সমাজের কথাটাও সেই সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

সমাজ? সমাজ তাঁহার কে? সমাজের পানে চাহিয়া তিনি জীবন-সর্ব্বস্ব কন্যার কষ্ট সহ্য করিবেন কেন? সমাজ তাঁহাকে কি দিয়াছে, ভবিষ্যতে কি দিতে পারিবে? সমাজের জন্য নিজেকে সকল রকমে হতভাগ্য করিয়া রাখিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

মণীশ গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে আসিবে লিখিয়াছে। সে আসিলে, তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা যাইবে, সে কি বলে। সে শিক্ষিত, কলিকাতাতেই থাকে, পল্লীর সমাজের

সহিত অতটা সম্পর্ক রাখে না। এ সব কাজে তাহার উৎসাহ খুব, রীতিমত সে যুক্তি দিয়া বিরুদ্ধ মতকে হার মানাইতে পারে।

মণীশের প্রতীক্ষায় অমরনাথ দিন গণিতে লাগিলেন। সেই দিনই তাহাকে একখানা পত্র দিলেন,—গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে সে আসিবে বলিয়াছে, আসা চাই-ই; কারণ, তাঁহার দরকার।

(৮)

গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে সকাল বেলাই মণীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে তাহার বন্ধু প্রভাস আসিয়াছিল।

প্রভাস বড়লোকের ছেলে, মণীশের সহিত একত্র কলেজে পড়িয়াছিল। এক সঙ্গেই দুজনে এম-এ পাশ করিয়াছিল। মণীশ তাহার পর প্রফেসর হইয়াছিল, প্রভাস বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। মণীশ এ জন্য তাহাকে অনেক কথা শুনাইয়া দিত; কারণ, বসিয়া থাকা সে মোটেই পছন্দ করিত না। তাহার নিজের গৃহে অভাব ছিল না, বসিয়া থাকিলে সেও বেশ পারিত। কিন্তু বেকার বসিয়া থাকা তাহার মত চঞ্চল প্রকৃতির লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। প্রভাস তাহার তিরস্কার কাণেও তুলিত না; কারণ কাজ করাকে সে অত্যন্ত ডরাইত। নানা দেশ বেড়াইয়া সে যতটা আনন্দ লাভ করিত, এত আনন্দ আর কিছুতেই সে পাইত না।

অনেক দিন হইতেই সে মণীশের এই আত্মীয়টির কথা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখানে আসিবার আগ্রহ কখনই তাহার হয় নাই। বাংলার পল্লীর সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন ছিল;—দেখিবার মত তাহাতে যে কিছু থাকিতে পারে, এ ধারণা সে কখনও করে নাই।

ধরিতে গেলে মনীশ এবার তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। শিকারের প্রলোভনও যথেষ্ট দেখাইয়াছে, এবং দুইটা দিন পরেই সে কলিকাতা ফিরিতে পারিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

মণীশের সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্ক অনেকটা দূর ছিল। তাহা সত্ত্বেও এতটা নিকট ভাব যে ছিল, তাহার কারণ, মণীশের পিতা অমরনাথের বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলিতে আমরা যেরূপ বুঝি, মণীশের পিতা যতীশ বাবু অমরনাথের সেরূপ বন্ধু ছিলেন না। তিনি অমরনাথকে ভাইয়ের মত ভাল বাসিতেন, স্নেহ করিতেন, অমরনাথও তাঁহাকে ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন। যতীশবাবু যখন মারা যান, তখন পুত্র মণীশকে দেখিবার জন্য অমরনাথকে বার বার বলিয়া গিয়াছিলেন।

সংসারে ছিলেন মণীশের মা ও একটী ভাই দানীশ। মণীশ মা ও ভাইকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছিল; তাহার পিতার যে জমীদারি ছিল, তাহা অমরনাথ দেখাশুনা করিতেন। মণীশ জমীদারির কিছুই বুঝিত না, কিন্তু মা সব বুঝিতেন। অমরনাথ বৎসরান্তে একবার কলিকাতায় গিয়া তাঁহাকে হিসাব-নিকাশ দিয়া আসিতেন। উমাও একবার দুইবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় মণীশের বাসায় গিয়াছিল।

অমরনাথ তখন প্রভাত-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথেই মণীশ ও প্রভাসের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল।

সহাস্যে মণীশের পিঠ চাপড়াইয়া তিনি বলিলেন, "এই যে তুমি এসেছ, আমি ভেবেছিলুম দুপুরের ট্রেণে আসবে। এটী কে?"

মণীশ প্রণাম করিল, দেখাদেখি প্রভাসও কোন মতে প্রণামটা সারিয়া মণীশের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মণীশ বলিল, "আমার একটী বন্ধু, যশোরের একটী জমীদার, গোবিন্দপুরের নাম শুনেছেন বোধ হয়—"

অমরনাথ হাসি মুখে বলিলেন "বিলক্ষণ শুনেছি। এস, বাড়ী যাওয়া যাক্। উমাকে আগে খবর দিতে না পারলে, সে কিছুই ঠিক করতে পারবে না, আজকাল বাড়ীর গিন্নি যে আমার উমা মা,—পিসীমা সব ছেড়ে দিয়ে কাশী যাচ্ছেন।"

তিনি অগ্রসর হইলেন। প্রভাস মণীশের পাশে পাশে চলিতে চলিতে বলিল, "মৃন্ময়ের শ্বশুর না?"

মণীশ উত্তর করিল, "হ্যাঁ। মৃন্ময়ের অদৃষ্ট—সে এমন রত্ন চিনতে পারেনি, কাচ ভেবে অগ্রাহ্য করছে। কিন্তু এ ভুল তার শোধরাতেই হবে, সেদিন মানতেই হবে সে যথার্থ হীরা পেয়েছিল।"

প্রভাসকে অমরনাথের কাছে বসাইয়া মণীশ বলিল,

"উমাকে আমিই গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনাকে যেতে হবে না কাকা। আপনি ততক্ষণ প্রভাসের সঙ্গে গল্প করুন।"

সে যে হঠাৎ গিয়া উমাকে বিস্ময়ে চমকিত করিয়া তুলিতে চায়, তাহা বুঝিয়া অমরনাথ হাসিলেন, বলিলেন, "বেশ তো, যাও।"

পা টিপিয়া টিপিয়া মণীশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

পূজার ঘরের সামনেই উমা। সে পূজা সারিয়া তখন বাহির হইতেছিল। তাহার সিক্ত কেশ-দাম আলুলায়িত ভাবে পৃষ্ঠে লুটাইতেছে। গরদের কাপড় তাহার পরনে। মাথায় সামান্য একটু কাপড়, গলে তখনও অঞ্চল বেষ্টিত। দুই ভ্রূর মাঝখানে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা, ঈষল্লাল মুখ খানার মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া আছে। ললাটে প্রণামের চিহ্ন ধূলা তখনও বিদ্যমান।

মণীশ মুগ্ধ নেত্রে তাহার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার পানে একটীবার চাহিয়াই চোখ নামাইল, তখনি একটা বড় গোছের শব্দ করিয়া ঝুপ করিয়া তাহার সামনে গিয়া পড়িল।

চমকাইয়া উমা এক পা পিছনে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই হাসিয়া বলিল, "তাই তো বলি, মণিদা ভিন্ন এমন করে ভয় দেখাতে পারবে কে?"

মণীশ হাসিয়া উঠিল, "আর কেউ নেই?"

উমা বলিল, "আর একজন ছিল, সে তো এখানে নেই মণিদা, শ্বশুর-বাড়ী গ্যাছে। এখন তুমি বই আর কে ভয় দেখাবে?"

মণীশ বলিল, "আমি কি দাঁড়িয়েই থাকব না কি? বসবার একটা জায়গা-টায়গা—কিছুই তো দেবে না দেখছি। তবে এইখানেই বসে পড়া যাক।"

সে ক্ষিপ্রহস্তে একখানি তক্তা টানিয়া লইয়া বসিতে যাইতেছিল, উমা শশব্যস্তে বলিল, "বাঃ, তুমি তো এই এসে দাঁড়ালে মাত্র। চল ঘরে বসবে।"

উমা ক্ষিপ্রপদে গিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল, মণীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল। একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু উমা, আমি ট্রেনে এসেছি, কত জাতকে ছুঁয়ে এসেছি তার ঠিক নেই। তোমার বিছানাটা যদিও গুটানো রয়েছে, তবুও ছোঁয়া গেল। হয় তো এতে তোমার অনেকটা কষ্ট হবে আবার ঐগুলো কাচতে।"

সঙ্কুচিতা উমা বলিল, "কাচব কেন, বাঃ। তুমি তো বেশ কথা বল মণিদা। আমার মধ্যে ওই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভাবটা মোটেই নেই, তা জেনে রেখো। মানুষ মাত্রই আমার কাছে সমান, এর মধ্যে জাত-বিচার করা চলে না, কাউকে ঘৃণা করে তফাৎ রাখাও চলে না। তুমিও যা, আমিও তাই, বাহ্যিক স্নান করলেই কি সব ময়লা কেটে যায় মণিদা, আমি তো তা বিশ্বাস করিনে। আমি জানি, মন পরিষ্কার থাকলেই হল, দেহ পরিষ্কার হোক বা নাই হোক।"

মণীশ হাসিমুখে মাথা দুলাইয়া বলিল, "আর আমার মন যদি অপরিষ্কার থাকে উমা—"

উমা বলিল, "সে তুমি জানো মণিদা, আমি তোমার মনের খবর কি করে পাব? আমি জানছি, আমার মধ্যেও যে ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন, তোমার মধ্যেও সেই ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন। গঙ্গাজলে যে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, ময়লাধোয়া ড্রেনের জলেও সেই সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়। জগতে কিছুই ঘৃণ্য নয় মণিদা, সবই পূজ্য। তুমিও যাই হও, আমি তোমায় চিরকালই প্রণাম করব।"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গেসঙ্গেই উমা নত হইয়া নিমেষে মনীশের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, এত তাড়াতাড়ি যে, মনীশ বাধা দিতেও পারিল না। মনীশের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখনি সে ভাব সামলাইয়া সে শুধু হাসিল মাত্র।

বিছানাটার ভিতর হইতে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া বেশ আরামে কাত হইয়া পড়িয়া সে বলিল, "তবে আর কি! বিনা সঙ্কোচেই এখানে শুয়ে পড়া যাক। কাল রাতটায় মোটেই ঘুম হয় নি, ভারি ঘুম আসছে।"

উমা বলিল "তা তুমি ঘুমাও, আমি ততক্ষণ তোমার খাবারের জোগাড় করে দিয়ে আসি।"

সে পা তুলিতেই মনীশ উঠিয়া বসিল "বিলক্ষণ, আমি একা বসে থাকি এই ঘরের মধ্যে? আমার এক বন্ধু এসেছে সঙ্গে, তার কাছে তবে যাওয়া যাক। সে বেচারা এতক্ষণ কত কি ভাবছে। ভাবছে—তাকে আমি নিয়ে এসে কোথায় ফেলে অন্তর্ধান হলুম।"

উমা বলিল "তোমার বন্ধু এসেছেন—এখানে ?"

মনীশ বলিল "হ্যাঁ, বেচারা শিকার করতে এই পাড়াগাঁয়ে এসেছে।"

উমা পূর্ব্বেই মনীশের এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুটীর খুঁটিনাটি সব কথাই মনীশের কাছে অবগত হইয়াছিল। তাই একটু হাসিয়া বলিল,"তবে তাঁকে একা ফেলে রেখে আসা তোমার ভারী অন্যায় হয়েছে মণিদা। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে, এ তো তোমার ঘর বাড়ী। তিনি যখন অতিথি হয়ে এসেছেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনাটা তোমাকেই ভাল করে করতে হবে। বাবা কি তোমাদের মত কলকাতার বাবুদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ?"

মনীশ গম্ভীর হইয়া বলিল "ওই দেখ, মেয়েরা যে কথা বলে, তার মধ্যে কাঁটা থাকবেই। আমায় শুদ্ধ জড়াচ্ছো কেন উমা, আমি কি দোষ করেছি ? ছুটি পেলেই চলে আসি এই পাড়গাঁয়ে। যদি ঘৃণা করতুম, তা হলে কি আসতুম ?"

উমা বলিল, "ওটা ভুল বেরিয়ে গ্যাছে মণিদা ! আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তোমাকে এ অপবাদটার মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে। যাক্, তোমায় আর বেশীক্ষণ আট্‌কে রাখব না, তোমার বন্ধু ওদিকে চোখ কপালে তুলছেন। আমারও ঢের কাজ আছে, তোমাদের খাওয়া দাওয়া দেখতে হবে, আমাদের দু'জনের রান্না আছে—"

মনীশ বিস্ময়ের সুরে বলিল, "তুমি রাঁধবে ?"

উমা হাসিয়া বলিল, "কেন, রাঁধতে নেই নাকি ?"

মনীশ বলিল "তা বলছিনে, আগে তো ঠাকুরমাই ওদিককার সব দেখাশুনা করতেন।"

উমা বলিল, "ঠাকুরমা চিরকালই করবেন ? যত দিন জ্ঞান ছিল না, তত দিন বাধ্য হয়ে তাঁর সেবা নিতে হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন বড় হয়েছি, জ্ঞান হয়েছে, এখনও কি তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব ? আমার যা কর্ত্তব্য কাজ, আমি এখন তাই করছি, তিনি এখন বিশ্রাম করুন।"

উমা চলিয়া গেল।

মনীশ চুপ করিয়া খানিকটা শুইয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। টেবিলের উপর একখানা বই পড়িয়া ছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া দেখিল—গীতা। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইতেই উমার হাতের লেখা—"তুমি যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব। অতএব হে প্রভু, তুমি আমার সকল ভার গ্রহণ কর।"

একান্ত অনুগত ভক্তের কথাই এ। মনীশ নিষ্পলক নেত্রে সেই লেখাটার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বইখানা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে বসিয়াই মনীশ জলখাবার তৈল ইত্যাদি সবই দাসী-ভৃত্যের হাতে পাইল। সে প্রভাসকে বলিল, "যাই বল, এমন নিপুণ শিক্ষা কাকার, যে, মেয়েগুলি ঠিক তেমনি হয়েছে যেমনটী আশা করেছিলেন। যে যেখানেই আসুক, উমার চোখ এড়িয়ে যাবে না। সে যেটী ভালবাসে, উমা ঠিক তাই করবে। আমি এই জন্যেই উমাকে বড্ড ভালবাসি, স্নেহ করি।"

স্নান সারিয়া সে একবার বাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিল। উমা তখন নিজের ও ঠাকুরমায়ের জন্য রাঁধিতেছিল। চৈত্রমাসের অসহ্য গ্রীষ্ম, তাহার উপর অগ্নির উত্তাপ। উমার স্বভাবতঃ ঈষৎ আরক্ত মুখখানা গাঢ় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা পড়িতেছিল।

মনীশকে দেখিয়া সে বলিল,"এই যে মণিদা, তোমাদের স্নান হয়ে গ্যাছে দেখছি। বামুন ঠাকরুণকে বলি তবে ভাত বাড়তে ?"

সে হাত ধুইয়া বাহির হইয়া ভাত বাড়িতে আদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিল। মনীশ তখন সেই গৃহের দ্বারের কাছে একখানা পঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া উনানে কাঠখানা ঠেলিয়া দিতেছিল। বাতাসে একরাশি ধোঁয়া তাহার নাকে চোখে লাগিতেই, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া নাক মুখ ডলিতে লাগিল।

উমা হাসিয়া বলিল, "যার কাজ তারে সাজে মণিদা ! এ সব কাজ কি তোমাদের ? যার যা কাজ সে তাই করবে, বিপরীত করতে গেলেই এমনি হবে।"

মনীশ বলিল "তা বই কি ? আমি বুঝি এ সব কাজ পারি নে, তাই ভাবছ ?"

উমা বলিল "তা তো চোখে দেখতেই পাচ্ছি। মুখখানা কি রকম লাল হয়ে উঠেছে একবার আয়নাখানা দিয়ে দেখে এসো তো।"

মনীশ ক্ষুণ্ণভাবে বলিল,"অপদার্থ আমি নই উমা, অপদার্থ বলতে পার বরং প্রভাসকে। সেটা কোন কাজেরই না,

একটু বেশী হাঁটলে হাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি শুধু ছেলে পড়াতেই যে পারি তা নয়,—মার যখন অসুখ বিসুখ হয় তখন তো আমাকেই সব করতে হয়। দাদীশ কিছুই জানে না, বাধ্য হয়ে আমাকেই তখন কোনও ক্রমে রেঁধে খেতে হয়।"

উমা কণ্ঠে গম্ভীর হইয়া বলিল "যারা কৃপণ তাদের অমনিই হয়ে থাকে।"

মনীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কৃপণ কিসে ?"

উমা বলিল "কৃপণ নও ? মাসে দুশো আড়াইশো টাকা মাইনে পাও প্রফেসারী করে, জমীদারি থেকে খাজনাও পাও বড় কম নয়, তবু একটা বামন রাখতে পার না। লোকে তোমায় কৃপণ বলবে না তো কি দাতাকর্ণ বলবে না কি ?"

কথাটা শেষ করিয়াই হাসিয়া ফেলিল, আর সে গম্ভীরতা বজায় রাখিতে পারিল না।

মনীশ বলিল, "বলবে না তা জানি, কিন্তু যদি আসল কারণটা জানতে পারে, তবে মাঝামাঝি জায়গাতেই রাখবে, দাতা বলে স্বর্গেও উঠাবে না, কৃপণ বলে নরকেও ফেলবে না।"

উমা তরকারী নামাইতে নামাইতে বলিল"কারণটা কি ?"

মনীশ বলিল "কারণটা—আমি আর কারও হাতে খেতে নারাজ। বিশেষ সহরে যে সব বামন বামনী পাওয়া যায়, তাদের চরিত্র প্রায়ই ভাল নয়। সেই সব অসৎ চরিত্র লোকদের হাতে খেয়ে অনর্থক শরীরটাকে খারাপ করতে চাই নে। নিজের লোক যদি কেউ থাকে, রেঁধে দেয় খাব, না হয় নিজের হাতে রেঁধে খাব সেও ভাল। এমন কিছু বেশী কষ্টের কাজ নয় এটা, ইচ্ছে করলে সবাই পারে। কিন্তু সহরে গিয়ে বাবু হয়ে লোকে রান্নাঘরের দিকে পর্য্যন্ত যায় না, পাছে ধোঁয়া লেগে অসুখ করে। কিন্তু এই রান্নাঘরই যে আমাদের জীবন, তারা সেটা বুঝতে চায় না। যে রাঁধে, সে কি রকম ভাবে রাঁধে, এটা আগে দেখা উচিত। তার স্বাস্থ্য কেমন, তার কোনও সংক্রামক ব্যারাম আছে কি না, তার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি সেই সব জন্যেই বামন ঠাকুর, বামন ঠাকরুণ কাউকেই রাঁধবার কাজে রাখতে চাই নে।"

উমা বলিল, "তা জেঠিমা যে চিরকালই তোমায় রেঁধে খাওয়াবেন, এমন কোনও মানে নেই। তিনিও তো বুড়ো হয়েছেন, কতদিন আর এ জোয়াল ঘাড়ে করে রাখবেন ? তুমি একটী বিয়ে কর না মণিদা, সব আপদ চুকে যাবে। এ সময় মাকে বসিয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। এই বুড়ো হয়েছেন, এখনও কি সংসার নিয়ে জড়িয়ে থাকবেন ?"

মনীশ পরিহাসের সুরে বলিল, "বউ এসে রেঁধে খাওয়াবে, না ?"

উমা বিস্ফারিত চোখে বলিল, "রাঁধবে না ?"

মনীশ বলিল "রক্ষা কর। সে কাজ করা তো চুলোয় যাক, বউকে বোলো তো একটু রান্নাঘরে যেতে, কি একখানা কাজ করতে, রান্নাঘরে গেলেই তার মান গেল, তা বুঝি জানো না ? বাবু হবে যে—অর্থাৎ যার দু পয়সা আছে, তাকে যেমন করেই হোক বামুন রাখতেই হবে। নচেৎ বাবু যে হওয়া যায় না। আমি তো এই পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করব না যে বউ এখানকার শিক্ষা নেবে ? সহরে থাকবে সে, কাজেই সহরের চালে চলবে।"

উমা বলিল, "তা কোনও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নিলেই হয়। উষার সঙ্গে বাবা যখন তোমার বিয়ে দেবার কথা বললেন—"

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মনীশ বলিল "ছিঃ, তা কখনো হতে পারে উমা ? সেই উষা—যাকে চিরটা কাল কোলে পিঠে করেছি, যে আমার নিজের বোনের মতই, তার সঙ্গে বিয়ে ? স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না, বাস্তবিক তা কি হতে পারে ? নাঃ, ও সব আমার দ্বারা হবে না। বিয়ে যদি করবার হোতো, অনেক দিন আগেই করতুম।"

উমা বিস্ময়ে বলিল "বিয়ে, করবে না ?"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "নাঃ।"

উমা বলিল, "দেখা যাবে। চল এখন, জায়গা হয়ে গ্যাছে, ভাত বাড়াও হয়ে গ্যাছে। বাবাকে আর তোমার বন্ধুকে ডাকতে পাঠাই।"

দালানে জায়গা করা হইয়াছিল। অমরনাথ প্রভাসকে লইয়া মনীশকে ডাকিয়া আহারে বসিলেন।

উমাকে উদ্দেশ করিয়া অমরনাথ বলিলেন "তোমার তরকারী নিয়ে এসো মা, নইলে আমার খাওয়া হবে না। প্রভাসকে দেখে লজ্জা করতে হবে না, মনীশও যেমন তোমার ভাই, প্রভাসও তেমনি।"

উমা নত মুখে পিতার আদেশে আসিয়া নিজের তরকারী পরিবেশন করিয়া গেল।

অমরনাথ একটু হাসিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার খাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা। মণীশের তবু অভ্যাস আছে, সে মাছ মাংস না হলেও বেশ খেতে পারে, কিন্তু তুমি—"

লাজুক প্রভাস নত মুখে হাসিয়া বলিল "না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, এ রকম তরকারী আমি কখনও খাই নি; তাই নিরামিষাহারীকে অপদার্থ বলেই ভাবতুম। এখন দেখছি আমিষের চেয়ে নিরামিষ জিনিসটাই লাগে খুব ভাল।"

বাস্তবিক সে একটু তরকারীও উঠিবার সময়ে পাতে ফেলিয়া উঠে নাই।

(ক্রমশঃ)

কৃষিজীবী ও মসীজীবী

সফিয়া খাতুন বি-এ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী চাষার মুখ দিয়ে গাহিয়ে গিয়েছেন—

"অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাস দাসী,
ক্ষতি নাই—নহি আমি সে সুখ প্রয়াসী।
আমি চাই—ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের সুখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।"

এই কয়টী কথা সে দিন আসামের সেনসাস্ রিপোর্ট পড়ে, আমার বারবারই মনে পড়ছিল। সেই রিপোর্টে দুটী লোকের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখতে পেলাম। তাদের একজন হচ্ছেন চাষা, আর একজন হচ্ছেন কেরাণী। চাষীটী শ্রীহট্ট জিলার বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত দিগবন্ধ গ্রামের জনৈক মুসলমান, আর কেরাণীটী শ্রীমঙ্গলের সরকারী মোহরের।

কৃষকটীর পরিবারে ৮ আটটী লোক। স্বামী স্ত্রী দুজন, ছেলে তিনটী, মেয়ে তিনটী। তার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা দেওয়া গেল।

জমা		খরচ	
ধান বিক্রয়—	২৫২৲	চাউল—	২২৮৲
দিনমজুরী—	১০০৲	লবণ—	৫৲
ঋণগ্রহণ—	১৫০৲	তেল—	১০৲
		মসলা—	৫৲
মোট—	৫০২৲	মাছ—	১২৲
		জের	২৬০৲
			৫০২৲
		ডাল—	৫৲
		তরকারী—	৩৲
		দুধ এবং ঘি—	৮৲
		সুপারি—	৫৲
		কেরসিন—	৬৲
জমা—	৫০২৲	তামাকু—	৮৲
খরচ—	৪০৪৲	কাপড়—	২০৲
		বাসনপত্র—	৫৲
তহবিল—	৯৮৲	গৃহের আসবাব—	৩৲
		রাজস্ব ও খাজনা—	২০৲
		ট্যাক্স—	১৲
		মোট —	৪০৪৲

এই গেল কৃষকটীর বাৎসরিক আয়-ব্যয়। এখন কেরাণী বাবুটীর অবস্থাটা একবার দেখা যাক্। এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকটীর পরিবারে পাঁচজন লোক। স্বামী স্ত্রী দুজন, ছেলে দুটী, মেয়ে একটী। ভদ্রলোকটীর মাসিক বেতন ৩০৲ ত্রিশ টাকা। কাজেই তাহার বাৎসরিক আয় হল ৩৬০৲ টাকা।

জমা		খরচ	
বার্ষিক বেতন—	৩৬০৲	চাউল—	১২০৲
		৵১৫ লবণ—	১৸৵০
		৵১২ তেল—	৯৲
		মসলা—	১৫৲
		মাছ—	৩০৲
		ডাল—	৫৷৵০
		তরকারী—	১০৲
		চা ও চিনি—	১৫৲
		পান সুপারী—	১২৲
জমা—	৩৬০৲	কাপড়—	৪৮৲
খরচ—	৩৩৪৸০	বাড়ী মেরামত—	২৪৲
		কেরসিন—	৭৲
	২৫৷০	তামাক—	১৫৲
		কাপড়—	৪৮৲
		বাসন—	৪৲
		গৃহের আসবাব—	৪৲
		চিকিৎসা খরচা—	১০৲
		উৎসব—	২৲
		খাজনা—	২৷০
		মোট—	৩৩৪৸০

সরকার পক্ষ কেরাণীটির আয় ব্যয়ের যে হিসেব দেখিয়েছেন, তা একটী পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যে নিতান্ত অপ্রচুর, তা যে ব্যক্তির একটু সামান্য বুদ্ধি আছে, তিনিই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ছেলে মেয়েদের দুধের খরচ লেখা হয় নাই। উৎসব খরচ ২৲ লেখা হয়েছে। রাজ-সরকার বিদেশী,—একটী হিন্দু পরিবারের উৎসব খরচ যে কত হয়, তা তাঁহাদের জানা নাই। হিন্দুর এক "শুভ-চণ্ডী" ব্রতে লম্বা টিকিওয়ালা বামুন ঠাকুর একখানা পা ধুয়েই বলেন "দক্ষিণা ৩৲ তিনটাকা দাও; তা নইলে তোমার ফুল বেলপাতা রইল, আমি চল্লুম।" হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে। মেয়েদের কত যে ব্রত আছে, তা বলেই শেষ করা যায় না। লক্ষ্মী ব্রত, কার্ত্তিক ব্রত, মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত, দূর্ব্বাষ্টমী, রাধাষ্টমী, অনন্তচতুর্দ্দশী, শিবচতুর্দ্দশী—এসব কত আর লিখিব। অবশ্য আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ একটী মুসলমান বালিকার পক্ষে হিন্দুর সকল ব্রতের নাম করা অসাধ্য। কিন্তু এটা জানি যে, হিন্দুর এসব মেয়েলী ব্রত বহাল না রাখতে পারলে তাকে হিন্দুই বলে না।

কেরাণীটীর দুটী ছেলে। এদের লেখা পড়ার খরচার কথা সরকার পক্ষ ভুলে গেছেন।

মেয়েটীকেও আজকাল দুকলম লেখাপড়া অর্থাৎ অন্ততঃ চিঠিপত্র লেখা শিখাতে না পারলে, কোন ছেলেই তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। জানি না, মেয়েটীর বয়স কত। যদি দশ বৎসরে পা দিয়ে থাকে, তাহলে ত মা-বাবার গলায় কাঁটা লেগে যাবে। কি করে মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, সেই চিন্তায় দিবারাত তাঁদের ঘুমই আসবে না। এ অবস্থায় ভদ্রলোকটীর বাড়ী ঘর বিক্রি করবার উপক্রম নয় কি? বৎসরের শেষে ত হাতে ২৫।০ আনা থাকে। মেয়ের বিয়ে হবে কি করে? এই সমস্যাটা সরকার পক্ষ খণ্ডন করে দিবেন কি?

চিকিৎসা খরচ দেখান হয়েছে ১০৲ টাকা। হাসি পায় শুনে। আসাম ত আর "স্বর্গ" নয় যে, সেখানে কোন রোগ হতেই পারে না। সারা দেশ ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরে ছেয়ে গেছে। তার প্রতিকারে সরকার পক্ষ উদাসীন বলে কি লোকটীর চিকিৎসা খরচও দশটাকা দেখান হয়েছে? আরে বাবু, একটী যেমন-তেমন ডাক্তারের ভিজিট্ই ত আজ কাল ১০৲ টাকা। তার উপর ঔষধের দাম কি ফাওয়ে গেল? পাড়াগাঁয়ে আর কটী হাঁসপাতাল আছে শুনি? এরকম যে কত খরচা বাদ দেওয়া হয়েছে, তা আর কত লিখব।

যাক্, এ সব সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কথা হচ্ছে, আমরা এই প্রবন্ধে দেখাতে চাই, সংসারে প্রকৃত সুখী কে? চাষী, না কেরাণী?

এই দুটী লোকের আয়-ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করে দেখা যায়, ঋণ ব্যতীত কৃষকের আয় ৩৫২৲ টাকা, আর কেরাণীর ৩৬০৲ টাকা। বৎসরের শেষে চাষী ৯৮৲ টাকা তহবিল রাখে, আর সেই যায়গায় কেরাণীটী ২৫।০ রাখেন। কেরাণীর পোষ্য ৫ জন, আর কৃষকের পোষ্য ৮ জন। শুধু চা ও পান-তামাকের খরচা ছেড়ে দিয়ে, অন্যান্য সব খরচাই কৃষকের অপেক্ষা কেরাণীর অল্প।

আসামের প্রসিদ্ধ পত্রিকা "জনশক্তি" এই আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখে বড় দুঃখ করে বলেছেন, "তবুও একটী ২৫৲ বেতনের চাকুরী খালি পড়িলে, হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে। অথচ সচ্ছল ভাবে স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের কত পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে।"

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় কি ভুলে গেলেন যে, সবই দোষ সেই নন্দ ঘোষ—কলেজ-স্কোয়ারের সাদা দালানটীর? এক দিন ইহার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা যিনি ছিলেন, তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে একদিন বলেছেন, 'You give slavery in one hand and money in other" অর্থাৎ তুমি এক হাতে দিচ্ছ টাকা, আর এক হাতে দিচ্ছ দাসত্ব।

কাজেই, সেখানকার শিক্ষা দাসত্ব ছাড়া আর কি হতে পারে? সেখানে ছেলেরা মাথামুণ্ডু কতকগুলি Text book পড়েই সময় পায় না। অন্য চিন্তা কি করবে? একবার পাঞ্জাবের কোন স্কুল দেখতে গিয়ে আমি সেই স্কুলের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা ভবিষ্যতে কে কি হতে আশা করে। সে স্কুলে ছেলে প্রায় পাঁচ শত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন একটীও ছেলে পেলাম না যে লিখলে, "আমি বাণিয়া হতে চাই।" সবই ডেপুটী, জজ, ব্যারিষ্টার, মুন্সেফ ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষায় আমাদের ছেলেরা প্রথমেই শিখে, কি করে চাকর হওয়া যায়। কেরাণীগিরিতে মাসের শেষে সাদা সাদা ৫০৲টী টাকা পাওয়া যাবে। আর কি চাই! বাণিয়াগিরী করে যে সেই যায়গায় ২০০ টাকা পাওয়া যায় সে বিষয়ে একটু চিন্তা করাকে তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা মনে করে।

ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের ন্যায় ছেলেদের চাকুরীর দিকে টেনে নিতে ঘৃণা করে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের স্বাধীন জীবিকার জন্য অনেক বন্দোবস্ত করেছে। মেকানিক্যাল ও টেক্নিক্যাল শিক্ষার কত যে সুযোগ ছেলেদের জন্য করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশে কি আছে? এক শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সেখানেও অনেক 'হাঁ হুজুর' না করে ঢোকা যায় না। গণা বাছা কয়টী ছেলে লওয়া হয়। তার বেশী হলেই বলেন "No seat." এই ত অবস্থা।

Commercial, Industrial ও Agricultural শিক্ষায় ছেলেদের কোন দিনই উৎসাহ দেওয়া হয় না। Carpentryতে আমাদের দেশে কত টাকা জমান যায়। আমাদের ছেলেদের সে সব জানতে দেওয়া হয় না।

স্বাধীন জীবিকা-নির্ব্বাহের যত সুবিধা পন্থা আমাদের দেশে আছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে তার শতাংশের একাংশও নাই।

আমেরিকান গ্লোব-ট্রটার মিঃ ষ্টেফোর্ড ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করে বলে গেছেন "It is true that India is a country of Gold, because all its treasures lie in its earth." অর্থাৎ ভারত যে সোণার ভারত তার ভুল নাই। তাঁর ধনরত্ন সবই মাটীতে।

কথায় বলে, জহুরী জানে জহরতের মর্ম্ম। আমাদের দেশে যে কি আছে না আছে, তা আমরা জানি না। বিদেশীরা এসে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়। তাই সারা ভারত জুড়ে কত কলকারখানা, চা-কর, নীল-কর, ইত্যাদি সবই সাদা মানুষদের হাতে। সে সব লোক প্রথমে আমাদের দেশে আসবার সময় লোটা-কম্বল হাতে নিয়ে আসে। তার পর যাবার সময় সেই লোটা-কম্বল আমাদের হাতে দিয়ে, জাহাজ ভরে সোণারূপা নিয়ে যায়। আমাদের ছেলেরা দেশের কুড়ে—পরিশ্রমে ভীতু বলে আজ আমাদের এই দশা। আমাদের ছেলেরা জানে যে, একটু পরিশ্রম করলে ৫০৲ টাকার জায়গায় ২০০৲ টাকা পাওয়া যায়। তা জেনে শুনেও সেই ৫০৲ টাকার কেরাণীগিরি করতে যায়। কারণ, এ যে গণা বাছা ৫০৲ টাকা। কে জানে, ২০০৲ টাকার আশায় যদি সেই ৫০৲ টাকাও যায়। এই ভয়ে সহজ পথেই তারা যেতে চায়। এর কারণ, আমাদের ছেলেদের মনের বল নাই। নিজকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারে না। চরিত্র-বলের অভাবেই আমাদের ছেলেদের এই অবস্থা। অবশ্য এসব কতকটা দীনতা হতেও আসে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার দোষ। ছেলেবেলা হতেই আমাদের ছেলেরা স্বাধীনতা কি তা জানে না। এর জন্য আমরাই দায়ী। শিশুকে নিজ হাতে কোন দিন কিছু করতে দেই না পাছে "সোণার চাঁদের" কোন অসুখ হয়। প্রথম ছেলে

হলে আমরা ভাবি, পাছে ছেলেকে মাথায় রাখলে উকুনে খায় কি মাটীতে রাখলে পিঁপড়ে খায়।

এমন সব ছেলে দেখতে পেয়েছি—ষোল সতর বৎসর বয়সেও সে বলতে পারে না—এ বেলায় সে কতটা ভাত খাবে। তাও মাকে বলে দিতে হয়। অথচ ছেলের এই লজ্জাকর নিঃসহায়তা দেখে পিতা-মাতা খুব আমোদ-আহ্লাদ করে থাকেন। কাজেই সেই আদুরে ছেলে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কি করে?

ছেলের বাবা যদি কোন সাহেবের বড়বাবু হন, তাহ'লে আর কথাই নাই। সে ছেলে যে বি-এ পাশ করে সাহেবের ছোটবাবু হবে, তার কোন ভুল নাই।

আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নেহাইত ছোটলোকের কাজ মনে করে। ছেলেদের যে বড় একটা দোষ, তা বলা যায় না। সব দোষ এই বুড়োদের। যদি বা কোন ছেলে বি-এ পাশ করে একটা দোকান দেয়, তা'হলে বুড়ো সমাজপতিরা গাঁজাখুরী আড্ডা দিয়ে বলেন, "হাঁ, ওটা বি-এ পাশ দিয়ে একেবারে গণ্ডমূর্খ হয়েছে। দারগা হতে পারল না ত কি ছাই তিনটে পাশ দিলে।"

ব্রাহ্মণের ছেলে যদি জুতার দোকান দেয়, তাতে তার হাতের জল কেহ পান করবে না। অথচ হাজার হাজার ব্রাহ্মণের ছেলে জুতা বা চামড়ার দোকানে কেরাণীগিরি করে থাকেন। সকালবেলা দোকানে এসে সেই চামড়া-বিক্রেতাকে বলে থাকেন, "সেলাম খাঁ সাহেব।" চামড়া বিক্রি করলে জাত যায়—কিন্তু চামড়াওয়ালার চাকর হলে জাত যায় না! এই ত দেশের অবস্থা!

ইয়োরোপে চাষী ও বাণিয়াদের বিশেষ সম্মান। কারণ তারা কারো চাকর নয়। সে দেশের লোক চাকর হওয়াকে ঘৃণা করে। তারা মানুষের ব্যবসা দেখে সম্মান করে না; তার আত্মা দেখে সম্মান করে। আর আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টা ব্যবস্থা।

সে সব দেশের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে শিক্ষা করে—"Try to stand on your own legs." আর আমাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা করে—"Try to be a burden to your own parents." তাই আমাদের ছেলেদের স্বাধীন জীবিকার নামে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

এসব অসুবিধার উপর সব চাইতে বড় অসুবিধা হয়েছে, আমাদের ছেলেদের অল্প বয়সে বিবাহ। আমাদের ছেলেরা মেট্রিক পাশ দিতে না দিতেই তিনটী সন্তানের পিতা সাজে। মা বাবা, পুত্রবধূ এমন কি পৌত্রমুখ দেখবার জন্য ছেলেদের এই সর্ব্বনাশ করে থাকেন।

ছেলে যুবতী স্ত্রী পেয়ে পুথিপত্রের সঙ্গে Non-co-operation করে। দিন রাত কিশোরী পত্নীর কথাই ভাবে; আর দিনের ভেতর সাতখানা চিঠি লিখে সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

এদিকে পিতাও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন,—হঠাৎ দুচোখ বুজে ফেল্লেন। তখন উপায়?

এক ফুৎকারে ছেলের সিল্ক ড্রেস্, সোণার ঘড়ী, মাথার টেরী, নাকের চসমা, যে কোথায় উড়ে গেল, তা আর বলা যায় না। একেবারে পথের ভিখারী। বাধ্য হয়ে ২৫৲ টাকার কেরাণীগিরি খুঁজতে বেরুতে হয়। কারণ, তা নইলে যে হাঁড়ীতে চাল উঠবে না। স্ত্রীকে ও ছেলে মেয়েদের খেতে দেবে কি? পাঠক! এই ছেলে কি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে? আজ যদি সেই ছেলেটী বিবাহিত না হত, তা হলে কি তার কোন চিন্তা ছিল? অনায়াসে সে কোন স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে পারত; কারণ, শুধু এক উদরের জন্য কেহই ভাবে না।

ইয়োরোপের মাতা পিতা আমাদের ন্যায় নয়। ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজ নিজ পথ দেখতে বলেন। কেহ মনে করবেন না যে, সে সব পিতা মাতা শিশুদের প্রতি স্নেহশীল নয়। বরং আমরাই আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি স্নেহশীল নই।

সে সব ছেলে মেয়েরা নিজ হাতে যথেষ্ট টাকা পয়সা সঞ্চয় না করে কোনদিন বিয়ে করতে চায় না। তাই তারা বড় একটা দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে কোন দিন পরিচিত হয় না।

আজ ইংরেজ এত ধনী কেন? তার মূলে বাণিজ্য। সারা জগত জুড়ে এরা ব্যবসা করে ঘুরছে। ব্যবসায়ে যে আমাদের দেশেও কত লোক বড় হয়ে গেছেন, তার প্রমাণ জেমশেদপুরের মিঃ টাটা।

আমি নিজ চোখে যা দেখেছি, সে রকম দুটী ছেলের কথা আমি বলব। Non-co-operation যখন পুরাদমে

চলছিল, সে সময় একদিন পূর্ব্ববঙ্গের একটী ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ছেলেটীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর হবে। ছেলেটীর পরিধানে মাত্র একখানা কাপড় ছিল। কিন্তু বেচারাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। ছেলেটী অনাহারে নগ্নপদে একটী গাছের নীচে বসে ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় এক একবার রাস্তার কলের জল পান করছিল। এ দৃশ্য দেখে আমি আর বসে থাকতে পারি নাই। আমি তার কাছে গিয়ে তার বাড়ী ঘর সব জিজ্ঞেস করলাম। সে প্রথমতঃ নিজ প্রকৃত পরিচয় দেয় নাই। নিজেকে অশিক্ষিত পাচক ঠাকুর বলে পরিচয় দিয়ে, তাকে কোন কাজ দিতে পারি কি না, তা জিজ্ঞেস করল। ছেলেটী জাতিতে ব্রাহ্মণ। মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। মুসলমান হয়ে তার কি করতে পারি। অথচ টাকা দিয়ে যে তার কোন উপকার করা যায়, সে অবস্থা তার ছিল না। অনাহারে সে এতই জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল যে, তাকে অন্ততঃ মাস কয়েক সেবা-শুশ্রূষা না করলে ও ভাল আহার না দিলে, সে ছেলেকে বাঁচানই মুস্কিল।

ছেলেটী সমস্ত দিন কিছুই খেতে পায় নাই। তাড়াতাড়ি তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। সেদিন তাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। পর দিন আমাদের বাড়ীর সবাই তাকে অনেক প্রশ্ন করার পর জানা গেল, সে আই-এ পড়ত। অসহযোগ করে জেলে যায়। মা-বাবা খরচা বন্ধ করে দিয়েছেন। জেল হতে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে তারই ঠিকানা নাই।

বাড়ীর ছেলে-মেয়ে সকলের বিশেষ যত্ন ও সেবায় ছেলেটী সহজেই তার স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করে। কিন্তু এ ভাবে থাকতে সে রাজী হয় না। কি করি, অনেক চিন্তা করে তাকে একটী দোকান করতে বলি। তখন ঠিক পূজার সময়। ২৫৲ টাকা তাকে দিই। তা দিয়ে সে প্রথমে শুধু সাবান কিনে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক মাসে তার ৩০৲ টাকা লাভ হয়।

তার পর আমি তাকে আরও ২০০৲ টাকা দিই। সে আজ ছয় মাসের কথা। আজ কয় দিন হল ছেলেটীর একখানা পত্র পেয়েছি। সে লিখেছে—

"আমি ছোট একখানা কুঠা ভাঁড়া নিয়েছি, কাজ এত বেশী যে একা আর পারি না। দুটী ছেলে রেখেছি। তাদের ১৫৲ টাকা করে বেতন দিই।" পাঠক! এই ছেলের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। সে যদি এই স্বাধীন পথ না নিয়ে কেরাণী সাজত, তাহলে বড় জোর ৩০৲ টাকা বেতন পেত। কিন্তু আজ সে ১৫৲ টাকা বেতনের দুটী চাকর খাটাচ্ছে। অবশ্য তার কারণ সে আত্মাভিমান একেবারে ভুলে গেছে। নিজ হাতে পাল্লা পাথর ধরে জিনিস বিক্রি করেছে। সে প্রথমেই টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে নাই; বা ম্যানেজার অমুক, অডিটার অমুক, কি প্রপ্রাইটার অমুক বলে "হামবাগের" ন্যায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন করে নাই। তাই এত অল্প সময়ে সে এত উন্নত হয়েছে।

আর একটী ছেলের কথা বলছি। তিনি আমার আপন "বোনপো।" ছেলেটী বি-এ পড়ছিলেন। তিনি এক দিন এসে আমাকে বল্লেন, "খালাজান (মাসীমা), Universityকে তালাক দিয়ে এসেছি।" আমি হেসে বল্লাম, "বাপু, বেশ করেছ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মায়া যে ছাড়তে পেরেছ, তাতেই তোমাকে শত ধন্যবাদ।" তার পর তিনি পরামর্শ চাইলেন, এখন কি করবেন। অসহযোগ করা ত আর সোজা নয়? খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সব বিষয়েই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

ছেলের বাবার যথেষ্ট জায়গা-জমি আছে। কিন্তু তাহলে কি হয়। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে বিলেত যাবে, ব্যারিষ্টার হবে, ইত্যাদি কত কি। তাই মা-বাবা তাকেত বাড়ী হতে তাড়িয়েছেন।

ভাগ্যে ছেলের শ্বশুর ছিলেন ধনী মহাজন। তিনি নিজ জামাতাকে কোন ব্যবসা করবার জন্য কয়েক হাজার টাকা দিতে রাজী হলেন। তাই নিয়ে ছেলেটী তার আর তিনটী পাঞ্জাবী বন্ধু নিয়ে মান্দ্রাজের "বাংলোর" নামক স্থানে কোন জমিদারের নিকট হতে কয়েক বিঘা জমি "লিজ" নেয় ও তাতে কার্পাসের চাষ আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা "অটমেটিক" তাঁত নিয়ে কাপড় বোনারও বন্দোবস্ত করে। আমি গেল মাসে তাদের "ফার্ম্মের" জন্মোৎসব দিনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। গেল বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখলাম। কুলী, চাকর ও নিজেদের খোরাক পোষাকের

খরচা বাদ দিয়ে প্রত্যেক ছেলে তিন হাজার টাকা নগদ হাতে করেছে। তাদের ফার্ম হতে সুন্দর সুন্দর খদ্দর, সাড়ী, কাপড়, জামা, আলোয়ান ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। অথচ ভারি সস্তা। ছেলেরা সম্প্রতি আর একটা নূতন কারবার চালাচ্ছে। সেখানকার একটী প্রকাণ্ড জঙ্গল "লিজ" নিয়ে, তা হতে টিম্বার কাটা সুরু করেছে। এ বছর ই, আই, আর এর রাস্তার স্লিপারের জন্য তারা কণ্ট্রাক্ট নিতে চাচ্ছে। তা ছাড়া, অনেক তাল মিশ্রী নিয়ে নানা রকমের চেয়ার, ইজিচেয়ার, খাট, পালং, ডেস্ক, ড্রয়ার ইত্যাদি নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করে নানা জায়গায় চালান দিচ্ছে।

ব্যবসায়ে যে কি করে মানুষ ধনকুবের হয়ে গেছেন, তার আর কত উদাহরণ দিব। তাই আমাদের দেশের অন্নাভাবের কথা শুনে বিদেশীরা হাসে।

আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই আমরা আমাদের মাটির কাছে পেতে পারি। আমাদের কিছুই কিনবার দরকার হয় না। আমাদের যা কিছু খাদ্য—ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, মাংস, ঘি দুধ, ইত্যাদি সবই বিনা পয়সায় পাওয়া যায়—যদি একটু পরিশ্রম করা যায়। আর যদি বল যে,—ইংলিস হেম, বেকন, Cream Dutch Ganda cheese, Dutch Edam Ball, Pubis, Patum, Pepperium, Huntley and Palmer's বিস্কুট না হলে খাওয়া চলে না। তা'হলে যাও বিলেতে। এ দেশে নয়। এ দেশের লোক যারা, তাদের খাদ্য একমাত্র ডাল ভাত। আমাদের নিজ হাতে চাষবাস করতে পারলে কিছুই কিনতে হয় না। ক্ষেতে ডাল চাউল পাওয়া যায়। বাগান করলে, যত প্রকারের তরকারী আছে, তা পাওয়া যায়। দুচারটা গাভী রাখলে যথেষ্ট দুধ ঘি পাওয়া যায়। তবে কাপড়;—অবশ্য চরকায় কেটে যে সূতা হয়, তা দিয়ে একটী পরিবারের কাপড়ের খরচ চলে না। সে এক দিন ছিল, যখন অবশ্য মেয়েরা সূতা কেটে পুরুষদের কাপড় তৈরী করে দিতেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কৃপায় আমরা এমন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছি যে, সে সব মোটা কাপড় পরলে নাকি আর সভ্যতা রক্ষা পায় না। অথচ এই কচুপাতার জল—সভ্যতা রক্ষা করার জন্য সবাইকে মাঞ্চেষ্টারের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। তা সত্যি কি মিথ্যা, গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে দেখা গিয়েছিল। যেই বিদেশীরা মাল বন্ধ করে দিল, অমনি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মা ভাই বোন নগ্ন হতে লাগলেন।

কিন্তু সে সময় কে আপন মা ভাই বোনকে উলঙ্গ ও অনাহারী দেখে নাই? তারা হচ্ছে, জংলী সাঁওতাল, উরাঁও, ভীল, কোল ইত্যাদি, যাদের আমরা অসভ্য বলে থাকি। কারণ এ সব জাতি কোন দিনই পরমুখাপেক্ষী নয়। তারা কাপড়ের জন্য মাঞ্চেষ্টারের আশা করে না, লবণের জন্য লিবারপুলে যেয়ে হত্যা দেয় না, বা কাউন্সিলে যেয়ে লবণ শুল্কের জন্য হাঁ হুজুরী করে না। তারা নিজ হাতেই সব করে নেয়। আমি একটী পাহাড়ী উরাঁও পরিবারের কথা এখানে বলব।

রাঁচী হতে কিছু দূরে "বারওয়ে" বলে একটা যায়গা আছে। সেখানকার অধিবাসী সবই "উরাঁও"। তাদের একমাত্র ব্যবসা কৃষি। সেখানে একটী কৃষক দেখতে পেলাম। তার ছয়টী ছেলে। মস্ত বড় কৃষাণ। একখানা ঘর দেখলাম, শুধু ধান চালে পূর্ণ। তার বাড়ীতে কোন জিনিসের অভাব নাই। ৮০।৯০টী, গরু ও মহিষ। শূকর অন্ততঃ দুই শত। ছাগল ৬০।৭০টী। বৎসরে সে নিজ খোরাকীর ধান রেখে ২০০ শত টাকার ধান বিক্রী করে। ডাল ৩০।৪০ টাকার; আলু, বেগুণ, কলা, পেঁপে, মরিচ, সিম, মূলা, সালগম ইত্যাদি, প্রতি বাজারে অন্ততঃ ২৲ টাকা করে বিক্রি করে।

পাঠক! এখন ভাবুন, সংসারে আমরা সুখী, না এই পাহাড়ী? সে কাহারও ধার ধারে না। ভয়ঙ্কর স্বাধীন। ভাবুন, মানুষ সে, না আমরা, যারা সহরবাসী!

তার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য দেখে আমি ও আমার আর তিনটী বন্ধু নানা কথা বলছিলাম। বৃদ্ধ তা বুঝতে পেরে আমাদের বল্ল, "মুর ছউয়া পুতা এতনা জুরাল কাঁহে নেই হোগে মেম সায়বান! দিনরাত এতনা এতনা বাদিয়া কা গোস্ত আর হাঁড়ী হাঁড়ী দুধ ঘি খাওয়ালে কমজোর কাঁহে হোগে!"

ঠিক সেই সময় আমি আমার কলিকাতা সহরে ছেলেদের কথা ভাবছিলাম। হায়। এই পাহাড়ী জংলী ছেলেরা যা খেতে পায়, আমাদের ছেলেরা তার শতাংশের একাংশও চোখে দেখতে পায় না। এরা অন্নাভাব যে

কি, তা জানে না। নিজ হাতে তৈরী মোটা চেলীর কাপড় পরছে। তাতেই তারা ভারি খুসী ও সন্তুষ্ট। জানি না, অমর কবি রজনী সেন এদেরে দেখেই কি গেয়ে গেছেন :—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

এ সব পাহাড়ীকে ফরাসডাঙ্গার ধুতি এনে দেও, দেখবে, সে কাপড়কে তারা কত ঘৃণা করে' দূরে ফেলে দিবে। আর তাদের তৈরী সেই চেলী এনে দাও, দেখবে মাথায় তুলে নিবে। এরা তাদের ছোট্ট ঘরে বড় মনটী নিয়ে নিজের পরিশ্রমের অন্ন খেয়ে নিজকে বড় ধন্য মনে করে। তাই তাদের ছেলেমেয়ের মুখে হাসি, আনন্দ চিরবিরাজমান। তাদের যুবক যুবতীদের দেখলে প্রকৃত যৌবনের আভাস পাওয়া যায়।

যুবতী মেয়েরা "জটলি" ফুল দিয়ে কেশের খোঁপা সাজিয়ে দল বেঁধে গলাগলি করে' পাহাড়ের উপর দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে চলছে। তাদের কপোলে কোন দিন চিন্তার রেখা পড়তে পারে না। এদের পারিবারিক জীবন কি সুন্দর। কেহই কাহারও মুখ চেয়ে থাকে না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই কাজ করে। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে ক্ষেতে বাঁধ করছে, ধান বুনছে, ধান কাটছে, গরু চরাচ্ছে, জঙ্গল হতে স্বামীর সঙ্গে জ্বালানি কাঠ আনছে। পুরুষ যা করছে, মেয়েরাও তাই করছে। তাই তাদের পরিবারে কোন কলহ বিবাদ নাই। স্বামীও বলতে পারছেন না যে, বসিয়ে বসিয়ে এক পালের আহার জুটাচ্ছেন। কারণ, সবাই নিজে পরিশ্রম করে খাচ্ছে।

এদের মেয়েরা বেশ স্বাধীন। এ সব মেয়েরা কোন দিনই ভাবে না যে, স্বামীর পরিশ্রমের উপর তাদের জীবন-যাত্রা নির্ভর করে।

তাই বলি, যেদিন হতে আমরা লাঙ্গল ছেড়ে কলম ধরেছি, সেদিন হতে লক্ষ্মীও আমাদের ছেড়ে গেছেন। ভারত যেদিন স্বাধীন ছিল, সেদিনকার লোক লাঙ্গলকেই বড় ভালবাসত। তাই রাজারা যজ্ঞ করবার সময় নিজ হাতে যজ্ঞ-স্থান চাষ করতেন।

আমাদের অধঃপতন সেদিন হতে এসে দেখা দিয়েছে, যেদিন হতে আমরা বিলাতি কায়দায় সহর তৈরী করে' বিলাতি কায়দায় চাল-চলন ও খাওয়া-পরা চালাতে গিয়েছি।

আরে বাপু, এই যে সাহেব সাজতে চাও, হেট কোট নেকটাই লাগাতে চাও, তাতে যে অনেক মাল মসলার দরকার। একটী বাঙ্গালী বি-এর মূল্য ৫০৲ টাকা; আর সেই যায়গায় একটী ইংরেজ বি-এর মূল্য যে এক হাজার। কত তফাৎ। অথচ এই আয় নিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই। এ সব কি নেহাৎ পাগলামী নয়?

তাদের ন্যায় চলা-ফেরা করতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু টাকা রোজগার করে' কর। কেরাণী পেশা ছাড়। প্রকৃত মানুষ হও। চাষী কি দোকানী সাজ। তবেই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। তা নইলে নয়।

ওদের ভাল গুণটি যা আছে, তা নকল কর। তা না করে' সাহেবরা কি করে Champagne মদ খায়, কি করে গো মাংসের তৈরী বেকন খায়, কি করে তারা হেট কোট নেকটাই লাগায়—এ সব শিখা ছেড়ে দাও। তাদের মত সময়ের সদ্ব্যবহার করা কয়জন বাঙ্গালী সাহেব শিখেছেন, শুনি। আমি পাটনায় একজন বৃদ্ধ আইরিস আই-সি-এসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এখন দেশে যেয়ে কি করবেন। তিনি বল্লেন, "দেখ, বুড়ো হয়েছি বলে আমাকে কুড়ে মনে কর না। Retired হয়ে যদি ঘরে বসে থাকি তাহলে ছয় মাসের ভিতরই আমি মরে যাব। সারাজীবন এত কাজ করেছি। তাই কর্ম্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারব না। দেশে যেয়ে কয়েকটী গরু ও ভেড়া কিনে চাষবাস করব। আমি ভাল চাষ করতে জানি। আমাদের দেশ ত আর ইণ্ডিয়া নয় যে সামান্য ২৫৲ টাকার কেরাণীও চাষ করতে ঘৃণা করবে। বরং বসে থাকলে কেহ তাকে ভাল বাসে না।"

আমি বলতে চাই, যে-সব বিলেত-ফেরতা বাঙ্গালী সিবিলিয়ান আমাদের দেশে আছেন, তাঁরা বুড়ো বয়সে হাতে লাঙ্গল নিতে রাজী আছেন কি?

আজকাল অনেক বিলেত-ফেরতা বারিষ্টার নিজ স্ত্রীকে পর্য্যন্ত মেমসাহেব তৈরী করবার জন্য স্ত্রীকে "হুইস্‌কি" ও বিলাতী সিগারেট সেবন করা শিখাচ্ছেন। আমি তা

স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু মেমরা যত বড় ঘরেরই হউন না, নিজের ছেলেমেয়েদের ভেলভেট জুতা, মোজা ফ্রক প্রভৃতি যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ নিজ হাতে তৈরী করে দেন।

আমি বলিতে চাই—এই মেম-সাজা কয়টী বাঙ্গালী স্ত্রী সে সব করছেন? মেমরা যেখানেই যাক না কেন, তাদের হাতে একটা না একটা কাজ আছেই। বাগানে ছেলেমেয়েদের খেলতে দিয়ে নিজেরা বসে বসে একটা না একটা সেলাই করছেই। বাঙ্গালী মেমরা তা করেন কি?

তাই বলি, এ সব না ছাড়তে পারলে, দেশের কোন দিনই মঙ্গল হবে না; তা হাজার Non-co-operationই কর, আর কাউন্সিলার সেজে বিলেতে ডেপুটেসন পাঠাও। যে দেশের হাত পা বদ্ধ, সে দেশের লোকদের প্রথমে দেশ তৈরী করতে হবে সমাজের নৈতিক চরিত্রের ভিতর দিয়ে। তা নইলে নয়।

নটবর

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(১)

নটবর দাস কংশাই গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তার ধন-সম্পত্তি এক রকম কিছুই নাই। জাতিতে সে কায়স্থ, সুতরাং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আধিপত্যও তার নাই। এক রকম কোনও কিছুই নাই—তার প্রতিষ্ঠা কেবল জিহ্বার জোরে। সে খুব বেশী বলিত না, কিন্তু যা বলিত তা সত্য আর ভয়ানক সরল। লোকে সে কথায় না হাসিয়া পারিত না—কেবল সেই ছাড়া, যার আঁতের ভিতর গিয়া কথাটা ছুরির মত বসিয়া পড়িত।

বলা বাহুল্য, নটবরের লেখাপড়া বেশী কিছু হয় নাই। নতুবা সে গ্রামে বসিয়া থাকিত না। একটা ডেপুটী, কি মুন্সেফ, কি উকীল, কি ডাক্তার, কি মাষ্টার, কি নিদান একটা উকীলের মুহুরী হইয়া গ্রামের পাপ সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিত। লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই, গ্রামে একখানা ভদ্রাসন ও যৎকিঞ্চিৎ জোতজমা ছিল; তাই সে গ্রামেই পড়িয়া রহিল। তার ভদ্রাসন—তা' সেটা যে খুব ভদ্র ছিল এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বিঘা দুই জমী তার ভদ্রাসন, তার বেশীর ভাগই আম কাঁটালের বাগান বা জঙ্গল। তার মধ্যে মরুভূমে ওয়েসিসের মত দুই-খানি খড়ের ঘর—একটা শুইবার, আর একটা রাঁধিবার। ইহার মধ্যে বাস করে দুটি প্রাণী—নটবর এবং তার গৃহ-লক্ষ্মী অম্বিকা।

অম্বিকা ঠাকুরাণীকে নটবর সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই গৃহলক্ষ্মী বলিত,—সেটা ঠাট্টা করিয়া কি না, বোঝা কঠিন। কেন না অম্বিকার চেহারার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীর অংশও ছিল না। কালো রং, দোহারা গড়ন—বেঁটে বলিয়া তার দোহারা চেহারা একটু বর্ত্তুলাকারের মতই দেখাইত। মুখের কোনও অংশেই সৌন্দর্য্যের ছায়াপাতও হয় নাই। তদুপরি তার বেশ একজোড়া চলনসই রকম গোঁফের রেখা ছিল।

এই তো গেল চেহারার লক্ষ্মীশ্রী। গৃহিণী হিসাবেও তাঁর লক্ষ্মীত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তিনি নটবরের ঘরে কেমন করিয়া আসিলেন, সে তথ্য সুদূর অতীতের গর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কংশাই গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভাবে তার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এইটুকু লোকমুখে চলিয়া আসিয়াছে যে, তখন নটবরের বয়স ছিল সাত বৎসর, আর অম্বিকার পাঁচ (কিম্বা ছয়) বৎসর। কিন্তু অম্বিকা আসিয়া নটবরের ঘর যে ধনধান্যে ভরিয়া দেন নাই, সে নিশ্চয়। নটবর চিরদিনই অভাবের মধ্যেই দিন কাটাইয়াছে। আর যাও কিছু নটবর উপার্জ্জন করে, তাও শ্রীমতী অম্বিকা গুছাইয়া খরচ করিতে পারেন না। সংসারে—গৃহস্থালীতে অম্বিকার শৃঙ্খলা, বা হিসাব-কিতাব, বা কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা করিয়া কিছু

করিবার অভ্যাস ছিল না। সে যখন যে কাজটা হাতের গোড়ায় পাইত, করিত; যখন যেটা পাইত, খাইত; যখন যা খুসী করিত। তাই তার ঘর-দুয়ার আবর্জ্জনায় ভরা, তার কাপড়-চোপড় সর্ব্বদাই ময়লা ও ছেঁড়া, তার রান্নাঘরের সঙ্গে পায়খানার বড় বেশী তারতম্য নাই। তাই নটবরের সংসারে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিলেও, কোনও দিনই পা বসাইতে পারেন নাই।

চঞ্চলা লক্ষ্মী এদিক ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক আধবার এক আধটুকু উঁকি ঝুঁকি মারিতেন নটবরের আঙ্গিনায়। এক একবার তিনি একটু বেশী হাতেই কিছু নটবরকে পাওয়াইয়া দিতেন। তার পর হইতে নটবর ও অম্বিকার হাত ছুল্‌বুল্ করিত,—তারা অস্থির হইয়া যাইত সেই টাকাটা যেন তেন প্রকারেণ খরচ করিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে গলহস্ত দিয়া বিদায় করিতে।

একবার নটবর থোকে ৫০০৲ টাকা পাইয়া গেল একটা সাক্ষ্য দিয়া। গরীব হইলেও নটবরের সর্ব্বত্র আদর ছিল—বিশেষতঃ বড়লোকের বৈঠকখানায়। সে বেশীর ভাগ সময় এ তল্লাটের সব বড়লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াই কাটাইত। ছিদামপুরের জমীদারদের একটা প্রকাণ্ড মামলা বাধিল মহেশগঞ্জের সাহাদের সঙ্গে,—সে মোকদ্দমার তায়দাদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ছিদামপুরের বাবুরা নটবরকে মানিলেন সাক্ষী—সেই হইল প্রধান সাক্ষী, তার উপর মোকদ্দমা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাবুদের মোকদ্দমা দাঁড় করাইতে গেলে নটবরকে নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে হয়। তবু নটবর তাহাতে রাজী হইল, কেন না তখন তার সংসার একেবারে অচল।

ঢাকায় মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে গিয়া নটবর মনে মনে নানা রকম চিন্তা করিল। সে টাকার খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হইয়াছে বটে, কিন্তু—মিথ্যা কথাটা বলিয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। অনেক সময় সে মিথ্যা কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, কেমন গোলমাল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই এবার মিথ্যা সাক্ষ্যটা দিয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হইতেছিল। না পারিলে বড় বিপদ! বাবুদের সঙ্গে কথা রহিল যে, সাক্ষ্য দিলে সে ৫০০৲ টাকা পাইবে—তাঁরা নগদ ১০০৲ দিয়াছেন, বাকী সাক্ষ্য হাসিল হইলে ঘরে উঠিবে। যদি সাক্ষ্য ঠিক মত দিয়া উঠিতে না পারে, তবে এ টাকা বেবাক লোকসান হইবে। যে ১০০৲ টাকা হাতে আসিয়াছে তাহা বাবুরা কিছুতেই আদায় করিয়া উঠিতে পারিবেন না সত্য—কিন্তু চিরদিনের একটা সম্বল যাইবে; কেন না, এই বাবুদের কাছে দশ রকমে নটবর এটা ওটা সেটা পাইত। তাই সে মহা ভাবিত হইল।

এই ভাবনাই তাহার কাল হইল। না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে হয় তো চট করিয়া শিক্ষা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়া আসিতে পারিত; কিন্তু যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তার বুক দমিয়া যাইতে লাগিল। তাই তো—যদি না পারে! শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া নির্জ্জলা মিথ্যা বলিবার সংকল্প করিয়া গিয়া সে নির্জ্জলা সত্য বলিয়া আসিল। কাটগড়া হইতে নামিয়া সে মাথা গুঁজিয়া চলিল, আর এদিক ওদিক চাহিল না। সোজা ঘাটে গিয়া একখানা "গয়নার নৌকায়" গিয়া বসিয়া রহিল। তার মন গেল!

সন্ধ্যার সময় সে নৌকা ছাড়িল। ঠিক ছাড়িবার পরে একটি লোক মহা ডাকাডাকি করিয়া নৌকা ফিরাইয়া তাহাতে উঠিল। লোকটির গা খোলা, গলায় কাঠের মালা, এবং সূক্ষ্ম সোণার একটা হার, বেশ জুতসই একটি ভুঁড়ি এবং হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল। লোকটি বসিয়াই চাদরের খুঁট দিয়া ঘাম মুছিয়া প্রচণ্ড বেগে চাদর ঘুরাইয়া আপনাকে ব্যজন করিতে লাগিল। তার ভুঁড়ির তাণ্ডব নর্ত্তন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ওর বড় দৌড়"।

নটবর এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে এই ব্যক্তিকে দেখিতেছিল। ইহার সঙ্গে তার দেখা-শুনা ছিল না। তবে সে আন্দাজ করিতেছিল যে ইনিই বোধ হয় মহেশগঞ্জের সেই সাহা মহাজন। লোকটাকে দেখিয়াই তার ভারি কৌতুক বোধ হইল। সে একাগ্রচিত্তে এই ব্যক্তির ভুঁড়ির প্রচণ্ড বিক্ষোভ লক্ষ্য করিতে লাগিল। যেই ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছে অমনি সে বলিয়া উঠিল, "আহা হা থামুন, ফাটবে।"

ভদ্রলোক চমকিত হইয়া সেদিকে চাহিলেন, বলিলেন, "কি ফাটবে?"

নটবর বলিল "দম।"

লোকটি একটু হাসিলেন। এতক্ষণে তিনি নটবরকে চিনিয়া বলিলেন, "আপনি কংশাইর নটবর দাস না?"

নটবর বুঝিল, ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুঝিয়া সুখী হইতে পারিল না। তার নিজের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে সে আজ একটা দারুণ অপকর্ম্ম করিয়াছে—কেন না সে বোকা বনিয়াছে। রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি রাশি রাশি লোক রোজ রোজ আদালতে দাঁড়াইয়া কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যা বলিয়া যাইতেছে, আর সে এই সোজা একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া টাকাগুলি রোজগার করিয়া উঠিতে পারিল না, এ কি কম কলঙ্কের কথা! নটবর দাস সাধারণ কলঙ্ক গ্রাহ্য করে না। তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে লোকে সত্য-মিথ্যা নানা কথা বলে, তা সে হাসিয়া উড়ায়। সে কাকে ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে বলিয়া একটা মিথ্যা অপবাদ তার নামে রটিয়াছিল; তাহাতে সে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু বেকুবীর অপবাদ সে সহ্য করিতে পারে না। আজ সে যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে লোকে তাকে এক নম্বর বেকুব বলিয়া সাব্যস্ত করিবে, এইটাই ছিল তার সব চেয়ে বেশী চিন্তা। তাই সে ধরা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় বড় বেশী ব্যস্ত ছিল। আর সে হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গেল ঠিক তারই কাছে, যে নিজে স্বতঃ পরতঃ তাকে এমনি বেকুব বানাইয়াছে।

কিন্তু উপায় নাই। তার পিতৃদত্ত নাম এবং পৈত্রিক বাসস্থান উভয়ই স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

"আমার নাম কুঞ্জলাল সাহা—প্রাতঃ প্রণাম।" নটবর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল; তার পর বলিল, "আজ্ঞে না, ভোর হ'তে এখনো বাকী আছে।" তখন সবে সন্ধ্যা।

এ রহস্যটা কেহ বুঝিয়া উঠিল না। কুঞ্জলাল নটবরকে বড় আপ্যায়িত করিলেন, এবং শেষে তাঁর বাড়ীর ঘাটে তাহাকে এক রকম জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। সাহা মহাশয় তাহাকে লইয়া সোজা গদীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি না, "দাস মশাই, ওরা আপনাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য কত দিতে চেয়েছিল?"

কি অন্যায় উদ্ধত প্রশ্ন! নটবর সত্য-সত্যই চটিয়া গেল। সে বলিল, "যদি টাকাই তারা দিতে চাইবে, তবে আমি তো তাদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিতাম।"

কুঞ্জলাল হাসিয়া বলিল, "আর যদি টাকাই না দিতে চাইবে, তবে আপনিই বা এত রাস্তা কষ্ট করে যাবেন কেন? আর তারাই বা আপনাকে এত তোয়াজ করে নিয়ে যাবে কেন—যদি আপনি এই সাক্ষ্যই দিতে গিয়াছিলেন?"

এ কথার জবাব নাই। নটবর দেখিল যে, মিথ্যা কথা বলাটা তার আসে না। তাই সে ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্পষ্ট বলিল, "পাঁচশো টাকা।" কুঞ্জলাল তখন তাঁর সিন্দুক খুলিয়া কাগজপত্র, টাকাকড়ি রাখিতেছেন, এবং সিন্দুক নাড়া-চাড়া করিতেছেন। নটবর লুব্ধ দৃষ্টিতে সিন্দুকের ভিতরকার নানা বিচিত্র মোড়কে ঢাকা জিনিসগুলি দেখিতে লাগিল।

একটা খাড়ুয়া-বাঁধা মোড়ক খুলিতে খুলিতে কুঞ্জলাল বলিলেন, "তাই তো, আপনার তো তবে বড় লোকসান গেছে।"

নটবর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। খাড়ুয়ার মোড়ক খুলিয়া একটা মোটা নোটের তাড়া বাহির হইলে, সে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কুঞ্জলাল কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিয়া, বাকী নোট আবার খাড়ুয়ায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "তা ছাড়া, বাবুরা তো এখন আপনাকে হয়রাণ ক'রতে ছাড়বেন না।"

এতগুলি টাকা নাড়া-চাড়া করিতে দেখিয়া সদ্য-বঞ্চিত নটবরের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলাইয়া গিয়াছিল, সে কিছু বলিল না।

তার পর—নটবর ঢোঁক গিলিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর সত্যসত্যই কুঞ্জলাল বাবু সেই বাইরে-রাখা নোটের তাড়া লইয়া নটবরের হাতে দিয়া বলিলেন, "তা' আপনি আমার আজ যা উপকার ক'রেছেন, তার জন্য এই যৎকিঞ্চিৎ দিলাম। এর পর যদি কোনও বিপদ আপদে পড়েন, আমাকে খবর দেবেন।"

নটবর হাঁ করিয়া চাহিল—পাঁচশো টাকার নোট! অ্যাঁ! তার পর সে আর কোনও কথা না বলিয়া চোঁ চোঁ ছুট দিল। তার কেবলি ভয় হইতে লাগিল যে, সে আর দেরী করিলে হয় তো কুঞ্জলালকে বলিয়া বসিবে যে, একশো

টাকা সে আগাম পাইয়াছে, এবং তাহা হইলে কুঞ্জলাল ১০০৲ টাকার নোট ফিরাইয়া লইবে। তাই-সে চোঁচা ছুট দিয়া একেবারে অম্বিকার কাছে গিয়া পাঁচশত টাকার নোট তার সামনে ফেলিয়া দিল।

অম্বিকা অবাক্ হইল না। এ যে পাওয়া যাইবে, তা তো তার জানাই ছিল। এমন কি, এ টাকা দিয়া যে কি কি করিতে হইবে, তাহাও সে মনে মনে আঁটিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন নটবর সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিল, তখন সে ধীরে সুস্থে অবাক্ হইল। নোটগুলি বাক্সে তুলিতে তুলিতে সে বলিল, "আচ্ছা বেকুব তুমি তো! পাঁচশো টাকার গলায় দড়ি দিয়েছিলে আর কি? ভাগ্যে কুঞ্জলালটা পাঁটা, তাই রক্ষে।"

যা' এতক্ষণ নটবর ভয় করিতেছিল, তাই হইল। বেকুব বলিয়া তার গাল খাইতে হইল, তবে কি না গিন্নীর কাছে!

ছয়শো টাকা ফুঁয়ে উড়িয়া গেল। নটবর ও অম্বিকা দুজনে মিলিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া তাড়াইল।

অম্বিকা আগে হইতেই ঠিক করিয়াছিল যে, এই টাকা পাইলে সে এক জোড়া বালা গড়াইবে, এবং নটবর ঠিক করিয়াছিল যে, ঘরখানায় টিনের চালা করা হইবে। সেই রাত্রে ঠিক হইয়া গেল যে দুই-ই করা হইবে। বালার দাম পড়িবে দুই শো টাকা; তাহা বাদে যে ৪০০৲ টাকা থাকিবে, তাহাতেই টিনের ঘর হইবে।

পরের দিন নটবর নিজেই একটা হিসাব করিতে বসিল যে, কি পরিমাণ টিন দরকার হইবে। তখন অম্বিকা বলিল, "ঘরখানা ক'রছো, একটু বড় ক'রেই করো।"

নটবরও তাই ঠিক করিয়াছিল। তার শুইবার ঘরখানা অত্যন্ত ছোট, তা' ছাড়া তার বসিবার একখানা ঘর নাই। আর তার ছেলে অবশ্য দেশে থাকে না, ঢাকার দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া ঢাকার স্কুলে পড়ে। তা' সেও বড় হইতেছে, বাড়ীতে আসিলে তার শুইবার একটা আলাদা ঘর দরকার। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ব্যবস্থা করিল যে, একখানা বড় গোছের আটচালায় চার পাঁচটা প্রকোষ্ঠ করিয়া সব কাজ চালাইবে। সেই হিসাবে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক করিয়া সে পরের দিন ঢাকায় চলিল।

প্রথমেই সে সোণা কিনিয়া স্যাকড়া-বাড়ী স্ত্রীর বালা গড়িতে দিল। তার পর অবশিষ্ট টাকা লইয়া সে টিন কিনিতে গেল। সে দোকানদারের কাছে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ জানাইলে, তাহারা হিসাব করিয়া যাহা বলিল, তাহা নটবরের নিজের হিসাবের অনেক বেশী। নটবর দেখিল যে, তার যে টাকা আছে, তাতে টিন কেনা যায় বটে, কিন্তু সেই টিন কায়-ক্লেশে বাড়ীতে পৌঁছান ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কাঠ কিনিয়া ঘর তুলিবার খরচ আর হাতে থাকে না। ভাবিল, আগে বালাটা না গড়াইলেই হইত।

দোকান হইতে ফিরিয়া সে নানা রকম চিন্তা করিয়া ঘরের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সে সংবাদ পাইল যে, একজন ঠিকাদার পুরাতন টিন বিক্রয় করিবেন। সে গিয়া দেখিল, দর নূতনের চেয়ে কিছু সস্তা; সে আবশ্যক মত টিন কিনিয়া ফেলিল। ঝরঝরে পুরানো কতকগুলি টিন আসিয়া আমবাগানে মজুত হইল। কাঠের জন্য বাকী টাকা সে একটী লোককে দিল। সে লোক কাঠ কিনিতে গিয়া আর বাড়ী ফিরিল না।

টাকাগুলি নিঃশেষ করিয়া দিয়া নটবর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। টিনগুলি পড়িয়া রহিল। কাঠ আসিল না। বালা তৈয়ার করিয়া স্যাকরা তাড়ার পর তাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু মজুরীর টাকা হাতে নাই বলিয়া বালা আনা হইল না। বৎসর খানেক বাদে স্বর্ণকার খবর দিল যে, নটবরের বালা সে ভাঙ্গিয়া সোণা বিক্রী করিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণকারের মজুরী বাদে ৪০৲ টাকা উদ্বৃত্ত আছে, নটবর যেন তাহা লইয়া যান। এত বড় বেকুব বনিয়া আর নটবর কেমন করিয়া সেদিকে ভিড়িবে? তাই সে ও-অঞ্চলে গেল না, টাকাও আদায় হইল না।

অনেক দিন পরে কতকগুলি পাওনাদারের উৎপীড়নে নটবর রাগ করিয়া তাহাদিগকে টিনগুলি জলের দরে বিলাইয়া দিল।

(২)

টিনগুলি বিদায় হইলে নটবর বলিল, "বাঁচা গেল! গরীবের ঘোড়া রোগ, এত অল্পে যে নিষ্কৃতি হ'ল তাই ভাল।"

অম্বিকা বলিল, "হাঁ! টিনের ঘরও হ'ল, গয়নাও হ'ল। এখন আমার আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল যে দূর হ'ল, তাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ওগুলোর দিকে চাইলে আমার প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠতো।"

"যা' ব'লেছ। টক ফল খেতে নেই। তা ছাড়া, খড়ের ঘর দিয়ে ঠাণ্ডা, টিনের ঘর তো নয়, যেন আগুন।" কাজেই সুস্থ সাব্যস্ত চিত্তে তারা মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

নটবরের ঘরে অনেক জিনিসেরই অভাব ছিল, ছিল না কেবল আনন্দের। হাসি তাদের মুখে লাগিয়াই আছে। তারী ভারী শক্ত শক্ত কথা লইয়াও নটবর রহস্য না করিয়া পারিত না; ভারী দুঃখের ভিতরও একটা হাসির কথা মনে হইলে সে না বলিয়া পারিত না। তাই অম্বিকা দিন রাত হাসিমুখেই থাকিত। স্বামীর উপর কোন দিন রাগ করিতে পারিত না।

এমন দিন গিয়াছে, যে দিন চালের ডোলে হাত দিয়া অম্বিকার চক্ষে জল আসিয়াছে। বড় দুঃখে সে নটবরের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিয়াছে, "থাক, এমনি বসে' থাক; রোজগারে কাজ নেই। আজ কি গিলবে গেল গে দেখি।"

নটবর ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ প্রেয়সী, মান্যের অপমান করো না!"

"কি আমার মান্য রে! যে খেতে পায় না, তার আবার মান কি?"

"আহা, তার কথা বলছি না! আমি! আমার কথা চুলোয় যা'ক, কিন্তু ওই যে আহার ব্যাপারটা, যাতে করে আমাদের জীবনধারণ হয়, তাকে বল্লে কি না গেলা—এমন অসম্মান করো না দেবি!"

"আহা, উনি এখন নাটক ক'রতে ব'সলেন।" বলিয়া অম্বিকা হাসিল। নটবরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া, তার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। যে দুটী চাল ছিল, সে তাই হাসিমুখে চড়াইল। দুই জনে দুই গ্রাস খাইয়া মনের আনন্দে গল্প করিতে লাগিল।

এ আনন্দ কিছুতেই টুটে না। নটবরের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—বেশ একটু খারাপ। লোকের মুখে সে কথা শুনিয়া অম্বিকা একটু রাগ করিল। স্বামী বাড়ী আসিলে অনুযোগ করিল, কিন্তু রাগ রাখিতে পারিল না। নটবর তাহাকে এমন করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিল যে, অম্বিকা একেবারে গলিয়া গেল। ইহার পর অন্য কোনও স্ত্রীলোক তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, সে বলিত, "পুরুষ মানুষ, ওতে আর কি হ'য়েছে।"

প্রতিবেশিনী আরও বুঝাইলে বলিত, "আরসীর ভিতর আমার মুখ এক-আধ দিন দেখেছি দিদি; বলতে কি, আমারই তাতে প্রাণ আঁৎকে উঠে। তাও তো উনি আমার কাছে আসেন!"

আসল কথা, নটবরের উপর রাগ করা অম্বিকার পক্ষে অসম্ভব ছিল। খুব রাগের মুখে নটবর এমন একটা হাসির কথা বলিত, বা এমন একটা হাসির কাণ্ড করিত, যে, না হাসিয়া তার উপায় থাকিত না।

কাজেই দারুণ অভাবের ভিতর থাকিয়াও নটবর ও অম্বিকা হাসিয়াই দিন কাটাইত। কিছুতেই তাদের মনের ভিতর দাগ বসাইতে পারিত না।

একখানা ছেঁড়া ময়লা ঢাকাই শাড়ী পরিয়া অম্বিকা তার শুইবার ঘরের দাওয়ায় মাছ কুটিতে বসিয়াছিল। নটবর বাড়ী আসিয়া তাই দেখিয়া বলিল, "যা'ক, বেশ সুবিধা ক'রেছ, এর পর বিছানায় শুয়েই সব কাজ কর্ম্ম খাওয়া দাওয়া হ'বে। কষ্ট করে আর উঠতে হ'বে না।"

অম্বিকা বলিল, "আহা! এতে কিই বা হ'য়েছে। দুটো এই মাছ কুটতে হ'বে, দা'খানা এখানে র'য়েছে, আবার ওইখানে টেনে নিয়ে যাব, তা' এখান থেকে কুটে নিচ্ছি।"

"না, না, ঠাট্টা নয়, আমরা এখন যে রকম বড়মানুষ হ'তে যাচ্ছি, তা'তে খাটে শুয়ে না খেলে মানাবে কেন? জান কি হ'য়েছে?"

অম্বিকা। কি?

চোখমুখে গম্ভীর একটা ভঙ্গী করিয়া নটবর বলিল, "হাজার টাকা।"

হাসিয়া অম্বিকা বলিল, "আবার কি মিথ্যা সাক্ষী না কি? সে কাজ—"

"আরে না না, লক্ষ্মী কি দুইবার এক রকমে দেখা দেন? তাঁর বেশ একটু মৌলিকতা আছে।"

"তবে এবার তাঁর কি রূপ?"

নটবর হাসিয়া বলিল, "বিয়ে।"

অম্বিকার প্রাণটা চমকিয়া উঠিল; তবু সে হাসিয়া বলিল, "আ মরণ? কুষ্টিখানা আজকালের মধ্যে দেখেছিলে? বয়সের হিসাব খেয়াল আছে?"

নটবর হাসিয়া বলিল, "এই নাও! এতেই হিংসেয় পেট ফাটে। আরে শোনই আগে, কার বিয়ে!"

"কার?"

"তোমার ছেলের! সতীশের।"

অম্বিকার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাই না কি? কোথায়? বল আমায়। হাজার টাকা দেবে?"

তখন নটবর ক্রমে খুলিয়া বলিল। মেয়ের বাপের বাড়ী ঢাকা সহরে। সেখানে সে কি একটা চাকরী করে। তা ছাড়া, বিষয় সম্পত্তি আছে, অবস্থা বেশ ভাল। তার একটি মেয়ে আছে, ভদ্রলোক সতীশের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চান। বিবাহের ব্যয়, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বাবদ তিনি নবলগ হাজার টাকা দিবেন, তা ছাড়া কিছু দানও দিবেন, মেয়ের গায়ও দু'খানা গহনা দিবেন। তা ছাড়া, সতীশের সমস্ত পড়ার ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, সে শ্বশুরালয়ে থাকিয়া পড়িবে।

অম্বিকা লুব্ধ হইয়া উঠিল। তার কাঙ্গাল ছেলের এমন বিবাহ! তার মনে হইল, এইবার তাদের দুঃখের দিন শেষ হইল। হাজার টাকায় তাহাদের জন্মের মতন স্বচ্ছলতা লাভ হইবে, আর ছেলে বউ বড়মানুষ শ্বশুরের বাড়ীতে পায়ের উপর পা দিয়া বাস করিবে। আর চাই কি?

কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা, মেয়েটি দেখিতে কেমন?

সে বিষয়ে নটবরের কোনও নিরপেক্ষ অভিমত দেওয়া অসম্ভব। মেয়ে সে দেখিয়াছে, কিন্তু ঐ হাজার টাকা এবং ছেলের পড়ার খরচ প্রভৃতি তার চারিধারে এমন একটা মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তার ভিতর দিয়া সে কিছুই দেখিতে পারে নাই; তার মনে চাপিয়া বসিয়াছিল এই ধারণা, যে মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু বাস্তবিক সে সুন্দরী নয়। মাত্র তেরো বছরের মেয়ে, নিতান্ত কচি, তাই তার ভিতর কৈশোর-সুলভ লাবণ্য একেবারে না আছে তা নয়; কিন্তু তার রং কালো এবং মুখ চোখ ভালো নয়। তার শরীর এখনো গড়িয়া ওঠে নাই। কাজেই শরীরের গড়ন বিষয়ে কোনও মতামত এখন দেওয়া চলে না।

কিন্তু নটবর অম্লান বদনে বলিল, "মেয়ে যেমন ভদ্রলোকের ঘরে হ'য়ে থাকে।"

কথাটা অম্বিকার মনঃপূত হইল না। সে বলিল, "তার মানে সুন্দরী নয়।"

"হাঁ, তেমন কি একটা ডানা-কাটা পরী? এই যেমন ভদ্রলোকের ঘরে হ'য়ে থাকে।"

"ভদ্রলোকের ঘরে তো কত রকমই হয়। ভট্চায্যি বাড়ীর নতুন বৌও হয়, আর আমার মতন রূপসীও হয়। তা ছাড়া, ডানা-কাটা পরী যদি হয় তো সে ভদ্র ঘরেই হয়, সে কিছু মাঝি মালীর মধ্যে হয় না।"

কথাটা শুনিয়া নটবর একটু খোঁচা খাওয়া বোধ করিয়া একবার চাহিল। তার মনে হইল যে, কথার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। মাঝিপাড়ার কোনও শেষ ঘরে তার একটু অবৈধ গতিবিধি আছে, সে কথা সবাই জানিত। কিন্তু কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া নটবর বলিল,

"কেন, তোমার রূপ কম কিসে ছোট বৌ?"

একটু হাসিয়া অম্বিকা বলিল, "আ মর! ঠেকায় করে কথা চাপা দিতে হবে না। আমার যা রূপ, তা আরসীর দিকে চাইলেই আমি দেখতে পাই। তা এখন এ মেয়ে কেমন তাই বল। রং কেমন?"

"আরে রঙ্গের মধ্যে আছে কি? কতকগুলো ফরসা রঙ্গ হ'লে কি পরমার্থ হয়? ওই তো রং আছে প্রাণ-কুমারের বউর, সে কি রং নিয়ে ধুয়ে খাচ্ছে? চাই লক্ষ্মী-শ্রী। তোমার যে রং ময়লা, তা কি তুমিই কিছু কষ্টে আছ, না, আমারই রোজ বুক ফেটে যাচ্ছে?"

"আচ্ছা, বোঝা গেল রং ফরসা নয়। তবু কেমন কালো, আমার মত, না পাঁচীর মত, না"—

"আরে না না, এই ভদ্রঘরে যেমন হ'য়ে থাকে—এই ধর আমার মতন।"

নটবরের রং অম্বিকার চেয়ে ফরসা কি কালো, সে সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। অবস্থা-বিশেষে নটবর মনে করিত, তার রং অন্ততঃ অম্বিকার চেয়ে একটু ফরসা, এবং অম্বিকা মনে করিত ঠিক উল্টা। কিন্তু যখন মেজাজটায় প্রেমের মাত্রা একটু চড়িয়া থাকিত, তখন নটবর মনে করিত

অম্বিকা অন্ততঃ তার চেয়ে ফরসা, আর অম্বিকা ভাবিত যে নটবর স্বর্ণকান্তি সুপুরুষ। বর্ত্তমান সময়ে অম্বিকার সে অবস্থা ছিল না। কাজেই অম্বিকা বলিল, "বুঝলাম, তুমিই যখন এ কথা ব'লছো, তখন সে মেয়ে পাঁচীর চেয়েও কালো না হ'য়ে যায় না। আমি কালো বউ আর এ বাড়ীতে আনবো না।"

সেদিন সতীশের জন্ম হয়, সেই দিন হইতে অম্বিকা স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটি ফুটফুটে বউ তার আঙ্গিনায় ঘুর ঘুর করিয়া কাজ করিতেছে। সেই স্বপ্নটা এখন খুব জোর করিয়া তাহার অন্তরকে এই প্রস্তাবে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।

নটবর তার অভ্যস্ত রসিকতার সহিত নানা কথার অবতারণা করিয়া অম্বিকার এ বিদ্রোহ জল করিয়া দিল। বিশেষ করিয়া এই হাজার টাকায় যে কত কি অসম্ভব কার্য্য করা যাইবে, তাহার কল্পনায় অম্বিকা গলিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত অম্বিকা সম্মত হইল।

সতীশকে লইয়া প্রথম একটু বেগ পাইতে হইল। সে বার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছে। তার এখন বিবাহ করিবার মোটেই গরজ ছিল না। তার আশা ছিল যে, সে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া একটা মস্ত বড় চাকরী করিবে, এবং সময়ে উপাখ্যানের রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক লইয়া বিবাহ করিবে। সে বলিল, চাকরী না করিয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। তার শ্বশুর বাড়ীর পক্ষের লোক তাহাকে বুঝাইল যে, ভাল চাকরী করিতে হইলে তার পড়াশুনা শেষ করা দরকার। বিবাহ না করিলে তার পড়ার খরচ চলিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। কাজেই তাকে পড়া ছাড়িয়া এখনি চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। বরাতের খুব বেশী জোর থাকিলে, সে যে চাকরী পাইতে পারে, তার মুনাফা ৩০৲ টাকার বেশী হইবে না। পক্ষান্তরে, তাহার শ্বশুর তাহাকে যতদূর ইচ্ছা পড়াইবেন। কালে পাশ করিয়া সে ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি যা' ইচ্ছা তাই হইতে পারিবে।

সতীশ টলিল না।

তার পর একটু গোল হইল। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিয়া সতীশ পড়িত, তাঁর একটি নিকটতর আত্মীয় ঢাকায় পড়িতে আসিল। তাই তিনি প্রথমে সতীশকে বিবাহ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তার পর কিছু করিতে না পারিয়া পরিষ্কার বলিলেন যে, সতীশকে আর তিনি রাখিতে পারিবেন না।

সতীশ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। সে বাপের কাছে এক পয়সাও সাহায্য পায় না। এই বাড়ীতে থাকিয়া সে খায়, আর এক বাড়ীতে ছেলে পড়াইয়া তার নিতান্ত আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করে। এমনি করিয়া সে হাতে কিছু টাকা জমাইয়াছিল; তাহা সে নিঃশেষ করিয়াছে পরীক্ষার ফিস দিতে এবং একান্ত দরকারী খান কয়েক বই কিনিতে। এখন এ বাড়ী ছাড়িতে গেলে তার পড়া বন্ধ করিতে হয়। সে ভয়ানক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এ-দিক সে-দিক ঘুরিয়া সে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্যের জোগাড় করিল, কিন্তু তাতে তো কোথাও থাকা আর খাওয়া কুলায় না। কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে অনেক প্রকারে দরবার করিয়া একটা বৃত্তির চেষ্টা করিল, অনেক ঘোরাঘুরির পর প্রিন্সিপ্যাল অস্বীকার করিলেন।

হতাশ হইয়া সতীশ রমণার মাঠে গিয়া কাঁদিতে বসিল। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া সে মন স্থির করিয়া পিতার কাছে চিঠি লিখিল যে, তার পড়ার ব্যবস্থা হইলে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

বিবাহ হইয়া গেল। নটবর হাজার টাকার মধ্যে ৫০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া বাড়ীতে তার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত টিনের ঘর বেড়া ইত্যাদি করিল। রান্নাঘরটা নূতন করিয়া বাঁধিল, বাড়ী-ঘর-দুয়ারের সংস্কার করিল। তার পর প্রায় তিন শত টাকা ঋণ করিয়া সে বেশ সমারোহ করিয়া বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিল। বিবাহের সময় বৈবাহিক তাহাকে নগদ তিন শত টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা সতীশের নামে সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিবেন বলিলেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, সে টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে এখনো জমা হয় নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া নটবর তিনশো টাকা শেষ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না। এখন বউ লইয়া ঘর করিতে হইবে, তার কাছে নিত্য নিত্য অভাব অনাটন দেখানটা সঙ্গত হইবে না,—কেন না বউ সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে। কাজেই এ তিনশো টাকা হাতে রাখা ভাল। হাওলাতি তিনশো টাকার জন্য সে দুখানা ক্ষেত বন্ধক দিয়া তমঃশুক দিল।

(ক্রমশঃ)

জাপানী আর্টের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

মস্ত বড় একটা গাছের গুঁড়ি, তার উপর একটা ফড়িঙ্ বসে—এ একটা জাপানী ছবি, বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আঁকা। আমাদের এ ছবি দেখে সাধারণতঃই এ প্রশ্ন মনে উঠবে—"একটা গাছ আর একটা ফড়িঙ নিয়ে আবার ছবি! এর মধ্যে কি আর্ট আছে?" কিন্তু আমরা যদি জাপানী আর্ট বুঝতে চেষ্টা করি, তবে এ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠবে না।



হাইজিন

(আঠারো শতাব্দীর হকুসাইয়ের আঁকা। হাইজিন বা হাইকাই লেখক (ছোট কবিতা লেখক) রাস্তায় বা বাজারে ছোট ছোট কবিতা লিখে বিক্রী করে। আর্টে হকুসাইয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। সব বিষয়েই তিনি ছবি এঁকেছেন। জাপানী সাংসারিক জীবনের ছবি, ব্যঙ্গ চিত্র, সাধু, দেবতা, বীর প্রভৃতির ছবি তিনি এঁকেছেন। প্রাণী-চিত্রে তাঁর খুব হাত ছিল। তাঁর অসংখ্য দৃশ্য-চিত্র আছে।)

জাপানীরা কিছুকে ছোট বলে অবহেলা করে না; সমস্ত জিনিসের মধ্যে তারা এক মহা সৌন্দর্য্য অনুভব করে। নর-নারীর মধ্যে স্রষ্টার যে মহিমা প্রকাশিত হয়েচে, তা পশু-পক্ষী বা ছোট-ছোট কীট-পতঙ্গতেও প্রকাশিত হয়েচে। ছোট, বড়, সুন্দর, অসুন্দর, জাপানী আর্টিষ্টের কাছে সমান। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেচেন—"জাপানী শিল্পীর কাছে সুন্দর-অসুন্দর, স্বর্গমর্ত্ত্য সকলি সমান। গোচর, অগোচর সমস্ত পদার্থের মর্ম্ম গ্রহণ কর, এবং সেই মর্ম্ম-কথা সহজে, সুসংযত ভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ কর।"

তাদের রেখাঙ্কণের একটা ভাষা আছে। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, গাছ, পাথর প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসের character বা বিশেষত্ব প্রকাশ করার জন্য তারা বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করে। ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয়, calligraphy' জাপানী আর্টিষ্টের তুলির টানে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে। তারা তুলির দুই এক টানেই নিতান্ত নগণ্য বস্তুতে—যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; তাতে—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে। এ জিনিসটা পৃথিবীর অন্যান্য আর্টিষ্ট-দের কাছে পাওয়া যাবে না। অন্যান্য দেশের আর্টে একটা Psychology আছে; তাদের আর্টে তেমন কোনো একটা তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে না। তারা একটা কিছু তত্ত্ব হিসাবে আঁকে না। আঁকা বস্তুকে তারা ভালবাসে, এবং আঁকতে ভালবাসে তাই আঁকে।

জাপানী আর্টের এই তত্ত্বটি তাওপন্থীদের এক গল্পে সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছে।

অনেক প্রাচীন কালে লাংমেন পাহাড়ের থাদে কিরি নামে এক বনস্পতি বনের সমস্ত গাছকে

অনেক নীচে পাহাড়ের গুহায়, যেখানে রূপালী-রংয়ের ড্রাগন ঘুমাত, সেখানে তার শিকড় পৌঁছেছিল। একবার এক বড় ঐন্দ্রজালিক তা দিয়ে একটা বীণা তৈরী করল। এমনি বীণা তৈরী হল যে, কোন বড় ওস্তাদও সেটা বাজাতে পারবে না। চীনের সম্রাট সেটাকে যত্ন করে রেখে দিলেন। নানা দেশ থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত বীণকার এল, সেই বীণা



বাঘের ছবি

(পনেরো শতাব্দীর নোয়ামির আঁকা। তুলির বাঁকা লাইনের টানে বাঘের হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। বাঘ স্বাভাবিক নয়, কিন্তু তার স্বভাব সুস্পষ্ট।)

থেকে সুর বার করতে। বীণা পোষ মানল না,—কেবল একটা কর্কশ এবং ধিক্কারজনক ধ্বনি বেরুল। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল, তারা মাথা নীচু করে চলে গেল। সকলের শেষে এল পীউ—বীণকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী। যেমন অশান্ত ঘোড়াকে পোষ মানায়, তেমনি সে বীণাকে কোমল হস্তে স্পর্শ করল, এবং তার তারে ঘা দিল। সে বাজাল প্রকৃতির গান, ঋতুর গান, গিরি-কন্দরের গান, আর নির্ঝরের গান। বীণার পূর্ব্ব জন্মের বৃক্ষ-জীবনের স্মৃতি



মিচিজানের ছবি

(সিল্কের উপর আঁকা। শিল্পী—নবম শতাব্দীর বিখ্যাত কানোকা। মিচিজান সম্রাটের মন্ত্রী ছিল। তাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজের বাগানে গিয়ে পুষ্পিত প্লামগাছের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যায়; সে সময়ের তার বিখ্যাত কবিতা "প্লাম, তোমার প্রভু যদিও দূরে চলে যাচ্ছে, তবুও তুমি বসন্তকে ভুলো না।")

জেগে উঠল। বসন্তের নিঃশ্বাস যেন গাছের শাখায়-শাখায় বয়ে গেল, নির্ঝর ঝরঝর করে শিলায়-শিলায় ঘা খেয়ে

ছুটে চল্লো, গিরি উপত্যকায় ফুল ফুটে উঠল। তার পর, পর পর, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ও শীতের গান বাজাল।

শেষে বাজাল ভালবাসার গান। বনের শাখা-প্রশাখা দুল্‌তে লাগ্‌ল, সুন্দরীর মত এক খণ্ড হাল্‌কা মেঘ আকাশে ভাস্‌ল। সকলের শেষে যখন যুদ্ধের গান বাজাল, তর-



বানরের ছবি

(আঠারো শতাব্দীর সোসেনের আঁকা। সোসেন, জন্তু, বিশেষ ভাবে বানর আঁকার জন্য সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওসাকার বনে সোসেন অনেক দিন ফল মূল খেয়ে কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি বানরের জীবনযাত্রা লক্ষ্য কর্‌তেন।)

বারির ঝনঝনি, এবং ঘোড়ার খুড়ের শব্দ যেন শোনা গেল। লাংমেনের ড্রাগন তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল, বিদ্যুত চম্‌কাল, মেঘ গর্জ্জিল। বন জঙ্গল ভেঙে, বরফের প্রবাহ ভেঙ্গে পড়ল।

মোহাবিষ্ট সম্রাট পীউকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সে যে বীণা জয় কর্‌ল, তার রহস্য কোথায়? পীউ বল্ল, "মহারাজ,

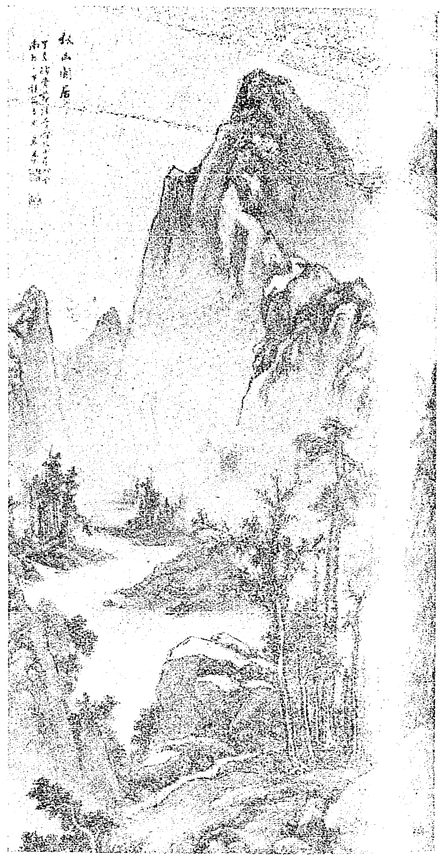

দৃশ্য চিত্র

(বর্ত্তমানের কোনো চিত্রকরের আঁকা। এ ছবি খুব উঁচু দরের নয়। পুরানো ছবিতে লাইনের যে জোর আছে, এ চিত্রে সে জোর নাই। হকুসাই, কোরিন প্রভৃতি পুরানো চিত্রকরের ছবির সঙ্গে তুলনা কর্‌লেই সেটা বোঝা যাবে।)

অন্যেরা বীণা বাজাতে ব্যর্থ হয়েচে, কেন না, তারা নিজেদের কথা বল্‌তে চেষ্টা করেছে। আর আমি বীণাকেই দিয়েছি তার গান বেছে নিতে; বাজাবার সময় আমার

খেয়াল ছিল না, যে বীণাটাই পীউ, কিংবা পীউ হচ্চে বীণা।"

জাপানীরা আর্টকে সাম্‌নে ধরে, নিজেকে আর্টের মধ্যে এগিয়ে দেয় না। এই গল্প থেকে সেটা বেশ সুন্দর বোঝা যায়।

তাদের মধ্যে একটি মৈত্রীভাব আছে, যা দিয়ে তারা বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে সুন্দর করে তুলেচে। জাপানীরা প্রকৃতই সৌন্দর্য্য-উপাসক। প্রাচীন গ্রীক্‌দের মধ্যে কেবল সেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা দেখতে পাই; তারা বল্‌ত—"gymnastic for the body and music for the soul"। তাদের আদর্শ ছিল, ভিতর ও বাহিরকে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়ে তোলা। প্রাচীন ভারতও খুব সৌন্দর্য্য-প্রিয় ছিল। গিরি-গুহার ভাস্কর্য্য ও চিত্র এবং কাব্য-নাটকাদির ভিতর দিয়ে, সেটা প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বোধ হয় সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তেমন গভীর ভাবে প্রকাশ পায় নি। যা পেয়েচে, সেটা একটা ধর্ম্ম-বোধের অঙ্গ হিসাবে।

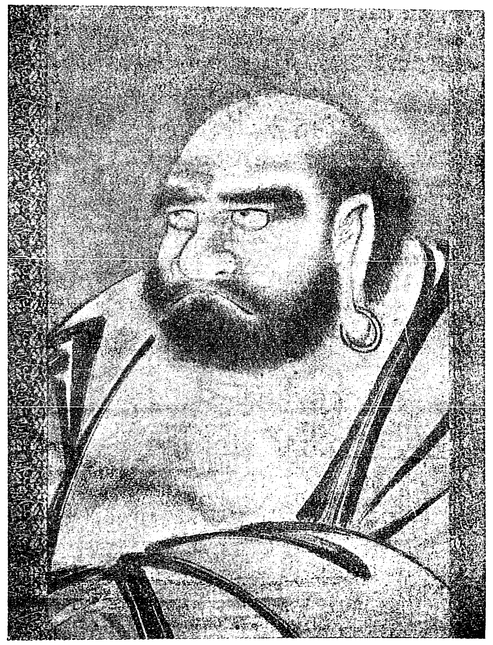

দরুম (ধর্ম্ম)

(পনেরো শতাব্দীর সোয়ামীর আঁকা। দরুম তাঁর চোখের পাতা কেটে ফেলেছিল। সোয়ামী কালীর কাজে (ink Sketch) পাকা ছিল)

জাপান দেশটা জাপানীদের সৌন্দর্য্যপ্রিয় করে তুলেচে। জাপান যেন একটি ছবির album। জাপানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাও, মনে হবে, যেন ছবির পাতা উল্টিয়ে যাচ্চ। উঁচু-নীচু জমির উপর আঁকা-বাঁকা রাস্তা, পাইনের বন, ঝরণা, ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়ের নীচে কুটীর, কুটীরের পাশে ছোট একটি বাগান; সমস্তই ছবির মত দেখায়। অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং মহিমা নিয়ে ফুজিসান গিরি-পদ্মের মত উঠেচে। ফুজিসান আমাদের "দেবতাত্মা হিমালয়ের" মত জাপানীদের মন অধিকার করেচে। কত কবির কাব্য, কত চিত্রকরের চিত্র ফুজিসান্‌কে অমর করেচে।

চন্দ্রমল্লিকায় যখন মাঠ ছেয়ে ফেলে, তখন জাপানীদের দেখা যাবে, নিস্তব্ধ ভাবে সবাই প্রকৃতির উৎসব দেখ্‌তে মিলিত হয়েচে। ধনী দরিদ্র সকলেই এই উৎসবে যোগ দেয়। এই দেখাটা যেন তাদের কাছে আহারেরই সামিল। তাদের জীবন-যাত্রার মধ্যে সহজ এবং সুসংযত ভাব আছে। তাদের গৃহ-সজ্জায় কোনো আড়ম্বর নাই, ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাদুর পাতা, দেওয়ালে কেবল একটি ছবি টানানো, এবং কুলুঙ্গির মধ্যে একটি ফুলদানি। এমন কি, যারা খেতে পায় না, তাদেরও ফুল রাখা চাই। আর্টিষ্টদের তারা খুব আদর করে। তারা আমাদের দেশের আর্টিষ্টদের মত ভাতে মরা নয়। জাপানে অসংখ্য চিত্রকর বর্ত্তমান। এক টোকিও সহরেই আটশত চিত্রকর আছে।*

সমস্ত প্রকৃতির সহিত এই মৈত্রীভাব জাপানীরা শিখ্‌ল কোথা থেকে? বুদ্ধদেব এই মৈত্রীভাব প্রচার করেছেন, আর তাদের দেশের আবহাওয়াও তাদের এই ভাব পুষ্ট করেচে।

* ভূমিকম্পের আগের কথা বলা হইতেছে।

তৃতীয় শতাব্দীতে চীনের পরিব্রাজকেরা জাপানে কনফুসিয়াসের ধর্ম্ম প্রচার করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সেই সময় থেকেই জাপানী আর্টের আরম্ভ।

জাপানের প্রাচীন চিত্রকরদের মধ্যে অনেক কোরিয়ান শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। সে সময় রাজকুমার শোটোকু (Slaotoku) তাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন। তিনি নিজের portrait আঁকিয়েছিলেন। নারাযুগে ৭০৯ খৃঃ হইতে ৭৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দর চিত্র হয়েচে। হরিউজি মন্দিরে এ সময়ে অনেক frescoe painting হয়েছিল। এগুলি আমাদের অজন্তার চিত্রের মত।

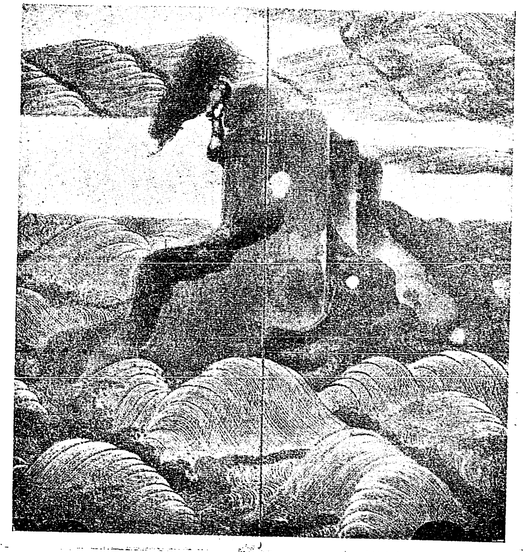

সমুদ্রের ঢেউ

(সতেরো শতাব্দীর কোরিনের আঁকা। কোরিনের সময় জাপানী আর্ট বিশেষ ভাবে জাপানের বিশেষত্ব পেয়েছিল। কোরিন অলঙ্কারিক শিল্পে (Decorative art) নূতনত্ব দিয়েছিল। এ ছবিতে পাহাড় এবং ঢেউয়ের অলঙ্কারিক দিকটা (Decorative Side) লক্ষ্য করার বিষয়।)

অজন্তার ১নং কুঠরীতে ঢোকবার দরজার বাঁদিকে বোধিসত্ত্বের যে মূর্ত্তি আছে, তার সঙ্গে হরিউজি মন্দিরের বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। জাপানী পত্রিকা কোকা এ সম্বন্ধে লিখেচে, "আমাদের হরিউজির বোধি-সত্ত্বের সহিত অজন্তার বোধিসত্ত্বের এত সাদৃশ্য আছে যে, আমাদের মূর্ত্তির আদর্শ অজন্তা থেকে নেওয়া হয়েচে; কিন্তু আমাদের মূর্ত্তির বর্ণ-সমাবেশ অজন্তার মূর্ত্তির বর্ণসমাবেশ অপেক্ষা অনেক নীচু রকমের।"

নারাযুগ বা বৌদ্ধযুগের পর আসল ইয়মাটো চিত্রকরদের যুগ। জাপানীরা প্রাচীন জাপানকে ইয়মাটো বলে থাকে। এই চিত্রকরদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত হল কানোকা, তিনি নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক portrait এবং দৃশ্য-চিত্র এঁকেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি "নাচির জলপ্রপাত।"—পর্ব্বত-শিখরের উপর শর্ব্বরী মেঘমগ্ন, ঝরণার জল, অনেক উঁচু থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়চে। নীচে পাইন বন।

তার পর টোসা চিত্রকরদের যুগ। এরা প্রধানতঃ দরবারের দৃশ্য ও সম্রাট ও ওমরাহদের ছবি আঁকত।

এর পর আসল সেসশু ও অন্যান্য চিত্রকরদের পালা। সেসশু একজন প্রতিভাবান এবং উঁচুদরের দৃশ্য-চিত্রকর ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত কানো চিত্রকরদের পালা আরম্ভ হয়। এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন বিখ্যাত শিল্পী কানো। এই শিল্পীরা জাপানের চিত্রকলাকে একেবারে হরণ করে নেয়,—আজ পর্য্যন্তও এদেরই জের চলেচে। এই চিত্রকরদের বিশেষত্ব হ'ল রেখার দৃঢ়তা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, এবং আলো-ছায়ার খেলা। এই তিনটী বিশেষত্বই হল জাপানীদের কাছে তাদের আর্টের বিশেষত্ব। তাদের ভাষায়, এই তিন বিশেষ অঙ্গকে বলে Finde no chicara tsuya o suni।

কানোরা প্রথম চীনে ধরণে দৃশ্য-চিত্র আঁকত।

কানোদের মধ্যে কোরিন, ওকিও প্রভৃতি আরও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কোরিন চিত্রকরেরা লাক্কার উপরে (Lacquer work) ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত। ওকিও চিত্রকরেরা খুব স্বাভাবিক করে ছবি আঁকতে পারত। এদের নাম জাপানীদের ঘরে ঘরে বিরাজ করচে। এদের মধ্যে সোসেন বানর আঁকার জন্য বিখ্যাত, আর ছিকাদো বাঘ আঁকার জন্য।

জাপান যখন প্রথম ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসেছিল, তখন জাপানীরা ইয়োরোপের চাকচিক্যে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে, তারা নিজের শিল্পকে অবহেলা করে ইয়োরোপের শিল্পকে বরণ করে নিয়েছিল। এদের মধ্যে গাহো হলেন প্রধান। তিনি ইয়োরোপে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্প শেখার জন্য। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি দৃশ্য চিত্র আঁকতেন। The spirit of Japanese art এর অধ্যাপক ইওনোগুচি তাঁর চিত্রকে রেলওের দৃশ্য-চিত্রকর টার্ণারের চিত্রের সহিত তুলনা করেছেন। ভারতীয় চিত্রে কোথাও দৃশ্য-চিত্রের স্থান নাই। কেবল রাজপুত চিত্রাঙ্কনে আছে—তা কেবল কোনও চিত্রের পশ্চাদ্ভাগ (background) রূপে অঙ্কিত হয়েচে। তার কারণ, আমরা আমাদের আর্টকে নরনারীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছি, আর জাপানীরা করেছে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে। আমাদের মানুষ সামনে, প্রকৃতি পিছনে; আর জাপানীদের প্রকৃতি সামনে, মানুষ পিছনে। মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যে তাদের কল্পনা কখনো উদ্বুদ্ধ হয় নি। মানুষের দেহ সম্বন্ধে তাদের কোনো মোহ নেই, সেজন্য জাপানী চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে নগ্ন নরনারীর মূর্ত্তি নাই।



শঙ্করের গৃহস্থালী

(রাজপুত ছবি (কাংরা স্কুল।)

জাপানী চিত্র বিশেষ ভাবে folk art বা জনসাধারণের চিত্র হয়েছিল উকিও চিত্রকরদের সময়ে। ভারতবর্ষে এত বড় folk art কখনো হয় নি। অজন্তার চিত্র ত মোটেই folk art ছিল না, তবে রাজপুত্র চিত্র folk art ছিল। মোগল চিত্রকে folk art বলা চলে না; কারণ, তাতে দরবারী গন্ধ আছে। কেবল বাংলা দেশের পটুয়াদের চিত্র খাঁটি folk art।

উকিও সম্প্রদায় স্থাপন করেন মাতাহেই। উকিওরা সম্প্রদায় টোসা চিত্রকরদের সমসাময়িক। উকিওরা কাঠের ব্লকে ছবি ছেপে পয়সা পয়সা হিসাবে এক একখানা বেচ্‌ত। বিষয় হল, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ব্যাপার, নাটকের অভিনেতা এবং সুন্দরী রমণীদের মূর্ত্তি। এসব ছবি মুটে, মজুর, কৃষক প্রভৃতি সাধারণ লোকেরা কিন্‌ত। পশ্চিমে উকিওদের কল্যাণে জাপানী চিত্র যথেষ্ট প্রচারিত হয়েচে। জাপানের শিল্পী মহলে উকিওদের বিশেষ আদর নাই, তারা বলে এগুলি ছাপা জিনিস, আর্টের খাঁটি জিনিস নয়।

এখন জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হচ্ছেন, টাইকন সান্। তিনি ভারতবর্ষে একবার বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সহিত তাঁর বন্ধুত্ব আছে। টাইকন সান্ অবনীন্দ্র নাথের বাড়ীতে অনেক দিন কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর শিল্পই জাপানী শিল্পকে ইয়োরোপের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাঁর কাছে অনেক শিল্পী শিক্ষা পাচ্চে। ইয়োরোপের প্রভাবে আচ্ছন্ন জাপানের সাম্‌নে যিনি প্রথম জাপানী শিল্পের মহিমা কীর্ত্তন করে, তার আদর্শকে উঁচু করে ধরেছিলেন, যাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে টাইকন সান্ প্রভৃতি জাপানী প্রথায় আঁকতে থাকেন, তিনি হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত কাউণ্ট ওকাকুরা। জাপানী আর্ট সম্বন্ধে তাঁর বই হল "Ideals of the East" এবং "The book of ten"। বছর কয়েক হবে এই মহাত্মার মৃত্যু হয়েচে। জাপানের আর্টের এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে, আমাদের বাঙ্গালা দেশের আর্টের যে নূতন আন্দোলন সুরু হয়েচে, তার তুলনা চলে। ওকাকুরা ও টাইকন সানের ন্যায় আমাদের ইয়োরোপীয় প্রভাবিত বাংলার সাম্‌নে যাঁরা ভারতীয় আর্টের মাহাত্ম্যকে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত হ্যাভেল সাহেব ও আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ।

একদল ইয়োরোপীয় চিত্রকরের উপর জাপানী আর্টের প্রভাব পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়কে Impressionist বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের একজন জগৎ-বিখ্যাত শিল্পী হলেন Whistler। জাপানী আর্টে এই Impressionism খুব বড় একটা দিক। এর মানে হচ্চে, কোনো জিনিষ দেখে আমাদের মনে যে ভাব হয়, তার impression বা ছাপ দেওয়া। গাছ বা একটা কিছু সাম্‌নে দেখ্‌চি, সেটাকে ঠিক নকল করে আঁকাকে impression বলে না, সেটাকে হয় ত বিশেষ কোনো একটা ভাবে দেখ্‌চি, সেই ভাবটাকে আঁকা। যেমন মনে করুন, গাছটাকে দেখ্‌চি যেন একটা পাখীর মতন, তখন গাছের সমস্ত details বা খুঁটি নাটি সব কমিয়ে দিয়ে সহজে সংক্ষেপে সেই দেখাটাকে আঁকতে হবে। একজন লেখক Impressionismএর মূল তত্ত্বটিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন :—"L' art d' ennuyer est de tout dire" অর্থাৎ সমস্ত জিনিস বলতে গেলে আমাদের মন ক্লান্ত হয়, তাই অপ্রধান অংশ চেপে গিয়ে মূল কথাটি কেবল প্রকাশ করতে হবে। জাপানী কবিতার মধ্যেও এই Impressionism পাওয়া যায়; যেমন একটি জাপানী কবিতা :—

Asagoo
Tswmbe torarete
Morai midza
আশাগাও মোর,
ঢাকিল গাগরী,
আমি জল মাগি ফিরি।

একটি মেয়ে ভোর বেলায় কূয়া থেকে জল তুলতে গিয়েছে; গিয়ে দেখে জল তোলার পাত্রটি আশাগাও নামে ফুলের লতা ঢেকে ফেলেছে। সে আর ফুল লতা পাতা ছিঁড়ে ফেলে, কলসীটাকে তা থেকে বাঁচিয়ে জল তুলতে গেল না, অন্য যায়গা থেকে জল যোগাড় করে নিল। এই উপলক্ষে সে এই কবিতাটি লিখ্‌ল। এ ধরণের ছোট কবিতাকে হাইকাই বলে। যারা হাইকাই লেখে, তাদের বলা হয় হাইকিন। সমস্ত ভাব এবং রস গ্রহণ করতে জাপানীদের পক্ষে ছোট ছোট দু চারটি কথাই যথেষ্ট। সমস্ত ভাব, এই অল্প কথার মধ্যেই তারা দেখ্‌তে পায়। তাদের ভাষায় এই যে সংযম,—চিত্রেও সেই সংযম, চরিত্রেও সেই সংযম।

ভারতবর্ষ

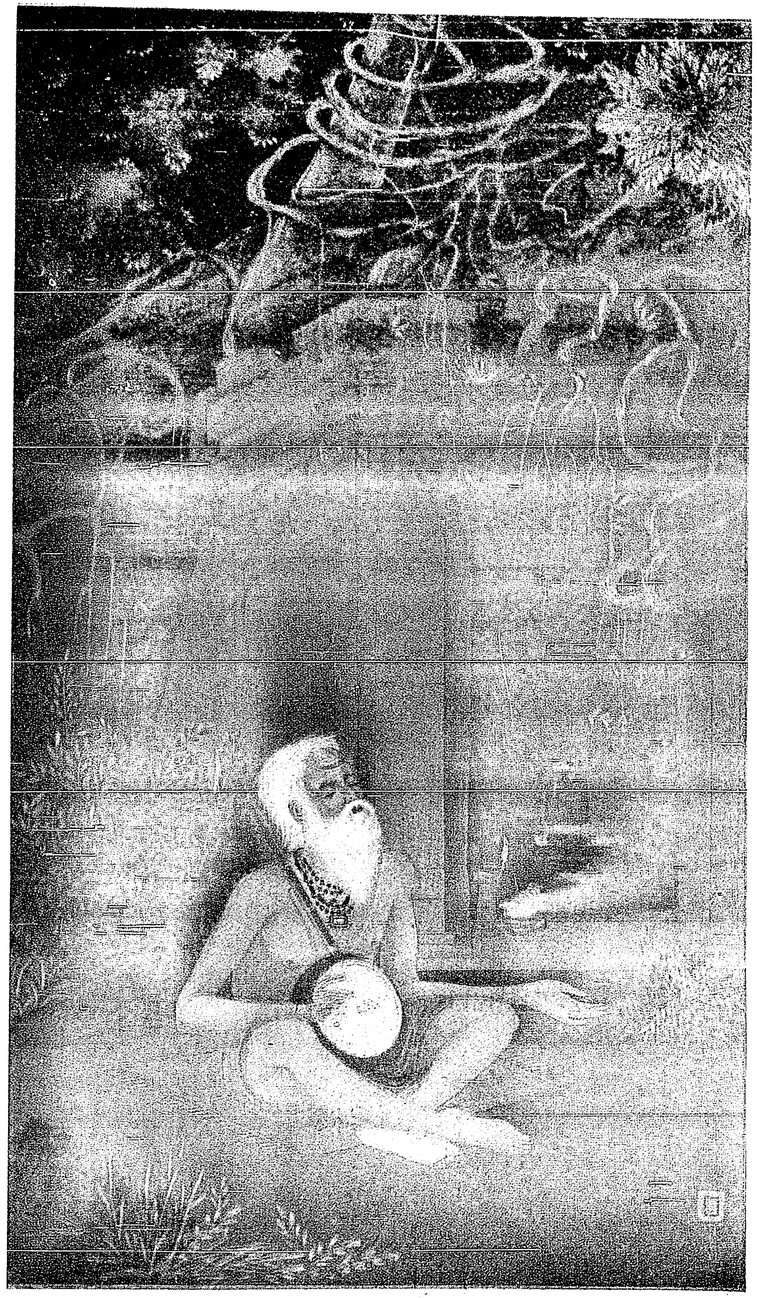

আরাধনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের খনি-বিভাগ ও উহার অধ্যাপক রবার্টন্

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল এ-এম, আই-এম্-ই

শিবপুর কলেজের খনি-বিভাগ ইংরাজী ১৯০৫ সালে প্রথম খোলা হয়; উদ্দেশ্য, খনিবিদ্ সৃজন করা। ফলে, ভারতবর্ষের খনিগুলি, বিশেষতঃ কয়লার খনিগুলি, সুপদ্ধতিমত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিঃশেষিত হইবে। সুশিক্ষিত কার্য্যক্ষম ম্যানেজারের অভাবে একটী কয়লার খনি হইতে সমস্ত কয়লা উত্তোলন করা অসম্ভব; কাঁথি ইত্যাদিতে অনেক কয়লা থাকিয়া যায়। অপিচ, খাদ বসিয়া যাওয়া বা উহাতে আগুণ লাগা হেতু অকালে খনিটিকে বন্ধ করিতে হয়। ইহাতে যে কেবল খনির স্বত্বাধিকারীর ক্ষতি তাহা নহে, ইহা জাতীয় ক্ষতি। কারণ, কোন এক দেশে উহার খনিজ সম্ভার মাত্র একবার উত্তোলিত হইয়া থাকে। জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইলে উহাতে সার দিয়া প্রতি বৎসরে সমপরিমাণ ফসল উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু কোনরূপ সার প্রয়োগে দেশের খনিজ পদার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা বাতুলতা। দেশের খনিজধন উহার জাতীয় ইতিহাসে একবার, মাত্র একবার, ব্যবহৃত হইতে পারে। ফুরাইলে পুনঃপ্রাপ্তির আশা বৃথা।

উদ্ভিদ চাপা পড়িয়া কয়লার উৎপত্তি। খনিবিদেরা স্থির করিয়াছেন, ১ ফুট কয়লাস্তর উৎপাদনোপযোগী উদ্ভিদ জন্মিতে ৫০০ বৎসর সময়ের প্রয়োজন এবং উহা বহুকাল ভূগর্ভে থাকিলে তবে কয়লাতে পরিণত হয়। প্রকৃতি ঠাকুরাণী মানবের হিতার্থ কতকাল ধরিয়া কত আয়াসে একটী কয়লারখনি সৃজন করেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনভিজ্ঞ ম্যানেজারের দোষে ঠাকুরাণীর এত চেষ্টা মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হয়। সুতরাং খনি-নিঃশেষের সময় যাহাতে খনিজ পদার্থ একটুও নষ্ট বা উহার একটুও অপব্যয় না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সকলের কর্ত্তব্য।

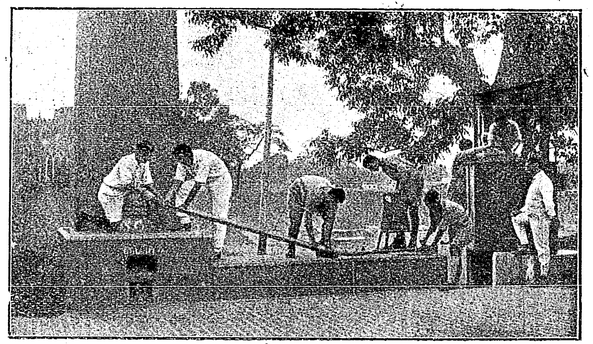

চরনপুর কয়লাখনিস্থ আপকার চানকের নিকটে অধ্যাপক রবার্টন্ ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ

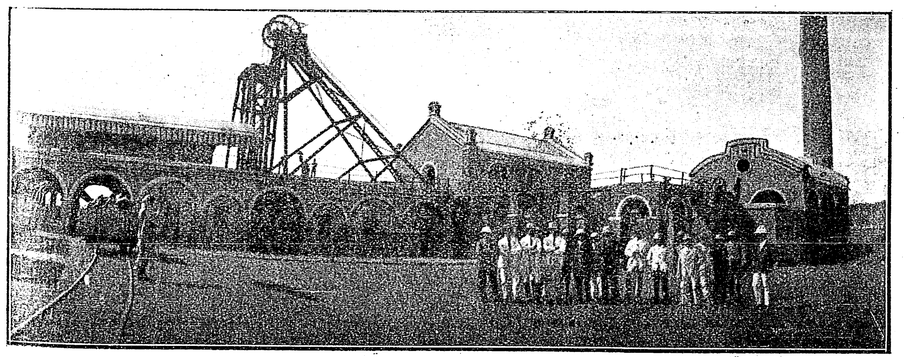

Coal Distillation Plant.

অতএব ম্যানেজারের খনিবিদ্যার জ্ঞান থাকা দরকার। এতন্নিমিত্ত সরকার ১৯০৫ সালে শিবপুর কলেজে কয়লার খনি ও অন্যান্য

ধাতুর খনি বিষয়ে শিক্ষা দিবার একটী বিভাগ খোলেন, এবং রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাভূমিতে প্রথমোক্ত খনি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিত ই, এইচ্, রবার্টন্ শিবপুর কলেজস্থ খনি বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ঐ আসন গত ১৭ বৎসর অলঙ্কৃত করিয়া, গত ২রা জানুয়ারি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

খনিবিদ্যা ও ভূবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আরও কলেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ধানবাদে এরূপ একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে অনেকদিন হইতে শোনা যাইতেছে। ভাবী কলেজের অধ্যক্ষও বিলাত হইতে আসিয়াছেন।

অধ্যাপক রবার্টন্ যদিও ইংলণ্ডে ইয়র্কশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন, তত্রাচ তাঁহার বাল্যজীবন ও যৌবনের অধিকাংশকাল বারমিংহামে



অধ্যাপক ই, এইচ্, রবার্টন্, বি,এ, (অক্সন); এম্, এস্‌সি (বারমিং); এস্, আই, এস্, ই; এফ্, জি, এস্

অতিবাহিত হয়। কারণ, তাঁহার পিতা স্থানীয় একটী বৃহৎ যাজকপল্লীর পাদ্রী ছিলেন। পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী খনক-শ্রেণীর (Miners) লোক। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লিথ্ স্কুলে সম্পন্ন হয়। ঐ স্কুল হইতেই তিনি গণিতবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য বৃত্তি পান। উহা পাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি স্কুলের বালকেরা প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন, এবং উহার B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অক্সফোর্ড হইতে তিনি বারমিংহামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ও উহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিবিভাগে শিক্ষার্থী রূপে প্রবিষ্ট হন, এবং তথাকার M. Sc উপাধি পান। তিনি বিখ্যাত সিটনডেলাভেল খনিতে শিক্ষানবীশ ছিলেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক রেডমেন তখন ঐ খনির পরিচালক। যখন অধ্যাপক রেডমেন বারমিংহামে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য রবার্টন্‌কেও ঐ বিদ্যালয়ের Lecturer Demonstrator রূপে লইয়া যান। বারমিংহাম হইতে রবার্টন্ সাহেব শিবপুর কলেজে অধ্যাপক রূপে আগমন করেন।

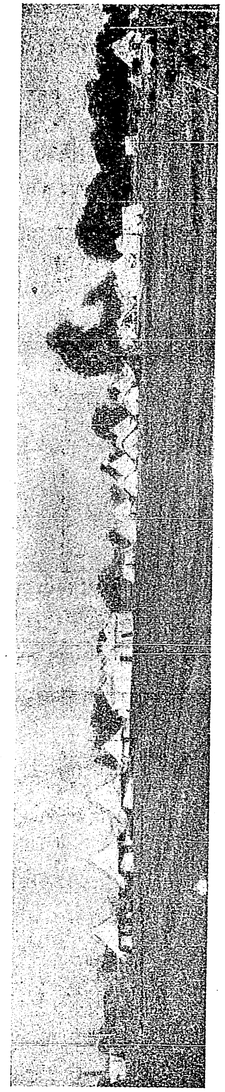

শঙ্করপুর কয়লার খনি অধ্যাপক রবার্টসের তাঁবু বসিবার ঘর ছাত্রদের তাঁবু নিঃ মণ্ডলের তাঁবু শঙ্করপুর খনিবিদ্গণের তাঁবু ১৯২৩

তিনি কলেজে ব্যায়াম-পটু ছিলেন। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে কলেজের জন্য সর্ব্বদা খেলিতেন, এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও অনেকবার খেলিয়াছেন; যদিও অল্পের জন্য তিনি অক্সফোর্ডের পরিচায়ক নীলবর্ণের চিহ্ন পরিধান করিবার অধিকার পান নাই। শিবপুর কলেজে অধ্যাপনা কালেও তিনি কলেজের হইয়া অনেকবার খেলিয়াছেন।

১৯০৫ সালে তিনি শিবপুর কলেজে B. E. College Mining Society নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। প্রথমে মাত্র উহার ১৫ জন সভ্য ছিল। এখন কলেজের খনিবিভাগের বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রগণের অধিকাংশই উহার সভ্য। তা' ছাড়া কয়লাকুঠীর অনেক ম্যানেজারও ইহার সভ্য। অধ্যাপক রবার্টন্ ১৮বৎসর ধরিয়া এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ইহার জন্য কিরূপ যত্ন লইতেন, তাহা যাঁহারা একবার ইহার কোন একটী সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন। প্রতি বৎসর ছাত্রেরা কয়লাভূমিতে তাঁবুতে অবস্থান কালে খনির কলকব্জা ও পরিচালন-পদ্ধতি দেখিয়া প্রত্যেকে নোট-বই লিখে। উৎকৃষ্ট নোট-

যে লেখককে সমিতির তরফ হইতে প্রতি বৎসর ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়। এই টাকা অধাপক রবার্টন্ দান করেন। ঐ সমিতি হইতে আরও তিনটি পারিতোষিক দেওয়া হয়।

সমিতি একটী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটী ১৮ বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। উহা ছাত্রদিগের দ্বারাই পরিচালিত। এটা কম কথা নয়।

অধ্যাপক রবার্টন্ ভারতবর্ষে আসিয়াই Transactions of the Mining and Geological Institute of India নামক বিখ্যাত পত্রিকার Editor নিযুক্ত হন। পরে ৫ বৎসর ঐ Instituteএর Secretary ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি উহার সহকারী সভাপতি। প্রবন্ধ লেখার জন্য ঐ Institute তাঁহাকে দুইবার সুবর্ণ পদক দান করেন।

তিনি নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন:—

"The Action Influence and Control of the roof in Longwall Workings." (Prize from the North of England Institute of Mining Engineers).

"The Problem of Dynamic Balance".

"The Experimental Mine at Birmingham University",

"The Development of Machinery in Mining".

"The Problem of Deep Mining".

"Methods of Working Coal".

"The Cementation Process of Shaft Sinking".

"Notes on the Manufacture of Briquettes." (Gold Medal, Mining and Geological Inst. of India).

"A Method of Working a thick steep Coal Seam". (Gold Medal, Mining and Geological Inst. of India.)

"Coal Mining" (শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত)।

"Mine Surveying" ঐ

চানকের কাঁধির (Shaft pillar) পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহার কৃত একটী সূত্র আছে, নাম রবার্টনের সূত্র। সূত্রটী সুফলপ্রদ।

শিবপুর কলেজের খনিবিভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত ২৪৮ জন ছাত্র বাহির হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩১জন Colliery Managers, 1st Class Certificate এবং ৭৩ জন 2nd Class Certificate পাইয়াছেন। সকলেই তাঁহার ছাত্র।

তাঁহার অধ্যাপনার প্রশংসা এক মুখে করা যায় না। বোর্ডে নানা বর্ণের খড়িমাটী দ্বারা দ্রুত সুন্দর চিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। একক তিনি Coal Mining, Mining Engineering, Metal Mining, Geology এবং Mineralogy এই এতগুলি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

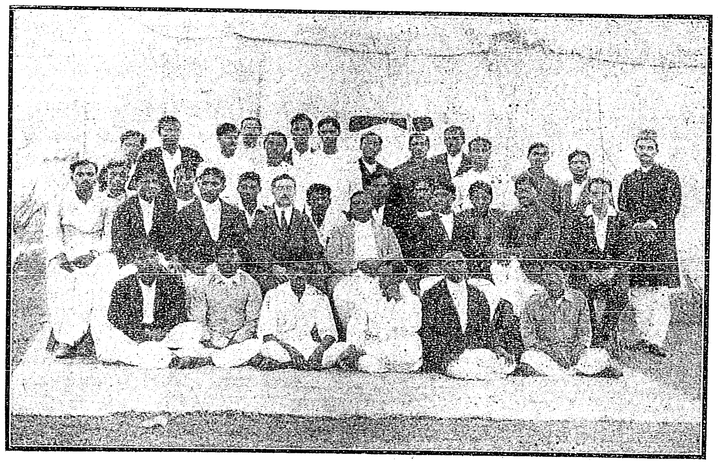

অধ্যাপক রবার্টন্ ও তাহার ১৯২৩ সালের ছাত্রবৃন্দ

খনি-বিদ্যার জটিল তত্ত্বগুলি অতি সহজ ভাষায় বুঝাইতে তিনি অদ্বিতীয়। Laboratoryর অনেক কাজ তিনি ছাত্রদিগের দ্বারা করাইয়া লইতেন। Mining Shed ছাত্রদিগের দ্বারা নির্ম্মিত; Baring Plant টীও তাহারা খাড়া করিয়াছে। একটী Coal Distillation Plant আছে, তাহার প্রায় সমস্তটী ছাত্রেরা গড়িয়াছে, মায় বনিয়াদ কাটা, কন্‌ক্রীট করা পর্য্যন্ত। কোন একটী যন্ত্র ভাঙ্গিলে উহা মেরামত করিবার জন্য হঠাৎ তিনি কারখানায় পাঠাইতেন না, আগে শিক্ষার্থীদিগকে মেরামত করিতে বলিতেন। Shed এর দুইদিকের ভারের বেড়া ছাত্রদিগের দেওয়া।

যে দুইমাস ছাত্রেরা জরিপ শিক্ষা করিবার জন্য কয়লাভূমিতে তাঁবুর মধ্যে বাস করে, সেই সময়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ছাত্রদিগের তাঁবুতে আসেন, এবং হয় তাহাদের তাস পাশা খেলা দেখেন, না হয় একটু হারমোনিয়াম বা বেহালা বাজান। তাঁহার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগের তাঁবুতে সিগারেট ও বহু মাসিক পত্রিকা পাঠাইয়া দেন। তাঁবুতে অবস্থান কালে প্রায়ই ছাত্রবৃন্দকে চার পাঁচ মাইল দূরে কোন

কয়লাখনি দেখিতে যাইতে হয়। ঐ স্থানে গমনের প্রারম্ভে তিনি মানচিত্র দেখিয়া যাইবার একটী দিক স্থির করিয়া লন, তার পর সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করেন; তা' নদীই থাকুক বা নালাই থাকুক অথবা জঙ্গলই সম্মুখে পড়ুক, উহা অতিক্রম করিয়া চলাই তাঁহার অভ্যাস। তাঁহার Geological excursion একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রায় ৫০জন যুবকের অগ্রে অগ্রে অধ্যাপক দ্রুত গতি চলিয়াছেন, এবং যেস্থানে বুঝাইবার আবশ্যক তথায় দাঁড়াইয়া শিক্ষার্থীদিগকে বুঝাইতেছেন। অতি কম ছাত্রই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিত, এত দ্রুত তিনি হাঁটিতেন। কাঁটা বা জঙ্গল কিম্বা জল অথবা নদী কিছুতেই তাঁহার ঈপ্সিত স্থানে গমনে বাধা দিতে পারিত না। লেখক প্রায় সকলের পশ্চাতে চলিত। একদা তিন চার বার লেখকের জন্য অপেক্ষা করিয়া হতাশভাবে ছাত্রদিগের নিকট বলিয়াছিলেন "Mr. Mondol has many things to carry"। লেখকের শরীর একটু স্থূল। অধ্যাপকের কথা সদাই রসিকতাপূর্ণ।

১৬ই জানুয়ারি খনিবিভাগের পুরাতন ছাত্র এবং কলেজের সমস্ত বিভাগের ছাত্রেরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দান করেন। কলেজের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই উপস্থিত ছিলেন, এবং কয়েকজন পুরাতন ছাত্রও আসিয়াছিলেন। বাহিরের কয়েকটি ভদ্রলোক আগমন করিয়াছিলেন। সভায় অধ্যাপক বলিয়াছেন যে, যদিও তিনি কলেজ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তত্রাচ তিনি মধ্যে মধ্যে আসিবেন, এবং Mining Societyর কাজে যোগদান করিবেন। এখন তিনি Messrs. Anderson Wright নামক কোম্পানির অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন এবং ভারতবর্ষেই থাকিবেন। কলেজে অধ্যাপকের একটী তৈলচিত্র রাখিবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়, এবং তাঁহার পুরাতন ছাত্র বাগডিঘি খনির ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় টাকা সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। আশা করি তাঁহার পুরাতন ছাত্রেরা গুপ্ত মহাশয়ের নিকট অর্থসাহায্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

রবার্টস্ সাহেবের কলেজ পরিত্যাগে শিক্ষা-বিভাগের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু খনি ব্যবসায় একজন বিচক্ষণ কর্ম্মকুশল ব্যক্তি পাইল।

মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ?

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"(৭) শরৎ বর্ণনা। কালিদাসের "শরৎ বর্ণনা" এবং রবীন্দ্রের "বঙ্গে শরৎ" শীর্ষক কবিতা একই ভাব-দ্যোতক। আপনারা "হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ তোমার বিমল প্রভাতে" ইত্যাদি রবি বাবুর কবিতা কালিদাসের "শরৎ বর্ণনা"র সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, উভয়ে এক প্রকৃতিই চিত্রিত করিয়াছেন।"

কবিভূষণ মহাশয়ের কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈষম্য থাকিলেও—সৌসাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে। তাই বিভিন্ন প্রদেশের কবিরা একই ঋতুর বর্ণনা করিলেও—উহাতে যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ বর্ণনার সাদৃশ্য দর্শনেই যদি ঐ কবিদিগের সকলকেই এক দেশীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়,—তাহা হইলে ভারবি, ভর্ত্তৃহরি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি শরৎ-বর্ণনা-কারী কবিগণকে বাঙ্গালী বলিয়া, কিংবা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে হিন্দুস্থানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অতঃপর কবিভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী "ভৌগোলিক" প্রমাণও দর্শাইয়াছেন—

"(১) সেই দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি, যে দেশের উল্লেখ তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রথমেই করিয়াছেন, যে স্থানকে স্মৃতিপথে রাখিয়া তাঁহার কবিত্বের উৎস প্রথম প্রস্ফুরিত হইয়াছে।

"কবিদের ইহা বিশ্বজনীন রীতি যে, তাঁহারা আজন্মবৎ রচনা করিয়া থাকেন—নিজের বাসস্থানই নায়কের বাসস্থান। অথবা নিজের বাসস্থান বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রধান নগরের ছায়াই নায়কের বাসস্থানে, এবং নিজের জীবন চরিত্রের ছায়াই নায়কের চরিত্রের কায়া করিয়া থাকেন। ইহার ইংরাজি নাম—Transfiguration of the Author.

"কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে অযোধ্যার বর্ণনা না করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমেরই প্রথম বর্ণনা করিয়াছেন; বশিষ্ঠাশ্রমকে স্মরণ করিয়াই তাঁহার কবিত্বের উৎস প্রথম বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠাশ্রমের বর্ত্তমান নাম রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী—৺তারাপীঠ। এই স্থান ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি "ঘোষবৃদ্ধ" ও "শালিগোপ" নামক গোপজাতিদ্বয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কপিলাশ্রম—বর্ত্তমান নাম চাকটা—চক্রতীর্থ ও কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গ সিঙ্গড়ি গড্ডা পাঁচথুপির নিকট। তৃতীয় কর্ণমুনির আশ্রম—বর্ত্তমান নাম কাণসোণা, কাটোয়ার উত্তর। চতুর্থ সোমতীর্থ—চক্রতীর্থের নামান্তর, এখানেই পূর্ব্বে কামনাসাগর ছিল। পঞ্চম মেধস মুনির আশ্রম (ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানের মতে রঘুকার কালিদাসের নামান্তর মেধস মুনি) বোলপুর ষ্টেসনের নিকট। এইরূপে পাওয়া গেল—রামপুরহাট, কাণসোণা, চাকটা, বোলপুর—এই চতুষ্কোণ ভূভাগের মধ্যে—মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি ছিল।"

কবিভূষণ মহাশয় কবিদিগের সে বিশ্বজনীন (?) রীতির কথা লিখিয়াছেন, উহার যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা বোধ হয় এই হইবে যে, কবির বর্ণিত মনোরম্য স্থানসমূহে তাঁহার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি'র এবং তাঁহার বর্ণিত মহনীয় নায়ক-চরিত্রে তাঁহার নিজ চরিত্রের অল্পাধিক ছায়া-পাত না হইয়া যায় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সুবিধা বা সুযোগ না ঘটিলে এরূপ করা যায় না। কুমারসম্ভব বা মেঘদূত কাব্যে কালিদাসকে বাধ্য হইয়াই যথাক্রমে হিমালয় ও রাম-গিরির বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিতে হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালী হইয়া থাকিলেও, ঐ দুই কাব্যে তিনি ঘুণাক্ষরেও বঙ্গদেশের কোনও প্রসঙ্গ উল্লেখ করার সুযোগ পান নাই। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় এবং ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজগণের বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি বহু দেশেরই নামোল্লেখ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কোনও দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া, নিজের জন্মভূমি সূচিত করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার্য্য বটে। কবিভূষণ মহাশয় তাহার ২নং ভৌগোলিক প্রমাণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং আমরাও সেখানেই আমাদিগের বক্তব্য বিবৃত করিব। এখানে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, আমরা পুরাতত্ত্ববিৎ নহি; বরং পুরাতত্ত্বের নাম শুনিলে একটু ভয়ই পাইয়া থাকি। কবিভূষণ মহাশয় একটি ক্ষুদ্র প্যারার মধ্যে, কোনও রূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়াই, এক নিশ্বাসে পাঁচ-পাঁচটী প্রাচীন ও অজ্ঞাত আশ্রমের যে স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা উহা পড়িয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। যাহা হউক, কোন মতেই অনধিকার চর্চ্চা কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়াই, কবিভূষণ মহাশয়ের এই সেনাক্ত-করণের (Identification) দোষ-গুণের বিচার ভার বিশেষজ্ঞদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া, তর্ক স্থলে কবিভূষণ মহাশয়ের অন্যান্য সেনাক্তগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, 'পঞ্চম মেধস মুনির আশ্রম' সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে রঘু-কার কালিদাসের নামান্তর 'মেধারুদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয়ের পুস্তিকার প্রারম্ভে "মহাকবি কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থা" নাম দিয়া প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, উহার নিম্নের বিবরণেও 'ত্রিকাণ্ডশেষের মতে কালিদাসের নামান্তর মেধারুদ্র।"—এইরূপই লিখিত হইয়াছে। এ অবস্থায় এখানে 'মেধারুদ্র' নামের পরিবর্ত্তে 'মেধস মুনি' লিখিত হইল কেন? 'মেধারুদ্রই যে 'মেধস মুনি' ইহার অনুকূলে কি প্রমাণ আছে? ইহা বলাবাহুল্য যে, অন্যান্য স্থানগুলির পূর্ব্বোক্ত সেনাক্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তদ্দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয় না। কালিদাস ইচ্ছা করিলেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন আকর গ্রন্থের উক্তির ব্যতিক্রম করিয়া বশিষ্ঠ, কণ্ব মুনি প্রভৃতির সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না; এ অবস্থায় যদিই বা তাঁহাদিগের আশ্রম বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যে পতিত হইয়া থাকে,—তাহা হইলে তিনি তাহা এড়াইবেন কি প্রকারে? কিন্তু যে পর্য্যন্ত "মেধারুদ্রই 'মেধস মুনি' বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত না হইবেন, এবং ত্রিকাণ্ডশেষের উল্লিখিত 'মেধারুদ্র' নামটী মহাকবি কালিদাসের নামান্তর বলিয়া চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত না হইবে—সে সময় পর্য্যন্ত কবিভূষণ মহাশয়ের এই উক্তি-মূলে কোনরূপ অনুমান করাই সঙ্গত হইবে না। আরও একটা কথা এই যে, এক দেশীয় লোকের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অন্য দেশে যাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করা এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তথায় তাঁহার স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। কাশীতেও ত শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; তাই বলিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানী মনে করিতে হইবে কি? কালিদাসের ন্যায় মহাকবি সর্ব্বত্রই পূজ্য। তাই, তর্কস্থলে উক্ত প্রতিমূর্ত্তি কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থার মূর্ত্তি বলিয়া মানিয়া লইলেও তদ্দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব

প্রমাণিত হয় না। ইহা দ্বারা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময়ে তদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মার অসাধারণ গুণবত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল—কেবল এইমাত্রই অনুমান করা যাইতে পারে।

কবিভূষণ মহাশয় রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে "ঘোষবৃদ্ধ" ও 'শালিগোপ' নামক গোপ জাতিদ্বয় বর্ত্তমান আছে বলিয়া লিখিয়াছেন! তিনি ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিলে, এই গোপজাতিদ্বয়ের ঐরূপ বিচিত্র নাম ধারণের রহস্য জানা যাইতে পারিত। এই ঘোষ-বৃদ্ধ গোপজাতির সহিত রঘুবংশের ১ম সর্গের "হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্। নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥" শ্লোকের বর্ণিত 'ঘোষবৃদ্ধ'দিগের কি সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সংস্কৃত 'ঘোষ' শব্দের অর্থ 'আভীর-পল্লী' অর্থাৎ গোয়ালাদিগের পাড়া। ঐ পাড়ার বৃদ্ধ ও বহুদর্শী গোপদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কালিদাস 'ঘোষবৃদ্ধান্' পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। রাজা, জমিদার প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদিগকে ভেট দিতে হইলে, স্বভাবতঃ গ্রাম-বৃদ্ধেরাই ঐ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অজ্ঞাত বৃক্ষাদির নাম জানিতে হইলে, এই বৃদ্ধদিগের নিকটেই উহার জিজ্ঞাসা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই উভয় কারণেই কালিদাস 'ঘোষবৃদ্ধান্' এই সুপ্রযুক্ত শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে কোনও 'গোপজাতি-বিশেষ' অর্থ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন—"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ং। আকুমার কথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥" এস্থলে 'শালিগোপ্যঃ' পদটী "শালীগোপী" এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনের পদ। উহার অর্থ—শালি-ধান্য-ক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্রী নারীগণ। 'গাথা-সপ্তশতী' 'আর্য্যা-সপ্তশতী' প্রভৃতি বাস্তব (realistic) কাব্যগুলিতে বহু স্থলেই এই ক্ষেত্র-রক্ষা-কর্ত্রী নারী-দিগের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই কার্য্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ইহাদিগের সহিত 'গোপ' বা 'গোপী' অর্থাৎ 'গয়লা' বা 'গোয়ালিনী'-দিগের কোনই সম্পর্ক নাই। কবিভূষণ মহাশয় বোধ হয় শুধু নাম-সাদৃশ্য দর্শনে ভ্রান্ত হইয়াই 'ঘোষবৃদ্ধ' ও 'শালিগোপ' (?) শব্দ দুইটীকে গোপজাতিদ্বয় বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, 'ভারতবর্ষে'র কোনও পাঠক যদি রামপুরহাট অঞ্চলের 'ঘোষবৃদ্ধ' ও 'শালিগোপ' নামক গোপজাতিদ্বয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ঐ বিচিত্র নামের রহস্য জানা যাইতে পারিবে।

"(২) কোনও কবি, কোনও লেখক, কোনও ঐতিহাসিক কখনও নিজের জন্মভূমি শত্রুতে জয় করিতেছে, এ কথা লিখিতে পারেন না। অতএব সেই দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি, যে দেশের উল্লেখ তিনি রঘুর দিগ্বিজয়ের মধ্যে করিয়াছেন, অথচ সেই দেশে রঘু কর্ত্তৃক বিজয় বর্ণনা তিনি করেন নাই।"

কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার এই প্রমাণ সূত্রটীর প্রয়োগ দেখাইতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কালিদাস নিজেই "কুমারে" হিমালয়ের বর্ণনা

"(৩) "সাহিত্য সংবাদ' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৮, "ভারতবর্ষ" আষাঢ় সংখ্যা, ঐ সাল এবং অনেক ইংরেজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলাম যে বলোমোর গাঁ—মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি ছিল।"

"তাহার পরে পুনরায় আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য অনুসন্ধানে জানিলাম—কালিদাসের জন্মভূমি মযূরাক্ষীর দক্ষিণ তীরে নহে, ইহার উত্তর তীরে এবং সিংহের গর্ত্ত নামক গ্রামে। এই সিংহের গর্ত্ত নামক গ্রামই বর্ত্তমানে "সিঙ্গড়ী গর্ড্ডা"—ইহাই বাহ্য সাক্ষ্যে এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে কালিদাসের জন্মভূমি।"

"(৪) ৺ব্রহ্মাণীতলা—এই স্থানে কবি কালিদাস যৌবনে প্রথমা স্ত্রী বিদ্যুন্মালার সহিত বাস করিয়াছিলেন।"

"(৫) শ্রীপাট দোগাছিয়া (কৃষ্ণনগর)—এই স্থান কালিদাসের দ্বিতীয় সংসার স্থল, এখানে কালিদাস তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত বাস করিয়াছিলেন এবং পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটেই যোয়ানিয়া ভালুকা গ্রামে কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থার প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।"

"(৬) রামগিরি বা রামগড়—ইহা সুরগুজা রাজ্যান্তর্গত ভীষণ অরণ্য-বেষ্টিত স্থান। রাজধানী হইতে ৩০ মাইল অরণ্য মধ্যগত। এখানে কালিদাস এক বর্ষ নির্ব্বাসিত ছিলেন।"

"(৭) শ্রীনগর (কাশ্মীর)—এই স্থানে কালিদাস স্বীয় "শাস্ত্রেষু কুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা" এই উভয় বিদ্যার বলে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তৃপদ পান। এখানে তিনি তৃতীয়বার "তারা" নাম্নী টগর ফুলের মত শুভ্র-বর্ণা কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহার নামানুসারেই সিঙ্গড়ীগড্ডার নিকটবর্ত্তী তারাপুরের ঘাট এবং তারা পীঠ হইয়াছে।"

"(৮) পাটলিপুত্রের এক শিবের মন্দিরে এক প্রস্তর-ফলক আছে। তাহাতে জানা যায়, কালিদাস সন্ন্যাসী হইয়া ৩২০ খৃষ্টাব্দে তথায় ছিলেন।"

"(৯) শান্তিপুরের ৺বাগ্‌দেবী তলা—কালিদাসের প্রথম নাটক লিখিবার স্থান।"

এই সকল সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কবিভূষণ মহাশয় স্থানীয় কিংবদন্তী ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। তাঁহার এ জন্য পরিশ্রম ও গবেষণা খুব প্রশংসনীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অন্য পোষক প্রমাণের অভাবে এরূপ কিংবদন্তী বা জন-শ্রুতি ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। "নহ্যমূলা জন-শ্রুতিঃ—এই প্রাচীন সূক্তিটী আমাদের অজ্ঞাত নহে; কোনও একটা কিছু মূল না থাকিলে এরূপ জন-শ্রুতি হয় না,—ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কালিদাসের ন্যায় একজন মহাকবির জন্মভূমি বলিয়া গৌরব অর্জ্জন করিতে অনেক দেশেরই আগ্রহ হইতে পারে। বেহার প্রদেশেরও কোনও কোনও স্থান কালিদাসের জন্ম-স্থল ও সিদ্ধি-পীঠ বলিয়া অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। কালিদাস নামে যে অন্য কোনও কবি বা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হন নাই—এ কথা কেহই হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। সংস্কৃতে "কালিদাসত্রয়ী অর্থাৎ তিনজন কালিদাস ছিলেন—এ কথা প্রসিদ্ধই আছে। আমরা প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছি—'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থের প্রণেতা একজন কালিদাস ছিলেন;—তিনি নিজকে ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বিক্রমাদিত্য নৃপতির সভায় নব-রত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার জালিয়াতী ধরা পড়িয়া গিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ইদানীং প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে, বারাঙ্গনা-প্রেমিক বর্ণিত কালিদাস—এই তিন কালিদাসের কোনও এক কালিদাস ছিলেন। কবিভূষণ মহাশয়ের বর্ণিত কিংবদন্তীর মূলেও এইরূপ কোনও এক কালিদাস থাকিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, জন-শ্রুতি উহাদিগকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য-জনক এই যে, ভারতবিখ্যাত রাজধানী উজ্জয়িনীর [illegible] বিক্রমাদিত্য এই কিংবদন্তীতে উজানি নামক একটা নগণ্য স্থানের ভূস্বামী অজ্ঞাতনামা বিক্রমাদিত্যে পরিণত হইয়াছেন! যাহা হউক—এইরূপ অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা মহাকবি কালিদাসের বাঙ্গালীর প্রমাণিত না হইলেও—কালিদাস-সমস্যার মীমাংসা বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, এজন্য কবিভূষণ মহাশয় ও তাঁহার স্বপক্ষদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন নিরপেক্ষ-ভাবে আরও অনুসন্ধান করিয়া উল্লিখিত কিংবদন্তীগুলির আরও বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন; তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের নূতন একটি উদ্ভট তথ্য আবিষ্কারের অচিরস্থায়ী বাহাদুরী লাভ না ঘটিলেও সত্য নির্ণয়ের সহায়তা করার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী চিরস্থায়ী কৃতিত্ব লাভ ঘটিবে।

আমরা আগামী সংখ্যায় কবিভূষণ মহাশয়ের লিখিত [illegible] "সাহিত্য-সংহিতা" পত্রিকার ১৩২৭ সালের মাঘ—চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন" শীর্ষক প্রবন্ধের ভাষা-তত্ত্বমূলক প্রমাণগুলির আলোচনা এবং উপসংহারে কালিদাসের জন্মভূমি সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মতামত ব্যক্ত করিব।

বঙ্কিম-সাহিত্যে নৌকা-যাত্রা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ

বহু শত বৎসরের বহু শত কারণ-পরম্পরায় বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা আজ স্বপ্ন-কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালীর বাণিজ্য-পোত মন্দ পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য দ্রব্য লইয়া দেশ-বিদেশে যাত্রা করিত। বাঙ্গালীর বৃহৎ অর্ণবযান-সমূহ কত দেশের রত্ন-ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায় শত সৌধ-চূড়ায় সে বিত্তচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত।

বাঙ্গালার বন্দর তখন বাঙ্গালীর পোতারোহণ-কোলাহলে নিয়ত

ফলকলাঞ্ছনমান রহিত। বাঙ্গালার বন্দরেই তখন বাণিজ্যপোত ও রণতরীসমূহ নির্ম্মিত হইত, আর বাঙ্গালী শিল্পী তাহা নির্ম্মাণ করিত। বাঙ্গালার রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের জন্য তখন তুল্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। বাঙ্গালীর সাহিত্য তখন সেই সকল সদাগরের বাণিজ্য-কাহিনী কীর্ত্তন করিত, আর বাঙ্গালার নরনারী বিমুগ্ধ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত।

তার পর ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর সেই বাণিজ্য-খ্যাতি কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। বাঙ্গালার রণতরীসমূহ বঙ্গোপসাগরের কোন্ অতল জলে তলাইয়া গেল। বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত আর সেই অনন্ত নীল জলরাশি ভেদ করিয়া ছুটিল না। বাঙ্গালী শিল্পী আর সেই শত হাঁড়মুক্ত তরণী নির্ম্মাণ করিল না। কালচক্রে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইতিহাসে কেবল তার একটা ক্ষীণ স্মৃতি রাখিয়া গেল। আর অলক্ষিতে বাঙ্গালীর মনের পাতে একটা দাগ দিয়া গেল। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ আজও সেই দাগ লুপ্ত করিতে পারিলেন না।

সেই প্রাচীনের স্মৃতি আজও চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনীগুলি বহন করিয়া আসিতেছে। কত কবি যে সে কাহিনী ছোট বড় কত কাব্যে কত রকমে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল সাহিত্যে নৌকা-যাত্রার মধ্যে তাঁহারা কি যে মাদকতা দিয়া গিয়াছিলেন,—বঙ্গের স্বনাম-খ্যাত সাহিত্যিকগণ আজও তার মোহ কাটাইতে পারিলেন না। তাঁহাদের লিখিত একটা না একটা গানে, গল্পে, কাব্যে বা উপন্যাসে তাই আজও নৌকা-যাত্রার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে এই নৌকা-যাত্রা কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব।

তবে সে যুগের নৌকা-যাত্রার সঙ্গে এ যুগের নৌকা-যাত্রার প্রভেদ এই যে, তখন সে সকল নৌকা পণ্যের বাণিজ্যে যাত্রা করিত, আর এ গুলি যাত্রা করে প্রেমের বাণিজ্যে। কারণ? কারণ, ঐ বঙ্কিম-চন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যেই পাই—"বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।" টীকা অনাবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র চৌদ্দখানি উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দুর্গেশ-নন্দিনী ও রাজসিংহ ব্যতীত অন্য বারখানিতে নৌকা-যাত্রার উল্লেখ আছে। এই বারখানির মধ্যে আবার কয়েকখানিতে নৌকা-যাত্রা এরূপ স্থান অধিকার করিয়া আছে যে, গ্রন্থের মধ্য হইতে সেই ঘটনাগুলি বাদ দিলে গ্রন্থের আর কিছুই থাকে না। সে গুলিকে হয় নূতন করিয়া লিখিতে হয়, না হয় ঢালিয়া সাজিতে হয়। পরে তাহা দেখাইতেছি।

(১) দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাসখানি লিখিয়া তিনি যশ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; অধিকন্তু বিলক্ষণ নিন্দাভোগ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার সহোদরগণও প্রথমে এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করেন নাই। ইহার কারণটা যে কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য গত ষাট বৎসরের মধ্যে ছোট-বড় অনেক সমালোচকই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই যে সঠিক কারণটা ধরিতে পারেন নাই, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেশ বড় গলাতেই বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গেশনন্দিনীতে 'নৌকা-যাত্রা'র কোন উল্লেখ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের নির্দ্ধারণ মতে দুর্গেশনন্দিনীর অখ্যাতির ইহাই মূল কারণ। কেহ এ কথা স্বীকার করুন, আর নাই করুন, লেখকের তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহকে সে দিন বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে অতবড় একটা তেজস্বী অশ্বে আরোহণ না করাইয়া, যেমন তেমন একখানা পান্‌সীতে উঠাইয়া, কোন রকমে শৈলেশ্বরের মন্দিরে হাজির করাইতে পারিতেন, অথবা পরেও (সপ্তম পরিচ্ছেদ) 'দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া দামোদর নদ কলকল রবে প্রবহন করিতেছিল, সেই অংশে এক কক্ষ বাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা যখন নদী-জলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,' সে সময়েও যদি কোন রকমে জোগাড় করিয়া 'নীলাম্বর প্রতিবিম্বিত স্রোতস্বতীর কোন স্থানে জগৎ সিংহকে বসাইয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থের ঐ অপযশটুকু হইতে পারিত না, আর গ্রন্থকারকেও মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে মোগল, পাঠান ও রাজপুত নরনারীর কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলেও, তাহাদের লীলা-খেলা সকলই যখন বাঙ্গালার মাটীর উপরেই হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালার মাটীর মর্য্যাদা রক্ষা করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা না করাতে তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। তীক্ষ্ণদর্শী সুচতুর গ্রন্থকার তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে যখন নানা লোকে নানা কথা বলিতেছিল, তখন তিনি নিজে দু'একটী কথা ব্যতীত আর বেশী কিছুই বলেন নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে তিনি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

(২) কপালকুণ্ডলা

দুর্গেশনন্দিনীর পরেই এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল। কপাল-কুণ্ডলা প্রকাশিত হইবামাত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের যশের বিমল রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। সমালোচকগণ বলেন যে, তিনি আর কোন গ্রন্থ না লিখিলেও, এই একখানি গ্রন্থই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিত। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম-চন্দ্রের অমর কীর্ত্তি।

কপালকুণ্ডলার সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা যাত্রায় একখানি চিত্র দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছেন, 'প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের

ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল। কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌ নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্‌ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহীগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।' ঐ যুবক গ্রন্থের নায়ক নবকুমার। ইহার পরের ঘটনা—মাঘ মাসের সেই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-নীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নবকুমারকে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।

গ্রন্থের নায়িকা কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেও গ্রন্থকার জানাইয়াছেন, 'ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টীয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ ও তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।' (সপ্তম পরিচ্ছেদ।) তার পর হিজলীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে যথা সময়ে সেই আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্তা বালিকা কপালকুণ্ডলার সহিত নিরাশ্রয় যুবক নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আর সেদিনও—গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন,—'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে' যখন তাহাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল, তখনও 'অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত-পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি হৃদয়ে উড়িতেছিল।' (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কেন এত সুখ্যাতি হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে হইলে, নায়ক নায়িকার জীবনের পূর্ব্বোক্ত তিনটী ঘটনার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা-যাত্রাকে ভিত্তি করিয়াই কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছিলেন। নবকুমার যদি নৌকা-যাত্রা না করিতেন, বা খ্রীষ্টীয়ান তস্কর যদি কপালকুণ্ডলাকে অপহরণ করিয়া জল পথে লইয়া না যাইত, তাহা হইলে গ্রন্থকারকে আর কপালকুণ্ডলা লিখিতে হইত না। তিনি হিজলীর সেই ভীষণ-দর্শন নররাক্ষস কাপালিকের 'কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূল চর্ম্মে আবৃত, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ও আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত মূর্ত্তি'র বা 'কুসুমে কুসুমে বিহারিণী' পদ্মাবতীর 'বিলাস-লালসা পরিতৃপ্তির' চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কয়জন সে চিত্র দেখিত?

(৩) মৃণালিনী

কপালকুণ্ডলার পরে এই উপন্যাস লিখিত হইয়াছিল। মৃণালিনীর পূর্ব্ব সংস্করণে গ্রন্থকার প্রথম পরিচ্ছেদে এক হস্তী যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। 'মহম্মদঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতবউদ্দীনের সেনাপতি' মগধ-বিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাহার 'বানরের ন্যায় শরীর' লইয়া এক মত্ত হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে রঙ্গাঙ্গনে নামিয়াছিলেন। কিন্তু সেই 'দুর্দ্দান্ত বারণ তাহার বিশাল চরণের চাপে' বখ্‌তিয়ারকে যে মুহূর্ত্তে 'কর্দ্দম-পিণ্ডবৎ দলিত' করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় এক হিন্দু যুবার নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে যূথপতি ক্ষরিত মূল অট্টালিকার ন্যায় সশব্দে রঙ্গ উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।' বখ্‌তিয়ারও বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এই ঘটনা হইতেই মগধ-বিজেতা বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্রের বিবাদের আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। সে দিনের সেই গজহন্তা হিন্দু যুবাই 'মৃণালিনী' গ্রন্থের নায়ক মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র।

হস্তী দর্শন হিন্দুর কাছে মঙ্গলদায়ক। গ্রন্থকার ভাবিয়াছিলেন, দেখা যাক্‌, এই শুভ দর্শন জন্তুটীকে পাঠক পাঠিকার কাছে প্রথমে হাজির করিতে পারিলে গ্রন্থের আদরটা কিন্তু বাড়ে কি না—নৌকা যাত্রার চেয়ে এটা অধিক পয়মন্ত হয় কি না। তাই এই পরীক্ষাটা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফণটা সুবিধাজনক হইল না। বুঝিলেন—প্রেমের রাজ্যে নৌকা-যাত্রারই প্রাধান্য। গ্রন্থের প্রথম অংশটা আবার তাঁহাকে ঢালিয়া সাজিতে হইল। মৃণালিনীর পরবর্ত্তী সংস্করণ প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, গ্রন্থকার এবার প্রথম পরিচ্ছেদে একখানি নৌকা যাত্রার চিত্র দিয়াছেন। বখ্‌তিয়ারের সাক্ষাৎ যম সেই প্রকাণ্ড হস্তীটী মৃণালিনীর মধ্য হইতে সরিয়া পড়িয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই গ্রন্থকার আরম্ভ করিয়াছেন, 'একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দ্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া' প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, ঘোড়সোয়ার। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, কক্ষে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর। ঘাটের উপর সংসার-বিরাগী পুণ্য-প্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে যুবা প্রবেশ করিলেন। ঐ যুবাই হেমচন্দ্র, আর যে রহিয়া থাকিল, সে তাঁহার ভৃত্য দিগ্বিজয়।

হেমচন্দ্র তাঁহার গুরু মাধবাচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী মৃণালিনীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর মাধবাচার্য্য বলিলেন, 'গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবন নিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।' হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'তাহাই স্বীকার করিলাম।' তার পর, আচার্য্যের কাছে বিদায় লইয়া ঘাটে আসিয়া পুনরায় সেই ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নায়িকা মৃণালিনীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে গৌড়নগরের যে ব্রাহ্মণের বাটীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা মণিমালিনী মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলে?'

ইহার উত্তরে মৃণালিনী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও নৌকা যাত্রার কথা। মৃণালিনী কহিতেছেন, 'মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকও এখানে আসি নাই।..... আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গটী দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দুতী কহিল যে রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া আছে। আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই, বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচনাশূন্য হইলাম, তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার বাহিরে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকটে আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে, এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে 'মা' বলিয়া বলিল, "আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না। আমার নাম মাধবাচার্য্য। আমি হেমচন্দ্রের গুরু।...আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়; তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।....এক বৎসর পরে আমি তোমাকে তোমার পিতার নিকট আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকেন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।"...এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি।'

বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক-নায়িকার জীবনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই তাহাদের মিলন হইয়াছিল। বিবাহও হইয়া গিয়াছিল। মাধবাচার্য্য বা হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর কাহারই পিতামাতা এ কথা অবগত ছিলেন না। ঐ বিবাহের মূলেও নৌকাযাত্রা। গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে "পূর্ব্ব পরিচয়" শীর্ষক পরিচ্ছেদে সে কথার উল্লেখ আছে। মৃণালিনী বলিতেছেন, '...আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জল মধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময় নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। জলমধ্যে চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান। হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন। তিনি তখন তীর্থ দর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন।...আমার জ্ঞান হইলে...উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম।...তীর্থ পর্য্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।...বিবাহের পর বাড়ী গেলাম। সকল কথা সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম।...আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন।' সেই সময় একদিন মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে সরাইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর জীবনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থখানির মূলেও নৌকাযাত্রা। গ্রন্থ মধ্যে আরও দু'একটী স্থানে নৌকাযাত্রার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের—"নৌকাযানে" শীর্ষক পরিচ্ছেদটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার এ পরিচ্ছেদে যে চিত্রটী আঁকিয়াছেন, তাহা মনোরম। ক্ষুদ্র একখানি তরণী, দুইটী মাত্র আরোহী। দুই জনেই তরুণী—একজন নির্ব্বাসিতা মৃণালিনী, আর একজন গিরিজায়া ভিখারিণী। 'রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত।' 'প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ খরতর বেগে প্রবাহিত'। সেই সময় গিরিজায়া গান ধরিয়াছে—

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥
ভাসল তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ "জল খেলা"
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন—গগনে গরজে ঘন,
বহে খর সমীরণ
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে॥
মনে করি কূলে ফিরি,
বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে॥
যাহারে কাণ্ডারী করি,
সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে'

গিরিজায়ার এই সঙ্গীতটী শুনিলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র মৃণালিনী গ্রন্থখানি এই গানের সঙ্গে একই সুরে বাঁধিয়াছেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছিল, একদিন ক্ষুদ্র একখানি তরণীতে আরোহণ করিয়া হেমচন্দ্র ও তাহার ভৃত্য দিগ্বিজয় যমুনার দুর্দ্দমনীয় স্রোতোবেগে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন। আর একদিন দেখা গেল ঐরূপ ক্ষুদ্র একখানি তরণীতে আরোহণ করিয়া মৃণালিনী ও গিরিজায়া গঙ্গার বিশাল হৃদয়ে ভাসিয়া চলিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে পাইয়াছিলেন—উভয়ে মিশিয়া এক সোণার সংসার পাতিয়াছিলেন। কিন্তু এক যাত্রার কেন পৃথক ফল ফলে, তাই ভাবিয়া গ্রন্থকার শেষে দিগ্বিজয়ের সঙ্গে গিরিজায়াকেও মিশাইয়া দিয়াছেন। পরিশিষ্টে তাদের সুখের সংসারেরও একটী চিত্র আছে। 'কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যেদিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার

আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিল, এমন নহে; বরং একদিন কোন দৈব কারণবশতঃ গিরিজায়া বাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষম-রুদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি?" বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। ইহা নৌকা-যাত্রার ফল।

(৪) চন্দ্রশেখর

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনীর' ন্যায় এই গ্রন্থখানির মূলেও নৌকা-যাত্রা। প্রথম পরিচ্ছেদেই নৌকা-যাত্রার চিত্র। প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন ছেলেমানুষ, নিজেদের নৌকা বাহিয়া যাইবার যখন সামর্থ্য হয় নাই, তখন তাহারা নদীর তীরে বসিয়া অপরের নৌকা যাত্রা দেখিতেছে আর পরস্পর বলাবলি করিতেছে—'নৌকা গণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে, বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল। আবার একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একাগ্র চিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথায় যাইবে? কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোণা জ্বলিতেছে।'

গ্রন্থকার বলিয়াছেন 'এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা।' সেদিনের ঐ বালক বালিকার ভালবাসাই গ্রন্থের প্রধান কথা। যৌবনে ঐ ভালবাসাই তাদের 'কাল' হইয়াছিল। 'শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-কন্যা।' একটু 'জ্ঞান জন্মিলেই' তারা যখন বুঝিল যে, দু'জনের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন 'দুজনে পরামর্শ করিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিতে গেল।' প্রতাপ বলিল "শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে।" তারপর 'প্রতাপ ডুবিল।' 'শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না—সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।'

'যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পানসী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল, প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্ম্মা। চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।...শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইলেন না, কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।... সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া, শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?' উপক্রমিকার প্রথম তিন পরিচ্ছেদে ঐ কথারই বিশদ বিবৃতি আছে। তার পর গ্রন্থের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্য হইতে উপক্রমণিকায় উল্লিখিত নৌকাযাত্রার বিবরণটুকু বাদ দিলে গ্রন্থের মধ্য হইতে প্রতাপকেও বাদ দিতে হয়। কারণ যেদিন প্রতাপ নদীতে ডুবিয়াছিল, সেদিন সে সময়ে যদি চন্দ্রশেখর শর্ম্মা সে পথে নৌকা-যাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে কে তাঁহাকে উদ্ধার করিত? ভাগীরথীর সলিলগর্ভেই সেদিন প্রতাপের মরদেহ সমাহিত হইত। চন্দ্রশেখর গ্রন্থে আর প্রতাপের নাম গন্ধও থাকিত না। কিন্তু প্রতাপকে বাদ দিলে গ্রন্থের আর কতটুকু থাকিত? যেটুকু থাকিত তারও আবার প্রায় পনর আনাই নৌকা-যাত্রার কাহিনী।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থখানি মোট ছয় খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু উহার মধ্যে এমন একটী খণ্ড নাই, যার মধ্যে নৌকা-যাত্রার চিত্র নাই। লরেন্স ফষ্টর চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গিয়া নৌকায় তুলিল। 'প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল।' বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্যের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন পরিপাটী তেমনই মনোরম। (প্রথম খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

চন্দ্রশেখর গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মনে হয়, গ্রন্থের প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে যে নৌকা-যাত্রায় একটা ঘনিষ্ট যোগ ছিল, তাহা দেখানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাই সেদিন যখন নূতন জীবন লইয়া শৈবলিনী গুহার বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রশেখরের চরণে পতিত হইল, তখন সেখানে নৌকার চিহ্নমাত্র না থাকিলেও বা নৌকা-যাত্রায় কোন কথা না উঠিলেও গ্রন্থকার কিন্তু সে পরিচ্ছেদটীর নাম দিয়াছেন "নৌকা ডুবিল।" (চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।) সেদিনের সেই আট বৎসরের বালিকা শৈবলিনী ভাগীরথীর তীরে প্রতাপের পার্শ্বে বসিয়া কল্পনারাজ্যে যে জীবনতরী ভাসাইয়াছিল, এত দিনে সেই তরীই ডুবিল। গ্রন্থকার ইঙ্গিতে সেই কথাই জানাইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের ইহাই মূল কথা।

(৫) বিষবৃক্ষ

এই গ্রন্থখানির মূলেও নৌকা-যাত্রা। প্রথম পরিচ্ছেদটীর নাম "নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা।" গ্রন্থকার আরম্ভেই লিখিয়াছেন,—'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না।" নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।'

নগেন্দ্র আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। তাঁহার বজরা ব্যতীত নদীতে আরও অনেক নৌকা যাতায়াত করিতেছিল। গ্রন্থকার সে সকলের কথায় বলিতেছেন, 'হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—

পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।' নগেন্দ্র দত্তের নৌকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে চলুক বা নাই চলুক, তিনি যদি সূর্য্যমুখীর মাথার দিব্য মাথায় রাখিয়া সেই তুফানের দিনে নৌকারোহণে কলিকাতা যাত্রাটা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আর বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইত না—ফুলও ফুটিত না—ফলও ফলিত না।

সেদিন নৌকাযাত্রা করিয়াই নগেন্দ্র মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলেন। তাহাকে গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সোণার সংসার উলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, তিনি নিজে অন্তরে বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, ভার্য্যা সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন। 'নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।' 'অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম অকালে শুকাইয়া গিয়াছিল।' নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া না আসিলে অভাগিনী হয় ত সেই রাত্রে 'জ্যোৎস্নাময়ী উজ্জ্বল নীল আকাশে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল মধ্যশোভিনী আলোকময়ী কিরীটকুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা তাহার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর আহ্বানে তাঁহারই কাছে চলিয়া যাইত। পর দিন প্রভাতে আসিয়া গ্রামবাসিগণ পিতা ও পুত্রীর এক সঙ্গেই সৎকার করিত; নয়, পিতৃমাতৃহীনা কুন্দনন্দিনীকে কাহারও বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিত। নগেন্দ্রের সংসারে তাহা হইলে আর বিষবৃক্ষের বিষময় ফল ফলিত না—গ্রন্থকারকেও আর বিষবৃক্ষ লিখিতে হইত না। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা এই বিষবৃক্ষের মধ্যে যে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইত। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডারেও এই অমূল্য রত্নটীর অভাব থাকিয়া যাইত। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

(৬) কৃষ্ণকান্তের উইল

বিষবৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থখানিতেও গ্রন্থকার নায়ক-নায়িকার সহিত নৌকাযাত্রার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। গোবিন্দলাল ও ভ্রমর স্বামী-স্ত্রীতে বড় সুখে, বড় আনন্দেই দিনগুলা কাটাইতেছিল। উভয়ের প্রেমে উভয়েই বিভোর হইয়াছিল। এমন সময় ঘটনা চক্রে কোথা হইতে এক রোহিণী আসিয়া জুটিল। রোহিণীর আবার এক বিষম রোগ ধরিল—সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ভ্রমর সে কথা শুনিয়া ব্যবস্থা দিল—"বারুণী পুকুরে সন্ধ্যা বেলা—কলসী গলায় দিয়ে—" তাহা হইলেই রোগ সারিবে। রোহিণী ভাবিল, গোবিন্দলালকে পাইবার যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন এ ব্যবস্থাই ভাল।

গোবিন্দলাল উদ্যান ভ্রমণে আসিয়া বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, 'জল কাচতুল্য স্বচ্ছ—সেই জলতলে স্বচ্ছ স্ফটিক-মণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী শুইয়া আছে। অন্ধকার, জলতল আলো করিয়াছে।' গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া রোহিণীকে তুলিলেন। সে সংজ্ঞাহীনা, নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিতা। কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আনাইবার জন্য গোবিন্দলালের উড়ে মালি রোহিণীর বাহুদ্বয় উঠাইতে ও নামাইতে লাগিল, আর স্বয়ং গোবিন্দলাল সেই 'ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগলে ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। সেই সময় ভ্রমর একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।' (ষোড়শ পরিচ্ছেদ) রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। নিদাঘের নীল-মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচন-পথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, 'বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব।' (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।) এই মনে করিয়া তিনি জমিদারী দেখিতে যাওয়াই স্থির করিলেন; ভ্রমরও সঙ্গে যাইবে বলিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল, কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তখন তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ কদরআলী যাত্রা করিলেন। অনুকূল পবনে চালিত হইয়া গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিনী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।' এইখানে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ শেষ হইল।

গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল, আর এ দিকে গ্রন্থের সমস্ত পাত্র পাত্রীগুলির অন্তরেও বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল। গোবিন্দলালের নৌকা যাত্রার পরেই গোবিন্দলাল ও রোহিণীকে লইয়া নানা জনে নানা প্রকার মিথ্যা কথা রটাইতে লাগিল। ভ্রমরের কাণেও সে কথা আসিল। ভ্রমর সে কথা প্রথমে বিশ্বাস করিল না। তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত দেখিল, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না।'

রোহিণীও শুনিল, গ্রামে তাহার নামে অনেক কুৎসা রটিয়াছে। গোবিন্দলাল তাহার গোলাম, তাহাকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে। রোহিণী বিনা অনুসন্ধানেই স্থির করিয়া ফেলিল, এ মিথ্যা কলঙ্ক ভ্রমর ভিন্ন আর কেহ রটাইবে না। কাহার গায়ের এত জ্বালা? তাই রোহিণী এক দিন ভ্রমরের কাছে গিয়া তার বড় সর্ব্বনাশ করিয়া আসিল। রোহিণী ভ্রমরকে জানাইয়া আসিল; যাহা রটিয়াছে তাহা সত্য—সে এখন গোবিন্দলালের আশ্রিতা। ভ্রমর এখন সে কথা বিশ্বাস করিল। মেয়েমানুষ যত বড় মিথ্যাবাদিনীই হউক, এ

বিষয়ে সে যে অতবড় একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারে, ভ্রমরের সে বিশ্বাস ছিল না। তাই ভ্রমর রোহিনীর কথায় বিশ্বাস করিল। ভ্রমর সে কথা শুনিয়া গোবিন্দলালকে সবিশেষ জানাইয়া শেষে লিখিল 'এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।' গোবিন্দলাল ঐ পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলেন, পরদিনই নৌকারোহণে বিষণ্ণ মনে গৃহে যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দলাল গৃহে আসিয়াই শুনিলেন, ইতঃপূর্ব্বে ডাকের পত্রে তাঁহার বাটী আগমনের সংবাদ পাইয়াই ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালের বড় অভিমান হইল—'এত অবিশ্বাস? না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল? আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?' (চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।) ইহার পর রোহিনী তার অতুল্যরূপরাশি লইয়া গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ নামিয়া অবনতির শেষ সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ফলে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত রায়ের সেই সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। ভ্রমর মরিল, রোহিণী মরিল, গোবিন্দলাল উদ্দেশ্যবিহীন অশান্তিময় জীবন লইয়া দীন ভিক্ষুকের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাজান বাগান অকালে শুকাইয়া গেল।

সে দিন যদি গোবিন্দলাল নৌকাযাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ সর্ব্বনাশ হইত না। কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের ও প্রাণাধিকা ভ্রাতঃপুত্রবধূ ভ্রমরের এরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না। গ্রন্থকার নিজেও তাই বলিয়াছেন, 'যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেম বন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও; অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময় কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "ভাল আছ ত?" হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না; যা যায় তা আর আসে না; যা ভাঙ্গে তা আর গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?'

'ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশে যাইতে দিয়া ভাল করে নাই। এ সময়ে দুইজনে একত্রে থাকিলে এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না।' 'এত রাগ হইত না।' (চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ) এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে গ্রন্থকারের কি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকখানা লেখা হইত? অন্ততঃ দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের উইলখানা লেখা সে জন্য বন্ধ থাকিত না। কিন্তু তাহাতে হরলালের ভাগ্যে তিন আনাই পড়ুক, কি এক আনায় গড়ুক বা শূন্যই পড়ুক তাহাতে গোবিন্দলাল বা ভ্রমরের, কি তোমার-আমার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত?

(ক্রমশঃ)

বন্ধন-মুক্তি

শ্রীভূপতি চৌধুরী

অনেক সময় মানুষ তার জীবনে এমন অবস্থায় এসে পড়ে, যখন সে তার উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে, সৎ অসৎ বিচার কর্ব্বার সময় বা সুযোগ পায় না, কিম্বা, পেলেও সে বিচার কর্ত্তে চায় না। এ অবস্থা খুব বেশী ভাবে উপলব্ধি করা যায় দরিদ্র জীবনে। অতি দরিদ্র রামগতি তার জীবনে ঠিক সেই অবস্থায় এসে পড়েছিল। এই কলকাতা সহরে ট্রামের লাইনের ধারে "জাপানি পেন্সিল" "জার্ম্মাণ সুচ" ইত্যাদি বিক্রী করে কোনো রকমে সে জীবন ধারণ করে আসছিল; কিন্তু আজ কয়েক দিন হ'ল তার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জিনিস পত্র আর বড় কেউ কেনে না। অথচ এই বেচা-কেনার উপর নির্ভর করছে তার জীবন। শুধু তার জীবন, এ কথা বলা ভুল হবে; কারণ, এ সংসারে সে একলা নয়। তার স্ত্রী ও এক শিশুপুত্র তার উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করে। এই তিনের ভরণপোষণ বড় সহজ ব্যাপার নয়। অথচ আজ সাতদিনেও যখন তার এক পয়সারও জিনিস বিক্রি হ'ল না, তখন একটা গভীর নিরাশায় তার বুক হ'তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। কয়েক দিনের অনাহারের ফলে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, তার জিনিস-পত্তরের বাক্সটা

নিয়ে, সে এক বাড়ীর বারান্দার উপর বসে পড়ল। সন্ধ্যার ম্লান আলো তার চোখের উপর ম্লানতর হয়ে আসতে লাগল।

ঠিক এমনি সময় চৈতন এসে ডাকলে—রামগতি যে, বসে পড়লি কেন? মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে যে। ক'দিন খাওয়া হয় নি না কি?

রামগতির মুখ থেকে কোনো উত্তর এ'ল না।

চৈতন বলে চলল—তা বলছি, আমাদের দলে আয়। খাওয়া পরার কোনো ভাবনা থাকবে না।

রামগতি চৈতনের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এই আজ প্রথম দিন নয়, এর পূর্ব্বে বহুবার এম্নিতর আহ্বান তার কাণে এসেছে; কিন্তু আজ এ আহ্বান তাকে যতটা চঞ্চল করে তুলেছে, এর পূর্ব্বে কখনও এতটা চাঞ্চল্য তার মনেও জাগে নি। কিন্তু আজ যে এই চাঞ্চল্য; এ ত অকারণে নয়। এর পূর্ব্বে যখন এমন আহ্বান তার কাণে এসেছে, তখনকার অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তফাৎ অনেক। আজ ক'দিন খাওয়া হয় নি; কাছে একটী পয়সাও নাই। ঘরে ক্ষুধা-কাতর সন্তানের করুণ দৃষ্টি ও চিন্তা-ক্লিষ্ট পত্নীর মূকবুভুক্ষু ব্যথা কল্পনা করতেই সে তার মনের সকল স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেল্লে। একটা উত্তেজনার মাথায় সে উঠে দাঁড়াল।

চৈতন অল্প হেসে, তার ফেরি-করে-বেড়ানর বোঝাটা নিজে নিয়ে বললে—তোর কষ্ট হবে, আমিই না হয় এটা নিয়ে যাই।

চৈতনের কথায় তার মনটা সমবেদনার প্রলেপে অনেকটা নরম হয়ে এল। সত্যই তখন ও বোঝা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর হত। কাজেই চৈতনের কথায় কোনো বাধা না দিয়ে, তার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে সে তার সাথী হ'ল।

বড় রাস্তা ছেড়ে, চৈতন একটা সরু গলিপথের এক ভাঙা বাড়ীর সাম্নে এসে, ভাঙা একটা কবজার উপর আটকান একটা দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ে রামগতিকে ইসারা করে ডাকলে। রামগতি ধীরে ধীরে তার অনুসরণ করলে। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে কিছুক্ষণ ঘোরার পর একটা মোড় ফিরতেই একেবারে দিনের আলোর মত আলোকিত এক কক্ষে এসে উপস্থিত হ'ল।

এতক্ষণ অন্ধকারে ঘুরে হঠাৎ আলোর সাম্নে এসে পড়তেই রামগতি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে আলো ও চোখের সহ্য-শক্তির সমতা ঘটিয়ে সে সর্দ্দারের সাম্নে গিয়ে দাঁড়াল।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সর্দ্দার তার হাতে একটী দশ টাকার নোট দিয়ে বললে—আজ্‌কের মত তুমি যেতে পার।

রামগতি হাত পেতে নোটটা নিতেই, তার সারা শরীরের মধ্য দিয়ে একটা কম্পনের প্রবাহ ছুটে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার হাতটা ভারী বোধ হল। অন্যপথে পা দেবার সময় সকল যুগের মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন—ক্ষণিক কি স্থায়ী—ঘটে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয় ত সেটা এক মুহূর্ত্তেই কেটে যায়। রামগতি তার ভাব দমন করে শুষ্ককণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে ঘর হতে বার হয়ে এল।

দুই

রাতে খাওয়ার পর রামগতি বিছানায় শুয়ে পড়েছিল; চোখে তার ঘুম আসছিল না। সেই যে দশটাকা লওয়ার পর তার মধ্যে একটা স্পন্দন এসেছিল, তার ধাক্কার ফলে এখনও তার চিত্ত-দোলার দোলা থামে নি।

ঘরে ঢুকেই কোন কথা না বলে রামগতি তার স্ত্রীকে দশটাকার নোটখানা গম্ভীরভাবে দিলে। স্ত্রী আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বল্লে—আজ দশটাকা পেয়েছ। ভগবান আজ মুখ তুলে চেয়েছেন; নইলে—কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই স্বামীর ভ্রূকুটী-কুটিল বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে সে আর তার কথা সমাপ্ত করতে সাহস করলে না। রামগতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার পর যথা-সময়ে খাওয়া শেষ করে সে শুতে এসেছিল। সারা দিনের ক্লান্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু মনের ক্রিয়া তখনও একেবারে স্থির হয়ে যায় নি।

এ কি উচিত হল? কিন্তু এ পথে না গিয়ে উপায়? তাকে বাঁচতে হবে ত। এত দিন যে পথ ধরে সে চলে এসেছে, সে পথ দিয়ে আর চলা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে অন্য পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। কিন্তু এ পথে আসবার কারণ কি? অন্য অনেক পথ ত আছে। পথ ত আছে; কিন্তু সন্ধান ত সে জানত না। কাজেই তখন চৈতনের আহ্বান মত সে তার অনুসরণ করেছে। সে এ পথে যাওয়ার সমর্থনের

জন্য নানা দিক হতে যুক্তি সংগ্রহ কর্ব্বার চেষ্টা করলে। এত দিন পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মপথে জীবন ধারণ কর্ব্বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হল কই? কি লাভ করেছিল সে তাতে? দিনে দুবেলা পেটপোরা ভাতও তার জুটত না। কিন্তু এ পথে ও সম্বন্ধে তার বিশেষ চিন্তার কারণ নাই, এ কথা ত সে চৈতনের কাছ থেকেই শুনেছে। এবং আজকের সর্দ্দারের ব্যবহারেও সে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কিন্তু কি কাজ তাকে এ পথে করতে হবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা তার ছিল না। "লোককে ঠকিয়ে, তার পকেট কেটে বেড়াতে হবে" এই ধরণের কথা সে শুনেছিল। কথাটা ভাবতে সে শিউরে উঠেছিল সত্য, কিন্তু আর কোন উপায় নেই। তাকে ও দলে যেতেই হবে—দলের টাকা পেয়ে আজ অনাহারে মৃত্যু থেকে সপরিবারে সে রক্ষা পেয়েছে। কাজেই কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাকে তাদের আজ্ঞা বহন করতে হবে। কিন্তু তবুও সে যেন কিছুতেই তৃপ্ত হতে পাচ্ছিল না। সকল যুক্তি তার কাছে অসার বোধ হচ্ছিল। আর তার স্বপক্ষে যুক্তি কি আছে? হঠাৎ একটু দূরে বিছানার উপর ঘুমন্ত খোকার দিকে দৃষ্টি পড়তেই, সে ধীরে ধীরে তার বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুমন্ত ছেলের মুখে অজস্র চুমু দিয়ে তার দিকে চেয়ে একটা যেন বিহ্বলতার আবেশে অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে—তোদের জন্যে রে খোকা, আমি তোদের জন্যে, এতদিনের সব পুঁজি আজ খুইয়ে এলাম।

তার পর ধীরে ধীরে বহুক্ষণ সে তার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। সত্যই এত দিনের পুঁজি ধর্ম্মের বা শান্তির, আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আজ সারাদিনের শ্রমশ্রান্ত শরীরের উপর অশান্তির ভার বহন করে, বিনিদ্র নয়নে পায়চারি করে মুহূর্ত্তগুলোকে অতিক্রম কর্ব্বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হচ্ছে। কিন্তু সময় যে কাটতে চায় না। অন্তরের রত্ন এমন ভাবে হারিয়ে ফেললে মানুষ এমনি অস্থির হয়ে পড়ে বটে।

তিন

এইভাবে কিছুদিন গেলে কলেরার এক ঝাপটে রামগতির স্ত্রী ও পুত্র যখন একসঙ্গে মারা পড়ল, তখন রামগতি তাদের সৎকার করে এসে প্রথমটা বেশ স্থির হয়ে বসে রইল। তার চোখ থেকে একফোঁটাও জল বার হয়ে এল না। তার পর হঠাৎ তার সমস্ত গাম্ভীর্য্য ভেদ করে সে পাগলের মত হয়ে, তার সায়ে যা কিছু ছিল—কাপড়, ঘটী, বাটী প্রভৃতি—সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আবার অবসন্নের মত বসে পড়ে বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগল—এ সব কি আমার জন্যে? এ সব ত তোদের জন্যে, আমার পুঁজি খুঁইয়ে এনেছিলাম। তোদের জন্যে কি না করলাম; আর তবুও তোরা থেকে যেতে পারলি না; চলে গেলি? অকৃতজ্ঞ, বেইমানের দল।—দরদর অশ্রুধারায় তার দৃষ্টি রোধ হয়ে গেল। শোকের অবসন্নতায় সে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

দলের সর্দ্দার এসে তাকে বোঝাতে বসল। তাকে শান্ত কর্ব্বার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। অবশেষে যে কোনও উপায় না দেখে, তাকে খানিকটা ঘুমের ঔষধ মেশানো মদ খাইয়ে দিলে। রামগতি অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

পরের দিনে প্রতি দিনের মত ভোর হতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। শোকে ও মাদকের প্রভাবে অবসাদ তখনও তার কাটেনি। তাই চোখ চাইতেই আবার সেই ঘরের শূন্যতা তার মনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছু সে ভাবতে পাচ্ছিল না; কিন্তু বুকের মধ্যে একটা শূন্যতার বিরাট হাহাকার ব্যথার আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। শ্রাবণের ধারার মত সেই বুকের ব্যথা অবিরাম অশ্রুধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত দিয়ে সে চোখের জল মুছাবার চেষ্টাও করলে না। চুপ করে স্থির নিশ্চেষ্ট ভাবে সে বসে রইল।

চৈতন তার ঘুম ভাঙাতে এসে, তাকে এমন ভাবে দেখে, সান্ত্বনার সুরে বল্লে দেখ রামগতি, ঘরে বসে খালি চোখের জল ফেলবি ত? সব খালি খালি ঠেকবে, বুকের মধ্যে হুহু কর্ব্বে। তার চেয়ে একটু আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি আয়। তাতে তবু দুদণ্ড মন একটু আন্‌মনা হতে পারে। আয়।—চৈতন তার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করলে।

একটা ঢোঁক গিলে, একটু ভেবে, চৈতনের দিকে তার বিষাদ-ভরা চোখ তুলে চেয়ে, যেন কত ক্লান্তের মত, সে বল্লে—আচ্ছা চল। তার কথার সুরে যেন তার বুকের জমাট বাঁধা কান্না গলে পড়ল।

কিছুদূর গিয়ে তার মনে হল—আর কেন? আর অধর্ম্ম পথে থেকে লাভ কি? তার আর অর্থের প্রয়োজন কি? যাদের জন্য সে উপার্জ্জন করতো, তারা ত সব চলে গিয়েছে। এইবার ত তার ছুটী। সর্দ্দারকে বল্লে হয় না যে, সে আর এ পাপ ব্যবসায়ে থাকতে চায় না। গণ্ডা করে যথেষ্ট দণ্ড সে পেয়েছে। এইবার না হয় সে আবার পূর্ব্বপথে ফিরে যাক।

এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে সর্দ্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দ্দার তাকে সাদরে বসিয়ে বোঝাতে লাগল। সেই কথাবার্ত্তার ফাঁকে একবার রামগতি অতি কুণ্ঠিতভাবে বল্লে, আর কিছু ভাল লাগছে না।—

যেমন কথা যেমন ভাবে সে বলবে ভেবেছিল, তার কিছুই সে বলতে পারলে না। এমন কি, সে যে আর এ দলে থেকে অধর্ম্ম করতে চায় না, এ কথাও যেন সে বলতে ভুলে গেল।

সর্দ্দার তার কথা শুনে সান্ত্বনার মধুর কণ্ঠে বললে—সব বুঝি ভাই, কিছু ভাল লাগবেও না এখন। কিন্তু এমন ভাবে কেঁদে শরীর নষ্ট করলে চলবে কেন ভাই? ঘরে বসে থাকলেই শূন্য ঘর দেখবে আর কান্না আসবে। কাজ কি আর করতে পার্ব্বে? তবে মনে যেটুকু বাঁধা পড়ে, এই লাভ। তার পর সর্দ্দার কোমল কণ্ঠে হাঁকলে—চৈতন, যাও তুমি রামগতির সঙ্গে বেড়াতে যাও।

রামগতি মুখে কোন কথা না বলে, ধীরে ধীরে চৈতনের সঙ্গে চলে গেল। যাবার সময় সর্দ্দার তার হাত ধরে তাকে বিদায় দিলে, যেমন করে বাপ তার ছেলেকে বিদেশে পাঠাবার সময় বিদায় দেয়।

সন্ধ্যায় রামগতি যখন চৈতনের সঙ্গে ফিরে এল, তখন তার শোকের শান্তি না হলেও, তার মনের ব্যথার তীব্রতা কমে গিয়েছিল। সর্দ্দার তাকে বল্লে—তুমি আমার এখানেই থাক। আর সেখানে গিয়ে কি হবে বল? আমি বাড়ীওয়ালার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এই পাশের ঘরটায় তোমার শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

রামগতি সর্দ্দারের দিকে নিষ্প্রভ চোখে তাকালে। এর অর্থ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলেও, সে দৃষ্টিতে কোন বিশেষ ভাব ফুটে উঠেনি। তার পর ধীরে ধীরে তার চোখ নামিয়ে, কোন কথা না বলে, ক্লান্তপদে সে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। নিদ্রার মাঝে মাঝে শোকার্ত্ত হৃদয়ের জমাট ব্যথা দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল।

চার

ফেরা তার হল না। যে পথের দিকে সে পা বাড়িয়েছিল, সেই পথেই তার চলা সুরু হল। এক নূতন জীবন আরম্ভ হল। কিন্তু ভাবপ্রবণ মন তার এই নূতন জীবনের চলার ফাঁকে ফাঁকে তার গত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিত। বহু দিন পর্য্যন্ত সহকারী রূপে কাজ করার পর প্রথম যে দিন সে একজন লোকের পকেট কেটে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল, সেই দিন আবার তার সেই পূর্ব্বজীবনের শান্তিময় দিনের কথা নূতন ভাবে নব তেজে তার মনের মধ্যে উদয় হয়ে তাকে' তার অন্তরের মানুষটাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

পকেট-কেটেই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কি দৌড়ই না তাকে দিতে হয়েছিল। দৌড়ে এসে আড্ডা ঘরে ঢুকেই মণিব্যাগটা সর্দ্দারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই, সর্দ্দার প্রশ্ন করলে—এ রকম ভাবে দৌড়ে আসবার মানে কি? কিন্তু তখন সে-কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। কোন কথা না বলে সে অবসন্ন ভাবে ঘরের কোণে বসে হাঁপাতে লাগল। ইত্যবসরে তার দলের যারা সেখানে ছিল তারা এসে পড়ল। তাদের মুখে সকল কথা শুনে সর্দ্দার বললে—এত বড় বোকামি তুমি কর্ব্বে তা আমি ভাবতেও পারিনি। কথা শেষ করে সর্দ্দার একটা বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে। রামগতি একবার সঙ্কোচভরা বিস্মিত নয়নে তার দিকে চেয়ে মাথা নত করে ফেললে।

চৈতন সব শুনে তাকে একটা মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বললে—আরে এতদিনেও কিছু শিখতে পাল্লি না, এর চেয়ে আফ্‌শোষ আর কি হতে পারে। পকেট কেটে কখনও দৌড়তে হয়? একটা লোক যদি বেশ সহজ ভাবে যেতে-যেতে থামকা দৌড়তে আরম্ভ করে ত সবাই তার দিকে চেয়ে থাকবে না? গম্ভীর ভাবে পকেট থেকে নিয়ে নিজে না রাখতে পারিস চালান করে দিবি। সেখানে ত আমাদের ঢের লোকই থাকে। আজ যদি

আমরা গোলমাল করে ভিড় জমিয়ে না দিতাম, তা'হলে তুই ত ধরাই পড়ে যেতিস্।—এমনি সব কত কি সে বলে চলল। কিন্তু এর পর আর একটা বর্ণও তার কাণে যায় নি। একটা দুর্জ্জয় অভিমানে তার সকল বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি একটু ভুল হয়ে গিয়েছে, তার জন্যে সকলে, এমন-কি চৈতনও—তাকে বকতে আরম্ভ করলে; কিন্তু এতটা টাকা যে সে উপার্জ্জন করে আনলে, এর জন্যে একটা মিষ্ট কথাও কেউ বললে না। অথচ এই টাকাটা হস্তগত করবার জন্যে কতটা কষ্ট তাকে স্বীকার করতে হয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কতক্ষণ, কতবার সে লোকটার পাছু পাছু ঘুরেছে, পকেটে কতবার হাত ঠেকিয়েছে; কিন্তু বুকের হৃৎপিণ্ডটা ঠিক সেই সময় কি ভীষণ বেগে স্নায়ুর মধ্যে রক্তবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। সেই আঘাত সহ্য করতে তার জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল। মণিব্যাগ হস্তগত করতেই তার শরীর হতে যেন উত্তাপের প্রবাহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে ছুটতে হল। তার পর সে কি অবসন্নতা! মনের মধ্যে কি অশান্তি! কি বিশ্রী জীবন এ! এর তুলনায় গত জীবন, তার শাস্তি, তার আনন্দ, সে এখন কল্পনার রাজ্যে। স্ত্রী, পুত্র—তাদের প্রীতি, তাদের ভালবাসা, তাদের স্নেহাদর,—এ সব স্মৃতি তাকে উন্মনা করে তুললে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক থেকে নেমে এল। তার মনে হল, যে দিন হতে এ পথে সে এসেছে, সে দিন হতে সে একে একে সব হারাতে বসেছে। প্রথম সে হারিয়েছে মনের শান্তি। প্রথম যে দিন সে সর্দ্দারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়, সেই দিন কেমন করে অনিদ্রায় তার রাত কেটেছে, তা তার মনে পড়ল। তার দুদিন পরে হারালে সে তার স্ত্রী ও পুত্র। তার পর ধীরে ধীরে সঙ্গপ্রভাবে সে তার সত্ত্বা, ব্যক্তিত্ব হারাতে বসেছে। পুরানো দিনের 'তার' সঙ্গে আজকে সে যা হয়েছে 'তার' কি তফাৎ। এ ব্যবধান অতিক্রম করে কি সে তার পূর্ব্বজীবনে ফিরে যেতে পারে না? এ জীবন হতে মুক্তি চাই, কিন্তু মুক্তির উপায় কি? কোন পথই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। নিরুপায় হয়ে তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা কচ্ছিল; কিন্তু তাও সে পাচ্ছিল না। ছোট ছেলেরা যেমন রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে নিজেকে নিপীড়িত করে, সেও ঠিক সেই ভাবে তার মাথাটাকে হাত দুটোর মধ্যে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সেই ভাবেই তার রাত কেটে গেল। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা সে টেরই পেলে না। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন প্রভাতের আলো জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

পাঁচ

প্রভাতের নবোদ্ভাসিত সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক, নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ বাতাস তার প্রাণে, তার হৃদয়ে যেন শক্তি-সঞ্জীবনীর বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়ে দিলে। সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল; তার মনে হল এই আলো, এই বাতাস, এই প্রভাত, এরা তাকে মুক্তির আনন্দ দান করতে এসেছে। মুক্তি,—মুক্তি তার চাই। ব্যক্তিত্ব-হীন দাস-মনোভাবের বন্ধন-শৃঙ্খল সে ছিঁড়ে ফেলবে। অমিত তেজে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে সে একেবারে সর্দ্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সর্দ্দার তখন সারারাত্রির ব্যাহত নিদ্রার পর সবে বিছানা হ'তে উঠেছে। মন তার একটা দুঃসংবাদে বিচলিত। এমন সময় রামগতি উন্নত শিরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার কথা—সে মুক্তি চায়। সর্দ্দার প্রথমে তার সে কথা বুঝতে পারলে না। একবার রুক্ষ জিজ্ঞাসু-নেত্রে রামগতির দিকে চেয়ে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লে—কি বল্‌ছ।

তার ভ্রূকুটীতে রামগতি প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় প্রভাতবায়ুর একটা স্নিগ্ধ ঝাপটা এসে তার হৃদয়ে বল সঞ্চার করে গেল। সে সংযত হয়ে স্থির নির্ভীক কণ্ঠে বললে—আমি চলনাম; এ কাজ আর আমার ভাল লাগে না। এ আমি কর্ব্ব না।

সর্দ্দার তিক্ত স্বরে বল্লে—কর্ব্ব না বল্‌লেই হয় না। এত দিন তোমার খাবার যে যুগিয়েছি, তার খরচ দেবে কে? দাম চাই তার।

রামগতি তার দৃষ্টির সকল তীব্রতা দিয়ে একবার সর্দ্দারের খের দিকে চেয়ে গর্ব্বোন্নত মস্তকে বীরের মতো বার হয়ে গেল। যাবার সময় একটা কথা তার মুখে এসেছিল—সয়তান, তোর মিথ্যা ছলনাময় মিষ্ট কথায়

আমায় মোহগ্রস্ত করে বিপথে নিয়ে গিয়ে, আহার দিয়ে আমার অমূল্য ধর্ম্ম কিনেছিস্। কিন্তু সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন ভেবে, কিছু না বলেই সে নীরবে বেরিয়ে গেল।

রামগতির তীব্র দৃষ্টিতে সর্দ্দার একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল; তার পর মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হয়ে, এই অপমানে ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে, বিছানা ছেড়ে জুতোটা পায়ে গলিয়ে হনহনিয়ে রাস্তায় বার হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় কোথা হতে এসে চৈতন বললে—সর্দ্দার, রামগতির হল কি? দেখলাম, সে হাসতে হাসতে চলেছে। কাজে যেতে ডাকলাম, বললে—মুক্তি পেয়েছি; আর নয়।

"মুক্তি" এই কথাটা সর্দ্দারের কাণে এসে বাজতেই, একবার মুখখানা বিকৃত করে অস্ফুট স্বরে সর্দ্দার বলে উঠল—মুক্তি!—চৈতন, যে করে পারিস, ওকে ধরিয়ে দিগে যা।

চৈতনকে তার দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে, তাকে এক ধমক দিয়ে সর্দ্দার বললে—চেয়ে আছিস্ কি? যা বললাম, করগে যা।

সর্দ্দার আর কোন কথা না বলে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল। আর চৈতন সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলে না। রামগতির কথা ও সর্দ্দারের আদেশে তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। কিন্তু তবুও, কিছু না বুঝেই, বিক্রীত দাস যেমন তার প্রভুর হুকুম পালন করে, সেইভাবে সেও হুকুম তামিল করতে চলে গেল।

খানিকটা পা চালিয়ে গিয়ে এক চেনা পাহারাওয়ালার সঙ্গে দেখা হতে, চৈতন অনুরাগত রামগতিকে দেখিয়ে মৃদু স্বরে অনেক কিছু বললে। ইতিমধ্যে রামগতি সে স্থানের কাছাকাছি এসে পড়তেই, চৈতন তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। পাহারাওয়ালা রামগতিকে হাঁক দিয়ে ডেকে তাকে গ্রেপ্তার করলে। পাহারাওয়ালা এবং চৈতনের কথাবার্ত্তা রামগতির চোখ এড়ায় নি। এই গ্রেপ্তার তারই ফল ভেবে, রামগতি কোন বাধা না দিয়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে থানায় চলল।

ছয়

কোন প্রকারের বাধা না দিতে দেখে পাহারাওয়ালা বেশ একটু বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর, একটা কিছু বলতে গিয়ে, রামগতির মুখের দিকে চেয়ে, কয়েকবার থেমে, অবশেষে আর তার মুখের দিকে না চেয়ে তার স্বভাব-সুলভ রুক্ষচালে বললে—এই দেখো—তার পর সে যা বললে, তার মোট কথা হচ্ছে, থানা পর্য্যন্ত গিয়ে কি হবে। সেখানে গেলে তাকে নির্ঘাত হাজতে যেতে হবে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে তাকে ছেড়ে দিতে পারে, যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

রামগতি বেশ স্থির ভাবে তাকে শুনিয়ে দিলে যে,তাকে একটা পয়সাও সে দিতে রাজী নয়; তাতে তার যাই হোক।

রামগতির একটা ঘৃণা-ভরা তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ পাহারাওয়ালা তাকে বর্ব্বর ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলল। এ অপমানের জন্য রামগতিও প্রস্তুত ছিল। কোন কথা না বলে নির্ব্বিকার ভাবে সে তার সঙ্গে গেল।

তার পর যথা নিয়মে থানার হাজতে বাস করার পর তাকে কোর্টে হাজির হতে হ'ল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—সন্দেহজনক ভাবে বিচরণ করা ও অসৎ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা। পাহারাওয়ালা ও তাদের দলেরই একজন লোকের সাক্ষ্যে তার অপরাধ প্রমাণিত হ'ল। বিচারক রামগতিকে প্রশ্ন করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

রামগতি এতক্ষণ মাথা হেঁট করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। বিচারকের কথায় চমক ভেঙে সে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, সর্দ্দার চৈতন প্রভৃতিকে নিয়ে প্রহসন দেখতে এসেছে। তাড়াতাড়ি তার চোখ ফিরিয়ে নিয়েই, কোন দিকে না চেয়ে সে বললে—না, আমার কিছু বলবার নেই।

হাকিমের হুকুমে রামগতির তিনমাস কারাদণ্ড হল।

দণ্ডাদেশ শুনে সর্দ্দার তার দিকে একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে চাইলে।

সর্দ্দার ও চৈতনকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্য সে বিচলিত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু পরক্ষণেই দণ্ডাদেশের মধ্যে তার মুক্তির বার্ত্তা শুনে, তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সর্দ্দারের ব্যঙ্গ-দৃষ্টির উত্তরে উপেক্ষা-বিষ হেনে প্রফুল্ল চিত্তে সে কয়েদীদের মোটার-বাসে গিয়ে উঠল। তার বন্ধনের শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। সে ঝনঝনানিতে সে তার মুক্তির সুর খুঁজে পেলে।



শিশুমঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

(১) "শিশু-সপ্তাহ"

যে তারিখে মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হন, সেই ইংরাজী মাসের ১৮ তারিখকে "গান্ধী পুণ্যাহ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মাসে, যাহাতে আমরা তাঁহার কথা, সমবেত ভাবে আলোচনা করিতে পারি, এই উদ্দেশ্যেই, ঐ তারিখটিকে বাছিয়া ঐ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে বা তিথিতে সমস্ত জাতিটা একই ভাবে প্রণোদিত হইলে, জাতীয়তার শ্রীবৃদ্ধি হয়, জাতীয় একতা বদ্ধমূল হয়। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুই শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করেন, তখন, মুখে সে কথা বলুন আর না বলুন, প্রত্যেক হিন্দুই জাতি-মাহাত্ম্য, এক প্রাণতা নিশ্চয়ই অনুভব করেন। ফল কথা, নির্দ্দিষ্ট দিনে, সপ্তাহে বা মাসে, কোনও একটি কার্য্যে সমগ্র জাতি মনোনিবেশ করিলে, তাহার ফল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়।

কতকটা এই উদ্দেশ্যে, লেডি রেডিং, এই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি হইতে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত, এই ছয়টি দিনকে "শিশু-সপ্তাহ" নাম দিয়া, সমগ্র ভারতে যাহাতে শিশু-মঙ্গল সংক্রান্ত কার্য হয়, তাহারই আদেশ দিয়াছিলেন। সেই ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান সকল সহরেই শিশু-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে ঐ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

(২) শিশু-সপ্তাহের প্রদর্শনী

ঐ প্রদর্শনীতে কি কি দেখান হইয়াছিল? ঐ প্রদর্শনীতে পাঁচ শ্রেণীর জিনিষ দেখান হইয়াছিল, যথা—

(ক) বাঙ্গালাদেশে মৃত্যুর তালিকা।

(খ) ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হুকওয়ার্ম (বক্র ক্রিমি), বসন্ত, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলির কারণ ও নিবারণের উপায়।

(গ) আঁতুড় ঘর এদেশে কি জঘন্য ভাবে নির্ম্মাণ করা হয়; এবং অতি সামান্য চেষ্টায় কি সুন্দর ভাবে তাহা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

(ঘ) শিশুকে রীতিমত ওজন করার প্রয়োজনীয়তা।

(ঙ) কলিকাতায় যে ৪।৫টি বেবি-ক্লিনিক (baby clinic) স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই শিশু-হাসপাতালে কি কি করা হয়, তাহা দেখান হয়।

(৩) শিশুদিগের জন্য হঠাৎ এত চেষ্টা কেন?

নন্দের দুলাল, বংশধর, সৃষ্টিধর, গোপাল, যাদুমণি প্রভৃতি গালভরা, প্রাণমাতান নামে যাহাদের জন্মগত অধিকার, তাহাদের জন্য এ জাতিটা কি না করিয়াছে ও কি না করিতে প্রস্তুত আছে? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শিশুদিগের আদর্শ ও প্রতীক, তাহাদিগকে হিন্দুরা যে কি চক্ষে দেখে, তাহা কি আজ বুঝাইয়া দিতে হইবে?

আমরা বড় গলায় আজ বলিব—হাঁ, আজ বুঝাইয়া দিতে হইবে—অন্ততঃ আজ। আমরা মানি যে, হিন্দুরা "ছেলেপুলের" জন্য সমস্ত ত্যাগই স্বীকার করিতে সদাই প্রস্তুত—কিন্তু আজ হিন্দুরা নামে হিন্দু থাকিলেও প্রকৃত হিন্দুর আদর্শ হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। যে হিন্দু, সন্তান জন্ম দিবার জন্য, কত যাগ-যজ্ঞ করিতেন, কত তপস্যা করিতেন, কত পাঁজিপুঁথী ধরিয়া গর্ভাধান করিতেন, কত সংযম করিতেন; (বর্ত্তমান কালের eugenics ছাড়া ইহা আর কি?) যে হিন্দু ধাত্রীকে মাতৃত্বের গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন; যে হিন্দুর কৌমারতন্ত্র, অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা আজিও বর্ত্তমান; যে হিন্দু শিশুকে সজীব শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখিতেন; যে হিন্দু পুত্রোৎপাদন না করাটা অধর্ম্ম মনে করিতেন, এবং অপুত্রক লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; যে হিন্দু স্ব স্ব পুত্রকন্যাকে দেশের ও সমাজের সম্পত্তি মনে করিয়া সেইভাবে লালন পালন করিতেন; আজ সে হিন্দু কোথায়?

আজ আমরা হিন্দুনামধারী কামাতুর, ব্যসনবিলাসী, হীন জীববিশেষে পরিণত হইয়াছি। আজ আমরা হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারের অর্থ না বুঝিয়া, পাদরীদের পড়ান বুলি শুনিয়া, হিন্দুদিগের eugenics বা সুপ্রজনন বিদ্যা-ঘটিত আচার-ব্যবহারকে নিরর্থক বোধ করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, শৈশবকাল হইতেই পুত্রকন্যাকে ভোগেরই পথে ক্রমশঃই ঠেলিয়া দিতেছি; আজ তাই এদেশে—

(ক) অকাল—শিশু-মৃত্যু।

(খ) শিশুদিগের স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগপ্রবণতা।

(গ) শিশুদিগের শ্রী ও বৃদ্ধির হ্রাস।

(ঘ) বিকলাঙ্গ, জন্মজড়, হীনবুদ্ধি, বুদ্ধিহীন শিশুর বাহুল্য।

আমরা, জাতি-হিসাবে, এই বিষয়গুলির সংবাদ রাখি কি? উত্তরে বলিব—আজ আমরা মুখে "নেসন" (জাতি?) বলিয়া যত চেঁচাই না কেন, আজ জাতি হিসাবে, আমরা মরিয়াছি। যদি না মরিতাম, তাহা হইলে, বাঙ্গালাদেশে যে ভীষণ হারে শিশু-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা দেখিলে কখনো স্থির থাকিতে পারিতাম না! আজ আমরা স্বার্থপর, খরবৃত্তিসম্পন্ন ও মুতকল্প না হইলে, নিম্নলিখিত শিশু-মৃত্যুর হার দেখিয়া যে-যার সকলেই কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, ইহার প্রতিবিধানার্থ উন্মত্তপ্রায় নিশ্চয়ই হইতাম! কিন্তু কৈ, এই বাঙ্গালা দেশ আজ নীরব—যেন এখানে কিছুই হয় নাই। এই বাঙ্গালী আজও পঙ্গপালের ন্যায় চাকুরী করিতে ছুটিয়াছে! এই বাঙ্গালী আজও মুখে গ্রাস তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে খাইতেছে! এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ ও নিরাশার কারণ এই যে, এই বাঙ্গালার মাতৃকুল আজও রাত্রিতে সুখশয্যায় শুইয়া ঘুমাইতে পারিতেছেন! এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালার প্রত্যেক ২ মিনিট অন্তর যে একটি করিয়া শিশু তাহার মায়ের কোল ছাড়িয়া যাইতেছে—এ বাঙ্গালায় বৎসরে যত শিশু জন্মায়, তাহার অর্দ্ধেকই যে মারা পড়ে—এ কথাগুলি কি বাঙ্গালার মর্ম্মে শেল হইয়া বিঁধে না? বাঙ্গালী ও বিশেষ করিয়া বঙ্গ-রমণীরা কি এতটাই হৃদয়হীন হইয়াছেন? তবে শোন মা বঙ্গ-নারিগণ:—

বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর তালিকা—

(ক) প্রত্যেক ২ মিনিট অন্তর ১টি শিশু মারা পড়ে।

(খ) শতকরা ৫০টি শিশু মারা পড়ে।

(গ) এই বাঙ্গালাদেশে প্রত্যহ

১	দিন	বয়স্ক	২৪৫টি	শিশু	মরিতেছে।
৭	,,	,,	১৩৯টি	,,	,,
১৪	,,	,,	৯৬	,,	,,
১	মাস	,,	৮৫	,,	,,
২	,,	,,	৫৭	,,	,,
৩	,,	,,	৪১	,,	,,
৪	,,	,,	৩৩	,,	,,
৫	,,	,,	২৬	,,	,,

	মাস	বয়স্ক		শিশু	মরিতেছে
৬	”	”	২২	”	”
৭	”	”	১৭	”	”
৮	”	”	১৬	”	”
৯	”	”	১৫	”	”
১০	”	”	১০	”	”
১১	”	”	৮	”	”
১২	”	”	৬	”	”

অর্থাৎ এই বাঙ্গালা দেশে—

প্রত্যহ	৮১৬টি	শিশু	মারা পড়িতেছে
প্রত্যেক মাসে	২৪৪৮০	”	”
”	বৎসরে ২৯৩৭৬০	”	”
”	১০ ” ২৯৩৭৬০০	”	”
”	২০ ” ৫৮৭৫২০০	”	”

যদি এই ৫৮৭৫২০০ শিশু না মারা পড়িত, এবং গড় পড়তা, তাহারা মাসিক ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিত, এবং তাহারা ৩০ বৎসর ধরিয়া এই ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিত, তবে এদেশে অন্ততঃ

২১,১৫০,৭২০,০০০ টাকা থাকিত!!!

(৪) শিশুরা এত মারা পড়ে কেন?

সুধু মায়া-মমতার হিসাবে নয়, আর্থিক হিসাবেও, শিশু-মৃত্যু কত ক্ষতিকর, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে—প্রথমতঃ, এ দেশের শিশু-মৃত্যুরই হার কি বেশী, না অপর দেশেও তাই? এবং দ্বিতীয়তঃ, এ দেশে শিশু-মৃত্যুর কারণ কি?

প্রথমতঃ অপরাপর দেশের শিশু-মৃত্যুর হার কত, তাহা দেখা যাউক :—

১০০০টি শিশুর মধ্যে, বৎসরে,

ভারতবর্ষে	২০৬ টি	শিশু মরে
বাঙ্গালায়	১৮৫	”
বিহার উড়িষ্যায়	১৮০	”
ইংলণ্ডে	৯১	”
অষ্ট্রেলিয়ায়	৭১	”
নিউজিলণ্ডে	৫১	”

যদি সুধু কলিকাতার হিসাব লওয়া যায় তবে দেখা যায়,—

খৃঃ অঃ	জন্ম	মৃত্যু	মৃত্যুর হার
১৯১৭	১,৬২৭,৮৭৭	৩০০৫১৪	১৮৫
১৯১৮	১,৪৮৯,১৩৫	৩৩৯৬৪৯	২২৮
১৯১৯	১২৪৫৩৯২	২৮৪২৯৪	২২৮
১৯২০	১৩৫৯৯১৩	২৮২০৯০	২০৭
১৯২১	১৩০১০০১	২৬৮১৬২	২০৬

এইবার দেখা যাউক, এত শিশু-মৃত্যুর কারণ কি? এই কথার উত্তরে সর্ব্বাগ্রেই বলা উচিত যে, কোনও কায করিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা চাই। অভিজ্ঞতা জ্ঞানসাপেক্ষ। যে কয়টি মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চরম কায, যে কার্য্যের ফল সমস্ত বংশ ও জাতিটাকে ভোগ করিতে হইবে, যে কার্য্যের ফলের উপরে উত্তরকালের জগতের সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে,—কি পরিতাপের বিষয়, সেই কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, জ্ঞানলাভের এতটুকু চেষ্টাও নাই—বরং স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের বাহুল্যই দেখা যায়। হিন্দু কখনো এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহার শাস্ত্রে 'ইউজেনিক্স্' (বা সু-প্রজনন বিদ্যার) নামোল্লেখ না থাকিলেও, নিত্য শাস্ত্রানুশাসনের ভিতর দিয়া হিন্দু এই মহৎ কার্য্য সাধিত করিয়া লইতেন। আর আজ পাশ্চাত্য জগৎ "ইউজেনিক্স্" বলিয়া চীৎকার করিতেছে মাত্র, দৈনন্দিন জীবনে, ছাগ, কুকুর, চটকপক্ষীর সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে।

জ্ঞানের অভাবই এদেশের প্রধান অভাব। আমাদের দেশ অতীব দরিদ্র, এ কথা মানি; কারণ, জন-পিছু বৎসরে আয়—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে	৭২	পাউণ্ড
অষ্ট্রেলিয়ায়	৫৪	”
ইংলণ্ডে	৫০	”
ক্যানেডায়	৪০	”
ফ্রান্সে	৩৮	”
জার্ম্মাণীতে	৩০	”
ইতালিতে	২৩	”
জাপানে	৬	”

১ পাউণ্ড = ১৫৲ গড়ে।

ভারতবর্ষের জন-পিছু বাৎসরিক আয় :—

দাদাভাই নওরোজীর মতে	২০৲ টাকা
লর্ড কার্জ্জনের মতে	৩০৲
ডাইরেক্টর্ অফ ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ মতে	৫৩৲
মিঃ রাধালকারের মতে	৪১৲

এত ভীষণ দারিদ্র্য এদেশে, তাহা খুব মানি; কিন্তু তাহার চেয়ে ভীষণতর যে অজ্ঞতা। ইংরাজী অর্থে literate (অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান মাত্র আছে) এই সংকীর্ণ অর্থেও যদি লই, তবে এ দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন :—

কোন্ দেশে শতকরা কতগুলি শিশু বর্ণপরিচয় করিতেছে—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে	১৯.৮৭
ইংলণ্ডে	১৬.৫২
জার্ম্মাণীতে	১৬.৩০
ফ্রান্সে	১৩.৯০
সীলোনে	৮.৯৪
রুসিয়ায়	৩.৭৭
ভারতবর্ষে	২.৩৮

শিক্ষা ব্যাপদেশে ব্যয়ের তালিকাটা দেখুন :—

দেশের নাম	জনসংখ্যা	বাৎসরিক শিক্ষা বাবদে ব্যয়
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১০ ক্রোর	১৬৭ ক্রোর
ভারতবর্ষ	৩০ ”	১২৷৷০ ”

এত গেল ইংরাজী মতে শিক্ষার কথা—যে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বকে ফুটায় না, সুধু রাজকার্য্য চালানর উপযোগী কেরাণী, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির সৃষ্টি করে। প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা একরকম নাই বলিলেও হয়—তাই বলিতেছিলাম যে, এদেশে অর্থের অভাবের চেয়েও বহু গুণে জ্ঞানের অভাবটাই প্রকট।

প্রাচীন হিন্দুরা অতীব দূরদর্শী ছিলেন। সেই দূরদর্শিতার ফলে তাঁহারা যে ভাবে সমাজ-বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ সে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তৎকালের সমাজে, "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" ছিল; গর্ব্বোন্নতশির মহারাজ-চক্রবর্ত্তীও দীন ভিখারীর পায়ে মস্তক লুণ্ঠিত করিতেন—যদি সে ভিখারী জ্ঞানে ধনী হইতেন। সে কালের হিন্দুসমাজে যতটা democracy বা গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কোনও কালে কোনও দেশে এখনো তাহা হয় নাই। হিন্দুসমাজের বারো মাসে তের পার্ব্বণের সময়গুলি ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে মেলামেশার সুযোগ প্রদান করিত। কথকতা, যাত্রা, পাঠ প্রভৃতি জনশিক্ষার আয়তন ছিল। সমাজ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষক-ব্রাহ্মণকে নিশ্চিন্ত করিত—ব্রাহ্মণেরা তৎপরিবর্ত্তে লোক শিক্ষার ভার লইতেন। এই ভাবে, হিন্দুসমাজে, 3 R's (অর্থাৎ ইংরাজী মতে কেতাবতী শিক্ষার) এর প্রচলন না থাকিলেও, হিন্দু মাত্রেই দেশের পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অবগত ছিলেন; এবং বৈদ্যকুল রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায়, বিনাব্যয়ে এ দেশে চিকিৎসা চলিত। এবং সব চেয়ে বড় কথাটা এই ছিল যে,—তখন সমাজদেহে প্রাণ থাকায়, অন্যোন্য সহানুভূতিশীল সকলেই ছিল। তাই তখন কাহারো এতটুকু মাথা ধরিলে সমস্ত সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। আর আজ—যে যা'র সুধু নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। তাই আজ এদেশে—

(ক) জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না।

(খ) ভ্রাতৃ-ভাবের, পরার্থপরতার প্রসার হইল না।

(গ) অজ্ঞানতা গাঢ় হইতে

(ঘ) বর্ত্তমানের বিপদ।

আমরা যদি খাঁটি হিন্দুর বা মুসলমানের দিক দিয়া দেখি, তবে বলিব যে, আমরা ইংরাজী অর্থে "নেশন" না থাকিলেও, আমরা একটা "জাতি" ছিলাম, আমাদের সমাজ, শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, জাতীয়তার অনুকূল বিধি সকলই ছিল। কিন্তু আজ সে সকলই একে একে লোপ পাইয়াছে।

লিখিত-পঠিত ভাবে হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভিতর "স্বাস্থ্যতত্ত্ব"—বিষয়ক কোনও পুস্তক না থাকিলেও, ধর্ম্ম ও আচারের অনুশাসনের প্রত্যেক গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে—আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি না। যদি habit is second nature (অভ্যাসই প্রকৃতির তুল্য) কথাটা সত্য হয়,—তবে হিন্দুদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না; যে হেতু তাঁহারা প্রত্যেক হিন্দুর দৈনিক জীবনের প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে, এবং সামাজিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ভিতরে পূর্ণমাত্রায় স্বাস্থ্যানুকূল বিধি

জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্মের সঙ্গে শরীরের সুস্থতা-মূলক বিধি একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

এখন আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমরা দেশ ও দেশের সকল জিনিসকে ছোট করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় পূর্ণ অধিকারী হইতে পারি নাই। যাঁহারা সংবাদপত্রাদি রীতিমত পাঠ করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পাশ্চত্য জাতিরা ইতিহাস-তৈয়ার কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছামত "লেজা-মুড়া" বাদ দিয়া স্থানে-স্থানে ইচ্ছামত ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনানুযায়ী রং ফলাইয়া ঘটনাগুলিকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষের ফলে, আমাদের দেশের যাহা কিছু তদ্বিষয়ে আমাদের ঘৃণা জন্মিয়াছে; আমাদের দেশকে, সমাজকে, ধর্ম্মনীতিকে, আচার ব্যবহারকে, শিক্ষার বিষয়গুলিকে হেয় ও হীন বিবেচনা করাইবার জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা করার ফলে, শৈশব হইতে জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, পরের শিখান বুলি আবৃত্তি করিবার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ অসভ্যদেশ, এ দেশে প্রশংসার কিছুই নাই, ইত্যাকার সংস্কারগুলিকে মগজে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে তিনটি বিষম জিনিস গজাইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে; যথা—

(ক) Change of mentality অর্থাৎ আমাদের ভাবনার ও চিন্তার ধারা উল্টাইয়া গিয়াছে—আমরা সাহেবদিগের মুখে ঝাল খাই, সাহেবেরা যে রঙ্গীন্ কাচ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরেন, সেই রঙ্গে সকল জিনিসই রঞ্জিত দেখি এবং সেই মতই কথা বলি; "নিজেদের" বলিতে যাহা কিছু, সে সকলকেই ঘৃণা করি; আর পাশ্চাত্যদের ময়লাকেও চন্দন বলি।

(খ) ভারতসাম্রাজ্য চালনার উপযোগী শিক্ষাদানের ফলে কতকগুলি অপরু ডাক্তার, উকীল, হাকিম, কেরাণী প্রভৃতি সৃষ্টি হইতেছে; ঠিক্ যেটুকু বিদ্যা হইলে দিনগত পাপক্ষয় করা চলে, সেইটুকু ভাসা-ভাসা জ্ঞান লইয়া ইহারা সমাজে "শিক্ষিত" নামে পরিচিত হইতেছে—এবং প্রকৃত "শিক্ষা" বস্তুটি যে কি, তাহার সংজ্ঞাকে লোপ করিতে বসিয়াছে।

(গ) এদেশে "শিক্ষিত" বলিতে, বর্ত্তমানকালে, বর্ণ-পরিচিতকেও বুঝায় (merely literacy); সে হিসাবে, ইংরাজদিগের দেড়শত বৎসর রাজত্বের ফলে এ দেশে শতকরা মাত্র ৪ জন "শিক্ষিত"; কিন্তু এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই নিজ নিজ কৌলিক আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্টই জ্ঞানী ছিল—তাহাদের বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও, হিসাব-নিকাশ, ব্যবসায় বুদ্ধি, লোক-ব্যবহার-জ্ঞান প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল। আজ আমরা তাহাও খোয়াইতে বসিয়াছি—ইংরাজের প্রদত্ত কেতাবতী বর্ণ-জ্ঞানের খোঁটা ধরিয়া বসিয়া আছি!

এই বিষম বিপাক হইতে এ জাতিটাকে উদ্ধার করিতে হইলে, জাতীয় শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—যে ধর্ম্ম, যে আচার, যে রীতি-নীতি এদেশে প্রচলিত ছিল, সেই ছাঁচে বর্ত্তমান সময়োপযোগী অদলবদল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে—তবে যদি এ জাতিটা আবার জীবন্ত হইয়া উঠে।

(৫) জাতীয় অবনতির হিসাব।

জাতি হিসাবে আমরা যে কতটা ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য এবং রোগপ্রবণ হইয়াছি, একবার তাহা দেখা যাউক। কোন্ দেশের লোক গড়ে কত বৎসর বাঁচে, একবার সেইটা আলোচনা করা যাউক:—

দেশের নাম	পুরুষ	স্ত্রী
নিউজিল্যাণ্ড	৫৯·১৭	৬২·৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	৫০·২০	৫৮·৮৪
ডেনমার্ক	৫৪·৯০	৫৭·৯০
নরওয়ে	৫৪·৮৪	৫৭·৭২
সুইডেন	৫৪·৫৩	৫৬·৯৮
হল্যাণ্ড	৫১·০০	৫৩·৪০
আমেরিকা যুক্ত রাজ্য	৪৬·৩২	৫২·৫৪
সুইজারল্যাণ্ড	৪৯·২৫	৭২·১৬
ইংলণ্ড	৪৬·৫৩	৫২·৩৮
ফ্রান্স	৪৫·৭৪	৪৯·১৩
জার্ম্মানী	৪৪·৮২	৪৮·৩৩
ইটালী	৪৪·২৪	৪৪·৮৩
জাপান	৪৩·৯৭	৪৪·৮৫
ভারতবর্ষ	২২·৫৯	২৩·৩১

এইবার দেখা যাউক, এ দেশের গত আদমসুমারীতে (১৯২১) লোক সংখ্যার হার কত:—



বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বঙ্গদেশের মোট আয়তন	৮২,২৭৭ বর্গমাইল।
বর্দ্ধমান বিভাগের লোক সংখ্যা	—৪·৯ (হ্রাস) শতকরা
প্রেসিডেন্সী বিভাগের ”	+০·৪ (বৃদ্ধি) ”
রাজসাহী ” ”	+১·৯ (”) ”
চট্টগ্রাম ” ”	+১০·৭ (”) ”
ঢাকা ” ”	+৭·১ (”) ”
সমস্ত বাঙ্গালাদেশে লোকসংখ্যা	+২·৮ (”) ”

বাঙ্গালাদেশে জন্মের হার কি হারে কমিতেছে, তাহা এইবার তুলনা করিয়া দেখুন :—

	শতকরা
১৮৭২—১৮৮১ আদমসুমারীতে হার ছিল	১১·৪+
১৮৮১—১৮৯১ ” ”	৭·৩+
১৮৯১—১৯০১ ” ”	৫·১+
১৯০১—১৯১১ ” ”	৮·০+
১৯১১—১৯২১ ” ”	২·৮+

(৭) দেশের লোক মরে কিসে ?

(ক) প্রথমতঃ ব্যারামে এদেশের লোক মরে। তাহার হিসাব লউন :—

এই বাঙ্গালাদেশে, প্রত্যহ,

১½ মিনিট অন্তর	১টি	লোক	ম্যালেরিয়ায় মারা পড়িতেছে।
৩ ”	”	”	নিউমোনিয়ায় ”
৪ ”	”	”	ওলাউঠায় ”
৪ ”	”	”	আমাশয়ে ”
৫ ”	”	”	ক্ষয়রোগে ”
৮ ”	”	”	সূতিকা ”
১৫ ”	”	”	ধনুষ্টঙ্কারে ”
৩০ ”	”	”	কালাজ্বরে ”
২৪ ঘণ্টা	”	”	টাইফয়েড্ জ্বরে ”

এই বাঙ্গালাদেশে

জন্মের হার ৪৬·৭

মৃত্যুর হার ৪০·০

দ্বিতীয়তঃ, যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এ দেশে লোক মরে। দুধ ও ঘি আর পাইবার উপায় নাই ; অথচ, এদেশে হিন্দু নামধেয়ী এমন কেহই ছিলেন না, যাঁহার ঘরে দশ বিশটা দুগ্ধবতী গাভী না থাকিত ; আর এখন — প্রতি একশত লোক পিছু কোন্ দেশে কতগুলি গাভী আছে, তাহা দেখুন :—

অষ্ট্রেলিয়ায়	২৫৯টা গরু
নিউজীলণ্ডে	১৫০ ”
কেপ-কলোনীতে	১২০ ”
ক্যানাডায়	৮০ ”
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে	৭৯ ”
ডেন্‌মার্কে	৫০ ”
ভারতবর্ষে	৫০ ”

তাহার পর, ধান-শস্যের উৎপন্নের হার লউন :—

সমগ্র ভারতে ৩৫ ক্রোর লোকের বাস। অতি কম করিয়া ধরিলেও, এই ভারতবর্ষে

আবশ্যক হয়, পূরা—৭৯০০০০০০ টন

কিন্তু জন্মায়, চাউল——৬৪,০০০০০০ ”

শস্য ও খড় ইত্যাদি ১৫,০০০,০০০ ”

তৃতীয়তঃ, বিনা চিকিৎসায় বা অচিকিৎসায় লোক মরে :—

এই বাঙ্গালাদেশে

লোকের বাস	৪৬০০০০০০
সুশিক্ষিত চিকিৎসক আছেন	৩৫৩৮
হাতুড়ে আছেন	১৭০০০

অর্থাৎ প্রত্যেক ১২৫০০ লোক পিছু ১ জন সুচিকিৎসক এবং ” ২২৪০ ” ” ১ ” যে কোনও রকমের চিকিৎসক আছেন।

(৮) উপসংহার।

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বেশী হইয়া গেল বলিয়া সংক্ষেপে সকল কথার সার গুলি এইখানে একত্রিত করিয়া দিলাম।

১। শিশুরাই ভাবী বংশধর—দেশের আশা ভরসা।

২। এ দেশে, ব্যক্তিগত অজ্ঞতা ও জাতিগত ঔদাসীন্যই প্রাত্যহিক ৮১৬টি শিশুর মৃত্যুর কারণ।

৩। “দেশ” বা গ্রামগুলি এখন রোগের আকর ; দেশব্যাপী দৈন্য ; আমরা চাকুরী-জীবি ; প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেহ ও মন-ধ্বংসকারী বিজাতীয় শিক্ষার অতি প্রসার ; এই সকল কারণে, আমাদের জীবনী-শক্তির অপচয় ও হ্রাস ঘটিতেছে।

৪। খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ, তেমনি

উদাসীন। এখন সর্ব্বভুক্ হইয়াছি বটে, কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ ভেজাল দেখিয়াও বিচলিত হই না। গরুকে মাতা বলি বটে, কিন্তু গরুর যেরূপ দুর্দ্দশা আমরা ঘটাইয়াছি, তেমনটি গোখাদক জাতিরাও করে নাই।

৫। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?—

প্রথম কর্ত্তব্য।—মৃত্যুর হারটি সকলকে জানান।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।—স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, মাতৃত্ব-তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করা ও জাতীয় বিদ্যালয়ের বহু প্রসার ঘটান।

তৃতীয় কর্ত্তব্য।—ধাত্রী, আঁতুড় ঘর প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা।

চতুর্থ কর্ত্তব্য।—গো জাতির উন্নতি করা; আইন দ্বারা উৎসর্গীকৃত বৃষকে মিউনিসিপ্যালিটির কবল হইতে উদ্ধার করা। গোচারণ ভূমির পরিসর বৃদ্ধি করা। গো-পালন, গো-সেবা ও গো-চিকিৎসার বহুল ভাবে প্রসার ঘটান। দেশ বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট বৃষ আনাইয়া গো-জাতির উন্নতি সাধন করা।

পঞ্চম কর্ত্তব্য।—ছেলেদের স্কুলের মত, "বাবা-বিদ্যালয়" স্থাপন করা—জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় পিতামাতার ও অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যত দিন অভিভাবকেরা ছেলেদের স্কুলের বেতন ও গৃহ-শিক্ষকের বেতন যোগাইয়া কর্ত্তব্যের চূড়ান্ত করিতেছেন মনে করিবেন; যত দিন জনসাধারণ ডাক্তারগণকে দূরে রাখিবেন,—যত দিন জনসাধারণ শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ না করিবেন, তত দিন আমাদের দুরবস্থা কমিবে না।

ষষ্ঠ কর্ত্তব্য।—জাতীয়তাব্যঞ্জক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ইংরাজদিগের অনুকরণে আতুরাশ্রম, সেবাশ্রম, খোকা-হাসপাতাল সুধু করিলে চলিবে না। শিশু-লালন পালনার্থ সমস্ত দেশের লোককে অবহিত হইতে হইবে। ষষ্ঠী উৎসব, নন্দোৎসব, গোপাষ্টমী প্রভৃতি ধাঁজের উৎসব-গুলি যাহাতে সারা জাতির মধ্যে প্রাণের সাড়া আনিয়া দেয়—ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই তাহা করিতে হইবে। তবে যদি শিশুকুলের আবার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে !!!

শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ গুহ, বি-এ

(১)

মধ্যযুগের ইয়োরোপে শিক্ষক-সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যে, শিশুদের মন নরম মাটির মত, উহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আকারে গড়িয়া তোলা যায়। কেহ কেহ মনে করিতেন, শিশুদের মন রেখাবিহীন শ্লেট (tabula rasa), উহাতে শিক্ষক যাহা ইচ্ছা অঙ্কন করিতে পারেন। কিন্তু, আধুনিক যুগের শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎগণের মত এই যে প্রত্যেক শিশুর একটা স্বতন্ত্র স্ব-ভাব (individuality) আছে; সেই স্ব-ভাবের বিকাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। "Education" শব্দের বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়,—e, বহিঃ, এবং ducere, গতিপথ নির্দ্দেশ করা, স্ফুরণে সহায়তা করা; 'education' শব্দের মৌলিক ভাব স্ব-ভাবের স্ফূরণ বা বিকাশ। শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্বের অনুসন্ধান করা, ও সেই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন পাঠ্যতালিকা ও কার্য্যতালিকার নির্দ্ধারণ করা। একই পাঠ্যতালিকা বা কার্য্যতালিকা অনেকগুলি বালকের জন্য ব্যবস্থা করিলে, কখনও তাহা কাহারও বিশেষত্বের স্ফুরণে সহায়তা করে না; সকলে একই বিধানে অনুশাসিত হইলে, প্রত্যেকের বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পাঠ্যতালিকায় যে নির্দ্দেশ, তাহাকে "education" শব্দের দ্বারা অভিহিত করিলে, "education" শব্দটীর অপব্যবহার হইবে; ঐ প্রকার নির্দ্দেশকে "Super-imposition" বা শিক্ষকের স্বেচ্ছানুশাসন বলা যাইতে পারে, অথবা আখ্যান্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তথায় "education" শব্দটীর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে।

রুশো (১৭১২—৭০) ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে "Emile" নামে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অল্প কথায় এই—শিক্ষকের কর্ত্তব্য, শিশুর প্রকৃতিগত বৃত্তিসমূহের অনুশীলন এবং ক্রমবিকাশের সহায়তা করা; শুধু কতকগুলি ঘটনা, আখ্যান বা তথ্যের সহিত পরিচিত করা নয়। রুশোর কিছুদিন পরে, Pestalozzi (১৭৪৬—১৮২৭) শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বহু দিন ধরিয়া গবেষণা করেন, এবং "How Gertrude teaches her children" নামে অনুবাদিত মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি শিশুকে একই ক্লাসে রাখিয়া শিক্ষা দিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিশু এক একটি স্বতন্ত্র ক্লাস। শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রত্যেক শিশুকে একটি প্রাণবান সত্তা মনে করা, এবং তাহার বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিত হওয়া। তাহাকে ক্লাস-রূপ জড় পদার্থের অণুর তুল্য মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে। তাঁহার মতে শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাকরণ বা গণিতের চর্চ্চা নয়, শিশুর মনোবৃত্তির বিকাশের চেষ্টাই শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, জীবনের চরিত্রবত্তা, শৈশবের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের অনুশীলনের ফলেই পাওয়া যায়। শিশুর ঐ সব মনোবৃত্তির পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। Pestalozzir কিছুদিন পরে Froebel (১৭৮২-১৮৫২) Kindergarten পদ্ধতির প্রচার করেন। তিনি তাঁহার "Education of Man" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The purpose of teaching is to bring ever more *out of* man rather than to put more and more *into* him (Froebelএর "Education of man," W. N. Hailmann কৃত অনুবাদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা)। তিনি আরও বলিয়াছেন—"the function of the teacher is that of benevolent Superintendence"; অর্থাৎ, তাঁহার মতে, শিক্ষকের কার্য্য প্রধানতঃ অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তির উন্মেষে সাহায্য করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য বাহ্য অনুশাসনাদির বিধান। বর্ত্তমান শতাব্দীতে আচার্য্যা Maria Montessori শিশুশিক্ষা পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। Montessori-পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন—"The teacher here is expected to observe and direct the activities of the child rather than to control them. The large degree of freedom allowed and the individual treatment are features which differentiate these schools from what are customarily found elsewhere"..... "courts and gardens are connected with these schools and these are used in training children to observe flowers and plants as well as birds and small animals kept as pets" অর্থাৎ, এই সকল শিক্ষাগারে শিক্ষকের কর্ত্তব্য শিশুদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ এবং তাহাতে যতদূর সম্ভব বাধা না দিয়া পরিচালিত করা। সাধারণ শিক্ষাগার হইতে এই সকল শিক্ষাগারের বিশেষত্ব এই যে, এখানে শিশুদের কার্য্যের স্বাধীনতা অনেকটা বেশী, এবং শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তির তারতম্য অনুসারে এখানে বিভিন্ন প্রকারে লালন পালনের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যতালিকার নির্দ্দেশ করা হয়।.....এই সকল শিক্ষাগারের সঙ্গে খেলার জায়গা এবং বাগান সংলগ্ন থাকে। এখানে শিশুদের গাছপালা, ফলফুল, পোষা পশুপক্ষীর সহিত পরিচিত করিবার সুব্যবস্থা আছে।

(২)

এখানে দুর্ব্বল, বিকৃতবুদ্ধি এবং রোগগ্রস্ত শিশুদের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শিশুদের মধ্যে দৈহিক এবং মানসিক তারতম্য থাকিলেও, এমন শিশুর সংখ্যা খুবই অল্প, যাহাদিগকে উপযুক্ত ব্যায়াম চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা সমাজের উপকারী, কার্য্যক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত করা যায় না। দুর্ব্বল, বিকৃতবুদ্ধি ও রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য এদেশে এখনও সমাজ কোন প্রকার ব্যবস্থা করে নাই। কতকগুলি শিশু দেখা যায়, পড়া মনে রাখিতে পারে না, শুধুই

বদ্-খেয়াল, কু-কাজে ব্যাপৃত। এই প্রকার শিশুদের লইয়া গবেষণা, ঐ প্রকার শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ নিরূপণ ও নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে (United States of America) অনেক পরিষৎ (Bureau) এবং চিকিৎসালয় (Hospital) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অনেক শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎ ও চিকিৎসক ইহাদের তত্ত্বাবধান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই প্রকারের Bureau বা পরিষৎকে Research Bureau of Juvenile Delinquency, অর্থাৎ শিশুদের কু-কাজ সম্বন্ধে গবেষণার সমিতি বলা হয়। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ কু-কাজের মূলে শিশুর শারীরিক বা মানসিক অস্বাস্থ্য বর্ত্তমান থাকে। নিম্নে ঐ প্রকারের একটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তক হইতে দুইটি উদাহরণ ভাষান্তরিত করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) W. Colman, বয়স ১৩ বৎসর, ৭ মাস। জিনিসপত্র ভাঙ্গে, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দৌরাত্ম্য করে, ইত্যাদি। আটবার হাসপাতালে গিয়াছে।

মে মাস, ১৯১৯ তাহাকে এই হাসপাতালে দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের পরীক্ষায় শক্তিহীনতা ও মানসিক বিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরের পরীক্ষায় পাওয়া যায়, আটটি দাঁত খারাপ এবং Kidney অসুস্থ। চিকিৎসক Kidneyর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। উপযুক্ত পথ্যাদির ব্যবস্থা হইল। ছয় সপ্তাহ পরে সে সুস্থ হইল এবং উপযুক্ত পরীক্ষার পর তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। তার পর তার বাড়ী হইতে কয়েকখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। এখন তাহার অবস্থা ভালই চলিতেছে।

(2) P. Kathryn, বয়স ১৬ বৎসর। স্কুল হইতে পলাইয়া যায়। অত্যন্ত দুরন্ত। ইত্যাদি।

তাহাকে এখানে আনা হইল। পরীক্ষায় দেখা গেল, বুদ্ধি বেশ আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কাজ (function) বিকৃত। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস লওয়া হইল। তাহাকে যতদূর সম্ভব সুখী করিতে চেষ্টা করা হইল; আনন্দজনক খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করা হইল। কিছুদিন পরে মস্তিষ্কের বিকার চলিয়া গেল। তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইল। এখন হইতে সে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। অল্প দিন হইল খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। এখন সে আত্মসম্মান বুঝিতে পারে, এবং সম্পূর্ণ সৎপথে চলিতেছে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে সকল শিশু লেখাপড়ায় বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার মূলে তাহাদের শারীরিক অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা আছে। তাহাদের এই অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা দূর করিলেই তাহারা অন্যান্য সাধারণ শিশুর মত লেখাপড়ায় বেশ ভাল হইতে পারে। অস্বাস্থ্যের প্রাদুর্ভাব শিশুদের মধ্যে কত, নিম্নে অনুবাদিত যুক্তরাজ্যের ওহিও প্রদেশের শিশুমঙ্গল পরিষদের। (Ohio Bureau of Juvenile Research, U. S. A.) প্রকাশিত সেনসাস হইতে গৃহীত একটি নমুনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

৪৬০টি বালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইল।
১৭৭ জনের খাদ্যের অভাবে শরীর অপুষ্ট।
১৭৫ জনের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।
২৮ জনের শ্রবণশক্তি ক্ষীণ।
৬ জন সম্পূর্ণ বধির।
২৪৩ জনের দাঁত দূষিত।
১৭৪ জনের টন্‌সিল রোগগ্রস্ত।
৯ জনের পেশীবিশেষ ক্ষয় রোগগ্রস্ত।
৯৮ জনের থাইরইড্ স্ফীত।
৯ জনের হৃদরোগ।
৩৬ জনের শ্বাসনালীর রোগ।
৬ জনের ক্ষয়রোগ আরম্ভ হইয়াছে।
১০ জনের ক্ষয়রোগের পূর্ব্বাবস্থা।
৫ জনের হার্ণিয়া।
১ জনের মস্তিষ্কে স্ফোটক।

এই অদৃষ্টবাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের অক্ষমতা অদৃষ্টের দোষ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এদেশে এখন নিতান্ত দরকার যে, একদল লোক এই সকল দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। এই স্বাস্থ্যহীনতার দেশে শিশুদের স্বাস্থ্যের সেনসাস প্রস্তুত করিলে, তাহা উপরে উদ্ধৃত সেনসাস হইতে কম বীভৎস হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(৩)

শিশুদের পাঠ্যতালিকা বা কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশু এক একটী ভিন্ন শ্রেণী; অনেকের জন্য একই তালিকা নির্দ্ধারিত হইলে, কাহারও পক্ষে তাহা সবিশেষ উপযোগী হইবে না; একই তালিকা পালনের ফলে কাহারও বিশেষত্বগুলি ফুটিবে না। কাহারও হয় ত সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের দিকে বিশেষ ঝোঁক, কাহারও হয় ত মিস্ত্রির কাজে বা বয়নাদি কর্ম্মে বিশেষ পটুতা। যতদূর সম্ভব, তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা না হইলে সকলেই বিশিষ্টতাহীন, একঘেয়ে, এক ছাঁচের হইয়া যাইবে। অথবা অনেকে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্য আছে বলিয়াই ত শিক্ষকের আবশ্যকতা। শুধু ব্যাকরণ বা পুস্তক বিশেষ হইতে কতকগুলি কথা আবৃত্তি করাই যদি শিক্ষকের একমাত্র কার্য্য হইত, তাহা হইলে ত শিক্ষকের পরিবর্ত্তে গ্রামোফোন ব্যবহার করিলেই চলিত। Froebel অনেক স্থানে শিশুকে চারাগাছ এবং গুরুমহাশয়কে মালীর (Gardener) সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। একস্থানে বলিতেছেন—"The educator should be called not a teacher but a gardener। ইহার তাৎপর্য্য এই। গুরুমহাশয়কে শিক্ষক না বলিয়া মালি (Gardener) বলা উচিত। চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে হইলে, মালির যেমন প্রত্যেক চারাগাছটির সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক, এবং তদনুযায়ী প্রত্যেকটীর প্রতি বিশেষ বিশেষ প্রকারে যত্ন করা আবশ্যক, গুরুমহাশয়ের কর্ত্তব্য সেইরূপ; এবং সেইখানেই তাঁহার সহিত গ্রামোফোনের তফাৎ। শৈশব-শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশী। Froebel একস্থলে বলিয়াছেন—"As the beginning gives a bias to the whole after-development so the early beginnings of education are of most importance"; অর্থাৎ, একটা জিনিস যে ভাবে আরম্ভ করা যায়, তা'র একটা বিশেষ প্রভাব সে জিনিসটার ভবিষ্যৎ গঠনের উপর থাকিয়া যায়; সেইরূপ শৈশবের শিক্ষার জীবন গঠনে একটা বিশেষ প্রভাব আছে।

শিশুশিক্ষায় তাহাদের ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদের ও খেলার বিশেষ উপকারিতা আছে। রুশো এতদ্ প্রসঙ্গে তাহার "Emile" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The lessons that boys get from each other in playing fields are a hundred times more useful to them than the lessons given in school"; অর্থাৎ, "বালকেরা একসঙ্গে খেলা করিতে করিতে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা স্কুলের দেওয়া জ্ঞানের চেয়ে শতগুণ বেশী মূল্যবান।" তা ছাড়া, শিশুদের খেলার দিকে দৃষ্টি রাখিলে, কা'র কোন দিকে ঝোঁক, শিক্ষকের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারা সহজ হইবে। জার্ম্মাণীর Koenigsberg বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আচার্য্য Rosenkranz তাঁহার Philosophy of Education" নামক গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন—"Play is of great importance in helping one to discover the true individualities of children, because in play they may betray thought-lessly their inclinations" অর্থাৎ, খেলার সময় শিশুদের বিশেষত্ব বুঝিবার বিশেষ সুবিধা; খেলার সময় অজ্ঞাতসারে তাদের প্রবৃত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

(৪)

শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া দরকার। শিশুর শরীর, মন, এবং নৈতিক জীবন তিনটির দিকেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। Froebel বলিয়াছেন—"Education is the development of man in the totality of his powers as a child of Man, as a child of Nature, as a child of God;" অর্থাৎ, "শিক্ষা মানুষের সবগুলি শক্তির বিকাশ; সে মানুষের, প্রকৃতির, এবং ঈশ্বরের সন্তান; তাহার এই ত্রিবিধ সত্তার বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" শরীরকে বাদ দিয়া শিক্ষা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, ত ভীষণ কুফল ফলাইতেছে; এখানকার চিন্তাশীল, মনীষী ব্যক্তিগণ অকালে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইতেছেন; আজীবন কর্ম্ম ও চিন্তার ফল জগৎকে দিবার পূর্ব্বে এবং জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্যাবলী সম্পাদনের পূর্ব্বেই শরীর তাঁহাদের ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা। "নিদ্রা ভঙ্গ হইল" ঠিক্ নহে, লাঠালাঠি করিয়া তাহা ভাঙা হইল বলিলেই সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেখি, বাড়ীর সকলের মুখেই হাসি। তাহাতে শব্দের সংমিশ্রণ না থাকিলেও, বেশ eloquent (সুপ্রকট)। কারণটা পরে প্রকাশ পাইল—জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির তাড়নায় বাড়ীর কেহই ঘুমাইতে পারেন নাই। বাড়ীর কৃতজ্ঞ কুকুরটা এই আকস্মিক উৎপাতের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, প্রভুদের সজাগ রাখিবার জন্য যথাশক্তি চীৎকার করিয়াছে। অবশেষে স্বয়ং ভয় পাইয়া কোন প্রকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; প্রাণভয়ে পলায়নের সুদীর্ঘ নখ-চিহ্ন সকল প্রাচীর-গাত্রে প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। আরো শুনিলাম—সেই নাসিকা-ধ্বনির মধ্যে বাড়ীর সকলেই সারারাত্রি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পরিচয় পাইয়াছেন। এ স্থলে একটা জ্ঞাতব্য কথা আছে—বাড়ীর কর্ত্তা বা বৈবাহিক মহাশয় স্বয়ং সুরজ্ঞ লোক,—প্রত্যহ প্রত্যূষে পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন, এবং সে সম্বন্ধে তাহাদের তালিম্ দিয়া থাকেন।

বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইতেই, নির্ম্মল আকাশতলে সূর্য্যালোক-সমুজ্জ্বল যেন একখানি নূতন ছবি দেখিলাম। ঠাণ্ডা থাকিলেও, শীতের হাওয়া বেশ সুমিষ্ট ও উপভোগ্য বোধ করিলাম; (moist) স্যাঁৎসেঁতে ভাব নাই, বেশ ঝরঝরে। পা বাড়ালেই পথ, বিশ গজের মধ্যেই ইষ্টেসন্—ট্রেণ দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে শিস্ দিয়া যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল। সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ণিয়ার কথাটাও মনে পড়িল—নিরুদ্যম আর অবসাদের আড্ডা; হাত-পায়ে যেন পাথর বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে। হচ্চে—হবে—থাক্,—এই ভাব। কাজেই লোক বিজ্ঞ হইতে বাধ্য; কারণ—"কি হবে!" "কি লাভ?" অর্থাৎ, সব তাতেই লাভের দিক দিয়া কিছু হওয়াটা চাই,—এবং সেটা কাজের পূর্ব্বেই চাই; নচেৎ নড়াচড়াটা সেরেফ্ নির্ব্বুদ্ধিতা। ফল কথা—মাটির গুণ,—জলবায়ুর প্রভাব।

গরম জল, (tooth powder) দন্ত-মঞ্জন, তোয়ালে, সাবান্, অর্থাৎ সভ্যযুগের ভব্য সরঞ্জাম সবই হাজির ছিল। সত্বর কাজ সারিয়া, কাপড় না ছাড়িতেই,—শুভ সন্দেশ ও চায়ের প্রবেশ।

শ্রীমান নাতজামাই বলিলেন,—"বাবা এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি।" অর্থাৎ এখন সন্দেশেই কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। বলিলাম,—"তাই ত, বড় ত্রুটি হয়ে গেল,—তা হোক্।—আমরা পরে সামলাইয়া লইব; তোমাদের কোনরূপ দুঃখের কারণ রাখিতে আমরা আসি নাই, এবং তাহা থাকিতে ফিরিবও না।"

বৈবাহিক মহাশয় গত রাত্রে আমাদের vitality (জীবনীশক্তি) বজায় রাখিবার ভিত্তি-স্থাপনা দেখিয়া নিশ্চয়ই একটু ভাবিত হইয়া থাকিবেন; তাই ভোরেই বাজারে ছুটিয়াছিলেন।

এ বাটীতে বিংশ শতাব্দির ব্যতিক্রমের মধ্যে পাইলাম—চায়ের অ-চর্চ্চা। যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অর্দ্ধসের পরিমাণে এক-একটি অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চা নহে,—দুগ্ধ-সংযুক্ত গরম চিনির পানা। অবশ্য তাহাকে "বামনবাড়ীর চা" আখ্যা দিয়া গৌরব করা চলে।

বহু দিন যাবৎ একটি রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি আমার মাথাটি দখল করিয়া, পাকা আশ্রয় লইয়াছেন, ও সেটিকে কৃপণের ধনাগার বানাইয়া বসিয়াছেন। যিনি একবার সেখানে ঢোকেন, তাঁহার অগস্ত্য-গমন ঘটে,—তিনি থাকিয়াই যান, এবং মনটিকেও তাঁহার অনুচর করিয়া রাখেন। রাজ-বৈদ্যেরা রায় দিয়াছেন—"নার্ভাস্ ডিবিলিটি"—বা "Nervous devil ইটি"। সোজা কথায়—"ভূতে পাওয়া"!

এক চুমুক চা মুখে দিয়াই মনে পড়িল—"আচ্ছা,—আমি এখন কোথায়,—দেওঘরে না বৈদ্যনাথে?" শ্রীমানকে প্রশ্ন করিলাম—"এ স্থানটির নাম কি?"

উত্তর পাইলাম—"ক্রাডক্ টাউন্"! নাও কথা! সে আবার কি? আবার তেরোস্পর্শ জোটে যে! অন্যমনস্ক অবস্থায় আস্তো একটা সন্দেশ মুখে দিয়েছিলাম, —সে আর নাবে না,—হাঁ করিয়াই রহিলাম।

শ্রীমান বলিলেন—"কি হোলো? চা যে জুড়িয়ে যায়।"

বোধ হয় সন্দেশটা টোল্ খাইয়া, কোথায় একটু ফাঁক রহিতেছিল, তাহারি সাহায্যে, কোন প্রকারে বলিলাম,—"কি যে হ'ল, তুমি তা বুঝবে না বন্ধু,—আমাকেও জুড়িয়ে আনচে।"

শুনিয়া জয়হরি বেশ সহজ ভাবেই বলিল—"তবে আর আপনি খেয়েচেন,—উচিতও নয়!" (শেষ মন্তব্যটা বোধ হয় ডাক্তারি হিসাবেই উচ্চারিত হইল।)—যে বলা সেই কাজ! পরে জানিলাম, বাকি সন্দেশ তিনটী তাঁরই গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

শ্রীমান বলিলেন—"বেশ এক চুমুক চা খান দিকি, নেবে যাবে!" চিকিৎসা-বিভ্রাট একেই বলে।

"এই নাও" বলিয়া, রোগমুক্ত হইলাম, ও বলিলাম—"রোগ ত ওখানে ছিল না, তিনি এখনও মাথায় মজুদ্। আসিতেছিলাম দেওঘরে, পথে দাঁড়াইল বৈদ্যনাথ, পৌঁছে শুনচি—ঐ যে কি সুমধুর নামটা শোনালে?"

শ্রীমান—"ক্রাডক্ টাউন্"।

"বেশ—তাই না হয় হল; কিন্তু আমি ত বৈবাহিক বাড়ী "অমরকোষ" আয়ত্ত করতে আসিনি, এখন ঠিক্ নামটা বাত্‌লাও বন্ধু।"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন, "But what is there in name!" (নামে কি আসে যায়)।

বলিলাম—"তবে কন্যার নাম "নিকষা" কি "মন্থরা" না রেখে, রবিবাবুকে বিরক্ত করে 'নূপুর' নাম আমদানী করতে ছোটা হয় কেন? এ স্থানটিকে লণ্ডন্ বল্‌লে মন ওঠে কি? রায় মহাশয়ও—"বিলেত দেশটা মাটির—সেটা সোণার রূপোর নয়।" ব'লে সাপ্‌টায় সেরেছেন,—"

শ্রীমান—"কেন? মাটি মাটিই; তা যেখানকারই হোক্।"

"তা ঠিক্ বটে, কিন্তু কাবুলের মাটিতে মেওয়া পাই, বাংলার মাটিতে লাউ-কুমড়োরই প্রাচুর্য্য! যাক্, কই, সব মাটীতে "ফ্রেদম্" হয় এমন কথা ত' কোথাও বলে না বন্ধু। শচীর দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ায় প্রেমতরঙ্গ এনে, সেই বন্যার মুখে সকল বাঁধ ভেঙ্গে যখন আচণ্ডালকে এক করে দিয়েছিলেন, তখন কোন প্রেমোন্মত্ত পোলিটিসন্ ভাবের নেশায় নদীয়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলেছিলেন —"এই মাটিতে 'ফ্রেদম্' হয়।" নেশার জড়তায় "ফ্রিডম্" (freedom) কথাটা স্পষ্ট না বেরিয়ে "ফ্রেদম্" শুনিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ সেই অবস্থা যে মাটিতে আসে বা আনে, সেই মাটিতেই 'ফ্রিডম্' (স্বাধীনতা) ফলে। তোমাদের মহারাজজি নূতন কিছু শোনাননি। সব মাটি এক নয় বন্ধু! এখন আসল নামটা শোনাও।"

শ্রীমান—কি মুস্কিল্! প্রায় সকলেই বলেন দেওঘর। দশবার দেওঘর বল্‌তে গিয়ে একবার বৈদ্যনাথও বেরিয়ে যায়। ক্রাডক্-টাউন্‌টা উহারই অংশবিশেষ। এখন বেড়াতে বেরুবেন ত' চলুন; ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?"

বলিলাম,—"সে বহুৎ কথা, তার ছোট একটা বলি। ছাখো—ক্রাডক্ টাউনে বেড়াতে হ'লে, কাটা আর আঁটা পোষাকে এড়ি থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত খাড়া সরল রেখায় straight and erect (সোজা) রেখে, সম-পদক্ষেপে পা-ঠুকে চলতে হয়,—এদিক-ওদিক হেলবে-দুলবে না; চক্ষু horizon এর (দিগন্ত-বৃত্তের) সঙ্গে parallel (সমান) রাখতে হবে। কিন্তু দেওঘরে বেড়াতে হ'লে, পম্‌শু, ফুল-মোজা, আর কালাপাড়ের উপর পলেস্তারা (অল্‌ষ্টার্) চড়িয়ে, মঙ্কি-ক্যাপ্ মাথায় দিয়ে জরদাসংযুক্ত পাণ চিবিয়ে, সিগারেট্ মুখে—ভাইন্ ষ্টিক্ হাতে বেরুনো চাই। চলনে—পায়ের গায়ের কোন নিয়ম নেই, বরং অনিয়মই শোভন। সকলে উচ্চহাস্যে এক যোগে কথা কইতে হবে; মাঝে মাঝে থেমে পোড়ে, semi-circle এ (অর্দ্ধচন্দ্রাকারে) বক্তৃতাকে বেগবান ক'রে নেওয়া চাই, আর বারবার সিগারেট্ ধরানো চাই; অর্থাৎ রাস্তা মাথায় ক'রে চলা চাই,—এটা যেন আমাদের রাজত্তি, এই ভাব।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা। "নিদ্রা ভঙ্গ হইল" ঠিক্ নহে, লাঠালাঠি করিয়া তাহা ভাঙা হইল বলিলেই সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেখি, বাড়ীর সকলের মুখেই হাসি। তাহাতে শব্দের সংমিশ্রণ না থাকিলেও, বেশ eloquent (সুপ্রকট)। কারণটা পরে প্রকাশ পাইল—জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির তাড়নায় বাড়ীর কেহই ঘুমাইতে পারেন নাই। বাড়ীর কৃতজ্ঞ কুকুরটা এই আকস্মিক উৎপাতের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, প্রভুদের সজাগ রাখিবার জন্য যথাশক্তি চীৎকার করিয়াছে। অবশেষে স্বয়ং ভয় পাইয়া কোন প্রকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; প্রাণভয়ে পলায়নের সুদীর্ঘ নখ-চিহ্ন সকল প্রাচীর-গাত্রে প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। আরো শুনিলাম—সেই নাসিকা-ধ্বনির মধ্যে বাড়ীর সকলেই সারারাত্রি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পরিচয় পাইয়াছেন। এ স্থলে একটা জ্ঞাতব্য কথা আছে—বাড়ীর কর্ত্তা বা বৈবাহিক মহাশয় স্বয়ং সুরজ্ঞ লোক,—প্রত্যহ প্রত্যূষে পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন, এবং সে সম্বন্ধে তাহাদের তালিম্ দিয়া থাকেন।

বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইতেই, নির্ম্মল আকাশতলে সূর্য্যালোক-সমুজ্জ্বল যেন একখানি নূতন ছবি দেখিলাম। ঠাণ্ডা থাকিলেও, শীতের হাওয়া বেশ সুমিষ্ট ও উপভোগ্য বোধ করিলাম; (moist) স্যাঁৎসেঁতে ভাব নাই, বেশ ঝর্‌ঝরে। পা বাড়ালেই পথ, বিশ গজের মধ্যেই ইষ্টেসন্—ট্রেণ দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে শিস্ দিয়া যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল। সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ণিয়ার কথাটাও মনে পড়িল—নিরুদ্যম আর অবসাদের আড্ডা; হাত-পায়ে যেন পাথর বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে। হচ্চে—হবে—থাক্,—এই ভাব। কাজেই লোক বিজ্ঞ হইতে বাধ্য; কারণ—"কি হবে!" "কি লাভ?" অর্থাৎ, সব তাতেই লাভের দিক দিয়া কিছু হওয়াটা চাই,—এবং সেটা কাজের পূর্ব্বেই চাই; নচেৎ নড়াচড়াটা সেরেফ্ নির্ব্বুদ্ধিতা। ফল কথা—মাটির গুণ,—জলবায়ুর প্রভাব।

গরম জল, (tooth powder) দন্ত-মঞ্জন, তোয়ালে, সাবান্, অর্থাৎ সভ্যযুগের ভব্য সরঞ্জাম সবই হাজির ছিল। সত্বর কাজ সারিয়া, কাপড় না ছাড়িতেই,—শুভ সন্দেশ ও চায়ের প্রবেশ।

শ্রীমান নাতজামাই বলিলেন,—"বাবা এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি।" অর্থাৎ এখন সন্দেশেই কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। বলিলাম,—"তাই ত, বড় ত্রুটি হয়ে গেল,—তা হোক্।—আমরা পরে সামলাইয়া লইব; তোমাদের কোনরূপ দুঃখের কারণ রাখিতে আমরা আসি নাই, এবং তাহা থাকিতে ফিরিবও না।"

বৈবাহিক মহাশয় গত রাত্রে আমাদের vitality (জীবনীশক্তি) বজায় রাখিবার ভিত্তি-স্থাপনা দেখিয়া নিশ্চয়ই একটু ভাবিত হইয়া থাকিবেন; তাই ভোরেই বাজারে ছুটিয়াছিলেন।

এ বাটীতে বিংশ শতাব্দির ব্যতিক্রমের মধ্যে পাইলাম—চায়ের অ-চর্চ্চা। যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অর্দ্ধসের পরিমাণে এক-একটি অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চা নহে,—দুগ্ধ-সংযুক্ত গরম চিনির পানা। অবশ্য তাহাকে "বামনবাড়ীর চা" আখ্যা দিয়া গৌরব করা চলে।

বহু দিন যাবৎ একটি রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি আমার মাথাটি দখল করিয়া, পাকা আশ্রয় লইয়াছেন, ও সেটিকে কৃপণের ধনাগার বানাইয়া বসিয়াছেন। যিনি একবার সেখানে ঢোকেন, তাঁহার অগস্ত্য-গমন ঘটে,—তিনি থাকিয়াই যান, এবং মনটিকেও তাঁহার অনুচর করিয়া রাখেন। রাজ-বৈদ্যেরা রায় দিয়াছেন—"নার্ভাস্ ডিবিলিটি"—বা "Nervous devil ইটি"। সোজা কথায়—"ভূতে পাওয়া"!

এক চুমুক চা মুখে দিয়াই মনে পড়িল—"আচ্ছা,—আমি এখন কোথায়,—দেওঘরে না বৈদ্যনাথে?" শ্রীমানকে প্রশ্ন করিলাম—"এ স্থানটির নাম কি?"

উত্তর পাইলাম—"ক্রাডক্ টাউন্"! নাও কথা! সে আবার কি? আবার তেরোস্পর্শ জোটে যে! অন্যমনস্ক অবস্থায় আস্তো একটা সন্দেশ মুখে দিয়েছিলাম,—সে আর নাবে না,—হাঁ করিয়াই রহিলাম।

শ্রীমান বলিলেন—"কি হোলো? চা যে জুড়িয়ে যায়।"

বোধ হয় সন্দেশটা টোল্ খাইয়া, কোথায় একটু ফাঁক বহিতেছিল, তাহারি সাহায্যে, কোন প্রকারে বলিলাম,—"কি যে হ'ল, তুমি তা বুঝবে না বন্ধু,—আমাকেও জুড়িয়ে আন্‌চে।"

শুনিয়া জয়হরি বেশ সহজ ভাবেই বলিল—"তবে আর আপনি খেয়েচেন,—উচিতও নয়!" (শেষ মন্তব্যটা বোধ হয় ডাক্তারি হিসাবেই উচ্চারিত হইল।)—যে বলা সেই কাজ! পরে জানিলাম, বাকি সন্দেশ তিনটী তাঁরই গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

শ্রীমান বলিলেন—"বেশ এক চুমুক চা খান দিকি, নেবে যাবে!" চিকিৎসা-বিভ্রাট একেই বলে।

"এই নাও" বলিয়া, রোগমুক্ত হইলাম, ও বলিলাম—"রোগ ত ওখানে ছিল না, তিনি এখনও মাথায় মজুদ্। আসিতেছিলাম দেওঘরে, পথে দাঁড়াইল বৈদ্যনাথ, পৌঁছে শুনচি—ঐ যে কি সুমধুর নামটা শোনালে?"

শ্রীমান—"ক্রাডক্ টাউন্"।

"বেশ—তাই না হয় হল; কিন্তু আমি ত বৈবাহিক বাড়ী "অমরকোষ" আয়ত্ত করতে আসিনি, এখন ঠিক্ নামটা বাত্‌লাও বন্ধু।"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন, "But what is there in name!" (নামে কি আসে যায়)।

বলিলাম—"তবে কন্যার নাম "নিকষা" কি "মন্থরা" না রেখে, রবিবাবুকে বিরক্ত করে 'নূপুর' নাম আমদানী করতে ছোটা হয় কেন? এ স্থানটিকে লণ্ডন্ বল্‌লে মন ওঠে কি? রায় মহাশয়ও—"বিলেত দেশটা মাটির—সেটা সোণার রূপোর নয়।" ব'লে সাপ্‌টায় সেরেছেন,—"

শ্রীমান—"কেন? মাটি মাটিই; তা যেখানকারই হোক্।"

"তা ঠিক্ বটে, কিন্তু কাবুলের মাটিতে মেওয়া পাই, বাংলার মাটিতে লাউ-কুমড়োরই প্রাচুর্য্য! যাক্, কই, সব মাটীতে "ফ্রেদম্" হয় এমন কথা ত' কোথাও বলে না বন্ধু। শচীর দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ায় প্রেমতরঙ্গ এনে সেই বন্যার মুখে সকল বাঁধ ভেঙ্গে যখন আচণ্ডালকে এক করে দিয়েছিলেন, তখন কোন প্রেমোন্মত্ত পোলিটিসন্ ভাবের নেশায় নদীয়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলেছিলেন—"এই মাটিতে 'ফ্রেদম্' হয়।" নেশার জড়তায় "ফ্রিডম্" (freedom) কথাটা স্পষ্ট না বেরিয়ে "ফ্রেদম্" শুনিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ সেই অবস্থা যে মাটিতে আসে বা আনে, সেই মাটিতেই 'ফ্রিডম্' (স্বাধীনতা) ফলে। তোমাদের মহারাজজি নূতন কিছু শোনাননি। সব মাটি এক নয় বন্ধু! এখন আসল নামটা শোনাও।"

শ্রীমান—কি মুস্কিল্! প্রায় সকলেই বলেন দেওঘর। দশবার দেওঘর বল্‌তে গিয়ে একবার বৈদ্যনাথও বেরিয়ে যায়। ক্রাডক্-টাউন্‌টা উহারই অংশবিশেষ। এখন বেড়াতে বেরুবেন ত' চলুন; ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?"

বলিলাম,—"সে বহুৎ কথা, তার ছোট একটা বলি। থাখো—ক্রাডক্ টাউনে বেড়াতে হ'লে, কাটা আর আঁটা পোষাকে এড়ি থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত খাড়া সরল রেখায় straight and erect (সোজা) রেখে, সম-পদক্ষেপে পা-টুকে চলতে হয়,—এদিক-ওদিক হেলবে-দুলবে না; চক্ষু horizon এর (দিগন্ত-বৃত্তের) সঙ্গে parallel (সমান) রাখতে হবে। কিন্তু দেওঘরে বেড়াতে হ'লে, পম্‌শু, ফুল-মোজা, আর কালাপাড়ের উপর পলেস্তারা (অল্‌ষ্টার্) চড়িয়ে, মঙ্কি-ক্যাপ্ মাথায় দিয়ে জরদাসংযুক্ত পাণ চিবিয়ে, সিগারেট্ মুখে—ভাইন্ ষ্টিক্ হাতে বেরুনো চাই। চলনে—পায়ের গায়ের কোন নিয়ম নেই, বরং অনিয়মই শোভন। সকলে উচ্চহাস্যে এক যোগে কথা কইতে হবে; মাঝে মাঝে থেমে পোড়ে, semi-circle এ (অর্দ্ধচন্দ্রাকারে) বক্তৃতাকে বেগবান ক'রে নেওয়া চাই, আর বারবার সিগারেট্ ধরানো চাই; অর্থাৎ রাস্তা মাথায় ক'রে চলা চাই,—এটা যেন আমাদের রাজত্তি, এই ভাব।

আর বৈদ্যনাথে চলতে হ'লে নগ্ন-পদে, সংযত আর ভক্তি-আনত ভাবে, সকলকে পথ ছেড়ে দিয়ে এক-পাশ ধ'রে নীরবে একাগ্র-পবিত্র মনে, দীনের মত ধীরে ধীরে চলতে হয়। বুঝলে বন্ধু মাথা ঘামে কেন ?"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন—"না মশায়, ও সব বাজে চিন্তার দরকার ত' বুঝলাম না।"

শ্রীমানের মুখে খাঁটি সত্য কথাটা শুনিয়া সুখী হইলাম,—ভাবিলাম, তাহা হইলে এখনো আশা আছে। "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া ঝেড়ে-কোপ্ মারেন নি।

বলিলাম—"বন্ধু, জান না ত'—ওই জন্যেই এখন বাঁচা বাহাল থাকা। সুতরাং আর একটু সইতে হবে। শুনে থাকবে—বানরের ভাষাটা আদায়ের জন্যে বড় বড় ওস্তাদ (expert) আফ্রিকার জঙ্গলে খাতা-বেঁধে খাঁচায় বাস করচেন। আবার পাখীর জাতি আর গোত্র নির্ণয়টা, আজ কয়েক শতাব্দি ধ'রে চোলচে ;—কত মাথা কত অর্থ তার পশ্চাতে খাড়া। জগতে ত' ভাষার, কি পাত্র-পাত্রীর অভাব হয়নি ! কই, এগুলোকে ত' বাজে ব'লতে যাও না ! অথচ—আমাদের জাতিভেদটা না কি যত নষ্টের গোড়া ; সেটা, মারবার উপদেশ বেশ উদার ভাবেই দাও ! পাখীর জাত খোঁজা আর তা রক্ষা করা চাই, আর আমাদের জাত মোছা আর জাত মারা চাই ! মন্দ নয় ! তাই বাজেতে আর কাজেতে ঘুলিয়ে ফেলি ; অপরাধ নিও না।"

শ্রীমানের ওইটুকুতেই over-dose (মাত্রাধিক্য) দাঁড়িয়েছিল, তিনি বলিলেন—"ও-সব ঘুমের ওষুধ রাত্রে দেবেন।" কথাটা ঠিক্, তার প্রমাণও কোন কোন যুবকের কাছে পাই। বাজে কথা পাড়িলেই তাদের নাসিকাধ্বনি হয়। দেশে এই প্রিয় বস্তুগুলি কেবল কাজের কথায় কাণ দেন যাতে সমর-সুল কিছু আছে ; যথা—কোন্ দরজী ভাল কটার (cutter), কোন্ নাপিত ভাল 'ছাঁটার্', কোন্ মিঞা ভাল chopper (চপ বানাতে পারে) ; ফুটবল সংগ্রামে, কে ভাল কিকার্, কে সঙ্গীন্ শুটার (shooter), ঘোড়-দৌড়ে কোন্ ঘোড়া ধর্তে পারলে বে ওজর বিজয়লক্ষ্মী চার পায়ে ললাটে লাফ্ মেরে উঠবেন ; ইত্যাদি ইত্যাদি দেশ রক্ষার রিহার্সেল, লইয়াই কাজ-প্রিয়রা উন্মত্ত। প্রারম্ভ্যে আশাপ্রদ, তা স্বীকার করতেই হবে।

বলিলাম—"বেশ, এখন কি কর্তে হ'বে বল', প্রস্তুত আছি।"

এতক্ষণ শ্রীমুখ চাহিয়াই ছিলাম। আর সময় নাই বুঝিয়া, কথা কহিতে কহিতে নীচে রেকাবীখানা হাতড়াইয়া দেখি—সর্ব্বত্রই সমতল ! জয়হরি অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"আপনি আর খেতেন্ না কি ? আমি যে—"

বাধা দিয়া বলিলাম—"বেশ করেছ ; তোমার হাতে তুলে দেবার তরেই খুঁজছিলাম।" মনে মনে শাস্ত্রকারদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারা না কি উপদেশ দিয়াছেন,—আহারের সময় ভোজনপাত্র বাম-হস্তে স্পর্শ করিয়া থাকিবে, এবং মাথা হেঁট্ করিয়া ও-কাজটি সারিবে। আহা, তাঁরা সব কি বিচক্ষণই ছিলেন !

শ্রীমান ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আপনার খাওয়াই হ'ল না, দু'চারখানা আনি।" তাহাকে অনেক করিয়া নিরস্ত করিলাম ও "এখন কোথায় যাবে চলো," বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

(১১)

বাহিরে পা বাড়াইতেই সম্মুখে দেখি—বেশ সুউচ্চ এক দ্বিতল বাড়ী, গেটের দুই পার্শ্বে দৌড়দার রোয়াক। রৌদ্র, আলোক, বায়ু, তিনই বাধামুক্ত। শুনিলাম, এটি একটি ধর্ম্মভীরু মাড়োয়াড়ি মহাজনের কীর্ত্তি—ধর্ম্মশালা। ইষ্টেসন ও ধর্ম্মশালাটির মধ্যে রাজপথের প্রশস্ততাটুকু মাত্রই ব্যবধান,—এইটিই ইহার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। গতরাত্রের অনিশ্চিত ও অসহায় অবস্থার কথা মনে হইয়া—এই সহজলভ্য আশ্রয়টি আমার কাছে অমূল্য বস্তু বলিয়া বোধ হইল। বিদেশী আশ্রয়হীন যাত্রী বা পথিক এখানে তিন দিন আরামে অতিবাহিত করিতে পারেন ; তদধিক কালের অবস্থান অনুমতি-সাপেক্ষ। কাল রাত্রে নন্দকিশোর এই ধর্ম্মশালার কথাই কহিয়াছিল। সে যে বলিয়াছিল—"কুছু চিন্তার কারণ নেই বাবুজি—আরামসে থাকবেন," তা ঠিক্। কেবল ভাইটালিটি বজায় রাখিবার (আহারের) ব্যবস্থাটা নিজের। হিঁহুঁর দেশ না হইলে, অর্থাৎ একজাত—৩২ চুলো আর ৩৬ ফ্যাঁসাদ্ বা ফোঁস্ না থাকিলে, পেটের ভারও সম্ভবতঃ শেঠেরা নিতেন।

গত রাত্রে অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই যে, আমাদের

ষ্ট্রেসনের পশ্চাতেই (ধর্ম্মশালা হইতে দশ গজের মধ্যেই) কোম্পানী অনুকম্পাবশে waiting shade (বিশ্রামাচ্ছাদন) বানাইয়া রাখিয়াছেন। তাহা হাত কয়েক লম্বা বেড়াশূন্য ন্যাড়া, করোগেটের (?) একটি আচ্ছাদন। এখানেও রৌদ্র, বায়ু, আলোক (দিবাভাগে) প্রচুর পরিমাণেই উপভোগ করা যায় ; অধিকন্তু—বৃষ্টির ছাট্ বাহিরে অল্পই অপব্যয় হয়। আমরা যেমন দেবতা তার উপযুক্ত একখানি নৈবেদ্য বিশেষ ; সুতরাং আক্ষেপের কোন কারণই নাই। রাত্রে (দিনেও দেখিলাম) নিজেদের সম্পত্তি ভাবিয়া গরু, বাছুর, ছাগল, কুক্কুর, মায় বেতো-ঘোড়ায়, সেটি দখল করিয়া থাকে। তাহাদের এরূপ ভাবিবার এবং এরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে, বিশেষ আপত্তিকর কিছু পাইলাম না। কেবল যে তাহারা থাকে তাহাই নয়,—ধর্ম্ম রক্ষাও করে, কারণ, থাকিতে হইলে, শরীর-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই হয়, এবং তাহা উচিতও। Floor বা মেঝে, মনে হয় কাঁচা, কারণ বেশ উচ্চাব ; আনন্দ মঠের পদচিহ্ন বলিয়াই অনুমান করি। উল্লেখ না করিলেও চলিত, তবে ধর্ম্মশালাটির এতটা সান্নিধ্যে বিশিষ্ট relief রূপে (সোয়াস্তির অবকাশ স্বরূপ) দণ্ডায়মান্ বলিয়াই, করিতে হইল।

বিশ-ত্রিশ পা অগ্রসর হইয়া শ্রীমান—একটু রোয়াক-সংযুক্ত দুইখানি একত্র সংলগ্ন সাধারণ কুটুরি দেখাইয়া বলিলেন—"এইটি ব্রাহ্ম-মন্দির।" চমকিয়া উঠিলাম। মন্দির হইলেই তাহার চূড়া চাই ; তাহাও আছে। ইভ্‌নিং-ক্যাপের কার্ণিস্ ঊর্দ্ধে উল্‌টাইয়া রাখার মত, ছাদের সম্মুখস্থ আলিসার উপর ক্রাউন্ বা মুকুট হিসাবে তাহা বর্ত্তমান। বেশ সাদাসিদে। আবার বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত অনেকটা নিম্নভূমিতে থাকায়—বিনয়ব্যঞ্জকও।

শ্রীমান না বলিলে বুঝিতেই পারিতাম না যে, এইটি ব্রাহ্ম-মন্দির। পরে বুঝিলাম, ভুলটা আমারি, প্রতিষ্ঠাতারা এত বড় ভুল করিতেই পারেন না। উক্ত চূড়ার ও-পিঠে বা ছাদ্ পিঠে "ব্রাহ্ম-মন্দির" বলিয়া বড় বড় হরপে লেখা আছে। কারণ ?

মন্দিরটির গা-ঘেঁশিয়াই রেল্‌লাইন্, ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইলে, যাত্রীরা বৈদ্যনাথের মাটি মাড়াইবার পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম-মন্দিরটির সংবাদ ও অবস্থিতি-স্থান বিনা আয়াসেই জানিতে পারেন,—উদ্দেশ্য বোধ হয় এই। যাহা হউক, ইহা কম লাভ নয়। বুঝিলাম, এই বৈপরীত্যের পশ্চাতে যথেষ্ট সদিচ্ছা ও বুদ্ধি খরচ বর্ত্তমান। তবে আমার মত যাঁরা রাত দুপুরের আগন্তুক, তাঁহাদের জন্য এ পিঠে একটা P. T. O. (পশ্চাৎভাগ দেখহ) দাগা থাকিলে যেন আরো ভাল হইত। মানুষের কিছুতেই মন উঠে না।

মন্দিরের position (স্থিতি স্থান) বেশ strategic (সামরিক কৌশলানুকূল) হইলেও, দেয়ালগুলি "এণ্ড কোং" মহাশয়দের আক্রমণে রক্তরঞ্জিত। ইঁহাদের range (দৌড়) ত' কম নয়—২০৫ মাইল ! জানি না ইঁহারা কি কারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, এখানে যাঁহারা আসেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা নাই,—বস্ত্র আর অলঙ্কারই আবশ্যক।

বলিলাম—"চল' ফেরা যাক্।"

শ্রীমান আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, এখনো ত' বাসা থেকে দুশো গজের মধ্যেই আছি !"

বলিলাম—"আমি যে অনেক এগিয়ে পড়েছি হে।"

শ্রীমান। আপনার এগুনো-পেছুনোর rateটা (হারটা) আমাদের বুদ্ধির বার্। কিন্তু পোষ্ট্ আপিস্ হ'য়ে যে যেতেই হবে। দশটা বাজে, window delivery (জান্‌লা বিদেয়) না নিলে, চিটি পেতে সেই দুটো তিনটে।"

বলিলাম—"তাড়ার কিছু আছে না কি ? না—"কেমন আছ" আর "কেমন আছির" আদান প্রদান ?"

শ্রীমান—সকলে কেমন আছে, সেটা জানবার একটা ব্যাকুলতা থাকে না ?

বলিলাম—"কিছু না, আমাদের আবার কেমন থাকা-থাকির এত খোঁজ কেন ? সব বেশ আছে। বড় জোর জ্বর, না হয় সর্দ্দি-কাসি। শাক্‌পাতাড় খেয়ে বাঁচতে হ'লে দু'বারের জায়গায় না হয় চারবার দাস্ত। আজো এসব স্বাভাবিক ব'লে ভাবতে শিখলে না—এই আশ্চর্য্য। ক'দিন অন্তর এই পত্র-বেদনা চাগায় ?"

শ্রীমান—বাবার হুকুম,—রোজ পত্র যাওয়া চাই, আর রোজ পত্র পাওয়া চাই। না পেলেই অধীর হন, টেলিগ্রাফ্ করেন।

বলিলাম—"বেশ স্বস্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন ত' !

হেলিসাহেব বিচক্ষণ লোক বটে, তিনি এঁদের ভরসাতেই বজেট্ বানিয়েছিলেন দেখছি। যাক্,—বৈবাহিক মহাশয়ের যখন delivery pain এর (বেদনার) আশঙ্কা রয়েছে,—চলো।"

(১২)

একটু এগিয়েই বন্ধু বলিলেন—"এই দেওঘর পুলিস্ ষ্টেসন।"

"বেশ—এঁরা দেশের শান্তি রক্ষা করেন, এঁদের এখান হইতেই নমস্কার করি। বোবার শত্রু নাই, চলো। এইবার বোধ হয় জেল্‌খানা ?"

জয়হরি এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে থাকিতে পারিল না ; সহসা বলিয়া উঠিল,—"সে এখন থাক্ মশাই, ওটা খাওয়া-দাওয়ার পরই ভাল।"

আমি চিরদিনই কথার কাঙ্গাল্—ইচ্ছা হইল জয়হরিকে আলিঙ্গন করি।

শ্রীমান বলিলেন—"আমি এইবার short-cut, অর্থাৎ আনাচ্ কানাচ্ ধরিলাম ; ও সব দেখতে গেলে delivery (পত্র বিলি) শেষ হ'য়ে যাবে।"

জয়হরি বলিল—"আঃ, জগদম্বা মালিক্,—চলুন,—সেই ভাল।"

অদূরে একটা জনতা দেখা গেল। ধুম-বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া ভাবিলাম, আগুন লাগিয়া থাকিবে। জোর-কদমে যত নিকট হইতে লাগিলাম, ততই ইংরাজি বাঙ্গলা মিশ্রিত কলরব কাণে পৌঁছিতে লাগিল। দেখি, নানা বয়সের, নানা বেশের ৩০।৪০ জন বাঙ্গালী, কেহ পথে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, একত্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া হাস্যালাপ করিতেছেন।

শ্রীমান কথাটা ভাঙেন নাই, আমাদের দৌড় করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। নিকটে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"এইটি দেওঘর পোষ্ট আফিস্, উপস্থিত সকলেই পত্র-প্রাপ্তির উমেদার !"

বলিলাম—"বহুৎ ধন্যবাদ !" কেই বা শোনে,—শ্রীমান তখন বেগে "বিতরণ বাতায়নে" হাজির।

দেখি,—তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—নিজের নিজের দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বের অণু পরমাণু হইতে জীব-জগৎ এ কাজটিতে ভুল করে না ; কাহারো জাতি বা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতে হয় না, আপনারাই খুঁজিয়া লয় ও দানা বাঁধে। সম্প্রতি কেবল আমরাই এই শাশ্বত নিয়ম ভাঙ্গিয়া এক করিতে বসিয়াছি। তেলে জলে এক করিয়া বোধ হয় "তেজলো" হইতে পারিব ; এরূপ নামের নজিরও রহিয়াছে। দেখা যাউক্। এ মনোরথে রথ যদি চলে ত' অমত নাই।

ইতিপূর্ব্বেই পত্র-বিলি সুরু হইয়াছিল। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেণ-যাত্রীদের টিকিট্ কিনিবার মত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য এই, আজিও পিক্-পকেট্ বা গাঁট্‌কাটারা, এ শুভ সংবাদটি পায় নাই। কেহ পত্র পাইয়াই পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কেহ পকেটে পুরিতেছেন (সম্ভবতঃ সেগুলি মহিলাদের নামাঙ্কিত)। কাহারো মুখে আনন্দ বা আরাম আভা দিতেছে, কাহারো বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। কেহ তখনি পোষ্টকার্ড লইয়া লিখিতে লাগিয়া গেলেন; কেহ টেলিগ্রাফ্ করিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

পত্রের প্রাপ্য বিষয়-বস্তু, আমাদের প্রায় একই রূপ; সাধারণতঃ—ভাল আছি, অমুকের অসুখ, শোবার-ঘরে সিঁদ, খুড়োর গঙ্গালাভ, পৌষের তত্ত্বের ফর্দ্দ, আর টাকা চাই। বড়লোকের মালগুজারি, মকর্দ্দমা, আর মোটারের অবস্থা, এবং গ্রে-হাউণ্ড্‌টা আপনার বিরহে বিমর্ষ থাকে। আর তা-বড় লোকের অধিকন্তু,—সশস্ত্র ডাকাতিতে ষাট হাজার টাকার সদ্গতি লাভ ;—ও একটা গরীব কেরাণীকে মোটর চাপা দিয়া, ছোটবাবু সে লোকটার শান্তির উপায় করিয়া দিলেও, স্বয়ং নিজের উপর অশান্তি আনিয়াছেন, এবং দশ হাজার টাকার জামিনে খালাস আছেন। হয়কে নয় করিতে পারেন, সত্বর এমন একটি সেরা ব্যারিষ্টারের ও ২।৩টি ভকিলের 'ফীর্' ব্যবস্থা করিবেন ;—মামলার তারিখ ১৩ই পৌষ। এই সংশ্রবে দুইটা টায়ার burst করিয়াছে (ফাটিয়া গিয়াছে) ও পেট্রল্-ট্যাঙ্ক্ তেউড়িয়া গিয়াছে; ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য নয়,—ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি, চিরদাস শ্রীভজহরি হাজরা। ইত্যাকার। কোন পত্রেই ত' দেখি না,—ছেলে মেয়ের রং সাহেব মেমের মত হইয়া গিয়াছে, অথবা বাতগ্রস্ত পঙ্গু বৃদ্ধ কর্ত্তা সহসা যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন,—টাকাগুলার সদ্ব্যবহারের সুরাহা হইল।

এই পত্রের জন্য এই ভিড়,—এই ব্যাকুলতা ! অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

যাহা হউক, একটা মস্ত মুস্কিল্ হইল—আমার সমবয়স্কের দল বাছিয়া লইয়া দুইটা বাক্যালাপের। আমি দাগী আসামী, মুখের উপর বয়সটা দাগা রহিয়াছে,—গোঁফ পাকিয়াছে ! এই দুর্দ্দৈবের সূত্রপাত্রেই স্থির করিয়াছিলাম, এ বালাই আর রাখা নয় ; কিন্তু ভৈরব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখখানা মনে পড়ায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। সাহসে আর কুলায় নাই ; অর্থাৎ সে মূর্ত্তি আর বাড়ানো কেন ! ক্রমে সেই পাকধরা গোঁফ্ অধুনা বেশ সুপক্ক। এ জমায়েতে প্রায় সকলেই গোঁফ্‌শূন্য। যাঁহাকে ষাটের উপর বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহারো এমন সাফ্ শেভিং (কামানো) যে একটু ফুঁপি পর্য্যন্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে,—ব্রহ্ম বলিলে হয়,—আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অগোচর ! ফ্যাসাদ্ এই, আবার আইনে বলে না কি—বয়স আর বেতন জিজ্ঞাসা করাটা অসভ্যতার চরম্ !

এ সম্বন্ধে একটু পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল। তিনি একজন ভাল ভকীল, বয়স ৬০।৬২, কিন্তু আমদানীর আতিশয্য—তাঁর উৎসাহ উদ্যমটাকে চাড়া দিয়া উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল। আমার বয়স জিজ্ঞাসা করায় বলি ৫১ ; তখন তিনি দুই স্কন্ধে হাত দিয়া, যথাসম্ভব erect (খাড়া) হইয়া, নিজেই প্রশ্ন করেন,—"আমার কত আন্দাজ কর ?" বলিলাম—"পঞ্চাশ এখনো হয় নি।" তিনি ভ্রূদ্বয় কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া—স্মৃতি সানাইয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—প্রায় তা হোলো বই কি ; ৫।৭ বছর আর ক'দিন,—ও হওয়াই ধরো !"

বেতন সম্বন্ধেও আমাদের দোয়ারিবাবু বেশ এক টোট্‌কা আবিষ্কার করিয়া বরাবর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বেশ সুফলও পাইয়াছিলেন। বেচারী—বাবুও ছিলেন, এবং বড় বংশেরও ছিলেন,—বেতনটি কেবল 'ছোট' ছিল। সেকালে বেতন জিজ্ঞাসা করিতে কাহারো বাধিত না, এমন কি সর্ব্বাগ্রে 'ব্যাতন'টাই যেন জিজ্ঞাস্য ছিল। দোয়ারি বাবুর বেশভূষা দেখিয়া ও প্রশ্নটা অনেকেই করিতেন। তিনিও—"সেই পাঁচ কম্ হে" বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া যাইতেন ;—বড় জোর বলিতেন—"বেটাদের কি আর বিচার আছে।"—ব্যস।

কাজেই সন্দেহের উপর কোন কিছু করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। মধুসূদন রক্ষা করিলেন। সম্ভবতঃ আমার দু'এক কেলাস্ (class) উপরের, একটি প্রবীণ ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া হাস্য-বিজড়িত বদনে বলিলেন—"মশাইকে নূতন লোক দেখছি।" আমি সেই ভাবে উত্তর করিলাম "আজ্ঞে, লোক আমি খুব পুরাতন, এখানে নূতন আসিয়াছি।"

এটা অবশ্য জানা ছিল—গড়ের মাঠে নূতন ঘোড়ার আমদানী হইলে—আজকাল খোঁড়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছোটে,—"পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্ !" এ সব ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ।

যেই কথা কহিয়াছি, দেখি দশজনের মধ্যে বেশ একটা সহাস-সমালোচনার সাড়া পাইলাম, গণ্ডীও গাঢ় হইয়া ঘেঁসিয়া আসিল ! কারণটা বুঝিলাম না ! দেবযানীর অভিশাপটা যে কচের মাফৎ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ কখনো করি নাই ; এখন আর সে সন্দেহ নাই। তাই সেদিন কার্য্যকালে ভুলিয়া গেলাম "—যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" ; তারৎটা নাই বা বলিলাম।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন দিন কতক থাকবেন ত ?" বলিলাম—"সঙ্কল্প সেইরূপই ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট সেরূপ নয় দেখছি—" কথা শেষ করিতে না দিয়াই, প্রৌঢ় গোছের একটি রোগা ভদ্রলোক বলিলেন—"কেন !—এই ত' চেঞ্জের সময় ; এখন এখানকার জলহাওয়া খুবই ভাল, খুব ঘুরে বেড়াবেন,—যা, আর যত, খান্ না, দুঘণ্টায় হজম্ ! দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন।"

বুঝিলাম লোকটি থামিবার পাত্র নন,—শুদ্ধ ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌ই (অজীর্ণ রোগী) নহেন,—বক্তারও ; এখনো অনেক কথা বলিবেন। তাই বাধা দিয়া বলিলাম—"মাপ করিবেন,—আপনার কথায় আরো দমিয়া গেলাম।" পাছে আবার "কেন ?" বলিয়া সুরু করেন, তাই দম না লইয়াই বলিতে লাগিলাম,—"আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, কিন্তু ঐ যে বলিলেন "জল-হাওয়া খুবই ভাল" ঐখানেই খট্‌কা,—আমার এমনি কপাল—"ভাল" কোন কিছু আমার কস্মিন্-কালে সহে না। আর "ঘোরা" সম্বন্ধে আমার নিজের কোন

ওজর-আপত্তি চলিতে পারে না,—কারণ ওটি আমার কোষ্ঠীর ঢালা হুকুম; আমি ঘুরিতে না চাহিলেও সে আমাকে ঘুরাইবে। ও-সম্পর্কে আমি সৌরজগতের গ্রহবিশেষ। কিন্তু ওই যে শুনাইলেন—"যত খান্ না—দু'ঘণ্টায় হজম"; ঐটিই দেখিতেছি থাকা সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।"

প্রাণায়াম-সিদ্ধ নহি,—দম না লইয়া মানুষ কতক্ষণ কথা কহিবে! লোকটি একটু অপ্রতিভ হইবার মত হইয়া গেলেও, যেই শ্বাস লইব, অমনি আরম্ভ করিলেন,—"কেন? এখানে মানুষ আসে আর কিসের জন্যে"! তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞাই করেচেন,—তবে দেশের এই দুর্দ্দিনে "যতই খান না—দু'ঘণ্টায় হজম" হইয়া গেলে,—বোধ হয় ইহাই দাঁড়ায় যে, ভোজনে ভিটেমাটি ফুঁকিয়া ফকিরি লইবার জন্যই এখানে আসা। এ অধিকারটা নিজের নিজের সম্পত্তিতে সকলেরি থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যে একটি নিরীহ ভদ্রলোকের বাসায় আসিয়াছি,—আবার একা নই—সঙ্গে একটি বিরাট দোসর।"

ইতি মধ্যে পত্রাদি পকেটে পুরিয়া, দল ক্রমে বেশ পুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে, কি কারণে হাসির একটা ঘূর্ণী বহিয়া গেল। রোগা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও এবার সে হাসিতে যোগ দিলেন। বোধ হয় এতক্ষণে তাঁহার রহস্যানুভূতি হইল।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আর "ভাল" বলিব না, তবে এখানকার জলহাওয়াটা প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর,—আমার caseএ দেখচি খুবই suit করেচে।" বলিলাম—"আপনার আমার প্রায়ই same case (একই হাল্) আমাকেও suit করা (সওয়া) সম্ভব।"

প্যাণ্ট্-অলষ্টার-পরা, হ্যাট্-হাতে, যুবাও-নন্-প্রৌঢ়ও-নন এমন একটি ভদ্রলোক বলিলেন—"তা বলা যায় না, ওঁর আর আপনার constitution (শারীরিক ও মানসিক গঠন বা ধাত) এক না হতেও পারে।" চাহিয়া দেখি, পকেট হইতে সানায়ের শেষ ভাগটা উঁকি মারিতেছে। এ পোষাকের সানাইওলা দেখি নাই, অতএব নিশ্চয়ই ডাক্তার। সানাই সুর শোনায়,—এ যন্ত্রে সুর শুনিতে হয়, প্রভেদ অল্পই। বলিলাম—"ডাক্তার বাবু, স্বদেশীর সময়ে অনেকেই তর্জ্জন গর্জ্জন সহ নামে মাত্র অনেক কিছু বর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে মায় সুদ্ সে সব পুনরর্জ্জন করিয়াছেন। কর্ত্তা ও অধীন উভয়েই বোধ হয় সেই সময় হইতেই দন্ত-বর্জ্জন সুরু করিয়াছি, এবং তাহা আর পুনর্গ্রহণের নামটি করি নাই। বরং এক্ষণে সমগ্র বর্জ্জনের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এ বর্জ্জনে আসল বস্তুর ফাঁক্ ছাড়া, ফাঁকির ফাঁক্ নাই, স্বদেশীর ছাপ মারা রুচিকর লুকোচুরি চলে না। সুতরাং "জল-হাওয়ার" মত suitable (সুবিধার) জিনিস এখন আর আমাদের কি আছে—তা এখানেই কি আর অন্যত্রেই কি;—চর্ব্বণের চর্চ্চা ত' উভয়েই একলম চুকিয়ে দিয়েছি! আমাদের same case হ'ল না কি ডাক্তার বাবু! তা না ত' কালীঘাটেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতে যাইতাম, এখানে কেন! কি বলেন?" এই বলিয়া প্রবীণ ভদ্রলোকটির দিকে চাহিতেই তিনি যুবকের মত ডিগ্নি মারিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"very true" (ঠিক্ বলেছেন), এবং এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নিবাস?" সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বলিলাম—"পরিচয়ের আদান প্রদান, কোথাও বসিয়া ধীরে-সুস্থিরে হইলেই ভাল হয়, আজ থাক্; বেলাও বাড়িতেছে—আমার সঙ্গীটি বোধ হয়, এতক্ষণে আধমরা হইয়া পড়িল;—কারণ—হজমের মেয়াদ (দুই ঘণ্টা) অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। কোন একটি জীবহত্যার পাপ সংগ্রহ করাও—আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য নয়।"

জন-দশেক বন্ধু-পরিবৃত একটি লক্ষ্মীমন্ত ডউলের যুবক বলিয়া উঠিলেন—"সেই কথাই ভাল মশাই—এখন থাক্। বেলা তিনটে নাগাদ্ যদি অনুগ্রহ করে সকলে একবার বম্পাস্ টাউনের (Bompas townএর) দিকে বেড়াতে আসেন ত' বড়ই আনন্দ হয়। আমাদের "***সদন" রাস্তার উপরেই।" পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি চা খান ত?"

বলিলাম—"বড় বড় ডাক্তারেরা দয়া করে নিষেধ করেছেন বটে,—কিন্তু খেতেই হয়।"

ডাক্তার বাবুটি ইকুইলিপটস্-মাখানো রুমালে মুখ মুছিতেছিলেন, একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

বলিলাম—"কারণ, যাঁরা নিষেধ করেন, তাঁরা সকলেই ওটা খান।"

ডাক্তার ছাড়িবার পাত্র নন, বলিলেন—"কিন্তু আপনার ধাতে চা নিষিদ্ধ হ'তে পারে। আপনার ডিসপেপ্সিয়া থাকে ত' ওটা আপনার পক্ষে বিষ।"

বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞা করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ,—কিন্তু যাচায়ে তা পেলাম কই! আমার তিনটি সহ-রোগী ও সম-রোগী, তাঁদের কথায় চা ত্যাগ ক'রে, অল্পদিনেই দেহটাশুদ্ধ ত্যাগ করে গেছেন। অপরাধ মাপ করবেন—আমিই কেবল ওটা ত্যাগ করিনি,—উপায়ও ছিল না; কিন্তু তার পর এই সুদীর্ঘ ৭ বৎসর—চা এবং শরীর দুই-ই যে আমার বজায় আছে, সেটা অস্বীকার করি কি ক'রে!"

একটি গাল-চড়ানো বাঁকারি-প্যাটার্নের কেশ-বিলাসী আপাদলম্বিত পাঞ্জাবী-পরা ভদ্রলোক, আমাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবুদের কথা বলবেন না মশাই, ওঁরা পরের গায়ে অস্ত্র চালাতে দশভুজা,—নিজের বেলায় জগন্নাথ! চা এক চিজই আলাদা; তা না ত galloping (লাফমারা) থাইসিসের (রাজযক্ষ্মার) মত এত দ্রুত promotion (উন্নতি) পেয়ে চোল্‌তো না। ভট্টপল্লীর সরসী স্মৃতিরত্ন মশাই তাঁর জামাতাকে পোষড়ার তত্ত্বের সঙ্গে তিন্ টিন লিপটন্ আর তিন টিন ব্রুকবণ্ড পাঠিয়েছেন—স্বচক্ষে দেখেছি। অতঃপর কে ব'লবে যে চা শাস্ত্রীয় উপকরণ নয়! কিন্তু আপনি ঐ যে দুটি কথা বল্‌লেন—"কিন্তু খেতেই হয়," আর "ছাড়বার উপায়ও ছিল না" এতে একটু ধোঁকায় পড়ে গেছি,—আপনার আপত্তি না থাকে ত'—

বলিলাম—"কিছু নাঃ—একটু আধ্যাত্মিক অন্তরায়ের কথা। কি জানেন, বরাবরই ঐ উপাদেয় পানীয়টা গোবিন্দকে নিবেদন কোরে—"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, মহাশয়ের নামটি তা'হলে—"

বলিলাম—"আজ্ঞে না, আমি প্রভু শ্রীগোবিন্দের কথাই বলচি। চা জিনিসটি চট করিয়া অভ্যাসের মধ্যে আসিয়া যায় কি না, সুতরাং বহুদিনের নিবেদনে যদি গোবিন্দের অভ্যাস হইয়া গিয়া থাকে—এখন প্রভুকে বঞ্চিত করি কোন্ অধিকারে?—এমন কাজ চণ্ডালেও পারে কি?"

"কখনই না, কখনই না, কে এমন নরাধম আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি, সহাস-উচ্ছ্বাসের ধুম পড়িয়া গেল।

এইরূপ বহু আধ্যাত্মিক আলোচনায়, সেদিনকার দাঁড়া দরবার ভঙ্গ হইল।

অবসান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাক্‌চি

মুক্ত কুসুম বিতরে গন্ধ মেলি' ওগো তার নব-পল্লব-আঁখি
করিতে পূর্ণ তব মহা-অভিলাষ,
শুকায়ে যায় গো দিবসের শেষে আপন করুণ স্মৃতিটি রাখি
ভরিয়ে বাতাসে মৃদুল পুষ্পবাস।
তেমনি এ শিশু লভিয়ে জনম অজানা ঐ কুসুমেরি প্রায়
করিতে পালন তোমারি মহান্ মন্ত্র।
দিবা-অবসানে মুদিল গো আঁখি, ফুরালো তাহার মৃদুল জীবন বায়,
শেষ হ'ল তার অশেষ দুঃখ-তন্ত্র।



ধ্যান

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল

চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে হইলে, স্থির পদার্থের আশ্রয় লইতে হইবে। যাহা স্থির, অচল, অটল, অবিকারী; যাহা নিত্য, সত্য, এক, সেই পদার্থের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইলে, চঞ্চলতা থাকে না, দূর হয়। চঞ্চল পদার্থই চঞ্চলতার সৃষ্টি করে, স্থির পদার্থ চঞ্চলতা নাশ করে। যাহার আশ্রয় বা সঙ্গ অবলম্বন করিবে, তাহারই ধর্ম্ম, তাহারই গুণ-দোষ তোমাতে আসিবে। অহিংসার সংসর্গে বন্য পশুগণও হিংসা পরিত্যাগ করিয়া অহিংস্রক হয়। হিংসাবৃত্তিপরিশূন্য ভগবদ্ধ্যাননিমগ্নচিত্ত বালক ধ্রুবের নিকট ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদি জন্তুগণ আসিয়া হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল, মনে আছে ত?

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

পাতঞ্জল। সাধনপাদঃ। ৩৫।

অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অহিংসার উদয় হইলে শত্রু শত্রুতা পরিত্যাগ করে।

সুতরাং সতের সঙ্গ করিলে, স্থির পদার্থের আশ্রয় লইলে, চঞ্চলতা থাকে না, চিত্ত স্থির হয়।

বিষয় জড়, অনিত্য, চঞ্চল; বিষয়ী চেতন, নিত্য, স্থির। বিষয়কে বিষবৎ জ্ঞান করিবে—বরং বিষ হইতেও বিষয় আরও অধিকতর ভয়ঙ্কর, অধিকতর অনর্থকারী। বিষপান করিলে মৃত্যু, বিষয় দর্শন করিলেই মৃত্যু। তবে বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীর যদি দর্শন পাও, বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে যদি দেখিতে পাও, তবে বিষয় অমৃত। পদার্থের বাহ্য দেখিয়া ভুলিও না, ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিও। ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, বাহ্যাভ্যন্তর সমস্তই অমৃত। অমৃত হইতে বিষ কখনও উৎপন্ন হয় না, অমৃতে গরল কখনও থাকে না—বিষয় বিষয়ী ছাড়া নয়। যাবৎ এই জ্ঞানের উদয় না হইবে, অর্থাৎ যাবৎ বিষয়কে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ থাকিবে, তাবৎ বিষয় চঞ্চল, হেয়, বিষবৎ পরিহর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি ছত্রিশ কোটি সেনা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হইতে দান পাইয়া ধন্য হইলেন। সীতাদেবী তাঁহার বহু মূল্যবান গলার

রত্নহার স্বয়ং পবন-নন্দনকে প্রদান করিলেন। হনুমান তাহা তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ঠাকুর লক্ষ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ছিঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহু মূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে॥
রামনাম হীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥

রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রত্নহারের মধ্যে ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত—বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে না দেখা পর্য্যন্ত, রত্ন বল, বিষয় বল, "পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন"—কেবল বাক্যে নয়, কার্য্য দ্বারা এই শিক্ষা শ্রীরামভক্ত মহাবীর মারুতি জগতে বিস্তার করিয়া দিলেন।

এইখানে একটী কথা। হনুমান কি রত্নহারে ভগবৎ-সত্তা অনুভব করিতে পারেন নাই? যিনি নিজের জড়দেহ বিদারণ করিয়া তাহাতে ভগবৎসত্তা দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তিনি কি জড় রত্নহারে ভগবৎসত্তা দেখিতে পান নাই? অবশ্যই পাইয়াছিলেন, কেবল লোক-শিক্ষার্থ তিনি একটী রত্নহার ছিন্নভিন্ন করিয়া জগৎকে তৎপরিবর্ত্তে আর একটী রত্নহার দিলেন—

রামনামহীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়। শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের মূলে যিনি অবস্থিতা, আত্মশক্তি নামে তিনি অভিহিতা। এই আত্মশক্তির প্রেরণায় ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল। তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়েরই স্বাধীনভাবে কোন ক্রিয়া করিবার শক্তি নাই, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি জড়। ফলতঃ এই আত্মশক্তিই জড় ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি, এই আত্মশক্তিতেই জড় ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিযুক্ত। এই আত্মশক্তি ব্রহ্ম পদার্থ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে; শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন, ঘ্রাণে—এই ব্রহ্ম পদার্থই অনুভূত হইয়া থাকেন, অথচ তাঁহাকে আমরা জানি না। শব্দে শ্রোত্র জুড়াইয়া যায়, স্পর্শে ত্বক জুড়াইয়া যায়, রূপে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, রসে রসনা জুড়াইয়া যায়, গন্ধে নাসিকা জুড়াইয়া যায়, আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু এই আনন্দ কোথা হইতে আসে, এই আনন্দের মূল কোথায়, তাহা কি আমরা জানি, না, জানিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করি?

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের অবিরাম স্পন্দন অনুভব করিতেছি—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই নাড়ীত্রয় স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু এই স্পন্দনের মূলে কে আছেন; কাহার শক্তিতে নাড়ীত্রয় স্পন্দিত হইতেছে, তাহার কি আমরা কোন তত্ত্ব বা অনুসন্ধান রাখি? অর্থ না বুঝিয়া, ভাব গ্রহণ না করিয়া, ভাবের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া না দিয়া, সর্ব্বদা কেবল বলি—

ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

সেই আনন্দময়ী মা, সেই আত্মশক্তি ঐ নাড়ীত্রয়ের মূলে অবস্থিতা, তাঁহারই শক্তিতে নাড়ীত্রয় স্পন্দন শীলা। কিন্তু আমরা কি তাহা জানি, না, জানিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করি? কেবল স্পন্দন অনুভব করি, কিন্তু ঐ স্পন্দনের মূলে যিনি অবস্থিতা; সেই মূলাধারা, সারাৎসারা, পরাৎপরা মাকে, সেই আত্মশক্তিকে, সেই ব্রহ্মসত্তাকে আমরা জানি না।

যাহা আছে তাহাই ত অনুভব করিতে পারি, যাহা নাই, তাহা কেমন করিয়া অনুভব করিব? সুতরং বিষয়ে আনন্দ যখন অনুভব করিতেছি, তখন বিষয়ের মধ্যে আনন্দ অবশ্যই আছে। বারিপানে প্রাণ যখন শীতল হয়, তখন বারিতে শীতলতা অবশ্যই আছে, না থাকিয়া পারে না। কোথায় সে আনন্দ? বারি মূলে যাও, দেখিতে পাইবে শীতলতা—বিষয়মূলে যাও, দেখিতে পাইবে আনন্দ। এই আনন্দই সেই ব্রহ্মপদার্থ, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। শব্দে ব্রহ্ম, স্পর্শে ব্রহ্ম, রূপে ব্রহ্ম, রসে ব্রহ্ম, গন্ধে ব্রহ্ম—সকলের মূলেই ব্রহ্ম; অথবা সমস্তই ব্রহ্মের—শব্দ ব্রহ্মের, স্পর্শ ব্রহ্মের, রূপ ব্রহ্মের, রস ব্রহ্মের, গন্ধ ব্রহ্মের। ভগবদ্বাক্য স্মরণ আছে ত?—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। (১)
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
গীতা—৭৮,৯,১০

আবার ঐ শোন একজন আত্মদর্শী মহাপুরুষের বাক্য—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ॥
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ॥ (২)
শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি। ৪৯,৫০

তাই বলিতেছিলাম, বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে ধরিতে পারিলে, বিষয় অমৃত—বিষয়ীকে ধরিতে না পারিলে, বিষয় বিষ। কিন্তু শীতলতা ছাড়া যেমন বারির কল্পনা করিতে পার না, তদ্রূপ বিষয়ী ছাড়া বিষয়ের কল্পনা হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় বিষ নয়, অমৃত—বিষয় ব্রহ্ম।

(১) হে কৌন্তেয়! জল পদার্থের মধ্যে সারভূত যে রস আমাকে সেই রস বলিয়াই জানিবে, অর্থাৎ আমিই রসতন্মাত্ররূপে জলের আশ্রয় হইয়া অবস্থান করি। এইরূপ চন্দ্র সূর্য্যে আমি প্রভারূপে, সর্ব্ববেদে প্রণব (ওঁ) রূপে, আকাশে শব্দরূপে, নরে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজোরূপ, সর্ব্বভূতে, জীবনরূপে এবং তপস্বিগণে তপোরূপে অবস্থিতি করি। হে পার্থ! আমাকেই চরাচর সমস্ত ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমদ্দিগের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজঃ। গীতা—৭।৮,৯,১০

(২) ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, অতএব সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিবে। ব্রহ্মই সকল প্রকার নাম, বিবিধ প্রকার রূপ ও সমগ্র কর্ম্ম ধারণ করিতেছেন, ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন।
শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি। ৪৯,৫০।

অনুভব

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

ধরায় বসন্ত নাহি, হৃদয়ে বসন্ত মোর,
কুসুমে কুসুমে প্রাণে কে রচিল ফুল নীড়?
প্রাণে প্রাণে এ কি স্পর্শ—সুখময়-সুনিবিড়
হৃদয়ে হৃদয়ে কেবা বাঁধিল এ ফুলডোর?
অনন্ত বসন্ত যেন,—সে অনন্ত মধুরতা,
মূর্ত্তি ধরিয়াছে যেন আমার আনন্দ-গান,
দু'জনায় নিরিবিলি—যেন সুখ-সুধাপান
মরমে মরমে ভাসে কত মধুমাখা কথা।
কত জীবনের স্মৃতি, কত জীবনের ব্যথা,
ঘুচে গেল, মুছে গেল—গেল মর্ম্ম-কাতরতা।
এ যেন প্রাণের রাস,—চির-নিবৃত্তির মাঝে,
বাহু পাশে বাঁধাবাঁধি, দেখাদেখি চোখে চোখে,
যারে চাওয়া, তারে পাওয়া পরিপূর্ণ প্রেমালোকে,
আঁখি মুদে মুদে আসে মধুর প্রণয়-লাজে।

পুনর্ম্মিলন

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

তুমি ছিলে দেবলোকে আমি হেথা ধূলি মাঝে,
তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আলোক-মণ্ডলে দূরে,
দেবের আনন্দ-গীতি যেথানে নিরত ফুরে,
আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যথা যেথানে করুণা যাচে।
কবে হয়েছিল, দেবি, ছাড়াছাড়ি দু'জনায়,
আপনা বিস্মৃত আমি ভুলেছিনু একেবারে,
তবু ঊর্দ্ধলোক হতে বাঁধি জ্যোতির্ম্ময় হারে
কবন্ধ অন্ধতা মোর ঘুচাইলে করুণায়!
ফুটিল মানস-পদ্ম—শতদল—শতশিখা,
শুচিশোভা মাখামাখি অমিয় সুবাস রসে
ধরে না হৃদয়ে সুধা পরাণ রহে না বশে
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি শিরে ছটা মুকুটিকা।
সর্ব্ব তপস্যার তীর্থ—বুকে নিয়ে পদ দু'টী,
পরম আনন্দ-নিধি—সুধার ভাণ্ডার লুটি'॥



(১৪)

বিদেশী মাল আমদানির বিরুদ্ধে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে কড়া আইন জারি আছে। কোন্ জিনিসটাকে কোন্ দেশ হইতে আসিতে দেওয়া হইবে, এই দিকে সুইস গবর্মেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমরা ভারতে যাহাকে বয়কট বলি, এ দেশে তাহা অতি সহজে বিনা গণ্ডগোলে মামুলি আইনের সাহায্যে সাধিত হয়।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ মালের বিরুদ্ধে সুইসদের নজর খুব বেশী। শস্তায় জার্ম্মাণ জিনিস সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলে সুইস কারখানার মাল বেচা কঠিন হইবে। তাহা হইলে কারখানায় মাল তৈয়ারি বন্ধ হইবে এবং অনেক মজুর বেকার বসিয়া থাকিবে। এই ভয়ে সুইস গবর্মেণ্ট বয়েক বৎসর হইল জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে চড়া হারে শুল্ক বসাইয়াছে।

আজকাল সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা স্থানে বেকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই বিদেশী মাল বয়কটের দিকে গবর্মেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জার্ম্মাণ সীমানায় কাষ্টম আফিসের কর্ম্মচারীরা যাহাতে কড়া পাহারা জারি রাখে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সুইসরা মহা স্বদেশ-ভক্ত জাতি। বিদেশী লোক আসিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের টাকা লুটিবে, এই দৃশ্য ইহাদের চক্ষুঃশূল। বিদেশী বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা এক্ষণে বিলাতে যে আকারে দেখা দিতেছে, তাহার ফলে, ক্ষুদ্র সুইস জাতি "চাচা আপন বাঁচা" নীতি অবলম্বন করিবে, সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

(১৫)

লোকার্ণো হইতে প্রকাশিত "স্যিড-শোআইট্‌স্" (অর্থাৎ "দক্ষিণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড") নামক কাগজের সম্পাদক লিখিয়াছেন:—লড়াইয়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সুইস জাতিকে অন্যান্য দেশের জন্য অজস্র টাকা খরচ করিতে হইতেছে। কোথায় হাঙ্গারি, কোথায় রুশিয়া,—ইহারা সকলেই সুইস দানশীলতার উপর দাবী বসাইয়াছে। ফ্রান্সের জন্য, জার্ম্মাণির জন্য, অষ্ট্রিয়ার জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কোন নগরেই বন্ধ হয় নাই। অথচ আজ জার্ম্মাণি-প্রবাসী বহুসংখ্যক সুইস নর-নারী অন্ন-কষ্টে ভুগিতেছে। তাহাদের জন্য সুইস-সমাজের কোথায়ও সাহায্য-সমিতি কায়েম করা হইতেছে না কেন?"

দেখিতে দেখিতে জার্ম্মাণি-প্রবাসী দুঃস্থ সুইস পরিবারের জন্য ধন-ভাণ্ডার খোলা হইল। বার্লিনের সুইস দূত স্বয়ংই এই সাহায্য-কাজের একজন প্রবর্ত্তক।

এ দেশের বেকার-সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য কোনো কোনো কাণ্টন নয়া সরকারী কাজ সুরু করিতেছে। আর একটা পথ দেখা যাইতেছে, বিদেশে মজুর চালান করা। উত্তর আমেরিকার কানাডা দেশে চাষ-আবাদের জন্য অনেক লোক দরকার। কানাডার গবর্মেণ্ট সুইস চাষী চায়। গবমেণ্টে-গবর্মেণ্টে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। আজকাল সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ফরাসী এবং জার্ম্মাণ দৈনিক পত্রে রোজই কানাডা সম্বন্ধে সকল প্রকার খবর ছাপা হইতেছে। বিদেশে মজুর চালান করিবার প্রয়াসে গবর্মেণ্ট স্বয়ংই উদ্যোগী। কাজেই প্রয়োজন হইলে জাহাজ ভাড়া দিয়া সাহায্য করিতেও গবর্মণ্ট প্রস্তুত আছে।

(১৬)

জুরিখের রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখ দিয়া যে বড় রাস্তা গিয়াছে, সেটার নাম বানহোফ ষ্ট্রাসে। শহরের নামজাদা বড় বড় হোটেল, ব্যাঙ্ক, দোকান, কাফে ইত্যাদি এই শড়কে অবস্থিত। সুইসরা এই পাড়াটার জাঁক করিয়া থাকে।

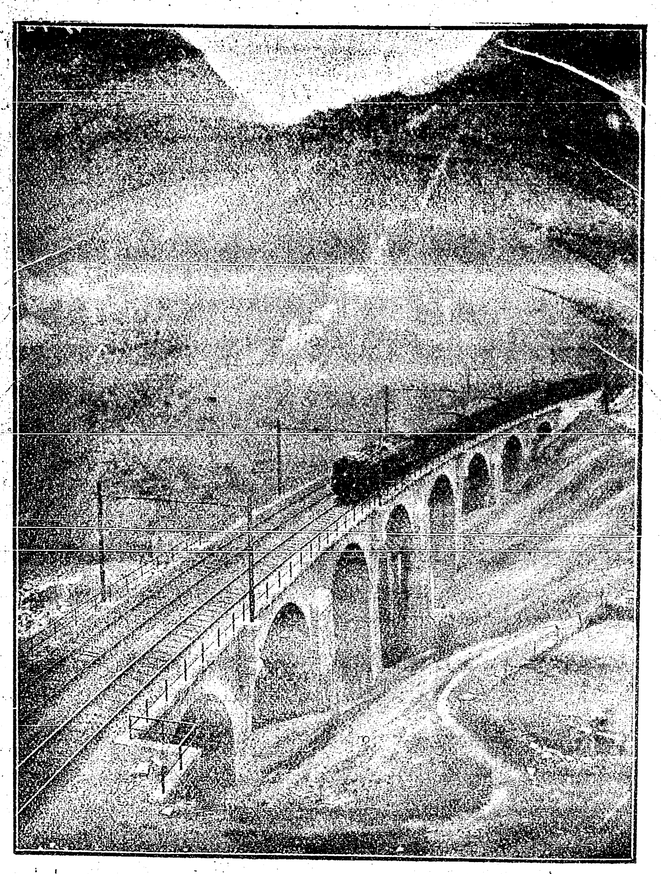

গোটহার্ড পাসের রেলপথ—(ফটো :—Rjffel, Zurich)

কিন্তু এ
স্বদেশ-ভক্ত সুই
পরিবার বি
তেছেঃ—"মহাশয়
বড় দুঃখে
কথা। এই
সুন্দর সুন্দর রেষ্ট
রাণ্ট, দোকা
ইত্যাদি দেখিতে
ছেন, এইগুলা
একটাও সুই
নর-নারী চোখে
পড়ে না। বিদেশীর
জুরিখ ছাইয়া
ফেলিয়াছে। এই
বিদেশী উৎপাত
না তাড়াইতে
পারিলে সুইস
সমাজে শান্তি
আসিবে না।"

বলা বাহুল্য,
এই বিদেশী দের
মধ্যে জার্ম্মাণ
দের সংখ্যা বেশী
আরও শুনিলাম,
"জার্ম্মাণির ইহুদি-
গুলা জার্ম্মাণজাতির রক্ত শোষণ করিয়া দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাইয়াছে। খাঁটি জার্ম্মাণ নরনারী অনাহারে মরিতেছে। আর এই ইহুদি বাটপার দালাল ব্যবসাদারেরা বিদেশী টাকার পুঁজি ট্যাঁকে গুঁজিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে বসিয়া মজা মারিতেছেন!"

বিদেশী আক্রমণ হইতে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডকে বাঁচাইবার জন্য জুরিখ কাণ্টনের লোকেরা গ্রামে-গ্রামে সভা করিতেছে। এই সকল পঞ্চায়তে ঠিক হইয়াছে যে, বিদেশীদের উপর একটা ট্যাক্স বসাইতে হইবে।

(১৭)

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাইশ কাণ্টন মার্কিণ মুল্লুকের ষ্টেটগুলার মতন স্বাধীন। আবার সুইস কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট আমেরিকার ফেডারল দরবারের ক্ষমতাগুলাই ভোগ করে। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই সুইস-যুক্তরাষ্ট্র মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি নকল করিয়াছে।

সুইস জাতিকে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ব পুরাতন গণতন্ত্রী বা স্বরাজ-পন্থী বলা হইয়া থাকে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেন না আমেরিকায় ১৭৮৯ সালে যে গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সেই শাসন-প্রণালীর আদর্শে সুইস জাতি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এবং পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নিজেদের কন্‌ষ্টিটিউশন গড়িয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, মার্কিণরাই সুইসদের শিক্ষা-গুরু।

কিন্তু সুইস গণতন্ত্রের দুইটা বিশেষত্ব আছে। মার্কিণরা সুইসদের নিকট এই দুই রীতি শিখিয়াছে। জগতের অন্যান্য জাতি এই দুই সুইস "আবিষ্কার" শাসন প্রণালীতে কায়েম করে নাই।

(১৮)

প্রথম সুইস রীতির নাম "রেফারেণ্ডাম।" কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট অনেক বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় একমাত্র সরকারী সভা পরিষৎ ইত্যাদির আলোচনার উপর

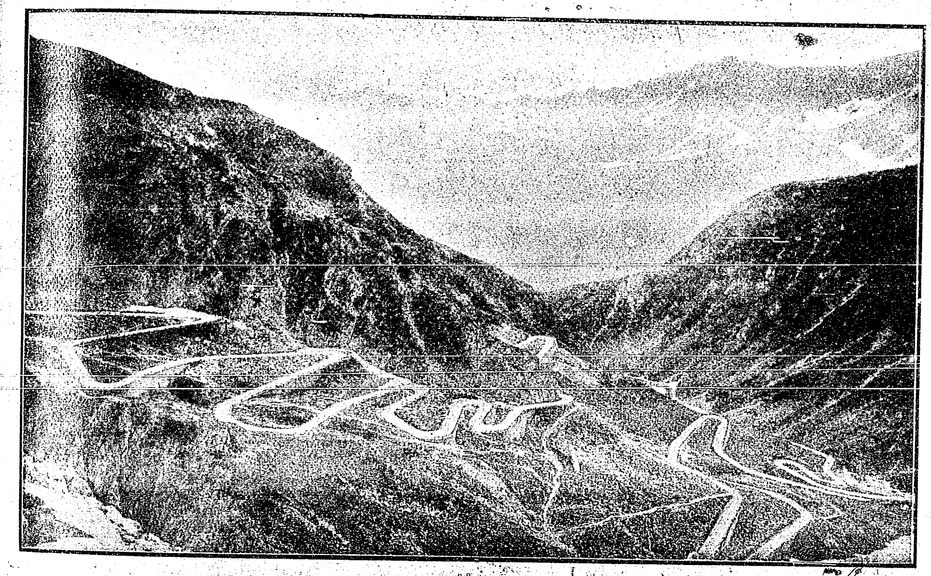

গোটহার্ড পাসের উপর মোটর-পথ—(ফটোগ্রাফার :—Anton Kienn)

নির্ভর করে না। সমস্যাগুলা একদম হাটে বাজারে পাড়াগ্রামে মফঃস্বলে হাজির করা হয়। জনসাধারণ যে যেখানে আছে, দল বাঁধিয়া প্রশ্নগুলা আলোচনা করে এবং সেই সম্বন্ধে মত দেয়। এই মতামত কেন্দ্র-গবর্মেণ্ট মানিয়া চলিতে বাধ্য। বর্ত্তমান জেনেহ্বা শহরের লাগা ফরাসী জেলা দুইটা লইয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যে ঝগড়া চলিতেছে, এই ঝগড়াটা "জনসাধারণের নিকট বিচারের" জন্য পাঠানো হইয়াছিল। জনসাধারণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছে।

দ্বিতীয় সুইস বিশেষত্বকে বলে "ইনিশিয়েটিভ" বা আইন সুরু করা। জগতের অন্যান্য দেশে পার্ল্যামেণ্ট ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি সরকারী পরিষৎ সমূহই পুরানা আইন বদলাইবার অথবা নয়া আইন কায়েম করিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোকেরা একমাত্র এই মামুলি পথ ধরিয়াই চলে না। ইহারা একধাপ আগাইয়া গিয়াছে।

সুইস নরনারী ইচ্ছা করিলে যখন তখন সুইস শাসন-প্রণালী বদলাইবার জন্য গবর্মেণ্টকে তলব করিতে পারে। এই জন্য দেশের শহরে পল্লীতে সর্ব্বত্র জনসাধারণ সভা ডাকিয়া পরামর্শ করে। একমাত্র শাসন-প্রণালীটার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনই এই পরামর্শের বিষয় নয়। নয়া নয়া কানুন কায়েম করাও এই সকল সভায় সাব্যস্ত হইতে পারে। পরে কেন্দ্র-গবর্মেণ্টকে প্রস্তাবগুলা পাঠানো হয়। বর্ত্তমানে জুরিখ জেলার লোকেরা যে বিদেশীদের উপর আইন বসাইতে চাহিতেছে, তাহা এই ইনিশিয়েটিভের ক্ষমতায়ই সম্ভব হইয়াছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রেফারেণ্ডাম বা ইনিশিয়েটিভ সুইস স্বরাজে ছিল না। সেই বৎসর এই দুই রীতি সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে প্রথম জারি হয়। পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কিস্থানের কোনো কোনো রাষ্ট্রে এই দুইটা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দুই ক্ষমতায়ই জনসাধারণ গবর্মেণ্টকে সর্ব্বদা স্ববশে রাখিতে পারে।

(১৯)

বাজেল শহরে সুইস মজুরদের দুইটা দৈনিক কাগজ চলিতেছে। একটা কাগজ মামুলী সোশ্যালিষ্টপন্থী। "আরবাইটার ৎসাইটুঙ্‌।" আর একটা বোলশেভিক বা কমিউনিষ্ট পন্থী। নাম "ফোরহ্বার্ট্‌স্"।

"আরবাইটারৎসাইটুঙ্‌" একটা লটারির বন্দোবস্ত করিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই টাকার সুদ দিয়া প্রত্যেক বৎসর কয়েকজন মজুরকে গ্রীষ্মকালে ছুটির সময় স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠানো হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে।

বোলশেভিক "ফোরহ্বার্ট্‌স্" বলিতেছে,—"সোশ্যালিষ্টরা জুয়াচোর। দেশের টাকা মারিয়া খাইবার জন্য "আরবাইটার ৎসাইটুঙ্‌" একটা ফন্দি আঁটিয়াছে মাত্র। কোনো মজুর এই ধাপ্পায় ভুলিবে না।"

"আরবাইটার ৎসাইটুঙ্‌" এক পাল্টা জবাব ছাপিয়া বলিতেছে :—"সোশ্যালিষ্টদিগকে জুয়াচোর বলিতেছেন কাহারা? বোলশেভিকরা! রুশ গবর্মেণ্টের অনেক টাকা ফোরহ্বার্ট্‌সের হাতে ছিল। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের প্রবাসী রুশ কমিউনিষ্টগণকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য ফোরহ্বার্ট্‌সের সম্পাদক মস্কো হইতে এই টাকা পাইয়াছিলেন। অথচ তিনি সব টাকা গাপ করিয়াছেন। আমার হাতে সকল প্রমাণ আছে।"

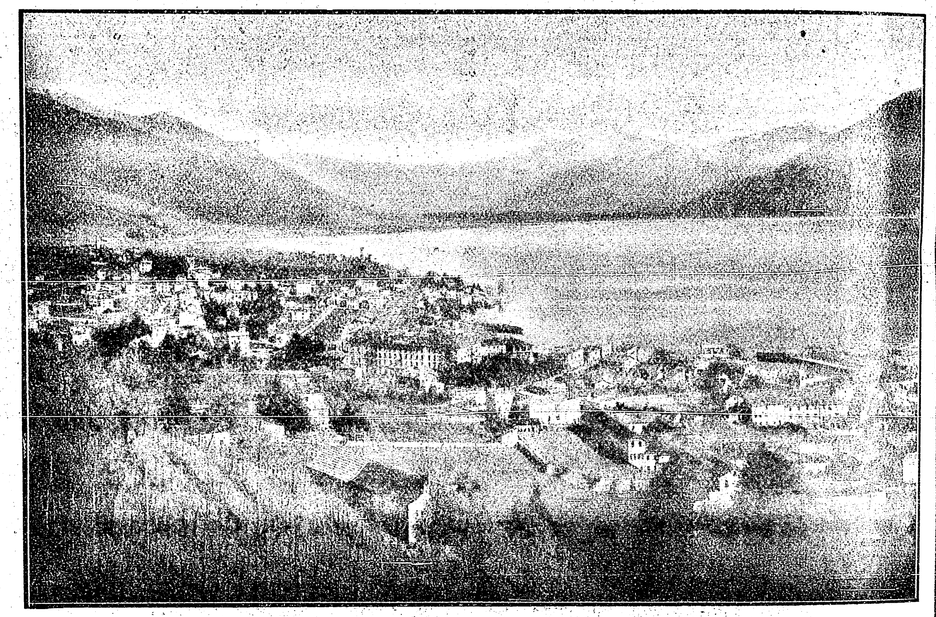

লোকার্ণো (ইতালির সুইট্‌ সার্ল্যাণ্ডের নগর)—(ফটো :—Wehrli, Zurich)

ফোরহ্বার্ট্‌সের সম্পাদক বলিতেছেন :—"রুশিয়ার নিকট হইতে আমি এক দামড়িও পাই নাই।"

(২০)

জুরিখ শহরটা ইন্‌স্‌ব্রুকের মতন সমতল ভূমির উপরই অবস্থিত। কিন্তু এখানেও ইন্‌স্‌ব্রুকের মতনই পাহাড়ী অংশের উপর নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরের "ইস্কুল পাড়াটা"কে প্যারিসের নকলে "কার্ত্তিয়ে ল্যাতাঁ"—ল্যাটিন পাড়া বা "ভট্টপল্লী" বলা হয়। টেকনিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় ইত্যাদি সবই পাহাড়ের উপর। ইস্কুল-পাড়ার ঘরবাড়ীগুলো জুরিখের সুইসদের এক গৌরব বিশেষ।

পাহাড়ের সৌন্দর্য্য আর পাহাড়ী দরিয়ার সৌন্দর্য্য দুই-ই জুরিখবাসীরা ভোগ করে। কিন্তু বোধ হয় বিদেশীরা প্রথমেই জুরিখের হ্রদ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। এইখানেই ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে জুরিখের প্রভেদ। আল্‌প্‌স্ পাহাড়ের এই দুই রত্নের ভিতর সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে কোনো একটাকে বাছিয়া লওয়া কঠিন।

হ্রদের নীল জল জুরিখকে যার পর নাই চিত্তাকর্ষক করিয়া রাখিয়াছে। পর্য্যটক মাত্রেই টিরোলী আর সুইস্

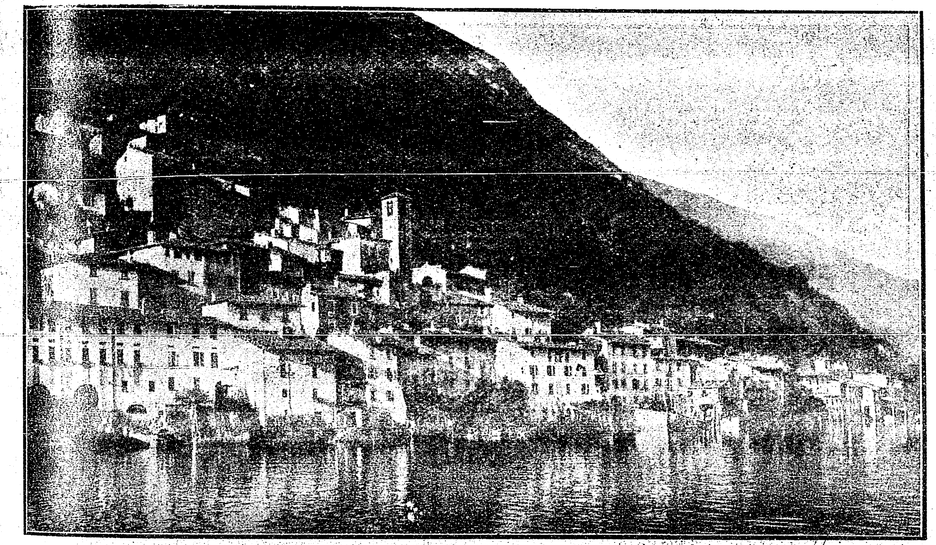

ইতালিয় সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পল্লী—গাণ্ডি্রয়া—(ফটো :—Wehrli, Zurich)

শহরের তুলনা করিতে যাইয়া এই মত প্রচার করিতে বাধ্য হইবেন। তবে ইন্‌স্‌ব্রুকের যে কোনো বাড়ী অথবা যে কোনো রাস্তা হইতে আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের মাথার মালা দেখিতে পাওয়া যায়। জুরিখে আল্পস্ অত উঁচু নয়। কাযেই প্রাকৃতিক গরিমা এখানে কিছু কম।

(২১)

জুরিখের "পুরানা শহরটা"য় মধ্যযুগের সুইস জীবন দেখিতেছি—অথবা আন্দাজ করিতেছি। ছোট ছোট

গলি ও ঘর-বাড়ীর আওতায় সুকুমার শিল্পের আওতা পাইতেছি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা গির্জ্জা বিদেশীরা সকলেই দেখিয়া যায়। নাম "গ্রোসমিন্‌স্টার"। "রোমানেস্ক" এবং "গথিক" এই দুই বাস্তু রীতির খিচুড়ি শিল্প-রসিকদের নিকট রসের রসদ বটে। এই গির্জ্জাতেই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লুথার স্বরূপ ধর্ম্ম-সংস্কারক ৎসুইংলি দশ-বারো বৎসর ধরিয়া পুরোহিত ছিলেন। সে ১৫১৯ সালের কথা।

জুরিখে লোকেরা স্বাস্থ্যের জন্যও আসে না অথবা সুকুমার শিল্পের জন্যও আসে না। অবশ্য জার্ম্মাণিতে সাহিত্য, নাটক, অপেরা, কনসার্ট ইত্যাদি যা কিছু জন্মে,



লুগানো হ্রদের পাহাড়ী উষা

জুরিখে সবই চালান আসে। এখানকার "টোনহালে" বা সঙ্গীতভবন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাহিরেও নামজাদা; মিউজিয়াম, আর্ট-গ্যালারি ইত্যাদিও আছে। কিন্তু মোটের উপর জুরিখ একটা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সুইস সমাজে পরিচিত। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই এই হিসাবে জুরিখের ইজ্জত। জুরিখ জেলায় এবং আশেপাশে এঞ্জিনিয়ারিং লাইনের কারবার অনেক।

উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্যাল কলেজ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে আছে মাত্র একটা। সেইটা এই স্থান মাহাত্ম্যের জন্য জুরিখেই কায়েম করা হইয়াছে। কলেজটা চলে জুরিখ জেলার খরচে নয়, সুইস কেন্দ্র-গবর্মেণ্টের খরচে ও শাসনে।

(২২)

ভারতবর্ষের যে সকল ছাত্র ইয়োরোপে আসে, তাহারা জুরিখের টেক্‌নিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী খবর রাখে না। কিন্তু বার্লিন, মিউনিক ইত্যাদি শহরের তুলনায় জুরিখের "টেক্‌নিশে হোখশুলে"টা খাটো বিবেচিত হইবে না। বলা বাহুল্য, দুচার দশজন ভারতীয় ছাত্র এখানকার ধরণ-ধারণের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে কোনো মত জাহির করা উচিত নয়। তাড়িতের বিদ্যা, যন্ত্রপাতির বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিভাগে জুরিখের শিল্প-কলেজের নাম আছে।

জুরিখের "নয়ে ৎস্যুরখার ৎসাইটুঙ্" কাগজ প্রতি দিন তিনবার করিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক সংখ্যায়ই কল কারখানা, ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংবাদ প্রচুর থাকে। এইগুলা রোজ রোজ পড়িয়া গেলে, সুইস জাতির বিপুল শিল্প-প্রয়াসের পরিচয় পাই। কাগজটাকে

জার্ম্মাণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাগজগুলার সমান বিবেচনা করিতেছিই। এমন কি, সঙ্গে-সঙ্গে ফ্যাক্টরি-শিল্পের আসরে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডকে একটা ছোটখাটো জার্ম্মাণি বিবেচনা করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। এই হিসাবে সুইস-সমাজকে যুবক ভারতের এক কর্ম্মক্ষেত্র বিবেচনা করা উচিত।

একটা লজ্জার কথা প্রত্যেক ভারত-সন্তানেরই মনে আসিবে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোক-সংখ্যা মাত্র চল্লিশ লাখ। অর্থাৎ ভারতের যে-কোনো তিন জেলায় গোটা সুইস জাতি বাস করিতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর সেই সুইস জাতির নিকট—বিশাল—পুরোপুরি একশগুণ বিশাল—ভারত-সমাজ সাগ্‌রেতি করিতে বাধ্য!

ভারতে আমরা শিক্ষাপ্রচারক পেষ্টালোট্‌সির (১৭৪৬-১৮২৫) মতামত আলোচনা করিয়া থাকি। ইনি জগৎ-প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। ইনি জুরিখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আর এক মনীষী জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নাম রুশো। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জেনেহ্বায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। রুশোর "এমিল" গ্রন্থে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতি-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। পেষ্টালোট্‌সি রুশোপন্থী রূপেই শিক্ষার আসরে সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। ফরাসী সাহিত্যে ও জীবনে—সমগ্র ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায়ই রুশোর প্রভাব বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল।

(২৩)

ভারতে বসিয়া আমরা মনে করি যে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের শহরগুলা সবই উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় অথবা উপত্যকায় অবস্থিত। এই ধারণা ভুল। নামজাদা সুইস শহরের কোনটাই ১৮০০ ফিট পার হয় না।

জুরিখ মাত্র ১৪০০ ফিট উঁচু। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জেনেহ্বা শহরের অবস্থান ইহার চেয়েও নীচু। বাজেল সহর জার্ম্মাণি, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সীমানায় অবস্থিত। শিল্প, বাণিজ্যে এই শহর জুরিখেরই সমান। শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদির তরফ হইতে অনেকে বাজেলকে জুরিখের চেয়ে বড় মনে করে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বপুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় বাজেল সহরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সে প্রায় চার পাঁচশ' বৎসরের কথা। বাজেল মাত্র ৮০০ ফিট উঁচু।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাহিরে আর যে কয়টা শহরের নাম সুপরিচিত, তাহার ভিতর লুৎসার্ণ প্রায় ১৫০০ ফিট উঁচু। লুৎসার্ণ জার্ম্মাণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের এক বড় কেন্দ্র। লোজানের নাম শিক্ষা-সাহিত্যের আসরে কথঞ্চিৎ পরিচিত। ফরাসী সভ্যতার এক খুঁটা রূপে লোজান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই কারণেও জগতে ইহার নাম রটিয়াছে। লোজান প্রায় ১৭০০ ফিট উঁচু।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল দরবার বসে বার্ণ শহরে। এই নগর জুরিখ, বাজেল, লুৎসার্ণের মতনই জার্ম্মাণ-সুইস-কেন্দ্র। বার্ণের নাম পাঠশালার ভূগোল ছাত্রেরাও মুখস্থ করিয়া থাকে। এই শহরটা উচ্চতায় লোজানের কিছু বেশী।

অর্থাৎ হিমালয়ের শহরগুলার তুলনায় নামজাদা সুইস শহরগুলা সবই নেহাৎ নীচু। শিমলা, নৈনিতাল, আলমোড়া, দার্জ্জিলিঙ এবং এমন কি টিহারিয়া, এই সব শহরের সঙ্গে কোনো প্রসিদ্ধ সুইস শহরই উচ্চতা হিসাবে টক্কর দিতে পারে না।

(২৪)

আল্‌প্‌স্ পাহাড়ের দেশগুলা সম্বন্ধে ভারতবাসীর জ্ঞান বিশেষ স্পষ্ট নয়। একটা কথা মনে পড়িতেছে। কি সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, কি টিরোল—দুই প্রদেশই বহুসংখ্যক হ্রদে ভরা। হ্রদগুলা সাগর বিশেষ। এই পাহাড়ী সাগর গোটা আল্‌প্‌স্ জনপদের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব। অধিকন্তু এক দিকে হ্রদগুলার কিনারা চাষ আবাদ, পশু পালন এবং বস্তি কায়েমের সুযোগ দিয়াছে। অপর দিকে দেশটা নীল জল এবং নীল আকাশের প্রভাবে সৌন্দর্য্যের খনিতে পরিণত হইয়াছে।

জুরিখের হ্রদ ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইতে না যাইতেই রেলে ফিয়ারহ্বাল্ড্‌ষ্টেটার হ্রদ পাওয়া গেল। হ্রদের কিনারার কুঁড়েগুলা ছবিতে আঁকা দৃশ্যের মতন দেখাইতেছে। শাফহাউজেন হইতে সুরু করিয়া রেলপথের দুই ধারে লাল টালির মতন ছাদওয়ালা কাঠের দেওয়ালযুক্ত শান বাঁধান ঘর দেখিতেছি। সাগরের ঘাটে ঘাটে নাওয়া, মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। ষ্টীমারে নৌকায় যাতায়াতের আয়োজনও দেখিতেছি। আকাশে মেঘ নাই। মাঠগুলা

বরফে ভরা। তরুহীন বরফ-ঢাকা সাদা পাহাড়-চূড়াগুলা হ্রদের দুই কিনারায় খাড়া হাতে করিয়া যেন আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে।

(২৫)

পথে পড়িল উরি, সুইটস্ ইত্যাদি পল্লী সন্নিহিত অঞ্চল। এই জনপদ জার্ম্মাণ নাট্যকার শিলার বিবৃত বীর হ্বিল্‌হেল্ম টেলের কর্ম্মক্ষেত্র। একজন সহযাত্রী বলিতেছেন :—"টেল নামক কোনো সুইস ছিল কি না সন্দেহ। গল্পটা একটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই জনপদের তিন জেলার চাষী মেষপালকেরা যে লড়াই চালাইয়াছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

সেই ঘটনাই সুইস স্বরাজের এবং সুইস স্বাধীনতার সূত্রপাত করিয়াছে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোকেরা অপর কোনো জাতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। বরং উরি, সুইট্‌স্ এবং উন্টার ভ্বাল্যানে এই তিন পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া আল্পস্-পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা বাইশটা সুইস কাণ্টন বা জেলা গড়িয়া তুলিয়াছে। হ্বিল্‌হেল্ম টেলের "বাস্তুভিটা" এই অঞ্চলের ফির্ম্মারহ্বাল্ডষ্টেটার হ্রদকে সুইস সমাজে এবং পর্য্যটক মহলেও প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রেলে বসিয়াও হ্রদের এবং পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা উপলব্ধি করিতেছি।

(২৬)

বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিতেছি। পাহাড়ী রেলপথ। পাহাড়ে গাছ-গাছড়ার আওতা বেশী নাই। সুড়ঙ্গ ফুঁড়িয়া যাইতেছি—কতগুলা তাহার হিসাব নাই। একটা সুড়ঙ্গ পার হইতে লাগিল পনর মিনিট। গাড়ী চলিতেছিল পুরা দমে। গোটহার্ড পাহাড়ের সুড়ঙ্গ নামে এইটা জগতে প্রসিদ্ধ।

গোটহার্ড ছিল পুরানা আমলে উত্তর-ইতালীয় নবাব-জমিদারদের সীমানা। এই জমিদারদের সঙ্গে সুইস চাষীরা অনেক লড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা জেলা ইতালীর খপ্পর ছাড়াইয়া সুইস কাণ্টনগুলার সামিল হইয়াছে। এই জেলার অধিকাংশ লোক আজও ইতালীয় ভাষায় কথা বলে। সভ্যতা, রীতি-নীতি, কুসংস্কার, চালচলন সবই এখানে ইতালীয়ান্। জেলাটার নাম টেসিন (জার্ম্মাণে), তেসাঁ (ফরাসীতে), টিসিনো (ইতালীয়ানে)।

গোটহার্ড পর্য্যন্ত রেলপথ ক্রমে উঁচাইয়া চলিতেছিল। এইবার নামিতে লাগিল। এঞ্জিন চলিতেছে তাড়িতের জোরে। সুইটসার্ল্যাণ্ডে শীঘ্রই বাষ্পের ঠাঁইয়ে সর্ব্বত্র তাড়িৎ প্রভাব বিস্তার করিবে। বেলিন্‌ৎসোনা শহরে গাড়ী একদম যেন সমতল ভূঁয়ে আসিয়া ঠেকিল বোধ হইতেছে। এই শহর টেসিন জেলার শাসন-কেন্দ্র। কারখানার ধুমধাম কিছু কিছু দেখিতেছি। গাড়ীতে বসিয়া যে সকল বাড়ী ঘর দেখিতেছি, তাহার বিজ্ঞাপনে জার্ম্মাণ বা ফরাসী ভাষার রেওয়াজ দেখিতেছি না। লোকজনের কথাবার্ত্তায় শুনিতেছি অপরিচিত আওয়াজ। বুঝিতেছি, ইতালীয়-সুইস মণ্ডলে আসিয়া পড়িয়াছি।

(২৭)

টেসিন কাণ্টনের চাষ-আবাদে লক্ষ্য করিতেছি নয়া নয়া দৃশ্য। বরফের প্রভাব এই অঞ্চলে নাই। জুরিখে ছিল শীত। এখানে গরম। দুই ধারের ক্ষেতে আঙুরের চাষের জন্য মাচাঙ দেখিতেছি। ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অথবা সমতল মাঠেই সারি-সারি মাচাঙ-শ্রেণী এক অভিনব সমাজের পরিচয় দিতেছে।

একদম হ্রদের কিনিরায় আসিয়া পৌঁছিলাম। নগরের নাম লোকার্ণো। মাত্র সাত শ ফিট উঁচু। নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি। অথচ শীত একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে শীতকালেও গরম। এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব কি? বস্তুতঃ লোকার্ণোর মতন দক্ষিণ-সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ইতালীয় শহরগুলা নরম শীতের জন্যই বিখ্যাত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি অর্থাৎ উত্তর-ইয়োরোপের যে সব নরনারী কড়া শীত সহ্য করিতে অপারগ, তাহারা লোকার্ণোর মত সুইস আড্ডায় বস্তি গাড়ে। এই হিসাবে লুগানো শহর টুরিষ্ট মহলে এবং স্বাস্থ্যান্বেষী মহলেও নামজাদা।

পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে হোটেল এবং পাংসিওন-গুলা উঠিয়াছে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের ধাপে-ধাপে সিঁড়ি-

কাটা শহর-বিন্যাসের নমুনায়ই সিমলা দার্জ্জিলিঙের নগর-গঠন সাধিত হইয়াছে। বাড়ীগুলার বাগানে-বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। সন্ধ্যা কালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, প্রত্যেক রাস্তায়ই জুঁই গোলাপ চামেলীর গন্ধই যেন পাইতেছি। গাছে গাছে কমলা লেবু দেখিতেছি। কলা গাছও বিরাজমান,—যদিও সেগুলা বেঁটে। হ্রদের নীল জলে দুএকটা নৌকা চলাফেরা করিতেছে। আকাশে চাঁদ উঠ্‌উঠ্। লাগো দি মাজ্জিওরে নামক, আধা-ইতালিয় আধা-সুইস হ্রদের সৌন্দর্য্যকাহিনী ইয়োরোপের বালক-বালিকারা ঠাকুরমার ঝুলিতেই পাইয়া থাকে।

পদার্থের ধর্ম্ম

(রঙ্গ-রস)

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ এম-এসসি

সংজ্ঞা (Definition)

পদার্থ কাহাকে বলে? পদার্থের definition দেওয়া কঠিন। তবে মোটা কথায়, যাহার 'ওজন' বা 'ভার' আছে, তাহাই পদার্থ। ছায়ার ওজন নাই বলিয়া, ছায়া পদার্থ নহে। [পত্নীকেও 'ছায়া' বলা হয়, তবে পত্নীও কি অপদার্থ!]

মানুষের মধ্যেও তাহাদেরই 'পদার্থ' আছে, যাহাদের চালচলন ভারী, মেজাজ ভারী, দেমাক ভারী, আওয়াজ ভারী, এমন কি অধিকাংশ সময়েই ভুঁড়িরও যথেষ্ট 'ভার' লক্ষিত হয়।

পদার্থের তিন রূপ [Three states of matter]

[শুধু যে পদার্থেরই তিন রূপ তাহা নহে, পদার্থ অপদার্থ, বস্তু অবস্তু, গুণ দোষ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,—মোট কথা, সকলেরই তিন অবস্থা! 'সস্তার তিন অবস্থা,' 'বিরহিনীর তিন দশা', ভগবানের তিন রূপ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; খৃষ্টানদেরও Trinity, গুণেও 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ', পরীক্ষাতেও তিন স্তর—আদ্য, মধ্য, উপাধি। ব্যাকরণে ত তুরী তুরী—Present, past, future; masculine, feminine, neuter; positive, comparative, superlative; indicative, imperative, subjunctive; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; দেব, মানব, দানব; কবি, সমালোচক, পাঠক—অলমতি বিস্তারেণ।]

জড়—Solid.

একের নম্বর—জড় বা নিরেট, solid; তাহাদের নিজের এক একটা চেহারা বা আকৃতি আছে। জড়-উপাসক সাহেবরা solid—তাহাদের কথা এমন শক্ত যে নড়চড় হয় না, কাজ এমন নিরেট, যে কিছুতেই তার মধ্যে ত্রুটী বা 'ফাঁক' পাওয়া যায় না। মত এত জড়, যে সহজে পরিবর্ত্তন হয় না, আর হৃদয়—সে তো ভয়ানক কঠিন। হনলুলু, কামস্‌কাটকা, টিম্‌বাকটু—যেখানেই তাঁহারা যান না কেন, পোষাকে পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সাহেবরা সর্ব্বদাই সাহেব,—একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

তরল—Liquid.

দুইয়ের নম্বর—তরল পদার্থ। তাহাদের নিজস্ব কোন আকৃতি নাই। ঘটী, বাটী, গ্লাসে যেখানে রাখা যাইবে, সেই পাত্রের চেহারার অনুযায়ী হইবে তাহাদের চেহারার পরিচয়।

এই দলে পড়িয়াছেন ভারতবাসী, যখন যে রকম প্রয়োজন বা অবস্থা, সেই রকম ভাবেই তাহাদের চেহারার বা 'ভোলের' বদল হইয়া থাকে। তাহাদের মতের, কার্য্যের, কিম্বা কথার কোন 'স্থিরতা' 'দৃঢ়তা' বা 'জড়তা' নাই। সবই 'শিথিল'। অর্থাৎ তাহাদের নীতি—যস্মিন্

দেশে যদাচারঃ। এই ফোঁটা তিলক আঁকিয়া হরিনামে মত্ত হইয়া, বৈষ্ণব চূড়ামণিরা "হিন্দুধর্ম্ম করিছে রক্ষা, খৃষ্টানী হো'ল মাটী" কিন্তু যেই পুলিস গুঁতা উঁচাইয়া আসেন, তখনই তাঁহারা দেন "চম্পট পরিপাটী।" তাঁহারা সাহেবের দলে সাহেব, হিন্দুর দলে টিকীধারী, মুসলমানের মধ্যে খিলাফৎকর্ম্মী এবং ইলেকসনের সময় খদ্দর-প্রচারক; বাড়ীতে কিম্বা বৈঠকখানায় গরমপন্থী, সভাসমিতিতে নরম-পন্থী এবং হুজুর সমীপে শ্রীচরণ-বন্দী। ইহাদের যে কোন নিজস্ব স্বরূপ আছে, এ কথা শত্রুতেও বলিতে পারিবে না।

বাষ্প—Gas.

তবে সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা 'তরল' হইয়াছে, আশা আছে কোন দিন 'জড়'ও হইতে পারে। [পাটিতে বাঙ্গালীকেও অনেক সময় তরল-অবস্থায় দেখা যায়; এবং তাঁহারা নিজেরা 'জড়' না হইলেও, অন্যের চেয়ে তাহাদের বেশী 'জ্বর' হইয়া থাকে, এবং কাজেই তাহাদের তনুও 'জ্বর-জ্বর'।]

বাঙ্গালীরা হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হইয়া মিশিয়া আছেন। তাহাদের স্বভাবধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ভয়ানক রকম volatile। বায়বীয় পদার্থের প্রধানতম গুণ—অত্যধিক 'বিস্তৃতি'। বাঙ্গালীরও কি সর্ব্বদিকে বিশেষ বিস্তার হইতেছে না? বংশে [যদিও কর্ণেল মুখার্জ্জী স্বীকার করেন না] বিদ্যায়, (অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে] খেতাবে, বাক্যে—তাহাদের মত 'বিস্তার' আর কোন্ জাতির?

ত্রিরূপ

একই পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে, যেমন একই জলের তিন অবস্থা—বাষ্প, জল, বরফ।

তেমনি একই রমণীর তিন অবস্থা—বালিকা, তরুণী ও বৃদ্ধা। বালিকারা বায়ুকণিকার মত দিন রাত ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে—মুহূর্ত্তের জন্যও 'নিশ্চল' নয়—ইহাই যে Kinetic theory of Gases.

সংসারের কথঞ্চিৎ 'শৈত্যে' এবং কথঞ্চিৎ বয়সের 'চাপে', এই বালিকাই যে তরুণীতে পরিণত হন; তাঁহারা যে অনেকেই 'ঊর্ম্মিলা', 'তরঙ্গমালা'। তাঁহারা 'হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যান, কুলুকুলু কল নদীর স্রোতের মত—'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' তখন তাঁহাদের বালিকাসুলভ সেই উদ্দাম 'চাঞ্চল্য' আর থাকে না,—তখন জলের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অত্র প্রমাণং যথা—

(১) তরল পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহার যে কোন স্থানে একটু 'চাপ' দিলে, সর্ব্বত্রই সেই 'চাপ' 'সমান' ভাবে পরিদৃষ্ট হইবে। ইহাই Pascalএর সূত্র। কোন অপরিণামদর্শী স্বামী ভুলক্রমে যদি কোন দিন গৃহিণীর উপর মৃদু ভর্ৎসনার 'চাপ' প্রয়োগ করেন, তিনি তখনই Pascalএর সিদ্ধান্ত হাড়ে হাড়ে অনুভব করিবেন। তৎক্ষণাৎ সেই 'চাপে'র ফল, তরুণীর প্রতি অঙ্গে, চোখে মুখে, হাবে ভাবে, এমন কি চাবীর ঠুন্‌ঠুনিতে পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে পরিলক্ষিত হইবে। [অবিশ্বাসী Experiment করিয়া দেখিতে পারেন।]

(২) Perfect fluidএর গতি অবাধ—এবং perfect নারীর স্বভাবও অবিকল তাহাই। "Her household motions light and free"। তবে যেমন viscuous liquidএরও অভাব নাই, তেমনি অনেক 'মাথার রতন'ই যে আবার 'নেপ্টে থাকেন আঠার মতন'। [বিছানার সঙ্গে কি?—কাজেই অনাবশ্যক দাসদাসীর প্রয়োজন।]

(৩) তরল পদার্থ মাত্রেরই 'চাপ' আছে—তবে তাহা 'normal'.

তরুণীরাও যে স্বামীকে 'চাপ' দেন—সাড়ী ব্লাউজ গহনার তাগাদার চাপ—তাহা বাহ্যদৃশ্যে অনেকেই abnormal মনে করেন। কিন্তু কোন স্বামীই কি এ কথা স্বীকার করিবেন? যাহাদের উপর চাপ, তাহারাই যখন normal বলিতেছেন, তখন ঝগড়ার ফল কি?

(৪) তরল পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু 'নিমজ্জিত' করিলে, পদার্থটীর ওজন (apparent weight) কমিয়া যায়—অর্থাৎ পদার্থটী সাময়িক ভাবে 'লঘু' হইয়া পড়ে। ইহাই Archimedesএর সিদ্ধান্ত।

অমন যে 'গুরু' গম্ভীর সভ্যঃ—দিলমরির এম্‌এ পাস বর—সেও যখন বাসর ঘরে তরুণী-সমাজে নিমজ্জিত হয়, তখন কি তাহার স্বভাবে একটা সাময়িক লঘুতা আসিয়া

পড়ে না? যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা তরুণী সমাজে 'ডুবিয়া' থাকে, তাহাদিগকে আমরা 'হাল্কা' জ্ঞান করি। বাস্তবিকই কি তাহারা 'হাল্‌কা'?—Archimedesএর Law অনুসারে এরূপ ঘটে না ত?

[যাঁহারা 'গুরু' হইতে বাসনা রাখেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা 'গুরুত্ব' বজায় রাখেন—এই জন্যই কি 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগের ব্যবস্থা? 'কাঞ্চন' কেন?—বোধ হয় অনুপ্রাসের অট্টহাস!]

অতএব প্রমাণ হইল তরুণীরা 'তরল'। Q. E. D.

শোক দুঃখের 'শৈত্যে', বয়সের নিদারুণ 'চাপে', এই সমস্ত তরুণীরাই 'জমাট' বৃদ্ধার পরিণত হন। রেলে ষ্টীমারে যাতায়াত কালে, সকলেই দেখিয়াছেন যে তাঁহাদের বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুরমারা, বাক্স পেটারার মত এক একটা বিরাট 'জড়' পিণ্ড—এক একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত বোঝা মাত্র!

Impenetrability—অবিভেদ্যতা

বস্তুর সেই গুণকে impenetrability বলা হয়, যে গুণবশতঃ ঠিক একই সময়ে দুইটী বস্তু একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। কলসীতে জল ভরিতে গেলে, আগে বায়ুকে বাহির করিয়া ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যাইবে, পরে জল তন্মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

এই নিয়মের গুণেই খেলা ও পড়া একই সময়ে চলে না। "One thing at a time." 'রথদেখা ও কলাবেচা' কথাটা চলিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু দুইটী কাজই সমানে চলিতে পারে কি না, সন্দেহ। Impenetrabilityর দরুণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই গৃহে একই সময়ে স্থান পাইতে পারেন না। যে গৃহে কমলা বন্দী, বাগ্‌দেবী সে দিকে বড় একটা যাতায়াত করেন না।

বাল্যকালে প্রত্যেক পুত্রের মন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন তাহার মা। তখন দুনিয়ার আর কেহ সেখানে স্থান পায় না। কিন্তু যেই নোলক-পরা, ঘোমটা-ঢাকা বধূটী আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই এক ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়; একজন না সরিলে যে আর একজনের স্থান নাই। পুত্রকে দোষ দিলে চলিবে না, ইহাই যে বিজ্ঞানের বিধান।

বিজ্ঞানের এই সত্যটী হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াই, আজকালকার বাপ মা, ছাত্রাবস্থায় পুত্রদের বিবাহ দিতে বড়ই নারাজ। 'শ্যাম ও কুল' দুইই এক সঙ্গে রাখা চলে না। ছাত্রাবস্থায় বিবাহ হইলে, বিদ্যা-অর্জ্জন এবং প্রণয়-বর্জ্জন, অথবা প্রেম চর্চ্চা এবং পড়াশুনাটা খরচার মধ্যেই রাখিতে হইবে।

এই নিয়মের গুণেই, একই লোক, একই সময়ে, দুইজন নারীকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। কাজেই কেহ আদৃতা, কেহ অনাদৃতা হইয়া পড়েন, দুয়োরাণী সুয়োরাণী হইয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গেই, তাঁহার স্মৃতি হৃদয় হইতে লোপ পাইয়া থাকে, তখন সেখানে নূতনকে বরণ করা কিছুই কঠিন নহে। [সাহেবরা অতিরিক্ত materialistic অর্থাৎ matter বা পদার্থের ধর্ম্মে সবিশেষ অভিজ্ঞ, কাজেই তাহাদের শাস্ত্রে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ নিষিদ্ধ।]

Porosity—সচ্ছিদ্রতা।

পদার্থের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সচ্ছিদ্র অর্থাৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। অমন যে নিরেট কাঠ, তাহাও যে ছিদ্রে পরিপূর্ণ, তাহা টের পাওয়া যায় তখন, যখন তাহাতে পেরেক প্রবেশ করান হয়।

মানুষ মাত্রেরই ছিদ্র আছে। অমন যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, তাঁহারও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই ছিদ্রটী সুপরিচিত। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কারণ "সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি ছিদ্রমিচ্ছন্তি দুর্জ্জনাঃ"।

Hardness—কাঠিন্য।

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে, একটী বস্তু অপর বস্তু হইতে কঠিন (hard), যদি ইহা অপরটীর উপর 'দাগ' কাটিতে পারে। হীরা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, কারণ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপরে হীরা অতি সহজেই আঁচড় কাটিয়া থাকে (Scratch)। [বিষবৃক্ষের হীরাও দেবেন্দ্রের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের হীরা, তাহার তো কথাই নাই—"কথায় হীরার ধার, হীরা যার নাম"।]

কাঠিন্যের এই সংজ্ঞা অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, নারীই কঠিন, পুরুষ কোমল। কয়জন পুরুষ নারীর হৃদয়ে আঁচড় বসাইতে সক্ষম হইয়াছেন? কিন্তু নারী পুরুষ-হৃদয়ে নিরন্তরই 'দাগা' দিতেছে।

অমন যে বক্তিয়ার, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী তাতার বক্তিয়ার,—

"——দেখ কার ছবি আঁকা
পরতে পরতে তাঁর।"

কাণাছেলের নামও যদি পদ্মলোচন হইতে পারে, সদা হর্ষোৎফুল্ল বালকের নামও যদি অক্রমান হয়, তবে 'বজ্রাদপি কঠিনা' যে নারী, তাহার পরিচয় হইবে 'শিরীশাদপি কোমলা'—ইহা আর বিচিত্র কি ?

Compressibility—সঙ্কোচনীয়তা।

চাপ দিলে বস্তুমাত্রেরই সঙ্কোচন হয়।

আফিসের কাজের চাপে কেরাণীবাবুরা কাবু, সমালোচনার চাপে কবিপ্রতিভা ক্ষুব্ধ, পরীক্ষার চাপে ছেলেরা রোগা, শাশুড়ীর চাপে বধূ অস্থিচর্ম্মসার, বিরহের গুরু চাপে বিরহিনী কৃশ।

এক কথায়, চাপ সবাইকে সঙ্কুচিত করে। কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, তরল পদার্থ সম্বন্ধে,—চাপে তাহাদের আয়তন ছোট হয় না। হাজার চাপ দিলেও এক বাটী জল তিল পরিমাণেও কমিবে না। কোনও কোনও বালকেরও যে সেই অবস্থা। তাহাদিগকে "বকো আর ঝকো", যতই রাগো না কেন, যতই চাপ দেও না কেন, কিছুতেই তাহাদের পরিবর্ত্তন বা নড়-চড় হইবে না—তাহারা যে বেজায় 'তরল'।

Malleability—পাতনীয়তা।

পদার্থকে পিটাইয়া পাত করা যায়, যেমন সোণার পাত, তামার পাত, লোহার পাত। বাহ্যিক আঘাতে একরূপ আকৃতি হইতে অন্যরূপ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হওয়া পদার্থের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

গাধা পিটাইয়া মানুষ করার কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু দেখি নাই। তবে গুরুমহাশয়ের অত্যধিক পিটুনীর চোটে, অনেক মানুষ যে গাধা হইয়াছে, ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত। আর আফিসের খাটুনীর চোটে—'পিটুনীর'ই নামান্তর মাত্র—কেরাণীবাবুদের দেহ যে 'পাত' হইতেছে, এ কথা তাহাদের গৃহিণীরা প্রতিদিনই বলিতেছেন। 'দেহ পাত করিয়া', 'প্রাণ পাত করিয়া', এ গুলি তো সাধারণ কথা। [গৃহিণীদের মুখে এ কথা সর্ব্বদাই শুনেন না কি ?]

Brittleness—ভঙ্গপ্রবণতা।

আঘাতে যে বস্তু মাত্রেরই 'পাত' হইবে, তাহা নহে, অনেক সময় ভাঙ্গিয়াও যায়—যেমন কাচ। কথার আঘাতে মন ভাঙ্গে, শোকের আঘাতে বুক ভাঙ্গে, পড়াশুনার চাপে বুদ্ধির জড়তা ভাঙ্গে, গহনার চাপে মান ভাঙ্গে, কন্যাদায়ের চাপে কুল ভাঙ্গে, সমালোচনার চাপে ভুল ভাঙ্গে।

Ductality—সূত্রপ্রবণতা।

অনেক পদার্থকেই টানিয়া সরু 'তারে' পরিণত করা যায়। তামার তার, লোহার তার, সোণার তার, এ তো আমরা দিনরাতই দেখিতেছি।

ঘটনাচক্রের আকর্ষণে মানুষ যে 'সরু' হইয়া যাইতে পারে, তাহা রামায়ণে দেখিয়াছি,—লক্ষ্মণ যখন 'সূক্ষ্ম' শরীরে ইন্দ্রজিতের উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাই যে একক দৃষ্টান্ত তাহা নহে, কারণ অনেকেই 'সূচ' হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হন।

Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা।

বলপ্রয়োগ করিলে, বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম হয় বটে, কিন্তু বল তুলিয়া লইবা মাত্র, তাহা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। বস্তুর এই ধর্ম্মকে Elasticity বা স্থিতিস্থাপকতা বলে।

বায়ুকে চাপ দিলে, তাহার আয়তন ছোট হয়। কিন্তু চাপ অন্তর্হিত হইবামাত্রই বায়ু নিজেকে পূর্ব্ববৎ ফুলাইয়া তোলে। 'বুক ফুলাইয়া' চলাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু উপরিওয়ালার চাপে তাহা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত থাকে; কিন্তু উপরিওয়ালার অসাক্ষাতে অর্থাৎ চাপের অবর্ত্তমানে, বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষতঃ গৃহিণীদের নিকট 'বুক ফুলাইয়া' 'ডোণ্টকেয়ার' ভাবে চলার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ক্লাসে ছাত্রদের দৃষ্টি যে কোন্ দিকে থাকে, তাহা ঠিক ভাবে বলা কঠিন, পাঠ্য পুস্তকে যে নয় তাহা নিশ্চিত। ইহা তাহাদের normal state বা স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু যেই শিক্ষক মহাশয় বজ্রনিনাদে গর্জ্জন করিয়া, বেত্রাস্ফালন পূর্ব্বক 'বলপ্রয়োগে' উদ্যত হন, অমনি সকলে কত মনোযোগীর ন্যায় পাঠ্য পুস্তকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে! কিন্তু এই 'আশঙ্কার চাপ' দূর হইবামাত্রই—অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

কেহ গল্পে, কেহ উপন্যাসে, কেহ মাসিক পত্রিকায়, কেহ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বিশ্রম্ভ আলাপে—অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

দুই হাত উঁচু হইতে একটা হাতীর দাঁতের বল ফেলিয়া দিলে, স্থিতিস্থাপকতার গুণে, উহা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্থানে লাফাইয়া উঠে। কিন্তু এই স্থিতিস্থাপক বলকেও হার মানিতে হয় মোসাহেবদের কাছে। দিনের মধ্যে শতবার জমীদারের পদাঘাতে দশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেও, তাঁহারা তৎক্ষণাৎই সেই চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন।

রবার টানিলে তাহা 'লম্বা' হয়, কিন্তু টান ছাড়িয়া দিলেই, তাহা পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ সেই ক্ষুদ্রত্বই প্রাপ্ত হয়। সময় সময় আফিসের বড় সাহেবের অনুকম্পার 'আকর্ষণে', দুই একজন ভাগ্যবান পেয়ারের লোক, বেশ একটু লম্বা হইয়া পড়েন, কিন্তু সাহেবের বদলীর সঙ্গে সঙ্গেই—অর্থাৎ আকর্ষণের তিরোভাবেই—'পুনর্মূষিকো ভব'।

Divisibility—বিভাজ্যতা।

বস্তুমাত্রকেই ছোট ছোট অংশে ভাগ করা চলে, কিন্তু তাহাতে ভগ্নাংশগুলির গুণের কোন তারতম্য হয় না। এক খণ্ড পাথরের যে ধর্ম্ম, যে গুণ, তাহার একটা রণিকারও সেই ধর্ম্ম, সেই গুণ।

সতীদেহ যে বিভিন্ন একান্ন স্থানে পড়িয়া ছিল, প্রত্যেক-টীতেই যে সতীর পূর্ণ মাহাত্ম্য বিরাজমান। প্রত্যেকটী পীঠই যে এক একটী মহাতীর্থ; দেহের ভগ্নাংশ বলিয়া গুণের কোন তারতম্য হইয়াছে কি ?

এক কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া, 'কংগ্রেস', 'মডারেট কন্‌ফারেন্স' 'হোমরুল লীগ', 'ন্যাশানাল লিবারেল লীগ' 'স্বরাজ্যপার্টী' কত কি হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের 'গুণের' বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? কেউ কি 'মেও' ছাড়িয়াছে ? সকলেই যে স্বরাজ চায়।

Boyle's Law

Boil বা ফোড়ার চাপ (Compress) দিলে, ফোড়া বসিয়া যায়, অর্থাৎ তাহার আয়তন ছোট হয়, এ কথা কাহারো অজ্ঞাত নাই। ইহাই হইল Boil's law বা ফোড়ার ধর্ম্ম। কিন্তু এই কথাটার, এই সহজ সত্যটার গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য, মুরুব্বি খাড়া করা হইয়াছে একজন সাহেবকে। [কারণ তাহাদের বাক্যই বেদবাক্য] বিদ্যা-জাহির-কারী পণ্ডিতেরা প্রচার করিয়াছেন যে, Boyle সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "চাপ যে পরিমাণে বাড়িবে, বায়বীয় পদার্থের আয়তন সেই পরিমাণে কমিবে, এবং চাপ কমিলে আয়তনও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।" Boyle সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, বায়ুর অবতারণা করিয়া বুঝি মস্ত একটা বাহাদুরী করিলেন, একেবারে 'টেক্কা' দিলেন। কিন্তু Boilও যে বায়ুর সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত, সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কারণ, কবিরাজী মতে কুপিত বায়ুর নামই যে ফোড়া।

বিদ্যা নিশ্চয়ই বায়বীয়, তা না হইলে 'উবিয়া' যায় কেন ? কাজেই বিদ্যাকে Boyle's Law মানিতেই হইবে। পাণ্ডিত্যের চাপ যত বেশী, বিদ্যার জাঁক তত কম, কিন্তু যে পরিমাণে পাণ্ডিত্যের অভাব হইবে, সেই পরিমাণে অহঙ্কার ও বিদ্যার জাঁক ফাঁপিয়া উঠিবে।

Indestructibility of matter—জন্মান্তরবাদ।

পদার্থের ধ্বংস নাই। একটী মোম বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইল, কিন্তু ধ্বংস হইল না। বিজ্ঞান বলে, তখন তাহা জল ও অঙ্গারক বাষ্পে পরিণত হয়। ইহাই বিজ্ঞানের conservation of matter.

যাহা পদার্থের বেলায় সত্য, আত্মার সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য। দর্শন শাস্ত্রে ইহারই অনুরূপ তত্ত্ব হইল জন্মান্তরবাদ। আত্মার ধ্বংস নাই—তবে রূপান্তর হইতে পারে, এই মাত্র।

Dalton's atomic theory—আণবিক তত্ত্ব।

বিজ্ঞানের atom আর দর্শনের 'আত্মা' কি identical ? শব্দ-সাদৃশ্যে ত তাহাই মনে হয়। আত্মন্ = আত্মম্ = atom [মনর্ণভেদঃ ইতি 'মানিনি'—অর্থাৎ কোন সূত্রই মানি নি] Dalton এর আণবিকতার আলোচনা করিলে, এ সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইবে।

(১) atom অবিনশ্বর।

আত্মাও ধ্বংসবিহীন।

(২) atom অবিভাজ্য, আর তাহাকে ভাগ করা চলে না।

আত্মাকেও বিভাগ করা চলে না।

(৩) বিভিন্ন পদার্থের atomএ atomএ মিলনের

(combination এর) ফলে বিভিন্নরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয়।

বিবাহও 'আত্মায়' 'আত্মায়' মিলন। "তোমার আত্মা আমার হউক, আমার আত্মা তোমার হউক"—"union of hearts"। এই বিভিন্ন আত্মার সংমিশ্রণে তেত্রিশ কোটী বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে। 'পাটেল' কিম্বা 'গৌর' এর 'বিল', নামে না চলিলেও কাজে আবহমান কাল চলিতেছে।

(৪) একটী মৌলিক পদার্থের atom অন্য একটী পদার্থের atom হইতে ওজনে, ধর্ম্মে ও গুণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রত্যেক বিভিন্ন পদার্থের atom বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মণের আত্মা শূদ্রের আত্মা হইতে ভিন্ন। "পঞ্চবর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ'। সাহেবের আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইল নেটিভের আত্মা—তাহা না হইলে Criminal Procedureএ ভিন্ন নিয়ম কেন?

Electron Theory—সূক্ষ্মাণুবাদ।

বর্ত্তমান ইলেকট্রণ-তত্ত্ব Daltonএর আণবিক সিদ্ধান্তকে সজোরে উড়াইয়া দিতেছে। ইলেকট্রন-বাদীরা বলেন যে, মূলতঃ সমস্ত বস্তুই এক electronএর সমষ্টি। সীসা, সোণা প্রত্যেকেরই electron এক ধর্ম্মাবলম্বী। [মুড়ি মিছরীর এক দর!] তবে কাহারো atomএ বেশী ইলেকট্রন, কাহারো atom এ কম, এই যা তফাৎ।

তাই বুঝি আজকাল মানুষেরও সুর বদ্‌লাইয়াছে, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী, নির্ধন, সাহেব নেটিভ নাই—আছে মানুষ, আছে elector [যাহার পক্ষে বেশী electer তাহারই যে জিত—এ যে democracyর দিন]

তাই বুঝি আজ বিশ্বব্যাপী রব উঠিয়াছে, তুমি ধনী, তোমার অর্থবল আছে, লোকবল আছে, প্রভুত্ব আছে, ক্ষমতা আছে, তোমার মধ্যে না হয় কয়েকটা electron বেশী, তাই বলিয়াই কি তুমি চিরদিনই আমা অপেক্ষা বড়! তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি না হয় দশটা বেশী electronএর অধিকারী, কিন্তু তাই বলিয়াই কি চিরদিন আমাকে পদদলিত করিয়া রাখিবে? সীসাও যে কালে সোণা হইতে পারে—তবে আমিই চিরদিন ছোট থাকিব কেন? এ কি 'ইলেকট্রনবাদ'—না 'বলসেভিক সংবাদ'!

Vortex—ঘূর্ণীতত্ত্ব।

স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক Helmoltz সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইথারের (ether) ঘূর্ণীচক্র বা vortex হইতেই বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়।

কথাটা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। হৃদয়ে যখন প্রবল ঘূর্ণী বহিতে থাকে, তখনই প্রেমের সৃষ্টি হয়। Irelandএর বিপ্লবের whirlpool হইতে Homeruleএর উদ্ভব। ছাত্রমহলে 'চাঞ্চল্য' বা 'আন্দোলন আলোড়নে'র ফলে ছুটীর সৃষ্টি! [প্রত্যক্ষ প্রমাণ, নন্-কো-অপারেসন মুভমেণ্ট] এমন কি দশচক্রের 'আবর্ত্তে' ভগবান হইতেও না কি ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে! অধিক কথায় নিষ্প্রয়োজন, অজীর্ণ বিদ্যা মাথার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিতেছে বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্ম!!

গার্গী

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

স্বর্ণ মুদ্রা যুক্তা শত গাভীদল যবে
রক্ষিয়া সভা'র মাঝে রাজর্ষি জনক,
ঘোষিলা, ব্রহ্মিষ্ঠতম দ্বিজ যেই হবে,
গাভী সহ গ্রহণিবে সহস্র কনক।
বিরাট মহতী সভা নিস্তব্ধ নীথর
লক্ষাধিক পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ জ্ঞানী,
কেহ না স্পর্শিল গাভী, হেরি অতঃপর
যাজ্ঞবল্ক্য গ্রহণিলা, শিষ্যে আজ্ঞা দানি।
মুহূর্ত্তে বিক্ষুব্ধ হ'ল স্তব্ধ সভাতল
দাঁড়াইলা তর্করণে শ্রেষ্ঠ সুপণ্ডিত,
'অশ্বল' ও 'আর্ত্তভাগ' বিদ্বান্ 'কহোল'
ক্রমে যবে জ্ঞানীত্রয়ী হ'লো পরাজিত,
উঠেছিলে জ্ঞান-তেজে নারী একাকিনী
'বচক্নু'-দুহিতা গার্গী, হে ব্রহ্মবাদিনি!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সমুদ্রগর্ভে রেলপথ

ইংলণ্ডের ডোভার বন্দর থেকে ফরাসীর ক্যালে বন্দরের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান একস্থানে মাত্র একুশ মাইল। আজ প্রায় একশ' কুড়ি বছর ধরে উভয় দেশের লোক জল্পনা কল্পনা ক'রছিল যে কেমন করে এই অল্প সমুদ্র পথটুকু বেঁধে ফেলে রেল পথে সত্বর আসা যাওয়া করা যায়। এতাবৎকাল ধ'রে অনেকে অনেক রকম উপায় উদ্ভাবন ক'রছিলেন, তার মধ্যে একটা প্রস্তাব ছিল এই 'টিউব রেলপথ'

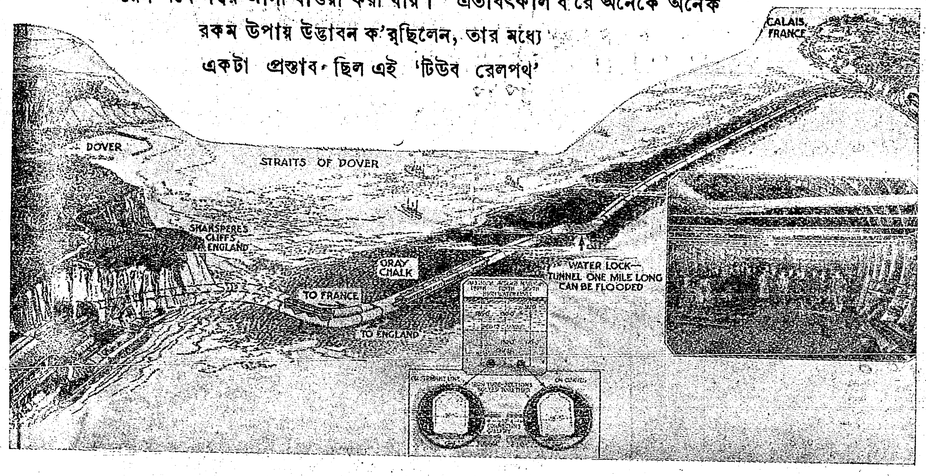

সমুদ্রগর্ভে রেলপথ

→জলের দরজা—এই দরজা খুলিয়া দিলে এক মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ জলে পূর্ণ হইবে। এই দরজা আর সুড়ঙ্গের যে দুই প্রান্ত জলের নীচে থাকিবে, তাহার সাহায্যে ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ যুদ্ধ বাধিলে সুড়ঙ্গটিকে অব্যবহার্য্য করা চলিবে।

যে দুইটী টিউবের দ্বারা সুড়ঙ্গটি নির্ম্মিত হইবে, সেই টিউব দুইটী কিভাবে নির্ম্মিত হইবে, এবং প্রণালীর নিম্নে তাহারা কিভাবে অবস্থিত হইবে তাহার নক্সা। যেখানে জলের গভীরতা অধিক তথায় সুড়ঙ্গের গভীরতা কম। এইরূপে ঙ ও সমুদ্র-পৃষ্ঠের ব্যবধান সর্ব্বত্র ২৬০ ফিট থাকিবে। এই গভীরতাই সুড়ঙ্গটি নিরাপদে রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বিস্তার করবার কথা। এতদিনে সেই পুরাতন স্বপ্ন সফল হ'তে বসেছে। স্থির হ'য়ে গেছে যে সমুদ্রগর্ভে প্রকাণ্ড লোহার টানেল্ বসিয়ে তার মধ্যে ৩১ মাইলব্যাপী টিউব রেলপথ বিস্তার করা হবে। এই পথে হিসাব করে দেখা হয়েছে যে লণ্ডন থেকে প্যারিস যাতায়াত করতে মাত্র ছ'সাত ঘণ্টা সময় লাগ্‌বে। চিত্রে উক্ত টানেল্ ও টিউব রেল-পথের একটি চমৎকার নক্সা দেওয়া

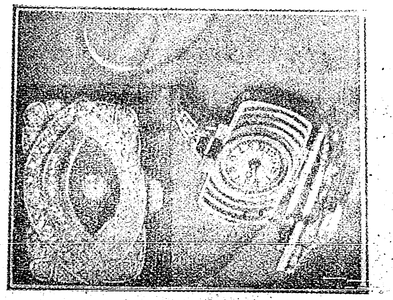

আংটী ঘড়ী

হয়েছে এ থেকে অনেকেই ব্যাপারটা কি রকম হবে তা বেশ বুঝতে পারবেন।

আংটি ঘড়ী

পকেট থেকে বেরিয়ে এসে ঘড়ী এতদিন পুরুষের হাতের কব্জীতে ও মেয়েদের ব্রেসেলেট বা ব্রূচের মধ্যে শোভা পাচ্ছিল, এইবার তাকে সেখান থেকেও স'রতে হোল। এখন থেকে চম্পকাঙ্গুলীর অঙ্গুরীয়কের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে

হবে। আংটি ঘড়ীর রেওয়াজ বিলেতে খুব চলেছে, এ দেশের কাপ্তেন বাবুদের মধ্যে এটা এখনও ছোঁয়াচে হ'য়ে উঠতে পারেনি। দাম বেশী বলে বোধ হয়।

কীট-পতঙ্গের যন্ত্রপাতি

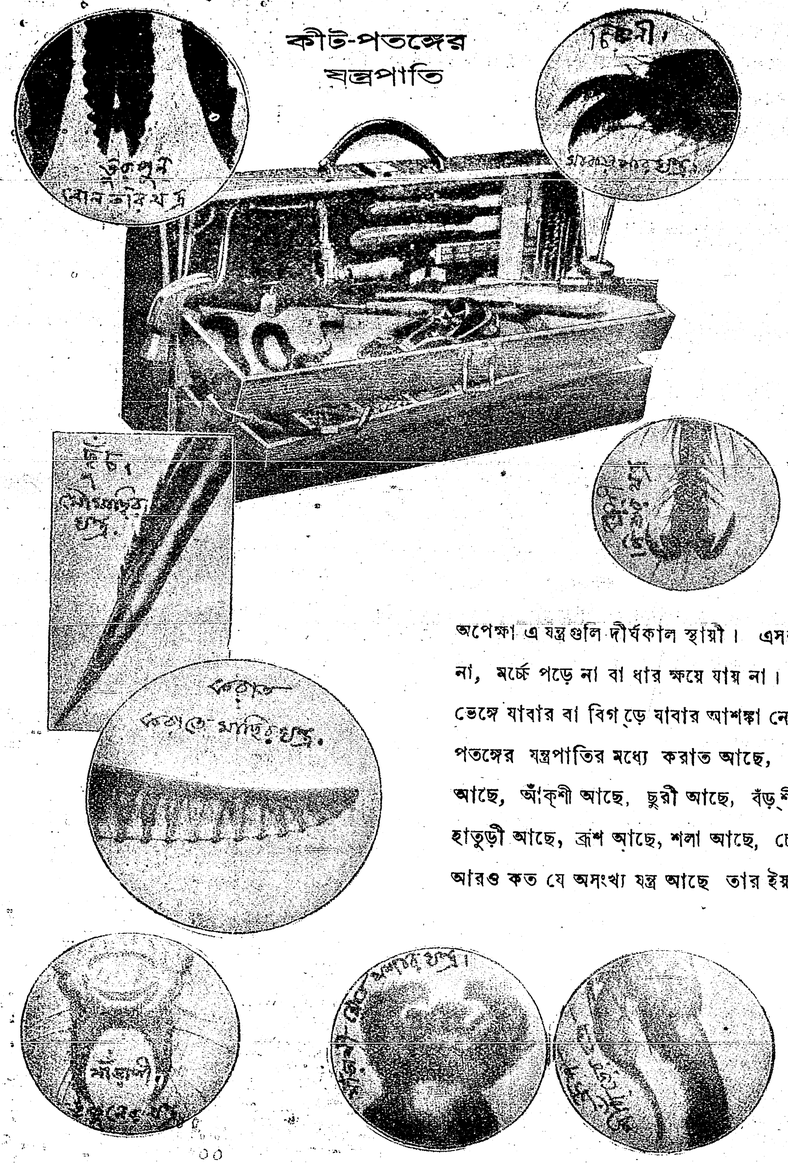

মানুষ তার ঘরকন্নার জন্য মাত্র কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেসব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ক'রেছে, প্রকৃতি তাঁর কীট পতঙ্গের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই তার চেয়েও বহুগুণে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ও কর্ম্মক্ষম যন্ত্রপাতি তৈরী ক'রে দিয়েছেন। এই সব যন্ত্রপাতি সদাসর্ব্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য তিনি কীট-পতঙ্গের অঙ্গে সংযোগ ক'রে দিয়েছেন, এবং এমন ভাবে দিয়েছেন যে, সেসব যন্ত্র বহন ক'রে নিয়ে বেড়াতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়। মানুষের তৈরী যন্ত্র অপেক্ষা এ যন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী। এসব যন্ত্রে কখনও ঘুণ ধরে না, মর্চ্চে পড়ে না বা ধার ক্ষয়ে যায় না। ব্যবহার ক'রতে গিয়ে ভেঙ্গে যাবার বা বিগড়ে যাবার আশঙ্কা নেই। প্রকৃতি প্রদত্ত কীট পতঙ্গের যন্ত্রপাতির মধ্যে করাত আছে, সাঁড়াশী আছে, তুরপুন আছে, আঁকশী আছে, ছুরী আছে, বঁড়শী আছে, ফোঁড় আছে, হাতুড়ী আছে, ব্রশ আছে, শলা আছে, চোঙ আছে, ছুঁচ আছে আরও কত যে অসংখ্য যন্ত্র আছে তার ইয়ত্তা হয় না।

অটল আবাস

ভীষণ ভূমিকম্পে টোকিয়ো ও ইয়োকোহামার যে নিদারুণ সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, সংবাদপত্র-

পাঠকমাত্রেই তা অবগত আছেন। এই প্রবল ভূকম্পের অপরিমেয় ক্ষতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্দ্ধারিত হবার আগেই আবার জাপানে আর একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল! ভূমিকম্প যে কেবল জাপানেই হ'চ্ছে তা নয়, পৃথিবীর নানা স্থানে প্রতি বৎসর কম বেশী অন্ততঃ চার হাজারবার ভূমিকম্প হয়। এক জাপানেই আজ পর্য্যন্ত একলক্ষ ষাট হাজারবার-ভূমিকম্প হ'য়ে গেছে! এইরূপ ঘন ঘন ভূমিকম্পের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য জাপান এবার উঠে প'ড়ে লেগেছে। প্রফেসার যানো ও ইনোকুটী নামে দু'জন বড় বড় জাপানী ইঞ্জিনীয়ার এবার অনেক মাথা খাটিয়ে এমন প্ল্যানে বাড়ী করবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন যে, যত বড় ভীষণ ভূমিকম্পই হোক্ না কেন, তাতে বাড়ীখানির কোনও ক্ষতিই ক'রতে পারবে না। ভূমিকম্প দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লেও এই নূতন কৌশলে নির্ম্মিত আবাস অটল অচল ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে! মানো ও ইনোকুটীর প্ল্যানে তৈরী প্রত্যেক বাড়ীখানি কৃত্রিম ভূমিকম্পের মধ্যে রেখে তার অটলত্ব পরীক্ষা ক'রে গ্যারাণ্টি দেওয়া হবে যে, মৃত্তিকা দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে গৃহখানির যদি পাতালে প্রবেশলাভ না ঘটে, তাহ'লে যত বড় বা যে রকম ভূমিকম্পই হোক্ না কেন, প্রত্যেক বাড়ীখানি অক্ষত অবস্থায় বিরাজ ক'রবে।



টোকিয়ো রাজপথের দুরবস্থা

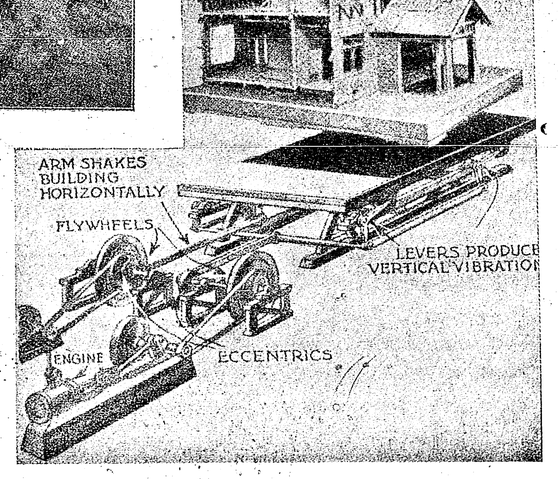

অটল আবাস

হাওয়ার হাল

জার্ম্মানীর রূঢ়প্রদেশ বিজয়ী ফরাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর থেকে জার্ম্মানীতে ভীষণ কয়লার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কারণ জার্ম্মানীর কয়লার খনিগুলি সব ঐ অঞ্চলেই আটকে পড়েছে। কয়লার অভাবে জার্ম্মানীর কলকারখানা প্রায় বন্ধ হ'তে ব'সেছে দেখে, এই বিপদ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য জার্ম্মানীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বিনা কয়লায় কল চালাবার একটা উপায় চিন্তা ক'রে, শেষে হাওয়ার

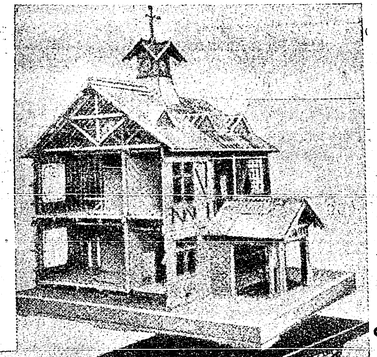

শরণাপন্ন হ'য়েছেন। কারণ বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকেই যখন বায়ুর শক্তি সাহায্যে ছোট-খাট হাওয়ার কল (Wind-Mill) চলে আসছে, তখন তাঁরা স্থির করলেন যে, বড় বড় কলকারখানাও হাওয়ার জোরে চালানো সম্ভব হ'তে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁরা



ইয়োকাহামা বন্দরের দুরবস্থা

হাওয়ার শক্তিকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা ক'রতে সুরু করেন এবং অনতিবিলম্বে বায়ুর প্রচণ্ড শক্তিকে

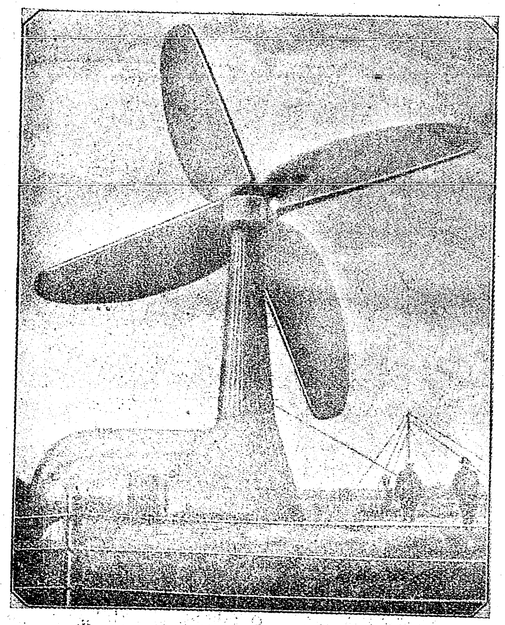

হাওয়ার কল

আপনাদের আয়ত্তাধীন ক'রতে সক্ষম হন। উপস্থিত প্রাশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে এগারোটি বড় বড় কলকারখানা কেবল মাত্র এই বায়ুর শক্তি সাহায্যে পরিচালিত হ'চ্ছে। ইচ্ছামত হাওয়ার জোরে ইঞ্জিন চালানো ব্যাপারটা জার্ম্মানীতে এখন এমন সহজ ও সম্ভবপর হ'য়ে উঠেছে যে, অতঃপর সেখানে বাষ্পীয়যান অর্থাৎ রেলগাড়ী পর্য্যন্ত এই বায়ুচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যেই চালাবার জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছে। এই বায়ুশক্তিকে করতলগত ক'রতে পারায়, জার্ম্মানী শুধু কয়লার অভাব থেকেই মুক্ত নয় কয়লা কেনার অত্যাধিক ব্যয় থেকেও অব্যাহতি পেয়েছে, কারণ হাওয়ার কোনও সাকার মহাজন না থাকায়, ও জিনিসটা তারা সব এখন বিনামূল্যেই পাচ্ছে!

অতলের ফুল

গভীর সমুদ্রগর্ভের তলদেশে এক প্রকারের পদার্থ জন্মাতে দেখা যায়, যাদের বহিরাকৃতি একেবারে হুবহু প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো! কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে আকৃতিতে তারা ফুলের মতো হ'লেও প্রকৃতি তাদের একেবারেই ফুল ক'রে গড়েন নি। সমুদ্রগর্ভের এই অদ্ভুত পদার্থকে উদ্ভিদ বলা চল্‌বে না এবং এরা অচেতনও নয়—এরা সব চেতন! অতএব এই চেতন পদার্থকে প্রাণী পর্য্যায় ভুক্ত করে নেওয়াই সমীচীন। কেবল বিস্ময় এই যে, মানুষের সযত্ন রচিত পুষ্পোদ্যানে যে সব বিচি বর্ণের



অতলের ফুল (ক)

(সাদা ধূসরবর্ণ এবং ফিকে লাল রঙের ফুলের মতো দেখ্‌তে সমুদ্রগর্ভের এই সজীব প্রাণীগুলি যখন উপরে ভেসে উঠে, তখন মৌমাছিরাও ফুল বলে ভুল ক'রে এদের গায়ে উড়ে বসে!)

বিচিত্র শোভার মনোহর কুসুম-রাজি বিকশিত হয়,—অতলের গভীরতলের এই সজীব ফুলবেশী প্রাণীগুলি শোভায় সৌন্দর্য্যে বর্ণ বৈচিত্রে তাদের সকলকে পরাস্ত করে দিয়েছে!

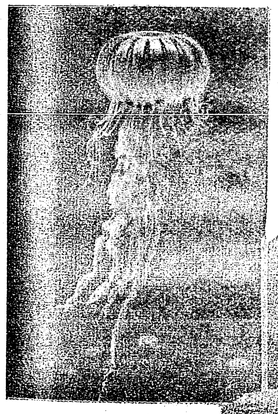

অতলের ফুল (খ)

(এটিকে হঠাৎ পলাণ্ডু বলে মনে হয় কিন্তু এটী হচ্ছে বিচিত্র বর্ণের অতি সুন্দর একটি সমুদ্রের 'জেলীফিস্'!)

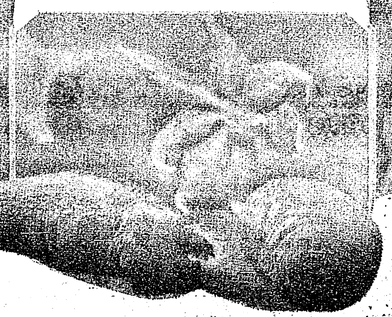

অতলের ফুল (গ)

(এই তারা ফুল বকফুলের মত পদার্থ দুটী সমুদ্রগর্ভের আর এক জাতীয় সজীব প্রাণী!)



অতলের ফুল (ঘ)

(এই যে রেশমী চামরের মতো একটি সুন্দর ফুলের ফোয়ারা দেখছেন এটীও ফুল নয়—সামুদ্রিক জীব!)

পীড়িতের আরাম

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে প্রতিদিন নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকরা সম্প্রতি যে তিনটী নূতন জিনিস নিখিল রোগীর কল্যাণ কামনায় উদ্ভাবন করেছেন, সে তিনটিই পীড়িতজনের বিশেষ উপকারে লাগবে। প্রথমতঃ অস্ত্রোপচার ও অস্থিসংস্কারার্থ যে নূতন ধরণের টেবিল তৈরি হ'য়েছে, সেটি পৃথিবীর সমস্ত হাসপাতালে রাখা দরকার হবে। টেবিলটি এমন ভাবে তৈরি যে, রোগীকে তার উপর একটী দীর্ঘ কোমল দোল শয্যায় (Hammock) শুইয়ে তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে অথবা শরীরের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করা বা প্ল্যাষ্টার লাগানো চ'লবে, অথচ রোগীর তাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। এ ছাড়া রোগী এই দোলশয্যার কোমল ক্রোড়ে অতি আরামে সুশায়িত থাকতে পারবে। একটিবারও নড়বার-চড়বার বা পাশ ফেরবার মতো কোনও অস্বস্তি বোধ ক'রবে না। দ্বিতীয় জিনিসটি হ'চ্ছে উষ্ণ জলের ভাপ্‌রা নেবার একটি সরঞ্জাম। গরমজলের দীর্ঘ নলযুক্ত কেটলি, বাষ্পরেণুকার, (Steam Atomizer) শ্বাসসহায়ক যন্ত্র (Inhalers) প্রভৃতি যে সব জিনিস এতাবৎ কাল চল্‌ছিল এই নূতন যন্ত্রটির সঙ্গে সে সবের তুলনা হয় না। এই নব উদ্ভাবিত বাষ্পাধারের (Vaporizer) জলীয় পদার্থ বস্ত্রাবরণের ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত বৈদ্যুতিক বাতির সংস্পর্শে এসে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ বাষ্পাকারে পরিণত হয়। তৃতীয়টি হ'চ্ছে অক্ষম ও দীর্ঘভোগী রোগীর আরামদায়ক শয্যা। রোগীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই যে নূতন ধরণের পীড়িতের পালঙ্ক নির্ম্মিত হ'য়েছে, এই পালঙ্ক-শায়ী রোগীর কোনও দিন শয্যাক্ষত (Bed-sore) হবে না। শরীর সর্ব্বদা যাতে বায়ু স্পর্শে সুশীতল থাকে, তার সুব্যবস্থা আছে। রোগীকে শায়িত অবস্থাতেই শয্যাসমেত তুলে বসাবার বন্দোবস্ত আছে। মলমূত্র ত্যাগ করাবার জন্য রোগীকে বিরক্ত না ক'রে শয্যার স্থান বিশেষ খুলে নিয়ে সেখানে মলভাণ্ড বা মূত্রাধার স্থাপন করবার অতি সুন্দর কৌশল করা আছে। রোগীকে কিছুমাত্র ক্লেশ না দিয়ে প্রতিদিন তার শয্যা পরিবর্ত্তন ক'রে দেবার এমন চমৎকার উপায় করা আছে যে কেবল এই শয্যার গুণেই বহু রোগীকে অল্প দিনের মধ্যে আরাম হ'য়ে উঠতে সাহায্য ক'রবে।

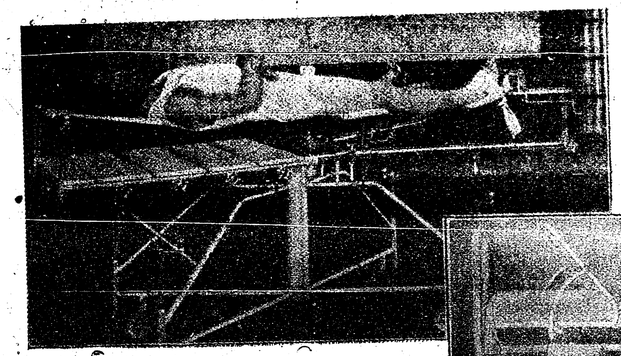

অস্ত্রোপচার টেবিল

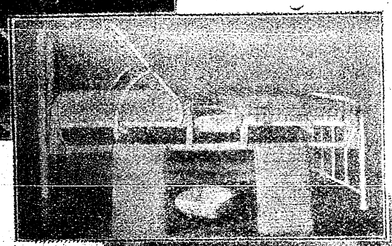

পীড়িতের পালঙ্ক

বাষ্পাধার যন্ত্র

দৃষ্টিদোষ

চল্লিশে চ'খে চাল্‌শে ধরার যে প্রবাদটা আমাদের দেশে অনাদি কাল থেকে চলে আস্‌ছে,—য়ুরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা আজ সে কথাটাকে খুবই খাঁটি কথা ব'লে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের মতে একুশ বছর বয়স থেকেই মানুষের চোখ কাহিল হ'তে আরম্ভ হয়, এবং চল্লিশ বছরে এমন কোনও নরনারী দেখতে পাওয়া যায় না, যার চ'খের একটা না একটা কিছু দোষ হয়নি! তাঁদের এখনও চশমা নিতে হয় না এবং খালি চোখে লেখাপড়া ক'রতেও যাঁরা এখনও কোনও কষ্ট বোধ করেন না,—তাঁরা হয়ত' জোর ক'রে এ কথায় প্রতিবাদ ক'রে বলবেন যে তাঁদের তাঁরা জান্‌তে পারেন না যে, তাঁদের চোখ এখনও অনেকটা ঠিক কাজ দিলেও, সে জরাজীর্ণ হ'য়ে পড়েছে, এবং ভিতরে তার গলদও হ'য়েছে! কোনও দৃষ্টি-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের



দৃষ্টি-পরীক্ষা

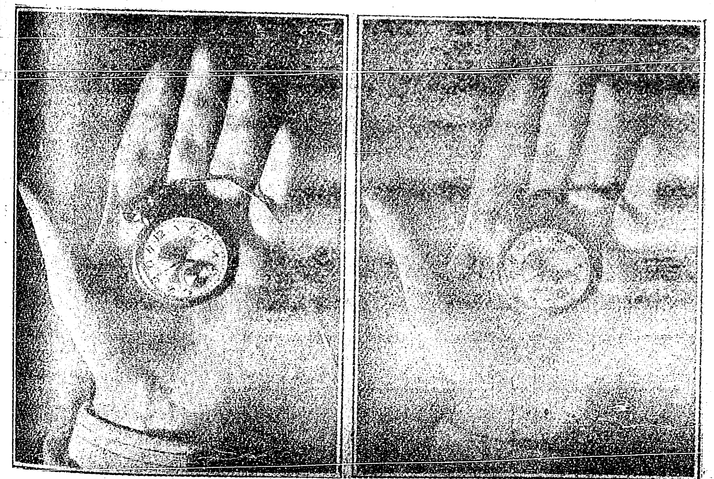

দৃষ্টি দোষ—(এই দু'টী ঘড়ীর মধ্যে একটী যদি পাঠক পাঠিকারা বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পান এবং অপরটি ঝাপ্‌সা মনে হয়, তা'হলে দৃষ্টি ঠিক আছে জানবেন; কিন্তু যদি দু'টীই ঝাপ্‌সা মনে হয়, তাহ'লে অনতিবিলম্বে চশ্‌মা নেবার ব্যবস্থা করিবেন।)

দ্বারা পরীক্ষা করালেই তাঁদের চোখের দোষ ধরা প'ড়ে যাবে। তাঁরা আরও বলেন যে ২১ বছরের পর থেকে প্রত্যেক লোকের মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা দৃষ্টি পরীক্ষা করানো উচিত এবং কোনও সামান্য দোষ হবার উপক্রম মাত্রই উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কেন না, চশমা হ'চ্ছে অধিকতর অধঃপতনের হাত চোখের কোনও দোষই এখনও হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, থেকে চক্ষুকে রক্ষা করবার একমাত্র দৃষ্টিকবচ।

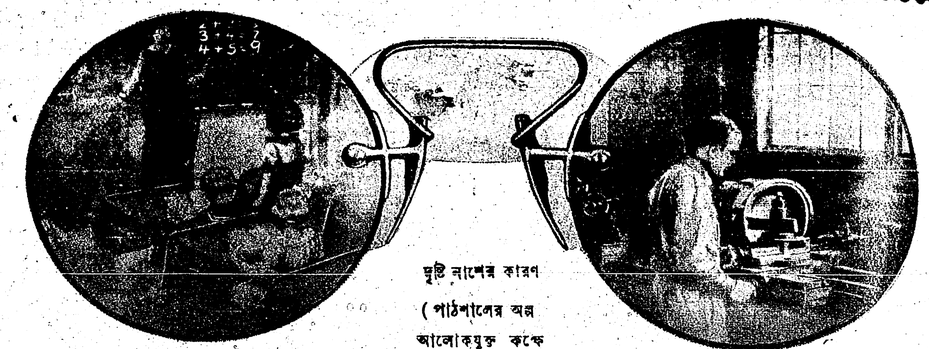

দৃষ্টি নাশের কারণ
(পাঠশালের অল্প
আলোকযুক্ত কক্ষে

ছেলেদের পাঠাভ্যাস এবং কারখানার অল্প আলোকযুক্ত গুদামে কারিগরদের কাজ ক'রতে হয় ব'লে তারাই বেশী ভোগে।)

১। এক্স-রে ও ক্যান্সার

ক্যান্সার রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ রেডিয়ো-বৈজ্ঞানিক ডাক্তার লুইস্ ফ্রায়েড্‌ম্যান্ সম্প্রতি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি 'এক্স-রে' চিকিৎসার দ্বারাও আরাম হওয়া সম্ভব। তবে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ তাড়িত-শক্তির প্রয়োগে এই ব্যাধি আরোগ্য করবার চেষ্টা চল্‌ছে, তাতে কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কর্কট রোগের ক্ষত যদি পুরাতন হয়ে যায়, তাহ'লে, অল্প শক্তি-সম্পন্ন এক্স রে আলোকে-রোগীর কোনও উপকারই হয় না। সেরূপ স্থলে রোগীকে অন্ততঃ আড়াই লক্ষ 'ভোল্টেজের' আলোয় চিকিৎসা করা দরকার। তিনি বলেন, এই রকম 'এক্স-রে' চিকিৎসার 'রেডিয়ম' চিকিৎসার চেয়েও সুফল পাওয়া যায়।

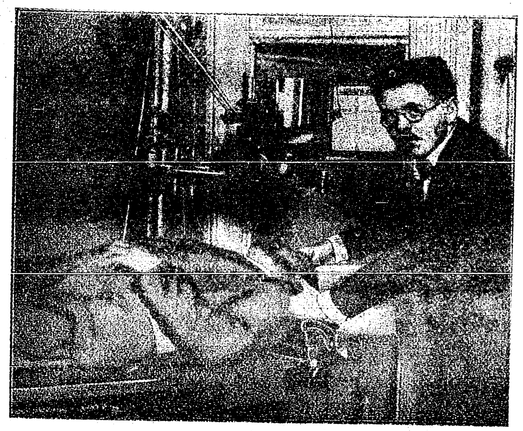

এক্সরের দ্বারা ক্যান্সার চিকিৎসা

তর্কে

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

নানা ধর্ম্ম আলোচনে তর্কে মীমাংসায়
শুধু সন্দেহের স্তূপ বেড়ে বেড়ে যায়।
প্রকৃত ঈশ্বর কোথা পড়ে থাকে চাপা—
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বাক্য দিয়ে মাপা—
জ্ঞানীরে অজ্ঞান করে পুণ্যাত্মায় পাপী,
সত্যের সরল পথ দেয় শেষে ছাপি।

সুনীল

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

আজও যে কোনও ত্যাগের কথা শুনিলেই তাহার মুখ মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায়, বেদনায় মন ভরিয়া ওঠে। সে দুঃখ পাইয়াছে বলিয়া সমবেদনায় নয়, আমি পরমাশ্চর্য্য সম্পদ হারাইয়াছি বলিয়া।

হাঁ, প্রথম পরিচয়ের কথা আজও মনে আছে। আমরা দুজনেই তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। তাহার সুন্দর মুখ প্রথমেই ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এই ভাল-লাগা স্থায়ী হয় তাহার মনের সন্ধান পাইয়া। সেই প্রথম দিনটার কথা আজও মনে পড়ে। মনের উপর অনেক ধূলামাটী জমিয়া অনেক জিনিস অস্পষ্ট, ঝাপসা হইয়া যায়; কিন্তু কই, এ দিনটী তো এতটুকু মলিন হয় নাই! সেদিন অনার্স ক্লাশে এক ফচ্ মিশনারী অধ্যাপক শেলীর একটী কবিতার ব্যাখ্যায় কয়েকটী লাইনকে mystic আখ্যা দিলেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিলেন না; কিন্তু সেই প্রসঙ্গে শেলীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মিশনারীর মতই কি কি বলিলেন। আমার তরুণ বন্ধুটীর ইহা ভাল লাগে নাই। সে সেদিন আমার পাশেই বসিয়া ছিল। সে অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে আমাকে বলিল, অন্যায় বল্লে ভাই—শেলী যে Platonic ছিলেন, এ কথাটী প্রফেসরের ভুল করা উচিত হয় নি। ইহার পর হইতেই আলাপ-পরিচয়ের ভিতর দিয়া আমাদের ঘনিষ্টতা ও সৌহৃদ্য বাড়িয়া যায়। ঝামাপুকুরের এক মেসে সে থাকিত। প্রথম দিন বিনা আহ্বানে যাইয়া দেখি, সে রাশিকৃত কাপড়, জামা, তোয়ালে লইয়া কলতলায় সাবান মাখাইতেছে,—পরিষ্কার করিতে হইবে। আমাকে দেখিয়া সাবানমাখা ফেনা-শুদ্ধ হাতে তাহার আশ্চর্য্য চক্ষু দুটী তুলিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল। প্রথম দিনটাতেই এমন অসময়ে আসিয়া পড়িয়া, আমি নিজেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, আমি নিজে যখন লজ্জা পাই নে, তোমার লজ্জার কি আছে? আমার বেশী কাপড়-জামা নেই, সব সময়ে ধোপাবাড়ী দেওয়া হয়ে ওঠে না—নিজে অনেক সময়ে কাচতে হয়। একটু থামিয়া—কষ্ট? তা কষ্ট হয় বৈকি একটুখানি—বলিয়া তাহার সুন্দর মোমের মত আঙুলের ডগা দেখাইল। দেখিলাম, শানের সঙ্গে ঘষা লাগিয়া এম্‌নি হইয়াছে যে, আর একটুকু হইলেই রক্ত বাহির হইবে। কি আশ্চর্য্য গরীব সে, তাহা তো জানিতাম না। রূপ দেখিয়া তো মনে হয় যে, বহু-পুরুষের সযত্ন-বর্দ্ধিত ও লালিত রূপের উত্তরাধিকারী সে। দেহ তো নয়, যেন একগোছা অশোকফুল। ক্রমে তাহার যত পরিচয় পাইতে লাগিলাম, বড় ভাল লাগিল,—প্রাণটী এত কোমল! পড়াশুনা? পড়াশুনা তার অনেক ছিল। এই বিশ-একুশ বছর বয়েসে কখন সে এত পড়িয়াছিল, তাই ভাবিয়া আমি আজও আশ্চর্য্য না হইয়া পারি না। তাহাকে সুকুমার সাহিত্যের সঙ্গে বার্টনের Anatomy of Melancholy যেমন পড়িতে দেখিয়াছি, বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতও তেমনি আগ্রহে পড়িতে দেখিয়াছি। তবে ইংরেজী নভেলই সে বেশী পড়িত বলিয়া যেন মনে হয়। পড়ার জন্য পড়া নয়, রসবোধের জন্য পড়া।

আজ তাহার জীবনের খাতা খুলিয়া বসিলে, লোকসানের অঙ্কই চোখে পড়ে। আহা, শুধু দারিদ্র্যই তাহাকে নিপীড়ন করে নাই,—ভাগ্যও বঞ্চনার ভিতর দিয়া পীড়ন করিয়াছে।

সেবার কলিকাতায় গরমটা খুব পড়িয়াছিল। দুপুরে বাসন-বিক্রেতার হাঁক নাই; চিলের কণ্ঠস্বরও বড় একটা শোনা যায় না। দুপুর বেলাটায় যেন মনে হইত, কলিকাতা জনমানবশূন্য—কেবল মরুভূমির কোন্ রক্তচক্ষু দেবতা এখানে তাহার উৎসবের বাতি জ্বালিয়াছেন। এমনি এক দিনে সুনীলের মেসে যাইয়া দেখি, সে বসিয়া বিলাতী চুরুট টানিতেছে। ঘরের এক কোণে তাহার অর্দ্ধভুক্ত শ্রীহীন অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা পড়িয়া আছে। তাহার ঘরে তক্তাপোষ বা খাটের বালাই ছিল না,—টেবিল চেয়ার কিছুই ছিল না। মেঝেতে অত্যন্ত সাদাসিধা রকমের বিছানা,

—যাহা না হইলে নয় তাহারও কম, কিন্তু পরিষ্কার। ঘরে অনেক বই—দুচারখানা বিছানার পাশে; আর অধিকাংশ মেঝেতে খবরের কাগজ পাতিয়া তাহার উপরে রক্ষিত। একটা জিনিস তাহার সাহচর্য্যে আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহার যখন কোনও চিন্তার কারণ ঘটিত, তখন সে চুরুট টানিতে থাকিত। চুরুট খাওয়াটা আমি আজও পর্য্যন্ত দেখিতে পারি না,—দেখিলে বিরক্ত হই; কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলি নাই। মানুষের নানা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকে; সুনীলের অন্য কিছুই দেখিতাম না; তাই অন্ততঃ এই চুরুট খাওয়া লইয়া সে যে অপর দুদশজন সাধারণ মানুষের মত, এই চিন্তা আমাকে সে সময়ে আনন্দ দিত। নহিলে সর্ব্বদা মনে হইত, সে যেন দূরের জিনিস—ততোধিক দূরের জিনিসের দিকে তাকাইয়া আছে। সেদিন যে সব কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেশ হাসিমুখেই সে তাহার উত্তর দিল। সে জর্জ্জ ইলিয়টের কি একখানা বই পড়িতেছিল। তখনও জর্জ্জ ইলিয়টের যুগ শেষ হয় নাই;—বাংলা দেশের ইংরেজী-পড়া ছেলেরা তখনও জর্জ্জ ইলিয়টের নাম লইয়া শপথ পর্য্যন্ত করিত—"আই সোয়ার আপন্ জর্জ্জ ইলিয়ট"—এ কথাও শুনিয়াছি। সুনীল বই পড়িতেছে, চুরুট টানিতেছে, হাসিমুখে কথাও কহিতেছে, কিন্তু চোখ দেখিলাম সজল। তার পর সে সজল চোখ বহুবার দেখিয়াছি। আকাশে সজল মেঘ দেখিলে বারিপাতের সম্ভাবনা হয়, বারি বর্ষণও হয়; কিন্তু তাহার বাহিরে, কই, এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল না—হৃদয় যখন রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছিল তখনও! আমার মনে আছে, আমি সেদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তুমি বাজে জিনিস পড়ে—নভেল পড়ে সময় নষ্ট কর্চ্ছ কেন? সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, নভেল বাজে জিনিস—এ তোমায় কে বল্লে? যদি কেউ বলে থাকে, নিশ্চয়ই সে লবণের দালাল, নয় ত পাঠশালার গুরুমশাই। উত্তরে আমি কি বলিয়াছিলাম, আজ মনে পড়িতেছে না; কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, ভুলি নাই। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, নভেল ও নাটক—এই তো সাহিত্যের দুটী বিরাট রূপ—যেন যমজ দুই ভাই। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতে এই কথা-সাহিত্যের যুগই চল্‌বে—এরই প্রসার দেখতে পাবে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নানা রূপে নানা অবস্থায় নানা রংএ দেখা দেবে। শ্রমজীবী-সমস্যা, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন আকারে সব আগামী কথা সাহিত্যের বিষয় হবে। তখন Blank Verseএ কবিতা কেউ পড়তে চাইবে না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। স্বল্পাবশিষ্ট চুরুট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, এও আজ বলি তোমায়, যে, কথা-সাহিত্যের লেখককে খুব প্রাণবন্ত হতে হবে, যাতে তিনি সজীব সাহিত্য সৃষ্টি কর্ত্তে পারেন। এ তো কঙ্কাল নিয়ে খেলা নয়—রক্তমাংসের জীব নিয়ে কারবার। যার কিছু বলবার নেই, সে কবিতা লিখ্‌লেও লিখতে পারে, কি অন্য কিছু লিখ্‌তে পারে; কিন্তু ভাই কথা-সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাই হবে না, যদি না তোমার বলবার বিষয় সজীব উপাদানে গড়া হয়। এ বড় শক্ত ঠাঁই। কিছুকাল পরে সে আবার বলিল, প্রাণস্পর্শী অনুভূতি চাই; অনুভূতির চাইতেও বড় কথা উপলব্ধি—সেই উপলব্ধি চাই। যার পেছনে অনেক চিন্তা, অনেক অভিজ্ঞতা আছে, সে-ই এ কাজ পার্ব্বে। তার সে দিনের এই কথাগুলির মধ্যে কতখানি সত্য ছিল, তাহা আমি যাচাই করি নাই; কারণ সাহিত্যের জহুরী আমি নই। তবে তাহার মুখ-নিঃসৃত দীপ্ত কথাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছিল, ইহাই আজ বলিতে পারি। সে যখন কথা বলিত, তখন একটা মোহাবেশের সঞ্চার করিত। যে শুনিত, সে-ই যেন ক্ষণিকের জন্য মাতাল হইয়া পড়িত।

ইহার পর কিছু দিন তাহার কাছে যাইতে পারি নাই। কলেজে দেখা হইত, মাঝে মাঝে আবার সে কামাইও করিত। কি একটা কাজে আমাকে সেদিন সন্ধ্যার ঠিক পরেই নিউমার্কেটে যাইতে হইয়াছিল। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, সুনীল একটী সুদর্শনা তরুণীর সঙ্গে নিকটে দণ্ডায়মান একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমার সঙ্গে কথা কহিবার অবসর তাহার ছিল না। সে শুধু আমাকে দেখিয়া দূর হইতে মাথা নোঙাইল, ও মিষ্টি হাসি হাসিল। গাড়ীখানা চলিয়া গেলে, আমার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি? এখানে সুনীলের কোনও আত্মীয় আছেন বলিয়া তো শুনি নাই! এক দিদি ছিল,—সুনীল বলিয়াছিল যে তিনি গৌহাটীতে থাকেন। যাঁহাকে দেখিলাম, ক্ষণকালের জন্য হইলেও ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহার বয়েস বেশী হয় নাই, এবং আজকালকার মেয়েদের

চালচলনগুলিও তাঁহার অনায়ত্ত বা অজ্ঞাত নয়। ইনি অন্য কোনও আত্মীয় হইবেন, যাঁহার কথা আমি জানি না,—আমার সঙ্গে এই কটা দিনের পরিচয় বই তো নয়।

ইহার পর পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। চা-কোকোর শরণ লইয়া যেমন রাত জাগিতে হয়, জাগিলাম; নোট করিতে হয়, করিলাম। ইহার মধ্যে সুনীলের খবর বড় একটা লইতে পারি নাই। এক দিন মাত্র আসন্ন সন্ধ্যায় তাহার মেসে গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখিলাম, ঘর খোলা। আঁধার ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ডাকিলাম 'সুনীল'। প্রথম ডাকে কোনও সাড়া পাইলাম না। দ্বিতীয় বার ডাকিতে, সে অতি ধীরে বলিল, ভেতরে এসো ভাই। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন বিকৃত বোধ হইল। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, আঁধারে চুপচাপ বসে যে? সে একটু থামিয়া উত্তর দিল, ভাল নেই ভাই। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিলাম, ও তাহার হাতখানি আমার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, কেন ভাই? সে কিছুক্ষণ থামিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিল 'এম্‌নি'—তখনও তার হাত আমার হাতের মধ্যে। আমি তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি তাহার মরমী বন্ধু, এ কথা বলিয়া আজ গৌরব অর্জ্জন করিতে চাই না; কারণ তাহাকে ভাল করিয়া বুঝি নাই,—বোধ হয় ভাল করিয়া তাহাকে বোঝা যায়ই না। তবুও যেন আজ মনে হইতেছে, সেদিন অন্য কিছু না বুঝিলেও, এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, এই তরুণ সতেজ প্রাণটী যেন কোনও নির্ম্মম হস্তের অকরুণ স্পর্শে কেবলি নিপীড়িত হইতেছে। কিছুকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, সে কি ভাবিয়া শয্যাপার্শ্বে রক্ষিত আলো জ্বালিল। এবং অত্যন্ত বেদনাহত মুখে এক ঝলক হাসি আনিল। অতি জীর্ণ অট্টালিকা-বক্ষে আলো জ্বালিলে যেরূপ দেখায়, এ হাসি তারই ছোট ভাই। সে বলিল, আজ এক নতুন বই এনেছি, পড়ি শোনো। বইখানা দেখিলাম, অন্য কিছু নয়—'শ্রীকৃষ্ণের শত নাম'। আমি দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম বৈ কি! আমি ভাবিয়াছিলাম, না জানি কোন্ বিখ্যাত ইংরাজী বইএর আলোচনা সে সুরু করিবে, যার কতক আমি বুঝিব, কতক বুঝিব না। তাহা যদি না হয়, বাংলা অথবা সংস্কৃত বড়-গোছের কিছু—তাও নয়। সে শত নাম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িল—পড়িয়া বলিল 'চমৎকার'। এ কথাটী অকৃত্রিম ভাবে সে উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু তাহার দেহে ও মনে যে বেদনা অহরহঃ ক্রীড়া করিতেছিল, তাহার আভাস গোপন রহিল না। সে বলিল, দেখ ভাই, শ্রীকৃষ্ণের এত নাম ছিল কি না, কেহ সত্যি সত্যি রেখেছিলেন কি না, সে নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি চাইনে—এর সরল মধুর অথচ সরস কবিত্বই, শুধু আমাকে আকর্ষণ করে। সে আবৃত্তি করিতে লাগিল—নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দের নন্দন, যশোমতী নাম রাখে যাদু-বাছাধন। আবার দেখ, অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া, কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া। কই, গর্গ, তিনি তো 'যাদু-বাছাধন' কি 'রাখাল-রাজা ভাই' নাম রাখেন নি। তাপস তিনি, ধ্যানে কৃষ্ণকে জেনে, তিনি তাঁর সত্য নামেই তাঁকে আহ্বান করেছেন। এ দিকে দেখ কি চমৎকার—ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী, কালসোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী। দেখ এই ননী-চোরা নাম গোপিনীদের সোহাগের স্নেহের দেওয়া নাম। কিন্তু শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সখী বল, প্রণয়িনী বল, কি দয়িতাই বল,—তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ কে ডাকলেন 'কাল সোণা'। আর কেউ এ নামে ডাকলে মানাত না; সেই জন্যই বোধ হয় কবি আর কাউকে এ অধিকার দিতে কাপর্ণ্য করেছেন। কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, কবিত্বের মাধুর্য্যই এখানে শুধু আমার মনে হয় না ভাই, —এ-ও মনে হয় যে, আমাদের প্রত্যেকের নাম অনেক সময়েই প্রত্যেকের যোগ্য হয় না। এর মানে এই যে, প্রতি নামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইতিহাসও বোধ হয় আছে,—যেমন শব্দমাত্রেরই আছে। আহা, আমাদের দেশের প্রাচীন, কাব্যের নামগুলি কি মধুর! নামটী উচ্চারিত হলেই, নামের পেছনের ছবিটী ভেসে ওঠে। আচ্ছা বল, তাই নয় কি? ইহার পর সে আবার বিমনা হইল। তার পর বলিল, আচ্ছা, আমার সুনীল নামটী কেমন ভাই? বলিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে আমার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিল। তাহার মন ভাল নাই, ইহা আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, বেশ। সে বলিল, দূর! এ তোমার মন-রাখা কথা ভাই, এত ভাল নাম আমার মানায় নি। তাহার হাত আমার হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, আজ তোমার কি হয়েছে সুনীল? সে ধীরে হাত টানিয়া লইয়া বলিল, ওই

যে গোড়াতেই বল্লুম, ভাল নেই। আমি একটুকু জোর দিয়াই বলিলাম, ভাল নেই কেন? আবার সেই উত্তর দিল, কেন? এম্‌নি,—না ভাই, অসুখ করেছে। আমি তাহার মন অন্যদিকে লইবার জন্য বলিলাম, তোমার কেমন তৈরি হল সেকেণ্ড পেপারটা? সে এ কথার কাছ দিয়া গেল না। সে বলিল, আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলি। আমার মনে হইল, যেন সে তাহার হৃদয়ের সতত সঞ্চরমান বেদনা ও কণ্ঠের আগন্তুক রোদন—এক কালেই দুইটীকে উপেক্ষা করিয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বিবর্ণ বেদনাহত মুখে ঢলিয়া পড়িল। আমি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেই, সে বলিল, সেই ব্যথাটা—

আজও ঠিক মনে পড়িতেছে, যখন আমি ফিরিলাম, তখন বেলফুল ও কুল্‌পি বরফ পথে পথে হাঁকিতেছিল, যেমন রোজ হাঁকিয়া থাকে; এবং পথের জন-বিরলতা রাত্রির গভীরতাই নির্দ্দেশ করিতেছিল। আজও ঠিক মনে আছে যে, সেদিন বাড়ী ফিরিয়াও আমার এই তরুণ বন্ধুটীর কথা মনে পড়িতেছিল; এবং এক অতীত সন্ধ্যায় দৃষ্ট মেয়েটীর সহিত আজকার এ ঘটনার কোনও সংস্রব আছে কি না, ইহাও মনে জাগিতেছিল।

সেনেটে পরীক্ষা-হলে সুনীলকে না দেখিয়া দুঃখিত কিছু হইলেও আশ্চর্য্য হই নাই। আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে আর পরীক্ষা দিবে না। তাহার অনুপস্থিতি তাহার এক প্রতিযোগী ছাত্রকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা বেশ মনে আছে। পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল, সে দিন পরীক্ষা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া সুনীলের ঝামাপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাহাকে দেখিলাম না,—দেখিলাম, তাহার ঘরে অন্য লোক। শুনিলাম, অনেক দিন হইতেই সুনীল জ্বরে ভুগিতেছিল; কিন্তু কিছু দিন হইতে খুবই অসুস্থ বোধ করায়, মেসের প্রাপ্য সব চুকাইয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে—কোথায়, তাহারা জানে না। খুব অসুস্থ বোধ করিতেছিল! আহা! ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ—কোনও নিকটতম আত্মীয়ের আশ্রয়ে সেবা ও স্বস্তি পাক,—সে ভাল হোক, ভাল হোক। তাহার ঠিকানা জানিতাম না, জানিবার চেষ্টাও করি নাই। সেই জন্য নীরবে দিন গুণিয়া চলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইত যে, কলিকাতার জনবহুল পথে অভূতপূর্ব্ব ভাবে কোনও দিন তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা আর হয় নাই। আর একদিন তাহার সেই মেসে খোঁজ করিলাম, তাহারা নতুন কিছুই বলিতে পারিল না। এমনও হইতে পারে তো যে, সে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিংবা অন্য কোথাও আছে, যে ঠিকানা আমি জানি না। পুরানো বইএর দোকানে বিকালে একবার নজর রাখিলে হয় না? অজ্ঞাত কবি বা লেখকের রচনা সংগ্রহের আগ্রহ তাহার ছিল।

কিছু দিন এইরূপে কাটিয়া গেলে, এক দিন সকালে আমার ডাক আসিল তারের মারফত গৌহাটী হইতে—"সুনীল অত্যন্ত পীড়িত, সুনীলের দিদি"—বুঝিলাম, সুনীলই ডাকিয়াছে দিদিকে দিয়া। কলিকাতায় অবস্থান কালে সে কোনও দিন আমাকে তাহার মেসে ডাকে নাই—আমি নিজেই বিনা আহ্বানে গিয়াছি। সেই জন্য এই ডাকে চঞ্চল না হইয়া পারিলাম না। গৌহাটীতে সুনীলের দিদির বাড়ী আসিলাম। সুনীলকে প্রথমে বাহিরের চেহারা দেখিয়া চিনিতে আমার কষ্ট হইয়াছিল—সুনীল আমার বিহ্বলাবস্থা দেখিয়া হাসিল—সেই হাসি, সেই চক্ষু! যে তাহা একবার দেখিয়াছে, সে ভুলিবে না। দুস্তর মরু-প্রান্তে, ব্যোম-পথে, সাগর-বক্ষে সেই হাসি, সেই চক্ষুই তাহাকে চিনাইয়া দিবে। ডাক্তার বলিয়াছেন হৃদরোগ—সুনীলের দিদি যেন দিনের পর দিন ভাইকে লইয়া মৃত্যুর সঙ্গে হাতাহাতি করিতেছেন। সেদিন ডাক্তার সুনীলের অবর্তমানে তাহার দিদিকে সুনীলের মৃত্যুর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ইহার দিন দুই পরে সুনীল নিজে দিদিকে ডাকিয়া, আমার ঠিকানা দিয়া, আমাকে টেলিগ্রাম করিতে বলিয়াছিল। এ যেন তাহার নিজের তাগিদ। আমি যে দিন পৌঁছিলাম, সেই দিনই রাত্রিতে সুনীল আমার হাত তাহার মুঠার মধ্যে লইয়া অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তার পর বলিল, আমার সঙ্গে শেষ দেখার জন্য ডাকিয়েছি—তোমাকে কত না কষ্ট পেয়ে এতদূর আসতে হ'য়েছে। আমাকে তো যেতেই হবে—যাবার সময়েও কি তোমাদের কাউকে দেখ্‌তে পাবো না? আর দেখ, তুমি এক দিন আমার সঙ্গে মালতীকে দেখেছিলে—ওই যে আমরা নিউ মার্কেটের ফেরত; তুমি—

বলিয়া সে চুপ করিল। তার পর বলিল, আমার মৃত্যু-সংবাদ দিদি তাকে দেবেন। তার খুব কষ্ট হবে। তার পড়ার খরচও দিদি নিয়মিত পাঠাবেন। দিদি তার বিয়ে দেবারও চেষ্টা কর্ব্বেন। দিদি একা, আর অজয় (সুনীলের ভাগ্নে) তো ছেলে মানুষ—এসব কাজে পুরুষ মানুষের সহায়তা দরকারও হতে পারে। তুমিই তা দিতে পার্ব্বে। আমার মৃত্যু-সংবাদ তাকে বড় বাজবে; কিন্তু কি কর্ব্ব, মৃত্যু আমাকে টেনে নিলে। সুনীল আর কিছু বলিল না। কিন্তু এমন আর্ত্ত কণ্ঠস্বর, এমন বেদনাহত মুখ আমি কোনও মানুষের দেখি নাই। তার পর সে দিদিকে বলিল, মালতী তার শরীর ভাল নেই লিখেছে না? ঐ খানটায় পড়তো।

এর পাঁচ দিন পরে এক সন্ধ্যায় সুনীল মারা গেল সেই সময়টায়, যখন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়া উঠে, আর চায়ের দোকানে ভিড় লাগিয়া যায়। সুনীলের অকাল-মৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তার বলিলেন, হার্ট গোড়া থেকেই দুর্ব্বল, নইলে এত শিগ্‌গির—যাক সে কথা। দিন তিনেক পরে দিদি চোখের জলে ভাসিয়া এক নতুন কথাই বলিলেন, বোধ হয় বা আসল কথাই বলিলেন—মালতী আমাদের দূর সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়-কন্যা, সে ঢাকা ইডেন স্কুলে পড়ত। আমার দেওরের বিয়েতে মালতী তার রাণ মায়ের সঙ্গে এই বাড়ীতে আসে। বিয়ে যে তারিখে হবার কথা, সে তারিখে কি একটা প্রতিবন্ধক পড়াতে বিয়ে পেছিয়ে যায়। সেজন্য মালতীদের এখানে কিছুদিন থাকতে হয়—সুনীল তখন সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছে। গরমের ছুটীতে এখানে এসেছে। সেই থেকে তাদের পরিচয়। সেবার মালতীর বাপ মারা যান। মালতীরা কিছু অসহায় হয়ে পড়ে। তার পড়াশুনা চলবার আর উপায় থাকে না। সুনীল এ সংবাদ মালতীর এক পত্রে জানতে পেরে, তার মাকে বুঝিয়ে, আমাকে বুঝিয়ে—জানো তো ভাই সে কি রকম জেদী ছিল—তাকে কলকাতায় নিয়ে যায়। সুনীলের টাকা কোথা? বাবা তো বেশী কিছু রেখে যেতে পারেন নি। যা ছিল, তার সুদ থেকে তার মাসে মাসে খরচ পাঠাতুম। কলকাতা থেকে সে আমায় এক পত্রে জানায় যে, এক নিঃসন্তান প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী মালতীকে নিজের কাছে রেখে পড়াবেন—খুব স্নেহ করেন, খরচপত্র তিনিই সব দেবেন। হা রে আমার প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী আর তার স্নেহ! আমরা এই কথাই বিশ্বাস করে এসেছি। এক দিন নয়, দু'দিন নয়, চার বছর। মালতী এবার এফ-এ দেবে। এক শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে ছিল ঠিক, কিন্তু সুনীল এখানে এসে স্বীকার করেছে এই ক'দিন আগে, যে, সে-ই এ পর্য্যন্ত তাকে সব খরচ দিয়ে পড়িয়েছে। মালতী কোনও দিন এ কথা প্রকাশ করে নাই, বোধ হয় সুনীলের নিষেধ ছিল। তুমি জান সুনীল জলপানি পেত—তাকে তার জল-পানির টাকা তুলে রাখতে বলে, আমি নিজে মাসে মাসে খরচ পাঠিয়েছি। দিদির চক্ষে তখন শ্রাবণের ধারা বহিতে-ছিল, তবুও তিনি থামিবার চেষ্টামাত্র করিলেন না। নিজে না খেয়ে তাকে পড়িয়েছে তা কি আগে জানি—শুধু কি জলপানির টাকা দিয়ে? উদরান্নের টাকা দিয়েও। শুধু কি তাই,—ফি ছুটিতে দারজিলিং, মধুপুর এ সব খরচও সুনীল জুগিয়েছে। যাবার সময়েও দেখলে তো তারই কথা—তারই জন্যে ব্যাকুল—দিদি, ঠিক সময়ে আমাকে যেমন টাকা দিতে, তাকেও পাঠিও—আরোও কিছু বেশী দিও। জানো তো, মেয়েদের কত বেশী কাপড় চোপড় দরকার হয়—খরচ বেশী হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আর বোধ হয় টাকা দিতে হবে না। তোমায় যদি লেখে, তুমি বিয়েতে যেও, উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দিও—এম্‌নি সব কথা। তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, সুনীল খরচ দিচ্ছে, এ কথা যদিও জানতুম না, তবুও বছর খানেক থেকে এ বুঝেছিলুম যে, সে মালতীকে ভাল চোখে দেখেছে। এও জানতুম যে, সুনীলের এ মনোভাব মালতীর অগোচর নয়। কিন্তু তাকে এমন করে যে গড়ে তুলেছে, তাকে সে কি আঘাত-টাই দিলে—মেয়ে বলেই বোধ হয় এত নির্ম্মম হতে পেরেছে, ছেলে হলে লজ্জায় বাধত। এক ধনীর ছেলের সঙ্গে কেমন করে যে তার পরিচয় হয়, তা সুনীলও ঠিক জানত না। সেই ছেলেটীর বোন মালতীর সঙ্গে পড়ত; বোধ হয় সেই থেকে সূত্রপাত। এ আঘাত তার দুর্ব্বল দেহ সহ্য কর্ত্তে পারেনি, মনও না।

* * * মৃত্যুর দিন সকালে সুনীল তাহার নতুন-কেনা দুই খণ্ডে সমাপ্ত টলষ্টয়ের Anna Kerina খানা আমাকে দিয়াছিল। আমি ও দিদি পাশেই রহিয়াছি, তবুও ঘন ঘন আমাদের ডাকিতেছিল। আহা, পরপারের যাত্রীর সংসারের প্রতি এ কি আকর্ষণ! তার দেওয়া Anna Kerina

খানার প্রথম পৃষ্ঠার এক পাশে তার নিজের হাতে বাংলায় লেখা তিনটী অক্ষর 'সুনীল'। ইংরেজী বইতেও সে বাংলায় নাম লিখিতে ভালবাসিত। এর কারণ এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে, মনে পড়ে, বলিয়াছিল, আমি বাঙালী, বাংলায় লিখবো এই তো স্বাভাবিক। ফার্সী কেতাবে ফার্সী নাম, ফ্রেঞ্চ বইএ ফরাসী ভাষায় নাম লিখতে যাবো কেন, আমি তো ভেবেই পাই নে।

আজকার দিনে যখন শুনি, অমুক ছেলে এমনি ত্যাগ করিয়াছে, অমুকে এতখানি মহত্ত্ব দেখাইয়াছে, তখন আমার সামনে সুনীলের দুটী চক্ষু ভাসিয়া ওঠে—তাতে সাগরের রহস্য আঁকা। সংসারে যাহারা ত্যাগ করে, তাহারা ত্যাগের মধ্য দিয়া কোনও না কোনও আকারে সান্ত্বনা পায়—সে কি কোনও প্রকার সান্ত্বনা পাইয়াছিল, জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।

সুনীলের পিতামাতা ছিলেন না, বিশেষ করিয়া সেইজন্য এই একমাত্র ভ্রাতৃবিয়োগ সুনীলের দিদিকে বড়ই আঘাত দিয়াছিল। চিতাগ্নিতে তাহার অনেক বই দিয়াছিলাম—বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত। সুনীল তার মৃত্যুর তিন দিন আগে করুণ হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল সঙ্গে বইটই দিও হে, একেবারে সম্বলহীন যাত্রী—আর বেশী খুঁচিও টুচিও না—এ কথার কোনও উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যে কুলায় নাই। তাই সে আমাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিয়াছিল, রাগ কলে না কি? তোমাকেও যদি না বলি, তবে কাকে বলি বল তো?

বৈষ্ণব পদাবলী সুনীলের বড় প্রিয় ছিল। সেখানা যখন আগুনে তুলিয়া দেই, তখন একটা জায়গা চোখে পড়িল "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

দিন পাঁচেক পরে সুনীলের দিদিকে প্রণাম করিয়া চোখের জলে বিদায় লইলাম। বিদায়ের সময় তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; ঠোঁট বার-দুই কাঁপিয়া উঠিল এবং আমার মাথায় হাত রাখিয়া নীরব অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই স্বল্পভাষিনী শোকাকুলা নারীকে আমি সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করি নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন আমার আড়ষ্ট ভাবে কাটিল। সুনীল আমার আত্মীয়-পরিজন নয়; কিন্তু এই একটা বছরের পরিচয় নিকটতম আত্মীয়তাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সুনীল সম্পর্কে মালতী দোষী ছিল কি না, সে বিচারে আজ প্রবৃত্তি নাই, সে চেষ্টাও করিব না। আঘাত সুনীল পাইয়াছিল, ইহা ঠিক। তাহা যে আকারেই আসিয়া থাকুক, তাহা মালতীর ইচ্ছাকৃত কি না, সে কথা তুলিয়াও আজ লাভ নাই।

সুনীল ও মালতীর ব্যাপার কতকটা ঝাপসা হইয়া আছে, তাহাই থাকুক। কিন্তু মন হইতে এ কথাটী আজ এই পনেরো বছরেও দূর করিতে পারি নাই যে, সুনীল গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, যাহা তাহাকে অকাল-মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। মালতী বিবাহ করিয়াছে, বোধ করি ভালই আছে,—তাহার সংবাদ আর কিছু জানিবার চেষ্টা করি না। ইহার মধ্যে শিলং যাইবার পথে গৌহাটীতে তিনবার দিদির সঙ্গে দেখা করিয়াছি, মাঝে মাঝে পত্রও লিখি। প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট হইতে ভাইফোঁটার কাপড়ও আমার কাছে আসে। কিন্তু ইহাতে সুনীলের কি আসিল গেল?

স্ত্রী পুরুষের সমস্যার কথা আজকাল যখন শুনি, তখন দু' একবার এ কথাও মনে জাগে যে, সুনীল উপকার করিয়াছিল, মালতীর মনে পায় নাই বলিয়াই যদি চলিয়া যাইয়া থাকে, তবে উপায় কি? তখন এ-ও মনে হয় যে, সুনীল কি শুধু উপকারী? সে যে তার চাইতে অনেক বড়।

আজ সে কোথায় আছে? পনেরো বছর সে লোক-চক্ষুর অতীত—পুনর্জন্ম থাকিলে সে নিশ্চয়ই আবার বাংলা দেশের শ্যামল ক্রোড়ে জন্মিয়াছে, ইহা আমার মন বলিয়া দেয়। সেই সৌন্দর্য্য, সেই প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে তো,—এখন কত বড়টী হইয়াছে? সেই দীপ্ত মুখ, সেই কথা কওয়ার ভঙ্গি, সেই চোখ? আহা, এক জন্ম তার বৃথা গিয়াছে, এ জন্মে যেন সে সুখী হয়, স্বস্তি পায়।

চিরদিন শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি যে, পুরুষ কত না নির্ম্মমভাবে নারী-পীড়ন করিয়াছে,—ভালবাসার অভিনয়ে কত না যন্ত্রণা, কত না মর্ম্মপীড়া দিয়াছে; নারীর চিত্তের দিকে, নারীর অধিকারের দিকে তাকায় নাই। পৃথিবীতে আজও পর্য্যন্ত পুরুষের এই Exploitation চলিয়া আসিতেছে, যেমন করিয়া কলের মালিক কলের কুলীকে চালায়। এ নরমেধের বুঝি আর নিবৃত্তি নাই,—আদিতেও

রেমন, মধ্যেও তেমনি, বর্ত্তমানেও সেই একই মূর্ত্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই একটী সামান্য অনাবশ্যক কথাও মনে হয় যে, যুগ যুগান্তের ক্ষুব্ধ ব্যথিত নারী-চিত্ত একটী নারী-রূপ ধরিয়া সুনীলের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার বুঝি আর তুলনা নাই!

* * * *

ত্যাগী ছেলে দেখিলে, সুকুমার মূর্ত্তি চোখে পড়িলে, কাব্যপ্রিয় সাহিত্যরত সুন্দর ছেলে দেখিলে তাহার কথাই মনে পড়ে, আর চোখ জলে ভরিয়া ওঠে, মন তখন রেলপথ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সেখানটিতে উপস্থিত হয়, যেখানে সুনীল তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল।

অচির-বিধবা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ

(১)

বাঞ্ছিত-বঞ্চিত হৃদিখানি চঞ্চল,
রুক্ষ সে কেশপাশ—লুণ্ঠিত অঞ্চল,
গর্ব্বিত চিত আজি মর্দ্দিত নিমেষে!
সঞ্চিত সুধাটুকু কেড়ে নিল কে এসে?

(২)

বসন যে স্রস্ত; এলায়িত কবরী;
লুণ্ঠিত দেবতায় তার নিল কে হরি?
অতীতের স্মৃতিটুকু সম্বল তার শুধু;
দুর্ম্মদ কোন্ রাহুগ্রস্ত রে তার বিধু?

(৩)

খিন্ন যে তনুখানি খিন্ন শোকের ভারে,
বিকলিত চিত্ত যে পূর্ণ রে হাহাকারে।
ক্লান্ত সে আঁখি তবু শান্ত সে দৃষ্টি,
ধরণীর পরে করে মঙ্গল বৃষ্টি।

(৪)

দুর্জ্জয় সিন্ধুর ঊর্ম্মির লহরে,
বালুময় সৈকত কেমনে বা নিবারে?
দুর্দ্দম আঁখি জল তাই বহে হুতাশে;
সংসার-শৃঙ্খল-মুক্তি-ভিখারী সে!

(৫)

কান্তের সাথে আজ শান্তির সাধ যত
লুপ্ত হয়েছে তার; সুপ্ত বাসনা শত।
দেয় নাহি অবশেষ কারো 'পরে এতটুক্
দূর মিলনের আশে সে যে গো বেঁধেছে বুক।



বিশ্ব-জগতের প্রাথমিক উপাদান

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু

মানবজাতির উৎপত্তির সময় হইতেই, মানুষ সমস্ত নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। সে মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছে—"পৃথিবী এমন কেন? গ্রহ-তারা, চন্দ্র-সূর্য্য কেন? কোথা হইতে ইহারা আসিয়াছে? আর ইহাদের পরিণতিই বা কোথায়?"

এই যে অনুসন্ধানের একটা প্রবল তৃষ্ণা, ইহা মানবের একটা মজ্জাগত স্বভাব। সত্যানুসন্ধানটা তাহার জীবনের একটা বিশিষ্টতা। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সত্যানুসন্ধানের তীব্রতার তারতম্য দেখা যায় না। প্রাচীন কালের সভ্যদেশের লোকেরা যত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, আমাদের অনেকে তার চেয়ে বেশী অনুসন্ধিৎসু—বোধ হয় এ গর্ব্ব করিতে কেহই সাহসী হইবেন না। তাঁহাদের চিন্তার ধারাটা যদি ভুল পথেই গিয়া থাকে, তবে সে দোষটা তাঁহাদের সত্যান্বেষণের ইচ্ছার নয়—বিচারের দোষ বা অভিজ্ঞতার অভাব।

আজ পর্য্যন্ত জগতের একটা প্রধান সমস্যা জড়পদার্থের স্বরূপ। জড়পদার্থ কি? কি উপাদানে চন্দ্রসূর্য্য গঠিত—আর কি উপাদানেই বা উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহ গঠিত? জড় পদার্থের উৎপত্তি কোথায়, কোথায় ইহার বিলয়? এই যে চেতন ও অচেতন পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের দুরন্ত বাসনা, ইহা সকল যুগেই মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সমভাবে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে।

মানবের আর একটা ধর্ম্ম Intuition বা "সহজ-সংস্কার"। এই সহজ-সংস্কার অন্ধকারে পথ দেখায়; যে প্রশ্নের সমাধানে আমাদের সকল চিন্তা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান হার মানে, সেখানে সহজাত সংস্কার এমন একটা জবাব দেয়, যাহার সততায় অনেক সময় কোন সন্দেহই থাকে না। এই সংস্কারবশেই মানুষ প্রাচীন কাল হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, জড়দ্রব্য একটা কঠিন "বিচ্ছেদহীন একটানা" দ্রব্য নয়—"Matter is not continuous but discrete"; আর বাস্তবিকই জড়পদার্থের continuity বা "সন্ততি" আমাদের ধারণায় আসে না—বা ইহাতে আমাদের কোন কাজ চলে না; "বহুত্বই আবশ্যক, বিচ্ছেদই আবশ্যক"। সেইজন্যই জড়পদার্থের grained structure—কণিকাময় স্বরূপের কল্পনা।

জড়পদার্থ অণু বা পরমাণুর সমষ্টি—এ কল্পনাটী বহু পুরাতন। যদি কোন দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত করা যায়, তবে কোথায় তাহার শেষ হইবে? যত সূক্ষ্মই হৌক না কেন, ইহার চরম অবস্থা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন, এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন পদার্থ মাত্রেরই কণিকা অবিভাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই অবিভাজ্য কণিকাই পরমাণু। অণু এক বা বহু পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। তাহা হইলে অণু ও পরমাণুর সমষ্টিই জড়-দ্রব্য। কিন্তু অণু-পরমাণুর কল্পনা পুরাতন হইলেও, বিভিন্ন প্রকৃতির অণু-পরমাণুর কল্পনা বেশী পুরাতন নয়। এই কল্পনা সকল সভ্যদেশেই বিভিন্ন যুগে পণ্ডিতদের নিকট বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অনেকেই জড় পদার্থের আদি বস্তুর একটা স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

গ্রীক্ সভ্যতার উৎপত্তির অনেক পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধি" অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন বস্তু না থাকিলে স্বতঃই কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। কিন্তু বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কণাদের জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্যগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ ও ও অধিকতর প্রস্ফুট। কণাদ-মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও মরুৎ এই চারি ভূতের পরমাণু দ্বারা বিশ্ব গঠিত। পরমাণু সকল নিত্য—কিন্তু এই সকল পরমাণু-গঠিত জড় পদার্থ অনিত্য। জড়-পদার্থ পরমাণুসকলের সংযোগে উৎপন্ন বটে, তবে ঐ উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত। সাংখ্য ও বৈশেষিক-দর্শনের অনেক পূর্ব্বে জড়-পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন—আদিতে এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন—তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইলে তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এই তেজের বহু হইবার ইচ্ছা হইলে, ইহা হইতে অপ্ উদ্ভূত হইল—এবং ক্রমে এই অপ হইতে ক্ষিতির (অন্ন) জন্ম হইল। অন্যান্য উপনিষদে সৎ হইতে আকাশ (ether), পরে মরুৎ, এবং তৎপরে তেজের উৎপত্তি হইল—এই একার কল্পনা আছে। এই ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের ইংরাজির অনুবাদ করা হয় যথাক্রমে—earth, water, fire and air; এবং আমরাও ইংরাজির বাংলা তর্জ্জমা করি—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু। কিন্তু হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে এই কথাগুলি এত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত না। Max Muller পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—By water is meant all that is fluid and bright in colour—by food (অন্ন) is meant the earth, all that is heavy, firm and dark in colour. এক কথায় বলা যাইতে পারে, তরল পদার্থ মাত্রেই অপ্ এবং কঠিন দ্রব্য মাত্রেই ক্ষিতি, এবং সম্ভবতঃ বায়ুর বাহ্যিক তাপবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেই (gaseous bodies) ছিল মরুৎ—তেজ তেজই ছিল, শুধু অগ্নি নহে। এবং কণাদের মতে এই চারি প্রকার পদার্থই প্রাথমিক বা fundamental principle বলিয়া তাহার কল্পিত পরমাণু ও হইতেছে চারি প্রকার, যথা—কঠিন পরমাণু, তরল-পরমাণু, মরুৎ-পরমাণু এবং তেজ-পরমাণু। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি একটী কঠিন পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের পরমাণুর কোন প্রকার বিভিন্নতা স্বীকার করেন নাই—বোধ হয় তাঁহার মতে কোন প্রকার বিভিন্নতা ছিল না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন—জলই আদি পদার্থ—জল বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলে পৃথিবী, আকাশ, পর্ব্বত, কীট, পতঙ্গ, গো, মহিষাদি, মনুষ্য ও উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। গ্রীস দেশেও এই মতটী খুব পুরাতন, এবং প্রায় ১৪০০ বৎসর ধরিয়া লোকে 'জলই আদি পদার্থ' এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যখন ফরাসী বৈজ্ঞানিক Lavoisier পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, জলকে মাটিতে পরিণত করা যায় না, তখন ঐ ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মতবাদের ন্যায় অনেক মত ও প্রাচীন দার্শনিকদিগের উক্তি আমরা সমর্থন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি না, উহা কতদূর সত্য। প্রাচীন দর্শনকারদিগের নিকট পরীক্ষা দ্বারা কোন ধারণা সপ্রমাণ করা হীন এবং অগৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত। মনই প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি স্থান, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইতে পারে না—ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। সৌভাগ্য বশতঃ আজকাল আবার কথায় কথায় নজির চাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই—এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লন। তাহা না হইলে আজ বিজ্ঞান-বিদ্যার এত দূর উন্নতি সাধিত হইত না। অন্ধ বিশ্বাস আমাদিগকে চিরকাল অন্ধকারেই রাখিত—জ্ঞানের আলোক আমরা কোন কালে দেখিতে পাইতাম না। যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

সনৎকুমার ও Thales of Miletus (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) যেমন জলকেই প্রাথমিক উপাদান (first principle) বলিয়াছেন—Horakleitos (খৃঃ পূঃ ৪৬০) তেমনই অগ্নিকে প্রাথমিক উপাদান বলিয়াছেন। অগ্নি ঘনীভূত হইলে বায়ু, বায়ু ঘন হইলে জল এবং জল জমাট বাঁধিলে মাটীতে পরিণত হয়। অগ্নি ও সূর্য্য উপাসকেরা এই মতের সমর্থন করিত। আর একজন গ্রীক দার্শনিক (Archelaus) বলিয়াছেন—বায়ু ঘনত্ব কমিলে অগ্নিতে ও ঘনীভূত হইলে জলে পরিণত হয়। Anaxamenes (খৃঃ পূঃ ৫০০) ঐ একই কথা বলেন। আবার Pherekidos অনুমান করিয়াছেন—মাটীই জড়-জগতের first principle। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কণাদের চারি প্রকার প্রাথমিক "পদার্থ" কোন না কোন সময়ে—কোন না কোন গ্রীসীয় পণ্ডিতের নিকট জড়জগতের প্রাথমিক উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

Empedocles কণাদের ন্যায় চারিটী মৌলিক পদার্থ মানিয়া লইয়াছেন, তবে বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার অনুমান অনেকটা পরীক্ষার উপর স্থাপিত। তিনি দেখিলেন, কাঠ পোড়াইলে—ধোঁয়া (gas), অগ্নি, জল ও ছাই (মাটী) এই চারিটী পদার্থ পাওয়া যায়—সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যাবতীয় জড়দ্রব্যের উপাদান এই চারিটি পদার্থ, যথা—মরুৎ (gas) অগ্নি, জল ও মাটী। Aristotleও (৩৮৫—৩২২ খৃঃ পূঃ) ঐ কথাই বলিয়াছেন; তবে Empedoclesএর সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ এই যে, তিনি বলেন জল বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকার প্রত্যেকটিকে অন্য আর একটিতে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ জল বায়ু, অগ্নি বা মাটির মধ্যে একটা বাহ্যিক বিভিন্নতা আছে মাত্র, গোড়ায় কোন প্রভেদ নাই। Aristotleএর এই মত কোনও পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, তৎকালে তাঁহার মতজ্ঞানী কেহই ছিলেন না, কাজেই তাঁহার মত সম্পূর্ণ অমূলক হইলেও সকলেই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিত,—অন্যান্য পণ্ডিতদের তর্কবুদ্ধি বড় একটা টিকিত না।

কিন্তু ঐ গ্রীসদেশেই Aristotle এর পূর্ব্বে নব্যবিজ্ঞানসম্মত একটা মত প্রচলিত ছিল। এই মতবাদের জন্মদাতা Anaxagoras (৫০০ খ্রীঃ পূঃ)। তিনি বলেন, আদিতে শৃঙ্খলা ছিল না, নিয়ম ছিল না, কোন মৌলিক পদার্থ ছিল না, শুধু এক প্রকার জড় কণিকা ছিল, যাহাকে তিনি homeomery বলিয়াছেন। সৃষ্টির সময়

কোন বুদ্ধিমান পুরুষ এই সমস্ত জড়পিণ্ডগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্টভাবে সংযোজিত করিলে জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। একটী homeomery অন্যটি হইতে বিভিন্ন নয়, বিভিন্ন সংখ্যক homeomeryএর সমবায়ে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই homeomeryই হইতেছে Anaxagorasএর ultimate matter (প্রাথমিক উপাদান)। এই homeomery বাদের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের Electron বা তড়িৎকণাবাদের খুব সাদৃশ্য আছে।

এই ত গেল গ্রীসদেশের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কথা। তিব্বত, মিশর, চীন বা ব্যাবিলনে জড়পদার্থের স্বরূপ অনুমান করিতে এই সময়ে কেহই অগ্রসর হন নাই। কিছুকাল পরে, গ্রীসে যখন এই সমস্ত মতবাদ লইয়া একটা বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছিল—তখন আরবদেশে ও মিশরীয় পুরোহিতদিগের মধ্যে পরীক্ষার উপর রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

"নানা মুনির নানা মতের" মধ্যে পড়িয়া প্রকৃত তথ্যটুকু জানিবার উপায় না থাকায়—গ্রীক যুবকেরা মিশরে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিলেন, ফলে Aristotle ও Anaxagorasএর মতবাদ উল্টাইয়া গেল—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে জড়পদার্থের উপাদান বিষয়ে এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইল। ইহাই গন্ধক-লবণ-পারদ মতবাদ। ইহার পরিপোষকগণ বলিতেন, জড়দ্রব্য এই তিনটী উপাদানে গঠিত। ধাতু মাত্রেই পারদ ও গন্ধকসম্ভূত, তবে বিভিন্ন ধাতুতে পারদ ও গন্ধক বিভিন্ন অনুপাতে বর্ত্তমান। গন্ধক যত কম থাকে, ততই ধাতুর দগ্ধ হইবার ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং ততই সেই ধাতু বহুমূল্য হয়। লোকে ভাবিল, এ যদি সত্য হয়, তবে ত লৌহ, তাম্র প্রভৃতি হীনধাতুদিগকে গন্ধকের সহিত রাসায়নিক সংযোগ করিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এই ধারণা লইয়া, প্রকাশ্যে বা গোপনে বহুমূল্য ধাতু প্রস্তুত করিবার একটা বিরাট চেষ্টা চলিতে লাগিল; এবং ইহাই ১৭০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত alchemistsদের সাধনা হইয়া রহিল।

এই সময়ে Paracelsus বলিলেন, প্রত্যেক ধাতুর ভিতর এক প্রকার "রস" বা seminal flurd আছে, যাহার প্রভাবে একটী ধাতু অপর ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এইখানেই "স্পর্শমণির" প্রথম কল্পনা। এই কল্পনার আলোকে আকৃষ্ট হইয়া স্পর্শমণির অন্বেষণে বৈজ্ঞানিকদের দিনরাত অতিবাহিত হইতে লাগিল—ফলতঃ অবশেষে ইহাই এই যুগের ultimate matter হইয়া দাঁড়াইল। পরীক্ষার উপর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ হইল, এই সকল মতবাদ ভিত্তিহীন—একটা ভ্রান্ত অনুমান মাত্র; ক্রমে স্পর্শমণির কল্পনা রসায়নশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

এই ত গেল মধ্যযুগের কথা। এইবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক মতামতের কথা বলিব। Proutএর মতবাদ ইহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বলিলেন যে, hydrogen বা উদ্‌জানই সমস্ত মৌলিক পদার্থের উপাদান। সমস্ত মৌলিক পদার্থ এই উদ্‌জানবাষ্পের বিভিন্নসংখ্যক পরমাণুর রাসায়নিক সমষ্টি মাত্র। হাজার বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কোন মত প্রচারিত হইলে, হয় ত লোকে মানিয়া লইত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যুগের প্রারম্ভ। কাজেই লোকে দেখিতে চাহিল, Proutএর মতবাদ কতদূর পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর স্থাপিত। সংশ্লেষণ (synthesis) ও বিশ্লেষণ (analysis) উভয় প্রক্রিয়া দ্বারা সত্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু উদ্‌জান বায়ুকে ঘনীভূত করিয়া অন্য পদার্থে পরিণত করা গেল না, কিংবা অন্যান্য পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া কেবল উদ্‌জানই পাওয়া গেল না। আরও এক কথা, দেখা গেল, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন (atomic weight) উদ্‌জানের পারমাণবিক ওজনের (উদ্‌জান সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ বলিয়া ইহার আপেক্ষিক পারমাণবিক ওজন এক ধরা হয়) অনুপাতে অনেক সময় অভগ্নরাশি না হইয়া ভগ্নাংশ হইতেছে। কিন্তু পরমাণু যখন ভাঙ্গা যায় না, তখন ইহা কিরূপে সম্ভব? কাজেই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট Proutএর অনুমানের কোন ভিত্তি থাকিল না। Proutএর শিষ্যেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহারা বলিলেন—উদ্‌জান প্রাথমিক পদার্থ (ultimate mattter) নয়, কিন্তু উদ্‌জানকে চারি ভাগ বা আট ভাগ করিলে যে পদার্থ হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে ultimate matter, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নূতন মতবাদের দাবী প্রমাণাভাবে খুবই কম—নাই বলিলেই হয়।

ইহার পর আর কেহ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বা কেবল অনুমানের দোহাই দিয়া, অন্য কোন স্বরচিত মত প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। কারণ কেবল মাত্র অনুমানের উপর যে সমস্ত মতের ভিত্তি, তাহা কখনই সুদৃঢ় নয় এবং অনেক সময় পরীক্ষা দ্বারা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হয়। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও শেষভাগে তড়িৎ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িল। খুব অল্প চাপযুক্ত বায়ুপূর্ণ কাচের আবদ্ধ নলের ভিতর দিয়া, রুমকর্ফ যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক অগ্নিশিখা পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গেল যে, চাপ যখন খুব কম থাকে, তখন বিয়োগ-সংজ্ঞক প্রান্ত (Negative electrode) হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল রশ্মির উৎপত্তি হয়; উহা যে স্থানে পতিত হয়, সেই স্থান উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। এই রশ্মিগুলিকে cathode rays বলা হইল, কেন না এই রশ্মিগুলি cathode বা বিয়োগ সংজ্ঞক প্রান্ত হইতে উদ্ভূত হয়। সাধারণ আলোক বা বৈদ্যুতিক আলোক হইতে এই নূতন আলোক অবিভিন্ন কি না, ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে, ইহা সাধারণ আলোকের ন্যায় ছায়া উৎপাদন করিতে পারে, যে স্থানে পতিত হয় সেই স্থানের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং সরল পথে চলে। আরও দেখা গেল যে, এই cathode রশ্মি জড় পদার্থে চাপ দিতে পারে এবং চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হইতে পারে, ইহা বিয়োগসংজ্ঞক বিদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ (negatively electrified) এবং ধাতুর পাতলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া নির্গত হইতে পরে।

প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিলেন যে, বায়ুর পরমাণুসকল বিয়োগসংজ্ঞক বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া এই নূতন আলোক সৃষ্টি করে। Sir William Crookes অনুমান করিলেন যে, ইহা এক প্রকার জড় পদার্থ, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত—a fourth state of matter বা radiant matter. পরে দেখা গেল যে, সকল পদার্থ একই প্রকার cathode রশ্মির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যদি কোন fourth state of matter থাকে, তাহা সব পদার্থেই বর্ত্তমান। এক কথায় ইহাই প্রাথমিক উপাদান। Sir J. J. Thomson এই radiant matterকে corpuscle নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বায়ুহীন আবদ্ধ কাচনলের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে, পরমাণু ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঐ সকল corpuscle বা electronএর সৃষ্টি হয়। ইহাই নব্য বিজ্ঞানের Electron Theory বা তড়িৎ-কণাবাদ। সকল বৈজ্ঞানিকই এই তড়িৎকণাবাদ মানিয়া চলেন—না মানিয়াও ত উপায় নাই। ইহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং হইতেছে। পরমাণু ভাঙ্গিয়া গেল,—এতকাল ধরিয়া (কণাদের আমল হইতে) যে পরমাণু দর্শনে, বিজ্ঞানে, অবিভাজ্য ছিল, তাহা আজ বিভাজ্য হইল—ডালটনের পরমাণুবাদের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় অধ্যাপক বেকারেল ইউরেনিয়মযুক্ত যৌগিক পদার্থ লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এই সকল radioactive বা 'সক্রিয়' পদার্থ এক প্রকার কিরণ বিতরণ করে। Radiumও এই সক্রিয় পদার্থের পর্য্যায়ভুক্ত। বেকারেলের সম্মানার্থ সক্রিয় পদার্থের রশ্মিগুলিকে—"বেকারেল রশ্মি" নামে অভিহিত করা হয়। পরে দেখা গেল যে, তিন প্রকার রশ্মির সংমিশ্রণে এই "বেকারেল রশ্মি" উৎপন্ন হয়। চুম্বক নিকটে আসিলে এই রশ্মি তিন ভাগে বিভক্ত হয়; (১) এক ভাগ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়, (২) অন্যভাগ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, বরং বিকর্ষিত হয় এবং (৩) তৃতীয় ভাগের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। যে ভাগ কোনপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার সহিত রঞ্জেন রশ্মির অনেক সাদৃশ্য আছে—যাহা চুম্বক দ্বারা বিকর্ষিত হয় তাহার সহিত ধনতড়িৎ সংযুক্ত হিলিয়ম নামক মারুতের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং যে ভাগ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহা cathode রশ্মি হইতে অভিন্ন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, cathode রশ্মি দ্রুতগামী ঋণতড়িৎ শক্তিবিশিষ্ট তড়িৎকণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং পরমাণু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে তড়িৎকণা পাওয়া যায়—সক্রিয় পদার্থ হইতে সেই তড়িৎকণাই পাওয়া যায়। তবে উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ এই যে সক্রিয় পদার্থের এই যে তড়িৎকণাবিকীরণ, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের শাসনে আনিতে পারেন নাই। সক্রিয় পদার্থ সর্ব্বদাই স্বেচ্ছায় আলোক, উত্তাপ এবং তড়িৎকণা দান করে—কোনরূপ বাহ্যিক শক্তি দ্বারা ইহার আলোক-উত্তাপ-তড়িৎকণা-বিকীরণ-শক্তির প্রতিরোধ করা যায় না। এই সক্রিয় পদার্থের অদ্ভুত প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক জগতে একটা সমস্যা। ইহাদের শাসন করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক হার মানিয়াছেন।

কিন্তু, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সক্রিয় পদার্থের তড়িৎকণা-আলোক-উত্তাপ বিকীরণ কত কাল ধরিয়া চলিবে? ইহার কি শেষ নাই, সক্রিয় পদার্থগুলি কি এক অসীম শক্তির ভাণ্ডার?—এ শক্তির কি অপচয় নাই? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার শেষ আছে। সক্রিয় পদার্থের এই সক্রিয়তা (Rodioactivity) এক দিন শেষ হইবে—প্রাণী-জগতের প্রাণীগণের মত, জড়জগতের এই সক্রিয় পদার্থগুলিও মৃত্যুর নিয়মাধীন। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন uranium হইতে radiumএর উৎপত্তি হইয়াছে—radium চিরকাল radium থাকিবে না। ইহা আজ আশ্চর্য্য গুণাবলীর পরিচয় দিতেছে—ইহা বৈজ্ঞানিকের, গৃহস্থের, ব্যবসায়ীর সহস্র কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রায় ২৫০০ বৎসর পরে এই ভেল্কির শেষ হইবে। আজ radium জড়পদার্থের রাজা, একচ্ছত্র সম্রাট, ইহার পরিণতি সীসকে। কালের এমনই কুটীল গতি! কিন্তু যে এখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই, ভবিষ্যৎ স্থবিরত্বের কঠোর কল্পনার চিত্রে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার চেয়ে দেখা যাউক, রেডিয়মের বংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে কি না?

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, electron জড়পদার্থের একটী উপাদান। এই Electron বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারের ভিতর বসিয়া তৈয়ারী করিতে পারেন। আর প্রকৃতি-রাণীও খেয়ালের বশে অহরহ কোটী কোটী electronএর সৃষ্টি করিতেছেন। Radioactivityর অন্ধ উপাসকেরা জগতের সমস্ত পদার্থকে কমবেশী সক্রিয় অনুমান করিয়া বলেন, জড়পদার্থের গঠনকৌশল সোজা হইয়া আসিতেছে—খুব ভারি পরমাণু ভাঙ্গিয়া অপেক্ষাকৃত হাল্কা পরমাণুর উৎপত্তি হইতেছে; Uranium হইতে radium উৎপন্ন হয়, আবার এই radiumই খুব সম্ভব সীসক হইবে। Thorium আর একটী সক্রিয় ধাতু, জানা গিয়াছে। অনেক বৎসর পরে ইহা Bismuth নামক পদার্থে পরিণত হইবে। Uranium, radium, thorium প্রভৃতি খুব ভারী ধাতু। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকে বলেন, জগতে বোধ হয় uranium অপেক্ষাও কোন ভারী পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হয়, পরে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নানাবিধ সাধারণ ধাতু ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অজ্ঞাতকুলশীল অতিশয় ভারী পদার্থই সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান। ইহাকে Devolution Theory বলা হয়।

ওদিকে জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন,—জগতের গঠন সরল হইতে হইতে ক্রমশঃ জটিল হইতেছে। দেখা গিয়াছে, নক্ষত্র যতই শীতল হয়, ততই তাহাতে নূতন নূতন মৌলিক পদার্থের আবির্ভাব হয়। যে সমস্ত নক্ষত্র খুব উত্তপ্ত, তাহাতে hydrogen, helium প্রভৃতি খুব লঘু পদার্থ বর্ত্তমান, অপেক্ষাকৃত শীতল নক্ষত্রগুলিতে calcium, magnesium প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়, এবং নক্ষত্র আরও শীতল হইলে আরও নূতন নূতন পদার্থ,এমন কি শেষে radium,uranium পর্য্যন্ত উদ্ভূত হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের এই Evolution Theory যেমন পরীক্ষার উপর স্থাপিত,—radioactivityর পরিপোষকদিগের Devolution

Theoryও সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরিণতিবাদ অনুসারে নক্ষত্র ক্রমশঃ শীতল হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, কাজেই hydrogen অপেক্ষা কোন লঘু পদার্থই বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান, কিন্তু তাহা এখনও অজ্ঞাত। এই অজানা অচেনা অত্যন্ত লঘু পদার্থ হইতে প্রথমে hydrogen, পরে helium ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতটা খুব সনাতন বলিয়া মনে হয়, অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে, প্রথমে কিছুই ছিল না, একদিনে বিশ্বস্রষ্টার একটা ক্ষুদ্র ইচ্ছায় সসাগরা স্থাবর জঙ্গমশীল পৃথিবী চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা সবই সৃষ্টি হইল। কিছুই ছিল না—কিছুর উৎপত্তি হইল। বৈজ্ঞানিক কিন্তু ইহা মানিতে চাহেন না, কারণ যেখানে কিছুই ছিল না কিরূপে সেখানে বাস্তব জিনিষের উৎপত্তি হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকের জানা নাই। বৈজ্ঞানিকদিগকে খুব পীড়াপীড়ি করিলে হয় ত তাঁহারা এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন যে, আদিতে কিছু ছিল, তবে সেটা মানব-ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য,রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি বিহীন এমন কোন বস্তু, যাহাকে জড়জগতের প্রাথমিক পদার্থ বলিতে পারি।

উপনিষদ কিন্তু Evolution ও Devolution উভয় থিওরিই মানিতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, আকাশ (Ether) হইতে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি (Evolution), এবং জড়দ্রব্য আকাশে পরিণত হইতে চায় (Devolution)। উপনিষদের এই কথাটা যেন astronomy ও radioactivityর বিরোধটা মিটাইয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা Devolution Theoryটাকে মোটেই আমল দিতে চাহেন না। Sir William Crookes বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনবাদ জড়জগতের পক্ষেও খাটে। অভিব্যক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু হয় ত সেগুলি প্রকৃতিদেবীর কুপুত্র, কাজেই সেগুলি জীবন-সংগ্রামে টিকিতে না পারিয়া লোপ পাইয়াছে—এই গুলিকে তিনি extinct elements বলিয়াছেন। আর কতকগুলি কোনরূপে বাঁচিয়া আছে—খুব বিরল, সেগুলি rare elements; আর যাহারা অযোগ্য অথচ কোন অজানা প্রাকৃতিক ঘটনাক্রমে কোনও সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখন যোগ্যতম নয় বলিয়াই হউক আর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বশতঃ হউক জীবনযুদ্ধে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে—ভবিষ্যতে লোপ পাইবে—তাহারাই আমাদের radioactive substance বা সক্রিয় পদার্থ।

অভিব্যক্তিবাদানুসারে জগতের প্রাথমিক উপাদানটী কিরূপ তাহা অনেকে অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তড়িৎ-কণা আবিষ্কারের পর অনেকেই এই ক্ষুদ্র বস্তুটী লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছেন। অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, জড়পদার্থ (matter) বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি, তাহার অস্তিত্ব তড়িৎ-কণায় নাই; তড়িৎ-কণার জড়ত্ব নির্ভর করে শুধু উহার গতি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উপর; বেগবান হইলে তড়িৎ-কণার জড়ত্ব আসে, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে জড়ত্ব আসে। আবার তড়িৎকে etherএর phenomenon বলা হয়; অর্থাৎ ether অবস্থাবিপর্য্যয়ে তড়িৎ হয়। পক্ষান্তরে তড়িৎ-কণাগুলিকে ether সমুদ্রে আবর্ত্ত বা ঘূর্ণি বলিয়া অনুমান করা হয়। আবার এই electron এর সমষ্টি লইয়া অণু-পরমাণু; সুতরাং Larmorএর কথা বলিতে গেলে, the material atom is formed entirely of ether and has no material substratum. কথাগুলি যেন একটু অদ্ভুত শুনায়। আরও শুনুন, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Ostwald বলিতেছেন—matter কেবল অনুমান মাত্র—শক্তি বা energyই প্রকৃত সত্য। আমরা লক্ষ্য করি শুধু শক্তির পরিবর্ত্তন এবং এই শক্তিকে মনে মনে কোন বস্তুর সহিত সংলগ্ন করিতে গিয়া আমরা জড়পদার্থের কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু সচরাচর আমরা উল্টাই বুঝি। ভৌতিক পরমাণুর কোনরূপ ভৌতিক অস্তিত্ব নাই—উহা ether, অথবা ether সমুদ্রে etherএর আবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র।

তড়িৎ-কণা বাস্তবিক যদি etherই হয়, তবে যেমন পরমাণুকে তড়িৎ-কণায় বিভক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ একদিন তড়িৎ-কণাকে etherএ পরিণত করা সম্ভব হইবে। সেদিন conservation of matter বা জড়ের নিত্যতা লোপ পাইবে, বিশ্ব-সংসার 'অনিত্য' হইবে, জড় পদার্থের মহানির্ব্বাণ লাভ হইবে। জগৎ তখন আর জড় থাকিবে না—তখন থাকিবে শুধু ether। Etherএর কথা অনেকবার বলিয়াছি বা বলিতেছি, আপনারাও এ কথাটা শুনিয়া থাকিবেন; বেদে উপনিষদে ইহাকে ব্যোম বা আকাশ বলা হইয়াছে। এই etherএর ধারণাটা খুবই পুরাতন, অতি প্রাচীনকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত etherএর ধারণাটা প্রায় একই প্রকার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই etherটা যে কি—ইহার স্বরূপ কি, তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন নাই—নিজেও ঠিক বুঝিয়াছেন কি না—বা ether বলিলে একই প্রকার কল্পনা করেন কি না, সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। একটী গল্প আছে (অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন):—এক রাজা কখনও আম খান নাই। মন্ত্রী মহাশয়কে আমের স্বাদ কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী মহাশয় নিজের পাকা দাড়ীতে তেঁতুল ও গুড় মাখাইয়া রাজাকে স্বাদ গ্রহণ করিতে বলেন। রাজা বুঝিলেন যে আম অম্লমধুর ও আঁশযুক্ত। যাঁহারা etherএর স্বরূপ ও স্বভাব অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্ত্রী মহাশয়ের মতই বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Edison বলিয়াছেন—As for ether which speculative science supposes to exist, we know nothing about it

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে—বৈজ্ঞানিকেরা, জড়-জগতের প্রাথমিক উপাদান খুঁজিতে গিয়া, এমন এক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না, পরকেও বুঝাইতে পারেন না,—একটা সরল সহজ পদার্থ বাহির করিতে গিয়া এমন এক 'অপদার্থ' বাহির করিয়া বসিলেন, যাহার আকৃতি-প্রকৃতি মধ্য যুগের 'স্পর্শমণির' মতই ঘোর অন্ধকারাবৃত ও রহস্যময়। জানি না, ভবিষ্যতে কোন্ বৈজ্ঞানিক এই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিবেন!

(নব্যভারত)

নব-জাতিবাদ

বাংলায় হিন্দু কমিতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে, এটা সরকারী সেন্সাসের কথা। বাংলায় সংগঠন আন্দোলন খুব মন্দা, এমন কি এক রকম নাই বলিলেই হয়, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। বিপিন বাবু হিন্দুসভা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, দ্বারভাঙ্গা হিন্দু মুসলমান সন্ধিপত্র নাকচ করিতে আসেন, সংগঠন সভার শাখা বিস্তৃতির চেষ্টাও হেথায় হোথায় পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুকে সংগঠনের ঢাক-পেটা হিন্দু এখনও বলা যায় না, কোনও দিন বলা যাইবে বলিয়াও মনে হয় না। ইহার কারণ বাংলার হিন্দুমুসলমান সমস্যা—সেটা জাতীয় সমস্যা নহে, সেটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমস্যা। বরং বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা যাহা কিছু, তাহা ঠিক শিক্ষিত বনাম অশিক্ষিতের মধ্যগত বলিয়াই ধরা যায়। বাঙ্গালীর জাতীয় রক্তে হিন্দুমুসলমান সমস্যা নাই, ওটা মনগড়া বাড়তি সামগ্রী, কণ্ডুয়নে দদ্রুবৃদ্ধির মত। বাংলাকে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া আপন মৌলিক জীবন সমস্যাই নিরাকরণ করিতে হইবে। পশ্চিম উত্তরভারতের অনুকরণে, গাত্রকণ্ডুয়নে ক্ষতসৃষ্টি করিলে চলিবে না।

* * * *

কথাটা বুঝিবার। রক্তের সম্পর্কে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ভিন্ন নয়, ভাই। চিরকাল তারা একই জাতির শোণিতধারা বহিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার তাদের একটা সাংস্কারিক ভাব পরিবর্ত্তন মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়া তাহার মূল্য আছে, কিন্তু জাতীয়তার মূলতত্ত্ব হিসাবে উহাতে বিশেষ কিছু প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্য ঘটে নাই। জাতির ধাতু রক্ত, শুধু ভাব নহে, কথাটা অনেকেই হয়ত ভুলিয়া যান। সেইজন্যই তাঁরা জাতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। জাতিতত্ত্বে ধাতব ভেদসৃষ্টি সঙ্ঘাত হয়, এই মূলগত রক্ত-বিপর্য্যয় ঘটিলে। বাংলার তিনকোটী মুসলমানে, যাঁটী আরবদেশীয় অথবা তাতার রক্ত খুব কম, অধিকাংশ ধর্ম্মেই মুসলমান, রক্তে নহে। আর শুধু বাংলায় কেন, ভারতের সকল প্রদেশে অল্পবিস্তর তাই, এমন কি মুসলমান আক্রমণের লীলাভূমি পঞ্জাবে পর্য্যন্ত ১৯১১ সালের সেন্সাসের উপর ভর করিয়া, অনুমান করা হয় যে মুসলমানের মধ্যে শতকরা ১৫ অংশের বেশী হজ মুসলমানী শোণিত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলিয়াছি অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে ত কথাই নাই, সুতরাং সমাজের ভিত্তিগঠনের দিক হইতে, ব্যাপারটা ভাবিবার নহে কি?

* * * *

আসল কথা, বাংলার জাতি মূলে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, বাংলার জাতি—বাঙ্গালী। আজ যেমন মুসলমান শোণিত জাতীয় দেহে কয়েক ফোঁটা আছে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, ভগবান না করুন জাতির তেমন দুর্ভাগ্য যদি কখনও ঘটে, কয় শতাব্দী বিদেশী খ্রীষ্টান রাজার আমলে থাকিতে হইলেও, নূতন শোণিত বিমিশ্রণের সম্ভাবনা অত্যল্প, এমন কি নাই-বলিলেও মনে সংশয় উপস্থিত হয় না, সেইরূপ কোনদিন বাংলার আর্য্য বিজেতাদের আমদানী শোণিত বাঙ্গালীর জাতীয় ধমনীতে কি পরিমাণে বহিতেছে তাহার নির্ণয় সম্ভব হইলে দেখা যাইত, বাঙ্গালীর আর্য্যরক্তও মৌলিক উপাদান তো দূরে, প্রধান ভাগও নহে। বাংলায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অবনত শ্রেণীর মধ্যে বাড়িয়া যাইতেছে, খৃষ্টধর্ম্ম বাংলা ছাইয়া ফেলিলেও, বাংলার বাঙ্গালী জাতি, দেশপ্রকৃতি, ধাতুগঠনে ও সহজাত স্বভাবধর্ম্মে তবু যেমন বাঙ্গালীই থাকিবে, খ্রীষ্টান লোকসাগরে মিশিয়া লোপ পাইবে না, তেমনি বাংলার বাঙ্গালী তার মূলপ্রকৃতিতে মুসলমানও হয় নাই, আর্য্যহিন্দুও হইতে পারে নাই, তাহারা যে খাঁটী বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীই আছে, উপরের সাংস্কারিক ও সাংসারিকভাব ঘোলাইলেও, ক্বচিৎ একটু আধটু বদলাইলেও, সে মৌলিক রক্তপ্রাধান্য মিলাইবার নহে। অন্য যাহা কিছু শোণিতসাঙ্কর্য্য, তাহা এই মূল রক্তপ্রবাহকে নানা বিভিন্ন রক্তধারায় বিচিত্র সম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াই তুলিয়াছে, তুলিতেছে অথবা তুলিবে—বাঙ্গালীর ধাতুগত, বিশিষ্ট মৌলিকতা নষ্ট, লুপ্ত বা বিকৃত করিতে পারিবে না।

* * * *

এই রক্ত-সম্বন্ধেই জাতি। তাই জাতি হিসাবে বাঙ্গালী বাঙ্গালীই,—হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীষ্টানও নয়। আজ যদি সমস্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতি নূতন জাতি হইবে না, বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী এইমাত্র বলিতে পারা যাইবে। তেমনি পঞ্জাব হইতে আর্য্যসমাজীরা শোধন করিতে আসিয়া যদি আপামর সাধারণকে দয়ানন্দের আর্য্যমতে দীক্ষিত করিতে পারে, তাহাতে শুধু মতধর্ম্মাচারেই যুগান্তর আসিবে, জাতীয় রক্তভিত্তির পরিবর্ত্তন তৎসঙ্গে না আসিতেও পারে। আসমুদ্র সমস্ত সিলোন যদি বৌদ্ধধর্ম্ম বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তাদের অবিকৃত সিংহলী জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারিত বা পারে, তাহা হইলে সিংহলের জাতিভিত্তিতে কিছু মৌলিক সর্ব্বনাশ ঘটে না, তেমনি বাঙ্গালী সম্বন্ধেও। বাঙ্গালী যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালীই, তার দেহের, প্রাণের, মনের রক্ত, শক্তি ও সত্য বাংলা হইতে, বাংলায় উৎপন্ন, পরিপুষ্ট ও পরিবৃদ্ধিশীল, সুতরাং বাংলায় জাতিবিপর্য্যয় আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণেও নহে, ধর্ম্মগত সংস্কারপ্রলেপেও নহে। বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি, বাঙ্গালীত্বের স্বরূপ, আজও বাংলার রক্তের মিশ্রণ, ভাবের প্রলেপ, ধর্ম্মসংস্কারের অতলে ডুবিয়া, স্পষ্ট, অখণ্ড, বিশুদ্ধতত্ত্বে ছানিয়া বাহির করা যায়। তাহাই বাংলার জাতীয় মুক্তির প্রথম ভিত্তিসোপান—বাঙ্গালীর জাতিত্বের আত্মোদ্ধার, বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়। ইহা নহিলে সমস্যার ইয়ত্তা মিলিবে না।

* * * *

ধর্ম্মের বাঁধা সূত্র পরিয়া, বাঙ্গালী মুসলমান এই বাঙ্গালীত্ব হারায় নাই। বাংলার জাতি যেমন স্বতন্ত্র জাতি, বাঙ্গালী মুসলমানও তদনুগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে। রক্তের টান বাংলার মুসলমান কোন দিন ভুলে নাই, ভুলিতে পারে

নাই। এই রক্তের ঘনিমা, ধর্ম্মের গোঁড়ামীকে ছাড়াইয়া বাঙ্গালী মুসলমানকে চিরদিন স্বাধীনমতাবলম্বী, স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-আচার সভ্যতা-পরায়ণ করিয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমান যখন পীরপয়গম্বরের স্তুতি গায়, দরগায় মসজিদে সিন্নি দেয়, ফকির দরবেশী তকেলমকেলী সাধনার অনুসরণ করে, প্রেরণা ও রসান দেয়, তার ভাব ও ভক্তির, সাধনা ও লোকাচারের প্রকৃতি ও তত্ত্ব নির্ণয় করে, আদর্শ ও লক্ষ্য অনুধাবন করায়। বাংলার হিন্দুমুসলমান একই সাধনতত্ত্বের অনুগামী নীতি ও আচার পরায়ণ, ফকিরের গুপ্তশাস্ত্র আর সাঁই সহজিয়ার গুপ্ত সাধন বিদ্যার শুধু পারিভাষিক প্রভেদ, আসল লক্ষ্যে ও সাধনার এতটুকুও তারতম্য নাই।

* * * *

যদি ইঁহাদের মুসলমান বলিতে হয়, বাংলার মুসলমানকে একটা বিশিষ্ট বিভিন্ন মুসলমান চিন্তা-তন্ত্রের (school of thought) মুসলমানই বলা উচিত। ভারতের সাকল্য আর্য্যহিন্দুসমাজের সঙ্গে যেমন বাংলার হিন্দুসমাজের নাড়ীগত সাদৃশ্য নাই, মিল নাই, তেমনি নিখিল ভারতের, তথা অখিল জগতের মুসলমান-মণ্ডলের মধ্যে বাংলার মুসলমান আপনাকে ধর্ম্ম, লোকাচার, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সভ্যতা সকল দিক দিয়াই চিরদিন বিশিষ্ট করিয়া গড়িতে চাহিয়াছে, কোথাও অগৌণ বিষয়ে অপরাপর সমাজের সহিত তাহাদের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। এখানে মুসলমান কবি যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে গান রচনা করে—

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচালি কাচরি রে।
বেণী মুরলি খুরলি গানরি রে॥

অথবা রাধাকৃষ্ণ পদ গাহিতে গিয়া ধুয়া ধরে—

ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি।

তখন বাংলার বৈষ্ণব-প্রাণেরই রসমূল চিনিতে পারি, এরা তো মুসলমান নয়—বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর প্রাণের গাঁথা ভক্তি প্রেমের রসে রসাইয়া গাহিয়া গিয়াছে। মুজা হুসেন আলির শ্যামা গান,—

যারে শমন এবার ফিরি।
এস না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
শ্যামা মায়ের খাস-তালুকে বসত করি॥

রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতই স্মরণ করাইয়া দেয়, এরাও বাংলার সাধক, শ্যামা মায়ের চরণতলে খাস তালুকের প্রজা হইয়া, বাঙ্গালীত্বকেই সাধনায় ও সাহিত্যে ফুটাইয়া গিয়াছেন, হিন্দু মুসলমানত্বের বাচ বিচার এঁদের প্রাণের মর্ম্মে ঠাঁই পায় নাই।

* * * * *

বাংলার মুসলমান সহজসাধক চিরদিন পল্লীর শ্যাম আস্তরণে মাদুর বিছাইয়া দেহতত্ত্ব সাধিয়াছে ও শিখাইয়াছে, সেখানে হিন্দু সহজসাধকের সঙ্গে তাদের মোটেই ভেদ দেখা যায় নাই। আজও গঙ্গাবক্ষে দাঁড় বাহিতে বাহিতে মুসলমান মাঝি, দেহের মাঝেই মক্কা মদিনা সকল তীর্থ কেন্দ্রীভূত এই তাৎপর্য্য গাহিয়া বেড়ায় ও ধারণা করে, দেহের মধ্যে চারিবেদের কথা ছেঁড়া পুঁথিতে পড়ে আর শুনায়, সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের তকেল মকেলের সাধনার মিল ও গোপন সাধন রহস্য কাণ পাতিয়া শুনে ও কয়,—এগুলি সব একত্র মিলিয়া শুধু এই পরিচয়ই দেয়, বাংলার মর্ম্ম, সাধনা, বাঙ্গালীর ধর্ম্মসঙ্গীত, বাঙ্গালীর সহজবাদ ও রস-পুষ্টি হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাংলার মুসলমান যুগের আবির্ভাবে, আর্য্যযুগের আবির্ভাবের ন্যায় দু এক ফোঁটা নূতন তাজা রক্তের আমদানির সঙ্গে, রক্তের ন্যায়, মনের ও প্রাণেরও আসল ধাতব বিপর্য্যয় কিছুই ঘটায় নাই, শুধু চিন্তার ও সাধনার কয়েকটা নূতন উপাদান ও পরিভাষা যোগাইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতি সমৃদ্ধই হইয়াছে, পরন্তু আপনাকে খোয়ায় নাই, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সমাজে সাহিত্যে, শিল্পকলায়, বাঙ্গালী চিরদিন আর্য্যপ্রভাব ও আর্য্যীকরণ যেমন অস্বীকার করিয়াছে, আত্মসাৎ করিয়াছে কিন্তু আত্মহারা হয় নাই, বাংলার মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ, চিন্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধেও আসলে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে, আর্য্যের ন্যায় মুসলমান এখানে উপনিবেশ করে নাই, অধিকারও করে নাই, বাংলারই শিকড় হইতে রস টানিয়া, আগন্তুক অবদান মিশাল দিয়া বাঙ্গালীত্বকেই পুষ্ট, শক্তিপূর্ণ, ভাব-রক্ত-ও-প্রাণ প্রাচুর্য্যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছে, পরন্তু কোথাও বহির্ভাবে চিরদিনের জন্য আচ্ছন্ন ও পরাভূত হয় নাই।

* * * * *

আজও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীই থাকিতে হইবে—ইহাই বাঙ্গালীর নব জাগরণের সত্য মর্ম্ম। বাহির হইতে আর্য্য সভ্যতা যেদিন আসিয়াছিল, বাংলার প্রকৃতির উপর তার আরোপ বেশী দিন টিকে নাই। বাংলার আত্মপ্রকৃতি, ধর্ম্মেতিহাসিক সুযোগ খুঁজিয়া, মাথা নাড়িয়া সে আরোপ ঝাড়িয়া ফেলিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। বাংলার বৌদ্ধধর্ম্মের বিকারে ও পৌরাণিক হিন্দু ভাবের নবোত্থানে, তান্ত্রিক কুলাচারের প্রবর্ত্তন তাহারই বৈশিষ্ট্য-সূচক। এই তন্ত্রাচারে বাঙ্গালী হিন্দু, আর্য্য কৌলীন্যের জয়স্তম্ভ চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভাব ভিতরের সাধন তত্ত্বের দিক দিয়া একেবারে অস্বীকার করিয়াছিল—সমাজ-বিজ্ঞানের মূল মর্ম্মে অনাপোষী একাকারের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। তত্ত্বের সাধনায় জাতি বিচার নাই, বর্ণধর্ম্ম বিচার নাই, যোনি-বিচার নাই। সাধনতত্ত্বে, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান অভেদ জাতি, অখণ্ডধর্ম্মী।

* * * * *

আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, প্রভৃতি বাংলার ধর্ম্ম সম্প্রদায়, কিন্তু মূল মর্ম্মে ইহারা বিভিন্ন নয়, সকলে এক। তাহাদের সকলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, বাংলার সহজ প্রকৃতিকে মুক্তি দিয়া, এক জাতির সৃষ্টি করা। এক রক্তে এক জাতি হয়, তাই বাঙ্গালী তান্ত্রিকসমাজ, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে একাচারী, রক্তের মিশ্রণে শুনা যায়, তারা শক্তিশালিনী পাঠান রমণীকেও আমন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠা করে নাই। অবশ্য মুসলমানের উদার সামাজিক বিধান, বাঙ্গালীর মুসলমানীকরণের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যীকরণের ন্যায়, বাঙ্গালীর মুসলমানীকরণও তার সাধন-তন্ত্রে ও জীবন-তন্ত্রে খুব মূল ও গভীর দিক দিয়া প্রশ্রয় পায় নাই। আজও যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক আনুকূল্যে, উন্নতি-লালসায় নিম্নশ্রেণীরা দলে দলে খৃষ্টান হয়, মুসলমান আমলেও তার বেশী কিছু ইতরবিশেষ ঘটে নাই। মৌলবীর শিক্ষার চেয়ে রাজপদের শীতল ছায়া অধিকতর প্রীতিপদ চিরদিনই ও উহাই অধিকাংশ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কারণ। তার উপর, মুসলমানের জোর জবরদস্তি ছিল, কোরাণের অপারগে কৃপাণের প্রবলতর যুক্তি কার্য্য করিত। সুতরাং বাংলার মুসলমান প্রভাব, রাষ্ট্রনীতি আশ্রয় করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, গভীরতর ভিতরের পরশ দিয়া, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী প্রকৃতিকে অধিকার করিতে পারে নাই। যে দীক্ষা লোভের, কামের বা প্রতিহিংসার, তাহাতে কালাপাহাড়ী কীর্ত্তিই শোভা পায়, মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটায় না। বাংলার মুসলমান তাই দীক্ষান্তর গ্রহণ করিয়া শুধু সামাজিক সংস্কার পরিবর্ত্তন যতটুকু স্বীকার করিয়াছে, অন্তরগত সাধনায় ও জীবনে, হিন্দুর ছত্রিশ জাতি, চৌষট্টি উপজাতি বিচারের ন্যায়, মুসলমানের চতুর্জাতি বিচারও প্রধান কথা নহে, বাঙ্গালীর মুসলমান বাংলার নব জাগরণে সাড়া দিলে, বাঙ্গালী হইয়াই তার যথার্থ সাড়া মিলিবে, মুসলমানী রক্ত সংস্কার তার তফাতে রাখিয়া দেওয়াই চাই।

* * * * *

আজিকার সাধ্য, এই মৌলিক প্রকৃতিগত আত্ম-বৈশিষ্ট্যকেই ভিত্তি করিয়া রক্তের ও প্রাণের বন্ধনে, সামাজিক সম্বন্ধ আরও নিবিড় করিয়া, সেই ঐক্যানুভূতিকেই জাতীয় জীবনে মূর্ত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলা চাই। বাংলার জাতিসাধনায় হিন্দু মুসলমান সমস্যা নাইও, থাকিবেও না, বাঙ্গালী জাতি, জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে, অখণ্ড অভেদমূর্ত্তি লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহা ভবিষ্যদ্ বাণী, হয় তো স্বপ্নময় ভাবুকতা আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালী অনেকে বলিবেন,—ইতিহাসের প্রকৃতি কিন্তু, বাংলার হিন্দু মুসলমান অথবা খৃষ্টানকে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশের ভেদমূলক নীতি ডুবাইয়া দিবার ইঙ্গিতই বরাবর দিয়া আসিয়াছে, রাষ্ট্র-জীবনে বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমানও মোসলেম সার্ব্বভৌমিকতায় বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করিয়া তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছে,—উহাও এই ঐতিহাসিক ধারাবাহী প্রবাহে স্বাধীনতার রাষ্ট্র-ভূমিকা প্রস্তুতির প্রচেষ্টা নহে কি? বাংলার জাতি, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, রাষ্ট্রে, সমাজে, জাতীয়তার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জীবন-রূপের প্রকাশে ও আত্মবিস্তারে—স্বাধীন তন্ত্রকেই (autonomy) লক্ষ্য-কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইবে।

* * * * *

এক জাতি যাহাতে সর্ব্বজাতি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এক ধর্ম্ম যাহাতে সকলের ধর্ম্ম মর্ম্মগত ঐক্য খুঁজিয়া পায়, এক সমাজনীতি যাহাতে সর্ব্বজাতির রক্তের সম্মিলন ও সমন্বয় বাধে না, বাংলার সাধনতত্ত্ব গূঢ় ইঙ্গিতে এই দিক দিয়াই জাতীয়তার বেদী নির্ম্মাণে প্রমুক্ত আছে—আজ গাঢ় অবগাহনে এই সাধনতত্ত্বের মর্ম্মে ডুব দিয়া নব জাতি-রূপ, সমাজ-রূপ ও রাষ্ট্ররূপের সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই বাংলার স্বরাজ দ্যোতনা। বাঙ্গালীত্বের প্রাপ্তি ও সিদ্ধিই তাহার পূর্ব্ব প্রস্তাবনা—এই ভূমিকার স্থির প্রতিষ্ঠা হইলে, বাংলার জাতি-ঘটে প্রাণশক্তির নূতন লীলা আরম্ভ হইবে, সে হইবে নূতন জাতীয়তার রূপ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা। উহাই দেবজাতি ও দিব্যরাজ্য—বাঙ্গালী, তোমার ভাগবত আহ্বান সেই লক্ষ্যেই। (প্রবর্ত্তক)

বিপথে

শ্রীপ্রফুল্ল হালদার এম্-এ

স্নেহের সুধা,

তোমার চিঠি পেয়েচি;—মনে করেছিলুম, জবাব দেবো না; যে হেতু, তুমি যা আমার কাছে জানতে চেয়েচ, ইচ্ছা ছিল না তা আর কাউকে জানাই। ভেবেছিলুম, নিজের জীবনের দুঃখের ও লজ্জার কাহিনীটা নিজের মুখে কারো কাছে বলে যাব না; কারণ, ঐ কথাটা যখন খুব অতিরঞ্জিত হয়ে তোমাদের নানা লোকের মুখ দিয়ে বেরোয়, সে আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে। আর বলবোই বা কাকে?—আজ পর্য্যন্ত সংসারে একটী প্রাণীর কাছেও আমি সহানুভূতি পাই নি—শুধু নিন্দা ও অপবাদই আমার সম্বল হয়ে এসেচে। জানি, আমার চিঠি পড়ে তোমরা হাসবে, তোমাদের মত সতী-লক্ষ্মীরা এই বিপথ-গামিনীর প্রতি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে, এবং নিন্দা ও অভিশাপে সে বেলাটা তোমাদের বেশ জমে উঠবে। কিন্তু

আজ যখন এতো অনুরোধ করে তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েচ, তখন এ কথাটা বলবোই যে, যাকে তোমরা চিরদিন বিপথ বলে প্রচার করচ—তাকেই আমি সত্যিকারের পথ বলে জেনেচি ; এবং তাতে খুব সম্ভব ভুল করি নি।

আজ তোমার কাছে চিঠি লিখচি, আর চোখের জলের ভিতর দিয়ে মনে পড়চে আমাদের সেই সুখের বাল্য-জীবনের কথা—যখন তুমি ও আমি সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকতুম, একসঙ্গে বেড়াতুম ও একসঙ্গে ইস্কুলে যেতুম। সে আজ বহু দিনের কথা—তার পর এই পোড়া শরীরটার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু সেই সুখের স্মৃতি এখনো আমার অন্তরের পুঞ্জীকৃত বেদনাকে মধুর করে তোলে। তোমরা ছিলে খুব বড়লোক, আর আমরা ছিলুম গরীব ; তোমার রং ছিল ফরসা, আর আমি ছিলুম কালো ; তুমি ছিলে বিখ্যাত সুন্দরী, আর আমি ছিলুম কুৎসিত। কিন্তু বিধাতা আমাকে সকল রকমে ঠকিয়েও না কি এক জায়গায় আমার জিৎ রেখেছিলেন,—লোকে বলত আমার বুদ্ধি না কি অসাধারণ ছিল। এখনো যে তারা তা স্বীকার না করে, এমন নয় ; কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাটা যোগ করতে তারা ভুল করে না যে, সেই বুদ্ধিই না কি শেষকালে আমার সর্ব্বনাশ করেচে। এই বুদ্ধির জন্যে তোমার বাবা, মা আমাকে কত আদর করতেন, আমাকে নিয়ে কত গল্প ও তামাসা করতেন। তাঁদের স্নেহ কি আজো ভুলতে পেরেচি! তার পর আমাদের বয়স যখন বারো বছর হলো, তখন এক দিন শুনতে পেলুম, তোমার বিয়ের বর না কি ঠিক হয়ে গেচে। সে দিনকার সে গলা জড়িয়ে ধরে কান্নার কথা কি তোমার আজো মনে আছে? তুমি ত তোমার বংশের সম্মান রেখে ঠিক বয়সে গিন্নী হয়ে চলে গেলে ; কিন্তু এ দিকে আমার বাবা, মা আমাকে নিয়ে বড় বিপদে পড়লেন—মেয়ে যে আর ঘরে রাখা যায় না! সকলেই আশঙ্কা করতে লাগলো যে, তাঁদের সংসারের এত কালের গৌরব বোধ হয় আমার জন্যেই একেবারে ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটী নিয়ে বর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল! আমাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল ; কারণ, এত বড় মেয়ের ইস্কুলে যাওয়া ভাল দেখায় না। শেষে বাবা বুঝতে পারলেন যে, বাজারে ঐ জিনিসটী পেতে হলে যে সম্বল থাকা দরকার, তাঁর তা কিছুই নেই—তিনি নিজে গরীব, আর তাঁর মেয়ে কুৎসিত।

এমন সময়ে আমার গোপালদা' আমাদের এখানে বেড়াতে এলেন। তাঁকে কি তোমার মনে আছে? সেই যে এক দিন 'শিশু' বই থেকে একটা কবিতা বের করে আমাদের বলেছিলেন, যে আগে মুখস্থ করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেবেন। আমরা থাকতুম সাবডিভিসানে, আর তিনি সহরে থেকে বি-এ পড়তেন। লম্বা, সরু, ফরসা তাঁর চেহারা। বড়লোকের ছেলে, কিন্তু বিলাসিতার লেশ মাত্র তাঁর ছিল না। পুরানো একজোড়া চটী জুতা, একটী মোটা সার্ট ও একখানা মোটা চাদর ছিল তাঁর সম্বল। কিন্তু বাড়ী থেকে তিনি এত টাকা এনে কি করেন, এ নিয়ে তাঁর হিতৈষীদের আর চিন্তার শেষ থাকত না। বড়লোককে তিনি বড় ভয় করতেন। আমাদের বাড়ী যে তিনি প্রায়ই আসতেন, তার কারণ, আমরা গরীব। আমার মাও তাঁকে নিজের ভাইয়ের ছেলে বলে বিশেষ করে আদর করতেন। তাঁর ধরণটা ছিল অন্য রকমের। সর্ব্বদা বসে ভাবতেন ; কারো কাছে ভয়ানক গম্ভীর, আবার কারো কাছে হয় ত বালকের মত সরলতা নিয়ে হাসি-তামাসা করতেন। কথা বলতে বলতে হয় ত তিনি কখনো হঠাৎ রবীবাবুর কবিতা আওড়াতে আরম্ভ করতেন ; অথবা খুব গম্ভীর হয়ে ডায়েরী লিখতে বসে যেতেন। সকলে যে কাজ করতে তাঁকে অনুরোধ করত, সে কাজ না করাটাতেই তিনি মজা পেতেন। এসব দেখে শুনে তাঁর নিজের ভাই-বোনরা পর্য্যন্ত তাঁকে পাগল বলত ;—বলত যে ওঁর মানসিক বিকার আছে। কিন্তু তাঁর ভিতরের মানুষটীর খোঁজ ওরা কেউ পায় নি। আমায় তিনি একটু বিশেষ করেই স্নেহ করতেন—খুব সম্ভব আমি সকলের উপেক্ষিতা বলেই। প্রথমে তিনি আমার বিয়ের বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক করতে লাগলেন ; কিন্তু বিশেষ ফল হলো না। কোথায় কোন এক মিশনের সাধুর সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে উঠল। গোপালদা' মাকে কোন মতে বশ করে, ঐ বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে দিয়ে, আমাকে সহরে নিয়ে গিয়ে আবার বুড়ো বয়সে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। সেখানে আমি বোর্ডিংএ থাকতুম। বাবা

আমাকে মাসে মাত্র সাত টাকা করে পাঠাতেন ; আর বাকী টাকা গোপালদা তাঁর পড়ার খরচের টাকা থেকে যোগাতেন।

এদিকে আমার চলে আসার কথা নিয়ে বেশ গোল বেধে গেল। আমার সম্বন্ধে নানারকম গল্প-গুজব বের হতে লাগল। মেয়েদের মহলে দিনগুলি বেশ কাটতে লাগল ; কারণ একটা নূতন নিন্দার বিষয় জুটে গেল। এ নিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজনরা পর্য্যন্ত বাবা-মাকে কত ঠাট্টা তামাসা করত—এমন কি আমার সামনেই বাবা-মাকে গাল দিত। আমার জবাব ছিল একমাত্র চোখের জল।

এ সবকে আমি উপেক্ষা করেই চলতুম—আর গোপালদা'র কাছে শিখেছিলুমও তাই। তিনি বলতেন—"এদের তুই ক্ষমা করিস, এরা যে বড় ছোট ;—নূতন সভ্যতার উদার আলো এখনো এরা পায় নি। অথচ ওরা সকলের হাততালি পেয়ে সারাটা জীবন সুখে ভাল-মানুষ বলে পরিচিত হয়ে কাটিয়ে দেবে। ওদের সঙ্গে যাদের মত মিলবে না, তাদেরই ওরা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া বলে গাল দেবে—এ ছন্নছাড়ার দলের যে সংসারে কত প্রয়োজন, তা ওরা বুঝেও বুঝবে না। কিন্তু ওদের সঙ্গে যেন তুই কোন দিন তর্ক করিস নে ; কারণ, ওরা সংখ্যায় এত অধিক, এবং এত প্রবল যে, ওদের সঙ্গে পেরে উঠবি নে।" আমার ছুটীর সময় তিনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যেতেন, অথবা আমাদের বাড়ী এসে থাকতেন। ঐ সময়টা তিনি আমাকে নিজে পড়াতেন। কত আধুনিক বাঙলা ও ইংরাজী বই পড়ে আমাকে শুনাতেন ও বুঝিয়ে দিতেন। নূতন নূতন লেখকের নূতন মতগুলি আমাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিতেন। মনে আছে, 'ইবসেনের' 'ডলস হাউসের' গল্পটা বলে আমাকে বলেছিলেন—"দেখ, ইচ্ছে নেই, অথচ যদি বাধ্য হয়েই স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়,—তাকে আর যাই বলতে পারি, অন্ততঃ বিয়ে বলতে পারি না। শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম, আর দেবতার কাছে প্রণাম করে বলেছিলুম—হে ঠাকুর, আমায় কোন দিন এ অবস্থায় ফেলো না। তিনি যখন অনর্গল এ সকল কথা আমার কাছে বলে যেতেন, আমি সময় সময় একদৃষ্টিতে তাঁর পানে এমন ভাবে চেয়ে থাকতুম যে, আমার ভয় করত;—মনকে ধিক্কার দিয়ে বলতুম—"ওলো হতভাগী, এ কোন্ সর্ব্বনাশের পথে তুই পা দিচ্ছিস—এ যে তোর আপন মামার ছেলে! বিয়ের উপরে ছিল তাঁর একটা আন্তরিক ঘৃণা,—আর সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে যেন ঐটা আমার উপরে বদ্ধমূল করতে চেয়েছিলেন। আমি জানতুম, আমার বিয়ে হবে না। মা বাবাও—অন্ততঃ মা, এক রকম তাই বুঝতে দিয়েছিলেন। এমন কি, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছেই এইটে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, আমার আর বিয়ে হবে না। দাদা তাঁর আদর্শ দিয়ে আমাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল। তখন 'আইডিয়ালিজম'এ আমার মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ভাবতুম, সাধারণের মত দাসীবৃত্তি করতে আমি জন্মাই নি—আমি নিষ্কলঙ্ক, আমার আদর্শ সুন্দর, আমার উদ্দেশ্য মহৎ।

এমনি ভাবে হয় ত দিন কেটে যেত ; কিন্তু পোড়া অদৃষ্ট যে আমাকে পাকে-পাকে ফেলে পিষে-পিষে মেরেচে। তখন আমার উনিশ বছর বয়স, ইংরাজী ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। এমন সময় এক বিপদ এসে জুটল। ঐ যে মিশনের সাধুর কথা বলেচি, সে কোথা থেকে কতকগুলি চিঠি নিয়ে এসে হাজির হল, এবং সকলের কাছে প্রমাণ করে বেড়াতে লাগল যে, ঐসব আমিই তাকে লিখেচি। এ সব কথা আজ তোমার কাছে লিখতে পর্য্যন্ত লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। তখন ঘরে-বাইরে যে নিন্দার রোল পড়ে গিয়েছিল, তা আমি রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে কি করে সহ্য করেছিলুম, বলতে পারি নে ; কিন্তু তাতে পাষাণ পর্য্যন্ত মাটিতে সেঁধিয়ে যেত। অবশেষে বাবার কাছে লোক পাঠিয়ে সে আমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করল, এবং এমন ভাব দেখাল, যেন আমি এতে রাজি। বাবা স্পষ্ট নিষেধ করে দিলেন। সে দিনকার বাবা-মার অপমান দেখে আমি সমস্ত রাত্রি চোখের জলে ভিজে গিয়েছিলুম। তখন বাবা মা ঠিক করলেন যে আপদ বিদায় করতেই হবে—মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মা আমাকে নীতি শাস্ত্রের বাক্য তুলে নানা রকম উপদেশ দিতে লাগলেন। বিয়ে হলে যে এ সব নিন্দার কোন ভিত্তি থাকবে না তাও বল্লেন। গোপালদা'র সেবার এম-এ পরীক্ষা। আমি সব কথা লিখে তাঁর কাছে

চিঠি দিলুম। জবাবে তিনি লিখে পাঠালেন—যারা মিথ্যা নিন্দার ভয়ে নিজের মেয়েকে আপদ বলে বিদায় করতে চায়, তারা যে কত ক্ষুদ্র, তা আমি ভাবতেও পারি নে। তুমি যাদের বাবা বল, মা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, তারা যে কত নীচ, কত হীন, তা তুমি জানতেও পার নি। এ নীচতা থেকে যে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি, সে শক্তি বিধাতা আমায় দেন নি। যা হ'বে পরে সব কথা জানাইয়ো।

চিঠি পড়ে রাগে অপমানে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। উদ্ধার করবার ক্ষমতা ত নেই-ই—আবার আমার মা বাবাকে গাল দিয়ে চিঠি দেওয়া—যাঁরা আমার জন্য এতদূর সহ্য করে এসেচেন। রাগের আরো একটা কারণ ছিল, ভেবেছিলুম তা আর লিখব না। শুনলুম, গোপালদা না কি কোথাকার কোন এক শিক্ষিতা, কলেজে-পড়া মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন! ঐ কথাটা যদিও তাঁর নিন্দুকদের—যে শুভাকাঙ্ক্ষীর দল চিরকাল তাঁর মানসিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্যে চেষ্টার ত্রুটী করে নি—মুখে শুনেছিলুম, তবু সেদিন এ কথাটা বিশ্বাস করতে আমি এক মিনিটের জন্যও সঙ্কোচ বোধ করি নি। সমস্ত শরীর মন আমার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে উঠল। সেদিন আমার অন্তর যে তাঁর বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, বলতে পারি নে। তাই সেদিন মা যখন আবার আমাকে উপদেশ দিতে এলেন, আমি বলে ফেল্লুম,—দাও মা আমায় বিদায় কোরে; কত লোক কত কষ্টে আছে, আর তোমরা কি যেমন তেমন করেও আমার একটা বিয়ে ঠিক করতে পারলে না? হায় রে, কি কুক্ষণে এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল! বাবা ঐ কথাটা আমার সম্মতি বলে ধরে নিয়ে আবার বর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে বর জুটতেও বেশী দেরী হল না। কোথাকার কোন এক হরিসভার সাধুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পরম সাত্ত্বিক তিনি, সমস্ত শরীর ফোঁটা তিলকে চিত্রিত—আর সন্ধ্যাবেলা হরিসংকীর্ত্তনে তার গলার স্বরটা থাকত সকলের উঁচুতে। শুনেছিলুম, কলেজে নাকি আই-এ পর্য্যন্ত পড়েও ছিল।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। বাবা ও বড়দা ধার করে বিয়ের জিনিস কিন্‌তে সুরু করলেন, কারণ, আমায় যিনি দয়া করে গ্রহণ করবেন, তাঁকে উপযুক্ত দাম দিতে হবে ত। আত্মীয়-স্বজনরা এসে আমোদ আরম্ভ করে দিলে। আমার কিন্তু ভাই নীরবে কান্না ভিন্ন আর কোনো সম্বল ছিল না। কি অসহ্য বেদনা যে তখন আমার বুক চেপে ধরেছিল, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। বিয়ের তিন দিন আগে গোপালদা এসে উপস্থিত। দেখে শরীর জ্বলে উঠেছিল সত্য, কিন্তু মনে মনে একটা আশ্রয় পেলুম। প্রথম দিন তিনি বড় গম্ভীর ছিলেন; আপন মনে বসে বসে চিন্তা করতেন, কারো সঙ্গে একটা কথাও বল্লেন না। হঠাৎ আমাকে একবার কাঁদতে দেখে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন। আমার কান্না আরো বেড়ে গেল; হায় রে, আমার অন্তর্যামীও কি আমার অন্তরের বেদনা বুঝতে পারলেন না! তার পর দিন তিনি আমায় ডেকে আমার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন—তুই একবার আমার কাছে এ কথাটা বল যে—যে দুঃখ তুই নিজে সুখী হয়ে সহ্য করতে পারবি, তা অন্যে কেন পারবে না? তোর মুখ থেকে আমি একবার শুনতে চাই যে, এ কাজে তুই সুখী হবি। তাঁর সেই দুঃখকাতর মূর্ত্তি আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। তাঁর কান্নার বেগ থামাতে গিয়ে তিনি কান্নাটাকে আরো স্পষ্ট করে তুল্লেন। আমিও কেঁদে ফেল্লুম। কিন্তু আমি তখন কি জবাব দিয়েছিলুম জান? আমার দেবতার কাছে আমি মিথ্যা বলতে পারলুম না। বলেছিলুম,—এক মুটো ভাতের জন্যে একজনার সঙ্গে বাধ্য হয়ে চিরজীবন সহবাস করাতে কি সুখ আছে দাদা? আর আমার কোন মত কি তোমার অজানা আছে যে, আজ এ কথা জিজ্ঞেস কর্চ্ছ? রাগ করো না,—জানি এ কথা শুনে ঘৃণায় তোমরা আমার নামে থুথু ফেলবে। কারণ, ছোটকাল থেকে শিবপূজা করে তোমরা যে এর জন্যেই দেবতার কাছে কামনা করে এসেচ! বিয়ের নামে ধর্ম্মের মুখস পরিয়ে আর নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে এই বীভৎস ব্যাপারটাকে চিরকাল তোমাদের কাছে আদর্শ বলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েচে; তাই মা বাপে জোর করে মেয়েকে গণিকা করে পাঠিয়ে দেওয়াটাও তোমাদের মত সতীদের কাছে অশোভন ঠেকে না। বিয়ের দিন ভোরে গোপালদার একখানা লম্বা চিঠি পেলুম,

তার থেকে জানলুম যে, তিনি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে আমার ভাবী স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাকে আমার মত জানিয়ে এ বিয়ে থেকে নিরস্ত হতে অনেক অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু বিয়ের সুখস্বপ্ন তখন তাঁর মনে জেগেছিল, তাই পিতৃ-মাতৃভক্ত বাঙালীর ছেলে তাতে রাজী হন্ নি। রাগ-মার দোহাই দিয়ে তিনি খুন করতে বেরিয়ে পড়লেন। চিঠির শেষে তিনি লিখেচেন,—"পুরুষ মানুষ যে এত বড় কাপুরুষ হতে পারে, তা আজ নিজের চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। কি করে' যে একজন পুরুষ মেয়ের অমত জেনেও মুকুট মাথায় দিয়ে বিয়ের আসনে গিয়ে বস্‌তে পারে—এ আমার আশ্চর্য্য ঠেক্‌চে। আর আমার এত বড় দুর্ভাগ্য যে, তোমার জীবনের এই সময় তোমায় আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করতে পারছি নে। জানি না এর ফল কি দাঁড়ায়। তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার আর দেখা হবার আশা নেই।"

আমার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে বলতে পারি নে; কারণ, এখন থেকে আমার জীবনের যে অধ্যায় আরম্ভ হল, তাতে যে শুধু বাইরের গ্লানি ছিল তা নয়, আত্মগ্লানিতেও আমার শরীর মন জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরদিনই আমার স্বামী সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগল যে, গোপালদা আমাদের বিয়ে ভাঙতে গিয়েছিলেন। এ কথাটা নানারকম রং চড়িয়ে যখন সকলের কাণে পৌঁছাল, তখন বাড়ীশুদ্ধ লোক গোপালদার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল এবং তাঁকে উপলক্ষ করে যে সব ঠাট্টা ও বিদ্রূপ চল্‌তে লাগল তা অকথ্য। এমন কি আমাকে ও গোপালদাকে জড়িয়ে নানারকম বিশ্রী ইঙ্গিত করতে পর্য্যন্ত সেদিন এরা সঙ্কোচ বোধ করে নি। আমার মাসিমা—যাঁর দাঁতের বিষে আমার অবিবাহিত জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল,—তিনি সেদিন সকলের কাছে গোপালদার যে চরিত্র খারাপ, তা প্রমাণ করে বেড়াতে লাগলেন। হায়রে, হৃদয় বলে কি এদের কোন জিনিষ নেই! যাঁকে আমি চিরকাল দেবতার মত ভক্তি করে এসেচি, যিনি জীবনে কোন দিন এক মিনিটের জন্যও আমার অমঙ্গল কামনা করেন নি,—তাঁর নামে এসব কথা! কিন্তু মনে রেখো, এসব কথা সেদিন আমায় নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল।

বিয়ের দু'দিন পরে গোপালদা কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এসে উপস্থিত। তাঁর চেহারা ম্লান, চুল উস্কখুস্ক, গায়ে একখানা মোটা চাদর—কিন্তু দেখলে বোঝা যায় যে, বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত তিনি ভিতরে গুম্ গুম্ করচেন। এসেই তিনি সকলকে একত্র করে বল্‌তে লাগলেন—আজ যখন এ কথাটা প্রকাশ হয়েই পড়েছে, তখন নিজের মুখে এর সত্য খবরটা সকলের কাছে আমি না বলে থাকতে পারব না, কারণ আমি জানি আমি অন্যায় করি নি। বাড়ীশুদ্ধ লোক অন্যায় করেচেন—একটী নির্দ্দোষ, নিরুপায় মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য অজানা পথে ছেড়ে দিতে আপনারা দ্বিধা বোধ করেন নি,—আর তার প্রতিবাদ করবার মত সাহস আমার ছিল বলেই অন্যায় হলো আমার? আর মজা এই—যে সকলের চাইতে বেশী দোষী, সেই কাপুরুষই এ কথাটা সকলের কাছে বড় গলা করে রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার স্বামীকে তিনি কাপুরুষ, খুনী, খুনীর চাইতে নিকৃষ্ট এবং আরো কত কি বলতে লাগলেন। সেখানে এমন কেউ ছিল না যে, তাঁর কথার একটা প্রতিবাদ করে। আমার কিন্তু মাথায় তখন খুন চেপে গিয়েছিল। গোপালদার এসব গালি শুনে রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগল। আর বাইরের নিন্দা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যও মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলুম, কারণ, এরা যে আমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, সবই নষ্ট করতে বসেচে। এই দুর্নাম ও অবিশ্বাস নিয়ে আমি কি করে সারাজীবন বেঁচে থাকব। সুরাসুরের যুদ্ধ তখন আমার মনের মধ্যে চলছিল—তখনকার মত আমি একরকম পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। তাই গোপালদা যখন এসব কথা খুব বড় গলা করেই বলছিলেন, আমি তখন সকলের সামনে গিয়ে বল্লুম যে, আমি কোনো দিন বিয়েতে অমত দিইনি। গোপালদা মাথা নীচু করে রইলেন; আর সকলে মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে একটা অনুকম্পার দৃষ্টি ফেলে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু গোপালদাকে চিরকাল দেখেচি যে, যেখানে সত্য সেখানে তিনি ভেঙে পড়েচেন, তবু তাঁকে কেউ নোয়াতে পারে নি। তাই সকলে যখন তাঁকে দোষী করতে লাগল, তখন তিনি এই বলে চলে গেলেন—দোষী কি নির্দ্দোষ, তা প্রমাণ করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমার কোন দিন না হয়; কিন্তু

আপনারা এ কথাটা মনে রাখবেন যে, একজনকে বিশ্বেস করবার পর যদি সে আমায় ঠকায়, তবে অন্যায়টা আমার নয়।" তার পর যখন প্রকৃতিস্থ হলুম, তখন দেখলুম, সব হারিয়ে বসে আছি। কাঁদতে কাঁদতে চক্ষু ফুলিয়ে ফেল্লুম, তাঁর চরণে ক্ষমা চাইলুম—দেবতা আমার, গুরু আমার, ভাই আমার, প্রাণের ঠাকুর আমার, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

এখানেই আমার এ দুঃখের কাহিনী শেষ হয় নি। এখন থেকে যে বিপদ ঘনিয়ে এলো, তা তোমাদের কাছে এতই স্বাভাবিক যে, ঐ বিপদ না আসাটাকেই তোমরা দুঃখের বিষয় বলে ভাববে। কিন্তু ছোটকাল থেকেই আমার ধারণাটা ছিল অন্য রকম—তাই বিয়ের রাত্রে যখন প্রথম স্বামীর শয্যায় পড়ে রয়েছিলুম, তখন শত বৃশ্চিক দংশনে যেন আমার সমস্ত শরীর মন জ্বলছিল। থেকে থেকেই আমার মনে হচ্ছিল—অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়। এতদিনের আমার শিক্ষা দীক্ষা যেন সমস্ত সত্য হয়ে উঠে, সে রাত্রির অন্যায়টা আমার সামনে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল। কিন্তু সে জঘন্য অন্যায় ও অপমানটার সঙ্গেও সেই সময় কোন মতে আপোষ করে নিয়েছিলুম। এরকম ভাবেও যদি শেষ দিনগুলি যেত, তাহলেও বুঝতুম, বিধাতা আমায় দয়া করেচেন। কিন্তু কয়েক দিন না যেতেই স্বামী আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। তখন যে সংগ্রাম অত্যাচার আরম্ভ হল, তা অকথ্য। কত রাত্রি আমি অনাহারে অনিদ্রায় বসে বসে কাটিয়েচি। এসব অত্যাচারে আমার শরীর তৃণের মত হয়ে গিয়েছিল। তবু আমি এ পর্য্যন্ত নিজেকে রক্ষা করে এসেছিলুম। কিন্তু কোন্ এক মোহের আবেষ্টনে পড়ে জানি না—এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এক রাত্রিতে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দিলুম। সে ব্যাপারটাকে তোমরা সতীরা কি ভাবে নিতে বলতে পারিনে, কিন্তু যখন মোহ ভাঙল, তখন বুঝলুম আমার আত্মহত্যার আর বাকী নেই। তখন ইচ্ছা হল, নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলি, ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। আমার শরীর তখন এতই অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে, নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলুম না—আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। তার পর থেকেই আমার ফিট্ হতে লাগল। একবার জ্ঞান হলে পর দেখলুম, বাপের বাড়ীতে বাবা মার কাছে বসে আছি—আর মাথার কাছে বসে গোপালদা। উতলা হয়ে "ক্ষমা করো, ক্ষমা করো" বলে তাঁর পায়ের উপরে পড়লুম।

ক্ষমা তিনি করেচেন কি না জানি না, তবে আজো তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমার কলেজে পড়ার টাকা মাসে মাসে পাঠিয়ে দেন। ইতি—

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৮)

প্রমথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে, অমলা পাণের সরঞ্জাম লইয়া পাণ সাজিতে বসিয়াছিল; এবং সাজা হইলে, আজ আর প্রভাবতীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, একটি রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পাণ ভরিয়া, তাহার উপর সুগন্ধি গোলাপ জলের ছিটা দিয়া, প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

প্রমথ তখন পুলক-প্রফুল্ল মুখে সুরেশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, এবং সুরেশ প্রমথর দেওয়া একরাশি লজেঞ্চুস্ মুখে পুরিয়া প্রমথর প্রতি করুণ-ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নিঃশব্দে চুষিয়া খাইতেছিল। তাহার সেই শিথিল-শান্ত চাহনির মধ্যে অপরিচয়ের বিমূঢ়তা, এবং স্ফীত-বিকৃত মুখের মধ্যে লোভের প্রমাণ, এই উভয় ব্যাপার প্রমথর চিত্তে যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছিল।

পিছন হইতে অমলা আসিয়া একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া

বলিল, "প্রমথ দাদা, পাণ নাও।" এবং প্রমথ ফিরিয়া চাহিতেই, সঙ্কীয়মান সঙ্কোচ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ওঃ, তাই সুরেশের মুখে একেবারে কথা নেই!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "সুরেশের মুখে কথার চেয়েও বেশী মিষ্টি জিনিস আছে।" তাহার পর অমলার হস্ত হইতে ডিবা লইয়া, দুই খিলি পাণ মুখে দিয়া, একবার চিবাইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তোমার পাণে যে তার চেয়েও বেশী মিষ্টি জিনিস রয়েছে অমলা!"

গভীর ঔৎসুক্যের সহিত অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

প্রমথ সহাস্য মুখে বলিল, "এ যে লজেঞ্চুসের চেয়েও মিষ্টি লাগছে! তুমি সেজেছ না কি?"

একজন সতের বৎসর বয়স্কা, দূর-সম্পর্কীয়া যুবতীর প্রতি এ পরিহাস সঙ্গত এবং পরিমিত নহে; এবং সেদিন প্রাতঃকালেও এরূপ পরিহাস করিলে অমলা অন্ততঃ মনে মনেও বিরক্তি বোধ করিত। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে প্রমথ তাহাকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ও মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সেই উপকারের মূল্য স্বরূপ আজ সে প্রমথকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজের অগোচরে মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং বহুমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ঠিক সেই রূপে, আজিকার এই প্রভূত উপকারের অনুপাতেই নিজেকে রিক্ত অথবা খর্ব্ব করিতে সে ন্যায়তঃ বাধ্য, এমনই একটা পরিশোধ-কল্পনা স্বতঃই তাহার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। তাই সে প্রমথর এই পরিহাস পরিপাক করিয়া কহিল, "লজেঞ্চুসের চেয়ে পাণ যদি আপনার মিষ্টি লাগে, তাহলে আপনার লজেঞ্চুস্ মিষ্টি নয়; নোন্‌তা।"

প্রমথ সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, আমার লজেঞ্চুস্ খুব মিষ্টি। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি পাণে চুণের বদলে চিনি দিয়েছ!"

এ কথায় অমলা হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর দিল, "তা হলে নিশ্চয়ই খয়েরের বদলে ক্ষীরও দিয়েছি!"

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে প্রমথ বলিল, "তা নইলে এত মিষ্টি লাগছে কেন? যে সেজেছে, তার হাতের গুণে? না, যে খাচ্ছে, তার মুখের গুণে?

এবার অমলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, এবং তাহার মুখের রেখা পাঠ করিয়া বিচক্ষণ প্রমথ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, প্রথম দিবসের পক্ষে ঔষধের মাত্রা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে, তাই প্রতিষেধ ক্রিয়ার জন্য তখনি কথাটাকে ভিন্ন মূর্ত্তি দিয়া বলিল, "আমার বাসার জগড়নাথের সাজা পাণ কি চমৎকার, তা' ত জান না, তা হলে বুঝতে পারতে! কোন দিন লাগে ঝাল, কোন দিন পোড়ে গাল! এক দিন তোমার জন্য দুখিলি পকেটে করে নিয়ে আসব; খেয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, তোমার পাণ মিষ্টি লাগছে বলে অন্যায় করেছি কি না!"

প্রমথর এই সামান্য একটু দুঃখের কাহিনী অমলার নারী-হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় জগন্নাথ ছাড়া আর কেউ নেই কি, যে একটু ভাল করে পাণ সেজে দেয়?

কোন স্থান গলিয়া কোমল হইয়াছে; এবং সাবধানে আঘাত দিতে পারিলে, ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিয়া লওয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রমথ মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "আছে; রায়ভদ্দর ঠাকুর আছে। কিন্তু পাণের দুঃখটাও আমি তারি হাতে পেতে চাই নে। দুনেই যে নিত্য পুড়িয়ে মারছে, চুণেও সে-ই পুড়োবে, তা আমার ইচ্ছা নয়।"

অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল রাঁধে না বুঝি?"

প্রমথ পুনরায় মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "বল ত এক দিন তাকে এখানে নিয়ে এসে রাঁধিয়ে দেখাই। তা হলে বুঝতে পারো, কি রকম কদাহারেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!"

ব্যথিত স্বরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় আর কেউ নেই?"

"বাড়ীতেই বা আর কে আছে যে, বাসায় থাকবে? শুনেছি, আমার যেদিন ষষ্ঠীপুজো হবার কথা ছিল, সেদিন মার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছিল! আর আমার বাবার ইতিহাস শুনবে? বছর পাঁচেক হোল নৌকো করে চুঁচড়োয় যাচ্ছিলেন আমার জন্যে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করতে; পাত্রীর বাড়ী পৌঁছিবার আগেই নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। এই ত, আমার আপনার লোক, বাসাতে আর বাড়ীতে! এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ অমলা, কত দুঃখে তোমাদের

কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি ? আর কেনই বা তোমার হাতের সুজা পাণ এত মিষ্টি লাগে ?"

অমলা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রভাবতী হস্তে জলখাবারের রেকাব লইয়া প্রবেশ করিলেন, এবং টেবিলের উপর তাহা স্থাপন করিয়া অমলাকে বলিলেন, "অমল, প্রমথকে এক গ্লাস জল দাও।"

প্রমথ জলখাবারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "মাসীমা, এত জলখাবার এখন যদি খাই, তা হলে আর বাসায় ফিরে গিয়ে কিছুই খেতে পারব না।"

প্রভাবতী কহিলেন, "না, একটুও বেশী নয়। বাড়ীর তৈরী খাবার, সবটুকু খেয়ে ফেল।"

অমলা জল আনিতে যাইতেছিল, প্রমথ ও প্রভাবতীর কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ প্রমথ দাদা রাত্রের খাবারও এখান থেকে খেয়ে যাবেন মা। ওঁর খাওয়ার যে রকম কষ্ট বলছিলেন, অন্ততঃ আজ রাত্রে রামভদ্দর ঠাকুরের রান্না ওঁর খাওয়া হবে না।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তাতে আমার আরও অসুবিধেই হবে অমলা। আজ মাসীমার হাতের রান্না খেলে, কাল সকালে আর রামভদ্দরের রান্না গলা দিয়ে গলবে না।"

"তা হোক!" বলিয়া অমলা জল আনিতে প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী বলিলেন, "সেই কথাই ভাল। জল খাওয়ার পর ইনি একবার তোমাকে ডাকছেন, কথাবার্ত্তা কইতে দেরী হয়ে যাবে। রাত্রে একেবারে খেয়েই যেয়ো।"

অমলা জল আনিলে সামান্য আপত্তি করিয়া প্রমথ জলখাবার খাইতে বসিল। খাইতে আরম্ভ করিয়া কিন্তু তাহার আর আপত্তির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বিনা বাক্যব্যয়ে দুই তিনটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "মাসীমা, তোমার এ ছেলেটি একটু বিশেষ রকম মিষ্টপ্রিয়! কলকাতায় এমন ভাল সন্দেশের দোকান নেই, যেখানে তার যাওয়া-আসা নেই। কিন্তু ভীম নাগই বল, আর যদু ময়রাই বল, কারো সাধ্য নেই যে তোমার তৈরী সন্দেশের মত সন্দেশ করে। সন্দেশের বিষয়ে এ সার্টিফিকেট আমার কাছে তুমি পেতে পার।"

এই প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত প্রশংসাবাদে মনে মনে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া প্রভাবতী ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিছু বলিলেন না।

নারী-প্রকৃতি বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, যে সকল পুরুষ কিছু আহার-প্রিয়, তাহাদের প্রতি সহৃদয়া নারীগণের একটু বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাত প্রকাশ পায়। এ তথ্যটুকু প্রমথ বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, রন্ধন-প্রিয়া স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে আহার বিষয়ে ঈষৎ লোভাতুরতা প্রকাশ করা। তাই সে নিঃশব্দে একে একে সব সন্দেশগুলি পরম পরিতোষ সহকারে নিঃশেষ করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "মাসীমা, লোভের মত পাপ নেই, তবুও আরো দুটো সন্দেশ না চেয়ে থাকতে পারছি নে। যদি থাকে—"

"ওমা, আছে বই কি! তুমি একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি" বলিয়া প্রভাবতী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন, এবং দুইটার পরিবর্ত্তে চারিটা সন্দেশ আনিয়া প্রমথর পাত্রে দিলেন।

রুচি অনুসারে প্রমথ মাংস-প্রিয়; সন্দেশ জাগোল্লার প্রতি বৈরীভাব না থাকিলেও, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ আসক্তি ছিল না। কিন্তু তাহার দুরদৃষ্ট বশতঃ আজ সন্দেশ দিয়াই তাহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। গলা দিয়া সন্দেশ আর সহজে নামিতেছিল না; কোন প্রকারে তিনটা শেষ করিয়া চতুর্থটা সুরেশের দিকে আগাইয়া দিয়া প্রমথ বলিল, "সুরেশ, একটা তুমি খাও ভাই। আমি এত লোভী যে, ভাল জিনিসে তোমাকে ভাগ না দিয়ে নিজেই সব খেয়ে ফেল্লাম!"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, সুরেশকে দেবার দরকার নেই; সুরেশ সন্দেশ খেয়েছে। তুমি ওটা খেয়ে ফেল।"

অমলা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া সুরেশের মুখে সন্দেশের জায়গাই নেই; লজেঞ্চুসে ভরা।"

অমলার কথায় প্রভাবতী টেবিলের উপরিস্থিত লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই সুরেশ এমন লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে রয়েছে! অত লজেঞ্চুস ওকে কেন দিয়েছ প্রমথ? ও লজেঞ্চুসের রাক্ষস! আজ বোতলটি শেষ করে তবে ঘুমোবে।"

অমলা সস্মিতমুখে বলিল, "মুখের মধ্যে বোধ হয় একেবারে গোটা পঁচিশ পুরেছে!"

অমলার কথা শুনিয়া জিহ্বার এক বিচিত্র কৌশলের

দ্বারা নিমেষের মধ্যে লজেঞ্চুস্‌গুলা বাম গালের এক দিকে ঠেলিয়া ধরিয়া হাঁ করিয়া সুরেশ বলিল, "কই গোটা পঁচিশ?"

সুরেশের ভঙ্গী দেখিয়া সকলে উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

প্রমথ বলিল, "তা যদি না থাকে, তাহলে সন্দেশটা তুমি খেয়ে ফেল সুরেশ।"

প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, না, সুরেশকে দিতে হবে না, তুমি ওটা খেয়ে ফেল।"

সুরেশের পক্ষ হইতে সন্দেশ খাইবার বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা গেল না; অধিকন্তু, সাত-আটটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া যেটুকু প্রসার লাভ করিয়াছে, পাছে একটা সন্দেশের জন্য তাঁহার কোন হ্রাস হয়, এই আশঙ্কায় প্রমথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বাকি সন্দেশটা কোন প্রকারে খাইয়া ফেলিয়া, জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া, একেবারে দুই-তিনটা পান মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "ডিস্‌পেপটিক যদি না হোতাম, তাহলে মাসীমার সব সন্দেশগুলাই আজ শেষ করে দিতাম। বাস্তবিক এমন চমৎকার হয়েছে!"

(৯)

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে, অমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমথ বলিল, "তুমিই এই হাঙ্গামাটি বাধালে!"

"কি হাঙ্গামা?"

"এই এত খেয়ে আবার রাত্রে খেয়ে যাওয়া!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে?"

প্রমথ কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় করিয়া লইয়া কহিল, "তাতে হয় নি কিচ্ছুই, শুধু তোমার হৃদয়ের একটু পরিচয় পেয়েছি! আমার খাওয়া-পরার এই তুচ্ছ দুঃখের কথা শুনে তোমার মন গলে গেল অমলা, আর আমার সারা দুঃখের কাহিনী যদি তোমাকে শুনাই, তাহলে তুমি যে কি কর, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে!"

কথাটা এমন কিছুই গুরুতর নহে; কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠের স্বর একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া, ঈষৎ ভারি গলায় বলিবার ভঙ্গীতে, এই সাদা কথাগুলার অর্থ এমন একটু রঙ্গীন এবং সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তরে কি বলিবে তাহা অমলা ভাবিয়াই পাইল না। অথচ কোন কথা না কহিয়া একেবারে নির্ব্বাক থাকা উত্তর দেওয়া অপেক্ষাও অশোভন হইবে মনে করিয়া, সে হঠাৎ সুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুরেশ, তোমার মাষ্টার মশায়ের অসুখ এখনও সারে নি?"

কিন্তু কথাটা বলিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল যে, এক ব্যক্তি যখন সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় সকাতর কণ্ঠে একটি চিত্তদ্রাবক প্রশ্ন করিয়াছে, তখন সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, অপর কোনও ব্যক্তিকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন একটি প্রশ্ন করিবার মত ধরা পড়িয়া যাওয়া আর কিছু হইতে পারে না। তাই সুরেশের মাষ্টারের শারীরিক সংবাদ শুনিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া, অমলা ঈষৎ আরক্তমুখে প্রমথকে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথকে ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য চাকর বামুন রাখলেই ত হয়।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ একটু হাসিল। অমলার মনের যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে বুঝিল যে ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা পুনরায় কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে, তাহার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বলে, নিজের আক্রমণ করিবার শক্তির তুলনায় অমলার প্রতিরোধ করিবার শক্তিকে এমন মাপিয়া লইয়াছিল যে, নিশ্চিন্ত মনে মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়াই দিল। সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসক যেমন ক্ষত পরীক্ষা করিবার জন্য লৌহ-শলাকা দিয়া ক্ষত স্থান বিদ্ধ করিয়া দেখে; তেমনি প্রমথ, অমলার চিত্ত কি ভাবে পরিণতি লাভ করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য, তাহাকে আরো একটু গভীর ভাবে বিদ্ধ করিল।

একটু হাসিয়া সে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথের দুঃখই আমার একমাত্র দুঃখ নয় অমলমণি, যে, তাদের ছাড়ালেই আমার সব দুঃখ যাবে! কুমীরে যাকে ধরেছে—দুটো কচ্ছপ তার দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বা কি, আর না নিলেই বা কি? কুমীরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পার অমলা?"

ত্রস্ত হইয়া অমলা শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমীর কাকে বলছ প্রমথ দাদা?"

অমলার প্রশ্নে ও সন্ত্রাসে হাসিয়া ফেলিয়া প্রমথ বলিল, "রামভদ্দর বা জগন্নাথের মত কোন লোককে বলছি নে।

কুমীর হচ্ছে আমার দুঃখ আর আমার অভাব, যা আমাকে ক্রমে ক্রমে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।"

অমলার একবার ইচ্ছা হইল যে জিজ্ঞাসা করে, তাহার দুঃখই বা কি, আর অভাবই বা কিসের। কিন্তু উত্তরে প্রমথ পাছে গুরুতর কিছু বলিয়া বসে, এই আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না। কোন কথা না বলিয়া প্রমথর দেওয়া লজেঞ্চুসের শিশিটা হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে দেখিতে লাগিল।

প্রমথ কিন্তু গুরুতর কথা বলিবার জন্য অমলার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকিল না। অমলার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল, "এই যে সন্দেশটা এত মিষ্টি লাগল,—এ কি শুধু ছানা আর চিনি কৌশলে মেশাবার গুণেই লাগল?—না, আরও কিছু তার সঙ্গে ছিল? তোমার সাজা পাণে যে চিনি দেওয়া ছিল বলছিলাম, সে কি বাজারে কেনা চিনি অমলমণি? সে চিনি তোমার মুখের মিষ্টি কথা, মিষ্টি হাসির চিনি! তোমার চোখের মিষ্টি চাহনির চিনি!"

প্রমথর কথাবার্ত্তার এই দুঃসাহসিকতায় অমলারা প্রাণের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। এ কি ধরণের কথা যে ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে না! কথার মধ্যে চিনির ছড়াছড়ি, তবু মিষ্ট লাগে না! তাহার পর এই অমলমণি বলিয়া সম্বোধন! তাহার এই সতের বৎসরের জীবনের মধ্যে যে আদরের সম্বোধন তাহার কোন আত্মীয়ই করিল না, দুই দিনের পরিচয়ের এই অর্দ্ধ-অপরিচিত ব্যক্তি কোন্ সাহসে, কোন্ অধিকারে তাহা করে? শুধু যে করে তাহাই নয়; এমন অবলীলাক্রমে করে যে তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে যাওয়ার সুবিধাই পাওয়া যায় না! সহজ ভাবে কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ সে কোনো এক মুহূর্ত্তে আপত্তিকর হইয়া উঠে; কিন্তু আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই পুনরায় সে সহজ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করে! কখন সে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা যেমন অনিরূপেয়, কখন সে নিবৃত্ত হইবে, তাহাও তেমনি অনিশ্চিত!

প্রমথর হস্ত হইতে, বিশেষতঃ প্রমথর জটিল ও কুটিল কথোপকথন হইতে, কি করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে, অমলা তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে প্রমথ নিজেই তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। রূপক চিনির আলোচনা হইতে সে একেবারে বাস্তব চিনির আলোচনায় আসিয়া পড়িল। সুরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "সুরেশের রুচি আমার রুচি থেকে কিছু বিভিন্ন হবারই সম্ভাবনা; সে হয় ত' হাসির চিনির চেয়ে শিশির চিনিই বেশী পছন্দ করবে। শিশিটা তাকে দাও।"

প্রমথর কথা শুনিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া আরক্ত মুখে অমলা তাহার হস্তস্থিত লজেঞ্চুসের শিশিটা সুরেশের সম্মুখে স্থাপিত করিল; তাহার পর এই প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে মনে মনে হৃষ্ট হইয়া স্মিতমুখে বলিল, "এরি মধ্যে অতগুলো লজেঞ্চুস শেষ হয়ে গেল সুরেশ?"

সুরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "অতগুলো কোথায়? কম ত!"

অমলা স্মিতমুখে বলিল, "কম যদি, তা হলে শিশি অত কমে গেল কেন?"

অমলার কথা শুনিয়া সুরেশ ব্যগ্র ভাবে একবার লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, অমলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি লজেঞ্চুস বার করে নিয়েছ?"

সুরেশের কথা শুনিয়া প্রমথ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। লজ্জারক্তমুখী অমলার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার ভয় নেই অমলা, তোমার স্বপক্ষে আমি সাক্ষী আছি। কিন্তু তোমার বয়স এখনও এমন হয় নি, যাতে তোমার ওপর সুরেশ এ অপবাদ দিতে না পারে।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অমলা সুরেশের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ভৎর্সনার সুরে বলিল, "বেশ ছেলে যা হোক! নিজে বসে বসে শেষ করছেন, আর পরের নামে দোষ!"

প্রমথ অমলার কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "এ তোমার অন্যায় অমলা! তুমি কি পর?"

অমলা হাসিয়া বলিল, "পর না হলেও অপর ত?"

এইরূপে তাহাদের কথোপকথন ক্রমশঃ সহজ সাধারণ প্রবাহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেদিন আর নূতন করিয়া কোন গোলযোগ বাধিল না।

রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ তাহার বাসায় ফিরিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]



কঙ্গো সর্দ্দার ও তাঁর কয়েকজন স্ত্রী

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মত কঙ্গো দেশ ভারতবর্ষের কোনও অঙ্গ নয়। এ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার



কঙ্গো বালা

(শরীর ক্ষত-বিক্ষত ক'রে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য দেহে চিত্র-বিচিত্র দাগ কেটেছে)

একটা অংশ—উপস্থিত বেলজিয়ম, পোর্ত্তুগাল, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বেলজিয়মের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ড্, নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও নিজ ব্যয়ে ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে তাঁদের ভাগের কঙ্গো প্রদেশে একটি ঔপনিবেশিক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ের ফলে পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই কঙ্গো দেশ য়ুরোপের অন্যান্য শক্তির অধীনস্থ উপনিবেশ সমূহের মত একটী উন্নতিশীল আধুনিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে বেলজিয়ান্ গভর্মেণ্ট নৃপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ড্‌ের হাত থেকে কঙ্গো রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করে সেখানে



রূপসী পল্লীবাসিনী

(ইনি শুধু সুন্দরী নন, অপূর্ব্ব নৃত্য-কৌশল-পটিয়সী। নাচের বেশে সজ্জিত হয়েছেন। হাতে ঝুমঝুমী, কোমরে ঘণ্টা; মুখের এক দিকে সাদা এক দিকে লাল রং মেখেছেন।)

রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নৃপতি দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সুশাসনে কঙ্গো দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তিনি পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই সেখান থেকে দাস-ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন, আরব অত্যাচারীদের দূরীভূত করেছিলেন। গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী এবং মদ প্রভৃতি আবগারীর চালান সেখানে একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি সে দেশে যাতায়াতের পথ সুগম করেছিলেন, এবং সেখানে সর্ব্বপ্রথম রেল লাইন বিস্তার করেছিলেন। বড় বড় নদীতে জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চলাচলের ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হবে বলে

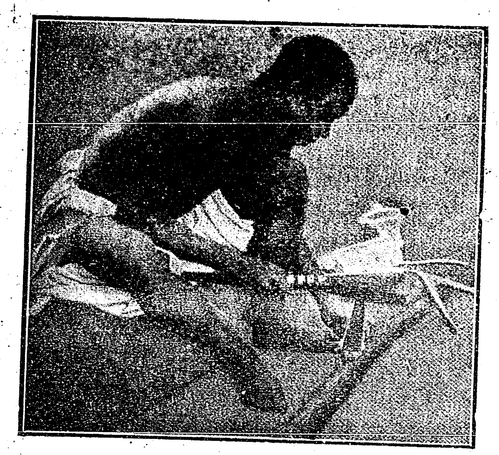

হাতির দাঁতের শিল্পী

সমুদ্রতীরে বন্দর নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেখানকার জমীতে তিনি কফি ও কোকো প্রভৃতির চাষ প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁর এই সব কাজের ফলে কঙ্গো আজ একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ হ'য়ে উঠেছে। বেলজিয়ান গভর্মেণ্ট তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আরও নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে এই উপনিবেশের উন্নতিসাধনকল্পে মনোনিবেশ করেছে। এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে এখানকার রাজকার্য্য পরিচালিত হ'চ্ছে যে, বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে বেলজিয়ম যখন শত্রু-করতলগত হ'য়ে পড়েছিল এবং সে দেশের রাজপুরুষদের পলায়ন ক'রে এসে ফ্রান্সের আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল, তখন কঙ্গোর এই ঔপনিবেশিক রাজ্যে কিন্তু এক দিনের জন্যও কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয়নি, বরং তাদের এখানকার ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনী পূর্ব্ব আফ্রিকা থেকে জার্ম্মাণীর আধিপত্য কেড়ে নিতে মিত্র শক্তিপুঞ্জকে আশাতীত সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধাবসানে শান্তি স্থাপনের পর, বেলজিয়ম তা'দের এই কঙ্গো দেশটাকে আফ্রিকার একটা আদর্শ প্রদেশে পরিণত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বেলজিয়ম আজ যে কাজের ভার স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, সে বড় অল্প ও সহজসাধ্য নয়।



সেকেলে যন্ত্রে সেকেলে শিল্প



গজদন্তের উপর পালিশ

প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত প্রদেশকে নানা দিক দিয়ে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে হ'বে। এ দেশের অসভ্য বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদের মানুষ করে তুলে সভ্যতার আলোকে





পছন্দ করে না। সুতরাং কঙ্গোর লোকসংখ্যা অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন কোটী আন্দাজ ধরা হয়।

এই তিন কোটী বা দু'কোটী লোক আবার এক জাতীয় বা এক শ্রেণীর নয়। এদের মধ্যে নানা বিভিন্ন শাখা আছে। সামাজিক ব্যাপার ছাড়া, আচারে ব্যবহারে বুদ্ধি বিবেচনায় তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। একদল হয়ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা গ্রহণের অনেকটা উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছে; আর একদল হয়ত একেবারে বন্য বর্ব্বরতার চরম অবস্থায় বিরাজ ক'রছে। তবে দু'দলই কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখে। তারা তাদের জাতের ভূতের ওঝাদের ভারি খাতির ক'রে। সেই ভূতের ওঝারা শ্বেতাঙ্গদের প্রতি মোটেই সদয় নয়। কাজে কাজেই তাদের সন্দেহ একেবারে দূর ক'রতে শ্বেতাঙ্গদের এখনও দীর্ঘকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে।

কঙ্গোর আদিম অধিবাসীদের অনেকেরই উৎপত্তি বান্তু-কাফ্রি বংশ থেকেই হ'য়েছে ব'লে নৃতত্ত্ববিদেরা নির্দ্ধারিত ক'রেছেন; এবং অল্পসংখ্যক নাউবা-কাফ্রীবংশ সমুদ্ভূত জাতও না কি একধারে আছে। সে





স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-শোভা

(শরীর ও মুখ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে এরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নানা বিচিত্র উল্কী ধারণ করে।)

পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বেলজিয়ম তার কঙ্গো রাজ্যের জমীর মাপজোক ঠিক ক'রে নিয়েছে বটে, কিন্তু সে দেশের লোক-সংখ্যা এখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি, কারণ আদিম কঙ্গোবাসীরা মানুষ গণনা করাটা একেবারেই

দেশে এখনও অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি যে একদল বামন জাতির অস্তিত্ব আছে, তারাই না কি আফ্রিকার প্রাচীনতম আদিম অধিবাসী বলে স্থির হ'য়েছে। কঙ্গোয় যে কয়টি প্রধান জাতির বাস, তাদের নাম যথাক্রমে বাঙ্গালা, বাটেক,

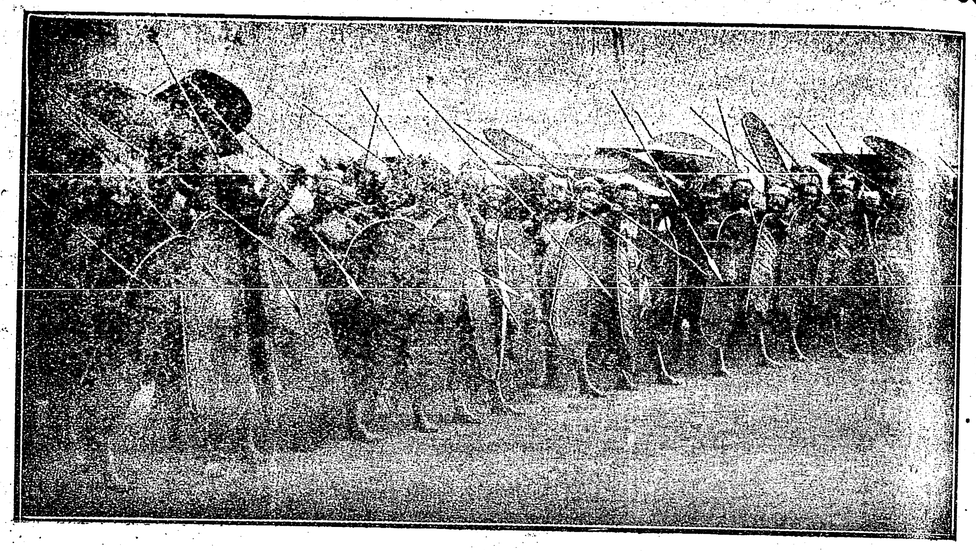

জান্দে যোদ্ধৃবৃন্দ

বায়াঙ্গী, বাম্‌বালা, বালুবা, বাটাটেলা, বাকুবা, বাকুতু, বাকোঙ গো, বাকুয়েন্দা, বাসুন্দী, বাজোক্‌ও বোলোকী। এই কয়টি



সুন্দরীর মুখ-শোভা

(দীর্ঘকাল ধ'রে ক্রমাগত অস্ত্রোপচারের পর অস্ত্রোপচার করে তবে এরা মুখের নানাস্থানে এই অতিরিক্ত মাংসপিণ্ডগুলির সৃষ্টি ক'রেছে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কি বীভৎস ধারণা!)

জাতের কোনটিই কিন্তু উত্তর-কঙ্গো বা পূর্ব্ব-কঙ্গোতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কঙ্গোর পূর্ব্বাঞ্চলে যেসব জাত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে, জান্দে, মোঙ্গো, মাঙ্‌বেটু—এই তিন দলই প্রধান। এ ছাড়া আর যারা আছে, তারা যে অঞ্চলে বাস ক'রে, সেই স্থানের নামে, কিম্বা যে সর্দ্দারের তারা দলভুক্ত, সেই সর্দ্দারের নামে পরিচিত হয়। বামনদের মধ্যে কাশাই প্রদেশস্থ বাতোয়া, বেলী অঞ্চলের টীক্‌টীকে, এবং উত্তর ইতুরী প্রদেশের ওয়াম্বুতীরাই প্রধান। রুয়ান্দা প্রদেশের রাক্ষস-রাজ মুশীঙ্‌গার প্রজাদেরও অনেকে পূর্ব্ব-কঙ্গোর বাসিন্দা। রুয়ান্দাবাসীরা সকলেই রাক্ষসরাজ মুশীঙ্‌গার ক্রীতদাস।

কঙ্গো নদীর বাম তীরবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বাকোঙ্‌গো, বাসুন্দী ও বাকুয়েন্দারা প্রাচীন কঙ্গোরাজের প্রজা ছিল, উপস্থিত তারা বেলজিয়ম ও পোর্ত্তুগালের অধীন হ'য়েছে। মুশারোঙ্গো বলে আর একটা সম্প্রদায়, যারা কঙ্গো নদীর দক্ষিণ কূলে বাস করে, তারা এখন ফরাসীদের অধীন। মুশারোঙ্গোরা বহুকাল ধ'রে শ্বেতাঙ্গদের সংস্পর্শে থাকায়, তাদের আদিম বর্ব্বরতা অনেকটা ঘুচে গেছে। এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাদের অপ্রীতির ভাবটাও অনেকটা কমে এসেছে। এদের সমাজে মেয়েদের স্থান খুব বড়। তারা, ক্ষেতের কাজকর্ম্ম যা'কিছু সবই করে, আবার দলের পঞ্চায়েতে যোগ দিয়ে সম্প্রদায়ের ভালমন্দ সম্বন্ধেও আলোচনা করে, আবার জগতের সব জাতের নারীদের মতই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা

এবং পাড়ার কোনও বাড়ীর নূতন কোনও কেলেঙ্কারী নিয়ে ঘটনা পাকিয়ে ফিশ্‌ফিশ্‌ গুজ্‌গুজও ক'রে। তারা মাঠের কাজে যাবার সময় ছেলেদের পিঠে বেঁধে নিয়ে যায়, সাপে কামড়াবার ভয়ে আর ছেলেধরার আশঙ্কায় ঘরে রেখে যেতে সাহস করে না। বাকোঙ্‌গোরা কোনও কালে কখনও নরখাদক ছিল না বলে, তাদের নরমাংসাশী প্রতিবেশীদের ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হয়। মেয়েদের ক্ষেতের কাজকর্ম্ম সেরে এসে আবার রান্নাবান্নার কাজও ক'র্‌তে হয়; কারণ, পুরুষেরা এই রাঁধাবাড়া কাজ-টাকে তাদের পক্ষে অসম্মানজনক ব'লে মনে করে।

বাতেকা, বায়াঙ্গী ও বাঙ্‌গালারা পাশাপাশি বাস করে।



কেশবিন্যাস

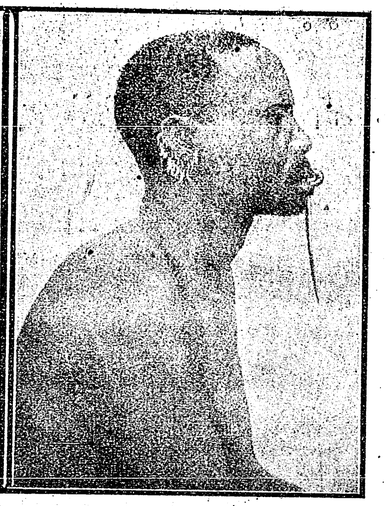

ওষ্ঠালঙ্কার





মাঙ্‌বেতু দম্পতী যুগল

কঙ্গো উপনিবেশের মধ্যে এই তিনটে জাতই সবচেয়ে খাসা! বায়াঙ্গীরা প্রাচীন-কাল থেকে নরখাদক ছিল বলে, এখনও যারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়, তাদের বন্দী করে ধরে এনে খেয়ে ফেলে! বাঙ্‌গালাদের লোক-সংখ্যা সব জাতের চেয়ে বেশী। সমগ্র কঙ্গো প্রদেশের মধ্যে এরা সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ও বুদ্ধিমান জাত। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা এরা খুব শীঘ্র আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে। এদের মধ্যে অনেকে ফরাসী ভাষাও বেশ শিখতে পেরেছে। ঔপনিবেশিক সৈন্যদলের এরাই প্রধান অবলম্বন। এরা 'ড্রিল' শিখ্‌তে ভারি ভালবাসে। দলে দলে এসে সৈন্য শ্রেণী-ভুক্ত হয় এবং খুব মনোযোগের সঙ্গে কুচ্‌কাওয়াজে যোগ দেয়। এরাও পুরাকালে নরখাদক ছিল, এখন কিন্তু সে লোভটা এদের মধ্যে আর একেবারেই নেই।

বোলোকীরা বাঙ্‌গালা-দেরই একটা শাখা বিশেষ। এরা সব একেবারে জন্ম-যোদ্ধা! লড়াই পেলে আর কিছু চায় না! যুদ্ধের নামে একেবারে মেতে ওঠে! এদের ছোরা আর বর্শা হ'চ্ছে প্রধান অস্ত্র। এরা অতি ভীষণ

প্রতিহিংসাপরায়ণ। আর একটা এদের পৈশাচিক দোষ ছিল, ক্রীতদাসদের মৃতদেহ ভোজন করা! অনেক সময় এদের নরমাংসলোলুপ রসনার পরিতৃপ্তির জন্য অনেক ক্রীতদাসকে অকালে প্রাণ দিতে হোতো। আজকাল এদের

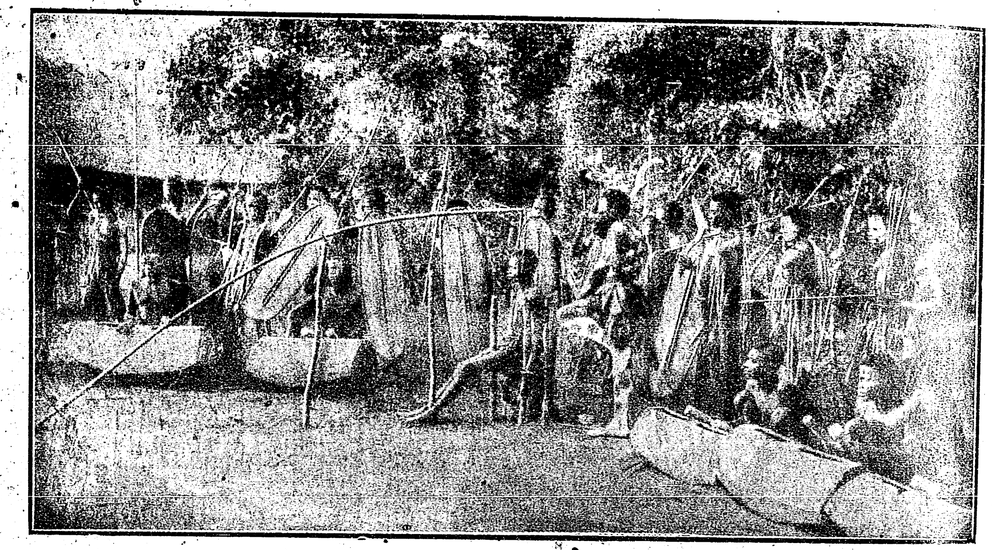

ফাঁসীর কাণ্ড

(অপরাধীর ফাঁসী হবার পূর্ব্বে ভূতের ওঝা এসে তার আত্মাকে মন্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট ক'রে, যাতে না সে প'রে প্রেত হয়ে এসে পল্লীতে উৎপাত করতে পারে। ফাঁসীর সময় ঘাতক অস্ত্রাঘাতে দণ্ডিত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করে, এবং বাদ্যকরেরা জোরে বাজনা বাজায় ও উচ্চৈঃস্বরে সুর করে অপরাধীকে অভিসম্পাৎ দেয়।)

সে পৈশাচিক অভ্যাসটা দূর হ'য়েছে। এখন আর চুরী করার অপরাধে এরা অভিযুক্ত ব্যক্তির নাক কাণ কেটে নেয় না; আগে এইটেই ছিল তাদের দেশের আইন। এদের সম্প্রদায়ের মেয়েরা ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয় গলায় এক প্রকাণ্ড পিতলের কণ্ঠহার পরে! এই কণ্ঠহার এক একটীর ওজোন অনেক সময় দশ সেরেরও বেশী হয়! পিতলের দণ্ড ছিল এদের পুরাকালের প্রচলিত মুদ্রা, এবং সেই দণ্ডই হ'চ্ছে এদের কণ্ঠহার নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। কাজেই যে লোকের স্ত্রীর কণ্ঠে যত বড় কণ্ঠহার দেখা যায়, সে তত বেশী ধনী বলে খ্যাত হয়।

বাঙ্গালাদের দেশের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে বাবুয়া, বারাম্বো ও মাঙ্‌বেতুরা বাস করে। এরা সকলেই আজ তিরিশ বছরের ওপোর হোলো বেলজিয়মের বশ্যতা স্বীকার করেছে। এর আগে তারা আরব দাস-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য ক্রমাগত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এসেছে। এই তিন দলের মধ্যে মাঙ্‌বেতুরা সবচেয়ে সুসভ্য হয়ে উঠেছে। এদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থাও বেশ সুনিয়ন্ত্রিত। প্রথমটা বেলজিয়মকেও এরা

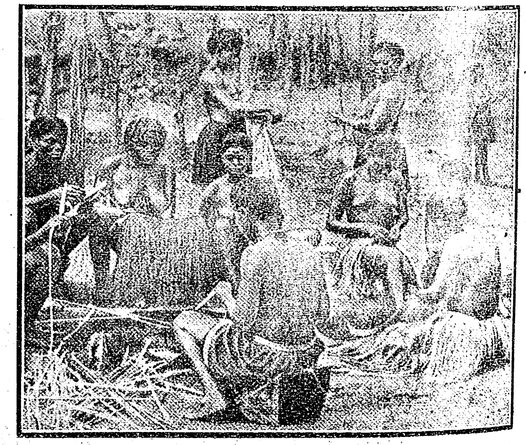

ডোম-সজ্জা

(ঝুড়ী-চাংড়ীও প্রয়োজন মত মেয়েরা নিজেরাই তৈরী করে।)

শত্রুর চক্ষে দেখতো; কিন্তু পরে বেলজিয়মের সঙ্গে এদের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বেলজিয়মের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিল তোমশাইনা নাম্নী একজন নারী সর্দ্দারণী। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী নারী

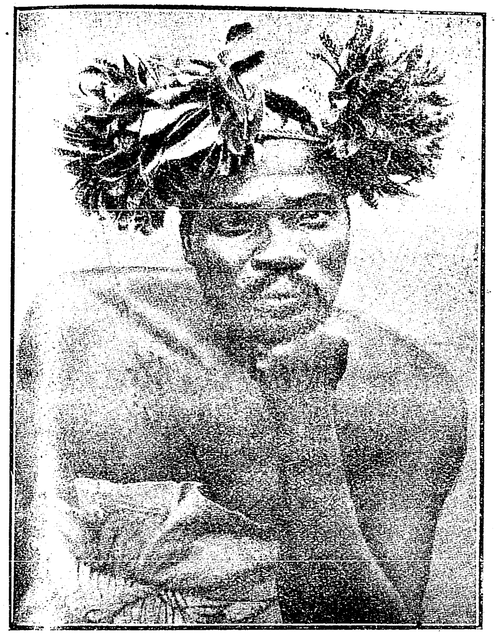

রাজা মাঞ্জিগা আভুঙ্গুরা

(ইনি একজন নামজাদা জান্দে সর্দ্দার। রাক্ষসরাজ উপ্‌বার পুত্র। উপ্‌বার ভীষণ নরখাদক ব'লে অখ্যাতি ছিল। এদের জাতটার হামাইং ও নিগ্রোর সংমিশ্রণে উৎপত্তি হয়েছে। এরা অতি ভয়ঙ্কর জাত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন।)



সুসজ্জিতা কঙ্গো সুন্দরী

(শিল্পীর হাতের তীক্ষ্ণধার ছুরি যে এঁর অঙ্গে এই বিচিত্র উল্কীর দাগ কেটে দিয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এঁর পরিহিত অলঙ্কারগুলি বিলাসিদের লোভনীয়। দু'দিন ধরে পরিশ্রম করে ইনি মাথায় চুলের কেয়ারা ক'রেছেন। তিন মাস আর মাথায় হাত দেবেন না।)

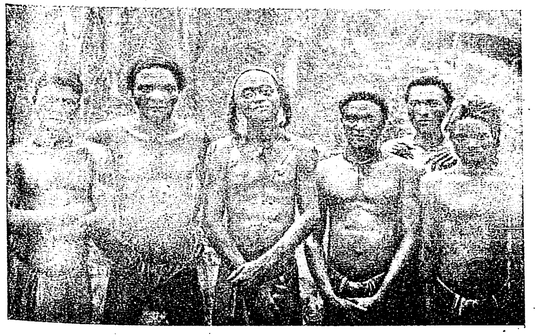

জংলী কাফ্রীর দল

(এদের ঠোঁট পুরু নয়, নাকও থাবড়া নয়। বেশ বুদ্ধিমানের মত চেহারা, অথচ এরা আফ্রিকারই জঙ্গলের অধিবাসী।)

তোমশাইনার অপ্রতিহত প্রভাবে মাঙবেতুরা বেলজিয়মের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য করতে বাধ্য হয়েছিল।

মাঙ্‌বেতুদের উত্তরে আর এক ভিন্ন জাতের আদিম অধিবাসীরা বাস করে তাদের নাম 'জান্দে' বা ন্যাম্-ন্যাম্। বাস্তু-কাফ্রিদের সঙ্গে এদের অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। এরা সকলে নাউবা কাফ্রী বংশ সমুদ্ভূত। এরা ভারি খাড়া লোক, এদের যে কথা সেই কাজ। "মরদ কা বাত হাতীকী দাঁত" এ প্রবাদ বাক্যটা এদের সমাজেই ঠিক বলা চলে। এরা অতি চমৎকার সৈনিক্। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই নিরামিষাশী, কেউ কেউ পাখী প্রভৃতি শিকার করেও খায়। এদের সমাজে

স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা খুব বেশী। এরা কেউ মেয়ে কেনা বেচা করে না। এদের মধ্যে সকলেই অতিরিক্ত গীতবাদ্য প্রিয়। জান্দের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে মাণ্ডোলীন্ (স্বরদের মত যন্ত্র)। এদের সর্দ্দার সুলতান শেমীয়ো একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও রাজনীতি বিশারদ পুরুষ। জান্দেরা অধিকাংশই এখন বোমুর উত্তরে ফরাসী রাজ্যে বসবাস করে।



রাজা আকন্দ

(উত্তর-পূর্ব্ব কঙ্গো অঞ্চলের ইনিই হ'চ্ছেন নরপতি। নৃত্য কলায় এঁর সমকক্ষ কেউ নেই। ইনি এই নর্ত্তকের বেশেই অধিকাংশ সময় সুসজ্জিত হয়ে থাকেন।)



রাণী নেন্‌জিমা

(ইনি নরমাংস ভোজী মাঙ্‌বেতুদের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী। এঁর যখন বিবাহ হয় তখন রাজার আরও ১৭৯টি রাণী ছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ বাগ্মিতার গুণে ইনিই সর্ব্বপ্রধানা হ'য়ে উঠেছিলেন। এঁর রাজ্য উপস্থিত বেলজিয়মের অধিকারে।)



রন্ধন-নিরতা কঙ্গো গৃহিণী

কঙ্গোর মধ্য প্রদেশে যেখান দিয়ে কাশাই নদী তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা—বিস্তার করে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, সেখানে বাবুন্দা, বাম্বালা, বাজোক, বাশোঙগো এবং বাঙ্‌কুতু জাতিরা বসবাস করে। এদের মধ্যে বাঙ্‌কুতুরা ছাড়া অপর' কটি জাত সবাই বেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কঙ্গো প্রদেশের এরাই হ'চ্ছে ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল!

বাবুন্দারা কাতারাক্ত অঞ্চলের বেশ সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে 'রবার' জিনিসটাই মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত। এদের যা কিছু কেনা বেচা সবই রবারের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। শরীরের গঠন হিসাবে এরা আফ্রিকার মধ্যে খুব সুপুরুষ জাতি; কিন্তু বর্ণের দিক দিয়ে মধ্য আফ্রিকার মধ্যে এরাই হ'চ্ছে সকলের চেয়ে কালো! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এদের সন্তান



খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সভ্য কঙ্গো সর্দ্দার ও তাঁর সবস্ত্রা পত্নীবৃন্দ



মৃতঃপুত যোদ্ধা

(বর্শা ও খড়্গধারী এই দুই বীরের গায়ে মুখে যে সব রং চং করা ফুলকাটা দেখছেন, এ সব শোভার জন্য নয়, যুদ্ধে অক্ষত থাকবার পক্ষে ওগুলি মন্ত্রঃপুত রক্ষা কবচ স্বরূপ।)

যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় তখন সেই সদ্যোজাত শিশুর বর্ণ থাকে একেবারে ধব ধবে সাদা! তার পর যতদিন যায়, ছেলে-মেয়েগুলি ক্রমে ততই কালো হ'য়ে যেতে থাকে! নিগ্রো-কাফ্রীদের অনেকেরই সদ্যোজাত শিশু গৌরবর্ণ হয়। বাবুন্দারা কেউ দল বেঁধে একত্র হয়ে গ্রামে বাস করে না, এদের একটা প্রধান বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে, এরা এক একটি পরিবার বিজন মাঠের মাঝ-খানে এক একখানি কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ-ভাবে বাস করে। বাম্বালারা এদেরই প্রতিবেশী। তারা পূর্ব্বাঞ্চলের কোয়াঙ্‌গো উপত্যকার বাসিন্দা। এরা সব কৃষী ব্যবসায়ী। এদের

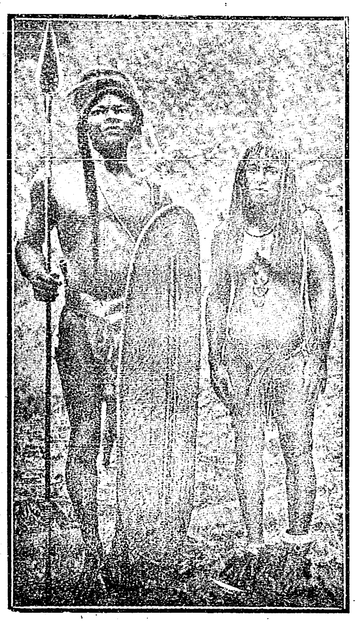

মোঙ্‌গো দম্পতী

(এরা জঙ্গলে বাস করে। যখন সহরে যাবার দরকার হয়, স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে আসে। স্ত্রীকে রক্ষা করবার জন্য স্বামী সশস্ত্র হয়ে আসেন।)

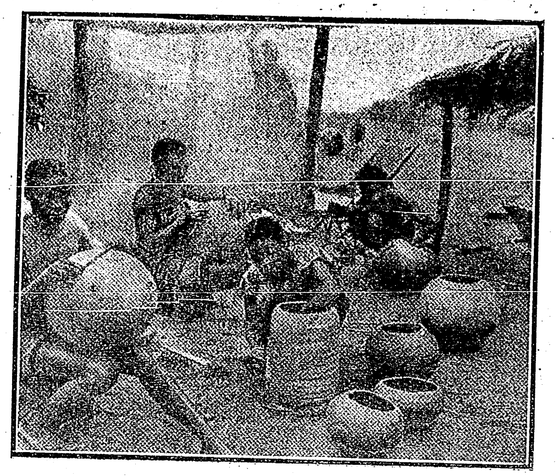

কুম্ভকার-শিল্প
(কঙ্গোর মেয়েরাই নিজেদের আবশ্যক হাঁড়িকুড়ি তৈরী করে নেয়।)

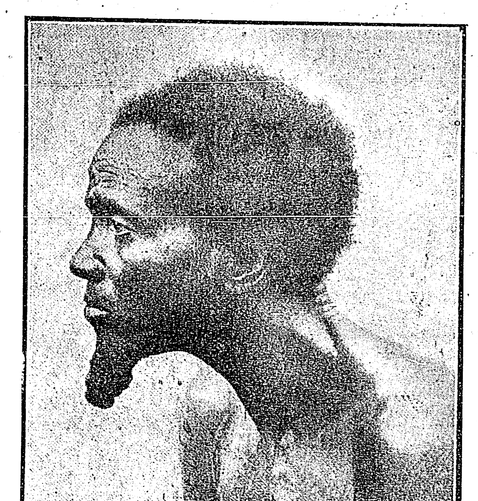

সর্দ্দারের দাড়ী
(সর্দ্দারের প্রকাণ্ড লম্বা দাড়ী বারোমাস গুটিয়ে পাকিয়ে ছোট্ট করে এঁটে রাখা হয়। কদাচ কখন পালা-পার্ব্বণে বা উৎসব উপলক্ষে সর্দ্দার তাঁর এই মূল্যবান দাড়ী সবটা খুলে বাহার দেন।)

বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। সবারই জায়গা-জমী, ক্ষেত-খামার আছে। এরাও খুব সঙ্গীতপ্রিয়। বাঁশের বাঁশী এদের চিরসঙ্গী। এরা আবার জুয়া খেলতেও ভারি ভালবাসে। এদের সব মুখে মুখে ছড়া গান কবিতা প্রভৃতি রচনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়! প্রতি দিন সন্ধ্যায় এদের গ্রামগুলি আমোদ-প্রমোদে আনন্দ-কলরবে, হাস্য-কৌতুকে, বাঁশীর তানে ও প্রেমের গানে মুখরিত হ'য়ে উঠে! এদের প্রধান অস্ত্র হ'চ্ছে তীর ধনুক। এরাও এককালে নরমাংস ভোজী ছিল, এখন অনেকটা বৈষ্ণব হয়ে এসেছে।

লুলুয়া উপত্যকায়—কাশাই নদীর একটি শাখা ও শাঙ্কুরু প্রদেশের মধ্যে—বালুবারা বাস করে। এদের এই অংশটুকুর জমী এত উর্ব্বরা যে, 'বীজ বুনলে সোনা ফলে' কথাটা এখানে খুব খাটে। কেউ কেউ বলে ওই জায়গাটুকুই ত হ'চ্ছে কঙ্গো দেশের মধ্যে অমরাবতী তুল্য! বালুবারা সকলে বেশ রাজভক্ত ও শান্ত প্রজা। বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্টকে তারা সম্পূর্ণ মেনে চলে। এদের মধ্যে অনেকেই নৌ-চালন বিদ্যায় বেশ সুদক্ষ।

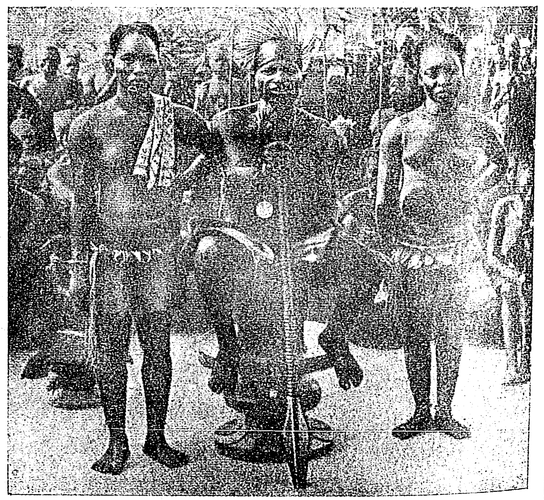

সর্দ্দার দাঙ্গা
(মাঙ্‌বেতুদের সর্দ্দার দাঙ্গা তার সিংহাসনে ব'সে আছে। দু'পাশে তার দু'টি তরুণী নারী রুক্মিণী দাঁড়িয়ে। শীঘ্রই এরা সর্দ্দারের পত্নীত্বলাভে সৌভাগ্যবতী হবে।)

ডোঙা, শাল্‌তী নৌকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ ক'রতেও এরা খুব সুদক্ষ।

বাঙ্গোক্‌রা এক রকম ব্যাধের জাত। তারা কেউ গৃহবাসী নয়, শিকার ক'রে ক'রে ঘুরে বেড়ায়। হাতী শিকার করতে এরা একেবারে সিদ্ধহস্ত। কেউ চাষবাস বা ক্ষেতের কাজের কোনও ধার ধারে না। কেবল হাতীর দাঁতের কারবারেতেই এরা বেশ ধনী হয়ে উঠেছে। এরা বড় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। সারা রাত জেগে ব'সে তাড়ী খায় আর ভারি হৈ চৈ করে। এরা এই তাড়ীটা আকের রস থেকেই তৈরী করে। এদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে বেশ বোঝা যাবে যে, এরা কেউ এখানকার আদিম অধিবাসী নয়, কোনও দূর বিদেশ থেকে এখানে এসে বসবাস করতে সুরু করে দিয়েছে। এদের চাল চলন অনেকটা বামন জাতিদের সঙ্গে মেলে।

বুশোঙ্গোরা—লৌকিক ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তাদের আধ্যাত্ম বিদ্যার জন্যই বিশেষভাবে পরিচিত। এরা সবাই একেশ্বরবাদী—এবং যে সব ন্যায়নীতির

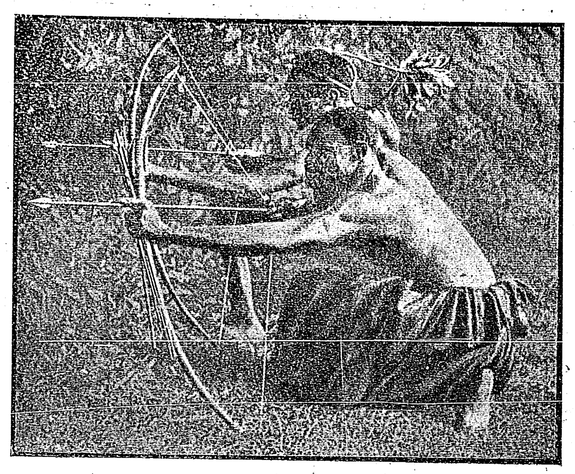

শিকারী সম্প্রদায়

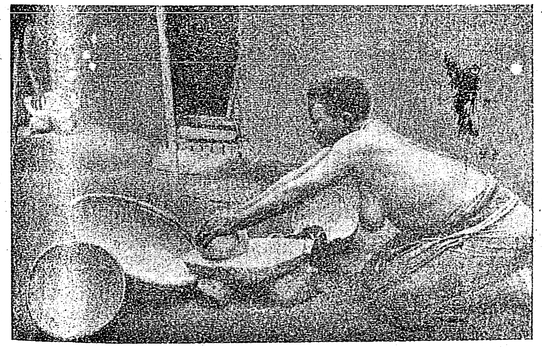

ধান ভাঙা
(এরা এখনও ঢেঁকী বা জাঁতার উদ্ভাবন ক'রতে পারেনি। শিলের সাহায্যেই ধান ভাঙে।)

অনুসরণ ক'রে চলে, তা সত্যই বিস্ময়কর। শিল্পবিদ্যায় তাদের অতুল প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে তাদের হাতের কাঠের খোদাই কাজে। এরা সবাই বেশ প্রতিভাবান তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিল্প ও সৌন্দর্য্যানুরাগী লোক।

উপরিক্ত চারটি উন্নতিশীল জাতির তুলনায় বাঙ্‌কুতুরা এখনও অনেক নিম্নস্তরে পড়ে আছে। মধ্য আফ্রিকার মধ্যে এরাই হচ্ছে সবচেয়ে নোংরা জাত। স্ত্রীপুরুষ কখন কেউ কোনও কালে স্নান করে না, মুখ ধোয় না। মেয়েরা সব মুখখানাকে কেটেকুটে এমন বীভৎস রকম কুৎসিত ক'রে তোলে যে, তাদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। এরা এখনও এদের কোনও ক্রীতদাসের মৃত্যু হ'লে তার মৃতদেহ ভক্ষণ করে। অনেক সময় নরমাংস লোভে তারা হয়ত তাদের কোনও প্রতিবেশীকে রাত্রের অন্ধকারে একা যেতে দেখলে গোপনে তার পশ্চাদনুসরণ ক'রে তাকে হত্যা ক'রে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলে। বাঙ্‌কুতুদের সঙ্গে বাপেন্দী সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে—কেবল একটা বিষয়ে তারা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী—সেটা হচ্ছে কুকুরের মাংস খাওয়া। বাপেন্দীদের কাছে কুকুরের মাংস পরম উপাদেয় ভোজ্য; কিন্তু বাঙ্‌কুতুরা কুকুরের মাংস একেবারে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। অথচ এই কুকুরের মাংস ছাড়া এ জগতে আর এমন কোনও পদার্থ নেই, যা বাঙ্‌কুতুরা অখাদ্য ব'লে মনে করে।

কঙ্গো দেশের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সেরা জাত হ'চ্ছে বাতাতেলারা। এরা বীরের জাত,

বেলজিয়মের সঙ্গে দীর্ঘকাল এরা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বার বার পরাস্ত হ'য়ে শেষে বেলজিয়মদের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে তাদের সঙ্গে একজোটে এরা আরবদের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রেছিল। এই নির্ভীক দুর্দ্ধর্ষ জাতের সাহায্যেই বেলজিয়ম আরব দস্যু ও দাসব্যবসায়ী-

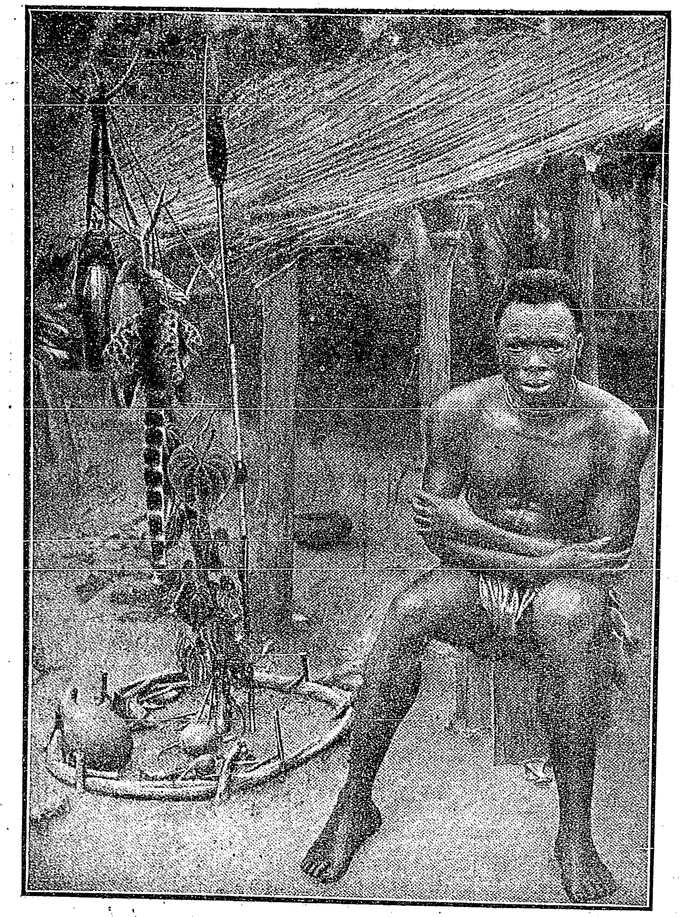

ভূতের ওঝা

দের দূরীভূত ক'রতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বেলজিয়মের সঙ্গে এদের মিত্রতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। বেলজিয়মের আইন অনুসারে নরমাংসভোজীর শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। বাতাতেলারা নরমাংসভোজী, বেলজিয়মের নিষেধ আজ্ঞা অবহেলা ক'রে তাদের সর্দ্দারেরা উৎসব উপলক্ষে নরমাংসভোজনের আয়োজন ক'রতো। বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্ট এই অপরাধে উপর্য্যুপরি তাদের জনকতক সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। এই ব্যাপারেই বাতাতেলারা বেলজিয়মের প্রতি যথেষ্ট বিরূপ হ'য়েছিল। তার উপর আবার তাদের সর্ব্বজনপ্রিয় প্রধান সর্দ্দার গঙ্গোলুতেট্‌কে যখন বেলজিয়ম বিশ্বাসঘাতকভেবে ভুল ক'রে অবিচার ক'রে ফাঁসি দিলে, তখন বাতাতেলারা একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লো এবং বেলজিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। এই বিরোধ এমন প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিল যে, বেলজিয়ম তার এই সাধের কাফ্রী উপনিবেশ প্রায় হারাতে বসেছিল। তিন চার বছর ধ'রে ক্রমাগত প্রাণপণ যুদ্ধ করে তবে বেলজিয়ম আবার দেশে শান্তিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাতাতেলাদের মধ্যে শিল্পানুরাগটা খুব প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। কারুকার্য্য ও কলা বিদ্যার প্রতি এদের কেমন একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। এদের সকলের বাসগৃহের ভিত্তিগাত্র নানা বিচিত্র কারুকার্য্যে সুশোভিত।

বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বেলজিয়ানরা আফ্রিকার জার্ম্মাণ অধিকার আক্রমণ ক'রে অনেকটা স্থান দখল করে নিয়েছে। বেলজিয়মের এই নূতন অধিকারের মধ্যে রুয়ান্দা প্রদেশের খানিকটাও তাদের দখলের মধ্যে এসে গেছে—এবং তাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই অংশটুকুই হচ্ছে আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে উর্ব্বর প্রদেশ। এই অংশটুকু আগে রুয়ান্দার প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি মুশীঙ্‌গার অধীনে ছিল। মুশীঙ্‌গার পূর্ব্বতন চার পাঁচ পুরুষ এই রাজ্যের অধীশ্বরত্ব ক'রে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মুশীঙ্‌গা এইবার সেই সিংহাসন পেয়েছে। কিন্তু তার রাজ্যের সবচেয়ে

উর্ব্বর অংশটুকু আজ বেলজিয়মের হাতে চলে গেছে বলে তাদের মধ্যে এখনও কোনপ্রকার মুদ্রার প্রচলন হয়নি।

মুশীঙ্‌গা অত্যন্ত দুঃখিত। মুশীঙ্‌গার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের সংখ্যা প্রায় বিশলক্ষ হবে। তাদের প্রত্যেকেরই ঘরে অন্ততঃপক্ষে একটি না একটি গরু এবং গোটাকতক ছাগল ভেড়া আছেই।

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে মুশীঙ্‌গার প্রজাদের মতন এমন সুশ্রী সুপুরুষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। যেমনি তারা সব ছ'ফুটেরও বেশী লম্বা (কেউ কেউ আট ফুট দীর্ঘাকারও আছেন) আবার তেমনি সব জোয়ানও বটে। অতি সুন্দর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ এদের। এমন আকৃতির মানুষ আজকাল আর বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এরা সকলেই ব্যায়াম কুচকাওয়াজ ও শক্তিসাধ্য ক্রীড়া কৌতুকের পক্ষপাতী। এরা আট দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যায়। ষাট

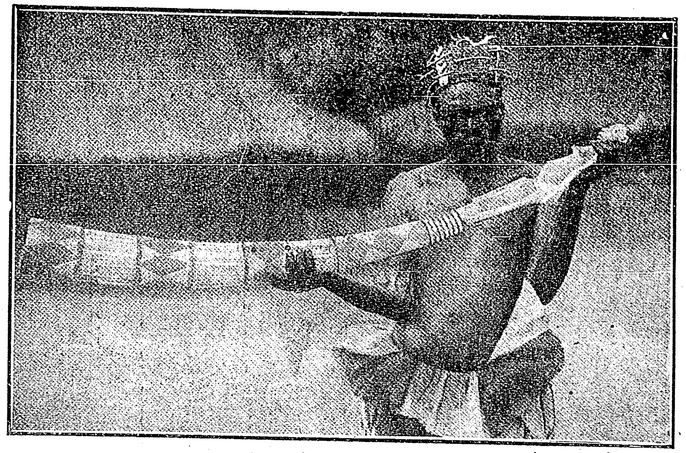

শৃঙ্গ-বাদক

(মাঙ্‌বেতুদের রাজসভায় যে শৃঙ্গ বাদক থাকে তার শিঙাটি একটি প্রকাণ্ড হাতীর দাঁতের তৈরী, তাতে আবার নানা বিচিত্র কারুকার্য্য করা।)

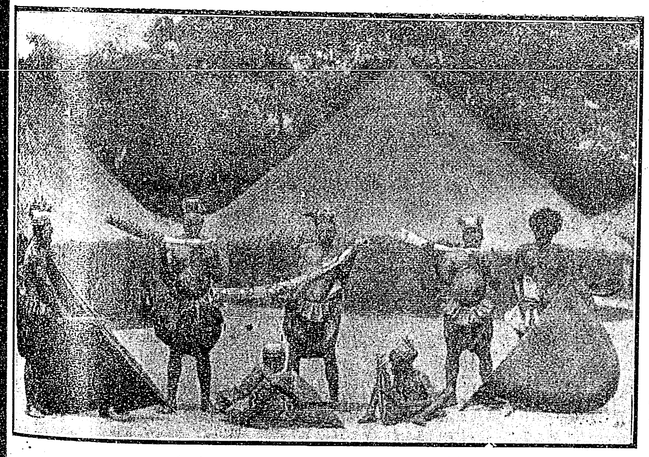

বাদ্যকরের দল

শিঙা, দামামা, জয়ঢাক, কাড়া প্রভৃতি এই বাদ্যকর সম্প্রদায়ের প্রধান যন্ত্র।)

গজ তফাৎ থেকেও বর্শা নিক্ষেপ ক'রে এরা লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারে। তাদের রাজা মুশীঙ্‌গাকে তারা সবাই পূজা দেয়—টাকায় নয়—জিনিসপত্র উপহার দিয়ে।' এরা মেনে নেবে। কি রাজকীয়, কি ধর্ম্ম সম্পর্কীয়, কি সামাজিক—সকল ব্যাপারেই রাজার মত সবার উপরে। কেবল রাজমাতা যিনি—তিনিই শুধু রাজাকে কোনও আদেশ করতে পারেন, অপর কোন লোকের সে অধিকার নেই। রাজমাতার অনুমতি ও উপস্থিতি বিনা কোন রাজারই রাজ্যাভিষেক ও মুকুটোৎসব সম্পন্ন হ'তে পারে না। যে রাজার আপন গর্ভধারিণী জীবিত নেই, তাঁকে রাজ্যাভিষেকের সময় অন্ততঃ একজন ধর্ম্মমাতারও শরণাপন্ন হ'তে হয়। কারণ রাজমাতার অবর্ত্তমানে তাদের রাজ্যাভিষেক বা মুকুটোৎসব একবারেই অসিদ্ধ।

আর একটি যে খর্ব্বাকৃতি বামন জাতির পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। তারা বামন হলেও কেউ চার ফুটের কম নয়। তারা সবাই শিকারীর জাত; কিন্তু নিগ্রোদের

মত তারা নোংরা নয়, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এরা মৃতদেহ সমাধিস্থ না করে আমাদের মত অগ্নি সৎকার করে। এদের মধ্যে কেউ কোনও পুরুষে কখনও নরমাংস ভোজন করেনি, এ খাদ্যটার প্রতি তাদের

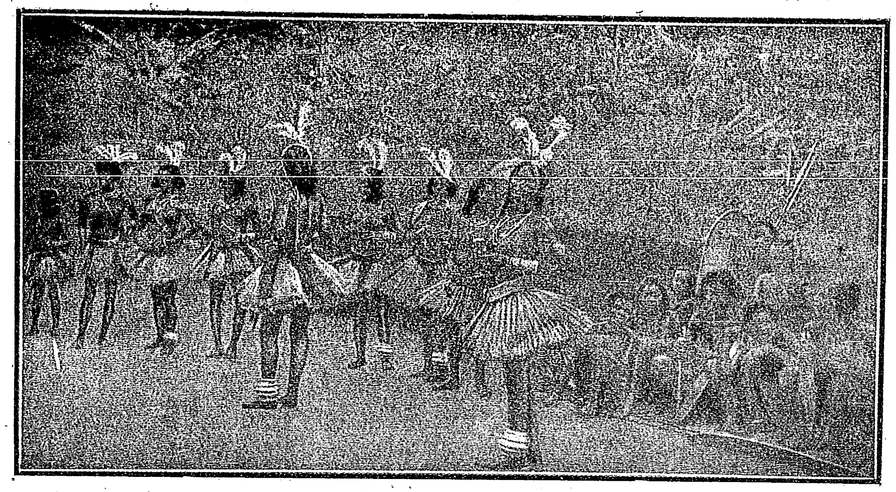

নিত্য-সন্ধ্যায় নৃত্য উৎসব

বরাবরই একটা অশ্রদ্ধা আছে। আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধাচরণ কেবল এই বেঁটের দলই কোনও দিন করেনি। এরা বরাবর তাদের সঙ্গে মিত্রতাই ক'রে এসেছে।



নৃত্যপরা নর্ত্তকীর দল

কঙ্গোর এই আদিম অধিবাসীদের সকলেরই সামাজিক আচার ব্যবহার প্রায়ই এক রকমের। ভূতের ওঝারাই একরকম এদের সমাজের ও ধর্ম্মের নেতা। তাদের এরা ভক্তি করে। ভূতের ওঝাদের এরা বলে "ঙ্গাঙ্গা"। "ঙ্গাঙ্গা" কথাটির মানে "সবজান্তা"। এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে ভূতের ওঝাদের কি রকম প্রতিপত্তি। ঙ্গাঙ্গারা শুধু ভূতের ওঝা নয়—তারা সব রকম বিদ্যেই জানে। তারা রোগের চিকিৎসাও করে, আবার আধিভৌতিক আধিদৈবিক ব্যাপারেরও তারাই পুরো-হিত। আজকাল কঙ্গোর কোনও কোনও অঞ্চলে এদের প্রতিপত্তি অনেকটা কমে আসছে। বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্ট এদের ও পেছনে একটু কড়া নজর রাখায় এদের ভূতুড়ে ক্রিয়াকাণ্ডগুলো এখন অনেকটা গোপনেই সম্পন্ন হয়।

নরমাংস ভোজন স্পৃহা এদের মধ্যে খুব দ্রুত কমে আসছে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে, মানুষে মানুষের মাংস খায়, এমন মানুষ আর এ দেশে থাকবে না। এরা ক্রমেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। বহুবিবাহ প্রথাটাও এদের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। মেয়েরা এখন আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে চাচ্ছে না, তারা



বামন যোদ্ধার দল

কাপড় প'রতে শিখছে। পুরুষেরাও তাদের বন্য বর্ব্বরতা ছেড়ে আস্তে আস্তে ভদ্র গৃহস্থ হয়ে উঠছে। তারা অনেকেই রবি, কোকো, তুলো, তামাক, রবার প্রভৃতির চাষবাসে মন দিচ্ছে। লুটপাট, খুন, দাঙ্গা এসব এখন অনেক কমে গেছে; বেলজিয়মের সুশাসনে, আশা করা যায়, কঙ্গোদেশ শীঘ্রই পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের সঙ্গে সমান হ'য়ে উঠবে।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৭)

বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি,—তুমি আলি মহম্মদ!

আলি মহম্মদ পথের জনস্রোতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

কিন্তু এ বেশে ত তোমায় মসজিদে যেতে দেবে না।

বোধ হয় দেবে না, আপনি চলুন আমার বাড়ীতে,—

সহসা সম্মুখে একজন শুভ্র বোরখাবৃতা নারী আসিয়া দাঁড়াইতে দুইজনে একটু চমকিয়া চাহিল। এ নারী যেন তাহাদের পথ রোধ করিতে চায়। শঙ্কর তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হওয়াতে, নারীটি পিছনে একটু সরিয়া গেল। দুইজনে এবার একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, কোথায়,—তোমার বাড়ী?

হাঁ, আমার বাড়ী বেশী দূর হবে না। আমার বোন আপনাকে দেখলে ভারি আনন্দিত হবে, সে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্র পড়েছে—

কিন্তু দেখো—

না, আজ আমি কোন আপত্তি শুনব না—

শঙ্কর আপত্তি করিল না, ধীরে আলি মহম্মদের সহিত চলিল। শঙ্করের কাছে এ দিনটি বড় বিচিত্র বিস্ময়কর লাগিতেছিল। বিশ্ববিধাতা যেন তাহার চোখের সম্মুখে কোন রহস্যময় যবনিকা তুলিয়া কি আশ্চর্য্যকর লীলা দেখাইবেন; আর আলি মহম্মদের কাছে এ প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক, পথের জনস্রোত, চারিদিকে আনন্দ কল্লোলময় জীবনধারা বড় মধুর অনির্ব্বচনীয় লাগিতেছিল। এক তরুণীর প্রেমদীপ্ত নয়নের চাউনিতে তাহার কপোলে আজ জ্যোতির্ম্ময় টীকা জ্বালা, এই হিন্দু তরুণীর প্রতি তাহার প্রেমের হোমানলে তাহার মাতৃ-পূজার জীবন-নৈবেদ্য পুণ্যময় হইয়া উঠিল। দুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, তাহাদের পেছন পেছন যে একটি বোরখাবৃতা নারী আসিতেছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না।

বাড়ীতে আসিয়া শঙ্করকে নিজের ঘরে বসাইয়া আলি ডাকিল, শিরিণ! শিরিণের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ঘর হইতে বাহির হইয়া আলি দেখিল, দূরে যমুনার দিকে বারান্দার কোণে শিরিণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া ধীরে আবার ডাকিল—শিরিণ—

দাদা! বলিয়া শিরিণ চমকিয়া উঠিল। দাদা, কোন দিক দিয়ে তুমি এলে?

বাগানের দিকের সুড়ঙ্গটা দিয়ে এসেছি, কাঁদছিলে কেন?

হাঁ, দাদা, তা'রা কোথায় চলে গেল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কা'রা?

সে তোমায় বলব'খন, কিন্তু ছেলেটার জ্বর রয়েছে, তাকে নিয়েই পাগলীটা চলে গেল—জানো দাদা, ছেলেটা কাল বিকারের ঝোঁকে ডুবে মরতে যাচ্ছিল—

এ করুণাময়ীর অন্তর-ব্যথার কথা আলি বিলক্ষণ জানিত। সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া আলি বলিল,—চল শিরিণ দেখবে, কাকে আজ নিয়ে এসেছি—

কে দাদা?

কে জানিস, শঙ্কর পণ্ডিত—

তিনি, সত্যি!

হাঁরে, আমি বল্লুম, আমার বোন খুব শাস্ত্র জানে, আপনার সঙ্গে তর্ক করবে, চলুন—

দাদা!

চল, আমার ঘরে বসে আছেন।

হাল্কা মেঘের এক পশলা বৃষ্টির পর শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের মত শিরিণের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে ধীরে বলিল,—আমি কিন্তু শুধু তাঁকে প্রণাম করে চলে আসব, কথা কিছু বলতে পারব না।

আচ্ছা আয় ত—

ঘরের প্রায় সম্মুখে আসিয়া দুইজনে থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের সিড়ি দিয়া একজন বোরখাবৃতা নারী উঠিয়া আসিতেছে। নারীটি উঠিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে, আলি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল, এই নারীই ত পথে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিরিণ একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, কে বহিন?

নারী হাসিয়া বলিয়া উঠিল—কি আলি, চিনতে পাচ্ছ না?

একটু ভীত ক্রুদ্ধ ভাবে আলি চাহিয়া রহিল!

এতক্ষণ পেছন পেছন এলুম, চিনতে পার্লে না?

গলার স্বরটা যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে—

মনে হচ্ছে! এ গলার গান শুনতে যে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ, তাও মনে হচ্ছে কি?

তুমি!

হাঁ, যার গান তুমি মদের চেয়েও ভালবাসতে—

ভীত ব্যথিত কণ্ঠে আলি মহম্মদ বলিল—তুমি, জামেলা!

ধীরে মুখের আবরণ খুলিয়া ক্রুর হাসিয়া জামেলা বলিল,—হাঁ, সেই রকমই ত মনে হচ্ছে—

করুণ কণ্ঠে আলি মহম্মদ বলিল—তুমি কেন এলে? তুমি যাও!

তাহার ভোগবিলাসের জীবনের এক জ্বালাময় স্মৃতি, তাহার যৌবনলালসার মাদকতার বহ্নিশিখা কেন আবার মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিল, আলি মহম্মদের ভয় হইল, বুঝি আপনাকে সে দমন করিতে পারিবে না।

ম্লান হাসিয়া জামেলা বলিল—কেন এলুম? মনে আছে বলেছিলে তুমি রাজা হলে আমায় রাণী করবে, সেইটা মনে করিয়ে দিতে এলুম—

অনুনয়ের সুরে আলি বলিল—তুমি যাও—

এবার ব্যথার সুরে জামেলা বলিল—হাঁ, যাবো, কিন্তু

জানো, তুমি চলে যাবার পর, তোমায় আমি কেবল খুঁজেছি আর খুঁজেছি। সবাই বল্লে, তুমি মরে গেছ, কিন্তু আমি আমার অন্তরে জানতুম তুমি মরোনি, আজ তাই দেখতে এলুম, নিজের মনের কাছে প্রমাণ দিতে এলুম, তুমি সত্যি বেঁচে আছো, সে আমায় মিছিমিছি ভুলোয়নি—আজ আল্লা—

জামেলা!

কি?

চুপ করো—

কেন—

বস্তুতঃ আলি মহম্মদ নিজের অন্তরের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, মনের সদ্যজাগ্রত তৃষ্ণা বেদনাকে একেবারে মূক করিয়া দিবার জন্য সে বিষসিক্ত সুতীক্ষ্ণ বাণটি নিক্ষেপ করিল; ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—তুমি বাইজী!

জামেলার মুখ কালো হইয়া গেল, সে উদ্দীপ্ত অগ্নির মত বলিয়া উঠিল—হাঁ, বাইজী, কিন্তু এই বাইজীর জন্য তুমি—

বলিতে বলিতে জামেলা আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ হইতে কে ভাষা কাড়িয়া লইল! শঙ্কর আসিয়া তাহাদের সম্মুখে ধীরে দাঁড়াইল; এই প্রসিদ্ধা গায়িকার কণ্ঠ সে মূক করিয়া দিল। জামেলা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণটির দিকে চাহিল, এই পণ্ডিতটিকে সুমিষ্ট ভাষায় বহুক্ষণ গালাগাল দিলে যেন তাহার মনের শান্তি হয়, কিন্তু কথা ফুটিল না।

স্নিগ্ধকণ্ঠে শঙ্কর বলিল—মা, তুমি আজ আলিকে ক্ষমা করে যাও, ওকে আজ আমাদের দরকার, ও ভারত মায়ের কাছে আপনাকে দিয়েছে—

ক্রোধ-অভিমান-ক্ষুব্ধ চোখে জামেলা একবার শঙ্করের দিকে চাহিল। তার পর তাহার জ্বালাময় মুখ স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। তার পর কান্নার সুরে সে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমি? আমার কি হবে?

কি চাও তুমি মা?

আমি শান্তি চাই—

শান্তি? ভোগের জীবনে শান্তি নেই। যদি সব ত্যাগ করতে পার, জীবন উৎসর্গ করতে পার, শান্তি পাবে—

বেশ, আমাকে সেই পথ বলুন—

এখন তুমি ঘরে যাও মা, এখন তোমার মন বড় চঞ্চল—

ঘর! আমার কোথায় ঘর? বলিয়া জামেলা ক্ষিপ্তার ন্যায় যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল সে সিঁড়ি দিয়া চঞ্চলপদে নামিয়া চলিয়া গেল।

শঙ্কর ধীরে ধীরে বলিল—দেখ, আলি, ও কোথায় গেল।

আলি মহম্মদ ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শিরিণ এককোণে একটি লতার মত দাঁড়াইয়া দৃশ্যটি দেখিতেছিল ও মাঝে মাঝে ব্যথায় কাঁপিতেছিল। শঙ্কর নিমেষের জন্য তাহার দিকে চাহিল, সরল করুণ চোখ দুইটি তাহার বড় মধুর লাগিল, সে যে তারাদের প্রতি চাহিয়া রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে, ঠিক সেই তারাদের মত তাহার চোখ দুইটি, জামেলার পাশাপাশি ইহার রূপ যেন অপূর্ব্বরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জামেলা যেন উল্কা, পূর্ণিমা রাত্রে বাগেশ্রী, বসন্তের রক্তজবা—আর শিরিণ যেন শুকতারা, ভোরের পূরবী, শরৎ প্রভাতের শুভ্র পদ্ম। নিমেষের জন্য চাহিয়া শঙ্কর আবার ঘরে ঢুকিল; কিন্তু শঙ্কর যদি ভাল করিয়া শিরিণের মুখ দেখিত, তবে দেখিতে পাইত সে পবিত্র শুভ্র মুখ প্রেমের আগুনে একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, শুধু ভক্তি শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, প্রেমের স্পর্শে অন্তর-আকাশ শরৎ ঊষার পূর্ব্বাকাশের মত সোনায় সোনা হইয়া উঠিতেছে।

(৮)

তিন দিন পরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে, শঙ্কর একা স্তব্ধ বসিয়া ভাবিতেছিল। প্রথম যেদিন ভারত-সিংহের সহিত দেখা হইয়াছিল, পুরাতন দিল্লীর ভগ্ন স্তূপের প্রায় সেই স্থানেই সে বসিয়া ভাবিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি রশ্মিশিখা সে যেন আপনার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছিল, এই সন্ধ্যার রক্তিম মায়ার মত যে মোগল-মহিমা ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছে, এই বিপ্লবের অন্ধকারে নবজীবনের অগ্নি তাহাকেই জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, তিমির-রাত্রি-শেষে জ্যোতির্ম্ময় জাগরণের বাণী

তাহাকেই বলিতে হইবে। হাঁ, সে শুধু একজন জ্যোতিষী, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়, আজ তাহারি হাতে ভারতভাগ্য-বিধাতা নবজীবনের অগ্নি প্রদীপ দিয়া দিয়াছেন, তাহারি স্পর্শে দিকে দিকে ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে সকলে জাগিয়া উঠিবে। সে শুধু এক সামান্য ব্রাহ্মণ শঙ্কর নয়, সে বিধাতার হাতের জয়শঙ্খ, তাঁহার উদ্যত বজ্র, এ রক্তের বিপ্লব-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে শান্তির সাম্রাজ্য-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে, সে তাহারি বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। শঙ্কর এরূপ ভাবে কোন দিন আপনাকে অনুভব করে নাই, তাহার যেন কোন অপূর্ব্ব সুখজ্বালাময় স্বপ্নের জীবন আরম্ভ হইল। সে আর যেন সহজ স্বাভাবিক রহিল না। আজ ভ্রাতৃদলের গুপ্ত সভায় সে কি বলিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। কোন দিকে পথ? ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা গভীর অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে, নাদির শাহ লাহোর অধিকার করিয়া দিল্লীর দিকে আসিতেছে, কে তাহার পথরোধ করিবে! আমীর-উল্-ওমরা খাঁ দুরাণ তাহার পথরোধ করিতে গিয়া বার বার স্বয়ং বাদশাহকে আসিতে বলিতেছে; এ নাদির যদি দিল্লী অধিকার করে তবে মোগল সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। তার পর?

অদূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হওয়াতে শঙ্কর একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার স্বপ্নের ঘোর কাটিল না। রাজপুতবেশী আলি মহম্মদ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে সে উৎসাহের সহিত উঠিয়া আলি মহম্মদকে ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল,—ভারতসিংহ, তুমি! হাঁ, তুমি পারবে, তুমি আলি মহম্মদ নও,—

কিন্তু—

তাহার দুই হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া শঙ্কর বলিল—হাঁ, তুমি জান না তুমি কে!

শঙ্করের মুখে চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিতেছে, তাহার দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আলি মহম্মদ প্রথমে অবাক হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে হাতের স্পর্শে চক্ষের চাউনিতে যেন মন্ত্রাহত হইয়া গেল, তাহার মনে হইল সত্যই সে আলি মহম্মদ নয়, সে জানে না সে সত্যই কে! হয় ত সে সত্যই ভারতসিংহ।

শঙ্কর ধীরে বলিল—চলো, তোমার কথা আজ ভ্রাতৃদলকে বলব। ছদ্মবেশে শঙ্করের সহিত আলির একটুও ভয় করিল না।

ভগ্নস্তূপের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া দুইজনে মাটির তলে এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। এখানে ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের গুপ্ত সভা হয়; মারাঠা, রাজপুত, শিখ, বাঙ্গালী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সকল হিন্দু যুবক এ সম্প্রদায়ের সভ্য; এই ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে একতা আনিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। এক বৎসর পূর্ব্বে আলি ইহাদের সম্প্রদায়ে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছে ও নিজ গুণে বুদ্ধিতে তাহাদের দলপতি হইয়াছে। সকলে ভারতসিংহ ও শঙ্করের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা দুইজনে প্রবেশ করিতে সকলে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। শঙ্কর আজ কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না, সে ভারতসিংহকে পাশে লইয়া এক উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়াইয়া সকলকে বসিতে বলিল, তার পর দীপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল—ভাই সব, আমি দেখতে পেয়েছি—

তাহার মুখ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃমণ্ডিত হইয়া উঠিল, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত তাহার মুখ হইতে প্রতি কথা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল—আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে পরমাশক্তি অবতীর্ণা হয়েছেন, তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে যে শক্তি দিয়ে রামচন্দ্র রাবণকে মেরেছিলেন, যে শক্তি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে ধ্বংস করেছিলেন, যে শক্তি দিয়ে অর্জ্জুনসখা কুরুক্ষেত্রে জয় করেছিলেন, সেই শক্তির অংশ তোমরা, তুমি অজিত সিং, তুমি অরুণ সিং, তুমি ভারত সিং, তুমি রাজশেখর, তোমরা ইন্দ্রের বজ্র, তোমরা সুদর্শন চক্র,—এই অন্ধকার প্রাঙ্গণে এক কোণে এই প্রদীপটি যেমন জ্বলজ্বল করছে, তেমি তোমরা প্রতিজন নবশক্তির প্রদীপ, তোমাদের শিখা দিকে দিকে জ্বলে উঠবে—

প্রতিজন অনুভব করিতে লাগিল, সত্যই তাহারা নব-জীবনের বাহক।

উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগে শঙ্কর বলিয়া যাইতে লাগিল—সেই বিচিত্রকর্ম্মা অপূর্ব্ব শক্তি আমি তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এ শক্তিকে সংহত করতে হবে, সংযত করতে হবে, এক করতে হবে—এক করতে হবে—এক সঙ্গে কি আমাদের প্রতিজনের তরবারি শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্কাষিত উদ্যত হয়ে উঠবে না—

মন্ত্রমুগ্ধ ভ্রাতৃদল মুখে কোন উত্তর দিতে যেন পারিল না, প্রত্যেকে আপন আপন তরবারি খাপ হইতে খুলিয়া হাতে ধরিয়া সম্মুখে নাচাইতে লাগিল, প্রদীপের কম্পিত আলোক তরবারিগুলির ওপর সাপের ফণার মত খেলিয়া গেল। শঙ্কর একটু শান্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—এখনও তরবারি খোলবার সময় আসেনি—এখন সাধনায় শক্তি সংগ্রহের সময়—এখন যেন আমরা বিরোধ না করি—ভারত সিং তোমার কি বলবার আছে?

সকলে একটু বিস্মিত হইয়া ভারতসিংহের দিকে চাহিল। ভারত সিং স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সে অনেক কথা বলিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল। সে কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু ধীরে বলিল—আমি আলি মহম্মদ। সকলে অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল, ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ভারতসিংহ আবার ধীরে বলিল—যে আলি মহম্মদের নাম তোমরা সবাই শুনেছ, আমি সেই আলি, ছদ্মবেশে তোমাদের মধ্যে এসেছি—

সকলে একটু ক্ষুব্ধ স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু ভূতপূর্ব্ব দলপতি অজিত সিং বলিয়া উঠিল—তুমি মুসলমান!

শঙ্কর একটু ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাঁ, মুসলমান, কিন্তু ভাই আমাদের ধর্ম্ম কি? একমাত্র দেশ সেবাই কি আমাদের ধর্ম্ম নয়—আমাদের কি জাত? সমস্ত দেশসেবক ভাইয়েরা কি এক জাত নয়—কে আমাদের আত্মীয় বন্ধু, কোথায় আমাদের ঘর? ভারতের প্রতি সন্তান কি আমার ভাই নয়—বলিয়া শঙ্কর ভারতসিংহকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের কথায় ব্যবহারে সকলে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। যেন তাহাদের সম্মুখে একটা ভোজবাজী হইয়া গেল। আলি মহম্মদকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সকলে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সে দিনকার সভা শেষ হইল।

সভার শেষে শঙ্কর ও আলি মহম্মদ আবার বাহিরে ভগ্নস্তূপের মধ্যে আসিয়া বসিল। মৃদু জ্যোৎস্নার আলো, মধুর বাতাস বহিতেছে, চারিদিকে জ্যোৎস্নাময় অন্ধকারের বিচিত্র মায়া। আলি মহম্মদ এ নির্জ্জন উন্মুক্ত আকাশের তলে আপনাকে যেন খুঁজিয়া পাইল, শঙ্কর এতক্ষণ তাহাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল, সে যেন অলৌকিক শক্তি জানে, তাহার মায়ার বলে সে কিছুই বলিতে বা করিতে পারে নাই। শঙ্করের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখের সে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। ধীরে সে বলিল,—কিন্তু, আমি কাল যাচ্ছি—

কোথায়?

আমি ত ভুলতে পাচ্ছি না, আমি মুসলমান—

তোমায় ত আমি ভুলতে বলিনি, তুমি মুসলমান, এই তোমার সত্য পরিচয় নয়, তার চেয়েও বড় তুমি, তুমি ভারতের—

তাই আমি যুদ্ধে যেতে চাই, আজ ভারতের রাজধানী কি বিপন্ন নয়, আজ ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের কি দুর্দ্দিন আসেনি?

হাঁ, আজ ঝড় উঠেছে, তাসের ঘর বুঝি টেঁকে না—কিন্তু দেখো কি শান্ত আকাশ, ওই তারাটার নাম জানো, ওই দূরে জ্বল্ জ্বল ক'রছে—

না, শুনুন আপনি, কাল দিল্লীর বাদশা স্বয়ং যাচ্ছেন নাদিরের পথরোধ করতে, তাঁর চিঠি নিয়ে আমাকে লক্ষ্ণৌ যেতে হবে সদৎখাঁর কাছে—বাদশা রাজপুত রাজাদের কাছে, পেশোয়া বাজীরাওয়ের কাছে সাহায্যভিক্ষা চেয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু কেউই এলো না—

তুমি তাহলে আবার আত্মপরিচয় দিয়েছ—

হাঁ, এখন, দিল্লীর বিপদের সময় সদৎখাঁকে নিয়ে আমি পাঞ্জাবে যাবো—

বেশ, তোমায় বাধা দেব না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্চি নাদির একটা উল্কার মত এসে চারিদিক জ্বালিয়ে চলে যাবে, এ সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করে—ভারত, ভারত, তুমি পারবে—আমি দেখতে পাচ্চি তোমার মধ্যে—

ভারতসিংহের মধ্যে মুসলমান মানুষটি শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বুঝি আবার তাহার সঙ্কল্প টুটিয়া যায়, সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না—

মৃদু হাসিয়া শঙ্কর বলিল—হায়, তুমি জান না তুমি কে—আচ্ছা বেশ, রাজনীতিচর্চ্চা থাক, এসো একটু জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করি—দেখ ওই যে তারাটা—

শঙ্কর তাহাকে তারালোকের অপূর্ব্ব রহস্য কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। ভারতসিংহ কিন্তু নিবিষ্ট মনে কিছু

শুনিতে পারিল না, সে বার বার ভাবিতে লাগিল, হয়ত সত্যই তাহার মধ্যে কোন সম্রাট জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(৯)

প্রায় দুইমাস পরে।

এই দুই মাসে ভারতের ইতিহাস বদলাইয়া গিয়াছে। দিল্লীর বাদশা কর্ণালের যুদ্ধে নাদিরশার নিকট পরাস্ত ও বন্দী হয়েছেন। সেই বন্দী সম্রাটকে লইয়া নাদির আজ দিল্লীর সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নতমুখে ধীরপদে আলি মহম্মদ দিল্লীতে প্রবেশ করিল। হায়, সে সম্রাট হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে কে বসিয়া—সুদূর পারস্যের এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু। পথে চারিদিকে নাদিরের বিজয়ী সৈন্যেরা লাল তুর্কী টুপি পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উৎসব করিতেছে, ভীত পরাজিত দিল্লীবাসী মুখে করুণ হাসি লইয়া তাহাদের উৎসবে যোগ দিয়াছে। আলি মহম্মদ এই ভীষণ করুণ আনন্দ-উৎসব দেখিতে দেখিতে চলিল। চারিদিকে নাদিরের সৈন্য,—এই ত নাদিরের শক্তির উৎস, লোহার মত দৃঢ়, ঝঞ্ঝার মত রুদ্র, মৃত্যুর মত নির্ম্মল এই সবল সুদক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যদলই নাদিরের একমাত্র শক্তি; এইরূপ এক বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহাদের নেতা হইতে পারিলেই ত সে বিজয়ী সম্রাট হইতে পারিবে। এতদিন সে ভুল পথে গিয়াছে, তার অধীনে পাঠান সেনাদের সে যদি এইরূপ সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত কর্ণালে নাদিরকে পরাজিত করিতে পারিত। কর্ণাল যুদ্ধে আমীর-উল-ওমরা যখন আহত হইল ও সদৎখাঁ বন্দী হইল, সে সম্রাট সৈন্য লইয়া একবার নাদিরের সহিত রণচাতুর্য্যের পরীক্ষা করিবার জন্য বাদশা'র কাছে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু নিজাম ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে সৈন্য চালনার ভার দিলেন না, তাঁহার ভয় হইল, আলি জিতিলে সেই হয়ত আমীর উল-ওমরা বা বাদশাহের প্রধান সৈনাধ্যক্ষ হইবে। তিনি নাদিরের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে মত দিলেন। সন্ধি করিতে গিয়া বাদশা যখন বন্দী হইলেন, আলি মহম্মদ তাহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। দিল্লীতে আসিয়া নগরাধ্যক্ষ লুৎফউল্লা খাঁর সহিত মিলিয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে নাদিরের জন্য দিল্লী অধিকার করিতে সসৈন্য সদৎখাঁ আসিয়া হাজির হইল। ব্যর্থ ক্ষুব্ধ হইয়া আলি মহম্মদ আপন পাঠান সেনাদল লইয়া দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু দিল্লীকে সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না; এ যে তার প্রিয়া, তার স্বপ্নের রাণী, তার শিরে একদিন বিজয় মুকুট পরাইবে, এ বন্দিনী দিল্লীকে সে দেখিতে আসিয়াছে।

পরাজিত সম্রাট যেদিন নতমুখে স্তব্ধ দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন, উৎসব-বাদ্য বাজিল না, জয়পতাকা উড়িল না, মূক ব্যথায় বন্দিনী তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। পরদিন প্রভাতে যখন বিজয়ী নাদির মহাসমারোহে দিল্লী প্রবেশ করিলেন, সেনাদলের অশ্বক্ষুরবিক্ষত দিল্লীর পথে বিজয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, ক্রূর হাসিয়া হাসিয়া রক্তমযী নগরী বিজয়ী বীরের দিকে চাহিল। বীরভোগ্যা সে, আজ তাহার মসজিদে মসজিদে নাদির সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহার নামে প্রার্থনা হইয়াছে।

বসন্তের মধুর বাতাস বহিতেছে, জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে ঝিকিমিকি করিতেছে, হোলি উৎসব আসিতেছে। আলি মহম্মদ তারাভরা আকাশের দিকে একবার চাহিল, সম্মুখে জুম্মা মসজিদের মিনারগুলি করুণ প্রার্থনার মত ঊর্দ্ধে করযোড়ে যেন চাহিয়া আছে, এ চিরবিলাসিনী দিল্লী আজ ক্ষুব্ধ নত একাকিনী উদাসিনী দাঁড়াইয়া, তাহার মুখে উৎসবের ক্রূর হাসি, তাহার বুকে প্রতিহিংসার নির্ব্বাক বহ্নি। এ বহ্নি একবার মুক্তি পাইলে বুঝি আপনাকে আপনি দগ্ধ করিয়া ছাই করিয়া দিবে। পথের উৎসব কোলাহল, আলোকমালা, জনপ্রবাহ আলির চোখে বড় করুণ বোধ হইল। ধীরে সে চাঁদনী চকের দিকে চলিল।

(ক্রমশঃ)

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

টুথ ব্রাস

চাপাতলায় অনেকগুলি ব্রাসের কারখানা দেখিয়াছি। জুতার ব্রাস, বনাতের কোট ঝাড়িবার ব্রাস, চুল আঁচড়াইবার ব্রাস, রং লাগাইবার ব্রাস,—সকল রকম ব্রাসই সেখানে তৈয়ারী হইতেছে। জিনিসগুলি মন্দ হইতেছে না। অবশ্য সেগুলি আরও ভাল হইতে পারে, হওয়া উচিতও বটে, এবং হইবেও বোধ হয়। কারণ, এখনও ঐ ধরণের যে সব জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী হয়, সেগুলি আমাদের দেশী ব্রাসের অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে দেশী ব্রাসগুলিতে একরকম কাজ চলিয়া যাইতেছে, এবং বিক্রীও হইতেছে বেশ।

কিন্তু দেশী টুথ ব্রাস ত এখনও হইতে দেখিতেছি না। কেন? যখন সব রকম ব্রাস তৈয়ার হইতেছে, তখন টুথ ব্রাসই বা হইবে না কেন? ইহার হাড়, শূকরের লোম, কোন জিনিসই ত এখানে দুর্লভ নয়। আর জাপানী ধরণে হইলে বাঁশের হাতলেও হইতে পারে। শূকরের লোমেও কোন আপত্তি হইবে না বোধ হয়; কারণ, জাপানী কিম্বা ফরাসী কিম্বা বিলাতী যে সব টুথ ব্রাস আমদানী হইতেছে, সেগুলিও শূকরের লোমে প্রস্তুত; এবং তাহা অনেকেই ব্যবহার করিতেছেন।

তবে একটা কথা আছে। লোমগুলিকে ঔষধের দ্বারা শোধিত করিয়া (disinfect) লইতে হইবে। কারণ, শূকর বড় নোংরা জীব; এবং একবার জাপানী ব্রাস ব্যবহারের ফলে স্থান বিশেষে বহু লোকে anthrax রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; এবং সেই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে খুব হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল—জাপানী ব্রাসের আমদানী বন্ধ করিবারও কথা উঠিয়াছিল।

যে সকল ব্রাসের হাতল কাঠের, এবং যে সকল ব্রাস অন্য কাজে ব্যবহার করিতে হয়, সেগুলি তৈয়ার করিবার যন্ত্রগুলি মোটামুটি ধরণের হইলেই চলে। কিন্তু টুথ ব্রাস সৌখিন জিনিস, তাহা তৈয়ার করিবার যন্ত্রগুলিও কিছু সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। আর টুথ ব্রাস তৈয়ার করিতে হইলে কারিগরের কিছু অধিক নিপুণতাও থাকা চাই।

টুথ ব্রাসের লোমগুলি খুব সাদা ধবধবে হওয়া দরকার। সেজন্য উপযুক্ত লোম বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। অল্প গরম জলে soft soap দ্রব করিয়া সেই সাবান-গোলা জলে লোমগুলিকে প্রথমে বেশ করিয়া কাচিয়া লইতে হইবে। তার পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া, sulphurous acidএর জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলে, লোমগুলি খুব সাদা ত হইবেই, ইহাতে শোধনের (disinfecting) কাজও হইবে।

টুথ ব্রাসের লোমগুলি হাতলে তার দিয়া বসাইতে হয় না—উহা মুড়িবার আলাদা মসলা আছে। পিচ কিম্বা পাতগালা ১ কি ২ ভাগ, গটাপার্চ্চা ১ ভাগ একত্র করিয়া মৃদু তাপে গলাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। মিশ্রিত হইলে শীতল জলে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে। ব্যবহারের সময় ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া গলাইয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। টুথ ব্রাসের হাতলে লোম মুড়িবার জন্য শিরিস কিম্বা ঐ রকম কোন আঠা ব্যবহার করা উচিত নহে। জলে না গলিয়া যায় অথচ লোমগুলি শক্তভাবে আটকাইয়া থাকে এমন অন্য কোন রকম আঠাও ব্যবহার করিতে পারা যায়। হাতলটিও খুব সাদা ও মসৃণ হওয়া চাই।

জাপানী ধরণে ভাত রান্না

আজ আমি আপনাদিগকে একটী নূতন ধরণের কথা বলিব। আমাদের দেশ দিন-দিন অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এখন আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে মিতব্যয়ী হইতে হইবে, সকল রকম অপচয় নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে।

চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। সেই চালের দাম দিন-দিন কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই

দেখিতেছেন। এখন হয় ধান্য কম জন্মিতেছে, না হয় বেশী লোকের জন্য চাউলের যোগান দিতে হইতেছে, অথবা খুব বেশী পরিমাণে চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই তিনটি কারণের কোন একটী কারণে, কিম্বা দুইটী অথবা তিনটী কারণের সমবায়ে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

আমরা ভাত রাঁধিয়া ফ্যান ফেলিয়া দিয়া ভাত খাই। যাঁহাদের বাড়ীতে গরু কিম্বা ছাগল থাকে, তাঁহাদের বাড়ীতে হয় ত ফ্যানটা একেবারে নষ্ট হয় না,—গরু-ছাগলে খাইতে পারে। কিন্তু অন্য সকল বাড়ীতে ফ্যান ফেলা যায়। কিন্তু ফ্যান অখাদ্য নহে। ফ্যানে চাউলের অনেকটা সারাংশ থাকে। সেটা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে চাউলের খরচ নিশ্চয়ই কিছু কমিতে পারে।

তাই বলিয়া আমি গোরু ছাগলের মতন কাহাকেও ফ্যান চুমুক দিয়া কিম্বা ভাতে মাখিয়া খাইতে বলিতেছি না; এবং সেটা কেহ পছন্দ করিবেন না। অথচ ফ্যানটা নষ্ট হইতেও দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে ফ্যান নষ্ট না হয়।

বিধবারা আলোচালের ভাত খান। তাঁহারা এমন ভাবে ভাত রাঁধেন যে তাঁহাদের ফ্যান গালিতে হয় না। আবার সিন্ধু দেশে আলোচালের ভাতও এমন ভাবে রাঁধা হয় যে, তাহারও ফ্যান গালিয়া ভাত খাইতে হয়। সে যাক। বিধবারা নিজেদের জন্য আলোচালের ভাত রাঁধিবার সময় এমন পরিমাণ মত জল দেন যে, ভাত-গুলিও সুসিদ্ধ হয়, অথচ, ফেলিবার মত একটুও ফ্যান উদ্বৃত্ত হয় না। আবার তাঁহারাই যখন গৃহস্থের জন্য সিদ্ধ চালের ভাত রাঁধেন, তখন জল এত বেশী ব্যবহার করেন যে, ফ্যান না গালিলে চলে না।

অবশ্য পরিমাণ মত জল দিয়া রাঁধিলে সিদ্ধ চাউলের ভাতের হয় ত ফ্যান গালিতে হয় না। কিন্তু একই হাতে যখন দুই রকম চালের ভাত দুই রকমে রান্না হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সিদ্ধ চালের ভাত রাঁধিবার সময় পরিমাণ মত জল দিয়া রাঁধিবার সুবিধা হয় না। কিন্তু এরূপ কুব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না, এবং দেওয়া হইবেও না। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে। নচেৎ আমাদের দুর্দ্দশা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

আজকাল রন্ধনের সাহায্যের জন্য একরকম "কুকার" প্রচলিত হইয়াছে; তাহাতে ভাতের ফ্যান গালিতে হয় না। কিন্তু এই কুকার কেবল ধনীরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহাও নিত্য নয়। কুকার বোধ হয় সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য হয় নাই; নচেৎ এত সুবিধা সত্ত্বে সর্ব্বসাধারণ নিত্য তাহা ব্যবহার করেন না কেন? আমার বোধ হয়, কুকার কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলে ও বিশেষ বিশেষ সময়ে ধনী লোকদের ব্যবহার্য্য জিনিসই থাকিবে—উহা সর্ব্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু হইবে না। অতএব সর্ব্বসাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। এক কথায়, আমাদিগকে জাপানী প্রথায় ভাত রাঁধিতে হইবে; অর্থাৎ বাষ্পের সাহায্যে চাউল সিদ্ধ করিতে হইবে। জাপানীরা আমাদের মতই অন্নভোজী। তাঁহারা এই প্রথায় বাষ্পের সাহায্যে ভাত রাঁধিয়া খান। তাঁহাদের অন্ন একটুও অপচয় হয় না; এবং তাঁহারা আমাদের মত অন্নভোজী হইয়াও আমাদের অপেক্ষা সবল ও দশের মধ্যে একজন।

জাপানীদের রন্ধনপাত্র কি রকম, তাহা আমি জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে, জাপানীরা চাউল জলে সিদ্ধ করিয়া লন না, তাঁহারা বাষ্পের সাহায্যে ভাত সিদ্ধ করেন। এই মূলতত্ত্বটুকু যখন আমাদের জানা রহিল, তখন, আমরা একটা উপায় বাহির করিয়া লইতে পারিব না কেন? বাষ্পে ভাত রাঁধিবার উপযোগী করিয়া রন্ধনপাত্র তৈয়ার করিয়া লইতে পারিব না কেন?

আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। এখন আমা-দিগের ভাত রান্না একটী হাঁড়ীতে হয়। অতঃপর আমাদিগকে দুইটী হাঁড়ী ব্যবহার করিতে হইবে। একটা হাঁড়ী উনানের উপর থাকিবে, তাহাতে জল থাকিবে। আর একটী হাঁড়ী প্রথম হাঁড়ীটার উপর থাকিবে। দ্বিতীয় হাঁড়ীতে চাল থাকিবে। এই হাঁড়ীটী হইবে সচ্ছিদ্র। ছিদ্রগুলি খুব ছোট ছোট হইবে। ছিদ্রের মাপ এমন হইবে যে, তাহার ভিতর দিয়া চাউল গলিয়া নীচে না পড়িয়া যায়, অথচ, বাষ্প স্বচ্ছন্দে তাহার ভিতর দিয়া গিয়া চাউল স্পর্শ করিতে পারে। গরম বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লইয়া চাউলগুলি সুসিদ্ধ হইবে, অথচ ফ্যান গালিবার মত

অতিরিক্ত জল টানিতে পারিবে না। ইহাতে আর এক সুবিধা এই যে, ভাত কখনও আঁকিয়া বা ধরিয়া বা পুড়িয়া যাইবে না। আর একটা সুবিধা এই যে, যতক্ষণ ইচ্ছা ভাত সমান গরম রাখিতে পারা যাইবে—গরম জলের হাঁড়ীর উপর ভাতের হাঁড়ী বসাইয়া রাখিলেই হইল। তৃতীয় সুবিধা—ভাত মালে বাড়িবে, কারণ, ফ্যান বাদ যাইবে না। চতুর্থ সুবিধা—ভাতগুলি বেশ ঝরঝরে থাকিবে, অতিরিক্ত গলিয়া গিয়া ডালা পাকাইয়া যাইবে না, কিম্বা আধ-সিদ্ধ, শক্ত থাকিবে না। বলা বাহুল্য, প্রথম হাঁড়ীটী বেশ বড় হওয়া চাই, যেন তাহাতে যথেষ্ট জল ধরে, অথচ, ফুটন্ত জল উপরের চাউলের হাঁড়ীতে গিয়া পৌঁছিতে না পারে,—কেবল বাষ্পটুকু দ্বিতীয় হাঁড়ীর ভিতর যাইতে পারে, শুধু এই ব্যবস্থাটুকু করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু যত সহজে আমি আপনাদের কাছে এই প্রস্তাবটি করিতে পারিতেছি, আপনারাও ইহাকে যত সহজ মনে করিতেছেন,—কাজটি বাস্তবিক তত সহজ নয়। প্রথমতঃ আমাদের দেশ এত বেশী রক্ষণশীল, পুরাতনের প্রতি আমাদের প্রীতি এত প্রবল যে, ইহার উপকারিতা লোককে বুঝাইয়া দিয়া এই উপায় অবলম্বনে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রন্ধন পাত্রের যে এখন আমাদের যাহা পড়িতেছে, সংশোধিত উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, তাহা কিছু বেশী,—বোধ হয় দ্বিগুণই পড়িবে। কিন্তু, ইহাতে চাউলের খরচ নিশ্চয়ই যথেষ্ট কমিবে; মোটের উপর কিছু লাভই থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ তত্ত্বটি প্রথম প্রথম লোককে বুঝানোই কঠিন।

তৃতীয়তঃ, যে সচ্ছিদ্র হাঁড়ীতে চাউল থাকিবে, তাহা প্রথম প্রথম বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইবে না, ফরমাস দিয়া তৈয়ার করাইয়া লইতে হইবে। কুমোররা প্রথম প্রথম এরূপ হাঁড়ী গড়িতে সম্মত হইবে কি না, সে পক্ষেও আমার ঘোর সন্দেহ আছে। তবে ইহাও দেখা যায় যে, সচ্ছিদ্র ভাতের হাঁড়ী তাহারা তৈয়ার না করুক, তুলসী গাছে জল দিবার জন্য "সহস্র ঝারা" তাহারা তৈয়ার করিয়া রাখে। আর আমাদের কলঙ্কভঞ্জনের দেশে সহস্র-ছিদ্র কলসীও বোধ হয় এক সময়ে তৈয়ার হইত। (শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এখন মালক্ষ্মীদের কাছে আমার এই সকাতর প্রার্থনা—সহস্র-ছিদ্র হাঁড়ীতে ভাত রাঁধিয়া তাঁহারা আমাদের জাতীর কলঙ্ক মোচনে সহায়তা করুন।) অতএব কুমোরদিগকে ফরমাইস দিয়া সচ্ছিদ্র হাঁড়ী তৈয়ার করিয়া লওয়া একেবারে অসম্ভব হইবে বলিয়াও বোধ হয় না।

আরও কোন কোন অসুবিধা হইতে পারে। সে সকলের উল্লেখ না করিলেও চলে। মোট কথা, জাতীয় কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থাটি আমাদিগকে করিতেই হইবে। ইহাতে যতই অসুবিধা ঘটুক, সে সমস্ত অতিক্রম করিতেই হইবে।

আমি গোড়াতে আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, আজ আমি আপনাদিগকে একটী নূতন ধরণের কথা শুনাইব। কথাটা কতকটা নূতন ধরণের শুনাইতেছেও বটে। আসলে কিন্তু আমার এ কথাটা আগাগোড়াই নূতন নয়। ভাতের ফ্যান গালা নিবারণের জন্য অনেক বৎসর পূর্ব্বে কিছু আন্দোলন হইয়াছিল। কোন একটী ভদ্রলোক কিম্বা কোন একটী ক্লাব ভাতের ফ্যান না গালিবার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—প্রবন্ধ বিরচিত হইয়া পুরস্কার লাভও করিয়াছিল বলিয়া যেন মনে পড়ে। তবে সে প্রবন্ধ দেখিবার ও পড়িবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। আবার, বাষ্পে ভাত রাঁধার কথাও আমার নিজের কথা নয়—উহা জাপান হইতে ধার করা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে নূতনত্বের কোন দাবীই আমি করিতেছি না, আমি কেবল আপনাদিগকে একটা পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। যে ধরণের হাঁড়ীতে ভাত রাঁধিবার প্রস্তাব আমি করিতেছি, তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখুন। যদি সুবিধা বুঝেন, করুন। যদি এতদপেক্ষা ভাল উপায় কেহ বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও ভালই হয়। তখন তিনি তাহার 'পেটেণ্ট' লইয়া ভাল ব্যবসা চালাইতে পারেন; এবং সর্ব্বসাধারণ এই প্রথার উপকারিতা বুঝিয়া ইহা গ্রহণ করিলে, চাই কি তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম ও প্রধান কথা—দেশের লোককে ইহার উপকারিতা ও সুবিধাগুলি বুঝাইয়া দেওয়া; লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে এই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত করা। কিন্তু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাজটি মোটেই সোজা নয়। সেজন্য, যাঁহারা আমার এই প্রস্তাবের উপকারিতা বুঝিবেন এবং স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে; কিছু ত্যাগ স্বীকার, হয় ত কিছু ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইবে। প্রথমে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিজ নিজ পরিবারে এই প্রথা চালাইতে হইবে। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে ইহার উপকারিতা ও সুবিধা প্রত্যক্ষ করিয়া অন্য লোকে ইহা অবলম্বন করিবে। Example is better than precept এই কথাটি এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। তার পর একবার লোকে বুঝিয়া লইলে আর ভাবনা নাই—শনৈঃ শনৈঃ এ প্রথা প্রতি গৃহে অবলম্বিত হইবে।

শেষ কথা। আমি দুইটী আলাদা আলাদা হাঁড়ীর কথা বলিয়াছি। যদি তৈয়ার করাইবার সুবিধা হয়, তবে দুইটী হাঁড়ী একসঙ্গে combined ভাবেও হইতে পারে। অর্থাৎ দোতালা হাঁড়ী হইবে। আর মাটীর হাঁড়ীর পরিবর্ত্তে ধাতুপাত্রও ব্যবহার করা যাইতে পারে। পিতলের বা কলাইকরা তাঁবার হাঁড়ী কিম্বা এনামেল বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ী বা ডেকচিও ব্যবহার করা যায়। চা ছাঁকিবার এ্যালুমিনিয়ামের ঝাঁঝরীতে যেরূপ ছিদ্র থাকে, হাঁড়ীগুলির তলায় সেইরূপ ছিদ্র করিয়া লইলে চলিবে। ফলে জাতির পক্ষে মহাকল্যাণকর একটী প্রথার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী নূতন শিল্পেরও সৃষ্টি হইবে। যাঁহারা নূতন হাঁড়ী বা ধাতুপাত্র নির্ম্মাণ করিবেন, তাঁহারা আর্থিক লাভ পাইবেন। যাঁহারা এই হাঁড়ী ব্যবহার করিবেন, তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—সাংসারিক ব্যয় হ্রাস হইলে সেটাকেও লাভ বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। তার পর স্বাস্থ্য ও বল লাভ—সেটা ফাউয়ের মধ্যে ধরুন। *

* শ্রীবিশ্বকর্ম্মার এই প্রস্তাবটি অতি সমীচীন। কিন্তু ইহা অতি বিরাট প্রশ্ন। বিশ্বকর্ম্মা প্রধানতঃ শিল্প-প্রচেষ্টার দিক হইতে কথাটা উত্থাপন করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে অর্থনীতির দিকটা কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইহার একটা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিক আছে। সকল দিক হইতে যথোচিতভাবে আলোচনা না হইলে সুফল লাভের আশা কম।

'ভাপে' (বাষ্পে) রান্না আমাদের দেশে একেবারে নূতন বা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত নহে। স্থলবিশেষে, সময়বিশেষে, ব্যক্তিবিশেষের জন্য 'ভাপে' রান্না ভাতের ব্যবস্থা করিতে হয়। বঙ্গ-সহিলারা ভাপে রান্নার নিয়মও জানেন। তবে কেন যে সাধারণ ভাবে এই সুন্দর প্রথা এ দেশে চলে না,—রহস্য এইখানেই। অনেকের ধারণা, ভাপে রান্না ভাত সহজে হজম হয় না। কথাটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তাহার কারণ আছে। ভাপে রান্না ভাত নিয়মিত ভাবে নিত্য আহার করিলে, তাহা হজম করিবার জন্য যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। শ্রম-বিমুখ, আলস্যপরায়ণ, বিলাসী লোকদের ভাপে রান্না ভাত হজম না হইবারই কথা। সেই কারণে ধনী ও বিলাসী লোকদের জন্য ভাতের ফ্যান গালার প্রয়োজন হয়। আর তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে এই প্রথা চলিতেছে। ভাপে রান্না ভাত যে কতখানি পুষ্টিকর, ফ্যান গালিয়া ভাত খাওয়ায় অন্নের কতখানি সারভাগ যে অপচয় হইতেছে, সে কথা কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। কিন্তু আজ এই জীবন-সংগ্রামের দিনে, অন্ন-সমস্যার সন্ধিক্ষণে জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিলক্ষণ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। ধনী, শ্রম-বিমুখ, অলস, বিলাসী লোকদের যদিই ভাপে রান্না ভাত হজম না হয়,—দরিদ্র, পরিশ্রমী লোকদের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ধনী লোকেরা না হয় ফ্যান-গালা ভাত খাইয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা তাঁহাদের অভাব পোষাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাহারা দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় না, অথচ দিবসের অধিকাংশ সময় যাহা-দিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়,—একটা প্রথা মাত্রের অনুসরণ করিতে গিয়া তাহাদিগকে এরূপ পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

চাউল যেমন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য (staple food), গোধূম তেমনি পশ্চিমাদিগের প্রধান খাদ্য। আমরা ভাতের ফ্যান গালিয়া পুষ্টিকর অংশ বাদ দিয়া ভাত খাই বলিয়া আমরা দুর্ব্বল, শক্তিহীন কাজেই সাহসহীন, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শ্রম-কাতর। আর গোধূমের ফ্যান গালিয়া খাইতে হয় না, উহার খোসা বাদে সবটা খাওয়া হয় বলিয়া পশ্চিমারা সবল, তেজস্বী, সাহসী। বাঙ্গালী জাতিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার রন্ধনপ্রণালীর ও আহার্য্য বস্তুর সংশোধন করিতেই হইবে। ভাপে রান্না ভাত খাইবার প্রথা সাধারণ ভাবে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রথম প্রথম সহ্য না হইলে দুই একদিন অন্তর কিম্বা সপ্তাহে দুই দিন খাইয়া অভ্যাস আনিতে হইবে। এবং হজম করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে শারীরিক পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করিতে হইবে। তবেই আমাদের বল, বীর্য্য, সাহস ফিরিয়া আসিবে, তবেই আমরা যথার্থ মানুষ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারিব। বিষয়টী অতি গুরুতর ও ব্যাপক। সে কারণে, একটু বিস্তৃত ভাবে এই প্রশ্নটির আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমরা জাতীয় অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।—ভারতবর্ষ সম্পাদক।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৫৩। মুদ্রা-তত্ত্ব

একটী তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার এক পৃষ্ঠে মধ্যস্থলে একটী সিংহাকৃতি। অপর পৃষ্ঠের লেখা অস্পষ্ট। কোন ঐতিহাসিক বলিয়া দিবেন কি, সিংহাকৃতি বিশিষ্ট মুদ্রা কোন দেশের, কোন সময়ের এবং কোন রাজা কর্ত্তৃক মুদ্রিত?

অন্য একটী তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার এক পৃষ্ঠে মধ্যস্থলে একটী বৃষাকৃতি। পার্শ্বে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা "শ্রীমৎ মহারাজ শিবাজী রাব হোলকার ইন্দোর"। অপর পৃষ্ঠে লেখা "পাব," "অনাংস" "১২৫৫"। "তারিখ" ও "অনাংস" কথাটী অস্পষ্ট। অন্য কিছু হইতেও পারে। ইন্দোরের এই শিবাজী মহারাজের বিবরণ এবং তাহার রাজত্বের প্রকৃত তারিখ কেহ অনুগ্রহ করিয়া দিবেন কি?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪। দেবপূজার বলি

কালী, দুর্গা, শীতলা, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীর সম্মুখে পশুপক্ষী, মাষকলাই, ইক্ষু ইত্যাদি বলি দেওয়া হয় কেন? শ্রীউমাকান্ত পাল

৫৫। প্রত্নতত্ত্ব

কুমিল্লার ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোটবাড়ী নামক স্থানে যে সকল দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? ইহার ইতিহাস এবং প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস কি?

শ্রীসুধীরচন্দ্র মৌলিক

৫৬। রাধাষ্টমী-তত্ত্ব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে "জন্মাষ্টমীব্রত" উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। "রাধাষ্টমী" ব্রত কোন উৎসব উপলক্ষ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়?

শ্রীভূপতিচন্দ্র শর্ম্মা

৫৭। শিবলিঙ্গ পূজা

শাস্ত্রমতে হিন্দুজাতি সকল দেবদেবীরই পূরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন; কিন্তু একমাত্র দেবতা শিবের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শিবের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে "শিবলিঙ্গ" পূজা করিবার পদ্ধতি কেন হইল, এ সম্বন্ধে কেহ শাস্ত্র-সঙ্গত প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলে বাধিত হইব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

৫৮। ফেজ টুপী

মুসলমান ভ্রাতাগণ "ফেজ" বা "তুর্কী" টুপী নামক লাল বর্ণের টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ টুপীগুলিতে কোনও রূপ জোড়া থাকে না। এবং ঐ টুপীগুলিতে উপরে কাল বর্ণের একটী ঝুমকা থাকে। ঐরূপ "ফেজ" বা "তুর্কী" টুপী প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কোনও কল খরিদ করা যায় কি না? যদি এ দেশে ঐ টুপী প্রস্তুতের কল পাওয়া যায়, তবে কোথায় পাওয়া যায়? একটী কলে দৈনিক কত টুপী প্রস্তুত হইতে পারে? কলগুলি হাতে চালান যায় কি না? যদি এ দেশে ঐ সকল কল না পাওয়া যায়, তবে কোথায় পাওয়া যায়? মূল্য কত?

ঐ রূপ "ফেজ" বা তুর্কী টুপী প্রস্তুত করিবার জন্য কি কি উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে? ঐ গুলি "felt" বলিয়া টুপী প্রস্তুতের জন্য যে জিনিষ ব্যবহৃত হয় সেই "felt" কি না? উক্ত "felt" কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়? "felt" প্রস্তুত করিবার কোনও কল এ দেশে পাওয়া যায় কি না? যদি পাওয়া যায় তবে কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্য কত?

কিরূপ মূলধন হইলে উক্ত "ফেজ" বা তুর্কী টুপী প্রস্তুত করার একটী কারখানা চালান যাইতে পারে?

Pelt প্রস্তুতের উপাদান কি? সমুদায় উপাদান এ দেশে পাওয়া যায় কি না? শ্রীযজ্ঞেশ্বর বসু

৫৯। গঙ্গার গতি

বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদ পদব্রজে যাইতে একটী পোল পড়ে। অনেকে বলে সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির সময়ে গঙ্গার গতি ঐ পোলের নীচে দিয়া ছিল। ইহা সত্য কি না? যদি সত্য না হয়, তবে গঙ্গার গতি কোন জায়গা দিয়া ছিল? শ্রীজীবনলাল দাশগুপ্ত

৬০। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইংরেজী সংবাদপত্র

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইংরেজী সংবাদপত্র কি?

শ্রীজীবনলাল দাশগুপ্ত

৬১। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রম অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রন্থাদিও দ্রুত লোপ পাইতেছে। সঙ্গীতের হিসাবে না হইলেও প্রাচীন সভ্যতার দিক হইতেও উহা সংরক্ষণের চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য মনে হয়। পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদিত ও তাঁহার সাহায্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদিও অধুনা দুর্লভ। উক্ত মহাত্মার পুস্তকাদিতে এবং অন্যান্য অনেকের পুস্তকে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশে আর ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থানের ২।৪টী পুস্তকালয়ে ২।৪ খানা মাত্র গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। আপনার

পাঠকবর্গ যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সংগৃহীত সংবাদ প্রকাশ করেন, তবে মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাতব্য।

১। কি কি মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাদের নাম, ভাষা, রচয়িতা ও প্রকাশকের নাম, প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য।

২। পাঠকবর্গের কাহারও নিকট কোন প্রাচীন গ্রন্থ থাকিলে, সেই গ্রন্থের ও তাহার রচয়িতার নাম, মুদ্রিত কি হস্তলিখিত, কোন্ ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত হইলে কোথা হইতে কবে মুদ্রিত, প্রকাশকের নাম ও মূল্য।

৩। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অথবা ভিন্ন প্রদেশস্থ কোন পুস্তকালয়ে, কোন পুস্তক আছে কি না, তাহা কেহ অবগত থাকিলে তদ্বিবরণ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৬২। Balance Sheet

Balance sheetএর কোন বাংলা বা হিন্দি প্রতিশব্দ থাকিলে তাহা জানাইবেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

উত্তর

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

৭৫ প্রশ্নের [ভারতে দ্বাদশটী অনাদি শিবলিঙ্গ আছে কোথায় কোথায় এবং তাহার বিশেষত্ব কি?] যথাসাধ্য উত্তর। বর্ত্তমানে অনেক স্থানের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্॥ ১
পরল্যাং বৈদ্যনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে॥ ২
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমী তটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুষ্মেশং শিবালয়ে॥ ৩
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ংপ্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি॥ ৪
ইতি দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি।

দ্বাদশজ্যোলিঙ্গস্তোত্রম্।

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে
জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ১
শ্রীশৈলসঙ্গে বিবুধাতি সঙ্গে
তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদা বসন্তম্
তমর্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেকং
নমামি সংসার সমুদ্র সেতুম্॥ ২
অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং
মুক্তি প্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং
বন্দে মহাকাল মহাসুরেশম্॥ ৩
কাবেরিকানর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে
সমাগমে সজ্জনতারণায়।
সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্ত-
মোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে॥ ৪
পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বলিকা নিধানে
সদা বসন্তং গিরিজামমেতম্।
সুরাসুরারাধিত পাদপদ্মং
শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি॥ ৫
যাম্যে সদঙ্গে নগরেঽতিরম্যে
বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং
শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬
মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমন্তং
সংপূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ
কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে॥ ৭
সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং
গোদাবরীতীর পবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকমাশু নাশং
প্রয়াতি তং ত্র্যম্বকমীশমীড়ে॥ ৮
সুতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে
নিবধ্য সেতুং বিশিষৈরসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং
রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি॥ ৯
বং ডাকিনীশাকিনিকা সমাজে
নিষেব্যমানং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদ প্রসিদ্ধং
তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি॥ ১০
সানন্দমানন্দবনে বসন্ত-
মানন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং
শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ১১
ইলাপুরে রম্যবিশালকেঽস্মিন্-
সমুল্লসন্তঞ্চ জগদ্বরেণ্যম্।
বন্দে মহোদারতরস্বভাবং
ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ১২

জ্যোতির্ম্ময়দ্বাদশলিঙ্গকানাং
শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজোঽতিভক্ত্যা
ফলং তমালোক্য নিজং ভজেচ্চ॥ ১৩
ইতি শ্রীদ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীহরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসুদেবের পত্নী দেবকীর আটটী পুত্রের নাম যথা—

১। কীর্ত্তিমন্ত ২। সুষেণ ৩। ভদ্রসেন ৪। উদারধী ৫। ঋজু ৬। সম্বর্দ্ধন ৭। অনন্ত বা সংকর্ষণ ৮। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত, দশম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত। শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী,
শ্রীরাখালচন্দ্র পণ্ডা,
শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী

ক্যামেরার আবিষ্কারক

ফটো তুলিতে যে ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় তাহার আবিষ্কারক 'জিয়াম্বাটিষ্টা ডিলা পোর্টা' (Giambattista della Porta)। তিনি নেপল্‌স্ (Naples) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনলিনীকান্ত দত্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে টমাস্ ওয়েজউড (Thomas Wedgwood) দ্বারা ক্যামেরা সর্ব্বপ্রথম ফটোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইঁহার কোন দেশীয় তাহা ঠিক জানা যায় না। অনুমানে মনে হয় ইনি ইংরাজবাসী। ক্যামেরার প্রকৃত আবিষ্কারক কে, তাহা বোঝা যায় না; সাধারণতঃ নেপল্‌সের অন্যতম মনীষী জিওভান্নী ব্যাপটিস্টা ডেলা পোর্টা (Giovanni Baptista della Porta) ক্যামেরার আবিষ্কারক বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে, এমন কি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও আরব্যদেশের বিখ্যাত তত্ত্ববিৎ এ্যাল হেযেন (Alhazen) এর কাব্যগ্রন্থে ক্যামেরার উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ক্যামেরা জ্যোতির্ব্বিদগণের জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবার একমাত্র যন্ত্র ছিল। তখন ইহা ফটোগ্রাফি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না। অতএব Thomas Wedgwood কে ফটোগ্রাফি হিসাবে ক্যামেরার আবিষ্কারক বলিয়া অভিহিত করিলে হয়ত নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। শ্রীচারুশীলা গুপ্তা

John Baptista Porta (১৫৪৪-১৬১৫) তাঁহার 'Magia Naturalis' নামক পুস্তকে বলিতেছেন যে, যদি একটা অন্ধকার কক্ষের জানালার একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বহির্স্থিত বস্তুগুলি ঐ কক্ষের সাদা দেওয়ালের উপর স্ব স্ব স্বাভাবিক বর্ণে প্রতিফলিত হইবে এবং ঐ ছিদ্রের সম্মুখে একটী মুক্তাকায় কাচ (convex lens) বসাইলে ঐ বস্তুগুলিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যাইবে। এবং ইহাই তাঁহার আবিষ্কৃত 'camera obscura'র মূলতত্ত্ব (principle)। বর্ত্তমান Photographic camera ও এই camera obscuraর মূলতত্ত্ব দুইটী পরস্পর তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান camera ঐ camera obscura হইতেই উদ্ভূত ও তাহারই রূপান্তর মাত্র। এই camera obscura অনুমান ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবিষ্কৃত হয়। Porta নেপ্‌লস (Naples) নগরের অধিবাসী ছিলেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুমান ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে Scheele, the Swedish chemist প্রথমে photography আবিষ্কার করেন। শ্রীনলিনাক্ষ হোড়

ঘড়ির আবিষ্কারক

সপ্তদশ শতাব্দীতে Huygens প্রথমে ঘড়ি আবিষ্কার করেন।

শ্রীনলিনাক্ষ হোড়

শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ

মঙ্গল গ্রহের চেয়ে শুক্র পৃথিবীর নিকটতর হইলেও নিম্নলিখিত কারণ দুটীর জন্য জ্যোতির্ব্বিদেরা শুক্র অপেক্ষা মঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগই বেশী দেখিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

১। সূর্য্য হইতে শুক্র গ্রহ ৬৭০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে শুক্রের দূরত্ব ২৪২৪০৭০০ মাইল। শুক্রের আহ্নিক গতি নাই কেবলমাত্র বার্ষিক গতি আছে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে শুক্রের ২২৫ দিন লাগে। আহ্নিক গতি নাই বলিয়াই শুক্রের কেবল মাত্র অর্দ্ধাংশ বরাবর সূর্য্যের সামনে থাকে। এই প্রকাশমান অংশ মেঘ এবং গাঢ় বায়ুমণ্ডলে আচ্ছাদিত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলেও শুক্রের উপরিভাগে দুই একটা কাল দাগের বেশী আর কিছু দেখা যায় না। শুক্র সমবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

২। মঙ্গল গ্রহ ডিম্বাকার কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়াই ইংার দূরত্ব সব সময়ে এক প্রকার থাকে না। কোন সময় সূর্য্য হইতে ১৫৫০০০০০ মাইল দূরে সরিয়া যায়; আবার কখনও বা ১২৪০০০০০০ মাইল নিকটে চলিয়া আসে। যখন ১২৪০০০০০ মাইল নিকটে আসে তখন যদি মঙ্গল এবং পৃথিবী সূর্য্যের এক পার্শ্ববর্ত্তী হয় তবে দুইয়ের মাঝের ব্যবধান থাকে ৩৬৭৫৯৩০০ মাইল। সেই সময় উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা মঙ্গল গ্রহ বেশ দেখা যায়। এই ভাবে মঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগের ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে। মঙ্গলের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দুইই আছে। মঙ্গল গ্রহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুমণ্ডল সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ থাকায় জন্যই দেখার বিশেষ সুবিধা হয়।

শ্রীবীরেশ্বর বাকচি

ধূপ প্রস্তুত প্রক্রিয়া

তন্ত্রসার, গরুড় পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন রকম ধূপের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে তন্ত্রসার লিখিত ষোড়শাঙ্গ ধূপ লিখিত হইল।

গুগ্গুলং সরলং দারুপত্রং মলয়সম্ভবং। ক্লীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং

সর্জ্জরসং ঘনং॥ হরীতকীং লখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং। ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মাণি॥ শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়ার তুক

অদ্য একখানি বহু পুরাতন "থিওসফিক্যাল" মাসিকপত্রে ম্যালেরিয়ার কম্প জ্বরের একটি প্রক্রিয়া (বা চলিত কথায় যাহাকে তুক বলে) দেখিলাম। আমাদের এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে তাহা সকলে জানিতে পারিলে অনেকের উপকারে আসিতে পারে। ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে ইউরোপে; হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ঐরূপ তুক লোকে বিশ্বাস করে। যাহা হউক ইহা আমরা সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

তুকটি এই—রোগীর যখন জ্বরের কম্প উপস্থিত হইবে তাহার হাত পায়ের সমস্ত আঙ্গুলের নখগুলি কাটিয়া রুটির ভিতর করিয়া একটি কুকুরকে খাওয়াইয়া দিলে কম্পজ্বর ভাল হয়। এবং শুক্রবারে নখ কাটিলে দাঁতের অসুখ থাকে না; তাহাও ফুট নোটে আছে। The Theosophist, Vol. II, Bombay, October, 1840, No. 1, Page 13.

শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই শ্লোকাংশটী ভাগবতের ১।৩।২৮ শ্লোকের এক ভগ্নাংশ। অন্ততঃ অর্দ্ধেক শ্লোক উল্লেখ না করিলে ঐ বাক্যাংশটীর তাৎপর্য্য অববোধ হওয়া অসম্ভব। তাহা এই—"এতেচাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এইটী সমগ্র ভাগবতের পরিভাষা সূত্র।

অবতার সকলের চরিত্র বর্ণন করুন—এই প্রশ্ন দ্বারা সৌনক কর্ত্তৃক সূত পৃষ্ট হইয়া সংক্ষেপে সূত অবতার সকলের নামাদি উল্লেখ করিলেন—১ম অবতার কৌমার, ২য় নারদ, ৩য় বরাহ ইত্যাদি কল্কি পর্য্যন্ত ২৫টী প্রাকৃত জগতের অবতার বর্ণন করিলেন। তার পর কহিলেন:—"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরে সত্ত্বনিধের্দ্বিজা"; হে দ্বিজগণ সত্ত্বনিধি হরির অসংখ্য অবতার। অর্থাৎ সেই অনন্তের অবতারও অনন্ত; প্রধান প্রধান কয়টী বলিলাম মাত্র। এই সকল অবতার বর্ণনার মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও বর্ণনা সামান্য ভাবে হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে পৃথক করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন:—এতেচাংশ কলাপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" অর্থাৎ এই যে অবতার সকলের নাম উল্লেখ করিলাম, তাহারা কেহ কেহ পুরুষের অংশ, কেহ কেহ কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই "তু" অব্যয়টী ভিন্ন উপক্রমে দেওয়া হইয়াছে। এই পুরুষটীর সামান্য পরিচয় দিই। ইনি কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। অসংখ্যকোটী ব্রহ্মাণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়া কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন। ইনিই মায়ার ঈক্ষন কর্ত্তা "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েতি" শ্রুতি। ইনি অপ্রাকৃত রাজ্যের আদি পুরুষাবতার ও নানাবতারের বীজ স্বরূপ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের এককলা মাত্র। যথা:—"আদ্যোবতার পুরুষ" ইত্যুক্তা "এতন্নানাবতার নিধান বীজনব্যয়ং।" ভাগবত।

বিষ্ণুর্মহান ইহ যস্য কলা বিশেষো; গোবিন্দ মাদি পুরুষ তমহং ভজামি। ব্রহ্ম সংহিতা "কিন্তু স্বয়ং ভগবান" অর্থাৎ কাহার অংশ, বা কলা এমন কি পুরুষাবতার সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুও নহেন। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণুর মধ্যে পালয়িতা বিষ্ণু ত নহেনই—তিনি কৃষ্ণের কলার কলা।

স্বয়ং রূপ কাহাকে বলা যায়? "অনন্যাপেক্ষিযদ্রূপং স্বয়ং রূপ স উচ্যতে" লঘুভাগবতামৃত। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না তাঁহাকে স্বয়ংরূপ বলা যায়। অর্থাৎ যাঁর রূপ গুণ মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি স্বতঃসিদ্ধ তিনিই স্বয়ংরূপ। আর ভগ অস্ত্যার্থে বতু প্রত্যয় করিয়া ভগবান। ভগ শব্দে "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃশ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈবষন্নাং ভগইতিঙ্গনা" অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি যাঁর আছে, তিনি ভগবান ও ঐ সকল গুণ যাঁর স্বতঃসিদ্ধ তিনিই স্বয়ং ভগবান। এ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রেমিক ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান শব্দের তাঁহাতেই সত্তা।"

"দীপ হৈতে যৈছে যহু দীপের জ্বলন.....।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ॥" চৈ চঃ
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণ॥ ব্রঃসং

অবতীর্ণ হইবার সময় তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছাতেই অবতীর্ণ হন। যথা—রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্', নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণ স্বয়ং সম্ভবৎ পরমপুমান—গোবিন্দমাদিপুরুষতমহং ভজামি॥ ব্রহ্মসং

কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ যখন ক্ষীরোদের তীরে বিষ্ণুর নিকট ধরণীর ভার হরণের নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন, বিষ্ণু তখন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন:—

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষংপরঃ।
জানিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ। ভাগবত

সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষোত্তম আবির্ভাব হইবেন বলাতে আমি বা অন্য কেহ নহে ইহা বুঝাইতে ১ম পুরুষের আত্মনীপদ দেওয়া হইয়াছে।

২। মহাভারতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তজ্জন্যই নারদ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ব্যাসদেব মহাভারতের পর ভাগবত প্রণয়ন করেন। তবে মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে গীতায় কৃষ্ণ স্বমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্ততে"। "মত্তঃপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়".....।.....যস্মাৎক্ষর মতীতোঽমক্ষরাদপিচোত্তম। অতোঽস্মিন লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তম"। গীতা॥ অর্জ্জুনের স্তবে পাওয়া যায়—ত্বমাদিদেবপুরুষঃ পুরানঃ—তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং" ইত্যাদি।

৩। কোন কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবান বলা হয়, দেখান যাইতেছে।

(ক) কংশকারাগারে আবির্ভাব হইয়াই বসুদেব দৈবকীর পূর্ব্বজন্মের উপাস্য বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। বসুদেব স্তব করিতেছেন "বিদিতোঽসিভবান্ সাক্ষাৎপ্রকৃতেঃপুরুষঃপরঃ।" ইত্যাদি—

(খ) ৭ দিনের বালকের অত্যাশ্চর্য্যরূপে পূতনাবধ। সে স্তনে তীব্র বিষ মাখিয়া কৃষ্ণকে বধ করিতে আসিয়াছিল, আর শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন—"প্রাণৈঃসমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ" ক্রোধে স্তন্যের সহ পুতনার প্রাণ পান করিলেন। তন্নিমিত্ত কোন প্রকার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয় নাই; ৭ দিনের অতি অতি সুকোমল তনু দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। নরসিংহাদির মত নহে। ইহাই স্বয়ং ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ বীর্য্য।

(গ) অতি শৈশবে মা যশোদাকে মুখ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন।

(ঘ) শৈশব পৌগণ্ডে অত্যাশ্চর্য্যরূপে তৃণাবর্ত্তাদি ভীষণ ভীষণ অসুর অবলীলাক্রমে বধ করা। নারদ বলেন—"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রে নাপি রথাঙ্গিনা। তেত্বয়া নিহতাকৃষ্ণ নবয়াবাল্যলীলয়া সাদ্ধং মিত্রৈ হরে ক্রীড়ন ভ্রুভঙ্গকুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা কম্পতে পরিতা স্তদা"। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

(ঙ) ব্রহ্মমোহনের সময় স্বীয় অঙ্গ হইতে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রকাশ করেন। স্বাংশ বলরাম পর্য্যন্ত কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"প্রায়মায়াস্তুমে ভর্ত্তু নান্যামেঽপি বিমোহিনী" ভাগবত। অর্থাৎ এ মায়া নিশ্চয় আমার ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের মায়া নচেৎ দৈবি-আসুরি প্রভৃতি মায়া, আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না।

(চ) রাসের সময় ও দ্বারকায় রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণের সময় অসংখ্য প্রকাশ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; যথা

"রাসোৎসব সং প্রবৃত্ত গোপীমণ্ডল মণ্ডিত।
যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যেদ্বয়োর্দয়ো" ভাগবত॥
"তাসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাং।
সবিধ জগৃহে পাণি মনুরূপং স্বমায়য়া" ভাগবত।

ইত্যাদি বহু বহু বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখান যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। ঐ সকল কার্য্য কবি বর্ণন বলিয়া উপেক্ষনীয় নহে; যেহেতু ভগবানের অবতার ঈশ্বরস্বরূপ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, "ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করনা পাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাই দোষ এই সব"। চৈ চঃ। তাহা ছাড়া নারদ কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া সাধন সিদ্ধবস্তু, শ্রুতির ঋক্, বেদান্তের অর্থ;—গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ ভাগবত বর্ণন করেন। ইহাই ভাগবতের বিশেষত্ব। গরুড় পুরাণ বলেন—অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়। গায়ত্রী ভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহতি। ইত্যাদি—

৪। ভগবানের যে কেবল ১০টী অবতার নহে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গীতগোবিন্দ কাব্যে জয়দেব ঠাকুর যে ১০টী অবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যে এই যে, মৎসাদি অবতার সকল একটী একটী রসের অধিষ্ঠাতা; কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতা অখিল নায়ক সকলের শিরোরত্নস্বরূপ। যথা "অখিল রসামৃত" ও "নায়কানাং শিরোরত্ন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। নচেৎ মৎস্য আদি অবতার নহেন তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিম্বা জয়দেব অবতারদের মধ্যে ইঁহারা প্রধান বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, কারণ প্রত্যেক অবতারের পৃথক পৃথক বন্দনা একরূপ অসম্ভব। কৃষ্ণ যে সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতা তাহা "চন্দনচর্চ্চিত" ও "সঞ্চরদধরসুধা" গীতদ্বয়েই অনুভব হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেওঘরিয়া

শিবের পঞ্চম মুখ

পূজার সুবিধা কবে বলে নিরাকারে আকার কল্পনা করা হয়। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁর আকারে জগতের আকার, যিনি সর্ব্বময়, তাঁর আকারের কল্পনা কর্ত্তে আমরা—পৃথিবীতে যতদূর দেখতে পাওয়া যায় ততদূর জ্ঞান নিয়ে—কল্পনা কর্ত্তে বসি; আর আকাশ হতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রসার বাড়িয়ে বিরাট পুরুষের কল্পনা করি।

ভূতভাবন ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির কল্পনায় পঞ্চভূতের বিকাশ। পঞ্চভূতের বিকাশ কর্ত্তে শিবের পাঁচ মুখ;—আর এই পাঁচমুখেই তিনি অনিত্য বিশ্বজ্ঞান থেকে নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন। এই পাঁচটী মুখের নাম,—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান।

সদ্যোজাত—অর্থাৎ, নিরাকার ব্রহ্মের প্রকৃতি আশ্রয়ে যে ভাবের বিকাশ—অশরীরীর প্রথম বিকাশ—তাহাই আকাশ-বদন।

বামদেব—মানে, প্রতিকূলক্রীড়;—প্রকৃতির কল্পনায় বিকারশূন্য—জীবরক্ষায় ও জীবনাশে শক্তি বিকাশপর বায়ুবদন।

অঘোর—অর্থাৎ, যা হতে ঘোর আর কিছুই নেই সেই মহা-তেজোময় অথচ যাতে ঘোরতার লেশমাত্র নেই, যে মহত্তেজ আনন্দময় তাই হচ্ছে তৈজসবদন।

তৎপুরুষ—তৎ অর্থে ব্যাপক, ব্যাপক পুরুষ বিশ্বব্যাপী জলময়—জীবন-বদন।

ঈশান—অর্থাৎ, ঐশ্বর্য্য বিকাশপর ভৌম-বদন।

এই গেল 'পঞ্চবক্ত্র'। এখন ত্রিনেত্রের কথা। প্রকৃতির কোলে শুয়ে যতদূর দেখা যায় তার ভেতর বিরাট পুরুষের কল্পনা কর্ত্তে গেলে চন্দ্র, সূর্য্য আর অগ্নি এই তিনটী চোখের কল্পনাই কর্ত্তে হয়; নীল আকাশকে ভাবতে হয় তাঁর নিবিড় কেশরাশি আর আকাশের তারাগুলি সব হচ্ছে তাঁর মাথায় মণিবিন্যাস। সাপের মত আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ রেখাই তাঁর হাতের ভুজঙ্গবলয় আর পৃথ্বীব্যাপী দৃশ্যমান চক্রবাল হচ্ছে তাঁর কটিদেশের মেখলা।

এই হচ্ছে শিবমূর্ত্তি যা আমাদের সাধনবিধানের অবলম্বন তন্ত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

সবুজ আলু

জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদদেহেরও প্রত্যেক অংশে (ফল, ফুল, মূল, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতিতে) অসংখ্য পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র (যাহা চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টির অতীত) গহ্বর (cells) নানাবিধ তন্তু (tissue) দ্বারা সংলগ্ন আছে। এই সকল cell অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অতি প্রচণ্ড সহন-ক্ষমতার (high magnifying power) দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে দেখা যায়।

প্রতি জীবিত cell এ নানাবিধ রসসিক্ত বস্তু আছে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাদিগকে cell-contents বলে। ইহাদের মধ্যে protoplasm এবং nucléus অন্যতম এবং এই বস্তুদ্বয়ই cell এর জীবনের লক্ষণ। এই protoplasmএর মধ্যে আবার তিন রকম বর্ণের বস্তু (colouring matters) আছে; ইংরাজিতে ইহাদিগকে pigment matters বলে; যথা—chloroplastids, chromoplastids এবং leucoplastids। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কার্য্য (function) আছে। উদ্ভিদের যে অংশে (সচরাচর পত্রে এবং কাণ্ডে যাহা মৃত্তিকার উপরে অবস্থান করে) chloroplastids থাকে; সেই অংশ সবুজ হয় এবং এই chloroplastidsই উদ্ভিদের একমাত্র জীবনধারণ এবং খাদ্য প্রস্তুত ও হজম করিবার উপায়। এই বস্তুটী না থাকিলে উদ্ভিদ রাজ্য (plant kingdon) এ পৃথিবীতে থাকিতে পারিত না। তার পর chromoplastids ফল এবং ফুলে সংশ্লিষ্ট থাকে, এই জন্য ফল এবং ফুলে আমরা নানারকম বিচিত্র রং দেখিতে পাই। আর Leucoplastids এর আসল এবং একমাত্র গুণ হল জিনিসকে সাদা করা, ইহা যে অংশে থাকে উদ্ভিদের সেই অংশ সাদা হইয়া যায়। সচরাচর ইহা মাটীর ভিতরে অবস্থিত উদ্ভিদের অংশে (underground stem এ) দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের এই সব অংশ বায়ুমণ্ডল এবং রৌদ্রের সংস্পর্শে সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং তাহাদের Leucoplastids উপরিউক্ত chloroplastidsএ পরিণত হয়।

গোল আলুকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় (in botanic terms) underground stems কিম্বা tuber বলে। ইহারা মূলের মত দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা মূল নহে। এই গোল আলু মাটীর মধ্যে থাকে; সুতরাং ইহার cell-contentsএর নানাবিধ জিনিসের (যথা starch ইত্যাদি) সহিত Leucoplastids সংশ্লিষ্ট থাকে। ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হইতে আলু বাহির করিবার সময় বায়ুমণ্ডল এবং রৌদ্রের সংস্পর্শে আলুর leucoplastids chloroplastidsএ পরিণত হয়, সুতরাং অধিকাংশ আলু নীলবর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এই নীলবর্ণ আলু রন্ধনের পর খাইবার সময় কোন অসুবিধা জন্মায় না এবং অনায়াসে সাধারণ আলুর মত ভক্ষণ করা যায়।

আবার ক্ষেত্র কর্ষণ কালে অধিকাংশ আলুকে মাটী হইতে বাহির করিবার সময়েই ঐরূপ নীলবর্ণ দেখায়, কিন্তু এই নীলবর্ণ উপরিউক্ত কারণের জন্য ঘটে না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কীটের মত এক জাতীয় উদ্ভিদ অনবরত দ্রুতবেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, চর্ম্মচক্ষে ইহাদিগকে ত দেখা যায় নাই, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাল করিয়া দেখা যায় কি না সন্দেহ। ইহাদের জন্যই মিষ্ট জিনিষ টক হয়, খেজুর রস বিস্বাদ হয়, রুটি প্রভৃতিতে ছাতা জন্মে। এই জাতীয় উদ্ভিদকে fungi বলে। ইহাদের মধ্যে এক জাতীয় fungus আলুকে যথেষ্ট পরিমাণে আক্রমণ করে বলিয়াই এই শ্রেণীর fungus কে potato fungus কিম্বা phytopthora infestans বলে। ইহার আক্রমণের ফলে আলু সবুজ বর্ণ কিম্বা কখনও কখনও লালবর্ণ হইয়া যায়; ফলে আলু শক্ত এবং কড়া হইয়া যায় এবং রন্ধনকালে ভাল সিদ্ধ না হইয়া অর্দ্ধ সিদ্ধ হয়। ভক্ষণ কালে এই আলু বিস্বাদ এবং তিক্ত বোধ হয়, এমন কি সময়ে সময়ে বমি হইবারও সম্ভাবনা থাকে। আর আলুতে এইরূপ উপসর্গ বেশী পরিমাণে বিরাজ করে।

শোক-সংবাদ



৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

আলিগড় কলেজের গণিত-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বাংলা ও ইংরেজী পাটীগণিত-প্রণেতা বিখ্যাত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। যাদব চক্রবর্ত্তীর পাটীগণিতের সাহায্যে অঙ্ক শিক্ষা করেন নাই, এরকম লোক বাংলা দেশের নব শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি অধ্যবসায় সহকারে প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া সম্মানের সহিত এম-এ পাশ করেন; এবং অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। চিরজীবন তিনি এই অধ্যাপনা কার্য্যেই কাটাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী ছাত্রেরা সেজন্য চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সাময়িকী

"ভারতবর্ষে"র পাঠক-পাঠিকাগণ অভয় প্রদান করুন,—আমরা এবার আমাদের দেশের আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের অর্থাৎ সরকারী বজেটের আলোচনা করিব। দুইটী বজেটের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ;—একটী ভারতীয় বজেট, আর একটী বাঙ্গালা দেশের বজেট,—এক বজেট দিল্লীর রাষ্ট্র-সভায় পেশ হইয়াছে, অপরটী আমাদের এই কলিকাতার মালসী মজলিসে।

এই মজলিসেই এবার বজেটের অবস্থা ভাল; কারণ ঘাটতি নাই, বাড়তিই হইয়াছে; ভারতীয় বজেটে প্রায় সাড়ে তিন কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে; বাঙ্গালার বজেটে কোটী টাকার উপর বাড়তি হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ঘোর টানাটানির পর এবার একেবারে স্বচ্ছল হইবার কারণ এই যে, ইঞ্চকেপ কুঠারের অঘাতে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে, এবং দুইটী দফায় আয় বিশেষ বাড়িয়াছে। সে দুইটী দফার নাম করিলেই পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন; তাহার একটী হইতেছে ষ্ট্যাম্প আর একটী হইতেছে আবগারী; অর্থাৎ উচ্ছন্ন যাইবার যে দুইটী প্রধান রাজপথ, আমাদের দেশের লোকে সেই রাজপথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া রাজকোষের অর্থাভাব দূর করিতেছে। ভারতীয় রাজস্ব-সচিব স্যার বাসিল ব্লাকেট ও বাঙ্গলার রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড মহোদয় খুব বাহাদুর বটে।

এই বাড়তি বজেট বা স্বচ্ছল অবস্থা উপলক্ষে আমাদের একটা গল্প মনে পড়িল। একজন আধুনিক ভাবাপন্ন সরকারী চাকুরীজীবী মাসিক ছয়শত টাকা বেতন পান; সংসার বড় নহে, একটী ছেলে, একটী মেয়ে, আর স্ত্রী; বেতন যাহা পান বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর হাতে দেন এবং স্বামী স্ত্রীতে খরচ করেন। ছয়শত টাকাতেই এই ক্ষুদ্র পরিবারের চলে না, প্রতি মাসেই ধার হয়। এ ভাবে সংসার চালান অকর্ত্তব্য মনে হওয়ায় বাবু একদিন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, এ রকম এলোমেলো খরচ করে আর চলিবে না, আমি একটা বজেট করিতেছি; সেই বজেট অনুসারে খরচ হইবে।" স্ত্রী তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরবর্ত্তী রবিবারের সমস্ত প্রাতঃকালটা স্বামী মহাশয় বজেট প্রস্তুত করিলেন এবং মধ্যাহ্নে তাহা তাঁহার স্ত্রীর হুজুরে পেশ করিয়া বলিলেন "এই দেখ ত, আমি সমস্ত খরচ হিসাবভুক্ত করিয়া দিয়াও মাসে মাসে চল্লিশ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছি; প্রতি মাসে সেবিংস্ ব্যাঙ্কে চল্লিশ টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারিবে।" তাঁহার স্ত্রী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বজেটখানি দেখিয়া বলিলেন "অতি সুন্দর বজেট হইয়াছে। দশজন চাকর, দুইজন আয়া, সহিস, কোচম্যান, গাড়ী-ঘোড়া, দরজী, কাপড়-চোপড় সমস্ত ব্যয়ই ধরা হইয়াছে; কিছুই বাদ যায় নাই। সমস্ত বাদেও মাসে চল্লিশ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তবে, যাহা দেখিলাম, তাহাতে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য একটা খরচ ধরা হয় নাই। সেটা আর কিছু নয়, এই এতগুলি লোকের আহারের ব্যয়; সেই সামান্য ব্যয়টাই ধরা হয় নাই।" এই বলিয়া বাবু গৃহিণী হাসিতে হাসিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। এই সকল বজেট দেখিয়া ঐ গল্পটীই আমাদের মনে পড়ে; আমাদেরও সেই বাবু গৃহিণীর মত বলিতে ইচ্ছা করে, "হাঁ, বজেট ঠিক হইয়াছে; সব কর্ম্মচারী ঠিক আছে, গাড়ীঘোড়া লোকলস্কর, আসবাবপত্র সমস্ত ঠিক হইয়াছে, কোন বিষয়ে কোনরূপ ব্যয়ের ত্রুটী হয় নাই,—যা সামান্য একটু ত্রুটী হইয়াছে, তাহা এই বাঁচিয়া থাকিবার ব্যয় সম্বন্ধে।" আমাদের বজেট সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না।

এই বজেট লইয়া বাঙ্গালার মালসী মজলিসে যে প্রকার বাদানুবাদ চলিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে স্বরাজবাদী দল এই বজেটখানিকে না-মঞ্জুর করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার পর? সরকার বলিবেন, তোমাদের কথা শুনিব না, এই বজেটই চলিবে; সার্টিফিকেটের ক্ষমতা ত গবর্ণর বাহাদুরের হাতে আছে। তখন কি হইবে? স্বদেশী দল বলিতেছেন, সে যাহা হয় পরে দেখা যাইবে। আমরাও পরে কি হয় দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম।

বড় মজ্‌লিসের বড় বজেট সম্বন্ধে একটা খবর না দিলে নিমক্‌হারামী করা হইবে; তাই সে সংবাদটী সকলের গোচর করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ ভুলিয়া যান নাই যে, বিগত বৎসরে বড় মজলিসের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে, শুধু সার্টিফিকেট বিধানের বলে, বড়লাট বাহাদুর লবণের দর মণকরা একটাকা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন; এবার মেহেরবাণী করিয়া সেই এক টাকার আট আনা কমাইয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল দেড় টাকা মণ, বিগত বৎসরে হইয়াছিল আড়াই টাকা, এবার হইল দুই টাকা। ইহার জন্য বড় মজলিশের রাজস্ব-সচিব সার বাসিল ব্ল্যাকেট মহোদয়কে আমরা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সেদিন চৌরঙ্গীতে গোপীনাথ সাহা নামক একটী যুবক অতি অসমসাহসিক কাণ্ড করিয়াছিল, রিভলভার চালাইয়া মিঃ আর্নেষ্ট ডে নামক একজন ইয়োরোপীয়কে



মিঃ আর্নেষ্ট ডে

হত্যা করিয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের অল্পক্ষণ পরে কিছু দৌড়া-দৌড়ি করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যথা সময়ে হাইকোর্টের বেসনে তাহার বিচার হয় এবং বিচারফলে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতর তাহার ফাঁসীও যথা সময়ে হইয়া গিয়াছে। এদেশে নর-হত্যা অনেক হইয়াছে, ফাঁসীও বিস্তর হইয়াছে; কিন্তু এমন অসাধারণ হত্যাকাণ্ড কেহ কখনও দেখে নাই, হত্যাকাণ্ডের মামলায় এরূপ আসামীও কখনও দেখা যায় নাই। ফাঁসির সময় পর্য্যন্ত গোপীনাথের মনে কোন ভয় উদ্বেগ বা অনুশোচনার ভাব দেখা যায় নাই। এমন কি, শুনা যায়, যে কয় দিন তাহাকে জেলে থাকিতে হইয়াছিল, সেই কয় দিনের মধ্যে সে না কি পাঁচ পাউণ্ড ওজনে বাড়িয়াছিল। ধরা পড়িবার পর গোপীনাথ না কি

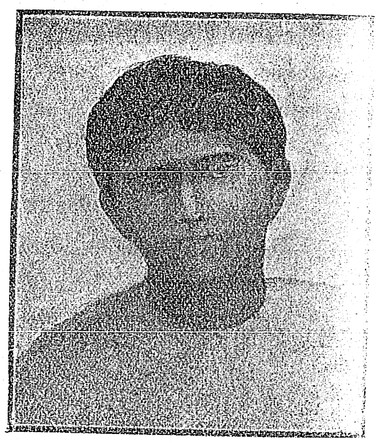

গোপীনাথ সাহা

বলিয়াছিল যে, সে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টকে খুন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল; এবং মিঃ টেগার্টের সহিত মিঃ আর্নেষ্ট ডে'র আকারগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া সে মিঃ ডেকে মিঃ টেগার্ট মনে করিয়া খুন করিয়াছিল। এবং এই ভ্রান্তির জন্য সে দুঃখিত। গোপীনাথের পক্ষ সমর্থন করিবার কালে তাহার ব্যারিষ্টার বলিয়াছিলেন, গোপীনাথ বিকৃত-মস্তিষ্ক; তাহার বংশের অনেকেরই মস্তিষ্ক বিকৃত, এবং এই রোগ তাহাদের বংশগত। গোপীনাথ তাহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিল, তাহাতে কাহারও বলিবার কিছুই নাই। তবে

হিন্দু ধর্ম্মানুসারে গঙ্গাতীরে তাহার শেষকৃত্য করিবার সম্বর্দ্ধনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি সুযোগ দেওয়া হয় নাই, এজন্য হিন্দু সাধারণ দুঃখিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ সাহিত্যিক-প্রধানগণ মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমরা শ্রীমানের এই সম্মান লাভে আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতেও তিনি যথা সময়ে সম্বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ভাগ্যবান পুরুষ। কয়েক দিন হইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে বাঙ্গলার সম্মিলিত সাহিত্যিকগণ শ্রীমান নলিনীরঞ্জনকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই

ভুল

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস

(১)

"ওগো!" "কি?" "ওঠ! রাত অনেক হ'য়েছে।—ওহো, বল্‌তে ভুলে গেছি। তুমি অমলার পত্রের উত্তর দাও নি ব'লে, সে আজ আমাকে দুঃখ ক'রে লিখেছে। একেই ত' তুমি তা'র বিয়েতে যাও নি ব'লে, সেই দিন থে'কেই সে তোমার উপর চটে আছে।"

জিজ্ঞাসার সুরে বিনয় বলিল, "অমলা?—ওহো, তোমার খুড়তুতো বোন্, অমলা? সত্যই ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে; কালই তা'র পত্রের উত্তর দিব। বিয়েতে কেন যাওয়া হ'য় নি, শুন্‌বে। যে দিন অমলার বিয়ে, সেই দিনই তোমার বাবার নিকট হ'তে নিমন্ত্রণ পত্র পাই; কিন্তু বিয়ের লাল খাম দেখে, পত্রটা সারা রাত্রি খুলতে সাহস হয় নি, কি জানি যদি তোমারই বিয়ের—। তার পর, সকালে খুলে দেখলাম, অমলার বিয়ে।"

কৌতুকের সুরে অচলা বলিল, "তার পর?"

"তার পর, ভগবানকে শতকোটি প্রণাম ক'রে, সেই দিনই সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে, তোমার বাবার কাছে গি'য়ে তোমাকে দাবী করলাম।"

এই সময় 'টুং' করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিল।

"এই! একটা বেজে গে'ল, শোবে চল," বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট বিনয়ের হাত ধরিয়া অচলা একটা টান দি'ল।

বাহিরে বিশ্ব-প্রকৃতি তখন জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক টুক্‌রা মেঘ আসিয়া চাঁদটাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সুনীল আকাশ, বাহ্য প্রকৃতি পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। মেঘের টুক্‌রাটি আবার সরিয়া গে'ল; জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা আলোয় রহস্যময়ী প্রকৃতি আবার হাসিয়া উঠিল। বিশ্ব-প্রকৃতির এই আলো-আঁধারের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে দেখিতে বিনয় বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর!"

অচলা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "Fine!"

দুজনে আবার আকাশের পানে চাহিল। কিছুক্ষণ পরে অচলা বলিয়া উঠিল, "দেখ, জীবনটা কি অদ্ভুত! মাঝে মাঝে যখন ভাবি, তখন বড় মজার লাগে! প্রকৃতিও তেম্‌নি! ওই মেঘের টুক্‌রোটি কোথায় কত দূরে ছিল, ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে, কিছুক্ষণের জন্য চাঁদকে ঢেকে, এখানটাকে অন্ধকার ক'রে দিয়ে আবার কোথায় স'রে গে'ল।—" "বাস্তবিক্! এই দেখ না, আমাদের বিয়ে হ'য়েছে মোটে দুবছর, আর, তা'র ছ'মাস্ আগে আলাপ হয়। এই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তুমিই বা কোথায় ছিলে, আমিই বা কোথায় ছিলাম! কেউ কা'উকে জানতাম না—কিসে যেন টেনে নিয়ে যেয়ে সেই গঙ্গার ধারে দেখা করিয়ে দিলে। আঃ, কি শুভক্ষণেই না চারিচক্ষুর মিলন হ'য়েছিল। সত্যই ভাব্‌তে

বসলে জীবনটা অদ্ভুত ঠেকে!—নাঃ, সত্যই অনেক রাত্রি হ'য়েছে, শো'বে চল।"

বিনয় ও অচলা বিবাহের পর এই দুই বৎসর এম্‌নি করিয়া বিভোর প্রাণে গল্প করিতে করিতে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে।

(২)

বিনয় সকালে চা খাইয়া, বাড়ীর বাহিরে আসিয়া, পাশের বাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান একটা চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ বাবু উঠেছেন?" "হাঁ বাবু, তিনি বাহিরে বসবার ঘরেই রয়েছেন।" বিনয় ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, সুরেশ এবং তাহার ছোট বোন ইন্দু বসিয়া গল্প ক'রতেছে। সুরেশ বিনয়ের প্রায় সমবয়সী। সুরেশের বাবা প্রথমে কলিকাতাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে তাঁহাকে বৎসর কয়েক অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল। তখন তিনি সুরেশ ও ইন্দুকে বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান। প্রায় মাসখানেক হইল, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; এবং বিনয়দের এই পাশের বাড়ীটা কিনিয়া লইয়া বাস করিতেছেন। মেয়েকে ও ছেলেকে বোর্ডিং হইতে বাড়ী আনিয়াছেন। সুরেশ এই বছর এম্‌-এ দিয়াছে; ইন্দু বেথুনে একটা উঁচু ক্লাসে পড়ে। ভাই বোন দুজনেই এখনও অবিবাহিত। বিনয় সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ যে খুব সকাল সকাল উঠেছেন, দেখ্‌ছি?" ইন্দু বলিল, "হায়! হায়! আপনি বুঝি ভাব্‌ছেন দাদা নিজে উঠেছেন? এই সকালে দাদাকে বিছানা হ'তে তুল্‌তে যে কত বেগই পে'তে হ'য়! বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, বিনয়বাবু, দশটিবার ধ'রে বসিয়ে দিই, দশটি বারই শু'য়ে প'ড়েন!—উনি আবার থিয়েটার কর্‌বেন!"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "থিয়েটার করবেন? কি রকম?"

ইন্দু বলিল, "হাঁ। কাল দাদার মাথায় এক ভূত চেপে গেছে। বল্‌ছিলেন, আমরা এত বন্ধু-বান্ধব রয়েছি, একটা এ্যামেচার—" "সত্য না কি, সুরেশবাবু? বেশ ত'! একটা এ্যামেচার পার্টি তৈরি করা যাক্। মাঝে মাঝে একটা দু'টো ভাল 'প্লে'—"

এই লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বেলা বাড়িয়া চলিল। অচলার প্রেরিত চাকরটা বিনয়কে ডাকিয়া যাইবার পর আলোচনা বন্ধ হইল।

বিনয় ঘরে আসিতে, অচলা বলিল, "খুব যে গল্প হ'চ্ছিল। ক'টা বেজেছে, ঠিক্ আছে?"

খাইবার সময় কথায় কথায় বিনয় বলিল, "সুরেশবাবুরা বেশ লোক।"

"বাস্তবিক্! এই একটা মাস এসেছে, এরই মধ্যে ইন্দু আমাকে যেন কত আপনার ক'রে নিয়েছে। আচ্ছা, ইন্দুকে তোমার কেমন লাগে?"

"বেশ! খাসা! যেম্‌নি free, তেমন forward। কি সুন্দর গান গায়! বাহিরের অনেক study ও—"

"ওঃ! প্রশংসা যে আর ধরে না! কিছুই ত খাওয়া হ'ল না?"

"একেবারে ক্ষিধে নাই, অচলা। সকাল সুরেশ-বাবুর ওখানে আর একবার হয়েছিল। ইন্দু পুরি আর চা তৈরি করেছিল, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না।"

(৩)

"জামাইবাবু এখনও এলেন না, রাত্রি দশটা বাজে!" বলিয়া একটি মেয়ে অচলার সোফার পাশে গিয়া বসিল। এই মেয়েটি অচলার এক দূর সম্পর্কের বোন, বৌবাজার হইতে তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

"মাথাটা কি এখনও ধরে আছে, দিদি?"

অচলা বলিল, "না।" সে ভাবিতেছিল, বিনয়ের কথা। আজকাল যেন তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে। রাত্রি আটটার পর যে কোন দিন বাহিরে থাকিত না, সেই বিনয় আজকাল রাত্রি দশটা, এগারটার কম কোন দিন সুরেশের বাড়ী হইতে গল্প করিয়া ফিরে না। আজ অচলার বোন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, এবং অচলার মাথা ধরা; শরীর খারাপ শুনিয়া গিয়াও এখনও ইন্দু ও সুরেশের সঙ্গে গল্প হইতেছে! নিবিড় অভিমানে অচলার বুকটা পূর্ণ হইয়া গেল। ইন্দু ও সুরেশের সঙ্গে এই একটা মাসেই এতটা? তা'দের সঙ্গে এত কিসেরই বা কথা? আজকাল আমার কাছে বস্‌তেও ভাল লাগে না দেখ্‌ছি! প্রতি দিনই সুরেশদের বাড়ী। তবে কি ইন্দুর—! না, না, ছিঃ, কি নীচ আমার! অসম্ভব!

রাত্রিতে শুইয়া বিনয় বলিল, "রাগ হ'য়েছে না কি? আমি সন্ধ্যেতেই চলে আস্‌ছিলাম, কিন্তু সুরেশ আর সব কিছুতেই ছেড়ে দিলে না। মাথা কি এখনও ধরে রয়েছে? সরে এস, একটু টিপে দিই। অচলা, আজকাল তোমার শরীর প্রায়ই ভাল থাক্‌ছে না, চল না, দিনকতক পুরীতে থেকে আসি। বাড়ীটাও সেখানে খালি প'ড়ে র'য়েছে।"

"আচ্ছা, শুধু শুধু অত টাকা দিয়ে বাড়ীটা কিন্‌বার কি দ'রকার ছিল?"

"সে ত তোমারই জন্য।—তুমি যে সমুদ্র বড় ভালবাস, তা' কি আমি জানি না?"

এম্‌নি নানা কথায় রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় বিনয়ের উপর অচলার যেটুকু অভিমান হইয়াছিল, তাহা ধুইয়া গিয়া, মন আবার পবিত্র, নির্ম্মল গঙ্গাজলের ন্যায় হইল। পরম শান্তি ও তৃপ্তিতে বিনয়কে জড়াইয়া ধরিয়া অচলা ঘুমাইয়া পড়িল।

(৪)

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। অচলা চুপ করিয়া সোফার উপর বসিয়া ছিল। বিনয় একটু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। আকাশ কালো মেঘে জমাট; পৃথিবী রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা। 'হু হু' করিয়া বাতাস বহিতেছে। কাছের একটা বাড়ী হইতে কাজরী গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অচলা চুপ করিয়া এমন সময় একা বসিয়া থাকিতে পারিল না। "যাই, একটু ইন্দুর সঙ্গে গল্প করে আসি" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুদের বাহিরের বসিবার ঘরের পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঠিক্ সিঁড়িতে পা দিবে, এমন সময় অচলা পাশের ঘর হইতে বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। বিনয়ের এই কথাগুলো তাহার কাণে আসিয়া লাগিল,—"ইন্দু! আজ পর্য্যন্ত সত্য কাউকে ভালবাসি নাই; আমি এতদিন আমার মানসী প্রতিমা খুঁজিতেছিলাম; আজ তা'র দেখা পেয়েছি;—সে তুমি, ইন্দু!"

এতদূর পর্য্যন্ত শুনিবার মত জ্ঞান অচলার ছিল; কিন্তু আর কোন কথা তাহার কাণে গেল না। বিশ্বসংসার তাহার নিকট লুপ্ত হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দেওয়ালটা ধরিয়া ফেলিল। এ কি! এও কি সম্ভব! এই শুনিবার জন্যই কি সে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল! কোন রকমে টলিতে টলিতে বাড়ীতে আসিয়া, পায়ের গ্রীসিয়ান্ স্লিপার শুদ্ধই বিছানার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত জগৎ তাহার নিকটে লুপ্ত হইয়া গেল। কাণে শুধু তাহার স্বামীর কথাগুলাই 'রন্‌ন্' 'রন্‌ন্' করিয়া বাজিতে লাগিল। অসহ্য যাতনায়, বেদনায় হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সেদিন তাহার মনে বিনয়ের উপর যে সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার জন্য নিজেকেই সে বার বার ধিক্কার দিয়াছিল, এবং তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। এখন একে একে তাহার সমস্ত মনে হইতে লাগিল। ইন্দুরা মোটে এই একটা মাস আসিয়াছে, তাহার মধ্যেই কত ঘনিষ্টতা, বিনয়ের প্রতিদিন তাহাদের বাড়ীতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত কাটান; বিনয়ের মুখে ইন্দুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা; আরও এম্‌নি কত দিনের কত অসংখ্য খুঁটিনাটি। আর আজ! আজ সে নিজের কাণে শুনিয়াছে বিনয় ইন্দুকে তাহার প্রণয় নিবেদন করিয়া বলিতেছে, 'তুমিই আমার মানসী প্রতিমা, ইন্দু!'

বাহিরে তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ঝঞ্ঝা পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। মনে পড়িল, এই বিনয়ই এক দিন বলিয়াছিল, 'তোমাকে না পে'লে আমি বাঁচ্‌ব না, অচলা। তোমার বাবার কাছ হ'তে আমি তোমাকে চেয়ে নে'ব। বল, তোমার কোন অমত নেই?' আরও এই দুটো বছর—!

কড় কড় করিয়া বজ্র ডাকিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে কালো আকাশের গা চিরিয়া একটা বিদ্যুৎ অচলাকে উপহাস করিয়া বলিয়া গেল, 'ওরে, সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সে কেবল তা'র মোহ! চোখের নেশা! প্রথম দেখে হয় ত ভাল লেগেছিল, কিন্তু এই দুবছরে সখ ফুরিয়ে গেছে; তাই আবার আর এক নতুন সুন্দরের দিকে মন ঝুঁকেছে।' হইতে পারে তাহার অপেক্ষা ইন্দুর রূপ, গুণ সহস্র গুণ বেশী; কিন্তু—! ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে মুখখানা তাহার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সে যে কি করিবে, কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। 'এই আমার জীবন! এই আমার স্বামী!' 'হু' 'হু' করিয়া অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আর, বাহিরে কড় কড় করিয়া এক একটা বজ্র বিনয়ের কথার

প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল, 'তুমিই আমার মানসী প্রতিমা, ইন্দু!'

মাঝে মাঝে একটা অতি কাছের বাড়ী হইতে করুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল,

"বুঝেছি, আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি নাই, রয়েছে ডোর।"

অচলার বুকটা 'হা' 'হা' করিয়া উঠিল। দুবছর আগে বিনয়ের মুখ হইতে 'তোমাকে ভালোবেসেছি' শুনিয়া সে'ত বিনয়কে মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়াই ধরা দিয়াছিল! কিন্তু সে বিনয়ের চোখের নেশা! সে মোহ! কিন্তু তার পরও এই দু বৎসর এত ভালবাসা, এত আদর? সে অভিনয় সে অভিনয়!

অস্পষ্ট সুর আবার কাণে আসিয়া লাগিল,

"বাঁশি বেজেছিল, ধরা দি'নু যেই,
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল,
কঠিন ফাঁসি।
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা হৃদয়ে তো'র।
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ মিছে আদর।"

(৫)

বুকে একটা অসীম ব্যথা লইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই সাম্‌নে বিনয়কে দেখিয়া অচলার সমস্ত শরীরে আগুন ছুটিয়া গে'ল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংযম দিয়া সে নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিল। "কাল তোমার ভয়ানক গা গরম হ'য়েছিল; সমস্ত রাত্রি একরূপ অজ্ঞানের মত ছিলে। এখন কেমন রয়েছ," বলিয়া বিনয় অচলার কপালে হাত দি'ল! যে করস্পর্শে এক দিন অচলার গ্রীবা গণ্ড গোলাপময় হইয়া উঠিত, সেই স্পর্শে আজ তাহার সমস্ত মন ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গে'ল। "এখন দেখ্‌ছি একটু ভাল, আচ্ছা, আমি ডাক্তারকে ডেকে আনি" বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া গেল। অচলার মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এই দিনটা ছিল রবিবার। ভাত খাইবার পর সুরেশ ও আর কতকগুলি বন্ধু বিনয়কে ডাকিতে আসিল। বিনয় বলিল, "মাপ কর ভাই, আজ আর যেতে পারব না;—অচলার শরীর খারাপ।"

"সে কি? কখন হ'তে?" বলিয়া সুরেশ ভিতরে যাইয়া অচলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদি', অসুখ না কি?" "না না, সে কিছু নয়।" "তবে অনুমতি করুন, বিনয় বাবুকে ঘণ্টা দুইএর জন্য নিয়ে যাই।" "খুব!"

বিনয়কে বন্ধুরা এক রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। অচলা বিছানায় শুইয়া পড়িল। কি করা যায়? এ রকম ভাবে আর থাকা চলে না। স্বামী সে অন্য একজনকে ভালবাস্‌বে, আর, তার কাছে শুধু ছলনা, অভিনয় করিয়া যাইবে! এ অপমান, এ লাঞ্ছনা অসহ্য! নিবিড় অভিমানে অচলার বুকখানা দুলিয়া উঠিল। রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে মুখখানা জ্বলিয়া উঠিল। না, না, আর এক দণ্ডও এখানে থাকা অসহ্য! কিন্তু, যাই কোথা? বাপের বাড়ীতে? এই অভিশপ্ত জীবন লইয়া সেখানে গিয়া বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি লাভ!

"মাইজী!" অচলা চম্‌কিয়া উঠিয়া বসিল। "কিরে ভজুয়া?"

"আজ আমি একবার বাড়ী যাই, মাইজী, ঠিক্ তিন দিন পরেই আস্‌ব।"

"আচ্ছা যা'। ওরে শোন্—" বলিয়া অচলা কতক্ষণ ভাবিল। মুখখানা দৃঢ় এবং ভয়ানক কঠিন হইয়া উঠিল। তার পর একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ওই চার আনার আফিং খুব শীঘ্র এ'নে দিয়ে যা' দেখি। দাঁতের গোড়া ফুলেছে; শুনেছি, আফিং লাগালে না কি সেরে যায়।"

কিছুক্ষণ পরে ভজুয়া টেবিলের উপর আফিং রাখিয়া দিয়া 'আসি মাইজী' বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

অচলা টেবিলের কাছে উঠিয়া আসিয়া একখানা কাগজে লিখিল—

"আমি কোন গুপ্ত কারণে আত্মহত্যা করিলাম; ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে।—অচলা।"

তার পর একটু ভাবিয়া আর একখানায় তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া লিখিল,—

"শ্রীচরণেষু,

তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে, এত শীঘ্র টের পেলুম কি ক'রে! প্রথম প্রথম আমার একটু সন্দেহ হয়, কিন্তু সে সন্দেহ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিয়ে নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিলাম; কারণ, এই আড়াই বছর ধরে খুব সুন্দর

অভিনয় করেছিলে কি না। কিন্তু কাল সন্ধ্যেয় যখন নিজের কাণে শুনলাম যে, তুমি ইন্দুকে প্রণয় নিবেদন ক'রে জানাচ্ছ যে, আজ পর্য্যন্ত কাউকে সত্য ভালবাসতে পার নাই;—সেই তোমার মানসী প্রতিমা!—তখনই আমার সব ভুল ভেঙ্গে গেছে। আচ্ছা, মিথ্যা মোহ এবং চোখের নেশার জন্য একটা নারীজন্ম মাটি ক'রে দেবার কি প্রয়োজন হ'য়েছিল, পতিদেবতা,—যদি সত্য ভালবাস্‌তে না পেরেছিলে? যাক্, আর বেশী দেরী করব না, শীঘ্র শেষ করে নিই; কারণ, তোমার মুখখানা দেখ্‌লে সত্যই মর্‌তে ইচ্ছে ক'রে না। আমি চল্লাম। তুমি তোমার মানসী প্রতিমা নিয়ে সুখে থাক। এ অপমানিত, লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা অসহ্য বলেই, তা আজ আমি নিজের হাতে শেষ করে দিলাম। পরকাল?—তা ত' জানি না। আচ্ছা, বিদায়।"

সেই সময় পাশের বাড়ী হইতে ইন্দুর গলা ভাসিয়া আসিল,

"আমার মিলন লাগি, তুমি আস্‌বে কবে থেকে।"

ওঃ! এটা বুঝি বিনয়ের উদ্দেশেই গাওয়া হ'চ্ছে! ঘৃণায় অচলার মুখখানা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। "O the flirt coquette" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আফিংটার দিকে একবার চাহিল। বুকের অগ্নি-বা রবিতে লহরী-লীলার তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হইল। তার পর ঘরের চারি ধারে একবার চাহিল। ওই বারান্দায় বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে; কত সুখের স্বপন দেখিয়াছে! এই বাড়ী এক দিন নূতন অতিথিদের কচি কচি সুন্দর মুখে ও তাদের হাসিতে ভরিয়া থাকিবে, তখন সে কি করিবে, কিরূপ প্রণালীতে তাহাদিগকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবে—ভবিষ্যতের এই সব কথা ভাবিয়া কত স্বপ্নের জাল বুনিয়াছিল; কিন্তু দু'টো বছরও কাটিল না; সে জাল টুক্‌রো টুক্‌রো হইয়া নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়িয়া গেল; আকাশ-কুসুম আকাশেই ঝরিয়া গেল! হা'র এই মাত্র একুশ বছর বয়সেই সবই ফুরাইয়া গেল, সব শেষ হইয়া গেল। অচলা বিছানার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বালিশে মুখ গুঁজিল। খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টির সুতীক্ষ্ণ ছাট আসিয়া বিঁধিতে লাগিল।

ঠিক্ এম্‌নি সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল বিনয়। বিছানার কাঁছে আসিয়াই টেবিলের উপর প্রথমে আফিংটার উপর পরে চিঠি দুটোর উপর তাহার নজর পড়িল। সে স্তব্ধ ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল এক পা চলিয়া গিয়া অচলাকে তুলিতে, না পারিল তাহাকে ডাকিতে। কিছুক্ষণ পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল "অচলা।"

অচলা চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বিনয় পাশে বসিয়া তাহার একটা হাত নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিল; অচলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার, অপবিত্র!" বিনয় ম্লান হাসি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "আমি বুঝেছি কি হ'য়েছে। সমস্ত বল্‌ছি, শুন; কিন্তু তার মধ্যে ভীষণ কিছু করবার চেষ্টা কোরো না।"

তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "চিঠিটা পড়ে বুঝলাম, কি হ'য়েছে। কিন্তু ভুল আমারই হ'য়েছে, অচলা, তোমাকে সব কথা না জানানো। আমরা থিয়েটার করব ঠিক্ ক'রে একটা এ্যামেচার পার্টি খুলেছি। এই আগামী জন্মাষ্টমীর দিনে 'শুভদৃষ্টি' নাটকটি 'প্লে' করব; আর তা'তে আমি দেবকিশোরের 'পার্ট' নিয়েছি। সুরেশের বসবার ঘরে আমাদের প্রতি সন্ধ্যায় 'রিহার্সেল' চলে, তাই প্রতি রাত্রে আমার ফিরতে দেরী হয়। আমি সেই দিনই কথাটা তোমাকে বলতাম, কিন্তু তোমার ঠাট্টার ভয়ে, কথাটা গুছিয়ে বলব-বলব করেও আজ পর্য্যন্ত বলা হয় নি। সুরেশের বাড়ীতে প্রতি দিন অত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকবার আর অন্য কোন কারণ নেই, শুধু 'রিহার্সেল' ছাড়া;—ইন্দুকে আমি ছোট বোনের মত দেখি।"

তার পর, পকেট হইতে 'শুভদৃষ্টি' নাটকখানা ও তাহার নিজের 'পার্ট' লেখা কতকগুলো কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই নাটকের নায়ক দেবকিশোর, নায়িকা ইন্দুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। এক জায়গায় দেবকিশোর ইন্দুকে বলিতেছে, 'ইন্দু, আমি আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও সত্য ভালবাসি নাই, এতদিন আমি আমার মানসী প্রতিমা খুঁজিতেছিলাম, আজ তার দেখা পেয়েছি;—সে তুমি, ইন্দু।' বলেছি ত' আমি আছি দেবকিশোরের ভূমিকায়, এবং মৃণাল, সেই ছোকরাটির আছে নাটকের নায়িকা ইন্দুর ভূমিকা। কাল সন্ধ্যেতে যখন আমি 'রিহার্সেল'

দিচ্ছিলাম, তখন বোধ হয় ওই কথাগুলো তোমার কাণে যায়! তাই নয় কি?"

এই বলিয়া বিনয় নাটকের সেই স্থানটা বাহির করিয়া অচলার চোখের সাম্‌নে ধরিল। অচলা অপলক দৃষ্টিতে দেখিল, তাই বটে। দু'হাত দিয়ে অচলা বুকটা চাপিয়া ধরিল। আঃ, তা হ'লে সব ভুল; সব মিথ্যা! আমার স্বামী আমারই আছে! কি পরম শান্তি! কি গভীর তৃপ্তি! তার পর নিজের সাংঘাতিক ভুল ভাবিয়া গভীর লজ্জায় সে বিনয়ের কোলে মুখ গুঁজিল।

"অচলা, ওঠ!"

"কি নীচ মন আমার! তোমাকে আমি ভুল ভেবেছিলাম। তোমাকে আমি নীচ সন্দেহ করেছিলাম! আমাকে কি ক্ষমা কর্‌তে পারবে? তোমার কাছে মুখ তুল্‌তেও যে আজ আমার লজ্জা হ'চ্ছে।"

"ভুল তোমারও যেমন হয়েছে, আমারও তেম্‌নি হয়েছিল,—চক্ষুলজ্জার জন্য তোমার কাছে সব কথা গোপন ক'রে রাখা।" তার পর আফিংটার দিকে চাহিয়াই তার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। "আর একটু আমার আস্‌তে দেরী হ'লে, কি হ'ত বল দেখি? অতটা rash—। আচ্ছা, ওঠ, খাবে চল, অসুখের নাম ক'রে কাল সন্ধ্যে হ'তে ত' কিছুই খাওনি।" "না, উঠো না, বস।"

বাহিরে তখন ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর 'কাতরানি,' গুম্‌রানি সমস্ত থামিয়া গিয়াছে। আকাশের কান্না থেমেছে। মেঘের লেশ নাই। স্বচ্ছ নীলাকাশের গা বাহিয়া পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীকে রহস্যময়, স্বপ্নভরা জ্যোৎস্নায় আচ্ছন্ন করিয়া অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে। পৃথিবী শান্ত, ধীর, নিস্তব্ধ। শুধু গাছের পাতা হইতে এক একটি বারিবিন্দু জ্যোৎস্নার আলোয় হাজার বর্ণ-ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতে করিতে, অচলার বুকের স্পন্দনের প্রতিধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবীর উপর ঝরিয়া পড়িছিল,—'টিপ' 'টিপ' 'টিপ'।

খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানার উপর ঝরিতে লাগিল। আর তারই উপর অচলা ও বিনয় পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া পরস্পরের বুকের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। কাছের একটা বাড়ী হইতে পিয়ানোর সুরের সহিত ভাসিয়া আসিল, "The moon shines bright in such a night." * * *

থিয়েটারের দিন বিনয় দেবকিশোরের ভূমিকায় নামিয়া নায়িকা ইন্দুর সহিত প্রেমের অভিনয় করিতে করিতে যখন বলিল, "তুমিই আমার মনিসী প্রতিমা, ইন্দু," তখন তাহার সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহারই জন্য অচলা আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছিল। উঃ, আর একটু বিলম্ব হইলে, সে কি জিনিসই না হারাইত? মুখখানার তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িল; সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গেল। এম্‌নিভাবে সে কতক্ষণ ছিল তাহার সে জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হইল তখন যখন সহস্র দর্শক বৃন্দের হাত-তালি ও Pathetic রবে রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া তুলিল। দর্শকবৃন্দ কিছুই বুঝিল না, শুধু ভাবিল, কি সুন্দর অভিনয়! কি করুণ! একজন শুধু চিকের আড়ালে বসিয়া একবার হাসিল, একবার কাঁদিল, আর একবার শিহরিয়া উঠিয়া ভাল হইয়া বসিল—সে অচলা।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ঝড়ো হাওয়া" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲ টাকা।

আট আনা গ্রন্থমালার ৯৭ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত "প্রণয়ের ফাঁদ" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গীতমালা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ প্রণীত কথা উপন্যাস "ভুল" প্রকাশিত হইল: মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত "ভাগবত পুরাণ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৷৷০ আনা।

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত "রোগশয্যার প্রলাপ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

৺উমেশচন্দ্র রৌপ্যপদক:—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মীরাট শাখা হইতে ৺পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জীবনী ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে এবং বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য-পদক প্রদান করা হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। প্রবন্ধ ১লা বৈশাখের (১৩৩১) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়
৩২, ওয়েষ্ট ষ্ট্রীট, মীরাট ক্যাণ্ট।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

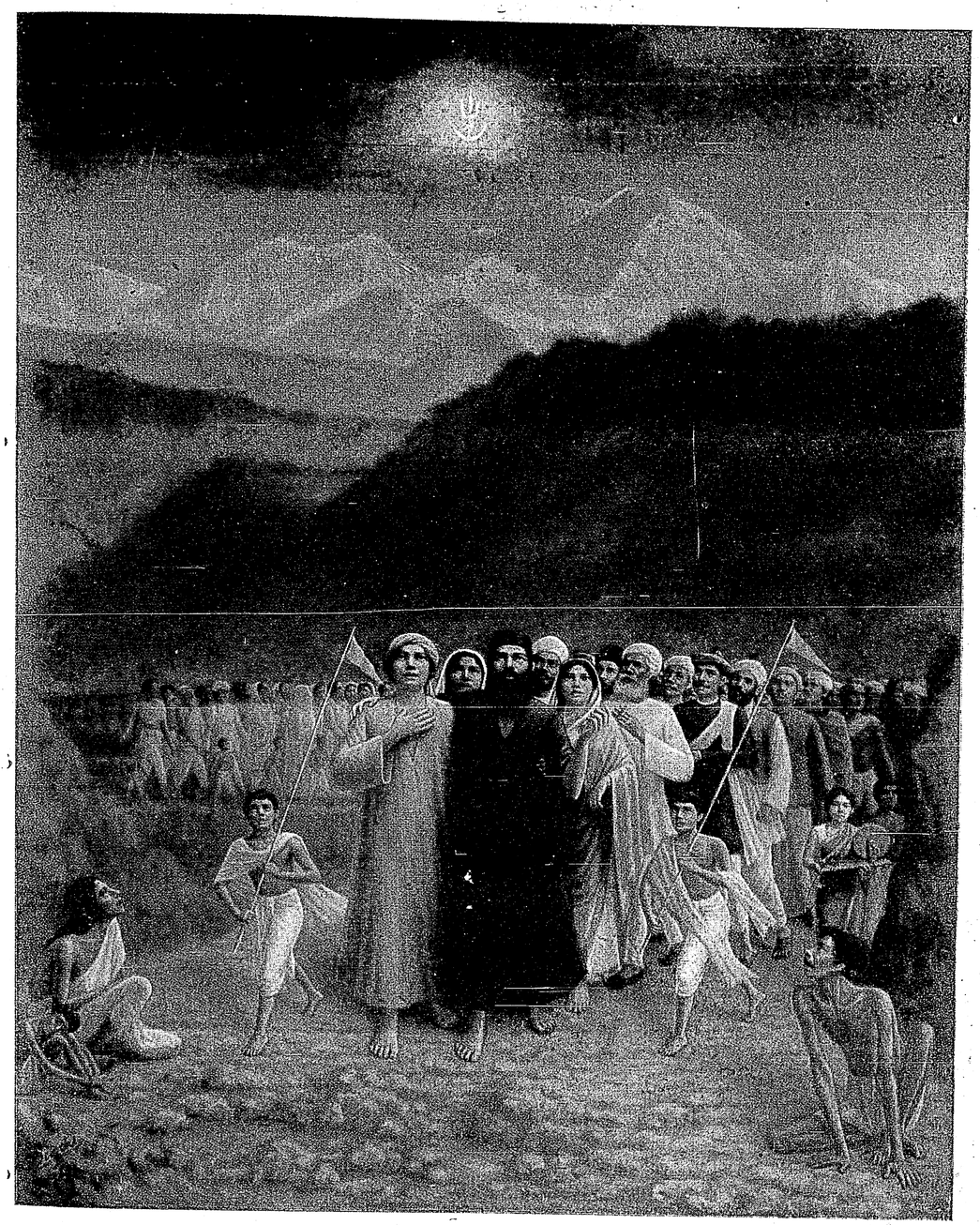

মুক্তির পথে

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে
শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচি

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.



বৈশাখ, ১৭৩৭

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রাজা রামমোহন রায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ

বানর এবং ভাল্লুক যাদের Totem এই রকম কতকগুলি ট্রাইবএর সহায়তায় উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতাকে একটা সমন্বয়ে উত্তীর্ণ করিবার সাধনার সাধক রূপে শ্রীরামচন্দ্রকে, রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্বে "বিশ্বভারতী"তে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্রুবচরিত প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যায়িকার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যাগুলি খুব সুন্দর। যীশুখৃষ্টের জন্ম এবং তাঁর crucifixion—তাঁর মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান প্রভৃতি ঘটনাকে ভল্‌জি সূর্য্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্ত রূপক বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেক লোক আছেন, যাঁদের কাছে যীশুখৃষ্ট এক নিত্যজাগ্রত চিরসহচর, জ্যোতিষের গল্পমাত্র নন্, এবং এদেশে যে কেহ সন্ধ্যায় পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই বহুকণ্ঠে উচ্চারিত দূরাগত রামায়ণ গান যদি শুনিয়া থাকেন, তবে অনুভব করিয়াছেন যে, এক বৃহৎ সংখ্যক জনগণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র যেন জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটির চেয়ে নিকটতর বন্ধু।—কোনো এক বিশেষ কালে ইতিহাসের কোনো এক বিশেষ সমস্যা কোনো একটি বৃহৎ জীবনকে আশ্রয় করিয়া যদি একটা সমাধানে পৌঁছিয়া থাকে, তবে সেই জীবনটি নিশ্চয়ই এক অর্থে অমরতা পাইয়াছে,—আমেরিকার জর্জ ওআশিংটন্-এর অমরতা তদ্রূপ। কিন্তু যদিও সম্ভবতঃ ওআশিংটন্‌এর ছবি ভদ্র আমেরিকান মাত্রেরই বৈঠকখানার এক অপরিহার্য্য আস্‌বাব,—এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে যে, আমেরিকান সিটিজেন তার স্বাধীনতার জনককে এক নিত্য সখা হিসাবে জীবনের সুখে দুঃখে আলোকে আঁধারে স্মরণ করিয়া থাকেন। চেরি গাছ কাটার উপাখ্যান থেকে

জানা যায়, ওআশিংটন্ এমন কি বালককাল থেকেই নিরতিশয় সত্যবাদী ছিলেন। তেম্‌নি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের শত শত ঘটনা থেকে জানা যায়, যে, যাকে দয়াবৃত্তি বলে তা তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং যাকে আত্মসম্মানবোধ বলে তাও তাঁর মধ্যে অদ্ভুত রকমে প্রখর ছিল। এই সকল বড়লোকেরা নানা ঘটনার স্রোতে লোক-লোচনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া পড়ার পর এঁদের এক একটা উল্লেখযোগ্য গুণ আমাদের চোখে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। এবং দেশের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তার জন্য সেইগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মারফতে আমরা বালকদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্থাপন করিয়াছি। ম্যাথু আর্ণল্‌ড্ এক জায়গায় কোনো এক প্রসঙ্গে সজারু নামক সর্ব্বাঙ্গে কাঁটাওয়ালা এক জন্তুর উপমা ব্যবহার করিয়াছিলেন—সজারু ফলগাছের নীচে গড়াগড়ি দিয়া এক দৌড় দেয়; এবং যে ফলগুলি তাঁর কাঁটায় বিঁধিয়াছে সেইগুলিকে গর্ত্তে গিয়া আহার করে। যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁদের জীবন আলোচনার কালে প্রায়শ আমরা উক্ত সজারুর অনুসরণ করি। আমরা মনে করি, যে, প্রথমত অনুকরণের দ্বারা মহত্ত্বকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর, দ্বিতীয়ত, কোনও এক মহাপুরুষের বিচিত্র সদ্‌গুণগুলি বৃক্ষতলে বিছানো ফলগুলির মত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ব্যাপার; জীবন বৃত্তান্তের বইএ বা শ্রাদ্ধ বাসরের আলোচনায় মনকে কয়েকবার সেই গুণাবলীর উপরে বুলাইয়া লইলেই, গুণগুলির মধ্যে কয়েকটা নিশ্চয়ই আমাদের চরিত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে। আমাদের এপ্রকার আচরণের কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ, সেই দৃষ্টির অভাব, যার দ্বারা, মহাপুরুষের জীবনের বিবিধ চেষ্টার মধ্যে একটিমাত্র যে মূল লক্ষ্য নিম্নে থাকিয়া কাজ করিতেছে, তাকে আবিষ্কার করা যায়; দ্বিতীয়ত, সেই কেন্দ্রগত মূল লক্ষ্যটি আবিষ্কার না করাতে আমরা তাঁর জীবনের প্রবাহের সঙ্গে নিজেদের নিগূঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া দিতে পারি না বলিয়া। যেখান থেকে তিনি তাঁর বিচিত্র কর্ম্ম-উদ্যমের শক্তি সংগ্রহ করেন, সে উৎস থেকে দূরে থাকিয়া, কেবল বাহিরে সেই সমুদায় কর্ম্ম-চেষ্টার দৃষ্টান্ত থেকে বল পাইতে চেষ্টা করি। আমরাও প্রবল বেগে শিক্ষা-বিস্তারে লাগিয়া যাই, সমুন্নত শ্রেণীদের উন্নতির জন্য নানা আয়োজন করি, এবং যথাসাধ্য তর্ক বিতর্ক জমাইয়া তুলিতে চেষ্টা করি। কিন্তু কিসের ক্ষুধায় রামমোহন রায়কে এমন কি বাল্যকালেই প্রতি দিন এক অধ্যায় করিয়া ভাগবত পড়িতে বাধ্য করে, আবার তাঁর পরিণত বয়সে তাঁকে বৈষ্ণবদেরই বিরুদ্ধে বিবাদে প্রবৃত্ত করে, ষোল বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে হিমগিরি উল্লঙ্ঘন করায়, হিব্রু এবং গ্রীক পড়িবার উৎসাহ দেয়, দিল্লীর সম্রাটের ওকালতী করিতে বিলাতে পাঠায়, আবার স্ত্রীলোকদিগের উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইনগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত করায়—সেই তাঁর মূল সূত্রটির সন্ধান পাই না বলিয়া, আমরা তাঁকে আশ্চর্য্য বিদ্যানুরাগী, সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী, নিপীড়িতদের সমব্যথী—এইরূপে বিবিধ সদ্‌গুণের আকর বলিয়া দেখি। ভুলিয়া যাই, যে, আকর হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে মাটি খুঁড়িয়া লোকেই যে মণিমুক্তা খুসি তুলিয়া আনিতে পারি, কিন্তু মহাপুরুষের জীবন হচ্ছে একটা স্রোতের মত, যার মধ্যে এমন এক অফুরান অজস্রতা আছে যা হীরকের খনিতে নাই—এবং যা যুগ থেকে যুগে তীরে তীরে নব নব ফলের সৃজন ক্ষমতার এক গুপ্ত রহস্য বহন করিতেছে।

ইতিহাসের এক সমস্যা এমন এক সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, যখন সে সমস্যা পৃথিবীর যে কোনো স্থানের যে কোনো লোকের মনীষার কাছে সম্যক অপরিচিত। ঘটনা-পরম্পরায় ভারতবর্ষেই তিনটি বড় বড় সভ্যতার এক সংঘাত উপস্থিত হইল। এবং রামমোহন রায় সমস্ত জীবন দিয়া সেই সংঘর্ষকে আপনার আত্মার মধ্যে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, যদি প্রশ্ন উঠে, এক বিপুল-সংখ্যক লোকের কাছে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র যে প্রকার আত্মীয়, কোনো কালে কোনো দলের কাছে রামমোহনের তেমন হওয়া সম্ভবপর কি না, তবে তার জবাব এই।—আইরিষ জাগরণের আন্দোলনের মধ্যে এই একটা চেষ্টা দেখা যায়, কেবল ইংরাজি ভাষার জায়গায় পুরানো লুপ্তপ্রায় Gaelic ভাষার পুনঃ প্রচলন নয়, তৎসঙ্গে যাকে 'Folk songs' এবং 'Folk tales' বলে সেইগুলির পুনরুদ্ধার, পুরানো গানের পুনঃ প্রচলন ও পুরানো উৎসবগুলির পুনরনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইয়াছে।

আপাতত মনে হইবে, যে, এ একটা আত্মরক্ষাপরায়ণ ও আক্রমণশীল স্বাজাত্য-বোধের অভিমানের উদ্দীপনার উপায় মাত্র,—এ সকলের interest কেবল মাত্র ভাষা সম্বন্ধীয়, সাহিত্য সম্বন্ধীয় এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বা তদপেক্ষা কিছু অধিক। কবি A. E. দেখাইয়াছেন ব্যাপারটা তার চেয়ে একটু গুরুতর।—সমস্ত ওল্‌ড্ টেস্‌টামেণ্টের বইগুলির মধ্যে দেখা যায়, যে, প্রফেটের পর প্রফেট আসিয়া অনেক দিন থেকে ভবিষদ্‌বাণী করিয়া যাইতেছেন, একজন মেসায়া আসিবেন, তিনি এই রকম হইবেন, ঐ রকম হইবেন, এ-কাজ করিবেন, ও-কাজ করিবেন। তার পরে এক সময়ে লাজারেথের এক ছুতার মিস্ত্রীর ছেলে, সেই সমস্ত উক্তির সঙ্গে মিলাইয়া কতকগুলি সেই সেই রকম কাজ করিলেন এবং এই দাবী উপস্থিত করিলেন, যে, আমিই সেই ভাববাদীদিগের কথিত মেসায়া আসিয়াছি। কতিপয় লোকে তাঁকে স্বীকার করিয়া লইল, তাদের সংখ্যা অল্প। অপর বেশীর ভাগ লোক বলিল, এ সেই লোক নয়। এই লোকেরা এখনো সেই লোকের আগমনের আশায় বসিয়া আছে। এই ছুতার মিস্ত্রীটিকে যদি উক্ত মেসায়ার সঙ্গে তাল না পাকাইয়া এঁকে আপনার স্বরূপেই দেখা যায়, তা হইলেও এই জীবনটি ফেলিবার জিনিস নয়, অর্থাৎ Jesus যদি Christ নাও হন, তথাপি তিনি এক অলোকসামান্য মানুষ। কিন্তু যিনি Jesus, তিনি এক সময়ে জীবিত ছিলেন, বাপমায়ের সঙ্গে বারো বৎসর বয়সের সময় জেরুসালেমে গিয়া বৃদ্ধদের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলেন, তেত্রিশ বৎসর বয়সের সময় স্বদেশবাসীদের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের মধ্যে নিষ্ঠুর রূপে হত হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি Christ, তিনি এই ত্রিদশ বৎসরের নাট্যলীলার সূত্রপাতের বহুপূর্ব্বে থেকে, এমন কি অনাদি যুগ থেকে (অর্থাৎ য়ীহুদীর জাতীয় চেতনার আদি যুগ থেকে), বিদ্যমান ছিলেন এবং কালভেরিতে যবনিকাপাতের পরেও, এখনও He is with *every man*. তার মানে আর কিছুই নয়:—Legend যদিও মিথ্যা তথাপি এক হিসাবে ইতিহাসের চেয়ে সত্য এই জন্য, যে, যদু, শ্যাম এবং মধু প্রভৃতি যে সকল মানুষকে নিত্য দেখি এবং যাদের সঙ্গে নিত্য কাজকারবার করি, তাদের মধ্যে মানবতা বলিতে আমাদের মনের মধ্যে যতখানি বুঝায় তার চেয়ে অনেকখানি খাট মানব দেখিতে পাই—এই প্রত্যহের সঙ্গীদের কারও মধ্যেই আমাদের raceএর standard statureটি না দেখিতে পাইয়া আমাদের মন অখুসি থাকে। যুগে যুগে মানুষ সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ উচ্চতাটিকে সুদূরে রাখিয়া তার জন্য আগমনী রচনা করিয়াছে, সেই-ই তার "ভবিষ্যদ্‌বাণী"। এবং যুগে যুগে মানুষ কোনো একটি লোকাতীত বীরকে কালের দূরত্বের ব্যবধানের মধ্য দিয়া সেই দীর্ঘতা দান করিয়াছে, সেই-ই তার Legend. এই জন্য এই লোক মানুষের "মনের মানুষ," এই জন্য ইনি "নিত্যসিদ্ধ" এবং নিত্যসহচর। যদু এবং মধুর মধ্যে এই মনের মানুষের খানিক মাত্র দেখি, এই জন্য তিনি এদের চেয়ে সত্যতর। এই জন্য, কবি A. E.'র মতে, আইরিষ গ্রাম্য গানের ও কাহিনীর নায়কদের মধ্যে আইরিষ মানবতার সত্যতম চেহারা আছে, এবং আয়র্ল্যাণ্ড যদি আয়র্ল্যাণ্ড হইতে চায়, এদের সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন করুক।

মানুষের চেতনা যেই সময়ে ট্রাইবএর বোধ থেকে বৃহত্তর বোধে উত্তীর্ণ হইবার বেদনার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, সে এক দূর অতীতের দৃশ্য। তখনকার কাল যে বীরটির জীবনের ধ্য দিয়া আপনার অভিপ্রায়কে মূর্ত্ত এবং সাফল্যের মধ্যে অগ্রসর করিয়াছিল, সে আজ আমাদের কাছে পুরাণ-কথার "hero", এবং এই hero, legendএর সমুদায় সুবিধা পাইয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে মানুষের চিত্ত ভূগোলে, ধর্ম্মে এবং জাতীয়তায় বিচিত্রিত এবং বিবিধ; এবং যে সময়ে, মানুষ যে সর্ব্বদেশে এই এক সত্যটি ঊষার ক্ষীণ আভাসটুকুর মতও কোনো দেশে কোনো লোকের মনে এতটুকু উঁকি দেয় নাই, সেই ঘোর রাত্রে যিনি বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বৃহত্তর বীর। কিন্তু একশত বর্ষও হয় নাই তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং চলিয়া গেছেন। তাঁর জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি আমাদের কাছে সুগোচর। তিনি তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন, রঙ্গপুরে দেওয়ানি করিয়াছিলেন, পাটনায় আরবি ফারসী পড়িয়াছিলেন, তাঁর বাপের সঙ্গে বিরোধ হইয়াছিল, মায়ের সঙ্গে মোকদ্দমা হইয়াছিল। এবং মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে এই সমস্ত ঘটনা চিরকালের জন্য ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য মুদ্রিত রহিল। পূর্ব্বে যখন ছাপার

কল ছিল না, তখন মৃত্যু মানুষের জীবনকে সেই স্নিগ্ধ অস্পষ্টতা দান করিবার সুযোগ পাইত, যা এই রৌদ্রালোকিত ধরণীকে নিশাগমে জ্যোৎস্নায় মণ্ডিত করিয়া দেয়। তখন, জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে যা কিছু ক্ষণকালের এবং অনাবশ্যক, তা স্বভাবত লুপ্ত হইয়া গিয়া যা শাশ্বত এবং সুন্দর তাই রমণীয় স্থায়িত্ব লাভ করিত। রামমোহন সেই যুগে জন্মিয়াছেন যখন দিবস তার কলকারখানা বিজলিবাতি প্রভৃতি লইয়া রাত্রির প্রাচীর ভাঙিয়া তার নিভৃত দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই জন্য, যদিও অন্ধকার ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে যে কিছু কর্ম্মপরতা, যে কিছু সংগ্রাম এবং যে বিরাট্ জাতি-সংগঠন-প্রয়াস চলিয়াছে, সে সকলেরই মূলে রাধানগরের রামকান্ত রায়ের ছেলে। তথাপি তাঁর শ্রাদ্ধ উৎসবকে ঠিক্ সেই হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না, যে হিসাবে আইরিষ কবি তাঁর জাতির জাগরণে গেলিক গ্রাম্যকথার বীরদের উৎসবকে কাজে লাগাইতে চাহেন। তথাপি গত দেড়শ' বৎসরে এই ভূখণ্ডে যে সকল লোক জন্মিয়াছেন ও মরিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কোনো একটি লোককে ভারতবর্ষীয় মানবতার প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে নিশ্চয়ই তিনি রাজা রামমোহন রায়।

উপকথায় যেমন পড়া যায়, দীঘির গভীর জলে পেটিকার মধ্যে একটি ভ্রমর আছে, রাজকন্যার প্রাণটি সেই ভ্রমরের মধ্যে; তেম্‌নি ভারতবর্ষের প্রাণটি এই রকম কোনো এক গহন কন্দরের মধ্যে আছে, সে কন্দরটি কোথায়? ভারতবর্ষের বিগত সাত শ বৎসরের ইতিহাস সেই কন্দর খুঁজিবার ইতিহাস। মুসলমানের ধাক্কায় একবার সেই গহনের খোঁজ পড়িয়াছিল। তখনকার ভারতবর্ষীয় সমাজে দুইটি আন্দোলন খুব স্পষ্ট। একটি, আপনার মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া সমাজের আত্মরক্ষার চেষ্টা, সে হচ্ছে স্মৃতি আন্দোলন। অপরটি, যা আসিয়া পড়িয়াছে তাকে আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস—কিন্তু আত্মসাৎ করিবার জন্য নিজের আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া প্রয়োজন। তখনকার দিনের যে বৈষ্ণব আন্দোলন বঙ্গে গৌরাঙ্গ, দ্রাবিড়ে বিঠোবা, গুজরাটে রণবীর—এইরূপ বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন আইডিয়াকে ঘেরিয়া দানা বাঁধিয়াছিল, মরাঠায় রামদাস স্বামীর জীবনের মধ্য দিয়া এক নূতন জাতি গড়িয়াছিল, এবং পঞ্জাবে জাঠ প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আপনার মধ্যে গ্রাস করিয়া লইয়া আবার তাদের বিশিষ্টতার দ্বারায় আপনি প্রভাবিত হইয়া শিখধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল, সেই উদার ধর্ম্মান্দোলন এই আত্মসাৎ-প্রক্রিয়ারই নিদর্শন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যখন য়ুরোপ হইতে ধাক্কা আসিল, সে একেবারে মরণ-ধাক্কা। দেখিতে পাওয়া গেল দলে দলে লোক খৃষ্টান হইতেছে। কিন্তু বিপদ্‌টি সেইখানে ছিল না। আসল সঙ্কটটি এই হইল, যে, একটা যান্ত্রিক সভ্যতা আসিয়া এখানকার সমুদায় সমাজ-স্থিতির একেবারে গোড়ায় ঘা দিয়াছিল; এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে "ধর্ম্ম"কে ভারতবর্ষের প্রাণ বলিয়াছেন, তারই প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই একটা কথা চলিত হইয়া গিয়াছে, যে, জড় আচার ও সংস্কারের নাগপাশে পড়িয়া যে ভারতীয় ধর্ম্ম মৃত্যুর কবলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, য়ুরোপীয় Rationalism আসিয়া সেই মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করিয়াছে; এবং রাজা রামমোহন রায় আর কিছু নন্—ভারতবর্ষীয় রুশো। এ কথা মিথ্যা নয়, যে, তিনি তাঁর যুক্তির খড়্‌গ য়ুরোপে শানাইয়াছিলেন; কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় আরব দেশে যে খড়্‌গ প্রস্তুত হইয়াছিল। রুশো ভল্‌টেয়ারএর প্রভাবের চেয়ে মতাজল সম্প্রদায়ের প্রভাব রাজার উপরে বেশি ছাড়া কম নয়। এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল, যে, যেখানটাতে মনে হইল, যে, তিনি য়ুরোপকে এখানে ধ্বংসকার্য্যে সাহায্য করিলেন, সেইখানেই তিনি এদেশে য়ুরোপের প্রতাপের ভবিষ্যৎ ধ্বংসেরও সূচনা করিলেন। হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুকে খৃষ্টানী ভাবাপন্ন করিলেন, আবার তাতেই খৃষ্টান মিশনরির কাজ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য প্রচলনে, স্বদেশীয়দের বিরাগ উৎপাদন করিয়া, ইংরাজকে সাহায্য করিলেন, পরন্তু ইংরাজ যদি কোনো একটি কাজের দ্বারা এ দেশে তার আধিপত্য চিরস্থায়ী হইবার মূলে কুড়ুল মারিয়া থাকে, তবে ইংরাজি প্রচার করিয়া সে-কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু এ সকলেরও চেয়ে যা গভীর তা এই:—ভারতবর্ষের যে গভীর প্রাণ-প্রবাহ উপনিষদ্‌এর গঙ্গোত্রী থেকে যাত্রা

মুক্ত করিয়া নানা খজু কুটিল পথ অতিবাহন করিতে করিতে কালক্রমে পৌরাণিকতা তান্ত্রিকতা প্রভৃতির বালুকাজালের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল রাজার তীক্ষ্ণ ধী তাকে খুঁড়িয়া আবিষ্কার করিল।

ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহনের প্রত্যক্ষ কীর্ত্তি। এই আর একটা কথা খুব চলিত হইয়াছে, যে, এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দরকার উপস্থিত হইয়াছিল, সে দরকারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কাজও শেষ হইয়া গেছে। ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হইয়া থাক্ কি না হইয়া থাক্, এ দেশে রামমোহন রায়ের কাজ শেষ হইয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে অন্তত সমসাময়ে বেশি সংশয় করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। যখন একটা প্রচণ্ড 'ন্যাশন্যাল' আন্দোলনের মধ্যখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, এ মহাদেশ, যেমন চিরকাল আজও তেম্‌নি, স্বার্থে স্বার্থে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রদেশে প্রদেশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত। জীবনবৃত্তান্তে পড়া যায়, যে, তিনি যখন বালক, সেই সময়েই ব্রিটিষ্ শাসনের প্রতি ঘৃণাবশত দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। অথচ ব্রিটিষ্ চরিত্রের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সে-লোক বহুদূর দেশেও কোনো সামান্য জাতি পরের অধীনতা প্রাপ্ত হইলে শোকে আচ্ছন্ন হইতেন, এবং একবার এক জাহাজে এক স্বাধীন জাতির পতাকা প্রথম দেখিয়া উল্লাস তাকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সে-লোকের কাছে স্বদেশের রাজনৈতিক কলঙ্ক রমণীয় এবং আদরণীয় ছিল না। অথচ, সেই কলঙ্ককে, বা সেই কলঙ্কের মোচন চেষ্টাকে একান্ত করিয়া দেখিলে ত চলিবে না। মানবীয় ম্যুব্‌মেণ্টগুলি একে অন্যের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ট যোগে সম্পর্কিত, সে এক রকমের 'জৈব' যোগ, রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম এই সত্যটি আবিষ্কার করিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তির এক প্রকার আলস্য থেকে, বা আজকাল থিওসফিক্যাল মনোভাব থেকে, এই একটা কথা আমরা প্রায়ই বলি, যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। রাজা এই কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া প্রথম দেখাইলেন, যে, সকল ধর্ম্মেই কিছু কিছু খুব ভাল অংশ আছে। নবযুগের মানবকে আপন অভিজ্ঞতাতে সেই সমুদায় অংশকে আত্মসাৎ করিতে হইবে। তাঁর এই চিন্তাটি কেশবচন্দ্রে এক অপূর্ব্ব পরিণাম প্রাপ্ত হইল। নববিধানের বাণীর মূলমর্ম্মই এই, যে, যেখানে যে মানুষ যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গিয়াছে, যেদেশে যেকালে, সত্য, যে আংশিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে—তার সবগুলিকে মিলাইলে পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন, তিনি নববিধান থেকে এই প্রেরণাটি লাভ করিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় উপধর্ম্মকে এক বৃহৎ synthesis এ আনয়ন করিলেন। করিয়াই, সকল পৃথিবীতে এই এক সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, ভারতবর্ষের পৃথিবীকে দান করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব বাণী আছে, এবং সেইটি দিবার জন্যই সে কোনোমতে বাঁচিয়া আছে। এই বার্ত্তাটি পরবর্ত্তীকালে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় এই আকারে প্রকাশ পাইল:—পূর্ব্ব এবং পশ্চিম complementary; য়ুরোপের মধ্যে সেই চঞ্চল গতিবেগ আছে, যা ভারতবর্ষকে পুনরায় ইতিহাসের যাত্রাপথে প্রেরিত করিবে; আবার, য়ুরোপ যে প্রচণ্ড লক্ষ্যহীন তৃষ্ণার তাড়নায় দিগবিদিক্ হারাইয়াছে, সেই তৃষ্ণা জুড়াইবার পানীয় ভারতবর্ষের কাছেই আছে। দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যের গভীর দুর্গতি সার্থক—যদি ভারতবর্ষ সেই অমৃতকে বহন করিয়া থাকে—তার দুঃখ করিবার কিছু নাই। যে-সময়ে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল, সেই সময়ে এদেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব। উক্ত বার্ত্তাটি অরবিন্দের লেখায় এই পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দিল:—ভারতবর্ষের অধুনাতন এই তামসিকতাকে দীপ্ত তেজের সঙ্গে দূর না করিয়া দিলে, সেই অমৃতবাণীকে জগৎ সভায় উপস্থিত করিবার যোগ্যতা তার অর্জ্জিত হইবে না। অতএব জগতেরই কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দুর্গতি দূরীকৃত করা দরকার এবং তা কেবল ঘোর রাজসিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া হইতে পারে। তৃতীয় পরিণতিটি এই শেষোক্ত হইতে একটু অন্য পথে চলিয়া গেল। তার বক্তব্য এই হইল, যে, রাগ এবং দ্বেষ এবং হিংসা এবং বল প্রকাশ এইগুলি এই সর্ব্বব্যাপী তামসিকতাকে সেই সাত্ত্বিকতাতে উত্তীর্ণ করিবে না, যে সাত্ত্বিকতা আপনাকে জানিবার, আত্মাকে পুনরাবিষ্কার করিবার, উপায়। গভীর দুঃখকে স্বেচ্ছায় বহন করিলেই সেই বৃহৎ আনন্দে

পৌছিব যাকে জানিলে "ন বিভেতি কুতশ্চন।" এবং যে যুরোগ আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে, আমারই দুঃখের দ্বারায় একই সঙ্গে আমাকে এবং তাকে উভয়কে উদ্ধার করিব।

কিন্তু এই সমস্ত বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে রামমোহনের যে মূল সুরটি বিবেকানন্দের কণ্ঠে অত্যুগ্র স্বাদেশিকতায় তাল হারাইয়া পুনরায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতায় স্বস্থ হইয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় প্রতিক্রিয়ার ঝোঁকে কন্‌গ্রেসী হট্টগোলে হারাইয়া গেছে। অদ্য এই কথাটি আমাদের স্মরণ করা দরকার যে, ব্যক্তি যেমন আপনার মধ্যে আপনি পঙ্গু, ব্যর্থ এবং অর্থহীন, সকলের সঙ্গে যোগেই তার জীবন এবং সার্থকতা, তেম্‌নি স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জিত বিশ্বাভিমুখীনতাও আবার একটা নিরর্থক একাকার মাত্র, তার কোনো রূপরসগন্ধ নাই, সে নিছক একটা abstraction. একদিকে যেমন কূর্ম্মের মত আপনার মধ্যে আপনাকে সংকুচিত করিয়া আমাদের মুক্তি নাই;—তেম্‌নি অপর দিকে নাটাইএর বাঁধন থেকে মুক্ত ছিন্নসূত্র ঘুড়িরও বিনাশ অনিবার্য্য। এইজন্য "না" যে-সাধনার প্রাণ, সে সাধনা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসমাজের সাধনা নয়; এবং ঐ কারণেই, যে-আন্দোলন প্রত্যাহারের উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহ দেখা গেল না।

রামমোহনের নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুসারে—তিনি কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। তাঁর সার্ব্বভৌমিকতার মূল তত্ত্বই এই—একত্রিত করিলেই এক করা হয় না; কিন্তু একই নানা হইয়া প্রকাশ পাইতেছে—সেই মূল সূত্রটি ধরা পড়িলেই এক বৃহৎ প্রসারিত চেতনার মধ্যে সমুদায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা। ভারতবর্ষের মর্ম্মসাধনারই মধ্যেই সেই মীমাংসা আছে, এই রাজা রামমোহন রায়ের আবিষ্কার। এই জন্যই যখন দেখি, যে, বিলাতেও শুধু যে তিনি বরাবর ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছেন তাই নয়, ব্রিষ্টলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গলায় যজ্ঞসূত্র পাওয়া গেল, কিংবা যখন আরো দেখি, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া তিনি তার পৌরোহিত্য করান, এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ব্রাহ্মণের দ্বারাই সমাজে বেদপাঠ হইবে এই ব্যবস্থায় জেদ করেন, তখন, এইগুলিকে তাঁর কেবল একটা ক্ষন্তব্য "দুর্ব্বলতা" হিসাবে আমরা দেখি না। মহাপুরুষদিগের পক্ষেও সমসাময়িক দেশাচারের বন্ধন সময়ে সময়ে কি প্রকার দুশ্ছেদ্য, রাজার জীবনবৃত্তান্ত লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এইগুলিতে তারই অন্যতর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। পরন্তু আমরা এইগুলির মধ্যেই সেই প্রমাণ পাই যদ্দ্বারা আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি, যে, যে সমাজব্যবস্থা ও তার অন্তর্নিহিত জীবনতত্ত্বকে পূর্ব্বে হয়ত 'ব্রাহ্মণ্য' বলা হইত, কিন্তু অধুনা আমরা 'ভারতবর্ষীয়তা' এই নাম দিতে চাই, সেই ভারতবর্ষীয়তাই রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম। কেহ যদি তাঁকে হিন্দু বলিতে চায় বলুক, না বলিতে চায় না বলুক। নামের [illegible] কিছুই আসিয়া যায় না। "Do unto others as you would be done by"—নীতি-প্রধান ধর্ম্ম থেকে এই লোকশ্রেয়ের আদর্শকে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ যদি সত্য ভাবে খৃষ্টেরও শিষ্যত্ব স্বীকার করিত, রাজার তাতেও কিছুই আপত্তি থাকিত না। রাজাকে আমরা আগামী যুগের সেই চর্চ্চের অগ্রদূত বলিয়া দেখি, যে-চর্চ্চের উপরে খৃষ্টান মুসলমান বা হিন্দু ইত্যাকার কোন labelই আঁটা নাই, অথচ সে চর্চ্চ একদিকে যেমন স্থানীয় ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন থেকে ভ্রষ্ট একটা দার্শনিকতা মাত্র নহে, তেম্নি অপরদিকে বিবিধ ধর্ম্ম থেকে সঙ্কলিত একখানি 'cosmopolitan' পুষ্পমাল্যও নহে। এ হচ্ছে সেই ঔপনিষদ ধর্ম্ম, যে সকলের মধ্যে আত্মাকে, এবং আত্মার মধ্যে সকলকে দেখিতে শেখায়; শেখায়, যে, আত্মসাৎ করিবার প্রণালী গ্রাস করা নয়, নিজেকে সর্ব্বত্র প্রচারিত করা নয়, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিয়া আত্মবিলোপ করা। যেদিন বণিকের দম্ভ এবং সৈইনিকের হুঙ্কার থামিয়া গিয়া "বিশ্বমানবের" জন্মদিন আগত হইবে, সেদিনই,—পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে উনবিংশ শতাব্দীতে যিনি সেই শুভঘটনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁর যথার্থ মর্য্যাদা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার সময় আসিবে।*

* পাটনার Behar Young Men's Institute-এ রাজার স্মৃতি-সভায় পঠিত।

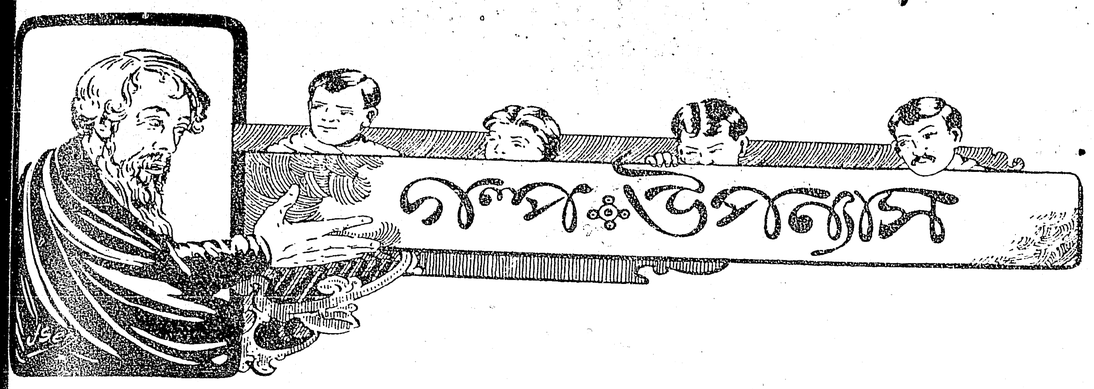

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৯)

সন্ধ্যার সময় ত্রিতলের খোলা ছাদে অমরনাথ বসিয়া ছিলেন। সেই সময় প্রভাস ও মনীশ বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করিয়া একেবারে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথ মনীশকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি ছাদে থাকিবেন, মনীশ বেড়াইয়া আসিয়া যেন সেখানেই যায়, তাহার সহিত কথা আছে; প্রভাসকেও তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। তাই মনীশ তাহাকে লইয়া উপরে উঠিল।

শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রি, আকাশে পূর্ণ চন্দ্র হাসিতেছে। মাঝে মাঝে নীলাকাশের গায় ভাসিয়া দুই এক খণ্ড ছোট ছোট মেঘ চাঁদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ছাদের পার্শ্ববর্ত্তী একটা আমগাছের পাতার আড়ালে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া ডাকিতেছিল, দূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার ডাকের উত্তর দিতেছিল। নীচে পিছন দিকে গঙ্গার বুকে গ্রাম্য যুবকেরা পান্সী ভাসাইয়া গান গাহিয়া যাইতেছিল—

তুমি স্নিগ্ধ যেমন চাঁদিমা কিরণ জ্যোছনা মাখা নিশায়—

মনীশ ও প্রভাসের পদশব্দ কাণে আসিতেই অমরনাথ উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন "এসো, এই মাদুরটার উপরে বস।"

উমা ছাদের একটি পাশে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর নীরব উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। পিতার আহ্বান শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রভাস ও মনীশকে দেখিয়া নীচে চলিয়া গেল।

প্রভাস জুতা খুলিয়া বসিয়া পড়িল, মনীশ জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল "আজ প্রভাস বেচারা বড্ড হাঁফিয়ে পড়েছে। অনেকদূর ঘুরিয়ে এনেছি ওকে। শেষে বলে—আর না, আর বেড়াব না, চল ফেরা যাক।"

অমরনাথ হাসি মুখে বলিলেন "এখানে আর কি-ই বা দেখবে প্রভাস, কেবল বন আর বন। দেশের লোক অর্দ্ধেক চলে গ্যাছে কলকাতায়, দেশে আর কয়জন লোক আছে।"

প্রভাস বলিল "কেন, অনেক লোকই তো আছে দেখলুম।"

অমরনাথ বলিলেন "আরও ছিল। এরা সবও চলে যেত, কারণ পেটে না খেতে পেলে মানুষ দেশের মায়া কাটাবেই। আমি কেবল দেশের পানে তাকিয়ে দেশ ছেড়ে যাই নি। কারণ, জানছি, আমি যদি চলে যাই, সব লোকই দেশ-ছাড়া হবে। নূতন এক একটা কাজ করাচ্ছি যাতে ওরাও অর্থ পাচ্ছে, আমারও লাভ

হচ্ছে। একটা ফ্যাক্টরী করবার ইচ্ছে আছে, যোগাড়ও করেছি। এতে অনেক লোকের জীবিকার্জ্জনও হতে পারবে অথচ আমারও ক্ষতি হবে না। আমার সঙ্গেই প্রজার সম্পর্ক। আমি এমন কাজ করব, যাতে ওদেরও লাভ হয়, আমারও লাভ হয়। তা হলে দেশের যা তা দেশেই থাকবে। দেশের মায়া আমার বড় বেশী, দেশটাকে আমি কোন মতেই ত্যাগ করতে পারি নে।"

প্রভাস একটু নীরব থাকিয়া বলিল "দেখে এলুম যা তাতে খুব ভালই বোধ হয়। আপনার প্রজাদের অবস্থা বেশ উন্নত।"

অমরনাথ বলিলেন "উন্নত করতে হয়েছে অনেক শিক্ষা দিয়ে। ওদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যাই ঘটুক না কেন, আমি সেটা আদালতে গড়াতে দিই নে, নিজেই দুই পক্ষের মত নিয়ে মিটিয়ে দিই, এতে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যায়। এই যে পায়ের তলে মাটী, এ তারা অনর্থক ফেলে রাখতে চায় না, একহাত মাটীতেও তারা উপযুক্ত ফসল তুলে নেবে। এতে লাভ হয় এই, কিছু কিনতে হয় না,—যার ঘরে যা হয় সে তা প্রচুর রূপেই ভোগ করতে পারে। এখানকার গরুদের চেহারা দেখ, এরা দুধও দেয় তেমনি। এতে শিশুদের ছোট বেলা হতে বার্লি, সাগু, এরারুট দিতে হয় না, তারা মায়ের দুধ যেমন প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছে, গরুর দুধও তেমনি পাচ্ছে, এতে তাদের চেহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। জ্ঞানের জন্যে স্কুল করেছি, শুধু দৈহিক উন্নতিতেই শেষ করিনি। গ্রামের মেয়েরা আমার বাড়ীতে এসে উমার কাছ হতে পড়া জেনে নেয়, নানারকম শিক্ষা লাভ করে। আমি দেখছি বাহিরে, উমা দেখছে অন্তঃপুরে। সংসারে সুগৃহিণী হওয়া, সুমাতা হওয়া, এ সব শিক্ষা দিচ্ছে উমা। উমার অনেক ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তারা উমার প্রদত্ত শিক্ষার সদ্ব্যবহার করছে।

মনীশ বলিল "আপনি ঠিক জেনেছেন বলেই করতে পারছেন। ধরুন, আমার মত লোক যদি হয় তবে—"

একটু হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন "তবে আর কি, যেমন সচরাচর হয়ে আসছে তেমনই হোত, তার বেশী একটুও কিছু হত না। সেটাতে তোমার ভাল হত না মন্দ হত, আমি তাই জিজ্ঞাসা করি।"

মনীশ আর কথা কহিল না, মুখ নত করিয়া হাসিতে লাগিল।

অমরনাথ বলিলেন, "আমি তোমায় ডেকেছিলুম মনীশ, একটা বিশেষ দরকার ছিল। আমি—"

তিনি একটু ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনীশ বলিল "প্রভাসের সামনে কোনও কথা লুকোবার নেই। ও কি একটা মানুষ? আমি তো বলি, ও মানুষ নামের বাহিরে—"

প্রভাস কৃত্রিম ক্রোধে বলিল "শুনবেন না ওর কথা, মনীশটা ভারি মিথ্যাবাদী।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন "না—না, ওর কথা আমি কাণেও তুলি নে। যাই হোক, আমার কথাটা আমি আগেই সেরে ফেলি, এখনি হয় তো আবার উমা এসে পড়বে। তার সামনে এ সব কথা এখন বলতে আমি রাজি নাই।"

মনীশ বলিল "উমা এখন সন্ধ্যা করতে গেছে, এখন সে আসছে না।"

অমরনাথ কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, "আমি উমার আবার বিয়ে দিতে চাই, এতে তোমার মত কি? যদি বল হতে পারে না, তবে কেন হতে পারে না তার কারণ আমায় দেখাও।"

"উমার বিবাহ!" মনীশ যেন চমকাইয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

দৃঢ়কণ্ঠে অমরনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, উমার বিয়ে। কথাটা কি এতই ভয়ানক, মনীশ, যে, তুমি একেবারে চম্‌কে উঠলে? কই, আমার কাছে তো এ রকম ভয়ানক বলে ঠেকছে না,—মনে হচ্ছে খুবই সহজ, সরল কথা এটা, কাজটাও বেশ সহজ।"

মনিশ বলিল "সেটা হতে পারে। আপনি অনেক দিন হতে বোধ হয় কথাটা ভেবে আসছেন, তাই আপনার কাছে এ কথাটা বিশেষ জটিল বলে ঠেকছে না। কিন্তু আমি কখনও এ কথাটা ভাবতে পারি নি, তাই হঠাৎ শুনেই আমি চমকে উঠেছি। আমার মনে হচ্ছে, এটাকে আপনি যত সহজ, সরল বলে ভাবছেন, এ কখনই তত সহজ সরল হবে না। এর মধ্যে জটিলতা খুব বেশী রকম রয়েছে, যাতে এটা একেবারে অসম্ভব বলেই বোধ হয়।"

অমরনাথ বলিলেন, "অসম্ভব হবে কিসে? শাস্ত্রে বিধবা বিয়ের উল্লেখ আছে, আমাদের দেশে এ রকম বিয়ে কয়েকটা হয়েও গ্যাছে। সমাজ আমার কি করবে, প্রথমটায় একটু চোখ রাঙাবে, কিন্তু আমি তাতে ভয় পাই নে। সমাজ বড়, না আমার উমা বড়, এই কথা যদি জিজ্ঞাসা করতে চাও, তবে আমি বলব, সমাজের চেয়ে আমার উমাই বড়। উমার সুখের জন্যে আমি সমাজের কাছ হতে দূরে গিয়েও বেশ থাকতে পারব।"

মনীশ বলিল "বুঝলুম তা। কিন্তু তা হলে আপনাকে হিন্দু ছাড়া ভাবেই কাজ করতে হয়,—আপনার স্ব-শ্রেণীর মধ্যে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। উমার যে রকম বিয়ে দিয়েছেন, উমারও তেমনি দিতে হবে।"

অমরনাথ বলিলেন "তাই দেব।"

মনীশ এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু উমা? উমা কি এতে মত দেবে? সে তো ছেলেমানুষ নয় যে, তাকে যা বলবেন, সে তাই শুনবে? তার নিজের বলে একটা যে মত আছে, সেটা বোধ হয় জানেন,—সেই মতে সে যদি আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে?"

অমরনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "তাই তো ভাবছি।"

মনীশের কণ্ঠ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "আমি ঠিক বলছি, সে আপনার এ প্রস্তাবে কখনই রাজি হবে না। আপনি তাকে যে চিনতে পারেন নি, এই ভেবেই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। আপনারই কাছে মানুষ সে, আপনি তাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষাই সে পেয়েছে; আপনি তো তাকে বিলাসের অনুযায়ী শিক্ষা দেন নি, তাকে যে সংযম শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে তো কোনও একটী বস্তুকে নির্দ্দেশ করে ভালবাসতে শিক্ষা দেন নি, তাকে যে জগৎকে ভালবাসা শিক্ষা দিয়াছেন। এখন কি সে আপনার সেই জগৎ-বিক্ষিপ্ত ভালবাসাকে গুটিয়ে এনে একটীর পরে ন্যস্ত করতে পারবে?"

চিন্তিত মুখে অমরনাথ বলিলেন "আমি তো তাই ভাবছি।"

মনীশ বলিল "ভাবছেন, জানছেন সবই, তবে কেন আবার এই গর্হিত কাজটা করতে যাচ্ছেন? যদি উমা তেমনি মেয়ে হত, তাও আপনি এ ভাবনাটা ভাবতে পারতেন না। বিধবা আমাদের সমাজে বরাবর দেবীর আসনই পেয়েছেন, তাঁকে টেনে এনে আবার সংসারের পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করা বড় সাংঘাতিক কথা।"

অমরনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "মানছি মনীশ, তোমার ঐ কথা আমি মেনে নিচ্ছি যে বিধবা দেবী, তিনি সংসারের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু বিধবা—সেও মানুষ তো। আমাদের মতই তার আহার নিদ্রা, তার ভাবনা চিন্তা, সবই। বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার যা কিছু সব পুড়িয়ে ফেলে দেবী হতে পারে না। তার মনের মধ্যেও কামনা আছে, বাসনা আছে, সে আমাদের ভয়েই প্রাণপণে তা সংযত রাখতে চায়। আমাদের পানে চেয়ে সে নিজের সুখকে বিসর্জ্জন দেয়। তার পানে চাওয়া আমাদের উচিত না অনুচিত? আমাদের কি উচিত নয়, তার বুভুক্ষু, তৃষ্ণাতুর হৃদয়কে শান্ত করা? আমরা এতই স্বার্থপর যে শুধু নিই, দিতে জানি নে, অথচ দেওয়াটা কিছু কঠিন কাজ নয়। ঐই যে উমা, এর বুকের মধ্যে কি একটু কামনা জেগে নেই, এ কি যথার্থই আপনার সবটা বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে? আমরা স্বার্থপর, তাই ওদের স্বার্থত্যাগটা শুধু দেখে যাই, প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারিনে। প্রাণ দিয়ে যদি অনুভব করতে পারতুম, তবে তাদের এ কষ্ট আমরা দূর করবার চেষ্টা করতুম।"

মনীশ চুপ করিয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল নদীবক্ষ পানে চাহিয়া রহিল। উমার বিবাহ—কথাটা তাহার হৃদয়কে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল। উমাকে সে যথার্থই দেবীর আসন দিয়াছিল, উমাকে সে ভক্তি করিত, ভালবাসিত। সে উমার সহিত হাসি-ঠাট্টা করিলেও, বেশ জানিত, উমা পৃথিবীর নহে,—উমার দেহ রক্তমাংসে গঠিত হইলেও, উমার মধ্যে যে আছে, সে পৃথিবী ছাড়া। উমাকে সে কোনও ক্রমে কাহারও সহিত তুলনা করিতে পারিত না,—বরাবর তাহাকে অতি ঊর্দ্ধে দেখিয়াই আসিয়াছে। সেই উমার মনে সংসারের কামনা-বাসনা, সেই উমার মনও ক্লেদ ছাড়া নয়? তবে জগতে বিশ্বাস করা যায় কাকে?

অমরনাথ বলিলেন "চুপ করে রইলে যে মনীশ? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, তা ছাড়া বন্ধুর ছেলে তুমি, আমিও তোমায় নিজের ছেলের মত দেখি। তুমি শিক্ষিত, দেশের মধ্যে গণনীয় একটা লোক, আমি তাই তোমার একটা মত জানতে চাচ্ছি। অবশ্য তোমার অমত

হলেও যে আমি পেছিয়ে যাব তা নয়, এ আমি করবই, উমাকে আমি সুখী করবই। তবু তোমার মতটা জানতে চাচ্ছি—"

মনীশ বিশুষ্ক মুখে বলিল "মত? আমার মত কিছু নেই কাকা, আপনি আপনার ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন, আমি তাতে স্পষ্ট কিছুই বলতে পারব না।"

অমরনাথ বলিলেন "এতে জানা যাচ্ছে, তোমার মত নেই।"

মনীশ বলিল "প্রকৃত কথা বলতে গেলে তাই-ই বটে। দেখুন, পাশ্চাত্য শিক্ষাতেই আমরা মানুষ হয়েছি, অনেক সভ্য সমাজেও বেড়িয়েছি, তাদের মধ্যে স্বামী মরলে একটা কেন, দশটা বিয়েও করতে পারে, কিন্তু সুখী তো কই কাউকেই দেখিনি। আপনি যাকে সুখ বলতে চাচ্ছেন, আমি জানি সে সুখ নয়, সুখের নামে অসীম দুঃখই মাত্র। যদি ভোগ বলতে চান, সুখ বলতে চান, তবে তা ত্যাগের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়। ত্যাগে যে তৃপ্তির সুখ, বিধবা ব্রহ্মচারিণী সেইটেই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। আপনি এ কথা এখানে কেন—অন্য সমাজেও আমায় বলতে দিন, আমি বলে আসব, আমি তর্ক করব। আপনাকে শুধু বলব মাত্র, তর্ক আপনার সঙ্গে কোন মতেই চলবে না। যাই বলুন, আমি যে আদর্শ মনের মধ্যে গড়ে রেখেছি, সে আদর্শকে খাটো করে ফেলা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমার মাও বিধবা, তিনিও তো ইচ্ছা করলে—"

অমরনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার ভুল হচ্ছে মনীশ, তুমি যে ধরণের কথা বলছ, আমি সে কথা বলছি নে। তুমি যে কথা বলছ, তাতে বুঝাচ্ছে, যে-কোনও বিধবার বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা যেন সমাজ-সংস্কারকের কথা। বিধবা বিয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের সংস্কার আমি তো চাচ্ছিনে। আমি দেখছি আমার মেয়ের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। সুখ দুঃখ এ কথাও আমি ধরছিনে; আমি দেখছি, নারীর জীবনের অভাবটা।"

মনীশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার কর্ত্তব্য আপনি করে যান, এতে কারু মতামত নেবেন না। আমার কথার ঠিক নেই, মাথারও ঠিক নেই। বিশেষ এ সব সাংসারিক কাজে দক্ষতা আমার মোটেই নেই। আমি জানি ঠিক সময়টায় খেতে, আর কলেজে গিয়ে ছেলে পড়াতে। কে রাখে অত সংসারের খবর, নারীর অভাবের অভিযোগ, সামাজিক কথা?"

সে উঠিয়া ছাদের ধারে পাদচারণা করিতে লাগিল।

অমরনাথ প্রভাসের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "বাস্তবিকই, একটু বুদ্ধি হল না মনীশের। এত বড় হয়েছে, এখনও ছেলেখেলা নিয়ে দিন কাটাতে চায়, তা পেলে আর কিছু দরকার নেই। সাংসারিক জ্ঞানও যে একটু দরকার, সেটা ওর ধারণাই নেই।"

প্রভাস একটু হাসিল, বলিল "মনীশ আবার অর্থকেই অপদার্থ বলে। আমি দেখছি, আপনি ঠিক কাজই করছেন। আট বছরের বিধবা মেয়ে, কি জানে সে, স্বচ্ছন্দে তার আবার বিয়ে দেওয়া চলে।"

অমরনাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন "নিশ্চয়ই চলে। আচ্ছা, তুমিই বল প্রভাস, আমি যে কথাগুলো বলছি, তা কি অযথার্থ? সন্তানবতী বিধবার কথা ছেড়ে দিই,—সন্তানহীনা যে বিধবা, আমি তার কথা বলছি। সত্যিই তার মনটা প্রথমেই সে উঁচু তারে বাঁধতে পারে না, লুব্ধ মনটা তার জগতের পানে পড়েই থাকে, তার অন্তরটা তখন হাহাকার করে কাঁদে—"

উৎসাহিত প্রভাস বলিল "তার পর একাদশী প্রভৃতি—"

বাধা দিয়া অমরনাথ বলিলেন, "নিশ্চয়ই। এতে যে আমরা তাদের ওপরে কতটা অত্যাচার করি, তা আর বলা যায় না। সংসারের সব দরজা আমরা নিজেদের হাতেই বন্ধ করে দিই। কিন্তু ব্যভিচারিতার প্রশ্রয়ই এতে দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের বড় করতে গিয়ে আমরা ছোটই করে ফেলি।"

ঘুরিয়া আসিয়া মনীশ অমরনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। চন্দ্রালোকে তাহার সুদীর্ঘ সটান দেহটাকে আরও উন্নত দেখাইতেছিল। সে বলিল, "এ কথাটা যে বলছেন, এ আমি ঠিক মেনে নিচ্ছি। কারণ, ব্যভিচারিতার প্রশ্রয় এই সব তরুণী বিধবাদের আমরাই দিয়ে থাকি। আমি একে একে কারণগুলো দেখাবার চেষ্টা করছি। প্রথম, কিছু-কাল আগে আমাদের দেশে বিধবার সংখ্যা এত বেশী ছিল না। আর থাকলেও অল্প-বয়স্কা বিধবা খুবই কম দেখা যেত। অর্থাৎ সেকালে লোকেরা স্বাস্থ্য-চিন্তায় উদাসীন ছিল না, স্বাস্থ্যটা তারা আগে দেখত। ধর্ম্ম বলুন, দেব-পূজা বলুন, যত রকম ক্রিয়া কর্ম্ম বলুন, এ সবই স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল। এ সব নিয়ে লোকে বাঁচতও বেশী দিন। আজকালকার মত অল্পায়ু হয়ে কুড়ি বাইশ বছরের মধ্যেই ভবের খেলা সাঙ্গ করত না। আগেকার লোকের মনের বল, দেহের বল কল্পনা করুন, আর এখনকার লোকের চেহারা দেখুন। শুধু আহারের অভাব নয়, এরা নিজেরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করে। তাতে মরণ শীঘ্রই এগিয়ে আসে। যে কয়টা দিন বাঁচে, কেবল যন্ত্রণাই সহ্য করে যায়। দেশের ছেলেদের পানে তাকান, কি রকম চেহারা দেখতে পাবেন। স্বাস্থ্যযুক্ত একটী ছেলেকে বার করুন দেখি। এরা বাইরের জাঁকজমক করে, কিন্তু ভেতরটা একবারেই ভুয়ো হয়ে রয়েছে। অনেকের এমন কদর্য্য অভ্যাস থাকে—সে কথা আমি বলতে চাই নে—যাতে সন্তান না হওয়ায় আবার বিয়ে করে, কিন্তু কিছুই হয় না। লাখের মধ্যে আয়ুকে এরা নিজেরাই শেষ করে আনে। ধর্ম্মের বাস নেই—লোকের চরিত্র-দোষ যথেষ্ট ঘটেছে। নানা রকমে মৃত্যু-সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই আমাদের দেশে তরুণী বিধবার সংখ্যা এত বেশী। ব্যভিচারিতা কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে, একবার ভেবে দেখুন দেখি। এতে স্ত্রীর স্বাস্থ্য কয় দিন ভাল থাকবে? আমরা বাইরের দিক দেখছি, কিন্তু ভেতর দেখতে যে একেবারেই উদাসীন। আমরা বাইরের উন্নতি করছি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্রের উন্নতি এ দেখছি কি? এ দেখতে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখা দরকার, সেই ধর্ম্মই যে নেই আমাদের। তবে আমাদের থামিয়ে রাখবে কে? এই সব অসচ্চরিত্র স্বাস্থ্যহীনদের বিয়েও তো হচ্ছে। কয়জন লোক আছে, যে, ছেলের স্বাস্থ্য চরিত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দেয়? এরই ফলে মেয়ে যে এক দিন বিধবা হবে—এ কথাটা তারা ভাবে না। সেই অপরিণামদর্শিতার ফল এই তো দেখা যাচ্ছে—তরুণীর বিধবার মলিন মুখ। আমি অস্বীকার করছি নে যে, তার হৃদয়ের সাধ আহ্লাদ সবই যায় না, সব থেকে যায়,—সেগুলো কোথায় যাবে তাকে ছেড়ে? আমিও তাদের দুঃখ অনুভব করি বুক দিয়ে, আমারও চোখ ফেটে জল বেরোয়। আমিও বলি, ভগবান এই মেয়েটীর কি পাপে এ দণ্ডলাভ হল? কিন্তু পাপ মেয়ের নয়, পাপ

মেয়ের বাপের। সে শুধু জামাইয়ের বাইরের দিক দেখে, তার স্বাস্থ্যের কোনও খবর রাখে না। যদি স্বাস্থ্যের খোঁজ আগে নিয়ে মেয়ে দিত, তবে তো মেয়ে অকালে বিধবা হতো না। আবার এও বলি, দোষ মেয়ের বাপেরই বা কি? সে হয় তো ধনী নয়। অথবা ধনী হলেই বা কি করবে, সৎচরিত্রতা যে আমাদের দেশের যুবকদের মধ্য হতে চলে গ্যাছে। শিশুকাল হতে তারা নিজেদের নষ্টের পথে চালিত করে আসছে। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি তারা মাথায় তুলে নিয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য চরিত্র এ দুটোর পানে তাকাতে একেবারেই উদাসীন। শিক্ষার বোঝা বহন করছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তাদের নেই। তারা সংযম জানে না, সকল বিষয়েই তারা অসংযমী। আমাদের দেশের যুবকেরা স্বেচ্ছায় অল্পায়ু হচ্ছে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। তারা যাচ্ছে, তাদের কাজ শেষ করে যাচ্ছে। কিন্তু পেছনে যে ফেলে রেখে গেল একটী নারীকে—কেবল ব্যর্থতাই বুকের মাঝে জাগিয়ে তুলেছে, সেটা তখন ভাবলেই না। অথবা মরবার সময়ও ভেবে যেতে পারে না, কেন যাচ্ছে তারা। অথবা ভগবানেরও পরেই দোষ চাপিয়ে যায়,—কেন ভগবানই তাদের জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন গলায় হাত দিয়ে। তার পর এই সব তরুণী বিধবার কর্ত্তব্য। আপনি বলছেন, এদের সব দরজা আমরাই বন্ধ করছি; এতে এরাই বা ব্যভিচারিতা দোষ হতে নিস্তার পাবে কেন? কথাটা যথার্থ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু আমরা তাদের কোনও দরজা বন্ধ করব কেন? বরং বলুন, তাদের আরও কাছে টেনে নেব, তাদের শিক্ষা দেব। তাদের মনে এমন ভাব দিতে হবে, যেন তারা কিছুতেই অপবিত্র না হতে পারে, যেন তারা নিজেদের খুব মহান বলেই ভেবে নিতে পারে। তাদের কাণে এই মন্ত্র দিতে হবে—তারা কিছুতেই মন্দ হতে পারবে না, তারা সৎ, তারা ভগবানের এক একটী আদেশ রূপেই জগতে এসেছে। ভগবানের আদেশ জগতের হিত কামনা বয়ে আনে, অহিত তাদের দ্বারা কখনই হতে পারে না। বিধবাকে দূরে রাখা—তাকে যথার্থ দেবীর মত কেবল পূজা করে যাওয়া—আমি তা চাই নে। কারণ, কাছে এনে কাজের মধ্যে না দিলে, সে ঠিক থাকতে পারবে না। বিধবার যোগ্য সম্মান আমরা দেব না কেন? আমরা তাদের হৃদয় মার্জ্জিত করব,

তাদের হৃদয়ে জ্ঞান দেব, যাতে তারা বুঝবে তারা মাটী নয়, আগুণের ফুলকি। এ আগুণে ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেবে না, সামনের পথই দেখিয়ে দেবে। তবে—আপনাকে এই কথাটাই বলে যাচ্ছি আমি, তাদের আমরাই অসংযমী করছি এটা ঠিক, এই কথাই বলবেন। কিন্তু তারা নিজে নিজেই যে সংযম হারায়, এ কথা বলবেন না। মানুষকে গড়ে তোলা মানুষের হাত। আমাকে আপনি বানর গড়ালেও পারতেন; কিন্তু তা গড়ান নি। উমাকে আপনি এত দিন সংযম শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন, এখন তাকে সুখের বদলে দুঃখই দিতে যাচ্ছেন, আমার তো এই ধারণা। অনেক কথা বললুম কাকা, রাগ করবেন না। উমার সম্বন্ধে আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, আমায় কোনও কথা বলবেন না।"

দ্রুতপদে সে নীচে নামিয়া গেল।

অমরনাথ আর একটা কথাও বলিলেন না। প্রভাস আর একটু গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল।

(১০)

সেই দিন রাত্রি হইতেই মনীশ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। উমা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে পড়লে যে মনীশ-দা, ব্যাপারখানা কি? কলকাতার জন্যে মন কেমন করছে, না?

মনীশ গম্ভীর মুখে বলিল "তাই।"

উমা সপরিহাসে বলিল, "আজকাল মনীশদা একেবারে কলকাতার বাবু হয়ে পড়েছে। তবে মনীশদা, কাল সে কথা বলতেই অতটা রাগ করেছিলে কেন? মনের কথাটা টেনে বের করে ফেলেছিলুম কি না, তাই। তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।"

মনীশ এ খোঁচাটাও সহিয়া গেল, একটাও উত্তর করিল না। কে জানে, কথা বলিতে গেলেই তাহার মনের ভিতরকার চাপা আগুনটা হয় তো বাহির হইয়া পড়িবে। উমাকে সে কেন সে আভাস দিবে?

প্রভাস ও মনীশ একটা গৃহে শয়ন করিত। প্রভাস বিছানায় বসিয়া পাখাখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল "যাই বল, কলকাতার চেয়ে পাড়াগাঁটা লাগে ভাল। বেশ ঠাণ্ডা যায়গাটা। কলকাতায় এ সময় টেঁকাই ভার। অসহ্য গরমও বটে, আর সাদা বাড়ীগুলো রোদের তাতে ঝলসে ওঠে চোখের সামনে, যাতে বেরুতেই ইচ্ছে হয় না।"

ছোট একটা হুঁ দিয়া মনীশ নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। কাল বিছানায় শুইয়া পড়িয়াও অনর্গল বকিয়া গিয়াছিল সে—রাত বারটা পর্য্যন্ত বেচারা প্রভাস কান ঘুমাইতে পায় নাই। আজ মনীশ আর একটীও কথা কহে না। কথায় এদিকে প্রভাসের কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজিকার ব্যাপারখানা কোনখানে গিয়া দাঁড়াইবে, মনীশের সহিত কথা কহিয়া সে সেইটাই বুঝিতে চায়।

প্রভাস খানিক চুপ করিয়া মনীশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তোমার কাকা সত্যিই তা হলে মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন?

মনীশ একটু উগ্র ভাবে বলিল, "তা দিন না, তাতে ক্ষতি কি? সত্যিই তিনি বাপ, মেয়ের কথা তিনি যত জানেন, আমি ততটা কি জানি? আমি পর বই তো নই। ছোট বেলা হতে ওঁর কাছে মানুষ হয়েছি, এইমাত্র সম্পর্ক। এমন সব গোপনীয় কথা থাকতে পারে, যা আমাকে জানানো ওঁরা অপমানের বলেই জ্ঞান করতে পারেন।"

এই কথাটা বলিতেও মনীশের হৃদয়খানা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যথার্থ কথাই যে এটা। সত্যকে সে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, মিথ্যা লইয়া থাকিতেও আর তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। অমরনাথের নিকট এ সত্য আবিষ্কার করা ঘড় সহজ কথা নয়, কিন্তু উমার কাছে পারিলেও পারা যায়। উমা যতবার তাহার নিকটে আসিয়াছে, ততবারই তাহার বুকে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একবার সে ভাবিয়াও ছিল, উমার সেই মৃণালের মত হাত দুখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া, সে তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দেয়, যাহাতে তাহার মনের সত্য ভাবটা মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একবার সে জিজ্ঞাসা করে—বল নারী, কি তোমার কামনা, কি তুমি চাও? তোমার ওই সুকুমার বুকে কি দুর্দ্দমনীয় বাসনারাশি জাগিয়া—একবার তাহা জানাও মনীশকে!

কিন্তু সে পারে নাই। সে সত্য কথা যদি সত্যই উমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, মনীশের কল্পনা যে একেবারেই ছায়া হইয়া যাইবে। মনীশ সম্মুখে বীভৎসতার

জ্বলন্ত ছবি দেখিয়া কিছুতেই আত্ম সম্বরণ করিতে পারিবে না। না, সে সত্য গোপনে থাক, চিরকালই গোপনে থাক,—মনীশ সে সত্যকে পাইতে চায় না। মনীশ পলাইবে, উমার সম্মুখে কিছুতেই তিষ্ঠাইতে পারিবে না।

উমা, এই দেবী, ইহার মনেও এই কলঙ্কিত কামনা? মনীশ যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। না করিলেই বা চলে কই? বিশ্বাস যে সামনে, তাহাকে এড়াইয়া চলা তো কোন ক্রমেই চলে না।

তবে—নারীর মধ্যে লক্ষ্য করিবার জিনিস কিছুই নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নারী কেবল পাইতে চায়, কিছু দিতে চায় না। যত দাও, সে বলিবে না—আর চাই না। এই ভিক্ষাবৃত্তি—এ তবে সকল নারীর বুকে সমভাবে বর্ত্তমান আছে?

উমার সে দেবীর মত মুখ, সরল হাসি, সরল কথা, কিন্তু তাহার মধ্যে পোষণ করিতেছে সে প্রবল তৃষ্ণা, প্রবল ক্ষুধা। হায় নারী, আরও কি চাও তুমি? বড় ঊর্দ্ধে ছিলে—নামিয়া আসিবে আবার মানুষেরই কাছে? আচ্ছা, তবে এসো, দেবীর রূপ তুমি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেল,—মানুষ তুমি তবে মানুষই হও। তোমাতে লক্ষ্য করিবার কিছু নাই, তুমি সামান্য নারী মাত্র। তোমার বুকেও যাহা, সকল নারীর মধ্যেও তাহা, তবে পার্থক্য কিসের?

মনীশ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। প্রভাস শুইয়া পড়িয়া তাহার দিকে ফিরিয়া পাশ বালিসটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আমার মতে বিয়ে দেওয়াই ভাল! তুমি আবার যে রকম একরোখা মানুষ, তোমার কাছে কোনও কথা বলতেই ভয় লাগে। কিন্তু—"

অধীর ভাবে মনীশ বলিল "আর কিন্তু ফিন্তু নেই। আমাকে ও সবের মধ্যে জড়াতে এস কেন ভাই, আমি ওর কি জানি? ছুটি যখন হয়, দুদিনের জন্য বেড়াতে আসি, যেমন এসেছি। আবার কাল সকালেই বেরুব।"

প্রভাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কাল সকালেই? কাল যে রবিবার!"

মনীশ বলিল "হোক না রবিবার, তাতে এসে গেল কি আমার? পরশু সকালেই আমার কলেজ, সকাল হ'তে নয়টা পর্য্যন্ত চলবে। সায়ান্স যারা নিয়েছে, তাদের—"

প্রভাস বলিল "বেশ তো, না হয় বিকেলের ট্রেনে গেলেই হবে। সকালেই যে যেতে হবে, এমন কোনও কথা নেই।"

মনীশ বলিল "দেখা যাক, এখন ঘুমাও তো। রাত বোধ হয় এগারটা বেজে গ্যাছে এ দিকে।"

প্রভাস বলিল, "তা বাজুক, আমি একটা কথা বলছিলুম তোমায়।"

মনীশ বলিল "বিয়ের কথা?"

প্রভাস বোকার মত হাসিল।

মনীশ বলিল "অর্থাৎ হিন্দুর ঘরে বিধবা বিয়ে চলতে পারে কি না, আর কোনও হিন্দুর ছেলে স্বেচ্ছায় বিধবা বিয়ে করবে কি না—তাই তো? তার উত্তর এই—নিষ্ঠাবান কোনও হিন্দু এতে রাজি কিছুতেই হবে না। তবে মৃন্ময়ের মত সাহেব-বাঙ্গালী যারা, তারা রাজি হতে পারে।"

প্রভাস মুখখানা বালিসে গুঁজিয়া দিয়া চাপা সুরে বলিল "আর—আর—ধর, যদি আমিই বিয়ে করতে চাই—?"

"তুমি—!"

মনীশ একেবারে ঠেলিয়া উঠিয়া বসিল। তখনি নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া শুইয়া পড়িল, "হ্যাঁ, তা বলতে পার বটে। কারণ, তোমার সঙ্গে মিলতে পারে।"

প্রভাসের চক্ষুলজ্জাটা ঘুচিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "সত্যি মনীশ, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, তবে আমি উমাকে বিয়ে করতে পারি। উমার বিয়ে হবেই। আমার সঙ্গে হলে—সেটা কিন্তু ভাই, তোমারই কথার ওপরে নির্ভর করছে। জানোই তো, আমায় কেউ বিয়ে দিতে পারে নি; কারণ, যথার্থ আমার মনের মত আমি কাউকেই দেখতে পাই নি। যদি উমাকে আমায় দিতে পার, তবে যথার্থ বন্ধুর কাজ করবে।"

মনীশ পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "করব। যদি উমা যথার্থই বিয়ে করতে চায়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করব। উমার উপযুক্ত যে তুমি, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু যদি সে না চায় বিয়ে করতে—"

প্রভাস একটু হাসিয়া বলিল "ক্ষেপেছ তুমি, বিয়ে করতে চেয়েছে সে নিশ্চয়ই। তার কথাটা কোনও ক্রমে

তার বাপের কাণে এসে পৌঁছেচে বলেই তিনি বিয়ের দিকে এত ঝুঁকেছেন। যাই হোক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি মনে রেখো, তা হলেই আমার হল।"

প্রভাস বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

মনীশের চোখে ঘুম ছিল না, সে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল প্রভাসের কথাগুলা।

এমন সুপাত্র অমরনাথ যে আর পাইবেন না, ইহা নিশ্চয়। প্রভাস হিন্দু। অতিরিক্ত চাল তাহার কিছুই ছিল না। একমাত্র দেশ ভ্রমণটাকেই সে শ্রেষ্ঠ বিলাসিতা বলিয়া জানিত, এবং তাহাই করিয়া যাইত। খুবই শান্ত, সংযত স্বভাব তার। লেখাপড়ায়ও ভাল, চরিত্রেও সে প্রশংসনীয়। সহরে সে ধনী নামে খ্যাত। সংসারে বিধবা একটী ভগিনী ছাড়া আর কেহই ছিল না। সত্যই সে বিবাহের উপর একেবারে চটা ছিল। উমাকে দেখিয়া, উমার কথা শুনিয়া সত্যই সে উমার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং নিজেই বিবাহের কথা তুলিল।

যদি উমা বিবাহই করে, তবে প্রভাসকেই করুক। প্রভাসের সহিত তাহার মিলন বাঞ্ছনীয়। উমা যদি সুখী হয়, তবে ইহাতেই হইবে।

কিন্তু তবু—মনীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না,—তবু—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা বাণী মুখে ভাসিয়া আসিল—নারী, অতৃপ্তিরই একটা শিখা মাত্র।

বাস্তবিকই কি তাই নয়? এর তৃপ্তি কিসে, তাহা কেহ এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে? নারী নিজেই বুঝিতে পারে নাই, কিসে তাহার তৃপ্তি হইবে। সে হাহাকার করিয়া ছুটিয়াছে মরীচিকা দেখিয়া। আজীবনকাল ছুটিয়াই চলিয়াছে। পাশে যাহারা, তাহাদের দগ্ধ করিয়া যাইতেছে, তাহাদের অন্ধ করিয়া যাইতেছে।

মনীশ আর শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না। গৃহের মধ্যে যেন আগুনের বাতাস বহিয়া যাইতেছে। বিছানাটা এত গরম হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে শয়ন করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

মনীশ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। চাঁদ তখন মাথার উপর। রজত-কিরণ-ধারায় ধোলা বারাণ্ডাটা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বারাণ্ডার নীচে কয়েকটা হেনা ফুলের গাছ সারি সারি দাঁড়াইয়া,—ফুল ফুটিয়া তাহার সুগন্ধে চারিদিক পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

বাহিরের বাতাস কি ঠাণ্ডা, মন ও দেহ এক নিমেষে জুড়াইয়া দেয়। মনীশ বারাণ্ডার ধারে একটা হেনা গাছের কাছে দাঁড়াইয়া মাথা নত করিয়া ঘ্রাণ লইল। তাহার পর একটা ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া পাদচারণা করিতে লাগিল।

আচ্ছা, যে যাহাই করুক, তাহার তাহাতে কি? সে তো জানিতেছে, সে পর ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে কেন তাহার এ ব্যাকুলতা, কেন সে বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতেছে?

কি কঠোর সত্য তাহার বুকের মধ্যে লুকাইয়া—

মনীশ, নিজের বুকের মধ্যে যে গোপন কথা ছিল, সেখানে দৃষ্টিপাত করিয়াই শিহরিয়া উঠিল।

এই যে প্রকৃত সত্য,—সে রাশিকৃত মিথ্যা আনিয়া ইহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, সত্য কি গোপন থাকে? এক সময় না এক সময় সে বাহির হইয়া পড়িবেই যে।

না, কিছুতেই না, কিছুতেই না। জীবন্ত সত্যের গলা টিপিয়া অত্যন্ত গোপনে সে হত্যা করিবে, সে যেন আপনাকে প্রকাশ করিতে না পারে, সে যেন একটা শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিতে না পারে।

গোপনতম স্থানবাসী সেই সত্যটা মনীশের চোখে পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিয়াছিল, হাতের হেনার শাখা কখন পড়িয়া গিয়াছিল।

সম্মুখে দ্বিতলের গৃহটায় দপ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল, জানালা পথে দেখা গেল, উমার শান্ত মুখখানা। সে এতক্ষণ অন্ধকারে জপ করিতেছিল, এইবার শয়ন করিতে যাইবে। তাহার আয়ত চক্ষু অশ্রুসিক্ত, গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

প্রেতে তাড়া করিলে লোকে যেমন ছুটে, মনীশ তেমনি করিয়া ছুটিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাসের গাঢ় নিদ্রা তাহার দুমদাম শব্দেও ভাঙ্গিল না।

পরদিন প্রভাতে মনীশ উঠিয়া প্রভাসকে লইয়া বাহিরে

চলিয়া গেল, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উমার সহিত দেখা করিবার সাহস তাহার ছিল না। নিজের সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ হওয়ায় যথার্থই সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রভাসকে চা খাওয়াইয়া সেখানে বসাইয়া রাখিয়া সে অমরনাথের খোঁজে গেল।

দেওয়ানের সহিত অমরনাথ কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, মনীশ সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ তাহার শুষ্ক মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কোনও দরকার আছে মনীশ?"

মনীশ উত্তর করিল "হ্যাঁ, একটা গোপনীয় বিশেষ দরকারী কথা আছে।"

দেওয়ানকে বিদায় দিয়া অমরনাথ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বল।"

মনীশ বলিল "আপনি উমার যখন বিয়েই দেবেন, তখন আর সে বিষয়ে কথা বলার বিশেষ দরকার নেই আমার। বিয়ে দেবেন—দিন, তবু যাতে সে সুপাত্রে পড়ে তা তো করবেনই। আমি বলছি, এ রকম সুপাত্র পাওয়া ভার, যার সঙ্গে উমার যথার্থ মিল হতে পারে। আমি ভেবে দেখছি, প্রভাস সব রকমেই উমার যোগ্য স্বামী হতে পারবে। আপনি যদি আমায় বিশ্বাস করেন, তবে ভেবে রাখুন, প্রভাসের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে উমা যথার্থ সুখী হতে পারবে, নচেৎ নয়।"

অমরনাথের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল "প্রভাস? প্রভাস বিয়ে করবে উমাকে?"

স্থির স্বরে মনীশ বলিল "করবে, সে বলেছে।"

অমরনাথ বলিলেন, "তা যদি হয়, তবে ভালই হবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমার কথাকেও বিশ্বাস করি। তুমি যে কথা বলছ, তা ঠিক কথা। প্রভাসকে তুমি যত চেন, তত আর কেউই চিনতে পারবে না। তুমি যদি উদ্যোগী হও, মনীশ—"

মনীশ মলিন হাসিল, বলিল, "উমা যদি রাজি হয়, বিয়ে দিতে দেরী হবে না। আপনি উমার মত করান, আমি সব করে দেব।"

অমরনাথ বলিলেন "তুমি বলতে পারবে না এ কথাটা তাকে? তুমি প্রথম এ কথাটা তাকে শুনিয়ে দাও, তার পরে আমি তাকে বুঝিয়ে রাজি করব এখন।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মনীশ বলিল, "না, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না কাকা। আমি বিধবা বিয়ের পক্ষে কোন মতেই দাঁড়াতে পারব না। আমি বলছি এই ভেবে—বিধবা বিয়ে দিতে গিয়ে কোন একটা লোকের হাতে উমাকে সঁপে দেবেন না, যাতে আজীবন সে দুঃখই পাবে। তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি প্রভাসকে দিচ্ছি। আমাকে ও সবের মধ্যে টানবেন না। প্রভাসের কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিলুম, এখন আপনারাই তার বোঝা-পড়া করুন গিয়ে।"

সেই দিনই বৈকাল বেলায় সে প্রভাসের সহিত কলিকাতায় রওনা হইল। প্রভাসের যাইবার তত ইচ্ছা ছিল না, অথচ বেচারী না বলিতেও পারে না।

যাইবার সময় উমা মনীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আবার এস, মনীশদা, সামনেই তো গ্রীষ্মের বন্ধ, তখন জেঠিমাকে সুদ্ধ নিয়ে এসো।"

মনীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বলতে পারিনে উমা, ভবিষ্যতে যা হবে, তার জন্যে কথা দেওয়া যায় না।"

উমা অভিমান পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কেন মনীশদা, অন্য বারে তো বলে যাও, এবারে তোমার ন্যায় জ্ঞানটা কি এতই বেশী হল?"

মনীশ বলিল "আমার ন্যায় জ্ঞান বেশী করছে যে সংসার, উমা! আমার নিজের সম্বন্ধেই আমি যখন বিশ্বাস করে কিছু বলতে পারি নে, তখন পরকে কথা দেব কি করে? আমায় মাপ কোরো উমা, বুকে বড্ড ঘা লেগেছে বলেই পালাতে চাচ্ছি, এখানে আসা আমার আর হবে না।"

উমা স্পন্দিত বক্ষে বলিল "কেন, কি হয়েছে মনীশদা, কেন তোমার আসা হবে না? বাবার সঙ্গে কিছু কি—?"

মনীশ মলিন হাসিয়া বলিল, "পাগল! তোমার বাপ যে আমারও বাপ, তা কি ভুলে যাচ্ছ? তিনি যদি রাগী হতেন, আমায় বকতেন, তাও আমি রাগ করতে পারতুম না; কারণ, তিনি ছেলের মত আমাদের দুটি ভাইকে ভালবেসেছেন,—যাতে আমাদের উন্নতি হয়, আমরা সুখে থাকি, প্রাণপণে তাই করেছেন। তিনি শিবের মত লোক,—রাগ তো দূরের কথা, তাঁর মুখ একটা দিন বিমর্ষ দেখতে পাই নি। আমি যাচ্ছি উমা, কেন যে আমার মনে ভাবান্তর, তা আমি তোমায় বলতে পারলুম না, আমায় সে জন্যে ক্ষমা কোরো। যাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, তোমার অন্তর যেন লোহার চেয়েও শক্ত হয়, হিমালয়ের মত অটল থাকে, তোমায় কেউ যেন তোমার আসনচ্যুত না করতে পারে।"

মনীশ চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)



বিলাসপুর ষ্টেশন হইতে আমরা যখন অমরকণ্টকের পথে যাত্রা করিলাম, তখন রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। ট্রেণ ছাড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঘনান্ধকার নিবিড় বনপ্রদেশের মধ্য দিয়া বিলাসপুর—কাট্‌নী রেলপথের যাত্রীপূর্ণ গাড়ী-খানি ছুটিয়া চলিল, আমরা অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। 'পেণ্ড্রারোড' ষ্টেশনে আমরা যখন নামিয়া পড়িলাম, তখন বৃষ্টি একটু ধরিয়াছে, রাত প্রায় এগারোটা। রেল-কোম্পা-নীর স্থানীয় সুযোগ্য প্লেটলেয়ার বাসুদেব বাবু আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত। তিনি ষ্টেশনে ট্রলি প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন; উহাতে চড়িয়া সে রাত্রির মত তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হওয়া গেল। অত্যাচার তাঁহার উপর অল্প হয় নাই। তিনি এবং বার্ড কোম্পানীর স্থানীয় কর্ম্মচারী বিনয়বাবু সাহায্য না করিলে আমাদের তীর্থদর্শন ঘটিয়া উঠিত কি না বলিতে পারি না।

পেণ্ড্রারোড হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে অমরকণ্টক মধ্যপ্রদেশের একটি প্রধান তীর্থ, বিন্ধ্যপর্ব্বতের একটি উচ্চতম শিখর। আমরা যে চারিজন যাত্রী ছিলাম, তাহার মধ্যে পুণ্যপ্রয়াসী কেহই ছিলাম না,—সে বয়স এখনও হয় নাই। তবে এটুকুও বলা দরকার যে, এমন মনোরম স্থান ভারতে অল্পই আছে। উত্তর ভারতের শোন এবং দক্ষিণ ভারতের নর্ম্মদা এই একটী যায়গায় প্রায় এক মাইলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং স্থানটী যে প্রত্নতাত্ত্বিক, কবি ও তীর্থযাত্রীদের দর্শনযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সামান্য জলযোগের পর যাত্রা করিলাম। সঙ্গে কিছু গরম কাপড়, জামেরা, খাবার এবং জল। দুইখানি গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল, সেগুলি বন হইতে বার্ড কোম্পানীর কাঠ বহিয়া আনে। আজ তাহাদের এক গ্রেড প্রমোসন হইল, তাহারা সজীব মনুষ্য বহনের অধিকার লাভ করিল। আমাদের দেশের গরুর গাড়ীর চেয়ে এ গাড়ীগুলি ঢের মজবুত, ও,পাহাড়ে উঠিবার উপযুক্ত। যাহা হউক, প্রথমতঃ আমরা হাঁটিয়াই চলিলাম। গাড়ী দুখানি মোট লইয়া ধীরে সুস্থে পিছনে আসিতে লাগিল।

আধমাইল পথ আসিয়াই রাস্তার দুপাশে অনেকগুলি কবর। সেইখান হইতে 'কবীর চৌংরা' যাইবার রাস্তা অন্য-দিকে চলিয়া গেল। পথে তিন চারটী পার্ব্বত্য নির্ঝর পড়ে। জল বেশী না থাকায় পার হওয়া শক্ত নয়। ঝরণার কাছে পথের উপর চতুর্দ্দিকে বাঘের পদচিহ্ন,—পথের

দুপাশে প্রায় পাঁচমাইল পর্য্যন্ত ইয়োরো-পীয় শিকারী-বীরগণের মাচা। দুঃখের বিষয় অমরকণ্টকের কাছে, যেখানে বড় বাঘের রীতিমত উপদ্রব, সেখানে কেহ বড় যেসেন না। রাস্তা কাঁচা এবং সঙ্কীর্ণ, ভয়ানক উঁচু নীচু, অনবরত চড়াই উৎরাই। পথের শেষে পর্ব্বত-শ্রেণীর দৃশ্য বড় সুন্দর। দুপাশে খাল, সাজার বন, মধ্যে মধ্যে আমলকী, ভেলা, নেবু প্রভৃতি নানারকমের গাছ। নানারকমের বনফুল ফুটিয়া আছে। ছোট ছোট কুলের ঝোপ লাল কুলে ভরিয়া টুকটুক করিতেছে। বনের গাছগুলি যেন ছবির মত সাজান, ঘাসগুলি যেন নিত্য ছাঁটা হয়, এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অথচ সে পথে হয়ত কত দিন পথিক চলে নাই। কাঠুরিয়াদের পায়ে চলার রাস্তাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় গভীর বনের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। আমলকীর ডাল পথের দুপাশে ফলভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এমন সুন্দর বনপথে সমস্ত সকাল চলিয়া আমরা গাথরিয়া গ্রামে পৌছিলাম। গ্রামপ্রান্তে ব্যাঘ্রদেবতার মৃন্ময় মূর্ত্তি, তাহার গায়ে একটু কেরোসিন তেল ঢালিয়া পূজা হয়; যেমন দেবতা তেমনই তার পূজার উপকরণ। গ্রামের হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলি, পুষ্পিত সরিষার ক্ষেত্র এবং

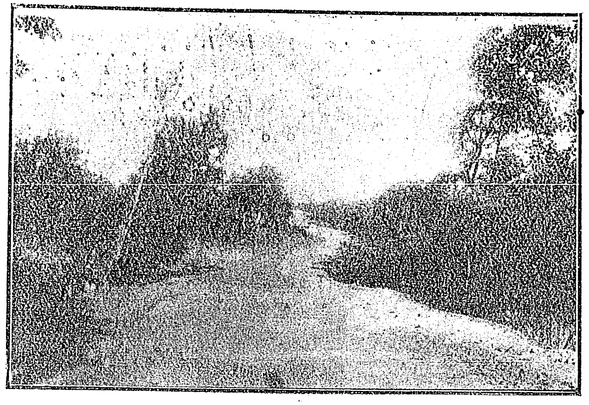

অমরকণ্টকের পথে—দ্বিতীয় দৃশ্য

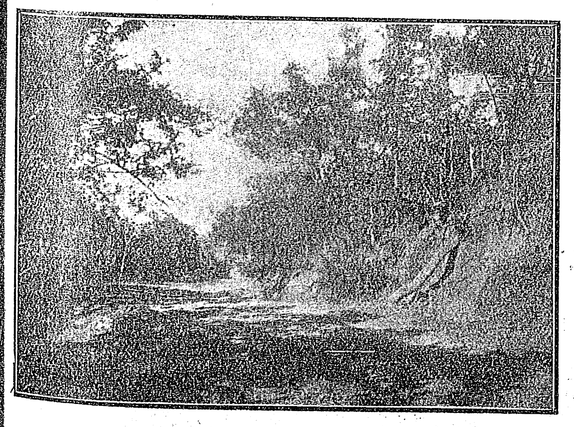

অমরকণ্টকের পথে—পার্ব্বত্য পথ—তৃতীয় দৃশ্য

সর্ব্বোপরি বনপর্ব্বত বেষ্টিত অবস্থানটী দেখিবার জিনিস। এখানে যাত্রীদের জন্য কয়েকটী চালাঘর আছে, তাহার না আছে দেওয়াল, না আছে দরজা। ব্যাঘ্রদেবতার দয়া হইলেই যাহাকে খুসী তুলিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আমরা রেওয়া-রাজের ডাক বাংলোয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকালের মত আহারাদি সারিয়া লইলাম। ঘণ্টা-খানেক পরে আমাদের গাড়ীদুখানি ও তাহাদের সঙ্গে এক হালুইকরের গাড়ী আসিয়া পৌছিল। এই হালুইকর পরে আমাদের অনেক কাজে লাগিয়াছিল।

এইবার গরুর গাড়ীর পালা। মন্থর গমনে সঙ্কীর্ণ পথে বড় বড় পাথর ডিঙ্গাইয়া গাড়ী চলিল। খানিকক্ষণ করিয়া গরু আমাদের টানে, খানিকক্ষণ করিয়া আমরা গাড়ীশুদ্ধ তাহাদের টানি। এইরূপ টানাটানি করিতে করিতে প্রায় নয় মাইল পথ উঠিয়াছি, এমন সময় নীচে পেণ্ড্রারোড সহর ছবির মত দেখা গেল, আবার আধ-মাইল উঠিতেই বনান্তরালে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। আরও মাইল খানেক; তার পর হঠাৎ গাড়ী থামিল। শুনিলাম, সেইখান হইতে হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতে হইবে।

সম্মুখেই আমানালার নির্ঝর, তার পরে খাড়া চড়াই। পাহাড়ের ওপাশে অমরকণ্টক গ্রাম—সেখান হইতে দেখা যায় না। গাড়ো-

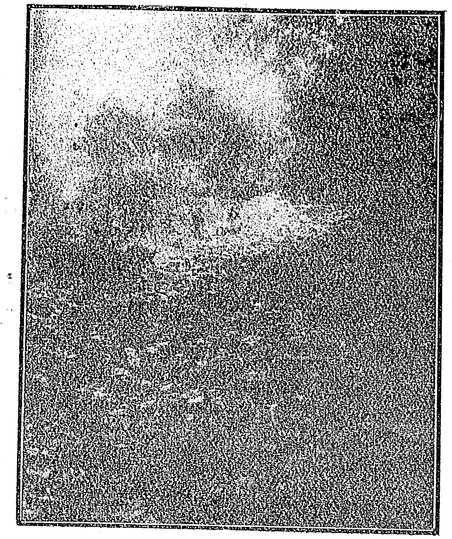

অমরকণ্টকের পথে—চতুর্থ দৃশ্য

স্নানদের পথ দেখাইতে বলায় তাহারা রাজী হইল না; মিষ্ট কথা, ভয়প্রদর্শন—কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে নিজেরাই মাইলখানেক পথ অগ্রসর হইয়া, অজানা পথে অন্ধকারে পর্ব্বতারোহণ অসম্ভব দেখিয়া, ফিরিয়া আসিলাম। তখন বেলা চারটা, অথচ ইতিমধ্যেই চারিদিক ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চারিধারে নিবিড় অরণ্য ও অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, সেইখানে শ্বাপদ-সঙ্কুল নির্জ্জন গিরি-অধিত্যকায় রাত্রিবাসের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ছোটখাট শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইতে লাগিল, বাঘের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা ত করা চাই!

প্রথমেই গোটাকতক সোজা ডাল কাটিয়া গরুর গাড়ীর ছাদ করা গেল। কম্বল দিয়া তাহার উপর অস্থায়ী রকমের ছাউনী হইল। ভিতরে কম্বল পাতিয়া লেপ মুড়ি দিবার ব্যবস্থা করিলাম। হালুইকর কামতাপ্রসাদের প্রসাদে খোয়া ক্ষীর কিনিয়া মহানন্দে রাত্রিভোজ সম্পন্ন হইল। গাড়োয়ানেরা ধুনি জ্বালিয়া তাহার পাশে কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল। এক সারে পরে পরে তিনখানা গাড়ী ঠেক্‌না দিয়া রাখা, মাঝের গাড়ীতে গরুগুলি বাঁধা। আমরা দুইজন করিয়া গুড়িসুড়ি দিয়া দুইটী খালি গাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। গাড়ীতে খড় পাতা ছিল, গরুগুলা সমস্ত রাত খড় টানিয়া খায়, আর আমার সঙ্গী ভ্রাতাটী বাঘে ধরিয়াছে বলিয়া ভয়ে আমাকে জাগাইয়া দেন।

এমনি করিয়া রাত কাটিল। ভোরের আলো ফুটিতেই আমানালা পার হইয়া আমরা পাহাড়ে চড়িতে আরম্ভ করিলাম। আড়াই ঘণ্টা উঠিবার পরে সাড়ে নয়টার সময় অমরকণ্টকের প্রথম গৃহ 'ধর্ম্মশালা' চোখে পড়িল। পাথরের বাড়ী—মাটীর মেঝেতে বড় উই ধরে। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যাত্রীদের খোঁজ খবর লইবার জন্য সেখানে থাকেন। বড় ভদ্রলোক তিনি। রাঁধিবার জন্য কাঠ, বাসন, জলের ঘড়া সমস্তই দিলেন। আমরা সঙ্গের জিনিসপত্র তাঁহার জিম্মায় রাখিয়া, ভারী মোটগুলা উপরে আনিবার জন্য ভারীর সন্ধানে গেলাম।

ধর্ম্মশালা হইতে পথ নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। কতকগুলি চালাঘর ও ঘেরা বাগান পার হইয়া চলিলাম। একটী মেয়ে ঘোড়ার পিঠে সম্বর হরিণের শিং বোঝাই দিয়া উপরে উঠিতেছিল, আর একটী সুবেশ সন্ন্যাসী একটী কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাদিগকে নিজের সম্পত্তি করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই

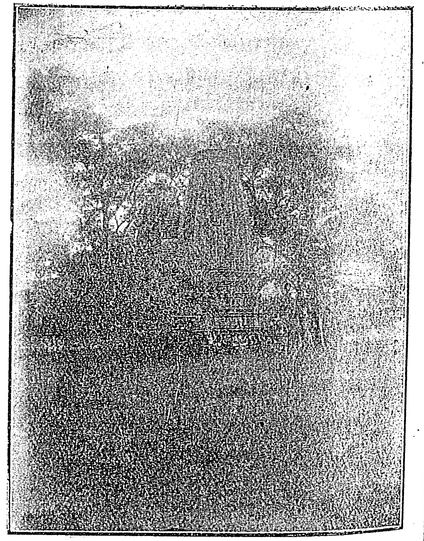

অমরকণ্টক—কর্ণরায়ের মন্দির

বাঘের রাজ্যে তাঁহার কুটীর আমরা নিরাপদ বিবেচনা করিলাম না। আর খানিক নীচে গিয়া বংশকুণ্ডের তুষার-শীতল জলে স্নান ও মন্দিরদর্শন হইল। বংশকুণ্ডের মধ্যে একটী প্রাকৃতিক প্রস্রবণে নর্ম্মদার জন্ম, সেই প্রস্রবণটীর উপরে একটী মন্দির থাকায় জলধারার প্রথম বহিরাগমন লোকচক্ষুর অগোচর। কুণ্ডের একটী মুখ দিয়া জল বাহির হইবার সঙ্কীর্ণ পথ; ঝির ঝির করিয়া যে একটু দুর্গন্ধ জল সেখান দিয়া বাহির হয়, তাহাকে নদী বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয় না। কাছেই কয়েকটী ছোট ছোট ঝরণা ঘাস বনের মধ্য দিয়া সেই নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে।

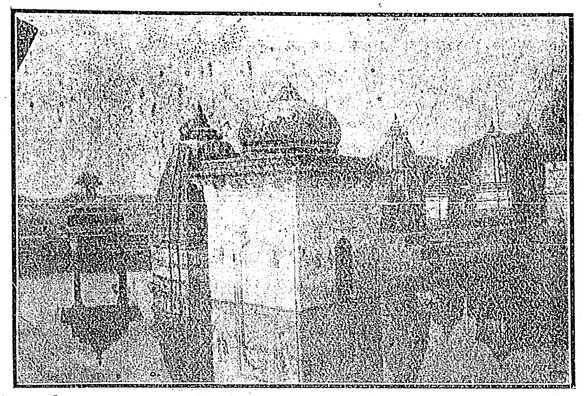

অমরকণ্টক—বংশকুণ্ড—নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান

বংশকুণ্ডের উপরে নর্ম্মদাদেবী ও অমরনাথের মন্দির। সম্মুখের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি প্রাচীন দেবমূর্ত্তি আছে, সবগুলিই নির্ম্মাণ কৌশল অতি চমৎকার। সূর্য্য, হরপার্ব্বতী, বিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য। নদীর কাছে অহল্যাবাইএর ধর্ম্মশালা আছে, পাকাবাড়ী হইলেও অত্যন্ত অপরিষ্কার।

সোমন ঠাকুরের পূজা দিয়া মোট আনিতে লোক পাঠান গেল। মন্দিরের কাছে একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের দোকান। সেখানে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সকল রকম জিনিস পাওয়া যায়। দ্বিপ্রহরে সেইখানে তাহাদের যত্নপ্রস্তুত 'পতর্ পতর্ পুরী' শশার তরকারী সংযোগে খাওয়া গেল। মোট উপরে পৌঁছিলে ধর্ম্মশালার ঘরে তালা দিয়া স্থানীয় চৌকীদার 'রাপ্টা'কে সঙ্গে করিয়া শোনভদ্র দেখিতে গেলাম। উঁচু নীচু দুর্গম পথ, দুধারে হরিতকী বহেড়ার গাছ। কোথাও উন্মুক্ত ক্ষেত্রে পালে পালে গরু চরিতেছে, কোথাও বিচিত্রবর্ণ পেখম দোলাইয়া ময়ূরগুলা এগাছ হইতে ওগাছে উড়িয়া যাইতেছে। মাইলখানেক চলিয়া শোনের উৎপত্তি স্থানে পৌঁছিলাম। এক যায়গায় গোটাকতক গাছের চারধারে মাটি চোয়াইয়া জল ঝরিতেছে, কয়েক ঝাড় উপকথা-বর্ণিত গুল্ বাকাওলীর গাছ, তাহার পাশেই কুল্‌কুল্ করিয়া জল ছুটিয়াছে। জলধারার অনুসরণ করিয়া শোনপ্রপাতের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেই ছোট্ট ঝরণাটি প্রবল বেগে কতখানি নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। চমৎকার দৃশ্য! গল্প শুনিলাম—নর্ম্মদার সঙ্গে শোনের বিবাহ ঠিক, এমন সময় অমরনাথ মহাদেব তাহাতে বাধা দিয়া নিজেই নর্ম্মদাকে বিবাহ করিলেন। তাই শোন বেচারা অভিমানে এতকাল ধরিয়া অধীর আবেগে ছুটিতেছে; আর সেইজন্য অমরকণ্টকের এই নামকরণ হইয়াছে। পর্ব্বত-গাত্র প্রাচীরের মত খাড়া

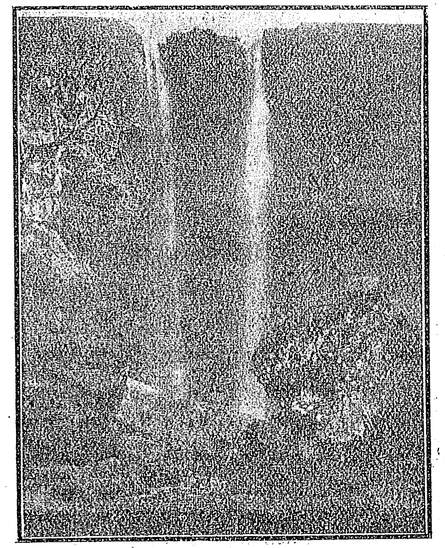

অমরকণ্টক-কপিলধারা—নর্ম্মদার জলপ্রপাত

নামিয়াছে। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত অগণ্য পর্ব্বত-শৃঙ্গ। পাদমূলে নিবিড় বনাচ্ছাদিত গভীর নিম্নভূমির দিকে চাহিলে বুক শুখাইয়া যায়।

সেদিন বাসায় ফিরিয়া গোছগাছ করিয়া বিছানা করা গেল। সঙ্গী হালুইকর কি একটা মেলা উপলক্ষে খাবারের দোকান করিতে আসিয়াছিল। তাহার বালক ভৃত্য খাবার দিয়া গেল। সন্ধ্যা সাতটার পর পথে বাঘ বেড়ায়, সুতরাং দরজা জানালা বন্ধ করিয়া সে রাত্রির মত লেপ মুড়ি দিলাম।

পরদিন প্রাতে দ্বার খুলিতেই একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল। যতদূর দৃষ্টি চলে, সমস্ত মাঠ বরফে সাদা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে বন, মাঝে মাঝে থাকে থাকে সাজান কুটীর ও উদ্যান। নিম্নে দেবী-মন্দিরের চূড়ায় প্রভাত-সূর্য্যের আলো ঝলমল করিতেছে। আর তাহাকে ঘিরিয়া ধরণীর ধূলায় শুভ্রোজ্জ্বল তুষারের আনন্দমেলা বসিয়া গিয়াছে। পথে নামিতেই কয়েকটা দীর্ঘপুচ্ছ বন্য ময়ূর ছুটিয়া পলাইল। তিন দিন ভাতের মুখ দেখি নাই, সেদিন নিজেরা ভাত রাঁধিয়া খাইব স্থির হইয়াছিল। প্রায় সাততলার সমান নীচে একটা বাগানে ইঁদারা আছে জানিতাম। সেইখানে রাত্রের বাসন মাজিতে ও জল আনিতে গেলাম। জল তুলিবার দড়িতে ও ইঁদারার বাঁধান চাতালে বরফ জমিয়াছিল,—সেগুলা চোখের পক্ষে যেমন তৃপ্তিকর, হাতের পক্ষে তেমন বোধ হইল না।

রান্না-খাওয়ার চিন্তায় সমস্ত সকালটা কাটাইলাম। পূজার প্রসাদ ঘরে বসিয়া পাওয়া গেল। দ্বিপ্রহরে রাপ্টাকে সঙ্গে করিয়া কপিলধারা দেখিতে বাহির হইলাম। গ্রামের বাহিরে দলে দলে শৃগাল ঘুরিতেছে। তখন বেলা ঠিক এগারোটা। একটা প্রকাণ্ড ভালুক তিনটী ছানা লইয়া কিছু দূরে একটা গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল, আমাদের চীৎকারে পার্শ্ববর্ত্তী বনে গিয়া ঢুকিল। তাহার ছানাগুলি গোলগাল তিনটি বলের মত,—তাহারা গুড়্ গুড়্ করিয়া এমন ভাবে তাহার পিছন পিছন ছুটিল যে, আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, সঙ্গে ছানা না

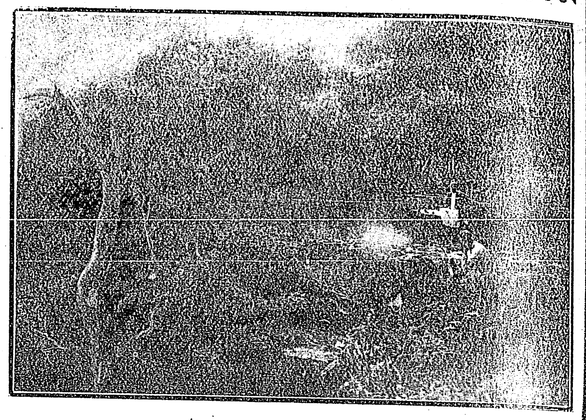

অমরকণ্টক শোনমুড়া শোননদের উৎপত্তি স্থান

থাকিলে ভালুক মহাশয়ের এই ভদ্রতাটা বোধ হয় বিসদৃশ ঠেকিত।

আমরা 'বৈতরণী' প্রভৃতি কয়েকটা কর্দ্দমাক্ত নালা ডিঙ্গাইয়া ঘাসবনে প্রবেশ করিলাম। একপার্শ্বে নর্ম্মদা, তাহার তীরে তীরে অরণ্য, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র কুশজাতীয় ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণে পরিপূর্ণ। সেই ঘাস ঠেলিতে ঠেলিতে সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া গেল। কোথাও এক মানুষ, কোথাও দু তিন মানুষ ভর উচ্চ দুর্ভেদ্য তৃণ-প্রাচীর। যে একটু ক্ষীণ পথের রেখা—দশবার করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। শেষে অনেক কষ্টে ঘাসবনের বাহিরে পৌঁছিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এইবার পথ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, পাশাপাশি দুজন মানুষ চলিতে পারে না। এক দিকে ঠিক নীচেই খরস্রোতা নর্ম্মদা গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়াছে। অন্য দিকে ঈষদুচ্চ জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি মাথার উপর ঝুলিয়া আছে। কোথাও নদীতে অবতরণ করিবার তীর্থ, কোথাও বা তাহার পরিবর্ত্তে পিচ্ছিল পথ হইতে নদীস্রোতে পড়িয়া তীর্থ-মৃত্যু লাভের সম্ভাবনা। আমাদের কোনটাই ঘটিল না। হঠাৎ কর্দ্দমাক্ত পথে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিলাম। একটা সম্বর হরিণ ছুটিয়াছে, তাহার পায়ের ছাপ এদেশী গরুর চেয়ে বড়। আর তাহার পিছনে যে বাঘটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই পথে চলিয়াছে, পদচিহ্ন হইতে অনুমানে তাহা বোঝা গেল। কলিকাতার পশুশালার যে কোন রয়েল বেঙ্গল

হইতে সে বড় হইবে ত ছোট হইবে না। প্রাণ হাতে করিয়া অগ্রসর হইলাম। এইরূপে চারমাইল পথের শেষে কপিল-ধারায় পৌঁছান গেল। চারিদিকের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বারিপাতের গম্ভীর শব্দ বড় চমৎকার। একটু ঘুরিয়া নীচে নামা যায়। সেইখানে গিরিপ্রকৃতির সেই সুগোপন সৌন্দর্য্যালোকে একটী সুন্দর আশ্রম। অধিকারীর নাম নাঙ্গাবাবা,—মিষ্ট ভাষী, সাধক পুরুষ,—দেখিলেই ভক্তি হয়। তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে করিয়া এক মাইল পশ্চিমে 'দুধধারা' দেখাইতে লইয়া গেলেন। কপিলধারায় আছাড় খাইয়া নর্ম্মদার জল অত্যন্ত ফেনাইয়া উঠিতেছে। সেই জলটার একমাইল দূরে আর একটা ছোট প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকে অনেক ফার্ণ ও বনফুল, রাশি রাশি ঝরগোলাপ ফুটিয়া আছে। কপিলধারার বারি-শীকরে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যায়। জল এত উঁচু হইতে এত বেগে পড়িতেছে যে, কাছে যাইবার উপায় নাই। দুধ-ধারায় কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে স্নান করা চলে। প্রায় দশ হাত চওড়া ধারায় দুধের মত সাদা জল যেখানে লাফাইয়া পড়িতেছে, তাহারই ডানদিকে একটি অন্ধকার গহ্বর। প্রবাদ, ঋষি দুর্ব্বাসা সেখানে তপস্যা করিতেন। গুহার গায়ে ধোঁয়ার দাগ দেখিয়াও ভিতরে ঢুকিতে সাহস হইল না,—ক্রুদ্ধ ঋষি বা ক্রুদ্ধ শ্বাপদ যে কেহ বাহির হইলেই বিপদ।

আবার সেই ভীষণ পথ পার হইয়া অমরকণ্টকে ফিরিলাম। সন্ধ্যাবেলা দলে দলে ময়ূর একটা পুকুরে জল খাইতে আসিয়াছিল। ছোটখাট অনেকগুলি ভগ্ন মন্দির দেখিয়া, করণ রায়ের মন্দিরের একটা ছবি লওয়া গেল। ধর্ম্মশালায় বিছানা পাতিয়া আলো হাতে খাবার আনিতে গেলাম। একটা দ্বারহীন খোলা ঘরে কাম্‌তা প্রসাদ লুচি ভাজিতেছিল, বাঘের কথা বলাতে বলিল—"জিস্‌কো পুরে গা, উস্‌কো লে যাগা বাবু।" বছরে দু চারটী যাত্রী বাঘে লয়। কয় দিন পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মশালার সম্মুখে একটা ঘোড়া লইয়াছে শুনিয়াছি। সুতরাং হালুইকরের সুযুক্তিতে নির্ভর না করিয়া তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম।

তৃতীয় দিন সকালে একজোড়া সম্বর হরিণের শিং কিনিয়া একটা ঘোড়া ভাড়া করা গেল। আমাদের পরে মেলা উপলক্ষে দুইজন লোক আসিয়াছিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, আমাদের গরুর গাড়ী দেরী দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া যাত্রা করিলাম। ঘোড়ার পিঠে মোট-ঘাট,—একটা লোক তাহার সঙ্গে আসিবে। ধর্ম্মশালার বৃদ্ধা কমলাবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। একটু আসিয়াই দেখি, একটা গাছে অসংখ্য সুতা ও ছেঁড়া নেক্‌ড়া ঝুলিতেছে। আমরা যে রাত্রে গরুর গাড়ীতে ছিলাম, সেই রাত্রেই একটা মহিষকে এইখানে বাঘে লইয়াছে। দুচার রকম বিচিত্র শাখাচারী জীব দেখিলাম,—তাহাদের নাম জানি না। আমানালায় পৌঁছিতে তিন কোয়ার্টার লাগিল। কতক-গুলি ময়ূর সর্ব্বদাই সেখানে দেখা যায়। হরিণ জল খাইতে আসে, বাঘের শিকার ধরিবার উপযুক্ত যায়গা। আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া চলিতে লাগিলাম। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া একটা পার্ব্বত্য নদীর ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম; তার পর আবার হণ্টন। পথের শেষে প্লেট-লেয়ার বাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম, তখন চারটা বাজিয়া পনের মিনিট। ঘণ্টাখানেক পরে মোট লইয়া ঘোড়াও হাজির হইল।

সেই দিন রাত্রি এগারটার গাড়ীতে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে ভোটাঙ্গের জঙ্গলে যে অলৌকিক বাঁশী শুনিলাম, তাহার সম্বন্ধে স্থানীয় অনেক উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিও কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। যাইবার সময়ও সেই বাঁশী শুনিয়াছিলাম। তখন তাহার রহস্য জানিতাম না। পেণ্ড্রা রোডে গল্প শুনিয়া, ফিরিবার সময় বন্ধ গাড়ীর মধ্যে গভীর জঙ্গলের বুকে সেই বাঁশী যখন একবার নিকটে একবার দূরে বাজিতে লাগিল, তখন সকলেরই গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। বিলাসপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদ্‌লাইয়া, সেই রাত্রেই ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরিলাম।

নটবর

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৩)

ছয়মাসে তিনশো টাকা ফুঁকিয়া গেল। তবে তার মধ্যে একশো টাকা দিয়া অম্বিকার জন্য একজোড়া রুলি হইল। বড় ঘরের বউ ঘরে আনিয়া শাশুড়ীর সুধু শাঁখা হাতে থাকাটা তো ভাল দেখায় না—তাতে একটু হীনতা স্বীকার করিতে হয়। এদিকে তমঃশুকের টাকা গোকুলে বাড়ীতে লাগিল। ঋণের টাকা ক্রমে যাহা হইতে পরিশোধ হইবে সে উদ্বৃত্ত অর্থ নটবরের হাতে কোনও দিনই থাকে নাই। কাজেই ঋণ শোধ হইল না। মহাজন ক্রমে জোত দুইখানায় টান দিতে, নটবর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে গিয়া হাজির হইলেন। সে জোত দু'খানা ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মত্রের ভিতর, কাজেই তিনি সম্মতি না দিলে মহাজন কিছুই করিতে পারে না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "জমী না হয় বেঁচতে না দিলাম আমি, কিন্তু টাকার উপায় কি? টাকা কটা শোধ করে না দিলে তো সে তোমার ঘরখানা নিয়ে যেতে পারে, তোমাকেও কয়েদ ক'রতে পারে। তখন? টাকার একটা জোগাড় কর, আমি তোমার মহাজনকে আপাততঃ ঠেকিয়ে রাখছি।"

নটবর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাড়ী ফিরিল। অম্বিকা শুনিয়া বলিল, "তার জন্য চিন্তা কি? আমার রুলি বেচে টাকা শোধ দিয়ে ফেল।"

নটবর বলিল, "তাতে না হয় শ'খানেক গেল, বাকী দুশো'!"

সুদের কথাটা তার তখন খেয়াল হইল না।

অম্বিকা বলিল, "আচ্ছা, এ একশো তো দিয়ে ফেল, তার পর সময় পাওয়া যাবে।"

নটবর রুলি বেচিতে গেল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ষাট টাকার বেশী কিছুতেই হইল না। ষাট টাকা লইয়া সে মহাজনের কাছে যাইতেই, মহাজন সুদ কষিয়া দেখাইল যে, সেই তারিখ পর্য্যন্ত সুদ দুইশো টাকা পাওনা হইয়াছে। ষাট টাকা সুদ ওয়াশিল দিয়া, বক্রী টাকা চক্রবৃদ্ধির চুক্তি অনুসারে আসল মধ্যে গণ্য করিয়া সে নটবরকে বিদায় দিল।

বাজারের মধ্যে মহাজনের গদীতে এই কারবার হইতেছিল। সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া নটবর বসিয়া পড়িল। জোতখানা বুঝি আর কিছুতেই থাকে না! এখন উপায় কি?

নটবরের মনে বিষাদ বা নিরাশা বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি মহাজনকে আর দুই বৎসর ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন, তবে আর তার চিন্তা নাই। যদি চ সতীশ দুইবার আই-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া তৃতীয় বারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তবু সে বি-এ পড়িতেছে। বি-এ-তে সে অনায়াসে পাশ করিবে, এ কথা সে বলিয়াছে। তবে তো দুই বৎসর পরে আর কোনও চিন্তাই থাকিবে না। বি-এ পাশ করিয়া সতীশ দু'শো পাঁচশো অনায়াসে রোজগার করিয়া এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। আর, না হয় তখন জমিখানা গেলেও কিছু ক্ষতি হইবে না; কেন না, সতীশ তো তখন সমস্ত পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে।

এই স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে দেখিলেন কুঞ্জলাল সাহা।

কুঞ্জলাল হাসিয়া বলিল, "প্রাতঃ প্রণাম দাস ম'শায়।"

নটবর গম্ভীর ভাবে বলিল "সাহাজী, আপনি একটু পয়সা খরচ করে একটা ভাল ঘড়ি কিনুন; আপনার সময়ের বড় দিগ্‌ভ্রম হয়।"

কুঞ্জলাল বলিল, "সন্ধ্যাবেলায় প্রাতঃ প্রণাম বল্লে এমন কিছু দিগ্‌ভ্রম হয় না দাস ম'শায়; কিন্তু আপনার দিগ্‌ভ্রমটা গুরুতর—আপনার একটা চশমা দরকার।"

"কেন? আমার দিগ্‌ভ্রমটা কোথায় দেখলেন?"

"দিগ্‌ভ্রম নয়! টাকা ধার ক'রতে হ'বে, যাবেন—আমার কাছে, না পথ ভুলে নফর সা'র কাছে এসে হাজির।"

নটবর একটু হাসিল, কিন্তু সে বড় শুষ্ক হাসি!

কুঞ্জলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা ধার ক'রেছেন এখানে?"

"এই বেশী নয়, সামান্য কিছু টাকা। এই তার সুদ দিয়ে গেলাম।"

কুঞ্জলাল বলিল, "শ'দুই? আচ্ছা, আপনি ও টাকা দিয়ে ফেলুন, আমার কাছে নিয়ে যান।"

মাথা চুলকাইয়া নটবর বলিল, "তা ছাড়া, সুদ কিছু আছে"—

"সুদের হার কত?"

"মাসে দু' টাকা।"

"আচ্ছা, না হয় দিয়ে তমঃশুক নিয়ে আসুন।"

নটবর বলিল, "দেখুন, একটু গোল আছে। এ টাকার সুদ বোধ হয় আর আমি দিয়ে উঠতে পারবো না, কাজেই জমী দুখান ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় ভাল।"

কুঞ্জলাল তখন তাঁহার কাছে খুঁটাইয়া সকল সংবাদ লইয়া পরামর্শ দিল যে, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে জমী দায়-শোধী বন্ধক দিয়া ঋণ শোধ করাই ভাল। দশ বৎসরে ঋণ শোধ হইয়া জমী ফেরত আসিবে, ইহার মধ্যে আর কিছু দিতে হইবে না।

সন্ধ্যার সময় সেই সর্ত্তে দায় শোধী দিয়া, কুঞ্জলালের টাকায় নফর সা'র ঋণ শোধ করিয়া, নটবর উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

এদিকে ঢাকায় সতীশের অবস্থা ক্রমে বিপন্ন হইয়া পড়িল।

তার শ্বশুরের সঙ্গতি সম্বন্ধে নটবর দাস যে পরিচয় পাইয়াছিলেন ও আন্দাজ করিয়াছিলেন, তাহা ষোল আনা সত্য নয়। তিনি সামান্য চাকরী করিলেও নানারকম অবৈধ উপায়ে তাহা হইতেই প্রায় শ'দেড়েক টাকা মাস মাস উপায় করিতেন। তা'ছাড়া তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বৎসরে পাঁচ ছয় শো টাকা আয় হইত। এই আয় লইয়া তিনি একটি বৃহৎ পরিবার পালন এবং চার পাঁচটি ছেলে মানুষ করিয়া, এবং বেশ একটু ভাল খাইয়া পরিয়া এমনিই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া আরও ঋণে জড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার সংসার অচল হইয়া উঠিল। কাজেই জামাইকে দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে খুব লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি করিলেও কার্য্যস্থলে, তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ সতীশ বার বার ফেল হওয়ায় আর তিনি মোটেই পারিয়া উঠিলেন না। শেষে তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, তার পড়ার খরচও তিনি দিতে পারিবেন না, বাড়ীতেও তাঁহাকে রাখিতে পারিবেন না।

স্বামী স্ত্রী দুজনে ইহাতে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু অপমানের জ্বালায় তাদের অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। সতীশের স্ত্রী বলিল "আমাকে কংশাই রেখে এসে তুমি যা' হয় একটা কর। আমি এ বাড়ীতে আর থাকবো না।"

যেদিন নটবর তার জমী দায়-শোধী বন্ধক দিয়া উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী আসিল, তার দুই দিন পরে সতীশ বিনা সংবাদে তার স্ত্রীকে লইয়া আসিল। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য নটবরের চক্ষু স্থির হইয়া উঠিল। জমী দায়-শোধী দিয়া তার আয় অর্দ্ধেক হইয়া গেল, কিন্তু তার পোষ্য বাড়িয়া গেল—কেবল বউমা একা নন, তার একটি পুত্র কোলে আর একটি গর্ভে। কিন্তু টাকা পয়সা বা ভবিষ্যতের চিন্তা যদি নটবরের মনে বেশীক্ষণ ঘর করিতে পারিত, তবে নটবরের এ দুঃখ থাকিত না, সে এতদিন একটা কিছু করিয়া খাইতে পারিত। এ সব বিশ্রী চিন্তা তার উজ্জ্বল আনন্দ-বহুল অন্তরে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এই আনন্দে যে, তার বউমা স্বামীর অপমানে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী জন্মের মত ছাড়িয়া তার এই কুঁড়েখানিতে আশ্রয় লইয়াছে। সে মহা উল্লাস ও উৎসাহের সহিত বধূকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। অম্বিকাও সমস্ত ঘরময় আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখন তো আর তাদের ঋণ নাই, কোনও মতে একটা উপায় হইবেই! নাতি কোলে করিয়া তাদের অন্তর জুড়াইয়া গেল।

সতীশ ঢাকায় ফিরিয়া গেল। সেখানে নানারকম কাজকর্ম্ম, ভিক্ষা প্রভৃতি করিয়া কোনও মতে আর এক বৎসর পড়ার বন্দোবস্ত করিল।

(৪)

তখন শ্রাবণের শেষ। পাটের ক্ষেত ফসলে বোঝাই হইয়া রহিয়াছে,—জোতদারদের অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল; আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাট কাটা হইবে। এবার ফসলও ভাল হইয়াছে, দামও ভাল হইবে শোনা যাইতেছে। যা'দের জোত জমি আছে, তাদের মধ্যে এ সব কথা লইয়া প্রায়ই আন্দোলন হইত। সবাই সুখ স্বপ্ন দেখিতেছে, এবার লক্ষ্মী ঘরে উঠিবেন।

নটবর যেখানে যায়, সেইখানেই পাটের কথা শোনে। কার ক্ষেতে কয় মণ পাট উঠিবে, কি রকম দর হইবার সম্ভাবনা, এ সব কথার আলোচনা হয়। তার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, সে তাতাতাড়ি উঠিয়া পলায়ন করে। তাই তো, এমনি সময় সে দায় শোধী বন্ধক দিয়া দখল ছাড়িয়া দিল। আর একটা মাস থাকিলেই তো সে অনেকগুলি টাকা ঘরে তুলিতে পারিত; তাহা হইতে মহাজনকেও ঠেকাইয়া রাখা যাইত, বছরকার খরচও বোধ হয় চলিয়া যাইত। নদীর ধার দিয়া চলাচল করিতে সে দেখিতে পাইত, তার হাতছাড়া সেই ক্ষেত পাটে একেবারে ঠাসাঠাসি হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সে জমীর পাট লম্বায় সবাইকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। সে জোর করিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু ফিরাইত। আর একখানা ক্ষেত ধানে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে, ধানের ডগায় কচি শিষ্ বাতাসে দোল খাইয়া যেন তাকে পরিহাস করিতেছে। এমন ফসল তো তার দশ বছরের মধ্যে হয় নাই। নটবর চক্ষু মুদিয়া ছুটিয়া পলাইত।

পাট কাটা হইল; গৃহস্থের আঙ্গিনা সব শুকাইবার জন্য টাঙ্গান পাটে বোঝাই হইয়া গেল, ফড়িয়াগণ ঘোরা-ঘুরি করিতে লাগিল। বন্দরে বন্দরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাটের নৌকা জমিয়া, বিপুল আলস্যের সহিত কেবল বস্তা বস্তা পাটে তাহাদের উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিল। এবার চারিদিকে কেবল পাট—পাট—পাট! ঘরে ঘরে পাটের গন্ধ আর টাকার ঝন্‌ঝনানি। নটবর ক্ষেপিয়া উঠিল।

একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া পথে বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল যে, তার সেই হাতছাড়া জমীর পাট তখনও কাটা হয় নাই, বর্গাদার সেখানে ঘোরা ফেরা করিতেছে, কাল কাটিবে বোধ হয়। নটবর রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল কুঞ্জ সাহার কাছে।

কুঞ্জ সাহার গদী এখন সরগরম। তার গুদাম পাটে বোঝাই, তার আঙ্গিনায় পাট শুকাইতেছে। গদীর ভিতর ফড়িয়া ও কর্ম্মচারীর দল ঘুরিতেছে, টাকা ঝনঝন করিতেছে। পাটের মরসুমে কুঞ্জসাহা একেবারে কাজে ভরপুর।

নটবরকে দেখিয়া কুঞ্জলাল একবার তার দিকে চাহিয়া বলিল, "দাসম'শায় যে! বসুন।" ময়লা ফরাসের এক কোণায় নটবর বসিয়া রহিল। সবাই একবার একবার করিয়া তাহাকে দেখিল, পরিচিতেরা নমস্কারাদি করিল, তার পর যে যার কাজ ও কথায়-বার্ত্তায় লাগিয়া গেল। নটবর যে সেখানে আছে, সেটাও কেহ লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া নটবর ভারি অপমানিত বোধ করিল। একে তার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল, তাতে আবার এই অপমান। তার চিত্তের সহজ প্রসন্নতা তাহাকে পরিহার করিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে একটা রসিকতা করিয়াও মনের বোঝা লাঘাইতে পারিল না। যেখানে তার মুখে হাস্যরসের ফোয়ারা ছোটে, সেখানে সে মাথা খুঁড়িয়া একটা হাসির কথা বাহির করিতে পারিল না।

নটবরের বড় ঘৃণা বোধ হইল। সে আজ কুঞ্জ সাহার কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। কুঞ্জলাল আগে বড় বেশী সহৃদয়তা দেখাইয়াছিল বলিয়াই সে আসিয়াছিল, নহিলে লোকের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষার অপমান সে কোনও দিনই সহ্য করে নাই। নটবরের মনে সন্দেহ রহিল না যে, কুঞ্জসাহাও জানে যে, সে তার কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে, তাই তার এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন।

অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া নটবর উঠিল। কুঞ্জসাহার নজর সেদিকে পড়িতেই সে বলিল, "দাসম'শায় উঠছেন? একটু বসুন। এঁর সঙ্গে কথাটা সেরেই আপনার কথাটা শুনছি। আমারও আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

নটবর বাধ্য হইয়া বসিল। কুঞ্জসাহার চাল দেখিয়া তার রাগ হইল, কিন্তু কোনও কথা জুয়াইল না।

অনেকক্ষণ পরে কুঞ্জ উঠিয়া তাহাকে একটু নিরিবিলি যায়গায় লইয়া গিয়া বলিল, "হাঁ দেখুন দাসম'শায়, আপনাকে

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম। আপনার জমী দুখানা তো দিয়ে ব'সেছেন, এখন আপনার সংসার চলবে কিসে?"

লজ্জায় নটবরের কাণ লাল হইয়া উঠিল। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে অপমান করিবার অধিকার নটবরই তো কুঞ্জকে দিয়াছে।

আত্মসংযম করিয়া নটবর বলিল, "তা যাবেই চলে এক রকম।" তার এখন ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, এই কথা বলিয়া কুঞ্জসাহার কাছে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল যে, সে যেন তার দায়শোধী দলিলমূলে দখলটা এ সনের ফসলটা বাদ দিয়া আমলে আনে। তাহা হইলে এবারকার ফসলটা নটবর পায়, তাহাতে এক বছরের খোরাক চলিয়া যাইবে। এমন ভিক্ষা করিবার মতি যে তার হইয়াছিল, সেজন্য নটবর আপনাকে মনে মনে চাবুক মারিতে লাগিল।

কুঞ্জলাল বলিল, "আপনার ছেলে এখন কি করে?"

"এবার বি-এ দেবে, সে ঢাকায় পড়ে।"

"তাই না কি? আমি ভাবছিলাম যে, যদি তাকে এনে এই মরসুমে আমার কাছে পাটের কাজে লাগিয়ে দিতেন, তা'হ'লে বোধ হয় কিছু সুবিধে ক'রতে পারতো।"

সুবিধা যে হইত, সে বিষয়ে নটবরের সন্দেহ ছিল না। আর ব্যবসায়ে এমন একটা সহায়ের সুযোগ পাওয়া খুব মুসত নয় তাও নটবর জানিত। কিন্তু তার ভয়ানক রাগ হইল এই কথা ভাবিয়া যে, কুঞ্জ সাহা তাহাকে অনুগ্রহ দেখাইতে আসিয়াছে। কুঞ্জ সাহার দয়ার দান গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল বলিয়া তার মনে হইল।

নটবর বলিল, "না সাহাজী, তার এখন মিলিটারী মেজাজ, সে বি-এ, এম-এ পাশ করে' কত কি ক'রবে! তার শ্বশুর তাকে খরচ দেয় কি না?" "ও তাই না কি" বলিয়া কুঞ্জলাল নীরব হইল।

নটবরের অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। কুঞ্জ সাহা নটবরকে অনেকটা অনুগ্রহ করিয়াছে সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। নটবরকে দেখিয়াই তার মনে হইল যে, নটবর বুঝি তার কাছে আরও টাকা ধার চাহিতে আসিয়াছে। ইহাতে সে বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করিল। একবার কি দুইবার সে ইহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছে বলিয়াই চিরদিন তো সে দাস মহাশয়ের সব ভার গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই এ দায় হইতে স্থায়ীভাবে মুক্ত হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল এই বুদ্ধি। নটবরের ইহা মনঃপূত হইল না দেখিয়া সে চুপ মারিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কুঞ্জ সাহা জিজ্ঞাসা করিল। "তা' আপনি কি মনে করে' এসেছিলেন?"

"কিছু না, এই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম সাহাজীর সঙ্গে একটু আলাপ সালাপ করে যাই। তা' দেখলাম, ম'শায়ের মুখ চোখ নাক কাণ একেবারে পাটে গাদা হ'য়ে গেছে।"

এই রসিকতাটুকু করিতে পারিয়া নটবর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার প্রাণটা একটু হাল্কা হইল। সে সাহাজীর সঙ্গে আর দুই একটা কথা বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। পথে ফিরিতে সে তার সেই পাটক্ষেতের ধার দিয়া গেল। একবার সেদিকে চাহিয়া সে চক্ষু বুজিয়া ছুট দিল।

যখন সে চক্ষু মেলিল তখন দেখিতে পাইল, গোপাল ভাণ্ডারী তাহাকে সাপটিয়া ধরিয়াছে।

গোপাল ভাণ্ডারী মস্তবড় ধড়িবাজ। পাশের গাঁয়ের সান্যাল মহাশয়দের কাজ করে সে, আর গ্রামের ভিতর দুষ্ট-বুদ্ধির মহাজনী করে। গোপাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে গ্রামের শরৎ দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর একটু গোলযোগ লইয়া তখন গ্রামে বড় গোলযোগ চলিতেছে; কেহ বড় তার সঙ্গে কথা কয় না।

গোপাল ভাণ্ডারী বলিল, "আরে চক্ষু বুজে ছুটছো কোথায় নটবর দা। তোমার বয়স কি উজান বইতে লাগলো না কি?"

নটবর বলিল, "বইবে না দাদা, এখানে স্বয়ং গোপাল, সাক্ষাৎ নবরুন্দাবন—সবই উজান বয়—সর্ব্ব উল্টা।"

গোপাল একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে নটবর দা'।"

পরামর্শ হইয়া গেল। সেই দিন রাত্রে নটবরের পাট ক্ষেত কাটিয়া সান্যাল ম'শায়দের প্রজারা লইয়া তাহাদের বাড়ীর সামনে জাগ দিয়া রাখিল। নটবরকে চুপ করাইবার জন্য দশ মণ পাট তার বাড়ীতে পৌছাইয়া গেল।

কুঞ্জ সাহা ক্রমে মোকদ্দমা করিল। নটবরকে সাক্ষী মানিল। নটবর এবার গোপালের কাছে টাকা খাইয়া উধাও হইয়া গেল। কুঞ্জ সাহা তাহাকে দিয়া সাক্ষী দেওয়াইতে পারিল না। গোপালের তদ্বিরের চোটে সে ক্ষেত সান্যাল মহাশয়দের জমীদারীর অধীনে গোপালের দখলি জোত সাব্যস্ত হইয়া গেল। কুঞ্জ সাহার স্বত্বের নালিস করিতে হইল। ইহাতে নটবরের মোট লাভ হইল দশ মণ পাটের মূল্য শতাধিক টাকা।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্বত্বের মোকদ্দমায় কুঞ্জ সাহা গোপালের কাছে জমী ও মোটা হাতে খেসারত আদায় করিয়া লইল। (আগামীবারে সমাপ্য)

নস্য-মহিমা

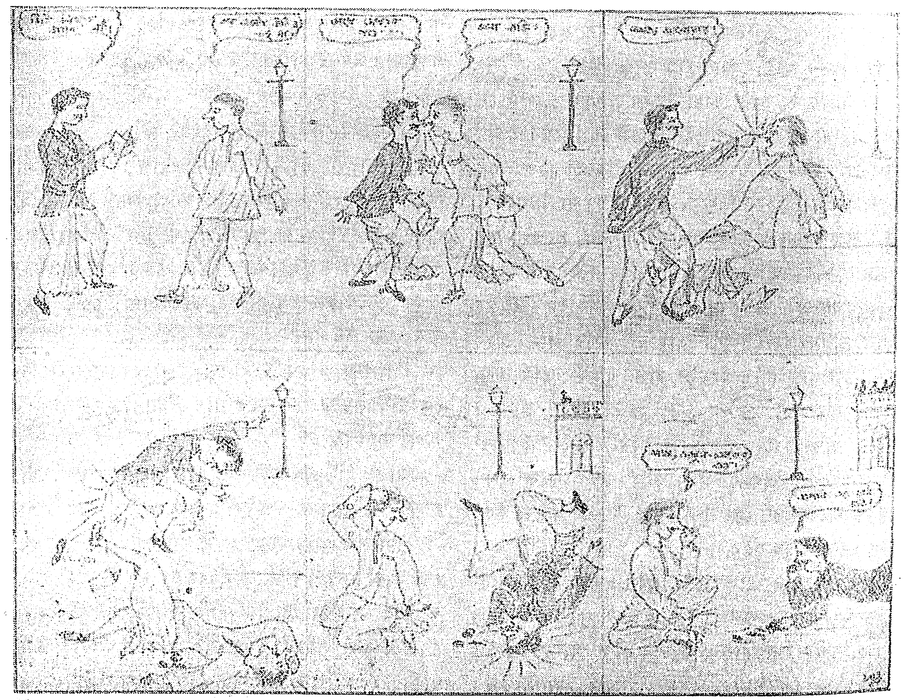

শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বোম্বাই সহরটি প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে মন্দ নয়। মালাবার পাহাড়টি অবশ্য বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শোভা। সেখান থেকে সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় সুন্দর। বোম্বাইয়ের সমুদ্র বঙ্গসাগরের মত চিত্তাকর্ষক নয়—কারণ, বঙ্গোপসাগর যেমন সজীব ও নৃত্যশীল, আরব মহাসাগর তেম্‌নি নির্জ্জীব ও মন্থর—অন্ততঃ বোম্বাইয়ের কাছে। কিন্তু প্রশান্ত সাগরবক্ষে সূর্য্যাস্ত বোধ হয় তার প্রশান্তির জন্যই আরও সুন্দর বোধ হয়। তার পর গোধূলির একটু পরেই পাহাড়ের গাদদেশে অগণ্য আলোক-শ্রেণী যখন ঝিক্‌মিক্ কর্ত্তে থাকে, এবং এখানে সেখানে যখন ধূসরীভূত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর সৌধমালা দেখা যায়, তখন মনে হয় যে মানুষের হাত যে সব সময়েই প্রকৃতি দেবীর অঙ্গহানি কর্ব্বে এমন কোনও কথা নেই। পাশাপাশি একদিন বম্বের কোলাবা অঞ্চলে কিন্তু ঠিক্ উল্টো মনে হয়েছিল। সেখানে এক দিকে সমুদ্র অপর দিকে ধনী বোম্বেবাসীর মনোহর হর্ম্ম্যরাজি। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে সমুদ্রের শীকর সম্পৃক্ত মলয়ানিল যখন বড় মধুর লাগ্‌ছিল, তখন প্রতি মুহূর্ত্তেই বেসুরো মোটরের বেখাপ্পা হেডলাইটের অত্যধিক লোহিত চক্ষু একটু বেশি রকম খাপছাড়া ঠেকেছিল, মনে আছে। অন্ততঃ সেদিন মনে হয়েছিল যে, এরূপ মনোজ্ঞ স্থানে মোটরের শব্দ ও কর্কশ জ্যোতিকে আস্‌তে দিয়ে মানুষ মোটেই তার সৌষ্ঠব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেনি। কিন্তু অর্থ যতদিন মার্জ্জিত রুচির দ্বারা চালিত না হবে, অর্থাৎ ধনী যতদিন সভ্য হতে না শিখ্‌বে, ততদিন এরূপ বেখাপ্পা যোগাযোগকে নিষেধ করা সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না।

বোম্বাই সহর লক্ষপতিতে ভরা। রাস্তায় প্রতি

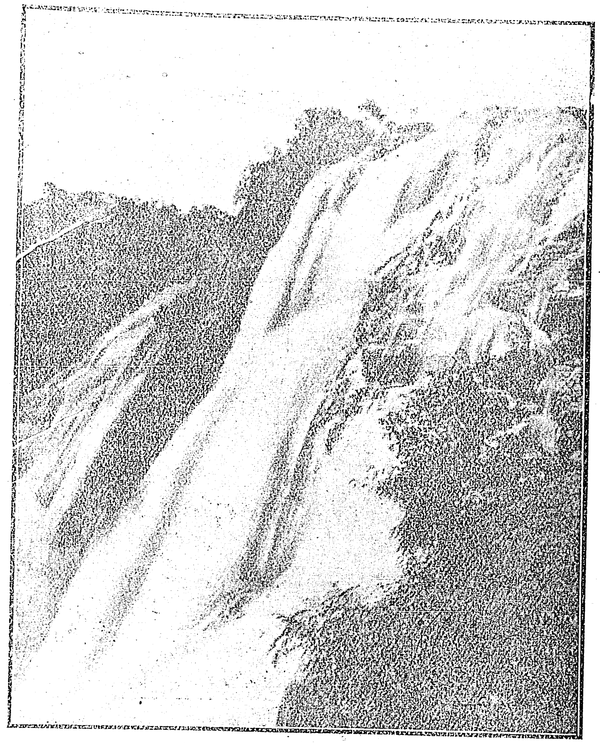

কাবেরী জল-প্রপাত
(মহীশূর ও পাশাপাশি অনেক সহরের বৈদ্যুতিক শক্তি এই জল-প্রপাত থেকে গৃহীত হয়)

পদক্ষেপেই তাঁদের মোটরের আলিঙ্গন বাঁচিয়ে চলা বর্ত্তমান যুগের সভ্য পথিকের পক্ষে এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যাত্রা এঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল এবং এঁদের প্রায় কারুর মধ্যেই সভ্যতার কোনও

culture এর পরিচয় পাওয়া গেল না। তা ছাড়া, যে সব পার্টিতে এঁরা উপস্থিত থাকেন, সেখানে কোনও culture সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তাও অচল হয়ে পড়ে দেখা গেল। শিশুর সামনে self-coscious হওয়া যেমন কঠিন, লক্ষপতি শ্রেণীর সামনে কোনও সত্যকার সদালাপ ঠিক তেমনি শক্ত হয়ে ওঠে। কারণ বোধ হয় বড়মানুষেরা এক জাতই আলাদা। আমার এক ইংরাজ বন্ধু একবার

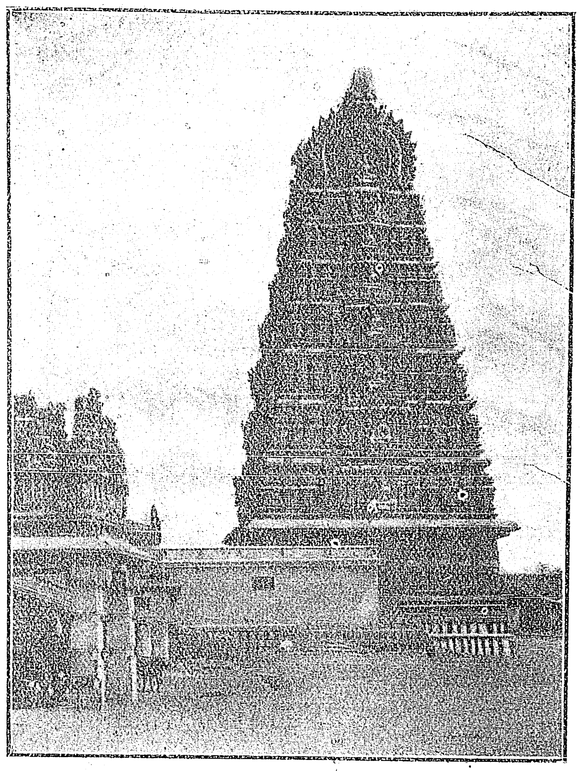

চামুণ্ডী মন্দির—মহীশূর

আমাকে বলেছিলেন যে, টাকার ছাপ জিনিসটা মানুষের মুখে বোধহয় লালসার ছাপের চেয়েও বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি তা ছাড়াও আর একটি কথা বেশ বলেছিলেন যে, এ রকম লোকের সাম্‌নে যদি তুমি practical বিষয় ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন কর, তাহলে দেখ্‌তে পাবে যে, তাদের মুখের প্রতি রেখা, প্রতি ভঙ্গী তোমাকে নিরন্তর শাসাতে থাক্‌বে যে "কর্চ্ছ কি? এ সব আলোচনা যে শুধু সময় নষ্ট, তা কি জান না?" বয়ের লক্ষপতিদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বুঝেছিলাম যে, এ কথা শুধু যে materialistic য়ুরোপীয় লক্ষপতিদের ক্ষেত্রেই খাটে তাই নয়, এ কথা আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতীয় ধনীদের সম্বন্ধেও বড় কম প্রযোজ্য নয়। পরে গুজরাতে এক ক্রোড়পতির সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় তৃপ্তিলাভ করেছিলাম; কারণ, তাঁর অগাধ অর্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি উচ্চশিক্ষা, পড়াশুনো, সদালাপ, ও culture প্রভৃতি উদ্ভট জিনিসে বিশ্বাস কর্ত্তেন। তবে তাঁকে অনেকটা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করার সঙ্গত কারণ ছিল। তাঁর সম্বন্ধে যথাস্থানে লেখার ইচ্ছে রইল।

বোম্বাই সহরে তারাবাইয়ের গান বেশ ভাল লাগ্‌ল। এমন মধুর কণ্ঠস্বর এব কমই শোনা যায়; এবং পেশাদার গায়িকাদের মধ্যে তারাবাইয়ের চালচলন, আচার-ব্যবহারের মধ্যে একটা মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, যেটার ফল তাঁর গানের ওপরেও প্রতিফলিত হয়েছিল। গান জিনিসটি যে কতখানি মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে, তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। গায়কের refinement, সুরুচি, শিক্ষা, সৌষ্টবজ্ঞান তার তানালাপের প্রতি ঝঙ্কারের ওপর প্রভাব বিস্তার না করেই পারে না। আমাদের অনেক পেশাদার গায়কের সুর-তাল-শুদ্ধ গানের মধ্যেই এই মনোজ্ঞ personality র পরশের অভাব থেকে যায় বলেই, আমরা এত বেশির ভাগ সময়েই তাদের উচ্চ সঙ্গীতের রসগ্রহণ কর্ত্তে পারি না। তারাবাইয়ের মধ্যে আমি কথাবার্ত্তায় যে সম্ভ্রমজ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় পেয়েছিলাম, সেটা তার গানকে বড় কম রসসম্পদ দান করে নি।

বম্বেতে এক দিন অপেরা হাউসে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি ও চিন্নস্বামী আয়ারের বেহালা শুনতে গিয়েছিলাম। বেহালার কথা পরে আলোচনা কর্ব্ব—

কিন্তু বাঁশের বাঁশী যে কত গুণ জানে, তা সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশী যিনি শোনে নি, তিনি কিছুতেই ঠিক্ বুঝতে পারবেন না। বাঁশীতে যে এত কাণ্ডকারখানা করা যায়, তা আমার ধারণা ছিল না। য়ুরোপীয়দেরও কখনও এত আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে ফ্লুট বা ক্লারিওনেট বাজাতে শুনি নি। তবে সঞ্জীব রাও বাজালেন কর্ণাটকী অথবা দক্ষিণী সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের মধ্যে দক্ষতার অভাব না থাক্‌লেও প্রাণের অভাব খুবই। তা ছাড়া, দক্ষিণী গানবাজনায় মিড়ের প্রয়োগ অত্যন্ত কম। কাজেই বাঁশীর সুস্বর ও অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও আমাদের খুব বেশিক্ষণ তা ভাল লাগ্‌ল না। সেদিন আমাদের একটি ভারি করুণ-

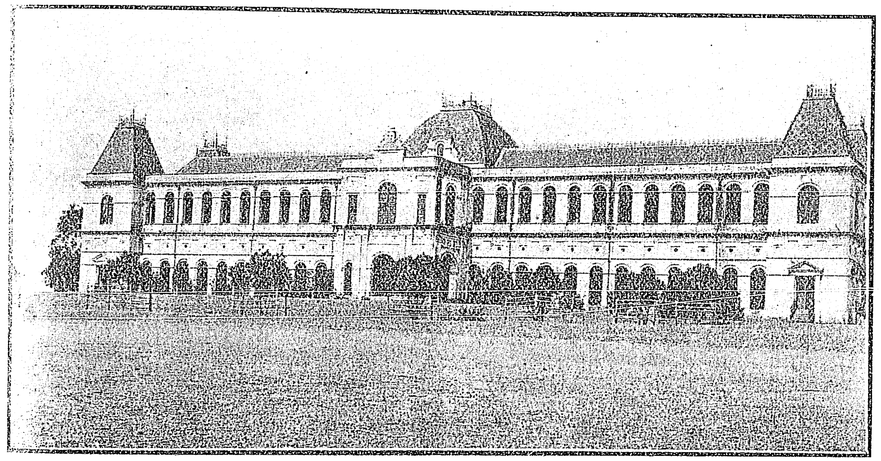

মহারাজার কলেজ—মহীশূর

হাস্য-রসাত্মক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের বক্সে একটি মান্দ্রাজী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ বেশ জমিয়ে নেওয়া গেল। দেখা গেল, লোকটি সঙ্গীতরসজ্ঞ—অন্ততঃ দক্ষিণী সঙ্গীতের ত বটেই। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের নানা বিষয় ব্যাখ্যা কর্চ্ছিলেন ও সঞ্জীব রাও যে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশীবাদক, তা বার বার বলে বোঝাচ্ছিলেন। আমরা ঘণ্টা দেড়েক শুনে আর ভাল না লাগাতে, চলে আসবার উপক্রম করাতেই, তিনি আমাদের সবিস্ময়ে প্রশ্নবর্ষণ কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেন যে, "এও কি সম্ভব? সব চেয়ে ভাল জিনিস এখনও আসে নি; আর মাত্র ঘণ্টা দুই বই ত নয়? কেন আমরা চলে যাচ্ছি—আমাদের কি ভাল লাগ্‌ছে না? ইত্যাদি ইত্যাদি।" লোকটির ব্যথাকুল প্রশ্নে বাস্তবিকই আমাদের শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌তে ইচ্ছে হল; কিন্তু যখন তিনি বল্লেন, আর মোটে দুঘণ্টা বাজনা চল্‌বে, তখন তাঁকে আমরা বল্‌তে বাধ্য হলাম যে, আমাদের যেতে হবেই, তবে ভাল লাগছে না বলে নয়, কাজ আছে বলে। তিনি কিন্তু নাছোড়বন্দ। বল্লেন "সত্যি এখন গেলে সব মাটি, কারণ, এইবারেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বাজনা আরম্ভ হবে।"

এতক্ষণ ত অশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বাজানো হয়নি বলাতে, তিনি বল্‌লেন যে, হাঁ মন্দ নয় বটে, তবে সবার সেরা সঙ্গীত এখনও আসেনি—এইবার আস্‌বে, আর দুঘণ্টার মধ্যেই। আমরা তাঁকে ব্যথা দিতে অনিচ্ছুক হওয়ার দরুণ সুসভ্য কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম—তাঁর আগ্রহের আতিশয্যে। "কি কর্ব্ব? কাজ আছে। দুঃখিত" ইত্যাদি। ভদ্রলোক কিন্তু আমাদের এমন বাঁশী ছেড়ে যাওয়ার উপক্রমে এতই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যে, শেষটা এমন প্রশ্নও করে বস্‌লেন, "কি কাজ? না গেলেই কি নয়?" শেষে climax এল, যখন তিনি বল্‌লেন, Please don't go". আমরা একদিকে এরূপ আগ্রহে যেমন একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম, তেমনি অপর দিকে যে বিস্মিত

কৌতুকে সস্মিত হয়ে উঠেছিলাম, তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। আমরা বাইরে চলে আসার পর, আমার সঙ্গী বন্ধু আমাকে করুণ মধুর হাসি হেসে বল্‌লেন, "আমরা তাড়াতাড়ি না চলে এসে আর খানিকক্ষণ তাঁকে বোঝাতে গেলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের পা জড়িয়ে ধর্ত্তেন।" নিজেদের যা খুব ভাল লাগে, তা অপরের ভাল লাগছে না দেখলে, ব্যথা বোধ করাটা স্বাভাবিক, তাই একটা বেদনা বোধ করার মধ্যে কৌতুকের উপাদান অনেকখানি থাক্‌লেও মাধুর্য্যের উপাদানও নিতান্ত কম নেই।



দরিয়া দৌলতের অভ্যন্তর ভাগ—শ্রীরঙ্গপত্তম

মান্দ্রাজী বাদকদের বাজনা আরও বেশি মনোজ্ঞ হত, যদি তাদের মাথার প্রথমার্দ্ধ মুণ্ডিত ও পশ্চাতে উন্নত বেণী খাড়া হয়ে না থাকৃত, যেমন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায়ই থাকে। পরে মহীশূরে এ দৃশ্য অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেলেও, সেদিন মনোরম সঙ্গীতের মাঝখানে তাদের চেহারা যেন অনেকটা ভূপালীতে কোমল ধৈবতের মতনই বেখাপ্পা ঠেক্‌ছিল। আমার রসিক বন্ধুটি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "ওরা এমন ভাবে বিধাতৃদত্ত রূপকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কেন বল্‌তে পারেন! এদের এমন ত কিছু surplus রূপ দেখা যাচ্ছে না, যাকে নিয়ে তছনছ করা সত্ত্বেও অনেকখানি অবশেষ থাকে!" তবে আজকাল শিক্ষিত মান্দ্রাজীদের মধ্যে অনেককেই এরূপ কেশ-প্রসাধনের পরিপন্থী হয়ে উঠ্‌তে দেখা যাচ্ছে, এইটেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মস্ত বড় আশার কথা।

গান বাজনার মধ্যে দৈহিক প্রকাশেরও একটা স্থান আছে, যেটাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা চলে না। কারণ, সৌষ্টবজ্ঞানই এর ভিত্তি। ধরুন, যদি কোনি গায়ক বিরাট কালো দাড়ির সঙ্গে মস্ত লাল নথ পরে এসে চমৎকার একটি বীণা বাজাতে সুরু করেন। এরূপ স্থলে তাঁর বীণা-বাদন যতই সুন্দর হবে, তাঁর রূপের বেখাপ্পা সঙ্গতি আমাদের রসগ্রহণের ততই পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে না কি? তবে তিনি যদি বীণায় কোনও caricature কর্ত্তে এসে থাকেন, তবে এ বেশ আমাদের সৌষ্টবজ্ঞানকে আঘাত না করার দরুণ, আমাদের হাস্যরসবোধের অনুকূলই হবে বোধ হয়। কিন্তু সঞ্জীব রাও ও আয়ার মহোদয় দুজনেই উচ্চ সঙ্গীত শোনাতেই এসেছিলেন—কৌতুক সঞ্চার কর্ত্তে নয়। কাজেই তাঁদের বেশ ও বিশেষ করে কেশ-প্রসাধন অন্ততঃ আমাদের উত্তর ভারতের শ্রোতার কাছে খুব রুচিসঙ্গত মনে হয় নি। তাছাড়া, বেহালা-বাদক মহাশয়ের মৃদঙ্গ-বাদকের দিকে রোষ-কষায়িত লোচনে তাকিয়ে মেলট্রেনের গতিতে মাথা নাড়াটাও অনেক সময়ে আমাদের সমাহিতভাবে সঙ্গীত রসভোগের বড় কম

অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। য়ুরোপের বিখ্যাত গায়ক Cuarwso মহাশয় তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে, গান গাইতে হয় শুধু গলা দিয়ে নয়, প্রতি অঙ্গ দিয়ে। তিনি যদি আমাদের ওস্তাদদের এ বিষয়ে তাঁর আনুগত্য দেখ্‌তে আজ কবর থেকে উঠে আস্‌তেন, তবে তাঁর বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে ও-উপদেশটি যে তুলে দিতেন, এমন কথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলেই মনে হয়।

মহারাষ্ট্রীয় থিয়েটারগুলির অভিনয় প্রায় দুঃসহ। তার ওপর এই বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষকে অভিনয় কর্ত্তে দেখলে, তা শান্তচিত্তে বরদাস্ত করা এক মহাত্মাজীর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব। তবে এদের থিয়েটারে সঙ্গীতের standard আমাদের দেশের চেয়ে উঁচু। অর্থাৎ এদের থিয়েটারী গানগুলিও একটু রাগ-ঘেঁষা ও তালশুদ্ধ। গুজরাতী থিয়েটার আমি দেখিনি, তবে শুনেছি, সেখানে সঙ্গীত না কি অনেকটা চুটকী-গোছের—মহারাষ্ট্রীয়দের মত রাগাত্মক নয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় থিয়েটারের গানগুলি রাগাত্মক হলে কি হয়, আ—আ—র উপদ্রব তাতে এত বেশি যে, একটু শুনতে না শুনতেই একঘেয়ে মনে হয়। এঁদের মধ্যে দুজন অভিনেতা আছেন—সিরনাভিস ও বালগন্ধর্ব্ব। এঁরা দুজনেই মহিলার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। প্রথমোক্ত অভিনেতা নিজেকে মহারাষ্ট্র-কোকিল নামে অভিহিত করে এক আত্মপ্রসাদই উপভোগ করে থাকেন বল্‌তে হবে, যেহেতু তাঁর গানে খুব কম অভিজ্ঞ শ্রোতারই প্রসন্ন হবার কথা। দ্বিতীয় অভিনেতা কিন্তু সত্যই লোকপ্রিয়। তিনি "স্বয়ম্বর" বলে একটি অভিনয়ে রুক্মিণীর ভূমিকা নিয়ে একটি ভীমপলশ্রী গাইলেন অন্ততঃ একঘণ্টা ধরে। প্রথমটা তাঁর গান মন্দ লাগছিল না; কারণ, তাঁর গলার মধ্যে এক সময়ে যে একটা দরদ ছিল, তা তাঁর আজকালকার ভাঙা গলা হতেও যে খানিকটা বোঝা যায় না এমন নয়; কিন্তু তাঁর নিরন্তর আ-আ তানে শেষে আমাদের প্রথম অঙ্কের শেষেই প্রস্থান কর্ত্তে হ'ল; কারণ, না করে উপায় ছিল না। এঁর আ-আ রূপ মল্লযুদ্ধে কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবর্গের পুলকের যেন পরিসীমা থাকে না, তারা প্রায় ক্ষেপে ওঠে। মহারাষ্ট্রীয়দের এরূপ গানে এতটা উৎসাহ দেখে আমি প্রথমে ক্ষুব্ধ ভাবে উপলব্ধি কর্লাম যে, চেষ্টা কর্লে সাধারণের রুচির অবনতি সাধন করাও অসম্ভব নয়। বালগন্ধর্ব্বের গান বম্বেতে কিরূপ লোকপ্রিয়, তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, তার গান আমার ভাল লাগেনি শুনে, বম্বের একজন লক্ষপতি এতই ক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তিনি আমাকে, বালগন্ধর্ব্বকে ও গটবর্দ্ধন বলে আর একজন নামজাদা থিয়েটারী গায়ককে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ করাটা কর্ত্তব্য মনে না করেই থাক্‌তে পারলেন না। কারণ, তিনি বল্‌লেন, বালগন্ধর্ব্বের গান আমার ভাল করে শোনা হয় নি, নইলে ভাল না লেগেই পারত না। কিন্তু এ লক্ষপতিটির বাড়ীতেও এঁদের দুজনের নিরন্তর আ-আ শুনতে শুনতে শরীর মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ল, ঠিক তখনই গৃহকর্ত্তা উৎফুল্ল নেত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লেন, "কেমন? বলেছিলাম কি না?" উত্তরে আমার কিছু বলা উচিত ভেবে, আমি ব্যতিব্যস্ত ভাবে বল্লাম, বালগন্ধর্ব্ব মহাশয়ের চেহারার মধ্যে বেশ একটা নম্রতা আছে। সেদিন এই উত্তর দেবার সময় এক ফরাসী মহিলার গল্প মনে হ'য়েছিল। তিনি এসেছিলেন ইংলণ্ডের কোথাও এক ইংরাজ গায়কের গান শুনতে। গান তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তিনি সত্যপরায়ণা অথচ সুশীলা হতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন যে, ইংরাজ গায়কটি বড় ভাল লোক, যেহেতু তিনি না কি তাঁর মার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। সভ্যতার খাতিরে আমাদের দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কত সময়েই না সোজা উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে!

বোম্বাইয়ে এক গুজরাতী ভাটিয়া যুবকের বিবাহে নিমন্ত্রণ পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের বাঙলাদেশের মতন গুজরাতী মেয়েরাও অনন্ত স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পক্ষপাতী দেখা গেল। এদের মধ্যে একটা প্রথা আছে বেশ মজার। কন্যাপক্ষীয় মহিলারাই একদিন প্রকাশ্য সভায় এসে দাঁড়িয়ে বরের মাকে ঠাট্টা কর্ত্তে থাকেন—সুর করে। সেদিন তাঁরা এসে বল্লেন যে বরের মা গালে আল্‌তা ও ওষ্ঠে রং দিতে ভালবাসেন—ওমা! কি লজ্জা! ইত্যাদি। বরের মা তাতে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লেন, দেখা গেল। কারণ, তিনি তাঁর বেলায় খুব একহাত নেবেন, ঠিক্ করে রেখেছিলেন।

গুজরাতীরা সব নিরামিষাশী। নানান রকম তরকারী

এরা রাঁধে ; কিন্তু আমাদের মুখে তা বড় রোচে না। ধরুন, ডালে বিপর্য্যয় টক দিলে, বেগুণ ভাজায় লেবু দিলে, বা লুচির সঙ্গে নিছক লঙ্কা আদা দিলে কি ভোজনবিলাসী বাঙালীজাতি তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে! তার উপর, এরা ভাত খায় সব শেষে, মধুরেণ সমাপয়েৎ রূপ বেদবাক্যে বিশ্বাস করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই আমাদের রসনায় এদের খাদ্য বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার কর্ত্তে পারে না। এরা ভাত শেষে খায় বলে এক দিন এক ব্রাহ্মণ পরিবেশক আমাকে তা আগে দিতে অসম্মত হয়ে আমাকে ও আমার পাশে এক কনোজী বন্ধুকে বেশ কৌতুক দিয়েছিলেন। আমার বন্ধু তাকে বল্লেন "এঁকে ভাত আগেই দাও।" তাতে সে বল্‌ল "সেটি হবে না। ভাত দেব এঁকে সব শেষে।" আমার অন্যান্য বিস্তর গুজরাতী বন্ধু আমাকে কিন্তু পরে একথা শুনে হেসে একবাক্যে বলেছিলেন যে এইরূপ "না" বলাটাকেই যেন আমি গুজরাতীদের আতিথেয়তা-সূচক বলে মনে না করি। পরে দেখেছিলাম যে তাঁদের কথা সত্য, গুজরাতীরা আতিথেয়তায় কারুর চেয়েই কম নয়।

তাছাড়া গুজরাতী গৃহস্থ বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—অনেক স্থলেই। কেবল এদের খাদ্যের মধ্যে পুষ্টিকর উপাদান বড় কম—এমন কি ডালেরও এরা খুব ভক্ত নয়। নানাবিধ আচারের পক্ষপাতী—যেগুলি এদের পুরুষরাও খায়। কাজেই গুজরাতীদের মধ্যে সবল লোক আমি একজনও দেখিনি বল্‌লেও বোধ হয় কথাটা অবিশ্বাসজনক হবে না। মহাত্মাজীর আত্মিক-শক্তির চর্চ্চা কর্ত্তে গিয়ে এরূপ কৃশকায় হওয়া একান্ত প্রয়োজন কি না, সে বিষয়ে আমাদের মৎস্যমাংসাশী বাঙালীর একটু পাপ-সন্দেহ হতে পারে ; কিন্তু গুজরাতীদের মনে বোধ হয় এ বিষয়ে সন্দেহ রূপ কলি প্রবেশ কর্ব্বার ছিদ্র জীবনে কখনও খুঁজে পাবে না—অন্ততঃ আজ অবধি যে পায় নি এটা নিশ্চয়। এ পাঁচ ছয় মাস ব্যাপী ভ্রমণের সূত্রে মারাঠী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, বেহারী, মধ্যপ্রদেশী, কর্ণাটী—সব রকম লোকের মাঝেই পড়তে হয়েছিল ; কিন্তু দুর্ব্বলতা এবং কৃশকায় ব্রতে গুজরাতীদের মত জলন্ত ভাবে বোধ হয় অন্য কোনও জাতিই বিশ্বাস করে না। যদি বা কখনও কোনও স্থূলকায় গুজরাটী ব্যবসায়ী চোখে পড়ে, তাহলেও তার শরীরে যে বল বা সামর্থ্য-রূপ বালাইয়ের বিশেষ উপদ্রব নেই, এ সত্যটি বুঝ্‌তে কারুরই কোনও কষ্ট হবার কথা নয়।

কিন্তু কবি ও দার্শনিক বলেছেন, সব অসুবিধেরই একটা না একটা ক্ষতিপূরণ আছে (এমার্সন)। তবে গুজরাতী জাতির পুরুষের বলের অভাবের ক্ষতিপূরণ পুরুষে বর্ত্তায় নি, বর্ত্তিয়েছে তাদের মহিলা জাতিতে। আমাকে বম্বেতে এক মুসলমান মহিলা বলেছিলেন যে, তিনি ত জগৎ ঘুরে এলেন, কিন্তু গুজরাতী মেয়েদের মত এমন ethereal, ফুলের নির্য্যাসে তৈরি, কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি আর কোথাও দেখেন নি। কথাটা খুব অতিরঞ্জিত নয়। গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে পথে ঘাটে অনেকেই চোখে পড়ে, যাদের সম্বন্ধে ও বিশেষণগুলি দেওয়া যায়। শুনেছি পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরি মেয়েরা না কি খুব সুন্দর—কিন্তু তাদের মধ্যে না কি একটা জড়তাও (coarseness) আছে। কিন্তু গুজরাতী মেয়েরা এক দিকে যেমন সুশ্রী ও সুগঠনা, অন্য দিকে তেমনি জড়তা-লেশহীন। কিন্তু গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে মারাঠী মেয়েদের মত আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় না, কিন্তু মধুরতা খুবই বেশি। তবে এরা পর্দ্দা না মান্‌লেও সহজে বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে আসে না। খাবার সময়ে পুরুষরা একদিকে বসে ও মেয়েরা অন্যদিকে বসেন। সব তাতেই এরা যেন একটা ব্যবধান রাখ্‌বার পক্ষপাতী। শুধু বিদেশী পুরুষদের নয়, স্বজাতীয় পুরুষদের সঙ্গেও এরা "শতহস্তেন" রূপ শাস্ত্রবাক্যটি মেনে চল্‌তে যেন অনিচ্ছুক নয়।

মনে আছে, দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীলোকদের দেহে রূপলাবণ্য ও বেশে রুচিজ্ঞানের অভাব যেমন চোখে ঠেকেছিল, সেখান থেকে ফিরে গুজরাতের রাজধানীতে একেবারে গুজরাতী সমাজের কেন্দ্র স্থলে পড়ে গিয়ে, গুজরাতী মেয়েদের মনোজ্ঞ আকৃতি ও সুরুচি-সঙ্গত বেশভূষা তেম্‌নি ভাল লেগেছিল। দাক্ষিণাত্যে মনে হ'ত, "হা বিধাতা, যাকে তুমি দাও না, তাকে কি এম্‌নি করেই বঞ্চিত কর! এক ত রূপের অভাব, তার ওপর লাল শাড়ীতে হলদে কারুকার্য্যে চওড়া বেগুণী পাড়—এ কোন্ দেশী রুচি এদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছ বল দেখি?" দাক্ষিণাত্যে যেমন

কোনও স্ত্রীলোক অত্যন্ত বিশ্রীরকম উজ্জ্বল রঙের শাড়ী ছাড়া অন্য কোনও রঙের শাড়ী পরেই না, (বোধ হয় পাছে তাদের একটু ভাল দেখায় এই ভয়ে) গুজরাতী মেয়েদের ও বাঙালী মেয়েদের বেশভূষায় ঠিক্ তেমনিই একটা সহজ সৌষ্টবজ্ঞানের পরিচয় মনকে তৃপ্তি না দিয়েই পারে না। আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে, দাক্ষিণাত্যেও রমণী অথচ সুরূপা এ বিস্ময়কর যোগাযোগও না কি সম্ভব, কিন্তু সেখানে রমণীর বেশ অথচ সুরুচিসঙ্গত এরূপ যোগাযোগ যে হতে পারে, এতটা অসমসাহসিক কথা কোথাও শুনিনি। মারাঠী মেয়েরাও বেশভূষায় খুব সুরুচিসম্মত রঙের বিশেষ পক্ষপাতিনী নন—কিন্তু গুজরাতী ও বাঙালী মেয়েরাই হচ্ছে এ বিষয়ে সেরা।

কিন্তু কি দক্ষিণী, কি মারাঠী, কি গুজরাতী এ সব জাতীয় স্ত্রীলোকেই এক বিষয়ে বাঙালী মেয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—সেটা হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। পথে ঘাটে একলা নির্ভীক ভাবে এ সব জাতির শিক্ষিত অশিক্ষিত মেয়েদের বিচরণ আমার বড় ভাল লাগ্‌ত—অবগুণ্ঠনের অত্যাচার নেই, শত পুরুষের দৃষ্টিতেও কুণ্ঠার লেশ নেই—সহজ সরল নির্ভীক ভাব। যে আবরু ও সঙ্কোচকে বাংলার গোঁড়াগণ ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য বলে অনেক সময় বাংলাদেশে বসে প্রচার করে থাকেন (এমন কি শিক্ষিত বাঙালী স্ত্রীলোকও করেন) তার সত্যতা যে কত সীমাবদ্ধ ও কত খানি ভিত্তিহীন, তা জান্‌তে হলে, তাঁদের পক্ষে শুধু একবার মাত্র বোম্বাই গুজরাত বা দাক্ষিণাত্যে গেলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।

গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে একপ্রকার লোক-সঙ্গীত (folk music) আছে, যাকে এরা বলে "গরবা।" "গরবা" শুধু যে চিত্তাকর্ষক তাই নয়, "গরবা"র মধ্যে সৌন্দর্য্যও বড় কম নেই। চিত্তাকর্ষক এই জন্য যে, শিক্ষিত সমাজেও লোক-সঙ্গীতের উপাদান জীবন্ত থাকা সম্ভব, এই সত্যটি গরবার সুরে দেখা যায় ; ও সুন্দর এইজন্য যে, এ মিলিত গানের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ও তালফের পাওয়া যায়। এ লোক-সঙ্গীতের tradition অনেকদিন থেকে চলে আস্‌ছে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, এর মধ্যে জীবন্ত রস আছে, কারণ বর্ত্তমান সময়েও নিত্য নতুন গান রচনা হয় ও স্ত্রীলোকদের দ্বারা গীত হয়। এ গানের মধ্যে খানিকটা নৃত্যের গতিও আছে—যে জন্য এ সুন্দর সঙ্গীত আরও ভাল না লেগেই পারে না। দশবারজন স্ত্রীলোক চক্রাকারে তালে তালে করতাল দিয়ে, পরিক্রমণ কর্ত্তে থাকেন। একজন সুরু করেন বাকী সব আমাদের কীর্ত্তনের দোয়ারদের মত তাঁকে অনুসরণ করেন। শ্রোতার ও দর্শকের মনের ওপর এই গতিশীল সঙ্গীতের artistic প্রভাবের কোনও যথার্থ ধারণা লিখে সম্যক্ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এর ফল কল্পনা কর্ত্তে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে একটা জিনিস দেখে বড় আনন্দ হয় যে, শত লোক-চক্ষুর সাম্‌নেও লজ্জাশীলা গুজরাতী রমণী এইরূপ নৃত্যভঙ্গীতে গান গেয়ে যেতে সঙ্কুচিত হন না। বিধাতা তাদের গলায় সুর দিয়েছেন, এজন্য তারা আমাদের মেয়ের মত লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যায় না। অবশ্য এখানে বলে রাখা উচিত যে, সঙ্গীতে সহজ স্ফূর্ত্তিরূপ বিধাতার এই মনোজ্ঞ প্রেরণায় সাড়া দিতে লজ্জা পাওয়া যে বৌ-মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, এ মনোভাবের জন্য দায়ী আমাদের মেয়েরা নন, দায়ী তাঁদের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতারা। গুজরাতী হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতাগণ এতে আপত্তি করেন না, কাজেই তাঁদের বাড়ীর-মধ্যেরাও বাইরে এসে সহজতা ও সরলতাকে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেওয়াটা বিসদৃশ মনে করেন না।

এক দিন কোনও এক সুন্দর বাগানে গোধূলির ম্লানিমায় এক ফুলের কেয়ারীর চারধারে অনেকগুলি সুন্দরী সুবেশা গুজরাতী মেয়ে আপনা হতেই তাদের সহজ স্ফূর্ত্তিতে অবিশ্রান্ত গরবা গেয়ে চলেছিল। পঞ্চমীর চাঁদও সেদিন হেসেছিল, মলয় পবনও আরম্ভ হয়েছিল। তার ওপর তাদের প্রধানা গায়িকা গান ওস্তাদ রেখে শেখার দরুণ তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল নির্ভীক ও নির্ভুল সুর। কাজেই সব জড়িয়ে এই গরবার দরুণ যে পরম তৃপ্তি সেদিন আমি পেয়েছিলাম, অনেক উচ্চ অঙ্গের গানেও সে আনন্দ পাই নি। গানের আনন্দ দানের ক্ষমতা শুধু কৃতিত্বের ওপরই নির্ভর করে না, করে নানান্ জিনিসের ওপর, যার মধ্যে সৃষ্টির ক্ষমতা, সহজ উচ্ছ্বাস, প্রকাশের চারুতা প্রভৃতি সবেরই যথাযথ স্থান আছে। মেয়েরা একযোগে গান কর্লে তা কত সুন্দর লাগে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার কেবলই এই কথা মনে হ'চ্ছিল যে, আমাদের সোণার বাংলার মেয়েরা একযোগে শুধু উলুধ্বনি ছাড়া

অন্য কোনও রূপ সঙ্গীত বিদ্যায়ই বিশেষ অত্যদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি—এ সমস্যাটি নিয়ে মনস্তত্ত্ববিৎরা গবেষণা করেন না কেন? তবে এর কারণ খুব দুর্ব্বোধও নয়, সেটা বোধ হয় এই যে বাঙালী পুরুষ মনে করেন "আমাদের সনাতন উলু ও শঙ্খ ধ্বনিতেই রক্ষে নেই, আবার গান!" কিন্তু রমণীজাতি যদি তাঁদের স্বভাব-কোমল কণ্ঠে একত্রে গান করেন, তবে তা যে কত মনোহর হয়, তা য়ুরোপীয় বা গুজরাতী মেয়েদের একত্র গান শুনলে উপলব্ধি করতে দেরী হয় না।

দক্ষিণে এবার যে বীণা শোনা গিয়েছিল, জানি না, সেরূপ বীণা আর কখনও শোনা ঘটে উঠবে কি না। ইনি মহীশূরের রাজার সভাবীণকার—নাম শেষণ। দাক্ষিণাত্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণকার বলে খ্যাত; এবং পরে আরও শোনা গিয়েছিল যে ইনি শুধু যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণকার তাই নয়, এঁর ভঙ্গীতে না কি অন্য কেহই বাজায় না বা বাজাতে পারে না। কাজেই এঁকে আমি আজ দাক্ষিণাত্যের বীণাবাদকদের মুখপাত্র বা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবেও আমাদের বাংলা দেশে পরিচিত কর্ত্তে চাই না, একজন সহজ গুণী হিসেবেই পরিচিত কর্ত্তে চাই। এত বড় সত্যকার আর্টিষ্ট বাজিয়ে আমি আজ অবধি কখনও শুনি নি। উচ্চশ্রেণীর অথচ মধুর গান বাজনা আমাদের দেশে বড় বেশি শোনা যায় না, তার খুব সোজা কারণ এই যে, আমাদের দেশের খুব কম ওস্তাদই সঙ্গীতের আসল মর্ম্মস্থলের খবর রাখেন। গত পাঁচ ছয় মাস ধরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক স্থানের ছোট বড় ওস্তাদের গান খুঁজে খুঁজে শুনে, এ সত্যটি আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছি, এ কথা বোধ হয় আজ বলতে পারি। আমাদের গান বাজনার যিনি ভক্ত, তিনিই জানেন যে, এ জঙ্গলের অফুরন্ত পথের মধ্যে গোলাপের বাগান কত কম মেলে। বিশেষতঃ আজকাল আমাদের ভারতবর্ষে সত্যকার উচ্চশ্রেণীর অথচ সত্যিকার প্রাণময় গান বাজনা অত্যন্ত বিরল হয়ে উঠেছে। কত সময় যে এই পরখ কর্ত্তে গিয়ে নষ্ট কর্ত্তেই হয়—তা আবার একেবারে নিছক নষ্ট—তা যাঁর মাথায় সঙ্গীতের অনুরাগ রূপ বেয়াড়া কীট প্রবেশ করে, তিনিই জানেন। শতকরা প্রায় নব্বইটী সঙ্গীতের আসরেই মন অতৃপ্ত অবস্থাতেই ফিরতে বাধ্য হয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোথাও পরশ-পাথর মেলে, এই আশায় ক্ষেপাকে কত পাথরই না কোমরের লোহাতে ঠেকাতে হয়! কিন্তু যখন এ পরশ পাথর একবার মেলে, যখন শেষণ একবার উদয় হয়, তখন শত নিরাশা অতৃপ্তির সঞ্চিত কুয়াশাও কেটে যেতে মুহূর্ত্তের বেশি দেরি হয় না। শেষণের একটিমাত্র প্রথম ঝঙ্কারেই বোঝা গিয়েছিল যে, হাঁ এই বটে, একেই বলে সঙ্গীত। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সঙ্গীত এত বিরল যে, বেশির ভাগ সঙ্গীতানুরাগীই এতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হন, কারণ তাঁরা শোনার সুযোগ পান না। মনে আছে, আমরা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষণের বীণা-বাদন শুনেছি, কিন্তু মন বলেছে আরও শুনি।

শেষণের বাজানোর মধ্যে এক দিকে যেমন তার উপরে পড়তে থাকে, অপর দিকে তেমনি মনে হয় যে, তাকে দেবে তার অপূর্ব্ব বাজনাতে কোনও চেষ্টা কর্ত্তে হয় না—যেন এ জিনিসটা কতই সহজ! কত গাইয়ে বাজিয়ের গানবাজনা শুনেছি—কিন্তু খুব কম গুণীতেই আজ অবধি এত অবলীলাক্রমে গাইতে বা বাজাতে শুনেছি। য়ুরোপে শুনেছিলাম জগদ্বিখ্যাত Kreisler, Mischa Elman ও Vescheyর বেহালা। কিন্তু ভারতে শেষণ techniqueএ, মৌলিকতায় বা রসসম্পদে এদের কারুর চেয়েই কম নয়। শেষণের বীণা শুনে বুঝতে পারা গেল যে, বেহালার চেয়ে মধুর যন্ত্রও তৈরি করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কীর্ত্তির কথা মনে হয়ে মন গর্ব্বে ও উল্লাসে ভরে না উঠেই পারে না। একটা কাঠের ওপর ধাতুর তার যে মানুষের অন্তরের অন্তরতম জিনিসটিকে নিয়ে ইচ্ছামত ভাঙাগড়া খেলতে পারে—সৃষ্টির এ রহস্যের সমাধান কে করবে জানি না, কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমিক এটুকু জানে যে, জড় বস্তু মোটেই জড় নয়, তার মন্দিরের প্রতিমায় প্রাণ আছে—যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব এক শেষণের মত শিল্পী-পুরোহিতে।

শেষণের techniqueএর বিস্তর তারিফ করা যেতে পারে; তার বৈচিত্র্যের সুখ্যাতি করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে দিতে পারা যায়। বাজনার সময় এ অন্ধপ্রায় গুণীর চোখমুখের অপূর্ব্ব ভাবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে অগণ্য উপমা দিতে পারা যায়; কিন্তু পারা যায় না কেবল—তার সুরের

আলোর ছায়াটিরও আভাষ কথার আড়ম্বরে প্রকাশ করা। তবে এত কথা বলা এই জন্য যে, শেষণ এখনও জীবিত, তাই যদি কেউ মহীশূর অঞ্চলে যান, তবে যেন এঁর বাজনা শুনতে ভুলে না যান।

শেষণ লোকটিও বড় ভাল—সত্যকার গুণীর মতনই নম্র, ও বললেই বাজায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, শেষণ সহজ সরল গান বড় কম ভালবাসে না। এক ওস্তাদের গলে যে নিজের গুরু ছাড়া অপর কারুর প্রশংসা করা কতটা অভাবনীয় ব্যাপার, তা এ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিকট সংস্পর্শে আসার দুর্ভাগ্য যাঁরই হয়েছে তিনিই জানেন। কাজেই শেষণের যে কোনও অপেক্ষাকৃত কম-ওস্তাদী সঙ্গীতের রসবোধ করা আমার কাছে একদিকে যেমন বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি তৃপ্তিদায়ক লেগেছিল। এর কারণ এই যে শেষণ লোকটি শুধু যে অসাধারণ আর্টিষ্ট তাই নয়, আমাদের দেশের সাধারণ গাইয়ে বাজিয়ের ক্ষুদ্র ঈর্ষাময় দ্বন্দ্ব কলহে আনন্দ পাবার মত মনও এ গড়ে তোলেনি।

শেষণের বীণার মধ্যে অনেক সময় য়ুরোপীয় সুরের বা চালের একটু আমেজ আসে—অবশ্য তাই বলে বেপর্দ্দায় তার হাত পড়ে না। এরূপ মৌলিকতায় শেষণের প্রতি ওস্তাদদের সন্তুষ্ট হবার কথা নয়, কাজেই দক্ষিণের একজন গোঁড়া সমালোচক আমাকে বলেছিলেন, "শেষণ আর্টিষ্ট হতে পারেন, কিন্তু ওস্তাদ নন।" আমি মনে মনে মস্ত তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বলেছিলাম "তথাস্তু। আমার কাঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধর্ত্তে পারে, তবে বেঁচে থাক্ কাঠের বিড়াল।" ওস্তাদী না করে যদি সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া যায়, তবে ওস্তাদীর অভাবে কেউই খিন্ন হয়ে পড়বে না। কিন্তু শেষণ ওস্তাদ নন এটাও সত্য কথা নয়। রাগের জ্ঞানও শেষণের যথেষ্ট—আমি পরে একজন নিরপেক্ষ শিক্ষিত সমজদারের কাছে শুনলাম। তবে রাগকে নিয়ে মল্লযুদ্ধ করায় শেষণ বিশ্বাস করে না, রাগকে নিয়ে খেলা করা, আদর করা, তাকে অভিনব ভাবে মূর্ত্ত করে তোলা এই সবেই শেষণের সৃষ্টিপ্রিয় মনের প্রায় সব উৎসাহ ব্যয়িত হয়। যিনি সঙ্গীতে Gymnastics চান, তাঁর শেষণের গান ভাল লাগার সম্ভাবনা কম, কিন্তু গানে মধ্যে দরদ যাঁর কাছে মূল্যবান্, মিষ্টত্বে যিনি উদাসীন নন, ও সুরের মোচড়ের দাম যিনি জানেন, শেষণের মূল্য তিনিই বুঝবেন। তাছাড়া, শেষণ তার বাজনার মাঝে মাঝে য়ুরোপীয় chord বা phraseএর মশলা দিতে কুণ্ঠিত হয় না বলে তার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মধুরত্বের আমদানী হয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রকার আমেজই আমাদের পবিত্র হিন্দু সঙ্গীতে বর্জ্জনীয়, এ কথা অনেকে মনে করে থাকেন। মনে করার সঙ্গত কারণ যে কিছুই নেই তা-ও নয়। তবু আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এতটা শুচিবাই হয়ত প্রশস্ত নয়। প্রকৃত শিল্পী যদি য়ুরোপীয় কোনও সুর নিজস্ব করে নিতে পারেন, তবে তাঁর দ্বারা সঙ্গীতের নতুন সৃষ্টির সহায়তাই হবে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল, এখানে কেবল এইটুকু বলে রাখি যে, শেষণের মাঝে মাঝে য়ুরোপীয় সুরের মশ্‌লা ব্যবহার করাটা তার বাজনার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করে।

দক্ষিণে এবার বাঙ্গালোর, মহীশূর, মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে কিছুদিন করে ছিলাম। করাচি সহরই বেশ ভাল লেগেছিল। তবে মহীশূর সহর সব চেয়ে দ্রষ্টব্য, এ বিষয়ে বোধ হয় দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই। হিমালয়ে ছাড়া ভারতের সমতলভূমিতে কোনও সহর আমি দেখিনি, যা প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও নগর নির্ম্মাণ কৌশলে মহীশূরের সমকক্ষ।

প্রথমতঃ মহীশূর সহরে চামুণ্ডার পাহাড় তাকে এক অপূর্ব্ব শোভা দান করেছে। দ্বিতীয়তঃ সহরটি এমন সুন্দরভাবে নির্ম্মিত যে নির্ম্মাণ-কর্ত্তার রুচিকৌশলের তারিফ না করেই পারা যায় না। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌধশ্রেণী সুদর্শন, তার উপর রাস্তায় চমৎকার designএর বিজলী বাতি রাত্রে সহরটিকে এক অপূর্ব্ব শোভা দান করে। তাছাড়া মহীশূর সহরের নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে আধুনিকতার প্রভাব খুবই বেশি হলেও—তার মধ্যেও একটা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা চোখে পড়ে। এরূপ চেষ্টা শুধু বৈচিত্র্যের জন্য নয়, তার সুষ্ঠুতার জন্যও আমাদের মনকে তৃপ্ত না করেই পারে না। আমাদের অনেক বড় সহরই আজকাল অত্যন্ত কুৎসিত, কারণ তাতে বড় বড় আফিসখানা, দফতরখানা ও মালগুদাম-খানা আমাদের আপত্তি বা সৌন্দর্য্য বোধের অপেক্ষা না

রেখেই আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শাসন-কাজের চাপেই গড়ে উঠেছে। কাজেই তাতে টাকা খরচের ত্রুটি না হলেও, জীবনে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়তা বিশেষ হয় নি এ কথা বলাই বেশি, যেহেতু প্রয়োজনের চাপে যা গড়ে উঠে—সৌন্দর্য্য, রুচি প্রভৃতি বাহুল্যের অপেক্ষা রাখার সময় তার থাকতেই পারে না। মহীশূর সহরটি কিন্তু এরূপ প্রয়োজনের চাপে গড়ে ওঠে নি। এর মধ্যে রাজার আড়ম্বরপ্রিয়তা বা স্ব-নাম প্রচারের স্পৃহা হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু এর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুরুচিও যে তার রস দান করেছে, তাতে কারুরই কোনও সন্দেহ হয় না। মনটা এক মুহূর্ত্তে বলে, যাই হোক্ তবু একটা কাজ হয়েছে।

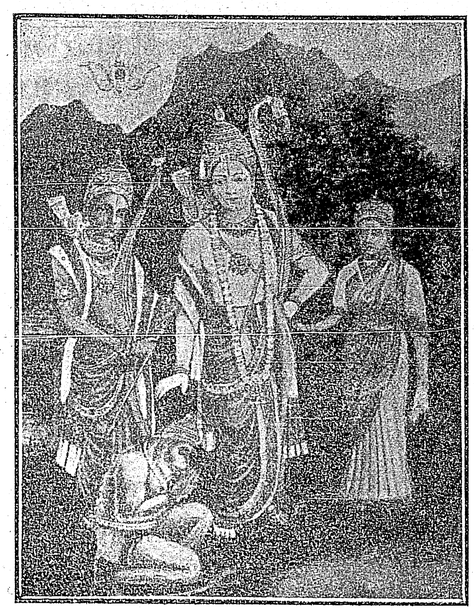

দাক্ষিণাত্যের একটী সুন্দর রাম-মূর্ত্তি

নরওয়ে ও সুইজলণ্ড দেখে আমার যা মনে হয়েছিল, মহীশূর সহর দেখে সেই কথাই আবার মনে হ'ল যে, আধুনিকতা-মাত্রই কিছু মন্দ নয়। আসল জিনিসটি হচ্ছে সুরুচি। সুরুচি দিয়ে গড়্লে আধুনিক নানান্ নূতন ক্ষমতা আমাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যও দিতে পারে। যেমন বিজলী বাতি, বা পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা-ঘাট। আধুনিকতার এ দুই দান স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য্যের যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করেছে এ বিষয়ে আশা করি মতভেদ হবে না। যে দুটি দেশের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি, সে দুটি দেশে বিজলী বাতির প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি ও তাতে রাস্তাঘাট রাত্রে যে কত সুন্দর দেখায় তা যিনিই সেখানে গিয়েছেন তিনিই জানেন। অবশ্য প্রকৃতি দেবীর স্বাভাবিক শোভার কথা কেউ-ই অস্বীকার কর্চ্ছে না, তবু স্বাচ্ছন্দ্যও যখন মন্দ জিনিস নয়, তখন মানুষের আধুনিক ক্ষমতার সাহায্য নেওয়ায় ক্ষতি কি?

চামুণ্ডা পাহাড়টিতে মোটরের জন্য সুন্দর রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে। দুধারে শ্রেণীবদ্ধ বিজলী বাতি। যতই উঠা যায়, পায়ের তলায় নানান ক্ষেত ও বাগান আলারঙের গালিচার মতই মনে হয়। উঠ্‌তে উঠ্‌তে এই উপমাটি মনে উদয় হতে মনে হল যে মানুষের মন কেমন উপমার ভক্ত! একটা সুন্দর কিছু দেখ্‌লেই অন্য কোনও সুন্দর বস্তুর সঙ্গে আমরা তা তুলনা করে বসি—এবং যেম্‌নি করে বসি তেম্‌নি মনটা আমাদের কেমন যেন একটা সহজ খুসিতে ভরে ওঠে। কোনও একটা সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌লে আমরা তৎক্ষণাৎ ভেবে বসি "যেন স্বপ্নের মতন!" সুন্দর মুখ দেখ্‌লেই বলি "যেন চাঁদের মতন!" অথচ এটাও একটা বিস্ময়ের কথা যে এমনতর উপমা দেবার সময়ে প্রায়ই এ-সব উপমার মধ্যে বিশেষ যাথার্থ্য (accuracy) আছে কি না ভেবে দেখি না। অর্থাৎ, হয়ত উপমাটি মোটেই সুপ্রযুক্ত নয়, যেমন কারুর অকস্মাৎ চাঁদের মতন মুখ হ'লে তা হয়ত আমাদের সত্যিই গভীর তৃপ্তি দিতে পার্ত্ত না, বা কারুর হঠাৎ ঠিক্ পদ্মপলাশের মত চোখ হলে তাতে আমরা হয়ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠ্‌ব না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ স্থলে উপমার accuracy আমাদের চালায় না, চালায় উপমেয় ও উপমিতের একটা সম্বন্ধ আবিষ্কারের সহজ আনন্দ দানের ক্ষমতা।

যাই হোক্, চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর থেকে মহীশূর সহর বড় সুন্দর দেখায়। বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়ে। কারণ, তখন সমস্ত নগরময় বিজলীবাতি জ্বলে ওঠে; ও চারিধারে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে যখন সে আলো ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ কর্ত্তে থাকে, তখন মনে বাস্তবিকই ভারি আনন্দ হয়। সহর থেকেও রাত্রে চামুণ্ডা পাহাড়ের ধারে ধারে দীপালিশ্রেণী ভারি মনোহর দেখায়।

চামুণ্ডা পাহাড় নাম হয়েছে তার উপর চামুণ্ডাদেবীর

এক মন্দির আছে বলে। এ মন্দিরের কারুকার্য্য মধ্যযুগের অনেক মন্দিরের কারুকার্য্যের মতনই (যেমন গোয়ালিয়রে সহস্রবাহু মন্দিরের) অত্যন্ত অসুন্দর ও যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে "জবড়জং"। পাথরের গায়ে অজস্র ছোট বড় খোদাইয়ের কাজ অবশ্য খুবই বিস্ময়কর রকমের কঠিন কাজ; কিন্তু যা-ই কঠিন, তাই ত সুন্দর নয়। দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি দেখ্‌বার এবার সময় পাইনি, তাই তার শিল্প সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই না, তবে পথেঘাটে যা চোখে পড়েছে তার প্রকৃতির বিশেষ ভেদ দেখিনি। সেই একই রকমের অসাধারণ ধৈর্য্যের ও যত্নের স্তম্ভ হিসেবে ছাড়া এ সব মন্দিরকে আর কোনও হিসেবে বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। তখনকার দিনে বোধ হয় সরলতার মধ্যে যে মস্ত আর্ট থাকতে পারে এ ধারণা লোকের ছিল না, অন্ততঃ অনেকের যে ছিল না এটা বোধ হয় ঠিক্। তাছাড়া, এ সব মন্দিরেরই ভেতরটা এত অন্ধকার যে দিনেও তাতে সূর্য্যদেব বড় আমল পান না।

পক্ষান্তরে দিল্লীর ও আগ্রার জুমা ও মতি মস্‌জিদ, সেকেন্দ্রা, তাজমহল ও ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্যের কথা মনে হ'ল। উপাসনা স্থলে আলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মুসলমানের মৌলিকতা। আমরা উপাসনা কর্ত্তে পারি এক বনে, না হয় গুহায়, না হয় মন্দিরে—অর্থাৎ অন্ধকারে। মুসলমানরা করে খোলা হাওয়ার মধ্যে। অন্য শিল্পীর কথা জানি না, কিন্তু স্থাপত্য ও সঙ্গীত শিল্পে যে মুসলমান জাতি আমাদের অনেকখানি সম্পৎ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ কথা বোধ হয় অকাট্য। মুসলমান রেনেসাঁসের (Renaissance) স্থাপত্য-কীর্ত্তি যেমন ভারতের গৌরব, মুসলমান রেনেসাঁসের সঙ্গীতোৎকর্ষও ভারতের তেম্‌নি মস্ত লাভ। এ কয় মাস ভ্রমণে এ সত্য দুটি বড় বেশি করেই আমার চোখে পড়েছিল।

সঙ্গীতে মুসলমান প্রভাবে আমাদের কি লাভ হয়েছে তা আগামী প্রবন্ধে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীত আলোচনার প্রসঙ্গে লেখ্‌বার ইচ্ছে রইল। (আগামীবারে সমাপ্য)



"বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে"

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস



অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ

(পদ্মনাথ বনাম পদ্মনাভ)

শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা

কথায় বলে 'নামে নামে যমে টানে' তা সে নামওয়ালাদের মধ্যে ধন, জন, জ্ঞান, বিদ্যা বা রুচির যতই কেন প্রভেদ থাকুক না।' ইহা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্রজনের 'পদ্মনাভ' নামটা যদিও 'পদ্মনাথ' নয়, তবু মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ (ইংরাজী সাহিত্যে) মহাশয়কে যে 'অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহের' আসরে টানিয়া আনিয়াছে, তাহার সাক্ষী মাধের 'ভারতবর্ষ'।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী এত অবান্তর কথায় পরিপূর্ণ যে, ইহাকে একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সব অবান্তর কথার আলোচনায় আমাকেও অবান্তর কথা বলিতে হইবে।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ সাধারণতঃ তিন প্রকারে নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোনও নাম পিতৃদত্ত, কোনও নাম বন্ধুবর্গ বা রাজদত্ত এবং কোনও নাম স্বদত্ত। আমারও নামটা যে এই তিন প্রকার দত্তের বাহির হইতে প্রাপ্ত হওয়া নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে বিড়ম্বিত করিবার জন্য যে উহা কেহই প্রদান করেন নাই, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তিনি এই নগণ্য লেখককে কোনও ছদ্মবেশী পাকা লেখক বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তজ্জন্য খুবই গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। কেন না, এইরূপ ফাঁকিতালে পাওয়া সম্মানটা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে স্বভাবতঃই অ তি লোভনীয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকল ক্ষেত্রেই আমাকে 'পদ্মনাভ মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; কোনও স্থানে ভুলিয়াও আমার দেবশর্ম্মা পদবীটা ব্যবহার করেন নাই। ইহা যে প্রচলিত রীতি-রিরুদ্ধ, তাহা যে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় জানেন না, তাহা মনে হয় না। তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই আমাকে দেবশর্ম্মা বলিতে বিরত হইয়াছেন। তিনি হয়ত' মনে করিয়াছেন যে একজন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে (কেন না তিনি ধরিয়াই লইয়াছেন যে ও নামটা আমার ছদ্মনাম) দেবশর্ম্মা বলিলে প্রকারান্তরে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করা হয়। এবং সেরূপ করা ব্রাহ্মণ সভার একজন কর্ণধারের পক্ষে একান্তই অনুচিত। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি এই বলিয়া আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ নাই; কেন না, আমার

ধারণা, বর্ত্তমান কালের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সব দেবশর্ম্মাই প্রায় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অবশ্যই শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা আছে, তদনুসারে আমি কেন, বর্ত্তমানে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলিয়া ফষ্টি করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ নন; কেন না শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মই না কি এই যে কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; শুধু গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। 'চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন'; নতুবা হয় ত বেশ্যা-পুত্র বশিষ্ঠ, রক্ষিতা-পুত্র নারদ, জেলেনী-পুত্র ব্যাস এবং ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে ভক্তির পাত্র হইতে পারিতেন না; কিম্বা মহর্ষি গৌতম ভর্ত্তৃহীনা জবালার পুত্রকে 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সাহসী হইতেন না। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও না কি এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ক্ষমাবান, ক্ষমাশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্ম, জিতেন্দ্রিয়, সাধনে নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, নিষ্কাম, বিদ্বান, ধার্ম্মিক, ও লোকের শিক্ষক তিনিই ব্রাহ্মণ। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ হওয়া খুবই সহজ। কিছু সূত্র, তাহা চরকা কাটাই হউক কিম্বা পুরাতন কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়াই হউক গলায় ঝুলাইলেই হইল। আমার বাড়ীর পাশে 'গৌড়িয় মঠ' বলিয়া একটি সমিতি আছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, এই সূত্র গলায় জড়াইয়া দিয়া যাহাকে তাহাকে যখন তখন ব্রাহ্মণ করা হইতেছে। এই সূত্রের এত মাহাত্ম্য যে, ইহা ডবল মোটা করিয়া গলায় ঝুলাইয়া আমার পাশের বাড়ীর বাবুর পাচক ভাবী বাড়ীওয়ালীর খোলার ঘরের ভাড়াটিয়া এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু কুঞ্জ মস্ত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। এবং এই সূত্রের বলেই সেদিন সেণ্ট এণ্ড্রু ভোজ সভায় কাঁটা চামচ হস্তে স্যার সুরেন্দ্রনাথ 'আমি ব্রাহ্মণ' বলিয়া অতি বড় গলায় গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া লাট সাহেবকে পর্য্যন্ত তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্যই তাহার প্রতিবাদে কোনও টিকির টুঁ শব্দ করিবার সাহস হয় নাই।

এইবার আসল কথা বলি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার বক্তব্যের এক স্থানে প্রত্যেক নারীকে এ কথা স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে দানব-দলনী আদ্যাশক্তির অংশভূতা; এবং অন্যস্থানে 'বিদ্যালয়ে যাতায়াত এবং অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়েও মেয়েদের পক্ষে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে' বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহারা বড়ই দুর্ব্বলা। কোন্ কথাটা যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাণের কথা, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

'নারীগণের কথা জননীরাই ভাল বুঝেন—তাঁহারাই এ বিষয়ে বলিবার অধিকারিণী'—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই স্বীকারোক্তিতে অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি—মরা গাঙে সামান্য জলস্রোত দেখিলেও কাহার না আনন্দ হয়? পদ্মনাভেরও ইহাই প্রাণের কথা। তবে তাহার আকাঙ্ক্ষা (হয় ত দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে পারে) এই যে, জননীরা সুশিক্ষায়, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেন এবং (ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের শিক্ষার গণ্ডীকে কতদূর ক্ষুদ্র করিতে প্রয়াসী তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা হইলেও আশা করি তাহা জননীগণের দৃষ্টি এড়াইবে না) কেবল অন্ধ আচার বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের ভালমন্দ স্থির না করেন। ভগবান-দত্ত বুদ্ধি জিনিসটাকে যেন তুচ্ছ বলিয়া দূর করিয়া না দেন। বালবিধবার নির্জ্জলা একাদশীর মত যন্ত্রণাদায়ক নিয়ম, যাহা অতি বড় নির্ম্মমের প্রাণেও ব্যথা আনয়ন করে—জননীদের দয়ার প্রাণের ত কথাই নাই—ইহার ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার যেন তাঁহাদের নিজেদের সহজ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উপরই ন্যস্ত করেন। সে বিষয়ে পুরাতন পুঁথি ঘাঁটিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই; কেন না, শুনিতে পাই, শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত। কাহাকে ত্যাগ করিয়া কাহাকে গ্রহণ করা যায়, সে এক সমস্যা। এবং তাঁহারা কখন কি ভাবে এবং কেন কোন কথা বলিয়াছেন, তাঁহার মীমাংসা করাও না কি অতি দুরূহ ব্যাপার। এবং তাহাদের এক কথার অর্থও না কি আবার অনেক প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। তাহা ছাড়া শুনিতে পাই, অনেক বাজে লোকও না কি অনেক বাজে কথা ঋষিবাক্য বলিয়া প্রচলিত করাইয়াছেন। তবে ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস (যদিও বহু পুণ্যফলে শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি ঘোর মূর্খ) যে, কেহ যদি নিজের হৃদয়ের ও বুদ্ধির বাতি জ্বালাইয়া সেই আলোকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে,

তাঁহার নিজের প্রাণের কথা ও ঋষিদের বাক্যে বিশেষ কোনও মত প্রভেদ নাই।

"বিদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ যৌবন-বিবাহ বা স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়। সমাজের বা বিবাহের আদর্শই তজ্জন্য দায়ী, এ কথার যে অর্থ আছে, তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভিতরে ভিতরে খুবই অনুভব করেন, মুখে যাহাই বলুন; নতুবা তিনি হিন্দুর যৌবন-বিবাহের আসরে গান্ধর্ব্ব বিবাহকে টানিয়া আনিয়া মূল কথা চাপা দিতে বাধ্য হইতেন না। সামাজিক পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিলে আদর্শও হয় ত কিছু বদলাইতে পারে, সত্য, যেমন পুরাকালের আদর্শ ও আজকালের আদর্শ সম্পূর্ণ এক নয়। হয় ত এরূপ হইতে পারে যে, বিল্বমঙ্গল গল্পের বণিক-পত্নীর মত স্বামীর অনুরোধে নিজের অমূল্য সতীত্ব পরপুরুষের পায়ে লুটাইতে প্রস্তুত রমণী আদর্শ রমণী বলিয়া গণ্যা হইবেন না, বরং যেরূপ ক্ষেত্রে "মহাগর্ব্বিত তেজস্বী এবং বাধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূত মুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও কোনও কথা কহেন নাই এবং পরের দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিয়াছিলেন" সেরূপ ক্ষেত্রেও সহজে দাসত্ব স্বীকার না করিয়া তেজস্বিনী দ্রৌপদীর মত যে রমণী বলিতে পারিবেন "হে সুত-নন্দন, তুমি সভাগৃহে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূত মুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন জানিয়া আমি তথায় যাইব।" অর্থাৎ যে রমণী স্বামীরও অন্যায় আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মতা হইবেন, তিনিই রমণী-কুলে আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন সমাজে বিশৃঙ্খলা ত দূরের কথা বরং সুশৃঙ্খলাই আনয়ন করিবে। ইহাই এ অধমের বিশ্বাস ও ধারণা। ভারত নারীকে যত স্বাধীনতা দিয়াছিল, সেরূপ স্বাধীনতা অন্য কোনও দেশ কোনও কালে দিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালের আমেরিকার স্ত্রী-স্বাধীনতাও তাহার তুলনায় নগণ্য। আবার সেই ভারতেই নারীর উপর যতদূর অবিচার হইয়াছে, সেরূপ অবিচারও বোধ হয় অন্য কোনও দেশে কোনও কালে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ভারতের নারী সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে নাই; ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। তাই যে পর্য্যন্ত ভারতের বনে একটি বৃক্ষ, মাঠে একটি তৃণ, নদীতে এক বিন্দু জল এবং লোকালয়ে একটিও রমণী থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভারতের এই বিশেষত্ব কিছুতেই নষ্ট হইতে পারিবে না। সময় সময় বাহিরের ঢেউ আসিয়া কোনটা তাহার চরণালক্তে হয়ত একটুকু কর্দ্দম মাখাইয়া দিয়া এবং কোনটা বা তাহার অঙ্গস্থ ধূলিকণা ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া করিয়াই চলিয়া যাইবে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু কোন ঢেউই তাহার বিশেষত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না। ইহা আমার দৃঢ় ধারণা।

যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের দৃষ্টিটা সাগর-পারের দিকে ঘুরাইতে না করাইয়া, আমাদের নিজের ঘরের সেই সুদূর অতীতের দিকে নিক্ষেপ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের জুজুর ভয়ে ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। কণাধারে অসুরমর্দ্দিনী এবং স্নেহময়ী জননী; দুষ্টের দমনকারিণী এবং শিষ্টের পালিনী; আততায়ী-ঘাতিনী এবং শরণাগতের আশ্রয়দায়িনী; অজ্ঞানতা-বিনাশিনী এবং জ্ঞান-বিদ্যা-প্রসারিণী,—এইরূপ মাতৃমূর্ত্তি যে দেশের রমণীগণের আদর্শ, তাঁহারা যে সুবিধা পাইলেই স্বাধীনতার আদর্শ খুঁজিবার জন্য মহাসিন্ধুর ওপারের দিক যাইবে না, এবং গেলেও ইহা অপেক্ষা বড় আদর্শ না পাইয়া আপনারাই ফিরিয়া আসিবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

এইবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মন্তব্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

তর্করত্ন মহাশয়ের ধারণা "যৌবন-বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক।". কেন না "জিহ্বায় যাহার যে রস ভাল লাগে, তাহার যেমন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, যৌবনে যাহার চক্ষে যাহার রূপ ভাল লাগে, তাহারও পরিবর্ত্তন করা সেইরূপ মনুষ্য শক্তির অতীত'। কিন্তু গান্ধর্ব্ব বিবাহ অত্যন্ত দোষণীয়; কারণ (১) ভগবান মনু বলিয়াছেন যে "এই বিবাহে যে সমস্ত সন্তান জন্মিবে, তাহারা মিথ্যা-বাদী, নিষ্ঠুর, ঈশ্বরদ্বেষী ও ধর্ম্মদ্বেষী হইবে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? যে, আর এক ভগবান যে কুন্তীপুত্রকে যুধিষ্ঠিররূপে নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছেন তাঁহার গতি কি? আসল কথা এই যে, যে যে শাস্ত্রকার যে যে ক্ষেত্রে

মহামহোপাধ্যায়দিগের মনের মত কথা বলিয়াছেন, শুধু সেই সেই ক্ষেত্রে তাঁহারা ভগবান; অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহারা ভূত। (২) ইয়োরোপের কতকগুলি (বাজে) উপন্যাস ও কাব্য হইতে এবং কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাহিরে' পুস্তকের চিত্র হইতে (হায় রে রসবোধ) এবং কোনও যুবক যুবতীর গুপ্ত প্রেমপত্র (যাহা তিনি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন) হইতে তিনি না কি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যৌবন-বিবাহের ফলে যুবতীরা নিত্য নূতন রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বামী পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইবে। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। কবি-সম্রাট মহাশয়ের অত্যুচ্চ লেখনী-প্রসূত ভালবাসার প্রস্রবণ এত বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, যে, তাহাতে তাঁহার 'মনুষ্য শক্তির অতীত' যুক্তিটাকে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

যাহা হউক, পণ্ডিতরাজ মহাশয়ের এই দৃষ্টান্ত যে তিতিহীন, তাহার দৃষ্টান্ত শকুন্তলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সুভদ্রা ইঁহারা কত বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যেও যে এক স্বামীকেই জপমালা করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী এ দেশে কাহারও অবিদিত নাই। ইহা ছাড়া, ভারতের আধুনিক শতসহস্র রমণীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাঁড় করান যায়। কিন্তু "একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত, জোর গলায় ইহা বলিতে পারা যায়"। তাই চারিটি দৃষ্টান্তই যথেষ্টরও বেশী মনে করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

"বাল্য বিবাহে এই সকল দোষের সম্ভাবনা নাই", কেন না, বালক বালিকার কচি হৃদয়ে যে ভালবাসার অঙ্কুর রোপন করা হয় (ভালবাসার অঙ্কুর, কেন না তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। তাহারা ভালবাসা কি তাহা বুঝুক আর না বুঝুক, বিবাহ ব্যাপারটাকেই ভালবাসা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে) তাহাতে পিতামাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, গুরু পুরোহিত প্রভৃতি লোকেরা কেহ বরফজল, কেহ ঠাণ্ডাজল, কেহ গরমজল কেহ বা ফুটন্তজল সেচন করিয়া সেই ভালবাসাটাকে এরূপ "পুষ্প, ফল, দল, পল্লবে বিভূষিত সুবৃহৎ প্রকাণ্ড বৃক্ষে" পরিণত করে যে, তাহাতে অনেক ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্ত পথিক আসিয়া সেই বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করিতে পারিবে ইত্যাদি"। বালক স্বামীর হৃদয়ে যে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সুবৃহৎ প্রকাণ্ড মহীরূপে পরিণত হয়, তাহার প্রমাণ সন্ধ্যার পর "চিৎপুর" অঞ্চলে বা "ডালকাগুণ্ডির" দিকে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর বালিকা বধূর যে স্বামীর প্রতি ভালবাসা কতটা বর্দ্ধিত হয়, তাহা গুরু পুরোহিতের ফুটন্ত জলের ভয়ে কেহ কেহ চাপিয়া রাখে; কেহ বা ভালবাসার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া উধাও হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়; কেহ বা কেরোসিন তৈল ও দেশালাইয়ের সাহায্যে, কেহ বা চলন্ত রেলগাড়ীর নীচে শায়িত হইয়া ভালবাসার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাঙ্গালীকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়।

এই জীবন সংগ্রামের দিনে বাল্যবিবাহ শুধু ব্যক্তিগত হিসাবে নয়, জাতিগত হিসাবেও যে অকাল-মৃত্যুর প্রধানতম কারণ, তাহা ভুক্তভোগী সকলেই বেশ অনুভব করিতেছেন, এ কথা মুখে সকলে স্বীকার করুন আর না করুন। এই যে দেশে এত দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, এই যে দেশ পরপদানত, ইহার যে প্রতিকার হইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ, দেশে প্রকৃত যুবক নাই। মারীভয় নিবারণ বা দেশে নূতন নূতন শিল্প বাণিজ্যের প্রসারণ করিয়া দেশের ধন-বৃদ্ধি ও রক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হওয়া দরকার, স্বার্থ ত্যাগের দরকার, ধৈর্য্যের দরকার, কষ্টসহিষ্ণু হওয়া দরকার ও কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া দরকার। কিন্তু যুবকগণ যে সেজন্য উপযুক্ত হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ, বিশ বাইশ বৎসর হইতে না হইতেই তাহারা হয় ত দুই একটি সন্তানের জনক। যে সময় তাহাদিগকে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন বলিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইবার কথা, তখন তাহারা কি না কি প্রকারে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণ করিতে পারিবে তাহার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। তাই কেহ বা যেন তেন প্রকারেণ আইনের কেতাব কণ্ঠস্থ করিয়া পরস্কন্ধে আরোহণ করতঃ, কেহ বা পরপদ লেহন করিয়া সহজ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের রাস্তা খুঁজিতে বাধ্য হইতেছে। আর কেহ কেহ উক্ত উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। তাহারা কেহ মরিতেছে, কেহ বা অন্য কোনও সহজ উপায় বাহির করিতে পারা যায় কি না তজ্জন্য

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আশা স্থান পাইবার সুবিধা পাইতেছে না, তাই ছোট কামনা ও ক্ষুদ্র আশা বাঙ্গালীর ছেলেকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণমনা করিয়া ফেলিতেছে। আর বালিকারা, যখন তাহাদের হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার সময়, যখন তাহাদের জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তি অর্জ্জনের সময়, যাহার সাহায্যে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামে স্বামীর সহায়রূপে তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবে, ভাবী বংশধরদিগের প্রথম শিক্ষার দায়িত্ব লইবার উপযুক্ত হইবে, তখন কি না তাহারা কুসংস্কারাচ্ছন্না, নিরক্ষরা দুর্ব্বলা বধূরূপে বালক, যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ স্বামীর গলগ্রহ হইতে বাধ্য হইয়া প্রকারান্তরে সমস্ত জাতিটাকে অকালমৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বাল্যবিবাহের এই যে বিষময় ফল, তাহা যে আমরা দেখিতেছি না এমন নয়। কিন্তু বালিকা বয়সে বিবাহ না হইলে 'হিন্দুনারী অধঃপাতে যাইবে' শুধু এই জুজুর ভয়ের যে কোনও ভিত্তি নাই, তাহা একবার চিন্তা পর্য্যন্ত করিয়া দেখিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। ভারতরমণী, তা তিনি কুমারীই হউন, কিম্বা সধবা বা বিধবাই হউন, তাঁহাদের সতীত্বের উপর এতটা যে তাঁহাদের মমতা যে, যাহার জন্য তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহা শুধু স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্য নয়। অলঙ্কারপ্রিয় রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সতীত্ব, যাহার শোভায় তাহাকে অতুলনীয়া সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া রাখে। তাহার উপর অগাধ ভালবাসাই তাহার প্রধানতম কারণ; ইহাই রমণীর, বিশেষতঃ ভারতরমণীর বিশেষত্ব। সেই ভালবাসা যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, সেইরূপ সুশিক্ষা দিয়া তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করা একান্ত দরকার। স্বামীকে কল্পিত দেবতারূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া হেঁয়ালীর ছড়া কাটিয়া রমণীদের চরিত্রের উন্নতি করিতে প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। কেন না, বর্ত্তমান ভারতে দেবচরিত্র স্বামীর সংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যায়।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ এফ, এইচ, ষ্ক্রীন (?) প্রণীত একখানা পুস্তকের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার রচনার উপসংহার করিয়াছেন।—তর্করত্ন মহাশয়দের আমলে সাহেবদের বাক্য বেদবাক্য বলিয়া মানা হইত শুনিয়াছি, কিন্তু এই গান্ধি যুগে ষ্টীল ফ্রেমের শলাকারা কি উদ্দেশ্যে কোন্ কথা বলিয়াছেন বা বলেন, তাহা যাচাই না করিয়া কেহ গ্রহণ করিবে না। এ যুগের লোকদের ধারণা, ভারতে ষ্টীল ফ্রেমকে সুদৃঢ় করিবার প্রধান সহায় বাল্যবিবাহ ও ছুঁৎমার্গ। এবং এই দুই সহায়ের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলে দেশে এরূপ তেজবীর্য্যের উদ্ভব হইবে যে, তাহার উত্তাপে ষ্টীল ফ্রেম পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে। তাই এই দুই সহায় যাহাতে এ দেশে চিরবর্ত্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা ষ্টীল ফ্রেমের শলাকারা অন্ততঃ প্রকারান্তরেও করিবেই (সোজা ভাবে করিতে অনেক অন্তরায় আছে)। এখন দেশে ছুঁৎমার্গ তাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে; তাই ষ্টীল ফ্রেমের বন্ধু ভারতবন্ধু ষ্টেটস্‌ম্যান ছুঁৎমার্গের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। যখন দেশে বাল্যবিবাহের আন্দোলন চলিতেছিল (উক্ত পুস্তকের ১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তখন ষ্টীল ফ্রেমের একটী স্ক্রীন প্রকারান্তরে তাহার গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই যে অত্যন্ত অবান্তর ভাবেও বাল্যবিবাহের গুণকীর্ত্তন উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই পদ্মনাভের ধারণা; নতুবা ওরূপ স্থলে ওরূপ প্রলাপ বাক্যের অবতারণার অন্য কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। যাহা হউক, যে মনীষি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অসাধারণ ক্ষমতা ও গুণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহাকে তাঁহার নিজ অপেক্ষা অনেক বড় মনে করিয়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য স্ক্রীন সাহেব যাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন এবং যাঁহাকে পূজা করিবার ছলে ঐ বাক্যগুলির ব্যবহার করিয়াছেন, সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের নিজের মত এ সম্বন্ধে কিরূপ ছিল, তাহার আভাস দিয়া পদ্মনাভ চিরবিদায় লইবে। দেশে তখন সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার আইন (consent bill) লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। অনেক বড় বড় টিকি 'হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যায়' বলিয়া ঘোর আস্ফালন ও তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং এমন কি যাঁহারা বিলের পক্ষে ছিলেন তাঁহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে অপদস্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তখন এই ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁহার এক বন্ধুকে—যিনি বিলের পক্ষে ছিলেন—যে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, (তাহার সম্পূর্ণ অংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই; পাঠকগণ নিজেরা

উক্ত পুস্তকে তাহা পড়িয়া দেখিবেন) এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি (উক্ত পুস্তকের ৩৮৮ পৃষ্ঠা):—

"Cheer up, Kaliprasanna Babu! There is no cause for anxiety. Let us do our duty manfully and we shall beat the barbarians."

মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকে প্রলাপ বাক্য বলে। পদ্মনাভও ভারতবর্ষ হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বে দুই একটি প্রলাপ বাক্য বলিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া তাহার নামের সার্থকতা করিবে। গ্রহের তাড়নায় পদ্মনাভকে সমস্ত পৃথিবীটা ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে একাধিকবার প্রবাস করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। একাদিক্রমে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ষ্ক্রীন সাহেবের জাতভাইদের সঙ্গে তাহাদের ঘরে অবস্থান করিবার দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। তাই, ধলা জাতি এই কালা আদমীদের যে কতটা বন্ধু, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পদ্মনাভ যতটা লাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছে, তর্করত্ন মহাশয় হয় ত ততটা পান নাই,—এ কথা বলিলে হয় ত তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রীচরণে সে দোষী সাব্যস্ত হইবে না।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩)

বাসায় ফিরিবার পথে শ্রীমান বলিলেন,—"খুব লোক ত' আপনি! ক'টা বেজেছে তা জানেন?"

বলিলাম—"দরকার? ২৫ বচর ঘড়ি ছিলেন আমার ইষ্ট দেবতার শ্রীমুখ, ওই দেখে—ওঠা বসা, চলা ফেরা, নাওয়া খাওয়া। এখন সে'টি তোমাদের দিয়ে ছুটি নিয়েছি। আর দিন রাতের ধার ধারি না বন্ধু। এখন—না হেথায়—"দিন ভায়,—না নিশীথ তারা।" সব একসা।

শ্রীমান। এতক্ষণ ত' কেবল বাজে ফাঁকা কথাই পেলুম।

বলিলাম—"ওঃ, material চাও,—নিরেট কিছু খুঁজচো!"

শ্রীমান। তা না ত' কি!

বলিলাম—"এ তো তোফা কথা; কিন্তু সেটা ত' বৈঠকখানায় জন্মায় না, তার গড়ন্ হয় কারখানায়। সে ত' মুখে ফলে না,—দুখে গজায়;—একটু নড়তে চড়তে হয়; পারবে কি? তবে,—তার সঙ্গে একটু বাজেরও চর্চ্চা রেখো;—ভয় নেই—ঠোক্‌বে না, বরং থাকবে ভাল। কেঁচো-মেরে হেও না। কেঁচোগুলো মাটিকে real (খাঁটি) ভেবে 'মাটিরিয়েল' (material) নিয়ে আজন্ম ব্যস্ত। সে ভাবচে—মাটি চেলে পৃথিবীটাকে কাঁকরশূন্য ক'রে গর্ভে পুরবে! স্পর্দ্ধার পার নেই; অজ্ঞানের ধারণা, সে নিরেট মেটিরিয়েল্ (বস্তু) চর্চ্চা করছে,—কিন্তু বানিয়ে চলেছে "ফাঁক্"! কাটের পোকাও দিন নেই রাত নেই তার জীবনব্যাপী পরিশ্রমে, সশব্দে শুষ্ক কাট কেটেই চলেছে। হায়! তার কাটের কারবারে জন্মাচ্ছে কিন্তু "ফাঁক্"! বন্ধু—আমার মস্তিষ্কটি ছাড়া, জগতে নিরেট অংশ আর কতটুকু! তাই বলছিলুম,—সজ্ঞানে ফাঁকের চাষ একটু রেখো! আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি-সম্রাট রবি বাবু পেয়ালার ফাঁকটাই যে তার প্রধান অংশ সেদিন তা বুঝিয়ে ব'লে দিয়েছেন; তা না ত' চাটুকু বাদ দিয়ে বাটী কামড়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়; রাজি আছ কি? দলাদলি থাকতে পারে; ইংরেজের কথা না শুনলে যদি বিশ্বাস না হয় ত' শোনো—

"How can I drink a cup of tea? A cup is not a fluid, nor am I an Ostrich. Strictly, I shall drink the Tea of the cup, and not the cup of Tea."

আবার আমাদের মধুকবি ব্যারিষ্টার মাইকেল কদিন ধ'রে এক নাপিতের মামলা—কয়েকটা কবির গান শুনে করে দিয়েছিলেন ;—তাইতেই হাজার টাকার থোলের ফাঁকটা ভ'রে উপ্‌চে উঠেছিল।"

শ্রীমান। আর তাই তাঁর শেষ অবস্থাটাও খুব শোচনীয়,—মলেন্‌ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

বলিলাম—"মলেন্‌ ?—না, মরাকে বাঁচালেন ? কোন খবরই রাখ না বন্ধু। ত্রেতাযুগের মরা মেঘনাদকে সব যুগে অমর ক'রে গেলেন, আর নিজেও অমর হয়ে রইলেন ! তোমার মেটিরিয়েল্‌ "মেশিনগনের" এত শক্তি নেই যে আর তাঁদের মারেন।—"বাজে" আছে তাই বাঁচোয়া ; তোমরা বস্তু-ব্যাপারীরাও কিছু হাসিল করতে হ'লেই ফাঁক্‌ খোঁজ ; তোমাদের মুখেই শুনি—ফাঁক্‌ পাচ্চি না,—একবার ফাঁক পেলে হয়।" নয় কি ?"

শ্রীমান। তা যেন স্বীকার করলুম, এখন বলুন তো আপনি অতক্ষণ ফাঁকা আলাপে—হাসিল করলেন কি ?

বলিলাম—"বহুৎ, যা খুঁজিতেছিলাম তাই। অর্থাৎ এখনো বৈদ্যনাথ পৌঁছাইনি—দেওঘরেই ঘুরচি। যাঁদের সঙ্গে কথা হ'ল তাঁরা কেহই বৈদ্যনাথে আসেন নাই, সকলেই দেওঘরের ঋতুবিহারী (bird of season) সখের দল। আর পেলাম এ অবস্থায় যেটা স্বাভাবিক, অর্থাৎ—সময় কাটাবার নূতন নূতন লোক পাবার আগ্রহ, যাতে আমোদে-আনন্দে দিনগুলো বেশ কাটে। এঁদের অনেকেই আরাম ছাড়া অন্য চিন্তা কমই রাখেন ; ৫।৭ জন স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত। পোষ্ট-অফিসে নিত্য প্রাতে এই যে এত বড় জমায়েৎ হয়,—সেটা কেবল পত্রের টানেই নয়, তার মূলেও ঐ সম্মিলনের আনন্দ বর্ত্তমান ; ওটা 'ক্লবের্‌' কাজও করে,—দেখা-শোনা, আলাপ-পরিচয়, খোঁজ-খবর, নতুন-লোক-পাকড়াও,—সবই চলে। ওটা সখের সফরী বাবুদের (Feeder Station) মনের খোরাক যোগাড়। বাদ্‌ দেবার জিনিস্‌ নয়,—বড় দরকারী।"

শ্রীমান। বৈকালে তা'হলে বম্‌পাস্‌ টাউনে যাচ্ছেন ত' !

বলিলাম—"আমার নিজের যাওয়ার আপত্তি নেই, আমার এখন ঐটাই দরকার ; কিন্তু তোমাদের নিয়ে যেতে রাজি নই।"

শ্রীমান। কেন ?

বলিলাম—"বাবুটি যে ঠিকানা দিলেন, সেটা কেবল আমারি উপযোগী। কি এক "সদন" বললেন্‌ না ? আমার এই দীর্ঘ জীবনে বিশেষ করে ত' একটিমাত্র 'সদনের' কথাই শোনা হয়েছে, আর সেটি তেমন লোভনীয়ও নয়। কুড়েরাম দত্তের নজিরে ফিরে আসতে পারি ত', ও-কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাও ত' দিলে দেখলুম,—আবার "দূত" না আসে।"

শ্রীমান। আমাকে এয়ি পেলেন বুঝি। থার্ড ক্লাসক্‌ টাউনে ইষ্টেসনের গায়ে, ঠিকানা দিয়েছি উইলিয়মস্‌ টাউন্‌ নন্দন পাহাড় ঘেঁসে,—তিন মাইলের তফাৎ।

বলিলাম—"ইস্‌—অপরাধ হয়ে গেছে ত' বটে ;—ভুলেই গিছলাম যে কলকেতায় থাকো। চোক্‌ কান্‌ বুজে lawটা (ভকিলীটা) দিয়ে ফ্যালো বন্ধু,—চট্‌ উন্নতি করতে পারবে।"

শ্রীমান আর কথা না কহিয়া, একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িল। বলিলাম—"এ আবার কোথায় ?"

দেখি, বামুন-ঠাকুর দরজা খুলিয়া দিল। জয়হরির উদ্দেশে ফিরিয়া দেখি, সে বহু পশ্চাতে,—হাতে একটা ঠোঙ্গা, মুখও বেশ সতেজে চলিতেছে। বোধ হয় বাসা যত নিকট হইতেছিল,—ঠোঙ্গা খালাসের কাজটা ততই দ্রুতবেগ ধরিতেছিল। শূন্য পত্র পথে পড়িয়া,—তিনিও বাসায় পা দিলেন, এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"এখানকার প্যাঁড়া খুব ভাল, মশাই ;—ঠাকুর—দু'ঘটি জল আনো।"

(১৪)

"ভাল কথা—পত্রাদি কিছু পেলে" ?

শ্রীমান। বাবার বিলম্ব সহে কি, তিনি নিজেই গিয়ে এনেছেন।"

গায়ের বোঝা নামাইতে নামাইতে বলিলাম—"দুশ্চিন্তা আর অশান্তি ডেকে আনার এ একটা বাতিক্‌।"

এই সময় মাধুরী আসিয়া শ্রীমানকে বলিল—"মামা, দিদিমা বললেন—"গোবিন্দের কি কি অভ্যাস হ'য়ে গেছে তার একটা ফর্দ্দ করে নিতে।"

তিনজনে অবাক হইয়া মুখ-চাওয়াচাওই করিলাম।

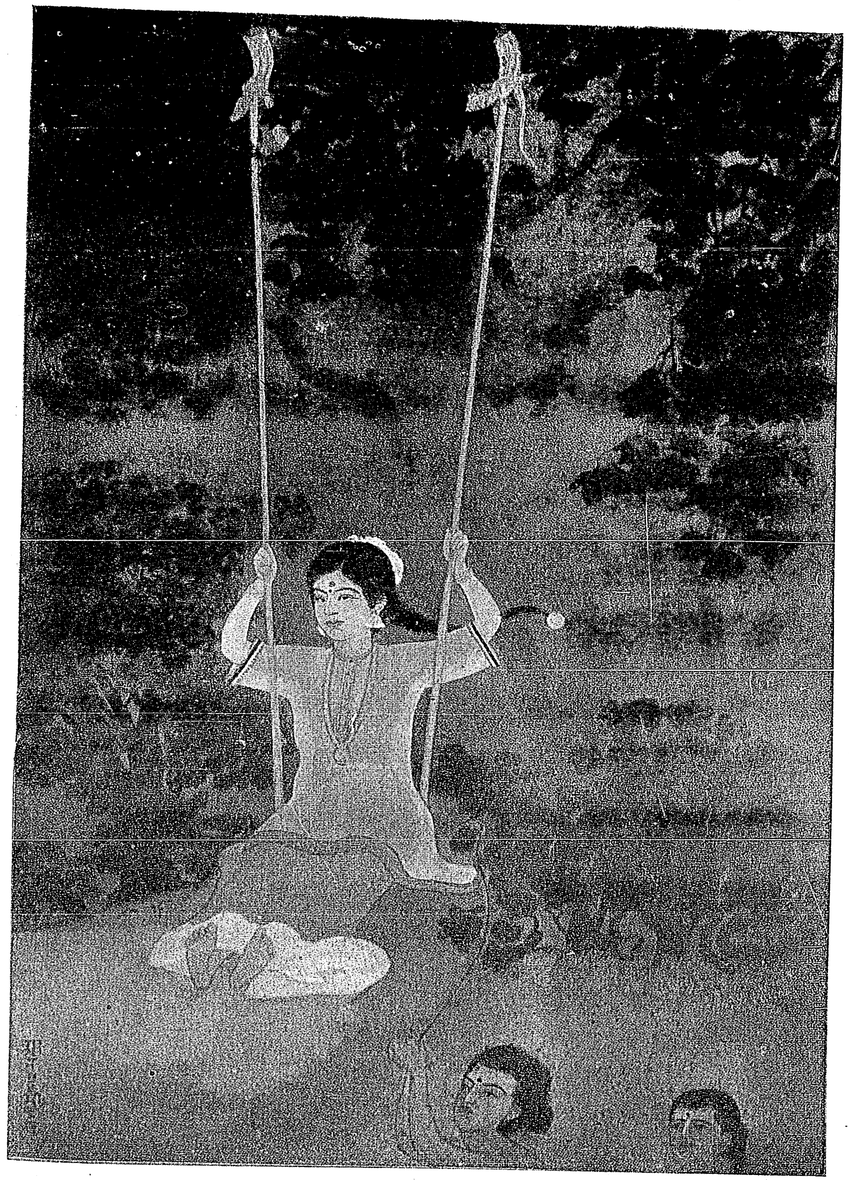

ঝুলন

শিল্পী—শ্রী আনন্দমোহন অঙ্কন জাতীয় কলাশালা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

এ কথা এখানে পৌঁছিল কি প্রকারে! জয়হরিকে আমার সাহায্যার্থেই সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্যের মধ্যে—তিনটি সন্দেশ সাবাড় করিয়াছিলেন মাত্র। এইবার সে ধর্ম্মরক্ষা করিল, বলিল—"খুকি, মাকে বলগে, আমি ফর্দ্দ নিয়ে যাচ্চি; আপাতক তিনি কিছু গরম গরম কচুরী আর সরভাজা দিয়ে গোবিন্দের পিত্তিটে সাম্‌লে দিন। সত্বর স্নানটা সেরে নিচ্চি. পরে সম্বত অন্নাহার,—নিরামিষ নিষিদ্ধ;—মনে থাকবে ত' খুকি?" মাধুরি হাসিমুখে "থাকবে" বলিয়া চলিয়া গেল। আমি ত' সঙ্গীর কথা শুনিয়াই অবাক্! পরিত্যক্ত ঠোঙার ব্যাস ও পরিধি হিসাবে অনুমান হয়, তিন-পো না হইলেও, অর্দ্ধ-সের পেঁড়া বেওজর পেটে পড়িয়াছে। আবার বলে-কি!

চাকর (বাণেশ্বর) ফুলেল-তেলের বাটী আনিয়া আঙ্গিনা গুটাইল। আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। জয়হরি একটা মোড়া টানিয়া লইয়া পা ছড়াইয়া দিয়া বসিল; বাণেশ্বর তৈল লইয়া ও বাবুকে লইয়া, ডলাই মলাই সুরু করিয়া দিল। আমি এই দৃশ্যটা বরাবরই সহিতে পারি না,—আমার গায়ে অপরে হাত দিবে কেন? মুক্ত-কচ্ছ হইয়া জীবন্ত মাংসপিণ্ডবৎ, অপরের সাহায্যে তৈল-সেবা গ্রহণ,—আমাদের অভিশপ্ত দেশের পঙ্গুদের বড়ই প্রিয়; এই মহিষ-মর্দ্দন ব্যাপারটা না কি সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক! যাক্,—আমি তাড়াতাড়ি মাথায় একটু তেল দিয়া স্নানটা সারিয়া ফেলিলাম। ভৃত্য তাহাতে যেন একটু কুণ্ঠিত হইল। তাহাকে দু'কথায় খুসী করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"কর্ত্তাকে দেখতে পাচ্চি না—তিনি কি এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি?" ভৃত্য বলিল—"তিনি অনেকক্ষণ এসেছেন বাবু,—এসেই চিটি লিখতে লেগে গেছেন। আজ দেখচি আমাকেই চিটি ফেলতে ডাকঘর ছুটতে হবে।"

বলিলাম—"অন্য দিন তবে কে যায়?"

ভৃত্য। বাবু নিজেই যান—তাই রক্ষে।

আমি। কেন! রক্ষে আবার কি?

ভৃত্য হাসিতে হাসিতে বলিল—"চিটি যে তাঁর কোম্পানীর কাগজ। আমরা রাস্তায় ফেলবো কি ছিঁড়ে ফেলে দেবো তার ঠিক্ কি!"

শ্রীমান আসিয়া বলিল—"কচুরী আর সরভাজা প্রস্তুত। কিন্তু বেলা হয়ে গেছে, আহারটা এখন দু'অঙ্কে ভাগ না ক'রে এক অঙ্কে সেরে নিলেই ভাল হয়।"

এ সম্বন্ধে জয়হরির মতই চূড়ান্ত। সে বলিল—কোন আপত্তি নেই,—"ও'-দুটো" গর্ভাঙ্কে ফেলে দিলেই হবে,—বিষয় বস্তু বাদ্ না গেলেই হ'ল।"

"তা' যাবে না" বলিয়া শ্রীমান হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

দশ মিনিটের মধ্যেই সুমুধুর ডাক্ পড়িল। গিয়া দেখি—ভিতর দালানে রীতিমত দুই প্রস্ত ষোড়শ সাজান' হইয়াছে,—সোপকর্ণ-অন্ন, ফলান্ন, মিষ্টান্ন, পরমান্ন, প্রভৃতি পরিপূর্ণ নৈবেদ্যে ভরাট! সহসা যেন বিপদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আসনখানা অনুসন্ধান করিয়া লইতে দু'তিন মিনিট গেল।

বৈবাহিক মহাশয় খান্‌কয়েক পত্র হস্তে নিজের আসনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—"বসে পড়ুন,—বসে পড়ুন, বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। বিদেশ, তায় বাসা-বাড়ী, কোন ব্যবস্থাই নেই;—ওঁর আবার অম্বলের অসুখ,—আগুন-তাত লাগানো বারণ, আবার গেরো দেখুন না—চাল্‌তা আর জর্দা আন্‌তে ভুলে গেছি,—তাতে তবু একটু দমন্ থাকে! তার ওপর বিস্ফোটক্—ছোট নাতীটির মিহিদানার অসুখ, তার সুর নাবচে না, চড়েই আছে! এই রকম একটা-না-একটা অসুখ সকলেরি লেগে রয়েছে,—কোন্‌টা সামলাই বলুন। বসে পড়ুন্—বসে পড়ুন। কোন প্রকারে যা হল' দুটি মুখে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।"

আমার ত' দেখিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছিল; বিনয়ে বাধা দিয়া বলিলাম—"অতিথি যে দেবতা সে সম্বন্ধে আপনার পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়ই পাইতেছি, এক্ষণে "ভ্যো নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিন, আমরা সন্তুষ্ট হইয়া সরিয়া পড়ি। দেবতারা দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভোজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন—এ কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার ধৃষ্টতা—"

জয়হরি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু "দেবতা" নই মশাই—"

বলিলাম—"ভয় নাই—তুমি যে "দানব" সে পরিচয় ওঁরা ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছেন।"

যাহা হউক, বসিতেই হইল। বৈবাহিক মহাশয় আর বসেন না,—তিনি ভৃত্য বাণেশ্বরকে ডাকিয়া পত্র পোষ্টিং সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ;—"হাত, বেশ-ক'রে মোছ, ছ'খানা আছে গুণে নে। সোজা ডাকঘরে গিয়ে, —এক এক-খানা ক'রে গুণে ডাক্‌বাক্সে ফেল্‌বি। হাঁ ক'রে এদিক্-ওদিক্ চেয়ে ফেলিস্‌নি,—দেখিস্, সব যেন বাক্সের ভেতর যায়,—পিছ্‌লে বাইরে না পড়ে। পার্‌বি ত' ?"

বাণেশ্বর। এ আর শক্তটা কি বাবু ;—পারব না কেন ?

বাবু। শক্ত নয় ? আচ্ছা বল-দিকি কি বল্‌লুম ?

বাণেশ্বর। চিটিগুলো ডাক্‌বাক্সে ফেলে দিতে—

বাবু। তাই বল্লুম্‌রে হারামজাদা ! ক'খানা চিটি তার খোঁজ নেই, কোথাকার ডাকবাক্সে তার ঠিকানা নেই,—ফেল্‌লেই হ'লরে পাজি ! এ কি কুট্‌নোর খোসা, না নাকের নিশ্বেস্ ?

বাণেশ্বর। আজ্ঞে, আমি খুব বুঝে নিয়েছি, আপনি ভাবচেন্ কেন—

বাবু। নাঃ, আমার আর ভেবে কাজ কি,—যত ভাবনা তোমার ! কি বুঝেচিস্ বল্।

বাণেশ্বর। আজ্ঞে—ছ'খানা চিটি গুণে গুণে ডাক-বাক্সে ফেলে আস্‌বো—

বাবু। তোদের মেদিনীপুরের ডাকবাক্সে ?

বাণেশ্বর। আজ্ঞে তা কেন,—দেওঘরের—ডাকখানার —ডাকবাক্সে।

বাবু। তাই বল্ ; যাবার সময় পথে কারুর সঙ্গে কথা ক'বিনি, কোথাও ব'সবিনি। আসবার সময়—ছ'খানা পোষ্ট কার্ড কিনে আনবি।

এই বলিয়া পত্র ও পয়সা বাণেশ্বরের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন—"আজ সোমবার ;—বুধ না হয়—বেস্পতি-বার জবাব না আসে ত'—তোমার জবাব ;—সেটা জেনে রেখ।"

বাণেশ্বর। তাঁরা যদি না লেখেন হুজুর—

বাবু। তারা লিখবে না ? তাদের ঘাড় লিখবে ;—ব্যাপারটি কেমন !

বাণেশ্বর। তা কি করে জানব বাবু—

বাবু। তা জানবে কেন ! বড় শীত বাবু গরম কোট্ না হ'লে গেল্ল, গরম র‍্যাপার না হ'লে মল্ল,—এ সব তো বেশ জানো—বেটার ছেলে বেইমান্ !—শুনিস নি, অমলার আজ পাঁচদিন ডিসেণ্ট্রী হয়েছে—

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বড় গুরুতর হইবে ভাবিয়া বাণেশ্বর মুখখানায় বেশ বিমর্ষভাব আনিতেছিল, কিন্তু কর্ত্তার শেষ কথাটায় একটু আশ্চর্য্য আর অবিশ্বাস মিশ্রিত ভাব আনিয়া বলিল—"এ কি হ'তে পারে হুজুর—"

বৈবাহিক মহাশয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শুন্‌লেন ত' ?—এই সব লোক নিয়ে আমাকে ঘর ক'র্‌তে হয় !"

বলিলাম—"খুব কঠিন বটে,—কি ক'রে যে মাথা ঠিক্ রেখেছেন বলতে পারি না ;—আমি ত' পাগল হ'য়ে যেতুম।"

বৈবাহিক। তা কি আর বাকি আছে বেঁচে, তবু ভবিষ্যৎ ভেবে—বহু পূর্ব্ব থেকে, নিত্য সকালে সাতটা করে বাদাম খেয়ে আসচি। বলে কি না—"তাও কি হ'তে পারে !"—ক্যানরে ব্যাটা হ'তে পারে না,—তোর কথায় না কি ? বড় বড় লোকের বাড়ী হ'চ্চে কি করে রে ছুঁচো।"

বাণেশ্বর এবার একটু বিরক্তি মিশ্রিত অভিমানে বলিল—"তিন বচরের মেয়ে দেশান্তরী হ'তে ত' জন্মে শুনিনি বাবু,—রাগ্ করেন্ ত' হো—("ক" টা পেটেই রহিয়া গেল।)

বাবু। চুপ্ কর্ হারামজাদা,-- ফের ঐ অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌বি ত'—

শ্রীমানও আহারে বসিয়াছিল, এবং মাথা হেঁট করিয়া, হাসি চাপিয়া নীরবে কাজ সারিতেছিল। এইবার বুঝিল—বাবার খাওয়া মাটি হয়। বলিল—"ডিসেণ্ট্রী কথাটা ও কি ক'রে বুঝবে বাবা,—'আমাশা' হয়েছে বল্‌লেই ত' হ'ত—

বাবু। আ—ব্যাটা মেদিনীপুরের ম্যাড়া,—জন্ম কাট্‌লো ঐ নিয়ে, আর 'ডিসেণ্ট্রী' বোঝ, না ? আমাদের পদ্ম ঝি যে বোঝে রে মুখ্‌খু ! আমাশা,—আমাশা,— অমলার আমাশা হয়েছে রে গাধা !

বাণেশ্বর। তাই বলুন্ বাবু,—তা এত ভাবচেন কেন !

বাবু। শোনো ব্যাটার কথা ! তবে কি ক'র্‌বো— নাচ্‌বো, করতালি দোব' ! ভাববো না ত কি নিয়ে থাকবো রে রাস্‌কেল্, ভদ্রলোকের ও-ছাড়া আর কি আছে !

বাণেশ্বর। দেড়মাস্ হয়ে গেছে বাবু, আমিও ত' পত্তর পেয়েছ্যান্থ, আমার মায়ের আমাশা লেগেছে ;— আর কোন খবর পাইনি। তা আমাদের আর উপায় কি,—ভাববারও ত' ফুরসৎ নেই।" এই বলিয়া বাণেশ্বর মুখ নীচু করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

বাবু একটু মোলায়েম্ হইয়া বলিলেন—"যেখানে থাকিস্, সেখানে ডাক্তার-বদ্দি নেই ত ?"

বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল—"না হুজুর,—৭ কোশের ভেতর কেউ নেই।"

বাবু। যাঃ বেঁচেগিছিস ; তোর আবার ভাবনা কি,— কিছু ভাবিসনি ;—তোর মা'কে মারে কে ? মারবার কেউ চাই ত'—

বাণেশ্বর। আপনি তবে অত ভাবচেন কেন ?

বাবু। আমি ভাব্‌বনা ত' ভাববে কে-রে গোমুক্ষু ! কলকেতা যে ডাক্তার-বদ্দির আড়োৎ,—তাদের মোটর-গুলো "মেটেগ্রহের" মত বোঁ-বোঁ ঘুর্‌চে ! সে চক্কে পড়তেই হবে। তার ওপর টাকা আছেন ;—আর কি বাঁচোয়া আছে ! দু'য়ে মিলে রোগ্‌ও দু'দিন জোম্‌তে দেয়না,— —রুগীও জোম্‌তে দেয়না ;—হয়েছে কি গেছে ! আবার এ রোগটির বেগও যেমনি, আমাদের বদ্দি ডাক্তার বেগও তেমনি। সেখানে এতক্ষণ ঘটা প'ড়ে গিয়ে থাকবে ! সাধে কি ভাবচিরে সিন্ধুঘোটক !"

শ্রীমান এইবার বিরক্ত হইয়া বলিল—"তাই তবে ভাবুন্, ঐদিকে আজকের ডাক্ চ'লে যাক্।"

কর্ত্তা চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"মাথা খেয়েছে, ব্যাটা মজালে দেখ্‌চি ! চিটি' ত কখন দিয়েছি,—হারাম্‌জাদা কি নোড়বে ?"

বাণেশ্বর মুখ ফিরাইয়া চাপা-হাসি হাসিতে হাসিতে দু'পা বাড়াইতেই, কর্ত্তা হাঁকিলেন—"ক'খানা ব'লে যা,— যেন পথে ঘাটে নিবেদন কোরো না ;—পোষ্ট আপিসের বাক্সে—বুঝলি ?"

বাণেশ্বর আর কথা না কহিয়া বাহিরা হইয়া গেল।

"এই মোড়েই একটা টিনের-ঢোল্ হাঁক'রে ব'সে আছে,—ব্যাটা ঠিক্ সেই লালিম্‌লির গর্ভে ঝেড়ে আস্‌বে দেখচি।"

বলিলাম—"তা কি পারে !"

বৈবাহিক মহাশয় উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"ও কি না পারে !—মেদিনীপুর থেকে এখানে হেঁটে এসেছিল, ও-বেটা আবার পারে না !"

এরূপ অকাট্য নজিরের উপর আর কথা চলে না, বলিলাম—"তা হ'লে পারে বটে ! যাক্—এখন আহার ক'রে নিন্,—আমাদের যে শেষ হ'য়ে এল।"

কর্ত্তা। না—না, এর মধ্যে ও কি কথা। কই—কি চাই বলচেন্ না ত'।—কি চাই বলুন।

বলিলাম—"আমার একটা ছোট আঁকুষি আর এক গাছা ছোট ছিপ্ হ'লেই হবে। দূরের রেকাবীগুলো হাতের আয়ত্তের অনেক বাইরে ;—আকর্ষী না হ'লে টেনে নেবার সুবিধা হবেনা ; আর ছিপ্ না হ'লে ঐ সব কাঁশার-ডোবা থেকে মাছও তুলে নিতে পারব'না। জয়হরি সুদীর্ঘ হস্ত সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গ হয়ে কাজ সারছে।"

বৈবাহিক মহাশয় সহাস্যে বলিলেন—"না—না,—মাছ কোথায় ? সবে সাত সের মাছ, তা—এই সাতগুষ্টিতে খাওয়া।—ওগো, তুমি একবার এদিকে এসো না—বাটী-গুলো সরিয়ে দাও, বে'ই মশাই শীতে হাত বাড়াতে পাচ্চেন না' ! তুমি ত' অম্বুলে রুগী,—তোমার এত লজ্জা কেন ?"

দুইটি গুরুতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলাম,—বোধ হয় 'নালন্দার' খুব নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছি। প্রথম,— মেদিনীপুর হইতে যে লোক হাঁটিয়া দেওঘর আসিতে পারে —সে পারে না এমন কাজই নাই ; এবং দ্বিতীয়,—অম্বলের অসুখ থাকিলে স্ত্রীলোকের লজ্জা থাকিতে পারে না ! গবে-ষণার বিষয় বটে।

এই বিবিধ ব্যঞ্জনের বেড়াজাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়,— বহু বিনয় বচনের পর পাইলাম—"গোবিন্দের কিসে কিসে পাকা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা জানা না থাকায়, অনুমানে যতটুকু পারেন, তাহারি যত্ন পাইয়াছেন। বিদেশ, বাসা—ইত্যাদি।

ভাবিলাম,—একটা কথা কহিয়া কি বিপদই ডাকিয়া আনিয়াছি,—বিজ্ঞেরা তাই "বোবার শত্রু নাই" বলিয়া

গিয়াছেন, এবং ও কাজের ভারটা উকীল, উন্মাদ আর বিশিষ্ট বিশিষ্ট বর্বীয়সীদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন। অধুনা একটু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে বলিয়াই ভুল করিয়া ফেলি, কারণ—সাধু পুরুষও দণ্ড ভোগ করিতেছেন। যাহা হউক,—আহারের এইরূপ পুনরভিনয় ঘটিলে, জয়হরি যেরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাকে খোয়াইতে হইবে। বেল্লিক্ যেন বাসন মাজিতে বসিয়াছিল! কেবল কমলালেবু-সংযুক্ত ছানার-পায়সের জামবাটীটি ছোঁয় নাই! তাহার এ অরুচির কারণটা আমার অনুমানে আসিতেছিল না।

বৈবাহিক মহাশয়কে বলিলাম—"আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ ভুল করা উচিত হয় নাই, শ্রীগোবিন্দের কিছুরই অভাব নাই। এ হিন্দুর দেশে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া বামী-বষ্টুমীর শ্রীকুঞ্জে পর্য্যন্ত—নিত্যই তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য নিবেদন করা হয়। তদ্ভিন্ন তিনি 'ক্ষুদে'ও তৃপ্তি লাভ করেন,—এমন প্রমাণও বর্ত্তমান। সুতরাং গোবিন্দের অভ্যাসটা, দয়া করিয়া কেবল চা সম্বন্ধেই নোট্ করিবেন।"

শুনিয়া বৈবাহিক মহাশয় বলিলেন—"বাসার এই যৎসামান্য আয়োজনের উল্লেখ করে আর লজ্জা দেবেন না,—এখন যাতে পেট্ ভরে তা' করুন্।—এ কি! জয়-হরি বাবু যে পায়স্টা ফেলে রাখচেন বড়? ভাল হয়নি বুঝি! তা হোক্,—পায়েস ফেল্তে নেই, তা জানেন!"

বলিলাম,—"কৃপা করুন্, ওকে আর উৎসাহ দেবেন না।"

জয়হরি উত্তেজনার সহিত বলিল—"আমাদের দেশেও —পায়সের অনুমাত্র ত্যাগ কর্লে তনুত্যাগ কর্বার বিধি আছে।"

হতাশ হইয়া বলিলাম—"তবে খাও,—যখন খেলেও যা, না খেলেও তাই,—তখন খেয়েই নাও।"

বৈবাহিক মহাশয়কে বলিলাম—"উনি শ্রীগোবিন্দ নহেন, আর এটা প্রভাস'ও নয়;—তবে উনি যে "ভোজ্-গোবিন্দ"—আর ওঁতে যে বহু অসাধারণত্ব বর্ত্তমান, তার প্রমাণ বোধ হয় অনাবশ্যক; কিন্তু আমাদের জানা না থাকলেও, এ স্থানটা যে "ভোজ্গোবিন্দের-প্রভাস্" হ'তে পারে না তার প্রমাণ কি!"

বৈবাহিক মহাশয় বলিলেন—"কেন বলুন দিকি আপনি অত' বাধা দিচ্চেন;—আপনি ওঁকে খেতে দেবেন না দেখচি।"

বলিলাম—"সে সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না;—পায়েস যথাস্থানে পঁউছে গেছে।"

জয়হরিও বাজে কথায় কাণ দেয় না,—সে কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু আমি এখন উঠি কি করিয়া এবং কি বলিয়া!—পাতে সবই মজুদ, অথচ পেটেও আর স্থান নাই।

বাণেশ্বর চিটি ফেলিয়া আসিয়া সম্মুখস্থ উঠানেই কি করিতেছিল। রোগটা' ত জানাই হইয়াছিল; বলিলাম—"সে—চিটি ফেল্তে গিয়েছে ত' এখন্ নয়, অন্য কোন ডাকঘর আছে না কি?"

কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আমায় ডোবাবে দেখ্চি, হাঁ-করা বেটা নিশ্চয়ই কোথায় ব'সে আড্ডা দিচ্চে;—দুখানা ফেলেই যাবে, কি তিনখানা হাত পিছ্লেই পোড়বে, তার ঠিক্ কি? নাঃ—দেখ্তে হ'ল,—আমি উঠ্তে পারি বে'ই!"

বলিলাম—"হ'য়ে থাকে ত' তাতে আর বাধা কি,—আমাদের বিলম্ব রয়েছে। তা'ছাড়া ব্যাপারটি ত' অবহেলা করবার মত' নয়।"

কর্ত্তা। সে কথা কি কেউ ভাবে বে'ই, তাহ'লে আর দুক্ষু কি! অম্বলের অসুখ ত' অস্বীকার করচি না, কিন্তু এ-সব তো কাঁচা-লঙ্কাও নয়, আর অড়র্ডাল্ও নয় যে ঘেঁশ্তে বারণ। থাক্, আমি তবে উঠি;—আমার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আপনারা যেন উঠবেন না,—বলি-য়াই, একটা আঁক্ কাটিয়া—হাঁক্ মারিতে মারিতে উঠি-লেন,—"বাণিকণ্ঠ—বাণিকণ্ঠ,—ওরে ও বাণিকণ্ঠ—এসে ছিস্।—আমার মাথা এসেছে,—তার ব'য়ে গেছে! যা ভেবেছি;—ঐ বেটাই আমায় মার্বে।"

এই বলিতে বলিতে সবেগে 'কুয়ো'-তলায় উপস্থিত হইতেই, বাণেশ্বর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দু'টো কুল্কুচো করিয়া—কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে—"বেটা কি কারুর উপনয়ন দিতে গেল,—অপ-রাহ্ণ হ'ল যে। ওরে ও বাণভট্ট,—বাণভট্ট হাঁকিতে হাঁকিতে বাহির হইয়া পড়েন দেখিয়া, বাণেশ্বর চীৎকার করিয়া বলিল—"কাকে ডাকচেন বাবু?"

কর্ত্তা চমকিতভাবে ফিরিয়া, বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে হারামজাদা! চোর বেটা এলি কখন,—এত শীগ্গির যে এলি?—এই তেমাতানিতেই আমার মুণ্ডুপাৎ করেছ দেখ্চি! তা না ত' আর এত ডাকে উত্তর নেই—বেট বেইমান—"

বাণেশ্বর। কি ক'রে জানবো হুজুর যে—আমাকে ডাকচেন—

কর্ত্তা। কা'কে আর ডাকিরে হারামজাদা! জান না ব্যাটা—তুমি এ বাড়ীতে ঢুকে-অবধি আর ভগবানকেও ডাকা নেই। দিন নেই রাত নেই—"বাণলিঙ্গ আর বাণলিঙ্গ!"—

একটু মোলায়েম সুরে—"আচ্ছা বাণলিঙ্গ—ঠিক্ ক'রে বল্ দিয়েছিস্ ত'—ছ'খানাই?"

বাণেশ্বর। আপনি ব্রাহ্মণ—আপনার কাছে—

কর্ত্তা। ওরে গর্দ্দভ,—ব্রাহ্মণ কি আর আছি! তা হ'লে তোকেই বা এদ্দিন্ আস্তো রাখবো কেন,—আগে তোকে ভস্ম ক'রে তবে অন্য কাজ করতুম—

আমরা আঁচাইবার জন্য উঠিয়াছিলাম। কর্ত্তার উপাদেয় উপসংহারটুকু শুনিয়া, জয়হরি সোজা বহির্ব্বাটীতে ছুটিল,—কারণ তাহার আর হাসিবার বা হাসি চাপিবার অবস্থা ছিল না। আমিও আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহারই অনুসরণ করিলাম।

ব্যঙ্গ চিত্র

সাবধানী পথিক



"পথ ভোল, পথ ভোল, ওহে সাবধানি পথিক"

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস

অলীক দেবতা

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

১

হে শক্তি-সাধক, ভক্তিহীন,
শক্তি যবে পেলে,
প্রতিদিন
দেবোদ্দেশে পূজা, বলি
নৈবেদ্য কুসুমাঞ্জলি
পূজারীর প্রাপ্য বলি'
আপনার গৃহে লয়ে গেলে।
তার পর ক্রমে ক্রমে
জ্ঞাতসারে কিবা ভ্রমে,
দেবের আসনখানি মেলে
আপনি বসিলে তাতে—
ধীরে ধীরে বাম হাতে
দেব-মূর্ত্তি অন্ধকারে ঠেলে
কত দূরে, কোথা দিলে ফেলে ?

২

সুখে দিন যাইছে চলিয়া।
প্রতিষ্ঠিত আজি দেবাসনে,
দেব বেশে,
ছলি অজ্ঞ, বিজ্ঞ, বহুজনে ;
সর্ব্বশেষে
বলিতেছ আপনা ছলিয়া—
"মানবত্ব হল অবসান।
এ বেদী আমারি বেদী
উঠিতেছে অভ্রভেদী
মম স্তব গান ;
আমি মর্ত্ত্যে দেবতা বলিয়া।"
হে নিঃশঙ্ক, হে প্রতাপবান্
তব পদে নত শত প্রাণ,
ভক্তি কত উঠে উছলিয়া।

৩

দেবতা হইলে ভবে।
সুখে দিন যাবে কি চলিয়া ?
নিত্য পূজা চাহ যদি, তবে
সত্যই দেবতা হতে হবে,
ক্ষুধা তৃষা নিঃশেষে দলিয়া ;—
সুখ স্বার্থ কাম্য কেন রবে ?
কি অভাব দেবতার ?
চাহিতে হবে না, তার
দিতে হবে, মর্ত্ত্যের মানবে
শুধু দিতে হবে ভক্ত সবে—
দেবতা সে যবে।

৪

পূজা আসে প্রত্যাশার সাথে।
এই তব ভক্তদল, হায় !
উচ্চকণ্ঠে স্তব তব গায় ;
আনন্দ কম্পিত হাতে
বাঁধিছে মুকুট মাথে
প্রণমিয়া ; জয়মাল্য গলায় পরায় ;
তার পরে আশা ভরে
হাতখানি পাতে।
এরা যে ভিখারী—কিছু চায় !
উচ্ছ্বসিত অনুরাগে
গোপনে কামনা জাগে
যদি না তা পায়—
(সব আশা মেটে কি ধরায় ?)
কি করিবে বলা নাহি যায়।
হয় তো একদা অকস্মাৎ
বজ্রদৃঢ় উহাদেরি হাত
মুকুটে পাড়িবে ভূমিতলে ;
ঐ পুষ্পমাল্যখানি
তোমারে নামাতে টানি
লোহার শৃঙ্খল হবে, আকর্ষিতে বলে।
দেবতা কি হওয়া যায় ছলে
বাক্‌বলে অথবা কৌশলে ?

অশ্রু

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

সে-বার একাই জগীদিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, যে বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম, সেটা একেবারে সহরের বাইরে, যেন সংসারের অনাদৃত পুত্র। বাড়ীটা একেবারে রেল লাইনের ধারে। রেল লাইনের ওপারেই বাড়ীটার ঠিক সামনেই একটা পাহাড়, বাড়ীটাকে তা'র ভীষণ দৈত্য দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে' দেখ্‌ছে। পাহাড়টাও ছিল দৈত্যের মতই রুক্ষ, কর্কশ। একটা গাছপালাও সেখানে ছিল না। বাড়ীর আর তিন ধার জনমানব-শূন্য প্রান্তর দিয়ে ঘেরা। কেবল একজন চাকর ছাড়া আর কেউ সঙ্গী ছিল না। সে-ই রান্না থেকে আরম্ভ করে' সব কাজ কর্‌তো। আর সঙ্গী ছিল অন্ধকার রাতে ঝিঁঝিঁ-পোকা আর জোনাকি-শিশু। তা'রা তাদের আগুণের ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আমার চারিপাশে আনন্দে নৃত্য করে' বেড়াতো, আর ঝিঁঝিঁ পোকার দল তাদের বাজনা সুরু করে' দিতো—আমি তাই শুন্‌তাম আর মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম, সেই বিচিত্র আলো ও সুরের খেলাতে। জ্যোৎস্না রাতে মাঠের উপর যেন জ্যোৎস্নার বান ডেকে যেতো। আমি বাইরে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে' জ্যোৎস্না স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতাম। কোনো কোনো দিন খেয়াল হ'তো, একটু বেড়িয়ে আসি। অমনি রাত দুপুরেই অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রী হ'য়ে, শুধু লাঠি সম্বল করে' বেরিয়ে পড়্‌তাম, তা' কে জানে জ্যোৎস্না রাত আর কে জানে অন্ধকার রাত। এমনি করে' নিজের খেয়ালেই আমার দিন কাট্‌ছিল, নিঃসঙ্গ বিড়াল-শিশুর নিজের ল্যাজের সঙ্গে খেলা করার মত।

দুপুর বেলা সঙ্গী হ'তো একটি লোক। তা'কে পাগল কি ভাল বল্‌বো, তা' ঠিক করে' উঠ্‌তে পারিনি। তা'র নাম কি তাও জানি না। তবে আমি তা'র নাম দিয়েছিলাম—সব-ভাল। যখনই সে আমার কাছে আস্‌তো তখনই—বাবু সব-ভাল, বলে' বাড়ী ঢুক্‌তো। সেই মধ্যে মধ্যে এসে আমার দুপুর বেলার আসরখানি তা'র আবোল-তাবোল গল্পে জমিয়ে তুল্‌তো। সে বাঙালী।

সে-রাত্রে বড় গুমোট হয়েছিল। পবনদেব বোধ হয় বিশ্বদেবের বিরুদ্ধে কোনো কারণে ধর্ম্মঘট করেছিলেন। একটুও বাতাস ছিল না। ঘরে থাকা অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। আমি বাইরে এসে ঘাসের উপর আমার শয্যা করে' নিলাম। উপরে একাদশী-ক্লিষ্ট একাদশীর খণ্ডশশী ম্লান নিস্তেজ হ'য়ে বিশ্রামের জন্য এলিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ম্লান আলো পৃথিবীর বুকের উপর ব্যথার মত ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীকেও ম্লান ধূসর দেখাচ্ছিল।

এমনি সময় এত রাত্রে হঠাৎ সব-ভাল আমার পাশে এসে বস্‌লো। আমি একটু অবাক হ'য়ে গেলাম। সে কিন্তু অন্য দিনের মত না বকে চুপ করে' বসে' রইলো। তা'র চেহারা কেমন শুকনো, মুখে বেদনার ম্লান আভা, চোখে অশ্রুর ছল্‌ছলে ভাব। আমিও তা'কে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লাম না, চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। দূরে কে একজন করুণ সুরে গেয়ে উঠ্‌লো—

গানের সুরের আসনখানি
পাতি পথের ধারে !
ওগো পথিক, তুমি এসে,
বস্‌বে বারে বারে।

সব-ভাল হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। তার পর আস্তে আস্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাকে বল্‌লে,—বাবু কি ঘুমিয়েছেন ? যদি কিছু মনে না করেন তো আমার জীবনের গল্পটা বলি। আজ প্রাণ বড় হাঁপিয়ে উঠেছে।

আমি প্রথম ভাব্‌লাম যে, এটাও হয় তো তা'র পাগলামির একটা অংশ। কিন্তু মনে কেমন একটা শোনবার কৌতূহল হ'লো, তা'কে বল্‌তে বল্‌লাম। তা'র গল্পের আরম্ভেই আমার মনের সব সন্দেহ দূর হ'য়ে গেল।

এটা যে তা'র জীবনের নিছক সত্য ঘটনা, তা'তে আমার আর সন্দেহ রইলো না। সে ধীরে ধীরে বল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে,—

আমি কোল্‌কাতায় যে বাড়ীতে থাক্‌তাম, তা'র সামনের বাড়ীতে এক ভাড়াটে এসেছিল। শুন্‌লাম, তা'রা আমাদের স্বজাত। ক্রমশঃ তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও যাওয়া আসা, এমন কি নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ভিতর দিয়ে পরিচয় বেশ গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি তখন কলেজে পড়ি। বিয়ে তখনো হয়নি।

সে দিনের রাত ছিল আজকের মতই গুমোট আর গরম। সে রাতও এমনি একাদশীর ক্লান্ত শশধর রাজত্বের রাত ছিল। সেই রাতেই অদেখা অচেনা অবস্থায় তা'র কথার সুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি বাইরে রাস্তার উপরকার বারাণ্ডায় একটা মাদুর পেতে শুয়ে ছিলাম। সামনে ছিল অনন্ত আকাশ, আর চাঁদ। একটু তন্দ্রা এসেছে, এমনি সময় তা'র সুর আমার কাণের কাছে মোহন সুরে বাঁশী বাজিয়ে উঠ্‌লো। সে সুর আমাকে এক অপূর্ব্ব মাদকতার নেশায় মাতাল করে' তুল্‌লে। সে-রাতে আর ঘুম হ'লো না। অনিদ্রার জাগরণের ভিতর দিয়ে নানা ভাবনার জাল বুনে বুনে রাত কেটে গেল। রাত্রে যদিও তা'র চেহারা দেখিনি, তবুও তা'র কথার সুরেই কেমন অবশ মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম। তার পর যেদিন প্রথম দেখ্‌লাম, সেদিন প্রাণে এক নূতন জাগরণের সাড়া পেলাম।

আমার বোনের সঙ্গে তা'র পরিচয় হয়েছিল। তা'র কাছেই পর দিন সকালে পরিচয় পেলাম। এটা তা'র মামার বাড়ী, দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। নাম তা'র অশ্রু।

হ্যাঁ, সার্থক নাম দিয়েছিল তা'র বাপ-মা। অশ্রুর মতই তরল অথচ জমাট নিটোল, শুভ্র টল্‌টলে। আর সেই রকমই সর্ব্বদাই পতনোন্মুখী—যেন এখনই কা'র উদ্দেশে ঝরে পড়্‌বে। ঝরে পড়্‌বার জন্যেই যেন তা'র জন্ম। আর সেই ঝরার আনন্দেই সে মাতোয়ারা। বয়স তা'র সাধারণ মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে।

প্রথম যেদিন তা'র সঙ্গে দেখা হ'লো, সেদিন, তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। আমি বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিলাম। হয় তো তারই দর্শন-প্রতীক্ষায় কি না তা' ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে মধ্যে মধ্যে তা'র দর্শন পাবার আশায় দাঁড়াতাম। অশ্রু একখানি সাদা ডুরে পরে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালো—সদ্যস্নাত অবস্থায়, চুলগুলি খোলা, পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমস্ত পিঠ একেবারে ছেয়ে গেছে। হাতে শুধু গাছ কতক চুড়ী, গলায় একছড়া মটর-মালা হার। আর কোনো গহনা নেই। তা'কে এই আড়ম্বরহীন সজ্জায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বারাণ্ডায় দাঁড়াতেই প্রভাতের সিঁদুর-গোলা আলো তা'র মাথায় সিঁদুরের মতই এসে ছড়িয়ে পড়্‌লো। মুখ লাল হ'য়ে গেল। হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে যেতেই, লজ্জার লালিমা তা'কে আরো রাঙা করে' দিল। সে ঘরে চলে গেল। আমার বুকের ভিতর রেখে গেল তা'র গমনের লঘু গতি-হিল্লোলের ঢেউ।

সেদিন আর তা'কে দেখ্‌তে পেলাম না। অনেকবার তা'র কথা শুনেছি, ততবারই সঙ্গীত-মুগ্ধ হরিণের মত মুগ্ধ-বিস্ময়ে উৎকর্ণ হ'য়ে সেই সুরের ঝঙ্কার শুনেছি। আর ততই তা'কে দেখ্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। দৃষ্টিকে তা'র সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছি; কিন্তু সে ব্যর্থাহত হ'য়ে ফিরে এসেছে—সন্ধান পায়নি। অন্তর ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাবার সকল আশাকে, লোভকে ভগবান কেন এমন বিফলতা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। যাকে যত চাই, সে যে ততই দূরে সরে' যায়, যেন মরীচিকার পিছনে জল ভ্রমে ঘোরা। জানি না, সে ভ্রম ঘুচে কবে সত্য জলের সন্ধান পাবো। আর আকণ্ঠ পান করে' জীবনের এই পাবার তৃষ্ণা নিবারণ কর্‌বো। লুকোচুরি খেলে যে আর জীবন কাটাতে পারি না।

এমনি করেই খোঁজাখুঁজি আর চকিত দেখার তৃপ্তির মধ্যে দিয়েই দিন কাট্‌ছিল। জানি না, সে আমাকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল কি না। আমার কিন্তু তা'কে দেখ্‌বার ও পাবার আশাই মনের মধ্যে সব চেয়ে বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

দুই

তার পর জানি না, প্রজাপতি দেবের কোন নির্ব্বন্ধে, তা'র সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চল্‌তে লাগ্‌লো।

না যে কি রকম আনন্দ হ'লো, তা' বল্‌তে পারি না। তার পর যেদিন তা'র বাড়ীতে তা'কে দেখ্‌তে গেলাম, সেদিন যে কি দেখ্‌লাম, তা' বল্‌তে পারি না। এর আগে তা'কে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সেদিন সেই প্রভাত অরুণ-রাগ-জড়িত মুখের লালিমা আমার মনের যেন একটা ছবি ফুটিয়ে তুল্‌লে। সে ছবি যেন শুধু সেই সম্ভব, আর কারো হ'তে গেলেই যেন তা'তে খুঁৎ থেকে যাবে। বিয়ের কথা ঠিক হ'য়ে গেল।

তখনকার মনের অবস্থা ঠিক বোঝাতে পার্‌বো না। আনন্দ হয়েছিল যে, কি কর্‌বো ঠিক কর্‌তে পারিনি। না থাক্‌লেও বিনা কাজে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এটা যে ভাব্‌তেও পারি নি যে, তা'কে পাবার আশা এমনি করেই সফল হ'বে, আর তাকে এমনি করেই এত কাছে আপনার হ'তে আপনতম করে', হৃদয়ের নিভৃত দেবীর আসনে বসাতে পার্‌বো। কিন্তু তবু এটা সত্য হ'লো।

বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তা'কে আর এক রূপে দেখ্‌লাম। সে মূর্ত্তি ঠিক মহিমান্বিত দেবীর মূর্ত্তি উপেক্ষার সামগ্রী নয়। এ যেন শক্তিময়ীর বিভিন্ন মূর্ত্তি খানার মত। তা'র ভিতর নানা রূপের প্রকট দেখ্‌তে পেলাম। কিন্তু যতই তা'কে নিকটে অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লাম, ততই তা'কে দূরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। কাছে তা'র উপর যেন কিছুতেই ধর্‌তে পারছি না, এমনি মনে হ'তে লাগ্‌লো। পরজীবনে তা'কে পাবো না বলেই কি এই রকম মনে হয়েছিল? কে জানে কেন।

ফুলশয্যার রাত্রে প্রিয়জনদের আড়িপাতা কাণ বাঁচিয়ে, সোহাগ পরিচয়ের মৃদুগুঞ্জন আমার কাণে, ঠিক নিশুতি রাতে কোন্ এক কোমল-করাঙ্গুলি-আহত সেতার-তারের মত লাগ্‌ছিল। তা'র মধ্যে লজ্জার দ্বিধা এতটুকু ছিল না। যেন কত পরিচিত। চিরকালই যেন সে আমার কাছেই আছে; আমার জন্যেই যেন সে সৃষ্টি। সত্যই তো তাই। বিধাতা কোন্ এক অনাদি অতীত কালের এক অজানিত শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের দুজনকে এক করে' দিয়েছেন। সে জোড় তো ভাঙ্‌বার উপায় নেই—তারও নেই, আমারও নেই। কাজেই আমরা যে সেইদিন হতেই উভয়ে উভয়ের কাছে পরিচিত। লজ্জা কুণ্ঠা তো আমাদের দু'জনের কাঁছে কিছু থাক্‌তে পারেই না। এইটাই যে বিশ্বনিয়ম। সেই নিয়মের আজ্ঞাধীন হয়েই আমাদের পরিচয় জমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

তার পর যখন অশ্রু আমায় তা'র খোঁজে বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে একটু অনুযোগ কর্‌লে, তখন কিন্তু আমার মনে বেশ গর্ব্বের উদয় হ'লো। বল্‌লাম—তুমি কি বুঝ্‌বে, কেন আমি আমার এই মানসীকে দেখ্‌বার জন্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম। আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে জন্ম-জন্ম প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। তুমি তো আর ভালবাস না, কাজেই নিজেকে আমার দৃষ্টির বাইরে রেখেছিলে। কিন্তু ওগো, অন্তর-বাসিনী, অন্তর হ'তে তো তুমি সরে যেতে পারো নি। সেখানকার আসনে যে তোমায় অটল নিশ্চল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে' দেবীর আসনে বসিয়ে রেখেছি। সাধ্য কি সেখান হ'তে সরে' যাও।

আমার এই লম্বা বক্তৃতায় অশ্রু লজ্জিতা হ'য়ে উঠ্‌লো। দু'টী গাল পলাশ ফুলের লালিমায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। চোখ নত করে' বল্‌লে—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু। তোমার সঙ্গে আর কথা কইবো না। কে তোমাকে এত বক্তৃতা দিতে বল্‌ছে বল তো। আমি যা তাই হ'য়ে থাক্‌তে চাই। ওসব দেবী টেবী হ'তে পার্‌বো না, তা' বলে দিচ্ছি।

এমনি করেই আড়ি-ঝগড়ার দোলন-দোলায় আমাদের রাত ফুরিয়ে গেল। পাখীরা প্রভাতের আগমনী ঘোষণা করে' উঠ্‌লো। ঊষাদেবী লজ্জারক্তিম হয়ে উঠ্‌লেন—সূর্য্যদেব পাছে তাঁকে এই রাত্রি-বাসর-জাগরিত আলু-থালু অবস্থায় দেখে ফেলেন এই ভয়।

অশ্রু উঠে' বাইরে চলে' গেল। যাবার সময় তা'র খোঁপায় জড়ানো যুঁয়ের মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে গেল। কেশের সুরভি-সিক্ত যুঁয়ের গন্ধ আমাকে আকুল করে', মাতাল করে' দিলে। সে চলে যেতেই আমি চুপ করে' শুয়ে শুয়ে নানা ভাবনায় আপনাকে তলিয়ে দিলাম।

এমনি করেই সুখের ভিতর দিয়েই দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। আমাদের দুই তরুণ-তরুণীর জীবন-তারের ঝঙ্কার একই সুরে মিলন-গীত গাচ্ছিল। কিন্তু বেশী দিন

সে রকমে কাট্‌ল না। কয়েক বছর কাটার পর, ঠিক যখন দুজনের ভালবাসা গভীর হ'য়ে উঠ্‌ছে, এমনি সময় কোথা দিয়ে একটা অশান্তির ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিলে।

অশ্রু আজকাল থাকে থাকে কেমন চিন্তান্বিতা হ'য়ে পড়ে'। মুখের হাসি কোথায় লুকিয়ে গেল। চোখে অশ্রু সদাই পতনোন্মুখী হ'য়ে ওঠে। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে কোনো উত্তর পাই না। কেবল চোখ তা'র সজল ছল্‌ছলে হ'য়ে উঠে। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে আরম্ভ করে। কোথায় যে তা'র ব্যথা, আর কিসের জন্যে যে তা'র এই আকুল বুক-ফাটা কান্না সর্ব্বদা আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছে, তা' এত কাছে থেকেও ধর্‌তে পার্‌লাম না। কি এমন গোপন ব্যথা, যা সে আমার কাছে পর্য্যন্ত বল্‌তে সঙ্কুচিতা হ'চ্ছে? কিন্তু নারী যখন তা'র প্রাণের কথা গোপন করে, তখন তো এমনি করেই করে। কারো কাছেই প্রকাশ করে না। বাইরে থেকে মনে হয়, যেন সে নিজের কাছেও গোপন করে' রেখেছে। কি জানি কেন, আমার মনও খারাপ হ'য়ে গেল।

ক্রমশঃ সে সাবধান হ'য়ে উঠ্‌লো। আমার সাম্‌নে সে তা'র মনের ভাবকে জোর করে' চেপে রেখে দিতো—এটা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু চাপতে পার্‌তো না,—তা'র চোখে মুখে সারা দেহে ব্যথার শিহরণ কম্পিত হয়ে উঠ্‌তো। তা'তে আমার মনে হ'তো যে, সে আরো বেশী করে' নিজেকে আহত কর্‌ছে, ক্ষত বিক্ষত কর্‌ছে। কেন, সেই জানে। আমি এত চেষ্টা করেও বেদনার মূল খুঁজে পাই নি। অনুনয় বিনয়, এমন কি, তিরস্কার পর্য্যন্ত করেছি, তবু জান্‌তে পারি নি। শুধু সে আমার মুখের দিকে বেদনা-কাতর দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাক্‌তো, আর আমাকে বাধ্য হয়েই চুপ কর্‌তে হ'তো।

সেদিন কি কাজে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। যখন বাড়ী ফির্‌লাম, তখন টিপ্ টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়্‌ছে। ঘরে ঢুকে দেখি, অশ্রু জান্‌লায় চুপ করে' বসে' আছে, বাইরের দিকে মুখ করে'। দু'চোখে অশ্রুবিন্দু মুক্তা-দুলের মতন টল্ টল্ করে' উঠে' তা'র গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়্‌ছে। প্রকৃতি রাণীও তা'র দুঃখের বেদনায় মর্ম্মাহত হ'য়ে কাঁদ্‌ছিলেন—বৃষ্টি-ধারায়। আমি পিছনে এসে দাঁড়াতেও অশ্রু টের পেলে না, এমনি অন্যমনে সে বসেছিল।

আমি তা'র কাছে বসে, তা'র চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিতেই, সে প্রথমে চম্‌কে উঠ্‌লো, তার পরই আত্মহারা হ'য়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে আমার বুকের উপর লুটিয়ে পড়্‌লো। খানিক এই রকম অবস্থায় কাট্‌বার পর, অশ্রু নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে কোনো কথা না বলে' দ্রুত হ'তে বেরিয়ে চলে গেল। আমি সেইখানেই স্থাণুর মত নিশ্চল হ'য়ে বসে' রইলাম।

বসে' এলো মেলো ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ মনে হ'লো, অশ্রু কি আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে নি, আর সেই জন্যেই কি সে নিজের সঙ্গে লড়ে' দ্বন্দ্ব করে' নিজেই আহত হ'চ্ছে? কতদিন দেখেছি যে, রাত্রে আমি ঘুমিয়েছি মনে করে সে বাইরে চলে' গেছে, সন্তর্পণে পা টিপে টিপে। আবার কিছু পরে তেমনি ভাবে ফিরে এসে বিছানায় পড়ে' আকুল আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠেছে, যেন এই মাত্র সে নিজের সঙ্গে একটা মস্ত লড়াই করে' জয়ী হ'য়ে এসেছে, আর সেই জয়লাভ কর্‌তে তা'কে আহত, মূর্চ্ছিত হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। এ জয়ের চেয়ে যেন পরাজয়ই ছিল ভাল।

মনে হলো, সে কি আর কাউকে ভালবাসে? এ কথা মনে কর্‌তেও আতঙ্কে গা শিউরে উঠ্‌লো। তা'র মতন সরলতার মূর্ত্তির ভিতরটা যদি পিশাচীর লীলা-নিকেতন হয়, তা' হ'লে তো জগতে কাউকে বিশ্বাস কর্‌বার যো নেই। না, সে যে একেবারেই অসম্ভব! দেবী কি করে' এতখানি নিম্নগামিনী হ'য়ে পাপের পঙ্কিল জলে ডুব্‌তে পারে! এ আমারই ভ্রম। তা'র ব্যথা বলি বলি করেও সে বল্‌তে পার্‌ছে না, এটা বেশ বুঝতে পারতাম। কিন্তু সেই ভাবটাই আমার মনে সময় সময় সন্দেহ জাগিয়ে তুল্‌তো।

অশ্রু দিন দিন শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তা'র সেই নবীন মঞ্জরিত তন্বী দেহখানির আর সে শোভা রইল না। গাছ যেমন গ্রীষ্মের দারুণ পীড়নে সব পাতা ঝরিয়ে দিয়ে, রিক্ত দৈন্যতায় শুধু তা'র নীরস কাঠামোখানাকে কষ্টে সৃষ্টে খাড়া করে' রাখে, অশ্রুও ঠিক তেমনি করে' নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

আমি অশ্রুর কাছে দিন কতক বাইরে বেড়িয়ে আসবার

প্রস্তাব কর্‌তেই, সে খুব আগ্রহের সঙ্গে মত দিলে। আমিও তা'কে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

তিন

এই জলধিতেই এই বাড়ীতেই এসে উঠ্‌লাম। অশ্রুর কি আনন্দ! যেন খাঁচার পাখী আজ মুক্তির আনন্দে, সীমা ছেড়ে অসীমের দিকে উড়ে চলেছে। রাত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে গল্প আমোদের ভিতর দিয়ে তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো। সে সব ভাবনা অশ্রু একেবারে ভুলে গেল। কত জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী আমরা বিনিদ্র অবস্থায় এই ঘাসের উপর শুয়ে, এলোমেলো গল্পের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আজ যে গান শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, সেই গানটাই ছিল অশ্রুর বড় প্রিয়। রাত্রে আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে এই গান যখন সে গাইতো, তখন সত্যই আমার মনে হ'তো, যেন আমি কোন্ স্বপন-পুরীর রাজকন্যার দেশে এক অচিন্ রাজপুত্র এসেছি। রাজকন্যার প্রেমে, গানে, রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছি।

কতদিন অশ্রু আমার এই অপটু কণ্ঠে সুর আনাবার জন্যে চেষ্টা করেছে। আমার অক্ষমতায় দু'জনেই হেসে উঠেছি। এমনি করেই নিত্য নূতন আনন্দের ভিতর দিয়ে আমার প্রিয়কে প্রিয়তম রূপে আবার ফিরিয়ে পেলাম। মন বলে' উঠ্‌লো,—ওগো প্রিয়, সাধ্য কি তোমার যে, দূরে সরে' থাক। সীমা দিয়েই যে তোমাকে অসীম করে' রেখেছি—পালাবার উপায় কোথায়।

সেদিন একটু ভোরেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অশ্রু তখনো ঘুমে অচেতন। নিশ্বাসের মৃদু স্পন্দনে বক্ষ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। দু' একটা অসংযত চূর্ণ-কুন্তল কবরীর বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে মুখের এখানে সেখানে এসে পড়েছে। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়্‌লো তা'র চোখের উপর। সেখানে শুকনো-ঝরা অশ্রু তা'র স্মৃতিটুকু রেখে গেছে—গালের উপর ঝরে পড়ে' শুখিয়ে দাগ হ'য়ে আছে। আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। তবে কি সে এখনো নিজেকে ভুলাতে পারে নি! কেবল আমাকে ভোলাবার জন্যে ঐ সরলতার মুখোস পরে' সে এত দিন বেড়িয়েছে! সমস্ত মন ঘৃণায় লজ্জায় ছি ছি কর্‌তে লাগ্‌লো।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুট্‌ছিল। রাতকে প্রায় দিন বলে' ভ্রম হচ্ছিল। পাশে অশ্রুকে দেখ্‌তে পেলাম না। ভাব্‌লাম, বাইরে কোথায় গেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল তবু সে ফিরে' এলো না। তখন উঠে' বাইরে বারাণ্ডায় বেরিয়ে আস্‌তেই দেখ্‌তে পেলাম, এই মাঠে ঘাসের উপর অশ্রু বসে' আছে, আর তা'র হাতটা হাতের মধ্যে ধরে তা'র গা ঘেঁসে বসে' এক তরুণ। দূরের জন্যে তা'র মুখ ঠিক স্পষ্ট দেখা গেল না। আমার চোখের সাম্‌নে সব ধোঁয়ার মত হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে হ'লো পায়ের তলার জমী সরে' গেল। আমি পড়্‌তে পড়্‌তে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

অশ্রু তা'কে কি বোঝাতে লাগ্‌লো। কিন্তু তরুণ ক্রমশই উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌তো লাগ্‌লো। মনে হ'লো, অশ্রু কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তা'তেও তা'কে শান্ত কর্‌তে পার্‌লে না। অশ্রু তা'র হাতে ধরে' কত কি বলে' যেতে লাগ্‌লো, সেগুলো ঠিক বোঝা গেল না। কেবল দূর থেকে মূক অভিনয় দেখে আমি এইগুলো অনুমান কর্‌ছিলাম মাত্র। যুবক ক্রমশঃ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে' অশ্রুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে আঁচল থেকে কি খুলে নিয়ে চলে গেল। অশ্রুর কি হ'লো ফিরেও দেখ্‌লে না। অশ্রু সেইখানেই লুটিয়ে পড়ে' কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পার্‌লুম না, হাত পা অবশ শিথিল হয়ে এলো, শরীর ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌লো। মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বিছানার উপর এসে শুয়ে পড়্‌লাম। এই জন্যেই অশ্রু আমার কাছে ঠিক আমার মত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ছিল না। গোপনে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন-কামনাই তা'কে উত্তেজিত করে' তুলেছে। মাঝখানে আমি থাকাতেই যত গোল। এর একটা বোঝাপড়া করা উচিত। এতে সেও সুখী হ'বে না, আমিও না। তা'র সঙ্গে যে এতদিন এক সঙ্গে কাটিয়ে এসেছি, এসব মনে কর্‌তেও গা ঘিন ঘিন্ কর্‌তে লাগ্‌লো।

উপকথায় শুনেছি রাক্ষসীরা মানবীর রূপ ধরে এসে মানুষের কাছে বাস করে' ক্রমশঃ তার সকল রস শোষণ করতো, এও যে ঠিক সেই রকম। কালই এর বিহিত

কর্‌বো। এক একবার মনে হ'লো, তাও কি কখন সম্ভব হ'তে পারে। অশ্রু যে অশ্রুর মতই শুভ্র পবিত্র। পঙ্কিলতা তো তা'র ভিতর স্থান পেতে পারে না। কিন্তু মন তখন এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল যে, এ সমস্ত বিচার করে' দেখ্‌বারও ক্ষমতা ছিল না। থাক্‌লে হয় তো জীবন এ রকম ছন্ন-ছাড়া হ'য়ে যেতো না। সে সব ভাবনা কোথায় যেই হারিয়ে গেল। ভাব্‌লাম, এখনি অশ্রু এসে আমারই পাশে শোবে। কিছুতেই তার সঙ্গে শুতে ইচ্ছে কর্‌ছিল না। এতদিন না জেনে যে কাজ করে' এসেছি, আজ থেকেই তা'র প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'বে। কি করে' তাকে বারণ কর্‌বো তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। ভাবা যত সহজই হোক না কেন, তা'কে মুখে বারণ করা যে কত শক্ত, তা' বোধ হয় আমার চেয়ে আর কেউ জান্‌তো না।

ভাবনার নাগর-দোলায় যখন এই রকম দুল্‌ছি, ঠিক এমনি সময় অশ্রু চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরে এসে ঢুক্‌লো। কোনো দিকে না তাকিয়ে, ঘরের মেঝের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে ফুপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমিও ভাব্‌লাম, যাক্, বাঁচা গেল। অপ্রিয় সাধন আর নিজেকে কর্‌তে হ'লো না। সে রাত অনিদ্রার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল।

পরদিন সকাল সকাল উঠে' পড়ে' ভাব্‌লাম, আজই যা হোক একটা হেস্ত নেস্ত করে' ফেল্‌বো, এরকম আর পোষায় না। কিন্তু কাজে তা' পার্‌লাম না। অশ্রুর সঙ্গে সেইদিন থেকে কথা একেবারে বন্ধ করে' দিলাম। সে কাছে এলে কাজের অছিলায় উঠে' যেতাম। তবু কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌তাম না। অশ্রুও আমার এই ব্যবহার দেখে কেমন মুষ্‌ড়ে পড়্‌লো। সেও কিছু বল্‌তে পার্‌তো না। সদাই আমার কাছ হতে দূরে সরে' থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌তো। এতে আমিও যেন কতক নিশ্চিন্ত হলাম।

চার

এই রকম আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলার মত—উভয়ের ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দুজনে আলাদা হ'য়ে থাক্‌তে লাগ্‌লাম। ক্রমে এটা এত বিশ্রী ঠেক্‌তে লাগ্‌লো নিজেদের চোখেই, যে, বেশী দিন এ রকম কর উচিত নয়, তা' বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম। তবুও এই সংশ যবনিকা তুলে' আলো বা আঁধারের দৃশ্যে কিছু পৌঁছতে পার্‌লাম না। অশ্রুর সেই আড়ো-আ ছাড়ো-ছাড়ো ভাব এতই বিসদৃশ ঠেক্‌তে লাগ্‌লো আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। তা'র সেবা-যত্ন ভ্যাঙ্‌চানো মনে হ'তে লাগ্‌লো। এগুলো তো প্রাণ থেকে কর্‌ছে না। আর আমারও তো তার সেবা-যত্ন নেবার কোনো অধিকার নেই। আমার গা বমি-বমি কর্‌তে লাগ্‌লো। অথচ মুখে বারণ কর্‌ পার্‌লাম না যে, তুমি এসব করো না। এই রকম অভিনয়ের ভিতর দিয়েই দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

সকালবেলা বাইরে বসেছিলাম। আজ এ স্থির নিশ্চয় করেছিলাম যে, অশ্রুর সঙ্গে আজকেই সম্বন্ধের শেষ রেখা টেনে দেবো। কাউল, কাল রা আবার সেই দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখেছি। অশ্রু জা যে, আমি এ সমস্ত কিছুই জানি না। আমার ভাবে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌তো না যে, কেন আমি এ রকম কর আর বেশী দিন এ রকম ঢাকাঢাকি ভাল নয়। বসে' ব এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাথাটা ক্রমেই গরম উঠ্‌তে লাগ্‌লো। উঃ! যাকে ভালবেসে, জীব শ্রেষ্ঠ দান ভেবে, বুকের উপর তুলে নিয়েছিলাম, আ সেই কি না অবহেলে ছুরি তুলে খুন কর্‌তে উদ্যত হয়ে কাকে তা হ'লে বিশ্বাস করা যায়!

ঠিক এমনি সময় আমার জলখাবারের থালায় সাজি সদ্যস্নাতা অশ্রু আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। চম্‌কে উঠ্‌লো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নি কঠোর স্বরে বল্‌লাম,—দেখ অশ্রু, তোমার এই বিমর্ষ কারণ আমি জান্‌তে পেরেছি। দু'দিন তোমায় গোপ অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বল্‌তে দেখেছি—তাও আ নিশুতি রাতে, আমাকে ঘুমন্ত ভেবে,—যাক্, আমি ত কোনো কৈফিয়ৎ তোমার কাছে চাই না। তুমি যা ভ বুঝেছো তাই করেছো। এখন তুমি কি কর্‌তে চাও ব আমি তাই কর্‌বো। আশা করি, তুমি কতকগুলো মি কথা বলে' নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা কর্‌বে না কারণ, আমি যা নিজের চোখে দেখেছি, তা' হা

বল্‌লেও অবিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো না। কাজেই আর এর উপর কতকগুলো মিথ্যা কথা কয়ে পাপ বাড়িয়ো না।

অশ্রু আমার কথা শুনে একবার চম্‌কে উঠ্‌লো। তার পরই স্থির নিশ্চল হ'য়ে গেল। আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলো। চেহারা সাদা ফ্যাকাশে—যেন শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি। খাবারের থালা হাত হ'তে ঝন্ ঝন্ করে' পড়ে গেল। তারই শব্দে সে চম্‌কে উঠ্‌লো, যেন এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল। আমার দিকে একবার চাইলে—সে দৃষ্টি এখনো ভুল্‌তে পারিনি,—চেয়ে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে সেখান হ'তে চলে গেল!

আমি সেইখানে অবশ হ'য়ে বসে রইলাম। খানিক পরে নিজেকে আর সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌লাম। ওরে, তোকে বড় বেশী ভালবাসতাম বলেই কি এমনি করে' তা'র প্রতিদান দিতে হয়! আমার জীবন যে একেবারে দুর্ভর হ'য়ে উঠ্‌লো! জীবন আমার কাটবে কি করে'!

এমনি করেই দিন কেটে গেল, রাত এলো। অশ্রুর আর কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না; এমন কি রাত্রেও। মন ছট ফট কর্‌তে লাগ্‌লো। তা'কে অবিশ্বাস কর্‌তেও যেন প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছিল। সে নিজে তো গেলই, আমাকেও কি পাগল করে' দিয়ে যাবে? দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে রাত কেটে গেল। সকালেও অশ্রুর যখন কোনো সাড়া পেলাম না, তখন মনে কেমন সন্দেহ হ'লো।

এঘর ওঘর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে শেষে একটা কোণের ঘরে দেখ্‌তে পেলাম, অশ্রু চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে—নিশ্চল নিস্তব্ধ, যেন ঘুমুচ্ছে। আমি কাছে এগিয়ে আস্‌তেই যা দেখ্‌লাম, তাতে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলে গেল। অশ্রুর মুখ মৃত্যু-মলিন, দেহ হিম-শীতল। চোখের কোণে ব্যথার জমাট অশ্রু। বুকের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। আমি এমনি নিষ্ঠুর যে, তখনো মনে হ'লো বেশ হয়েছে, নিজের পাপ নিজে ঢেকে চলে' গেছে। কৌতূহলী হ'য়ে চিঠিখানা সেইখানে বসেই পড়্‌তে লাগ্‌লাম। চিঠিতে সে লিখেছিল যে,—আমরা দু'ভাই বোন ছিলাম—আমি ছোট, ভাই বড়। বাবা মারা যাওয়ার পর ভাইয়ের স্বভাব চরিত্র খারাপ হ'য়ে যায় এবং সে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে চলে' যায়। সেটা তুমিও জান বোধ হয়। তার পর তা'র কথা এক রকম সকলেই ভুলে যায়। কয়েক মাস হলো আবার সে ফিরে এসেছে—রিক্ত দৈন্যে জর্জ্জরিত হ'য়ে, পথের কাঙাল হ'য়ে। কিন্তু স্বভাব বদ্‌লাতে পারে নি। শুন্‌লাম, এর উপর' আবার বিয়ে করেছে, একটি ছেলেও হয়েছে। জানি না, কোন্ অভাগিনী তা'কে বরণ করেছে। তুমি জানো যে, ভাইকে আমি কত ভালবাসতাম। সে-ই মধ্যে মধ্যে রাত্রে গোপনে এসে আমার কাছে টাকা চাইতো। আমি কত বারণ করেছি, টাকা দিতে চাইনি, তবু সে জোর করে' কেড়ে নিয়ে গেছে। যেদিন কিছু দিইনি, সেদিন মেরেছে পর্য্যন্ত। সব চেয়ে আমার দুঃখ হ'তো তা'র হতভাগিনী স্ত্রীর জন্যে, আর অভাগা ছেলেটার জন্যে। এই ভাব যেদিন তা'র কাছে ধরা পড়ে' গেল, সেদিন হ'তে সে এক নূতন পথ ধর্‌লে—স্ত্রীর কাছ হ'তে আমার নামে চিঠি নিয়ে আস্‌তো। আমি সব ভুলে তা'কে টাকা দিতাম। জানি, সে টাকায় সে কতখানি সদ্ব্যবহার কর্‌তো। শুধু সেই অভাগিনীর জন্যেই তাকে সাহায্য কর্‌তাম। প্রায় রোজ রাত্রেই সে চোরের মত আস্‌তো। তোমার কাছে প্রকাশ করিনি, পাছে তুমি টাকা দিতে বারণ করো। আর তা'ছাড়া, ভাইয়ের কলঙ্ক, বংশের কলঙ্ক তোমার কাছেও প্রকাশ কর্‌তে সাহস হয়নি—অন্যের কাছে তো দূরের কথা। নারীকে ভগবান এইখানেই যে কেন এত দুর্ব্বল করেছেন, তা' তিনিই জানেন। যেখানে তা'র নিজের স্বার্থ জড়িত, সেখানেই সে দুর্ব্বল। তুমি সেদিন আমায় কলঙ্কের ছোপে রঙিয়ে তুল্‌লে, তখনো বল্‌তে সাহস করিনি, আর বল্‌লে তুমিও হয় তো বিশ্বাস কর্‌তে না। কারণ, তোমার মনের গতি তখন অন্য দিকে। নিজের ভাইয়ের জন্যে নিজের সঙ্গে এত দিন যুদ্ধ করে' এসেছি, কি কর্‌বো ঠিক কর্‌তে পারি নি। তোমার কথা আমায় পথ দেখিয়ে দিলে। মিথ্যা কলঙ্কের ছোপ তুল্‌তে প্রমাণ দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই; আর তোমার কাছে কলঙ্কিনী হ'য়ে থাকা ও এই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। তাই আজ সকলের কাছে নিজেকে নত করে' মৃত্যু বরণ করে' নিলাম, ক্ষমা কোরো। পড়্‌তে পড়্‌তে চোখ জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল। সত্যই আমার মনের অবস্থা এমনি হয়েছিল যে, সে সত্য কথা বল্‌লেও আমি

TIGHT BINDING.

বিশ্বাস কর্‌তাম না। আজ তাই অশ্রু মরণ বরণ করে' সকল মিথ্যার সত্য প্রমাণ দিয়ে, সত্যলোকে চলে' গেল—সকলের কলঙ্ককে নিজের পুণ্য জ্যোতিতে ধন্য করে'। আমি আর নিজেকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। তা'র দেহের উপর লুটিয়ে প'ড়ে, অশ্রুর ধারায় তার ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লাম, যদিও ক্ষমা চাইবার আমার অধিকার ছিল না।

সেই দিন থেকে আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াতাম। রাত্রে এক এক দিন উঠে চীৎকার করে' কাঁদ্‌তাম। যখন কাছে ছিল, তখন অশ্রুকে দূরে দেখেছি,—আজ দূরে গিয়ে তা'কে কাছে পেয়েছি।

রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। বাইরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময় দেখ্‌লাম অশ্রুর ভাই চোরের মত বাড়ীতে ঢুক্‌ছে। মনে হ'লো, ওরে হতভাগা, আর কি তুই সে করুণাময়ীর দেখা পাবি। তুই ও তোরই মত আর একজন তা'কে মৃত্যুর দোরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। আর তা'র দেখা পাবি এত পুণ্যের জোর তোরও নেই—আমারও নেই। বৃথাই খোঁজাখুঁজি। মন কঠোর হ'য়ে উঠ্‌লো যে, ওর জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা। ছুটে গিয়ে পিছন থেকে তা'র গলা দু'হাতে প্রাণপণ বলে চেপে ধর্‌লাম। কিন্তু তখনি মনে হ'লো, অশ্রু যে একে বড় ভালবাস্‌তো। হাতের টিপুনি শিথিল হ'য়ে গেল। সে মুক্ত হয়েই ছুটে পালিয়ে গেল। হতভাগা বুঝ্‌তেও পার্‌লে না যে, সেখানে কি হ'য়ে গেছে। কত বড় ত্যাগের মহিমান্বিত মূর্ত্তি আজ বিসর্জ্জন দিয়েছি—দেখেছি শুধু স্মৃতির বাঁধনে পূর্ণ ঘটে তা'র আসন পূর্ণ করে'। মন আবার শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, না, ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়নি, শেষ করে' দেওয়াই উচিত ছিল। তা হ'লে সব দিকেই ভাল হ'তো—কিন্তু না, সব ভাল।

এই পর্য্যন্ত বলেই সব-ভাল আস্তে আস্তে উঠে' চলে' গেল, রেখে গেল শুধু একটা দুঃখের ভারী হাওয়া। রাত তখন শেষ হ'য়ে এসেছে। দূরে কোথায় একটা রাত-চরা পাখী কি এক অস্ফুট করুণ সুরে কাত্‌রাচ্ছিল—হয় তো তা'র প্রিয়ার বিরহ বেদনা জানাচ্ছিল। আমি সেইখানেই সেই পুণ্যের স্মৃতি-সৌধের দিকে মুগ্ধ ভক্তের মত চেয়ে বসে' রইলাম।



"আজকালকার বাবুদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ আর কর্‌বার যো নাই,—বলে টেরী খারাপ হোয়ে যাবে।"

"তেমনই আবার জানেন,—আজকালকার বৃদ্ধদের ও পায়ের ধুলো নেবার যো নাই,—পায়ে মোজা আঁটা।"

জম্মু-যাত্রা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা বেলা সাড়ে দশটায় কাল্‌কা এক্সপ্রেসে আমি জম্মু যাত্রা করি। প্রয়াগে অর্দ্ধ-কুম্ভ মেলা, যাত্রীর ভিড় যথেষ্ট। মোগলসরাইএ অসংখ্য লোক উঠিল, তোর চারটায় এলাহাবাদে গাড়ী প্রায় খালি হইয়া গেল। কেবল কনোজের একটী আতর-ব্যবসায়ী কলিকাতা হইতে সপরিবারে দেশে যাইতেছিলেন, তিনিই আমাদের সহিত কানপুর পর্য্যন্ত গেলেন। ইহাঁর সহিত 'রু' 'মতিয়া' 'বেলা' প্রভৃতির সম্বন্ধে নানা আলাপ হইল। দিল্লীর পথে গাজিয়াবাদে এক বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর সঙ্গে খানিক মিলন ও বাঙ্গলা কথা হইয়াছিল; আর সারাপথ বাঙ্গালী সঙ্গী পাই নাই।

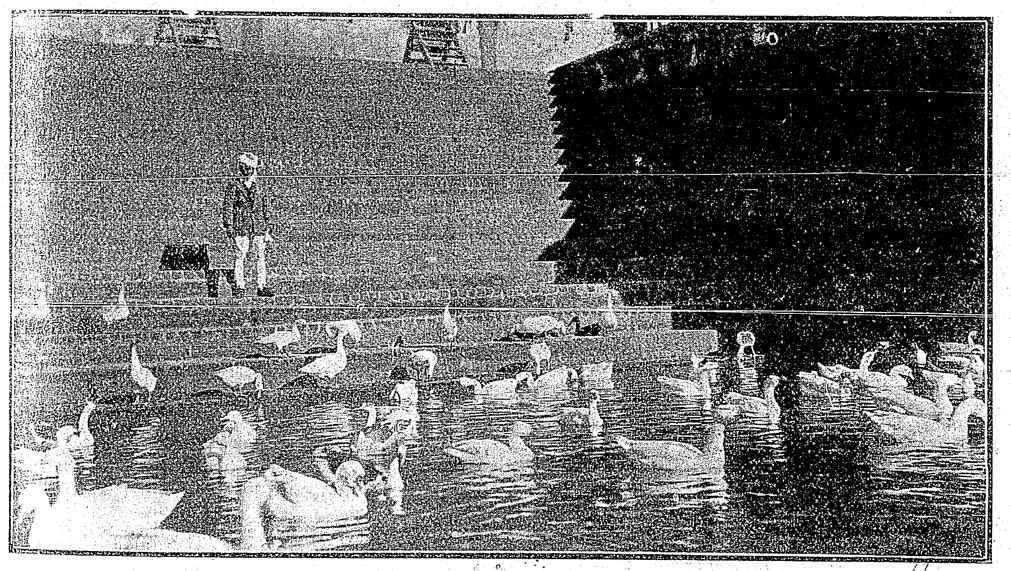

মরাল সরোবর

"যাইতে মানস সরে কারো না মানস সরে
আছে তারা এমনি আরামে"

দিল্লী ষ্টেশন খুব বড়। এখানে একদল ফকির গান করিতেছিল, কি ভাষায় তা জানিনে; শ্রোতা ছিল কতক-গুলি নেপালী। গানের সুরটী যে কি মিঠা, তাহা বলিতে পারি না, এখনো কাণে ও প্রাণে তাহার রেশ লাগিয়া আছে। দিল্লী হইতে অম্বালা রাত্রে যাই, কিছুই দেখিতে পাই নাই। অম্বালায় রাত্রি পাঁচটায় মেল ধরি, এবং দুইজন শিখ, ও একজন শিয়া জমিদারের সহিত আলাপ করিতে করিতে অমৃতসর ও জালন্ধর পর্য্যন্ত যাই। এ পথটী আমার বড় সুন্দর লাগিয়াছে। পাশ দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড—আমাদের সেই পরিচিত রাস্তা একসঙ্গে চলিয়াছে,—যেন এ অচেনা দেশে একটা চেনা লোক। জালন্ধরে অনেক-গুলি স্ত্রীলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। এখান আর্য্য সমাজের খুব প্রভাব, তাহার চেষ্টায় পর্দ্দার কড়াকড়ি কমিয়াছে। অনেক মহিলা সার্ট জুতা ষ্টকিং প্রভৃতি পরিয়া রেলে প্রকাশ্য ভাবে যাতায়াত করেন। সঙ্গে

একখানি ওড়না থাকে, তাহাই গায়ে ও মাথায় দেন। তবে বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারে এখনো পর্দ্দার খুব কড়াকড়ি শুনিলাম। এখানে একটী দৃশ্য আমার বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। আমাদের গাড়ীতে প্রথমে একটী যুবতী ও তাঁহার স্বামী উঠিলেন। যুবতীর বয়স ১৬।১৭, গৌরাঙ্গী, চমৎকার সুন্দরী; মুখের চোখের সৌন্দর্য্য অনবদ্য। স্বামীটীর আকৃতি পরুষ, রুক্ষ, সৌন্দর্য্যের বা লাবণ্যের লেশ

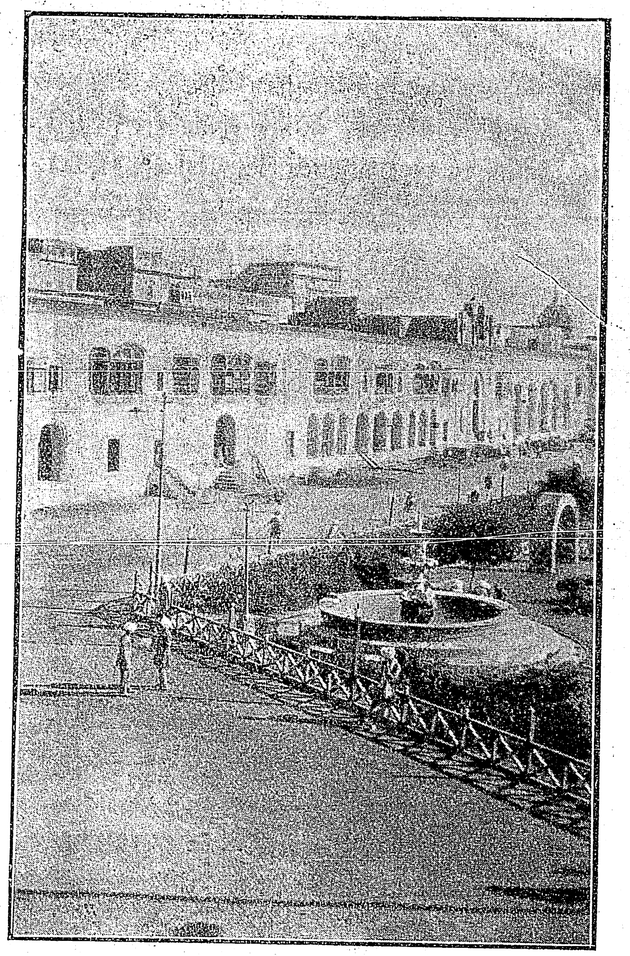

মহারাজার অন্দরমহল

নাই। সাহেবী পোষাক, কিন্তু সাহেবী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তমাল পাশে কনকলতার উপমায় আমরা অভ্যস্ত; কিন্তু এখানে শিমুল গাছে কনকলতার উপমাই ঠিক মানাইত।

তাঁহারা দুইজনে একটী বেঞ্চে পাশাপাশি বসিয়া কত কথাই কহিতে লাগিলেন,—তাঁদের স্ফুট অস্ফুট গুঞ্জন যেন আর শেষ হয় না। চোখ চাওয়াচায়ি, মুচকি হাসির বিরাম নাই। কিছুক্ষণ পরে একজন অর্দ্ধ-বয়সী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও পুত্র লইয়া সেই গাড়ীতেই উঠিলেন। তাঁর স্ত্রীও রূপসী; যৌবনে তিনিও অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। এখন ছেলেদের দেহে সে লাবণ্যের আভাস লাগিয়া আছে। তাঁহারা দুজনে মুখোমুখি বসিয়া মধ্যে মধ্যে নব দম্পতির পানে কটাক্ষ করেন, আর পরস্পর চক্ষু টিপিয়া মৃদু হাসেন, যেন ইঙ্গিতে বলিতে চান, "সেদিন গেল বৈয়া বঁধু, সেদিন গেল বৈয়া" সে দৃষ্টিতে বেশ একটু ঈর্ষা ও আনন্দের ভাব মিশ্রিত ছিল। এক দিকে কুমুদিনীর নিমীলন, অন্য দিকে কমলের উন্মেষ; এক দিকে ফাগুনের অপরাহ্ণ অন্য দিকে কোজাগরের সন্ধ্যা;—ইহারি মাঝখানে আমি পড়িয়াছিলাম। ভিড়ের আড়ালে যে একটী ফটোগ্রাফার তাদের ছবি তুলিতেছিল, এ খেয়াল তাহাদের ছিল না।

ক্রমে ট্রেণ আসিয়া উজিরাবাদে থামিল, আমরা অবতরণ করিলাম। জম্মুগামী ট্রেণের এখনো ৫।৬ ঘণ্টা বিলম্ব। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক Refreshment room আছে, তাতে সবই পাওয়া যায়। এ পথের প্রায় সব ষ্টেসনেই এই বন্দোবস্ত।

সন্ধ্যার সময় জম্মুর ট্রেণে উঠিলাম এবং রাত্রি ৯টার সময় জম্মু টাওয়াই (Jammu Towi) ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ট্রেণেরও এইখানে বিশ্রাম। পথে একটী শিখ সর্দ্দারের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল; তিনিই আমার টোঙ্গা ঠিক করিয়া দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি বাসায় পঁহুছিলাম।

প্রভাতে উঠিয়াই সহর দর্শনে বাহির হইলাম। অত্যন্ত শীত। কোট, পেণ্টুলেন ও ওভারকোটের উপর শাল জড়াইয়া,মাথায় একটী পাগড়ী টুপী পরিয়া বাহির হইলাম। সাথী হইলেন শ্রীমান বিশ্বনাথ। ইনি এখানকার কলেজের ইংরাজীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়স

১০।১১ বৎসর হইবে। কথাবার্ত্তায় আলাপে বিশু আমার সমবয়সী, যেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইয়া উঠিল,—এত বড় পাণ্ডা অল্প লোকের ভাগ্যেই জোটে। তাহার সহিত প্রথমেই তাহাদের বাড়ী গেলাম। আশুতোষ নামের সহিত আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি বিজড়িত। আশু বাবুকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম, অতি অমায়িক স্বভাব। তাঁহাদের সহিত আমাদের দীর্ঘকাল গভীর আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে; আমি একেবারে নিজের ঘরের ছেলের মত হইয়া গেলাম। আসিবার সময় এখানকার গণিত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুণ্ডু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। তাঁহার বাড়ী কলিকাতায়। এখানে গণিত শাস্ত্রে

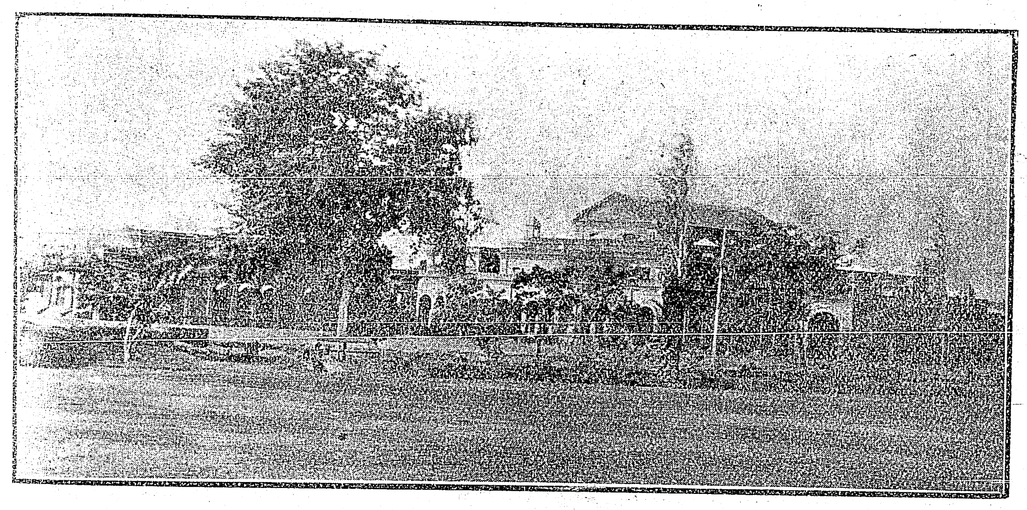

প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলেজ

তাঁহার বিশেষ নাম আছে, তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে একবার বর্দ্ধমান ষ্টেসনে আলাপ হইয়াছিল। তিনি খুব গম্ভীর স্বভাবের অথচ স্নেহশীল।

বৈকালে জম্মু কলেজের নামজাদা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকনাথ সান্ন্যাল এম-এ, ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু এম-এস্‌সি নিজেরাই আমাদের বাসায় শুভাগমন করিলেন। তারকবাবু কাশীর প্রসিদ্ধ সান্ন্যাল-বংশ-সম্ভূত; গভীর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য তিনি এখানে সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। শরীরে প্রচুর শক্তি, গঠন সবল সুন্দর, মূর্ত্তি বীরত্ব ও পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাবুর বয়স অল্প, এখানে Geologyর প্রফেসার, শিশুর ন্যায় সরল। আমি ত তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়াই কথা বলিতাম, ছোট ভাইএর মত লাগিত। কিন্তু জ্ঞানে তিনি আমার অপেক্ষা কত বড় সেটার পরিচয় পাইলাম, college laboratory দেখিতে গিয়া। যতদূর জানি, এক কলিকাতা ভিন্ন জম্মুতেই কেবল Geologyর অধ্যাপনা হয়। জম্মু নানাবিধ খনিজে পরিপূর্ণ, নানাবিধ প্রস্তরে মণ্ডিত; সেইজন্য এ স্থান এ শিক্ষার উপযোগী। উপযুক্ত অধ্যাপকের হাতেই এ শিক্ষার ভার পড়িয়াছে। আমি laboratoryতে গিয়া ঘণ্টাখানেক ছিলাম। এখানে একটী প্রকাণ্ড হস্তীদন্ত fossil আকারে দেখিলাম; এবং শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ আমাকে অনুবীক্ষণের মধ্য দিয়া নানা প্রকার প্রস্তর চিনিবার কৌশল যখন দেখাইয়া দিতে লাগিলেন, তখন আমি নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইলাম।

জম্মু কলেজের নাম Prince of Wales College। স্থান ও অট্টালিকা দুইই সুন্দর। ছাদে উঠিলে সহরটী ও পাঞ্জাবের শস্যপূর্ণ দিগন্তব্যাপী শ্যামল সমভূমি নয়নগোচর হয়। দূরে তুষারাচ্ছিত ত্রিকূটা দেবীর পাহাড় অতি সুন্দর দেখায়। কলেজের প্রকাণ্ড হলে একদিকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের, অন্যদিকে কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা প্রতাপ সিংএর তৈলচিত্র। ডাক্তার রামদাস খান এই কলেজের

প্রিন্সিপাল ছিলেন ! এক্ষণে Mr. Dadina (দাদিনা) তাঁর স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

পূর্ব্বে জম্মু সহরে প্রবেশ করা কঠিন ব্যাপার ছিল, Towi (তোবি) নদী পার হওয়া ক্লেশকর ছিল। অধিকন্তু সহর প্রবেশের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান তোরণ-দ্বার গুমট Gate সর্ব্বদা তোপে ও সৈন্যে সুরক্ষিত থাকিত। সহর ঘন বাবলার বনে আবৃত ছিল, সে বৃক্ষের একটী শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিলেও দণ্ডিত হইতে হইত। তাহারা রাজ্যের উদ্ভিদ-ফৌজ ছিল। বহুপূর্ব্বে কোনো ইয়োরোপীয় এখানে আসিলে, দিন এক মোহর করিয়া মহারাজকে ভেট দিতে হইত। বর্ত্তমানে Towi নদীর উপর সুন্দর সেতু নির্ম্মিত

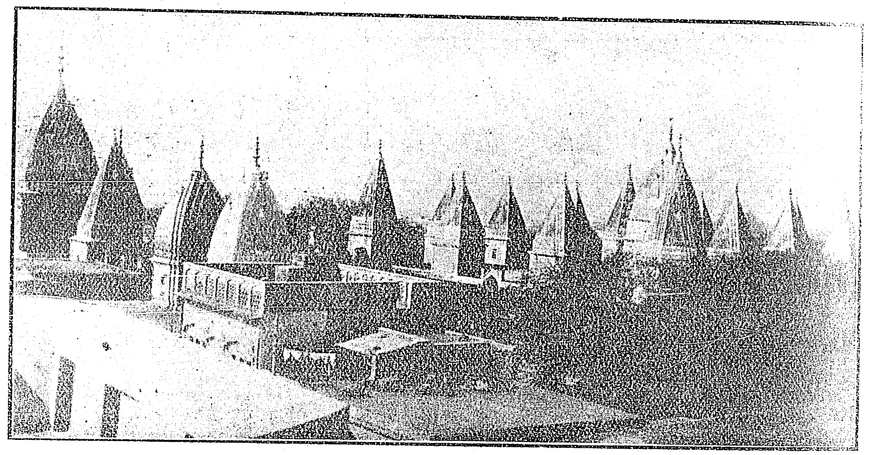

রঘুনাথজীর মন্দির

হইয়াছে। ষ্টেসন হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সুরম্য সুগম সড়ক প্রস্তুত হইয়াছে। উহা মোটর, টোঙ্গা প্রভৃতির রবে মুখরিত। পর্ব্বতের উপর হইলেও সহরটীতে যাতায়াতের কষ্ট নাই।

রাজপ্রাসাদ দেখিবার মত। বিশাল চত্তর মধ্যে ছোট একটী উদ্যান ও উৎস। এক দিকে সুন্দর সুসজ্জিত অন্দরমহল, এক দিকে রাজা হরি সিংএর জাইগির-দপ্তরখানা, অন্য দিকে রেভিনিউ ও হোম সেক্রেটেরিটে সমস্ত রাজবাড়ী একখানি ছবির ন্যায়। ঢুকিতেই একটী মরাল সরোবর দর্শকের চক্ষে পড়ে। তাহাতে অসংখ্য রাজহংস কেলি করিতেছে। দেখিয়া মেঘদূতের যক্ষের গৃহের বর্ণনা মনে পড়ে।

"যাইতে মানস সরে কারো না মানস সরে
আছে তারা এমনি আরামে।"

সহর ও সহরের প্রত্যেক বাড়ীই বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। চেনাব (Chenub) নদী হইতে জলধারা আনিয়া একটী দুইশত ফিট উচ্চ কৃত্রিম জলপ্রপাত প্রস্তুত করিয়া Power সংগ্রহ করা হয়; এবং তাহাতেই অতি অল্প খরচে সহর আলোকিত করা হয়। এক হাজার ফিট উপরে Resevoirএ জল তুলিয়া সহরে পরিষ্কৃত পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ক্যান্টনেমে জল আনিয়া চাষ-বাসের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক কথায়, সহরটীকে সুরম্য, শান্তিকর ও স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য মহারাজা কোনো ত্রুটীই করেন নাই।

মহারাজা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, তপ-জপ লইয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া উদাসীন নহেন। ইনি জম্মু হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত নয় হাজার ফিট উচ্চ বানিহাল Passএর উপর দিয়া, দুই শত তিন মাইল দীর্ঘ এক মোটর যাইবার রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহাতে জম্মু হইতে কাশ্মীর যাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে রাওলপিণ্ডি হইয়া বারামুলা (Berhamulla) দিয়াই কেবল রাস্তা ছিল। মহারাজার এখনো অনেকগুলি Plan আছে, যাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, কাশ্মীরের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিনের

জন্য অমর হইয়া থাকিবে। তিনি ছয়শত ফিট উচ্চে আড়াই মাইল দীর্ঘ এক টানেল প্রস্তুত করিয়া, জম্মু-কাশ্মীরের রাস্তা যাহাতে বারমাস সুগম থাকে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ঐ টানেলটী যদি প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে উহা ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম টানেল হইবে। অধিকন্তু মহারাজার একান্ত ইচ্ছা, জম্মু হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত একটী Electric Railway খুলেন। সেইজন্য Raisi ষ্টেসনে (Chenub) চেনাবের উপর Hydro-electric installation বসাইয়া power সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে।

আর একটী বিশেষ প্রশংসার কথা, মহারাজার নিজের

১। জেনারেল সার রাজা হরিসিং কে-সি-ভি-ও; কে-সি-আই-ই, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র, কাশ্মীর বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চিফ, সিনিয়র ও ফরেন মেম্বর

২। কর্ণেল রায়বাহাদুর জনকসিং বাহাদুর

৩। মিঃ বি, জে, গ্রানসি I. C. S., C. I. E.

৪। খান বাহাদুর চৌধুরী খুসি মহাম্মদ বি-এ

৫। মিঃ এ, ডি, হাকিম B.A., LL.B. Home and Education Member.

৬। মিঃ ডি, এন, নগরকোটলি B. Sc.

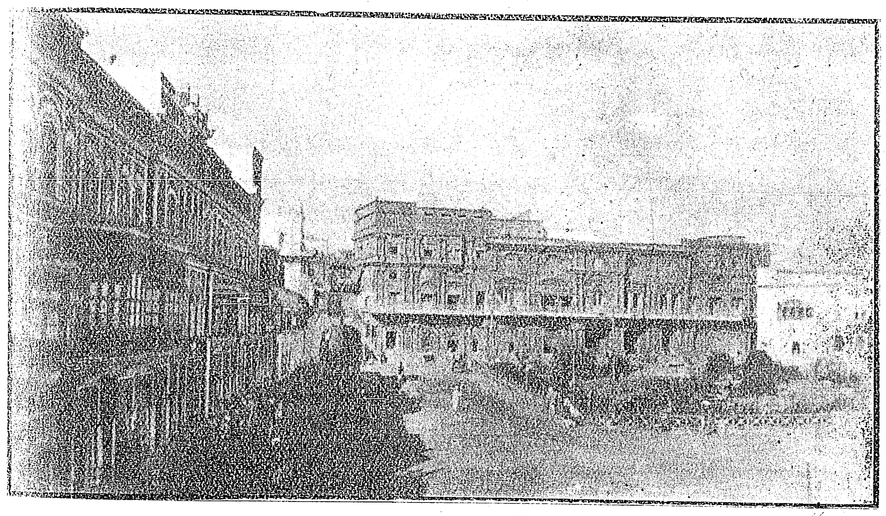

রাজা হরিসিংএর জাইগির দপ্তর ও মহারাজের সেক্রেটেরিয়েট

টেলিগ্রাফ আছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোনো মিত্র রাজার নাই। এ systemএ উর্দ্দু symbolএ কার্য্য হয়, যাহা একেবারে নূতন। টেলিগ্রাফ লাইন বহুদূরব্যাপী Skamdu ও তিব্বত সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের গৌরব করিবার বিষয় এই যে, এই বিভাগের কর্ত্তা হইতেছেন একজন বাঙ্গালী যুবক—শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, নিবাস বর্দ্ধমান স্থানকর।

বর্ত্তমানে মহারাজা রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য একটী Council গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে সাতজন সদস্য আছেন।

৭। মৌলভি আব্দুল খাইয়ুম B.A., LL.B., Foreign Secretary.

ইহার নিবাস লক্ষ্ণৌ, সরল সুন্দর চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য ইনি সকলেরই প্রিয়।

রামনগর প্রাসাদ জম্মুতে একটী দর্শনীয় স্থান। তোবি নদীর উপর পাহাড়ের উপর ইহা Balmoral Castleএর অনুকরণে নির্ম্মিত। সম্মুখে নদী ও পর্ব্বতমালা। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন জম্মু আসেন (১৯০৬ খৃঃ অব্দে), তখন এই প্রাসাদে তিনি চা পান করেন। তিনি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন, It is one of

the finest view I have ever seen. এই মনোহর প্রাসাদ ও পর্ব্বতাদির অধিকারী হইতেছেন রাজা হরিসিং। এই সকল পাহাড় হরিণ, নীল গাই, ময়ূর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। ইহাকে 'রাথ' বা Preserved forest বলে। এখানে কোনো জীব কাহারো শিকার করিবার অধিকার নাই। শিয়ালকোটে সুচিতগড় পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। সেইখান হইতে ইংরাজদের সীমা আরম্ভ। সেখানে পশুপক্ষী শিকার করিবার বাধা নাই; কিন্তু উহারা এমনি সতর্ক যে, কোনক্রমে ইংরাজ সীমানায় যায় না। রাজা হরিসিং রাজ্যে সুনিয়ম, ন্যায় বিচার ও শৃঙ্খলা আনিবার জন্য সতত সচেষ্ট। তাঁহার চলিয়াছে। উপরে পাহাড় জঙ্গল, নিম্নে গভীর খাত,—শেফালি প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। নিকটেই প্রাচীন 'বাহ' কেল্লা। এখানে এক কালী আছেন, এবং পুরাতন তোপ প্রভৃতিও আছে।

জম্মুতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট দর্শনীয় দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে রঘুনাথজীর মন্দিরই প্রধান। বিশাল বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অসংখ্য মন্দির। সুবর্ণের পত্রে যোড়া হেমকলস-যুক্ত মন্দির-চূড়ায় প্রভাত ও সান্ধ্য রবির কিরণচ্ছটা বড়ই মনোরম দেখায়। এখানে সাম, ঋক, যজু ও অথর্ব্ব বেদানুযায়ী চতুষ্কোণে চারি লক্ষ শালগ্রাম শিলা স্থাপন



গুলট গেট সহর প্রবেশের প্রধান তোরণদ্বার

সুন্দর সুদৃঢ় গঠন সৈনিক সাজে বড়ই গম্ভীর, বড়ই প্রশান্ত দেখায়।

রামনগর পাহাড়ে আমি শ্রীযুক্ত আশুবাবুর সঙ্গে অনেক দূর ভ্রমণ করিয়াছি। এখানে পাহাড়ের উপর পঙ্কপীর দেখিলাম, বর্ষায় জলে ঝড়ে কোনো দিনই ইহার কাছে ভক্তেরা প্রদীপ দিতে ভুলে না। এখান হইতে ত্রিকুটা দেবীর পাহাড়। জমাট তুষার বেশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। উহা পাঞ্জাবের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ও অতি কঠিন তীর্থ-স্থান। আশুবাবুর উহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই রামনগরের পথটী পাহাড়ের গা বাহিয়া

করা হইয়াছে। অঙ্গনের একদিকে স্বর্গগত মহারাজগণের সুবর্ণ মণ্ডিত সমাধি-মন্দির। কি কারুকার্য্যে, কি বহুমূল্য স্বর্ণ কলসে কোনটীই কোনটী অপেক্ষা ন্যূন নহে। এখানে একটী চতুষ্পাঠীও আছে। একটী সৌম্য ব্রাহ্মণ বালককে দেখিলাম। সেটী বিদ্যার্থী,—কালিদাসের নাম এখনো জানে না, বোধ হয় "মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" পড়িতেছে।

এখানে প্রতিদিন বহু নরনারীর সমাগম হয়; পূজার বেশ ধুম। দ্বিতীয় দর্শনযোগ্য মন্দির রণবীরেশ্বর শিবের। মহারাজ রণবীরের নাম সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত, তিনি এই মন্দিরকে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শিবালয়ে

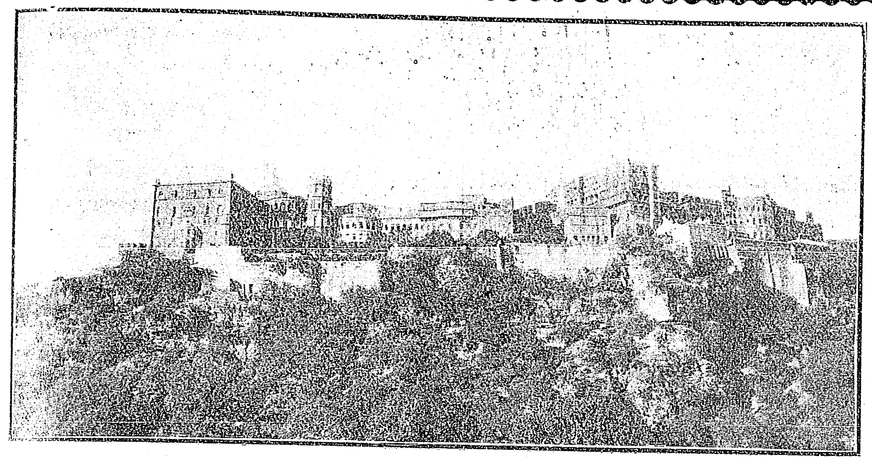

রাজপ্রাসাদে তাবি তীর হইতে

পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ মন্দিরে এক লক্ষাধিক শিবলিঙ্গ আছেন। মধ্যে একটী বৃহৎ স্ফটিকের শিব ও চতুর্দ্দিকে দশটী ছোট ছোট শিবলিঙ্গ আছেন।

তৃতীয় গদাধরজীর মন্দির, উহা রাজার প্রাসাদেরই অন্তর্গত।

জম্মুতে একটী আজব-ঘর আছে, তাহাতে দেখিবার কিছুই নাই। লাইব্রেরী ইহারি মধ্যে—সামান্য কাগজপত্র আসে। শুনিলাম সংস্কৃত, পালি, টিবেটিয়ান বহুমূল্য পুঁথি Manuscript সব এখানে আছে। সম্প্রতি এ আজব-ঘরটী Civil ও Military Clubএ পরিণত হইয়াছে। কাছেই একটী পশুশালা আছে; তাহাতে বেশী পশু নাই, গোটা দুই চিতা আছে; তাহা দেখিতেও লোক যায়, তাই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শুনিলাম, একটী সিংহ আছেন, তিনি দিবালোকে অন্ধকার ঘরের ভিতর ঘুমান; কাজেই interviewএর আশা কম।

আজব-ঘর Museumএর প্রাঙ্গণে একটী বাঁধানো বেদী আছে। উহাতে বসিয়া মহারাজ রণবীর সিং বিচার করিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। তখন মাত্র একটাকা নজর দিয়াই আরজী পেশ হইত। আমাদের দেশের স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ই এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতাদি স্থাপন ও কোর্ট ফি এর প্রচলন করেন। এখন রাজার মণ্ডির একদিকে সমস্ত বিচারশালা স্থাপিত। তাহাতে State এর জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিচার করেন। ৺নীলাম্বর বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঋষিবর

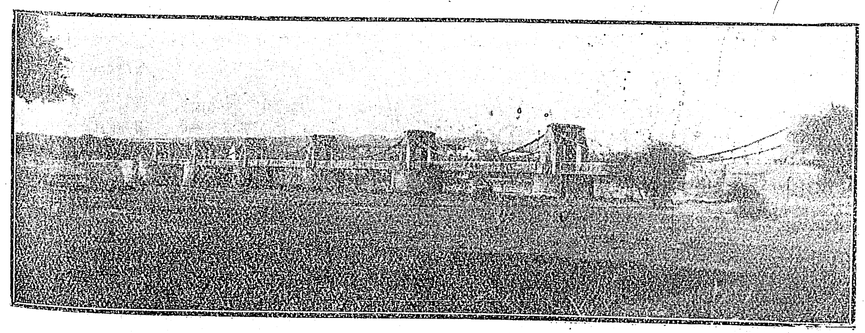

তোবি Tow নদীর উপর পুল

বাবু কাশ্মীরের Chief Justice ছিলেন। এ রাজ্য নীলাম্বর বাবুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী; তাহার পরই ডাক্তার A Mitraর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অল্প দিন পূর্ব্বে হোম ও এডুকেশন মেম্বর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজ্যের ও বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

এখন এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী নহে। যাঁহাদের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা ছাড়া, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুদিন কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমার আলাপের সুবিধা হয় নাই; কারণ, তিনি তখন এখানে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার পুত্র

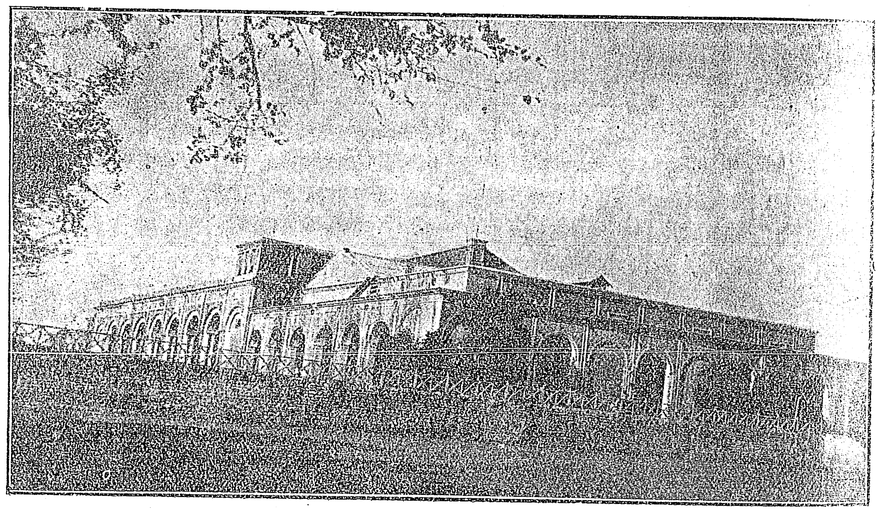

আজবঘর

শ্রীমান পঞ্চানন আমার সঙ্গে খুব ঘুরিয়াছে; এবং তাঁহাদের বাড়ীতে কাকীমার যথেষ্ট আদর আমি পাইয়াছি। এখানে শ্রীপঞ্চমীর দিন আমি আশুবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রিত হই। সুদূর বিদেশে দিনটী আমার বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। এখানে ভগিনী ভাগিনেয়ের স্নেহ পাইয়াছি। আশুবাবুর স্ত্রী ও সান্ন্যাল মহাশয়ের স্ত্রী দুই জনেই পরম স্নেহশীলা, আমি তাঁহাদের গভীর স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলাম। প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাড়ীই নিমন্ত্রণ ও আদর পাইয়াছি। আমি তাঁহাদের আদরে সত্যই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কতবার মনে হইয়াছিল—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই;
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

পরিশেষে আমার সঙ্গী ও পাণ্ডা শ্রীমান বিশ্বনাথের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। জম্মু সম্বন্ধে যাহা দেখিবার তাহা ত দেখিলাম; কিন্তু অলৌকিক অনেক সংবাদ বিশু আমায় দিল। তোবি নদীর কোন ঘাটে কি ভূত বাস করে এবং তাহার ক্রিয়া কলাপ কি প্রকার সে সম্বন্ধে বিশুর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমি কয় দিনের জন্য আসিয়া ইহাদিগকে লইয়া সুন্দর ঘর পাতাইয়াছিলাম। শ্রীমান অবিনাশ চন্দ্রের পিতাঠাকুর—আমার পিতৃব্য-কল্প শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় অসুস্থ শরীরেও প্রতি দিন আমাকে দেখিতে আসিতেন, মা ষষ্ঠীর ফোঁটা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। আমি বড় সুখেই ছিলাম। জম্মু কাশ্মীর আমার কৈলাস। এখানে আমার মাতা পিতা অবস্থিতি করেন। আমি হতভাগ্য—এত দিন এখানে আসা ঘটে নাই। এবার আমার সৌভাগ্যোদয়ে এমন তীর্থ দর্শন ঘটিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বঙ্কিম-সাহিত্যে নৌকাযাত্রা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ

(৭) দেবীচৌধুরাণী

এই উপন্যাসখানির বারআনাই নৌকার কথায় পূর্ণ। দেবীচৌধুরাণী তাঁর সেই নানাবর্ণে চিত্রিত, রকমওয়ারী মুরদ আঁকা, গিল্‌তের হাল ও রূপার গিল্‌টী করা দাণ্ডা ও হাঙ্গরের মুখওয়ালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে বজরাখানিকে যেদিন প্রথমে খরস্রোতা ত্রিস্রোতার বক্ষে ভাসাইয়াছিলেন, সেইদিনই প্রকৃত পক্ষে দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের আরম্ভ, আর যেদিন হইতে নিশি ঠাকুরাণী সেই বজরাখানিকে চেলা করিয়া পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, (তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ) সেই দিনেই ঐ গ্রন্থের শেষ। অনুসন্ধান করিলে পাঠক পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন যে, ইহার পূর্ব্বের ও পরের ঘটনার সহিত দেবী চৌধুরাণীর কোন সম্বন্ধ নাই—প্রকুল্লের থাকিতে পারে।

দেবী চৌধুরাণীর ঐ বজরাখানি ব্যতীত গ্রন্থ মধ্যে ডাকাইতদের তিনখান চড়ক্কা, ষাট হাত লম্বা ছিপ আছে, কোম্পানীর সিপাহীদের নৌকা আছে, ব্রজেশ্বরের পান্সী আছে, হরবল্লভ রায়ের ডিঙ্গী আছে, লেপ্টেন্যাণ্ট সাহেবের বজরা আছে, আরও কত কি আছে। উহাদের গতিও যেমন বিচিত্র—আকৃতিও তেমনই রকমওয়ারী। সেই সকল বাদ দিলে গ্রন্থের—আর কিছু থাকে কি?

(৮) যুগলাঙ্গুরীয়

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত ইহা একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকার ইহার মধ্যে নৌকাযাত্রার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই—আর সে নৌকাযাত্রাও বেশ বড় রকমেরই নৌকা যাত্রা। এবার গ্রন্থকার গঙ্গা, যমুনা বা ত্রিস্রোতার বক্ষে নৌকা লইয়া যান নাই, দিগন্ত প্রসারিত—অনন্ত সাগর মাঝে তরী ভাসাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে সে দৃশ্যের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা যেমন গম্ভীরভাবাপন্ন, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। নায়ক পুরন্দর ও নায়িকা হিরণ্ময়ী দুইজনেই তাম্রলিপ্তের দুইজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীর পুত্র ও কন্যা। দুই জনে উদ্যান মধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।.....পুরন্দর কহিতেছিলেন—

"আমি দূরদেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী। "দূরদেশে? কোথায়?"

পুরন্দর। "সিংহলে।"

হিরণ্ময়ী। "সিংহলে? সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?"

পুরন্দর। "কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী, বাণিজ্যার্থ যাইব।"

বলিতে বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগর তরঙ্গে সূর্য্য কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদু পবন বহিতেছে, মৃদু পবনোত্থিত উত্তুঙ্গতরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগর জলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে—রজতালঙ্কারবৎ ফেন নিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেত রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।

হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন, নীল জল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন, দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটী পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলস্থায়ী একটী শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কেন যাবে, অন্যান্যবার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।" পুরন্দর বলিল, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন, পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে, হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষুর জল গণ্ড বাহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যেদিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেইদিন হইতে আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না; ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎ সংসার একদিকে, তুমি একদিকে হইলে, জগৎ—তোমার তুল্য নহে।"

(প্রথম পরিচ্ছেদ।)

তার পর এক দিন পুরন্দর সিংহলে চলিয়া গেলেন। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।) সেই দিন হইতে উভয়ের বিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। আবার আট বৎসর পরে যে দিন পুরন্দর দেশে ফিরিলেন, সে দিন হিরণ্ময়ীর মরা গাঙ্গে আবার বান ডাকিল, সে দিনও আবার সেই নৌকার কথা। অমলা হিরণ্ময়ীকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে?" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষুর জল অমলা দেখিতে না পায়।... অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শ্রেষ্ঠীর ছেলে?"

হিরণ্ময়ী। "চিনি।"

অমলা। "তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তামনিপে কেহ কখনও দেখে নাই।"

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল।.....হিরণ্ময়ী ক্ষণেককাল অন্য মনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়ন কালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই। হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ।) ইহার পর এক দিন শুভক্ষণে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে পুরন্দরের সাক্ষাৎ হইল। পুরন্দর তখন স্বামী, হিরণ্ময়ী তার স্ত্রী। গ্রন্থখানিতে পুরন্দরের সমুদ্র-যাত্রার মধ্য দিয়াই নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের মাধুর্য্যটুকু উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(৯) রাধারাণী

যুগলাঙ্গুরীয়ের ন্যায় এখানিও বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইহার মুখেও নৌকাযাত্রা। গ্রন্থের নায়ক দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়—নায়িকা রাধারাণী। প্রথম যে দিন উভয়ের মিলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, সে দিনের কথায় নায়ক দেবেন্দ্রনারায়ণ ওরফে রুক্মিণী কুমার নিজেই বলিতেছেন, "আমি সেদিন নৌকা পথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম।—অপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে আসিয়াছিলাম।" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) তার পরেই রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ। কে জানে সেদিন যদি দেবেন্দ্রনারায়ণ নৌকার না গিয়া গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া বা শিবিকারোহণে রথ দেখিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে রাধারাণী জুটিত কি না? গ্রন্থকারের অন্ততঃ সেইরূপ বিশ্বাস ছিল, তাই—সেদিন দেবেন্দ্র নারায়ণকে তিনি নৌকা পথেই মাহেশের মেলায় লইয়া গিয়াছিলেন।—অন্য ব্যবস্থা করেন নাই।

(১০) ইন্দিরা

এই গ্রন্থখানিতেও বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক-নায়িকার মিলনে নৌকা যাত্রায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমেই ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ী যাত্রার চিত্র। কিন্তু এ যাত্রা নৌকা যাত্রা নহে। ইন্দিরাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার শ্বশুর পাল্কী বেহারা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা হালের বড় মানুষ। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট্, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। ইন্দিরার পিতা বনিয়াদি বড় মানুষ। তাই পাল্কীখানা দেখিয়া একটু হাসিয়াছিলেন।

ইন্দিরা সেই পাল্কী চড়িয়া দাস দাসী ও ভোজপুরী দ্বারবানে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্বশুর বাড়ী চলিলেন। কিন্তু তাঁকে সে যাত্রায় সে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইল না। পথে তিনি দস্যুর হস্তে পড়িলেন। দস্যুগণ তাঁহার লোকজনকে মারিয়া তাড়াইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিয়া চলিয়া গেল।

ইন্দিরা সেই অসহায় অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে এক ভদ্রপরিবারের অনুগ্রহে তাহাদের সঙ্গে নৌকায় উঠিয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। ইন্দিরা গঙ্গাবক্ষে 'কত রকমের কত নৌকা দেখিলেন, জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল।'... 'জেলেরা মোচার খোপার মত ডিঙ্গীতে মাছ ধরিতেছে।'...কলিকাতায় ঘাটে জাহাজের মাশুলের অরণ্য দেখিয়া ইন্দিরার জ্ঞানকুঞ্জ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে করিলেন, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে? (পঞ্চম পরিচ্ছেদ।) ইন্দিরা যথাসময়ে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। তার পর এই কলিকাতা সহরেই এক দিন তাঁহার স্বামীর সহিত মিলন হইল।

ইন্দিরার শ্বশুর হালের বড়মানুষ, তাই তিনি পুত্রবধূকে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী বেহারা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তিনি প্রাচীন বঙ্গের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেই কিংখাপ মোড়া, রূপার হাঙ্গরের মুখওয়ালা পাল্কীখানার পরিবর্ত্তে, পিতলের হাঙ্গরের মুখওয়ালা একখানা যেমন তেমন বজরাও পাঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁর সেই সুন্দর পাল্কীখানার এরূপ পরিণাম হইত না; আর তাঁর সুন্দরী যুবতী পুত্রবধূকেও এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। অথচ অন্যদিকে দেখা যায় যে, পরের নৌকায় উঠিয়া দাসীবৃত্তি করিতে যাইয়াও স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়া গেল। এটা যে ইন্দিরার নৌকা যাত্রার ফল, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন?

(১১) রজনী

ইন্দিরার ন্যায় এই গ্রন্থখানির নায়িকা রজনীর জীবনের সুখ ও দুঃখ-নৌকা-যাত্রার সঙ্গে জড়িত। রজনী মনে মনে শচীন্দ্রকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। রজনী অন্ধ, ফুল বেচিয়া খাইত, আর শচীন্দ্র ছিলেন ধনীর সন্তান, সুপুরুষ, বিদ্বান। তাঁহার পিতা রামসদয় মিত্র অগাধ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। রজনী তাই বুঝিয়াছিল যে, এ জীবনে তার শচীন্দ্রকে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।—সে মনে মনেই শচীন্দ্রের চরণতলে তার জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল। শচীন্দ্র সে কথা জানিতেন না। দরিদ্রের প্রতি তাঁর চিরদিন আন্তরিক অনুগ্রহ ছিল। অন্ধ রজনীর কথা

ভাবিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি উদ্যোগী হইয়া গোপাল বসু নামক এক ব্যক্তির সহিত রজনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। রজনী এই সংবাদে প্রমাদ গণিল। তাহার নিজের কথাতেই বলি—"বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।" সেই সময় গোপাল বসুর প্রথমা স্ত্রী চাঁপা আসিয়া তাহার সহায় হইল। তাহার যুক্তিমত স্থির হইল, রজনী আপাততঃ দুই চারি দিবস চাঁপার ভাই হীরালালের সঙ্গে গিয়া তাহার বাপের বাড়ীতে থাকিবে। মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ রজনীর চক্ষে ইহাই তখন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইল। (প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।)

হীরালাল জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। রজনীও সেই নৌকায় চলিল। এই নৌকা যাত্রায় যদিও রজনীকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তথাপি ইহারই ফলে তাহার শচীন্দ্রকে পাইবার পথ সুগম হইয়া গেল। তাহার আর গোপাল বসুকে বিবাহ করিতে হইল না। যথাসময়ে শচীন্দ্রই তাহাকে বিবাহ করিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

কায়স্থের বাড়ীর মূর্খ সন্তান হীরালালের অনেক 'গুণ' ছিল। সে মদ খাইত, গাঁজাও টানিত, আরও কত কি করিত। নৌকায় উঠিয়া সে রজনীকে বলিল, "আমায় বিবাহ কর।" জেদাজেদি করিল, বিচার আরম্ভ করিল; বাগ্‌বিতণ্ডা করিল। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না, রজনী যখন তার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হইল না, তখন রাত্রিশেষে তাহাকে এক চড়ায় নামাইয়া দিয়া হীরালাল নৌকা লইয়া চলিয়া গেল। রজনী সেই নৈরাশ্যময় জীবনের অবসান করিবে বলিয়া গঙ্গার জলে ডুবিল। কিন্তু ডুবিয়া থাকিতে পারিল না। ভাসিয়া উঠিল। সেই প্রভাত-বায়ু-তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল। (প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ।)

সেই পথে একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। নৌকার লোক তাহাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। তাহার চেতনা হইল। একজন আরোহী তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিবে বলিয়া তাহাকে লইয়া এক গ্রামে নামিল। দুর্ব্বৃত্ত অতঃপর সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলের মধ্যে রজনীকে লইয়া গিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সেই সময় এক ভদ্রলোক ঘটনাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গেই নরাধমের হস্ত হইতে অন্ধ রজনীকে উদ্ধার করিলেন। ঐ ভদ্রলোকের নাম অমরনাথ।

অমরনাথ গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকা লিখিতে গিয়া প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভেই লিখিয়াছেন, "আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এ বিশ্বের চিত্রে আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।" অমরনাথের জীবনের সে সকল ঘটনার সহিত আলোচ্য প্রবন্ধের বিশেষ সম্পর্ক নাই, কেবল যতটুকু আছে, এই স্থানে সেইটুকুর উল্লেখ করিতেছি। অমরনাথের পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, আর তিনি লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনকুলে যেমন তাঁর কেউ ছিল না, সংসারেও তেমনই তাঁর কোন কাজ ছিল না। এইরূপ 'অকেজো' জীবন লইয়া তিনি যখন বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁর একটা কাজ জুটিয়া যায়। কোন গুপ্ত কারণে রামসদয় মিত্রের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, রামসদয় যে অগাধ পৈতৃক বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন, উহা তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বাঞ্ছারাম মিত্রের পরম বন্ধু মনোহর দাসের প্রাণপাত চেষ্টাতেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। বাঞ্ছারামের জীবদ্দশাতেই একদা মনোহরের সহিত রামসদয়ের ঘোর বিবাদ হওয়াতে, মনোহর বাঞ্ছারামের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে পিতা পুত্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং উইল করেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তি মনোহর দাস বা তাহার উত্তরাধিকারীরা পাইবেন। তদভাবে রামসদয়ের পুত্র পৌত্রাদি যথাক্রমে পাইবে, কিন্তু রামসদয় নহে। রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সেখানে একজন সজ্জন বণিক সাহেবের আনুকূল্যে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। এ দিকে বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল, মনোহর দাসও মরিয়াছে। তাহার কোন উত্তরাধিকারীর সন্ধান না পাওয়ায় বাঞ্ছারাম মিত্রের উইলের একজিকিউটার সমুদয় সম্পত্তি রামসদয় মিত্রের পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।)

অমরনাথ ঘটনাচক্রে জানিতে পারিলেন, মনোহর দাসের সন্তানাদি না থাকিলেও, হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, আর তার রজনী নামে এক কন্যা ছিল। এখন রজনী যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। সেই রজনীর অনুসন্ধান করাই অমরনাথের কাজ হইল। অমরনাথ যখন রজনীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এক দিন রজনী তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত হইল। তিনি পরে জানিতে পারিলেন, ঐ রজনীই সেই মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা। অমরনাথের চেষ্টায় তখন সেই অন্ধ রজনী শচীন্দ্রের সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে অমরনাথ এত করিয়াছিলেন, শেষে সব উলট পালট হইয়া গেল। তাহার বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থের মধ্যে আছে—এ প্রবন্ধে তার আবশ্যক নেই। যথাসময়ে শচীন্দ্রের সহিত রজনীর বিবাহ হইল। জন্মান্ধ রজনী ভগবানের আশীর্ব্বাদে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল।

সেদিন যদি রজনী নৌকা যাত্রা না করিত, তাহা হইলে তাহার

অদৃষ্টে কি এত সুখ হইত? তাহাকে হয় ত আজীবন সেই ফুল বেচিয়া খাইতে হইত, নয় সামান্য গৃহস্থ গোপাল বসুর বাড়ীতে সতীনের সঙ্গে ঘরকন্না করিতে করিতে অশান্তিময় জীবন যাপন করিতে হইত। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সে যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী হইয়া বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূলেও নৌকা যাত্রা ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে অন্যের নৌকা যাত্রার ফলে তার অদৃষ্ট খুলিয়া গিয়াছিল। মনোহর দাস বা তাহার সন্তানাদি কেহ জীবিত থাকিলে, রজনীকে আর ঐ সম্পত্তি পাইতে হইত না। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে চলিয়া গিয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কষ্ট হওয়াতে কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। (দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।)

তার্কিক পাঠক ও কলহপ্রিয়া পাঠিকা হয় ত এখন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন যে, নৌকাযাত্রাই যদি রজনীর এত সুখের কারণ, তবে নৌকাযাত্রার ফলে মনোহর দাসের সপরিবারে এরূপ পরিণাম হইল কেন? এ কথার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে নৌকাযাত্রায় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।—সেইখানেই ইহার সাফল্য। অন্যস্থানে ফল পৃথক রকম। বলা বাহুল্য, মনোহর দাস প্রেমের চেষ্টায় নৌকাযাত্রা করেন নি, তিনি করিয়াছিলেন পেটের চেষ্টায়, প্রাণের দায়ে। ফলও তাই সেইরূপ হইয়াছিল।

(১২) আনন্দমঠ

পূর্ব্বে অনেকবার উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রেমের বাণিজ্যেই নৌকার অবাধ গতি। সেইখানেই ইহার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি। কিন্তু আনন্দমঠের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার প্রথমে জানাইয়াছেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরাজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এ গ্রন্থে বুঝান গেল।" সুতরাং প্রেমিক প্রেমিকার সাফল্য এই গ্রন্থখানিতে যে বড় একটা পাওয়া যাইবে না, গ্রন্থকার প্রথম হইতেই উহার আভাষ দিয়া রাখিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানির আগাগোড়াই এক রকম দেশের কথা ও স্বদেশ-প্রীতির কথাতেই পূর্ণ। গ্রন্থে বর্ণিত নরনারীর প্রায় সকলেই দেশের কাজ লইয়াই ব্যস্ত। কেহ বা এক রকম উন্মত্ত। তাহাদের কাছে প্রেমের কথা বড় বেশী শুনিবার আশা করা যায় না। তবে উহার মধ্যেই যাহাদের কাছে এক আধটুকু আশা করা যায়, গ্রন্থকার—সেইরূপ দুইজনের মুখ দিয়া প্রসঙ্গক্রমে একবার নৌকাযাত্রার কথাটা শুনাইয়া দিয়াছেন। শান্তি গাহিতেছিল,—

'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

জীবানন্দের পুরুষকণ্ঠেও ঐ সঙ্গীত গীত হইতেছিল, আর তার হাতের সারেঙ্গেও ঐ সুর বাজিতেছিল। সেদিন—তিন সুরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। তার পর দুইজনে গলা মিলাইয়া "বন্দেমাতরম্" গাহিল। (তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। জীবানন্দ প্রেমিক ও সন্ন্যাসী। শান্তি তার স্ত্রী ও সহধর্ম্মিণী।

(১৩) সীতারাম

এই উপন্যাসখানির নায়ক নায়িকার উপর 'নৌকাযাত্রা' কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মধ্যে নৌকার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই গ্রন্থখানির প্রধানতঃ দুইটী দিক আছে—একটী ঐতিহাসিক আর একটী আধ্যাত্মিক। গ্রন্থকার এই জন্যই বিজ্ঞাপনে একদিকে ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ও অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা সাহেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা হইতে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তির কিয়দংশও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক অংশে যুদ্ধ বিগ্রহের কথা। হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ। নৌকা-যাত্রাতেই এই যুদ্ধের আরম্ভ। সীতারামের গুরুদেব চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার—'অতি প্রত্যূষে রাজপ্রাসাদের উচ্চচূড়ায় উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে ঠিক তাঁহার সম্মুখে বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে।' অনুসন্ধানে জানিলেন, এ সকলই মুসলমানের নৌকা। প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ ছয় শত মুসলমান সিপাহী আসিয়াছে দুর্গ আক্রমণ করিতে।.....যুদ্ধের অবসানে আবার চন্দ্রচূড় ঠাকুর দেখিলেন, জনময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, 'ছিন্ন, নিমগ্ন নৌকাসকল স্রোতে উলটি-পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদীস্রোত ঝটিকা শান্তির পর পল্লব কুসুমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও খাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। যে কয়খানা ডোবে নাই, সে কয়খানার নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।' (দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।)

গ্রন্থের যে আধ্যাত্মিক দিকটা আছে, তাহার মধ্যেও গ্রন্থকার নৌকাযাত্রার কথা অন্যভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—

"এই ত বৈতরণী। পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়। আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

'খরবাহিনী বৈতরণী সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল।.....'

"এ সে বৈতরণী নহে—যমদ্বারে মহাঘোরা তপ্তা বৈতরণী নদী—আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

'পিছন হইতে শ্রীর কথার কে উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী!'

শ্রী বলিল, "ও মা! সেই সন্ন্যাসিনী! তা মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে, না ও পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে! তুমি এই পারেই কি বল-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুইপারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই, ওপারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এপার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ পারের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া বৈতরণীর সেই খেয়ারীর খেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে-সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না।

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার অকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হলে বাতাস উঠিবে।

সন্ন্যাসিনী। তুফানের ভয় কর মা! কেন তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?

শ্রী। পাকা মাঝি আছে। কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না,—কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব।

সন্ন্যাসিনী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরণীর তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই না কি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল মা, দুইজনে একত্রে যাই! (প্রথম খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ।)

পরদিন প্রাতে উঠিয়া খরস্রোতা জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শোভিতা হইয়া পুনরপি, 'পঞ্চারিণী দীপশিখা'দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। (প্রথম খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।)

ইহার উপর আর টীকা টিপ্পনি চলে না। পাঠক-পাঠিকাগণ কেবল এইটুকু স্মরণ রাখিবেন যে, সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত শেষ উপন্যাস। বৃদ্ধ বয়সের রচনা। কবিরও প্রেমের নদীতে তখন ভাটার টান ধরিয়াছে।

(১৪) রাজসিংহ

দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় এই উপন্যাসখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র নৌকাযাত্রার উল্লেখ একবারেই করেন নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়া তাঁহাকে যেমন অপযশ খাইতে হইয়াছিল, রাজসিংহ লিখিয়া তাহা খাইতে হয় নাই। দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় রাজসিংহের পাত্র-পাত্রীরাও রাজপুত ও মোগল হইলেও, তাদের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালার বাহিরে উত্তর ভারতে ছিল বলিয়া—বাঙ্গালার মাটীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গ্রন্থকারকে নৌকাযাত্রার অবতারণা করিতে হয় নাই। সেই কারণে, সেই পাহাড়, পর্ব্বত ও মরুভূমির দেশে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের নানা-প্রকারের নৌকায় একখানিও দেখা যায় না। সে দেশে, গ্রন্থের নায়ক নায়িকাগণ অশ্বারোহণে, হস্তীপৃষ্ঠে বা শিবিকাযানেই যাতায়াত করিয়াছেন। দেশের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রেমের বাণিজ্যও সেদেশে ঐ সকল যানের দ্বারাই হইয়াছে।

রাজসিংহের সঙ্গে যখন চঞ্চলকুমারীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার অতিপূর্ব্বেই রাজসিংহ ছিলেন অশ্বারোহণে আর চঞ্চলকুমারী ছিলেন দোলায়। (চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।) মাণিকলালের সহিত নির্ম্মলকুমারীর প্রথম মিলনটা ঘোড়ার উপরেই হইয়াছিল। দুইজনে এক ঘোড়াতেই চড়িয়াছিলেন। (চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।) সম্রাট ঔরংজেব বেগমদিগকে হস্তীপৃষ্ঠে বসাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, গ্রন্থের অনেক স্থানেই তাহা দেখা যায়। দরিয়ার সঙ্গে মবারকের প্রথম মিলনটা কোথায় এবং কিরূপে হইয়াছিল, তাহা জানা নেই; তবে গ্রন্থমধ্যে প্রথম যেদিন মবারক ও দরিয়াকে দিল্লীর চাঁদনী-চৌকে এক সঙ্গে দেখি, সেদিন মবারক ছিলেন অশ্বারোহণে। (দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ।) আর সম্ভবতঃ দরিয়া আসিয়াছিলেন দোলায়। আবার যেদিন দরিয়া মবারককে কূপের মধ্য হইতে টানিয়া তুলিল, সেদিন দেখি ব্যবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে। দরিয়া বাদশাহী সওয়ার আর মবারক চলিয়াছেন দোলায়। (পঞ্চম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ।) শাহজাদি জেব-উন্নিসার প্রেমের ব্যবস্থা আবার আর এক রকমের—বড় উচ্চস্তরের। মবারককে সর্পের মুখে ফেলিয়া—সর্প দংশনের জ্বালা কিরূপ তাহা বুঝাইয়া দিয়া জেবউন্নিসা তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন—বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বড় ঘরের সে সকল বড় কথা এখন থাক্। যা বলিতেছিলাম, তাই বলি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল কারণে রাজসিংহে নৌকাযাত্রার কোন উল্লেখ করেন নাই, আর তাহা না করাতে গ্রন্থের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। তথাপি কেন এই খুঁতটুকু থাকিয়া যায়। তাই ভাবিয়া

বোধ হয় নৌকাযাত্রা-প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ সেটুকুও সারিয়া লইয়াছেন। তিনি রাজসিংহের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র একটী প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটী-একটী নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কে একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন, তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোন কোন অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকায় অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র এবং সেই জন্য মনঃক্ষোভে লেখকের নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, লেখক গ্রন্থ বিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটী অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া, তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া, লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। (আধুনিক সাহিত্য—পৃঃ ১৫)।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের নৌকাপ্রীতির কথা সুপরিচিত। ঐ প্রীতির ফলেই তিনি তাঁহার একখানা প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাম দিয়াছেন "নৌকা-ডুবি," আর একখানা প্রসিদ্ধ কাব্যের নাম রাখিয়াছেন "সোণার তরী"। এ ছাড়া তাঁর লিখিত কত গানে, গল্পে, কাব্যে ও উপন্যাসে যে নৌকাযাত্রার চিত্র আছে তার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল গ্রন্থের কতকগুলির কতক কতক অংশ আবার কবি নিজেও নৌকা পথে বা জাহাজের উপর বসিয়াই লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষের স্বনামখ্যাত প্রবীণ সম্পাদক হিমালয়ের পথিক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরও যৌবনে বঙ্গের বাহিরে দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিণত বয়সে আবার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর সনাতন প্রথায় নৌকাযাত্রা সুরু করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার মাটীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বহুগ্রন্থে নৌকাযাত্রার সুন্দর চিত্র আছে। বঙ্গের এই সকল সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের উপর নৌকাযাত্রা কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে, তাহার একটা হিসাব ভিন্ন প্রবন্ধে দিবার ইচ্ছা রাখিয়া, আজ এই খানেই বিদায় লইতেছি। তবে যাইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পাঠক পাঠিকাগণকে বলিয়া যাই যে, ঐ সকল স্বনামখ্যাত সাহিত্যিকগণের লেখা পড়িয়া জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে নৌকাযাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই কথাটা মনে রাখিবেন যে, পণ্যের বাণিজ্যে লাভ লোকসান যেমন দুই হইতে পারে, এ ক্ষেত্রেও তাই। উপরেই তার অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন।—তেমন তেমন অবস্থা দেখিলে বরং কলিকাতা হইতে উষ্ট্রারোহণে একবারে মক্কা যাওয়াও ভাল; তথাপি গেঁউখালীর নৌকায় বসিয়া হিজলী কাঁথি আসাও উচিত নয়। আমার কেবল ঐটুকুই বলা।

প্রাচীন ভারতের গৃহস্থ

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন ভারতের কথার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই দেখা উচিত, ভারতের প্রাচীন মনীষিগণের মতে মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? তাঁহাদের মতে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি।

"যেনাহম্ নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"

যাহা আমাকে অমরত্ব দিতে পারে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব।

সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা মানব-জীবনকে চারিটী পৃথক স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। পর্য্যায়ক্রমে এই চারিটী অবস্থার মধ্য দিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়া অন্তিমে মোক্ষলাভই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। জীবন নাট্যের এই চারি অঙ্ক চারি আশ্রম নামে অভিহিত। এই চারি আশ্রমই মানবকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞান লাভের সুযোগ প্রদান করিত।

গৃহস্থ কাহাকে বলে?—প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল কে? মহর্ষি মনু ধর্ম্মের এই দশটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

"ধৃতিঃক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ্।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥"

ধৈর্য্য, ক্ষমা, চিত্তচাঞ্চল্য দমন, লোভহীনতা, শারীরিক মানসিক পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সংযম। সেই সংযম শিক্ষার জন্য বাল্যে গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি ছিল। বালক যতদিন গুরুগৃহে থাকিতেন, ততদিন তিনি গৃহী নহেন ব্রহ্মচারী। গুরুগৃহ পরিত্যাগের পর সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে, তিনি স্নাতক। তখন তাঁহার বিবাহে অধিকার জন্মিত; এবং বিবাহান্তে সস্ত্রীক গৃহে যে অগ্নি-প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহা গার্হপত্য অগ্নি নামে অভিহিত। শ্রৌত অগ্নি-স্থাপনের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আরম্ভ হইত; এবং তখন হইতে তিনি গৃহী বা গৃহস্থ নামে অভিহিত হইতেন। মনুতে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"বেদান্ অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥" (মনু ৩য় অধ্যায়)

যথাক্রমে বেদের দুই তিন বা এক শাখা অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

আশ্রম-প্রথার প্রয়োজনীয়তা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতের চরম লক্ষ্য ভগবৎ-লাভ। সেইজন্যই তাঁহাদের আশ্রম-প্রথার প্রবর্ত্তন। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির সংযমপূর্ব্বক বেদান্তশিক্ষা—বেদান্তের মূল শিক্ষা হইতেছে জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং পুঁথিগত বেদান্ত অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মময় এই মহাশিক্ষার কর্ম্মজীবনে পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন শিক্ষা করিবার জন্য গার্হস্থ্য আশ্রমের অবতারণা।

গৃহস্থের বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের উপভোগের বস্তু নহে। পুত্র স্ত্রী পুরুষের সঙ্গসুখ উপভোগের ফলমাত্র নহে—

"পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনাৎ॥"

শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পূর্ব্বপুরুষদের তৃপ্তি সাধনের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ ও করিতে হয়। শুদ্ধমাত্র তাহাদিগকে নিজের দাস বলিয়া বা তাহাদিগের সঙ্গসুখ উপভোগ করিবার জন্যই ভরণপোষণ করিতেছি, এ ভাব প্রাচীন গৃহস্থের বিধি নহে। স্ত্রী পুত্রকে ভগবান জানিয়া, তাহাদের মধ্যে সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিয়া, তাহাদিগের পরিচর্য্যা করায় ভগবানেরই সেবা করা হইল, এরূপ মনে করিতে হইবে।

স্ত্রীর সেবা করিতেছি অর্থাৎ আদ্যাশক্তির সেবা করিতেছি; পুত্রকে খাওয়াইতেছি অর্থাৎ গোপালের সেবা করিতেছি—ইহাই হইতেছে কর্ম্মজীবনে বেদান্ত। এবং বিশ্ববাসী সমস্ত জীবের প্রতি এইরূপ ধারণা গোপণ করিয়া গুরুগৃহে অধীত পুঁথিগত বেদান্ত-বিদ্যার কর্ম্ম-জীবনে পরীক্ষা দিতে যন্ত্রই প্রাচীন ভারতে গৃহস্থাশ্রমের প্রবর্ত্তন। পরে উপযুক্ত পুত্রের উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া স্বামী-স্ত্রীর অরণ্যে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে ধ্যান ধারণা দ্বারা পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ করাই হিন্দুর বানপ্রস্থাশ্রম। এবং বাহিরের জগতের সহিত সকল সম্পর্ক মিটাইয়া, দেহ হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মহাসমাধি লাভই হিন্দুর যত্যাশ্রম। চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমের স্থান সর্ব্বোচ্চ। বেদ স্মৃতির বিধান মতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও যতি এই চারিটী পৃথক আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমের স্থান সকলের উচ্চে।

ব্রহ্মচারীগৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থ যতি স্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারো পৃথগাশ্রম॥ ৮৭
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাম বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্চ্যতে শ্রেষ্ঠ স ত্রীনেতান বিভর্ত্তিহি॥ ৮৯
(মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও যতি এই চারিটীই গৃহস্থ আশ্রম হইতে উৎপন্ন। এই সমস্ত আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থই অবশিষ্ট তিনটী আশ্রমকে পোষণ করিতেছেন। এইজন্য বেদস্মৃতির বিধান মতে গৃহস্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হয়। কাজেই গৃহী বা গৃহস্থ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, জিনিসটা তত সহজ নহে। তিন আশ্রমের পরিপোষণের ভার যাহার উপর, সংসারে তাহার দায়িত্ব বড় কম নহে। গৃহস্থের মত কর্ত্তব্যবহুল জীবন আর কিছুই নয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অন্য তিন আশ্রম প্রায় বিলুপ্ত, কেবলমাত্র গৃহস্থাশ্রমই তৈলহীন দীপশিখার ন্যায় ভারতের অতীত গৌরবের দীন গরিমা প্রকাশ করিতেছে। আজও হিন্দুর গৃহস্থ আর ইংরাজের family manএর মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান লক্ষিত হয়।

গৃহস্থের গৃহে তার স্ত্রীর স্থান।—বৈদিক যুগে গৃহস্থের গৃহে তাঁর স্ত্রীর স্থান এত উচ্চ, এত দায়িত্বময়, এবং এত সম্মানার্হ ছিল যে আমরা বর্ত্তমান যুগে তাহার কল্পনাও করিতে পারি না। পুরাণমতে গৃহিণীকেই গৃহীর গৃহ বলা হইয়াছে।

ভার্য্যাশূন্যা বনসমা স ভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ
গৃহিণীঞ্চ গৃহম্প্রোক্তম্ ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

ভার্য্যাযুক্ত গৃহই গৃহ। ভার্য্যাহীন গৃহ অরণ্যের সমান। গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ, গৃহ গৃহ নহে।

ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্থান আর কি হইতে পারে? তাহাদের দায়িত্বের কথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

"যথা রথশ্চরথিনাং গৃহিণাঞ্চ তথা গৃহম্।
সারথিস্ত যামা তেষাং গৃহ স্থানাম্ তথা প্রিয়া॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

রথীর যেমন রথ, গৃহস্থের তেমনি গৃহ। তাহার যেমন সারথি, গৃহস্থের তেমনি স্ত্রী। সারথি যেমন রথীকে স্থান কালের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত রথ চালনার দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণের সহায়তা করেন, স্ত্রীও সেইরূপ সারথির ন্যায় স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে সংসার সমরাঙ্গনে অগ্রসর হইবার সাহায্য করিয়া থাকেন। স্ত্রী শুদ্ধমাত্র স্ত্রী নহেন;

"গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ, প্রিয়শিষ্যা—।"
(রঘুবংশম্ —৮-৬৬)

যাহার কথা স্মরণ করিয়া বঙ্কিমবাবু বোধ হয় বিষবৃক্ষে আমাদের সম্মুখে সূর্য্যমুখীর সৃষ্টি করিয়াছেন—সূর্য্যমুখীর স্মরণে নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সখা। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক—পরিচর্য্যায় দাসী।" ইহাই প্রাচীন ভারতের গৃহস্থের স্ত্রী। সংসারে যাহাকে এতগুলি দায়িত্ব বহন করিতে হইত, তাহাকে তাহার পদোপযোগী সম্মান প্রদানেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা স্ত্রীকে সংসারে লক্ষ্মীর স্থান জ্ঞান করিতেন।

"স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন"

গৃহে স্ত্রীর আর লক্ষ্মীর কোন প্রভেদ নাই। প্রাচীন ভারতের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মোদ্দেশে সাধিত হইত, এবং

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীন স্তথা স্বর্গঃ পিতৃনামাত্মনশ্চহি॥ (মনু নবম অধ্যায়)

সন্তান ধর্ম্মকর্ম্ম সেবা উৎকৃষ্ট সুখ, নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের স্বর্গ সমস্তই স্ত্রীর অধীন; সুতরাং স্ত্রীকে অনাদর করিলে ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হইবে। এই ধারণা হইতেই মহর্ষি মনু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজের উপর এই নীতিবাক্য প্রয়োগ করেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তু বিফলাঃ ক্রিয়াঃ (মনু ৩য় অধ্যায়)

যে গৃহে নারী পূজা পাইয়া থাকেন, সেই গৃহে দেবগণ অধিষ্ঠান করেন।

যেখানে নারী অনাদৃতা, সেখানে ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল। এমন কি, স্ত্রীকে পৃথক রাখিয়া স্বামীর কোনরূপ সৎকার্য্য করিবার অধিকার ছিল না। তাহার প্রমাণ রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞকালে স্বর্ণসীতা প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল।

স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ।—

বৈদিক যুগে বিবাহিত স্ত্রীর পুরুষের সম্বন্ধ মাত্র দেহের সহিত নহে, মনের একত্বই তাহাদের মিলনের বিশেষত্ব। বৈদিক বিবাহ মন্ত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছেন

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি
মম চিত্ত মনুচিত্তং তে অস্তু
মম বাচ মেকমনা জুষস্ব
প্রজাপতিস্ত্বাম্ নিযুনক্তু মহ্যম্।"

আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল হউক; একমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর। প্রজাপতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন। ইহা হইতে স্বামী স্ত্রীর মনের একত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলা হইবার কথাই বুঝাইতেছে।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।—বিরাহিত স্ত্রীকে লইয়াই যখন গৃহীর গৃহ, গৃহস্থাশ্রম, তখন সেই স্ত্রীর কর্ত্তব্যের একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। স্ত্রীর যে কেবলমাত্র স্বামীর সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা নহে; স্বামীর অন্যান্য পরিবারবর্গের সেবা শুশ্রূষার জন্যও তিনিই দায়ী। পতি বলিতে পতিকুল এবং পতি সম্পর্কীয় সকলেরই সেবায় তাঁহাকে আত্ম নিয়োগ করিতে হইত। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ভাসুর গৃহস্থের গলগ্রহ—এ কথা তখনকার স্ত্রীর অভিধানে পাওয়া যাইত না। এটি আমাদের সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণের কথা। স্বামীর অন্যান্য পরিবারবর্গের পালন যে স্ত্রীকে করিতে হইত, এ কথা বিবাহের মন্ত্রেই পাওয়া যায়। স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছেন।

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাংভব
ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবেষু।

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দা সকলে সম্রাজ্ঞী হও, এবং দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও; অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, তুমিও সেইরূপ শ্বশুর শাশুড়ী ইত্যাদির সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে পালন কর। শুধু তাহাই নহে, গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যও স্ত্রীকে নিজের হাতেই করিতে হইত এবং সেগুলি অপমানজনক মনে না করিয়া বরং গর্ব্বের সহিতই করিতেন। এমন কি রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী হইয়াও দ্রৌপদী নিজ হাতে রন্ধন এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে পাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন; মহাভারত বর্ণিত বনপর্ব্বে দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদে এরূপ পাওয়া যায়—দ্রৌপদী বলিতেছেন

"প্রমৃষ্টজন্তা মৃষ্টান্নকালে ভোজনদায়িনী
সংযতা গুপ্তধান্যাচ সুসংসৃষ্ট নিবেশনা।"

আমি প্রত্যহ উত্তম রূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, রন্ধন, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। রন্ধন ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যের ভার বেতনভুক দাস দাসীর উপর ন্যস্ত না করিয়া গৃহিণী নিজের হাতে সেগুলির ভার গ্রহণ করাতে গৃহস্থের আর্থিক অসচ্ছলতা সে অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গৃহস্থের নিত্যকৃত্য।—

মহর্ষি মনুর মতে প্রাচীন ভারতে নিত্যকৃত্যের মধ্যে এই পঞ্চযজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"ঋষি যজ্ঞং দেব যজ্ঞং ভূত যজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথা শক্তিন হাপয়েৎ।"

ঋষি যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ—শক্তি থাকিতে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কদাচ পরিত্যাগ করিবে না; ঋষি যজ্ঞ অর্থে বেদাধ্যয়ন বা ধর্ম্মালোচনার দ্বারা ঋষিদিগের পূজা; দেব যজ্ঞ অর্থে হোম দ্বারা দেবতার সন্তোষ বিধান; হোম অর্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন; পিতৃযজ্ঞ অর্থে শ্রাদ্ধের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধন অর্থাৎ কুলধর্ম্ম পালন; নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অন্যান্য গ্রস্ত দুস্থ মনুষ্যদিগের সেবা; ভূত যজ্ঞ অর্থে সাহায্যের দ্বারা জীবগণের সেবা। সুতরাং আধুনিক ভাষায় পূর্ব্বের গৃহস্থের প্রধান নিত্যকর্ম্ম ছিল—ধর্ম্ম আলোচনা স্বার্থ বিসর্জ্জন কুলধর্ম্ম পালন মনুষ্যের প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যেতর জীবের প্রতি দয়া।

সন্তানের প্রতি ব্যবহার।—অতীতের আদর্শ ছিল ধর্ম্ম। সুতরাং অতীতের গৃহস্থ সন্তানের যাহাতে ধর্ম্মপাত না হয়, সে বিষয়ে সতত যত্নবান থাকিতেন। ধর্ম্ম অর্থে কুলধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত ধর্ম্মকেই বালকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। এবং সন্তানকে সেই কুলধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য অপত্য স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া পিতামাতাকে সময় সময় কিরূপ কঠোর হইতে হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীর অশান্তি দূর করা। পুত্রকে সেই ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ও পরোপকার বৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিবার জন্য পাণ্ডব জননী প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তী বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য দুর্দ্ধর্ষ বক রাক্ষসের নিকট স্বীয় পুত্র ভীমসেনকে পাঠাইয়াছিলেন।

দাস দাসী আত্মীয় স্বজনের প্রতি ব্যবহার।—

দাস দাসী আত্মীয় স্বজনের প্রতিও তাঁহারা যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাহাদিগকে অনাহূত, রবাহূত গলগ্রহ না ভাবিয়া প্রাচীন গৃহস্থ তাহাদিগকে গৃহস্থেরই পরিজনের মধ্যে গণনা করিতেন, এবং যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনু দাস দাসীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার বিধির উল্লেখ করিয়াছেন।

"ভুক্তব্যঞ্চপি বিশ্বেষু স্বেষু ভৃত্যেষ চৈবহি
ভুঞ্জীয়াতাং ততপশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতি।"

(মনু ৩য় অধ্যায়)

ব্রাহ্মণ, আত্মীয় এবং ভৃত্যগণকে আহার করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে গৃহস্থ স্ত্রী পুরুষ তাহাই আহার করিবেন।

অতিথি সৎকার।—

অতীত ভারতে অতিথি সৎকার বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয়। "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি"—অতিথি সকল দেবতার সমান, এটি ভারতের নিজস্ব কথা। অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে স্থান কাল পাত্র নির্ব্বিচারে তাহার সেবা করা প্রাচীন গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত। যে গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি অনাদৃত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সে গৃহস্থের ক্রিয়া কলাপ কীর্ত্তি সমস্তই পণ্ড হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু অতিথির পরিতুষ্টির জন্য নিজহাতে পুত্রের মস্তক ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দানবীর কর্ণের অতিথি-সৎকারের কথা কাহারও অবিদিত নাই; উপাখ্যানের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

স্বদেশ প্রীতি বা স্বদেশানুরাগ।—

আজকাল অনেকের ধারণা—স্বদেশানুরাগ গুণটী ভারত পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতে স্বদেশ-প্রীতির ভাব ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, স্বদেশ-প্রীতি যথেষ্টই ছিল; ছিল না কেবল স্বদেশ-অপ্রীতি। স্বদেশ-অনুরাগ যে যথেষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ মহাভারতের পৃষ্ঠাতে পৃষ্ঠাতে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব রাজা নীলধ্বজের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, "অররক্ষক মহাবীর অর্জ্জুন" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিতে মনস্থ করিলেন। তখন নীলধ্বজ-পত্নী জনা নিজ রাজ্যের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বীয় পুত্র প্রবীরকে নিজ হাতে রণসাজে সজ্জিত করিয়া কুরুক্ষেত্র রণজয়ী মহাবীর অর্জ্জুনের বিপক্ষে প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। চিত্রাঙ্গদার স্বদেশ-প্রীতিও জগতে অতুলনীয়। স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থে মণিপুর-রাজ্ঞী অর্জ্জুন-পত্নী চিত্রাঙ্গদা স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনকে তাহার রণপণ্ডিত পিতার বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিশ্বের প্রতি ব্যবহার।—

প্রাচীন ভারতের বিশ্বের প্রতি ব্যবহার কিরূপ, তাহা একটী মাত্র নীতি-বাক্য হইতেই উপলব্ধি করা যায়—"বসুধৈব কুটুম্বকম্"। যাহাদের সহিত কেহ কোনরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ, তাহারাই যে কুটুম্ব, তাহা নহে। বসুধাবাসী সামুষ মাত্রেই মানুষের কুটুম্ব। বর্ত্তমান ভারতে এত বর্ণ-বিপর্য্যয়, এত জাতি-বিপর্য্যয় ও এত সম্প্রদায়-বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলেও, 'মানুষ মাত্রেই মানুষের আত্মীয়' এই ভাবটীই প্রাচীন ভারতের প্রাণের ভাব। নিজের উপার্জ্জিত অর্থ স্ত্রী পুত্র আর নিজেরই ব্যবহারে লাগিবে, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, এরূপ সংকীর্ণ ভাব বৈদিক ভারতের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই একটীমাত্র গুণকে আশ্রয় করিয়াই দেশের আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল সমস্যারই মীমাংসা হইত। একের ধন, একের জ্ঞান ও একের শক্তি ভারত-বাসী সকলের জন্য নিযুক্ত রাখায় ভারত মহাশান্তিতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অর্চ্চনা করিয়া জগতে মহামহিমান্বিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বার্দ্ধক্যে কর্ম্মশক্তি

শ্রীরাধাচরণ দাস

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে একবার লিখিয়াছিলেন;—

"আধুনিক ভারতবর্ষে যিনি কাহক্লেশে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করিতে পারিলেন, তিনি শ্রমশীলতার আদর্শস্বরূপ সমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। অথচ স্কট, সৌদী, প্রভৃতি ইংরেজী লেখকেরা কত লিখিয়া গিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। জেম্‌স একা প্রায় আশীখানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।"

ইংলণ্ডের ডাক্তার আলফ্রেড রসেল ওয়ালেশ নব্বুই বৎসর বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন। তিনি আশী বৎসর বয়সের পর চারিখানা খুব বড় বড় পুস্তক প্রকাশ করেন।

টেনিসন বৃদ্ধ বয়সে উৎকৃষ্ট ও অধিকসংখ্যক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ক্রসিং দি বার (Crossing the Bar) নামক সুবিখ্যাত গীতি-কবিতা তিনি তিরাশী বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন।

লকস্‌লিহল বাইশ বছরের সময় রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিশিষ্ট Sequel, বিরাশি বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন।

ল্যাণ্ডর পঁচাশি বৎসর বয়সে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমাপন করিয়া সাতাশি বৎসর বয়সে আবার Hervie Idylls নামক গ্রন্থের শেষাংশ-টুকু প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

জার্ম্মণ কবি গেটে আশী বৎসর বয়ঃক্রম কালে "ফষ্ট" নামক বিখ্যাত কাব্যের রচনা-কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

র‍্যাঙ্কে ঐ বয়সেই 'জগতের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিয়া একানব্বুই বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ড লিখিয়া যান।

গ্লাডষ্টোনের কর্ম্মক্ষমতা ও শ্রমশীলতা জগদ্বিদিত। আশী বৎসর বয়সে তিনি চতুর্থবার ইংলণ্ডের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

নিউটন তিরাশি বৎসর বয়সে উদ্যমশীল যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করিতে পারিতেন।

হার্ব্বার্ট স্পেনসারের ঐ বয়সে মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

গ্রীক দেশীয় কবি সাইমান্ ডিস একানব্বুই বৎসর বয়সে কবিতা লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বাফন (Buffon) একাশি বছরের সময় তাঁহার জীবনের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভার্জ্জিল এগার বৎসর ধরিয়া তাঁহার ইনিদ কাব্যখানি লেখা শেষ করেন।

ভলটেয়ার Voltaire কোন গ্রন্থ লিখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন নাই।

তুরস্কের সম্রাট সেলিম সমস্ত দিন কাজ করিতেন; রাত্রিতে অল্পক্ষণ ঘুমাইতেন। বাকী রাত্রিটুকু পড়াশুনা করিয়া কাটাইতেন। জীবনে কাজ [illegible] ন সুখ বা আনন্দ পাইতেন না।

মাইকেল এঞ্জেলো কাজ করিতে না পাইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন। সময় সময় মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতেন।

পক্ষান্তরে বাঙ্গালার উপর—বিশেষতঃ বাঙ্গালার কবি, মনীষী, ধর্ম্মপ্রচারক ও মনস্বীদিগের উপর বিধাতার অভিশাপ আছে। এখন "বাঙ্গালীর বল বুদ্ধি ভরসা, চল্লিশ না হ'তেই ফরসা।" অকাল মৃত্যু গোটা বাঙ্গালী জাতিটাকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে! যে বয়সে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বয়সে এ দেশের জ্ঞানী গুণী ভাবুক চিন্তাশীল, কবি কো বদ্‌লণ শ্মশান-চিতায় আরোহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ (৪০ বৎসর), বঙ্গের গ্যারিক গিরিশ (৪০), 'নীলদর্পণ'কার দীনবন্ধু (৪৪) 'পলাসীর যুদ্ধের' কবি নবীনচন্দ্র (৬২), "বৃত্রসংহার"—করে হেমচন্দ্র (৬৬), "মেঘনাদ বধ"-রচয়িতা মধুসূদন (৪৯) প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী ভাবুক, কবি, নাট্যকার, ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক গড়ে ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়সে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

বার্দ্ধক্যে সাহিত্য-সেবা

সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালদেশে যে সমুদায় সাহিত্য সেবক দীর্ঘ জীবন লাভ করেন, তাঁহাদের তখন আর সাহিত্য-চর্চ্চার প্রবৃত্তি বা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে না। "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা চন্দ্রশেখর সেন ও "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" দার্শনিক কবি অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন—কিন্তু শেষকালে তাঁহারা কোন কিছুর রচনা কার্য্য হইতে অবসর বা অব্যাহতি লইয়াছিলেন। কেবল সুধী সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরানব্বই বৎসর বয়সেও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় অগ্রজ সুপণ্ডিত, দার্শনিক-প্রবর ও রসিক চূড়ামণি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঘনান্ধকার জীবন-সন্ধ্যায় বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় মাসিক পত্রে তাঁহার সুরসাল, সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ সম্ভার উপঢৌকন দিয়া এ পক্ষে বাঙ্গালী জাতির—বিশেষতঃ দুষ্ক সাহিত্য-সেবকগণের মুখ রক্ষা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

যে দেশে আঠার বৎসরের বালক পিতার পদ প্রাপ্ত হয়, সে দেশে অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু ও বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম-শক্তি লোপ পা খুবই স্বাভাবিক।

কোন দেশের লোক আশী বৎসর বয়সে আপনাকে যুবক মনে করেন। আবার কোন দেশের লোক চল্লিশ বৎসরেই মনে করেন—তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। বস্তুতঃ বয়সে মানুষ বৃদ্ধ হয় না—মানুষের ভাব ও চিন্তাপ্রণালী ও শক্তি বৃদ্ধ হইলেই মানুষ বৃদ্ধ হয়।

ভদ্রলোকের লক্ষণ



"আপনি ভদ্রলোক? আচ্ছা, দেখি আপনার পকেট।"

"কেন? পোষাক দেখে কি চিন্‌তে পারছেন না?"

শিল্পী—শ্রীনীমঙ্গনাথ নাগ



জাতি-বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক সৃষ্টি—মানুষ। মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান, মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জ্ঞান। মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারাই মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা নৃ-তত্ত্বের কার্য্য। মানুষের আদি কি, জীব-জগতে মানুষের স্থান কোথায় নৃতত্ত্ব তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ব্যক্তি (Ontogeny) ও জাতি (Phylogeny) হিসাবে মানুষের পরিণতি আলোচনা করা নৃতত্ত্বের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে মানবের জীবন-কালে তাহার শরীর এবং মন কিরূপ অবস্থা হইতে কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইল, এ শাস্ত্র তাহার বিশিষ্ট সন্ধান লইয়া থাকে। এ ছাড়া জৈব জগতের যন্ত্র বা হাতিয়ার-ব্যবহারকারী প্রাণিরূপে মানুষের নূতন কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ, তাহার স্পষ্টরূপে উচ্চারিত ভাষা এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান (ethics), পরার্থবাদ (altruism), সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি এই নৃ-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও নৃ-তত্ত্বের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে হিপোক্রাটেস্‌ই (Hippocrates) নৃ-তত্ত্বের প্রথম প্রবর্ত্তক। হিপোক্রাটেস্ ৪৬০ হইতে ৩৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার পরে আরিষ্টট্‌ল্ (Aristotle) নৃ-তত্ত্বের আলোচনা করেন। আরিষ্টট্‌ল্, মানুষকে জীব-সাধারণের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে মানুষের বৈশিষ্ট্য তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই তাহা নয়। মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানুষ যে দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলে, তাহার মস্তিষ্কের আয়তন যে সকল প্রাণীর মস্তিষ্কের আয়তন অপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার মন যে অনন্যসাধারণ—এই কয়টীই তাহাকে অনন্যসাধারণ প্রাণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে। সুতরাং আরিষ্টট্‌লের মতে মানুষ সাধারণ ও অনন্যসাধারণ প্রাণী।

কিন্তু স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে নৃতত্ত্বের আলোচনা ইউরোপে অতি অল্পকাল পূর্ব্ব হইতেই হইতেছে। পুরাতন শাস্ত্রের মধ্যে নৃতত্ত্বের স্থান নাই। এমন কি কিছুকালের জন্য ইহার স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী বাধা পাইয়াছিল। জীব-বিজ্ঞান (biology), শরীরসংস্থান-বিদ্যা (anatomy), শারীরবিজ্ঞান (physiology), মনস্তত্ত্ব (psychology), ধর্ম্মতত্ত্ব (theology), নীতি-বিজ্ঞান (ethics), ভাষাতত্ত্ব (philology), জাতি-বিজ্ঞান (ethnology) প্রভৃতিতে নৃ-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকল বিষয়ই ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া, নৃ-তত্ত্ব স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হওয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূতত্ত্ব (geology), প্রত্নজীবতত্ত্ব (palæontology), প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ন-বস্তুতত্ত্ব (prehistoric archæology) প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলিতে বিগত শতকের দ্বিতীয় পাদে কয়েকটী বিস্ময়কর আবিষ্কার হয় এবং ডারউইনের (Darwin) "Origin of Species" প্রকাশিত হয়। এই দুই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকগণ জৈববিবর্ত্তনবাদ (theory of Organic evolution) অঙ্গীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। আর এই তত্ত্বানুসন্ধানের নূতন ক্ষেত্রে অন্য কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয় এমন সব উপকরণের সন্ধান বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণকে মানিয়া লইতে হইল—কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বিস্তৃত বিবরণের সকল মূলতত্ত্বই নৃ-তত্ত্বের অন্তর্গত। নৃ-তত্ত্ব কার্য্যতঃ মানবজাতির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার অনুসন্ধানের সীমায় আবদ্ধ।

নৃ-তত্ত্বের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে বিজ্ঞান পর্য্যায়ভুক্ত করিতে আপত্তি করেন। ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া যদি নৃতত্ত্বকে বিজ্ঞান-পর্য্যায়ভুক্ত করা না যায়, তাহা হইলে জীব-তত্ত্বকেও (biology) বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কিন্তু জীবতত্ত্ব যে বিজ্ঞানের একটী অঙ্গ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। নৃতত্ত্ব জীবতত্ত্বেরই একটী শাখা। জীব-তত্ত্বের সহিত যে ইতিহাসের সম্বন্ধ নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। জীবতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় প্রাণতত্ত্ব বা life। প্রাণতত্ত্ব এবং জড়তত্ত্ব বা matter একই বস্তু নয়। জড়তত্ত্বকে আর একটী অজ্ঞাত তত্ত্ব দিয়া গুণ (multiply) করিলে তবে জড়তত্ত্ব প্রাণতত্ত্বে পরিণত হয়। এই উভয় তত্ত্বে প্রভেদ এই যে, জড়ের ধর্ম্ম গতি বা motion এবং প্রাণের ধর্ম্ম বিবর্ত্তন বা evolution। গতিধর্ম্মশীল জড়তত্ত্ব এক বস্তু এবং বিবর্ত্তনশীল প্রাণতত্ত্ব পৃথক্ বস্তু। যে অজ্ঞাত তত্ত্বের দ্বারা গুণিত হইয়া জড়তত্ত্ব প্রাণতত্ত্বে পরিণত হয় তাহা জড়ধর্ম্মশীল নয়। বিবর্ত্তন বা evolution এর অর্থ—কোন না কোন দিকে নিয়ত পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি। জড়রাজ্যে তাহা নাই, কিন্তু প্রাণরাজ্যে তাহা আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীবতত্ত্বের ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ আছে। ইতিহাসধর্ম্মী হইয়াও জীবতত্ত্ব যদি বিজ্ঞান পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ইতিহাসধর্ম্মী বলিয়া জীবতত্ত্বেরই একটী শাখা নৃ-তত্ত্ব কেন বিজ্ঞানপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারিবে না। ডক্টর ম্যারেট (Dr. Marett) বলেন যে, নৃতত্ত্ব যখন কোন এক বিশেষ সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, এবং ইহা যখন জীবতত্ত্বেরই শাখা, আর জীবতত্ত্বেরই বিবর্ত্তন-পদ্ধতি (evolutionary principle) যখন ইহার অবলম্বন, তখন ইহাকে বিজ্ঞান পর্য্যায়ভুক্ত করিবার আপত্তি থাকিতে পারে না।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং ইতিহাস প্রভৃতির মাঝামাঝি নৃতত্ত্বের স্থান। ইতিহাস, সাহিত্য, কলা ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ইহার অঙ্গীভূত হইলেও, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের রীতি অনুসারেই ইহার আলোচনা হইয়া থাকে। মানব-জাতির বিভিন্ন শাখা দ্বারা আলোচিত সাহিত্য, কলা, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরস্পরের তুলনা করিয়া মানুষের উৎপত্তি এবং তাহার অতীত উন্নতাবনত অবস্থা সকল সন্ধান করিবার চেষ্টা করিলেই আমাদের নৃতত্ত্বের আলোচনা করা হয়।

শারীরতত্ত্ববিদ্যা বা Somatology নৃতত্ত্বের একটী অংশ বা শাখা। ইহাকে physical anthropologyও বলা হয়। অনেকে শারীরতত্ত্ববিদ্যাকে নৃতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু নৃতত্ত্ব হইতে শারীরতত্ত্ব-বিদ্যাকে পৃথক্ করিয়া লইলে নৃতত্ত্বের পূর্ণতা বজায় থাকে না। বস্তুতঃ নৃতত্ত্বের সহিত একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ সেইরূপ অপর দিকে ইহার সহিত জীবতত্ত্বেরও

বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু যাঁহারা বিশুদ্ধভাবে জীবতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই নৃতত্ত্বের মনোবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক অংশের প্রতি আস্থাবান্ থাকেন না। কিন্তু তাই বলিয়া নৃতত্ত্বের আলোচনায় ঐ উভয় অংশের কোন অংশকে বাদ দিলে নৃতত্ত্বের অঙ্গহানি হয়। নৃতত্ত্বের আলোচনায় উভয় অংশের সংযোগ রক্ষিত হওয়া দরকার।

বর্ত্তমানকালে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ অনুসন্ধান হইতেছে পূর্ব্বে কখনও সেইরূপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ নৃতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। ইঁহারা যে সকল মূল্যবান্ আবিষ্কারের পরিচয় দিয়াছেন, সেগুলি পূর্ব্বে স্বপ্নের অগোচর ছিল। জুল দিসেরুফ (Juul Dieserud) * বলেন, নৃতত্ত্বকে দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত করা উচিত। এই শাখা দুইটীর নাম তিনি দিয়াছেন—(ক) Physical Anthropology ও (খ) Ethnical Anthropology। প্রকৃত নৃতত্ত্ব এই প্রথম শাখার অন্তর্গত।

জাতি-বিজ্ঞান (Ethnology)*, জাতিবিদ্যা (Ethnography)*, প্রত্নবস্তুতত্ত্ব (Archæology), সমাজতত্ত্ব (Sociology), মনস্তত্ত্ব (psychology), ও শিল্প-বিজ্ঞান (Technology) দ্বিতীয় শাখার অন্তর্গত।

বিগত কয় বৎসরের মধ্যে নৃতত্ত্বে বিশেষ বিশেষ কতক-গুলি আবিষ্কার হইয়াছে। সুধু তাহাই নয়, ইহার কয়েকটী বিভাগে সরল ও বিশদ আলোচনার ফলে এই বিজ্ঞানের দিকে সাধারণে আকৃষ্টও হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে সেই সমুদয় আবিষ্কার-লব্ধ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মানবের ইতিহাস সঙ্কলনের বিশেষ অভাব ও প্রয়োজন ছিল। সম্প্রতি H. G. Wells-এর Outline of Historyতে সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে। প্রয়োজনও কিছু সিদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিবার শক্তিও ওয়েল্‌সের যথেষ্ট। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যে সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের সকলগুলি যদিও নিবিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার পুস্তক-খানি পড়িয়া এই ধারণা হয় যে ইহা বর্ত্তমান সময়ে আদর্শস্থানীয়। মানুষ প্রথম স্তর হইতে কেমন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল ইঁহার গ্রন্থে প্রথম হইতে ২৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তাহাই আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের এই অংশটুকু শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ। †

পৃথিবীর সকল জীবেরই দেহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। হিন্দুশাস্ত্র-মতে দেহ ও আত্মার সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়। কিন্তু দেহ-বিযুক্ত আত্মার বিষয় আলোচনা করা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিষয় নহে।

মানুষের যেমন দেহ আছে, তেমনই আত্মাও আছে। কিন্তু শুদ্ধ আত্মার সহিত প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃতিক বিষয়ই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য। দেহযুক্ত আত্মাতেই মানুষ। দেহকে একেবারে বাদ দিলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। দেহের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, মানব-দেহের আলোচনা করিলেই মানব-তত্ত্বের অনেকটাই আলোচনা করা হয়। মানবতত্ত্বের উৎপত্তি-কেন্দ্র দেহের আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ—আত্মা অজ। দেহে আত্মার উৎপত্তি হয় নাই। আত্মা দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, দেহেই আত্মার উৎপত্তি হয়। আমাদের শাস্ত্রের মতে, আত্মা যে পুনঃপুনঃ দেহ পরিগ্রহ করে, তাহার কারণ দেহজাত সংস্কার। দেহজাত সংস্কার

* Member of the Staff of the Library of Congress, Washington, D. C. Chicago.

† ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে Neuchatelএ জাতি-বিজ্ঞান বিচারের যে আন্তর্জাতিক মহাসভার প্রথম (Congre´s International d' Ethnologie et d' Ethnographie) অধিবেশন হয় তাহাতে স্থির হয় যে, Ethnology বলিলে জাতি সমূহের বিভাগ এবং Ethnography বলিলে জাতি সকলের সভ্যতার তুলনামূলক অনুশীলন বুঝাইবে [Ethnologie, le classement des races এবং Ethnographie, le´tude compare´e des civilisation]।

অধ্যাপক হটন ওয়েবষ্টারও প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য গত বৎসর সুন্দর, সহজ ও সরলভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। টুটাংখা-মেনের tombএর আবিষ্কার উপলক্ষ্য করিয়া মিসরতত্ত্ব (Egyptology) ও প্রত্নবস্তুতত্ত্ব লইয়া সম্প্রতি সে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে তাহাতে চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

হইতে একেবারে বিচ্যুত হইলে, আত্মাকে আর জন্মিতে হয় না। সুতরাং মুক্তাত্মার মানবত্বের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কাজেই মুক্তাত্মার সম্বন্ধে আলোচনার দেহতত্ত্বের আলোচনার সহিত সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অমুক্তাত্মার দেহজাত সংস্কারের সহিত সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং মানবত্বের আলোচনার, মানবদেহ-তত্ত্বের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আর যদি বুঝিতে হয় যে, মানব-দেহেই মানবাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলেও, মানবত্বের আলোচনার জন্য, মানব-দেহতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হয়। কারণ, দেহ হইতে, যে মানবাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই মানবাত্মা দেহমুক্ত হইলেও, দেহজাত সংস্কার এড়াইতে পারে না। দেহমুক্ত হইলেও আত্মার ক্রমোন্নতি হইতে পারে, কিন্তু সে উন্নতি দেহজাত সংস্কারেরই উন্নতি। সুতরাং উভয় মতেই, দেহতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

হিন্দুশাস্ত্র মতে, যাহার উৎপত্তি আছে,তাহার বিনাশও আছে। ইহা অতি সুন্দর যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে, দেহ হইতে উৎপন্ন আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে, মানবাত্মার উৎপত্তি স্বীকার করেন, কিন্তু বিনাশ স্বীকার করেন না। হিন্দু দর্শন অনুসারে ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত।

পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা মানবাত্মার উৎপত্তি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু মানবাত্মা অবিনশ্বর কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারেন না। যাহা হউক, মানবতত্ত্ব আলোচনার জন্য, মানবদেহতত্ত্বের আলোচনার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মানব-শরীর একটী অত্যদ্ভুত জটিল যন্ত্র। এই যন্ত্রের অনেকগুলি অংশ আছে। তন্মধ্যে মস্তিষ্কই সর্ব্বপ্রধান। মানুষের মস্তিষ্কাধার সকল জন্তুর মস্তিষ্কাধার অপেক্ষা বড়। মানুষের মস্তিষ্কের ভার এবং পরিমাণ সকল জন্তুর মস্তিষ্কের ভার এবং পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ককে বুদ্ধির কেন্দ্র বলিয়া থাকেন। জড়বাদীর মতে মস্তিষ্ক বুদ্ধির কারণ; কিন্তু অধ্যাত্ম-বাদীদিগের মতে মস্তিষ্ক বুদ্ধি প্রকাশের যন্ত্র। জড়বাদীদিগের মতে, মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাণের আধিক্য বশতঃ মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু মস্তিষ্ককে যদি বুদ্ধির জনক না বলিয়া বুদ্ধি-প্রকাশের যন্ত্র বলা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-প্রকাশের সুবিধার জন্য, যন্ত্রের আয়তন-বৃদ্ধির যে বিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যে অনুপাতে ইতর প্রাণীর বুদ্ধি অপেক্ষা বেশী, ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কের আয়তন অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ঠিক সেই অনুপাতে বেশী নহে। অঙ্ক-শাস্ত্রের হিসাব অনুসারে ইতর প্রাণীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্ক যত বড় হওয়া উচিত, তাহা তত বড় হইলে, এত প্রকাণ্ড হইত ও এত ভারি হইত যে, মানব-শরীর তাহা বহন করিতে পারিত না। সুতরাং সুধু আয়তনের বৃদ্ধি ছাড়া, মানব-মস্তিষ্কের আরও অন্যপ্রকার বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব। মানব-মস্তিষ্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য, মস্তিষ্কের জটিলতা ও তাহার উপরের ধূসর বর্ণের আবরণে। মানব-মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণের আবরণের উপর যতগুলি খোপ দেখা যায়, আর অন্য কোন প্রাণীর মস্তিষ্কে ততগুলি খোপ দেখা যায় না। মানুষের স্মৃতিশক্তি সকল প্রাণীর স্মৃতিশক্তি অপেক্ষা প্রবল। এই খোপগুলি মানুষের স্মৃতিশক্তির সহায়তা করে। বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যতপ্রকার জ্ঞান হয়, তাহাদিগকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। এক এক শ্রেণীর জ্ঞানের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যে এক একটী খোপ আছে; সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতা সকল নষ্ট হইয়া না গিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক যেন একটী প্রকাণ্ড ভাণ্ডার-গৃহ। যাহার জ্ঞান হয় সেই চৈতন্যময় জীব প্রয়োজন মত ভাণ্ডার-গৃহ হইতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি বাছিয়া বাহির করিতে পারে। জড়বাদীর মতে, এই চৈতন্যময় জীব, কতকগুলি শক্তির সমষ্টীভূত ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। জড়বাদ অনুসারে, উত্তাপ, আলোক প্রভৃতি যেমন একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন আকার, অনুভূতিও সেইরূপ জড়-শক্তিরই আকারান্তর। শারীরিক জটিল ক্রিয়ার ফলে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, অনুভূতি সঞ্জাত হইতে পারে, বিজ্ঞান এখনও তাহা সাধারণের গোচর করিতে পারে নাই। অধ্যাত্মবাদী একেবারেই তৈরী অনুভূতি-সম্পন্ন জীবের সত্তায় বিশ্বাসবান্। যাহাই হউক, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা সে বিষয়ের

বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত অত্যন্ত উদার। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে, বিশুদ্ধ আত্মা আর সাধারণ অনুভূতি-সম্পন্ন জীবে পার্থক্য আছে।

জীব, জড় শক্তিরই পরিণাম হউক, বা অনুভূতি-সম্পন্ন চৈতন্যময় সত্তাই হউক, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-বশতঃই তাহার উৎপত্তিই হউক, দেহ যে তাহার লীলা-নিকেতন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। জীবদেহ যখন মানবদেহে পরিণত হয়, তখনই জীবে মানবত্বের বিকাশ হয়। অর্থাৎ দেহের ক্রম-বিকাশের ফলে দেহ যখন মানবোচিত গঠন প্রাপ্ত হয়, তখনই জীব মানব নামের যোগ্য হয়। কিন্তু সকলেই জীব-সাধারণের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের পক্ষপাতী নহে। অনেকে মনে করেন, যত প্রকার জীব এখন আছে সমই সৃষ্টিকালে, পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ বিবেচনায় বিবর্ত্তনবাদ সমর্থিত হইতে পারে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে বিবর্ত্তনবাদের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদ বাইবেলের মতের ঘোর বিরোধী, সেই কারণে বিবর্ত্তনবাদের সূত্রপাতের সময়, খৃষ্টীয় সমাজ ঘোর আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিল। এমন কি তখনকার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবর মনে মনে বিবর্ত্তনবাদের পোষকতা করিলেও প্রকাশ্যে বিবর্ত্তনবাদ প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। তাই ডারইউনের পূর্ব্বে ইয়ুরোপে বিবর্ত্তনবাদের বিধিমত প্রচার হইতে পারে নাই। বিবর্ত্তনবাদের দ্বারা বাইবেলের মত যেরূপ বাধা প্রাপ্ত হয়, হিন্দু শাস্ত্রের মত সেরূপ বাধা প্রাপ্ত হওয়া ত দূরের কথা, বরং ইহা বিবর্ত্তনবাদের বিধিমত সমর্থন করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক সমাজ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ করিলেও, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল। ভারতবর্ষে বিবর্ত্তনবাদের প্রচার বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। মানুষ এবং বানরজাতীয় জীবে মূলগত যে কোন পার্থক্য নাই, এ কথা খৃষ্টীয় সমাজে যেরূপ বিসদৃশ, হিন্দুসমাজে সেরূপ বিসদৃশ হইবার কোন কারণ নাই। হিন্দুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ গীতায় স্পষ্টই উপদিষ্ট হইয়াছে, "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" হিন্দু জানে, যে আত্মা মানবদেহ পাইয়া মানব হইয়াছে, সেই আত্মাই গর্দ্দভ-দেহে গর্দ্দভ।

হিন্দুশাস্ত্র বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদ এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিবর্ত্তনবাদে কিছু পার্থক্য আছে। তাহার কারণ এই যে, হিন্দু, আত্মতত্ত্বের ভিতর দিয়া বিবর্ত্তনবাদে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান তাহাতে জড়তত্ত্বের ভিতর দিয়া পৌঁছিয়াছে। হিন্দু যে পথে যে দিক্ দিয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান সে পথে সে দিক্ যায় নাই। আত্মতত্ত্ব হিন্দু যেমন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে, বিজ্ঞান জড়তত্ত্ব সেইরূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে। হিন্দু আত্মতত্ত্বের প্রতি সবিশেষ ঝোঁক দিয়া, জড়তত্ত্বের প্রতি অপেক্ষাকৃত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। সুতরাং আত্মতত্ত্ব-পথের পথিক না হইলে, হিন্দুর বিবর্ত্তনবাদ ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন। এক জন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, পৃথিবীর কোন জাতিই দার্শনিক চিন্তায় হিন্দুর সমকক্ষ হইতে পারে নাই, কিন্তু পদার্থতত্ত্ববিদ্যায় হিন্দু শিশুমাত্র। যাহা হউক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই এখন পদার্থতত্ত্বের ভিতর দিয়া আত্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Alfred Russel Wallace জড় জগতের পশ্চাতে বিশ্বমনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার মতে জড় পদার্থের অনাদিত্বের প্রতি আর আস্থা স্থাপন করা যায় না। মনোজগৎই যে অনাদি, এবং তাহাই যে জড়জগতের মূলীভূত কারণ, তাহা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মত আলোচনাকরিয়া দেখা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রীয় মত বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, এবং বিজ্ঞান হিন্দু মতের প্রতিকূলতাচরণ না করিয়া ক্রমশঃ অনুকূলতাচরণই করিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য জৈব বিবর্ত্তনবাদীদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, জলেই প্রথমে জীবের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে জীব প্রথমে trilobite এর আকারে জলজ জীবই ছিল। জলজ জীবের কূর্ম্মাদি জীবে পরিণতি পরে হয়। প্রথমে পৃথিবী জলময়ই ছিল। পৃথিবীর স্থলভাগ সৃষ্ট হইবার পরে, কূর্ম্মাদি উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। পাশ্চাত্ত্য জৈব বিবর্ত্তন-প্রণালী অনুসারে, গিরগিটি-জাতীয় জীবই পক্ষিরূপে পরিণত হয়। আমাদের হিন্দু ঋষিদিগের হিসাব অনুসারে, কূর্ম্মযোনির পর, পক্ষিযোনি উৎপন্ন হয়। পক্ষী হইতে যে পশু, এবং পশু হইতে যে বানরের উদ্ভব হয়,

ইহা উভয় মতেই স্বীকৃত হইয়াছে। বানর-জাতীয় জীবের যে পরিণামে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহাও উভয় মতে স্বীকৃত। মানবত্ব প্রাপ্তির জন্য যদি অশীতি লক্ষযোনি ভ্রমণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, মানুষ যে, সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর জীবের ক্রম-বিকাশের ফল, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদ এবং হিন্দু শাস্ত্রীয় বিবর্ত্তনবাদে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ আছে। কর্ম্মফলে মানুষও জন্মান্তরে পশুযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে, হিন্দুর এই মত, পাশ্চাত্ত্য বিবর্ত্তনবাদের সহিত এক মত নহে। পাশ্চাত্ত্য বিবর্ত্তনবাদ জড়তত্ত্বের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং প্রাচ্য বিবর্ত্তনবাদ আত্মতত্ত্বের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া উভয়ের মধ্যে এই তারতম্য। বিবর্ত্তন-প্রণালীতে যে সমস্ত জীব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে পড়িয়া, জীবনের গতিতে পিছাইয়া পড়িল, তাহারা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত হইল, এবং তাহাদের মনুষ্যত্ব লাভের আশাও রহিল না, এই মত, জড় জগতের পশ্চাতে মনোজগতে সত্তাবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। সে যাহা হউক বিবর্ত্তনবাদ ইয়ুরোপেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহা প্রচলিত ছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Darwin এর Origin of Species বাহির হইবার পূর্ব্বে, বিবর্ত্তনবাদ ইয়ুরোপে বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। কিন্তু Darwinই যে, বিবর্ত্তনবাদের প্রবর্ত্তক তাহা বলা উচিত নহে।

হিন্দু ঋষিদিগের মনে জৈব-বিবর্ত্তনের ধারণা বহুকাল পূর্ব্বে স্থান পাইয়াছিল। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে জীবের আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর মানবত্ব প্রাপ্তির কথা স্পষ্ট-ভাবে উল্লিখিত আছে। জীব বিংশতি লক্ষ স্থাবর যোনি, নব লক্ষ জলজযোনি, নব লক্ষ কূর্ম্মযোনি, দশ লক্ষ পক্ষি-যোনি, ত্রিংশ লক্ষ পশুযোনি, চতুর্লক্ষ বানরযোনি ভ্রমণ করিবার পর, তবে যে মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণে ইহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে,—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চা নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

বিষ্ণুপুরাণের মতে, জীব প্রথমে স্থাবরের অবস্থাতেই ছিল, তার পর জীব জলজ প্রাণীতে পরিণত হয়। জলজপ্রাণী কূর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কূর্ম্ম পক্ষীরূপে পরিণত হয়, পক্ষী হইতে পশুযোনি, এবং পশু হইতে বানরযোনি উৎপন্ন হয়; এবং জীবের বানরত্ব প্রাপ্তির পর মানবত্ব প্রাপ্তি ঘটে। বৈজ্ঞানিক জৈব বিবর্ত্তনের ক্রমও প্রায় এইরূপ। *

* উদ্ধৃত সংস্কৃত এই অংশটুকু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়-লিখিত Anothrooplogy হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

বেদের অগ্নি

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ভোজনার্থক অদ্ ধাতু (অদ্‌ল ভোজনে) হইতে 'অদিতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'অদিতি' শব্দের এই ভোজনার্থক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্-ভাগবৎকার পূজ্যপাদ মহর্ষি বলিয়াছেন "অন্নাদ্যকামস্ত-দিতম্" (শ্রীমদ্ভাগবৎ ২য় স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক) 'যাঁহারা অন্নাদি কামনা করেন তাঁহারা অদিতির পূজা করুন।' বস্তুতঃ 'অদিতি' শব্দ 'অত্তি' এই শব্দেরই সাম্প্রসারণিক রূপমাত্র। অন্নময় ভিত্তির উপরই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগতের প্রতিষ্ঠা। অন্ন দ্বারাই প্রাণিগণের বিকাশ হইয়া থাকে এবং তদভাবে লয় হয়। এইজন্যই ঋগ্বেদে 'অদিতি দ্যৌঃ-অদিতি অন্তরিক্ষ-অদিতিই পরিদৃশ্যমান জগৎ, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত ১০ মন্ত্র)।

ঋগ্বেদে দুই এক স্থলে 'অদিতি' শব্দের সহিত 'দিতি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ৪র্থ মণ্ডল ২য় সূক্ত ১১শ মন্ত্রে অগ্নিদেবকে উদ্দেশ করিয়া ঋষি বামদেব বলিতেছেন ঃ—

"চিত্তিম্ অচিত্তিম্ চিনবৎ বি বিদ্বান্
পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চ মর্ত্তান্।
রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব
দিতিঞ্চ রাস্ব অদিতিম উরুষ্য।"

'হে দেব নিখিলবেত্তা অগ্নে! আপনি চেতন অচেতন সকলেরই পুষ্টিসাধন করেন। আপনি নিজবলে মনুষ্যগণকে যেন পৃষ্ঠে বহন করিতেছেন। আমাদিগের ধন ও সুন্দর অপত্যের জন্য দিতি প্রদান করুন এবং অদিতি বৃদ্ধি করুন।'

পুনরায় ৫ম মণ্ডল ৬২ সূক্ত ৮ম মন্ত্রে মিত্রাবরুণ দেবের উদ্দেশে বলা হইয়াছে ঃ—

"হিরণ্যরূপম্ উষসঃ ব্যুষ্টৌ
অয়ঃ স্থূণম্ উদিতা সূর্য্যস্য।
আরোহথ বরুণমিত্র গর্ত্তম্
অতঃ চক্ষাথে অদিতিম দিতিঞ্চ।"

'উষা অতিক্রান্তা হইলে সূর্য্যদেবের সুবর্ণবর্ণ কনকস্তম্ভ উদিত হইল। হে বরুণ ও মিত্রদেব আপনারা আপনাদের গৃহে আরোহণ করুন এবং অদিতি ও দিতিকে নিরীক্ষণ করুন।' এক্ষণে দেখা যাক্ এই দুই মন্ত্রে অদিতি ও দিতি শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি, ভোজনার্থক অদ্ ধাতু হইতে 'অদিতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষুধার উপরই জগৎ ব্যবস্থিত। সামান্য তৃণ গুল্মশৈবালাদিও ভোজনের অপেক্ষা করে। ক্ষুধাই সমগ্র জগতের অন্তঃপ্রকৃতি। এই জন্যই দেবী মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা"—'যে দেবী সর্বভূত মধ্যে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন।' এই অদিতি বা অন্তঃ প্রকৃতির সহিত আত্মার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই অদিতি বা অন্তঃ প্রকৃতির উপরিই আত্মলীলা প্রতিষ্ঠিত। আত্মাই আবার সকল দৈবতের আধার। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৪২ তম আত্মসূক্তে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এই জন্যই অদিতি দেবমাতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

'দিতি' শব্দ খণ্ডন বা ছেদন বাচি 'দো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। যাহা খণ্ডিত বা বিলীন হইয়া যায় তাহাই 'দিতি'। মিথ্যা মায়া-প্রপঞ্চ প্রসূত বহিঃপ্রকৃতিই 'দিতি' শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। আত্মাধিষ্ঠিত 'অদিতি' মোহাবিষ্টা হইয়াই 'দিতির' কল্পনা করেন। ভগবান্ বসিষ্ঠ দেব ইহাই বুঝাইবার জন্য যোগবাসিষ্ঠে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহাই বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য এবং ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনবিৎ ক্যাণ্টের (Kant) মায়াবাদ। অতএব ভূমি গৃহ ধন রত্নাদি বহিঃ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য সকলই 'দিতি' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। 'দিতির' উপাসনায় আত্ম-লাভ হইতে পারে না। এই জন্যই বেদমর্মবিৎ পুরাণকার 'দিতিকে' বলদৃপ্ত, ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত, অনাত্ম-বান্, সর্ব্বদা ধ্বংসোন্মুখ দৈত্যগণের মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরিধৃত ১ম মন্ত্রের শেষ চরণে যে বলা হইয়াছে, "দিতিঞ্চ রাস্ব অদিতিম্ উরুষ্য" তাহার অর্থ এই যে, 'হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে দিতিরূপ ভূমিধনরত্নাদি বহিরৈশ্বর্য্য প্রদান করুন এবং অদিতিরূপ আমাদিগের অন্তঃপ্রকৃতির উন্নতিসাধন করুন।' এবং ২য় মন্ত্রের শেষ চরণে যে বলা হইয়াছে "অতঃ চক্ষাথে অদিতিম্ দিতিঞ্চ" ইহার অর্থ এই যে "হে বরুণ ও মিত্রদেব! আপনাদের অগোচর কিছুই নাই! আপনারা বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃ প্রকৃতি উভয়ই অবলোকন করুন।"

অতএব দেখা গেল, 'অদিতি' ও 'দিতি' এই দুইটী শব্দ পরস্পর নিরপেক্ষ। এই দুইটী শব্দের কোনটীতে তদন্যবাচকত্ব অভিব্যক্তি নাই। বেদে 'অদিতি'কে দেব-গণের মাতা, বলা হইয়াছে, কিন্তু 'দিতি' যে দেববিরোধী দৈত্যগণের মাতা ঋগ্বেদে এরূপ দৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত উপরিধৃত মন্ত্রে দেখা গেল, অভীষ্টদেবের নিকট হইতে যাজক 'দিতি'কে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। 'অসুর' শব্দ আলোচনার সময় দেখাইয়াছি, পুরাণ কিরূপে তদ্বিরোধিভাবের গভীর অঙ্কনে উক্ত শব্দ অঙ্কিত করিয়া তদন্যবাচকত্বে ঐ শব্দের প্রয়োগ দৃঢ়মূল করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগে 'অদিতি' শব্দেও ঐরূপ তদ্বিরোধিভাবের গভীর অঙ্কন অঙ্কিত হইয়া গেল এবং ঐ শব্দ 'ন—দিতি'—'দিতি নহে'—এইরূপ তদন্যবাচকত্বে অভিব্যঞ্জিত হইল। কেন এবং কিরূপে এই বিপর্য্যয় সংঘটিত হইল, তাহা মৎপ্রণীত 'বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান' নামক পুস্তকে ৬৩—৬৬ পৃষ্ঠায় সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি আর্য্য-জাতীয় সকল শাখা কর্ত্তৃকই অগ্নি পূজিত হইতেন। আব্রাহাম (Abraham) প্রমুখ যহু * (Jew) গণ একেশ্বরবাদিত্ব নিবন্ধন যখন অসুর্য্য (Assyria) দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পল্লীস্থান (Palestine) প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন, তখন তাঁহারাও তাঁহাদের সহিত অগ্নির সেই সর্ব্বপূজিত দেবভাব সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভগবদুদ্দেশ্যে বলি 'যহু'গণ কর্ত্তৃক অগ্নিতে প্রদত্ত হইত। আবার যখন যহুবংশ-প্রদীপ মূষা (Moses) ঈ-গুপ্ত (Egypt) দেশ হইতে পলায়ন করিয়া সিনাই (Sinai) পর্ব্বতের সানুদেশে পশুপালন করিতেন, তখন ভগবান অগ্নিস্তম্ভ রূপে বার বার তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। এই স্থলে আমরা কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণিতচার্য্য উইলিয়ম হুইষ্টন (William Whiston) মহোদয় কর্ত্তৃক অনূদিত ফ্লেভিয়স্ যোসেফস্ (Flavius Josephus) প্রণীত 'যহু'গণের প্রাচীন ইতিহাস (Antiquities of the Jews) নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিতেছি :—

I. "Now Moses.....taking his station at the mountain called Sinai...drove his flocks thither to feed them.....It had not been before fed upon because of the opinion men had that God dwelt there...And here it was that a wonderful prodigy happened to Moses ; for a fire fed upon a thorn bush, yet did the green leaves and the flowers continue untouched, and the fire did not at all consume the fruit-branches, although the flame was great and fierce.....fire uttered a voice and called to him by name and spake words to him.....

4. Moses having now seen and heard these wonders.....besought Him to vouchsafe him the knowledge of his own name..... Whereupon God declared to him His holy name which had naver been discovered to men before ; concerning which it is not lawful for me to say anymore." (Antiquity of the Jews, Chap. XII, pages 59-60) ইহার অর্থ এই :—

১। এক্ষণে মূষা সিনাই নামক পর্ব্বতে অবস্থান নির্ণয় করিয়া চরাইবার জন্য তাঁহার পশুযূথ তথায় লইয়া গেলেন। পূর্ব্বে আর কেহ তথায় পশু চরাইতে যায় নাই—কারণ মনুষ্যগণের ধারণা ছিল যে, সেখানে ভগবান বাস করেন। এবং এই স্থলেই মূষার জন্য এক একটী অভাবনীয় বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। সেই স্থলে কণ্টক গুল্মে অগ্নি জ্বলিতেছিল, কিন্তু যুগল হরিদ্বর্ণ পত্রগুলি এবং পুষ্প সকল অবিকৃত ছিল। যদিও অগ্নি-শিখা ভয়ঙ্কর প্রবলভাবে জ্বলিতেছিল, তথাপি তদ্ভারে অবনত শাখাগুলি কিছুমাত্রও দগ্ধ হয় নাই। ঐ অগ্নি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, নাম ধরিয়া মূষাকে আহ্বান করিলেন এবং মূষার সহিত আলাপ করিলেন।

৪। মূষা এই সকল বিচিত্র ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ভগবানকে তাঁহার নিজ নাম ব্যক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর ভগবান মূষার নিকট নিজের পবিত্র নাম ব্যক্ত করিলেন। ঐ নাম পূর্ব্বে আর কখন কোন মনুষ্যের নিকট ব্যক্ত হয় নাই। ঐ নাম সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা বিধি-সঙ্গত নহে। যোসেফস্ ঐ নাম সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই। কিন্তু অনুবাদক টিপ্পনীতে বলিতেছেন :—"The name with four letters which of late we have been used falsely to pronounce Jehovah, but seems to have been originally pronounced Jahoh or Jao..." ইহার অর্থ এই যে 'চারি বর্ণাত্মক ঐ নাম যাহা আমরা এ যাবৎ ভ্রান্তভাবে 'যিহোবা' বলিয়া আসিতেছি, বোধ হয় তাহা আদিতে 'যহো' বা 'যও' এই প্রকার উচ্চারিত হইত।'

পাঠকবর্গকে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, ভগবানের অগ্নিস্তম্ভে আবির্ভাব বা তাঁহার 'যহো' বা 'যও' এই বিশিষ্ট নাম ইহাতে 'যহু' (Jew) ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কোন

* 'যহু' এই শব্দটী অপত্যবাচী বৈদিক শব্দ।



মাতৃহারা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আব্রাহাম প্রমুখ যহুগণ যখন অসুর্য্য (Assyria) দেশ হইতে চলিয়া আসেন, তখন তাঁহারা সকল আর্য্যশাখা পূজিত অগ্নির দেবভাবও সঙ্গে করিয়া আনেন। অতএব অগ্নি স্তম্ভে যে ভগবদাবির্ভাব কল্পিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি! 'যহো' বা 'যহ' শব্দটীও বৈদিক 'যহ্ব' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। নিঘণ্টুতে এই 'যহ্ব' শব্দটী 'মহন্নামানি' অর্থাৎ মহদ্বাচি শব্দ তালিকায় দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। * অতএব ভগবদ্বাচকত্বে 'যহ্ব', 'যহো' বা 'যও' শব্দ প্রয়োগে কোন বিশেষত্ব বা মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয় না। যহু ধর্ম্মশাস্ত্রে 'যহো' বা 'যও' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে উপরিধৃত বর্ণনা অস্মদ্দেশীয় পুরাণের বৈদেশিক অভিনয় মাত্র। ফলতঃ 'যিহোবা' 'যোভ' (Jove) প্রভৃতি শব্দ মহদ্বাচি বৈদিক 'যহ্ব' শব্দেরই ঈষদ্বিকৃত রূপান্তর মাত্র।

* ঋগ্বেদ :—১মং ১১ সূক্ত ৭ মন্ত্র
... ৩৬ ... ১ ...
৪ ... ৫ ... ২ ...
৫ ... ৫ ... ৬
৮ ... ১৩ ... ২০ ...
... ... ২৪ ... ইত্যাদি

চাঁদের কলঙ্ক

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি-এ

(ন্যাথানিয়েল হথর্ণের অনুকরণে)

(১)

ফুলশয্যার রাত্রে অবিনাশ একরূপ জোর করিয়াই সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী সরযূর ঘোমটা খুলিয়া দিল। সরযূ ফিক্ করিয়া হাসিয়া চোখ দুইটী হাতের পাতার তলে লুকাইতে না লুকাইতে, স্বামী তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি টানিয়া তুলিল। তার পর, বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রলোভনের আবেশে মুখের কাছে মুখ আনিতেই অবিনাশের দৃষ্টি পড়িল—স্ত্রীর বাম গালের ছোট্ট কালো তিলটীর প্রতি।

দেওয়ালের গায়ের জুয়েল-ল্যাম্প্ হইতে কিরণ-রেখা বিচ্ছুরিত হইয়া স্বামী-স্ত্রীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। তুষার-শুভ্র পুষ্প-বিতানের মাঝে আধ-ফুটন্ত চম্পক-কলির ন্যায় সরযূর মুখখানি সোহাগে-সরমে ঢলঢল, আর অনুরাগ-রঞ্জিত লোহিতাভ গণ্ডের উপর কৃষ্ণবর্ণ একটী ছিটা—যেন দেব-মন্দিরের স্বর্ণ-থালায় তিল-চন্দন!

সুধার সমুদ্র ভুলিয়া অবিনাশ মুখ নোয়াইয়া সোহাগের প্রথম চুমুক দিল—পত্নীর সেই তুল্‌তুলে গালের সেই তিলটীরই উপর। স্বামীর পানে চোখের কোণের পুলক-দৃষ্টি দিয়াই সরযূ অবিনাশের হাঁটুর উপর হুইয়া পড়িল।

(২)

এম্-এ পরীক্ষায় রসায়নে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া অবিনাশের চাকুরী হইল—লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে। কলেজের ন্যায় বাসায়ও যেটুকু সময় পায়, তাহা সে ঘরের ল্যাবোরেটরীতে রসায়ন চর্চ্চায়ই কাটাইয়া দেয়। গৃহ-কর্ম্মের তদারক করিয়া অবসর পাইলেই সরযূও অবিনাশের কাছে ছুটিয়া আসে, টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীর হাতের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করে।

একটা পাতা-বাহারের রঙীন ডোরায় আরকের ফোঁটা ঢালিয়া অবিনাশ ল্যাবরেটরীতে কি পরীক্ষা করিতেছিল; সরযূ ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল—'গাছের পাতায়ও কি আত্মারামের ভেল্‌কী চালাতে চাও না কি?'

মৃদু হাসিয়া স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া অবিনাশ নিজের কার্য্যই করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে

হঠাৎ তাহার চোখের সম্মুখে পাতাটী তুলিয়া ধরিয়া সোৎসাহে বলিল—'ছাখো।'

সরযূ দেখিল—ডোরা-কাটা পাতা-বাহারটীর গায়ে ডোরার লেশমাত্রও নাই,—পাতাটী আগাগোড়া গাঢ় অতসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিস্মিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল—'বাঃ রে! সত্যি সত্যিই এ যে ভেল্‌কী।...ভগবানের ছিষ্টির ওপরও, দেখ্‌চি, তোমার হাত চলে!'

(৩)

দুপুরে কলেজের পোষাক পরিতে পরিতে অবিনাশ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল—'আচ্ছা, আরকের গুণে গাছের পাতার রং বদ্‌লায় এ তো চোখেই দেখেচ,—মানুষের ওপরও এ গুণ খাটে, বিশ্বাস কর?'

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সরযূ বলিল—'কি রকম?'

'এই ধর,—যেমন, তোমার গালের তিলটী ঠিক গালেরই রঙের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া।'

'যাঃও! তা-ও আবার হয় না কি?'

'আচ্ছা, যদি হয়ই! দেখ্‌বে, পরশু ক'রে? শুধু দু-চার ফোঁটা আরকেই—'

'ও মাঃ! গাছের পাতায় ঢেলেছ ব'লে আমার গালেও আরক মাখাতে চাও না কি?...বাঃ রে! আমি দিতেই গেলুম!—এ হ'লো আমার এয়োতির চিহ্ন।'

অবিনাশ হাসিয়া উঠিল—'এয়োতির চিহ্ন গালে থাকে না কি?—না, কালো হয়?'

সরযূ বলিল—'তোমার ডাইনের দৃষ্টি,—যাতে লাগে তা কালো হবে, বিচিত্তির কি!...ভালো,—কেন?—এ তিলটার ওপরও তোমার ডাইনের দিষ্টি পড়েচে কেন, বল' দিকিন্?'

অবিনাশ বলিল,—'চাঁদ-মুখখানির ঐটুকুন্‌ই যে কলঙ্ক!'

'বটে?...আর এক দিন এ কলঙ্কই মাথার মণি—'

—বলিতে বলিতে নীচের ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া সরযূ হঠাৎ থামিয়া গেল।

অবিনাশের মনে পড়িল—সেই ফুলশয্যার রাত্রের কথা। সে-ও ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া, স্ত্রীর পানে অপাঙ্গের দৃষ্টি হানিয়া, উত্তর করিল—'তখন ছিলাম নেহাৎ আনাড়ি,—হাফেজের মত মনে হ'ত—

গালের 'পরে তিলটী,
ফুল-বিতানের ঝিলটি'!—

সে ভুল ভেঙেছে,—এখন বুঝেছি—

এই তো সুধা, এই তো সুধা—
এইখানে মোর মিট্‌বে ক্ষুধা!'—

বলিয়াই অবিনাশ হাত বাড়াইয়া সরযূর ঠোঁট দুখানি ধরিতে গেল।—'তুমি যে কি!'—বলিয়া সরযূ ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল।

(৪)

ঘরের ল্যাবোরেটরীতে কয়েকদিন অবিশ্রান্ত মাটুনীর পর, শনিবার একটু সকাল সকাল বিছানায় শুইয়া অবিনাশ বই পড়িতেছিল। সরযূ খাটের নিকটে আসিতেই সে উঠিয়া বসিল। তার পর, তাহাকে টানিয়া আনিয়া সম্মুখে বসাইয়া উভয় চক্ষুর একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল—তাহার বামগালের সেই কালো তিলটীর দিকে।

সরযূ বলিল—'ও কি?—এ পোড়ামুখে কি রসকষের আলো জ্বল্‌চে যে, একদিষ্টে তাকানো হচ্ছে?'

অবিনাশ বলিল—'বড় মিছে বলনি।...ঐ রসকষের আলো থেকে যদি কালির দাগটী ঘুচোতে পারি, তবে হাজারো বাতির ঝাড়লণ্ঠন লাগে কোথায়!'

সরযূ বলিল—'ঐ কথাই রোজ হচ্ছে। কেন?—একটা ছোট্ট তিলে তোমার কি ক্ষেতি কর্‌ল?'

'ক্ষতি না?—ঐ একটা খুঁতে কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিকোচ্ছে!...ও যে ভারী বিশ্রী,—মোটেই আমার ভাল লাগে না।'

'তা লাগ্‌বে কেন?—একটা ছুতো চাই তো! আজ এ তিলটা বিশ্রী, কাল চোকের কোণটা বিশ্রী, পরশু হবে মুখটা বিশ্রী,—তার পর আমার সবই বিশ্রী!—কেমন? এই তো মনের ভাব?'

'পাগল আর কি!...আচ্ছা, নিজেই ভাবো দেখি—মুখখানি কেমন নিটোল টুলটুলে হবে, যদি—টুক্ করে' ঐ গালের 'পরের তিলটী তু'লে নেওয়া যায়।'

'যাও যাও, অত কথায় আর কাজ নেই,—আসল কথা বল, নিজের খেয়াল চেপেছে, তাই। ভালো, যদি এ তিলটা থাক্‌লে তোমার ঘুম না হয়, তবে নয় পরশু ক'রেই দেখ।...কিন্তু,—পরশুর সময় যদি আমি ম'রে যাই!'—

'দূর্! তবে আর য়্যাদ্দিন বই প'ড়ে কি বিদ্যে শিখলুম, আর দিনরাত খেটেই বা হাতে-কলমে কি কর্‌চি!'

'না, না,—এ তো একটা কথার কথা বললুম।...তবে, দিন ঠিক কর,—কবে পরশু করবে?'

—উৎসাহে অবিনাশ মাতিয়া উঠিল; বলিল—'কাল রবিবার,—কলেজ ছুটি আছে; ভালো কালই তোমায় হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেবো—মানুষের সৃষ্টি বড়, না ভগবানের সৃষ্টি বড়।'

(৫)

ভোরে জাগিয়াই সরযূ অবিনাশকে প্রশ্ন করিল—'শেষ রাত্তিরে অমন কচ্ছিলে কেন?—অনেকক্ষণ ধ'রে বিড়বিড় ক'রে বক্‌ছিলে, আবার মাঝে মাঝে আমার নাম নিয়েও কি বল্‌ছিলে!—কোন স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছিলে বুঝি?'

'স্বপ্ন?...কই, কিছুই তো মনে পড়ে না।'—

—'মনে পড়ে না' বলিতেই ছ্যাৎ করিয়া আবছায়ার মত স্বপ্নের একটা দৃশ্য অবিনাশের মনে পড়িয়া গেল। সত্যই তো শেষরাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে—পদ্মের মৃণালের মত সরযূর গালের তিলটী লতাইয়া লতাইয়া দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম্মস্থল জড়াইয়া ধরিয়াছে; আর সেই মৃণালের আগায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—সরযূর হৃদয়-পদ্ম। অবিনাশ মৃণালের মূল ধরিয়া টান দিতেই সরযূর হৃদ্‌পিণ্ড-শুদ্ধ পদ্মটী ছিঁড়িয়া আসিল।

পাশ ফিরিয়া শুইয়া অবিনাশ আপন মনে স্বপ্নের কথাই ভাবিতে লাগিল।

সরযূ বলিল—'কই, উঠ্‌বে না? চুপ করে' শুয়ে' রইলে যে!...আজ না কোন্ কলঙ্ক, না, তোমার চোখের কাঁটা নিকেশ করার কথা!'

'হুঁ' বলিয়া অবিনাশ সরযূর দিকে ফিরিল। ফিরিয়া ঘুরিয়া রাতের স্বপ্ন তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল। সে ভাবিল—সত্যই যদি ঐ তিলটী সরযূর জীবনের তন্ত্র হয়!...না, না, তাহাও কি সম্ভব?...স্বপ্ন কি আর সত্য! অলীক ভাবনা ঝাড়িয়া মুছিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল।...বলিয়া গেল—'তুমি নেয়ে ধুয়ে ল্যাবোরেটরীতে এস, আমি সেখানে যাচ্ছি।'

(৬)

স্নান সারিয়া চওড়া লাল-পেড়ে সাড়িখানি পরিয়া সরযূ যখন ল্যাবোরেটরীতে প্রবেশ করিল, তখন অবিনাশ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুইটা সাদা গুঁড়া একত্র মিশাইতেছিল।

ঘরের কোণে সোঁ সোঁ করিয়া গ্যাসের ষ্টোভ্‌টা জ্বলিতেছে। উনুনের পাশে তে-পায়ার উপর চৌ-কোণা চীনা বাসনে বেগুণে রঙের কি একটা আরক। ঘরের দরজা জানালা সবুজ পর্দ্দায় ঢাকা। আর মেঝের মাঝখানে একখানি সোফা—তাজা যুঁইফুলে ভর্‌পুর।

অবিনাশ মুখ ফিরাইয়া সরযূকে বলিল—'সোফার ওপর শোওগে।'

সোফায় শুইয়া সরযূর মনে পড়িল—ফুলশয্যার সেই রাতের কথা। বিছানাময় সেই রকম ফুলের রাশ; ঘরের ভিতর নিরালায় সেই রকমই দুইটী তাহারা,—স্বামী আর স্ত্রী! সেদিন যাহা সোহাগের চিহ্ন ছিল, আজ তাহাই কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!—এ কি চোখের ভুল, না মনের ভুল?

এক হাতে বেগুনে আরকের বাসন, আর এক হাতে সাদা গুঁড়ার মোড়ক লইয়া অবিনাশ স্ত্রীর সোফার নিকট আগাইয়া আসিল। বলিল—'ছোট একটা তিল তুলে দেওয়া, সে ত সামান্য কথা, বিজ্ঞানের বল কত বেশি, এই ছাখো।'—

জানালার গোড়ায় একতাল মাটী ছিল; অবিনাশ তাহাতে একটা বীজ পুঁতিয়া কয়েক ফোটা বেগুনে আরক ঢালিয়া দিল। তার পর দুই চামচে সাদাগুঁড়া ছড়াইয়া দিতেই, যাদুকরের ভেল্‌কীর ন্যায়, মাটীর উপর একটী সবুজ অঙ্কুর দেখা দিল; অঙ্কুরটী বাড়িয়া বাড়িয়া দশ মিনিটের মধ্যেই হইল একটী গোলাপ গাছ; আর, সেই গাছের আগডালে ফুটিয়া উঠিল—টাট্‌কা রক্তের বর্ণ দল্‌দলে একটী গোলাপ ফুল।

হাস্য-পুলকে অবিনাশ মাটীর ডেলাভদ্ধ গাছটী আনিয়া সরযূর চোখের সামনে ধরিল। বলিল—'নাও, গন্ধ শোঁকো, হাতে ধ'রেও দ্যাখো—খাঁটী বসোরার গোলাপ।'

'বাঃ রে! বড় সুন্দর তো!' বলিয়া সরযূ হাত বাড়াইয়া ফুলটী ছুঁইতেই, লাল পাপড়িগুলি কুঁচ্‌কাইয়া কাল্‌চে হইয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া অবিনাশ একবার শুষ্ক গোলাপটীর দিকে, আর একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল—দেহের শক্তি আর মনের শক্তি এক না হইলে এই রকমই তো হওয়ার কথা। সরযূর মনে হয় তো ভয়ের উত্তেজনা হইয়াছে, তাহারই সাড়ায় ফুলটা এমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

স্ত্রীর ডান হাতখানি নিজের হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল—'সত্যি বল তো, সরযূ, তোমার কি ভয় করছে?' তার পর নিজেই আবার সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল—'ভয় কি!...ভগবান্ সৃষ্টি করচেন, বিজ্ঞানও সৃষ্টি করচে,—বিজ্ঞানের সৃষ্টি বরং ভগবানেরও ওপরে; বিশ্বাস হারিও না, ফল দেখে' মেনে যাও,—মনের ধাঁ ধাঁ ঘুচে' যাবে।'

মুখে স্ত্রীকে সাহস দিলেও অবিনাশের নিজের মনে একটু খট্‌কা লাগিয়াছিল। সরযূর মন ভুলাইবার জন্য এবার সে ফটোগ্রাফের ক্যামেরাখানি সোফার নিকট টানিয়া আনিল। বলিল—'ঠিক হ'য়ে শোও,—কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে, মাথাটা একটু তুলে';...না, না, এদিকে না,—বাঁদিকে আর একটুকু হেলে'।...ব্যস্, এবার ঠিক হয়েছে।'

ক্যামেরা হইতে প্লেট্ খুলিয়া অবিনাশ—দেখে—এ কি ফোটো!—প্লেটের গায়ে বড় বড় কালো দাগে ভরা! বিরক্তি ভরে সে কাচখানি দুই হাতে ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

সরযূ বলিল—'ও কি করলে!'

অস্বাভাবিক জোর গলায় অবিনাশ চ্যাঁচাইয়া উঠিল,—'কিচ্ছু না।...তুমি এখন চুপটি করে' শুয়ে থাক, দেখি।'

টং টং করিয়া ল্যাবোরেটরীর ঘড়িতে নয়টা বাজিল। অবিনাশ দেওয়ালের গায়ের একটা চাবি খুলিয়া দিতেই ঘরের ছাদের ঝাঁঝরি হইতে ফুলের রেণুর মত জলের কণা ঝির্ ঝির্ করিয়া সরযূর গায়ে পড়িতে লাগিল। শেফালির সুবাসের ন্যায় মৃদু গন্ধ ঢেউ খেলিয়া সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুরভির নেশায় সরযূর চোখ ঢেলিয়া অবসাদ জাগিয়া উঠিতেছিল,—চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া সে সোফার উপর পড়িয়া রহিল।

(৭)

গালের উপর কিসের একটা ঝাঁঝ লাগিতেই, সরযূ চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে—স্বামী তাহার মুখের উপর নুইয়া রহিয়াছে; তাহার বাঁ হাতে একটী ক্ষুদ্র শিশি; শিশির ভিতর হল্‌দে আরক। ঐ আরক ভরা হাতের তুলিতে মাখাইয়া অবিনাশ সরযূর গালে বুলাইয়া দিতেছিল।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সরযূ বলিল—'এতক্ষণে বুঝি আসল পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো!'

'পরীক্ষা!' অবিনাশ বলিল—'পরীক্ষা কি? দু'মিনিট সবুর কর, পরীক্ষার ফলই চাক্ষুষ দেখতে পাবে।...এই যে ছোট শিশিটী দেখ্‌চ, কি এতে বল তো?—অমৃত-গরল। অমৃতের ফল এক্ষুনি পাবে, কিন্তু ওজন ঠিক না রাখ্‌তে পার্‌লে এ অমৃতই হয়ে ওঠে কালকূট বিষ।'

'বিষ!'—কথাটা যেন কাণের ভিতর ঢাক পিটাইয়া সরযূকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সে ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—'ঐ বিষ দেবে আমার গালে!—কেন, কেন, কি করেচি আমি!'

সান্ত্বনার স্বরে অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'সে কি! মিছে ভয় কর্‌চ কেন!—বিষ না, এ অমৃত, তোমার পক্ষে অমৃত-সঞ্জীবনীরই কাজ করবে।'

মলিন মুখে মৃদু হাসিয়া সরযূ আপন মনেই যেন অস্ফুট গুঞ্জন করিল—'দাও, তবে দাও,—তোমার দেওয়া সবই আমার অমৃত।'

(৮)

অবিনাশ আরক-মাখা তুলিটী তিন চারিবার বুলাইতেই বাস্তবিক অমৃত সঞ্জীবনীর ফল ফলিল। ইন্দ্রধনুর রঙের রেখা যেমন আস্তে আস্তে আকাশের গায়ে

গায়, সরযূর গালের কালো তিলটী তেমনি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

জয়ের উল্লাসে অবিনাশ দেওয়ালের গায়ের বড় আয়নাখানি টানিয়া আনিয়া স্ত্রীর মুখের সামনে ধরিয়া বলিল—'ছাখো, এবার চেয়ে ছাখো।'

আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়িতে সরযূ দেখিল—সত্যই তিলের দাগটী প্রায় মিলাইয়া আসিয়াছে; যেটুকু আছে তাহাও, রাত্রি-অবসানে আসন্ন প্রভাতের ন্যায়, ফিকে হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর বিজয়-গর্ব্বে সরযূ অবিনাশের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিল। অবিনাশ হাঁটু গাড়িয়া পত্নীর হাসির-কোলে-টোল-খাওয়া তিলটীর উপর অধর স্পর্শ করিয়া বলিল—'এবার চাঁদ নিষ্কলঙ্ক।'

কিসের অবসাদে স্বামীর সোহাগ সরযূর প্রাণে উৎসাহের তেমন সাড়া দিতেছিল না। অবিনাশের হাতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া সে শুইয়াই রহিল।

স্ত্রীর মুখের পানে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া অবিনাশ পরীক্ষার শেষ ফলের অপেক্ষা করিতেছিল। চাঁদের কণা যেমন বাড়িয়া বাড়িয়া পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়, সরযূর গালের গোলাপী রঙ কালো তিলটীকে গ্রাস করিয়া তেমনি সমস্ত মুখে ভরিয়া উঠিতেছিল।...কলঙ্কের ঐ শেষ চিহ্নও মুছিয়া যায়!—আনন্দে-উৎসাহে অবিনাশ চ্যাঁচাইয়া উঠিল—'ওঠ, সরযূ, ওঠ—পরীক্ষায় জয় হয়েচে।'

চোখের পাতা টানিয়া মেলিয়া ঘুমের নেশায় জড়িত স্বরে সরযূ বলিল—'জয় হয়েচে?...কলঙ্কের চিহ্নটী মোর মুছে গেছে? বেশ। তোমার জয়ই আমার জয়,—তোমার এ জয়ের টীকা প'রে আমার পরাজয়ের ভয় কিসে!'

কিন্তু এ যে পরাজয়েরই লক্ষণ! অবিনাশ চমকাইয়া উঠিল—সরযূর এ কি স্বর!...চোক কেন বোজা আর হাত পা কেন এমন ভাবে এলাইয়া পড়িল!

কম্পিতকণ্ঠে সে ডাকিল—'সরযূ! সরযূ!'

ক্ষীণগলায় সাড়া আসিল—'হুঁ।'

'সরযূ, এরূপ কোচ্ছ কেন?—চোখ মেল—কথা কও—আমার পানে তাকাও—'

কোন্ সুদূর হইতে হাওয়ায় ভাসা চাপা সুরের অস্ফুট ধ্বনি আসিল—'কই তুমি?...ঘুম চোখে ঘুম—'

ঘুম! এ কিসের ঘুম?...কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবিনাশ পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘুমের ঘোরে সরযূর মৃদু নিঃশ্বাস মৃদুতর হইয়া আসিল। তার পর,—সন্ধ্যার সূর্য্য ডুবিতেই যেমন পশ্চিমের রোদটুকুও হঠাৎ নিভিয়া যায়, তেমনি গালের তিলটী নিশ্চিহ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরযূর শেষ নিঃশ্বাসও বাহির হইয়া গেল।

স্ত্রীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অবিনাশ ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! ক্ষুদ্র তিলটী তুলিতে গিয়া স্ত্রীর জীবন-তন্তু কি সত্য সত্যই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম!...

মহাকবির শতবার্ষিকী

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

হে বাণীর বরপুত্র মহাকবি মধুসূদন! আজ পূর্ণ এক শতাব্দী বিগত হইল, এই পুণ্যাহ মাঘ মাসের ১২ই তারিখে, (শনিবার) এক অনুপম কীর্ত্তিসঞ্চারি শুভক্ষণে তুমি কবিত্বময়ী কপোতাক্ষী নদীর তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলে। আজ সেই মহাশুভ পুণ্য দিন স্মরণ করিয়া আমরা আনন্দাশ্রু বিগলিতনেত্রে, তোমার পাদপদ্মে হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি,—গ্রহণ কর, আমরা কৃতার্থন্মন্য হই।

বাঙ্গালার গৌরব-মুকুটে তুমিই কীর্ত্তিদীপ্তোজ্জ্বল কোহিনূর। তুমিই বাঙ্গালার উনবিংশ-শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা! তুমি সেই শতাব্দীর সমগ্র ভারতের

কবিমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ছিলে, এবং আজও অক্ষুণ্ণ গৌরবে তোমার কবি-সিংহাসন মহিমার সমুচ্চ বেদিকায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তোমার একনিষ্ঠ সাধনার, শিক্ষার, দীক্ষার, অধ্যয়নের এবং আত্ম-নিয়োগের আদিত্য-প্রভায় বাঙ্গালার সাহিত্য-কমল সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তোমার সর্ব্বতোমুখী ঐশিক প্রতিভার রস-প্লাবনে আমাদের সাহিত্য-কানন সরস ও রসাল হইয়া রহিয়াছে। তোমার গাঢ় কাব্যানুরাগে বঙ্গবাণীর



মাইকেল শ্রীমধুসূদন

চরণতল বাসন্তী উষার অরুণিমায় রাঙাইয়া রাখিয়াছে। হে কবিকেশরী! তোমার সাহিত্য-সাধনার গুরুত্ব ও গভীরতা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতালাভের উপযুক্ত আজও আমরা হই নাই; হইলে এই স্মৃতি-উৎসবের প্রবল বন্যায় বঙ্গদেশ ডুবিয়া যাইত।

তোমার ন্যায় বিবিধ ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এ দেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছিলেন। তুমি সেই ভাষা-সমূহে রচিত অসংখ্য কাব্য-নাটকের ভাবসাগর মন্থন করিয়া দরিদ্রা বঙ্গভাষাকে অতুলনীয় সম্পদ-সম্ভারে সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত এবং সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া গিয়াছ। সেই ঐশ্বর্য্য-গৌরবে বঙ্গজননী আজ গৌরবময়ী।

বাঙ্গলার ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা ও আলোচনা করিতে কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করিতেন। তুমি যখন জ্ঞানে, বিদ্যাবত্তায় এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের পাণ্ডিত্যে সকলের উপর শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া 'মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে' চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলে, তখন হইতে সকলের অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইল। সকলেই আত্মহারা হইয়া দেখিলেন যে,আমাদের বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি অপর কোন দেশীয় ভাষা অপেক্ষা ন্যূন বা হীনপ্রভ নহে। বরং সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এবং পদলালিত্যে অনেক ভাষাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। তোমার ন্যায় পুরুষসিংহকে বঙ্গকাব্যোদ্যানে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের বিলাতী পার্ক ভ্রমণের মোহ-ঘোর কাটিল, চমক ভাঙিল, লজ্জা দূর হইল এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অলীক ধারণা ঘুচিয়া গেল। এ দেশে বিদেশী ভাবের প্রাবল্যের সময় তুমিই দেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চার পথ-প্রদর্শক। আমরা শ্রদ্ধাভরে তোমার শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণত হই।

হে মধুসূদন! তুমি তোমার সমগ্র জীবনই সাহিত্যের আরাধনায় উৎসর্গ করিয়াছিলে। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর সাধনায় আত্মসমর্পণ এবং আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত তুমি যেমন দেখাইয়া গিয়াছ, তেমনটি এ পর্য্যন্ত আর কোন সাহিত্যিক দেখাইতে পারেন নাই। সাহিত্যের প্রবাহ তোমার শিরায়-শিরায় মজ্জায়-মজ্জায় প্রবাহিত হইত। সে অশ্রান্ত প্রবাহের কোন কালেই বিরতি বা উপরতি ছিল না। সাংসারিক অসচ্ছলতার প্রখর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া তোমার অবিকম্পিত বজ্রদৃঢ় হৃদয় বিপর্য্যস্ততার দুরন্ত সংঘাতে অণুমাত্র বিক্ষুব্ধ না হইয়া মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সেই সুকঠোর বাণীব্রতের উদ্‌যাপনে তুমি অর্থসঞ্চয়, গার্হস্থ্য সুখ, উচ্চ রাজপদ, এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলে। পার্থিব বৈভবের

বাহ্যাড়ম্বর তোমার আয়ত লোচনের সর্ব্বভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে বিহ্বলতার বৈকল্যে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অসার ক্ষণভঙ্গুর সম্পদের নশ্বরতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া, অপার্থিব রত্ন-সমুদ্রে নিজেকে আপ্লাবিত নিমজ্জিত করিয়া, সংসারের সহস্র নির্য্যাতনের প্রতি চির দিন অটুট উপেক্ষায় ভ্রূকুটি করিতে তুমি কখনও ভীত বা বিচলিত হও নাই। তোমার শৌর্য্যের অগ্নি-কটাক্ষের সম্মুখে যত কিছু পার্থিব বস্তু সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়াছিল। স্বদেশের কবিতার উন্নতির তুলনায় তোমার প্রলুব্ধ, প্রমত্ত হৃদয়, সমগ্র রুসিয়ার বিপুল রাজৈশ্বর্য্যের প্রলোভনও অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়াছিল।

হে মনীষি-প্রবর! তুমি সাহিত্য-সাম্রাজ্যের শিল্প-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত নানা অভিনব প্রাসাদের স্রষ্টা। কত দিক হইতে কত যে রত্নোপকরণ আহরণ করিয়া তুমি এ সাম্রাজ্যের সৌষ্ঠব-শ্রী পরিবর্দ্ধন করিয়াছ, তাহা চিন্তা করিলে আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই, আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অতি অল্প দিনে, মাত্র সার্দ্ধ তিন বৎসরের সেবায়, তুমি বঙ্গসাহিত্য-সমাজে যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছ, পৃথিবীর যে কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাস এরূপ অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য-প্রদানে স্তব্ধ ও মৌন হইয়া পড়ে। এ অঘটন ঘটনা বাঙ্গালা দেশেই সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি।

হে কাব্যবীর! সাহিত্য-সংসারে তোমার নূতন প্রবর্ত্তনা, নূতন পরিকল্পনা, নূতন পরিব্যঞ্জনা তোমাকে কি ভীষণ সংঘর্ষণে সংঘর্ষিত করিয়াছিল। সেই মহারণে বিজয়লাভ তোমারই তুল্য মহাপুরুষের অমিত তেজ, অমানুষিক বীর্য্য, এবং অপরাজিত শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন-স্বরূপ। প্রকৃত বিজয়ীর ন্যায়ই তুমি বিজয়ী হইয়াছ। জয়শ্রী তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

হে কবিগুরু! তুমিই বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রছন্দের স্রষ্টা, পোষ্টা, ও প্রবর্ত্তক। অমিত্রছন্দ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিযোগী এবং বাঙ্গলায় সেই ছন্দের ঝঙ্কার ও গুরুগম্ভীর নিনাদ যুগপৎ সংরক্ষিত হইতে পারে, এ ধারণা তদানীন্তন বুধ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ছিল না। তুমিই অমিত্রছন্দের মাহাত্ম্য এ দেশে প্রচার করিলে। তোমার প্রবর্ত্তিত ছন্দের গতিও অতীব মনোহারিণী। একই ছন্দের রচনা-চাতুর্য্যে ভেরী-নিনাদ ও বীণাধ্বনি উভয়ই সংসাধিত হয়, ইহা তুমি মেঘনাদ বধে এবং বীরাঙ্গনায় দেখাইয়া দিয়াছ। মেঘনাদ বধে যে অমিত্রছন্দ সাগর-কল্লোলের গভীর গর্জ্জনে মেঘমন্দ্রে মুখরিত হইতেছে, তাহাই আবার বীরাঙ্গনায় গঙ্গা-যমুনার মধুর কুলু-কুলু নিনাদে বিলোল হিল্লোল তুলিতেছে। উভয় কাব্যে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে নিবদ্ধ। কবির কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

ব্রজাঙ্গনায় রাধিকা-রমণের বাঁশরী-স্বর-লহরী বৃন্দাবন-পুলিনবাহিনী নীল যমুনার তরঙ্গ-বিভঙ্গে উথলিত হইতেছে। বাঙ্গলার চির-তৃষাতুর মর্ম্মের সুধা-সঞ্জীবনী গীতিকবিতা, আত্মহারা বাঙ্গালীজাতি সেই সময়ে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল। তুমিই গীতিকাব্যের পুনরুদ্বোধনে বাঙ্গালার মৃতকল্প মূর্চ্ছাতুর প্রাণকে পুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত, সঞ্জীবিত ও রসসিক্ত করিলে। মরুভূমিতে স্নিগ্ধ-শীতল প্রস্রবণের উৎক্ষিপ্ত ধারা ছুটাইয়া, হৃদয়ে অসীম শান্তি ও তৃপ্তির নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া দিলে। তোমার এ মহিমা বিস্মৃতির বস্তু নহে।

নাটক ও প্রহসনে তোমার মূর্ত্ত প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। আধুনিক মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটকের রচনা-পদ্ধতির তুমিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। তোমার মধুময় রস-রচনা চিত্তপ্রফুল্লকর প্রহসনেরও নবীন উদ্ভাবক ও অগ্রদূত। বাঙ্গালায় অমন সুখপাঠ্য প্রহসন আর নাই। তোমার এই মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব সৃষ্টি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় সমস্ত চরাচরে দেদীপ্যমান। তোমার স্মৃতি-পূজা হইবে না তো হইবে আর কাহার? তুমিই ইহার যথার্থ উত্তরাধিকারী। আমাদের ভক্তিপ্লুত হৃদয় আজ তাই তোমার স্মৃতিপূজায় অগ্রসর হইয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে তোমাকে নমস্কার করি।

হে কবি-সম্রাট্! যে দেশাত্মবোধ তোমার বহু পরবর্ত্তীকালের প্রতিভা-সৌরভে সুরভিত এবং যুগযুগান্তর-সঞ্চিত স্বপ্নাভিভূত অবসাদের জড়তা বিদূরণে আজ আবেগে উদ্বেলিত, তাহার মূলেও তোমার কলাকৌশলী নিপুণ হস্ত বিন্যস্ত রহিয়াছে। য়ুরোপ-যাত্রার প্রাক্কালে তোমার 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতায় কি মধুর স্বদেশানুরাগ

বিকশিত। তোমার সেই সকরুণ প্রার্থনা তোমার দেশমাতৃকা বিস্মৃত হন নাই। তিনি তোমার আকাঙ্ক্ষিত মানস-সরোবরে কি বসন্তে, কি শরদে প্রস্ফুটিত তামরসের হৃদয় তোমাকে স্মৃতি-জলে ফুটাইয়া, অমরত্ব প্রদানে বক্ষে বিলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

হে মধুসূদন! সুদূর য়ুরোপ-প্রবাসে ফরাসীদেশে নানা অপ্রত্যাশিত ক্লেশে, বিপদে, বিজড়িত ও নিপীড়িত হইয়াও তুমি তোমার 'সুকোমলা মাতৃভাষাকে' বিস্মৃত হও নাই। তোমার ঊর্দ্ধপাথণ্ডে বিরচিত রত্নময় চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীতে প্রভাতের শুভ্রোজ্জ্বল শুক্র-তারকার হীরক-দ্যুতি দলমল করিতেছে। বাঙ্গালায় তুমি এই শ্রেণীর কবিতারও প্রবর্ত্তক। ইতালীর কাব্য-কাননের মনোমদ কুসুম তুমিই চয়ন করিয়া যে বিচিত্র মালিকা গাঁথিয়াছ, তাহা তোমারই যশঃ-কণ্ঠহার রূপে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে।

হে যুগ-প্রবর্ত্তক বরণ্যে মহাকবি! তোমার বিরাট কবি-হৃদয়ের প্রসারতার ইয়ত্তা কে করিবে? তুমি স্বদেশের ও বিদেশের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালবর্ত্তী মহাকবি-দিগকে বক্ষের কবাট খুলিয়া যেরূপ প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গিয়াছ, পৃথিবীর আর কোন কবি ঠিক তেমন ভাবে দিতে পারেন নাই। তুমিই অপরিমীম উদারতার বলে স্বয়ং সে মহত্ত্বের একচ্ছত্র নির্ব্বিঢ় অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলে। তোমার অপরিমেয় দান-শক্তির মূলে সেই মহত্ত্বের অমোঘ বীজ নিহিত ছিল। এখন উত্তরাধিকার-সূত্রে সে অধিকার আমাদের করতলগত হইলেও, আমাদের চিত্তের অভিশপ্ত সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে সেই অধিকারলাভের অনুপযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তুমিই প্রীতি-পূজা লাভের অবিসম্বাদী দেবতা! আমরা যেন তোমার প্রদত্ত দীক্ষায় হৃদয়ের পূর্ণতা, ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারি। দিগন্ত-উদ্ভাসি শশি-কলার ন্যায় তোমার জ্যোতির্ম্ময় ললাটের প্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃপ্রভায় আমাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অন্ধকার চিত্ত উদারতার আলোকে প্রশস্ত ও উদ্ভাসিত করিয়া দিক।

হে সাহিত্য-গুরু! জীবনের সন্ধ্যাগমেও তোমার মহতী সাহিত্য-সাধনার শেষ-স্মৃতি 'হেক্টর-বধে' বিজড়িত। তুমি বাঙ্গালা-ভাষায় জর্ম্মণ-আদর্শে এক অভিনব গদ্য-রচনা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছিলে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যে তোমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের প্রচণ্ড নিদাঘ-সায়াহ্নে সে অনন্য-মুখ প্রচেষ্টার মাত্র অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। সেই অর্দ্ধস্ফুট বীজাঙ্কুর ক্ষেত্র-ভেদে ভিন্ন-রূপে পরিপুষ্ট ও ফলপ্রসূ হইলেও, তোমার উৎকট আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় নাই। গদ্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সাধনে তোমার হৃদয়ের ঐকান্তিক অভিলাষ পরবর্ত্তী প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক-বর্গ সম্পন্ন করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট গদ্য-সাহিত্যে আজ বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তোমার প্রতিভা-উদ্ভাসিত আলোক-সম্পাতে আমাদের সাহিত্য-গগন আজ আলোময়!

হে মহাকবি মধুসূদন! তোমার স্বদেশ-হিতৈষণা, তোমার স্বজাতি-প্রীতি, তোমার বঙ্গবাণীর সেবায় অনন্য-সাধারণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, বাঙ্গালীর প্রাণে নবজীবন-শক্তি সঞ্চার করুক; তোমার অতুল প্রতিভা, অননুকরণীয় বাণী-সাধনা বঙ্গসন্তানকে তোমার প্রদর্শিত কিরণোজ্জ্বল পবিত্র পথের পথিক করুক! মাতৃভূমির প্রতি তোমার অকৃত্রিম অনুরাগ তোমার স্বদেশবাসী নরনারীর অবসন্ন হৃদয়ে বলসঞ্চার করিয়া বিশ্ব-ভারতীর সেবায় তাহাদিগকে একনিষ্ঠ করুক; তোমার মধু-সাগরে অবগাহন করিয়া তোমার স্বদেশীয়গণের হৃদয় মধুময় হউক, কার্য্য মধুময় হউক, আশা মধুময় হউক, উদ্দেশ্য মধুময় হউক, ইহাই মধু-দেবতার সকাশে আমাদের প্রার্থনা! ওঁ, মধু! মধু! মধু!!

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১০)

দশ দিন পরে টাকার জন্য মাণিকলালের আসিবার কথা ছিল। তন্মধ্যে দিন দুই হরমোহন নিশ্চেষ্টা ও নিরুদ্বেগে কাটাইলেন; চার পাঁচ দিন ঋণের সন্ধানে বন্ধু, অবন্ধু, আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের পিছনে পিছনে নিষ্ফল ঘুরিয়া বেড়াইলেন; এবং বাকি কয়েকটা দিন প্রমথর আসার পথ চাহিয়া এবং বাসার পথ হাঁটিয়া কাটিল। কিন্তু শেষ অবধি প্রমথ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঁচ ছয় দিন হইল প্রমথ যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা জগন্নাথ বা রামভদ্র কাহারও নিকট হরমোহন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে প্রমথর বাটীর ঠিকানায় জবাবী তার করিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন দশম দিনে রবিবারের প্রাতে ঠিক দশ দিন পূর্ব্বের অবস্থা হরমোহনের গৃহে ফিরিয়া আসিল। আর কয়েক ঘণ্টা পরে যমদূতের মত মাণিকলাল আসিয়া বসিবে, এবং টাকা না পাইলে যেরূপে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিবে, তাহা মনে করিয়া ঘৃণায় ও বিরক্তিতে হরমোহনের চিত্ত ভরিয়া উঠিল; এবং হরমোহনের মনের অবস্থা বুঝিয়া ও মুখের বাক্য শুনিয়া প্রভাবতী ও অমলার পানাহারে প্রবৃত্তি রহিল না।

এ পর্য্যন্ত প্রমথ যাহা করিয়াছে, ভালই করিয়াছে; অন্ততঃ একটা দিন সে নিজের ব্যয়ে সামলাইয়া দিয়া দশ দিনের মধ্যে একটা কোন ব্যবস্থা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ হরমোহন, প্রভাবতী অথবা অমলা, কাহারও, সে কথা মনে হইতেছিল না। তাঁহাদের মনে হইতেছিল, প্রমথ যাহা করিয়াছে, অন্যায়ই করিয়াছে—একটা দুরূহ দুর্ব্বিপাকের মধ্যে তাঁহাদের টানিয়া আনিয়া অবশেষে বিপদের মুহূর্ত্তে নিজে সরিয়া পড়িয়াছে। প্রমথ ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থা যে কি প্রকারে সুবিধাজনক হইতে পারিত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত কাহারও ধৈর্য্য বা অবসর ছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল যে, প্রমথ তাহাদিগকে মজাইয়াছে,—বিপন্ন করিয়াছে!

তিনজনের মধ্যে অমলার মনস্তত্ত্ব একটু জটিলতর ছিল। সেদিন রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ চলিয়া যাওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত অমলা কয়েকবারই কারণে এবং অকারণে প্রমথর কথা মনে মনে ভাবিয়াছে, এবং যতবার ভাবিয়াছে প্রতিবারই তাহার মনে হইয়াছে যে প্রমথ আর না আসিলেই ভাল হয়। বিবাহে পূর্ব্বে সে কয়েক-বার প্রমথকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কথা ভাল করিয়া মনেই পড়ে না। তাহার পর সে দিন যখন প্রমথ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কি অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে পড়ে ত?" তখন হইতে এই কয়েক দিনের মধ্যে এমন হইয়াছে যে, নির্জ্জনে প্রমথর সহিত কথা কহিবার কথা মনে হইলেই আতঙ্কে অমলার বুক কাঁপিতে আরম্ভ করে! প্রমথ যে কি বলে সময়ে সময়ে তাহা একেবারেই বুঝা যায় না! তাহার কথা ভারি গোলমেলে, তাহার দৃষ্টি অতিশয় দুর্ব্বোধ, এবং তাহার কণ্ঠস্বর সময়ে সময়ে অকারণ এমন গাঢ় হইয়া উঠে যে, মনে হয় তৃতীয় কোনও ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিলে ভারি অশোভন দেখাইত! এই সকল কারণে, অভিযোগের বিশেষ কোনও কথা না থাকিলেও, প্রমথর কথা মনে পড়িলেই অমলার মনে হইত যে, সে না আসিলেই ভাল, তাহার সহিত কথা কহিবার অবসর না ঘটিলেই মঙ্গল! আজ সকাল হইতে কিন্তু তাহার চিত্তের কম্পাস-কাঁটা একেবারে অন্য দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রমথর না আসার জন্য এবং তাহাদের এই বিপদের দিনে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া থাকার জন্য আজ সকাল হইতে অমলা মনে মনে

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সেই ক্রোধের সহচর হইয়া একটা অতি সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ অভিমান দেখা দিতেছিল! এই অভিমান পঞ্চারের তত্ত্বটুকু বড় কৌতূহলজনক ব্যাপার। অভিমান জিনিসটা কোন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নহে, এবং স্বাধীন সত্তাও ইহার কিছু নাই। যখনই ইহা উপস্থিত হয়, বাহনের স্কন্ধে চড়িয়া উপস্থিত হয়; অন্যের অভাবে নিজের পায়ের ভরে উপস্থিত হইবার ইহার শক্তি নাই। ব্যাধি-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহা একটি রোগ নহে, রোগের লক্ষণ।

অমলার চিত্তের কোন্ নিভৃত প্রদেশে কি বিকৃতি ঘটিয়াছিল, যাহা হইতে এই অভিমান-রস বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছিল, সে বিষয়ে অমলার নিজেরই কোন জ্ঞান এমন কি সংশয় পর্য্যন্ত ছিল না; এবং এই আপাত-তুচ্ছ অভিমান অচিরে যে গুরুতর পরিণতি লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধেও তাহার মনে কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না। প্রত্যূষে যে তালের রস নির্দ্দোষ সুশীতল পানীয় থাকে, মধ্যাহ্নেই তাহা উগ্র মদিরায় পরিণত হইতে পারে তাহা সে জানিত না। তাই বেলা তিনটার সময়ে সুরেশের হাত ধরিয়া 'মাসিমা কোথায়?' বলিয়া প্রমথ অন্দরে প্রবেশ করিতেই যখন সর্ব্বপ্রথমে অমলা সম্মুখে পড়িয়া গেল, তখন অমলার মনের মধ্যে অভিমানটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না কহিয়া পাশ কাটাইয়া প্রমথর পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল।

প্রমথ কিন্তু দেখিবামাত্র অমলার মুখে তাহার অন্তরের কাহিনী পাঠ করিয়া লইল। মৃদু হাসিয়া অমলার গতি-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সে নিম্নকণ্ঠে বলিল. "রাগ করেছ?"

প্রমথর এই আকস্মিক অহেতুক আচরণে ও প্রশ্নে অমলা চকিত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আরক্ত মুখে সে বলিল, "কেন? রাগ করব কেন?"

প্রমথ হাসিমুখে উত্তর দিল, "কেন রাগ করবে তা আমি কি করে বলব বল? কারণ যদি কিছু থাকে ত' তুমিই বল, শুনি।"

এই কথোপকথনের ধারাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অমলা একটু প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কারণ কিছুই নেই!"

প্রমথ কিন্তু এই উত্তরে কিছুমাত্র প্রতিহত না হইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কারণ কিছুই নেই?—একেবারে অকারণ? শুনে সুখী হলাম অমলা! সংসারের অকারণ জিনিসগুলোর উপরই আমার শ্রদ্ধা আর লোভ বেশী মাত্রায় আছে। খাতাপত্রের হিসাবের মধ্যে যে সব জিনিস চড়ান যায় না, মনের মধ্যেই আমি তাদের স্থান দিই।"

সব কথাটার তাৎপর্য্য অমলা হয় ত ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল! প্রমথর কথার উত্তরে কথা বলিতে গিয়া প্রমথকে এইরূপে পরিহাস করিবার সুযোগ দিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। এবং পাছে পুনরায় তাহার কথায় সুযোগ পাইয়া প্রমথ কথা বাড়াইয়া বসে, সেই আশঙ্কায় সে প্রমথর কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তখন প্রমথ সুরেশের হাত ধরিয়া হরমোহনের কক্ষে উপস্থিত হইল।

প্রমথকে দেখিয়া হরমোহন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; মনে হইল প্রমথ যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন যেরূপেই হউক এ বিপদের একটা উপায় সে করিবে।

অপরাপর বিষয়ে দুই একটা কথার পর প্রমথই প্রথমে কথাটা তুলিল; বলিল, "মেসো মশায়, আপনার পাওনাদার ত আর একটু পরেই আসবে; টাকার কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কি?"

হরমোহন চিন্তিত মুখে কহিলেন, "না, কিছুই হয় নি! অনেক চেষ্টা করেছি প্রমথ; এই কয়েক দিনে অনেকেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কেউ দিলে না! এখন একমাত্র তুমিই ভরসা, তুমি যদি কোন রকমে তাকে নিরস্ত করতে পার! তোমার বাসায় যে কতবার গিয়েছি তার সংখ্যা নেই। অবশেষে তোমাকে বাড়ীতে গ্রিপেড্ টেলিগ্রাম করলাম। তারও কোন উত্তর পেলাম না। তুমি যে সেই গেলে তার পর ত আর এলে না!"

প্রমথ ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম না মেসোমশায়। এখান থেকে যাবার আগে আমি আমার চার পাঁচজন বন্ধুর কাছে চেষ্টা করেছি,

কিন্তু উপস্থিত কারও হাতে টাকা নেই। তার পর হঠাৎ একটা জরুরী কাজে বেনারসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার কাজ শেষ না করেই আমি ধড়ফড়িয়ে চলে এলাম। আমার নিজের হাতে টাকা থাকলে আমি ভাবতাম না; আমারও এ সময়টা বড়ই টানাটানি চলেছে। তা হলে উপায়?"

হরমোহন হতাশ হইয়া কহিলেন, "কোন উপায় নেই!"

প্রমথ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে দিন রাত্রে যে আপনার লাইফ্ ইনসিওর্যান্সের কথা বলছিলেন তা কবে ডিউ হবে?"

"সে অনেক দেরী,—দু বৎসর পরে।"

প্রমথ কোন কথা না বলিয়া বিরস চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ ব্যগ্র ভাবে কহিল, "আচ্ছা, আপনার পলিসিটা বাঁধা রেখে ত কিছু টাকা তোলা যায়?"

হরমোহন কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন, "পলিসি কি আমার কাছে আছে প্রমথ? তা-ও কোম্পানীর কাছেই বাঁধা আছে।"

কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রভাবতী আসিয়া নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "মাসিমা, তুমি কেন এ সব কথার মধ্যে পড়ে কষ্ট পাও? এ সব ব্যাপার আমাদের পুরুষদের ওপর ছেড়ে দাও, যে রকম করে হোক আমরা সামলাব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।"

প্রভাবতী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি শুধু এই ভাবছি প্রমথ, হাতে এই সধবার লক্ষণটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই যা দিয়ে এই বিপদের সময়ে তোমাদের একটু উপকার করতে পারি। কিন্তু যে হতভাগীর জন্যে তোমাদের এই কষ্ট তার ত যা হোক দু চারখানা ক্ষুদ্র কুঁড়ো আছে, তাই না হয় আপাততঃ নিয়ে—"

প্রভাবতীকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বাপ্ রে! তা কখন করা যায়? ওকে ছেলে মানুষের সাধের জিনিস, তার পর হঠাৎ যদি শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে আসে তখন পাঠাবে কি করে?"

সংসারের এই বিপদানলে দুর্ভাগিনী কন্যার অলঙ্কারগুলি আহুতি দিতে প্রভাবতীরও একান্ত অনিচ্ছা ছিল; এ বিষয়ে প্রমথর দৃঢ় অসম্মতি দেখিয়া বিপদের মধ্যেও তিনি এক দিকে একটু আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মান অমলা কিন্তু প্রমথর কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল! ছেলে মানুষের সাধের জিনিস? প্রমথ ভাবে কি তাহাকে! সে কি মনে করে সে এতই সামান্য যে তাহার পিতার এই মহা বিপদের দিনে তুচ্ছ কয়েকটা সোণা রূপার ঢেলার উপর তাহার বিন্দুমাত্রও মমতা আছে? তাহার ইচ্ছা হইল তখনি তাহার মকরমুখো বালা দুই গাছা হাত হইতে খুলিয়া প্রমথর দেহের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়!

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহনের এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাইল! তিনি বলিলেন, "ছেলেমানুষের সাধের জিনিসই বল আর যাই বল, সে আলাদা কথা; কিন্তু শ্বশুরবাড়ী থেকে হঠাৎ নিতে আসবে সে ভাবনা একটুও নেই। তা বলে আমি অবশ্য গহনা নেওয়ার কথাও বলছিনে, আমি শুধু এই বলছি যে তোমার ভাবনাটা একেবারে অমূলক।"

প্রমথ একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল, "না মেসোমশায়, তা নয়। এই টাকার ব্যবস্থা করা, আর মাণিকলালকে ঠাণ্ডা করা, এ সব সামান্য ব্যাপারগুলো শেষ হয়ে গেলে, আমি সেই আসল কাজেই উঠে পড়ে লাগব; আর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে—"

প্রমথর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সে সবিস্ময়ে দেখিল আরক্ত মুখে অমলা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি প্রমথ দাদার ও সব বাজে কথা শুনো না! আমার সব গয়না দিয়ে যদি তোমার একবিন্দুও কষ্ট কমে তাতে আমি খুব খুসী হব। আমি আলমারী থেকে এখনি সব বার করে দিচ্ছি, আগে এ দুটো খুলে দিই!" বলিয়া নিজের হাতের বালা দুই গাছা সজোরে খুলিতে আরম্ভ করিল।

প্রভাবতী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, "ওরে করিস কি, করিস কি! আজ একাদশীর দিনে অকল্যাণ করিস নে!"

কিন্তু ততক্ষণে অমলা দুই গাছি বালাই হস্ত হইতে উন্মোচিত করিয়া হরমোহনের পদতলে রাখিয়া দিয়াছিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে প্রমথর দিকে ফিরিয়া অমলা

আর্ত্তস্বরে বলিল, "প্রমথ দাদা, তুমি কি আমাকে এতই ছেলে মানুষ মনে কর যে——" আর তাহার কথা বাহির হইল না, সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিল।

হরমোহন সজল চক্ষু মুদিত করিয়া 'নারায়ণ! নারায়ণ!' করিতে লাগিলেন।

প্রমথ এক মুহূর্ত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে মাপ কর অমলা, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, আমি নিজে এসে তোমার কাছ থেকে গয়না চেয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু এখন তুমি আমার অনুরোধ রাখ, বালা হাতে পর।" বলিয়া বালাগাছা তুলিয়া লইয়া প্রভাবতীর হস্তে দিয়া বলিল, "মাসি মা, তুমি পরিয়ে দাও।"

প্রভাবতী বালা লইয়া অমলার হাতে পরাইয়া দিলেন।

হরমোহন অমলাকে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া সস্নেহে পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ছি মা, এত অধীর হতে আছে কি? ভয় কি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার গহনায় কতটুকু ধার কমবে বল? তা ছাড়া একেবারে নিঃস্ব হয়ে থাকাও ত ভাল নয়। তেমন দরকার হলে খরচ করতে পারব শুধু এই ভরসাটুকু মনের মধ্যে রাখবার জন্যেও হাতে কিছু বাঁচিয়ে রাখা দরকার।"

অমলা নিঃশব্দে নতমুখে পিতার পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি আসিল, "হরমোহন বাবু বাড়ী আছেন?"

(১৬)

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরমোহন প্রমথর সহিত বাহিরে আসিলেন। মাণিকলাল বিনয় সহকারে উভয়কে নমস্কার করিল, এবং দুই তিন মিনিট সাধারণ কথাবার্ত্তার পর টাকার কথা তুলিল।

বিপন্নভাবে একবার প্রমথর দিকে চাহিয়া, একবার ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে কুণ্ঠিত ভাবে মাণিকলালের প্রতি চাহিয়া হরমোহন বলিলেন, "আপনার টাকার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ত' করতে পারি নি!"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মাণিকলাল ধীরভাবে বলিল, "অবিশেষ ব্যবস্থা কি করেছেন শুনতে পারি কি?"

কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া হরমোহন বিমূঢ়ভাবে প্রমথর দিকে চাহিতেই প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "অবিশেষ ব্যবস্থা আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আর বড় বেশী কিছু নয়। দয়া করে কিছু সময় দিতেই হবে!"

প্রমথর কথা শুনিয়া মাণিকলাল কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে পকেট হইতে কয়েকখানা কাগজ বাহির করিল, এবং তন্মধ্য হইতে দুইখানা কাগজ বাছিয়া লইয়া হরমোহনের হস্তে দিয়া বলিল, "চারু চৌধুরী উকিল বলেছেন, বিশেষ দরকার না থাকলেও, আপনি দুটো কাগজ মিলিয়ে দেখে নিয়ে একটা আপনার কাছে রাখবেন, আর অপরটা দস্তখত করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।"

কিয়দংশ পাঠ করিয়াই হরমোহন বুঝিতে পারিলেন যে তাহা নালিশ করিবার নোটিস্। শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়াই প্রমথর হস্তে তিনি তাহা অর্পণ করিলেন।

নোটিস পাঠ করিয়া প্রমথ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তাহার পর আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিবার জন্য সে মিনতিপূর্ণ ভাষায় মাণিকলালকে সনির্ব্বন্ধে চাপিয়া ধরিল। তাহার অসামান্য উদ্বেগ এবং আগ্রহ দেখিয়া, হরমোহন এবং দ্বারান্তরালে স্থিতা প্রভাবতী ও অমলার কথা ত স্বতন্ত্র, অভিনয়কারী মাণিকলালেরই সময়ে সময়ে ভ্রম হইতেছিল যে প্রমথ হয় ত' সত্য-সত্যই তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিতেছে। প্রমথর কপট অনুরোধ রক্ষা না করিয়া অভদ্রতার অভিনয় করিতেও সে মনে মনে ঈষৎ পীড়া অনুভব করিতেছিল।

মাণিকলালের দ্বিধা-মন্থর ভাব লক্ষ্য করিয়া, প্রমথর ওজস্বী বক্তৃতায় কিছু ফল হইয়াছে ভাবিয়া হরমোহনও এরূপ ভাবে মাণিকলালকে স্তুতি করিলেন যে ব্যাপারটা যদি অভিনয় না হইয়া প্রকৃত হইত তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই মাণিকলাল হরমোহনের সকরুণ প্রার্থনা মঞ্জুর করিত; কিন্তু এ অভিনয়ের বাঁধাবাঁধিতে সব জিনিসটাই নকল হইলেও নকল করুণার স্থান ইহার মধ্যে একেবারেই ছিল না। তাই প্রমথ ও হরমোহনের নির্ব্বন্ধ নিবেদন শেষ হইলে সে শান্ত অবিচলিত ভঙ্গীতে বলিল, "আপনারা দুজনে যে, এই দীর্ঘ সময় ধরে কাতরতা প্রকাশ করলেন, শুনে দুঃখিত হোন, তা'তে আমার মন একটুও গলে নি। আমি একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ; চক্ষুলজ্জা বা মায়া

মমতার সঙ্গে আমার কারবার নেই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সখ্ যদি আপনাদের থাকে ত' সেটা আমাকে বাদ দিয়েই করবেন। এখন নোটিসখানায় একটা সই করে দেবেন, না অম্নিই উঠ্‌ব, অনুগ্রহ করে বলুন।"

প্রমথ বলিল, "যতটা বাজে আপনি আমাদের মনে কচ্ছেন, ততটা বাজে আমরা না হতেও পারি। অতএব এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইতে দোষ কি?"

মাণিকলাল বলিল, "কথাবার্ত্তার যদি প্রয়োজন হয় ত আমার উকিল চারুবাবুর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইবেন। ষ্টেশন রোডে রাধামাধব জীউর মন্দিরের সম্মুখে তাঁর বাড়ী; আপনাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরের পথ নয়।"

প্রমথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কখন তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হবে?"

মাণিকলাল অনুৎসুক ভাবে বলিল, "এখন থেকে আরম্ভ করে ডিক্রীজারী পর্য্যন্ত যখন আপনাদের অভিরুচি হয়।"

প্রমথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মশায়, উকিলের সঙ্গে কথা কয়ে সুবিধা করতে পারব না! যে কথা উকিলকে বাদ দিয়ে কইলে সহজ হয়ে আসে, সেই কথাই উকিলের সঙ্গে হলে জটিল হয়ে ওঠে! মরতে যদি হয় ত রামের হাতেই মরি; রাবণের হাতে মরলে আর বেশী সুবিধে কি হবে?"

মাণিকলাল মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হলে বলুন, আপনার কি বলবার আছে, শুনেই যাই। কিন্তু দোহাই আপনার, সংক্ষেপে বলবেন।"

প্রমথ বলিল, "লাইফ্ ইনসিওরের টাকা পেতে এখনও দু বৎসর দেরী; তার আগে আমরা আপনার টাকা পরিশোধ করতে পারছি নে। আপনি যখন শুধু হাতে দু বৎসর অপেক্ষা করতে রাজী নন্, তখন মাসে মাসে কিছু টাকা নিয়ে আপনাকে দু বৎসর অপেক্ষা করতে হবে।"

মাণিকলাল একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, "কত টাকা মাসিক দিতে আপনারা প্রস্তুত আছেন? পাঁচ শ'?"

প্রমথ বলিল, "পাঁচ শ', হাজার জানিনে মশায়। আপনি ঠিক বুঝে একটা বলুন যার এক পয়সা কমে আপনি রাজী হবেন না। আবদার অনুরোধ করে কমাব সে পথও ত নেই, কারণ আবদার অনুরোধে আপনার মন গলে না! আপনি ঠিকই বলেছেন,—চক্ষুলজ্জা না থাকার দরুণ আপনার প্রকৃতি একটু ভিন্ন হবারই কথা। যেমন চক্ষু না থাকলে জীব-বিশেষের বাসস্থান ভিন্ন হয়!" বলিয়া প্রমথ উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিল।

প্রমথর হাসি থামিলে মাণিকলাল বলিল, "দেখুন প্রমথবাবু, আপনি আমাকে গালাগাল দিলেও আমি আপনাকে পছন্দ করি। কি জানেন? হাতীর লাথিও সহ্য হয়। আপনার কথার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, আপনিই বলুন কত আপনারা দিতে পারেন; আমার যদি পছন্দ হয় আমি নিশ্চয়ই রাজী হব।"

প্রমথ বলিল, "আচ্ছা তাই ভাল। পঞ্চাশ?"

মাণিকলাল সংক্ষেপে বলিল, "না।"

হরমোহন একটু উস্‌খাস্ করিয়া প্রমথর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রমথ, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।"

প্রমথ হস্ত সঙ্কেতে হরমোহনকে নিরস্ত করিয়া কহিল, "আগে এঁর সঙ্গে কথা শেষ করি, তার পর আপনার কথা শুনছি। আচ্ছা, আশী?"

হরমোহন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, প্রমথ, একবার যদি বাড়ীর ভেতর"

হরমোহনকে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া প্রমথ বলিল, "প্রথমে বাইরের হাঙ্গামাটা চুকোই, তার পর ভেতরে যাওয়া যাবে।"

মাণিক বলিল, "না, আশীও না।"

প্রমথ বলিল, "তবে পুরোপুরি এক-শ'। কিন্তু এবার থেকে আমার না বলবার পালা, তা জানিয়ে দিচ্ছি।"

হরমোহনের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তিনি হতাশ হইয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া রহিলেন।

মাণিকলাল বলিল, "তবে একশ'ই। আপনার কথাকে মান্য করি; আপনি যখন বলছেন যে এক শ'র বেশী হবে না, তখন বাজে কথায় সময় নষ্ট করে কোন ফল নেই। কিন্তু মাসের পনের তারিখের মধ্যে টাকা না পেলে ষোল তারিখে নালিশ দায়ের করব।"

প্রমথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ন্যায্য কথা।"

"আর প্রথম মাসের কিস্তিটা আজ দিতে হবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "এটা অন্যায় কথা হ'ল। মাসের পঁচিশ তারিখে চাকুরের কাছ থেকে যিনি টাকা চান তাঁর বিবেচনার সুখ্যাতি আমি করতে পারি নে।"

মাণিকলাল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আচ্ছা, আসছে মাস থেকেই হবে। আমি তা হলে এখন উঠি—"

"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।" বলিয়া হরমোহনের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "এবারে চলুন মেসো মশায়, বাড়ীর ভিতর যাবেন বলছিলেন।"

বাড়ীর ভিতর পদার্পণ করিয়াই হরমোহন কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "এ ব্যবস্থা কেন করলে প্রমথ? মোটে দেড় শ' টাকা মাইনে পাই, একশ' টাকা কোথা থেকে দোব?"

দ্বারান্তরাল হইতে শুনিয়া প্রভাবতী ও অমলারও এ ব্যবস্থা ভাল লাগে নাই। মাসকাবারের পনের দিন পরে পনেরটি টাকাও যে পরিবারে অবশিষ্ট থাকে না, মাসে মাসে দুই বৎসর ধরিয়া একশত টাকা করিয়া ঋণ-পরিশোধ সে পরিবারের দ্বারা কেমন করিয়া হইতে পারে?

হরমোহন প্রমথকে লইয়া এমন স্থানে আসিলেন যেখান হইতে মাণিকলাল কোন' কথা শুনিতে না পায়। সঙ্গে সঙ্গে অমলা এবং প্রভাবতীও তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "যা দিনকাল পড়েছে, দেড়শতেই ত কুলোয় না; তার যায়গায় পঞ্চাশ হলে ত অর্দ্ধেক দিন উপস করতে হবে প্রমথ?"

অমলা নিজে কিছু বলিল না; পিতা ও মাতার প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ কি বলে তাহা শুনিবার জন্য সে আগ্রহের সহিত কিন্তু অপ্রসন্ন মুখে প্রমথর দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রমথ নিমেষের জন্য একবার অমলার মুখ দেখিয়া লইয়া তাহারও মনের ভাব কতকটা উপলব্ধি করিয়া হরমোহনের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে ত ঠিক কথা। কিন্তু এমনি একটা ব্যবস্থা না করলে কালকে নালিশটাই বা কি করে আটকান যায়? সে-ও ত সুবিধের ব্যাপার নয়। নালিশ হলে কতকগুলা হাঙ্গামার ব্যাপার হয়ে পড়বেই; অথচ পঞ্চাশ টাকাতে আর কিছু না হোক নুন ভাতটাও ত চলতে পারে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "শুধু নুন ভাত নয় প্রমথ, তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? ওর মধ্যে লাইফ ইনসিওরান্সের প্রিমিয়ম আর সুদ আছে, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, স্যাকরা আছে, কাপড়ের দোকান আছে, আরও কত কি যে আছে তা আর তোমাকে কত বলব? আমার বোধ হয় এর চেয়ে নালিশই ভাল ছিল!"

প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "না, তা ভাল নয়। কেন না তা'তে এ সব অসুবিধে ত থাকবেই, অধিকন্তু নালিশের উৎপাতটা বাড়বে। শুনুন মেসো মশায়, শোন মামিমা, অমলা তুমিও শোন, আমি একটা উপায় মনে মনে ভেবেছি। তোমাদের সকলের যদি মত হয় তাহলে বোধ হয় এর একটা ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় আমাদের সকলেরি হয় ত একটু অসুবিধা ভোগ করতে হতে পারে,—আপনাদেরও, আমারও। কিন্তু একটা দুরূহ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় যে খুব সহজ হবে না, এ ত' আমাদের ভেবে নেওয়াই উচিত।"

প্রমথর এই দীর্ঘ ভূমিকায় বাকি তিনজনেই অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন; হরমোহন ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "অসম্ভব না হলেই হোল। কি বল শুনি?"

প্রমথ বলিল, "না, অসম্ভব হয় ত নয়। কাজকর্ম্মের জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় থাকতে হয়, কখন মাসে দশবার দিন, কখন বা নমাস ছ-মাসে দুচার দিন। তার জন্যে আমাকে একটা চল্লিশ টাকা ভাড়ার বাড়ী আর বামুন চাকর রাখতে হয়। তা'তে মাসে মাসে আমার সত্তর পঁচাত্তর টাকা পড়ে। ধরুন, আমি যদি আমার বাসা তুলে দিই, তা' হলে সেই টাকাটা এ দিকে লাগান যেতে পারে। আপনাকে মাসে মাসে বাকি পঁচিশ ত্রিশ টাকা দিলেই চলবে! এভাবে ছ-মাসের বেশী চালাতে হবে না। ছমাস পরে আমি একটা টাকা পাব, তা থেকে মাণিকলালের দেনাটা চুকিয়ে দিলেই হবে। তার পর আপনার লাইফ ইনসিওরের টাকা পেলে আমার টাকটা দিয়ে দেবেন। বাসা তুলে দিয়ে আমি একটা মেস্ টেস্ দেখে নিতে পারি। মেসে অসুবিধা হলে আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়ী আছে, আপনারা আছেন, মাঝে মাঝে দুচার দিন এক রকম করে চালিয়ে নেওয়া যাবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয় আশা ও আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। এত সহজে যে এ দুরূহ বিপদের উপায় হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হৃষ্টচিত্তে হরমোহন বলিলেন, "আমাদের পক্ষে ত এ খুবই ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু একটা কথা প্রমথ, শুধু তুমিই কি আমাদের আপনার লোক, আর আমরা তোমার কেউ নই? আমাদের জন্যে বাসা তুলে দিয়ে তুমি মেসে বা বন্ধুর বাড়ীতে থাকবে, এ কথা তুমি বলছ কি করে?"

প্রভাবতী কহিলেন, "আমরা থাকতে তোমার স্বতন্ত্র বাসা করে থাকাই অন্যায় প্রমথ। এখন যে আছ, তা'ও অন্যায়!"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "একশ' বার; যদি না তোমাদের এ অঞ্চলে থাকলে আমার কাজকর্ম্মের পক্ষে একটু অসুবিধা হ'ত। তা সে পরের কথা পরে যেমন সুবিধা হয় করলেই হবে, এখন তা হলে মাসে মাসে একশ টাকা করে দেবার কথা বলাই, ঠিক ত? তুমি কি বল অমলা? এ ব্যবস্থা মন্দ কি?"

অমলা প্রমথর দিকে না চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মন্দ নয়।" তাহার পর হরমোহনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তার চেয়ে বাবা, এক কাজ করলে ত' হয়। আমার গয়না থেকে ছশো টাকার অনেক বেশী ত' হবে। সেই টাকা থেকে ছমাস, অর্থাৎ যত দিন প্রমথ দাদার টাকাটা না পাওয়া যায়, মাণিক বাবুকে মাসে মাসে একশ' টাকা করে দেওয়া যেতে পারে। তার পর আপনার লাইফ ইনসিওরের টাকা থেকে প্রমথদাদার টাকাটা দিয়ে দেবেন। এ হলে আর প্রমথ দাদাকে নানা রকমের অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।"

শেষোক্ত ব্যবস্থাটির চেয়ে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটি কত হিসাবে সুবিধাজনক, তাহা বুঝিতে হরমোহনের কিছু মাত্র বিলম্ব হইল না। সেই নিরতিসুব্যবস্থায় বিবেচনা-হীনা কন্যাকে অমনভাবে বাধা দিতে দেখিয়া হরমোহন অন্তরের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রমথর উপস্থিতির জন্য যথাসম্ভব সংযত হইয়া অমলার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার গহনা বিক্রি করবার জন্যে তুমি তখন থেকে এত পীড়াপীড়ি করছ কেন তা ত বুঝতে পারছি নে! তুমি কি মনে কর যে তোমার বিয়ের ধার বলে এটা তোমারই শোধ করা কর্ত্তব্য, আর তোমার গহনা থেকে এটা শোধ গেলে তুমি আমাদের সকলের কাছে একেবারে ঋণ-মুক্ত হবে?"

হরমোহনের কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে তথাকার বায়ু পর্য্যন্ত ঘন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ পরিহাসের দংশনে অমলার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, পিতার কথার উত্তরে আর কোন কথা বলিবার তাহার ক্ষমতা রহিল না।

প্রমথ অমলার দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া সেই অপরিচ্ছন্ন অভিযোগের গ্লানি হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "তা নয় মেসোমশায়; অমলা মনে করে, আপনাকে সাহায্য করবার অধিকার তার তুলনায় আমার কিছুই নেই। সেই জন্যে সে ভাবছে যে, সে তার সব গহনা-গুলো অনায়াসে বিক্রী করে দিতে পারে, কিন্তু আমাকে সামান্য বাসা তুলে দিয়েও সাহায্য করতে দেওয়া যেতে পারে না। তাই সে আমার অসুবিধে নিয়ে তত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আমার অসুবিধের কথা যদি এতটা ভাব অমলা, তা হলে প্রমথ দাদার অসুবিধে না বলে প্রমথবাবুর অসুবিধে বলা উচিত।" বলিয়া প্রমথ হাসিতে লাগিল।

প্রমথর এই তিরস্কারে অমলা অপ্রতিভ হইল, কিন্তু খুসীও কম হইল না। বিসদৃশ ব্যাপারটাকে প্রমথ এমন করিয়া একটা সঙ্গত আকার দেওয়ায় তাহার মনে যুগপৎ প্রমথর প্রতি সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা এবং হরমোহনের প্রতি তদনুপাতে একটু অভিমান উদ্রিক্ত হইল। সে একটু বেগের সহিত বলিল, "আমার কথার যদি আপনারা এই রকম সব মানে করেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই, আপনি আজ রাত্রেই বাসা তুলে দিয়ে আসুন!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তোমার কথার যদি সে রকম সব মানে না হয়, তাহলে আর কোন কথা নেই, বাসা যেদিন হয় তুলে দিলেই হবে। উপস্থিত মাণিকবাবুকে বিদায় করে আসা যাক্।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই, প্রমথ ও হরমোহনের নিকট মাসে মাসে একশত টাকা পাইবার কথা পাইয়া মাণিকলাল প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

দীনের দিল্লী দর্শন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

একটী দিনে দেখে এলাম দিল্লি সহরখানা
রক্ত রঙ্গত রূপ দিয়ে এ তৈরি হল না কি ?
মর্ম্মরে আর লাল পাথরে চলছে পড়েন-টানা,
দুধ-আল্‌তার এ সহর দেখে তৃপ্ত হ'ল আঁখি।
বান্দা বীরের বন্দীশালা, হুমায়ূনের কবর,
দেখে এলাম শেষ নবাবের বন্দী হবার ঠাঁই,
হিন্দুরাজার স্তম্ভ লোহার, ধ্বংস জবর জবর,
সেই দরজা শিব্‌জী পলান যে দিক দিয়ে ভাই।

ওই সে খুনি মস্‌জিদেতে জঙ্গী নাদীর শা
ভীম খুনিয়া খুন-খারাপির হুকুম দিলে জোর,
এই নগরী আন্‌লে টেনে জগতের ঈর্ষা
হ'ক রূপসী, চির দিবস কপাল ভাঙ্গা ওর।

অশোক রাজার অনুশাসন পাষাণ-থামে গাঁথা,
কুতবমিনার গাত্রে তাহার বয়েদ লেখা কত,
তোপ-থেকো সব পাষাণ-প্রাচীর, সাম্‌নে কামান পাতা,
লাগলো আমার দেব-দানবের মল্লভূমির মত।

দুর্গদ্বারে আজ বিদেশী দিচ্ছে ফিরে টহল,
ভিতর-বাহির দেখে এলাম ঝড়ের মত বেগে,
আজ যাদুঘর বেগম এবং বাদশাজাদীর মহল,
কনক এবং কনক রূপের কস্‌টী আছে লেগে।

দেখতে পেলাম নানান রঙের গম্বুজ এবং ঢিপি,
বোরকা-পরা ময়ণপুরের নৌরোজেরি মেলা,
ভাঙ্গন গড়ন চলছে এ যে অদৃষ্টেরি লিপি,—
'রাইসিনাতে' দিল্লী নূতন কালের হোলি-খেলা।

দেখতে পেলাম রূপের বীথি মস্‌জিদেরি পাশে,
সত্য না কি স্বর্গ নরক এমনি কাছাকাছি ?
যায় আজানের জান্ শুকিয়ে গজল গীতের ত্রাসে,
কটাক্ষের ওই বিষ-সায়কের তফাৎ হলে বাঁচি।

মুগ্ধ আমায় করলে বড়ই চাঁদনী-চকের শোভা,
ফলের এবং ফুলের রঙের যাইরে বলিহারী,
ভিন্ দেশীদের কুম্ভমেলা নিত্য আঁখিলোভা,
হেথায় যেন অতীত যুগের খোঁসবো পেতে পারি !

বধলে যেথা নিঠুর হাতে শেষ নবাবের সুতে
সেইখানেতে নীল ফোয়ারায় জল পড়িছে ঝরি,
বসুন্ধরা অশ্রু-ধারা কলঙ্ক তার ধুতে
ঢালছে যেন অহর্নিশি ঝরঝরিয়ে মরি !

ভাগ্য লয়ে এই নগরী খেলছে ছিনিমিনি
দিলদরিয়া, গড়লে বিধি সুধায় এবং বিষে,
আজকে এ রাজ-রাজেশ্বরী, কালকে অনাথিনী,
জীবন ইহার যৌবন পায় মৃত্যু সাথে মিশে।

বর্ত্তমান আর অতীত দোঁহে দুদিক দিয়ে ডাকে,
কেউ বা খুসীর খোস্‌রোজে কেউ দুখের তালিমায়,
বুলবুল এবং পেচক হেথা এক পিঁজারায় থাকে,
ভাসান-রাতে বোধন-প্রাতের শঙ্খ শোনা যায়।

এক মলাটে বাঁধলে হেথায় কোরাণ এবং গীতা,
জম্‌জম্ এবং জর্ডন এলো রূপ-যমুনায় বুঝি ;
চিতায় উঠে রঙমহল এর, রঙমহলে চিতা,
একদিকেতে নূপুর বাজে, অন্যদিকে ঝিঁঝিঁ।

একদিকে এর কিরীট শোভে, একদিকে হাড়মালা,
সজীব হর-গৌরী যেন চিন্‌তে নারে লোকে ;
আনন্দেরি বোগ্‌দাদ্ এ যে, দুঃখেরি কারবালা,
শুষ্ক ঝরা বৃন্তে নব মুকুল পড়ে চোখে।

এক দিবসে দিল্লী দেখা নূতনতর বটে
এমন বিরাট মহাভারত একদমেতে পড়া,
সাত সাগরের তুফান ধরা একটী ছোট ঘটে,
সাত পুত্তুল দশভুজার মানস-পূজা করা !

অগস্ত্য নই, করবো কিসে গণ্ডুষেতে পান
শতাব্দীর এই সাগর-সেচা গরল-ভরা সুধা ?
অঞ্জলিতে আঁটবে কেন বিশ্বজিতের দান ?
সম্রাটেরি সত্রে এসে মিটল না যে ক্ষুধা !
এলাম পাষাণ শকুন্তলার প্রস্তাবনা পড়ে,
এলাম শুনে শুধু কালের নীরব সা রি গা মা,
চৌদ্দ ভুবন ঘুরে ফিরে পক্ষীরাজে চড়ে
দরিদ্র হায় দেখলে শুধু রৌদ্র এবং ঝামা।



ভারতবর্ষ

অতিনম্র

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পৃথ্বিরাজ সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

ভুশণ্ডির মাঠের পরিশিষ্ট

শ্রীরামচন্দ্র

ভুশণ্ডির মাঠে নানাজাতীয় ভূতের চেঁচামেচিতে ভয় পাইয়া রিপোর্টার পরশুরাম মহাশয় চম্পট দিলে, এ পক্ষ সেস্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিবেন, এবং শরৎবাবু, চারুবাবু, যতীনবাবু, ও নরেশবাবুর কাছে তাঁর পাঁতির জন্য ছুটাছুটি করিয়া টেঁকের কড়ি খরচ করিবার প্রয়োজন হইবে না। যাঁহারা তাঁহার প্রকাশিত বিবরণ ও সমস্যা পড়িয়া বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহারাও আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

প্রকৃত অবস্থা এই :—

ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ ও কেলেভূত ডাকিনী শাঁকচুন্নি এবং পেত্নী যখন মহা মারামারি করিতেছে, এবং তাই লইয়া নানা জাতীয় ভূতের মধ্যে মহা দলাদলি চেঁচামেচি মারামারি সুরু হইয়াছে, সেই সময়ে হঠাৎ একটা ইয়াক ভূতের পৃষ্ঠে চাপিয়া এক লামা ভূত তিব্বত হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইয়াকটা মাঠের এক কোণায় বাঁধিয়া, লামা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু ভূতের দলের ঠেলাঠেলিতে পারিল না। তখন লামা মহাশয় দাঁত খিঁচাইয়া "রাম রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে হিন্দু ভূতগুলি একেবারে হাওয়া হইয়া মিলাইয়া গেল; ব্রহ্মদৈত্য, যক্ষ ও কেলেভূত ও তিনটি সহধর্ম্মিণী ঝগড়াতে অতিমাত্র ব্যস্ত থাকায় তাহাদের কাণে রাম নাম পৌছিল না; কাজেই তাহারা টিকিয়া রহিল।

হিন্দু ভূতের দল চলিয়া গেলে খৃষ্টান ভূতগুলি বিপুল উৎসাহে লামাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু লামা একটা হাতের উপর আর একটা হাত আড় করিয়া (sign of the cross) দন্তসর্ব্বস্ব মুখ খিঁচাইয়া তাহাদের দিকে চাহিতেই—খৃষ্টান ভূতের দল তাড়াতাড়ি পিটটান্ দিল। শত্রু পক্ষে কেউ লামা ভূতকে তাড়াইবার মন্ত্র জানিত না

ইহাতে গোলমাল অনেক কমিয়া গেল। লামা ভূত তখন অগ্রসর হইয়া সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বলিল, "আরে, এর জন্য এত ঝগড়া! রোসো, তোমাদের কুরসীনামা মিলিয়ে দেখি—আচ্ছা ভাই যখ্—তুমি না একজন্মে ওর নাম কি গ্যাংটসিতে—"

যক্ষ্ মুখ কাঁচু মাচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ লামা ম'শায়, কিন্তু তাই ব'লে আমি আমার এ টাকাকড়ি ফেলে সেই দারুণ হিমের দেশে গিয়ে সেই বরফ ঢাকা গাছের উপর ব'সে থাকতে পারবো না।"

ব্রহ্মদৈত্য তখন হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বল দাদা, আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছে কোথায় যেন তোমায় দেখেছি,—তুমি যে আমারই তিব্বতী জন্মের সহোদরা। পেন্নাম হই দাদা, পেন্নাম হই।"

লামা তখন হাসিয়া বলিল, "তবে আর হাঙ্গামাটা কি? তোমরা তিব্বতী বিধিমতে দুই ভাইয়ে মিলিয়া এই সাধ্বীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পার।"

ইহাতে তিনজনেই খুসী হইল, কিন্তু কেলেভূত চীৎকার করিয়া বলিল, "বাঃ রে, ইকা বেইমানি, এ মুংরি, কেনে যা'ত বাট?" বলিয়া ডাকিনীর আঁচল ধরিয়া মারিল টান। ডাকিনী অমনি হাত পা ছড়াইয়া চিৎ হইয়া পড়িল। সেই অবসরে পেত্নী ও শাঁকচুন্নী আসিয়া তার বুকের উপর নাচিতে লাগিল। তাহাকে ছাড়াইতে আসিল ব্রহ্মদৈত্য ও যক্ষ—আবার হট্টগোল লাগিয়া গেল।

লামা তাহাদিগকে বহু কষ্টে থামাইয়া কেলেভূতের কুরসীনামা দেখিতে লাগিল। কোনও জন্মেই কেলেভূতের অপর দুইজনের ভাই হইয়া জন্মানর সংবাদ পাওয়া গেল না! তিব্বতী ধর্ম্মে তিন কেন পাঁচ সাত দশজন ভাইও এক সঙ্গে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু ভাই ছাড়া আর কেউ তো স্ত্রীর বখরাদার হইতে পারে না। লামার মাথা ঘামিয়া গেল।

কাছাশূন্য কাপড় পরিয়া ধপধপে পৈতা ঝুলাইয়া এক ব্রহ্মদৈত্য. দক্ষিণ হইতে হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বলি, এত হল্লাটা কিসের ?"

লামা চটিয়া বলিল, "তুমি কে হে বাপু ? আমার ধ্যান ভঙ্গ করিলে ?"

নবাগত বলিল, "আমি নম্বুরী, একেবায়ে কোচিন থেকে ছুটে এসেছি হল্লা শুনে। শুনি ব্যাপারটা কি ?"

সমস্ত অবস্থা শুনিয়া সে হাসিয়া বলিল, "এর জন্য এত হল্লা। মেয়েরা যার যার ঘরে যাক, আর ঘরে বসে প্রত্যেকে এই তিনজনের সঙ্গে সম্বন্ধম্ করুক। পালা করে এরা এদের বাড়ী ঘুরে বেড়াবে। এক সময়ে একজন স্ত্রীর কাছে একজনের বেশী স্বামী না থাক্‌লেই হ'ল। এই তো মরুমকাট্টেয়াম বিধি! স্বয়ং পরশুরাম নায়রদের এ বিধি দিয়ে গিয়েছেন।"

কেলেভূত নাচিয়া উঠিয়া বলিল,—"বেশ বাবা, বেশ! এই তো ভাল! চল ভাই, চল রে মুংরী, সবাই ওই কি মুমখাট্টাই দেশে যাই!"

যক্ষ ততক্ষণ হুঁকা হাতে লইয়া দুই টান লাগাইয়াছ। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"ম'শায়ের কত দিন হ'ল কাল হ'য়েছে ?"

নম্বুরী বলিল, "এই ভাদ্রে একশো বছর পুরবে।"

"এখন মরুমক্কা না কি বল্লেন—সে আইন চলে কি ? আর চল্লে তাকে এখানে টেনে আনতে পারা যায় কি ? কোনও বিশিষ্ট কারণে আমি এখান থেকে নড়তে নারাজ।"

নম্বুড়ী মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সেটা আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু"—

হঠাৎ অন্তরীক্ষে একটা মহা হট্টগোল শোনা গেল। একদল ভূত মহা আনন্দে নৃত্য-গীত করিতে করিতে ছুটিয়াছে। এখানে ভূতের মেলা দেখিয়া তাহারা নামিয়া আসিল।

স্থানীয় ভূতেরা দেখিল যে এরা বেশ মোটা সোটা তেল-কুচকুচে—যেন প্রায় জ্যান্ত মানুষ আর কি ? হাঁ করিয়া তারা এই নবাগন্তুকদের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে কেলেভূত তাদের জিজ্ঞাসা করিল, "আপনে লোগ কাঁহাসে আইসেন—সেখানে কি খান আপনে লোগ ?"

আগন্তুকেরা বলিল, তাদের বাড়ী অষ্ট্রেলিয়ার আরণ্টা জাতির মধ্যে। সম্প্রতি তারা League of Nations এর সভায় গিয়াছিল সব সভ্যদের ঘাড়ে চাপিবার জন্য। তারা বেশ খায় দায় ভাল, কেন না আরণ্টা জাতি ভূতদের বেশ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পূজা দেয়, আর বেশ তোয়াজ করিয়া ভোগ দেয়।

কেলে বলিল, "সে দেশে যাওয়া যায় না ?"

"অতি সহজে! আমাদের লেজ ধরে ঝুল দিলেই হ'ল।"

ব্রহ্মদৈত্য বলিল, "হাঁ ম'শায়, সে দেশে বিবাহের একটা সুবিধা হ'তে পারে ? যদি হয় তো আপনার লেজটা এদিকে দিয়ে আমাকে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।"

আরণ্টা ভূতের সর্দ্দার সমস্ত অবস্থা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিল। সে বলিল, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত হাঙ্গামা! চল, তোমরা সব্বাই চল আমাদের দেশে, সেখানে খাবে দাবে আর তোয়াজে থাকবে। আর বিয়ের কোনও হাঙ্গামাই তোমাদের পোয়াতে হ'বে না। এক গুষ্টির যত পুরুষ আর এক গুষ্টির যত মেয়েমানুষের সঙ্গে যেমন খুসি মেলামেশা করুক, কোনও বাধা নেই। আর স্ত্রী পুত্রের কোনও হাঙ্গামই তোমাদের পোয়াতে হ'বে না। সে সব বুঝবে সেই মেয়েদের বাড়ীর লোক।"

শাঁকচুন্নী পেত্নী ও ডাকিনী সমস্বরে বলিল, "আচ্ছা। কিন্তু সেখানে গেলে আমরা কটা ক'রে স্বামী পুষতে পারবো ?"

"কোনও সীমা সংখ্যা নাই! যত খুসী তত স্বামী পেতে পার—কিন্তু পুষতে পারবে না। তারা প্রজাপতির মত আসবে যাবে, বেশীক্ষণ ব'সবে না।"

পেত্নী বলিল, "রাজী!"

শাঁকচুন্নী বলিল, "কিন্তু স্বামী না পুষতে পারলে বাজার হাট ক'রবে কে ?"

ডাকিনী বলিল, "আরে, একবার হাতের গোড়ায় এসে পড়লে হয়! তাহ'লে দেখবো কেমন পোষ না মানে। একটার জায়গায় যখন দশটা পাওয়া যাবে, তখন সেই দেশই আমার দেশ! চলুন ম'শায়!'

যক্ষ গম্ভীর ভাবে বলিল, "বেহ্মদত্যি ভায়া কি বল ? আমি বলি, মন্দ কি ? রাজার হালে থাকবে, শ্বশুর

খুড়ি শাশুড়ী বাড়ী—যাতায়াত ক'রবে—মন্দ কি ? কিন্তু এই তমঃশুকগুলো!"

আরণ্টা সর্দ্দার বলিল—"আরে ছ্যাঃ, ই সাড়ে তিন-খানা কাগজের জন্য ব্যস্ত হ'চ্ছ—আমার দেশে সোণা মাটিতে ছড়ান র'য়েছে, কুড়িয়ে নিলেই হয়!"

যক্ষ অমনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তবে রাজী!"

কেলেভূত কোনও কথা বলে নাই, সে একটা সুবিধা মত শক্ত লেজ ধরিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আরণ্টা-পরিষদ আকাশে উঠিয়া গেল—দেশী ভূত ও ভূতনী কয়টী তাদের লেজে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিতে লাগিল।

কেবল পড়িয়া রহিল ব্রহ্মদৈত্য! সে মন-স্থির করিয়া উঠতে পারে নাই। আরণ্টা দেশের এত প্রলোভন সত্ত্বেও নিত্যর সঙ্গে এক লেজ ধরিয়া সে দেশে যাইতে সে সম্মত হইল না।

কেলেভূতের আনা তামাকের এখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। বেলগাছের উপর বসিয়া ব্রহ্মদৈত্য সেই অবশিষ্ট তামাক সাজিয়া টানিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল!

ক্রমে তামাকের ধোঁয়ায় তার সূক্ষ্ম শরীরটা ঢাকিয়া গেল। ব্রহ্মদৈত্য সেই ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইল না। কি হইল ? তার শরীরটা কি তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে ধোঁয়া হইয়া গেল ? এমনি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সে "ট্যাঁ ট্যাঁ" করিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ঘরের বাইরে শ্যামা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি ছেলে হ'ল রে ?"

দাই বলিল, "বেটাছেলে—কালাচাঁদ!"

আর তার জ্ঞান রহিল না।

ভাবের অভিব্যক্তি



শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ফাণিম্যান)



ফাণিম্যান—যুবতী মেম সাহেব

বহুদিন পূর্ব্বে আমরা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভাবের অভিব্যক্তি' প্রকাশিত করিয়াছিলাম; আজ আর একজন ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তির 'ভাবের অভিব্যক্তি' প্রকাশিত হইল। ইহার নাম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (Mr. S. C. Mukherji) কিন্তু ইনি 'ফাণিম্যান' Funnimann নামেই দেশ বিদেশে সুপরিচিত। ভাবের অভি-

ব্যক্তিতে ইনি যে কতদূর দক্ষ তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত ছবিগুলিতে দেদীপ্যমান। ইনি ইংরাজী ভাষাতেই অভিনয় করিয়া থাকেন; ভারতবর্ষের লাট-বেলাট হইতে মহারাজা রাজা এবং ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেই ইহার অভিনয় ও অভিব্যক্তি দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

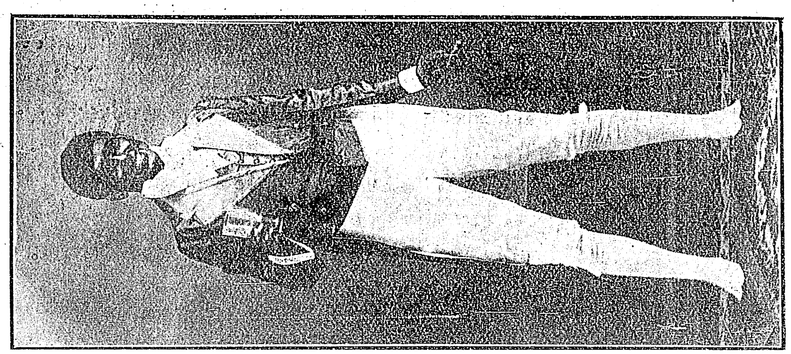

কানিমান—হাতুড়ে ডাক্তার

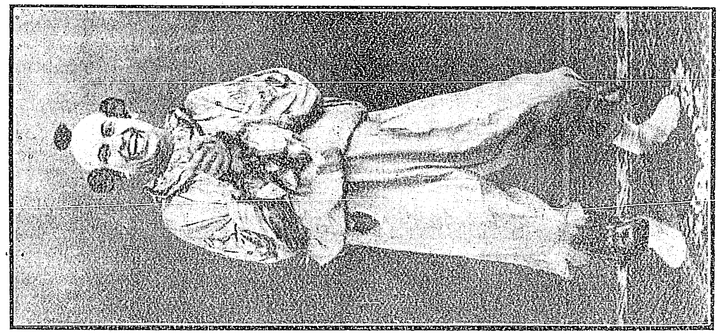

কানিমান—হাতুড়ে ডাক্তার

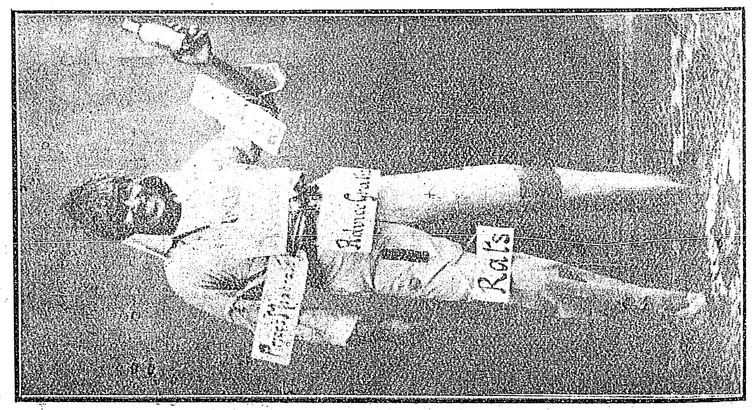

কানিমান—হাতুড়ে ডাক্তার

চিত্রশালা

(ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের দৃশ্যাবলি)

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মজুমদার গৃহীত-আলোকচিত্র

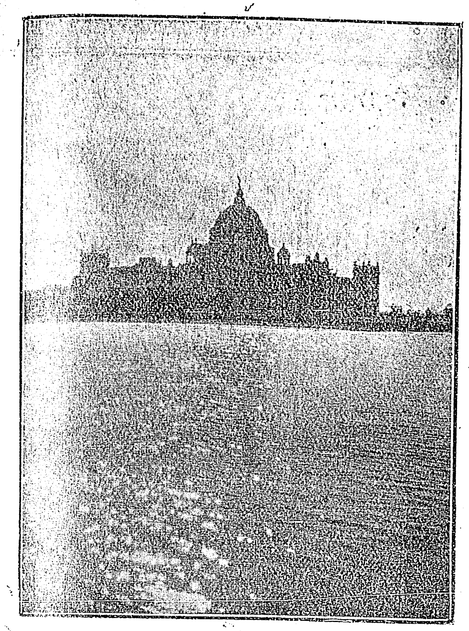

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ (বাহিরের দৃশ্য)

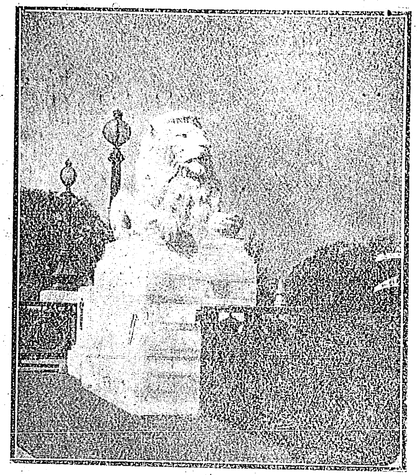

প্রধান প্রবেশদ্বারের কারুকার্য্য

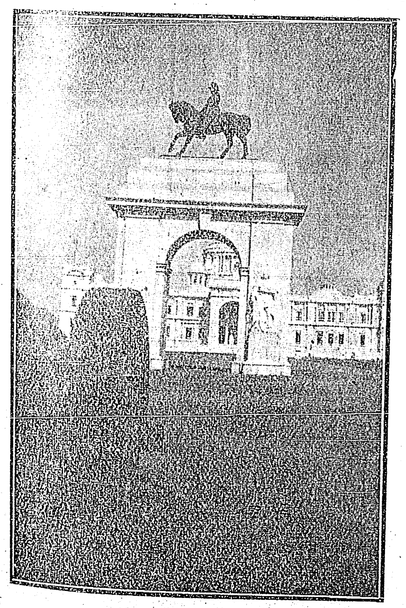

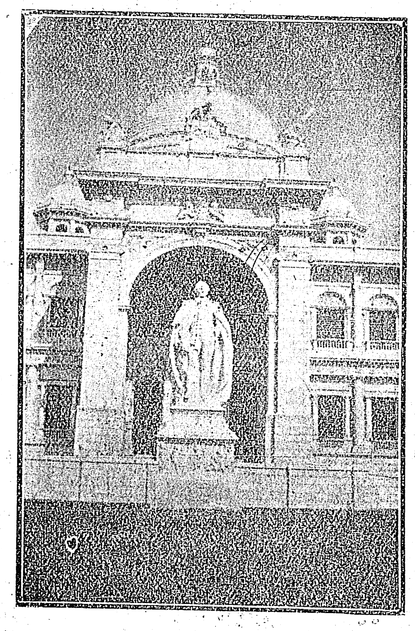

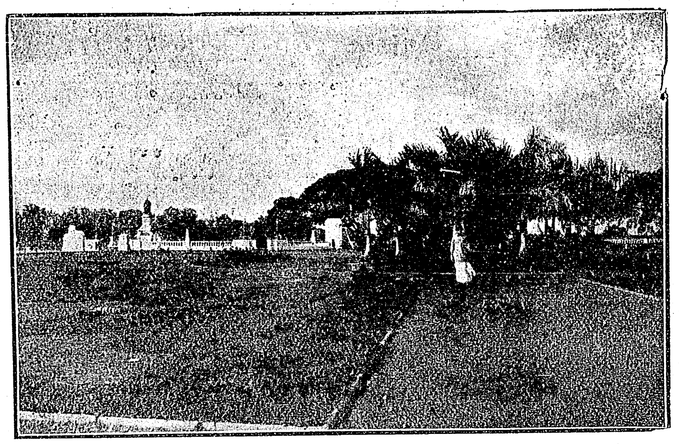

স্মৃতি-সৌধের প্রবেশ-পথ

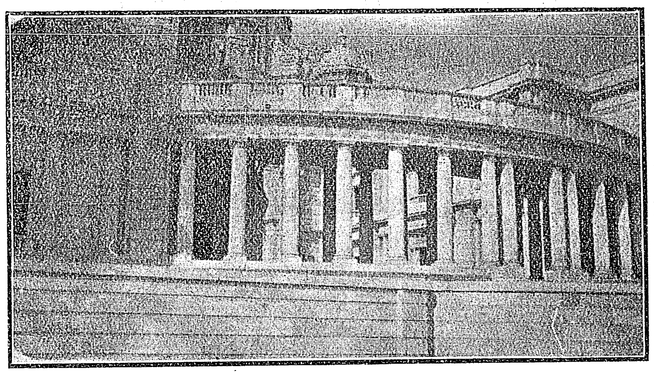

সৌধের পূর্ব্বদিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারান্দা

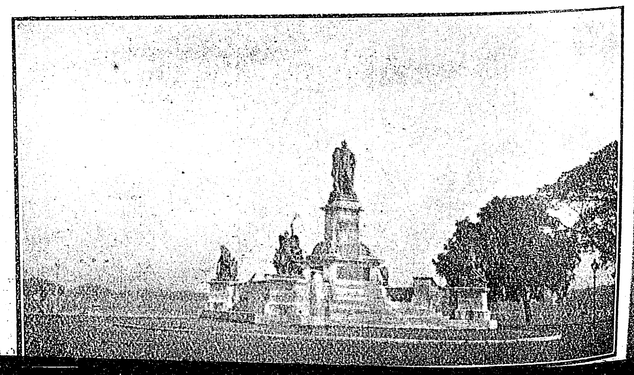

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ডিম্ব-রহস্য

মানুষের দৃষ্টি এতদিন যে রহস্য ভেদ করতে অক্ষম ছিল, চলচ্চিত্রের কল্যাণে আজ সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আজ সে ডিম্বের অভ্যন্তরে প্রাণী জীবনের প্রথম সঞ্চার থেকে ধীরে ধীরে তার পরিপুষ্টি ও ক্রম-পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হ'য়েছে। রোগের বীজাণু যা অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না তা যে কেমন ক'রে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে ক্রমে পরিপুষ্টি ও বিস্তার লাভ করে। সে রহস্যও আজ চলচ্চিত্র



অধ্যাপক হার্স তাঁর স্বনির্ম্মিত ক্যামেরায় ডিম্ব-রহস্য উদ্ঘাটন ক'রছেন

খুব্‌রি কাটা ডিম — দশদিন পরের অবস্থা — ডিম ফেটেছে

(এই বোঝা অংশের ভিতর দিয়ে ডিম্বের আভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্র তোলা হয়।)

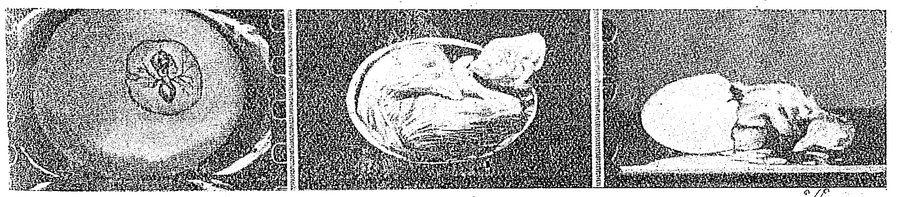

ডিম্বের মধ্যস্থ ভ্রূণ (বয়স মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা।) — ডিম ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে (এখনও খাড়া হ'তে পারে নি) — কুড়ি দিন পরের অবস্থা (ডিমের আবরণ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসবার পূর্ব্বাবস্থা)

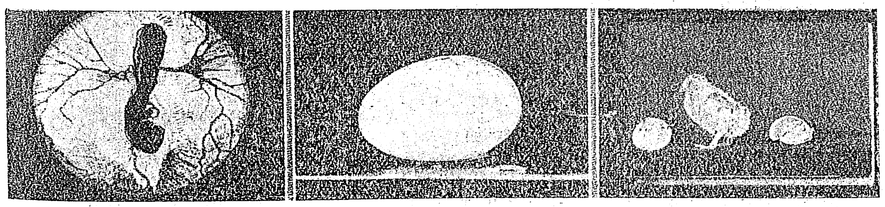

ভ্রূণের বৃদ্ধি (আড়াই দিনে) — ডিমের গায়ে ঠোকর মেরেছে — ডিমজাত সদ্য-শিশু

লোক-চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ ক'রে ধরেছে। আমেরিকার প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত চার্লস্ এফ্ হার্ম ছয় বৎসরের ক্রমাগত চেষ্টায় এমন একটি চল-চ্চিত্র-গ্রহণোপযোগী ক্যামেরা তৈরি করেছেন যে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে আজ মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর এই যে সব ব্যাপার, তাকেও দ্রষ্টব্য ক'রে তোলা যাচ্ছে। ডিম্বস্থ ভ্রূণ কেমন ক'রে

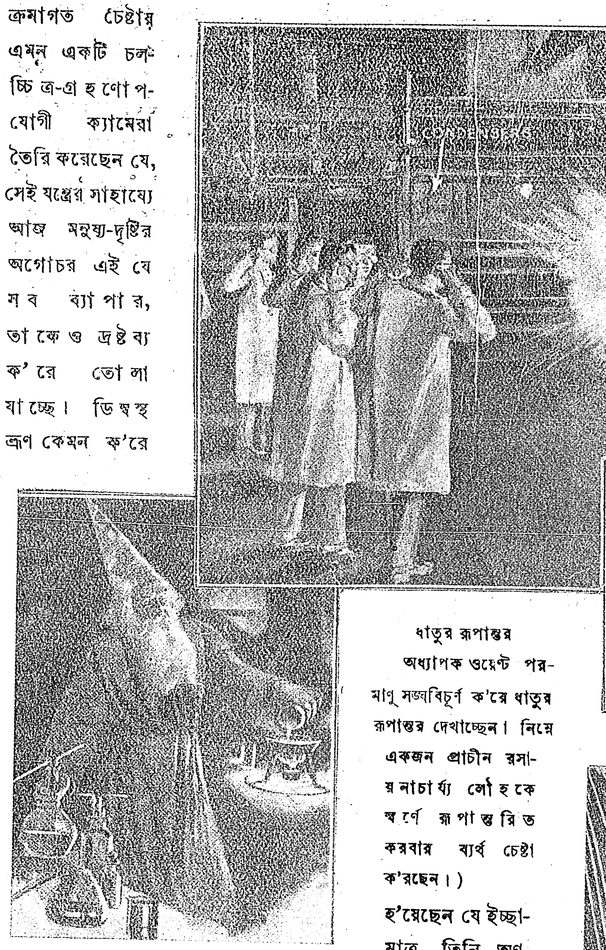

ধীরে ধীরে জীবাকারে রূপান্তরিত হয় অধ্যাপক হার্মের গৃহীত সেই চিত্রের কয়েকখানি এখানে মুদ্রিত হ'য়েছে।

ধাতুর রূপান্তর

অধ্যাপক ওয়েণ্ট পরমাণু সঙ্ঘবিচূর্ণ ক'রে ধাতুর রূপান্তর দেখাচ্ছেন। নিম্নে একজন প্রাচীন রসায়নাচার্য্য লৌহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রছেন।)

পরমাণুর পরাভব

কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গেছল' যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাচার্য্য অধ্যাপক জিরাল্ড্ ওয়েণ্ট্ না কি ধাতুর রূপান্তর ঘটাতে সমর্থ হ'য়েছেন। ব্যাপারটা কি, অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল যে, পরমাণুতত্ত্বে তিনি এতদূর সিদ্ধ হ'য়েছেন যে ইচ্ছামাত্র তিনি অণু-পরমাণুর সঙ্ঘকে চূর্ণ ক'রে পদার্থ-নির্ব্বিশেষে তাহার রূপের পরিবর্ত্তন সাধন ক'রতে পারছেন! তিনি বলেছেন যে, এই

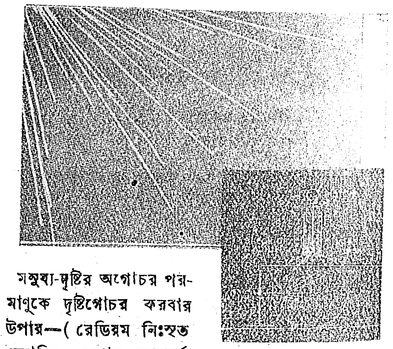

মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর পরমাণুকে দৃষ্টিগোচর করবার উপায়—(রেডিয়ম নিঃসৃত জ্যোতিঃ রেখার সংস্পর্শে এলে গ্যাসের মধ্যস্থ পরমাণুগুলিতে তাড়িত শক্তি সঞ্চারিত হ'য়ে পরমাণু সঙ্ঘের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই সময় উহা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকেও দৃষ্টিগোচর হ'তে পারে

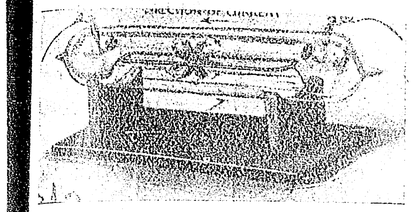

তাড়িত-প্রবাহের প্রকৃত রূপ

(তাড়িত-প্রবাহ যে 'তেজাণুর' (Elections) স্রোত ভিন্ন অন্য কিছুই নয় এই যন্ত্রের সাহায্যে সেটা সুস্পষ্ট জানতে পারা যায়।)

পরমাণুর শক্তি যে দিন মানুষের আয়ত্ত হবে, সেদিন তার অসাধ্য কাজ আর কিছুই থাকবে না। সেদিন জাহাজ ও রেল চালাবার জন্য কয়লার মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হবে না। ইঞ্জিনের জন্য তেলের প্রয়োজন হবে না। তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করা তো কোন্ ছার্, শিসককে সুবর্ণে রূপান্তরিত ক'রতে পারা যাবে।

পরমাণু বা atom ব'লতে এমন কোনও ক্ষুদ্রতম পদার্থ বোঝায় যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবীক্ষণের সাহায্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। হাজার বৎসর আগে ভারতীয় ঋষিরা ব'লে গেছলেন যে জগতের সমস্ত পদার্থ—জলে, স্থলে, শূন্যে, কি স্থূল, কি বাষ্পীয়, কি বায়বীয়, সমস্তই এই অণু-পরমাণুর সমষ্টি মাত্র; তাই ঈশ্বরকে কল্পনা করবার সময়ও

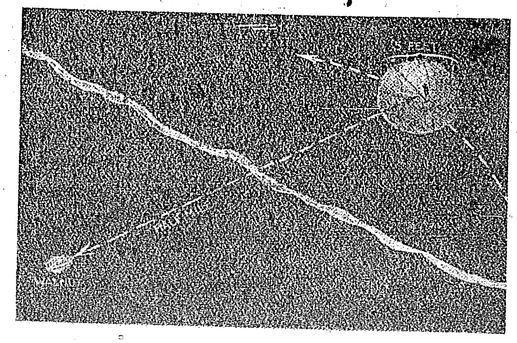

পরমাণু সঙ্ঘের প্রতিকৃতি

(সৌর-জগতের গতির মতো প্রত্যেক পরমাণুকে বেষ্টন করে তেজাণুর দল নিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ ক'রছে! কিন্তু সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের তুলনায় এই অণুপরমাণুর জগৎ এত ক্ষুদ্রতম যে একটী কুলের আঁটির মত পরমাণুর কেন্দ্র থেকে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ তেজাণুর পরিধির দূরত্ব যদি আধমাইলও কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়—তাহ'লে প্রত্যেক 'তেজাণুর ব্যাসের পরিমাপ পাঁচ ফুটের বেশী হয় না।)

তাঁরা বলেছিলেন তিনি "অনয়োরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্।" এই পরমাণুর আকৃতি এত ক্ষুদ্র যে, মনে হয় একে আর ভাগ করা যায় না। কোনও একটা জিনিসকে ক্রমাগত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ক'রতে করতে যেমন শেষে এমন অবস্থায় এসে থামতে হয় যে, তখন আর তার কোনও টুক্‌রোটাই ভাগ করতে পারা সম্ভব বা সাধ্যপর থাকে

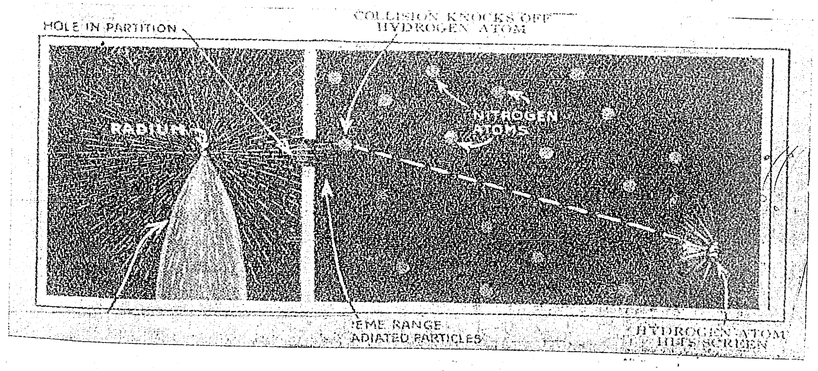

পরমাণুর সংঘর্ষ

(সার্ আর্ণেষ্ট রদারফার্ড দেখিয়েছেন যে, সূচ্যগ্রে অবস্থিত রেডিয়মের বিন্দু থেকে যে জ্যোতিকণা নিয়ত বিকীর্ণ হয়, তাকে যদি নাইট্রোজেন বাষ্পের সংস্পর্শে আনা যায় তাহ'লে রেডিয়ম নিঃসৃত জ্যোতিঃ পরমাণুর সঙ্গে নাইট্রোজেন পরমাণুর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষের ফলে উদ্‌যানপরমাণু সকল স্থানচ্যুত হ'য়ে যদি পর্পটি খর্পরের (Zinc Sulphid) উপরে ঠিকরে এসে লাগে, তাহ'লে সেই পর্পটি খর্পরের গায়ে অনেকগুলি অনলদীপ্তি বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠতে দেখা যায়।)

না ; এ-ও যেন অনেকটা সেই রকম ! আজ রেডিয়ম ও এক্সরে প্রভৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশশতাব্দীর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরাও সেই প্রাচীন অণু-পরমাণুর মধ্যেই এসে ঠেকেছেন। রেডিয়মের অসাধারণ শক্তি যা অবিরাম ব্যয় হ'য়ে যাচ্ছে তথাপি দু'হাজার বৎসরের মধ্যে একটুও ক্ষয় বা হ্রাস হবার সম্ভাবনা নেই—সে আজ পরমাণুর প্রবল পরাক্রমের দিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সার আর্ণেষ্ট রদারফোর্ডই সর্ব্বপ্রথম এই পরমাণুর শক্তি ও প্রকৃতির পরিচয় প্রকাশ ক'রেছিলেন। তিনি তাঁর বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, পরমাণুর সঙ্ঘকে বিচূর্ণ ক'রে তার শক্তি মানুষের বহু প্রয়োজনীয় কাজে বিনিয়োগ ক'রতে পারা যায়।

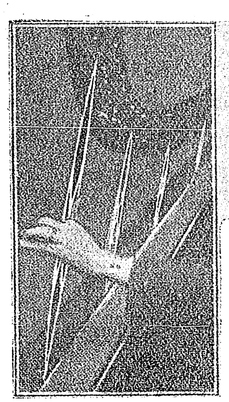

বেসুরের রূপ

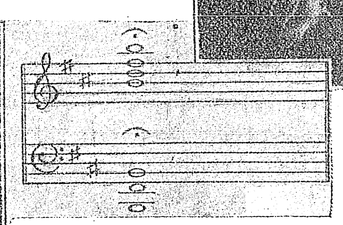

রূপ-রেখা ও সুর-সঙ্কেত

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই অণু-পরমাণু ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করছে। এই পরমাণু-সঙ্ঘের গতি ঠিক সৌর-লোকের গতির মতই চক্রাকার। প্রত্যেক পরমাণুটি মুখ্য তাড়িত শক্তির এক একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা এবং তার চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে আবার গৌণ তাড়িত-শক্তিসম্পন্ন কতকগুলি 'তেজাণু' Electrons নিয়ত ঘূর্ণ্যমান। প্রত্যেক পরমাণুর তুলনায় এক একটি 'তেজাণুর' ব্যাসের পরিমাণ মাত্র তার এক-লক্ষাংশের সমান ; যেমন একটি পরমাণুর ব্যাসের পরিমাণ যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে একশত ফুট, তাহ'লে সেই পরমাণুর বেষ্টনী-মধ্যস্থ এক একটি তেজাণুর ব্যাসের পরিমাণ হবে এক ইঞ্চির একশতাংশ মাত্র ! পড় বড় বিরাট গ্রহ উপগ্রহের ব্যাপার অবগত হ'য়ে আমরা যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ি, ততোধিক বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয় এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অথচ অসীম শক্তি-সম্পন্ন অণু-পরমাণুর বিবরণ জেনে !

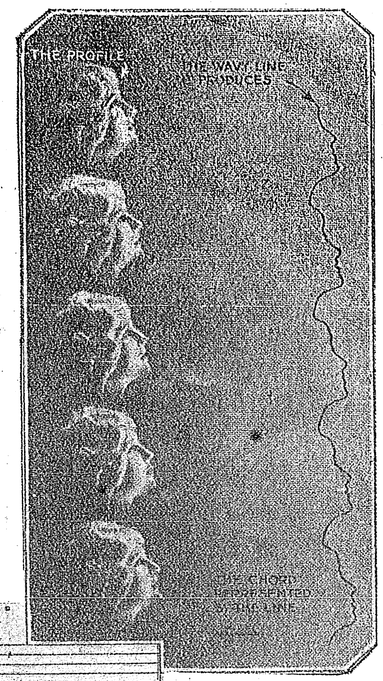

রূপের সুর

প্রত্যেক রূপসীর সুন্দর মুখের যে সুশ্রী ছাঁদটি, ঠিক তার অনুরূপ একটি সুর যে সঙ্গীত-লোকে নিয়ত ঝঙ্কৃত হ'চ্ছে, এই আশ্চর্য্য সন্ধান আজ আমাদের জানিয়েছেন অধ্যাপক ডেটন্ মিলার। তিনি ওহিয়োর ক্লেভল্যাণ্ড বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে শব্দতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন। তিনি একটি সুঠাম তরুণীর সুন্দর মুখের লীলায়িত রেখাগুলি পিয়ানোর সুরে বাজিয়ে দেখিয়েছেন যে, সে রূপের মধ্যে কি মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হ'চ্ছে। এ ব্যাপা-

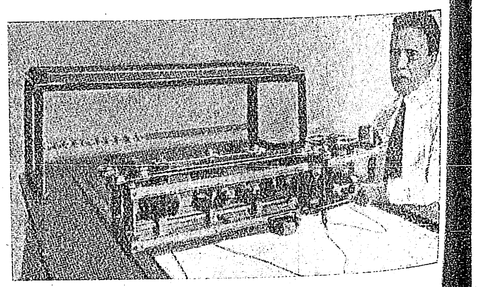

অধ্যাপক মিলার ও তাঁর-'সুরমন্থন'-যন্ত্র

রের মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই বা গোঁজামিল নেই, সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রের হিসাব অনুসারে তিনি সুন্দরী যুবতীর সুচারু মুখশ্রীর যে স্বরলিপি তৈরি করেছেন, তার প্রত্যেক রেখাটি এক অপূর্ব্ব সুর-সঙ্কেত জানিয়ে দিয়েছে ! রমণীর অমনীয় রূপ কেবলমাত্র নয়নানন্দকর নয় ; তার মধ্যে যে সঙ্গীতের সুরটি নিয়ত ধ্বনিত হ'চ্ছে, সেই সুর পুরুষের চিত্তকে মন্ত্র-শান্ত ভুজঙ্গের মতো আত্মহারা ক'রে দেয়। সঙ্গীত বেসুরে বাজলে যেমন তা কর্ণকে পীড়া দেয় এবং সে গান কারুরই প্রাণ পরিতৃপ্ত ক'রতে পারে না,—অধ্যাপক ডেটন্ মিলার প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, ঠিক তেমনি কুরূপ। নারীর কুৎসিত

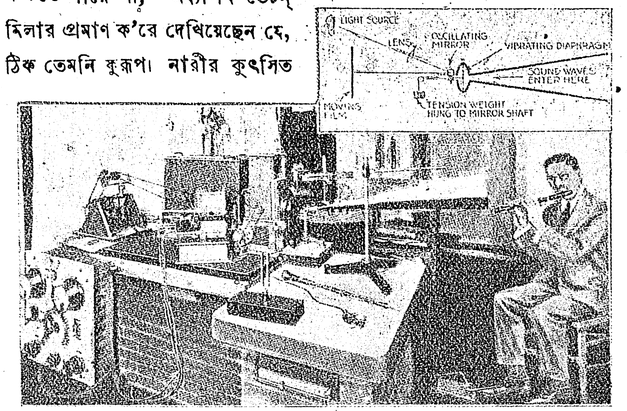

বাঁশীর সুর—(অধ্যাপক মিলার বাঁশীর সুরটিকে তাঁর যন্ত্রের মধ্যে ধ'রে তার রূপ সন্দর্শনে প্রয়াসী হ'য়েছেন।)

মুখের বিশ্রী রেখা অত্যন্ত বেসুরে বাজে, আর সেই জন্যই কোনও লোক রূপহীনা স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। মিলার সাহেব এই রূপের সুর আবিষ্কার ক'রে এখন সুরের রূপটিকে ধরবার চেষ্টা ক'রছেন। বাঁশী বা বেহালার মারফৎ যে সব বিখ্যাত সুর শ্রোতাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে এবং তাদের হৃদয় মুগ্ধ ক'রে দেয়, সেই সুরের রেখা কোন মোহিনীর সুন্দর মুখের সমতুল, তিনি আজ সেই সন্ধানে নিযুক্ত আছেন।

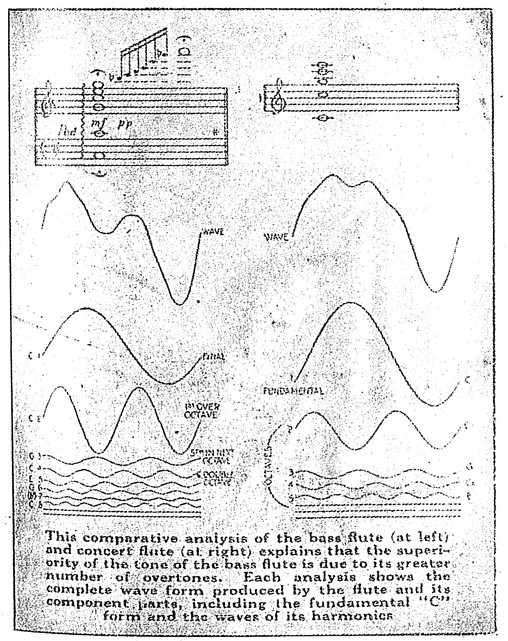

This comparative analysis of the bass flute (at left) and concert flute (at right) explains that the superiority of the tone of the bass flute is due to its greater number of overtones. Each analysis shows the complete wave form produced by the flute and its component parts, including the fundamental "C" form and the waves of its harmonics

বাঁশরী-বনাম-মুরলী---[বাঁশরী (Bass-Flute) ও মুরলী (concert-Flute) উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ'লে দেখা যাবে যে বাঁশরীর সুরের অন্তরালে যে রূপসীর কলকণ্ঠ শোনা যায়, মুরলীর সুরপুরের সুন্দরীর চেয়ে সে রূপবতী। উভয় সুরের রূপরেখার পার্থক্য থেকে অধ্যাপক মিলার এই অনুমান করেন।]

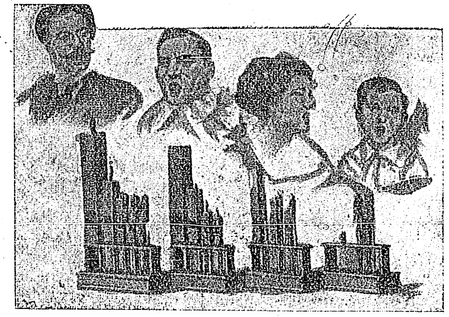

সুরের রূপ

(চারটি বিভিন্ন সুর যে চার রকম গলার পরিচয় দিয়েছে, এখানে তাদের রূপের পরিকল্পনা করা হ'য়েছে।)

অবসরের প্রয়োজনীয়তা

বড় বড় চিকিৎসকেরা এতদিন যে তত্ত্বটা জানবার জন্য ব্যগ্র হ'য়েছিলেন, বিজ্ঞান আজ তাঁদের সে-তত্ত্বের সন্ধান ব'লে দিয়েছে। পরিশ্রান্ত মানুষের ক্লান্তির একটা সঠিক হিসাব এবং যে কোন লোকের শারীরিক সামর্থ্যের স্বরূপ

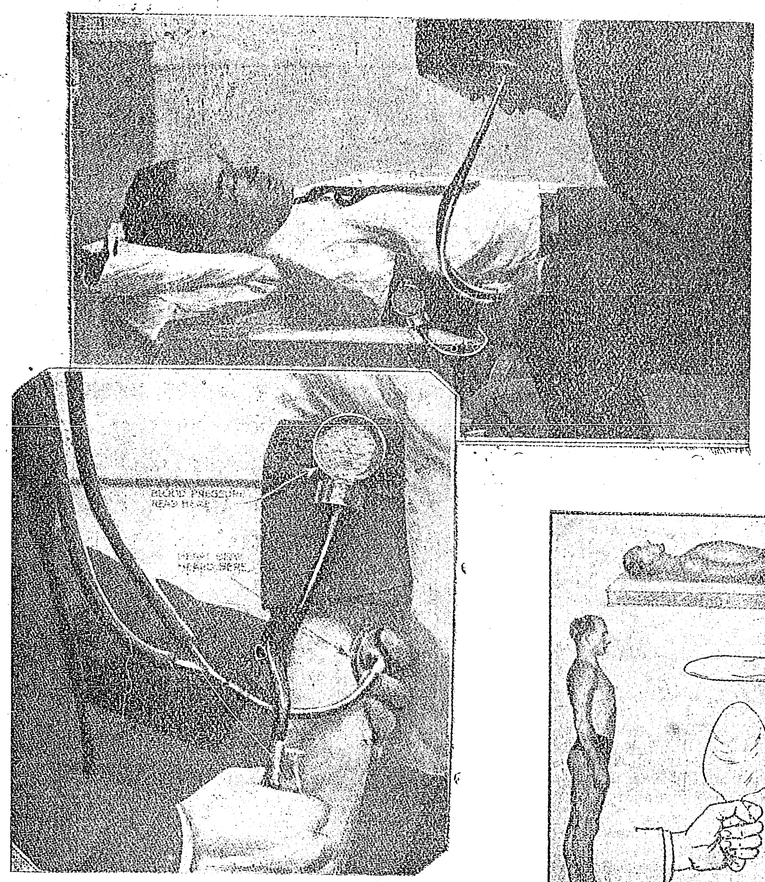

ক্লান্তির পরিমাণ পরীক্ষা

অবস্থা আজ পরীক্ষা করবামাত্র জান্‌তে পারা যাবে। এ তত্ত্বটি এতদিন মানুষের জ্ঞানের অনধিগম্য ছিল। এখন যে কোনও চিকিৎসক একজন লোককে পরীক্ষা ক'রে ব'লে দিতে পারবেন যে তার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা কি রকম, তার দেহ-যন্ত্র কতটা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে; তার অবসরের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং যদি থাকে তবে সে কতদিনের জন্য এবং কেন সে প্রয়োজন। ব্যাপারটা খুব জটিল নয়। একজন লোক সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি তার দেহের শোণিত-প্রবাহকে যখন নিচের দিকে টেনে নিয়ে আস্‌তে চায়, তখন সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে মানুষের শারীরিক সামর্থ্য যে বাধা দিতে থাকে, সেই বাধার জোরের একটা সঠিক পরিমাণ জান্‌তে পারলেই সে লোকের মস্তিষ্কের ও মাংসপেশীর ক্ষমতার পরিচয়ও পাওয়া যায় এবং তার দেহের ক্লান্তির অবস্থাও অবগত হওয়া যায়। দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার এই গোপন সন্ধান জান্‌তে পারার ফলে কুলী, মজুর, কেরাণী, শিক্ষক

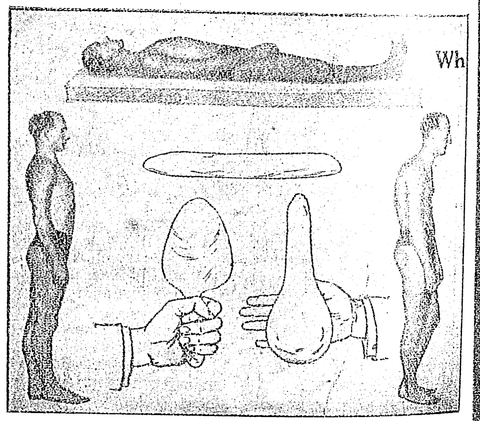

কুব্জতার কারণ

(শায়িত অবস্থায় শরীরের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে সমানভাবে প্রবাহিত হয়। দণ্ডায়মান অবস্থায় শোণিত-প্রবাহ নিম্নাভিমুখী হয় বটে, কিন্তু সুস্থ লোকের সবল স্নায়ু তাকে স্বস্থানে আট্‌কে রাখে। আর ক্লান্ত লোকের শ্রান্ত স্নায়ু পেশী তা' ক'রতে অক্ষম হয় ব'লে পরিশ্রান্তের দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন একটি জলপূর্ণ থলের তলদেশ চেপে ধরা বা ছেড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তে দেখান হ'য়েছে।)

ছাত্র, খেলওয়াড়, পালওয়ান প্রভৃতি যারাই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করে, তাদের

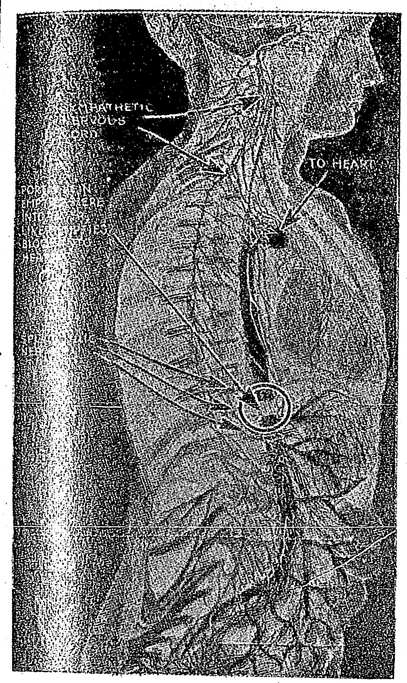

স্নায়ু পেশীর সঙ্গে শোণিত-প্রবাহের সম্পর্ক

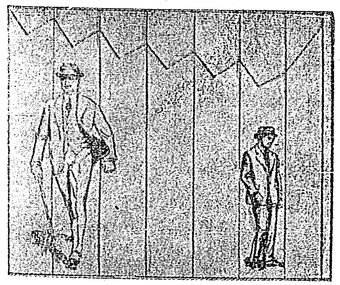

ছুটীর আগের ও ছুটীর পরের অবস্থা

সকলের যোগ্যতার একটা সঠিক সংবাদ জান্‌তে পারা ও জানাতে পারা যায়।

অবসরের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি সেটা সহজেই জান্‌তে পারা যায়—যখনই শরীরের ক্লান্তির হিসাবটা চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে! এই নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়ার ফলে এখন জান্‌তে পারা গেছে যে একজন লোকের শরীর সমস্ত দিনের পরিশ্রমে যে পরিমাণ ক্লান্তি অর্জ্জন ক'রে রাত্রে আট ঘণ্টা নিদ্রা গেলেও তার শরীর ঠিক সেই পরিমাণে সুস্থ হ'য়ে ওঠে না। সমস্ত দিনে যদি কোনও লোকের শারীরিক শক্তির শতকরা দশভাগ ব্যয় হ'য়ে যায় এবং সে যদি ঠিক রাত্রি ন'টার সময় শু'য়ে ভোর পাঁচটায় ওঠে তাহ'লে সেই আট ঘণ্টা বিশ্রাম ও সুনিদ্রার পর তার দেহের ব্যয়িত জীবনী-শক্তির মাত্র শতকরা সাত ভাগ সে

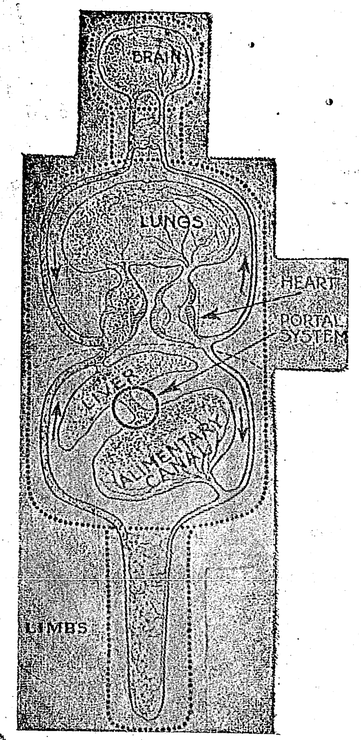

রক্তপ্রবাহের দেহ-পরিক্রমণ

ফিরে পায়। এমনি ক'রে দিনের পর দিন যদি সে শতকরা তিন ভাগ হিসাবে জীবনী শক্তি হারাতে থাকে, তাহ'লে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে প'ড়তে তার আর বেশী বিলম্ব হয় না। কিন্তু সপ্তাহে এক দিন রবিবার কাজকর্ম্ম থেকে অবসর পায় বলে এবং প্রতি শনিবার পরিশ্রমটা অনেকখানি কম ক'রতে হয় বলে, কাজের মানুষরা কোনও রকমে টিঁকে থাকে। যাদের জীবনে বিশ্রাম লাভ করবার অবসর একেবারেই ঘটে ওঠে না, তারা প্রায়ই অকাল-বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

প্রতি রবিবার বিশ্রাম করা ছাড়া, বছরের মধ্যে কিছুদিন ক'রে সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে, কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় পালিয়ে গিয়ে বাস ক'রে আসা উচিত। তাতে সারা বরষের সঞ্চিত শরীরের ক্লান্তি অপনোদিত হ'য়ে দেহ নববলে বলীয়ান হ'য়ে ওঠে! অবসর কালে শুধু

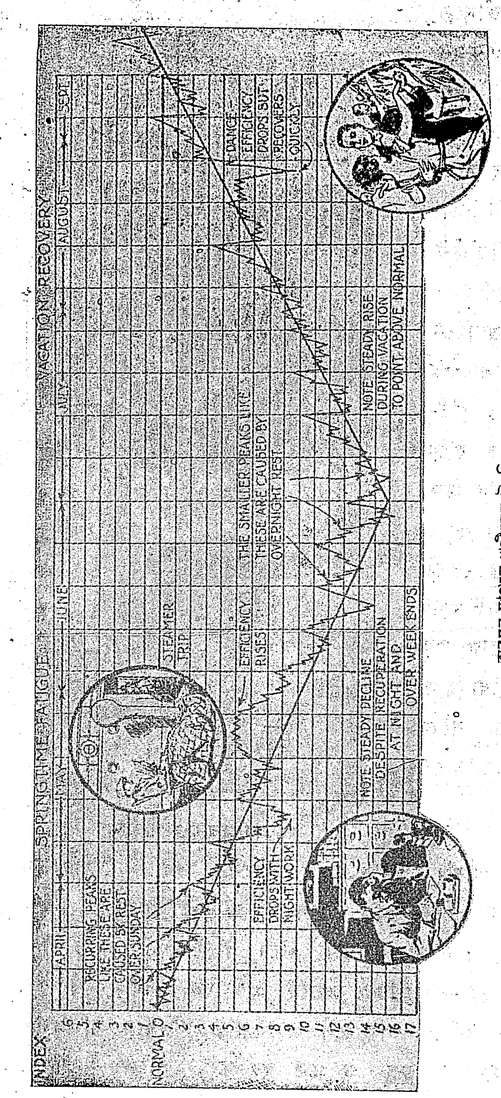

ছুটির ঘাপনে শরীরের উন্নতি

উপর জীবনী-শক্তির তারতম্য সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে। একজন সুস্থ সবল ও সক্ষম লোক যখন সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়; তখন তার শরীরের সমস্ত শোণিত-প্রবাহ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিম্নগামী হবার চেষ্টা করে; কিন্তু সুস্থদেহের সবল স্নায়ু ও সক্ষম পেশী সমূহ সজাগ হ'য়ে উঠে —ক্রমাগত শোণিত-প্রবাহকে সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা থেকে বাধা প্রদান ক'রে। আর শ্রান্ত ও পর্য্যবসিত-শক্তি লোকের স্নায়ু ও পেশীসমূহ এমনিই অবশ হ'য়ে প'ড়ে যে, তারা এরকম সময়ে ঠিক ভাবে তাদের কাজ ক'রতে পারে না; কাজেই তাদের শরীর ক্রমে ভেঙে পড়ে! এই ভাঙনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই অবসরের প্রয়োজন এবং অবসর বিনোদনের আবশ্যকতা।

শব্দহীন পথ

আমাদের এ পাড়ার রাস্তা দিয়ে একখানা গাড়ী গেলে তার ঘড়ঘড়ানী আওয়াজে কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়। কিন্তু সেটা বন্ধ করবার জন্য এখানে কারুরই মাথা ব্যথা ধরে না। সাগর-পারের লোকেরা কিন্তু সে আওয়াজ বরদাস্ত ক'রতে প্রস্তুত নয়। তারা প্রথমতঃ গাড়ীর চাকায় রবার টায়ার এঁটে শব্দ বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে যেটুকু আওয়াজ ক'মল সেটুকুতে তারা খুসী হ'তে পারলে না,

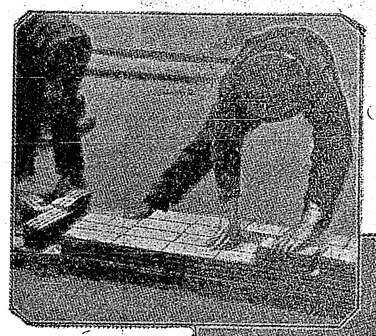

এখন আবার রাজপথে রবারের থান বিছিয়ে পথ চলাচল একেবারে নিঃশব্দ ক'রে ফেলেছে

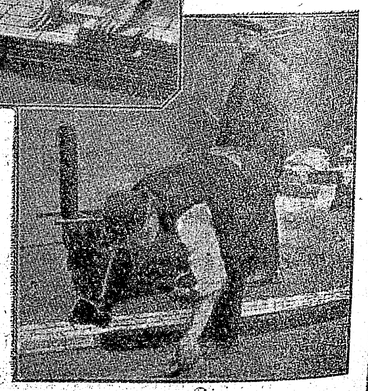

শব্দহীন পথ

চুপচাপ ব'সে থেকে বিশ্রাম করা বা নিদ্রা যাওয়া বিধেয় নয়; নৃত্যগীত হাস্য কৌতুক খেলা ধূলা প্রভৃতি—চিত্ত-প্রফুল্লকর আমোদ প্রমোদে কালযাপন করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরকম সব আনন্দজনক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ক্লান্তির মাত্রা এত শীঘ্র এবং এত বেশী বিদূরিত হয় যে, সুদীর্ঘ বিশ্রামেও সে ফল পাওয়া যায় না।

শরীরের মধ্যে শোণিত-প্রবাহের সুনিয়ন্ত্রিত গতির

অদৃশ্য লেখার পাঠোদ্ধার

প্রাচীন পুঁথি-পত্রের অনেক লেখা এমন ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় যে, কিছুতেই আর তা প'ড়্‌তে পারা যায় না। সেই সব মূল্যবান পুরাতন রচনা, ও প্রাচীন দলীল প্রভৃতির পাঠোদ্ধার এবং রাজনৈতিক বা সাধারণ অপরাধীদের ষড়যন্ত্র-ঘটিত গুপ্ত চিঠি-পত্র, যা অদৃশ্য কালীতে লিখে চালান হয়, সেগুলিকে ধরবার সুবিধে হ'বে ব'লে জার্ম্মাণ প্রোফেসার এইচ, কোয়োগেল একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে গাঢ় বেগুনী রংয়ের আলো

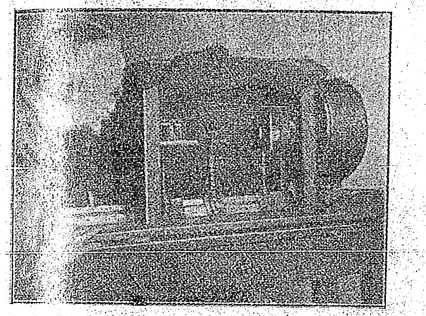

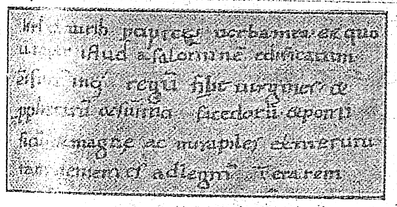

অধ্যাপক এইচ্ কোয়োগেল ও তাঁহার পাঠোদ্ধার যন্ত্র

বিকীর্ণ হ'য়ে যখন অদৃশ্য লিপিখানিকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, তখন গুপ্তলেখার সমস্ত অক্ষর যেন যাদু মন্ত্রে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের মধ্যে সম্প্রতি বিমান-যান নির্ম্মাণ ও খপোত পরিচালনা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হওয়াতে, এত অসংখ্য ছাত্র সেই বিভাগে ভর্ত্তি হ'য়েছে যে, আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট মিঃ কুলীজ স্থির করেছেন যে, সমস্ত ষ্টেটের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বিমান যান সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয় বিশদভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তার বন্দোবস্ত করা হবে। এই নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্ব প্রথম "বেতার বিজ্ঞান" সম্বন্ধে ছেলেদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাতে, আজ আমেরিকায় ঘরে ঘরে বেতারবিদ বালকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কলিকা তা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উকীল আর ডাক্তার আর, কেরাণী তৈরী ক'রেই চ'লেছে

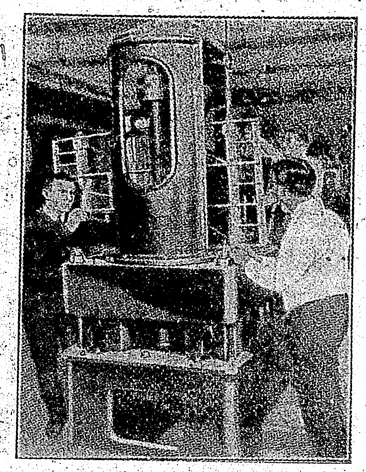

ছাত্রেরা খপোত-বিদ্যা শিখ্‌ছে

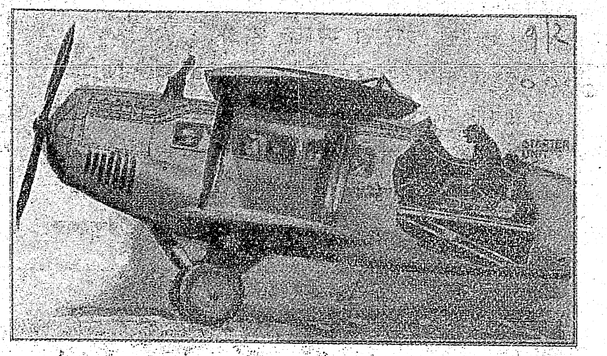

ছাত্রের তৈরি খপোত

সুচালনোপযোগী হল

এ দেশে অনেক সময় দুঃস্থ কৃষককে তার হালের বলদ বেচে অকর্ম্মণ্য ও দুস্কৃত জমীদারের খাজনা বুঝিয়ে দিতে হয়; সুতরাং পরের মরশুমে সে আর ভাল ক'রে জমীতে চাষ দিতে পারে না, এবং অনাহারে মরে। মানুষ যাতে বিনা বলদে কেবলমাত্র নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা অনায়াসে তার ক্ষেতে হল-চালনা ক'রতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণরা একরকম নূতন ধরণের লাঙল নির্ম্মাণ করেছে! এই লাঙলের সাহায্যে একজন লোক অল্প পরিশ্রমে অনেকখানি জমী সত্বর চ'ষে ফেল্‌তে পারবে। কেবলমাত্র হাতের ও পায়ের ঈষৎ চাপে এই লাঙলে কাজ হয়।



স্বচালিত হ'ল

আলোর চারে মাছ ধরা

ভূমধ্য সাগরের মৎস্যজীবীরা তাদের জেলে-ডিঙীতে এক একটি বিশেষ ধরণের ছ'পেশে লণ্ঠন রেখে দেয়। সেই লণ্ঠনের আলোয় গভীর রাত্রে মাছের চার ক'রে তারা অসংখ্য মাছ ধরে আনে। দীপশিখার প্রতি পতঙ্গের আকর্ষণের মতো আলোক-রশ্মির উপর মৎস্যকুলের এমনই একটা প্রবল মোহ আছে যে, দিনের আলোয় যেসব মাছের টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, রাত্রের লণ্ঠনের আলো তাদের অজ্ঞাতসারে জেলের হাতে নিশ্চয় মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে আসে। জীবতত্ত্ববিদেরাও মাছের এই দুর্ব্বলতার সাহায্য নিয়ে রাত্রে জলের মধ্যে আলো জেলে তাদের গতিবিধি ও আকৃতি প্রকৃতির পরীক্ষা করেন।

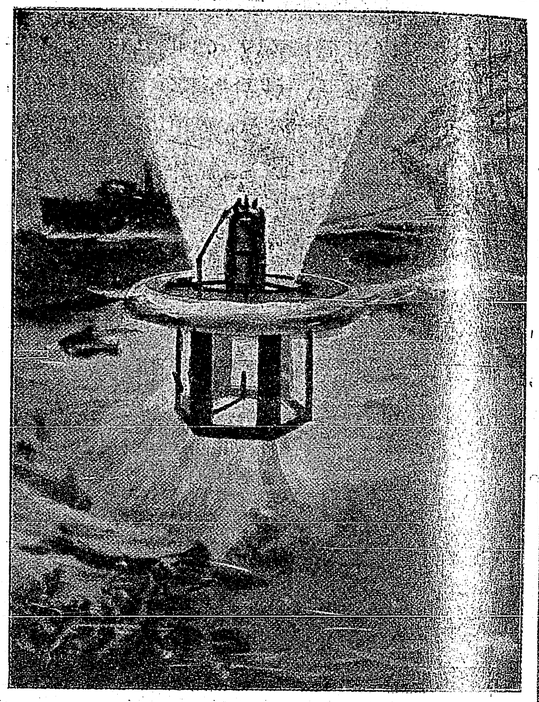

আলোর চারে মাছ ধরা

দেশালাই পরীক্ষা

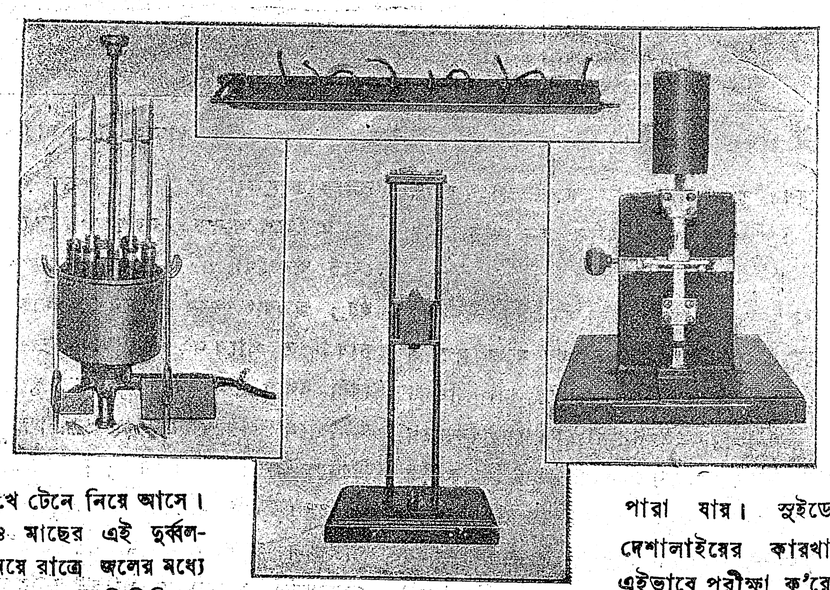

দেশালাই পরীক্ষা

"Safety match" মার্কা যে সব দেশালাই আমরা কিনি, সেগুলি বাস্তবিকই নিরাপদ কি না, সেগুলি নিম্নলিখিত কয়প্রকার পরীক্ষায় জানতে পারা যায়। সুইডেনের প্রত্যেক দেশালাইয়ের কারখানায় আগে এইভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে, তবে সে দেশালাইয়ের বাক্সের উপর "Safety" মার্কা দেওয়া হয়।

স্বদেশী দেশালাই-ওয়ালাদেরও এ'টি করা উচিত। প্রথমে এক পাত্র তেলের মধ্যে গোটা কয়েক দেশালাইয়ের কাঠি রেখে আগুনের উত্তাপে তেলটা গরম করা হয়। তেলটা যে পরিমাণ গরম হ'লে দেশালাইয়ের কাঠিগুলি ধ'রে যাওয়া উচিত তার আগেই যদি তারা জ্ব'লে ওঠে তবে সে দেশালাই কেনা নিরাপদ নয়। একটী পাতলা কাষ্ঠের উপর গোটা কতক ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের মধ্যে দেশালাইয়ের কাঠি সোজা ভাবে গুঁজে দিয়ে জেলে দেখবে যদি সেগুলি শেষ পর্য্যন্ত ঠিক জ্বলে, একটীরও মাথা ভেঙ্গে না পড়ে, তাহলে সে দেশালাই নিরাপদ। আর একরকম পরীক্ষা হ'চ্ছে ঈষৎ ভারি জিনিষের সংঘর্ষে যদি দেশালাইয়ের কাঠি ভেঙে যায় বা জ্বলে ওঠে তবে সে নিরাপদ নয়।

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-ই, এম-এ-আই-ও-ই

আমি পুনরায় সাধারণের নিকট আর একটী বাড়ীর চিত্র ও নির্ম্মাণের খরচ প্রকাশ করিলাম। আশা করি, পূর্ব্ব-পূর্ব্ববারের ন্যায় ইহাও সাধারণের উপকারে আসিবে। এইরূপ ধরণে বাড়ীর বিশেষত্ব এই যে, ঘরগুলির চারিদিক হইতে আলো বাতাস আসিতে পারে—সব ঘরগুলিই খুব airy ও well-lighted.

এইরূপ বাড়ী তৈয়ার করিতে মোট ২ কাঠা ৭ ছটাক জমি আবশ্যক। এই অল্প জমিতে অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, ঘরগুলি অতি ছোট হইবে। কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যেক তলায় ৪টা ঘর ও একটী স্নানের ঘর ও একটী পায়খানা থাকিবে। ২টা বড় ঘর ১৪ ফিট+৯ ফিট ও ২টা ছোট ঘর ১২ ফিট+৯ ফিট ও স্নানের ঘর ৯ ফুট+৫ ফিট করিয়া থাকিবে। ত্রিতলের দুটী ঘর আরও একটু ছোট হইবে।

এরূপ প্রবন্ধ লেখার আমার উদ্দেশ্য এই যে, কত কম জমির মধ্যে ম্যুনিসিপ্যালিটীর সমস্ত আইন বজায় রাখিয়া কত বড় ঘর হইতে পারে এবং জনসাধারণে কত অল্প জমিতে নিজের মনোমত বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারেন।

এইরূপ বাড়ীই শতকরা ৯০ জনের উপযোগী হইবে। এই ধরণের বাড়ী করিতে হইলে, কেবল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

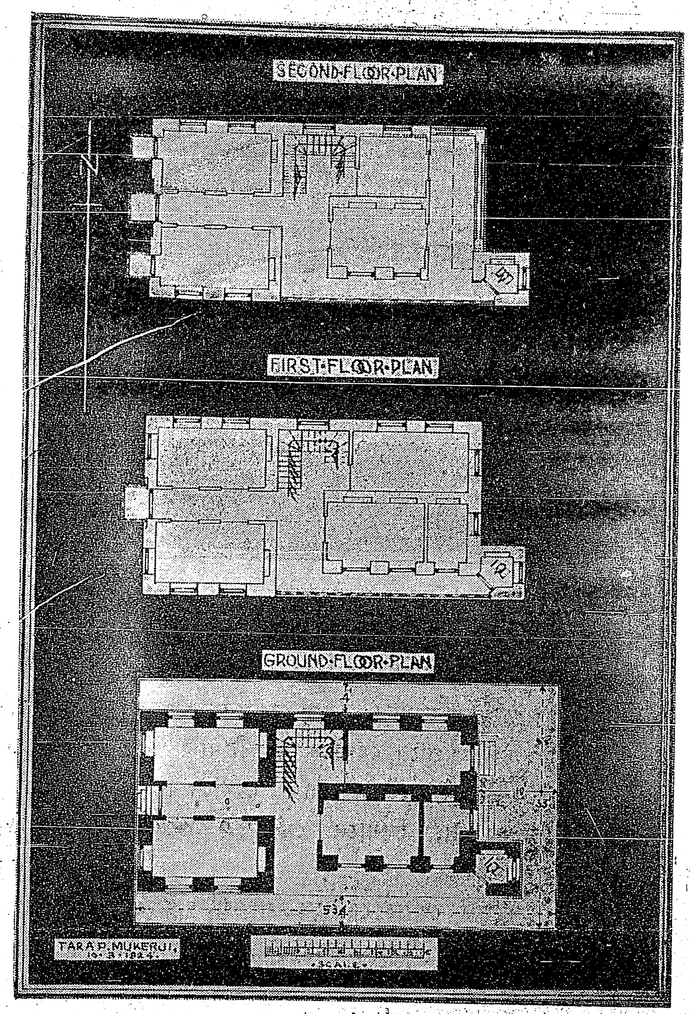

বাড়ীর নক্‌সা

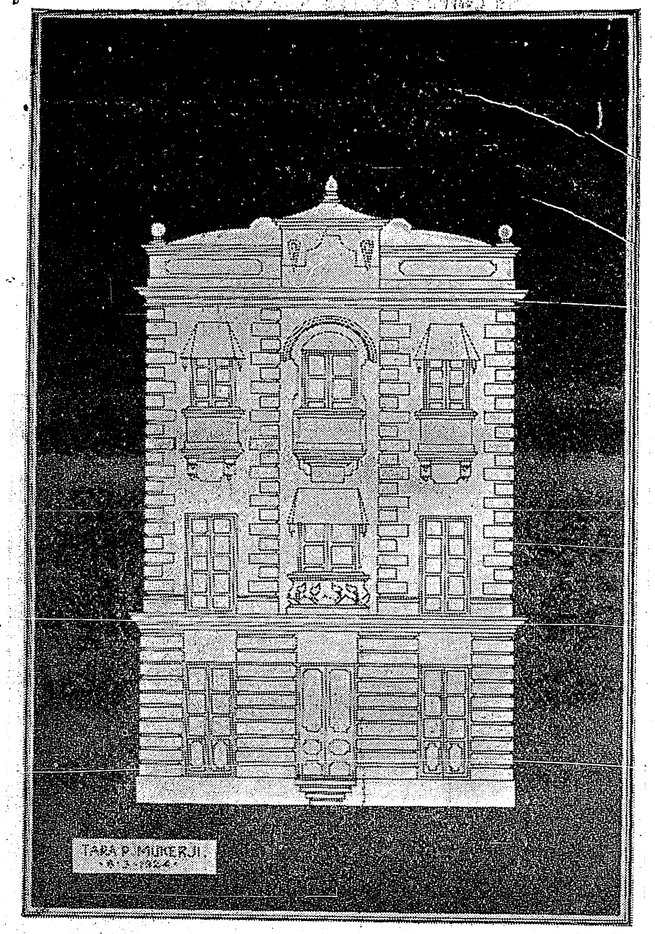

নূতন ধরণের বাড়ী

জমির পরিমাণ অধিক হইলে তাহাতে বড় বড় বাড়ীঘর তৈয়ার করা অতি সহজ কার্য্য। কিম্বা যেখানে চুণ শুরকী থোয়াতে কাজ চলিতে পারে, সেখানে বিলাতী মাটী দিয়া থোয়া পেটাই করাও অতি সোজা কথা। যেখানে যতটুকু না হইলে চলিবে না, সেখানে সেইটুকুই দেওয়াই এঞ্জিনিয়ারের কার্য্য।

আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বনিয়াদ Pilingএর উপর আবার Reinforced concrete দিতেছে। যেখানে ১০।৫ কড়ি হইলেই চলে, সেখানে ১৫।৫ দেওয়া হয়। এসব অনর্থক পয়সা নষ্ট মাত্র। আবার অনেক সময় যে ছাদে ১০।৫ কড়ির দরকার, সেখানে ৬।৩ দেওয়া হয়; ফলে মুসলমান Orphanageএর দশা ঘটে।

গৃহনির্ম্মাণ একটী শিল্প। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা ও অধ্যয়নের আবশ্যক। অন্যান্য সভ্যদেশে এ বিষয়ে গভীর গবেষণা চলিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এ বিষয়ে কেহই মনোযোগ দেন না। আমাদের গৃহ-সমস্যা যতই বাড়িতেছে, ততই এই শিল্প বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকগুলি অনভিজ্ঞ ও ব্যবসাদার লোক কেবল সাধারণকে ঠকাইয়া তাহাদের ব্যবসায় চালাইতেছে।

কলিকাতায় এখন Improvement Trustএর যেরূপ হিড়িক পড়িয়াছে, তাহাতে বেশীর ভাগ লোককেই গৃহ-শূন্য হইতে হইতেছে। পৈত্রিক ভদ্রাসনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যে যৎসামান্য টাকা পাইতেছেন, তাহাতে ১।।০ কাটা হইতে বড় জোর ৩ কাটা পর্য্যন্ত জমি হইতে পারে। তাহারই উপর আবার ম্যুনিসিপ্যালিটীর আইন বাঁচাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এদিকে আবার আমাদের সংসারে লোকের অভাব নাই, তদুপযুক্ত সংখ্যক ঘরও চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকে অনভিজ্ঞ ও অনুপযুক্ত এঞ্জিনিয়ার ও Draftsmanএর হাতে পড়িয়া উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে পারিতেছেন না। এই সব অসুবিধা ও অনর্থক অর্থ-নষ্ট নিরাকরণের আশায় আমি কতকগুলি গৃহের Plan ও খরচের হিসাব দিতেছি; এবং মাঝে মাঝে দিব এবং এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করিব।

খরচের তালিকা

		পরিমাণ	দর	হিঃ	খরচ
১।	মাটী কাটাই ও ভরাই	৫৫০৪ ফুট	১০৲	শতকরা	৫৫৲
২।	কঙ্ক্রীট পেটাই	১৪৫০ ফুট	৪০৲	”	৫৮৲
৩।	সুরকীর গাঁথনি—বনিয়াদ ও পোতা পর্য্যন্ত	২১৮৪ ফুট	৪৫৲	”	৯৮৩৲
৪।	Damp-Proof Course	৩০০ ফুট	২২৲	”	৬৬৲
৫।	একতলার গাঁথনি	২৯৩৪ ফুট	৫০৲	”	১৪৬৭৲
৬।	দোতলার গাঁথনি	১৯৮৩	৪২৲	”	১০৩১৲
৭।	তিনতলার গাঁথনি	১৯৮৩	৫৪৲	”	১০৭০৲
৮।	ভিতরের বালিকাম মায় চূণের কাজ ও চূণের পোঁচড়া	১১৬৫৫	১০½	”	১২২৪৲
৯।	বাহিরে কলিপলস্তারা মায় চূণের পোঁচড়া	২৯৮৮	৭৲	”	২১০৲
১০।	দরজা জানালার ফ্রেম	৯৩	৬½ ফিট	”	৬০৬৲
১১।	১½″ সেগুনের পেনেল দরজা	৮৯৭	৮½	”	১৩৫০৲
১২।	১½″ সেগুনের সার্সি	৪৪৪	১।০	”	৫৫৫৲
১৩।	১১″ সেগুনের খড়খড়ি	৪৪৪ স্কোয়ার ফুট	১৸০ হিঃ	”	৭৭৭৲
১৪।	লোহার কড়ি ও টি	৮১ হন্দর	১০৲	”	৮১০৲
১৫।	জানালা, দরজা মায় কড়িটি রং করাই	৫০০০	৫।।০	”	২৭৫৲
১৬।	মোল্ডিং				৩০০
১৭।	সিঁড়ি				৬০০
১৮।	একতলার মেজে	৮৩৫	২৮৲	”	২৩৪৲
১৯।	ঐ ½ সিমেণ্ট পলস্তারা	৮৩৫	১২৲	”	১০০৲
২০।	দোতালার মেজে	৮৩৫	৫০৲	”	৪১৭৲
২১।	ঐ ½ সিমেণ্ট পলস্তরা	৮৩৫	১২৲	”	১০০৲
২২।	তিনতলার মেজে	৯৪৭	৬০৲	”	৫৭৮
২৩।	ঐ ½ সিমেণ্ট পলস্তারা	৪৪৭	১২৲	”	১১৪৲
২৪।	তিনতলার জলছাদ	১০৯০ ফুট	৬৫৲	”	৬৫০৲
২৫।	পেরাপেট	১৪০ ফুট	২৲	”	২৮০৲
২৬।	৪″ রেনওয়াটার পাইপ	২৮০ ফুট	১।০	”	৩৫০৲
২৭।	পায়খানা মায় ড্রেন ফিটিং				৫০০৲
					১৪,৭৬০৲

গাঁথনির জন্য চুণ ও শুরকী আবশ্যক। এই চুণ ও শুরকী এরূপ ভাগে মিশান দরকার, যাহাতে মশলা ইটের মধ্যে উত্তমরূপে জমিয়া যায়। সাধারণতঃ তিন ভাগ শুরকীর সহিত এক ভাগ চুণ মিশাইতে হয়। এই শুরকী এক কিম্বা দুই নম্বর নূতন ইট হইতে ভাঙ্গান দরকার যত মিহি হয়। ততই ভাল, শুরকী টাটকা ভাঙ্গাইয়া কাজে লাগাইলে গাঁথনি খুব শক্ত হয়। চুণও কার্য্যের উপর slake করিয়া লইলে সেই চুণে বেশী জোর হয়। এইরূপ ভাবে মশলাতে গাঁথনি করিলে সেই গাঁথনি পাথরের মত শক্ত হইবে।

এইরূপ ভাবে গাঁথনি করা উচিত যাহাতে ইটের জোড় সোজা না পড়ে (break joint) গাঁথনির প্রত্যেক স্তর লেভেল হইবে ও দেওয়ালটী ঠিক ওলনে উঠিবে। এইরূপ ভাবে গাঁথিয়া দরজা জানালার মাথা পর্য্যন্ত হইলে, তার পর খিলান করিতে হইবে। খিলান অনেক রকমের হয়। তবে সাধারণতঃ তিন রকম,—সোজা খিলান, চামচে ও গোল। তন্মধ্যে হাল ক্যাসান মতে সোজা খিলানই বেশী ব্যবহৃত হয়। এই খিলান করিবার সময় অধিক সতর্কতা আবশ্যক। ইটের মধ্যে বেশী মসলা থাকিবে না। এবং মাঝের ২।৩ খানি ইট বিনা মশলায় কেবল ঠুকিয়া বসাইবে। বেশী মশলা দিলেই খিলান ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এই সব হাঙ্গামার জন্যই অনেকে লোহার কড়ি কিম্বা টি ও এঙ্গেল দিয়া দরজা-জানালার মাথা আঁটিয়া দেন। ইহাকে লিনটেল দেওয়া বলে। সোজা খিলান কিম্বা লিনটেলের উপরে একটী করিয়া ২ ইটের গোল খিলান দেওয়া দরকার। এই খিলানটী উপরকার ছাদের দেওয়ালের ভারটী পিল্লার উপর লইয়া যায়। তাহাতে সোজা খিলান কিম্বা লিণ্টের উপর বেশী ভার পড়ে না।

তার পর আবার ছাদ পর্য্যন্ত গাঁথিবে।

ঘরের মেজ হইতে কড়ির থামাল পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১০ফিট হওয়া দরকার। ঘরের লম্বা চওড়া হিসাবে উঁচু করিতে হয়। ঘরের চওড়া অপেক্ষা উঁচা কখনও কম হইবে না।

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(১০)

ধীরে ধীরে আলি মহম্মদ চাঁদনী চকের দিকে চলিল। হোলি উৎসব আসিতেছে; তার পর আজ মুসলমানদের এক পর্ব্বের দিন। চারিদিকে লোক উৎসবে মত্ত। নাদিরের সৈন্যেরা একা বা দুই তিনজন মিলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ ভোগপুরী আজ তাহাদের,—তাহাদের জন্যই ত চারিদিকে উৎসবের আয়োজন। কেহ মদের দোকানে ঢুকিয়া প্রচুর মদ খাইতেছে, কেহ হিন্দুস্থানের খাবার কিরূপ তাহা খাবারের দোকানে ঢুকিয়া চাখিতেছে, কেহ পথের কোন নাগরিকার সহিত রসিকতা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে দাম চাহিতে বা তাহাদের বাধা দিতে কেহই সাহসী হইতেছে না। দিল্লীবাসীরাও তাহাদের সহিত উৎসবে যোগ দিয়াছে। আতরের গন্ধে, সারঙ্গের সুরে, বাইজীর কণ্ঠের মূর্চ্ছনায় জ্যোৎস্নারাত্রি বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আলি চারিদিকে করুণ উৎসবের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। হায়, এই কি উৎসবের সময়! এ অপমানিতা বন্দিনী দিল্লী কি একবার বিদ্রোহিনী হইয়া উঠে না? তাহার বীর সন্তানের দল কি ভোগবিলাসপঙ্কে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে? এ ফাল্গুন জ্যোৎস্নারাত্রি উৎসবেরই সময় বটে; কিন্তু সে কিসের উৎসব? সে মরণোৎসব,—সারঙ্গের ঝঙ্কারে নয়, অসির ঝঞ্ঝনায়,—গানের সুরে নয়, শত্রুর আর্ত্তনাদে,—ফাগের মাতামাতিতে নয়, শত্রুরক্তের প্রবল উচ্ছ্বাসে,—আতরের গন্ধে নয়, মৃতদেহের পচা গন্ধে—সে নিপীড়িতের বিজয়-উৎসব। হায়, যদি কোন মহামন্ত্রবলে সে দিল্লীর

প্রতি ঘরে সকলকে আহ্বান করিতে পারিত,—জাগো, জাগো, এ বিলাসপঙ্ক হতে প্রতিহিংসার রুদ্র অগ্নিশিখায় জাগো, আজ বন্দিনী দিল্লী শত্রুরক্তের জন্য তৃষিত—

সহসা আলি মহম্মদ চমকিয়া উঠিল। দেখিল, তাহার সম্মুখে ভিক্ষুক মির্জ্জা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাহার এক চক্ষু নাচাইয়া বলিল—পালাও, পালাও, নাদির শা' খুন হয়েছে। নাদির শা'কে খুন করেছে! আলি বিস্মিত হইয়া চাহিল। মির্জ্জা অট্টহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—একেবারে নিমখুন—দিল্লীর সিংহাসন সইবে কেন—তার পর ভিক্ষার জন্য হাত পাতিল। মির্জ্জার খবরে খুসি হইয়া আলি তাহাকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। কিন্তু তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়া, সে রসিকতা করিল কি সত্য বলিল, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। চলিতে চলিতে সে মুস্তাফা মিঞার সরাইখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরাইখানায় খুব নাচগান চলিতেছে। এক নর্ত্তকী পদ্ম কি করিয়া পাপড়ির পর পাপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া উঠে, অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহা দেখাইতে দেখাইতে নাচিতেছে, আর ফুলের গান গাহিতেছে। যে সারেঙ্গীবাদক তাহার সহিত সঙ্গত করিতেছে, সে তাহার নাচের প্রতি তালে 'আহা' বলিয়া উঠিতেছে। নূপুরের ধ্বনি রিমঝিম বাজিয়া সমস্ত ঘরকে উতালা করিয়া তুলিয়াছে। সবাই নাচ দেখিতে মুগ্ধ; কিন্তু মুস্তাফা দ্বারের সম্মুখে বসিয়া তাহার সুপরিচিত আলবোলা লইয়া তামাক খাইতেছিল। পাশের ঘর হইতে সুপ্রচুর মদ খাইয়া নাদিরের এক সেনাপতি বাহির হওয়াতে সে একটু ভীত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতিটি সম্মুখে সুন্দরী নটীমূর্ত্তি দেখিয়া একটু বিহ্বল হইয়া নাচের ঘরে প্রবেশ করিল। বাহবা বিবিজান, বলিয়া নটীর দিকে অগ্রসর হইল। নর্ত্তকী নাচ থামাইয়া ভীত হইয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি তাহার হাত ধরিয়া পা দোলাইয়া বলিল—আহা চলুক, থামলে কেন। সেনাপতির পেছন পেছন আরও কয়েকজন সৈনিক ঢুকিয়াছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া ঘরের কেহ সেনাপতিকে বাধা দিতে সাহস করে নাই। সারেঙ্গীবাদক সুরের নেশায় এত তন্ময় ছিল যে, সম্মুখের দৃশ্যটি ভাল করিয়া দেখে নাই। কিন্তু নূপুরধ্বনি থামিতেই সে চমকিয়া চাহিল; হাতের ছড়িটা সজোরে সেনাপতির মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল, কিন্তু তাহাতেও সেনাপতির চেতনা হইল না। নটী হাত ছাড়াইয়া দ্বারের দিকে যাইতেছে দেখিয়া সেনাপতি তাহার পেছনে ছুটিল। তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া নর্ত্তকী দ্বারে থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর মুস্তাফার আলবোলা হইতে কল্কে তুলিয়া লইয়া সজোরে তাহার মুখে জলন্ত অঙ্গার ছুঁড়িয়া মারিল। সমস্ত ঘটনা নিমেষের মধ্যে ঘটিয়া গেল। সেনাপতির আর্ত্তনাদের সঙ্গে দর্শকেরা সব অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, সৈনিকেরাও হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সেনাপতি গর্জ্জন করিয়া উঠিতে সকলের হাসি থামিয়া গেল। সম্মুখে মুস্তাফাকে দেখিয়া সেনাপতি তাহাকে আক্রমণ করিল। সে তাহার বৃহৎ ভুঁড়ি লইয়া কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সৈনিকেরাও তাহাদের সেনাপতির অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইল। সৈনিকেরা যদিও নিরস্ত্র, তবু তাহাদের উদ্যত রোষ ও ভীমকান্তি দর্শনে সকলে ভীত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে আলিমহম্মদ সরাইখানায় আসিয়া প্রবেশ করিল। পথ হইতে সে ঘটনার শেষটুকু দেখিয়াছিল। সবাই ভীত হইয়াছে দেখিয়া সে নাচের ঘরে প্রবেশ করিয়া সরোষে বলিল—বাজশেখর, এখন কি নাচগানের সময়! শত্রুর কি শেষ হয়েছে! তার পর সারেঙ্গীবাদকের হাত হইতে সারঙ্গ ছিনাইয়া লইয়া সেনাপতির মাথায় সজোরে মারিল।

গোঁ গোঁ করিতে করিতে সেনাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িল। তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া নাদিরের সৈন্যগণের দিকে চাহিয়া আলি বলিল—নাদির শার কাটামুণ্ড আজ বাদশার পায়ের তলায় লুটোচ্ছে, তার এই হিংস্র কুকুরগুলোর মুণ্ডও দিল্লীর পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ুক—শোন—নাদিরকে বাদশা হত্যা করেছেন—তার এ সেনাদলকে নির্ম্মূল করবার ভার আমাদের ওপর—রক্ত চাই—

ক্ষিপ্তের মত আলি মহম্মদ সৈনিকদের আক্রমণ করিল, তাহার নিরুদ্ধ রোষ জ্বলিয়া উঠিল। সৈনিকেরা নাদিরের হত্যার কথা শুনিয়া ভীত হইয়া পথের দিকে ছুটিল। সকলে তাহাদের পেছন পেছন ছুটিল। শুধু নটী ও সারেঙ্গীবাদক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে সারেঙ্গীবাদক—রাজশেখর, সে নটী—ফতেমা।

ফতেমা করুণ সুরে বলল—এ কি হোল!

রাজশেখর করুণ চোখে তাহার ভাঙা সারঙ্গের প্রতি চাহিল। ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—ঠিক হয়েছে। তার পর সারঙ্গের ভাঙা খণ্ডগুলি কুড়াইতে লাগিল। তার পর দু'জনে ধরাধরি করিয়া আহত সেনাপতিকে নিজেদের ঘরে লইয়া গেল।

বাহিরে জ্যোৎস্নারাত্রি উন্মত্ত কলধ্বনি-মুখর হইয়া উঠিল। নাদির মরিয়াছে, পারস্যের শাহানশা ভারতের দুষমন নাদির মরিয়াছে, প্রলয়-অগ্নির মত এ খবর চারিদিকে ছড়াইয়া গেল, দিকে দিকে নিরুদ্ধ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষুব্ধ দিল্লীবাসী উন্মত্তের মত নাদিরের বিক্ষিপ্ত সৈনিকদের আক্রমণ করিল, প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল।

তখন দিল্লীর প্রাসাদে মহম্মদ শাহের কক্ষে নাদির বসিয়া; ভীত দিল্লীর বাদশা'কে তিনি আশ্বাস দিতেছেন, মহম্মদ শা'ই দিল্লীর সিংহাসনে থাকিবেন, নাদির তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া সখ্যভাবে থাকিতে চান। মহম্মদ শা নম্রভাবে কৃতজ্ঞতার সহিত বিজয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহার জীবনদানও করিলেন, রাজমুকুটও কাড়িয়া লইলেন না। নাদিরের এ পরম অনুগ্রহের জন্য মুহম্মদ শা' তাঁহার রাজকোষের সকল ধনরত্ন নাদিরকে উপহাররূপে দিলেন। দিল্লীর বাদশা'র এ আতিথ্যে পরম প্রীত হইয়া নাদির আবার তাঁকে অভয় দিলেন, তাঁহার রাজসিংহাসন যাইবে না।

(১১)

এমন কুন্দশুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রে জামেলার চোখে ঘুম আসিতেছিল না। তাহার বাইজী-জীবনে সে অনেক ভোগ-উৎসবের রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়াছে; কিন্তু এরূপ নিদ্রা-হারা রজনীর ব্যথা সে কখনও অনুভব করে নাই। সত্যই সে কি চায়, এ জীবনে সে কি চাহিয়াছে; কি পাইল? কোথায় তাহার জীবনের সার্থকতা? সে গান গাহিয়াছে, অর্থ পাইয়াছে, যশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনের কোন গোপন তৃষ্ণা চির-অতৃপ্ত রহিয়াছে। এ ভোগ-সুখের জীবনে সে যে ব্যথাকে কোন মায়াজাল দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে, কিন্তু আর পারিতেছে না। শঙ্করের সহিত দেখা হইবার পর তার অন্তর অন্তরালে কি পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ওই ব্রাহ্মণ যেন যাদু জানে, তাহার সুখের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া কোন্ বেদনার দুঃসহ পথে আহ্বান করিল। এ বাইজী জীবন আর জামেলার ভাল লাগিতেছে না। কোন আমীরের গৃহে সে গান গাহিতে যায়, সহসা তাহার কণ্ঠে গান থামিয়া যায়; কোন তেজোজ্জ্বল পবিত্র চক্ষের ব্যথিত দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, কণ্ঠের সুর কাঁপিয়া শুদ্ধ হয়, গানের মজলিসের লালসাতুর পুরুষদের দৃষ্টিগুলি সূচের মত বিঁধিতে থাকে, সে অসুখ হইয়াছে বলিয়া চলিয়া আসে। সোণার অলঙ্কার পরিয়া রঙীন সাজসজ্জা করিয়া আয়নায় আপনার ছায়া দেখিলে লজ্জায় যেন সে শিহরিয়া উঠে, তাহারি সালঙ্কৃত প্রতিমূর্ত্তির পাশে আয়নায় তাহার দুইটি স্বপ্নময় সুন্দর চক্ষের করুণ চাউনি জাগিয়া উঠিয়া তাহার দিকে সুতীব্র বেদনায় চাহিয়া থাকে। সে চাউনি বলে এ তোমার সত্যি রূপ নয়, তুমি এর চেয়েও সুন্দর, তুমি এর চেয়েও মহৎ। এই শঙ্কর তাহার কাছে কি চায়, কেন সে শুধু ব্যথা জাগায়, পথ বলিয়া দেয় না? শঙ্কর বলিয়াছিলেন, সে যদি সব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, তবে সে শান্তি পাইবে। সে কি ত্যাগ করিবে, তাহার সব ধন রত্ন কি ত্যাগ করিতে হইবে? সে কিসের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহার জীবনের কি কাজ? শঙ্কর তাহাকে আদেশ করুন, তাহার জীবনের পথ দেখাইয়া দিন। তাহার জীবন কি ব্যর্থ? সে কি শুধু ভোগনিশীথে কামের পাত্র ভরিয়া হলাহল দিয়াছে, গানের পাত্র ভরিয়া কি সুরের অমৃত বণ্টন করে নাই? তাহার জীবন যাহাই হউক তাহার হৃদয়পাতে আজ বেদনার অশ্রুভরা। এ বেদনা কি প্রেমের বেদনা? প্রেম! এক দিন কেহ তাহাকে ভালবাসিবে, সে কাহাকেও ভালবাসিবে এই তাহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। এক দিন সে ভাবিয়াছিল, সে আলি মহম্মদকে ভালবাসে; কিন্তু এ ভালবাসার শুধু জ্বালা আছে স্নিগ্ধতা শান্তি নাই, সে এ ভালবাসা চায় না। সে বুঝিতে পারিতেছে না সে কি চায়; সে শঙ্করের সম্মুখে গিয়া বলিতে চায়, আমি কি করিব বলিয়া দাও, আমাকে আদেশ কর। হায়, সে যদি পুরুষ হইত তবে আপনাকে সে আপন পৌরুষ দিয়া এ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিত, তবে আজ আলি মহম্মদ নয় আজ জামেলা শঙ্করের প্রধান সহচর হইত।

দিল্লীনগরীর গম্বুজ মিনারের ওপর জ্যোৎস্নারাত্রি যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দূর পথ হইতে মাঝে মাঝে মশালের আলো চমকিয়া উঠিতেছে, জনকোলাহলের ঢেউ ভাসিয়া আসিতেছে, সকলে উৎসবে মত্ত। এ উৎসবে জামেলারও গান গাহিবার নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু সে যায় নাই। গান আর তাহার ভাল লাগে না। এ সুন্দরী রাত্রির মত একাকিনী উদাসিনী আপন বেদনার বিরহ শয্যা বিছাইয়া জাগিতেছে।

এ রাত্রে যমুনার চোখেও ঘুম ছিল না, কিন্তু তাহার রাত্রি জাগরণ বড় সুখের। আপনার মন লইয়া সে খেলিতেছিল। তরুণী নারী যখন আপন মনের সদ্যজাগ্রত ভালবাসা লইয়া খেলা করে, মনের সে খেলা বড় সুখের। আপনার অন্তরের কাছে আপনি যখন সে স্বীকার করে সে ভালবাসিয়াছে, নিজের কাছে নিজের গোপন প্রেম চুপি চুপি বলা যেমন বেদনার তেমনি আনন্দের। যমুনা আপন মনে বলিতেছিল, সে ভারত সিংহকে ভালবাসে না, না, সে আলি মহম্মদকে ভালবাসে! আচ্ছা, সে মনকে একটু ভুলাক তাহাতে কাহার কি ক্ষতি, সে ত সত্যি আলিকে তাহার প্রেমের কথা বলিতে যাইতেছে না; আর সত্যই যদি সে ভালবাসে, এ ভালবাসা কি তাহার লজ্জা, তাহার গৌরবের নয়? এ ভালবাসা কি তাহার ব্যথার, তাহার সৌভাগ্যের নয়? আচ্ছা, সত্যই ত সে তাহাকে ভালবাসে না, সে তাহার মন লইয়া মিছিমিছি ভুলাইয়া খেলা করিতেছে। চাঁদের আলোর দিকে চাহিয়া এরূপ ভালবাসা লইয়া কল্পনায় খেলা করিতে করিতে যমুনা ঘুমাইয়া পড়িল।

রক্তের মদে মাতাল হইয়া দলের পর দল উত্তেজিত করিয়া আলি মহম্মদ নাদিরের সৈন্য অনুচরদের হত্যা করিতে করিতে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়া যখন সে শ্রান্ত হইল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। দেহের কয়েক স্থানে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তপাত হওয়াতে সে আপনাকে দুর্ব্বল অনুভব করিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে তখন শঙ্করের বাড়ীর গলির সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। এ গলিটি দেখিয়া তাহার হত্যা করার নেশা যেন কাটিয়া গেল, টলিতে টলিতে সে শঙ্করের বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীটি স্তব্ধ সুপ্ত, দ্বার বন্ধ। রুদ্ধদ্বারের পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল, কিছু ভাবিবার কিছু করিবার আর তাহার যেন শক্তি নাই। ধীরে ধীরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

খুব ভোরে যখন যমুনার ঘুম ভাঙিয়া গেল, যন্তর মন্তর হইতে দাদার ফিরিবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া সে বাড়ীর দরজা খুলিয়া রাখিতে গেল। দরজা খুলিয়া পথের দিকে চাহিতে সে চমকিয়া উঠিল। কে দরজার পাশে হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে! চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে; তাহার আলো তরুণ মুখের আধখানা জলজল করিয়া তুলিয়াছে, সে মুখের দিকে চাহিয়া যমুনার বুকের রক্ত দুলিতে লাগিল। বিমুগ্ধা হইয়া সে আলির দিকে চাহিয়া রহিল। অতি মৃদুস্বরে সে ডাকিল—আলি। সে ত ঘুমাইতেছে, সে ত শুনিতে পাইবে না, কেহ শুনিতে পাইবে না, এখন ডাকিলে কি দোষ, যে নাম সে নিজের মনে মনে কতবার গুঞ্জরণ করিয়াছে, সে নাম সে মৃদুস্বরে বলিতে বড় সুখ পাইল—আলি। সে জাগাইতে চায় না, আপন মনে ডাকিতে চায়।

কিন্তু আলি জাগিয়া উঠিল, ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল, তাহার সুদীর্ঘ উজ্জ্বল চোখের ওপর চাঁদের আলো ঝকমক করিতে লাগিল, যমুনা মুগ্ধা হইয়া দেখিতে লাগিল। যখন আলি মুখ ঘুরাইয়া সোজা হইয়া বসিল, তাহার চমক ভাঙিল। সে দ্বারের কোণে সরিয়া দাঁড়াইল, চলিয়া যাইতে পারিল না। যে যৌবন অতিথি তাহারই হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে সারারাত্রি প্রতীক্ষা করিয়াছে, তাহাকে সে কিরূপে ফিরাইয়া দিবে? আলি উঠিয়া ধীরে বলিল—তুমি না স্বপ্ন! যমুনা মুখ রাঙা করিয়া তাহার দিকে চাহিল, তার পর চলিয়া গেল। তাহারি রাঙা মুখের মতন পূর্ব্বাকাশ তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, জুম্মা মসজিদের মিনার হইতে মুয়াজ্জিনের আহ্বান ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মুক্ত দ্বারের সম্মুখে আলি নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিল। সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, একমাত্র দেশকে সে ভালবাসিবে।

(১২)

বিদ্রোহের রুদ্র রজনী প্রভাত হইল, কিন্তু এ রোষ স্তম্ভিত শান্ত প্রভাত বড় নিদারুণ, বড় ভয়ঙ্কর। রাত্রের

অন্ধকারে যদি প্রলয় হইয়া থাকে তবে দিনের আলোকে মহাপ্রলয় আসিতেছে। দিল্লীবাসীর বিদ্রোহের কথা রাত্রেই নাদিরের কাছে পৌঁছিয়াছিল। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করেন নাই, তার পর যখন বুঝিলেন সত্যই তাঁহার অনেক সৈন্য ও পরিচর হত হইয়াছে, তিনি সকলকে শান্ত হইয়া রাত্রি কাটাইতে বলিলেন, এ ধূলার ক্ষণিক ঝড় বহিয়া যাক, তিনি শ্রাবণ ঝঞ্ঝারে হাহাকারের সঙ্গে বজ্রপাত বন্যা ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত আনিবেন। প্রভাতে উঠিয়া নাদির আপন রত্নখচিত বর্ম্মে সজ্জিত হইলেন, তার পর রক্ষী সৈন্যদল লইয়া চাঁদনী চকের দিকে চলিলেন। তাণ্ডবনৃত্যের পূর্ব্বে রুদ্রের মত তাঁহার মূর্ত্তি। তাঁহার দুই দিকে সৈন্যেরা ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারি লইয়া চলিল। চাঁদনী চকে আসিয়া রোসেনউদ্দৌলার সোনালী মসজিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন সত্যই তাঁহার বহু লোকজন রাত্রে হত হইয়াছে। মূর্ত্তিমান প্রলয়ের মত মসজিদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাঁহার তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া সৈন্যদের সম্মুখে ধরিলেন, প্রতিহিংসার হত্যাকাণ্ড এবার সুরু হোক। বাঘের মত হিংস্র সৈন্যেরা হত্যা ও লুণ্ঠনের জন্য এতক্ষণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, হুকুম পাইয়া উল্লসিত হইয়া তাহারা দাবানলের মত দিল্লীবাসীদের আক্রমণ করিল। নাদির মসজিদে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

জামেলার ব্যথার রজনীও প্রভাত হইল। জাগরণ-ক্লান্ত নয়নে সে প্রভাতের আলোর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজপথের দিকে দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন তাহার প্রিয় আসিবে, এ প্রভাত ব্যর্থ হইবে না। বহুক্ষণ পথের দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া সে ঠিক করিল সে শঙ্করের কাছে যাইবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে কেন তিনি তাহার অন্তরে এ ব্যথা দিতেছেন। বোরখা পরিয়া পথে বাহির হইবে ভাবিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে চীৎকার আর্ত্তনাদ ভীম উল্লাসের ধ্বনিতে সে চমকিয়া উঠিল। পথের লোকজন গৃহহারা মেষদলের মত চারিদিকে ছুটিতেছে, আর্ত্তনাদ করিতেছে, সৈন্যদলের কোলাহল শোনা যাইতেছে। একটু ভীত হইয়া জামেলা জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিল। ও কে যাইতেছে, সকলে উন্মত্তের মত ছুটিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ও কে শান্ত বীরের মত চলিতেছে,—ওই ত শঙ্করের সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি, বুঝি তাহারি দ্বারের দিকে আসিতেছে। নিমেষে জামেলার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। মত্ত বরাহদলের মত নাদিরের সৈন্যদল তরবারি দিয়া পলায়মান জনসংঘকে কাটিতে কাটিতে আসিতেছিল। কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিতে আসিতে শঙ্করের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল, তাহাদের আঘাতে শঙ্কর পথের পাথরে পড়িয়া গেল, মাথায় আহত হইয়া উঠিতে পারিল না। কেহ তাহাকে মাড়াইয়া গেল, কেহ তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া গেল। সে মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিল, একটু আর্ত্তনাদ করিল না। নাদিরের সৈন্যেরা তাহাকে মৃত ভাবিয়া আর তরবারির আঘাত করিল না। শঙ্করকে পথে লুটাইয়া পড়িতে দেখিয়া জামেলা উন্মাদার মত পথে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু দ্বারে মূর্ত্তিমান লালসা ও মৃত্যুর মত দুইটি সৈনিক তাহাকে বাধা দিল, তাহারা দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সে তাহাদের ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করাতে এক সৈনিক তাহার বোরখা টানিয়া ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিল, তার পর তাহার রূপ দেখিয়া উল্লাসের হাসি হাসিয়া তাহাকে ঘরের মেজেতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া হাতের তরবারি কোষে বন্ধ করিল। তাহাদের বেশ দেখিয়া জামেলা বুঝিল এ নাদিরের সৈন্য; ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার নাই। দু'জনে মত্ত লালসার সহিত তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। জামেলার বড় ভয় হইল। সে অনেক লালসামত্ত পুরুষকে বশ করিয়াছে। কিন্তু এ হিংস্র নগ্ন লালসার মূর্ত্তি সে কখনও দেখে নাই। সে উঠিয়া ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল, হাতের হীরের আংটির দিকে একবার চাহিল, এই আংটি বিষে ভরা আছে, এই আংটি একবার চুম্বন করিলে সে সকল লজ্জা সকল ব্যথা হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু তাহারি দুয়ার সম্মুখে পথে যে শঙ্কর পড়িয়া আছে, এমন সময় সে মরিতে চায় না। ওই সৈনিক দুইটিকে সে জয় করিবে, অস্ত্রে নয়, তাহারি কটাক্ষ হানিয়া সে মারিবে।

যে সৈনিকটি খাপে তরবারি পুরিয়া রাখিল, জামেলা তাহার দিকে মৃদু হাসিয়া চাহিল। সে চঞ্চল হইয়া ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হওয়াতে, দ্বিতীয় সৈনিকটি তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া জানাইল, সে-ই এ বাড়ীতে প্রথম ঢুকিয়াছে, এ নারী তাহার প্রাপ্য। প্রথম সৈনিকটি

তাহাকে এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল যে, এ বাড়ীর সমস্ত ধন-রত্ন সে লইতে পারে, এ নারী তাহার প্রাপ্য। দ্বিতীয় সৈনিকের দিকে জামেলা এক কটাক্ষবাণ হানিল। দ্বিতীয় সৈনিকটি বলিল যে, সে ধন-রত্ন চাহে না। আচ্ছা, দুয়া খেলিয়া ঠিক হউক, এ কাহার ভাগ্যে প্রাপ্য। জামেলা একবার পথের দিকে চাহিল; তার পর আপনাকে দমন করিয়া, মোহিনীর হাসি হাসিয়া বলিল—বন্ধু, ঠিক বলেছ। আচ্ছা, আমি তোমাদের বাজী খেলা ঠিক করে দিচ্ছি। ওইখানে ভাল মদ আছে, সে মদ যে সব চেয়ে বেশী খেতে পারবে সে জিতবে। বহুৎ আচ্ছা, বলিয়া দুই-জনেই সম্মত হইল। জামেলা দুইটি পাত্র বাহির করিল, তাহাতে মদ ঢালিয়া হাতের আংটি বারম্বার ডুবাইয়া তাহাদের দিল। সুন্দরীর হাত হইতে মদ খাইয়া বেহেস্তে যাইতেছে ভাবিতে ভাবিতে তাহারা গোঁ গোঁ করিয়া টলিয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িল, কিছুক্ষণ পরে তাহাদের অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে হৃদ্‌স্পন্দনও থামিয়া গেল।

সৈনিক দুটি মেজেতে গড়াইয়া পড়িতেই, জামেলা একটু শিহরিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পথের ওপর শঙ্কর আহত হইয়া পড়িয়া আছে, এই দৃশ্যটি তাহার চোখে আসিতেছিল, সে এবার ওড়না দিয়া তাহার রক্ত-মাখা মাথা জড়াইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া আসিবে। কিন্তু পথে বাহির হইয়া জামেলা শঙ্করকে কোথাও দেখিতে পাইল না। সে যেখানে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে খানিকটা রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। সে কাহার জন্য এইমাত্র দুইটি পুরুষের ওষ্ঠে বিষ তুলিয়া দিয়া আসিল,—নিজেকে বাঁচাইবার জন্য ত নয়। যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সে নারী নরহত্যা করিল, সে নিষ্ঠুর চলিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে জামেলার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। ঘরে দুইটি মৃত সৈনিক পড়িয়া রহিয়াছে, বাড়ীতে ঢুকিতে তাহার বিতৃষ্ণা হইল, আজ পথে বাহির হওয়া যতই বিপদের হউক, সে আর ঘরে ফিরিবে না। উন্মত্তার মত সে শঙ্করের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন শঙ্করের ঘরের দ্বারে যমুনার সম্মুখে এক তুর্কি সৈনিক দাঁড়াইয়া। যমুনা তাহার দিকে কটমট করিয়া চাহিল। সৈনিকটি সুর্ম্মামাখা কালো চোখে নাচিয়া হাসিয়া রসিকতা করিয়া বলিল—ভয় কি বিবি, তোমাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব। যমুনা তাহাকে গালাগালি দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিল, কিন্তু সে বাহির হইল না, তাহার দিকে অগ্রসর হইল। যমুনার এবার ভয় হইল, 'মা' বলিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল,—'মাগো'! সম্মুখে শঙ্করের কয়েকখানি পুঁথি পড়িয়া ছিল। পুঁথিগুলি শঙ্করের অতি প্রিয়। পুঁথিগুলি হাতে করিয়া একটু ভাবিল; তার পর সজোরে সৈনিকের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সৈনিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল, পুঁথিগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সৈনিকটি হাসিয়া বলিল—সুন্দরী কটাক্ষবাণ দিয়েই আমায় মেরেছ; আর পুঁথি ছুঁড়ে মেরো না। সে আর একটু অগ্রসর হইল। সহসা দুজনেই এক আর্ত্তনাদে চমকিয়া উঠিল। যমুনা শিহরিয়া দেখিল, এক মুসলমান তাহার মায়ের পেছনে ছুটিতেছে, তিনি চীৎকার করিয়া উঠানে ঘুরিতেছেন। মুসলমানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি উঠানের মধ্যে কূপের ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ যমুনার কানে তীরের মত আসিয়া বিঁধিল। মরিয়া হইয়া যমুনা দ্বারের দিকে ছুটিল, সেও কূপে ঝাঁপ দিবে। সিঁড়ির সম্মুখে ছুটিয়া আসিতেই, সৈনিকটি আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া তাহার হাত ধরিল। দুইজনে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। ঘুসি মারিয়া, খিমচাইয়া, ঠেলিয়া সে তাহাকে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এ লালসা-মত্ত বলিষ্ঠ তুর্কীর সহিত সে কি করিয়া পারিবে! দু' তিনবার তাহাকে সজোরে হাত দিয়া ধাক্কা দিল, এ যেন অচল পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া। সৈনিকটি তাহার ওপর কোন বলপ্রয়োগ করিতেছিল না, যেন তাহার শক্তির পরীক্ষায় খেলা করিতেছিল, দেখি এ তরুণী কি করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু সহসা তাহার পা পিছলাইয়া গেল, সে সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িল। আপনার শক্তিতে যমুনা প্রথমে অবাক্ হইল, বস্তুতঃ আলি মহম্মদই সৈনিকটিকে পেছন হইতে টানিতে সে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িল। মাথা কাটিয়া গেলেও সৈনিকটি লজ্জায় ক্ষোভে টলিতে টলিতে দাঁড়াইল। কিন্তু এক তরবারির আঘাতে আলি মহম্মদ তাহাকে ভূমিতে লুটাইয়া যমুনার সম্মুখে দাঁড়াইল। যমুনা কিন্তু তাহার দিকে চাহিল না, সে তাহাকে ঠেলিয়া পথ করিয়া কূপের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল। ওই কালো স্নিগ্ধ জল অতল স্নেহের শান্তিময় স্পর্শের মত তাহাকে আহ্বান করিতেছে, মৃত্যু মাতৃরূপে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। সে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিতে গেল, আলি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কূপ হইতে দূরে লইয়া আসিল, করুণ চোখে তাহার দিকে চাহিল, হায়, সে কেন মরিবে? আলির করুণ সুন্দর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া যমুনার বাঁচিতে ইচ্ছা হইল, তবু সে কূপের দিকে যাইতে চাহিল। আলি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া সম্মুখের এক ঘরে টানিয়া আনিল। যমুনা আলির মুখের দিকে চাহিল, তাহার চোখে অগ্নিদীপ্তি নাই, অশ্রু ঝরিতেছে। কি অসহনীয় বেদনায় যে যমুনা মরিতে ছুটিয়াছিল তাহা সে বুঝিয়াছে। দাদা, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া যমুনা ঘরের মেজেতে লুটাইয়া পড়িল। আলি দুয়ারের সম্মুখে মুক্ত তরবারি লইয়া রক্ষী রূপে স্থির দাঁড়াইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

সাধ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃণ-হৃদিমাঝে যে কাঁপন জাগে প্রথম বরষাপাতে,
যে কাঁপনে নাচে তরুণীর হিয়া প্রথম-মিলন-রাতে,
তটিনীর হিয়া যে কাঁপনে দোলে সমীরের পরশনে,
আমি হতে চাই সেই কম্পন নিতি নিতি প্রাণে মনে!

দীপ্ত দুপুরে বাজে যেই সুরে উদাসী বাঁশের বাঁশী
যে সুরে ঝরায় মানসশিলার সঞ্চিত বারিরাশি;
ঘুমহারা পাখী যে সুরেতে কাঁদে ঘুমে অচেতন-পুরে,
হৃদয়তন্ত্রী বাজাইতে চাই দিবানিশি সেই সুরে!

সাধ হয় মনে শিবের গলায় ফণীমালা হয়ে দুলি,
হই সে বিষাণ ঈশান যাহারে লইবে মুখেতে তুলি!
গরল হইয়া চাই আমি তাঁর কণ্ঠে বাঁধিতে বাসা,
সতীদেহ হয়ে ত্রিশূলের ঘায় ছিন্ন হবার আশা!

শ্মশানের বুকে কঙ্কাল মুখে যে-হাসি ফুটিয়া রহে,
যেই লোলুপতা হিংস্র বাঘের চোখমুখ বাহি বহে,
নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে রাতে সিংহের ডাক সম,
তেমনি ভয়াল ভীষণ হইতে সাধ হয় বড় মম!

রমণীর যথা যূথিমল্লিকা, শিশুর মুখেতে হাসি;
কমনীয় যথা মা'র স্তনধারা, রূপসী-অশ্রুরাশি;
অনুপম যথা উষার আকাশে অরুণের আলিপনা,
তেমনি হইতে অন্তর করে নিতি কত জল্পনা!

গোলাপের বুকে লুকালো যে গীতি, তারকা যে গান গাহে,
জোছনার রূপে যে গান নিশীথে ধরণীর মুখে চাহে,
কমল যে গান গাহিছে নিয়ত নিশাকরে তুষিবারে,
সে নীরব গীতি হতে সাধ যায় ঘুরে ফিরে বারে বারে!

হতে চাই আমি কামনা-বহ্নি, ত্যাগের শান্তি-বারি!
হতে চাই আমি ক্রূর নৃশংস, কেবল করুণা-বারি!
যশ মোর আমি ছড়াইতে চাই দিক্ ও দিগন্তরে!
স্মৃতি মোর আমি চাই মুছে দিতে ধরণীর ধূলিপরে!

পত্রলেখা সে হতে চাই আমি প্রেয়সীর পয়োধরে
স্নিগ্ধসুরভি চারু নন্দনে মন তার র'ব ভরে'!
যে মনোমোহন লালিমা বিরাজে রূপসী-বিম্বাধরে
হতে চাই সেই লালিমা গো আমি শুধু ক্ষণেকের তরে!

সাধ হয় মনে গ্রহ হয়ে আমি শূন্যের বুকে দুলি,
পটুয়া হইয়া আকাশের গায়ে বুলাই রঙীন তুলি!
তৃণ হতে চাই শিশিরের টিপ ললাটে পরিতে প্রাতে,
উন্মনা হয়ে ধরিবারে চাহি স্বপ্ন-পসরা হাতে!

বিরাট হইয়া তপনের দেহে ছায়া ফেলিবার আশা!
হওয়া কি যায় না কোনও উপায়ে জড়ের মুখের ভাষা?
ধরণীর আলো মুছিয়া ফেলিয়া বারেক হইব অন্ধ—
মানস-নয়নে মুক্ত করিব দিঠিরে করিয়া বন্ধ!

সাধ হয় মনে গরুড় হইয়া অসীমের সীমা খুঁজি,
পর্ব্বত হয়ে ধরণীর যত স্বপ্ন করিগো পুঁজি!
বাতাস হইয়া চাঁদেরি গণ্ডে চুমা দিয়ে আসি গিয়া,
সাগরের ঢেউ হইয়া আকাশে ধরিগো আলিঙ্গিয়া!

শিশু হতে চাই, নারী হতে চাই, প্রাচীন হইতে চাই—
ঘৃণ্য ক্ষুধিত অজ্ঞ যতেক চণ্ডালের হব ভাই!
বাঙালীর বধূ হইয়া সহিব নিদারুণ যন্ত্রণা—
কি যে হতে চাই নাহি জানি তাই কেমন বিড়ম্বনা!

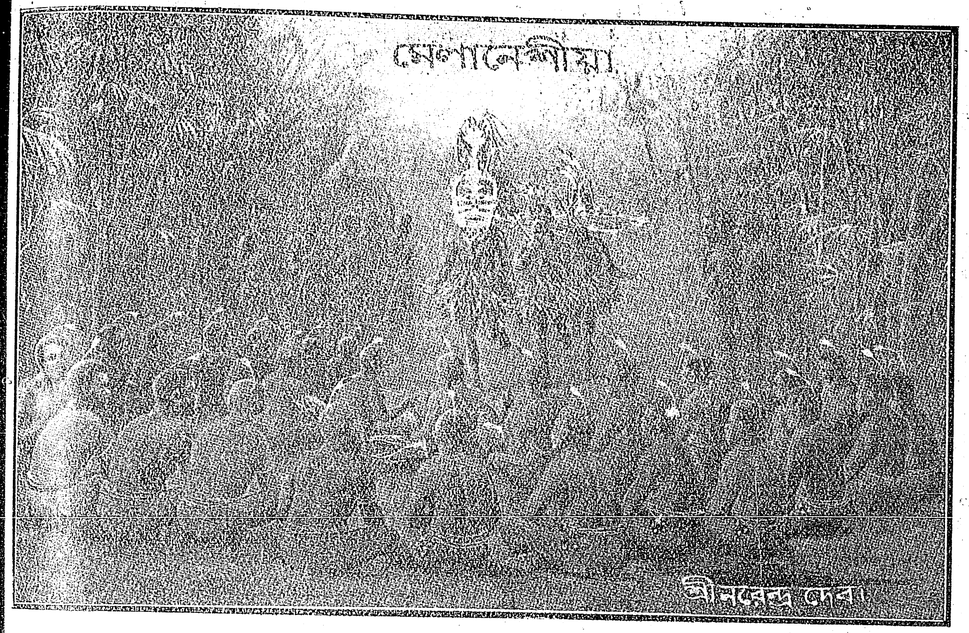

নৃত্যভঙ্গী (সম্মুখ দৃশ্য)

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে কয়েকটি দ্বীপ-পুঞ্জকে আবার যারা য়্যাডমিরাল্টী দ্বীপ আর নিউগিনির অধিবাসী, তারা আরও বেশী লম্বা। তাদের বর্ণও অধিকতর গাঢ়। এদের পাপুয়াঁ নামে অভিহিত করা হয়। মেলানেশীয়ার বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদ প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা অধিকাংশ উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। অল্প জনকতক কেবল কৌপীন বা একটু নেংটি মাত্র পরে' লজ্জা নিবারণ করে। মেয়েরাও কৌপীন পরে, কেউ

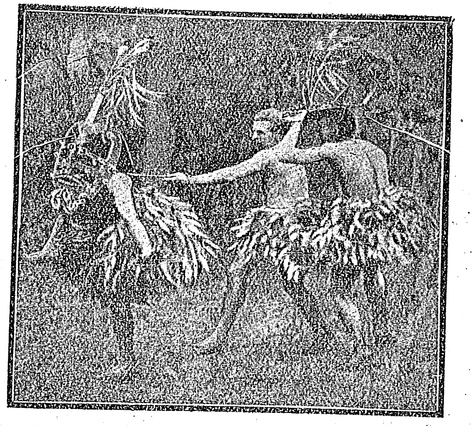

মুখোস প'রে নাচ—(এই প্রকাণ্ড বীভৎস মুখোসের কোনও চক্ষু কোটর নেই বলে মুখোসধারী নর্ত্তককে পথ নির্দ্দেশ করবার জন্য পিছনে, একজন লোক সর্ব্বদা একটি দড়ি ধরে' তাকে পরিচালিত করে।)

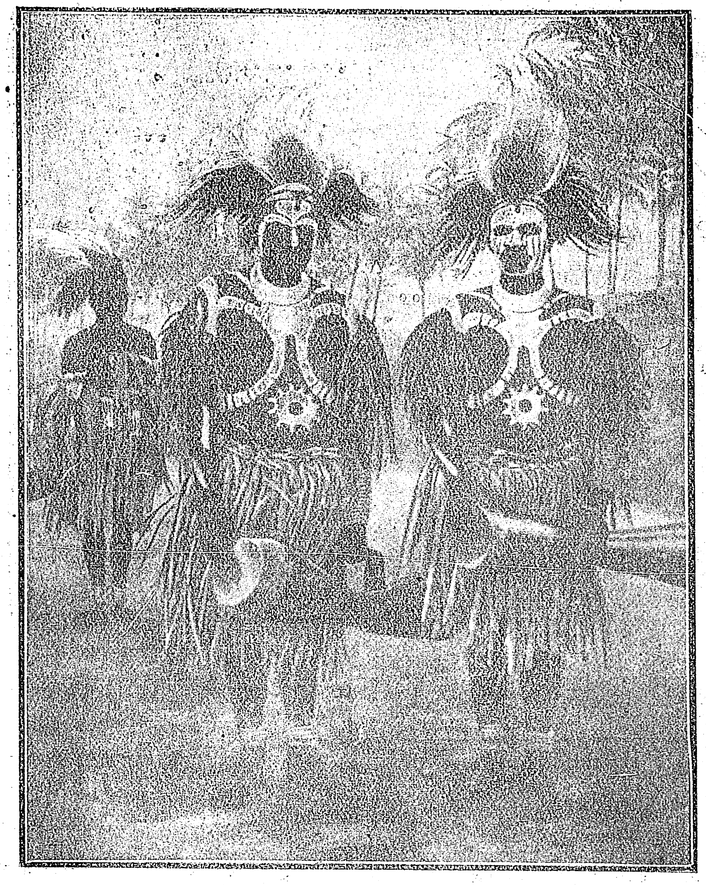

সুসজ্জিত নর্ত্তকের-দল

কেউ পাতার গাঁথা ঘাগ্‌রা পরেও বেড়ায়। মেয়েরা যৌবনে পদার্পণ করবার আগে পর্য্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে লজ্জিত হয় না। এদের মেয়েদের মধ্যে অলঙ্কার ব্যবহারের কতকগুলো বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে। অলঙ্কারের মধ্যে যদিও পালকের মুকুট,—শঙ্খ ও শামুকের খোলের কণ্ঠহার, জীবজন্তুর দাঁত ও ফলের বীজের তৈরী গলায় মালা, কানের দুল, নাকছাবি, তাগা, কোমরবন্দ, মল, পাঁজর ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছু নেই। এর মধ্যে কোনও কোনও অলঙ্কার তারা গাছের আঁশ, বেতের ছাল ইত্যাদি বুনে তৈরি করে। এই অলঙ্কারের ভিতর দিয়ে তাদের শিল্পজ্ঞানের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণে, প্রাচীর চিত্রে, নৌকা গঠনে, তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কৌশলের মধ্যে তাদের কলা-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান।

মেলানেশীয়ার অধিকাংশ অধিবাসীদের মধ্যে উল্কী ধারণ করা একটা অতি সাধারণ প্রথা। কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই উল্কী ধারণ করে, আবার কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে কেবল মাত্র মেয়ে মহলেই উল্কীর প্রথা প্রচলিত। স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই বিবাহযোগ্য বয়স হ'লে তবে উল্কী ধারণ করে। মেয়েদের মধ্যে এটা একটা বিবাহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। আবার এই উল্কীর ধরণ ও কারিকুরি থেকে উল্কী-ধারীর সামাজিক অবস্থা ও তার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ যদি তার জীবনের পথে কখনও কোনও নরনারীকে হত্যা করে থাকে, সে কথা তাদের উল্কীর আঁচড়ের মধ্যে লেখা থাকে। নাক



মাকুলু গৃহিণীর কেশ-বেশ

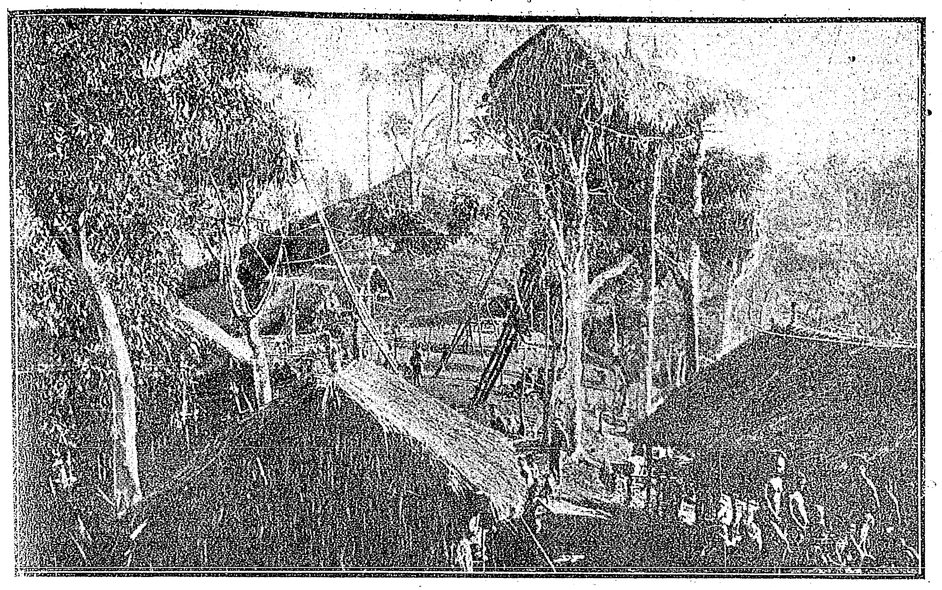

বৃক্ষচূড়ে নির্ম্মিত গৃহ। (মেলানেশীয়াবাসীরা যুদ্ধের সময় শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'লে এই উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে নির্ম্মিত-কক্ষে আশ্রয় নেয়। এখানে তারা দুঃসময়ে প্রয়োজন হবে ব'লে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করে রাখে।)

ফোঁড়া ও কর্ণবেধ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই হ'য়ে থাকে। একটা হাড়ের বা শাঁকের গজাল পরে থাকে। কানের নাকের নানারকম অলঙ্কার থাকলেও সাধারণতঃ তারা ছিদ্রের মধ্যে তারা কারুকার্য্যখচিত একটা মস্ত চাকৃতি পরে ব'লে কানের ছিদ্রটা তারা যতদূর সম্ভব বড় করবার চেষ্টা করে। চশমার ফ্রেমের মধ্যে যেমন ভাবে কাঁচ আঁটা থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে ওদের কানের ছিদ্রের মধ্যে চাকৃতি-খানি আঁটা থাকে।



অন্য একরকম বেশ (ভিন্ন গুপ্ত সমিতির)



গুপ্ত সমিতির সভ্যদের উৎসব-বেশ (প্রত্যেক গুপ্ত সমিতির এক এক রকম বিশেষ বেশ আছে।

মেলানেশীয়ার অল্প দু'চার অংশ ছাড়া প্রায় সকল অঞ্চলেই নরমাংস ভোজন প্রচলিত ছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতার অধীনে এসে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-

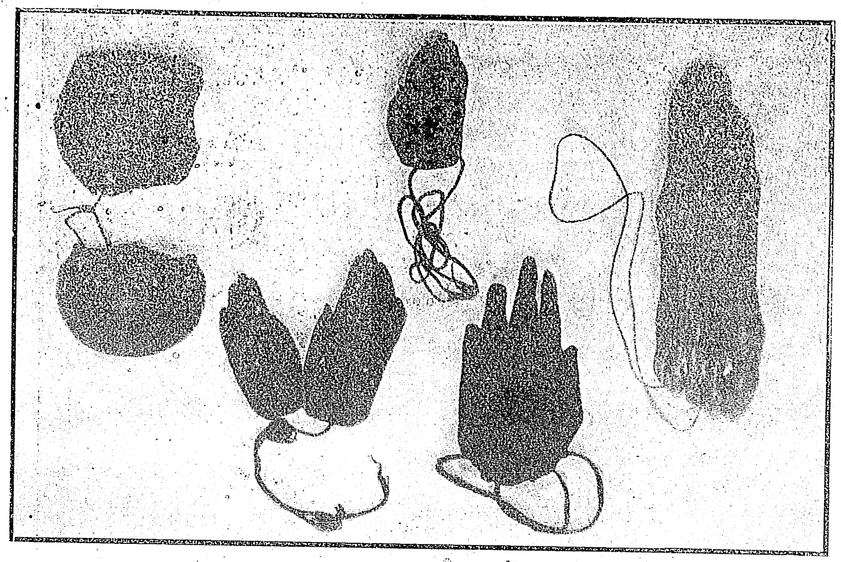

নরকঙ্কালের অলঙ্কার (নিউগিনির অধিবাসীরা কেউ কেউ মৃত আত্মীয়ের হস্তপদ বা মস্তিষ্কের অস্থি—তাঁর স্মৃতি ও শোক চিহ্ন স্বরূপ অলঙ্কারের মত ব্যবহার করে)

প্রচারকদের প্রাণপণ চেষ্টায় তারা এখন এই নৃশংস বর্ব্বরতাটা ধুমধামটা সাধারণের মধ্যে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার

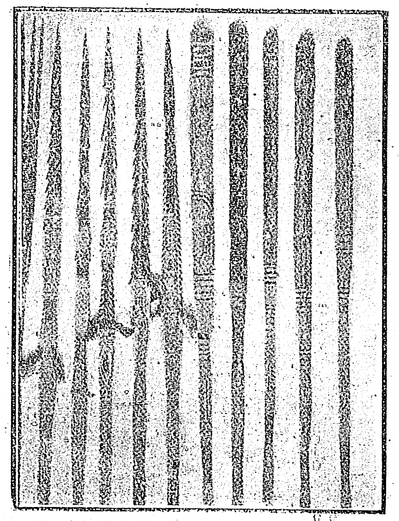

নানা কারুকার্য্য-খচিত বিভিন্ন রকমের বর্শাফলক

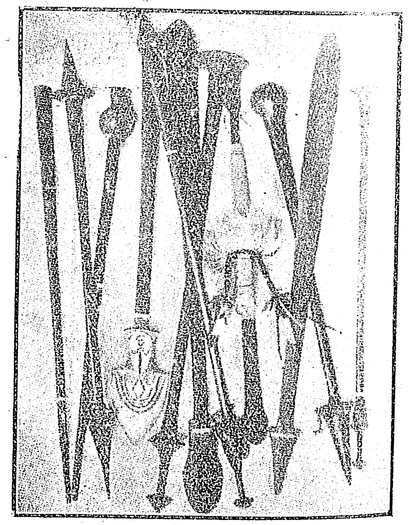

হরেকরকমের হাতিয়ার (এই অস্ত্র মেলানেশীয়াবাসীরা মন্ত্রপূত ক'রে নিয়ে ব্যবহার করে।)

পরিত্যাগ করেছে। তবে মাঝে মাঝে অভ্যাসের দোষে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধ জিনিষ যে তারা খায় না এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না।

মেলানেশীয়ার অধিবাসীদের মধ্যে নানা রকমের উৎসব-প্রথা প্রচলিত আছে। শিশুর জন্মোৎসবে

সময়-ই হ'য়ে থাকে। কিন্তু সর্দ্দার বা প্রধানদের প্রত্যেক নবজাত শিশুর জন্যই উৎসব হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে আবার প্রথা আছে যে প্রসব বেদনা সুরু হবার সময় থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত জননীর



বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত নাচের মুখোস

সহিত পিতাকেও সূতিকাগারে পীড়িতের মত অবস্থান ক'রতে হয়। এ ছাড়া গর্ভিণী ও প্রসূতি নারীকে যেমন আহার ও বিহারের কয়েকটা বিশেষ বিধি-নিষেধ মেনে চ'লতে হয় তেম্‌নি তাদের সঙ্গে সেখানে জনকদেরও সমান ভাবে সেই সব নিষেধ মান্‌তে হয়। শিশুর জন্ম গ্রহণের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত পিতার পক্ষে কোনও গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন, বৃক্ষারোহণ, সমুদ্রস্নান বা কোনও রকম

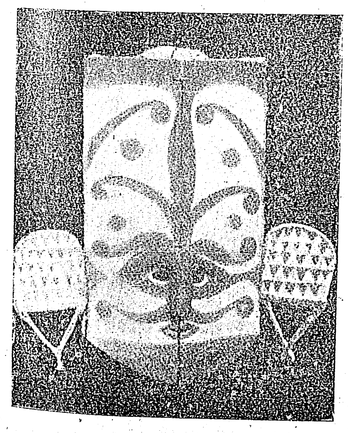

ডানাসংযুক্ত মুখোস (শোকের সময় ব্যবহৃত হয়)

কঠোর পরিশ্রম করা একেবারে নিষেধ; কারণ, তাদের বিশ্বাস যে পিতার এই সব আচরণে নবজাত শিশু কষ্ট পাবে। ব্যাঙ্ক দ্বীপের সদ্যজাত শিশুর জনকেরা এক মাস কাল সে খানকার কোনও দেবালয়ে বা তীর্থস্থানে প্রবেশ করবার অধিকার পায় না। নিউগিনির 'কোয়েতা' সম্প্রদায়ের মধ্যেও আসন্ন-প্রসবা পত্নীর পক্ষে যে সব আহার্য্য গ্রহণ নিষেধ বলে বিধি আছে স্বামীকেও খাদ্য সম্বন্ধে উক্ত নিষেধগুলি মেনে চলতে হয়, নইলে ভাবী সন্তানের অকল্যাণ হ'তে পারে এই তাদের বিশ্বাস। নিউহেব্রাইডিস্ দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে নিয়ম আছে যে শিশুর জন্মের দশদিন পরে দেবস্থানে পশু বলি দিতে হবে। এই বলির ফলে তারা মনে করে শিশুর দুর্ভাগ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনও শিশু যদি সর্ব্বপ্রথম খাদ্যগ্রহণের পর মৃত্যু মুখে পতিত

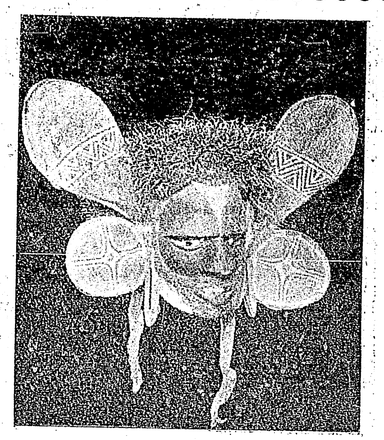

পাখাযুক্ত মুখোস (এই মুখোস নাচে ব্যবহৃত হয় না)

হয় তাহ'লে সেই শিশুর পিতা মাতা জীবনে আর সেরূপ খাদ্য গ্রহণ করে না। ব্যাঙ্ক দ্বীপে প্রথা আছে যে প্রথম সন্তানের জন্মগ্রহণের পর শিশুর মাতামহ গোষ্ঠির সহিত তাহার পিতৃবংশের একটা প্রচণ্ড কৃত্রিম সংগ্রামের অনুষ্ঠান হয় এবং শিশুর পিতা সেই যুদ্ধের শান্তি কামনায় শিশুর মাতুল গোষ্ঠীকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত ক'রে নেয়।

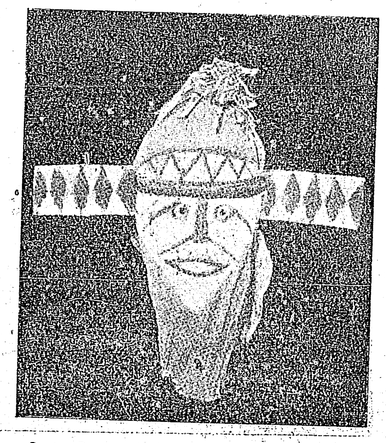

নীশায়ু দ্বীপে প্রচলিত নাচের মুখোস কেবল মাত্র)

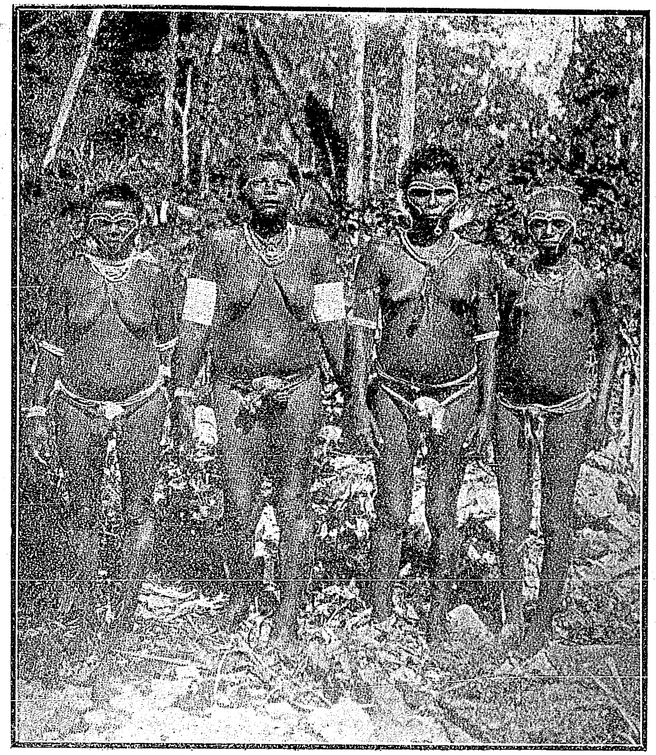

পর্ব্বোপলক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসজ্জিত মেলানেশীয়াবাসিনীগণ

বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা তাদের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দিন একটা জন্মোৎসবের



নৃত্যভঙ্গী (পশ্চাৎ দৃশ্য)

অনুষ্ঠান করে। একজন মন্ত্র সিদ্ধ ব্যক্তি সেই উৎসবে উপস্থিত থেকে প্রসূতির আহার্য্য বস্তু মন্ত্রপূত ক'রে দেন এবং মন্ত্রপূত পলাভস্ম চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ ক'রে সেস্থান-

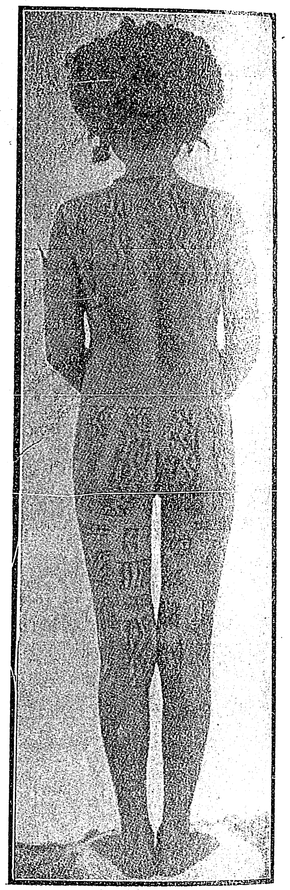

উল্কীপরা কোয়েতা মেয়ে

টিতে প্রেতের প্রবেশ পথ রুদ্ধ ক'রে রাখেন। প্রসূতির অঙ্গেও সেই মন্ত্রপূত পলাভস্ম লেপন ক'রে দেওয়া হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই উৎসব অঙ্গনে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় এবং ধাত্রীরা সেই সদ্যজাত শিশুকে সেই হোম শিখোদ্গত ধূমরাশির ভিতর দিয়ে প্রদক্ষিণ ক'রে নিয়ে যেতে যেতে বার বার এই আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ ক'রতে থাকেন—"শক্তিমান হও—ধনবান হও!" শিশু যদি কন্যা

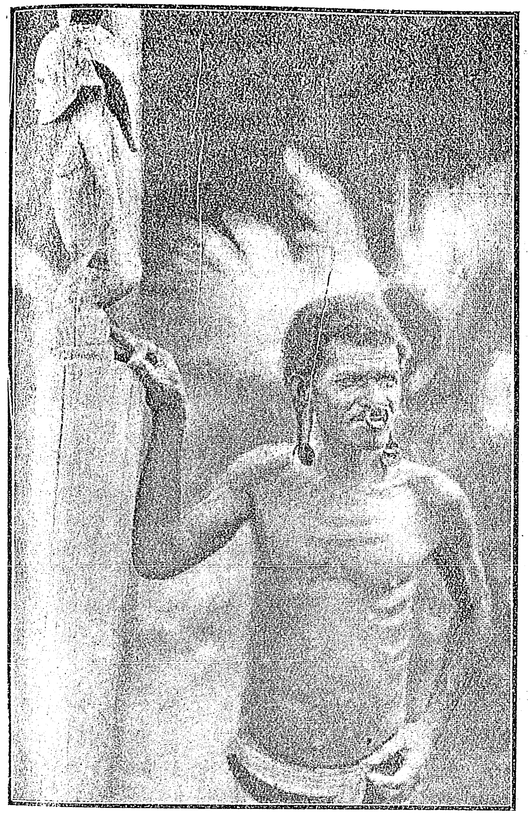

সলোমন দ্বীপের নাক কান ফোঁড়া লোক

হয়—তাহলে বলেন—"যৌবনশালিনী হও, নিপুণা কর্ম্মিষ্ঠা হও!" হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হবার পর—মন্ত্র-সিদ্ধ পুরোহিত হোমের ভস্মাবশেষ গ্রহণ ক'রে শিশুর ললাটে, নাসাগ্রে, কর্ণপ্রান্তে, চিবুকে ও আঁখি-পল্লবে হোমটিকা অর্পণ ক'রে শিশুকে সকল প্রকার বিঘ্ন বিপদের অন্তরাল ক'রে দিয়ে যান।

বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জে শিশুর জন্মোপলক্ষে প্রথা আছে যে গ্রামের সমস্ত পুরুষ একত্র হয়ে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে একটা যুদ্ধ করে। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হ'য়ে পুরুষদের আক্রমণ করবার সময়—তাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে এবং পুরুষেরা লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে। যুদ্ধ শেষে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। এই ভোজে প্রচুর তরি তরকারী ও শূকর-মাংসের ব্যবস্থা থাকে। সলোমন দ্বীপের নিয়ম হচ্ছে আসন্ন-প্রসবাকে পাড়ার মেয়েরা একটী ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, একখানি পাতার কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে তার মধ্যে তাকে রেখে দেয়। এই কুটীর নির্ম্মাণে কোনও পুরুষের সাহায্য লওয়া হয় না। এবং কোনও পুরুষকে এমন কি প্রসূতির স্বামীকে পর্য্যন্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার একপক্ষ কালের মধ্যে সে অঞ্চলেই প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হয় না। নিউগিনির দক্ষিণ অঞ্চলে একটী চমৎকার প্রথা আছে যে শিশু জন্ম গ্রহণের পর যে প্রথম পূর্ণিমা

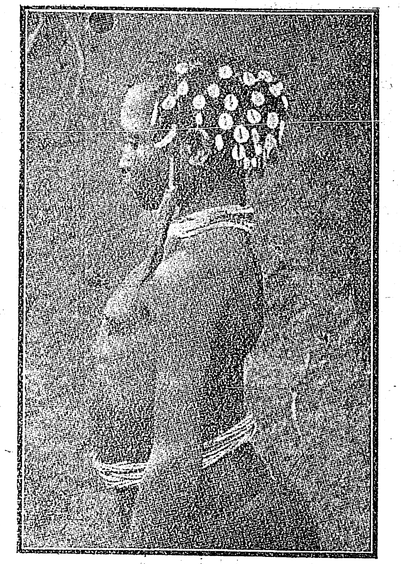

মাফুলু মেয়ের কবরী

আসে সেই পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে জননী তার সন্তানকে পূর্ণ চন্দ্রের চরণে অর্ঘ্য দেবার মতো দুহাতে তুলে ধরে উৎসর্গ করে দেয়। তাদের বিশ্বাস চন্দ্রের কৃপায় শিশু দিন দিন শশীকলার মতো বৃদ্ধি পাবে। নিউগিনির মেকীয়ো অঞ্চলেও একটী সুন্দর প্রথা আছে যে কাহারও প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে জানতে পারলে

তরুণ প্রতিবেশীরা এসে সারারাত তার দ্বারে জেগে বসে গান করে। প্রভাতে নবজাত শিশুর পিতা বহু সমাদরে তাদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে বিবিধ ভোজ্যে পরিতুষ্ট করে। কিন্তু গ্রাম যদি সে সময় কাহারও মৃত্যু উপলক্ষে শোকাচ্ছন্ন থাকে তাহ'লে ভোজটা গ্রামের বাহিরে গিয়ে সম্পন্ন ক'রে মৃতের প্রতি সম্মান ও সদ্যজাত শিশুর কল্যাণ উভয়দিক রক্ষা করা হয়।

নিউগিনির পূর্ব্বাঞ্চলের এই বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একটা খুব ভাল নিয়ম প্রচলিত আছে—যেটা আমাদের এই বিংশ-শতাব্দীর সভ্য সমাজের অনুকরণ-যোগ্য। সেটা হচ্ছে এই যে শিশুর জন্মের পর অন্ততঃপক্ষে ছ'মাস কাল স্বামী-স্ত্রী পৃথক ভাবে অবস্থান করে এবং আট মাসের আগে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে স্পর্শ করা পর্য্যন্ত একেবারে নিষেধ। তবে ভ্রূণহত্যা ব্যাপারটা মেলানেশীয়ার সর্ব্বত্র অত্যন্ত প্রচলিত। কারণ যদিও সতীত্ব ব'লে কোন উচ্চ ধারণা তাদের মধ্যে একেবারেই নেই, কিন্তু অবিবাহিত কন্যা যদি গর্ভবতী হয় সেটা তাদের সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার বলে প্রচলিত থাকায় সে দেশের যে সব বয়স্থা কুমারীরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে তারা কঠোর সামাজিক শাস্তির ভ সকলেই ভ্রূণহত্যা করে, অথচ এই নৃশংস পাপ কার্য্যটাকে তারা একেবারেই দোষের বা অপরাধের মধ্যে গণ্য করে না। বিবাহিতা স্ত্রীলোক যে কোনও পুরুষের সহবাসে গর্ভবতী হোক না সেটা কোনও দিনই তারা দুষ্য ব'লে ধরে না। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাও অনেক স্থলে শিশু হত্যা করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। তার কারণ শিশু জারজ বলে নয়,—শিশুর সংখ্যা হ্রাস করবার জন্য; যে হেতু সেখানকার স্ত্রীলোকেরা বহু সন্তান পালন করাটা মোটেই পছন্দ করে না। শিশু হত্যার আর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে—শিশুর লিঙ্গ বিভেদ। কারণ যেখানে অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে জননীরা পুত্রকেই লালন

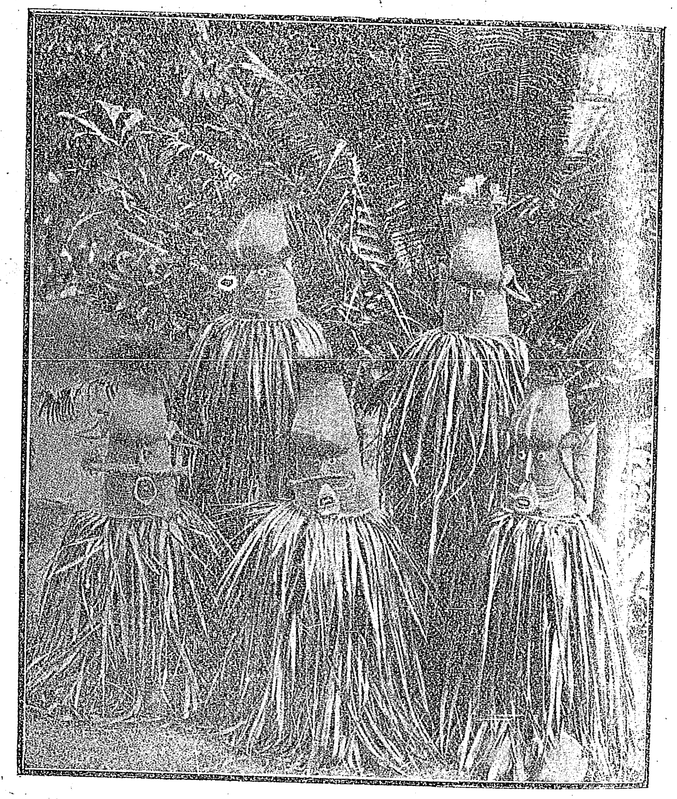

ভৌতিক বা যাদুশক্তিসম্পন্ন মুখোসধারীর দল (এরা নৃত্য করবার সময় এই বেশ পরিধান করে। নৃত্য আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এরা যখন নতজানু হ'য়ে ভূমিতে উপবেশন ক'রে তখন জননীর দল তাদের ছেলে ভাল থাকবে বলে শিশু সন্তানগুলিকে এদের পদস্পর্শ করিয়ে নিয়ে যায়।)

পালন ক'রতে চায়, কন্যাকে মানুষ ক'রতে চায় না। তাই শিশু যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে তবে অনেক সময় সূতিকাগারেই তার অপঘাত মৃত্যু হয়। যমজ সন্তান প্রসব করা সে দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে মেয়েদের পক্ষে একটা গৌরবের ব্যা । আবার

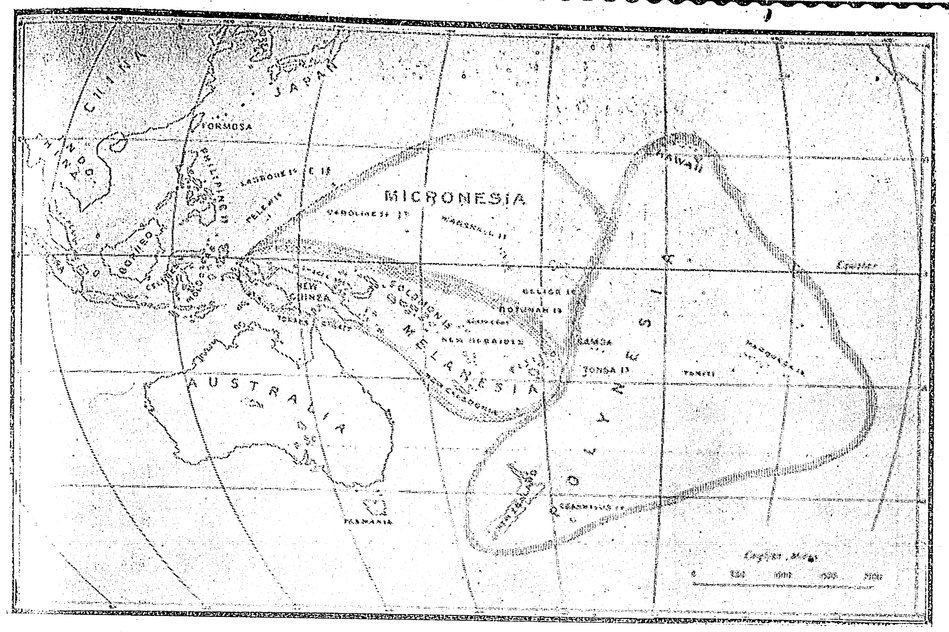

মেলানেশীয়ার মানচিত্র

কোনও কোনও অঞ্চলে যমজ সন্তান প্রসব ক'রলে জননীর দুঃখের আর অন্ত থাকে না! কারণ সেখানকার লোকেদের বিশ্বাস যে যমজ সন্তানের কখনই একজন জনক হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই দুই বিভিন্ন পিতার ঔরসে এই যুগল শিশুর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে তারা অনেক সময় যমজ শিশুর একটীকে হত্যা ক'রে ফেলে। অন্ধ খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ শিশুকে বধ করাই হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি। তবে কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয় কেবলমাত্র যাদুকর, ডাইনী, ভূতের ওঝা ইত্যাদি ব্যবসায়ে তারা জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে এই আশায়। নিউগিনির মধ্য-প্রদেশের



বিবাহযোগ্যা কন্যা

কোনও স্থানে অতি সামান্য কারণে শিশু হত্যা করা হয়। যেমন শিশুর জন্মোসবে প্রতিবেশীদের ভোজ দেবার মত সচ্ছল অবস্থা যদি পিতা-মাতার না হয়, তবে সেই অক্ষমতাজনিত সামাজিক লজ্জার হাত এড়াবার জন্য শিশুকে গোপনে হত্যা ক'রে ফেলা হয়। মাফুলু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে—সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর মাতা শিশুটিকে নিয়ে নদীর ধারে যায় এবং এক গণ্ডুষ জল নিয়ে শিশুর মুখে দেয়, শিশু

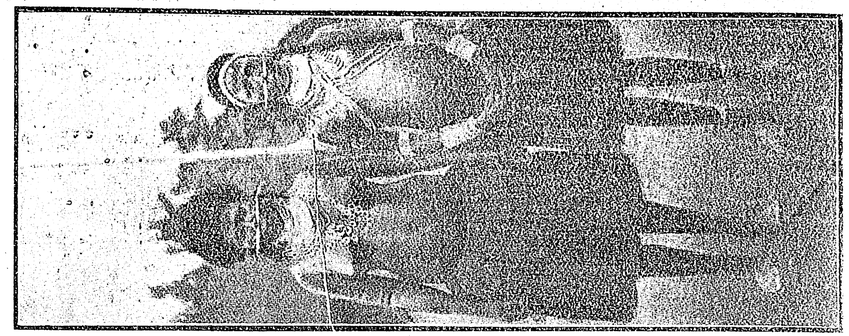

উৎসব-বেশে সজ্জিত মেলানেশীয় পুরুষদ্বয়

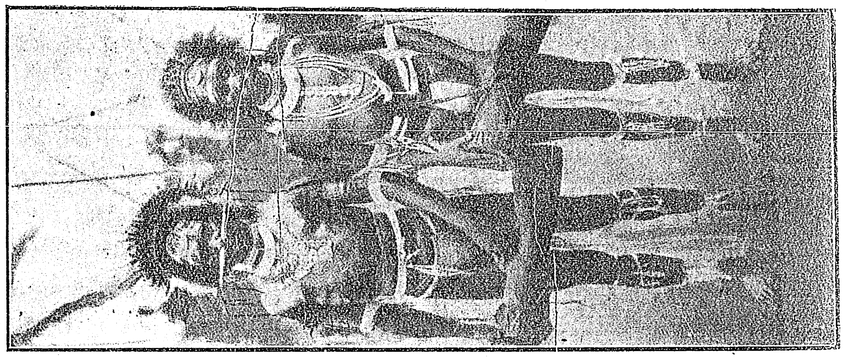

উৎসব-বেশে সজ্জিত মেলানেশীয় মহিলা

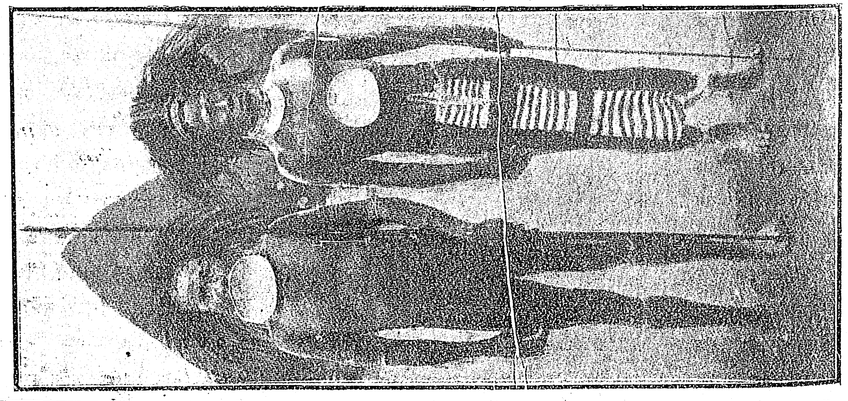

নবম মাসে সজ্জিত মেলানেশীয় যোদ্ধৃদ্বয়



বিদর্ভার দ্বীপপুঞ্জের মাথা-পেটা লোক (শিশুর মাথা যাতে চেপ্টা হ'য়ে ওঠে সেই চেষ্টায় অতি শৈশবাবস্থা থেকেই সে দেশের জননীরা যত্নবান হ'ল।)

যদি আগ্রহের সহিত সেই জল পান করে তবেই তার মা তাকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সযত্নে পালন পালন ক'রে। কিন্তু শিশু যদি সেই জল না পান করে, তাহলে জননী তাকে সেই নদী গর্ভেই বিসর্জ্জন দিয়ে চলে আসে। শিশুর এই জলপান পরীক্ষার সময় নিঃসন্তান ও বন্ধ্যা নারীরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত থাকে; এবং যদি শিশুটীকে তার মাতা বিসর্জ্জন দিয়ে যায়, তাহ'লে তাদের মধ্যে কেউ একজন তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে আপন সন্তানের মতো পালন করে।

আমাদের দেশে যেমন শিশুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাদের মধ্যেও সেই রকম শুধু অন্নপ্রাশন নয়, শিশুর প্রথম বস্ত্রগ্রহণেও একটা উৎসবের আয়োজন হয়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শিশুর মুখে মামার হাতে ভাত দেওয়ানোর যে প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ওদের বস্ত্রগ্রহণ উৎসবেও ঠিক সেই রকম শিশুকে সর্ব্ব-প্রথমে মামার বাড়ীর কাউকে বস্ত্রদান ক'রতে হয়।

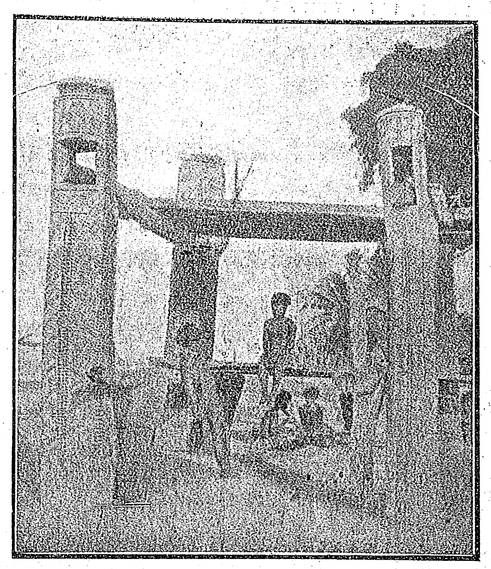

কোয়েতা সম্প্রদায়ের দেবালয়। (এই দেবালয়ে বিদেহ আত্মারা এসে মধ্যে মধ্যে বাস করেন, এই বিশ্বাসে কোয়েতা সম্প্রদায় এস্থানটিকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এবং তীর্থ বলে মনে ক'রে। কোনও গভীর সমস্যার সমাধান করবার প্রয়োজন হ'লে এইখানে তাদের পঞ্চায়েত বসে। যে লোক তার জীবনে সর্ব্ব প্রথম নরহত্যা ক'রেছে সে ই সভাপতির উচ্চ আসনে বস্‌তে পায়। এই মন্দিরের চারটি স্তম্ভ পুরুষানুক্রমে চার জন সর্দ্দারের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। স্তম্ভগুলি নানা কারুকার্য্যখচিত।)

বালক বালিকারা যৌবনে পদার্পণ করলে একটা বৃহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান করে তাদের

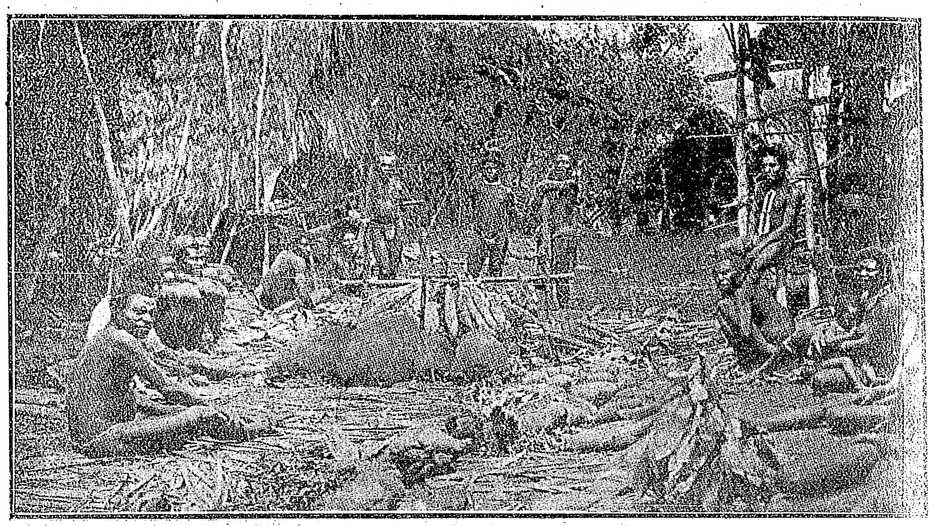

মাফুলুদের ভোজ (শিশুর প্রথম বস্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে মাফুলু সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসব ও ভোজের অনুষ্ঠান হয়

'সাবালক' বলে ঘোষণা করা হয়। এই 'সাবালক' করার পদ্ধতিটা এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের, কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা সেই আষ্ট্রেলীয়ার আদিম অধিবাসীদের 'সাবালক' হওয়ার মতনই। এদের মধ্যেও অনেক 'গুপ্ত সমিতি' আছে—যেখানে নাবালক ও নারীর প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। শিশুর সাবালকত্বের একটা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হচ্ছে যে তাকে এই গুপ্ত সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হয়।

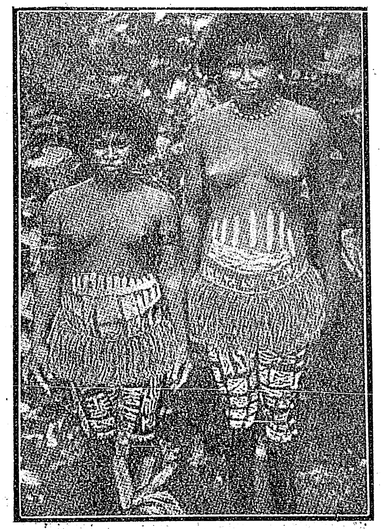

নিউগিনীর উল্কীপরা মেয়েরা

মেয়েরা প্রথম রজঃস্বলা হ'লে আমাদের দেশের মতই তাদের মধ্যে একটা পুষ্পোৎসবের আয়োজন হয়, এবং সেই প্রথম ঋতুমতী কন্যাকে কিছুকালের জন্য সমস্ত পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখা হয়। এই সময় বয়স্থা গৃহিণীরা কন্যাকে বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, এবং তার সর্ব্বাঙ্গে নানা চিত্র

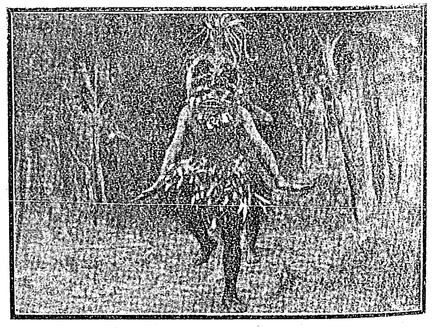

নৃত্যভঙ্গী (সম্মুখ দৃশ্য)

বিচিত্র উল্কী এঁকে দেবার ব্যবস্থা করে। তার পর সেই দীর্ঘ অজ্ঞাত বাস শেষ হ'য়ে গেলে উক্ত ষোড়শী কুমারী যদি কাহারও বাগ্‌দত্তা না হয় তবে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হ'য়ে কয়েক সপ্তাহ ধ'রে সে প্রতিদিন গ্রামের এমন কোনও একটী প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত থাকে, যেখানে তরুণ যুবকের দল তাকে দেখে আকৃষ্ট হ'তে পারে। সেই ভাবে সুসজ্জিতা ষোড়শী বালাকে কোনও প্রকাশ্য স্থানে প্রতিদিন অপেক্ষা ক'রতে দেখ্‌লে, অবিবাহিত যুবকেরা বুঝ্‌তে পারে যে, সে স্বামী অন্বেষণে বেরিয়েছে। তখন এই নিয়ে তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয় যে কে সেই তরুণীর মন হরণ ক'রে তার বরমাল্যটি আপন কণ্ঠে ধারণ ক'রতে পারে।

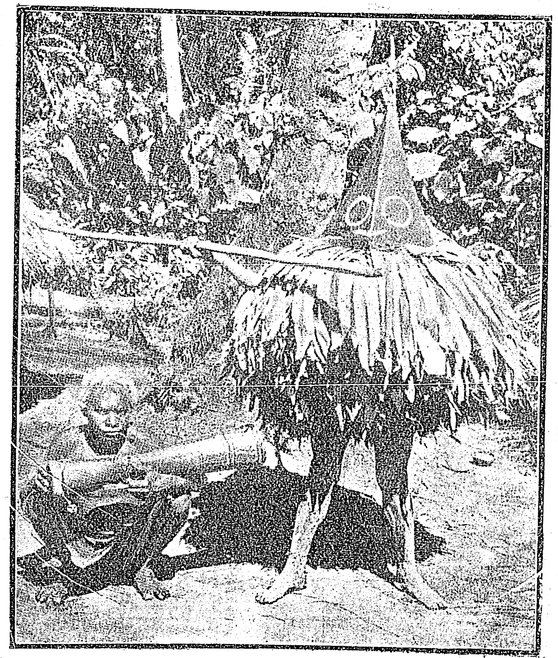

বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের মুখোসধারী নর্ত্তক। (এরা 'ডুকডুক্' নামক গুপ্ত সমিতির সভ্য। এদের সমিতির গুপ্ত অধিবেশনে নারী ও সাবালকদের প্রবেশ নিষেধ। এরা মধ্যে মধ্যে সমিতির গুপ্ত অধিবেশন থেকে ছুটকে বেরিয়ে চীৎকার ও তাণ্ডব নৃত্য ক'রতে ক'রতে গ্রামে এসে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের তাড়া ক'রে এবং ধ'রতে পারলে খুব প্রহার দিয়ে ছেড়ে দেয়।)

কর্ণবেধ ও নাসিকা-ছেদ ব্যাপারে যদিও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উৎসবের আয়োজন হয় না, তবে সেটা যে প্রায়ই একটা সমারোহ ব্যাপার হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। কারণ, গাঁয়ের যত ছেলে মেয়ে নাসিকা ও কর্ণবেধের উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের সকলকে একেবারে একসঙ্গে একদিনে এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়। এই কাজে যে লোক বেশ দক্ষ এমন একজনের বাড়ী তারা সকলে এসে উপস্থিত হয়। ওস্তাদ্ তখন মন্ত্র পড়তে পড়তে অস্থি নির্ম্মিত একটি ফোঁড় নিয়ে তাদের নাকে কানে ছিদ্র ক'রে দেয়। তার পর সেই ছিদ্র ক্রমশঃ বড় করবার জন্য তার মধ্যে ক্রমশঃ স্থূল হতে স্থূলতর গজাল পরিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপার শেষ হ'তে যত দিন লাগে, তত দিন পাত্র-পাত্রীদের সেই ওস্তাদের অতিথি হ'য়ে তার কাছেই বাস ক'রতে হয়। ওস্তাদ তাদের থাকবার জন্য পূর্ব্ব হ'তেই একটি অস্থায়ী অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়ে রাখেন। নাক কানের ক্ষত যত দিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠে, তত দিন তাদের রাঙা-আলুসিদ্ধ ছাড়া আর কিছু গুরুভার ভোজ্য খেতে দেওয়া হয় না। মাফুলু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে যে, নাসিকা ও কর্ণবেধের পর ওস্তাদের বাড়ী থেকে ছাড়া পেলে, গ্রামের মধ্যে ফিরে এসে একটী একহাত দেড়হাত লম্বা সর্প ধ'রে তাদের নাসিকা ও কর্ণের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সাপটিকে জীবিতাবস্থায় গলিয়ে নিয়ে যেতে হয়!

বিবাহ ব্যাপারের বিধি ব্যবস্থাও মেলানেশীয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। মেয়ে বিবাহ-যোগ্য হ'লেই তার অঙ্গ উল্কীর দ্বারা চিত্রিত ক'রে দেওয়া হয়। সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষকে কন্যা-লাভের জন্য পণ দিতে হয়। কোথাও এই পণের অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী কন্যাকে বাগ্‌দত্তা করবার সময় দিতে হয়, কোথাও বা বিবাহের সময় কি বিবাহের পরেও দেওয়া চলে। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে

যে, বাগ্‌দত্তা কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্বে কিছুদিন শ্বশুর গৃহে গিয়ে অবস্থান ক'রে আসতে হয়।

সেখানকার মেয়েরা মাতৃকুলের গোত্রভুক্ত এবং

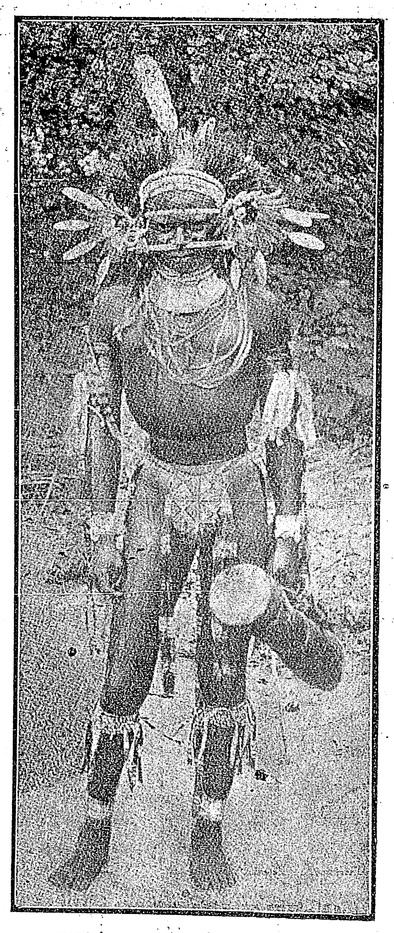

নৃত্যসজ্জা (রোয়ো ও মেকীয়ো সম্প্রদায়ের যুবকেরা উৎসব উপলক্ষে নৃত্য করবার জন্য সুসজ্জিত হ'য়ে আসে। তাদের এই নৃত্যসজ্জার প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে তারা খুব ক'সে কোমর বেঁধে ভ্রমরক'টির অনুকরণ করে।)

ছেলেরা পিতৃকুলের গোত্রভুক্ত থাকে বলে, সগোত্রে বিবাহ প্রথা তাদের মধ্যে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থলে বৈমাত্র ভ্রাতার সহিত বৈমাত্র ভগ্নীর বিবাহ হয়—এবং পিতা তার পত্নীর পূর্ব্ব স্বামীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ ক'রতে পারে। তবে এরূপ বিবাহ খুব বিরল। কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হ'লে তার কোনও নিকট আত্মীয়, যে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়, সে মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীকেও আপন পত্নীরূপে লাভ ক'রে, কারণ পণ দিয়ে স্ত্রী গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত থাকায় স্ত্রীকে তারা সম্পত্তির সামিল ব'লে গণ্য করে।

অত্যন্ত শৈশবাবস্থাতেই পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির ক'রে রাখা সে দেশের একটা সাধারণ নিয়ম। তবে শিশু বর বধূকে পরস্পরের বাগ্‌দত্তা ক'রে দেবার সময় বিশেষ কোনও উৎসবের অনুষ্ঠান হয় না। দু' একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য একটু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। এই উপলক্ষে কন্যাপক্ষের মহিলাদের বরপক্ষের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে মিলে-মিশে নৃত্য গীত ক'রতে হয়। বর বধূর বয়সের দিকে তারা কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে না। অনেক সময় যুবতী কন্যার সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহ বা প্রৌঢ়ের সহিত এক বালিকার পরিণয় প্রায়ই সম্পন্ন হতে দেখা যায়। যুবক যুবতীদের মধ্যে যে বিবাহ হয় তার অধিকাংশই প্রেম সঞ্জাত পরিণয়। অনেক সময় পিতা মাতা ও অভিভাবকেরাও যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে দেন।

যুবতীদের মন ভুলিয়ে তাদের চিত্ত জয় করবার জন্য সে দেশের যুবকেরা অনেক রকম প্রেমের কবচ ধারণ ও বশীকরণের তুকতাক্ অবলম্বন করে। কোনও যুবতীর প্রতি অনুরক্ত যুবক তাকে বিবাহের প্রস্তাব করবার সময় সাদরে সসম্ভ্রমে উক্ত যুবতীর গণ্ডদেশ স্পর্শ করে। তার এই ব্যবহারই বিবাহের প্রার্থনা জ্ঞাপন ক'রে, মুখে আর তাকে কোনও কথাই ব'লতে হয় না। যুবতীও তার সম্মতি বা অসম্মতিটুকু ইঙ্গিতেই প্রকাশ করে।

এদের মধ্যে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে আমরা আসছে বারে আরও কিছু বোলবো।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৬৩। পয়গম্বর সাহেবের জীবনী

মুসলমানদের এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সাহেবদের জীবনী কোন (বাংলা, ইংরাজী বা ফারসী) পুস্তকে আছে ?

৬৪। সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা গদ্য পুস্তক

বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গদ্য পুস্তকের নাম কি ও লেখক কে ?

৬৫। শিশুশিক্ষা

আমরা যেমন ছোট ছোট ছেলেপিলেকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা শিখাইবার সময় একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র প্রভৃতি শিখাই, অন্য কোন দেশে এই রকম কিছু আছে কি ? এবং থাকিলে উহা কি ?

মোহাম্মদ মনসুরউদ্দিন শাহজাদপুরী

৬৬। "সাত সমুদ্র তের নদী পার"

সাত সমুদ্র তের নদী পার—উহার অর্থ কি ? উহার কোন ইতিহাস আছে কি না ?

শ্রীকমলকামিনী দেবী

৬৭। পোড়া দাগ

আগুনে পুড়ে গায়ের চামড়া সাদা ও জড়ানো জড়ানো ভাব হইলে তাহা সহজে ও শীঘ্র কিরূপে পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক হয়।

শ্রীলাবণ্যপ্রভা দেবী

৬৮। রামধনুর বর্ণ

রৌদ্রে একটি ত্রিকোণাকার কাঁচে কোন বস্তু দেখিলে কিম্বা কেরোসিন তৈল মিশ্রিত জল কোন রৌদ্রযুক্ত স্থানে ঢালিলে রামধনুর ন্যায় যে ৭।৭টি বর্ণ দেখা যায়, ঐ বর্ণ প্রতি দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট মত ২।৩ ঘণ্টা পর পর পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কেন ? সূর্য্যের দূরত্বানুসারে কিরণের প্রখরতা হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু বর্ণ বৈষম্যের কারণ বুঝা যায় না।

শ্রীগিরিজানাথ নিয়োগী

৬৯। প্রত্নতত্ত্ব

নাটোর মহকুমায় উদীশা নামক ভদ্র পল্লীর এক মাইল পূর্ব্বে ও সোয়াইর নামক বিশিষ্ট গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী বৃহৎ পুষ্করিণীকে লোকে তদঞ্চলে "বাল্লালের দীঘি" বলিয়া থাকে। ইহা কি বল্লাল সেনের দীঘি ? দুয় পল্লীর এই অতি পুরাতন জঙ্গলে ঘেরা দীঘি রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির একবার দেখা উচিত। চৌগ্রাম-রাজধানীর দক্ষিণে, ঈষৎ পশ্চিমে, প্রায় দুই মাইলের মধ্যে এই পুরাতন দীর্ঘিকা অবস্থিত।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৭০। সিংহলের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

সিংহলের (Ceylon) ভৌগোলিক বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এমন কোন ইংরাজী অথবা বাংলা পুস্তকের নাম ঠিকানা সহ কেহ দিতে পারেন কি ?

শ্রীবিশ্বেশ্বর মণ্ডল

উত্তর

মেয়েদের মূর্চ্ছা রোগ

সম্পাদকের বৈঠকে শ্রীযুক্ত অনিলবাবু "মেয়েদের মূর্চ্ছা রোগের কারণ ?" প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন। দিন দিন এই কর্ম্মনাশা ব্যাধিটি যেরূপ বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদে—মূর্চ্ছা ও অপস্মার নামে দুইটি ব্যাধি পাওয়া যায়। এই ব্যাধির কারণ চরক লিখিতেছেন—রজঃ ও তমোগুণে যাহাদের চিত্ত অভিভূত, যাহারা বিকৃত, মলিন, অশুচি ও রজঃ তমোবর্দ্ধক দ্রব্য আহার করে, শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রতিকূলে শরীর চেষ্টা বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠান করে, এবং যাহাদের শরীর ক্ষীণ, তাহাদের রজঃ তমোগুণের আধিক্যবশতঃ অন্তরাত্মায় শ্রেষ্ঠ-নিকেতন হৃদয়কে বায়ু পিত্ত, কফ দোষ সকল আশ্রয় করে, তখন বায়ু পিত্ত কফদোষ গুলি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, হর্ষ, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগ কর্ত্তৃক সহসা উত্তেজিত হইয়া হৃদয় ও ইন্দ্রিয় স্থানকে পূর্ণ করিলে মনুষ্য স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। এবং স্মৃতি বুদ্ধি ও সত্ত্ব লোপ পাওয়ায় বীভৎস চেষ্টার সহিত অজ্ঞানাভিভূত হয়। ইহাকে অপস্মার বলে।

মূর্চ্ছা—হীনসত্ত্বগুণব্যক্তি বিরুদ্ধ আহার বিহার দ্বারা এবং মানসিক ও শারীরিক অভিঘাত জন্য বায়ু পিত্ত কফ দোষসকল যখন মন এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি বাহেন্দ্রিয় ও মনোবহ আভ্যন্তরিক স্রোত সকলকে অবরুদ্ধ করে তখন সে মূর্চ্ছিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সত্ত্বগুণের অভাব, রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি, শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রতিকূলে আহার বিহারাদি করা, এবং মনের অভিঘাত প্রভৃতি এই রোগের কারণ।

বর্ত্তমানে মেয়েরা যে ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাতে তাহাদের রজঃ তমোগুণের বৃদ্ধি, মনের অভিঘাত, চিত্তের উদ্বেগ প্রভৃতি কারণ যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। দেশ ও প্রকৃতি অনুযায়ী মেয়েরা সৎশিক্ষা পায় না। সময়মত বিবাহ না হওয়ায় যৌবনসুলভ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়

না। তাহার উপর প্রেমপূর্ণ নাটক নভেলগুলি "অগ্নিতে ঘৃতসংযোগের" ন্যায় চিত্তের চঞ্চলতা, মনের অবৈধ উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, আহার বিহার অধ্যয়ন—যাহা কিছু দৈনিক কৃত্য তাঁহারা করিয়া থাকে, তাহাতে সাত্ত্বিক ভাবের পোষণ কিছুই হয় না।

যাহারা বিবাহিতা তাহাদেরও দিন চর্য্যা "ঋতুচর্য্যা" শিক্ষার অভাবে রোগের কারণগুলি যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। মনে হয় এইজন্যই বাঙ্গালীর ঘরে এই ব্যাধিটি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই রজঃতমোপ্রধানা। হিন্দুশাস্ত্রে বলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রজোগুণ অষ্টগুণ বেশি। সে স্থলে কতদূর পবিত্র সাত্ত্বিক বৃত্তি আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর গৃহে এ ব্যাধিটির নাম ক্বচিৎ শুনা যাইত। তাঁহার কারণ মেয়েরা অতি অল্প বয়স থেকে ঠাকুর দেবতার কার্য্যে, গৃহকর্ম্মে এবং রামায়ণ, মহাভারতাদি সদগ্রন্থ পাঠে দিন যাপন করিত। তাহাতে জীবন পবিত্র সত্ত্বভাবে গঠিত হইত, অবৈধ উত্তেজনার কারণ কোন প্রকারেই ঘটিত না।

স্ত্রীলোকদের মাসিক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম (ঋতু গোলমাল) হইলে মূর্চ্ছারোগ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, যাহার যেরূপ স্বাভাবিক বল তাহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যদি রজঃস্রাব হয়, তাহা হইলে ক্রমে স্নায়ু সকল দুর্ব্বল হয় এবং শরীরে স্নেহ ভাগ কম হওয়ায় কৃষ্ণাংশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কৃষ্ণগুণের বৃদ্ধি হইলে বায়ু কুপিত হয়, কুপিত বায়ু পিত্তধাতুকে বিকৃত করত, মন এবং মলোবহ স্রোত সকল অবরুদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছা জন্মায়। এইরূপ অল্প রজঃ বা কষ্ট রজঃস্রাবে স্বাভাবিক ধর্ম্মের গতিরোধ হওয়ায় বহির্মুখস্থ রজঃ (ঋতু) অন্তস্থ হইয়া উষ্মার পরিণত হয় এবং স্নায়ু সকলকে ক্রমে দূষিত করিয়া উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগ উৎপন্ন করে। এইজন্য শাস্ত্রে "ঋতু চর্য্যা"র উপদেশ দিয়াছে। এখানে রোগের নিদান তত্ত্ব বিস্তৃত রূপে লিখিত হইল না; কারণ সকলের রুচিসঙ্গত নাও হইতে পারে। শ্রীশ্যামানাথ শাস্ত্রী

রাধাষ্টমী

পদ্মপুরাণে উত্তরাখণ্ডে শ্রীরাধা জন্মাষ্টমী ব্রতকথা কথন মাহাত্ম্য নামক ১৬২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পর শুক্লাষ্টমীতে রাধার জন্ম হয়। তদুপলক্ষে রাধাষ্টমীব্রত হইয়া থাকে।

যথা—

ভাদ্রস্য কৃষ্ণ পক্ষেতু হরিজন্মাষ্টমী যদা।
তস্যাঃ পরেতু বা শুক্লা তস্যাং জাত্য হরিপ্রিয়া॥

Balance sheet

Balance sheetএর বাঙ্গলা নাম রেওয়ার কাগজ।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতু পূজা

"মিত্র শব্দে সূর্য্য; মিত্র হইতে ক্রমশঃ মিতু ও ইঁতু হইয়াছে।"

(শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন কৃত আহ্নিক কৃত্যম্ ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)

পায়ের কড়া

রাত্রিতে স্পিরিট টার্পেন্টাইনে তুলা ভিজাইয়া কড়ার স্থানে বান্ধিয়া রাখিলে কড়ার কাঠিন্য অতি সত্বর বিদূরিত হয়।

শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'স্তনের অগ্রভাগ'

আমাদের দেশে দেখা যায়, স্তনের অগ্রভাগ (areola) সাধারণতঃ কাল। বিলাতী মেমেদের স্তনের অগ্রভাগ কুমারী অবস্থায় গোলাপী বর্ণের (delicate rosy hue), গর্ভধারণের দ্বিতীয় মাসের পর থেকে উহা কাল বর্ণের হইতে আরম্ভ করে, (due to deposition of pigment granules in the malpighian layer of the skin. সুতরাং গর্ভ হইয়াছে কি না জানিবার ইহা একটা চিহ্ন।

—শ্রীচৈতন্য

৺চণ্ডীর শ্লোক সংখ্যা

দেবী মাহাত্ম্যে চণ্ডীর অপর এক নাম সপ্তশতী স্তব। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, চণ্ডীতে সাতশত শ্লোক লিখিত হইয়াছে; কিন্তু চণ্ডীর শ্লোক গণনা করিলে ৫৭৮টি শ্লোক পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে, উত্তর পশ্চিম এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে "ঋষিরুবাচ" "দেব্যুবাচ" ইত্যাদি শব্দযুগল মাত্রকে একটি শ্লোক বলিয়া ধরিয়া কোন রকমে ৭০০ সংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। চণ্ডী রচনার সময় সাতশত শ্লোক ছিল, এ বিশ্বাস বোধ হয় শতকরা ৯০ জনের। তবে গতানুগতিক ন্যায়ে ঐ রূপ শ্লোককে ৭০০ গণ্য করিয়া সকল দেশে পাঠ করা হইতেছে। পশ্চিম দেশে চণ্ডীপাঠকে দুর্গাপাঠ বলে। এখানে কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা মায়ের বাড়ীতে প্রায় দিবারাত্রি চণ্ডী পাঠ হইয়া থাকে। আমি এ দেশের কয়েক জন পণ্ডিতকে শ্লোক সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। তাঁহারা প্রায় সকলেই কাত্যায়নী তন্ত্রের দোহাই দিয়া বলেন যে, সপ্তশতী অর্থ ৭০০ হবন মন্ত্র—শ্লোক নহে। ইহাদের এই ধারণার মূল হচ্ছেন—

"অষ্ট সপ্তত্যুত্তরাণা শ্লোকানাং শত পঞ্চকম্
প্রোক্তং সপ্তশতী স্তোত্রং তৎসপ্তশত সংখ্যয়া
বিভজ্য জুহুয়ান্মন্ত্রমিতি কাত্যায়নী মতম্।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় চণ্ডীর সংস্করণেও এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই মত কি ঠিক, না ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ ফল বিধায়িনী চণ্ডীর অবশিষ্ট ১২২ শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে? কাত্যায়নী তন্ত্রমতে মন্ত্র বিভাগেরও বহু মতান্তর আছে। বাহুল্য ভয়ে প্রথম অধ্যায়ের মাত্র প্রথম কয়েকটা শ্লোক দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। "মার্কণ্ডেয় উবাচ" এক মন্ত্র, সাবর্ণি, সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সপ্তদশ মন্ত্র এবং একটি অর্দ্ধ শ্লোকে একটি মন্ত্র সাকুল্যে উনবিংশতি মন্ত্র; এই অর্দ্ধ শ্লোক "প্রত্যুবাচ সতং বৈশ্য প্রশয়াবনতো নৃপম্' অনেকে বলেন, আবার কোন কোন প্রাচীন টীকাকার "সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র-মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ" এই অর্দ্ধ শ্লোককেই একটা মন্ত্র বলিয়াছেন। এইরূপ বহু স্থানে মতান্তর। এ স্থলে যেখানে

একটা বিষয়ে এত ভিন্ন মত, সেটা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে; সুতরাং এই বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ সন্দিহান থাকায় আপন আপন মত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাত্যায়নী-তন্ত্র ছাড়া আর কোন তন্ত্রে কি এ বিষয়ের উল্লেখ আছে? বারাহী তন্ত্রে চণ্ডীপাঠ ফল বিশেষ ভাবে বিবৃত। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা নাই। তাহাতে মনে হয় যে বারাহী তন্ত্র প্রকাশের সময় চণ্ডীর শ্লোক সংখ্যা হয় ত পূর্ণ ৭০০ ছিল; এই জন্য অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই।

রুদ্রযামলে—"পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ
সমাপয়েত্তু তস্যান্তে সাবর্নিভবিতা মনুরিতি"

ইহাতে "মাকণ্ডেয় উবাচ" ইহা ধরা হয় নাই। কাজেই ইহা সপ্তশতীর মধ্যে নয় এবং শ্লোক মধ্যে পরিগণিত নহে, যদিও আধুনিক পাঠকেরা জোর করিয়া সঙ্কল্প সময়ে এটিকে সঙ্কল্প মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

চিন্তেশ্বর তন্ত্রে এ বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে নাই; যথা—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্তঃ স্তবঃ সপ্তশতাভিধঃ। স্তবস্য পঠনাস্য সর্ব্বসৌখ্যং লভেৎপ্রবং। তস্মিন দেব্যাঃ স্তবে পুণ্যে মন্ত্রাঃ সপ্তশতং শিবে। ইহাতে "মন্ত্রাঃ শব্দ পাওয়া যাইতেছে বটে কিন্তু সেই নিঃশ্বাসেই "স্তবস্য পঠনাস্য—" পাওয়া যাইতেছে।

সঙ্কেতমন্ত্র প্রদীপে—"পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বকাম সমৃদ্ধয়ে" পাই;—এখানে হবনের কথা নাই। অর্গলা প্রভৃতিতেও পাঠ শব্দ পাওয়া যায়, হবন শব্দ নাই। এ ত গেল বাহিরের প্রমাণ। চণ্ডীর ১২ অধ্যায়ে মায়ের শ্রীমুখেরই উক্তি ৭ম শ্লোকে "তস্যান্নমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ" অপিচ নবম শ্লোকে "যত্রৈতৎ পাঠ্যতে সম্যক্ত নিত্যমায়তনে মম" ঐ অধ্যায়ে বহুস্থানে পঠন ও শ্রবণ পাওয়া যায়—হবন শব্দের নামও নাই। ইহা অপেক্ষা প্রবলতর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আর কি আবশ্যক?

এই কাশীক্ষেত্রে কাত্যায়নী তন্ত্র মতে হবন করিতে দেখা বা শুনা যায় না। কাজ কাত্যায়নী তন্ত্র মতে হয় না; শুধু দোহাই দিবার সময় বা আত্মম্ভরিতার সময় তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ। আমরা বিংশ শতাব্দীর (উনবিংশও বটে) লোক সমর্থন (corroboration) ব্যতিরেকে কোন প্রধাণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই জন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ দয়া করিয়া আমাকে কোন তন্ত্র কি পুরাণ হইতে সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাইয়া দেন ত চিরবাধিত হইব। নেপাল, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি আনাইয়া শ্লোকগুলি যতদূর সম্ভব উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছি। ৺কাশীবাসী কয়েকজন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা হুঁ, হাঁ করিয়া সরিয়া পড়েন। চণ্ডী অসম্পূর্ণ স্বীকার করিলে তাঁহাদের পাঠে অঙ্গহীনতা দোষ জন্মে; কিম্বা কে এ বাজে কথায় সময় নষ্ট করে, ভাবিয়া পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেন।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপীলিকা, মাছি ও মশা নিবারণের উপায়

গত পৌষ মাসের "সম্পাদকের বৈঠকে" দেখা গেল—ভাদুড়ী মহাশয় "পিপীলিকার উৎপাতে" বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক বন্দুক-কামান প্রভৃতির প্রয়োগেও পিপীলিকা-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া, বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে উহাদিগকে আর "হাতে না মারিয়া" একবার "ভাতে মারিবার" চেষ্টা দেখিলে ভাল হয়। পিপীলিকা ক্ষুদ্র জীব হইলেও উহারা অতিশয় লোভী ও সঞ্চয়ী। গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে তৈল ও মিষ্টদ্রব্যের প্রতি উহাদের প্রবল লোভ। এই দুইটী সূত্রে উহাদের আক্রমণ করিলে, বোধ হয়, উহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বিশ্বাস—যে-সকল স্থানে উহারা আসিয়া জোটবদ্ধ হয়, ঐ সকল স্থান নিশ্চয়ই—হয় কোন প্রকারে নারিকেল বা সরিষা-তৈল-সিক্ত থাকে—না হয় মিষ্টদ্রব্য সংযুক্ত হইয়া থাকে। খালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর প্রভৃতিতে মাথা বা গায়ের তৈল প্রায়ই লাগিয়া থাকে, অথবা ছেলেপুলে দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে বিছানা পত্রাদিতে কোনরূপে মিষ্টদ্রব্যের সংযোগ ঘটাও বিচিত্র নহে। ট্রাঙ্ক ইত্যাদির মধ্যেও জননীগণের পরিহিত কাপড় চোপড়ে বালকদিগের দ্বারা ঐরূপ মিষ্টদ্রব্যের সংযোগ বা কোনরূপে তৈল সংস্পৃষ্ট হওয়ায়, উহারা খাইবার লোভে উহার মধ্যে প্রবেশ করে;—এবং জাতীয় স্বভাব বশতঃ—এক স্থানে উহাদের আগমন হইলে—পার্শ্ববর্ত্তী সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। তজ্জন্য ঐ-সকল কাপড় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাপড়-জামা ইত্যাদিতে প্রবেশ করে, এবং ঐ গুলি নষ্ট করিয়া থাকে। ময়লা কাপড় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইলে বা ঐরূপ তৈলসিক্ত হইলেও উহা খাইবার লোভে আসিয়া থাকে এবং কাপড় কাটিয়া লইয়া যায়। কাপড়ে মিষ্টদ্রব্য বাঁধিয়া রাখিলে, কাপড় ফুটা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। যাঁহারা অধিক পরিমাণে তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের গামছা বা তোয়ালে প্রভৃতিতে ঐরূপ পিপীড়া ধরিয়া থাকে এবং কাটিয়া নষ্ট করে।

সে যাহা হউক পিপীলিকাক্রান্ত ঐ-সকল বিছানাপত্র বা কাপড় চোপড় সাবানজল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া বা ধুইয়া ফেলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে আর পিপীলিকার উপদ্রব হইতে পারিবে না।

অন্যান্য কারণেও পিপীলিকার উপদ্রব হওয়া সম্ভব। বিছানা বা খাট ইত্যাদিতে যদি ছারপোকা আরশোলা বা অন্য কোন কীট ডিম পাড়িয়া থাকে, অথবা উহার মধ্যে কোন মৃত পোকা ইত্যাদি থাকে, তাহা খাইবার লোভেও উহারা আসিতে পারে; তজ্জন্য বিছানা পত্রাদি রীতিমত রৌদ্রে দিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, এবং মাদুর বা খাট ইত্যাদি ফুটন্ত গরম জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে। বিছানা এবং কাপড়গুলি উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন রীতিমত রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন যে-স্থানে পিপীলিকার গর্ত্ত রহিয়াছে,—একটী হাঁড়ির মধ্যে কিঞ্চিৎ গুড় রাখিয়া বা গুড়হাত মাখাইয়া দিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া দিবে—হাঁড়িটী কাৎ করিয়া রাখিলে অথবা উহার গায়ে একস্থানে

একটু গুড়ের ছিটা দিয়া রাখিলে, গন্ধে শীঘ্র পিপীলিকা আসিয়া জুটিবে এবং সমস্তগুলি হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবে। পরে হাঁড়িটী উঠাইয়া লইয়া আগুনের উপর বসাইয়া দিলে পিপীলিকাগুলিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। আবশ্যক হইলে আরও ২।১ বার ঐরূপ করার প্রয়োজন, কিন্তু পিপড়া, মশা ও মাছির পক্ষে ধূঁয়ার গন্ধ অতি অসহ্য। তজ্জন্য হাঁড়িগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে, কিম্বা আর একটা নূতন হাঁড়ির দরকার। পিপীড়ার সারি ধরিয়া গর্ত্তের মুখ পর্য্যন্ত জুন খড় (উলুখড়) বা নারিকেল পাতা জ্বালাইয়া সারিগুলি পুড়াইয়া দিতে হইবে, একবার স্থলে দুই তিনবার ঐরূপ করিতে হইবে; তাহা হইলে ধূঁয়ার গন্ধে উহারা আর ঐ পথে আসিতে চাহিবে না। ২।১ মিনিট পর্য্যন্ত গর্ত্তের মুখে আগুন জ্বালাইতে হইবে।

অতঃপর মাছির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

মাছির উপদ্রবে সময়ে সময়ে লোকে বড়ই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, এমন কি খাইতে শুইতেও আরাম পায় না। ইতঃপূর্ব্বে একবার এই "ভারতবর্ষ" পত্রে বৈজ্ঞানিক ভাবে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা নিবারণ জন্য পল্লীগ্রামে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) যে-গৃহে দল বাঁধিয়া মাছি উপস্থিত হইবে, একটী হাঁড়িতে গুড়-মাখান ভাত, অথবা আঁইস বা পচা মাছ ইত্যাদি রাখিয়া দূর হইতে মাছিগুলি তাড়াইতে থাকিবে, তাহা হইলে উহারা আপনাআপনি আসিয়া গন্ধে অকৃষ্ট হইয়া হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবে; কিন্তু হাঁড়ির গায়ে বা বাহিরে যেন ঐ-সকল দ্রব্য কিছু না থাকে—তাহার পর, যখন বহু পরিমাণে মাছি উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে দেখা যাইবে, তখন আস্তে আস্তে উহার মুখে একটী সরা চাপাইয়া বা কাপড় বাঁধিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু সাবধান, উহারা বড়ই চতুর—একটু বিপদাশঙ্কা জানিতে পারিলে সদলে উড়িয়া পলাইয়া যাইবে। তাহার পর হাঁড়িটী আগুনের উনানে বসাইয়া দিলে মাছিগুলি সব মরিয়া যাইবে। এইরূপ ২।৩ বার করিলে আর মাছি থাকিবে না। কিন্তু হাঁড়িগুলি প্রত্যেক বারে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে, অথবা নূতন হাঁড়ির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ উহারা আর ঐ হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবে না। মাছি ও মশার পক্ষে ধূঁয়া ও ধূঁয়ার গন্ধ অতি বিরক্তিকর। মৌচাক ও ভীমরুলের বাসা ভাঙ্গিতে হইলে ধূঁয়া লাগাইয়াই উহাদিগকে তাড়াইতে হয়।

(২) ধূনার গন্ধও মাছিদের বিষম বালাই। ধূনা বা তদ্রূপ কোন সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধ পাইলে, মাছি তথায় অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। আহারাদির সময় ধূনাচিতে ধূনা দিয়া পাখা বা কাপড়ের দ্বারা ঐ ধূঁয়া পরিচালিত করিলে আহার্য্য দ্রব্যের উপর কিছুতেই মাছি বসিতে পারে না। যে সকল ময়রার দোকানে প্রত্যহ তিন বেলা রীতিমত ধূনা পোড়ানো হয়, সেখানে মাছির উপদ্রব কম দেখা যায়। এই কারণেই আমাদের আর্য্য ঋষিগণ দেবতার ভোগের সময়—ধূপ, ধূনা ও দীপের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ময়রা-দোকানের ন্যায় স্তূপীকৃত ভোগের নানাবিধ সুমিষ্ট সামগ্রী পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও উহার নিকটও একটীও মাছির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না; কারণ, দেবগৃহে ঐ সময়ে প্রায় প্রচুর ধূনার ধূঁয়ায় ভরপুর করিয়া দেওয়া হয়। এমনকি মাছি ধরিয়া কোন-রূপে দুই রোগ-বীজ দ্বারা সংক্রামিত না হইতে পারে—তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা। পুষ্প-চন্দন ও ধূপ-ধূনার গন্ধে দেবস্থানটি সর্ব্বদা সুগন্ধিত থাকে বলিয়া, মাছি মহাশয়েরাও ও-দিক আর একটা মাড়ান না।

(৩) ঘৃত ও তৈল মাছির মারাত্মক বিষ—

জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া মাছি বাঁচিয়া যায়, কিন্তু ঘৃতে বা তৈলে একবার পড়িয়া গেলে—মৃত্যু, তৎক্ষণাৎ অনিবার্য্য; তাত ইত্যাদির উপর ঘৃত মাখাইয়া দিলে, উহাতে মাছি বসিতে পারে না, বসিলেও তৎক্ষণাৎ প্রাণ লইয়া উড়িয়া পলায়।

মশক নিবারণের একমাত্র উপায় ধূম প্রদান—

উড়িষ্যাবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা সন্ধ্যার সময় একটী "লুখা" (উনন ধরাইবার "মুড়া") জ্বালাইয়া ঘরের ভিতর আনাচে কানাচে ধূঁয়া দিয়া মশা তাড়াইয়া ঘরের কপাটটী বন্ধ করিয়া দেয় এবং নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিযাপন করেন। মশার আর কোন দৌরাত্ম্য পোহাইতে হয় না এবং মশারিরও আবশ্যক করে না। ঐরূপ গো-শালায়ও সাঁতসেতে খড়ে আগুন ধরাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে ধূঁয়ার সঞ্চার করিয়া দিলে সারারাত্রি গরুগুলি মশার কামড়ে আর জ্বালাতন হয় না। মশা-মাছির সময় অর্থাৎ বর্ষাকালে সকল গৃহস্থই প্রতিদিন এই রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি যে-সকল মশা ঐ ধূঁয়া না মানিয়া হেকায়েত করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের পাখাগুলি খসিয়া যায় এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাহারা চির-শয্যায় শয়ন করে।

শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গতবারে সবুজ আলুর প্রসঙ্গে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার লেখকের নামটি দৈবক্রমে ছাপিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। ঐ অংশটির লেখক—শ্রীশচীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় বস্ত্র-বাণিজ্য

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার

বস্ত্র-বাণিজ্যের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে তুলার কথা আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয়, এবং তুলার আমদানি ও রপ্তানির কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল বস্ত্রের কথা বলিলে ভারতের তুলার ব্যবসায় সমুদায় বস্ত্র-বাণিজ্যে কি স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন; কারণ একমাত্র ভারতীয় রপ্তানি তুলার মূল্য ভারতে আমদানি তুলাজাত দ্রব্যাদির মূল্যের অপেক্ষা অধিক। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩ সালে ভারত হইতে তুলা রপ্তানি হইয়াছিল ৮১ ক্রোর টাকার, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা ভারতে আমদানি করিয়াছিলাম ৬৬ ক্রোর টাকার তুলায় নির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

প্রথমতঃ দেখা যাক ভারতে কত পরিমাণ জমিতে কত পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইতেছে। সরকারি নীল-কেতাবে দেখা যায় যে গত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তায় ভারতে প্রতি বৎসর মোট ২১,০৫৮ হাজার একার জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে, ও তাহাতে ৪,৬০৮ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড। এই যে তুলা, তাহার প্রায় সবই রপ্তানি হয়, যদিও আমরা শুনিয়া থাকি যে ভারতীয় তুলা লম্বা আঁইসযুক্ত না হওয়ার দরুণ তেমন মজবুত ও ভাল নয়। নিম্নের হিসাব হইতে ভারতে তুলার আমদানি ও রপ্তানীর ধারা বুঝা যাইবে:—

		১৯২১	১৯২২	১৯২৩
আমদানি	টন	২৭,১৬৮	১২,২৮১	১২,১৭৯
	লাখ টাকা	৩,৭৮	২,০১	২,২৯
রপ্তানি	টন	৪৭৪,৪৫২	৫২১,০৬৯	৬২৯,৭২৪
	লাখটাকা	৪৫,৮৯	৫৯,০৭	৮১,৩০

এই রপ্তানি ব্যতীত আবার পুনঃরপ্তানি অর্থাৎ বিদেশী তুলা ভারতে আমদানি হইয়া আবার অন্যান্য বিদেশে প্রেরণ ব্যাপারও আছে, কিন্তু তাহা তুলনায় কম। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের "নিকৃষ্ট" তুলার বিদেশে যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং তাহার ফলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বিদেশ হইতে তুলা কিনিতে হয়। গত বৎসর যুক্তরাজ্য ৬ ক্রোর, জার্ম্মেণী ৫ ক্রোর, বেলজিয়ম ৬ ক্রোর, ফ্রান্স ৩ ক্রোর, স্পেন ২ ক্রোর, ইটালি ১০ ক্রোর, অষ্ট্রিয়া ১ ক্রোর, চীন ৯ ক্রোর ও জাপান ৩৬ ক্রোর টাকার ভারতীয় তুলা লইয়াছে। ইহা ছাড়া ছোটখাট অন্যান্য দেশও আছে। ফলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বিদেশ হইতে নিজেদের লজ্জানিবারণের জন্য তুলা আমদানি করিতে হইতেছে। অর্থনীতিবিশারদেরা বলিবেন ইহাতে আমাদের লাভ ব্যতিরেকে লোকসান নাই, যেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রের উপদেশ—সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বাজারে মাল খরিদ করা ও সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য বাজারে বিক্রয় করা। আমেরিকান, ইজিপ্‌সিয়ান্ ও ভারতীয় তুলা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও জন্মেও প্রচুর। সেইজন্য যত কাপড়ের কলকারখানা-বহুল দেশগুলি তুলা উৎপন্ন হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই চুক্তি-সর্ত্তে খরিদকার্য্য সমাধা করিয়া রাখেন। এই ব্যাপারে রাজনীতিক স্বাধীনতা, স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী, বীমা, আনয়ন প্রেরণের নৈকট্য, বা জাহাজ ভাড়ার স্বল্পতা ইত্যাদির সমবেত সুবিধা স্বাধীন জাতি-দিগের পক্ষে যত সাহায্যকারী, আমাদিগের পক্ষে ততটা নহে। এতদ্ব্যতীত বলবান ও ধনশালী জাতিরা ব্যাঙ্কের সাহায্যে তুলা উৎপাদনকারী দেশ হইতে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলা কিনিয়া থাকে এবং পরে অন্যান্য দেশ-গুলিকে সেই তুলা অধিক দরে কিনিতে বাধ্য করে। সকলেই জানেন যে ইংলণ্ডে তুলার চাষ হয় না এবং ভারতে যথেষ্ট চাষ হয়, অথচ সেই ইংলণ্ড হইতে প্রতি মাসে কিছু না কিছু তুলা ভারতে আমদানি হয়। ইংলণ্ড ধনশালী ও প্রচুর পরিমাণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিদ্যায় শিক্ষিত, এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায়শঃ ইংরাজের হাতে থাকায় জগতের নিভৃততম দেশের যাবতীয় বাড়তি তুলা তাহার পক্ষে একচেটিয়া করিয়া ভারতের ধাপার মাঠে ফেলা কিছু

আশ্চর্য্য নহে। ১৯২১ সালে ইংলণ্ড হইতে ভারতে ২,১৯ লাখ, ১৯২২ সালে ৫১ লাখ ও ১৯২৩ সালে ৫৩ হাজার টাকার তূলা আমদানি হইয়াছে। ইহার অর্থ কি?

এখন দেখা যাক তূলা-নির্ম্মিত কি কি জাতীয় দ্রব্যাদি আমাদিগকে আমদানি করিতে হয়। প্রধান প্রধান জিনিসগুলি এই,—সূতা—কাপড় বুনিবার ও সেলাই করিবার, যথা, রুমাল, মোজা, গেঞ্জি, তোয়ালে ইত্যাদি, পরিধেয় বস্ত্রাদি ও ফেল্ট, ইত্যাদি। ভারতে প্রায় ২৮০টি তূলার কল কারখানা থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে এই সকল জিনিস আমদানি করিতে হয়। ইহা আমাদিগের বুদ্ধিমত্তার বা শ্রমশীলতার আদৌ পরিচায়ক নহে। আমাদের দেশে মিহি সূতা প্রায় একরূপ উৎপন্নই হয় না, সেই জন্য যাবতীয় মিহি সূতা ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি আমাদিগকে বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়। মোটা সূতা (১নং হইতে ২৫নং) ১৯২২—২৩ সালে ভারতে ৬৩৩,৬৩৬ হাজার পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বিদেশ হইতে ১৩,৮৭০ হাজার পাউণ্ড আসিয়াছিল, মাঝারি সূতা (২৬নং হইতে ৪০নং) ৬৯,৮০৩ হাজার পাউণ্ড উৎপন্ন ও ৩১,৩৬৫ হাজার পাউণ্ড আমদানি,এবং মিহিসূতা (৪০নং এর অধিক) ২,১৯৫ হাজার পাউণ্ড উৎপন্ন ও ৬,২২২ হাজার পাউণ্ড আমদানি হইয়াছিল।

উপরে যে ভারতীয় তূলার কারখানার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ যেন অনুমান না করেন যে সবগুলিই বস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা, বা বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রে চালিত কারখানা। অধিকন্তু এখানে কারখানা অর্থে সেইগুলিই অনুমিত হইবে যেগুলিতে প্রাত্যহিক শ্রমিকের সংখ্যা ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ জন ও যাহার হিসাব সরকারি বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত অনেক চরকার বা হস্তচালিত তাঁতের কারখানা আছে যাহার হিসাব সরকারি বিবরণীতে প্রকাশিত হয় না, কারণ, হয় তাহারা অতি ক্ষুদ্র না হয় অস্থিস্রোয়ী। প্রত্যেক কারখানায় এক রকমের কার্য্য করা হয় না। কোনটিতে তূলার বীজ ছাড়ান, গাঁইট বাঁধা, সূতা প্রস্তুত করা, সূতা রং করা বা ইহার একাধিক কার্য্য হয়। বেশীর ভাগ দেশী কলওয়ালাদিগকে দেশী সূতা বা বিদেশী সূতা কিনিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে হয়। খাঁটি স্বদেশী কল, অর্থাৎ দেশীয় কোম্পানির তত্ত্বাবধানে দেশে উৎপন্ন সূতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করান এরূপ কলের সংখ্যা কুড়ি পঁচিশটি হইবে কি না সন্দেহ।

তূলার নির্ম্মিত প্রধান প্রধান দ্রব্যাদির আমদানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২১ লাখ	১৯২২ লাখ	১৯২৩ লাখ
(১) সূতা (হাজার পাউণ্ড)	৪৯,২১৪	৬৩,৬৪৮	৪৭,৩৭৩	১০,৭৪	১০,৭৮	৭,৮১
(২) মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি	—	—	—	৭৪	৭১	৯৬
(৩) বস্ত্রাদি (হাজার গজ)——						
(ক) কোরা	৬৫৯,২৪৯	৮২৮,৪১১	৭২৪,২৪৯	২৪,৫৫	২৭,৪৭	২২,৯৪
(খ) ধোয়া	২৯১,৮৩৬	৩৮২,৭৮১	৪৯০,২৮৪	১২,২৪	১৪,৬০	১৪,৯৮
(গ) রঙ্গিন	১৯৬,৫৭৩	২০২,৯৭৫	৩৩৮,৭৭৮	১১,৭৬	১০,৪৪	১৭,২৯
(ঘ) ফেল্ট	১১,০৪২	১৪,৪৩৫	১৬,৭৭১	৩০	৪১	৫৬
(৪) সেলায়ের সূতা (হাজার পাউণ্ড)	৯৮৮	১,১৭৯	১,৩৭৪	৭০	৭৩	৬৭
(৫) অন্যান্য	—	—	—	১,০৬	৮১	১,০৬
মোট আমদানি	—	—	—	৬২,০৯	৬৫,৯৫	৬৬,২৭

ইহার মধ্যে ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে কত টাকার বিদেশী মাল আমদানি হয় নিম্নের তালিকায় তাহা দেখা যাইবে :—

	১৯২১ লাখ	১৯২২ লাখ	১৯২৩ লাখ
বাংলা	২৯,৩০	৩০,৪৯	২৮,৩১
বোম্বাই	১৬,১৪	১৭,৫৬	১৯,০৫
সিন্ধু	৭,৭৭	৭,১২	৯,১৯
মাদ্রাজ	৪,৯৩	৪,৯০	৪,৮৭
ব্রহ্ম	৩,৯৫	৫,৮৮	৪,৮৫
মোট	৬২,০৯	৬৫,৯৫	৬৬,২৭

এই পাঁচটি প্রদেশ জলপথে বিদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই জন্য উপরি উক্ত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের ব্যবহারের জন্য মাল এই সকল প্রদেশের মারফৎ আনীত ও প্রেরিত হয়। এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে আমাদের বাংলা দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরমুখাপেক্ষী। ইহার কারণ আর যাহাই হউক বাংলা যে বেশী রাজভক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা এই যে বাংলার সহিত সংযুক্ত বিহার উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসাম ইত্যাদি সকলকে বাংলার মারফৎ আমদানি করিতে হয়, কারণ হয় তাহাদিগের সমুদ্র উপকূল নাই, না হয় যদি বা থাকে তাহা হইলে সেখানকার বন্দরে বড় বড় বিলাতি জাহাজ থামে না। কাজেই বাংলার সংখ্যামালা কিছু গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী কোন্ কোন্ দেশ আমাদিগকে কত মূল্যের মাল উপহার দিয়া মনোরঞ্জন করেন নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

	১৯২০-২১ লাখ	১৯২১-২২ লাখ	১৯২২-২৩ লাখ
যুক্তরাজ্য	৮১,১১	৪৭,৪০ *	৫৯,২৩
বেলজিয়াম্	১,৪৮	১,১০	১,০৬
সুইট্জারল্যাণ্ড্	৭০	৩১	৪৫
ইটালি	১,৩৬	২৭	২৪
জাপান	১৪,৯৩	৬,৪৮	৮,১৯
আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য	৯৭	৮১	২৯
অন্যান্য দেশ	১,৫৭	৫৭	৪৭
মোট	১,০২,১২	৫৬,৯৪*	৭০,১৩

তারা * চিহ্নিত বর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমদানি অনেক কমিয়াছে এবং পর বর্ষে বেশ মাথা তুলিয়াছে। এ বৎসর সবিশেষ পিকেটিংএর এই ফল। অতঃপর পুঃ সপ্তানির একটি তালিকা দিলাম :—

		১৯২১	১৯২২	১৯২৩
(১) তূলা	(লাখ টাকা)	২৪	১,২৭	১,৫১
(২) সূতা	”	১০	২০	২১
(৩) বস্ত্রাদি	”	৩,৫৬	৩,১৩	২,৯৫
(৪) অন্যান্য	”	২৫	১৬	১১
মোট	”	৪,১৫	৪,৭৬	৪,৭৮

এখন রপ্তানির কথা আলোচনা করা যাক। আমাদের ভারতবর্ষ কাঁচা মালের দেশ। কিন্তু হয়ত অনেকে জানেন না যে আবার এই ভারতবর্ষই পৃথিবীর আটটি বৃহত্তম কল-কারখানা-বিশিষ্ট দেশের অন্যতম, এবং ইংলণ্ডের দুই আনা পরিমাণ লোক এই কামধেনুর দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করে। কি পরিমাণ কাঁচামাল ভারত হইতে বিদেশে তথা ইংলণ্ডে রপ্তানি হয় এবং তাহার বিনিময়ে কি পরিমাণ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি তথা হইতে এদেশে আমদানি

হয় তাহা এই এক "তুলার খেলা" হইতে কিছু উপলব্ধ হইবে। কারখানাবহুল যত বিদেশী রাজ্য বিশেষতঃ য়ুরোপীয় বা আমেরিকান রাজ্য আমাদের তুলা লইয়া থাকেন নিম্নের তালিকায় তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
	লাখ	লাখ	লাখ
যুক্তরাজ্য	৫২	২,১৪	৬,৩৭
জার্ম্মেণী	৩,৪৭	৪,৫৪	৫,২২
নেদারল্যাণ্ডস্	৮	১১	৬১
বেলজিয়াম্	২,৭৯	৪,২৬	৬,৩৯
ফ্রান্স্	৫৭	১,৯৯	৩,৩২
স্পেন	৪৭	৯২	১,৬৭
ইটালি	২,২৩	৩,৫৫	৯,৭৯
অষ্ট্রিয়া	৫৩	৭০	১,১৯
চীন	৬,৭২	৯,৬৭	৮,৯২
জাপান	২৮,০৬	৩০,২৬	৩৬,১৯
আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য	৮	২৫	৬৯
অন্যান্য দেশ	৩৭	৬৮	৯৪
মোট	৪৫,৮৯	৫৯,০৭	৮১,৩০

ইহা ব্যতীত "নষ্ট" তুলা (cotton waste) এই তিন বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ৭৭ লাখ ও শিমুল তুলা বৎসরে ১১ লাখ টাকার রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর বোম্বাই হইতে ৬৫ ক্রোর, সিন্ধু হইতে ৯ ক্রোর, মাদ্রাজ হইতে ৫ ক্রোর, এবং বাংলা ও ব্রহ্ম হইতে এক এক ক্রোর টাকার তুলা রপ্তানি হইয়াছে। শুদ্ধ তুলার তুলনায় নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানির মূল্য এত কম যে প্রায় অবিশ্বাসযোগ্য। সর্ব্ববিধ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য ১৯২১ সালে ১৫,৭১ লাখ, ১৯২২ সালে ১৩,১৫ লাখ এবং ১৯২৩ সালে ১১,৯০ লাখ টাকা মাত্র। অর্থাৎ তুলার রপ্তানি প্রতি বৎসর বাড়িতেছে ও নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানি কমিতেছে। তাহা হইলেই প্রমাণ হয় যে (১) আমাদের দেশে এত অধিক পরিমাণ তুলা আবশ্যক হয় না, (২) যদিও বা আবশ্যক হয় তাহা হইলে দেশে উপযুক্ত সংখ্যক কল কারখানা বা চরকা ও হাতের তাঁত নাই, (৩) অথবা বস্ত্রাদি প্রস্তুতকরণ আমাদিগের কলে বা হস্তে যত সহজে সুবিধায় বা সস্তায় হইতে পারে বিদেশ হইতে ক্রয় করা তদপেক্ষা সহজ, সুবিধাজনক বা সস্তা, (৪) রাজনীতিক ব্যাপার ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তাহাও এই স্থলে বিবেচ্য, (৫) দেশীয় দ্রব্যাদি দেশে অধিক ব্যবহৃত হইতেছে, (৬) বিদেশীয়েরা আমাদিগের সমস্ত তুলা কিনিয়া লইয়া যে যে বাজারে ভারতীয় মাল কাটতি হইত সেই সেই বাজারে ভারতীয়ের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, (৭) অথবা এই সবগুলির সংমিশ্রণ।

নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানির মূল্য-তালিকা নিম্নে দিলাম—

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
	লাখ	লাখ	লাখ
(১) সূতা	৭,৭৯	৬,০৬	৪,৫০
(২) রুমাল ও শাল	৭	১৯	৩৪
(৩) বস্ত্রাদি	৭,৪৯	৬,৬২	৭,১৯
(৪) সেলায়ের সূতা	৩	৩	৩
(৫) অন্যান্য	৩৩	২৪	৩১
মোট	১৫,৭১	১৩,১৪	১১,৯০

১৯২৩ সালে তুলা ও তুলা নির্ম্মিত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাণিজ্যে অন্যান্য প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় বোম্বাই প্রথম, শুদ্ধ তুলায় সিন্ধু দ্বিতীয় ও তুলার নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে চতুর্থ, তুলায় মাদ্রাজ তৃতীয় ও নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে দ্বিতীয়, ও তৎপরে যথাক্রমে বাংলা ও ব্রহ্মদেশ আসন পাইয়াছে।

এখন গত তিন বৎসরে, যাহার হিসাব সরকারি নীল-কেতাবে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মোট আলোচ্য বিষয়-গুলি দেখা যাক,—

	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
উৎপন্ন তুলা (হাজার টন)	৬৪৩	৮০১	৯২৫
	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
আমদানি ঐ „	২৭	১২	১২
রপ্তানি ঐ „	৪৭৪	৫২১	৬৩০
পুঃ রপ্তানি ঐ „	১	৭	৮

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভারতে উৎপন্ন তুলা গড়ে প্রতি বৎসর ৭৯০ হাজার টন দাঁড়ায়। এবং রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানি উভয়ে মিলিয়া গড়ে ৫৪৭ হাজার টন, এবং আমদানি গড়ে ১৭ হাজার টন। এখন উৎপন্ন ও আমদানি তুলার যোগফল হইতে রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির যোগফল বিয়োগ করিলে আন্দাজ মোটামুটি আমরা পাই

২৬৫ হাজার টন। অতএব তর্কের খাতিরে আরও কিছু বাদ দিয়া ধরিলে আমরা দেখিতে পাই প্রায় ২৫০ হাজার টন তুলা আমাদের দেশীয় সমস্ত কল কারখানা ও চরকা ইত্যাদিকে প্রতি বৎসর খোরাক যোগাইতেছে। অতঃপর নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এত তুলা বিদেশে না পাঠাইয়া দেশে কল, কারখানা, চরকা ও তাঁত বসাইলে বিদেশে তুলা প্রেরণের আবশ্যকতা অর্দ্ধেক কমিয়া যায় অথচ দেশে অন্নসংস্থানের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
	লাখ	লাখ	লাখ
আমদানি	৬২,০৯	৬৫,৯৫	৬৬,২৭
পুঃ রপ্তানি	৩,৯০	৩,৪৯	৩,২৭
রপ্তানি	১৫,৭১	১৩,১৫	১১,৯০
মোট রপ্তানি	১৯,৬১	১৬,৬৪	১৫,১৭
রপ্তানি হইতে আমদানির আধিক্য	৪২,৪৮	৪৯,৩১	৫১,১০

অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসর আমাদিগকে প্রায় ৪৮ ক্রোর টাকা তুলা নির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিনিময়ে বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিতে হয়; এবং ইহার নিমিত্ত কত অসংখ্য শ্রমিক, দালাল, চুক্তিকারী, মহাজন, রেলওয়ে কোম্পানি, জাহাজ কোম্পানি, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি, অর্থাৎ সমস্ত দেশ অর্থ উপার্জ্জন হইতে বঞ্চিত হয়। অতএব অনুমান করা যায় যে সমুদায় ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণের জন্য ভারতীয় কলে যত বস্ত্র অধুনা উৎপন্ন হয়, যদি কোন উপায়ে (যথা দ্বিগুণ সংখ্যক চরকা ও হস্তচালিত তাঁত, বা উপস্থিত কলের দ্বিগুণ সংখ্যক কলের প্রতিষ্ঠা করিয়া বা দ্বিগুণ সংখ্যক লুম্ স্পিণ্ডল জুড়িয়া দিয়া) তাহার দ্বিগুণ মাল উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। পার্শ্বস্থ গ্রাফ দৃষ্টে জানুয়ারি ১৯২২ হইতে মার্চ্চ ১৯২৩ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ব্যবসার কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এই প্রসঙ্গে চরকা ও খদ্দরের কথার এই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যতদিন না খদ্দর সস্তা সুশ্রী ও কলে উৎপন্ন বস্ত্র বা কাঁচিধুতির ন্যায় উৎকৃষ্ট হয়, ততদিন কেবল কংগ্রেসওয়ালাগণ ব্যতীত খদ্দরের অন্য পৃষ্ঠপোষক পাওয়া দুরূহ। কারণ দেশভক্তি কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ও ত্যাগী লোকের পক্ষে সম্ভব, কংগ্রেসেতর লোকে কেবল সস্তা ও সুশ্রী জিনিস চায়। তাহারা বুঝে না যে, আজ কষ্ট করিয়া মোটা ধুতি বেশী দাম দিয়া কিনিলে কাল মিহিধুতি অল্প দামে পাওয়া যাইবে। কারণ তখন বিদেশীর প্রতিযোগিতা থাকিবে না। ইতিমধ্যে চরকার ও তাঁতের এবং কলের সাহায্যে দেশে একটা মহা অন্নসংস্থানের কায়েমি বন্দোবস্ত হইবে, পরে ধীরে ধীরে দেশে উৎকৃষ্ট বৃহত্তম কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারিবে।

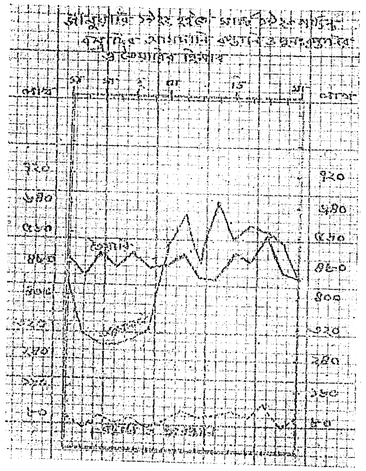

গ্রাফ্

অন্নসংস্থানের প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সংবাদপত্রে পড়িলাম বেঙ্গল কৌন্সিলে বজেট বিতর্কের সময় বাংলার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন,—the British people ruled only for the protection of their trade, and if the people refused to buy foreign goods there would no us apprehension of any foreign invasion. অর্থাৎ বৃটিসজাতি নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে শাসন করে; এবং যদি আমরা বিদেশী জিনিস কিনিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদিগের আর বিদেশীর আক্রমণের ভয় থাকে না।

আবহাওয়া

চাষ-বাস

চা

কলিকাতায় চার বাজার ঃ—

২৯শে জানুয়ারী তারিখে চা বিক্রী খুব কমই হইয়াছে। ২৫০০০ ঝাড় ডাষ্ট সহ মোট ১২০০০ ঝাড় বিক্রী হইয়াছে। কাটতি সাধারণতঃ ভালই ছিল, এবং কোন কোন প্রকার চায়ের দর বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময় অনুযায়ী ভাল প্রকারের চা খুব কমই দেখা গিয়াছে, নীলামের অধিকাংশ চাই বাদামী বর্ণের এবং ডাঁটাযুক্ত ছিল। সাধারণ ব্রোকেন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যম রকমের ব্রোকেন পর্য্যন্ত চার দর বেশ হইয়াছে। অন্যান্য বার অপেক্ষা এবার ভালরকম প্রস্তুত ভাল চার কাটতি বেশী হইয়াছে, কিন্তু ডাঁটাযুক্ত চার প্রতি খরিদ্দারের দৃষ্টি খুব কমই দেখা গিয়াছে। ডাষ্ট চার দরই সবচেয়ে বেশী হইয়াছে।

ভারতে চার ব্যবসায় ঃ—

১৯২২ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতের চার কারবারে যৌথ কোম্পানীগুলির মোট মূলধন ছিল ৪২ কোটি টাকা। ভারতে ইন্‌কর্পোরেটেড্ কোম্পানীগুলির মূলধন ৮৮৩৫০০৯৬৲ টাকা এবং যুক্তরাজ্যে ইন্‌কর্পোরেটেড্ কোম্পানীগুলির ৩২৭৭৪১৩৮০৲ টাকা ছিল। ভারতের ১৩৬টি কোম্পানীর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের আদায়ী মূলধন মোট ৪৫২ লক্ষ। উহাদের ৪৪টী ১৯২১ সনের মোট ১৪৩ লক্ষ মূলধনের উপরে শতকরা ১৮·৬ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়াছে। ৮৮টি কোম্পানী মাত্র মোট মূলধন ২১০ লক্ষের উপরে ১৯২২ সনের জন্য শতকরা ৩২·৭ ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। কলিকাতা শেয়ার মার্কেটে মার্চ্চ মাসে ১১৫টি কোম্পানীর ১০০৲ টাকা যৌথ মূলধনের উপরে ১৯১৯ সনে ২১৫·২ টাকা ও ১৯২০ সনে ২১৮·৬ টাকা এবং ১২টি কোম্পানীর ১৯২১ সনে ১৪৭৲ টাকা, ১৯২২ সনে ১২২টি কোম্পানীর ১৪৪ টাকা ও ১৯২৩ সনে ১১৯টি কোম্পানীর প্রতি ১০০ টাকার স্থলে ১৮২৲ টাকা মূল্য দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার চা বিক্রীর হিসাব ঃ—

১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কলিকাতার নীলামে বিক্রীত চার হিসাব পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরের হিসাবের সহিত তুলনা করিয়া দেখান হইল ঃ—

বৎসর	বিক্রীত বাক্সের সংখ্যা	গড়ে প্রতি পাউণ্ডের দর
১৯১৮—১৯	২২৯৩৩১	৷৷১০ পাই
১৯১৯—২০	২৫৮৬৪৭	৷৷১
১৯২০—২১	২০১৪৩১	।/৬
১৯২১—২২	২২৫৩৪৫	৷৷১১
১৯২২—২৩	৩৩৭১৭৭	৷৷/১
১৯২৩—২৪	৩২০০০০	৸৵১১

১৯২২ সনে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৫১৮০০ জন, তন্মধ্যে ৭০১৭০০ জন স্থায়ী ও ৫০১০০ জন অস্থায়ী। তৎপূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় ঐ বার স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৩০২০০ জন কমিয়াছে এবং অস্থায়ী ১৯০০ জন বাড়িয়াছে।

জাপানের চা রপ্তানী ঃ—

কানাডা ও উত্তর আমেরিকার ব্রিটীস সাম্রাজ্যে উৎপন্ন চার সহিত জাপানের চার রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিতেছে। উন্নত প্রণালীতে জাপান চা প্রস্তুত করায় এই প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করা ভিন্ন কমাইবে না। গত ১১ বৎসরের জাপানের চা রপ্তানীর হিসাব নিম্নে দেওয়া ল।

	আমেরিকা পাউণ্ড	কানাডা পাউণ্ড	মোট পাউণ্ড
১৯২২	২৪৫০৪৯২২	২৫২৫৫৬২	২৭১০৩৯৮৪
১৯২১	১৫১৭৭৬৮৫	১৩৭৬২৮৬	১৬৫৫৩৯৭১
১৯২০	১১২৯২২০৩	৩৫৩৬০৯	২২৮১৫১২৫
১৯১৯	২৩ ৬৩৬১৬	৩৮৩৬০৩২	২৭৭৯১২২৮
১৯১৮	৩১৫৬২৩৫১	৫৮৩৮১৫৫	৪১৫০৫১৪
১৯১	৩৫২০৩৫১৭	৭১৪২৪৫৭	৪২৩৫১৫৫
১৯১৬	৩৪৭৩৬৬৬৫	৬৭২৩৭৬৬	৪১৭৬৭৯১
১৯১৫	৩৩৪০৪৯৭	৫৮১৭৫৬২	৩৯১১৩৫৪
১৯১৪	২৯২,৬৩৮৭	৪৪৫১৬০৩	৩৩৭৫১৯০
১৯১৩	২৬০৪০৯৬২	৩৪১১৯৭৩	২৯৫৯০৩৫
১৯১২	৩১৭৭৩৮৮১	৩৭৩৩৪০৩	৩৫৪০৬৮৯

চার কমৃতি ঃ—

এবারকার চার বিক্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার কথা; কিন্তু হিসাবে দেখা যায় গত বারের এই সময়ের বিক্রীত চা অপেক্ষা এবার প্রায় ৫৬০০০০ পাউণ্ড কম হইয়াছে। ১৯২২ সনের উৎপন্নের উপরে এবার ৫০০০০০০ পাউণ্ড বেশী হওয়ার কথা, সুতরাং তদনুসারে মূল্য হ্রাস হওয়ার কথা। অতএব দেখা যাইতেছে খুচরা বিক্রেতারা খুব কমই বিক্রয় করিয়াছে এবং যদি কোন বড় খরিদ্দার দর দেখিয়া খরিদ বন্ধ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা আরও বেশী দরে খরিদ করিতে বাধ্য হইবেন।

চীনে চার বাজার ঃ—

চীনের চার বাজার বড়ই বিশৃঙ্খল, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থায় ধর নাই, ভবিষ্যতেও সহসা চার বাজারে সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। খুব সম্ভব চীনের নূতন বৎসর আরম্ভ না হইলে বাজার দর ঠিক হইবে না।

ভূমিকম্পে জাপানের চার ক্ষতি ঃ—

ভূমিকম্পে টোকিও ও ইয়াকোহামার প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা নষ্ট হইয়াছে। আজ কাল জাপানের চার দর ২ সেণ্ট হইতে ৫ সেণ্ট (স্বর্ণমুদ্রা) পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। চা ব্যবসায়ীরা বলে যে জুন মাস পর্য্যন্ত নূতন উৎপন্ন না হইলে আর দর কমিবে না।

(বাণিজ্য-বার্ত্তা)

পাট

পাটের মরসুম ১৯২৩—২৪

১৯২৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্ক এর ৬ মাসের রিপোর্ট

মজুত পাট ঃ—	৪০০ পাউণ্ড ওজনের গাঁট	
	১৯২২—২৩	১৯২৩—২৪
গত মরসুম হইতে আনীত		
আনুমানিক বরাদ্দ কলিকাতার	১২৫০০০	১৭৫০০০
১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় আগত	৪৫৪৩০০০	৬৩০০০০০
চট্টগ্রামে আমদানী	৮৯০০০	১২৫০০০
	৪৭৫৭০০০	৬৬০০০০০
বাদ—স্থানীয় বিক্রয়	৩৬০০০	১৩০০০
মোট	৪৭২১০০০	৬৫৮৭০০০
নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত ঃ—		
কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী	২০৩৩০০০	২৪০১০০০
কলিকাতার কলে গৃহীত	২১৮৮০০০	৩৭৮৬০০০
বাজার ও কলঘরে মজুত	৫০০০০০	৪০০০০০
মোট	৪৭২১০০০	৬৫৮৭০০০
কলিকাতার কলগুলির অবস্থা ঃ—		
৩০শে জুন কলে মজুত (আনুমানিক)	৪১০০০০০	২৩৫০০০০
১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গৃহীত	২১৮৮০০০	৩৭৮৬০০০
মোট	৬২৮৮০০০	৬১৩৬০০০
বিদেশী রপ্তানীর পরিমাণ ঃ—	৪০০ পাউণ্ড ওজনের বস্তা।	
	১৯২২—২৩	১৯২৩—২৪
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রপ্তানী	২০৩৩০০০	২৪০১০০০
কলের পরিমাণ ঃ—		
গভর্ণমেণ্টের বঙ্গদেশ, বিহার উড়িষ্যা, আসাম ও নেপালের উৎপন্নের শেষ এষ্টিমেঃ	৫৪৮৬০০০	৬৯১৬০০০
১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রামে আমদানী	৪৫৯৬০০০	৬৪১২০০০
গরবর্ত্তী হিসাবে নেওয়ার জন্য	৮৯০০০০	৫৮৪০০০

১৯২৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মেসার্স জে থোমাস্ এণ্ড কোম্পানীর ৬ মাসের রিপোর্ট।

	জুলাই—ডিসেম্বর ১৯২৩	জুলাই—ডিসেম্বর ১৯২২
কলিকাতায় গত মরসুম হইতে আনীত—		
১লা জুলাই আনুমানিক মজুত	১৭৫০০ গাঁট	১২৫০০০ গাঁট
কলিকাতায় আমদানী	৬৪০০০০ গাঁট	৪৬১৫০০০ গাঁট
	৬৫৭৫০০০ গাঁট	৪৭৫১০০০ গাঁট
বাদ—স্থানীয় বিক্রয়	১৩০০০ গাঁট	৩৭০০০ গাঁট
	৬৫৬২০০০ গাঁট	৪৭০৪০০০ গাঁট
চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী	১২৫০০০ গাঁট	৮৯০০০ গাঁট
মোট	৬৬৮৭০০০ গাঁট	৪৭১৩০০০ গাঁট
নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত ঃ—	জুলাই—ডিসেম্বর ১৯২৩	জুলাই—ডিসেম্বর ১৯২২
রপ্তানী	২৪০১০০০ গাঁট	২০৩৩০০০ গাঁট
মজুত—বাজার, কলঘর ও জাঃ বোঃ	৪০০০০০ গাঁট	৫০০০০০ গাঁট
কলে গৃহীত	৩৮৮৬০০০ গাঁট	২২৬০০০০ গাঁট
মোট	৬৬৮৭০০০ গাঁট	৪৭১৩০০০ গাঁট
গভর্ণমেণ্টের এষ্টিমেট	৬১৯৬০০০ গাঁট	৫৪৮৬০০০ গাঁট
গৃহীত	৬৫১২০০০ গাঁট	৪৬৬৮০০০ গাঁট
গরবর্ত্তী হিসাবে নেওয়ার জন্য	৪৮৪০০০ গাঁট	৮১৮০০০ গাঁট

(৮২⅔ পাউণ্ড=১ মণ এবং ১ গাঁট=৪০০ পাউণ্ড।)

ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ এসোসিয়েশনের গত অধিবেশনে সভাপতি মিঃ জি এফ রোজ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে—গভর্ণমেণ্ট কৃপণতা অবলম্বন পূর্ব্বক পাটের ভবিষ্যদ্দর্শীদের বরাদ্দ হইতে ২২৫০ টাকা কমাইয়া দিয়া বিশেষ বিবেচকের ন্যায় কাজ করেন নাই। গত ৩ বৎসরের পাটের যে এষ্টিমেট ধরা হইয়াছিল তাহাতে সাঙ্ঘাতিক ভুল দেখা গিয়াছে। ১৯২১—২২ সনের এষ্টিমেটে শতকরা ৭৬ মণ কমতি পড়িয়াছে। ভবিষ্যদ্দর্শীদের সংখ্যা পুরা থাকাতেই যখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে তখন তাহাদের সংখ্যা কমাইলে কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়। গভর্ণমেণ্ট পাটের কাঁচা মাল হইতে বৎসরে গড়ে ২·৮২ কোটি টাকা কর আদায় করিয়াও এরূপ ব্যয়কুণ্ঠ হইলে বড়ই ঘৃণার কথা। কিন্তু কেবল গভর্ণমেণ্টকে দোষ না দিয়া জুট এসোসিয়েশনের যাহাতে ঠিক এষ্টিমেট পাওয়া যায় তজ্জন্য স্বব্যয়ে আর ব্যয় রক্ষণের জন্য বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

(বাণিজ্য বার্ত্তা)

চুঁচড়ায় চিকিৎসা বিদ্যালয়।—চুঁচুড়ায় একটী মেডিকেল স্কুল খোলার উদ্যোগ চলিতেছে। উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় দেশে চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতির জন্য যে ৬০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই নিমিত্ত পাওয়া যাইবে।

হিন্দু রমণীর বিবাহ বিচ্ছেদ।—একটী হিন্দু রমণী মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার হিন্দু স্বামী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ নিমিত্ত হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি আবেদনকারিণীকে সম্প্রতি ডিক্রি দিয়াছেন।

(সম্মিলনী)

আলোকচিত্রের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষা।—কলিকাতা বেঙ্গল কেমিক্যাল হইতে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় গোপাল দে নামক অন্ধ একজন লোকসহ খুলনা, দৌলৎপুর, সেনহাটী, খালিসপুর, মহেশ্বরপাশা আজগড়া প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়া বীজ কি প্রকারে মানবদেহে প্রবিষ্ট হয় চিত্র সাহায্যে সে সমস্ত সুন্দরভাবে দেখাইয়া দিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই প্রকারে প্রচার কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় দেশের অনেক উপকার হইবে, এতদুপলক্ষে তিনি নৈহাটি হাইস্কুলে ও মেয়েদের দৃশ্যার্থে কালীবাটী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মহাশয়ের বাটীতে এই আলোক চিত্র দেখাইয়া মেয়েদের মনে একটা শুভ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। (স্বরাজ)

বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার কার্য্য।—১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৮৯টি বিধবা বিবাহ হইয়াছে বলিয়া লাহোরের বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার নিকট সংবাদ আসিয়াছে। এই বৎসরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ১৭৪টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। কোন্ জাতির ক'টি এবং কোন প্রদেশে ক'টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। জাতি অনুসারে—ব্রাহ্মণ ৪১, ক্ষত্রিয় ৩০, অগ্রবাল ১৯, আরোরা রাজপুত ১৭, কায়স্থ ১, বিধব ২৫, মোট ১৭৪। প্রদেশ অনুসারে—পঞ্জাব ১১৫,৪১, যুক্ত প্রদেশ ৪৪ দিল্লী ৭, বোম্বায় ১, মধ্য ভারত ৫, রাজপুতনা ১, বিহার ও উড়িষ্যা ১, মোট ১৭৪।

(সম্মিলনী)

গমের চাষ।—সমগ্র ভারতে যত পরিমাণ জমীতে গম চাষ করে তাহার শতকরা ৩৩·২ ভাগ পাঞ্জাবে উৎপন্ন হয়, ২২·৯ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ১০·৬ ভাগ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে। ৭·৮ ভাগ বোম্বাইতে; ৩·৮ ভাগ বেহার ও উড়িষ্যায়, ৩·২ ভাগ উত্তর পূর্ব্ব সামান্ত প্রদেশে, ৫·৪ ভাগ বঙ্গদেশে, ৪·১ ভাগ গোয়ালিয়ারে, ৩·২ ভাগ রাজপুতানায় উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশে এ বৎসর ১২১·০০ একর জমীতে গম চাষ

হইয়াছে গত বৎসর বৎসর ১১৫০০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। বিহারে এ বৎসর ১৩৩০০ একর জমীতে গম চাষ হইয়াছে, গত বৎসর অপেক্ষা ইহা শতকরা ১ ভাগ কম পরিমাণ স্থানে চাষ হইয়াছে। এবং সমগ্র ভারতে ৩০২০০০০ একর জমীতে গম চাষ হইয়াছে, গত বৎসর ২৯৯৯১০০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। অর্থাৎ শতকরা ২ ভাগ পরিমাণ অতিরিক্ত জমীতে চাষ হইয়াছে। (সম্মিলনী)

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

স্মাট্‌সের সহিত শ্রীমতী নাইডুর সাক্ষাৎ।—আজ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক ঘণ্টার অধিক কাল কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসীদিগকে যে সব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কঠোর আইনের জন্য তাহাদিগকে কিরূপ উৎপীড়িত হইতে হয়, শ্রীমতী নাইড খোলাখুলি ভাবে জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট সেইসব কথা বলেন। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ পৃথকীকরণ বিধির আলোচনা উঠাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। বিধির মূলে যে নীতি রহিয়াছে, ভারতবাসীরা তাহা মানিয়া লইতে পারে না। কারণ উহা তাহাদের জাতীয় সম্মানের হানিকর। ঐ বিধির বিরুদ্ধতা করিবার জন্য ভারতবাসীরা আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কঠোর দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। জেনারেল স্মাটস উত্তরে শ্রীমতী নাইডুকে জানান, ভারতবাসীরা কোন অধিকারে অযোগ্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা আদৌ তাঁহার মনে নাই, ভারতবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এরূপ আচরণও তিনি তাঁহাদের প্রতি করিতে চাহেন না, তবে দেশে একটা সাম্প্রদায়িক বৈরাবৈরির ভাব বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি তাহাই দূর করিতে চাহেন, ভারতবাসীরা যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তির সহিত বসবাস করিতে পারেন, এবং নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে পারেন. তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা সেই মতলবেই ঐ আইন করিতে চাহিতেছেন। ঐ আইনের ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের নিজেদের শিক্ষা ও সভ্যতার অনুযায়ী উন্নতি সাধন করিতে পারিবে—অপর সম্প্রদায়ের সভ্যতা সভ্যর্ষে তাহাদিগকে পড়িতে হইবে না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন, পীড়ন মূলক বিধিতে কখনও কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি ভারতীয় সমস্যার আলোচনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টের কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয় নেতাগণ এবং ভারতের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া একটি গোল টেবিলের বৈঠক আবাহন করিবার জন্য জেনারেল স্মাট্‌সকে অনুরোধ করেন। (স্বরাজ)

কয়লা

শ্রীহট্টে কয়লা আবিষ্কার :—

শ্রীহট্টে কালিতী চা বাগানে এক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উহার স্বত্ব লইয়া উক্ত চা কোম্পানী ও পৃথিম্পাসা ইষ্টেটের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক :—

নাতালের কয়লার উপরে কর ধার্য্য করার প্রস্তাবে মিঃ কে সি নিয়োগীরই জয়লাভ হইয়াছে। এসেম্‌ব্লীর অন্যূন ৭৭ জন সভ্য তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন, এবং স্যার চার্লস ইন্‌স্ এর সহিত ৩৯ জন সভ্য ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন, এবং এরূপ কর ধার্য্য হইলে বোম্বাইর অনেক অসুবিধা হইবে ইহাও প্রকাশ করেন। যাহা হউক নিয়োগীর প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে।

কোল্ কোম্বাইনের কার্য্য :—

কয়লা ব্যবসায় সম্পর্কে যে প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এই ব্যবসায়ের খুব উন্নতির আশা করা যায়। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, পাছে কয়লা উৎপাদকেরা দর চড়াইয়া দিয়া এই সুবিধার অপব্যবহার করে। কলিকাতা কোল কোম্বাইনের কমিটী এবিষয়ে বিবেচনা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রস্তাব বোম্বাইর সদস্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, কমিটি বোম্বাইর এজেণ্ট করী ব্রাদার্সকে তারযোগে জানাইয়াছে যে, আফ্রিকার কয়লার উপরে কর ধার্য্য হওয়ার ফলে কলিকাতা কোল্ কোম্বাইন্ কমিটী কয়লার দর বিষয়ে কোনরূপ সুবিধা করিয়া লইবে না এবং বোম্বাইর যত কয়লার দরকার হয় এখান হইতে তৎক্ষণাৎই চালান করা যাইবে। যে প্রকারের এবং যত পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হয়, কলিকাতা কোল কোম্বাইন তাহাই দিতে প্রস্তুত।

কোম্বাইনের প্রথম জাহাজের মাল :—

কেথারাইন জাহাজে প্রথমবার পাঠানের জন্য কয়লা আসিয়া খিদিরপুর ডকে একত্র হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রীড্ এবং কয়লা পরীক্ষক মিঃ আর্ ভি ব্রিন্‌স্ কয়লা পরীক্ষা করিয়া দেন। অমনোনীত কয়লা পৃথক করিয়া রাখা হয়। উহা জাহাজে চালান করা হইবে না। এরূপে বিশেষ যত্নের সহিত বাছিয়া জাহাজে কয়লা উঠান হয়। এই চালানের কয়লা পূর্ব্বেই বোম্বাইতে বিক্রয় করা হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই কোম্বাইনে যোগদান করিতে উৎসুক হইয়াছেন। বোম্বাইর রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে আফ্রিকার কয়লার দর ৩ শিলিং বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোম্বাইনের বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। বোধ হয় ইহা সংযোজন দেখাইবার জন্য। বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায় আফ্রিকা ও ভারতীয় কয়লার প্রতিযোগিতা ঠিক রাখিতে হইলে বিদেশী কয়লার প্রতিটনে ৩৲ টাকা শুল্ক বসান দরকার। জাহাজে কয়লা উঠাইতে ট্রেন্‌সপোর্টেশন অফিসার ই, আই, এবং বি, এন্ রেলওয়ের কয়লার ম্যানেজারগণ এবং কলিকাতা পোর্ট কমিশনের ডেপুটী ট্রেফিক্ ম্যানেজার ও কোল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা কোল কোম্বাইন :—

কলিকাতা কোল কোম্বাইনের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে কলিয়ারী ও বোম্বাইর খরিদ্দারদিগের সহিত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হইবে। কিন্তু আমরা জানিলাম প্রথম চালানের সমুদয় কয়লাই বোম্বাইর এক স্থানীয় কয়লা ব্যবসায়ী খরিদ করিয়াছে।

ভারতীয় বনাম বিদেশীয় কয়লা :—

গত সপ্তাহে "রেয়ার্ড" এর বিদেশী কয়লা আমদানী বন্ধ করার কথায় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার একটু পূর্ব্বে চীৎকার শুনা গিয়াছিল যে বোম্বাই কখনও বাঙ্গালার নিকটে কয়লার জন্য আসিবে না। কিন্তু তখন বোম্বাইর আসা না আসার কোন প্রশ্নই উঠে নাই, কলিকাতাই বোম্বাইর বাজারে যাইতে তেমন চেষ্টা করে নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার দোষেই বাঙ্গালা বিদেশী বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার কয়েকটী প্রধান কারবার আফ্রিকার কয়লা খরিদ করিয়া বেশ লাভবান হইতেছিল। সুতরাং স্থানীয় বাজার হইতে আফ্রিকার কয়লা সরাইয়া দেওয়ার তেমন চেষ্টা করা হয় নাই। আমি "রেয়ার্ড এর উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু স্বীকার এই যে কলিয়ারীর স্বত্বাধিকারীদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নাই। নতুবা 'কোম্বাইন' যে কাজে হাত দিয়াছে, তাহা বহু পূর্ব্বেই হইত। মিঃ ওকলি ও মিঃ এন্ সি সরকার ইহার সাহায্যে অগ্রসর না হইলে আজ পর্য্যন্তও কোন কোম্বাইন হইতে পারিত না।

নব-বিধান

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮

সিঁড়িতে যাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়াছিল তাহারা শৈলেশ, বিভা এবং বিভার ছোট ননদ উমা। শৈলেশ ও বিভা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সকলের পিছনে ছিল উমা; সে চৌকাটের এদিকে পা বাড়াইতেই তাহার দাদা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, জুতোটা খুলে এস উমা।

বিভা ফিরিয়া চাহিয়া স্বামীকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, দোষ কি? পায়ে কাঁটাও ফুটবে না, হোঁচট্‌ও লাগবে না।

বিভা কহিল, সে আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ জুতো খোলার দরকার হল কিসে তাই শুধু জিজ্ঞেসা করেচি।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌ-ঠাকরুণ হিঁদু মানুষ,—তাছাড়া গুরুজনের ঘরের মধ্যে ওটা পায়ে দিয়ে না আসাই বোধ হয় ভাল।

বিভা স্বামীর পায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল শুধু কেবল ভগিনীকে উপদেশ দেওয়াই নয়, নিজেও তিনি ইতিপূর্ব্বে তাহা পালন করিয়াছেন। দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার অসাধারণ। সে ভালই, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। গুরুজনের এটা শোবার ঘর না হয়ে ঠাকুরঘর হলে আজ হয়ত' তুমি একেবারে গোবর খেয়ে পবিত্র হয়ে ঢুকতে।

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া ক্ষেত্র হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, গোবরের প্রতি রুচি নেই, ওটা বৌ-ঠাকরুণের খাতিরেও মুখে তুলতে পারতুম না, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যখন কোন সুবাদই রাখিনে, তখন অকারণ তাঁদের ঘরে ঢুকেও উৎপাত করতুম না। আচ্ছা, ঠাকরুণ, এ ঘরে ত আগেও বহুবার এসেচি, মনে হচ্চে যেন একটা ভাল কার্পেট পাতা ছিল, সেটা তুলে দিলেন কেন?

উষা কহিল, ধোয়া-মোছা যায় না, বড় নোঙ্‌রা হয়। শোবার ঘর—

বিভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, কার্পেট পাতা থাকলে ঘর নোঙ্‌রা হয়?

উষা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, হয় বই কি ভাই। চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু নীচে তার ঢের ধূলো-বালি চাপা পড়ে থাকে।

বিভা বোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবল কণ্ঠে অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ব্যস্ ব্যস্, বৌ-ঠাকরুণ, নোঙ্‌রা চাপা পড়লেই আমাদের কাজ চলে যায়,—তার বেশি আর আমরা চাইনে। ও জিনিসটা চোখের আড়ালে থাকলেই আমরা খুসি হয়ে থাকি। কি বল শৈলেশ, ঠিক না?

শৈলেশ কথা কহিল না। বিভার ক্রোধের অবধি রহিল না; কিন্তু সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সে তর্ক না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার স্নেহ ও প্রীতির হয়ত কোন অভাব ছিল না, কিন্তু বাহিরে সাংসারিক আচরণে বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত। লোকের সম্মুখে বিভা তর্কে কিছুতেই হার মানিতে পারিত না, ইহা তাহার স্বভাব। সেই হেতু প্রায়ই দেখা যাইত, এই বস্তুটা পাছে কথায় কথায় বাড়াবাড়িতে গিয়া উপনীত হয়, এই ভয়ে প্রায়ই ক্ষেত্রমোহন বিতণ্ডার মাঝখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহার সে ভাব নয় ইহা ক্ষণ-কালের জন্য অনুভব করিয়া বিভা আপনাকে সম্বরণ করিল।

বস্তুতঃই তাহার বিরুদ্ধে আজ ক্ষেত্রমোহনের মনের মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল না। পরের দোষ ধরিয়া কটু কথা বলা বিভার একপ্রকার স্বভাবের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত ইহাতে অশিষ্টতা

ভিন্ন আর কোন ক্ষতিই হইত না ; কিন্তু এই যে নিরপরাধ বধূটির বিরুদ্ধে প্রথম দিন হইতেই সে একেবারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে, বিনা দোষে অশেষ দুঃখ-ভোগের পর যে স্ত্রী স্বামীর গৃহকোণে দৈবাৎ স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার সেইটুকু স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি আর একজন স্বামীর চিত্ত দুঃখ ও বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া আনিতেছিল। অথচ, ইহারই পদধূলির যোগ্যতাও অপরের নাই এই সত্য চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের তিক্ত ব্যথিত চিত্তে বিভার বিরুদ্ধে আর কোন ক্ষমা রহিল না। অথচ এই কথা প্রকাশ করিয়া বলাও এই উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তেম্‌নি সুকঠিন। বরঞ্চ যেমন করিয়া হোক সভ্যতার আবরণে বাহিরে ইহাকে গোপন করিতেই হইবে।

ক্ষেত্রমোহন ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, উমা, তোমার এই পল্লীগ্রামের বৌদিদির কাছে এসে যদি রোজ দুপুর বেলা বস্‌তে পারো, যে-কোন সংসারেই পড়না কেন দিদি, দুঃখ পাবেনা তা বলে রাখ্‌চি।

উমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। ঊষা মুখ না তুলিয়া বলিল, তা'হলেই হয়েছে আর কি। আপনাদের সমাজে ওকে এক-ঘরে করে দেবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, তা' দিক বৌ-ঠাকুরুণ। কিন্তু ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যে পরম সুখে থাক্‌বে তা' বাজি রেখে বল্‌তে পারি।

শৈলেশ বিভার প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, বাজি রাখ্‌তে আর হবে না ভাই, এই বলাতেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিয়া বলিল, আর যাই হোক আজকের কাজটুকুও যদি মনে রাখতে পারে ত নিরর্থক নিত্য নূতন মোজা কেনার দায় থেকেও অন্ততঃ ওর স্বামী বেচারা অব্যাহতি পাবে!

বিভা সেই অবধি চুপ করিয়াই ছিল, কিন্তু আর পারিল না। কিন্তু গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন গোপন করিয়া একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, ওর ভবিষ্যত সংসারে হয়ত মোজায় তালি দেবার প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। দিলেও হয়ত ওর স্বামী পরতে চাইবেন না। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, যায় বই কি। চোখ কান খোলা থাক্‌লেই বলা যায়। যে সত্যিকার জাহাজ চালায়, সে জলের চেহারা দেখ্‌লেই টের পায় তলা কত দূরে। বৌ-ঠাকরুণ, জাহাজে পা দিয়েই যে ধরে ফেলেছিলেম একটু অসাবধানেই তলার পাঁক ঘুলিয়ে উঠ্‌বে, এতেই আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিই। আর শৈলেশের পক্ষ থেকে ত লক্ষ-কোটী ধন্যবাদেও পর্য্যাপ্ত হবার নয়।

ঊষা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে বলিল, নিজের গৃহে নিজের স্বামীর অবস্থা বোঝবার চেষ্টা করার মধ্যে ধন্যবাদের ত কিছুই নেই ক্ষেত্রমোহন বাবু।

এ কথার জবাব দিল বিভা। সে কহিল, অন্ততঃ, নিজের স্ত্রীকে অপমান করার কাজটা হয়ত সিদ্ধ হয়। তা' ছাড়া কাউকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখ্‌লেই বোধ হয় কারুর ভক্তি শ্রদ্ধা উথ্‌লে ওঠে।

ঊষা মুখ তুলিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, স্বামীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টাকে কি উঞ্ছবৃত্তি বলে ঠাকুরঝি?

ক্ষেত্রমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, না, বলে না। পৃথিবীর কোন ভদ্রব্যক্তিই এমন কথা মুখে আনতেও পারে না। কিন্তু, স্বামীর চক্ষে স্ত্রীকে নিরন্তর হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে হৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি বলে, আপনার ঠাকুরঝিকে বরঞ্চ জিজ্ঞেসা করে নিন।

বিভার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। অভিভূতের মত একবার সে বক্তার মুখের দিকে, একবার শৈলেশের মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এতগুলি লোকের সমক্ষে তাহার স্বামী যে যথার্থই তাহাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারে, প্রথমে সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিল না। তার পরে শৈলেশের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এর পরে আর ত তোমার বাড়ীতে আস্‌তে পারিনে দাদা। আমি তাহ'লে চিরকালের মতই চল্‌লুম।

শৈলেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ঊষা হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমরা ত তোমাকে কোন কথা বলিনি ভাই।

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল। এবং এই গণ্ডগোলের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যখন আপনার কেবল শত্রুতাই কর্‌চি, তখন এ বাড়ীতে আমার আর কিছুতেই প্রবেশ করা উচিত নয়।

ঊষা কহিল, কিন্তু এমন কথা আমি ত কোন দিন মনেও ভাবিনি ঠাকুরঝি।

বিভা কানও দিল না। অশ্রু-বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল, আজ উনি মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেলেন, কাল হয়ত দাদাও বল্‌বেন,—তাঁর নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে কথা কইতে যাওয়া শুধু অপমান হওয়া। ঊষা, বাড়ী যাও ত এস। এই বলিয়া সে নীচে নামিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বৌদিদি যখন নেই, তখন এ বাড়ীতে পা দিতে যাওয়াই আমাদের ভুল। এবার বাপের বাড়ীর সকল সম্বন্ধই আমার ঘুচ্‌লো। এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল। শৈলেশ পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে কহিল, না হয় আমার লাইব্রেরী ঘরে এসেই একটু বোস্ না বিভা।

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। কিন্তু আমার বৌদিদিকে একেবারে ভুলে যেওনা দাদা। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল সোমেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়,—দোহাই তোমার, তাকে নষ্ট হতে দিয়োনা। আজ তাকে যে ভাবে চোখে দেখ্‌তে পেলুম, এই শিক্ষাই যদি তার চল্‌তে থাকে, সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারব না।

তাহার অশ্রু-গদ্গদ কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া শৈলেশ মিনতি করিয়া কহিল, তুই আমার বাইরের ঘরে বস্‌বি চল্ বোন্, এমন করে চলে গেলে আমার কিষ্টের সীমা থাক্‌বে না।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি না জানিনা, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বস্‌তে চাইনে দাদা, কিন্তু, সোমেন আমাদের বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো। একেবারে মাতৃহারা হয়ে যেয়োনা দাদা! এই বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার গাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিল। ঊষা বরাবর নীরব হইয়াই ছিল, এখনও সে একটি কথাতেও কথা যোগ করিল না, নিঃশব্দে বিভার পার্শ্বে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিভা, সোমেনকে না হয় তুই নিয়ে যা। তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই, তাকে তুই নিজের মত করেই মানুষ করে তোল্।

বিভা এবং উমা উভয়েই একান্ত বিস্ময়ে শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভা কহিল, কেন এই নিরর্থক প্রস্তাব করচ দাদা, এ তুমি পারবে না,—তোমাকে পারতেও দেবে না।

শৈলেশ ঝোঁকের উপর জোর করিয়া উত্তর দিল, আমি পারবোই—এই তোকে কথা দিলাম বিভা।

বিভা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মাথা নাড়িয়া কহিল, পারো ভালই। তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। তাকে উচ্চ শিক্ষা দেবার টাকা যদি তোমার না থাকে, আমিও কথা দিচ্চি দাদা, সে ভার আজ থেকে আমি নিলাম। এই বলিয়া সে ঊষার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঊষা নীচে তাদের দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরক্ষণে মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শৈলেশ তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। উপরে যাইতে তাহার ইচ্ছাও হইল না, সাহসও ছিল না। সমস্ত কথাই যে ঊষা শুনিতে পাইয়াছে, ইহা জানিতে তাহার অবশিষ্ট ছিল না।

৯

রাত্রে খাবার দিয়া স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঊষা অন্যান্য দিনের মত নিকটে বসিয়া ছিল। শুধু সোমেন আজ তাহার কাছে ছিল না। হয়ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিম্বা এমনিই কিছু একটা হইবে। শৈলেশ আসিলেন ; তাঁহার মুখ অতিশয় গম্ভীর,—হইবারই কথা। ব্যর্থ প্রশ্ন করা ঊষার স্বভাব নয় ; আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এবং যাহা জানে না তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। স্ত্রীর এই স্বভাবের পরিচয়টুকু অন্ততঃ শৈলেশ এই কয়দিনেই পাইয়াছিল। আহারে বসিয়া মনে মনে সে রাগ করিল, কিন্তু আশ্চর্য্য হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে চাহিয়া সে স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার নিশ্চয় বোধ হইল ঊষা ইচ্ছা করিয়াই আলোটার দিকে

আড় হইয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত আজ সে খাইতে পারিল না। যে জন্য আজ তাহার আহারে রুচি ছিল না তাহার কারণ আলাদা, তথাপি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও গায়ে পড়িয়া শুনাইয়া দিল যে অনভ্যস্ত খাওয়া-পরা শুধু দু'চার দিনই চলিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড় করাইলে আর স্বাদ থাকে না। তখন অরুচি অত্যাচারে গিয়া দাঁড়ায়।

কথাটা তর্কের দিক দিয়া যাই হোক, এ ক্ষেত্রে সত্য নয় জানিয়া ঊষা চুপ করিয়া রহিল। মিথ্যা জিনিষটা যে নিশ্চয়ই মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিতে কোনদিনই তাহার প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু এমন করিয়া নিঃশব্দে অস্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের রাগ বাড়িয়া যায়। তাই, শুতে আসিয়া শৈলেশ খামোকা বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার প্রতি একদিন অতিশয় অন্যায় করেছিলাম তা' মানি, কিন্তু তাই বলেই আজ তোমার ছাড়া আর কারও কোন ব্যবস্থাই চল্‌বে না এও তো ভারি জুলুম।

এরূপ শক্ত কথা শৈলেশ প্রথম দিনটাতেও উচ্চারণ করে নাই। ঊষা মনে মনে বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে শুধু বলিল, আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

কিন্তু এমন করিয়া অত্যন্ত বিনয়ে কবুল করিয়া লইলে আরও রাগ বাড়ে। শৈলেশ কহিল, তোমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সমাজ সমস্ত উল্টে দিয়ে যদি এ বাড়ীকে তোমার বাপের বাড়ী বানিয়ে তুল্‌তে চাও ত আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুস্কিল হতে থাকে। সোমেনকে বোধ হয় কাল ওর পিসির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি কি বল?

ঊষা কহিল, ওর ভালর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত দিতে হবে বই কি।

তাহার বলার মধ্যে উত্তাপ বা শ্লেষ কিছুই ধরিতে না পারিয়া শৈলেশ দ্বিধার মধ্যে পড়িল। কিসের জন্য যে এসব করিতেছে তাহার হেতুও মনের মধ্যে বেশ দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু এই সকল দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসঙ্গত অভিমানের দ্বার ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, হাঁ, প্রয়োজন আছে বলেই সকলের বিশ্বাস। যে সব আচার ব্যবহার রীতি নীতি আমরা মানিনে, মান্‌তে পারিনে, তাই নিয়ে অযথা ভাই-বোনের মধ্যে বিবাদ হয়, সমাজের কাছে পরিহাসের পাত্র হতে হয়,—এ আমার ভাল লাগে না।

ঊষা প্রতিবাদ করিল না, নিজের দিক হইতে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা মাত্র করিল না, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শৈলেশের তাহা কানে গেল। ঊষা নিজে কলহ করে নাই, তাহার পক্ষ লইয়া বিভার প্রতি যত কটু কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার একটিও যে ঊষার নিজের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তাহা এতখানিই সত্য যে সে লইয়া ইঙ্গিত করাও চলেনা, ভুলাও যায় না। সুতরাং, ক্ষেত্রমোহনের দুষ্কৃতির শাস্তি যে আর একজনের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছেলো—ইহাতে প্রতিহিংসার কিছুই যে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে সে পুনশ্চ কহিল, যাকে বিলেতে গিয়ে লেখা-পড়া শিখতে হবে, যে সমাজের মধ্যে তাকে চলা-ফেরা করতে হবে, ছেলেবেলা থেকে তার সেই আব-হাওয়ার মধ্যেই মানুষ হওয়া আবশ্যক। শিশুকালটা তার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাট্‌তে দেওয়া তার প্রতি গভীর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিল, এ সম্বন্ধে তোমার বলবার কিছু না থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মুখ বুজে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেই তার জবাব হয়না। সোমেনের সম্বন্ধে আমরা রীতিমত চিন্তা করেই তবে স্থির করেচি।

সোমেন পাশেই ঘুমাইতেছিল। এ বাটীতে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায়, আসিয়া পর্য্যন্ত ঊষা তাহাকে নিজের কাছে লইয়াই শয়ন করিত। তাহার নিদ্রিত ললাটের উপর সে সস্নেহে ও সন্তর্পণে বাম হাতখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, যাই কেন না স্থির কর, ছেলের কল্যাণের জন্যই তুমি স্থির করবে। এ ছাড়া আর কিছু কি কেউ কখনো ভাবতে পারে? বেশ ত, তাই তুমি কোরো।

ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া ঘরের কোণে মিট্ মিট্ করিয়া একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সেই সামান্য আলোকে শৈলেশ নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অদূরবর্ত্তী শয্যায় শায়িত ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া

দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা'ছাড়া সে সোমেনের সমস্ত পড়ার খরচ দেবে বলেছে। সে তো কম নয়!

ঊষার কণ্ঠস্বরে কিছুতেই উত্তেজনা প্রকাশ পাইতনা। শান্ত ভাবে কথা কহাই তাহার প্রকৃতি। কহিল, না, সে হতে পারবেনা। ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।

শৈলেশ কহিল, সে যে অনেক টাকার দরকার।

ঊষা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, দরকার হয় দিতে হবে। কিন্তু আর রাত জেগো না, তুমি ঘুমোও।

পরদিন অপরাহ্ণকালে শৈলেশ কলেজ ও ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিয়া রান্নার এক প্রকার সুপরিচিত ও সুপ্রিয় গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিত চিত্তে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল পরে চা ও খাবার লইয়া যে ব্যক্তি দর্শন দিলেন, শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সে মুসলমান।

রাত্রে খাবার ঘরে আবার আলো জ্বলিল, এবং সজ্জিত টেবিলের চেহারা দেখিয়া শৈলেশ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলনা যে ইহারই জন্য অত্যন্ত সঙ্গোপনে মন তাহার সত্যই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিনার তখনও দুই একটা ডিসের অধিক অগ্রসর হয় নাই, ঊষা আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া একটু দূরে বসিল।

শৈলেশের মন প্রসন্ন ছিল, ঠাট্টা করিয়া বলিল, ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণেও যে অর্দ্ধ-ভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

ঊষা অল্প একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ তোমার উচিত নয়। যে শাস্ত্রকে তুমি মানো না গণ না, তার দোহাই দেওয়া তোমার সাজে না।

শৈলেশও হাসিল। কহিল, আচ্ছা হার মানলুম। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই আমিও দেবনা, তুমিও কিন্তু পালিয়ো না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে ভাগ্যে কাল খোঁটা দিয়েছিলুম, তাই ত আজ এমন বস্তুটি অদৃষ্টে জুটলো! ঠিক না ঊষা? কিন্তু খরচ-পত্র কি তোমার খুব বেশি পড়বে?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। অপব্যয় না হলে কোন খাবার জিনিসেই খুব বেশি পড়ে না। আস্‌চে মাস থেকে আমি নিজেই এ সব কোরব ভেবেছিলাম। কিন্তু এইটি দেখো জিনিসপত্র বৃথা নষ্ট যেন না হয়। আমার খরচের খাতায় যেমনটি লিখে রেখেচি, ঠিক তেম্‌নিটি যেন হয়। হবে ত?

শৈলেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন হবে না শুনি?

ঊষা তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কাল সারা রাত ভেবে ভেবে আমি যা স্থির করেচি তাকে অস্থির কর্‌বার জন্যে আমাকে আদেশ কোরো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

শৈলেশ আর্দ্রচিত্তে কহিল, তা'তো আমি কোনদিন করবার চেষ্টা করিনে ঊষা। আমি নিশ্চয় জানি তোমার সিদ্ধান্ত তোমারই যোগ্য। তার নড়-চড় বড় হয়ও না, হওয়া উচিতও নয়। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তোমার মন তেম্‌নি সবল তেম্‌নি দৃঢ়।

স্বামীর মুখের উপর হইতে ঊষা দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সত্যিই আর কিছু হবার নয়, আমি অনেক ভেবে দেখেচি।

শৈলেশ নিশ্চয় বুঝিল ইহা সোমেনের কথা। সহাস্যে কহিল, ভূমিকা তো হল, এখন স্থির কি করেছ বল ত? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি তোমাকে কখনো অন্যথা করতে অনুরোধ করব না।

ঊষা মিনিট খানেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে বলিল, দাদার সংসারে আমার ত চলে যাচ্ছিল,—বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কাল আবার আমি তাঁদের কাছেই যাবো।

তাঁদের কাছে যাবে? কবে ফিরবে?

ঊষা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, ফিরতে আর আমি পারব না। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি এখানে আমার থাকা চল্‌বে না। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

কথা শুনিয়া শৈলেশ একেবারে যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন নিরন্তর মুগুর মারিয়া মারিয়া কহিতে লাগিল যে লৌহ-কবাট রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

ঝড়ের পাখী—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত, মূল্য ২৲। বাংলার কথা-সাহিত্য অধুনা যে সকল সমস্যামূলক উপন্যাস দিয়েছে সেগুলির অধিকাংশই ইংরাজী নভেলের অন্ধ অনুকরণ ব'লে মনে হয়, কারণ উক্ত উপন্যাসগুলিতে যে সকল সমস্যার অবতারণা করা হয় সেগুলিকে সব ঠিক আমাদের দেশের বা আমাদের সমাজের সমস্যা ব'লে চিন্‌তে পারা যায় না। অনেক সময় মনে হয় যেন জোর ক'রে বিলিতি সমাজের সমস্যাগুলোকে আমাদের দেশের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করা হয়েছে! যে গুলোকে এখনও ঠিক আমাদের সমাজের একটা বর্ত্তমান সমস্যা হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনে করা চলে না—এবং এখনও যেগুলো নিছক বিলাতী সমাজেরই ভাব্‌বার কথা সেগুলোকে আমাদের সাহিত্যের মধ্যে অসময়ে আমদানী করাটাকে নেহাৎ বিলাতীয় অনুকরণ করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কেউ কেউ হয়ত' বলবেন যে সমাজোচকের দূরদৃষ্টির অভাবে আজ তিনি যে সমস্যাটাকে নিজের বর্ত্তমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব'লে চিন্‌তে পারছেন না, দু'দিন পরে তিনি দেখ্‌তে পাবেন যে সেগুলো আমাদের সমাজেরও সমস্যা হ'য়ে উঠেছে! তা হয় ত' দু'দিন পরে হ'তেও পারে; কিন্তু সেই অনাগত ভবিষ্যৎ অকল্যাণের ছায়াকে বর্ত্তমানের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে একটা কাল্পনিক সমস্যামূলক উপন্যাস খাড়া করবার চেষ্টা না ক'রে দুর-দুর্দ্দিনের অপেক্ষার একটু ধৈর্য্য ধারণ ক'রে ব্যাপারটাকে সেই সময়ের জন্য মুলতুবী রাখাই সমীচীন নয় কি? সমস্যামূলক উপন্যাসই যদি লিখ্‌তে হয় তবে যে ব্যাপারগুলো এদেশের শুধু বর্ত্তমান কেন অতীত কাল থেকেই সমাজের সঙ্কটময় সমস্যা বলে বিবেচিত হ'য়ে আস্‌ছে, আগে সেইগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করাই বর্ত্তমানে যুক্তিযুক্ত নচেৎ অপরিচিত বিদেশী সমস্যাকে অকারণ নিজেদের ঘরের মধ্যে অসময়ে ডেকে নিয়ে এসে অনর্থক বাজে সমস্যার সংখ্যা ও সেই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সমাজের একটি বিরাট সমস্যার উপায় প্রতিষ্ঠিত হ'লেও "ঝড়ের পাখী" সে শ্রেণীর উপন্যাস নয়। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচিত এই "ঝড়ের পাখী" উপন্যাসখানিতে যে সমস্যার আলোচনা করা হ'য়েছে সেটি আমাদেরই সমাজের একটি প্রধান সমস্যা। জননীর অপরাধে নিরপরাধিনী কন্যাকে এদেশের সমাজ চিরদিনই দাগী ক'রে আস্‌ছে। বিনা অপরাধে নির্দ্দোষীকে শাস্তি দিয়ে তার সমস্ত জীবনটাকে চ'খে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা আছে। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের নিকট অপরিচিত নহেন। ভারতবর্ষ, ভারতী প্রভৃতি নানা মাসিক পত্রে তাঁর একাধিক ছোট গল্প অনেকেই পড়েছেন। তাঁর লেখার অসাধারণ ভঙ্গী, তাঁর রচনার বিশেষত্ব, তাঁর বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করবার দক্ষতা, তাঁর চরিত্র-চিত্রনের নৈপুণ্যে পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ করে। "ঝড়ের পাখী" তাঁর প্রথম উপন্যাস হলেও উপন্যাস-ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবটা এই প্রথম নয়, কেন না সুপ্রসিদ্ধ "যাযাবরী" উপন্যাসের মহড়ায় আমরা তাঁর উপন্যাস-রচনার অদ্ভুত শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছি। "ঝড়ের পাখী" উপন্যাসখানিতে আমরা এই শক্তিশালী লেখকের সাহিত্য-কলা-কুশলতা সম্বন্ধে দক্ষতার নিদর্শন পেয়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হ'য়েছি। চরিত্রহীন ব্যভিচারী স্বামীর উপেক্ষিতা অনাদৃতা উৎপীড়িতা স্ত্রী হ'য়ে থাকার দীনতা দুঃখ ও লজ্জাকে নিরুপায়ের মতো বরণ করে নিয়ে জীবনটাকে ব্যর্থ না ক'রে লীলার জননী তাঁর প্রণয়প্রার্থী ও প্রেমাস্পদ পুরুষকে সত্য-স্বামীরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর স্খলিত চরিত্র সামাজিক পঙ্‌ক্তিকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলেন, কিন্তু সমাজ তাঁর অবস্থা কিছুমাত্র বিবেচনা না করে তাঁকে সাধারণ কুলত্যাগিনীদের মতই শাস্তি দিলেন। আত্মরক্ষার্থ নরহত্যা ক'রলেও সমাজদণ্ডের রাজ-বিধি যেরূপ হত্যাকারীকেও ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করেন, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ কোনও স্ত্রী যদি তার স্বামী অপরেরতাকেও পরিত্যাগ করেন, সমাজের কঠোর শাসনে তাঁর সে বিদ্রোহের ক্ষমা নেই! এই অন্যায়ের ফলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে বিবাহ-বন্ধনের বাহিরে চ'লে এসে নিঃসন্তান লীলায় মা যখন লীলাকে কোলে পেলেন সেদিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত হৃদয়হীন সমাজ তাঁর কন্যার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ললাটেও নিদারুণ কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিয়ে কন্যা ও জননী উভয়েরই জীবন একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিলে! এ দেশের এই বিরাট সামাজিক সমস্যাটিকে ভিত্তি করে একটি অভিনব গল্পের ভিতর দিয়ে প্রেমাঙ্কুর বাবু নারীর প্রতি সমাজের অত্যাচারের যে করুণ ও উজ্জ্বল চিত্রখানি অঙ্কিত করেছেন, বাঙ্গলার উপন্যাস সাহিত্যে সে ছবি একটা নূতন আলোক উদ্ভাসিত করে দিয়েছে ব'লে মনে হয়। প্রত্যেক চরিত্রটি যেন একেবারে রক্তমাংসের গড়া সজীব প্রাণের সৃষ্টি! সংসারের ঝঞ্ঝা-হত ও সমাজের বাত্যা-বিক্ষুব্ধ বিহগী লীলার জীবনটি ঠিক ঝড়ের পাখীর মতোই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল! অশুচি পঙ্কের মধ্যে আমরা যে পদ্মকলিটিকে প্রথম বিকশিত হ'তে দেখি, গ্রন্থ-শেষে সেই নির্ম্মল শতদল বিশ্ব-দেবতার পূজায় জেগে ধন্য ও চরিতার্থ হয়ে গেছে। একটা স্বাতন্ত্র্য একটা বৈশিষ্ট্য এই বইখানির আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে মুগ্ধ ক'রে রাখে। আশা করি প্রেমাঙ্কুর বাবু এই ধরণের আরও উপন্যাস রচনা ক'রে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে সম্পদশালী ক'রে যাবেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের প্রভাব।—শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। 'প্রেমের প্রভাব' একখানি খণ্ড কাব্য; ভোজ প্রবন্ধের একটী শ্লোক অবলম্বনে এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিন পরে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন; তাঁহার প্রথম রচনা 'কবিকুঞ্জ' আমরা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম; সেই কবিকুঞ্জের দুই একটী কবিতা এখনও আবৃত্তি করিতে পারি, এতই সুন্দর সে কবিতাগুলি হইয়াছিল। বহুকাল পরে সেই কবির লেখা 'প্রেমের প্রভাব' পাইয়া পরম আগ্রহে পাঠ করিলাম। ইহা সেই সেকেলে লঘু ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত; কোন স্থানে একটুও কষ্ট-কল্পনা নাই, সর্ব্বত্র অবধি গতি। তাহার পর, গ্রন্থের শেষে কবির যে পরিশিষ্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি সত্যসত্যই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

ঝড়ো হাওয়া।—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই উপন্যাসখানির পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে লেখকের সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। লেখক মহাশয় এতদিন তাঁহার নামকে 'নিরানন্দ' করিয়া 'শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়' নাম স্বাক্ষর করিয়া সাময়িক পত্রাদিতে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিয়া আসিতেছিলেন, এমন কি এই 'ঝড়ো হাওয়া'ও সেই 'আনন্দ'হীন নামেই 'বাঁশরী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরাই অনুরোধ করিয়া তাঁহার নামের সহিত যে 'আনন্দের' যোগ ছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি স্ত্রী কি পুরুষ এই সমস্যা সমাধানের দায় হইতে পাঠকগণের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছি। অতঃপর তিনি শৈলজানন্দ নামই ব্যবহার করিবেন। এখন উপন্যাসখানির কথা বলি। এখানি যখন 'বাঁশরী' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা পড়িয়াছিলাম, সেই জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর আমাদের আর বইখানি নূতন করিয়া পড়িবার আগ্রহ জন্মে নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীমান শৈলজানন্দ বলিলেন যে, বইয়ের নাম 'বাঁশরী'তে প্রকাশিত 'ঝড়ো হাওয়া' হইলেও আখ্যানভাগ আগাগোড়া নূতন, শুধু নামগুলি পুরাতন। তখন উপন্যাসখানি পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার কথাই ঠিক; বইয়ের নাম এবং গল্পের যাঁহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহাদের অনেকের নাম ঠিকই আছে, কিন্তু ঘটনা-সংস্থান একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে; সমস্ত গল্পটাই সম্পূর্ণ নূতন। গ্রন্থকার নূতন করিয়া সমস্ত লিখিলেও লিখিবার নূতন ছাঁচে ঢালিতে পারেন নাই কারণ এই যুগটাই যে ঝড়ো হাওয়া। শ্রীমান শৈলজানন্দের এই নূতন বইখানি নূতন করিয়া পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি; লেখা আড়ম্বরশূন্য, সরল, সহজ ও অবাধগতি। এই উপন্যাসখানি আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

পতিতার সিদ্ধি—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত; মূল্য আড়াই টাকা।

এই বইখানি একটী পতিতা রমণীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। অনেক স্থলেই কুলকামিনীরা যে কারণে পাপ-পথ অবলম্বন করে, চারু ওরফে রাধী সেই কারণে তাহার মাসী সম্পর্কীয়া এক দুষ্টা নারীর প্ররোচনায় কুলত্যাগ করিয়াছিল। একদিন দৈব দুর্য্যোগে তাহার স্বামী 'না জানিয়া শুনিয়া তাহার গৃহে আশ্রয় লয়। সেই এক রাত্রির জন্য স্বামী-সেবা করিয়া চারুর পাপের সমস্ত মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া, পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। তাহাকে খাঁটি সোণা জানিয়া পরম ভাগবৎ শ্রীল-শ্রীযুক্ত গোঁসাইজী তাহাকে সরস্বতী নামে স্বীয় কন্যার ন্যায় নিজগৃহে আশ্রয় দেন। আখ্যানবস্তু মাত্র এইটুকু; কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার পাকা হাতের গুণে ইহাকেই ৩২০ পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থে পরিণত করিয়াছেন। লেখকের মুন্সিয়ানায় বইখানি এমনই সুখপাঠ্য হইয়াছে যে, পড়িতে আরম্ভ করিবার পর শেষ পৃষ্ঠার "সমাপ্ত" কথাটি পর্য্যন্ত না পড়িয়া ছাড়িতে পারি নাই। এক নিঃশ্বাসে এত বড় বই-খানি পড়িয়া শেষ করিলাম বটে, কিন্তু মনে একটা দুঃখও রহিয়া গেল। ইহাতে মুদ্রাকর প্রমাদ এত বেশী যে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ রসভঙ্গ হইয়াছে।

গ্রহের ফাঁদ—আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার সপ্তনবতিতম গ্রন্থ, শ্রীসরসীবালা বসু প্রণীত।

বইখানি চারিটী ছোট বড় গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "মহযোগ" নামক গল্পটি "ভারতবর্ষে"র পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয়ই "ভারতবর্ষে" পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন, এবং লেখিকার লিপিকুশলতায় পরিচয় পাইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, অপর গল্পগুলিও তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।

সপ্তপদী—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

পাঠক-পাঠিকারা বইখানির নাম দেখিয়া যদি মনে করেন যে, ইহাতে কোন সাত-পাকের ব্যাপার লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে ভুল করিবেন। সাতটি গল্প আছে বলিয়া, সপ্তপদী কথাটি আমাদের চিরপরিচিত বলিয়া এবং এই সপ্তপদীর ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের জীবনের সুখদুঃখ প্রধানতঃ জড়িত বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার বই খানির নাম "সপ্তপদী" রাখিয়াছেন; নচেৎ "সপ্তপদী" নামক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। তবে গল্পগুলির প্রত্যেকটিরই এক একটী বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক গল্পের আখ্যান-বস্তুও নূতন, লিখনভঙ্গীও নূতন—একটীও পুরাতনের চর্ব্বিত-চর্ব্বন নহে। গল্পগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ঋণমুক্তি।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্‌সি প্রণীত; আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চনবতিতম গ্রন্থ।

এই বইখানির আগাগোড়া একটী প্রেমের—একটী বক্ষ-বাৎসল্যের—একটী পাওনো মায়ে-পোয়ের শ্রদ্ধা-স্নেহের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। সংসারের কোন বাধা-বিঘ্নই সে সুরের বিকৃতি হয় নাই; কোথাও

একটু তাল কাটে নাই, একটুও বেসুরো আওয়াজ বাহির হয় নাই। গ্রন্থকার বন্ধু-প্রীতির অতি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন,—নরনারীর প্রেমের উপরেও তাহাকে আসন দিয়াছেন। তাঁহার লেখনী অক্ষয় হউক।

সাধে বাদ।—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। এখানি আট-আনা গ্রন্থমালার চতুর্নবতিতম গ্রন্থ।

সাধে বাদ কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটি "সাধে বাদ" করুণ রসাত্মক—পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে। শেষ গল্প—বন্ধ্যা এই ভারতবর্ষেই বাহির হইয়াছিল, এবং অনেক পাঠক পাঠিকার ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই শুনিয়াছিলাম। ন্যাজ ও মুড়ার খবর আমরা দিলাম; মাঝখানকার বাকী গল্পগুলি কেমন তাহা পাঠক পাঠিকারা অনুমান করিয়া লউন। তা' যদি না পারেন, তবে পড়িয়া দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা।—স্বাস্থ্যসেবক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র বসু এম-বি ও স্বাস্থ্যসেবক শ্রীমৃপেন্দ্রকুমার বসু—সম্পাদিত। মূল্য চৌদ্দ পয়সা।

গত বৎসর হইতে এই নূতন পাঁজীখানি বাহির হইতেছে। এবার ইহার দ্বিতীয় প্রকাশ। এই পাঁজীর একটী নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। সাধারণ পঞ্জিকার সকল বিষয় ইহাতে ত আছেই, অধিকন্তু ইহাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা সাধারণের খুব উপকারে আসিবে। কার্ত্তিকবাবু ইংরাজী, বাঙ্গলা, হিন্দী মাসিকপত্র ও পুস্তকাদির প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে বহুদিন হইতেই আত্মবিনিয়োগ করিয়াছেন। এবার তিনি পাঁজীর সহায়তায় স্বাস্থ্যধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। শুনিতেছি দুই বৎসরেই এই পাঁজীর খুব আদর হইয়াছে। কিন্তু কেবল পাঁজীর আদর হইলেই যথেষ্ট হইল না। পাঁজীতে উল্লিখিত স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উপদেশগুলি পালন করিয়া বঙ্গদেশ যেদিন স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে, বলবীর্য্যে শৌর্য্যে পৃথিবীতে বরেণ্য হইয়া উঠিবে, সেই দিন জানিব, কার্ত্তিকবাবুর পাঁজী বাহির করা সার্থক হইয়াছে।

উচ্ছ্বাস পঞ্চক।—শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় প্রণীত মূল্য বার আনা। আমরা "উচ্ছাস পঞ্চক" পুস্তকখানি পাঠ করিলাম। পাঁচটি উচ্ছাসের মধ্যে "বিশ্বসমস্যা" ও "হিন্দুর সাধনা" ১৩২১ ও ১৩২২ সালের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। "হিন্দুর পূজা" "ব্যাসদেব" ও "ওঁকার মন্ত্র" পরে লিখিত। আমাদের মনে হয় পাঁচটি উচ্ছাসই প্রত্যেক হিন্দুর মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়েরা একবাক্যে পুস্তকখানির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন; আমরাও তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে পুস্তকখানি যথার্থই ধর্ম্মগ্রন্থ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অবশ্য পঠনীয়।

সাহিত্য সংবাদ

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাজপেয়ী প্রণীত রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা সহ সচিত্র "রামেন্দ্রসুন্দর" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৩৲।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গীতাভিনয় "তারকেশ্বর মাহাত্ম্য" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৷৹।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "বুড়া জহুরীর কারসাজী" ও "ঘাটপাড় বামন" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেকখানি—৸৹।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত নূতন গল্প-পুস্তক "সপ্তপদী" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷৹।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "সোণামি" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৹।

আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ৯৮ সংখ্যক পুস্তক শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত "আয়ুষ্মতী" প্রকাশিত হইল।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.



বুদ্ধ ও জরা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেনচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.



জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | একাদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আমাদের সঙ্গীতের সংস্কার *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রথমতঃ আমাদের মনে এই বিশ্বাসটি জন্মান দরকার যে, সত্যকার সংস্কার বলে একটি জিনিস জগতে আছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে সংস্কারের নামে অনেক বাজে জিনিসই কোনও কোনও সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং যাঁরা পুরাতন,—বা সনাতন-পন্থী, তাঁদের যে কিছু বল্‌বার নেই এমন নয়। এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ এমন কি স্রোতোহীনতারও গুণকীর্ত্তন করে থাকেন—পাছে নতুন কোনও স্রোত বর্ত্তমানের মধ্যে যা কিছু অল্প স্বল্প সত্যকার ভাল জিনিস আছে তা থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, সেই গরীয়ান্ পুরাতন যুগে সর্ব্বসমেত ফিরে যাওয়াই হচ্ছে একমাত্র পন্থা—যখন সংসারে ছিল শুধু সরলতা ও কবিত্ব, মৈত্রী ও সাম্য, অনাঘ্রাত প্রকৃতি ও স্বাধীনতার অবাধ লীলা।

গত যুগকে বড় করে দেখা মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—অন্ততঃ বর্ত্তমানে অসন্তোষের ফলে এ-রকমটা হওয়ার মতন সহজ জিনিস সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলে বলা চলে যে সংসারে এমন প্রায় কোনও জিনিসই দেখা যায় না, যার স্বপক্ষে দু' চারটে কথাও বলা অসম্ভব। তাই আমি বল্‌তে চাই যে, কোনও সংস্কার-সাধনের ক্ষেত্রে এরূপ দু' চারটে যুক্তি নিয়ে বিচার কর্‌লেই চল্‌বে না; আমাদের দেখ্‌তে হবে যে নতুন কোনও কিছুর আগমনে বৈচিত্র্য বাড়ে কি না এবং তার নিহিত উৎস বা প্রেরণার শক্তি বৃদ্ধি হয় কি না।

* এই প্রবন্ধটি ইংরাজীতে পড়া হয়েছিল—রামমোহন লাইব্রেরীতে, গুজরাত সাহিত্য সভায়, লক্ষ্ণৌয়ে ক্যানিং কলেজে ইত্যাদি।

সত্য সংস্কারকের প্রধান কাজ হচ্ছে, বর্ত্তমানের মধ্যে ভাল যা-কিছু আছে তার সংরক্ষা করে নতুনের আমদানী করা। এটা অনেক সময়েই বাস্তবিকই একটা শক্ত সমস্যা হয়ে ওঠে। তাই যাঁরা নূতনের অভিযানকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে থাকেন, তাঁদের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এ কথা বলা যায় না। কারণ, সমাজে অনেক সময়েই সংস্কারের নামে অসারতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—এটা প্রায়ই দেখা গিয়েছে। যেমন এক সময়ে আমাদের সমাজে অনেকেই মনে কর্ত্তেন যে টেবিলে খাওয়া, বা সাহেবী পোষাক পরা হচ্ছে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। অনেক দিন ধরে ঠেকে শিখে তবে আমরা বুঝ্‌তে শিখেছিলাম যে, আসল সভ্যতা বা শিক্ষা হচ্ছে ভিতরের জিনিস, বাইরের নয়। তখন আমাদের জ্ঞান হয়েছিল যে, একটা মিথ্যা জিনিসকে আমরা সত্য বলে আঁকড়ে ধরে বসেছিলাম। গত শতাব্দীর শেষাশেষি রুষ সমাজেও এরূপ দিগ্‌ভ্রমের দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই, যখন প্রায় সত্য রুষ মাত্রেই ফরাসী ভাষায় কথা বলাটা একটা চরম কাম্য জিনিস বলে মনে কর্ত্তেন; কারণ, রুষ ভাষায় না কি কোনও ভাল ভাবই প্রকাশ করা যায় না, এই ছিল তখনকার ধারণা (Dostoevski)। সংস্কারের ব্যভিচার সম্বন্ধে এমন আরও অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারত; তবে বাহুল্য ভয়ে আজ মাত্র আর একটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। আমাদের দেশে বিবাহোৎসবাদিতে বা থিয়েটার প্রভৃতি আনন্দভবনে যাকে আমরা কন্‌সার্ট আখ্যায় অভিহিত করি, সেটা যে আমাদের সুরুচি ও শিক্ষার ওপর কত বড় কলঙ্ক, তা আমরা খুব কমই উপলব্ধি করি বলে মনে হয়।

কাজেই, একরোকা ভাবে কোনও সমাজ-সংস্কার কর্ত্তে যাওয়াটা যে বড় নিরাপদ নয়, এ কথা আমাদের প্রথমে ভাল করেই বুঝতে হবে। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যা পেয়েছি, তার গুণাগুণ বুঝতে হলে আগে সেটাকে নিয়ে ভাল করে বিচার করে দেখা দরকার—এবং সঙ্গীত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। কারণ, তা না করলে নিরপেক্ষ ভাবে সত্যকার গুণের কদর করতে শেখা সম্ভব নয়, বরং হঠকারিতার ফলে সংস্কার করতে গিয়ে আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব ধারা সম্বন্ধে দিগ্‌ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

আমার মনে হয় যে, এজন্য অপর দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জ্জন করা বাঞ্ছনীয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে অল্প স্বল্প সংস্পর্শে এসেই আমি যে ভাবে লাভবান্ হয়েছি, তাতেই আমার খুবই মনে হয় যে, অপরাপর দেশের সঙ্গীত কি ভাবে বিকাশ লাভ করেছে জান্‌লে, তাতে আমাদের নিজেদের সঙ্গীত সম্বন্ধেও অন্তর্দৃষ্টি বড় কম বাড়বে না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও এই কথাই বলে। অনেক "দৈনিক সত্য" (fact) সংগ্রহ না কর্লে বৈজ্ঞানিক "সাধারণ-সত্যে" (truth) পৌঁছিতে পারেন না। এবং এ factএর সংখ্যা যতই বেশি হবে, সাধারণ সত্যের ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাও ততই কম্‌বে। জ্ঞানের পরিধি বাড়লে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, জীবনে এমন অনেক জিনিসকে আমরা নির্ব্বিকারে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করে এসে থাকি, যা হচ্ছে—না সত্য না অভ্রান্ত। তা'ছাড়া এই সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়ার দরুণই আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যের ধারাটি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। একটু ভেবে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, এটা কম আশ্চর্য্য নয় যে, অপরের মতামত জান্‌লে আমাদের নিজেদের সভ্যতের যথার্থ দাম সম্বন্ধে কত বেশি সচেতন হয়ে পড়া যায়। নানান্ সভ্যতা বা cultureএর সংস্পর্শে আমাদের নিজেদের সভ্যতা বা culture সম্বন্ধে দিব্য নির্ণয় করার যে কতখানি সহায়তা করে, তা এ সংস্পর্শের ফলে এক মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাই য়ুরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাক্‌লে তা থেকে আমাদের সঙ্গীতে যথেষ্ট লাভ হবার সম্ভাবনা। যেমন য়ুরোপীয় সঙ্গীতের একটা রীতি—স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি আমরা আমাদের সঙ্গীতের জন্য গ্রহণ কর্ত্তে পারি। এখানে অবশ্য বলে রাখা উচিত যে, স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি যে আমাদের সঙ্গীতে একেবারেই ছিল না তা নয়। আমাদের দেশে এখনও দুচার জন গায়ক-গায়িকা গানের সময় স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি করে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ ওস্তাদেরা সঙ্গীতের এ অলঙ্কারটি সম্বন্ধে না-ভাবার দরুণই হোক্, বা এর প্রয়োগ ভুলে যাবার দরুণই হোক্, এর ব্যবহার আজ খুব বিরল হয়ে এসেছে। য়ুরোপে কিন্তু গায়কেরা কখনই সুরের এক ওজনে গায় না। য়ুরোপের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গীতকে কিছু দিতে পারে, এ কথা স্বীকার

করায় লজ্জা নেই, বিশেষতঃ যখন স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি করে গাওয়া বা বাজানো যে আমাদের সঙ্গীতে একেবারে নেই তা নয়। সে যাই হোক্, এরূপভাবে গাওয়া বা বাজানোর বেশি প্রচার হওয়াটা বাঞ্ছনীয়, এইটেই হচ্ছে মোট কথা। সঙ্গীতে স্বরের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে চিত্রকলার আলোছায়ার তুলনা হতে পারে। আমাদের মধ্যে খুব কম ওস্তাদই এ সত্যটি উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছেন বলে মনে হয়। এমন কি এজন বেশ ভাল গায়ক আমাকে এরূপ ভাবে গান গাইতে বারণ করেছিলেন শুধু এই জন্যে যে, আমাদের বড় বড় ওস্তাদেরা এর পক্ষপাতী ন'ন। কারণ, তাঁরা চান শুধু রাগরাগিনীর ওপর তাঁদের ক্ষমতা দেখাতে বা তাঁদের জানালাপের দক্ষতা প্রদর্শন করতে। (এখানে আমি বলে রাখ্‌তে চাই যে, এ দক্ষতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ও খানিকটা প্রশংসনীয়—তাতে প্রাণ থাকুক বা না থাকুক)। কিন্তু স্বরের মনোজ্ঞ হ্রাসবৃদ্ধি করে গাইলে তাতে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য যে কতটা বেড়ে যায়, তা যাঁরই শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন। য়ুরোপীয় গায়ক-গায়িকাগণ স্বরের ওজন বাড়াবার বা কমাবার অভ্যাস রীতিমত ও অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে করে থাকেন। কারণ, তাঁরা জানেন ও বোঝেন যে, সঙ্গীতের কতখানি সৌন্দর্য্য এর ওপর নির্ভর করে।

এবার আমি যে বিষয়ের অবতারণা কর্ত্তে চাই, সেটি একটু বেশি রকম বিশদ ভাবে করবারই অধিকার নিতে চাই; কারণ, যাঁরা আমাদের সঙ্গীতে সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁদের এ বিষয়টি বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার বলে আমার মনে হয়। কারণ, যে বিষয় নিয়ে আমি এবার আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা খুবই গুরুতর; কেন না, শুধু গাওয়া বা বাজানোর পদ্ধতি মাত্র এর বিষয়ীভূত নয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের মূলগত ধারণা নিয়ে আলোচনা করা এ প্রসঙ্গের অবতারণার উদ্দেশ্য।

শ্রেষ্ঠ ললিতকলা সকলের সম্পর্কে সাধারণ ভাবে এ কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, তাদের technique বা বিকাশ পদ্ধতির মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে, বা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রও আলাদা হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাক্‌বেই যে, প্রত্যেক মহৎ শিল্পই মানব-মনের কোনও সৌন্দর্য্যানুভূতির বা সুন্দর উচ্ছ্বাসের (emotion) অভিব্যক্তি। ওস্তাদেরা কিন্তু ঠিক্ এই কথাটিই প্রায় ভুলে গিয়ে বসে থাকেন। কারণ, তাঁরা দাম দেন শুধু—তানালাপে নৈপুণ্যের, তা সে নৈপুণ্যের মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস থাকুক বা না থাকুক। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার। প্রত্যেক শিল্পের দুরকম আবেদন আছে বলে মনে হয়। একটি intellectual বা প্রবুদ্ধ উপভোগ, অপরটি emotional বা অনুভূতির উপভোগ। কোন সুরের বা রাগের রচনা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাকে বলা যেতে পারে—intellectual বা প্রবুদ্ধ উপভোগ; এবং সঙ্গীতের সব জড়িয়ে যে প্রভাব বা রস আমাদের কাছে ধরা দেয়, সেটাকে বলা চলে—emotional বা অনুভূতির উপভোগ। কোনও শিল্প হতে প্রবুদ্ধ ভাবে রস গ্রহণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে তার technique বা রচনাপদ্ধতির সঙ্গে কমবেশি নিবিড় পরিচয়ের ওপর এবং তাকে বিশ্লেষণ করে বোঝার ক্ষমতার ওপর। তা থেকে শুধু অনুভূতির দ্বারা রস গ্রহণ করা নির্ভর করে মূলতঃ ভাল-লাগার ওপর। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রহীতা বিশ্লেষণ করার কোনও পরোয়া রাখেন না, তিনি শুধু গ্রহণ করেই খুসি। অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধ উপভোগের ঠিক এ রকম ভাবে সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করা চলে না। কারণ এ দুই আবেদনের প্রকৃতি কখনও কখনও অনেকটা মিলেমিশে গিয়ে এমন অবস্থা হয় যে তাদের তফাৎ করা তখন মুস্কিল হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধির ও উচ্ছ্বাসের প্রত্যেকেরই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে একথা বলা যেতে পারে, সেহেতু যে আবেদন বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের চৈতন্যে পৌঁছয়, তাকে অপর আবেদন (অর্থাৎ যা উচ্ছ্বাসের দ্বারা আমাদের চৈতন্যের গোচর হয়) হতে পৃথক্ করে চেনা যেতে পারে এ কথা বলাও বোধ হয় নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। তাই এ কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, যেমন কোনও শিল্পীকে বিশ্লেষণ করে উপভোগ করার আনন্দের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তেম্‌নি তার সংস্পর্শে যে সহজানন্দ হয়—বিশ্লেষণ না করেও—তার মধ্যেও ঠিক তেমনি একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম আনন্দটি নির্ভর করে—শিল্পটি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের ওপর, যার মূলে সে বিষয়ে কিছু না কিছু চর্চ্চা থাকা দরকার; দ্বিতীয় আনন্দটির জন্য এরূপ

চর্চ্চার বা বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজন থাকে না। এখন—এবং এই কথাটিই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য—যে শিল্পের মধ্যে এ দুই প্রকার আবেদনের সামঞ্জস্য না থাকে, তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আখ্যায় অভিহিত করা চলে না। যাঁরা কোন শিল্পে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন, তাঁরা তার মধ্যে উচ্ছ্বাসের যথেষ্ট দাম দিতে প্রায়ই ভুলে গিয়ে থাকেন দেখা যায়। ফলে হয় এই যে, তাঁদের শিল্প এত বেশি intellectual হয়ে পড়ে যে, যে এ বিষয় নিয়ে বিশেষ রকম চর্চ্চা না করেছে সে তাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, ভালমন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পারে না—রস গ্রহণ করা ত দূরে থাকুক।

এখানে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার মনে করছি ও সেটা এই যে, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, এ রকম শুধু intellectual আবেদনের কোনও মূল্যই নেই। কেন না এর মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, ও সংসারে কোনও আনন্দই নিরর্থক বা মূল্যহীন নয়। সঙ্গীতের নিছক্ intellectual বিকাশের মধ্যেও যে সত্য আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, তা রাগরাগিনীর বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন। একটা রাগ বা রাগিনীর কাঠামকে বজায় রেখে তাকে নিয়ে যে সব বাহাদুরি করা যেতে পারে, তার একটা বিশেষ রকম আবেদন আছে, যেটা নির্ভর করে বোদ্ধার বিশ্লেষণে-ক্ষমতার ওপর। তবে বস্তুতঃ এরূপ আনন্দ মূল্যহীন না হলেও, সেটা আর যাই হোক্, ঠিক্ ললিতকলার আনন্দ নয়, এইটেই আমার বক্তব্য। কারণ যে নৈপুণ্যের মধ্যে আন্তরিক কোনও ভাবের বিদ্যমানতা নেই, তাকে artistic আনন্দ বলা সঙ্গত নয়। কেন না ঠিক্ এইখানেই ললিতকলার সঙ্গে বিজ্ঞান বা গণিতের তফাৎ। যেখানে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে গুণী তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসকে (emotion) সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দেন, সেখানে সে বাহাদুরিকে আর যাই হোক্ আর্ট বলে গণ্য করা চলে না। কিন্তু আর্ট না হলেও এর মধ্যে আনন্দ থাক্‌তে খুবই পারে; সুতরাং যাঁরা শুধু এরূপ বাহাদুরিরই পক্ষপাতী, তাঁদের দিক্ দিয়ে যে বল্‌বার কিছু নেই, এ কথা আমি মোটেই প্রমাণ কর্ত্তে চাই না; কেন না, এর মধ্যেও আনন্দ আছে, বং সংসারে কোনও আনন্দই মূল্যহীন নয়। তাই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সমজদারগণ যদি একেই সঙ্গীত-রসের চরম সার্থকতা মনে করে আনন্দ বোধ করেন, তা'হলে আমার তাঁদের সঙ্গে কোনও বিবাদ থাক্‌তে পারে না। আমি কেবল এরূপ কোনও দক্ষতার অভিব্যক্তিকে, ললিতকলা শ্রেণীভুক্ত করার বিরোধী, এই মাত্র।

আমাদের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত আজ কেন যে লোকের বিরাগভাজন হতে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রধান কারণ আমি মনে করি—ওস্তাদদের এই প্রাণহীন সুরকে নিয়ে অত্যধিক মারামারি করা। অথচ এটাই কেবল একমাত্র কারণ নয়। আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গীতে চর্চ্চার একান্ত অভাবও একটা মস্ত কারণ। কারণ তাঁরা এ সাদা কথাটি অনেক সময়ই ভুলে গিয়ে বসে থাকেন যে, কোনও শ্রেষ্ঠ ললিতকলার বিকাশকে উপভোগ কর্ত্তে হলে আর্ট সম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করা দরকার, শুধু একদেশদর্শী অর্থকরী শিক্ষার বলে তাকে বোঝা যায় না। কিন্তু ওস্তাদদের গানবাজনায় আশ্চর্য্য নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও, তা যে প্রায়ই আমাদের হৃদয়কে আর্দ্র করে তুল্‌তে পারে না, তার জন্য তাঁরাই বোধ হয় মোটের উপর বেশি দায়ী। কবি বলেছেন, He best can paint them who shall feel them most." এ কথা সব শিল্প সম্বন্ধেই খাটে। আমাদের ওস্তাদেরা কিন্তু এই কথাটিই প্রায় ভুলে গিয়ে তানের পর তান বিস্তার করতেই ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ে তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান, সঙ্গীতের আসল প্রাণটি কোথায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীও কখনও কখনও এ কথাটি যে ভুলে না যান এমন নয়। বিখ্যাত "জন খ্রিষ্টফার" উপন্যাসে Gottfried তাঁর ভাগিনেয় Christopherকে বল্‌ছেন, "তুমি সঙ্গীত রচনা করেছ শুধু রচনা করবার খাতিরে।" "সঙ্গীতের কর্ত্তব্য বিনয় ও আন্তরিকতা শেখা।" এ কথাগুলি আমাদের ওস্তাদদের মনে করে রাখা উচিত। কারণ তারা অনেক সময় কালোয়াতি করে, কোনও সত্য উচ্ছ্বাস বা ভাবকে মূর্ত্ত করে তোল্‌বার জন্য নয়, করে—শুধু তাদের শ্রোতৃবর্গকে ওস্তাদি দেখিয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব করে দেবার সাধু-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হয়ে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শিল্পী সৃষ্টি কর্ত্তে যান—আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় নয়, প্রশংসা পাবার উদ্দেশ্যে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁর শিল্পের খর্ব্বতা সাধন কর্ত্তে বাধ্য। কারণ প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা মানেই—অহঙ্কার-অভিমান, এবং

অহঙ্কার-অভিমানের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পের পরিপন্থী খুব কম বস্তুই আছে। কারণ কোনও শিল্পের প্রেরণা আমাদের মধ্যে কেবল তখনই আস্‌তে পারে, যখন আমরা প্রেরণার উৎসের কাছে আন্তরিক বিনয়ে মাথা নত কর্ত্তে সঙ্কুচিত না হই।

কালোয়াত চটে-মটে হয়ত বল্‌বেন, "এ সব কি বাজে কথা! আমার আর্ট বুঝ্‌তে হলে তোমাকে প্রথমতঃ কি দীক্ষিত হতে হবে না? (অর্থাৎ ভাল করে জিনিসটা শিক্ষা কর্ত্তে হবে না?)" এ কথা সত্য যে শিল্পীর কৃতিত্ব হতে যথার্থ রস গ্রহণ কর্ত্তে হলে তার গুণপনাকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে—কারণ এ সহানুভূতির অভাবে শিল্পী ও বোদ্ধার মধ্যে কোনও সত্যকার বন্ধন স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে যখন শিল্পী তাঁর শিল্পের দ্বারা বাহাদুরি পেতে গিয়ে অপরের বিস্ময় উদ্রেক করাটাই আসল জিনিস মনে করে বসেন, আত্ম-প্রকাশকে নয়, তখন জনসাধারণের বলা দরকার—"ব্যস্, আর না।" কারণ ঠিক সময়ে যদি এ সাবধান বাক্য বলা না যায়, তা'হলে পরে এক সময়ে না এক সময়ে reaction বা প্রতিক্রিয়ার স্রোত আস্‌বে আস্‌বে; এবং সেটা চিরকালই দুঃখের বিষয়, যেহেতু সব প্রতিক্রিয়ারই প্রবৃত্তি এই যে সে একটু বেশি দূর গিয়ে ভুল করে বসে। এ শতাব্দীর প্রারম্ভে যেমন টলষ্টয় তাঁর "আর্ট কাকে বলে?" (What is art?) বইখানিতে আর্টের দুর্ব্বোধ্যতার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে প্রতিক্রিয়ার ফলে একটু বেশি বলে ফেলেছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ভারি চমৎকার দেখিয়েছিলেন যে কোনও শিল্প হ'তে রস গ্রহণ কর্ত্তে হলে যদি তার গঠন-পদ্ধতি (technique) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজন হয়, তা'হলে সে শিল্পের সমজদার-সংখ্যা ক্রমেই কমে যেতে থাকবে ও শেষে এমন দাঁড়াবে যে একজন শিল্পীর সৃষ্টি কেবল এক সে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। অনেকটা এরূপ অবস্থা য়ুরোপে ঘটেছে—রহস্যময় কবিতায়, futurist চিত্রবিদ্যায় ও আধুনিক সঙ্গীতে। সুতরাং টলষ্টয়ের উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী যে সম্পূর্ণ অমূলক আশঙ্কা, এমন কথা বলা চলে না। উদাহরণতঃ আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রবণতাই হচ্ছে—সঙ্গীতবিশারদদেরও তাক্ লাগিয়ে দেওয়া। তাতে এমন সব অদ্ভুত জিনিস ঢোকান হচ্ছে যে, সে সবের সৌন্দর্য্য এক তাদের প্রবর্ত্তকগণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে কেউই বড় একটা বুঝতে পারছে না। এক কথায় সঙ্গীতকলা আজ য়ুরোপে অত্যন্ত technical হয়ে পড়ছে। কাজেই টলষ্টয় আর্টে techniqueএর অনেক সময় দুঃসহ দাবীর বিরুদ্ধে যা যা লিখেছেন, তা কখনও কখনও শুন্‌তে একটু কঠোর হলেও, সম্পূর্ণ বাজে কথা নয়। কেবল, তাঁর মনোভাব অনেকটা প্রতিক্রিয়া-প্রসূত বলে তিনি শেষটা নিরপেক্ষ স্থৈর্য্য রক্ষা কর্ত্তে পারেন নি, যার অভাবে সত্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। আমার মনে হয় যে টলষ্টয় ও তাঁর মতাবলম্বিগণের ভুল হয়েছিল প্রধানতঃ আর্টে techniqueএর দাবী একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া। কারণ technique ত আর কিছুই নয়—শুধু শিল্পের উপাদানকে নিয়ে ইচ্ছামত গড়ার ক্ষমতা মাত্র। খানিকটা শিক্ষালাভ বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হলে কোনও মহৎ শিল্পের মর্য্যাদা বোঝা সম্ভবপর নয়। কেন না কোনও বিশেষ রকম আবেদনের অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে তাতে সাড়া দেওয়া শক্ত। কোনও বিশেষ ভাবোচ্ছ্বাসের বা শিল্পের দাম তখনই দেওয়া যায়, যখন তার সঙ্গে কিছু না-কিছু পূর্ব্ব-পরিচয় থাকে। সকলেই কিছু সেক্ষপীয়রের বিশ্বজনীনতা বা আনাতোল ফ্রাঁসের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপভোগ কর্ত্তে সক্ষম নয়। সুতরাং এরূপ প্রকৃত শিল্পীও যদি কারুর মনে অনুরণন তুলতে না পারেন, তাহলে দোষ শিল্পীর নয়। আমার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু শিল্পের লোকপ্রিয়তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা নয়,—শিল্পীর নিজের প্রতি কর্ত্তব্য নিয়েই বেশি করে আলোচনা করা। কারণ কোনও শিল্পের সংস্কার সাধন কর্ত্তে হলে এই শেষোক্ত সমস্যাটিরই প্রয়োজনীয়তা বেশি ও সেটা এই জন্য যে শিল্পীর পক্ষে কখনই লোকপ্রিয়তার অপেক্ষা রাখা চল্‌তে পারে না। তাঁর একমাত্র ধ্রুবতারা হচ্ছে—নিজের আন্তরিক অনুভূতিকে যথাযথভাবে মূর্ত্ত করে তোলা। এ আন্তরিকতা যদি থাকে, তবে তার আদর পরে হয়ে যাবেই, কিন্তু এ আদর হওয়া-না-হওয়াটা একটা মুখ্য বিষয় নয়, গৌণ-বিষয় মাত্র।

এখন শিল্পীর কীর্ত্তি-কলাপের মধ্যে উচ্ছ্বাসের উপাদান বিদ্যমান না থাক্‌লে সেটা শিল্পের মধ্যে গণ্য হতে পারে না এই সত্যের আলোয় আমাদের ওস্তাদদের গুণপনার বিচার

করা যাক্। এ সবের মধ্যে আমরা সচরাচর কি দেখতে পাই?—না, প্রধানতঃ সুর নিয়ে নীরস লাফালাফি, মুদ্রাদোষের কথা যদি ছেড়েই দেওয়া যায়। এবং এ কথা বলাই বেশি যে এ লাফালাফির মধ্যে আমরা খুব কম ক্ষেত্রেই উচ্ছ্বাসের অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাই। অথচ এই উপাদানটিই হচ্ছে শিল্পের প্রাণ। কাজেই এসব ওস্তাদদের কারোয়াতির আরেদন হতে পারে কেবল অত্যন্ত technical গোছের। এখন, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, যতক্ষণ না কোনও শিল্পের মধ্যে intellectual ও emotional আবেদনের একটা সহজ সামঞ্জস্য দেখা যায়, ততক্ষণ তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলা চলে না। এ সংজ্ঞা যদি সত্য হয়, তবে ওস্তাদদের নিছক সুর নিয়ে লাফালাফি করা আর যাই হোক তাকে ললিতকলা বলা চলে না। এখন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে তা-ই যদি হয়, তবে এ-রকমটি হোলই বা কেমন করে, যখন এরূপ কদভ্যাসের দৃষ্টান্ত শুধু আমাদের দেশে নয় য়ুরোপেও দেখা গিয়ে থাকে। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর Purpose of Art প্রবন্ধে লিখছেন:—"An extraordinary piece of vocalisation or a display of marvellous gymnastics on the violin brings a round of applause."* তিনি আরও আক্ষেপ করেছেন যে, Musical critics often give applause to compositions as being "scientific"—as being meritorious not in respect of the emotions they arouse, but as appealing to the cultured intelligence of the musician.* সঙ্গীতের এ দিগ্‌ভ্রমের প্রধান কারণ খুব সম্ভবতঃ এই যে, সঙ্গীতে কোন দুরূহ সাধনা দেখলে তজ্জনিত বিস্ময়কে আমরা শিল্পের আনন্দ ভেবে ভুল করে বসে থাকি। একটা দুরূহ বা অসাধারণ কিছু দেখলেই সাধারণ মানুষ তাতে বিস্মিত না হয়ে পারে না; এবং এ বিস্ময়কে সহজেই শিল্পের আনন্দ ভেবে ভুল করে বসে থাকে। তা'ছাড়া ঘোরতর চীৎকার বা অদ্ভুত দ্রুত গান-বাজনা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে অনেকটা মোহমুগ্ধ করে ফেল্‌তে পারে, যাকে পুলক মনে করা কঠিন নয়। অন্ততঃ মহীশূর-রাজ্যে কোনও নামজাদা গায়কের বিদ্যুদ্গতি সার্গম আলাপ শুন্‌তে শুন্‌তে এ কথাটা আমি বিশেষ করেই উপলব্ধি করেছিলাম মনে আছে। কিন্তু একটু ধীর ভাবে বিচার করে দেখলেই দেখা যায় যে, এরূপ তারিফ বা বিস্ময় ও শিল্পকলার মনোজ্ঞ পুলকের আনন্দ—এক বস্তু নয়। যিনিই আর্ট সম্বন্ধে ভাল করে ভেবে দেখেছেন, তাঁরই কর্ত্তব্য এ ভ্রান্ত লোকমতটিকে জনসমাজ হতে নির্ব্বাসিত করা।

এখানে একটা কথা আমার বলে রাখা দরকার, কারণ নইলে আমাকে ভুল বোঝা শক্ত হবে না। কথাটা এই যে, সঙ্গীতের প্রাণ বা উচ্ছ্বাস বলতে আমি সম্পূর্ণ গানের কথার আবেদন বুঝছি না। কারণ তা'হলে এসব কথার কোনটাই যন্ত্রসঙ্গীতের সম্বন্ধে খাট্‌তে পারে না, অথচ সঙ্গীতে কণ্ঠ সঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্র-সঙ্গীত ছোট নয়। এমন কি কণ্ঠসঙ্গীতের বেলায়ও কথার মূল্য থাকলেও—গানে কথার স্থান সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল—সুরের মূল্যই যে বেশি এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তার প্রধান কারণ এই যে, কথাবিহীন সুরের দ্বারা সঙ্গীত হয়, (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতে বা কণ্ঠসঙ্গীতে ও আলাপে) কিন্তু বিনা সুরে শুধু কথায় গান হতে পারে না। তাই সঙ্গীতে প্রাণ বলতে আমি প্রধানতঃ সুরের প্রাণই বুঝি, যদিও হয়ত সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কোনও রাগের আরোহ বা অবরোহ অন্যমনস্ক ভাবে বা অনুভব না করেও গাওয়া যায়, আর দরদ্ দিয়েও গাওয়া যায়। এবং যিনিই ভাল সঙ্গীতের কোনও খবর রাখেন, তিনিই জানেন এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কতখানি।

গান যে আমাদের মনে কতখানি অনুরণন তুলতে পারে ও সঙ্গীতানুরাগীকে কতখানি অভিভূত করে ফেলতে পারে, তার সম্যক্ ধারণা পেতে হলে মধুর স্বরের সঙ্গে গান শোনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এ স্বরের মাধুর্য্যের অবর্ত্তমানে গান কখনই তার চরম আবেদন আমাদের কাছে জ্ঞাপন কর্ত্তে পারে না। কোনও ললিতকলার প্রেরণাকে যদি আমাদের মর্ম্মস্থানে পৌঁছতে হয়, তা'হলে প্রকাশের mediumএর উৎকর্ষ সাধন করতেই হবে। চিত্রকলায় এ medium হচ্ছে ভাল রঙ্, স্থাপত্যে ভাল প্রস্তর ও সঙ্গীতে স্বর-মাধুর্য্য। যন্ত্রসঙ্গীতের বেলায়ও এ কথা খাটে, অর্থাৎ যন্ত্রের সুর পাতলা বা খনখনে হলেও

* Facts and Comments.

তার বাজনার চরম ফল পাওয়া সম্ভব নয়। বীণার সুর সেতারের চেয়ে অনেক মধুর বলেই বীণা শুনে বেশি তৃপ্তি পাওয়া যায়, নইলে কৃতিত্ব ত দুয়েই যথেষ্ট দেখানো যেতে পারে। কণ্ঠসঙ্গীতেও তেম্‌নি মধুর স্বরের দাম খুব বেশি। অবশ্য মধুর কণ্ঠস্বরই সব নয়, কিন্তু তাই বলে তার দাম নিতান্ত কমও নয়! মধুর স্বরের প্রধান গুণ হচ্ছে, তা শোনবামাত্রই আমাদের মোহিত করে ফেলে। আমি এটা আক্ষেপের বিষয় মনে না করেই পারি না যে আমাদের দেশের ওস্তাদেরা সুন্দর কণ্ঠস্বরের বিকাশের যথেষ্ট দাম দেন না, বা তার পদ্ধতিও জানেন না। এ কথা হয় ত অনেকেই অস্বীকার কর্ত্তে পারেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ কথা যে সত্য, তা মনে করার অনেকগুলি যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। আমি সম্প্রতি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে ও প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ গায়কের গান শুনে এসেই আজ এ কথা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি (এখানে বলে রাখা দরকার মনে করি যে, এ কথাটি শুধু ওস্তাদদের সম্পর্কেই বিশেষ করে প্রযোজ্য, যেহেতু বাইজীদের মধ্যে মিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়)। আমাদের ওস্তাদেরা বা শিক্ষকেরা যে গানে কণ্ঠস্বরের দাম সম্যক্ উপলব্ধি করেন না, এ কথার সপক্ষে শুধু প্রধান প্রধান যুক্তিগুলির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। প্রথমতঃ, আমি নিজে অনেকের কাছে শিক্ষা নিয়েছি। তাঁদের কাকেও কখনও, কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য্য যে বাড়ান যায়, বা কি উপায়ে যায়, সে সম্বন্ধে কোনও উপদেশ আমাকে অদ্যাবধি দিতে শুনি নি; অথচ জার্ম্মাণিতে এ কথা আমি প্রথমেই শুনেছিলাম বল্‌লেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমি ভারতবর্ষের নানা স্থলে নানা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখে শুনে এসেছি। এসব বিদ্যালয়ের প্রায় কোথাও ছাত্র-ছাত্রীর স্বরের মাধুর্য্য বাড়াবার জন্য শিক্ষকদের কোনও উল্লেখ-যোগ্য চেষ্টা দেখি নি। তৃতীয়তঃ, আমাদের ওস্তাদেরা যদি গানে কণ্ঠস্বরের মর্য্যাদা বুঝ্‌তেন, তা'হলে তাঁরা অনেক সময় তাঁদের স্বাভাবিক সুকণ্ঠ প্রচণ্ড গলাবাজি ও অত্যধিক চীৎকারে নষ্ট করে ফেলতেন না। শুধু কণ্ঠস্বরের কোমলত্ব ও মিষ্টতা বাড়ানোর দরুণ গানের মনোহারিত্ব যে কতখানি বাড়ান যেতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণা নেই বলে, তাঁরা বাধ্য হয়ে শুধু গলাবাজি দ্বারা শ্রোতাকে হতবুদ্ধি করে দেবার প্রয়াসী হয়ে থাকেন। এর ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, যাদের গান মধুর, তাদের এ সব ওস্তাদেরা অবজ্ঞার চোখেই দেখা উচিত বলে মনে করেন। চতুর্থতঃ, আমাদের দেশে এমন অনেক গাইয়েরই নাম শোনা যায়, যাঁদের কণ্ঠস্বর কর্কশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের নিছক কালোয়াতির জোরে যশের শিখরে উঠেছেন। গানে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য একটা বিলাস মাত্র নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা যদি তাঁরা বা জনসাধারণে বুঝ্‌তেন, তাহলে এর অভাবের দরুণ তাঁদের মুখে আক্ষেপ শোনা যেত। পঞ্চমতঃ, আমি অনেক সমজদারের সঙ্গেই সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তাঁরা কোনও গাইয়ের সুখ্যাতি করার সময়, বিশেষ করে জিজ্ঞাসা না কর্লে, প্রায় কখনও তাঁর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্যই করেন না। যদি সুকণ্ঠ গানের একটা প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য হত, তাহলে কি তাঁরা সমালোচনা স্থলে এর প্রতি এতটা উদাসীন হতে পার্ত্তেন? ষষ্ঠতঃ, আমি এমন অনেক দৃষ্টান্তই জানি, যেখানে ওস্তাদেরা ছাত্রকে দিয়ে এত বেশী গান করিয়ে নিয়েছেন, যে, তাতে তার গলার মিষ্টত্ব যথেষ্ট নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ সেজন্য ওস্তাদবরকে অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, দুঃখিত হতেও দেখি নি। পশ্চিমে কোনও এক বিখ্যাত সঙ্গীত স্কুলের কয়েকজন ছাত্রকে এক দিন আমার কাছে গাইতে বলা হয়। তারা এত দুরারোহ পর্দ্দায় উঠে তাদের তানালাপে কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা কর্চ্ছিল যে, তাতে আমার শ্রোতা হয়েও কষ্ট হচ্ছিল—তাহলে বুঝুন, তাতে তাদের কতখানি পরিশ্রম হচ্ছিল। অথচ এরূপ ভাবে কষ্ট করে অনবরত উচ্চ পর্দ্দায় গাওয়ার ফল কণ্ঠস্বরের পক্ষে অত্যন্ত মন্দ। ও শেষতঃ, এটা কি ভেবে দেখ্‌বার বিষয় নয় যে, আমাদের দেশেই বা কেন খুব বেশির ভাগ ওস্তাদের কণ্ঠস্বর অমনোহর, যেখানে য়ুরোপে কণ্ঠস্বর ভাল না হলে কোনও গায়ক বা গায়িকারই নাম হওয়া অসম্ভব? এটা হওয়া বোধ হয় খুব সম্ভব নয় যে, বিধাতা কোনও বিশেষ দেশের লোককে সুকণ্ঠকে একচেটে করবার অধিকার দিয়েছেন। কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী, অর্থাৎ যেমন ভাব তেমনি লাভ। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, য়ুরোপীয় গায়ক গায়িকারা কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বর্দ্ধনের একান্ত প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন, আমরা তা করি না। জার্ম্মানীতে

য়ুরোপীয় প্রণালীতে স্বর সাধন কর্ত্তে গিয়ে আমি প্রথম এ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলাম। কারণ, সেখানে আমি প্রথমে বুঝেছিলাম যে স্বরের মিষ্টতা ও জোয়ারি (over-tones) চেষ্টা করে বাড়ানর উপায় আছে, যে উপায়গুলি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আগে হয় ত জান্‌তাম, কিন্তু আজকালকার দিনে যে জানি না এটা নিশ্চয়। ফলে আমরা গাই যে যেমন ভাবে পারে। কারুর কারুর গলা আপনা হতেই মিষ্ট, কারুর কারুর নয়। কিন্তু মিষ্টতা বাড়াবার বা জোয়ারির উন্নতি সাধন করার কোনও পদ্ধতিই অন্ততঃ আজকের দিনে আমাদের জানা নেই। কণ্ঠসাধনের মধ্যে যে য়ুরোপ কত নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের ওস্তাদদের কোন ধারণাই নেই, এ কথা, যাঁরই য়ুরোপীয় পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় আছে, তিনিই জানেন।

তবে আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট দাম না দেবার গভীরতম কারণ হচ্ছে—আমাদের ওস্তাদদের গানকে নিছক intellectual সাধনা বলে মনে করা, এ সব পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়। কারণ, অভাব বোধ হলে তবেই সে অভাব-পূরণের আবিষ্কার নিয়ে মানুষ মাথা ঘামাতে পারে। গানকে যদি শুদ্ধ একটা intellectual জিনিস বলে মনে করা যায়, তাহলে প্রকাশভঙ্গীর মিষ্টতাই বল বা কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্যই বল, এ সবের অভাব তত মনে হয় না; সুতরাং এ সবই ছোট বলে প্রতীয়মান হয়। গানের intellectual দিক্‌টার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েও এ কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, গান হতে যতটা আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, তা আদায় করে নিতে হলে, গানের অন্য অনেক দিক্ সম্বন্ধেও সচেতন হতেই হবে। তার মধ্যে প্রধানতঃ গানের প্রেরণার বা উচ্ছ্বাসের আন্তরিকতাকে ও স্বরের মনোহারিত্ব বা গাম্ভীর্য্যকে নিতান্ত দরকারী জিনিস বলে মনে করা যেতে পারে। সঙ্গীতে মনোজ্ঞ কণ্ঠস্বরকে স্থাপত্যে মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমাদের সঙ্গীতের যে কোনও সংস্কারে আমাদের এই গভীর ত্রুটির সংশোধন না কর্লেই চল্‌বে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি আর একটি প্রসঙ্গের মাত্র উল্লেখ করেই নিরস্ত হব। সেটা হচ্ছে এই যে, কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পই অশিক্ষিত ও সঙ্কীর্ণ-চিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে শুধু যে উত্তরোত্তর বিকশিত হতে পারে না তাই নয়, এতে তার উত্তরোত্তর অবনতি হওয়াই সম্ভব, যেমন আমাদের দেশে হয়েছে। পক্ষান্তরে য়ুরোপে গত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে * শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কি আশ্চর্য্য রকম দ্রুত উন্নতি হয়েছে তা ভাব্‌লে গানে শিক্ষা ও culture এর মূল্য আরও বেশি করে বোঝা যায়। এর কারণ এই যে অজ্ঞতার মাঝখানে থাক্‌লে স্বাধীন সৃষ্টির প্রেরণা আচার ও শাস্ত্রের ভয়ে পদে পদে বাধা পেতে থাকে। তাই যেখানে স্বাধীন বিশ্বাস অনুসারে কাজ কর্ত্তে সঙ্কোচ বা বাধা বিদ্যমান, সেখানে নূতন কিছু সৃজনের শক্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। কাজেই যেখানে শিক্ষা নেই, সেখানে ললিতকলা পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়ে উঠ্‌তে পারে না। আজ আমাদের সুন্দর সঙ্গীতের দুর্দ্দশার দৃশ্য এ কথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। আমাদের ওস্তাদেরা সচরাচর বোধ হয় কুশিক্ষার ও গোঁড়ামির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না (অবশ্য দুচারটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়)। তার ফলও হয়েছে তেম্‌নি। য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এ বিষয়ে আমাদের তার কাছে অনেক শেখ্‌বার আছে। Beethoven ও Wagner † শুধু যে সঙ্গীত বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভাবান্ ছিলেন তাই নয়, তাঁরা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চহৃদয় লোক ছিলেন। Beethoven বলেছিলেন :—আমি মানুষের কোনও গুণকেই গুণ বলে মানি না যা তাকে মানুষ হ'তে না শেখায় ‡। Wagner অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সঙ্গীতে সমালোচক হিসেবেও তাঁর স্থান বড় কম ছিল না। তিনি কত চিন্তাশীল

* John Sebastian Bachএর সময় থেকেই (১৬৮৫—১৭৫০ য়ুরোপীয় symphony orchestral musicএর উন্নতি আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে।

† Beethoven (১৭৭০—১৮২৭) জার্ম্মাণীর ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ classical সঙ্গীত-রচয়িতা।

Wagnerও (১৮১৩—১৮৮৩) জার্ম্মাণীর ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতাদের অন্যতম।

‡ Ich kenne keine andern Vorzuege des Menschen als diejenigen welche ihn zu den bessern Menschen zaehlen machen (Romain Rolland প্রণীত Beethoven)

লোক ছিলেন, তা তাঁর এই একটি সুন্দর উক্তি থেকেই বোঝা যায় :—"জীবনের যেখানে অবসান শিল্পের সেখানে আরম্ভ" বা "যখন আমাদের বর্ত্তমান নৈরাশ্যময় তখন আমরা যা চাই, শিল্পকলা দিয়ে তা সৃষ্টি করি।" (L'art commence où la vie cesse", Quand le present ne nous offre plus rien, nous crions par l'œuvre d'art"—from "Musiciens d' Aujourd'hui" Romain Rolland প্রণীত,) এরূপ সুন্দর গভীর চিন্তা এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ভাবাও কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?—আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে, "না, সম্ভব নয়।" কিন্তু যত দিন সঙ্গীতে স্বাধীন চিন্তা ও উদার মতামতের দাম দিতে আমরা না শিখ্‌ব, তত দিন তাতে কোনও সত্যকার সংস্কার সাধন করা সম্ভব হবে না। আমি Romain Rolland মহোদয়েরই বাণী উদ্ধৃত করে আজ এ প্রবন্ধের শেষ করব যে, যেখানে "চরিত্র মহৎ নয়, সেখানে শুধু যে মহৎ মানুষের বা শিল্পীর বিকাশ সম্ভব নয় তাই নয়, বড় কর্ম্মীর বিকাশও সম্ভব নয়" (Où le caractère n'est pas grand, il n'y a pas de grand homme, il n'y a meme pas de grand artiste, ni de grand homme d'action—Beethovenএর জীবনী।)

কুজ্ঝটিকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম-এ, বি-সী-এস্

(১)

কোন লুপ্ত যুগ হ'তে ভ্রমিতেছ ধরা'পরে কহ ওলো সুন্দরি কুয়াসা,
কারে খুঁজি সারা হ'লে আপনাবিকিয়ে দিয়ে,—দিশা-হারা এ-কি ভালবাসা!
স্রষ্টার ইঙ্গিতে যবে উঠেছিল দিবাকর জগতের প্রথম ঊষায়,
অসহিষ্ণু জেগে উঠি,—ঢেকেছিলে কি গো তারে অভ্রময়ী ধূসর ভূষায়!
নবীন ভাস্কর যবে গিরিশীর্ষে দিবালোক বিতরিলা সৃষ্টির প্রভাতে,—
সেদিন অবধি কি গো প্রসারিয়া ধূম্রদেহ ফিরিতেছ তারি সাথে সাথে!

(২)

নিত্য অন্ধতমসায় আবরিতে চরাচরে কি মোহিনী উন্মাদনা নব,
কোন্ প্রিয় নাগরের সুদূর প্রণয় লোভে উচ্ছ্বসিত অভিসার তব!
কার ধ্যান ভাঙ্গিবারে শ্রান্তিহীন পন্থা বাহি "নিশা"-বেশে নিত্য আগমন,
কোন্ ধন্যা নায়িকারে ক্ষুণ্ণ করিবার তরে একনিষ্ঠ অক্লান্ত যতন!
সদ্য-জ্ঞানালোক-দীপ্ত বিশ্ব যবে চেয়েছিল সুপ্তোত্থিত অনাবৃত আঁখি,
লজ্জা-স্নাত-নতমুখে দিগন্ত হইতে তারে ফেলেছিলে অঞ্চলেতে ঢাকি!

(৩)

নিত্য পুরাতন খেলা,—নবীন প্রমোদে, তবু শুনিতেছি নিত্য হাহাকার!
অনন্তের তট হ'তে কি বেদনা এনেছিলে,—কি বাসনা সাধনা তোমার!
ফিসে তব নিরাময়,—আঁধারে কি আলোকেতে,—কার সাথে মিলিবারে চাও,
ব্যর্থ কত অতীতের স্মৃতি সহ তাই বুঝি কোন্ শূন্য আকাশেতে ধাও!
ক্ষান্ত হও পার যদি।—শুন ওলো কুজ্ঝটিকা, কুহকিনী সুন্দরি কুয়াসা,
অনন্তের সত্তাসনে ক্ষুব্ধ এ প্রণয়-লীলা,—অভিশপ্ত এ কি ভালবাসা!

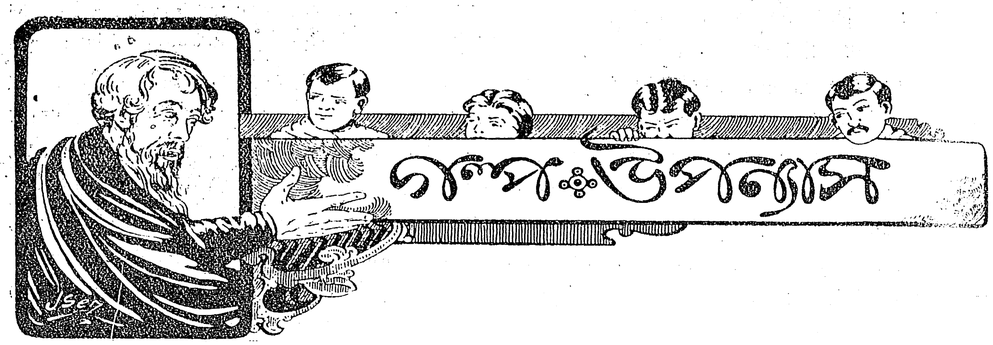

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১১

মনীশ যে এমন করিয়া কেন চলিয়া গেল, তাহা উমা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কারণটা যতই তাহার কাছে দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছিল, সে ততই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

চিরশান্ত মনীশদা,—তাহার মুখ একটা দিনের জন্য গম্ভীর দেখা যায় না, সর্ব্বদা সে হাসি-মুখ,—যাহার মনটা বালকের মতই সরল, মধুর,—সে আজ কেন এরূপ হইয়া পড়িল।

নিজের মন দিয়া সে মনীশদার মনটা বুঝিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না। তখন সে সাধারণের ভাব দিয়া মনীশকে দেখিবার চেষ্টা করিল।

মনীশের মনে কি কোনও পাপ—

আ-ছি, তাহাও কি হইতে পারে?

মনীশদার মনে পাপ, এও কি সম্ভব হয়? মনীশদা যে শিশুর মত সরল—পবিত্র মনখানি তাহার, সে মনে পাপ কখনও তাহার কালিমা রেখা অঙ্কিত করিতে পারে না।

কিন্তু সংসারে বিচিত্রই বা কি? অমরনাথ যে বলিতেন সংসারে সকলই সম্ভব হইতে পারে, অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না, সেই কথাটা উমার মনে পড়িয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল—মনীশের মাসিমা মৃত্যুকালে এক দিনকার কথা। মদ খাওয়া লইয়া তিনি বলিতেছিলেন, মনীশও মাঝে মাঝে মদ খায়। কথাটা সম্ভবপর বলিয়া সে ধারণাই করিতে পারে নাই; তাহার পর জগতে সবই সম্ভব মনে করিয়া সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল—কিন্তু সে বিশ্বাসের মূল শিথিল ছিল। সে দিন কথায় কথায় সে মনীশকে উপহাসছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি না কি মদ খাও মনীশদা?"

মনীশ তাহার শান্ত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিয়াছিল, "কথাটা শুনেছ নিশ্চয়ই, আগে বল উমা, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?"

কালবিলম্ব না করিয়া উমা উত্তর দিয়াছিল, "করি বই কি, কারণ জগতে অসম্ভব কিছুই থাকতে পারে না।"

মনীশ গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "তবে তাই জেনে রাখ, আর বেশী কিছু জানতে চেয়ো না। আমার সম্বন্ধে বেশী খোঁজ করা উচিত নয়। শুধু আমার সম্বন্ধেই বা বলি কেন, মানুষের সম্বন্ধেই বেশী খোঁজ করা উচিত নয়। যা শুনবে—তা শুধু শুনেই যেয়ো। মানুষের সম্বন্ধে খোঁজ করতে করতে তার এমন অনেক দোষ বেরিয়ে পড়ে, যাতে

অত্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তিও ঘৃণার্হ বলে বিবেচিত হন। যাদের মান্য কর, ভালবাস, তাদের খোঁজ মোটেই নিয়ো না। পার যদি এই উপদেশটা আমার মনে করে রেখো।"

উমার মনে মনীশের এই কথাটা জাগিয়া উঠিতেই, সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। না, মনীশদার মনে যাহাই থাক, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে কি অধিকার তাহার আছে? সে মনীশদাকে ভক্তি করে, ভালবাসে, তাহাই করিয়া যাক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুক, মনীশদার মনে যদি কোনও চিন্তা উঠিয়া থাকে, সে চিন্তা লয় হউক।

সন্ধ্যাবেলা ব্যতীত উমা পিতাকে পাইত না। সারা দিন তিনি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। দিবানিদ্রা তাঁহার ছিল না, সে সময়ও লেখাপড়া, কাজকর্ম্ম করিতেন। সন্ধ্যার মধ্যে সব কাজ তাঁহার শেষ করাই চাই। সে সময়টা তিনি কন্যাকে উপদেশ দিবেন, ভালমন্দ চারিদিককার গল্প করিবেন।

উমা ঠাকুরমায়ের সন্ধানে গেল। বগলা দেবী তখন বাবুন ঠাকরুণের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। গল্পটা আর কিছুই নহে—সেই কাশী যাত্রা। তিনি না কি অতি-বড় পাপিনী, তাই বাবা বিশ্বনাথ তাঁহাকে টানি-টানি করিয়াও পায়ের তলে টানিতে পারিতেছেন না। তা এইবার তো তিনি আশা করিতেছেন নিশ্চয়ই কাশী যাইতে পাইবেন। ঊষাটাকে বড় ভালবাসিতেন, কেবল তাহার মায়াতেই যাইতে পারিতেছিলেন না। মনীশ যাহা বলিল, তাহাতেই তাঁহার সব আশা ভরসা ফুরাইয়াছে। ঊষা আসিলেও তিনি আর তো তাহাকে ছুঁইতে পারিবেন না, ঘরেও প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন না. সে না কি একেবারে খিষ্টেনের বাড়ী, তারা না খায় এমন জিনিস নাই। বাধ্য হইয়া ঊষাকেও সব খাইতে হয়, নইলে শুকাইয়া মরা—তা তো আর পারা যায় না। যাহাই হোক, ঊষাও খিষ্টেন হইয়াছে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। বাবা বিশ্বনাথ কি এই নিদারুণ সংবাদ দিয়া তাঁহার বুকটা ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার পর তাঁহাকে চরণে টানিয়া লইবেন?

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে কতবার তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, কতবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িল, হার ঠিক নাই। বাস্তবি তাঁহার মনঃকষ্টের অবধি ছিল না। যে দুইটিকে হাতে করিয়া মানুষ করিলেন, তাহার একটি বিধবা হইল, সংসারের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গেল, আর একটী, সে থাকিয়াও রহিল না।

উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল,—এ দুঃখময় প্রসঙ্গের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইল না।

নিজের গৃহে গিয়া সে কাপড়খানা ছাড়িয়া গরদ পরিয়া আহ্নিকে বসিল। এ কাজটা কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত; এ সময়ে উমার মনে কোনও ভাবনা থাকিতে পারিত না।

প্রায় এক ঘণ্টা সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—দাসী কখন আসিয়া দেয়ালের ল্যাম্পটা জ্বালাইয়া খুব কমাইয়া দিয়া গিয়াছে।

বাহির হইবামাত্র দাসী সংবাদ দিল, ঠাকুরের আরতির সময়ে তাহাকে সেখানে যাইতে অমরনাথ আদেশ দিয়াছেন, তিনিও সেখানে গিয়াছেন।

উমা নীচে নামিয়া গেল।

ঠাকুরবাড়ী স্বতন্ত্র, সেখানে ঠাকুরের বৃহৎ গৃহ, দালান, ছোট ছোট অনেকগুলি কুঠারিও ছিল। পূজারি এখানে থাকিত। একজন ভৃত্য ও দাসী এ দিককার জন্য আলাদা রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক দিন অতিথি, দরিদ্র এখানে ঠাকুরের প্রসাদ পাইত, এ জন্য একটী পাচকও ছিল।

উমা দালানের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ যুক্ত করে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আরতির সময়ে প্রত্যেক দিনই অনেক লোক সেখানে আসিয়া জুটিত, আজও অনেক লোক আসিয়াছিল। আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, দর্শকেরা ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে দাঁড়াইয়া ছিল।

উমা একদৃষ্টে গোবিন্দজীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয় তখন পবিত্র ওঁ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দীপ্ত চক্ষে অপূর্ব্ব অপার্থিব দৃষ্টি।

আরতি শেষ হইয়া গেল,—বোল হরিবোল শব্দে সমস্ত ঠাকুরবাড়ীটা কম্পিত হইয়া উঠিল। দর্শকেরা মাটীতে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া যে যার গৃহে ফিরিল।

"উমা—"

উমা তখনও মাটীর উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া ছিল।

পিতার আহ্বান কাণে আসিতে, শেষ আর একবার প্রণাম করিয়া উঠিল। তখন ঠাকুরবাড়ী প্রায় লোকশূন্য।

অমরনাথ স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "চল মা—ঘরে যাই।"

পিতার দক্ষিণে কন্যা অগ্রসর হইল।

"আচ্ছা বাবা, এই দেবতাই আগে সত্য ছিলেন?"

অমরনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ কি প্রশ্ন পাগলী মা?"

উমা বলিল, "না বাবা, বল না। তোমার কথাগুলো কিন্তু সব ঠিক হয়। আমি তাই ভাবি, তুমি সব জানতে পার কি করে?"

অমরনাথ বলিলেন, "যত বছর মাথার উপর দিয়ে চলে যায় মা, তত জ্ঞানও দিয়ে চলে যায়। দেখে শুনে সবই জানা যায়, এতে তোমার বাপের বিশেষত্ব বড় কিছু নেই। দেবতা আগে সত্য ছিলেন, এখন কি মিথ্যে হয়েছেন মা? দেবতাকে আগে লোকে ডাকত, তাই তিনি ছিলেন সত্য; এখন ডাকে না, বিশ্বাস হারিয়েছে, তাই বলে কি তিনি মিথ্যা? সত্য মিথ্যা নিজের মনে, সত্য মিথ্যা বাইরে জেগে নেই। তোমার মনে যদি সত্যকেই আসন দাও, সব জিনিসেই সত্য দেখতে পাবে, মিথ্যা যদি বরণ কর, সত্যও তোমার কাছে মিথ্যা হয়ে যাবে। তবে একটা কথা, মিথ্যাকে বরণ করলেও সত্য গোপন থাকবে না, এক দিন সে বার হবেই। সে দিন মিথ্যাকে আশ্রয় করার জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে বড় কম নয়।"

উমা পিতাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিতেছিল। পিতা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে উমা।"

"আসছি বাবা," উমা চলিয়া গেল।

সেদিন আকাশটা মেঘে ছাওয়া ছিল, চাঁদের আলো স্ফুট ছিল না। মেঘের আড়াল হইতে সামান্য শুভ্রতার আভা আসিয়া ধরার বুকে পড়িয়াছিল, তাহাতে অন্ধকারের ভীষণতা ঘুচিয়াছিল।

বৃষ্টি পতনাশঙ্কায় অমরনাথ আজ ছাদে গেলেন না, নিজের গৃহে গিয়া সোফায় বসিয়া পড়িলেন।

উমাকে বলিলেন কথা আছে; এখনি সে আসিবে; কিন্তু তাহাকে তিনি কি বলিবেন? কেমন করিয়া সে কথাটা তাহাকে শুনাইবেন, ইহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। উমা ত তাঁহার যে-সে মেয়ে নয়,—সে যে সত্যই উমা, সে যে সত্যই দেবী। তাহার পবিত্রতা, তাহার সরলতা, তাহার কোমলতা, সবই যে সাধারণ নারীকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই কথা ভাবিয়াই তিনি মনীশের উপর উমাকে বলার ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে তো স্পষ্টই অস্বীকার করিল, এখন তাঁহার নিজের মুখে বলা ছাড়া আর উপায়ও নাই।

খানিক পরেই উমা আসিয়া পড়িল, "তুমি ঘরে রয়েছ বাবা, আমি এদিকে ছাদ খুঁজে তোমায় না পেয়ে যাচ্ছিলুম আবার নীচে। ভাবলুম, বুঝি আবার কোনও দরকার পড়েছে তোমার বাইরে, তাই বুঝি গ্যাছো।"

অমরনাথ বলিলেন, "ছাদে যাব কি মা, দেখলুম এক ফোঁটা দু ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। আবার বেশী আসবে, সেই জন্যেই যাইনি। বস তুমি ওই চেয়ারখানায়। ওই পত্রিকাখানা রয়েছে, যাতে একটা লাল দাগ দেওয়া আছে, সেইটে পড় তো মা।"

উমা পত্রিকা তুলিয়া লইল। লাল দাগ দেওয়া প্রবন্ধটা একেবারে ভাঁজের উপরেই ছিল, সেখানে লেখা ছিল—বিধবা বিবাহ।

উমা ভাঁজ খুলিয়া ফেলিয়া পিতার পানে চাহিয়া বলিল, "বিধবা বিবাহ নামে যে প্রবন্ধ, সেইটা বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ।"

এই প্রবন্ধটা বহুকাল পূর্ব্বেই অমরনাথ পড়িয়াছিলেন। আজ আবার নূতন করিয়া ইহা পড়াইয়া শুনিবার যে বিশেষ আগ্রহ তাঁহার ছিল, তাহা নহে। তবে এই কথাটা হইতেই তিনি নিজের কথা বলিবার সুবিধা পাইবেন।

উমা পড়িতে লাগিল। কথাগুলা সে যে বুঝিয়া পড়িতেছে, অমরনাথের তাহা বোধ হইল না। শিশু যেমন পাঠ্যপুস্তক হইতে পাঠ মুখস্ত বলিয়া যায়, এ যেন তেমনি।

খানিক দূর পড়িয়া উমা কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "না বাবা, আমাদের না কি এ সব পড়তে নেই।"

অমরনাথ বলিলেন, "কেন মা?"

উমা শান্ত ভাবে বলিল "বিধবার বিয়ে—এ যে কল্পনা করাও পাপ, বাবা। উৎসর্গ করা গ্যাছে যে ফুলকে, তা কি আর দেবপূজায় লাগতে পারে? সে দেবতার উৎসৃষ্ট

বলে তোলা থাকে, তাকে আর কিছুতেই লাগানো যেতে পারে না।"

অমরনাথ তাহার শান্ত শ্রীতে উদ্ভাসিত মুখখানার পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বিধবার বিয়ে বলতে আমি সমাজ-সংস্কার বুঝছিনে মা,—বুঝছি, বিধবার দারুণ কষ্ট হ্রাস।"

উমা একটু হাসিল, "কষ্ট?—কষ্ট কি বাবা? আমি তো দেখছি, বিধবার কষ্ট কিছুই নেই। সত্যি বাবা, আমার তো মনে হয় এই ভাল।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ বলিলেন, "তা তো বলবেই মা। তুমি আমাদের পানে চেয়ে নিজের সুখদুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে। কিন্তু মা, আমাদেরও তো কর্ত্তব্য আছে, আমাদেরও তো চোখ আছে।"

উমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পিতার কথার মধ্যে সে যেন একটা নূতন সুর শুনিতে পাইল। কই, এত কাল পিতা তো তাহার বৈধব্য অবস্থাকে উড়াইয়া দিয়াই আসিয়াছেন; যদি কেহ বিধবার কষ্টের কথা বলিত, তিনি তর্কের দ্বারা তাহা কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। সেই পিতা—তিনি আজ এ কিরূপ কথা বলিতেছেন!

উমা বলিল, "কি কর্ত্তব্য তোমাদের বাবা?"

অমরনাথ বলিলেন, "বাপ-মায়ের বুক সন্তানকে সুখী দেখলেই ঠাণ্ডা থাকে মা। তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা—তোমার বাপ। উমা, আমি তোমার আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।"

"আমার বিয়ে?"

উমা যেন আকাশ হইতে পড়িল; বিস্ফারিত চোখ দুইটা তুলিয়া সে পিতার পানে চাহিয়া রহিল।

পিতা আবেগভরা কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, উমা, তুমি যে আমার সেই ছোট্ট মেয়েটী, তোমার মন আমিই যে গড়ে তুলেছি মা। আমার পানে তাকিয়ে নিজের সব বিসর্জ্জন দিচ্ছ, এ কি আমি সহ্য করতে পারি? আমি তোমার আবার বিয়ে দেব, তোমায় সুখী করবার চেষ্টা করব।"

"বাবা—"

উমা উচ্ছ্বসিত ভাবে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

অমরনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কাঁদছ কেন মা?"

উমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে এ রকম ভাবে কেন নির্য্যাতন করছ বাবা? তুমি যে আমার পরম ন্যায়বান, জ্ঞানবান বাবা, তোমার মুখে তো ঐ কথা মানায় না। তুমি আমায় এত দিন এত জ্ঞানোপদেশ দিয়ে এসেছ, সে সব কি আজ মিথ্যে হবে? আমায় উপরে তুলে কেন আবার নরকে ফেলবে বাবা? তুমি যে আমায় শিখিয়েছ, আমি আর কেউ নই, আমি শুধু মা,—তোমার কথায়, তোমার উপদেশে আমি যে আমার বুকখানা মায়ের ভাব দিয়েই ভরে নিয়েছি। এ জগতের সবাই যে আমার সন্তান, এই কথাই তুমি যে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি উপদেশ দিয়ে এসেছ। তবে আজ আবার এ কি নূতন কথা শুনাচ্ছ? তোমার উমা তো দ্বিচারিণী নয়। তার যে একবার বিয়ে দিয়েছিলে, সে কথাটা একবার মনে কর। আমার স্বামী ছিল, এখনও সে আছে, মর্ত্তে নেই, স্বর্গে আছে। এক দিন আমিও তো সেখানে যাব, তার সঙ্গে সেখানেই তো আমার যথার্থ মিলন হবে, মাঝখানে দুদিনের জন্যে কেন একটা জন্মান্তরব্যাপী প্রাচীর তুলে দিচ্ছ বাবা!"

ক্ষুদ্র বালিকার মতই সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমরনাথ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ উমার পানে তাকাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেঁদ না উমা, তোমার চোখে জল—এ আমার সহ্য হয় না। আনন্দময়ী মা আমার—আমি তো তোমায় কাঁদাতে চাই নি, আমি যে তোমায় হাসাতেই চেয়েছি।"

উমা পিতার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া, পায়ের উপর মুখখানা রাখিয়া, চোখের জলে সিক্ত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, ও কল্পনা তুমি মনেও এনো না। আমায় তাতে তো আনন্দ দিতে পারবে না বাবা, সে যে আমার বুকে আরও শেল বিঁধবে। আমি কখনও তোমার কথার অবাধ্য হই নি, তোমার আদেশ আমার দেবাদেশ। তুমি যদি আদেশ কর, তবে এ ভীষণ দণ্ডও আমায় বইতে হবে। যদি আমায় একটু স্নেহ কর বাবা, তবে—তবে আমায় এমন করে নষ্ট কোরো না।"

"মা—উমা"

অমরনাথের দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। দৃঢ়চিত্ত অমরনাথ ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন,

"কাঁদালি মা আমায়? আমি যে কেন আবার তোর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, তা জানিস নে মা? তুই চলে গেলে তোর বাপের আর কি থাকবে মা, এই শ্মশানে তাকে যে একলা প্রেতের মত হাহাকার করে বেড়াতে হবে—এ জেনেও আমি তোকে তফাৎ করতে যাচ্ছিলুম। মা, বাপের মন বড় স্নেহপরায়ণ। ওরে অভাগা মেয়ে, যদি তোর মা থাকত, তবে আমার এত দায় তো থাকত না। আমি নিজের এতবড় ক্ষতিও সহ্য করতে যাচ্ছিলুম কেবল তোর মুখের পানে চেয়ে। যদি এতে সুখীই না হোস মা—তবে কি হবে আমার এতে? না, তুই এমনিই থাক আনন্দময়ী, আমার বুক, আমার বাড়ী তোর হাসিতেই ভরে থাক।"

পিতা কন্যার মাথাটা তুলিয়া ধরিলেন; স্নেহপূর্ণ চোখে সে মুখের পানে চাহিতে চাহিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া সেই মাথাটার উপর পড়িতে লাগিল।

(১২)

মনীশ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু যেমন হাসিমুখে সে আসিয়াছিল, তেমনি হাসিমুখে ফিরিতে পারিল না। তাহার মনের সুখ শান্তি সব যেন সে হারাইয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বের মতই ফিরিয়া চলিল।

মা তাহার বিষণ্ণ ভাবটা প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না; কিন্তু বেশী দিন সে মায়ের চোখ এড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সেদিন পুত্র যখন আহারে বসিয়াছিল, মা নিকটে বসিয়া বাতাস করিয়া মাছি তাড়াইতেছিলেন। মনীশ ইহাতে অনেক আপত্তি করিত, কিন্তু স্নেহময়ী জননী কিছুতেই তাহার আপত্তি কোন দিন কাণে তুলেন নাই।

মা বলিলেন, "তোর কি হয়েছে মনীশ, আজকাল তোর মুখখানা অত ভার হয়ে থাকে কেন, যেন কিছুতেই আর স্ফূর্ত্তি পাস নে?"

মনীশ যেন চমকাইয়া উঠিল। তখনি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাঃ, স্ফূর্ত্তি পাই নে কে বললে তোমায়? আমি তো আগেকার মতই বেশ হাসি!"

মা বলিলেন, "আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিস মনীশ? আমি বেশ জানি, আমার কাছে কক্ষনো তুই মিথ্যে কথা বলিস নে, তবে আজ কেন মিথ্যা কথা বলছিস বাবা?"

মনীশ ভারি বিব্রত হইয়া পড়িল। সত্যই সে মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলিত না, এবং মাকে সে বড় ভক্তি করিত। মায়ের কথা তাহার নিকটে বেদবাক্য তুল্য ছিল, এবং তাহা বিশ্বাসও করিত সে প্রাণ দিয়া। সে ঠিক জানিত, মায়ের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু, সে সত্যকে সে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া,—সে যে বড় অপ্রিয় সত্য।

মনীশ মাথা নত করিয়া সব ভাতগুলা একসঙ্গে ডাল দিয়া মাখিয়া ফেলিল। মা বলিয়া উঠিলেন, "ও কি করলি? দুটো ভাত দুধ দিয়ে খাবার জন্য রাখলি নে?"

সে কথায় কাণ না দিয়া মনীশ বলিল, "তোমার কাছে কখনও যে মিথ্যা কথা বলি নি, এ কথা ঠিকই মা! এখন আমার কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে, বাড়ী ফিরে এসে সব কথা বলব'খন।"

তাড়াতাড়ি যা তা করিয়া খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। কাপড় জামা পরিয়া মাথার চুলটা ফিরাইয়া একটা পাণ মুখে দিয়া বাইকটা হাতে লইয়া সে সবে বাহির হইতেছে, সেই সময় পোষ্টম্যান আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল।

এনভেলপখানা দু'চারবার উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিয়া, সেখানা পকেটে ফেলিয়া, সে হাতের ঘড়িটার পানে চাহিল। অতি ব্যস্তভাবে বাইকে উঠিয়া বাইক চালাইল। পত্রখানা পড়িবার সময় হইল না। উপরের পোষ্টের ছাপ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এখানা প্রয়াদপুর হইতে আসিতেছে।

টিফিন আওয়ারে সে বিশ্রাম করিতে গেল লাইব্রেরী-রুমে। সেখানে একটু নির্জ্জন পাইয়া সে পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল।

পত্রখানা উমার। সে লিখিয়াছে,—

মনীশদা, আজ পনের ষোল দিন গ্যাছ, এর মধ্যে একখানাও যে পত্র দিলে না, এর মানেটা কি? আগে তুমি সাত দিনের মধ্যে দুখানা পত্র দিয়েছ, তা কি মনে পড়ে? আমার পত্র না পেলে হয় তো রোজই পত্র দিয়েছ। আচ্ছা মনীশদা, হঠাৎ এ রকম ব্যাপারটা ঘটল কি করে? তোমার সেই গোপন কথা আমি জানতে পেরেছি। ছি মনীশ দা, এমনি তোমার মনের ভাব—তা তো আমি জানতুম না। তুমি হাসতে, কথা বলতে আগেকার

মতই। তোমার বুকে এই কামনাটা ছিল, তা তো আমায় এক দিনও জানতে দাও নি। আমায় স্পষ্ট যদি সামনা-সামনি জানাতে, আমি তোমার এ ভুল ধরিয়ে দিতে পারতুম। আমি বৈশাখ মাসের দশ বার তারিখে তোমাদের বাড়ী যাব। তোমার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা দরকার। আর মাঝে কয়টা দিন মাত্র বাকি আছে। আমি এ দিনগুলো শিগগির কেটে যাবার প্রার্থনা করছি। উমার খোঁজ মাঝে মাঝে নিয়ো। পত্র পাঠ উত্তর দিয়ো মনীশ দা, রাগ করে থেক না। যদি পত্র না দাও, তবে আমিও আর দেব না। তোমার রাগ থাকতে পারে, আবার কি রাগ থাকতে পারে না, বিশেষ এ যে আমারই কথা। ইতি

স্নেহের উমা।

মনীশের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। উমা সব জানিয়াছে, লিখিয়াছে। তবে কি সে তাহার হৃদয়ের সেই জলন্ত সত্য কথাটাও জানিয়া ফেলিয়াছে? সে যে রকম বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানাও তো বিচিত্র নয়। উমাকে কোনও কথা লুকানো বড় সহজ কথা নয়, তাহা মনীশ বেশ জানিত।

মনীশ ভাবিতে লাগিল—উমা আসিবে। সে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, বৈশাখ মাসে সে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় আসিবে, পত্রেও লিখিয়াছে আসিবে। সে আসিয়াই মনিশকে ধরিবে। সে বলিবে, সে যে নিজের ভাইয়ের মতই মনীশকে দেখে, মনীশ তাহা ভুলিয়া গেল কি করিয়া,—মনীশের বুকের মধ্যে এ কিসের আকাঙ্ক্ষা? এ তো ভগিনী-স্নেহ নয়, এ যে আর একটা জিনিস।

না, মনীশ কিছুতেই সে সময়ে বাড়ী থাকিবে না, মনীশ এখান হইতে চলিয়া যাইবে। উমার সম্মুখে সে কিছুতেই মুখ বাহির করিতে পারিবে না। এ কলঙ্কিত মন লইয়া দেবীস্বরূপা উমার কাছে থাকাও তাহার উচিত নয়, উমার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য।

উমার বিবাহ—

ভাবিতেই মনীশের সুগৌর মুখখানা হইতে কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। না, তাহা কখনই হইতে পারে না। উমা যে দেবী, সে কিছুতেই মানবের শ্রেণীতে নামিয়া আসিতে পারিবে না।

হাত দুখানা যোড় করিয়া সে ললাটে ঠেকাইল—"ভগবান, আমার মনে পাপ আছে, আমি তার কাছ হতে বহু দূরে থাকব। উমা যে দিকে থাকবে, আমি সে দিকে যাব না, কিন্তু—তাকে পবিত্র রাখ। সে যে তোমারই নির্ম্মাল্য প্রভু, সংসারের উপরেই তাকে রেখো, সংসারের পঙ্কিলতার মাঝে তাকে ফেল না।"

প্রার্থনান্তে সে হৃদয়ে অনেকটা যেন বল পাইল। রুমালে মুখখানা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া সে ক্লাস-রুমে প্রবেশ করিল।

বৈকাল বেলা বাসায় ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া সে ছাদে গিয়া শুইয়া পড়িল। উমার পত্রখানা তাহার সার্টের পকেটেই ছিল, সেখানা বাহির করিয়া আবার পড়িল। একবার দুইবার, দশবার পড়িয়াও তাহার শান্তি হইতেছিল না।

সে নিজেও তো এ কথা জানিত না। সে দিন বড় আঘাতেই তাহার বুকের মধ্য হইতে এই অচিন্তনীয় সত্যটা একেবারে উলঙ্গ ভাবেই বাহির হইয়া পড়িয়া তাহাকেই স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। এ কথা তাহার নিজের কাছেই হয় তো চিরকাল অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইত—সে উমাকে ভালবাসে। সে এই ভালবাসাটাকে জোর করিয়া ভগিনী-স্নেহ প্রভিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এ ভগিনী-স্নেহ তো নয়।

আচ্ছা—উমা? উমা যদি এ কথা জানিয়াই থাকে, তবে সে কি ভাবিতেছে? সে মনীশকে কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ভাবিয়া কি শিহরিয়া উঠিতেছে না?

উমার মূর্ত্তিটা হৃদয়ে কল্পনা করিয়া মনীশ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল—সেই উমা,—যাহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত, যে তাহাকে নিজের ভাই মনে করিয়াই অসঙ্কোচে কাছে বসিয়াছে, দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখ কি গম্ভীর, তাহার চোখে কি সে আগুনের মত দীপ্তি! সে যেন মেঘের গর্জ্জনের মতই গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "এই তোমার মনে ছিল মনীশদা, তোমার মনের মধ্যে এই পাপটা বহন করে তুমি আমার কাছে আসতে?"

এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ইহার উপযুক্ত শাস্তি মানুষে দিতে পারে না। যে অপরাধ করে, শাস্তি তাহার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হয়। সে বড় অসহ্য জ্বালা। সে জ্বালায় মানুষ মরে না, কিন্তু মরণের অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে।

মনীশ দুই হাতের মধ্যে মাথাটা লুকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সহরের বুকে লক্ষ লক্ষ বাতি জ্বলিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল,

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়,
কণাটুকু যদি হারায়, তা নিয়ে প্রাণ করে হায় হায়।

বাস্তবিকই জগতে আমরা থাকি অতি অল্প লইয়া, বেশী করিবার যোগ্যতা থাকিলেও কারবারের ক্ষমতা তো নাই। এই অল্পের মধ্য হইতে লোকসানই গিয়া থাকে। কোথায়, কখন যে হারাইয়া যায়, তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক পাই না। কিন্তু সেইটুকুর জন্য আমরা কাঁদি, হাহাকার করি। যে যথার্থ বড়লোক, তাহার সহিত কারবার করিতে গেলে ঠকিতে তো হয়ই না, উপরন্তু সেখানে আমরা লাভই পাই। তবু কেন যে সহজে অগ্রসর হইতে পারি না, তাহা বলিতে পারি না। সংসারে কেবল দিয়া যখন দেখি, সবই গেল, আর কিছুই পাইলাম না, তখনি আমরা কাঁদিয়া সেই বিশ্বপিতার দ্বারে গিয়া অভিযোগ করি, অভাব জানাই।

পূজাহ্নিক সারিয়া মা আসিয়া পুত্রের পাশটায় বসিলেন। তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহে বলিলেন, "দিন দিন তোর চেহারা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে মনীশ। বুকের হাড়গুলো জির জির করছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কিছু দিন আগেও তো তোর এমন চেহারা ছিল না।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "আর খাটুনীটাও কি কম মা?"

মা বলিলেন, "সে সত্যি বাছা, একদণ্ড ছুটি নেই তোর। এত খাটারই বা কি দরকার, তা তো আমি বুঝি নে। মাইনে দুশো টাকা যা পাস তাই ভাল, জমিদারীরও যথেষ্ট আয় আছে। আবার এই প্রাইভেট টিউশানি করবারই বা কি দরকার? আজ নেহাৎ শরীরটা এলিয়ে পড়েছে, তাই যেতে পারলি নে বলেই গেলি নে। নচেৎ একটা দিন তো জিরাবি নে। মানুষের শরীর তো, ক' দিন বাঁচবি এ রকম করে খাটলে? তিনি গেছেন, আমি যেতে পারলেই বাঁচি তোদের দুটি ভাইকে এমনি রেখে। আমার সদাই ভয় হয়—কখন আমার মাথায় বাজ মেরে তোরা কি করে বসিস।"

মায়ের চোখের জল হঠাৎ উছলাইয়া উঠিয়া মনীশের পিঠে পড়িয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়া মনীশ হাসিয়া ফেলিল। উঠিয়া বসিয়া মায়ের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি তো আচ্ছা পাগল মা, এমনি করে বুঝি আমাদের কথা ভেবে কেঁদেই মর দিনরাত? না, তোমায় নিয়ে দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তোমার কোনও ভয় নেই মা, ভগবান তোমায় নেন না করে আমাদের যাবার আদেশ দেন নি। আমি চিকিৎসা ছেড়ে দেব, বাস্তবিকই বড় পরিশ্রম হচ্ছে আমার, শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না। আমি মনে ভাবছি মা, এই বৈশাখ মাসের প্রথমেই মামার বাড়ী গিয়ে দিন কত থাকব। এই তো কলেজের বন্ধও এল। এখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছা করছে না।"

আনন্দিত হইয়া মা বলিলেন, "আমাকেও তবে নিয়ে চল মনীশ, অনেক কাল সেখানে যাই নি। এ সময়টায় দেশে ঘরে থাকতেই ভাল,—কলকাতাটা মোটেই ভাল লাগে না বাপু।"

মনীশ বলিল, "তোমায় আশ্বিন মাসে নিয়ে যাব মা। বৈশাখ মাসে উমা আসবে বলেছে। সম্ভব, তোমাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে প্রসাদপুর ফিরবে। তার আবদার তোমায় রাখতেই হবে, জান তো সে কেমন নাছোড়বান্দা মেয়ে। উমা আসবে বলেই আমি তোমায় এখন নিয়ে যেতে পারব না; আশ্বিন মাসে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

মা বলিলেন, "উমা আসবে—তুই থাকবি নে?"

সম্পূর্ণ উদাস ভাবে মনীশ বলিল, "আমি থেকে কি করব মা? আমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখানে থাকলে কোন দিন কি হয়ে বসবে, তার ঠিক নেই। আর—দানীশ তো থাকছে, তোমাদের কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া, গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে যাওয়া, সেই সে সব করবে। সে নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, সব পারবে।"

পুত্রের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তাই হবে বাবা, তুই মাস-দেড়েক শান্তিপুরে থেকে আয় গিয়ে। শরীরটা যাতে ভাল হয় তাই কর। সুস্থ শরীরের চেয়ে মূল্যবান জিনিস জগতে আর কিছু নেই। তাই তো আমি আজ কয় দিন ধরেই দেখছি, দুবেলাই তুই ভাত খেতে পারিস নে, তোর মুখখানা সদা সর্ব্বদা মলিন, ভার মত। দিনরাত কেমন একটা অন্যমনস্কতা। আমার মনে কি সুখ আছে বাবা? তোরা বেশ হেসে খেলে বেড়া, আমি বসে বসে কেবল তাই দেখি। তোদের কিছু খারাপ দেখলে আমার যে কি হয়, তা আর কি জানাব তোকে?"

মনীশ চুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। মা ও নীরবে পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মনীশ বলিল, "একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছলুম মা। এবার প্রসাদপুর হতে আসবার সময় কাকার মুখে শুনেছিলুম, তিনি আবার উমার বিয়ে দেবেন।"

কথাটা সে এমন ভাবে বলিল, যেন এটা একটা বাজে কথা। সংসারে প্রত্যেক দিন যেমন অনেক কথাই কাণে আসে, ইহাও তেমনি একটা কথার কথা মাত্র, বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার মত ইহাতে কিছুই নাই।

"উমার বিয়ে!" মা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুই বলিস কিরে?"

কষ্টে হাসিয়া মনীশ বলিল, "কেন, বড় আশ্চর্য্যের কথা না কি এটা? সংসারে এ রকম যেন আর হয় না! এটাতে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব নেই, যা শুনে তুমি চমকে যাবে।"

মা বলিলেন, "বিধবা বিয়ের নামে আশ্চর্য্যের কিছু না থাক, উমার বিয়ে, এ কথাটায় আছে বই কি। ঠাকুরপো উমাকে এত শিখিয়ে পড়িয়ে, এমন ভাবে মানুষ করে, শেষে তাকে দুঃখের মধ্যে ফেলবেন?"

মনীশ বলিল, "দুঃখের মধ্যে ফেলা কি? বিয়ে হলে উমা সুখে থাকবে, তিনি তাই মনে করছেন।"

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সুখ? না মনীশ, উমার বিয়ে দিলে সে সুখী হতে পারবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। উমার মনটা যে উঁচু সুরে বাঁধা রে! সে যে ছাড়া পাখী। সে কি বন্ধনের মধ্যে আর পড়তে পারে? তাকে আমি যত চিনি, তত কি তোরা চিনিস? তার মনের কথা সব যে খুলে বলে সে আমাকেই, সে যে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ রত্ন—কোহিনুর। তার বাপ তাকে সুখী করবার নামে না জানি কি অত্যাচার করছেন, তা বলতে পারি নে। তুই তাকে চিনিস নি মনীশ, সে কারও কাছে ধরা দিতে চায় না। তার মনটা কেমন জানিস? সদ্য-ফোটা যুঁই ফুলটীর মতই, তেমনি শুভ্র, তেমনি পবিত্র, তেমনি সুগন্ধে পূর্ণ। তার আবার বিয়ে—এও কি সম্ভব হতে পারে?"

উমার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে মনীশের হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিয়া দেখিল, মায়ের বিশেষণ-গুলা সবই উমাতে খাটে। সে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "উমা আসবে, তাকে তুমিই জিজ্ঞাসা কোরো মা। আমি পারি নি, এ সম্বন্ধে কোন কথা আমার মুখ দিয়ে বার হতে চায় নি। আমি প্রাণপণে কাকার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পারি নি। যখন দেখলুম, কাকা তার বিয়ে দেবেনই, তখন পাত্র নির্ব্বাচন করে দিলুম।"

বিস্ময়ে আত্মহারা মা বলিলেন, "তুই—তুই পাত্র নির্ব্বাচন করে দিলি?"

মনীশ বলিল, "হ্যাঁ মা, আমিই পাত্র নির্ব্বাচন করে দিলুম। তিনি বিয়ে দেবেনই,—উমার কষ্ট দূর করবেনই, এই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। আমি তখন প্রভাসকে দেখিয়ে দিলুম। সে বিদ্বান, সুপুরুষ, ধনী, তার সঙ্গে উমার বিয়ে—যদি যথার্থই তার বিয়ে দেওয়াই হয়, তবে দেওয়া যেতে পারে। কাকা যখন ঝোঁক ধরেছেন, তখন দেবেনই। কোথায় দেবেন, কার হাতে দান করবেন, তার ঠিক কি? উষাকে যেমন ঘরে দিয়েছেন, উমাকে সে রকম ঘরে দিলে তার যা অবস্থা হবে, সে তো জানাই যাচ্ছে। অনেক ভেবে আমি প্রভাসকেই দেখিয়ে দিলুম।"

মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তবে আর কি, বড্ড ভাল কাজই করে এসেছিস মনীশ। এই তুই উমাকে ভাল-বাসিস, এই তুই উমাকে স্নেহ করিস? তুই বলছিস উমাকে তুই কিছু বলতে পারিস নি; কিন্তু এই না বলাটাই যে তোর অন্যায় হয়েছে মনীশ। তুই তাকে কেন তার বিপদের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিলি নে, তাকে কেন তার

ভবিষ্যৎটা দেখালি নে? উল্টে তুই তার সর্ব্বনাশের পথটা আরও বিস্তৃত করে দিয়ে এলি? না, এটা তোর উপযুক্ত কাজ হয় নি মনীশ!"

মনীশ নীরবে মায়ের তিরস্কার শুনিয়া গেল। সে কিছুতেই মাকে বলিতে পারিবে না যে, তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সত্য বাহির হইয়া পড়াতেই সে স্তম্ভিত, ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, উমার কাছ হইতে সে তাই পলাইয়া আসিয়াছে,—উমাকে একটা কথাও সে বলিতে পারে নাই।

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আর কয় দিন পরেই তো উমা আসছে, আমার কথা তার সঙ্গেই হতে পারবে। তুই কাল একবার উষাকে দেখতে যাস, সে বিকেলে খবর পাঠিয়েছিল, তার না কি খুব জ্বর হয়েছে। কত দিন যাসনি দেখতে তার ঠিক নেই। দানীশঙ্কে সে দিন পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু তারা কেউ সেদিন বাড়ী ছিল না, ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেছল। কাল অবশ্য করে একবার যাস। কাল রবিবার—যেতে পারবি সকালের দিকেই।"

আর একটু বসিয়া তিনি আহারাদির উদ্যোগ করিতে উঠিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

দুর্ভিক্ষ ও মানব-সংখ্যা

সফিয়া খাতুন বি-এ

কারলাইল বলেছেন, "ঈশ্বর এত বেক্কোপ ন'ন। তিনি যতগুলি জীব সৃষ্টি করছেন, তার উপযুক্ত খাবার জিনিসও সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করছেন। মহর্ষি কারলাইলের এই বাণীটি আজকাল অনেক বড় বড় পণ্ডিত মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন, "ওহে, সে ছিল ভাবপ্রবণ বুড়োদের কথা। আজকাল মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে, যাতে করে মা ধরিত্রী অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি সন্তানগুলির উপযুক্ত পরিমাণে খাবার তৈরী করতে পারছেন না।"

এখন কোন কথায় সায় দিই? কারলাইলের কথায় সায় দিতে গেলে একটী কথা বার বার মনে পড়ে—কেন তবে দুর্ভিক্ষ হয়? যদি কারলাইলের কথাই সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে, একদল মানুষ অন্য একদল মানুষের খাদ্য জোর করে নিয়ে যায়—তাই অপর দলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। একজনের ঘরে খাবার নাই দেখলেই বুঝতে হবে যে, সেই লোকটীর কোন না কোন প্রতিবাসী তার অংশটি কোন ফন্দিফান্দা করে নিয়ে যায়, তাই তাহার ঘরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের জমিদারগুলির উদর এমনি করে বড় হয়েছে। তিনি (কারলাইল) আরও বলেছেন "Every generation in every time is by nature selected product of ages of food-victory." কিন্তু তবু যে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে! সেও কি যেমন তেমন? পেটের জ্বালায় মা নিজ সন্তানের গলা টিপে মেরে ফেলছে, পাছে ছেলেকে অনাহারী দেখতে হয়। কত হাজার হাজার লোক ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করছে; এবং সেই যায়গায়ই আর একদল লোক আমোদ আহ্লাদ করে দিন কাটাচ্ছে, তাদের যেন কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। তাই Heine বলেছেন—"যেখানে দেখবে বিলাসিতা, যথেচ্ছাচারিতা যত বেশী, জানবে, সেখানে অনাহার, অন্নকষ্ট, মহামারী, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিও তত বেশী। সাধারণতঃ দেখা যায়, একই গ্রামে একটী লোক কোটীপতি, আর একটী লোক পথের ভিখারী। যে যায়গায় সমবেশে দুর্ভিক্ষ, সেই যায়গায়-ই স্বেচ্ছাচারী ও বিলাসীর অভিনব বিলাস নিকেতনের সৃষ্টি। একজন ক্ষুধার জ্বালায় নিজের সন্তানকে পুড়িয়ে খাচ্ছে, আর একজন নৃত্য, গীত, থিয়েটার ও সিনেমা দেখায় এত ব্যস্ত থাকেন যে, ছেলে-মেয়েরা কি খাচ্ছে কি না খাচ্ছে, তা দেখবার অবসর হয় না। সবই নিয়ম মত চলছে। একজনের টেড়ী কাটায় যা খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে কিন্তু অন্য এক ব্যক্তির এক মাসের পারিবারিক খরচ চলতে পারে।

জাতির ও দেশের এই অবস্থাকে আমরা খুবই বাহাদুরী করে' বলে থাকি, "Most up to date and enlightened Nation," একেই আমরা আদর্শ সভ্যতা

বলে থাকি। এই সভ্যতার জন্য আমরা না করছি এমন কাজ নেই। মা বোনকে সাড়ী ছাড়িয়ে গাউন পরাচ্ছি। গরম জলের গ্লাসে হুইস্‌কি ঢালছি, ইত্যাদি কত কি। যাক, এসব বলে আর কি হবে?

আমাদের দেশটার ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা বলে একটা মস্ত বড় বদনাম আছে। যদি তাই হয়, তা'হলে এত ধন ধান্য থাকতে হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যায় কেন? এ বিষয়ে মেটার্লিঙ্কের মত হচ্ছে যে, দেশের আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তনের জন্য দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু গ্যারীল্ডী বলেন—শুধু তা নয়, আসল কথা হচ্ছে, মানুষের সংখ্যা বড় বেড়ে যাচ্ছে। দেশে এত খাবার যে জন্মায় না। আবার টলষ্টয় বলেছেন, শুধু কি তাই—আমরা অনাহূত অপ্রার্থিত এত যে সব অকর্ম্মণ্য সন্তান পৃথিবীতে আনছি, তাদের ভরণ-পোষণের জন্যই দেশে অন্নকষ্ট। এখানে সবাই কর্ম্ম করতে আসে, বসে থাকবার জন্য আসে না।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ এসব কারণ হতেই ত হয়। তার উপর কতক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণ থেকেও হয়ে থাকে।

দেশে যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হয়, আবার যে বৎসর প্রয়োজনের অধিক অতিবৃষ্টি হয়ে যায়, তবেই সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ হয়। উক্ত উভয় কারণেই ফসল জন্মায় না। রাজপুতানার দিকে অনাবৃষ্টির জন্য সচরাচর দুর্ভিক্ষ হতে দেখা যায়। এ অভাব যে দূর করা যায় না তা নয়। দেশের সরকার পক্ষ হুঁসিয়ার হলেই হয়। খাল কেটে যথেষ্ট জলের সরবরাহ করা যায়। আর্য্যা নিবেদিতা বলেন, "'That a railway must increase prosperity as long as it pays a dividend is supposed to be obviously there, for railways take coin into a country and corn out of it. And coin is not food." যিনি যতই বলুন না কেন যে রেল আমাদের খুবই উপকার করছে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যায়—ওটা আমাদের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। প্রথমতঃ Land acquisition আইনে রেল পথের জন্য যে সমস্ত যায়গা নেওয়া হয়, তার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, তা সেই ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায় তার শতাংশের একাংশও নয়। তার পর মানুষ দু' মাইল পথ যেতেই 'দু' আনা পয়সা খরচ করতে কষ্ট বোধ করে না। তা ছাড়া food stuff এর ভয়ঙ্কর অভাব হয়; টাকা খেয়ে ত আর বেঁচে থাকা যায় না। দেশের জিনিস (সব জিনিস নয়, যা আমাদের খাদ্য সামগ্রী) দেশে থেকে গেলে বোধ হয় আর কিছু না হউক, উপোস করে থাকতে হত না। রাজপুতানার কোন এক নেটীভ ষ্টেটে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেখেছিলুম—চালের মণ ২৲ টাকা, ডাল (উরীত) ১৲, ঘৃতের সের ১।০, দুধ ৲১৫ পয়সা। অন্যান্য জিনিসও সেই অনুপাতে সস্তা। সেই ষ্টেটে রেলের কৃপায় সেদিন দেখে এলাম—চালের মণ পাঁচ টাকা, ঘৃতের সের ২৷৷০ টাকা, অন্যান্য জিনিসও তাই। লাভ হয়েছে এই যে, কতকগুলি লোক লক্ষপতি হয়ে গেছে, আর কতকগুলি লোক পূর্ব্বে যাও বা খেতে পাচ্ছিল, এখন তাও না পেয়ে দেশ ছেড়ে চা-বাগানে বুকের রক্ত দিতে গিয়েছে। রুসিয়ার ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় M. Helkoff, Minister of the Interior, যে সব গাড়ী Odessaতে "হুইট"এর মাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তিনি সেখানে যেতে বাধা দিয়ে, যে সব জেলাতে দুর্ভিক্ষ ছিল, সে সব জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই লোকটী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই গাড়ী আর তার ব্যবসাদারদের জন্যই সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ব্যবসাদাররা চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে জিনিস কিনে নিয়ে যায়—আবার যেখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, সেখানেও তার চাইতে চূড়ান্ত মূল্যে বিক্রি করে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যেখান হতে জিনিস কিনে আনে, সেখানকার দরিদ্র লোক তা কিনতে পারে না, আবার যেখানে বিক্রি করে, সেখানেও তাই হয়। এমনি করে দেশে ধনী দরিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। সে সব ধনীদের স্বেচ্ছাচারিতায় দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ। সাধারণ লোক যে চাল খায়—সেই চাল ডাল তাঁরা গরু ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করেন। যেখানে গরু ঘোড়ার খাবার জন্য ঘাসই যথেষ্ট হয়, সেই যায়গায় বড়মানুষী জাহির করবার জন্য এসব করা হয়। ধনীর এই অপব্যয়েই গরীবের সর্ব্বনাশ হয়। এমনি করে বিলেতের ঘোড়ার খোরাকের জন্য যে কত শস্য চলে যাচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। রেলগাড়ী বিষয়ে

আর্য্যা নিবেদিতা বলেন, "The railway adds nothing to the productivity of the soil; it merely aids re-distribution. As a matter of fact, this re-distribution always acts by centralising markets. The goods of the country are eaten in the city. The peasant who can now only sell his commodities in a certain given place may not be richer utlimately for the power to get there. The fare may absorb his margin of profit. Therefore the fact that railways are much used does not prove anything about their usefulness."

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা কে না জানে। সে সময়ে ষাট সত্তর লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিল। সেই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল শস্যের অভাব। ক্রমান্বয়ে তিন চার বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় মধ্য প্রদেশ একেবারে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল। এই সব পার্ব্বত্য দেশে শুধু জলের অভাবে যে কত জমি অকর্ষিত থাকে, তা আর কত বলব। সরকার পক্ষ যদি সে সব যায়গায় খাল কাটিয়ে জলের সরবরাহ করে দিতেন, তাহলে কত জমি যে উর্ব্বরা হয়ে যেত, তা বলে শেষ করা যায় না। কৃষিবিভাগের মন্ত্রী মশাইরা এসব বিষয়ে কোন দিন চিন্তা করেন না। বনজঙ্গলের মধ্যে যাতে আবাদ করা যায়, তার কোন চেষ্টা নাই। অথচ প্রত্যেক জেলায়ই কৃষিবিভাগের এক একটী ধুরন্ধর কর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। আবার কোন যায়গায় যদি সরকারের কৃপা হয়, তা'হলে সে যায়গাটি খাস মহলে চলে যায়। তাতে দেশের লোকের কোন উপকার হয় না।

এই গেল রেলগাড়ীর কথা। মানুষের জন্ম-সংখ্যার বৃদ্ধিও দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। অনেক যায়গায় দেখতে পাওয়া যায় যে, মানুষের সংখ্যা যত, তত পরিমাণে খাদ্য সেখানে উৎপন্ন হয় না। বাংলা দেশের ঢাকা ময়মনসিং প্রভৃতি জেলা তার প্রমাণ। ঢাকায় জমির মূল্য অত্যন্ত বেশী। অনেকের বলতে কি বাড়ীর ভিটে ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। কিন্তু এরকম জন্ম-বৃদ্ধিতে দেশের কোন ক্ষতি হয় না। আসল কথা হচ্ছে, জন্ম-সংরোধে অসংযমতার জন্য যে জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি, তাহাই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ। মা হওয়ার দায়িত্ব হইতে বড় দায়িত্ব বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করতে পারেন নাই। দেশের, দশের ও সমাজের যারা ভাবী প্রাণ ও আদর্শ হবে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার তার ভগবান মার হাতে দিয়েছেন।

শুধু বংশ-রক্ষার জন্য যে সন্তান উৎপাদন করা হয়, তা অত্যন্ত ভুল। ইসলাম বলেন, "আমাকে কে কত ভালবাসে, তা তার সন্তান-বাৎসল্য হইতেই বুঝতে পারা যায়। অনেক হিন্দু মহাপুরুষ বলে গেছেন যে, স্বয়ং ভগবানই শিশুরূপে তার প্রিয় সেবক-সেবিকাদের কোলে এসে দেখা দেন। তাই হিন্দু শাস্ত্র বলেন "অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়া মায়া।" আমার মনে হয়, যদি সন্তানের সেবা আমরা কায়মনচিত্তে করতে পারি, তবে নমাজ, রোজা, সন্ধ্যা পূজা অর্চ্চনার বোধ হয় কোন দরকার হয় না। সন্তান মার কাছে যে কি, তা মা যে না হয়েছে, সে বুঝতে পারবে না। মা সম্বোধনে বঞ্চিতা নারীর ন্যায় হতভাগিনী দুনিয়ায় আর কেহ নাই। তাই যে হতভাগিনীর ঘৃণিত ও লজ্জাকর জীবন, সেও মা সাজবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। শাস্ত্রকারগণ" বন্ধ্যা" নারীকে অপবিত্র বলে গেছেন। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, তা বড় মিথ্যা কথা নয়। সন্তান জন্মাবার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীর যে অবস্থা থাকে, সন্তান জন্মাবার পর তার একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী তা দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। সন্তান লাভের পূর্ব্বে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ভালবাসা থাকে, সন্তান জন্মাবার পর তা আরও গভীর ও পবিত্র প্রেমে পরিণত হয়। তখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন। কিন্তু সে আসক্তি কামজ নয়। তা বড় নিঃস্বার্থ, বড় পবিত্র। স্ত্রীও সন্তানে স্বামীর প্রতিবিম্ব,—সেই মুখ, সেই হাত, সেই চোখ, সেই নাক, সমস্তই সেই এক দেখে যেমনি বিস্ময়াভিভূত হন, তেমনি আনন্দে ও ভগবৎ প্রেমে স্বামীকে হৃদয়ের অতি নিভৃত কোণে দেবতার আসন দান করেন। তখন স্ত্রীর দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। সেই দিন হতে নারী স্বামীকে শুধু খেলার বা রঙ্গরসের সাথী মনে করেন না। তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকেন। সেইজন্য জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মাণ কবি "গেটে" বলেছেন, "Nothing is more

charming than to see a mother with a child upon her arm; nothing is more reverend than a mother among many children." অর্থাৎ মার কোলে শিশু দেখার চাইতে আর কোন দৃশ্য দুনিয়ায় তত সুন্দর নহে। অনেক ছেলের মাকে দেখে মনে যে সম্ভ্রমের উদয় হয়, তেমনটি আর কিছুতেই হয় না। বড় সুন্দর কথা। সন্তানের মা হলেই মানুষ সেই নারীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে থাকেন। তার কারণ এই, মানুষ বুঝিল, ভগবান আর একটী জীবকে মানুষ করবার জন্য, আর একটী জীবকে সুপথে চালাবার জন্য তাকে নিযুক্ত করেছেন। তার মানে এই যে, ঈশ্বর সেই নারীকে দায়িত্ব জ্ঞানশীলা গুর্ব্বীর আসনে বসিয়েছেন। সন্তানের মাতা পিতা তা বুঝতে পারেন; এবং বুঝতে পারেন বলেই তখন তাঁদের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন এসে দেখা দেয়। অসচ্চরিত্র পিতা কি মাতা সচ্চরিত্র হয়ে যায়। ধর্ম্মে মতি আসে, পাপকে লোকে ভয় করতে শিখে, স্থির ধীর ও প্রবীণ হতে শিক্ষা করে। নিজেদের কঠোর দায়িত্বজ্ঞান এসে দেখা দেয়। সংসার যে খামখেয়ালের জন্য নয়, তা বুঝতে পারে। এ সময়ে স্ত্রী পুরুষ ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করতে শিখে, ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম করতে শিখে। সন্তানের ন্যায় পবিত্র জগতে আর কিছু আছে কি? সন্তান মানুষের অসীম উন্নতির কারণ। শুধু সন্তানের জন্য মানুষকে মান-সম্ভ্রম, ধন-দৌলৎ কিম্বা আত্মমর্য্যাদা লাভ করতে হয়। কোন এক মহাপুরুষ বলে গেছেন, "গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে একটী অপেক্ষাকৃত সহজ নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে—কোন এক বিষয়েনহে—সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কর—ধর্ম্মসাধন হইবে। মোটামুটি সমুদায় ধর্ম্মচর্য্যা ঐ এক ভিত্তি মূলে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরেও দেখ, যাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা উন্নতিশীল মানবজীবনের সার্থকতা সাধন করেন, তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকই রক্ষিত হয়। যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদের ইহলোকে মনস্তাপ এবং পরলোকে অধোগতি।"

কি সুন্দর উপদেশ! সত্যই তাই। সন্তানকে সৎ করতে হলে পিতাকে সৎ হতে হয়। সন্তানকে বীর করতে হলে পিতা মাতাকে বীর, বীরাঙ্গনা হতে হয়। সন্তানকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করতে হলে, পিতা মাতাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হতে হয়। পিতামাতার কাছেই সন্তানের প্রথম শিক্ষা। সন্তান পিতামাতাকে যা করতে দেখবে, নিজেরাও তাই করতে চেষ্টা করে। অনেক অসচ্চরিত্র মাতাল বদমাস লোক ছেলের কাছে লজ্জা পেতে হবে এই ভয়ে মাতলামি ও বদমাসী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মগুরুই সন্তানোৎপাদনকে ধর্ম্মসাধনজ্ঞান করতে বলে গেছেন। সন্তান চরিত্রহীন, কি বিকলাঙ্গ হলে বুঝতে হবে, তার জন্য একমাত্র পিতা-মাতাই দায়ী! পিতামাতার অসাবধানতা ও অসংযমের জন্য সন্তান এরূপ হয়ে থাকে। কামাতুর হয়ে স্ত্রীগমন করলে, সে সন্তান কামাতুর, অসচ্চরিত্র না হয়েই পারে না। এ সব অবক্তব্য বিষয় আলোচনার ভার লেডী ডাক্তারদের উপর থাকাই ভাল। তবে এটা ঠিক—অসংযমী, অমিতাচারী, কামাসক্ত হয়ে যে সকল সন্তান উৎপাদন করা যায়, তারা সন্তান নামে অভিহিত হবার নিতান্ত অযোগ্য। সেসব সন্তানের শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক বল কিছুই থাকে না। বরং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশের আর্থিক এবং নৈতিক অবস্থা দিন দিন জঘন্য হতে জঘন্যতর হয়ে থাকে। তেজস্বী, বীর, সচ্চরিত্র কি মেধাবী সন্তান উৎপাদন করতে হলে, পিতা-মাতাকে তাই হতে হয়। তা না হলে তার বিপরীত হয়ে থাকে। আজকাল আমাদের ছেলেমেয়েরা এত অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি বা অল্প মেধাবী হয় কেন? তার কারণ, পিতামাতা অসংযমী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, শক্তিধারণে অক্ষম বলে। সন্তান উৎপাদন কার্য্যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্মিলিত ভাবে নিয়োজিত করা দরকার। সন্তান সঞ্চারিত হবার সময় স্বামী স্ত্রী যে প্রকৃতিতে অর্থাৎ মনে যে ভাব নিয়ে থাকেন, সন্তানও সেই ভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই কবি বলছেন "ইচ্ছা হয়ে ছিলি তুই মনের মাঝারে।"

স্বামী স্ত্রীর সংযমের উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করে। আমি অনেক মেয়ে দেখেছি, যাদের এক এক বৎসর অন্তরেই এক একটী ছেলে জন্মাচ্ছে। তাতে সেই নারী স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েছেন; সূতিকা রোগে জীর্ণ শীর্ণ ও শক্তি হীন হয়ে পড়েছেন। উঠবার কি বসবার শক্তি

নাই। দেহে রক্ত থাকলে ত? পাঠিকা ভাবুন, এই মহিলার নিকট হতে আরো কিরূপ সন্তান আশা করতে পারি। যখন কোন সন্তানবতীর এই অবস্থা দেখতে পাবে, তখন বুঝতে হবে যে, সেই স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত অসংযমী। আমার কোন বন্ধুর বার বার গর্ভস্রাব হতে দেখে আমি তাকে বল্লাম, "দেখ, কিছুদিনের জন্য, অন্ততঃ দুটী বৎসরের জন্য পিত্রালয়ে চলে যাও ত।" এদিকে বন্ধুর স্বামীকেও শাসিয়ে দিলুম, "খবদ্দার, দু' বৎসরের জন্য তোমাদের কাল রাত্রি।" ফলে বন্ধুটীর শরীর সুস্থ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যারামও চলে যায়। মোরোগের পালের মত একপাল সন্তান পৃথিবীতে এনে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করার দরকার কি? তাতে যে বিচারের দিন ঈশ্বরের কাছে কোন কৈফিয়ৎই দেওয়া যাবে না। অনেক মেয়েকে নিজ নিজ স্বামীর আর্থিক দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে দেখেছি, "কি আর করব বলুন। এতগুলি কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে মহা বিপদে পড়েছি। দুমুটো খাবারই সময়মত দিতে পারছি না। লেখাপড়া শেখাব কি করে।" এ সব কথা শুনে আমার বড্ড হাসি পায়, দুঃখও হয়। ছেলেদের এই দুর্দ্দশার জন্য যে নিজেরা দায়ী, তার জন্য একটুও অনুতপ্ত হন না। সব বিষয়েই ঈশ্বরের উপর ভার দিয়ে বসে থাকেন। আরে বাবা, তা তে বুঝলুম যে এটা ঈশ্বরের কাজ। কিন্তু এটা ভুলে গেছ যে, প্রতিপালন তোমাকে করতে হবে। তাদের মানুষের মতন মানুষ তৈয়ী করে দিতে হবে। তা না হলে ঈশ্বরের নিকট মহাপাপ করা হয়। এ পাপ নরহত্যার চেয়েও ভীষণ পাপ। এই সব সন্তান যত দিন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে দুঃখ দৈন্যের ভীষণ আঘাত পাবে, তত দিন তাদের অন্তরাত্মা সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতামাতাকে গালি দিবে। তাতে কোন ভুল নাই। সেই জন্য বলি, পিতামাতার দায়িত্ব যত বড়, তত আর কিছুই নয়। আমরা তা না বুঝে কাজ করি বলেই আজ আমাদের ছেলে মেয়েদের এ দশা।

যে সন্তানের কৃপায় সংসারে আমরা মানুষ বলে পরিচিত হই, তাদের এমনি করে সর্ব্বনাশ করা কি নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ নয়? আমাদের অভাব অনাটনের এও এক কারণ। এ কথা হয় ত অনেকে পাগলের পাগলামী মনে করবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এক ভিখারিণীর আটটী সন্তান। ভাবুন, এই পরিবারের ভরণপোষণ কি করে চলে। অন্নাভাবের জন্য মানুষ কি না করতে পারে। এই ভিখারিণীর যুবতী কন্যা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রলোভনে পড়তে পারে না কি, তাতে দুর্নীতির উৎপত্তি হয় না কি? সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য কি তাই? হিন্দুশাস্ত্র বলেন, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। অতি সুন্দর কথা। আমাদের ইস্‌লামও বলেন তাই। হজরত মোহাম্মদ (দ) তাঁর শিষ্যগণকে বলে দেন, "হে বিশ্বাসী, যদি সন্তানের ভরণ পোষণ যথানিয়মে না করতে পার, তবে তাকে হতভাগ্য করে সংসারে এন না। কারণ, তাতে তোমার অধিকার নেই।" খৃষ্টানদের বাইবেলও তাই বলেন। কিন্তু কার্য্যকালে আমরা তা করি কই? ২০৲ টাকা বেতনের কেরাণীর পাঁচ ছয়টী সন্তান। অশিক্ষিতদের কথা বলতে চাই না, কারণ, তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু লেখাপড়া জানা লোকই যখন এরূপ করছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলব। জন্ম-সংযোধের কথা শুনলে তোমরা বলে উঠেন "কি সর্ব্বনাশ, এ যে মস্ত বড় পাপ ও দুর্নীতি। এসব ত ভগবানের কাজ। মানুষে কি বাধা দিতে পারে?" অবশ্য অসৎ উপায়ে সংরোধ করা যে মহাপাপ তার কোন ভুল নাই। তার দণ্ডের জন্য আইনও আছে। কিন্তু ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ভিতর দিয়ে সংরোধ করা কি অন্যায়? ছেলের মত ছেলে একটীও ভাল। আমার একটী ছেলের রীতিমত ভরণ পোষণ করবার ক্ষমতা নাই। এদিকে যদি দশটি ছেলের মা হই, তবে কি সেটা পাপ নয়? শিশুর যদি বলবার ক্ষমতা থাকত আর বলত, "বল মা, একটী ছেলেরই খোরাক জোটাতে পাচ্ছ না। তবে আমায় এমনি দরিদ্রের ঘরপুত্র করে কেন সংসারে আনলে?" তখন মায়ের দিক দিয়ে কি কোন জবাব থাকে? এদিকে ভগবানও আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি দয়া করে আমাদের এসব সন্তানের শুধু পাহারাদার করে দেখেন, আমরা তাঁর কাজ করতে কতটুকু উপযুক্ত হয়েছি। এমনি করে শুধু সন্তানবতী হয়ে আমরা দেশের সর্ব্বনাশ করছি। তার উপর সে সব ছেলেদের মধ্যে অনেক অন্ধ আতুর খোঁড়া কালা, বোবা ইত্যাদি কত প্রকারের বিকলাঙ্গ সন্তান দেখতে পাওয়া যায়।

সে সব ছেলের দ্বারা দেশের কোন কাজ হয় না। তাদের দিয়ে দেশের কোন আয় নেই, ব্যয় আছে। এদের জন্য যে food stuff খরচ করা হয়, তা শুধু খরচের হিসেবেই পড়ে। এসব ছেলেমেয়েদের জন্য পিতামাতা দায়ী। সন্তান বিকলাঙ্গ হয় পিতামাতার দোষে। নিজেদের অসাবধানতায় যারা প্রাণের চাইতেও প্রিয়, তাদের সর্ব্বনাশ করে থাকেন। এ সব অযথা population বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয়তঃ আজ কাল আমরা যেসব কারণে দুর্ভিক্ষ হতে দেখছি, তার জন্য স্থানীয় শস্য ব্যবসায়ীরা দায়ী। গ্রামের লোকের অভাব দূর না করেই ওরা টাকার লোভে সব শস্য রপ্তানি করে ফেলে। তার জন্য যত শীঘ্র পারা যায়, শস্য রপ্তানি বন্ধ করতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু তাতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয় এবং টাকার অত্যন্ত অভাবে পড়তে হয়। তা'ছাড়া, দেশের উন্নতি একমাত্র বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করে। এমন অবস্থায় দেখতে হবে যে প্রত্যেক গ্রামের কি প্রত্যেক থানার অন্তর্গত লোকের যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, তা উৎপন্ন হয়ে যদি বেশী হয় ত তা রপ্তানি করা দরকার। আর খাদ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য কোন জিনিস যত ইচ্ছা চালান দেওয়াই ভাল। আমাদের বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পাটের চাষ অনেক হয়ে থাকে। সেখানকার লোক টাকার লোভে শুধু পাটের চাষই করে। কিন্তু পাট খেয়ে ত আর বাঁচা যায় না? তাই সে সব জায়গায় চালের এত দর যে গরীব লোকদের কষ্টের সীমা থাকে না। সে সব লোক যদি সারা বৎসরের খোরপোষের ধানের চাষ করে' অবশিষ্ট জমিতে পাটের চাষ করে, তাতে দেশের অন্নকষ্ট থাকে না। তাতে আর একটা কাজ হয়ে যায়। সাহেবরা বাধ্য হয়ে বেশী মূল্য দিয়ে জিনিস কিনে নিতে পারে। পাড়াগাঁয়ের লোক জুট মার্চ্চেন্টদের চালাকি বুঝতে পারে না। ওরা প্রথমত লোককে পাটের চাষে প্রলোভন দেখাবার জন্য দু এক বার জিনিসের দর বাড়িয়ে দেয়। তার পর হঠাৎ এমনি কমিয়ে দেয় যে ২০৲ টাকা হতে ১০৲ টাকা করে ফেলে। তাতে হতভাগ্য চাষা লোকদেরই কষ্ট সহ্য করতে হয়। মোট কথা হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে। তা না হলে কোন লাভ নেই। অবশ্য সব জিনিসই যে দেশে পাওয়া যাবে, তার কোন মানে নেই। আমাদের দেশের চাষীরা শিক্ষার অভাবে জানতে পারে না যে, কোন মাটিতে কোন শস্য বেশী উৎপন্ন হবে। সেই মান্ধাতার আমল হতে যে নিয়ম চলে আসছে, আজও সেই নিয়ম চলছে। তাতে দেশের অনেক ক্ষতি হয়। এমন অনেক জমি আছে যে তাতে ডালের চাষ না করে আকের চাষ করলে ডালের চাইতে চিনি বেশী পাওয়া যায়। অথচ ডালের মূল্য হতে চিনির মূল্য অনেক বেশী। সে সব হিসাব করে যদি চাষ করে, তাতে কত লাভ করতে পারে। বাংলাদেশে অনেক পড়ো জমী আছে। সে সব যায়গা হতে কোন আয় হয় না। তার মাটি পরীক্ষা করে' তাতে কোন ফসল ভাল জন্মাতে পারে, তার পরীক্ষা করে চাষ করলে, অনেক কাজ হয়। আসাম মধ্যপ্রদেশ ছোট নাগপুর প্রভৃতি যায়গায় বিস্তর অকর্ষিত জমি পড়ে আছে। এখন সে সব যায়গায় জঙ্গল হয়ে গেছে। সে সব যায়গা অনুর্ব্বর থাকার একমাত্র কারণ অনাবৃষ্টি। খাল কেটে জল সরবরাহ করতে পারলে কত জমি যে উর্ব্বর হয়ে যেত তার সীমা নাই। তাতে আলু, আক, কার্পাস, গম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। এ সব অভাব মোচন করতে পারলে হয়ত এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখতে হত না। দেশে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাদের বসবাসের যায়গাও তৈরী করে নিতে হবে; তা না হলে চলবে কি করে। তা না করলে যে সব সময় দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকবে। কত লোক বেগার বসে থাকবে। এ সব কি দুর্ভিক্ষের কারণ নয়?

নটবর

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৫)

এমনি করিয়া আরও কয়েক বৎসর চলিল। কেমন করিয়া চলিল, তা' এক কথায় বলা কঠিন। কিন্তু এমনি করিয়া যোড়া তাড়া দিয়া দিন চলিল। কিন্তু দিন ক্রমশঃই কঠিন হইয়া আসিল।

সতীশ বি-এ পরীক্ষায় আবার ফেল করিয়া পনেরো টাকা মাহিনার একটা চাকরী লইয়া ঢাকায় আছে। তাতে তার কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। কিন্তু তার সর্ব্বদাই মনে মনে আশা আছে যে, এমন দিন থাকিবে না, একটা উপায় হইবেই। সেই আশায় সে এদিক সেদিক নানা ফিকিরফন্দীতে ঘোরা ফেরা করে; কিন্তু কোনও সুরাহা করিতে পারে না।

এদিকে বাড়ীর অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হইয়া উঠিল। মেরামতের অভাবে বাড়ী ক্রমে জীর্ণ হইয়া উঠিল। সতীশের কঙ্কালসার রোগজীর্ণ পুত্র-কন্যায় আঙ্গিনা পঙ্কিল হইয়া উঠিল। শুইবার কাঁথা ও পরিবার কাপড় ক্রমে জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া উঠিল। উপযুক্ত গাত্রাবরণের অভাবে সতীশের স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হওয়া বন্ধ করিল। ভরপেট খাওয়ার রেওয়াজ উঠিয়া গেল, নুণ-ভাত ও আপন হাতে ধরা মাছের—তেল ও মশলা ছাড়া ঝোল একেবারে বিলাসের চরম দাঁড়াইয়া গেল।

এক দিন নটবর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "বউমা, তুমি কেন এখানে পড়ে এত কষ্ট পাও? তুমি যাও না তোমার বাপের বাড়ী।"

বউ সেদিন সারা দিন কাঁদিয়া ভাসাইল। শ্বাশুড়ী অনেক সাধিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। এমনি করিয়া দিন চলিল। নটবরের রসিকতার রস কমিয়া আসিল। পরিমাণও কমিল এবং ঝাঁজ বাড়িয়া চলিল।

দুঃখে পড়িয়া নটবরের মনে হইল যে, কুঞ্জ সাহা তার কাছে যে প্রস্তাবটা দুই বৎসর আগে করিয়াছিল, সেটা শুনিলে তার হয় তো আজ এত দুর্গতি হইত না। আজ যে সে এদিক সেদিক ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, এ দশা তার হইত না। কিন্তু সে কথা সে যে গ্রাহ্য করে নাই, সেটা ভালই করিয়াছে। কুঞ্জ সাহা তাহাকে দয়ার প্রত্যাশী মনে করিয়া এই উপকার ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল। এমন দান তো নটবর কোনও দিনই লয় নাই। কুঞ্জ সাহার কাছে যে সে প্রথমে পাঁচ শো টাকা লইয়াছিল, সে তো তার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার। আজ এই দারুণ দৈন্যে পড়িয়াও নটবর এক দিনের তরেও কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহে নাই, কারও দয়ার দান গ্রহণ করে নাই।

এক দিন সে জেলের কাছে মাছ কিনিতে গিয়া একটা মাছ ধরিল। জেলে তার যা' দাম চাহিল, তাহা শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চার আনার মাছ সে কেমন করিয়া কিনিবে। নটবর বিরস বদনে ফিরিতেই, জেলে বলিল "দাস ম'শায়, নিয়ে যান মাছটা, যা' হয় দেবেন।"

কথা শুনিয়াই নটবর ক্ষেপিয়া উঠিল। হায়, এই দীন ধীবরও তাকে দয়া করিয়া ভিক্ষা দিতে চায়! সে খুব চটাচটি করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

কাজেই বড় কষ্টে দিন চলিল। নটবর কাহাকেও কিছু বলিত না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার সে যতদূর সম্ভব আগের মতই করিত; কিন্তু তার ভিতরটা যে শুকাইয়া উঠিতেছে, তাহা সবাই অল্প বিস্তর টের পাইত।

সতীশের কোনও কিছুই সুবিধা হইল না। এদিকে নাতি-নাতিনীতে নটবরের ঘর ভরিয়া উঠিল। ইহাদের দিকে চাহিতে নটবরের অন্তর আনন্দে প্লাবিত হইয়া উঠিত। সে যতক্ষণ পারিত, এই শিশুদেরকে খেলা দিত। খেলা দিয়া শিশুদের আনন্দ দিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নটবরের। যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকিত, শিশুরা হাসিয়া বাড়ীটি একেবারে মুখর করিয়া রাখিত—তারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত।

কিন্তু নটবর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিত না যে, এই শিশুদের ক্ষুধা সে মিটাইতে পারিতেছে না, ইহাদের বসন ভূষণ সে কিছুই জোগাইতে পারিতেছে না। এ কথা মনে হইলেই তার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত। নাতিদের আনন্দে ছুটিয়া কোলে করিতে যাইয়া, কতবার সে হঠাৎ তাদের ফেলিয়া বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছে এই জন্য।

এক দিন বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল, বাড়ীর পিছনে খানিকটা কাদা লইয়া বড় নাতি একটা চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে খুব মাথামাখি করিয়া খেলিতেছে। এই চাঁড়ালটির বাড়ী নটবরের ঘর হইতে বেশী দূরে নয়। ইহারা নটবরের অত্যন্ত অনুগত। যুধিষ্ঠির নমোদাস মজুরী খাটে, ক্ষেত চষিয়া অনেক শস্য ঘরে তোলে। কৃষাণদের মধ্যে সে একজন অবস্থাপন্ন লোক। তার বাড়ীতে একখানা টিনের ঘর আছে। গরু বলদে চার যোড়া, আর একটা বোঝা বহিবার ঘোড়া তার আছে। চাষ আবাদের অবসরে সে বর্ষা কালে নৌকায় মাঝিগিরি করে, অন্য সময় তার একখানা গরুর গাড়ী চালায়, ঘোড়া ভাড়া দেয়। এমনি করিয়া সে বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। তার ছেলেপিলে খায় দায় ভাল।

চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে এমনি এক হইয়া মিশিয়া নাতিকে খেলিতে দেখিয়া নটবরের হঠাৎ ঘৃণা বোধ হইল। ভদ্রলোকের ছেলে চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে এত মেশামিশি কিসের? সে নাতিকে ডাকিয়া বকিল। শুনিয়া অম্বিকাও বলিল, "তাই তো, যত সব ইতর ছোটলোকের সঙ্গে ছেলেটার মেশামিশি—তাই তো, ছেলের ভদ্রলোকের মত কোনও ছিরিই হচ্ছে না।"

এমনি কথা নটবরও বলিয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীর মুখে তার নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া তার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তার আভিজাত্যের গর্ব্ব ধূলায় মিশিয়া গেল। যুধিষ্ঠির নমোদাস শরীর খাটাইয়া খায়, কিন্তু তার স্বচ্ছল অবস্থা। সে কারও কাছে হাত পাতে না, বেশ খায়-দায়, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে বেশ স্বচ্ছন্দে পালন করে। নটবর ভদ্রলোক, শরীর খাটাইতে পারে না। তার ছেলে সতীশ শরীর খাটাইতে নারাজ—তারা খোঁজে এমন কোনও উপার্জ্জনের উপায়, যাতে শরীর খাটাইতে হয় না, অথচ কৃষকের অন্ন অনায়াসে আপনার পেটে আসে। তাই নটবর হা অন্ন, হা অন্ন করিতেছে, স্ত্রীপুত্রদিগকে পালন করিতে পারিতেছে না। আর তার সেই আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা লইয়া তার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ওই যুধিষ্ঠিরের ছেলেকে অন্ত্যজ ছোটলোক বলিয়া তফাৎ করিতে চাহিতেছে।

নটবরের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল। "দুত্তোর" বলিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। স্থির করিল, শরীর খাটাইয়া কিছু রোজগার না করিয়া সে ঘরে ফিরিবে না। অন্ততঃ যুধিষ্ঠিরের সমান সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সে আর তার আভিজাত্যের গৌরবটা কিছুতেই মনে জিয়াইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

(৬)

সে হাটখোলায় গেল। মহাজনদের কাছে সে প্রস্তাব করিল যে, সে নৌকার মাঝির কাজ করিবে। যাহাদের নৌকা আছে, তাহাদের কাছে ঘোরা-ফেরা করিল। সকলেই ইহা নটবর দাসের একটা প্রকাণ্ড পরিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়া হাসিয়া অধীর হইল। গতিক সতিক দেখিয়া নটবরও শেষ পর্য্যন্ত বুঝিল যে, ব্যাপারটাকে পরিহাসের আবরণে ঢাকিয়া বিদায় হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। সে শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া খুব খানিকটা হাসি মস্করা করিয়া, বুকভরা ব্যথা লইয়া বাড়ী ফিরিল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল।

সে বাস্তবিকই খুব সুদক্ষ নাবিক। তার মত নৌকা বাহিতে বা হাল ধরিতে কোনও মাঝির ছেলে পারে কি না সন্দেহ। তবু তার পক্ষে নৌকার মাঝিগিরি করা একেবারেই অসম্ভব! হায় রে, তার এই একমাত্র বিদ্যা কেহ মূল্য দিয়া কিনিতে চায় না, কেন না সে ভদ্রলোক। তার এই আভিজাত্যই তার জীবিকা উপার্জ্জনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুঞ্জলাল সাহাও হাট হইতে ফিরিয়া এই পথে চলিয়াছিল। নটবরের কথা শুনিয়া তার মনে খটকা লাগিয়াছিল। তাই সে নির্জ্জন পথে নটবরের সঙ্গে জুটিল। পিছন হইতে সে ডাকিল, "দাস মশাই!" নটবর পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া কুঞ্জলালকে দেখিয়াই চোঁচা ছুট দিল। কুঞ্জলালের কাছে সে ঠিক এই সময় কিছুতেই হাজির হইতে পারে না।

তবে তার মান ইজ্জত একেবারে যাইবে। দুনিয়ার আর সবার কাছে সে সব মান বিসর্জ্জন করিয়া চাষী মজুর হইতে প্রস্তুত, কিন্তু এই কুঞ্জলালটির কাছে সে তার ইজ্জত একটুও খোয়াইতে রাজী নয়। তা' ছাড়া, এখন যে তার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছে—এ কান্না যদি কুঞ্জলালের কাছে ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে যে তার মাথা কাটা যাইবে! তাই সে ছুটিয়া পলাইল। তা ছাড়া, তার সন্দেহ হইল যে, কুঞ্জলাল বুঝি আজ তাহার ঘাড়ে আর কোনও দয়া বা অনুগ্রহ চাপাইতে আসিতেছে।

নটবরকে ছুটিতে দেখিয়া কুঞ্জ সাহা প্রথমে অবাক হইয়া গেল। তার পর অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে ইহার যথার্থ কারণ কতকটা আঁচ করিল। দুই বৎসর আগে নটবর তাহার কাছে গিয়াছিল—কোনও রকম সাহায্য পাইবার আশায়ই গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। যখন কুঞ্জ সাহা নিজে সাহায্য করিবার ইচ্ছায় নটবরের ছেলেকে তার ব্যবসায়ে লইতে চাহিল, তখন নটবর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া কুঞ্জ সাহা অনেক দিন দিন ভাবিয়াছে। তার পর, সে খবর পাইয়াছে, নটবরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সতীশেরও চাকরী বাকরি বিশেষ কিছু হয় নাই। তবু নটবর একটি দিন টাকা ধার করিবার জন্যও তার কাছে ভিড়ে নাই।

এই সমস্ত কথা গভীর ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া, কুঞ্জ সাহা বাড়ী না গিয়া, নটবরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। নটবর এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না; তাই সে তখন তার বাহিরের উঠানে বসিয়া ঠাণ্ডা হইতেছিল। কুঞ্জ সাহা হাসিয়া বলিল, "প্রাতঃ প্রণাম, দাস ম'শায়।"

"এই যে, সাহজী যে" বলিয়া নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে নানা কারণে বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কারণ এই যে, যে জল চৌকীর উপর বসিয়া নটবর আরাম করিতেছিল, তাহা ব্যতীত দ্বিতীয় আসন সেখানে ছিল না। কুঞ্জসাহাকে দাঁড় করাইয়া সে আসনে বসিতে পারিতেছিল না। অথচ, কুঞ্জ সাহা জাতে সাহা, অভিজাত কায়স্থ হইয়া নিজে দাঁড়াইয়া সাহাকে ওই চৌকীতে বসিতে বলিতেও তাহার দ্বিধা হইতেছিল। এবং ঠিক সেই কারণে নিজে বসিয়া কুঞ্জ সাহার জন্য দ্বিতীয় আসন সংগ্রহ করিতেও সে সঙ্কুচিত হইতেছিল। "ভদ্রলোকের" বাড়ীতে সাহা মহাজন যত কেন বড় লোক হউক না, সমান আসন তো পাইতে পারে না।

কুঞ্জ সাহা এ সকল একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়ে এলাম দাস ম'শায়। আমার চার খানা পাটের নৌকা পরশু দিন নারায়ণগঞ্জ না পাঠালেই নয়। তার সঙ্গে যাবার কথা একজন গোমস্তার; তা তার হ'য়ে প'ড়েছে অসুখ! আমার অন্য লোকও নেই। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি এ বিপদ থেকে উদ্ধার না করেন, তবে আমার অনেকগুলি টাকা লোকসান যায়।"

উপকার করিতে নটবর সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দ্বারা কিরূপে সাহজী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।

সাহজী বলিল, "আপনাকে তো ব'লতে পারি না সাহস করে,—তবে আপনি যদি নৌকা ক'খানা নিয়ে যেতেন, তবেই হ'ত।"

"আমাকে আপনি গোমস্তা করে' পাঠাতে চান,—তা আমি তো এ সব কাজ কিছুই জানি না।"

কুঞ্জলাল জিব কাটিয়া বলিল, "বাপরে বাপ! আপনাকে আমি গোমস্তা করবো, এমন সাধ্য কি? আপনি কেবল দয়া করে পাটগুলি সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দেবেন। আমার সেখানে গোমস্তা আছে, তারা সব বুঝে নিয়ে যা হয় ক'রবে।"

নটবর হাতে স্বর্গ পাইল। সে অবশ্যই রাজী হইল। কুঞ্জলাল এই সাধু বঞ্চনা করিয়া নটবরের হাতে কিছু মোটা টাকা গছাইয়া দিলেও তার লোকসান হইল না। কেন না গোমস্তা তার একজন পাঠাইতে হইত; আর নটবরের চেয়ে অনেক কাজের লোক সে পাইতে পারিলেও, তার চেয়ে বিশ্বাসী লোক পাইত না।

(৭)

একশত টাকা রোজগার করিয়া নটবর যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন সে পা তুলিতে পারে না। তিন দিন হয় তার জ্বর; তাই লইয়া সে লম্বা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে।

বড় উৎসাহ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়াছে। সে যে কেবল কিছু টাকা রোজগার করিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়; এমনি আরও রোজগারের পথও এখন হইতে পারিবে। তা'ছাড়া একবার সে ভাবিয়াছিল যে, এখন সে ছেলেকে আনিয়া কুঞ্জলালের সঙ্গে কারবারে লাগাইয়া দিতেও পারে। কিন্তু ঢাকায় সতীশের সঙ্গে দেখা করিয়া সে শুনিতে পাইল যে, তার এক জমীদার সতীর্থ এত দিনে তার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এত দিন সে এক সামান্য জমীদারের সুমারনবিশি করিতেছিল, এখন এই বন্ধু তাহাকে একটা ভাল ডিহির নায়েবীতে নিযুক্ত করিয়াছেন। বেতন চল্লিশ টাকা। তা'ছাড়া তহরী ইত্যাদি উপরি আছে। উৎকৃষ্ট বাড়ী ঘর, স্বাস্থ্যকর স্থান ইত্যাদি যত রকম সুবিধা থাকিতে হয়, আছে। সতীশ গিয়া কাজের ভার লইয়াই দেশে গিয়া 'সবাই'কে লইয়া যাইবে।

এত দিনে দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন ভাবিয়া, নটবর জ্বর সত্ত্বেও উৎফুল্ল হৃদয়ে ক্লান্ত চরণে বাড়ী ফিরিল। ঘুস ঘুসে জ্বর চলিল। সাত দিন পরে সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

মায়ের কাছে সতীশ বলিল, "মা, ওদের নিয়ে যেতে চাই সেখানে।"

অম্বিকা একেবারে আকাশ হইতে পড়িবার মত মুখ করিয়া ছেলের দিকে চাহিল। একবার তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল। নটবর যে বড় আশা করিয়া আছে, যে, সতীশ আসিয়া তাহাদের সকলকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবে। আর সতীশ বলে কি না সুধু বউকে লইয়া যাইবে। এ কথায় স্বামী তার যে কতটা নিরাশ হইবে, তা ভাবিতে অম্বিকার মুখে কথা সরিল না। পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "তা যাও, যাবে বই কি? আমরা তো তাই ঠিক ক'রেছি।"

সতীশের স্ত্রী বরাবরই ছোট্ট বৌটি হইয়া আছে, স্বামীর কাছেও এখনও তার মুখ ফোটে নাই। নটবর ও অম্বিকা যে সতীশের সঙ্গে যাইবার কথা লইয়া কত জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন, আর তাহাতে কত আনন্দ করিয়াছেন, তাহা তার জানা ছিল। কিন্তু সে শাশুড়ীর মনের ভাব পরিষ্কার বুঝিলেও, স্বামীর কাছে খুব খোলসা করিয়া বলিতে সঙ্কুচিত হইল। সে কেবল বলিল "মা বাবাকে নিয়ে চল।"

সতীশ বলিল, "এখন তো আমার টাকায় কুলোবে না। তা ছাড়া, সব শুদ্ধ সেখানে গেলে এখানে বাড়ী ঘর দেখে কে? আর সবশুদ্ধ সেখানে গেলে খরচ চলা কঠিন হইবে; বাবা মাকে বরং এর পরে একবার নিয়ে ঘুরিয়ে আনা যাবে।"

সতীশের স্ত্রী বলিল, "আহা, তাঁরা এত আশা করে আছেন তুমি তাঁহাদের নিয়ে যাবে।"

সতীশ। আশা করে থাকলেই তো হয় না, রাহা খরচের টাকাও থাকা চাই। আমার কাছে যা আছে, তাতে কেবল তোমাকে আর ছেলে পিলেকে নিয়ে যেতে পারি। সে তো আর এ দেশে নয়!"

বউ বেচারী হার মানিল; কিন্তু সে বলিল শ্বশুরের অসুখ ফেলিয়া সে কেমন করিয়া যায়!

সতীশ সে সব বোঝে, কিন্তু তার ছুটী তো নাই। তা'ছাড়া, সামান্য একটু জ্বর, এর জন্য এমনই কি? ইত্যাদি।

নটবর পরে বলিলেন, "আমার জন্যে তোমার থাকবার দরকার নেই বউ মা, তুমি এসো গে,—ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর। যখন মেয়ের বিয়ের দরকার হ'বে, তখন কিন্তু এ বুড়ো জামাইকে ভুললে ছাড়ছি নে।"

সতীশ পরের দিন স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া চলিয়া গেল। নটবর ও অম্বিকা তার পর অনেকক্ষণ কেবল পরস্পরের মুখ চাহিয়া বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

শেষ পর্য্যন্ত নটবর বলিয়া ফেলিল, "এরি জন্য মানুষ জন্মায় মরে। ছেলেটি মানুষ করে দিয়ে রোকশোধ। তার পর ছেলেও পোঁছে না, দুনিয়াও ফিরে চায় না।...গিন্নী, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এত দিনে যে আমাদের বয়সটা অনেক হ'য়ে গেছে। এখন বিদায়ের সময় এসেছে।"

অম্বিকা একবার চোখ মুছিল, কোনও কথা বলিল না।

নটবরের জ্বর বাড়িয়া গেল। এক দিন কবিরাজ আসিয়া হঠাৎ ভয় পাইয়া গেলেন। নটবর তখন বেশ শান্ত ভাবে ঘুমাইতেছে, কিন্তু কবিরাজের চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিলে নটবর বলিল, "বড় ঠকিয়েছে গিন্নী; লক্ষ্মী ঠাকরুণ বড় ঠকিয়েছে। এত দিন মুখ ফিরিয়ে বসে থেকে, শেষ কালে কি ঠাট্টাটাই ক'রলে। টাকা দেবার বেলা ফাঁকি দিয়ে শেষে প্রাণটাকে ঠকিয়ে নিলে!"

এই শেষ পরিহাসের হাসি তার অধরৌষ্ঠে মিলাইবার আগেই নটবর চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

(সমাপ্ত)

রক্তের সম্বন্ধ

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(১)

নফরদাসের কন্যা চিন্তামণি গরীব কৈবর্ত্তের ঘরে না জন্মিয়া যদি ধনী বাবুন কায়েতের ঘরে জন্মিত, তাহা হইলে বেমানান তো হইতই না, বরং বোধ করি বেশী শোভন হইত। কারণ, তাহার মত রূপবতী বালিকা বাগমারা ও তাহার আশেপাশের গ্রামের মধ্যে বড় একটা দেখা যাইত না। বৃদ্ধ নফরদাসের এই কন্যাই একমাত্র সম্বল। তাহার তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী চিন্তার মা এই কন্যাটিকে প্রসব করিয়া যুবতী বয়সেই যমের ঘরে চলিয়া গিয়াছিল। সেই হইতেই এই বৃদ্ধ নিজেই ইহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

চিন্তামণির বয়স এখন বছর বারো—কিন্তু তবু নফরচন্দ্রের সেদিকে হুঁস ছিল না। কৈবর্ত্তদাসের ঘরের মেয়েরা আট নয় বছরের মধ্যেই ডুরে সাড়ি, হাতে 'খাড়ু', সিঁথিতে প্রশস্ত সিঁদুরের দাগ ধারণ করিয়া শ্বশুর-ঘর করিতে চলিয়া যায়। কিন্তু নফর এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিল। পাড়া প্রতিবেশী স্বজাতিরা দুবেলা আসিয়া তাহাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার তামাকের খরচটা কিছু বেশী হইল মাত্র, কিন্তু তবু তাহাকে কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিতে দেখা গেল না। এদিকে গ্রামের বিবাহিত অবিবাহিত স্বজাতি বিজাতি যুবকেরা রীতিমত চিন্তামণির দিকে 'নেক-নজরে' চাহিতে আরম্ভ করিল। বালিকা চিন্তামণি তাহাদের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া কিছুই সন্দেহ করিত না—সে হাসিয়া খেলিয়া, খাইয়া বেড়াইয়া, গাছে চড়িয়া, জলে সাঁতার কাটিয়া তাহার সুন্দর দেহ সুগঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিন এমনি করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল—সহসা এক দিন কন্যার কথায় নফর সচকিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর ঘরের দাওয়ায় বৃদ্ধ পিতার কোলে শুইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চিন্তামণি কহিল—"বাবা, তুমি আমার বিয়ে দেবে ?"

কন্যার শিশুসুলভ কথায় নফর হাসিয়া কহিল—"দেব বৈ কি। কিন্তু এত তাড়া কিসের রে ? বিয়ে হলেই ত পর হয়ে যাবি।"

চিন্তামণি মাথা মুখ ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—"হুঁ, আমার বুঝি তাড়া! তোমারও যেমন কথা! ওই ওরাই তো বার বার করে বল্‌ছে।"

বিস্মিত হইয়া নফর কহিল—"কারা রে ?"

"মান্‌কে, পণ্টু, কাঞ্চি—সব্বাই তো আমাকে দেখ্‌লেই ক্ষেপায়।"

"তারা ক বলে ?"

"কত কি বলে—আমি কি তার কিছু বুঝি ? এ বলে আমাকে বিয়ে কর, ও বলে আমাকে বিয়ে কর। আমাকে দেখ্‌লেই তাদের মুখে ঐ কথা। আমাকে সবাই জ্বালিয়ে তুলেছে বাবা।" বৃদ্ধের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

চিন্তামণি বলিতে লাগিল—"আর দেখ, আজ মান্‌কে আমাকে কি বিরক্তটাই করেছে। তখন ঘাটে জল আন্‌তে গেলুম না ? সে সময় সেখানে তো কেউ ছিল না। কোথা থেকে মান্‌কে না ছুটে এসে, আমার মুখে জোর করে, বুঝলে বাবা, চুমু খেলো। আমিও তার আচ্ছা শাস্তিটা দিয়েছি। তার মুখ চোখ খামচে রক্ত বার করে দিয়েছি। কাল তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে বাবা।" এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এ হাসিতে নফর যোগ দিতে পারিল না। সহসা তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

পিতার ভাব দেখিয়া চিন্তা কহিল—"তুমি কি ভাবছো বাবা ?" তাহার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া নফর কহিল—"তুই বাড়ীতে একা থাক্‌তে পারবি চিন্তা ?"

বাহিরের অন্ধকারের ভিতর দিয়া অদূরে ঐ প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটির দিকে একবার তাকাইয়া পরক্ষণেই পিতাকে সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভীতভাবে সে বলিয়া উঠিল—"না বাবা, ভয় করবে যে !"

"তবে আমার সাথে চল্"—এই বলিয়া কন্যাকে তুলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তামণি বিস্মিত হইয়া কহিল—"এত রাত্রে কোথায় যাবে বাবা ?" নফর তাহার কোনও উত্তর দিল না—শুধু ঘরের ভিতর হইতে তাহার বার্দ্ধক্যের সহায় যষ্টিটি হাতে লইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রামের অপর প্রান্তে রাইচরণ দাসের বাড়ী। রাইচরণ গ্রামের মধ্যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। জাতিতে কৈবর্ত্ত হইলেও তাহার একমাত্র পুত্রকে শিক্ষিত করিতে সে জেলায় পাঠাইয়াছে। নফর কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কম্পিত কলেবরে রাইচরণ দাসের বাড়ী উপস্থিত হইল। রাইচরণ একাকী তাহার প্রকাণ্ড আটচালায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। নফরচন্দ্রকে এত রাত্রে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"এত রাত্রে বাড়ীর বার হয়েছ যে দাদা—ব্যাপারখানা কি ?"

নফরচন্দ্র তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া গম্ভীরভাবে কহিল—"বড় জরুরি কাজ, তাই আজ আস্‌তে হলো ভাই। যে নফরের দিনের বেলায় পথ চল্‌তেই কষ্ট বোধ হয়, সে এত রাতে অন্ধকারে বিশেষ জরুরি দরকার না হলে আসবে না, এ তুমি বুঝতেই পারছো।" তার পর সহসা রাইচরণের হাত নিজের শীর্ণ কম্পিত দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল—"বড়ই বিপদে পড়েছি ভাই, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার। তাই এত রাত্রেও তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

নফর গ্রামের মধ্যে একজন সৎ ব্যক্তি বলিয়া রাইচরণ তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধা করিত। তাহার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া রাইচরণ কহিল—"তোমার কোন কথা কোন্ দিন অবহেলা করেছি দাদা ?"

"সেই সাহসেই তো তোমার কাছে এসেছি ভাই। কিন্তু এ একটু নতুন ধরণের কথা কি না !" এই বলিয়া সে একটু ম্লান হাসি হাসিল।

রাইচরণ একটু রাগের ভান করিয়া কহিল—"ভাইয়ের কাছে যে কথা বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে—তার কোনও কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।"

নফর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না না, সঙ্কোচ কিসের। তুমি—তুমি কি আমার এই কন্যাটিকে তোমারও কন্যা বলে গ্রহণ করতে পার না ? এ কি তোমার পুত্রবধূ হবার আশা করতে পারে না ?" নফরের এই অপ্রত্যাশিত কথায় রাইচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ঝঞ্ঝাকুল নেত্রে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমার কি এমন ভাগ্য হবে ? লক্ষ্মী মাটিফে কি এই গরীবের কুটীরে বরণ করে আনবার যোগ্যতা আমার আছে ?"

নফরচন্দ্র কহিল—"এ ত তোমারই আছে—তাই এত রাত্রে তোমারই কাছে ছুটে এসেছি। বল, আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবে না ?"

রাইচরণ একবার তাহার দিকে স্মিত মুখে চাহিয়া, চিন্তামণির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল—"এস তো মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী আমার কাছে এস তো।"

চিন্তামণি সঙ্কুচিত ভাবে তাহার নিকট আসিতেই, সে তাহার মস্তকে সস্নেহ পরশ বুলাইয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখী হয়ে আমার ঘর উজ্জ্বল করো।" তার পর সহাস্য আননে নফরচন্দ্রকে কহিল—"এর বেশী আর তোমার কিছু শোনবার আছে দাদা ?"

বৃদ্ধ নফরচন্দ্রের শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল—"তুমি মানুষ নও ভাই—তুমি দেবতা। তোমার কাছে এইবার চিরঋণী হয়ে থাকলাম।"

রাইচরণ বলিল—"কিন্তু আমিও যে আমার এই মা লক্ষ্মীটির জন্য ভিতরে ভিতরে অনেক দিন থেকেই লোভী হয়েছিলুম। কিন্তু এ রত্নটি দুর্লভ মনে করেই আমি এত দিন তোমার কাছে হাত পাতি নি, মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই চেপে রেখে এসেছি। শুধু ভয় হতো, কি জানি, যদি আমার আশা ভেঙ্গে যায়। আজ কি জন্য তুমি স্বেচ্ছায় এসেছো—সে কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখো, যদি আরও কিছু দিন তুমি না আসতে, তাহ'লে আমাকেই তোমার বাড়ী গিয়ে এম্‌নি করেই ভিক্ষা চাইতে হ'তো।"

নফরচন্দ্র খুসী হইয়া কহিল—"তাহ'লে এইবার শীগ্‌গিরই দিনটা ঠিক করে ফেল না ভাই।"

রাইচরণ বলিল—"শুধু এই যায়গায় আমার একটুখানি আপত্তি আছে। বিয়ে আরও কিছু দিনের মত স্থগিত রাখতে হবে দাদা। রাখাল একটা পাশ না করলে আমি তার বিয়ে দেবো না।"

নফর কহিল—"কিন্তু তত দিন আমি কি বেঁচে থাক্‌বো?" রাইচরণ মৃদু হাসিয়া বলিল—"এত দিন বাঁচতে পারলে, আর এই ক'টা দিন কি আর বাঁচতে পারবে না? আর যদি, ভগবান না করুন, সত্যিই তেমন দিন আসে, তাহ'লে ছেলেও আমার বেশী দূর নাই, শুভকাজ তখনই শেষ করে ফেল্লেই চল্‌বে; তাতে কিছুই আট্‌কাবে না।" এ কথায় নফরচন্দ্র আপত্তি করিতে পারিল না,—আর একপালা কৃতজ্ঞতার কথা জানাইয়া কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। বাড়ী পৌঁছিয়া সে কন্যাকে বলিয়া দিল—আর যেন সে কাহারও সঙ্গে না মিশে, বিনা কাজে যেন বাড়ীর বাহির না হয়।

(২)

কথাটা কিন্তু প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না। পর দিন গ্রামের দুই একজন বলাবলি করিতে লাগিল, কাল কিসের জন্য এত রাত্রে বৃদ্ধ নফরচন্দ্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ দাসের বাড়ী গিয়াছিল। সন্ধান লইতে লইতে ভিতরের খবরেরও কতকটা আভাষ পাওয়া গেল। রাইচরণ দাসের একজন কৃষাণ চুপি চুপি বলিয়া ফেলিল—সে কাল গোপনে শুনিতে পাইয়াছে যে, তাহার মনিবের পুত্রের সহিত নফরদাসের কন্যার বিবাহ পাকা রকমে ঠিক হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের এত দিন হয় তো আশা করিবার কিছুই ছিল না—তবুও তাহাদের মনে আশার এই ক্ষীণ রশ্মিটুকু বিদ্যমান ছিল যে, কালে হয় তো নফরচন্দ্রের মেয়েকে ঘরে আনা সম্ভব হইতেও পারে! কিন্তু একেবারে এই ভাবে নিরাশ হইয়া তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য তাহারা সদলবলে নফরের বাড়ী উপস্থিত হইল। সেদিন নফরচন্দ্র তাহাদের কোনও রূপ আদর অভ্যর্থনা করিল না—তাহার বৈঠকে যে কয়েক ছিলিম তামাক পুড়িত, তাহাও সেদিন খরচ হইল না। সকলেই রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া আসিল, এবং এই বৃদ্ধের অহঙ্কার কি করিয়া চূর্ণ করা যাইতে পারে, ইহাই স্থির করিবার জন্য তাহারা রীতিমত দল গঠন করিয়া ফেলিল। এই দলের সর্দ্দার হইল—পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ রামচরণ দাস। নফরচন্দ্রের উপর ইহার বিশেষ একটু রাগ ছিল। তাহার চতুর্থ পক্ষ ইহসংসার হইতে বিদায় লইলে, আবার একটি 'পক্ষ' গ্রহণ করিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে সে নফরচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু নফর তাহার এই মহৎ প্রস্তাব এমনি হাসির ঝড়ে উড়াইয়া দিয়াছিল যে, তাহার বুকে এ অপমান কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। আজ সুযোগ পাইয়া সে প্রতিশোধ লইবার জন্য একেবারে দলপতি হইয়া বসিল; এবং যাহাতে চিন্তামণির বিবাহের সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া যায়, এ জন্য তাহার বাড়ীতে দুবেলা রীতিমত পরামর্শ সভা বসিতে লাগিল।

উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ বিলম্ব হইল না। নফরচন্দ্রের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর এককালে কলঙ্ক রাহির হইয়াছিল—সহসা সেই কথাটা রামচরণের মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু গ্রামের জমিদারের সহিত তাহার কলঙ্কের যোগ থাকায়, কথাটা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এত কাল পরে সেই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহারা অন্তরে অন্তরে পুলকিত হইয়া উঠিল, এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে মনে করিয়া, তাহারা সদলবলে রাইচরণ দাসের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাইচরণ চতুর লোক—সে ব্যাপারটি অনুমান করিয়া লইল। কেন না, বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য যে গ্রামের লোকগুলি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, এ কথা তাহারও কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।—কিন্তু মুখে সে হাসির রেখা টানিয়া বলিল—"ইস্—আমার কি ভাগ্যি! আপনারা এতগুলি লোক গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন। আজ আমার সুপ্রভাত বল্‌তে হবে।"

কয়েক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া একথা সেকথার পর অবশেষে রামচরণ কাজের কথাটা পাড়িয়া ফেলিল। সে বলিল "শুন্‌লাম, রাখালের সঙ্গে নফরদাসের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কথাটা কি সত্যি?"

রাইচরণ হাসিয়া কহিল—"এরই মধ্যে কথাটা আপনাদের কাণে গিয়ে পৌঁছেছে দেখ্‌ছি। তা সত্য বৈ কি।"

রামচরণ বলিল—"হয় তো নফর তোমার হাতে পায়ে ধরেছে—তাতেই বুঝি তুমি সম্মত হয়েছ। কিন্তু সম্মত না হলেই ছিল ভাল।"

রাইচরণ তেম্‌নি হাসিয়াই উত্তর দিল—"না, নফরদা আমার হাতে পায়ে ধরে নি— এ কথা একেবারে মিথ্যা। যদি সে বিয়ের কথা নিজে এসে না বল্‌তো, তা'হলে আমাকেই তার হাতে পায়ে ধর্‌তে হ'তো—ঐ মেয়েটিকে আমার এম্‌নি প্রয়োজন।"

রাইচরণের স্পষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রামচরণ আবার কহিল—"কিন্তু মেয়ের মায়ের কলঙ্কের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?"

—"মনে পড়ে বটে, কিন্তু সেটা কোনও কাজের কথা নয়। অমন কলঙ্কের কথা খুঁজে দেখ্‌লে সব্বারই বেরিয়ে পড়ে। আর সত্যি বল্‌তে কি, ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি নে।"

রামচরণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—"বিশ্বাস করো না, সে কথা আলাদা; কিন্তু কথাটা যে সত্যি, তার তো আর ভুল নাই। দুপুর রাতে জমিদারকে যে নফরের বাড়ীর পাশে ঘুরতে আমি নিজ চোখেই দেখেছি। আর এই হরিলাল যে সেবার দুপুর রাতে নফরের স্ত্রীকে জমিদারের বাড়ী থেকে বের হতে দেখেছে, এ কথাই বা তুমি কাটিয়ে দেবে কি করে বল তো?"

রাইচরণ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া হরিলালের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল—"তোমার বয়স কত বাবা?"

হরিলাল মাথা নীচু করিয়া কোনও রকমে কহিল—"উনিশ।"

রামচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রাইচরণ কহিল—"নফরদার স্ত্রী মরেছে আজ কয় বচ্ছর?"

রামচরণ একটু ভাবিয়া বলিল—"এই দশ এগারো বচ্ছর হবে আর কি!"

"তা হ'লে যখন হরিলাল নফরদার স্ত্রীকে জমিদারের বাড়ী থেকে দুপুর রাতে বার হতে দেখে, তখন ওর বয়স ছিল কত রামচরণদা?"

রামচরণ এইবারে কথাটা তলাইয়া বুঝিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ রাগিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—"তা হরিলাল না হয় আর কেউ হবে! অত কথা কি আর এত দিন পরে মনে থাকে'? বিশেষ এই বুড়ো বয়সে!"

রাইচরণ এইবার বিদ্রূপ করিয়া কহিল—"বুড়ো বয়সে? বল কি রামচরণদা? এই সেদিনও না তুমি নফরদার মেয়ের সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে!"

রামচরণ এইবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—"কে বলেছে? সেই পাজি নচ্ছার নফরা বুঝি? যমকে শিয়রে করে এম্‌নি সব মিথ্যে কথা প্রচার করতে তার ভয় করে না? অমল জিভ খসে পড়বে যে! আমি গেলাম ওই বেজন্মা মেয়েকে বিয়ে করতে! কেন, আর কি মেয়ে জুটবে না?"

রাইচরণ কহিল—"তা জুটবে বৈ কি! তাই বলে তোমার মত লোকের অমন গালমন্দ দেওয়া উচিত হচ্ছে না, রামচরণদা।"

"গাল দেব না? আলবৎ দেবো। ওই বুড়োর কত বড় আস্পর্দ্ধা একবার দেখ দেখি! মরলে ওকে কাঁধ দেবে কে শুনি?"

রাইচরণ কহিল—"সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। যখন সে আমার বেহাই হতে চলেছে—যদি তেমন দিন তার সত্যিই আসে, তা হলে সে ভাবনা আমিই ভাববো।"

"তা হলে এ বিয়ের কিছুতে নড়চড় হবে না?"

"তা আর কি করে হয়—কথাবার্ত্তা একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে কি না!"

"সেই জমিদারের জন্মা মেয়েকেই ঘরে আনবে?"

অসহ্য ক্রোধে এইবার রাইচরণের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। দীপ্ত স্বরে সে বলিয়া উঠিল—"জমিদারের জন্মা! কিন্তু এ কথা তো জমিদার বেঁচে থাক্‌তে বল্‌তে সাহস পাওনি—তখন ভয় ছিল বুঝি?"

"তখন প্রয়োজন হয় নি—তাই বলিনি। নইলে রামচরণদাস কাউকেই ভয় করে না—জমিদার কেন ভগবানকেও না।"

রাইচরণ বিদ্রূপ করিয়া কহিল—"ভগবানকে যে

করো না, সে আমিও দেখ্‌তে পাচ্ছি—নইলে এমন কথা তুমি মুখ দিয়েও বের কর্‌তে পারতে না। কিন্তু জমিদারের কথা আলাদা যে! তিনি যে প্রত্যক্ষ ছিলেন—সে-বারকার নাকে খত দেওয়ার কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছে?"

পুরাতন কথা আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিল—"ও সব বাজে কথা থাক্—তা হলে এ বিয়ে কিছুতেই ভাঙ্গবে না?"

"সে কথা তো আগেই বলেছি।"

"বেশ, আর আমাদের কিছু বলবার নাই। তোমার টাকার অহঙ্কার বেশী দিন থাক্‌বে না, থাক্‌বে না—এই কথা আজ বলে যাচ্ছি।" এইবার তাহারা সকলে উঠিয়া পড়িল।

রাইচরণ হাসিয়া কহিল—"টাকার গরম আমার একটুও নাই দাদা। কারণ, লক্ষ্মী যে চঞ্চলা, এটুকু জ্ঞান আমার এ বয়সে হয়েছে। সে কথা যাক—আপনাদের কিন্তু বিয়ের রাত্রিতে এ বিয়েতে যোগ দিতে হবে। যথা সময়ে অবিশ্যি আবার খবর পাবেন।"

এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া রামচরণ সদল বলে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

শিবশঙ্কর চৌধুরী যেমন দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন, তেম্‌নি তাঁহার বদখেয়ালেরও অন্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পত্নী ব্রজেশ্বরী সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী ছিলেন। দুঃখীর দুঃখ, ব্যথিতের বেদনা নিঃশেষে মুছিয়া দিবার জন্য তাঁহার হাত দু'খানি অনুক্ষণ নিযুক্ত হইয়া থাকিত। স্বামীর অত্যাচারে অবিচারে যখনই যে প্রজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত, তিনি সে সংবাদ পাইলে তাহাকে গোপনে ডাকাইয়া আনিয়া অর্থ ও নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া অনেকটা শান্ত করিয়া দিতেন। এই জন্য গ্রামের প্রজারা সকলেই যেমন জমিদারকে গোপনে ঘৃণা করিত, তেমনি দেবীরূপিণী জমিদার-পত্নীকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। জমিদার মহাশয়ের এক মাত্র পুত্র। পুত্র যাহাতে পিতার আদর্শে গঠিত না হইয়া উঠে, সেজন্য ব্রজেশ্বরী দেবী অতি শিশুকাল হইতেই তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাকে স্বামীর নিকটও অনেক কথা শুনিতে হইত। তিনি গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিতেন—"কি দুঃখে একমাত্র সন্তানকে দূরে রেখেছি, সে আমিই জানি, আর জানেন অন্তর্যামী ভগবান্।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনও দিনই পুত্রকে দেখিবার আকুল ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

শরীরের প্রতি নানা অত্যাচারে স্বামী যখন শয্যাশায়ী হইলেন, আর যখন তাঁহার বাঁচিবার কোনও আশাই রহিল না—সেই সময় তিনি পুত্র অজয়কুমারকে ঘরে লইয়া আসেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হইয়া গেলে, পুত্রকে বলিলেন—"তোর যত দিন না লেখাপড়া শেষ হয় অজয়, তত দিন জমিদারী আমিই দেখ্‌বো; তার পর, লেখা পড়া শিখে যখন মানুষ হয়ে আস্‌বি, তখন এই একটা কথা আমার মনে রাখিস্ বাবা, তোর পিতাদের যেন তোকে দিয়ে আর কোনও দিন দুঃখ পেতে না হয়! ওরা অনেক জ্বালায় জ্বলেছে রে—তোর সৎশাসনের গুণে যেন ওরা একটু শান্তি পায়।"

মায়ের মনের ব্যথা অজয় বুঝিল কি না সেই জানে; সে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলিয়াছিল—"আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার ইচ্ছাই যেন সত্য হয়।"

পুত্রের কথায় অনেক দিন পরে ব্রজেশ্বরীর দাব-দগ্ধ হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকিয়াছিল।—ইহার পর পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

অজয় এখন কলিকাতায় বি-এ পড়ে। ছুটির সময় সে শুধু বাড়ী আসে, নইলে তাহাকে সব সময় কলিকাতায় থাকিতে হয়। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সে বাড়ী আসিয়াছে। এক দিন বৈকালে নদীর তীরে বেড়াইবার সময় অজয় চিন্তামণিকে দেখিতে পাইল। চিন্তামণি নদীতে পা ধুইয়া একটি পিতলের কলসী কক্ষে লইয়া—পাড় বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল। বালিকার সুন্দর আনন এবং সর্ব্বোপরি তাহার সিক্ত বসনের ভিতর দিয়া যে সরস সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—তাহাই পলকের মধ্যে অজয়ের যুবক-বুকে বেশ একটু গভীর রেখাপাত করিয়া গেল। অজয়ের সঙ্গে সেদিন তাহার প্রজা রামচরণ ছিল। সে অজয়ের ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"ওকে চিনলেন

না বুঝি? ও হুজুরেরই প্রজা নফরদাসের মেয়ে। আমাদেরই স্বজাতি। ওর বিয়েও ঠিক হয়েছে রাইচরণের ছেলের সঙ্গে।"

অজয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া কহিল—"বিয়েও ঠিক হয়েছে?"

রামচরণ হাসিয়া বলিল—"তা হয়েছে বৈ কি। এত দিন তো বিয়ে হওয়াই উচিত ছিল। অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে আর কত দিন আইবুড়ো রাখা যায় বলুন! সবই দেখলেন তো!"

ইহার পর সেদিন আর অজয়ের বেড়াইতে ইচ্ছা হইল না—সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিল।

ব্রজেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত শীগ্‌গিরই ফিরলি যে অজয়?"

বিমর্ষভাবে অজয় কহিল—"আজ আর বেড়াতে ভাল লাগলো না মা।"

সেদিন অজয়ের আর রাত্রে নিদ্রা আসিল না। সেই হঠাৎ-দেখা বালিকার সুন্দর মুখখানিই তাহার মনের মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। সে তাহার উত্তেজিত মনকে শান্ত সংযত করিবার অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সবই বৃথা হইয়া গেল।

পরদিন অজয় একাকী আবার সেই নদীর ঘাটে ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইল। আবার চিন্তামণির সঙ্গে তাহার তেম্‌নি ভাবেই দেখা হইল। আজ অন্য কেহ না থাকায় অজয় তাহাকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। এক অপরিচিত যুবককে অমন ভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া চিন্তামণি দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

চতুর রামচরণ সেদিন অজয়ের সঙ্গে আসে নাই বটে—কিন্তু দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। চিন্তামণি চলিয়া গেলে সে অজয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হুজুর আজও এইদিকেই যে এসেছেন দেখ্‌ছি।"

অজয়ের মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"নদীর ধারে বেড়াতে আমার বেশ লাগে।"

রামচরণ মনে মনে বলিল—"বেশ লাগবে না—রস পেয়েছ যে! বাপেরই ব্যাটা তো!"

সেই দিন চিন্তামণি বাড়ী ফিরিয়া তাহার পিতাকে বলিল—"নিত্যি এক বাবু ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে।"

নফর বলিল—"সত্যি? তা হ'লে কাল থেকে আর তুই ঘাটে যাস্‌নে।"

পরদিন যথাসময়ে বালিকাকে দেখিতে না পাইয়া অজয় ক্ষুণ্ণ হইল। সে অনেকক্ষণ সেই ঘাটের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সেদিন আর তাহার প্রার্থিত বস্তু মিলিল না। রামচরণ সেদিনও অজয়কে লক্ষ্য করিতেছিল। সে নিকটে আসিয়া কহিল—"হুজুর এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখ্‌ছি।" অজয় বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। রামচরণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই কহিল—"হুজুরের মনের ভাব আমি বুঝেছি। ঐ মেয়েটিকে আপনি চান এই তো? তা এ সব আপনাদের মত বড়লোকদের তো হতেই পারে। আপনি ইচ্ছে করলেই তো—"

অজয় তাহাকে এক প্রচণ্ড ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—"এ তুমি কি বল্‌ছো রামচরণ?"

ধমক খাইয়া রামচরণ একটু থতমত খাইয়া গেল—বিনীতভাবে কহিল—"আমি বুঝতে পারিনি হুজুর।" কিন্তু তখনও তাহার ঠোঁটে দুষ্টামির হাসি লাগিয়া ছিল।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া অজয় জননীকে কহিল—"কালই আমি কল্‌কাতা যাব মা।"

ব্রজেশ্বরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কালই? এখনও তো কলেজ খোলবার অনেক দেরী অজয়।"

"তা হোক। এখানে আমার কিচ্ছু পড়াশোনা হচ্ছে না। আমি কালই যাব।"

ব্রজেশ্বরী আর কোন আপত্তি করিলেন না। তিনি পুত্রের জিনিসপত্র গুছাইয়া, যাইবার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। পরদিন অজয় সত্যই কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কিন্তু কলিকাতাও তাহার উত্তেজিত মনকে শান্ত করিতে পারিল না। অবশেষে দশ পনরো দিন পরে আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইল।

ব্রজেশ্বরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এই সেদিন গেলি, আবার এখনই ফিরলি যে?"

অজয় মাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"কলকাতায় বড্ড বসন্ত হচ্ছে মা।"

ব্রজেশ্বরী চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তাই না কি! তাহলে চলে এসে খুব ভাল করেছিস্ অজয়।"

সেই দিনই সন্ধ্যার পর গোপন পরামর্শের জন্য অজয় রামচরণকে ডাকিয়া পাঠাইল।

(৪)

রাত্রি বোধ করি তখন নয়টা। নফর দাওয়ায় ছিন্ন মাদুরের উপর শুইয়া ছিল, আর চিন্তামণি ঘরের ভিতর প্রদীপের নিকট দুই পা মেলিয়া দিয়া কেঁথা সেলাই করিতেছিল। এমন সময় রামচরণ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"কি গো নফরদা', ঘুমোচ্ছ না কি?"

নফরচন্দ্র ঘুমায় নাই বটে, কিন্তু এত দিন পরে এই অসময়ে রামচরণের গলার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল! কারণ, এই লোকটি যে তাহার বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না।

নফর কহিল—"কে, রামচরণ ভায়া যে! এত রাত্রে কি মনে করে?"

রামচরণ দাওয়ায় উঠিয়া নফরের পাশে বসিয়া বলিল—"এখনও ঘুমোও নি? চিন্তা কোথায়?"

"ঘরে। কেঁথা সেলাই করছে।"

"তোমাদের কাছে বড় জরুরি কাজে এসেছি দাদা। জমিদারবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।"

নফর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"জমিদার পাঠিয়েছে? ব্যাপার কি রামচরণ? এত রাত্রে জমিদার তোমাকে পাঠিয়েছে কেন?"

রামচরণ চাপা গলায় বলিল—"আস্তে কথা কও দাদা। তোমার বরাত ফিরেছে। চিন্তাকে অজয়বাবুর মনে ধরেছে।"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া নফর বলিল—"এঁ্যা!"

রামচরণ হাসিয়া বলিল—"বিশ্বাস হচ্চে না বুঝি? এই দেখ।"—এই বলিয়া সে চাদরের তলা থেকে একটি বাণ্ডিল বাহির করিয়া কহিল—"এতে হাজার টাকার নোট আছে। তুমি যদি চিন্তাকে দেও—এই হাজার টাকা তোমার।"

নফর একটু ভাবিল। তার পর কহিল—"কিন্তু চিন্তাকে নিয়ে তাঁর কি লাভ?"

ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া রামচরণ বলিল—"তাকে নিয়ে কি লাভ, তাও কি আমাকে খুলে বলতে হবে? বুড়ো হয়েছ বলে এটুকুও কি তোমার মাথায় ঢোকে না? তিনি বলে দিলেন—তুমি চিন্তাকে নিয়ে কলকাতায় যাও। সেখানে এক বাড়ী তিনি করে দেবেন। তোমরা বাপ মেয়ে দুজনেই এক বাড়ীতে থাকবে। অজয়বাবুই তোমাদের সমস্ত খরচ জোগাবেন। তোমার ভাগ্যি ভাল নফরদা, শেষটা জমিদারই তোমার জামাই হয়ে বস্‌লো।"

"তা' মন্দ কি"—বলিয়া নফর চুপ করিল।

রামচরণ কহিল—"তা'হলে রাজি তো?"

শান্ত ভাবেই নফর বলিল—"রাজি না হয়ে আর উপায় কি! স্বয়ং জমিদারই যখন জেদ ধরেছেন।"

রামচরণ সুখী হইয়া বলিল—"যাক্, তোমার সুমতি হয়েছে দেখ্‌ছি। তা'হলে টাকাটা রাখ। কিন্তু আমি যে তোমার উপকারটা করলাম—সুখের দিনে সে কথাটা ভুলো না দাদা।"

নফর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"পাগল! তাই কি কখনও ভুল্‌তে পারি।"

রামচরণ চলিয়া যাইতেছিল—সহসা নফর তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"শোনো ভায়া, জমিদারের কাছ থেকে তোমার পাওনাটা কত হল?"

লজ্জিত হইয়া রামচরণ বলিল—"বেশী আর কি, পাঁচশো টাকায় রফা হয়েছে।"

রামচরণ চলিয়া গেলে চিন্তামণি পিতার নিকট আসিয়া বলিল—"ও কি বলে গেল বাবা?"

কন্যাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া নফর কহিল—"কই, বিশেষ কিছু বলেনি তো মা। তবে আর বুঝি বেশী দিন তোকে আমার কাছে রাখ্‌তে পারিনে।" পিতার ভাব দেখিয়া চিন্তামণি বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

পর দিন প্রাতঃকালে নফরচন্দ্র টাকার পুঁটলিটি চাদরের তলে ঢাকিয়া লইয়া একেবারে জমিদার-বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। এই বৃদ্ধের জমিদার-অন্তঃপুরে অবাধ-গতি। তবে শরীরটা ইদানীং একেবারে ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছে বলিয়া সে বড় একটা এদিকে আসিত না। আজ অনেক দিন পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সে জোর গলায় হাঁকিল—"কই, আমাদের রাণীমা কোথায় গো?"

ব্রজেশ্বরী তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিতেছিলেন, নফরের গলার শব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"নফর যে! এত দিনে কি তোমার রাণীমাকে মনে পড়েছে?"

নফর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মনে আমার সব সময়েই পড়ে মা। কিন্তু দেখ্‌তেই পাচ্ছ, কেমন বুড়ো হয়ে পড়েছি। আর ঘরের বার হতে পারিনে—বড় কষ্ট হয়। কিন্তু সে কথা যাক্। তোমাকে যে আমার একটু নিরিবিলি দরকার রাণীমা!"

ব্রজেশ্বরী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জনবিরল স্থানে গিয়া বসিলেন।

নফর এইবার তাহার চাদরের তল হইতে নোটের পুঁটুলিটি বাহির করিয়া ব্রজেশ্বরীর পায়ের নিকট রাখিয়া কহিল—"এইটি তোমাকে দিতে এসেছি মা।"

ব্রজেশ্বরী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এতে কি আছে নফর?"

"টাকা। হাজার টাকা।"

"হাজার টাকা? এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?"

ম্লান হাসিয়া নফর কহিল—"তোমার ছেলে পাঠিয়েছিল।"

দুর্দ্দমনীয় বিস্ময়ে ব্রজেশ্বরী একসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন—"অজয় পাঠিয়েছিল? তোমাকে? কিসের জন্য?"

শান্ত সংযত কণ্ঠে নফর উত্তর করিল—"অজয়বাবু আমার মেয়েকে চান। এ তারই দাম।"

তাহার কথায় ব্রজেশ্বরীর মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল—কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই ক্রোধের উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত আনন দ্বিগুণ লাল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—"বুঝেছি। শেষে সেও অমনি হ'লো। আমার উপদেশ, আমার শিক্ষা সবই কি ব্যর্থ হয়ে গেল নফর? বাপের উপযুক্ত পুত্র হয়েই কি সে গড়ে উঠ্‌লো?"

ব্রজেশ্বরীর মানসিক কষ্ট যে কতখানি, তাহা নফরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে সান্ত্বনার সুরে বলিল—"কি করবে মা—সবই অদৃষ্টের ফল। কিন্তু আজ এই কথাই শুধু বল্‌তে আসিনি। তোমাকে আরও কিছু আমার বলবার আছে। ভেবেছিলাম, সে কথা আর কাউকে বল্‌বো না। কিন্তু তা আর হয় না। অজয় বাবুর যখন একবার এদিকে ঝোঁক এসেছে—যাতে এ ঝোঁকটা তার চিরকালের মত দূর হয়—সেজন্য এই বুড়ো বয়সেও আমার ঘরের কলঙ্কের কথা তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি এই কথা তাকে বলো—চিন্তা তারই বোন্।"

ব্রজেশ্বরী চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এঁ্যা! তবে কি, তবে কি—" উত্তেজনায় তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নফর শান্তভাবেই কহিল—"হ্যাঁ মা। চিন্তা তোমারই স্বামীর ঔরসজাত।"

ব্রজেশ্বরী কিছুক্ষণ মূর্চ্ছাহতার ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"এ কথা তুমি আগে শোন নি নফর?"

"শুনেছি বৈ কি মা। আমি সব প্রথম থেকেই জানি যে!"

"কিন্তু এর তুমি প্রতীকার করো নি কেন?"

নফর এইবার হাসিয়া কহিল—"আমার বুদ্ধিমতী মায়ের কিন্তু এটা বোকার মত কথা হ'লো। প্রতীকার করবো এ সাধ্য তখন কোথায় আমার মা? এক দিকে আমি গরীব—তার উপর আবার ষাট বছরের বুড়ো। আর অন্য দিকে জমিদারের অজস্র অর্থ, আর আমার স্ত্রীর পূর্ণ যৌবন। আমি কি দিয়ে এগুলো সামলাবো বল তো?"

ব্রজেশ্বরী তাহার কথায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নফর কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল—"সবাই আমার স্ত্রীকে দোষ দেবে, কিন্তু আমি তাকে দোষ দিতে পারি নে। তার কতটুকু মনের সাধ আমি পূরণ করতে পেরেছি যে, সে আমার বশে থাকবে? আমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে তাকে বিয়ে করে এনে কি তার মনে আঘাত দিই নি? তবে সেই বা আমার উপর শোধ নেবে না কেন? না—না, সে ঠিকই করেছে। কিন্তু এ জ্ঞান তো আমার আগে হয় নি মা—আমি ঠেকে শিখেছি।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন—"নফর, তুমি যা পেরেছ—তা

মানুষে পারে না। তুমি বলেই ঐ মেয়েকে নিয়ে ঘর করছো।"

নফর এইবার স্নেহে গলিয়া গিয়া বলিতে লাগিল—"ওই মেয়েই যে আমার সব সুখ-শান্তি রাণী মা! ওকে দিয়ে গিয়েছে বলেই আমার একটা অবলম্বন আছে—নইলে এত দিনে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।"

তার পর একটুখানি স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—"এই বয়সের মধ্যে অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার। কিন্তু বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেয়েছি, যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা' যেন পরজন্মে না ভুলে যাই, এই আশীর্ব্বাদ আজ তুমি কর মা।"

"নফর!"

"মা!"

"তুমি একটু বসো—আমি অজয়কে ডেকে আনি। সে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিক্।"

নফর ভীত হইয়া বলিল—"ছিঃ! ও কি কথা মা? তুমিই তাকে বেশ করে বুঝিয়ে ব'লো। সে ভাল ছেলে,—আমি জানি। ভগবান তার মঙ্গলই করবেন। শুধু আমার এই কথাটা তাকে জানিও রাণীমা—এখন এম্‌নি দিন কাল পড়েছে, যাতে পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল হলে আর উপায় নাই। এরই জন্য আমরা এতখানি হীন হয়ে পড়েছি।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন—"এইবার তাড়াতাড়ি চিন্তার বিয়েটা সেরে ফেল নফর। আমি এক মাসের মধ্যেই কাশী যাব। তার আগে মায়ের বিয়ে চুকিয়ে ফেল—তা'হলে তুমিও তো শেষ বয়সে আমারই সঙ্গে কাশীবাস করতে পারবে।"

নফর বাষ্পাকুল নেত্রে কহিল—"আমার কি এত ভাগ্যি হবে মা? কিন্তু রাইচরণ যে ছেলের বিয়ে এখন দেবে না বলেছে।"

"যাতে সে দেয়, সে বন্দোবস্ত আমি করছি। তাকে আজই আমি ডেকে পাঠাবো। আর এক কথা—চিন্তার বিয়ের সমস্ত খরচ আমিই দেবো। তুমি এখন থেকেই আয়োজন আরম্ভ করে দাও।"

নফর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ব্রজেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিয়া, তার পর তাঁহার পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

(৫)

অজয় তাহার পড়িবার কক্ষে একখানি বই হাতে করিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু তাহার মন সেই নদীর ঘাটের আশেপাশেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। যৌবনের রঙ্গিণ কল্পনা তাহার তরুণ মনের উপর যে পুলক ও আনন্দের শিহরণ জাগাইয়াছিল, তাহারই রেস সমস্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। এরূপ অনুভূতি এই তার প্রথম; কিন্তু ইহার শক্তি এতই প্রবল যে, তাহার শিক্ষিত মনও ইহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিল না। তাহার সমস্ত সংযমের বাঁধন শিথিল হইয়া যৌবনের প্রবৃত্তির পথেই খরবেগে ছুটিয়া চলিল। চিন্তামণিকে যে সে লাভ করিতে পারিবে, এই আনন্দ তাহার সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচকে প্রবল বন্যার মুখে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

সহসা ব্রজেশ্বরী তাহার চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়া ডাকিলেন—"অজয়!" তাঁহার মুখ গম্ভীর, স্বর ক্রোধ-ব্যঞ্জক।—জননীর অপ্রত্যাশিত আগমন এবং তাঁহার স্বরের কঠোরতা অজয়কে বিচলিত করিয়া তুলিল। সে ভীত ভাবে বলিল—"মা!"

"তবে, তুমিও আমাকে শাস্তি দেবে না? অনেক জ্বালায় জ্বলেছি, এতেও কি তোমাদের তৃপ্তি হয় নি?" মায়ের কথা অজয় কতক বুঝিল, কতক বা বুঝিল না। কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক দুরদুর করিয়া উঠিল। সে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—"আমি তোমায় শাস্তি দেব না? এ বিশ্বাস তোমার কি করে হ'লো মা?"

অকস্মাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বরী কহিলেন—"হ্যাঁ হয়েছে! উপযুক্ত পুত্রের মা আমি বলে বড় গর্ব্ব আমার হয়েছিল। কিন্তু সে সম্বলটুকুও তুমি আমার কেড়ে নিয়েছ!"

তার পর সেই নোটের তাড়াটি বাহির করিয়া পুত্রের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন—"এ টাকা তুমি নফরের কাছে পাঠিয়েছিলে? তার মেয়ের জন্য?"

একেবারে স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া অজয় আর মাথা তুলিতে পারিল না।

ব্রজেশ্বরী বলিতে লাগিলেন—"অজয়, শেষে তোমার কাছেও প্রবৃত্তিই বড় হয়ে দাঁড়ালো?—মায়ের ইচ্ছা, মায়ের

ভারতবর্ষ



দেবদাসী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

মুখ-শান্তি, মায়ের শিক্ষা-দীক্ষা, মায়ের উপদেশ সবই বৃথা হয়ে গেল ? ছিঃ !" ব্রহ্মচারিণী জননীর দৃপ্ত স্বরে অপরাধী অজয় আর মাথা তুলিতে পারিল না ; শুধু তাহার মুখখানি উত্তরোত্তর মলিন হইয়া আসিল। সেইদিকে চাহিয়া ব্রজেশ্বরী কহিলেন—"তুমি না জেনে কি করতে চলেছিলে অজয় ? চিন্তামণি তোমার কে হয় জান ? সে তোমার বোন।"

মলিন বিবর্ণ মুখখানি মায়ের মুখের দিকে তুলিয়া ব্যাকুল ভাবে অজয় বলিয়া উঠিল—"আমার বোন্ ?"

"হ্যাঁ ! বাপের কলঙ্কের কথা আরও কি শুনতে চাও অজয় ? তিনি আমাকে যে দুঃখু দিয়েছেন—তা আমি সহ্য করতে পেরেছি। কিন্তু তোমার দেওয়া এ দুঃখ বজ্রের অধিক আমার বুকে বেজেছে। অজয়, ছেলের চরিত্র যে মায়ের কাছে কতখানি অহঙ্কারের, এ আমি কি করে তোমায় বোঝাবো।" দুঃখের আবেগে তাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অজয় আর সহ্য করিতে পারিল না। সে সহসা জননীর পদতলে পড়িয়া আর্ত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—"মা, এবারকার মত তুমি আমায় ক্ষমা কর।" তাহার চোখের জলে ব্রজেশ্বরীর পদযুগল ধৌত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ নিস্পন্দ ভাবে থাকিয়া ব্রজেশ্বরী ধীরে ধীরে পুত্রকে টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—"ক্ষমা আমি তোকে এক দিন না এক দিন করবোই। আজ আমি ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে শুধু এই প্রার্থনা করছি, যেন এই একটি ভুলের উপর দিয়েই তোর জীবন একেবারে নির্ম্মল হয়ে যায়। কিন্তু আজই তোকে কলকাতায় যেতে হবে যে অজয়।"

অজয় বেদনাতুর দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল,—"আজই ? আমাকে কিছু দিন তোমারই কোলের ভিতর থাকতে দাও মা !"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন—"আর সময় নাই যে বাবা। আমি এই মাসের মধ্যেই কাশী যাব। তার আগেই নফরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে যাব মনে করেছি। তুই এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে কয়েকখানা গয়না গড়িয়ে নিয়ে আয়। আমি এ বিয়েতে ভাল রকম খরচ করবো মনে করেছি।"

অজয় আর আপত্তি করিল না ; বরং জননীর প্রস্তাবে অন্তরে অন্তরে খুসীই হইয়া উঠিল।

* * * * * * *

যথাসময়ে রাইচরণ দাসের পুত্রের সহিত চিন্তামণির বিবাহ হইয়া গেল। সকলেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে, এ বিবাহে জমিদার অজয় ও তাহার মা ব্রজেশ্বরী এরূপ ভাবে কন্যাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যেন তাঁহাদেরই বাড়ীর মেয়ের বিবাহ। রামচরণ দাস কিন্তু বিবাহে একটু গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিল—সে তাহার দল লইয়া ঘোঁট পাকাইয়া বসিল, এ বিবাহে তাহারা যোগ দিবে না। কিন্তু বিবাহের রাত্রে যখন জমিদারের পাইক আসিয়া দলপতি রামচরণের কাণ ধরিয়া লুচির পাতে বসাইয়া দিল, এবং ব্রজেশ্বরী নিজে সম্মুখে থাকিয়া তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন—তখন তাহার দলের লোক-গুলিও একে একে নিঃশব্দে বসিয়া যাইতে লাগিল।

বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেলে, ব্রজেশ্বরী কাশী যাইবারও দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। ঠিক হইল—সঙ্গে নফরদাস যাইবে। যাত্রার দিন অজয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, আমিই কি তোমাকে দেশত্যাগী করলাম ?"

ব্রজেশ্বরী পুত্রের মস্তকে সস্নেহ পরশ বুলাইয়া বলিলেন—"ছিঃ, ও কথা বলো না বাবা। আমার কি কাশী যাওয়ার বয়স হয় নি ? আর সংসারে পড়ে থাকবো কিসের জন্য ? এইবার নিজে দেখে শুনে বিয়ে কর।—তার পর বউমাকে নিয়ে একবার কাশী যাস্। আশীর্ব্বাদ করি, ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হ', সংযমের বাঁধন তোর অটুট থাকুক।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক বিধান

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

(২)

যুধ্যমান নৃপতিগণ পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবেন, সেই সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যে হেগ সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেই যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। যে সমুদায় নৃপতি ঐ সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহারা কেহই পূর্ব্বে সাবধান না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন না। হয় যুদ্ধের কারণ দর্শাইয়া, একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিবেন, অথবা বিরোধী রাজ্যে একখানি চরম পত্র লিখিবেন। পূর্ব্বকালে দূতগণ যুদ্ধ ঘোষণার জন্য বিরোধী রাজ্যে গমন করিতেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইত তাহা নহে। এই দ্বিতীয় বারের হেগ সমিতির বৈঠক হইবার পূর্ব্বে ক্বচিৎ কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করা হইত মাত্র। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মাত্র ১১টী যুদ্ধ রীতি মত ঘোষণা করা হইয়াছে; রীত্যনুযায়ী ঘোষণা না করিয়া ৬০টীর অধিক যুদ্ধ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে নৃপতিগণের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটী প্রধান যুদ্ধ রীতিমত ঘোষণার পর সংঘটিত হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ জার্ম্মানগণের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুষিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়ারগণ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানি চরমপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সাধারণতঃ যুদ্ধ ঘটিবার অনতিকাল পূর্ব্বে উভয় রাজ্যে দূতের দ্বারা সংবাদ আদানপ্রদান ব্যাপার কিয়ৎ পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়; পরে কোন রাজ্যের দূত হঠাৎ চলিয়া যান এবং এইরূপ সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর কোনরূপ ঘোষণা না করিয়াই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাপানের মিকাডো রুষিয়ার জারকে জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ করিয়েন। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যথোচিত উপায় বিধান করিবেন এবং তাঁহার দূত আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেণ্ট্ পিটার্স্বর্গ ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ৮ই তারিখেই জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়, এবং ১০ই তারিখে তৎসম্বন্ধে রীতিমত ঘোষণা করে। এই বিষয়ে জাপান অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, পরে রুষিয়া এই কথা প্রকাশ করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, সেই সময় হইতে যুদ্ধের আরম্ভ বুঝিতে হইবে; আর যদি ঘোষণা করা না হয়, তাহা হইলে প্রথম আক্রমণের সময় হইতেই যুদ্ধের আরম্ভ জানিতে হইবে। যুদ্ধ আরম্ভের পর বিরোধী রাজ্যের প্রজামাত্রই শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ স্থলে যুদ্ধ আরম্ভের পর যদি বিরোধী রাজ্যের কতক লোক অপর রাজ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে? সেই সমুদায় লোককে ঐ দেশ পরিত্যাগের জন্য কিছু সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে সমুদায় ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন, নেপোলিয়ন তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলেন; এইরূপ কার্য্য আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। তবে বিরোধী রাজ্যের যে সমুদায় লোককে ধৃত করিলে অপর রাজ্যের বিশেষ উপকার হইবে, তাহাদিগকে ধৃত করা যইতে পারে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই কতকগুলি লোক শত্রুভাবাপন্ন হয়; বিরোধী রাজ্যের প্রজা মাত্রেই যে শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকগুলি লোককে অতি প্রবল শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যান্য ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণে শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছে, ইহাই ধারণা করিতে হইবে। বিরোধী রাজ্যের পক্ষ হইতে যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারাই অতি প্রবল শত্রু। আন্তর্জাতিক বিধানোক্ত নিয়মাবলী পালন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ স্থলে নিহত বা আহত করিতে পারা যায়। আর যদি তাহারা ধৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যুদ্ধের বন্দী রূপে আটক রাখিতে হইবে। শত্রু পক্ষের যোদ্ধৃগণ যদি নিরপেক্ষ রাজ্যেরও প্রজা হয়, তাহা হইলেও তাহারা শত্রুর ন্যায়ই ব্যবহার পাইবে। বিরোধী রাজ্যের বাণিজ্য জাহাজের নাবিকগণও বহু পরিমাণে শত্রুভাবাপন্ন বটে। সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ, ফেরীওয়ালাগণ প্রভৃতিকে সৈন্য ও নাবিকগণের পরেই শত্রুরূপে গণ্য করিতে পারা যায়। বিরোধী রাজ্যে যে সব প্রজা বাস করিতেছে অথচ যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা সৈন্য নাবিক প্রভৃতি অপেক্ষা অল্প শত্রুভাবাপন্ন। শত্রুগণ যে সমুদায় স্থান যুদ্ধে নিজ অধিকারে আনিয়াছে, সেই সব স্থানের অধিবাসিগণ, এবং যদি কোন নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজার বিরোধী রাজ্যে বাণিজ্যাধার থাকে কিন্তু সে যদি তথায় বাস না করে, এইরূপ ভাবের প্রজা অতি অল্প শত্রুভাবাপন্ন। বিরোধী রাজ্যের যে সমস্ত অধিবাসী যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা শত্রু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও, যত দিন তাহারা শান্তভাবে বাস করিবে, এবং সংগ্রাম ব্যাপারে কোনও

প্রকারে সাহায্য করিবে না, তত দিন তাহাদিগকে বধ করা বা বন্দী করা ন্যায়সঙ্গত নয়। যাহা হউক শত্রুর রাজ্যের কোনও অংশ সাময়িক ভাবে নিজ অধিকারে আনয়ন করিতে পারা গেলে, সেই অংশের প্রজাগণের নিকট টাকা ও আবশ্যক দ্রব্য সমুদায় আদায় করিয়া লওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সেই প্রজাগণকে অনেক বিষয়ে খাটাইয়া লওয়াও হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এরূপ স্থলে লুণ্ঠনাদি ব্যাপার নিষিদ্ধ হইয়াছে। শত্রু সৈন্যগণকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বধ করিতে পারা যায় বটে; কিন্তু তাহারা আহত হইলে, অথবা কেহ আশ্রয় ভিক্ষা করিলে, অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করিতে হইবে। হেগ সমিতিতে উহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে আশ্রয় প্রদান না করা ভয়ানক দোষাবহ ও বেআইনি কার্য্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন জাপানীগণ পোর্ট্ আর্থার অধিকার করে, তখন তাহারা বন্দী চীনা সৈন্যগণকে আশ্রয় প্রদান করে নাই; তাহারা বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোককে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অবশ্যই এই কার্য্য ঘৃণিত দোষার্হ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যুদ্ধস্থলে যে সমুদায় সৈন্য আহত হইত, তাহাদিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইত। আহত সৈন্যগণের কথা দূরে থাক্, যুদ্ধের শেষ ভাগে যে সমুদায় নিঃসহায় সৈন্য অবশিষ্ট থাকিত, বিজেতৃগণ তাহাদিগকে ভীষণ কষ্ট প্রয়োগ করিয়া বধ করিত। বর্ত্তমান কালে আহত ও পীড়িত সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের নিকট হইতেও যথোচিত যত্ন ও শুশ্রূষা পাইয়া থাকে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় যে আন্তর্জাতিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এতৎ সম্বন্ধে নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সেই নিয়মসমূহ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আহত ও পীড়িতের সুব্যবস্থার জন্য আরও কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আহত শত্রু সৈন্যগণকে যত্ন ও শুশ্রূষা করা প্রত্যেক রাজারই কর্ত্তব্য। আহত ও পীড়িত সৈন্যগণ যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রস্থ হাসপাতালে থাকে, অথবা যখন তাহাদিগকে এক হাসপাতাল হইতে অন্য হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাদিগকে আর শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, অথবা তাহাদিগের উপর কোন অত্যাচার করা হয় না। চিকিৎসক ও ধর্ম্মযাজকগণকেও বিপক্ষ পক্ষের লোক বলিয়া ধারণা করা হয় না। হেগ সমিতি ও জেনেভা সমিতির দ্বারা জলযুদ্ধ সম্বন্ধেও অনেক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সমুদায় জাহাজ পীড়িত সৈন্যের সেবার জন্যই ব্যবহার করা হয় এবং যুদ্ধোপযোগী নয়, কোন পক্ষই তৎসমুদায়ের ক্ষতি করে না।

যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য আত্ম-সমর্পণ করে এবং শত্রু পক্ষের নিকট আশ্রয় লাভ করে, সেই যুদ্ধে বন্দী সৈন্যগণের কথা এ স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রাচীন কালে বন্দীগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করা হইত। সেকালে তাহাদিগকে প্রায় হত্যা করাই হইত। কোনও কোনও অসভ্য জাতীয় লোক তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলিত এবং পরিশেষে ভক্ষণ করিত। কোনও নৃপতি বন্দীগণকে বধ করিত না, কৃপা পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কৃতদাসে পরিণত করিত। প্রাচীন রোমানগণ বলিতেন, বন্দীগণকে বধ করাই ত নিয়ম। তবে আমরা যে তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া দাসত্ব প্রদান করি, সেটী আমাদিগের অনুগ্রহ মাত্র। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে আর সেরূপ নিষ্ঠুর নিয়ম নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের হেগ সমিতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বন্দীগণকে বাসস্থান, আহার্য্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। তাহাদিগের নিকট অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও যুদ্ধের কাগজপত্র ব্যতীত অন্য যে সমুদায় দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে বিজেতার কোন অধিকার নাই। তাহাদিগকে নিরাপদে লইয়া যাওয়ার জন্যই কেবল বল প্রয়োগ করা হইতে পারে, নতুবা নহে। তবে তাহারা যদি পলায়নের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া শাসন করা যাইতে পারে। যুদ্ধে কাহাদিগকে বন্দী করা যাইতে পারে? শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে অবশ্য বন্দী করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। বিশেষ বিশেষ স্থলে যোদ্ধা ব্যতীত অন্য লোককেও বন্দী করা যাইতে পারে। নৃপতি বা অন্য প্রধান লোককে বন্দী করা যায়; কারণ, তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আবার যোদ্ধা না হইলেও যে সব লোক যুদ্ধে প্রয়োজনীয়, শত্রু পক্ষের এরূপ লোককে বন্দী করা হইয়া থাকে। এই হেতু পথ প্রদর্শক, টেলিগ্রাফ-কারক প্রভৃতি লোককে বন্দী করা যায়। শত্রুপক্ষের বাণিজ্য-জাহাজের নাবিকগণকেও বন্দী করা যাইতে পারে। হেগ সমিতিতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যদি এই শ্রেণীর লোক এইরূপ লিখিয়া দেয় যে, তাহারা যুদ্ধের সম্পর্কে কোনও কার্য্য করিবে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যুদ্ধকালে উভয়পক্ষের বন্দীর অদলবদল করা হইতে পারে। বিপক্ষ দলের কতক পরিমাণ বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিলে, সেই পক্ষ হইতেও উপযুক্ত পরিমাণ বন্দীকে মুক্তি দান করা হয়। অবশ্য উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্য হইলে এইরূপ অদলবদল করা হইয়া থাকে।

যখন কোন নৃপতি অন্য রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন সেই রাজ্যের সমুদায় সম্পত্তিকেও তিনি অবশ্য শত্রুর সম্পত্তি বলিয়া ধারণা করেন; এবং সেরূপ সম্পত্তি তিনি অধিকার করিতেই প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই শত্রুর সম্পত্তির মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। যে সমুদায় সম্পত্তি বিপক্ষ রাজার সাক্ষাৎ অধিকারভুক্ত, সেগুলির উপর আক্রমণকারী রাজার যথেষ্ট অধিকার রহিয়াছে। বিপক্ষ রাজার যুদ্ধ-জাহাজ, কামান, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি এইরূপ শ্রেণীর সম্পত্তি। এই সকলের মধ্যে যেগুলি রাজার অস্থাবর সম্পত্তি, তৎসমুদায় সঙ্গে সঙ্গে অধিকার করিয়া লইতে পারা যায়। স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য আছে। রাজ এষ্টেটের সামিল ঘরবাড়ী আক্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, তাহা তাঁহারা বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবেন না। এরূপ সম্পত্তি তাঁহারা সাময়িকভাবে ভোগ করিবেন; তাহা হইতে যে লাভ উৎপন্ন হইবে, তাহাও গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাহা ধ্বংস করিবেন না। তবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, চিকিৎসাসম্বন্ধীয় বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে সমুদায় গৃহ অথবা দ্রব্যাদি থাকে, তৎসমুদায়ে হস্তক্ষেপ না করাই আন্তর্জাতিক বিধানের অনুমোদিত।

বিপক্ষ নৃপতির যে সমুদায় জাহাজ দেশাবিষ্কারের জন্য বা বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য নিযুক্ত থাকিবে, সেই সব জাহাজেরও কোন অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়। রাজ এষ্টেটের পরেই রাজ্যের প্রজাগণের সম্পত্তিকে গণনা করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ এইরূপ সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ না করাই নিয়ম; কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে বিপক্ষ রাজার প্রজাগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা আন্তর্জাতিক বিধান কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে লুণ্ঠনের পরিবর্ত্তে সেই সমস্ত প্রজাবর্গের নিকট হইতে টাকা বা অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য আদায় করিয়া লওয়া হয়। বিপক্ষ রাজ্যের প্রজার জাহাজ সমুদ্রে থাকিলে, পরে সেগুলিকে ধৃত করিতে পারা যায় কি না, এতৎ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। যাঁহারা ধৃত করার পক্ষে নন, তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধ ত দুই রাজার মধ্যে ঘটে, তাহার সহিত আবার প্রজাদিগের সম্বন্ধ কি? হল বলেন, স্থলযুদ্ধে যখন প্রজার সম্পত্তির উপর টাকা আদায় করা হয়, তখন জাহাজ সমুদায় ধৃত করা হইবে না কেন? বিশেষতঃ এরূপ ভাবে জাহাজ ধৃত করিতে বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ নাশও করিতে হয় না, অথচ সেই নৃপতিকেও শাসনে আনিতে পারা যায়। এই জাহাজ ধৃত করিবার অধিকার এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান আছে। তবে ইংলণ্ড ব্যতীত ইয়োরোপের অন্যান্য রাজ্য এই অধিকারের বিরুদ্ধবাদী। যদি কোন রাজ্যের প্রজার জাহাজ শত্রুপক্ষ ধৃত করে, পরে ঐ রাজ্যের যুদ্ধ জাহাজ সেই জাহাজখানির উদ্ধার সাধন করে, তাহা হইলে, সেই প্রজার নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া রাজা জাহাজখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ইংলণ্ডে এইরূপ নিয়ম আছে যে, যদি শত্রুপক্ষ জাহাজখানিকে যুদ্ধ জাহাজে পরিণত না করিয়া থাকে, তাহা হইলেই জাহাজখানি প্রত্যর্পিত হইবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের পৃথক পৃথক নিয়ম। নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজার সম্পত্তি যদি শত্রুপক্ষের দেশে থাকে, অথবা শত্রুর সম্পূর্ণ অধিকারে থাকে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তিও শত্রুর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

কিরূপ লোক যোদ্ধা নামের উপযুক্ত, কিরূপ গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারা যায়, এবং কিরূপ প্রণালীতে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত বিষয়ে বহু আলোচনা হইতেছে। যাহারা শত্রুর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করে না, কেবলমাত্র লুণ্ঠন করিয়া বেড়ায়, কোন সেনাপতির অধীনে থাকে না, যোদ্ধার পরিচ্ছদ পরিধান করে না, যুদ্ধের নিয়মসমূহ পালন করে না, তাহাদিগকে সভ্য রাজগণ যোদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। তাহারা দস্যু ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা ধৃত হইলে দস্যু বা ঘাতকের ন্যায় দণ্ডার্হ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যাহারা সৈন্যের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারা নৃপতির আদেশ গ্রহণ করিত, এবং যোদ্ধার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিত। এক্ষণেও ব্রুসেল্‌স্ সমিতিতে ও হেগসমিতিতে এতৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সৈন্যগণ একজন সেনাপতির অধীনে কার্য্য করিবে। তিনিই সমুদায় বিষয়ের দায়িত্ব বহন করিবেন। তাহাদিগের পরিধানে বিশেষভাবের পরিচ্ছদ থাকিবে, তাহা যেন দূর হইতেও চিনিতে পারা যায়। আর তাহারা প্রকাশ্যভাবে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইবে; যুদ্ধসংক্রান্ত যে সমস্ত বিধান ও রীতি আছে, তৎসমুদায় তাহারা পালন করিবে। এই স্থানে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—আবশ্যক বোধ করিয়া কোন দেশের নৃপতি যদি দেশের সমুদায় প্রজাকেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেন, তাহা হইলে তা আন্তর্জাতিক বিধানের কোন আপত্তি হইতে পারে না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে এইরূপ বহু সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল। আবার বুয়ার যুদ্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়—ট্রান্‌সভাল ও স্বাধীন অরেঞ্জ রাজ্যের যাবতীয় সক্ষম ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ঐ ক্ষেত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এরূপ বলিতে পারিতেন না যে, ঐ সমুদায় সৈন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৈন্য নয়। তবে তাহাদিগের পরিচায়ক কোন পরিচ্ছদ ছিল না বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিতেন বটে। আবার যদি এমন ঘটে যে, দেশের সমুদায় লোক যুদ্ধে শিক্ষিত। তাহা হইলে শত্রুর আগমন দর্শনে দেশের যাবতীয় লোক স্বেচ্ছায় অথবা রাজাজ্ঞায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। যদি তাহারা যুদ্ধের আইন মতই চলে, তবে তাহাদিগকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোদ্ধা বলিয়া কেন গণ্য করা না হইবে। ব্রুসেল্‌স্ সমিতিতে জার্ম্মান রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি এ কথায় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আবশ্যক হইলে তাঁহার দেশেই এইরূপ ত্রিশ লক্ষ সৈন্য হঠাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারিবে। কিন্তু এই সমুদায় শিক্ষিত সৈন্যের কথা যাক্। যদি কোন স্থানের যুদ্ধে অশিক্ষিত অধিবাসিগণ শত্রুর আগমনে যুদ্ধার্থ হঠাৎ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? এরূপ ঘটনা যে অতীব বিরল তাহাও নহে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌স্ সমিতিতে ইয়োরোপের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ এইরূপ কার্য্যের পক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছিল। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর সমিতিতে পরিশেষে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, যদি তাহারা যুদ্ধের বিধান ও রীতি মানিয়া চলে, তাহা হইলে তাহারা সৈন্য বলিয়া পরিচিত হইবে। প্রথম হেগ সমিতিতেও এইরূপ কথাই বলা হইল; তবে ইহাও নির্দ্দেশ করা হইল যে, তাহারা অবশ্য প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইবে। যাহা হউক, সম্মুখ-সমরেই সৈন্যগণকে বধ করিতে পারা যায়। ছদ্মবেশে যাইয়া কোন শত্রুর হত্যাসাধন করা নিয়মবিরুদ্ধ। যুদ্ধে বিষ প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও পর্টুগাল ব্যতীত অন্য সমুদায় রাজ্য স্বীকার করিয়াছে, যে-সব গুলি মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রশস্ত ও সুবৃহৎ ক্ষত উৎপাদন করে, তাহা তাহারা ব্যবহার করিবে না। শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে প্রতারণা করিতে পারা যায়। কিন্তু শ্বেত ধ্বজা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের যুদ্ধে অতীব আবশ্যকতা থাকায়, সেগুলি সম্বন্ধে প্রতারণা করা নিয়মবিরুদ্ধ। আর একটী আশ্চর্য্য নিয়ম আছে। সৈন্যগণ তাহাদিগের শত্রুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য তাহাদিগের পরিচ্ছদ বা ধ্বজা ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সৈন্যগণ স্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিবে এবং জাহাজে নিজ-পক্ষের ধ্বজা উত্তোলিত হইবে।

এস্থলে গুপ্তচরের কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। যে লোক শত্রুপক্ষের সৈন্য মধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষের সৈন্যগণের উপকারের জন্য গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে, তাহাকে গুপ্তচর কহে। আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে গুপ্তচর নিয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্তু এইরূপ চরের কার্য্য অযশস্কর। গুপ্তচর ধরা পড়িলে বিচারের পর তাহার প্রাণনাশ করিতে পারা যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে সমুদায় শত্রুপক্ষীয় লোক আকাশযানে আরোহণ করিয়া প্রুসিয়ানগণের উপর দিয়া আকাশে যাওয়া আসা করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রুসিয়ানগণ গুপ্তচর বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু তাহা বলা ঠিক হয় নাই। কারণ, তাহারা গোপনে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই, অথবা ছদ্মবেশেও যায় নাই। হেগ সমিতিতে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে, এরূপ বেলুনযাত্রী শত্রুকে ধরিতে পারিলে, তাহারা যুদ্ধের বন্দীরূপে গণ্য হইবে।

যুদ্ধকালে উভয়পক্ষের মধ্যে কখনও কখনও কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, অথবা কোন বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে। সেই সময়ের জন্য যুদ্ধ অবশ্য স্থগিত থাকে। যখন এইরূপ কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয়, তৎকালে শ্বেতপতাকা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। কোনও পক্ষ শ্বেত পতাকা প্রেরণ করিলেই বুঝিতে হইবে, কোন বিষয় মীমাংসা করার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিতেছে। শ্বেত পতাকা বাহকের কোন অনিষ্ট করা হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার অনিষ্টাচরণ করা হয়। কোন সেনাপতি একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া এরূপ বিজ্ঞাপন করিতে পারেন যে, সেই সময়ের মধ্যে তিনি এইরূপ শ্বেতপতাকাধারী লোককে তাঁহার সৈন্য মধ্যে আসিতে দিবেন না; যদি সেই সময়ের মধ্যে শ্বেত পতাকার বাহক আইসে, তাহা হইলে তাহার উপর গুলি নিক্ষেপ করাও যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে শ্বেত পতাকাধারিগণের চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। যদি তাহারা হঠাৎ কোন বিষয় জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ রাখাও যাইতে পারে। আর যদি তাহারা ইচ্ছা করিয়া কোন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা গুপ্তচররূপে গণ্য হইবে। যাহা হউক, সমুদায় যুদ্ধক্ষেত্রে বা কোনও অংশে কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারা যায়। এইরূপভাবে যুদ্ধ নিবৃত্ত রাখা হইলে, কোনও পক্ষ সেই নিবৃত্তি-কালের মধ্যে এরূপ কিছু করিতে পাইবে না, যাহাতে অপর পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে যেরূপ কার্য্য দ্বিতীয় পক্ষের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবেই হইবে—তদ্রূপ কার্য্য প্রথম পক্ষ করিতে পারে না। যদি কোন দুর্গ শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ভাবে যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকিলে, সেই নিবৃত্তি-কালের মধ্যে দুর্গস্থ সৈন্য শত্রুর কামানের নিকটবর্ত্তী দুর্গের কোন ভগ্ন দেওয়াল মেরামত করিতে পারিবে না; কিন্তু শত্রু সৈন্য হইতে দূরস্থিত দুর্গ প্রভৃতি মেরামত করিতে পারা যায়।

যুদ্ধ কিরূপে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই বিষয় আলোচ্য। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির দ্বারাই যুদ্ধ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে এরূপ ব্যাপারও হইতে পারে যে, সন্ধি না করিয়াই উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইল; আবার এক পক্ষের রাজ্য অন্য পক্ষ সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া লইতে পারিলে, আর সন্ধির প্রয়োজন থাকে না; যুদ্ধও নিবৃত্ত হইয়া যায়। উভয় রাজ্যের দূতের দ্বারা সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। দূতগণকে নৃপতির সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে বরণ করা হইলেও, তাহাদিগের স্থগিত সর্ত্তে যে নৃপতিগণকে অবশ্যই বাধ্য হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পরও নৃপতিগণ যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করিতে পারেন।

নৃপতিগণের মধ্যে বিবাদ বিনা যুদ্ধেও নিষ্পত্তি হইতে পারে। মধ্যস্থের দ্বারা যেরূপে আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। যখন কোন রাজ্যের নৃপতি মধ্যস্থরূপে নির্ব্বাচিত হন, তখন তিনি একজন প্রতিনিধির উপর তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোক এইরূপ মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হইলে, তাঁহারা আর প্রতিনিধির উপর ভার দিতে পারেন না। যদি মধ্যস্থগণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করেন, বা অন্যায্যভাবে নিষ্পত্তি করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিচার অমান্য করা যাইতে পারে। যখন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে হেগ সমিতির অধিবেশন হয়, তখন সেই একত্র সমবেত চতুর্ব্বিংশতি রাজ্যের প্রতিনিধি যাহাতে বিনা রক্তপাতে আন্তর্জাতিক কলহ সমুদায়ের নিষ্পত্তি হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে হেগ নগরে মধ্যস্থগণের দ্বারা গঠিত একটী স্থায়ীভাবের বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; এবং সেই বিচারালয়ে বহু বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

যে সকল রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত যুধ্যমান নৃপতিগণের রাজ্যের যেরূপ সম্বন্ধ সেই বিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করা আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সভ্য রাজগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কোনও নিরপেক্ষ রাজ্য যেন কোন পক্ষকেই সাহায্য না করে। নিরপেক্ষ রাজ্যের রাজা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন যে বিরোধী রাজ্যের রাজা বা প্রজা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজ্য বা তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার না করেন। এবং বিরোধী রাজ্যের রাজাও নিরপেক্ষ রাজার সম্মান যেন সর্ব্বথা রক্ষা করেন। দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নিরপেক্ষ রাজ্যগুলি সম্বন্ধে বিরোধী রাজ্যের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে। আন্তর্জাতিক বিধানে এই সকল কর্ত্তব্য স্পষ্ট ভাবেই উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, নিরপেক্ষ রাজ্যের মধ্যে যেন যুদ্ধ না চালান হয়। এই নিয়ম চিরকালই ছিল বটে। কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নিয়ম সেরূপ রক্ষিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন নৃপতি এই নিয়ম রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সভ্যজাতি মাত্রেই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই নিয়ম ভঙ্গ হইলেও, সেই নৃপতিকে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন

জাপানীগণ পোর্ট আর্থার অবরোধ করিয়াছিল, তৎকালে রুষিয়াবাসিগণের রেশিটেল্নি নামক একখানি জাহাজ বন্দর হইতে দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। দুইখানি জাপানী জাহাজ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে পর রেশিটেল্নি নিরপেক্ষ রাজ্য চীনের চেফু নামক বন্দরে প্রবেশ করে। সেই দিন রাত্রি পর্য্যন্ত জাপানী জাহাজ দুইখানি বন্দরের বাহিরে অপেক্ষা করে; কিন্তু রুষিয়ার জাহাজখানি বাহিরে আসিল না দেখিয়া অবশেষে বন্দরে প্রবেশ করে। একদল জাপানী পরদিন প্রাতে জাহাজে আরোহণ করিয়া বলে, জাহাজ বাহিরে লইয়া চল, অথবা আত্মসমর্পণ কর। রেশিটেল্নির আরোহিগণ এই সময় জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। পরিশেষে জাপানীগণ জাহাজখানি ধৃত করে। যাহা হউক, চীনের যদি কোনরূপ দোষ না থাকিত, আর জাপান এইরূপ করিত, তাহা হইলে জাপানের এই কার্য্য অতীব নিন্দার্হ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু চীন নিরপেক্ষ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও পদে পদে রুষিয়াবাসিগণ তাহাকে অমান্য করিতেছিল এবং তাহার নিরপেক্ষতার সম্মান রক্ষা করিতেছিল না। নিরপেক্ষ চীন গবর্ণমেণ্টও রুষিয়ার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। এই হিংসাতেই জাপান এতাদৃশ ব্যবহার করিয়াছিল। সমুদ্রের ভিতর দিয়া নিরপেক্ষ রাজ্যের যে সমস্ত সংবাদের তার রহিয়াছে, বিরোধী রাজাগুলি তাহা যেন ধ্বংস না করে, ইহাই নিয়ম। সমুদ্রের ভিতর সংবাদের তার বস্তুতঃ আধুনিক জিনিস। এই হেতু সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে।

নিরপেক্ষ রাজ্যে থাকিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়া আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। নিরপেক্ষ রাজার রাজ্যের মধ্যে অথবা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রে যুধ্যমান নৃপতির সৈন্যগণ যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত না হয়। কিন্তু যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়া বলিলে কি বুঝিতে হইবে? এই কথা লইয়াই অনেক সময়েই গোলযোগ হইয়া থাকে। অতি সামান্যভাবে বা অতি অল্প সময়ের জন্য নিরপেক্ষ রাজ্যের কোন অংশ যুধ্যমান নৃপতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলে দোষাবহ হইবে না। যদি যুধ্যমান নৃপতির জাহাজ অত্যল্প কালের জন্য নিরপেক্ষ রাজার বন্দরে অবস্থান করে, তাহা হইলে কোন দোষ নাই। কিন্তু যদি বিশ্রামের জন্য বা নিজ বল বৃদ্ধির জন্য বহুক্ষণ বন্দরে থাকে, তাহা হইলে নিরপেক্ষ রাজার এ বিষয় নিবারণ করা উচিত।

এ ক্ষেত্রে 'এলাবামা' জাহাজ সম্বন্ধীয় ব্যাপারটী উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাহাজখানি লিভারপুলে নির্ম্মিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে উহা জলে ভাসান হইয়াছিল। জাহাজখানি যুদ্ধের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডস্থিত আমেরিকার মন্ত্রী বৃটিশরাজকে জানাইলেন যে, আমেরিকার ফিডারেল গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেই জাহাজখানি নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেছে। ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারিগণ এতদ্বিষয় আলোচনা করিয়া নিরূপিত করিলেন যে, ইংলিশ ফরেন এনলিষ্টমেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে জাহাজখানি ধৃত করা হউক। কিন্তু ঐ আইন অনুসারে জাহাজখানিকে ধৃত করা সঙ্গত হইতেছে কি না, এই বিষয়ের মীমাংসা হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। এই অবসরে জাহাজখানি লিভারপুল ত্যাগ করিয়া যায়। জাহাজে তখন অস্ত্র শস্ত্র সৈন্যাদি কিছুই ছিল না। পরদিন একখানি পোতে আরোহণ করিয়া ৪০ জন লোক যায়। তাহারা এলাবামায় নামিয়াছিল। আর কয়েকখানি জাহাজে এলাবামার জন্য কামান প্রেরিত হইয়াছিল। অবশ্য ইংরাজগণ এই সমস্ত লোক ও কামান যে এলাবামার জন্য প্রেরিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। তৎকালে নিরপেক্ষ রাজ্যেও ব্যবসায়ীগণ যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিত; আবার কামানও এরূপ স্থলে বিক্রয় করা হইত। সুতরাং ইংলণ্ডের এই বিষয়ে অনবধানতা দোষাবহ হইয়াছে কি না, তাহাই প্রশ্ন। জেনেভাতে মধ্যস্থগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের কার্য্যটী উচিত হয় নাই; কারণ ইংলণ্ডের নিরপেক্ষতা যাহাতে ভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, ইহাই তাঁহাদিগের অভিমত। যাহা হউক, নিরপেক্ষ রাজ্যের সম্মান রক্ষার জন্য বর্ত্তমান কালে যে সকল বিধান করা হইয়াছে, যুধ্যমান রাজাকে সেগুলি সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে কোন যুধ্যমান রাজার সৈন্য নিরপেক্ষ দেশের কোন অংশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। তবে পীড়িত ও আহত সৈন্যগণকে এরূপ স্থলে যাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। আবার যদি এমন ঘটে যে, সৈন্যগণ শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নিরপেক্ষ রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নিরপেক্ষ রাজার তাড়াইয়া না দেওয়াই উচিত। কারণ, তাড়াইয়া দিলে তাহারা শত্রুর অস্ত্রে নিশ্চিতই প্রাণ হারাইবে। এই হেতু এরূপ স্থলে নিরপেক্ষ রাজা তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া—যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেশের মধ্যে অন্তরীণ (intern) করিয়া রাখিবেন। তাহাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যয় হইবে, পরে তাহাদিগের নৃপতির নিকট তাহা তিনি প্রাপ্ত হইবেন। যদি কোন যুধ্যমান নৃপতি কোন নিরপেক্ষ রাজ্যের নিরপেক্ষতা ভঙ্গের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি এই বিষয়ের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই প্রদান করিবেন। আন্তর্জাতিক বিধানে এতৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয় নাই। কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যখন দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন যদি কোন নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজার জাহাজ বা অন্য সম্পত্তি বিরোধী রাজ্যে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ আবশ্যক হইলে সেই জাহাজ বা সম্পত্তি ব্যবহার অথবা ধ্বংস করিতে পারা যায়। এরূপ স্থলে তাহা ব্যবহার বা ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত প্রাপ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিরোধী রাজ্যের প্রতি নিরপেক্ষ রাজ্যসমূহের যে সকল কর্ত্তব্য থাকে, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। এই সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে—নিরপেক্ষ রাজা যেন কোন পক্ষকেই যুদ্ধ বিষয়ে সাহায্য না করেন! কোন প্রকারেই যেন তিনি সৈন্য বা জাহাজের দ্বারা সাহায্য না করেন। নিরপেক্ষ রাজা এক পক্ষকে যে সুবিধা দিবেন না, অন্যপক্ষকেও যেন সেই সুবিধা প্রদান না করেন। নিরপেক্ষ রাজা কোন পক্ষকেই যেন ঋণদান বা অর্থ প্রদান না করেন। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণও যুধ্যমান কোন রাজাকে প্রদান বা বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নয়। ঋণদান সম্বন্ধে এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। নিরপেক্ষ রাজা যদি যুধ্যমান রাজাকে ঋণদান করেন, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে আপত্তিজনক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় অর্থও একটী বাণিজ্য দ্রব্য এবং ঋণদানও একটী ব্যবসায়। এইহেতু নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজাগণ এই ব্যবসায় যুধ্যমান রাজ্যের সহিত চালাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এস্থলে প্রজাগণ যাহা করিতে পারে, রাজার তাহা করিবার অধিকার নাই। নিরপেক্ষ রাজার পুরাতন জাহাজ, কামান প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ বিক্রয় করাও অধিকার নাই। কারণ বাণিজ্য করাও রাজার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিরপেক্ষ রাজার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যেন তাঁহার রাজ্য দিয়া যুধ্যমান নৃপতির সৈন্য না যায়, অথবা তাঁহার রাজ্যের কোন অংশ সৈন্যাদি সজ্জিত করার জন্য বা অন্য কোন কারণে ব্যবহার না করে। আর নিরপেক্ষ রাজ্যে গিয়া যুধ্যমান উভয় রাজা যদি যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাহা অতীব দোষাবহ হইবে সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষ রাজ্য হইতে যুধ্যমান রাজগণ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পাইবেন না। দ্বিতীয় হেগ সমিতিতে ইহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে যুধ্যমান রাজার যুদ্ধ জাহাজ সমূহ নিরপেক্ষ রাজ্যে গিয়া যেন লোক সংগ্রহ না করে। এতাদৃশ যুদ্ধ জাহাজ সমূহ অথবা যে সমস্ত জাহাজ ধৃত হইবে সেই সব জাহাজ নিরপেক্ষ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রে বা বন্দরে গিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবে না। যখন আমেরিকার গৃহবিবাদ ঘটে, সেই সময় ইংলণ্ড ঘোষণা করিয়াছিল যে কোনও বিরোধী পক্ষের যুদ্ধ জাহাজ বৃটিশ বন্দরে ২৪ ঘণ্টার বেশী অবস্থান করিতে পাইবে না। তবে যদি কয়লা গ্রহণ করিবার জন্য বা মেরামত করিবার জন্য থাকিতে হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। সেই সময় হইতে অনেক রাজ্যই বৃটিশের আদর্শের অনুকরণ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ রাজাকে যুধ্যমান রাজগণ কর্ত্তৃক কৃত অনেক ক্ষতিই সহ্য করিতে হয়। অন্য সময় তিনি সে সমুদায় ক্ষতি সহ্য করিবেন না। যুদ্ধ বা অবরোধ কালে নিরপেক্ষ রাজ্যের সম্পত্তি কামানের গোলায় ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। অথবা যদি ট্রেনে সৈন্য থাকে এবং নিরপেক্ষ রাজ্যের লোকজন থাকে, তাহা হইলে তাহা আক্রান্ত হইতে পারে। অবশ্য যুধ্যমান রাজ নিরপেক্ষ রাজার সহিত সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারেন। আবার যুধ্যমান রাজার জাহাজ নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ অনুসন্ধান করিতে বা ধৃত করিতে পারে। নিরপেক্ষ বণিকগণের পক্ষে ইহা অতীব ক্ষতিকর হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে নিরপেক্ষ রাজ্যের নিরপেক্ষতা রক্ষার যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ নিরপেক্ষ রাজা রাজদূতের দ্বারা তাঁহার প্রতি যে অন্যায় ঘটিয়াছে, তাহা জানাইতে পারেন। এরূপ স্থলে দূতের কথার সম্মান সর্ব্বত্রই রক্ষা করা হয়। কারণ নিরপেক্ষ রাজগণের সহিত সম্প্রীতি রাখাই যুধ্যমান রাজার পক্ষে মঙ্গলকর। দ্বিতীয়তঃ যে নিরপেক্ষ রাজার ক্ষতি করা হইতেছে, তিনি ইহাতে বাধা দিতে পারেন, অথবা অনিষ্টকারীর প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারেন। যদি কোন যুধ্যমান রাজার যুদ্ধ জাহাজ নিরপেক্ষ দেশের বন্দরে শত্রুর জাহাজ ধৃত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিরপেক্ষ রাজার কর্ম্মচারিগণ—বল প্রয়োগের দ্বারা ঐ চেষ্টা বিফল করিবার উদ্যম করিবেন। তৃতীয়তঃ ধৃত জাহাজের বিচারের জন্য নিরপেক্ষ রাজার যে সমস্ত বিচারালয় আছে, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যুধ্যমান রাজা কর্ত্তৃক জাহাজ ধৃত হইলে তিনি সেই সকল বিচারালয়ে তাহার বিচারও করাইতে পারেন।

পূর্ব্বকালে নিরপেক্ষ রাজ্যের বাণিজ্যের দ্বারা যুধ্যমান রাজার কোনরূপ স্বার্থহানি হইলে, তিনি নিজেই তাহার দণ্ডবিধান করিতেন। ক্রমশঃ বাণিজ্যেরও যেরূপ উন্নতি হইতে লাগিল, নিরপেক্ষ রাজগণ এ বিষয়ে যুধ্যমান নৃপতিগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য ততই বদ্ধপরিকর হইতে লাগিলেন। যাহা হউক, নিরপেক্ষ রাজ্যের বাণিজ্যের দ্বারা বিরোধী রাজ্যের অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রেল পথে যে বাণিজ্য করা হয়, তদ্দ্বারা বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ যেদেশে সেই বাণিজ্য দ্রব্য সমূহ থাকে, সেখানে বণিকদিগকে অবশ্যই কর দিতে হয়। আবার আক্রমণকারী রাজাও তাহাদিগের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল দাবী করিতে পারেন। কিন্তু সমুদ্রে বাণিজ্য সম্বন্ধে অন্য কথা। সমুদ্রের সব অংশ ত কোনও নৃপতির অধীন নহে। সেখানে শত্রু রাজ্যের বাণিজ্য দ্রব্য নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে থাকিতে পারে। এস্থলে দুইটী মত হইতে পায়ে। বাণিজ্য দ্রব্যের মালিক যদি শত্রু রাজ্যের লোক হয়, তাহা হইলে যুধ্যমান রাজা সেই দ্রব্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পায়েন, অথবা যে জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্য থাকে, তাহা যদি শত্রুর জাহাজ হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের উপর দাবী করা হইতে পারে।

কনসোলেটো ডেল মেয়ার নামে পূর্ব্বকালের যে সমুদ্র সম্বন্ধীয় আইন ছিল, এস্থলে তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। সেই আইন অনুসারে এই বিষয় স্থিরীকৃত হইল। যদি নিরপেক্ষ লোকের জাহাজে শত্রুর বাণিজ্য দ্রব্য থাকিত, তাহা হইলে আক্রমণকারী জাহাজ ঐ শত্রুর জাহাজখানিকে নিরাপদ স্থানে মাল পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য করিত। পরে ভাড়া মিটাইয়া দিত। আবার যদি শত্রুর জাহাজে নিরপেক্ষ লোকের বাণিজ্য দ্রব্য থাকিত, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের অধিকারী আক্রমণকারীকে অর্থ প্রদান করিয়া জাহাজখানি ছাড়াইয়া লইতে পারিত, নতুবা তাহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। যাহা হউক, এই কনসোলেটো ডেল মেয়ারের নিয়ম সমূহ বর্ত্তমান কালে আর পালিত হয় না। নিরপেক্ষ রাজ্যের বাণিজ্যের দোষ নিরূপণের জন্য বহুদেশে বহু নিয়ম প্রণীত হইয়াছিল।

অতঃপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে এতৎসম্বন্ধে যে বিধান ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই বিধান নিরপেক্ষ রাজ্য সমূহের পক্ষে যথেষ্ট মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই। শত্রুর জাহাজে নিরপেক্ষ দেশের লোকের বাণিজ্য দ্রব্য থাকুক অথবা নিরপেক্ষ লোকের জাহাজে শত্রুর বাণিজ্য দ্রব্য থাকুক,—কোন ক্ষেত্রেই যুধ্যমান রাজা বাণিজ্য দ্রব্যের অনিষ্ট করিবেন না। তবে নিষিদ্ধ দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে গেলে যুধ্যমান রাজা অবশ্যই বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

দুই দেশের মধ্যে যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ রাজ্যের লোক যে সেই দুই দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিবেন না, আন্তর্জাতিক বিধানে এমন কথা বলে না। তবে যদি তাহারা কোন বিরোধী রাজ্যের সহিত এরূপ কতকগুলি দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করে যে তদ্দ্বারা সেই রাজ্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে উপকার হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য পক্ষ সেই নিরপেক্ষ রাজ্যের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। নিরপেক্ষ রাজ্যের বণিকগণ বিরোধী রাজ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অবাধে প্রেরণ করিতে পারে। তাহাতে ঐ রাজ্যের নিরপেক্ষতার হানি হয় না। কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা বিরোধী রাজ্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে উপকার হইবে, তৎসমুদায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে। সেরূপ করিলে যুধ্যমান রাজা পথি মধ্যেই সেই সকল দ্রব্য হস্তগত করিবেন। এবং এরূপ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাজা সেই ক্ষতিগ্রস্ত বণিকগণকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য এইরূপ ভাবের নিষিদ্ধ দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রোসাস বলেন যে, বাণিজ্য দ্রব্য সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইতে পারে। প্রথমতঃ কতকগুলি দ্রব্য কেবল যুদ্ধেই আবশ্যক হইয়া থাকে; কামান গোলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর দ্রব্য। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি দ্রব্য যুদ্ধে আবশ্যক হয় না; পিয়ানো নামক বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয়তঃ কতকগুলি জিনিস যুদ্ধের সময়ও আবশ্যক হইতে পারে, শান্তির সময়ও আবশ্যক হইতে পারে। অর্থ, খাদ্য, জাহাজ প্রভৃতি এই শ্রেণীর দ্রব্য। কোনও বিরোধী রাজ্যের সহিত প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করা সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্য কখন নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর দ্রব্যের কোন্ গুলিকে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা হইবে এবং কোন্ গুলিকে হইবে না, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর। এতদ্বিষয়ে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট করিবে। তবে প্রতি যুদ্ধের সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া নিয়মসমূহ নির্দ্ধারিত করা হয়। গন্ধক, সোরা, অশ্ব, নৌসম্বন্ধীয় দ্রব্যসম্ভার (মাস্তুল, এঞ্জিন, আলকাতরা প্রভৃতি)—এই সকল দ্রব্যকে প্রায়ই নিষিদ্ধ দ্রব্য রূপে গণ্য করা হয়। কয়লা এইরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্য কি না এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। ১৮৫৯ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ঘোষণা করে যে—কয়লা নিষিদ্ধ দ্রব্য নয়; ইংলণ্ডও ইহা নিষিদ্ধ দ্রব্য বিবেচনা করে না। তবে যদি শত্রুর বন্দর বা যুদ্ধ জাহাজের জন্য ইহা প্রেরিত হয়, তাহা হইলেই নিষিদ্ধ দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। জার্ম্মাণির মতে ইহা নিষিদ্ধ দ্রব্য নয়। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও এইরূপ নানা মত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ঘোষণা করিয়াছিল, যুদ্ধের বিশেষ অবস্থা অনুসারে খাদ্যদ্রব্যকে নিরপেক্ষ রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে নিষিদ্ধ দ্রব্য বলা যাইতে পারে। আর যদি শত্রুর বন্দর বা যুদ্ধ জাহাজের জন্য প্রেরিত হয়, তাহা হইলেও এই কথা। কোন যুধ্যমান রাজা নিরপেক্ষ রাজ্যের লোককে এইরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্যের বাণিজ্যে লিপ্ত দেখিলে, সেই দ্রব্যসমূহ তিনি বাজেয়াপ্ত করিয়া থাকেন; অথবা কোন কোন স্থলে অল্প লাভে সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিয়া থাকেন। যে জাহাজে এইরূপ বাণিজ্য করা হইতেছে, সেখানি আক্রমণকারীর স্বকীয় বন্দরে লইয়া যাওয়া হয়—এবং দ্রব্যসমূহ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। তবে জাহাজখানির অন্য কোন অনিষ্ট করা হয় না। কিন্তু যদি জাহাজখানি এবং ঐ নিষিদ্ধ দ্রব্য একই ব্যক্তির হয়, অথবা যদি জাহাজের মালিকের জ্ঞাতসারেই নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ জাহাজে উত্তোলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাহাজখানিও বাজেয়াপ্ত হইবে। লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক বিধান ঘোষণা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে যে, যদি জাহাজের সমস্ত মালের অর্দ্ধেকের অপেক্ষা বেশী নিষিদ্ধ দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে জাহাজখানি বাজেয়াপ্ত হইবে। আর যদি কোন জাহাজে একই ব্যক্তির নিষিদ্ধ দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য পণ্যও বাজেয়াপ্ত হইবে।

আবশ্যক হইলে যুধ্যমান রাজা শত্রুর বন্দর জাহাজের দ্বারা অবরোধ করিয়া থাকেন; এরূপ করায় শত্রুর বাহিরের সহিত সম্বন্ধও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য শত্রুপক্ষকে দমন করায় জন্যই এইরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এইরূপ অবরোধের কালে যদি কোন নিরপেক্ষ রাজ্যের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার কার্য্য আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অতীব দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং জাহাজখানিকেও তৎক্ষণাৎ ধৃত করা হয়। এইরূপ ভাবে বন্দর অবরোধ করা অতীব দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য; এই হেতু কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে ইহা সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে যদি কোন কর্ম্মচারী অবরোধ আরম্ভ করে এবং তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় তাহা হইলেই চলিবে। উপযুক্ত পরিমাণ জাহাজ ও সৈন্য অবরোধ ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক। নিরপেক্ষ রাজগণকে এই অবরোধ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অভিমত এই যে, নিরপেক্ষ নৃপতিগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু ফ্রান্স ও অন্যান্য রাজ্যের অন্য মত। তাহাদিগের মতে নিরপেক্ষ রাজ্যের বণিকগণকেও এ বিষয় জ্ঞাপন করা প্রয়োজনীয়।

কোন্ সময় হইতে এই অবরোধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আবশ্যক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ দাবী করিয়াছিল যে, অবরোধের প্রারম্ভে অবশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। আর অবরোধের নিবৃত্তির বিজ্ঞাপনও যত দিন না দেওয়া হইবে, তত দিন অবরোধ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু এই দাবী ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলিয়া

বোধ হয় না। যখন অবরোধের জাহাজগুলিকে প্রকৃতপক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন অবরোধেরও নিবৃত্তি হয়। যথাসম্ভব সত্বর এই অবরোধ নিবৃত্তির বিষয় সকলকে বিজ্ঞাপিত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিরপেক্ষ রাজ্যের জাহাজ অবরোধ লঙ্ঘন করিলে দণ্ডার্হ হইবে। কিন্তু কিরূপ কার্য্য করিলে তাহারা অবরোধ লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে? ফরাসীদিগের অভিমত এই যে যদি কোন জাহাজ অবরুদ্ধ বন্দরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, অথবা নিবারণ করা সত্ত্বেও যদি বন্দর অভিমুখে চলিতে থাকে, তাহা হইলে অবরোধ লঙ্ঘন করা হইল। কিন্তু ইংরাজ ও আমেরিকানদিগের মতে কোন নিরপেক্ষ রাজ্যের বন্দর ত্যাগ করিয়া অবরুদ্ধ বন্দরের অভিমুখে যাত্রা করিলেই, অবরোধ লঙ্ঘন করা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হোম পরব্

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

১

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন পশ্চিমবঙ্গে "হোম পরব্"।—এ দিন সাধারণতঃ হোমের দিন বলিয়া পরিচিত। অনেক স্থানে এ উৎসব 'চৈত্রের গাজন' অথবা 'শিবের গাজন' নামেও বিখ্যাত। এতদঞ্চলে স্থাপিত,—অথবা অনাদি নামে খ্যাত সকল শিবলিঙ্গ সমীপেই এ দিন হোমের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সংক্রান্তির দিন চড়ক। দেশে চড়কের গাজন আছে। তবে চড়ক গাছ ও তাহাতে ভক্তদের ঘুরপাক খাওয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; মাত্র প্রথা বজায় রাখিবার জন্য শিবের "বাণেশ্বর"কে ঐদিন চড়কতলায় লইয়া যাওয়া হয়। স্থানে স্থানে এতদুপলক্ষে ছোটখাট মেলাও বসে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই পরবের ভিন্ন ভিন্ন আচার প্রচলিত আছে। লোকে কেহ বা 'মানসা' করিয়া, কেহ বা বংশানুক্রমিক ভাবে এই আচার পালন করিয়া থাকে। ইহারাই "বালা ভক্ত" বা "ব্রতভো" নামে পরিচিত। সাধারণতঃ ভক্তগণকে চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্বে, মূল দেবাংশী বা প্রধান ভক্তকে তিন দিন বা প্রচলিত আচার অনুসারে তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দিনে ক্ষৌরাদির পর স্নানান্তে স্ব-পাক হরিষ্যান্ন ভোজন করিয়া সংযম সাধন করিতে হয়। ভক্তগণ কেহ বা দিনে, কেহ বা রাত্রে আহার করেন। যদিও আজকালকার অনেক ভক্ত স্ব-পাকের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া অনুকল্পে, কেহ বা ব্রাহ্মণ বাড়ীতে, কেহ বা কোনো দেবতার মন্দিরে 'প্রসাদ' পাইয়া নিয়মরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু মূল দেবাংশীর সংযম সর্ব্বত্রই প্রায় সমান কঠোর। তাঁহাকে স্ব-পাক ভোজন করিতে হয়, নির্জ্জনে নির্ব্বাক হইয়া নিঃশব্দে ভোজন করিতে হয়। সে সময় অপর কোনো কোলাহল, এমন কি হাসি কান্নার রোল পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে অভুক্ত উঠিয়া পড়িতে হয়। অনেককে আবার কয় দিন ধরিয়া বিনা পান ভোজনে মৃত্তিকা-গর্ভেই কাটাইয়া দিতে হয়। কেহ বা জলমাত্র পান করিয়া থাকেন। কেহ বা 'ফল-জল' কেহ বা কেবল দুগ্ধ, কেহ বা ফল ও দুগ্ধ ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য্য পালন সকল ভক্তগণের পক্ষেই সাধারণ বিধি।

এই সংযমের চলিত নাম "বার"। সাধারণ ভক্তগণের বারের পরদিনই হোম পরব। এই দিন ভক্তগণের উৎসব, বাণেশ্বর, শিব বা তৎপ্রতিনিধি ভৈরবের স্নান যাত্রা, হোম, পূজা। সংক্রান্তির দিন "পারণা" এবং অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় চড়ক। কোথাও কোথাও হয় তো ইহার ব্যতিক্রমও আছে। আমরা বহুল প্রচলিত সাধারণ প্রথার কথাটাই মোটামুটি বলিলাম। পূর্ব্বোক্ত স্নানযাত্রার অপর নাম "বাণমুখ"। কোথাও বা এই দিনে, কোথাও বা বারের দিনে ভক্তগণকে "উত্তরীয়" গ্রহণ করিতে হয়। পুরোহিত এক গোছা পাকানো সূতা শিবকে ছোঁয়াইয়া তাহারই এক এক গাছি "নীবিতী" আকারে ভক্তগণের গলায় পরাইয়া দেন, ইহাই উত্তরীয় গ্রহণ। মূল দেবাংশীর উত্তরীয় গ্রহণের রীতি বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন আচারানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে স্নানের দিন ভক্তগণের জিহ্বায় এবং চড়কের দিনে পৃষ্ঠে "বাণ" ফুঁড়িয়া দেওয়া হইত, পৃষ্ঠে বাণ ফুঁড়িয়া ভক্তগণ চড়কে দোল খাইত। ভক্তগণের অনুগৃহীত কোনও কর্ম্মকার-বংশ পুরুষানুক্রমে এই বাণ ফোঁড়ার কার্য্য সম্পন্ন করিত। জিহ্বায় বাণ ফোঁড়া দেখিয়াছি। চট্ সেলাইয়ের জন্য যে রকম মোটা সূচ এদেশে ব্যবহৃত হয়, সেই রকম সূচ জিভের এপারে ফুটাইয়া ওপারে বাহির করিয়া লয়। ভক্তগণ মুখে এক রাস বেলপাতা পুরিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া রক্ত রোধ করে। উত্তরীয় দানের বেলায় যেমন জাতি বিচার নাই, শিবের পাণ্ডা অথবা পূজক ব্রাহ্মণ জাতি নির্ব্বিশেষে হাড়ি ডোম চাঁড়ালের গলায় যেমন উত্তরীয় পরাইয়া দেন, জলআচরণীয় জাতি কর্ম্মকারও তেমনি হাড়ি ডোম চাঁড়ালের মুখে হাত পুরিয়া জিভ ধরিয়া তাহাতে বাণ ফুঁড়িয়া দেয়, ইহাতে কাহারো জাতিচ্যুতি ঘটে না। পাণ্ডা বা পূজারি ব্রাহ্মণকে তো এই কয়দিন হাড়ি ডোম চাঁড়ালের প্রায় পুরোহিতের কাজই করিতে হয়। তা সে এই শিবের গাজনেও যেমন, ধর্ম্মরাজ পূজাতেও তেমনি। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোনো জাতি ভক্ত হইতে পারে। শিব এবং ধর্ম্মরাজের গাজনে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ,—ভক্ত অনেককেই হয়।

বাণ ফোঁড়ার পর বাণেশ্বরাদিকে স্নান করাইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে নৃত্য করিতে করিতে সকলে গাজনে ফিরিয়া আসে। স্নানে যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই গাজনের একপার্শ্বে একটী অগ্নিকুণ্ড এবং তাহারই সম্মুখে "দোল" খাইবার জন্য দুইটী কাঠের খোঁটার উপর অপর একখানা কাঠ লাগাইয়া একটী দোলনযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ভক্তগণ সেখানে আসিয়া শিব দেয়াশী (মূল দেবাংশী) ক্রমে পর্য্যায়মত এক একজন সেই দোলায় দোল খায়, আর ভক্তেরা বা পুরোহিত নিজে তাহার অঞ্জলি ফুলে ভরিয়া দেয়; সে দোল

খাইতে খাইতে সেই ফুলের অঞ্জলি সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, অমনি সমবেত ভক্তগণ সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠে—"দোলে বাবা মহাদেব হে" কি "মহেশ্বর হে" ইত্যাদি। কোথাও বা সেই রাত্রে, কোথাও বা পরদিন প্রাতে, সেই অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি অন্যত্র স্তূপীকৃত করিয়া তাহার চারিধারে বেড়িয়া "ফুল" খেলিতে হয়। অগ্নি-প্রদক্ষিণের সময় আবৃত করিতে হয়—

"দেববন্দম, দেয়াশীবন্দম, খাট পাট লাঠীবন্দম, এলেরি (আলিরি?) ভবতিবন্দম সরস্বতীর গাঙে, বামে বীর হনুমান, গাজনে যে ধামৎকান্ন আছেন তাঁর চরণে কোটী কোটী প্রণাম।"

এইরূপ গাজনে যে বাবা বুড়োশিব আছেন বা মহাদেব আছেন এবং গ্রামের মধ্যে যে শিব বা ধর্ম্মরাজ কি অন্যত্র আসে পাশের গ্রামে ঐরূপ যিনি আছেন, তাঁহাকেও প্রণাম করিতে হইবে। প্রতিবেশী দেবতার পর তেত্রিশকোটী দেবতাকে বন্দনা করিয়া শেষে সম্মুখে যে অগ্নিদেব আছেন তাঁহার বন্দনা। তৎপরে সেই জ্বলন্ত আধার স্তূপ হইতে এক একখণ্ড তুলিয়া দেবতার বেদীতে রাখিয়া অবশেষে কতক ইতস্ততঃ ছুঁড়িয়া কতক বা পায়ে মাড়াইয়া নৃত্য করিতে হয়। বাণফুলের পর দিন হোম পরব।

হোমের দিন স্নানের পর বেলা প্রায় মধ্যাহ্নের সময় হইতে বাণেশ্বর বা শিবের প্রতিনিধি ভৈরবাদিকে লইয়া সে এক রকমের শোভাযাত্রা বাহির হয়। ভক্তগণের হাতে নানা আকারের বেতের ছড়ি, ময়ূরচন্দ্রিকাগুচ্ছ, আসাসোঁটা প্রভৃতি বিচিত্র সজ্জা, গলে গৈরিক উত্তরীয়, কটীতটে আঁটা মলবটী, মুখে ব্যোম, ব্যোম রব, পরস্পরের বেত্রে বেত্রে আঘাত প্রতিঘাতে উত্থিত চট্‌চটা শব্দ, আর ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশির মিলিত কল্লোলের তালে তালে তাহাদের উন্মাদ নৃত্য বাস্তবিকই একটা দেখিবার বস্তু। মাঝে মাঝে সমবেত জন-কণ্ঠে উচ্চারিত 'ব্যোম শিব শঙ্কর হে' উচ্চনাদ মনকে যেন মাতাল করিয়া দেয়। ভক্তেরা প্রায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চারিদিকে নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। এই শিবতাণ্ডব সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমান তালে চলিয়া তবে শেষ হয়। কাটোয়া, উদ্ধারণপুর, নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে গিয়া যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন সে ভীমকান্ত দৃশ্য না দেখিলে শুধু বর্ণনায় বুঝ যায় না।

২

ইহাই "হোম পরব" বা শিবের গাজন বা চৈত্রের গাজন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কি? হোম দৃশ্য তো শিব পূজার অঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু এই লৌকিক ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি, এ সব আসিল কোথা হইতে? ইহার মূল কোথায়? আমাদের মনে হয়, তথাকথিত লৌকিক ধর্ম্মগুলি নিতান্ত ভুঁইফোঁড় নহে। অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে অনেক রহস্যের সন্ধান মিলিতে পারে। গত ১৩২৮ সালের তৃতীয় সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাদেব' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী সিদ্ধান্ত শিবের গাজন সম্বন্ধে আমাদের এই অনুমানের সমর্থন করিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ প্রবন্ধে "ব্রাত" শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ব্রাতদের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত এই হোম পরবের আচার অনুষ্ঠানের এবং ভক্তদের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "ব্রাত" বলিতে দল বুঝায়। যে দলের কোনো সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। শিবের গাজনের ভক্ত কত হইবে বা হইতে পারে, তাহারও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই, আর ইহাদিগকে যে 'ব্রতো' বলে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই "ব্রাত" ভুক্ত জাতিকে "ব্রাত্য" বলিত। ইহারা এক প্রকার যাযাবর ছিল। দুই চারিদিনের জন্য ইহারা যেখানে থাকিত, সেই স্থানকে "ব্রাত্য" বলিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বলে ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মতন দৈব প্রজা অর্থাৎ দেবতাদের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন, উহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত না। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে তাহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম হইত তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে যজমান ছাড়া একজনমাত্র যজমান থাকে, দুজন যজমানের কথা বড় শুনা যায় না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোমের পর ঋষিরা ব্রাতদের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন, তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদিগকে ঋত্বিক্ দিতেন, মোটা মুটী তাহাদিগকে আপনার সমান করিয়া লইতেন।" শিবের গাজনেও ভক্তদের মধ্যে এইরূপ প্রথা আজিও প্রচলিত রহিয়াছে। যে কোনো জাতি, যতজন ইচ্ছ, ভক্ত হইতে পারে,—ভক্ত হইলেই আর তাহাদের মধ্যে জাতিগত ভেদ থাকে না। তখন তাহারা পরস্পরে গলা জড়াজড়ি করিয়া উৎসবে মত্ত হয়, সকলে মিলিয়া শিবের পূজা করিতে পায়, একই পুরোহিতের দ্বারা তাহাদের সকলের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ভক্তেরা এক সঙ্গে ভিক্ষায় যায়, যাহা পায় সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে বসিয়া খায়। তা ছাড়া ভক্তদের নৃত্য, ভ্রমণ, ভিক্ষা, বেশ ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয়, যেন কোনো বন্ধনহীন চির-দুর্দ্দম যাযাবর জাতি এই কয়দিনের জন্য শান্ত হইয়া আছে। এই শিবের গাজন যে প্রাচীন ব্রাত্যস্তোমেরই শেষ রূপান্তর, ইহাই আমাদের অনুমান। ইহা "শুদ্ধি" সংস্কারেরই প্রাচীন রূপ। সেদিনের বৌদ্ধ ভারতে কেন যে শঙ্করাচার্য্য শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কেন যে তাঁহাকে লোকে শিবের অবতার বলে এই শিবের গাজন দেখিয়া অনেকটা অনুমিত হয়। সকলেই জানেন ভারতের বৌদ্ধগণ দেশান্তরিত হয় নাই. এই ভারতেই ছিল, সুতরাং তাহাও সে দিনের বৌদ্ধ ভারত যে এই ব্রাত্যস্তোমে 'শুদ্ধ' হইয়াছিল, হিন্দু হইয়াছিল, ইহা একরূপ নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায়। যাঁহারা বলেন শিব অনার্য্যের

দেবতা, অথবা জ্ঞানী বুদ্ধের নূতন সংস্করণ তাঁহাদিগকে একবার এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। রাঢ়ের ধর্ম্মরাজ পূজাও ষোল আনা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত নহে, ইহা বলিবারও হেতু আছে ব্রাত্যস্তোমের একটা ধারা ইহার সহিতও মিশিয়া রহিয়াছে। যদি শিবের গাজনে বা ধর্ম্মরাজ পূজায় বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত কোনো আচার অনুষ্ঠানের ক্ষীণ চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহারও মূল ঐ ব্রাত্যস্তোমের শুদ্ধি সংস্কার। একটা অত বড় সম্প্রদায়কে দলে টানিতে গিয়া তাহাদেরও কোনো কিছু গ্রহণ করাই তো সম্ভব, এইরূপ মিশ্রণই তো স্বাভাবিক।

শিবের গাজনের সঙ্গে ব্রাত্যস্তোমের সম্বন্ধ অনুমানের কারণ ব্রাত্যদের দেবতা ছিলেন শিব। অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে—"ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ভিতর লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন একটা আলো, একটা ঘৃ-বর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জন্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্ম হইল। সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে দেবগণের কর্ত্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে এক ব্রাত্য হইল, অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইল, ব্রাত্যগণ যেন এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইল। * * * * ইনি পূর্ব্বদিকে চলিলেন, কতকগুলি সাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রদ্ধা তাঁহার প্রিয়তমা মাগধ তাঁহার পরামর্শদাতা হইল। বিজ্ঞান তাঁহার কাপড় হইল, দিন উষ্ণীষ হইল, রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। * * * তাহার পর ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া এক বৎসর দাঁড়াইয়া রহিলেন, এইরূপে দেখা গেল তাঁহার পাঁচ মাথা হইল। * * দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাত্য তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন, তিনি বলিলেন আমার আসনদ্য (চার পাই) দাও; দেবতাগণ দিলেন। চারিটী সাম উহার দুইটী বাজু ও দুইটী আড়ানি হইল, গ্রৌষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত চারিটী পায়া হইল, ঋকগুলি লম্বা দড়ি হইল, যজুগুলি ছোট দড়ি হইল। বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিশ হইল, সামবেদ বসিবার স্থান হইল, উদ্গীথ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাঁহার অনুচর হইলেন ও তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এক ব্রাত্য মহাদেব 'স্তুতসমরগণৈঃ' হইলেন, যে বেদ বিশ্বের আত্ম, বিশ্বের বীজ তিনি তাহাতে চাপিয়া বসিলেন।" (শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ) ইহা হইতে ব্রাত্য ও ব্রাত্যদের দেবতাটীকে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে রুদ্র সর্ব্ব প্রভৃতি নাম আছে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তাহা কুমারেরই নাম, এই কুমারই অগ্নি। শিবের অষ্টমূর্ত্তির কথা, এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধের বিষয়। অনেকেই অবগত আছেন এই কুমার শিবের পুত্র, তারকাসুর বধের জন্য কুমারের জন্ম, এবং কুমার জন্মেরই আনুষঙ্গিক ব্যাপার মদনভস্ম প্রভৃতি। যাহা হউক, ইহা হইতে শিবের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধের কথা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই সম্বন্ধের জন্যই হোক আর ব্রাত্য-স্তোমের যজ্ঞ স্বরূপেই হোক শিবের গাজনে হোম" একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ রহিয়াছে। বৈদিক ঋষিরা এই রুদ্রের ভয়ে অস্থির হইয়া থাকিতেন, সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন, আমাদের মেরো না, আমাদের আমাদের ছেলে মেরো না, গরু মরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না ইত্যাদি। হোমের শেষাশেষি দর্ভজুটিকা হোম" করিতে হয়, দর্ভজুটিকা হোমের মন্ত্রেও এই ভাবের আভাস পাওয়া যায়।

"যঃ পশুনা মধিপতি রুদ্রস্তস্য চরোবৃষা,
পশুনস্মাকং মাহিংসী য়েতদস্তু হুতং তব স্বাহা।"

ব্রাত্যগণ তাঁহাদের দেবতাকে হারাইয়াছিলেন, দেবতা স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ব্রাত্যস্তোমে দেবতার অন্বেষণ করিতেন। এই "দেবতাহারা" বা "দেবতাহীন জাতি" হইতেই সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাত্য শব্দের "পতিত" অর্থ প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দুরা দেববাদী, দেবতা না মানিলে কেহ হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই ব্রাত স্তোমে দেবতার অনুসন্ধান, ব্রাত্যস্তোম প্রকারান্তরে পাততো-দ্ধারেরই অনুষ্ঠান। হিন্দু অর্থে এখানে চাতুর্বর্ণকে উদ্দেশ করিতেছি; কালে যখন সাঙ্কর্য্য ঘটিল, চারিবর্ণ ক্রমে বহুবর্ণে রূপান্তরিত হইল, বহু বৈদেশিক জাতি আসিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সে সমস্যা হইতে জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এই ব্রাত্যস্তোম। বৌদ্ধপ্লাবিত ভারতকে হিন্দু করিয়াছে এই ব্রাত্যস্তোম।

হয় তো কালে সারা বৎসরের শেষে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধি নির্দ্ধারিত হয়, সেই সময়েই শুদ্ধি সংস্কার সম্পাদিত হইত; তাই এই চৈত্রের গাজনে শিবপূজায় আমরা এখনো তাহারই লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাইতেছি। এখানে "ভক্ত" কথাটীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গাজনে যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকে "বালাভক্ত" বলে। বালাভক্ত অর্থে নূতন ভক্ত। দেববাদের সঙ্গে এই ভক্ত কথাটীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, লোকে আপ্তত্বানুসাদ্ধৎসুগণকে যোগী এবং ব্রহ্ম-পরায়ণ যাঁহারা তাঁহাদিগকে জ্ঞানী নামে অভিহিত করে। দেবোপাসক-গণই প্রধানতঃ ভক্ত নামে পরিচিত, কথায় বলে ভক্তের ভগবান। এই 'ভক্ত' কথাটীতে ব্রাত্যদের হারানো দেবতাকে খুঁজিয়া পাওয়ার অর্থাৎ দেববাদ মানিয়া লওয়ার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলিয়াই মনে হয়। অনেকে শিবের গাজনকে গোণ্ডাপুরের শিবপরায়ণ অসুররাজ বাণের প্রবর্ত্তিত উৎসব বলিয়া মনে করেন। 'বাণেশ্বর' দেবতাটী এবং 'বাণ ফোঁড়া' ও 'চড়কের' দোল খাওয়ার সঙ্গে কোনো আসুরিক স্মৃতি জড়িত আছে কি না কে জানে?

মনুষ্য-বিক্রয়-পত্র

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ

দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে আমি "যশোহর-খুলনার ইতিহাসের" উপাদান সংগ্রহ কালে আমারই নিজ গ্রামের সন্নিকটে একখানি দাসখত বা মনুষ্য-

বিক্রয়পত্র হস্তে পাই। সে পুরাতন জীর্ণ দলিলখানি এখনও আমার নিকট আছে। গত ১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে আমি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" নামক মাসিক পত্রে উক্ত দাসখতের অবিকল প্রতিলিপি মন্তব্য সহ প্রকাশিত করিয়া কয়েকটি ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ধারের জন্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। উহার কি ফল হইয়াছে, তাহা পরে বলিতেছি। উক্ত দাসখতে দেখিতে পাইয়াছি, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের একজন কায়স্থ ভদ্রলোক ৭টি ছোট বড় স্ত্রী পুরুষকে ৩১৲ একত্রিশ টাকায় বিক্রয় করিতেছেন। সম্প্রতি যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমা নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হইতে আমি আর একখানি "বান্দাজীরী" বা মনুষ্য-বিক্রয়-পত্র সংগ্রহ করিয়াছি। দলিল-খানি ১১৯৪ সালের ১৬ই পৌষ বা ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রদত্ত। সুতরাং উহার বয়স ১৩৬বৎসর এবং উহা ইংরাজ রাজত্বারম্ভের পর লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন কালে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দলিল পুরাতন তুলট কাগজে উৎকৃষ্ট কালো কালী দ্বারা সুন্দর হস্তাক্ষরে, প্রায় একই মর্ম্মে, উপরি ভাগে ফারসী ভাষায় এবং নিম্ন ভাগে বহু উর্দ্দু শব্দ সম্বলিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ফারসী ও বাঙ্গালা উভয় হস্তাক্ষর এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, যে, বর্ত্তমান যুগে উহা এক প্রকার দুর্লভ। তবে লিপির ভাব ও ভঙ্গি, রচনা ও বানান সকলই যে প্রাচীন কালের স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। দলিলের মর্ম্ম এই যে, (বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত) আমীরাবাদ পরগণাস্থিত গোয়ালা গ্রাম নিবাসী রামনাথ চক্রবর্ত্তী তাহার পদ্মলোচন দাস নামক একটি সাত বৎসর বয়স্ক দাসকে দুর্ভিক্ষ বশতঃ অন্নবস্ত্র দিতে না পারিয়া দুই টাকা মাত্র পণে রাজচন্দ্র সরকারের নিকট বিক্রয় করেন। দলিলের বাঙ্গালা অংশের অবিকল প্রতিলিপি এবং ফারসী অংশের সরলানুবাদ নিম্নে দিতেছি।

মূল বাঙ্গালা দলিলখানি (হস্তলিখিত বানানের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া) অবিকল উদ্ধৃত হইতে :—

"ইয়াদি কির্দ্দি[১] সকল মঙ্গলাময় শ্রীরাজচন্দ্র সরকার সচ্চরিতেষু। লিখিতং শ্রীরামনাথ শর্ম্মণঃ পিসরে[২] রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী এবনে রামকেসব চক্রবর্ত্তী সাকিন গোয়ালা পরগণে আমিরাবাদ বান্দাজীরী[৩] পত্রমিদং সন ১১৯৪ সন এগারো সও চৌরানব্বৈ সালাব্দে লিখিনং কার্য্যানঞ্চাগে আমার কওলার মনুষ্য[৪] শ্রীপদ্ম লোচন দাশ পিসরে রামকান্ত দাশ ইবনে দুর্গারাম দাশ ওলদে[৫] সতানন্দ দাশ উমর[৬] সাত বৎসর উত্তম শ্যাম বর্ণো কতসানীতে[৭] ইহাকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া সেৎসা পূর্ব্বক[৮] নগদ ২ দুই টাকা সিক্কা গন দস্তবদস্ত[৯] পাইয়া তোমার স্থানে বিক্রী করিলাম জাবত জিবন পর্য্যন্ত অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিবা তোমার নফরী[১০] ব্যাপার করিবেক তোমার দাসীর সহিত বিবাহ দিবা সন্তানাদি যে হয় তাহারাও তোমার নফরী ও দাসিত্ব করিবেক দান বিক্রীর অধিকার তোমার কোনখানে পলাইয়া জায় আপন একক্তি-য়ারে[১১] পাকড়া করিয়া আনিবা মর্দ্দত[১২] ৭০ সত্তরী বৎসর ইহার পর আজাদ[১৩] হইতে চাহে হলব্বী[১৪] সহরের ২২ বাইষ মন সিসা[১৫] ও রঙ্গুনের ছিলকা[১৬] দিয়া আজাদ হইবেক এতদর্থে মনুষ্যবিক্রী পত্র দিলাম ইতি শন সদর বতারিখ—১৬ সোলত্তী পৌষ।" *

দলিলে উপরিভাগে ফারসীতে যাহা লিখিত আছে, তাহার সরল বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

'চাকলা ভূষণার অন্তর্গত পরগণে আমীরাবাদের মৌজা গোয়ালা নিবাসী আমি রামনাথ শর্ম্মা পিতার নাম রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী বৃদ্ধাবস্থায় স্থির বুদ্ধিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ ভাবে অঙ্গীকার করিতেছি এবং লিখিয়া দিতেছি যে একজন গোলাম—নাম পদ্মলোচন দাস পিতা রামকান্ত দাস তদীয় পিতা দুর্গারাম দাস বয়স ৭ বৎসর, শ্যামবর্ণ (মূল ফারসীতে গোন্দুম বা গোধূম রঙ্) উহাকে দলিল করিয়া নিজ অধীনে আনিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষের সময় বলিয়া তাহার ভরণপোষণ দিয়া প্রতিপালন করিয়া অসমর্থ হইয়াছি। সেইজন্য শ্রীরাজচন্দ্র সরকারের নিকট হইতে সিক্কা দুই টাকা গ্রহণ করিয়া ঐ টাকার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাসম্মতিপূর্ব্বক উক্ত সরকারের নিকট বর্ণিত দাসকে বান্দা-আজীর (দাস বিক্রয় দলিল) করিয়া দিলাম। সে উক্ত সরকারের সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিবে। তিনি উহাকে আপন দাসীর সহিত বিবাহ দিবেন। উহার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও ঐরূপ দাসদাসীর কার্য্য করিবে। যদি কখনও অন্যত্র পলাইয়া যায়, তাহাকে নিজ ক্ষমতায় ধরিয়া আনিতে পারিবেন। যদি সে কখন মুক্ত হইতে চায়, হলভ্ সহরের একমণ সিসা ও রঙ্গুনের ছিলকা দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত হইতে পারিবে।

১ ইয়াদি কির্দ্দি=ইয়াদে কীর্দ্দেগার (ফারসী)=ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া। ২ পিসরে, এবনে বা ইবনে, ওলদে তিনটি শব্দই তনয় পিতা এইরূপ এক অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং যথাক্রমে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নামের পৃষ্ঠে ব্যবহৃত হইত। ৩ বান্দাজিরী="বান্দা-আজীর" (দাস-মজুর) হইতে প্রতিপন্ন=দাস-বিক্রয়-দলিল। ৪ কওলার মনুষ্য=কোবলা দ্বারা পূর্ব্বক্রীত মনুষ্য বা দাস। ৫ উমর= বয়স। ৬ কতসানী=কহৎছালী (ফারসী)=দুর্ভিক্ষ। ৭ সেৎসা= স্বেচ্ছা। ৮ দস্তবদস্ত=হাতে হাতে। ৯ নফরী=দাসত্ব। ১০ একক্তিয়ার=এক্তিয়ার অর্থাৎ অধিকার। ১১ মর্দ্দত=মুদ্দত=মেয়াদ (সময়)। ১২ আজাদ=মুক্ত। ১৩ হলব্বী=এই সহর কোথায় ঠিক জানা যায় না; সম্ভবতঃ আরব বা শ্যাম দেশের অন্তর্গত হলভ্ বা হলজী নামক সহর হইতে পারে। ১৪ সিসা=কাচ বা সীসক ধাতু। ১৫। ছিলকা=খোসা।

* দলিলের লিপিতে অন্ত্য যে সব বর্ণাশুদ্ধি আছে, আশা করি পাঠকগণ উহা সহজেই ধরিয়া লইয়া সবস্ত লিপির অর্থবোধ করিতে পারিবেন।

† বাঙ্গালা দলিলে অঙ্কে ও অক্ষরে ২২ বাইশ মণ সীসার উল্লেখ আছে, কিন্তু ফারসী অংশে স্পষ্টই একমণই আছে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালার উক্তিই সত্য, কারণ পণটি যথাসাধ্য ভাবে অসম্ভব করা হইয়াছে, অর্থাৎ

এতদর্থে দান বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে আবশ্যক মত কার্য্যে লাগিবে। সন ১১২৪ সালাব্দ ১৬ই পৌষ।'

এই ফারসী অংশের শিরোভাগে যে প্রাচীন কালের সিলমোহর দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে সৈয়দ জালাল্ উদ্দীন হাইদরের অনুগত আমীর (প্রধান) কাজি রফিউদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। পার্শ্বে হস্তাক্ষরে লিখিত আছে, সাক্ষীদিগের সম্মুখে মোহর সংযুক্ত হইল এবং মোহরের দুই পার্শ্বে সাক্ষী কানুনগো গোকুলকৃষ্ণ দাসের স্বাক্ষর আছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা অংশে দক্ষিণ শিরোভাগে দলিলদাতা রামনাথ শর্ম্মা সাং গোহালা পোঃ আমীরাবাদ বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। মূল বাঙ্গালা দলিলের পৃষ্ঠে ৬ জন সাক্ষীর দস্তখত আছে। তন্মধ্যে ৪ জনের নিবাস বাঐজানি, একজনের নিবাস নারায়ণপুর এবং অবশিষ্টের নিবাস তেলিহাটি পরগণার ভাটরা গ্রাম। বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত যে মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল, এবং যে স্থানের উক্ত নামকরণ তিনিই করিয়াছিলেন, তাহারই পূর্ব্বনাম বাঐজানি বা বাগ্জানি; এখন রাজধানী নাই, বাঐজানি নাম আছে এবং উহার পার্শ্বে নারায়ণপুর গ্রাম বিদ্যমান (যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫৯১ পৃঃ)। এই স্থান যে ভূষণা সরকারের অন্তর্গত, তাহা ফারসী লিপি হইতে পাওয়া গেল। ইংরাজ আমলের প্রথমে এই মহম্মদপুরেই যশোহর জেলার সদর ষ্টেশন করিবার কথা হইয়াছিল। দলিলোক্ত সময়ে সম্ভবতঃ এইস্থানে কাজির আদালত ছিল এবং তথাকার কাজি রফিউদ্দীনের নিকট দলিলখানি তদানীন্তন প্রথায় রেজেষ্ট্রী করা হয়। দাসক্রেতা রাজচন্দ্র সরকারের বাড়ীর উল্লেখ না থাকিলেও তাহার বাসস্থান যে বাঐজানি বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। সরকারী কানুনগো ও ছয়জন লেখাপড়া জানা বিশিষ্ট সাক্ষীর স্বাক্ষর, কাজির মোহর ও হস্তলিপি প্রভৃতি প্রমাণ হইতে দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

দলিলের আরও দুই একটি উক্তি হইতে সময়সাময়িক অবস্থার ইতিবৃত্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। প্রথমতঃ কহৎছালী বা দুর্ভিক্ষ তখনও হইত। * এত কষ্ট উপস্থিত হইত যে, দুই টাকায় একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সাত বৎসর বয়স্ক সুন্দর বালককে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার হৃদয়হীনতার অভাব হইত না।

দ্বিতীয়তঃ রামনাথ শর্ম্মা উল্লেখ করিতেছেন যে, বালকটি তাহার কওলার মনুষ্য; অর্থাৎ ঐ বালককে তিনি কোবালা পত্রে খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন; এখন আবার বিক্রয় করিতেছেন। আমি যে অন্য দাসখতখানি ঢাকা রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে, "আমার খানে জাত নিজ মনুষ্য শ্রী শিবাই সজ্জন আর তিতি নামে তাহার স্ত্রী, এবং শ্রীরামপাল, শ্রীকৃষ্ণ জীবনপাল, শ্রীরাজা-রাম পাল ও শ্রীমণিরাম পাল এই চাইর (চারি) পুত্র ও রুক্মিণী নামে তাহার কন্যা এই সাতজন মনুষ্য অন্ন দিতে না পারিয়া দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট সবলগে ৩১৲ টাকায়" ইত্যাদি। এখানকার

সহজে আর উদ্ধারের উপায় নাই। তবে রঙ্গুনের খোসার ওজন দেওয়া আছে। সীসা সংগ্রহ করিতে না পারিলে পর্ব্বত প্রমাণ রঙ্গুনের খোসা দিয়াও নির্দ্দিষ্ট ওজন পূরণ করার সম্ভাবনা ছিল না।

* এই দলিল সম্পাদিত হইবার বৎসরে অর্থাৎ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যে একটি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহা সরকারী কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি। See Calcutta Gazette, 20th September, 1787 and 27th March, 1788.

উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শিবাইকে দাসরূপে ক্রয় করা হয়। তাহার প্রভু তাহার সহিত ভিতি নাম্নী এক দাসীর বিবাহ দেন। উহার ফলে উহাদের ৪ পুত্র ও এক কন্যা হয়। ইহাতেই "খানে জাত নিজ মনুষ্য" বা দাস বলা হইতেছে। এখনও যাহারা চাকরগিরি করে বা দৈনিক কুষাণ দেয়, তাহাদিগকে স্থানভেদে মনিষ (মনুষ্য) বা মজুর বলে। মোট কথা, বুঝা যাইতেছে যে, লোকে পুরুষানুক্রমে দাসদাসী হইয়া থাকিত।

তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তি নিজ দাসের ভরণপোষণ দিতে অসমর্থ হইলে সময় সময় উহাকে নামমাত্র শুল্ক লইয়া অন্য ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতেন। টাকার মূল্য তখন অনেক বেশী ছিল, তাহা সত্য। কিন্তু দুই টাকা পণে দূরে গিয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া কাজিকে নজরানা দিয়া পোষাইত না তাহা সত্য। সুতরাং এখন যেমন কেহ কেহ কাহাকেও গবাদি পশু উপহার দেওয়ার সময় স্বত্বত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ একটি পয়সা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বেও কোন কোন সময় নামমাত্র পণ লইয়া দাস বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্থতঃ দুর্ভিক্ষাদি জন্য লোকে যে শুধু দাস বিক্রয় করিত, তাহা নহে; কেহ কেহ আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থাৎ চিরজীবনের দাসত্ব স্বীকৃতি পূর্ব্বক কিছু পণ লইয়া তদ্দ্বারা নিজের পূর্ব্ব দেনা পরিশোধ করিতেন। কোন কোন প্রভু নিজের খরিদা দাসীকন্যাকে বিবাহ দিবার সময় "ফারুগ-পত্র" লিখিয়া দিয়া নিজে মুনিবানার জন্য সামান্য কিছু অর্থ লইয়া অবশিষ্ট শুল্ক দাসীকন্যার পিতামাতাকে দিতেন। এই দুইপ্রকার দাস বিক্রয় প্রথার প্রমাণ স্বরূপ সুলেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহোদয় স্বপ্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিহাসে" (২য়, ৫ম-৮৮-৯ পৃঃ) দুইখানি মনুষ্যবিক্রয় পত্র অবিকল প্রকাশিত করিয়াছেন।

গত ১৯২২ অব্দে কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের ঐতিহাসিক শাখায় ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয় "পরগণাতি সনের" সময় নির্দ্দেশকল্পে একটি উপায়ের নিবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি যে ১৬খানি প্রাচীন দলিলে পরগণাতি সনের উল্লেখ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে "ঢাকা রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত আমার "দাসখত"খানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অবধারণ করেন। তিনি ঐখানি ব্যতীত আরও ৪খানি দাসখত বিচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২খানি তাঁহার নিজের সংগৃহীত এবং ২খানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের "ঢাকার ইতিহাসে" প্রকাশিত হইয়াছে। নানাপ্রকার বিচারফলে শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ১১২৪ শকাব্দের ১লা কার্ত্তিক অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পরগণাতি সনের সূত্রপাত হয়। আমিও ঐ মত সমর্থন করি। মৎ প্রকাশিত পূর্ব্ব দাসখত খানিতে ৪৬১ সনের উল্লেখ আছে, এবং উহা যে পরগণাতি সন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাহা হইলে উক্ত দাসখতখানি ৪৬১ + ১২০২ অর্থাৎ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হয়। তাহা হইলে উহার বয়স ২৬০ বৎসরের কম নহে। আমার বর্ত্তমান মনুষ্যবিক্রয় পত্রখানিতে পরগণাতি সনের উল্লেখ নাই, ইহাতে সুস্পষ্টভাবে বাঙ্গালা মাসই দেওয়া হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ইংরাজ আমলের প্রাক্কাল হইতে পরগণাতি সনের গণনা স্থগিত হইয়াছিল। ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দে অর্থাৎ ১৬১৪ হইতে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরগণাতি সনযুক্ত দলিল কদাচিৎ পাওয়া গিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে উহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। আমাদের বর্ত্তমান দলিলখানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত।

বংশ-রক্ষা

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

১

"বল কি নরেশ, ছেলের বিয়ে দেবে না? এ কি রকম মতলব তোমার? কে তোমায় এ কুবুদ্ধি দিলে বল দেখি?"

নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে ৩০০৲ টাকা বেতনে চাকরি করেন। তাঁহার এক পুত্র ও একটি কন্যা। কন্যাটীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার একটি পুত্র-সন্তানও হইয়াছে। নরেশচন্দ্রের পুত্র যোগেন্দ্রের বয়স ২৫ বৎসর। সে রেভিনিউ বোর্ডে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরি করে।

নরেশচন্দ্র পুত্রের বিবাহ দিতে নারাজ। তিনি বলেন "ছেলে বেশ আছে, সে উপার্জ্জন করিয়া আপনি সুখে থাক, ভোগ করুক। বিবাহ দিয়া, তাহার এক গলগ্রহ জুটাইয়া দিলে, ও ক্রমে সন্তানাদি হইলে, তাহার দুঃখ ও দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলেই তাহার ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির পথে কণ্টক দেওয়া হইবে। সুতরাং বিবাহ দিলে পুত্রের অনিষ্ট করা হইবে।

নরেশের বন্ধু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যার সহিত যোগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধে নরেশের উক্ত রূপ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বল কি নরেশ, ছেলের বিয়ে দেবে না? এ কি রকম মতলব তোমার? কে তোমায় এ কুবুদ্ধি দিলে বল দেখি?"

"কুবুদ্ধি আবার কি? আমার নিজেরই এই কুবুদ্ধি, বুঝলে? আমি নিজে ত দাসত্ব করে কোনও গতিকে দিন কাটাচ্ছি, আমাদের মত অবস্থার লোকের কি বিয়ে করা উচিত? এতে poverty নিয়ে আসে। আর এই জন্যেই ত আমাদের মত ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের এই দুর্গতি। এখন আমি বেঁচে আছি। আজ যদি আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে, পরের জঞ্জাল ঘরে এনে হাজির করি, আপাতক বউ এলেই নানা রকমের খরচ বাড়ল। তার খাওয়া পরা ত আছেই। তার উপর এখনকার মেয়ে,—তার সাবান চাই, এসেন্‌স্ চাই, স্নো, ক্রীম, এই নানান রকমের ভজকট তার চাই। পাঁচখানা গহনা দিতে হবে, না দিলে লোকে নিন্দে করবে। ওরে বাপরে! বিয়ে দিলে এখনই হাজার খানেক টাকার কেলে পড়ে যাব। তার পর ক্রমে আরও বাড়বে।"

"আরে না না, ও গয়না পত্র এসেন্‌স্ সাবান—সে সব আমি দেব। এখন তাতে তোমার খরচ কি?"

"এখন যেন তুমি দিলে,—বছর খানেক তত্ত্ব তাল্লাস করে না হয় এক বছরই যোগালে,—চির দিন তো আর দেবে না ভাই! ও কথা ছাড় হরপ্রসাদ, ও হবে না। আমি ইচ্ছে করে নিজের ছেলের শত্রু হতে পারব না। দুদিন বাদে অমন সোণার চাঁদ ছেলে আমার—পাঁচটা ছেলে মেয়ে হলেই একটা কোলে, একটা পিঠে, একটা কাঁধে, একটার হাত ধরে,—ওরে বাপরে! ও কথা ভাবলেও আমি শিউরে উঠি,—ও হবে না ভাই, ও হবে না; তুমি আর কোথাও চেষ্টা কর।"

এই সময় নরেশের আর এক বন্ধু মোহনলাল সেই স্থানে আসিলেন। মোহন আসিতেই হরপ্রসাদ বলিলেন "শুনছ মোহনদা, নরেশের ideaটা কি জান?" বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। শুনিয়া মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ নরেশ, এ কথা সত্য?"

"হ্যাঁ। আমি বাপ হয়ে ছেলের এ সর্ব্বনাশ করতে পারব না। হরপ্রসাদের কি বল না,—ওর কন্যাদায় উপস্থিত, নিজের দায়টী আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। তার পর আমি ব্যাটা পরের জঞ্জাল নিজের ঘরে এনে খরচা বাড়াই, আর ছেলেটাকে জন্মের মত প্যাঁচে ফেলে দিই, তার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নষ্ট করি।"

"বল কি নরেশ? তা' কত দিন বিয়ে দেবে না?"

"কোন দিনই দেব না। আমাদের কি বিয়ে করবার মত অবস্থা?"

"নিজে যখন বিয়ে করেছিলে, তখন কি লক্ষপতি ছিলে? তখন এ কথা ত ভাব নি ভাই!"

"তখন বয়স অল্প ছিল, বুঝতে পারি নি। তার ওপর বাবা মা বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা ছেলের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির কথা ভাবেন নি। তাঁরা ভুল করেছিলেন বলে' সেই রকম ভুল আমাকেও করতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই।"

"আচ্ছা নরেশ, তুমি হিন্দু শাস্ত্র মান?"

"নিশ্চয়ই মানি; আমি গোঁড়া হিন্দু।"

"তা'হলে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ সব কর?"

"হ্যাঁ, তা করি বই কি। পিতৃপিতামহের কাছে সে আমার কর্ত্তব্য; সেগুলো regularly করতে হয়।"

"তাতে পরলোকগত বাপ-পিতামহের তৃপ্তি হয়, এ কথা মান?"

"মানি বই কি—না মানলে করব কেন?"

"তা'হলে তুমি মরে যাবার পর পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ না হয় তোমার ছেলে করলে; তার পর? তার যদি বিবাহ না দাও, তোমার বংশ থাকবে কেমন করে? আর বাপ-পিতামহের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে পরলোকগত তাঁদের সে তৃপ্তিই বা কে দেবে?"

"তখন আর শ্রাদ্ধ-তর্পণ হবে না, বংশ extinct হয়ে যাবে। কেবল এই কারণে আমাদের মত কেরাণীর বংশ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তাতে সংসারের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশান্তি সমস্তই কমবে। তবে যদি কোন দিন বড়লোক হয়ে ছেলে বিয়ে করে,তাতে আমার আপত্তি নেই।"

"বড়লোক বল কাকে? তার একটা definition আছে ত?"

"কেন, হাইকোর্টের জজ আশু মুখুজ্যে মশাইয়ের ছেলে, কি বর্দ্ধমানের মহারাজার ছেলে—এরা যদি বিয়ে করে, তা'হলে আপত্তি নেই। এঁদের সঙ্গতি আছে, এঁদের ছেলেদের বিয়ে করবার অবস্থা, তারা করুক; আমার মত কেরাণীর ছেলে বিয়ে করলেই poverty, আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে অশান্তি নিয়ে আসবে বই তো নয়।"

"জগতে সবাই হাইকোর্টের জজ কি বর্দ্ধমানের মহারাজা হয় না; কোটীর মধ্যে একটা হয় ত হতে পারে। তা'হলে তোমার মতে এই কোটী কোটী লোকের মধ্যে কারও বিয়ে করা উচিত নয়। যার হয় ত ৫০টী টাকা উপার্জ্জন করে, তাইতেই দু' চারটী ছেলে মেয়ে নিয়ে দুঃখে সুখে সংসার করছে, তারা সবাই মূর্খ? সবাই আহাম্মক? তোমার মত এ সূক্ষ্মবুদ্ধি কারও নেই। তুমি নিজে ৩০০৲ টাকা রোজগার করছ, যা'হোক পাঁচ সাত হাজার টাকা ব্যাঙ্কেও আছে শুনেছি। ছেলে, ভগবানের ইচ্ছেয় চাকরি করছে, যাহোক আনছে। তুমি যদি নিজেকে গরীব বল, তা'হলে এ বাঙ্গলা দেশের কোটী কোটী লোক সকলে ত অত্যন্ত গরীব, আর বেবাক মূর্খ; কারণ নিজেরাও বিয়ে করেছে আর ছেলে মেয়েদেরও বিয়ে দিয়েছে। তোমার মতে তাদের সবারই নির্ব্বংশ হওয়া উচিত ছিল।"

"আমার ত তাই বোধ হয়। আর সেই জন্যেই দেশের এই দারিদ্র্য।"

মোহন বলিলেন, "একেবারেই ছেলের বিয়ে দেবে না বলছ,—আচ্ছা, ওর যৌবনকাল, যদি স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে যায়?"

"সেও ভাল, বুঝলে মোহনদা, আমার মতে সেও ভাল! তাতে ত আর নিজের পাঁচটা ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাঞ্জারী হয়ে পড়বে না;—এই হরপ্রসাদ ভায়ার মত কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়াতে হবে না।"

মোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "হরপ্রসাদ, ও হবে না ভাই, বুঝলে? মরার বাড়া গাল নেই। নরেশ যখন 'বংশ extinct হোক' এমন কথা পর্য্যন্ত বলতে পারছে, তখন আর ওকে বলবার কিছুই নেই। ভেব না, মেয়ের বিয়ে তোমার আটকাবে না, হয়ে যাবে, অন্য কোথাও চেষ্টা কর। নরেশের মত অত সূক্ষ্মবুদ্ধি আর কারও আছে বলে ত বোধ হয় না। ছেলেদের ওপর এত স্নেহ যদি সবার হত, তা'হলে দেশে লোক থাকত না। আর নরেশ, তোমাকেও বলছি ভাই, এ বুদ্ধি যদি তোমার চির দিন থাকে, তা'হলে তুমি নিজেই তোমার ছেলের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছ। এর পরিণাম ভাল হবে বলে বোধ হয় না।"

এই বলিয়া হরপ্রসাদকে ডাকিয়া লইয়া মোহন চলিয়া গেলেন।

"ব্যাপার কি ? এখানে এত ভিড় কিসের ?"

উপরিউক্ত ঘটনার প্রায় তিন মাস পরে, এক দিন মোহনলাল অফিস হইতে বাটী ফিরিবার সময়, গোয়াবাগান ষ্ট্রীটের একটী দ্বিতল বাটীর সম্মুখে অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া, সম্মুখস্থ একটী ভদ্রলোককে উক্ত প্রশ্ন করিলেন। সে লোকটী তদুত্তরে বলিল "কি জানি মশাই, এক ভদ্রলোকের ছেলেকে এই বাড়ীর ভেতর থেকে টেনে বার করে দুজনে পড়ে খুব ঠ্যাঙ্গাচ্ছে। কি জন্যে, তা বুঝতে পারিনি—এত গোলমালে কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। যারা মারছে, তারা কেবল 'রাসকেল, রাসকেল' বলছে, আর বেদম মারছে !"

একটু চেষ্টা করিয়া মোহন ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইহার কারণ, যে দুই একটা আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, সে যেন পরিচিত কণ্ঠস্বরে। নিকটবর্ত্তী হইয়া মোহন দেখিতে পাইলেন যে, নরেশের পুত্র যোগেন্দ্রকে অপর দুইটী যুবা ধরিয়া আছে। তাহারা কি বলিতেছে, গোলমালে কিছু শোনা গেল না। বন্ধুর পুত্র দেখিয়া মোহন আর ইতস্ততঃ করিলেন না, ভিড় ঠেলিয়া একেবারে বাটীর দ্বার সমীপে যুবকগণের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন যুবকদ্বয় পুনর্ব্বার যোগেন্দ্রকে প্রহার করিতেছে।

"আহা-হা, আর মের না—ছেড়ে দাও !" বলিয়া মোহন যোগেন্দ্রকে ছাড়াইয়া লইয়া, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন, ও যুবকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা, আহা—হা ! এত করে মারলে কেন ? রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে ! কি করেছে যোগেন ?"

মোহনের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল "মারব না ? ওকে খুন করে ফেলব। আপনি সরে যান— না হলে আপনিও অপমান হবেন। রাসকেলকে আমি খুন করে না হয় ফাঁসী যাব।"

"একটু ঠাণ্ডা হয়ে কি হয়েছে বল দেখি বাবা ? রাগ হবার খুব কারণ আছে, তা বেশ বুঝতে পারছি,—না হলে তোমরা এত মারতে না। ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

অপর যুবা বলিল, "কি করেছে শুনবেন ত ভেতরে আসুন,—এখানে রাস্তার মাঝখানে, এত লোকের সামনে সে কথা বলা যায় না !"

"বেশ, তাই চল ; এস যোগেন।" বলিয়া মোহন যুবকদ্বয়ের পশ্চাতে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় যুবক বলিল, "এই সুকুমার আর যোগেন এক অফিসে চাকরি করে, দুজনে খুব বন্ধুত্ব। যোগেন প্রায়ই এখানে আসে—বসে, গল্প গুজব করে। এই রকম বরাবর হয়ে আসছিল। সুকুমারের family একটু enlightened ধরণের, মেয়ে ছেলেরাও, বন্ধু-বান্ধব এলে—যারা খুব আপনা আপনির মত, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন, তাতে কোন বাধা নেই। প্রায় ছ মাস আগে সুকুমারের ভগ্নী এখানে এসেছেন। মেয়েটীর সেকেলে হিসাবে একটু বয়স হয়েছে—তার তেমনই বা কি ? বছর ১৪।১৫ হবে। এখনও বিবাহ হয়নি। যোগেন অন্তরঙ্গ বন্ধু, এখানে আসে,—সুকুমারের স্ত্রী আর এই ভগ্নীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করত, কথাবার্ত্তা কইত। তার পর মশাই, রাসকেল কি করেছে জানেন—সুকুমারের ভগ্নীর—"

মোহন বাধা দিয়া বলিলেন, "হুঁ বুঝেছি, আর বলতে হবে না।"

যুবক উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না বোঝেন নি, ব্যাপারটা শুনুন। সুনীতির—এই সুকুমারের ভগ্নীর,—সঙ্গে একা হলেই প্রায় চুপি চুপি কথা কয়। সুকুমারের স্ত্রী প্রায় ছ'মাস সেটা লক্ষ্য করছেন ; কিন্তু এঁদের সরল মন, তখন কিছু মন্দ ভাবেন নি। তিনি জিজ্ঞাসা করলে, সুনীতি, বায়স্কোপের কথা হচ্ছিল, কি কোন নাটকের বা নভেলের কথা হচ্ছিল, এই রকম উত্তর দিত। দু' সপ্তাহ আগে এক দিন সুকুমারের বাড়ী আসতে একটু দেরী হয়েছে। বাড়ীতে ঢুকেই দেখে, রাসকেল এই বাইরের ঘরে সুনীতির কাছে বসে তার সঙ্গে খুব আস্তে কি কথা কইছে। ওর স্ত্রী সেই সময়টা সংসারের কি কাযে একবার ভেতরে গিয়েছেন। সুকুমারকে দেখেই, পাছে ওর কোন সন্দেহ হয়, পাঞ্জিটা বললে, সুকুমার, সিনেমায় কাল একটা নূতন ফিল্‌ম্ দেখে এলুম, সেই কথাই সুনীতিকে বল্‌ছিলুম। বলব কি, splendid ! অমন ফিল্‌ম্ আমাদের দেশে আর কখন আসে নি,—যথার্থই একটা দেখবার জিনিস। আমি, তোমরা যাবে বলে, চারজনের একখানা পাস নিয়ে

এসেছি। খাওয়া দাওয়া করে আসি। তোমরাও তৈয়ারি হয়ে থাক। তার পর সবাই একসঙ্গে যাওয়া যাবে। সুকুমারের একটু সন্দেহ হলেও কিছু বললে না। কেবল সুনীতিকে চা আনতে বলে, বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সুনীতির আর এর জেদে সিনেমায় সেদিন যাওয়া হল। তার পর মশাই আর কিছু এঁরা দেখেন নি। হঠাৎ কাল—আর কথায় কাজ নেই, আপনি নিজেই দেখুন—" বলিয়া যুবক সুকুমারের নিকট হইতে ৪।৫ খানি পত্র লইয়া মোহনের হস্তে প্রদান করিল ও বলিল, "বৌদিদি অর্থাৎ সুকুমারের স্ত্রী, সুনীতির বাক্‌সোয় দেখতে পেয়ে এইগুলো কাল বার করেছেন।"

মোহনলাল পত্রগুলি লইয়া একে একে পাঠ করিয়া দেখিলেন, যোগেন সুনীতিকে প্রেম পত্র লিখিয়াছে। শেষের দুইখানি পত্রে প্রেমের উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়াছে, যদি সুনীতি সম্মত হয়—তাহাকে লইয়া অন্য কোনও দেশে পলায়ন করিবে এবং দুই জন সুখে বাস করিবে। "সেখানে আমাদের এ পবিত্র প্রেমের পথে এত কণ্টক, এত বাধা-বিঘ্ন কিছুই থাকিবে না।" পত্রে যোগেন্দ্রের পিতার পুত্রের বিবাহের অসম্মতির কথার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। সুনীতির পিতা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না ; সুতরাং স্থান ত্যাগ ব্যতীত তাহাদের এ স্বর্গীয় প্রেমের পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা নাই।

সুকুমার সক্রোধে বলিল, "দেখলেন, বদমায়েসের আক্কেল দেখলেন মশাই ? একটা ভদ্রলোকের বংশে কলঙ্ক দেবার চেষ্টায় আছে। আমি ওকেও খুন করব, সঙ্গে সঙ্গে বোনটাকেও কেটে ফেলব, তার পর নিজে হতে ধরা দিয়ে না হয় ফাঁসী যাব।"

"শোন বাবা, স্থির হও। এ নিশ্চয়ই ভয়ানক রাগ হবার কথা। যা বলছ সব ঠিক। কিন্তু তা হলেও একটু বুঝে দেখতে হবে। এ তোমার ঘরের কেলেঙ্কারী, এ সকল কথা,—যা করবে তাইতেই অল্প-বিস্তর বাইরে বেরুবে, তাতে মুখে চুণ-কালি পড়বে, সেটা বুঝে দেখ। এখনও যথার্থ কিছু মন্দ হয় নি। এ কথা লোককে না জানিয়ে, চেপে যাওয়াই, আমার মতে, উচিত। যোগেনকে যা' মেরেছ—তা যথেষ্টই হয়েছে। কেন মারলে সে কথা আর লোকে নাই বা জানলে। এখন তোমাদেরই ভালর জন্যে আমি পরামর্শ দিই শোন। বোনটীকে কালই দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আর সঙ্গে সঙ্গে যাতে শীঘ্রই তার বিবাহ হয়, তারও চেষ্টা করতে বল। যোগেন যাতে এদিকে আর না আসে, সে ব্যবস্থা ওর বাপকে সমস্ত কথা বলে, আমিই করব।"

দ্বিতীয় যুবক মোহনের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "সুকুমার, সত্য কথা,—ইনি যা বললেন তাই করাই উচিত। এর ওপর আর মারধর করলে, একটা পুলিস কেস টেস হয়ে, শেষে সত্য সত্যই ঘরের কেলেঙ্কারী প্রথমতঃ কোর্টে, তার পর হয় ত খবরের কাগজে বেরোবে। যথার্থ ই তাতে মুখে চুণ-কালি পড়বে। তাতে সুনীতির বিবাহ দেওয়া শক্ত হয়ে উঠবে। তার চেয়ে ইনি যেমন বললেন, কালই সকালের ট্রেণে সুনীতিকে নৈহাটীতে পাঠিয়ে দাও ; আর শীঘ্র বিয়ের ব্যবস্থা করতে লিখে দাও, আসল কথা বাড়ীতেও না বলে' লেখ যে, মেয়ে বড় হয়েছে—লোকে বড় নিন্দা করে। আর যোগেনের কথা—ও যদি আর কোনও দিন এ মুখো হয়—তখন,—সে তখন যা হয় করা যাবে।"

দন্তে দন্ত চাপিয়া অনুচ্চ ক্রুদ্ধ স্বরে সুকুমার বলিল, "উঃ ! ইচ্ছে করছে মাথাটা গুঁড়ো করে দিই ! যাও—বড় বেঁচে গেলে। আর কোন দিন আমার সামনে পড়লে, কি এ গলিতে দেখতে পেলে, নিদেন হাতটা পাটাও ভেঙ্গে দেব। অফিসে উপায় নেই—দেখা হবে। কিন্তু কোন দিন আমার কাছে এস না—তাহলে রাগ সামলাতে পারব না। মুখ দেখছি—আর গা জ্বলে উঠছে ! দূর হয়ে যাও !" বলিয়া বাম হস্তে দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তে যোগেনের গলদেশ ধারণ করিয়া প্রচণ্ড বেগে সুকুমার এমন ধাক্কা দিল যে, সম্মুখস্থ পথের পাথরের উপর পড়িয়া তাহার নাক হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল।

৩

এক সপ্তাহ পরে এক দিন মোহনলাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাটী ফিরিবার সময় গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে সুকুমারের বাটীর সম্মুখীন হইতেই, সুকুমার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মশাই, একটা কথা আছে, একবার দয়া করে এদিকে আসবেন ?"

মোহন নিকটবর্ত্তী হইলে, সুকুমার একখানা টেলিগ্রাম তাঁহার হস্তে দিল। মোহন পাঠ করিলেন, "সুনীতি দুইদিন নিরুদ্দেশ, কলিকাতায় গিয়াছে কি না সংবাদ দিবে।" মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন "হুঁ, তার পর ?"

"তার পর বুঝলেন না ? যোগেনও বর্ম্মায় transfer হয়ে, ঠিক দুদিন আগে মেল ষ্টীমারে গেছে, এ কথা জানেন ত ?"

"বর্ম্মায় transfer হয়েছে ? যোগেন ? সে কি ! কই, আমি ত কিছু জানি না ! তবে আমি ৮।১০ দিন নরেশের বাড়ীর দিকে যেতে পারি নি, তাই তেমন কিছু খবর রাখি নি। এ transfer বোধ হয় হঠাৎ হল ?"

"না, ভেতরে ভেতরে অনেক দিন থেকে চেষ্টা করে, সমস্ত ঠিক করে, যাবার দু' তিন দিন আগে আমাদের অফিসে জানালে। ছোট সাহেবকে ধরে তাড়াতাড়ি Service transfer করিয়ে নিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম মত জাহাজ ভাড়া, গাড়ি ভাড়ার জন্য টাকা advance নিলে। তার পরেই বোধ হয় চুপি চুপি নৈহাটী গিয়ে, সুনীতির সঙ্গে মতলব স্থির করে, ভোরের গাড়িতে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আর সেই দিনই মেল ষ্টীমারে চলে গিয়েছে। নিশ্চিত বলছি—সুনীতিকে সেই নিয়ে গেছে।"

"উঃ, এর পরিণাম এতদূর খারাপ হতে পারে, তা আমি বুঝতে পারিনি। বদলী হয়ে তার মাইনে কত হল ?"

"এখানে ৫০৲ টাকা পাচ্ছিল, সেখানে বর্ম্মা সেক্রেটারিয়েটে ১৫০৲ থেকে ২০০৲ টাকার গ্রেডে গেল। এখন কি করা যায় বলুন দেখি ? বাবাকে এ টেলিগ্রামের আমি কি উত্তর দিই ?"

"ভেতরে চল, ঘরে বসে কথা কওয়া যাক।"

মোহনকে বৈঠকখানা ঘরে একখানা আরাম চেয়ারে বসাইয়া, সুকুমার দাঁড়াইয়া ভৃত্যকে তামাক সাজিয়া আনিতে বলিল। মোহন বলিলেন, "দেখ বাপু, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ষ্টীম ন্যাভিগেশনের গঙ্গাতীরের অফিস এখন খোলা নেই। কাল দশটার পর তোমাতে আমাতে গিয়ে খোঁজ করলেই জানা যাবে যে সে একা passage book করেছে, না সঙ্গে আর কেউ আছে।"

"যদি Deck passenger হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ত নাম পাওয়া যাবে না।"

"না, তা যাবে না বটে, তবু দেখা যাক ! নাম না পেলে, জাহাজের অফিসের বাবুদের জিজ্ঞাসা করে দেখা যাবে, যদি কারও কিছু মনে থাকে।"

পর দিন তাহারা জাহাজ-অফিসে খোঁজ করিয়া কোন সন্ধানই পাইল না। রেঙ্গুনেও অন্যের দ্বারা অনুসন্ধান করা হইল ; সেখানেও সুনীতির সন্ধান মিলিল না।

৪

পাঁচ বৎসর পরের কথা। এক দিন নরেশের বৈঠকখানায় মোহন ও নরেশ বসিয়া আছেন, এমন সময় "বাবু, চিঠি আছে।" বলিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাক পিয়ন ডাকিল, ও তখনই ভৃত্য একখানি রেজেষ্ট্রি করা বড় খাম ও তাহার রসীদ আনিয়া নরেশের হস্তে প্রদান করিল। স্বাক্ষর করিয়া রসীদখানা ভৃত্যকে ফিরাইয়া দিয়া, নরেশ পত্রখানা খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর হইতে এক তাড়া নোট ও দুইখানি পত্র বাহির হইল। প্রথম পত্রখানি দুই এক ছত্র পাঠ করিয়াই নরেশ বিকৃত ও কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "মোহনদা, মোহনদা ! তুমি পড় ভাই, আমি পারব না ! জানি না, কি বজ্র এতে আছে ! তুমি দেখ ভাই, আমার ভাল বলে বোধ হচ্ছে না।"

পত্র দুখানি লইয়া মোহন নোটগুলি নরেশের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এগুলো ধর।" তৎপরে মনে মনে নিম্নলিখিত পত্র পাঠ করিলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণ সমীপেষু

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,—

বাবা ! আপনাকে এ সম্বোধন করিবার অধিকার না থাকিলেও, তিনি ধর্ম্মতঃ আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই পিতৃ সম্বোধন করিতে সাহসী হইলাম।

বহু সন্ধানের পরও আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতা আমাকে পান নাই। কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গে আসিয়া তাঁহার পত্নীরূপে রেঙ্গুনেই ছিলাম, এবং এখনও আছি। এ কথা আর এখন গোপন করিবারও কোন প্রয়োজন নাই।

পাঁচ বৎসর বেশ সুখেই ছিলাম। বিধাতার বুঝি আমাদের এ সুখ সহ্য হইল না। ছয় মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ গত আশ্বিন মাস হইতে সন্ধ্যাকালে তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম "ও কিছু নয়" বলিয়া অগ্রাহ্য

করিয়া পরে যখন কাসি দেখা দিল ও বুকে ব্যথা বোধ করিতে লাগিলেন—আমার অত্যন্ত ভয় হইল। আমারই জেদে প্রথমে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, থাইসিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তবে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিলে, ও সাবধানে থাকিলে ভয় নাই, আরাম হইয়া যাইবে। রোগের নাম শুনিয়া আমার অত্যন্তই ভয় হইল, ও বড় সাহেব ডাক্তার ডাকা হইল। তিনিও ঐ একই কথা বলিলেন। তাঁর অফিসের বড় সাহেবের বিশেষ অনুরোধে সাহেব ডাক্তার স্বয়ং চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এক মাস চিকিৎসার পর বেশ ভাল হইয়া আসিল। জ্বর বন্ধ হইল, গায়ে বলও পাইলেন। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের ইচ্ছায় ঔষধ বন্ধ হইল না, চলিতে লাগিল। তিন মাস ঔষধ খাইয়া ও সাবধানে থাকিয়া তিনি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার ও আমরাও সবাই ভাবিলাম, রোগ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরে বোঝা গেল, সে আমাদের ভ্রম। মাঘ মাসের শেষে হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যাকালে জ্বর হইয়া বাড়ী আসিলেন। সেই রাত্রেই কাসিতে কাসিতে অনেকটা রক্ত উঠিল। আমার অত্যন্ত ভয় হইল ; কিন্তু তখন রাত একটা, ডাক্তার সাহেবকে ডাকা হইল না। পর দিন ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'গ্যালসিং থাইসিস', চাপা ছিল, এত দিন পরে দ্বিগুণ তেজে পুনরাক্রমণ করিয়াছে। আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। ডাক্তার সাহেব প্রবোধ দিয়া ও আশা ছাড়িতে মানা করিয়া চলিয়া গেলেন। পুনর্ব্বার চিকিৎসা হইতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব আর একজন বড় ডাক্তার সাহেবকে আনিয়া পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। এবার বারো দিন রোগশয্যায় থাকিয়া এই ফাল্গুন মাসের ১০ই তারিখে সন্ধ্যাকালে এ অভাগীর মস্তকে বজ্রঘাত করিয়া ও তিন বৎসরের শিশু পুত্রকে অনাথ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বাবা, আমি আর কি বলিব ? বলিবার মুখ আমার নাই। পিতামাতার কাছে ফিরিতে পারিব না, তদপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে মঙ্গল। আপনি চরণে আশ্রয় না দিলে, আমি আর দেশে কালামুখ দেখাইব না, কোনও না কোনও প্রকারে তাঁহারই অনুগামিনী হইব। এত দিন হইতাম, আজ চার দিন হইল গিয়াছেন, এত দিন এ পাপ প্রাণ রাখিতাম না। কিন্তু বাবা, সে উপায়ও তিনি রাখিয়া যান নাই,—আমি মরিলে খোকার কি হইবে ? এ শিশুকে কাহার হস্তে দিয়া আমি তাঁহার অনুগামিনী হই ? বাবা, আর কিছু হোক আর না হোক, অন্ততঃ তাঁহার সন্তান বলিয়া এই অবোধ শিশুটাকে চরণে স্থান দিবেন। তাহাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারি।

এই কয় বৎসর তিনি সংসারে ব্যয় করিয়া ৩৫০০৲ টাকা রাখিয়াছিলেন। অল্পমাত্র রাখিয়া সমস্ত পাঠাইলাম। এরূপ অসহায় অবস্থায় বিদেশে সঙ্গে এত টাকা রাখিতে সাহস করিলাম না।

দয়া করিয়া তাঁহার পুত্রের কোনও ব্যবস্থা করিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার আশ্রয় চাহিবার মুখ নাই, তবে যদি বাটীতে দাসীরূপে আমাকে স্থান দেন, তাহা হইলে আপনাদের সেবা করিয়া অভাগিনী কৃতার্থ হইবে।

উত্তরের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি

অভাগিনী

সুনীতি।

অপর পত্রখানি ক্ষুদ্র। যোগেন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া, মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অতি করুণ ভাষায় পিতামাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও সুনীতি ও পুত্রের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে।

মোহন ধীর ভাবে বলিলেন, "নরেশ, বুক বাঁধ ! তোমার ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত। অস্থির হয়ো না ! যোগেন মারা গিয়েছে। সে তোমার উপর ভয়ানক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছে। সে ভার ঠেলতে পারবে না। তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন, তার স্ত্রী আর তার ছোট ছেলেটীকে তোমাকে বুকে করে রাখতে হবে।"

নরেশ চীৎকার করিলেন না, কোনও রূপ অস্থিরতাও প্রকাশ করিলেন না। পত্র দুইখানি নরেশের হস্তে দিয়া মোহন বলিলেন "এইবার ধীরভাবে পড়।"

সমস্ত পাঠ করিয়া নরেশ একদৃষ্টে মোহনের মুখপানে চাহিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"নরেশ, এখন কঠোর কর্ত্তব্য তোমার সামনে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে হলেও ধর্ম্মতঃ সুনীতি তার স্ত্রী, আর তার

ছেলে তোমার নাতি, তাদের তুমি ফেলতে পারবে না। হিন্দুশাস্ত্র মতে তাদের বিবাহও হয়েছিল। এখানে কেউ জানবে না, সবাইকে বলা যাবে, যোগেন রেঙ্গুনে গিয়ে এক রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের মেয়েকেই বিবাহ করেছিল, অবশ্য তোমার অনুমতি না নিয়ে। আমার মতে তাদের এখনই সেখানি থেকে নিয়ে এস। আহা, অনাথা স্ত্রীলোক, সেই দূর দেশে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে কি বিপদে পড়েছে, একবার ভেবে দেখ। আমি বলি, কালই সুনীতিকে একখানা তার করে দাও,—বলে দাও যে, তাদের আনবার জন্য দু' এক দিনের মধ্যে লোক যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দেবারও ব্যবস্থা কর। কি, পার ত, তুমি নিজেই দিন পনেরো ছুটি নিয়ে গিয়ে তাদের এনে ফেল। তুমি নিজে যাও ত এখানে দেখবার শোনবার জন্য আমি ব্যবস্থা করে দেব। আর তুমি না যেতে পার ত, না হয় আমার ছেলেকে তাদের আনবার জন্য রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেব। এর অন্যথা কোরো না, আর দেরিও কোরো না। কি জানি, দেরি হলে একা অনাথা স্ত্রীলোক—হঠাৎ যদি একটা ভয়ানক কাণ্ড করে বসে! টেলিগ্রাম একটা কালই করে দাও।"

কম্পিত-কণ্ঠে নরেশ বলিলেন "তাদের আনতে হবে বই কি মোহনদা, না হলে আর কি নিয়ে সংসারে থাকব বল?" তৎপরে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মোহনদা! সত্য সত্যই আমার বংশটা লোপ হল?"

"কে বললে বংশ লোপ হল? তোমার বংশধর বর্ত্তমান রয়েছে। কালই তুমি ছুটি নাও। আসছে মেলে নিজে রেঙ্গুন চলে যাও, নিজে সঙ্গে করে বংশধরকে বাড়ী নিয়ে এস।"

মহিষুর

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল

বাঙ্গালোরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া এক দিন (২৭শে জুন, ১৯২০) ভোরের ট্রেণে মহিষুর যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে মহিষুরের একজন রাজকর্ম্মচারী ও একজন ফরাসী পাদ্রি আমার সহযাত্রী হইলেন। মহিষুর রাজ্য সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাদের নিকট শুনিতে পাইলাম।

বাঙ্গালোর ও মহিষুরের মধ্যপথে মাদ্দুর ষ্টেসন। এই স্থান হইতে ৩০ মাইল দূরে শিবসমুদ্রম্ গ্রামের নিকট কাবেরী নদীর বিখ্যাত জলপ্রপাত। বিখ্যাত হইলেও ইহা মহিষুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান জলপ্রপাত নহে। শিমোগা জেলায় সরস্বতী নদীর জলপ্রপাত ভারতবর্ষের সকল জলপ্রপাতের শীর্ষস্থানীয়। উহা "গার্সপা জলপ্রপাত" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বিশাল জলপ্রপাতের দৃশ্য অতুলনীয়। কিন্তু শিবসমুদ্রমের জলপ্রপাত কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহে। বিজ্ঞানবলে এই স্থানে কাবেরী নদীর প্রচণ্ড বেগ বশীভূত করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হইতেছে। বাঙ্গালোর, মহিষুর, এবং সুদূর কোলার জেলার স্বর্ণখনি সমূহে যে তাড়িতালোকের ব্যবস্থা আছে, উহার মূলে কাবেরী জলপ্রপাতজাত বিদ্যুৎশক্তি। এই জলপ্রপাত ও বিদ্যুতের কারখানা দেখিতে হইলে, মাদ্দুর ষ্টেশনে নামিয়া শিবসমুদ্রম্ যাইতে হয়।

রেলওয়ে লাইনটি শ্রীরঙ্গপত্তন সহরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নদীর দুই শাখা দ্বারা বেষ্টিত—এই জন্য ইহাকে একটি দ্বীপ বলা যাইতে পারে। আমার সহযাত্রিদ্বয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ এবং টিপু সুলতানের যুদ্ধে প্রাণদানের কাহিনী আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সৈন্য নদীর অপর পার হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া, দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ ধ্বংস করিয়া, দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই ভগ্ন প্রাচীর এবং দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। রেলওয়ে ষ্টেশনটি দুর্গের সীমানার মধ্যেই

স্থাপিত হইয়াছে। ষ্টেশনের অদূরে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর প্রাচীন মন্দির। এই দেবতার নাম অনুসারেই এই নগরের নাম শ্রীরঙ্গপত্তনম্।* ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ টিপু সুলতানের দুর্গাভ্যন্তরে এই হিন্দু মন্দিরে নারায়ণ বিগ্রহ প্রত্যহ পূজিত হইতেন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীরঙ্গপত্তন নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে 'লাল-বাগ' উদ্যানে টিপু পিতার কবরের উপরে একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। টিপুর মৃতদেহও এই সমাধি-মন্দিরে সমাহিত

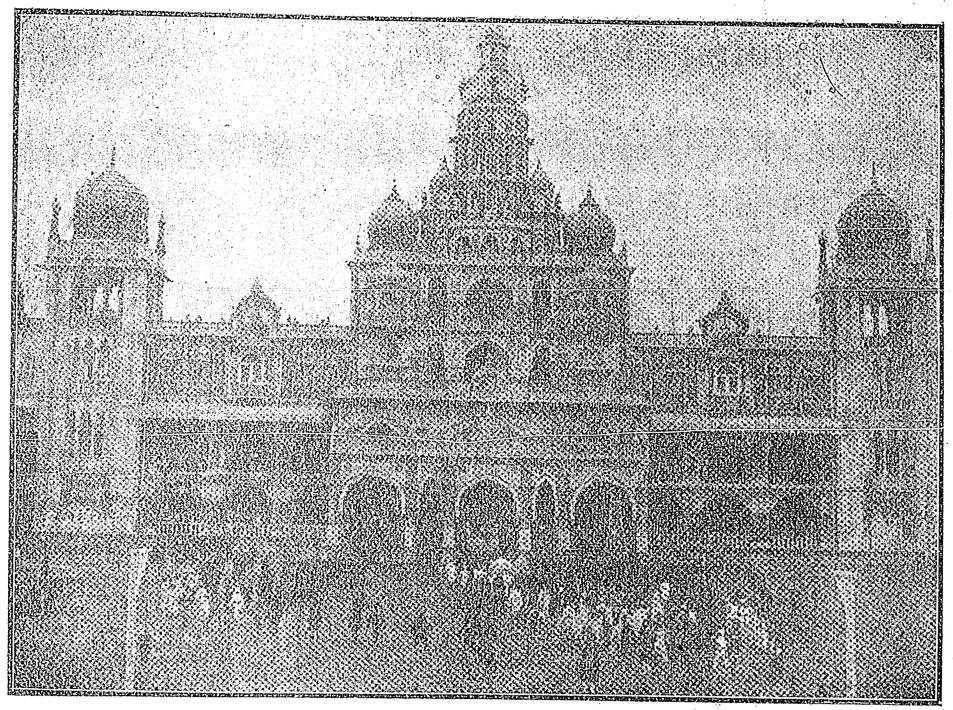

মহিষুর রাজপ্রাসাদ

হইয়াছিল। এই সুদৃশ্য সমাধি-মন্দিরের নাম "গুম্বজ", ষ্টেশন হইতে ইহা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে মহিষুরের দূরত্ব ৮ মাইল মাত্র। বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা মহিষুরে পৌঁছিলাম। মহিষুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমার একজন বন্ধু পূর্ব্বেই আমাকে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষ্টেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং এই নূতন স্থানে আসিয়া আমাকে কোনই অসুবিধায় পড়িতে হইল না। আহারাদির পর, তাঁহার সঙ্গে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। মহিষুর সমুদ্র সমতল হইতে ৮০০ ফিট উচ্চ রাজধানী হইলেও, রাঙ্গালোর অপেক্ষা এই নগর অনেক ছোট। বাঙ্গালোর আয়তনে ২০ বর্গমাইল, মহিষুর ৭॥ বর্গমাইল মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালোরের ন্যায় মহিষুরও ক্রমশঃ উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। রাজপথগুলি প্রশস্ত ও ঋজু। বিশ্ববিদ্যালয়, মহারাজার কলেজ, মহারাণীর কলেজ, মিশনারী কলেজ, বিচারালয়, পাঠাগার, চিকিৎসালয় ইত্যাদি বিবিধ অট্টালিকা নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। মহিষুর রাজ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং শিক্ষার উন্নতি সাধনকল্পে

* ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরও এই কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। ঐ স্থানের নাম—"শ্রীরঙ্গম"; রামানুজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উহা প্রধান তীর্থ।

রাজসরকারের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—মহিষুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। মহিষুরের ২টি এবং বাঙ্গালোরের ২টি, এই ৪টি কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন কলেজ, লাইব্রেরী প্রভৃতি সৌধশ্রেণী দর্শন করিলাম। তাহার পরে নগরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপনীত হইলাম। রাজপ্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরে। ফটকের এক পার্শ্বে দেব-মন্দির, এবং

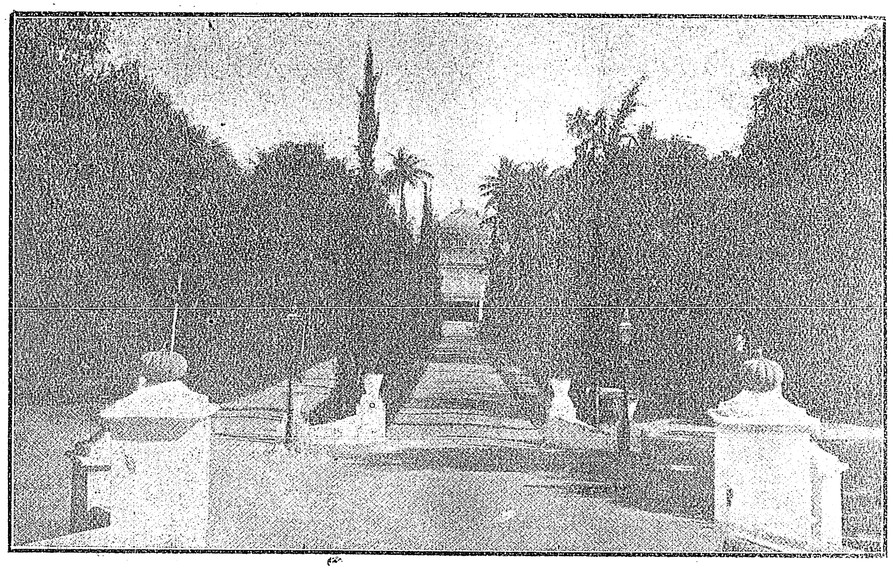

টিপুর সমাধি—শ্রীরঙ্গপত্তনম্

প্রাচীর গাত্রে শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাতের চিত্র। প্রাসাদটি হিন্দু স্থাপত্য আদর্শ অনুসারে গঠিত। ইহার স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়া দূর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্গের এক সীমায় একটি প্রকাণ্ড জলাশয়—"ডোড্ডা কেরি।" বর্ত্তমান দুর্গ ও রাজপুরী খুব বেশী প্রাচীন নহে। কিন্তু প্রাসাদে যে রাজসিংহাসনখানি রক্ষিত হইয়াছে, উহার ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধান-যোগ্য। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে মহিষুরের রাজগণ পুরুষানুক্রমে এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আসিতেছেন। জনপ্রবাদ অনুসারে মহিষুর রাজভবনে আনীত হইবার তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই সিংহাসন প্রাচীন হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যাদববংশীয় বিজয় নামক একজন যুবক, মহিষুরের ১৫ মাইল দক্ষিণে হাদিনাড় নামক জনপদে আসিয়া স্থানীয় "উদেয়ারে"র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তিই বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ, ও মহিষুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রাচীন বিজয়নগর-রাজের একজন প্রতিনিধি শ্রীরঙ্গপত্তনে থাকিয়া দেশ-শাসন, এবং মহিষুরের উদেয়ার রাজগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। কালক্রমে এই প্রতিনিধি-রাজা শক্তিহীন হইয়া পড়িলে, ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মহিষুরের তদানীন্তন রাজা শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিয়া সেইখানেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, শ্রীরঙ্গপত্তন মহিষুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে মহিষুর রাজবংশকে নির্ব্বাসিত করেন, এবং মহিষুরের প্রাচীন দুর্গ ও রাজপুরী ভূমিসাৎ করিয়া দেন। টিপুর পতনের পরে, লর্ড ওয়েলেস্‌লী নির্ব্বাসিত রাজবংশের ৪ বৎসর বয়স্ক একটি বালক—কৃষ্ণরাজা উদেয়ারকে মহিষুরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। সেই সময়ে মহিষুর পুনরায় রাজধানীতে পরিণত, এবং এখানে নূতন দুর্গ ও

রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অগ্নি লাগিয়া প্রাসাদের কিয়দংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। সেই অংশ আরও শোভা সম্পন্ন করিয়া পুনর্গঠিত হইয়াছে।

মহারাজার বৃহৎ অশ্বশালা দেখিয়া আমরা চিড়িয়াখানা দেখিতে গেলাম। চিড়িয়াখানায় অনেক দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু রক্ষিত হইয়াছে। দর্শকের সংখ্যাও কোন দিন কম হয় না।

"হার্ডিং সার্কল" নামক একটি বৃত্তাকার উদ্যান নগরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। লর্ড হার্ডিংয়ের মহিষুর আগমন উপলক্ষে এই উদ্যানের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। "কার্জন পার্ক" লর্ড কার্জনের মহিষুর ভ্রমণের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। মহিষুরের "রেস্ কোর্স" এর ন্যায় সুন্দর ঘোড় দৌড়ের মাঠ দক্ষিণভারতে আর নাই। সেই মাঠ দেখিয়া আমরা "ললিতাদ্রি" পাহাড়ে আরোহণ করিলাম। এই পাহাড় হইতে সমস্ত সহরটির সাধারণ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সহরের দুই মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে বিখ্যাত চামুণ্ডী পাহাড়। এই পাহাড়টি ৩৪৫৮ ফিট উচ্চ। শৈলশিখরে মহিষুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডার মন্দির। প্রবাদ অনুসারে এইখানে দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এই মহিষাসুর হইতেই, এই স্থানের নাম হইয়াছিল "মহিষ-উর" অর্থাৎ মহিষ-পুরী। পর্ব্বত শিখরে উঠিবার জন্য প্রশস্ত পথ এবং সোপানাবলী আছে। সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে পৌঁছিবার পথের এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড "নন্দী" অর্থাৎ বৃষ-মূর্ত্তি আছে! মূর্ত্তিটি ১৬ ফিট উচ্চ। একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর খুদিয়া সমগ্র মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মহিষুর-রাজ ডোড্ডা দেবরাজা এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চামুণ্ডী পর্ব্বতে মহারাজার একটি প্রাসাদ আছে। বর্ত্তমান মহারাজা অনেক সময় চামুণ্ডী প্রাসাদে বাস করেন।

কাবেরী Power House—বিজলী কারখানার কল্যাণে মহিষুরে তাড়িতালোকে যথেষ্ট সুলভ। সন্ধ্যার

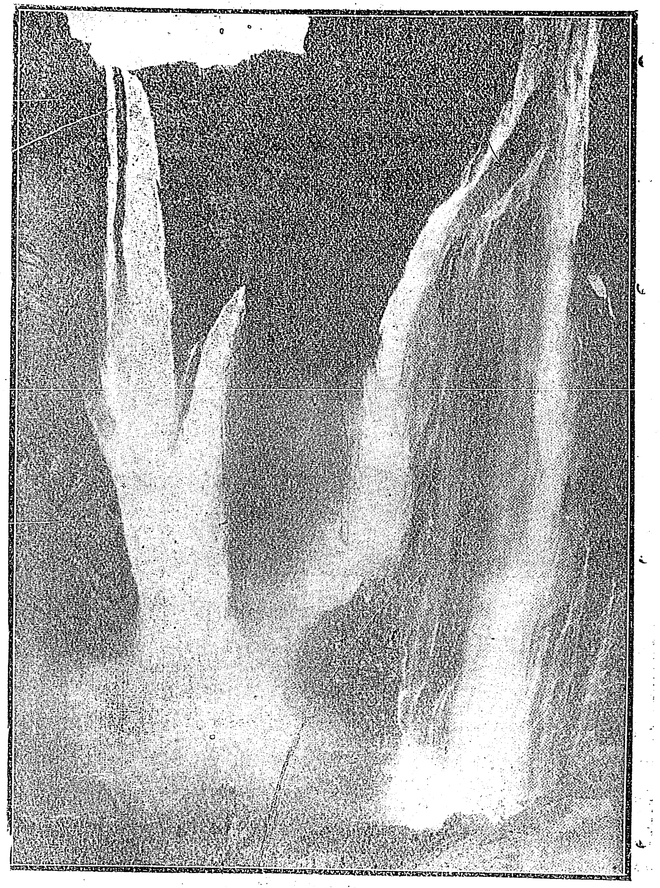

গার্সপা জলপ্রপাত

পর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় ভূষিত সহরের দৃশ্য দেখিতে অতি সুন্দর। রাজপ্রাসাদের শিখরে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ আলোক মহারাজার রাজধানীতে উপস্থিতির নিদর্শন। চামুণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত সোপানাবলী বৈদ্যুতিক আলোকমালায় আলোকিত; দূর হইতে ঐ

আলোকরাজি পর্ব্বত-গাত্রে অঙ্কিত একটি বক্র আলোক-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মহিষুর রাজ্যে, চামুণ্ডী পর্ব্বতের ন্যায় পৌরাণিক কাহিনী-সংশ্লিষ্ট স্থান আরও আছে। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরি, কাদুর জেলায় তুঙ্গভদ্র নদী তীরে

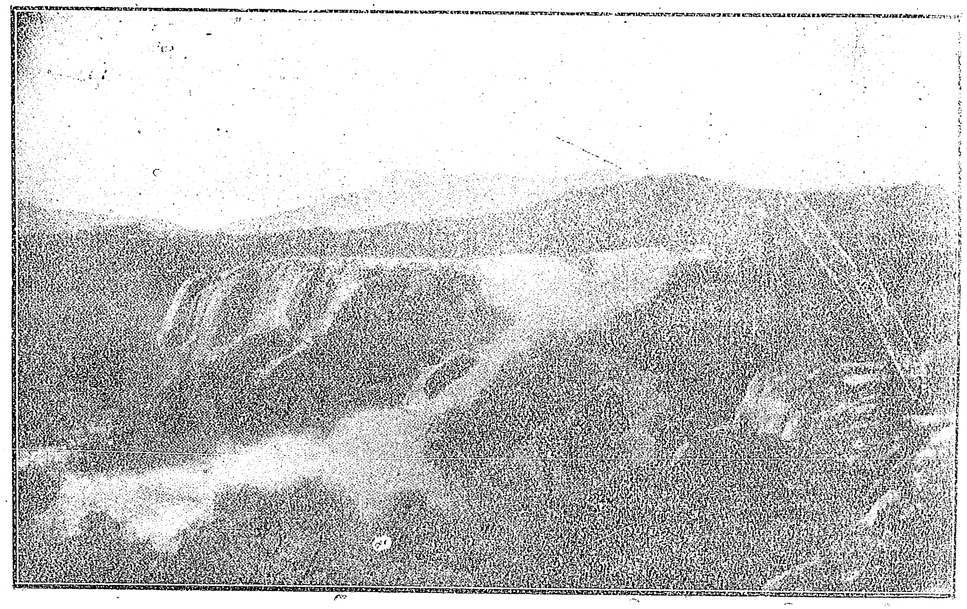

কাবেরী জলপ্রপাত—শিবসমুদ্রম্

অবস্থিত। রামায়ণী যুগে বর্ত্তমান মহিষুর রাজ্যের অধিকাংশই দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ছিল। জনপ্রবাদ অনুসারে যে স্থানে মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল, উহাই বর্ত্তমান শৃঙ্গেরি। বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য কৌশলে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের নাম অনুসারে স্থানটির নাম হয় "ঋষ্যশৃঙ্গগিরি"—সংক্ষেপে "শৃঙ্গগিরি"। ইহারই অপভ্রংশ শৃঙ্গেরি। আধুনিক কালে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত মঠের জন্যই শৃঙ্গেরি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বিখ্যাত।

মহিষুরের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে মণিপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে লিখিত আছে, অর্জ্জুন বনবাস কালে মণিপুর রাজ্যে আসিয়া রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এই চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার বভ্রুবাহন নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই মণিপুর আসামের অন্তর্গত বলিয়াই আমরা বাল্যাবধি শুনিয়া আসিয়াছি, এবং মণিপুরের রাজবংশও বভ্রুবাহনকে তাঁহাদের আদি পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্ব্বে অর্জ্জুন-বনবাস-পর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুনের যে ভ্রমণ-বিবরণ আছে, তদনুসারে মণিপুর দক্ষিণ ভারতে "মহাসাগরের উপকূল মার্গে" অবস্থিত। মহিষুরের প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মহিষুরের ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বর্ত্তমান চামরাজ নগরের নিকটে প্রাচীন মণিপুর নগর ছিল। যে পুরীতে আসিয়া অর্জ্জুন এক দিন চিত্রাঙ্গদাকে বলিয়াছিলেন

আমি পার্থ, দেবি, তোমার হৃদয়-দ্বারে প্রেমার্ত্ত অতিথি—

সেই রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ সেখানে এখনও না কি বিদ্যমান আছে।

যাঁতি-কল

মৌলবী তরিকুল আলম এম-এ, বি-এল্

সূচনা

যাঁতি-কল! যাঁতি-কল! যাঁতি-কল! ঘুমের ভেতর মনে হ'চ্ছিল যেন মগজটাকে কে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। কাণের ভেতর ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে। চোখ দিয়ে আগুনের ঝল্‌ক বের হ'চ্ছে। জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একটা চাপা গোঁগানির শব্দ মুখ থেকে বের হ'লো। শরীরটা আপনা-আপনি নড়ে উঠে পাশ ফির্‌তে চাইল—হাতটা গিয়ে কার গায়ে পড়্‌ল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে। গিয়ে জাফর শুন্‌তে পেল তার স্ত্রী তাকে ডাক্‌ছে, আর বল্‌ছে, তখনি তোমায় বার বার বারণ কর্‌লাম, তবুও গেলে। জাফর তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল, দু'হাত দিয়ে চোখ দু'টো খুব ভাল করে, রগড়ে নিল, গলাটা উঁচু করে, ঘাড়টা লম্বা করে, মাথাটাকে বার কয়েক ভাল করে এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে নিল, তার পর বিছানা ছেড়ে একেবারে মেজের ওপর নেমে দাঁড়াল। ঠং ঠং করে ঘড়িতে ক'টা বাজ্‌ল, চেষ্টা করেও জাফর তা' গুণতে পারল না। একটু বাদে শুন্‌তে পেল, পাড়ার মস্‌জিদ্ থেকে শব্দ আস্‌ছে। আস্‌সালাতো খয়রুম্ মিনন্ নওম!' 'আস্‌সালাতো খয়রুম্ মিনন্ নওম!' ঠিক ত। ঘুমোনের চেয়ে নমাজ পড়া ভাল। অনেক দিন পরে জাফর ওজু করে নমাজ পড়্‌তে গেল।

দিনটা এক রকম কেটে গেল, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়া অবধি আবার যেন কেমন কেমন বোধ হ'তে লাগ্‌ল। রাতে খাওয়ার সময় জাফরের স্ত্রী জিদ্ ধরে বস্‌ল তাকে বল্‌তেই হ'বে—নইলে একটা খুন-খারাবি হ'বে।—তা হোক্, হাজার বন্ধু হ'লেও কেহ ঘরাও বিবাদের কারণ হ'তে পারে না। একজনাকে না বল্লে, মনের ভার যাবে না, শরীরও সুস্থ হ'বে না। বন্ধু যখন আর কাউকে বলতে বারণ করেছে, তখন একমাত্র স্ত্রীকে ছাড়া আর কা'কে বলা যেতে পারে? হোক্ না বন্ধু মৃত—হোক্ না তা'র কাছে প্রতিজ্ঞা সব প্রতিজ্ঞার চেয়ে অলঙ্ঘনীয়,—তবুও, যখন নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি তখন বল্‌তেই হ'বে। নইলে কিন্তু—। শেষের দিকে জাফরের স্ত্রীর গলার স্বরটা কেমন একটু ভার ভার শোনাচ্ছিল; আর তার চোখের কোণায় আলো পড়ে কিসের একটা ছোট্ট বিন্দু দক্ দক্ করছিল। জাফর মনে মনে ভাবছিল, এম্‌নি করেই বাবা আদমকে মা হাওয়া নিষিদ্ধ ফল খেতে স্বীকার করিয়েছিলেন।—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাফর বল্‌তে লাগল...

জাফরের কথা

সে আজ বছর পঁচিশের কথা—হোসেন আর আমি এক সঙ্গে পড়্‌তাম। আমার বাসা ছিল ধরম্‌তলার মোড়ের পূবদিকের একটা গলিতে, হোসেনের ছিল পশ্চিমের দিকের একটা গলিতে। আমরা দু'জনে প্রায় প্রত্যেক দিন এক সঙ্গে ট্রামে চড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়্‌তে যেতাম। দু'বছর মাত্র আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম।—কিন্তু এর ভেতরেই আমাদের দু'জনাতে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। হোসেন বড্ড শান্ত শিষ্ট ছিল। বাসা থেকে এসে ট্রামে চড়ে কলেজে যাওয়া, আর কলেজ থেকে ট্রামে চড়ে এসে বাসায় যাওয়া,—বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল এইটুকু। কথাবার্ত্তা ও বল্‌ত নিতান্তই কম—নেহাৎ দরকারি, যা না বল্লে চলে না, এম্‌নি দু'চারটা কথা বল্‌ত। কিন্তু মুখখানা ওর সদাই বেশ প্রফুল্ল থাকত। মনে হ'তো, যেন দুনিয়াতে সুখ ছাড়া দুঃখের সন্ধান ও কখনও পায় নি। ট্রামে যেতে যেতে যখন মোড়ের কাছে কি চৌরাস্তায় ট্রাম দাঁড়াত, তখন এক এক দিন এমন এক একটা ভিক্ষুক ভিক্ষা কর্‌তে আস্‌ত যে তা'দের দেখে আল্লার ওপর রাগ না হয়ে পারত না। মনে হ'তো, এ-গুলিকে ত আল্লা ইচ্ছা কর্‌লে এখুনি মেরে ফেল্‌তে পারেন,—খামাখা যন্ত্রণা দিতে কেন এদের বাঁচিয়ে রেখেছেন? আবার কোন কোন দিন মিউনিসিপ্যালিটীর ওপর রাগ

হ'তো। এমন করে ভিক্ষা করা আইন করে কেন বন্ধ করে দেয় না? এই রাগের মাথায় ভিক্ষা দেওয়া আমার ত কোন দিন ঘটেই উঠ্‌ত না, যদিও মনে হ'তো কিছু দেই,—কিন্তু হোসেনকে দেখ্‌তাম, সেই তার হাসি মুখে কোন দিন বা দু'পয়সা, কোন দিন বা চার পয়সা, যেদিন যেমন পকেটে থাক্‌ত, ওদের ভিক্ষা পাত্রে ফেলে দিচ্ছে। এক দিন এক বেটা কুষ্ঠ রোগী ওর সেই ঘায়-ভরা ঠুঁটো আঙুল দিয়ে হোসেনের র‍্যাপারটা ধরে টান্‌ছিল। দেখে ত রাগে আর ঘৃণায় আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। হোসেন কিন্তু কেবল একটু হেসে তাকে একটা দু'আনি দিয়ে দিল, আর কলেজে গিয়ে আলওয়ানখানা একটা কাগজে মুড়ে আলাদা করে রাখ্‌ল। সে দিন ওর খাতিরে আমায় পর্য্যন্ত হেঁটে বাসায় ফির্‌তে হ'লো। ট্রামের পয়সা আমি দিতে গেলাম, কোন মতেই নিলে না। সে দিন কিন্তু সত্যি সত্যি ওর ওপর আমার রাগ হ'চ্ছিল।

তার পর হোসেন আই-এ পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়্‌তে গেল। কলেজের কাছেই একটা মেসে থাক্‌তে লাগল। আমি আমার পুরানো বাসাতে থেকেই বি-এ, এম-এ, বি-এল, পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। এর মাঝে ক্বচিৎ কখনও হোসেনের সঙ্গে দেখা হ'তো,—সেই পুরান হোসেন; সেই হাসি মুখ, সেই স্বল্প ভাষ।

আজ বছর দশেক হ'লো, সে দিনের কথা তোমারও নিশ্চয় মনে আছে, সেই যে দিন বড়ছেলেটা—বড়ছেলের কথা মনে পড়ায় দু'জনাই খানিক্ চুপ করে রইল। হায়! ছেলেটা যদি বেঁচে থাক্‌ত, তা' হ'লে আজ হয় ত বি-এ এম্-এ পাশ করত। যাক্—ফুট্‌বল ম্যাচ্ দেখ্‌তে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর গায়ে ফিরে এল। সে দিন রাত এগারটায় যখন ওর জ্বর বড্ড বেড়ে উঠ্‌ল, তখন আর কাউকে না পেয়ে, আমি নিজেই ডাক্তার ডাক্‌তে বের হ'লাম। গেট থেকে বেরিয়েই দেখি, সাম্‌নে দিয়ে মোটরে চড়ে হোসেন যাচ্ছে। আমরা পরস্পরকে চিন্‌লাম। আমার মুখের উদ্বিগ্ন ভাব বোধ হয় ও লক্ষ্য করেছিল। মোটর থামিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল, কারুর অসুখ না কি? আমি শুনেছিলাম, হোসেন ভাল ডাক্তার হয়েছে, পশারও ভাল হয়েছে। গেটের সাম্‌নেই ওকে পেয়ে মনে হলো, আল্লা বুঝি খাস করে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে টান্‌তে টান্‌তে একেবারে ওপরে বড় ছেলের বিছানার কাছে নিয়ে গেলাম। ও পরীক্ষা করে বল্‌লে, ভয়ের কোন কারণ নেই। সেই থেকে আমাদের কলেজের ভাব নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া হ'লো। ক'দিন ছেলেটার অসুখের জন্য ও প্রত্যহ দু'বেলা করে আস্‌ত। তখন নিজেদেরই সামাল সামাল—হোসেনের দিকে আমি বিশেষ করে নজর দিতে পারি নি। ছেলেটা যখন ভাল হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, তখন এক দিন হঠাৎ যেন আমার চোখে পড়্‌ল, হোসেনের চেহারায় একটা পরিবর্ত্তনের ভাব। সেই হাসি মুখে লেগেই আছে বটে, কিন্তু ওপর ঠোঁটের কোণ দু'টো যেন দু'ধারে ঝুলে পড়েছে—যেন কোন একটা অপ্রীতিকর চিন্তা সদাই মনের ভেতর লেগে রয়েছে, আর মনটাকে শক্ত করে সেটাকে দূর করে দেওয়ার জন্যে সদাই চেষ্টা হ'চ্ছে। এক দিন গল্প কর্‌তে কর্‌তে ওকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম আর কি, অমন মুখের ভাব ওর কেন হয়েছে। কিন্তু কপালের লেখা! সে দিন জিজ্ঞেস কর্‌লে, কে জানে, বোধ হয় আজ যা তোমায় বল্‌ছি, তা' বল্‌তে হ'তো না। প্রশ্নটা মনে মনে ঠিক করে কেবল 'আচ্ছা' পর্য্যন্ত বলেছি, এমন সময় ছোট ছেলেটা ধুড়্ মুড়্ করে এসে একেবারে হোসেনের গলা জড়িয়ে ধরে, চাচাজান! চাচাজান! আরম্ভ করে দিলে। আর জিজ্ঞেস করা হ'লো না। এর পর আরও অনেক দিন অনেকবার আমাদের এখানে, ওর ওখানে, ক্লাবে, পার্টীতে, সভায়, আরও কতখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কত কথা হয়েছে, কত বিষয় নিয়ে পরামর্শ হয়েছে, কিন্তু এ প্রশ্ন আমিও আর উঠাই নি, হোসেনও নিজে থেকে কোন দিন আমায় কিছু বলে নি। এম্‌নি করে বছরের পর বছর কেটে গেল, তারপর হঠাৎ...

সেই দোস্‌রা অক্টোবার তোমার মনে আছে। আমি ত এ জীবনে কোন দিন ঐ তারিখটা ভুল্‌তে পার্‌ব না। পাবনার জজের কাছে একটা ফৌজদারী আপীল করে দার্জ্জিলিং মেলে কল্‌কাতা ফির্‌লাম। সে দিন শনিবার। পাবনায় খবরের কাগজ দেখ্‌তে পারি নি, মনটা ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল। শেয়ালদহে নেমেই হুইলারের ষ্টল থেকে একখানা ষ্টেটস্‌ম্যান কিনে নিয়ে টেলিগ্রামের পাতাটা

উল্টোতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখ্‌লাম, হোসেনের নাম। কি যে পড়্‌লাম, প্রথমে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। চাপরাশীটা এসে বল্লে মোটর তৈরী রয়েছে। আমি কিছু উত্তর না করে, একটা বেঞ্চে গিয়ে বস্‌লাম। এক একটা করে শব্দ পড়ে' তা'র মানে করে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম, ব্যাপারটা কি। আমার মনে হ'লো যে, হয় আমিই পাগল হয়েছি, নয় ত খবরের কাগজওয়ালারা পাগল হয়েছে। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝ্‌লাম যে, কাগজে লিখ্‌ছে যে, হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ও ওর স্ত্রীকে খুন করেছে! বাসায় না এসে আমি বরাবর পুলিস কমিশনারের আফিসে গেলাম। কমিশনার সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁকে বল্‌লাম, আমি হোসেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই। তিনি তখনি বন্দোবস্ত করে দিলেন। হোসেনেরও ওঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল। কথার ভাবে মনে হ'লো, যেন হোসেনের জন্যে উনিও দুঃখিত। তাইতে বলা মাত্রই উনি সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমি জেলখানায় গেলাম হোসেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে। হোসেনকে নিয়ে এসে খাঁচার ভেতর পুরে দিল। আমি খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। হোসেনের সঙ্গে দেখা কর্‌বো শুনে, জেলার আমায় বল্‌ছিল যে, হয় ত হোসেন দেখা কর্‌বে না, কেন না, আমার আগে আরও ক'জন ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু হোসেন কারুর সঙ্গে দেখা করে নি। যা' হোক্ তবুও আমি খবর পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। মিনিট কয়েক পরে ওকে খাঁচার ভেতর ঢুক্‌তে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লাম। যাক্ তবুও দেখাটা হ'লো। ভেবেছিলাম দেখ্‌বো, হয় ত হোসেন একেবারে মুষ্‌ড়ে গিয়েছে, হয় ত এই ভীষণ বিপদের চাপে পড়ে ও একেবারে বসে পড়েছে। কিন্তু খাঁচায় লোক ঢোকার শব্দে আমি মুখ তুলে চাইতেই, ওর মুখের ওপর নজর পড়াতে, আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। সত্যি হোসেন, না সেই কলেজ-বয়সের হোসেনের একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি আমার মনের কোন রকম ভ্রান্তির বশে আমার সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি? তার পর হোসেন যখন হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলল, তখন আমার চমক ভাঙ্গল। সত্যি ত' এ ত' এখনকারই হোসেন। বন্দী হোসেন। খুনের দায়ে পড়ে মানুষ যে নবযৌবন লাভ করে, এই আমি প্রথম দেখ্‌লাম। কত মাওয়ার মোকদ্দমা করেছি, কত ফাঁসির আসামীর আপীল করেছি; কিন্তু এমন বিপদের মুখে এমন না-পরওয়া ভাব, শুধু না-পরওয়া বল্লেও ঠিক হয় না। এমন কেল্লা-ফতেহ্‌র ভাব আর ক্ষুরুর মুখে আমি কখনও দেখি নি। ওর মুখের ওপরে ঠোঁটের দু'কোণের সেই ঝুলে পড়া ভাবটা আর মোটেই ছিল না। ওর সারাকালের সেই হাসিটী যেন রিফাইন হয়ে ওর সারা অঙ্গে ছাপিয়ে পড়েছিল। আর ওর চোখ দু'টোর ভাব ছিল, যেন পয়লা বসন্তের পয়লা কুঁড়ি ফোটা গোলাপের মত—একেবায়ে নতুন, একেবারে প্রথম, একেবারে সুন্দর।

দু'চার কথার পর আমি ওর মোকদ্দমার কথা তুল্‌লাম, ওর কাছে মোকদ্দমা চালানোর জন্য আবশ্যক কথা জিজ্ঞেস কর্‌লাম। মাথা নেড়ে বল্লে, আর সব কথা বল, মোকদ্দমার কথা উঠিও না। বল্লে, কিছু কর্‌তে হ'বে না। যে দিন আমার ফাঁসী হ'বে, কেবল সে'দিন যদি মনে কর যে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে, তা'হলে আধঘণ্টা আগে এস! সে দিন আমার সঙ্গে দেখা হ'বে। এর ভেতর আর হ'বে না। এই ব'লে, আমায় আর কিছু বল্‌বার অবসর না দিয়েই, ও খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেল। আমি অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ শূন্য খাঁচার দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এলাম।

তার পর আইন অনুসারে প্রথমে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, তার পর হাইকোর্টে ওর মোকদ্দমার বিচার হ'লো। আমি কত চেষ্টা কর্‌লাম, আবার ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে, ওর কাছ থেকে আবশ্যক কথা জেনে নিতে। কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার বিশেষ বন্ধু শুনে বড় বড় ব্যারিষ্টাররা ওর পক্ষে মোকদ্দমা চালানোর জন্যে তৈরী হ'লো। অবশেষে গভরমেণ্টের তরফ থেকে পর্য্যন্ত ওর পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হ'লো। কিন্তু ও যে চুপ্, সেই চুপ্। বিচারের সময় ও যখন কাঠগড়ায় বসে—ওকে বস্‌তে চেয়ার দিয়েছিল—নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে একদৃষ্টে একদিকে তাকিয়ে থাক্‌ত, তখন মনে হ'তো না যে, ও কিছু শুনতে বা বুঝ্‌তে পারছে। মনে হ'তো, যেন ওর চারদিকে যা' কিছু হ'চ্ছে, তাথেকে ওর মন হাজারও ক্রোশ দূরে আর কিছুরও সন্ধানে

ফির্‌ছে। শুধু গভরমেণ্টের নিযুক্ত ব্যারিষ্টার উঠে যখন ওর দিকে জজ আর জুরিদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ছে, ও বিকল-মনা বলে বিচার স্থগিত রাখ্‌বার জন্যে আবেদন কর্‌ছিল, তখন ও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ শান্ত স্বরে স্পষ্ট কথায় বল্‌ছিল যে, ওর মন সম্পূর্ণ সুস্থ, বিচারের কাজও খুব ভাল ভাবে বুঝ্‌তে পারছে। এ ছাড়া প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাসে তিন দিন, আর হাইকোর্টে এক দিন, এই চার দিনের ভেতর আর কখনও আমি ওকে একটা শব্দ পর্য্যন্ত কর্‌তে শুনি নি।

যখন ওর ফাঁসীর হুকুম হ'লো, তখন ও কোর্টের চারদিকে তাকিয়ে যেন কা'কে খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। আমার মনে হ'লো, আমায় খুঁজ্‌ছে। আমি গিয়ে কাঠগড়ার কাছে দাঁড়ালাম। ওর মুখের প্রসন্ন ভাব দেখে বুঝ্‌লাম, আমাকেই খুঁজ্‌ছিল। আমায় দেখে হেসে বল্লে, সে দিনের নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে ত? শক্তিতে যদি কুলোয় ত'বে এসো। এই ব'লে ও নীচে নেমে গেল।

তার পর সেই কালকের দিন—আঃ, আর যে বল্‌তে পার্‌ছি না! সত্যি, আমার বুকটায় যেন কেমন ব্যথা লাগ্‌ছে। গলাটা যেন কিসে চেপে ধরেছে। না, না, তোমায় বল্‌তেই হ'বে, না বল্লে তুমি ঘুমোতে পারবে না, ব্যারামে পড়ে যাবে.....আচ্ছা বলি—পর্‌শু সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারি নি। পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এই জন্যে চুপ্‌ করে মড়ার মত পড়ে ছিলাম, কিন্তু সমস্ত রাত আমার মাথার ভেতর পাঞ্জাব মেল চলেছিল। যখন ঢং ঢং করে কোথাকার একটা ঘড়িতে দু'টো বেজে উঠ্‌ল, তখন আর আমি বিছানায় থাক্‌তে পার্‌লাম না। খুব আস্তে আস্তে উ'ঠে নীচের কামরায় গিয়ে পোষাক পর্‌লাম। ফাঁসী হওয়ার কথা সাতটায়। তখন সবে মাত্র দু'টো বেজে এগার মিনিট, কিন্তু তখন আমার যা' অবস্থা, তা'তে ঘরের ভেতর থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওভার, কোটটা গায়ে চড়িয়ে একটা ছড়ি হাতে করে বেরিয়ে পড়্‌লাম। কি বিছ্‌ছিরি সে রাতটা ছিল। একে ত ডিসেম্বর মাস, তা'তে সে দিন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়্‌ছিল, কন্‌কনে উত্তরে হাওয়া বচ্ছিল—তার দু'দিন আগে থেকে দার্জ্জিলিংএর ওদিকে বরফ পড়ছিল।—গেট খোলবার সময় দারওয়ান জিজ্ঞেস কর্‌লে, সফারকে ডাক্‌বে না কি। বল্‌লাম, যেন সাতটার সময় জেলখানার দরজায় হাজির থাকে। দারওয়ান সঙ্গে লোক নেওয়ার কথা কি যেন বল্লে। আমি উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। কেমন করে আর কোথায় যে মাঝের সময়টা কাটালাম, আমার কোন ধারণাই নেই। তবে দেখ্‌লাম যে ঠিক ছ'টা পঁচিশ মিনিটের সময় আমি জেলখানার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছি। খবর দিতেই আমায় তা'রা একেবারে হোসেনের কাছে নিয়ে গেল। দেখ্‌লাম, ও যেন কোথাও রুগী দেখ্‌তে যা'বে, এই ভাবে দাড়ি কামিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, পোষাক পরে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। আমায় দেখে বল্লে, এসেছ—বস।

আমি বস্‌লাম। ও বল্‌তে সুরু কর্‌লে.....

হোসেনের কথা

জাফর, ভাই, কিছু বল্‌বার আগে আমার দু'টো অনুরোধ আছে,—অবশ্য পালন কর্‌বে।

আমি বল্লাম, নিশ্চয়।

বল্লে, আমি তোমায় যা' বলবো, তা' তুমি আর কাউকে বলো না, আর আমার মেয়েটার জন্যে যা' করা দরকার, করো। ওর জন্যে আমি ব্যাঙ্কে ত্রিশ হাজার টাকা জমিয়ে রেখেছি।

আমি বল্লাম, আচ্ছা।

বেশ, তবে এখন শোনো, বলে ও আরম্ভ কর্‌ল, তুমি হয় ত আমার কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক্‌ হয়ে গিয়েছ; কিন্তু আমার কথা শুন্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, এ ছাড়া আমার করার আর কিছু ছিল না।

সেই তোমার সঙ্গে কলেজে পরিচয়। তার পর আমি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেশ ভাল করে পাশ করে বেরিয়ে, কল্‌কাতাতেই ডাক্তারি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। পশারও বেশ হ'লো। অনেকখান থেকে বিয়ের প্রস্তাব আস্‌তে লাগ্‌ল। তুমি ত জান, আমার নিজের বল্‌তে কেউ ছিল না। কেবল একটা আধ-পাগ্‌লা বুড়ো বোন ছিল। বিয়ে কর্‌লে, কি জানি তার কোন কষ্ট হয়, এই জন্যে আমি বিয়ে কর্‌তে নারাজ ছিলাম। কিন্তু সেই বোনই খুব জিদ ধরে বস্‌ল। তার পর বিয়ে কর্‌লাম। প্রথম ক'টা বছর বেশ কাট্‌ল, বেশ মাজে, বাইরে কোন

ঝগড়াঝাটি হ'তো না, কিন্তু প্রথম থেকেই আমাদের ভেতর মনের মিল হয়নি। ও যে লোক খারাপ ছিল তা' নয়। তবে কোন একটা বিষয় ও যে চোখে দেখ্‌ত, আমি সে চোখে দেখ্‌তাম না, আবার আমি যে চোখে দেখ্‌তাম ও সে চোখে দেখ্‌ত না। আসল গোল ছিল ঐ খানটায় যে, আমি ওর দেখ্‌বার ভাবটা বুঝ্‌তাম, কিন্তু ও কিছুতেই আমার দেখবার ভাবটা বুঝত না। এই যে আজকাল একটা নূতন কথা উঠেছে angle of vision, যা'কে তোমরা বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করে বল দৃষ্টির কোণ, এই দৃষ্টির কোণ ওর ছিল এক, আমার ছিল আর। তবে ওর দৃষ্টির কোণটা আমি বুঝ্‌তে পার্‌তাম, আমার কোণটা কিন্তু কোন মতেই ওর নজরে আসত না। যাক্—তবু ত পয়লা ক'বছর যখন দু'জনারই বয়স এক রকম কাঁচা ছিল, তখন কেটেছিল ভালই। মেয়েটা হয়ে দু'জনাতে ভাব আরও গাঢ় হয়েছিল। ভেবেছিলাম শেষটা বোধ হয় ভালই কাট্‌বে। এম্‌নি করে ১৯১০ সাল এল। মাসটা কি, মনে নেই। রাতে টেলিফোঁর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। বোধ হয় শীতকাল। হাঁ শীতই বটে, লেপ ছেড়ে উঠতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। উঠে গিয়ে টেলিফোঁর কল কানে ধর্‌লাম, সংবাদ এল—নং রিপন ষ্ট্রীটে আমায় তখনি যেতে হ'বে, বিশেষ জরুরী ডাক। স্ত্রীকে বলে আমি বেরিয়ে পড়্‌লাম। রিপন ষ্ট্রীটের সেই নম্বর বাড়ীতে পৌঁছে মোটরের হর্ণ বাজাতেই গেট খুলে একজন সাহেবি পোষাক-পরা মুসলমান ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বল্লেন তাঁর বাপের বড্ড অসুখ তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ভেতরে ঢুক্‌লাম। নীচে অপেক্ষা করে তিনি আমায় একেবারে ওপরে রুগীর কাছে নিয়ে গেলেন। দেখ্‌লাম একটী বুড়ো ভদ্রলোক একখানা খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। গলা থেকে নীচের দিকটা একটা বালাপোষ তার ওপর একটা শাল দিয়ে ঢাকা। দেখ্‌লাম বিছানার কাছেই একখানা চেয়ার রয়েছে; টেনে নিয়ে রুগীর পাশে বসে কপালে হাত দিয়ে বুঝ্‌লাম বৃদ্ধ চিরদিনের মত ঘুমিয়েছেন। বালাপোষের নীচে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে দেখ্‌লাম সব শেষ। বুকে ষ্টেথস্‌কোপ লাগিয়ে দেখ্‌লাম সব চুপ্‌চাপ। আমি যতক্ষণ পরীক্ষা কর্‌ছিলাম—বোধ হয় মিনিট দু'তিন—ততক্ষণ সেই ভদ্রলোকটী মাথা হেঁট করে কামরার ভেতর পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। যখন আমি বিছানার ওপর ঝুঁকে বৃদ্ধের চোখের পাতা খুলে শেষ পরীক্ষা কর্‌ছিলাম, তখন মনে হলো যেন আমার পেছনে দরজার ওপাশের কামরায় দুটী স্ত্রীলোক ঝড়াঝড়ি কর্‌তে কর্‌তে এল। একজন যেন দরজার কাছে আসতে চাচ্ছে, আর একজন যেন তা'কে টেনে ফিরাতে চেষ্টা কর্‌ছে। তা'দের গয়নার ঠুং ঠাং আওয়াজ স্পষ্ট আমার কানে গেল। তার-পর শুন্‌লাম কে একজন চেঁচিয়ে বল্‌ছে, ডাক্তার সাহেব'—বুঝ্‌লাম মেয়ে মানুষের গলা। আর কিছু শোনা গেল না। সেই ভদ্রলোক আর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বল্লেন, আমার বোন বাবার কাছে আস্‌তে চাচ্ছিলেন, আমি নিষেধ করে এলাম। আমি বল্লাম সব শেষ হয়ে গিয়েছে। বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। নীচের কামরায় এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোকটী আমার হাতে দু'খানি একশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বল্লেন, শীতের দিন, অনেক রাত হয়েছে। আর একটা সার্টিফিকেট দরকার, ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে দাখিল কর্‌তে হ'বে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ডাক্তার তাঁকে দেখ্‌ছিলেন। তিনি একজন সাহেব ডাক্তারের নাম কর্‌লেন। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌গুলি দেখে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলাম—লিখ্‌লাম যে হার্ট ফেল হয়ে মারা গেছেন।

তা'র দিন কয়েক পরে একটা অপরিচিত হাতের লেখা চিঠি পেলাম। লেখাটা মেয়েলী হাতের। ভেতরের ঠিকানাটা সেই রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীর। তা'তে লেখা রয়েছে,—"ডাক্তার সাহেব, আমায় রক্ষা করুন। রাত ১১টার পর—লেনে থাক্‌বেন। আপনার আল্লার কসম্‌ আমায় উদ্ধার করুন।" আমি যখন চিঠিখানি পড়্‌ছিলাম তখন আমার স্ত্রী টেবিলের আর একপাশে বসে কি কর্‌ছিল। আমি চিঠিখানি ওকে পড়তে দিলাম। পড়ে ও একটু ঘৃণার হাসি হেসে সেখানি আমায় ফিরিয়ে দিল। আমি চুপ্‌ করে ভাবতে লাগলাম। ও আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লে, কি কর্‌বে? আমি বল্লাম, তাইত ভাবছি। ও বল্লে, তুমিও যেমন! মাগীটা হয় ত কোন কুকর্ম্ম করে বসেছে,

এখন ডাক্তারকে ডাক্‌ছে উদ্ধার করতে। আমি বল্লাম, হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে। তারপর সেই রাতের 'ডাক্তার সাহেব' বলে ডাক, তারপর একেবারে চুপ্ ইত্যাদি সব কথা ওকে বল্লাম। শুনে আমার স্ত্রী একটু অতিরিক্ত উত্তেজিত ভাবে বল্লে, না, না, ওসব নভেলি তোমায় করতে হ'বে না। তুমি যেতে পাবে না। আমি চুপ্ করে রইলাম। তুমি ত জান কেউ বিপদে পড়ে আমায় ডাক্‌লে আমি স্থির থাক্‌তে পারি না। আমার স্ত্রী বুঝ্‌লে আমি ওর কথা রাখ্‌বো না। ও রাগে গর্ গর্ করতে করতে উঠে গেল।

রাত এগারটায় আমি সেই লেনে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আধ ঘণ্টা পরে দেখলাম একটা ছোক্‌রা গলির অপর পাশ থেকে বের হ'লো। আমার মোটর দেখে সেই দিকে আসতে লাগল। একটু পরেই তার পেছনে দেখলাম আর দু'টো লোক। তা'দের পায়ের শব্দ পেয়ে ছোঁড়াটা দৌড়তে লাগ্‌ল। লোক দু'টোও ছুটতে লাগল, ছোঁড়াটা মোটরের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে একখানা কাগজ আমার দিকে ধরল। আমি হাত বাড়ালাম। এমন সময় পেছনের একটা লোক একটা ঢিল উঠিয়ে আমার হাত লক্ষ্য করে মার্‌ল। ঢিলটা এসে জোরে আমার হাতে লাগ্‌ল। আমি হাত টেনে নিলাম। পর মুহূর্ত্তেই দেখ্‌লাম সেখানে কেউ নেই। আমার হাতটা বড্ড ব্যাথা করতে লাগল। বুঝ্‌লাম সে রাতের মত আর কিছু হ'বে না, ফিরে গেলাম। পরদিন হাতের ব্যাথায় জ্বর হ'লো। আমার স্ত্রী ত আমি বেরিয়ে যেতেই বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল। আমি দু'তিন দিন জ্বর ভুগে উঠলাম। স্ত্রীকে আন্‌তে পাঠালাম। সে এল না। যেদিন ফের বের হলাম সেদিন রিপন ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে গেলাম, দেখলাম 'ভাড়া দেওয়া হবে' বলে বিজ্ঞাপন ঝুল্‌ছে।

তার কিছুদিন পর আর একদিন ঐ রকম একখানা চিঠি। সেদিন নির্দ্দিষ্ট যায়গায় মোটর গিয়ে দাঁড়াতেই একটা লোক এসে আমার কানে কানে বল্লে, ফের যদি তুমি এম্‌নি করে আস, তা' হ'লে তোমায় খুন করে ফেল্‌বো। বুঝ্‌লাম কোথাও একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হ'চ্ছে। আমি ফিরে এলাম। কিন্তু একটা চিন্তা মনের ভেতর লেগেই রইল। আর আফ্‌সোস রইল যে কিছু করতে পার্‌লাম না।

তার কিছুদিন পর একদিন দু'জন সাহেব ডাক্তারের সঙ্গে আমি একটী ভদ্রমহিলাকে দেখ্‌তে গেলাম। সেটা থিয়েটার রোডের ওপর একটা বেশ বড় বাড়ী। আমাদের ডাকা হয়েছিল সেই ভদ্রমহিলাটীকে পরীক্ষা করে মত দেওয়ার জন্যে, তিনি পাগল কি না। তাঁকে যিনি দেখালেন তাঁর চেহারাটা যেন পরিচিত লাগ্‌ছিল কিন্তু ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌ছিলমে না। ভদ্রমহিলাটীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আমরা বুঝ্‌তে পারলাম যে তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক। আমরা চলে আসার সময় ভদ্রলোকটীর বাঁ কানের ওপর একটা তিল দেখে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম তিনি রিপন ষ্ট্রীটের ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বল্লেন, এ জীবনে তিনি কখনও রিপন ষ্ট্রীটে ছিলেন না। আমার মনে কেমন সন্দেহ হ'লো, যিনি আমায় চিঠি লিখেছিলেন ইনিই সেই ভদ্রমহিলা ন'ন ত?

আমি সন্ধানে রইলাম। ক্রমশঃ যে সমস্ত কথা জান্‌তে পার্‌লাম তা'তে বুঝ্‌লাম যে সেই ভদ্রমহিলাটী ভীষণ চক্রান্তে পড়ে আদালতে বিকৃত-মনা বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। আর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এখন সেই ভদ্রলোকটীর হাতে। আমার কেমন একটা খেয়াল চাপ্‌ল যে ভদ্রমহিলাটীকে ভাল করতেই হবে। সেই অবধি আমি মানসিক বিকার সম্বন্ধে নতুন ডাক্তারি বই সমস্ত পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম।—এদিকে আমাতে আর আমার স্ত্রীতে মনের অমিল বেড়েই চল্‌ল। সেই যে ও বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তার পর থেকে আর আমরা এক বিছানায় শুতাম না। ও এলে ওর বিছানা অন্য ঘরে কর্‌ল। আমার অসুখের খবর পেয়েও আসেনি বলে আমার মেজাজটা কেমন খারাপ হয়েছিল, আমিও কিছু বল্লাম না।—এম্‌নি করে দু'জনার আলাদা আলাদা শোবার বন্দবস্ত হয়ে গেল। কেমন করে জানি না, আমার স্ত্রী আমার সেই দু'রাত্তের অভিযানের খবর জান্‌তে পেরেছিল—বোধ হয় সফারটার কাছে শুনেছিল। চিঠি একখানি ত দেখেছিল। আর একখানিও দেখে থাক্‌বে।—তার পর আমায় নতুন করে ডাক্তারি বই পড়্‌তে দেখে ওর মনে কি হ'লো ওই জানে। ও একটু ইংরেজি জান্‌ত। বোধ হয় বইগুলোর নাম পড়ে

বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, সেগুলি মানসিক-বিকৃতি সম্বন্ধে। একদিন খাওয়ার পর আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ল, ওগুলি আবার পড়্‌ছ কেন? আমি বল্লাম, খেয়াল। সত্যি না কি, বলে ও চুপ করে রইল। ওর সেই সত্যি-না-কি-র সুরটাতে যেন সন্দেহ, ঘৃণা আর হিংসার ভাব জড়ান ছিল। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, বিশ্বাস হ'লো না? ও সে কথার উত্তর না করে বল্লে, নিজের ঘরের লোকের রোগ সারানোর দিকে লক্ষ্য নেই, বাইরের লোকের পাগ্‌লাম সারানোর জন্যে এত পরিশ্রম! সত্যি ত'! কথাটা খুব ঠিক।—দিন কয়েক আগে ও আমায় বলেছিল ওর গলার ভেতর কেমন একটা ব্যথা হয়েছে। খাওয়ার সময় লাগে। আমি বলেছিলাম একজন গলার ডাক্তারকে ডেকে আন্‌ব—কিন্তু তার পর সেদিকে আর খেয়াল করিনি।—পরদিন সকালে উঠেই একজন ডাক্তারকে নিয়ে এলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী গলা দেখাতে বা কোন রকম ওষুধ খেতে কিছুতেই রাজি হ'লো না। দিনকয়েক পরে ওর অসুখ খুব বেড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে আর উঠ্‌তে পার্‌ত না। তবুও কিছুতেই ও ওর জিদ্ ছাড়্‌ল না। বেশী কিছু বল্‌লেই বল্‌ত, বেশ ত আমি মলে তুমি তোমার পাগ্‌লিকে নিয়ে ঘর ক'রো।—সেটা শুনে আমার মনটা একবারে তেতো হ'য়ে যেত, বুঝ্‌তাম এ জীবনে আর আমাদের মনের দুয়ার পরস্পরের কাছে খুল্‌বে না। মেয়েটাকে আমি খুব ভাল বাস্‌তাম। কিন্তু ওর মা যে ওকে কি মন্ত্র দিয়েছিল জানি না, মেয়েটাও আর আমার কাছে ঘেঁষ্‌ত না, যদিও দূর থেকে ও আমার দিকে যেমন ভাবে তাকাত তা'তে মনে হ'তো যে আমার কাছে আস্‌বার জন্যে ওর মনটা ছট্‌ফট্ করছে। কিন্তু আমি আদর কর্‌তে গেলেই ও ছুটে পালিয়ে যেত।—আমার বোনটাও এর ভেতরে মারা গেল।—বাড়ীর চাকর বাকর আমার স্ত্রীর খুব ভক্ত ছিল।—ওর বন্ধু বান্ধবও ছিল অনেক। মোটের ওপর এখন আমার মনে হচ্ছে যে এক আমি ছাড়া আর সবার সঙ্গেই ওর বন্‌ত। আর আমার সঙ্গে না বনারই কথা। তুমি ত জান, আমি কথা বলি খুব কম। কাজেই লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাও আমার ঘটে ওঠে না। অনেকে ভাবে আমি দেমাগী। এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে আসলে আমার দৃষ্টির কোণটা একটু অদ্ভুত রকমের। অন্যদের দৃষ্টির কোণ যেমন সোজা আমার তেমন নয়, একটু বাঁকা ধরণের। বেশীর ভাগ লোক যেখানে একেবারে মন্দ দেখে, আমি সেখানে একটু ভালর গন্ধ পাই, আর সেই দিকেই আমার নজর যায় বেশী। আবার খুব ভালর ভেতরেও যে মন্দ রয়েছে সেটা আমার দৃষ্টি এড়ায় না। কাজেই বুঝ্‌তে পারছ যে যদি দু'জনাকে আজীবন ঘর কর্‌তে হয়, আর তাদের দৃষ্টির কোণ যদি একেবারে না মেলে, তা' হ'লে তাদের আলাদা ঘরে শোওয়া থেকে সব বিষয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া একেবারে স্বাভাবিক। মোটের ওপর শেষে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই যে, বাড়ীতে আমার কোন স্থান রইলনা। নিজের ঘরে আমি হ'লাম পরদেশী।—সেখানে যারা বাস্ করত তাদের আর আমার ভেতর লেন-দেন হ'তো যেন মুখোসের ভেতর থেকে, কেউ কারুর আসল পরিচয় পেতাম না। তুমি ত জান আমার মনটা ভারি লাজুক, একটু টোকা পেলেই সামুকের মত নিজের খোলের ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু মানুষ জাতটাকে আমি দেখি বড্ড প্রীতির চোখে। কথা কম বলি বটে, কিন্তু কারুর না কারুর কাছে মনটা খোলা আমার বিশেষ দরকার। বাড়ীতে ত এই অবস্থা। বাইরের লোক ত সব রুগী। বন্ধুর ভেতর তুমি একা। সেই যে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, মনে আছে বোধ হয় সেই তোমায় বড় ছেলের অসুখ সেরে আস্‌বার সময়। কিন্তু সে সময় আর কিছু জিজ্ঞেস কর্‌তে পারনি। তুমি শেষ কর্‌তে না পার্‌লেও আমি তোমার প্রশ্ন বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম উত্তর দেব, কিন্তু হয়ে উঠেনি।—হবার কথাও যে নয়; নইলে আজ আমি কেমন করে এখানে আস্‌তাম।

এই বলে হোসেন একটু হাস্‌ল।—আহা! সে হাসিতে পৃথিবীর আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত যত হতভাগ্য জন্মেছে তাদের সমস্ত দুঃখের বোঝা যেন চাপান ছিল। আবার বল্‌তে লাগল···

মনে রেখো, এম্‌নি এক নয়, দু'নয়, দশ দশ বছর কেটেছে।—তার চেয়ে কি এই জেলে বদ্ধ হয়ে থাকা বেশী কষ্টকর?

এদিকে সেই ভদ্রলোক গত বৎসর পশ্চিমে গিয়ে মারা গেলেন।—এ ক'বৎসর ধরে আমি সেই ভদ্রমহিলার মনের বিকারের চিকিৎসা কর্‌ছিলাম। আমার এই চেষ্টায়

ভদ্রলোকটী কোন বাধা দেন নি।—তবে গেল বৎসরের আগের বৎসর থেকে ভদ্রমহিলাটী ক্রমশঃ একটু ভালর দিকে এগুতে আরম্ভ কর্‌লেন; তখন থেকে ওঁর ব্যবহারেও যেন একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগ্‌ল। আমি প্রায় অবসর মত গিয়ে ভদ্রমহিলাটীর সঙ্গে গল্প কর্‌তাম। যখন কেবল আমরা দু'জন থাক্‌তাম, তখন মহিলাটী বেশ প্রকৃতিস্থ ভাবে কথা বল্‌তেন, কিন্তু ভদ্রলোকটী সেখানে গেলেই আবল তাবল বক্‌তে সুরু কর্‌তেন। তার পর কিন্তু তিনি এলেও মহিলাটী কতকটা স্বাভাবিক ভাবেই কথা বল্‌তেন।

এম্‌নি ভাবে গতবৎসরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চল্‌ল। একদিন আমি গিয়ে দেখ্‌লাম বাড়ীর দরজা বন্ধ। শুন্‌লাম তাঁরা পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন। এবছরের মাঝামাঝি খবর পেলাম ভদ্রলোকটী মারা গেছেন। তার পর আজ মাস পাঁচেক হ'লো একদিন রুগী দেখে ফিরে গিয়ে দেখি যে সাম্‌নের ঘরে কতকগুলি বাক্স আর বোচ্‌কা বুচ্‌কি পড়ে রয়েছে।—আমার বাড়ীতে অতিথি ত কোনকালে কেউ আস্‌ত না, হঠাৎ কে এল? তাড়াতাড়ি ওপরে উঠ্‌তেই বারান্দায় দেখ্‌লাম আমার স্ত্রী সিঁড়ির দিকে মুখ করে বসে রয়েছে, আর তার সাম্‌নে সিঁড়ির দিকে পেছন করে একটী ভদ্রমহিলা, কোলে একটী শিশু নিয়ে। আমার স্ত্রীর কোন আত্মীয়া ভেবে আমি তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়ার জন্যে ফিরেছি, এমন সময় আমার স্ত্রী বল্ল, ফিরে যাচ্ছ কেন, ইনি তোমার পরিচিত। মনে হ'লো কথাটার ভেতর একটু ব্যঙ্গের ভাব রয়েছে।—আমি ফির্‌লাম। দেখ্‌লাম মহিলাটীও ফিরেছেন। চিন্‌লাম তিনি সেই থিয়েটার রোডের বাড়ীর। তিনি বল্লেন ভদ্রলোকটী মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি ভয়ানক বিপদে পড়েছেন, অন্য আশ্রয় না থাকায় আমার এখানে এসেছেন। আমায় দেখে শিশুটী হাত পা ছুড়্‌ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে নিলাম। আমার স্ত্রী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে উঠে চলে গেল। আমি কোন কারণ তখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

যা' হোক্ সেই অবধি তিনি আমাদের ওখানে রয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস কর্‌বো কর্‌বো ক'রেও আমি ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার স্ত্রীর অসাক্ষাতে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তাম না। আমার স্ত্রীর অসাক্ষাতে উনি নিজের সম্বন্ধে আমায় কিছু বল্‌তেন না। এম্‌নি করে দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। একদিন আমি একখানা গল্পের বই পড়ছি, এমন সময় আমার স্ত্রী তার সেই ব্যঙ্গের স্বরে বল্লে, যাক্ এতদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছ। বলেই সে নিজের ঘরে গিয়ে ধড়াস্ করে দুয়ার বন্ধ করে দিল।

এম্‌নি করে আরও কিছু দিন কেটে গেল। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে আগের চেয়ে বেশীক্ষণ ধরে বাড়ীতে থাক্‌ছি।—একটা সন্দেহ এল মনে। হিসাবের খাতাখানা নিয়ে দেখ্‌লাম আগের চেয়ে ডাক প্রায় অর্দ্ধেক কমে গিয়েছে। দিন চা'রেক পরে পাড়ায় একটা বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ হলো না। আমি কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লাম। নানা কথা কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। একদিন আমি শিশুটীকে নিয়ে খেলা কর্‌ছি, আমার স্ত্রী এসে আমার মুখের সাম্‌নে একটা আয়না ধরে বল্লে, দেখ। আয়নায় নিজের চেহারা ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও শিশুটীর দিকে দেখিয়ে বল্লে, একেবারে যেন এক ছাঁচে ঢালা।—আমি যে সমস্ত কথা শুনেছিলাম, আর আবার এই স্পষ্ট ইঙ্গিতে বুঝ্‌লাম ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। আমি হাস্‌বো কি কাঁদবো কিছু বুঝ্‌লাম না। শুধু বল্লাম, তুমিও? উত্তর শুন্‌লাম, ওঃ কি আমার সতিটী রে!

দিন কয়েক পরে আমার ডাক একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, সারাদিন ধরে মুখ বুঁজে বাড়ীতে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে একেবারে হাঁপিয়ে উঠ্‌লাম।—মনটা হাল্কা করা বিশেষ দরকার ভেবে বায়স্কোপে গেলাম। সেখানে যে ছবিটা দেখ্‌লাম তা'তে মনটা আরও দশগুণ ভারী হয়ে গেল। তোমার ওখানে গিয়ে শুন্‌লাম তুমি মফঃস্বলে। থিয়েটারে গেলাম। ভাল লাগ্‌ল না। একটা ট্যাক্সি করে রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে বেড়ালাম।—অবশেষে রাত তিনটাতে বাড়ী ফির্‌লাম। গেট খোলা পেলাম। কারো কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ওপরে উঠে গেলাম, আমার শোবার কাম্‌রার দরজা একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে দেখ্‌তে পেলাম।— পা টিপে টিপে ঘরে ঢুক্‌লাম। টেবিলের ওপর পড়্‌বার ল্যাম্পটা জ্বলছিল। তা'র আলোতে যা' দেখ্‌লাম তা'তে আমার রক্ত জমে

একেবারে বরফ্ হয়ে গেল। দেখ্‌লাম আমার স্ত্রী আমার বিছানায় শুয়ে রয়েছে; তা'র গলার এপার থেকে ওপার একেবারে কাটা। কাছেই একখানা বড় ছুরি পড়ে রয়েছে। আমার মনে হ'লো আত্মহত্যা করেছে।—চোখে পড়্‌ল চিঠির মত একখানা কাগজ বিছানার কাছে পড়ে রয়েছে। উঠিয়ে নিয়ে দেখ্‌লাম আমার স্ত্রীর হাতের লেখা।—লিখেছে, 'তোমায় আজ খুন কর্‌তে আস্‌বে। খুন কর্‌লে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হ'বে না।—আমি তোমায় বিছানায় শুয়ে থাক্‌ব। তোমায় বলে আমায় তা'রা খুন কর্‌বে।—অন্যের হাতে খুন হ'লেও বাস্তবিক তুমিই আমার খুন কর্‌ছ। এ জন্য সারা জীবন তোমায় জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হ'বে—যেমন করে আমি মর্‌লাম।'—

চিঠিখানা পড়ে আমার কি হ'লো জানি না। যখন জ্ঞান হ'লো তখন দেখ্‌লাম থানার গারদে আমায় আটক্ করে রেখেছে। আমার জীবনের আরম্ভ থেকে সমস্ত ঘটনা আমার মনের ভেতর এক এক করে উদয় হ'তে লাগ্‌ল। আমার স্ত্রী খুব ঠিক বিচার করে গিয়াছে। অন্যের হাত বটে, কিন্তু কাজ আমারই। আমিই ওকে খুন করেছি। আমি ঠিক কর্‌লাম মোকদ্দমার কোন তদ্‌বির কর্‌বো না।

তারপর বিচারের সময় দেখ্‌লাম যেন কে আড়াল থেকে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার প্রমাণ যোগাড় করে দিচ্ছে।—সমস্ত সাক্ষী আগাগোড়া সাজান, একটা চাকর যে সাক্ষী দিয়ে গেল যে সে আমায় ছুরি নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেছিল, সে কথা একেবারে মিথ্যা।—আমি শুধু শুন্‌ছিলাম আর হাস্‌ছিলাম। আমার উপযুক্ত বিচার হ'চ্ছে।—শেষ! শেষ! আমার মেয়েটাকে দেখো।

ক্যাঁচ্—কিচ্ মিচ্ কিচ্।

আমরা দু'জনে চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম ব্যাপারটা কি। দেখ্‌তে পেলাম ঘরের একটা ঝুড়ির কাছে একটা যাঁতি-কল পাতা ছিল, তা'তে একটা ইঁদুর পড়েছে।—হোসেন হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।—আমার হাত ধরে বল্ল, ভায়া হে! আমারও ঠিক ঐ দশা, বেঁচেও মরা, মরেও মরা! গুড্‌বাই।

* * *

আধ ঘণ্টা পরে ওর লাশ আমায় এনে দিল।

* * *

ক্যাঁচ্—কিচ্ মিচ্ কিচ্। যাঁতি-কল! যাঁতি-কল! যাঁতি-কল! দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে জাফর বল্ল, উঃ কবে এই যাঁতি কল মাথার ভেতর থেকে যাবে।—

জাফরের স্ত্রী অনেকক্ষণ চুপ্ করে থাক্‌বার পর বল্ল, যাই বল না কিন্তু এই ফাঁসীটা একটা ভয়ানক নৃশংস বর্ব্বরতা। তোমার কাছে শুনেছি যে ইংরেজের আইনে বলে যে হাজার জন দোষী খালাস হোক্ তবুও যেন একজন নির্দ্দোষী শাস্তি না পায়। আবার সেই আইনেই এমন ব্যবস্থা রয়েছে যা'তে একজন নির্দ্দোষীর প্রাণহানি হ'তে পারে। তোমাদের আইনের আমি কিছু বুঝি না।—

জাফর এর কিছু উত্তর কর্‌তে পার্‌ল না।

দুই যা

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

ঘন ঘন তার ওঠা-নামা ওগো হয়ে গেছে আজি শেষ;
কপালে টিপটি কাটেনিক' সে ত' চিরুণি ছোঁয়নি' কেশ।
বৈকালে কই সাবান মাখেনি'; ঠোঁটে নেই তার হাসি।
যখন তখন বার বার তার লাগিছে বিষম কাশি।
কিশোরী বধূর পতি পর-দেশে চোখ দু'টি ছলছলে—
সকলের পাশ কাটা'তে সে চাহে অসুখ করেছে বলে।

বড় যা' ত তার রকম-সকমে ফেলিল তাহারে ধরি'—
"কই গা ত' তোর নয় ক' গরম কোথা' যাস ছল করি।
অসুখ কোন ত' করেনি ও-দেহে যত জ্বালা ওই বুকে,
বিরহ স্রষ্টা কলেজগুলিরে দে'রে শাপ মনো-দুখে।
বুকের বেদনা করিস্‌নে বা'র চেপে রাখ্ মনো-ব্যথা।"
মুখটি লুকায়ে কহিল কিশোরী "দিদি এ সত্য কথা।"



একটি নূতন আবিষ্কার

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্-সি

নানা আকারে নানা স্থান জুড়িয়া পৃথিবীতে অসংখ্য পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্ত আকাশের সুদূরতম নক্ষত্রের আলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র-গর্ভের অদ্ভুত সরীসৃপ ও উদ্ভিদের কোনোটাই বৈজ্ঞানিকের চোখ্ এড়াইতে পারে নাই। জগতের এই সংখ্যাতীত দ্রব্যের হিসাব বা তালিকা মানবের গণনাতীত এবং মননাতীত। জিনিসের আকৃতি অনেক সময় এক হইলেও, তাহাদের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়া যায়; এবং প্রকৃতি এক হইলেও, তাহাদের আকৃতি ও রসায়ন-ধর্ম্ম বিভিন্ন হইয়া পড়ে। আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈষম্যের হিসাবে কোন জিনিসকেই শ্রেণীবদ্ধ করা যাইল না দেখিয়া, বৈজ্ঞানিকেরা এই অসংখ্য দ্রব্য-সম্ভারকে তাহাদের রীক্ষণাগারে (Laboratory) বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের গঠন ও উপাদানের তালিকা রচনা করিতে লাগিলেন। এই হইল রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম গোড়াপত্তন। এই আদিম রসায়নের কথা আলোচনা করিলে প্রথমেই আল্‌কেমিষ্টদের (Alchemist) কথা মনে হয়। আল্‌কেমিষ্টগণ যখন পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ—গন্ধক, পারদ ও লবণ এই ত্রিবিধ উপাদানের সংযোগে সংগঠিত বলিয়া প্রচার করেন, তখন জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অদ্ভুত লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহারা আল্‌কেমিষ্টদের 'যাদুকর' নামে অভিহিত করিত। প্রাচীন রসায়নের ইতিহাসে এই আল্‌কেমিষ্ট বা যাদুকরদের আমল অনেক দিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল।

তাহার পর ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ঊনআশী বৎসর কাল হইতেছে, বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ রাসায়নিক হেন্‌রি ক্যাভিণ্ডিসের (Henry Cavendish) নূতন আমল। ক্যাভেণ্ডিসের এই আমলে রসায়নের অনেক নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। নব্যরসায়নের ইহাই হইতেছে প্রকৃত গোড়াপত্তন। পূর্ব্বকালের গন্ধক, পারদ্ ও লবণের মধ্যে প্রথম দুইটি নিছক খাঁটি (Element)

পদার্থ হইলেও তৃতীয় পদার্থ লবণ জিনিসটাকে কখনো খাঁটি পদার্থ বা Element বলা চলে না। উহা সোডিয়মের সহিত ক্লোরিনের এক যৌগিক ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাসায়নিক ক্যাভেণ্ডিস্ বাতাসের গঠনোপাদান বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন; এবং পর বৎসরেই জলের ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইয়া দিয়া তিনি জলের দুইটি উপাদান, এক পরমাণু অক্সিজেন্ এবং দ্বিতীয় পরমাণু হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া রসায়নে যুগ-প্রবর্ত্তন করেন। এই ক্যাভেণ্ডিসের আমলেই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাসায়নিক রাদারফোর্ডের (Rutherford) হাতে বায়ু মণ্ডল ও অপরাপর জৈব পদার্থ হইতে নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছিল। ঠিক্ ইহারি দুই বৎসর পরে যখন প্রিষ্ট্‌লি (Priestley) অক্সিজেন্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখনো রসায়নে ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেবের যুগই চলিতেছে। এই ঊনআশী বৎসরের মধ্যে রসায়নশাস্ত্র যতটা দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল, জ্ঞানের অপর কোন বিভাগই এতদূর উন্নত হইতে পারে নাই। এই যুগেই রসায়ন শাস্ত্রের পরমাণুবাদ (atomic theory) প্রকৃত প্রতিষ্ঠালাভ করে। ক্যাভেণ্ডিসের এই যুগের দুই হাজার বৎসর আগে ৪৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রীসে ডিমোক্রিটিস্ নামক একজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কতকটা এই পরমাণুবাদই সংগঠিত করিয়াছিলেন। তখনো পর্য্যন্ত তাহা পুঁথির পাতাতেই আবদ্ধ ছিল; অতঃপর গ্রীসেরই এপিকিউরাস্ (Epicurus) ও লুক্রিটিয়াস্ (Lucretius) নামক দুইজন পণ্ডিত ইহাকে সম্যক্‌রূপে জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলেন।

এই সময় রাসায়নিকেরা বিদ্যুৎ, উত্তাপ ও রসায়ন দ্রব্য দিয়া পদার্থকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করিতেছিলেন। পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশটুকুকে যখন তাঁহারা আর কোন উপায়ে ভাঙ্গিয়া আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা ইহাকে পরমাণু (Atom) বা পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নামে অভিহিত করিলেন। এই পরমাণুই হইতেছে তখনকার রসায়ন-শাস্ত্র মতে পদার্থের চরম দশা। রাসায়নিকের হাতে পড়িলে জগতের যে কোনো জিনিস তাহার পরমাণুর এই আসল মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে; হীরক এবং অঙ্গারকে তখন একাসনেই বসিতে হয়। নানা পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলি পরস্পর যোড়াতাড়া লাগিয়া যে সকল নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাদের নাম ও পরমাণুর অবস্থান হিসাবে তাহাদের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। জলকে রাসায়নিকেরা সেই জন্য শুধু জল বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, পরন্তু তাহাকে—এক পরমাণু অক্সিজেন্ ও দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া, তাঁহারা ইহাকে H_2O নামক সাঙ্কেতিক চিহ্নে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া রাসায়নিকেরা একটি জল-কণিকাকে (A molecule of water) নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই কণিকা (Molicule) ও পরমাণু (Atom) দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। পরমাণু মিলিত হইয়া কোন দ্রব্যের একটী বিশেষ কণিকা সৃষ্টি করিতে পারে। তা'ছাড়া বিভিন্ন পরমাণুর যোগে একটী বিশেষ কণিকা সংগঠিত হইতেছে, এমন উদাহরণ রসায়নেরপুস্তকে ছড়াইয়া আছে। হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু ও অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলিয়া জলের একটি কণিকার (molecule) সৃষ্টি করিতেছে, এই উদাহরণটি শেষোক্ত সিদ্ধান্তটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। সোডা ওয়াটারের বোতলের ভিতরকার গ্যাসের এক একটি কণিকাও তদ্রূপ দুই পরমাণু অক্সিজেন্ ও এক পরমাণু অঙ্গার লইয়া সংগঠিত। জলের এক একটি কণিকাকে রাসায়নিকেরা H_2O নামক সাঙ্কেতিক চিহ্নে নামকরণ করিয়াছেন, সোডাওয়াটার বোতলের গ্যাস্ কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের এক এক কণিকাকেও, তাঁহারা তদ্রূপ CO_2বলিয়া নামাঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, অঙ্গারের এক পরমাণু ও অক্সিজেন বাষ্পের দুই পরমাণুর সংযোগেই কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের একএকটি কণিকার অস্তিত্ব সম্ভব হয়। রসায়নে ক্যাভেণ্ডিসের এই নবযুগের ভিতর আরও অনেক মূল পদার্থ (Element) আবিষ্কৃত হয়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সার হাম্‌ফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) ক্ষার পদার্থের সহিত মিশ্রিত মূল পদার্থ পোটাসিয়াম্ ধাতু ও লবণের অন্যতম উপাদান সোডিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ঠিক্ ইহারি এক বৎসর পরে, তিনি ক্যাল্‌সিয়াম্, ষ্ট্রন্‌সিয়াম্, বেরিয়াম্ ও বোরোন্ নামক চারিটি মৌলিক

পদার্থ (Element) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সমস্ত মৌলিক পদার্থেরই এক একটি পরমাণুর ওজন ঠিক্ করা হইয়াছে। এই ওজন্-হিসাবে সমগ্র মৌলিক পদার্থের একটি তালিকা রচনা করিলে, হাইড্রোজেন্ বাষ্পকে ঐ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিতে দেখা গিয়াছে। কারণ হাইড্রোজনের একটি পরমাণুর ওজন অপর সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন হইতে অল্প। হাইড্রোজেনের ওজন রাসায়নিকেরা মোটামুটি ১ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের এই একের বিশেষ গুণটিই ইহাকে অপরাপর মৌলিকের ওজনের মাপ্-কাটি রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। কারণ, তালিকায় হাইড্রোজেনের পর আর যে সকল মৌলিক পদার্থ পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত আছে, তাহাদের পরমাণুর ওজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাণুর ওজনের এই ক্রমিক বৃদ্ধির হিসাব ধরিয়া যে তালিকা রচিত হয়, তাহার ভিতর একটি আশ্চর্য্য নিয়ম লুক্কায়িত আছে। এইরূপে পরস্পর সহিত সমগ্র মৌলিকের প্রতি অষ্টম মৌলিক দ্রব্য গুণে ও অপরাপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ একতা রক্ষা করিয়া চলে। সুতরাং তালিকার কতকগুলি ধাতব পদার্থ গুণে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক। এই অষ্টম মৌলিকের নিয়ম মানিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক নূতন নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনাবিষ্কৃত প্রত্যেক অষ্টম মৌলিকের গুণ ও তাহার পরমাণুর ওজন, এই হিসাব ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আগে হইতেই বলিয়া দিতে পারেন। সম্প্রতি যে নূতন মৌলিক পদার্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাহার আবিষ্কার কতকটা এই নিয়মেই হইয়াছে।

এই পরমাণুবাদের পর রসায়নশাস্ত্রের আধুনিক সিদ্ধান্ত ইলেকট্রণের (Electron) কথা আসিয়া পড়ে। আজকাল বৈজ্ঞানিকের হাতে মূল পদার্থ পরমাণু হইতেও যে সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকেই তাঁহারা ইলেকট্রণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ রাসায়নিক রাদারফোর্ড (Rutherford) এই ইলেকট্রণের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। রাদারফোর্ডের পর, ডেন্‌মার্কের বিখ্যাত রাসায়নিক ভোর (Bhor) ইহাকে আরও উন্নত করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মৌলিক ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) দুই প্রকার ইলেক্‌ট্রন্ লইয়া সংগঠিত। এই দুই শ্রেণীর ইলেক্‌ট্রণ মৌলিক মাত্রেরই পরমাণুতে কখনো সমসংখ্যক অবস্থায় থাকে না। সাধারণতঃ ধনাত্মক বা Positive ইলেক্‌ট্রণের সংখ্যাই প্রথমটিকে ছাড়াইয়া যায়। মৌলিকের এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রণের সংখ্যাই তাহার পরমাণুর গুরুত্বের সংখ্যার সমান হয়। হাইড্রোজেন্ বাষ্পের পরমাণুর গুরুত্ব সংখ্যায় এক্, সুতরাং ইহার পরমাণু কেবলমাত্র একটি অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রণের সংখ্যাই নির্দ্দেশ করে। এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রণের সমসংখ্যক আর এক জাতীয় ইলেক্‌ট্রণ পরমাণুর চারিদিকে অনবরত ঘুরপাক্ খাইয়া পরমাণুটির ভার সমান করিয়া দেয়। যেমন এক জাতীয় ইলেক্‌ট্রণ বেশী থাকে, তেমনি অপর আর এক জাতীয় নূতন ইলেক্‌ট্রণ (Plauetary Electron) ঠিক তাহারি চারিদিক ঘিরিয়া মৌলিকের পরমাণু গঠনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর ইলেক্‌ট্রণ এইবারে সংখ্যায় সমান হইয়া পদার্থের গঠনোপাদানকেও অনেকটা সামঞ্জস্যের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৌলিকের তালিকায় পূর্ব্বোক্ত পরমাণুতত্ত্বের বাঁধা নিয়মে প্রতি অষ্টম মৌলিক গুণে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক বলিয়া, এমন অনেক মৌলিক আছে, তালিকায় যাহাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। এইরূপ একটি অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত মৌলিকের পরমাণুর গুরুত্ব ৭২ ছিল। সম্প্রতি ডেন্‌মার্কের এক রাসায়নিক্ ডি, কষ্টার (D. Coster) ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সুবিখ্যাত রাসায়নিক জর্জ ভন্ হেভেসি (George Von Hevesy) একত্র গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে সম্প্রতি এই অজ্ঞাত মৌলিকটি আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার একটি পরমাণুর গুরুত্ব ৭২ এবং ইহার অজ্ঞাত নাম মৌলিকের তালিকায় লিখিত থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই। এত দিন ইহা জিরকোনিয়াম্ (Zirconium) নামক আর একটি মৌলিকের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া ছিল যে, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক পণ্ডিত দুইজনকে ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব আবিষ্কারে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। নানা দুঃসাধ্য পরীক্ষায় এই নূতন মৌলিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে, বৈজ্ঞানিকদ্বয় ইহার নাম দিয়াছেন, হাফ্‌নিয়াম্ (Hafnium)। ডেন্‌মার্কের রাজধানী কোপেন্ হেগেন্‌কে ল্যাটিন্ ভাষায় হাফ্‌নিয়া (Hafnia) বলা হইয়া থাকে। আবিষ্কর্ত্তার রাজধানীর নামে এই নূতন মৌলিকের নামকরণ করায়, ডেন্‌মার্ক বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। হাফ্‌নিয়াম্ সবে এই বৎসর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা ডি, কষ্টার হাফ্‌নিয়াম্ বিষয়ক কোন পুস্তক না লিখিলেও, বিজ্ঞানের সংবাদপত্রে আজকাল ঐ বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। ব্যবসায় ও উপকারী দ্রব্য হিসাবে এখনও এই মৌলিকটির প্রচলন না হইলেও, ভবিষ্যতে ইহার প্রচলন সম্ভব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১২]

একমাস অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রমথ আর একদিনও হরমোহনের বাটীতে দেখা দেয় নাই। কিন্তু মাস শেষ হইতেই দুই তিন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ যথা সময়ে, তাহার নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা মণিঅর্ডারে হরমোহনের নিকট পৌঁছিয়াছিল, এবং চুক্তি মত মাণিকলালও প্রথম কিস্তির একশত টাকা যথাসময়ে লইয়া গিয়াছে। হরমোহন দুই তিনবার প্রমথর সন্ধানে তাহার বাসায় গিয়াছেন, কলিকাতায় প্রমথ আসিয়াছে সে সংবাদও মাঝে মাঝে পাইয়াছেন, কিন্তু একবারও তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

অসঙ্গত অধিকার লাভের প্রধানতঃ দুইটি উপায় আছে, বল ও কৌশল। তন্মধ্যে মানব-চিত্ত-অধিকারের পক্ষে শেষোক্ত উপায়টিই উপযোগী। মাছ বঁড়শী বিদ্ধ হওয়ার পর তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য সুতা গুটাইবার পূর্ব্বে সুতা ছাড়াই কৌশল; প্রমথ অমলার উপর সেই কৌশল প্রয়োগ করিতেছিল। মাসে মাসে একশত টাকা দিবার প্রসঙ্গে সে দিন যখন প্রমথর বাসা তুলিয়া দিবার কথা হইয়াছিল, তখন, বিশেষ কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও, অমলার মনের মধ্যে এই কথাটাই বারম্বার হইয়াছিল যে প্রমথ পরদিনই তাহার বাসা সমূলে উৎপাটিত করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল 'আপনি আজ রাত্রেই বাসা তুলে দিয়ে আসুন।' কিন্তু ধূর্ত্ত প্রমথ সে কথা শুনিয়া তখনই বুঝিয়াছিল যে আসিতে বিলম্ব না করিলেই আসলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, ধরা দিলেই ধরিতে পারিবে না। তাই একমাসের মধ্যেও যখন প্রমথর আসিবার কোনও লক্ষণ বা আগ্রহ দেখা গেল না, তখন অমলার মনের সব আন্দাজ একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। প্রমথকে সে যতটা সহজ এবং সুলভ মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ সে নয় বুঝিতে পারিয়া একদিকে সে যেমন মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ বোধ করিল, অপরদিকে প্রমথর উপর তাহার অপসৃত শ্রদ্ধা অনেকটা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তৎসহিত সে মনের নিভৃত প্রদেশে একটা অদ্ভুত রকমের নৈরাশ্যের গ্লানিও বোধ করিল; চিকিৎসক 'জবাব' দিয়া যাইবার পর সমস্ত অনুমান এবং অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া রোগী সহসা বাঁচিয়া উঠিলে আনন্দেরই সহিত চিকিৎসক যেরূপ একটা অপ্রত্যাশার আঘাত অনুভব করে, কতকটা সেইরূপ।

মাস-কাবারের পর আট নয় দিন অতিবাহিত হইয়াছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় কিস্তি দিতে হইবে। টাকার জন্য হরমোহন চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে প্রমথর নিকট হইতে টাকা না আসিয়া একখানা চিঠি

আসিল। চিঠি খুলিয়া হরমোহন দেখিলেন একটা নূতন ঠিকানা হইতে প্রমথ পত্র দিয়াছে, এবং মাণিকলালের কিস্তির টাকা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

বৈকালে অফিসের ফেরত হরমোহন প্রমথর নূতন ঠিকানায় উপস্থিত হইলেন। তালতলা অঞ্চলে একটা জীর্ণ দ্বিতল গৃহ, দেখিলে মনে হয় না যে নির্ম্মিত হওয়ার পর কখনও সংস্কার হইয়াছিল। গৃহদ্বারে বসিবার বাঁধান জায়গায় এক ব্যক্তি বসিয়াছিল; কৃশকায়, কৃষ্ণবর্ণ, এবং মাথার কাঁচা চুল এবং মুখের পাকা ভাব এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা তাহার যথার্থ বয়সের পরিচায়ক, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

হরমোহন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এটা মেস ত'?"

হঠাৎ ম্যাজিকের মত সেই নিকষকৃষ্ণ মুখের মধ্য হইতে দুই শ্রেণী দুগ্ধ-শুভ্র দন্ত বাহির করিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "মেস বলেন কি মশাই? হোটেল! দেখছেন না, ছাইন-বোর্ড দেখছেন না, গেরেট্ বেঙ্গল হোটেল?"

হরমোহন সন্ধ্যায় স্তিমিত আলোকে পাঠ করিয়া দেখিলেন সেই ক্ষুদ্র এবং নগণ্য গৃহের সেই জমকাল নামই বটে।

"আপনি কি এখানে থাকেন?"

আবার সেই দন্তের ম্যাজিক হইল। "থাকি কি? আমি এখানকার মালিক! আর কেউ অংশীদার নেই।"

হরমোহন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বটে? তবে তো একেবারে আসল লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে! আমি প্রমথনাথ চাটুয্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি বাড়ী আছেন কি?"

"আছেন। আপনি?"

হরমোহন এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি প্রমথর মেসো হই।"

শুনিবামাত্র সেই ব্যক্তি ত্বরিত-বেগে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া হরমোহনের পদধূলি লইল। তৎপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি ত' তাহলে গুরুজন ব্যক্তি! চলুন, ওপরে চলুন। কদিন থেকে চাটুয্যে মশায়ের বড় অসুখ করেছে।"

অসুখের কথা শুনিয়া হরমোহন উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রমথর নিকট উপস্থিত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র, অন্ধকারময় কক্ষ। তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। হরমোহন প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছুই ভাল দেখিতে পাইলেন না। একদিকে একটা খাটের মত মনে হইল। তাহার উপর হইতে যখন "আসুন মেসো মশায়, এদিকে আসুন" বলিয়া প্রমথ আহ্বান করিল, তখন হরমোহন গিয়া শয্যার এক প্রান্তে প্রমথর শিয়রে বসিলেন।

"কি অসুখ হয়েছে তোমার প্রমথ?"

"বলছি" বলিয়া প্রমথ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "চক্কোত্তি, আলোটা জেলে দিয়ে, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া প্রমথর বাতিদানে বাতি জ্বালিয়া দিয়া দ্বার ভেজাইয়া প্রস্থান করিল। হরমোহন বুঝিতে পারিলেন ধনী বলিয়া হোটেলে প্রমথর বিশেষ একটু খাতির আছে।

চক্রবর্ত্তী প্রস্থান করিলে প্রমথ বলিল, "অসুখ তেমন কিছু নয় মেসো মশায়। চার পাঁচ দিন জ্বরে ভুগেছিলাম, কাল থেকে জ্বর আর নেই, কিন্তু ভারী দুর্ব্বল করেছে। নইলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, নিজে গিয়েই টাকাটা দিয়ে আসতাম। আপনার বড় কষ্ট হ'ল!"

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হরমোহন বলিলেন, "হ্যাঁ, বাস্তবিকই কষ্ট হয়েছে তোমার এই দুর্ব্যবহারে। বাসা তুলে দিয়ে একটা কদর্য্য জায়গায় পড়ে তুমি অসুখে ভুগছ, অথচ আমার বাড়ী যেতে পারনি, এই ত' তুমি আমার আপনার লোক? আমি এখনি একটা গাড়ী নিয়ে আসছি, তুমি আমার সঙ্গে যাও ত ভালই, নইলে তোমার এক পয়সাও আমি আর হাতে করছি নে, তা আমার যত বড় বিপদই হ'ক না কেন!"

হরমোহনের কথা শুনিয়া প্রমথ মনে মনে বিশেষ হৃষ্ট হইল, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য্যের মুখস পরিয়া হরমোহনের বাড়ী না গিয়া সেই মেসে থাকার পক্ষে এমন সব কারণ দেখাইতে লাগিল, যাহাতে হরমোহনের বুঝিতে একটুও ভুল না হয় যে, অন্য কারণ থাকিলেও, যে গুলা দেখাইতেছিল সে গুলা সত্য কারণ একেবারেই নয়, নিতান্তই মিথ্যা ওজর-আপত্তি। এমন কি হরমোহনের গৃহে তাহার বাস করিবার আমন্ত্রণের প্রসঙ্গে অপর সকলের নামোল্লেখের

মধ্যে অমলার নামটা সে এমন স্পষ্টভাবে বাদ দিয়া গেল যে হরমোহনের এ সন্দেহ হইতেও বাকি থাকিল না যে, তাহার আপত্তির যথার্থ কারণ অমলার সেদিনের রূঢ় আচরণ।

ঘণ্টাখানেক তর্কবিতর্কের পরও প্রথম যখন বাসা তুলিয়া হরমোহনের গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল না, তখন হরমোহন দুঃখে ও অভিমানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রমথর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও টাকা না লইয়াই প্রস্থান করিলেন।

পথে বাহির হইয়াই হরমোহনের অভিমান আশঙ্কায় রূপান্তরিত হইয়া গেল! এই সব মান-অভিমানের গোলযোগে পনের তারিখের মধ্যে মাণিকলালকে টাকা দেওয়া না হইয়া উঠিলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিয়া হরমোহন অধীর হইয়া উঠিলেন। আত্মসম্মান-বোধের সীমাতিরিক্ত অভিনয় করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া আসার জন্য মনের মধ্যে গভীর পরিতাপ উপস্থিত হইল। কিন্তু গৃহে পৌঁছিলে প্রভাবতী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন প্রমথ কেন আসিল না, এবং টাকা আসিয়াছে কি না, তখন অদূরে উৎকর্ণ হইয়া অমলাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হরমোহনের আশঙ্কা ও অনুতাপ মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল।

প্রভাবতীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "এবার পাওনাদার এসে যখন অপমান করবে, তখন তোমার মেয়েকে সামলাতে বোলো!"

প্রভাবতী সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কেন? ও কি করেছে?"

হরমোহন তেমনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "কেন তুমিও কি ভুলে গিয়েছ? তোমার সাক্ষাতেই ত' ও সেদিন এ বাড়ীতে আসা নিয়ে প্রমথর সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করলে, তাতে তখনই আমি বুঝেছিলাম যে প্রমথর যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকে তা হলে এ বাড়ীতে কখন সে বাস করছে না! মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা করে দিয়ে এ বাড়ীতে কষ্ট করে থেকে ওর ত ভারী লাভ যে ওর উপর তম্বী!"

প্রভাবতী বলিলেন, "প্রমথ কি সে সম্বন্ধে কোন কথা তুলেছিল?"

হরমোহন কহিলেন, "সে কি সেই রকম লোক যে স্পষ্ট করে সে কথা বলবে?"

"টাকা এনেছ?"

"এখনও আত্মসম্মান-জ্ঞান একেবারে হারাই নি যে এ অবস্থাতেও হাত পেতে টাকা নেব, তা অদৃষ্টে যত দুঃখই থাক!"

অমলা এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। দুঃখে ও বেদনায় তাহার হৃদয় বিগলিত হইতেছিল না, অভিমানে ও অপমানে দগ্ধ হইতেছিল! পাওনাদারকে সে সামলাইবে, এত বড় অপমানের কথা পিতার মুখ দিয়া বাহির হইল! অথচ বাস্তবপক্ষে তাহার আর বাকি ছিল কোথায়? প্রথমকে এই প্রশ্রয় দেওয়া পাওনাদারকে সামলান ভিন্ন অন্য কিছুই ত নয়! কিন্তু সে কথা বুঝিবে কে, আর বুঝাইবেই বা কে

তাহার পর, তাহাদের বাটীতে বাস করিলে প্রমথর যদি কোন লাভ না থাকে ত' তাহারই বা ক্ষতি কি? বেশ, তবে তাহাই হউক। কিন্তু পরে যদি কখন প্রমথকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তখন সে ব্যাপার হইতে সে একেবারে নির্লিপ্ত থাকিবে!

অমলা উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল। তাহার পর হরমোহনের বসিবার ঘরে গিয়া টেবিলের উপর হইতে প্রথম চিঠিটা লইয়া ঠিকানা দেখিয়া নিজ লিখিত চিঠিখানা একখানা খামে পুরিয়া প্রমথর ঠিকানা লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

১৩

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রমথ স্থির করিল যে দ্বিপ্রহরে হরমোহন যখন অফিসে থাকিবেন, তখন গিয়া প্রভাবতীকে পঁচাত্তর টাকা দিয়া আসিবে; এবং সেই সময়ে অমলা ও প্রভাবতীর আগ্রহ এবং আচরণ লক্ষ্য করিয়া হরমোহনের গৃহে বাস করা-না-করা স্থির করিবে। এ বিশ্বাস তাহার মনে মনে বেশ ছিল যে, অন্ততঃ প্রভাবতী তাহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, এবং এ কথাও সে মনে মনে এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিল যে এবার একটু পীড়াপীড়ি করিলেই আর অসম্মত হইবে না।

আহারাদির পর টাকা লইয়া যাইবার জন্য প্রমথ প্রস্তুত

হইতেছিল, এমন সময়ে ডাক-পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামের উপর অপরিচিত হস্তের লেখা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া প্রমথ দেখিল লেখিকা অমলা। ঔৎসুক্যের সহিত প্রমথ চিঠিখানা পাঠ করিল। লেখা ছিল,

শ্রীচরণেষু,

একমাসের মধ্যে আপনি একবারও এ বাড়ীতে আসেন নাই; এমন কি অসুস্থ শরীরে হোটেলে বাস করিতেছেন, তবুও আমাদের নিকট আসিলেন না। যদি আমার কোনও অপরাধের জন্য আপনি রাগ করিয়া থাকেন ত অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন, এবং আমার একান্ত অনুরোধ পত্রপাঠ মাত্র আপনার জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া আসিবেন। না আসিলে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হইব।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এ চিঠিখানা কাহাকেও দেখাইবেন না, এবং কাল আসিয়া চিঠিখানা আমাকে ফেরত দিবেন।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন, ইতি—

অমলা

চিঠি পড়িয়া প্রমথর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একটু চিন্তা করিয়া সে হোটেলের ভৃত্যকে ডাকিয়া একখানা ঠিকা গাড়ী আনিতে আদেশ দিল, এবং তৎপরে চিঠির কাগজ বাহির করিয়া নিম্নলিখিত মত একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিল।

স্নেহের অমলা,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে অতিশয় সুখী হলাম। গোপাল ডাক্তারের চার শিশি ঝাঁঝাল ওষুধ খেয়ে যে ফল না হয়েছিল, তোমার এই ছোট্ট হোমিও-প্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটার মত চিঠিখানিতে তার দশ-গুণ ফল হ'ল! পাঁচ মিনিট আগে দুর্ব্বলতায় মাথা তুলতে পারছিলাম না, আর এখন একেবারে সোজা হয়ে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি।

তুমি আমাকে যাবার জন্যে আদেশ করেছ। শরীর যদি নিতান্ত অপটু না হ'ত তা হ'লে এক মিনিট দেরী না করে তোমার হুকুম তামিল করতাম। যাই হ'ক তুমি যখন আমাকে আহ্বান করেছ, তখন তার প্রতিকূলে এমন কোনও শক্তি নেই যা আমাকে আটকে রাখতে পারবে। কাল সকালেই হাজির হব। এই হল তোমার প্রথম আদেশের কথা।

তোমার দ্বিতীয় অদেশটি আমি আংশিক ভাবে নিশ্চয়ই পালন করব, অর্থাৎ তোমার চিঠিখানি কাউকে কখনই দেখাব না, কিন্তু তোমাকে ফেরতও কিছুতে দোব না। কেন তা জান? ভেবে চিন্তে তুমি মনে মনে যে কারণটা বারম্বার সন্দেহ করবে, ঠিক সেই কারণে।

কাল যখন তোমার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে, তখন আজ আর থাক। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি

তোমার প্রেমময়দাদা

একখানা খামে অমলার ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানা ভরিয়া প্রমথ পকেটে রাখিল, তাহার পর গাড়ী আসিলে একটা ট্রাঙ্ক ও বিছানা গাড়ীর মাথায় দিয়া হরমোহনের গৃহে যাত্রা করিল।

সুরেশ স্কুলে গিয়াছিল, প্রভাবতী আহারের পর দৈনন্দিন নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং অমলা নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, এমন সময়ে প্রমথর গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। গাড়ীর শব্দে জাগ্রত হইয়া অমলা জানালায় আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল প্রমথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছে। প্রথমেই তাহার প্রভাবতীকে উঠাইয়া দিবার কথা মনে হইল, কিন্তু তৎপরমুহূর্ত্তেই মনে হইল প্রভাবতীর সম্মুখে প্রমথ যদি তাহার পত্রের কোন উল্লেখ করে, তদপেক্ষা তাহারই সহিত প্রথমে প্রমথর সাক্ষাৎ হওয়া ভাল।

তখন ত্বরিত পদে নামিয়া গিয়া অমলা দ্বার খুলিয়া দিল। প্রমথ সহিসকে তাহার জিনিস দুইটা বাহিরের ঘরে রাখিতে বলিয়া সহাস্য মুখে প্রবেশ করিল। জিনিস রাখা ও ভাড়া দেওয়া হইলে প্রমথ সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল।

অমলা দ্বারের বাহির হইতে বলল, "তোমার ত' অসুখ শরীর প্রমথ দাদা, এখানে কষ্ট হবে। ওপরে বাবার ঘরে গিয়ে একটু শুলে ভাল হয় না?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা কোথায় অমলা?"

অমলা বলিল, "মা ঘুমচ্ছেন।"

"সুরেশ?"

"সুরেশ স্কুলে।"

"মেসো মশায় ত' অফিসে?"

"হ্যাঁ।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তবে তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় গতি নাই?"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলার মুখখানা প্রথমে লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মা ঘুমচ্ছেন বলে তোমার আসা টের পান নি। চল না, ওপরে তাঁর কাছেই চল।"

প্রমথ বলিল, "ওপরে গেলেও ত' টের পাবেন না যদি না তাঁকে জাগিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মাসিমাকে জাগাবার আগে তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে। সে'টা সেরে নেওয়া যাক্।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমলা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরামর্শ?"

প্রমথ তাহার বিচিত্র কৌশলে কণ্ঠস্বরটা সহসা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া কহিল, "কাল মেসো মশায় আমাকে নিয়ে আসবার জন্যে অত পীড়াপীড়ি করলেন তাতে এলাম না, আর আজ তোমার দু লাইনের একখানা চিঠি পেয়ে দৌড়ে এলাম, এ শুনলে লোকে কি বলবে বল দেখি?"

প্রমথকে পত্র লিখিয়া, এবং সেই পত্রমধ্যে প্রমথর সহিত একটা গুপ্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপিত করিয়া কতটা ভুল ও অন্যায় করিয়াছে, তাহা অমলা বুঝিতে পারিল। সেই তুচ্ছ এবং সামান্য উপাদানটুকুর সাহায্যে প্রমথ একটা কদর্য্য লুকোচুরীর অবস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর সহসা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই পরামর্শ? এ ত' অতি সহজ কথা। এ শুনলে লোকে তোমাকে নিন্দে করবে; বলবে বাবার অত অনুরোধে না আসা যেমন অন্যায় হয়েছে, আমার চিঠি পেয়ে দৌড়ে আসা তেমনি অন্যায় হয়েছে, আর সব চেয়ে অন্যায় হয়েছে এ কথা বলে ফেলা!"

এই সবল ও সরল উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া প্রমথ অসংলগ্ন ভাবে যে কথা বলিল, সে কথার কোনও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া অমলা তাহার চিঠিখানা প্রমথর নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিল।

তদুত্তরে প্রমথ হাসিয়া বলিল, "রামচন্দ্রঃ! এমন কাজও করে? সে হ'ল একখানা দলীল, সে কি হাতছাড়া করতে আছে? বরঞ্চ দলীলের বদলে তোমাকে একখানা পাল্টা দলীল দিচ্ছি, রসীদের মত রেখে দিয়ো।" বলিয়া পকেট হইতে তাহার লিখিত পত্রখানা বাহির করিয়া অমলার হস্তে দিল।

অমলা খামে-মোড়া চিঠিখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এ কি?"

প্রমথ স্মিত মুখে বলিল, "তোমার চিঠির জবাব। প্রথমে ভেবেছিলাম কাল আসব, তাই তোমার চিঠির জবাব লিখলাম; কিন্তু লেখার পরই মন বদলে গেল, ভাবলাম হুকুমটা আজই তামিল না করলে যদি বড় রকম কিছু শাস্তি দিয়ে ব'স! তাই তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডাকিয়ে চলে এলাম।"

অমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বড় ভাইকে ছোট বোন কি আবার শাস্তি দেবে!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তা আমি তেমন কিছু জানি নে অমলা, কারণ ছেলেবেলা থেকেই বোনের সঙ্গে আমার কারবার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় স্নেহ ভালবাসার যত কিছু অধিকার আর আব্দার, তা তুমি আমার ওপর অবাধে খাটাতে পার; আমাকে তিরস্কারও করতে পার, পুরস্কারও দিতে পার। তোমাদের সেই মান্ধাতার আমলের চামসে পড়া ভাই বোনের সম্পর্ক আমার পছন্দ হয় না; আমি ভালবাসি আজ কালকার আদর্শ,—সমান ভালবাসা, সমান অধিকার। একে তুমি সাহেবীয়ানা বলে গাল দিতে চাও দাও, কিন্তু এ আমার খুব মিষ্টি লাগে। সাহেবরা এই ভাই-বোনের সম্পর্কটা এমন সমান করে দেখে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন কি বিয়ে পর্য্যন্ত হতে পারে যদি না একেবারে সহোদর ভাই বোন হয়।"

প্রমথর এই দীর্ঘ ও কূট বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া অমলা প্রমথর দিকে মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে বলিল, "সে যাই হোক্, আমি কিন্তু সেই সেকেলে ভাবকেই বড় মনে করব—তা সে যতই পচা হ'ক;—আর এই একেলে ভাবকে যাকে তুমি বলছ প্রমথ দাদা"—সহসা অমলা অসমাপ্ত কথার মধ্যে থামিয়া গেল। হয় তাহার মুখ দিয়া অতি কটু কথা বাহির হইল না, নয় গভীর উত্তেজনায় সহসা কণ্ঠ-রুদ্ধ হইয়া গেল।

মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখ চক্ষে একটা করুণ কাতর ভাব আনিয়া প্রমথ বলিল, "আমি যদি কোনও অন্যায় কথা বলে তোমাকে বিরক্ত করে থাকি ত' আমাকে ক্ষমা করো অমলা। কিন্তু একটা কথা ভুলে না গেলে তুমি আমার ওপর রাগ করতে না; সংসারে আমার আপনার লোক এত অল্প আছে, তোমরা দুচার জন ছাড়া, যে আমি তাদের সকলকেই ষোল আনা পেতে চাই! স্নেহ ভালবাসার বিষয়ে আমি এত গরীব যে ফেলবার আমার কিছুই নেই! দুর্ভিক্ষের দেশে গিয়ে যদি একবার দেখে এস সেখানকার লোক খাবার পেলে কি রকম হাঁউ হাঁউ করে খায়, তা হলে আমার এই বাড়াবাড়ি আদেখ্‌লে ভাবটা ক্ষমা করতে পারবে। যদি এ তোমার ভাল না লাগে ত' উপায় ত' তোমার নিজের হাতেই রয়েছে, কাঙ্গালকে ধানের ক্ষেত দেখিয়ো না; দেখালেই সে উঞ্ছবৃত্তি করবে!"

প্রমথর এই সকাতর কৈফিয়ৎ শুনিয়া অমলা মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি ত' তোমাকে রূঢ় কোনো কথা বলি নি প্রমথ দাদা?"

প্রমথ স্মিতমুখে শান্ত-কণ্ঠে বলিল, "না, তা তুমি বল নি; রূঢ় কথা বলবার তুমি অনেক ওপরে! সে কথা যাক্, আমার ত' সব কথাই তোমাকে বলা হয়ে গেল, এবার চল মাসিমাকে ডাকা যাক্।" তাহার পর অমলার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, "সশরীরে যখন এসে হাজির হয়েছি, তখন আর চিঠির কি দরকার? ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।"

ফিরাইয়া দিতে গিয়া অমলার বিগলিত করুণার একটু বাধিল। বলিল, "পড়ে তারপর ফিরিয়ে দোব।"

"ফিরে পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত নই; পড়াতেই আমার আপত্তি।"

"কেন?"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেটা পড়লেই বুঝতে পারবে।"

একবার অমলার চিঠিখানা ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বৃন্ত যেমন করিয়া ফলকে ধরিয়া রাখে, কৌতূহল তেমনি করিয়া চিঠিখানা আটকাইয়া রাখিল।

প্রমথকে দেখিয়া প্রভাবতী যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং তাহার শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত সংবাদ লইলেন। তৎপরে অবশেষে মেস ছাড়িয়া তাঁহাদের নিকট আসিবার সুমতি প্রমথর যে হইয়াছে, তজ্জন্য বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কাল তোমার মেসো-মশায়ের অত অনুরোধ না রেখে আজ হঠাৎ তোমার এ সুমতি কেমন করে হল প্রমথ?"

পলকের জন্য প্রমথ ও অমলা দুজনের দৃষ্টি মিলিত হইল। পর মুহূর্ত্তে মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "কালকের দুর্ম্মতির জন্যই আজ এ সুমতি হল মাসিমা! কাল মেসো-মশায়ের কথায় না আসা অন্যায় হয়েছিল, তা আজ বেশ বুঝতে পেরেছি।"

আবার অমলার সহিত চোখোচোখি হইল। এবার প্রমথ দেখিতে পাইল অমলার অধরোষ্ঠ মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখায় কুঞ্চিত। মনের সন্ধান পাইলে বুঝিতে পারিত অতি তরল কৃতজ্ঞতার রসে সে স্থল সিক্ত হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

এস!

(মীরাবাই)

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর বি-এ

সন্ধ্যা আসিছে ঐ
এস শ্যাম প্রিয়তম,
তব সমাগমে নাথ
অন্তরখানি মম
নন্দিত কর—জয়-
মণ্ডিত সব আশা—
আমারে ঘিরিয়া চির
তব প্রেম ভালবাসা।

তুমি আমি দূর—দূর—
কভু কভু নহে স্বামি,
তুমি দিবাকর মম,
তোমার ধরণী আমি,
শ্যাম ধন বিনা মন
আর কিছু নাহি চায়—
এস প্রিয় প্রাণারাম,
বেলাটুকু যায় যায়।



গৃহ-ধর্ম্ম

শ্রীপদ্মাবতী দেবী চৌধুরাণী

"বিবাহই নারীর জীবনের সাধনার পথ—গৃহধর্ম্মই তাহার প্রধান ধর্ম্ম। এই বিবাহ ইচ্ছাপূরণের জন্য নহে, কল্যাণ সাধনের জন্য। সংসার সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, একমনে সেই সংসারকেই বরণ করিয়া সতী সাধ্বী পবিত্র হইয়া ধর্ম্মকেই রমণী গৃহের মধ্যে মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিবেন—এই তাঁহাদের ব্রত।"

—রবীন্দ্রনাথ

জনসমাজ বিধাতা কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত, নর ও নারী। সংসারে থাকিতে হইলে নরের নারীকে ও নারীর নরকে একান্ত প্রয়োজন। এই সংসার আবার দুই ভাগে বিভক্ত। ভিতর ও বাহির। বাহিরে, বৃহত্তর সমাজে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বাণিজ্যে ও সমাজের বহির্দ্দিক গঠনে পুরুষের অধিকার; আর ভিতরে, অন্তঃপুরে আবহমান কাল হইতে নারীর একচ্ছত্র আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের কায নারী করিতে পারে না। তবে যখন নারীর সাহায্য বাহিরে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার অক্ষম, অপটু দেহ লইয়াও বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া সে পুরুষের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছে। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বর্ত্তমানে পদ্মিনী চাঁদবিবি, সুলতানা রাজিয়া ও ঝান্সীর লক্ষ্মীবাঈএর কার্য্যাবলী ও জীবন-কথা আজও ভারতবাসীর স্মৃতিফলকে সোণার অক্ষরে লেখা আছে। আজও ভারতের প্রদেশে প্রদেশে অনেক ভূম্যধিকারিণী পুরুষোচিত বিক্রমে ও নিপুণতার সহিত নিজ নিজ ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তবে এই কথা লাখো কথার এক কথা যে, "যার কায তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

গৃহীকে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ ও সুখী করিবার নিমিত্ত সমাজের সৃষ্টি। পারিবারিক সুশৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধিই সমাজের মেরুদণ্ড। ইহার অভাব হইলেই সমাজের বাঁধন শিথিল হয়। তখন জনগণ ইহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, ও বিভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়। বর্ত্তমানে কাশীতে ভারতের প্রধান হিন্দুনেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে যে মহতী হিন্দু-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা সমাজ পুনর্গঠন ও তাহার গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টারই সূচনা মাত্র।

মেয়েদের গৃহধর্ম্ম, পারিবারিক সুখসমৃদ্ধি ও সামাজিক মঙ্গলের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই গৃহধর্ম্ম-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলেই নারীজন্ম সার্থক হয়। এই সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে যে কতটুকু জ্ঞান, বুদ্ধি,

বিবেচনা, ধীরতা, একাগ্রতা, এবং সর্ব্বোপরি পবিত্রতা আবশ্যক, তাহা ভাবিতে গেলে, বিস্মিত হইতে হয়। আশৈশব পিতামাতার গৃহে লালিত পালিত হইয়া, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া, এই যে সকলকে চিরপরিচিত করিয়া জানা, গুরুজনকে ভক্তিসহকারে পরিচর্য্যা করা, কল্যাণীয় কনিষ্ঠদিগকে স্নেহ সোহাগ দ্বারা বশীভূত করা, সংসারের দশজনের উপকারার্থ এই যে আপনাকে তিল তিল করিয়া বিলাইয়া দেওয়া, ও সর্ব্বোপরি পতির সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া, পরার্থে এই যে নারীর নিজেকে দান করা,—ইহা যে নারী-জীবনের কত বড় গৌরব, কত বড় শ্লাঘার বস্তু, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নারী-জীবনের মহত্ত্ব গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াই সম্যক পরিস্ফুট হয়। এইরূপে নিজেকে দান করিয়াই নারী সমাজ রক্ষা করে। আর নারী যদি কেবলই নিজের আপাতমধুর সুখশান্তির দিকে চাহিত, তবে বোধ হয় মানব-সমাজ এত দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না। মনীষী ভূদেব বলিয়াছেন, "গৃহীজনের গৃহ-ধর্ম্ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।" আমাদের মেয়েদের শৈশবেই-গৃহধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে আমাদের নারী-জীবনে এমন কতকগুলি জটিল সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহার সুমীমাংসা করা অতি সত্বর আবশ্যক। সমস্যার বিষয় আমার "হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "সমাজের গৃহ পল্লী,—সহর নহে।" পল্লীর বিরাট জনসংঘের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজ-গঠন ও সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে হইবে। সহরের মধ্যে শতাধিক ধনী পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধরণ দেখিয়া ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আদর্শ মনে করিয়া, তাহাই সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করিতে বলিলে, সমাজের অনিষ্ট বই আর কিছু হইবে না। দরিদ্রের সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নতুবা দরিদ্রের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার থামিবে না, ও অচিরে তাহা সমাজকে ডুবাইয়া দিবে। গরীবের দুঃখ নিজে সম্যক বরণ করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধীজীর আদেশ সমগ্র ভারত নত-মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিল। এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী একবার কোনো একজন প্রসিদ্ধ লোকের পীড়ার সময়ে তাঁহাকে দেখিতে উক্ত লোকের বাড়ীতে যা'ন। উক্ত ভদ্রলোকের আধুনিক ধরণের শিক্ষিতা পুত্রবধূ তাঁহার কাছে বসিয়া ব্যজনী চালনা করিতেছিল। ঐ ভদ্রলোক তাঁহার পুত্র-বধূকে মহাত্মার নিকট পরিচিত করিবার সময় বলেন যে, "এ মেয়েটি খুব accomplished, আই-এ পাশ ইত্যাদি।" মহাত্মা তার উত্তরে বলেন, "I have nothing to do with that. Does she work at charka daily? Can she spin?" ভদ্রলোকটি চুপ করিয়া রহিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে দেখিতে হইবে নারীর B. A., M. A. পাশ হইতে আরো উচ্চ কর্ত্তব্য আছে। অবশ্য আমি শিক্ষার অপবাদ করিতেছি না। শিক্ষা না হইলে মনুষ্য-জীবন বৃথা। কিন্তু ইহাও বলি যে, নারী ও পুরুষের শিক্ষা এক হইতে পারে না। পুরুষের যে শিক্ষার প্রয়োজন, নারীর সে শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এবং এই যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ায় এক বড় মস্ত একটা গলদ রহিয়াছে, ইহার দরুণ এম-এ, বি-এ পাশ অনেক হইতেছে, কিন্তু দারিদ্র্যব্রতী, তপস্বিনী পতি-ব্রতা সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, দময়ন্তী ও রাবেয়ার সৃষ্টি হইতেছে না। আর দেশের মা যাঁহারা, তাঁহাদের যদি গৃহধর্ম্ম পালনের উপযুক্ত শিক্ষাই না হইল, তবে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি কি প্রকারে "পূর্ণ মানুষ" হইবে? নারী-শিক্ষা কি প্রকার হইলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় তাহার প্রবর্ত্তনের ভার নারীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। নারীর ব্যাধির চিকিৎসা যেমন নারী চিকিৎসক সহজেই আরাম করিতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। এই মহাব্যাধির প্রতিকারও আমাদের হাতে। আমাদের নিকট বর্ত্তমানে দুইটি সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—একটি বিবাহের বয়স ও অপরটি নারী শিক্ষা।

(১) বিবাহের বয়স।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে—আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, আমরা ভারতীয়, আর আমাদের শত চেষ্টাতেও ভারতবর্ষকে রাতারাতি আমেরিকায় বা অন্ততঃ পক্ষে ইংল্যাণ্ডে পরিণত করা যাইবে না। আর আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড দেশবাসিগণের জীবনযাত্রা-প্রণালী যে আদর্শ ও ভ্রমশূন্য, ইহাই আমাদিগকে মানিয়া লইতে

হইবে—এমন কথা বোধ হয় কোন অর্ব্বাচীনও এ দেশে এখন স্বীকার করিবে না। ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ, ভোগের নহে; পবিত্র জীবন যাপনের জন্য অগাধ অর্থ ত্যাগ করিয়া ভারতবাসী দারিদ্র্য বরণ করিয়া লয়। কেমন করিয়া সতী সাধ্বীর পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়, নারী-জীবন ভরিয়া তাহাই শিক্ষা করে। পাশ্চাত্য দেশে "thats a convention" বলিয়া যে কথা উড়াইয়া দেওয়া হয়, আমরা তাহার কথা শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। জানি, এই সব পড়িয়া অনেক ভদ্রলোকের গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে; কিন্তু সত্য কঠোর ও অশোভন হইলেও বলিতে হইবে।

আমাদের জাতীয়তা, আমাদের খাঁটি দেশী ব্যবহার হারাইয়া আজ আমাদের যে দুর্গতি, তাহা বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। খাঁটি ভারতীয় ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান দেশ। এখানে যে রোজ দুই বেলা খাইতে পায় না, সেও বিবাহ করে। প্রায় সকলেরই অধিকসংখ্যক পুত্র-কন্যা হয়। এত দিন ধরিয়া এই নিয়মই এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। আজ যদি দুইশত টাকা মাসিক আয়ের কম কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না, এরূপ ব্যবস্থা হয়, ও child birth regluate করার নিয়ম হয়, তবে পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের মত এদেশেও ব্যভিচার দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইবে। একটা জেলাতে দশটা Divorce courtএও কুলাইবে না। সে কথা কল্পনায় আনিলেও পাপ হয়।

আগে লোক সংযমী ছিল; ও বাল্য বিবাহে প্রায় সর্ব্বত্রই সুফল ফলিত। তখন 'গৌরীদান' প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এখন লোকের মতিগতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মতিগতি কিরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহা "হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য" প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন মেয়েদের তেরো বা চৌদ্দ বৎসরে বিবাহ দেওয়া উচিত। পণপ্রথা যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার জন্য সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও সুশিক্ষিতের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত। পাঁচখানি মোটর ও তিনখানি কলিকাতার বাড়ীর মণ্ডপ ও কদাচারী মালিক অপেক্ষা ত্রিশ টাকা বেতনের সচ্চরিত্র স্কুলমাষ্টার কন্যার বর হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ।

(২) নারী-শিক্ষা।

বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা সমাজের কোনো বিশেষ স্তরেই আবদ্ধ (Reserved) থাকিবে; কারণ তাহা সৌখীন ও ধনী নারীগণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। গরীবের মেয়ে বেথুন কলেজে পড়িয়া প্রকাশ্যে বাসন মাজিতে, ঘর নিকাইতে ও গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে রাজী নহে। তাহারা কবিত্বময়, বিলাসী জীবন যাপন করিতে চায়। ব্লাউস, সেমিজ, ব্রুচ, রিষ্টওয়াচ, পিয়ানো, সৌখীন ও মূল্যবান বাঁধাই ব্রাউনিং বা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, রুজ, পমেটম এ সব ত চাই-ই। তাঁহারা ধানভানায় ঢেঁকী দেখিলে মূর্চ্ছা যান, এবং গ্রামে থাকিতে অনিচ্ছুক। বাড়ীর পাশেই দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে এমন "আলোক-প্রাপ্ত" মেয়ে দেখিয়াছি।

আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা (Moral education) দিতে হইবে। বিবাহান্তে তাহারা শ্বশুরালয়ে কি প্রকারে শান্তিময়, পবিত্র জীবনযাপন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও অবস্থায় কুলাইলে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। অবশ্য ইংরাজি না শিখিলে জন্ম বৃথা—এমন ভাবিবার কোনো আবশ্যক নাই। কুটীর-শিল্প, বয়ন, সূচীকর্ম্ম ও চরকা কাটা সযতনে শিক্ষা দিতে হইবে। ধনী গৃহস্থ-কন্যাকে সঙ্গীতাদিও শিক্ষা দিতে পারেন। ঘর পরিষ্কার রাখা, গো-সেবা ও অন্যান্য গৃহস্থালীর কার্য্য সযত্নে শিখিতে হইবে। অবসর মত ভাল ভাল উপদেশ-পূর্ণ পুস্তক পাঠ করা যাইতে পারে। অতি সতর্কতার সহিত সন্তান-সন্ততি পালন করিতে শিখিতে হইবে। দেশের আশা ভরসা যাহারা, তাহাদের পালন ও শিক্ষা যেন সুচারু রূপে হয়। পাড়া-প্রতিবাসীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা, তাহাদের উপকার করা ও রোগীপরিচর্য্যা শিখিতে হইবে। পরম সমাদরে অতিথি-সৎকার করিতে হইবে। পাপকর্ম্মে ভয় ও ধর্ম্মে মতি যেন অচলা থাকে। সর্ব্বোপরি আমাদের ভারতীয় আদর্শ লক্ষ্যপথে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সৈন্যদলের শিবির

শ্রীননীগোপাল সমাদ্দার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সৈন্যদলের কথা আজকাল প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু দূর 'পশ্চিমে' পাটনায় যে সে রকম একটা ব্যাপার ঘটেছে, সে খবর বোধ হয় খুব কম লোকেই রাখেন। (অবশ্য যাঁরা রোজ একবার করে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে থাকেন, তাঁহাদের কথা আলাদা) আমাদের এই সেদিন প্রথম শিবির (Camping) শেষ হ'ল। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবীশদের যে রকম শিক্ষা হয়েছিল, আমাদের তা থেকে বিশেষ অন্যরকম কিছু হয়নি বটে, তবে দেশ-কাল হিসাবে একটু আধটু তফাৎ হয়। সেই ভেবেই আজ আমাদের কাহিনী আপনাদের কাছে শোনাতে এসেছি।

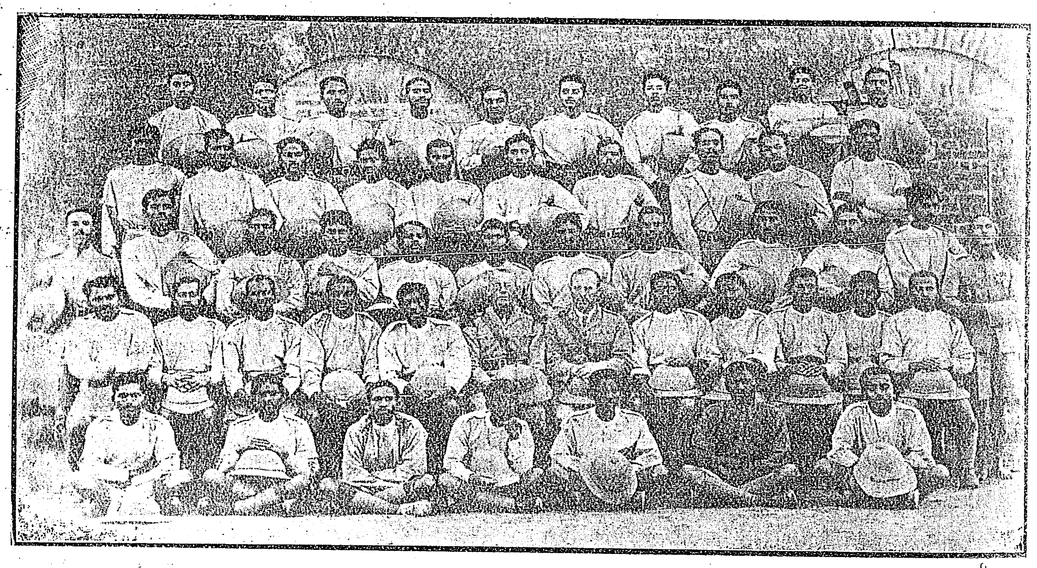

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রসৈন্যদল

গেল ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি যখন শীতের প্রকোপটা কমে আসছিল, তখন একদিন প্যারেড্ করতে গিয়ে শুনলুম যে, শীগ্‌গিরই আমাদের ১৫ দিনের জন্য দানাপুরে "Camping" কর্ত্তে যেতে হবে। শুনে তখন মনটা এক অজানা পুলকে নেচে উঠেছিল। কিন্তু আনন্দের ঝাঁঝটুকু অচিরেই অনেকটা কমে গিয়েছিল।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। আমাদের দলটী (7th Boy. Patna University Training corps) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সৈন্যদলের অনুকরণে গড়ে তোলা হয়েছে। ওখানকারই Captain G. L. Hyde গেল বছর পাটনায় এসে এই সৈন্যদলটীর পত্তন করে দিয়ে যান। এর প্রধান নায়ক হচ্ছেন বিহার লাইট হর্সের অধিনায়ক ও পাটনা কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার কে, এস, কোল্ডওয়েল, আর adjutant হচ্ছেন Major E. B. Maugin। কিন্তু আসলে শেখাবার ভার King নামে এক সার্জ্জেণ্টের হাতে। পাটনায় যে কয়টী কলেজ আছে,—পাটনা কলেজ, নিউ কলেজ, বিহার ন্যাশনাল কলেজ,—

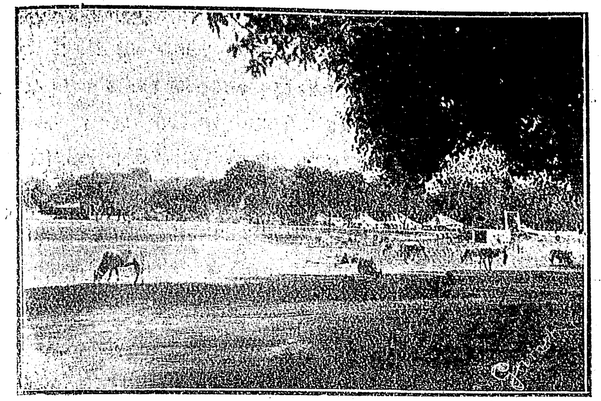

প্যারেড-মাঠ

ল কলেজ—সব কটী থেকেই ছেলেরা এই সেনাদলে নাম লিখিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশীর ভাগ ছেলে—পাটনা কলেজ থেকে। সুখের কথা যে, সংখ্যার অনুপাতে বাঙ্গালী ছেলেরাই আছে বেশী। আজ পর্য্যন্ত ৮০ জন ছাত্র নাম লিখিয়েছে।

এখন আসল কথাটা বলা যাক। দানাপুর সেনা-নিবেশে যে আমাদের শিবির পড়বে, এ কথাটা আগে থেকে রটে গিছল। যাত্রার দিন ঠিক হয়েছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী। আমরা ভেবেছিলুম, যে ফিটন করে দিব্যি হাওয়া খেতে খেতে শিবিরে গিয়ে হাজির হব। কিন্তু যখন সার্জ্জেণ্টের হুকুম পেলুম যে, আমাদের ৯ মাইল মার্চ্চ করে যেতে হবে, আর কেউই আলাদা গাড়ী করে যেতে পারবে না, তখন অনেকেরই ফুর্ত্তি কমে এল। সেই বুট, মোজা পট্টি লাগিয়ে ৯ মাইল হাঁটার নাম শুনে সত্যি বল্‌তে কি আমার যে কিছু দ্বিধাবোধ না হয়েছিল, তা নয়।

সার্জ্জেণ্ট কিং বল্‌লেন, যারা যারা শিবিরে যাবে, তাদের ১০ই তারিখ সকাল ৯ টার সময় পাটনা পুলিস ব্যারাকে আসা চাই। সেদিন ৮টা বাজ্‌তে না বাজতেই আমরা ৪৭ জন ব্যারাকে গিয়ে হাজির। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় যখন ৯ ½টা তখন আমরা মনে মনে ইষ্ট দেবতা স্মরণ করে দানাপুরের দিকে রওনা হলুম। প্রথম ৩।৪ মাইল বেশ ফুর্ত্তিতে জোরে মার্চ্চ করে যাওয়া গিছল। কিন্তু তার পরে রৌদ্রেরও বেশ তেজ হল, আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। বড় ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগলুম। এক একবার মনে হচ্ছিল যে, আমরা বুঝি পার্ব্ব না—তাল গাছের আড়াই হাত আর ফুরায় না। এই রকমে পাক্কা ৩½ ঘণ্টা মার্চ্চ করে কোন গতিকে শিবিরে গিয়ে পৌছলুম। পায়ের আর মনের অবস্থা তখন সবারই প্রায় সমান। আমাদের মধ্যে একজন আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তাকে কোন রকমে জলের ঝাপ্‌টা টাপ্‌টা দিয়ে ফের 'সজ্ঞান' করে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কি ভাগ্যি তাঁবুগুলো আগে থেকেই ফেলা ছিল। তাঁবুগুলো মানে ৩টী বড় বড় office camp—এক একটীতে ২০।২২ জন ছেলে স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি শুয়ে থাক্‌তে পারে। আমাদের শিবিরের কিছু দূরে একই মাঠে Territorial forceএর camp পড়েছিল। তাদের তাঁবুগুলো ছোট ছোট। কিন্তু, ভাগ্যই বলুন আর অভাগ্যই বলুন, ঐ রকম ক্যাম্প আর না থাকাতে আমাদের বরাতে বড় বড় "office camp" তাঁবু জুটেছিল। দেখলাম তাঁবুর মধ্যে শোবার জন্য খড় বিছোনো রয়েছে। তখন ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, মাথা ঘুরছে, পায়ের অবস্থা ত বলেইছি —সঙ্গীন। তাড়াতাড়ি মিলিটারী পোষাক ছেড়ে খাবারের কি জোগাড় হ'ল দেখতে চললুম। আমরা আসবার আগের

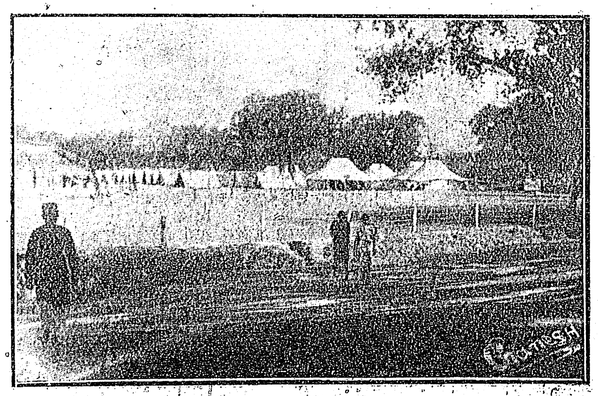

শিবির দৃশ্য

দিন, আমাদের ওখানকার খাওয়ার বন্দোবস্তের ভার নিয়েছিল—পাটনা হোটেল। তাদের সঙ্গে কথা ছিল যে, তারা দৈনিক প্রত্যেক জনের জন্য ১৲ করে পাবে ও তাতে আমাদের দুবেলা জলখাবার এবং দুপুরে আর রাতে ভাত কিম্বা রুটী দেবে। বেলা তখন প্রায় ১২, ক্ষিদের চোটে আমরা তাদের কাছে যা পেলুম, তাইতেই কোন রকমে পেট ভরালুম। সার্জ্জেণ্ট আমাদের অবস্থা দেখেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, বলে পাঠালেন, আজ আর প্যারেড হবে না, কাল থেকে সব আরম্ভ হবে। আমরা প্রত্যেকেই দুটো করে কম্বল পেয়েছিলুম—একটায় শুতে, একটা গায় দিতে। ক্যাম্পে এসে খড়ের উপর যে যার কম্বল বিছিয়ে শোওয়া গেল। খড়ে শোওয়ায় ঘুমের বিশেষ কিছু ব্যাঘাত হয়নি। ঘুম যখন ভাঙ্‌ল, তখন বিকেল ৫৲টা হয়ে গেছে—সন্ধ্যে হয়-হয়। ক্যাম্পের চারিধারে একটু বেড়িয়ে এলুম। সার্জ্জেণ্টের ক্যাম্প আমাদের ক্যাম্প ৩টীর পাশেই পড়েছিল—তাতে তিনি সপরিবারে অধিষ্ঠান করেছিলেন। তার পর গল্প-গুজবে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে হোটেলে সকাল সকাল যা পেলুম খেয়ে নিয়ে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের সুবিধে হয়েছিল বিছানা-পত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম বলে; যারা বোকামি করে আনেনি, এই কম্বলদুটী সম্বল করে খোলামাঠে পশ্চিমের শীতের রাত কাটাতে তাদের বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। এমনি করে ত প্রথম রাত্তির কাটল।

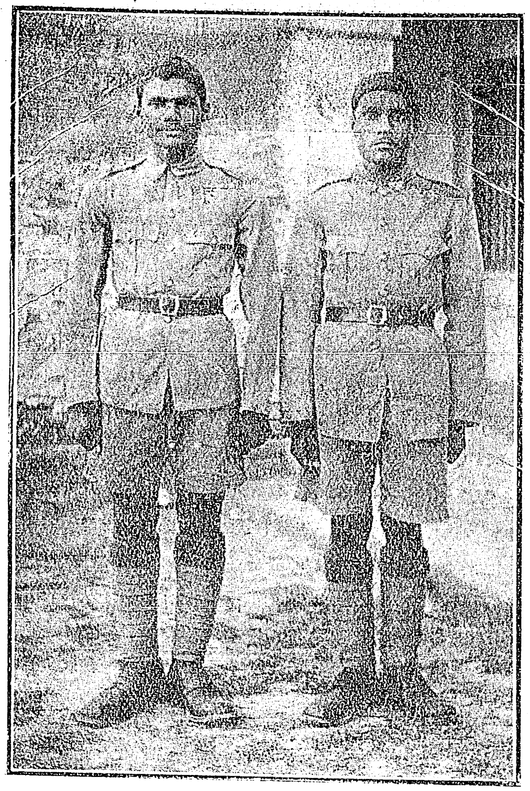

শ্রীমান ননী ও মাখন

সেই রাত্তিরেই সার্জ্জেণ্ট এসে বলে গিছলেন যে, আমাদের কাল সকাল ৭৲টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত Physical exercise বা শুধু-পায়ে ড্রিল করতে হবে। তার পর ৮৲ থেকে ১১৲টা পর্য্যন্ত রীতিমত প্যারেড হবে। ভোর ৭টায় তৈরী হয়ে খালি পায়ে ড্রিল করা আমাদের মত বাবুদের পক্ষে কষ্টকর বোধ হয়েছিল। যে শীত তাতেই হাত পা কনকনিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমরা বাধ্য হয়ে ৬৲টার সময় উঠে হাত মুখ ধুয়ে হোটেল-ওয়ালাদের কাছে জল-খাবার চাইলুম। ভাবলুম কি-ই না দেবে, কিন্তু হরি! দেখি কি যে, সকলকে এক এক পেয়ালা চা, আর একটু করে পাঁউরুটী দিয়ে বিদেয় কচ্ছে। তবু নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল। তাই থেকে Physical exercise কর্ত্তে চললুম। Physical exercise কোন মতে সেরে গিয়ে অমনি বুটপট্টি ইত্যাদি এঁটে প্যারেডের জন্য প্রস্তুত হতে হলো। অনেকের পায়ে কালকের মার্চ্চের চিহ্নস্বরূপ, বেশ বড় বড় ফোস্কা পড়েছিল। তারা সার্জ্জেণ্টের কাছে গিয়ে বল্‌লে যে, ও-বুট পরে আজ প্যারেড কর্ত্তে পারবে না! তিনি ত শুনে মহা খাপ্পা। তখন সকলে সুড় সুড় করে আবার শিবিরে ঢুকে ধড়াচূড়ো পরে প্যারেড কর্ত্তে প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ সার্জ্জেণ্টের চীৎকার শোনা গেল, "Fall in"—যে যেখানে ছিল, বন্দুক ঘাড়ে করে এসে জড়ো হল। ২৷৷০ ঘণ্টা স্কোয়াড ড্রিল, আর্টিলারী ফরমেশন ইত্যাদি

করে যখন ছুটী পেলাম, তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারলে যে Camping জিনিসটী কি। তার পর খেয়ে-দেয়ে বিছানায় একটু গড়াগড়ি দিতে না দিতেই আবার সেই চীৎকার—"fall in," আর অমনি দৌড়। আবার ২ ঘণ্টা ধরে কুচ-কাওয়াজ করে যখন ফিরে এলাম, তখন যেন একটা ভৌগোলিক সত্যের উপলব্ধি হল; মনে হতে লাগ্‌ল পৃথিবীটা ঘুরছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা সকলে মিলে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলুম, কেমন করে বাকী কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন সার্জ্জেণ্টের কাছ থেকে ছুটী নিয়ে বাড়ী থেকে বিছানা পত্তর আনতে গেল। আমরা এক বন্ধুকে একটী গ্রামোফোন ও একটা হারমোনিয়াম নিয়ে আসতে বার বার করে বলে দিলুম। তাড়াতাড়িতে ক্যামেরাটা নিয়ে আসা হয়নি, তাও একটা আনতে বললুম। এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যদি একটু আমোদ-প্রমোদ না করা যায়, তবে ত আর শরীর বয় না।

তৃতীয় দিন ভোর পাঁচটার সময় হঠাৎ বাহিরে হল্লা শুনে বেরিয়ে এসে দেখি আমাদের বন্ধুরা অরগান, বাঁশী, গ্রামোফোন আর বিছানা-পত্তর নিয়ে হাজির। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিছানা সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাঁরা তখন খুব একচোট বাহাদুরী নিলেন।

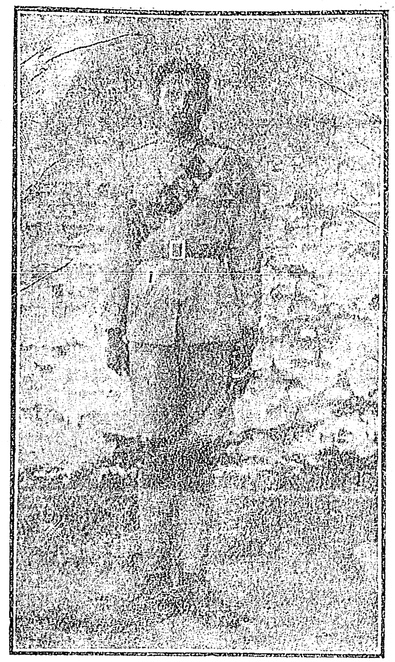

করপোরাল্ বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই। না বল্‌লেও চল্‌ত, তবে বল্‌তেও দোষ নেই। সকাল বেলার নিত্যকৃত্যের প্রধান অঙ্গটী নিয়ে প্রথম ২।১ দিন একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। ৫।৬টী টিন দিয়ে ঘেরা জায়গা করে দেওয়া ছিল। তাতে আমাদের অতগুলি ও Territorial forceদের প্রায় ৩৫০ লোকের এক এক বার করে গেলেও সমস্ত সকাল লেগে যেত। তাই আমরা জনকয়েক ভোরে ভোরে উঠে thermoflask ঝুলিয়ে নিত্য মাঠের মধ্যে Excursion কর্ত্তে যেতাম, অর্থাৎ কি না প্রাতর্ভ্রমণের নাম করে প্রাতঃকৃত্যটা সেরে আসতাম।

সেদিন প্যারেড করে এসেই এক ক্যাম্পে অরগান ও আর এক ক্যাম্পে গ্রামোফোন বাজানো সুরু হ'ল। খানিকক্ষণ আমরা গান, চেঁচামেচি, লাফালাফি কর্চ্ছি, এমন সময় সার্জ্জেণ্ট আমাদের তাঁবুর বাইরে এসে একজনকে ডাকতে লাগলেন। ভেতর থেকে 'Just come in' বলাতে, তিনি হেসে বল্‌লেন "I dont want to enter a dancing camp"। আমরা তখন বাহিরে গিয়ে সাহেবকে ডাকতেই, তিনি ভিতরে এলেন, আর আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করেই মহাস্ফূর্ত্তিতে বাজনা আরম্ভ করে দিলেন। একটু পরে সাহেবকে খুঁজতে মেমসাহেব ও তাঁর ৫।৬ বছরের মেয়ে এসে হাজির। মেমসাহেবকে গান গাইতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন, "গান গাইতে ভাল জানি না।" মেমসাহেব ও সাহেব আমাদের কোন "love song" শুনতে চাওয়াতে আমাদের নব-নিযুক্ত করপোরাল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল মহাশয় "চাঁদ চকোরে" ইত্যাদি গাইলেন। ইংরাজীতে তর্জ্জমা করে মানে বুঝিয়ে দিতেই, সাহেব মেম খুব খুসী হলেন।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে হোটেলওয়ালা গোড়া থেকেই গোলমাল সুরু করেছিল। আমাদের হাজার ওজর আপত্তি সত্ত্বেও "menu" বদলাত না। সকালে এক কাপ চা, ১ টুকরা পাঁউরুটী, দুপুরে একটা ডিসে ভাত, যত রাজ্যের কুড়োনো জিনিষ দিয়ে তৈরী এক চচ্চড়ী বা ঘ্যাঁট, আর এক টুকরা মাছ, এই ছিল দৈনিক বরাদ্দ। কোন কোন দিন মাছের বদলে একটা ছোট্ট দেখে ডিম দিত—সে মুরগী কি হাঁস কি কিসের ডিম তা তারাই কেবল জানত। আবার রোজ যে কেমন করে

ঐ এক শিলং মাছ পেত, তা ভাববার বিষয়। কোন কোন দিন তারই বাচ্চা পুঁটী বাটা বলে চালিয়ে দিত। অনুসন্ধান করে শেষে জানা গেল শিলং মাছ বোয়াল মাছেরই নামান্তর। হোটেল-কর্ত্তার তৈরী নামটা কি না জানি-না। ভাল খাওয়ার কথা বল্‌লে—হোটেলওয়ালা (সে বাঙ্গালী) বল্‌ত, "মশায়, আপনারা সবাই বাঙ্গালী বলেই জানতুম। বাঙ্গালীর ছেলের ঐ ত খাবার—মাছ আর ভাত।" এ রকম কথা শুন্‌লে কার না আপাদমস্তক জ্বলে যায়। এমন কোন দিন যায় নি—যেদিন কোন না কোন ছেলে বমি করে নি। সাহেবকে দিয়ে অনেক ধমক ধামক দেওয়াতে, শেষের ক'দিন আগের চাইতে একটু ভাল খাবার পেয়েছিলুম; অর্থাৎ ২।১টী খাবার যুগ্যি তরকারীও দিত। এই সব কারণেই বিহারীরা প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই আর একটা হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল।

দানাপুরে থাক্‌তে আমরা প্রায়ই শোন নদীতে নাইতে যেতাম। ওখানকার ক্যাণ্টুনমেণ্টের Tommyরা আমাদের বেশ খাতির করত। কত মাইলে পাই, কোত্থেকে আস্‌ছি ইত্যাদি প্রশ্নের বৃষ্টিতে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ত। আমাদের Corpsএ Tirkey বলে একজন দেশী ক্রীশ্চান ছিল। ক্রীশ্চান বলে ঐ সৈন্যগুলো ওর খুব প্রশংসা করত।

সুখে দুঃখে ৫।৭ দিন কেটে যাওয়ার পর, সার্জ্জেণ্ট এক দিন এসে বল্‌লেন যে, আমাদের মধ্যে ২ জন Sergeant, ৩ জন Corporal, আর ৪ জন Lance Corporal বাছা হবে, এবং কয়েকজনকে লাটসাহেবের দরবারের দিন Guard of Honour হয়ে যেতে হবে। সাহেব আমাদের ভিতর senior ও কার্য্যক্ষম লোকদের ঐ পদগুলি দিলেন এবং Guard of Honourএর জন্য ২০ জন বেছে নিলেন। আমাদের আনন্দের বিষয় যে, সার্জ্জেণ্ট, কর্পোরাল, ল্যান্সে কর্পোরাল প্রভৃতি সব কজনই বাঙ্গালী, আর Guards of Honours দের মধ্যেও প্রায় অধিকাংশই বাঙ্গালী। আমরা ওখানে থাক্‌তে লিঙ্কনদের (Lincoln) কর্ণেল, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মিঃ সুলতান আহমদ, বিহার ও উড়িষ্যার Executive Councilএর Vice President এবং Senior member the Hon'ble Mr H. Mcpherson C. S. I. প্রভৃতি আমাদের দেখ্‌তে এসেছিলেন। এ ছাড়া আমরা পাটনায় থাক্‌তে কর্ণেল উইলসন্, বেঙ্গল জেনারল কিউবিট প্রভৃতি উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারিগণ এসেছিলেন। আমরা ৫।৬ মাসের মধ্যেই এত সফলতা লাভ করেছি দেখে তাঁরা ভারী খুসী হয়ে গেছেন।

এমনি করে নানা কাযে ১৫টী দিন ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে গড়িয়ে গেল। তখন ফিরে আসবার পর্ব্ব। আসবার আগের দিন সে কি ফূর্ত্তি! মেজর ম্যানপিণ, কাপ্তেন কনডোয়েল, আর সার্জ্জেণ্ট ফিং সমেত আমাদের একটা group photo তুলে নেওয়া গেল। তার পর আবার সেই নয় মাইলের মার্চ্চ। আমাদের মধ্যে যারা জিনিষপত্তর Kit-bag প্রভৃতি নিয়ে আস্‌বার হুকুম পেলে, তাদের ফূর্ত্তি দেখে কে!—তারা ত ২ ঘণ্টা আগেই রওয়ানা হ'ল। তার পর যারা Sergeantএর left right শুন্‌তে শুন্‌তে যাবে, তারা কি করবে না করবে ঠিক কর্ত্তে না পেরে হাঁ করে রইল। কিন্তু বেশীক্ষণ গবেষণা করবার অবকাশ হল না—হঠাৎ হুকুম হ'ল "Fall in"। তখন আবার মার্চ্চ করে যেখান থেকে গিয়েছিলুম, সেইখানে ফিরে এসে, armouryতে rifle জমা দিয়ে, যে যার বাড়ী ফিরে যাবার অনুমতি পেলাম। ধীরে সুস্থে ক্যাম্পের কথা নিয়ে গল্প কর্‌তে কর্‌তে যখন আমরা দুভাই বাড়ী পৌঁছলুম, তখন ৮॥ বাজে।

বক্‌শিস্

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

রাত ১২টা। ফাল্গুনের হাওয়া বইছে।

বড়বাজারের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে পোলের দিকে চলেছি। পথের দু'ধারের দোকানপাট কতক বন্ধ, কতক বন্ধ হ'চ্ছে। লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া চলাচলও প্রায় একরকম কমে এসেছে।

কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে, মাথার টুপীটা বাম হাত দিয়ে খুল্‌তেই বাঙ্গালী-বেশী দু'জন মাড়োয়ারী হাত তুলে আমায় ডাক্‌লে। ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে দিলুম। তারা দুজনে উঠে বসে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। আমি ক্লাচটা পা দিয়ে চেপে গিয়ার বদ্‌লাতে না বদ্‌লাতে পিছন হ'তে কে যেন ডাক্‌লে—"এ ভাই, এ ভাই—"

আরোহী দুজনে ফিরে চাইল; আমিও চেয়ে দেখলুম। মাথায় পাগড়ী, গায়ে একটা আধ-ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবী, লম্বা, ঢোগা, গাল দু'খানা চড়ান একটা লোক ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে গাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে মিনতিমাখা সুরে আধা মাড়োয়ারী ও আধা বাংলায় তাদের বল্লে—"আমি যাব ভাই—"

গাড়ীতে যে একটু বয়সে বড় ছিল সে বল্লে—"আরে না না—"

"না ভাই তোর পায়ে ধরি—"

"আরে ঘরে যা"—বলে আমায় ট্যাক্সি চালাতে বল্লে। লোকটা তখন হয় ত বিপুলকায় গাড়ীখানাকে আয়ত্তের ভিতর আন্‌তে পারবে না ভেবে মিটারটিকে দুহাত দিয়ে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে এক রকম কেঁদেই বল্লে—"এ ভাই, তোর গোড় লাগি ভাই—"

বয়স্ক লোকটি আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"এ জী, চালাও না—"

আমি খুব ধীরে গাড়ীখানা চালিয়ে দিলুম; গাড়ী চল্‌তে লাগল, আর সে লোকটাও মিটার ধরে একরকম ঝুল্‌তে ঝুল্‌তেই তেমনি কাঁদতে কাঁদতে চল্ল।

তখন তরুণ আরোহীটি সদয় কণ্ঠে বল্লে—"আরে আও আও—"

গাড়ী থামালুম। লোকটা উঠে বসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে;—যেন সে একটী পরম বস্তু লাভ করেছে।

চিৎপুরের মোড়ের কাছে গাড়ী আস্‌তেই তারা একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল—"বাঁয়ে—"

চিৎপুর ধরে চল্‌তে লাগলুম; কোম্পানির বাগানে, মাণিকতলার মোড়ের মাথায় এসে পৌঁছতেই হুকুম হ'ল —"ডাইনে—"

ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়লুম।

সারা গলিটি লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া, মোটর রিকসয় ঠাসাঠাসি। বাড়ীগুলির বিজলী বাতি আর পথের পাশের গ্যাসের আলোয় যায়গাটা দিনের মতন হয়ে উঠেছে। নাচ, গান, হর্‌রায় রাস্তার দুধার একেবারে ভরপুর!

একেবারে গলির শেষ বাঁকে গিয়ে হুকুম মত গাড়ী থামালুম।

আরোহীরা নেমে আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। আর সেই লম্বা মাড়োয়ারীটা সেই তরুণ মাড়োয়ারীটির পাঞ্জাবীর পিছনের খুঁট ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যাবার ভয়ে দু' হাত দিয়ে চেপে ধরল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ভীড়ের ভিতর তিনজনে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

সেদিন রোজগার হয়েছে অনেক; সে রাতের মতন সেই আমার শেষ যাত্রী-বওয়া।

গাড়ী-ঘোড়া, লোকজনের ভীড়ের মাঝে পথ কোরে একটু একটু কোরে এগিয়ে চল্‌ছি। হঠাৎ একটা বাড়ীর

ভিতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে একটু সাহেবী ধরণের সুরে আমায় ডাক্‌লে—"এ ট্যাক্সী—"

আমি বল্‌লাম "ঘর যাচ্ছি ; যাবো না—"

"বক্‌শিস্ মিল্‌বে—"

মনটা কেমন একটু দুলে উঠ্‌ল। বকসিস্ বা ফাউয়ের লোভ কাটিয়ে ওঠা আমাদের মত লোকের পক্ষে কঠিন। গাড়ী থামিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

বাড়ীর ভিতর থেকে আর একজন লোক বেরিয়ে এল, আর তার পিছনে পিছনে লম্বা পিপছিপে ফর্সা বাইজী ধরণের বাইশ তেইশ বছরের একটী মেয়ে এসে গাড়ীতে উঠ্‌ল।

পথের আলোয় তার রূপটা চোখের ওপর তলোয়ারের মতন ঝিলিক্ দিয়ে গেল। গাড়ীতে উঠেই সে ফিক্ করে একটু হাস্‌ল ; লোক দুজন বল্লে—"চালাও—মীরবহর ঘাট—"

ভীড়ের ভিতর থেকে কোন রকমে পথ কোরে বেরিয়ে খোলা পথে পড়ে খুব জোরে গাড়ী চালিয়ে দিলুম ; কাণের কাছে হাওয়া সনসনিয়ে ডেকে বয়ে যেতে লাগ্‌ল। গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ফূর্তির পরিমাণ এত বেড়ে গেল যে মনে হল তারা ভাব্‌ছে ভাড়া যখন দেব তখন গাড়ীখানিকে শোবার ঘর ভাবা যেতে পারে। অবশ্য আমাদের এসব দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছলুম। বামে আঁধার-ঢালা গঙ্গা বয়ে চলেছে, দক্ষিণে সুদূরগামী রেলপথ। একবার ফিরে চাইলুম ;—কিন্তু ভাল কোরে ঠাহর কোরতে পারলুম না আমার আরোহীরা তখন কি অবস্থায় রয়েছেন।

হঠাৎ হুকুম হল—"আস্তে—"

এক্সিলেটারটা একটু আলগা দিয়ে চালাতে লাগলুম। পথে যে দু' একজন লোক ছিল, তাও একটা যায়গায় এসে আর দেখা গেল না।

খুব বিশাল এক বটগাছের তলায় আসতেই আবার হুকুম হ'ল—"সবুর—"

গাড়ী থামালুম। গঙ্গার বুকের আঁধারের খানিকটা যেন তীর বেয়ে সেইখানটিতে উঠে এসেছে, রাতের প্রহরী পথের আলোটি ও গাছের ডালের আড়ালে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে, আর সারা সহরের সুপ্তি ও নির্জ্জনতা যেন সেই-খানটিতে আশ্রয় খুঁজে নিয়ে পড়ে আছে।

একজন বল্লে—"ওহে, তোমার গাড়ীর পিছলের একটা চাকায় যেন কিসের শব্দ হচ্ছিল।"

গাড়ী থেকে নেমে দেখ্‌তে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ আরোহী দুজনেও গাড়ী থেকে নেমে একটু দূরে সরে গেল। একখানি চাকা পরীক্ষা করে গাড়ীর পাশে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ দুখানি নরম হাত এসে আমায় লতার মতন জড়িয়ে ধরলে! একটু চমকে উঠে ফিরে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আমার ধূলো ভরা মুখের ওপর এক সঙ্গে উষ্ণ ঠোঁটের অনেকগুলো চুমো পড়তে লাগ্‌ল! আমি মুখটা সরিয়ে নিয়ে আপনাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলুম। নাড়া পেয়ে বুক-পকেটের টাকগুলো ঝন্ ঝন্ কোরে বেজে উঠ্‌ল, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে নাকের ওপর মস্ত একখানা ঝক্‌ঝকে ছোরা এসে স্থির হয়ে রইল। ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল! কানে এল—"চুপ্—কথা বল্লেই খুন—"

সেই নরম হাত দুখানি তখনও আমায় তেমনি জড়িয়ে।

নিমেষের মাঝে হাত দুখানি সরে গেল, পকেটটি খালি হ'ল, আর গাড়ীখানিও চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল!

আমি একবার মাত্র চীৎকার কোরে "পুলিশ" বলে ডাক্‌তে চেষ্টা করে হতভম্বের মতন সেই জনহীন পথে একলা দাঁড়িয়ে রইলুম! বক্‌শিসের লোভে পড়ে আসল যা ছিল তাও গেল।

খড়্গপুর

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

আগেই বলে রাখা ভাল যে, এ খড়্গপুর বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের প্রধান আড্ডা খড়্গপুর নহে,—ইহা মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত বারিয়ারপুরের ১২ মাইল দূরবর্ত্তী একটা গ্রাম। এখানে আমরা স্কুলের ছাত্রদের পল্লী-ভ্রমণে (School-excursion) গিয়াছিলাম। তারই একটা বিবরণ দিচ্ছি।

গাড়ী সাতটার সময় ভাগলপুর ছাড়ে। যাত্রী আমরা প্রায় ৫০ জন। 'ঠাকুর', 'খান্‌সামা' সবই আমাদের সঙ্গে ছিল। প্রিন্সিপাল আমাদের সঙ্গে গেলেন না, সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইবেন। জিনিষ-পত্র খান্‌সামার জিম্মায় দিয়া আমরা কয়েক-জন বন্ধু একটা কক্ষ জুড়িয়া বসিলাম।

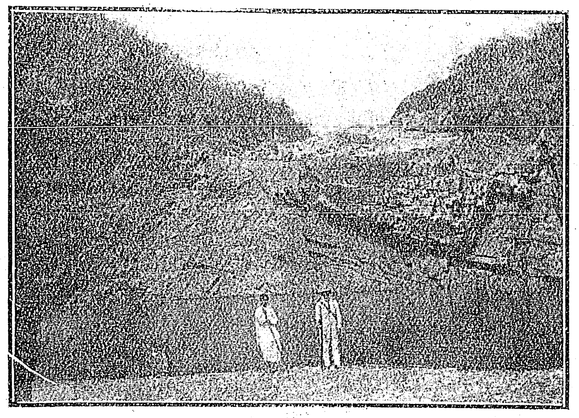

পাঁচকুমারী—খড়্গপুর

অনুমান ১৷৷০ ঘণ্টা পরে আমরা বারিয়ার-পুর ষ্টেসনে পৌঁছি-লাম। বারিয়ারপুর লুপলাইনের একটি ছোট ষ্টেসন। কলিকাতা হইতে ২৯১ ও জামালপুর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। আমাদের এক্কায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি কোনও এক্কাওয়ালাই যাইতে চাহে না। তাহাদের সঙ্গে খুব বকাবকি করা গেল, কিন্তু তারা কিছুতেই যাইবে না, বলে, "দারোগাবাবু যায়েঙ্গে।" কি করা যায়—দু'একজন দারোগাবাবুর কাছে গেলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। তখন কয়েকজন সেই এক্কা তিনখানিতে উঠিয়া বসিলেন। আমরা বাকী কয়েকজন হাঁটিয়া যাত্রা করিলাম। জিনিষপত্র ও কয়েকজন গরুর গাড়ীতে পরে যাইবে। আমার কিন্তু গরুর গাড়ীতে যাইতে মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না ; অত ধীরে ধীরে যাওয়ার চেয়ে হাঁটিয়া যাওয়া ভাল!

খড়্গপুর বারিয়ারপুর হইতে ১২ মাইলে দূরে। যালের মধ্যে সেই বেহারের সনাতন এক্কা, আর গরুর গাড়ী। কিন্তু রাস্তাটী খুব ভাল, দুই পার্শ্বের উচ্চ বৃক্ষগুলি রৌদ্র-তাপের কষ্ট কিছুই বুঝিতে দেয় না।

এই রাস্তায় ত চলিলাম। কিন্তু একমাইল যাইবার পর আর পারি না! বসিয়া প ড়ি লা ম। কিছুক্ষণ পরে দেখি এ ক খা নি ট ম্ ট ম্ আসিতেছে। একজন বন্ধুকে নামিতে বলিয়া সেইখানিতে চাপিয়া বসিলাম। সহযাত্রীটি বলিলেন যে অন্য এ ক খা নি ট ম্ ট ম্ উল্‌টিয়া রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে।

কিছুদূরেই একটি ছোট গ্রাম। সেখানে কিঞ্চিৎ জলখাবার খাইয়া আবার যাত্রা করা গেল। প্রায় ৬ মাইল দূরে সানপুর গ্রাম। এইখানে পোষ্টাফিস ও ছোটখাট একটি বাজার আছে। বাজারে চা'ল, ডা'ল, পান—প্রায় সব আবশ্যক জিনিষই পাওয়া যায়। পোষ্ট-আফিসে বিশ্রামের জন্য আমরা বসিলাম। সঙ্গে যে এক্কাওয়ালা ছিল, সে আর কোন ক্রমেই যাইবে না। শেষে সে জোর করিয়া চলিয়া গেল, ভাড়া লইল না। আমরা এখানে প্রচুর পরিমাণে জলপান এবং কিছু খাবার খাইয়া আবার যাত্রা করিলাম। অনতিবিলম্বে, আমাদের

যে দল যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত দেখা হইল।

আমাদের সঙ্গী শ্রীযুক্ত সুশীলবাবু আদর্শ শিক্ষক। তাঁহার মত লোক বিরল। তিনি ছেলেদের কষ্ট দেখিয়া সাইকেল ছাড়িয়া পদব্রজেই চলিলেন। আমি নির্লজ্জের মত বলিলাম, "স্যর্, আমি সাইকেলে যাই।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা যাও, কিন্তু একঘণ্টা পরে দাঁড়িয়ো।" আমি কিন্তু তাঁহার শেষোক্ত কথা শুনিতে পাই নাই। তখন আর আমায় পায় কে? মাথার টুপিটা ভাল করিয়া আঁটিয়া দ্রুত যাইতে লাগিলাম। এখানকার পল্লীবাসীর জীবনযাত্রা মধুর, দৃশ্য উপভোগ্য। দুইদিকে শ্যামল ক্ষেত্ররাজি, দূরে—আরও দূরে উন্নতশীর্ষ পর্ব্বতমালা, মধ্যে তরু-ছায়া সমন্বিত একটি সুন্দর পথ।

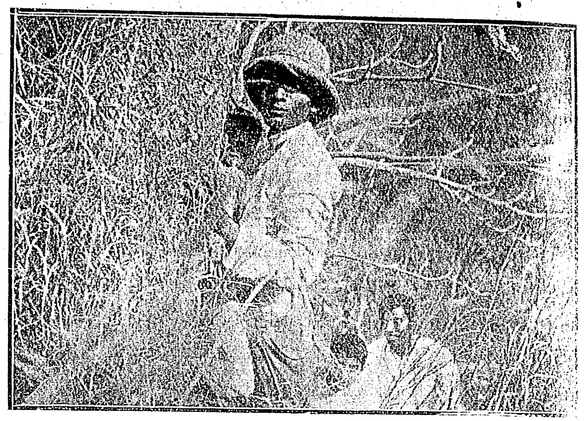

জঙ্গল—খড়্গপুর

ক্রমে সাতমাইল পথ ছাড়াইলাম। পথে অনেকের সহিত দেখা হইল। খড়্গপুর বাজারে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা বারটা। ডাক্‌বাঙ্গালার কুয়ার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 'হাটের' চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বাঙ্গালী

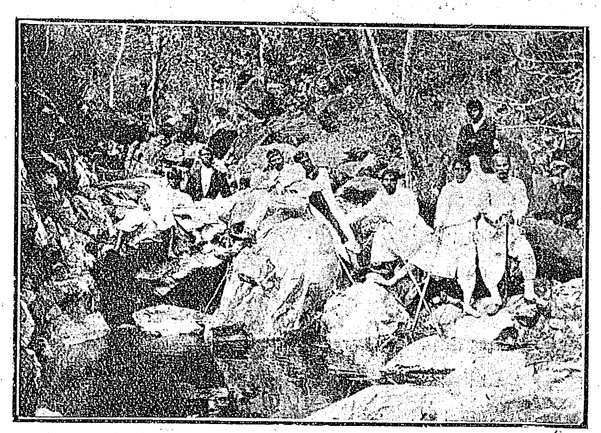

খড়্গপুর পাহাড়—একটি দৃশ্য

জমিদার বাবুর বাসায় আমাদের থাকিবার কথা! একজন লোকের কাছে পথ জানিয়া লইয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের শিক্ষক পূজনীয় অরবিন্দবাবু পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন। আমি হাত মুখ ধুইয়া কোট্‌টি খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলাম।

খড়্গপুর মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত। এখানে ডাক্‌বাঙ্গালা, থাদা ও আবগারী বিভাগের একটি ভাটীখানা আছে। অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশী নহে। খড়্গপুর মহারাজা দ্বারভাঙ্গার এলাকার অধান। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র আসিল। সকলে নিজের নিজের জিনিষপত্র উঠাইতে লাগিলেন। আমার ব্যাগটার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গরুর গাড়ী বোঝাই জিনিষের চাপে সেটা অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল!

ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিতেছে। দু' চারিজন বাজারে মুড়ী ও জিলিপি কিনিতে গেলেন। অন্য জলখাবার জিনিষ এখানে মেলা দুষ্কর। আর এক মুস্কিল—একজন বেহারী ছাত্র আমাদের হস্ত-স্পৃষ্ট মুড়ীও খাইবে না। তাহাকে পয়সা দেওয়া হইল—নিজের ইচ্ছামত কিনিয়া খাইবে।

সন্ধ্যার সময় প্রিন্সিপাল মহাশয় আসিলেন। আমরা কয়েকজন বাজার করিতে গেলাম। এখানকার বাজারটী

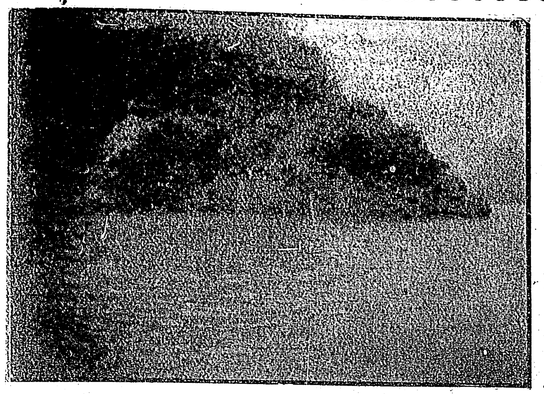

খড়্গপুর হ্রদ

নিতান্ত ছোট নহে। আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ—এমন কি লেমনেড্ পর্য্যন্ত এখানে পাওয়া যায়। বাজার করিয়া আমরা যখন ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা। শুনিলাম যে অন্যান্য সকলে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের সহিত হ্রদে বেড়াইতে গিয়াছে। মনে একটু দুঃখ হইল—কেন বাজারে গিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে আসা, তাহা আজ দেখিতে পাইলাম না।

অল্পক্ষণ পরে সকলে ফিরিলেন। অদূরে একটি বাঁধান পুষ্করিণী ছিল। তাহার ঘাটের উপর বসিয়া সকলে গান গাহিতে লাগিলেন। সুললিত সুরলহরী দিগ্‌দিগন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আশ্চর্য্য—প্রতিধ্বনির স্থিতি-কাল এখানে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড!

রাত্রি ৯টার সময় খাবার ডাক পড়িল। এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই—ঐ তরকারী, ঐ ভাত কি করিয়া অত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই নির্দ্দিষ্ট বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন খুব ভোরে উঠিতে হইবে, উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখিতে যাওয়ার কথা ছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রাত্রি প্রায় ৩টা। সকলেই আমার পূর্ব্বে জাগিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

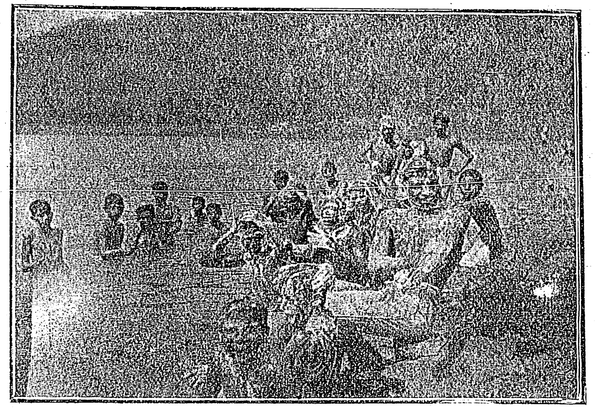

হ্রদে স্নান

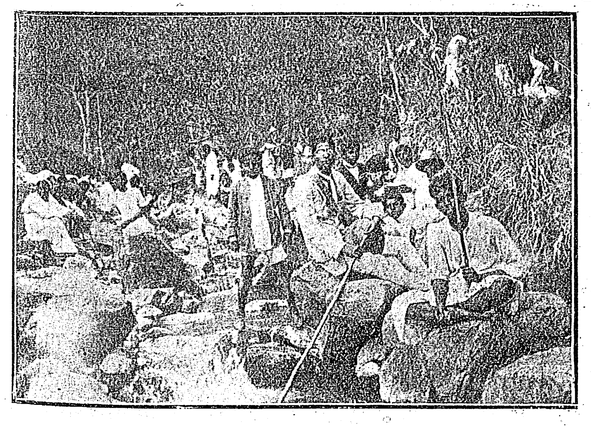

উষ্ণ-প্রস্রবণ (বড় কীকুণ্ড)

আমি চা পান করিয়া জামা পরিয়া, জুতা পায় দিব কি না একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন,—"না"। তিনি একবার এখানে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথা মানিয়া লইলাম। আমার দেখা-দেখি অনেকেই জুতা পরিত্যাগ করিলেন। একবার হাজরী (Roll-call) লওয়া হইল। পরে দুই পার্শ্বস্থ নিরীহ পল্লীবাসিদিগকে সচকিত করিয়া যাত্রা। আমাদের সঙ্গে ছিল :—খান্‌সামা, ঠাকুর, চাকর, দু'তিনজন 'গাইড্', প্লেট্, পাঁউরুটী, চিনি ও চা-ভরা একটা বাক্স, হাঁড়ি' চা'ল, ডা'ল, ইত্যাদি।

পাহাড় আমাদের আড্ডা হইতে দুই মাইল দূরে। সেই পথটুকু শীঘ্রই শেষ করিয়া, পাহাড়ে উঠিলাম। চারিদিকের গাছে এক-প্রকার সুস্বাদু ফল ফলিয়াছিল। ছাত্রগণ নির্ব্বিবাদে তাহা প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করিলেন। আমরা যেস্থান দিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহার নিকটে পার্ব্বত্য জাতির কতকগুলি উপাস্য মূর্ত্তি আছে। তারপর ক্রমাগত 'চড়াই' ও 'উৎরাই' ভাঙ্গিয়া যাত্রা। প্রায় ৮টার সময় আমরা পাঁচকুমারী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটীর দৃশ্য তত মনোরম নহে। কিন্তু এই স্থানের সহিত একটি করুণ ইতিহাস বিজড়িত আছে। যবনেরা যখন এইস্থানের রাজাকে পরাজিত করে, তখন তাঁহার পাঁচ কন্যা উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নের জলাশয়ে পড়িয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। তাহারই জন্য ঐ স্থানের নাম 'পাঁচকুমারী' হইয়াছে এবং এখনও সেই স্বল্পতোয়া পঙ্কিল জলাশয়কে ঐ অঞ্চলের সকলে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে।



খড়্গপুর নদী—উষ্ণ-প্রস্রবণ নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে

খড়্গপুর পাহাড়ে অনেক ঝরণা আছে। কোনটীর জল বেশ পরিষ্কার, আবার কোনটীর জল একেবারে অপেয়। এবার আমরা যে ঝরণাটি পাইলাম, সেটার জল অপরিষ্কার। সেই জলই প্রাণ ভরিয়া সকলে পান করিলাম।

রামেশ্বর-কুণ্ড পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য স্থান। এটীও একটী উষ্ণ-প্রস্রবন। তবে অপরটীকে 'বড়কী' কুণ্ড বলিয়া থাকে। মহারাজা দ্বারভাঙ্গা ১৯০৪ সালে স্থানটীকে পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন; তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম রামেশ্বর-কুণ্ড হইয়াছে।



জল ঠাণ্ডা করা হইতেছে

রামেশ্বর কুণ্ডে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যাত্রা। প্রায় ১১ মাইল পথ (বাসা হইতে) হাঁটিয়া, বেলা ১১টার সময় আমরা 'বড়কি' কুণ্ডে পৌঁছিলাম। কি সুন্দর! পাহাড়ের পাদদেশ হইতে একটি স্বচ্ছ বারিধারা বহিয়া যাইতেছে। জল এত উষ্ণ যে শীতকালে বাষ্প উঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রবনটী একটি ছোট নদীর আকারে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। জল ক্রমশঃ ঠাণ্ডা।

আমাদের চা তৈয়ারী করিতে কোনও কষ্ট হইল না। কেট্‌লি ভরিয়া এই উষ্ণ-প্রস্রবনের জল আনিয়া জল অপরটীর মত গরম নহে, এবং তদপেক্ষা আকারেও ছোট; অতি উপাদেয় গরম চা প্রস্তুত হইতে লাগিল। এইজন্য স্থানীয় লোকেরা এইটীকে 'ছোটকী' কুণ্ড ও ক্রমশঃই উত্তাপ বাড়িতেছে। খালি পায়ে কি উত্তপ্ত

পাথরের উপর দিয়া যাওয়া যায়! একজনের নিকট জুতা ধার করিতে হইল। কয়েকজন দূরে—যেখানে জল অপেক্ষাকৃত শীতল, সেইখানে স্নান করিতে গেলেন। একজন আসিয়া বলিলেন যে নিকটেই একটা শীতল প্রস্রবন আছে! সেখানে গিয়া দেখি, একটা নয় তিনটা প্রস্রবন। জল অত্যন্ত অপরিষ্কার।

এবার খাবারের পালা। খিচুরী ও আলুসিদ্ধ যে এত উপাদেয় হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এক রকম মাংসও ছিল। পরে আমরা কয়েকটি পাখি শিকার করিয়াছিলাম।

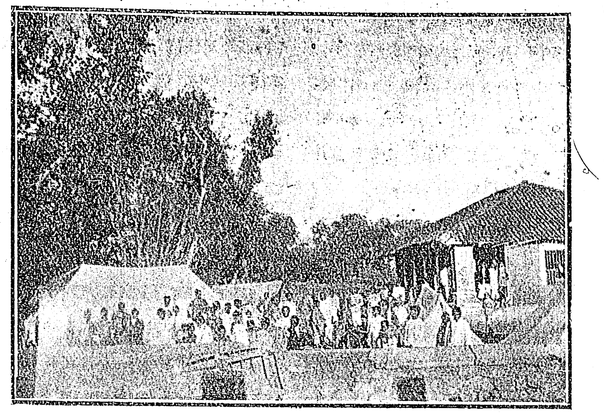

আমাদের বাসস্থান—খড়্গপুর

ডিনটার সময় আমরা ফিরিলাম। এবার অন্য পথে। খড়্গপুর নদীর ধার দিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা একটা উপত্যকায় পৌঁছিলাম। পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহার শেষ রশ্মি ছোট নদীটির উপর যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো যায় না! নদীর দুই পার্শ্বে কোমল দুর্ব্বাদল, পার্শ্বে সমান্তরাল পর্ব্বতশ্রেণী। ঠিক যেন একখানি ছবি! বাইনোকুলার (Binocular) দিয়া মুগ্ধনেত্রে অনেকক্ষণ এই শোভা দেখিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে, ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পরদিন উঠিয়া শুনি প্রিন্সিপাল চলিয়া গিয়াছেন। আমরা কয়েকজনে বন্দুক-হস্তে শিকারে বাহির হইলাম। শিকার ভাল মিলিল না। কিন্তু হ্রদের শোভা সমস্ত কষ্ট ভুলাইয়া দিল। প্রকৃতিদেবীর এ নগ্ন-সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই উপভোগ্য। পাহাড় ও জঙ্গল, মধ্যে নীল-জল। গভীরতা অত্যন্ত বেশী। ছোট ছোট ঢেউগুলি নাচিয়া নাচিয়া তীরের কাছে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

কিছুক্ষণ জঙ্গলে শিকারের পর আমরা দুপুর রৌদ্রে সকলে বাসায় ফিরিলাম। রাত্রি ১২টার সময় আমরা ভাগলপুর যাত্রা করিলাম। এবার গরুর গাড়ীতে। ভাগলপুর পৌঁছিলাম পরদিন বেলা আট্‌টায়। আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ হইল। এ স্থানের বিবরণ পূর্ব্বে কেহ লেখেন নাই, তাই আমি একটু চেষ্টা করিলাম মাত্র।

আমার বীণা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

ওরে আমার সাধের বীণা,
রইলি কেন থেমে রে তুই,
বল্ বাজ্‌বি কিনা!
ওরে সকাল সাঁঝে সকল কাজে,
সুখের মাঝে দুঃখের মাঝে;
তোরই কাছে হৃদয় বাঁধা,
বল্ বাজ্‌বি কিনা!
ওরে আমার সাধের বীণা!

ভোরের বেলা যখন আমি তোরই সাথে গাই,
বিশ্ব ছেড়ে কোথায় যেন তখন চলে যাই।—
সাঁঝের বেলা পাখী যবে,
খাঁচা ছেড়ে উধাও হবে;
তখন বুঝি বিদায় সুরে উঠ্‌বি তুই বাজি!
ওরে, সাধের বীণা মোর,
বুঝি, দুঃখের জলে গা ছেড়ে দিয়ে
কাটাবি দিবসরাজি!

ব্যথার দান

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যায় মণীষ যখন ঝরিয়ায় একটা কয়লা-কুঠীর ধারে নদীর চড়ায় বসে আপনার ব্যর্থ জীবনের পাতা-গুলার উপর চোখ বুলাইতেছিল, তখন একটা বেদনা ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার বক্ষে জমা হইয়া উঠিল ও চক্ষু দুটা জ্বালা করিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

দমকা বাতাসে যেমন তাসের খেলাঘর ভাঙ্গিয়া যায়, তেমনি তাহার জীবনের সুখশান্তি আশা ভরসা জন্মের মতই ভূমিসাৎ হইয়াছিল, সেইদিন, যেদিন সে জানিল 'আরতির' সঙ্গে 'সলিলের' বিবাহ স্থির হইয়া গেছে! আরতির দাদা প্রভাত যখন এই নির্ম্মম সত্য মণীষকে শুনাইল, সে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না; তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না যে, সেই মমতাময়ী আরতি কেমন করিয়া একজনের হৃদ্‌পিণ্ডকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে পদ-দলিত করিতে পারে! কিন্তু আরতি নিজ মুখে যখন বলিল, "হ্যাঁ মণীষবাবু, দাদা মিথ্যা বলেন নি," মণীষের চারিধারে আলোক-রেখার উপর কে যেন এক রাশ গাঢ় অন্ধকার ছড়াইয়া দিল। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে কেমন করিয়া যে সে রাত্রে ঘরে ফিরিয়াছিল, তাহা আজও তাহার মনে পড়ে না! তাহার অন্তঃপ্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া আরতিকে ঘৃণা করিতে ছুটিল, কিন্তু একটা কথা যখন আরতির পক্ষ হইয়া মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে জানাইয়া দিল, এমন মিথ্যা আশা সে কোনও দিনই দেয় নাই এবং ছলনা সে করে নাই, মণীষ তখন সমস্ত দুঃখের বোঝা নিজের মাথায় চাপাইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিল! সে আজ প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আত্মীয়, বন্ধু সকলকে ছাড়িয়া কত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারিল কই! কর্ম্মপ্রবাহে আপনাকে ডুবাইয়া এই নিষ্ঠুর স্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার পাইবে ভাবিয়া, সে কয়লা খাদের কঠিন কার্য্য গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারিল না। কার্য্য-শেষে শ্রান্ত দেহে, শূন্য মনে যখন সে কোয়ার্টারে ফিরিত, তাহার অন্তর একটা হাহাকারে ভরিয়া উঠিত! মনটা তখন তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কলিকাতার একটি পরিচিত গৃহকোণে লইয়া গিয়া এক তরুণীর সম্মুখে হাজির করিত। প্রতি কথা, প্রতি হাসি, প্রত্যেক দিনের ছোট খাটো ঘটনাগুলো বায়োস্কোপের ছবির মত তাহার চক্ষের সম্মুখে পর পর আসিয়া মিলাইয়া যাইত। মণীষ ক্ষুব্ধ অভিমানে এই হৃদয়হীনা নারীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল; কিন্তু পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তির মত যাহা বুকের রক্ত মাংস কাটিয়া হৃদয়ের অর্দ্ধেক জুড়িয়া বসিয়া আছে, ইচ্ছা করিলেই কি তাহাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলা যায়! আর ভুলিয়াই বা কি হইবে? তাহার ব্যর্থ জীবনটা ত কোন দিনই ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে না!

একটা বাঁশির উদাস করুণ সুর দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। মণীষ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল! কোন্ বিরহী প্রাণের অব্যক্ত বেদনা সুরের পরতে পরতে ঢালিয়া এই মৌন সন্ধ্যা ম্লান করিয়া দিল, তাহাকে দেখিতে হইবে!

মণীষ উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আসিতেই দেখে ঝুমন কুকী তাহার বাঁশের বাঁশীটি পাশে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি দূর আকাশের গায়ে নিবদ্ধ। তাহাকে হাটের দিনে এ রকম চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মণীষ জিজ্ঞাসা করিল, কিরে ঝুমন, হাটে যাস্‌নি?

ঝুমন কহিল, না বাবু।

তবে ভোর হপ্তা কি খাবি?

একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সাঁওতাল যুবক বলিল, নাই খাব—

কেন রে?

ঝুমন সে কথার কোন জবাব দিল না।

মণীষ কহিল, তোর কি হয়েছে?

অশ্রু গোপনের চেষ্টায় মুখটা ফিরাইয়া ঝুমন কহিল— কুছু না!

মণীষ বুঝিল, একটা গভীর দুঃখ না হইলে এই ছুটির দিনে ঝুমন কখনও তাড়ি না খাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে না। সে তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, এই, তোর কি হয়েছে আমায় বল্!

এই স্নেহ-করস্পর্শে ঝুমন কাঁদিয়া ফেলিল! আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, মুনীয়া গুথনকে বিয়া করবে, হামাকে বিয়া করবে না।

কেন?

গুথন উহার বাপকে বিশ গণ্ডা টাকা দিবেক বলেছে।

এতক্ষণে মণীষ বুঝিল, তাহারই মত ব্যর্থতার আঘাতে আজ এই বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তাহার প্রাণ করুণায় ভরিয়া উঠিল! পূর্ব্বে মণীষ কতদিন দেখিয়াছে মুনীয়া কামীন ঝুমনের হাত ধরিয়া হাটে চলিয়াছে। ঝুমনের এ সৌভাগ্য অনেক সাঁওতাল কুলীর ঈর্ষা আনিয়াছে। মণীষ উচ্চকণ্ঠে কহিল, তুই টাকা দিলে তোকে বিয়ে করবে ত?

ঝুমন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু হামি অত টাকা কোথাকে পাব বাবু?

আমি দোব।

ঝুমন গভীর বিস্ময়ে মণীষের পানে চাহিয়া রহিল। সে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কেন বাবু তাহাকে এতগুলো টাকা দিবে?

আমার সঙ্গে আয়, খাজাঞ্চিবাবুকে টাকা দিতে বল্‌ছি!

জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন কোন ভাসমান কঠিন পদার্থকে ব্যাকুল বাহু দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, ঝুমন তেমনি মণীষের পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাবু, তুই হামার বাপ্ আছিস, ঝুমন তুহার গোলাম।"

মণীষ কহিল, ওঠ্, আমার সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দিন সকালে মণীষ বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিল, খাদের সমস্ত কুলী কামীন্‌রা তাড়ি খাইয়া ঝুমুর গাহিয়া মাদলের তালে নাচিতেছে। মণীষ বুঝিল, ঝুমনের বিবাহোৎসব। তাহার প্রাণ একটা সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল! ঝুমন ও তাহার নবপরিণীতা বধূ মুনিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া মণীষের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া কহিল, বাবু হামাদের বাপ্ আছিস্, দোয়া কর্—

প্রভাতের সূর্য্যকিরণ এই সদ্য-বিবাহিত সাঁওতাল-দম্পতির মুখের উপর পড়িয়া তাহাদের হাসিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল! মণীষ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। তাহারা চলিয়া গেল। মণীষ ভাবিল, হায়, সে যদি মণীষ না হইয়া এই সাঁওতাল যুবক ঝুমন হইত! তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু ঝরিল ও অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আরতি, তুমি সুখী হও!

চতুর্দ্দশী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল

তোমায় ধরিনু, না—সে ধরা দিলে তুমি?
কেমনে মনের মাঝে লেগে গেছে গোল,
তৃপ্তি অতৃপ্তির মাঝে হয়েছি পাগল;
—মর্ত্ত্যে কবে নেমে এল মুগ্ধ স্বর্গভূমি!
কাছে এসে হেসে তুমি গিয়েছ পলায়ে,
অন্তরে রাখিয়া রেশ—সে লীলার সুর।
—মেঘের পেয়েছে দেখা মনের ময়ূর;

এ কি আজ? মায়াময়ি, বুঝিনি ছলা এ!
সহসা সহসা যেন হৃদয় ছাপিয়া,
স্বপনের সুখে গেল ভুবন প্লাবিয়া,
সাগরের বুকে এল আকাশের শশী।
কোথা থেকে এলে কাছে, অয়ি প্রেমাতুরা,
ধরা পড়ে গেলে মোর সরলা-চতুরা!
চতুর্দ্দশে বন্দী হলে, তুমি চতুর্দ্দশী।



সত্য-যোগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, আমার কর্ম্মে আমার প্রাণে। আমাদের নিজের সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতির সঙ্গে যখন তাঁকে জড়িত করে দেখি, তখন আমাদের স্বার্থের অন্ধকারে সংসারের ছায়ায় সে দেখা বিকৃত হয়ে যায়। তিনি যেখানে সকল বিশ্বের, সেইখানে তাঁর সঙ্গে সত্য যোগ যখন উপলব্ধি করি, তখন বুঝতে পারি সমস্ত থেকে প্রত্যাহরণ করে তাঁর সঙ্গে যে চেষ্টা সে সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর সঙ্গে একলা যে যোগ তারও দরকার আছে, সেই যোগের আনন্দ একটি ঝরণার মত, এই ঝরণাটিকে বিশ্বের মধ্যে দিয়ে আনন্দ মহাসমুদ্রে নিয়ে যেতে হবে। পূর্ণতাকে যখন জানতে পারি, তখন আমার নিজের দিকেই তার সীমা দেখতে পাইনে। যে গানটি গাচ্ছি সে যেই থামল অমনি তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগ গেল, তাকে হারালুম। কিন্তু গান যখন সমে এল, তখন সমজদার যে, সে পরম একটি পরিতৃপ্তিকে পেলে। সমাপ্তির মধ্যে আনন্দকে পাওয়া কি করে সম্ভব? আমার কাছে সে ত হারালই, তবু আনন্দ পাই, কেন না, তার আনন্দরূপ আমারই ক্ষুদ্র দেখাশোনার মধ্যে আবদ্ধ নয়। আমি যে কাণে গান শুনচি সেটা আকস্মিক, কিন্তু গানের একটি নিত্যতা আছে। সুরগুলো চিরন্তন নয়, তবু গান থেমেও থামে না; আমার সঙ্গে তার ব্যবহারিক যোগেই তার শেষ নয়। তার পূর্ণতার রূপ আনন্দের রূপ সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আছে। যে ছন্দে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা চলছে, ফুল ফুটছে, মানুষের প্রেম বিকশিত হয়ে উঠছে, সেই বিশ্বব্যাপী ছন্দের একটি প্রকাশকে আমরা গানের মধ্যে পাই, তাই তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাপ্তি হলে তার পূর্ণতাকে পাওয়া হ'ল না।

পূর্ণতার উপলব্ধি সত্য যেখানে, সেখানে তা ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা খণ্ডিত হয় না। টাকা শেষ হলেই শেষ হল, কেন না সে বাইরের, একান্ত আমারই, তাই তার আন্তরিক পূর্ণতা নেই। আমার সঙ্গে যোগ ছিন্ন হলেই সে সমাপ্ত হল, পূর্ণতার যে রূপ অন্তরে বাইরে সমস্ত বিশ্বে, টাকায় তা নেই। যাকে কেবলমাত্র আমি পাই, তাকে আমিও পাই না। সে অল্প একটু পাওয়ার কত বিকার।

উপনিষদে একটি কথা আছে, সেই বেদনীয় যে পুরুষ তাঁকে জান, তাহলে মৃত্যু তোমাকে আর ব্যথা দেবে না। প্রত্যেক মানুষের একটি ব্যক্তি-রূপ আছে, তার সুখ দুঃখ চিন্তা, ভাল মন্দ নিয়ে সেখানে সে পূর্ণ। গোলাপের যে গোলাপত্ব, সেই হল তার ব্যক্তিরূপের ঐক্য। আমাদের মধ্যেও যেখানে ঐক্য সেখানে আমি পুরুষ। কিন্তু সেই ব্যক্তিরূপের ঐক্যকে যদি আমার আমির মধ্যেই পরিসমাপ্ত দেখি, তবে মৃত্যু হলেই ত শেষ হল, সে ত ব্যথা দেবেই। কিন্তু যদি দেখি সেই অসীম পুরুষ, তাঁরই পূর্ণতার ঐক্যকে আমার ঐক্যের মধ্যেও প্রকাশ করেছেন, তাহলে মৃত্যু-ভয় ত আর নেই। গানের যে অসীম রূপ সমস্ত বিশ্বে রয়েছে আমার দ্বারা ক্ষণকালশ্রুত গানটুকু যে তারই! আমার মধ্যে যে এক রয়েছে, তাকে বহুর মধ্যে খণ্ডিত করলে দেখি,

সে আজ আছে কাল নেই, কিন্তু যদি তাকে সেই এক পুরুষের মধ্যে দেখি, তবে সমাপ্তি দেখে দুঃখিত হই না। পূর্ণতার সমাপ্তি নেই।

আর একরকম করে উপনিষদ এই কথাই বলেছেন—এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাম্ হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ হৃদা মনীষা মনসা ক্লিপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। এই যে দেবতা, বিশ্বের ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম্ম। গানের পূর্ণতা চিরকালই আছে, তার প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশে কালে খণ্ডিত। যে পরিপূর্ণ, আনন্দরূপ পূর্ণ হয়ে বিরাজ করছেন, খণ্ড খণ্ড করে সুর দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করতে হয়; দেশে কালে আপনার কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সেই অনন্ত স্বরূপ আপনাকে প্রকাশ করেন। লক্ষকোটী বছর আগে যে তারা এসেছিল দপ্ করে সে চলে গেল, ফুল তার সব সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটেছিল, ঝরে গেল। কর্ম্ম তাহলে মায়া, এতে ত নিত্যতা নেই। সমগ্রের মধ্যে তার ঐক্যধারাকে যখন না দেখতে পাই, তখন আমরা ভয় পেয়ে এই কথা বলি। সংসারের ক্ষেত্রে সবই আসছে যাচ্ছে—এ কথা ত সত্যই। পূর্ণতার ক্ষেত্র আত্মার। আত্মাই পূর্ণতার স্বরূপ। সংসারে চঞ্চলতার প্রকাশ, মহিমা আত্মার মধ্যে, সেখানে তিনি শুব্ধ পূর্ণ। বিশ্বের মধ্যে তাঁর কাজের ধারার আর শেষ হয় না, কিন্তু সেইটুকুর মধ্যে ভিন্ন করে দেখলে দেখা হল না, আপনার আত্মার মধ্যে যেখানে তিনি মহীয়ান, সেখানে আত্মার পূর্ণতাকে দেখতে হবে, তা'হলে বিশ্বকর্ম্মের মধ্যে সেই নিত্য তাঁকে দেখে আনন্দিত হতে থাকব, মৃত্যুকে ভয় পাব না, আত্মার সেই মহিমাকে যখন না দেখি তখন মৃত্যুকে চঞ্চলকে দেখে মুহ্যমান হই। তাই যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা বলেছেন, বিশ্বকর্ম্মে সেই মহাত্মাকে দেখ।—গানের রসজ্ঞ যেমন সমাপ্তিকে দেখেন না, পর্য্যাপ্তিকেই দেখেন, তেমনি সংশয়বিরহিত জ্ঞান এবং প্রেমের দ্বারা অমৃতকে যাঁরা জানেন, তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হন না।

এই দুই দিক থেকে উপনিষদ একই কথা বলেছেন।—পূর্ণতাকে আমার দ্বারা যখন সীমাবদ্ধ করে দেখি, তখন তার ধ্বংস আছে, ক্ষয় আছে, তখন আনন্দ পাই না। অন্তরের মধ্যে দেখি—সমস্তের মধ্যে যা কিছু পূর্ণ সুন্দর আছে, আমির দ্বারা তা খণ্ডিত নয়, যার মধ্যে যা কিছু সত্য তা সমস্ত বিশ্বের অণু পরমাণু গ্রহ তারকার মধ্যে আছে। জুঁইফুলের ওই ক'টি ছোট পাপড়ির সৌন্দর্য্য অসীমদেশ অসীমকাল বহন করছে। আমার মধ্যে যদি কোনও সত্য থাকে তবে সে রইল, আমি লুপ্ত হলেও সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাকে ধারণ করে থাকবে, এই জেনে যেন অনন্দিত হই।

এখানে কতকগুলি বিশেষ কাজ, বিশেষ ঘরবাড়ী কি বিশেষ কতকগুলি লোক একত্র হয়েছি বলেই যে আমাদের বিশ্বভারতী সত্য হবে তা নয়, আমাদের সাধনা যদি সত্য হয়, তবে বলতে পারব বিশ্বের সঙ্গে এর যোগ আছে বলেই এর সমাপ্তি নেই।—ভগবান বুদ্ধের সেই সংঘ, কত আম্রবনে রাজগৃহ কাশী কত কি জায়গায় আপনার আয়তন বিস্তার করেছিল; কিন্তু সে সবই আজ চলে গেছে। কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই—তাঁর জীবনের মধ্যে যে সত্য ছিল সে ত রাজগির কি নালন্দার মধ্যে বদ্ধ ছিল না।—সৈন্য সামন্তের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের শেষ হয়ে গেছে, তার সমস্ত প্রতাপ নিয়ে আওরঙ্গজেবের কি আছে? বিশ্ব তাদের ধারণ করেনি, কেউ তাদের রক্ষা করতে পারলে না। তাজমহাল সাহাজানের নয়, সে সম্রাটের প্রতাপের সীমার বস্তু নয়, বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্ট আনন্দ লোকের সুরে সে সুর দিয়েছে, তাই মৃত্যুহীন আনন্দরূপকে সে পেয়েছে, সমস্ত বিশ্বের লোকে সেই আনন্দকে পাচ্ছে।—এ বাহ্য রূপ যদি আজ ভেঙেই যায়, তাতে কোনও ক্ষতি নেই; এ ত ইঁট কাঠ পাথরকে প্রকাশ করেনি, কতকোটী টাকা দিয়ে এ তৈরী হয়েছে সে এর হিসাব নয়, যে হিসাব এই আলোর স্বর্ণ ছটায় পুষ্পবনে, মানুষের প্রেমে—তাকে প্রকাশ করে সে ধন্য হয়েছে।

আমাদের আশ্রমকেও সেই কথা বলতে হবে—সেই আনন্দকে প্রকাশ কর। ধনের মধ্যে পূর্ণতার রূপ নেই। তোমার যে ঐশ্বর্য্য তার প্রকাশ নেই, বিশ্বের যে ধন তারই প্রকাশ আছে। তৈলের নিজের মধ্যে প্রকাশ নেই, দীপশিখার আলো সমস্ত জ্যোতির্লোকে তার আত্মীয়তাকে প্রকাশ করে।—মানুষ আমরা যেখানে নিজেকে শান্তিতে প্রেমে অভিষিক্ত করে সত্যকে প্রকাশ করলুম, সেখানে আনন্দরূপকে সৃষ্টি করেছি, সেখানে আমরা অমৃত।

অসত্য হতে তোমার সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাদের নিয়ে যাও, তোমার জ্যোতির প্রকাশ আমাদের অনন্তের অসীমের মধ্যে নিয়ে যাক, তুমি যে নিত্য সত্য অমৃত, আমার মধ্যে সেই অমৃত-রূপের জ্যোতির্ম্ময়তা প্রকাশিত হোক! (শান্তি-নিকেতন)

আঙ্গোরার চিঠি

সফিয়া খাতুন, বি-এ

পাঁচ বছর পরে আবার আঙ্গোরায় এসে শুধু মনে হচ্ছে, আর্ভিংএর "রিপভানউইঙ্কেল" গল্পটীর কথা। "রিপে"র কুড়ি বৎসর পরে দেশে ফিরে দেশের অবস্থা দেখে একেবারে তাক লেগে গিয়েছিল। কোথায় বা ভোটারদের lecture, কোথায় বা "প্লেকার্ড" মারা আছে "স্বাধীন পরাধীন নাই" ইত্যাদি কত কি। আঙ্গোরায় এসে আমিও যে তাই হয়ে গেছি! দেশের কি পরিবর্ত্তন! তোমার কথাগুলিই ঠিক। সত্যি স্বাধীনতা মানুষকে নবজীবন দান করে। এ কথা যে কবি-কল্পনা নয়, তা এখন বুঝিতে পারছি এই জাগ্রত নবীন তুর্কীদের দেখে। পরাধীন জাতির একটী বালিকা বলে এখনও বুঝিতে পারছি না এদের আনন্দের মাত্রাটা কতটুকু হয়েছে। যে তুর্কীজাতি স্বেচ্ছাচারী, বিলাসী, কুসংস্কারাপন্ন ছিল, আজ তার কি পরিবর্ত্তন! পাঁচ বছর পূর্ব্বের ও পরের তুর্কীকে তুলনা করিলে এমনি তফাৎ মনে হয়, যেন আকাশ আর পাতাল; তেল আর জল। বলিতে পার,

এদের এমন পরিবর্ত্তন কেন? খাঁচায় পোরা পাখী খাঁচা ভেঙ্গে হঠাৎ অনন্তাকাশে উধাও হয়ে যে ছুটে, তার যে অবস্থা হয়, আজ তুর্কীদেরও ঠিক সেই অবস্থা। কে যেন তাদের সেই পাঁচ বছর আগেকার দৃশ্যাবলিকে জবা দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে একটা নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। তাই রাস্তায় বেরুলেই সব নূতন বলে মনে হয়। যাকে পূর্ব্বে দেখেছি তাকেও যেন নূতন বলে মনে হয়। তার মুখের চেহারায় চলাফেরায় যেন কি একটা নূতন ভাব উপলব্ধি করা যায়—যা তখনকার দিনে করতে পারিনি।

আজ তুর্কীদের ভেতর এমন একটা জাগরণ এসে দেখা দিয়েছে যে, তাহাদের প্রত্যেক নরনারীকেই দেখলে মনে হয়, যেন তাদের মধ্যে কর্ম্মের এক অভিনব ব্যস্ততা এসে দেখা দিয়েছে। কাজ করে যেন শেষ করে উঠতে পারছে না। সত্যি আজ তুর্কীর ভাঙ্গাগড়ায় দিন এসে দেখা দিয়েছে। এদের এই ভাঙ্গা গড়া দেখে মনে হয়, সত্যি বুঝি মানুষ কিছু না ভেঙ্গে কিছু গড়তে পারে না।

এই ভাঙ্গা গড়ার প্রধান ধুরন্ধর—আমার মনে হয় তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ধর্ম্মের অবতার ছিলেন না। আর মনে হয় বলছি কেন? এ একেবারে ধ্রুব সত্যি যে, শ্রীকৃষ্ণের মত এত বড় "এনার্কিষ্ট" বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ জন্মায় নি। শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মের অবতার না বলে বিপ্লবের অবতার বল্লেই যেন ভাল হত। শ্রীকৃষ্ণ ভারতে যা কিছুই করে গেছেন, সবই destruction। ওঁর মাথায় কোন দিনই construction কথাটী জোয়ায়নি। তিনি শুধু ভাঙতে জান্‌তেন গড়তে জান্‌তেন না। তার এই ভাঙবার বাতিক বাল্যকাল হতেই দেখা দিয়েছিল। তিনি যে দয়া করে জন্ম নিতে এসেছিলেন, তখনও ধ্বংস না করে ছাড়েন নি। ক্রমান্বয়ে সাতটী সন্তান মেরে তার পর জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল ভয়ঙ্কর স্বাধীন; অর্থাৎ একগুঁয়ে।—কোন কাজে হাত দিতে নিষেধ করলে সে মানত না। সেটা তার করাই চাই। যদি বল "এই ওতে হাত দিসনে হাত পুড়ে যাবে" তখনই দেখবে কৃষ্ণ তাই করে বসেছে। কারণ তার ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে কাহারও প্রতিবাদ সে সহ্য করতে পারত না। তাই গার্গী মুনির কি করে খাবার নষ্ট করেছে এ তা জান ত? তার পর ইন্দ্র যজ্ঞ ধ্বংস, কংস বধ, সবাইর উপর কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। এখানেই তার destruction এর চরম দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। এই একটুখানি লোক সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যকে নাস্তানাবুদ করেছিল। কিন্তু তাঁর construction করবার শক্তি মোটেই ছিল না। তাই তাঁকে আমি বিপ্লববাদী বলেছি।

আমার ভয় হয়েছিল, তোমরা বুঝি সেই আদর্শ নিয়ে কাজে নেমেছ; কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।

* * * * *

তাই মনে হয় destruction ছাড়া construction হয় না, Non-Co-operation ছাড়া Co-operation হয় না। তাই বিপ্লববাদের আদি পিতা বেকুনিন বলেছেন, "দুনিয়ায় একটা কিছু না ভেঙ্গে আর একটা কিছু তৈরী হয়নি। Destruction আছে বলেই construction আছে, রাত আছে বলেই দিন হয়, নাইট্রোজান আছে বলেই এট্রোজান পাওয়া যায়।"

আজ তুর্কীরা তাই করছে। ওরা একটা ভেঙ্গে আর একটা তৈরী করছে। তাদের এই ভাঙ্গা গড়ার তাল দেখে এক ভদ্র লোককে জিজ্ঞেস করলেম, বলতে পারেন—আপনাদের মাথায় এখন ভূত চেপেছে কেন? সব যে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। লোকটী হেসে বল্লে, বুঝতেই ত পাচ্ছ, কেন সব ভেঙ্গে চুরমার করছি। জান ত, একটা মাটির পুতুলের পা যদি ভেঙ্গে যায়, সেই পুতুলের অবস্থা ভাল করবার জন্য যদি মাটি দিয়ে আর একখানা পা তৈরী করে সেই পুতুলের সঙ্গে জোড়া দেওয়া যায়, তবে কি সে জোড়া মানে? কখনও না। তা মানাতে পারে যদি সমস্ত পুতুলটাকে আবার ভেঙ্গে নূতন করে জল দিয়ে গুলিয়ে আবার নূতন ছাচে তুলে নূতন করে পুতুল তৈরী করা যায়। আমাদেরও হয়েছে ঠিক তাই। পুরাতন তুরস্ক যে ছিল বিকলাঙ্গ—ওকে আবার জোড়াতাড়া দিয়ে কি হবে—সব আমূলে ধ্বংস করে আবার নূতন করে তাই গড়ে তুলছি। তাই যে আমাদের ভাঙ্গা গড়ার এই তাল উঠেছিল।

এই লোকটীর কথায় তোমার মতই গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছি। তোমরা যে আজ ভারত সরকারের শাসন-পদ্ধতি ভেঙ্গে আবার নূতন করে গড়ে তুলতে চাইবে, তা প্রথম শুনে আমার মনে মস্ত বড় একটা খট্‌কা বেধেছিল তা নয়—মনে মনে রাগও হ'য়েছিল, তোমাদের উপর। মনে হ'ত তোমাদের মাথায় বুঝি একটা কেড়া ঢুকেছে। কিন্তু দেখছি তা নয়, আমারই ছিল ভুল। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে আর ক'দিন চলে? নূতন কাপড়ে যে অনেক দিন যায়, তুর্কীরাও তাই সুরু করেছে। ওরা যে পুরাতনের নাম গন্ধও রাখতে চাইবে না। তাদের এই ভাঙ্গা গড়ার দুটী দল দাঁড়িয়েছে। একটী সমাজ সংস্কারে আর একটী রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারে। ওদের সঙ্গে আমার একটা মত বেশ মিলেছে। জানই ত আমি বুড়দের নাম শুনতে পারি না। এমন কি বুড়ো হওয়াটাই আমার কাছে কি রকম মনে হয়। আমি কিন্তু বুড় হতে রাজী নই। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করি, যেন বুড় হবার পূর্ব্বেই মরে যাই। কেন এ কথা বলি জান? বুড় হলে ভীমরতি পেয়ে বসবে। তুর্কীরাও ঠিক তাই বলে। ওরা বলে মায়ের সেবায় চাই তাজা তাজা জোয়ান ছেলে, যারা সত্যিকার একটা কাজ করতে পারবে। তাই তাদের পার্লামেণ্টে দেখো সব জোয়ান জোয়ান ছেলে যারা নবীন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়েছে, যাদের জীবনে একটা নূতন সাড়া এসে দেখা দিয়েছে। বুড়ারা আশা ভরসা ও উৎসাহ খুইয়ে বসেছে। ওদের দিয়ে কি কোন কাজ হয়? তা হবার নয়। ওরা শুধু "এডভাইস্ ইন্ গ্রেটীস" দিতে জানে।

যাক্, ওদের সেই দুটা দলের কথা তোমাকে বলব। দেখ তুর্কী ছেলে আর তোমরা কত তফাৎ। তোমরাও পল্লী-সংস্কার

করতে ছেলের দল পল্লীতে পল্লীতে পাঠিয়ে ছিলে। কিন্তু কোন কাজ তোমাদের হয়েছে কি? তা হয় নাই। কেন হয় নাই বলতে পার? আমি কিন্তু বলতে পারি। তোমাদের ছেলেরা সবই করতে গিয়েছিল "নাম কা ওয়াস্তে।" তা করেই তোমরা "Nonviolent Non-co-operation"এর ন্যায় এমন পবিত্র এমন সুন্দর ব্রহ্মাস্ত্রেও মরচা ধরিয়ে দিয়েছ। আমি ত সে সময়ই লিখেছিলুম যে, পল্লী গঠন এত সোজা কাজ নয়। দলে দলে সেবক জেলে পাঠাচ্ছ, তাদের মধ্যে সবই মেকি মাল হয়ে যাবে, সাচ্চা বোধ হয় একটা কি দুটাও পাওয়া যাবে না। তখন আমার উপর বড় রাগ ছিল। বলেছিলে "তোমার সবটাই বেখাপ্পা। মানুষের দোষটা শুধু তোমার চোখে পড়ে, ভালটা দেখতে পার না।" এখন দেখলে ত কার কথা সত্যি। শুন, পল্লীর জন্য এমন সব তুখোর ছেলের দরকার, যাঁরা জীবনটাকে চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করে দিতে পারে শুধু পল্লীর জন্য। (সারথি)

ধর্ম্ম ও পলিটিক্স

স্বামীজী বলিয়াছিলেন "God and truth are the only politics in the world, everything else is trash"—কিন্তু এই ভগবান ও সত্য নিরূপণ করিতেই জীবনের আয়ু ফুরাইয়া যায়। সংসারে থাকিয়া আমরা কাদাই মাখি, মাছ আর ধরা হয় না।

ভগবান ও সত্য সম্বন্ধে অবিসম্বাদী ধারণা কোন যুগে সম্ভব হয় নাই, আজও হইবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না, প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ সত্য ও ভগবানের অনুসরণ করে; একজনের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, তাই অন্যের নিকট পরধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

যেখানে সমধর্ম্ম, সেখানে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হউক, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে ইহা এক ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারে নাই। মোসলেমের জয়ধ্বজা এক দিন জগতে সর্ব্বত্র উড়িয়াছিল, খৃষ্টের বক্ষ-রক্তে অর্দ্ধধরণী প্লাবিত হইয়াছিল, বুদ্ধের কণ্ঠধ্বনি আসিয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। প্লাবনের জলরাশি শুষ্ক ভূমির উপর রেখাপাত করিয়া যেমন অপসারিত হয়, সত্য ও ভাগবত নিরূপণের নির্দ্দিষ্ট রেখা তদ্রূপ স্মৃতি হইয়াই থাকে, সবখানিকে ভরাইয়া সমতা বিধান করে না।

কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারের নেশা মানুষকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, একজনের যাহা ধর্ম্ম, তাহা অন্য জনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে প্রাণবলি দিতেও কুণ্ঠা হয় না, দলে দলে ইহার জন্য রক্ত ঢালিয়া দেওয়ার ইতিহাস জগতে বিরল নহে।

ভগবান ও সত্যের অনুশীলনের সঙ্গে ইহা কি খাঁটি politics নহে? মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারের পশ্চাতে জগতে স্থায়ী সুদৃঢ় একটি শক্তি প্রতিষ্ঠান সংগোপিত ছিল, মোসলেমের গৌরব যুগের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্ত। আজও মুসলমান জাতি যে অপরাজেয় হইয়া জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি প্রকাশ করিতে চাহে, তাহা এই politics-চর্চ্চার পরিণতি।

খৃষ্টের আত্মদান, ভবিষ্যতে একটা জাতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্য জাতির অভ্যুত্থান সম্ভব করিয়াছিল, ইহা politics ভিন্ন আর কি বলিব। ভারতে এমন politics চর্চ্চার যুগ স্বামীজীর জীবন হইতে সুরু হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম চর্চ্চার মূলে এমন politics ছিল। জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ আজ পর্য্যন্ত ইহাই হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মেরুদণ্ডহীন ভারতের আধার ধর্ম্মের খরস্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভগবান ও সত্যের চাপ সহিয়া খাড়া থাকে না—কাজেই কর্ম্ম সাধনায় ভারত দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে, এই কথাই চারিদিক হইতে শুনা যায়।

এই যে এক একটী ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া শত সহস্র লক্ষ লোক কেন্দ্রীকৃত হয়, ইহার মূলগত উদ্দেশ্য কি? ভগবানের সাধনা বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় তো সম্পন্ন হইতে পারে। লোকালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচার দল বাঁধারই নীতি, এবং তেমন শক্ত নির্ভীক প্রাণশক্তি থাকিলে সংহতিবদ্ধ এক একটী দল, জাতির এই দুর্দ্দিনে অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করিত। পঞ্চনদে এমন একটী ধর্ম্মের আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মিলিয়া এক দিন প্রবল রাষ্ট্র গড়িয়াছিল। এই উৎপীড়নের যুগে তাহারা আজও নিশ্চিহ্ন হয় নাই, চল্লিশ লক্ষ লোকের মুখে এখনও গর্জ্জিয়া উঠিতেছে সে অমর মন্ত্র—

"সৎ শ্রী অকাল"

বাংলায় সত্য ও ভগবানকে আশ্রয় করিয়া একটা দলের মত দল মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আঘাতের পর আঘাত সহিয়া তাহারা বাংলাদেশে তিন শত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাদের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন না। স্বার্থে ও মত-বিরোধে সে উদীয়মান শক্তি অর্দ্ধপথেই অবনত হইল। তার পর যাহা হইয়াছে, তাহা আঘাতে যত না হউক, আপোষ বীর্য্যহীন। আঘাতে অমৃত ঝরে—অপোষেই তো শক্তিক্ষয় হয়।

ভবে কি মনে করিতে হইবে, ভগবান ও সত্যের নাম লইয়া, ভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মানুষ ধর্ম্ম প্রচার করে? না, মানুষের মনগড়া ঈশ্বরতত্ত্ব বা সত্য কে শুনে, কে তাহা অনুসরণ করে? ভগবান চাহেন বলিয়াই সাধকের কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠে। জগতে তাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সার সত্য, যাহা তিনি চাহেন। আর যাহা তিনি চাহেন না তাহাই অধর্ম্ম বলিয়া মানুষ ত্যাগ করে।

কিন্তু ভগবানের চাওয়াও মানুষের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া থাকে। তাই ভগবানের দান বহিয়া যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে হয়। কত প্রাণ বলি দিয়া যে ভগবানের চাওয়াকে ফুটাইতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দেশে এমন আত্মদানের উৎসব কোথাও অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না, ভগবানের চাওয়ার সুর ফুটাইতে কারু কণ্ঠ কেহ চাপিয়া ধরিতেছে কি না, আপনাকে হারাইয়া ফুরাইয়া কাঙ্গাল বেশে কেহ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কি না?

যদি এমন কোথাও দেখিতে পাও, জানিও, ভগবানের আসন সেই-খানেই সুপ্রতিষ্ঠিত; সত্যের নিশান সেইখানেই উড়িবে; ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণের উদ্যোগ পর্ব্ব সেইখান হইতেই আরম্ভ হইবে।

দেশ জাতি যাদের ভগবান, মুক্তি যাদের সত্য তারা আজ কোথায়? ভগবান ও সত্য ভিন্ন politics নাই শুনিয়া এই সহজকে ছাড়িয়া যারা বিপরীত পথে যাত্রা করে, তাহাদের বিদায় দাও। বাংলার তরুণ! তোমরা উদ্বুদ্ধ হও, দেশের মুক্তি কামনা সত্যচ্যুতি নয়, এই ত্রিশকোটী নরনারীর বিগ্রহমূর্ত্তি—শ্রীভগবানের লীলা প্রকাশ, দেশ ও জাতির সেবায় যাহার উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তাহারা ভগবানের উপাসক, তাহারাই যথার্থ সত্যাগ্রহী।

(প্রবর্ত্তক)

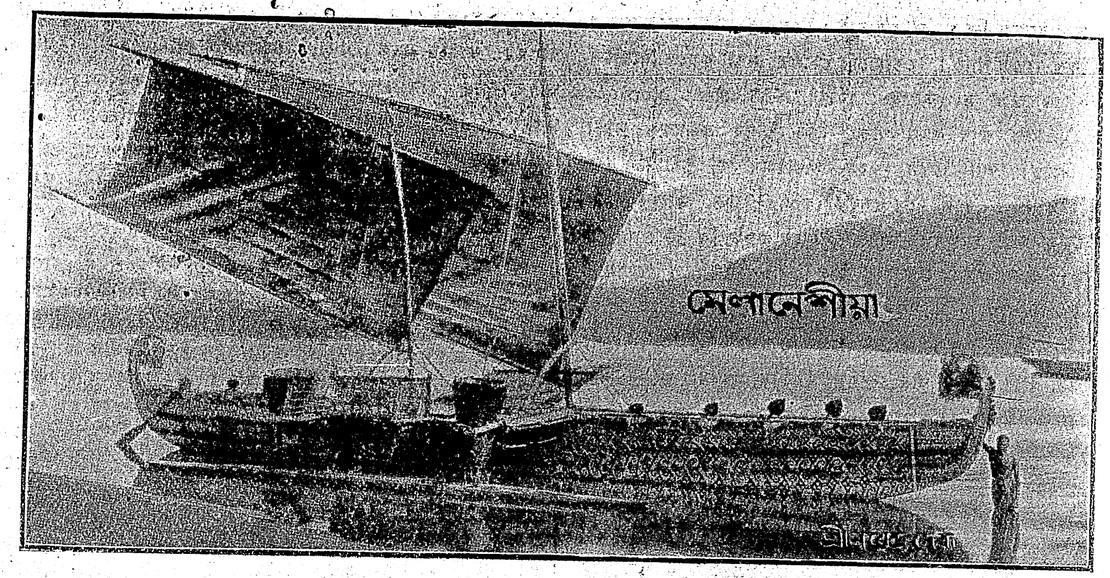

সমুদ্র-যাত্রী তরণী ('লাকাতই')

মেলানেশীয়াবাসীদের মধ্যে বিবাহের একটা কোনও বিশেষ প্রচলিত পদ্ধতি নাই। অধিকাংশ স্থলে কন্যাপণ দিতে পারলেই পাত্র-পাত্রীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই পবিত্র বন্ধন স্থাপন উপলক্ষে কোনও সমারোহ ব্যাপার বা উৎসবের অনুষ্ঠান হয় না। নিতান্ত অনাড়ম্বরের মধ্যেই দুটি জীবন পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে দেখা যায়। তবে কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহোপলক্ষে একটা ভোজের অনুষ্ঠান প্রায়ই বাদ পড়ে না। নিউহেব্রাইডিস দ্বীপের অধিবাসীরা অনেকেই বিবাহের দিন একটা ভোজের আয়োজন করে। নিমন্ত্রিতেরা সকলে উপস্থিত হ'লে কন্যার পিতা অথবা তার অভিভাবক স্থানীয় কোনও লোক বর-বধূকে উদ্দেশ ক'রে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি পাত্র-পাত্রীকে গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন। তাদের মধ্যে সেদিন যে বন্ধন স্থাপিত হ'তে চলেছে তাঁরা বেশ স্পষ্ট ভাষায় তার দায়িত্ব গুরুত্ব ও কর্ত্তব্যগুলি তাদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন। নিউগিনির মেকীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে যে বিশেষ বিধিটি প্রচলিত আছে তা' থেকে বেশ বোঝা যায় যে কন্যাকে

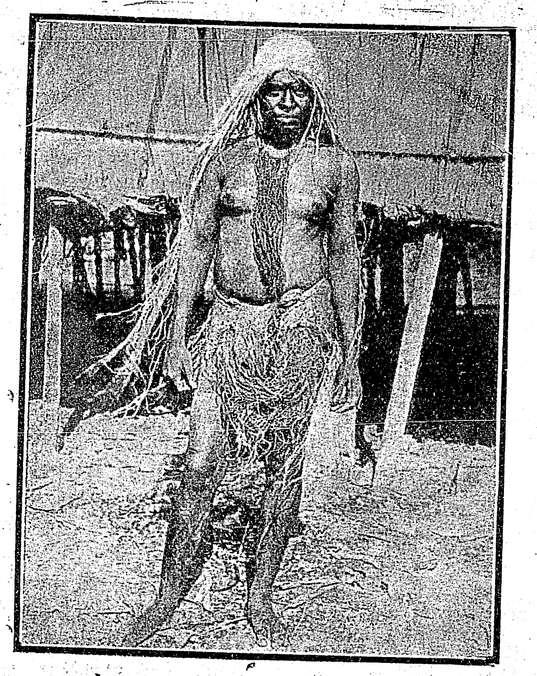

শোকাবসানকালীন বেশ—(শোকের নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি যেমন একে একে শেষ হ'য়ে আসতে থাকে, শোকার্ত্ত বিধবাও তেমনি ক্রমশঃ তার অঙ্গের তৃণজ শোকাবরণ কমিয়ে ফেলে।



অনাচ্ছাদিত কবর

বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করার যে রাক্ষস-প্রথা একদা জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল সেটার জন্ম হ'য়েছিল মানব-ইতিহাসের অতীত বর্ব্বরতার যুগে।

মেকিয়োদের মধ্যে বিবাহের আর একটি বড় মজার প্রথা প্রচলিত আছে। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যে বিবাহ স্থির করেন সে বিবাহের পাত্র-পাত্রীরা প্রায়ই অপরিচিত, তাদের মধ্যে প্রেম বা পূর্ব্বরাগের অস্তিত্ব ত দূরের কথা জীবনে তারা হয়ত কেউ কাউকে কখনও দেখবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায়নি। সেরূপ স্থলে বিবাহের সময় বর-বধূ একটি উচ্চ আসনের উপর পরস্পরের দিকে পশ্চাৎ ফিরে বসে থাকে, কিছুতেই তারা দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে শুভ-দৃষ্টি বিনিময় বা বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ক'রতে সম্মত হয় না। তখন বর-বধূর আত্মীয়েরা এগিয়ে এসে উভয়কে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় ক'রে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ক'রতে অনুরোধ ক'রে। বহু সাধ্যসাধনার পর পাত্র-পাত্রী যখন এই মিলনে সম্মত হয়, তখন বধূ একটুকরো গুপারি বা একটি চুরুট সেই পিছনফেরা অবস্থাতেই পিঠের দিকে হাত বাড়িয়ে বরকে উপহার দিতে যায়। বধূর এই প্রসন্নভাব দেখবামাত্র বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে বর-বধূর নাম ধরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেন যে আজ থেকে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লো। আজ থেকে তারা বিবাহিত দম্পতী ব'লে সমাজে গণ্য হবে।

নিউগিনির 'রোরো' প্রদেশের প্রথা হ'চ্ছে বরপক্ষ

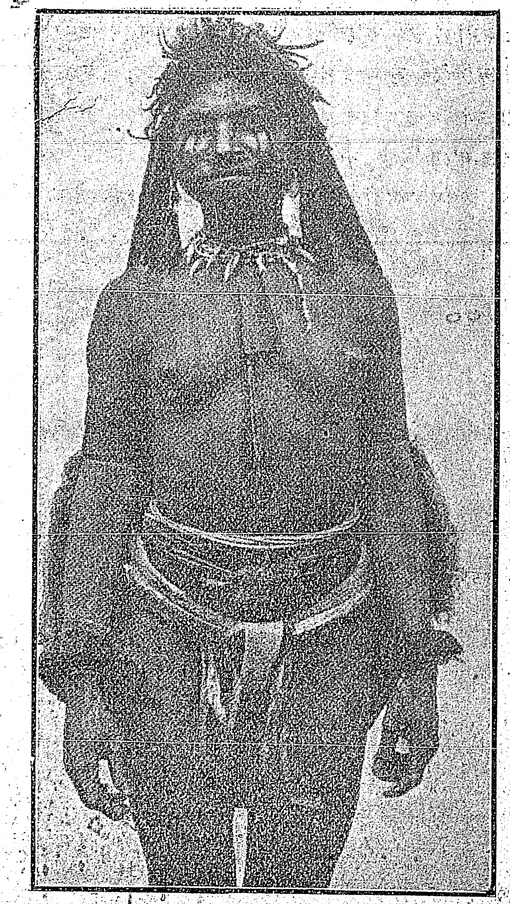

উলানা যুবতী—(এরা পাহাড়ী মেয়ে, ঘাসের ঘাগরার বদলে এরা পাতায় কৌপীন পরে।)



আবৃত কবর

এসে কন্যাপক্ষের বাড়ী ঘেরাও ক'রে লুটপাট এবং একটা কৃত্রিম দাঙ্গা সুরু ক'রে দেয়। এই আক্রমণের সময় কন্যা পলায়ন ক'রে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা ক'রে; কিন্তু বরের বন্ধুরা তার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাকে বল প্রয়োগে ভাবী পতির আলয়ে ধ'রে নিয়ে যায়। কন্যাকে ধ'রে নিয়ে আসতে দেখে তখন আবার বর পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। বন্ধুরা গিয়ে আবার বরকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে আসে এবং তাদের দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে তাদের বিবাহ হ'য়ে গেছে ব'লে ঘোষণা ক'রে দেয়।

টরেজ প্রণালীস্থ দ্বীপগুলিতে বিবাহ অভিলাষী যুবক তার মনোমত কুমারীকে নিশীথের অন্ধকারে গিয়ে গোপনে চুরি ক'রে নিজ গৃহে নিয়ে আসে। পরের দিন কন্যার পিতা মাতা কন্যাকে গৃহে দেখ্‌তে না পেয়ে তার অনুসন্ধান ক'রতে থাকে এবং কোথায় আছে সন্ধান পেলে তাদের দলবল ডেকে নিয়ে এসে কন্যাপহারীকে আক্রমণ করে। পাত্র পক্ষের স্বজন-বর্গ মিলিত হয়ে সেই আক্রমণকে

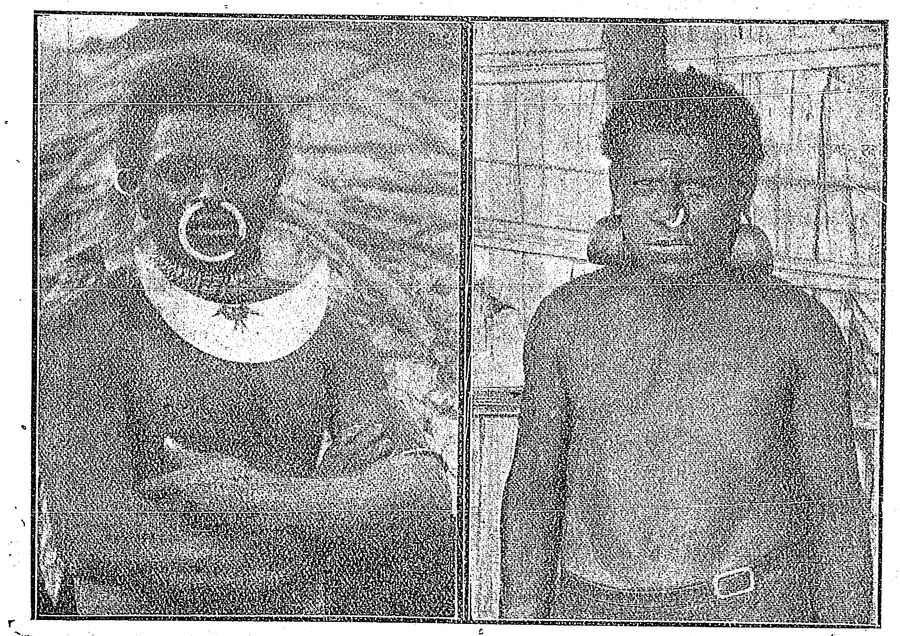

মালাইতাবাসীর নাসাভরণ ও কণ্ঠহার

মালাইতাবাসীর কর্ণাভরণ।

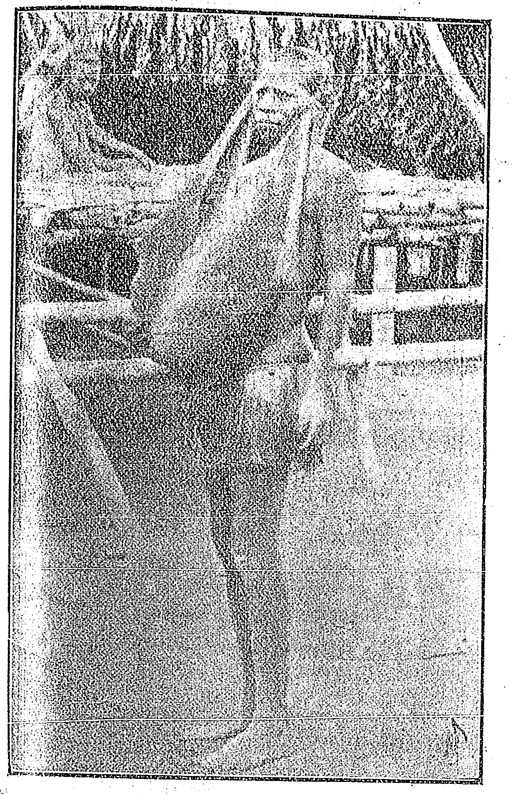

সন্তানবাহিনী জননী—(জালের থলের মধ্যে ছেলেকে ভ'রে মায়েরা সেই থলেটিকে মাথার উপর দিয়ে সামনে দিকে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ায়।)

বাধা দেয়। কিয়ৎক্ষণ সেই কৃত্রিম যুদ্ধ হবার পর একটা আপোষে রফা হয়ে যায় এবং বিবাহের পণ স্থির হয়ে যাবার পর একমাসের মধ্যেই একটা আনন্দ উৎসব ও ভোজের অনুষ্ঠান ক'রে উক্ত বিবাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয়।

পাপুয়াদের মধ্যে বিবাহ প্রথার একটা বিশেষত্ব আছে। বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে কন্যাপক্ষের পুরনারীরা সুসজ্জিতা পাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রোদন ক'রতে ক'রতে পাত্র ভবনে যাত্রা ক'রে। কন্যা চিরদিনের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ ক'রে পতির আলয়ে বাস ক'রতে চলেছে, কন্যার সঙ্গে তাদের এই চিরবিচ্ছেদের দুঃখে তারা সেদিন অশ্রুপাত করে। কন্যাকে সেদিন নানা অলঙ্কারে

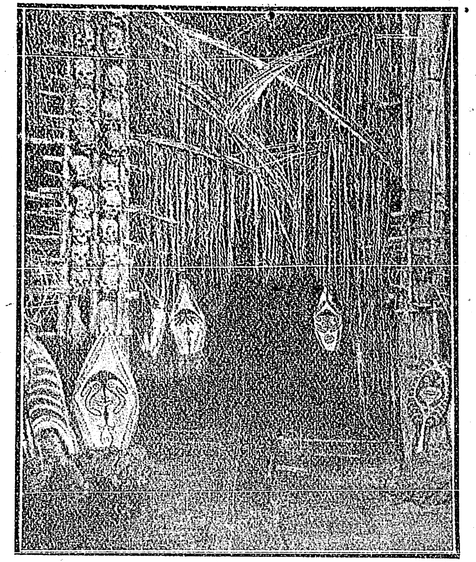

"আড্ডাবাড়ীর" অভ্যন্তর দৃশ্য

ভূষিত করে দেওয়া হয় এবং তার কুণ্ডল ও কবরীতে কুসুমাভরণ পরিয়ে দেওয়া হয়। বিবাহের বধূর পরিধানে সেদিন শ্বেতবর্ণের সুদীর্ঘ বল্কল-বাস থাকে। যাত্রীদলের পুরোভাগে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। বধূকে মুদিত নয়নে—

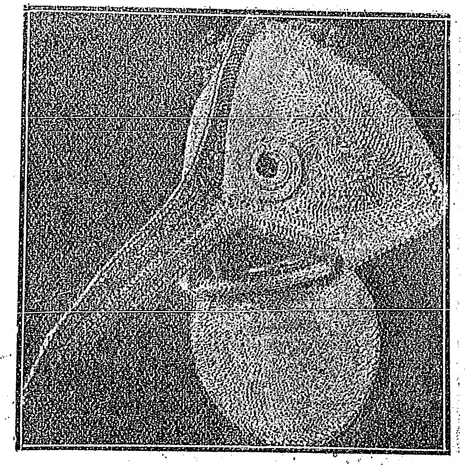

নর্ত্তকের গরুড়-মুখোস।

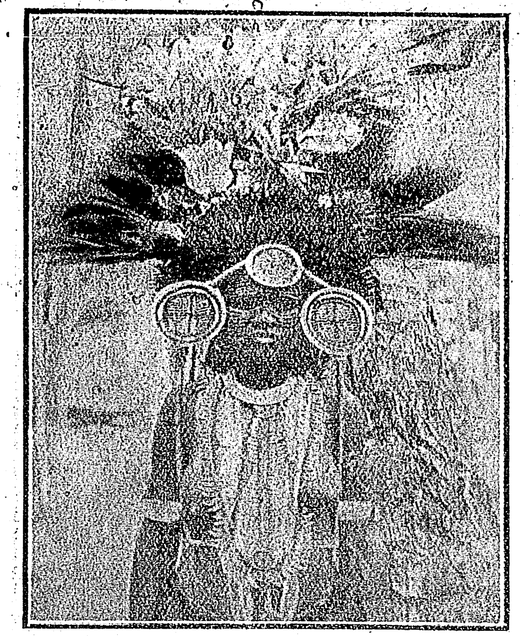

নৃত্যের জন্য সুসজ্জিতা তরুণী

উভয় বাহু যেন পতি-আলিঙ্গনে ব্যাকুল এমনি ভাবে—প্রসারিত করে অগ্রসর হ'তে হয়। তাঁকে পথ দেখিয়ে

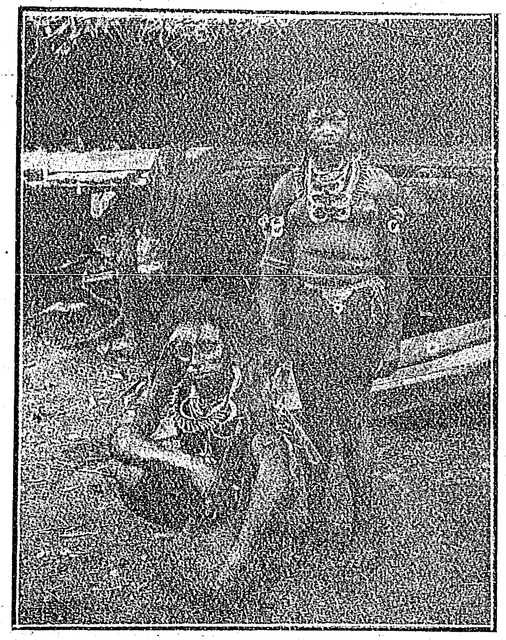

নব-বিবাহিত দম্পতী

নিয়ে যায় প্রতিবেশী দু'জন বৃদ্ধ লোক। পল্লীর সমস্ত নারী সেদিন এই মিছিলে যোগ দেয়। পুরুষেরা কেবল দর্শকের মতো যে যার গৃহের সম্মুখে পথের ধারে অবস্থান করে। এই বিবাহযাত্রীর মিছিল সমস্ত গ্রামখানি ঘুরে বরের বাটীতে উপস্থিত হ'লে তখন বিবাহ ঘোষণা করা হয়।

বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা তাদের মধ্যে খুব প্রচলিত আছে। যেকোনও স্বামী যখন ইচ্ছা তার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে, এবং যে কোনও স্ত্রী তার অযোগ্য বা অমনোনীত স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে তার প্রিয়তম প্রণয়ীকে বরণ ক'রতে

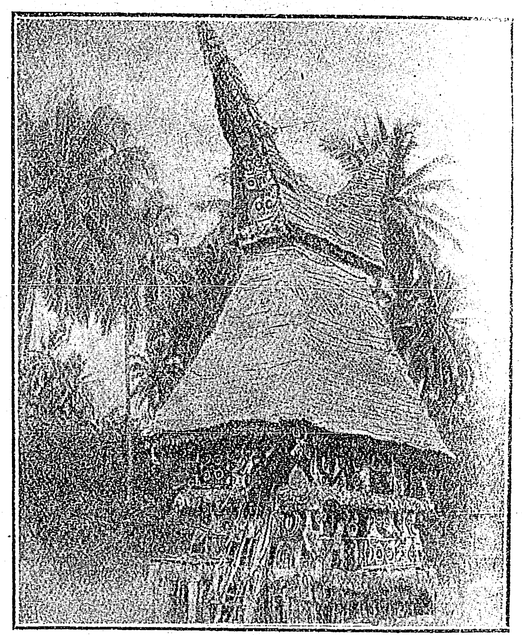

গুপ্ত-সমিতির সাজঘর

(স্ত্রীলোক বালক বালিকা এবং যেসব লোক এখনও পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করেনি, গুপ্ত-সমিতির প্রাঙ্গণের মধ্যে তাদের কাহারও প্রবেশাধিকার নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালস্থ সেই গুপ্ত-সমিতির প্রাঙ্গণে আবার এই গুপ্ত-সাজঘর নির্ম্মিত হয়। গুপ্ত-সমিতির সভ্যগণ এই সাজঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মুখোস ও ছদ্মবেশ প'রে যখন বেরিয়ে আসে তখন আর কেউ তাদের চিন্‌তে পারে না। স্ত্রীলোক ও বালকেরা তখন তাকে দেখে কোনও প্রেতলোকের অধিবাসী মনে ক'রে ভয় পায়।)

পারে। এরূপ স্থলে প্রায়ই স্বামীর দলের সহিত প্রণয়ীর পক্ষের মারামারি দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং দুজনের একজন অনেক সময় এই দাঙ্গার ফলে খুন হ'য়ে যায়। তবে যে ক্ষেত্রে স্ত্রী কোনও প্রণয়ীর সঙ্গে না পালিয়ে কেবলমাত্র

তার স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হোল' না ব'লে তাকে পরিত্যাগ ক'রে পিতৃগৃহে চলে যায়, সে স্থলে স্বামী কেবল বিবাহের যৌতুক ও পণ ইত্যাদি স্ত্রীর নিকট হ'তে ফিরিয়ে নেয়।

মেলানেশীয়াবাসীদের মধ্যে কাহারও কোনও কঠিন ব্যাধি বা মৃত্যু হ'লে তারা সেটা অপদেবতার কোপে বা কোনও শত্রুর দ্বারা অনুষ্ঠিত ঐন্দ্রজালিক-ক্রিয়ার প্রভাবে

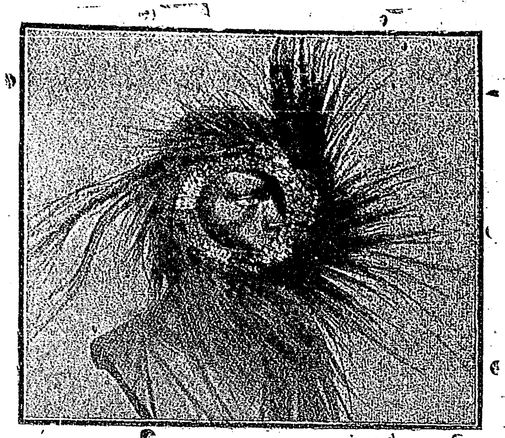

দীক্ষার্থীর মুখোস—(সাবালকত্বে দীক্ষা গ্রহণ করবার সময় এই মুখোস প'রে উৎসবে যোগ দিতে হয়।)

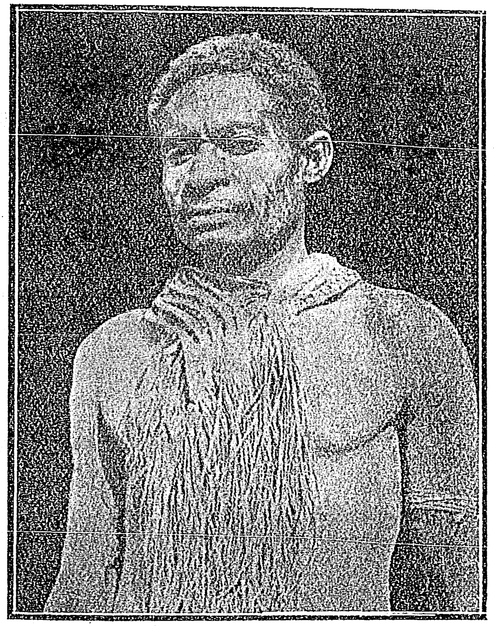

শোকার্ত্ত কীবাই—(কীবাইদের মধ্যে শোকের সময় গলদেশে তৃণ নির্ম্মিত উত্তরীয় ধারণের ব্যবস্থা আছে।)

—ঘটেছে ব'লে মনে করে। শবদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া মেলানেশীয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় সম্পন্ন হয়। মৃতের পদ-মর্য্যাদা ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে তার সৎকারেরও বিশেষত্ব দেখা যায়।

সলোমন দ্বীপে ও তার পূর্ব্বাঞ্চলের দ্বীপসমূহে মৃত দেহ কবর দেওয়ার রীতিই প্রচলিত! কোথাও বা শবদেহ সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রথা আছে। তবে সে ব্যবস্থাটা কেবল মাত্র সাধারণ লোকদের পক্ষেই চলে। বিশিষ্ট বা পদস্থ লোক যারা, তাদের কবর দেওয়াই হ'চ্ছে সম্মানকর বিধি। মৃতের একখণ্ড অস্থি বা নখ-কণা তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ ধারণ করবার জন্য মৃতের আত্মীয়েরা সংগ্রহ ক'রে রেখে দেয়।

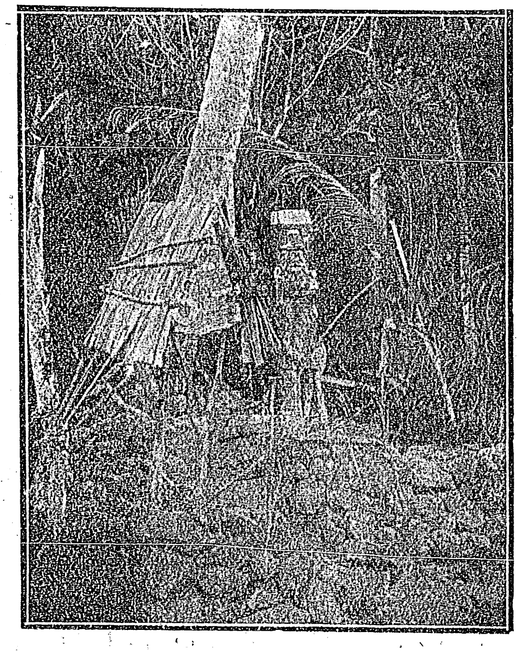

সর্দ্দারের সমাধি—(এই শিলাস্তূপের মধ্যে একজন সর্দ্দারের মাথার খুলি সযত্নে রক্ষিত হ'য়েছে। শিলাস্তূপের উপর একটি দারু মূর্ত্তি সর্দ্দারের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ স্থাপিত এবং আশে পাশে ধ্বজ পতাকা স্তম্ভ প্রভৃতি সন্নিবেশিত।)

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাথার খুলি, দাঁতের পাটি বা কর-কঙ্কাল একটি স্মৃতিস্তূপের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করা হয়। মৃতের অঙ্গাভরণ ও পরিধানের বস্ত্রাদি সমস্তই তার সঙ্গে কবরে



মরণের করুণ নৃত্য—(মৃতের সম্মানের জন্য তাদের মধ্যে নৃত্য করবার প্রথা আছে ; কিন্তু সে আনন্দের তাণ্ডব নৃত্য নয়, শোকের করুণ নাচ। নর্ত্তকদের বেশভূষাও শোকের পরিচায়ক।)

দেওয়া হয়। তার নিজের ব্যবহারের যা কিছু জিনিষ সমস্তই পুড়িয়ে ফেলে, পুঁতে ফেলে বা জলে দিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়।

সর্দ্দারদের কবর দেবার সময় কেবল মাথাটি মাটির উপর দিকে বার ক'রে রাখা হয় এবং সেইখানে বজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করে মস্তকের কেশ ও মাংস ভস্ম হয়ে গেলে করোটী ও কপালাস্থিটি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রাখে। কোথাও বা কেবল ভস্মাবশেষটুকু নিয়ে তুলে রাখা হয়। এই অস্থি বা ভস্মাবশেষ প্রায়ই একটি ঝুলির মধ্যে ভ'রে ঝুলিটি একটি বাঁশের ডগায় বেঁধে সমুদ্রতীরে পুঁতে রাখা হয়। সলোমন দ্বীপের আরও উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে সর্দ্দারদের সমাধি স্থলে উচ্চ প্রস্তর স্তূপ নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়ার বিধি প্রচলিত আছে। স্তূপশীর্ষে একটী দারুমূর্ত্তি



কালের করাল নৃত্য—(মৃতের স্মরণে সেখানে যে সম্বৎসরিক নৃত্য প্রচলিত আছে, সেই নৃত্য উপলক্ষে নর্ত্তকেরা সশস্ত্র হ'য়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে এবং তার মধ্যে মহাকালের করাল ভাবটাই খুব বেশী প্রকট হ'য়ে উঠে।)

স্থাপন করাই হ'চ্ছে সাধারণ নিয়ম। কোনও কোনও স্থলে স্তূপ-চূড়ার উপর একটী ত্রিকোণ পত্রাচ্ছাদনও নির্ম্মাণ ক'রে

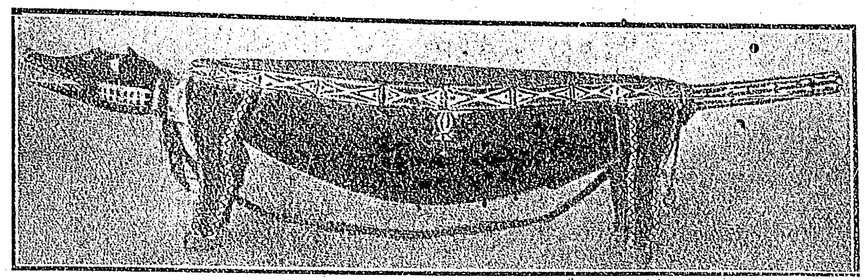

কাষ্ঠের পান-পাত্র—(এ্যাডমিরাল্টী দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এই পাত্রের প্রচলন খুব বেশী। কাঠকুঁদে এরা কচ্ছপ, কুমীর, পাখী, পরী প্রভৃতি নানা আকারে এই পাত্র নির্ম্মাণ করে। এই পাত্রের কারুকার্য্য অতি সুন্দর এবং এর ভিতর বাহির উভয় দিকই অতি পরিপাটি রকম পালিশ করা।)

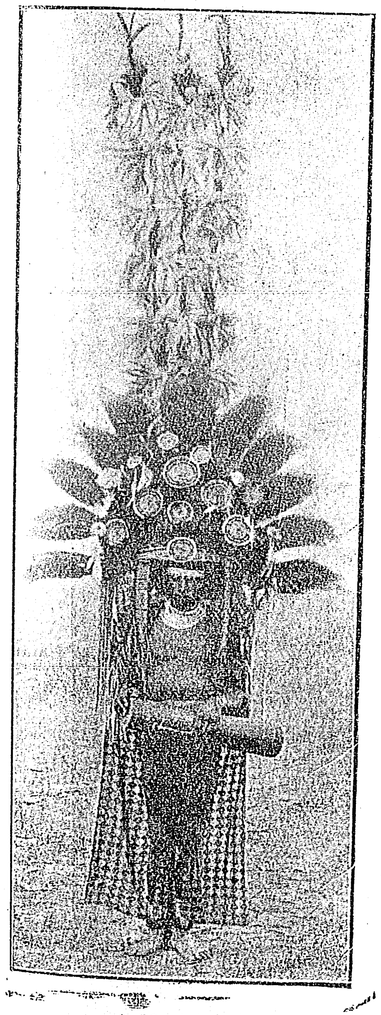

রোরো জাতীয় শিরো-ভূষণ।

দেওয়া হয়! অনেক ক্ষেত্রে এরূপ একটী স্তূপ দেখেই সেটিকে নিশ্চয়ই কোন সর্দ্দারের মৃতদেহের কবর বলে স্থির ক'রলে চ'লবে না ; কারণ, শবের অস্থি ও ভস্মাবশেষের উপরও তারা এরূপ এক একটি পৃথক সমাধিস্তূপ নির্ম্মাণ করে রাখে। খুব বিশেষ রকম বর্দ্ধিষ্ণু ও পদস্থ ব্যক্তিদের জন্য সুবৃহৎ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে তার মধ্যে মৃত ব্যক্তির শবদেহের সঙ্গে তার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিও রেখে দেওয়া হয়। এবং সেই স্থান অতঃপর তীর্থ স্থান ব'লে গণ্য করা হয়।

সাপুয়াদের মধ্যে মৃত্তিকার নিম্নে মৃতদেহ কবরস্থ করাই বিধি। কিন্তু মাফুলুরা শবদেহ একটি বাক্সের মধ্যে বন্ধ ক'রে গ্রামের সমাধিক্ষেত্রে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর বা বৃক্ষশাখার উপর রেখে দেয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনেক প্রাচীন বিধিই আজ কাল আর তাদের মধ্যে প্রচলিত নেই। খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে তারা এখন বহু বর্ব্বর ব্যবস্থার প্রত্যাহার ক'রেছে। বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা কোনও পদস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দামামা ধ্বনি ক'রে সকলকে সেই মরণ

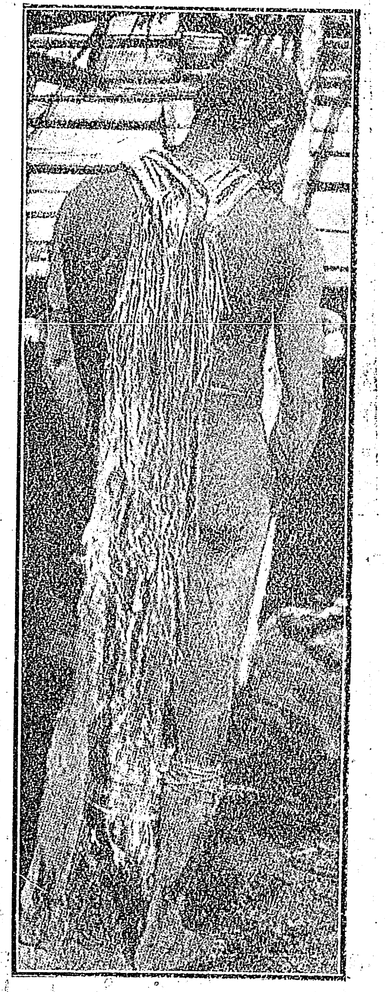

শোকার্ত্ত কীবাই—(কীবাইরা কেবল তৃণের উত্তরীয় ধারণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম লেপন ক'রে শোক প্রকাশ করে।)

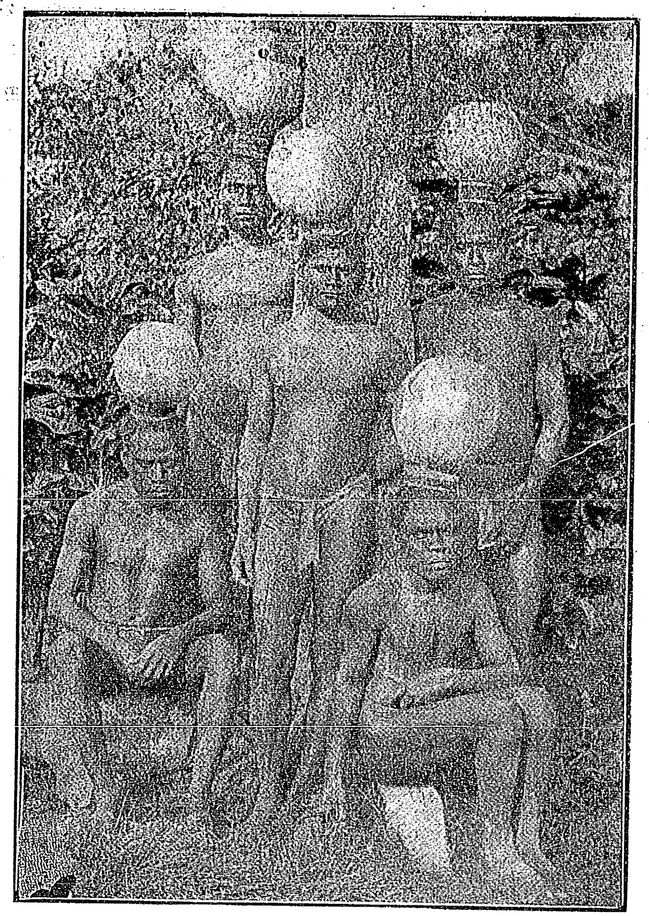

দীক্ষার্থীর দল—(গুপ্ত-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী ও সাবালকত্বে দীক্ষার্থী একদল যুবক। যত দিন না এদের দীক্ষা শেষ হয় তত দিন মাথায় ওরা ওই কলসী-টুপী প'রে থাকে।)

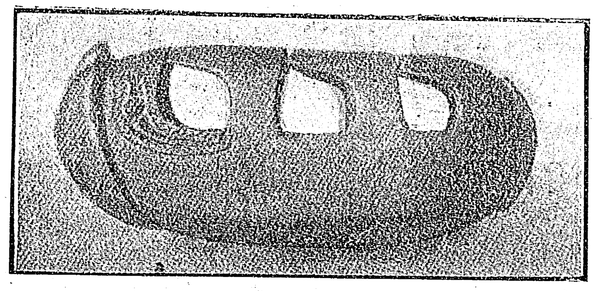

বাদ্যযন্ত্র—(করাঙ্গুলীর ও করতলের সাহায্যে তবলার মত বাজাতে হয়।)

যাত্রীর শয্যাপার্শ্বে সমবেত হবার জন্য আহ্বান করে। মরণোন্মুখের নিকট-আত্মীয়েরা কাছে ব'সে সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাকে কত কি আশার বাণী ও সান্ত্বনা-বাক্য শোনায়। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু তার প্রাণবায়ু বহির্গত হবার আগে থেকেই 'মড়া-কান্না' কাঁদ্‌তে সুরু ক'রে দেয়। মৃত্যু হবামাত্র আবার দামামা বেজে ওঠে—এবং স্ত্রীলোকদের রোদন-ধ্বনি একেবারে সপ্তমে চড়ে ওঠে। এবার আবার পুরুষেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই ভাবে কান্না ও বাজ্‌না সারারাত চল্‌তে থাকে। প্রভাতে গৃহের সম্মুখে একটি নিচু মাঁচা বেঁধে

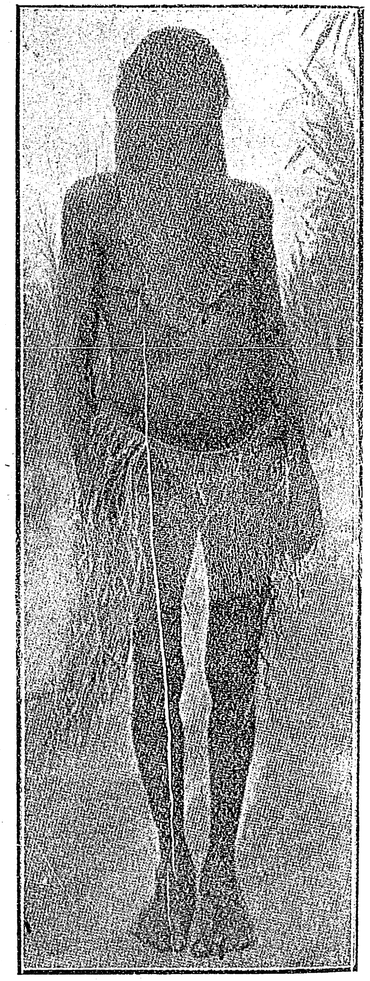

শোকসূচক অবগুণ্ঠন—(একান্ত আপন জনের মৃত্যু হ'লে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে শোক চিহ্ন স্বরূপ তারা কিছুদিন এই জালের অবগুণ্ঠনে মুখাবরণ করে রাখে।)

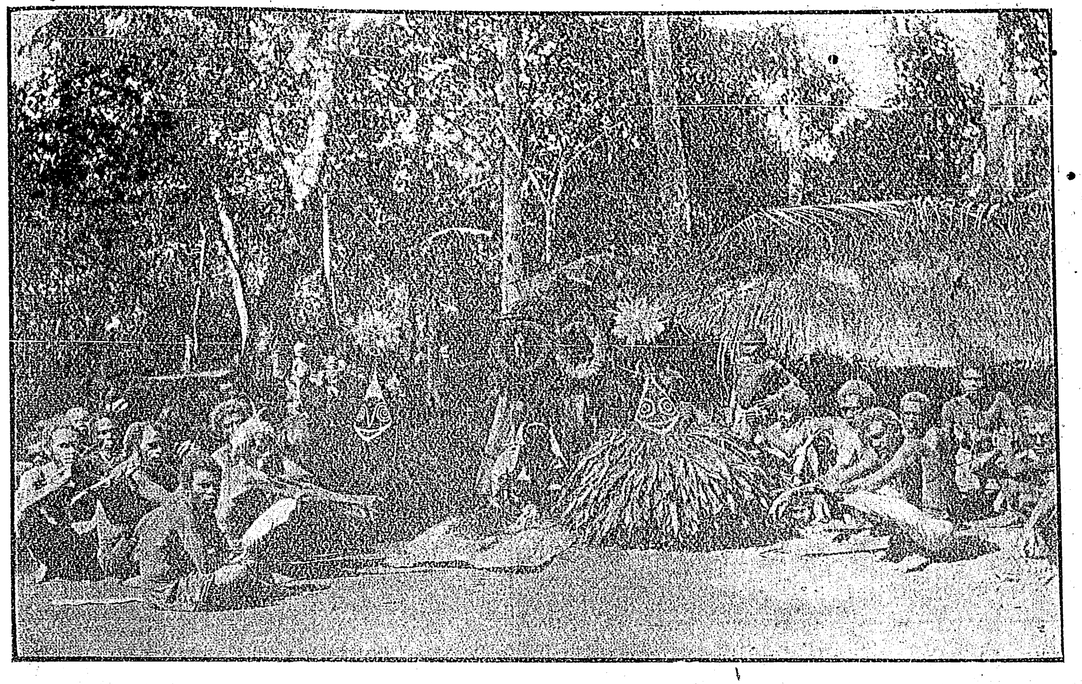

অন্ত্যেষ্টি উৎসব—(সুসজ্জিত শবদেহ ঘিরে তার আত্মীয় স্বজনেরা বসে আছে এবং মুখোসপরা ছদ্মবেশধারী দু'জন নর্ত্তক শবের দুই পার্শ্বে অপেক্ষা ক'রছে, যথা সময়ে নৃত্য গীত সুরু ক'রবে বলে।)

তার উপর শব দেহটিকে উপবেশনের ভঙ্গীতে স্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত ব্যক্তির রোপিত বৃক্ষ লতাদি ধ্বংস ক'রে ফেলা এবং তার প্রতিপালিত গৃহপশুগুলিকে বিতরণ ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তার সমস্ত

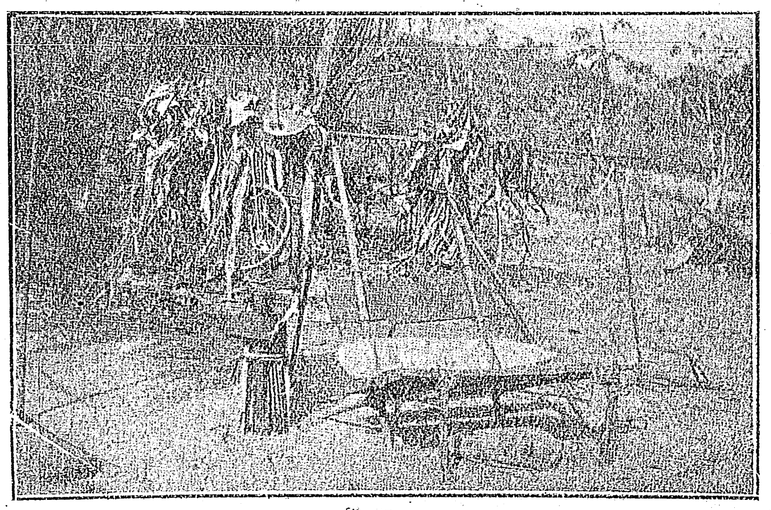

শবাসন—(মৃত ব্যক্তি, তার পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র যাতে একত্রে উপবেশন করতে পারে এমন ভাবে তৈরি একখানি বড় শবাসন।)

আস্‌বাব পত্র ও দ্রব্য সামগ্রীও ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে এসে মৃতদেহের চারপার্শ্বে সাজিয়ে রাখা হয়। তার পরই জন কয়েক মুখোসপরা লোক এসে শবদেহ প্রদক্ষিণ ক'রে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু ক'রে দেয়। মৃতের একজন আত্মীয় তখন কিছু মুদ্রা নিয়ে এসে শবের পায়ে ছুঁইয়ে নৃত্যকারীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। অর্থ পাবামাত্র মুখোসধারীরা অন্তর্হিত হয়। তখন একখানি কাঠের ছোট নৌকার মধ্যে শবদেহটিকে বসিয়ে তার



ভূত-নৃত্য—(পাপুয়াদের মধ্যে প্রতি বৎসর একদিন মৃত আত্মাদের স্মরণে নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এইদিন পরলোকগত আত্মীয়েরা যেন ফিরে এসে তাদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিয়েছে এমনিই একটা ধারণা তারা দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে জন্মে দেয়, বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোকেরা এদিন একবারে অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়ে।)

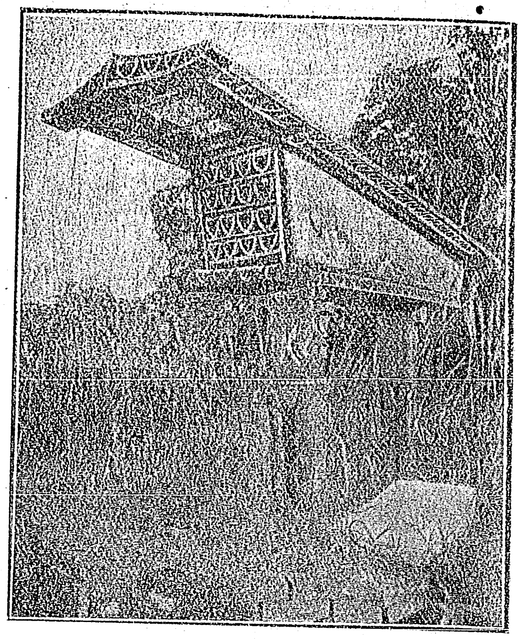

সমাধি-স্তূপ—(গ্রামের সর্দ্দার প্রধান বা পদস্থ ব্যক্তির দেহাবশেষ এইরূপ কারুকার্য্য খচিত স্তূপের মধ্যে রক্ষিত হয়।)

হাতে একটা দাঁড় গুঁজে দেওয়া হয়। এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য কতকটা মনে হয় যেন এই তরণী বেয়ে সে বৈতরণী পার হ'য়ে যেতে পারবে বলে। তারপর সেই নৌকাসমেত সুসজ্জিত মৃতদেহ একখানা প্যাটায়ে মুড়ে

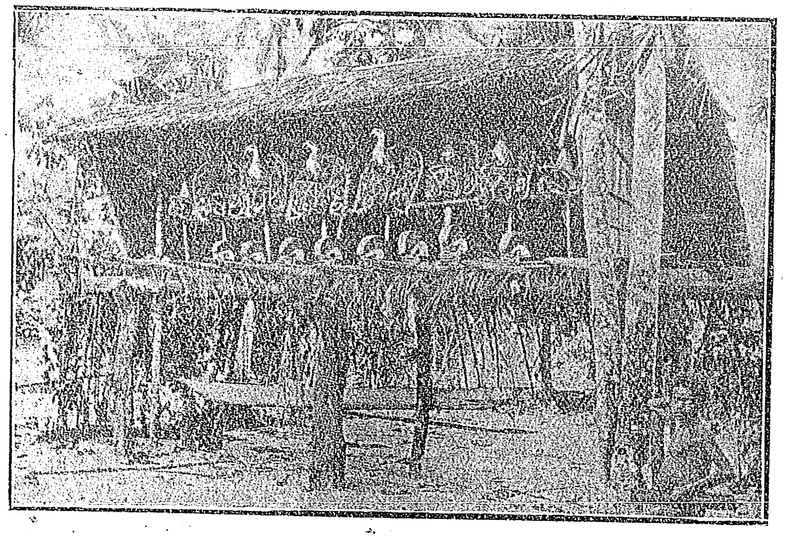

মুখোসখানা—(বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অসংখ্য মুখোস তৈরি ক'রে 'গুপ্ত-সমিতির' সভ্যেরা এই মুখোসখানার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এই মুখোসখানা তাদের সমিতি গৃহেরই সংলগ্ন। সেখানে সভ্য ব্যতীত অপর কাহারও প্রবেশ একেবারে নিষেধ।)

কবরস্থায়ী করা হয়। পুরাকালে বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জে প্রথা ছিল যে, মৃতের সঙ্গে তার একজন বা একাধিক স্ত্রী কিম্বা ক্রীতদাসীকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হবে। আজ কাল এই নৃশংস প্রথাটা উঠে গেছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায় যে, মৃতের সম্মানের জন্য তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রীতদাসীকেও হত্যা করা হয়। এই নিষ্ঠুর

আচরণের উদ্দেশ্য এই যে পরলোকে মৃতব্যক্তির আত্মার সেবা করবার জন্য তার একজন ক্রীতদাসীকেও সেখানে পাঠানো হোলো।

হানোভার দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে নিয়ম

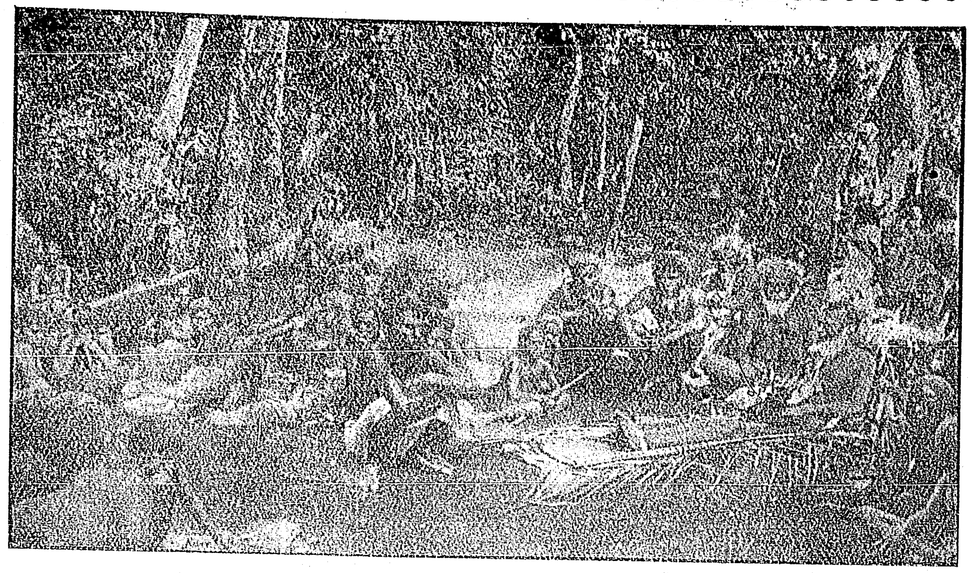

শবাধারে রক্ষিত মৃত দেহ—(উপবেশনের ভঙ্গীতে মৃত দেহটিকে শবাধারে স্থাপন ক'রে আত্মীয় স্বজনেরা ঘিরে বসে আছে।)

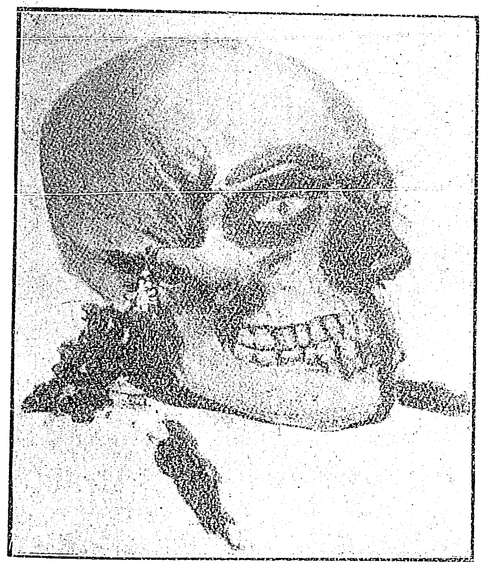

দৈবায়ত্ত নরকপাল—(আরাধনায় সঞ্জীবিত হ'য়ে এই নরকপাল ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে বলে ধারণা আছে।)

আছে—যে মৃত ব্যক্তিকে বর্ষা ফলকের 'শর-শয্যায়' আরোহণ করিয়ে প্রত্যেক প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়। তার পর দিন একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করে, সেই মঞ্চের উপর শবদেহটি রেখে মঞ্চের নিম্নে অগ্নি

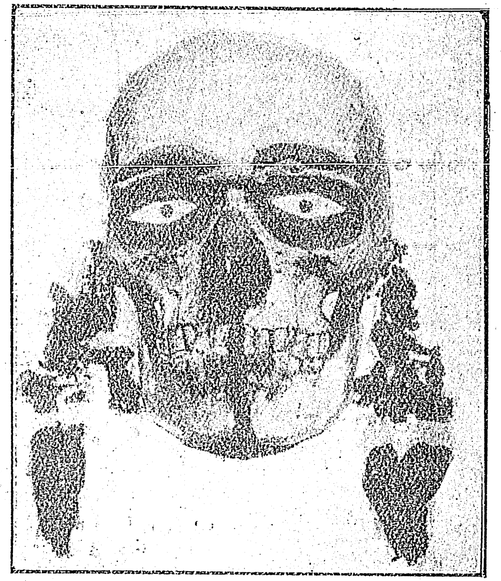

মন্ত্রপূত নরকপাল—(এই নরকপাল পূজান্তে শিয়রে রেখে শয়ন ক'রলে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জানিয়ে দেয়।)

প্রজ্বালিত ক'রে দিয়ে—এক ব্যক্তি মঞ্চের উপর আরোহণ ক'রে শ্মশান-সঙ্গীত গাইতে থাকে এবং তালে তালে তার বর্ষাফলকটি মৃতের মস্তকে স্পর্শ করায়। অগ্নিশিখা প্রবল



বর্শাফলকে মৎস ধরা—(সলোমন দ্বীপের অধিবাসীরা সকলেই ত্রিফলা বিশিষ্ট বর্শার সাহায্যে অঙ্গবিদ্ধ ক'রে সমুদ্র গর্ভ থেকে বড় বড় মৎস্য অনায়াসে সংগ্রহ করে।)

হ'য়ে উঠ্‌লে, সে বাধ্য হ'য়ে মঞ্চ পরিত্যাগ ক'রে নেমে আসে। ক্রমে অগ্নির লেলিহান শিখা মঞ্চটিকেও আক্রমণ করে এবং মঞ্চটি পুড়তে পুড়তে ভেঙ্গে অনল গর্ভে এসে পড়ে ও শবদেহটিকে ভস্মসাৎ ক'রে দেয়।

যতক্ষণ চিতা প্রজ্জলিত থাকে, ততক্ষণ মৃতের আত্মীয় বন্ধুরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও হাহাকার ক'রতে থাকে। চিতা নির্ব্বাপিত হবার পর চিতা ভস্মের উপর একটি আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করে দেওয়া হয়। কতক সপ্তাহ পরে ডাবের জলে সেই চিতাভস্ম ভিজিয়ে প্রত্যেক শোকার্ত্ত জনের গাত্রে লেপন ক'রে দেওয়া হয়। এই দিন একটা ভোজের অনুষ্ঠানও হ'য়ে থাকে। তার পর একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মৃতের আত্মীয়-বন্ধুরা শোক চিহ্ন ধারণ ক'রে অশৌচ পালন ক'রে। এই অশৌচ পালনের সময় তারা কতকগুলি বিধি-নিষেধ মেনে চলে। অশৌচান্তে আবার একটা ভোজের অনুষ্ঠান হ'য়ে মৃতের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায়।

কোয়েতা সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম হ'চ্ছে, মৃত্যুর পর শবদেহটিকে সুসজ্জিত করা হয় এবং মৃতের মুখখানি সিঁদুর

কর্ণ-বিদ্ধ শিশু—(কাণের ফুটো বড় করবার জন্য ছিদ্র মধ্যে গজাল পুরে রাখা হয়েছে।)

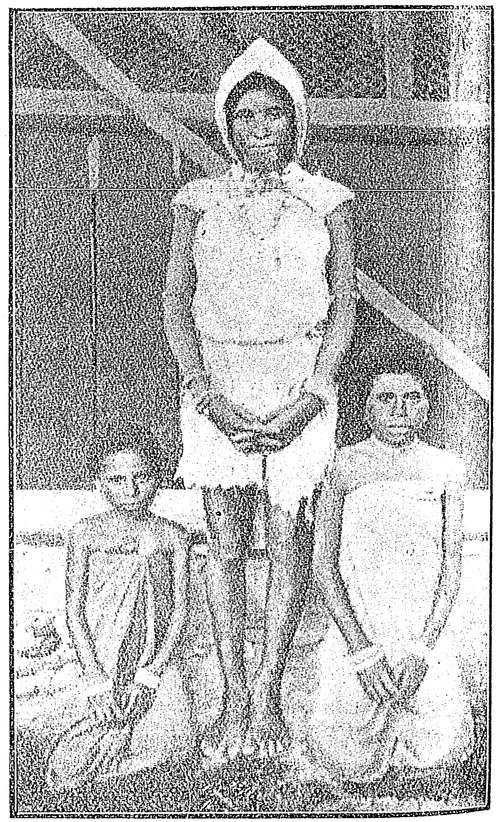

বল্কল-বেশিনী বিধবা—(নিউগিনির স্ত্রীলোকেরা পতির মৃত্যু হ'লে বল্কল নির্ম্মিত শোকবেশ পরিধান করে।)

ক'রে দেওয়া হয়। মৃতের বিধবা পত্নী শবদেহটি ক্রোড়ে করে অনাহারে সারানিশি জেগে ব'সে কাটায়। মৃতের আত্মীয়-বন্ধুরা কাঁদতে কাঁদতে এসে মৃত ব্যক্তির মুখ চুম্বন করে। এদের মধ্যে চুম্বনের প্রথা অন্য রকম। এরা ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ ক'রে চুম্বন করে না, নাসিকায় নাসিকা ঘর্ষণ ক'রে চুম্বন করে। চুম্বনান্তে তারাও সারারাত্রি মৃতের পার্শ্বে ব'সে অনাহারে অনিদ্র অবস্থায় যাপন করে। পর-দিন তিনজন লোক বসবার মত একখানি বড় কাঠাসন্ নির্ম্মাণ ক'রে তাইতে মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থলে বসিয়ে একপাশে তার স্ত্রীকে ও অপর পার্শ্বে তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপবেশন করায়। তার পর তাদের ঘিরে শোক সূচক নৃত্য গীত ও বাদ্য সুরু হয়। ঘণ্টা খানেক এই রূপে কাটাবার পর মৃত ব্যক্তির সমস্ত দ্রব্যাদি ভেঙেচুরে তারা শব-দেহের নিকট জড় ক'রে রাখে এবং মৃত ব্যক্তির সমস্ত সাজসজ্জা খুলে নিয়ে আর একবার তার মুখচুম্বন ক'রে তাকে একখানি ন্যাটায়ে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কবর-শায়ী করে। মৃত্যুর তিন দিন পরে একটা ভোজের অনুষ্ঠান হয়। ভোজের পর মৃতের বিধবা পত্নীর মস্তক মুণ্ডন ক'রে দিয়ে তার আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে দেওয়া হয়। ছ'মাস কাল বিধবাকে এই রকম শোক সজ্জা পরিধান ক'রে যাপন ক'রতে হয় এবং এই ছমাসের মধ্যে অশৌচ-গ্রস্তের মতো তাকে অনেক বিধি নিষেধ মেনে চ'লতে হয়। ছ'মাস পরে ডাবের জলে তার অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণ ধুয়ে ফেলে বিধবাকে শোক পালনের নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে আবার একটা ভোজের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে। অশৌচ অবস্থায় তাদের মধ্যে স্নান করা, পান খাওয়া এবং কোনও কোনও খাদ্য গ্রহণ করা একেবারে নিষেধ থাকে। এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে মেলানেশীয়ার অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরাই আমাদের মত চুন সুপারি দিয়ে পান সেজে খায়।

মৃত ব্যক্তিকে কবরশায়ী করবার সময় নিয়ম আছে যে তাকে পশ্চিম শিয়র ক'রে শোয়াতে হবে; কারণ সূর্য্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় বলে তাদের বিশ্বাস যে মৃতের অস্তমিত জীবাত্মাও পশ্চিম লোকে প্রস্থান করে।

এদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস যেটুকু, সে কেবল মাত্র মন্ত্র-প্রভাব ও মৃত আত্মার অলৌকিক শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

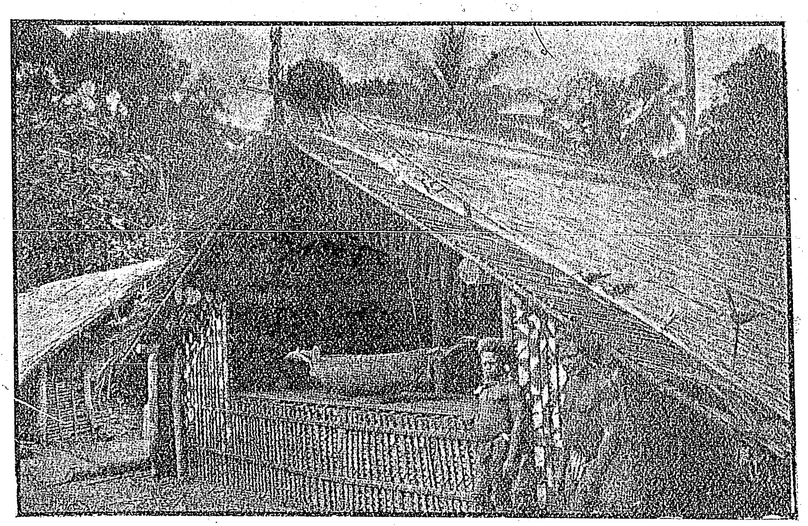

"আড্ডাবাড়ীর" বাহ্যদৃশ্য—(প্রবেশ-পথের সম্মুখেই বিরাট পানপাত্র স্থাপিত)

যাদু বিদ্যাকে এরা যতটা ভয় করে—বা মানে, ততটা আর কিছুই মানে না। এরা কোনও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু দৈব-শক্তির উপর প্রবল আস্থাবান। এই যে এক অদৃশ্য দৈবশক্তির উপর তাদের গভীর বিশ্বাস—যে শক্তির কৃপায় বা কোপে তাদের ইষ্টানিষ্ট ঘটে ব'লে তারা বিশ্বাস করে—তার নাম রেখেছে এরা "মানা"। যে কাজ মানুষের পক্ষে করা অসাধ্য এবং মানব শক্তির অতীত যে ক্ষমতা সেও আয়ত্ত ক'রতে পারা যায় যদি "মানা"র কৃপালাভে কেউ সমর্থ হ'তে পারে, এই তাদের বিশ্বাস। তাই "মানা"র প্রসন্নতা লাভের জন্য তারা

অনেক রকম সাধ্য সাধনা ক'রে এবং মন্ত্রপুত কবচ মাদুলী প্রভৃতি ধারণ করে। মৃত আত্মীয়ের পরলোকগত আত্মার সাহায্যে এই "মানা"র অনুগ্রহভাজন হ'তে পারা যায় ব'লে তাদের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের ফলে তারা মৃত ব্যক্তির আত্মার উপাসনা করে। অনেক সময় তারা মৃত ব্যক্তির মাথার খুলিটি অতি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখে দেয়; কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে, এই মাথার খুলির সাহায্যে মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত তাদের সংবাদ আদান প্রদান প্রভৃতি একটা যোগ সংস্থাপন ক'রতে পারা যায়। "মানা"র অস্তিত্ব যে কেবল অশরীরী আত্মার মধ্যেই প্রকাশমান তা নয়—

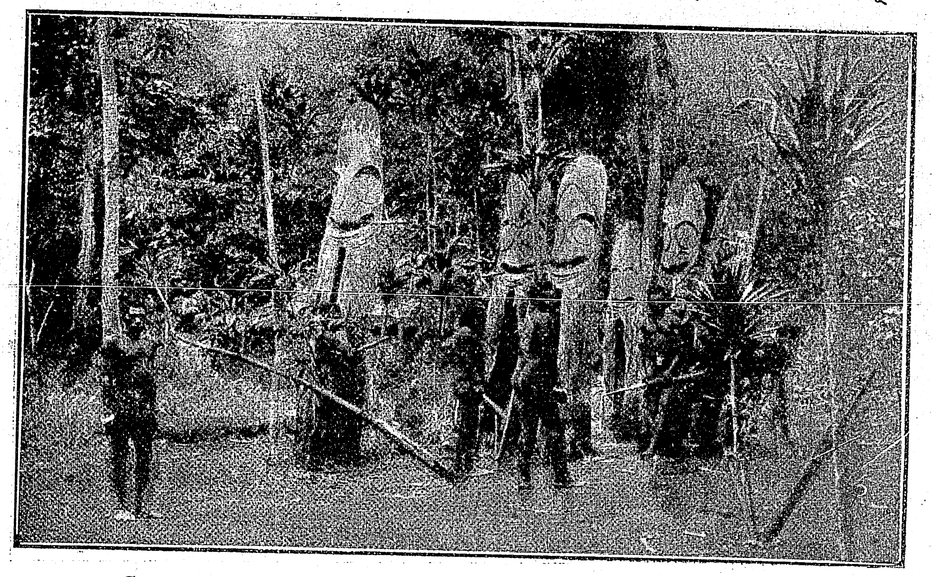

স্মারক-মূর্ত্তি—(মৃতের স্মৃতি রক্ষার্থ এইসব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দারুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে সমাধিক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। মূর্ত্তিগুলি এমন কৌশলে নির্ম্মাণ করা হয় যে, তাতে আঘাত করবামাত্র দামামাধ্বনির মত বেজে ওঠে। কেবলমাত্র অন্ত্যেষ্টি উৎসবের সময় এই স্মারক মূর্ত্তিগুলিকে বাজিয়ে দামামা ধ্বনির অনুকরণ করা হয়।)

কোনও কোনও পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদির মধ্যে এমন কি জড় পদার্থের ভিতরও তাঁর আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত, এ কথাও তারা মানে। কোনও পাষাণখণ্ড, কোনও অস্থি, কোনও মন্ত্র বা মন্ত্রপুত পদার্থ—যা কাছে রাখলে, যার পূজা অর্চ্চনা ক'রলে এবং যা উচ্চারণ করলে সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি হয়, ও দুর্লভ দৈবশক্তিকেও করায়ত্ত ক'রতে পারা যায়, তারই মধ্যে এরা "মানার" অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে নেয়। তাদের বিশ্বাস সেই শিলাখণ্ড, সেই অস্থি, সেই মন্ত্রের মধ্যে "মানা"র অশরীরী আত্মা এসে অধিষ্ঠান ক'রেছে বলেই ওই সমস্ত এমন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে।

ভূত প্রেতের অস্তিত্বের উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এখনও অটুট ও অটল হ'য়ে আছে। তারা ভক্তিতে যতটা না হোক্ ভয়েতেও অন্ততঃ খুব ধুম ধাম ক'রে ভূত-পূজার অনুষ্ঠান করে। ভূতপূজা উপলক্ষে ভূরি ভোজের ব্যবস্থা হয়। কারণ এই অপদেবতাদের পরিতুষ্ট করবার জন্য তাঁদের পূজায় প্রচুর নৈবেদ্য উপহার ও পশু বলি প্রভৃতি প্রচলিত আছে। যা কিছু অমঙ্গল, অনিষ্ট, আধি, ব্যাধি দুর্ঘটনা, মৃত্যু সমস্তই যে এই ভূত প্রেতের উৎপাতে ঘটে এই তাদের ধারণা। ভূতপূজা, ভূতার্চ্চনা বা ভূতের উপাসনা ইত্যাদি তাদের মধ্যে যে কোনও লোকের করবার অধিকার আছে। এই সব দৈবানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মত পূজারী শ্রেণীর কোনও বিশেষ একটা দল নেই। তবে এই ভূত পূজার জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কারণ, তারা মনে ক'রে যে সব রকম ভূতকে এক জায়গায় পাওয়া যায় না। এই জন্য তাদের দেশে বিভিন্ন ভূতের ভিন্ন ভিন্ন মন্দির আছে। সেই সেই স্থান এদের কাছে তীর্থ স্বরূপ গণ্য। প্রত্যেক ভূতালয়ে প্রায়ই ভূতের এক একটি কাল্পনিক প্রতিমূর্ত্তি অথবা শিলাবিগ্রহ বা দারু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সকলে গিয়ে সেখানে পূজা দিয়ে আসতে পারে—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সেই যে 'মানা' আখ্যাত দেবতা যার কোনও রূপ নেই, মূর্ত্তি নেই, মন্দির নেই—সেই অদৃশ্য-চারী



বিবাহ-যাত্রীর মিছিল—(পুরোভাগে 'বধূ' দণ্ডায়মান। পশ্চাতে বধূর সহযাত্রী ও বিবাহের উপহারবাহীর দল।)

মহাশক্তিধরের পূজার অধিকার সেখানে সকলের নেই। তাঁর পূজা ক'রতে পারে কেবল মাত্র যারা মন্ত্রসিদ্ধ, ভূত-জানত ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী অসাধারণ লোক। সাধারণের

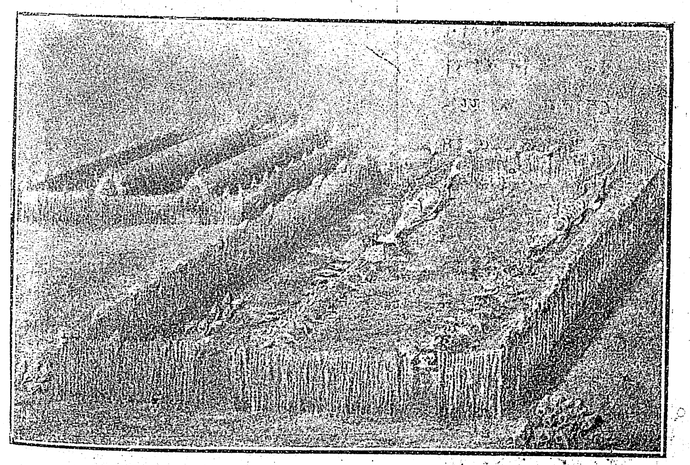

তীর্থভূমি—('দেবক' [Totem] উপাসকদের এই তীর্থভূমি বাইরে থেকে যেরূপ দেখায়, তার চিত্র বাম ভাগে। দক্ষিণে উহারই আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এই তীর্থস্থ "দেবকত্রয় হ'চ্ছেন কুম্ভীর, হাঙ্গর ও)



গভীর শোক-সজ্জা—(পতির মৃত্যুর পর পত্নীকে এই তৃণজ শোক-পরিচ্ছদে আপাদ-মস্তক আবৃত ক'রে থাকতে হয়।)

মধ্যে যারা মানার অর্চ্চনাভিলাষী, তাদের এই সব লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এদের মধ্যস্থ মেনে, এদের হাত দিয়েই পূজার অর্ঘ্য পাঠিয়ে—তবে তাদের 'মানা' দেবতার প্রসন্নতা অর্জ্জন ক'রতে হয়।

ভেল্কী, ভোজবাজী, যাদুবিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড, ভূত নামানো, ভূত ছাড়ানো, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি রোঝার কাজ এবং মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্র, শীত, ঝড়, তুফান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি বা

শাস্তি বিধান করবার প্রথা ও এদের মধ্যে খুব প্রচলিত আছে দেখা যায়।

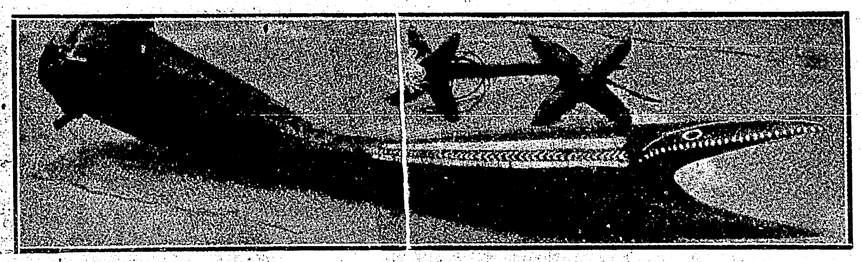

ডমরু ও চক্রদণ্ড—(এই ডমরুর কেবল একদিক মাত্র বাজে। ইহা কেবলমাত্র দেবপূজা উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। চক্রদণ্ডটি দৈবাস্ত্রের মতো পবিত্র আয়ুধ বলে গণ্য।)

এই সকল বিষয়ে এরা একেবারে অবিকল আষ্ট্রেলীয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সমান। যাত্রাকালে শুভাশুভ লক্ষণ মেনে চলার কুসংস্কারটা এদের মধ্যে আমাদের চেয়েও প্রবল।

মেলানেশীয়াবাসীদের একটা প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে তাদের "আড্ডাবাড়ী" (Club-House)। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটা করে বাড়ী আছে, যে বাড়ীতে গ্রামের সমস্ত লোকের ইচ্ছামত যাওয়া আসার এবং রাত্রি-বাস করবার অধিকার আছে। সন্ধ্যের পর কাজ কর্ম্ম সেরে এসে গাঁয়ের গান বাজনা, পানাহার ও রাত্রি-বাস তো করেই—তাছাড়া এই আড্ডাবাড়ীকে সেখানকার যা-কিছু সাধারণ উৎসবের বা সামাজিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থান বলা যেতে পারে। এইখানে তাদের পঞ্চায়েত বসে! মন্ত্রণা সভা আহূত হয়। কোনও জটিল বিষয়ের পরামর্শ ও কঠিন সমস্যার সমাধান করবার প্রয়োজন হ'লে গ্রামের শুভ্রকেশ বৃদ্ধ চাঁই মশাইরা এইখানেই তাঁদের বৈঠক বসান। এই জন্য প্রত্যেক গ্রামে আড্ডাবাড়ী নির্ম্মাণে গ্রামশুদ্ধ লোকের একটা অসাধারণ উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। আড্ডাবাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হ'লে গৃহ প্রবেশের দিন মহাসমারোহে তার একটা প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতারা সেদিন আড্ডাবাড়ীতে এসে পান ভোজনে ও নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে সারারাত্রি যাপন করে। গ্রামের সর্দ্দার স্বয়ং প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়ে 'গুয়া-পান' দিয়ে তাদের সকলকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে আসে।

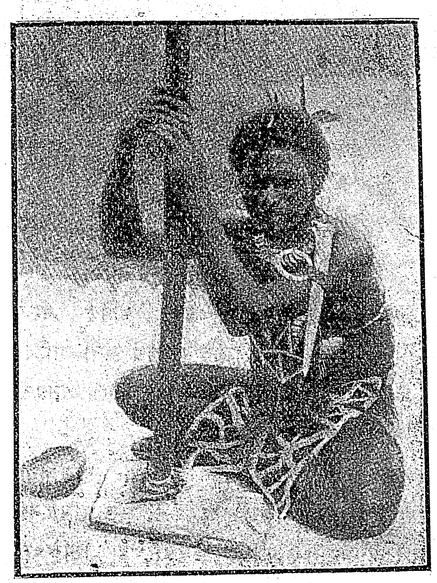

অগ্নি-প্রজ্জ্বালন

(প্রস্তরের সহিত লৌহের সংঘর্ষে অগ্নি জ্বালাইবার সেই প্রাচীন প্রথা এখনও এদের মধ্যে প্রচলিত আছে।)

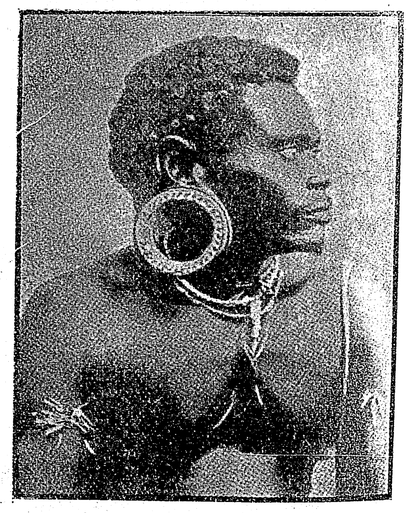

কর্ণাভরণ

(ঝিনুকের মুক্তোর মাকড়ী কাণের প্রকাণ্ড ছিদ্রের মধ্যে ফ্রেমের মতো আঁটা থাকে।)

নারিকেল ও তালপত্র দিয়ে নবনির্ম্মিত আড্ডাবাড়ী সেদিন সুসজ্জিত ক'রে রাখা হয়। এবং সকলের ব্যবহারের জন্য আড্ডাবাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড পানপাত্র স্থাপিত থাকে।

ধান কাটা ও নবান্ন উপলক্ষে সে দেশের অনেক অঞ্চলে উৎসব অনুষ্ঠানের বিধি আছে। পান ভোজন ও নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদ প্রমোদই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। প্রতি বৎসর বসন্তকালে কোনও কোনও গ্রামের অধিবাসীরা দলবদ্ধ হ'য়ে বড় বড় "লাকাতই" তরণী নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করে। আশেপাশের দ্বীপগুলির অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদান করাই তাদের এই সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্যে। বাণিজ্যযাত্রীরা যাবার দিন গৃহের চালে একগাছি ক'রে রজ্জু ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। তাদের বিরহিণী প্রিয়ারা প্রবাসী পতির প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় প্রতি দিন সেই রজ্জুতে একটি ক'রে গ্রন্থি বন্ধন ক'রে দিন গণনা করে। প্রত্যেক দশম দিনের গ্রন্থিটি আবার বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ক'রে বাঁধা হয় কারণ ঠিক পঞ্চাশ দিনের পর অর্থাৎ পাঁচটি বিশেষ গ্রন্থি পড়বার পরই প্রবাসী পতির প্রত্যাগমন এইবার সন্নিকট জেনে পতিবিরহ-বিধুরা-পত্নীর দল আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রতি দিন সমুদ্রতীরে গিয়ে তারা নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখে তাদের "লাকাতই" খানির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি না। "লাকাতই" খানি যে দিন তাদের দৃষ্টিপথে সুদূর সমুদ্র বক্ষের উপর ভেসে ওঠে, সেদিন মহানন্দে তারা স্নান ক'রে গাত্র মার্জ্জনা ক'রে উত্তম বেশভূষায় ও নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হ'য়ে ছোট ছোট তরী বেয়ে অগ্রসর হ'য়ে যায় তাদের দয়িতদের আগু বাড়িয়ে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে আনবার জন্য। কাদের তরী সর্ব্বাগ্রে গিয়ে "লাকাতই" খানি ছুঁতে পারে এই নিয়ে একটা আনন্দের প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়ে যায়। তার পর তারা সকলে একত্র হ'য়ে মহানন্দে গৃহে ফিরে আসে।

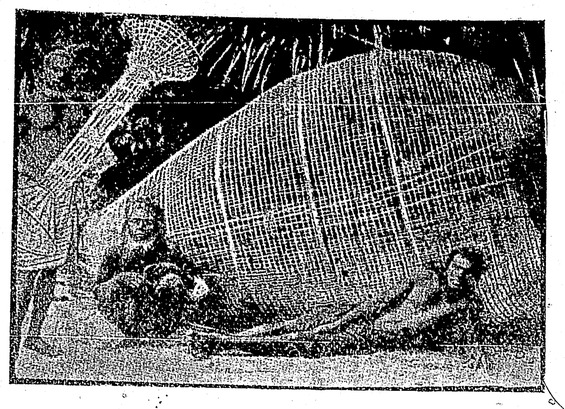

মাছ-ধরা ফাঁদ—(চিয়াড়ীর বোনা এই মাছ-ধরা ফাঁদ এরা গভীর জলের মৎস্য ধরবার জন্য ব্যবহার করে।)



বিক্ষত-ললাট বালক—(শৈশবে কোনও শিশুর মৃগীরোগ বা কঠিন শিরঃপীড়া হ'লে তার ললাট ক্ষত বিক্ষত করে তাকে আরোগ্য করা হয়।



চুণের ডিবে—(পশ্চিম মেলানেশীয়াবাসীরা সকলেই উড়িষ্যাবাসীদের মত অতিরিক্ত পান খায়। তাদের কাছে সদাসর্ব্বদা পান সুপারী থাকে এবং কোমরে চুণের ডিবে ঝোলে। এই চুণের ডিবেটি নানা কারুকার্য্য খচিত এবং নানা আকারের হয়। এই চিত্রে যে চুণের ডিবেটি দেওয়া হয়েছে এটি একজন প্রধান সর্দ্দারের ডিবে। এর কারুকার্য্য অতি চমৎকার!)

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(১৩)

আলি মহম্মদ ধীরে ডাকিল—যমুনা।

যমুনা যেরূপ স্থির নিস্পন্দ মেজেতে লুটাইয়া পড়িয়া ছিল, তেম্নি লুটাইয়া পড়িয়া রহিল।

আলি তাহার তরবারি খাপে পুরিয়া রাখিয়া দরজার ওপর উদাস ভাবে বসিয়া পড়িল।

মৃদু স্বরে আবার ডাকিল—যমুনা!

যমুনা একটু নড়িয়া সাড়া দিল।

হায়, আল্লা, বলিয়া আলি একটু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—অন্তরের বেদনা আর সে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যমুনা এবার একটু সচকিত হইয়া উঠিয়া নতমুখে বসিল। তাহার চুলগুলি মেজেতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

করুণক্লান্ত স্বরে আলি আবার ডাকিল—যমুনা, ওঠো।

অশ্রুসিক্ত চোখে যমুনা আলির ব্যথিত মুখের দিকে চাহিল।

আলি স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, একটু নড়িয়া উঠিল। তরবারি একটু ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। তৃষিত করুণ চোখে সে যমুনার দিকে চাহিল।

বাহির হইতে ভীত আর্ত্তনাদ, রক্তপিপাসু সৈনিকদের উল্লাস-ধ্বনি, কত রকম শব্দের ঢেউ হঠাৎ ভাসিয়া আসিল। আলি একটু সন্ত্রস্ত হইয়া তরবারি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ বাড়ীতে আর কোন সৈনিক প্রবেশ করিতেছে না দেখিয়া একটু শান্ত হইল। ধীরে আবার বলিল—যমুনা, চলো।

একটু বিস্মিত ভীত ভাবে যমুনা বলিল—কোথায়! হায়, কোথায় সে যাইবে।

আলি ধীরে বলিল—এখন আমাদের পালান দরকার—

কেন?

নাদিরের সৈন্যেরা আবার আসতে পারে—

আসুক!

দেখো—

কি?

ওঠো, আমার ঘোড়া দরজায় দাঁড় করিয়ে এসেছি—

আর আমার মা!

আলি চুপ করিয়া রহিল।

দাদা!

তিনি ত সহরের বাহিরে, আমি সেইখানে তোমায় নিয়ে যাব।

আমি বাঁচতে চাই না—

শোন—

যমুনা আলির ব্যথামণ্ডিত মুখের দিকে চাহিল। তাহার বুকের রক্ত একটু দুলিয়া উঠিল। সত্যই কি সে বাঁচিতে চায় না?

আলি ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চলো, যমুনা।

অশ্রুসিক্ত সুরে যেন স্বপ্নের ঘোরে যমুনা বলিল—কোথা, কোথা যাবো!

আলির চোখে জল আসিল, ধীরে সে আবার বসিয়া পড়িল।

কোথা সে তাহার প্রিয়াকে লইয়া যাইবে? আজ বসন্তের এই সুন্দর দিনে নীল যমুনার কোন সুস্নিগ্ধ শ্যামল তীরে ফাল্গুনের রঙে রাঙা পুষ্পের বনে সে যদি তাহার প্রিয়াকে লইয়া যাইতে পারিত! এই বিপ্লব বহ্নি, এই অত্যাচারের দারুণ উৎসব হইতে দূরে, এই মৃত্যুর বিভীষিকা বিচ্ছেদ-ব্যথা হইতে মুক্ত করিয়া কোন শান্ত মিলন-উৎসবের আনন্দে সে যদি তাহার প্রিয়াকে লইয়া যাইতে পারিত! আজ সিংহাসন সাম্রাজ্যের সকল স্বপ্ন নিমেষে দূর করিয়া বসন্তের ছিন্ন পুষ্পমঞ্জরীর মত এই তরুণীকে শুধু

বুকে লইয়া যদি কোন অখ্যাত গ্রামে নিভৃতে প্রেমের নীড় রচনা করিতে পারিত!

ব্যথায় উদ্বেলিত হইয়া আলি বলিয়া উঠিল,—কি হবে রাজ-সিংহাসনে, কি হবে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গে, ব্যর্থ সব! তার চেয়ে চল যমুনা, আমরা দু'জনে যমুনার তীরে কোন ছোট গ্রামে গিয়ে ঘর বাঁধি—তোমায় ওই নীল অঞ্চলের সিংহাসনে—

যমুনার উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া আলি থামিয়া গেল। যমুনা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বুক দুরু দুরু করিতেছে। সে টলিতেছে।

যমুনা!

আলি যমুনার চোখের সম্মুখে যে স্বপ্নছবি আঁকিতেছিল তাহার রঙীন মোহে যমুনার বুক দুলিতেছিল; কিন্তু নিমেষে সে রাঙা মায়া কালো হইয়া গেল। যমুনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলির দিকে অগ্রসর হইতেই, সে দেখিতে পাইল, সম্মুখের কুয়ার জল হইতে তাহার মা ধীরে উঠিয়া তাহার দিকে খর দৃষ্টিতে চাহিয়া নিমেষে আবার কুয়ার মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। তাহার মাথা টলিতে লাগিল। মাগো, বলিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আলি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। বাহিরে আবার ক্ষিপ্ত সৈনিকদের হিংস্র গর্জ্জন শোনা গেল। আলি আর স্থির বসিয়া রহিল না। নাদিরের যে সৈনিকটির মৃতদেহ সিঁড়ির কাছে পড়িয়া ছিল, তাহার দিকে সে অগ্রসর হইল। তাহার সুর্ম্মা-মাখা স্পন্দনহীন চোখ দুটি কালো পাথরের মত চাহিয়া আছে। ধীরে তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া আলি নাদিরের সৈনিক সাজিল। তার পর যমুনার মূর্চ্ছিত দেহ বুকে তুলিয়া লইয়া পথে বাহির হইল। প্রভুভক্ত তাহার ঘোড়াটি স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পিঠে যমুনার এলায়িত তনু রাখিয়া সে ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। লুণ্ঠিতা সুন্দরীর দিকে চাহিয়া পথের সৈন্যেরা ঈর্ষান্বিত হইলেও, কেহ তাহাকে যাইতে বাধা দিল না। দিল্লী নগর হইতে বাহির হইয়া আলি দিল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে তাহাদের গুপ্ত মিলন-স্থানে চলিল।

শঙ্কর যখন তাহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, দরজার সম্মুখে এক মৃত সৈনিকের দেহ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। দেখিল শূন্য গৃহ, কেহ নাই। নিজের ঘরে গিয়া দেখিল, চারিদিকে পুঁথি ছড়ান, জিনিসপত্তর উল্টান। এখানে যে একটা খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহারি চিহ্ন চারিদিকে রহিয়াছে। ব্যাপারটা যে কি হইয়াছে তাহা সে যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। মাথায় যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে রক্ত তখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। এই রক্তস্রাবের জন্য সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। টলিতে টলিতে শঙ্কর মেজেতে ছড়ান পুঁথিগুলির মধ্যে বসিয়া পড়িল। মা—যমুনা—বলিয়া সে দু'তিনবার অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হয় ত মাকে হত্যা করিয়াছে, হয় ত যমুনাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গিয়াছে। কথাটা মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিতেই তাহার মাথাটা অসহনীয় ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল। কে যেন মাথায় মুগুর মারিল। যে ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়াছিল, সেখান হইতে এক ঝলকে খানিকটা রক্ত পড়িয়া গেল, অচৈতন্য হইয়া সে মেজেতে লুটাইয়া পড়িল।

তখন ভগ্ন স্তূপের মাঝে এক নিভৃত শীতল স্থানে নিজের উত্তরীয় বিছাইয়া দিয়া আলি মহম্মদ যমুনাকে ধীরে শোয়াইয়া তাহার পাশে স্থির হইয়া বসিয়া। যমুনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু সে এখনও সহজ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই, ঝড়ে ছেঁড়া পুষ্পবল্লরীর মত সে পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিক জনহীন, নিঝুম। শুধু মাঝে মাঝে ভগ্নস্তূপের মধ্যে আগাছাগুলি কাঁপাইয়া বাতাস করুণ দীর্ঘশ্বাসের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যমুনার দিকে চাহিয়া আলি স্বপ্নজাল বুনিতেছিল। এই প্রলয়-অগ্নির মধ্যে মৃত্যুর সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার হৃদয়-লক্ষ্মী আবির্ভূতা, সে আর তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দিবে না। কত রাজপুত কন্যা ত কত মুসলমান বাদশা'কে বিবাহ করিয়াছে,—তাহাদেরও মিলন সম্ভবপর হইতে পারে। এ সিংহাসনের মরীচিকা স্বপ্নের জীবন ছাড়িয়া দিবে। সে আর বিচ্ছিন্ন ভারত-মিলন-পিপাসী বীর নয়, সৈনিক নয়, সে এক সুন্দরী নারীর প্রেমিক।

দাদা—দাদা! যমুনা অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আলি মহম্মদ চমকিয়া উঠিল, তাহার প্রেমের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। ও কি যমুনার কণ্ঠস্বর, না শিরিণের?

তাহার মনে হইল শিরিণ তাহাকে ডাকিতেছে—দাদা! নাদির-নিষ্পেষিত দিল্লীনগর হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি আসিতেছে, দাদা! ঝাতাসের হাহাকারে ভগ্নস্তূপের গহ্বরে গহ্বরে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহার কাণে সূঁচের মত আসিয়া বিঁধিতেছে। আলি মহম্মদ শিহরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। হায়, শিরিণের কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল! যমুনার মত হয় ত তাহারও ঘরে কোন কামোন্মত্ত সৈনিক প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ওপর অত্যাচার করিতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? আলি তাহার তরবারি দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিল। আর্ত্তনাদের মত বলিয়া উঠিল—যমুনা!

যমুনা কোন সাড়া দিল না।

যমুনা, একটু শোন।

যমুনা যেন কিছু বুঝিতে পারিল না।

তুমি একটু একলা থাকতে পারবে?

যমুনা শুধু ভীতি-বিহ্বল চোখে তাহার দিকে চাহিল।

আলি স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, সে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া এক উঁচু পাথরের উপর দাঁড়াইল। দূরে আকাশে সহস্রটা নাগিনীর মত ধূমের কুণ্ডলীর মধ্যে অগ্নিশিখা নাচিতেছে, দিল্লী পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে।

উন্মত্তের মত আলি যমুনার কাছে ছুটিয়া আসিল, তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—যমুনা—শিরিণ—একবার থাকো—শোন—

ধীরে যমুনা বলিল—যাও তুমি!

আলি ভাবিল সে ভুল শুনিল, কিন্তু যমুনা যখন তাহার হাত ছাড়িয়া দিল, সে বুঝিল যমুনা তাহাকে যাইতে বাধা দিবে না। কিন্তু বাধা না দিলেই ত যাওয়া যায় না। তাহাকে কিরূপে একাকিনী অসহায়া রাখিয়া যাইবে? কিন্তু সে ত আদেশ দিয়াছে, যাও তুমি।

ধীরে আলি বাহির হইল, ঘোড়াটির কাছে গেল, আবার যমুনার কাছে ফিরিয়া আসিল। কেন যমুনা তাহাকে বারণ করে না, তাহাকে আটকাইয়া রাখে না। ইচ্ছা হইল আর একবার জিজ্ঞাসা করে, যমুনা যাবো? মুখ ফুটিল না, যমুনার কাছেও বসিয়া থাকিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া দূরে দিল্লীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ জ্বলিতে লাগিল। চঞ্চল হইয়া সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তার পর অসহায় শিশুর মত সে বসিয়া পড়িল, দুই চোখ ফাটিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

(১৪)

তখন দিল্লীর অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। হত্যা করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া, নারীদের নির্য্যাতন করিয়া নাদিরের সৈন্যেরা পরিতৃপ্ত হইল না, তাহারা দিকে দিকে আগুন জ্বালাইয়া দিল। মুস্তাফা মিঞার সরাইখানা হইতে যে সৈন্যেরা গত রাত্রে প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা তাদের সেনাপতির অপমানের প্রতিহিংসা লইবার জন্য প্রথমে অগ্নিকাণ্ড সুরু করিল।

রাজশেখর ফতেমাকে লইয়া ঘর বন্ধ করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু বাড়ীতে আগুন লাগাতে ঘর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইল। পথে লোক উন্মত্তের মত ছুটিতেছে। প্রলয়াগ্নির আলোকে রক্তস্রোতে চারিদিক রুদ্র রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে সে ফতেমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। গত রাত্রে যে আহত সেনাপতিকে তাহাদের ঘরে লইয়া আসিয়াছিল, তাহার তরবারি এক হাতে লইয়া আর এক হাতে ফতেমাকে ধরিয়া সে পথে বাহির হইল। পথে বাহির হইতেই তাহার মন যেন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, উন্মত্ত জনসংঘের সঙ্গে মৃত্যুর উৎসবে মাতিয়া ওঠে। সম্মুখে এক সৈনিককে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ সুরু করিয়া দিল। তার পরে তাহাকে হত করিয়া তাহার লাল টুপি মাথায় দিয়া সে মাতালের মত চলিল। ফতেমা তাহার হাত ধরিয়া চলিল। ফতেমাকে আংটি দিয়া ক্রয় করিয়া মুক্তি দিয়া সে যে পথ দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই দুজনে আজ মৃত্যুর হাত এড়াইয়া যাইবার জন্য যমুনা নদীর দিকে চলিল।

যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া রাজশেখরের মনে হইল, স্থানটা যেন তাহার পরিচিত। স্থির হইয়া সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। হাঁ, এইখানে এক দিন সে মরিতে আসিয়াছিল! সে মৃত্যুর কথা মনে পড়িতেই তাহার চোখে এক স্নিগ্ধ পবিত্র মুখের ছবি ভাসিয়া উঠিল। শিরিণের কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে বাড়ীখানি কোথায়? সে চাহিয়া

শিহরিয়া উঠিল। ওই যে অদূরে অগ্নি একটি বাড়ী ঘেরিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, ওই কি তাহার রক্ষাকর্ত্রী দেবীর বাড়ী? একবার সে ফতেমার মুখে ভীতি-ব্যথিত নয়নে উৎসুক ভাবে চাহিল। তাহার চাউনি দেখিয়া ফতেমা বুঝিল, রাজশেখর ওই অগ্নির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। সে দৃঢ় করিয়া রাজশেখরের হাত ধরিল। রাজশেখর করুণ নয়নে মিনতির সহিত ফতেমার দিকে চাহিল। তাহার হৃদয়ের বেদনা ফতেমা বুঝিল। সে কিছু বলিল না, ধীরে তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। উদ্দীপ্ত নেত্রে ফতেমার দিকে চাহিয়া রাজশেখর সম্মুখের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে মরিয়ার মত ছুটিল, এখনও সমস্ত বাড়ী গ্রাস করে নাই, এখনও আশা আছে।

রাজশেখর অগ্নির মধ্যে ছুটিয়া গেল। সম্মুখের দ্বার পুড়িয়া গিয়াছে, অঙ্গারের উপর দিয়া সে চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল, কোথায় তাহার দেবী?

তাহার দেবীর যে পূজারতা মূর্ত্তি তাহার মানসপটে আঁকা ছিল, সেই মূর্ত্তিই সে দেখিল। চারিদিকে আগুন লাগিয়াছে। শিরিণ তখন তাহার ঘরে স্থির বসিয়া আল্লার নামে এক ভজনগান করিতেছে। সে গাহিতেছে, হে প্রভু, কত দিন কত মধুর মূর্ত্তিতে তুমি এসে দেখা দিয়েছ; কিন্তু তোমার এ রুদ্র মূর্ত্তি সবশেষের জন্য রেখে দিয়েছিলে; এ অগ্নিময় মূর্ত্তিতে তুমি আমায় দেখা দিলে, আমি ধন্য।

মাঝে মাঝে পাথর ফাটার শব্দ হইতেছে। কোথাও দরজা খসিয়া পড়িতেছে। আগুনের শিখা নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। বাতাস হা হা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে শিরিণের বন্দনা-গান উঠিতেছে। রাজশেখর মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আগুনের হল্কায় তাহার গা ঝলসিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে শিরিণকে ডাকিতে পারিল না, স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এখন যদি বাড়ী চাপা পড়িয়া শিরিণের সঙ্গে একসঙ্গে পুড়িয়া সে মরিতে পারে, ইহার চেয়ে আনন্দের মৃত্যু আর কি আছে। সে বাঁচিতে চায় না, সে এখানে পুড়িয়া মরিবে।

সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। ফতেমা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। আগুনের মধ্য দিয়া আসিতে তাহার ওড়না পুড়িয়া গিয়াছে, গা জ্বলিতেছে। রাজশেখর পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, সে জোরে তাহাকে নাড়া দিল। তার পর শিরিণের দিকে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল—বহিন, বহিন! শিরিণের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। শিরিণ কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার অগ্নি-তাপ-ক্লিষ্ট দেহ অবসন্ন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। রাজ-শেখর তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। এ পবিত্র দেহ ছুঁইতে তাহার যেন সাহস হইতেছে না। কিন্তু শিরিণ মূর্চ্ছিতার মত হইয়া পড়িল দেখিয়া ধীরে সে ধরিল। ভক্ত যেমন করিয়া দেবতার জন্য ফুলের নৈবেদ্য বহন করে, তেমি করিয়া সে শিরিণকে তুলিয়া লইল। ফতেমা দেখিল, একদিকের দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—সিঁড়ি এখুনি বুঝি ভাঙিয়া পড়ে। নিমেষের মধ্যে সে রাজশেখরকে সিঁড়ির ওপর ঠেলিয়া দিল।

মূর্চ্ছিত দেহ বুকে ধরিয়া রাজশেখর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার পায়ের তলায় সিঁড়িটা টলমল করিতে লাগিল। তার পর শিরিণকে দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া সে সম্মুখের অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া ঝড়ের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ফতেমার কি হইল, সে নিরাপদে আসিতে পারিতেছে কি না, তাহা সে ফিরিয়াও দেখিল না। যখন সে দরজা পার হইয়া গেল, প্রচণ্ড শব্দে তাহার পেছনে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে একটু চমকিয়াও উঠিল না, শিরিণকে লইয়া যমুনার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘাসের ওপর শিরিণকে শোয়াইয়া সে তাহার মুখের দিকে ভক্তিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল।

ভীম শব্দে বাড়ীর সম্মুখভাগ ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। এবার রাজশেখর একটু কাঁপিয়া উঠিয়া বাড়ীর দিকে চাহিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ফতেমা কোথায়? হয় ত সে এখনও ওই বাড়ীর মধ্যে আগুনে আছে। রাজশেখর আবার আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু শিরিণের মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল; শিরিণ চোখ মেলিয়া চাহিল, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, ওঃ, একটু জল!

সম্মুখে আগুন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। ফতেমার দীপ্ত মুখের মত একখানা মুখ নিমেষের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আগুনে মিলাইয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখভাগ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। রাজশেখর বুঝিল, ইহার তলে ফতেমা চিরদিনের মত চাপা পড়িয়াছে। ধীরে সে যমুনা হইতে একটু জল আনিতে গেল। (ক্রমশঃ)

সম্মিলনে সম্মেলন

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

গত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা সাহিত্যিক না হইলেও ছোট বড় মাঝারী সাহিত্যিকগণের দর্শন স্পর্শন সুখ অনুভবের জন্য সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে বিশেষ চেষ্টা করি। গাজনের সন্ন্যাসীর মত চড়কের ঢাকের বাজনা শুনিলেই পিঠ সুড় সুড় করিয়া উঠে। অভ্যর্থনা-সমিতি হইতে নিমন্ত্রিত ও ২।১ স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতি বৎসরই সম্মিলনে যাইবার জন্য ব্যগ্র হই; কিন্তু কোন কোন বার সময়ের অভাব ও পকেটের ক্ষীণ অবস্থা বশতঃ ব্যগ্রতাই সার হয়, মনোরথ উথায় হৃদি লীয়ন্তে হইয়া পড়ে। এবার অভ্যর্থনা-সমিতি পথের যেরূপ মনোরম বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রথ দেখা ও কলা বেচার ন্যায় এই সুযোগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দর্শনের লোভই প্রবল হইয়া উঠিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক কবিরাজ মহাশয়ের ভাণ্ডারে বেদনা-নাশক ঔষধের অভাব হইবে না এ ভরসাও ছিল। কাজেই দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম। আমি বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির প্রতিনিধি ভাবেই গিয়াছিলাম।



মূল সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

কোলাঘাট হইয়া যাওয়ারই ব্যবস্থা করিতে হইল। আগম-নির্গম এক পথে হওয়াটা ঠিক নহে। ৫ই বৈশাখ কোলাঘাটে ষ্টীমার রিজার্ভ থাকিবে জানিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দূরের পথ বলিয়া এক দিন পূর্ব্বে রওনা হইয়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর রাণী-চকে উপস্থিত হই। সম্মিলন-যাত্রী আর কাহারও দর্শন সে দিন পাই নাই; "যাতায়াতের পথে কার বা সাথী কে" কথাটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অভিজ্ঞতার ফলে অনুমান করিয়াছিলাম, যে অন্ততঃ ২।১ জন স্বেচ্ছাসেবক ষ্টীমার-ঘাটে পাইব; কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। অগত্যা শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাণী-চকেই বিশ্রাম করিতে হইল। শুনিলাম রাণী-চক হইতে ক্রোশ খানেক দূরে গড়ের ঘাটে প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে। প্রাক্তনের ফল খণ্ডন হইবার নহে। বিছানা ও ছত্র রাণীচকে রাখিয়া নৌকা ভাড়া করিয়া গড়ের ঘাট পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াও কাহারও দর্শনলাভ ঘটে নাই, উপরন্তু তথায় পয়সা দিয়াও থাকিবার

মত স্থল না পাইয়া পুনরায় রাণীচকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল, সন্ধ্যার পর আবার লট বহর লইয়া গড়ের ঘাটে পৌঁছিয়া রাজহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিপদ বাবুর দর্শন লাভ ঘটিল। এত কষ্টের পর হরি-পদ-প্রাপ্তি সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। হরিপদ বাবু যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়া রাধানগর যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পথে এক জায়গায় জলযোগ করিয়া রওনা হইতে হইল; আর কিছু দূর গিয়া ললিত বাবুর বাড়ীতে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ২টার সময় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। *

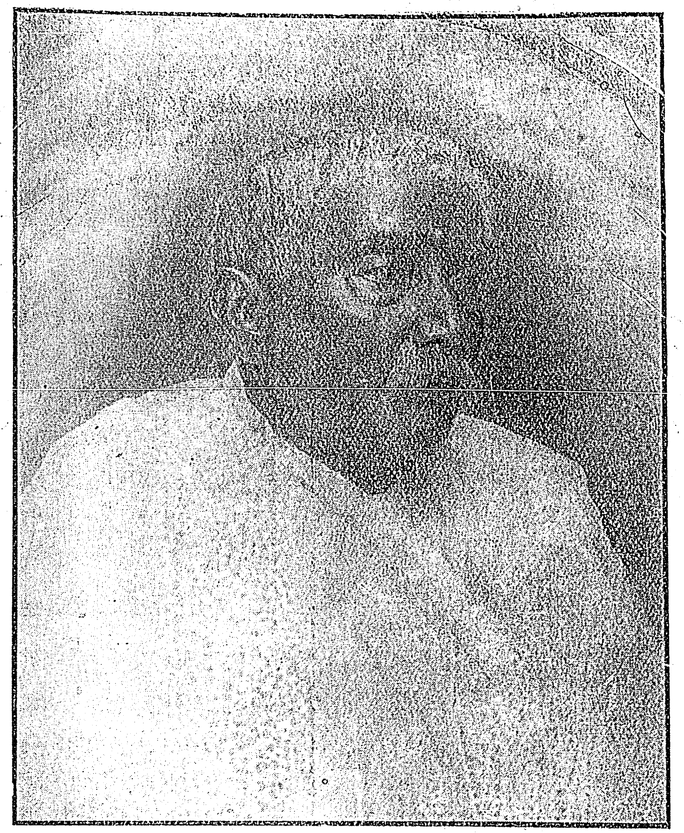

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর

শনিবার প্রায় ৩টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় ভূপেন্দ্র বাবু অসুস্থতা বশতঃ সম্মিলনে যোগদান করিতে না পারায় তাঁহার পক্ষ হইতে সার দেব প্রসাদ সমাগত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমাগত ভদ্রলোকদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় দুইটী মঙ্গলাচরণ পাঠের পর একটী সঙ্গীত হইল। সঙ্গীতের বন্দোবস্ত বোধ হয় পূর্ব্বে ছিল না, উপস্থিত মত ব্যবস্থা করা হয়। ডি এল রায়ের সুর, এইটুকুই বুঝিলাম, গানের পদের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। যথারীতি সভাপতি-নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, এই স্থানে একটু অবান্তর আলোচনা করিতে হইল। যদিও সভাপতি নির্ব্বাচনের কর্তৃত্ব অভ্যর্থনা-সমিতির উপরই ন্যস্ত, তাহা হইলেও সব দিক দেখিয়া শুনিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—অন্ততঃ করা উচিত বলিয়া মনে হয়। অষ্টম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাকেই সভাপতি করার এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না। যোগ্য লোকের কি এতই অভাব হইয়াছে?

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটী কবিতা পঠিত হয়; তন্মধ্যে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক রচিত "এই সে নগর" শীর্ষক কবিতাটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর চারিটী শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন অন্তে তাঁহাদের অভিভাষণ পঠিত হয়। সাহিত্য-শাখার সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুর তাঁহার নিবেদন পাঠ করেন; তাহাতে অনেক জানিবার বিষয় আছে। তিনি "জননী বঙ্গ ভাষা এ জীবনে

* সংবাদ-পত্রাদিতে পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে, বৃহস্পতিবারে কোথাও কোন ব্যবস্থা থাকিবে না; সেই সংবাদটি না জানিতে পারায় মনোমোহন বাবুকে এই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।—ভাঃ—সম্পাদক।

চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমল-কমল চরণে স্থান" বলিয়া নিবেদন শেষ করিয়াছেন। জননী বঙ্গবাণী আমাদের বুড়া দাদার বাসনা পূর্ণ করুন। অতঃপর দর্শন-শাখার সভাপতি প্রিয়দর্শন খগেন্দ্রবাবু তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ স্বাভাবিক সুস্বরে পাঠ করেন। দর্শন-শাস্ত্রটা স্বভাবতঃ কটমটে হইলেও খগেন্দ্রবাবুর ভাষার ও পাঠের গুণে প্রত্যেকের কাণের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে প্রবেশ করিয়াছিল! সমাগত সুধিবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাহা উপভোগ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইতিহাস-শাখার সভাপতি প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সময় সভায় কিছু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল, সকলে ভাল করিয়া শুনিতে পান নাই, তবে মুদ্রিত

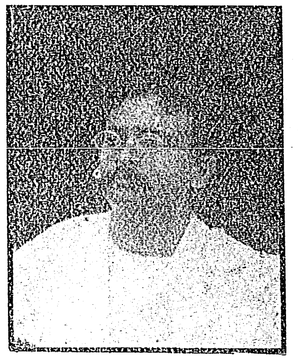

দর্শন-শাখার সভাপতি—
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

অভিভাষণ সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। এই গবেষণামূলক অভিভাষণে শিখিবার অনেক বিষয় আছে। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ-অন্তে সেদিনকার মত সভার কার্য্য শেষ হয়।

আরামবাগ মহকুমার প্রস্তুত খদ্দর ও শিল্প-দ্রব্যের একটী প্রদর্শনী রবিবার প্রাতে ৭॥ টার সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে খোলা হয়। দুই চারিটা লাউ কুমড়া থাকায় ইহাকে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীও বলা যাইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্য অবশ্য অতি অল্পই সংগৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু খদ্দর ও শিল্প-দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শুনিলাম এ অঞ্চলে বড়-ডোঙ্গলা নামক স্থানই খাদি-প্রতিষ্ঠানের একটী কেন্দ্র। তথায় প্রতি মাসে তিন মণ করিয়া সূতা প্রস্তুত হয়। আরও সুখের কথা এই যে আচার্য্যদেবের প্রণালী অনুসারে এখানে সূত্র রঞ্জনের কার্য্যও চলিতেছে। খদ্দরের সাদা ও রঙ্গিন তোয়ালে অতীব মনোরম হইয়াছে। আবলুসের কলম, হুকা ও গড়গড়ার নলিচা, পিতলের ঘড়া, কারুকার্য্য-শোভিত রেকাবী লোহার ছুরী কাঁচি ক্ষুর ইত্যাদি প্রদর্শিত



বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী

হইয়াছিল; মহিলাদিগের প্রেরিত চারু-শিল্পেরও অভাব ছিল না। ফল কথা, প্রদর্শনী-মণ্ডপটী তালপাতার ছাউনী হইলেও তাহার মধ্যে মাণিক লুকান ছিল।

বেলা ৮টার পর সম্মিলন-ক্ষেত্রে চারিটী বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হয়। মামুলী মত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি সমস্তই হইয়াছিল। এবার ইতিহাস-শাখায় রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় এম-এ উপস্থিত ছিলেন। সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে আজন্ম লালিত-পালিত হইয়াও যাতায়াতের এত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি যে সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই আশার কথা। আমরা ভগবানের নিকট কুমার বাহাদুরের

দীর্ঘ জীবন কামনা করি। রাজা মহারাজাদের মধ্যে কুমার বাহাদুর ও উত্তরপাড়া রাজবংশের শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ-লসি ব্যতীত আর কাহাকেও এবার সম্মিলনে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। অপরাহ্ণ তিনটার সময় স্থানীয় ডোম সর্দ্দার-গণের লাঠি-খেলা প্রদর্শিত হয়। তৎপরে ৫টার সময় পুনরায় সাধারণ সভার অধিবেশন ও নিয়ম মত প্রস্তরাদি গৃহীত হইয়া সন্ধ্যার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

এবার অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যে কিছু গলদ ছিল। প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা ও আদর আপ্যায়ন তত্ত্বাবধানের ভার কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করিয়া স্থানীয় জমিদার ধরণী-বাবু, যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দেখিবার প্রবল আকর্ষণে এতগুলি ভদ্রলোক দুর্গম পথক্লেশ উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়াছিলেন—তিনি উপস্থিত ছিলেন না; কিন্তু অপর সরিকের স্বর্গীয় হরিমোহন রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এই উপলক্ষে রাধানগরে গিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যতদূর তত্ত্বাবধান হওয়া সম্ভব তাহার ত্রুটী হয় নাই।



ইতিহাস-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ

নোয়াখালীবাসী একটী কর্ম্মচারী—নামটী ভুলিয়া গিয়াছি, বোধ হয় হরিমোহনবাবু—বিশেষ আন্তরিকতার সহিত আমাদের সেবা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অষ্টম অধিবেশনের কথা মনে পড়ে। অগণিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখকের নিকটে পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই বেলা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কোন অভাব অসুবিধা হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তবে এখানেও সার দেবপ্রসাদ ও যতীনবাবু শনিবার প্রাতে এক বার মাত্র প্রতিনিধিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ লইয়াছিলেন; তাহার পর আর কাহারও দর্শন-লাভ ঘটে নাই। সম্মিলন-মণ্ডপের বিলাতী কাপড়াদি ও ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা লইয়া একটু গোলযোগের উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু কর্ত্তারা ঐ সমস্ত অপসারিত করায় গোলযোগ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। শুনিলাম আগামী বর্ষে বিক্রমপুর রামপালে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে; বাঁচিয়া থাকিত যাইব।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

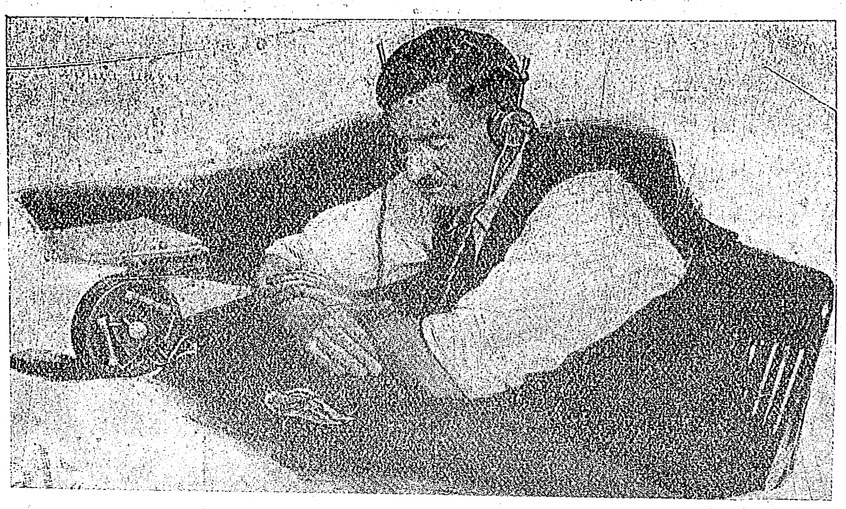

ডাঃ ফিলিপ টমাস (পোকার কথা শুন্‌ছেন)

পোকা-মাকড়ের কথা

অতি ক্ষুদ্রকায় কীট-পতঙ্গেরা কোনও প্রকার শব্দ করে কি না, সেটা আমরা অনেকেই জানিনি। প্রাণীতত্ত্ব-বিদেরা বলেন, তারাও না কি আওয়াজ দেয়। কিন্তু তাদের যে শব্দের কম্পন এত দ্রুত যে, আমাদের কাণ সেটা ধর্‌তেই পারে না। প্রতি সেকেণ্ডে যে কম্পনের তাল বিশহাজার মাত্রাও

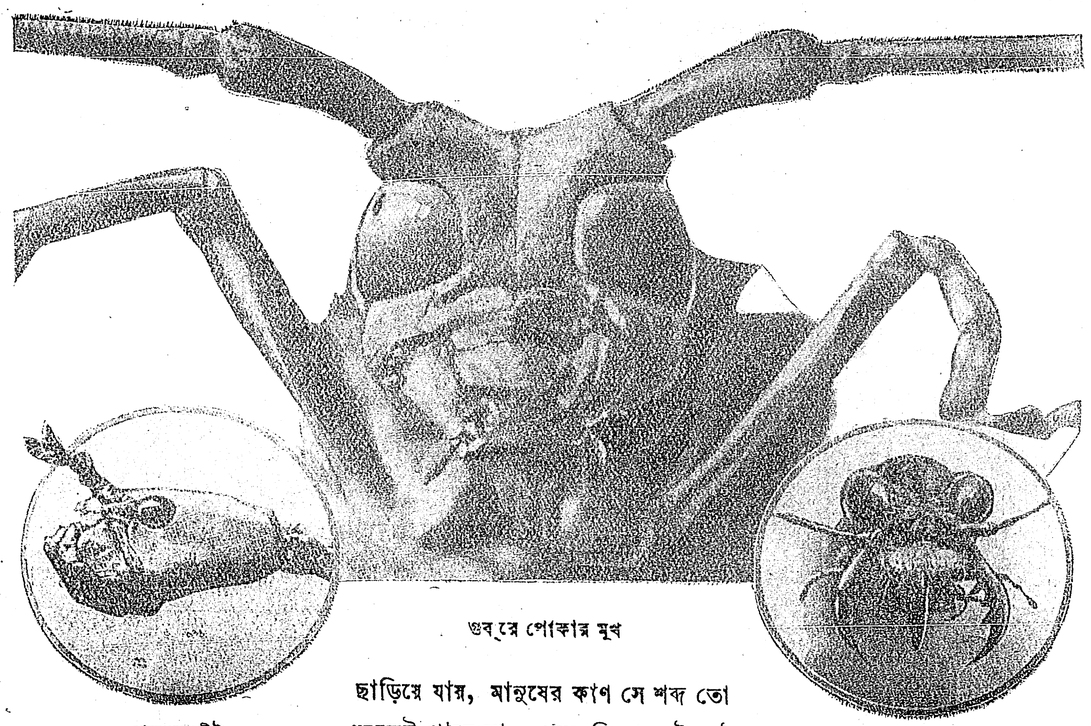

শৃঙ্গধর কীট

গুব্‌রে পোকার মুখ

কাঁচপোকার মুখ

ছাড়িয়ে যায়, মানুষের কাণ সে শব্দ তো ধরতেই পারে না; এমন কি খুব উৎকৃষ্ট

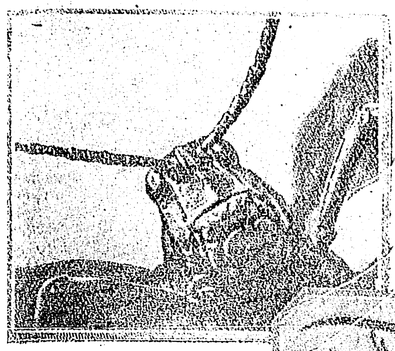

ফড়িংয়ের মুখ

অনেক দিন ধ'রে চেষ্টা করবার পর এখন এমন একটা অণুশ্রবণ (ultra audible Radio-microphone) যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যে,

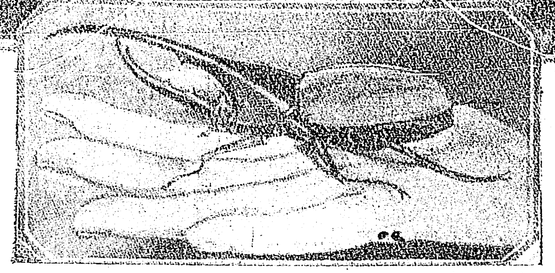

খড়্গ কীট

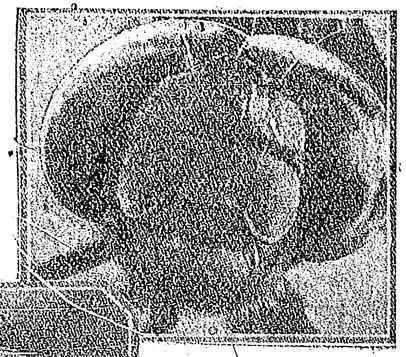

মাছির মুখ

শব্দগ্রাহী যন্ত্রও সেটা গ্রহণ ক'রতে অক্ষম। আমেরিকার ওয়েষ্টিং-হাউসের তাড়িত-তত্ত্ববিদ ডাক্তার ফিলিপ টমাস্ সেই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এখন পিপীলিকা মাকড়সা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গের ধ্বনিও শুন্‌তে পাবো। এই



মাকড়শার মুখ

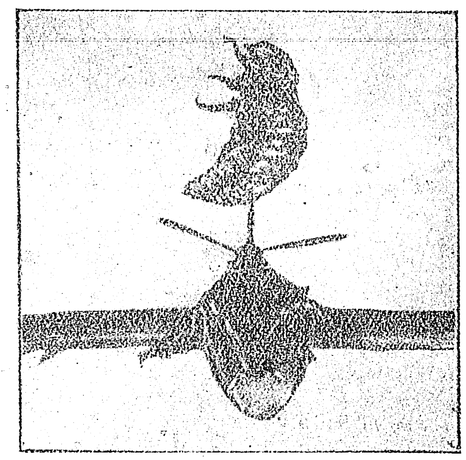

ছারপোকার মুখ



মৌমাছির মুখ

তো গেল তাদের শব্দের কথা। তার পর আর একটা ব্যাপার আছে, সেটাও আমাদের অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। সে হচ্ছে তাদের মুখের আকৃতি। আমরা অনেক পোকা-মাকড়ের চেহারা দেখ্‌লে চিনতে পারি বটে, কিন্তু তাদের মুখ আমরা চিনিনি। যদি কেউ কেবলমাত্র তাদের মুখটি আমাদের দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ জীবটি কি, তাহ'লে হয় ত আমরা ঠিক ব'লতে পারবো না; কারণ, তাদের চেহারা এত ক্ষুদ্র যে, মুখের

আকৃতিটুকু আমাদের ভাল ক'রে নজরে পড়ে না ব'লে মনেই থাকে না।

কয়লার গুঁড়ো

আমাদের দেশে অবশ্য অনেক দিন থেকেই মেয়েরা কয়লার গুঁড়োগুলো ফেলে না দিয়ে তার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে 'গুল' পাকিয়ে উনান ধরাবার কাজে লাগিয়ে আস্‌ছেন। কিন্তু য়ুরোপে

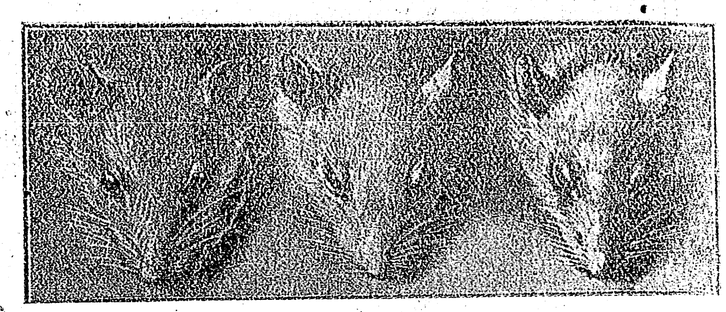

ইঁদুরের মুখ

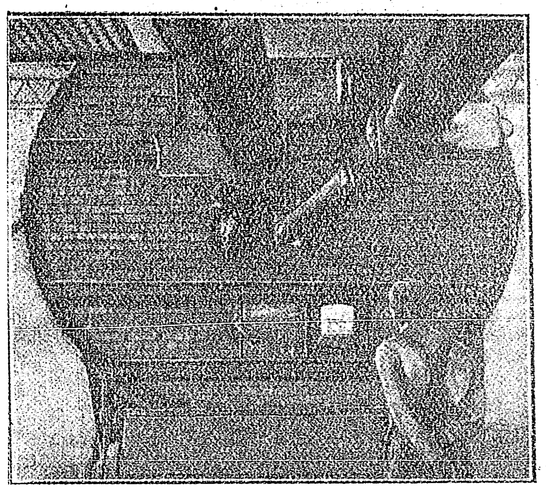

ইঞ্জিনের মধ্যে পাইপে কয়লার গুঁড়ো আস্‌ছে

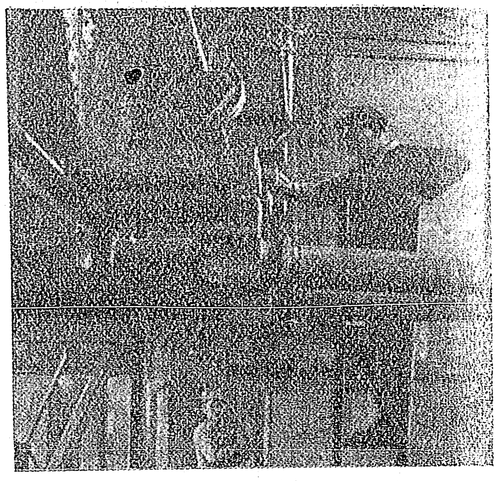

পাইপের ভিতর দিয়ে কয়লার গুঁড়ো পাঠানো হচ্ছে

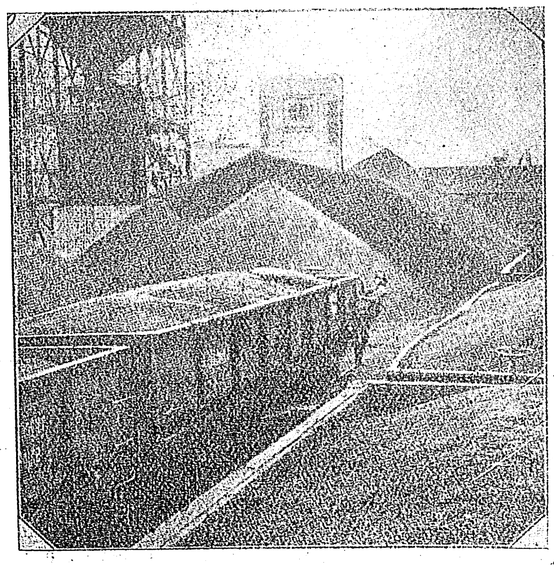

রেল লাইনের পাশে স্তূপাকার কয়লার গুঁড়ো

কয়লার গুঁড়ো এত কাল কোনও কাজেই আসছিল না, একরকম ফেলাই যাচ্ছিল। সম্প্রতি সেখানকার ইন্ধন-বিশারদরা (Fuel Expe rts) আবিষ্কার করেছেন যে, কয়লার গুঁড়োর গুণ আগুনের আঁচ বৃদ্ধির জন্যে কয়লার চাঁইয়ের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। বরং অতিরিক্ত গুঁড়ো কয়লার শক্তি আরও বেশি বলে প্রমাণ

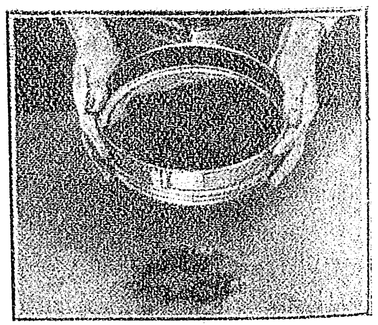

কয়লার গুঁড়োর ছাঁকনী—(খুব মিহি গুঁড়ো ছেঁকে নেওয়া হয় পাইপের ভিতর দিয়ে পাঠাবার জন্য)

হওয়ায় তাঁরা একেবারে কয়লার খনি থেকে গুঁড়ো কয়লা পাইপের সাহায্যে সোজা একেবারে ইঞ্জিনের মধ্যে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। কয়লার দামে গুঁড়ো খুব সস্তা

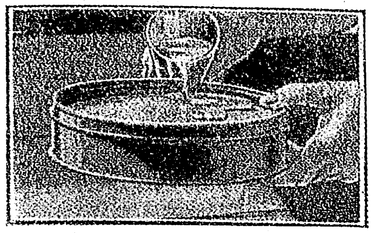

ছাঁকনীতে জল—(ছাকনীর ছিদ্র এত ক্ষুদ্র যে জল গলিয়া পড়িতেও বিলম্ব হয়)

এবং বায়ু চাপের সাহায্যে তাকে পাইপের ভিতর দিয়ে—তরল পদার্থের মতো টেনে নিয়ে যাওয়া চ'ল্‌বে ব'লে অতিরিক্ত রেলভাড়াটা আর লাগবে না এই সব বিবেচনা ক'রে সেখানকার অনেক কল কারখানার মালিক গুঁড়ো কয়লা নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

ব্যাধি বিজয়

নানা রোগের আক্রমণে মানুষ এতদিন নিঃসহায়ের মতো প্রাণ দিচ্ছিল। কিন্তু সে নিরুপায় হ'য়ে বসে ছিল না। প্রাণপণে ব্যাধিকে জয় করবার জন্য সে তার প্রতিষেধকের সন্ধান করছিল। এত দিনে তার সাধনা

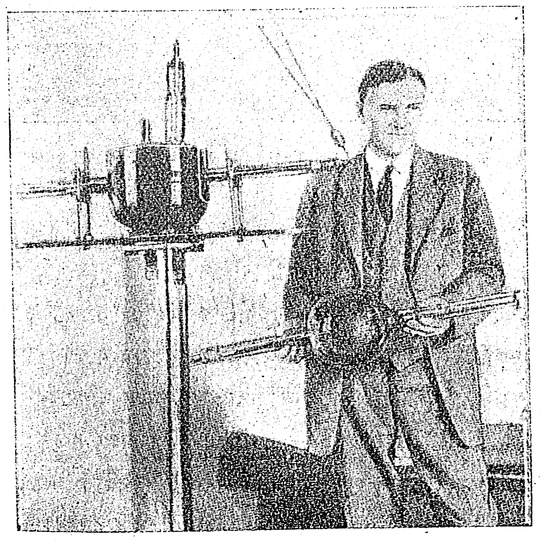

তীব্র-শক্তি-সম্পন্ন এক্স্-রে দীপ

(কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত "ক্রোকার কর্কট রোগ সন্ধানাগারের" অধ্যক্ষ ডাক্তার ফ্রান্সিস সি উড্ এই প্রচণ্ড এক্স্-রে আলোকাধার নির্ম্মাণ করিয়েছেন। কেবলমাত্র এই দীপের প্রখর রশ্মী স্পর্শে দুরন্ত কর্কট রোগও সেরে যাচ্ছে)

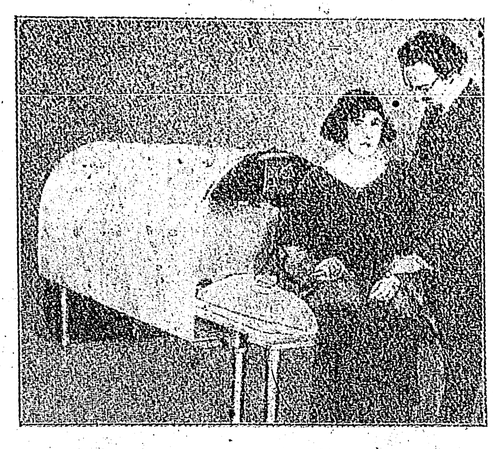

রূপ যৌবনের চিকিৎসা—(তাড়িত প্রবাহে অবগাহন করে জরার আক্রমণ থেকে বিলাতের যুবতীরা যৌবন ও আত্মরক্ষায় চেষ্টা করছেন)

ফলবতী হতে সুরু হ'য়েছে। সে আজ একে একে অনেকগুলি কঠিন ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ আবিষ্কার ক'রে ব্যাধির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছে। ডিপথিরীয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধিকে সে পূর্ব্বেই পরাস্ত ক'রেছিল। এইবার সে কুষ্ঠ, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া এমন কি অতি কঠিন কর্কট রোগকেও করায়ত্ত ক'রে ফেলেছে।

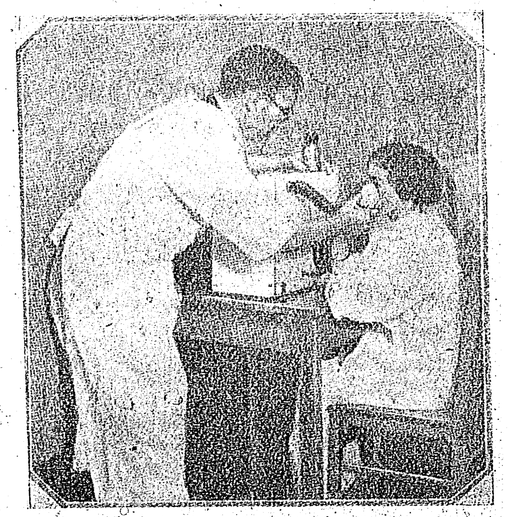

যক্ষ্মার প্রতিকায়

(নিউইয়র্কের ডাক্তার টি এফ্ নোলান্ তরল কারবন ও ক্যাল-শিয়াম সল্টের আঘ্রাণ দিয়ে যক্ষ্মারোগীর জর্জর ফুস্‌ফুস্‌কে সুস্থ ও সবল ক'রে তুলছেন)



বসন্তের প্রতিষেধক—(গুটি মহামারীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থ সকলে টিকা নিচ্ছে)

শিবের অসাধ্য যে যক্ষ্মা রোগ, তাকেও সে এইবার দূরীভূত করবার একটা পন্থা খুঁজে বার করেছে। ক্ষিপ্ত বুকুর দংশনের ফলে ভীষণ জলাতঙ্ক রোগে মানুষের যে শোচনীয় মৃত্যু হ'তো, ডাঃ প্যাষ্টিয়োর তার প্রতিকার নির্দ্দেশ ক'রে জগতে আজ অমর হয়ে গেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান একে একে ব্যাধি বিজয় ক'রে মানুষকে আজ অকাল মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ব'লে ভরসা দিচ্ছে।

নূতন জগৎ

হার্ভাড মান-মন্দির থেকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূরবীণ দিয়ে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে ক'রতে সহসা

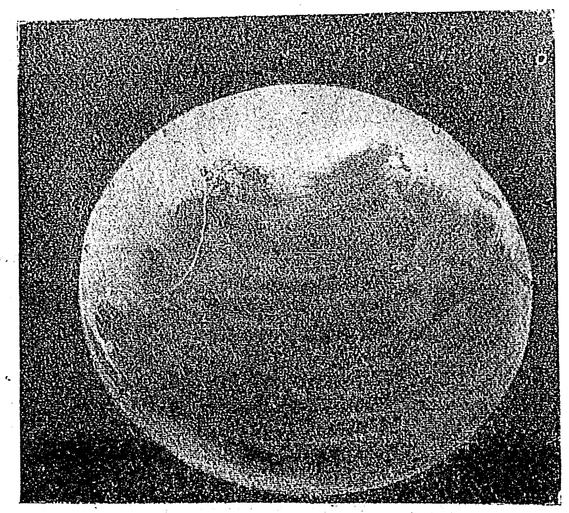

নূতন জগৎ



প্লেগের প্রতিষেধক—(প্লেগ মহামারীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সকলে টিকা নিচ্ছে)

বহুদূরে আজ এক নূতন জগতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই নব আবিষ্কৃত গ্রহটি পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, এখান থেকে অতি শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যেও তাকে মাত্র একটি সরিষার আকারের আলোক-পিণ্ডের মতো দেখায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার উইলসন পর্ব্বতস্থ মান-মন্দিরের উপর থেকে এই আলোকবিন্দুর যে ছায়া চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, এ বিন্দুটি পৃথিবীর আর এক সুদূরস্থ স্বজাতি। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ; কিন্তু এই বেগে এলেও নূতন জগতের আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে দশলক্ষ বৎসর লাগে ; অর্থাৎ ছ'য়ের পিঠে আঠারটি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, নূতন জগৎ এই পুরাতন থেকে ঠিক তত মাইল দূরে !

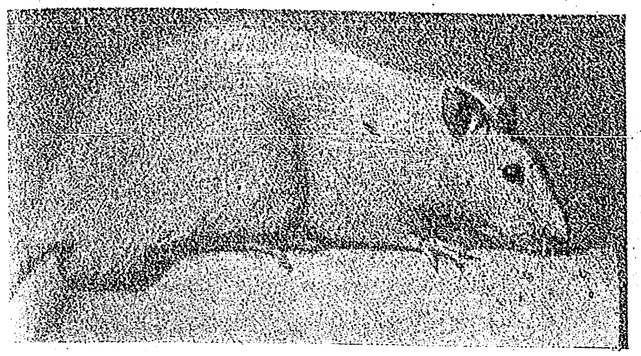

বংশগতগুণ—১ম পুরুষ

বংশগত গুণ

রুষিয়ার শরীর-তত্ত্ববিদ প্রোফেসার আইভান পি পালো জোর গলায় ঘোষণা ক'রেছেন যে পিতা ইচ্ছা কর'লে পুত্রকে তাঁর সদ্‌গুণের অধিকারী করে দিয়ে যেতে পারেন। তাঁর চেষ্টা এক পুরুষে যদি সফল না হয়, পুত্র যদি পিতার গুণের যথাযথ অধিকারী হতে না পারে তাহ'লে হতাশ হবার কারণ নেই ; যেহেতু পুত্রের অপেক্ষা পৌত্র আবার আরও শীঘ্র পিতামহের সদ্‌গুণরাশি আয়ত্ত ক'রতে সক্ষম হ'বে। তিনি এ বিষয়ে নিয়েছিল যে ঘণ্টার শব্দ হ'লেই খেতে যেতে হবে। আবার তাদের উত্তর পুরুষেরা এই নিয়মটা শিখে ফেল্‌লে মাত্র ৫ দিনের মধ্যে! সুতরাং তিনি বলছেন মানুষের মত উচ্চশ্রেণীর জীবেদের মধ্যে এটা আরও পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা আছে। যদি কোনও পিতা তাঁর পুত্রকে সর্ব্বদা সঙ্গে রেখে নিয়ত চেষ্টা করেন—পুত্রের মধ্যে তিনি নিজের সদ্‌গুণরাশি গচ্ছিত ক'রে দিয়ে যাবেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি কৃতকার্য্য

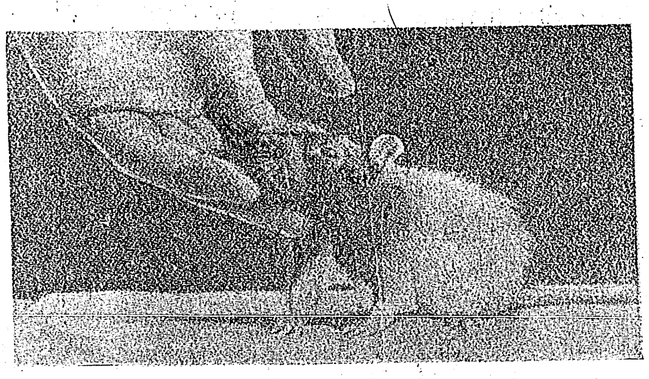

২য় পুরুষ

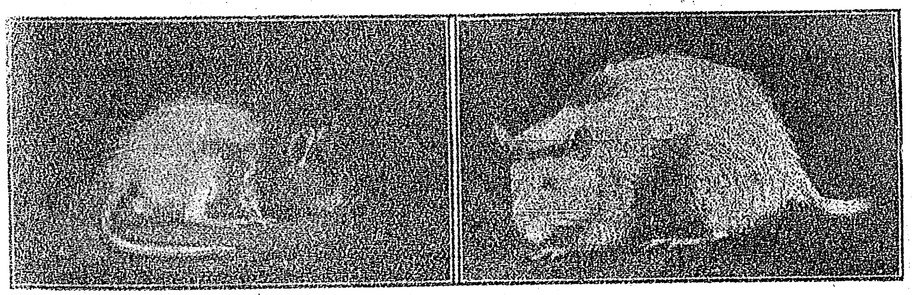

৩য় পুরুষ

হবেন। তবে সে পিতার একাগ্র সাধনা থাকা চাই, অটুট অধ্যবসায় থাকাও দরকার। পুত্রে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হ'তে না পারলে, হতাশ হবার কথা নয়, কারণ গ

পরীক্ষা করবার সময় দেখেছেন যে তাঁর পোষা নেংটী ইঁদুরের দলকে খাবার ঘণ্টা দিলেই খেতে আসতে হবে এই নিয়মটা শেখাতে প্রায় দশমাস লেগেছিল, কিন্তু এই দলের উত্তরাধিকারীরা তিন মাসের মধ্যেই শিখে

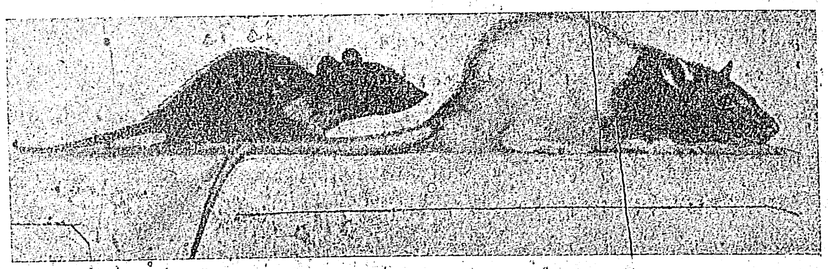

৪র্থ পুরুষ

পৌত্রেরা হয়ত সে শিক্ষা সহজেই গ্রহণ ক'রতে পারবে।

ছেলে না মেয়ে ?

গর্ভবতী রমণীদের সাধারণতঃ এই কৌতূহলটি খুব বেশী রকম হয়। তাঁদের গর্ভে পুত্র এসেছে না কন্যা এসেছে এই খবরটা জানবার জন্য



৫ম পুরুষ



ছেলে না মেয়ে ?

তাঁরা ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন ; অথচ সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এ সংবাদ তাঁদের কাছে রহস্যাবৃতই র'য়ে গেছে। সম্প্রতি জেকো-শ্লোভাকীয়ার ডাক্তার আইজ্যাক ফ্রায়েড্ তাঁদের অভয় দিয়ে বলেছেন যে অন্তঃসত্ত্বা রমণীর দেহের রক্ত পরীক্ষা ক'রে তিনি প্রসবের অন্ততঃ চার মাস পূর্ব্বে বলে দিতে পারবেন যে তিনি পুত্রের জননী হবেন কি কন্যার মাতা হবেন। তিনি যে কয়জনকে পরীক্ষা ক'রে বলেছেন তাদের সকলেরই সম্বন্ধে তাঁর সেই ভবিষ্যবাণী সঠিক মিলেছে।

বেতারের বিক্রম

বেতার বার্ত্তা প্রবাহের গতিকে যে পৃথিবীর কোনও বাধাই রুদ্ধ ক'রতে পারে না এবং তার গতি যে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পাতালে সর্ব্বত্র সমান ভাবে অপ্রতিহত, তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি হাডসান নদীগর্ভের একটী সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে বেতারে প্রেরিত একটী মজলিশের গীতবাদ্যের ঐকতান সঙ্গত শুনতে পাওয়া গেছে। আরিজোনার একটী খনিগর্ভে প্রায় ১৪০০ ফিট মাটীর নিচেয় বেতারে প্রেরিত কোনও সাঙ্কেতিক সংবাদ শুনতে পাওয়া গেছে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান

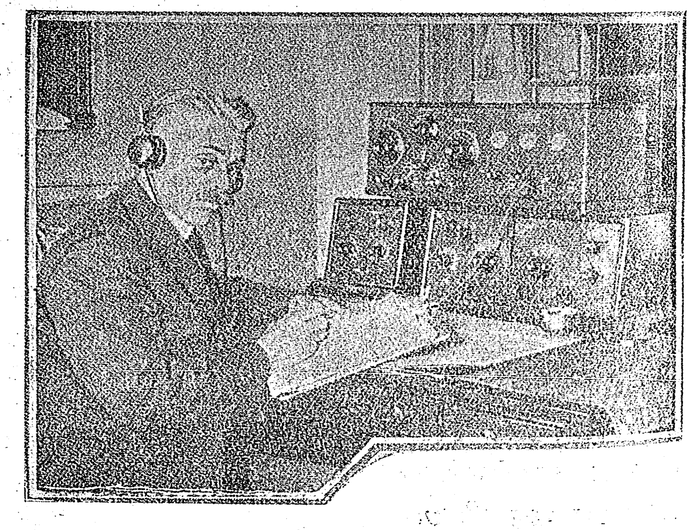

হিরাম ম্যাক্সিম্
(ইনিই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে বেতারে আলাপ ক'রেছেন)

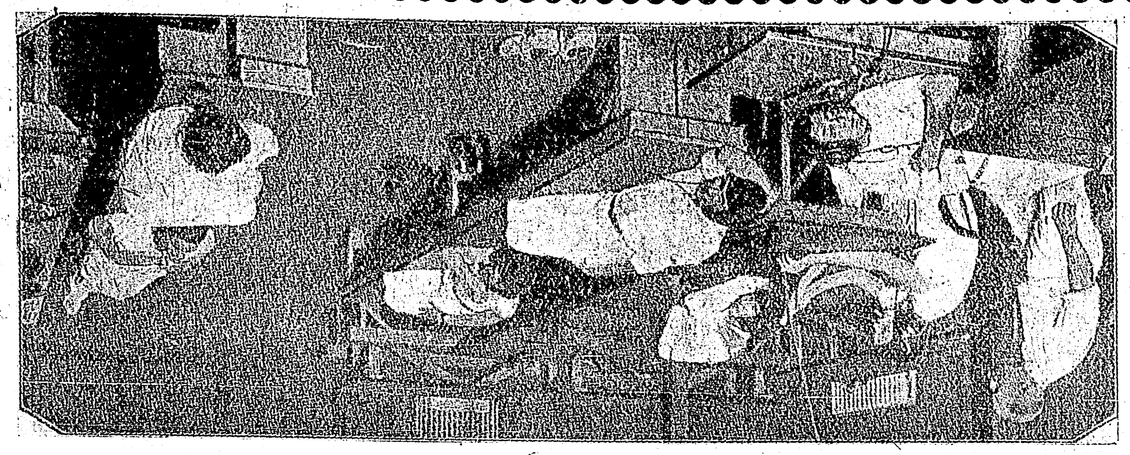

ঘুমের ঘোরে খেতার



সুড়ঙ্গ পথে বেতার

জগৎ থেকে টেলি-গ্রাফ্ টেলিফোঁ কেব্‌ল্‌গ্রাম প্রভৃতি তারের খবরাখবর উঠে যাবে।

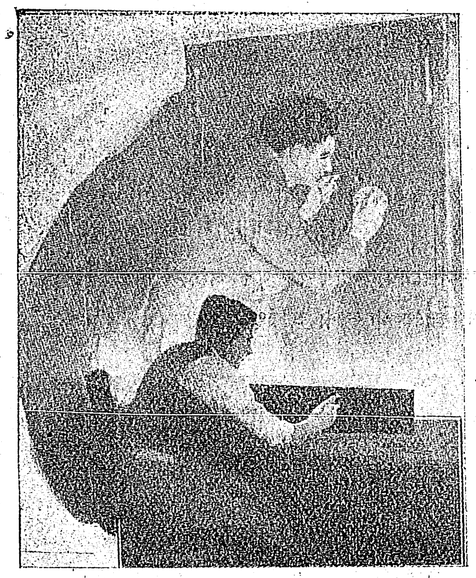

এপারে-ওপারে বেতার আলাপ

ধাতুর বার্দ্ধক্য

মানুষের শরীর যেমন অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জরাগ্রস্ত হ'য়ে ক্রমে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যায়,—ধাতু পদার্থও ঠিক তেমনি অধিক ব্যবহারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে এবং কালের প্রভাবে জরাজীর্ণ হ'য়ে হঠাৎ একদিন ভেঙে পড়ে'

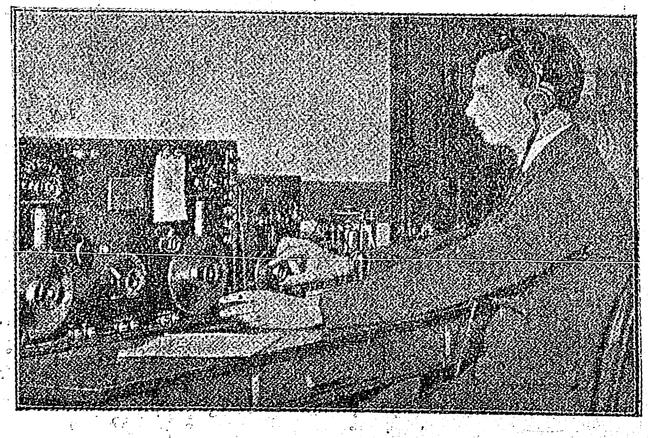

খনি-গর্ভে বেতার

একটা দুর্ঘটনা উপস্থিত করে। ধাতুকে এই অবসন্নতা ও জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য 'ইলিনয়েস্ বিশ্ব-



ধাতুর বার্দ্ধক্য—(প্রোঃ মূর ও প্রোঃ জ্যাস্পার এক খণ্ড জরাজীর্ণ ধাতুর বয়ঃক্রম পরীক্ষা ক'রছেন।)

বদ্যালয়ের অধ্যাপক মূর সাহেব এবং অধ্যাপক জ্যাস্পার এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছেন।

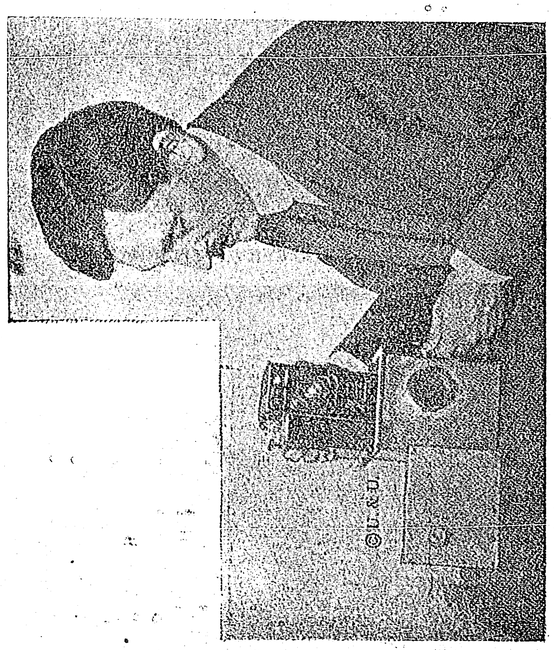

জলের ক্যামেরা

সমুদ্রগর্ভের সঠিক চিত্র পাওয়া এতদিন দুর্লভ ছিল। যেসব ছবি এ পর্য্যন্ত সমুদ্র গর্ভের চিত্র বলে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাশংই শিল্পীদের হাতে আঁকা। ওয়াশিংটনের জাতীয় যাদুঘরের অধ্যক্ষ ডাক্তার পল বার্ট্‌শ বহু দিনের চেষ্টায় এবার এমন একটি ছোট খাটো বারি-বারণ (Water proof) ক্যামেরা তৈরী করেছেন যে, সেই ক্যামেরার সাহায্যে সমুদ্র গর্ভের অবিকল প্রতিচ্ছবি জলের ভিতর থেকেই তুলে নেওয়া চল্‌বে।

বায়ুর গতিবেগ

কলেজ অফ্ ফ্রান্সের বৃদ্ধ অধ্যাপক আব্বে রূশেলো

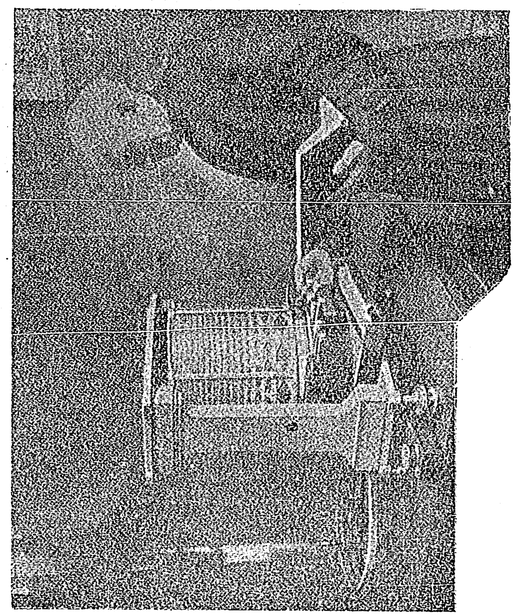

বায়ুর গতিবেগ নির্ণয় যন্ত্র—(যন্ত্র নির্ম্মাতা বৃদ্ধ আব্বে রূশেলোট যন্ত্রটি ব্যবহার করছেন)

জলের ক্যামেরা।

শব্দ' তরঙ্গের কম্পন থেকে বায়ুর গতিবেগ নির্দ্ধারণ করবার এক সহজ উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন। তিনি একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন। এই যন্ত্রটী বায়ুর গতিবেগের তারতম্য অনুসারে যখন যে ভাবে ঘোরে তখন সেই যন্ত্র থেকে ঠিক সেইভাবে শব্দ নির্গত হ'তে থাকে। সেই শব্দের কম্পনের পরিমাণ অনুযায়ী বায়ুর গতিবেগও অতি সহজেই ধ'রতে পারা যায়।

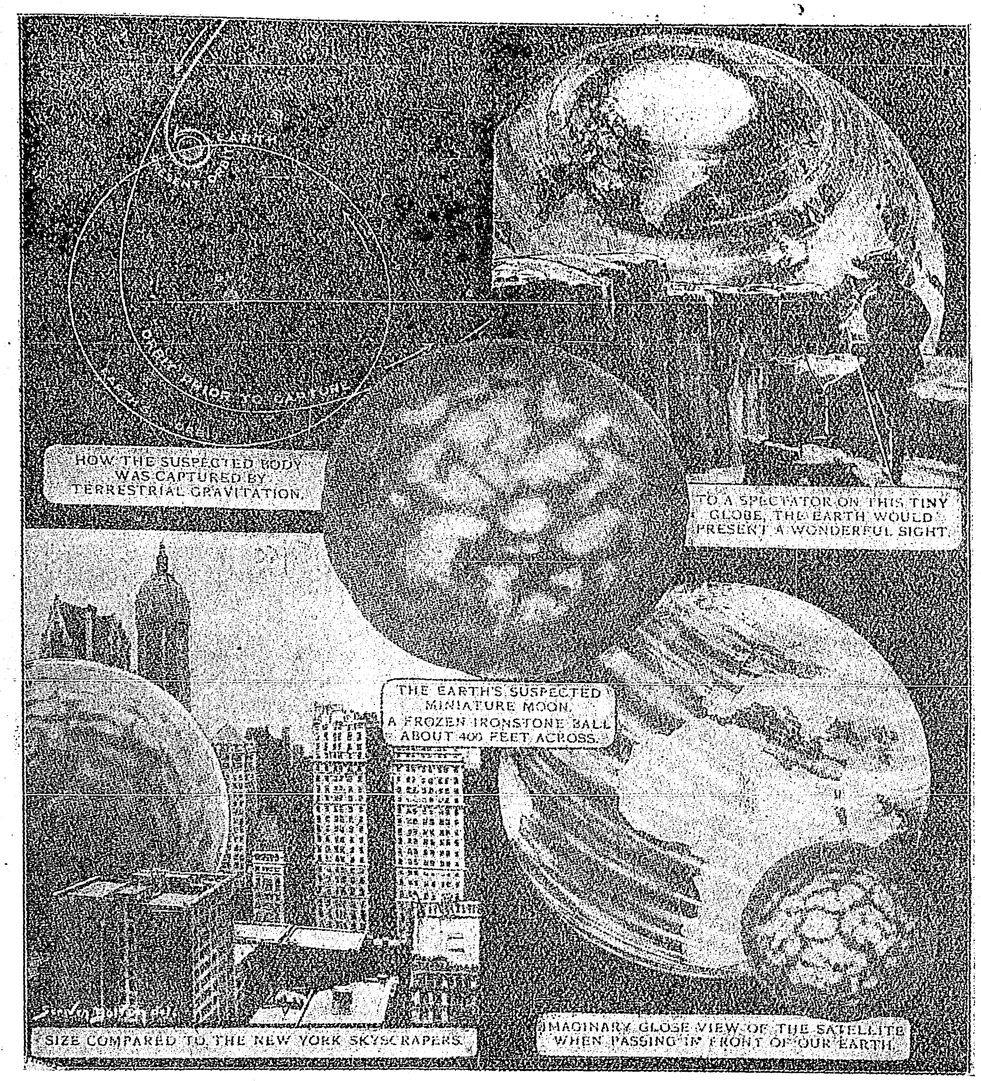

সূর্য্য, পৃথিবী ও নকল চাঁদ — নকল চাঁদ — নকল চাঁদের উপর হইতে পৃথিবী-দর্শন

নকল চাঁদ নিউইয়র্কের অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার তুলনায় ছোট — নকল চাঁদ ও পৃথিবী

নকল চাঁদ

জ্যোতির্ব্বিদেরা সম্প্রতি একটি কনিষ্ঠ চন্দ্রের অস্তিত্ব দেখ্‌তে পেয়েছেন। তবে এই চাঁদটির আর চন্দ্রত্ব কিছু নেই। এটি একেবারেই উত্তাপহীন এবং হিম-তুষারে সমস্তটাই একেবারে জমাট বেঁধে গেছে। এই নকল চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে তিন ঘণ্টায় একবার ক'রে প্রদক্ষিণ ক'রে আসছে। এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মাইল। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মোটে দুহাজার পাঁচশ মাইল এবং ব্যাসের মাপ চার পাঁচ-শ ফিটের বেশী নয়; সুতরাং দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একে ঠিক একটি কাল মটরের মতো দেখায়।

ফুলের ব্যথা

ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলে অথবা বাড়ীর পোষা কুকুরটাকে ছড়ির দ্বারা ঘা কতক দিলে কারুর বুঝতে বাকী থাকে না যে কৃষ্ণের জীব ওরা আঘাতে কষ্ট পায়! কিন্তু গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নেবার সময়, গাছের ডাল ভেঙে নেবার সময়, ফলের খোসা ছাড়াবার সময় কিংবা অঙ্গনের অপ্রয়োজনীয় আগাছা ও তৃণ গুল্ম ছিন্ন ক'রে ফেলবার সময়—এত দিন কারুর মনে হোতো না যে তাদের এ কাজ গুলোও একটা হৃদয়হীনের অত্যাচার—এবং পূর্ব্বোক্ত কাজের চেয়েও নিষ্ঠুর।—আজ বিজ্ঞান প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে আঘাতের

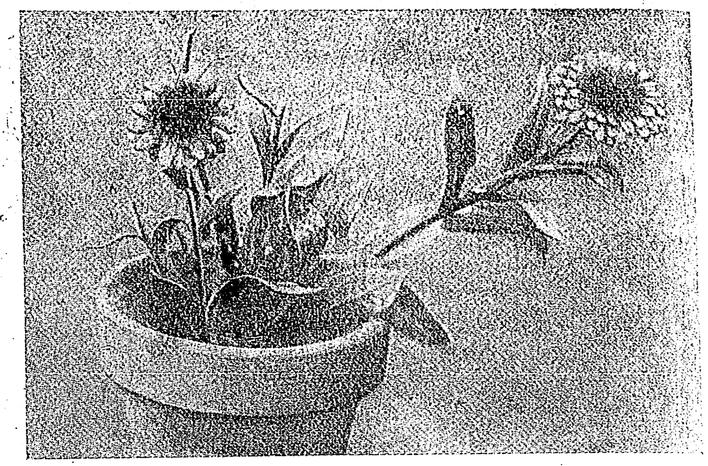

প্রভাতের প্রসারিত মারিগোল্ড। (গাঁদা জাতীয় ফুল)
(আলোককে বরণ করবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে তার সব দলগুলি মেলে দিয়েছে)

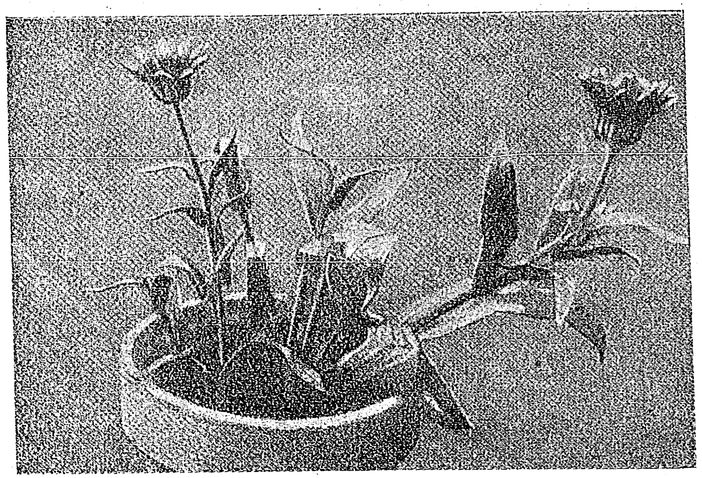

রাত্রের সঙ্কুচিত মারিগোল্ড
আলোর বিরহে কাতর হ'য়ে আপনাকে গোপন ক'রে রেখেছে)

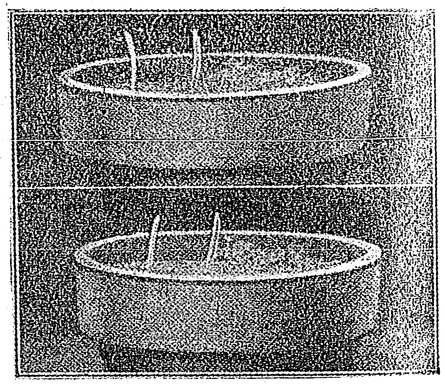

ছোলার অঙ্কুর (আলোক স্পর্শের পূর্ব্বের মুহ্যমান অবস্থা)

ছোলার অঙ্কুর—(বারো সেকেণ্ড মাত্র ডান পার্শ্ব থেকে আলো পেতেই ছোলার অঙ্কুরগুলি সেই দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে !)

বেদনায় মানুষের মতই তারাও ব্যথা পায়। তাই বৃক্ষ লতা ফল পুষ্পের প্রতি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বিস্মিত য়ুরোপও আজ নূতন দৃষ্টি নিয়ে সহৃদয়ের মতো চেয়ে দেখ্‌ছে। তাদের এই স্নেহের দৃষ্টিতে উদ্ভিদ জগতের বহু অজানিত রহস্য আজ প্রকাশ হয়ে প'ড়েছে। অরুণকে দেখে শুধু কমলিনী নয় আরও যে অনেক কুসুম কুমারী খুসি হয়ে তাদের পাপড়ীর আড়াল ঠেলে বেরিয়ে আসে সে সন্ধানটা আজ অকবিরাও জান্‌তে পেরেছে!

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

৭১। কেকয় রাজ্য

দশরথ-মহিষী কৈকেয়ী কেকয় দেশের রাজকুমারী ছিলেন। সেই কেকয় রাজ্য কোথায় ছিল? এবং তাহার বর্ত্তমান নাম কি।

শ্রীসরযূ রায়

৭২। ধবল রোগ

"ধবল রোগে (Leucoderma) বিশেষতঃ কলিকাতার অনেকেই আক্রান্ত হইতেছেন। ইহার নিদানতত্ত্ব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া শুনি। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা রোগ হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়া দিন।

শ্রীদামিনী চক্রবর্ত্তী

৭৩। ভুয়ো কাঁঠাল

প্রবাদ আছে যে, বীজ হইতে কাঁঠাল গাছ হইলে সেই গাছের ফল ভুয়ো হয়। ইহা সত্য কি না? এবং সত্য হইলে কারণ কি?

শ্রীব্রজেন্দ্র নারায়ণ নন্দী

৭৪। লক্ষ্মীপূজা

কেহ কেহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিত্য সেবা করেন; আবার কেহ কেহ ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ ও চৈত্র এই চারি মাসে চারিবার পূজা করেন। কোন ব্যবস্থাটি শাস্ত্রসম্মত এবং কোন্ পুস্তকে লক্ষ্মীপূজায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে?

শ্রীউমাকান্ত পাল

৭৫। সংস্কৃত ও প্রাকৃত

১। সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষা উৎপন্ন? না প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত উৎপন্ন? গবেষণা-মূলক উত্তর আবশ্যক।

শ্রীসত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

৭৬। তালের মিছরি

তালের মিছরি কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে রস হইতে চিনি, (পরে মিছরি) বা একেবারেই মিছরি প্রস্তুত হয় কি না। ইহাতে কি কি যন্ত্রাদি লাগে। কি করিয়া চৌকা মিছরি প্রস্তুত করে। (Square Size) কি কি দ্রব্য দিলে তালের রসের চিনি বা মিছরি সাদা হয়। তালের রসের তাড়ির মত যে উগ্র গন্ধ বাহির হয়, তাহা কি উপায়ে নষ্ট করা যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত যে রস হয়, সেই রস প্রায়ই গাঁজিয়া যায়; সেই গাঁজা রসে মিছরি প্রস্তুত করিতে পারা যায় কি না। কি উপায়ে গাঁজা রসের গাঁজাত্ব নষ্ট করা যায়। একটা গাছে (সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত) দুইবার রস লওয়া যাইতে পারে কি না। তালের গাছকে জিরেন দেওয়া উচিত কি না। যদি দেওয়া হয়, তবে কতদিন অন্তর। কয়লা বা কাঠ কোন জিনিষের দ্বারা জ্বাল দিলে মিছরি ভাল হয়। আসল তালের মিছরি কোন স্থানে পাওয়া যায়। শ্রীসুবোধ কুমার ঘোষ

৭৭। অবগুণ্ঠন

হিন্দুদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রথার প্রচলন হয় কোন সময় হইতে?

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ চন্দ ও আর, কে দাস, বার-এ্যাট্-ল।

৭৮। চশমার ব্যবহার

১। আজকাল স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের অনেককেই চশ্‌মা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এত অল্প বয়সে চোখের দোষ হওয়ার কারণ কি?

শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার

৭৯। গঙ্গাবংশ

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তরে (৪র্থ সংস্করণ ২৮ পৃঃ) লেখা আছে যে,—"১১৩১ খৃঃ অঃ উড়িষ্যাতে গঙ্গবংশীয় গিয়ের রাজ্যারম্ভ হয়। ইহারা গঙ্গাবাড়ী অর্থাৎ তমলুক ও মেদিনীপুর হইতে গিয়া উড়িষ্যা জয় করেন। গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়।" এই গঙ্গবংশীয় রাজার বংশধরেরা বঙ্গে কি জাতি বলিয়া পরিচিত? মেদিনীপুর ও তমলুক অঞ্চলে ইঁহার বংশধরেরা আছেন কি না? শ্রীহৃষীকেশ জানা

৮০। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

ভারতে Engineering শিক্ষার কলেজ কয়টী আছে? উহাতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কি পাশ হইলে ভর্ত্তি হইতে পারা যায়? কত ছাত্র লওয়া হয়? এবং বয়সের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে কি? এবং কয় বৎসরের course?

শ্রীহৃষীকেশ জানা

উত্তর

মল্লভূমি ও মল্লরাজ

'রয়ণী' 'রোহিণী'র রূপান্তর। রোহিণী গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপিবল্লভপুর থানায় ২২°১৮'৫০" অক্ষাংশ ও ৮৭°১৭'৩৪" দ্রাঘিমাংশে সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। 'রসিক মঙ্গলে' আছে—

উড়িষ্যাতে আছয় সে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রুহিণী নগর অনুপম॥
কটক সমান গ্রামে সর্ব্বলোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্য স্থানে॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে॥
রুহিণী নিকটে বারাজীত মহাস্থান।
যাতে সীতা-রাম-লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম॥

(পূর্ব্ব বিভাগ, ৪র্থ লহরী)

সুবর্ণরেখার পূর্ব্ব ও পশ্চিম কূলে যথাক্রমে রোহিণী ও বারাজিত গ্রাম পরস্পর সম্মুখীন ভাবে এখনও বর্ত্তমান। এই মল্লভূমি বনবিষ্ণুপুর বা বাঁকুড়ার সংস্রব পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। ইহা সম্ভবতঃ ঝাড় গ্রামের মল্লরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া এক সময় 'মল্লভূমি' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত কেবলমাত্র বনবিষ্ণুপুরের নৃপতিগণই মল্ল উপাধিধারী—প্রশ্নকর্ত্তার এই উক্তি প্রকৃত নহে; কারণ মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামের রাজগণও 'মল্ল' উপাধিধারী ছিলেন এবং এখনও আছেন। গোপিবল্লভপুর থানার অব্যবহিত উত্তরেই ঝাড়গ্রাম পরগণা ও থানা অবস্থিত। ঝাড়গ্রাম এষ্টেটের কতকাংশ এখনও গোপিবল্লভপুর থানায় বর্ত্তমান। রোহিণী গ্রাম রোহিণী মৌভাণ্ডার পরগণার অন্তর্গত,—এই পরগণা ময়ূরভঞ্জের রাজা গবর্ণমেণ্টের অধীনে জমিদার রূপে দখল করিয়া থাকেন। ইহার পার্শ্বেই গোপিবল্লভপুর থানায় 'চিয়াড়া' পরগণা ঝাড়গ্রাম এষ্টেট্ ভুক্ত। চিয়াড়ায় অব্যবহিত পশ্চিমে বেলাবেড়্যার 'প্রহরাজ'-দিগের জমিদারী। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, এই রাজ্যের সংস্থাপক প্রভাতরুদ্রদেবের সভাসদ নিমাইচাঁদ কালাপাহাড়ের ভয়ে ভীত হইয়া স্বপ্নাদিষ্টভাবে মল্লভূমের রাজা সংসার মল্লের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক দিন সংসার মল্ল তাঁহাকে এক সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান করিয়া আতপ নিবারণার্থ একটী ছত্র উপহার প্রদান করেন। নিমাইচাঁদ কোথায় ছত্র রাখিবেন জিজ্ঞাসা করিলে সংসার মল্ল আদেশ দিলেন—একপ্রহরের মধ্যে তিনি অশ্বারোহণে যতটা স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন—সেই পরিমাণ স্থান তাঁহার ছত্রের অধিকার ভুক্ত হইবে,—অর্থাৎ তিনি সেই স্থানের রাজা হইবেন। নিমাইচাঁদ এক প্রহর মধ্যে পাথ্রা গ্রাম হইতে জাহারপুর পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে গমন করায় উক্ত স্থান তাঁহার অধিকার ভুক্ত হয় (Midnapur Dist. Gazetteer, pp. 67-68)। এই মল্লভূমি-রাজ সংসার-মল্ল যদি বনবিষ্ণুপুরের রাজা হন—তাহা হইলে বনবিষ্ণুপুরের রাজত্ব দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গল মহালে পরিব্যাপ্ত ছিল মনে করিতে হয়। কিন্তু নিকটেই ঝাড়গ্রামের প্রাচীন মল্লবংশীয় ভূপতিগণের রাজ্য দেখিয়া সে সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। ঝাড়গ্রাম রাজের বংশপত্রী প্রাপ্ত হইলে, সংসারমল্ল উহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কি না, জানা যাইত। তবে বেলাবেড়্যা ও রোহিণী যে এক সময় ঝাড়গ্রামের মল্লরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা স্থানগুলির অবস্থান দেখিয়া সহজে ধারণা হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা রঘুনাথ মল্লের লোকান্তে ১৯১৭ সালে এষ্টেট্ কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী রাজা যদুনারায়ণ মল্ল ছিলেন। ঝাড়গ্রাম রাজ্যকেও মল্লভূমি নামে কথিত হইতে দেখা যায়। কাঁথি হইতে প্রকাশিত 'কান্তি' নামক মাসিক পত্রে ঝাড়গ্রামের রাজা রঘুনাথ মল্লের বিপুল শারীরিক বলের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লেখক ঝাড়গ্রামকে 'মল্লভূমি' বলিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলায় বিন্পুর থানায় মল্লভূম নামে পরগণা বর্ত্তমান আছে; ইহার বর্ত্তমান নাম ঘাটশীলা। রেণেলের মানচিত্রে (Sheet VII) ঘাটশীলা আছে। এই ঘাটশীলা গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট রোহিণীর রাজপুত্র বৈষ্ণবপ্রধান রসিকানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ("ঘাটশীলা গ্রামে রসিক থাকে কৌতুকে অহর্নিশি শ্যামানন্দে দেখিয়া ধ্যানেতে॥" র, ম, পৃ, বি, ১৬শ লহরী)। ঘাটশীলা বাঁকুড়ার সমীপবর্ত্তী বলিয়া ইহার 'মল্লভূম' নাম বনবিষ্ণুপুর রাজসংস্রবের স্মারক হইতে পারে; কিন্তু ইহা রোহিণী হইতে সুদূরবর্ত্তী।

বনবিষ্ণুপুরের মেদিনী মল্ল কর্ত্তৃক মেদিনীপুর সংস্থাপিত এই প্রবাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে খণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহার মতে 'মেদিনীকোষ' রচয়িতা, মেদিনীকর কর্ত্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত। তবে মেদিনীপুরের বগ্ড়ী, গড়বেতা প্রভৃতি স্থানে এককালে বনবিষ্ণুপুরের রাজগণ মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বগ্ড়ী এক সময়ে বিষ্ণুপুর রাজের সামন্ত দ্বারা শাসিত হইত (Midnapore Dt. Gazetteer, p. 164)। রোহিণী, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি ১৭৬৭-১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রেনেলের মানচিত্রে রোহিণী পর্য্যন্ত জঙ্গলভূমি চিহ্নিত আছে। টোডল্মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত জলেশ্বর সরকারভুক্ত "দাওয়ার শরভুম" মহালের অন্তর্গত ছিল। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বলেন,—'শরভুম'—'শবর ভূমে'র নামবিকৃতি। মেদিনীপুরের পশ্চিমে দক্ষিণদিকে সুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংসাবতী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগই 'শবর ভূম' ছিল (I. S. B-, New series, vol. XII, 1916, no 1. p. 51)। বীরহাম্বিরের সামন্ত-রাজের অধিকৃত হইলে ইহা টোডল্মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হইত না। কারণ বনবিষ্ণুপুরের অধীশ্বর তখনও স্বতন্ত্র ছিলেন,—এবং জঙ্গলে দস্যুদলপতিত্ব করিতেছিলেন। ঐতিহাসিক-বরেণ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্যারিস্ হইতে সংগৃহীত 'বহারিস্তান' নামক ফার্সী হস্তলিপি হইতে জানা যায়—১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গের সুবাদার ইস্লাম্ খাঁ কর্ত্তৃক প্রেরিত শেখ্ কমালের নিকট বীরহাম্বির মুঘল-বশ্যতা স্বীকার করেন (বহারিস্তান হস্তলিপি ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)। সম্ভবতঃ সে সময় বীরহাম্বির মুঘলরাজ্যে উৎপাত

করিতেছিলেন। মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত পথ বিদ্রোহী আফঘান ও জঙ্গলভূমির জমিদারবর্গের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল—(Sarkar's Studies in Mughal India—Orissa in the Seventeenth Century pp. 201-208)। হিজলীর জমিদার ইথ্তিয়ার খাঁকে উড়িষ্যার মুঘল সুবাদার বাকর খাঁ যে সনন্দ প্রদান করেন (১৬২৮), তাহার অন্যতম সর্ত্ত ছিল—মেদিনীপুর হইতে ভদ্রক পর্য্যন্ত সুবাদারের যাতায়াত কালে তিনি পথ রক্ষা করিবেন (হিজলীতে প্রাপ্ত লেখকের নিকট রক্ষিত ফার্সী হস্তলিপি)। কিন্তু এত উপদ্রবের পূর্ব্বে বীরহাম্বির (রাজত্বকাল ১৫৩৬-১৬২১) মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রসিকানন্দ রোহিণীর রাজা অচ্যুতের পুত্র। অচ্যুতকে মল্লভূমির রাজাও বলিত—যথা—"মল্লভূম অধিপতি অচ্যুতনন্দন' (র. ম., পৃ. বি., ১০শ লহরী)। সুতরাং এই মল্লভূমি বনবিষ্ণুপুর না হইয়া রোহিণী ঝাড়গ্রাম প্রভৃতিকেই বুঝাইতেছে। কারণ, অচ্যুত কস্মিন্কালে বনবিষ্ণুপুরের অধীশ্বর ছিলেন না, ইহা বলা বাহুল্য। 'ভক্তিরত্নাকরের' "মল্লভূমি মধ্যেতে রয়ণী নামে গ্রাম",—এই মল্লভূমি বনবিষ্ণুপুরবাচক নহে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

প্রশ্নকর্ত্তা কল্পিত রসিক ও মুরারি দুই ভাই নহেন। 'মুরারি' রসিকানন্দেরই 'ডাক' নাম। যথা—

"অচ্যুত জুড়িয়া কর, বলে শুন দ্বিজবর
এক মুই করি নিবেদন॥
শ্রীরসিক মুল নাম, জ্ঞাত-কোষ্ঠি পরমাণ
উদিত হইবে সে ভুবনে।
মোর মনে অভিলাষ, পুরাও আমার আশ
মুরারি বলয়ে সর্ব্বজন॥
* * * * *
রসিক মুরারি নাম হইল সে পরমাণ
বিধাতা লিখিত শুভক্ষণে"

(র. ম., পৃ. বি., ৫ম লহরী)

অন্যত্র,—

"নির্জ্জনে রসিক গিয়া পড়িল চরণে।
আনন্দের ধারা বহে রসিক নয়নে॥
উঠিয়া করিব কোলে শ্যামানন্দ রায়।
এ পুরুষ কা'র সুত পুছিল সবায়॥
কি নাম এ বালকের করহ প্রকাশ।
দেখিতে মধুর মূর্ত্তি মুখে মন্দ হাস॥
মুরারি বলিয়া নাম কহে সর্ব্বজন।
মল্লভূমি অধিপতি অচ্যুত-নন্দন॥

(র. ম., পৃ. বি., ১৫শ লহরী)

"ভক্তিরত্নাকরের" ন্যায় নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে'ও রসিক ও মুরারি দুই ভ্রাতার উল্লেখ আছে। যথা—

"যবন উদ্ধারি শ্যামানন্দ রয়ণীতে গেলা।
তথা গিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিল॥
সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয় সেই গ্রাম।
তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম॥
রসিক মুরারি নামে তার পুত্রদ্বয়।
শ্যামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয়॥"

(প্রে. বি., ১৯শ বিলাস)

অন্যত্র 'শ্যামানন্দ শাখা' বর্ণন প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,—

"শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যার যশোগুণাসায় উৎকল দেশ ভরি॥
এই দুই বিপ্রের বণিতা দুই জনে।
শ্যামানন্দ শিষ্য কৈলা আনন্দিত মনে॥
রসিকানন্দের পত্নী মাধবী তার নাম।
মুরারির পত্নী শচীরাণী অভিধান॥
শ্যামানন্দের প্রিয়-পাত্র দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে রয়ণী আলয়॥"

(প্রে. বি. ২০শ বিলাস)

শ্রীখণ্ডের অধিবাসী নিত্যানন্দ দাস মহাশয় সুদূর উৎকলের শ্যামানন্দী শাখার বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন না। সত্যপরায়ণ গ্রন্থকার সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন—

শ্যামানন্দের বহুশাখা মুঞি নাহি জানি।
যে কিছু লিখি এ তাহা লোকমুখে শুনি॥"

(প্রে, বি, ২০শ বিলাস)

'রসিকমঙ্গলের' রচয়িতা কবি গোপিবল্লভ দাস মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী। রোহিণী হইতে ৪।৫ মাইলমাত্র ব্যবধানে নারায়ণগড় থানার ধারেন্দা গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। সুতরাং রসিকানন্দ সম্বন্ধে গোপিবল্লভ দাসের উক্তিই প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য। 'ভক্তিরত্নাকরের' রচয়িতা "গঙ্গাতীরবাসী" নরহরি চক্রবর্ত্তী অথবা 'প্রেমবিলাস'-প্রণেতা শ্রীখণ্ডবাসী নিত্যানন্দ দাস দূরবর্ত্তী স্থানে বাস নিবন্ধন লোকমুখে রসিকানন্দের বিষয় শ্রুত হইয়া লিখিয়াছেন। জনশ্রুতি অনেকস্থলে অপ্রকৃত বা অতিরঞ্জিত তথ্য সমাবেশে বিকৃত হয়;—এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। রসিকানন্দ করণ জাতীয় ছিলেন, ("শুদ্ধ শিষ্টকরণ কুলে তাঁর জনম বিদিত।" র, ম, পৃ, বি, ৩য় লহরী)। তদীয় বংশধরগণ এখনও শ্রীশ্রী৺গোপিবল্লভ রায়ের সেবায়েত রূপে গোপিবল্লভপুরে বাস করিয়া 'শ্যামানন্দী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিনায়কত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এখনও করণ-সমাজভুক্ত রহিয়াছেন। রসিকানন্দ হিজলীর রাজা বলভদ্রের দুহিতা ইছাই দেবীকে বিবাহ করেন;—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারে ইঁহার দীক্ষাগ্রহণের নাম শ্যামাদাসী হয়। কিন্তু 'প্রেমবিলাস'কারের উপরিধৃত বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে—রসিকানন্দ ব্রাহ্মণ জাতীয়,—তাঁহার পত্নীর নাম মাধবী;—কল্পিত মুরারি নামক রসিকানন্দ ভ্রাতারও শচীরাণী নাম্নী পত্নীর

কল্পনা 'প্রেমবিলাসে' দৃষ্ট হইবে। সুদূরবাসী গ্রন্থকারের নিকট জনশ্রুতি বিকৃত হইয়া যে ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি লেখায় নিবদ্ধ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রায় বাহাদুর দীনেশবাবু সম্ভবতঃ ভক্তিরত্নাকর ও 'প্রেমবিলাসের' অনুবর্ত্তনে লিখিয়াছেন, শ্যামানন্দের "শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩১৩ পৃঃ)। কিন্তু একটু পরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে 'রসিক-মুরারি' একই ব্যক্তি বলিয়া ধারণা হয় (ব ও সা, ৩২২ পৃঃ)। এ স্থলে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক যে, দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "প্রায় ৩৫০ বৎসর হইল, নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস রচনা করেন" (ব, ও সা, ৩১৭ পৃঃ),—কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। প্রেমবিলাসে রসিকানন্দ ও তৎশিষ্য-গণের প্রসঙ্গ আছে,—সুতরাং গ্রন্থকার রসিকানন্দের সমকালবর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। নিত্যানন্দ দাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুপত্নী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষিত হন বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং ইনি রসিকানন্দের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক হইবেন। এই হিসাবে প্রেমবিলাস রচনা তিনশত বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। 'রসিকমঙ্গল' রচয়িতা গোপিজনবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল' রচনা কাল দীনেশবাবু "শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে" বলেন (ব, ও সা, ৩২২ পৃঃ)। কিন্তু রসিকানন্দের তিরোভাবের (শকাব্দ ১৫৭৪) পর এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং 'রসিকমঙ্গল' শকাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রণীত হয়।

রসিকানন্দ হিজলীর 'মণ্ডল অধিকারী' বিভীষণ মহাপাত্রের ভ্রাতু-পুত্র সদাশিব মহাপাত্রের ভ্রাতা বলভদ্র মহাপাত্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলভদ্র লক্ষ টাকা বাকি রাজস্বের জন্য মেদিনীপুরে মুঘল রাজকর্ম্মচারীর নিকট বন্দী হন। সুবাদারের নিকট অচ্যুতের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ("অচ্যুতের বচন ভাঙ্গিতে নারে সুবা। কোটি কোটি দোষ ক্ষমে হইলে সে উভা॥ র, ম, পূ, বি, ১০ম লহরী)। অচ্যুত বলভদ্রের টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করায় মুঘল রাজকর্ম্মচারী বলভদ্রকে মুক্তি প্রদান করেন। এই প্রতিপত্তিভাব দ্বারা প্রতীত হয়—রোহিণীর রাজা মুঘলদিগেরই করদ ছিলেন। 'রসিকমঙ্গল' পাঠে জানা যায়—তখন রসিকানন্দের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর; সুতরাং তাঁহার বিবাহ ইহার অনেক পূর্ব্বে হইয়াছিল। অতএব বেশ সিদ্ধান্ত করা যায়—মুঘলের নিকট বলভদ্রের টাকার দায়িত্ব গ্রহণকারী অচ্যুত কখনই তৎকালীন স্বাধীন বা মুঘল বিরোধী বীর হাম্বিরের সামন্ত ছিলেন না।

রসিকানন্দ ব্যতীত অচ্যুতের আরও কতকগুলি পুত্র ছিলেন। যথা—'হেনরূপে আছেন সে অচ্যুত তনয়। দুই চারি পত্নী তাঁর অনেক তনয়" (র, ম, পূ, বি, ৩য় লহরী)। রসিকানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে আজীবন ব্যয়িত করিয়াছিলেন, রাজত্ব গ্রহণ করেন নাই। রোহিণী গ্রামে অবস্থানকালে জাতি নির্ব্বিশেষে তিনি সমস্ত অভ্যাগত ব্যক্তির ভোজনাবশেষ সস্ত্রীক স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন বলিয়া ভ্রাতা ও আত্মীয়গণ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় তিনি নয়নাবসানের সন্নিকটে কাশীপুরে গমন করেন। কাশীপুর রসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ দাসের স্থাপিত। ময়ূরভঞ্জের রাজা কাশীপুর হইতে তাঁহাদের গৃহ-দেবতায় বিগ্রহ মূর্ত্তি বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিলেন; রসিকানন্দ সেই গৃহদেবতাকে ময়ূরভঞ্জ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক গোপিবল্লভ রায় নামে কাশীপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই অবধি কাশীপুরের নামও 'গোপি-বল্লভপুর' হয়। 'রসিকমঙ্গলের' অন্য স্থলে রসিকানন্দের অজ্ঞতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ পট্টনায়কের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের প্রসঙ্গ আছে। রসিকানন্দের অন্য কোনও ভ্রাতার নাম পাওয়া যায় না। রসিকানন্দের চেষ্টায় উৎকলের অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ময়ূরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথভঞ্জ, নৃসিংহপুরের ভুঞ্যা উদত্ত রায়, পটাশপুরের রাজা গজপতি, পাঁচটের রাজা হরিনারায়ণ, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু, বীরেন্দ্রার রাজা ভীমশ্রীকর প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ব্যক্তি রসিকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আহম্মদ্ বেগ (নবাব ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) ইঁহার মাহাত্ম্য বশীভূত হইয়াছিলেন বলিয়া 'রসিকমঙ্গলে' উক্ত আছে। রসিকানন্দের প্রভাবে উত্তর উড়িষ্যায় যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল—আজিও তাহার রস আস্বাদন করিয়া এ দেশবাসী ধন্য হইতেছে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ করণ।

শিবলিঙ্গ

৫৭ প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রশ্ন—"শিবের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শিবলিঙ্গ পূজা করিবার পদ্ধতি কেন হইল।"

স্কন্দপুরাণান্তর্গত মহেশ্বর খণ্ডে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন, ভিষক-রত্ন।

কোন সময়ে কতকগুলি ঋষি একত্র হইয়া ভৃগু মুনিকে শিবের নিকট কোন বিশেষ বিষয় জানিবার জন্য পাঠান। ভৃগুমুনি তদনুসারে কৈলাসে যেখানে শিবঠাকুর ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন প্রার্থী হইলে, নন্দী তাঁহাকে সেইখানেই অবস্থিত থাকিতে বলেন, কারণ শিব তখন গৌরীর সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে ভৃগু দীর্ঘকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া অধৈর্য্য হইয়া এইরূপ শাপ প্রদান করেন যে তোমরা যোনি এবং লিঙ্গরূপে অবস্থিত থাকিবে।

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৭৮ অধ্যায়। শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৺আত্মারাম সরকার

গত ২২।১।২৪ তারিখে জেলা হাওড়া নারীট নিবাসী শ্রীযুত গয়া-গোবিন্দ রায় মহাশয় "ভারতবর্ষে" ভোজবিদ্যাবিশারদ আত্মারাম সরকার মহাশয়ের বাস-স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা উক্ত রায় মহাশয়ের জ্ঞান ও প্রমাণ মতে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে। উক্ত ভোজবিদ্যাবিশারদ মহাশয়ের বাসস্থান আমার পৌষ মাসের (ভারতবর্ষে) সম্পাদকের বৈঠকে লিখিত হাওড়া জেলার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামেই হইবে, তাহার প্রমাণগুলি

ভারতবর্ষ

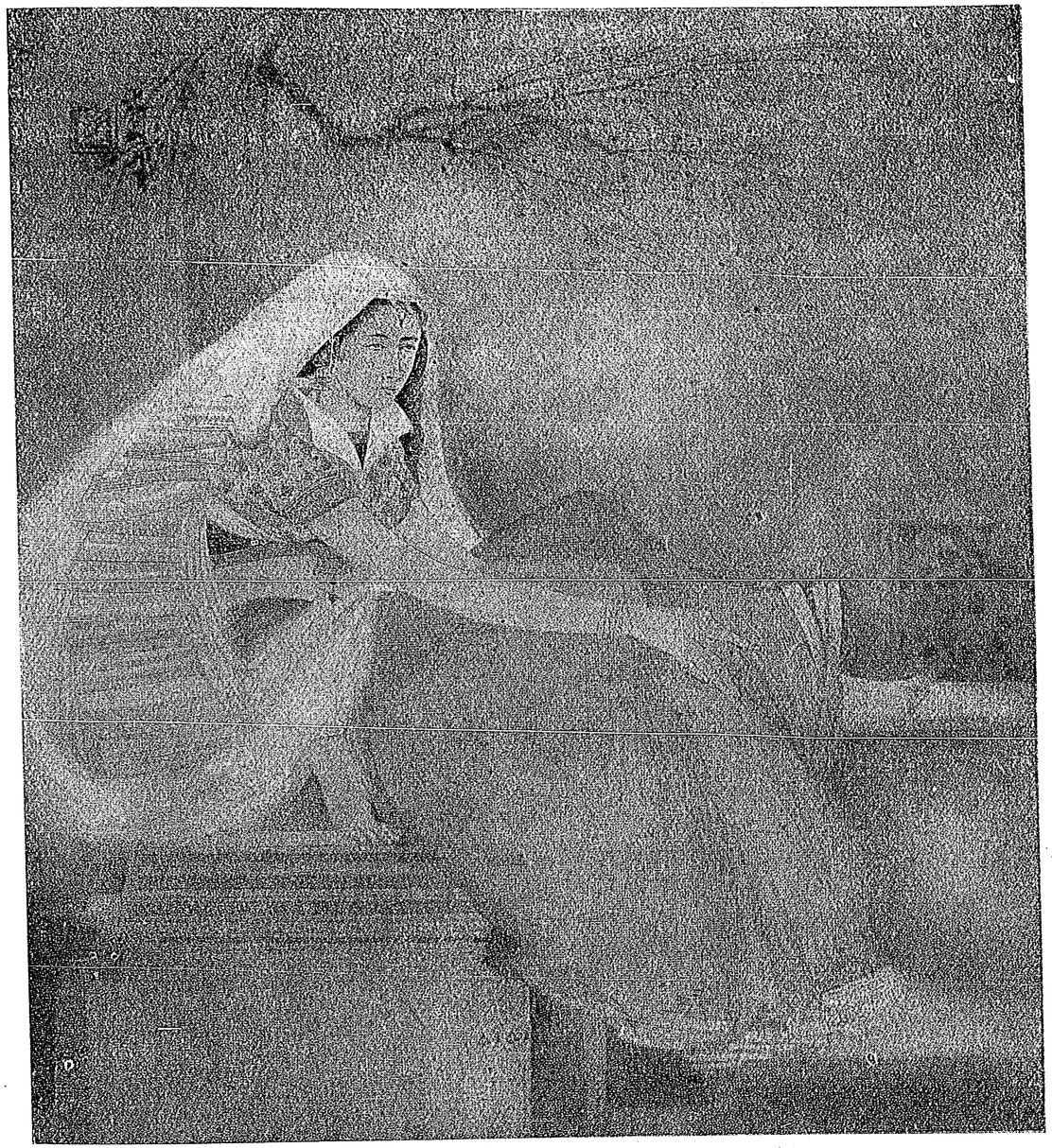

বসন্তের আগমন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইল। উনি ৺মাধব রাম সরকার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র; তাঁহার পুত্রের নাম পরে লিখিব। তাঁহার পৌত্রের নাম ৺তারক নাথ সরকার। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সন ১২০০ সালে যে ৩৩২৯২ ও ৩২২০৫ নং ২খানি তায়দাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রায় ১২১ বৎসর যাবৎ তাঁহার কমলাপুর গ্রামেই বাস। আরও প্রমাণ আছে, গ্রামস্থ বহু প্রাচীন লোক শুনিয়াছেন যে, কোন সময়ে ঐ গ্রামে বারাশত নামক একটী যায়গায় উক্ত সরকার মহাশয়ের মজুরেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছিল, ইনি চালুনী করিয়া মজুরদিগের পানীয় জল পাঠাইয়াছিলেন। ঠিক তাহার ২।৩ দিন পূর্ব্বে কতকগুলি যাদুকর ঐ মাঠের নিকট আসিয়া তাঁবু ফেলিয়া অস্থায়ী ভাবে বাস করিয়াছিল। তাহারা ঐরূপে চালুনীতে জল থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়। যাদুকরেরা বুঝিতে পারে যে, অন্য কোন যাদুকর এখানে আছে। তাহারা কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্র দ্বারা তাহাদের নিজ বল সরকার মহাশয়ের উপর প্রয়োগ করে; এবং তদ্দণ্ডেই সরকার মহাশয় তাহা মন্ত্র দ্বারা জানিতে পারেন এবং যাদুকরদের উপর নিজ যাদুবিদ্যা বল প্রয়োগ করায় সকলে চৈতন্যশূন্য হয়। কতক্ষণ পরে তিনি তাহাদের আরোগ্য করেন এবং তাহাদের জ্ঞান হইলে সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে; অবশেষে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করে। তাহারা আরও বলে যে, তাঁহার নাম আত্মারাম সরকার জানিলে তাহারা এরূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিত না।

আরও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এক দিন কোন মেছুনী কই মৎস্য বিক্রয় করিতে আসে। তাহার নিকট হইতে আত্মারাম কিছু কই মৎস্য ক্রয় করেন এবং মৎস্যের মূল্য বাকী থাকে। তিনি সেই দিন মৎস্যের ঝোল দিয়া অন্ন আহার করেন। কয়েক দিন পরে মেছুনীটী মৎস্যের মূল্য তাগাদা করে। তিনি তাহাকে মৎস্যগুলি ফিরাইয়া দিতে বলেন, মেছুনী তাহা লইতে অস্বীকার করে। কয়েক মিনিট পরেই তিনি মুখ হইতে সমস্ত কই মৎস্যগুলি জীবিতাবস্থায় বাহির করেন এবং ফেরত লইতে পুনরায় মেছুনীটীকে অনুরোধ করেন। ইহা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হন ইত্যাদি। সরকার মহাশয়ের বাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচদশ্মা গ্রামে ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই এবং তিনি অপুত্রকও ছিলেন না। আমাদের বাসস্থান যে বহু পূর্ব্বে চন্দন নগরের নিকট ছিল, আমাদের বাটীর ৺ব্রজবল্লভ সরকার মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র বসু বিশ্বস্ত সূত্রে তাহা অবগত হইয়াছেন। ইতি— শ্রীজীবন কৃষ্ণ সরকার

চন্দ্রের কলঙ্ক

পৌষের ভারতবর্ষে সম্পাদকের বৈঠকে শ্রীমতী মৃণালিনী চৌধুরাণী চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার উত্তর :—

চন্দ্রে যখন সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আইসে, তখন চন্দ্র যে দর্পণতুল্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মহাভারতে মনুর উক্তি এ-পক্ষে খাঁটি সত্য। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে যে কলঙ্ক-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই জগতের প্রতিবিম্ব নহে। এই খানে মনুর উক্তির সহিত বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিকগণের উক্তির ঠিক মিল নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে যে আদৌ কোন সত্য নাই এ কথা একেবারে বলা চলে না। আমাদের পুরাণাদি বর্ণিত অনেক বিষয় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারায় আলোচনা ও গবেষণার ফলে সত্য বলিয়া জানা যাইতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে জগতের প্রতিবিম্বও সেই প্রকার। ফলতঃ ধরণী-পৃষ্ঠের সহিত চন্দ্রের উপরিভাগের যে সৌসাদৃশ্য আছে—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যেমন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, আগ্নেয় গিরির গহ্বর, মালভূমি, নিম্নভূমি, সাগর, কান্তার, নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতিতে সমাচ্ছন্ন, চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশও যে তেমনই,—ইহা আর্য্য ঋষিগণ নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন; এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না হইলেও তাঁহারা নানাভাবে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্নকর্ত্রী মহাভারতের যে অংশ হইতে বিষয়টী উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই অংশে আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহার দুই অধ্যায় পূর্ব্বে অর্থাৎ একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের আরম্ভ। মহর্ষি-দেবগণাগ্রগণ্য মহাত্মা বৃহস্পতি প্রজাপতি মনুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "জগতের কারণ কি? কোন বিষয় বেদবাক্য দ্বারাও অপ্রকাশিত রহিয়াছে? কোন মহাত্মা হইতে পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, বায়ু, আকাশ, জল, জলচর, স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? * * আমি ঋক, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, নক্ষত্রগতি, নিরুক্ত ও সকল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু "আকাশাদি মহাভূতের কারণ কি?" তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই।" বৃহস্পতির জিজ্ঞাসার উত্তরে আদি মানব মনু যে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের এবং মোক্ষ তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা দেবগুরু বৃহস্পতির সম্যক বোধগম্য হইয়াছিল কি না মহাভারতে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু মনুর বংশধরগণের নিকট উহা চিরকালই এক দুর্ব্বোধ, দুর্ব্বোধ কেন—অযোধ্য, প্রহেলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছিল। অনন্তকাল ধরিয়া আত্মা সম্বন্ধে কত গবেষণা হইয়াছে, বেদান্ত, ব্রাহ্মণ আরণ্যকোপনিষদের ভাষ্যের উপর ভাষ্য টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়া অগণিত গ্রন্থরাশির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আত্মা সাধারণ পাঠকগণের নিকট যে দুর্ব্বোধ্য সেই দুর্ব্বোধ্যই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে আশ্চর্য্যরূপে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তাঁহাদের Nebula Theory এবং cosmogony (নীহারিকাবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব) মধ্য দিয়া। ১৩২৬ সালের হিন্দু পত্রিকায় "আত্মতত্ত্বে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক" প্রবন্ধে আমি এ সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ যাঁহারা উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন এবং জগতের নিয়মিত কার্য্যাবলির পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতিদেবী তাঁহার হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া অন্তর নিহিত গূঢ় রহস্যাবলি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মা বা ব্রহ্ম তখন প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয় না।

মনু কথিত চন্দ্রে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব কিরূপ এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। শুক্ল পক্ষের প্রথম ভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয়া হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত চন্দ্র মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রের কলা অর্থাৎ সূর্য্যালোকে আলোকিত উজ্জ্বল অংশ ব্যতীত চন্দ্রের অপর অংশও অনুজ্জ্বল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমগ্র গোলাকার চন্দ্রমণ্ডলই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কতকাংশ উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মান এবং কতকাংশ অনুজ্জ্বল ও তমসাচ্ছন্ন থাকে। চন্দ্র নিজে জ্যোতিষ্মান নহে, উহার উপর সূর্য্যালোক পতিত হওয়ায় উজ্জ্বল দেখায়। তাহা হইলে চন্দ্রের যে অংশে সূর্য্যালোক পতিত হয়, মাত্র সেই অংশই দেখিতে পাইবার কথা, অপর অংশ অর্থাৎ যে অংশে আলোক পতিত হয় নাই সেই অংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও অদৃশ্য থাকিবার কথা। কেন না জ্যোতিহীন অথবা বিগত-জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিসাধ্য নহে। কিন্তু চন্দ্রের যে অংশে সূর্য্যালোক পতিত হয় নাই, সেই অংশ তমসাচ্ছন্ন হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় কেন? নিশ্চয়ই ঐ অংশে কোনও না কোনও মৃদু আলোক পতিত হইয়া থাকে। ঐ মৃদু আলোক কোথা হইতে আইসে? এই বিষয়ের কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন যে, যেমন চন্দ্রে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়, ঠিক তেমনই পৃথিবীতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রে গিয়া পতিত হয়। এবং জগতের নৈশ অন্ধকায় শুক্লপক্ষে যেমন চন্দ্রিকা-সম্পাতে আংশিক দূরীভূত হয়, চন্দ্র মণ্ডলের তিমিরময়ী কৃষ্ণারজনীও ঠিক তেমনই পার্থিব মৃদু আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই যে অংশে সূর্য্যালোক পতিত হয় নাই, চন্দ্রের সেই অংশও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং মহাভারতে কথিত আদি মানব মনুর উক্তি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের উক্তির সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিলেও যে সত্য, তাহাতে কোনও সংশয় আসিতে পারে না। এখানে কথা উঠিতে পারে যে চন্দ্রের ঐ অনুজ্জ্বল অংশ সপ্তমীর পরে আর দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, চন্দ্রের কলা বৃদ্ধির সহিত জ্যোতিঃও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রের ঐ উজ্জ্বল জ্যোতিতে নিকটস্থ আকাশমণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া থাকে। আকাশের ঐ উজ্জ্বলতার ফলে চন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত তমসাচ্ছন্ন অংশ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়টী অন্যপ্রকারেও বুঝিতে পারা যায়; যথা—চন্দ্রের জ্যোতিঃ যখন কম থাকে, অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া বা চতুর্থী তিথির রাত্রিতে আকাশে যত নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তমী বা অষ্টমী তিথির রাত্রিতে তত নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা ব্যতীত অপর ছোট ছোট তারাগুলি সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, চন্দ্রের জ্যোতিঃ বৃদ্ধির সহিত তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। তদ্রূপ ঐ পরিদৃশ্যমান তমসাচ্ছন্ন চন্দ্রাংশও নিষ্প্রভ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

চন্দ্রে যে কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই নিম্নভূমি ও আগ্নেয় পর্ব্বতের গুহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদগণ চন্দ্রের ঐ সকল নিম্নভূমি, পর্ব্বত, গুহা প্রভৃতির নামকরণ করিয়াছেন; ঐ সকল নামের অনেকগুলি পৃথিবীর পাহাড় পর্ব্বতের নামের সহিত সমান। আবার কতকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বতের গুহার নাম দিয়াছেন পূর্ব্বকালের জ্যোতিষী ও দার্শনিকগণের নামানুসারে; যেমন, The Apennines, The Alps, The Caucasus Mountains, The Great Alpine Valley, The Anaxagoras, The Copernicus, The Tycho, The Herschele, The Hypatia Craters ইত্যাদি। যে প্রধান এবং বৃহৎ কুজাকার কলঙ্ক-চিহ্নটীকে মৃগ বা শশ বলা হয় এবং যাহা হইতে চন্দ্রের নাম মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর প্রভৃতি হইয়াছে, সেই চিহ্নটীকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে, ঐ সকল নাম Sea of Fecundity, Sea of Tranquility, Sea of Serenity, Sea of Showers, Ocean of Tempests, Sea of Clouds, Gulf of fire, and Sea of Vapours। উহারা যথাক্রমে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া কুজ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল নিম্নভূমির মধ্যে মধ্যে Taruntius, Vitruvius, Aristillus Archimedes, Timocharis, Copernicus, Kepler, Bullialdus প্রভৃতি আগ্নেয়-গিরির গুহাগুলি বিদ্যমান আছে। ঐ সকল গুহার মধ্যে Copernicus, Kepler প্রভৃতি কতকগুলি গুহার মধ্যদেশে সূচ্যাগ্র-শীর্ষ গিরিশৃঙ্গ বিদ্যমান আছে। চন্দ্র-মণ্ডলের দক্ষিণ দিকে এক স্থান হইতে যে তরল ধাতুস্রাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, ঐটী সুপ্রসিদ্ধ Tycho নামক অগ্নি-গিরি-গুহা। এই গিরিগুহাটী এবং ধাতুস্রাবের চিহ্ন সুস্পষ্ট চক্ষে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। Aristillus, Copernicus ও Kepler নামক গুহাগুলি হইতেও ঐ প্রকার গলিত ধাতু স্রাবের চিহ্ন ছোট দূরবীণে এবং একটু ভাল Binocular যন্ত্রে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন পাঠক-পাঠিকা কৌতূহলপরবশ হইয়া দূরবীক্ষণে চন্দ্র-মণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদের নিকটে আসিলে আমরা সানন্দে এবং সযত্নে তাঁহাদিগকে ঐ সকল দেখাইব। কিছু দিন পূর্ব্বেও লোকের ধারণা ছিল যে, চন্দ্রে জল নাই। কিন্তু দুই বৎসর হইল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষের অধ্যাপক Willium Henry Pickering জ্যামেকার ম্যাণ্ডেভিলি নামক স্থানে স্থিত হার্ভার্ডের শাখা মানমন্দির হইতে সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যোগে চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া জলাভূমি ও বনভূমির চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র M. B, A. A.
বগচর বশোহর

মায়া-দর্পণ *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আহত পশু যেমন ছুটে চ'লে আসে নিজের আবাসে, তেমন ক'রে অরুণকুমার যখন কলিকাতার সহর ফেলে ফিরে এল তার সুদূর পল্লীর ঘরে, তখন তার সে তীব্র যন্ত্রণা অনতিবিলম্বেই পরিবর্ত্তিত হয়ে দেখা দিল একটা মধুর স্মৃতির মাদকতায় ভরা, কেমন মৃদুল অস্বোয়াস্তির আবেশ রূপে।

তখন শীতের কুয়াসার মধ্যে গ্রামখানি যেন ঘুমিয়ে ছিল। এই গ্রামেই তার শিশু-জীবন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, এইখানেই দুটি বৎসর আগে সে তার নবপরিণীতা বালিকা বধূকে নিয়ে এসেছিল। গত জ্যৈষ্ঠ মাসেও তারা দুজনে আবার এসেছিল—তেমনি সমান বুকভরা ভালবাসা, কত আশা ভরসা নিয়ে। এবার ফিরেছে সে একলাটি, গঙ্গার ঘাটে মৃতার ছাইটুকু রেখে! কিন্তু নাই-যে তার স্মৃতিচিহ্ন ত বাড়ীখানা একেবারে মুছে ফেলতে পারে নি। ঐ ত দেয়ালে তারই হাতের কত কাজ—ছবি, লেখা টাঙ্গান রয়েছে। আলমারীর কোণে তারই গায়ের সুরভিমাখা কয়েকটা পুরান জামা কাপড় এখনও পড়ে রয়েছে। টেবিলের উপর একখানা "কপালকুণ্ডলা" তারই নামের চিঠি একখানা বুকে করে রয়েছে। তারই হাতে টাঙ্গান একগাছা শুকনো ফুলের মালা জানালার উপরে এখনও ঝুলছে—সে জানালাটা কেউ এত দিন খোলে নি, পাছে মালা ছড়া ঝুর ঝুর করে পড়ে যায়।

অরুণকুমার একটু আশ্চর্য্যই হ'ল যে, পলাতকার এত সব জাগ্রত চিহ্ন তার প্রাণকে কিছুই তেমন ব্যথিত করে তুললো না। কই, সহরে যে ঘরে যূথীর শেষ, সেখানকার এমনই সব চিহ্ন ত তাকে যেন বিছুটির ঘায়ে যন্ত্রণা দিয়েছে। বরং যূথীর এখানে যা কিছু সবই—মরণের নয়, কেবল সুপ্তির ঘোরে স্তব্ধ। এখানকার যূথী মনে হয় যেন বেঁচেই আছে—দুদিনের জন্য কোথায় শুধু বেড়াতে গিয়েছে। তার হাতের ছোঁয়া জিনিসগুলি তার অবর্ত্তমানে তাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—ফিরে এলেই আবার সব জেগে উঠ্‌বে।

"ফিরে আসবে সে!"...প্রিয়জনের বিয়োগে দারুণ দুঃখে মানুষের হয় একটা সঙ্কটের অবস্থা, অরুণকুমারের তাই। স্ত্রীকে আবার দেখবার জন্যে—তা স্বপ্নে হোক, বিকারে হোক, এমন কি পাগলামীর ঘোরে হোক—একটি-বার দেখবার জন্যে, সে তার জীবনের বাকী অংশ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। ভাই প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সে যূথিকার চেহারা, তার পোষাক-পরিচ্ছদ, তার হাবভাব সব মানস-নয়নে ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করতো—ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তাকে পাওয়ার জন্যে।...কিন্তু, হায়! নির্ম্মম সুপ্তি সে ছবিখানি শুধু মুছেই দিত। অরুণকুমার অনেক রকম বিভীষিকাই দেখ্‌ত, সে যেন শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কালো কালো ছায়ামূর্ত্তি সব তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অথবা মৃত যত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা বিষণ্ণ বদনে তাকে ঘিরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে··কিন্তু যূথীর মুখখানি এ সকল দৃশ্যের মধ্যে এসে কোন দিন ধরা দিল না।

অরুণকুমার ভাবতে লাগলো, "তাকে কি কোন রকমেই দেখা যায় না? আধুনিক বিজ্ঞানে ত কত কি হয়—আফিমের উগ্র নির্য্যাস সে বের করেছে, এর একটুকু গুঁড়ার মধ্যে কতখানি সুখনিদ্রা বেঁধে রেখেছে—এ নিদ্রার মধ্যে তার মানুষী-মূর্ত্তি সে কি ফুটিয়ে তুলতে পারে না? আবার শুনি প্রেতাত্মাকে ডেকে আনা যায়, তার সাথে আলাপাদি করা যায়,—এও কি হয় না?

সমস্যাটি সে তার প্রতিবাসী গ্রামের ডাক্তারের কাছে নিবেদন করলে। ডাক্তার ছিলেন তার পিতার পরম বন্ধু। একমাত্র এই ডাক্তারটিকেই সে তার নিভৃত নিলয়ের শান্তিভঙ্গ করতে বাধা দিতে পারে নি। ডাক্তারটি বৃদ্ধ, ব্যবসা এখন ছেড়ে দিয়েছিলেন—অরুণকুমারের বাসার

* একটি ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

লাগালাগি তাঁর বাসা। বহুদিন তিনি বিপত্নীক, একমাত্র কন্যা মালিকাকে নিয়ে পৈতৃক ভিটায় পড়ে রয়েছেন। জন্মাবধি মালিকাকেও অরুণ দেখে এসেছে। মালিকা অরুণকে দাদা বলে ডাকে। মালিকা সুন্দরী, স্বল্পভাষিণী, গাম্ভীর্য্য-ময়ী—তার বিশাল আয়ত নয়নে উদ্ভাসিত কি একটা ঐশ্বর্য্য। বয়স তার ১৬ পার হয়ে চলেছে প্রায়—কিন্তু বিবাহের কোন প্রসঙ্গ ডাক্তার এ পর্য্যন্ত আমলে দিতে চান নাই। বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা পাঁচজনের পাঁচকথা দরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে অনেক সহজ ছিল। মেয়েটি ছাড়া ডাক্তারের ছিল আর একটি প্রিয় জিনিস—ডাক্তারী গবেষণা, যদিও নিষ্ফল গবেষণা—নিষ্ফল কারণ, ভালরকম জানাশুনার অভাবে তিনি অতি কষ্টে যে সব তথ্য আবিষ্কার করতেন, সে সব যে বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়ে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেছে, তা তিনি জানতেনও না।

অরুণকুমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় যে প্রশ্ন করলে, শুনে ডাক্তার বললেন, "ভাই, ও সব খামখেয়ালের পিছনে ছুটোছুটি করে কোন লাভ নাই। আমিও এক দিন ওরকম করেছিলাম, ঐ রকমই তীব্র একটা মোহ আমাকেও পেয়ে বসেছিল, যে দিন আমিও তোমার মত আমার স্ত্রীকে হারাই।.....কিন্তু মৃতের দেখা কোন দিনই পাই নি, কোন দিনই না! আর তোমার যে রকম স্থির মস্তিষ্ক, ধীর স্বভাব, তাতে আমার বিশ্বাস, তুমিও কোন দিন মৃতাকে দেখতে পাবে না।...আমি বলি, এই ভাগ। গতস্য শোচনা নাস্তি, মহাজনের উপদেশ। নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করতে যাওয়া বৃথা। স্মৃতি ক্রমে মলিন হয়ে আসে। কাল সকল মূর্ত্তি মুছে দেয়। উপায় কি? দেখ আমাকে, আমি আমার মেয়েটিকে আর আমার সামান্য কাজকর্ম্ম নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলাম। তোমার এখনও তিরিশ পার হয় নি। আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি, তুমি আবার বিয়ে করবে—তোমার জীবন আপনা হতেই আবার নূতন করে গড়ে উঠবে।"

"কখ্খনো না"—উত্তেজিত কণ্ঠে অরুণকুমার বলে উঠলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল গিয়ে মালিকার উপরে—দেখ্‌লে, মালিকা সরল আয়ত দৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে আছে। মুখ ফিরিয়ে মনে মনে বললে, "তাও কি হয়?... মালিকা সুন্দরী, সরল, শান্ত। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আমার উপর তার যে ভালবাসা, তাতে যেন কি নতুন রঙ ধরেছে। ডাক্তারেরও এতে নিশ্চয় খুবই সায় হবে..... কিন্তু সে হোক আর তার মত যেই হোক, কাকেও যূথীর ঘরে তুলে আনবো—এ চিন্তাতেও যে আমার সকল প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।"

মৃতার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বেদনাময় অথচ কি একটা সুখকর মোহের আবেশে তার জীবন এই রকমে বয়ে চললো। কাজকর্ম্ম তার ছিল না; কিন্তু দিনগুলি সে জ্ঞানে ভারাক্রান্ত কিছু বোধ হল না। সজ্ঞানে ইচ্ছা করেই সে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে এলিয়ে দিল দুঃখেরই ধ্যানে। রাত্রি-দিন এখন তার পক্ষে সমান—কেবল রাত্রিকালের মোহ-ভাবটা গভীরতর আর অনিচ্ছাকৃত, এই যা পার্থক্য। কিন্তু জীবনী শক্তি তার মন্দীভূত হয়ে এল, শরীর শুকিয়ে চললো—বেঁচে রইল সে কেবল মৃত্যুরই আশায় আশায়!

"তার জন্যে এই রকমেই আমি যদি ধীরে ধীরে চলে যাই"—এই তার এখন চিন্তা।

এক দিন রাত্রে শোবার জন্যে যেমন সে ঘরে ঢুকলে, ঠিক দরজাটা খুলতে খুলতে, হাতের আলোতে সে দেখতে পেলে সম্মুখে জানালার পাশে টাঙ্গান বড় আরশীখানির মধ্যে তার পত্নীর ছায়ামূর্ত্তি! সত্য-সত্যই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যূথী যেন দাঁড়িয়ে ছিল ঐ আলো-আঁধারে, আরশীর কেমন আধ-উজ্জ্বল আধ-তরল পটখানির মধ্যে—গতবারে যে ভাবে তাকে সে দেখেছিল ঠিক তেমনি ভাবে, সেই ডুরী দেওয়া সাড়ী, আধ ঘোমটা লাল পাড়টি তার ঠিক মাথার মাঝখান দিয়ে গিয়েছে, দু পাশে কাণে মুক্তার দুল জোড়া ঝক্ ঝক্ করে দুলছে.....এক নিমেষের জন্যে কেবল, তার পর ছায়ামূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। আরশীর নিকটে গিয়ে অরুণকুমার দাঁড়াল, দেখলে শুধু তার নিজেরই প্রতিবিম্ব।

এই ছায়ামূর্ত্তি দেখে ত তার কোন রকম ভয়ই হল না। বরং যেন সে আশ্বস্ত হল,—মৃতা অবশেষে তার প্রার্থনা পূর্ণ করতে রাজী হয়েছে ভেবে প্রাণটা তার ভরে উঠলো। উদ্দেশেই সে আলাপ আরম্ভ করলে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে, অনুনয় বিনয় করলে—যেন আর সে তাকে ছেড়ে না যায়। বাড়ী ফিরবার পর এই প্রথম রাত্রি সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুলে, স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন সে নিদ্রাকে ব্যাঘাত করলে না—অন্ততঃ সে সব কিছু তার মনে রইল না।

পর দিনের সমস্ত বেলাটা তার দারুণ উদ্বেগে কেটে গেল,—কখন রাত্রি হয়, কখন রাত্রি হয় এই আশায়। যূথীর সাথে আবার দেখা হবে কি? তার দৃঢ় প্রত্যয়, নিশ্চয়ই হবে। আগের রাত্রিতে যে সময়ে সে ঘরে গিয়েছিল, ,আজও ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো,—ঠিক সেই ভাবে, হাতে সেই রকমে বাতিটি ধরে.....আলোর এক ঝলক উন্মুক্ত দুয়ারের ভিতর দিয়ে গিয়ে পড়ল আরশীখানার উপর, তার নাভি-উজ্জ্বল বুকে এক মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে মিশে গেল যূথীর সেই ডুরে সাড়ী, সেই দোদুল দুল, সেই হাসিমুখ.....

এর পর থেকে অরুণকুমারের সমস্ত জীবন যেন গুটিয়ে এসে দাঁড়াল ঐ একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে—ভাগ্য-বিধাতার প্রসাদে প্রতি দিন রাত্রে এই একটি মুহূর্ত্তের সুখ উপভোগ করবার অনুমতি সে পেলে। দিনের সুদীর্ঘ বেলা এখন তার অসহ্য—সূর্য্যের আলো তার চোখে পীড়াদায়ক। প্রতীক্ষায় বসে বসে থেকে প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। এখন আর আগের মত চুপ করে মোহাবিষ্ট হয়ে যূথীর ধ্যানে সে মগ্ন হয়ে যেতে পারে না। দিনের গুরু ভার লাঘব করবার জন্যে তাই সে নানা কাজের গোলমালে আপনাকে ব্যাপৃত রাখবার কল্পনা করলে। তার ক্ষেত খামার কিছু ছিল—সেখানে গিয়ে নিজের হাতে কাজ করতে সুরু করলে। প্রায়ই ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে গল্প গুজব করে আসত, তাদেরও নিজের বাড়ীতে ডেকে আনত। কিন্তু বাস্তব জীবনের এই সব যা কিছু, তা থেকে প্রাণ তার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। তার সত্য জীবন সেই অনির্ব্বচনীয় অতি গোপন একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে—সেই যে মুহূর্ত্তে প্রতি দিন আরশীর অস্পষ্ট আলোকে তার দিকে চেয়ে ফুটে উঠতো মৃতার মধুর হাসিটুকু।

শীত চলে গেছে—ফাল্গুনের শেষ। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা, দিনের বেলা গরম। দক্ষিণ হাওয়া দিয়েছে—পৃথিবীর গায়ে নব যৌবনের সবুজ হিল্লোল লেগেছে। কি একটা অপরূপ আবেশের নেশায় অরুণকুমারের চিত্ত অভিভূত। ধীরে ধীরে তার প্রাণে জেগে উঠলো একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা—ছায়াকে পাওয়া চাই। এ অবধি শুধু মুহূর্ত্তের জন্য ছায়ার দর্শনেই তার হৃদয় তৃপ্ত ছিল—মৃতাকে সে ইষ্টের মত, দেবতার মত দূর থেকে পূজা করতো। এখন সে চায় ছায়া যেন নেমে আসে তার অপার্থিব লোক হতে, কায়া হয়ে যেন ধরতে ছুঁতে দেয় তাকে—স্বপ্নেরও মধ্যে যদি সম্ভব হয়, তাতেও ক্ষতি নাই। হায়! অরুণকুমারের মনের মত হয়ে স্বপ্ন দেখা দিল না, স্বপ্নের মধ্যেও এত সাধের একটি চুম্বন দিয়ে যূথী তার কথাটি রাখ্‌লে না!...

তবু পূর্ব্বেরই মত প্রতি রাত্রিতে বড় আরশীর কাঁচে এক নিমেষের জন্য তার সজীব মূর্ত্তি ফুটে উঠতে লাগলো।

অরুণকুমারের জীবনে আবার ভাঁটা দেখা দিয়েছে, আবার সে শুকিয়ে শুকিয়ে চলেছে। ডাক্তার দেখে ভর্ৎসনা করে বল্‌লেন—

"তুমি কি পাগল হলে অরুণ? এতখানি মুহ্যমান হয়ে পড়তে আছে? এই বয়সে তোমার রকমসকমটা কি! একটা কঠিন রোগ বাধাবে সেই ব্যবস্থা করছ, আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি।...আমার কথা শোন ত, এখান থেকে চলে যাও, যত শীঘ্র পার বেরিয়ে পড়। দেশ বিদেশে কিছু ঘোরাঘুরি কর, লোকের সাথে মেলামেশা কর—নিজেকে এ রকম করে নিজের মধ্যে জেলবন্দী করে রেখো না।"

অরুণ শুধু মাথাটি নেড়ে বল্‌লে, "না, এখানেই ত বেশ আছি।" কিন্তু ডাক্তার যে ঠিক কথাই বল্‌ছেন, তাও সে বুঝতে পার্‌লে। একটি ছায়ার লোভে পড়ে থাকার অর্থ—পাগল হয়ে যাওয়া।...কিন্তু এই লোভ যে তার সমস্ত প্রাণকে বুভুক্ষিত করে তুলেছে—আর যে সহ্য হয় না।...মনে মনে বল্‌লে, "যূথী ছাড়া আর কোন মেয়েকে আমি ভালবাসতে পারবো না, পারবো না—তার কি?"...

চৈত্র চলে গেল, বৈশাখও গেল— জ্যৈষ্ঠের প্রথম। এক দিন রাত্রিতে অরুণের ওখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে ডাক্তার মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ীতে ফির্‌ছিল। অরুণকুমার তাদের এগিয়ে দিতে সঙ্গে চলেছিল। ফটকের কাছে এসে মালিকা হঠাৎ দেখ্‌লে, ব্রুচটা খুলে যে অরুণের টেবিলের উপর রেখেছিল, আসবার সময়ে তা আনতে ভুলে গেছে। অরুণ সেটা নিয়ে আস্‌তে আবার ভিতরে গেল। কিন্তু আস্‌তে দেরি হচ্ছে দেখে, বাবাকে একটু দাঁড়াতে বলে, মালিকাও ভিতরে গেল। ব্রুচটা কিন্তু, কিছুক্ষণ খুঁজে পাওয়া গেল না। হঠাৎ অরুণ সেটাকে

মেঝের উপর টেবিলের পায়ার একপাশে পড়ে থাকতে দেখ্‌লে, কুড়িয়ে মালিকার হাতে তুলে দিলে...কিন্তু এ কি হলো? তার দোষ? মালিকার দোষ? না আর কিছু? কি যে হলো বুঝ্‌তে না বুঝ্‌তে দেখ্‌লে মালিকাকে সে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে—চুম্বনে চুম্বনে বালিকার আরক্ত কপোল সিক্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ খট্ করে কি একটা শব্দ হ'ল—ঠুণকো একটা জিনিসের উপর কঠিন কিছু দিয়ে আঘাত দিলে যেমন শব্দ হয় তেমনি একটা শব্দ। চম্‌কে অমনি দুজনা দুদিকে সরে দাঁড়াল।

মালিকা কম্পিত অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের শব্দ?"

—"জানি না ত।"

এ দিকে ডাক্তারের গলা শোনা গেল, "কি রে! তোদের হ'ল কি?"...

দুজনাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। মালিকা কোন রকমে মুখ মুছে বাপের কাছে এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অরুণও অতি কষ্টে জবাব দিবার চেষ্টা করলে যে ব্রুচটা পাওয়া যাচ্ছিল না ইত্যাদি। বিদায় নিয়ে ডাক্তার সকন্যা প্রস্থান করলেন।

ফটকে খিল দিয়ে অরুণ ফিরছে! তার সাধের শুভ মুহূর্ত্তটির সময় যে হয়ে এসেছে—তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বাইরের ঘরে এসে, একটা কৌচ টেনে নিয়ে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু প্রাণ আজ তার শঙ্কায় চঞ্চল। বাইরে সব নিস্তব্ধ—আলোটা সম্মুখে নিঃশব্দেই মিটি মিটি জ্বল্‌ছে। তার মনে হলো, যূথী আর আজ আসবে না আমি বিশ্বাসঘাতক! ওঃ। কেন এমন করলেম?..."

ধীরে ধীরে সে উঠলো...পূজারীর অনুষ্ঠানের মত রোজ সে যা যেমন ভাবে করতো, আজও ঠিক তেমনি ভাবে তা করলে, তেমনি ভাবে ঘরে ঢুকল...বাতির আলো প্রতিফলিত হল গিয়ে আরশীর উপরে—কিন্তু আরশী শূন্য।...সত্য তবে?.. যূথী চলে গেছে?...আরশীর একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখ্‌লে তারই নিজের প্রতিবিম্ব সেথায় কিন্তু যেন একখানা তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে, দ্বিধা বিভক্ত।

একটা সূক্ষ্ম ফাটলের দাগ আরশীখানার বুক বরাবর এক পাশ থেকে আর এক পাশ অবধি চলে গেছে।

দৈববাণী

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ

ছেলের তরে 'মানত পূজা' দিতে,
সুদূর হ'তে এল কৃষক-বালা ;
দেবের দুয়ার বন্ধ তখন হায়—
উৎরে গেছে নিত্য পূজার বেলা।
লজ্জানতা—বল্লে পুরোহিতে,
ভগ্নস্বরে সভয়-দুরু বুকে ;
"পূজা আমার",—"কিসের পূজা আর—
সময় গেছে"—বল্লে পূজক রুখে।
কইলে বালা "মৃত্যু-শয্যাশায়ী
পুত্র আমার, করুন দয়া প্রভু—
তৃপ্ত আজি পূজায় তিনি জানি
দীনের ঠাকুর সদয় হবেন তবু।"
দারুণ রুখে বল্লে সেবক এবে—
"অর্ঘ্য তোর ওই আঙিনাতেই রাখ্‌ ;
দেবের আশীস্-পুষ্প চেয়ে বেটী
ঐখানে ওই ধূলোর রাশি মাখ্‌"।
—হাসল পূজক,—কাঁদল কৃষকবালা,
থির হয়ে কি ভাবল আপন মনে ;
অর্ঘ্য রাখি' আঙিনার এক পাশে,
ধূলি তুলে বাঁধল আঁচল কোণে
গৃহে ফিরে রুগ্ন সুতের শিরে,
যত্নে দিল আশীস্ চরণ ধূলি,
মরণ জয়ী জীবন-আশা লয়ে
'মা' বলে যে ডাকল মাথা তুলি!
হয়ত সেদিন পূজকের সেই রোষ,
শেষের ক'টী অনাদরের কথা ;
এনেছিলো চক্ষে তাহার জল,
বক্ষে তাহার অভিমানের ব্যথা।
—কিম্বা বুঝি রোষের কথাগুলি
দেবের আদেশ করলে প্রতিধ্বনি ;
কৃষকবালা মাতৃ হৃদি মাঝে
সত্য সেদিন শুনলে দৈববাণী।

আফ্রিকান্ কয়লা ও বোম্বে বাজার

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস্‌সি

য়ুরোপের মহাসমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, আর সেই সমরাগ্নির প্রধান ইন্ধন কয়লার আবশ্যকতাও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল;—যুদ্ধের সময়ে যে কয়লা লাফে লাফে, ধাপে ধাপে, বোম্বের বাজারে সপ্তমে চড়িয়াছিল, অল্প দিনের মধ্যে সেই কয়লাই আবার উদারাতে নামিয়া গেল। বাংলার বাজারে অত্যধিকগ্রাসী মালিকদের মাঝে হাহাকার উঠিল,—যে রকমেই হউক গভর্ণমেণ্টের তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে—অর্থাৎ তাহাদিগকে অত্যধিক লাভবান করিতে হইবে। যুদ্ধের সময়ে Government demand, বোম্বায়ের demand এবং অন্য দেশীয় কয়লার আমদানী বন্ধ থাকার জন্য, যে কয়লার উত্তোলন খরচ চারি টাকার অধিক নহে, তাহাও ত্রিশ টাকা দরে বিক্রীত হইতেছিল, বর্ত্তমানে এই ত্রিধারার অন্তর্ধানে খনির মালিকগণ বসিয়া পড়িয়াছেন—তাহাদের জান গেল—মান গেল—সর্ব্বস্ব গেল—আর সেই সঙ্গে তাঁহাদের দেশাত্ম-বোধটাও খুব বেশী জাগ্রত হইল!

আফ্রিকার কয়লা আসিয়া বাংলার কয়লা তথা ভারতীয় কয়লার বাণিজ্য নষ্ট করিতে বসিয়াছে, অতএব সাজ সাজ সমরে। যে রকমেই হউক আফ্রিকার কয়লা আমদানী বন্ধ করিতে হইবে—ইহাতে যদি নিজের নাক কাটা যায় তাহাতেও কিছু পরোয়া নেই।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উপরিউক্ত ত্রিবিধ কারণে বাংলার কয়লার বাজার অনেকটা পড়িয়াছে, কিন্তু এই দাম পড়ার একটা মস্ত বড় কারণ বাংলার বণিকদিগের অত্যধিক লাভের জন্য অসদ্‌ব্যবহার। যুদ্ধের সময় প্রথমতঃ রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার আনাচে কানাচে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসৎ Intermediate Company বসিয়াছিল, আর তাহারা কয়লার ব্যবসার নামে এত অন্যায় কাজ করিয়াছিল যে, কোন ক্রেতা আর দ্বিতীয়বার বোধ হয় বাংলার কয়লা লইবার ইচ্ছা করিল না। Contractএর টাকা পুরাপুরি লইয়াও তাহারা ক্রেতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাঁইয়া দিয়াছে, অনেক মালিক কয়লার নামে ধূলো, পাথর, কয়লার ছাই এবং অন্যান্য যে কোন বস্তু, যাহাকে লোকে কালো বলিয়া থাকে, তাহাই গাড়ী বোঝাই করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এইরূপ ব্যবহার যদি আপনারা কখনও কাহারও কাছে পাইয়া থাকেন, তবে কি পুনর্ব্বার তাহাদের সহিত কাজ করিতে আপনাদের ইচ্ছা হইবে? যুদ্ধের সময়ে ক্রেতাদের বাধ্য হইয়া এই সমস্ত অবিচার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে, তখন তাহাদের অন্য কোন গতি ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার তাহাদের হাত আসিয়াছে—এবারে তাহারা সেই পুরান অত্যাচার সহজে ভুলিতেছে না। তাহার পর আর একটা কারণ দাঁড়াইল Technical Economy। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম Technical Economyর দিক হইতে ভারতীয় কয়লার প্রথম শ্রেণী, অনেক বিদেশীয় প্রথম শ্রেণীর কয়লার সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারে না,—ভারতীয় কয়লার অনেক বেশী দরকার হয় এবং শ্রমিকদের মধ্যেও অনেক অসন্তোষ বাড়ে। যাঁহারা মিল কি ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। তবে যদি অপেক্ষাকৃত অল্প দামে জিনিস পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বাংলার কয়লা বোম্বের বাজারে Technical Economyর দিক হইতে দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্যই 'revival of Bengal Coal'এর জন্য এত মারামারি। কেহ বলিলেন,—আফ্রিকার কয়লার উপর চাপ বসাও; কেহ বলিলেন, রেলমাসুল কমাও,—যে কোন রকমে সমতা রক্ষা কর। আর একটা কারণ wagon delivery। বোম্বে আমেদাবাদ বাঙ্গালা হইতে অনেক দূরে—আর এখানে অনেক কয়লারও প্রয়োজন,—রেলকোম্পানীর এত দূরে ঠিক সমান ভাবে কয়লা সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে কি না,—তাহা না হইলে কলিকাতা হইয়া—জাহাজে

মাল বোম্বে পাঠাইতে হইবে, তাহাতে বারবার উঠা নামা করাতে কয়লার quality ও খারাপ হইয়া যাইবে। আবার বোম্বায়ের রেলমাসুল খুব বেশী—যদি খনির মালিকগণ ঠিকমত সময়ে ক্রেতার নিকট হইতে রেলমাসুল না পায়, তবে তাহাদের অনেকটা রেলকোম্পানীতে আটক পড়িয়া যায়। রেলকোম্পানী পূর্ব্বে নানা স্থানে মাসুল লইয়া গোলে পড়াতে বর্ত্তমানে নিয়ম করিয়াছে, চালানের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রিম মাসুল দিতে হইবে, এবং এ জন্য খনির মালিকগণই দায়ী থাকিবে। এখন এক রেক (Rake, প্রায় পঞ্চাশ গাড়ী) মাল পাঠাইতে তাহাদের প্রায় ১৩।১৪ হাজার টাকা রেলমাসুল দিতে হয়। কাজেই বোম্বায়ে কয়লা পাঠাইতে হইলে তাহাদের capital অনেক আটক থাকে। সমস্ত দিক দিয়া দেখিতে গেলে বোম্বের বাজার ও বাংলার কয়লা একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। আফ্রিকার কয়লার উপর duty বসাইলেই যে সুফল ফলিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে বোম্বায়ে বাংলার কয়লা সহজ ভাবে চলিতে পারে, ইহাই এখন ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। এই বাংলা অঞ্চলে এত অধিক মিল কি ফ্যাক্টরী নাই যে, বাংলার সমস্ত কয়লা এখানেই ব্যয়িত হইতে পারে। আমাদের বোম্বে ও আমেদাবাদ বাজার লইতেই হইবে, নতুবা বাংলার কয়লার ব্যবসায় একেবারে স্থবির হইয়া পড়িবে। এখন প্রশ্ন হইল 'রকম' লইয়া। আফ্রিকার কয়লা তাহাদের গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বোম্বে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং তাহার এই গতিরোধের জন্য এসেম্বলিতে বিরাট আন্দোলনের পর আফ্রিকার কয়লায় উপর duty বসান মত ও পাশ হইয়াছে। তবে এই মতটা খুব সমীচীন হইয়াছে কিনা তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

Conservative spirit এর দিক দিয়া দেখিতে গেলে, অবশ্যই এই duty বসানো ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মানিতে হইবে। আমাদের দেশে আমাদের দেশীয় ব্যবসা স্থবির থাকিবে—আর অন্য দেশীয় বণিক সেই ব্যবসাতেই আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদের দেশীয় ব্যবসার উন্নতি আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক।—আমাদের আভ্যন্তরিক ব্যবসায়ের, সাধ্যের মধ্যে হইলে অবশ্যই যে কোন রকমে উন্নতি করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—এজন্য যদি বিদেশী মালের উপর duty বসান যায়, তাহা কোন রকমেই অন্যায় হইবে না। উদাহরণ স্থলে বলিতে পারি, আমাদের দেশে সবে রং তৈরী হইতে সুরু হইয়াছে, অথচ অল্পদামী জার্ম্মানীর রংয়ের সহিত আমাদের রং বাজারে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেছে না—এ সময়ে আমাদের দেশীয় রংয়ের ব্যবসার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের জার্ম্মানীর রংয়ের উপর duty বসান দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। যদি কোন বৈদেশিক বাণিজ্য আমাদের জাতীয় ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত করে, তবে অবশ্যই আমাদের সমস্ত ক্ষতি সহ্য করিয়াও বৈদেশিক ব্যবসাকে প্রতিহত করিতে হইবে। এখন আফ্রিকার কয়লা আমাদের জাতীয় ব্যবসার মূলে আঘাত করিয়াছে কি না তাহাই বিচার্য্য। আমি এখানে একটু সামান্য কথা বলিতে চাই—বোম্বের বাজারে বাংলার কয়লা দাঁড়াইতে পারিলে লাভ যে ভারতীয় কোম্পানীদের খুব বেশী হইবে, এমন আশা করিবেন না। বাংলার প্রথম শ্রেণীর কয়লার মালিক অধিকাংশই য়ুরোপীয়—লাভের অধিকাংশেই যাইবে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে। সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়লার মালিক—আমাদের দেশীয়েরা। আফ্রিকার কয়লার উপর যতই duty বসান হউক না কেন, এ কয়লার কাটতি ওখানে খুব বাড়িবে না—আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরে!"

সে যাহা হউক, অত বাঁকা ভাবে না দেখিয়া সোজা ভাবেই দেখিতে গেলে, আফ্রিকার কয়লার উপর duty বসিলে আমাদের আশা হইবে, বাংলার কয়লার ব্যবসায়ের revival,—আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট কয়লার খনির পুনর্জ্জন্ম। গত এক বৎসরের মধ্যে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার অনেক ছোট ছোট খাদ, কয়লা বিক্রীর অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর কয়লার আর কাটতি নাই।—এদিককার মিল ও ফ্যাক্টরীর মালিকগণ যখন অল্প দামে প্রথম শ্রেণীর কয়লা পাইতেছে, তখন তাহারা কেন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করিবে। বোম্বে বাজার খুলিলে প্রথম শ্রেণীর কয়লার সাধারণতঃ সেদিকেই টান পড়িবে। এই সুযোগে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মালিকদের কিছু সুবিধা হইতে পারে। আবার তাহারা লাভের আশায়

কুলীমজুরদের উপর কিছু দৌরাত্ম্য করিতে পারে। এই সমস্ত মালিকগণ ঠিক মিলিটারী অফিসার—নিরস্ত্র কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদাই শ্যেন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—কখন উপরিস্থিত পেন্‌সন্ লন কি মারা পড়েন—অমনি তাহাদের পদবৃদ্ধি। তাহাদের বুলিই হইয়াছে "দেশের ব্যবসা নষ্ট হইতেছে, অথচ বিদেশী মালের আমাদের দেশে কাটতি হইতেছে (!) ইহা অত্যন্ত অন্যায়।" তাহাদের এই বুলি নিশ্চয়ই সত্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি এই বুলিটাই সত্য হয়—আপনারা এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, আফ্রিকার কয়লার উপর duty বসানোতে যদি কলিকাতার অনেক বড় বড় ফার্ম্মের লাভই হয়, তবে তাহাদের এত আপত্তি কেন? যদি লাভের টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেই যায়, তবে এই সব ফার্ম্মেরই ত duty বসানোতে খুব সহানুভূতি দেওয়া উচিত! আপত্তির কারণ আর বিশেষ কিছুই নাই। তাহারা আফ্রিকার কয়লার দরুণ বড় বড় Contract করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে এত লাভ পাইতেছে যে, duty বসানোর পরোক্ষ লাভ তাহার কাছে কিছুই নয়। যাহারা হয় ত এই লাভটা পাইতেছিল না, তাহারাই একত্র হইয়া আফ্রিকার কয়লার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে, আফ্রিকান কয়লার উপর duty বসানোতে আমাদের ভারতের স্বার্থের কতদূর হানি হইবে। আমাদের দেশীয় মিল ও ফ্যাক্টরী য়ুরোপীয় ও আমেরিকার মিল ফ্যাক্টরীর কাছে শিশু, আমাদের দেশীয় উৎপন্ন জিনিস বহু কষ্টে কোন কোন বৈদেশিক জিনিসের সহিত competition চালাইতেছে, কোথাও বা পরাস্ত হইতেছে। আমাদের যতদূর সম্ভব অল্প দামে জিনিস তৈরী করিতে হইবে, নতুবা বিদেশজাত জিনিসের সহিত ইহারা competitionএ অসমর্থ হইয়া অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। অনেক সময়ে জিনিসের মূল্যের খুব সামান্য তারতম্যেও এক একটা নবজাত ব্যবসা সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। আফ্রিকান কয়লার উপর duty বসানোতে বাংলার কয়লার দাম বম্বে ও আমেদাবাদে বাড়িয়া যাইবে—সুতরাং সেখানকার উৎপন্ন জিনিসের দামও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইবে এবং ক্রেতাদের অপেক্ষাকৃত অধিক দামে সেই সকল জিনিস কিনিতে হইবে। ইহা দেশীয় ব্যবসার উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, যাহাতে অল্প দামে আমরা দেশে জিনিসপত্র তৈরী করিতে পারি। যাহাতে বাংলার কয়লা বোম্বে বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রীত হয়, সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

বোম্বে বাজার খুলিলে সেখানে সাধারণত প্রথম শ্রেণীর কয়লারই টান বেশী পড়িবে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীদের লাভ খুব বেশী হইবে না। অপেক্ষাকৃত একটু বেশী দাম দিয়া প্রথম শ্রেণীর কয়লা লওয়াতেই লাভ বেশী—সুতরাং দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীদের কয়লার বোম্বে বাজারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভের আশা নাই। তাহাদের বিক্রী বাংলা ও আশে-পাশেই নিবদ্ধ থাকিবে। আমাদের প্রথম শ্রেণীর কয়লার দুর্দ্দশা কোন দিনই হয় নাই। বর্ত্তমানেও প্রথম শ্রেণীর কয়লা বেশ পুরোপুরি চলিতেছিল এবং ভবিষ্যতেও চলিবে। গত বৎসরেও এক কোম্পানী শতকরা ৭৫৲ ডিভিডেণ্ড দিয়াছে, ১৯১৯ খৃঃ ঐ কোম্পানি ১২০৲ দিয়াছিল। ১৯১৯ সনে প্রায় শতকরা ৫৮টা কোম্পানী ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। ১৯২৩ সনে ঐখানেই শতকরা ৪৩টা কোম্পানী ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। অথচ কয়লার দাম প্রায় এক চতুর্থাংশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কয়লা খাদে লোকসান বিশেষ হয় নাই। তাহাদের মাল বরাবরই পুরোপুরি ভাবে চলিয়াছে! উত্তোলন খরচ প্রায়ই চারি পাঁচ টাকার অধিক পড়ে না—কিন্তু সেইখানে ডবল দামে সেই কয়লা বিক্রী হইয়াছে; কাজেই তাহাদের লোকসান হয় নাই। লোকসান যদি কাহারও হইয়া থাকে ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকদের,—তাহাদের অনেক কয়লা জমা পড়িয়া গিয়াছে, কি টাকা অভাবে খাদ বন্ধ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের বাজার দরে প্রথম শ্রেণীর মালিকগণ আপত্তি করিতে পারেন না; যদি করেন তবে তাহা তাহাদের অতিরিক্ত বুভুক্ষা।

এসেম্বলির আলোচনায় আর একটা ভাবিবার বিষয়ও দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক জাহাজ বোম্বে হইতে কয়লা লয়। Shipmentএও অনেক কয়লার দরকার হয়। বোম্বেতে আফ্রিকার কয়লা মহার্ঘ হইলে, বাংলার কয়লাও মহার্ঘ হইবে। কিন্তু এখানে ত আর আফ্রিকার কয়লার উপর duty বসিবে না। সেখানে কয়লা অল্প দামেই বিক্রয় হইবে—আর জাহাজগুলি সেইখানেই তাহাদের

কয়লা লইবে। তাহারা কোন মতেই বেশী দাম দিয়া বোম্বেতে বাংলার কয়লা লইবে না। কাজেই দাম বাড়াইয়া বাংলার কয়লার কাটতি এখানে চলিবে না।

তার পর হয় ত আফ্রিকাতে ভারতীয় জিনিসের উপর খুব চাপ বসিবে। আফ্রিকানগণ প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছা অমনি ত্যাগ করিবে না। যদিও আমাদের ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তথাপি ঘরের কাছে অসন্তুষ্ট প্রতিশোধ-প্রয়াসী প্রতিবেশী রাখা উচিত নয়। আফ্রিকানগণ ভারতীয়দের এ কার্য্য কখনও ভুলিবে না—যত ছলে পারে ভারতের অনিষ্ট করিতে থাকিবে, কি সচেষ্ট হইবে। যাহাদের অবাধ বাণিজ্যে আস্থা আছে (Liberals) বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অন্য দেশীয় কোন জিনিসের উপর খুব চাপ বসান তাহাদের মত নয়। তাহারা চায় সমস্ত পৃথিবীব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের অধিকার। ঠিক যেটুকু সুবিধা আমি অন্য দেশীয় ব্যবসায়ীদের দিব, উহাদের দেশে আমিও সেইটুকু সুবিধা পাইব। তবে বিচারের সময়ে এ মতে বিশেষ আসে যায় না। বৈদেশিক দ্রব্যের উপর duty বসানোতে যদি আমাদের কোন একটা ব্যবসায়ের revival হয়, তবে liberalismএর দোহাই দিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আফ্রিকান কয়লার উপর চাপ দিয়া বাংলার কয়লার বোম্বায়ে দাম বাড়ানোর প্রচেষ্টা অর্থনীতির মূল সূত্রের কতদূর অনুকূল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আজ আফ্রিকার কয়লার উপর চাপ দিয়া বাংলার কয়লা চালান যাইতে পারে; কিন্তু কাল যদি আফ্‌গানিস্থানের কয়লা আরও অল্প দামে আসিয়া বোম্বায়ে উপস্থিত হয়, তখন বাংলার কয়লার কি দুর্দ্দশা হইবে! বোম্বেতে যদি কয়লার খনি মিলিয়া যায়, তবে ত কথাই নাই। তখন বাংলার মালিকগণ কি করিবেন ভাবিয়াছেন কি? চাপ দিয়া দাম বাড়ানোতে সব সময় ভয় থাকে—কখন আবার ভিন্ন দেশীয় অল্প দামী জিনিস আসিয়া পড়ে। তখন খুনীর মত অবস্থা! অমুকে খুন করিতে দেখিয়াছে। অতএব মারো তাহাকে। আফ্রিকা, আমেরিকা, জার্ম্মানি সবার জিনিসের উপর duty বসাও। যদি আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট আফ্রিকার কয়লাকে আরও সাহায্য করে এবং যদি মালিকগণ অল্প লাভেই কয়লা বিক্রী করিতে রাজি হয়, তবে এই duty বসাইয়াও বিশেষ কিছু লাভ হইবে না—বাংলার কয়লা সেখানে চলিবে না।

সব চেয়ে শ্রেয়ঃ হইত, যদি বাংলার কয়লা কোন রকমে দামে অল্প হইয়া বোম্বে বাজারে আফ্রিকান কয়লার সহিত পাল্লা দিতে পারিত। অবশ্য যদি ব্যবসায়ের মূলে ক্ষতি হয়, তবে দাম কমান উচিত নহে। তবে যদি লাভের অল্প কিছু তারতম্য হয়, তবে দাম কমাইয়া বৈদেশিক জিনিসের সহিত competition চালাইতে হয়। বোম্বে বাজার লইতে হইলে, বাংলার কয়লা অল্প লাভে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। উৎকট লাভের প্রত্যাশী হইয়া কেবল পরের দোষ দেখিলে চলিবে না। আফ্রিকা স্বভাবতই ভারতে কয়লা আনিবে—ইহাতে আফ্রিকার দোষ নাই। কিন্তু ভারত যদি তাহার অত্যধিক অর্থলিপ্সা হইতে তাহাকে ব্যাহত না করিতে পারে, তবে ইহা ভারতেরই কলঙ্ক। রেল মাসুল ত বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। এক লম্বা চৌড়া মাসুলের ফর্দ্দ ধরিয়াছে—কয়লার দামের ডবল দাম রেল মাসুল। রেল প্রভুরা যদি একটু অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের লাভের অংশটা একটু কম লইতেন, তাহা হইলেও বোম্বে বাজারে আফ্রিকান কয়লার এতদূর বিস্তার হইত না, আর বাংলাও "গেল রাজ্য, গেল মান" বলিয়া ডাক ছাড়িত না।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

হাসির জাবরকাটা আর শেষ হয় না। বত্রিশ নাড়ীতে পাক দিয়া এক একটা তরঙ্গ—গুড়্‌গুড়ে বানের মত উপর্য্যুপরি আসিয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কাহার মুখের দিকে তাকাইলেই বেগ্ বাড়িয়া যায়। আর একত্র থাকা যুক্তি নয়, লোকে পাগল ভাবিবে। একটু তফাৎ হইয়া পড়িলাম। জয়হরি আড়্ হইয়া ব্যথা খাইতে লাগিল।

শ্রীমান্ এক রেকাবী পান লইয়া হাজির। তাহার কাছে শুনিলাম,—কাহারো অসুখ শুনিলে বৈবাহিক মহাশয় এইরূপই বিচলিত হন,—বানেশ্বরের উপর সব ঝোঁকটাই গিয়া পড়ে; চিটি আর চাকর লইয়া তাঁহার সময় কাটে। বানেশ্বরকে ভর্ৎসনাও যত করেন—ভালও তত বাসেন। ইত্যাদি।

অদূরে দুইটি ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া শ্রীমান্ বলিল—"বেশ হয়েছে, মামা আসছেন, আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল।"

কথাটা খোলসা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—নমস্কার বিনিময় হইয়া গেল।

মামাটি পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, বেশ পুষ্ট ও সবল, প্রাতেই মাথায় ব্রসের পরশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীটিকে দেখিয়াই চিনিলাম,—আমার বাল্য সাথী অমর। তাহার হস্তে একটি বিলাতী বাদ্যযন্ত্র। বহু দিন পরে এই অভাবনীয় সাক্ষাতে বড়ই আনন্দ হইল! অমর কেবলই হাসে আর বলে—"অনেক কথা আছে—বলচি।"

অল্প পরিচয়েই বুঝিলাম,—মামা সেকালের বনেদী ঘরের ছেলে (?) অধুনা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে,—চাকুরী করেন। প্রকৃতি বেশ সরল। শুনিলাম—অমর ও তিনি পরস্পরের বৈবাহিক! ভাবিলাম—মন্দ নয়;—যত কুকুরে কামড়ানো রোগী কসৌলিতে জমা হয়, এটা কি তবে বৈবাহিক-চিকিৎসালয়! রোগটা জানা দরকার!

এই সময় শ্রীমান্ নীচু গলায় আমাকে জানাইল—"মামার গলা খুব ভাল।" মাতুল বুঝিয়া লইয়া বলিলেন,—"সে আশা আর রেখ না বাবাজি,—তার দফা গয়া! গলায় রাহুর দৃষ্টি পড়েছে! সব গলাটুকু (অমরকে দেখাইয়া) ওঁর গর্ভেই দিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করলেই—শ্রীরাধা আকুল হতেন।—এঁর গর্ভে না পৌঁছুলে সাড়্ হয় না!"

বলিলাম—"বুঝিলাম না যে।"

মামা বলিলেন,—"দুই বাল্য-সখায় সাক্ষাৎ হয়েছে,—একটু নাড়াচাড়া করুন,—বুঝতে পারবেন! আমি দম-নি।"

কথাটা জটিলতর দাঁড়াইল,—মনটা দমিয়া গেল,—অমরের মাথা কি তবে খারাপ হইয়াছে! কখনও হাসি, কখনও indifferent (নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব) দেখিতেছি বটে। শুনিয়াছি লোহার কারবারে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে; আহা—ভোগ করিতে পারিল না!

যাহা হউক, সে বলিয়াছে, অনেক কথা আছে; শুনি কি বলে! বলিলাম—"ভায়া -চাক্‌রি হ'ল, ব্যবসা হ'ল,—এখন কি ব্যাণ্ডের (Bandএর) দল্ বানিয়েছ! যন্ত্রটা একবার বাজাও শুনি!

অমর যন্ত্রটা কাণে লাগাইয়া বলিল—"একটু উঁচু গলায় বল,—শুন্‌তে পাই না!"

ও হরি,—বধির;—তবু ভাল। প্রহেলিকা পরিষ্কার হইল। ক্রমেই উচু পর্দ্দায় উঠিতে লাগিলাম,—"ডি-শার্পেও" (D-sharp) পায় না—উদারা মুদারা শেষ করিয়া 'তারা'য় চড়িলে সাড়া পাই! এ কসরৎ কতক্ষণ

চলে। নাড়ী পূর্ব্ব হইতেই অবসন্ন ছিল; অল্প কথায় সারিয়া, শুনিবার দিকটা দরাজ্ করাই ভাল।

জীবনে, বিশেষ করিয়া—যৌবনে, অনেক তরঙ্গই আসে। কখনও ব্যায়াম, কখনও কন্‌সার্ট, কখনও থিয়েটার, কখনো লেক্‌চার, কখনো সমাজ-সংস্কার, কখনো দেশোন্নতি, কখনো হঠযোগ,—ইত্যাদি! আমাদের জীবনেও ইহাদের কোনটিরই অকৃপা ঘটে নাই। অমরের যৌবনটা কিন্তু একেবারেই প্রৌঢ়ত্বের রং ধরিয়া দেখা দিয়াছিল; ও সকল কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র উৎসাহ ছিল অর্থোপার্জ্জনে;—সেই কথা ও তাহারই উপায় চিন্তা তাহাকে আনন্দ দিত। এ হাবাতেদের সঙ্গে তাই তাহার মৌখিক মিলন মাত্র ছিল। শেষ লোহার কারবার করিয়া সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহারা কেবল উপার্জ্জনই করে—অমর তাহাদেরই একজন। তাহার যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—এটি মা-লক্ষ্মীকেও খড়ি পাতিয়া দেখিতে হয়,—এমনি সাদাসিদে চাল্।

অমর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ—আগে বলো!"

বলিলাম—"বেশ আছি; বয়সে ব্রাহ্মণী ক্রমশই ব্যাধিমন্দির বনিতেছেন,—নিজে বাতের সংবাদ পাইতেছি;—বিষয়-চিন্তা কোনদিনই ছিল না—আজো নাই। পুত্রসন্তান না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ হাতীর খোরাক যোগাইতে হয় না, এবং ছেলের বিবাহব্যপদেশে ব্রহ্মহত্যার পাতকও স্পর্শ করিবে না। বাক্স আছে চাবি নাই;—বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়।"

আমাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া অমর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি দেখছি সে-ই আছ, একটুও বদ্‌লাওনি! বেশ আছ—বেশ আছ! তা—এত দিন যে চাক্‌রি করলে—করলে কি?"

বলিলাম—"চাকরি করলে যা যা করতে হয়, সবই করেছি! ভাল-মন্দ হুকুম, নির্ব্বিচারে আর কর্ত্তব্যজ্ঞানে (?) পালন্ করেছি; দরকার হলে মিথ্যা আটকায়নি, কারণ চাকরির চ্যাপ্‌টারে সত্যের মর্য্যাদা কম-ই,—ক্ষমাও নাই। চাকরির উপর হাড়ে হাড়ে চটেওচি,—চাকরিও করেছি, ফাঁক পেলে ফাঁকিও কম দিইনি। কেবল বড়বাবু হবার চেষ্টাটি পাইনি,—অনেকের অন্ন মারতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশু হত্যাও হয়ে যায়, আর এই দুয়ে মিলে দুঃখিনী পত্নী ও মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস আর চখের জল (নীরবে আর নিভৃতে পড়লেও) সে ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হয় এটা আমি ভাবতেই পারি না। তা হলেও, কেরাণী জাতের মুখ হেঁট্ করি নাই। চাল্লিশ টাকা বেতনে, ষাট টাকার স্যুট্ বানিয়েছি; ভাল খেয়েছি, ভাল পরেছি, ভাল থেকেছি,—অবশ্য স্ত্রী পুরুষে। নির্ভীকের মত দেনা করেছি,—কেউ কা-পুরুষ বলতে পারবে না! টাকায় তিন্‌টে ন্যাংড়া, দেড়টাকা সের পটোল, সাতসিকের একটা ইলিস, একটাকা পুঁজি এণ্ডা-ওলা তোপ্‌সে, চায়ের সঙ্গে Lady's afternoon biscuit (বিস্কুট) খেয়েছি। ফার্ষ্ট ক্লাস্ এসেন্স্ মেখেছি, বাউটি ঘড়ি (wrist watch), সোনার চশমা, পরেছি। কাশীতে মা-কে সাড়ে চার টাকা ক'রে পাঠিয়েছি; কুকুরকে ভিনোলিয়া সোপ্ মাখিয়েছি; একটা গ্রামোফোনও কিনেছি।—আর কি করতে বলো?"—

অমর বোধ হয় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবার তাহার আর উচ্চহাস্য আসিল না; তবু একটু মৃদুহাস্যে আমার মুখের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া,—মাঝারি আওয়াজে বলিল—"বলি—রেখেছ কি?"

বলিলাম—"আগেও যা ছিল,—কিঞ্চিৎ ঋণ! তার কিছুমাত্র নষ্ট হতে দিইনি,—ঠিক্ তাই আছে। সম্পত্তির মধ্যে গেছে বইগুলি,—অবশ্য উয়ের গর্ভে; আর দাঁত—কালের গর্ভে। বেড়েছে কেবল—বয়স, তা দুজনেরি। আর হালে বেড়েছে তিন ট্রঙ্ক্ চোতা খাতা আর টুক্‌রো কাগজ!"

এবার অমর আবার হো হো করিয়া হাসিয়া তাহার বৈবাহিককে বলিল—"ভায়ার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি—একভাবেই আছেন,—চল্লিশ বচর আগে যা ছিলেন ঠিক্ তাই!" পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"বেশ আছ,—বেশ আছ; তবে কিছু টাকা,—আচ্ছা তুমি ত' কবিতা-টবিতা লিখ্‌তে, তাতে কিছু করতে পারলে না?"

বলিলাম—"রবিঠাকুর বাজার মাটি ক'রে রেখেছেন,—তা না হ'লে—"

অমর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কে লোক্‌টা,—কই নাম শুনিনি ত'। মাড়োয়ারী?"

বলিলাম—"পোদ্দারদের (পস্তকারদের) কাছে শুনেছি—কব্যরী"!

অমর বলিল—"ওঃ বুঝেছি—গব্বরদের কেউ,—না? তাদের সঙ্গে পারবে কে! কিসের কারবার! একচেটে বুঝি?"

বলিলাম—"দুনিয়ার সব সেরা রসই তাঁর একচেটে।"

অমর বলিল—"ওঃ, মদের কারবার; ওতে মোটা লাভ হে। ওটা বরাবর আমার মাথায় আছে। আমাদের সে সময়ের সমাজ মনে পড়ে ত', তার উপর পৈতে পরার পাপ; তাই একটু ইতস্ততঃ ছিল। এখন হাঁড়ি-মুচিতে পৈতে প'রে সে বালাই ঘুচিয়ে দিয়েছে। গেল বচর দেখি গণ্ডা-গণ্ডা গ্রাজুয়েট্, কেউ ভট্টাচার্য্য, কেউ মুখুয্যে,—আবগারী-তলায় আর্জি নিয়ে উমেদার, ঘাসের উপর গড়া-গড়া বোসে। মদ, গুলি, গাঁজা—যা মেলে। আপদ যখন চুকে গেছে—ধর্ম্মতলার ডাক্‌টা এবার ছেলেকে দিয়ে ডাকাবো। আর আমিও কাশী যাচ্চি, দেখি বিশ্বনাথ কি করেন। হাঁ—মহাজনটির ঠিকানাটা কি?"

উঃ—এখনো অর্থোপার্জ্জনের পিপাসা প্রবল,—আমার কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে,—ভালই হইয়াছে। বলিলাম—"লিখে দেব অখন।"

অমরের মাথা তখনো আবগারীর দখলে ছিল; সে বলিল—"শর্ম্মা ঝুঁক্‌লে মদ তো মদ, ঝর্‌ঝরে গাঁজা থেকে রসের ঝর্ণা বেরিয়ে আস্‌বে।"

বলিলাম—"যখন লৌহ মোক্ষণ করেছ,—তোমার অসাধ্য কিছু নেই।"

শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে অমর বলিল—"লোহা থেকে যে রস বার করেছি ভায়া,—সোমরস তার কাছে ছ্যা ছ্যা!"

ক্রমে আমার অবস্থা তখন নাভিশ্বাসে দাঁড়াইয়াছে। একটু নীচু সুরে মাতুলকে বলিলাম—"এর চেয়ে ফুট্‌বল্ খেলা ভাল, তাতে তবু হাঁপ ছাড়বার একটা হাফ্-টাইম্ আছে;—আর্ ত' পারি না!"

মাতুল বলিলেন—"তবে এখন থাক্,—রাত্রে রেখে যাব অখন্, দুই বাল্যবন্ধুতে বেশ কথাবার্ত্তায় কাটাবেন!"

শুনিয়া সত্যই ভিতরে ভিতরে একটা আতঙ্ক অনুভব করিলাম; মুখে বলিলাম—"আহা, তার চেয়ে আর আনন্দ কি ছিল, কিন্তু আমি যে এই বৈকালের ট্রেনেই চল্লুম!"

সকলেই হাসিলেন, অমরও যোগ দিল।

মাতুলকে বলিলাম—"আপনার অসুখটা কি?—মাপ করবেন—দেখে ত বোধ হয়—ওজন্‌টা কমাবার জন্যে আসা; তা হ'লে এখনো অনেক দিন দেরি। আশা করি—আস্‌চে বচর আসি ত দেখা হবে।"

মাতুল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভয় নেই, আপনাকে আর যেতে হবে না,—যেতে আমাকেই হবে! নিজের আমার কোন অসুখই নাই, বাড়ীর জন্যই আসা। দেখে শুনে আজ তিনি বল্‌ছিলেন,—'তুমিই যদি গেলে ত' সে'রে দরকার!—চল' ফিরি'!"

আবার একটা হাসি পড়িয়া গেল! অমর আঁচিয়াছিল—তাহার বাহাদুরীর প্রসঙ্গই চলিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—"ওঁর কাছে কি শুনচো,—যে রস টেনেছে তার কাছে শোনো।" এই বলিয়া লোহার ব্যবসায়ে, গত বুদ্ধের সময়, সে কিরূপ ও কি পরিমাণ বুদ্ধি খরচ করিয়া লৌহরস শোষণ করিয়াছে, বিপুল উৎসাহে তাহারই ইতিহাস আরম্ভ করিয়া দিল।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-জগতের প্রায় সব সম্পর্কই তাহার শেষ হইয়াছিল;—ছিল কেবল লোহার শব্দ, আর সংসার, আর ছেলেদের দাবী শোনা। বাস্তুর জগৎই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সে জগতে সে থাকিত না।

যাহা হউক, লৌহ-নির্য্যাস শোষণ ও সঞ্চয়ের কায়দা-কৌশল, সাহিত্য-রস-লিপ্সুদের রুচিকর হইবে না; কারণ, সেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জিনিস্ ও লক্ষ্মীমন্তদেরই তাহা প্রাপ্য। তাই সেটা বাদ দিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের উপায় ছিল না—অতি কষ্টে অনেকটা সময় সেই কঠিন লৌহ-প্রসঙ্গ শুনিয়া কাটাইলাম,—রস্‌টা বক্তারই রহিল।

বুঝিলাম—অমরের এই প্রিয়-প্রসঙ্গ কোন দিনই শেষ হইবে না; বলিলাম—"ভায়া—লোহা যে এমন সরস জিনিস, ইতিপূর্ব্বে তা জানা ছিল না,—ছাড়তে ইচ্ছা হচ্চে না, কিন্তু তোমার বৈবাহিকের সঙ্গে নূতন সাক্ষাৎ,—তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ না ক'রলে ভাল দেখায় না—"

অমর তাড়াতাড়ি বলিল,—"তা ঠিক্—তা ঠিক্, বেই খুব জমাদার লোক্, আলাপ কর না—টের পাবে।"

বলিলাম—"কাল কিন্তু বাকিটুকু শোনাতে হবে ভাই,—"

অমর প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"বেশ্—কালই শুনো—হুঁ হুঁ, কেমন চিজ,তো বলো!"

মাতুল মধ্যম স্বরে বলিলেন—"তা ঠিক—চিজ বটে,—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ত' লোহারাম বানিয়েছেন, আপনাকেও নির্ঘাত ইস্পাতরাম বানিয়ে ছাড়লেন।"

অমরকে বলিলাম—"তবে চল' বৈবাহিকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একটু বেড়ানো যাক।"

অমর বলিল—"সেই ভাল—সেই ভাল!"

বাঁচিলাম;—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

১৬

"দেখুন—আমাদের সঙ্ঘটা যখন বৈবাহিকের চতুষ্পাঠীতে দাঁড়িয়ে গেল, তখন ১, ২, দেগে মার্কা না দিলে ভুল-ভ্রান্তি হ'তে পারে;—আপনাকে আমি 'মাতুলই' বোল্‌ব।"

মাতুল হাসিয়া বলিলেন—"দু'পা এগিয়ে 'বাতুল'ও ব'ল্‌তে পারেন, কোন' আপত্তি নেই। দিনরাত সপ্তমে সুর বেঁধে চেঁচিয়ে আর মাথার ঠিক নেই।"

কথাটা যে কতখানি সত্য, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা আমার বিশেষ জানা হইয়া গিয়াছে। আমি সহানুভূতির ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম—"সতীলক্ষ্মী বিশেষ ভয় পেয়েই বলেছেন—'তুমিই যদি গেলে, ত' আমার সেরে দরকার!' আহা দুর্ভাগা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের অন্ধকার জীবন-পথে, এই শুভ্র সুখতারার স্নিগ্ধ জ্যোতিই একমাত্র সম্বল!"

মাতুল যেন প্রতিবাদের ইচ্ছায় আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু"—আমি অশ্চর্য্য হইয়া বাধা দিয়া বলিলাম—"ওর মধ্যে আর 'কিন্তু' ঢোকাবেন না।"

মাতুল সামলাইতে গিয়া বলিলেন—"না—তা বলচি না,—তবে এই সব কঠিন রোগ—যার জন্যে স্বাস্থ্যকর স্থানের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়, তাতেও যে মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড মোচ্‌কে যায়!"

বলিলাম—"আপনার কথাও অস্বীকার করতে পারি না। রোগটা কি!"

মাতুল ঈষৎ রাগমিশ্রিত দুঃখে বলিলেন—"তাই-ই যদি জানতে পার ত' আজ এ ভোগাভোগ ভুগবে কে? মেয়েটা এক দিন ব'ল্‌লে—'মা তো আজ ছ'সাত বচর ভুগচেন, তুমি ত' বাবা সে খোঁজ রাখ না; মা কবে খান্ কবে না খান্—কি খান্ কখন খান্ তাই-ই জান না!' শুন্‌লেন কথা? এই মুক্ষু-জাত নিয়ে আমাদের সংসার করতে হয়।"

বলিলাম—"সে ত' চিরকালই হ'য়ে আসছে; এখন দাঁড়িয়েছে কি?"

মাতুল। এখন দাওয়ানী মামলায় দাঁড়িয়ে গেছে; জিতলে ফতুর, হারলে ফর্সা! শুনলুম আগে আগে মাথা ঘুরতো, মাথা ধোরত, বোধ হয় জ্বরও হ'ত। এখন বেশ ঘোরালো ক'রে তুলেছেন,—বৈকালে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, আর মাথার ভেতর যেন হাতুড়ি পেটে! 'ব্রহ্মচারী' দেখে শুনে আমাকেই দুষী করলেন! বল্লেন—'এখনি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যান, যা যা ব্যবস্থা দিলুম করবেন। এ ত' দু'এক মাসের রোগ নয়। কেবল চক্ষু বুজে সেবা নিয়েছেন! এ দেশের আত্মসুখান্বেষী পুরুষেরাই এই সব স্ত্রীহত্যার জন্য দায়ী;—এর কড়া আইন হওয়া উচিত।'—ইত্যাদি।

শুনে আমি ত' অবাক্ মশাই! আমারি বিপদ,—আর আমাকেই বকুনি!"

বলিলাম—"তাই ত দেখচি,—ব্যবস্থা মন্দ নয়! আপনার বিপদ এতই সুস্পষ্ট যে অন্ধেও তা দেখতে পায়,—ব্রহ্মচারী মশাই দেখতে পেলেন না! বলেন কি—এটা তিনি বুঝলেন না—যিনি আত্মত্যাগের বা আত্মহত্যার এই দুরভিসন্ধিটা ভিতরে দাবিয়ে রেখে, বাইরে সারাজীবন কেবল স্বামীর সেবা, স্বামীর আরাম খুঁজে স্বামীকে কাজের বার বানিয়েছেন। দুঃখ যন্ত্রণা রোগ নীরবে সহ্য ক'রে—অকালে কি মুখে দিয়েছেন না-দিয়েছেন, তা স্বামীকে চেয়ে দেখবার কষ্ট নিতেও বলেন নি; এত দিন এই বদমতলবটা মনে মনে পুষে, আজ ধীরে ধীরে তিনি স'রে যাবার চেষ্টা করেন কোন্ অধিকারে? তাঁর এই অন্যায় অত্যাচারের জন্যে কি ব্রহ্মচারী মশাই আইনের আবশ্যক ভাবলেন না! মজার লোক বটে! আপনার ব'য়ে গেছে, আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—মাতুল!"

মাতুল এলো-মেলো দুচার কথা আরম্ভ করিতে গিয়া

কোনটাই শেষ করিতে পারিলেন না; খানিক অগ্রসর হইতেই তাহা তাঁহার নিজের কাণেই প্রলাপের মত বাজিতে লাগিল! শেষে বলিলেন—"তা কি হয় মশাই, দুদিন না উঠলে সংসারের কল্-কব্জা তেউড়ে যায়।"

বলিলাম—"তাই নাকি?"

মাতুল। তিন দিন মাথা তুলতে পারেননি, চিঁড়ে চিবিয়ে চোয়াল ধ'রে যাই আর কি। একটু গরম জল জোটেনি—দাঁতগুলো কন্‌কনিয়ে ঢিলে মেরে গেছে; কে গামছাখানা দেয়, কে সাবান এনে দাঁড়ায়, কোথায় দেশালাই, কে ঠিক্‌রে খুঁজে দেয়। ক'দিন আর তেল-তামাক, পান-জরদা, লুচি-হালুয়া, ছুঁতে হয়নি। চেহারা দাঁড়িয়েছিল—ভাগ্যহীনের; কেবল কাছাটা গলায় ওঠেনি,—দোর'হ পর্য্যন্ত হয়েছিলুম—চা'র জন্যে। কে বিছানা করে, কেই বা মশারি ফেলে দেয়; একদম ভেটেরাখানায় বাস,—ঘর-দোর যেন গোরাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

বলিলাম—"তিনটে দিন আর চালিয়ে নিতে পারেন নি?"

মাতুল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি! যাদের যা কাজ; কখন' করেছি, না, করবার দরকার হয়েছে।"

বলিলাম—"ঠিক বলেচেন,—আমার রাগ ত তাই। যাঁরা এমন ক'রে মানুষকে জানোয়ার বানিয়েছেন,—কুটোটি নাড়তে দেন না, তাঁদের উপর আবার দয়া কেন?"

মাতুল যেন কেমন বিমূঢ় বনিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—"এখন কি করি বলুন দিকি?"

বলিলাম—"সাত বৎসর সমান ভাবে যা'করে এসেছেন, এখন যে তার চেয়ে কিছু বেশী ক'রে উঠতে পারবেন তা ত' বিশ্বাস হয় না। ঐ যে তাঁর মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ে বললেন—সেটা আপনি ছাড়া আর কেউ পেটে না। আমাদের অবহেলার অপমানই—অভিমান এনে তাঁদের নীরব ক'রে মরণের পথে ছোটায়! শাস্ত্রে তাঁদের 'অবলা' বলা হয়েছে,—তাঁরা নিজেদের তরে কিছু বলবার জন্যে জন্মান না। বাকশক্তিহীন গরুর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গাড়ীর প্রাণহীন চাকাগুলো পর্য্যন্ত কাতর চীৎকারে প্রতিকার খোঁজে, আর সজীব স্বামী-দেবতার কি এতটা উদাসীন থাকা উচিত মাতুল। যাক্—চিন্তা করবেন না, খোঁজ-খবরটা নেবেন,—তাঁরাও মানুষ; তা'হলেই সত্বর সেরে উঠবেন।"

কথাবার্ত্তাটা ক্রমে sermonএ (ধর্ম্মোপদেশে) ঝুঁকিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, পালটাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। তখন একটা বড় কম্পাউণ্ড মাড়াইয়া চলিয়াছি। দেখি, তাহারই এক কোণে প্রাচীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ ও বট মিলিয়া একটি অন্ধকার অটবী রচনা করিয়াছে,—তলায় বড় বড় পাথর। সসম্ভ্রমে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম!

মাতুল যে খুব দুর্ব্বল ধাতের ভীতু লোক, তাহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি শশব্যস্তে প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠাকুর মশাই?" গভীরভাবে বলিলাম—"যে-সে ঠাকুর নন,—বাবা-ঠাকুর।"

"বলেন কি মশাই—অ্যাঁ—এখানেও।" বলিয়া মাতুল দুই হাত শিথিলভাবে একত্র করিয়া—যেন একটি সুপুষ্ট কাবুলী কাম্‌রাঙ্গা, কপালে ঠেকাইলেন ও ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন—"অপরাধ নিও না বাবা, বড় বিপদে পড়েছি—জানতেই পারচো, দয়া ক'রে ভাল করে দাও; তা'না হলে আমিও বে-খিদমতে মরে' যাব' ঠাকুর।"

মামার আবেদনটা যেমন সত্য, তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল!

অমর কিছু বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষ আগ্রহে দুই চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া, ঘাড়টা পশ্চাতে হেলাইয়া তাহার বৈবাহিককে প্রশ্ন করিল—"দেব্‌তা নাকি,—কোন্ দেব্‌তা?"

মাতুল তাহার কাণের কাছে ঝুঁকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"দেব্‌তা নয়—দেব্‌তার বাবা!"

"কাজ নেই বাবা, সকলকে সন্তুষ্ট রাখাই ভাল, কে কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না," এই বলিয়া অমরও নমস্কার করিল।

ভাবিলাম—ব্যবসা-বুদ্ধি একেই বলে; ঠাকুর বোধ হয় একেই বলিতেন—"পাটোয়ারী বুদ্ধি!"

"আমারি মাথাটা খেলে,—দু'সন্ধ্যে এই পথেই আমার যাতায়াত," বলিয়া মাতুল একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক হইলেন। বুঝিলাম পূর্ব্ব প্রসঙ্গ একদম সরিয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম—সুজলা সুফলা দেশের এই মোলায়েম জাতটির নিরীহ ছেলেগুলি দৃঢ়তা বলিয়া কোন কিছুর ধার ধারে না, Sentimentএর উপর সাঁতার কাটে,—ডুব দিতে নারাজ।

সহসা আমার দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে একটা টিপুনি দিয়া, অমর আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া নীচু সুরে বলিল—একটি "সিদ্ধ পাঞ্জাবী গুরু পেয়েছি,—মহাপুরুষ! কি চেহারা—ওজনে দু'হন্দয় তিন কোয়াটার; দীর্ঘে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ৫ জ পাক্কা। বুঝলে—আসন ছেড়ে দেড় ফুট তিন ইঞ্চি তিন "জ্র" পর্য্যন্ত ওঠেন।" (এ সব লোহালক্কড়ের মাপ)। বলিলাম—"বলো কি! তা'হলে ত বৈতরণীর পোল্ বেঁধে বসে আছ।"

অমর হাসিমুখে বলিল—"তোমার সে স্বভাব আজো যায়নি,—এতেও ঠাট্টা।"

বলিলাম—"ঠাট্টা নয় ভাই,—গুরু যা পাকড়েছ—ও মাল্ বহুৎ সৌভাগ্যে মেলে! যা শোনালে, বৈতরণীর কোথাও তাঁর ডুব-জল হবে না;—হেঁটে মেরে দেবেন।"

অমর একটু বিরক্ত ভাবে বলিল—"তুমি সেই বেল্লিকই আছ, তোমার কাছে গুরুদেবের প্রসঙ্গ চল্‌বে না। বরং তোমার কথাই শুনি, কাশীতে কাটাও—কি রকম পেলে?"

বলিলাম—"তুমি কি বলবে জানি না—আমার ভাগ্যে ভাই একটা পাঞ্জাবী জামাও জোটেনি।"

অমর বলিল—"নাঃ—তোমাকে পারলুম না! তা' হোক্, বহুকাল পরে পেয়ে ভারি আনন্দ হচ্চে, না বলেও থাকতে পারি না। কিছুদিন হ'ল এখানে একজন অবধুত সন্ন্যাসী এসেছেন,—ধন্বন্তরী বল্‌লে হয়। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে,—যাবে?"

বলিলাম—"কেন, কাজ আছে না কি?"

অমর। বিনা মতলবে শর্ম্মা কোথাও যান না। কানের জন্যে কবিরাজী, হাকিমী, ইউনানী অ্যালোপ্যাথী, জোলোপ্যাথী, ইলেক্‌ট্রো—সবই করেছি; এখন একবার অবধুত সন্ন্যাসীর দৈবপ্যাথী দেখব'। তাঁদের কৃপা হ'লে মুহূর্ত্তেই মার্ দিয়া!"

বলিলাম—"আর কেন অমর। মঙ্গলময় যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। ছেলেরা এখন আমাদের "ওল্ড-ফুল" (Old fool) ত' বলেই,—সেটা তোমার শুন্‌তে হয় না; বউমাদের একটু আরাম দেওয়া হয়—অসঙ্কোচে গলা সাধতে পারেন; বিশেষ বিশেষ স্থলে—কোর্টে হলপ্ করে বলা চলে—'শুনিনি'। এ সব ভগবানদত্ত সুবিধা ছাড়তে নেই।

অমর হাসিয়া বলিল—"যা বলেছ, তবে কাছে পেয়ে দেখাটা ভাল;—এ সুবিধেও ছাড়তে নেই হে।"

বলিলাম—'বেশ, রাজি আছি।"

অমর কি জানি কি ভাবিয়া মত পরিবর্ত্তন করিল, বলিল—"তোমরা কাজ নিতে জান না, সব বিগড়ে না দাও!"

বলিলাম—"আচ্ছা, তুমিই আগে হয়ে এস।"

মাতুল যেন চট্‌কা ভাঙিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কোথায়?"

বলিলাম—"সাধুর কাছে।"

মাতুল। কাণ মেরামতের জন্যে বুঝি? যেন 'শিশি" নিয়ে যান।" বলিলাম—"সাধুর কাছে শিশি কেন?"

মাতুল। পায়ের ধূলো দিন,—ঐ কথাই ত আমিও বলি। আমি কি যেতে বাকি রেখেচি মশাই! মহাপুরুষ সব শুনে বল্লেন—'শিশি এনেছ!' আমি ত শুনেই বোকা মেরে গেলুম। সাধুর কাছে শিশি কি মশাই! শিশি ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত চলেছিল। সাধু একটু পায়ের ধূলো দিন, না হয় একটিপ্ বিভূতি ঝেড়ে অভয় দিন—"

বলিলাম—"বড় জোর তাতে একটা ফুঁ মেরে দিন—" ব্যাস্।"

মাতুল। এই ত' বলুন ত' মশাই সেখানেও শিশি! এ কি বটকেষ্ট পালের দোকানে এসেছি, বলুন?'

বলিলাম—"ঠিক ত!"

সাময়িকী

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপালিটীগুলির অন্যতম। এই মিউনিসিপালিটীর পরিচালন সম্বন্ধে যে নূতন আইন জারী হইয়াছে, সেই আইন অনুসারে এই বৎসর হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা ছিলেন চেয়ারম্যান; তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। এখন আর চেয়ারম্যান পদ থাকিল না; এখন যিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার নাম হইল প্রধান কার্য্যকারক (Chief Executive officer)। তিনিই কিন্তু সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন না; তাঁহার উপরে আরও দুইজন কর্ত্তা হইলেন; তাঁহাদের নাম হইল মেয়র ও ডেপুটী মেয়র। ইঁহারা সকলেই করদাতৃগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইলেন। স্বরাজ দলের অধিনায়ক দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কলিকাতার প্রথম মেয়র হইলেন; ডেপুটী মেয়র হইলেন শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দি মহোদয়, আর প্রধান কার্য্যকারক হইলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়। ইঁহারা সকলেই স্বরাজ-দলভুক্ত, স্বরাজ দলের নেতৃ-স্থানীয়। এবার কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সদস্য বা কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশই স্বরাজ দলভুক্ত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে অন্ততঃ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের সকলেই এই স্বরাজ মিউনিসিপালিটীর কার্য্যক্ষমতা দেখিবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু ও তাঁহার সুযোগ্য সহযোগিগণ মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে তাঁহাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া যশোমণ্ডিত হইবেন। তাই আমরা আজ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে বিলাতে বৃটিশসাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে; এবং সম্রাট মহোদয় এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, এই প্রদর্শনী হইতে বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যসমূহ পরস্পরের অভাব মোচনের অবসর পাইবে, সাম্রাজ্য মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইবে এবং সকলেরই মঙ্গল হইবে। আমরা কিন্তু মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক দেখিতেছি। আমাদিগের শিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থায় কোন পাশ্চাত্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় আমাদিগের এখানে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, যদি সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য কোন দেশ হইতে তাহার আমদানি হয়, তাহা হইলে আমরা প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারিব কি? তারপর পরস্পর সহানুভূতির কথা। কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহানুভূতি কতদূর, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও কেনিয়া প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। এ অবস্থায় এই প্রদর্শনী হইতে আমাদিগের কি উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এ দেশের শ্বেতাঙ্গ-সভা বা ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসন ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ভারত-সচিবের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আজকাল ভারতের হিন্দু, মুসলমান, চরমপন্থী, মধ্যপন্থী সকলেই শাসন-সংস্কার বিধানের আশু পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছেন; দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট এক বিভাগীয় অনুসন্ধান কমিটিও বসাইয়াছেন; ভারত হইতে বেশান্ত ও মান্যবর শাস্ত্রী প্রমুখ দুই চারিজন বিলাতে পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। অবস্থায় যাঁহারা প্রথম হইতে শাসন-সংস্কারের তীব্র বাদ করিয়াছিলেন, "গেল রাজ্য গেল মান" বলিয়া করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "বাঘের মুখে ক্ষেপ করা হইতেছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি নীরব থাকিতে পারেন? পাছে সংধানের

ভাবিলাম—সুজলা সুফলা দেশের এই মোলায়েম জাতটির নিরীহ ছেলেগুলি দৃঢ়তা বলিয়া কোন কিছুর ধার ধারে না, Sentimentএর উপর সাঁতার কাটে,—ডুব দিতে নারাজ।

সহসা আমার দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে একটা টিপুনি দিয়া, অমর আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া নীচু সুরে বলিল—একটি "সিদ্ধ পাঞ্জাবী গুরু পেয়েছি,—মহাপুরুষ! কি চেহারা—ওজনে দু'হন্দয় তিন কোয়াটার; দীর্ঘে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ৫ জ পাক্কা। বুঝলে—আসন ছেড়ে দেড় ফুট তিন ইঞ্চি তিন "জ" পর্য্যন্ত ওঠেন।" (এ সব লোহালক্কড়ের মাপ)। বলিলাম—"বলো কি! তা'হলে ত বৈতরণীর পোল্ বেঁধে বসে আছ।"

অমর হাসিমুখে বলিল—"তোমার সে স্বভাব আজো যায়নি,—এতেও ঠাট্টা।"

বলিলাম—"ঠাট্টা নয় ভাই,—গুরু যা পাকড়েছ—ও মাল্ বহুৎ সৌভাগ্যে মেলে! যা শোনালে, বৈতরণীর কোথাও তাঁর ডুব-জল হবে না;—হেঁটে মেরে দেবেন।"

অমর একটু বিরক্ত ভাবে বলিল—"তুমি সেই বেল্লিকই আছ, তোমার কাছে গুরুদেবের প্রসঙ্গ চল্‌বে না। বরং তোমার কথাই শুনি, কাশীতে কাটাও—কি রকম পেলে?"

বলিলাম—"তুমি কি বলবে জানি না—আমার ভাগ্যে ভাই একটা পাঞ্জাবী জামাও জোটেনি।"

অমর বলিল—"নাঃ—তোমাকে পারলুম না! তা' হোক্, বহুকাল পরে পেয়ে ভারি আনন্দ হচ্চে, না বলেও থাকতে পারি না। কিছুদিন হ'ল এখানে একজন অবধুত সন্ন্যাসী এসেছেন,—ধন্বন্তরী বল্‌লে হয়। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে,—যাবে?"

বলিলাম—"কেন, কাজ আছে না কি?"

অমর। বিনা মতলবে শর্ম্মা কোথাও যান না। কাণের জন্যে কবিরাজী, হাকিমী, ইউনানী অ্যালোপ্যাথী, জোলোপ্যাথী, ইলেক্‌ট্রো—সবই করেছি; এখন একবার অবধুত সন্ন্যাসীর দৈবপ্যাথী দেখব'। তাঁদের কৃপা হ'লে মুহূর্ত্তেই মার্ দিয়া!"

বলিলাম—"আর কেন অমর। মঙ্গলময় যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। ছেলেরা এখন আমাদের "ওল্ড-ফুল" (Old fool) ত' বলেই,—সেটা তোমার শুন্‌তে হয় না; বউমাদের একটু আরাম দেওয়া হয়—অসঙ্কোচে গলা সাধতে পারেন; বিশেষ বিশেষ স্থলে—কোর্টে হলপ্ করে বলা চলে—'শুনিনি'। এ সব ভগবানদত্ত সুবিধা ছাড়তে নেই।

অমর হাসিয়া বলিল—"যা বলেছ, তবে কাছে পেয়ে দেখাটা ভাল;—এ সুবিধেও ছাড়তে নেই হে।"

বলিলাম—'বেশ, রাজি আছি।"

অমর কি জানি কি ভাবিয়া মত পরিবর্ত্তন করিল, বলিল—"তোমরা কাজ নিতে জান না, সব বিগড়ে না দাও!"

বলিলাম—"আচ্ছা, তুমিই আগে হয়ে এস।"

মাতুল যেন চট্‌কা ভাঙিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কোথায়?"

বলিলাম—"সাধুর কাছে।"

মাতুল। কাণ মেরামতের জন্যে বুঝি? যেন 'শিশি' নিয়ে যান।" বলিলাম—"সাধুর কাছে শিশি কেন?"

মাতুল। পায়ের ধূলো দিন,—ঐ কথাই ত আমিও বলি। আমি কি যেতে বাকি রেখেচি মশাই! মহাপুরুষ সব শুনে বল্লেন—'শিশি এনেছ!' আমি ত শুনেই বোকা মেরে গেলুম। সাধুর কাছে শিশি কি মশাই! শিশি ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত চলেছিল। সাধু একটু পায়ের ধূলো দিন, না হয় একটিপ্ বিভূতি ঝেড়ে অভয় দিন—"

বলিলাম—"বড় জোর তাতে একটা ফুঁ মেরে দিন—" ব্যাস্।"

মাতুল। এই ত' বলুন ত' মশাই সেখানেও শিশি! এ কি বটকেষ্ট পালের দোকানে এসেছি, বলুন?'

বলিলাম—"ঠিক ত।"

সাময়িকী

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপালিটীগুলির অন্যতম। এই মিউনিসিপালিটীর পরিচালন সম্বন্ধে যে নূতন আইন জারী হইয়াছে, সেই আইন অনুসারে এই বৎসর হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা ছিলেন চেয়ারম্যান; তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। এখন আর চেয়ারম্যান পদ থাকিল না; এখন যিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার নাম হইল প্রধান কার্য্যকারক (Chief Executive officer)। তিনিই কিন্তু সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন না; তাঁহার উপরে আরও দুইজন কর্ত্তা হইলেন; তাঁহাদের নাম হইল মেয়র ও ডেপুটী মেয়র। ইঁহারা সকলেই করদাতৃগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইলেন। স্বরাজ দলের অধিনায়ক দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কলিকাতার প্রথম মেয়র হইলেন; ডেপুটী মেয়র হইলেন শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দি মহোদয়, আর প্রধান কার্য্য কারক হইলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়। ইঁহারা সকলেই স্বরাজ-দলভুক্ত, স্বরাজ দলের নেতৃ-স্থানীয়। এবার কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সদস্য বা কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশই স্বরাজ দলভুক্ত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে অন্ততঃ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের সকলেই এই স্বরাজ মিউনিসিপালিটীর কার্য্যক্ষমতা দেখিবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু ও তাঁহার সুযোগ্য সহযোগিগণ মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে তাঁহাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া যশোমণ্ডিত হইবেন। তাই আমরা আজ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে বিলাতে বৃটিশসাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে; এবং সম্রাট মহোদয় এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, এই প্রদর্শনী হইতে বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যসমূহ পরস্পরের অভাব মোচনের অবসর পাইবে, সাম্রাজ্য মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইবে এবং সকলেরই মঙ্গল হইবে। আমরা কিন্তু মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক দেখিতেছি। আমাদিগের শিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থায় কোন পাশ্চাত্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় আমাদিগের এখানে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, যদি সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য কোন দেশ হইতে তাহার আমদানি হয়, তাহা হইলে আমরা প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারিব কি? তারপর পরস্পর সহানুভূতির কথা। কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহানুভূতি কতদূর, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও কেনিয়া প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। এ অবস্থায় এই প্রদর্শনী হইতে আমাদিগের কি উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এ দেশের শ্বেতাঙ্গ-সভা বা ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসন ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ভারত-সচিবের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আজকাল ভারতের হিন্দু, মুসলমান, চরমপন্থী, মধ্যপন্থী সকলেই শাসন-সংস্কার বিধানের আশু পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছেন; দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট একটী বিভাগীয় অনুসন্ধান কমিটিও বসাইয়াছেন; ভারত হইতে সিবি বেশান্ত ও মান্যবর শাস্ত্রী প্রমুখ দুই চারিজন বিলাতে এ পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। এ অবস্থায় যাঁহারা প্রথম হইতে শাসন-সংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, "গেল রাজ্য গেল মান" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "বাঘের মুখে" নিক্ষেপ করা হইতেছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি নীরব থাকিতে পারেন? পাছে সংস্কার বিধানের

আশু কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীর অমঙ্গল সাধন করেন, এই আশঙ্কায় ভারত-প্রেমিক পরার্থপর মহাপুরুষেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সংস্কারপ্রার্থী ভারতবাসীরা যাহা চাহিতেছেন, তাহা ভারতের নিরক্ষর বিপুল জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল। তাঁহারা ভারতের অর্থাৎ অধিকাংশ ভারতবাসীর অমঙ্গল সাধন করিতে চাহিতেছেন। তাই ভারতের মূর্খ জনসাধারণের প্রকৃত হিতৈষী, দয়ার সাগর শ্বেত-কলেবর মহাশয়েরা ভারত-সচিবকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তিনি যেন কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিয়া সংস্কার-আইনের আশু পরিবর্ত্তন সাধন দ্বারা ভারতের অনিষ্ট করিয়া না ফেলেন। পরার্থপরতা ও উদারতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেহ দেখিয়াছেন কি? শ্বেতাঙ্গ সভার আবেদনে নূতন কথা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই "থোড় বড়ি খাড়া", সেই অশিক্ষিত নীরব রাজভক্ত জনসাধারণের স্বার্থ, ভারতের মঙ্গল, সেই উচ্চ জাতিসমূহের অত্যাচার হইতে নিম্নতর জাতিসমূহকে রক্ষা, এইরূপ মামুলী কথায় আবেদনখানি পূর্ণ। লর্ড অলিভিয়ার্স শ্বেতাঙ্গ সভায় শিরঃপীড়া দূরীকরণ-কল্পে কি ঔষধের প্রয়োগ করেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের আগ্রহ রহিল।

কি প্রকারে ভারতের লৌহ ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি শুল্ক-সমিতির (Tariff Board) মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন যে, উপযুক্ত ভাবে চেষ্টা করিলে ভারতে লৌহ ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। ভারতে অশোধিত লৌহ (Ore) প্রচুর পরিমাণেই আছে। আপাততঃ বিদেশী লৌহ ব্যবসায়িগণের যাহাতে ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য শতকরা ২০ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক বিদেশ হইতে আনীত লৌহ-দ্রব্যের উপর স্থাপিত করিতে সমিতি পরামর্শ দিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে দেশের লৌহ-ব্যবসায়িগণকে অর্থ-সাহায্য করিতেও শুল্ক-সমিতি পরামর্শ দিয়াছেন। সমিতি প্রথমে তিন বৎসরের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় শীঘ্রই একটী আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হইবে। সরকার-পক্ষ হইতে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি-কল্পে সংরক্ষণ নীতির অবলম্বন এই সর্ব্বপ্রথম। ভারত-সরকার এই নীতির পক্ষপাতী হইলে তাহাতে ভারতের মঙ্গল হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গে মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুধী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। শিক্ষকদিগের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের দুরবস্থার বিষয়ে দুই এক কথা বলিব। আজকাল সূত্রধর কি রাজমজুর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদের অপেক্ষা অধিক রোজগার করে; এ কথা মনে করিলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিমাত্রেরই লজ্জায় মুখাবনত হয়। আমার মতে কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষককে ও মাসিক ৪০ টাকার কম বেতনে নিযুক্ত করা উচিত নহে; ও পরে তাঁহাদের বেতন যাহাতে অন্ততঃ ক্রমিক ৭৫ টাকায় বৃদ্ধি পায় ও দক্ষতা দেখাইতে পারিলে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার বিধান করা উচিত। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকদিগের মাসিক বেতন যাহাতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত ক্রমবৃদ্ধি হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের কর্ম্মের অবসানে তাঁহারা যাহাতে বৃদ্ধ বয়সে অস্বচ্ছল অবস্থায় কষ্ট না পান তাহারও ব্যবস্থা আবশ্যক। বিলাতে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া কষ্টকর হইত বলিয়া ১৯১৮ সালে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আইনে শিক্ষকদিগের পেন্‌সন্ দিবার বিধান করা হয় এবং তদবধি উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সহজ হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি, সরকারী বা বেসরকারী হউক, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীরই হউক, বা নিম্নশ্রেণীরই হউক, সব যখন প্রস্তাবিত বোর্ডের অধীনে আসিবে, তখন সব শ্রেণীর শিক্ষকদিগের জন্য বোর্ড হইতে পেন্‌সন্ বা Provident Fund স্থাপন করা সঙ্গত ও সম্ভব হইবে।"

আর্থিক সমস্যার পর সভাপতি মহাশয় আয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেন যে, "বঙ্গপ্রদেশে সমস্ত বালক-বালিকাকে

বৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যয় বর্ত্তমান রাজস্ব হইতে সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হইবে না; কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যয় যে রাজস্ব হইতে সম্ভব নয়, তাহা আমি বলি না। ধনী জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ বিষয় সাহায্য করিবেন আশা করিতে পারি ও তাহাতে করেন তাহার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইব মনে হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সালকাবারী হিসাবপত্র আমি দেখিয়া থাকি। আমাদের প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে অন্যান্য দিকে কতক কতক ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া যে আরও দশ, বিশ লক্ষ, কি ততোধিক উচ্চশিক্ষা সংস্কারের জন্য অর্থ-সাহায্য করা যায়, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের ব্যবস্থাপক সভা শিক্ষাবিভাগের পর্য্যবেক্ষণ খরচ নামঞ্জুর করিয়াছেন। অবশ্য একেবারে ৬ লক্ষ টাকা একদিনে কমান সম্ভব ও সঙ্গত না হইতে পারে, তবে শিক্ষার খরচের তুলনায় যে পর্য্যবেক্ষণ খরচ অত্যধিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট এখন সরকারী খরচে যে জেলাগুলি পোষণ করেন, তাহার আর সার্থকতা নাই। সেই স্থলে সঙ্কোচ করিয়া সরকারী সাহায্য দিয়া প্রতি জেলায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের সহায়তা করিতে পারেন। সাধারণ লোকেও এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। দেখা গিয়াছে যে, অনেক জেলায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণের সহায়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি যে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি সেগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজ বলিলেও কিছু যায়-আসে না। যখন সাধারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই শ্রেণীর স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, তখন বোর্ডের সহায়তা পাইলে সেগুলি যে উচ্চশিক্ষা দিবার উপযোগী করা যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে বাঙ্গালার শিক্ষা-বিস্তার ও উন্নতি বিধায় যে কোন সাহায্য পাইবার আশা রাখি না, সে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্বন্ধে কেবল একটী কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। কেহ কেহ বাঙ্গালায় পাটের চাষের বিরোধী। আমি তাহা নহি। পাট চাষ পৃথিবীতে বাঙ্গালা দেশের এক রকম একচেটে। ইহা চাষ করিয়া বাঙ্গালার কৃষকের ঘরে যে পয়সা আসে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়া সেই অর্থের কতকটা শিক্ষা ও শিল্প-উন্নতির কার্য্যে ব্যয় করিলে এই দুই গুরুতর সমস্যার সহজ মীমাংসা হইয়া যায়। সে ত পরের কথা। ভারত গভর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে এখন কোন বিষয়ে সাহায্য না করিয়া অতি অবৈধ ভাবে বাঙ্গালা দেশ হইতে যে পাট ও চট রপ্তানি হয় তাহার উপর শুল্ক বসাইয়া বৎসর বৎসর প্রায় ২৷৷০ কোটী টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করেন। বাঙ্গালা হইতে গড়ে বাৎসরিক ২৪ কোটী টাকার পাট ও ৫০ কোটী টাকার চট রপ্তানি হয়। এই আড়াই কোটী টাকা সঙ্গতরূপে আমাদের প্রাপ্য; তাহা পাইলে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি অতি সহজেই সাধিত হইতে পারে।"

শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বলিয়াছেন—

"বঙ্গ-ভঙ্গের সময় জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে সব সদাশয় ব্যক্তি প্রায় ১২ লক্ষ টাকা দান করেন, তাঁহাদের বদান্যতার বিষয় আপনারা অবগত আছেন। তৎকালে অন্যান্য মহানুভব ব্যক্তিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। বঙ্গের এইরূপ একটী স্বনামধন্য মহাত্মার বদান্যতায় আজ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মূলধন ২৫ লক্ষ কি ততোধিক দাঁড়াইয়াছে। তাহার আয় হইতে একটী শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার প্রসারণের জন্য কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে যাদবপুরে এক শত বিঘা জমি লইয়া শিল্পশিক্ষার উপযোগী কারখানা, পাঠগৃহ, ছাত্রাবাস, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইতেছে। এই শিল্প-বিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষা শেষ করিয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া বাহির হন, তাঁহাদের কাহারও উপজীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ভাবিতে হয় না। কিন্তু এইরূপ একটী বিদ্যালয়ে কি হইবে? ইংলণ্ডে নানারূপ শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য ৩১৪৩টি বিদ্যালয় (Technical School) আছে, তাহাতে ৪১৭,১৪৮ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পায় ও তাহাদের অধিকাংশেরই বয়স ১৭র কম। অন্য এক শ্রেণীর শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতেও প্রায় ১লক্ষ ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রায় ২২০টি, ভাস্কর-বিদ্যা ও অন্যান্য সুকুমার-কলা শিক্ষা দিবার বিদ্যালয় আছে।"

স্কট্‌লণ্ডের ও আয়ারলণ্ডের শিল্প ও কলা শিক্ষা দিবার অনুরূপ বহু বিদ্যালয় আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে না গিয়া ১৫ কি ১৬ বৎসর হইতে শিল্প-শিক্ষা করিতে থাকে। আবার অনেকে ১৮ বৎসরে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়া ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ও কলকারখানা ও স্থপতি বিদ্যাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ঐ সব বিষয় সবিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তথায় যায়। এই সব কারণে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে তত ভিড় নাই। আমাদের ছেলেদের শিক্ষা দিবার জন্য যত স্কুল কলেজ, সব এক ছাঁচে গড়া। যাহা হউক এ সম্বন্ধে যখন আমাদের চৈতন্য আসিয়াছে, তখন আশা করি বিভিন্ন শিক্ষার দিকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িবে।"

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যোগেশ বাবু বলিয়াছেন—

"উচ্চশিক্ষার স্কুলগুলি সংস্কৃত হইলে তাহার চালনা, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভার কাহার উপর থাকিবে? বিলাতে ও অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চালনার ভার উহার অধ্যক্ষদিগের উপর ও উচ্চ বিদ্যালয়ের চালনা ও পর্য্যবেক্ষণের ভার কতকটা স্থানীয় কাউন্‌সিল্ উচ্চশিক্ষার একটি বোর্ডের উপর থাকে। আয়ার্ল্যা এই বোর্ডকে Board of Secondary Educati বলা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের না পাঠ্য বিষয় ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, অধ্যক্ষদিগের প ৯০০ কি হাজারটি স্কুলের পরিচালনের ভার লওয়া সম্ভব নহে। এই কারণেই উচ্চশিক্ষা দিবার বিদ্যালয়গু পরিচালনের ভার একটি স্বতন্ত্র বোর্ডের উপর দেও সঙ্গত। পাঠ্য নির্দ্ধারণ, উপযুক্ত শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্ত সরকারী সাহায্য দান, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পরিচা প্রভৃতি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে। বো সম্পাদক অবৈতনিক লোক হইলে চলিবে না। কাজের জন্য শিক্ষা-সম্বন্ধে যতদূর সুদক্ষ ব্যক্তি পাওয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে। শি বিভাগের ডিরেক্টারের পদ যদি বহাল রাখা না হয়, ত হইলে শিক্ষা-সচিবের সেক্রেটারির দ্বারায় সে এ ক চলিবে, এ একটি ভুল বিশ্বাস। যে লোক সরকারি দপ্তর ভিতর ডুবিয়া থাকে, চিঠি-পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তরে ও না রূপ কৈফিয়ৎ আদান-প্রদান ও রিপোর্টের মুসাবিদা ইত্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তাহার দ্বারা বোর্ডের সম্পাদকীয় কা চলিতে পারে না।"

সাহিত্য-সংবাদ

আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ৯৯ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "গরীব" প্রকাশিত হইল।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত নূতন উপন্যাস "পরের ছেলে" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পল্লীরাণী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "অপূর্ণ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲

ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত নূতন পুস্তক "গ্রামের কথা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲

শ্রীমানকুমারী বসু প্রণীত কবিতা-পুস্তক "বিভূতি" প্রকাশি হইল। মূল্য ১৷৷০

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আট আনা সংস্ক গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থ "বেগম সমরুর" দ্বিতীয় সংস্করণ বহু চি শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত কবিতা-পুস্তক "যৌবনের গা প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০

সুপ্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত বহুচিত্রশোভি "পাখী" প্রকাশিত হইয়াছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.